ভারতকোষ

তৃতীয় খণ্ড

ভারতকোষ

তৃতীয় খণ্ড

খই - থ্রম্বোসিস

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীআদিত্য ওহদেদার
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীচিন্তামণি কর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
শ্রীনির্মলকুমার বসু
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী
শ্রীবিনয় দত্ত
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীসুকুমার সেন
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুশীলকুমার দে

সহ-সম্পাদক

শ্রীঅশোকা সেন...
শ্রীকামিনী...
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ
...মণীন্দ্রনাথ রায়
শ্রীসুধেন্দুপ্রসাদ বসু

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
কলিকাতা

ব্যবস্থাপনা-সমিতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীসুশীলকুমার দে | শ্রীনির্মলকুমার বসু
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার | শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
শ্রীত্রিদিবনাথ রায় | শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

কর্মসচিব

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

প্রধান সহকারী

শ্রীসুবিমল লাহিড়ী | শ্রীরাধামাধব তর্কতীর্থ
শ্রীদীপ্তি সমাদ্দার

সহায়ক

শ্রীমিনতি দাশগুপ্ত | শ্রীপূরবী চক্রবর্তী
শ্রীনিমাইচাঁদ দে

কর্মী

শ্রীপাঁচুগোপাল ধাওয়া | শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতিবিধানকল্পে প্রদত্ত সরকারি অর্থানুকূল্য লাভের ফলে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করা হইয়াছে।

ভারতকোষ তৃতীয় খণ্ডের প্রসঙ্গনির্বাচন, তথ্যসংকলন, রচনাসম্পাদন এবং প্রকাশনা বিষয়ে ইঁহারা সম্পাদকমণ্ডলীকে সাহায্য করিয়াছেন।

আচার অনুষ্ঠান

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

দর্শন

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য

ভাষাতত্ত্ব

শ্রীদীপ কর দাশগুপ্ত
শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
[illegible]
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীপুলিনবিহারী সেন
শ্রী[illegible]রঞ্জন ঘোষ
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত
শ্রীভবতোষ দত্ত
শ্রী[illegible] গুপ্ত

অর্থনীতি

শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস
শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
শ্রীঅমিয় বাগচী
শ্রীঅশোক মিত্র
শ্রীঅশোক সেন
শ্রীশক্তিব্রত সরকার
শ্রীশ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী
শ্রীসঞ্জিত বসু

আইন

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

[illegible]

শ্রীঅভিজিৎ গুপ্ত
শ্রীঅমিতকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীঊষা সেন
শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়
শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন
শ্রীতারাপদ সাঁতরা
শ্রীদিনেশকুমার সোম
শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায়
শ্রীযোগেশপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী
শ্রীঅজিতকুমার সাহা
শ্রীঅনিলকুমার আচার্য
শ্রীঅনিলকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য
শ্রীঅরূপকুমার সিংহ
শ্রীআরাধনা দাশ
শ্রীকপিল ভট্টাচার্য
শ্রীকমলকুমার মল্লিক
শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচিত্তরঞ্জন সর্বাধিকারী
শ্রী[illegible] সেন
শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী
শ্রীপদ্মনাভ দাশগুপ্ত
শ্রীপরিমলবিকাশ সেন
শ্রী[illegible] রায়
শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক
শ্রীবাসন্তিকা লাহিড়ী
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবেদান্তকুমার সিংহ
শ্রীভাস্কর চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমনীষা বসু

শ্রীমহাদেব দত্ত
শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ
শ্রীরঙ্গলাল ভট্টাচার্য
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীরমাতোষ সরকার
শ্রীশক্তিকান্ত চক্রবর্তী
শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামলকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীসত্যময় মুখোপাধ্যায়
শ্রীসত্রাজিৎ দত্ত
শ্রীসন্তোষকুমার পাইন
শ্রীসীমানন্দ অধিকারী
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীসুবিমল দেব
শ্রীসুব্রত রায়
শ্রীসুরজিৎ সিংহ
শ্রীসুযেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য

চিত্রকলা

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ

শ্রীকুমার রায়
শ্রীকৌস্তভ মুখোপাধ্যায়
শ্রীনির্মাল্য আচার্য
শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

শ্রীকরুণাশংকর রায়
শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত
শ্রীধ্রুব গুপ্ত
শ্রীমৃগাঙ্কশেখর রায়

সংগীত

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীভাস্কর মিত্র
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ক্রীড়া

শ্রীঅজয় বসু
শ্রীমুকুল দত্ত

ভারতকোষে অনুসৃত বর্ণানুক্রম

অ	আ	অ্যা	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ	ং	ঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ড়
ঢ	ঢ়	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	ব	ভ	ম	
য	য়	র	ল	শ	ষ	স	হ						

অ্যা স্বতন্ত্র স্বর হিসাবে আ-এর পরে গণ্য হইয়াছে, যেমন 'আহোম'-এর পর 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান', কিন্তু য-ফলা+আ-কার-এর উচ্চারণ 'অ্যা'-এর মত হইলেও উহা যথাস্থানেই বিন্যস্ত হইয়াছে, তাই 'অগ্নিহোত্র'-এর পর 'অগ্ন্যাশয়'। ৎ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে পরিগণিত না হইয়া হস্‌-যুক্ত 'ত'-রূপে গৃহীত হইয়াছে। বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-কারান্ত ব্যঞ্জন হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়, তাই স্থলনির্দেশপ্রসঙ্গে কোনও বর্ণের হসন্ত ও অ-কারান্ত রূপের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই, যথা 'অকলঙ্ক'-এর পর 'অক্‌ল্যাণ্ড', 'উৎপল বংশ'-এর পর 'উত্তঙ্ক'। বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে 'ণ্ট' বা 'ণ্ড' ণ্‌+ট বা ণ্‌+ড হিসাবে উল্লিখিত হয় নাই, ন্‌+ট ও ন্‌+ড-রূপে গৃহীত হইয়াছে। তাই যদিও 'অণুবীক্ষণ'-এর পর 'অণ্ড'— তথাপি 'অ্যানেস্থেসিয়া-এর পর 'অ্যান্টিবায়োটিক্‌স' বা 'ইনসুলিন-এর পর 'ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েন্টালিস্ট্‌স' দেওয়া হইয়াছে।

সংকলন ও প্রকাশন-কার্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীইন্দ্রাণী রহমান, শ্রীকালীপদ সরকার, শ্রীগোপালদাস রায়, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীতারকনাথ লাহিড়ী, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীনকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিঃশঙ্ক ঘোষ, শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত ('যুগান্তর'), শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীবিমলকুমার মল্লিক, শ্রীমুকুলিকা কোনাব, শ্রীসুজিৎকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহিরণকুমার সান্যাল। ইঁহাদের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

লেখকবিবরণ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ঘুম ; চক্ষু ; জিহ্বা

শ্রীঅজয় বসু, ক্রীড়া বিভাগ, 'যুগান্তর' , ডেভিস কাপ

শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ / ঘাম ; জিহ্বা ; ত্বক

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বন বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / গাব ; ছাতিম ; জারুল

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, ইংরেজী বিভাগ, আশুতোষ কলেজ / গণপতি চক্রবর্তী

শ্রীঅঞ্জন সিংহ, পশুচিকিৎসা বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / ছাগল ; ডেয়ারি

শ্রীঅঞ্জনা রায়চৌধুরী, ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ / ঘাটপ্রভা

শ্রীঅণিমা তালুকদার, কলিকাতা / গজলক্ষ্মী

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ / ডিবেঞ্চার ; ডিভিডেন্ড

শ্রীঅধীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / গুর্জর প্রতীহার

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট অফ প্রাকৃত, জৈনোলজি অ্যাণ্ড অহিংসা, বৈশালী / জ্ঞানশ্রী-মিত্র

শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ, ইনস্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিক্‌স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ট্রানজিস্টর

শ্রীঅনিন্দ্যকুমার পাল, ভূগোল বিভাগ, উত্তর বঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয় / ডুয়ার্স , তাঞ্জোর

শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা সহায়ক / গাথা[২] , গ্রিয়র্সন, জর্জ আব্রাহাম ; তেস্‌সিতোরি, লুইজি পিও

শ্রীঅনিলকুমার কুণ্ডু, ন্যাশন্যাল অ্যাটলাস অর্গানাইজেশন চিল্কা

শ্রীঅনিলকুমার দত্ত, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / গৈরিক ; গ্রথন ; ডিপজিট

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মজুমদার, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / খান্দেশ

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সেন্টেনারি প্রফেসার অফ ইন্টার-ন্যাশন্যাল রিলেশন্‌স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , খালসা

শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সম্পাদক, 'গ্রন্থপরিক্রমা' / গ্যারিবল্ডি, জিউসেপ্‌পে ; জাতিসংঘ ; তারিণীচরণ মিত্র

শ্রীঅভিজিৎ গুপ্ত, ভূগোল বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / খম্বাত উপসাগর

শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' / টাইপ-রাইটার

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, যুগ্ম কর্মসচিব, 'ভারতকোষ' / চিত্র-কলা , ছাত্র-আন্দোলন ; জনসংঘ, ভারতীয় ; টমসন, জোসেফ জন ; টেরাকোটা ; ড্যুরের, আল্‌ব্রেশ্‌ট ; তোগলকাবাদ

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন / খাজনা ; খেতমজুর , গণতন্ত্র ; চর্মশিল্প ; চিনিশিল্প ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; চীন , জাতি[১] , জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন ট্যারিফ্‌স অ্যাণ্ড ট্রেড ; ট্যারিফ বোর্ড , ট্রেড ইউনিয়ন , ডোমিনিয়ন

শ্রীঅমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ / জোঁক

শ্রীঅমলচন্দ চৌধুরী, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গণেশপ্রসাদ , গালোয়া, এভারিস্ত

শ্রীঅমলচন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ / গোরু

শ্রীঅমল ভট্টাচার্য, ইংরেজী বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি

শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, ট্যুরিস্ট ব্যুরো, পশ্চিম বঙ্গ সরকার খেতুরি

শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, কলিকাতা / গ্রিফিথ, ডেভিড ওয়ার্ক

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ঝালাই ; ঢালাই

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / চন্দেল্ল ; চৌহানবংশ ; জয়চন্দ্র ; জয়সিংহ

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / চার্নক, জোব

শ্রীঅমিতাভ সেন, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলেজ অফ লেদার টেক্‌নোলজি / গিব্‌স, যোসিযাহ্‌ উইলার্ড, গ্রাস্‌মান, হের্‌মান গুন্‌থের, চেভিশেভ, পাফ্‌নুতিই ল্‌ভোভিচ্‌; জীন্‌স, জেম্‌স হপ্‌উড, জেনো, টলেমি

শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চীনাভবন, বিশ্বভারতী / চীনা সাহিত্য

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, কলিকাতা ডুবুরি

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, অধ্যক্ষ, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল / চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, পাঠভবন, বিশ্বভারতী / জগদানন্দ রায়

শ্রীঅমিয় বাগচী, অর্থনীতি বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / জোগান

শ্রীঅমূল্যধন দেব, ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা / গিয়ার, ঘড়ি, টালি, ড্রিল

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ছন্দ, বাংলা

শ্রীঅমৃতানন্দ দাস, 'ক্যাপিট্যাল' / গণক, গাণিতিক অর্থনীতি, জনতত্ত্ব

শ্রীঅরবিন্দ বসু, সেন্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউট অফ ফিশারিজ টেক্‌নোলজি, এরনাকুলম / খাদ্যসংরক্ষণ

শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য, আর জি. কর মেডিক্যাল কলেজ / টক্‌সিন

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট / গঙ্গেশ উপাধ্যায়, ট্র্যাজেডি

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, লোকসভার প্রাক্তন সদস্য / চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীঅরুণ মিত্র, ফরাসী বিভাগ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় / জোলা, এমিল

শ্রীঅরূপকুমার সিংহ, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ / ঝিনুক

শ্রীঅরূপরতন চট্টোপাধ্যায়, টেক্‌নিক্যাল অ্যাড্‌ভাইজরি কমিটি, ডায়াগ্‌নস্টিক সার্ভে অফ দামোদর ভ্যালি রিজন / গোরখপুর

শ্রীঅলককুমার মজুমদার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় / চিন্তা[১]

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / চালচিত্র, চিত্রকলা: ভারতীয় চিত্রকলা

শ্রীঅশোককুমার মজুমদার, অধিকর্তা, মুংগালাল গোয়েঙ্কা ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অ্যাণ্ড রিসার্চ, ভারতীয় বিদ্যা ভবন / ডুরাণ্ড লাইন, তারনাথ, তিব্বত

শ্রীঅশোক মুস্তাফি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ / জিন্নাহ্‌, মুহম্মদ আলী

শ্রীঅশোকা সেনগুপ্ত, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি / গঙ্গাপ্রসাদ সেন, গালিচা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ[১], গেজেট, গেজেটিয়ার, গোপীমোহন ঠাকুর, গোবিন্দ অধিকারী, গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা, গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার-বিদ্যা, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনশী, চিন্তামণি, চিব্‌বাবুরি যজ্ঞেশ্বর, ছায়া-নৃত্য, ছৌ, জনার্দন কর্মকার, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ ঘোষাল, জাতীয় পতাকা, ঝা, গঙ্গানাথ, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, ঠাকুরদাস দত্ত

শ্রীঅসীমকুমার চক্রবর্তী, গবেষক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / জেলিমাছ

আঁতোয়ান, ফাদার এবেয়ার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / খ্রীষ্টধর্ম, জেস্যুইট, তাস্‌সো, তেরেন্‌তিয়ুস

শ্রীআদিত্য ওহদেদার, মুখ্য গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / খোদা-বখ্‌শ্‌ লাইব্রেরি

শ্রীআরতি দাশ, মনোবিদ্যা বিভাগ, বেথুন কলেজ / চক্ষু

শ্রীআশীষ বসু, অখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষদ / ঘট, চিকন, ঢোকরা কামার

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গাছ বেড়া, গাজন, গাজীর পট, গীতিকা, গোসানী, ঘনরাম চক্রবর্তী, ঘাটু, চড়ক, ঢেলা বাঁধা

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রসায়ন বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ / তামা, থোরিয়াম

শ্রীইন্দ্রশেখর রায়, চক্ষুরোগ বিভাগ, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা / চক্ষুরোগ

শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী / ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীউৎপল দত্ত, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, কলিকাতা / গ্র্যানভিল-বার্কার, হার্লি

শ্রীউত্তরা বসু, ভূগোল বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন / গণ্ডক, গোদাবরী; গোমতী, ঘর্ঘরা, চম্বল

শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ কলেজ / জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ; ডন সোসাইটি

শ্রীঊষা সেন, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গঙ্গাসাগর ; গড় মান্দারন ; গড় মুক্তেশ্বর ; গিরিডি ; গিলগিট ; গুপ্তিপাড়া ; গোসাবা ; চন্দ্রভাগা ; চীন ; জ্বালামুখী ; তাম্রবপর্ণী

শ্রীএণা সেন, অর্থনীতি বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ / জাহাজনির্মাণ-শিল্প

শ্রীকপিল ভট্টাচার্য, ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা / গৃহনির্মাণ ; চুর্ণী ; জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ; জলবিদ্যুৎ ; জলশক্তি ; ড্রেজার

শ্রীকমলকুমার মল্লিক, ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ, কলিকাতা / চিকিৎসাবিদ্যা ; জলাতঙ্ক ; জোলাপ ; জ্বর ; থ্রম্বোসিস

শ্রীকমল গুহ, কলিকাতা / গিরনার

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত, প্রাক্তন সম্পাদিকা, 'মন্দিরা' / চন্দ্রশেখর আজাদ ; জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / খাইবার গিরিপথ ; খাসি-জয়ন্তিয়া ; গঙ্গা ; গঙ্গোত্রী ; গাসের ক্রম ; গ্যাংটক ; গুরলা মান্ধাতা ; গোমল ; গোর্খা ; গোঁসাইথান ; গৌরীশংকর ; তিরিচ মীর

শ্রীকরুণা ভট্টাচার্য, দর্শন বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ / গুণ ; জাতি²

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গণেশ¹ ; চামুণ্ডা ; তিলক

শ্রীকল্যাণী দত্ত, সংস্কৃত বিভাগ, বাসন্তী দেবী কলেজ / গ্রহ ; গৌতম¹ ; গৌতম² ; জয়দেব ; তৈলঙ্গস্বামী

শ্রীকল্যাণী মল্লিক, লোরেটো হাউস, কলিকাতা / গোপীচন্দ্র ; গোরক্ষনাথ

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, রাজা রামমোহন রায় কলেজ, আরামবাগ / গন্ধতৈল

শ্রীকামাখ্যাকুমার চক্রবর্তী, যুগ্ম সচিব, বিধান বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / খনি আইন

শ্রীকামিনীকুমার দে, গণিত বিভাগ, গুরুদাস কলেজ / চন্দ্র ; তারা² ; তিথি

শ্রীকালীকুমার দত্ত, স্নাতকোত্তর ও গবেষণা প্রশিক্ষণ বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / চৌরপঞ্চাশিকা

শ্রীকালীপদ ঘটক, আসানসোল / টুসু

শ্রীকালীপদ সেন, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ / গিরিশচন্দ্র ঘোষ² ; চ্যবন

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / চন্দ্রকেতুগড়

শ্রীকুমারেশ ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ / চিরুনি

শ্রীকুমুদরঞ্জন দাস, বর্ধমান রাজ কলেজ / গায়কোয়াড় , ঘসিটি বেগম ; চাঁদ রায় ; চিত্রলিপি , জাহানারা , জেবউন্নিসা

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, ক্যাটালগ বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ / গৌরমোহন বিদ্যালংকার

শ্রীকৃষ্ণা গুপ্ত, কলিকাতা / জুনাগড়

শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজি, খড়্গপুর / গাণিতিক ক্রীড়াকৌতুক ; জাইরোস্কোপ

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য, কলিকাতা / চারুচন্দ্র দত্ত

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাধিকর্তা, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বসু বিজ্ঞান মন্দির / খয়ের ; খরগোশ ; গাঁজা ; গ্যাস মাস্ক ; গুটিপোকা ; গ্লাইডার ; চকমকি ; চন্দন ; চুম্বক ; জবা , জাম ; জেটপ্লেন ; জৈব আলোক ; ঝাউ

শ্রীগোপাল হালদার, প্রাক্তন সম্পাদক, 'পরিচয়' / তুর্গেনেভ, ইভান সেগেইভিচ

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ; জয়গোপাল তর্কালংকার ; জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ; জীবানন্দ বিদ্যাসাগর

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, মিউজিয়াম অফ ফোক অ্যাণ্ড ট্রাইব্যাল কাল্‌চার / গোরাচাঁদ পীর ; ঘুটিয়ারী-শরিফ ; ছত্রভোগ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার নিরীক্ষক, প্রচার ও জনসম্পর্ক বিভাগ, পূর্বোত্তর রেলওয়ে / জেকব, জর্জ অগস্টস ; থিবো, জর্জ ফ্রিড্‌রিখ উইলিয়াম

শ্রীগৌরীশংকর ঘটক, বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ / টার্শিয়ারি ; ট্রায়াসিক

শ্রীচণ্ডীচরণ দেব, শারীরবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / টিস্যু

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, ডিরেক্টর অফ রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান ল ইন্‌স্টিটিউট, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিট / গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী ; জুরিপ্রথা

শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / জীবাশ্ম

শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদক, ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ্‌ অফ ইণ্ডিয়া / চলচ্চিত্র ; চলচ্চিত্র উৎসব

শ্রীচিন্তামণি কর, অধ্যক্ষ, গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট / গ্রেকো, এল

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / গঙ্গা ; গঙ্গাযাত্রা ; গণেশ[১] ; গন্ধেশ্বরী , গর্ভাধান , গাঁজা ; গায়ত্রী ; গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ; গুড় ; গুরু , গোরু ; গৌরীদান , গ্রহণ ; ঘণ্টাকর্ণ ; ঘাট ; ঘি ; চড়ক ; চণ্ডী[২] ; চন্দন ; চন্দ্র , চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার ; চাতুর্মাস্য , চান্দ্রায়ণ ; চামুণ্ডা ; চাল ; ছাতু , ছিন্নমস্তা ; জগদ্ধাত্রী ; জন্মতিথি ; জন্মাষ্টমী ; জপ ; জয়দুর্গা ; জয়নারায়ণ তর্করত্ন , জয়ন্তী দেবী , জাতাপহারিণী ; জিতাষ্টমী ; জরাসুর , ঝুলন ; টোল ; ডাল , তপস্যা ; তর্পণ ; তাল , তিল ; তুলসী

চৈতন্যদেব, শ্রী বি., ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক, ডান্‌স্‌ অ্যাণ্ড ড্রামা / গোটুবাদ্যম

শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / খলিফা ; খাদুয়া , খিজির খাঁ ; খিলজী ; খুশহাল চাঁদ ; গুরুগোবিন্দ সিংহ , চেঙ্গিজ খাঁ , চৌথ ; জয়মল্ল ; জায়গির ; জিয়াউদ্দীন বরণী , টোডরমল

শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / জান, জন

শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ / খ্যাতিবাদ

শ্রীজনরঞ্জন সেন, পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ / গুড়

শ্রীজয়নারায়ণ সেন, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ কলেজ হাসপাতাল / গণনাথ সেন

শ্রীজাস্টিন পাল, প্রাক্তন ভূবিজ্ঞানী, আসাম অয়েল কোম্পানি / খনিজ তৈল শিল্প ; ডিগবয়

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ / গজকচ্ছপ ; ঘটোৎকচ ; চিত্রগুপ্ত ; জড়-ভরত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রুদ্র, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / গণ্ডার

শ্রীজীবনকুমার সেনগুপ্ত, শারীরবিদ্যা বিভাগ, জে. জে. এম. মেডিক্যাল কলেজ, দাভানগেরে / টন্‌সিল

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' / তারকনাথ দাস

শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন / খড়কভসলা ; গোয়া, দমান, দীউ

শ্রীজ্যোতি সেন, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / গ্রামদেবতা

টিক্কু, শ্রীপ্রতাপকৃষ্ণ, মাস্টার অফ দি মিণ্ট, ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট মিণ্ট, কলিকাতা / টাঁকশাল

টিকেকর, শ্রীশ্রীপদ রামচন্দ্র, বোম্বাই / গোখলে, গোপালকৃষ্ণ, তুকারাম

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা / গোবিন্দরাম মিত্র ; জগৎশেঠ

শ্রীতরুণকুমার বসু, সম্পাদক, রয়্যাল অ্যাগ্রি-হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া / চন্দ্রমল্লিকা , টগর , ডালিয়া

শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ, অধ্যক্ষ, লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল / গিরীন্দ্রশেখর বসু , গূঢ়ৈষা , চেতনা

শ্রীতাপস মজুমদার, অর্থনীতি বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ চাহিদা

শ্রীতারাদাস বাকচী, কানপুর ডাকটিকিট

শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / খেজুর ; গুপ্তবীজী ; তাল

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ্‌, লণ্ডন / গান্ধারী[২] ; চর্যাগীত ; টমাস, ফ্রেডরিক উইলিয়ম

তাহের, শ্রীমহম্মদ, ভূগোল বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় / গৌহাটি

ত্রিবেদী, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রণছোড়লাল, এম. টি. বি. কলেজ, সুরাট / গুজরাতী সাহিত্য

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ / চার্বাক

দাতার, শ্রীচিন্তামণ বামন, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি / চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ; জয়াকর, মুকুন্দ রামরাও ; জ্ঞানদেব , টিলক, বাল-গঙ্গাধর ; তুলসীবাঈ ; তেলাঙ্গ, কাশীনাথ ত্র্যম্বক ; থানা

শ্রীদিনেনকুমার সোম, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / গয়া

শ্রীদিব্যেন্দু রায়চৌধুরী, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন / গুন্টুর ; ঘাটশিলা ; চেরাপুঞ্জী

শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল, সংস্কৃত বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ / ঘটকর্পর

শ্রীদিলীপকুমার বসু, ভূবিজ্ঞানী, খনিজ বিভাগ, বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানি / খনি

শ্রীদিলীপকুমার বসু, গবেষক, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / থার্মোডাইনামিক্স

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / খাফী খাঁ ; গোলাম হোসেন খাঁ, সৈয়দ ; গোলাম হোসেন সলীম জৈদপুরী ; গোল্‌ড্‌স্ট্যুকর, থিওডোর ; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ; তাভেনিয়ে, ঝাঁ বাতিস্ত

শ্রীদিলীপকুমার ভাদুড়ী, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির / খিদিরপুর ; গার্ডেনরীচ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / খরতাল, গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, গণপৎ রাও ; গিরিজাশংকর চক্রবর্তী ; গুরুপ্রসাদ মিশ্র ; গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ; গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; গোপালচন্দ্র মল্লিক, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ; গোয়ালিয়র, ঘরানা, চতুরঙ্গ ; চৈতি ; জাইলোফোন ; জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ; জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ডফ

শ্রীদিলীপকুমার মৌলিক, উমেশচন্দ্র কলেজ / খড়্গপুর

দীনশা, আর্দেশীর, কলিকাতা / জরথুশ্ত্র ; জরথুশ্ত্র ধর্ম

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / খরোষ্ঠী ; খারবেল ; গঙ্গবংশ, গাঙ্গেয়দেব কলচুরি ; গৌড় ; গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি ; চন্দ্রদ্বীপ ; চালুক্যবংশ ; চোলবংশ ; জম্বুদ্বীপ ; তীর্থস্থান

শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / খাসি ; গোঁড় ; চাকমা[২] ; তিব্বতী ভাষা

শ্রীদীপংকর লাহিড়ী, খনি ও ভূবিদ্যা বিভাগ, বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ / গণ্ডোয়ানা মহাদেশ ; গৌণ সমৃদ্ধি

শ্রীদীপক ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, বোলপুর কলেজ / গোত্র ; গোপথ ব্রাহ্মণ ; ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ; ছায়া

শ্রীদীপকরঞ্জন দাস, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / চারণ ; জহরব্রত ; টড, জেম্‌স ; তীরভুক্তি

শ্রীদীপালি ঘোষ, ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অফ কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেন্ট / গারো[১], গোণ্ড

শ্রীদীপেন্দ্রনাথ আচার্য, কলিকাতা / গোরু

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / খিল, চরক

শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শারীরবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ / খাদ্য ; গম ; গর্ভ ; গলগণ্ড ; গোরু ; গ্রন্থি ; ঘুম ; চক্ষু ; চা ; চাল ; চিনি, জরায়ু ; ট্যাপিওকা ; ডাল ; ডিম ; ডিম্বাশয় ; তরুণাস্থি ; তামাক, তৈল

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / গুহাচিত্র ; জলরঙ

শ্রীদেবব্রত রেজ, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / গ্যেটে, য়োহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ ফন

শ্রীদেবলা মিত্র, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / খজুরাহো ; গান্ধার ; গিরনার ; গিলগিট, গুপ্তিপাড়া ; গৌড় ; তক্ষশীলা ; তেলকুপি

শ্রীদেবাশীষ বসু, ডিজাইন ব্যুরো, বোকারো স্টীল লিমিটেড / ট্র্যাক্টর

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, সিটি কলেজ / চার্বাক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা / খো-খো

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, অধিকর্তা, বসু বিজ্ঞান মন্দির / জগদীশচন্দ্র বসু

দ্যতিয়েন, ফাদার পল, কলিকাতা / জেরুসালেম

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গুজরাতী ভাষা ; তারাপুরওয়ালা, আই-রাচ জাহাঙ্গীর সোরাবজী

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ত্রিপিটক, ত্রিশরণ ; থেরবাদ

শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য, অর্থনীতি বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / জাতীয় ঋণ

শ্রীধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, ভূবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / গুহা

শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শিশুরোগ বিভাগ, ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / জেনার, এডওয়ার্ড ; টাইফয়েড ; ডিফ্‌থেরিয়া

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ / জগদীশচন্দ্র গুপ্ত , জলধর সেন

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়, প্রাক্তন সেন্টেনারি প্রফেসার অফ পাব্‌লিক অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / চীফ কমিশনার , জেলা পরিষদ , জেলা বোর্ড

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / চিলডার্স, রবার্ট সীজার , চুল্লবগ্‌গ

নামাজী, এম. এম., প্রাক্তন অধ্যাপক, আরবী ও ফারসী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ঘজ্জালী

নারা, শ্রীৎসুয়মী, টোকিও ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ / জাপানী ভাষা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ছোটগল্প , ছোটগল্প, বাংলা ; ডিকেন্‌স, চার্লস ; ডিফো, ড্যানিয়েল , তলস্তয়, লোভ নিকোলায়েভিচ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন, চীনাভবন, বিশ্বভারতী / চীনা ভাষা

শ্রীনিমাইসাধন বসু, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / খোদা-ই-খিদমৎগার

শ্রীনির্মলকুমার বসু, কমিশনার ফর শিডিউল্‌ড কাস্ট্‌স অ্যাণ্ড শিডিউল্‌ড ট্রাইব্‌স / খিচিং ; খিলাফৎ আন্দোলন , গান্ধী, কস্তুরবা , গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ , গান্ধীবাদ , গোগাঁ্যা, পল , জগন্নাথ , জাতি-ব্যবস্থা ; তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, প্রাক্তন সম্পাদক, ক্যালেণ্ডার রিফর্ম কমিটি / গ্রহণ , জ্যোতির্বিদ্যা

শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ, নাম্‌গিয়াল ইন্‌স্টিটিউট অফ টিবেটোলজি, গ্যাংটক / তাশিলামা ; তিব্বত

শ্রীনিরুপম চট্টোপাধ্যায়, ডিরেক্টর, ইন্‌স্টিটিউট অফ ইংলিশ / চিত্রকল্পবাদ , চেতনাপ্রবাহ , জয়স, জেম্‌স , টেনিসন, অ্যালফ্রেড , ড্রাইডেন, জন , থ্যাকারে, উইলিয়াম মেকপীস

শ্রীনীতীশকুমার বসু, ইংরেজী বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ / চসার, জেয়োফ্রে

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' / জীবনানন্দ দাশ

শ্রীনীলমণি মিত্র, কৃষি বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / ছোলা

শ্রীনীলা দে, বি. টি. বিভাগ, লোরেটো হাউস / গজদন্ত ; গুহামন্দির ; গোপুর ; চিত্রকলা : পারসীক চিত্রকলা ; চিত্রকলা : মধ্য এশিয়ার চিত্রকলা , চিত্রকলা : মধ্য প্রাচ্যের চিত্রকলা ; চিত্রকলা : মিশরীয় চিত্রকলা , জয়সওয়াল, কাশীপ্রসাদ

নীলাম্বল, শ্রীশ্রীনিবাসন, বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়াম / ট্রম্বে

শ্রীনীলোৎপল শ্যাম, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ / জামনগর

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, প্রাক্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, কলিকাতা / গুপ্তচর

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ / জয়দেব-কেঁদুলি , তারকেশ্বর ; ত্রিবেণী

শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / গোনিওমিটার , টেথিস

শ্রীপদ্মনাভ দাশগুপ্ত, গবেষক, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স / গ্যালিলেও , জ্লোলিও-কুরি, ইরেন ; জ্লোলিও-কুরি, জ্যা ফ্রেদেরিক

শ্রীপবিত্রকুমার রায়, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী / জেম্‌স, উইলিয়াম

শ্রীপবিমলবিকাশ সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / খাদ্য , চর্বি , জল , তৃষ্ণা

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধিকর্তা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / তমলুক

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহকুমা তথ্য আধিকারিক, চন্দননগর / চন্দননগর

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, পোর্ট কমিশনার্‌স, কলিকাতা / ডক

পাল্লিস, শ্রীমার্কো, তিব্বততত্ত্ববিদ / তিব্বত

শ্রীপিনাকীশংকর রায়, কলিকাতা / গ্রূপ থিওরি

শ্রীপুলিনবিহারী সেন, অধ্যক্ষ, বিশেষ রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প, বিশ্বভারতী / গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; গুরুপ্রসাদ সেন , চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য , জগদিন্দ্রনাথ রায় ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম কর্মসচিব, 'ভারতকোষ' / খেলাধুলা ; ঘোড়দৌড় ; জিমখানা

শ্রীপ্রণবকুমার চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগ, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় / জলপাইগুড়ি ; জালন্ধর ; ঝিলম ; টিটাগড় ;

তরাই ; তুতিকোরিন ; ত্রিচিনোপল্লী ; ত্রিপুরা ; ত্রিবন্দরম

শ্রীপ্রণবকুমার বর্ধন, অর্থনীতি বিভাগ, ম্যাসাচুসেট্স ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনোলজি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / জাতীয় আয় ; জীবনযাত্রার মান

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / চণ্ডীচরণ সেন

শ্রীপ্রণীতা ভট্টাচার্য, ভূগোল বিভাগ, শেঠ সুরযমল জালান গার্ল্‌স কলেজ / চিত্রল

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব এশীয় বিদ্যা বিভাগ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় / চাণক্য

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, প্রাক্তন অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ; জ্বালানি

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত, প্রাক্তন সম্পাদক, জু্‌অলজিক্যাল গার্ডেন, ক্যালকাটা / খঞ্জন ; ঘুঘু ; চড়াই ; চিল

শ্রীপ্রফুল্ল মিত্র, কলিকাতা / খঞ্জনি , গীটার ; গোপীযন্ত্র , জলতরঙ্গ ; ডমরু ; ঢাক ; ঢোল ; ঢোলক , তবলা, বাঁয়া ; তম্বুরা

শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, কলিকাতা / তারাসুন্দরী

শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক, নৃবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / খাড়িয়া

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী / ছন্দ ; ছন্দ, বাংলা

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, 'হিমাদ্রি' / জগদ্বন্ধু

শ্রীপ্রশান্তকুমার গায়েন, প্রাক্তন সম্পাদক, বেঙ্গল টেব্‌ল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন / টেব্‌ল টেনিস

শ্রীপ্রশান্তকুমার বিশ্বাস, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী হাসপাতাল / জনস্বাস্থ্য , টিকা

শ্রীপ্রাঞ্জলকুমার ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / খাসিয়া বিদ্রোহ

শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তী, কলিকাতা / ছো-ওয়ু

ফালোঁ, ফাদার পিয়ের, ফরাসী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / খ্রীষ্টধর্ম ; খ্রীষ্টধর্ম, ভারতে , গির্জা ; জেভিয়ার, সেণ্ট

শ্রীবংশীধর হাজরা, অধ্যক্ষ, শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ / গোসাপ

শ্রীবঙ্কবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / খচ্চর ; ছিদ্রালী প্রাণী ; তারা মাছ

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), ভাগলপুর / চারুব্রত রায়

শ্রীবারীন বসু, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস / খাইবার গিরিপথ ; গারো , তুষারযুগ

শ্রীবারীন সাহা, চলচ্চিত্র পরিচালক, কলিকাতা / ডকুমেণ্টারি

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা / গণ্ডোফার্নেস ; গন্ধর্ব ; গিয়াসুদ্দীন তোগলক ; গিয়াসুদ্দীন বলবন ; গুর্জর , গুলাব সিং ; ঘোড়াঘাট , জালিয়ানওয়ালাবাগ ; জেলা ; জোয়ান অফ আর্ক , টীকেন্দ্রজিৎ , ডাফরিন, লর্ড ; ড্যালহৌসি, লর্ড ; তাজমহল , তাঁতিয়া তোপী ; তারনাথ ; তিতুমীর ; তেগ বাহাদুর , ত্রিপুরা ; থিব

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় / চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিনয় দত্ত, 'ভারতকোষ' , টাইপরাইটার

শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য, পল্লীশিক্ষা সদন, বিশ্বভারতী / গ্রাম

শ্রীবিনয় মজুমদার, কলিকাতা / চেখভ্‌, আন্তন পাভ্‌লোভিচ

শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরী, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / জেতবনবিহার

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলাভবন, বিশ্বভারতী / গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিমলকৃষ্ণ মতিলাল, এশীয় বিদ্যা বিভাগ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় / গদাধর ভট্টাচার্য , জগদীশ তর্কালংকার

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী, আইনজীবী, কলিকাতা / গৌর, হরি সিং

শ্রীবিমল রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, বেঙ্গল মিউজিক কলেজ / খেয়াল

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, অধ্যক্ষ, ইম্‌দাদ্‌খানী স্কুল অফ সিতার / তাল, লয় ; তিলানা

শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, সর্বাধ্যক্ষ, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ কলেজ / চক্রপাণি দত্ত

শ্রীবিমলেন্দু মিত্র, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির / ডাইনামিক্স ; ডিফ্র্যাকশন ; থার্মোমিটার

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, পাটনা / খেতুরির মহোৎসব; গদাধর দাস; গদাধর পণ্ডিত; গোপাল ভট্ট; গোবিন্দদাস[১]; গোবিন্দদাস[৪]; গোঁসাই; গৌরীদাস পণ্ডিত; ঘনশ্যাম কবিরাজ, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, জগদানন্দ; জগদ্বন্ধু ভদ্র; জগাই-মাধাই; জাহ্নবা দেবী

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / খেমা, জগদ্দল

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / চাকমা[১], চেন্চু; টোডা;

শ্রীবিশ্বময় বিশ্বাস, জু অলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / জু অলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় / চন্দ বরদৈ; তামিল; তেলুগু

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ফেলো, সংগীত নাটক অকাদেমী / তানসেন

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ / গিরিশচন্দ্র বসু, চুনীলাল বসু

শ্রীবেদান্তকুমার সিংহ, সাহা ইন্স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স / গ্যালভ্যানোমিটার

শ্রীবেলা চন্দ, ভূগোল বিভাগ, মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা কলেজ / জলঢাকা

শ্রীবেলা দত্তগুপ্ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / জেল

শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস পঞ্চতীর্থ, পাটবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর / জগন্নাথ দাস, অতিবড়

শ্রীব্রতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় / গৌড়পাদ

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নাতকোত্তর ও গবেষণা প্রশিক্ষণ বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / টাঁকশাল

শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, স্নাতকোত্তর ও গবেষণা প্রশিক্ষণ বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / গ্রাস্মান, হের্মান গুন্থের; গ্লাজেনাপ, হেলমুট ফন্; চিকিৎসাবিদ্যা; ডয়সেন, পাউল

শ্রীভক্তপ্রসাদ মজুমদার, ইতিহাস বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় / গয়া; চিত্রকূট; তাম্রবর্ণী

শ্রীভবতোষ দত্ত, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী; গোজলা গুঁই; গোবিন্দচন্দ্র দাস; গোবিন্দচন্দ্র রায়; টপ্পা; ঢপ কীর্তন; তরজা

শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ / জ্যোতিষ

শ্রীমঞ্জিরা সরদার, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন / ড্যাল্‌হৌসি; থানা

শ্রীমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, কলেজ অফ লেদার টেক্‌নোলজি / চর্ম

শ্রীমণি বর্ধন, নৃত্যশিল্পী, কলিকাতা / খেমটা; জারি; ঢালি নৃত্য

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকী, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / টেন্সর

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / জেনারেটর

শ্রীমণীন্দ্রমোহন লাহিড়ী, চাকদহ, নদিয়া / ডেভি ল্যাম্প

শ্রীমধুসূদন প্রসাদ, সভাপতি, দি থিওসফিক্যাল সোসাইটি / থিওসফি

শ্রীমনীষীপ্রসাদ গুহ, প্রাক্তন রসায়নবিদ, শিওনারায়ণ রামনারায়ণ অ্যাণ্ড কোম্পানি / ঘি

শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ, 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' / ছবি বিশ্বাস

শ্রীমনোজকুমার পাল, সাহা ইন্স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স / চন্দ্র, টেলিভিজন

শ্রীমনোজ রায়, ফলিত রসায়ন বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজি, খড়্গপুর / টিন

শ্রীমনোরঞ্জন বসু, গবেষক, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / জগৎ; জন্মান্তরবাদ, জ্ঞান, ডিউই, জন, তন্ত্রশাস্ত্র

শ্রীমন্দার মল্লিক, চলচ্চিত্রকার, কলিকাতা / ডিজ্‌নি, ওয়াল্টার

শ্রীমহাদেব দত্ত, গণিত বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজি, বোম্বাই / গণিত

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, চলচ্চিত্র বিভাগ, 'যুগান্তর' / চলচ্চিত্র, ভারতে

মাসুদ, শ্রী এস. এ., বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট / তাজিয়া; তালাক

শ্রীমিত্রা দত্ত, ভূগোল বিভাগ, শেঠ সুরযমল জালান গার্ল্‌স কলেজ / চিত্তরঞ্জন; জে. কে. নগর

শ্রীমিনতি ঘোষ, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন / খান্দেশ; ঝাঁসি

শ্রীমীরা গুহ, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / চিৎপুর ; চৌরঙ্গী ; জরিপ ; টাউন হল

শ্রীমুকুলকুমার বসু, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ / জবলপুর

শ্রীমুকুল দত্ত, কলিকাতা / গাদি ; গোল্লাছুট

শ্রীমুক্তি দাশগুপ্ত, শিক্ষকশিক্ষণ বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় / ঘোষপাড়া

শ্রীমুক্তিসাধন বসু, ইন্‌স্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / থার্মাল আয়োনাইজেশন ; থার্মিয়নিক্স

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ / গোলমরিচ ; চীনাবাদাম ; জোয়ার ; ডাল ; তামাক ; তিল ; তুলা ; তৈলবীজ

মুরার্কা, শ্রীঈশ্বরপ্রসাদ, প্রাক্তন গবেষক, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / জয়পুর

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, রসায়ন বিভাগ, আর. জি. কর মেডিকাল কলেজ / খনিজ তৈল, ঘি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, কলিকাতা / জনসংখ্যা

শ্রীযদুনাথ সিংহ, প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, মীরাট কলেজ / চতুর্ব্যূহ ; জৈমিনি

শ্রীযূথিকা ঘোষ, সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন কলেজ / খাণ্ডবপ্রস্থ ; গন্ধমাদন ; গোবর্ধন ; ঘৃতাচী ; ঘোষযাত্রা ; জটিলা-কুটিলা ; জয়দ্রথ ; জরাসন্ধ ; তক্ষক ; তপতী ; তরণীসেন, তাড়কা ; তারকাসুর ; তারা[১], তিলোত্তমা ; ত্রিশঙ্কু

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ / ঘুরীবংশ ; চাঁদ সুলতানা, চীন কিলীচ খাঁ, জাঠ ; জাহাঙ্গীর ; টিপু সুলতান, ডাক ; তারাবাঈ ; তৈমুরলঙ্গ ; তোগলক

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, 'প্রবাসী' / গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; গৌরদাস বসাক ; গৌরমোহন আঢ্য ; টমসন, জর্জ ; ডাফ, আলেক্‌জাণ্ডার ; ড্যানিয়েল, উইলিয়াম ; ড্যানিয়েল, টমাস ; ডিগ্‌বি, উইলিয়াম ; ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান ; তত্ত্ববোধিনী সভা ; তারাচাঁদ চক্রবর্তী ; তারানাথ তর্কবাচস্পতি

শ্রীরত্নাবলী ঘোষ, ইতিহাস বিভাগ, বাসন্তী দেবী কলেজ / থানেশ্বর

শ্রীরথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, রাজা প্যারীমোহন কলেজ / গোপীনাথ সাহা

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরবি মিত্র, সম্পাদক, 'দর্শক' / গ্যারিক, ডেভিড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স / থুম্বা রকেট স্টেশন

শ্রীরবীন্দ্র মজুমদার, 'সোভিয়েৎ দেশ' / চিত্রকলা : চীনা চিত্রকলা

শ্রীরমাতোষ সরকার, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম / গোধূলি ; গ্রহ

শ্রীরমা নিয়োগী, ইতিহাস বিভাগ, বেথুন কলেজ / গাহড়বাল

শ্রীরমেন্দ্রকুমার দাশ, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ / চিতোর গড়

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / গণভোট

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / খাকসার আন্দোলন, খোটান ; গাঙ্গারিদাই ; গুপ্ত যুগ, গোবিন্দ, তৃতীয় ; গোলামহোসেন খাঁ, সৈয়দ ; চণ্ডাল ; চন্দ্রগুপ্ত, ১ম ; চন্দ্রগুপ্ত, ২য়, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ; চন্দ্রবংশ ; চম্পা ; চেদি ; চৈৎ সিংহ ; জিজিয়া ; জৈন্নুল আবেদীন ; জোন্‌স, উইলিয়াম ; টলেমি ; ঠগ ; ডবাক ; তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান ; তোরমান

রাঘবন, শ্রীশান্তি, কলিকাতা / চন্দ্রমুখী বসু

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / তরু দত্ত

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, কলিকাতা / খোল, গজল ; গৎ ; গমক ; গান্ধর্ব ; গায়কী ; গোপাল উড়ে ; গোপাল নায়ক ; চর্যাগীত ; জাতি[৩], টপ্পা, ঠুংরি ; তান

শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত, জনসংযোগ বিভাগ, দি টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড / টাটা, জামসেদজী

শ্রীরাধামাধব তর্কতীর্থ, 'ভারতকোষ' / চতুর্বর্গ, জগৎ

রানী মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, হুগলি উইমেন্‌স কলেজ / জনমত ; জাতীয়তাবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী, অধীক্ষক, জুঅলজিক্যাল গার্ডেন, কলিকাতা / চিড়িয়াখানা

শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী, নৃত্য বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় / ছৌ

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিভাগ, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা / গন্ধক ; গাটাপার্চা ; চুন ; জল

শ্রীরামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / চিনিশিল্প

শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিপ হাইড্রোডাইনামিক্স ল্যাবরেটরি, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় / জলপথ ; জলযান ; জাহাজ ; টর্পেডো ; টারবাইন ; ডুবোজাহাজ

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, শারীরবিদ্যা বিভাগ, ক্যালকাটা ন্যাশ-ন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / চিকিৎসাবিদ্যা ; টোটকা

শ্রীলতা চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, লোরেটো হাউস / তট

লালওয়ানী, শ্রীগণেশ, জৈনভবন, কলিকাতা / জিন ; জৈন আচার-অনুষ্ঠান ; জৈন ধর্ম ; জৈন সাহিত্য ; তীর্থংকর

শ্রীলীনা চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, উইমেন্‌স খ্রীষ্টিয়ান কলেজ / চটকল ; চা ; তুষার

শ্রীলীলা মজুমদার, যুগ্ম-সম্পাদিকা, 'সন্দেশ' / গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়

শ্রীলোকনাথ দেবনাথ, গণিত বিভাগ, চন্দননগর কলেজ / গণিত

শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / চুঁচুড়া

শ্রীশক্তিকান্ত চক্রবর্তী, গণিত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় / জিওডেসি ; ডিটারমিন্যান্ট ; ডেডেকিন্‌ড, জুলিয়ুস

শ্রীশক্তিব্রত সরকার, ভারত চেম্বার অফ কমার্স / চেম্বার অফ কমার্স

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সেন, অ্যাগ্রোনমিস্ট, কমিউনিটি ডেভেলপ্-মেণ্ট প্রজেক্ট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / জামরুল ; টেপারি

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক, পুনা / জাতিস্মর

শ্রীশরদিন্দু বসু, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, জুট টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি / তন্তু ; তুলা

শাস্ত্রী, শ্রীনোরি নরসিংহ, কর্মসচিব, সাহিত্য সমিতি, রেপাল্লে, অন্ধ্র প্রদেশ / তেলুগু লোকসংগীত ; তেলুগু সাহিত্য

শ্রীশিপ্রা আদিত্য, 'দর্শক' / জিওত্তো ; টার্নার, জোসেফ ম্যালর্ড উইলিয়াম

শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ; প্রেসিডেন্সি কলেজ / জার্মপ্লাজ্‌ম ; জীবন ; ডারউইন, চার্ল্‌স

শ্রীশিবদাস চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক, এশিয়াটিক সোসাইটি / তাকাকুসু, জুনজিরো

শ্রীশিবনাথ রায়, রিসার্চ অফিসার, মিনিস্ট্রি অফ এক্‌স্টার্নাল অ্যাফেয়ার্স / জাতীয় মহাফেজখানা

শ্রীশিবপ্রসাদ দাসগুপ্ত, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন / গেজেটিয়ার

শ্রীশিবরাম ভট্টাচার্য, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / তুঙ্গভদ্রা

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / গুপ্তচর ; জয়পাল ; জয়াপীড়

শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / জেম্‌স, হেনরি

শ্রীশীতাংশুশেখর মিত্র, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / জ্যামিতি

শ্রীশুভেন্দুকুমার দত্ত, ইন্‌স্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / টেপ রেকর্ডার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন

শ্রীশুভেন্দুগোপাল বাগচী, শান্তিনিকেতন / তারাপীঠ

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সাহিত্য সংসদ / জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন / চরকা আন্দোলন ; তুলট

শ্রীশ্যামল সেনগুপ্ত, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / তাপ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী, প্রাক্তন অধ্যাপক, গোবিন্দ-সুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ / চরক

শ্রীশ্রীদামসখা মণ্ডল, সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট / ট্রান্সফর্মার ; ট্রান্সমিটার

শ্রীসংযুক্তা গুপ্ত, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / গান্ধার ; গার্গী ; গীতা ; জনমেজয় ; জমদগ্নি

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি / গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় ; চিরঞ্জীব শর্মা

শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির / টেলিভিজ্‌ন ; তেজস্ক্রিয়তা

শ্রীসত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্র পরিচালক, কলিকাতা / চিত্রনাট্য

শ্রীসত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ত্রিপুরা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ / ঢালাই

শ্রীসত্যময় মুখোপাধ্যায়, ভূবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / খনিজ সম্পদ ; ডায়াজেনেসিস

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গণধর, গোম্মট ; গোসাল মখলিপুত্ত ; গ্রিফিথ, র‍্যাল্ফ টমাস হচ্‌কিন

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, অভয় আশ্রম / গরদ ; তসর ; তাঁত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী / জ্ঞানদাস

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কলিকাতা চন্দনা, চাতক, টিয়া ; টুনটুনি

শ্রীসন্তোষকুমার পাইন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ / গাছ ; চা, ছত্রাক

শ্রীসন্তোষ ঘোষ, স্থপতি ও নগরপরিকল্পনাবিদ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন / চণ্ডীগড়

শ্রীসমর বসু, কলিকাতা / গামা ; গুঙ্গা, গোলাম পালোয়ান ; জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন, জিম্‌ন্যাস্টিক্‌স, জু-জুৎসু

শ্রীসমীরকুমার ঘোষ, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ

শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার, রেজিস্ট্রার, ইনস্টিটিউট অফ এঞ্জিনিয়ার্স তেলিয়াগড়ী

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার, প্রাক্তন অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / খড়ি

শ্রীসলিলকুমার চৌধুরী, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গুলমার্গ ; গোলকোণ্ডা ; জৌনপুর

শ্রীসলিলকুমার পাজা, চর্মরোগবিশারদ, ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেল্‌থ / চর্মরোগ

শ্রীসাধনা দাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / গোর্কি, মাক্‌সিম, গোলটেবিল বৈঠক ; জীদ, আঁদ্রে পোল গিয়োম

শ্রীসান্ত্বনা দাস, ভূগোল বিভাগ, রানী বিড়লা গার্ল্‌স কলেজ / তুন্দ্রা

শ্রীসাবিত্রী মুখোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় / তাপ্তী

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / গরুড় ; গুহক ; গোদাবরী ; চন্দ্রাবলী ; জটায়ু ; জাম্ববান্

শ্রীসীমানন্দ অধিকারী, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ / চিংড়ি ; ছারপোকা ; তিমি

শ্রীসুকুমার সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গাথাসপ্তশতী ; গোপালভাঁড় ; গৌড়ী ; চণ্ডী[১] ; চণ্ডীদাস ; চৈতন্যদেব ; ছুটি খাঁ ; জয়গোপাল গোস্বামী ; জয়ানন্দ, জাগ-গান ; জিপ্‌সী ; জীবগোস্বামী ; জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্য ; ডাকিনী, ডোম্বী ; তৎসম, তদ্‌ভব, তুর্কী, তুলসীদাস

শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতক

শ্রীসুকুমারী ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রাঙ্গদা, জনা, জবালা

শ্রীসুকোমল চৌধুরী, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / জীবক

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী / গান্ধারী[১], জনক

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী গোবিন্দমাণিক্য, ঘটক, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্‌

শ্রীসুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় / জলবায়ু

শ্রীসুধা বসু, কলিকাতা / চিত্রকলা : জাপানী চিত্রকলা

শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী গোপী, জীব, জৈন দর্শন

শ্রীসুধীর করণ, অধ্যক্ষ, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয় / ছটু

শ্রীসুধীরকুমার বসু, প্রাক্তন অধ্যাপক, মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গুজব

শ্রীসুধেন্দুপ্রসাদ বসু, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ট্যাঙ্ক ; ট্রাম, তরল বলবিদ্যা, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক / খশ, খেরবাল, ডোগরা

শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক, অধ্যক্ষ, ভোটভাষা মহাবিদ্যালয় / চন্দ্রকীর্তি ; তন্‌-জ্যুর

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ব আবহবিদ্যা সংস্থা, ব্রাজিল / তাপবলয়

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / গম ; গাজর ; গাঁদা ; ঘাস ; চীনাবাদাম, ছোলা ; জোয়ার ; ঝাঁজি ; ডুমুর ; তিল ; তুঁত, তুলসী ; তৈলবীজ ; থ্যালোফাইটা

শ্রীসুনীলকুমার মিত্র, ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ডোমিসিল

শ্রীসুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গ্রোসিয়াস হিউগো

শ্রীসুবিমল দেব, মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / জড়বুদ্ধি

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী, ফলিত গণিত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / গাউস, কার্ল ফ্রিড্‌রিখ

শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়, বোম্বাই / ট্রম্বে

শ্রীসুব্রত রায়, কলিকাতা / খমির ; খরমুজ , গোলাপ

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী, সম্পাদিকা, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম / গৌরীমা

শ্রীসুব্রতা সেন, গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / চন্দ্র ; জীমূতবাহন

শ্রীসুভদ্রকুমার সেন, ইংরেজী বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ / গোরেসিও, গ্যাসপারে ; গ্রোটেফেণ্ড, জর্জ ফ্রেডরিখ

শ্রীসুভাবরঞ্জন বসু, গবেষক, ভূগোল বিভাগ, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় / গঙ্গা

শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্টেটস্‌ম্যান' / গোইয়া; চিত্রকলা : পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা

শ্রীসুরথ চক্রবর্তী, কলিকাতা / গিরিশচন্দ্র সেন

সুরিটা, শ্রীপিয়ার্সন, কলিকাতা / গল্‌ফ

শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কলেজ অফ ইণ্ডোলজি, বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় / গৃহনির্মাণ ; গৃহ্যসূত্র ; গোভিল ; চরু ; জুয়াখেলা

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, আকাশবাণী / গম্ভীরা ; ঝুমুর

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / খনা , গঙ্গাধর কবিরাজ ; গোবর্ধন আচার্য ; চম্পূ ; চাণক্য ; চৌর্যশাস্ত্র ; জয়দেব

শ্রীসুরেশ সরকার, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন / গোপালপুর ; জোয়ার-ভাঁটা

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / চন্দ্রনাথ বসু

শ্রীসুশীলকুমার সেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সিটি কলেজ / গণপরিষদ

শ্রীসুশীলরঞ্জন কর্মকার, বিদ্যাসাগর (ইভনিং) কলেজ, কলিকাতা / থার্মোস্টাট

শ্রীসুহাসকুমার বিশ্বাস, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা শাখা, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / খাসি

শ্রীসেবতী মিত্র, ভূগোল বিভাগ, রানী বিড়লা গার্ল্‌স কলেজ / তৃণভূমি

সোব্‌হান, শ্রীআব্দুস, আরবী, ফারসী ও উর্দু বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / জাকাত ; জেহাদ

শ্রীসৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা / গুজরাত ; গুরুকুল ; গোয়ালিয়র ; চট্টগ্রাম ; চব্বিশ পরগনা ; চুনার ; জয়পুর ; জামসেদপুর , জাসকার , ঢাকা ; তমসা , তিরুপতি ; তেলেঙ্গানা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা / ত্রৎস্কি, গোভ

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ / চণ্ড প্রদ্যোত

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, চন্দননগর কলেজ / জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ , ডন সোসাইটি

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, আরবী ও ফারসী বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ / গালিব, মীর্জা আসদুল্লা খাঁ

হাই, শ্রীমুহম্মদ আবদুল, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / গোলাম মোস্তফা

হায়াত, শ্রীআবুল, কলিকাতা / খাদিজা ; জমিয়তু-ল্-উলেমা-ই-হিন্দ

শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / জটার দেউল

শ্রীহিমাংশুকুমার সরকার, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন / জলস্তম্ভ

শ্রীহিমাংশুরঞ্জন বেতাল, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / থিয়োডোলাইট

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত, অধ্যক্ষ, দমদম মতিঝিল কলেজ / ত্রিকোণমিতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, বিশ্বভারতী / টোয়েন, মার্ক ; ডি কুইন্সি, টমাস

শ্রীহৃষীকেশ রক্ষিত, কলিকাতা / টেলিকমিউনিকেশন

শ্রীহেনা ঘোষ, ভূগোল বিভাগ, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ / গিলান্দী ; জলঙ্গী ; তিস্তা ; তোরসা

শ্রীহেমচন্দ্র গুহ, উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ডাইনামো

ভারতকোষ

ভারতকোষ

খই ধান দ্র

খইল সার ও তৈলবীজ দ্র

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮০-১৯৬১ খ্রী) যশোহরের ধূলগ্রামের দীননাথ ও রাজলক্ষ্মী দেবীর পুত্র। দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় (১৮৯৯ খ্রী) উত্তীর্ণ হইয়া বিভিন্ন সরকারি কলেজে (রাজশাহী, কৃষ্ণনগর, প্রেসিডেন্সি) অধ্যাপনা করেন (১৯০১-২৮ খ্রী)। পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়-পরিদর্শক ছিলেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' নিযুক্ত হন (১৯৩২ খ্রী) এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ও কীর্তন গানে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও অনুশীলন ছিল। খগেন্দ্রনাথ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক এবং ১৩২৬-২৯ বঙ্গাব্দ পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'নীলাম্বরী' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), 'কানের দুল' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'মুদ্রাদোষ' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'বিবিবউ' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), 'সারী' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), 'রূপতৃষ্ণা' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), 'সুখ দুঃখ' (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ), 'কীর্তন' (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), 'পদামৃতমাধুরী' (১-৫ খণ্ড ১৯৩০-৪৩ খ্রী) ও 'কীর্তনগীতি-প্রবেশিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হরপ্রসাদ মিত্র

খগোল নভঃস্থানাঙ্ক দ্র

খচ্চর অশ্ব ও গর্দভের মিলনে যে সংকর প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাহাকে খচ্চর বা অশ্বতর বলা হয়। বাংলা ভাষায় একটি নামে অভিহিত হইলেও ইহারা প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকারের। পুং-অশ্ব ও স্ত্রী-গর্দভের মিলনে জাত প্রাণীকে ইংরেজীতে বলে 'হিনি'; ইহারা আকারে ক্ষুদ্রতর এবং আকৃতিতে অশ্বের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য বেশি। স্ত্রী-অশ্ব ও পুং-গর্দভের মিলনে উৎপন্ন জাতকের ইংরেজী নাম 'মিউল'; ইহারা আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং আকৃতিতে গর্দভের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য বেশি।

খচ্চর অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ভারবাহী পশু। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দুর্গম অঞ্চলে মালবহনের কার্যে ইহারা ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় সংকর পশুগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রজনন শক্তি থাকে না।

হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যের উল্লেখ হইতে জানা যায় যে সেই প্রাচীন কালেও এশিয়া মাইনরে এই জাতীয় পশুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

দ্র R. Lydekker, *The Horse and Its Relatives*, London, 1912.

বঙ্কুবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়

খজুরাহো ২৪°৫১' উত্তর ও ৮০° পূর্ব। বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিম দিকে প্রাচীন কালঞ্জর রাজ্যের মধ্যে একটি প্রাচীন নগর। মধ্য প্রদেশের ছতরপুর জেলায় একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সদর শহর হইতে ৪৩ কিলোমিটার (২৭ মাইল) পূর্বে অবস্থিত। ট্রেনে ঝাঁসি-মানিকপুর লাইনস্থ হরপালপুর স্টেশনে নামিয়া বাস প্রভৃতি যানবাহনে প্রায় ৯৭ কিলো-মিটার (৬০ মাইল) রাস্তা যাইতে হয়। চন্দেল্ল রাজবংশের অন্যতম রাজধানী খর্জুরবাহকই বর্তমান খজুরাহো। তদ্বংশীয় নৃপতিদের শাসনকালে খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই স্থানটিতে বহু মন্দির নির্মিত হয়। তাহাদের মধ্যে প্রায় ২৫টি এখনও বিদ্যমান। স্থানীয় বিশ্বনাথ মন্দির -সংলগ্ন একটি শিলালেখে উক্ত হইয়াছে চন্দেল্লরাজ ধঙ্গ (৯৫০-১০০২ খ্রী) শিব-মরকতেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ করেন। অনেকের মতে বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দিরই সেই প্রাচীন মরকতেশ্বর মন্দির। কিন্তু কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন এই লেখ অধুনালুপ্ত কোনও পূর্বতন মন্দিরে ছিল; মন্দিরটি বিনষ্ট হইবার পর সেখান হইতে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে অদ্যাপি বর্তমান 'নাগর' রীতিতে নির্মিত কোনও মন্দিরই একাদশ শতকের পূর্বেকার নয়।

এই মন্দির-নগরীর প্রাচীনতম মন্দির চতুঃষষ্টি যোগিনী নির্মিত হয় আনুমানিক নবম শতকে। উচ্চ চতুষ্কোণ মঞ্চের উপর একটি প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে রচিত হইয়াছিল পরস্পর সংলগ্ন ক্ষুদ্রাকার মন্দিরশ্রেণী।

পিছনের সারির মধ্যস্থিত মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বড়, ইহাতে খুব সম্ভব মূল দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাকিগুলিতে এক-একটি করিয়া যোগিনীমূর্তি। অনেকগুলি মন্দিরই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। মূর্তিগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি অবশিষ্ট আছে।

পরবর্তী কালে আরম্ভ হয় বড় বড় রেখ ও পিঢা মন্দিরের নির্মাণ, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কন্দারিয়া মহাদেব-মন্দির। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল চিত্রগুপ্ত, পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, লক্ষ্মণ, জগদম্বী, বামন, বিশ্বনাথ, চতুর্ভুজ এবং দুলাদেও। এইগুলির মধ্যে চিত্রগুপ্ত হইল সৌর। পার্শ্বনাথ ও আদিনাথ জৈন এবং বাকিগুলি শৈব অথবা বৈষ্ণব -ধর্মাশ্রিত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বুদ্ধ, গণেশ ও দেবী -মূর্তি (বর্তমানে স্থানীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) এইসব সম্প্রদায়সংপৃক্ত মন্দির নির্মাণেরও প্রমাণ দেয়।

ভারতীয় 'নাগর' মন্দিরের ইতিহাসে খজুরাহোর মন্দির-রাজি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, এখানে মধ্য ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। লাক্ষণিক পূর্ণাবয়ব মন্দিরগুলি উচ্চ মঞ্চের উপর স্থাপিত। বাহির হইতে প্রবেশ করিলে যথাক্রমে দেখা যায় অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ ও গর্ভগৃহ। সব কয়টির কেন্দ্ররেখা একই, তবে তাহাদের মেঝে কখনও কখনও ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। কয়েকটি মন্দিরের প্রবেশদ্বার মকর তোরণে শোভিত। অর্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপের তিন দিকে খোলা, দুই পার্শ্বে বসিবার কক্ষাসন। বৃহত্তর মন্দিরগুলির দুই পার্শ্বে গবাক্ষ। মহামণ্ডপ ও গর্ভগৃহের মধ্যে অন্তরাল অবস্থিত। কোনও কোনও বৃহৎ মন্দিরের গর্ভগৃহের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ পথ বর্তমান, প্রদক্ষিণ পথকে আবার আলোকিত করিয়াছে আয়ক-বাতায়ন। এই জাতীয় মন্দিরের নাম 'সান্ধার', অন্য জাতীয়ের 'নিরন্ধার'।

মন্দিরের এই চতুরঙ্গ বিভাগ (অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ ও গর্ভগৃহ) বাহিরের দিকেও সুস্পষ্ট। পার্শ্বদেশ হইতে লক্ষিত হয় মঞ্চের উপর উচ্চ অধিষ্ঠান, তাহার উপর উঠিয়াছে জঙ্ঘা।

চতুরঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গের উপরিভাগে শিখর। অর্ধমণ্ডপের শিখরটি সর্বনিম্ন ও গর্ভগৃহের শিখরটি সর্বোচ্চ। আকাশগাত্রে অঙ্কিত ক্রমোন্নত এই চারিটি শিখরের শোভা অপরূপ। প্রথম তিনটি শিখর খানিকটা পিরামিডাকার ও অপসরমান পিঢা -সংবলিত। গর্ভগৃহের শিখর ঈষদ্-বক্ররেখায় সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার গাত্রদেশে অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট অঙ্গ-শিখরের অলংকরণ। গর্ভগৃহ-শিখরের চূড়ায় আমলকের সংখ্যা দুইটি। ব্রহ্মা, লালগুয়াঁ-মহাদেব প্রভৃতি কয়েকটি মন্দিরের গর্ভগৃহের শিখর পিঢা ধরনের।

বেশির ভাগ মন্দিরের গর্ভগৃহ ও মহামণ্ডপের জঙ্ঘাভাগ অলংকারবহুল। দেবদেবীর মূর্তি, লীলারত সুরসুন্দরী ও নায়িকার মূর্তি, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, নৃত্যগীত ইত্যাদির অজস্র প্রতিচ্ছবিতে মন্দিরগাত্র শোভিত এবং কখনও কখনও ভারাক্রান্ত। যৌন-আবেদন মূলক মূর্তির সংখ্যাও নগণ্য নয়। আবার আভ্যন্তরীণ মূর্তিগুলিকেও উপেক্ষা করা যায় না। তাহাদের মধ্যে মহামণ্ডপের ছাউনির ছাদের অবলম্বনস্বরূপ অপ্সরা-মূর্তির লীলাভঙ্গি অনবদ্য। রূপের পূজারী শিল্পী এখানকার মন্দিররাজিতে জীবনরসের প্রবাহ চালিয়া স্বর্গ মর্ত্য একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। রাখিয়া গিয়াছেন অকৃপণভাবে তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন। মূর্তিগুলির রেখা সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ এবং ইহাদের মধ্যে গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের সুডৌল কমনীয়তা, স্নিগ্ধতা ও আধ্যাত্মিকতার অভাব।

মূর্তি বাহুল্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা অনস্বীকার্য যে শৈব ও বৈষ্ণব দেবতাগোষ্ঠীর প্রাধান্যই এই স্থলে এককালে সমধিক ছিল এবং চন্দেলদের রূপকল্পনা বিচিত্র। মন্দিরগাত্রে নৃত্যপরায়ণা মাতৃকামূর্তির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এতদ্ব্যতীত সাধারণ দেবতা -যথা নবগ্রহ (প্রবেশদ্বারের উপর), অষ্টদিকপাল (গর্ভগৃহের বাহিরের প্রাচীরে অথবা সান্ধার মন্দিরের ভিতরের প্রাচীরে), গঙ্গা-যমুনা (দ্বারোপান্তে) ইত্যাদি — এবং উপদেবতা— যথা বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, নাগ ইত্যাদি — ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে লক্ষিত হয়। জৈন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর চক্রেশ্বরী দেবী, মন্দির গাত্রে জৈন শাসনদেবতা ও বিদ্যাদেবী, সঙ্গে সঙ্গে রাম, বলরাম ও পরশুরামের মূর্তিও বিরাজমান।

খজুরাহোর সাধারণ ধরনের মন্দির ভিন্ন মণ্ডপ-ধরনের দেবায়তনও বিদ্যমান, ইহাদের মধ্যে আরাধ্য মূর্তিও অধিষ্ঠিত — যথা বরাহ, বিরাট বরাহমূর্তির গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত। অনতিপ্রাচীন কক্ষ-মধ্যে বিরাজমান হনুমানের প্রকাণ্ড এক মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। ইহার পাদপীঠে ৩১৬ অব্দের (মনে হয় হর্ষাব্দ, অর্থাৎ ৯২২ খ্রী) একটি লেখ বর্তমান।

দ্র S. K. Mitra, *The Early Rulers of Khajuraho*, Calcutta, 1958; Krishna Deva, 'The Temple of Khajuraho in Central India', *Ancient India*, no. 15, 1959; E. Zannas & J. Auboyer, *Khajuraho*, The Hague, 1960.

দেবলা মিত্র

খঞ্জন প্যাসেরিফর্মেস বর্গের (Order-Passeriformes) অন্তর্গত মোতাসিল্লিদী গোত্রের (Family-Motacillidae) পাখি। ইহারা দীর্ঘপুচ্ছ, দীর্ঘপদ, ভূচর, ক্ষুদ্র বিহঙ্গ, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ হইতে ২৩ সেন্টিমিটার। সর্বদা উপরে-নীচে পুচ্ছ আন্দোলন করা ইহাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। ইহারা সামাজিকতাপ্রিয়, দলবদ্ধভাবে থাকে, কীটপতঙ্গ শিকার করিয়া খায় ও নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থলে রাত্রি যাপন করে। খঞ্জন প্রাণোচ্ছল ও নৃত্যপর পাখি।

ভারতে প্রাপ্ত খঞ্জন— বন্য, বৃহৎ শ্বেতভ্রূ, শ্বেত, প্রাচ্য ধূসর, পীতশির ও পীত— এই ছয়টি প্রধান জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কেবল বৃহৎ শ্বেতভ্রূ খঞ্জনই ভারতে আবাসিক, অন্যগুলি উত্তরের শীতপ্রধান দেশ (যথা সাইবেরিয়া, উত্তর ইওরোপ, তুর্কিস্তান প্রভৃতি) এবং হিমালয় অঞ্চল (যথা কাশ্মীর, লাদাখ, নেপাল ও সিকিম) হইতে শীতকালে এ দেশে আসে। সে সময়ে ইহাদের দেহের বর্ণসজ্জা অনুজ্জ্বল ও আংশিক লুপ্ত থাকে এবং গ্রীষ্মে ঠিকানে ফিরিয়া যাইবার আগে পুনরায় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে - ইহাই ইহাদের প্রজনন ঋতুর রূপ।

দ্র E C Stuart Baker, *The Fauna of British India. Birds*, vol III, London, 1926; S. Dillon Ripley, *A Synopsis of the Birds of India and Pakistan*, Bombay, 1961

প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

খঞ্জনি, -রী ক্ষুদ্র আনদ্ধ যন্ত্র। গোলাকার অখণ্ডিত খণ্ড-ক্ষোদিত কাষ্ঠের এক মুখে ছাগাদির চর্মাচ্ছাদন পূর্বক এই যন্ত্র নির্মিত হয়। গোলাকার কাষ্ঠের উপর ছিদ্র করিয়া পিত্তল নির্মিত ফাঁপা ঘুঙুর সংলগ্ন থাকে এবং ঘুঙুরের মধ্যে সীসকের গুলি থাকে। নাচ-গান ঐকতান বাদনে ব্যবহৃত হয়।

প্রফুল্ল মিত্র

খড়কভসলা পুনা নগরী হইতে ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে খড়কভসলা শহরটি (জনসংখ্যা ৭৩৫৫ : ১৯৬১ খ্রী) ৬১০ মিটার (২০০০ ফুট) উচ্চতায় সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মুথা নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরটি মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুনা জেলার অন্তর্গত ও কেবলমাত্র পুনা নগরীর সহিত পথযোগে যুক্ত। খড়কভসলা হ্রদ (অপর নাম ফিফে হ্রদ) ও বাঁধটি এই শহরের পশ্চিমে অবস্থিত। পুনা ও কিরকি শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফিফের সুপারিশানুসারে ১৮৬৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে এই হ্রদটি সৃষ্ট হয়। ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) দীর্ঘ এই হ্রদটির উপর দিয়া খড়কভসলা হইতে পশ্চিমে কুরাণ বুদরুক গ্রাম পর্যন্ত মোটরলঞ্চ পরিবহন ব্যবস্থা (সার্ভিস) রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি, সেচ এবং নৌচালন গবেষণা কেন্দ্রটি (দি সেন্ট্রাল ওয়াটার-পাওয়ার, ইরিগেশন অ্যাণ্ড নেভিগেশন রিসার্চ স্টেশন) এখানে অবস্থিত। এই কেন্দ্রের নদী এবং খালের জলের গতি-বিজ্ঞান (রিভার অ্যাণ্ড ক্যানাল হাইড্রলিক্স), নৌচালন, মাটি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা, কংক্রিট এবং নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত উপকরণ-সম্পর্কিত গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাতীয় স্মরণচিহ্ন (ন্যাশন্যাল মেমোরিয়াল) রূপে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৫ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষা মহাবিদ্যালয় (দি ন্যাশন্যাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি) এই শহরে স্থাপিত হইয়াছে। স্থল নৌ ও বিমান যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থী অফিসারগণ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা তিন বৎসরের শিক্ষাপর্ব। এখানে নিখিল ভারতীয় নদী-গবেষণাগার ও জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগার আছে।

এই শহরের দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিংহগড় দুর্গটি অবস্থিত।

দ্র *Gazetteer of Bombay State*, vol XX, *Poona District*, Bombay, 1954; C B Joshi & B. Arunachalam, *Maharashtra*, Bombay, 1962

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

খড়দহ পানিহাটি দ্র

খড়ি চুনাপাথরের নরম, শাদা, ভঙ্গপ্রবণ আকার। রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট (সংকেত $CaCO_3$)। মার্বেল পাথর ও ক্যালসাইট খনিজ একই বস্তু, তবে কেলাসিত অবস্থা। স্বাভাবিক খড়িতে শতকরা ৯৫-৯৯ ভাগ এই রাসায়নিক থাকে। ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রকূলে খড়ির পাহাড় ৩০৫ মিটার (১০০০ ফুট) পর্যন্ত উঁচু হয়। ফ্রান্সে ও ডেনমার্কের উপকূলে, লেবাননে আবাবাতে খড়ির পাহাড় আছে। পাথরের ইট বা টালির বদলে খড়ি পাথরের ইট বা পাথর বাড়ির বাইরের দেওয়ালে ব্যবহার করা যায়। খড়ি গরম করিলে একদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, অন্য দিকে চুন (লাইম) পাওয়া যায়। চুন বাড়ি তৈয়ারিতে ও সিমেন্ট ও সোডার প্রচুর প্রস্তুতিতে এবং অন্য বহু শিল্পে ব্যবহার হয়। কৃত্রিমভাবে তৈয়ারি খড়িকে প্রেসিপিটেটেড চক বলে। প্রধানতঃ অম্ল রোগে এবং পারদের সঙ্গে মিশ্রিত চূর্ণের আকারে জোলাপ হিসাবে ঔষধে ব্যবহার

আছে। তাহা ছাড়া ধাতুর পালিশে, কাঠের উপর লেখার জন্য চা-খড়ি বা চকের আকারেও কম ব্যবহার হয় না। সামুদ্রিক বহু প্রাণীর শরীরের খোলাও প্রধানতঃ খড়ি, যেমন গুগলি, শামুক, ঝিনুক ও এইজাতীয় বহু সামুদ্রিক 'ফরামিনিফেরা' পর্যায়ের প্রাণী।

সর্বাণীসহায় গুহসরকার

খড়্গপুর কলিকাতা হইতে ১১৬ কিলোমিটার (৭২ মাইল) পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর একটি বিশিষ্ট রেলওয়ে নগরী। মেদিনীপুর শহরের প্রায় ১২ কিলোমিটার (৮ মাইল) দক্ষিণে খড়্গপুর। জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর। খড়্গপুরের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪৭২৫৩ (১৯৬১ খ্রী), খড়্গপুরে গত দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১ খ্রী) জনসংখ্যা প্রায় ১৩% বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খড়্গপুর হইতে আগত এক ব্যক্তির দ্বারা এই জনপদের সূচনা হয়। অন্যপক্ষে স্থানীয় মালঞ্চ অঞ্চলের ইন্দা গ্রামে খড়্গেশ্বর শিবমন্দিরের নামানুসারেই খড়্গপুর নাম হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর শাখার স্টেশনের গোড়াপত্তন হইতেই এই জনপদের বৃদ্ধি। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অন্যতম বৃহত্তর রেলওয়ে কারখানা স্থাপন এই অঞ্চলের উন্নতির কারণ। বর্তমানে প্রায় পনর হাজার লোক এই কারখানার কার্যে নিযুক্ত আছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য শিল্পও বর্তমানে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। খড়্গপুরের নিকটে হিজলিতে ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনোলজি স্থাপিত হইয়াছে।

খড়্গপুরে প্রধানতঃ তিন ধরনের লোকবসতি বর্তমান। প্রথম রেলওয়ে কর্মচারীদের বসতি (রেলওয়ে কলোনি), দ্বিতীয়তঃ খড়্গপুর পৌরসভার অন্তর্গত ও তৃতীয়তঃ ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনোলজি ও তাহার আবাসিক অঞ্চল।

খড়্গপুরের নিকটে কলাইকুণ্ডা বর্তমানে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক অন্যতম কেন্দ্র।

খড়্গপুরের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরনের। পশ্চিম বঙ্গের সমতলভূমির অন্তর্গত হইলেও স্থানে স্থানে ক্ষয়িষ্ণু বন্ধুর ভূমি বর্তমান। জলবায়ুর তারতম্যে কিঞ্চিৎ সামুদ্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ ভূমি সাধারণতঃ লাল রঙের (ল্যাটেরাইট) হয়। গৃহ-ব্যবহার্য জল প্রধানতঃ কূপ হইতে ও শিল্পাঞ্চলের জল সাধারণতঃ কাঁসাই নদী হইতে সরবরাহ করা হয়।

খড়্গপুর বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এক উল্লেখযোগ্য স্থান। খড়্গপুর দুইটি বিশেষ রেলওয়ে লাইনের সংযোগস্থলে অবস্থিত। কলিকাতা-মাদ্রাজ ও কলিকাতা-বোম্বাই রেলপথের ইহা সংগমস্থল। এতদ্ব্যতীত দুইটি প্রধান জাতীয় সড়ক যথা— ১. ওড়িশা জি. টি. রোড ও ২. কলিকাতা-বোম্বাই জাতীয় সড়ক নং ৬ (বর্তমানে নির্মাণ-কার্যাধীন) খড়্গপুরের সরবরাহ ব্যবস্থায় ও অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযোগসাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। কলিকাতা, জামসেদপুর, রাউরকেলা ও ভিলাই ইস্পাত নগরী লইয়া যে শিল্পাঞ্চল তাহার মধ্যস্থলে খড়্গপুর অবস্থিত। হলদিয়া বন্দর খড়্গপুরের আরও মূল্যবৃদ্ধি করিবে। হলদিয়া হইতে যে রেলপথ নির্মিত হইতেছে তাহা পাশকুড়া হইয়া খড়্গপুরে মিলিত হইবে। ইহা ছাড়া বর্তমানে খড়্গপুরের পূর্বে রূপনারায়ণ নদীর উপর পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধার্থে দুইটি সেতু নির্মিত হইতেছে। ইহাতে কলিকাতা মহানগরীর সহিত খড়্গপুরের সরাসরি সংযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করিবে। খড়্গপুরে বৃহৎ রেলওয়ে হাসপাতাল ও একটি রেলওয়ে স্কুল আছে। ইন্দা গ্রামে আর-একটি হাসপাতাল আছে। বর্তমানে খড়্গপুরে একটি বনবিভাগের অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

খড়্গপুরের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মটি পৃথিবীর দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্মগুলির অন্যতম।

নিকটবর্তী বলরামপুর গ্রামে একটি বড় গ্রাম্য সেবাকেন্দ্র আছে। খড়্গপুরের নিকটে হিজলিতে ব্রিটিশ আমলে একটি বিখ্যাত বন্দিনিবাস ছিল।

দ্র L. S. S O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Midnapore*, Calcutta, 1911.

দিলীপ মৌলিক

খণ্ডগিরি উদয়গিরি-খণ্ডগিরি দ্র

খনা খনার সম্বন্ধে কিংবদন্তি এইরূপ: ইনি ছিলেন সিংহল রাজের কন্যা। শুভক্ষণে জন্ম বলিয়া নাম হয় ক্ষণা, 'ক্ষণা' হইতেই 'খনা' নামের উৎপত্তি।

মিহির-এর পিতা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ বরাহ পুত্রজন্মের পর গণনা করিয়া দেখেন যে এই শিশুর পরমায়ু মাত্র এক বৎসর। এইজন্য তিনি মিহিরকে একটি পাত্রে রাখিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেন। পাত্রটি সিংহল দ্বীপের উপকূলে উপস্থিত হয়। রাজা ঐ শিশুকে লইয়া পালন করেন ও পরে খনার সহিত বিবাহ দেন। মিহির ও খনা উভয়েই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ

করেন। মিহির খনা সহ জন্মভূমিতে যাইয়া পিতার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তৎপর খনা শ্বশুর ও পতি সহ তথায় বাস করিতে থাকেন। পিতার ন্যায় মিহিরও বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আকাশের নক্ষত্রসংখ্যা কত তাহা রাজা জিজ্ঞাসা করিলে পিতা ও পুত্র উহা নির্ধারণে অক্ষম হইয়া খনার সাহায্যে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। খনার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া রাজা তাঁহাকে সভায় আনিবার আদেশ দেন। ইহাতে প্রতিপত্তি হানির ভয়ে পিতার আদেশে পুত্র খনার জিহ্বা ছেদন করেন এবং উহার অল্পকাল পরেই খনার মৃত্যু হয়।

উল্লিখিত কিংবদন্তির মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। উপরন্তু বরাহের পুত্র মিহির ইহা ইতিহাস-স্বীকৃত নহে, বরাহমিহির একই ব্যক্তির নাম। অধুনাপ্রাপ্ত খনার বচনগুলি বাংলা ভাষায় লিখিত। বচনগুলির ভাষা হইতে অনুমান করা যায় যে, এগুলির রচনাকাল চারিশত বৎসরের পূর্বে নহে, অথচ বরাহ-মিহিরের আবির্ভাবকাল প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে। বরাহমিহিরের জাতকাদি জ্যোতিষ গ্রন্থের সহিত খনার কতকগুলি বচনের অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান; ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহাকে বরাহমিহিরের সহিত সংবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ।

কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয় সম্বন্ধে খনার বচনগুলি অমূল্য এবং অদ্যাপি কৃষিজীবীগণের আদরণীয়।

দ্র কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, বরাহ-মিহির ও খনা, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ; মহেন্দ্রনাথ কর সংগৃহীত, খনার বচন (অনুবাদ), কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খনি আকর, জ্বালানি পদার্থ, প্রস্তর কিংবা বিশেষ প্রকারের মৃত্তিকা আহরণের জন্য পর্বত গাত্র, ভূমি-পৃষ্ঠ বা ভূগর্ভে ক্ষোদিত স্থানকে খনি বলে।

খনিসমূহকে মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; ভূপৃষ্ঠস্থিত এবং ভূগর্ভস্থিত। যে ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট খনিজ ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের অল্প নীচে অবস্থিত সে স্থানে প্রথম প্রকার এবং যেখানে উদ্দিষ্ট খনিজ ভূতলের বহু নিম্নে বা পর্বতাভ্যন্তরে বহু দূরে অবস্থিত সেই সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকার খনি খনিত হয়।

ভূপৃষ্ঠস্থিত উন্মুক্ত খনির একাধিক প্রকারভেদ বর্তমান। খনিজের বিভিন্ন অবস্থান-প্রকৃতিই এই প্রকারভেদের কারণ। সীমিত আয়তনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিন্যস্ত অগভীর অবস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুপাতের গর্ত খোঁড়া হয়। অভীষ্ট পদার্থের অবস্থান বৃহৎ হইলে খনিত স্থান নিয়মিত সোপান-নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের বহু খনি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বহুশত মিটার বিস্তৃত।

প্লেসার জাতীয় খনিজকে জলের তীব্র বেগে হাইড্রলিকিং শিলা হইতে বিশ্লিষ্ট করা হয়। অবস্থান নদী বা সমুদ্রতল হইলে যন্ত্রযোগে খননকার্য চালানো হয়।

খনিজ অবস্থানের প্রকারভেদে এবং তাহার চারিপাশের শিলার কাঠিন্য অনুসারে ভূগর্ভে খনন-প্রণালীরও প্রভেদ ঘটে। খনিজ শিলাদেহে শিরা-উপশিরার মত অবস্থিত হইলে খনিতল হইতে ঊর্ধ্ব বা নিম্নমুখী সুড়ঙ্গ (রেইস বা উইনজ) ঐ শিরায় আবার খননস্থানে (স্টোপ) পৌঁছায়। খনিজ অবস্থান অনিয়মিত হইলে খনিতল হইতে ঊর্ধ্বমুখী সুড়ঙ্গ টানিয়া খনিজদেহ নীচে হইতে কাটা হয়, যাহার ফলে উপরিস্থিত আকর ধ্বসিয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে খনিজদেহের সমান্তরাল সুড়ঙ্গ হইতে আড়াআড়ি সুড়ঙ্গ টানিয়াও আকর আহৃত হয়। কয়লা বা অনুরূপ স্তরীভূত সুবিন্যস্ত সমতালিক খনিজের ক্ষেত্রে খনিতল বহুসংখ্যক বর্গাকার খননস্থানে বিভক্ত হয় এবং তদন্তর্বর্তী অখনিত স্থান স্তম্ভ রূপে রহিয়া যায়।

গভীর কূপ (শাফ্‌ট) বা সুড়ঙ্গ পথ (টানেল) খনিতল ও ভূপৃষ্ঠকে সংযুক্ত করে। সুড়ঙ্গপথ প্রয়োজনমত ঢালু বা সমতল (অ্যাডিট) হইতে পারে। মূল প্রবেশপথ হইতে নিয়মিত গভীরতা অন্তর সমতল সুড়ঙ্গ কাটা হয়। খনিজ তৈল গভীর নলকূপ দ্বারা উত্তোলন করা হয়।

খনিজ বা ধারক শিলা যথেষ্ট কঠিন না হইলে খোদক যন্ত্র বা শাবল-গাঁইতি দ্বারা কাটা হয়। কঠিন শিলা বা খনিজে ড্রিলিং করিয়া সরু গর্ত করা হয় এবং তাহাতে বিস্ফোরক সংযোগে ফাটানো হয়।

খনিত এবং বিচূর্ণিত দ্রব্য খননস্থান হইতে অপসৃত হইবার পর অকঠিন শিলার ক্ষেত্রে ঐ স্থান বালু অথবা অব্যবহার্য প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ভরাট করিয়া দেওয়া হয় কিংবা লৌহ বা কাঠের কড়ি-বরগা দ্বারা ছাদ ও দেওয়াল সুরক্ষিত করা হয়।

ভূগর্ভস্থিত খনিতে একটি বিশেষ কাজ, উপযুক্তভাবে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা রাখা এবং দূষিত বায়ু বিদূরিত করা। খনি ভূমধ্যস্থ জলস্তরে পৌঁছিলেই জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখিতে হয়।

খনিত সামগ্রী যথেষ্ট ক্ষুদ্র না হইলে পুনর্বার পেষণযন্ত্রে বা হাতুড়ি দ্বারা ভাঙা হয়। খনিজ শিলা মিশ্রিত হইলে ভাঙিবার পর বাছাই বা ঝাড়াই দ্বারা কিছু মানোন্নয়ন

(বেনিফিসিয়েশন) করিয়া বিক্রয়ের জন্য বা ধাতু নিষ্কাশনের জন্য নীত হয়।

বড় খনিতে চূর্ণ আকর খনির বাহিরে আনিবার জন্য মালগাড়ি বা ট্রাক ব্যবহৃত হয়। ভূনিম্নস্থিত খনি হইতে আকর তুলিবার জন্য লৌহ-রজ্জু যুক্ত গাড়ি (স্কীপ) ব্যবহার করা হয়। খনির প্রবেশপথের মুখে বসানো বড় চাকার উপর রজ্জু লাগানো হয় এবং রজ্জুর দুই প্রান্তে দুইটি গাড়ি যুক্ত থাকে যাহাতে একটি উঠিলে অপরটি নামে। ঐ গাড়িতে বা উহার উপর বসানো খাঁচাতে লোক ওঠা-নামা করে। অনেক স্থানে রজ্জুবাহক (রোপওয়ে) বা বেল্টবাহক (কনভেয়র বেল্ট) ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষের বৃহত্তম কয়লাখনি সংস্থা (ন্যাশন্যাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। বিহারের ঝরিয়া, গিরিডি, করণপুরায়, ওড়িশার তালচরে এবং মধ্য প্রদেশের কররা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানের অধীন বড় খনি-সমূহ অবস্থিত। বর্তমান মোট বার্ষিক উত্তোলন প্রায় ত্রিশ বিলিয়ন মেট্রিক টন। বেসরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে বেঙ্গল এবং বরাকর কোল কোম্পানি উল্লেখযোগ্য। রানীগঞ্জে ঝরিয়া অঞ্চলে ইহাদের খনিগুলি অবস্থিত। মাদ্রাজের নয়েভেল্লীস্থ সুবৃহৎ লিগনাইট খনিও রাষ্ট্রায়ত্ত।

কয়লা ভিন্ন খনির মধ্যে মহীশূরস্থ কোলার স্বর্ণখনি প্রায় দশ হাজার ফুট গভীর এবং অধুনা রাষ্ট্রায়ত্ত (‘কোলার গোল্ড ফিল্ড টাউন’ দ্র)। বিহারের ঘাটশিলাস্থিত ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের তামার খনি, রাজস্থানের জাওয়ারস্থ মেটাল কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার সীসা দস্তার খনি এবং বর্তমানে আধা সরকারি ‘সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস ম্যাঙ্গানিজ ওর’ সংস্থার মহারাষ্ট্রের নাগপুর-ভাণ্ডারাস্থিত এবং মধ্য প্রদেশের বালাঘাটস্থ ম্যাঙ্গানিজ খনিগুলি ভূগর্ভে অবস্থিত খনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত খনিসমূহের মধ্যে হিন্দুস্তান স্টীলের মধ্য প্রদেশস্থিত ডাল্লিরাজহারা এবং টাটা কোম্পানির বিহারস্থিত নোয়ামুণ্ডী লৌহ-আকর খনি, বিসরা স্টোন-লাইম কোম্পানির ওড়িশার বীরমিত্রপুরস্থিত চুনাপাথর খনি উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রীয় সংস্থা এন. এম. ডি. সি (ন্যাশন্যাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) বিহারের কিরিবুরু, মধ্য প্রদেশের বাইলাডিলায় লৌহ আকর, মধ্য প্রদেশের পান্না-য় হীরক, রাজস্থানের ক্ষেত্রী এবং বিহারের রাখা-মাইন্স এলাকায় তামার খনি খননকার্যে নিযুক্ত।

অপরাপর বিশিষ্ট খনিসমূহের মধ্যে রাজস্থানের বিকানীরস্থ জিপসাম, বিহারের কোডারমা-গিরিডি অঞ্চলে অভ্র, যাদুগোড়াস্থিত ইউরেনিয়াম, খরসোঁয়াস্থ কায়ানাইট এবং আমঝোড়স্থ পাইরাইট ও কেরলের সমুদ্রবেলায় অবস্থিত ইলমেনাইট-মোনাজাইট খনি উল্লেখযোগ্য।

দ্র C. F. Jackson & J. H. Hedges, ‘Metal Mining Practice’, *U. S. Bur. Mines, Bulletin* no. 419, 1939; Robert Peele, ed., *Mining Engineer's Hand book*, New York, 1941.

দিলীপকুমার বসু

খনি আইন ভারতীয় সংবিধান অনুসারে খনি ও খনিজ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সংসদ ও রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর মধ্যে বণ্টন করা আছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কার্যতঃ খনি ও খনিজ সম্পর্কে প্রচলিত আইনের অধিকাংশই সংসদ কর্তৃক রচিত। কারণ খনি ও খনিজের প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন জনস্বার্থে সংঘের কর্তৃত্বাধীনে করা উচিত হইলে তৎসম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মাত্র সংসদেরই আছে। আবার খনিসমূহে শ্রমিক নিয়োগ প্রনিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তাবিধান করিবার ভার সংঘের উপরে ন্যস্ত আছে।

খনি আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩৫ আইন) সবপ্রকার খনি সম্বন্ধে প্রযোজ্য আইনগুলির মধ্যে প্রধানতম। ইহাতে ও ইহার বলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রচিত নিয়ম ও প্রনিয়মে খনির কর্মপ্রণালী ও পরিচালনা এবং খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইনের বিধি-নিষেধগুলি যাহাতে সম্যক পরিপালিত হয় তজ্জন্য খনি-পরিদর্শক ও প্রমাণপত্র-প্রদায়ী ডাক্তার (সার্টিফাইং সার্জন) নিয়োগ করার ব্যবস্থা আছে। এই আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত খনি-পর্ষদ (মাইনিং বোর্ড)-গুলি নিজ নিজ এলাকার মধ্যে অবস্থিত খনিসমূহের সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন পরিচালনার সহায়তায় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

কয়লা খনি সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ বিধান কয়লা খনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আইন) দ্বারা করা হইয়াছে। এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কয়লা-পর্ষদ (কোল বোর্ড)-এর হস্তে কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তাবিধান ও কয়লা সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই সকল কৃত্য সম্পন্ন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদিত কয়লার

উপরে অন্তঃশুল্ক আরোপণ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করেন তাহা হইতে আবশ্যকীয় পরিমাণ অর্থ কয়লা-পর্ষদকে প্রদান করেন। এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রচিত নিয়মাবলীর দ্বারা কয়লাখনিতে নিরাপত্তা ও কয়লা সংরক্ষণ বহুলাংশে প্রনিয়ন্ত্রিত হয়। কয়লাখনি সংক্রান্ত শিল্পের উন্নয়ন ও জনস্বার্থে প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য কয়লাবাহী অঞ্চল গ্রহণ করিবার অধিকার কয়লাবাহী অঞ্চল (গ্রহণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৫৭ (১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আইন) কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত হইয়াছে। এই আইনের বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও অঞ্চলে কয়লা আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং কোনও অঞ্চলে কয়লা থাকিলে মালিক এবং অন্যান্য স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিয়া সেই অঞ্চল গ্রহণ করিতে পারেন।

খনিজ সম্পদ প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করিবার উদ্দেশ্যে খনি ও খনিজ (প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৫৭ (১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬৭ আইন) প্রণীত হইয়াছে। খনিজ তৈল ব্যতীত সর্বপ্রকার খনিজ সম্বন্ধে এই আইন প্রযোজ্য। কোনও অঞ্চলে খনিজ আছে কিনা ইহা অনুসন্ধান করিতে হইলে এই আইনের বিধান অনুসারে অনুজ্ঞাপত্র লইতে হয় এবং খনির ইজারাও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খনিজ তৈল সম্পদ বর্ধন করিবার উদ্দেশ্যে তৈলক্ষেত্রগুলি প্রনিয়ন্ত্রণ করার জন্য তৈলক্ষেত্র (প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫৩ আইন) প্রণীত হয়। পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হওয়ায় তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন আইন, ১৯৫৯ (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪৩ আইন) দ্বারা তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন নামে এক বহু ক্ষমতাযুক্ত কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অভ্রখনি, কয়লাখনি, লৌহখনি প্রভৃতি বিভিন্ন খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য বহুবিধ আইন ও নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছে। স্ত্রীলোক খনিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইলে প্রসূতি সাহায্য পাইতে পারে। পনর বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকাকে খনির অভ্যন্তরে কোনও কর্মে নিয়োগ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। খনির শ্রমিকেরা যে সকল স্থানে বাস করে সে সকল খনিবসতি যাহাতে অস্বাস্থ্যকর বা বাসের অযোগ্য না হয় তাহার জন্য আইনের বিধান আছে। একদিকে খনির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, অন্য দিকে খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ; এই উভয় লক্ষ্যই খনিসংক্রান্ত আইনসমূহে সমভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

কামাখ্যাকুমার চক্রবর্তী

খনিজ তৈল ভূগর্ভ হইতে গাঢ় বাদামী রঙের কাদামাটি-গোলা পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। এই তৈল কাদামাটি হইতে পৃথক করার উদ্দেশ্যে বড় বড় পাত্রে জল মিশ্রিত করিয়া গরম করা হয়। তাহাতে কাদামাটি থিতাইয়া পড়ে এবং জলের উপর পেট্রোলিয়াম ভাসিয়া ওঠে। অন্য একটি পাত্রে এই পেট্রোলিয়াম ঢালিয়া লইয়া আংশিক পাতন-ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়।

পেট্রোলিয়াম প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি জৈব-যৌগের মিশ্রণ। এই মিশ্রণের প্রধান উপাদানগুলি সবই কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইড্রোকার্বন জাতীয়। তাহা ছাড়া সালফার (গন্ধক), নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের কতকগুলি যৌগও অপদ্রব্যরূপে মিশ্রিত থাকে।

আংশিক পাতন-প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়াম হইতে বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের মাত্রা অনুসারে পেট্রল, কেরোসিন, ডিজেল তৈল প্রভৃতি পৃথক করা হয়। সেগুলি আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠানো হয়। ইহাদের কোনটিই বিশুদ্ধ যৌগিক পদার্থ নয়, একাধিক হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ।

সাধারণতঃ পেট্রোলিয়াম হইতে যে সকল প্রয়োজনীয় অংশ পৃথক করা হয় তাহার একটি তালিকা ৮ সংখ্যক পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

ভূগর্ভে প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস ও তরল পেট্রোলিয়াম প্রায়ই একসঙ্গে থাকে। নলকূপ বসাইলে এই গ্যাস প্রচণ্ড বেগে নিঃসৃত হইতে থাকে। এইজন্য আগেই ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে এই গ্যাসের অপচয় না ঘটে। প্রাকৃতিক গ্যাসে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে :

স্ফুটনাঙ্ক ডিগ্রী/সেন্টিগ্রেড	হাইড্রোকার্বন	শতকরা কত ভাগ	ব্যবহার
১৬১·৪	মিথেন	৮২	জ্বালানি হিসাবে এবং ভুসা কালি উৎপাদনে
৮৮·৩	ইথেন	১০	"
৪১·৫	প্রপেন	৪	গ্যাস-সিলিণ্ডারে
০·৫	বিউটেন	২	"
অপেক্ষাকৃত অনুদ্বায়ী অংশ	অন্যান্য হাইড্রোকার্বন	২	মোটর-স্পিরিট হিসাবে

চাপ ও শৈত্যের প্রভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের খানিকটা তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। তরল প্রপেন ও বিউটেন গ্যাস সিলিণ্ডারে ভরতি করিয়া বাজারে পাঠানো হয়। সিলিণ্ডারের চাবি খুলিলেই এগুলি গ্যাসীয় অবস্থায় বাহির

স্ফুটনাঙ্ক (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	নাম	যৌগের অণুতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা	ব্যবহার	পেট্রোলিয়ামের কত অংশ (শতকরা হিসাব)
২০ পর্যন্ত	গ্যাস	১-৫	জ্বালানি	২
৩০-২০০	ন্যাফ্‌থা	—	—	—
৩০-৭০	ক পেট্রোলিয়াম ঈথর	৫-৬	দ্রাবক	
৭০-৯০	খ বেনজাইন	৬-৭	গরম জামাকাপড় ধোলাই করার জন্য	২
৯০-২০০	গ পেট্রল বা গ্যাসোলিন	৭-১১	মোটর বা বিমানের জ্বালানি তৈল	৩২
২০০-৩০০	কেরোসিন	১১-১৬	লণ্ঠন, স্টোভ জেট এঞ্জিন প্রভৃতির জ্বালানি তৈল	১৮
৩০০	ডিজেল তৈল	১৩-১৮	ডিজেল এঞ্জিনের জ্বালানি তৈল	২০
অবশেষে—				
অপচিত তাপমাত্রায় পাতন-প্রক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অন্যান্য উপাদানগুলি পৃথক করা হয়।	ক লুব্রিকেটিং বা পিচ্ছিলকারী তৈল	১৬-২০	যন্ত্রাদি পিচ্ছিল রাখার জন্য	২৬
	খ তরল প্যারাফিন	১৪-১৮	জোলাপের ঔষধ	
	গ ভ্যাসেলিন	১৮-২২	প্রসাধন দ্রব্যাদি তৈয়ারির জন্য	
	ঘ কঠিন প্যারাফিন বা মোম	২০-৩০	মোমবাতি তৈয়ারির জন্য	
	ঙ অ্যাস্‌ফাল্ট	—	রাস্তা তৈয়ারির জন্য	

হইয়া আসে বলিয়া ইহাদের সহজেই গৃহস্থালির কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অপেক্ষাকৃত অনুদ্বায়ী অংশ পেট্রলের সঙ্গে মিশাইয়া মোটর গাড়ির জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়।

উপরি-উক্ত উপাদানগুলি পৃথক করিবার পর যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহা জ্বালানি রূপে তৈলক্ষেত্রের ইঞ্জিন, বয়লার ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই গ্যাস স্বল্প পরিমাণ বায়ুর সঙ্গে জ্বালাইয়া ভুসা কালি প্রস্তুত করা হয়। ইহা হইতে ছাপাখানার কালি, জুতার পালিশ, বার্নিশ, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈয়ারি করা হয়।

পেট্রোলিয়ামের উদ্বায়ী অংশকে সাধারণভাবে ন্যাফ্‌থা বলা হয়। ইহাকে লইয়া আবার আংশিক পাতন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় এবং স্ফুটনাঙ্কের মাত্রানুযায়ী তিনটি অংশে ভাগ করা হয়—পেট্রোলিয়াম, ঈথর, বেন্‌জাইন এবং পেট্রল।

পেট্রোলিয়াম ঈথরের প্রধান উপাদান পেন্টেন, হেক্সেন এবং হেপ্টেন নামক তিনটি সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন। ইহা ব্যবহার করা হয় প্রধানতঃ স্নেহজাতীয় পদার্থের দ্রাবক হিসাবে। তাহা ছাড়া রং, বার্নিশ ও এনামেল-শিল্পেও ইহা ব্যবহার করা হয়।

বেন্‌জাইন প্রধানতঃ দ্রাবক হিসাবে এবং গরম জামা-কাপড় ধোলাই করার কাজে (ড্রাই ক্লিনিং) ব্যবহার করা হয়।

মোটরগাড়ি, বিমান প্রভৃতির জন্য পেট্রলের চাহিদা খুব বেশি। অপরিচ্ছন্ন পেট্রোলিয়ামের শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ পেট্রল রূপে পাওয়া যায়। পেট্রলকে দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া সজোরে ঝাঁকাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। ক্রমে অ্যাসিড থিতাইয়া পড়ে। তলানি হইতে ময়লা অ্যাসিড ও গাদ বাহির করিয়া লইয়া পর পর কয়েকবার জল দিয়া তৈল হইতে অ্যাসিড ধুইয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে দুর্গন্ধমুক্ত এবং অ্যাসিডমুক্ত করিবার পর এই পেট্রল মোটরগাড়ি বা বিমানে ব্যবহার করা হয়। পেট্রলে সালফার (গন্ধক)

-ঘটিত পদার্থ (যেমন, থায়ো অ্যালকোহল) মিশ্রিত থাকিলে আরও শোধন করিতে হয়।

পেট্রল নানা প্রকার হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। ইহার প্রধান উপাদান নানা রকম সংপৃক্ত (স্যাচুরেটেড) হাইড্রোকার্বন, তাহা ছাড়া স্বল্প পরিমাণে অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন এবং অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন -জাতীয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, খনির ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে তৈলের উপাদানগুলির পরিমাণে অনেক পার্থক্য হইতে দেখা যায়। পেট্রলের গুণাগুণ অনুযায়ী মোটর গাড়ির ইঞ্জিনে কম বেশি নকিং (একপ্রকার বিশ্রী আওয়াজ) হয়। নকিং-বিরোধী ধর্মসম্পন্ন আদর্শ তৈল হইল আইসো-অক্টেন, তাই ইহার অক্টেন-মান (অক্টেন-নাম্বার) ধরা হয় ১০০। আর এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তৈল হেপ্টেনের অক্টেন মান ধরা হয় শূন্য। একশত ভাগের কত ভাগ আইসো-অক্টেনের সহিত বাকি হেপ্টেন মিশাইলে তাহার নকিং-ধর্ম পরীক্ষিত তৈলের অনুরূপ হয় তাহা নিরূপণ করা হয় এবং সেই সংখ্যার সাহায্যে তৈলের অক্টেন মান নির্দেশ করা হয়। বলা বাহুল্য পেট্রলের অক্টেন মান যত বেশি হয় জ্বালানি হিসাবে তাহার মূল্য ততই বেশি হয়। এজন্য সব দেশের বিজ্ঞানীরাই এখন পেট্রলের অক্টেন মান বাড়াইবার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন।

যৌগের অণুতে কার্বন সংখ্যা সমান রাখিয়া কার্বন পরমাণুগুলি সরল শৃঙ্খলে না সাজাইয়া যদি শাখা-প্রশাখায় সাজানো যায় তবে অক্টেন-মান বাড়ে। আবার মিশ্রণে অসংপৃক্ত (আনস্যাচুরেটেড) হাইড্রোকার্বন এবং অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন -জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে তৈলের অক্টেন-মানও বাড়িয়া যায়। আর একটি উপায় হইল, কৃত্রিম উপায়ে আইসো-অক্টেন প্রস্তুত করিয়া তাহা পেট্রলের সঙ্গে মিশানো।

আগেই বলা হইয়াছে পেট্রল পৃথক করার সময় উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের বিভিন্ন জ্বালানি তৈলও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সমস্ত তৈলের (যথা—কেরোসিন, ডিজেল তৈল প্রভৃতি) হাইড্রোকার্বনের অণুগুলি বড় ও ভারি। তাহাদের স্ফুটনাঙ্ক মাত্রাও উঁচু। হঠাৎ খুব উত্তপ্ত করিলে (৪০০°-৬০০° সেন্টিগ্রেড) এইসব অণু ভাঙিয়া ছোট এবং হালকা অণুতে পরিণত হয়। তাহাদের স্ফুটনাঙ্কও কম হয়। এইভাবে পেট্রলের উৎপাদন বাড়াইবার পদ্ধতির নাম 'ক্র্যাকিং' বা ভাঙন -প্রক্রিয়া।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধন করা হইয়াছে; ইহাতে অনুঘটক (ক্যাটালিস্ট) ব্যবহার করিয়া আরও ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। এখন এই প্রক্রিয়া নানাভাবে সম্পাদন করা হয়, যেমন ক. তৈলের বাষ্প উত্তপ্ত অনুঘটকের উপর দিয়া পরিচালনা করা হয় (Houdry প্রসেস) খ. অনুঘটকের মিহি গুঁড়া এবং তৈলের বাষ্প একই সঙ্গে প্রবাহিত করা হয় (ফ্লুইড প্রসেস) অথবা গ. দানার মত অনুঘটক এবং তৈলের বাষ্প পরস্পরের বিপরীত দিক হইতে পরিচালিত করা হয় (থার্মোফর প্রসেস)। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অনুঘটকের সহযোগিতায় ভাঙন-প্রক্রিয়া সম্পাদন করিলে উচ্চতর অক্টেন-মানবিশিষ্ট পেট্রল পাওয়া যায়।

আবার ইহাও লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিম্ন অক্টেন মানবিশিষ্ট পেট্রলে অনুঘটকের সহযোগিতায় ভাঙন-প্রক্রিয়া সম্পাদন করিলে নানা প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং তাহার ফলে পেট্রলের অক্টেন মান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া যায়। এজন্য আজকাল পেট্রোলিয়াম হইতে প্রাপ্ত পেট্রল সোজাসুজি বাজারে না পাঠাইয়া উপরি উক্ত পদ্ধতিতে তাহার অক্টেন-মানের উন্নয়ন করিয়া তাহার পর বাজারে পাঠানো হয়। বিজ্ঞানীরা ইহার নাম দিয়াছেন 'রিফর্মিং'।

আরও একটি উপায়ে তৈলের অক্টেন মান বাড়ানো হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মিজলে ও বয়েড দেখিলেন, পেট্রলের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ 'টেট্রা-ইথাইল লেড' সংক্ষেপে টি. ই. এল. মিশাইলে তাহার অক্টেন মান অনেক বাড়িয়া যায়। তাই আজকাল পেট্রলের সঙ্গে স্বল্প পরিমাণ টি. ই. এল. মিশাইয়া বাজারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে।

টি. ই. এল. ব্যবহার করার একটা অসুবিধা আছে। দহনের ফলে ইহা হইতে যে লেড অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাহা অপচিত হইয়া লেড বা সীসায় পরিণত হয় এবং ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে সঞ্চিত হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য পেট্রলে ব্যবহৃত টি. ই. এল-এ থাকে টেট্রা-ইথাইল লেড (শতকরা ৬৫ ভাগ), ইথিলিন ডাই-ব্রোমাইড (২৫ ভাগ), ইথিলিন ডাই-ক্লোরাইড (১০ ভাগ) এবং রঙ (স্বল্প পরিমাণ)। এ ক্ষেত্রে দহনের ফলে লেড ব্রোমাইড এবং লেড ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়, আর সেগুলি ইঞ্জিনের উষ্ণতায় গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে বলিয়া সহজেই ইঞ্জিন সংলগ্ন পাইপ (একজস্ট পাইপ) দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়।

সীসা জীবদেহের পক্ষে বিষাক্ত বলিয়া টি. ই. এল. যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে না— আইনসংগতভাবে মোটরের পেট্রলের জন্য গ্যালন প্রতি ১-৩ মিলিলিটার টি. ই. এল. ব্যবহার করা যায়। বিমানে ব্যবহার্য তৈলের সঙ্গে অবশ্য

গ্যালন প্রতি ৪ মিলিলিটার পর্যন্ত টি. ই. এল. মিশাইয়া তাহার অক্টেন-মান আরও বাড়ানো হয়। বিমানে ব্যবহার্য ১০০ অক্টেন-মান বিশিষ্ট আদর্শ পেট্রলে থাকে—

আইসো অক্টেন	শতকরা	৪০	ভাগ
আইসো পেন্টেন	,,	২৫	,,
পেট্রল	,,	৩৫	,,
টি. ই. এল.	গ্যালন প্রতি ৪ মিলিলিটার		

অপরিচ্ছন্ন পেট্রোলিয়ামের শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ হইল কেরোসিন। প্রধানতঃ আলোক উৎপাদনের জন্য কেরোসিন তৈল ব্যবহার করা হয়। পেট্রলের মত এই তৈলকেও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে শোধন করা হয়। পরে কষ্টিক সোডার দ্রবণ এবং জল দিয়া ধুইয়া ইহাকে সম্পূর্ণ রূপে অ্যাসিডমুক্ত করা হয়। এইভাবে আলকাতরা জাতীয় পদার্থ, অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বনসমূহ এবং সালফার ঘটিত যৌগসমূহ দ্রবীভূত হয় বলিয়া তৈলের বর্ণ এবং গন্ধের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

যে তৈলে সালফারের পরিমাণ খুব কম থাকে তাহা এইভাবে শোধন করার পরই ব্যবহার করা চলে। কিন্তু গন্ধকের পরিমাণ বেশি থাকিলে আরও ভালভাবে সালফার দ্রবীভূত করিতে হয়। কারণ, সালফার ঘটিত পদার্থ বেশি থাকিলে তৈলে দুর্গন্ধ হয়। লণ্ঠনের পাতলা ধাতব পাত্রে তাড়াতাড়ি ছিদ্র হয় এবং লণ্ঠনের সলিতা তাড়াতাড়ি পুড়িয়া যায় বলিয়া খুব ধোঁয়া হয় এবং কম আলো পাওয়া যায়। এইরূপ কেরোসিন তরল সালফার ডাইঅক্সাইড দিয়া ধুইয়া শোধন করা হয়। ইহাতে সালফার-ঘটিত পদার্থ এবং সেইসঙ্গে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনজাতীয় পদার্থ অপসারিত হয়।

আজকাল সম্পূর্ণ রূপে বর্ণহীন এবং গন্ধহীন কেরোসিন বাজারে পাওয়া যায়, ইহা হইতে নানা প্রকার কেশ তৈল প্রস্তুত করা হয়। তাহা ছাড়া নানা প্রকার কীট-পতঙ্গ নাশক ঔষধের (যেমন ডি. ডি. টি., পাইরিথ্রাম প্রভৃতি) দ্রাবক হিসাবে কেরোসিন ব্যবহার করা হয়। জালানি হিসাবেও প্রচুর কেরোসিন ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে পেট্রলের তুলনায় কেরোসিনের চাহিদা অনেক কম ছিল বলিয়া বেশির ভাগ কেরোসিনকেই ভাঙন-প্রক্রিয়ায় পেট্রলে পরিণত করা হইত। কিন্তু বর্তমানে কেরোসিনের চাহিদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ এই তৈল এখন গ্যাস-টারবাইন এবং জেট ইঞ্জিনে জালানি রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। তাই আজকাল উচ্চ চাপে এবং অধিক উষ্ণতায় হাইড্রোজেন ও অনুঘটকের (নিকেল সালফাইড) সহযোগিতায় ভারি অথবা নিম্ন মানের তৈলের এক বিশেষ ভাঙন-প্রক্রিয়া (ক্যাটালিটিক আইসো-ক্র্যাকিং প্রসেস) সম্পাদন করিয়া উচ্চ মানের পেট্রল এবং কেরোসিন উৎপন্ন করা হইতেছে।

অপরিশ্রুত পেট্রোলিয়ামের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ হইল ডিজেল তৈল। এই তৈল কেরোসিন অপেক্ষা ভারি অথচ পিচ্ছিলকারী (লুব্রিকেটিং) তৈল অপেক্ষা হালকা। সাধারণতঃ ডিজেল ইঞ্জিনের জালানি হিসাবে এই তৈল ব্যবহার করা হয়।

ডিজেল তৈলের সহজদাহ্যতার পরিমাপ করা হয় সিটেন মান (cetane number) দ্বারা। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য আদর্শ তৈল হইল সিটেন বা হেক্সা ডিকেন, ইহার সিটেন মান ধরা হয় ১০০, অপর দিকে আলফা মিথাইল ন্যাপথালিন এর সিটেন-মান ধরা হয় শূন্য। একশত ভাগের কত ভাগ সিটেনের সহিত বাকিটা আলফা মিথাইল ন্যাপথালিন মিশাইলে তাহার ধর্ম পরীক্ষিত তৈলের অনুরূপ হয় তাহা নিরূপণ করা হয় এবং সেই সংখ্যা দ্বারা তৈলের সিটেন মান নির্দেশ করা হয়। একটি সাধারণ ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য যে তৈল প্রয়োজন তাহার সিটেন-মান ৫০ ৬০ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লুব্রিকেটিং তৈল পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর পাত্রে যে অবশেষ থাকে তাহা লইয়া আবার অপচিত চাপমাত্রায় আংশিক পাতন প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। এইভাবে স্ফুটনাঙ্কের মাত্রাযায়ী পিচ্ছিলকারী তৈল, তরল প্যারাফিন, ভ্যাসেলিন এবং কঠিন প্যারাফিন বা মোম পৃথক করা হয়।

পিচ্ছিলকারী তৈল লইয়া পুনরায় আংশিক পাতন-ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় এবং হালকা, মাঝারি ও ভারি —এই তিন গ্রেডের পিচ্ছিলকারী তৈল তৈয়ারি করা হয়। তৈলের সান্দ্রতা (ভিস্কসিটি) নির্ভর করে, তাহার উপাদানে যে সব হাইড্রোকার্বন আছে তাহাদের অণুর গঠনের উপর। অণুতে কার্বনের শৃঙ্খল যত বড় হয় তৈলের সান্দ্রতাও তত বেশি হয়। কাজেই তৈলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে সান্দ্রতাও বাড়ে। বিভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডের পিচ্ছিলকারী তৈল ব্যবহার করা হয়।

তরল প্যারাফিন (লিকুইড প্যারাফিন) স্বচ্ছ ও বর্ণহীন তরল পদার্থ হিসাবে বাজারে বিক্রয় করা হয়। ইহা সাধারণতঃ জোলাপের ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাহা ছাড়া নানা প্রকার প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতিতেও ইহার প্রয়োজন হয়।

ভ্যাসেলিন নরম জেলির মত অবস্থায় পাওয়া যায়।

গলনাঙ্ক ৩৮° হইতে ৬০° সেন্টিগ্রেড। নানা প্রকার মলম এবং প্রসাধন দ্রব্য তৈয়ারিতে ইহা ব্যবহার করা হয়।

সাধারণতঃ কঠিন প্যারাফিনের সঙ্গে অনেকখানি তরল প্যারাফিন থাকিয়া যায় বলিয়া তাহা বেশ নরম হয় এবং তাহা দিয়া মোমবাতি তৈয়ারি করা যায় না। এজন্য ইহাকে প্রথমে খুব ঠাণ্ডা করিয়া তাহার পর ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হয়, তখন ইহা হইতে তরল প্যারাফিন ঝরিয়া পড়ে। ইহার নাম প্রস্বেদন প্রক্রিয়া (সোয়েটিং প্রসেস)। এভাবে বাদামি রঙের কঠিন প্যারাফিন পাওয়া যায়। ইহাকে গলাইয়া ইহার মধ্যে অঙ্গারচূর্ণ দিলে তাহা রঙ শুষিয়া লয়। তাহার পর উত্তপ্ত অবস্থায় ছাঁকিয়া লইলে শাদা মোম পাওয়া যায়।

আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ামের উদ্বায়ী অংশগুলি সব পৃথক করিয়া লওয়ার পর পাতনযন্ত্রে যে চটচটে কালো পদার্থ অবশেষ রূপে পড়িয়া থাকে তাহার নাম অ্যাসফাল্ট। ইহা রাস্তা তৈয়ারিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পেট্রোলিয়াম শোধনকালে উৎপন্ন উপজাত দ্রব্যসমূহ, বিশেষতঃ অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনসমূহ হইতে অনেক প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদন করা হয়। যেমন অ্যালকোহল, গ্লিসারিন, ইথার, রং, প্ল্যাস্টিক, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম তন্তু, নানা প্রকার দ্রাবক ইত্যাদি। ইহাদের সাধারণভাবে পেট্রোকেমিক্যাল বলা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিয়াছে। এ দেশে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইথিলিন উৎপাদন করা হয় ৫০০০০০ কোটি পাউণ্ড, প্রপিলিন ২০০০০০ কোটি পাউণ্ড, আর বিউটাডাইন ১৫০০০০ কোটি পাউণ্ড।

ভারত এখনও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে খুবই অনগ্রসর। একটি হিসাবে দেখা যায়, ভারতে এখন বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি ডলার মূল্যের পেট্রোকেমিক্যাল বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। বলা বাহুল্য, এইসব জিনিসের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য ভারত সরকার এখন এইসব দ্রব্য দেশেই উৎপাদন করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। এজন্য পরিকল্পনা করা হইয়াছে যে, আগামী ছয় সাত বৎসরে প্রায় ৯০ কোটি ডলার মূলধন এই শিল্পে নিয়োজিত করা হইবে এবং এইসব শিল্প গড়িয়া উঠিবে প্রধানতঃ বোম্বাই, কোয়ালি, বরউনি এবং হলদিয়াতে।

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

খনিজ তৈল শিল্প পেট্রোলিয়াম সাধারণতঃ খনিজ তৈল নামে পরিচিত। পেট্রোলিয়াম অপরিশুদ্ধ তৈল, গ্যাস ও অ্যাসফাল্ট রূপে পাওয়া যায়। পেট্রল, কেরোসিন ও মোম পরিশুদ্ধ খনিজ তৈল হইতেই উৎপন্ন হয়। পেট্রোলিয়াম মাটির নীচে প্রবহমান স্রোত বা সঞ্চিত হ্রদের ন্যায় অবস্থান করে না। ইহা বিশেষ গঠনবিশিষ্ট স্তরীভূত শিলার অন্তর্গত বেলে পাথরের ছিদ্রে বা চুনা পাথরের সূক্ষ্ম ফাটলে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুবিধ মতবাদ আছে। সাধারণতঃ সকলেই একমত যে উদ্ভিদ বা প্রাণীর জৈব পদার্থ ভূগর্ভে বৃহৎ স্তরীভূত শিলা পাললে সঞ্চিত হইলে বিশেষ কোনও উপায় দ্বারা (পাতন প্রণালীতে) বোধ হয় জীবাণুর সহায়তায়, উহা ক্ষয়ীভূত হইয়া তৈল ও গ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া যায়। পরবর্তী কালের উৎক্ষেপণ, চ্যুতি ও ভাঁজের ফলে তৈল শিলাস্তরের ঊর্ধ্বভাগে চলিয়া আসে। যে স্থানে ক্ষয়কার্য বেশি হয় সেই স্থানে অনেক ক্ষেত্রে খনিজ তৈল বা গ্যাস উপরিতলেই নষ্ট হইয়া থাকে।

পেট্রোলিয়ামের গুরুত্ব অল্পদিনের মধ্যে এত দ্রুত বর্ধিত হইবার কারণ এই যে জ্বালানি তৈলের দাহিকা শক্তি কয়লা হইতে প্রায় দেড় গুণ বেশি, ইহা ছাড়া ইহার ব্যবহারও সহজ।

ভারতবর্ষে খনিজ তৈল শিল্পের কাজ অল্পদিনের হইলেও বহু শতাব্দী পূর্বেও পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার মানুষ জানিত। খ্রীষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্বেও চীন ও মধ্যপ্রাচ্যে খনিজ তৈল কোনও না কোনও ভাবে ব্যবহৃত হইত। তৈল উত্তোলনের প্রাচীন নজির থাকিলেও প্রকৃত তৈল শিল্পের কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন কর্নেল এডুইন এল ড্রেক কেবলমাত্র খনিজ তৈলের জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের টিটাসভিলাতে (Titus-Ville) সফলতার সহিত তৈলকূপ খনন করান।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতে, আসামের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে তৈলের অবস্থিতির কথা জানা যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ভূতত্ত্বীয় সমীক্ষা বিভাগের বিশেষজ্ঞ এইচ. বি. মেডলিকট এখানকার কয়েকটি তৈল নির্গম স্থানে পরিদর্শন করিয়া তৈলকূপ খননের পরামর্শ দেন। মার্গেরিটার নিকট মাকুমে কয়েকটি তৈলকূপ খনন করিয়া প্রভূত তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য কাজ অগ্রসর হয় নাই।

ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ ডিব্রুগড় হইতে মার্গেরিটার নিকটবর্তী বরগোলাই, লীডো ও নামডাং -এর কয়লা অঞ্চল পর্যন্ত রেলপথ প্রসারিত হইলে পুনরায় তৈলের সন্ধান আরম্ভ

করা হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে নিকটবর্তী ডিগবয়-এ প্রথম সার্থক তৈলকূপ খনন করা হয়। ইহাই ভারতবর্ষে তৈল শিল্পের প্রথম সূত্রপাত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আসাম অয়েল কোম্পানির পরিচালনায় তৈল উত্তোলনের কার্য সম্পাদন হইত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বর্মা অয়েল কোম্পানি ইহাদের সহিত যুক্ত হয় ও সুসংবদ্ধভাবে উত্তোলনের ও অনুসন্ধানের কাজ চালাইতে থাকে ('ডিগবয়' দ্র)।

পাঞ্জাব অঞ্চলে তৈলের জন্য বিশদ অনুসন্ধানের ফলে খাউর ও ধুলিয়ান তৈলক্ষেত্র (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে) আবিষ্কৃত হয়।

বর্মা অয়েল ও আসাম অয়েল কোম্পানি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পললভূমি অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইয়া ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নাহারকাটিয়া ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মরান তৈলক্ষেত্র আবিষ্কার করে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ও. এন. জি. সি. (ভারতের অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন) আসামের পললভূমি অঞ্চলে শিবসাগরের নিকটে রুদ্রসাগর ও লাকমা তৈল ক্ষেত্র, খম্বাত বা ক্যাম্বে অঞ্চলের গ্যাসক্ষেত্র, অঙ্কলেশ্বরের তৈলক্ষেত্র আবিষ্কার করে এবং খম্বাত কলোল ও নাবাগামে তৈলের সন্ধান পায়।

পশ্চিম বঙ্গে স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তৈলের সন্ধান আরম্ভ করে ও ১৯৫৪-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু গবেষণা ও বিশদরূপে জরিপ করার পর নবগঠিত ইন্দো-স্ট্যানভ্যাক প্রজেক্ট এই অঞ্চলে দশটি গভীর পরীক্ষামূলক কূপ খনন করিয়া বিফল হয়। ও. এন. জি. সি-এর দ্বারা ক্যানিং শহরের নিকট পরীক্ষামূলক কূপখননের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

বিশেষজ্ঞদিগের মতে পাললিক শিলা দ্বারা পুরু ভাবে আবৃত বিশাল স্তরীভূত শিলা-পর্যায় তৈল সঞ্চিত থাকিবার উপযুক্ত স্থান। এই মতে ভারতে কচ্ছ, খম্বাত পর্যন্ত, রাজস্থান, পাঞ্জাব, গঙ্গা-অববাহিকা, বঙ্গ দেশের পললভূমি প্রভৃতি স্থানে তৈল সঞ্চিত থাকা সম্ভব।

যেখানে ভূগঠন গভীর পাললিক সমভূমি দ্বারা আবৃত সেখানে ভূগঠনের ব্যাপক জিওফিজিক্যাল জরিপ হওয়া প্রয়োজন। আসাম, গুজরাত ও খম্বাত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ তৈলক্ষেত্রগুলি এরূপ বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষণের দ্বারাই সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খনিজ তৈলের গুরুত্বের জন্য বিদ্যাক্ষেত্রেও ইহা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে ও বর্তমানে পেট্রোলিয়াম টেকনোলজি নামে একটি নূতন বিদ্যার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

পেট্রোলিয়াম শিল্পের সাধারণভাবে পাঁচটি স্তর আছে— ১. অনুসন্ধান (এক্সপ্লোরেশন) ভূতত্ত্বীয় (জিওফিজিক্যাল সার্ভে) ও পরীক্ষামূলক খনন ২. প্রসার—(ডেভেলপমেণ্ট) খনন, তৈল উৎপাদন ৩. বহন—শোধনাগার পর্যন্ত নল দ্বারা তৈল পরিবহন ৪. পরিশোধন—অপরিশ্রুত তৈল শোধন ও নানারূপ তৈলজাত দ্রব্য উৎপাদন ৫. বাজার —দেশের বিভিন্ন জেলায় পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা।

ভারতে বর্তমান তৈলের উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদার অপেক্ষা অনেক কম, সেইজন্য পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। স্থানীয় অথবা আমদানিকৃত অপরিশ্রুত তৈল শোধনের জন্য বর্তমানে শোধনাগারগুলি ভারতের পেট্রোলিয়াম শিল্পে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারতে এখন সাতটি শোধনাগার আছে—

স্থান	[illegible]
ডিগবয়, আসাম	[illegible] (বর্মা [illegible])
গৌহাটি (নুনমাটি, আসাম)	ভারত সরকার
বরৌনি (বিহার)	ভারত সরকার
বোম্বাই	[illegible]
বোম্বাই	[illegible]
বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্র প্রদেশ)	[illegible]
কয়ালী (গুজরাত)	ভারত সরকার

কোচিন, মাদ্রাজ ও হলদিয়া এই তিনটি স্থানে আরও তিনটি শোধনাগার খুলিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

নানাবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি ও লুব্রিকেটিং অয়েল হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও শিল্পের অন্যান্য কাজে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা প্রচুর বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ শিল্পের মধ্যে প্লাস্টিক, প্রসাধনী ও ঔষধ প্রধান। অধুনা এই রহস্যময় হাইড্রোকার্বনযুক্ত পদার্থ হইতে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য পাওয়া সম্ভব কিনা তাহারও গবেষণা চলিতেছে।

দ্র. Erich W. Zimmermann, *World Resources and Industries*, New York, 1951 ; L. P. Mathur & P. Evans, ed., *Oil in India* New Delhi, 1964.

ডাস্টিন পাল

খনিজ সম্পদ ভূত্বকে কোনও কোনও স্থানে মানুষের ব্যবহারের যোগ্য মণিক (mineral) ও শিলা পুঞ্জীভূত আছে এবং তাহা নিষ্কাশন করিয়া মানুষ লাভবান হইতে পারে। এইসব মণিক ও শিলাকে আকর আখ্যা দেওয়া

হইয়া থাকে। ইহারাই আমাদের খনিজ সম্পদ। ইহাদের দুই শ্রেণী: ধাতব এবং অধাতব খনিজ। ধাতব খনিজ সরল বা যৌগিক হইতে পারে।

স্বর্ণ, রৌপ্য, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতু অমিশ্রিত অবস্থাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধাতুগুলি কোনও মৌলিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া মণিক রূপে বর্তমান থাকে। এইরূপ মণিকের সঙ্গে সচরাচর কতকগুলি অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় মণিকও সংলগ্ন থাকে, সেগুলিকে ধাতুমল বা গ্যাং (gangue) বলে। উভয়ের সংমিশ্রণ-জাত পদার্থের নাম আকর।

যে আকর হইতে একটিমাত্র ধাতু উদ্ধার করা যায় তাহা সরল আকর। যেমন, হেমাটাইট হইতে শুধু লৌহ পাওয়া যায়। অপর যে আকর হইতে একাধিক ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব, তাহাকে যৌগিক আকর বলে। রাজস্থানে এইরূপ এক প্রকার আকর হইতে একাধারে সীসা, দস্তা এবং রৌপ্য নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে।

অধাতব খনিজ সম্পদ কঠিন, তরল বা বায়বীয় আকারে থাকে যেমন, জিপসাম (কঠিন) বা কঠিন খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি।

কোনও কোনও মণিক বা শিলা ধাতু নিষ্কাশনের জন্য অথবা অন্য প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ক্রোমাইট বা বক্সাইট হইতে যথাক্রমে ক্রোমিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতু উদ্ধার করা হয়, আবার এগুলির সাহায্যে তাপসহ ইট তৈয়ারি হইতেও পারে। এরূপ অবস্থায় আকরগুলিকে ধাতব এবং অধাতব— উভয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায়।

আগ্নেয়, পাললিক এবং রূপান্তরিত এই তিন শ্রেণীর শিলার মধ্যে নানা প্রক্রিয়ার বলে খনিজ সম্পদ পুঞ্জীভূত হইতে পারে। যেমন:

১. ভূত্বকের গভীরে ম্যাগ্‌মার উষ্ণ শিলাদ্রব মধ্যে হীরক, ক্রোমাইট, প্ল্যাটিনাম ম্যাগনেটাইট মুক্ত হইয়া বর্তমান থাকে ২. গন্ধকের মত পদার্থ ঊর্ধ্বপাতিত হইয়া সঞ্চিত হইতে পারে ৩. উচ্চ তাপের অবস্থায় শিলার সংস্পর্শ ক্ষেত্রে নূতন মণিক সঞ্চিত হয়। এইরূপে ম্যাগনেটাইট, গ্র্যাফাইট, সীসা ও দস্তার কিছু আকর নির্মিত হয় ৪. ম্যাগ্‌মাসম্ভূত জলের ক্রিয়ায় সিংভূমের তাম্র-আকর ও রাজস্থানের সীসা, দস্তা, রৌপ্যের যৌগিক-আকর উদ্ভূত হইয়াছে ৫. সিংভূমের লৌহ আকর নানা স্থানের চুনাপাথর, বিকানিরের জিপসাম আদি, পলল রূপে অবক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে ৬. জল বৃষ্টি ও রৌদ্রাদির ক্রিয়ার বলে কয়েক প্রকার শিলার মধ্যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়া, শিলার কয়েকটি উপাদান দ্রবীভূত হইয়া যায়, অবশেষে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা আকর হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, যথা, ল্যাটেরাইট, বক্সাইট প্রভৃতি লৌহ বা অ্যালুমিনিয়ামের আকর গঠিত হয়, কেরলের মোনাজাইট বা ইলমেনাইট বালুকারাশি ৭. তাপ এবং চাপের প্রভাবে কোনও কোনও শিলার রূপান্তরিত হওয়ার সময় আকর গঠিত হইতে পারে। উদাহরণ, মহীশূরের লৌহ আকর, সিংভূমের কায়ানাইট, সোনপাহাড়ের সিলিম্যানাইট, কেরলের গ্র্যাফাইট।

ভারতবর্ষকে খনিজ সম্পদের দিক দিয়া মোটামুটি ভাবে সমৃদ্ধ বলা চলে। লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ইলমেনাইট, ক্রোমাইট, বক্সাইট, অভ্র, চুনাপাথর প্রভৃতি ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কয়লা, মোনাজাইট, জিপসাম, ম্যাগনেসাইট, কায়ানাইট, গ্র্যাফাইট, অ্যাসবেস্টস, সিলিম্যানাইটের ভাণ্ডার কম নয়। কিন্তু হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য সীসা, দস্তা, টাংস্টেন, তাম্র, খনিজ তৈল প্রয়োজনের তুলনায় এখনও কম বলিয়া মনে হয়। টিন, নিকেল, কোবাল্ট নাই বলিলেই চলে।

শংকর মুখোপাধ্যায়

খন্দ কন্দ দ্র

খমধ্য নভঃস্থানাঙ্ক দ্র

খমির উঁহা অ্যাসকোমিসিটিস শ্রেণীর (Class-Ascomycetes) অন্তর্গত এন্ডোমিসিটেসিই গোত্রের (Family-Endomycetaceae) ছত্রাক। খমির বিভিন্ন প্রজাতির হইয়া থাকে— সবগুলিই অবশ্য স্যাকারোমিসেস গণের (Genus-Saccharomyces) অন্তর্ভুক্ত।

খমির বহু এককোষের সমষ্টি, কিন্তু কোষগুলির পরস্পরের মধ্যে বন্ধন অতি শিথিল। কোষগুলি গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং প্রত্যেকটি কোষই কোষ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। ক্লোরোফিল না থাকায় ইহারা সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্থেসিস) দ্বারা খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে না। প্রধানতঃ অঙ্গজ বিস্তার (ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন) পদ্ধতির সাহায্যে খমিরের বংশবৃদ্ধি হয়। ইহা ছাড়া কখনও কখনও যৌন প্রজননের দ্বারাও খমির কোষের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দ্রুত বংশবৃদ্ধির সময় খমিরের কোষগুলি মালার মত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ ছত্রাকের সহিত খমির প্রায়ই বর্তমান থাকে। ইহা ছাড়া কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্যে অর্থাৎ কাল্‌চার মিডিয়ামে খমিরের চাষ করা যায়।

কয়েক প্রজাতির খমির বেকিং শিল্পে, যেমন পাউরুটি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। মদ্য উৎপাদনেও খমিরের প্রভূত ব্যবহার হইয়া থাকে — খমির কোষের এনজাইমগুলি শর্করাকে অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করে। খমির কোষে প্রচুর ভিটামিন বি থাকে। এইজন্যই দেহে ভিটামিন বি এর অভাব ঘটিলে 'ঈস্ট ট্যাবলেট' খাওয়া হয়।

মদ্য উৎপাদনে খমিরের উপযোগিতা বহু প্রাচীন কাল হইতেই জানা ছিল। মিশরের থিব্‌স নগরে প্রায় ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সমাধিতে প্রাপ্ত মদ্যপাত্রেও খমিরের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে।

দ্র J. Hodder & N. J W. Kreger-van-Rij, *The Yeasts. A Taxonomic Study*, Amsterdam, 1952; G. Smith, *An Introduction to Industrial Mycology*, London, 1960

সুব্রত রায়

খম্বাত উপসাগর ক্যাম্বে উপসাগর। আরব সাগরের অংশ এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এই ফিতাকৃতি উপসাগরটি গুজরাত উপকূল হইতে কাঠিয়াওয়াড় উপদ্বীপকে পৃথক করিতেছে। পূর্ব উপকূলে তাপ্তী ও নর্মদা, উত্তর উপকূলে মহি ও সবরমতী এবং পশ্চিমে শেত্রুঞ্জি এবং কাঠিয়াওয়াড়ের অন্যান্য ছোট ছোট নদী এই উপসাগরে পড়িয়াছে। নদীবাহিত পলল বর্তমানে এই অঞ্চলে নৌচলাচলের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। উপসাগরীয় উত্তর উপকূল জলা ও হ্রদ আকীর্ণ। ঐতিহাসিক কালে উপকূলাশ্রিত বন্দরগুলি হইতে ভারতের সহিত আরব, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির বাণিজ্য চলিত। বর্তমানে বন্দরগুলির গুরুত্ব অনেকাংশে লোপ পাইয়াছে। সুরাট, বরোচ, খম্বাত (ক্যাম্বে), ভাওনগর ইহার তীরাশ্রিত বন্দর।

অভিজিৎ গুপ্ত

খয়ের, খদির পানের মশলা হিসাবেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। বাবলার মত এক প্রকার গাছের নির্যাস ও আঠা হইতে খয়ের প্রস্তুত হয়। খয়ের গাছ (আকাসিয়া কাটেচু, *Acacia catechu*) লেগুমিনোসী গোত্রের (Family-Leguminosae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী পর্ণমোচী বৃক্ষ। ভারতের সর্বত্র এই গাছ জন্মিলেও পার্বত্য অঞ্চলের বৃক্ষের খয়েরই উৎকৃষ্ট। পশ্চিম বঙ্গে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচুর খয়ের গাছ জন্মায়। খয়ের গাছের নির্যাস দুই প্রকার হইয়া থাকে, শ্বেতসার ও রক্তসার। শ্বেতসার খয়ের অধিক উপকারী, ইহা পাপড়ি খয়ের নামে পরিচিত। বস্ত্রাদি রঞ্জনের কার্যে রক্তসার খয়ের ব্যবহৃত হয়। রাজনির্ঘণ্টুতে পাঁচ প্রকার খয়েরের উল্লেখ আছে— খদির, সোমবল্ক, তাম্রকণ্টক, বিট খদির ও অরি। পানের মশলা হিসাবেও পাঁচ প্রকার খয়েরের প্রচলন আছে - পাপড়ি, জনকপরী, পেগু, তিলি ও বেলগুটি। এই প্রসঙ্গে সুগন্ধি কেয়া খয়েরও উল্লেখযোগ্য ('কেয়া' দ্র)। বৈদ্যক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, খয়ের গাছের পাতা, ছাল, কাঠ ইত্যাদির নির্যাস হইতে কয়েক প্রকার ব্যাধির উপশম হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫১।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

খরগোশ লাগোমর্ফা বর্গের (Order-Lagomorpha) অন্তর্গত লেপোরিডী গোত্রের (Family-Leporidae) তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণী। খরগোশ প্রধানত দুই প্রকার: লেপাস গণের (Genus-Lepus) অন্তর্ভুক্ত বড় খরগোশ (ইংরেজী নাম 'হেয়ার') এবং অরিক্টোলাগাস গণের (Genus-Oryctolagus) অন্তর্ভুক্ত ছোট খরগোশ (ইংরেজী নাম 'র‍্যাবিট')। অস্ট্রেলিয়া ও মাদাগাস্কার ব্যতীত অন্যান্য স্থানে সর্বত্রই খরগোশ দেখা যায়।

খরগোশ দেখিতে অনেকটা ইঁদুরের মত হইলেও আয়তনে ইঁদুর অপেক্ষা অনেক বড়। ইহাদের মাথা অনেকটা গোলাকার, মুখ ছোট, চোখের তারা বেশ বড়, কান দুইটি খুব লম্বা, লেজ খুব ছোট এবং পিছনের পা দুইটি সামনের পায়ের তুলনায় দীর্ঘ। সর্ব শরীর কোমল লোমে আবৃত, জাতিভেদে লোমের রং শাদা, খয়েরি, ধূসর প্রভৃতি হইয়া থাকে। ছোট জাতের খরগোশ বা র‍্যাবিটের কান ও পা বড় জাতের খরগোশ বা হেয়ারের তুলনায় ক্ষুদ্রতর, ইহা ছাড়া প্রথমোক্ত জাতের খরগোশ মাটিতে গর্তের মধ্যে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় জাতের খরগোশ গর্তে বাস করে না।

খরগোশ উদ্ভিদভোজী প্রাণী। ইহারা রাত্রে আহারের অন্বেষণে বাহির হয় ও শস্যাদির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। খরগোশ অত্যন্ত ভীরু এবং সামান্য শব্দ শুনিলেই দ্রুত ছুটিয়া গিয়া গর্তে বা ঝোপে মুখ লুকায়।

স্ত্রী-খরগোশ প্রায় ৬-৭ মাস বয়স হইতেই গর্ভধারণ করিতে পারে এবং মাসখানেক গর্ভধারণের পর একবারে ৬-৭টি শাবক প্রসব করে। খরগোশ সাধারণতঃ ৭-৮ বৎসর বাঁচে।

দীর্ঘ লোমের জন্য আংগোরা র‍্যাবিট বিখ্যাত। খরগোশের লোম হইতে নমদা বা ফেল্টের টুপি, চেয়ার সোফা ইত্যাদির গদি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শাদা খরগোশ পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই গৃহে পালিত হয়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

খরতাল ভজন সংগীত ও ঐকতান বাদনে তালযন্ত্র বিশেষ। করতাল হইতে ইহা ভিন্ন। সাধারণতঃ ইহা কাষ্ঠ ও লৌহখণ্ডে নির্মিত হইয়া থাকে। বঙ্গ দেশে ঐকতান বাদনের অঙ্গ রূপে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বেও লৌহ নির্মিত খরতালের ব্যবহার লোকরঞ্জক ছিল। প্রায় ২৫·৪ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চি) দীর্ঘ ও ২·৫৪ সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চি) ব্যাস। ভিতরের দিক সমতল ও উপরিভাগ ঈষৎ গোলাকার পৃথক দুইটি লৌহখণ্ড হস্তাঙ্গুলির মধ্যে রাখিয়া কবজি ও বাহুর সাহায্যে সঞ্চালিত করিয়া আঘাত করিলে মধুর শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ নানা ভাবে প্রয়োগ করিয়া সংগীতের সহিত তালযন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। দুই হস্তে দুই জোড়া খরতাল বাজাইয়া অধিকতর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। কাঠের খরতাল ভজন গানে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। সাধারণতঃ ইহা বাঁশের অংশ হইতে প্রস্তুত হয়, সেজন্য ইহাকে 'কর্ত্রিকা বাদ্য'ও বলে। তথাপি এই যন্ত্র খরতাল নামে সুপ্রচলিত এবং 'কাপক্ষেপ' ও অনুরূপ সামাজিক ও ধর্মীয় সংগীতানুষ্ঠানে জনসাধারণের জন্য বাদিত হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

খরমুজ (কুকুমিস্ মেলো, *Cucumis melo*) কুকুর্বিটাসিঈ গোত্রের (Family-Cucurbitaceae) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী লতা। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এবং প্রচলিত প্রকার বা ভ্যারাইটি উতিলিস্সিমা (Utilissima) বাংলায় 'ফুটি' নামে পরিচিত। খরমুজের উৎপত্তিস্থল ইরান ও ট্রান্স্-ককেশীয় অঞ্চল। এশিয়া এবং আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলেই ইহার চাষ প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্বত্র, বিশেষতঃ নদীর চরে এবং উর্বর বালুকাময় মাটিতে ইহার চাষ করা হয়। সাধারণতঃ জানুয়ারি মাসে বীজ বপন করা হয়। প্রথম দিকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সেচ প্রয়োজন, ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলে সেচ বন্ধ করিতে হয়। সাধারণতঃ মার্চ মাসে ফল তোলা হয়।

সাধারণতঃ খরমুজ গাছের কাণ্ড রোমশ এবং ক্ষুদ্রাকৃতি, পাতা লম্বা বৃন্তসহ সরল, একান্তর ও তাম্বুলাকার, পাতার কিনারা খাঁজকাটা এবং তলদেশ রোমশ। পাতার কক্ষ হইতে শাখাবিহীন আকর্ষ ও পুষ্পবিন্যাস বাহির হয়। ফুলে পাঁচটি পাপড়ি থাকে। পুং পুষ্পে তিন হইতে পাঁচটি সংযুক্ত পুংকেশর এবং স্ত্রী পুষ্পে অধোগত ডিম্বাশয়ে অসংখ্য ডিম্বক (ওভিউল) থাকে। অর্ধপক্ক অবস্থায় ফল মৃদুরোমশ ও চিহ্নিত সবুজ রঙের। ফলের খোসা পুরু। এই ফল বহুদিন স্থায়ী এবং ক্রমশঃ মসৃণ ও পীতবর্ণ হয়। ফলের শাঁস মিষ্ট, জলপূর্ণ এবং সাধারণতঃ শাদা বা হলুদ রঙের। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়।

তরমুজ (সিট্রুলস ভলগারিস, *Citrullus vulgaris*) খরমুজের সমগোত্রীয় উদ্ভিদ, কিন্তু ইহার আকর্ষ শাখাযুক্ত, ফলের খোসা পাকা অবস্থায় সবুজ রঙের, শাঁস সাধারণতঃ লাল রঙের এবং ফলে জলীয় ভাগ অনেক বেশি (৯৫%)।

দ্র L. S S Kumar, A C Aggarwala, H. R. Ataneri and M G. Kamath, *Agriculture in India*, vol. II, Bombay, 1963

[illegible]

খরোষ্ঠী মৌর্যবংশীয় সম্রাট অশোক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান ব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। অশোকের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় স্বতন্ত্র লিপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আফগানিস্তানে তিনি যবন (গ্রীক) ও কাম্বোজ (ইরানী জাতীয়) প্রজার সুবিধার জন্য গ্রীক এবং অরামিক (Aramaic) ভাষা ব্যবহার করিতেন। ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাপ্ত লেখগুলিতে অশোক প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই দুই স্থানে ব্যবহৃত লিপি এক নহে। ভারতের লেখগুলি যে লিপিতে লিখিত উহা বাম হইতে দক্ষিণে পড়িতে হয়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের লিপি দক্ষিণ হইতে বামে পঠিতব্য। মৌর্য যুগে এই লিপিদ্বয়ের নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু পরবর্তী কালে প্রথম লিপিটি ব্রাহ্মী এবং দ্বিতীয়টি 'খরোষ্ঠী' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ফা-যুয়ন্ চৌ লিন্' (Fa-yuan-tchou-lin) সংজ্ঞক চীনা গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে অশোকের দুই একটি অরামিক লেখও পাওয়া গিয়াছে।

খরোষ্ঠী লিপির 'অ' অক্ষরটির আকার খরের ওষ্ঠের ন্যায় বলিয়াই সম্ভবতঃ উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Levi) মনে করেন যে, নামটি প্রকৃতপক্ষে 'খরোষ্ট্র', 'খরোষ্ঠী' নহে। তাঁহার মতে পশ্চিম পাকিস্তানের নিকটবর্তী

'খরোষ্ট্র' সংজ্ঞক একটি ক্ষুদ্র দেশের নাম হইতে লিপিটির নামকরণ হইয়াছিল। এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দুইশত বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকাংশ পারস্যের হখামনিষ বংশীয় (Achaemenian) সম্রাটগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। হখামনিষদিগের রাজকার্য ব্যাপারে অরামিক ভাষা ব্যবহৃত হইত বলিয়া ঐ যুগে অরামিক লিপির ব্যবহার পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রচলিত হইয়াছিল। খরোষ্ঠী এই অরামিক লিপির ভারতীয় বিকার। ভারতে রাজস্ব সংগ্রাহক কর্মচারী এবং মহাজন প্রভৃতি অরামিক লিপিতে ভারতীয় ভাষায় দ্রুতহস্তে লিখিবার যে চেষ্টা করিতেন তাহারই ফলে কালক্রমে খরোষ্ঠী লিপির উদ্ভব হয়। কেহ কেহ মনে করেন, ভারতীয় পারসিক 'খরপোস্ত' (অর্থাৎ 'খরের চর্ম') শব্দ হইতে 'খরোষ্ঠী' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের মতে খরের চর্মে দলিলপত্র লিখিত হইত বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'খরোষ্ঠী' নামটি অরামিক ভাষায় 'হারুথা' (হিব্রু 'বারুসেথ্' অর্থাৎ 'উৎকীর্ণ করা') শব্দের বিকারজাত বলিয়া বোধ হয়।

অশোকের খরোষ্ঠী লেখ পেশোয়ার ও হাজারা জেলায় পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে গ্রীক, শক ও পহ্লব জাতীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মুদ্রায় গ্রীক লেখের ভারতীয় অনুবাদ সাধারণতঃ খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত হইত। ঐ যুগে এবং পরবর্তী কুষাণ আমলেও ঐ অঞ্চলের লেখাবলীতে খরোষ্ঠী ব্যবহৃত হইত। কিন্তু খরোষ্ঠী বর্ণমালায় 'আ' 'ঈ' 'ঊ' প্রভৃতি দীর্ঘ স্বর ও মাত্রা চিহ্নের অভাব থাকায় উহা ভারতীয় ভাষা লিখিবার পক্ষে খুব উপযোগী ছিল না। এইজন্যই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ক্রমশঃ খরোষ্ঠীর ব্যবহার লোপ পায় এবং ব্রাহ্মী উহার স্থান অধিকার করে। মৌর্য যুগের পর আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার আরও কতিপয় জনপদে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু একই কারণে ঐ দেশগুলিতেও ক্রমশঃ ব্রাহ্মীর ব্যবহার জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

বৈদেশিক রাজগণের মুদ্রায় সম্মুখভাগে গ্রীক লেখ, এবং পশ্চাদ্ভাগে প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী লিপিতে উহার অনুবাদ দেখা যায়। এই সূত্র হইতেই খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হইয়াছিল। পরে গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের চতুর্দশ অনুশাসনের ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী রূপান্তরের তুলনাও এই কার্যের সহায়ক হয়। খরোষ্ঠীর পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপ (Prinsep), লাসেন (Lassen), নরিস (Norris), কানিংহ্যাম (Cunningham) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। খরোষ্ঠী বর্ণমালার কতকগুলি অক্ষর দেখিতে অনেকটা একরূপ বলিয়া খরোষ্ঠী লেখের পাঠোদ্ধার অপেক্ষাকৃত কঠিন। আবার খরোষ্ঠীর ব্যবহারভূমিতে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার উপর বৈদেশিকগণের ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাব পড়ায় অনেক সময়ে কাজটি আরও কঠিন হইয়া পড়ে।

দ্র গৌরীশংকর হীরাচন্দ ওঝা, ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা বা *The Palaeography of India*, 2nd edn, Ajmir, 1918, Renou & Filliozat, ed, *L' Inde Classique*, Tome II, Paris, 1953; G. Buehler, *Indian Palaeography*, Reprint, Calcutta, 1961.

দীনেশচন্দ্র সরকার

খলিফা শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। মহম্মদ ছিলেন একাধারে পয়গম্বর, ধর্মগুরু, রাষ্ট্রনায়ক, আইনদাতা, প্রধান বিচারপতি ও সেনাপতি। আল্লার পয়গম্বরের অবশ্য কোনও উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু রাষ্ট্রনায়কের উত্তরাধিকারী কে হইবেন ইহাই তাঁহার মৃত্যুর (৬৩২ খ্রী) পর প্রধান সমস্যা দাঁড়ায়। তাঁহার একমাত্র কন্যা ফাতিমা ছিলেন আলীর পত্নী। আরব দেশে শেখ (সর্দার) এর পদ পৈতৃক ছিল না। মহম্মদ ভবিষ্যতের জন্য কোনও ব্যবস্থা করেন নাই বা কোনও উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আরব দেশের বিভিন্ন স্বার্থের ঐক্যগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় ও কয়েকটি বিবদমান দলের উদ্ভব হয়। কেহ কেহ প্রাগিস্লামিক যুগের ন্যায় বয়োজ্যেষ্ঠ ও সবসম্মানিত ব্যক্তির নির্বাচন সমর্থন করেন। কেহ কেহ আবার আইনানুবর্তিতার (লেজিটিমেসি) পক্ষে ছিলেন, আবার অনেকে কোরেশ অভিজাত বংশীয় ওমায়াগণের অধিকার সমর্থন করেন। অবশেষে প্রথম দল জয়লাভ করে। আবু-বকর ছিলেন পয়গম্বরের পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ সর্বজনসমাদৃত এবং তিনিই নির্বাচিত হন।

খিলাফতের ইতিহাস পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

ক. ৬৩২-৬১ খ্রী— সাধু বা নৈষ্ঠিক খলিফাগণের যুগ (অল্ রাশিদূন)। ইহার মধ্যে আবু-বকর (৬৩২-৩৪ খ্রী) ও ওমর (৬৩৪-৪৪ খ্রী)-এর রাজত্বকালকে ইংরেজীতে প্যাট্রিআর্ক্যাল (Patriarchal) যুগ বলা হয়। ওসমান (৬৪৪-৫৬ খ্রী)-এর শাসনে ইসলাম বিরোধী প্রতিঘাতের সূত্রপাত হয়। আলীর (৬৫৬-৬১ খ্রী) সময়ে খিলাফতের

জন্য মুয়াবিয়ার সহিত সংঘর্ষ ঘটে। মুয়াবিয়া জয়লাভ করেন। এই যুগে রাজধানী ছিল মদিনায়।

খ. ৬৬১-৭৪৯ খ্রী— ওমায়্যা খিলাফৎ মুয়াবিয়া (৬৬১-৮০ খ্রী), এজিদ (৬৮০-৮৩ খ্রী), মারওয়ান (৬৮৩-৮৫ খ্রী) ও আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রী) এই বংশের শাসন সুদৃঢ় করেন। ওমায়্যা বংশের উন্নতির পরাকাষ্ঠার যুগ হইল ৬৮৫-৭৪৩ খ্রী; কিন্তু তাহার পরই অবনতি ও পতন ঘটে (৭৪৩-৪৯ খ্রী)। ওমায়্যা যুগে দামাস্কাস ছিল রাজধানী।

গ. ৭৪৯-১২৫৮ খ্রী— আব্বাসীয় খিলাফৎ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা আবদুল্লা আস্‌সাফ্‌ফা (৭৪৯-৫৪ খ্রী) পয়গম্বর মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর। ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা মনসুর (৭৫৪-৭৫ খ্রী) খ্যাতনামা বরমকী উজিরদের সহায়তায় রাজ্যের গোড়াপত্তন সুদৃঢ় করেন। এই বংশের হারুণ অল্ রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রী) ও মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রী)-এর রাজত্বকালকে খিলাফতের স্বর্ণ যুগ বলিয়া পরিগণিত করা হয়। কিন্তু খলিফা মুতওয়াক্কিলের সময় (৮৪৭-৬১ খ্রী) হইতে অবনতি আরম্ভ হয় এবং মঙ্গোল সর্দার হলাগুর আক্রমণে (১২৫৮ খ্রী) পতন ঘটে। আব্বাসীয় যুগের সময় রাজধানী ছিল বাগদাদ, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল।

এই প্রাচ্য খিলাফৎ ব্যতীত স্পেনে এক প্রতীচ্য খিলাফৎ স্থাপন করেন ওমায়্যা বংশীয় আবদুর রহমান (প্রথম, ৭৫৬ খ্রী)। প্রায় তিন শত বৎসর ১০৩১ খ্রী পর্যন্ত এই খিলাফতের রাজধানী কর্ডোবা বাগদাদকেও হার মানাইত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন আবদুর রহমান (তৃতীয়)।

প্রথম ও শেষ শিয়া খিলাফৎ (ইমাম রাজ্য স্থাপিত হয় প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় পরে অল-কাহিরায়, কাইরোতে অর্থাৎ মিশর দেশে, ৯০৯-১১৭১ খ্রী) শিয়াদের ইসমাইলী শাখা-সম্ভূত এই বংশকে ফতিমীয় বংশ বলা হইয়া থাকে। ইঁহাদের শাসনকালে কাইরো সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে উন্নতি করিয়াছিল তাহা বাগদাদ ও কর্ডোবার তুলনায় ন্যূন নহে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অটোম্যান তুর্কীগণের কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌ল অধিকারের পর যে খিলাফৎ স্থাপিত হয় তাহার অবসান হয় মুস্তাফা কামালের সময় (১৯২৪ খ্রী) ('খিলাফৎ আন্দোলন' দ্র)।

মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান হিসাবে খলিফা পয়গম্বরের পয়গম্বরী কার্য ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কার্যই সম্পাদন করিতেন। মাওয়ার্দীর মতে খলিফার কর্তব্য ছিল দশটি, যথা: ১. ধর্মরক্ষা ২. আইন নির্দেশ ও বিচার ৩. শান্তিরক্ষা ৪. অপরাধীগণের শাস্তিবিধান ৫. রাষ্ট্ররক্ষা ৬. 'জিহাদ' অর্থাৎ ইসলাম-প্রত্যাখ্যানকারীগণের সহিত যুদ্ধ ৭. যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ব্যবস্থা ও দান বিতরণ ৮. সৈন্যদের পুরস্কার বিতরণ ও বেতন ব্যবস্থা ৯. নিযুক্তি ১০. রাষ্ট্রকার্যে স্বয়ং অংশগ্রহণ। অতএব দেখা যাইতেছে, খলিফা ছিলেন ধর্মরক্ষক, শ্রেষ্ঠ শাসক, বিচারক ও সেনাপতি। সংক্ষেপে তাঁহার কর্তব্য ছিল বিচার, করস্থাপন, শুক্রবারে প্রার্থনাসভা নিয়ন্ত্রণ ও জিহাদ। কিন্তু খলিফা পোপ ছিলেন না। ইমাম হইলেও তাঁহার কোনও আধ্যাত্মিক অধিকার ছিল না।

শিয়া মতবাদানুসারে খলিফা আলী ও ফতিমার বংশসম্ভূত হইবেন, নির্বাচনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেইজন্য শিয়াদের আইনানুবর্তী (লেজিটিমিস্টস) বলা হয়। তাঁহাদের মতে মহম্মদ আলীকেই মনোনীত করিয়া কিছু গুপ্ত জ্ঞান দিয়াছিলেন, অতএব শিয়া ইমাম দৈবশক্তিসম্পন্ন। শিয়া মতবাদ বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শিয়াদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে।

শিয়াগণের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ পোষণ করেন খারিজীগণ (Kharajis)। প্রাচীন গণতান্ত্রিক আদর্শানুবর্তী এই দলকে মৌলিকতাবাদী (র‍্যাডিক্যালস) বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের মতে কোনও ইমামেরই প্রয়োজন হয় না, যদি ইসলামীয় কানুন বজায় থাকে: প্রয়োজন হইলে ইমাম জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন ও তিনি আল্লার নররূপী প্রতিনিধি। যে কোনও সমর্থ, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক মুসলমান ইমাম হইতে পারিবেন। অসন্তোষজনক বা অধার্মিক খলিফাকে পদচ্যুত বা নিহত করা যাইতে পারে। উৎকট খারিজীগণের মতে খলিফার বা রাষ্ট্রনায়কের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। 'খিলাফৎ আন্দোলন' দ্র।

দ্র T. W. Arnold, *The Caliphate*, Oxford, 1924; W. Muir, *The Caliphate*, Edinburgh, 1924; H. A. R. Gibb & J. H. Krammers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden, 1953.

জগদীশনারায়ণ সরকার

খশ, -স, -ষ, -শীর উত্তর ভারতে হিমালয়ের সানুদেশের অধিবাসী প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষী উপজাতি। মহাভারত, হরিবংশ, মনুসংহিতা, অথর্ববেদের পরিশিষ্ট, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে খশ জাতির উল্লেখ আছে। এই আর্যভাষী উপজাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দরদ জাতির সহিত সম্মিলিতভাবে বাস করিত

এবং মধ্য এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব পারস্যের আর্যজাতির কতকগুলি শাখার সহিত ইহাদের যোগ ছিল। খশ জাতি মোটের উপর ভারতে সংস্কৃতভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদিও কতকগুলি বিষয়ে সম্ভবতঃ ইহাদের ভাষা ও সমাজ -গত ব্যাপারে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্তী কালে ইহারা মুখ্যতঃ পশ্চিমে কাশ্মীরের পূর্বাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে নেপালের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে প্রসৃত হয়। খশ জাতি প্রাচীন ভারতে বৈদিক আচার হইতে বিচ্যুত ব্রাত্য বা পতিত আর্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ইহাদের মৌলিক ক্ষত্রিয়ত্বও স্বীকৃত হইত। তুর্কী বিজয়ের পরে বহু ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজা ও যোদ্ধা, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য, উত্তর ভারতের নানা বিজিত হিন্দুরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, আশ্রয়লাভের জন্য হিমালয় প্রান্তে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং এই খশদিগের সহিত তাঁহাদের বহু সংমিশ্রণ ঘটে— উত্তর ভারতের সমতল ভূভাগ হইতে আনীত প্রাকৃত ও আধুনিক আর্য ভাষা (হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির পূর্ব রূপ) খশেদের নিজেদের আর্য ভাষার সহিত এবং হিমালয় অঞ্চলের প্রাগার্য অধিবাসী ভোটব্রহ্ম (কিরাত) ও মুণ্ডাকোল (নিষাদ) জাতিদ্বয়ের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া এখন হিমালয় প্রদেশের 'পাহাড়ী' বা 'হিমালী' আর্যভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, যথা ১. পশ্চিমী পাহাড়ী— চমেয়ালী (চম্বার ভাষা), মাণ্ডেয়ালী (মাণ্ডির ভাষা), কাঙ্গড়াঈ, কুলুঈ, কিউঁঠালী, জৌনসর-বাওয়ার, সিরমৌড়ী প্রভৃতি; ২. মধ্য-পাহাড়ী— গাড়ওয়ালী ও কুমায়ুনী এবং ৩. পূর্বী পাহাড়ী— খসকুরা বা গোরখালী বা পর্বতীয়া অথবা নেপালী।

মূল খশ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক কথা আছে যে, ঋষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভে যক্ষ, রাক্ষস ও খশ এই তিন জাতির উদ্ভব হয়। মধ্য এশিয়ার কাসগর নামের সহিত এই আদি খশ জাতির সংস্রব অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ এই খশ জাতির লোকেরা গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি কর্তৃক Kasia নামে উল্লেখিত হয় এবং এখনও গাড়ওয়াল ও কুমায়ুনের জনসাধারণ 'খাসিয়া' নামে পরিচিত। নেপালে 'খস' শব্দ 'ছেত্রী' বা 'ক্ষত্রিয়' শব্দের সমার্থক— নেপালী ভাষায় 'খস্' 'বাহুন' অর্থে 'ক্ষত্রিয়' ও 'ব্রাহ্মণ' এবং নেপালী ভাষার একটি প্রচলিত নাম হইতেছে 'খসকুরা' অর্থাৎ 'খস' জাতির ভাষা। লাতিন লেখক প্লিনির পুস্তকে হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসী casiri জাতির উল্লেখ আছে। ইহা খশ জাতির অন্যতম সংস্কৃত নাম 'খশীর' শব্দের রূপান্তর বলিয়া মনে হয়।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol IX, part IV & vol. I, part I, Calcutta, 1916, 1927.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খসকুরা নেপালী দ্র

খসখস ঘাস দ্র

খাইবার গিরিপথ ৩৪°১´ হইতে ৩৪°১৫´ উত্তর এবং ৭১°১০´ হইতে ৭১°৩০´ পূর্ব। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী গিরিপথগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সফেদকোহ্ পর্বতমালার মধ্য দিয়া প্রায় ৫৩ কিলোমিটার (৩৩ মাইল) দীর্ঘ এই পথটি কাবুল নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া জামরুদ হইতে ডাক্কা পর্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের পেশোয়ার ও আফগানিস্তানের কাবুলের মধ্যে ইহার মাধ্যমে সংযোগ রক্ষিত হয়। পেশোয়ার হইতে লাণ্ডিখানা (১০১২ মিটার বা ৩৩৭৩ ফুট) পর্যন্ত ৫১ কিলোমিটার (৩২ মাইল) রেলপথ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর উন্মুক্ত হয়। লাণ্ডিখানা হইতে ৯ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূরে অবস্থিত তোরখাম হইতে আফগান সীমান্ত। গিরিপথ দিয়া মোটর ও উট চলিবার পৃথক রাস্তা আছে। গিরিপথের উভয় দিকে কাদা পাথর ও চুনা পাথরের পাহাড় ১৮০ মিটার (৬০০ ফুট) হইতে ৩০০ মিটার (১০০০ ফুট) পর্যন্ত উচ্চ। তাহার পিছনে আরও উচ্চ শৃঙ্গ বিদ্যমান। আফগানিস্তানের উচ্চভূমির দক্ষিণাংশে নদীর সহিত সমান্তরালভাবে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলি ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী রহিয়াছে। নদীগুলি নামিবার সময় তাহাদের উপত্যকায় গিরিখাত সৃষ্টি করিয়াছে। খাইবার গিরিপথ ৪২০ মিটার (১৪০০ ফুট) হইতে ১০৫৫ মিটার (৩৫০০ ফুট) পর্যন্ত ওঠা-নামা করিয়াছে। গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ মুখে খাড়া চড়াই। পরে আলী মসজিদ (৯৫২ মিটার) পর্যন্ত উচ্চতা ক্রমশঃ ধীরগতিতে বাড়িয়াছে। আলী মসজিদ হইতে সুলতান খেল গ্রামের মধ্য দিয়া এই পথ লাণ্ডি কোটাল পর্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। এইখানেই গিরিবর্ত্মের উচ্চতা সর্বাধিক (১০৫৫ মিটার)। এইখান হইতে শীলমানি অঞ্চলের দিকে একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। প্রধান সড়ক শিনওয়ারি প্রদেশের মধ্য দিয়া লাণ্ডিখানার দিকে নামিয়া গিয়াছে। জামরুদ হইতে আলী মসজিদের মধ্যে পথে পড়ে কুকি খেল, সিপাহ্ কমবর খেল ও কামরাই খেল। আলী মসজিদ হইতে গরহিলালা-বেগ পর্যন্ত এই পথ মাল্লিকদিন খেল ও জাক্কা খেল গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

খাইবার গিরিবর্ত্মের সামরিক গুরুত্ব সমধিক। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিও ইহার সহিত জড়িত।

প্রাচীন কাল হইতে বহু বৈদেশিক আক্রমণকারী এই পথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বে দরেইওস (ডেরিয়াস) এবং ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বে আলেকসান্দর (আলেকজাণ্ডার)-এর একদল সৈন্যবাহিনী এই পথে ভারতে প্রবেশ করে। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ এই পথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং পেশোয়ার প্রান্তরে জয়পালের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ ইহারই পার্শ্ববর্তী পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন ও মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৫২৩ খ্রী) এই গিরিপথটি ব্যবহার করেন।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ্ এই পথে ভারতে প্রবেশ করেন। আহমদ শাহ্ দুর্‌রানী খাইবারের পথেই পাঞ্জাব আক্রমণ করেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় (১৮৩৯-৪২ খ্রী) ইংরেজ সৈন্য খাইবার পথ অধিকার করে। প্রথম আফগান যুদ্ধের অন্তে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনানায়ক জেনারেল পোলক কাবুল অভিযানে এই গিরিপথটি ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশবাহিনী এই গিরিপথ সাময়িকভাবে দখল করে। স্বাধীনচেতা সীমান্ত জাতিগুলিও চুক্তিবলে নামে ব্রিটিশদের অধীনে আসে, কিন্তু কোনদিনই তাহারা প্রকৃত বশ্যতা স্বীকার করে নাই। দুর্ধর্ষ আফ্রিদি খাইবারী ও শিনওয়ারী উপজাতিরাই এ স্থলে প্রধান।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গণ্ডামাক সন্ধির ফলে ইহারা ব্রিটিশ আনুগত্য গ্রহণ করে। ১৯১০-১১ সালে ইহাদের সহিত বহুবিধ চুক্তির ফলেই পার্বত্য পথে রেলওয়ে ও রাস্তা নির্মাণ শুরু করা সম্ভব হয়।

কমলা মুখোপাধ্যায়
বারীন বসু

খাকসার আন্দোলন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনায়তুল্লাহ্ খাঁ মশ্‌রিকী সমাজসেবার জন্য মুসলমানদের লইয়া খাকসার দল গঠন করেন। খাকসারগণ উর্দি পরিয়া হাতে বেলচা লইয়া কুচকাওয়াজ করিত। লাহোরে খাকসারদের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল এবং ১৯৩৭-৩৯ খ্রী র মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ শাখার সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ২৫০০ হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খাকসারদের সংখ্যা ছিল ৭৫০০। এই সময় লখনৌ শহরে শিয়া এবং সুন্নীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে খাকসার দল বলপ্রয়োগ করিয়া ইহা দমনের চেষ্টা করে। এতদুপলক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেস-গভর্নমেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া তাহারা অস্ত্রশস্ত্রসহ দলে দলে উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করে। ইনায়তুল্লাহ্ কয়েকজন অনুচরসহ ধৃত হন। ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষার আশ্বাস দিলে তাঁহাকে উত্তর প্রদেশের সীমান্তের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি দিল্লীতে আস্তানা গাড়িয়া এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পুনরায় উত্তর প্রদেশে অভিযান করেন এবং বিচারে তাঁহার একমাস কারাদণ্ড হয়। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া দলে দলে বহু খাকসার উত্তর প্রদেশে অভিযান করে। মন্ত্রীসভায় হিন্দু মন্ত্রীর আধিক্য হওয়ায় খাকসারদের আন্দোলন ক্রমশঃ হিন্দু মুসলমান আন্দোলনে পরিণত হয়। কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করিলে ইংরেজ গভর্নরের সঙ্গে তাহাদের আপস রফা হয়।

ক্রমে খাকসারদের সংখ্যা ১৭০০০ হয় এবং তাহারা ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে বিশেষতঃ পাঞ্জাবে সামরিক কুচকাওয়াজ অভ্যাস করে। শান্তিভঙ্গের ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আশঙ্কায় পাঞ্জাব সরকার ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে সামরিক কুচকাওয়াজ বন্ধ করিবার জন্য এক আইন প্রণয়ন করেন। খাকসারেরা এই আদেশ অমান্য করে এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের অনেক পার্বত্য মুসলমান তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পুলিশ বাহিনীর সহিত সংঘর্ষের ফলে বহু লোক হতাহত হয় এবং ইনায়তুল্লাহ্‌কে বন্দী করা হয়। অতঃপর মুসলমান জনসাধারণের সহানুভূতিতে উৎসাহিত হইয়া খাকসারেরা লাহোরে ও অন্যান্য স্থানে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাঞ্জাব সরকার বহুদিন চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে মসজিদ হইতে সরাইতে না পারিয়া অবশেষে পুলিশ বাহিনী দ্বারা তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বিতাড়িত করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে খাকসারেরা পুনরায় জোর আন্দোলন আরম্ভ করে এবং গোপনে বিদ্রোহের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় সরকার খাকসার-সংঘকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু ইনায়তুল্লাহ্ জেলে অনশনব্রত আরম্ভ করিলে খাকসারেরা উত্তেজিত হইয়া নানা স্থানে উপদ্রবের চেষ্টা করে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইনায়তুল্লাহ্ অনশন ভঙ্গ করেন এবং লিখিত ঘোষণাপত্রে খাকসারগণকে বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক কুচকাওয়াজ ও আইনবিরুদ্ধ আন্দোলন ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। ইহার পর এই সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসবাদী, অর্ধ-সামরিক, বে-আইনী সংঘ হীনবল হইয়া পড়ে। অনেকে মনে করেন খাকসার দলের প্রতি উত্তর প্রদেশ সরকারের ব্যবহার সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মনোবৃত্তির

পরিচায়ক ; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে পাঞ্জাব সরকারের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ সর্বাপেক্ষা তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রধান অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুসলমান নায়ক সেকেন্দর হায়ত খাঁ।

দ্র কে. এন. ইসলাম, আমীর আল্লামা মশরেকী ও খাকসার আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৪৪ , Hiralal Seth, *The Khaksar Movement under Searchlight and the Life Story of its Leader Allama Mashraqui*, Lahore, 1943 ; R. Coupland, *The Constitutional Problem in India*, London, 1945.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

খাজনা শব্দটি প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় : ১. জমিদারের আয় (রেণ্ট) ২. রাষ্ট্রের প্রাপ্য ভূমিরাজস্ব। খাজনার এই দুই ধারণা নিঃসম্পর্কিত নয়। ভূমিরাজস্ব ও জমিদারি খাজনা, দুইই ভূমিজাত উৎপন্নের অংশ। জমিদার কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করে ; তাহার এক অংশ রাষ্ট্রকে দেয় ভূমিরাজস্ব হিসাবে, বাকি-অংশ জমিদারের লাভ। প্রাচীন ভারতে রাজা ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বা পুরোহিতদের ও যুদ্ধজয়ী ক্ষত্রিয়দের ভূমিদান করিতেন। রাজস্ব কর্মচারীদেরও বেতনের বদলে ভূমিদান করা হইত। সম্ভবতঃ এইভাবেই ভারতে প্রথম জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা প্রকৃতপক্ষে ভূস্বামিত্ব লাভ করিত না, শুধু রাজার প্রাপ্য ভাগ, ভোগ, বলি ইত্যাদিকে পুরুষানুক্রমে আদায় ও ভোগ করার অধিকার পাইত। মুসলিম আমলেও নানা প্রকার জমিদারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহারা বংশানুক্রমে জমিদারি স্বত্ব ভোগ করিত বটে কিন্তু মোটের উপর ইহারা ছিল সনদপ্রাপ্ত রাজস্ব-কর্মচারী অথবা ভূমিরাজস্বের ইজারাদার। নিজ জোত হইতে তাহাদের আয় কতকটা 'বিশুদ্ধ' জমিদারি খাজনার তুল্য ছিল কিন্তু তাহাও লোকাচারের দ্বারা নির্ধারিত হইত। অন্যথা তাহাদের আয় ছিল ভূমিরাজস্বেরই একটা অংশ। ভারতে প্রাচীন ও মধ্য যুগে রাষ্ট্রই ভূস্বামী ছিল অথবা রায়তই ভূস্বামী ছিল, এই দুই মতের সপক্ষেই অনেক কিছু বলিবার আছে কিন্তু জমিদারের ভূস্বামিত্ব সম্পর্কে কোনও যুক্তিপূর্ণ কথা কেহই বলিতে পারেন নাই। বোধ হয় সত্যের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি হইল এই দৃষ্টিভঙ্গী যে, প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে ভূস্বত্বকে রাষ্ট্র, জমিদার ও রায়ত এই [illegible] বিভিন্ন মাত্রায় একযোগে ভোগ করিত। জমিদারদের [illegible] ভূস্বামিত্ব ও প্রতিযোগিতামূলক খাজনা ভারতে [illegible] শাসনেরই সৃষ্টি।

খাজনার নানা রূপ দেখা যায়, যথা : ১. শ্রম খাজনা ২. ফসলী খাজনা বা দ্রব্য খাজনা ৩. নগদী খাজনা ৪. বর্গাদারি খাজনা। ইওরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমিদাসেরা নিজ ক্ষেত্রের উৎপন্নকে পূর্ণভাবে ভোগ করিত এই শর্তে যে, তাহারা সপ্তাহে দুই বা তিন দিন প্রভুর জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম করিবে ; এই বিশেষ প্রকার বেগার শ্রমের নাম শ্রম খাজনা। ভারতে কোনও না কোনও প্রকারের শ্রম খাজনা কখনও বিদ্যমান ছিল না ইহা অবশ্য বলা যায় না। উপজাতি সমাজে রাজার বা দলপতির জমি কৃষকেরা বিনা প্রতিদানে চাষ করিয়া দেয়, এই প্রথা আজিও বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইওরোপীয় ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট শ্রম খাজনা প্রথা ভারতে গড়িয়া ওঠে নাই। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে, তৎকালীন অত্যাচারী জমিদারেরা কৃষকদিগকে বেগার খাটাইত। ইহা ছিল নগদী খাজনার অতিরিক্ত একটি অবৈধ আদায়। ইহাকে শ্রম খাজনা বলা উচিত নয়। শ্রম খাজনা একটি বিধিবদ্ধ প্রদেয়। ভারতে খাজনার প্রথম রূপ ছিল ফসলী খাজনা। ইহা বৈদিক যুগ হইতে মোগল আমল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। নগদী খাজনা ফসলী খাজনারই রূপান্তর। ফসলী খাজনার মুদ্রামূল্যই নগদী খাজনা। মোগল আমলেই নগদী খাজনা একটা বিধি হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু নগদী খাজনার পাশাপাশি ফসলী খাজনা প্রথাও চলিতে থাকে এবং আজিও তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। বর্গাদারী বা ভাগ চাষ প্রথার বিশেষত্ব এই যে, চাষের উপকরণ কতটা জমিদার সরবরাহ করে এবং কতটা কৃষক নিজে সরবরাহ করে, ইহার উপর নির্ভর করে উৎপন্ন ফসল কি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইবে। বর্গাদারী প্রথার অঙ্কুর প্রাচীন ভারতেই দেখা দিয়াছিল। সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত তাহা চলিয়া আসিতেছে।

জমির ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয় কেন ? ইহার সহজ উত্তর এই যে, জমি সর্বপ্রকার উৎপাদন কার্যের একটি অপরিহার্য উপাদান। উৎপাদনের সব উপাদানের জন্যই দাম দিতে হয়, জমির জন্যও। খাজনা জমির উপাদানমূল্য।

কিন্তু জমির একটি বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে বেশি দাম দিলে জোগান বাড়ে, কম দাম দিলে জোগান কমে। কিন্তু খাজনা বাড়ুক বা কমুক, জমির জোগান সর্বদা সমান থাকে কেননা জমি প্রকৃতির দান এবং তাহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ ও সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়।

সুতরাং খাজনা একান্তভাবে জমির চাহিদার উপর নির্ভর করে। এই কারণেই ইংরেজ ক্ল্যাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানী ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩ খ্রী) বলিয়াছিলেন যে, শস্য জমির খাজনা বাড়িয়াছে বলিয়াই শস্যের দাম বাড়ে নাই, শস্যের দাম বাড়িয়াছে বলিয়াই খাজনা বাড়িয়াছে। খাজনা 'কস্ট'-এর বা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহা জমিকে কাজে লাগাইবার জন্য অবশ্যপ্রদেয় দাম নয়। খাজনা মূল্যনিয়ন্ত্রক ব্যয় নয়, মূল্যনিয়ন্ত্রিত উদ্বৃত্ত।

রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া ধরা যাক যে, জমির একটিমাত্র ব্যবহারই আছে এবং তাহা হইল গম (রিকার্ডোর ভাষায় 'কর্ন') -এর চাষ। কর্ষিত নিকৃষ্টতম জমিতে অর্থাৎ প্রান্তিক জমিতে গমের উৎপাদন ব্যয় যদি হয় মন প্রতি ১০ টাকা তাহা হইলে গমের দামও হইবে ১০ টাকা। এই জমিতে মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হইবে। ইহা খাজনাবিহীন জমি। সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন উর্বরতর জমিতে নিযুক্ত হইলে খাজনাবিহীন জমির তুলনায় আয়ের যে আধিক্য দেখা দিবে তাহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনা। যদি গমের চাহিদা হ্রাসের ফলে গমের দাম কমিয়া হয় ৯ টাকা এবং উর্বরতর জমিটিতে গড় উৎপাদন ব্যয়ও হয় ৯ টাকা, তাহা হইলে এই জমিতেও কোনও উদ্বৃত্ত লব্ধ হইবে না। ইহাও হইবে খাজনাবিহীন, তবু ইহা গম চাষে নিযুক্ত থাকিবে, কেননা জমির অন্য কোনও ব্যবহার নাই।

রিকার্ডীয় বিশ্লেষণ হইতে এইরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর জমির গুণভেদের ফলেই খাজনা উদ্ভূত হয়। ইহা ভুল ধারণা। যদি সকল জমি সমগুণান্বিত হয়, তাহা হইলেও একই ভূমিতে ক্রমশঃ অধিকতর শ্রম ও মূলধন নিযুক্ত করিয়া বেশি বেশি ফসল ফলানোর চেষ্টা করিলে জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান দেখা দিবে, প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের অপেক্ষা বেশি হইবে, মোট আয় মোট ব্যয়ের অপেক্ষা অধিকতর হইবে এবং উভয়ের পার্থক্যটুকু হইবে অর্থনৈতিক খাজনা।

বাস্তু জমির খাজনা ও কৃষিগত জমির খাজনা মূলতঃ একই নিয়মে নির্ধারিত হয়। গৃহের চাহিদা বাড়িলে বাস্তু জমির খাজনা বাড়ে, গৃহের চাহিদা কমিলে বাস্তু জমির খাজনা কমে। বাস্তু জমির গুণ-ভেদ অবস্থানের উপর নির্ভর করে। শহরে জমির খাজনা বেশি, শহরতলিতে জমির খাজনা অপেক্ষাকৃত কম, গ্রামে বাস্তু জমির খাজনা আরও কম। যাহাকে বাড়ি ভাড়া বলা হয় তাহার এক অংশ বাড়ি তৈয়ারি বাবদ মূলধনের সুদ, বাকি অংশ ভূমি খাজনা।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কৃষক প্রজাই খাজনাকে নিজ উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে। সমাজের দিক হইতে— সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক হইতে— বিচার করিলে তবেই বলা যায় যে, খাজনা জমির জোগান দাম নয়, তাহা একটি উদ্বৃত্ত।

খাজনার ক্ল্যাসিক্যাল বিশ্লেষণে ধরিয়া লওয়া হয় যে, জমির একটিমাত্র ব্যবহারই আছে। কিন্তু একই জমির নানা বিকল্প ব্যবহার সম্ভব। যে জমিতে গম চাষ হইতেছে তাহাতে অন্য শস্যও উৎপন্ন হইতে পারে। ধরা যাক, গম-জমির শ্রেষ্ঠ বিকল্প ব্যবহার হইল যব চাষ, গম চাষ করিলে জমির আয় হয় ১০০ টাকা এবং যব চাষ করিলে একই জমির আয় হয় ৮০ টাকা। এ ক্ষেত্রে জমিকে গম চাষে নিযুক্ত করিতে হইলে অন্ততঃ ৮০ টাকা খাজনা দেওয়া অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ইহাই জমিটির দ্রব্যান্তর আয় (ট্রান্সফার আর্নিং)। জমিটিতে গম চাষ করার ফলে যে ৮০ টাকা পরিমাণ যব হইতে সমাজ বঞ্চিত হইল তাহা সমাজের দিক হইতে 'কস্ট' বা ত্যাগ ব্যয়। সুতরাং গম-জমিটির আয়ের সমস্তই উদ্বৃত্ত বা 'বিশুদ্ধ' খাজনা নয়; উদ্বৃত্তাংশ হইল ২০ টাকা। গমের উৎপাদনে জমিটির বিশিষ্ট উপযোগিতা হইতেই এই উদ্বৃত্ত উদ্ভূত হইতেছে।

অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বা খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয়, এই ধারণাও আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ বর্জন করিয়াছেন। যে কোনও উপাদানের বিশিষ্ট উপযোগিতা আছে এবং যাহার পরিমাণ অপরিবর্তনীয়, তাহার দ্বারা লব্ধ উদ্বৃত্তকে আধুনিক অর্থনীতি খাজনা বলে।

খাজনা শস্যের দামের অন্তর্ভুক্ত নয়, এই রিকার্ডীয় তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া কার্ল মার্ক্‌স (১৮১৮-৮৩ খ্রী) বলিয়াছেন যে, জমিদারেরা সকল জমির একচেটিয়া মালিক বলিয়া তাহারা কর্ষিত নিকৃষ্টতম জমির অর্থাৎ প্রান্তিক জমির ব্যবহারের জন্যও খাজনা আদায় করে। মার্ক্‌স ইহার নাম দিয়াছেন নির্বিশেষ ভূমি খাজনা; তাঁহার মতে ইহা শস্যের উৎপাদন ব্যয়ের ও দামের অন্তর্ভুক্ত। নির্বিশেষ ভূমি খাজনা মার্ক্‌সের মতে একটি করের তুল্য; শুধু ইহা রাষ্ট্রের দ্বারা স্থাপিত না হইয়া জমিদারের দ্বারা স্থাপিত হয়। রিকার্ডোর মতে শস্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষ সেই শ্রেণীর জমি পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে যেখানে শস্যের গড় উৎপাদন ব্যয় তাহার দামের সঙ্গে সমান। মার্ক্‌সের মতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও নির্বিশেষ ভূমি খাজনা চাষের বিস্তারে বাধা ঘটায়; প্রান্তিক জমি হইল সেইরূপ জমি যেখানে গড়

উৎপাদন ব্যয় ও নির্বিশেষ ভূমি খাজনা উভয়ের যোগফল শস্যের দামের সঙ্গে সমান। কাহার কথা সত্য তাহা নির্ণয়ের জন্য ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হইবে। তবে নির্বিশেষ ভূমি খাজনার হার কতটা হইবে তাহার কোনও অর্থনৈতিক বিচার মার্ক্সীয় তত্ত্বে পাওয়া যায় না। ইহাকে জমিদারের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলে ইহা এক-এক জমিতে এক-এক রকম হইবে। জমিদারেরা সকলে একজোট হইয়া একটি নির্দিষ্ট হারে নির্বিশেষ ভূমি খাজনা ধার্য করে, ইহা অবাস্তব এবং মার্ক্সও তাহা বলেন নাই।

খাজনা জমির উপাদান মূল্য, এই ধারণা উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণে অত্যন্ত মূল্যবান। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তবু এই সমাজেও বিভিন্ন শ্রেণীর জমির ব্যবহার মূল্য বা খাজনা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ নানা বিকল্প ব্যবহারে জমি ঠিকমত বণ্টিত হইবে না, উৎকৃষ্ট জমি নিকৃষ্ট ব্যবহারে নিযুক্ত হইবে এবং জমির সামাজিক অপচয় ঘটিবে।

অনেকে বলেন যে, খাজনা 'অনুপার্জিত আয়'। সামাজিক প্রগতির ফলে ভূমির উদ্বৃত্ত বাড়িতে থাকে এবং জমিদারশ্রেণী কোনরূপ শ্রম বা ত্যাগ স্বীকার না করিয়া উত্তরোত্তর আরও ধনী হইতে থাকে। ইহার প্রতিকারের জন্য প্রস্তাব করা হয় যে, ভূমিকর বসাইয়া জমিদারদের 'অনুপার্জিত আয়'-কে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক আয়ে পরিণত করা হউক। হেনরি জর্জের নামের সঙ্গে এই প্রস্তাব বিশেষভাবে জড়িত। এ কথা ঠিক যে, জমির 'বিশুদ্ধ' উদ্বৃত্তের উপর শতকরা একশত ভাগ হারে কর বসাইলেও জমি উৎপাদন কার্য হইতে প্রত্যাহৃত হইবে না। রিকার্ডো ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, খাজনা ভূমির 'আদি ও অবিনাশী' গুণগুলির জন্যই প্রদত্ত হয়। কার্যত: কোন্‌টি জমির 'আদি ও অবিনাশী' গুণ এবং কোন্‌টি মানবসৃষ্ট এবং মূলধননিয়োগপ্রসূত গুণ, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। সম্পত্তির বহুতর রূপের অন্যতম হইল ভূসম্পত্তি। যে ব্যক্তি ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অন্য রূপে সম্পত্তি ধারণ করিল সে ভূমিকর হইতে অব্যাহতি পাইবে, অথচ যে নিজের 'উপার্জিত' ও সঞ্চিত আয় ব্যয় করিয়া সম্প্রতি জমি কিনিয়াছে তাহার উপর এই কর পড়িবে যদিও সে খাজনা রূপে যাহা পাইতেছে তাহা মূলধনের সুদ মাত্র। এইরূপ ভেদাত্মক কর ন্যায়সংগত নহে। শুধু ভূমি নয়, সকল বিত্তমান সম্পত্তি হইতেই উদ্বৃত্ত লব্ধ হইতে পারে। যদি উদ্বৃত্তকে হস্তগত করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ভূমিকর নয়, আয়করই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

দ্র Alfred Marshall, *Principles of Economics*, London, 1890; C. D. Field, *Introduction to the Regulations of the Bengal Code*, Calcutta, 1912; Joan Robinson, *The Economics of Imperfect Competition*, London, 1933; Radhakumud Mukherji, *Indian Land-Systems, Ancient, Mediaeval and Modern*, Calcutta, 1938; Karl Marx, *Capital*, vol. III, Calcutta, 1946; A. P. Lerner, *The Economics, of Control*, New York, 1947; P. A Samuelson, *Economics*, London, 1952; F Benham, *Economics*, London, 1960; S. C. Sarkar, ed., *Rammohun Roy on Indian Economoy*, Calcutta, 1965.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

খাড়ি নদী দ্র

খাড়িয়া, খেড়ে আদি কোলগোষ্ঠীর অন্তর্গত উপজাতি। মধ্য প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিম বঙ্গের অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে খাড়িয়াদের বাস। আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ওড়িশার সীমান্তে, পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় এবং বিহারের ধলভূম অঞ্চলের খাড়িয়ারা পাহাড়ী খাড়িয়া বলিয়া পরিচিত। ইহার পশ্চিমে যাহাদের বাস তাহারা দুধ খাড়িয়া এবং আরও পশ্চিমের খাড়িয়া-গোষ্ঠী ঢেল্কি খাড়িয়া নামে অভিহিত। অরণ্যের মধু ও ফলমূল সংগ্রহ এবং পশুপক্ষী শিকার পাহাড়ী খাড়িয়াদের উপজীবিকা। কোথাও কোথাও তাহারা প্রাচীন প্রথায় কৃষিকার্য করে। স্বাভাবিক জলাশয়ের পার্শ্বে তাহাদের বাস। ঢেল্কি খাড়িয়া বা দুধ খাড়িয়ারা কৃষিকার্যে আগ্রহশীল।

ইহাদের সমাজ পিতৃকেন্দ্রিক। সমাজে কয়েকটি কুল বা গোত্র আছে। কুলগুলির সঙ্গে গোত্র দেবতার সম্পর্ক তেমন নাই। বিবাহের জন্য বরপক্ষকে কন্যাপণ দিতে হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত। মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা সাধারণ রীতি, তবে শবদাহ প্রথাও অপরিচিত নয়।

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস ও গুণিন বা ওঝার সাহায্যে ভবিষ্যৎ জানা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পূজার্চনার জন্য 'দেউরী' বা পুরোহিত আছে। পূজায় মোরগ বলি দেওয়া হয়। ইহারা সাড়ম্বরে কর্ম, ধরম, বড়াম পূজা উদ্‌যাপন করে। রাখি-পূর্ণিমার দিন পিতৃপুরুষ পূজার ব্যবস্থা আছে। দুধ খাড়িয়ারা অনেকে মিশনারিদের

সংস্পর্শে আসিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের খাড়িয়াগণকে সরকার স্বভাবদুর্বৃত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত (ডিনোটিফায়েড ট্রাইব) বলিয়া গণ্য করেন।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

খাণ্ডবপ্রস্থ দাহ কুরুক্ষেত্রের সমীপে যমুনাতীরে অবস্থিত মহাভারতে উল্লিখিত প্রাচীন নগর। পুরাতন কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত খাণ্ডববনের অংশবিশেষের উপর অবস্থিত এই নগর বর্তমান দিল্লী শহরের অন্তর্গত ফিরোজশাহের কোটলাভূমি ও হুমায়ুনের সমাধিস্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণের পর হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত পাণ্ডবগণকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি ভীষ্মের উপদেশে অর্ধেক রাজ্য দান করেন এবং খাণ্ডবপ্রস্থে বসবাস করিতে আদেশ দেন। রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ এই স্থানেই স্থাপিত হয়। মহাভারতের আদিপর্বে খাণ্ডবপ্রস্থের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় (মহাভারত, পুনা সংস্করণ ১।১৯৯।২৭-৪৬)।

খাণ্ডবদাহের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বে বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মার কথামত অগ্নিমান্দ্য হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অগ্নিদেব খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু ইন্দ্রের প্রতিকূলতা হেতু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জলবিহারের পর যমুনাতীরে বিশ্রামরত কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিকট তিনি উজ্জ্বলকান্তি দীর্ঘদেহ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দান করেন এবং খাণ্ডবদাহের নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করেন। বরুণদেবের নিকট হইতে তিনি অর্জুনকে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণদ্বয় এবং কৃষ্ণকে চক্র ও কৌমোদকী গদা দান করেন। উহাদের সাহায্যে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া তিনি রোগমুক্ত হন (মহাভারত ১। ২১৪-২২৫)।

যূথিকা ঘোষ

খাত নদী ও সমুদ্র দ্র

খাদি চরকা আন্দোলন দ্র

খাদিজা হজরত মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ পাইবার পূর্বে মহম্মদ এই ধনী বিধবাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বয়স মহম্মদ অপেক্ষা পঞ্চদশ বৎসর অধিক ছিল। তিনি মহম্মদের কর্মজীবনে প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন। খাদিজাই প্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন।

আবুল হায়াত

খাদ্য যাহা আহার করিলে দেহের যথোপযুক্ত বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ হয় এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি অব্যাহত থাকে, তাহাই খাদ্য। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং দেশবাসীর কর্মপ্রচেষ্টা ও সংস্কৃতি তদ্দেশবাসীর বিচিত্র খাদ্যব্যবস্থার কারণ। ক্ষুধা নিবৃত্তি ও রসনা পরিতৃপ্তি খাদ্য গ্রহণে প্রেরণা দিলেও বর্তমান কালে খাদ্য নির্বাচন মূলতঃ পুষ্টিবিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করে।

প্রচলিত খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহাতে জীবদেহের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উভয় প্রকার উপাদানই বর্তমান। দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য খাদ্য হইতে প্রধানতঃ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ প্রভৃতি জৈব পদার্থ এবং ক্যালসিয়াম, লোহা, ফসফরাস প্রভৃতি অজৈব উপাদান পাওয়া দরকার। খাদ্যের উপাদানগুলিকে প্রয়োজনমত ভাঙিয়া, কিছু পরিবর্তিত করিয়া, সেই টুকরাগুলি নূতনভাবে সাজাইয়া এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত রাসায়নিক বন্ধনে বাঁধিয়া দেহের উপাদান তৈয়ারি করা হয়। এই সংশ্লেষণের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহাও সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ -ভাবে খাদ্যের উপাদান হইতে উদ্ভূত হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, প্রোটিন দেহের টিস্যুগুলির গঠন বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য এবং কার্বোহাইড্রেট শক্তি উৎপাদনের জন্য আবশ্যক, স্নেহপদার্থ প্রধানতঃ চর্বি রূপে সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনের সময় শক্তির অতিরিক্ত উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্যে প্রোটিনের গুণ ও পরিমাণ যথোপযুক্ত হওয়া চাই। সাধারণতঃ জান্তব প্রোটিনকে উৎকৃষ্ট প্রোটিন বলা হয়। দৈহিক প্রোটিন-অণুর সংশ্লেষণের জন্য যে সকল বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রয়োজন, তাহাদের কয়েকটি দেহ নিজ শক্তিতে তৈয়ারি করিতে অসমর্থ, সাধারণতঃ জান্তব প্রোটিনে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি অধিকতর পরিমাণে থাকে। এইজন্য যে-পরিমাণে জান্তব প্রোটিন আহার করিলে দেহে প্রোটিনের অভাব মেটে, শুধু উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উপর নির্ভর করিলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উহা গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণতঃ মিশ্র খাদ্যে নানাবিধ প্রোটিনের মিশ্রণের ফলে একটি খাদ্যের অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব অন্য খাদ্যের অ্যামাইনো অ্যাসিডের দ্বারা সম্পূরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে; ইহাকে প্রোটিনের সম্পূরক ক্ষমতা (সাপ্লিমেণ্টারি ভ্যালু) বলে। এই সম্ভাবনা থাকিলেও খাদ্যতালিকায় কিছু জান্তব প্রোটিন রাখা বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দেহের উচ্চতা অনুসারে

ওজন যত কিলোগ্রাম হওয়া স্বাভাবিক, তাহার খাদ্যে তত গ্রাম প্রোটিন থাকা উচিত। শৈশবে ও বাল্যে দেহ-বৃদ্ধির সময় এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী নারীর খাদ্যে পূর্বোক্ত আনুপাতিক পরিমাণের তুলনায় অধিক প্রোটিন থাকা আবশ্যক। বালক ও শিশুদের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন না থাকিলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং কোয়াশিয়রকর (kwashiorkor) নামক শিশুরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। খাদ্যে প্রোটিনাভাব ঘটিলে পূর্ণবয়স্কের, বিশেষতঃ গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী নারীদের, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগ হয় এবং রক্তে প্রোটিনের পরিমাণ কমিয়া যাইবার ফলে হাত-পা ফোলে ('প্রোটিন' দ্র)।

সাধারণতঃ খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যাহাতে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তির প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ উহা হইতে উৎপন্ন হয় ('কার্বোহাইড্রেট' দ্র)।

খাদ্যের স্নেহজাতীয় পদার্থে উপযুক্ত পরিমাণে অসংপৃক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিড (আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড) থাকা প্রয়োজন, কারণ লিনোলেয়িক, লিনোলেনিক ও অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড নামক অত্যাবশ্যক অসংপৃক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিডগুলি দেহে উৎপন্ন হয় না ('স্নেহপদার্থ' দ্র)।

খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় জৈব উপাদান বিদ্যমান। পরিমাণে যৎসামান্য হইলেও প্রয়োজনীয়তায় উহারা অসামান্য। উহারা ভিটামিন অথবা খাদ্যপ্রাণ নামে পরিচিত। কয়েকটি ভিটামিন দেহে নানা এনজাইমের সহায়ক কো-এনজাইমগুলির অপরিহার্য অংশ। ভিটামিন-গুলিকে স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় ও জলে দ্রবণীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়— ভিটামিন এ, ডি, ই, এবং কে স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় এবং অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (ভিটামিন সি), থিয়ামিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড, রাইবোফ্ল্যাভিন, পিরিডক্সিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, বায়োটিন, ভিটামিন বি-১২, ফোলিক অ্যাসিড প্রভৃতি জলে দ্রবণীয় ভিটামিন ('ভিটামিন' দ্র)।

খাদ্যের অজৈব লবণগুলি দেহ গঠনে অংশ গ্রহণ করে এবং দেহের বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। দ্রবীভূত কিছু অজৈব লবণের আয়ন (ion) দেহে স্বাভাবিক কর্মকুশলতার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, ক্লোরিন, ফসফরাস, গন্ধক প্রভৃতি অজৈব উপাদান খাদ্যে থাকা দরকার। এতদ্ব্যতীত তামা, কোবাল্ট, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, ফ্লুয়োরিন প্রভৃতি আরও কয়েকটি অজৈব উপাদান খাদ্যে অল্প পরিমাণে থাকিলেই চলে।

বিভিন্ন খাদ্যের উপাদানসমূহের হিসাব করিয়া এমন-ভাবে দৈনিক আহারের তালিকা স্থির করা উচিত যাহাতে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উপাদান যথোপযুক্ত পরিমাণে থাকে। এইরূপ খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

সকলের দৈহিক প্রয়োজন একরূপ নহে, সেইজন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনের ভিত্তিতে খাদ্যতালিকা তৈয়ারি করা অবিধেয়। কোনও অবস্থাতেই খাদ্যে যাহাতে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা না থাকে সেজন্য খাদ্যে অপরিহার্য উপাদান-গুলির পরিমাণ প্রয়োজনীয় পরিমাণের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি থাকা যুক্তিযুক্ত।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানে যে রাসায়নিক শক্তি নিহিত থাকে তাহাই জীবদেহে শ্রমশক্তির উৎস। এই শক্তির পরিমাণ তাপন মাত্রায় প্রকাশ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ক্ষুদ্র অথবা গ্রাম-ক্যালরি সেই পরিমাণ তাপশক্তি, যাহা ১৪.৫° সেন্টিগ্রেড গরম ১ গ্রাম জলকে আরও ১° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করে। বৃহৎ অথবা কিলোগ্রাম ক্যালরি (কিলোক্যালরি) উহার অপেক্ষা এক হাজার গুণ অধিক তাপশক্তি। ইংরেজীতে উহাদের যথাক্রমে cal এবং Cal. লেখা হয়।

প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট – এই তিন শ্রেণীর খাদ্য-উপাদানই দেহে শক্তি উৎপাদন করিতে পারে। ১ গ্রাম প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট ৪ কিলোক্যালরি এবং ১ গ্রাম স্নেহপদার্থ ৯ কিলোক্যালরি তাপ বা শক্তি উৎপাদন করে। অতএব খাদ্যে উহারা যত গ্রাম পরিমাণে থাকে তাহাকে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে ৪ এবং স্নেহপদার্থের ক্ষেত্রে ৯ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলগুলির সমষ্টি করিলে স্থূলভাবে খাদ্যের কিলোক্যালরির মাত্রা পাওয়া যায়। গুরু দৈহিক শ্রমের জন্য অধিক ক্যালরিযুক্ত খাদ্য বিধেয়। কিন্তু এজন্য খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ না বাড়াইলেও চলে। অধিক ক্যালরিযুক্ত খাদ্য বিপাকের জন্য কয়েকটি জলে দ্রবণীয় ভিটামিনও অধিক পরিমাণে খাদ্যে থাকা দরকার।

শারীরিক অবস্থা ও কর্মভার অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ২৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

প্রতি মুহূর্তে ঘর্ম, মূত্র প্রভৃতির সহিত জল দেহ হইতে বহু পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং কঠিন পরিশ্রম করিবার সময় উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। এইজন্য শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে যথোপযুক্ত পরিমাণে জল পান করা উচিত।

দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ

ব্যক্তির বিবরণ	বৃহৎ ক্যালরি বা কিলো ক্যালরি	মিশ্র প্রোটিন (গ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ভিটামিন এ (আন্তর্জাতিক একক)	ভিটামিন ডি (আন্তর্জাতিক একক)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)	থিয়ামিন (মিলিগ্রাম)
পুরুষ (ওজন ৫৫ কিলোগ্রাম)								
১. সাধারণ পরিশ্রম	২৮০০	৫৫						
২. কঠিন পরিশ্রম	৩৯০০							
নারী (ওজন ৪৫ কিলোগ্রাম)				১.০	৩০০০-৪০০০	৪০০-৮০০	৫০	১.০-২.০
১. সাধারণ পরিশ্রম	২৩০০	৪৫	২০-৩০					
২. কঠিন পরিশ্রম	৩০০০							
৩. গর্ভবতী (গর্ভকালের শেষার্ধ)	২৩০০	১০০		১.৫				
৪. দুগ্ধদাত্রী	২৭০০	১১০		২.০				

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর নিউট্রিশন অ্যাডভাইসরি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ডি. কে. পটবর্ধন কর্তৃক সংশোধিত তালিকা অবলম্বনে।

খাদ্য এমনভাবে সংরক্ষণ ও রন্ধন করা উচিত, যাহাতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নষ্ট না হয় এবং খাদ্য স্বাদু ও সহজপাচ্য হয়। অবশ্য রন্ধনের সময় খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের কিছু কিছু অপচয় ঘটে। উত্তাপের ফলে কিছু কিছু ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়, ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে তাহার সহিতও কিছু অজৈব লবণ ও ভিটামিনের অপচয় হয়, তরকারি বা ফল কাটিয়া ধুইবার সময়েও কিছু পরিমাণে ভিটামিন ও অজৈব লবণ খাদ্য হইতে বাহির হইয়া যায়। অত্যধিক উত্তাপের ফলে অনেক সময়ে প্রোটিন ও স্নেহপদার্থেরও খাদ্যমূল্য হ্রাস পাইতে পারে।

দ্র নীহাররঞ্জন ধর, আমাদের খাদ্য, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ; National Academy of Sciences: National Research Council, *Recommended Dietary Allowances*, Publication no. 589, Washington, 1958; H. C. Sherman & C. S. Langford, *Essentials of Nutrition*, New York, 1963.

পরিমলবিকাশ সেন

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ যে সকল খাদ্য গ্রহণ করা হয় তাহাদের কোন্‌টির মধ্যে কি জাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

উপাদান	খাদ্য
১. কার্বোহাইড্রেট	চাল, গম, চিনি, গুড়, মধু, আলু, কচু, ডাল ইত্যাদি
২. প্রোটিন	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, ডাল, সয়াবিন ইত্যাদি
৩. স্নেহপদার্থ	দুধ, ঘি, মাখন, ডিম, বনস্পতি, তৈল, বাদাম ইত্যাদি
৪. ভিটামিন এ	দুধ, মাখন, শাকসবজি, ভুট্টা, গাজর, বিলাতি কুমড়া, রাঙা আলু, হাঙর ও কড মাছের যকৃতের তৈল ইত্যাদি
৫. ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্স	মেটে, ডিম, শাকসবজি, ফলমূল, ডাল, দুধ, ঢেঁকিছাঁটা চাল, গম ইত্যাদি

৬. ভিটামিন সি— কালোজাম, লেবু, কমলালেবু, আনারস, পেয়ারা, আম, আমলকি, টম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা প্রভৃতি
৭. ভিটামিন ডি — চিতল, চাঁই, হেরিং, স্যামন, সার্ডিন প্রভৃতি তৈলপ্রধান মাছ, হাঙর ও কড মাছের যকৃতের তৈল ইত্যাদি
৮. ভিটামিন ই— গম, ছোলা ও ডাল- এর অঙ্কুর, ডিম, উদ্ভিজ্জ তৈল ইত্যাদি
৯. ভিটামিন কে— বাঁধাকপি, পালং শাক, শুঁটকি মাছ, টম্যাটো প্রভৃতি
১০. লৌহ — ডিমের কুসুম, মেটে, মাংস, ফল, পালং শাক, বাদাম প্রভৃতি
১১ ক্যালসিয়াম— চাল, গম, শাকসবজি, ফল, দুধ, বাদাম, ডিম ইত্যাদি
১২ ফসফরাস — দুধ, ডিম, মাংস, মাছ, চাল, গম, বাদাম প্রভৃতি

ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের প্রচলিত আহার্যে কার্বো-হাইড্রেটের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক ও প্রোটিনের পরিমাণ কম। ইহার উপর আবার অনেক অঞ্চলের খাদ্যে ক্যালরিরও অভাব থাকে।

ভারতে বহু লোকেই নিরামিষভোজী। সাধারণতঃ নিরামিষ খাদ্যে উপযুক্ত মানের প্রোটিনের অভাব থাকে। প্রথমতঃ— উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় জান্তব প্রোটিনের অনেক বেশি অংশ পাচনতন্ত্রে পরিপাকের পর দেহের কাজে লাগে, মাংস, ডিম বা দুধের প্রোটিনের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই পরিপাক হইয়া রক্তে বিশোষিত হয়, কিন্তু ডাল, শিম, আলু বা মটরের প্রোটিনের শতকরা ২০-৩০ ভাগ পরিপাকের সময় অপচয় হয়। দ্বিতীয়তঃ— গম, যব, ভুট্টা, মটর, চাল, ডাল প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্যের বিভিন্ন প্রোটিনে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড না থাকায় এ সকল উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের খাদ্যমূল্য মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতির প্রোটিনের তুলনায় কম। রাষ্ট্রসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থাও মাংস, ডিম ও দুধের প্রোটিনকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় অধিকতর গুণসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর প্রোটিন ব্যতীত ভিটামিন বি-১২, ভিটামিন ডি প্রভৃতি কয়েকটি ভিটামিনও মুখ্যতঃ আমিষ খাদ্যেই থাকে, তাই সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণে ইহাদেরও অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু নিরামিষাশী ব্যক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করিলে খাদ্যে প্রোটিনের ঐরূপ অভাব পূরণ হইতে পারে। কোনও কোনও বিজ্ঞানী ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কয়েকটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন উপযুক্ত পারস্পারিক অনুপাতে আহার করিলে দেহে তাহাদের গুণ অনেক বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ নিরামিষাহারী অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে এবং নানা প্রকারের উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাইলে তাহা হইতেই দেহে প্রোটিনের সম্পূর্ণ প্রয়োজনটুকু পূরণ হইতে পারে। অন্য দিকে আবার অনেক বিজ্ঞানীর মতে, অত্যধিক স্নেহপদার্থযুক্ত আমিষ খাদ্য আহার করিলে জান্তব স্নেহপদার্থ ও কোলেস্টেরলের আধিক্যের জন্য রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে ('কোলে-স্টেরল' দ্র)।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈনিক আহার্যের তুলনামূলক খাদ্যমূল্য লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলের আহারের খাদ্যমূল্য সর্বাধিক এবং দক্ষিণ ভারতের আহার সে হিসাবে নিকৃষ্ট। গম বা বাজরা, ঘন ডাল, সবুজ ও কাঁচা শাকসবজি, ফল, ঘি, মাখন, দুধ, দই, লস্যি, মাংস, ডিম ইত্যাদি পাঞ্জাব-হরিয়ানা অঞ্চলের নিয়মিত খাদ্যতালিকার অন্তর্গত। প্রচুর আমিষ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়ায় এ অঞ্চলের আহারে উচ্চশ্রেণীর প্রোটিন যথেষ্ট থাকে। ঘি, মাখন ইত্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট স্নেহপদার্থ প্রচুর পাওয়া যায়। কাঁচা শাকসবজি ও ফল হইতে পাওয়া যায় পরিমিত ভিটামিন ও অজৈব লবণ। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থানেই বহু লোক নিরামিষাশী। এ অঞ্চলের আহারে দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যের পরিমাণও খুব কম। ফলে দক্ষিণ ভারতের আহারে প্রোটিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, জান্তব প্রোটিন অতি সামান্য। অবশ্য সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বিশেষতঃ কেরলে সামুদ্রিক ও শুঁটকি মাছ খাওয়া হয়, ইহা হইতে কিছু জান্তব প্রোটিন মেলে। দক্ষিণ ভারতের লোক সবুজ শাকসবজি ও ফল কম খায়, কাজেই খাদ্যে প্রায়ই ভিটামিন ও অজৈব লবণের অভাব থাকিয়া যায়। খাদ্যে স্নেহপদার্থ বলিতে থাকে প্রধানতঃ নারিকেল বা তিলের তৈল এবং বনস্পতি, ফলে জান্তব স্নেহপদার্থেরও অভাব, ইহা ছাড়া নারিকেল তৈলে বাদাম বা সরিষার তৈলের তুলনায় সংপৃক্ত চর্বি-জাতীয় অ্যাসিড অধিক থাকায় ইহার দীর্ঘ ব্যবহারে রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানেই সাধারণ মানুষের আহার্যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরিরও অভাব থাকে। ইহার উপর আবার দক্ষিণ ভারতের অনেক অংশে (যেমন, অন্ধ্র প্রদেশ ও মাদ্রাজে) অত্যধিক লঙ্কা ব্যবহার করা হয়, পাচনতন্ত্রের উপর ইহারও ফল ভাল নয়।

পশ্চিম বঙ্গে সিদ্ধ চাল, মুগ, মুসুর বা কলাইয়ের ডাল, তরকারি ও শাকসবজি, বাদাম বা সরিষার তৈল, বনস্পতি, দুই-এক খণ্ড মাছ প্রভৃতি দৈনিক খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। আমিষ খাদ্যের পরিমাণ যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষের পক্ষে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যও দুর্লভ। তাই এ অঞ্চলের খাদ্যে প্রায়ই প্রোটিনের অভাব থাকে। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের তুলনায় এ অঞ্চলের আহার্যে প্রোটিন অপেক্ষাকৃত অধিক। ঘি, মাখন প্রভৃতি জান্তব স্নেহপদার্থের পরিবর্তে বনস্পতি ও বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈলই বেশি ব্যবহৃত হয় বলিয়া আহার্যে উপযুক্ত খাদ্যমূল্যের স্নেহপদার্থেরও অভাব হইতে পারে। কলেছাঁটা চাল, সরিষার তৈল প্রভৃতিতে ভিটামিন কম থাকে, কাঁচা শাকসবজিও নিয়মিত খাওয়া হয় না, কাজেই বিভিন্ন ভিটামিনেরও অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। বর্তমানে অবশ্য পশ্চিম বঙ্গের অনেক অঞ্চলে গমের অল্পাধিক প্রচলন হইয়াছে, গমে চালের তুলনায় প্রোটিন ও ভিটামিন বেশি থাকে।

উপযুক্ত খাদ্যের অভাব যেমন ক্ষতিকর, অতিরিক্ত আহারও তেমনই কুফলপ্রসূ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারের অভ্যাস থাকিলে ক্রমে সেই উদ্বৃত্ত খাদ্য দেহে মেদ রূপে সঞ্চিত হইয়া অত্যধিক স্থূলতার সৃষ্টি করে। এরূপ অবস্থায় মেদের আধিক্য অনুযায়ী খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয়, ইহার ফলে দেহের অতিরিক্ত মেদ ক্রমশঃ শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যয় হইয়া যায়। খাদ্যে প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থের পরিমাণ কমাইয়াই এভাবে ক্যালরির নিয়ন্ত্রণ করা হয়। চিনি, মধু, গুড়, জ্যাম, চকোলেট, জেলি, মার্মালেড, ঘি, মাখন, ক্ষীর, বনস্পতি, তৈল প্রভৃতি যে সকল খাদ্যে জলের পরিমাণ কম এবং কার্বোহাইড্রেট বা স্নেহপদার্থের পরিমাণ বেশি, সেগুলি যথাসম্ভব পরিহার করিতে হয়। কিন্তু খাদ্যের মোট পরিমাণ অব্যাহত রাখিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এবং পর্যাপ্ত মাত্রায় ভিটামিন ও অজৈব লবণের জন্য সবুজ শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। অন্যদিকে আবার অতি শীর্ণ ব্যক্তির দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য আলু, ঘি, মাখন, মধু প্রভৃতি অধিক ক্যালরিযুক্ত খাদ্য বেশি খাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। 'আহার', 'কৃষি' ও 'খাদ্যসংরক্ষণ' দ্র।

দ্র H. C. Sherman, *Chemistry of Food and Nutrition*, New York, 1952; M. G. Wohl & R. S. Goodhart, *Modern Nutrition in Health and Disease*, Philadelphia, 1955; Food and Agriculture Organization, United Nations, *Protein Requirement*, F. A. O. Nutritional Studies, no 16, Rome, 1957; Food and Agriculture Organization, United Nations, *The State of Food and Agriculture*, Rome, 1958.

দেবজ্যোতি দাশ

খাদ্যপ্রাণ ভিটামিন দ্র

খাদ্যসংরক্ষণ বিশেষ বিশেষ ঋতুতে এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলি অঞ্চলে উৎপন্ন খাদ্যবস্তুকে বৎসরের সকল সময়ে ও দেশের সকল স্থানে উপযুক্ত রূপে বণ্টন করিবার জন্য বিবিধ প্রক্রিয়ায় ইহাদের দীর্ঘকাল অবিকৃত ও গ্রহণযোগ্য রাখা প্রয়োজন, ইহাকেই খাদ্যসংরক্ষণ বলা হয়।

সকল জৈব খাদ্যবস্তুই পচনশীল। প্রধানতঃ জীবাণুর সংক্রমণ, খাদ্যের নিজস্ব এনজাইমের ক্রিয়া, বায়ুর অক্সিজেনের প্রভাব প্রভৃতির জন্য খাদ্যের বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, ফলে খাদ্যের গন্ধ ও স্বাদের অবনতি হয় এবং বিভিন্ন রোগেরও কারণ ঘটে। খাদ্যের বিকৃতি বন্ধ করিতে হইলে পচনের এই সকল কারণের প্রতিবিধান প্রয়োজন। কোনও একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় পচনের সকল কারণ রোধ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। তবে অধিকাংশ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াই জীবাণুঘটিত পচন বন্ধ করে এবং অন্যান্য রাসায়নিক পরিবর্তনও কতকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

খাদ্যসংরক্ষণের প্রধান কয়েকটি প্রক্রিয়া :

১. বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ এই পদ্ধতিতে প্রথমে আহারের অনুপযোগী অংশগুলি বাদ দিয়া খাদ্যবস্তুকে পরিমাণমত খণ্ড করিয়া সেই খণ্ডগুলিকে বিশেষ বিশেষ তরল সংরক্ষক পদার্থের সহিত কাচ, টিনের প্রলেপ দেওয়া ইস্পাত, কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখা হয়, ইহার পর উত্তাপ বা পাম্পের সাহায্যে পাত্রটিকে বায়ুশূন্য করিয়া যন্ত্রের দ্বারা এরূপভাবে ঢাকনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে বাহিরের বায়ু আর ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় উত্তপ্ত করিয়া খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। সর্বশেষে পাত্রটিকে দ্রুত শীতল করা হয়।

২. প্যাস্টেরাইজেশন (Pasteurization). কেবল স্বল্পস্থায়ী খাদ্যসংরক্ষণেই ইহা ব্যবহৃত হয়, কারণ এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যকে সম্পূর্ণ জীবাণুশূন্য না করিয়া কেবল জীবাণুর সংখ্যা অনেক কমাইয়া দেওয়া হয়। বিশেষতঃ কাঁচা দুধের সংরক্ষণে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে দুধকে না ফুটাইয়া কেবল উত্তপ্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ (যেমন, ৬১.৭° সেন্টিগ্রেড বা ১৪৩° ফারেনহাইট তাপে আধঘণ্টা) রাখিয়া

দ্রুত ১০° সেন্টিগ্রেডের (৫০° ফারেনহাইট) নীচে শীতল করা হয় এবং ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত সেই শীতল তাপেই সংরক্ষণ করা হয়, ফলে অধিকাংশ জীবাণু নষ্ট হইয়া দুধ সংরক্ষিত হয়।

৩. শীতলীকরণ : খাদ্যবস্তুকে শীতল করিয়া রাখিলে জীবাণুর বৃদ্ধি ও খাদ্যের নিজস্ব এনজাইমগুলির কার্য সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে, ফলে খাদ্য বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। অন্য কোনও প্রক্রিয়াতেই এত অবিকৃত-ভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় না।

ধীরে ধীরে শীতল হইলে খাদ্যবস্তুর মধ্যের জলীয় অংশ বড় বড় বরফের কণায় পরিণত হয় ও তাহাদের চাপে খাদ্যের কোষগুলি ভাঙিয়া খাদ্যের পচন বৃদ্ধি পায়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যবস্তুকে শীতল কক্ষে হিমায়ন যন্ত্রের সংস্পর্শে রাখিয়া, কিংবা হিমশীতল কোনও তরল পদার্থে ডুবাইয়া, অথবা দুইটি শীতল ধাতব পদার্থের মধ্যে রাখিয়া, বা অতিশীতল বায়ু সঞ্চালন করিয়া দ্রুত শীতল করা হয়। নিম্নতাপে সংরক্ষিত খাদ্যকে ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত অনুরূপ নিম্নতাপে রাখা প্রয়োজন, কারণ নিম্নতাপ হইতে সাধারণ তাপমাত্রায় আনার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর বৃদ্ধি ও এনজাইমের কার্য আবার শুরু হয় ও দ্রুত পচনের সম্ভাবনা থাকে। এইজন্যই হিমঘরে সংরক্ষিত আলু বা মাছ বাজারে আনিবার পর দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৪. বিশুষ্কীকরণ এই পদ্ধতিতে খাদ্যে জলীয় অংশের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে কমাইয়া দেওয়ায় খাদ্যে পচনকারী জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ হয় ও এনজাইম প্রভৃতির কার্যও নিবারিত হয়, ফলে খাদ্য সংরক্ষিত হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে গুঁড়া দুধ উৎপাদনের জন্য দুধকে সাধারণতঃ 'স্প্রেয়ার' বা 'রোলার' যন্ত্রের দ্বারা শুষ্ক করা হয়, প্রথম প্রক্রিয়ায় দুধকে উচ্চ চাপের সাহায্যে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়া ফোয়ারার মত উত্তপ্ত আবহাওয়ার বাহির করা হয় এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় দুধকে উত্তপ্ত রোলারের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়— উভয় প্রক্রিয়াতেই দুধের জলটুকু শুকাইয়া গিয়া গুঁড়া দুধ উৎপন্ন হয়। এইভাবে দ্রুত বিশুষ্ক হওয়ায় খাদ্যবস্তুর স্বাদ, গন্ধ, খাদ্যমূল্য প্রভৃতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না।

৫. আচার প্রস্তুত করিয়া সংরক্ষণ : বহুকাল হইতেই এই পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিতে ফল ও সবজি সাধারণতঃ ১৫-২০% লবণজলে ডুবাইয়া রাখা হয়। ক্রমে খাদ্যের শর্করাজাতীয় দ্রব্যের সন্ধানের (ফার্মেন্টেশন) ফলে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়; এই ল্যাকটিক অ্যাসিডই খাদ্যকে পচনকারী জীবাণু হইতে রক্ষা করে। লবণজল ছাড়া তৈল, চিনির রস, ভিনেগার প্রভৃতির সাহায্যেও এরূপ সংরক্ষণ সম্ভব।

৬. রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সংরক্ষণ : দেহের পক্ষে ক্ষতিকর নয় অথচ খাদ্যে জীবাণু ও এনজাইমের ক্রিয়া রোধ করিতে পারে, এমন রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যে মিশাইয়া খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। ভাবে ফলের রস, জেলি প্রভৃতির সংরক্ষণে বেনজয়িক অ্যাসিড-ঘটিত লবণ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্র M. B Jacob, ed., *Chemistry and Technology of Food Products*, vols I-III, New York, 1952.

অরবিন্দ বসু

খানুয়া প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। বাবরের ভারত আক্রমণকালে হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক প্রভুত্ব আফগান ও রাজপুতদের মধ্যে বিভক্ত ছিল। আফগান সুলতানের অধিকারের পরিধিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে রাজপুত বীর মেবার রানা সংগ্রাম সিংহ (সঙ্গ) হিন্দুস্থানে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সুতরাং পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রী) বাবর দিল্লী ও আগ্রার আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়াও হিন্দুস্থানে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। সমৃদ্ধিশালী ও সুবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর সঙ্গকে পরাজিত করাই বাবরের এখন প্রধান লক্ষ্য হইল। এই লক্ষ্য পূর্ণ হয় খানুয়ার যুদ্ধে।

বাবর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে রানা সঙ্গ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে বাবরকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করেন নাই। এ বিষয়ে মতভেদ আছে কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে পানিপথের পর বাবর ও রানা সঙ্গের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অবশ্য রানা সঙ্গ একাকীও ছিলেন না। তিনি সুলতান সিকন্দর লোদীর এক পুত্র মাহ্‌মুদ লোদীকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই সুলতান রানা সঙ্গের সহিত যোগদান করেন। মাড়বার, অম্বর, গোয়ালিয়র, আজমীর ও চান্দেরীর রাজগণকে লইয়া তিনি এক বিশাল রাজপুত সংঘ সংগঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার দলে ছিলেন হাসান খাঁ মেওয়াটী ও লোদীগণের অন্যান্য মুসলমান পৃষ্ঠপোষক। তথাপি বাবর এই সংঘর্ষকে 'জিহাদ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

রানার অধীনে ১২০ জন সর্দার ও ৮০০০০ অশ্বারোহী

ও ৫০০ হস্তী ছিল। রাজপুতগণের শৌর্য, সামরিক খ্যাতি ও রানার যুদ্ধপ্রস্তুতির বৃত্তান্তে বাবরের সৈন্যদল আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। বাবর মদ্যপান পরিত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। মানুষমাত্রই মরণশীল ও কাপুরুষতা অপেক্ষা সসম্মানে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান শ্রেয়— এই বলিয়া তাঁহার সৈন্যদের প্রোৎসাহিত করেন। ইহাতে তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং তাহারা কোরান স্পর্শ করিয়া আপ্রাণ যুদ্ধ করিবে এই শপথ করে।

আগ্রার ৬০ কিলোমিটার (৩৭ মাইল) পূর্বে অবস্থিত খানুয়ার যুদ্ধে (১৬ মার্চ ১৫২৭ খ্রী) রাজপুতগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করে। বাবরের সঙ্গে কামান ছিল কিন্তু রাজপুতেরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানিত না। ইহার ফলে ও বাবরের উৎকৃষ্ট রণকৌশলে পানিপথের ন্যায় খানুয়ার যুদ্ধেও তিনি সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। সংগ্রামসিংহ কোনরকমে পালাইয়া বাঁচেন, কিন্তু প্রায় এক বৎসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খানুয়ার পর বাবর চান্দেরী অবরোধ করেন ও মেদিনী রায়কে পরাজিত করেন (১৫২৮ খ্রী)।

পানিপথে বাবরের যে জয়যাত্রার সূচনা হইয়াছিল খানুয়ার যুদ্ধে তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইল। পানিপথে বিদেশ বাবর এক পতনোন্মুখ রাজ্যের সুলতানকে পরাজিত করেন। খানুয়ায় তিনি এক পুনঃসঞ্জীবিত জাতীয় শক্তিকে দমন করেন। খানুয়ার পূর্বে বাবরের হিন্দুস্তান অধিকার সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ছিল। খানুয়ার যুদ্ধের পর ইহা সহজসাধ্য হয়। এইজন্যই এই যুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

জগদীশনারায়ণ সরকার

খান্দেশ ২০°১৫' উত্তর হইতে ২২°১' উত্তর ও ৭৩°৩৭' পূর্ব হইতে ৭৬°২৪ পূর্ব। এই জেলা বর্তমানে ধুলিয়া ও জলগাঁও— যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম খান্দেশ জেলা হিসাবে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত। পূর্বে ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার উত্তরে সাতপুরা পর্বতশ্রেণী নর্মদা ও তাপ্তী নদীকে বিভক্ত করিয়াছে, পূর্বে নিমার ও বুলদানা জেলা, দক্ষিণে সাতমালা ও অজন্টা পাহাড় ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।

ভূপ্রকৃতি হিসাবে এই জেলা চতুর্দিকেই পর্বতবেষ্টিত। দাক্ষিণাত্যের সমভূমি এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার অধিকাংশই ব্যাসাল্ট দ্বারা গঠিত। উত্তরে ও পশ্চিমে এই সমভূমি ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়াছে এবং সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ৯৪০ মিটার। নদীর অববাহিকায় পলিমাটি দেখা যায়। তাপ্তী নদীই সর্বপ্রধান, প্রচুর শাখানদীসহ প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমিতে বাঘ, চিতা, ভল্লুক, বাইসন ও শম্বর হরিণ, নীলগাই ও বিভিন্ন ধরনের হরিণ দৃষ্টিগোচর হয়।

খান্দেশ জেলার আয়তন ২৪৮৫১ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩১১৬২৮৩ (১৯৬১ খ্রী)। ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আলাউদ্দীনের করায়ত্ত হইবার পূর্বে খান্দেশ আসিরগড়ের চৌহান রাজার অধীনে ছিল।

খান্দেশের ফারুকী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'মালিক রাজা' নিজেকে খলিফা ওমর ফারুকের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। ফিরুজ তোগলকের অনুগ্রহে থালনের (বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের ধুলিয়া জেলার অন্তর্গত) ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে মালিক রাজার কর্তৃত্বে আসে। কয়েক বৎসরের মধ্যে মালিক শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং সম্ভবতঃ ফিরুজের মৃত্যুর (১৩৮৮ খ্রী) পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মালিকের পুত্র নাসির রাজা হন এবং শীঘ্র আসিরগড়ের হিন্দু দুর্গ দখল করিতে সমর্থ হন। তাপ্তী নদীর পশ্চিমে বুরহানপুর শহর তাঁহার রাজত্বকালেই গড়িয়া উঠে। মালব সুলতানের সহযোগিতায় নাসির গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হন এবং গুজরাটের সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। গুজরাটের সুলতান তাঁহাকে 'খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর এই খান বংশের রাজ্য খান্দেশ নামে অভিহিত হয়। নাসিরের প্রপৌত্র আদিল খানের রাজত্বকালে (১৪৫৭ ১৫০৩ খ্রী) বুরহানপুর দুর্গ নির্মিত হয়, গণ্ডোয়ানা ও গড়মান্দলা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে এবং খান্দেশ অধিকতর শক্তিশালী হয়।

মোগলদের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ খান্দেশ। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক ইহা সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় এবং একটি মোগল প্রদেশে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবাদার নিজাম উল মুল্ক ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে বুরহানপুর ব্যতীত খান্দেশ মারাঠা পেশোয়া বালাজী বাজিরাওকে সমর্পণ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশ ব্রিটিশ অধিকারে আসে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বুরহানপুর সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশের অধীনস্থ হয়।

বুরহানপুর শহর ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল দাক্ষিণাত্যের রাজধানী ছিল। ১৭২০ ৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নিজামের রাজধানী ছিল। প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার (৫ বর্গ মাইল) আয়তনের এই শহরে পৃথিবীর নানা জাতির লোক বাস করিত। রেলপথ না হওয়া অবধি বুরহানপুর উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা

অনুসারে ইহার লোকসংখ্যা ৮২০৯০। ফারুকী আমলে নির্মিত (১৫৮৮ খ্রী) জমা মসজিদ এখানকার একটি দর্শনীয় বস্তু।

নবম-দশম শতাব্দীতে মধ্য ভারতে তিন শিখরবিশিষ্ট 'তিন থানের মন্দির' খান্দেশ অঞ্চলেও নির্মিত হইত। উত্তর দাক্ষিণাত্যের 'দখন' মন্দির, যাহার বেদি এবং মণ্ডপ বিভিন্ন দেওয়ালের সহিত বহু কোণের সৃষ্টি করিত, তাহাও এই অঞ্চলে নির্মিত হইত। ফারুকী আমলে খান্দেশী স্থাপত্য ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কৃষিসম্পদের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, গম ও বিভিন্ন প্রকারের ডাল উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল তুলার জন্য প্রসিদ্ধ এবং রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তুলাই প্রধান। অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, মাখন, নীল, মোম এবং মধু এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে লবণ, মশলা, ধাতব পদার্থ, সুতা এবং চিনিই প্রধান। খনিজ সম্পদে খান্দেশ উল্লেখযোগ্য নয়। গৃহনির্মাণোপযোগী পাথর ও চুনাপাথর প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। শিল্প ও হস্তনির্মিত শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প ও মোটা পশমের কম্বল বিখ্যাত। জলগাঁও ও ধুলিয়ায় কাপড়ের কল এবং ভুসাওয়ালে রেলের কারখানা আছে।

দুইটি জাতীয় সড়ক ধুলিয়ায় মিলিত হইয়া নাসিক হইয়া বোম্বাই গিয়াছে এবং মধ্য রেলপথের একটি শাখা জলগাঁও হইয়া বোম্বাই গিয়াছে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, vol XV, Oxford, 1908; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vols. V & VII, Bombay, 1937 & 1960.

নিশান্তি ঘোষ
অনিলকৃষ্ণ মজুমদার

খাফী খাঁ মুসলিম ঐতিহাসিক। প্রকৃত নাম মহম্মদ হাশিম, হাশিম আলি খাঁ নামেও তিনি অভিহিত হইতেন, খাফী খাঁ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। কথিত আছে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াও সম্রাটের অপ্রীতিভাজন হইবার আশঙ্কায় তিনি উহা গোপন রাখিয়াছিলেন ও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'খাফী' (বা 'গুপ্ত') খাঁ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতপক্ষে খোরাসানের অন্তর্গত 'খোয়াফ্' বা 'খাফ্' অঞ্চলে তাঁহার বংশের আদি নিবাস হওয়াতে তিনি 'খাফী খাঁ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। ফারসী ভাষায় রচিত 'মুন্তাখাব্-উল্-লুবাব্ মুহম্মদ্ শাহী' (সংক্ষেপে 'মুনতাখাব্-উল্ লুবাব্') গ্রন্থে তিনি ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের প্রথম ভারত-আক্রমণ কাল হইতে সম্রাট মহম্মদ শাহের (১৭১৯-৪৮ খ্রী) চতুর্দশ রাজত্ববৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের মুখবন্ধস্বরূপ মোগল ও তাহাদের পূর্বতন ইতিবৃত্তও অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হইয়াছে, আকবরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিবরণও বড়ই সংক্ষিপ্ত। ইহার পরবর্তী সময় হইতে বর্ণনা বিস্তারিত আকার ধারণ করিয়াছে। লেখকের স্বীকৃতি অনুসারে শেষ তিপ্পান্ন বৎসরের ইতিহাস তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য ও প্রত্যক্ষদর্শী বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীগণের নিকট সংগৃহীত বিবরণ মিলাইয়া রচনা করিয়াছিলেন। ইতিহাসের, বিশেষতঃ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাঁহার রচনার এই অংশই সর্বাধিক মূল্যবান। খাফী খাঁ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক সাময়িক ভাবে রাজকার্যে নিযুক্ত হইলেও রাজভয়ে সত্য গোপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন ঐতিহাসিককে লোভ ও ভয়-শূন্য হইতে হইবে, তাঁহার রচনায় সর্বদা আন্তরিকতা থাকিবে এবং রচনাকালে পরিচিত ও অপরিচিতের মধ্যে কোনও পার্থক্য না করিয়া তিনি সত্য ও নিরপেক্ষতার আদর্শে অটল থাকিবেন। তিনি তাঁহার সুশৃঙ্খল ঘটনাবিন্যাস ও সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী দ্বারা স্বীয় গ্রন্থকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দ্র যদুনাথ সরকার, 'মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ', প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, H. M. Elliot and J. Dowson, *History of India as told by its own Historians*, vol. VII, London, 1877.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

খারবেল ওড়িশার বর্তমান রাজধানী ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরি পাহাড়ে হাতীগুম্ফা নামে একটি গুহা আছে। উহাতে 'কলিঙ্গাধিপতি' উপাধিধারী খারবেল (ক্ষারবেল) সংজ্ঞক জনৈক প্রাচীন নরপতির প্রাকৃত ভাষায় লিখিত একটি প্রশস্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। খারবেলের অপর একটি নাম বা উপাধি ছিল 'মহাবিজয়'। সমীপবর্তী মঞ্চপুরী গুহার একটি লেখে খারবেলের মহিষী তাঁহাকে 'কলিঙ্গচক্রবর্তী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ওড়িশা এবং আন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে

কলিঙ্গ দেশ অবস্থিত ছিল। ইহার প্রাচীন রাজধানীর নাম তোসলী। ভুবনেশ্বর হইতে ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূরে অবস্থিত ধৌলির নাম এই 'তোসলী' নামের বিকার। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে মগধ অর্থাৎ আধুনিক পাটনা-গয়া অঞ্চলের নন্দবংশীয় সম্রাট মহাপদ্ম কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগে মৌর্য বংশীয় সম্রাট অশোককে পুনরায় বাহুবলে কলিঙ্গ দেশ জয় করিতে হইয়াছিল। মগধ সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে কলিঙ্গ দেশে 'মহামেঘবাহন' নামক এক নূতন 'কলিঙ্গ' রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। উহা ছিল প্রাচীন চেদিকুলের একটি শাখা। এই বংশের রাজগণ আপনাদিগকে আর্য বলিয়া উল্লেখ করিতেন। খারবেল ঐ মহামেঘবাহন বংশের তৃতীয় নরপতি। তিনি আপনাকে রাজর্ষি বসু অর্থাৎ পৌরাণিক চেদিরাজ উপরিচর বসুর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন।

পূর্বে অনেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খারবেলের রাজত্বকাল নির্দেশ করিতেন। কিন্তু হাতীগুম্ফা লেখ হইতে জানা যায় [illegible] মগধের নন্দবংশীয় রাজগণের সময়ের (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর) তিন শত বৎসর পরে (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে) রাজত্ব করিতেছিলেন। হাতীগুম্ফা লেখের লিপি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে [illegible] ভাগভদ্রের বেসনগর স্তম্ভলেখ হইতে কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালীন। আবার মঞ্চপুরী গুহার শিল্পকর্মও খ্রীষ্টপূর্ব [illegible] শতাব্দীর [illegible] পরবর্তী।

হাতীগুম্ফা লেখের আসল বক্তব্য এই যে রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে জৈনধর্মাবলম্বী রাজা খারবেল অর্হৎ অর্থাৎ জৈন সন্ন্যাসীদিগের জন্য কুমারী পর্বত বা খণ্ডগিরি পাহাড়ে একটি গুহাবাস (বর্তমান হাতীগুম্ফা) নির্মাণ করিয়াছিলেন। লেখটিতে যেভাবে বাল্য হইতে ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্ক বৎসর পর্যন্ত খারবেলের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

বাল্যকালে খারবেল লিখনবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, মুদ্রাতত্ত্ব এবং আইন ও উহার প্রয়োগ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পনর বৎসর বয়সের পর তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন এবং নয় বৎসর পরে চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইলে 'মহারাজ' রূপে কলিঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে দক্ষিণাপথের শাতবাহন বংশীয় নরপতি শাতকর্ণিকে অগ্রাহ্য করিয়া খারবেল পশ্চিম দিকে এক বিরাট সেনাদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবেণ্ণা (কৃষ্ণা) নদীর তীরবর্তী ঋষিকনগর ঐ সেনাদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। চতুর্থ রাজ্যবর্ষে খারবেল বিদ্যাধর নামক জনৈক নরপতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রিক এবং ভোজকদিগকে দমন করেন। তিন শত বৎসর পূর্বে মগধের নন্দরাজ কলিঙ্গ দেশে একটি নালা খনন করিয়াছিলেন, রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে খারবেল উহা বর্ধিত করাইয়া রাজধানীর সহিত সংলগ্ন করেন। অষ্টম বৎসরে গোরথগিরি (গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পাহাড়ে অবস্থিত দুর্গবিশেষ) বিধ্বস্ত করিয়া খারবেল প্রাচীন রাজগৃহ নগর (পাটনা জেলার রাজগির) আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া জনৈক যবন (গ্রীক) নরপতি মথুরাতে পলাইয়া যান। নবম বর্ষে আটত্রিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে খারবেল কর্তৃক 'মহাবিজয় প্রাসাদ' নামক এক বিরাট অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। রাজত্বের একাদশ বৎসরে আধুনিক কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত পৃথুদ নগর অধিকার করিয়া খারবেল উহা গর্দভবাহিত লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করাইয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষে মগধের মিত্র বংশীয় রাজা বৃহস্পতি মিত্রকে পরাজিত করিয়া খারবেল মগধ ও অঙ্গদেশ (অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ব বিহার) হইতে অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। এই সময়ে তিনি নন্দরাজ কর্তৃক কলিঙ্গ দেশ হইতে আহৃত একটি জিনমূর্তি স্বদেশে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। মগধ রাজগণের কলিঙ্গ আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য খারবেল বারবার ঐ দেশে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জৈনধর্মাবলম্বী হইলেও খারবেল অন্যান্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। তিনি গীতবাদ্যে বিশারদ ছিলেন এবং প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং উপকারের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন।

দ্র *Epigraphia Indica*, vol XX, 1929, R C Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay, 1960, Dines Chandra Sircar, *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization*, vol. I, Calcutta, 1965

দীনেশচন্দ্র সরকার

খাল সেচ দ্র

খালসা শব্দটি আরবী ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহার মৌলিক অর্থ 'পবিত্র', 'স্বাধীন' ইত্যাদি। রাজস্ব বিভাগে প্রযুক্ত হইলে এই শব্দ দ্বারা রাজার বা জমিদারের (নিজস্ব অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন) জমি বুঝায়।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দশম গুরু গোবিন্দসিংহ শিখসমাজে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করেন, যথা, জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ, পঞ্চ 'ক'— কেশ, কৃপাণ, কাড়া

(বালা), কচ্ছ, কঙ্ঘ (চিরুনি) ধারণ, কৌলিক উপাধি বর্জন করিয়া ‘সিংহ’ উপাধি গ্রহণ, ‘পাহুল’ প্রথার সহায়তায় নূতনভাবে দীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি। শিখসম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা এই সকল সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যে সকল শিখ এই নববিধান গ্রহণ করিল তাহারা সম্মিলিতভাবে ‘খালসা’ নামে পরিচিত হইল এবং নানাভাবে প্রাচীনপন্থী শিখদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। ‘খালসা’ অর্থে গুরু গোবিন্দের স্বকীয় বাহিনী অর্থাৎ বিশেষভাবে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত শিখদিগকে বুঝাইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নববিধান বহুল প্রচলিত হইলে কার্যতঃ সমগ্র শিখসম্প্রদায় সমষ্টিগতভাবে ‘খালসা’ নামে পরিচিত হয়। স্বাধীন শিখরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম যে মুদ্রা প্রচারিত হয় তাহা ‘খালসা’ নামাঙ্কিত ছিল।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খাসি, খাসিয়া অস্ট্রিক বংশের ভাষা। ইহা অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার মোন্-খ্মের উপশাখার অন্তর্গত। শব্দ ও ভাষার গঠনের দিক দিয়া মোন খ্মের উপশাখার পলাউঙ ওআ (Palaung-Wa) ভাষাগুলির সহিত খাসিয়ার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও খাসিয়ার মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে এবং এই কারণে মোন খ্মের উপশাখার অন্তর্গত ভাষাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ইহার একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে— অর্থাৎ খাসিয়া ও তাহার উপভাষাগুলি মিলিয়া একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে। খাসিয়া ভাষা আসামের খাসি ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত, পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলেও খাসি বা খাসিয়া-ভাষীদের দেখা যায়। আসামের ভোটবর্মী ভাষাগুলির মধ্যে অস্ট্রিক ভাষার একক অবস্থিতি ভাষাতাত্ত্বিকগণের নিকট কৌতূহল ও গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। খাসি চারিটি উপভাষায় বিভক্ত.

১. আদর্শ খাসি (Standard Khasi)— ইহা দক্ষিণ খাসি পার্বত্য অঞ্চলে চেরাপুঞ্জি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত ২. ল্যাঙ্-ঙাম (Lyng-ngam)— ইহা খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গারো পাহাড়ের সীমানা পর্যন্ত অঞ্চলে কথিত হয় ৩. সুনতেঙ্ বা প্নার (Synteng বা Pnur)— ইহা শিলং-এর পূর্বে অবস্থিত জোয়াই মহকুমার উত্তর দিকের অঞ্চলে বলা হইয়া থাকে ৪. ওয়ার (War)— ইহা দক্ষিণের নিম্ন উপত্যকাগুলি যেখানে শ্রীহট্টের সমতলভূমিতে মিশিয়াছে সেই অঞ্চলে বলা হইয়া থাকে।

তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, পুরাতন খাসিয়াতে যেখানে ‘জ’ (z) ধ্বনি ছিল, সেখানে ইহার পরিবর্তে ‘স’ (s) আসিয়া গিয়াছে। Synteng, আগে ছিল Zynteng, ‘জ্যান্তেঙ্’, ইহা হইতেই ‘জয়ন্তিয়া’, ‘জয়ন্তী’ প্রভৃতি নামের উদ্ভব, পূর্বে বাংলা আসামে খাসিয়াদের জন্য এই নাম বহু প্রচলিত ছিল।

ইহা ছাড়া, মিশ্রিত খাসি ভাষাও রহিয়াছে যাহাদের উল্লিখিত উপভাষাগুলির ঠিক কোনও একটির মধ্যে নির্দিষ্ট করা যায় না।

গত শতকের মধ্য ভাগ হইতেই খাসি ভাষা লইয়া চর্চা শুরু হইয়াছে— বাইবেল প্রভৃতির অনুবাদের মধ্যে দিয়া ওয়েল্শ্ খ্রীষ্টান মিশনারিগণই খাসি ভাষার চর্চা শুরু করে। ফলে খাসি ভাষায় কিছু সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে। আদালতের সরকারি ভাষা খাসি ব্যবহৃত হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ইহাকে পাঠ্যভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছে। ওয়েল্শ্ ভাষার বানান ধরিয়া খাসিয়ার জন্য রোমান বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে। ইহাতে স্বরবর্ণ ‘এ’ ধ্বনি কতকটা ‘অ্য’ র মত।

দ্র H. Roberts, *Grammar of the Khasi Language*, London, 1891; G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol II & vol I, part I, Calcutta, 1904, 1927; S. K. Chatterji, *Kirata-jana-krti*, Calcutta, 1951; Lili Rabel, *Khasi, a Language of Assam*, Baton Rouge, 1961

দীপংকর দাশগুপ্ত

খাসি[২] আসামের খাসি (খাসিয়া) ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলার এক উপজাতি। ইহারা একাধিক শাখায় বিভক্ত। আকৃতিতে যথেষ্ট মঙ্গোলীয় প্রভাব দেখা যায়। জনসংখ্যা তিন লক্ষের কিছু কম।

খাসিগণ কৃষিজীবী, ভাত ইহাদের প্রধান খাদ্য। পাহাড়ের পরিবর্তে ইহারা পাহাড়ের গায়ে কোদাল দিয়া চাষ করে। কোনও কোনও জায়গায় আগুন লাগাইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ‘জুম’ প্রথায় চাষও হয়। চাল অথবা বাজরা হইতে প্রস্তুত মদ্য ব্যতীত কোনও অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ নয়। কাঁচা সুপারি ও পান খাওয়ার খুব চলন আছে।

ঘরবাড়ি বাঁশ বুনিয়া ও কাঠ দিয়া মাটি হইতে কিছু উঁচুতে পাটাতনের উপর তৈয়ারি করে। ঘরের মধ্যস্থলে উনান থাকে।

সম্পত্তির মালিক মেয়েরা, বংশপরিচয়ও মেয়েদের

দিক দিয়া হয়। সম্পত্তি রক্ষা ও পরিবারের যাবতীয় পূজা-অর্চনার দায়িত্ব মেয়েদের। বৈষয়িক ব্যাপারে মামার মতামত অগ্রগণ্য। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর বাড়িতে বাস করিতে যায়।

মূর্তিপূজা নাই। খাসিগণ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে। সর্প-দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। পিতৃপুরুষ, ভূতপ্রেতে ও নানা প্রকার দেবদেবীর পূজা-অর্চনা প্রচলিত। অনেকেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছে।

মৃতের অস্থি সংরক্ষণার্থে গোত্রের স্বতন্ত্র সমাধিস্থলে অস্থি প্রোথিত করা হয়। তাহার উপরে সমাধিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

সুহাসকুমার বিশ্বাস

খাসি-জয়ন্তিয়া ২৪°৫৮´ হইতে ২৬°৭´ উত্তর এবং ৯০°৪৫´ হইতে ৯২°৫১´ পূর্বে অবস্থিত। আসামের শৈলশ্রেণী সংবলিত মালভূমি। ইহারা শিলং মালভূমির অংশ। মধ্য অংশ খাসি ও পূর্ব অংশ জয়ন্তিয়া ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। ঐ দুইটি অংশ লইয়া সংযুক্ত 'খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড়' নামক জেলাটি গঠিত। এই জেলার উত্তর সীমায় কামরূপ ও নওগাঁ, পূবে মিকির ও উত্তর কাছাড় জেলা, দক্ষিণে শ্রীহট্ট ও পশ্চিমে শিলং মালভূমির পশ্চিম অংশ গারো পাহাড। আয়তন প্রায় ১৪৩৭৫ বর্গ কিলোমিটার (৫৫৪৬ বর্গ মাইল), লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুসারে ৪৬২১৫২ জন।

শিলং মালভূমি দাক্ষিণাত্যের মালভূমিরই অংশ বিশেষ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রবাহিত বহু যুগের সঞ্চিত পলি ইহাকে মূল মালভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহার শিলার প্রকৃতির সহিত 'বেঙ্গল বিহার নিস' ও 'ধারওয়ার শিলা'র সাদৃশ্য দেখা যায়। এই অঞ্চলের বিশেষ করিয়া খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের শিলাগুলি প্রধানতঃ গ্র্যানিট, নিস, শিস্ট ও কোয়ার্টজাইট শিলা। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে সুরমা উপত্যকা হইতে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কয়েকটি অতি সরলোন্নত শৈলশ্রেণী ধাপে ধাপে উঠিয়া অন্তবর্তী উচ্চ প্রশস্ত সমভূমি (টেব্‌ল্ ল্যাণ্ড) পর্যন্ত আসিয়াছে। দক্ষিণের শৈলশ্রেণীটি হঠাৎ উন্নত হইয়া সুরমা উপত্যকার প্রান্তে উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। এখানকার মালভূমির উচ্চতা ১২০০ মিটার (৪০০০ ফুট) হইতে ১৮০০ মিটার (৬০০০ ফুট)। শিলং শহরটি এই অংশেই অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ১৪৭০ মিটার (৪৯০০ ফুট)। ইহার পশ্চাতে শিলং শৈলশ্রেণী। সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি ১৯২৯ মিটার (৬৪৩৩ ফুট) উচ্চ। উত্তরে কামরূপের দিকে অনুরূপ আরও দুইটি উচ্চ প্রশস্ত সমভূমি আছে। তবে উহাদের উচ্চতা দক্ষিণের সমভূমি হইতে অপেক্ষাকৃত কম।

এই অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে কপিলী, বরাপানি, লুভ, ভোগাপানি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহারা অনেক স্থলে গভীর গিরিখাতের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

এতদঞ্চলের জলবায়ু মনোরম। গ্রীষ্মকালে শিলঙের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬° সেন্টিগ্রেড (৮০° ফারেনহাইট)-এর বেশি। শীতকালে বরফ জমিয়া যায়। খাসি পাহাড়ের দক্ষিণে চেরাপুঞ্জির নিকট মৌসিনরাম গ্রামে ১২৫০০ মিলিমিটারের (৫০০ ইঞ্চি) অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

উচ্চ প্রশস্ত সমভূমিগুলি সাধারণতঃ তৃণাচ্ছাদিত তরঙ্গায়িত ভূমি। ৯০০ মিটার (৩০০০ ফুট) ঊর্ধ্বে পাইন বন দেখা যায়। ইহার কাঠ গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চল নানাবিধ ফুলে সমৃদ্ধ, তন্মধ্যে অর্কিড প্রধান। কমলালেবু ও সুপারি গাছ অপর্যাপ্ত হইয়া থাকে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা লৌহ ও চুনা পাথর প্রধান। শতকরা ৯০ জন অধিবাসী কৃষিজীবী।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ খাসি অঞ্চল জয় করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তিয়াও তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত হয় কিন্তু বহুলাংশে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে শিলং, খাসির কয়েকটি গ্রাম এবং জয়ন্তিয়ার সম্পূর্ণ অংশ লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড় নামক জেলাটি গঠিত হয়। ১৯৫০ সালে সম্পূর্ণ খাসি ও জয়ন্তিয়া লইয়া জেলাটি পুনর্গঠিত হয়। শিলং এই জেলার সদর। খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের বহু জলপ্রপাতের মধ্যে মোসমাই জলপ্রপাত দর্শনীয়। এই অঞ্চল খাসিজাতি অধ্যুষিত ('খাসি' দ্র)। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী খ্রীষ্টান। শিক্ষিতের হার ৬০% এর ঊর্ধ্বে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XI, Oxford, 1908; Edwin H. Pascoe, *A Manual of the Geology of India & Burma*, 1950.

কমলা মৃণাল ধর

খাসিয়া বিদ্রোহ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসাম ইংরেজদের করতলগত হইবার পর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরুত সিংহের নেতৃত্বে খাসি পাহাড়ের স্বাধীনতাপ্রিয় অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড স্কটের প্ররোচনায় তিরুত সিং নিজেকে ইংরেজদের আশ্রয়াধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আসাম ও শ্রীহট্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনায়

সম্মতিও প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিরুত সিংয়ের রাজধানী নাংক্লো (Nunklow)-তে ইংরেজদের বাংলো নির্মাণের পর হইতেই খাসিয়াদের মনে ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইংরেজরা তাহাদের উপর শীঘ্রই কর বসাইবে, এই গুজবে তাহারা আরও ক্রুদ্ধ হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল তিরুত সিংয়ের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ শত খাসিয়া বার্লটন এবং বেডিং ফিল্ড নামক দুই জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করে। তাহাদের প্রায় ৬০ জন দেশীয় অনুচরও নিহত হয় এবং নাংক্লো বাংলোটি পুড়াইয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা নাংক্লো হত্যাকাণ্ড নামে খ্যাত। অন্যান্য পার্বত্য অধিবাসীরাও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। বিদ্রোহ দমনকল্পে ইংরেজ সেনাবাহিনী বিভিন্ন দিক হইতে পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করে এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনেক সর্দার বশ্যতা স্বীকার করেন কিন্তু তিরুত সিং এবং তাঁহার অনুচরবর্গ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালানো একজন পার্বত্য বীরের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। ইংরেজ সেনাবাহিনী সর্বপ্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া দেয়। তিরুত সিংয়ের অনুচরবর্গের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। পরিশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন (১৩ জানুয়ারি, ১৮৩৩ খ্রী)। ঢাকায় বন্দীদশায় তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্যান্য সর্দারও একের পর এক বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রাজন সিং রাজা নির্বাচিত হন (২৯ মার্চ, ১৮৩৪ খ্রী)।

প্রাঞ্জলকুমার ভট্টাচার্য

খিচিং, খিচিঙ্গ ২১°৫৫′ উত্তর এবং ৮৫°৫০′ পূর্ব। ময়ূরভঞ্জ জেলার উত্তর ভাগে পশ্চিম প্রান্তে সিংভূম ও কেওনঝরের সীমানার নিকট অবস্থিত গ্রাম। বারিপদা হইতে ইহার দূরত্ব ১৪৬ কিলোমিটার (৯১ মাইল)। খয়েরবন্ধন ও কণ্টাখয়ের নামে বৈতরণী নদীর দুইটি উপনদীর মধ্যে অবস্থিত এই স্থান পূর্বে খিজ্জিঙ্গ বা খিজ্জিঙ্গকোট নামে পরিচিত ছিল। ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জ রাজবংশের পূর্বপুরুষ রণভঞ্জ এবং রাজভঞ্জ (রায়ভঞ্জ)-এর তাম্রশাসন (১১শ শতাব্দী) হইতে জানা যায়, ইহা তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

খিচিংে কয়েকটি রেখমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বহু মূর্তি ও দুই-একটি ইটের স্তূপ বর্তমান। কুটাইতুণ্ডী/কুটাইতুণ্ডা বা নীলকণ্ঠেশ্বর, খণ্ডিয়া দেউল এবং চন্দ্রশেখর মন্দির ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ। এখানে শিব, মহিষমর্দিনী দুর্গা, সূর্য ভিন্ন অবলোকিতেশ্বর এবং ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিগুলির মধ্যে শিবের প্রতিমা প্রায় ২ মিটার (৬ ফুট)-এরও অধিক উচ্চ এবং তক্ষণশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ওড়িশার শিল্পশৈলীর প্রভাবের সহিত বাংলা দেশের প্রভাব এখানে পরিলক্ষিত হইলেও খিচিংের শিল্পরীতিতে কিছু মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ১১শ ১২শ শতাব্দীতে ভঞ্জ রাজবংশের আশ্রয়ে এখানে একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

কুটাইতুণ্ডী মন্দিরটি শেষ ভঞ্জ নরপতিগণ কর্তৃক প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে সংস্কৃত ও পুনর্নির্মিত হয়।

দ্র Ramaprasad Chanda, *Bhanja Dynasty of Mayurbhanj and Their Ancient Capital Khiching*, Mayurbhanj, 1929.

নির্মলকুমার বসু

খিজির খাঁ (রাজ্যকাল ১৪১৪-২১ খ্রী) তথাকথিত সৈয়দ বংশের প্রথম ও যোগ্যতম সুলতান। তারিখ-ই-মবারক শাহীর রচয়িতার মতে ইনি ছিলেন সৈয়দ। ইহা অনিশ্চিত। সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আরব দেশ হইতে ভারতে আসেন ও মুলতানে বসবাস করেন। ফিরোজ তোগলক তাঁহাকে মুলতানের শাসকপদে নিযুক্ত করেন কিন্তু মল্লু একবালের ভ্রাতা সারঙ্গ খাঁর দ্বারা বিতাড়িত হন (১৩৯৫ খ্রী)। পরে তিনি তৈমুরের সঙ্গে যোগদান করেন। ভারত ত্যাগের পূর্বে তৈমুর খিজিরকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ধীরে ধীরে তিনি মুলতান, লাহোর ও দীপালপুরে অধিকার স্থাপিত করেন (১৩৯৯ খ্রী)। মল্লু একবালকে নিহত ও দৌলত খাঁ লোদীকে পরাজিত করিয়া খিজির দিল্লী অধিকার করেন (১৪১৪ খ্রী)। পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশ পুনরায় দিল্লীর অন্তর্গত হয়।

কিন্তু নিজের আধিপত্য স্থাপনা করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তিনি তৈমুর ও তাঁহার উত্তরাধিকারী শাহরুখের বশ্যতা স্বীকার করেন। খুৎবা মঙ্গোল রাজের নামেই ঘোষিত হইত ; কর শাহরুখের নিকট প্রেরিত হইত। মুদ্রায় তোগলক নৃপতিদের নাম অঙ্কিত থাকিত। স্বাধীন (শাহ্) উপাধি না লইয়া খিজির মাত্র রায়াৎ-ই-আলা (তুঙ্গ নিশান) উপাধি লন। অবশ্য কার্যতঃ তিনি স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আচরণ করিতেন।

তাঁহার সময়ে পাঞ্জাব, মেবাট, সরহিন্দ, দোয়াব, বিয়ানা ও গোয়ালিয়র অঞ্চলে বিদ্রোহ ও অশান্তি বিরাজ করিত। সরহিন্দে তুর্ক-বাচ্চাদের (১৪১৬ খ্রী) ও তুঘান রইসের বিদ্রোহ (১৪১৭ খ্রী) ও বদায়ুঁতে মহাবৎ খাঁর

বিদ্রোহ (১৪১৮ খ্রী) হয়। দোয়াব, সেওয়াট ও গোয়ালিয়রে হিন্দু জমিদারগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুসলমানদিগের প্রতিরোধ করায় এই সকল স্থানে বিদ্রোহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও খিজির এটাওয়া, কাটেহর, কনৌজ, পাতিয়ালী ও কম্পীল পুনরুদ্ধারে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

এই প্রকার বিভিন্ন বিপদ ও সমস্যায় জর্জরিত হইয়া ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মে খিজির মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্র Yahya bin Ahmad Sirhindi, *Tarikh-I-Mubarak Shahi*, (E. & D. IV); Ferishta (Briggs); Iswari Prasad, *History of Mediaeval India*, Allahabad, 1933; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1960.

জগদীশনারায়ণ সরকার

খিদিরপুর ২০°৩২´২৫´´ উত্তর ও ৮৮°২২´১৮´´ পূর্ব। চব্বিশ পরগনা জেলার আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত ও কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত এই অঞ্চলটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী শ্রমিক দ্বারা অধ্যুষিত। বর্তমানে গঙ্গার ধারে অবস্থিত ডকের জন্য ইহার প্রসিদ্ধি। কলিকাতা পৌরনিগমের ৫টি উপবিভাগ (ওয়ার্ড) লইয়া গঠিত খিদিরপুরের বর্তমান আয়তন ৩৬ বর্গ কিলোমিটার (১৪ বর্গ মাইল)। কেহ কেহ বলেন, কর্নেল জেমস কীডের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। আবার অপরে বলেন, নবাবী আমলের 'খেজরপুর' নামের অপভ্রংশ খিদিরপুর। পুরাতন খিদিরপুর গঠনের মূলে ছিলেন ভূ-কৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ('জয়নারায়ণ ঘোষাল' দ্র) ও তাঁহার কয়েকজন বংশধর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার কয়েকজন বিখ্যাত কবি ও মনীষীর এখানে বাস ছিল। মহানগরীর আদিপর্ব হইতেই খিদিরপুর শিল্পোন্নত শহরতলি রূপে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে এবং নৈসর্গিক পরিবেশের আনুকূল্যে ইহা বর্তমানে এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর বা ডক অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। এই অঞ্চলে আধুনিক যন্ত্রসম্ভারে সজ্জিত দুইটি কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে— খিদিরপুর ডক ও কিং জর্জেস ডক। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুর ডকে কাজ আরম্ভ হয়। ইহার বর্তমান আয়তন ৮০ হেক্টর (২০০ একর), গভীরতা ১৮ মিটার (৬০ ফুট)। দুইটি পোতাশ্রয়ে মোট ৯০টি সমুদ্রগামী জাহাজ একসঙ্গে অবস্থান করিতে পারে। কয়লা, লৌহ আকর প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য, নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যশস্য এই বন্দর হইতে রপ্তানি ও আমদানি হইয়া থাকে। অনেকগুলি বৈদ্যুতিক ভারোত্তোলন যন্ত্রের (ক্রেন) সাহায্যে পণ্যসম্ভার চালনা করা হয়। তন্মধ্যে একটি যন্ত্র ২০৪ মেট্রিক টন (২০০ টন) পণ্য, উঠাইতে বা নামাইতে পারে। দুইটি পোতাশ্রয়ে ৫টি 'শুখা ডক' (ড্রাই ডক) আছে, সেখানে জাহাজ মেরামত করা হয়। বিভিন্ন দিকে পণ্যসঞ্চালনের জন্য বন্দর অধিকর্তাদের (পোর্ট কমিশনারস্) তত্ত্বাবধানে ৪৮৩ কিলোমিটার (৩০০ মাইল) রেলপথ আছে। বন্দরের কারখানায় ৩০০০ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এই কারখানায় সাধারণতঃ মেরামত ও তত্ত্বাবধানের কাজ হয়। সমগ্র বন্দর অঞ্চলে বন্দর অধিকর্তাদের অধীনে ৪০০০০ শ্রমিক ও কর্মচারী দিবারাত্র কাজ করিয়া চলিয়াছে— আরও ২০০০০ শ্রমিক 'ডক লেবার বোর্ড'-এর অধীনে কাজ করে। বন্দর কর্তৃপক্ষ জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া থাকে। কলিকাতা পুলিশ বিভাগের একজন ডেপুটি কমিশনার বন্দর অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত আছেন।

খিদিরপুর অঞ্চলে এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া বহুবিধ শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে লৌহ বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৫০টি ছোট-বড় কারখানায় নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যেমন, রেলের মালগাড়ি, সেতু নির্মাণের সাজসরঞ্জাম, বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, টিনের বাক্স ইত্যাদি। একটি চটকলে ২৫০০ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রধান কার্যালয় এইখানে অবস্থিত। অসংখ্য গুদামঘর সমস্ত অঞ্চলে ছড়াইয়া আছে।

এখানকার জনসংখ্যা ন্যূনাধিক দুই লক্ষ। বৃহত্তর কলিকাতার অনেক অঞ্চল হইতেই এখানে সহস্র সহস্র লোক নিয়মিতভাবে প্রতিদিন যাতায়াত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভের পরবর্তী কালে খিদিরপুর বন্দর ও তৎসংলগ্ন শিল্পাঞ্চল উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হইতেছে।

দ্র হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা : সেকালের ও একালের, কলিকাতা, ১৯১৫ ; শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকবি রঙ্গলাল, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

দিলীপ ভাদুড়ী

খিল কোনও গ্রন্থের পরিশিষ্ট বা পরিপূরক অংশ 'খিল' বলিয়া গণ্য হয়। হরিবংশ পুরাণ মহাভারতের খিলপর্ব বা

খিল হরিবংশ নামে পরিচিত। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তকেও খিল বলা হয় ('ঋগ্বেদ' দ্র)। উহা ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট রূপে মূল সংহিতার শেষে মুদ্রিত হইয়া থাকে। খিল প্রকরণ বিভিন্ন লুপ্ত শাখার অন্তর্ভুক্ত বিচ্ছিন্ন মন্ত্রসমূহের এক সংকলন বলিয়া মনে হয়। এই সকল মন্ত্রের পদপাঠ নাই; প্রচলিত ঋক্-সংহিতার সূচি সর্বানুক্রমণী অনুবাকানুক্রমণী গ্রন্থেও এইগুলির উল্লেখ নাই। সুতরাং এইগুলিকে মূল সংহিতায় স্থান দেওয়া হয় না। কিন্তু মূল সংহিতার কোন্ কোন্ মন্ত্রের পরে এইগুলির যোগ্য স্থান হইতে পারে, তাহার নির্দেশ পাওয়া যায়। পরিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হইলেও খিল প্রকরণের সব মন্ত্রই খুব অর্বাচীন নয়। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে ইহাদের অনেক মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রিত খিল সূক্তের সংখ্যা বিভিন্ন রূপ। কাশ্মীরে প্রাপ্ত একখানি পুথিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক খিল সূক্ত পাওয়া গিয়াছে। শেফ্‌তেলোভিৎস এই খিল সূক্তের এক পৃথক সংস্করণ ছাপিয়াছিলেন। পুনার বৈদিক সংশোধন মণ্ডল হইতে প্রকাশিত ঋগ্বেদ সংহিতার শেষে উহা টিপ্পনী ও পাঠান্তর সহ স্থান পাইয়াছে। খিলসূক্তগুলি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্রীসূক্ত রাত্রিসূক্ত নিবিদধ্যায় প্রৈষাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রসমূহ খিল প্রকরণের অন্তর্গত।

দ্র ঋগ্বেদ সংহিতা, ৪র্থ ভাগ, বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, পুনা, ১৯৪৬, J. Scheftelowitz, *Apokryphen des Rgveda*, Breslau, 1906.

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

খিলজী, খলজী ভারতে খিলজীগণ মাত্র ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন (১২৯০-১৩২০ খ্রী)। তাঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে অনেকের বিশ্বাস এই যে আফগানিস্তানের অন্তর্গত খলজ দেশ তাঁহাদের আদি বাসভূমি। মধ্য এশিয়ায় মঙ্গোল আক্রমণের চাপে ও গজনভী ও ঘুরী আক্রমণের প্রবাহের সঙ্গে খিলজীরা ভারতে চলিয়া আসেন।

খিলজী বা খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন ফিরোজ ছিলেন বলবনের পৌত্র মুইজ্জুদ্দীন কাইকোবাদের সর-ই-জানদার (প্রধান শরীররক্ষী) ও সামান প্রদেশের শাসনকর্তা। মুইজ্জুদ্দীন ও তাঁহার শিশুপুত্রকে হত্যা করাইয়া ও নানা চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া তিনি সিংহাসন অধিকার করেন (১৩ জুন, ১২৯০ খ্রী)।

অভিজ্ঞ ও সফল সেনাধ্যক্ষ হইলেও সুলতান জালালুদ্দীন ফিরোজশাহ্ খিলজী (১২৯০-৯৬ খ্রী) প্রথমে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। জালালুদ্দীন ধর্মপ্রবণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে রাজোচিত দৃঢ়তা ছিল না। কিন্তু শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতা জালালুদ্দীনের ছিল। দায়িত্বপূর্ণ পদে তুর্কীগণকে নিযুক্ত করিয়া তিনি তাহাদের প্রতিকূলতা ক্রমে ক্রমে জয় করিতে সমর্থ হন। অত্যাচার ও রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ শাসনই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য তাঁহার লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই অরাজকতা ও বিদ্রোহ দেখা দিল। বলবনী মালিক কারা-মানিকপুরের শাসনকর্তা ছজ্জু (সুলতান মুঘীসুদ্দীন) বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১২৯০ খ্রী)। বিদ্রোহীকে পরাজিত করিয়াও জালালুদ্দীন যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। জালালুদ্দীন খিলজীর বৈদেশিক নীতিও ছিল দুর্বল।

অযুধানের শেখ ফরিদুদ্দীন গঞ্জ-ই-শকরের শিষ্য, পারস্যবাসী, সিংহাসনলিপ্সু, খলিফা পদপ্রার্থী, দরবেশ ভেকধারী সিদি মৌলার কূট ষড়যন্ত্রের জাল জালালুদ্দীন দৃঢ় হস্তে ছিন্ন করিয়া (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১২৯১ খ্রী) তাহার প্রাণনাশ করিলেন। সুলতান পারস্যরাজ হুলাগুর পৌত্র আবদুল্লার মঙ্গোল আক্রমণও (১২৯২ খ্রী) প্রতিরোধ করেন। চেঙ্গিজ খানের পৌত্র উলঘ্ এখানে বসবাস করিতে আসিলে স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ দিল্লীর উপকণ্ঠে 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হইলেন। মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সুলতান স্বীয় পুত্র আরকলী খাঁকে লাহোর, মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি রাজপুতদের নিকট হইতে মন্দোর পুনরুদ্ধার করেন (১২৯২ খ্রী) ও ঝাইন দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন।

তরুণ খিলজীগণও সুলতানের শান্তিনীতির বিপক্ষে ছিলেন এবং ইঁহাদের নেতা হইলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন। তিনি মালব (১২৯২ খ্রী) ও দেবগিরি (১২৯৬ খ্রী) জয় করার পর স্নেহান্ধ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া নিজে সুলতান হইলেন ('আলাউদ্দীন খিলজী' দ্র)।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুতে খিলজী দরবারে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইল। মালিক কাফুর সুলতানের এক পুত্র (মুবারক) ও এক মহিষীকে বন্দী ও জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র (খিজির ও শাদী)-কে অন্ধ ও বন্দী করিয়া, অন্য এক মহিষীকে বিবাহ করিয়া ও তাঁহার শিশুপুত্র (সিহাবুদ্দীন ওমর)-কে সিংহাসনে বসাইয়া সর্বশক্তিমান হইয়া উঠিলেন। খিলজীগণ কাফুরকে মাত্র ৩৫ দিন রাজত্বের পর নিহত করে।

আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র বন্দী মুবারক মুক্তিলাভ করিয়া প্রথমে সিহাবের প্রতিনিধি (রিজেন্ট)-রূপে রাজ্যশাসন করিতেন কিন্তু শীঘ্রই শিশুরাজাকে অন্ধ ও বন্দী করিয়া সুলতান কুতবুদ্দীন মুবারক শাহ্ নামে সিংহাসনে আরোহন করিলেন (১৩১৬-২০ খ্রী)। তিনি আলাউদ্দীনের কঠোর বাধা-নিষেধ তুলিয়া দেন এবং খিজির খাঁকে হত্যা করেন। তিনি গুজরাত ও দেবগিরিতে বিদ্রোহ দমন করেন ও নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার প্রিয় উজির খুসরু খাঁ দাক্ষিণাত্যে বরঙ্গলের রাজাকে পরাজিত করিয়া মা'বারের দিকে অগ্রসর হন। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক খুসরুর প্ররোচনায় মুবারক নিহত হন। খিলজী শাসন সমাপ্ত হইল।

খসরু ছিলেন গুজরাতের বরবারী অথবা পরবারী নামক বংশোদ্ভূত। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার নাম হইয়াছিল হাসান। মুবারক শাহ্ তাঁহাকে খুসরু খাঁ উপাধি দিয়া উজির করিয়াছিলেন। তিনি এখন নাসিরুদ্দীন খুসরু শাহ্ উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বর্নীর মতে খুসরু শাহ্ হিন্দুরাজ্য স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। প্রায় চার মাস পরে তাঁহার অত্যাচারপূর্ণ শাসনের অবসান ঘটাইলেন পাঞ্জাবস্থিত দীপালপুরের শাসক তোগলকবংশীয় গাজী মালিক (গিয়াসুদ্দীন তুঘলাক শাহ, সেপ্টেম্বর, ১৩২০ খ্রী)

দ্র Iswari Prasad, *History of Mediaeval India*, Allahabad, 1933; K. S. Lal, *History of the Khaljis (1290-1320)*, Allahabad, 1950; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1960.

জগদীশনারায়ণ সরকার

খিলাফৎ আন্দোলন 'খলিফা' শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী বা দায়াধিকারী। সংস্থাটির নাম 'খিলাফৎ' ('খলিফা' দ্র)।

হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের প্রতিভূ স্বরূপ মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের দায় গ্রহণ করেন। কোনও মানবগোষ্ঠী নির্বাচনের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে নাই; ইসলামের নীতি অনুসারে রাজশক্তি ঈশ্বরের প্রতিভূত্বের উপরেই নির্ভর করে। শাসকের উপরে শুধু মুসলিম জনগণের নহে, তাঁহাদের দ্বারা অধ্যুষিত ভূখণ্ড ও পবিত্র ধর্মস্থান-সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ন্যস্ত থাকে।

হজরত মহম্মদের তিরোধানের পর খ্রীষ্টীয় ৬৩২ হইতে ১৯২২ অব্দ পর্যন্ত ৯৮ জন খলিফা পর পর ইসলামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কখনও উমৈয়দ, কখনও অব্বাসিদ, কখনও অটোম্যান রাজবংশের অধিকারে খিলাফৎ অব্যাহতভাবে পরিচালিত হয়। ১৫১৭-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কের অটোম্যান বাদশাহ্ খলিফা বলিয়া স্বীকৃত হন।

১৮৭৬-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে ভারতীয় মুসলিম সমাজে চাঞ্চল্য দেখা যায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির সহিত যুদ্ধকালে তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে যখন কার্যতঃ তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন ঘটে তখন ভারতীয় মুসলিম সমাজে অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুসলিম সমাজ ও সৈনিকগণের আনুগত্য রক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পর্কে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যুদ্ধান্তে সেগুলি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মনে করেন। প্রতিকারার্থে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর বোম্বাই শহরে সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটি স্থাপিত হয়। বালগঙ্গাধর টিলক, মদনমোহন মালব্য, মোতীলাল নেহরু, গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুসলিম দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অল-ইণ্ডিয়া খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিদল ইংল্যাণ্ডে তুরস্কের সহিত শান্তির শর্ত সম্পর্কে সুপারিশ করিতে যান, কিন্তু কোনও ফললাভ হয় নাই। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ গান্ধীজী এক বিবৃতিতে খিলাফৎ দাবির সমর্থনে অসহযোগের এক কর্মসূচি প্রকাশিত করেন। তাহার পরামর্শে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মে সেন্ট্রাল খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগের বিস্তৃত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। খিলাফৎ আন্দোলনে মওলানা মহম্মদ ও শওকৎ আলী, আবুল কালাম আজাদ, আবদুল বারি, হাকিম আজমল খাঁ, সৈফুদ্দীন কিচলু প্রমুখ অনেকে অগ্রণী ছিলেন।

অমৃতসরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং কলিকাতায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস ভারতের জাতীয় দাবিসমূহের সহিত খিলাফতের দাবিকেও সংযোজিত করেন। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে ভারতের বাহিরে কোনও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সহিত ভারতের জাতীয় দাবিকে সংযুক্ত করার ভবিষ্যৎ কুফল সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বিশেষভাবে দেশকে সতর্ক করিয়া দেন। তৎসত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলনের সহিত সংযুক্তভাবে খিলাফৎ আন্দোলন বৎসরাধিক কাল চলিতে থাকে।

কেমাল আতাতুর্ক ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করিলে ১২৯০ বৎসরের

পুরাতন খিলাফতের বিলোপসাধন ঘটে। তুরস্কের তদানীন্তন সম্রাট ও ইসলামের খলিফা সুইট্জারল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইহার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে থাকে।

নির্মলকুমার বসু

খুলনা পূর্ব পাকিস্তানের জেলা ও শহর। জেলার অবস্থান ২১°৩৮′ হইতে ২৩°১′ পূর্ব এবং ৮৮°৫৫′ হইতে ৮৯°৫৯′ উত্তর। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর খুলনা জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরে যশোহর, পূর্বে বরিশাল এবং পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলা। পূর্ব দিকে মধুমতী বলেশ্বর নদী, পশ্চিমে ইছামতী-কালিন্দী নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ইহার প্রাকৃতিক সীমানা, উত্তরে কোনও প্রাকৃতিক সীমানা নাই। ইহার সদর খুলনা শহর ২২°৪৯′ উত্তর এবং ৮৯°৩৬′ পূর্বে ভৈরব নদীর উপর অবস্থিত। জেলার মোট আয়তন প্রায় ১২৪৫৮ বর্গ কিলোমিটার (৪৮১০ বর্গ মাইল)।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্তর্গত এই ভূভাগ গঙ্গার শাখা-উপশাখায় প্রবাহিত পলিমাটির দ্বারা গঠিত। অল্পাধিক বালুকা মিশ্রিত বলিয়া এই মাটির রঙ ঈষৎ পাটলবর্ণ। ইহার নদ-নদী অসংখ্য। পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে সমান্তরাল-ভাবে এবং প্রায় সমদূরবর্তী হইয়া মধুমতী-হরিণঘাটা, ভৈরব-রূপসা-পুশুর, ভদ্র-শিবসা, কপোতাক্ষী-কয়রা-আড়পঙ্গাসিয়া এবং ইছামতী-কালিন্দী-রায়মঙ্গল— এই প্রধান নদীগুলি দক্ষিণ অভিমুখে সমুদ্রগামী হইয়াছে। এই সকল নদীতে প্রায় সর্বত্রই জোয়ার-ভাটার প্রবাহ বর্তমান এবং নদীর জলও অল্পবিস্তর লবণাক্ত।

ইহার দক্ষিণাংশে সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রধান অংশ খুলনা জেলার অন্তর্গত এবং জেলার অর্ধাংশ জুড়িয়া বিস্তৃত। খুলনায় সুন্দরবনের আয়তন ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী প্রায় ৬০০১ বর্গ কিলোমিটার (২৩১৭ বর্গ মাইল)। একাধারে লবণাক্ত ও মিষ্ট জল-মাটির জন্য সুন্দর-বনে এক বিশেষ ধরনে বৃক্ষলতার সমন্বয় ঘটিয়াছে। সুন্দরী, পশুর, বাইন, কেওড়া, গরান, গর্জন, গোল প্রভৃতি ইহার প্রধান বৃক্ষ। সুন্দরবনের জীবজন্তুর মধ্যে 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নামক অতিকায় ব্যাঘ্র, চিতা, হরিণ, শূকর, বানর, কুমির, হাঙর ও নানা প্রকার বিষধর সর্প উল্লেখযোগ্য। কাঠ, মাছ, মধু, মোম গোলপাতা প্রভৃতি ইহার অর্থকরী উৎপন্ন দ্রব্য।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে জেলার লোকসংখ্যা নিম্নোক্তভাবে বিবৃত হইয়াছে—

	১৯৪১ খ্রী	১৯৫১ খ্রী
মোট লোকসংখ্যা	১৯৪৪৪১৮ জন	২০৭৯৬১১ জন
মুসলমান	৪৯·৫৫%	৫৪·৫৫%
হিন্দু	৫০·৩১%	৪৫·২২%
অন্যান্য	·৩২%	·২৩%
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসতি	১৬১ জন	১৭৩ জন
(প্রতি বর্গ মাইলে বসতি	৪০৪ জন	৪৩২ জন)

জেলার গড় বৃষ্টিপাত ১৯০৫ মিলিমিটার। সমগ্র ভূমির শতকরা ৫৪·৮২% অংশ বন জঙ্গলে আবৃত এবং ৩৯·৮২% অংশ কৃষিকার্যে নিয়োজিত। ইহার মধ্যে ৫২২৬৭০ হেক্টর (১২৯১৫০০ একর) ধান্য, ৯২১৯ হেক্টর (২২২৮৫ একর) পাট, ৫৬৭ হেক্টর (১৪০০ একর) তামাক এবং ৪৮৬ হেক্টর (১২০০ একর) জমিতে ইক্ষু চাষ হয়। এতদ্‌ভিন্ন অন্য প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইল পান, সুপারি এবং নারিকেল। সেচ ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির জন্য এখানে এফ. এ. ও-র (F. A. O.) সাহায্যে গঙ্গা কোবাডক (কপোতাক্ষী) বহুমুখী প্রকল্পের পরিকল্পনা রহিয়াছে। মৎস্য শিকার ও ব্যবসায় এখানকার বহু লোকের উপজীবিকা। উহাদের মোট সংখ্যা ১৩৮৩৫ জন অর্থাৎ লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতি হাজারে প্রায় ৬ জন।

ছোটখাট কুটির শিল্প সংস্থার মোট সংখ্যা ১৯৮৩৯, তন্মধ্যে বস্ত্রাদি বয়নের কাজে ৫৮০৪ খানি তাঁত আছে। এখানকার বড় শিল্প বলিতে দুইটি চাউল কল, দুইটি কাপড়ের কল এবং একটি দিয়াশলাই কারখানা।

খুলনা শহর এই জেলার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই জেলায় আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের কেনাবেচা চলে সাপ্তাহিক হাটের মাধ্যমে। এই ধরনের প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ হাটগুলি হইল. বড়দল, নওয়াকী, ডুমরিয়া, চালনা, চুকনগর, কলারোয়া ও মোরেলগঞ্জ।

নদী-নালায় পূর্ণ খুলনা জেলায় জলপথই যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। খুলনা শহর স্টিমার লাইনের একটি বৃহৎ কেন্দ্র। এখান হইতে চুকনগর ও সাতক্ষীরা ব্যতীত বরিশাল, ঢাকা, নড়াইল, মাগুরা, বোয়ালমারি এবং তারপাশা যাইবার নিয়মিত স্টিমার লাইন আছে। অল্প-বিস্তর দূরে যাইবার জন্য অসংখ্য টাবুরে নৌকা ও 'গয়না'-র নৌকা আছে। খুলনা-বনগাঁ রেল লাইনের ২৩ কিলোমিটার (১৪ মাইল) এই জেলার অভ্যন্তরে; ইহা ভিন্ন খুলনা শহরের অপর পারে রূপসা হইতে বাগেরহাট পর্যন্ত ৩২

কিলোমিটার (২০ মাইল) ছোট রেলপথ আছে। জেলায় পাকা রাস্তার পরিমাণ মোট ১০৯ কিলোমিটার (৬৮ মাইল) এবং কাঁচা রাস্তার পরিমাণও খুব কম নহে। কিন্তু অসংখ্য নদ-নদীর জন্য কোনও সুদীর্ঘ টানা রাস্তা নাই বলিলেই চলে। চালনার সন্নিকটে পুশুর নদীর কূলে সমুদ্রগামী জাহাজের একটি বন্দর তৈয়ারি হইতেছে।

জেলায় হাই স্কুল ৪৫টি। প্রথম শ্রেণীর কলেজ ২টি : একটি দৌলতপুরে এবং আর একটি বাগেরহাটে।

জেলায় ৩টি মহকুমা— খুলনা সদর, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা। সমগ্র জেলায় ২২টি থানা আছে। খুলনা জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ১৪২৪।

খুলনার অরণ্য অঞ্চল বিজ্ঞাভূত বা সংরক্ষিত। ইহার শাসনের জন্য একজন পদস্থ কর্মচারী পৃথকভাবে নিযুক্ত আছেন।

ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী দ্বীপাকৃতি স্থান আদি যুগে বঙ্গদ্বীপ বা উপবঙ্গ নামে অভিহিত ছিল। খুলনা ভূভাগ ইহারই দক্ষিণাংশে।

প্রতি পাঁচ ছয় শত বৎসর অন্তর সুন্দরবন অঞ্চলের অবনমন ঘটায় এই যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

মুসলমান তুর্কীগণ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় দখল করার পরও প্রায় একশত বৎসর সেনবংশ পূর্ব বঙ্গে রাজত্ব করেন। এই সময়ে খুলনা অঞ্চল তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে খাঁ জাহান নামে একজন গোঁড়া ধার্মিক মুসলমান বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহা ৪৯ মিটার (১৬০ ফুট) লম্বা ও ৩৩ মিটার (১০৮ ফুট) চওড়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মসজিদ। ইহার তিন মাইল উত্তর-পূর্বে খাঁ জাহানের সমাধি-ভবন আছে।

১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব যবন হরিদাস ঠাকুর এই জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সোনাই নদীর তীরে কলাগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মোগল আমলে এই জেলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্গ দেশে বার-ভুঞার অন্যতম ভুঞা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব ('প্রতাপাদিত্য' দ্র)।

ওয়ারেন হেস্টিংস ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমগ্র দেশকে কয়েকটি সার্কেলে বিভক্ত করেন। খুলনা এই সময় যশোহর সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয়। যশোহর সার্কেলের সর্বময় কর্তা ছিলেন হেঙ্কেল সাহেব। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর সার্কেলের কিয়দংশ লইয়া যশোহর জেলা গঠিত হয়। খুলনা ভূভাগ তখনও যশোহর জেলার মধ্যে থাকে।

বর্তমান খুলনা শহরের পূর্ব পার্শ্বে তালিবপুরে খুল্লনেশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল। সম্ভবতঃ উহা হইতেই খুলনা নামের উৎপত্তি। রেনি নামে একজন সৈনিক এই তালিবপুরে আসিয়া জমিদারি পত্তন এবং নীল ও চিনির কারবার আরম্ভ করেন। অন্যান্য নীলকরের মত রেনি সাহেবও অত্যাচার করিতে থাকিলে অসীম সাহসিকতার সহিত শিবনাথ ঘোষ, চন্দ্র দত্ত, সাদেক মোল্লা প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সময় নীল ও চিনি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে খুলনা মহকুমা গঠিত হয় (১৮৪২ খ্রী)। খুলনাই বঙ্গ দেশের প্রথম মহকুমা।

নীলবিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র যশোহর ও নদিয়া হইলেও তাহার প্রভাব খুলনা জেলাতেও বিস্তৃত হয়। এখানে বহু নীলকুঠি ছিল। তাহা ছাড়া, মোরেলগঞ্জে মোরেল সাহেব জমিদারি পত্তন করিয়া প্রজাপীড়ন শুরু করিলে স্থানীয় মাতব্বর রহিমুল্লার নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ হয় এবং ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ ঘটে। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন খুলনা মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্র মোরেল সাহেব ও তাঁহার দলবলকে কঠোর হস্তে এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দমন করেন।

নীলবিদ্রোহ এবং এই সকল হাঙ্গামার ফলে সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট— এই দুইটি পৃথক মহকুমা সৃষ্ট হয়। ইহার পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবন অঞ্চলে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাগেরহাট, খুলনা সদর এবং সাতক্ষীরা মহকুমা লইয়া খুলনা জেলা গঠিত হয়। এই জেলার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান হইল : ঈশ্বরীপুরে যশোরেশ্বরীর পীঠমূর্তি, ভরতভায়নার বৌদ্ধস্তূপ, বাগেরহাটের সন্নিকটে শিববাড়ির শিবমূর্তি (আসলে উহা বুদ্ধ-প্রতিমা); বাগেরহাটের খাঁ জাহানের 'ষাট গম্বুজ', ধূমঘাটের টেঙ্গা মসজিদ, ত্রিকোণ মন্দির এবং প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ; ভাসবেলীর উত্তুঙ্গ সমাজ মন্দির, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে সেখের টেকের অভগ্ন মন্দির; বাগেরহাটের নিকটে কোদলার মঠ; সর্বোপরি সুন্দরবন ও উহার জীবজন্তু।

দ্র সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩-১৯৬৫, F. E. Pargiter, *Revenue History of the Sunderbans, from 1765 to 1870*, Calcutta, 1934; L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Khulna*, Calcutta, 1908; R. C. Majumdar, ed., *The History of Bengal*, vol. I, Dacca, 1943; J. N. Sarkar, ed.,

The History of Bengal, vol. II, Dacca, 1948; Nafis Ahmad, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958.

খুশরোজ নওরোজ দ্র

খুশহাল চাঁদ নামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকজন বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যথা খুশহাল চাঁদ জগৎ শেঠ, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ওড়িশাস্থিত এক গোমস্তা ও ইতিবর আলি খাঁর পেশকার। ইহাদের মধ্যে খুশহাল চাঁদ জগৎ-শেঠই বিশেষ বিখ্যাত। এখানে কেবল তাঁহারই বিবরণ লিখিত হইল।

জগৎশেঠ পরিবারের ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর (১৭৪৪ খ্রী) বংশের গৌরব রক্ষা করেন তাঁহার উত্তরাধিকারী মহতাব চাঁদ জগৎশেঠ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদ। খুশহাল চাঁদ ছিলেন ফতেচাঁদের পৌত্র, মহতাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহতাবের ভ্রাতা স্বরূপচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন উদয়চাঁদ বা উদৎচাঁদ। সমসাময়িক ফারসী পত্র-পত্রীতে আমরা খুশহাল ও উদয়ের নাম একসঙ্গে পাই।

পলাশীর যুদ্ধের পর (১৭৫৭ খ্রী) শেঠ বংশের অবনতি দেখা দেয়। নবাব মীর কাশিম মহতাব ও স্বরূপ চাঁদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করেন এবং ইংরেজদের আনুকূল্য করায় অবশেষে ইহাদিগকে হত্যা করেন। খুশহাল চাঁদ ও উদয় চাঁদ আপন আপন পিতার মৃত্যুর পর (১৭৬৩ খ্রী) পারিবারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ও নবাব মীর জাফর উভয়েরই সহিত ইহাদের সম্বন্ধ প্রীতিপূর্ণ ছিল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা ও মুর্শিদাবাদে গোলযোগের সময় ইহারা নিরাপত্তার জন্য সপরিবারে কলিকাতায় আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসিলে খুশহাল চাঁদ ও স্বরূপচাঁদ তাঁহাদের 'প্রাক্তন প্রভু ও রক্ষক' ক্লাইভের নিকট নিজেদের দারিদ্র্য অপনোদন মানসে পাঁচটি স্বর্ণমোহরের উপঢৌকনের সহিত মীর কাশিম-কৃত অত্যাচারের বিবরণ দিয়া এক আবেদনপত্র পাঠান (১০ মে)। ক্লাইভ প্রথমে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন কিন্তু পরে (নভেম্বর ১৭৬৫ খ্রী) তাঁহাদের কঠোর সমালোচনা করেন।

দেওয়ানি সনন্দ দানের পর (আগস্ট ১৭৬৫ খ্রী) শেঠ পরিবারের সহায়তায় আর রাজস্ব দেওয়া হইত না। ট্রেজারি বা রাজকোষ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে জগৎশেঠ পরিবার আর কোম্পানির ব্যাঙ্কার রহিলেন না। তাঁহাদের সমৃদ্ধির উৎস শুকাইয়া গেল।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্ আলম খুশহাল চাঁদকে জগৎশেঠ ও উদয়চাঁদকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।

খুশহাল চাঁদের বয়স যখন মাত্র ২১ বৎসর ছিল, তখন ক্লাইভ তাহাকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির খাজাঞ্চি নিযুক্ত করেন। ১৭৬৬ ও ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে সন্ধি হয় তাহাতে জগৎশেঠের নাম অর্থসচিব (ম্যানেজার অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাফেয়ার্স) রূপে উল্লিখিত আছে। ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সম্মান ও দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচায়ক। ক্লাইভ তাঁহাকে এই কার্যের জন্য তিন লক্ষ টাকা বেতন দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আরও অধিক লাভের আশায় রাজি হন নাই। ১৯ বৎসর এই কার্য সম্পন্ন করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

খুশহাল চাঁদ তাঁহার নিজের পরিবারবর্গকে অনেক টাকা তো দিতেনই, তদ্ব্যতীত পরেশনাথের পাণ্ডাদেরও অনেক দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই পরিবারের অবশিষ্ট সমৃদ্ধিটুকুও নষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি অনেক ধন ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় ইহার কোনও হদিস পাওয়া যায় নাই। নিজে অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরকচাঁদকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন। ইংরেজ কোম্পানি সম্রাটকে না জানাইয়াই তাঁহাকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন।

দ্র *Calendar of Persian Correspondence*, vols. 1-5, Calcutta, 1907-30; J. H. Tull Walsh, *A History of Murshidabad District*, London, 1902; J. H. Little, 'House of Jagat Seth', *Bengal Past & Present*, vols XX-XXII; N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, vol. I, Calcutta, 1961.

জগদীশনারায়ণ সরকার

খেজুর তালগোত্রের গাছ (ফ্যামিলি-পালমী, Family-Palmae)। বিজ্ঞানসম্মত নাম ফোয়েনিক্স সিল্‌ভেস্ট্রিস্ (*Phoenix sylvestris*)। খেজুর গাছের দীর্ঘ, শাখাবিহীন কাণ্ডের মাথায় পত্রমুকুট থাকে এবং কাণ্ডটি পত্রমূল দিয়া আবৃত থাকে। পাতাগুলি পক্ষল (পিনেট) ও প্রায় ৩-৪ মিটার লম্বা; ইহাদের অগ্রভাগ কাঁটায় পরিণত হয়। খেজুর গাছের পুং ও স্ত্রী -পুষ্প পৃথক পৃথক গাছে জন্মায়; ফুলগুলি ছোট ও শাদা রঙের এবং স্ত্রী ও

পুরুষ ফুলের মঞ্জরী-দণ্ডগুলি নৌকার মত মঞ্জরী পত্র দিয়া আবৃত থাকে। ফল সাধারণতঃ কমলা রঙের এবং প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা, বীজ অত্যন্ত কঠিন।

খেজুর গাছ ভারতবর্ষের সর্বত্রই, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে জন্মায়। তবে এই গাছ প্রধানতঃ মরু অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়।

পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিম বঙ্গে শীতকালে খেজুর গাছের মাথার কাছে কাণ্ডের কিছু অংশ চাঁছিয়া রস সংগ্রহ করা হয়। এই রসে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ শর্করা ও প্রচুর ভিটামিন থাকে। এই রস জ্বাল দিয়া খেজুর গুড় তৈয়ারি করা হয় ('গুড়' দ্র)। খেজুর রস গাঁজাইয়া তাড়ি উৎপন্ন হয়। খেজুর রসকে অল্প জ্বাল দিয়া তাতারসি প্রস্তুত করা হয়।

খেজুরের ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে ভারতীয় খেজুর মরু অঞ্চলের খেজুরের মত রসাল নহে। শুষ্ক খেজুরে শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক শর্করা এবং অল্প পরিমাণে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও অজৈব লবণ থাকে। খেজুর গাছের গুঁড়ি খুঁটি ইত্যাদি করিতে ও পাতা ছাউনির কাজে এবং মাদুর, ঝুড়ি, হাতপাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

মহেঞ্জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত প্রচুর খেজুরের বীজ হইতে মনে হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দেরও আগে খেজুর সিন্ধু দেশে খাদ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল।

দ্র J. C. Th. Uphof, *Dictionary of Economic Plants*, New York, 1959.

হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খেতমজুর কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিক। খেতমজুর বলিতে বুঝায় এমন কৃষিগত শ্রমিক যাহার আদৌ জমি নাই বা অতি সামান্য পরিমাণ জমি আছে এবং যে মজুরির বিনিময়ে অপরের জমিতে কাজ করিয়া কৃষিকার্যে সহায়তা করে। যে কৃষকের কিছু জমি আছে তাহার আয়ের প্রধান উৎস মজুরি হইলে তাহাকে খেতমজুর আখ্যা দেওয়া হয়। মজুরি মুদ্রায় বা ফসলে প্রদেয়। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মজুরি দেওয়া হয় মুদ্রায় এবং দৈনিক হারে। পূর্বে ফসলে মজুরি দেওয়া হইত। কোলব্রুক ১৭৯৪ খ্রী. অব্দে বাংলার কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন তাহাতে দেখি যে, তখন নিড়ানি, হলচালন, বীজ বপন ইত্যাদির জন্য খেতমজুরের প্রাপ্য ছিল দৈনিক দুই হইতে তিন সের শস্য; ফসল কাটার সময়ে এইরূপ চুক্তি হইত যে, ফসল কাটা হইতে শুরু করিয়া গোলাজাত করা পর্যন্ত সর্বপ্রকার কর্মের বিনিময়ে খেতমজুর মোট ফসলের এক ষষ্ঠাংশ পাইবে। তখন খেতমজুরকে মুদ্রায় মাস মজুরি দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল, ইহার হার ছিল মাসিক এক টাকা। খেতমজুরকে ফসলী মজুরি বা দ্রব্য মজুরি দেওয়ার রীতি আজিও বেশ বিদ্যমান আছে, 'থাউকো' মজুরি দেওয়ার রীতিও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

গ্রামাঞ্চলে কৃষিগত শ্রমিকের অস্তিত্ব কোনও না কোনও রূপে ভারতের ইতিহাসে বরাবরই দেখা যায়। বোধ হয় আদিতে কৃষিগত শ্রমিকেরা নীচ বর্ণের দাস বা ভৃত্যই ছিল, 'খোরাক পোশাক' এবং তদুপরি সামান্য কিছু মজুরি পায় এমন খেতমজুরের অস্তিত্ব ভারতে এখনও আছে। যাহা হউক, ভারতে একটি বিশাল, ভূমিহীন খেতমজুর শ্রেণী বিশেষ করিয়া আধুনিক কালের এবং ব্রিটিশ শাসনেরই সৃষ্টি। ইহার পিছনে নানাবিধ কারণ কাজ করিয়াছে। যথা, গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর মুদ্রার প্রভাব, হস্তান্তরযোগ্য বিক্রেয় পণ্যে জমির রূপান্তর, ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অচল অবস্থা, জমির উপর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সৃষ্টি, মহাজনদের নিকটে কৃষকদের ঋণদাসত্ব, প্রজাস্বত্বের অনিশ্চয়তা, ভূমি হইতে দরিদ্র কৃষকদের উচ্ছেদ, খাজনাভোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, কুটিরশিল্পের অবক্ষয় ইত্যাদি। ইহা লক্ষণীয় যে খেতমজুরদের একটা বড় অংশ অনুন্নত জাতি উপজাতির পর্যায়ভুক্ত। ভারতের বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থাও খেতমজুর সমস্যার সহিত জড়িত।

সমগ্র উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী ধরিয়া খেতমজুরদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ও অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ১৮৮২ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রাম্য শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ে ৭৫ লক্ষ হইতে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ। ১৯১১ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ – এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে খেতমজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে প্রতি এক হাজার চাষী পিছু ২৫৪ হইতে ৪১৭। ১৮৮২ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চালের দাম বাড়ে আট গুণ কিন্তু খেতমজুরদের মজুরি বাড়ে চার হইতে ছয় গুণ, অর্থাৎ তাহাদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় ২০ হইতে ৫০ শতাংশ। এই প্রবণতা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমানে চলিতে থাকে। ক্রমাধিক জমিহীনতা, জমির খণ্ডতা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, ঋণগ্রস্ততা, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আবশ্যক ন্যূনতম ব্যয়ের চেয়েও স্বল্পতর আয়— খেতমজুরদের এই সকল জীবন সমস্যা সমগ্র ব্রিটিশ রাজত্বকাল ধরিয়া চলিতে থাকে।

স্বাধীন ভারতে এখনও ব্রিটিশ আমলের ঐ ইতিহাসেরই জের চলিতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে এবং পুনরায় ১৯৫৬-৭

সালে কৃষিগত শ্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬-৭ সালের রিপোর্ট অনুসারে ভারতে খেতমজুর পরিবারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৩ লক্ষ। প্রত্যেক পরিবারের ব্যক্তিসংখ্যা গড়ে ৪·৪০। মোট গ্রাম্য জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ খেতমজুর পরিবার। খেতমজুর পরিবারগুলির ৫৭ শতাংশ সম্পূর্ণ ভূমিহীন। খেতমজুরদের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ, ইহাদের মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পুরুষ, ১ কোটি ২০ লক্ষ নারী এবং ৩০ লক্ষ শিশু। খেতমজুর পরিবারগুলির ৭৩ শতাংশ 'ভাসমান' শ্রমিক পরিবার, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত খেতমজুরেরা স্বল্প ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য মজুরি চুক্তিতে কাজ করে। বাকি ২৭ শতাংশ খেতমজুর পরিবার 'সংলগ্ন', তাহাদের অন্তর্ভুক্ত খেতমজুরেরা নির্দিষ্ট কালের জন্য মজুরিচুক্তিতে স্থায়ী শ্রমিক রূপে কাজ করে। ভাসমান পুরুষ শ্রমিকেরা বৎসরে প্রায় ২০০ দিন মজুরি লইয়া অপরের এবং ৪০ দিন নিজেদের জমিতে কাজ করে। তাহারা বৎসরে ১২৫ দিন বেকার থাকে। বয়স্ক পুরুষ খেতমজুরদের দৈনিক মজুরির হার গড়ে ৯৬ পয়সা। মজুরির ৪০ শতাংশ দ্রব্য মজুরি। পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। খেতমজুরদের মাথাপিছু আয় জাতীয় মাথাপিছু গড় আয়ের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। পরিবার পিছু খেতমজুরদের বাৎসরিক আয় ছিল ৪৩৭ টাকা এবং বাৎসরিক ভোগব্যয় ছিল ৬১৭ টাকা, ঘাটতির পরিমাণ ১৮০ টাকা। ধার করিয়া ও হাতে যাহা ছিল তাহা খরচ অথবা বিক্রয় করিয়া ঘাটতি মিটানো হইত।

১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৭ সালে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল: ১. ভূমিহীন খেতমজুর পরিবারের অনুপাত ৫০ শতাংশ হইতে বাড়িয়া হইয়াছিল ৫৭ শতাংশ ২. 'সংলগ্ন' খেতমজুর পরিবারের অনুপাত ১০ শতাংশ হইতে বাড়িয়া হইয়াছিল ২৭ শতাংশ, ইহার কারণ জমিদার প্রভৃতি পূর্বতন মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা নিজ জমির চাষের পুনরারম্ভ এবং ভূস্বামীদের দ্বারা জমি প্রজাবিলি না করিয়া স্থায়ী শ্রমিক লাগাইয়া জমি চাষ, 'সংলগ্ন' খেতমজুরদের অনুপাত বৃদ্ধি ধনতান্ত্রিক কৃষির প্রসারের সূচক ৩. খেতমজুরদের বেকারত্ব বাড়িয়াছিল, ইহার মূল কারণ তাহাদের আরও বেশি ভূমিহীন হওয়া এবং গৌণ কারণ কৃষির পশ্চাৎপদ অবস্থার ও জমির খণ্ডীকরণের দরুন জমিতে খেতমজুর নিয়োগের সুযোগাভাব ৪. খেতমজুরদের মজুরি ১৫ পয়সা কমিয়াছিল এবং খেতমজুর পরিবারগুলির মোট আয় ১১ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছিল, ১৯৫০-৫১ সালে কৃষিগত মজুরি অকৃষিগত মজুরির চেয়ে বেশি ছিল কিন্তু ১৯৫৬-৭ সালে অবস্থাটা ঠিক বিপরীত হইয়া যায় ৫. পুরুষ খেতমজুরের মজুরির চেয়ে নারী খেতমজুরের আয়ের হ্রস্বতা বাড়িয়াছিল ৬. দ্রব্য মজুরি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৭. শিশু শ্রমিকদের (১০ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে) নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইহাদের শোষণ করাই লাভের অঙ্ক বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায়।

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রামাঞ্চলে 'উদ্বৃত্ত' শ্রম সমস্যার সমাধান এ পর্যন্ত করিতে পারে নাই। অনশন রেখার নিম্নে অবস্থিত একটি বিরাট আধা-বেকার খেতমজুরশ্রেণীর অস্তিত্ব মূলতঃ গ্রামাঞ্চলে 'উদ্বৃত্ত' শ্রমেরই অভিব্যক্তি। কৃষিগত শ্রমের জোগানের তুলনায় চাহিদার ঘাটতি আছে এবং এই ঘাটতি বাড়িতেছে। যে সকল সাধারণ কৃষক খেতমজুর নিয়োগ করে তাহারা নিজেরাই অনশন রেখার নিকটবর্তী। এ অবস্থায় খেতমজুরদের আয় যে ন্যূনতম জীবনধারণ ব্যয়ের চেয়েও কম তাহা বিচিত্র নয়। ন্যূনতম মজুরি বাঁধিয়া দিয়া খেতমজুরদের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা ভারতের সব রাজ্যেই হইয়াছে কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। কুমারাপ্পা কমিটি সুপারিশ করিয়াছিল যে, খেতমজুরদের ব্যয় ও আয়ের ফাঁক দূর হয় এরূপ ন্যূনতম মজুরি বাঁধিয়া দিতে হইবে। কার্যতঃ ন্যূনতম মজুরি বাস্তব ন্যূনতম মজুরির সমান হারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। খেতমজুরদের ভূমিহীনতা দূর করার জন্য চাই জমির সমতামূলক পুনর্বণ্টন ও সমবায়ী কৃষির প্রবর্তন। এ পর্যন্ত এই দুইটি ব্যাপার অবহেলিত হইয়াছে। খেতমজুরদের অবস্থার উন্নতির জন্য চাই কৃষির আধুনিকীকরণ ও উন্নতিসাধন, গ্রামশিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন, দ্রুততর হারে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সুযোগের বিপুল বৃদ্ধিসাধন। অল্পকালের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

দ্র Radhakamal Mukherji, *Land Problems in India*, London, 1933, Indian National Congress, *Agrarian Reforms Committee Reports*, New Delhi, 1949; Indian Labour Bureau, *Agricultural Labour Inquiry Reports, 1950-51 & 1956-57*, Delhi, 1960; Census 1961; Ajit Roy, *Planning in India*, Calcutta, 1965.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

খেতুরি রাজশাহী জেলায় রামপুর বোয়ালিয়ার ২১ কিলোমিটার (১৩ মাইল) পশ্চিমে গোদাগাড়ীর পথবর্তী একটি

সুপরিচিত গ্রাম। আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের বিখ্যাত ভক্ত এবং চৈতন্যযুগের অন্যতম পদকার নরোত্তম ঠাকুর এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নরোত্তম খেতুরির রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের পুত্র, মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার বিশাল সম্পদ ও রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন গমন করেন, পরে গুরুর আজ্ঞায় স্বদেশে ফিরিয়া তিনি হরিভক্তি প্রচার ও কীর্তনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনাময় জীবন বৈষ্ণবদের উদ্বুদ্ধ করে। খেতুরির মন্দিরে গৌরাঙ্গ, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নিত্যানন্দের মূর্তি আছে। নরোত্তমের সাধনাস্থল মন্দিরের পশ্চিমে কতিপয় তেঁতুল বৃক্ষের সন্নিকটে। খেতুরিতে প্রতি বছর লক্ষ্মীপূজার সময় তিন দিন ধরিয়া বৈষ্ণবদের মেলা ও মহোৎসব হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে পার্শ্ববর্তী বহু জেলা হইতে বৈষ্ণবেরা এই মেলা দর্শন করিতে আসিতেন এবং ফলে বিশাল লোকসমাগম হইত। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) দূরে প্রেমতলীতে স্নান করিয়াছিলেন। এখনও যাত্রীগণ প্রেমতলীতে স্নান করিয়া খেতুরির মন্দির দর্শন করিতে যান।

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

খেতুরির মহোৎসব নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তের অর্থানুকূল্যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে— সম্ভবতঃ ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি খেতুরি গ্রামে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সেই সময়ে বাংলা দেশে বৈষ্ণবজগতে যত সাধুসন্ত, কবি ও কীর্তনীয়া পুরুষ ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ঘটনার প্রায় শতাধিক বৎসর পরে নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই মহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে মহোৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবী।

খেতুরির মহোৎসবের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের তিনটি কারণ। প্রথমতঃ ইহাতেই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গড়েরহাটী বা গরানহাটী ঢঙে উচ্চস্তরের রাগ রাগিণীসহ কীর্তন গান প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়তঃ রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রী বিগ্রহের পূজা এই সময় হইতেই প্রবর্তিত হয়। সম্ভবতঃ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাবের কিছু পরেই এই প্রথা প্রচলিত হয়। তৃতীয়তঃ রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা মহাকবি গোবিন্দদাস কবিরাজ, শ্রীনিবাসের অন্যতম শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি বহু কবি ও গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের যে সকল লীলাসহচর জীবিত ছিলেন তাঁহারা এই মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে প্রথম বৈষ্ণব ও কবি-সম্মেলন বলিয়া ধরা হয়।

বিমানবিহারী মজুমদার

খেমটা উত্তর ভারতীয় 'বাঈজী' নৃত্যের হীন বিকল্প। গ্রীবা সঞ্চালনে, কটি চালনায় ও ভ্রূভঙ্গীতে শৃঙ্গার রসের আধিক্য। খেমটা নৃত্য এক সময়ে পল্লী বা গ্রাম, শহরে এবং শহর ঘেঁষা পল্লী অঞ্চলে ধনী ও জমিদারের বৈঠকখানায় ও অন্তঃপুরে আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। তবলা, হারমোনিয়ম, সারঙ্গী সহকারে সারা রাত ধরিয়া নৃত্য চলিত। খেমটা বাঈ (নর্তকী) গানের কলি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী ও ভ্রূভঙ্গী করিয়া গানের পদার্থ ও ভাবার্থের ব্যঞ্জনা দিত। হস্তস্থিত রুমাল বা বসনপ্রান্ত, কখনও বা ঘাগরার অঞ্চলপ্রান্ত এক হস্তে ঊর্ধ্বে তুলিয়া নর্তকী বিভিন্ন পাদচারণে নৃত্যস্থল মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিত। দর্শকেরা খুশি হইয়া টাকা কড়ি রুমালে বাঁধিয়া ছুঁড়িয়া দিত।

ভিড়ের চাপ এড়াইতে কখনও বা নাট্যমণ্ডপের পরিবর্তে নিকটবর্তী কোনও জলাশয়ের ধারে সাময়িকভাবে বাঁধা মঞ্চে নৃত্যের আসরের ব্যবস্থা হইত। দর্শকবৃন্দ জলাশয়ের পাড় হইতে নৃত্যের রসাস্বাদ করিত। জলে বাঁধা মঞ্চের নাচকে বলা হইত জল খেমটা।

মঞ্জু বসন

খেমা মদ্র দেশের সাগল নগরের রাজকন্যা। বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী। অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী খেমা বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না পাছে ভগবান তাঁহার রূপ-যৌবনের নিন্দা করেন। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। রানীর মনোভাব পরিবর্তনের জন্য তিনি সভাকবিকে বেণুবন আশ্রমের গৌরব গান করিতে বলেন। আশ্রমের সৌন্দর্য বর্ণনা শ্রবণ করিয়া খেমা রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রম পরিদর্শনে যান। ভগবান বুদ্ধ সেই সময় ঐ স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। রূপগর্বিতা খেমার শিক্ষার জন্য ভগবান বুদ্ধ খেমা অপেক্ষা সুন্দরী এক অপ্সরী সৃষ্টি করেন এবং ঐ অপ্সরী বুদ্ধকে ব্যজন করিতে লাগিল। বুদ্ধ ঐ অপ্সরীর দেহের পরিবর্তন ঘটাইয়া খেমাকে মানব-দেহের চরম পরিণতি প্রদর্শন করান। রূপ যৌবনের পরিণতি দেখিয়া খেমা অত্যন্ত ভীতা হন ও তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন হয়। অতঃপর স্বামীর অনুমতি লইয়া তিনি ভিক্ষুণী-সংঘে যোগ দেন এবং বুদ্ধের উপদেশের

ফলে অর্হত্ত্বলাভ করেন। গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মার তাঁহার মনে কামভাবের উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেয়াল, খয়াল মুসলিম যুগের প্রবন্ধ গানের একটি প্রকার। জন্মস্থান দিল্লী ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব। ইহার ভাষা সাধারণ বা মিশ্র ব্রজভাষা, বিষয়বস্তু নায়ক-নায়িকার মানসিক লীলা, তাল— একতাল, ঝুমরা, তিলবাড়া, ঢিমা-ত্রিতাল, আড়া চৌতাল, সওয়ারী, পাঞ্জাবী ঠেকা ও তিনতাল। খেয়াল কওয়াল শিষ্যবংশপরম্পরায় পূর্ব দিকে জৌনপুর এবং পশ্চিম দিকে পাঞ্জাবের বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যাহার কারণে খেয়ালের ভাষার মধ্যে পূর্বীহিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষার কিছু সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

খেয়াল গানে ধাতু বা তুক দুইটি থাকে, যথা— স্থায়ী ও অন্তরা, যাহার প্রাচীন নাম ছিল উদ্‌গ্রাহ ও আভোগ। কোথাও কোথাও স্থায়ীর পরে মাঞ্জা নামক তুকটিকেও পাওয়া যায়, যাহা উদ্‌গ্রাহের দ্বিতীয় খণ্ড ব্যতীত আর কিছু নয়। খেয়ালে পদ, বিরুদ, স্বর এবং তাল— এই এই চারিটি অঙ্গের ব্যবহার আছে। সাধারণতঃ পদ এবং তাল সর্বত্র থাকে।

খেয়াল শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ খয়াল। খয়াল শব্দটি আরবী শব্দ যাহার অর্থ কল্পনা বা চিন্তা বা শ্রদ্ধা। খেয়ালের জন্মদাতা আমীর খুসরৌ (১২৫৩-১৩২৫ খ্রী) এবং নামটি হয় তাঁহার না হয় তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা উদ্ভাবিত। এই খেয়াল প্রথম দিকে দ্রুতলয়ের কৌল জাতীয় গানের অনুসরণকারী ছিল। সুলতান হোসেন শর্কীর সময় চুটকলা জাতীয় গীতের প্রভাবে খেয়াল মধ্যগতিকেও গ্রহণ করে এবং নিজস্ব রীতি পায়। ঔরঙ্গজেবের সময় ইহার অনেক পরিবর্তন দেখা যায় এবং মহম্মদশাহের রাজত্বকালে সদারঙ্গ খেয়ালের নূতন রূপ প্রদান করেন যে জন্য ইহাকে বিশেষভাবে কলাবন্তী খেয়াল বলা হইত। সদারঙ্গের এবং অদারঙ্গের শিষ্যপরম্পরায় এই খেয়াল বহু ঘরানায় বিভক্ত হইয়া আজ রাগসংগীতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

খেয়ালের যে রূপ আমরা দেখিতে পাই ইহার সহিত ভারতীয় প্রবন্ধগীতের যথেষ্ট মিল থাকিলেও ইহাকে একটি পৃথক মুসলিম উদ্ভাবিত প্রবন্ধ বা গান রীতি হিসাবে গণ্য করাই ভাল।

খেয়ালের চালে গাম্ভীর্যের সহিত সামান্য অস্থিরতার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিলম্বিত লয়ের খেয়ালে গানের স্থায়ী অন্তরা শেষ হইবার পর বিলম্বিত বিস্তার শুরু হয়, ইহাকে মন্দ বিস্তার বলে। মন্দ বিস্তারের পরের অংশ হইল মন্দ মধ্য বিস্তার, যাহার পরের অংশ মধ্য বিস্তার। এই মধ্য বিস্তারে স্বরের নানা প্রকার মিশ্রণ ঘটিতে থাকে যাহাকে ফিকরা বন্দী বলা হয়। ইহার পরে আরম্ভ হয় মধ্য দ্রুত অংশ অর্থাৎ ফিকরা বন্দীর দ্রুত অংশ, যাহা পরিণত হয় পরবর্তী তান অংশে। বিস্তারের ভাষা লইয়া ঘরে ঘরে পার্থক্য আছে। কোথাও ভাষার টুকরা লইয়া বিস্তার করার নিয়ম, কোথাও বা আকার দিয়া বিস্তার করা হয়। ভাষার টুকরা দিয়া বিস্তারকে বোল আলাপ এবং ভাষা দিয়া তানকে বোলতান বলা হয়।

মধ্যগতির খেয়ালে বিস্তার আরম্ভ হয় মধ্য লয়ে অর্থাৎ ফিকরা বন্দী হইতে, শেষ হয় তানে। দ্রুতগতির খেয়ালে বিস্তার আরম্ভ হয় দ্রুত ফিকরা বন্দীতে এবং শেষ তানে। ইহাদের সাধারণতঃ আস্তাই বলা হয়।

খেয়ালের তান অংশে সরগম করিবার পদ্ধতি পূর্বে কখনও ছিল না কারণ তখনকার দিনে সরগম নামে একটি পৃথক প্রবন্ধ গানের প্রকার ছিল, যাহা সরগম দ্বারাই গীত এবং বিস্তৃত হইত। এখন অনেকেই তানের মধ্যে এমন কি গানের বিস্তারের মধ্যেও সরগম দেখাইয়া থাকেন।

খেয়াল গায়কগণ খেয়ালকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে গাহিয়া থাকেন এবং তাহা হইতে খেয়ালের বিভিন্ন ঘরানার উৎপত্তি হইয়াছে। সর্বপ্রাচীন ঘরানার নাম কওয়াল ঘরানা, কালে সদারঙ্গ হইতে লখনৌ ঘরানা, গোয়ালিয়র ঘরানা, দিল্লী ঘরানা এবং জয়পুর ঘরানার উৎপত্তি হয়। গোয়ালিয়র ঘরানা হইতে আগ্রা ঘরানা জন্মগ্রহণ করে। দিল্লী ঘরানা হইতে পরবর্তী কালে কিরানা ও দ্বিতীয় দিল্লী ঘরানার সৃষ্টি হয়।

কওয়াল ঘরানার পৃথক পৃথক অংশ পাঞ্জাব, দিল্লী, খয়রাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে দেখা যাইত। বিভিন্ন প্রকৃতির গান এবং গানের বিভিন্ন প্রকারের অলংকরণাদিও ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য। এই বিভিন্ন প্রকৃতিগুলিকে বাণী বলা হইত। খেয়ালের বাণীগুলির নাম হইল : পাঞ্জাবী, কবীরী, জৌনপুরী, খয়রাবাদী ইত্যাদি।

দ্র বিমল রায়, ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

বিমল রায়

খেরুরাল সাঁওতাল জাতির পুরাণ অনুসারে উহাদের পিতৃপুরুষগণের একটি প্রাচীন নাম ছিল 'খেরুরাল', এবং সাঁওতাল ভিন্ন মুণ্ডা, বিরহোড়, কুড়ুখ প্রভৃতি সাঁওতালদের

সহিত সংপৃক্ত কতকগুলি জাতি 'খেরবাল-বংশ'-র অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতালদের মধ্যে একটি আন্দোলন শুরু হয়, তাহার নাম 'সাফাই' অথবা 'সাফা-হড়' (শুদ্ধ অথবা শুদ্ধ মানুষ) আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, সাঁওতালদিগকে তাহাদের কল্পিত পূর্বপুরুষদের আচারে ফিরাইয়া আনা — 'সাফাই'-মতের লোকেরা মুরগি ও শূকর পালন, মাংস খাওয়া এবং সাধারণ সাঁওতাল 'বঙ্গা' বা দেবতাদের পূজা বর্জন করিত (এই আন্দোলনে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের আচারের প্রভাব ছিল)। নিজেদের জাতির প্রাচীন ও গৌরবময় পরিচয় হিসাবে সাঁওতালেরা এই 'খেরবাল' নাম নিজেদের সম্পর্কে ব্যবহার করিতে থাকেন। এখন এই আন্দোলন প্রায় মৃত, তথাপি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বহু সাঁওতাল এই প্রাচীন 'খেরবাল' নাম নিজেদের সম্পর্কে ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'খেরবাল' শব্দের অর্থ জানা যায় না।

স্টেন কনো (Sten Konow, ১৮৬৭-১৯৪৮ খ্রী) ও স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১ খ্রী) প্রমুখ আধুনিক ইওরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিক এই 'খেরবাল' নামটি ভাষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতে অনার্য জাতিসমূহ এই তিন শ্রেণীতে পড়ে: ১. দ্রাবিড় ২. নিষাদ বা অস্ট্রিক এবং ৩. কিরাত অথবা মঙ্গোলয়েড। ভারতবর্ষে নিষাদ-জাতীয় মানুষ দুই মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত. ১. কোল (Kol) অথবা মুণ্ডা ২. মোন-খ্মের (Mon-Khmer) - আসামের 'খাসি' বা 'খাসিয়া' জাতি ও নিকোবর-দ্বীপের 'নিকোবারী' জাতি। কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর বিভিন্ন উপজাতির মানুষকে ভাষার বিচারে এই কয়টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ১. খেরবালী— ইহার মধ্যে আসে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো বা লড়কা-কোল, খাড়িয়া, কোরবা, আসুর, তুরী, কোড়া, ভূমিজ, কারমালী, বিরহোড়, মাহলে। কোলশ্রেণীর ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জন এই সমস্ত খেরবালী বংশের মধ্যে পড়ে। এখনও দক্ষিণ বিহারে ও ছোট-নাগপুরে 'খেরবার' বা 'খরবার' নামে একটি চাষী জাতি আছে, ইহারা এক সময়ে কোল-ভাষা বলিত, এখন ইহারা আর্যভাষা মগহী বা ভোজপুরী বলে ২. কোরকু — ইহারা বন্থাড় বা বেরার অঞ্চলে বাস করে ৩. জুয়াং (বা পাতুয়া) ৪. গদবা এবং ৫. সোরা বা শবর — এই শেষ ৩টি জাতি ওড়িশায় বাস করে।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. V, Calcutta, 1906.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা মানবসভ্যতার আদিকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার উদ্দেশ্যে প্রথম হইতেই দেহকে শক্তিশালী এবং বিভিন্ন কৌশলের অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য মানুষকে পরস্পরের সহিত নানাভাবে অনুশীলন করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাধুলা এই সকল চর্চার ফল। জীবনধারণের সমস্যা সহজসাধ্য হইয়া উঠিবার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ সূচক সামাজিক খেলাগুলির প্রবর্তন হয়।

অধিকাংশ প্রতিযোগিতামূলক খেলাগুলিতে সাধারণতঃ কোনও না কোনও প্রকারের উপকরণের ব্যবহার আছে। উপকরণবিহীন খেলাগুলির প্রবর্তন ইহার বহু পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল মনে হয়। মানবসভ্যতা যতই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বা উহাতে জটিলতা যতই বাড়িয়াছে উপকরণের বৈচিত্র্য ও তাহার নির্মাণ কৌশলেও তদ্রূপ জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান কালে উপকরণের সাহায্য না লইয়া খেলাধুলার সংখ্যা একরকম নগণ্য। যেগুলি টিকিয়া আছে সেগুলিকে যথেষ্টভাবে উদ্দাম উদ্দীপক করিয়া তুলিয়াই জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে।

সকল প্রকার প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ক্রীড়াভূমি বা ক্রীড়াচত্বর এবং সেগুলির সম্পাদ্য কাল সীমাবদ্ধ। বিশেষ বিশেষ নিয়মের দ্বারা ইহার প্রত্যেকটি নিয়ন্ত্রিত। উৎসব-সূচক খেলাগুলি এ পর্যায়ে পড়ে না, সকল ক্ষেত্রে এগুলির বাঁধাধরা নিয়ম না থাকিতেও পারে।

খেলার স্বাভাবিক আনন্দ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ হাতের কাছে যাহা কিছুই সুবিধামত পাইয়াছে তাহাকেই খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। গাছের ডালপালা হইতে আরম্ভ করিয়া গোলাকৃতি নানা প্রকারের ফুল ফল বীজ পাথর বা ভাঁটা এইভাবেই তাহার খেলার উপকরণ হইয়া উঠিয়াছে। খেলার উপকরণগুলির মধ্যে কন্দুক জাতীয় গোলক বা বল প্রতিযোগিতামূলক খেলার বৈচিত্র্য সাধনে সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছে। ইতিহাস-পূর্ব যুগ হইতে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে নির্মিত চিত্রাদি ইহার নিদর্শন বহন করিতেছে। প্রাচীন প্রায় সকল জাতির সাহিত্যে কোনও না কোনও প্রকার কন্দুক জাতীয় খেলার উল্লেখ আছে। আদি যুগে বলজাতীয় উপকরণগুলি গোলাকার প্রাকৃতিক দ্রব্য ছিল। এখন নূতন নূতন উপাদানে নির্মিত হইয়া বল ও চক্র জাতীয় ক্রীড়াসামগ্রীগুলি নানা প্রকার নূতন খেলার প্রবর্তনে সহায়তা করিয়াছে, বিশেষতঃ রবার বা রবারের সমতুল্য স্থিতিস্থাপক দ্রব্যগুলি ক্ষিপ্রতা আনয়নে সহায়তা করিয়া

খেলাধুলায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করিয়াছে ('বল খেলা' দ্র)।

জানোয়ারকে শিক্ষিত করিয়া মানুষ খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব হইতেই উহাদের খেলার কাজে লাগাইয়াছে এবং রথ জাতীয় যান আবিষ্কৃত হইলে ইহাদের সাহায্যে প্রতিযোগিতামূলক নানা প্রকারের খেলার প্রবর্তন করিয়া উত্তেজনার খোরাক জোগাইয়াছে। বরফের দেশে চক্র-বিহীন যানও এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। জলেও সন্তরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাইচ প্রভৃতি নানা প্রকারের খেলার আয়োজন করিয়াছে। মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি উদ্ভাবিত হইলে সেগুলিও ক্রমশঃ খেলার উদ্দীপনা আনয়নের উপায় হইয়া উঠিয়াছে।

আদি যুগে বোধ হয় দর্শক বলিয়া একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই। গুরু বা শিক্ষকেরাই তাঁহাদের ছাত্রদের ক্রীড়ানৈপুণ্য রাজা বা ধনী ব্যক্তির সাহায্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতেন। এইগুলি জনপ্রিয় হওয়ায় এবং এই সকল সমাবেশের সাহায্যে প্রচারকার্য চালাইবার সুবিধা হওয়ায় রাষ্ট্রসমূহও ক্রমশঃ এগুলি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার সহিত নানা প্রকার আমোদ-আহ্লাদেরও ব্যবস্থা থাকিত। প্রথম যুগে খেলাধুলা পরিচালনার মান অত্যন্ত উচ্চ ছিল, কোনও প্রকার নীচতা বা চালাকি দূষ্য ছিল, এমন কি সুপরিচালনা করিব বলিয়া বিচারকগণকে শপথ গ্রহণ করিতে হইত ('ওলিম্পিক ক্রীড়া' দ্র)। খেলার মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সংখ্যাও বাড়িতে থাকে এবং অর্থ বিনিময়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা চালু হইতে আরম্ভ করে। নানা সম্মানে ভূষিত খেলোয়াড়গণও একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হয়। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার যুদ্ধের বিভিন্ন কাজে খেলোয়াড় শ্রেণী উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় নানা প্রকারের প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা শুরু হয় এবং জনপ্রিয় হইয়া উঠিলে এগুলির ব্যবস্থাপনা ক্রমশঃ পেশাদার এক শ্রেণীর হাতে চলিয়া যাইতে থাকে। প্রথম যুগে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে পাতা বা ফুলের মালা, বড় জোর শিরোপা উপহার দেওয়া হইত। খাতিরের বিশেষ পাত্র হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে কাপ মেডেল হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত নানা রূপ মূল্যবান বস্তু এবং পুরস্কার স্বরূপ মোটা টাকা দিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। খেলাধুলা এইভাবে পেশাদারী বৃত্তি রূপে গৃহীত হইতে আরম্ভ করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাগুলি আনন্দ-উত্তেজনার খোরাক রূপে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত হইতে থাকে। খেলার ফলাফলের উপর বাজি রাখিয়া অর্থ বা দ্রব্য লাভ করার রেওয়াজ প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশেই ছিল কিন্তু তাহা নিন্দনীয় বিবেচিত হইত। খেলার ফলাফল পূর্বাহ্নেই বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া অপকৌশলে প্রচুর অর্থোপার্জন বর্তমান কালের এক শ্রেণীর তথাকথিত ক্রীড়ামোদীর ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যশোলিপ্সা সহজে পূরণ করিবার উপায় হিসাবেও খেলা-ধুলার পরিচালক বা পৃষ্ঠপোষক হইবার প্রবণতাও সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিলক্ষিত হইতেছে।

অন্য সকল প্রকার কার্যকলাপের ন্যায় খেলারও ভাল-মন্দ দুইটি দিক আছে। ঠিকভাবে প্রযুক্ত হইলে ইহা সাহস ও সহিষ্ণুতা আনিয়া দেয়, বিপক্ষের সহিত ন্যায় ব্যবহারের প্রবণতা জাগ্রত করে, বহুর প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বার্থ সংহত করিতে শক্তি দান করে। অন্যভাবে ব্যবহৃত হইলে ইহার দ্বারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-গত অহংকার প্রশ্রয় লাভ করে, যে কোনও উপায়ে জয়লাভ একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগাইতে সাহায্য করে, গোষ্ঠী-প্রীতি অসহনশীল হইয়া উঠিয়া গোষ্ঠীবহির্ভূত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঘৃণার ভাব জাগরণে সহায়ক হয়; অথচ উপরি-উক্ত দুইটি যে কোনও পদ্ধতির দ্বারা চালিত হইলে খেলাধুলা সমষ্টিগতভাবে দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতার অভ্যাস নষ্ট করিতে সক্ষম হয়।

তেজোদৃপ্ত চরিত্রলক্ষণযুক্ত মানুষ-যুদ্ধের প্রয়োজনে একান্ত আবশ্যক। খেলার মাধ্যমে এই মনোভাবসম্পন্ন মানুষ সহজেই তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায়, আবার গঠনমূলক কাজ করিবার জন্য পরোপকার বৃত্তি সম্পন্ন শান্তিকামী ব্যক্তিও ইহার সাহায্যে গড়িয়া তোলা সম্ভব। বর্তমান কালে প্রতিযোগিতামূলক সকল প্রকার খেলাধুলাই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে সকল দেশে কম-বেশি অনুশীলিত হইতেছে। 'আমোদ-প্রমোদ' ও 'বল খেলা' দ্র।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

খো-খো দেশজ ক্রীড়া। বাংলা দেশের গাদি খেলার সমগোত্রীয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে খো-খো খেলার প্রচলন আছে। খেলার নিয়মাবলীও সর্বত্র একরকম নয়। সম্ভবতঃ ইহা সুপ্রাচীন 'লবণবীথিকা' খেলা হইতে উদ্ভূত। বোম্বাই, কোলহাপুর, গুজরাত, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মহীশূর ইত্যাদি রাজ্যসমূহে খেলাটি জনপ্রিয়। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে 'ভোক্কা' নামেও

৪০-৫০ বৎসর পূর্বে ইহা অল্পবয়স্কদের প্রিয় খেলা ছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে 'খো-খো ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। নারীসমাজের মধ্যে খেলাটিকে প্রচলিত করিয়া তুলিতে সমিতি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। ফেডারেশনের উদ্যোগে বিজয়ওয়াড়া (১৯৫৯ খ্রী), কোলহাপুর (১৯৬১ খ্রী), জব্বলপুর (১৯৬২ খ্রী), বরোদা (১৯৬৩ খ্রী), ইন্দোর (১৯৬৪ খ্রী) এবং হায়দরাবাদে (১৯৬৫ খ্রী) খো-খো খেলার জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

নয় জন খেলোয়াড় বিশিষ্ট দুইটি দলের মধ্যে ঘরকাটা মাঠে প্রতি খেপে ৭ মিনিট করিয়া দুই খেপে এক পর্যায় করিয়া খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এক দলের খেলোয়াড় (এই দলকে অনুধাবক বলা হয়) মাঠের কাটা ঘরগুলির চারিটির প্রত্যেকটিতে দুই জন করিয়া পরস্পর মুখামুখী অথচ বিচ্ছিন্ন হইয়া বসিবে। যাহাতে তাহাদের পরস্পরের ভিতরকার স্থান দিয়া বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় যাতায়াত করিতে পারে অথচ তাহাদের পিঠ এড়ো পথের দিকে ফিরানো থাকিবার ফলে নিজ দলের নবম খেলোয়াড় (সক্রিয় অনুধাবক) যাহাতে এড়ো পথ হইতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে। খেলা আরম্ভ হইবার সূচনাকালে আট জন এইভাবে ঘরের মধ্যে ও নবম খেলোয়াড় অর্থাৎ সক্রিয় অনুধাবক কাটা লাইনগুলির যে কোনও স্থানে অবস্থান করিতে পারে। সম তিন ভাগে বিভক্ত বিপক্ষ দলের তিন জনের একটি খণ্ড দল আঙিনায় প্রবেশ করে এবং তাহাদের মধ্যে একজন কাটা ঘরগুলিতে প্রবেশ করিলে সক্রিয় অনুধাবক তাহাকে তাড়া করিয়া 'মোড়' করিবার চেষ্টা করে। লাইনের বাহিরে অথবা লাইনের শেষ পর্যন্ত না গিয়া মাঝপথে হঠাৎ দিক পরিবর্তন সক্রিয় অনুধাবকের পক্ষে আইনবিরুদ্ধ। বিপরীত অর্থাৎ ধাবিত দলের খেলোয়াড় কিন্তু ঘরের মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে। সক্রিয় অনুধাবক যখন দেখে যে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধরা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে অথবা অন্য কাহাকে দিয়াও এই কাজ সহজতর হইবার সম্ভাবনা আছে তখন সে উপবিষ্ট এই খেলোয়াড়কে 'খো' ধ্বনি দিয়া পিছন হইতে স্পর্শ করে। নবস্পৃষ্ট খেলোয়াড়টি তখন সক্রিয় অনুধাবক রূপে পরিগণিত হইয়া বিপক্ষ খেলোয়াড়কে 'মোড়' করিতে চেষ্টা করে। এইভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে খেলিয়া বিপক্ষ দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে যে দল 'মোড়' করিতে পারে সে দল অধিকতর পয়েণ্ট সংগ্রহকারী দল হিসাবে জয়ী সাব্যস্ত হয়।

দ্র পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ্‌, খো-খো খেলার নিয়মাবলী।

দেবেন্দ্রনাথ বসু

খোটান ৩৭°৪´ উত্তর এবং ৮০°২´ পূর্ব। মধ্য এশিয়ার পূর্বতুর্কীস্থানে কুয়েনলুন পর্বতের উত্তর পাদদেশ ও তাকলা-মাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ শহর। খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম চারি শতকে এবং সম্ভবতঃ তাহার কিছু পূর্ব হইতেই ইহা একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে মৌর্য সম্রাট অশোকের পুত্র কুস্তন (অথবা কুণাল) এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার নাম অনুসারে ইহা কুস্তন (বর্তমান খোটান) নামে পরিচিত হয়। চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থে এই বংশীয় রাজাদের নামের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। ইহাদের সকলেরই নামের প্রথম ভাগ 'বিজিত'। প্রত্ন-তাত্ত্বিক খননের ফলে নিশ্চিত রূপে জানা গিয়াছে যে খ্রীষ্টীয় প্রথম চারি শতকে খোটান একটি সমৃদ্ধ হিন্দু উপনিবেশ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। একটি খরোষ্ঠী লিপিতে মহারাজ রাজাতিরাজ দেব বিজিত সিংহ এই নামটি পাওয়া যায় এবং ইহা পূর্বোক্ত তিব্বতী প্রবাদটির সমর্থন করে। কাঠের ফলক, চর্ম, কাগজ ও রেশমের উপর ভারতীয় অক্ষরে ও ভারতীয় ভাষায় লিখিত লিপিগুলি হইতে বেশ বুঝা যায় যে এখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে অনেক বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার ছিল—ইহার মধ্যে গোমতী বিহার এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (চতুর্থ শতাব্দের শেষে) এবং হিউএন্‌-ৎসাঙ (সপ্তম শতাব্দের মধ্য ভাগে) উভয়েই এই বিহারের ও খোটানের সমৃদ্ধির বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। তখনও খোটানে ভারতীয় সভ্যতা বিদ্যমান ছিল এবং প্রায় একশত বিহার (সংঘারাম) ও পাঁচ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষু এখানে বাস করিতেন। চীন দেশীয় অনেক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পাঠের জন্য ভারতে না গিয়া এখানেই শিক্ষা লাভ করিতেন। গোমতী বিহারে রচিত অনেক গ্রন্থ প্রায় বৌদ্ধ ত্রিপিটকের ন্যায় মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। চীন দেশীয় সভ্যতার প্রভাবও খোটানে কিছু ছিল। কতকগুলি মুদ্রায় একদিকে চীনা ভাষায় এবং অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষায় লেখ আছে।

দ্র M. A. Stein, *Ancient Khotan*, Oxford, 1907; P. C. Bagchi, *India and Central Asia*,

Calcutta, 1955; R. C. Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vol. II. Bombay, 1951.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

খোদা-ই-খিদমৎগার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফ্ফার খান কর্তৃক গঠিত মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী সমাজ সংস্কারে ব্রতী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী দল। 'খোদা-ই-খিদমৎগার' অর্থ ঈশ্বরের সেবক। দলের সদস্যগণ সীমান্ত অঞ্চলের প্রাচীন পোশাক লাল রঙের কুর্তা পরিত বলিয়া এই সংগঠনটি 'লাল কুর্তা' বা 'রেড শার্ট' নামে খ্যাতি লাভ করে। জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯ খ্রী) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল হইতে বহু পাঠান খোদা-ই-খিদমৎগার উহাতে যোগ দিয়াছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের অংশ রূপে স্বীকৃত হয়। ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্যের সময়ে সরকারি পীড়ন সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠান অহিংসা নীতিতে অটল ছিল। গান্ধী-আরউইন চুক্তির (১৯৩১ খ্রী) পরেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খোদা-ই-খিদমৎগারের উদ্যোগে আইন অমান্য আন্দোলন অব্যাহত থাকে। গ্রামে গ্রামে লাল কুর্তার কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া সত্ত্বেও এই সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। খোদা-ই-খিদমৎগারের সংগঠন, শৃঙ্খলাবোধ, আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ আইন অমান্য আন্দোলনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস ১৫টি মুসলমান আসন লাভ করে। ইহা 'লাল কুর্তা'র জনপ্রিয়তা ও সংগঠন শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে খোদা-ই-খিদমৎগার সক্রিয় ও গৌরবময় অংশ গ্রহণ করে।

নিমাইসাধন বসু

খোদা-বখ্‌শ্‌ লাইব্রেরি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার। খোদা-বখ্‌শ্‌ নামক এক সম্ভ্রান্ত, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির নিজস্ব পুথি-সংগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারই অর্থব্যয়ে ইহা পাটনায় স্থাপিত হয় (১৮৯১ খ্রী)। ইহার আসল (রেজিস্ট্রিকৃত) নাম ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, কিন্তু ইহা 'খোদা-বখ্‌শ্‌ লাইব্রেরি' নামেই সমধিক পরিচিত। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য পুথিপত্রের নিমিত্ত ইহা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। খোদা-বখ্‌শ্‌ তাঁহার পিতার নিকট হইতে ১৫০০ পুথি পান এবং নিজ অর্থব্যয়ে বহু পুথি সংগ্রহ করেন। তিনি গ্রন্থাগারের জন্য একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেন ও তাহাতে ৫০০০ পুথি ও লক্ষাধিক মুদ্রার পুস্তক রক্ষিত হয়। এই সংগ্রহের এমন কিছু পুথি আছে যাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অনেকগুলি পুথিতে মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ভারতের ইতিহাস ও রাজা-বাদশাহ্‌দের জীবনী পাওয়া যায়। কয়েকখানিতে বাদশাহদের স্বাক্ষর বর্তমান। খোদা-বখ্‌শ্‌ লাইব্রেরির একটি নিয়ম এই যে, এখানকার পুথি-সংগ্রহ পাটনা হইতে স্থানান্তরিত করা যায় না। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে ১০০০০ পুথি এবং ৩৫০০০ মুদ্রিত পুস্তক আছে।

দ্র Jadunath Sarkar, 'Khuda-Bakhsh, the Indian Bodley', *The Modern Review*, September, 1908; S Khuda Bukhsh, *Essays: Indian and Islamic*, London, 1912.

আদিত্য ওহদেদার

খোল অপর নাম মৃদঙ্গ। দুই দিক ঢালু, মধ্যস্থলের পরিধি স্ফীত। বাম এবং দক্ষিণ দুইটি মুখ চর্মাবৃত এবং মধ্য ভাগ গাবযুক্ত। বাম মুখটি দক্ষিণ অপেক্ষা বৃহত্তর। দুই মুখের চর্মাবরণ চামড়ার টানায় আটভাবে সংযুক্ত থাকে। ইহা কীর্তনের সহিত সংগতে ব্যবহৃত হয়।

বা[illegible] মিত্র

খ্যাতিবাদ ভারতীয় দর্শনে ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিভিন্ন আলোচনাকে খ্যাতিবাদ বলে। 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ জ্ঞান। কোনও বস্তুর তদ্ভিন্ন রূপে খ্যাতিকে ভ্রম বলা হয়। প্রাচীন দার্শনিক প্রস্থানসমূহে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার খ্যাতি স্বীকৃত হইয়াছে :

১. অখ্যাতিবাদ : ইহা মীমাংসক প্রভাকর মিশ্রের (৭০০ খ্রী) মতবাদ। বস্তুনিষ্ঠ (রিয়ালিস্ট) প্রভাকর ভ্রমের অস্বীকার করেন। শুক্তি রজত ভ্রমে 'ইহা রজত' এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, ইহা সাধারণ সম্মত। কিন্তু প্রভাকর মতে ইহা বিশিষ্ট জ্ঞান নহে। শুক্তিকা দুষ্ট ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইয়া 'শুক্ল ভাস্বর ইহা' রূপে প্রতীত হয়। সাদৃশ্য জন্য রজত স্মৃত হয়। দোষ বশতঃ রজত যে স্মৃত তাহা জ্ঞাতার বোধ হয় না। এই অসম্পূর্ণ স্মৃতির জন্য রজতের সহিত সামান্যাংশে প্রতীত শুক্তিকার ভেদ গৃহীত হয় না। এই অগৃহীত ভেদই রজতার্থীকে রজত লাভে প্রবৃত্ত করে। 'ইহা রজত নহে' এই বাধজ্ঞান শুক্তিকা ও রজতের ভেদ গৃহীত হয় নাই প্রমাণ করে।

২. অন্যথা খ্যাতিবাদ : ইহা নৈয়ায়িক ও মীমাংসক কুমারিল ভট্ট (৭০০ খ্রী) প্রবর্তিত ব্যাখ্যা। এই মতে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বিশেষ্য (সাবজেক্ট) ও বিশেষণের (প্রেডিকেট) বৈশিষ্ট্যদ্যোতক বিশিষ্ট জ্ঞান (জাজমেন্ট)। পিত্তদূরত্বাদি দোষ নিবন্ধন শুক্তিকা 'ইহা' রূপে গৃহীত হয়। পূর্বানুভূত বলিয়া রজত সংস্কার আত্মাতে সমবেত। শুক্তিকার চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য পরম্পরা সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ স্থাপন করে। ফলতঃ রজত পুরোভাগে অবিদ্যমান হইয়াও জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষ বলে প্রত্যক্ষীকৃত হয়। এক দেশী এইরূপ কল্পনা পরিহার পূর্বক অপূর্ব জনক দোষকেই দূরস্থিত রজতের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ স্থাপনে সমর্থ মনে করেন। এইরূপে রজত ও তৎসমবেত রজতত্ব ধর্ম গৃহীত হয়। 'ইহা' রূপে প্রতিভাত শুক্তিকায় রজতত্ব-বিশিষ্ট রজত আরোপিত হইয়া উভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্য উৎপন্ন করে, এবং 'ইহা রজত' এই বিশিষ্ট জ্ঞান হইলে ভ্রান্ত পুরুষ প্রবৃত্ত হন। যথার্থ বাধজ্ঞান বিশেষ্য শুক্তিকা ও বিশেষণ রজতের ঐকাধিকরণ্য প্রতীতির নিষেধ করে।

৩. আত্মখ্যাতি : যোগাচারবৌদ্ধসম্মত। ক্ষণিক ধারা বিশেষবিজ্ঞানই এই মতে আত্মা। ইহা আন্তর এবং বাহ্য রূপেও প্রকাশিত হয়। ভ্রমপ্রত্যক্ষও ইহা হইতে বিলক্ষণ নহে। আন্তর বিজ্ঞানের বহির্বৎ অবভাস বিভ্রম। বাধজ্ঞান ভ্রমে ভাসমান বস্তুটির বহির্বস্তুত্বের নিষেধ করে।

৪. অসৎখ্যাতি. অসৎখ্যাতিবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধাচার্যগণের মতে জগৎ সংবৃতি সত্য মাত্র (কনভেনশনাল)। যাহা দৃশ্য তাহা নিঃস্বভাব বা শূন্য। শুক্তি-রজত ভ্রমে প্রতিভাত রজত সর্বথা অসৎ। আর বাধজ্ঞান শুক্তিকায় রজতের অসত্ত্ব ঘোষণা করে।

৫. অনির্বচনীয় খ্যাতি. অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদী অদ্বৈতবেদান্তীর মতে ভ্রম একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। দোষবশতঃ শুক্তিকার শুক্তিকাত্ব আবৃত হয়। শুক্তিকাত্ব আবরক অজ্ঞান চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ রজতসংস্কার সহযোগে রজতাকারে পরিণত হয়। সামান্যতঃ ইহা রূপে প্রতীত শুক্তিকায় এই রজত আরোপিত হইয়া 'ইহা রজত' এই বিশিষ্ট জ্ঞান এবং তজ্জন্য পুরুষের প্রবৃত্তি নিষ্পন্ন করে। বাধজ্ঞানে এই রজত নিষিদ্ধ হয়। যাবৎ প্রতিভাসকাল ইহার স্থিতি বলিয়া ইহা প্রাতিভাসিক। ইহা সৎ নহে, কারণ সৎ অবাধিত। ইহা অসৎও নহে, কারণ ইহা প্রতীয়মান। সদসদ্ধর্মদ্বয় দ্বারা নির্বচনীয় নহে বলিয়া রজত অনির্বচনীয়। শুক্তিকারূপ আধারে ইহা প্রতিপন্ন অথচ শুক্তিকায় রজত সর্বকালেই নিষিদ্ধ বলিয়া মিথ্যা। এক দেশীর মতে জ্ঞানও বিষয়বৎ মিথ্যা হইতে পারে। শুক্তিকার শুক্তিকাত্ব অজ্ঞাত হইলে ইহা রূপ একটি অন্তঃকরণবৃত্তি (সাইকোসিস্) হয়। এই অন্তঃকরণবৃত্তি ঘটপটাদি জড় বস্তুর ন্যায় চৈতন্যে অধ্যস্ত। এই চৈতন্যস্থিত অজ্ঞান দূরত্বাদি দোষ ও রজত সংস্কার সহকারে রজতজ্ঞানে পরিণত হয়। ভ্রমে প্রাতিভাসিক বস্তুটি ব্যাবহারিক বলিয়া বোধ হয়। শুক্তিকারূপ সদধিষ্ঠানের জ্ঞানানন্তর বাধজ্ঞান ব্যাবহারিক রজতত্ব বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজত ও তাহার জ্ঞান উভয়কেই নিষেধ করে।

রামানুজ (১০১৭ খ্রী) সৎখ্যাতি নামক একটি স্বতন্ত্র খ্যাতি স্বীকার করেন। সকল জ্ঞান তাঁহার মতে যথার্থ। উপনিষদ্ কথিত ত্রিবিৎকরণ রীতি অনুসারে সকল কিছুর মধ্যে সকল কিছু স্বীকৃত হইলেও রজত-পরমাণু শুক্তিকার সর্বাংশে সত্য নহে। যাহা আংশিক সত্য তাহা সর্বাংশে সত্য বলিয়া যে বোধ, তাহা ভ্রম। ভ্রমে আংশিক সৎ বস্তুর খ্যাতি হয় বলিয়া ইহা সৎখ্যাতি।

দ্র F. T Stcherbatsky, *Buddhist Logic*, vols. I-II, Leningrad, 1930 , S. K. Maitra, *Fundamental Question of Indian Metahphysics & Logic*, Calcutta, 1936

ভবীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্ট যীশু দ্র

খ্রীষ্টধর্ম যীশুখ্রীষ্টকে প্রভু ও মুক্তিদাতা রূপে স্বীকার করিয়া যাহারা তাঁহার নামে দীক্ষিত হইয়াছে তাহাদের সাধনমার্গকে খ্রীষ্টধর্ম বলা হয়। ঈশমানব খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস এবং তাঁহার সঙ্গে জীবনসংযোগ খ্রীষ্টধর্মের সারকথা। খ্রীষ্টধর্মীদের বিশ্বাস, খ্রীষ্টের আবির্ভাবে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণা পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের দ্বারাই স্রষ্টিকর্তার সঙ্গে পতিত মানবজাতির পুনর্মিলন সাধিত হইয়াছে। এই বিশ্বজনীন মুক্তির বার্তাকে মঙ্গল সমাচার (গস্পেল) বলা হয়। মানুষ পরমেশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল শাশ্বত কাল ঐশ জীবন-পূর্ণতার অংশভাক হওয়ার জন্য, পাপের ফলে মনুষ্যজাতি সেই ঐশ সারূপ্য হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে, করুণাময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মুক্তিদাতা যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা পাপকলঙ্কিত মানুষ তাহার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরায় ঈশ্বরপুত্র হইয়া ওঠে এবং ঐশ জীবন লাভ করে—ইহাই খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের মূল শিক্ষা।

খ্রীষ্টধর্ম স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে। যীশু ছিলেন জাতিতে ইহুদী,

তাঁহার প্রথম শিষ্যেরাও ইহুদী ছিলেন। ইহুদী জাতির বহু ঋষি ও প্রবক্তা ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন যে, পরমেশ্বরের দ্বারা অভিষেকপ্রাপ্ত (হিব্রু ভাষায় 'মসীহ', গ্রীক ভাষায় 'খ্রীষ্ট') একজন মুক্তিদাতা আবির্ভূত হইবেন যিনি ঐশ রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। যীশু যখন তাঁহার বাণী প্রচার করিয়া এবং নানাবিধ অলৌকিক নিদর্শনকার্য সাধন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন তখন অনেক ইহুদী তাঁহাকে 'খ্রীষ্ট' বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিল। কিন্তু যীশু কেবলমাত্র ইহুদীদের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত মুক্তিদাতা রূপে তাঁহার মঙ্গল সমাচার প্রচার করাতেই অনেকে তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল, যীশুর বিশ্বজনীন ও আধ্যাত্মিক ধর্মরাজ্যের বাণী ইহুদী সমাজের নেতৃবর্গ ও মহাযাজকগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইল। অবশেষে তাঁহাকে মিথ্যা রাজদ্রোহের অভিযোগে বিদেশী শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করা হয় এবং বহু অপমান ও যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। যীশু বিনা প্রতিবাদে সেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। তিনি সকল মানুষের অপরাধ ও পাপের জন্য স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্পাপ বলি রূপে আত্মোৎসর্গ করিলেন। মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হইয়া তিনি তাঁহার বহু শিষ্যের নিকট বার বার দেখা দিয়াছিলেন, তিনি যে পাপ ও মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন তাহার প্রকাশ্য প্রমাণ তাঁহাদের দান করিয়াছিলেন। শিষ্যেরা তাঁহার সাক্ষী রূপে তাঁহার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

যীশুর মুক্তিদায়ী মৃত্যু ও পুনরুত্থান খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ও প্রমাণ-স্বরূপ। খ্রীষ্ট যে শুধুমাত্র মহাপুরুষ কিংবা ধর্মগুরু নহেন, তিনি ভগবান স্বয়ং, খ্রীষ্টধর্মীরা তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকে। প্রত্যেক রবিবারে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা গির্জায় গির্জায় সমবেত হইয়া খ্রীষ্টের পুনরুত্থান স্মরণ করে, প্রত্যেক বৎসরে পুণ্য-শুক্রবারে (গুড ফ্রাইডে) খ্রীষ্টের আত্মবিসর্জন এবং পুনরুত্থান-উৎসবে (ঈস্টার সানডে) তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার কথা কীর্তিত হয়।

খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, দেশদেশান্তরে গিয়া তাঁহারা সকল জাতির নিকট তাঁহার বাণী ও শিক্ষা প্রচার করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষকে দীক্ষাস্নাত করুন। খ্রীষ্টধর্ম প্রথমে ইহুদীদের নিকট এবং পরে অ-ইহুদীদের নিকটও প্রচারিত হয়। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে, এশিয়ায় আফ্রিকায় ও ইওরোপে অনেকে খ্রীষ্টের বাণী গ্রহণ করিল। নানা কারণে খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার ও বিস্তার পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে অধিক সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম কোনও কালে পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; প্রথম শতাব্দী হইতেই দক্ষিণ ভারতে, আরব দেশে, মধ্য-প্রাচ্যে এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় বাণীর অনেক প্রচারক খ্রীষ্টসাক্ষী হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিলেন।

কালক্রমে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দলভেদ দেখা দিল। বর্তমানে খ্রীষ্টমণ্ডলী (চার্চ) তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: প্রাচীমণ্ডলীসমূহ (ঈস্টার্ন চার্চ), রোমান ক্যাথলিকমণ্ডলী এবং বিভিন্ন প্রটেস্ট্যান্টমণ্ডলী ও সম্প্রদায়। সকল খ্রীষ্টধর্মী খ্রীষ্টকে প্রভু ও মুক্তিদাতা বলিয়া মানে, সকলে বাইবেলকে শাস্ত্রগ্রন্থ রূপে স্বীকার করে, খ্রীষ্টের অনুষ্ঠিত 'প্রভুর ভোজ' (লর্ড্‌স সাপার) সকলের উপাসনার মধ্যে মুখ্য ও পবিত্রতম ক্রিয়া রূপে প্রায়ই সমবেত উপাসকমণ্ডলীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সকলে দীক্ষাস্নান (ব্যাপ্টিজ্‌ম) খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রথম ধর্মসংস্কার বলিয়া গ্রহণ করে। এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অখণ্ড একতা স্বীকার করিয়া সকল খ্রীষ্টধর্মী পরমেশ্বরকে ত্রিব্যক্তিময় (ট্রিনিটি) বলিয়া আরাধনা করে: স্বরূপগত অভেদেই পিতা পুত্র ও আত্মা পরমেশ্বরের এই ব্যক্তিগত ভেদ মানিয়া তাহারা পিতাকে সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা রূপে, পুত্রকে পিতার শাশ্বত বাক্‌ বা বাণী (লগস) রূপে এবং পরম আত্মাকে অনন্ত প্রেম রূপে স্বীকার করিয়া থাকে। অন্যান্য বিষয়ে, যথা খ্রীষ্টমণ্ডলীর বাহ্য ঐক্যরূপ ও পরিচালনার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক, ধর্মক্রিয়া-সংক্রান্ত রীতি, বাইবেলের প্রামাণিক ব্যাখ্যাদানের অধিকার, নানাবিধ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মত পরম্পরা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য রহিয়াছে। প্রাচী ও প্রতীচীমণ্ডলীর মধ্যে এবং প্রতীচীমণ্ডলীতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টের মধ্যে গুরুতর মনান্তরও নানা সময়ে দেখা দিয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি সমস্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গীণ ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাপনার্থে নানাবিধ চেষ্টা শুরু হইয়াছে এবং পূর্বেকার বিভেদজনিত বিদ্বেষ ও বিরোধিতার ভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বজনীন মুক্তি ঘোষণার বার্তা বহন করিয়া অনেক ধর্মপ্রচারক (মিশনারি) দেশে-বিদেশে খ্রীষ্টের নাম ও বাণী প্রচার করেন। খ্রীষ্টধর্মের ক্রমপ্রসারের ইতিহাসে প্রথম ধর্মপ্রচারকেরা প্রাচ্য হইতে আসিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে খ্রীষ্টের নাম শুনাইয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য হইতে আগত প্রচারকেরা প্রাচ্যে সেই নাম প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম কোনও দেশ বা জাতির নিজস্ব নহে। খ্রীষ্টধর্মীদের বিশ্বাস, প্রভু খ্রীষ্ট মানবজাতির

অনন্ত পরিত্রাতা এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ও তাঁহারই প্রদত্ত নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া সকল দেশ ও জাতির মানুষ একতাবদ্ধ হইতে আহূত, অবশ্য এই সর্বজনীন ধর্মীয় একতা রাজনৈতিক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক স্তরের নহে। খ্রীষ্টধর্ম ইহাও শিক্ষা দেয় যে, খ্রীষ্টকে জানে না এবং খ্রীষ্টের নামে দীক্ষিত হয় নাই, এমন বহু লোক খ্রীষ্টপ্রদত্ত নবজীবন ও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। জগতের আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত সকল জাতির মধ্যে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষ ভগবানের অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছে, এই অন্বেষণ ও সাধনার কার্যে বহু মহাপুরুষ এবং নানা ধর্মের সহায়তায় মানুষ দিব্য আলোক ও প্রেরণা পাইয়াছে, কারণ আন্তরিকতা ও ভক্তি যেখানে, সেখানে ঐশ জীবন ও অনুগ্রহ বিদ্যমান। তাই খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বজনীনতা কোনও জাতির আধ্যাত্মিক সাধনা বা কোনও ধর্মের মূল্যবান ঐতিহ্য অস্বীকার করে না। প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় বা অ-খ্রীষ্টীয় অন্যান্য ধর্ম ও সাধনমার্গের প্রতি খ্রীষ্টধর্মীরা অতীতে যে অশ্রদ্ধা বা অজ্ঞতা প্রকাশ করিত, সম্প্রতি তাহা বিদূরিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যাতা সেন্ট পৌল (পল) তাঁহার দ্বারা লিখিত বিবিধ পত্রে খ্রীষ্টধর্মের মূল সূত্রগুলি এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন:

১. মানবজাতি এক প্রাণবন্ত দেহের তুল্য, সকল মানুষ অঙ্গাঙ্গী ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই দেহরূপ মনুষ্যসমষ্টির আদি জনক আদম পাপ করাতে সমস্ত জাতির আধ্যাত্মিক জীবন কলুষিত হইয়াছে, জগতে পাপ ও মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে। পতিত ও পাপপ্রবণ মনুষ্যজাতির সন্তান বলিয়া মানুষ আজ জন্মগত অধিকারে দুর্বল ও মরণশীল, যদিও ঐশ জীবন লাভ করার আকৃতি তাহার হৃদয়ে অনির্বাণ, তথাপি এই পাপময় উত্তরাধিকার তাহাকে ঐশ জীবন লাভে অপারক করিয়া রাখিয়াছে। ২. তাহার অন্তরে এই দ্বৈত থাকার দরুন সর্বকালের মানুষ ব্যাকুলভাবে স্বীয় পাপময় দশা হইতে মুক্তির অন্বেষণ করিয়াছে। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সমগ্র মানব ইতিহাস এক অন্তহীন অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ সন্ধানরত মানুষের সহায় হইয়া নিত্যই তাহাকে প্রেরণা ও নির্দেশনা জোগাইয়াছে, ঈশ্বর-প্রেরিত বহু প্রবক্তা বহুবিধ বাণী ও উপদেশ মানুষকে দানও করিয়াছেন। পরমেশ্বরের শাশ্বত সংকল্প ছিল, পথে পথে অন্বেষণকারী বিশ্বমানবকে তাঁহার পূর্ণতম বাণীপ্রকাশে খ্রীষ্টের আশ্রয়ে সম্মিলিত করিয়া সেই চিরসন্ধানকে চরিতার্থ করিবেন। ৩. তাঁহার বিধানে নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন পরমপিতা তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্রকে পৃথিবীতে যীশুখ্রীষ্ট রূপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারই দ্বারা পরমেশ্বর তাঁহার পূর্ণ প্রেম ও জ্যোতি প্রকাশিত করেন। ঈশমানব যীশুখ্রীষ্ট একাধারে প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ, তাঁহার মধ্যে ঐশ জীবনের শাশ্বত পূর্ণতা এবং মানবজাতির কালবদ্ধ জীবনধারা সম্মিলিত হইয়া আসে। তাঁহারই সঙ্গে পাপপ্রবণ ও মরণশীল মানুষের ইতিহাসে ঐশ অমরতা ও পবিত্রতা পুনরায় নবজীবনস্রোত রূপে জগতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। আদমের দ্বারা পাপ ও মৃত্যু যেমন জগতে প্রবেশ করিয়াছিল, খ্রীষ্টের দ্বারা তেমনই ঐশ জীবন ও মৃত্যুময় পুনরুত্থানের আশা জগতে ফিরিয়া আসে। ৪. পরমেশ্বরের আত্মদান সীমিত নহে। খ্রীষ্টের মধ্যে ঐশ জীবন পূর্ণতা অধিষ্ঠান করে, আর খ্রীষ্ট মানবজাতির একজন, দেহধারণের ফলে ঈশ্বর সত্যই মানব হইয়াছেন, যাহাতে বিশ্বমানব তাঁহার দ্বারাই ঐশ জীবনের অংশভাগী হইতে পারে। 'যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার নামে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তিনি তাহাদের ঈশ্বর সন্তান হইবার অধিকার দিয়াছেন' (জন ১:১২)। ৫. ক্রুশবিদ্ধ হইয়া যীশু মৃত্যুবরণ করিলেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতিভূ হইয়া তিনি নিজেকে প্রায়শ্চিত্তের বলি রূপে উৎসর্গ করিলেন। ঐশ বিধান এবং পরমেশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া মানুষ যে পাপ করিয়াছিল তাহার ফলে পরমেশ্বরের প্রতি মানবের ভক্তিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ভাব বিনষ্ট হইয়াছিল। খ্রীষ্টের একান্ত আনুগত্য ও আত্মনিবেদন মানুষের মনে নম্রতা ও অনুরক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে নিজের আনুগত্য ও আত্মনিবেদন মিলাইয়া মানুষ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। ৬. যীশু শুধুমাত্র উপদেষ্টা কিংবা অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপ মহাপুরুষ নহেন। মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত যীশুখ্রীষ্ট নবজীবনের উৎস। তাঁহার জীবনধারা হইতে যে কেহ দিব্য নবজীবনধারা লাভ করিতে চায়, তিনি তাহাকে সেই জীবন দানে সঞ্জীবিত করেন। 'আমি হইলাম দ্রাক্ষালতা, তাহার শাখা-প্রশাখা তোমরাই। যে আমার মধ্যে অবস্থান করিবে আর আমি যাহার মধ্যে অবস্থান করিব, সে-ই প্রচুর পরিমাণে ফলপ্রসূ হইবে, কারণ আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তোমরা কিছুই করিতে পারিবে না (জন ১৫।৫)। সেন্ট পৌল বার বার এই তুলনা করেন মানবজাতি হইল দেহ, খ্রীষ্টই সেই দেহের মস্তক স্বরূপ, মস্তকের সহিত সংযুক্ত থাকিলেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জীবনের স্ফুরণ অব্যাহত থাকে। 'যিনি আমাদের মস্তক স্বরূপ, তাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আমরা জীবনবৃদ্ধি লাভ

করিব, তাঁহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী রূপে জীবনসংযোগ রক্ষা করিয়া সমগ্র দেহ তাঁহার প্রাণদায়ী প্রভাবে পরিপুষ্ট হইবে খ্রীষ্টপ্রেমের অনুপ্রাণনে' (এফেসীয় ৪।১৫-১৬) ৭. খ্রীষ্টপ্রবর্তিত সংস্কার (স্যাক্রামেণ্ট) বা ধর্মক্রিয়াগুলির মাধ্যমেই সাধারণতঃ খ্রীষ্টের সহিত সেই জীবনসংযোগ স্থাপিত ও সংরক্ষিত হয়। এই বাহ্য সংস্কারগুলি সাংকেতিক অর্থে নবজীবনদানের পরিচায়ক নিদর্শন কিন্তু খ্রীষ্টের ঐশ শক্তির গুণেই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার দ্বারা ঐশ প্রেম ও জীবন প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। স্বয়ং খ্রীষ্ট এই ক্রিয়া বা সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠাতা হইয়া তাঁহার দেহরূপ বিশ্বাসী সমষ্টিকে আপন জীবন সঞ্চারে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন ৮. খ্রীষ্টের বিশ্ব পবিত্রাণ কার্য তাহার চরম সমাপ্তি তখন লাভ করিবে যখন জগতের সকল জাতি খ্রীষ্টের আশ্রয়ে সম্মিলিত হইয়া ঐশ রাজ্যে এক ভাবাপন্ন হইবে। পরমেশ্বরের সহিত বিশ্ব মানবের এই পুনর্মিলন এক শাশ্বত মিলনোৎসবের তুল্য। স্বর্গীয় শান্তিনগরীতে, অর্থাৎ ভগবানের সন্নিধানে, পাপমুক্ত ও নবজীবনপ্রাপ্ত মানবজাতি শাশ্বত কাল পিতা পুত্র ও আত্মা পরমেশ্বরের এক ও অদ্বিতীয় অখণ্ড জীবনপূর্ণতার সহভাগী হইবে। "অসংখ্য জনতা, নিখিলের সর্বজাতি, সর্বগোষ্ঠী এবং সর্ব ভাষাভাষী অগণ্য জনসংঘ তাহার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উদাত্ত কণ্ঠে তাঁহার মহিমা কীর্তন করিবে 'পরিত্রাতা প্রভু পরমেশ্বর, পরিত্রাতা তাঁহার পুত্র সেই উৎসর্গীকৃত মেষশাবক আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট'" (রিভিলেশন ৭।৮-১০)।

দ্র নূতন নিয়ম, বাঙ্গালোর, ১৯৬৩, পত্রাবলী, কলিকাতা, ১৯৬৬, L. S. Thornton, *The Common Life in the Body of Christ*, London, 1942, H. A. Reinhold, ed, *The Soul Afire Revelations of the Mystics*, New York, 1944, P. Tillich, *Dynamics of Faith*, London, 1957, C. H. Dodd, *The Meaning of Paul for Today*, New York, 1957; C. S. Lewis, *Mere Christianity*, London, 1958; E. Schillebeeckx, *Christ the Sacrament of Encounter with God*, London, 1963.

পিয়ের ফালোঁ
রবের্যার আঁতোয়ান

খ্রীষ্টধর্ম, ভারতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এক কোটির অধিক। প্রত্যেকটি প্রদেশে নানাবিধ খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান ও গির্জা এবং স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী (চার্চ) থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ভারতীয় খ্রীষ্টান দক্ষিণ ভারতে বাস করে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী ও উপজাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত অনেকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। অধিকাংশ ধর্মযাজক ও ধর্মপাল (বিশপ) ভারতীয় হইলেও নানা দেশ হইতে আগত বহু মিশনারিও ভারতে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাদানের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে তিনটি প্রধান ভাগ পাওয়া যায়, যথা রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যাণ্ট এবং সিরিয়ান খ্রীষ্টান, তাহা ব্যতীত আর্মানী গ্রীক প্রভৃতি কয়েকটি মণ্ডলীর সভা ও ধর্ম কেন্দ্র আছে।

দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস সুপ্রাচীন। খ্রীষ্টের আপন শিষ্য ও প্রেরিত দূত সাধু থোমা (সেণ্ট টমাস) ৫২ খ্রীষ্টাব্দে কেরলে খ্রীষ্টের বাণী বহন করিয়া আসিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া কেরলবাসী খ্রীষ্টানদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল মধ্য-প্রাচ্য ও পারস্যের সঙ্গে, তাহারা সিরিয়া হইতে তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ ও উপাসনার রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের 'সিরিয়ান খ্রীষ্টান' নামে অভিহিত করা হয়। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কেরলীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে প্রতীচী মণ্ডলীর প্রায় কোনও সম্বন্ধ ছিল না, পরবর্তী কালে সেই সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হয় এবং বেশির ভাগ সিরিয়ান খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর সঙ্গে এক শাখাবদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু অদ্যও সিরিয়ান মণ্ডলীর এক বৃহৎ অংশ রোম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া প্রাচী মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কেরলবাসী খ্রীষ্টীয় সমাজের ধর্মোৎসাহ, শিক্ষা, আর্থিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য সমগ্র ভারতীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনে সিরিয়ান খ্রীষ্টানদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কন্যা কুমারিকার পূর্ব অঞ্চলে তামিল আদিবাসীদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দী হইতে একটি স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী আছে। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেই অঞ্চলে ধর্মশিক্ষা ও মণ্ডলীসংগঠনের কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে নানাবিধ পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রে ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে ক্যাথলিক মিশনারিরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পশ্চিম উপকূলে, বিশেষতঃ গোয়াতে ও ম্যাঙ্গালোরে, অনেকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, সেই সময়ে হুগলিতে এবং পূর্ব বঙ্গেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারিত হয়। পর্তুগীজ মিশনারিদের নিকট ভারতীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী বহু কারণে ঋণী এবং তাঁহাদের দ্বারা দীক্ষিত খ্রীষ্টানদের অনেকে আন্তরিক ও গভীরভাবে খ্রীষ্টভক্তি ও রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য মূল্যবান উত্তরাধিকার রূপে আজও সংরক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় মনোভাব হইতে

বিমুক্ত ছিলেন না বলিয়া তাঁহারা প্রাচ্যের সংস্কৃতি, সমাজাদর্শ, ও ধর্মাশ্রিত ঐতিহ্যের যথার্থ মূল্য প্রায় উপলব্ধি করিতেন না। তাই তাঁহারা নবদীক্ষিতদের উপর বহুবিধ বিদেশীয় প্রথা ও আচার চাপাইয়া দিতেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে আর্মানীরাও ভারতের নানা স্থানে ব্যবসায়কেন্দ্র স্থাপন করে, সেই সব স্থানে আর্মানী গির্জাও স্থাপিত হয়। আজও ভারতে আর্মানী খ্রীষ্টানের সংখ্যা নগণ্য নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নব আদর্শে অনুপ্রাণিত কয়েকজন মিশনারি বিদেশী বণিক ও শাসকদের সঙ্গে কোনও সংযোগ না রাখিয়া এদেশীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক রোবের্তো দে নোবিলি দক্ষিণ ভারতের মাদুরা শহরে আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করেন। হিন্দু শাস্ত্রের অধ্যয়ন, সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্যের চর্চা, ধ্যান ও কঠোর তপস্যায় নিরত নোবিলি সর্বপ্রথম ভারতীয় ঐতিহ্য ও খৃষ্টবাণীর সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিলেন। নোবিলি ও তাঁহার অনুগামী ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টা প্রভূত পরিমাণে সার্থক হয়, পরবর্তী কালে ডেনমার্ক ও জার্মানি হইতে আগত প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা, বিশেষতঃ ত্রাঙ্কেবার মিশনের অধ্যক্ষ বার্থলমেয় জিগেনবল্‌গ ও হেনরিক প্লোয়াট্‌স্‌ এই আদর্শে দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টবাণী প্রচার করেন। তাঁহাদের ধর্মকার্যের ফলে তামিল ও তেলুগু ভাষাভাষী হিন্দুদের মধ্যে কয়েক লক্ষ নরনারী খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তামিলনাদে ও অন্ধ্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত হইয়াছে এবং সেই সব অঞ্চলের খ্রীষ্টধর্মীরা তাঁহাদের জাতীয়তা ও ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলী ও সম্প্রদায়গুলির মিশনকার্য ভারতের অনেক স্থানে আরম্ভ হয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ ধর্মপ্রচারকেরা ভারতীয় অনেক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিলেন এবং শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাপ্রবর্তনের জন্য প্রশংসনীয় সাধনা করিলেন। আজ অবধি ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের বহুবিধ ধর্মপ্রচারকার্য ও জনসেবার প্রচেষ্টা ভারতের অনেক অঞ্চলে সার্থকভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ কয়েকজন মিশনারি কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি শহরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হইতে এই মিশনারি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মিশনকার্যের প্রধান অংশ রূপে গণ্য করা যায়। তাহার ফলে ভারতের শিক্ষিত সমাজে খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক আদর্শের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। বহু ভারতীয় খ্রীষ্টানও এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে খ্রীষ্টমণ্ডলী ও খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছেন।

আসামে, সাঁওতাল পরগনায়, ছোটনাগপুরে আর মধ্য ভারতের নানা স্থানে আদিবাসীদের মধ্যে ও উপজাতিগুলির মধ্যে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম সার্থক ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। আজ ভারতীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর এক বৃহৎ অংশ আদিবাসী ও উপজাতিদের লইয়া গঠিত।

ভারতীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে পূর্ণাঙ্গীণ ঐক্যের পুনঃস্থাপনের জন্য সম্প্রতি অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সেই চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইয়া উঠিতেছে। অপর দিকে ভারতীয় খ্রীষ্টানগণ ভারতীয় ঐতিহ্য ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় স্থাপন করিতে পূর্বাপেক্ষা উদ্যোগী হইতেছে। জাতীয় জীবনে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের সক্রিয় অংশগ্রহণও পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে।

দ্র এম. সি. চক্রবর্তী, ভারতে খ্রীষ্টের বাণীপ্রচারক, কলিকাতা, ১৯৫৯।

[illegible]

খ্রীষ্টাব্দ অব্দ দ্র

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮ খ্রী) জন্ম ৩ আশ্বিন ১২৭৪ বঙ্গাব্দ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ খ্রী, মৃত্যু ২ ফাল্গুন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ খ্রী। গগনেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুজ, শিল্পী সুনয়নী দেবী তাঁহার অন্যতম ভগিনী। সেন্ট জেভিয়ার্স বিদ্যালয়ে গগনেন্দ্রনাথ শিক্ষালাভ করেন। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার কোনও নির্দিষ্ট পথ লক্ষ্য করা যায় না। তৎকালে বিখ্যাত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গগনেন্দ্রনাথ কিছুকাল শিক্ষা করেন। অতঃপর জাপানী শিল্পী ইয়োকোহামা টাইকানের দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হন।

গগনেন্দ্রনাথ উদ্ভাবনপ্রিয় শিল্পী, তাঁহার প্রতিভার প্রকাশ ও বিবর্তন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে। ফোটোগ্রাফি, তৈজসপত্র, পোশাক ইত্যাদি নানা দিকে গগনেন্দ্রনাথের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা নানা স্তরে বিভক্ত, যথা দৃশ্যচিত্র, বর্ণনামূলক চিত্র, প্রতিকৃতি, বিমূর্ত চিত্র, ব্যঙ্গচিত্র

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইত্যাদির দৃষ্টান্ত হইতে তাঁহার উদ্ভাবনী ও বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইওরোপীয় জল-রঙ ও জাপানী কালিতুলির কাজ — এই দুই পদ্ধতির সংযোগ গগনেন্দ্রনাথের রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় আঙ্গিকের অনুসরণ বা অনুকরণের প্রয়াস গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। গগনেন্দ্রনাথ বাস্তববাদী (রিয়ালিস্ট) শিল্পী, দৃশ্যানুগত উদ্দীপনার সুস্পষ্ট প্রকাশ তাঁহার রচনার বিশেষ লক্ষণ। এই বিশেষ লক্ষণ অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় তাঁহার অঙ্কিত দৃশ্যচিত্রে। এক নিমেষে গৃহীত আলোকচিত্রের মত গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্রে আকস্মিকতার ভাব বহু ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।

আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে কালিতুলিকাজের পথিকৃৎ গগনেন্দ্রনাথ। এই শ্রেণীর রচনাতে তুলি অপেক্ষা কালির প্রয়োগে গগনেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অধিক। কালিতুলিতে করা প্রতিকৃতি গগনেন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। দৃশ্যচিত্রের তুলনায় গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রতিকৃতি অনেক পরিমাণে আকারনিষ্ঠ।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর গগনেন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক ফরাসী শিল্পের নানা উপাদান তিনি স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস করেন। কালিতুলির কাজে গগনেন্দ্রনাথ যেমন পথিকৃৎ অপর দিকে ফরাসী শিল্পভাষাগত উপাদান প্রবর্তনের প্রয়াসেও গগনেন্দ্রনাথ পথিকৃৎ রূপে স্মরণীয়। যদিও সমসাময়িক সমালোচকেরা গগনেন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক ফরাসী প্রভাবান্বিত চিত্ররূপের সঙ্গে কিউবিজমের তুলনা করিয়াছেন কিন্তু এই তুলনা সকল সময় গ্রহণ করা চলে না। জার্মান ও ফরাসী শিল্পীদের উদ্ভাবন কোলাজের (Collage) সহিত গগনেন্দ্রনাথের রচনার সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ। এই নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম পর্বে লক্ষ্য করা যায় কোণ-যুক্ত কতকগুলি ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের সমাবেশ। কালো-শাদার উজ্জ্বল সমাবেশ এই সব রচনার বৈশিষ্ট্য। ক্রমে জ্যামিতিক আকার স্ফটিকোজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্যে অভাবনীয় উদ্দীপনা প্রবর্তন গগনেন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বিতীয় স্তরের রচনাতে লক্ষ্য করা যায়।

বর্ণের দ্যুতি এই সময়ের রচনার সর্বপ্রধান আবেদন। স্বপ্নে-দেখা জগৎ যেমন স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতার অতীত তেমনই গগনেন্দ্রনাথের উপরে বর্ণিত চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য। অতঃপর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের আর একটি বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাক্‌কালে।

গগনেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের এমন কতকগুলি রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলি পূর্বোক্ত রচনার পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। কারণ এই সব রচনাতে উদ্ভাবন অপেক্ষা একটি নির্দিষ্ট অনুভূতি প্রকাশের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

পরিত্যক্ত গৃহের অভ্যন্তর, এই বিষয় অবলম্বনে জীর্ণ অট্টালিকার জীবনকথা প্রত্যক্ষ করা যায় শিল্পীর এই সব রচনাতে। ভুতুড়ে (আন্‌ক্যানি) ভাবভঙ্গী এই সময়ের প্রায় প্রত্যেক রচনাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়গত ব্যঞ্জনা থাকিলেও এই ছবিগুলির সর্বপ্রধান আবেদন বস্তুসমাবেশে।

আধুনিক শিল্পের নানা দিকে গগনেন্দ্রনাথকে পথিকৃৎ বলা সংগত। কলিকাতা প্রধানতঃ সম্ভ্রান্ত সমাজকে লক্ষ্য করিয়া গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ ও কৌতুকের চিত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। এই সকল রচনাতে যে অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকাশ-ভঙ্গীর উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করা যায়, তাহার তুলনায় রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র অনেক পরিমাণে নিষ্প্রভ। আধুনিক শিল্পের পথিকৃৎ রূপে গগনেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ হইলেও তাঁহার কোনও অনুগামী নাই, যদিও তিনি নব্য শিল্পীদের সহানুভূতিসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবেশ ও বিদগ্ধ রুচির প্রভাবে গগনেন্দ্রনাথ সকল সময়েই সমকালীন শিল্প আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াছেন। শিক্ষকতার গুরু দায়িত্ব গগনেন্দ্রনাথ কখনও গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেও তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুগামী লক্ষ্য করা যায় না। ক্রমে আধুনিকতার প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার কারণে গগনেন্দ্রনাথ প্রগতিবাদী শিল্পী সমাজের উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯০৫ খ্রী) পরে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সকলেই ক্রমশঃ কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস ত্যাগ করিলে, গগনেন্দ্র-নাথই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতিকেন্দ্রের অন্যতম ধারক ও বাহক রূপে পরিগণিত হন, যদিচ রবীন্দ্রনাথই তাঁহার প্রধান প্রেরণাস্থল থাকেন। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার পুরোধা রূপে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি এই সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার চিত্রকলার মাহাত্ম্যে যেমন, গগনেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেও তেমনই, ভগিনী নিবেদিতা, রদেনস্টাইন, ওকাকুরা, কারমাইকেল, রোনাল্ডসে, উড্‌রফ প্রভৃতি বহু বিদেশী মনীষী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আকৃষ্ট হইয়া বাংলার নবচিত্রকলার প্রসারে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। এই শিল্পসাধনাকে প্রতিষ্ঠানগত রূপ দিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট (১৯০৭ খ্রী)

সংগঠনে সম্পাদক রূপে গগনেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অসামান্য। শুধু চিত্রকলায় নহে, ব্যাবহারিক জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা বিভাগে শিল্পরুচির বিকাশেও তাঁহার দান স্মরণীয়। গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র তৈয়ারির যে বিশিষ্ট রীতি ও রুচি শান্তিনিকেতনের সূত্রে দেশে প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, ঠাকুরবাড়ির পূর্বকালীন বিদেশী গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া, তিনি ও অবনীন্দ্রনাথ দক্ষিণী শিল্পীকে নির্দেশ দিয়া নূতন রীতির আসবাবপত্র প্রস্তুত করান, ক্রমশঃ সে ধারা অন্যত্রও ব্যাপ্ত হইয়াছে। বাংলার গৃহনির্মিত কারুশিল্পের প্রচারার্থ স্থাপিত বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (১৯১৬ খ্রী) অন্যতম সম্পাদক রূপে তিনি বিশেষ উদ্যোগের পরিচয় দিয়াছিলেন।

অভিনয়কলাতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী অভিনয়ে (১৯১৬ খ্রী) রাজার ভূমিকায়, রূপশোন শারদোৎসব অভিনয়ে (১৯২২ খ্রী) সম্রাট বিজয়াদিত্যের ভূমিকায় এবং বৈকুণ্ঠের খাতার অভিনয়ে বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় তাঁহার কৃতিত্ব স্মরণীয় হইয়া আছে। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট রচনা প্রভৃতিতেও তিনি অভিনব দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন।

সাহিত্যেও তাঁহার অধিকার ছিল, শিশুপাঠ্য 'ভোঁদড় বাহাদুর' গল্প (রচনাকাল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) তাঁহার রচনার নিদর্শন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার নানাবিধ আনুকূল্যে উপকৃত হইয়াছে।

গগনেন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রধান একটি সংগ্রহ কলিকাতায় রবীন্দ্রভারতী সমিতিতে রক্ষিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পুস্তক চিত্রণ উপলক্ষে গগনেন্দ্রনাথ যে সকল চিত্র অঙ্কন করেন সেগুলি এবং তাঁহার অন্য কোনও কোনও চিত্র শান্তিনিকেতন কলাভবন সংগ্রহভুক্ত। এতদ্ব্যতীত আরও কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁহার আঁকা ছবি আছে।

রবীন্দ্রভারতী সমিতি গগনেন্দ্রনাথের নির্বাচিত চিত্রাবলীর প্রতিলিপির একটি সংগ্রহগ্রন্থ (১৯৬৪ খ্রী) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহ ও অন্য কোনও কোনও সংগ্রহভুক্ত চিত্রাবলীর তালিকা মুদ্রিত আছে।

তাঁহার অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রাবলীর অনেকগুলিই 'বিরূপ বজ্র' (১৯১৭ খ্রী ?), 'অদ্ভুত লোক : *Realm of the Absurd*' (১৯১৭ খ্রী) ও 'নবহুল্লোড় . *Reform Screams*' (১৯২১ খ্রী) গ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে।

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর', সেঁজুতি, কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, অশোক মিত্র, 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর', ভারতের চিত্রকলা, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, কানাই সামন্ত, 'গগনেন্দ্রনাথ', চিত্রদর্শন গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৮৮১ শকাব্দ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'গগনেন্দ্রনাথ', পরিচয়, আশ্বিন ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার কথা ও ভারতের শিল্পকথা', অমৃত, ৩ আষাঢ় ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, Nirad C Chaudhuri, 'The Art of Gaganendranath Tagore', *The Modern Review*, March, 1938, O C Gangoly, 'Gogonendranath Tagore The Great Indian Artist', *The Modern Review*, March, 1938, Rathindranath Tagore, 'Cousin Gaganendra', *The Visva-Bharati Quarterly*, May-July, 1938, The Marquis of Zetland, 'Memories of Gaganendranath Tagore', *The Visva-Bharati Quarterly*, May-July, 1938, William Rothenstein, Gaganendranath Tagore', *The Visva-Bharati Quarterly*, May-July, 1938, Mulk Raj Anand, 'Gaganendranath Tagore's Realm of the Absurd', *The B B & C I Annual*, 1951 ; Kshitis Roy, *Gaganendranath Tagore*, Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1964

পুলিনবিহারী সেন

গঙ্গবংশ ভারতের ইতিহাসে দুইটি গঙ্গবংশ সুপ্রসিদ্ধ। এই দুইটি বংশকে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য গঙ্গবংশ বলা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য গঙ্গগণের রাজধানী মহীশূরের নিকটবর্তী তলকাড নগরে অবস্থিত ছিল, প্রাচ্য গঙ্গরাজগণের রাজধানী ছিল অন্ধ্র প্রদেশস্থিত শ্রীকাকুলম-এর নিকটবর্তী কলিঙ্গনগর (আধুনিক মুখলিঙ্গম)। এই দুইটি বংশই আট শতাধিক বৎসরকাল রাজত্ব করে। কিন্তু উত্তরকালীন প্রাচ্য গঙ্গগণ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বংশই ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রাচ্য গঙ্গ : ৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মহীশূর হইতে আসিয়া এই গঙ্গগণ শ্রীকাকুলম অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন। ঐ সময় হইতে তাঁহারা গঙ্গাব্দের গণনা করিতে থাকেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য গঙ্গেরা ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এক সময়ে গঙ্গরাজ্য পাঁচটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হয়। চোল বংশীয় সম্রাট রাজরাজের

গঙ্গবংশ

(৯৮৫-১০১৪ খ্রী) সময়ে প্রাচ্য গঙ্গবংশের একটি শাখা চোল সম্রাটের সহায়তায় পরাক্রান্ত হইয়া ওঠে। এই সময় হইতে রাজ্যে গঙ্গাব্দের পরিবর্তে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয়। উল্লিখিত শাখার প্রথম স্বাধীন নরপতি ছিলেন তৃতীয় বজ্রহস্ত (১০৩৮-৭০ খ্রী)। তাঁহার পুত্র প্রথম রাজরাজ (১০৭০-৭৮ খ্রী) চোলসম্রাট রাজেন্দ্রের কন্যা রাজসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজরাজের চোলবংশীয়া মহিষীর গর্ভজাত সন্তান অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (চোলগঙ্গ) দীর্ঘ সপ্ততিবর্ষকাল (১০৭৮-১১৪৭ খ্রী) রাজত্ব করেন। তিনি দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার পরাক্রমে প্রাচ্য গঙ্গরাজ্য দক্ষিণ পশ্চিমে গোদাবরী নদী তীর হইতে উত্তর-পূর্বে ভাগীরথীর তীরদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি পুরী-কটক অঞ্চল হইতে সোমবংশের অধিকার উচ্ছেদ করেন এবং পৈতৃক শৈব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পুরীর পুরুষোত্তম-জগন্নাথ অর্থাৎ বিষ্ণুর ভক্ত হন। তিনি পুরীর সুবিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সোমবংশীয় রাজ্যের দক্ষিণ ভাগের রাজধানী অভিনব যযাতিনগর অর্থাৎ কটক জেলার অন্তর্গত যাজপুরে গঙ্গরাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৩শ শতাব্দীর সূচনায় পশ্চিম ও উত্তর বাংলায় তুর্কী মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাই মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধের সুবিধার জন্য চোড়গঙ্গের প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীম (১২১১-৩৯ খ্রী) মহানদীর তীরবর্তী অভিনব বারাণসী অর্থাৎ কটকে পুনরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

ওড়িশার ইতিহাসে তৃতীয় অনঙ্গভীমের রাজত্বকাল বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি কুলদেবতা পুরুষোত্তম-জগন্নাথের প্রতি অত্যধিক ভক্তিবশতঃ সমগ্র রাজ্য ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে দান করেন। ফলে গঙ্গরাজ্য দেবোত্তর সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং তখন হইতে ওড়িশার সম্রাটগণ আপনাদিগকে দেবতা জগন্নাথের সামন্ত জ্ঞান করিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

তৃতীয় অনঙ্গভীমের পর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাঁহার আট জন বংশধর গঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম এর নাম নরসিংহ এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম এর নাম ভানু। তৃতীয় অনঙ্গভীমের পুত্র প্রথম নরসিংহ (১২৩৯-৬৪ খ্রী) মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। গঙ্গ লেখমালায় বলা হইয়াছে যে, তিনি রাঢ়া এবং বরেন্দ্রী দেশের যবন অর্থাৎ মুসলমানদিগকে পরাজিত করেন। মিন্হাজুদ্দীনের তবকৎ-ই-নাসিরী নামক গ্রন্থেও এই দাবি সমর্থিত দেখা যায়। হিজরা ৬৪১ অব্দে লক্ষ্মণাবতীর অধিপতি মালিক তুঘ্রিল্ তুঘান খাঁ জাজনগর (ওড়িশা) রাজ্যের সীমান্তবর্তী কতাসীন আক্রমণ করেন, কিন্তু ওড়িশারাজের বাধার জন্য তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। পরবৎসর কতাসীন আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ওড়িশারাজ লক্ষ্মণাবতী রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথমে তাঁহার সেনাদল লখনোরের শাসক ফখ্রুল মুল্ক্ করীমুদ্দীন লাঘ্রীকে সসৈন্যে ধ্বংস করে এবং মুসলমান সেনা বিতাড়িত করিয়া মুসলমান রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (বর্তমান মালদহের অন্তর্গত গৌড়) নগরীর দক্ষিণে গঙ্গা তীরে উপস্থিত হয়। কিন্তু অযোধ্যা ও দোয়াব অঞ্চল হইতে মুসলমান সেনার আগমনের সম্ভাবনায় ওড়িশারাজের সেনাপতি (সামন্তরায় উপাধিধারী রাজজামাতা) সেনাদল দেশে ফিরাইয়া লইয়া যান। মুসলমান ঐতিহাসিকের বিবরণ অনুসারে, কিছুকাল পরে ওড়িশারাজের সেনাদল মালিক ইখ্তিয়ারুদ্দীন য়ুজবক্ই তুঘ্রিল্ খাঁ কর্তৃক দুইবার পরাজিত হইয়াছিল। কোনারক এর সুপ্রসিদ্ধ সূর্যমন্দির গঙ্গরাজ প্রথম নরসিংহের অতুলনীয় কীর্তি।

প্রথম নরসিংহের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র তৃতীয় ভানুর (১৩৫২-৭৮ খ্রী) রাজত্বকালে ওড়িশা রাজ্য বারবার বিদেশীয় আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ইহার মধ্যে দিল্লীর তুঘলুক বংশীয় সুলতান ফিরুজ শাহের আক্রমণই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইয়াছিল। ফিরুজ শাহ ওড়িশার রাজধানী বারাণসী (অভিনব বারাণসী বা কটক) অধিকার করেন এবং তৃতীয় অনঙ্গভীম কর্তৃক কটকে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথবিগ্রহ দিল্লীতে লইয়া যান। দেশলুণ্ঠন করিয়া সুলতান এত অধিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, ক্রেতার অভাব ঘটিয়াছিল, ফলে একটি ঘোড়ার দাম ২ জিতল বা পয়সায় দাঁড়াইয়াছিল।

তৃতীয় ভানুর পৌত্র চতুর্থ ভানুই প্রাচ্য গঙ্গবংশের শেষ নরপতি। ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে উৎখাত করিয়া তদীয় মন্ত্রী কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর ওড়িশায় সূর্যবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

পাশ্চাত্য গঙ্গ পাশ্চাত্য গঙ্গবংশীয় রাজগণ বিভিন্ন যুগে পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজবংশের সামন্ত রূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু সমৃদ্ধির যুগে তাঁহাদের রাজ্য ক্ষুদ্র ছিল না, উহা 'গঙ্গবাড়ি-৯৬০০০' নামে খ্যাত হয়।

পাশ্চাত্য গঙ্গবংশীয় শ্রীপুরুষ (৭২৫-৮৮ খ্রী) একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিলন্দে নামক স্থানের মহাযুদ্ধে তিনি কাঞ্চীর পল্লব নরপতি দ্বিতীয়

পরমেশ্বরবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শিবমার রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক দুইবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। শিবমারের দ্বিতীয় পুত্র রাজা প্রথম পৃথ্বীপতি পল্লববংশীয় অপরাজিতের সামন্ত ছিলেন। অপরাজিতের অন্যতম সেনাপতিরূপে তিনি শ্রীপুরম্বিয়মের ভীষণ যুদ্ধে পাণ্ড্যরাজ বরগুণকে পরাজিত করেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। প্রথম পৃথ্বীপতির বৃদ্ধপ্রপৌত্র দ্বিতীয় বুতুগ রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় কৃষ্ণের (৯৩৯-৬৮ খ্রী) ভগ্নীপতি ও সেনাপতি ছিলেন। তৃতীয় কৃষ্ণ চোলরাজ্য আক্রমণ করিলে চোলরাজ পরান্তকের পুত্র যুবরাজ রাজাদিত্য বিপুল সেনা লইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। ফলে তক্কোলম নামক স্থানে যে ভয়াবহ সংগ্রাম হয়, উহাতে বুতুগ স্বহস্তে যুদ্ধরত রাজাদিত্যকে নিহত করায় চোলসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

দ্র J. F. Fleet, 'Dynasties of the Kanarese Districts', *Bombay Gazetteer*, vol. I, part II, Bombay, 1896; R. D. Banerji, *History of Orissa*, vol. I, Calcutta, 1930; H. C Ray, *Dynastic History of Northern India*, vol. I, Calcutta, 1931; R. Sewell, *Historical Inscriptions of Southern India*, Madras, 1932; M. V. Krishna Rao, *The Gangas of Talakad*, Madras, 1936; R. C. Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vols III, IV, V, Bombay, 1954 1955, 1957.

দীনেশচন্দ্র সরকার

গঙ্গা মধ্য হিমালয়ের গাঢ়ওয়াল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গঙ্গোত্রী (৩০°৫৯´ উত্তর ও ৭৮°৫৯´ পূর্ব) হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পূর্ব দিক হইতে আগত অলকনন্দা ('অলকনন্দা' দ্র) ও পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত ভাগীরথী নদীর সংগমস্থল দেবপ্রয়াগের দক্ষিণ হইতে ঐ দুই নদীর মিলিত ধারা গঙ্গা নামে বিখ্যাত।

পশ্চিমে প্রধান ধারা ভাগীরথীর সহিত ভগীরথের পূর্বপুরুষদের উদ্ধারকল্পে গঙ্গার মর্ত্যে আগমন বৃত্তান্ত জড়িত। ইহা গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ (৩৮৩১ মিটার বা ১২৭৭০ ফুট) নামক গুহা বা তুষারগুহা হইতে উদ্ভূত হইয়া নদী রূপে প্রবাহিত হইয়াছে। গোমুখ হইতে ২৮ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের তিব্বত হইতে আগত জাহ্নবী বা জাডগঙ্গা ভাগীরথীতে আসিয়া মিলিয়াছে। এই মিলিত ধারা বন্দরপুঁছ (৬২১৬ মিটার বা ২০৭২০ ফুট) ও শ্রীকণ্ঠ ৬১৮৬ মিটার বা ২০৬২০ ফুট)— এই দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী গভীর খাদের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। ঐ উচ্চ স্থান হইতে ইহা সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সুক্কী (২৫৫০ মিটার বা ৮৫০০ ফুট) গ্রামের পর হইতে ভাগীরথী অতি প্রবলবেগে পর্বত ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। টিহরী শহরের দক্ষিণে দেবপ্রয়াগে ইহার সহিত অলকনন্দা সংযুক্ত হইয়াছে।

অতঃপর শিবালিক পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে বহু দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হইবার পর দক্ষিণবাহিনী হইয়া হরিদ্বারের ('হরিদ্বার' দ্র) নিকট গঙ্গা সমভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। হরিদ্বার একটি বড় তীর্থস্থান। হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া গঙ্গা দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী হইয়া সাহারানপুর, মুজফ্‌ফরনগর, বুলন্দশহর, ফরুকখাবাদ ইত্যাদি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ফরুকখাবাদে ইহার সহিত রামগঙ্গা মিলিত হইয়াছে। যমুনোত্রী হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনা এলাহাবাদ বা প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। এইখানে সরস্বতী নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই তিনটি নদীর সংগমস্থল ত্রিবেণী নামেও বিখ্যাত। এই ত্রিবেণীকে যুক্তবেণী বলা হয়। ইহা একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এলাহাবাদের পর নদীর প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্ষার সময় ভিন্ন নদীর গতি অতি ক্ষীণ। নদীগর্ভেও অনেক চরের সৃষ্টি হয়। যুক্ত নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইবার সময় বাম দিক হইতে গোমতী ও ঘাগরা আসিয়া মিলিয়াছে। রামনগর ও কাশীর নিকট গঙ্গা উত্তরবাহিনী। পশ্চিমতটে বারাণসী বা কাশী অবস্থিত। ইহার পর পূর্ববাহিনী গঙ্গা বিহারে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানের বাম পার্শ্বে উপনদীর মধ্যে কর্ণালী রাপ্তী, গণ্ডক, বাগমতী ও কুশী উল্লেখযোগ্য। এই নদীগুলির মধ্যে কয়েকটির উৎসস্থান তিব্বতে। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে শোণ নদী বিন্ধ্যপর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া পাটনা শহরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

রাজমহল পর্বতের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় গঙ্গার তীর ঘেঁষিয়া তেলিগড় ও সক্রিগলির সংকীর্ণ খাত অতিক্রম করিয়া গঙ্গা বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর রাজমহল পর্বত বেষ্টন করিয়া গঙ্গা বাংলার সমতলভূমিতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। গিরিয়ার নিকট (২৪°৩১´ উত্তর এবং ৮৮°৬´ পূর্ব) ব-দ্বীপের শীর্ষকোণে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার একটি ধারা দক্ষিণ দিকে অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণবাহিনী ধারা

মালদহ জেলার গৌড় শহরের ধ্বংসাবশেষের নিকট দিয়া প্রবাহিত। এই স্থলে হিমালয় হইতে আগত মহানন্দা আসিয়া এই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ধারাটি আরও দক্ষিণে বহরমপুর, নবদ্বীপ, কালনা, চুঁচুড়া, চন্দন-নগর, কলিকাতা প্রভৃতি শহরের পার্শ্ব দিয়া বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। গিরিয়া হইতে নবদ্বীপ পর্যন্ত এই অংশ ভাগীরথী নামে অভিহিত। নবদ্বীপ হইতে মোহানা পর্যন্ত অবশিষ্টাংশ হুগলি ('হুগলি' দ্র) নামে পরিচিত। আদিগঙ্গা ইহার প্রাচীনতর প্রবাহপথ ('আদিগঙ্গা' দ্র)। চুঁচুড়ার কিছু দূরে অবস্থিত ত্রিবেণী ভাগীরথী এবং ইহার শাখানদী সরস্বতী ও যমুনার সংগমস্থল। ইহা মুক্তবেণী নামে পরিচিত। গঙ্গার দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী ধারা পদ্মা নামে পরিচিত হইয়া পূর্ব পাকিস্তানের গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। চাঁদপুরের নিকট মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হইবার পর বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার মধ্যবর্তী স্থান দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

পুরাকালে গঙ্গার বিপুল জলরাশি মুখ্যতঃ ভাগীরথী-হুগলির পথে নির্গত হইত। কিন্তু বর্তমানে পদ্মা মেঘনা গঙ্গার জলরাশির প্রধান বাহক হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে প্রবেশ করিয়া ভাগীরথী অনেকবার খাত পরিবর্তন করিয়াছে।

গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৪৬৪ কিলোমিটার (১৫৪০ মাইল) ও ইহার অববাহিকার আয়তন প্রায় ৯৯৩৭৫০ বর্গ কিলো-মিটার (৩৯৭৫০০ বর্গ মাইল)। এই বিপুল অঞ্চল হইতে গৃহীত পলি দ্বারা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি। রাজমহলের নিকটবর্তী যে স্থান হইতে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন মুখে গমন করিয়াছে সেই স্থান হইতে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ আরম্ভ। এই ব-দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে গঙ্গা ভিন্ন ভিন্ন মোহানায় সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান পশ্চিমের হুগলি মোহানা ও পূর্বের বৃহৎ মেঘনা মোহানা। হুগলি মোহানার মুখে প্রসিদ্ধ তীর্থ সাগরদ্বীপ ('গঙ্গা-সাগর' দ্র) অবস্থিত। অন্যান্য মোহানাগুলির মধ্যে মাতলা, মালঞ্চ, রায়মঙ্গল ও হরিণঘাটা উল্লেখযোগ্য। হুগলি মুখ হইতে মেঘনা পর্যন্ত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বিস্তৃতি। আয়তন প্রায় ৬২৫০০ বর্গ কিলোমিটার (২৫০০০ বর্গ মাইল)। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগনা ব-দ্বীপের প্রাচীন অংশ। এখানে জলাঙ্গী, মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি ম্রিয়মাণ নদীগুলি অবস্থিত। খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ব-দ্বীপের নূতন অংশ। দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে অসংখ্য খাঁড়িযুক্ত শ্বাপদসংকুল ও সুন্দরীবনে পূর্ণ সুন্দরবন অবস্থিত ('সুন্দরবন' দ্র)। ইহার দৈর্ঘ্য হুগলি মোহানা হইতে মেঘনা পর্যন্ত ২৮২ কিলোমিটার (১৭০ মাইল) ও প্রস্থে ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল) হইতে ১২৮ কিলোমিটার (৮০ মাইল)।

পার্বত্য অংশ ব্যতীত গঙ্গা বহু দূর পর্যন্ত নাব্য। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেও এলাহাবাদ পর্যন্ত স্টিমার যাতায়াত করিত। উত্তর ভারতে কৃষি ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য আজও গঙ্গার পথে বহুল পরিমাণে বাহিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ ব-দ্বীপ অঞ্চলে নৌকা চলাচল ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িতেছে। পলি নিষ্কাশন না হওয়ার দরুন কলিকাতা বন্দরে বড় জাহাজের গমনাগমন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

হুগলি নদীতে জোয়ার ভাঁটা হয়। ব্যাণ্ডেল ইহার ঊর্ধ্ব সীমা।

গঙ্গার জলপ্রবাহ বন্যার সময় প্রায় ১৮০০০০০ কিউসেক হয় ও অন্য সময় ২০৭০০০ কিউসেক থাকে।

গঙ্গামাতৃক সমতলভূমি কৃষিকার্যে সমৃদ্ধ। পশ্চিমাংশে গম ও আখ এবং পূর্ব দিকে ধান ও পাট প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মোহানার নিকট অর্থাৎ কলিকাতা ও তন্নিকট-বর্তী অঞ্চল শিল্পে সমধিক উন্নত। ফলে এই সমগ্র সমভূমি অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ('উত্তর প্রদেশ' দ্র)।

পুরাকাল হইতে বহু সাম্রাজ্য ও জনপদ গঙ্গার তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তের মধ্যে প্রধান যোগাযোগের পথ ছিল। ফরুক্কাবাদ মীর্জাপুর সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান নদী বন্দর হিসাবে খ্যাত ছিল।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে সেচের জন্য আপার গ্যাঞ্জেস ক্যানেল ও লোয়ার গ্যাঞ্জেস ক্যানেল নামে দুইটি খাল কাটা হইয়াছে। ১৮৫৪ ৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা হইতে মেজর কটলির পরিচালনায় প্রথম খালটি কাটা হয়। উপখালসহ ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৪৪০ কিলোমিটার (৩৪০০ মাইল)। ইহা গঙ্গা যমুনা মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রায় ৭ মিলিয়ন হেক্টর (১৭ মিলিয়ন একর) ভূমি জলসিক্ত করে। লোয়ার গ্যাঞ্জেস ক্যানেল ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে বুলন্দশহর জেলার নরোরা হইতে কাটা হয়। ইহার সাহায্যে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন হেক্টর (১ মিলিয়ন একর) জমি জল পায়। শাখা খালসহ ইহার দৈর্ঘ্য ৪৮০০ কিলোমিটার (৩০০০ মাইল)। গঙ্গা খালের জল হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। শোণ ও গঙ্গার মধ্যে আর একটি খাল আছে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের নিকট ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে ('ফারাক্কা বাঁধ' দ্র)।

গঙ্গার উপর কয়েকটি সেতু আছে। তাহার মধ্যে হাওড়া, মোগলসরাই, কাশী ও এলাহাবাদের সেতু প্রধান। মোকামা ঘাটের নূতন সেতু কিছুদিন পূর্বে বর্তমানে শেষ হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে পদ্মার উপর সারা ব্রিজ আর একটি উল্লেখযোগ্য সেতু।

গঙ্গা ভারতের শুধু প্রধান নদী নহে। ইহা ভারতের সর্বসাধারণের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। ইহার তীরে হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ বিদ্যমান। গঙ্গা নদীর সহিত অন্য নদীর সংগমস্থলগুলি তীর্থস্থান রূপে গণ্য হয়। এলাহাবাদের নিকটবর্তী প্রয়াগই সর্বশ্রেষ্ঠ— ১২ বৎসর পর পর এখানে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয় ('কুম্ভমেলা' দ্র)।

দ্র নীহাররঞ্জন রায়, বাংলার নদ-নদী, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, *The Imperial Gazetteers of India*, vol XII, Oxford, 1908; William Willcocks, *Ancient System of Irrigation in Bengal*, Calcutta, 1930; Kanan Gopal Bagchi, *The Ganges Delta*, Calcutta, 1944

কমলা মুখোপাধ্যায়
সুভাষরঞ্জন বসু

ঋগ্বেদে (১০।৭৫।৫) অপর কয়েকটি নদীর সহিত গঙ্গা নদীর স্তব করা হইয়াছে। পৌরাণিক সাহিত্যে গঙ্গা সম্বন্ধে নানা কাহিনী পাওয়া যায়। ইনি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। দেবতাদের অনুরোধে হিমালয় ইঁহাকে দেবতাদের হস্তে সমর্পণ করিলে দেবতাদের দ্বারা ইনি স্বর্গে নীত হন। কপিল মুনির শাপে পাতালে ভস্মীভূত সগর-রাজের পুত্রগণের উদ্ধারসাধনার্থ সগরবংশোদ্ভব ভগীরথ কঠোর তপস্যা করিয়া ইঁহাকে মর্ত্যে অবতরণ করান ও সেখান হইতে পাতালে লইয়া যান। স্বর্গ হইতে পতন কালে মহাদেব ইঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন। পথে জহ্নু মুনির যজ্ঞশালা জলে প্লাবিত করিলে জহ্নু মুনি ইঁহাকে নিঃশেষে পান করেন ও দেবতাদের অনুরোধে কান দিয়া বাহির করিয়া দেন। ফলে ইনি জাহ্নবী আখ্যা লাভ করেন। গঙ্গা ভগীরথের কন্যা-তুল্যা, তাই ইঁহার আর এক নাম ভাগীরথী। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন স্থানেই ইনি প্রবাহিত বলিয়া ত্রিপথগা নামে প্রসিদ্ধ। (রামায়ণ, বালকাণ্ড. ৩৫, ৪২, ৪৩, ৪৪, ভাগবত ৯।৯)। ভাগবতপুরাণের মতে ত্রিবিক্রমরূপী বিষ্ণুর বামপদাঙ্গুষ্ঠের নখাঘাতে ব্রহ্মাণ্ড গর্ভ হইতে গঙ্গার জলধারা পৃথিবীতে পতিত হয় (ভাগবতপুরাণ, ৯।১৭)।

দেবীভাগবত (৯।১২, ১৩) ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের (প্রকৃতিখণ্ড ১০, ১১) কাহিনী অনুসারে গঙ্গা রাধাকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা এবং বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা। কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসোৎসবে মহাদেব কৃষ্ণ সংগীত করিতে থাকিলে রাধাকৃষ্ণ মুগ্ধ ও দ্রবীভূত হন। ফলে গঙ্গার উৎপত্তি হয়। এক সময়ে রাধা ঈর্ষান্বিত হইয়া গঙ্গাকে পান করিতে উদ্যত হইলে গঙ্গা কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেন। জলাভাবপীড়িত দেবতাদের অনুরোধে কৃষ্ণ তাঁহাকে পদাঙ্গুষ্ঠ নখের অগ্রভাগ হইতে বাহির করিয়া দেন। তাই তিনি বিষ্ণুপদী নামে পরিচিত।

গঙ্গা মকরবাহিনী শুক্লবর্ণা চতুর্ভুজা রূপে পূজিত হন। ইঁহার বিশেষ পূজার দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী। এই-দিন গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপ নাশ হয়। তাই এই দিনে গঙ্গাদেবী দশহরা নামে পরিচিত। এই তিথিকেও দশহরা বলা হয়। অন্যান্য নানা উপলক্ষ্যেও গঙ্গাস্নানে বিশেষ বিশেষ ফললাভের কথা বলা হয়। বাল্মীকি ও শংকরাচার্যের নামে প্রচলিত দুইটি সুন্দর স্তোত্রে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গাজলে স্নান, গঙ্গাজল পান, এমন কি গঙ্গা-জল স্পর্শ করা পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। গঙ্গাহীন দেশেও অনেকে গঙ্গার জল ও গঙ্গার মৃত্তিকা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখেন। গঙ্গাজল স্পর্শদোষে দুষ্ট হয় না। ইহা বাসি হইলেও অপবিত্র হয় না। গঙ্গাতীরে বাস করা, গঙ্গাতীরে মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যের নিদর্শন বলিয়া মনে করা হয়। শবসংকারের পর শবের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থির অংশ গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার প্রথা আছে। যেখানে গঙ্গা নাই সেখানে এই অস্থি তুলিয়া রাখিয়া অবসর মত গঙ্গায় দেওয়া হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম বাঙালী পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা, মুদ্রাকর, পুস্তক প্রকাশক ও লেখক। নিবাস শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহড়া গ্রাম। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় কিছুদিন কম্পোজিটরের কাজ করিয়া কলিকাতায় প্রথম পুস্তক প্রকাশনা শুরু করেন। পুস্তক ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। 'বাঙ্গাল গেজেটি' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। এই পত্রিকাটি কবে বাহির হইয়াছিল এবং কতদিন চলিয়াছিল তাহা বলা যায় না। পত্রিকাটির কোনও সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। গঙ্গাকিশোরের রচিত সংকলিত ও

প্রকাশিত গ্রন্থ : 'এ গ্রামার, ইন ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলী' (১৮১৬ খ্রী) ; 'দায়ভাগ' (১৮১৬-৭ খ্রী) ; 'দ্রব্যগুণ' (১৮২৪ খ্রী) ; 'চিকিৎসার্ণব' (১৮২০ ? খ্রী) ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (সচিত্র ১৮১৬ খ্রী) ইত্যাদি।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতামহ হরকৃষ্ণ সিংহ বাংলার নবাব সরকারে উচ্চ কর্মে নিযুক্ত হইয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুবেদার রেজা খাঁর অধীনে গঙ্গাগোবিন্দ কানুনগো-র পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজারের রেশম কুঠির রেসিডেন্ট থাকায় গঙ্গাগোবিন্দর সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব জন্মে। রেজা খাঁ কর্মচ্যুত হইলে তিনি কলিকাতায় আসিয়া হেস্টিংসের গুপ্তকার্যে নানাভাবে সহায়তা করেন এবং তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়া ওঠেন। তাঁহাকে রাজা রাজবল্লভের অধীনে সহকারী দেওয়ান-এর পদে নিযুক্ত করা হয়; পরে রাজস্ব বিভাগের সর্বপ্রকার কাজ তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস তাঁহাকে কলিকাতার রেভিনিউ কাউন্সিল-এর দেওয়ানের পদে নিয়োগ করেন। পর বৎসরে হেস্টিংসের বিপক্ষ দলের অভিযোগক্রমে উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে গঙ্গাগোবিন্দ পদচ্যুত হন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিরোধীদলের সদস্য মনসন পরলোক গমন করিলে হেস্টিংস পুনরায় পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন এবং গঙ্গাগোবিন্দ দেওয়ানী পদে পুনর্নিয়োজিত হন। পাঁচশালা বন্দোবস্তের সুযোগ লইয়া তিনি নাটোর রাজবংশের কয়েকটি পরগনা এবং কালেক্টর গুডল্যাড-এর দেওয়ান দেবী সিং-এর যোগ-সাজশে দিনাজপুর-রাজের জমিদারির কতকাংশ হস্তগত করিতে সমর্থ হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে হেস্টিংস নাটোর-রাজের জমিদারির কিছু অংশ গঙ্গাগোবিন্দকে পাওয়াইয়া দেন কিন্তু পরবর্তী গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিস-এর সময়ে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রূপে তাঁহার বিশেষ অখ্যাতি রটিয়াছিল। এমন কি বিলাতের পার্লামেন্টে হেস্টিংসের বিচারকালে তাঁহার সম্বন্ধেও নানারূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। অথচ তৎকালীন সামাজিক আচার অনুযায়ী মন্দির নির্মাণাদি প্রভৃতি সৎকার্যে তাঁহার দানের কথা জানা যায়। সুবিখ্যাত লালাবাবু ইঁহার পৌত্র। উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের এই পরিবার পাইকপাড়া-রাজ নামেও পরিচিত।

গঙ্গাধর কবিরাজ (১৭৯৮-১৮৮৫ খ্রী) প্রথিতযশা কবিরাজ। জন্ম যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে। পিতা কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায় রাজশাহী'তে রামকান্ত সেনের নিকট আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের পর ২১ বৎসর বয়সে মুর্শিদাবাদে আসেন ও ক্রমে বিশিষ্ট আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক রূপে খ্যাতি লাভ করেন। চিকিৎসা ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরকসংহিতার 'জল্পকল্পতরু' নামক টীকা (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ সংবৎ), অগ্নিপুরাণের আয়ুর্বেদাংশের ভাষ্য, কয়েকটি উপনিষদের টীকা (তৈত্তিরীয়োপনিষদ বৃত্তি, ১২৯১ বঙ্গাব্দ), বৈশেষিক সূত্র (ভারদ্বাজ-বৃত্তিভাষ্য ১৮৭০ খ্রী), মনুসংহিতা টীকা (১৮৮২ খ্রী), 'দুর্গবধকাব্য' নামে কাব্য এবং 'প্রাচ্যপ্রভা' নামে অলংকারগ্রন্থ। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'গঙ্গাধর মনীষা' নামে একখানি পত্রিকা কিছুদিন (১৯১১ খ্রী) প্রচারিত হইয়াছিল।

দ্র রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন, 'স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ', বৈদ্য-সঞ্জীবনী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; Chintaharan Chakravarti, 'Bengal's Contribution to Sanskrit Literature', *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, vol. XI, 1929-30.

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮০৬-৭৪ খ্রী) কলিকাতার আদি ধ্রুপদাচার্য, খাণ্ডারবাণী রীতির গায়ক রূপে সুপ্রসিদ্ধ এবং স্বনামধন্য যদুভট্টের সংগীত গুরু। নদিয়া জেলার মুড়াগাছার অন্তর্গত বিল্বপুষ্করিণী গ্রামে গঙ্গানারায়ণের জন্ম হয়। ষোল-সতের বৎসর বয়সে সংগীত শিক্ষা লাভের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। দশ-বার বৎসর কাশী, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া সংগীত শিক্ষার শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তৎকালীন বাংলা দেশে ধ্রুপদী রূপে গঙ্গানারায়ণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ত্রিপুরার মহারাজা, মুর্শিদাবাদের নবাব, গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায় পরিবার, কলিকাতার হরকুমার ঠাকুর, শ্যামাচরণ মল্লিক, পোস্তার

রায় পরিবার প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহাদের সংগীতসভায় তাঁহার গানের আসর হইত। মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব গঙ্গানারায়ণকে 'ধ্রুপদ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। যদুভট্ট কয়েক বৎসর তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার নিকট রীতিমতভাবে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। তিনি ভিন্ন গঙ্গানারায়ণের অপর শিষ্যগণের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। গঙ্গানারায়ণ ভৈরব রাগে সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা কোল বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মানভূমের ভূমিজরা এক বিদ্রোহ করে। ইহা গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা নামে খ্যাত। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত উত্তমর্ণ অধমর্ণ আইনের প্রয়োগ এই অঞ্চলের আদিবাসীগণের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইংরেজের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ অনেক আদিবাসী জমিদারকে অসহিষ্ণু করিয়া তোলে। বিদ্রোহের নেতা গঙ্গানারায়ণ বরাভূম জমিদারির একজন দাবিদার ছিলেন। বিবাদের বিষয়ভূত জমিদারির দেওয়ান মাধব সিং গঙ্গানারায়ণকে অনেকগুলি তরফ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন এবং নানা প্রকারে পীড়ন করায় প্রজাসাধারণের নিকট তিনি অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গঙ্গানারায়ণ প্রজাসাধারণ ও আদিবাসী ভূমিজদের ইংরেজ বিদ্বেষের সুযোগ লইয়া ঘাটওয়াল ও বিরূপ কৃষকশ্রেণীর সহায়তায় একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং মাধব সিং-কে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। পরে এই দল বরাবাজার নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের লবণ-দারোগার কাছারি, পুলিশ থানা ইত্যাদি পুড়াইয়া সমগ্র অঞ্চলটি লুণ্ঠন করিতে থাকে। অবস্থা এরূপ সঙ্গিন হইয়া ওঠে যে সরকারি ফৌজকে বাঁকুড়ায় ছুটিয়া যাইতে হয়। বরাভূম অধিকার করিয়া গঙ্গানারায়ণ নিজে রাজা উপাধি ধারণ করেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর গঙ্গানারায়ণ বরাভূমের পূর্বাঞ্চল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। স্থানীয় ভূমিজ কোলগণ এই পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণের সৈন্যদলে যোগদান করে নাই— এইবার তাহারা সৈন্যদল-ভুক্ত হইয়া এই অঞ্চলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিতে থাকে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ছোট ছোট কয়েকটি সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া ব্রিটিশ সরকার ইহাদের দমন করিতে সমর্থ হন। গঙ্গানারায়ণ সিংভূমে পলায়ন করিয়া আদিবাসী 'হো'-দের নিজ দলে টানিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হন। পরে খরসোয়ান এর রাজাদের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে এই হাঙ্গামার অবসান ঘটে।

দ্র H Coupland, *Bengal District Gazetteers. Manbhum*, Calcutta, 1911; Sashibhusan Chaudhury, *Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1857)* Calcutta, 1955

গঙ্গাপ্রসাদ সেন (১২৩১-১৩০২ বঙ্গাব্দ) প্রখ্যাত আয়ুর্বেদশাস্ত্রী। গঙ্গাপ্রসাদ সেন ১২৩১ বঙ্গাব্দের ২ ভাদ্র ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে উত্তরপাড় কমরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নীলাম্বর সেন মহাশয়ের নিকট গঙ্গাপ্রসাদ আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১২৫৯ বঙ্গাব্দে তিনি কুমারটুলিতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন ও ক্রমে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালের ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার চিকিৎসাধীনে ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাঁহার চিকিৎসায় ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসরেরও উপর তিনি গৌরবের সহিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে চিকিৎসা করিয়া বাংলা দেশে কবিরাজী চিকিৎসার অন্যতম ধারা প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ৭২ বৎসর বয়সে গঙ্গাপ্রসাদ তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

অশোকা সেনগুপ্ত

গঙ্গাযাত্রা মৃত্যুর অনতিপূর্বে মুমূর্ষুকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া। মনে করা হয়— গঙ্গাগর্ভে বা গঙ্গাতীরে মৃত্যু হইলে মৃতের সদ্গতি লাভ হয়। এইজন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মুমূর্ষুর পা হইতে নাভি পর্যন্ত দেহ গঙ্গার জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইত। ইহার নাম নাভিগঙ্গা। পূর্বে বোধ হয় গঙ্গা ছাড়া অন্য জলাশয়েও এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল এবং তাহার নাম ছিল অন্তর্জল বা অন্তর্জলি। মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছে মনে হইলে রোগীকে গঙ্গাতীরে নিয়া দিনের পর দিন অপেক্ষা করা হইত। এই উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবার জন্য অনেক স্থলে সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঘর তৈয়ারি করিয়া রাখিতেন। কোনও কারণে গঙ্গাযাত্রীকে বাড়িতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে তাহা অমঙ্গলসূচক বলিয়া মনে করা হইত। গঙ্গাযাত্রা সম্ভবপর না হইলে আসন্নমৃত্যু রোগীকে ঘরের বাহিরে তুলসী বা আমলকী গাছের তলায় নারায়ণ ক্ষেত্র নামে পরিচিত

পরিষ্কার করা জায়গায় নূতন কাপড় পরাইয়া উত্তর শিয়রে শোওয়াইয়া দেওয়া হইত। জলাশয়ের অনুকল্পস্বরূপ একটি জলপূর্ণ গর্তের উপর পা রাখা হইত এবং কানের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম ও রামনাম উচ্চারণ করা হইত, গায়ে গঙ্গামৃত্তিকা লাগাইয়া মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বুকের উপর গীতা বা ব্রাহ্মণস্থলে শালগ্রাম শিলা রাখা হইত। ঘরের মধ্যে মৃত্যু নিন্দনীয় ছিল।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গঙ্গাসাগর ২১°৩৬´ হইতে ২১°৫৬´ উত্তর ও ৮৮°২´ হইতে ৮৮°১১´ পূর্ব। সাগর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত গ্রাম। তীর্থ-মাহাত্ম্যে সমস্ত দ্বীপটি গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। সাগর-দ্বীপ চব্বিশ পরগনা জেলার একটি থানা। ইহার উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা (হুগলি) নদী, উত্তর-পূর্বে বড়তলা খাঁড়ি ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দ্বীপটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, আয়তন ৫৯৪ বর্গ কিলোমিটার (২২৪.৩ বর্গ মাইল), লোকসংখ্যা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে ৫১৪৬৩ জন।

অনেকের মতে সাগরদ্বীপে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। এককালে এই স্থান যে সমৃদ্ধিশালী ছিল, উত্তরের জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ভগ্নপ্রায় ইটের বাড়ি ও প্রাচীন মন্দিরগুলি তাহার সাক্ষ্য দেয়। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এক ভীষণ জলপ্লাবনে এই দ্বীপ জনহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

ইংরেজ আমলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে নানাবিধ উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলে। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি লাইট হাউস নির্মিত হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পুনরায় বসতি স্থাপনের চেষ্টা চলে। কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রচণ্ড ঝড়ে বহু লোক মারা যাওয়ায় ঐ প্রচেষ্টায় বাধা পড়ে। বর্তমানে পুনরায় উন্নয়ন কর্ম শুরু হইয়াছে। উত্তর দিকের অরণ্য পরিষ্কার করিয়া চাষ-আবাদ হইতেছে, দক্ষিণ দিক অরণ্যে পরিপূর্ণ। কাষ্ঠ, মোম ও মধু এই অরণ্যের সম্পদ।

গঙ্গাসাগর হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ। এই পবিত্রতার কারণ ইহা গঙ্গা ও সাগরের সংগমস্থলে অবস্থিত। কপিল মুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সগর রাজার প্রপৌত্র ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়া এই স্থানেই কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগররাজার ষাট হাজার পুত্রকে গঙ্গার জলধারা দ্বারা উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গঙ্গাসাগর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তির সময় মকর স্নানের মেলা হয়। তদুপলক্ষে ভারতের প্রায় সকল রাজ্য হইতে লোক সমাগম ঘটে। গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি মন্দির আছে, সেখানে কপিল মুনি, সমুদ্র ও ভগীরথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাচীন মন্দির জলমগ্ন হইয়া যাওয়ায় কয়েক বৎসর হইল একটি নূতন মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

পূর্বকালে কোনও কোনও সন্তানহীনা নারী সন্তানবতী হইবার আশায় মানসিক করিয়া প্রথম পুত্রকে গঙ্গাসাগরে অর্ঘ্য দিয়া আসিতেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি এই প্রথা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ন করেন।

পূর্বে তীর্থযাত্রীগণ পদব্রজে বা নৌকায় করিয়া গঙ্গাসাগরে যাইতেন। ইহা বিপজ্জনক ও কষ্টকর ছিল। বর্তমানে অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এই তীর্থটিও সুগম হইয়াছে। মেলার সময় কলিকাতা হইতে বাসযোগে কাকদ্বীপ ও নামখানা পর্যন্ত গিয়া সেখান হইতে নৌকা বা স্টিমার-যোগে গঙ্গাসাগরে যাওয়া যায়।

দ্র *The Imperial Gazetteers of India*, vol XXI, Oxford, 1908, A K Mitra, *Census 1951 West Bengal District Handbooks 24 Parganas*, Alipore, 1954.

সু সেন

গঙ্গু বাহ্‌মনী দ্র

গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রখ্যাত ভারতীয় নৈয়ায়িক ও ‘তত্ত্বচিন্তামণি’ গ্রন্থের প্রণেতা। কাশ্যপগোত্রীয় ‘ছাদন’ বংশে জাত মিথিলার এই ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকের জন্মকাল লইয়া অনেক বাদানুবাদ আছে। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে গঙ্গেশের গ্রন্থরচনাকাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নহে, পরন্তু ১৩২৫ ৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হওয়াই সম্ভব।

ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থানাবলম্বী হইয়াও গঙ্গেশ প্রকৃতপক্ষে একটি নবীন চিন্তাধারার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। গঙ্গেশ-প্রণীত তত্ত্বচিন্তামণি নামে চারি খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থকে কেন্দ্র করিয়া এক নবীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় একটি অভিনব তর্ক-পদ্ধতি ও রচনা-শৈলীর প্রবর্তন করেন, তাহারই সাহায্যে বহুপল্লবিত নানা টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্যের মাধ্যমে একটি বিশিষ্ট শাস্ত্রধারা উত্তরকালে সমস্ত ভারতীয় দর্শন-চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই শাস্ত্রধারাই নব্যন্যায় বলিয়া খ্যাত। ইহার প্রভাবে পরবর্তী যুগের সমস্ত দর্শন-গ্রন্থে, এমন কি অলংকারশাস্ত্রেও, ভাষা ও চিন্তার মধ্যে অসামান্য সূক্ষ্মতা ও দুরূহতার প্রবর্তন হয়।

তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ —এই চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রত্যক্ষ খণ্ডের আলোচ্য বিষয় হইল : প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রামাণ্য ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপ, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তাহার কারণ, সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্তসমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায় এবং বিশেষণতা নামে ছয় প্রকারের ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ, অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও তাহার স্বরূপ, অভাব, প্রত্যক্ষ কারণবাদ, মনোঽণুত্ববাদ, অনুব্যবসায়বাদ এবং নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষ। অনুমান খণ্ডে রহিয়াছে অনুমিতির স্বরূপ-নিরূপণ, প্রত্যক্ষ হইতে অনুমিতির পার্থক্য নিরূপণ ইত্যাদি ব্যাপ্তির পাঁচটি ভ্রান্ত-লক্ষণের সমালোচনা, সিংহ-ব্যাঘ্র-নামীয় ব্যাপ্তি-লক্ষণ, ব্যাপ্তির যথার্থ বা (সিদ্ধান্ত) লক্ষণের আলোচনা, বিশেষ ব্যাপ্তির সংজ্ঞা-নিরূপণ, ব্যাপ্তি-গ্রহ কি করিয়া হয় তাহার আলোচনা, তর্কের লক্ষণ-বর্ণনা, সামান্য লক্ষণ, পরামর্শ, কেবলান্বয়ি-অনুমান, অর্থাপত্তি, স্বার্থানুমান, পরার্থানুমান, অবয়ব ও হেত্বাভাস এবং সবশেষে ঈশ্বরানুমান।

উপমান খণ্ডে আছে প্রধানতঃ উপমানের দ্বারা জ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হয় তাহার আলোচনা, তৎপ্রসঙ্গে মীমাংসকেরা সাদৃশ্য নামে বৈশেষিকোক্ত সপ্ত-পদার্থ ছাড়াও আর একটি অভিনব পদার্থ স্বীকৃতির পক্ষে যে যুক্তি অবতারণা করেন তাহার খণ্ডন আছে। ইহা ছাড়াও ঐ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ হইতে উপমানের বৈষম্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

সর্বশেষ গ্রন্থ শাব্দখণ্ডে আছে, শাব্দবোধ কি করিয়া হয়, শব্দ হইতে যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় কি না, শাব্দবোধ প্রত্যক্ষের একটি প্রকার বিশেষ কিনা অথবা অনুমানের অন্তর্গত কিনা তাহার আলোচনা। ইহা ছাড়া, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য প্রভৃতি শাব্দবুদ্ধির কারণ-নির্ণয়, শব্দের অনিত্যতা, বিধিবাদ, শব্দশক্তিবাদ, লক্ষণা, আখ্যাতবাদ, সমাসবাদ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও ঐ খণ্ডে করা হইয়াছে। পরিসমাপ্তিতে চারি প্রকার প্রমাণের প্রামাণ্য স্থাপন করা হইয়াছে।

গঙ্গেশের গ্রন্থের আকার ক্ষুদ্র, ন্যূনাধিক তিন শত পৃষ্ঠা হইবে। কিন্তু পরবর্তী যুগে ইহার যেসব ভাষ্য, টীকা এবং টিপ্পনী লেখা হইয়াছে— তাহা সংখ্যাতীত বলিলেই চলে। মৈথিল পণ্ডিতেরা বহুকাল ধরিয়া এই গ্রন্থের প্রচার ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতক এবং ঊনবিংশ শতকের মধ্যে নবদ্বীপে যেসব ধুরন্ধর নৈয়ায়িকবৃন্দ তত্ত্বচিন্তামণিকে আশ্রয় করিয়া নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাই নব্যন্যায়ের মহত্তম পরিণতি। 'গদাধর ভট্টাচার্য', 'জগদীশ তর্কালংকার', 'বাসুদেব সার্বভৌম', 'মথুরানাথ তর্কবাগীশ' ও 'রঘুনাথ শিরোমণি' দ্র।

দ্র গঙ্গেশ উপাধ্যায়, তত্ত্বচিন্তামণি, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৯৮-১৯০১, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়-পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৪০, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙালীর সারস্বত অবদান, প্রথম ভাগ, বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, কলিকাতা, ১৯৫২, Monomohan Chakravarti, 'History of Navya Nyaya in Bengal and Mithila', *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (New Series), vol. XI, 1915 ; Satischandra Vidyabhushana, *A History of Indian Logic*, Calcutta, 1921, Gopinath Kaviraj, *Gleanings from the History and Bibliography of Nyaya-Vaisesika Literature*, Calcutta, 1961.

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

গঙ্গোত্রী ৩০°৫৯ উত্তর এবং ৭৮°৫৯ পূর্ব, উচ্চতা ৩০৯৬ মিটার (১১১২০ ফুট)। মধ্য হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের প্রধান ৪টি তীর্থস্থানের অন্যতম। ইহা উত্তর প্রদেশের উত্তর কাশী জেলার অন্তর্ভুক্ত। অপেক্ষাকৃত দুর্গম বলিয়া এখানে যাত্রীর সংখ্যা কেদার বদরী অঞ্চল অপেক্ষা কম। বদ্রীনাথ অঞ্চলের চৌখাম্বা (৬৯০০ মিটার বা ২৩০০০ ফুট) শিখর হইতে উদ্ভূত গঙ্গোত্রী হিমবাহের উত্তর পশ্চিমে যে স্থান হইতে পূর্বে হিমবাহ গলিয়া গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী রূপে প্রকাশিত হইত সেই স্থানটি গঙ্গোত্রী নামে খ্যাত। গঙ্গোত্রী হইতে বদ্রীনাথ (২৯° হইতে ৩০° ৫৯ উত্তর ও ৭৮°৪০ হইতে ৭৯°৪ পূর্ব) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রায় মাঝামাঝি চৌখাম্বা বা চারিটি শিখর হইতে বিভিন্ন হিমবাহ উত্তর-পশ্চিমে, উত্তর ও উত্তর পূর্বে প্রবাহিত হিমবাহগুলির নাম ভগীরথ খড়্গ ও সতোপন্থ। এখান হইতেই গঙ্গার অপর উৎসমুখ অলকনন্দা প্রবাহিত। উত্তর পশ্চিমে গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ কিলোমিটার (১৬ মাইল), কিন্তু প্রস্থ ২·৫ কিলোমিটারেরও (১ মাইল) কম। গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গোত্রীর দক্ষিণ পূর্বে বর্তমানে যে স্থান হইতে গলিয়া নদী রূপে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটি গোমুখ নামে বিখ্যাত (৩৮৩১ মিটার বা ১২৭৭০ ফুট উচ্চ)। পূর্বে এই হিমবাহের প্রান্ত গঙ্গোত্রীতে অবস্থিত ছিল। ঝালা গ্রাম হইতে

গঙ্গোত্রী

গঙ্গোত্রীর চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণীর আকার বিন্যাস ও প্রলম্বিত উপত্যকা দেখিলে অনুমিত হয় যে এই হিমবাহের প্রসার আরও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পর্বতশ্রেণী ভগ্ন হওয়ায় বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, হিমবাহ ক্রমশ: প্রথমে গঙ্গোত্রী এবং বর্তমানে গোমুখ হইতেও দক্ষিণ-পূবে পিছনে হটিয়া যাইতেছে।

ইহা ভারতের অন্যতম দীর্ঘ হিমবাহ। দুই পার্শ্ব হইতে মন্থনী, স্বচ্ছন্দ, গহন ও কীর্তি হিমবাহ ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। কীর্তি হিমবাহের নিকটে কেদারনাথ শৃঙ্গ ৬৮৩১ মিটার (২২৭৭০ ফুট)। ইহার বাম দিকে শিবলিঙ্গ পর্বতমালার তিনটি শিখর (গড় উচ্চতা ৬০০০ মিটার বা ২০০০০ ফুট) ও দক্ষিণ দিকে ভগীরথ পর্বতমালার তিনটি শিখর (গড় উচ্চতা ৬৩০০ মিটার বা ২১০০০ ফুট) দেখা যায়। ভগীরথ শিখরগুলি গঙ্গোত্রী শিখর নামেও বিখ্যাত। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ইহার দুইটি শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। নন্দনবন (৩৯৭৩ মিটার বা ১৩২৪৬ ফুট)-এর নিকট উত্তর পূর্ব দিক হইতে প্রায় ১১-১২ কিলোমিটার (৭-৮ মাইল) দীর্ঘ চতুরঙ্গী হিমবাহ, পশ্চিমে গঙ্গোত্রী হিমবাহের সহিত মিলিয়াছে। চতুরঙ্গী হিমবাহ ধরিয়া গেলে মানাগ্রাম হইয়া বদ্রীনাথ যাইবার একটি দুর্গম রাস্তা আছে। গোমুখের নিকট রক্তবর্ণ নামক একটি ক্ষুদ্র হিমবাহ গঙ্গোত্রী হিমবাহের সহিত মিলিয়াছে। গোমুখের নিকট একটি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া নদী আনয়নের জন্য ভগীরথ তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ শিলার নাম ভাগীরথী শিলা ও নদীর নাম ভাগীরথী। নদীগর্ভ হইতে কিছু উচ্চে গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে— গঙ্গাদেবীর মূর্তির পদতলে রাজা ভগীরথের মূর্তি। তিব্বতীয় ধরনে মন্দিরের দ্বারের উপর ভিন্ন ভিন্ন রঙের বস্ত্রখণ্ড ঝোলানো আছে। এই স্থানে শীতকালে জল জমিয়া বরফ হয়, গঙ্গার স্রোতের উপরেও বরফের আস্তরণ পড়ে, তাই সেই সময় এতদঞ্চল জনপরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। এখানকার বাড়ির ছাদে শ্লেট পাথর আলগাভাবে লাগানো থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এই স্থানে বসবাস করেন। শীতকালে এই স্থানের পূজারীগণ কয়েক মাইল আগে মুখওয়া গ্রামে (ধরালীর নিকট) চলিয়া যান, ঐ স্থানেই ইঁহারা স্থায়ীভাবে বাস করেন।

গঙ্গোত্রীর পথ বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন পর্যন্ত খোলা থাকে। উত্তর কাশী হইতে হাঁটা পথে ৯২ কিলোমিটার (৫৮ মাইল) দূরে অবস্থিত। এখন সামরিক গুরুত্বের জন্য যানবাহন যাইবার পথ আরও উন্নত হইয়াছে। সরকার ঐ কয়েকমাস পথঘাট সরাইখানা ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার বন্দোবস্ত করেন। বৈশাখ মাসে বরফ গলিয়া যাইতে শুরু করে, উচ্চাংশে শ্রাবণ মাসে বরফ গলিয়া যায়। শাদা গোলাপ, রডোডেনড্রন ও বহুবিধ ফুল দেখা যায়। চীর বৃক্ষ ছাড়াও বার্চ বা ভূর্জপত্রের বৃক্ষে এ স্থান পূর্ণ। সমস্ত কার্যেই ভূর্জপত্রের ব্যবহার হয়। ইহা তিব্বতের প্রায় ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল)-এর মধ্যে অবস্থিত।

শ্রাবণ আশ্বিন মাসে বরফ গলিলেও বৃষ্টির জন্য ধ্বস নামে, সেইজন্য চৈত্র-বৈশাখ মাসেই বেশি যাত্রী আসে। এ সময় এখানকার ডাকঘর খোলা থাকে। থাকিবার নিমিত্ত বহু চটি ও ধর্মশালা আছে। তবে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই উত্তর কাশী হইতে আনিতে হয়। এখানে পাহাড়ের ঢালু জমিতে আলু ও নিকৃষ্ট ধরনের গম উৎপন্ন হয়। অন্য উপজীবিকার মধ্যে পশুপালন প্রধান। চৈত্র-বৈশাখ মাসে চতুর্দিক হইতে পশুচারণের দলগুলি উত্তরে গোমুখ ও তাহার উত্তরে তৃণাঞ্চলগুলিতে আসে এবং ঐখানেই অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। এই সময় উচ্চ অঞ্চলে মেষই প্রধান ভারবাহী পশু, ঘোড়াও মাঝে মাঝে ঐ অঞ্চলে বোঝা বহন করে। এখন পাইন কাষ্ঠের রস হইতে ধুনা, তারপিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এখানকার তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ২১° ২৫° সেন্টিগ্রেড ও শীতকালে ৭°-৩° সেন্টিগ্রেড হয়। জুলাই মাসের শেষে প্রবল মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয়, তবে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় আগস্ট মাসে, প্রায় ৫১ ৫৭ সেন্টিমিটার।

এই অঞ্চলে কয়েকটি জলপ্রপাত আছে, জলের স্রোত খুব প্রবল হওয়ায় তাহার সাহায্যে গম পেষা হইয়া থাকে (পানি চাক্কী)।

স্থানীয় লোকেরা মঙ্গোলীয়, তিব্বতী ও ভারতীয় জাতিগুলির মিশ্রণে উদ্ভূত। ইহারা গৌরবর্ণ বা ঈষৎ বাদামী রঙের। ইহারা প্রধানতঃ নিরামিষাশী। মেষ ও অন্যান্য পালিত পশু হইতেই ইহাদের জীবনধারণের সব কিছুই সংগৃহীত হয়। মেষলোম ইহাদের দৈনিক পোশাকের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। নিকটের হরশিল গ্রামটিতে যে গোষ্ঠী বাস করে তাহাদের 'জাড' (Jad) বলে, ইহারা তিব্বত হইতে আগতদের বংশধর। ইহাদের গ্রামে যে মন্দির বা গোম্ফা আছে তাহাও তিব্বতীয়। ইহারা মেষলোমের দ্বারা বহুবিধ জিনিস যথা কম্বল, আসন প্রভৃতি তৈয়ারি করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই স্থানটি তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিবার একটি কেন্দ্র ছিল। তিব্বত হইতে নীলগঙ্গা ধরিয়া যে পথটি গিয়াছে, সেই পথেই এই বাণিজ্য চলিত। এই অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামগুলিতে

গ্রাম্য পঞ্চায়েত ও প্রাথমিক শিক্ষার কিছু কার্য শুরু হইয়াছে।

চৌখাম্বা শিখর হইতে গিরিপথ দিয়া মীড সাহেব (Meade) একবার সন্তোপন্থ হিমবাহ হইয়া বদ্রীনাথ গিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে এ পথ অতি দুর্গম বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহ হইয়া এখনও বদ্রীনাথ যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

দ্র J. Smythe, *Kamet Conquered*, London, 1932, Kenneth Mason, *Abode of Snow*, London, 1955.

কমলা মুখোপাধ্যায়

গজকচ্ছপ গজকচ্ছপ রূপে পরিণত পূর্বজন্মের বিবাদ পরায়ণ অভিশপ্ত দুই ভাই। পুরাকালে বিভাবসু নামে কোপনস্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ মহাতপা সুপ্রতীক। সুপ্রতীক অগ্রজের সহিত একত্র থাকিতে না চাহিয়া ধন বিভাগ করিয়া দিতে বলেন। বিভাবসু ভিন্ন হওয়ার কুফল সম্পর্কে অনুজকে নানা উপদেশ দিয়াও যখন নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি হস্তী হইবে। সুপ্রতীকও অগ্রজকে অভিশাপ দেন, তুমিও অন্তর্জলচর কচ্ছপ হইবে। অন্যোন্য অভিশাপে সুপ্রতীক ও বিভাবসু যথাক্রমে গজ ও কচ্ছপ রূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং পূর্বশত্রুতাবশে পরস্পর বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইলেন। অমেয়কায় এই গজ কচ্ছপের যুদ্ধে সরোবর আলোড়িত হইতে লাগিল। তাহাদের যুদ্ধপ্রমত্ত রূপ ও আক্রমণ ভয়ংকর ও অমঙ্গলজনক। অমৃত আহরণোদ্দেশে স্বর্গগমনকালে গরুড় প্রচণ্ড ক্ষুধাবোধে পিতা কশ্যপের নিকট আহার প্রার্থনা করিলে কশ্যপ তাঁহাকে নিকটস্থ সরোবরে পরস্পর যুদ্ধরত গজকচ্ছপকে ভোজন করিতে বলেন। পিতার নির্দেশে গরুড় এক নখে গজকে অপর নখে কচ্ছপকে উত্তোলিত করিয়া মনুষ্যবর্জিত একটি পর্বতের শৃঙ্গে বসিয়া ভক্ষণ করিলেন।

দ্র মহাভারত, আদি ২৪ ২৫।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

গজদন্ত প্রধানতঃ পুরুষ হাতির মুখের উপরের পাটির দুইটি বৃহৎ কৃন্তক (ইন্‌সাইজর) দন্ত ('হাতি' দ্র)। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে জলহস্তী, বরাহ, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতির দাঁতও গজদন্ত নামে ব্যবহৃত হয়। গজদন্তের প্রাপ্তিস্থান আফ্রিকা ও এশিয়া। গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি, অলংকার, দেবমূর্তি, কৌটা, চিরুনি, ছুরি ও বুরুশের হাতল, বিলিয়ার্ডের বল প্রভৃতি নির্মাণে গজদন্ত ব্যবহৃত হয়। বিদরির কাজে গজদন্তের ক্ষুদ্র কুচি ব্যবহৃত হয়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষতঃ কেরল, হায়দরাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ, দিল্লী, রাজস্থান এবং পশ্চিম বঙ্গে হাতির দাঁতের কাজ হয়। অতি সূক্ষ্ম কাজের জন্য মুর্শিদাবাদের খাগড়া ও জিয়াগঞ্জের শিল্পীরা বিখ্যাত।

লীলা দে

গজপতি বংশ ওড়িশা দ্র

গজল, ঘজ়ল আরবী শব্দ। ইহা একপ্রকার প্রেম-বিষয়ক কবিতা বা গীতি। গজল একটি বিশিষ্ট রীতিতে সুর করিয়া পাঠ বা গান করা হয়। ফারসী ভাষায় রচিত গজল জগদ্বিখ্যাত। ইহা সাধারণতঃ অনেকগুলি পদে রচিত হয়। প্রথম পদকে মাৎলা বলে এবং এই পদের দুইটি লাইনের অন্তে মিল থাকে। পরবর্তী পদগুলির শেষ লাইনে একই ছন্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফারসী সাহিত্যের অনুকরণে উর্দু সাহিত্যে গজল প্রচলিত হইয়াছে। বাংলায় নজরুল ইসলাম গজল রচনা করেন।

রামশঙ্কর মিত্র

গজলক্ষ্মী শ্রী সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর একটি বিশিষ্ট রূপ, দেবীর 'লক্ষ্মী' নাম বৈদিক সাহিত্যের শেষ স্তরে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু দেবীর সহিত গজের সম্পর্কের কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ উক্ত সাহিত্যে পাওয়া যায় না। গুপ্ত অথবা গুপ্ত যুগের কিছু পরবর্তী কালে রচিত বিষ্ণুধর্মোত্তরমে গজলক্ষ্মীর রূপ কল্পনার সাক্ষাৎ মেলে। ঐ রূপ কল্পনা অনুসারে লক্ষ্মীর পশ্চাতে দুইটি গজ দেবীর শিরোপরি অভিষেক-বারি সিঞ্চন করিবে। এই জন্য গজলক্ষ্মী 'অভিষেকলক্ষ্মী' নামেও পরিচিতা। তবে এই রূপ কল্পনা খ্রীষ্টপূর্ব শতকেই ভারতীয় শিল্পকলায় দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ ভাস্কর্যগুলিতে দুইটি হস্তীকে পদ্মের উপর দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট দেবীমূর্তির শিরোপরি অভিষেক বারি সিঞ্চন করিতে দেখা যায়। এই দেবী কখনও কখনও পদ্মহস্তা, প্রশস্তজঘন, ক্ষীণকটি এবং পীনবক্ষ, এই দেবী মূলতঃ উৎপাদিকাশক্তির এবং পৃথ্বীমাতার প্রতীক এবং সেই হিসাবে পরবর্তী কালের শ্রী সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর সহিত রূপ-কল্পনাগতভাবে অভিন্ন। অর্থাৎ বৌদ্ধ শিল্পে এই দেবী এবং হিন্দুদের লক্ষ্মী রূপ-

কল্পনার দিক দিয়া অভিন্ন, অন্ততঃ গভীর সম্পর্কে অন্বিত। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে অনেকগুলি মুদ্রায় দুইটি গজ কর্তৃক অভিষিক্তা দেবীমূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মুদ্রা ধৃত এই দেবীও পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা অথবা সমাসীনা এবং প্রায়শঃই পদ্মপাণি। কৌশাম্বী, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলিতে গজলক্ষ্মীর মূর্তি বর্তমান এমন কি অ্যাজিলিসেস (বা অয়িলিস), রজুবুল (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতক), শোডাস (খ্রীষ্টীয় ১ম শতক) প্রভৃতি বিদেশী শাসকবর্গের মুদ্রাতেও গজ-অভিষিক্তা দেবীমূর্তি দেখা যায়। মুদ্রা ছাড়া মৃৎফলকেও এই দেবীমূর্তির সাক্ষাৎ মেলে। উত্তর প্রদেশের ভিটা এবং বিহারের বসাঢ় গ্রামে প্রাপ্ত কিছু গুপ্তকালীন মৃৎফলকে গজলক্ষ্মীর মূর্তি পরিদৃশ্যমান। উত্তর প্রদেশের কানপুরের নিকট লালাভগত গ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলাস্তম্ভের উপর গজলক্ষ্মীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। শশাঙ্কের গজলক্ষ্মীর মূর্তিবহ মুদ্রা, শরভপুরের (মধ্য প্রদেশের রায়পুর অঞ্চলে) রাজাদের এবং চন্দেল্লবংশীয় কোনও কোনও নৃপতির গজলক্ষ্মীর মূর্তিযুক্ত তাম্রশাসন পাওয়া যায়। মধ্যযুগে অনেকটি মনোজ্ঞ গজলক্ষ্মীর মূর্তির মধ্যে ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত খিচিঙে আবিষ্কৃত মূর্তিটির উল্লেখ করা যায়। এই মূর্তিতে দেবী বিশ্বপদ্মের উপর ললিতাক্ষেপে সমাসীনা, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ হাঁটুর উপরে বরদমুদ্রাযুক্তা, বাম হস্তে পদ্ম এবং দুই দিকে দুইটি গজ পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকোপরি অভিষেক-বারি বর্ষণ করিতেছে।

গজের সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে অনুমান, প্রাচীন কালে হস্তী শ্রী, সম্পদ এবং উর্বরতার প্রতীক বলিয়া গণ্য হইত। বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীগণের মধ্যে হস্তীকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই প্রাণীর সহিত সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর (যাহার আদি নাম 'শ্রী') যোগ সম্পর্ক তাই খুব বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নহে। সংক্ষেপে প্রাচীন কাল হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি গজলক্ষ্মী বা অভিষেকলক্ষ্মীর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত এবং প্রায় প্রতি মঙ্গলকর্মেই ইহার যোগ অপরিহার্য।

দ্র H. Zimmer, *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization*, New York, 1953 ; J. N. Banerjea, *Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

অণিমা তালুকদার

গজালী ঘজালী দ্র

গড় মান্দারন এখনকার নাম পড়োর গড়। বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) যাইবার পথের দক্ষিণ দিকে মান্দারন গ্রামে অবস্থিত ও হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত।

একসময়ে ইহা ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অংশ ছিল ও সমৃদ্ধিশালী স্থান হিসাবে পরিগণিত হইত। গড় মান্দারনে কয়েকটি দুর্গ ছিল। বাংলার পাঠান সম্রাট হোসেন শাহ্-র সেনাপতি ইসমাইল গাজী এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে গড় মান্দারনের উল্লেখ আছে।

দ্র L S S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Hooghly*, Calcutta, 1912

ঊষা সেন

গড় মুক্তেশ্বর ২৮°৪৭ উত্তর ও ৭৮°৬ পূর্ব। উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলায় অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। এই স্থান হইতে নিকটবর্তী শহর হাপুর পাকা সড়কের পথে ৩৩ কিলোমিটার (২১ মাইল) ও দিল্লী ৯৩ কিলোমিটার (৫৮ মাইল) দূরে।

গড় মুক্তেশ্বর গঙ্গা ও বুড়িগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গঙ্গার উপর একটি সেতু আছে। ১৯০০ সালে গড় মুক্তেশ্বর শহর রূপে গঠিত হয়। এই স্থানটি প্রাচীন কালে হস্তিনাপুরের অংশ ছিল বলিয়া মনে করা হয়। গড় মুক্তেশ্বর নামটি মুক্তেশ্বর মহাদেবের বৃহৎ মন্দিরের নাম হইতে উদ্ভূত। এই মন্দিরের নিকট অবস্থিত অন্য ৮টি মন্দিরের প্রত্যেকটির ভিতরে শ্বেতপাথরে নির্মিত ও রোকেড দ্বারা সজ্জিত গঙ্গাদেবীর মূর্তি আছে। মন্দিরগুলির নিকটে ও মীরাট যাইবার রাস্তায় একটি পবিত্র কূপ আছে। লোকের বিশ্বাস ইহার জল স্পর্শ করিলে পাপমোচন হয়। কূপটি আশিটি সতীস্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত। এইখানে সতীরা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতেন।

কার্তিকী পূর্ণিমার বৃহৎ মেলাতে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। শুক্লপক্ষের শেষ দিন সোমবার হইলে বা অন্যান্য বিশেষ সময়েও এখানে মেলা বসে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ৮৭১৭ জন এবং আয়তন ১২৯ বর্গ কিলোমিটার (৩২৪৭ একর)। এই স্থান কৃষিপ্রধান। বাঁশ ও কাঠের ব্যবসায়ও আছে।

দ্র H. R. Nevill, *District Gazetteers of the United Provinces of Agra & Oudh : Meerut*, Lucknow, 1922.

ঊষা সেন

গণক যিনি গণনা অথবা সংখ্যান করিয়া থাকেন তিনিই গণক। কিন্তু প্রচলিত অর্থে গণক শব্দের দ্বারা জ্যোতিষী অথবা দৈবজ্ঞকেই বুঝায়।

প্রাচীন এবং বর্তমান কালের প্রায় সকল সমাজেই গণকের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। গণক বা ভবিষ্যৎ বেত্তাগণ প্রধানতঃ ৩ ধারায় বিভক্ত। প্রথম ধারার গণকগণ যোগসিদ্ধি অথবা পিশাচসিদ্ধির ফলে ত্রিকালজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। প্রাচীন গ্রীসের ওর‍্যাক্‌ল্‌গণ, বর্তমান ও প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্য ও প্রাচ্যের ফকির, যোগী, জাদুকর, তাওপন্থী ও তান্ত্রিক এবং রোমানি (জিপ্‌সি), স্ফটিকদর্শী গণ এই ধারার গণক।

দ্বিতীয় ধারার গণকগণ অদৃষ্টগণনার মধ্যে 'চান্স' অথবা আকস্মিক ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আকস্মিক ঘটনাকে দেবতার নির্দেশ বলিয়া জ্ঞান করেন, আবার কেহ কেহ এক আকস্মিকের দ্বারা অপর আকস্মিককে প্রতিরূপিত করিতে চাহেন। এই ধারার অন্তর্গত প্রথম উপধারার অন্যতম উদাহরণ প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় 'অগার' গণ (augur) এবং দ্বিতীয় উপধারার মধ্যে কমল-পার্ষ্ণি গণনা অথবা আরব্য পাশক জ্যোতিষের নাম উল্লেখযোগ্য। ধূলি উড়াইয়া, ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিয়া, চক্রমণ্ডলাদি অঙ্কন করিয়া, আচম্বিতে স্পর্শ করিয়া বা করাইয়া যে নানাবিধ গণনা আছে তাহাও এই দ্বিতীয় উপধারার অন্তর্গত।

তৃতীয় ধারার গণকগণ ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানকে গণিতের সূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করেন। গণিতশাস্ত্র গ্রহস্ফুট, নক্ষত্র, রাশি এবং লগ্ন ইহাদের প্রধান উপজীব্য। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'গণক' শব্দ ইহাদের প্রতি সম্যক রূপে প্রযোজ্য। এই ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহাদের পদ্ধতির সহিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে এবং ইঁহারা ইনট্যুইশন বা স্বতোদর্শন অথবা আকস্মিক ঘটনাকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাবলম্বনে গণনা করিয়া থাকেন। এই ধারার সংশ্লিষ্ট উপধারা হিসাবে হস্তরেখাশাস্ত্র এবং সংখ্যাশাস্ত্রের (নিউমেরোলজি) উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও হস্তরেখাবিদ্‌গণের অনেকেই আবার 'স্পর্শজ্যোতিষ' প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারার টেলিপ্যাথি (অতীন্দ্রিয়সংযোগ)-নির্ভর উপধারারই উপাসক তথাপি করের দ্বারা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার এবং জন্ম তারিখের উপর নির্ভর করিয়া গণনা প্রভৃতির অস্তিত্বের ফলে হস্তরেখাশাস্ত্র, সামুদ্রিকশাস্ত্র, তথা প্রশ্নাক্ষরসংখ্যাশাস্ত্র প্রভৃতিকে তৃতীয় ধারার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করাই ন্যায়সংগত।

ইহা ঠিক যে গণকবিদ্যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। তথাপি কেবল প্রাচীন কালে নহে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও গণকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে গণকের প্রতিপত্তির কারণ হইল ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এবং তাহার বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম। গণকের কাছে সাধারণ লোকের প্রধান দাবি হইল উন্নতির উপযুক্ত পথনির্দেশের। বলা যাইতে পারে, গণকবিদ্যার অবৈজ্ঞানিকতা বশতঃ এই দাবি অপূরণীয়। তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের বৈজ্ঞানিক কোনও সমাধান পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অবৈজ্ঞানিক পন্থাতেই সেই মৌলিক দাবি মিটাইতে চেষ্টা করিবে। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতের গণক অবৈজ্ঞানিকতাকে এড়াইয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরেই তাঁহার বৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

দ্র বরাহমিহিরাচার্য, বৃহৎসংহিতা, বিমলাকান্ত লাহিড়ী জ্যোতিঃশাস্ত্রী অনূদিত পারাশরী হোরা, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, নগেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিঃশাস্ত্রী, ভারতে জ্যোতিষচর্চা ও কোষ্ঠীবিচারের সূত্রাবলী, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, Count Hamon (Cheiro), *Palmistry for All* London, 1952 Count Hamon (Cheiro), *Cheiro's Book of Numbers*, Bombay, 1959

অমৃতানন্দ দাস

গণতন্ত্র কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুখ্যতঃ গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা। যে শাসনব্যবস্থায় সরকার জনগণের কর্তৃত্বাধীন তাহারই নাম গণতন্ত্র। ইহা জনগণের আত্মশাসন ব্যবস্থা বলিয়া সচরাচর বিবেচিত হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের নানা অরাজনৈতিক ধারণারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেমন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, এক বিশেষ ভাবাদর্শ ও জীবনপন্থা, রাষ্ট্রহীন মানবসমাজ ইত্যাদি।

ইতিহাসে যে সকল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ পাই সেগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (ডিরেক্ট ডেমক্র্যাসি) ও প্রাতিনিধিক গণতন্ত্র (রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমক্র্যাসি)। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ নিজেরাই গণসভায় মিলিত হইয়া রাজকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং রাষ্ট্রের নীতিকে নির্ধারণ ও প্রয়োগ করে। এই ব্যবস্থা প্রাচীন গ্রীসের ও রোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে টিউটন উপজাতিগুলির মধ্যে এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ডের পুরাতন ক্যান্টনগুলিতে প্রচলিত ছিল। এই ধরনের গণতন্ত্রে দল গড়িয়া জনসাধারণকে সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না এবং

সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তই সর্বসাধারণের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য হয়। অ্যাথেন্সীয় গণতন্ত্রই (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০৮-৩৩৮) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিশিষ্টতম দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। দাস প্রথা, কায়িকশ্রমের অমর্যাদা, অবসরভোগীদের দ্বারা রাজকার্যের পরিচালনা, সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির পূর্ণ নিমজ্জন, এইগুলিই ছিল অ্যাথেন্সীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বহু রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহাদিগকে গণ বা সংঘ বলা হইত। প্রধানতঃ এক-একটি সংঘ ছিল কয়েকটি ক্ষত্রিয়কুলের স্বয়ংশাসিত আভিজাতিক সাধারণতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে সকল সিদ্ধান্ত প্রভুস্থানীয় ক্ষত্রিয় বংশের সভ্যদের লইয়া গঠিত সভায় আলোচনার পর গৃহীত হইত। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি সংঘের সভায় কৃষক, গোপালক ও বণিকেরাও স্থান পাইত। সেনাপতি ও প্রধান কার্যনির্বাহক সভার দ্বারা নির্বাচিত হইত। সচরাচর সংঘের শীর্ষে থাকিত একজন নামমাত্র 'রাজা' (নির্বাচিত অথবা পুরুষানুক্রমিক)। কিন্তু শাসন ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী ছিল সংঘমুখ্য বা জ্যেষ্ঠগণের পরিষদ্‌। ভারতের প্রাচীন গণগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত। তাহাদের কয়েকটি ছিল একক সংঘ এবং কয়েকটি ছিল মিলিত সংঘ, যেমন, বজ্জি (বৃজি), ত্রিগর্ত, যাদব (মথুরা) ইত্যাদি। সংঘশাসিত উপজাতিগুলিকে রাজতন্ত্রীরা বলিত অরাষ্ট্রক বা আরট্ট।

গৌতম বুদ্ধের সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দী) বিদ্যমান গণগুলির মধ্যে বৈশালীর (মজফ্‌ফরপুর জেলায়) বজ্জিরা বা লিচ্ছবীরা এবং কুশীনগরের (উত্তর প্রদেশের দেওড়িয়া জেলা) মল্লেরা ছিল সর্বাগ্রগণ্য, কপিলবস্তুর (নেপালী তরাই) শাক্যেরা ও পিপ্পলিবনের (মগধে) মৌর্যরা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গণ। লিচ্ছবী ও মল্ল গণরাজ্যের আদর্শ বৌদ্ধ সংঘের সংগঠনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম হইতে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চনদ ভূখণ্ডে যে সকল সংঘ বিদ্যমান ছিল, মহাভারতে (রচনারম্ভ, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) তাহাদের নাম পাই, যথা, ১. যৌধেয় ২. ক্ষুদ্রক ৩. মালব ৪. বসাতি ৫. শিবি ৬. অম্বষ্ঠ ৭. উড়ুম্বর ৮. ত্রিগর্ত ৯. মদ্র ১০. কেকয় ১১. অগ্রেয় ১২. প্রস্থল। আলেকসান্দরের (আলেকজাণ্ডার) ভারত অভিযানের (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬) গ্রীক বিবরণীগুলিতে ইহাদের অনেকের নাম পাই, যেমন, Malloi (মালব), Oxydrakai (ক্ষুদ্রক), Abastanoi বা Sabarcae (অম্বষ্ঠ, মতান্তরে যৌধেয়-গণের অন্তর্ভুক্ত সৌভ্রেয়), Ossadioi (বসাতি), Sibioi (শিবি), Kathaioi (কঠ) ইত্যাদি। গ্রীক ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, এই সকল উপজাতি, বিশেষ করিয়া মালবেরা, ছিল অত্যন্ত সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ঐ সময়কার অন্যান্য যে সকল সংঘের নাম মহাভারতে, পাণিনিতে (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে) কৌটিল্যের (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গণগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা, অন্ধক-বৃষ্ণি (সৌরাষ্ট্র, যাদবদের সাত্বত শাখা), কুকুর (উত্তর গুজরাত), কুরু (রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ), পাঞ্চাল (রাজধানী কাম্পিল বা কাম্পিল্য, উত্তর প্রদেশে), বৃক (সম্ভবতঃ শকগণ) সাল্ব (আলোয়ার অঞ্চলে), কাম্বোজ (গান্ধারের সন্নিকটে), মধুমন্ত ও অপ্রীত (সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মোহমান্দ ও আফ্রিদিদের পূর্বপুরুষ)। আলেকসান্দরের পরবর্তী কালে ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়োজনে স্বভাবতঃই সংঘগুলির অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু ইন্দো-গ্রীক শক এবং কুষাণ রাজশক্তির পতনের পর (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী) যৌধেয়, মালব, শিবি, অর্জুনায়ন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সংঘগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল।

আধুনিক কালে গণতন্ত্র বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় উদারনৈতিক গণতন্ত্র (লিবারেল ডেমক্র্যাসি)। ইহা জনগণের অপ্রত্যক্ষ, প্রাতিনিধিক ও সাংবিধানিক স্বয়ংশাসন ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে গণভোটে অংশ গ্রহণ করা ভিন্ন আইন প্রণয়নে জনসাধারণের আর কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না ('গণভোট' দ্র)। জনগণের নিকট জবাবদিহিত্বের শর্তে গণপ্রতিনিধিরা আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের দ্বারা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দুই রূপ, ব্রিটেনের পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতন্ত্র। ইহারা মূলতঃ এক, উভয়ই জনগণের নিকট দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা। পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের মন্ত্রীরা প্রতিনিধিসভার নিয়ন্ত্রণাধীন। সচরাচর গণতন্ত্র বলিতে ইহাই বুঝায়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে, যথা, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, গোপন ব্যালট, দলপ্রথা এবং লিখিত বা অলিখিত সংবিধান। পূর্বে ভোটদান বিত্তবানদের ও পুরুষদের 'প্রিভিলেজ' বা কায়েমী অধিকার ছিল। বহু সংগ্রামের পর শ্রমিকেরা ও নারীজাতি ভোটের অধিকার পায়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৩০, ফ্রান্সে ১৮৭৫ ও ব্রিটেনে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। নারীজাতি ভোটের অধিকার পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০, ব্রিটেনে

১৯২৮ এবং ফ্রান্সে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। প্রতিনিধি সভায় প্রকাশ্যভাবে ভোট দেওয়া হয়, কিন্তু প্রতিনিধিদের নির্বাচনে জনগণ গোপনে ভোট দিয়া থাকে। গোপন ব্যালটের ফলে নির্ভয়ে ভোটদান সম্ভব হয়। দলপ্রথা বলিতে বুঝায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব। ইহা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আবশ্যিক ও অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। দলগুলি জনমতকে সংহত ও অভিব্যক্ত করে এবং বিধানমণ্ডলীতে আসন লাভের জন্য কিছুকাল অন্তর অন্তর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিনিধি সভায় বিতর্ক ও সংখ্যাগুরু ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলিই রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করে। গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক জীবনপ্রবাহের লক্ষ্য হইল, কি করিয়া এক বিশেষ দল (বা দলজোট) প্রতিনিধি সভায় সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করিয়া দেশ শাসন করিতে পারে। দলীয় বিরোধ গণতন্ত্রের বাস্তবতার ও প্রাণবত্তার লক্ষণ। ইহার মূলে আছে সমাজে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের, মতের সঙ্গে মতের বাস্তব বিরোধ। কিন্তু দলগুলি বিরোধসর্বস্ব হইলে গণতন্ত্র অচল হয়, বিভিন্ন দলের মধ্যে ন্যূনতম 'কনসেন্সাস' বা মতৈক্য না থাকিলে গণতান্ত্রিক বিধি কাজ করিতে পারে না। ভারতে মতৈক্য অতি সামান্য, প্রায় নাই বলিলেই চলে, ইহা ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপন্ন করিয়াছে। অন্য দিকে মার্কিন গণতন্ত্রে দুই দল কার্যতঃ এক কর্মসূচি অনুসরণ করিয়া থাকে। মার্কিন দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকারিতাবাদী (প্র্যাগ্‌ম্যাটিক), ইহা গণতন্ত্রকে শুষ্ক ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত করে। সংবিধান বা মৌলিক আইন রাষ্ট্রকে জনগণের সম্মতি দান করে, কিভাবে সরকার গঠিত হইবে তাহার একটি ছক কাটিয়া দেয় এবং নাগরিকগণকে শর্তাধীনে কয়েকটি মৌলিক অধিকার দান করে, যথা, স্বাধীন চিন্তার ও মত প্রকাশের অধিকার, সভা-সমিতিতে মিলিত হওয়ার অধিকার, অবাধ গতি-বিধির অধিকার, আইনের চোখে সমতার অধিকার ইত্যাদি। মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষিত হয় 'আইনের বিধ পদ্ধতি'র দ্বারা। কাহারা দেশ শাসন করিবে এবং কি উদ্দেশ্যে তাহা সাংবিধানিক কাঠামোর গণ্ডির মধ্যে স্থিরীকৃত হয়। সরকার-বিরোধিতা আইনসম্মত। আলোচনা ও বিতর্কের দ্বারা জনগণের ইচ্ছানুসারে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার পথ উন্মুক্ত রাখাই গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান আকারগত বৈশিষ্ট্য।

আলোচনা ও প্ররোচনাই গণতন্ত্রের ধর্ম। এইজন্যই গণতন্ত্রকে বলা হয় আলোচনা-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা। কয়েকটি মূল বিশ্বাসের ও নীতির উপর গণতন্ত্র দাঁড়াইয়া আছে, যথা: ১. রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির বাধ্যতার ভিত্তি হইল জনগণের সম্মতি ২. ব্যক্তিদের স্বার্থের ও মঙ্গলের বাহিরে রাষ্ট্রের কোনও নিজস্ব স্বার্থ ও মঙ্গল নাই ৩. সামাজিক পুরুষার্থ লাভ প্রাচীরবেষ্টিত অচলায়তনে সম্ভব নয়, তাহা মুক্ত মানবসমাজেই সম্ভব ৪. সত্য পরীক্ষাধীন, শেষ সত্য বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং কোনও মতকেই দমন করা উচিত নয় ৫. যুক্তিগত আলোচনাই মতপ্রকাশকে মূল্য দান করে, বিনা আলোচনায় হাঁ বা না বলার কোনও মূল্য নাই ৬. সাধারণ মানুষ মোটের উপর বুদ্ধিমান, নীতিপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ৭. একের মত বা মুষ্টিমেয়ের মতের অপেক্ষা বহুর মতের সত্য ও শুভ হইবার সম্ভাবনা বেশি ৮. আলোচনার পর সংখ্যাগুরু ভোটে যাহা স্থিরীকৃত হয় তাহাই জনগণের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য ৯. কয়েকটি ব্যক্তিগত অধিকারের ধারক রূপে সকল মানুষ স্বাধীন ও সমান ১০. আইন মানুষের অধিকারকে সৃষ্টি করে না, তাহাকে স্বীকৃতি দেয় ও অভিব্যক্ত করে মাত্র ১১. ব্যক্তির একটি নিজস্ব জীবনক্ষেত্র আছে; এখানে রাষ্ট্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ ১২. শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা ও আপসের দ্বারা মানুষের সহিত মানুষের ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা জাতিগত সকল প্রকার বিরোধের মীমাংসা বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব।

গ্রীক, স্টোইক, আদি খ্রীষ্টীয় ও ইওরোপীয় মধ্যযুগীয় ভাবধারায় গণতান্ত্রিক চিন্তার পূর্বাভাস ছিল। আরিস্তোতল (অ্যারিস্টটল, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) বলিয়াছিলেন যে শাসনক্ষমতায় ধনী ও দরিদ্র, উভয় শ্রেণীর সংখ্যাভিত্তিক সমতাই গণতন্ত্রের ধর্ম, অত্যধিক অর্থনৈতিক বৈষম্য বিপ্লবের অন্যতম কারণ। স্টোইক দার্শনিকদের চিন্তায় রাষ্ট্রীয় বিধানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রাকৃতিক বিধান (ন্যাচরাল ল) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এই দুইটি ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষ সমান (ঈশ্বরের চোখে), সর্বসাধারণের অছি রূপে ধনীরা সম্পত্তিধারণ করে। দাসপ্রথার অবলোপের বাণী খ্রীষ্টীয় চিন্তায় অন্তর্নিহিত ছিল। মধ্যযুগের ইওরোপীয় চিন্তায় রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমতার ও সর্বশক্তিমত্তার কোনও স্থান ছিল না, বহু ক্ষমতাকেন্দ্রের উপর মধ্যযুগীয় সমাজ অবস্থিত ছিল। প্রজাদের সহিত চুক্তি রাজশক্তির ভিত্তি, এই ধারণা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল;

রাজার অভিষেককালীন শপথ গ্রহণ রাজশক্তির সীমা-নির্ণায়ক চুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক গণতন্ত্রের উদয় ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে। ১৬৪৭-৫০ খ্রীষ্টাব্দের ইংলণ্ডীয় গৃহযুদ্ধের কালে ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনীতে কয়েকজন প্রটেস্ট্যান্ট 'লেভলার' জন লিল্‌বার্ন (১৬১৪-৬৭ খ্রী) ও রিচার্ড ওভারটনের নেতৃত্বে 'জনতার চুক্তি' ('এগ্রিমেন্ট অফ দি পিপ্‌ল্') নামে যে দলিল পেশ করা হয় তাহাই আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রথম নিদর্শন। ব্যক্তি প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত পার্লামেন্টের শাসন, জনগণের সম্মতিসাপেক্ষে শাসনের প্রয়োজনীয়তা, সর্বমানবের সমান স্বাভাবিক অধিকার, ধর্মমত সম্পর্কে ঔদার্য, এই সকল ধারণা লেভলারদের চিন্তাধারায় ছিল।

নবোদিত মধ্যম বা বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির নেতৃত্বে স্বৈর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াই আধুনিক গণতন্ত্র জন্মলাভ করিয়াছিল। যে ধরনের সীমিত, নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য মধ্যম শ্রেণীগুলি ও ইংল্যাণ্ডের হুইগ রাজনৈতিক দল লড়াই করিতেছিল তাহার রাজনৈতিক দর্শন রচনা করিলেন জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রী) তাঁহার 'ট্রীটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' নামক গ্রন্থদ্বয়ে (১৬৯০ খ্রী)। লক-এর চিন্তায় নিম্নলিখিত ধারণাগুলির সাক্ষাৎ পাই : ১. জনগণের স্বেচ্ছাদত্ত সম্মতিই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের ভিত্তি ২. কয়েকটি সীমিত উদ্দেশ্যের গণ্ডির মধ্যেই রাষ্ট্রের শাসন বৈধ ৩. রাষ্ট্রীয় বিধান প্রাকৃতিক বিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং তাহারই প্রকাশ মাত্র ৪. শাসক বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে ও অত্যাচারী হইলে অবশেষে তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ও বিপ্লবের অধিকার জনগণের আছে ৫. জীবনের অধিকার, মুক্তির অধিকার, সম্পত্তি ধারণের অধিকার, এইগুলি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার এবং ইহাদিগকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। রুশো (১৭১২-৭৮ খ্রী) তাঁহার 'সামাজিক চুক্তি' 'কনত্রাত সোশিয়াল' (১৭৬২ খ্রী) গ্রন্থে জনগণের সার্বভৌমতা (পপুলার সভরেন্‌টি) তত্ত্বের প্রতিপাদন করিলেন। রুশোর চিন্তাধারায় একদিকে আছে স্বৈরতন্ত্রের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহের বাণী, অন্য দিকে আছে 'সাধারণ ইচ্ছা'র অর্থাৎ কার্যতঃ সংখ্যাগুরুর ইচ্ছার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির কাছে মানুষের ব্যক্তিত্বকে আহুতি দেওয়ার আহ্বান। 'সাধারণ ইচ্ছা'কে রুশো সংখ্যাগুরুর ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত করিয়াছিলেন। ব্যক্তিমানব ও সমাজের সংখ্যালঘু অংশ 'সাধারণ ইচ্ছা'র দাস, রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের দ্বারা মানুষ স্বাধীন হইতে বাধ্য হয়, রুশোর এই চিন্তা উত্তরকালে রাষ্ট্রসর্বস্ববাদী নায়কতন্ত্রকে তাত্ত্বিক হাতিয়ার জোগাইয়াছিল। ক্ষুদ্রায়তন অশিল্পায়িত নগর-রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই ছিল রুশোর আদর্শ। প্রাতিনিধিক গণতন্ত্রকে তিনি প্রকৃত গণতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু প্রাতিনিধিক গণতন্ত্র তাঁহার ভাবধারার দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল। জনতার বিধানই প্রকৃত বিধান, রুশোর এই বাণী ফরাসী বিপ্লবের নীকোবিন নেতাদের মনে আগুন জ্বালাইয়াছিল। শোনা যায় যে রোবেসপিয়ার (১৭৫৮-৯৪ খ্রী) সর্বদা পকেটে 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থের এক কপি বহন করিতেন। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৬ খ্রী) এবং প্রথম ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রী), স্বৈর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই দুই সংগ্রামের ফলে গণতন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব হইয়া ওঠে বাস্তব জগতে শাসনব্যবস্থার নিয়ামক এক বিপুল শক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইওরোপে রাজতন্ত্রী প্রতিক্রিয়া প্রবল হইয়া ওঠে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে গণতন্ত্রের পুনরুত্থান ঘটে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরই ইওরোপে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে ইংল্যাণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মোড় ফিরিয়া যায়। যাহা আদিতে ছিল স্বৈর শাসকদের হাত হইতে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতালাভের লড়াই তাহা ক্রমশঃ হইয়া পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকট হইতে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতাজয়ের সংগ্রাম। কার্ল মার্ক্‌স (১৮১৮-৮৩ খ্রী) পুঁজিবাদী সমাজের উপর যে সর্বাত্মক আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা তদানীন্তন গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ও শূন্যগর্ভতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে। ইহা অনুভূত হয় যে বুর্জোয়া সমাজ প্রাচীন দাস সমাজেরই অন্যতর সংস্করণ। শ্রেণীগত ও ধনগত বৈষম্যের অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসাধনই হয় শিল্পসভ্যতাসম্পন্ন দেশগুলিতে গণতন্ত্রের নূতন মন্ত্র বা আদর্শ, শ্রমিক আন্দোলনই হয় গণতন্ত্রের প্রধান বাহন। ভোটাধিকারের প্রসার সাধন, ফ্যাক্টরি-আইন, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকারের স্বীকৃতি, ন্যূনতম মজুরি আইন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, প্রগতিশীল করব্যবস্থা, কাজের ঘণ্টার ক্রমিক হ্রাসসাধন, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণ মানের উন্নয়ন ও অবসর সময়ের বৃদ্ধি, আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয়— এইগুলি ইওরোপের ও আমেরিকার উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে এক নূতন রূপ দান করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে যাহাকে গণতন্ত্র বলা হয় তাহা বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে বিকশিত শিল্পগত সভ্যতার

গণতন্ত্র

সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বের ও বোঝাপড়ার ফল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের বিচারকেরা ট্রেড ইউনিয়নকে 'ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার'-এর প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী একটি বৈধ সামাজিক শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নিত্যনূতন আইন প্রণয়নকারী আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশে জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২ খ্রী) ও জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩ খ্রী)-এর চিন্তার প্রভাব সামান্য নয়। মিলই গণতন্ত্রের সবশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা যদিও তিনি নিজে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত গণতন্ত্রী ছিলেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় এক বিশেষ ধরনের সমাজ গঠনের কর্মসূচি। এই সমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নাম দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রীদের মূল ধারণা এই যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর স্থাপিত সমাজে গণতান্ত্রিক আদর্শ সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সমতাই রাজনৈতিক সমতার জনক। সম্পত্তির অধিকারকে মানুষের 'স্বাভাবিক অধিকার' বলিয়া ঘোষণা করিয়া লক ও তাঁহার অনুবর্তীগণ গণতন্ত্রের পায়ে যে বেড়ি পরাইয়া দিয়াছিলেন তাহাকে মোচন করিতে হইবে। উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাজীকরণ, রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ, আঞ্চলিক ও শিল্পগত স্বায়ত্তশাসন, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর শ্রমিকদের কর্তৃত্ব, এই সকল ধারণা সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের ও সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু মত বিদ্যমান। হ্যারল্ড লাস্কির (১৮৯৩-১৯৫০ খ্রী) মতে পুঁজিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্র খাপ খায় না। গণতন্ত্র পুঁজিবাদের অবসান না ঘটাইলে হয় পুঁজিপতিরাই গভীর সংকটের সময়ে ফাসিস্ত রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া গণতন্ত্রের অবসান ঘটাইবে, আর নয় তো কমিউনিজম পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র উভয়েরই বিলুপ্তি সাধন করিবে। ফন হায়েকের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্বভাবতঃই দাস সমাজ এবং তাহার সহিত গণতন্ত্র খাপ খায় না। শুম্পেটারের মতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ই চলিতে পারে। যাঁহারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিনা বলপ্রয়োগে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতে চান, তাঁহাদিগকেই আজকাল সমাজতন্ত্রী অথবা গণতান্ত্রিক (অ কমিউনিস্ট) সমাজতন্ত্রী বলা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ইঁহাদের লক্ষ্য, রাজনৈতিক গণতন্ত্র লক্ষ্যসিদ্ধির আবশ্যিক পন্থা। পন্থাটিকে বর্জন করিলে, লক্ষ্যেরও বিনষ্টি ঘটে, ইহাই গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের মূল মন্ত্র।

যাঁহারা গণতন্ত্রকে একটি ভাবাদর্শ ও জীবনপন্থা বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মতে গণতন্ত্র একটি অখণ্ড ও সর্বব্যাপী জীবনধর্ম। জীবনের রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক, সকল বিভাগই ইহার শাসনাধীন। এই মতের প্রতিপক্ষীয়েরা বলেন, গণতন্ত্রকে একটি বিশেষ জীবনদর্শনে পরিণত করা অবিধেয়। গণতন্ত্রে নানা মৌলিক বিশ্বাসের, দৃষ্টিভঙ্গীর ও মতবাদের স্থান আছে।

বহু মনস্বী মনে করেন গণতন্ত্র বলিতে প্রকৃতপক্ষে বুঝায় মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার দ্বারা চালিত রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা। রাষ্ট্রের ধর্ম হইল বলপ্রয়োগ, গণতন্ত্রের ধর্ম হইল স্বেচ্ছাসম্মতি। সুতরাং রাষ্ট্রের অবসান না ঘটিলে গণতন্ত্র অসম্ভব। গণতন্ত্রের এই ধারণাকে বলা হয় অ্যানার্কিস্ট বা অরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র। ইহার নানা রূপ ও নানা ভাবনাদর্শ আছে। গান্ধীজীর গণতন্ত্রকে একপ্রকার অরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র বলা যাইতে পারে। শ্রমজীবী জনসাধারণ সত্যাগ্রহের বলে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নীচ হইতে রাষ্ট্রহীন ও শোষণহীন মুক্ত মানবসমাজ গড়িয়া তুলিবে, ইহাই ছিল গান্ধীজীর আদর্শ ('গান্ধীবাদ' দ্র)। মূলতঃ গণতন্ত্র যে একটি রাষ্ট্রীয় ধারণা এ বিষয়ে মার্ক্সীয় ও অমার্ক্সীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিকগণ একমত। লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রী) মন্তব্য করিয়াছিলেন 'রাষ্ট্রের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রও অন্তর্হিত হইবে।'

বিংশ শতাব্দীতে এক নূতন ধরনের রাজনৈতিক গণতন্ত্র দেখা দিয়াছে। ইহার নাম শ্রমিক গণতন্ত্র (প্রলেটারিয়ান ডেমক্র্যাসি)। ইহাকে সর্বাত্মক গণতন্ত্র (টোটালিটারিয়ান ডেমক্র্যাসি) আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় ইহার প্রথম অভ্যুদয় ঘটে। ইহার মার্ক্সবাদী প্রবক্তারা বলেন, মানুষকে অরাষ্ট্রীয় মুক্তির দিকে যাত্রা করিতে হইলে কিছুকালের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য (ডিক্টেটারশিপ) প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। মার্ক্সীয় ভাবাদর্শে রাষ্ট্র শ্রেণীর সঙ্গে একীভূত। মার্ক্সবাদীদের মতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর একাধিপত্য। বুর্জোয়া সমাজে অর্থনৈতিক দাসত্বে আবদ্ধ শ্রমজীবীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার ও স্বাধীনতার অধিকারী হইতে পারে, এই ধারণা মার্ক্সবাদীদের চোখে স্ববিরোধী। শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য বলপূর্বক বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ করিয়া এবং শোষণহীন সমাজ স্থাপন করিয়া সংখ্যাগুরু জনগণকে অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, উভয়েরই

অধিকারী করে, এই যুক্তির বলে মার্কসবাদীরা বলেন যে, শ্রমিক রাষ্ট্রই একমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্র। এইপ্রকার গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা নির্ধারণের ও ইচ্ছা প্রকাশের রাজনৈতিক রূপগুলির উপর জোর দেওয়া হয় না, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাই প্রামাণিক বলিয়া মনে করা হয়। ইহা একদলীয় গণতন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী রূপে কমিউনিস্ট পার্টি দেশ শাসন করে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কর্মসূচি পরিচালনা করে। শ্রমিক গণতন্ত্রে শোষক বা শোষণের সমর্থক বলিয়া বিবেচিত সংখ্যালঘুরা শত্রু রূপে গণ্য হয়, সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার জনগণের নাই, সরকার বিরোধিতা রাষ্ট্রবিরোধিতা বলিয়া গণ্য হয়, বিকল্প কর্মসূচির ভিত্তিতে বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা অবৈধ, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত হয় কেন্দ্রীভূত কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃপক্ষের দ্বারা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রার্থীকে জনগণ বিনা আলোচনায় এবং বিনা সমালোচনায় ভোট দেয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলি পার্টির তথা সরকারের কর্তৃত্বাধীন এবং ধর্মঘট আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ, শুধুমাত্র মত প্রকাশ পার্টিনেতাদের মনঃপূত না হইলে রাষ্ট্রবিরোধী বলিয়া নিন্দিত হয়, এমন কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে গণ্য হয়। এই সকল কারণে শ্রমিক গণতন্ত্রকে তাহার প্রতিপক্ষীয়েরা গণতন্ত্র বলিয়া মনে করেন না এবং তাহাকে রাষ্ট্রসর্বস্ববাদী, স্বৈর নায়কতন্ত্র আখ্যা দেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক গণতন্ত্র ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আশাবাদী ও যুক্তিবাদী। যে সকল বিশ্বাসের উপর তাহা দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের ভিত্তি বর্তমানে শিথিল হইয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাসমরোত্তর যুগের মানব জগৎ আগেকার মানব জগৎ নয়। ব্যক্তিমানব এখন রুশোর আরাধ্য জনতার বল্মীক স্তূপের একটি পিপীলিকা মাত্র। বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সংগতিসাধন সম্ভব, এই ধারণাটি কার্ল মার্কসের আক্রমণের পর নিজের ক্ষতশুশ্রূষায় লিপ্ত। বুদ্ধিগত আলোচনাই রাজনৈতিক কর্মের ও সামাজিক পুরুষার্থ সাধনের পথপ্রদর্শক, মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। বুদ্ধি শুধু মানুষের শ্রেণী-স্বার্থের ও বাস্তব অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অথবা অবচেতন মনের কামনার দ্বারা চালিত হইয়া যুক্তি উদ্ভাবন করে মাত্র, এই ধারণা বুদ্ধির শিরশ্ছেদন করিয়াছে। জীবনের সকল বিভাগেই সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের জন্য মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করিতে হয়। সাধারণ মানুষ নিজের মূঢ়তা বোধের দ্বারা বিপর্যস্ত। নেতাদের ও জনসাধারণের মধ্যে বিপুল ও দুস্তর ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সমিতি ইত্যাদি সংস্থার নেতৃবৃন্দের হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। ইহারাই বর্তমান জগতের ক্ষমতাভিজাত। ইহারা নিজেদের মধ্যে বুদ্ধিবিচার ও যুক্তিসংগত বিতর্কের ভিত্তিতে আলোচনা করেন। কিন্তু নিজেদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে জনসাধারণের সম্মতি সংগ্রহের জন্য ইহারা যে পন্থা অবলম্বন করেন তাহা যুক্তিনির্ভর নয়, অযৌক্তিক প্রচারকার্যই তাহার প্রধান উপায়। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ব্যক্তিপূজা, সমাজতান্ত্রিক আত্মগরিমা, রাষ্ট্রের ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা প্রচার, এই সকল অযৌক্তিক পন্থা অনুসৃত হয়। অ-কমিউনিস্ট দেশগুলিতে বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্যিক বিক্রয়নীতির কূট ছলাকলার দ্বারা জনসাধারণকে প্ররোচিত করা হয়। শুধু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই এখন আর রাষ্ট্রের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকা এখন সর্বত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, কি কৌশলে পঞ্চবার্ষিক যোজনার ন্যায় একটা জটিল ও দুর্বোধ্য জিনিসকে মূঢ় জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা যায় এবং কিরূপ অযৌক্তিক প্ররোচনার দ্বারা জনসাধারণের মনে ইহার প্রতি বিরাগ জাগানো যায়, ইহাই রাজনৈতিক দলপতিদের 'গণতান্ত্রিক' সাধনা। জনসাধারণও মধ্যে মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া ভাবে, হয়তো একজন মহামানব আবির্ভূত হইয়া তাহাদের সকল দুঃখের অবসান ঘটাইবে। ইহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। সুতরাং মনে হইতে পারে, উদারনৈতিক গণতন্ত্র যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিল তাহা অতীতের স্বপ্ন। কিন্তু এরূপ নৈরাশ্যের কোনও কারণ নাই। নকীয় উদারনৈতিক রাষ্ট্রের দিন চলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শ মিথ্যা মরীচিকা নয়। গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে চাই শিক্ষিত সমাজ, সত্যপরায়ণ, দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও নির্ভীক নেতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্বেচ্ছাভিত্তিক কার্যকলাপের ব্যাপক অনুষ্ঠান, পরমতসহিষ্ণুতা, সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে জনগণের আত্মশক্তির অনুশীলন, শান্তিকামী মনোভাব, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী, চিত্তাবেগের প্রশমন, বীরপূজা-বিরতি ও সর্বোপরি মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন। এই আদর্শ রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মিলনক্ষেত্র। ইহা কোথাও সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া ইহাকে সিদ্ধ করার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।

দ্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্য', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, D. R. Bhandarkar, *Carmichael Lectures, 1918*, Calcutta, 1919; Radhakamal Mukherjee, *Democracies of the East*, London, 1923; H. J. Laski, *A Grammar of Politics*, London, 1925, A D. Lindsay, *Essentials of Democracy*, Philadelphia, 1929, H. J. Laski, *Liberty in the Modern State*, London, 1930, H J Laski, *Democracy in Crisis*, 1933, C D Burns, *Democracy*, London, 1934; N. K Basu, *Studies in Gandhism*, Calcutta, 1940; C D Burns, *Political Ideals*, London, 1948, J S. Mill, *On Liberty and Considerations of Representative Government*, Oxford, 1948, UNESCO, *International Bibliography of Political Science*, vols. 1-9, Paris, 1953-1960, U N Ghoshal, *Studies in Indian History and Culture*, Bombay, 1957, J Filliozat, *Political History of India: From the Earliest Times to the 7th Century A. D*, Calcutta, 1957, E H Carr, *The New Society*, London 1957, *Gandhiji's Reflections on Democracy*, Philadelphia 1957, V I Lenin, *The State and Revolution*, *Lenin's Selected Works*, vol. 2 Moscow, 1960, Gordon Leff, *The Tyranny of Concepts*, London, 1961 C L Wayper, *Political Thought*, London, 1954

অমলেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

গণধর জৈন তীর্থংকরগণের প্রথম শিষ্য। তীর্থংকরগণ তাঁহাদের উপদেশাবলী প্রচারের জন্য কয়েকজন সাধুকে দীক্ষা দেন এবং তাঁহাদেরই গণধর পদ প্রদান করেন। গণধরদের অধীনে অন্যান্য অনেক সাধুকে শাস্ত্রাভ্যাস করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। চতুর্বিংশ তীর্থংকর মহাবীরের ১১ জন গণধর ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে— ১. ইন্দ্রভূতি গৌতম ২. অগ্নিভূতি গৌতম ৩. বায়ুভূতি গৌতম ৪. আর্যব্যক্ত ৫. আর্য সুধর্ম ৬. মণ্ডিক পুত্র ৭. মৌর্যপুত্র ৮. অকম্পিত ৯. অচলভ্রাতা ১০. মৈত্রার্য ও ১১. প্রভাস। গণধর ও গণী একার্থক নহে। গণী বলিতে আচার্য বা আচার্যগণের শিষ্যকে বুঝায়। সাধুগণের মধ্যে অনেক গণী হইতে পারেন, কিন্তু গণধর হইতে পারেন না। তীর্থংকর-নির্দিষ্ট সাধুগণই কেবল গণধরপদবাচ্য।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গণনাথ সেন (১৮৭৭-১৯৪৪ খ্রী) লব্ধপ্রতিষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। পিতা কবিরাজ বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম। গণনাথ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এল এম এস ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক রূপে খ্যাতি লাভ করেন। সর্বভারতীয় আয়ুর্বেদ মহামণ্ডলের ইন্দোর অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। পিতার নামে তিনি বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপন করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার গণনাথের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দান করেন। আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার যথাসম্ভব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্তি। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার মূলতত্ত্ব আয়ুর্বেদের ছাত্রদিগকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে গণনাথ সংস্কৃতে যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে 'প্রত্যক্ষশারীর' (১৯১৯ খ্রী) ও 'সিদ্ধান্তনিদান' (১৯২০ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে প্রকাশিত তাঁহার 'আয়ুর্বেদ-পরিচয়' (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) পুস্তিকায় সরলভাবে আয়ুর্বেদের সারকথা বিবৃত হইয়াছে।

দ্র Chintaharan Chakravarti, 'Bengal's Contribution to Sanskrit Literature', *Annals of The Bhandarkar Oriental Research Institute*, vol. XI, 1929-30.

সুমেন নারায়ণ সেন

গণপৎ রাও (১৮৫২-১৯২ খ্রী) ঠুংরি গানের সুপ্রসিদ্ধ কলাবৎ এবং নূতন মর্যাদায় ঠুংরির প্রচলনকর্তা। সংগীত জগতে ইনি ভাইয়া সাহেব নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি গোয়ালিয়রের মহারাজা জিয়াজী রাও এবং গায়িকা চন্দ্রভাগার পুত্র। অল্পবয়স হইতে বীনকার বন্দে আলী খাঁ ও গোয়ালিয়রের নানা ওস্তাদের নিকট এবং পরে লখনৌতে ঠুংরিগুণী সাদিক আলী খাঁর নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ঠুংরিতে কৃতবিদ্য হইয়া তিনি পাটনা, কলিকাতা, রামপুর ও শেষে ঢোলপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঠুংরি অঙ্গের সূক্ষ্ম কলাকৃতি তিনি হারমোনিয়ামে সুনিপুণভাবে প্রদর্শন করিতেন। গণপৎ রাও 'সুঘর পিয়া' ভণিতায় বহু উৎকৃষ্ট ঠুংরি গান রচনা করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে জোহ্‌রা বাঈ, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, মৌজুদ্দীন,

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, বসির খাঁ, জঙ্গী খাঁ, সোহনী সিং, ইরসাদ, গফুর খাঁ, নূরজাহান বাঈ প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গণপতি কাকতীয় কাকতীয় বংশ দ্র

গণপতি চক্রবর্তী (? -১৯৩৯ খ্রী) বাংলা দেশে আধুনিক জাদুচর্চার জনক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শ্রীরামপুর চাত্‌রা নিবাসী জমিদারবংশে জন্ম। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলায় 'জাদু-সম্রাট' নামে খ্যাত ছিলেন। জাদুজীবনের প্রথম দিকে ভারতবিখ্যাত 'বোসেজ-সার্কাস' দলে জাদু প্রদর্শন করিতেন; পরে নিজেই আলাদা দল গঠন করিয়া নানা স্থানে জাদু প্রদর্শন করিয়া বেড়ান। সার্কাসে থাকা কালেই তাঁহার 'বাক্সের খেলা' ('ইলিউশন বক্স') এবং 'কংস কারাগার' নামক বিস্ময়কর খেলা দুইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার আর একটি চমক-প্রদ খেলার নাম ছিল 'ইলিউশন ট্রি'। এই তিনটি খেলাতেই তিনি অতি কঠিন ও জটিল বন্ধন দশা হইতে অবলীলাক্রমে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত মুক্ত হইয়া আসিয়া আবার সেই পূর্বাবস্থাতে ফিরিয়া যাইতেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে ভৌতিক বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে করিত এবং তাহার ফলে তিনি জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। এই জাতীয় 'পলায়নী খেলা'তে ('এসকেপ্‌স') তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুকর আমেরিকার হ্যারি হুডিনির (১৮৭৩-১৯২৬ খ্রী) সহিত তুলনীয়। হস্তকৌশলপ্রধান নানা রূপ জাদুর খেলায় এবং কৌতুক সৃষ্টিতেও তাঁহার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। জাদু-প্রদর্শন করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং বরাহনগরে দেবালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই-খানেই পরিণত বয়সে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আজীবন অকৃতদার ছিলেন এবং জীবনের শেষ বছরগুলি ধর্মচর্চায় কাটান। 'যাদুবিদ্যা' (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) নামে তিনি একটি বই লিখিয়াছিলেন।

দ্র অজিতকৃষ্ণ বসু, 'যাদু-কাহিনী', কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

অজিতকৃষ্ণ বসু

গণপরিষদ নূতন সংবিধান রচনা বা রচনার প্রস্তাব করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক সংস্থাকে গণ-পরিষদ (কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লি) বলিয়া অভিহিত করা হয়। গণপরিষদ প্রতিষ্ঠার তত্ত্বগত ভিত্তি হইল: জন-সাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার এবং শাসনব্যবস্থা শাসিতের সম্মতির উপরই স্থাপিত। সাধারণতঃ বিপ্লব বা বহিঃশক্তির অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিসংগ্রামের মধ্য হইতে গণপরিষদের উদ্ভব হয়। আধুনিক ধারণা অনুসারে গণপরিষদ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হইবে এবং চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত— অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

ভারতে গণপরিষদ গঠনের জন্য সুস্পষ্ট আন্দোলন শুরু হয় এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ-দল গণপরিষদের মাধ্যমে ভারতের আত্মনির্ধারণের অধিকার দাবি করে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক ভারতের সংবিধান রচনা ভিন্ন ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। দুই বৎসর পরে এই প্রস্তাবের সূত্র ধরিয়া জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন, কংগ্রেসের দাবি হইল যে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করিবে প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত এবং সর্বতোভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত গণপরিষদ। ইহার পর হইতে এই প্রকার গণপরিষদের ধারণা ও দাবিই হইয়া দাঁড়ায় কংগ্রেস আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য বিষয়।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিপ্‌স মিশন প্রস্তাব করেন, যুদ্ধাবসানে ভারতীয়দের লইয়া গঠিত একটি নির্বাচিত গণপরিষদের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধান রচিত হইবে। ইহার পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ভারতে একটি ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করে। ক্যাবিনেট মিশন সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেস অধিকাংশ আসন অধিকার করে। মুসলিম লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলেও পাকিস্তানের দাবিতে গণপরিষদে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করিয়া ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট হইতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমিনিয়ন গঠন করে। এই আইনে প্রত্যেক ডোমিনিয়নের গণপরিষদকে যে কোনও প্রকার সংবিধান গ্রহণ করিবার সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হয়। ভারতীয় গণপরিষদ প্রথম মিলিত হইয়াছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর এবং সংবিধান

রচনার কার্য সমাপ্ত করে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তারিখে। এই সময়ের মধ্যে ১১টি অধিবেশন বসে এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি তারিখে সংবিধানের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যান্য বিভিন্ন কমিটি ব্যতীত ইহা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে একটি খসড়া কমিটি নিযুক্ত করে। খসড়ার বিচার-বিবেচনা সমাপ্ত হইলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তারিখে ভারতের বর্তমান সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং উহা প্রবর্তিত হয় ঠিক দুই মাস পর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তারিখে।

দ্র Y. G. Krishnamurti, *Constituent Assembly and Indian Federation*, Bombay, 1940; N. Gangulee, *Constituent Assembly of India*, London, 1942; A. C. Banerjee, *The Constituent Assembly of India*, Calcutta, 1947; N. C. Roy, *Towards Framing the Constitution of India*, Calcutta, 1947; D. N. Sen, *Revolution by Consent?* Calcutta, 1947; D. N. Sen, *From Raj to Swaraj*, Calcutta, 1951; K. M. Munshi, 'Constituent Assembly— The Hour of Freedom', *Hindustan Times*, Independence Supplement, Delhi, August 15, 1955; Publication Division, Government of India, *India's Constitution*, Delhi, 1960; D. Basu, *Introduction to the Constitution of India*, Calcutta, 1962.

সুশীলকুমার সেন

গণভোট রোমানরা কমিতিয়া ত্রিবুতা-য় (Comitia tributa) সমবেত হইয়া যে আইন পাশ করিত তাহার নাম ছিল প্লেবিস্‌কিতুম (Plebiscitum)। অধুনা কোনও অঞ্চল দুই দেশের মধ্যে কোন্ দেশের সহিত যুক্ত হইবে, ইহা নির্ধারণের জন্য ঐ অঞ্চলের নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটকে প্লেবিসিট বলা হয়। রেফারেনডাম-এর সহিত ইহার পার্থক্য হইল এই যে, কোনও বিশেষ শ্রেণীর আইন গ্রহণ বা বর্জন সম্বন্ধে ইহা শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট কোনও স্থায়ী ভোট ব্যবস্থা নহে, রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। ফরাসী বিপ্লবীরা তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে ইহা প্রথম প্রয়োগ করিয়া মৌখিক ভোটের দ্বারা অঞ্চলগুলির ভাগ্য নির্ধারণ করে। ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নাইস, স্যেভয় ও উত্তর ইতালির ডাচীগুলির; ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভার্সাই সন্ধির শর্তানুসারে আপার সাইলেসিয়ার ও জার্মানির অন্যান্য কয়েকটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সার অঞ্চল গণভোটের ফলে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুরূপ ভোটের ফলে পুনরায় ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ বিভাগের সময়ে তদানীন্তন আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গ্রহণ করা হয় এবং ভোটের ফলাফল অনুসারে শ্রীহট্ট পূর্ব পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগর শহরেও অনুরূপভাবে জনমত গ্রহণ করা হইয়াছিল। গণভোটের ফলে চন্দননগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রমেশচন্দ্র ঘোষ

গণিকা বেশ্যা দ্র

গণিত দৈনন্দিন ও ব্যাবহারিক জীবনে গণিতের প্রয়োগ অপরিহার্য। আবশ্যক জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে, সাংসারিক আয়-ব্যয়ে এবং বয়স নির্ণয়ে প্রাথমিক গণিতের অর্থাৎ পাটিগণিতের প্রয়োগ স্বীকৃত। নিরক্ষর মানুষকেও জীবন ধারণের তাগিদে সহজ সরল গণনার সহিত পরিচয় রাখিতে হয়।

ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে গণিতের প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে। গৃহাদি নির্মাণে, আধুনিক গৃহসজ্জার বৈদ্যুতিক উপকরণ সংস্থাপনে, এমন কি সাধারণ আসবাবপত্র নির্মাণেও গণনার প্রয়োজন। জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনায়, যথা নদীর বাঁধ, সেতু, রাস্তাঘাট, নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরনের যানবাহন, যথা বিমান, মহাকাশযান প্রভৃতির পরিকল্পনায় ও পরিকল্পনানুযায়ী নির্মাণকার্যে গণনার প্রয়োজন সর্ববাদীসম্মত। শুধু যুদ্ধের নানাবিধ উপকরণ নির্মাণেই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন, গণনার সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন কি যুদ্ধকৌশলবিদ্যা আলোচনার জন্যও গণিতের একটি বিশেষ শাখার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, সমাজবিজ্ঞানে এবং বিশেষ করিয়া অর্থনীতিতে গণিতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ অতি প্রাচীন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আপেক্ষিকবাদ (থিয়োরি অফ রেলেটিভিটি) ও কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞানে গণিত প্রয়োগের বিশেষ সাফল্য তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাকে গাণিতিক রূপ দিবার প্রেরণা দিয়াছে। শুধু পদার্থবিদ্যা বা রসায়নে নয়,

জীববিদ্যা, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল সমস্যাগুলিকে গণিতে প্রকাশ করিয়া গাণিতিক সমস্যা রূপে সমাধান করিবার বিশেষ প্রয়াস আধুনিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য।

নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও সাফল্যের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমস্ত বিজ্ঞানে অধিযন্ত্রবাদের (মেকানিস্টিক ফিলসফি) প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ (থিয়োরি অফ ইভলিউশন) অনুরূপভাবে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখাগুলিকে প্রভাবান্বিত করে। তদ্রূপ আধুনিক কালে আপেক্ষিকবাদ ও কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞানের সৌষ্ঠব ও সাফল্য, প্রত্যেক বিজ্ঞান শাখাকেই বিশেষভাবে গণিত-ভাবাপন্ন করিয়াছে।

বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যাও গণিতের প্রভাবে নবরূপ পাইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের বহু শাখা প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হওয়ায় প্রতীকীন্যায় (সিম্বলিক লজিক) তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা গণিতের শাখা হিসাবে পরিচিত। প্রতীকীন্যায়ের সাহায্যে গণিতের আলোচনার পরিধি ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতিতে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ছন্দ পরীক্ষায় ও সংগীতের অষ্টক আলোচনাতেও গণিতের প্রয়োগ সুপ্রাচীন।

গণ্‌ ধাতুর সহিত ত প্রত্যয় যোগে গণিত শব্দটির উৎপত্তি। সুতরাং গণিতের ব্যুৎপত্তিগত সাধারণ অর্থ হইল, যাহা গণনা বা হিসাব করিয়া পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া গণ্‌ ধাতুর আর একটি অর্থ আছে, যাহা সমষ্টি বা সমূহ বুঝাইয়া থাকে। গণতন্ত্র, গণশক্তি প্রভৃতি শব্দগুলি গণ্‌ ধাতুর এই অর্থেরই প্রকাশক। গণিতের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'ম্যাথিম্যাটিক্‌স' শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে— যাহার অর্থ সাধারণ শিক্ষা। অবশ্য প্রথম দিকে ম্যাথিম্যাটিক্‌স শব্দটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইত। ক্রমে ইহার অর্থের সম্প্রসারণ হইয়াছে। আধুনিক কালে ম্যাথিম্যাটিক্‌স শব্দটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার সহিত গণ্‌ ধাতুর দ্বিতীয় অর্থের বিশেষ নৈকট্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

বর্তমান নিবন্ধে 'গণিত' শব্দটি ম্যাথিম্যাটিক্‌স শব্দের এই আধুনিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে একটি দ্রুতবর্ধমান বিষয়কে (তাহা কলা, দর্শন বা বিজ্ঞান যাহাই হউক না কেন) একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

গণিতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহা মূলতঃ দুই ধারায় প্রবাহিত। প্রথমটি সংখ্যা-বিষয়ক, দ্বিতীয়টি আকৃতি-বিষয়ক— যাহার প্রচলিত নাম জ্যামিতি। জ্যোতিষশাস্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তত্ত্বীয় বিজ্ঞান প্রভৃতিকেও গণিতের অংশ রূপে গণ্য করা হয়। সংখ্যা ও তৎসম্পর্কিত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ডারউইনের (১৮০৯-৮২ খ্রী) মতে, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনই (ন্যাচরাল সিলেক্‌শন) এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানশাস্ত্রের উৎপত্তির মূল হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের অপর প্রবর্তক অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩ খ্রী)-এর মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনই ইহার উৎপত্তির হেতু। গণিতের উৎপত্তি বিষয়ে জীববিজ্ঞানীদের এই মতবিরোধের আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে করা অসম্ভব। অভিব্যক্তিবাদের দৃষ্টিতে দেখিলে, মানুষ যখন পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেই সময়েই তাহার মনে ১, ২, ৩,⋯প্রভৃতি স্বাভাবিক (ন্যাচরাল) সংখ্যার ধারণা জন্মিয়াছে। মনে হয়, প্রথম দিকে অধিক ও অল্পের পার্থক্য নিরূপণের ধারণা হয়। পালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পশুর প্রতিভূ হিসাবে মানুষ প্রস্তর বা কাষ্ঠখণ্ড রাখিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে সংখ্যার উক্ত ধারণা ও ইহার প্রাথমিক প্রক্রিয়া (অপারেশন) তাহার আয়ত্তে আসে।

অনুরূপভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে আকৃতির ধারণা জন্মে। ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল হইলে, বাস্তব সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে আকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি পাইল। এইভাবেই জ্যামিতিজ্ঞানের উৎপত্তি। অবশ্য সেই সময়ের গণিত ছিল মূলতঃ ব্যাবহারিক পরীক্ষামূলক। সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যেই কোনও কোনও গাণিতিক প্রক্রিয়া ও প্রণালীর সহিত মানুষের পরিচয় ঘটে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রাচীন গণিত মূলতঃ দুই ধারায় প্রবাহিত: প্রাচীন সংখ্যাগণিত (পাটিগণিত, সংখ্যাতত্ত্ব, বীজগণিত) ও জ্যামিতি। গণিতের প্রাথমিক ধারণা প্রায় সর্ব দেশেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাচীন যুগে জ্যামিতি প্রধানতঃ ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অপর পক্ষে বাস্তব-নিরপেক্ষ দর্শন আলোচনায় অভ্যস্ত ভারত, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে পাটিগণিত, সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। পূর্ণ (হোল) সংখ্যা, দশমিক ক্রম (ডেসিম্যাল সিস্টেম অফ নোটেশন), শূন্য সংখ্যা, ভগ্নাংশ, দশমিক সংখ্যা প্রভৃতির ধারণার উদ্ভাবন ও প্রয়োগে ভারতের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত। তাহা ব্যতীত

জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ্‌গণের দান উল্লেখযোগ্য।

গণিতের ইতিহাসকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গণিতের প্রথম উৎপত্তি। প্রাচীন যুগের সীমারেখা সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে। অষ্টম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ। পরবর্তী যুগকে আধুনিক বলিয়া ধরা হয়। প্রাচীন যুগে গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশে জ্যামিতির চর্চাই অধিক হইয়াছে। তবে পাটিগণিতেরও অতি সামান্য আলোচনা হয়। এই সময়ে উক্ত দেশসমূহে জ্যামিতির সাহায্যেই পাটিগণিত ও বীজগণিতের কয়েকটি সূত্রের আলোচনা হয়। ইহা ব্যতীত বর্তমান গতিবিদ্যা ও তরলস্থিতিবিদ্যার প্রাথমিক ধারণার এবং ইহাদের কোনও কোনও সূত্র আবিষ্কারের উল্লেখও পাওয়া যায়। এই বিষয়ে আর্খিমেদেস (আর্কিমিডিস, ২৮৭-২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) -এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংখ্যাতত্ত্বের কোনও কোনও সংখ্যা সমাধানে দিওফান্তস (Diophantus, ৩য় খ্রীষ্টাব্দ)-এর নামও উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে উল্লিখিত গণিত শাখাগুলির আলোচনাই ব্যাপকভাবে করা হয়। কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান এ যুগে কিছুই নাই। এই যুগে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় বীজগণিতের উৎকর্ষ ও প্রসার। এই গণিত শাখার উৎকর্ষ ও প্রসারের জন্য ভারতীয় গণিতবিদ্‌ ভাস্করাচার্যের (দ্বাদশ শতাব্দী) নাম চিরস্মরণীয়। ভাস্করাচার্য ও অন্যান্য গণিতবিদের প্রচেষ্টায় গতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। এই যুগেই আরব গণিতবিদ্‌গণের সহযোগিতায় প্রাচ্য হইতে সংখ্যাবিষয়ক জ্ঞান পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রবেশ ও প্রসার লাভ করে। অপর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে জ্যামিতি বিষয়ক উন্নততর জ্ঞান প্রাচ্য দেশে পৌঁছায়। ফলে বীজগণিতের সাহায্যে জ্যামিতিক সমস্যাগুলির সমাধানের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং বীজগণিতের সমস্যাকে জ্যামিতিক রূপ দিবার প্রচেষ্টাও সার্থক হয়। আকবরের সময়ে (১৫৪২-১৬০৫ খ্রী) জয়সিংহের চেষ্টায় ইউক্লিড (এউক্লিদেস)-এর জ্যামিতির সংস্কৃত অনুবাদ করা হয় এবং ইহার কোনও কোনও অংশ ন্যায়শাস্ত্রের অংশ হিসাবে আলোচিত হয়।

গণিতের আধুনিক যুগ সাধারণভাবে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রী) ও ফের্মা (১৬০১-৬৫ খ্রী)-এর সময় হইতে আরম্ভ হয়। এই দুই গণিতবিদ্‌ বিশ্লেষক জ্যামিতি প্রবর্তন করায় বীজগণিত ও জ্যামিতি— এই ধারা দুইটির মিলন সাধিত হয়। এইরূপে গণিত নবজীবন লাভ করে ও নূতন নূতন শাখা প্রশাখার উদ্ভব ঘটে। কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রী), গালিলেও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রী) ও কেপলের (১৫৭১-১৬৩০ খ্রী) প্রভৃতি গণিতবিদ্‌গণের গবেষণায় জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়। ফের্মা ও পাস্কাল (১৬২৩-৬২ খ্রী)-এর প্রচেষ্টায় সম্ভাব্যবাদের (থিয়োরি অফ প্রব্যাবিলিটি) এক নবরূপ প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রী) ও লাইব্‌নিট্‌স (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রী) পৃথক ও স্বাধীনভাবে কলনবিদ্যা (ক্যালকুলাস) আবিষ্কার করেন। কলনবিদ্যার আবিষ্কার গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে নবদিগন্তের উন্মোচন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলনবিদ্যার প্রগতি ও প্রয়োগে বিভিন্ন গণিত শাখার দ্রুত, অভূতপূর্ব উন্নতি ও প্রসার ঘটে। নিউটন প্রবর্তিত গতিবিদ্যা ও মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব কলনবিদ্যার সংস্পর্শে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে গণিতের বিভিন্ন শাখাকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হয়। ফলে বিভিন্ন গণিত শাখার উৎপত্তি, উৎকর্ষ ও প্রসার এই শতাব্দীর গাণিতিক আলোচনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই শতাব্দীর বিশিষ্ট গণিত শাখাসমূহের নাম যথাক্রমে বিশ্লেষণবিদ্যা (অ্যানালিসিস), সেটতত্ত্ব (থিয়োরি অফ সেট্‌স), নিত্যবাদ (থিয়োরি অফ ইনভেরিয়্যান্স), ভেদকলনবিদ্যা (ক্যালকুলাস অফ ভেরিয়েশনস্‌), টপলজি, বিমূর্ত বীজগণিত, বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতি ও প্রতীকী ন্যায় প্রভৃতি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পূর্বলব্ধ গণিত শাখা ও প্রশাখার অভূতপূর্ব উন্নতি ও প্রসার ঘটে। মিশ্র গণিতের সমধিক উন্নতি ও প্রয়োগ বিংশ শতাব্দীর গণিতচর্চার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই শতাব্দীতে আপেক্ষিকবাদ ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার উৎপত্তি ও তজ্জন্য সম্ভাব্যবাদ ও সীমানীয় জ্যামিতি প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ ও আলোচনা হয়।

প্রাথমিক ও উচ্চ গণিতের মধ্যে সাধারণভাবে কোনও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে এই সীমারেখা নির্ণয় করা হয়। আমাদের দেশে অনেক সময়েই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলোচিত গণিতকে প্রাথমিক গণিত এবং মহাবিদ্যালয়ে আলোচিত গণিতকে উচ্চগণিত বলা হয়। আবার কখনও কখনও বীজগণিতের ৪টি মৌলিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে-গণিত বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে আলোচিত হয় এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতি— এইগুলিকে প্রাথমিক গণিত রূপে

গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে গণিতের পঞ্চম প্রক্রিয়া (লিমিট প্রসেস) ব্যবহার করিয়া যে-গণিত আলোচিত হয় তাহাকে উচ্চগণিত বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু এ শতাব্দীর প্রায় আরম্ভে বিখ্যাত গণিতবিদ্ ক্লাইন (১৮৪৯-১৯২৫ খ্রী) তাঁহার প্রাথমিক গণিত সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, কলনবিদ্যা, বিশ্লেষণবিদ্যা প্রভৃতিকে প্রাথমিক গণিতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, এই সময় জার্মান ভাষায় রচিত প্রাথমিক গণিতের বিদ্যাকোষে ডা: ভেবর প্রমুখ গণিতবিদ্ পাটিগণিত, বীজগণিত, বিশ্লেষণ-বিদ্যা, কলনবিদ্যা, জ্যামিতি (সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ), বলবিদ্যা, সম্ভাব্যবাদ প্রভৃতি শাখাগুলিকে প্রাথমিক গণিতের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ উল্লিখিত গণিতবিদ্‌গণ বিমূর্ত গণিতকে শুধু উচ্চতর গণিত রূপে আখ্যাত করিয়া অন্যান্য গণিত শাখাকে প্রাথমিক গণিতের শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। আবার বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতের মধ্যেও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করা সহজ নয়। সাধারণভাবে আলোচনার উদ্দেশ্য হইতেই বিশুদ্ধ বা ফলিত নামকরণ করা হয়। আলোচনায় যদি গাণিতিক রূপটিই প্রাধান্য লাভ করে তবে আলোচ্য বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন তাহাকেই বিশুদ্ধ গণিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন গাণিতিক আলোচনা অন্যান্য বিজ্ঞান শাখার উদ্দেশেই প্রয়োগ করা হয়, তখন তাহাকে ফলিত গণিত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তবে সাধারণতঃ সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যামিতি, বিমূর্ত বীজগণিত ও ইহার বিভিন্ন শাখা, বিশ্লেষণবিদ্যা প্রভৃতি বিশুদ্ধ গণিত হিসাবেই পরিচিত। বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স (পরিসংখ্যান) প্রভৃতি ফলিত গণিতের শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়। অবশ্য এই প্রকার শ্রেণীবিভাগও ত্রুটিপূর্ণ। পাটিগণিত বিশুদ্ধ কি ফলিত বলা কঠিন। সম্ভাব্যবাদের অবস্থাও অনুরূপ। জ্যামিতির সাধারণ প্রচলিত শাখাসমূহকে বিশুদ্ধ গণিত আখ্যা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। মানুষ প্রথমে জ্যামিতিকে পদার্থবিদ্যার শাখা হিসাবেই চর্চা করিয়াছিল। পদার্থের গতির সাধারণ নিয়মাবলীর আলোচনা— যাহা স্থিতিবিদ্যা (কিনেম্যাটিক্‌স) নামে পরিচিত— যদি ফলিত গণিতের অংশ হয় তবে পদার্থের আকৃতি ও রূপ সম্পর্কিত বিদ্যাকে— অর্থাৎ জ্যামিতিকে— ফলিত গণিতের মধ্যে স্থান দানে বাধা কোথায় ?

অন্যতর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আবার গণিতকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : মাত্রিক (কোয়াণ্টিটেটিভ) ও গুণীয় বা বৈশেষিক (কোয়ালিটেটিভ) গণিত। সাধারণতঃ পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ইহার বিভিন্ন শাখা, কলনবিদ্যা, ফলিত গণিত ও ইহার বিভিন্ন শাখাগুলিকে মাত্রিক গণিতের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, বিমূর্ত বীজগণিত, টপলজি, প্রতীকীন্যায়, সেটতত্ত্ব প্রভৃতিকে গুণীয় বা বৈশেষিক গণিত রূপে অভিহিত করা হয়। অবশ্য এই প্রকার শ্রেণীবিন্যাসেও বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, গতিবিজ্ঞানকে মাত্রিক গণিতের শাখা হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু গতিবিজ্ঞানের অন্য অংশে গতির যে সকল ধর্ম পরিমাপের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় তাহার আলোচনা গুণীয় গণিতের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইহা গুণীয় গতিবিদ্যা (কোয়ালিটেটিভ ডাইন্যামিক্‌স) নামে পরিচিত। বর্তমানে গুণীয় ও বিমূর্ত কথা দুইটি প্রায় এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

এ পর্যন্ত গণিতের শ্রেণী বিভাগের আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গণিতের বিভিন্ন শাখা – পাটিগণিত, বীজগণিত, বিভিন্ন জ্যামিতি, ব্যবকলন ও সমাকলন -বিদ্যা (ডিফারেন্‌শল অ্যাণ্ড ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস), ব্যবকলনীয় ও সমাকলনীয় সমীকরণতত্ত্ব (থিয়োরি অফ ডিফারেনশল অ্যাণ্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন), ভেদকলনবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, সম্ভাব্যবাদ, বিভবতত্ত্ব (থিয়োরি অফ পোটেন্‌শল), গাণিতিক স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স, বিমূর্ত বীজগণিত, সেটতত্ত্ব, টপলজি, প্রতীকীন্যায় প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। আপেক্ষিকবাদ, কোয়াণ্টাম গতিবিদ্যা এবং তন্ত্রীয়-তড়িৎ-চুম্বকবিদ্যা (ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্নেটিক থিয়োরি) প্রভৃতিকে গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয়েরই শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের (যাহার গাণিতিক রূপ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে) কোনও কোনও শাখাকে গণিত ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে— বর্তমান যুগে গণিতের প্রকৃত অন্তর্নিহিত গঠন কিরূপ ? এ প্রশ্নের উত্তরে গণিতবিদ্‌গণ মোটামুটি ৩ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন :

১. বৃহত্তর ন্যায় ও গণিত : ফ্রেগে (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রী), রাসেল (১৮৭২ খ্রী-) প্রভৃতি গণিতবিদ্ গণিতকে বৃহত্তর ন্যায়ের অংশ হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ন্যায়ের মূল প্রকল্পসমূহকে ভিত্তি করিয়া প্রতীকীন্যায়কে এমনভাবে সম্প্রসারণ করা যায় যে গণিতের সমস্ত যুক্তি ও প্রণালী এই প্রতীকীন্যায়ের দ্বারা বিধিবদ্ধ করা সম্ভব। অবশ্য সংখ্যা প্রভৃতির মূল ধারণাগুলিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সেট বা প্রতীকীন্যায়ের অপরাপর মূল ধারণার সাহায্যে সংজ্ঞাত করা সম্ভব। সুতরাং যাহাই এইরূপ

প্রতীকীন্যায়ের বিধিবদ্ধ রূপে প্রকাশ ও প্রমাণ করা যাইবে, তাহাই গণিত।

২. স্বজ্ঞাবাদ ও গণিত : ক্রোনেকর (১৮২৩-৯১ খ্রী) গাণিতিক কোনও বস্তুর অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া ইহার আলোচনার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার পর ব্রৌওঅর (Brouwer), অনুরূপ ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। গণিতের মূল আলোচনা উহার বহির্বর্তী ন্যায় বা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া আরম্ভ করা অনুচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহার মতে মানুষের এমন একটি গাণিতিক স্বজ্ঞা আছে যাহা যুক্তি তর্ক বা অন্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়, এই স্বজ্ঞা হইতেই মানুষ স্বাভাবিক সংখ্যা ১, ২, ৩,··· ও ইহার মূল প্রক্রিয়াগুলি জানিতে পারে। গণিতের অপরাপর সমস্ত ধারণা, সংখ্যা ও ইহার মূল প্রক্রিয়াসমূহের সাহায্যে গঠন করিতে হইবে। যাহা এইভাবে গঠিত বা প্রমাণিত হইবে, তাহাই গণিতের অংশ বলিয়া গণ্য করা হইবে। স্বজ্ঞাবাদী হেইটিঙ্ (Heyting) এইরূপ গঠনমূলক গণিতের উপযোগী প্রতীকীন্যায় লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং স্বজ্ঞাবাদী গণিতবিদ্‌গণের মতে, এইরূপ গঠনমূলক প্রণালীতে যাহারই সংজ্ঞা দেওয়া যাইবে ও যাহাই প্রমাণ করা সম্ভব তাহাই গণিত। স্বজ্ঞাবাদী গণিতবিদগণ ৎসেরমেলো (Zermelo)-র নির্বাচন প্রকল্প ও তৎসাহায্যে প্রমাণিত প্রতিজ্ঞাসমূহ স্বীকার করেন না।

৩. আকারনিষ্ঠাবাদ ও গণিত. হিল্‌বের্ট (১৮৬২-১৯৪৩ খ্রী), পেয়ানো (Peano, ১৮৫৮-১৯৩২ খ্রী) প্রমুখ গণিতবিদ্ গণিতের বহিরঙ্গ বা আকারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে গণিতের একটি বিশিষ্ট আকার আছে। যাহাই এই আকারে প্রকাশ করা সম্ভব, তাহাই গণিত বলিয়া গণ্য করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে, গণিত কতকগুলি বস্তু ও প্রমাণসাধ্য প্রতিজ্ঞার সমষ্টি। গাণিতিক বস্তু দুই প্রকার : কতকগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয়, অন্যগুলির হয় না (প্রয়োজন নাই)। শেষোক্ত বস্তুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রতিজ্ঞার আকারে বিবৃত করা হয়— প্রমাণ করা হয় না, অর্থাৎ উহাদের প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ পরিভাষায় এই জাতীয় প্রতিজ্ঞাকে স্বতঃসিদ্ধ বলা হয়, যদিও আধুনিক কালে গণিতবিদগণ 'অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞা' এই পরিভাষাটিকেই শ্রেয়তর মনে করেন। অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞার সাহায্যে পূর্বোক্ত বস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। গাণিতিক বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ধর্ম গাণিতিক প্রতিজ্ঞায় প্রকাশ করা হয় এবং এই সকল প্রতিজ্ঞা পূর্ব-উল্লিখিত সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমাণ করা হয়। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, কাহাকে গাণিতিক প্রমাণ বলা হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে হিল্‌বের্ট ও তাঁহার অনুগামীরা গাণিতিক প্রমাণের আকারও নির্দিষ্ট করিয়া দেন, যাহা প্রমাণতত্ত্ব নামে অভিহিত। তাঁহারা গণিতের বিভিন্ন শাখাকে তাঁহাদের প্রস্তাবিত আকারে প্রকাশ করেন। হিলবের্টের ধারণা ছিল যে, গণিতের প্রত্যেক শাখাকে এইভাবে আকার দেওয়া সম্ভব। অপ্রমাণিত প্রকল্পসমূহ সংগতিপূর্ণ, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরস্পর-বিরোধী প্রকল্প হইতে কখনও যুক্তিসম্মত বিজ্ঞান সম্ভব নয়। যদি প্রকল্পগুলির সাহায্যে কোনও প্রতিজ্ঞা ও ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী প্রতিজ্ঞা একই সঙ্গে প্রমাণ করা যায় তাহা হইলে উহাদের অসংগতিপূর্ণ বলিয়া ধরা হয়। গণিতের সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার সাহায্যে যে সকল প্রতিজ্ঞা বিবৃত করা যায় সেগুলি যদি প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে প্রকল্প হিসাবে গৃহীত ঐ অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞাগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধরা হইবে। প্রকল্পসমূহের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য গণিতের সৌষ্ঠবের পরিচায়ক।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী গোদেল (Goedel) দেখান যে, যে-সকল প্রতিজ্ঞা পূর্বালোচিত বস্তু ও প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা সম্ভব নয়, ঐ জাতীয় প্রতিজ্ঞাকে সর্বদাই সূত্রবদ্ধ করা সম্ভবপর। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা সমষ্টি সাধারণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অবশ্য গোদেল উপরি-উক্ত তথ্য সংখ্যাতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন। এই তত্ত্ব হিলবের্ট ও তাঁহার অনুগামীদের আকারনিষ্ঠাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু গণিতবিদ্‌দের মধ্যে আকারনিষ্ঠাবাদ এখনও অধিক প্রচলিত।

এই প্রশ্ন উঠিতে পারে গণিতের মত এরূপ নিখুঁত ও যথাযথ বিজ্ঞানের গঠন ও ভিত্তি সম্পর্কে এইরূপ মতবিরোধ কেন? ইহাতে অবশ্য আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ইহা গণিতের বিরাটত্ব ও ব্যাপকত্বের পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের অন্ধের হস্তীদর্শন উপাখ্যানটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ গণিতকে উপরি উক্ত এক-একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে, উহার আংশিক পরিচয় লাভ করা যায়। এক শ্রেণীর গণিতবিদের মতে, এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীগুলির সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেই গণিত সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যাইবে। এইভাবে দেখিলে গণিত বলিতে কোনও এক বিমূর্ত সেটের গঠন (স্ট্রাক্‌চার) এবং উক্ত গঠনের পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা বুঝায়। অবশ্য এই সমস্ত আলোচনার স্পষ্ট গাণিতিক আকার থাকা উচিত।

গণিতের বৈশিষ্ট্য ইহার আলোচনার সামান্যীকরণ (জেনারেলাইজেশন); বিমূর্তন (অ্যাবস্ট্র্যাকশন) ও ন্যায়সংগতি (কন্‌সিসটেন্সি)। ইহার এই ন্যায়সংগত আকারের জন্য প্রাচীন কাল হইতেই ইহা দার্শনিকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দার্শনিক প্লেটো (প্লাতোন, ৪২৮-৩৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁহার দ্বারশীর্ষে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন 'যে জ্যামিতি জানে না, তাহার প্রবেশাধিকার নাই'। সামান্যীকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইহার প্রয়োগের সাধারণ নিয়মাবলী আবিষ্কার সম্ভব হইতেছে। গণিতের বিমূর্ত প্রকৃতির জন্যই একই গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানের আপাত-সম্পর্কহীন প্রশ্নাবলীর আলোচনা ও সমাধান সম্ভবপর।

বর্তমানে গণিতের এই বিরাট ও বিমূর্ত রূপ হইতে মনে হয়, এমন একদিন আসিবে যখন মানুষ জ্ঞানের বিভিন্ন দিকে গণিতকে আরও সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিবে। বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানীরা গণিতের মাধ্যমে পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও ভাববিনিময় করিবেন। গণিতকে শুধু বিজ্ঞানেরই শাখা হিসাবে গণ্য করা হয় না; ইহাকে কেহ কেহ একটি কলা হিসাবেও অভিহিত করিয়া থাকেন। গণিতের সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে যথাযথভাবে রূপ দেওয়া সম্ভবপর। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ভাষাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতির বহু বিষয় ইহার সাহায্যে আলোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং গণিতের এমন এক অন্তর্নিহিত শক্তি রহিয়াছে যাহার জন্য ইহা মানবের জ্ঞানরাজ্যে বিশ্বজনীন ভাষা হইবার যোগ্য। 'জ্যামিতি', 'জ্যোতির্বিজ্ঞান', 'পরিমিতি', 'পরিসংখ্যান', 'পাটিগণিত', 'বলবিদ্যা', 'বীজগণিত' ও 'হিন্দু গণিত' দ্র।

দ্র সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬২, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; H. Weber, *Encyklopaedie der Elementaren Algebra und Analysis* Leipzig, 1906; Charles Darwin, *The Descent of Man*, London, 1930; B. Dutta & A. N. Singh, *History of Hindu Mathematics*, vols. I-II, Lahore. 1935; F. Klein, *Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint*, vols. 1-2, New York, 1939; E. T. Bell, *The Development of Mathematics*, New York, 1945; Lancelot Hogben, *Mathematics for the Million*, London, 1947; H. Weyl, *Philosophy of Mathematics and Natural Science*, Princeton, 1949; Max Black, *The Nature of Mathematics*, London, 1950. R. L. Wilder, *Introduction to the Foundation of Mathematics*, New York, 1952; H. Poincare, *Science and Hypothesis*, New York, 1952. H. Poincare, *Science and Method*, New York, 1952; F. Cajori, *A History of Mathematics*, New York, 1955; R. Courant and H. Robbins, *What is Mathematics*, London, 1956; H. Poincare, *The Value of Science*, New York, 1958; Brajendranath Seal, *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, Delhi, 1958.

মহাদেব দত্ত
লোকনাথ দেবনাথ

গণেশ[১] হরপার্বতীর পুত্র। ইঁহার অপর নাম গণপতি বা বিনায়ক। যে কোনও দেবতার পূজার পূর্বে গণেশের পূজা করিতে হয়। শুভকার্যের পূর্বে গণেশের নাম স্মরণ করা হয়। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নববর্ষে বা ব্যবসায়ের সূচনায় গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিয়া থাকেন। ইনি সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্ননাশক। গণেশের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যাঁহারা ইষ্টদেবতা হিসাবে গণেশকে পূজা করেন তাঁহারা গাণপত্য নামে পরিচিত। এইরূপ গণেশের উপাসক বর্তমানে অতি অল্পই আছেন। দুর্গাপূজার সময় ও ভাদ্র এবং মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে গণেশের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী গণেশ চতুর্থী নামে প্রসিদ্ধ। এই দিনে গণেশের পূজা ও উৎসব নানা স্থানে বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রে গণেশের নানা রূপের নানা মন্ত্রে পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। যথা, গণপতি, মহাগণপতি, বিরিগণপতি, শক্তিগণপতি, বিদ্যাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, লক্ষ্মীবিনায়ক, হেরম্ব, বক্রতুণ্ড, একদন্ত, মহোদর, গজানন, লম্বোদর, বিকট ও বিঘ্নরাজ। গণেশ ও তাহার শক্তির ৫১ প্রকার ভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের সচরাচর পরিচিত গণপতির ধ্যান বা বর্ণনা এইরূপ— ইনি পার্বতীনন্দন, খর্বাকার, স্থূলতনু, গজেন্দ্রবদন, লম্বোদর, সুন্দর, সিদ্ধিপ্রদ, মদগন্ধলুব্ধ ভ্রমরবৃন্দ ইঁহার গণ্ডদেশে বিচরমাণ, দন্তাঘাতে বিদারিত শত্রুর রক্তে ইনি সিন্দূরের শোভা ধারণ করেন। ইঁহার গজেন্দ্রবদন ধারণ সম্পর্কে নানারূপ কাহিনী পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ মতে (গণপতি খণ্ড ১১-১২) পার্বতীপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর দেবতাদের নির্দেশে শনি তাঁহাকে দেখিতে যান। পার্বতীর অনুরোধে শনি বালকের প্রতি

াত করিলে তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হয়। তখন বিষ্ণু উত্তর দিকে মাথা করিয়া নিদ্রিত হস্তীর মস্তক কাটিয়া আনিয়া সেই দেহের সহিত জুড়িয়া দেন। বরাহ-পুরাণের (২৩ অধ্যায়) মতে শিবমুখ হইতে উৎপন্ন অপূর্ব সুন্দর কুমার পার্বতীপ্রমুখ দেবতাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শিবের শাপে তিনি হস্তিমুখ হন। পরে শিব তাঁহাকে পুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে গণেশ নামে অভিহিত করেন। শিবপুরাণের রুদ্রসংহিতার অন্তর্গত কুমার খণ্ডের (১৩-১৮ অধ্যায়) মতে পার্বতীর গাত্রমল হইতে উৎপাদিত গণেশ পার্বতীর স্নানগৃহের দ্বারপাল নিযুক্ত হইয়া শিব ও তাঁহার অনুচরদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দিলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফলে মহাদেব দুর্জয় গণেশের শিরশ্ছেদ করেন। গজমুণ্ড সংযোগে গণেশ পুনরুজ্জীবিত হইলে পার্বতী যুদ্ধ সমাপ্তির ব্যবস্থা করেন। শিবের অনুগ্রহে গণেশ সমস্ত দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার অধিকার লাভ করেন।

গণেশ একসময়ে হরপার্বতীর দর্শনার্থী পরশুরামকে গৃহে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় পরশুরামের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয় এবং তাহার ফলে তাঁহার একটি দাঁত ভাঙিয়া যায় (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণপতি খণ্ড ৪১ ও ৪৩ অধ্যায়)। তদবধি তিনি একদন্ত। গণেশের বাহন হিসাবে মূষিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু হেরম্বের বাহন সিংহ। গণেশের কোনও কোনও রূপভেদকে কেন্দ্র করিয়া মারণাদি ষট্‌কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গণেশের কতকগুলি মূর্তি (মহাগণপতি, শক্তিগণপতি, বিরিগণপতি) শক্তি সমন্বিত ও আদি-রসাশ্রিত। বিরিগণপতি মদ্যপূর্ণ নরকপাল ধারণ করিয়া থাকেন। মহাভারতের কোনও কোনও সংস্করণ অনুসারে ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করেন তখন গণেশ উঁহার লেখক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্র লক্ষ্মণদেশিক, শারদাতিলক ; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে গণেশের একান্তিকী পূজার প্রচলন হয়, কিন্তু গণেশ গণপতির একভক্ত সম্প্রদায় বা গাণপত্যগণ আরও দুই-এক শতাব্দী পরে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গাণপত্যগণ কালক্রমে ছয়টি শাখায় বিভক্ত হন এবং তাঁহারা মহা, হরিদ্রা, উচ্ছিষ্ট, নবনীত, স্বর্ণ ও সন্তান নামীয় ছয়টি গণপতি রূপের উপাসনা করিতে থাকেন। গাণপত্যগণের প্রতিষ্ঠা অধুনা বিলুপ্ত হইলেও গণপতি আজও হিন্দুদের প্রিয় দেবতা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গণেশ-গণপতির মন্দিরগুলির মধ্যে পুনার নিকট চিঞ্চওয়াডের দেবায়তনটি সুপ্রসিদ্ধ। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কপিলাশ রোড স্টেশনের অদূরবর্তী ‘গণেশক্ষেত্র’ নামে পরিচিত মহাবিনায়ক পর্বত হিন্দুদের অন্যতম তীর্থ।

গণেশের রূপ-কল্পনার উৎস-সন্ধান দুরূহ হইলেও এইরূপ অনুমান অসংগত নয় যে ইতিহাসের কোনও এক পর্বে আদিম জাতিদের পূজিত হস্তী দেবতা বিবর্তনের সূত্রে মানব-রূপের সঙ্গে সমন্বিত হইয়া কালক্রমে গজমুণ্ডবিশিষ্ট মানবাকৃতি দেবতায় পরিণতি লাভ করিয়াছেন। গণেশের হস্তীমুণ্ড যেমন হস্তী-দেবতার স্মারক ‘তুন্দিল’ বা লম্বোদর তেমনই প্রাচীন যক্ষদেবতার রূপ-বৈশিষ্ট্যের স্মারক। ‘নিদ্দেস’ নামীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত হস্তী ও যক্ষ-দেবতার উপাসনার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গণেশের বাহন মূষিক। ইহাকেও কোনও আদিম জাতির ‘টোটেম’ বলিয়া মনে হয়।

সিংহলের মিহিনটালে অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত একটি শিলাফলকে উৎকীর্ণ ঔড়ি মারা অবস্থায় প্রদর্শিত গজমুণ্ড ও বদ-বিশিষ্ট মূর্তিটিই গণেশ গণপতির আদি-রূপের প্রাচীনতম শিল্প নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে অথবা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত হইয়াছিল। উত্তর প্রদেশের ফরুক্কাবাদ জেলায় প্রাপ্ত আনুমানিক চতুর্থ শতকের একটি প্রস্তর-মূর্তিতে দ্বিভুজ গজানন দেবতা বাম হাতে সম্ভবতঃ মোদকভাণ্ড ধারণ করিয়া শুণ্ড দ্বারা মোদক আস্বাদনে ব্যাপৃত, তাঁহার ডান হাত দন্ত স্পর্শ করিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের উদয়গিরির (মধ্য প্রদেশ) গুহাগাত্রে এবং ভূমারা (মধ্য প্রদেশ) ও ভিতরগাঁওর (উত্তর প্রদেশ) মন্দির দুইটি হইতে প্রাপ্ত ফলকে যে-গণেশমূর্তির সাক্ষাৎ মেলে তাহাতেও দেবতা শুণ্ডের দ্বারা মোদকাস্বাদনে নিরত। বস্তুতঃ শুণ্ডের সাহায্যে মোদকা-স্বাদন গাণেশমূর্তির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উপরি-উক্ত উদয়গিরির মূর্তিতে সমাসীন গণপতি ঊর্ধ্বলিঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

গণেশ গণপতির মূর্তিগুলি তিন শ্রেণীতে বিভাজ্য : ‘স্থানক’ (দাঁড়ানো), ‘আসন’ (বসা) এবং ‘নৃত্যরত’। গণেশের হস্তসংখ্যা সাধারণতঃ চার, তবে ছয়-, আট-, কিংবা দশ- হস্তযুক্ত গণেশমূর্তিও বিরল নয়। দ্বিভুজ গণেশমূর্তি অপেক্ষাকৃত কম, পূর্বোক্ত ফরুক্কাবাদের ও উদয়গিরির মূর্তি দুইটি বা মিসনে (আনাম) আবিষ্কৃত মূর্তিটি দেবতার দ্বিভুজ রূপের উদাহরণ। মিসনের মূর্তিতে দণ্ডায়মান দেবতা মোদকাস্বাদনরত, দেখিয়া মনে হয়

একজন সুখী সচ্ছল ভদ্রলোক। গণেশের হাতে মোদক-ভাণ্ড ছাড়া পরশু, অক্ষমালা, মূলকদন্ত, অঙ্কুশ, পাশ, দণ্ড, শূল, সর্প, ধনুঃ, শর ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্য দেখা যায়। তবে মোদকভাণ্ড, পরশু, অক্ষমালা, মূলক ও দন্তই তাঁহার প্রধান লাঞ্ছন।

গণেশের 'স্থানক' ও 'আসন' মূর্তির সংখ্যা প্রচুর। 'স্থানক' মূর্তির তুলনায় 'আসন' মূর্তির সংখ্যা অধিকতর। জাভার বাড়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি আসনমূর্তিতে দেবতাকে নরকপাল যুক্ত আসনের উপর সমাসীন দেখা যায়, তাঁহার জটামুকুটেও নরকপাল লাঞ্ছন। আনুমানিক একাদশ শতকের এই মূর্তিতে তান্ত্রিকতার প্রভাব স্পষ্ট, যদিও দেবতার শক্তি এখানে অনুপস্থিত। 'নৃত্য' মূর্তিগুলিতে গণেশ তাঁহার বাহনের উপর নৃত্যপর। উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত এইরূপ একটি নৃত্যমূর্তির 'প্রভাবলী'র উপর দিকের কেন্দ্রস্থলে সপল্লব আম্রগুচ্ছ দেখা যায়। আম্রের মত উৎকৃষ্ট ফল সিদ্ধির দেবতা তাঁহার ভক্তকে দিয়া থাকেন ইহাই বোধ হয় আম্রগুচ্ছ রূপায়ণের তাৎপর্য। তাঞ্জোরের একটি চোলযুগীয় লেখে গণেশের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্কের উল্লেখও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। 'স্থানক', 'আসনা'দি স্বতন্ত্র মূর্তি ছাড়া সপ্তমাতৃকার ফলকে সববামে গণেশের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ হয়।

শক্তিপূজা ও তান্ত্রিকতার প্রাধান্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গণেশকে শক্তির সহিত উপস্থাপিত করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের শক্তিসহ গণেশের মূর্তি শক্তিগণেশ, লক্ষ্মীগণেশ (এই লক্ষ্মী 'শ্রী লক্ষ্মী' নন), উচ্ছিষ্ট গণেশ ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় পরিচিত। ইহাদের মধ্যে উচ্ছিষ্টগণেশ রূপটি আদিরসাশ্রিত। দক্ষিণ ভারত হইতে কিছু উচ্ছিষ্টগণেশের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। জব্বলপুরের কাছে ভেড়াঘাটে আবিষ্কৃত গজমুণ্ডবিশিষ্ট একটি নারীমূর্তি গণেশদেবতার স্ত্রীরূপ বা 'গণেশানী' বলিয়া মনে করা হয়।

গণেশের বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে বিশিষ্ট একটির নাম হেরম্ব-গণপতি। হেরম্ব মূর্তিগুলিতে দেবতার বাহন সিংহ হইলেও নেপালের অনুরূপ কিছু মূর্তিতে মূষিক দেখা যায়। হেরম্ব-গণপতি পঞ্চমুখ-বিশিষ্ট, চারিটি মুখ এক এক করিয়া পূর্ব-পশ্চিমাদি চতুর্দিকের অভিমুখী, পঞ্চমটি আকাশ-মুখীভাবে মুখচতুষ্টয়ের উপর সংস্থাপিত। ঢাকা জেলার রামপালে আবিষ্কৃত হেরম্ব-গণপতি মূর্তিটি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, ইহার 'প্রভাবলী'র উপরিভাগে ছয়টি ক্ষুদ্রাকৃতি গণেশ-মূর্তির উপস্থিতি। এই ছোট মূর্তিগুলি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখার আরাধ্য ষড়্‌বিধ গণপতি মূর্তির প্রতীক বলিয়া মনে হয়।

দ্র T. A. Gopinath Rao, *Elements of Hindu Iconography*, vol. I, Madras, 1914; Alice Getty, *Ganesa*, Oxford, 1936; J. N Banerjea, *Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

গণেশ[২] দনুজমর্দনদেব দ্র

গণেশপ্রসাদ (১৮৭৬-১৯৩৫ খ্রী) ভারতীয় গণিতবিদ্‌। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট ডিগ্রি লইয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে কেম্ব্রিজ ও পরে জার্মানিতে গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাইন, হিলবের্ট, সমারফেল্ড প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত গণিতবেত্তাদের নিকট পাঠ সমাপন করেন। পাঁচ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া বারাণসীতে কুইন্‌স কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতে ঘোষ অধ্যাপক ও আরও পরে বিশুদ্ধ গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। যদিও একবার উত্তর প্রদেশের বিধানসভায় নির্বাচিত হন তথাপি তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন নাই। তিনি চিরজীবন গণিত চর্চায় কাটাইয়াছেন এবং শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সুনাম ছিল। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্‌ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কলিকাতা গণিতসভার (ক্যালকাটা ম্যাথিম্যাটিক্যাল সোসাইটি) সভাপতি রূপে তিনি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সভায় বক্তৃতা দান কালে তিনি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

গণ্ড গোণ্ড দ্র

গণ্ডক উত্তর ভারতের তুষারপুষ্ট নদী। ইহা নেপালের পার্বত্য উপত্যকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ধৌলাগিরি ও গোসাইথান পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী নেপাল রাজ্যের পার্বত্য উপত্যকা দিয়া প্রবাহিত কয়েকটি ছোট ছোট ধারার মিলিত প্রবাহই গণ্ডক নদী। পুরাণে ইহা 'সদানীরা' নামে উল্লিখিত এবং নেপালে 'শালগ্রামী' নামে পরিচিত। ইহার প্রধান উপধারাগুলির অন্যতম কালীগণ্ডকী পশ্চিমে অবস্থিত ধৌলাগিরি ও অন্নপূর্ণা শিখরের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার নিকট মুক্তিনাথ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। পূর্ব দিক হইতে গোসাইথান

পর্বত হইতে উত্থিত ত্রিশূলীগঙ্গা বা ত্রিশূলীগণ্ডকী দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া বুড়িগণ্ডকী, মারসিয়ান্দি (Marsyandi) ও শ্বেতীগণ্ডকীর সহিত যুক্ত হয়। পরে এই যুক্ত নদী ২৭°২৭′ উত্তর ও ৮৩°৫০′ পূর্বে কালীগণ্ডকীর সহিত মিলিত হইয়াছে। মিলিত ধারা প্রথমে নারায়ণী ও পরে গণ্ডক নামে পরিচিত হইয়া মহাভারত পর্বতমালা ভেদ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। নেপাল সীমান্তে ত্রিবেণীর নিকট ইহা শিবালিক পর্বতমালা ভেদ করিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং চম্পারন ও গোরখপুর এই দুই জেলার সীমান্ত দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল) প্রবাহিত হইয়াছে। পরে সারন, মজফ্‌ফরপুর ও চম্পারন জেলার মধ্য দিয়া প্রায় ৩০৭ কিলোমিটার (১৯২ মাইল) প্রবাহিত হইবার পর ইহা পাটনার বিপরীত দিকে (২৫°৪′ উত্তর এবং ৮৫°১২′ পূর্ব) গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ধান ও আখ গণ্ডক উপত্যকা অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই নদী চম্পারন জেলার বাগাহা পর্যন্ত সারা বৎসরই নাব্য। নেপাল ও গোরখপুরের অরণ্যভূমি হইতে এই নদীপথে কাঠ আমদানি হয়। শস্য ও শর্করাও এই নদীপথে আনীত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই নদী মাত্র ১·৬ কিলোমিটার (১ মাইল) এর এক-চতুর্থাংশ জুড়িয়া বিস্তৃত থাকে – অথচ বর্ষাকালে ইহার বিস্তার হয় ৩ বা ৪ কিলোমিটার (দুই হইতে তিন মাইল)। ত্রিবেণী খাল দ্বারা চম্পারন জেলায় জলসেচ করা হয়। ইহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সারন খাল বাহির হইয়াছে। ইহার বাম তীরে হাজীপুর প্রধান শহর। গঙ্গার সহিত সংগমের নিকটে শোণপুরে স্নানার্থীগণের এক বিশাল বাৎসরিক মেলা বসে।

দ্র L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Muzaffarpur*, Calcutta, 1907 ; Pradyumna P. Karan, *Nepal*, Lexington, 1960 ; M. S. Krishnan, *Geology of India & Burma*, Madras, 1960.

উত্তরা বসু

গণ্ডার স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অযুগাঙ্গুলি বা পেরিসসোদাক্‌তিলা বর্গের (Order-Perissodactyla) অন্তর্ভুক্ত রিনোসেরোতিদী গোত্রের (Family-Rhinocerotidae) প্রাণী। ইহাদের দেহ হৃষ্টপুষ্ট, মস্তক বৃহৎ, গাত্রচর্ম পুরু, পা দেহের অনুপাতে অনেকটা খর্বাকৃতি এবং প্রত্যেক পায়ে তিনটি ক্ষুরযুক্ত অঙ্গুলি থাকে। নাসিকার উপরিভাগে নাতিবৃহৎ একটি বা দুইটি খড়্গ জন্মে। খড়্গটি কেশের ন্যায় পদার্থের সংযোজনে গঠিত ; মস্তকের অস্থির সহিত ইহার সংযোগ নাই। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি অতি প্রখর। ইহারা উদ্ভিদভোজী, কিন্তু রোমন্থন করে না। গণ্ডার একবারে একটি মাত্র শাবক প্রসব করে। সাধারণতঃ নিরীহ হইলেও শাবক সঙ্গে থাকিলে অথবা আক্রান্ত হইলে ইহারা অত্যন্ত হিংস্র হইয়া ওঠে। গণ্ডার নিশাচর প্রাণী এবং কর্দমাক্ত জলাশয়ে থাকিতে ভালবাসে।

ভারতবর্ষে আসাম, উত্তর বঙ্গ, নেপাল, ভুটান ও হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গল, ব্রহ্ম দেশ, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্নিও, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে গণ্ডার পাওয়া যায়। আসামের গণ্ডার (রিনোসেরস উনিকর্নিস, *Rhinoceros unicornis*) দৈর্ঘ্যে প্রায় সাত হাত, উচ্চতায় প্রায় চার হাত এবং ইহার খড়্গটি প্রায় এক হাত লম্বা, ইহার গাত্রচর্ম কেশবিরল এবং স্কন্ধে ও জঙ্ঘাদেশের চর্মে কয়েকটি ভাজ থাকে— অন্যান্য স্থানের গণ্ডার এরূপ নহে। আফ্রিকার শ্বেত গণ্ডার (সেরাথোথেরিয়ম সিমস, *Cerathotherium simus*) আকৃতিতে বৃহত্তম, ইহার দুইটি খড়্গ থাকে।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতে গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধ। আসামের কাজিরঙ্গা, উত্তর বঙ্গের হাসিমারা প্রভৃতি অঞ্চলের সংরক্ষিত অরণ্যে গণ্ডার দেখিবার ব্যবস্থা আছে।

গণ্ডারের খড়্গে পুংযৌন-উদ্দীপক (অ্যাফ্রোডিসিয়াক) পদার্থ বর্তমান, এরূপ একটি প্রচলিত ধারণা আছে। গণ্ডারের চামড়া অত্যন্ত পুরু ও ঘাতসহ বলিয়া এক সময়ে ইহা ঢাল নির্মাণে ব্যবহৃত হইত।

দ্র T. J. Parker & W. A. Haswell, *A Textbook of Zoology*, vol. II, London, 1951.

জিতেন্দ্রনাথ বসু

গণ্ডোফার্নেস (রাজ্যকাল আনুমানিক ২০-৫০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম জীবনে পহ্লব সম্রাটের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। পরে আফগানিস্তানে স্বাধীনভাবে আনুমানিক ২০ হইতে ৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি এজেস-এর পর রাজা হন ও সিন্ধু দেশ ও কান্দাহার জয় করেন। পরে তিনি পেশোয়ার জেলা ও এজেসের রাজত্বের কিয়দংশ জয় করেন কিন্তু তাঁহার পুব-গন্ধার বা তক্ষশীলা জয়ের সঠিক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গণ্ডোফার্নেস সর্বশেষ গ্রীকরাজ হারমেইয়সকে বিতাড়িত করিয়া কাবুল উপত্যকা দখল করেন। কিন্তু তাহার

মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে যীশুখ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সাধু টমাস ভারতবর্ষে আসিয়া রাজা গণ্ডোফার্নেস ও তাঁহার ভ্রাতা গ্যাড্‌কে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কেহ কেহ এই দীক্ষার কথা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষে এই সময়ে গণ্ডোফার্নেস নামে সত্য সত্যই একজন রাজা ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কাহিনীই খ্রীষ্টীয় কিংবদন্তিতে স্থান পাইয়াছে। এই কিংবদন্তিতে অনেক অপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহার মূলে হয়ত কিছু সত্যও আছে। নচেৎ সুদূর আফগানিস্তানের এই রাজার নাম পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত হওয়ার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay, 1960.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

গণ্ডোয়ানা মহাদেশ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্টিকা বর্তমানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। কিন্তু ভেগেনর (Wegener) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ইঁহাদের ভূতত্ত্ব, হিমবাহবাহিত উপলখণ্ডের স্তর, উদ্ভিদ-জীবাশ্ম ও জীবজন্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অনুমান করেন, কার্বনিফেরাস যুগে ইহারা একই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কার্বনিফেরাস হিমযুগের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল দক্ষিণ ভারতে। সেইজন্য দক্ষিণ ভারতের (বর্তমান গণ্ডিয়ার নিকট) একটি প্রাচীন এবং প্রায় লুপ্ত উপজাতি 'গোণ্ড'দের নামে এই অতিকায় ভূখণ্ডটির নামকরণ হইল গণ্ডোয়ানা মহাদেশ বা গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড।

গণ্ডোয়ানা মহাদেশের উত্তরে এক মহাসাগর পূর্ব দিকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান ভূমধ্যসাগর এই মহাসাগরেরই অবশেষ মাত্র। এই মহাসাগরের নাম দেওয়া হইয়াছে 'টেথিস'। টেথিসের উত্তরে ছিল আর একটি মহাদেশ, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে লরেসিয়া। উত্তর আমেরিকা, ইওরোপ, সাইবেরিয়া ও চীন ছিল এই মহাদেশের অন্তর্গত। উভয় মহাদেশ হইতে বাহিত পলি টেথিসে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পরবর্তী যুগে চাপের ফলে এই পলি কঠিন হইয়া হিমালয় ও আল্পস পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি করে।

ভেগেনরীয় মতের পরিপন্থী মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকগণ স্থলজ উদ্ভিদ ও স্থলচর প্রাণীর সংস্থানের অন্য কারণ দেখান। তাঁহাদের মতে মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলির অবস্থান বরাবর বর্তমানের মতই ছিল, তবে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এই ভূখণ্ডগুলি যোজক দ্বারা যুক্ত ছিল। যোজকগুলির স্থায়িত্ব সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার উপর নির্ভর করিত। উহারা কখনও পানামা যোজকের মত অবিচ্ছিন্ন থাকিত আবার কখনও বেরিং প্রণালীর মত ঈষৎ বিচ্ছিন্ন থাকিত। ফলে প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রতিসরণে কোনও অসুবিধা হয় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে ভূ-গোলকের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে যে ভূখণ্ডগুলির সহিত মেরুদ্বয়ের অবস্থান আপেক্ষিকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আজ বৈজ্ঞানিকরা প্রায় একমত। যে প্রক্রিয়ায় লরেসিয়া ও গণ্ডোয়ানা এই প্রাচীন অতিকায় ভূখণ্ডদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্তমান মহাদেশগুলির সংহতি লাভ করিয়াছে তাহার প্রকৃতি ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীমহলে এখনও প্রচণ্ড মতপার্থক্য বিদ্যমান।

দ্র A. Wagener, *The Origin of Continents and Oceans*, London, 1920 , A. L. Du Toit, *Our Wandering Continents*, Edinburgh, 1937 ; J. A. Steers, *The Unstable Earth*, London, 1958

দামোদর লাহিড়ী

গৎ 'গতি' শব্দের ব্যাবহারিক প্রয়োগ অনুসারে এই শব্দটি চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ অনুমান করা হয়। ইহা রাগ এবং তালে সুসংবদ্ধ স্বরসমূহের নিবদ্ধ রূপ। বাদ্যযন্ত্রে প্রযুক্ত হয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

গতিবিদ্যা বলবিদ্যা দ্র

গদর পার্টি আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় বৈপ্লবিক দল। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে একাধিক ব্যক্তির নাম উপস্থাপিত হইবার কারণ হইল এই যে, আনুষ্ঠানিকভাবে এই দলের প্রতিষ্ঠা কালের পূর্ব হইতেই আমেরিকা-প্রবাসী কয়েকটি ভারতীয় দল স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সকল বিভিন্ন দলের সমন্বয়ের ফলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গদর পার্টির পত্তন হয় এবং ঐ সময়ে হরদয়াল ('হরদয়াল' দ্র) কার্যভার গ্রহণ করিলে দলটি শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। দলটির 'গদর' নামকরণের কারণ হইল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে

গদর পার্টি

পাঞ্জাবের কৃষক সম্প্রদায়ের কয়েকটি দল জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে এবং শ্রমজীবী রূপে জীবন যাপন করিতে থাকে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনে ইহারা যোগদান না করায় ভারতীয়দের প্রতি আমেরিকানদের মনোভাব বিমুখ হইতে আরম্ভ করে এবং ব্রিটিশ প্রচারের ফলে ইহা প্রায় ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। প্রবাসী ভারতীয়গণ এই সময় হইতে পরাধীনতার গ্লানি উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন এবং ব্রিটিশের কবল হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে ছোট ছোট দল বাঁধিয়া ঐ দেশে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে এই সকল পাঞ্জাবী বা উর্দুভাষীর সংখ্যাধিক্য হইবার ফলে এবং জাতীয়তাবোধে প্রবুদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে দলটির নাম 'গদর' রাখা হয়। 'গদর' শব্দের অর্থ বিপ্লব। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া যে কোনও উপায়ে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

নিয়মিত সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার এবং ইংরেজের অত্যাচার ও অনাচার কাহিনী নিজ 'গদর' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া উপরি-উক্ত কার্যপদ্ধতি সফল করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। 'গদর' পত্রিকাখানি ক্রমশঃ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। উহার উর্দু, মারাঠী ও গুরুমুখী সংস্করণগুলিও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রেরণা জোগাইতে থাকে। প্রধানতঃ ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগণ, ওয়াশিংটন ও ব্রিটিশ কলম্বিয়া ইহার প্রচারক্ষেত্র ছিল। সানফ্রান্সিস্কোর 'যুগান্তর আশ্রম' হইতে প্রথমে দলের কার্যারম্ভ হয়। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি লইয়া দলের কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হইত। নীতি নির্ধারণ মোটামুটিভাবে এই কমিটির কার্য ছিল, উহা কার্যকর করিবার জন্য প্রত্যেক স্টেট বা রাজ্যে উহার শাখা-সমিতি ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরাধীন দেশসমূহে এই সময়ে মুক্তি আন্দোলন প্রবল হইয়া ওঠে এবং ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে। 'গদর' পত্রিকা বিশেষতঃ ব্রিটিশ-বিরোধী সকল প্রকার আন্দোলনের খবর দিয়া প্রচার কার্য চালাইতে থাকে। প্রাচ্য দেশবাসীর আমেরিকায় স্থায়ী বসবাস নিষিদ্ধ করিয়া এই সময়ে আইন বিধিবদ্ধ হয়। প্রবাসী ভারতীয়গণ ইহাতে বিপন্ন হইয়া পড়ে। হরদয়াল তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করেন। এই সময় তিনি আমেরিকার সিণ্ডিক্যালিস্ট দলের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতা দেওয়ার ফলে মার্কিন সরকারের বিরাগভাজন হন এবং ইহার সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ কাউন্সিল হরদয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলে 'অনভিপ্রেত ব্যক্তি' বলিয়া হরদয়ালকে গ্রেফতার করা হয়। জামিনে খালাস থাকা কালে হরদয়াল জেনিভায় পলায়ন করেন। রামচন্দ্র নামে তাঁহার অনুগামী তখন কার্যভার গ্রহণ করিয়া ভগবান সিং এবং মহম্মদ বরকতুল্লার সাহায্যে পার্টির কাজ চালাইতে থাকেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জার্মান সরকারের পৃষ্ঠপোষিত বার্লিন কমিটি নামে ভারতীয় বিপ্লবী দল গদর পার্টির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া ভারতে বিদ্রোহ ঘটাইবার আয়োজন করে। গদর দলের সহায়তায় বিদ্রোহের প্রাথমিক কার্য করিবার জন্য দূর প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের ভিতর দিয়া বিপ্লব ঘটাইবার জন্য শিক্ষিত লোক ভারতে প্রেরণ করা হইবে এবং ভূমি প্রস্তুত হইলে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থাদি প্রেরণ করা হইবে এইরূপ স্থির হয়। শ্যাম দেশের মধ্য দিয়া একদল ভারতে প্রবেশ করে। কিন্তু জওয়ালা সিংহের অধীনে একটি বড় দল কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র ধরা পড়ে। এই চেষ্টা বিফল হওয়ায় জার্মান সরকার 'ম্যাভেরিক' জাহাজে আমেরিকা হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতে চেষ্টা করে। 'অ্যানি লারসেন' নামক ছোট জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে ম্যাভেরিকে তাহা পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নানা কারণে এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হয় নাই, সুতরাং 'ম্যাভেরিক' জাহাজখানিতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হয় নাই। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী জার্মান সরকারের সাহায্যপুষ্ট হইয়া সারা এশিয়ায় আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন কিন্তু সাহায্যের মৌখিক আশ্বাস ভিন্ন অপর কোনও প্রকার সহায়তা তিনি জার্মান প্রভৃতি স্বাধীন দেশসমূহ হইতে আদায় করিতে পারেন নাই। এই সময়ে আমেরিকার ভারতীয় বৈপ্লবিক দলগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া যায়। জার্মান সরকারের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইয়াও তাঁহাদের কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নিরপেক্ষতা আইন অমান্য করিবার অভিযোগে চক্রবর্তী গ্রেফতার হন এবং তাঁহার সকল সহযোগীর নাম বলিয়া দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরেই রামচন্দ্র ও তাঁহার দলের ১৬ জন ভারতীয় সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো শহরে গ্রেফতার হন। শিকাগো ও অন্যান্য শহরেও কিছু ভারতীয় গ্রেফতার হন। মোটের উপর ১০৫ জনের বিরুদ্ধেও ষড়্‌যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। সান্‌ফ্রানসিস্কোতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিচার-

কার্য আরম্ভ হয়। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী সমস্ত ষড়্‌যন্ত্রের কথা ব্যক্ত করেন। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধেও অনেকের গভীর অবিশ্বাস ছিল। বিচারের শেষ দিনে রাম সিং নামে এক আসামী রামচন্দ্রকে গুলি করিয়া হত্যা করে। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর ৩০ দিন কারাবাস ও ৫০০০ ডলার জরিমানা হয়। অন্য ১৩ জন ভারতীয় ২২ হইতে ২ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। ‘বিপ্লব আন্দোলন’ দ্র।

দ্র R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. II, Calcutta, 1963.

গদাধর দাস নিত্যানন্দের পরিকর। বরাহনগরের নিকটস্থ আড়িয়াদহ বা এঁড়েদহে ইঁহার শ্রীপাট। ইনি সর্বদা গোপীভাবে বিভোর থাকিতেন। গদাধর দাস কাজীকেও ‘হরি বোল’ বলাইয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দেখাশুনা করিতেন। তাঁহাদের তিরোধানের পর ইনি কাটোয়ায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। গদাধর দাসের তিরোভাব উৎসবের কথা ভক্তিরত্নাকরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

বিমানবিহারী মজুমদার

গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সহচর। পিতার নাম মাধব মিশ্র। মাধবেন্দ্রপুরীর গৃহী শিষ্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট গদাধর পণ্ডিত দীক্ষা গ্রহণ করেন। গয়া হইতে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলে গদাধরই সর্বদা তাঁহার সাহচর্য করিতেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গদাধরও পুরীতে আসিয়া ক্ষেত্র সন্ন্যাস অর্থাৎ আমরণ বাস স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে গদাধরের তিরোভাব হয়। বাসু ঘোষের মতে শ্রীচৈতন্য গদাধর সেবিত গোপীনাথের মন্দিরেই অন্তর্ধান করেন। গদাধর পণ্ডিতের অনেক কবি ও পণ্ডিত শিষ্য ছিল। গদাধরকে শ্রীচৈতন্যের শক্তি বলা হয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্বাগ্রে গৌর-গদাধর মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়।

বিমানবিহারী মজুমদার

গদাধর ভট্টাচার্য (আনুমানিক ১৬০৪-১৭০৯ খ্রী) নব্য-ন্যায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও টীকাকার। তাঁহার রচিত ‘গদাধরী টীকা’ই রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতি টীকার বিস্তৃত ব্যাখ্যা। রঘুনাথ শিরোমণির পরবর্তী কালে বাংলা দেশের নৈয়ায়িক সমাজে মৌলিকতার দাবিতে তিনি সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গদাধরের গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ নানা স্থান হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ ১০১১ সালের (১৬০৪ খ্রী) তাঁহার জন্ম হয় এবং ১১১৫ সালে (১৭০৯ খ্রী) মৃত্যু হয়। গদাধরের গ্রন্থ রচনার কাল ১৬৪০-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। গদাধরের ন্যায়শাস্ত্রের গুরুর নাম হরিরাম তর্কবাগীশ। হরিরাম গদাধরের গুরু-শিষ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে।

দ্র দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, বঙ্গে নব্য ন্যায় চর্চা, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল

গন্ধক বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে গন্ধক ও গন্ধক যৌগিকের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এ দেশে গন্ধক-ঘটিত বিবিধ যৌগিক পদার্থ পাওয়া গেলেও মৌলিক পদার্থ রূপে গন্ধক তেমন পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ আগ্নেয়-গিরি প্রধান অঞ্চলে গন্ধক খনিজ রূপে পাওয়া যায়। তাই এশিয়া ভূখণ্ডে জাপানে গন্ধক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। ইতালি, সিসিলি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বহুল পরিমাণে গন্ধকের সঞ্চয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ পাললিক শিলাপ্রধান অঞ্চলে গন্ধক দেখা যায়। সালফেট-জাতীয় গন্ধক যৌগিক বিজারণ করিয়া কোনও কোনও ব্যাকটিরিয়া গন্ধক উৎপাদন করে বলিয়া প্রকাশ। ধাতব যৌগ হিসাবে গন্ধক ধাতব সালফাইড (যেমন কপার সালফাইড, মার্কারি সালফাইড ইত্যাদি) বা সালফেট রূপে (যেমন জিপসাম, এপসম সল্ট ইত্যাদি) পাওয়া যায়। কোনও কোনও খনিজ জলে ও উষ্ণ প্রস্রবণের জলে অন্যান্য খনিজ যৌগিকের সহিত সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গন্ধকজাত যৌগিক মিশিয়া থাকে। অনেক জৈব পদার্থে গন্ধক যৌগ অবস্থায় থাকে। পেঁয়াজ, রশুন, মূলা, শালগম, সরিষা ও সরিষার তৈল, নখ, চুল, শৃঙ্গ প্রভৃতিতে গন্ধক যৌগিক থাকে। বহু গন্ধক যৌগিক সংশ্লেষিত হইয়াছে এবং ভেষজগুণের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ‘সালফা ড্রাগস্’ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইতালি, সিসিলি, জাপান, আমেরিকার লুইসিয়ানা, টেক্সাস, মেক্সিকো অঞ্চল হইতে বহুল পরিমাণে গন্ধক উত্তোলন করা হয়। আমেরিকায় ভূগর্ভের ১৫২ মিটারেরও (৫০০ ফুট) অধিক গভীর প্রদেশ হইতে ফ্রাশ উদ্ভাবিত পদ্ধতি (১৮৯১ খ্রী) অবলম্বনে গন্ধক উত্তোলন করা হয়।

এই প্রণালীতে অতি মাত্রায় উত্তপ্ত বাষ্প নলপথে ভূগর্ভের গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট করানো হয়। সেই তাপে ভূগর্ভে কঠিন গন্ধক গলিয়া তরল অবস্থায় আসে, চাপ ব্যবহারে সেই তরল গন্ধক নলপথে ভূপৃষ্ঠে উঠাইয়া আনা হয়। ভূপৃষ্ঠে শীতল হইয়া তরল গন্ধক আবার কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই উপায়ে প্রাপ্ত গন্ধক প্রায় বিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব।

ধাতুর সহিত গন্ধক যুক্ত হইলে ধাতুর কাঠিন্য, প্রসারতা, নমনীয়তা, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি গুণ নষ্ট হয় বলিয়া প্রাচীনেরা জানিতেন। তাই গন্ধক ধাতুঘ্ন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। চরক, সুশ্রুত, রসহৃদয়ে গন্ধক এবং গন্ধক যৌগিকের উল্লেখ আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে ত্রিবিধ গন্ধকের উল্লেখ আছে। রসায়নবিদ্যা অনুসারে গন্ধকের অ্যালোট্রপি ধর্ম বর্তমান, অর্থাৎ মৌলিক গন্ধকের বিভিন্ন রূপবিকার দেখা যায়, ইহাদের ভৌত ধর্ম অনেকাংশে পৃথক হইলেও রসায়নগত দিক দিয়া ইহারা গন্ধক ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ নয়। গন্ধকের শ্বেত, পীত, রক্ত প্রভৃতি বর্ণ, কেলাসের গঠনের বৈষম্য, গন্ধের পার্থক্য প্রভৃতি রূপবিকার জানা গিয়াছে।

বারুদের মশলায় গন্ধক ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ইহা গন্ধকের মুখ্য ব্যবহার নয়। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক ও গন্ধক ঘটিত খনিজ আয়রন পাইরাইটিস ব্যবহৃত হয়। গন্ধক হইতে ক্যালসিয়াম বাইসালফাইট প্রস্তুত হয়, ইহা কাগজ নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দ্রাক্ষাফলে ও দ্রাক্ষালতায় ছত্রাক নিবারণের জন্য গন্ধক চূর্ণ ব্যবহার করা হয়। চর্মরোগে গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত মলম ব্যবহৃত হয়। মাটিতে স্বল্প পরিমাণে (এক কিলোগ্রামে মাত্র ০·০২৩ গ্রাম) গন্ধক থাকিলে আলু, পেঁয়াজ, গাজর, বিট -জাতীয় সবজির চাষ ভাল হয়। রবার ভাল্‌ক্যানাইজ করিতে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। সালফার ক্লোরাইড (গন্ধকের দ্রাবক), কার্বন ডাইসালফাইড দ্রাবক, সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস (রেশম, পশম, বিরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়), সিঁদুর প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ গন্ধক হইতে প্রস্তুত হয়।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

গন্ধতৈল সুগন্ধযুক্ত প্রকৃতিজাত তৈল (উদ্বায়ী তৈল, এসেন্‌শল অয়েল্‌স)। সাধারণতঃ গন্ধতৈল বলিতে যে সুগন্ধমিশ্রিত কেশতৈল বুঝায় তাহা এই উদ্বায়ী গন্ধতৈল-মিশ্রিত তিল, নারিকেল, এরণ্ড ইত্যাদির তৈল।

নানা প্রকার সুগন্ধ ফুল, মূল, পাতা বা ছাল হইতে বিভিন্ন প্রকার গন্ধতৈল পাওয়া যায়। কস্তুরী মৃগ, গন্ধগোকুল (সিভিট) ইত্যাদি প্রাণীর দেহ হইতেও গন্ধতৈল পাওয়া যায়। গন্ধধারক বস্তু হইতে গন্ধতৈল পৃথক করিয়া লইবার সর্বাধিক প্রচলিত উপায় জলবাষ্প পাতন (স্টিম ডিস্টিলেশন)। গন্ধধারক বস্তুটি একটি বকযন্ত্রে অল্প জলসহ রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া জলবাষ্প চালনা করা হয়। গন্ধতৈলের বাষ্প বহন করিয়া ঐ জলবাষ্প শীতল পরিবেশে স্থাপিত দ্বিতীয় কলসে আসিয়া ঘনীভূত ও সংগৃহীত হয় এবং গন্ধতৈল পৃথক হইয়া জলের উপরে ভাসিতে থাকে। এ দেশে এই দ্বিতীয় কলসে কিছু চন্দনতৈল রাখা হয়, ইহা গন্ধতৈলকে দ্রবীভূত করিয়া রাখে। এইরূপে গোলাপ, বেলা, জুঁই, চামেলী, খসখস ও বকুলের গন্ধতৈল জলবাষ্প-পাতন পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত হইয়া চন্দনতৈলে ধৃত হয়। ইহাদের আতর বলা হয় ('আতর' দ্র)। গন্ধতৈল নিষ্কাশনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি অবশ্য দ্রাবক নিষ্কাশন (সলভেন্ট এক্সট্রাকশন)। কিন্তু ইহা ভারতে বিশেষ প্রচলিত নহে।

শ্যাম্পু, সাবান ও পোমেডে উপরি উক্ত কোনও উপায়ে নিষ্কাশিত এক বা একাধিক গন্ধতৈল মিশ্রিত থাকে। গন্ধতৈলের উদ্বায়ন মন্দতর করিতে পারে এমন বস্তু যথা, লবণ, ধূপ, বৃক্ষজাত আঠা বা বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য গন্ধের স্থায়িত্ব বাড়াইবার জন্য মিশানো হয়। কয়েকটি গন্ধতৈলের মিশ্রণে নূতন নূতন গন্ধ উৎপন্ন করা যায়।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

গন্ধবণিক জাতিব্যবস্থা দ্র

গন্ধমাদন হিমালয় পর্বতের অংশ বিশেষ। কৈলাস পর্বতের নিকটে অবস্থিত। মহাভারতে বলা হইয়াছে যে এই পর্বতের কদলীবনে হনুমানের বাসস্থান ছিল (মহাভারত, পুনা সংস্করণ ৩।১৪৬।৪২)। ইহা ভগবতীর অন্যতম পীঠস্থান, ভগবতী যে রূপে এখানে বিরাজমান তাহা কামুকী নামে পরিচিত (দেবী ভাগবত ৭।৩০।৫৬)। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে গন্ধমাদন পর্বতের উল্লেখ আছে। শক্তিশেল অস্ত্রে অচৈতন্য লক্ষ্মণের পুনরুজ্জীবনের জন্য ঔষধ সংগ্রহ করিতে হনুমান এই পর্বতে উপস্থিত হন এবং ঔষধ চিনিতে অক্ষম হইয়া শৃঙ্গসমেত পর্বত উৎপাটন করিয়া আনয়ন করেন। এই ঘটনা হইতে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস একসঙ্গে আনাকে গন্ধমাদন আনা বলা হয়।

যূথিকা ঘোষ

গন্ধর্ব আদি গন্ধর্ব প্রথম মানবযুগল যম ও যমীর পিতা ছিলেন (ঋগ্বেদ ১০।১০।৪)। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে গন্ধর্বগণ বাচের নিকট বেদ ব্যক্ত করেন (শ. ব্রা. ৩)। পরবর্তী সাহিত্যে দেবযোনি বিশেষ গন্ধর্বগণ স্বর্গের গায়ক ছিলেন। সংগীতশাস্ত্র গন্ধর্ববেদ নামে প্রসিদ্ধ। কোষকার জটাধরের মতে আট জন প্রধান গন্ধর্ব ছিলেন, যথা: হাহা, হূহূ, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু, গোমায়ু, তুম্বুরু ও নন্দি। অগ্নিপুরাণে গণভেদ অধ্যায়ে ১১ জন প্রধান গন্ধর্বের উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে গন্ধর্বলোকের বর্ণনা আছে। কাদম্বরী হইতে আমরা জানি যে প্রজাপতি দক্ষের দুই কন্যা ছিলেন মুনি ও অরিষ্টা। মুনির পুত্র ছিলেন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ। তিনি চৈত্ররথ উদ্যান নির্মাণ ও অচ্ছোদ সরোবর খনন করেন। অরিষ্টার পুত্র হংস অপ্সরা গৌরীকে বিবাহ করেন। ইহাদের কন্যার নাম মহাশ্বেতা। মহাভারতে অর্জুনের সহিত চিত্ররথের যুদ্ধের কথা আছে (আদিপর্ব, ১৭০ অধ্যায়)। যুদ্ধে দগ্ধরথ হইয়া চিত্ররথ অর্জুনকে চাক্ষুষীবিদ্যা ও ৫০০ গান্ধর্ব অশ্ব দান করেন। গোপালতাপনী উপনিষদে শ্রেষ্ঠা গোপীর নাম গান্ধর্বী। অথর্ববেদে গন্ধর্বগণের অমঙ্গল সাধনের ক্ষমতার কথা উল্লেখ আছে (অথর্ববেদ ৪, ৩৭)। বাংলা দেশে সুপুরুষ হিসাবেও গন্ধর্বদের খ্যাতি আছে। সুন্দর লোককে গন্ধর্বতুল্য বলা হয়।

দ্র মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, কাদম্বরী, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৫৭ শকাব্দ; শব্দকল্পদ্রুম, কলিকাতা, ১৯৩১; Monier Williams, *Sanskrit-English Dictionary*, Oxford, 1951.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

গন্ধেশ্বরী গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের কুলদেবী। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ইনি বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিন বণিক্ জাতির শত্রু গন্ধাসুরকে বধ করিয়া গন্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হন। তাই বৈশাখী পূর্ণিমা ইহার বিশেষ পূজার ও গন্ধবণিক্ সমাজের মহোৎসবের দিন। পূজাপদ্ধতি গ্রন্থে ইনি দুর্গার রূপভেদ হিসাবে পরিগণিত। দুর্গার ধ্যানেই ইহার পূজা হয়। তবে ইহার প্রচলিত মূর্তি জগদ্ধাত্রীর অনুরূপ। ইনি চতুর্ভুজা ও সিংহোপরি সমাসীনা। ইহার পূজার অন্যতম উদ্দেশ্য বাণিজ্য বৃদ্ধি; পূজার সংকল্পে এই উদ্দেশ্য উল্লিখিত হইয়া থাকে।

দ্র গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গন্ধবণিকতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ; সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পুরোহিতদর্পণ, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গভর্নর রাজ্যপাল দ্র

গভর্নর-জেনারেল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতস্থ রাজ্যের শাসনপদ্ধতি লর্ড নর্থ-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট নামে আইন দ্বারা আমূল পরিবর্তিত হয়। এই আইনের বলে বঙ্গ দেশের শাসনভার একজন গভর্নর-জেনারেল-এর সহিত চারি জন সদস্যযুক্ত একটি শাসন পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। অধিকন্তু স্থির হয় যে কতকগুলি বিষয়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নর ও তাঁহাদের প্রত্যেকের শাসন পরিষদ গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার শাসন পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন বলবৎ হয়। এই ব্যবস্থা আশানুরূপ কার্যকর না হওয়ায় বিলাতের পার্লামেন্ট ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট নামে একটি নূতন আইন প্রবর্তন করেন। ইহা পিট্স ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট নামে খ্যাত। এই আইন অনুসারে পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বোর্ড অফ কন্ট্রোল নামে একটি সমিতিকে ভারত-শাসন ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়। নামে কোম্পানির বিলাতের ডিরেক্টারগণের অধীন থাকিলেও কতকগুলি বিষয়ে গভর্নর-জেনারেল অতঃপর বোর্ড অফ কন্ট্রোল বা পার্লামেন্ট-এর অধীন হইলেন।

গভর্নর-জেনারেলের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কমাইয়া তিন করা হইল এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নরের উপর সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি আইনে স্থির হইল যে বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে গভর্নর-জেনারেল সেনাপতির পদ গ্রহণ এবং তাঁহার পরিষদের সদস্যের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধেও কার্য করিতে পারিবেন। ১৭৯৩ ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আইনে মাদ্রাজ ও বোম্বাই সম্পূর্ণ রূপে সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলের অধীন হইল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আইনে আইন-কানুন বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন নূতন সদস্য পরিষদে যোগ করা হইল।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিহার ওড়িশা ও আসামের শাসনভার একজন লেফ্টেন্যান্ট গভর্নর-এর উপর ন্যস্ত হইলে গভর্নর-জেনারেল কেবল সর্বভারতীয় শাসন ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত হন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে ভারতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ রাজের হস্তে ঐ ক্ষমতা

সম্পূর্ণভাবে অর্পিত হয়। এই সময় হইতে গভর্নর-জেনারেলের পদ রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয়-এর পদের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। কতকগুলি ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেল স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী হইলেও সাধারণভাবে তদানীন্তন ভারত সরকারের এই সর্বোচ্চ শাসক ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল এই যুগ্ম নামে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত অভিহিত হইতেন। অবশ্য এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে গভর্নর-জেনারেলের শাসন পরিষদের ও ক্ষমতার অনেক অদলবদল হইয়াছে।

গম ধান্যগোত্রের (ফ্যামিলি গ্রামিনিঈ, Family-Gramineac) অন্তর্গত একবীজপত্রী, বর্ষজীবী, শীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। গম গাছের কাণ্ড ও শাখা গাঁটযুক্ত, পত্র দীর্ঘ সরু ও রেখাকার এবং পত্রবিন্যাস দ্বিসারি। গুচ্ছমূল দ্বারা ইহা মাটি হইতে খাদ্যরস সংগ্রহ করে। পুষ্পবিন্যাসকে অক্ষমঞ্জরী বা স্পাইকলেট বলা হয়। পুষ্পের চারিটি মঞ্জরীপত্র, তন্মধ্যে নিম্নের তিনটিকে 'গ্লুম' ও উপরের মঞ্জরীপত্রটিকে 'প্যালিয়া' বলা হয়। দুইটি ক্ষুদ্র, পাতলা ও পুরু 'লডিকিউল' দল বা পুষ্পপুটের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। পুংকেশর ও গর্ভপত্রের সংখ্যা তিন। গমের ফল একবীজযুক্ত, শুষ্ক ও অবিদারী। ইহাতে বীজত্বক ও ফলের আবরণ পরস্পর যুক্ত হইয়া থাকে। বীজের মধ্যে এককোণে থাকে ভ্রূণ, অবশিষ্টাংশ ভরিয়া থাকে খাদ্যবস্তু। গম মানবের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য।

ত্রিতিকম (Triticum) গণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির গম গাছ আছে, তন্মধ্যে ত্রিতিকম ভুল্‌গারে (Triticum vulgare), ত্রিতিকম আএস্তিভুম (T. aestivum) ও ত্রিতিকম ডুরুম (T. durum) প্রভৃতির গমই অধিক পরিমাণে চাষ করা হয়। সাধারণতঃ গম গাছগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয় — ১. আইন্‌কোর্ন (Eincorn) বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম মোনোকোক্কম (T. monococcum)। ইহা অতি প্রাচীন উদ্ভিদ, ইহা হইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গম উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ইওরোপের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষতঃ স্পেনে ইহার কিছু কিছু চাষ হয়, সাধারণতঃ পশুখাদ্যের জন্যই ইহা ব্যবহৃত হয়। ২. এমের (Emmer) : বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম দিকোক্কম (T. dicoccum)। ইহাও খুব প্রাচীন উদ্ভিদ। ইহা শুষ্ক অঞ্চলে জন্মায়। স্পেন, ইতালি, জার্মানি ও রাশিয়ায় ইহার চাষ করা হয়। ৩. স্পেল্ট : বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম স্পেল্‌তা (T. spelta)। ইহাও একটি পুরাতন প্রজাতি। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, বিশেষতঃ স্পেনে এখনও ইহার চাষ হইয়া থাকে। ৪. পোল্যাণ্ডীয় গম : বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম পোলোনিকম (T. polonicum)। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই গাছ আকারে বড়, কিন্তু ইহার ফলনের পরিমাণ কম। স্পেন, ইতালি, ইথিওপিয়া, তুর্কীস্তান প্রভৃতি দেশে এখনও ইহার চাষ করা হয়। ৫. পোলার্ড গম (Poulard wheat) : বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম তুর্গিদম (T. turgidum)। ইহার ফলন কম ও ইংল্যাণ্ডের বাহিরে সাধারণতঃ ইহার চাষও কম। ৬ ক্লাব গম : বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম কোম্‌পাক্‌তুম (T. compactum)। ইহা অনুর্বর ক্ষেত্রে জন্মাইতে পারে। মধ্য ইওরোপ, তুর্কীস্তান ও ইথিওপিয়ায় ইহার চাষ হয়। ৭. ম্যাকারোনি গম : বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম ডুরুম (T. durum)। বহুদিন ধরিয়া ইহা পৃথিবীর শুষ্ক অঞ্চলে চাষ হইয়া আসিতেছে। স্পেন, আলজিরিয়া, ভারতবর্ষ, রাশিয়া ও আমেরিকার কোনও কোনও অঞ্চলে ইহার চাষ হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে ইহার চাষ সম্ভব। ৮. টিমোফেভি গম : বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম তিমোফেভি (T. timopheevi)। রাশিয়ায় আবিষ্কৃত এই প্রজাতির গম সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। ৯. ভুল্‌গারে গম : বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিতিকম ভুল্‌গারে (T. vulgare)। ইহাই সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অধিক পরিমাণে চাষ করা হইয়া থাকে।

শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে গমের চাষ ভাল হয়। বার্ষিক অন্ততঃ প্রায় ২৩ সেন্টিমিটার পরিমাণ এবং চাষের সময়ে অন্ততঃ ৯০ দিন বৃষ্টির প্রয়োজন। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু গম চাষের উপযোগী নহে। চাষের জন্য এঁটেল কর্দম বা ভারী দোআঁশ মাটি উৎকৃষ্ট। জমিতে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক।

ভারতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ গমের বীজ বপন করা শ্রেয়। মাটিতে সবুজ সার দিবার জন্য অনেক সময় গমের জমিতে জুন মাসের শেষ দিকে শণ, বরবটি প্রভৃতির চাষ করা হয় ও প্রায় ৮ সপ্তাহ পরে সবুজ গাছগুলিকে লাঙল দিয়া জমিতে মিশাইয়া দেওয়া হয়, এই গাছগুলি হইতে প্রচুর নাইট্রোজেন জমিতে সঞ্চিত হয়। সবুজ সার ব্যতীত অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপারফসফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সারও ব্যবহার করা যায়। প্রতি হেক্টর জমিতে ১১৫ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ১৬৮ কিলোগ্রাম সুপারফসফেট সার প্রয়োগ করা বিধেয়। সুপারফসফেট সার বীজ বপনের পূর্বে প্রয়োগ করিতে হয়। জমিতে খারিফ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকিলে গমের বীজ

বপনের সময়েই অ্যামোনিয়াম সালফেট সার দিতে হয়, নচেৎ জমিতে বীজ বপনের পর প্রথম জলসেচের সময় এই সার দেওয়া উচিত। জমিতে সঞ্চিত জল কম থাকিলে বীজ বপনের প্রায় ৪০ দিন পরে, ৬০ হইতে ১০০ দিনের মধ্যে এবং গমের দানা গঠিত হওয়ার সময়— অন্ততঃ এই তিন বার জমিতে জলসেচের প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে যে, গম ও ছোলা বা মটর সমপরিমাণে মিশাইয়া একত্রে চাষ করিলে গমের উৎপাদন বাড়ে।

দ্র A. F. Hill, *Economic Botany*, Tokyo, 1952, P. C. Raheja, *New Pusa Method of Wheat Production*, New Delhi, 1961.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

নব্য প্রস্তর যুগ হইতেই মানুষ গমের চাষ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ যব ও এমের গম বন্য অবস্থায় পাশাপাশি জন্মাইত এবং মানুষ কৃষিকার্য আরম্ভ করার পর এই দুই শস্যই প্রথম চাষ করিতে থাকে। বোধ হয় পশ্চিম এশিয়ায় আনুমানিক ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বেই গমের চাষ আরম্ভ হয়। নব্য প্রস্তর যুগে মধ্য ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এমের গমের চাষ প্রবর্তিত হয়। মিশরে প্রস্তর যুগের শেষ দিকের কোনও কোনও সমাধিতে শবদেহের নিকট রক্ষিত পাত্রে এমের গম পাওয়া গিয়াছে। নীল নদের উর্বর উপত্যকায় ক্রমে গমের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, মিশরে পুরাতন রাজ্যে (ওল্ড কিংডম, আনুমানিক ২৯৮০-২৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) শস্যাগার এমের গমে পূর্ণ থাকিত। সুমেরীয় সভ্যতার আদি যুগে (আনুমানিক ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সুমেরের অধিবাসীগণ গমের চাষ শেখে এবং তিগ্রিস ও এউফ্রাতেস নদীর সমতল ভূমিতে উহার চাষ করিতে থাকে। সিন্ধু দেশে মহেঞ্জো-দড়োর (আনুমানিক ২৮০০-২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ধ্বংসস্তূপেও গম পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া রাজ্যে (আনুমানিক ২১০০-১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং এশিয়া মাইনরের হিত্তী রাজ্যে (আনুমানিক ১৭৭০-১১৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য ছিল এমের গম। পরবর্তী কালে বিশেষতঃ গ্রীক ও রোমান আমলে, ইওরোপ ও এশিয়ায় ক্রমশঃ এমের গমের পরিবর্তে বিভিন্ন আধুনিক প্রজাতির গমের চাষ প্রচলিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকা মহাদেশে আস্তেক ও অন্যান্য আদিবাসীদের নিকট গমের চাষ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তাহাদের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল ভুট্টা।

বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া বিশেষতঃ ইউক্রেন, দানিয়ুবের সমতল ক্ষেত্র, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ-পূর্ব ব্রিটেন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর ও মধ্য চীন, উত্তর-পশ্চিম ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল পৃথিবীর মুখ্য গম উৎপাদক অঞ্চল বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতে উৎপন্ন গম সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪·৫ ভাগ মাত্র। ভারতের উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব-হরিয়ানা, মধ্য প্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের গম উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মোট গম উৎপন্ন হইয়াছিল প্রায় ৭৫২০০০০ মেট্রিক টন, তাহার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের উৎপাদন (মেট্রিক টনে) ছিল: উত্তর প্রদেশ— ২৩৪০০০০, মধ্য প্রদেশ— ১৭৬০০০০, পাঞ্জাব— ১৩২০০০০, বোম্বাই – ৭৯০০০০, রাজস্থান— ৭১০০০০, বিহার — ৩৫০০০০ এবং অন্যান্য রাজ্য - ২৮০০০০। সমসাময়িক কালে ভারতে প্রায় ১২০০০০০০ হেক্টর এরও অধিক জমিতে গমের চাষ হইত ('কৃষি' দ্র)।

উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব-হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে গম অন্যতম মুখ্য খাদ্য। আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, ওড়িশা, কেরল, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে গমের ব্যবহার কম। গম প্রধানতঃ আটা, ময়দা ও সুজি রূপে খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুজরাত অঞ্চলে আংশিক ভগ্ন গমের খিচুড়ির প্রচলন আছে।

গমে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ জল, ৭২ ভাগ কার্বো-হাইড্রেট, ১২·৫ ভাগ প্রোটিন, ২ ভাগ স্নেহ পদার্থ, ১·৫ ভাগ অজৈব লবণ ও যথেষ্ট পরিমাণে থিয়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, পাইরিডক্সিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড প্রভৃতি বি-বর্গীয় ভিটামিন থাকে। চালের তুলনায় গমে প্রোটিন ও ভিটামিন বি এর পরিমাণ অধিক। অবশ্য অন্যান্য বহু উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মত গমের প্রোটিনেও সকল প্রকার অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড নাই। সেজন্য খাদ্যমূল্যের দিক দিয়া গমের প্রোটিন মাছ মাংস ডিম বা ছানার প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। গমের প্রোটিনগুলির মধ্যে গ্লায়াডিন, গ্লুটেনিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গমের কার্বোহাইড্রেট মুখ্যতঃ শ্বেতসার বা স্টার্চ, ইহা ছাড়া কিছু শর্করা ও অল্প কিছু সেলুলোজ ঘটিত তন্তুও গমে বর্তমান। অজৈব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও ফসফরাস-ঘটিত লবণ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গমে ফাইটিক অ্যাসিড নামক একটি ফসফরাস-ঘটিত পদার্থ চালের তুলনায় বেশি থাকে, ইহা খাদ্যের ক্যালসিয়ামের বিশোষণ যথেষ্ট হ্রাস করে।

আটায় ময়দার তুলনায় প্রোটিন, ভিটামিন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও তন্তুর পরিমাণ অধিক, বর্তমানে বিভিন্ন উন্নত দেশে ময়দার সহিত অতিরিক্ত থিয়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ মিশাইয়া দেওয়া হয়। সুজিতে ময়দার তুলনায় প্রোটিন অধিক, কিন্তু শ্বেতসার কম। তন্তুর পরিমাণ কম থাকায় আটা বা ময়দার তুলনায় সুজি সহজপাচ্য।

১০০ গ্রাম গমের খাদ্যমূল্য প্রায় ৩৬০ কিলোক্যালরি ('খাদ্য' দ্র), ১০০ গ্রাম রুটির খাদ্যমূল্য প্রায় ২৬০ কিলোক্যালরি, কিন্তু ১০০ গ্রাম ভাতের খাদ্যমূল্য মাত্র ১২০ কিলোক্যালরি।

দ্র J M. Hector, *Introduction to the Botany of Field Crops*, vol I, Johannesburg, 1936, Statistical Office of the United Nations, Department of Economic & Social Affairs, *Statistical Year-Book 1958*, New York, 1958.

দেবজ্যোতি দাশ

গমক সংগীতশাস্ত্র অনুসারে স্বরের কম্পনকে গমক বলা হয়। একটি স্বর একটি বিশেষ শক্তিতে সম্ভূত হইয়া আর শক্তির দ্বারা কম্পিত করিয়া একবার বা ততোধিকবার উচ্চারিত হইলে তাহাকে গমক আখ্যা দেওয়া হয়। শাস্ত্রে বহু প্রকার গমকের উল্লেখ আছে। বর্তমানে প্রধানত গীতে এবং বীণা জাতীয় বাদ্যে বহু প্রকার গমকের ব্যবহার আছে।

দ্র শার্ঙ্গদেব, সংগীতরত্নাকর; পার্শ্বদেব, সংগীতসময়সার।

[illegible]

গম্ভীরা মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত লোকগীত। দেবাদিদেব মহাদেবকে গ্রামের প্রধান এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া, সমাজের ভালমন্দ যাহা কিছুর জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হয়। প্রতি বৎসর গম্ভীরার দলে নূতন নূতন গান রচনা করা হয় এবং সেই সব গানে উন্নতি বা অবনতি-মূলক যে সমস্ত কাজ গত এক বৎসরে ঘটিয়াছে সেগুলির সমালোচনা থাকে। নিত্য নূতন গীত রচনা হওয়াতে গম্ভীরা সুর এবং বিষয় সম্বন্ধে অন্য যাবতীয় লোকসংগীত হইতে ভিন্ন। 'গাজন' দ্র।

দ্র হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, মালদহ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, মণি বর্ধন, বাঙলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, কলিকাতা, ১৯৬১।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

গয়া ২৪°১৭' ও ২৫°১৯' উত্তর এবং ৮৪° ও ৮৬°৫' পূর্ব। বিহার রাজ্যের পাটনা বিভাগের জেলা। আয়তন ১২৩২১৬ বর্গ কিলোমিটার (৪৭৬৬ বর্গ মাইল)। এই জেলার উত্তরে পাটনা জেলা, পূর্ব দিকে মুঙ্গের ও হাজারিবাগ জেলা, দক্ষিণে হাজারিবাগ ও পালামৌ জেলা, পশ্চিমে শোণ নদী। জেলার সদর ও প্রধান শহর গয়া এই জেলার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর গয়া জেলা গয়া, জাহানাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ ও নওয়াদা— এই চারিটি মহকুমা লইয়া গঠিত হয়।

সমুদ্র হইতে দূরত্ব বেশি বলিয়া জলবায়ু চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম ও শীতকালে তীব্র শীত অনুভূত হয়। বার্ষিক তাপমাত্রার গড় গ্রীষ্মকালে ৪০° সেন্টিগ্রেড (১০৫° ফারেনহাইট) ও শীতকালে ৮° সেন্টিগ্রেড (৪৭° ফারেনহাইট)। গ্রীষ্মকালে লু প্রবাহিত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ১১২৩ মিলিমিটার (৪৫ ইঞ্চি)।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে জেলাটি প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত। গুল্মপত্র বেষ্টিত দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল অনুর্বর, কৃষিবিহীন। উত্তরের পাললিক সমভূমির বিস্তৃত অংশে কৃষিকার্য হয় এবং জলসেচের ব্যবস্থা আছে। গয়া জেলার বিস্তৃত পাললিক ভূমির মধ্যস্থলে কতিপয় ক্ষুদ্র পর্বতমালা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে গয়া, ভিন্দ এবং [illegible] পর্বতমালা উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র হাদিয়া পাহাড় (৪৯১ মিটার বা ১৪৭২ ফুট) ব্যতীত এই সকল পর্বতমালার উচ্চতা আর কোথাও ৩০০ মিটার (১০০০ ফুট) অতিক্রম করে নাই। বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলির মধ্যে মাহের পাহাড়ের উচ্চতাই (৪৮৩ মিটার বা ১৬১২ ফুট) সর্বাধিক। গয়া শহরের ২৪ কিলোমিটার (১৫ মাইল) উত্তরে বরাবর ও পশ্চিমে লহবা পাহাড় ক্রমে ৩০৬ মিটার (১০২৩ ফুট) ও ৩৫৭ মিটার (১১৯২ ফুট) উচ্চ।

গয়া জেলার জলপ্রপাতের মধ্যে গোহানা ও কাকোলাট উল্লেখযোগ্য। জেলার নদীগুলি উত্তরবাহিনী, ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিত। বর্ষাকালে নদীগুলি জলে পরিপূর্ণ ও খরস্রোতা থাকে, অন্যান্য সময় একমাত্র পুনপুন ব্যতীত অন্যান্য নদীগুলি প্রায় শুকাইয়া যায়। জেলার প্রধান নদী শোণ। প্রাচীন নাম 'হিরণ্যবাহু'। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। হিন্দুগণ এখানে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। অদি, মদার, ধাওয়া, মোরহর, যমুনা, পইমার, ধাধর,

তিলাইয়া, ধনার্জী, সকরী প্রভৃতি জেলার অন্যান্য নদী। নদীগুলির বর্ষাকালীন বন্যা প্রতিরোধকল্পে পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ চলিতেছে।

গয়ার প্রাচীনত্ব ও নামকরণ অনুমানসাপেক্ষ। গয়াসুরের নামানুসারে শহরের গয়া নামকরণ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গয়া শহর হইতে ৮.৯ কিলোমিটার (৫.৬ মাইল) দূরে বোধগয়া বা বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুমতলে গৌতমবুদ্ধ সম্বোধি লাভ করেন। এই কারণে বিশ্বের ধর্মের ইতিহাসে ও বৌদ্ধজগতে গয়ার গুরুত্ব অসাধারণ। উক্ত ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থে বোধিদ্রুমের পার্শ্বে একটি বিশাল মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমান কালেও এখানে একটি বৃহৎ মন্দির আছে। ইহার নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না তবে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধ রাজা এই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার করেন।

আনুমানিক ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের সহিত সুদূর সিংহলের রাজা মেঘবর্ণের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি সম্রাটের অনুমতি লইয়া সিংহলীয় বৌদ্ধ যাত্রীদের বাসের জন্য একটি ভবন এবং পবিত্র বৃক্ষের উত্তর দিকে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। চীন দেশীয় পরিব্রাজক বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ্ (খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) এই বিহার ও অন্যান্য মন্দির, চৈত্য, স্তূপ বিহার প্রভৃতির অতুল সমৃদ্ধি ও মনোহারিত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। সিংহলীয় বৌদ্ধবিহারে তখন সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বোধগয়ায় সিংহলীয় ভিক্ষুদের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল এবং ইহা বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্ররূপে গণ্য হইত।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় গয়া জেলার কয়েকজন জমিদার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজগির পরগনার হায়দর আলী খাঁ, অরওয়ালের জুবর সিংহ ও কুশল সিংহের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গয়া কৃষিপ্রধান জেলা। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা, ছোলা, কলাই, অড়হর, খেসারি, তৈলবীজ, তুলা, ইক্ষু ইত্যাদি প্রধান। জেলার বনজ সম্পদ লাক্ষা। জেলার দক্ষিণ অংশে বহু অভ্র খনি আছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনানুযায়ী ১৮১৪৬৭৪ জন পুরুষ ও ১৮৩৩২১৮ জন নারী সমেত জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৬৪৭৮৯২। গয়া শহরের লোকসংখ্যা ১৫১১০৫ জন, তন্মধ্যে ৮২৪১২ জন পুরুষ ও ৬৮৬৯৩ জন নারী। জেলায় প্রতি কিলোমিটারে ২৬৬ জন (বর্গ মাইলে ৭৬৫ জন) বাস করে।

জেলার প্রধান ভাষা বিশুদ্ধ মাগহি বা মাগধি বা বিহারী হিন্দী।

গয়া শহরের 'গয়াবাল' জাতি গয়া জেলা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। গয়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে সূর্যমূর্তিপূজক (মিত্রপূজক) মগদের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গয়ায় প্রথম সরকারি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গয়া ও ঔরঙ্গাবাদ শহরে স্থাপিত কলেজ দুইটি এই জেলার সর্বপ্রথম কলেজ। বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ৬৯৯২২৯। তন্মধ্যে ৫৭১৫৮৩ জন পুরুষ ও ১২৭৬৪৬ জন নারী।

সম্প্রতি বোধগয়ায় মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জেলার ১২৬টি সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে গয়া শহরের দুইটি প্রাচীনতম। একটি স্থাপিত হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে

বর্তমানে এই জেলায় ৬১টি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি আছে। তন্মধ্যে দুইটি মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রও আছে।

গয়া জেলার পরিবহন ব্যবস্থা বেশ ভাল। [illegible] পাকা সড়কের [illegible]। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ১২৮ কিলোমিটার (৮০ মাইল) এই জেলার মধ্য দিয়া বাহিত হইয়াছে।

গয়া শহর (২৪°৪৮'১৩" উত্তর ও ৮৫°০৩'১৬" পূর্ব) ফল্গু নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ইহা গয়াধাম, গয়াপুরী বা গয়াক্ষেত্র নামেও পরিচিত।

গয়া পূর্ব রেলের একটি জংশন। হাওড়ার পথে কলিকাতা হইতে গয়ার দূরত্ব ৫৩২ কিলোমিটার (৩৩১ মাইল) এবং গ্রান্ড কর্ড সেকশনের পথে ৪৬৮ কিলোমিটার (২৯২ মাইল)।

গয়া শহরের অনধিক ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) দূরে একটি প্রথম শ্রেণীর বিমানবন্দর আছে।

শোণ নদী নাব্য বলিয়াই ইহা একমাত্র জলপথ। অন্য নদীগুলি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে।

জেলার ইউনিয়ন বোর্ড ৭টি ও মিউনিসিপ্যালিটি ৩টি। গয়া মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানে এই মিউনিসিপ্যালিটির বিস্তৃতি প্রায় ২৯ বর্গ কিলোমিটার (১১.৭৫ বর্গ মাইল)।

গয়া শহরের বৈদ্যুতীকরণ সম্পন্ন হয় ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারতীয় তীর্থের মধ্যে গয়া বিশেষ গৌরবের অধিকারী। ইহা শ্রেষ্ঠ পিতৃতীর্থ। গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্মে

পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান হিন্দুদের অবশ্যকর্তব্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত। বিষ্ণুপাদ মন্দির গয়ার মন্দিরের মধ্যে সর্বপ্রধান। এখানে বিষ্ণুর পাদপদ্ম রক্ষিত আছে। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে গয়ার পিতৃপক্ষের মেলা প্রসিদ্ধ।

বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ মন্দিরের নিকটে একটি বিরাট মেলা বসে। নবীনগরে সূর্যমন্দিরের নিকটে কার্তিক ও চৈত্র মাসে ওয়ারিশালিগঞ্জ থানার সপ্তাত খেরা নামক স্থানে এবং সদর মহকুমার উমাভিরগঞ্জে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাও উল্লেখযোগ্য।

দ্র P. C. Roy Chaudhury, *Bihar District Gazetteers: Gaya*, Patna, 1957; *Census of India: Paper No 1 of 1962, 1961 Census, Final Population Totals*, Delhi, 1962.

দিনেশকুমার ঘোষ
ভবপ্রসাদ মজুমদার

গরদ তুঁত রেশমের পাকানো সুতায় তৈয়ারি বস্ত্র। তুঁত রেশমের গুটি হইতে প্রথম যে সুতা বাহির করা হয় তাহাকে বলে বাচা রেশম। বাচা রেশম সুতা ২।৩ খেই পাকাইয়া সেই সুতায় গরদের কাপড় বোনা হয়। গরদের কাপড় নানা রকমের হয়, যেমন— লালপাড় শাড়ি, জামার থান, নকশাদার রুমাল, চাদর ও অঙ্গবস্ত্র। সচরাচর যে রঙিন ছাপানো শাড়ি ও জামার কাপড়ের থান ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহা তৈয়ারি হয় বাচা রেশমের সুতায়। উহার প্রচলিত নাম সিল্ক। গরদ উহা অপেক্ষা অনেক বেশি টেকসই। বাংলা দেশের মুর্শিদাবাদের মীর্জাপুর এবং বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও সোনামুখীর গরদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজের কাঞ্জীপুরমের গরদের শাড়িরও সুনাম আছে। 'রেশম' দ্র।

সত্যেন সেন

গরুড় বিষ্ণুর বাহন। কশ্যপনন্দন গরুড় বিনতার দ্বিতীয় পুত্র। এই মহাবলশালী পক্ষী মাতার সাহায্য ব্যতীতই অণ্ডভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন (মহাভারত, আদিপর্ব, ২৩।৫, বঙ্গবাসী সংস্করণ) ও তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড শরীর লাভ করেন (ঐ ২৩।৮)। ঋগ্বেদে ইনি তার্ক্ষ্য (১।৮৯।৬, ১০।১৭৮।১) ও গরুত্মান্ (১।১৬৪।৪৬, ১০।১৪৯।৩) নামে উল্লিখিত। গায়ত্রী যখন গন্ধর্বগণের নিকট হইতে সোম অপহরণ করেন তখন গরুড় পথ প্রদর্শন করেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৮।৬১)। ক্ষুধাতুর গরুড় যুদ্ধরত গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করেন (মহাভারত, আদি ৩০।৩০)। একদা বিনতা সর্পগণের ছলনার ফলে মিথ্যাপণে পরাজিত হইয়া সপত্নী কদ্রুর দাসী হন (ঐ ২৭।১৩)। মাতার দাসীত্ব অপনয়নের জন্য গরুড় সর্পগণের নির্দেশে (ঐ ২৭।১৬) স্বর্গ হইতে অমৃত অপহরণ করেন (ঐ ৩৩।১০)। পথিমধ্যে বিষ্ণু গরুড়কে অমৃত ভক্ষণ না করিয়াই অমৃত আনয়ন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও অমৃতপান ব্যতিরেকেও অমরত্বের বর প্রদান করেন এবং গরুড়কে নিজের উপরে অর্থাৎ পতাকায় স্থান দান করেন (ঐ ৩৩।১৩-১৪)। 'গজকচ্ছপ' দ্র।

সীতানাথ গোস্বামী

গরুড়পুরাণ পুরাণ দ্র

গর্ভ গর্ভধারণ স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হংসচঞ্চু (প্ল্যাটিপাস)-জাতীয় স্তন্যপায়ীরা গর্ভধারণ করে না, ইহারা পাখির মত ডিম পাড়ে। ক্যাঙ্গারু-জাতীয় স্তন্যপায়ীরা গর্ভধারণ করে বটে, কিন্তু গর্ভে ভ্রূণের পূর্ণ বৃদ্ধির পূর্বেই সন্তানের জন্ম হয়, সেই অপুষ্ট সন্তানকে দেহসংলগ্ন থলিতে রাখিয়া তাহারা পালন করে। কিন্তু মনুষ্য, বানর, গো মহিষ, মার্জার প্রভৃতির ক্ষেত্রে গর্ভে উত্তমরূপে বর্ধিত হওয়ার পরে সন্তানের জন্ম হয়। মানুষের ক্ষেত্রে নারীর গর্ভধারণের কাল গড়ে প্রায় ২৮০ দিন।

পুরুষ ও স্ত্রীর সংগমের ফলে স্ত্রীর জননতন্ত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে গর্ভসঞ্চার হয়। এই মিলিত কোষটিকে বলা নিষিক্ত ডিম্ব। নিষিক্ত ডিম্বটি কোষবিভাজনের দ্বারা বহু কোষে পরিণত হইতে হইতে জরায়ুতে আসিয়া পৌঁছায়। এদিকে ডিম্বাশয় হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রোজেস্টেরোন নামক স্ত্রী-যৌনহর্মোন ক্ষরিত হইতে থাকে। ইহা নিষিক্ত ডিম্বকে জরায়ুর অভ্যন্তরে সংলগ্ন হইতে সাহায্য করে ও ঐ সংলগ্নির স্থানে ফুল (প্লাসেন্টা) সৃষ্টি করে। এতদ্ব্যতীত প্রোজেস্টেরোন জরায়ুর গায়ে মাংসপেশীর সংখ্যা বাড়াইয়া জরায়ুকে সন্তান-ধারণে সাহায্য করে, জরায়ুর টিস্যু ও গ্রন্থিগুলির যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটায়, জরায়ুর সংকোচন বন্ধ রাখিয়া ভ্রূণকে জরায়ুতে বর্ধিত হইতে দেয়, গর্ভকালে মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ রাখে, জন্মনালীকে প্রসারিত করিয়া সন্তানজন্মের পথ প্রশস্ত করে ও স্তনের গ্রন্থিগুলির বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায়। গর্ভবতী নারীর দেহে ফুল হইতে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরোন নামক দুইটি স্ত্রী-যৌনহর্মোন এবং কোরিয়নিক গোনাডোট্রোপিন নামক একটি যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোন ক্ষরিত হয়।

জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়ে ও উহার দেহে বিবিধ টিস্যু ও অঙ্গের বিকাশ হইতে থাকে। নির্দিষ্টকাল গর্ভধারণের পর ডিম্বাশয় ও ফুল হইতে হর্মোন ক্ষরণ কমিয়া যায়। তখন পিটুইটারি গ্রন্থি হইতে অক্সিটোসিন নামক একটি হর্মোন ক্ষরিত হয়। রক্তের প্রবাহে জরায়ুতে পৌঁছিয়া ইহা জরায়ুকে সংকুচিত করে, ফলে সন্তান জরায়ু হইতে বাহির হইয়া জননালীর মধ্য দিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। সন্তানজন্মের পর জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গগুলি ক্রমে প্রাক-গর্ভ অবস্থায় ফিরিয়া যায় ও মাসিক ঋতুস্রাব আবার আরম্ভ হয়। গর্ভকালের শেষে মাতার স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ আরম্ভ হয় ('দুধ' দ্র)।

গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নানা পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে আশাইম-জোন্দেক (Ascheim-Zondek) পরীক্ষাপ্রণালী অন্যতম। যে নারীর গর্ভ নিরূপণ করা হইবে, এই পরীক্ষায় তাঁহার মূত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-ইঁদুরের দেহে ইন্‌জেক্‌শন করা হয়। কয়েক-দিন পরে ইঁদুরগুলিকে মারিয়া তাহাদের ডিম্বাশয় পরীক্ষা করা হয়, গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে ইঁদুরের ডিম্বাশয়ে যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোন ঘটিত পরিবর্তন দেখা যায়।

গর্ভকালে দেহে ভ্রূণের বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য নানা উপাদানের প্রয়োজন হয়। এজন্য সাধারণ অবস্থার তুলনায় গর্ভবতী নারীকে দৈনিক প্রায় ৩০০ কিলোক্যালরি মানের খাদ্য বেশি দেওয়া প্রয়োজন। এই খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণও সাধারণ অবস্থার তুলনায় ২০-২৫ গ্রাম অধিক হওয়া উচিত। ভিটামিন এ, বি-কমপ্লেক্স, সি, ডি প্রভৃতি ভিটামিন এবং লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন প্রভৃতি অজৈব উপাদানও খাদ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক থাকা যুক্তিযুক্ত। 'ভ্রূণ' দ্র।

দ্র G. W. Corner, *The Hormones in Human Reproduction*, Princeton, 1942 ; J. M. Robson, *Recent Advances in Sex and Reproductive Physiology*, London, 1947 , S. R. M. Reynolds, *The Physiology of the Uterus*, New York, 1949 ; A. S. Parkes, ed , *Marshall's Physiology of Reproduction*, vols. I & II, London, 1952.

দেবজ্যোতি দাশ

গর্ভাধান গর্ভোৎপাদনের উদ্দেশ্যে আচরণীয় অনুষ্ঠান-বিশেষ। ইহা দ্বিতীয় বিবাহ পুনর্বিবাহ বা ফলবিয়া (ফল বিবাহ) নামে পরিচিত ছিল। প্রথম রজোদর্শনের ষোল দিনের মধ্যে প্রথম চার দিন বাদ দিয়া যে কোনও যুগ্ম দিনে ইহা করণীয়। ইহা মানবজীবনের প্রথম সংস্কার। বিবাহাদি সংস্কারের মত এই উপলক্ষ্যেও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা কেহ কেহ দিয়া থাকেন। তবে তাহার প্রচলন নাই। বস্তুতঃ সমগ্র অনুষ্ঠানটিই এখন লুপ্ত। পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্ব পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া ঘরে ঘরে উৎসবের আড়ম্বর দেখা যাইত – কিছু কিছু শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রতিপালিত হইত — স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া 'নব-পুষ্পোৎসবে' সূর্যকে অর্ঘ্যদান করিতেন এবং স্বামী পুত্র-লাভের উদ্দেশ্যে গর্ভের মঙ্গল কামনা করিয়া বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতেন। বধূকে রজোদর্শনের দিন হইতে আহারাদি ব্যাপারে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ও সংযত হইয়া গৃহমধ্যে দিনযাপন করিতে হইত। নির্দিষ্ট দিনে একটি পুতুলকে নানা রকম ফল বাঁধিয়া তাহাকে দেওয়া হইত, একটি প্রস্তর খণ্ডকে সন্তান কল্পনা করিয়া প্রসবের অভিনয় করা হইত। উৎসবে নারীসমাজেরই প্রাধান্য ছিল। পুরনারীরা অনেক সময় শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিত। রজোদর্শনের দ্বারা স্ত্রী-লোকের গর্ভধারণ ক্ষমতা সূচিত হওয়ায় পৃথিবীর নানা স্থানে আধুনিক পূর্ব যুগে এ জাতীয় নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

গুরুদাস চক্রবর্তী

গলগণ্ড থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে গলায় যে স্ফীতি দেখা দেয়, তাহাকে গলগণ্ড, গয়টার বা গেঁগ বলে। গলগণ্ড প্রধানতঃ দুইটি কারণে হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, দেহে আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড হইতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি রক্তে থাইরক্সিন নামক একটি হর্মোন ক্ষরণ করে। এই হর্মোনের অণুতে আয়োডিন থাকে। খাদ্যে আয়োডিনের অভাব ঘটিলে থাইরয়েড গ্রন্থিতে উপযুক্ত পরিমাণে থাইরক্সিন উৎপন্ন হইতে পারে না, ফলে রক্তে থাইরক্সিনের পরিমাণ কমিয়া যায়। রক্তে থাইরক্সিনের মাত্রাল্পতা ঘটিলেই মস্তিষ্কে পিটুইটারি গ্রন্থি উদ্দীপিত হইয়া রক্তে অধিক পরিমাণে থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোন ক্ষরণ করে, ইহার প্রভাবে থাইরয়েডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে ও গলগণ্ড হয়। কিন্তু থাইরয়েডের বৃদ্ধি সত্ত্বেও পর্যাপ্ত আয়োডিনের অভাবে থাইরক্সিনের ক্ষরণ স্বাভাবিকের তুলনায় কমই থাকিয়া যায়, ফলে রোগীর দেহে গলগণ্ড ছাড়াও থাইরক্সিনের অভাবজনিত নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ইওরোপে আল্পস এবং ভারতে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এই ধরনের গলগণ্ডের প্রকোপ দেখা যায়। কোনও কোনও দেশে খাদ্যের লবণে সোডিয়াম আয়ো-ডাইড নামে আয়োডিন-ঘটিত লবণ মিশাইয়া দিয়া এই প্রকার গলগণ্ড রোধ করিবার প্রয়াস করা হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, পিটুইটারি গ্রন্থির রোগে অতিরিক্ত মাত্রায় থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোন ক্ষরিত হইতে থাকিলে তাহার জন্যও থাইরয়েডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গলগণ্ড হইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেহে আয়োডিনের অভাব না থাকায় গলগণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থাইরয়েড হইতে থাইরক্সিন ক্ষরণের পরিমাণও বাড়ে, ফলে এরূপ গলগণ্ডে দেহে থাইরক্সিনের আধিক্য-জনিত নানা উপসর্গ প্রকট হয়। ইহা ছাড়া এই ধরনের গলগণ্ডে প্রায়ই রোগীর চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিগহ্বর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে (এক্স-অপ্থ্যাল্মিক গয়টার)। কিন্তু এই শেষোক্ত উপসর্গটি আদৌ থাইরক্সিনের আধিক্যের জন্য নহে, ইহার জন্য দায়ী পিটুইটারি গ্রন্থিরই অপর একটি হর্মোনের অতিক্ষরণ সেই হর্মোনের নাম এক্স-অপ্থ্যাল্মস্ প্রডিউসিং ফ্যাক্টর বা ই. পি. এফ।

এতদ্ব্যতীত থাইরয়েডের টিস্যুবৃদ্ধি বা টিউমারের জন্যও গলগণ্ড হইতে পারে, সে ক্ষেত্রেও গলগণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে থাইরক্সিনের আধিক্য-জনিত উপসর্গগুলি দেহে প্রকাশ পায়। 'হর্মোন' দ্র।

দ্র J. H. Means, *The Thyroid Gland*, Philadelphia, 1948, R. Pitt-Rivers & J. R. Tata, *The Thyroid Hormones*, London, 1959.

দেবজ্যোতি দাশ

গল্ফ স্কটল্যাণ্ডে অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত এক প্রকার খেলা, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ক্রীড়াটি এইরূপ বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি ডাণ্ডার (ক্লাব) সাহায্যে শাদা রঙের একটি রবারের ছোট বলকে ন্যূনতম সংখ্যক বাড়ি দিয়া একটি প্রান্তর পার করা। প্রান্তরটি কয়েক কিলোমিটার (মাইল) দীর্ঘ, অসমতল এবং তাহার ভূমি-প্রকৃতি বালুকাবহুল বা অন্য প্রকারের হইতে পারে। সাধারণতঃ উহা কয়েক শত মিটারের (গজ) ব্যবধানে আঠারটি ঘরে বিভক্ত থাকে। প্রত্যেক ঘরকে 'হোল' বলা হয়। ইহা মোটামুটি বৃত্তাকারে রচিত সবুজ মসৃণ ঘাসের ক্ষুদ্র একটি ক্ষেত্র যাহার মধ্যস্থলে একটি ১১ সেন্টিমিটার (৪.৫ ইঞ্চি) ব্যাস এর ছোট গর্ত বা 'গাবু' থাকে। নির্দিষ্ট স্থানে খেলোয়াড় তাহার নিজস্ব একটি ছোট খুঁটি (Tee)-র উপর বল স্থাপন করিয়া ডাণ্ডার বাড়ি দিয়া উহা দূরে পাঠাইলে খেলা আরম্ভ হয়। তাহার পর বারংবার বাড়ি দিয়া বলটিকে 'হোলে'র সীমানার ভিতরে লইয়া গিয়া নিপুণ মারের সাহায্যে বলটিকে গর্তের মধ্যে ফেলা হয়। এইভাবে আঠারটি ঘর যে খেলোয়াড় ন্যূনতম সংখ্যক বাড়ি দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে সে জয়ী সাব্যস্ত হয়। বলটি এমন কোনও স্থান — যেখানে পড়িয়া বা আটকাইয়া গেলে, যেখান হইতে উহা মারা বা উদ্ধার করা সম্ভব নহে অথবা হারাইয়া গেলে, নূতন একটি বল লওয়া চলে, তবে সে ক্ষেত্রে খেলোয়াড়কে একটি মার বা ক্রীড়াঙ্ক জরিমানা হিসাবে দিতে হয়। সাধারণতঃ দুই জনের মধ্যে অথবা দল হিসাবেও প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। স্কটল্যাণ্ডের রয়্যাল অ্যাণ্ড এনশেণ্ট গল্ফ ক্লাব অফ সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ (১৭৫৪ খ্রী) কর্তৃক পৃথিবীর সকল দেশের গল্ফ খেলা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পুরুষ, নারী ও দলগত কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আইসেনহাওয়ার ট্রফি নামে সকল দেশের অপেশাদার খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক একটি প্রতিযোগিতা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গল্ফ খেলা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়। তৎকালীন কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, দমদম ক্যান্টনমেণ্ট-এর কয়েকজন ব্রিটিশ অধিবাসীর উৎসাহে দমদমে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে খেলাটি কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়া ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল ক্যালকাটা গল্ফ ক্লাব জন্মলাভ করে। ব্রিটেনের বাহিরে পৃথিবীর মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম গল্ফ ক্লাব। পূর্বে খেলাটি ইওরোপীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে ইহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বহু ভারতবাসী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতেছে। এ যাবৎ যে চারিটি আইসেনহাওয়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই ভারত দল যোগদান করিয়াছে। ভারতবর্ষে অপেশাদার, পেশাদার, সহকারী ক্যাডি বা যাহারা অপেশাদার খেলোয়াড়দের ডাণ্ডার ব্যাগ বহন করে তাহাদের এবং কিশোরদের জন্য গল্ফ প্রতিযোগিতার বিবিধ ব্যবস্থা আছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সর্বভারতীয় অবাধ (ওপ্‌ন) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই বহু ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে খেলাটির নিয়ন্ত্রণকল্পে ইণ্ডিয়ান গল্ফ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্র H. G. Hutchinson, *Golf*, London, 1892, Charles Price, *The World of Golf*, London, 1963.

পিয়ার্সন সুরিটা

গাঁই কৌলীন্য প্রথা দ্র

গাইগার কাউণ্টার কণাসন্ধানী যন্ত্র দ্র

গাইজার ভৌমজল দ্র

গাউস, কার্ল ফ্রিড্‌রিখ (১৭৭৭-১৮৫৫ খ্রী) পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্‌গণের অন্যতম। শুদ্ধ গণিত, ফলিত গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় এত প্রচুর এবং উচ্চ স্তরের গবেষণায় গাউসের সমকক্ষ খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল জার্মানির ব্রাউন্‌সভাইগ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গেরহেড্‌-ডিড্রিক্ (Gerherd Diedrich) ছিলেন গরিব রাজমিস্ত্রী। মাতা ডোরোথা বেনংস এবং মাতুল ফ্রিড্‌রিখ -এর চেষ্টাতেই গাউসের মনে গণিতের প্রতি অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া ওঠে। মাতৃভক্ত গাউস মায়ের এই চেষ্টার জন্য চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন এবং মায়ের বৃদ্ধ বয়সেও নিজেই তাঁহার সেবা করিয়াছেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ অক্টোবর য়োহানে ওসলহাফ্‌ এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু ৭ বৎসর পরেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এক বৎসর পরে মিনা ভাবডেক-এর সহিত আবার গাউসের বিবাহ হয়। গাউসের ৪ পুত্র এবং ২ কন্যা কেহই পিতার উপযুক্ত হইতে পারেন নাই।

তিন বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পরেই গাউস গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, একদিন মৌখিক গণনার সাহায্যে তাঁহার পিতার হিসাবে ভুল ধরিয়াছিলেন। সাত বৎসর বয়সে গাউস বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। দশ বৎসর বয়সে পাটিগণিত আরম্ভ করার অল্পদিনের মধ্যেই এক বিশাল সমান্তর শ্রেণীর (81297+81495+... +100899) যোগফল মানসিক গণনায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাহির করিয়া তাঁহার শিক্ষক বুটনের মনে চমক লাগাইয়া দেন। শিক্ষক মহাশয় বালক গাউসের মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে গণিতের কতিপয় উৎকৃষ্ট পুস্তক পুরস্কার দেন। শিক্ষকের প্রেরণাই গাউসের মনকে গণিত চর্চার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কয়েকটি অসীম শ্রেণীর অভিসারিত্ব (কনভর্জেন্স) প্রমাণ করেন— কিন্তু প্রমাণের ধারা ছিল নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রী), অয়লার (১৭০৭-৮৩ খ্রী) এবং লাগ্রাঞ্জ (১৭৩৬-১৮১৩ খ্রী)-এর ধারা হইতে পৃথক ও অধিকতর যুক্তিসংগত। তাঁহার যুক্তিবাদী মন তাঁহাকে ইউক্লিডের (এউক্লিদেস) জ্যামিতিতত্ত্বের ভিত্তি পরীক্ষায় চালিত করিয়াছিল। পনর বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি সংখ্যাতত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক সমস্যার সমাধান করেন। পনর বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেরোলিন কলেজে যোগদান করেন এবং পরে (১৭৯৫-৯৮ খ্রী) গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। কলেজে পাঠকালে গাউসের সাহিত্য চর্চায় বিশেষ অনুরাগ ও পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গাউস সপ্তদশ বাহুর সুষম বহুভুজ অঙ্কন-পদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক নানাবিধ জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জ্যামিতির এই সমস্যা, যাহা দুই সহস্রাধিক বৎসর বহু গণিতজ্ঞের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে, অষ্টাদশ বর্ষীয় গাউস তাহার সমাধান করিয়া গণিত চর্চার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে গাউস প্রিন্সিপল অফ লিস্ট স্কোয়ার্স আবিষ্কার করেন এবং উহার ভিত্তিতেই পরে 'গাউসীয় স্বাভাবিক বণ্টন সূত্র' (গাউসিয়ান ল অফ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন) আবিষ্কৃত হয় যাহা আজও গণিত ও স্ট্যাটিস্টিকসশাস্ত্রের একটি মৌলিক তত্ত্ব রূপে সম্মানিত হইয়া থাকে। এই সময় হইতে তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সকল লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গাউসের মৃত্যুর ৪৩ বৎসর পরে এই সকল প্রবন্ধের তালিকাও প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২২ বৎসর বয়সে গাউস হেলমস্টেড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে গাউস জ্যোতির্বিদ্যা, তড়িচ্চুম্বকতত্ত্ব, ভূচুম্বকতত্ত্ব ও গোলকের আকর্ষণ প্রভৃতির সম্পর্কিত ফলিত গণিতের নানা বিষয়ে গবেষণা করেন। এই সকল বিষয়ের অনেক মৌলিক সূত্রের সহিত গাউসের নাম চিরদিন যুক্ত থাকিবে। নিউটনের পরবর্তী কালে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার ঝোঁক সর্বত্রই ছিল। গাউসও উহাতে আকৃষ্ট হইয়া সিরেস-এর কক্ষের আকার গণনায় বহু সময় দিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার নির্ভুল গণনা বিশেষ জনসাধারণের নিকট চমকপ্রদ হইয়াছিল এবং তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তথাপি গণিতের অবদান হিসাবে ইহার মর্যাদা তাঁহার অন্যান্য কাজের তুলনায় কম। এই সময়েই লাপ্লাস (১৭৪৯-১৮২৭ খ্রী) গাউসকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলিয়া আখ্যাত করেন।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বুটনের মাধ্যমে গাউস ব্রাউনসভাইগ-এর দানশীল ডিউক কার্ল ভিলহেল্‌ম ফের্দিনেন্দের সহিত পরিচিত হন। গাউসের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া ডিউক তাঁহার লেখাপড়া এবং গবেষণার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। নাপোলেঅঁ (নেপোলিয়ন)-এর সহিত যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিউকের মৃত্যু হয়। গাউস সেই সময়ে চাকুরি গ্রহণ

করিতে বাধ্য হন এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্যোটিঙ্গেন মানমন্দিরের অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন। তিনি মনে করিতেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অপেক্ষা মানমন্দিরের অধিকর্তার পদেই গবেষণার সুযোগ অধিক। নিয়মিত অধ্যাপনায় তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। গাউসের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তদুপরি নাপোলেঅঁ সেই সময়ে জার্মানির উপর যুদ্ধোত্তর কর ধার্য করিয়াছিলেন। গাউসকেও ২০০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হইয়াছিল, যাহা দেওয়া গাউসের সাধ্যাতীত ছিল। ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরাও ফরাসী সরকারের এই অন্যায় আচরণের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং লাপ্লাস নিজে এই জরিমানা গাউসের অজ্ঞাতেই জমা দিয়াছিলেন। ইহাতে গাউসের জাতীয় সম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ হয় এবং তিনি অবিলম্বে লাপ্লাসের টাকা পরিশোধ করেন। ডিউকের মৃত্যু, তাঁহার আর্থিক অনটন, স্ত্রীবিয়োগ, জার্মানির পরাজয় এবং যুদ্ধোত্তর দেশের দুরবস্থা— একই সময়ে এতগুলি অশুভ ঘটনার সংঘাতে গাউস বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি কাহাকেও কিছু দুঃখের কথা বলেন নাই, শুধু তাঁহার রোজনামচায় তৎকালীন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

গাউস নিজের মানসিক তৃপ্তির জন্যই গবেষণায় লিপ্ত থাকিতেন। বহু গবেষণার ফলই তিনি প্রকাশ করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ইহার ফলে কতিপয় সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এমন কি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ করিয়াও লজাঁদর্ (১৭৫২ ১৮৩৩ খ্রী) নিজেকেই প্রিন্সিপ্‌ল্ অফ লিস্ট স্কোয়্যার্স এর আবিষ্কর্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, ফলে গাউসের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁহার সমসাময়িক নবীন বৈজ্ঞানিকদের কাজের প্রশংসা গাউস অনেক সময় করিতেন না। কোশি (১৭৮৯ ১৮৫৭ খ্রী) এবং হ্যামিলটন (১৮০৫ ৬৫ খ্রী) এর এই বিষয়ে বিশেষ অভিযোগ ছিল।

বিজ্ঞান ব্যতীত ইওরোপের সাহিত্য, প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস এবং বৈদেশিক ভাষা চর্চায় গাউসের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ৬২ বৎসর বয়সে তিনি রুশ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই তাহা আয়ত্ত করেন। তিনি তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধ লাতিন ভাষায় প্রকাশ করাই পছন্দ করিতেন। নাপোলেঅঁর পতনের পর জাতীয়তাবোধের প্রাবল্যের ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতিপয় প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মানসিক উদারতার যথেষ্ট পরিচয় তিনি দিয়াছেন। নাপোলেঅঁর যখন পতন হয় তখনও তিনি উল্লাস না করিয়া তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন, যদিও নাপোলেঅঁর উপর বিরক্ত হইবার কারণ তাঁহার যথেষ্ট ছিল। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তিনি নিজেকে বিশ্বের মানব বলিয়া মনে করিতেন। গবেষণা বিষয়ে আলোচনা বা বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি বিদেশে যাওয়া পছন্দ করিতেন না। জীবনের শেষ ২৭ বৎসরের মধ্যে মাত্র একবার তিনি তাঁহার মানমন্দিরের বাহিরে গিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি ৭৮ বৎসর বয়সে গাউসের মৃত্যু হয়।

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

গাঙ্গারিদাই, গঙ্গরিডই প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ঐতিহাসিকেরা ভারতের পূর্বাঞ্চলে গাঙ্গারিদাই ও প্রাসিঅই— এই দুইটি দেশ ও জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই দেশের ভৌগোলিক সীমা ও এই দুই জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ কি ছিল তাহা সঠিক বলা যায় না কারণ এ সম্বন্ধে উক্ত ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোটের উপর বলা যায় যে গঙ্গা নদীর মোহানায় যে সমুদয় লোক বাস করিত তাহারাই গাঙ্গারিদাই এবং বর্তমান বিহার প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে প্রাসিঅই রা বাস করিত। প্রাসিঅইদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা)। এই দুই দেশ ও জাতি পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইলেও আলেকসান্দর (আলেকজাণ্ডার) এর ভারত আক্রমণের সময় উহারা হয় এক রাজার অধীন ছিল নচেৎ একযোগে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য মিত্রতার বন্ধনে বদ্ধ ছিল। এই দুই মিলিত জাতি যে খুব শক্তিশালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ প্লুতার্কের বিবরণ অনুসারে তাহারা দুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজার রথ, আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয় হাজার রণহস্তী লইয়া আলেকসান্দরের গতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। এক সময়ে এই মিলিত রাজ্য পাঞ্জাবের বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই দিওদোরস গাঙ্গারিদাই রাজ্যের এইরূপ ভৌগোলিক বিস্তৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই বিশাল সাম্রাজ্য খ্রান্দ্রামেস (Xandrames) নামক এক রাজার অধীন ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে এই রাজা পুরাণে উল্লিখিত নন্দবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে এই দুই জাতির উল্লেখ নাই এবং সম্ভবতঃ এই দুই নামে কোনও জাতি ছিল না। গ্রীক লেখকেরা প্রাচ্য দেশ এই সাধারণ অর্থে প্রাসিঅই এবং

গঙ্গা নদীর তীরবর্তী এই অর্থে গাঙ্গারিদাই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

গাঙ্গেয়দেব কলচুরি অনেকে মনে করেন যে কলচুরিরা বৈদেশিক জাতি, হূণ-গুর্জরদিগের সহিত তাহারা গুপ্তযুগে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কলচুরি রাজবংশের উল্লেখ দেখা যায়। প্রথমে কলচুরিরা নর্মদাতীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কালক্রমে তাহারা আপনাদিগকে প্রাচীন ভারতের হৈহয় কুলের শাখা বলিয়া দাবি করে। এই কলচুরিগণের একটি উপশাখা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর সূচনায় ত্রিপুরী অর্থাৎ মধ্য প্রদেশস্থ জব্বলপুরের নিকটবর্তী তেবর অঞ্চলে ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে। গাঙ্গেয়দেব (আনুমানিক ১০১৫-৪১ খ্রী) এবং তৎপুত্র কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণ (আনুমানিক ১০৪১-৭১ খ্রী) এই রাজবংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তুর্কী মুসলমান কর্তৃক ভারত আক্রমণের যুগে শকারি বিক্রমাদিত্যের কাহিনীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সকল ভারতীয় নরপতি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, কলচুরি গাঙ্গেয়দেব তাহাদের অন্যতম।

কলচুরি বংশের লেখমালা অনুসারে গাঙ্গেয়দেব কীর, অঙ্গ, কুন্তল এবং উৎকল দেশ জয় করিয়াছিলেন। কুন্তল বা কর্ণাট দেশে এই সময় উত্তরকালীন চালুক্যবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ মনে করেন, চালুক্য জয়সিংহের সহিত গাঙ্গেয়দেবের সংঘর্ষ হইয়াছিল। চন্দেল্লবংশীয় বিজয়পাল গাঙ্গেয়দেবকে পরাজিত করেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, কিন্তু গাঙ্গেয়দেব কর্তৃক প্রয়াগ বা এলাহাবাদ অঞ্চল অধিকার হইতে মনে হয়, পরিণামে চন্দেল্ল যুদ্ধে তিনিই বিজয়ী হইয়াছিলেন। চন্দেল্ল দেশে তাঁহার কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মদনের 'পারিজাতমঞ্জরী'তে বলা হইয়াছে যে, পরমার-বংশীয় নরপতি ভোজ কর্তৃক গাঙ্গেয় পরাজিত হন।

কলচুরিরাজ গাঙ্গেয় এবং কর্ণ উভয়েই বাংলা-বিহারের পাল বংশের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসে গাঙ্গেয়দেবের সহিত পালবংশীয় প্রথম মহীপালের (আনুমানিক ৯৯০-১০৪০ খ্রী) দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ স্মরণীয় ঘটনা। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে গাঙ্গেয়দেবের অধিকারভুক্ত তীরভুক্তি অর্থাৎ উত্তর বিহারের অন্তর্গত তীরহুতে রামায়ণের একখানি পাণ্ডুলিপি লিখিত হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তর বিহার মহীপালের অধীন ছিল না। কিন্তু ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহীপালের একটি লেখ বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে, উহার পূর্বেই বিহার এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল হইতে কলচুরি অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। আবার ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন মুসলমান সেনাপতি আহ্‌মদ নিয়াল্‌তিগীন বারাণসী আক্রমণ করেন, তখন সেখানে গাঙ্গেয়দেবের অধিকার স্বীকৃত হইত। সুতরাং বারাণসী অঞ্চলে মহীপালের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। তবে মুজফ্‌ফরপুর জেলার ইমাদপুরে প্রাপ্ত তাঁহার ৪৮ রাজাঙ্কের মূর্তিলিপি হইতে মনে হয় যে, গাঙ্গেয়দেব উত্তর বিহার পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন নাই।

জয়ানকের পৃথ্বীরাজবিজয় বর্ণিত 'সাহসিক' অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের কাহিনীটি কলচুরি গাঙ্গেয়দেবের প্রতি প্রযোজ্য। এই কাহিনী অনুসারে বৃদ্ধ বয়সে গাঙ্গেয় স্বীয় গুরু বামদেবকে আপনার রাজ্য দান করিয়াছিলেন। এইজন্যই গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণের সময় হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কলচুরি রাজগণ আপনাদিগকে বামদেবের সামন্ত রূপে উল্লেখ করিতেন।

কলচুরি লেখমালা হইতে জানা যায় যে গাঙ্গেয়দেব তাঁহার একশত মহিষীর সহিত প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সংগমের পুণ্য সলিলে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

দ্র R D Banerji, 'The Haihayas of Tripuri and Their Monuments', *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, no. 23, 1931; H. C Ray, *Dynastic History of Northern India*, vol. II, Calcutta, 1936, D C. Sircar, 'Saugor-Insciption of Sankaragana', *Epigraphia Indica*. vol XXX, Delhi, 1953-54

দীনেশচন্দ্র সরকার

গাছ এই প্রবন্ধে সর্বত্র উদ্ভিদ অর্থে গাছ কথাটি প্রযুক্ত হইবে। সকল গাছের বিকাশ একরূপ নহে। অনেক গাছে সুস্পষ্ট অঙ্গবিভাগ বিদ্যমান। কিছু গাছের দেহে আংশিক অঙ্গবিভাগ পরিলক্ষিত হয়, আবার কোনও কোনও গাছে একেবারেই অঙ্গবিভাগ দেখা যায় না।

যে সকল গাছে ফুল ফোটে না, তাহাদের অপুষ্পক গাছ (ক্রিপ্টোগ্যাম) এবং যে সকল গাছে ফুল ফোটে তাহাদের সপুষ্পক গাছ (ফ্যানেরোগ্যাম) বলে। যে সকল অপুষ্পক গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা কিছুই বিকশিত হয় না, তাহাদের থ্যালোফাইটা বলে। যাহাদের সাধারণতঃ কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু মূল নাই, তাহাদের ব্রায়োফাইটা বলা হয়, আর যাহাদের মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে

তাহাদের টেরিডোফাইটা বলে। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে যাহাদের বীজ ফলের মধ্যে আবৃত থাকে তাহাদের গুপ্তবীজী (অ্যান্‌জিওস্পার্ম) এবং যাহাদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে না তাহাদের ব্যক্তবীজী (জিম্‌নোস্পার্ম) বলে। বীজপত্রের সংখ্যানুসারে গুপ্তবীজী গাছগুলিকে আবার একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী— এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

সাধারণ মানুষের পরিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সপুষ্পক গাছের সঙ্গে। সপুষ্পক গাছে প্রধানতঃ দুইটি অংশ – মাটির উপরে আলোর দিকে যে অংশ থাকে তাহাকে বিটপ (শুট) বলে আর মাটির তলায় অন্ধকারে যে অংশ থাকে তাহাকে মূল বলে। মূলের আবার অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। মূলের অগ্রভাগে একটি পাতলা টুপির ন্যায় অঙ্গ বা মূলত্র (রুট ক্যাপ) থাকে এবং মূলত্রের কিছু উপরে মূলের গায়ে প্রচুর রোম (মূলরোম বা রুট হেয়ার) থাকে। মূলের ন্যায় বিটপেরও কয়েকটি অংশ থাকে, যথা— কাণ্ড ও তাহার শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল। মূল গাছকে মাটিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে এবং জল ও খাদ্যাদি শোষণ করিতে সাহায্য করে। কাণ্ড ও পাতা গাছের বৃদ্ধি সাধন করে। ফুল ফল ও বীজের দ্বারা গাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি হয়।

যে সকল গাছের কাণ্ড নরম ও রসাল, তাহাদের বীরুৎ (হার্ব) বলে, যথা ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদি। যাহাদের কাণ্ড কতকাংশে শক্ত ও কাষ্ঠল এবং কতকাংশে নরম ও রসাল, তাহাদের গুল্ম বলে, যেমন– জবা, শেফালি, গোলাপ, জুঁই ইত্যাদি। যে সকল গাছের কাণ্ড খুব শক্ত ও বহুলাংশে কাষ্ঠল, তাহাদের বৃক্ষ বলা হয়, এই গাছগুলির উচ্চতা সাধারণতঃ খুব বেশি হয়, যথা — আম, জাম, কাঁঠাল, দেবদারু, ডারুল, পাইন ইত্যাদি।

আয়ুষ্কাল অনুযায়ী গাছকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. বর্ষজীবী : এক বৎসরের মধ্যেই ইহাদের জন্ম, বৃদ্ধি এবং ফুল ফল ও বীজের উৎপাদন সমাপ্ত হইয়া গাছগুলি মরিয়া যায়, যেমন – ধান, দোপাটি ইত্যাদি। ২. দ্বিবর্ষজীবী : এই সকল গাছের জীবনচক্র সমাপ্ত হইতে দুই বৎসর লাগে, প্রথম বর্ষে বৃদ্ধি ও খাদ্যসঞ্চয় এবং দ্বিতীয় বর্ষে ফুল, ফল ও বীজের উৎপাদন ঘটে, যেমন— মূলা, গাজর ইত্যাদি বীরুৎ। সাধারণতঃ এই গাছগুলি উষ্ণ অঞ্চলে বর্ষজীবী ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দ্বিবর্ষজীবী। ৩. বহুবর্ষজীবী : ইহারা দুই বৎসরের অধিককাল বাঁচিয়া থাকে, প্রতি বৎসরই ইহাদের বৃদ্ধি হয় ও বিশেষ ঋতুতে ফুল, ফল ও বীজ হইয়া থাকে, যথা— হলুদ, কলাবতী প্রভৃতি বীরুৎ এবং সকল প্রকারের গুল্ম ও বৃক্ষ। অনেক বহুবর্ষজীবী বৃক্ষের পাতা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে, ইহাদের পর্ণমোচী বৃক্ষ বলে, যেমন — শিমুল, পলাশ, শাল ইত্যাদি। অন্য যে সকল গাছের পাতা বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু করিয়া ঝরিয়া পড়ে তাহাদের চিরহরিৎ বৃক্ষ বলা হয়, যেমন — আম, কাঁঠাল প্রভৃতি।

জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্য অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের গাছ জন্মায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতির নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। উদ্ভিদবিদ্যার ইকলজি (বাস্তুসংস্থান) শাখায় ইহার আলোচনা ও পরীক্ষা করা হয়।

গাছের দেহ এক বা একাধিক কোষে গঠিত। আলোক, উত্তাপ প্রভৃতির পরিবর্তনে ইহাদের দেহে নানা প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয় ও তদ্দ্বারা উদ্দীপিত হইলে উদ্ভিদ সাড়া দেয়। উদ্ভিদের মধ্যে নড়াচড়াও দেখা যায়। গাছের শরীরেও বিপাক ক্রিয়া (মেটাবলিজ্‌ম) চলিতেছে, পারপাক ও আত্মীকরণ (অ্যাসিমিলেশন) পুষ্টিসাধন করিতেছে, শ্বাসকার্যের প্রয়োজন হইতেছে, রেচন ক্রিয়ার (এক্সক্রিশন) দ্বারা অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যদ্রব্য বাহির হইয়া যাইতেছে, প্রজননের দ্বারা বংশবৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমে বার্ধক্য ও অবশেষে মৃত্যু আসিয়া জীবনের সমাপ্তি ঘটাইতেছে।

মূলরোমের সাহায্যে গাছ অভিস্রবণ (অস্‌মোসিস) নামক প্রক্রিয়ার দ্বারা মাটি হইতে রস শোষণ করে। মূলের মধ্যে কোনও ছিদ্র না থাকিলেও কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজ্‌মের স্তর ভেদ করিয়া জল মূলের ভিতর প্রবেশ করে। অভিস্রবণ ছাড়া অন্য সজীব প্রথায়ও রস কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। মূলরোম হইতে অভিস্রবণের দ্বারা রস এক কোষ হইতে অন্য কোষে স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমে 'জাইলেম' নামক নালিকায় প্রবেশ করে এবং গাছের সমস্ত শরীরে স বাহিত হয়।

মূলরোমের দ্বারা শোষিত জলের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশটুকু পাতা হইতে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়, ইহাকে বাষ্পমোচন (ট্রান্‌স্‌পিরেশন) বলে। পাতার বা কাণ্ডের ত্বকের উপরকার কিউটিক্‌ল হইতে কিছুটা বাষ্পমোচন হইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ পাতায় অবস্থিত পত্ররন্ধ্র হইতেই অধিকাংশ জল বাহির হইয়া যায়। পাতার মধ্যে পত্ররন্ধ্রের ভিতরেই একটি গহ্বর থাকে, জলীয় বাষ্প বিভিন্ন কোষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সেই গহ্বরে জমা হয় ও পত্ররন্ধ্র দিয়া বাহিরে যায়। আলোক, উত্তাপ, শুষ্ক বায়ু প্রভৃতির প্রভাবে পত্র-

রন্ধ্র বড় হইয়া খুলিয়া যায় ও বাষ্পমোচন বাড়ে। আবার বিপরীত অবস্থায় পত্ররন্ধ্র অত্যন্ত ছোট হইয়া গেলে বাষ্পমোচন কমে। মরু অঞ্চলে জলের অভাবের জন্য নানাবিধ উপায়ে পাতা হইতে বাষ্পমোচন রোধ করিবার ব্যবস্থা থাকে। বাষ্পমোচন ছাড়াও কচু, পদ্ম ইত্যাদি কোনও কোনও গাছের পাতা হইতে একপ্রকার বিশেষ রন্ধ্রপথে জল তরল অবস্থাতেই খনিজ পদার্থের সহিত বাহির হইয়া আসে।

দিবারাত্র পাতা ও অন্যান্য সমস্ত সজীব অঙ্গ দিয়াই গাছ শ্বাসকার্য চালাইয়া যাইতেছে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা গাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে; সেই অক্সিজেন আন্তঃকোষ রন্ধ্র দিয়া বিভিন্ন কোষে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের সাহায্যে কোষমধ্যস্থ খাদ্যের জারণ (অক্সিডেশন) ক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল ও শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি নানাবিধ জৈব প্রক্রিয়া সাধিত করে।

সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্থেসিস) প্রক্রিয়ায় গাছ নিজ খাদ্য উৎপন্ন করিতে পারে। গাছের সবুজ পাতায় ও অন্যান্য সবুজ অংশে ক্লোরোফিল থাকে; সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ইহার সাহায্যেই বাতাস হইতে গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মাটি হইতে শোষিত জলের সমন্বয়ে কোষমধ্যে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়; এজন্য কিছুটা উত্তাপ ও পটাসিয়ামেরও প্রয়োজন হয়। সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড পত্ররন্ধ্র দিয়া গাছের দেহে প্রবেশ করে এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন অক্সিজেন ঐ একই পথে বাহির হইয়া যায়। সূর্যালোকের প্রয়োজন থাকায় কেবলমাত্র দিনের বেলায় এই প্রক্রিয়া চলে ('ক্লোরোফিল' ও 'সালোকসংশ্লেষ' দ্র)।

গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনের জন্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ— এই কয়টি মৌলিক উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন; গাছ তন্মধ্যে কার্বন ও অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে, অন্যগুলি মাটি হইতে লয়। ইহা ছাড়া অত্যল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ, বোরোন, তামা, মলিবডেনাম, সিলিকন ইত্যাদিও উদ্ভিদের দেহগঠনে সহায়তা করে।

সমস্ত কিছু মৌলিক উপাদান প্রয়োজনীয় অনুপাতে কোষমধ্যে পৌঁছিলে ও আত্তীকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিলে উদ্ভিদের আকার ও ওজনে যে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে, উহাকেই বৃদ্ধি বলে। বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে কোষগুলি বিভক্ত হইয়া বহু নূতন কোষ গঠিত হয়। তাহার পর এই নূতন কোষগুলি আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কোষবৃদ্ধির এই পর্যায়ে অক্সিন (auxin) নামক উদ্ভিদ-হর্মোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। অবশেষে কোষগুলি স্থায়ী আকার ধারণ করে ও নানাবিধ টিসু বা দেহকলার সৃষ্টি হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সমতা রাখিয়া গাছের বৃদ্ধির আহ্নিক ও ঋতুগত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 'কাণ্ড', 'পাতা', 'ফল', 'ফুল' ও 'মূল' দ্র।

দ্র E. W. Sinnott & K. S. Wilson, *Botany : Principles and Problems*, New York, 1955.

সন্তোষকুমার পাইন

গাছ বেড়া একটি গাছকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুতা দিয়া বেষ্টন করা বীরভূম জেলার সুবর্ণবণিক সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিবাহের আনুষঙ্গিক একটি আচার। বিবাহের দিন কিংবা তাহার পূর্বদিন এই আচারটি পালন করা হয়। পাত্র কিংবা পাত্রীর গৃহ হইতে শোভাযাত্রা সহকারে একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে মনসামঙ্গলের গায়ক, মধ্য ভাগে এয়োস্ত্রীগণ, তৎপশ্চাৎ দেয়াশীর ক্রোড়ে মনসার ঘট, তারপর দর্পণ কিংবা কাজললতা হস্তে বর কিংবা কনে এবং সকলের পশ্চাতে বাদ্যভাণ্ড অগ্রসর হয়। গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে একটি বৃক্ষের চারিদিকে সুতা দিয়া বেষ্টন করিয়া তাহা প্রদক্ষিণ করা হয়। মনসামঙ্গলের গায়ক কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া চামর-মন্দিরা সহযোগে মনসামঙ্গল গান করে। অতঃপর শোভাযাত্রা গৃহে ফিরিয়া আসে।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

গাজন বাংলা দেশের লৌকিক উৎসব। ইহা নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত কোনও কোনও সংক্রান্তি কিংবা পূর্ণিমা তিথিতে বাংলার সর্বত্রই ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বাংলা দেশে ইহা বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে, যেমন শিবের গাজন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন, আদ্যের গাজন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবের লক্ষ্য সূর্য এবং তাহার পত্নী বলিয়া কল্পিত পৃথিবী। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। চৈত্র মাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচণ্ড অগ্নিময় রূপ ধারণ করে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও সুবৃষ্টি লাভের আশায় কৃষিজীবী

সমাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করিয়াছিল। গ্রাম্য শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কোনও কোনও গ্রামবাসী পূর্ব হইতে মানসিক করিয়া ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা বলে। সন্ন্যাসীরা হবিষ্যান্ন ভোজন করে, উত্তরী (উত্তরীয়) ও একখণ্ড বেত্র ধারণ করে। তাহার ফলেই দেবকর্মে তাহাদের অধিকার জন্মায়। সন্ন্যাসীরা শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা দেবতার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিবার প্রয়াস পায়। এই সব কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে জিহ্বা ফোঁড়া, কাঁটা ঝাঁপ, আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চড়ক গাজন অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। এই উপলক্ষে এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়া গ্রামান্তরের শিবতলায় লইয়া যাওয়া হয়, একজন শিব ও একজন গৌরী সাজিয়া নৃত্য করে, অন্যান্য সন্ন্যাসী নন্দী, ভৃঙ্গী, ভূতপ্রেত দৈত্যদানব প্রভৃতি সাজিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। শিবের সম্পর্কে নানা লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হয়, তাহাতে শিবের নিদ্রাভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কৃষিকর্ম পর্যন্ত নানা বিষয়ের উল্লেখ থাকে। এই অনুষ্ঠান সাধারণতঃ তিন দিন ব্যাপী চলিয়া থাকে।

পূর্ব বা শায চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে কালীকাচ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। অসুরবধ উপলক্ষে কালীর নৃত্য ইহার বিষয়। বাংলার লোকনৃত্যের ইহা একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। 'চড়ক' দ্র।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-শ্রুতি, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

গাজর ধন্যাক গোত্রের (ফ্যামিলি উম্‌বেল্লিফেরী, Family-Umbelliferae) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ, বিজ্ঞানসম্মত নাম দাউকস কারোতা (*Daucus carota*)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ধনে, মৌরি, জিরা জোয়ান প্রভৃতি মশলার গাছও ঐ একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

আফগানিস্তান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল গাজরের জন্মভূমি। বর্তমানে পৃথিবীর বহু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। ভারতবর্ষে শীতকালীন সবজি হিসাবে গাজর উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গাজর বর্ষজীবী গাছ, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ইহা দ্বিবর্ষজীবী। বেলে ও দো-আঁশ মাটিতে গাজর ভাল হয়। হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১৮ হইতে ৪৫ মেট্রিক টন।

গাজরের যৌগ (কম্পাউণ্ড) পত্রগুলি ভূমিসংলগ্ন ক্ষুদ্র কাণ্ড হইতে বাহির হয়। দীর্ঘ পুষ্পদণ্ডের প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাদা বা গোলাপি ফুল ফোটে। পুষ্পবিন্যাস যৌগ ছত্রবিন্যাস জাতীয়। ফল ক্ষুদ্র ও শ্বেতবর্ণ।

মাটির নীচে গাজরের প্রধান মূলে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকায় মূলটি স্ফীত ও শাঙ্কব (কোনিক্যাল) হইয়া ওঠে। জল, কার্বোহাইড্রেট, খনিজ লবণ প্রভৃতি ছাড়া এই মূলে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন নামক পীতবর্ণ রাসায়নিক পদার্থ থাকায় মূলটির বর্ণ হলুদ বা কমলা। এই ক্যারোটিন হইতে প্রাণীদেহে ভিটামিন এ উৎপন্ন হইতে পারে, তাই গাজরের মূল সবজি হিসাবে উৎকৃষ্ট।

দ্র Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India . Raw Materials*, vol. III, New Delhi, 1952.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

গাঁজা সিদ্ধি গাছের ফুল হইতে উৎপন্ন মাদকদ্রব্য। সিদ্ধি গাছ (কান্নাবিস সাতিভা, *Cannabis sativa*) মোরাসিঈ বা তুঁত গোত্রের (Family-Moraceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী, বর্ষজীবী, বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। আসাম, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে এই গাছের চাষ আছে। কার্তিক মাসে বীজ বপন করিলে তিন চারি মাস পরে ফুল ফোটে। গাছ ১-৫ মিটার উঁচু হয়, কাণ্ড সবল। সরু পাতার উভয় প্রান্ত করাতের দাঁতের মত এবং অগ্রভাগ সূচালো। ফুল ঈষৎ সবুজাভ শাদা। গাছের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

সিদ্ধি গাছের কাণ্ড হইতে একপ্রকার সেলুলোজ-প্রধান তন্তু উৎপন্ন হয়, ইহা হইতে নৌকার পাল, ত্রিপল প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। ভারতের গাড়ওয়াল, আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতি অঞ্চলে এই তন্তুর জন্য সিদ্ধি গাছের চাষ হয়। সিদ্ধি গাছের বীজের তৈল সাবান, রঙ প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সিদ্ধি গাছের পাতা শুকাইয়া সিদ্ধি বা ভাঙ, আঠা হইতে চরস ও স্ত্রী গাছের ফুল হইতে গাঁজা উৎপন্ন হয়। এই তিনটি মাদক দ্রব্যের মধ্যে সিদ্ধির মাদকতাই সর্বাপেক্ষা কম।

ভারতে আহ্‌মদনগর অঞ্চলের গাঁজাই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। গাঁজার জন্য চাষের সময় খেত হইতে সকল পুং-গাছ কাটিয়া ফেলা হয়। স্ত্রী-গাছের ফুলের বোঁটায় হলুদ রঙ ধরিতে আরম্ভ করিলেই ফুলগুলি কাটিয়া লইয়া মাড়াই, শুকানো, চাপ দেওয়া ইত্যাদি পদ্ধতির সাহায্যে গাঁজা প্রস্তুত করা হয়। গড়ে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ২৮০ কিলোগ্রাম গাঁজা উৎপন্ন হয়।

সিদ্ধি বা ভাঙ পানীয় ও খাদ্যবস্তুর সহিত মিশাইয়া মাদকদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে সিদ্ধি সেবন ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। নেশার জন্য গাঁজা ও চরসের ধূমপান করা হয়। গাঁজার ধূমপান করিলে স্বপ্ন-বিভোর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি জন্মে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায়ই চেঁচামেচি ও উন্মত্ত আচরণ করে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে বুদ্ধিভ্রংশ ও এমন কি মস্তিষ্কের বিকৃতিও হইতে পারে।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২, Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India : Raw Materials*, vol. II, Delhi, 1950.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গাঁজা— বিশেষ করিয়া সিদ্ধি বা ভাঙ— শিবপ্রিয় পবিত্র বস্তুরূপে স্বীকৃত। সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহাদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। গাঁজার ধূমপানের সময় শিবের নাম স্মরণ করিবার প্রথা আছে। ত্রিনাথ নামক লৌকিক দেবতার উপাসনাত্মক উৎসবানুষ্ঠান ত্রিনাথের মেলায় গাঁজা একটি প্রধান উপকরণ। মেলায় সমবেত সকলকেই গাঁজা খাইতে বা গাঁজার কলিকা মুখে ছোঁয়াইতে হয়। ভাঙখোর শিবের ভাঙ খাওয়ার প্রচুর উল্লেখ শিবায়ণকাব্যে আছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে সিদ্ধি ঘোটা ও সপারিষদ শিবের সিদ্ধি ভক্ষণের বিবরণ দিয়াছেন। বিবাহাদি শুভকার্যে সিদ্ধি কিনিয়া বাজার আরম্ভ করার রীতি দেখা যায়। বিজয়াদশমীর দিন দেবী-বিসর্জনের পর আনুষ্ঠানিক সিদ্ধিভক্ষণের প্রথা আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকে মদ্য অপেক্ষা প্রশস্ততর বলা হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রের প্রিয়— সমুদ্রমন্থনের সময় পীযূষ রূপে ইহার উৎপত্তি। ইহা ত্রৈলোক্য বিজয়প্রদা। ইহার সংস্কৃত নাম বিজয়া, ভঙ্গা, গঞ্জা, ইন্দ্রাশন, সংবিদা বা সংবিদ্ প্রভৃতি। গাঁজার প্রতিশব্দ রূপে গঞ্জিকা শব্দের ব্যবহার বহুল প্রচলিত হইলেও ইহার আভিধানিক অর্থ মদিরাগৃহ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গাজীর পট মধ্যযুগের মুসলমান ধর্মযোদ্ধাগণ সমাজে গাজী নামে সম্মান লাভ করিতেন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত পটে চিত্রিত করিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গীতসহযোগে প্রদর্শন করা হইত, তাহাই গাজীর পট নামে পরিচিত। গাজীগণ অলৌকিক শক্তি ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন বলিয়া মনে করা হইত। বাংলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁহারা তাঁহাদের শৌর্যবীর্য দ্বারা ব্যাঘ্রকে শাসন করিতে পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। তাঁহারা ব্যাঘ্রের দেবতা বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই পূজিত হইতেন। গাজীর পটে যে চিত্র অঙ্কিত করা হইত, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্যাঘ্রারূঢ় রূপে দেখা যাইত। ক্রমে গাজী সাহেবের ব্যাঘ্রকে দমন করিবার বিষয়ই গাজীর পটগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে বড় গাজী খাঁ বা জেন্দাগাজী সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

গাটাপার্চা বোর্নিও, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে সাপোটাসিয়ী গোত্রের (Family-Sapotaceae) অন্তর্ভুক্ত দিকপ্সিস গক্তা (Dichopsis gutta) নামক বৃক্ষ জন্মায়, ইহার উচ্চতা গড়ে ৭০-১০০ ফুট (২১-৩০ মিটার) ও কাণ্ডের বেড় ২-৩ ফুট (৬০-৯০ সেন্টিমিটার)। ইহার ত্বক, কাণ্ড বা শাখায় আঘাত করিলে দুধের আঠার মত সাদা রস নিঃসৃত হয়। সেই রস হইতে গাটাপার্চা নামক প্লাস্টিকবৎ পদার্থ প্রস্তুত করা হয়। মালয় ভাষায় 'গাটা' অর্থে আঠা, 'পাচা' অর্থে গাছ, অর্থাৎ গাছের আঠা। উক্ত বৃক্ষ হইতে আহৃত রস কিছুক্ষণ পরে চটচটে আঠার মত ঘন কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। গরম উষ্ণ জলে লইয়া মাড়িলে ত্বক, শাখার টুকরা, ধুলা-বালি প্রভৃতি হইতে পৃথক হইয়া যায়। এই পরিশুদ্ধ আঠার দলা মাখিয়া বেলিয়া পাতলা চাদরের মত করা হয়, তাহার পর চাদর গুটাইয়া গোলাকার করিয়া তাহাতে চাপ দেওয়া হয়। গাটাপার্চা কতকগুলি টার্পিন জাতীয় হাইড্রোকার্বনের ($(C_{10}H_{16})_n$) সংমিশ্রণ। ইহার বর্ণ সাদা, পিঙ্গল বা বাদামী। ইহা শক্ত, ইহার প্রসার্যতা কম। তাপ দিলে (৫০° সেন্টিগ্রেড) ইহার প্রসার্যতা বৃদ্ধি পায়, তখন ইহাকে টানিয়া লম্বা করা চলে। ইহা ক্লোরোফর্ম, বেন্‌জিন, কার্বন-ডাইসালফাইড প্রভৃতি তরল পদার্থে দ্রাবিত হয়। গন্ধক মিশাইয়া তাপ দিলে (ভালকানাইজ করা) রবারের মতই ইহা কঠিনতর হয়, তখন ইহার প্রসার্যতা আর থাকে না। ইহা রবারের অপেক্ষা কম তড়িৎপরিবাহী। সেইজন্য তড়িৎশিল্পে কুপরিবাহী পদার্থ রূপে ইহার ব্যবহার প্রচলিত।

শ্যামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

গাড়ওয়াল, গাড়য়ালী পাহাড়ী চিত্রকলা দ্র

গাণপত্য গণেশ দ্র

গাণিতিক অর্থনীতি অর্থনীতি পারিমাণিক (কোয়ান্টিটেটিভ) বিজ্ঞান। তাহার পক্ষে গণিতের আশ্রয় গ্রহণ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। গাণিতিক অর্থনীতির বিকাশের ইতিহাস অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু অর্থনৈতিক চিন্তায় গণিতের সামান্য বা আনুষঙ্গিক প্রয়োগ থাকিলেই তাহা গাণিতিক অর্থনীতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। অর্থনীতিশাস্ত্রের যে ধারা গাণিতিক চিন্তন ও উন্নত গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগের উপর বিশিষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই গাণিতিক অর্থনীতি। বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের দ্রুত উন্নতি ও ক্রমবর্ধমান বিশেষজ্ঞবোধ্যতাই গাণিতিক অর্থনীতিকে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

অর্থনীতিতে গণিতের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের বিরুদ্ধে মার্শাল (১৮৪২-১৯২৬ খ্রী), কেইন্‌স (১৮৮৩-১৯৪৬ খ্রী), ফন মিজেস প্রমুখ বহু প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ আপত্তি তুলিয়াছেন। তথাপি গণিত প্রয়োগের নানাবিধ উপযোগিতার ফলে অর্থনৈতিক চিন্তায় গণিতের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। প্রথমতঃ, গাণিতিক উপস্থাপনা অর্থনৈতিক চিন্তাকে সংক্ষেপ, শৃঙ্খলা ও নিশ্চিতি দান করে। দ্বিতীয়তঃ গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বহু সুপরিজ্ঞাত অর্থনৈতিক তত্ত্বের অব্যক্ত তাৎপর্যের বা অনুষঙ্গের আবিষ্কার সম্ভব। তৃতীয়তঃ, বাণিজ্যিক চক্র, সর্বাত্মক সাম্যস্থিতি (জেনেরাল ইকুইলিব্রিয়াম) প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে গাণিতিক চিন্তাধারা বিনা গত্যন্তর নাই, ভাষাগত চিন্তা একরকম অসম্ভব বলিলেই চলে। চতুর্থতঃ, এ যুগে অর্থমিতি বিদ্যার (ইকনমেট্রিক্‌স) বহুল প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলিকে ইহার উপযোগী রূপদানও গণিতের অন্যতম উপযোগিতা।

বেকারিয়া (Beccaria, ১৭৩৮-৯৪ খ্রী), ঝাক বের্নুয়ি (Jacques Bernoulli, ১৬৫৪-১৭০৫ খ্রী), দানিয়েল বের্নুয়ি (১৭০০-৮২ খ্রী), ইজনার (Isnard, অষ্টাদশ শতাব্দী)— ইহারাই গাণিতিক অর্থনীতির প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছেন। ফন ট্যুনেন (Thunen, ১৭৮৩-১৮৫০ খ্রী) অর্থনীতিশাস্ত্রে ক্যাল্‌কুলাসের প্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন। অগস্তাঁ কুর্নো (১৮০১-৭৭ খ্রী) তাঁহার সুবিখ্যাত 'অর্থনীতির গাণিতিক সূত্রের গবেষণা' (১৮৩৮ খ্রী) নামক পুস্তকে একান্তভাবে গাণিতিক আলোচনার সহায়তা গ্রহণ করেন। উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্‌স (১৮৩৫-৮২ খ্রী) এবং অস্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বারা প্রবর্তিত প্রান্তবাদী (মারজিনালিজ্‌ম) বিপ্লবের সময় হইতেই গাণিতিক অর্থনীতির ধারা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করে।

গাণিতিক চিন্তাধারার শক্তিমত্তার প্রথম পরিচয় দেন হ্বালরাস (১৮৩৪-১৯১০ খ্রী) তাঁহার সর্বাত্মক সাম্যস্থিতিতত্ত্বে। আংশিক সাম্যস্থিতিতত্ত্বের গবেষণায় গণিতের প্রয়োগে জেভন্‌স, এজওয়ার্থ (১৮৪৫-১৯২৬ খ্রী), মার্শাল, বৌলি, পিগু (১৮৭৭-১৯৫৯ খ্রী) প্রমুখ অর্থনীতিবিদের দান সমধিক। পারেতো (১৮৪৮-১৯২৩ খ্রী) এবং তাঁহার অনুগামী এওগেনে স্লুতস্কি, হিক্‌স, অ্যালেন প্রভৃতি অমেয় সুখানুভূতি তাত্ত্বিকগণ (অর্ডিন্যাল ইউটিলিটি প্রিন্সিপ্‌ল) ক্রয়তত্ত্বের গাণিতিক রূপায়ণে সহায়তা করেন। স্যামুয়েল্‌সন (১৯১৫ খ্রী) কর্তৃক 'ব্যক্ত পছন্দ' তত্ত্বের প্রবর্তন হইতেই ক্রয়তত্ত্বে গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের প্রবেশ ঘটিয়াছে। অন্য দিকে পারেতো, বারোনে, লাঙ্গে (১৯০৪-৬৫ খ্রী), হিক্‌স প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌ হ্বাল্‌রাসীয় সর্বাত্মক সাম্যস্থিতির আলোচনাকে গাণিতিক পন্থায় বহু দূর অগ্রসর করেন এবং সমাজবাদী অর্থনীতিব্যবস্থার উপর নূতন আলোকপাত করেন।

মুর, ফিসার প্রমুখ পণ্ডিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কসাধনে ব্রতী হন। সুইডেনে হ্বিক্‌সেলের অনুগামী লিন্‌ডাল, মিরডাল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা গতিশীল সমষ্টিগত অর্থনীতিকে গাণিতিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। কেইনসীয় অর্থনৈতিক বিপ্লবের সহিত গাণিতিক অর্থনীতির সংমিশ্রণে এক সম্পূর্ণ নূতন সমষ্টিগত অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। স্যামুয়েল্‌সন, হ্যারড, হিক্‌স প্রভৃতি অর্থনীতিবিদের গাণিতিক অর্থনৈতিক গবেষণা আর্থিক চক্রগতিতত্ত্বকে উচ্চতর স্তরে উপনীত করে এবং আর্থিক উন্নতিতত্ত্বের পথ উন্মুক্ত করে। এই সময় হইতেই অর্থনীতিশাস্ত্রে বর্তমান গাণিতিক যুগের সূত্রপাত।

এ যুগে অর্থনীতির বহু শাখাই একান্তভাবে গণিতনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। গাণিতিক অর্থনীতির সর্বাধিক গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে আর্থিক উন্নতিতত্ত্ব ও আর্থিক যোজনাতত্ত্বের (প্ল্যানিং থিয়োরি) বিকাশে। উন্নত, অর্ধোন্নত এবং অনুন্নত অর্থনীতি ব্যবস্থার গাণিতিক প্রতিরূপের সৃষ্টিতে (মডেল বিল্ডিং) বহু অর্থনীতিবিদ্‌ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। হ্বাসিলি লিওন্তিয়েফ কর্তৃক প্রবর্তিত উৎপাদক-উৎপন্ন সম্পর্কের বিশ্লেষণ (ইন্‌পুট-আউটপুট অ্যানালিসিস) অর্থনীতির ক্ষেত্রে গাণিতিক

গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুক

চিন্তার এক অমূল্য অবদান। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রুশীয় পণ্ডিত কান্তোরোভিচ বৈখিক যোজনা গণিত (লিনিয়ার প্রোগ্রামিং) প্রথমে উদ্ভাবন করেন। এই বিদ্যার প্রসারে টিন বার্জেন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য গাণিতিকগণের দানও অসামান্য। গাণিতিক অর্থনীতির নবতম বিকাশ ঘটিয়াছে গণক যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। আজিকার আর্থিক যোজনার (প্ল্যানিং) ও অটোমেশনের যুগে গাণিতিক অর্থনীতি আর পূর্বেকার মত শুধু পণ্ডিতী ধ্যান-ধারণাই নয়। ব্যাবহারিক অর্থনৈতিক জীবন আজ ক্রমশঃই অধিকতর গণিতনির্ভর হইয়া পড়িতেছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নয়মান-মর্গেনস্টার্ন কর্তৃক প্রবর্তিত ক্রীড়াতত্ত্বের (গেম থিয়োরি) অর্থনৈতিক প্রয়োগ এবং ইহার সহিত ম্যাট্রিক্স-বীজগণিত প্রণালীর মাধ্যমে বৈখিক যোজনা গণিতের মিলন গাণিতিক অর্থনীতিকে এক নবীন রূপ দিতেছে। 'অর্থনীতি' ও 'অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ' দ্র।

দ্র R. G. D. Allen, *Mathematical Analysis for Economist*, London, 1938 ; John von Neumann and Oskar Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behaviour*, Princeton, 1944 ; P. A. Samuelson, *Foundations of Economic Analysis*, Cambridge, Mass., 1947 ; J. A. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, New York, 1955 ; S. Vajda, *Theory of Games and Linear Programming*, London, 1956 ; Robert Dorfman, Paul A. Samuelson and Robert M. Solow, *Linear Programming and Economic Analysis*, New York, 1958 ; W. J. Boumol, *Economic Theory and Operations Research*, New Jersey, 1961 ; D. Reghines Theocharis, *Early Development of Mathematical Economics*, New York, 1961.

অমৃতানন্দ দাস

গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুক সংখ্যা, জ্যামিতিক ক্ষেত্র ইত্যাদি গাণিতিক বিষয় লইয়া নানা প্রকার অবসর বিনোদন পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা ধাঁধা, জাদুবিদ্যা ও হেত্বাভাস বা কুযুক্তির দ্বারা ভ্রান্ত ও অসম্ভব প্রস্তাবের প্রমাণ ইত্যাদি গাণিতিক সাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে। দাবার ছক ও দাবার বল লইয়া কয়েকটি সমস্যা বিশ্লেষণ-ভিত্তিক হওয়ায় ইহাদেরও গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্গত করা হয়। ইহা ভিন্ন আরও যুক্তি ও বিশ্লেষণ -ভিত্তিক ক্রীড়া-কৌতুকের কথা জানা আছে। ক্রীড়া-কৌতুকের সূত্রে নূতন গাণিতিক চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এমন দৃষ্টান্তও গণিতের ইতিহাসে বর্তমান। খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ক্রীড়া-কৌতুকে উৎসাহিত হইয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই সকল কারণে গণিতের রাজ্যে গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এইরূপ গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুকাদিকে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়: ১. পাটিগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত ২. জ্যামিতি সংক্রান্ত ৩. যুক্তিবিন্যাস সংক্রান্ত ৪. বিভিন্ন কূটবর্গ (ম্যাজিক স্কোয়্যার) ও দাবা খেলা সংক্রান্ত। এইগুলির প্রত্যেকটিরই একটি-দুইটি করিয়া উদাহরণ আলোচিত হইবে।

১. পাটিগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত: সংখ্যা অথবা তদনুরূপ কিছু লইয়া কয়েক প্রকার ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে গ্রীসে প্রচলিত একটি ক্রীড়ার সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া যাক, এই খেলাটির নাম 'সংখ্যা যুদ্ধ'। দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী পালাক্রমে ১ হইতে ৬ পর্যন্ত যে কোনও সংখ্যা বলিবে এবং দুই জনের কথিত সংখ্যা একত্রে যোগ হইতে থাকিবে। এই পদ্ধতিতে যাহার দ্বারা যোগফল ৫০-এ নীত হইবে জয় তাহারই।

উক্ত খেলায় যে ব্যক্তি যোগফল ৪৩ করিতে পারিবে সেই জিতিবে। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী ১ বলিলে সে ৬ বলিবে, ২ বলিলে ৫ বলিবে ইত্যাদি। উল্লিখিত বিশ্লেষণ অনুসারে জয়লাভের জন্য যোগফল ৪৩ করিবার পূর্বে তাহা ৩৬ করা প্রয়োজন। এইভাবে পুনঃপুনঃ ৭ বিয়োগ করিতে করিতে দেখা যাইবে যে প্রথম ব্যক্তি ১ বলিলে তাহার জয় অবধারিত।

এই খেলায় তিনটি খেলোয়াড় আনিলে আর কোনও নিয়ম খাটে না।

এই খেলাটির আরও রকমফের আছে। তাহার একটির নাম নিম (Nim)। মুর (Moore) বা উইথফ (Withoff)-এর খেলাও মূলতঃ ইহার সমগোত্রীয়। তবে এই খেলাগুলিতে খেলোয়াড় ও ঘুঁটির সংখ্যা বেশি।

পাটিগণিত ও বীজগণিত পর্যায়ের কয়েকটি সমস্যা বা ধাঁধার উদাহরণ দেওয়া যাক। ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি পাথরকে এমন ৪ টুকরায় ভাঙিতে হইবে যে টুকরাগুলির সাহায্যে ১ হইতে ৪০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজন করা যায়; ইহার উত্তর ১, ৩, ৯, ২৭।

৫, ১০, ১২ ও ২১ সের তরল পদার্থ ধরে এমন ৪টি

পাত্রের শেষেরটি পূর্ণ এবং অন্যগুলি শূন্য। কি উপায়ে পাত্রস্থ তরল পদার্থ তিনটি সমান ভাগে ভাগ করা যায়?

এই ধরনের সমস্যা সমাধানের কোনও বাঁধাধরা উপায় নাই। বর্তমান সমস্যাটির উত্তর এই: প্রথমে ২১ সেরি (অর্থাৎ ২১ সের জল ধরে এরূপ পাত্র) হইতে ১২ সেরি পূর্ণ করিয়া তাহা হইতে ৫ সেরিটি পূর্ণ করিলে ১২ সেরিতে ৭ সের জল থাকিবে। এই ৭ সের ১০ সেরিতে ঢালিয়া ৫ সেরির সমস্ত জল পুনরায় ২১ সেরিতে ঢালিয়া তাহা হইতে ১২ সেরি ও ১২ সেরি হইতে ৫ সেরিতে ঢালিলে ১২ সেরিতে ৭ সের মাত্র জল থাকিবে। এইবার ৫ সেরি শূন্য করিয়া ২১ সেরিতে ঢালিলেই ভাগাভাগি সম্পূর্ণ হয়।

এইবার পাটিগণিত ও বীজগণিত-সংক্রান্ত ম্যাজিক বা জাদুর খেলার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক. দুই জনকে লইয়া যে জাদু তাহাতে প্রথমে দুইটি সংখ্যা স্থির করা হইবে এবং উক্ত দুই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া একজন একটি ও অন্য জন অন্য সংখ্যাটি মনে করিবে। অতঃপর জাদুকর এই সংখ্যা দুইটি লইয়া ইহাদের কিছু গাণিতিক ক্রিয়া করিতে বলিবে এবং উত্তরটি শুনিয়া কে কোন সংখ্যা লইয়াছেন তাহা বলিয়া দিবে। পূর্বে এই খেলাটি যেভাবে প্রচলিত ছিল তাহাতে একজনকে জোড ও অন্য জনকে বিজোড সংখ্যা লইতে হইত। বাশে (Bachet) এই জাদু খেলাটি প্রসারিত করেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে বাশের পুস্তকে লিখিত বহু খেলা ও জাদু গ্রন্থকার বল (Ball) এর পুস্তকে সন্নিবিষ্ট আছে।

একজনকে লইয়া যে ম্যাজিক দেখানো যায় তাহা দুই প্রকার। কোনও সংখ্যা ভাবিতে হইবে, জাদুকর ইহা জানিবে না কিন্তু ইহার উপর কয়েকটি গাণিতিক ক্রিয়া করিতে হইবে। প্রথম প্রকার ম্যাজিক ক্রিয়ার উত্তর শুনিয়া জাদুকর সংখ্যাটি বলিয়া দিবে। দ্বিতীয় প্রকার ম্যাজিকে সংখ্যাটি না জানিয়া জাদুকর উত্তর বলিয়া দিবে। দ্বিতীয় প্রকারের একটি উদাহরণ দেওয়া গেল:

কোনও সংখ্যা মনে করিয়া তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া যে সংখ্যা হইল তাহার যে কোনও স্থানে ১ বসানো হউক। এই সংখ্যাটিকে পুনরায় ২ দিয়া গুণ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগশেষের সহিত ৮ যোগ করিলে উত্তর হইবে ১০।

ঘড়ি বা সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত স্থান বা তাস ইত্যাদি লইয়াও গাণিতিক জাদুবিদ্যা আছে।

পাটিগণিত ও বীজগণিত পর্যায়ের কয়েকটি হেত্বাভাস-ঘটিত খেলার দৃষ্টান্ত: প্রচ্ছন্ন ভ্রান্ত যুক্তির দ্বারা অসম্ভব সপ্রমাণ করা গণিতে উপভোগ্যও বটে এবং শিক্ষাপ্রদও বটে। উদাহরণ দিবার পূর্বে দুই ধরনের ভ্রান্ত যুক্তির বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমটির মূল এই 'শূন্য দিয়া কোনও সংখ্যাই বিভাজ্য নহে' এই সূত্রটি ভুলিয়া না গেলেও ভাগ করিবার সময় সর্বদা ভাজকটির মান পরীক্ষা করিবার কথা স্মরণে থাকে না। ইহার সুযোগ লইয়া যে সকল হেত্বাভাস নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে খ সংখ্যক আলোচনাটি তাহারই একটি উদাহরণ।

ভ্রান্ত যুক্তির দ্বিতীয়টি নিম্নরূপ: বর্গমূল বাহির করার পর + বা − যথাযথ বসানোর প্রতি অনেকেই মনোযোগ দেন না। $(2)^2 = (-2)^2$ সম্পর্কটিতে উভয় দিকের বর্গমূল লইয়া $2 = -2$ লিখিলে চলিবে না - সম্ভাব্য $2 = -2$ এবং $2 = -(-2)$-এর মধ্যে যেটি ঠিক সেইটিই লইতে হইবে। নিম্নের আলোচনাটি ইহার উদাহরণ.

ক. $$1/-1 = -1/1 \therefore \sqrt{1}/\sqrt{-1} = \sqrt{-1}/\sqrt{1}$$

$$\sqrt{1} \times \sqrt{1} = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} \therefore 1 = -1$$

খ. ধরা যাক $a = b$

সুতরাং $a^3 = a^2 b$

দুই দিক হইতে b^3 বিয়োগ করিয়া $a^3 - b^3 = a^2 b - b^3$ পাওয়া যায়। সুতরাং $(a-b)(a^2 + ab + b^2) = b(a^2 - b^2)$

অর্থাৎ $$a^2 + ab + b^2 = b\,\frac{a^2 - b^2}{a - b}$$

অথবা $$a^2 + ab + b^2 = b\,(a + b)\text{।}$$

এইবার $a = b$ স্মরণ করিলে উপরের সমীকরণটির অর্থ হয়

$$3a^2 = 2a^2 \text{ অর্থাৎ } 3 = 2\text{।}$$

২. জ্যামিতি সংক্রান্ত. সকলেই জানেন নানা প্রকার জ্যামিতিক ক্ষেত্র দ্বারা আলপনায়, উদ্যানের নকশায় বা গৃহাদিতে সৌন্দর্য সংবচন সম্ভবপর। বর্তমান প্রবন্ধে ইহার সম্যক বিবরণের স্থান নহে কিন্তু যে সকল জ্যামিতিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের আংশিক বর্ণনা এখানে দেওয়া যাইতে পারে। ক এবং খ সংখ্যক আলোচনায় সেই প্রচেষ্টা আছে।

ক. সমান কোণ ও বাহু-বিশিষ্ট ষড্ভুজ, চতুষ্কোণ এবং সমবাহু ত্রিভুজ—এই তিন প্রকার জ্যামিতিক ক্ষেত্রের যে কোনও একটিকে পরস্পরসংলগ্নভাবে বিন্যস্ত করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলা যায়। দুইটি বা ততোধিক ক্ষেত্রের সাহায্যে কেমন করিয়া ইহা সম্ভব এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা আছে। ক্ষেত্র একাধিক হইলে সৌন্দর্য বর্ধন সম্ভবপর কিন্তু সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গণিত অবশ্যই জটিলতর হইয়া পড়িবে।

গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুক

খ. সাতটি সমান বৃত্তকে এমনভাবে সাজানো যায় যে একটি বৃত্ত মাঝখানে থাকিবে ও বহিঃস্থ ছয়টি বৃত্ত প্রত্যেকে মধ্যেরটি ও পার্শ্বস্থ দুইটিকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে। এই সম্ভাব্য বিন্যাসের সাহায্যে শুধু যে নানা প্রকার জ্যামিতিক রূপকল্প নির্মাণ করা সম্ভবপর তাহাই নহে, বস্তুর আভ্যন্তরীন গঠনেও ইহার প্রভাব বিদ্যমান। ক্যারামবোর্ডের ঘুঁটির বিন্যাসপ্রণালী ইহার প্রসারিত রূপের একটি দৃষ্টান্ত। বৃত্তগুলির স্পর্শবিন্দুগুলি কেন্দ্র করিয়া সমান মাপের আরও বৃত্ত আঁকিলে ইহাদের পরস্পর ছেদের দ্বারা আরও অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক নকশার সৃষ্টি হয় এবং নানা বর্ণের সাহায্যে নকশাগুলিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়।

কারুকার্য ভিন্নও জ্যামিতিতে অবসর বিনোদনের উপাদান আছে, যথা কম্পাসমাত্র ব্যবহারে কয়েকটি নির্মাণ বা বলবিদ্যার সাহায্যে জ্যামিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করা। তবে এই অবসর বিনোদন গণিতজ্ঞদের পক্ষেই অধিক উপভোগ্য।

জ্যামিতিক হেত্বাভাস: দুই প্রকার কুযুক্তি বা হেত্বাভাসের কথা বলা যায়— পাটিগণিতের হেত্বাভাসের মত শূন্য দ্বারা বিভাগ উদ্ভূত এবং দ্বিতীয়টি মিথ্যা নির্মাণ-উদ্ভূত। নিম্নোক্ত আলোচনাটি প্রথম ধরনের হেত্বাভাসের দৃষ্টান্ত। স্থূল A কোণ-বিশিষ্ট ABC ত্রিভুজে যদি C-এর সমান করিয়া ∠BAD কোণ কাটিয়া লওয়া হয় এবং D বিন্দুটি যদি BC-র উপর হয় তাহা হইলে

$\frac{\Delta CBA}{\Delta ABD}=\frac{AC^2}{AD^2}=\frac{BC}{BD}$ হইবে। প্রথম সমীকরণটির প্রথমাংশের কারণ ABD ও CBA সদৃশ ও শেষাংশের কারণ ঐ ত্রিভুজদ্বয়ের উচ্চতা এক হওয়ায় ক্ষেত্রফল BC এবং BD ভূমি (base) দ্বয়ের অনুপাতবিশিষ্ট। সুতরাং $AC^2/BC=AD^2/BD$। AE যদি A হইতে BC-র উপর লম্ব হয় তাহা হইলে $AC^2=AB+BC^2-2BC.BE$ ও $AD^2=AB^2+BD^2-2BD.BE$।

সুতরাং

$$\frac{AB^2+BC^2-2BC.\ BE}{BC}=\frac{AB^2+BD^2-2BD.\ BE}{BD}$$

অর্থাৎ

$$\frac{AB^2}{BC}+BC-2BE=\frac{AB^2}{BD}+BD-2BE$$

অথবা

$$\frac{AB^2}{BC}-BD=\frac{AB^2}{BD}-BC$$

অথবা

$$\frac{AB^2-BD.\ BC}{BC}=\frac{AB^2-BD.\ BC}{BD}$$

সুতরাং প্রমাণিত হইল

$$BC=BD$$

৩. যুক্তি বিন্যাস সংক্রান্ত: যুক্তি বিন্যাস সংক্রান্ত সমস্যার সংখ্যা এত অধিক ও তাহারা এত প্রকার যে তাহাদের শ্রেণীবিভাগ প্রায় অসম্ভব। শ্রেণীবিভাগের কোনও ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। হয়ত প্রতীকী ন্যায় (সিম্বলিক লজিক) দ্বারা এগুলির সমাধান করা যাইবে এবং তদ্রূপ অধ্যয়নে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও কিছু আলোকপাত হইবে।

দৃষ্টান্ত: সুরেশের মায়ের ৪ ছেলে। বড়র নাম এককড়ি, মেজর নাম তিনকড়ি, সেজর নাম পাঁচকড়ি, ছোটর নাম কি? যুক্তিহীনভাবে সংখ্যার ইঙ্গিতে ভ্রান্ত না হইলে বোঝা যাইবে যে নাম অবশ্যই সুরেশ, সাতকড়ি নয়।

৪. কূটবর্গ ও দাবা খেলা সংক্রান্ত: দাবার ছক লইয়া দুইটি সমস্যার উল্লেখ করা হইবে:

ক. ঘোড়াকে কিরূপ চাল দিলে উহা প্রত্যেক ঘরে একবার করিয়া যায় ও কোনও ঘরেই একাধিক বার যায় না।

চালটি এমন ভাবে হইতে পারে যে ঘোড়াটি ছকটির উপর ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমেই ভিতরের দিকে আসিতে থাকিবে। স্থানাভাবে বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভব নহে।

খ. ১৬টি মন্ত্রী এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে কোনও তিনটিই এক সরল রেখায় অবস্থিত না হয়। প্রথম সারির প্রথম ঘরকে ১১, তৃতীয় সারির চতুর্থ ঘরকে ৩৪ ইত্যাদি বলিলে বর্তমান সমস্যার অন্যতম সমাধান:

১৫, ১৬, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৪১, ৪২, ৫৭, ৫৮, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৭৪, ৮৩, ৮৪ ঘরগুলিতে মন্ত্রী রাখা।

কূটবর্গ (ম্যাজিক স্কোয়্যার)-এর কথা বহুজনবিদিত। ইহাতে দাবার ছকের মত একটি ছক আবশ্যক যাহার প্রতি সারিতে যত ঘর আছে প্রতি পঙ্ক্তিতেও ততই আছে। ঘরগুলিতে ১,২,৩,৪··· পর পর সংখ্যাগুলি প্রত্যেকটি একবার করিয়া এমনভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক সারির ও প্রত্যেক পঙ্ক্তির সংখ্যাগুলির যোগফল সমান হয়।

প্রতি সারিতে বা পঙ্ক্তিতে যতগুলি ঘর আছে তাহাকে বর্গের ক্রম বলা হইবে। বিজোড় ক্রমের কূটবর্গ তৈয়ারি করিবার প্রণালী নীচের আলোচনায় দেওয়া হইল।

১৩, ৫৪ ইত্যাদির অর্থ পূর্বোক্ত আলোচনায় (খ) দাবার ছকের অর্থের অনুরূপ।

প্রথম সারির মধ্যস্থ ঘরে অর্থাৎ বর্গক্রম ৫ হইলে ১৩ ঘরে এক বসিবে। অতঃপর সারির সংখ্যা এক করিয়া কমাইয়া ও পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ১ করিয়া বাড়াইয়া যে ঘরগুলি পাওয়া যায় তাহাতে যথাক্রমে ২, ৩ ইত্যাদি বসাইতে হইবে। ধরিয়া লইতে হইবে ৫-এর পরের সংখ্যা ১ অর্থাৎ ১-এর চেয়ে ১ কম সংখ্যা ৫। সুতরাং ৫ ক্রমের বর্গে ২, ৩, ৪, ৫ বসিবার ঘরগুলি যথাক্রমে ৫৪, ৪৫, ৩১, ২২। ২২ এর পরের ঘর ১৩ কিন্তু সেখানে ইতিপূর্বেই ১ রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই সারির সংখ্যা ১ বাড়াইয়া ও পঙ্‌ক্তির সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখিয়া যে ঘরটি পাওয়া যাইবে সেই ঘরে পরের সংখ্যাটি বসিবে। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে ৩২ ঘরটিতে ৬ বসিবে।

উক্ত প্রণালীটি ডি লা লোবেয়ার (De La Laubeies) কৃত। বাশে (Bachet) কৃত আরও একটি নিয়মও জানা আছে।

জোড় সংখ্যা ক্রমের বর্গ তৈয়ারি করিবার নিয়ম অপেক্ষা কৃত জটিল এবং ইহা সম্বন্ধে ডেভেডেক (Devedec) কৃত নিয়ম প্রচলিত আছে।

বর্তমান প্রবন্ধে যে সমস্ত বহু বিষয় স্পর্শও করা গেল না তাহার আংশিক তালিকা — সম্ভাবনা বিদ্যা-উদ্ভূত ও চপলতা বিষয়ক কৌতুকাদি, কলনবিদ্যা (ক্যালকুলাস)-উদ্ভূত হেত্বাভাস, অনন্তশ্রেণী (ইনফিনিট সিরিজ) সম্বন্ধে সমাঙ্কের ধাঁধা ও তৎসংশ্লিষ্ট কৌতুক ইত্যাদি। পাটিগণিতের অন্তর্গত ক্যালেন্ডার সমস্যা, বিবিধের অন্তর্গত পঞ্চদশ সমস্যা (ফিফটিন পাজ্‌ল), হ্যানয়ের অট্টালিকা নামক সমস্যা, 'ল্যাটিস' ইত্যাদি আরও নানা প্রকার গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুক আছে। উহাদের বিবরণ এই প্রবন্ধে পরিসরের স্বল্পতা হেতু সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয় নাই।

দ্র W. W. R. Ball, *Mathematical Recreations and Problems*, London, 1896

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

গাত্রহরিদ্রা বিবাহ ও হরিদ্রা দ্র

গাথা[1] সংগীত দ্র

গাথা[2] ভারতীয়-আর্য ভাষায় 'গাথা' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় বেদে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ইহার পুংলিঙ্গ রূপটিও ('গাথ') একাধিক বার প্রযুক্ত হইয়াছে— স্বতন্ত্র পদ রূপে এবং সমাসের পূর্বপদ রূপে। বৈয়াকরণেরা শব্দটি 'গৈ'-ধাতুর উত্তর 'থন'-প্রত্যয়ের যোগে সিদ্ধ করিয়াছেন। এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী 'গাথা' শব্দের অর্থ হইতেছে 'গীতি' বা 'গেয় পদ'। বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য 'গাথ গাথা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন — 'গাতব্য স্তোত্র', 'স্তুতিরূপা বাক্', 'মন্ত্ররূপা বাক্', 'সকলের দ্বারা গীত হইবার যোগ্য গীতি'।

বৈদিক ভাষার ভগিনীস্থানীয়া প্রাচীন ইরানীয় ভাষাতেও 'গাথা' শব্দটি অজ্ঞাত নহে। 'অবেস্তা'র একটি অংশের নামই 'গাথা' (Gāθā)। ইহা জরথুশ্‌ত্রের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, বৈদিক ছন্দের অনুরূপ প্রাচীন ছন্দে গ্রথিত, কতকগুলি স্তোত্রের সংগ্রহ। এই পদ বা 'গাথা'-গুলির ভাষা 'অবেস্তা'র অন্য অংশের ভাষা অপেক্ষা প্রাচীনতর। বৈদিক সংহিতা ও 'অবেস্তা'র প্রয়োগ সাক্ষ্যে ইহা বলিতে পারা যায় যে, আর্য ভাষায় 'গাথা' শব্দটি আদিতে 'ছন্দোবদ্ধ ক্ষুদ্র স্তোত্র বা স্তুতিরূপ গীতি বা শ্লোক বা পদ' এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় পরে এই অর্থের প্রসার ঘটে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে সবিস্তারে বিবৃত শুনঃশেপ উপাখ্যানে গদ্যের মধ্যে মধ্যে ছন্দোবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় পদ – 'সকলের দ্বারা গীত হইবার যোগ্য গীতি' —উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গীতি-পদগুলিকে বলা হইয়াছে 'গাথা'। এই 'গাথা'গুলি শুদ্ধ স্তুতিরূপ পদ বা গীতি মাত্র নহে, এগুলিতে উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে একটি পুরাতন উপাখ্যানের সারাংশ ধৃত হইয়া আছে। এই 'গাথা'গুলি অপেক্ষাকৃত পুরাতন, সবিস্তারে বিবৃত গদ্য উপাখ্যানের বীজ এইগুলিতে নিহিত।

পালি ও 'মিশ্র সংস্কৃত' বৌদ্ধ সাহিত্যেও গদ্যের মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গতঃ 'গাথা' নামে অভিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে – এই 'গাথা'গুলিতেও অনেক স্থলে উপাখ্যানের মূল কথাবস্তু বিধৃত রহিয়াছে। পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রের খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত দুইখানি গ্রন্থ— 'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা' – গদ্য বর্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি 'গাথা'র সংগ্রহ। এইগুলি একাধারে গীতি ও কবিতা। কিন্তু এইগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই কোনও-না-কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এবং কতকগুলিতে আখ্যায়িকারও সন্ধান পাওয়া যায়। রামায়ণে এক স্থলে একটি প্রাচীন লোকোক্তিকেও 'গাথা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাকৃতেও 'গাথা' রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। হাল কর্তৃক সংকলিত 'গাথা সপ্তশতী' গ্রন্থখানি প্রাকৃতে রচিত এইরূপ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকীর্ণ 'গাথা'র সংগ্রহ।

বিশেষ ছন্দে রচিত এই 'গাথা'গুলি ঠিক আখ্যান-মূলক নহে, এইগুলিকে গীতি-পদ বলাই সমীচীন।

আদিতে 'গাথা'-অর্থে 'স্তুতিরূপ' পদ বা শ্লোক-গীতি বুঝাইলেও, কালক্রমে অর্থের প্রসার হেতু, 'গাথা' বলিতে বুঝায়— পৌরাণিক বা প্রাচীন কোনও লৌকিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত ক্ষুদ্র বা নাতিদীর্ঘ কবিতা, যাহা সুর-সংযোগে গীত হইবার যোগ্য, কিংবা যাহা সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে পারা যায়। আধুনিক বাংলাতে 'গাথা' বলিতে ইহাই বুঝায়।

প্রসঙ্গতঃ বলিতে পারা যায় যে, সংস্কৃতের 'গাথ্'-ধাতু হইতে গঠিত ক্রিয়াপদ হইতে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায়— যথা বাংলা হিন্দী প্রভৃতিতে— 'গাহ্'-ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে— সংস্কৃত 'গাথয়তি' > 'গাথেতি' > 'গাধেদি' > 'গাহেই' > 'গাহই'— আধুনিক বাংলা 'গাহে' > 'গায়' (=গাহ্ + -এ))। গান বা সুর-লয়ের সহিত 'গাথা'র সংযোগ ইহাতে সুস্পষ্ট।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

গাথাসপ্তশতী প্রাকৃত ভাষায় গাহা (গাথা) ছন্দে লেখা শ্লোকের সংকলন। প্রাকৃতে গ্রন্থটির নাম 'গাহা-সত্তসঈ'। সাতবাহন (সাতবাহন বংশীয়) হাল সংকলনটি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। হর্ষচরিতের উপক্রমে বাণ পূর্ব কবিদের প্রশংসা প্রসঙ্গে সাতবাহনের সংকলিত প্রাকৃত সূক্তি-মুক্তাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সংকলনটি সপ্তম শতাব্দীর আগেই করা হইয়াছিল। অন্ধ্রদেশীয় সাতবাহন বংশ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহ এই সংকলন-কর্তা হইতে পারেন এই অনুমান অনেকেই করিয়াছিলেন। কিন্তু গাথাসপ্তশতীর শ্লোকের ভাষা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যেমন হওয়া উচিত তেমন পুরানো নহে। এই কারণে গ্রন্থটিকে অত প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পণ্ডিতেরা নারাজ। তবে এমন হইতে পারে যে সংকলনটি প্রথম শতাব্দীতে শুরু হইয়াছিল, পরবর্তী শতাব্দীতে ইহার কলেবর ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াছে এবং ভাষাও কালানুক্রমিক প্রসাধন লাভ করিয়াছে। নাম 'সপ্তশতী' হইলেও বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন সংখ্যার শ্লোক পাওয়া যায়। মনে হয়, 'গাহাসত্তসঈ' নাম পরে দেওয়া হইয়াছে। বাণভট্ট বইটির কোনও নাম নির্দেশ করেন নাই। যাহাই হউক গাথাসপ্তশতী যে রূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা মোটামুটিভাবে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী নহে।

কোনও কোনও পুথিতে কোনও কোনও শ্লোকের রচয়িতার নাম দেওয়া আছে। তাহার মধ্যে নারীর নামও আছে। এ নামগুলির যথার্থতা যাচাই করিবার উপায় নাই।

গাথাসপ্তশতীর শ্লোকগুলি সবই পণ্ডিত কবির রচনা নয়। সাধারণ কবির, গ্রাম্য কবির রচনাও আছে। এমন কি মেয়েলি রচনাও আছে। বেশির ভাগ শ্লোকই আদি-রসাত্মক। সত্যকার কবিত্বের প্রকাশ দুর্লভ নয়। বহু পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীতে গাথাসপ্তশতীর কোনও কোনও শ্লোকের ভাববিস্তার দেখা যায়। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় লেখা সাধারণ লোকের সেবিত কবিতার পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া বইটির সমধিক মূল্য।

সুকুমার সেন

গাঁদা কোম্পোজিটী গোত্রের (Family-Compositae) অন্তর্ভুক্ত বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম তাগেতেস এরেক্তা (*Tagetes erecta*), ইংরেজী নাম আফ্রিকান ম্যারিগোল্ড। সূর্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ইহার সমগোত্রীয়। আদি জন্মভূমি মেক্সিকো, বর্তমানে ভারতের বহু অঞ্চলেই মরসুমী ফুল হিসাবে শীতকালে বাগানে লাগানো হয়।

গাঁদা গাছ সাধারণতঃ ৬০ হইতে ৯০ সেন্টিমিটার উচ্চ হয়। কাণ্ড ঋজু। পত্র সরল, কিন্তু অতিখণ্ডিত হওয়ার ফলে যৌগ পত্রের (কম্পাউন্ড লীফ) ভ্রম দেখায়। হেমন্ত ও শীতে ফুল ফোটে। ইহার পুষ্প-বিন্যাসকে মুণ্ডক (ক্যাপিটিউলাম) বলে। ইহা দেখিতে ফুলের মত এবং সাধারণভাবে ইহাই 'ফুল' বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল বা পুষ্পিকার (ফ্লোরেট) সমন্বয়। প্রতিটি মুণ্ডকের মধ্যপুষ্পিকাগুলি (ডিস্ক ফ্লোরেট) উভলিঙ্গ ও প্রান্তপুষ্পিকাগুলি (রে ফ্লোরেট) স্ত্রীলিঙ্গ। ফুলের রং কমলা, হলুদ বা ফিকে হলুদ। প্রকার (ভ্যারাইটি) ভেদে ফুলের আকার, আয়তন ও বর্ণের পার্থক্য আছে। বীজ অথবা শাখাকলম দ্বারা গাঁদা গাছ উৎপন্ন করা যায়। আয়ুর্বেদ মতে, ফুলের রস অর্শ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে উপকারী।

তাগেতেস পাতুলা (*Tagetes patula*) প্রজাতির অন্তর্গত গাঁদা গাছের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম এবং ফুলও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ফুলের রঙ হলুদ, কমলা বা লাল। ইহাদের ইংরেজী নাম ফ্রেঞ্চ ম্যারিগোল্ড।

দ্র W. Burns, *Firminger's Manual of Gardening for India*, Calcutta, 1918.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

গাঁদাল ভৈষজ্য উদ্ভিদ দ্র

গাদি দেশজ প্রাচীন ক্রীড়া। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা দাড়িয়াবান্ধা, হিংগল দাড়ি, শিরগিজো, নুনচিকে, নুনঘর, ধাপসা ইত্যাদি নামেও খ্যাত। নামে পৃথক হইলেও খেলাটির মূল পদ্ধতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় এক। সাধারণতঃ ছয় বা সাত জনের দুই দলের মধ্যে খেলা হইয়া থাকে। সমতল জমির উপর ৩ মিটার (১০ ফুট)-এর ব্যবধানে সমান্তর পথ বা দাড়ি চিহ্নিত হয়। আর একটি দাড়ি ইহার মধ্যস্থল দিয়া প্রথম হইতে শেষ দাড়ির সহিত যুক্ত করা হয়। মধ্যস্থলের এই দাঁড়িটি, খাড়া দাড়ি, শির বা চিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সমান্তরাল দাড়িগুলির উভয় প্রান্তে এক-একটি সীমারেখা চিহ্নিত হয়। ফলে ৩ মিটার × ৪ মিটার (১০ × ১২ ফুট) মাপের কয়েকটি ঘর সৃষ্ট হয়। এইগুলি ব্যতিরেকে প্রথম ও শেষ দাঁড়ির সম দৈর্ঘ্য ২ মিটার (ফুট) চওড়া একটি করিয়া ঘর তৈয়ারি হয়। ইহার প্রথমটিকে 'পাকা ঘর' ও শেষটিকে 'কাচা ঘর' বলা হয়। খেলার মূল পদ্ধতি হইল এই যে একদল ঘর আগলাইবে, ইহাদের দাঁড়িয়াল বলা হয় এবং অপর দল যাহাদের ছোটনদার বলা হয় তাহারা দাঁড়িয়ালদের স্পর্শ এড়াইয়া পাকা ঘর হইতে কাচা ঘরে গিয়া এবং সেখান হইতে অনুরূপভাবে ফিরিয়া আসিবে। পর্যায়ক্রমে এই ভাবে খেলিয়া উভয় দলের মধ্যে যে দল বেশি পয়েন্ট অর্জন করিতে পারিবে সেই দল বিজয়ী সাব্যস্ত হয়। অঞ্চল ভেদে সূক্ষ্ম নিয়মগুলির পার্থক্য আছে। বঙ্গ দেশে সাধারণতঃ ছোটনদার দাড়িয়াল কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে সে 'মরা' এবং কোর্টের বাহিরে চলিয়া গেলে 'জলা' গণ্য হয়। ছোটনদার দলের দুই জনের বেশি একসঙ্গে একঘরে আসিয়া পড়িলে এবং 'কাচা ঘরে' গমনোদ্যত ও 'পাকা ঘরে' প্রত্যাবর্তনরত একাধিক ব্যক্তি এক ঘরে উপস্থিত হইলে তাহারা 'পচা' গণ্য হয়। 'মরা', 'জলা' বা 'পচা' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটনদার দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে 'পাকা' ঘরে ফিরিয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া খেলা আরম্ভ করিতে হয়। অপর পক্ষে দাঁড়িয়ালকে সব সময়ে 'দাঁড়ি' আগলাইতে হয়, দাঁড়ির বাহিরে গিয়া ছোটনদারদের ছুঁইলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। কাঁচা ঘরের দিকে ধাবমান ছোটনদারকে পশ্চাৎ হইতে এবং পাকা-ঘরের দিকে অগ্রসরমান ছোটনদারকে খাড়া দাড়িতে গিয়া ছুঁইতে পারিলে ছোটনদার মরা বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহার বিপরীত অর্থাৎ কাঁচা ঘরের দিকে ধাবমানকে সম্মুখ হইতে এবং পাকা ঘরের দিকে ছুটন্ত ব্যক্তিকে খাড়া দাড়িতে পশ্চাৎ হইতে ছুঁইলে তাহা গ্রাহ্য নহে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৩।৩।৭) লবণবীথিকা নামে উল্লিখিত খেলাটি ইহার প্রায় অনুরূপ। সুতরাং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে খেলাটি চলিয়া আসিতেছে অনুমান করা অসংগত নহে। 'নুনচিকে', 'নুন চোর' নামগুলি এই অনুমান সমর্থন করে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে রচিত শংকর কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দ মঙ্গল' কাব্যে চিকদাড খেলাটি যে 'গাদি' খেলার নামান্তর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুকুল দত্ত

গাধা স্তন্যপায়ী শ্রেণীর পেরিসোদাক্তিলা বর্গের (Order-Perissodactyla) অন্তর্ভুক্ত একুয়িদী গোত্রের (Family-Equidae) প্রাণী। সে হিসাবে ইহারা অশ্বের নিকট-আত্মীয় এবং অশ্বের সহিত একই গণের (জেনাস-একুয়ুস, Genus-Equus) অন্তর্গত। ইহারা বিজোড় খুর প্রাণী। নিরামিষাশী হইলেও ইহারা গোরুর মত রোমন্থন করে না এবং ইহাদের পাকস্থলীতে অশ্বের মতই একটিমাত্র কক্ষ থাকে। গাধা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও সন্তানবৎসল। গাধার প্রজনন-ঋতু বসন্তকাল এবং গর্ভধারণের সময় প্রায় ৩৬৫ দিন।

গাধা গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রাণী, ভারত, ইরাক, সৌদি আরব, সুদান প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে অশ্বের পূর্বেই গাধা মানুষের পোষ মানিয়াছিল। মিশরে পিরামিড যুগে ইহারা ভারবহন কার্যে নিযুক্ত হইত। সুমের ও ব্যাবিলনে এবং সমসাময়িক পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশে গাধা রথ টানিত।

প্রকৃত বন্য গাধা দেখা যায় উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায়। ইহা ছাড়া বন্য গাধা নামে কথিত কিয়াং, চিগেতাই প্রভৃতি প্রাণী তিব্বত, ইরান ও মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে বিচরণ করে।

ভারতে প্রধানতঃ ভারবহনের জন্যই গাধা পালিত হয়। মধ্য এশিয়ার কোথাও কোথাও গাধার দুধ পান করিবার প্রথা প্রচলিত।

দ্র T. J. Parker & W. A. Haswell, *A Text-book of Zoology*, vol. II, London, 1951.

গান্ধর্ব গান্ধর্ব সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনি এই সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করিয়াছেন: তন্ত্রী অর্থাৎ বীণাবাদ্যের অন্তর্গত

অপরাপর বাদ্য সমাশ্রিত স্বর, তাল এবং পদ -যুক্ত যে বচনা দেবতাদিগের বিশেষ প্রার্থিত এবং গন্ধর্বদিগের প্রীতিকর তাহাকে গান্ধর্ব বলা হয় (নাট্যশাস্ত্র ২৮।৮ ৯)। বীণা বাদ্যের প্রাধান্য থাকিলেও কণ্ঠসংগীতও ইহাতে যোজিত হইত। নাট্যশাস্ত্রে ভরতবর্ণিত অষ্টাদশ জাতি, প্রাচীন তাল -আশ্রিত বিবিধ প্রকার বীণাবাদ্য, সাত প্রকার কণ্ঠ সংগীত, যথা - মদ্রক, উল্লোপ্যক, অপরান্তক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক এবং উত্তর— এই সবই গান্ধর্বের অন্তর্গত।

ত্রয়োদশ শতকের পূর্বার্ধে নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব তদীয় সংগীতরত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ের সূচনায় বলিয়াছেন রঞ্জক গুণসম্পন্ন স্বরসন্দর্ভকে গীত বলা হয়। ইহার দুইটি প্রকারভেদ গান্ধর্ব এবং গান। গান্ধর্বগণ কর্তৃক যে অনাদিসম্প্রদায় -সংরক্ষিত নিয়ত শ্রেয়স্কর বস্তু সম্প্রযুক্ত হয় তাহাকেই জ্ঞানীগণ গান্ধর্ব বলিয়া থাকেন (সংগীতরত্নাকর, প্রবন্ধ অধ্যায়, শ্লোক ১, ২)। সংগীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলিয়াছেন, ‘গান্ধর্বং মার্গঃ গানং তু দেশীতি বক্তব্যম্’, অর্থাৎ, গান্ধর্বকে মার্গ এবং গানকে দেশী এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহার মতে সংগীতরত্নাকরে বর্ণিত প্রাচীন গ্রামরাগ, ভাষারাগ, বিভাষারাগ এবং অন্তরভাষারাগ - এই সকল ভরতোক্ত রাগসংগীতও গান্ধর্বের অন্তর্গত। জনরঞ্জক দেশীরাগ অবলম্বন করিয়া যে কাব্যসংগীত প্রস্তুত হইয়াছে তাহাই গান বলিয়া অভিহিত হয়।

প্রাচীন ভারতে ভরতের কাল পর্যন্ত যে শ্রেষ্ঠ সংগীত প্রচলিত ছিল তাহা গান্ধর্ব নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে রাগসংগীতের অভ্যুদয়ের পর ইহার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিগুলি গান্ধর্বের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ইহার আখ্যা দেওয়া হয় মার্গসংগীত। অপর পক্ষে দেশে দেশে প্রচলিত গীতকে সাধারণভাবে ‘গান’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

গান্ধার, গন্ধার গান্ধার অতি প্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদ (১ ১২৬ ৭) ও অথর্ববেদ (৫ ২২ ১৪)-এ গান্ধারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় (৭ ৩৪) ও শতপথ -ব্রাহ্মণে (৮ ১ ৪ ১০) গান্ধার দেশের নৃপতি নগ্নজিৎ ও তদ্বংশীয় স্বর্জিতের কাহিনী বিধৃত রহিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৬ ১৪ ১ ২) গান্ধার দেশ ও তদধিবাসীর বিষয়ে আলোচনা আছে। রাজা বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা যযাতির দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। শর্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্রের জননী হন। দ্রুহ্যুর প্রপৌত্র গন্ধারের নামানুসারেই গান্ধার দেশ খ্যাত হয় (মৎস্য-পুরাণ ৪৮।৬ ৭)। গন্ধারের পিতার নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকার পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণ মতে গন্ধার অরদ্বের পুত্র। মৎস্যপুরাণ মতে গন্ধারের পিতার নাম শরদ্বাজ। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে গন্ধারকে সেতুর পুত্রের পুত্র বলিয়া বলা হইয়াছে। ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য-পুরাণে সেতুকে দ্রুহ্যুর পুত্র ও গন্ধারের পিতামহ বলিয়া উল্লেখ করা আছে। মহাভারতে (আদি ৬৩।১১১ ১২) গান্ধার দেশাধিপতি সুবলের উল্লেখ আছে। রাজা সুবলের পুত্র শকুনি। সুবলের কন্যা গান্ধারী হস্তিনাপুরাধিপতি ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায় ও ধর্ম পরায়ণা বলিয়া বিখ্যাত হন। অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয় দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি গান্ধারান্তর্ভুক্ত তক্ষশিলা জয় করেন। অযোধ্যার রাজা দশরথ গান্ধারের নিকটবর্তী কেকয়রাজ্যাধিপতির কন্যা কৈকেয়ীকে বিবাহ করেন। পরে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করার পর কেকয়রাজ যুধাজিৎ তাঁহাকে গান্ধার দেশ জয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র ভরতকে গান্ধারের বিরুদ্ধে অভিযানের আদেশ দেন। ভরত তথা গান্ধার অধিকার করেন। [illegible] গান্ধার রাজ্যে [illegible] তাঁহাদের নামানুসারে [illegible] তাঁহাদের রাজধানী পুষ্কলাবতী ও তক্ষশিলা নামে পরিচিত হয়।

[illegible]

[illegible] গান্ধারের [illegible] সাম্রাজ্যে [illegible] (আনুমানিক ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্ব)। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বার্ধে গান্ধার ছিল ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধে গান্ধার পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পারস্যরাজ প্রথম দরায়ুস (Darius আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫২১ ৪৮৬) এর বহিস্তান শিলালেখে (আনু-মানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৯) অকামেনীয় (Achaemenian) সাম্রাজ্যের অধীন গদারের উল্লেখ আছে। পের্সেপোলিস ও দক্ষিণ কবর শিলালেখেও অকামেনীয় নৃপতির অধীন গান্ধারের উল্লেখ আছে, এই লেখটি খুব সম্ভবত: অর্ত-ক্ষেরক্সেস এর (Artaxerxes, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৫ ৩৫৮)। তৃতীয় দরেইওস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৫ ৩৩০) এর রাজত্বকালে গান্ধারের উপর অখমেনীয়দের আধিপত্য অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ম্যাসিডনরাজ আলেকসান্দর (আলেক-জাণ্ডার) এর আক্রমণ কালে উত্তর পশ্চিম ভারত পুষ্কলাবতী, তক্ষশিলা, গান্ধার প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে খণ্ডিত ছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই এই সমস্ত রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে মৌর্য

সাম্রাজ্যের অধীন হয়। অশোকের রাজত্বকালে (আনুমানিক ২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপূর্ব) গান্ধারের সীমা ছিল সিন্ধু নদের পশ্চিম পর্যন্ত, তক্ষশিলা তখন ইহার অন্তর্গত ছিল না।

প্রাচীন বৈদেশিক লেখকদের মতে গান্ধারের সীমা ছিল এইরূপ : উত্তরে সোয়াত ও বুনেরের পাহাড়, দক্ষিণে কালবাগের পাহাড়, পূর্বে সিন্ধু নদ এবং পশ্চিমে লমঘান ও জালালাবাদ। কিন্তু ভারতীয় লেখকদের গ্রন্থে লব্ধ নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির আলোকে ইহা সুস্পষ্ট যে, পূর্ব দিকে ইহার বিস্তার অন্ততঃ কোনও কোনও সময়ে অনেক বেশি ছিল এবং পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। গান্ধারের রাজধানী হিসাবে তিনটি নগরী প্রসিদ্ধি লাভ করে — পুষ্কলাবতী (পেশোয়ারের প্রায় ২৭ কিলোমিটার বা ১৭ মাইল উত্তর পূর্বে চারসাদা ও প্রাঙ্গ), পুরুষপুর (পেশোয়ার) ও তক্ষশিলা। প্রথম দুইটি সিন্ধু নদের পশ্চিমে, শেষোক্তটি পূর্বে। সম্ভবতঃ অশোকের সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম গান্ধারে প্রসারিত হয়।

ভারতবর্ষের প্রবেশপথে অবস্থিত হওয়ায় গান্ধার বহু শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিক আক্রমণের তরঙ্গাঘাত সহ্য করে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরেই প্রথমে ইন্দো গ্রীকদের, তাহার পর শক পহ্লবদের, অবশেষে কুষাণদের। বিদেশীরা এখানে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করে। বিদেশী রাজাদের রাজত্বকালের খরোষ্ঠী লেখ হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ সৌধ নির্মিত হয়। 'মিলিন্দ-পঞ্‌হ' গ্রন্থের মতে ইন্দো গ্রীক রাজা মেনান্দের (Menander) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। থেওদোরস (Theodorus) নামে জনৈক গ্রীক সোয়াত উপত্যকায় বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শকরাজ মাওয়েসের রাজত্বকালের (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক) তারিখযুক্ত একটি তাম্রপট্টে ক্ষত্রপপুত্র শক পতিক কর্তৃক তক্ষশিলায় শাক্য মুনির দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠা ও সংঘারাম নির্মাণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ফা হিয়েন, সুং যুন (ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদ) ও হিউএন ৎসাঙ্ (সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগ) এই তিন জন পরিব্রাজকের মতে কুষাণ নৃপতি কনিষ্ক কর্তৃক তাঁহার রাজধানী পুরুষপুরে নির্মিত স্তূপ ভারতবর্ষের উচ্চতম স্তূপগুলির অন্যতম।

আফগানিস্তানে এবং এমন কি আরও দূরবর্তী মধ্য এশিয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতিসাধনে এই সকল বৈদেশিক শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তির নিদর্শন এখনও প্রচুর, সাধারণতঃ এইগুলির নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম-পঞ্চম শতক, অবশ্য উহার কয়েকটি কিছু পূর্ববর্তী কালের হইতেও পারে। বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি-সমৃদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে জালালাবাদ, হাড্ডা এবং বামিয়ান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত স্থান গুহাচিত্র ও অতিকায় বুদ্ধমূর্তিরাজির জন্য প্রখ্যাত, ইহাদের মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্তির উচ্চতা ৫১ মিটারেরও (১৭০ ফুট) অধিক।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে বা ইহার সামান্য পরে কিদার-কুষাণেরা গান্ধারের শাসক ছিলেন।

বিভিন্ন জাতির আগমন ও তাহাদের সহিত স্থানীয় অধিবাসীদের সংমিশ্রণের প্রভাব গান্ধারের বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে সুস্পষ্ট। গ্রীক স্থাপত্য কৃতির রূপ রীতি ও অলংকরণ (যথা করিন্থীয় স্তম্ভ, সৌধের উপরিভাগে ত্রিকোণাকার গঠন এবং ক্ল্যাসিক্যাল মোল্ডিং ও নকশা) বৌদ্ধ সৌধাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমসাময়িক উত্তর-পশ্চিম ভারতের সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্প-রূপ ও রীতির দ্যোতক গান্ধার কলা হইতেছে ভারতীয় এবং যাবনিক (হেলেনিস্টিক) সংস্কৃতির মিলনের স্থায়ী নিদর্শন। আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যে বিলসিত গান্ধার কলার বৌদ্ধ আদর্শ, কিংবদন্তি ও মূর্তিতত্ত্বের সঙ্গে যাবনিক কলাপ্রকরণ ও ভাস্কর শৈলীর অপূর্ব সমন্বয় হয়। বুদ্ধ প্রতিমার দেহ গঠন বাহ্যতঃ যাবনিক রীতির অনুগ, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় ভাবাদর্শ-সম্মত মহাপুরুষের সর্ববিধ লক্ষণও বিদ্যমান। বহিরঙ্গে বিদেশী হইলেও মূর্তিগুলির আত্মা ভারতীয়ই।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে গান্ধার শিল্পীগোষ্ঠীই বুদ্ধ প্রতিমার প্রথম স্রষ্টা। অবশ্য ইহা এখনও পর্যন্ত সর্বসম্মতিভাবে প্রমাণিত হয় নাই। কেননা প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তি আমরা পাই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণদের রাজত্বকালে যুগপৎ গান্ধারে ও মথুরায়। সুদীর্ঘ চারি শতাধিক বৎসর ধরিয়া অফুরন্ত সৃষ্টিক্ষম গান্ধার শিল্পীগোষ্ঠী বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও জনশ্রুতি হইতে আহৃত বুদ্ধদেবের জীবনীকে জন্ম হইতে মহানির্বাণ পর্যন্ত রূপ দিয়াছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অজস্র ভাস্কর্য কৃতিতে, উপজীব্য ঘটনাবলী কখনও বা সত্য কখনও বা কিংবদন্তিমূলক। জাতক অপেক্ষা বুদ্ধদেবের জীবনীই গান্ধার শিল্পীদের অধিকতর আকৃষ্ট করে। গান্ধার কলার মুখ্য বিষয় বুদ্ধ ও তাহার জীবনের ঘটনাবলী। গৌণ ভূমিকায় দেখা যায় সাধারণতঃ মৈত্রেয়-প্রমুখ কয়েকজন বোধিসত্ত্ব, হারিতী ও তাঁহার স্বামী পাঞ্চিককে।

গান্ধার কলাকে দুইটি সুনির্দিষ্ট পর্বে বিভক্ত করা যায়। এই দুই পর্যায়ের পার্থক্য কেবল শিল্পরীতিতেই নহে, নির্মাণ উপাদানেও। প্রথম পর্বের ভাস্করগণ প্রধানতঃ সোয়াত ও বুনেরের পাহাড়ের শিস্ট (schist) শিলা ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের মুখ্য উপাদান চূন-বালি

গান্ধার

(stucco), এঁটেল ও পোড়া মাটি— এগুলি আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সোনালি ও বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হইত। নমনীয় উপাদানের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক-ভাবে দেখা দেয় কোমলতর দেহগঠন ও কমনীয় অঙ্গ-লাবণ্য। এই পর্যায়ের মূর্তিগুলি ভাবানুভূতিতে বিভাসিত এবং ইন্দ্রিয়গম্যতার সঞ্চারে সমৃদ্ধ, সম্ভবতঃ ইহাদের প্রেরণা আসিয়াছে আর্যাবর্ত হইতে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলির মধ্যে অংশতঃ পরিলক্ষিত হয় প্রখ্যাত গুপ্তযুগীয় মূর্তির আধ্যাত্মিকতার আবেশ, করুণার অভিব্যক্তি ও শান্তসমাহিত আত্মসংযম।

গান্ধার কলার উৎপত্তি ও প্রেরণা মূল সম্পর্কে উগ্র মতবিরোধ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে দুই শতাব্দী ধরিয়া উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীক আধিপত্যের প্রত্যক্ষ ফল এই শিল্পকলা। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ যুগের তারিখ বিশিষ্ট একটি মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলেন, গান্ধার কলায় অনুসৃত বৈদেশিক রীতি ও প্রকরণের প্রেরণা গ্রীস হইতে আসে নাই, আসিয়াছে রোম হইতে, কারণ এই সময়ে গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে, অপর পক্ষে রোম প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং গ্রীসদেশীয় শিল্প-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গান্ধার কলার প্রেরণার উৎস মনে হয় গ্রীসও নয়, রোমও নয়— পশ্চিম এশিয়া, সম্ভবতঃ গ্রীক সাম্রাজ্য-বিস্তার ও তাহার আনুষঙ্গিক গ্রীক উপনিবেশের ফলেই এখানে এক আঞ্চলিক ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পধারা উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট হয় পহ্লবেরা এবং পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত কুষাণেরা।

বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তিরাজির ধ্বংসাবশেষে গান্ধার পরিপূর্ণ। পেশোয়ার, তখ্‌ত্‌-ই-বাহি, সাহ্‌রিবাহ্‌লোল, জামালগঢ়ি, তক্ষশিলা এবং মানিকিয়ালার ভগ্নাবশেষই ইহাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। গান্ধারে ফা-হিয়েন ও হিউএন ৎসাঙ্‌ বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, প্রথমোক্ত পরিব্রাজক সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় এবং পরবর্তী জন জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায়।

এখানে স্তূপই ছিল মুখ্য উপাস্য। বর্তমানে প্রধান স্তূপগুলির নিম্নাংশই কেবল বিদ্যমান। তবে কিছু কিছু ক্ষুদ্রাকার স্তূপ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এইগুলিই গান্ধারের স্তূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা গঠন করিতে সাহায্য করে। চিরাগত অর্ধগোলাকার এবং মোটা স্তম্ভের মত— এই দুই ধরনের স্তূপই বিদ্যমান ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তক্ষশিলার ধর্মরাজিকা ও ভল্লারের স্তূপের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য প্রথমোক্ত শ্রেণীর স্তূপের সংখ্যা অতি কম। প্রাচীনতর স্তূপগুলিতে (যথা— তক্ষশিলার ধর্মরাজিকা, মানিকিয়ালার ও জামালগঢ়ির মুখ্য স্তূপ) নিচু মেধির তলদেশে কোনও বেদি ছিল না। ক্রমে ক্রমে মেধির উচ্চতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মেধি নির্মিত হয় ক্রমক্ষীয়মাণ একাধিক স্তরে। ক্রমে মেধি প্রতিষ্ঠিত হয় চতুষ্কোণ বেদির উপর। বেদিশীর্ষে আরোহণের নিমিত্ত সোপানের ব্যবস্থা থাকে এবং বেদির উপরকার চত্বর ব্যবহৃত হয় প্রদক্ষিণ পথ রূপে। বেদির উচ্চতাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং আরও অভিনবত্ব আনা হয় দুই বা তিন অপসরমান স্তরে বেদিটিকে নির্মিত করিয়া। মেধি ও বেদির গাত্রদেশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিচিত্র মোল্ডিং, উপস্তম্ভ এবং বুদ্ধদেবের প্রতিমা ও অন্যান্য মূর্তির সমাবেশে অলংকৃত করা হয়।

বেশির ভাগ বৌদ্ধ কেন্দ্রে মুখ্য স্তূপের পার্শ্বে ছোট ছোট দেবায়তন ছিল, তবে স্তূপের কাছে তাহারা গৌণ। বিগ্রহ পূজার অনুষঙ্গ রূপে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ মন্দিরের অস্তিত্ব বিরল।

গান্ধারে প্রতি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক স্তূপ এবং সংঘারাম ছিল। আবাসগুলি অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত, সাধারণতঃ একটি বারান্দার পিছনে কয়েকটি করিয়া প্রকোষ্ঠ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে চতুঃশালা আদর্শে সংঘারাম নির্মাণের সূত্রপাত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এইগুলি আবার একাধিক তলবিশিষ্ট, আরোহণ অবতরণের ব্যবস্থা একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে নির্মিত সোপানের মাধ্যমে। তদবধি সংঘারাম পূর্বপরিকল্পিত বিন্যাস অনুযায়ী হইত। বারান্দা ঘেরা আয়ত বা দীর্ঘায়ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, বারান্দার পশ্চাদ্ভাগে সংঘারামের বাসিন্দাদের জন্য আবাসিক প্রকোষ্ঠের সারি। সুতরাং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ও এখানকার সংঘারাম বিন্যাসরীতিতে মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই, এখানকার ছোটখাটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে প্রাঙ্গণের ঘেরা স্নানাগার (এই অঞ্চলের শৈত্যের তীব্রতা-বশতঃই বোধ হয়) এবং অনুষঙ্গ রূপে সমাবেশশালা, রন্ধনশালা, ভোজনকক্ষ, তৈজসপত্র প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার ঘর ইত্যাদি।

হিউএন্‌ ৎসাঙ্‌-এর পরিদর্শন কালে গান্ধারের রাজ-পরিবার অবলুপ্ত এবং গান্ধার কপিশির (কাফিরিস্তান) অধীন। অধিকাংশ নগর ও গ্রাম তখন জনহীন। বৌদ্ধদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, অধিবাসীদের অধিকাংশই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। জনগণ সাহিত্যানুরাগী। তিনি এ দেশের পূর্বতন শাস্ত্রকার ও গ্রন্থকারদের মধ্যে নারায়ণদেব,

অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্মত্রাত, মনোরথ এবং পার্শ্বের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেশ ফুলে, ফলে, শস্যে সমৃদ্ধ ছিল। প্রায় সহস্র সংঘারাম তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং লোকশূন্য। অবৌদ্ধ মন্দিরের সংখ্যা একশতের কাছাকাছি। ইহাদের মধ্যে পো-লু সের উত্তর-পূর্বে একটি উচ্চ পর্বতের পাদদেশে মহেশ্বরের মন্দির এবং পর্বতস্থ মহেশ্বরপত্নী ভীমাদেবীর এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন স্বয়ম্ভূমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ভীমাদেবী পর্বতই সম্ভবতঃ মহাভারতোক্ত ভীমাস্থান।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India* Report II & V, Simla, 1871, Calcutta, 1875; *Annual Report of the Archaeological Survey of India*, 1906-07, John Marshall, 'The Stupas and Monasteries at Janlian', *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, no 7, Calcutta, 1921; Hemchandra Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1953; T. Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India* Delhi, 1961

দেবলা মিত্র

গান্ধারী[1] গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা ও কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের তেজস্বিনী দৃঢ়চেতা, পতিপরায়ণা পত্নী। পতি ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া সমগ্র জীবন ইনি বস্ত্রদ্বারা স্বনেত্র আচ্ছাদিত রাখেন। কুন্তীর পুত্রলাভের সংবাদে উদরে আঘাত হানিয়া গর্ভপাতের ফলে প্রসূত মাংসপেশী হইতে ব্যাসদেবের প্রসাদে দুর্যোধনাদি শত পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

পাণ্ডবগণের প্রতি পতি ও পুত্রের ঈর্ষা দেখিয়া এই মনস্বিনী দুঃখে রোদন করিতেন ও দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার নিমিত্ত স্বামীকে তিনি অনুরোধ করেন (মহাভারত, সভা, ৭৫.৮)।

কুরুসভায় কৃষ্ণের দৌত্যকালে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে আহ্বান করিলে তিনি সর্বসমক্ষে পতিকে বলিয়াছিলেন— 'রাজন্, পুত্রের অশিষ্টতার জন্য তুমিই সমধিক ভর্ৎসনার পাত্র। লোভী ও অহংকারী পুত্রকে তুমিই এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছ' (উদ্যোগ পর্ব ১২৯)।

কুরুপাণ্ডব মহাযুদ্ধের সময় দুর্যোধন প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে জননী বলিয়াছেন, 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' (স্ত্রী ১৪।৯)। এই যুদ্ধে তাঁহার শতপুত্র নিহত হয়।

পুত্রাদির নিধনে শোকাকুল গান্ধারীর দৃষ্টিতেই যুধিষ্ঠির কুনখিত্ব প্রাপ্ত হন। পনর বৎসর পরে পতির সহিত বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া তিনি অরণ্যযাত্রা করেন এবং অবশেষে যোগাসনে দেহত্যাগ করেন (আশ্রমিক ৩৭)।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

গান্ধারী[2] গান্ধার এবং গান্ধারী স্থানের নাম এবং ব্যক্তির নাম হিসাবে ইতিহাসে এবং পুরাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষার নাম হিসাবে 'গান্ধারী' শব্দটির প্রয়োগ আধুনিক। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারল্ড বেলী (H. W Bailey) একটি প্রবন্ধে, অন্যান্য সাহিত্যিক প্রাকৃতের নামের (যথা মাহারাষ্ট্রী শৌরসেনী মাগধী ইত্যাদির) সঙ্গে মিলাইয়া ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশের প্রাকৃতের নামকরণ করেন 'গান্ধারী'। তখন হইতে উত্তর পশ্চিমা প্রাকৃত 'গান্ধারী' নামে পণ্ডিত সমাজে পরিচিত হইয়াছে।

গান্ধারী ভাষার প্রায় যাবতীয় নিদর্শন খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ বা লিখিত। গান্ধারী ভাষার নিদর্শন মোটামুটিভাবে এইগুলি— অশোকের শাহ্‌বাজগঢ়ী এবং মানসেরা শিলালিপি, ইন্দো-গ্রীক রাজাদের ও শকক্ষত্রপদের কোনও কোনও অনুশাসন, মধ্য এশিয়া হইতে প্রাপ্ত ধর্মপদ, এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ এবং তদ্ভিন্ন কাঠ, চামড়া বা রেশমের উপর উৎকীর্ণ কিছু দলিলপত্র।

দ্র H. W Bailey, *Gandhari*, *Bulletin of the School of Oriental & African Studies*, vol XI, part 1

হারাধন মুখোপাধ্যায়

গান্ধী কস্তুরবা (১৮৬৯?-১৯৪৪ খ্রী) গান্ধীজীর সহধর্মিণী। ১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। আদর্শে স্বাতন্ত্র্যের জন্য স্বামীর কঠোরতা সহ্য করিতে হয়। অবশেষে ধৈর্য ও দৃঢ়তার বলে স্বামীকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেন।

সত্যাগ্রহ আশ্রমের সকলের মাতৃস্বরূপিনী ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতে বারংবার কারাবরণ করিতে হয়। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনে বন্দী হন এবং সেই অবস্থায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি দেহান্ত ঘটে।

নির্মলকুমার বসু

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রী) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর গুজরাতে পোরবন্দর বা সুদামাপুরীতে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক সংগতিপন্ন বৈষ্ণব পরিবারে গান্ধীজীর জন্ম হয়। ইহারা জাতিতে গান্ধী বা মুদী ছিলেন। পিতা রাজদরবারে

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ

দেওয়ানের কাজ করিতেন। মাতা পুতলীবাঈ ধর্মপ্রাণা এবং অতিশয় নিষ্ঠাসহকারে ব্রত উপবাসাদি পালন করিতেন।

গান্ধীজীর শিক্ষা রাজকোটে হয়। বাল্যকালে যাত্রা দেখার শখ ছিল। একবার হরিশ্চন্দ্রের পালায় সত্য-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মোহিত হন। বাড়িতে নিম্নজাতির ভৃত্যদের সম্পর্কে অস্পৃশ্যতা মানা হইত। ইহা তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিত। তিনি ইহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। তের বৎসর বয়সে পোরবন্দরবাসী গোকুলদাস মাকনজীর কন্যা কস্তুরবা-র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আঠার বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবনগর কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু পাঠ সমাপ্তির পূর্বে ইংল্যাণ্ডে আইন অধ্যয়ন করিতে যান। মাতা ইহাতে চিন্তিত হইলেন। তখন পরিবারের হিতৈষী এক জৈন সাধুর প্রস্তাবে বিলাতে মদ, মাংস এবং স্ত্রীসঙ্গ বর্জনের প্রতিজ্ঞা করায় মায়ের অনুমতি লাভ করিলেন।

গান্ধী ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে পাঠকালে এক নিরামিষাশী সমিতির সভ্য হন এবং ঘটনাক্রমে কবি এডুইন আর্নল্ডের গীতার অনুবাদ ও 'লাইট অফ এশিয়া' নামে বুদ্ধচরিত পাঠ করেন। বাইবেল ও হজরৎ মহম্মদের জীবন সম্বন্ধেও সামান্য পড়াশুনার সুযোগ হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুন ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ১২ জুন স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করেন।

বোম্বাই শহরে কিছুদিন আইন ব্যবসায়ের চেষ্টার পর রাজকোটে চলিয়া আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থিত দাদা আবদুল্লা অ্যাণ্ড কোম্পানির মামলা সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব লইয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আফ্রিকা রওয়ানা হন। অল্পদিনের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে তাঁহার বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘটে। যে মামলার সুপারিশের জন্য আসিয়া-ছিলেন, তাহা আপসে মিটাইতে সমর্থ হন। সেই সময়ে স্থানীয় সরকার ভারতীয় অধিবাসীদের নাগরিক নানা অধিকার সংকুচিত করিবার আয়োজন করিতেছেন। দেশে ফিরিয়া আসিবার প্রাক্কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নাগরিকগণের অনুরোধে ইহার প্রতিকারকল্পে সেখানে থাকিয়া গেলেন। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আগস্ট নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শুধু রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই নয়, গান্ধীজী সমাজ সংগঠনেও বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। আন্দোলন চলিতে থাকে এবং মাঝে একবার দেশে ফিরিয়া আসিলেও তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বহুদিনের জন্য বসবাস করিতে হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা স্থাপনা করেন। এবং সম সমাজের আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য নাটাল প্রদেশে ডারবান শহরের ২৩ কিলোমিটার (১৪ মাইল) দূরে ফীনিক্স শহরের নিকট এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় রাস্কিনের লেখা 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থ ও টলস্টয়ের 'দি কিংডম অফ গড ইজ উইদিন ইউ' গ্রন্থ তাঁহার উপরে প্রভাব বিস্তার করে।

সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে ট্রান্সভাল প্রদেশে জোহানেস-বার্গের ৩৪ কিলোমিটার (২১ মাইল) দূরে কালেনবাক নামক জনৈক বন্ধুর প্রদত্ত এক বিস্তৃত ভূমিতে টলস্টয় ফার্ম নামে দ্বিতীয় এক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসময় গভর্নমেন্টের সহিত সংঘর্ষ বাধিয়া গেল এবং এই সংঘর্ষের সূত্রে কর্মপদ্ধতি হিসাবে সত্যাগ্রহের উদ্ভব হয়। সত্যাগ্রহের মূলনীতি এইভাবে স্থিরীকৃত হয়: সমাজে কোনও অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে একদিকে আদর্শ জীবন-যাপনের চেষ্টা, অপর দিকে অন্যায়ের সহিত অসহযোগ করিতে হইবে। অত্যাচারীকে আঘাতের প্রয়োজন নাই, বরং নিজে সত্যপথে থাকিয়া অপরের প্রদত্ত আঘাত বীর্য এবং তিতিক্ষার সহিত সহ্য করা প্রয়োজন। ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষের চিত্তে বিস্ময় এবং সম্ভ্রম জাগরিত হইতে পারে। তখন উভয়পক্ষ মিলিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত সন্তোষ-জনক মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতিকে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আখ্যা দেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দ-স্বরাজ অর ইণ্ডিয়ান হোম রুল' নামক পুস্তিকায় তাঁহার সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা করেন। আট বৎসর সত্যাগ্রহ চলার পর বহু নির্যাতনের অন্তে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতীয়গণ ন্যায্য নাগরিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইল। গান্ধীজীও বিচ্ছিন্নভাবে একুশ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটাইয়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বোলপুর শান্তি-নিকেতনে কিছুদিন থাকিবার পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দেই আমেদাবাদের উপকণ্ঠে কোচরাব নামক এক পল্লীতে প্রথম সত্যাগ্রহ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহাই পরে সবরমতী নদীর তীরে স্থানান্তরিত হয়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে অবস্থানকালে গান্ধীজী বিহারের চম্পারন জেলায় নীলকরদের উৎপাতের কথা শুনিতে পান। তৎপরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রতিকারকল্পে চম্পারন পৌঁছিলে তাঁহার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ইহা অমান্য করিয়া গান্ধীজী চম্পারনে

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ

সত্যাগ্রহের বীজ বপন করিলেন। সমগ্র বিহারে ও ভারতবর্ষে উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। ক্রমে নীলচাষের অন্যায়ের প্রতিকার সাধিত হইল। ইহার পরে গান্ধীজী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দেই আমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থন এবং গুজরাতে খেডা জেলায় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে অজন্মার পর জমির খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। শেষোক্ত উভয় আন্দোলনই আংশিকভাবে জয়যুক্ত হইলেও গান্ধীজী গঠনকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যেন আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিলেন। চম্পারনে শিক্ষা ও সংগঠনের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল, আমেদাবাদের শ্রমিক সংগঠন এক নূতন পদ্ধতি অনুসারে রচিত হইল।

১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিলে ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্যের শাসন আরও দৃঢ় করিবার চেষ্টা করেন। রাউলাট কমিটি রিপোর্ট দেন যে ভারতের ধূমায়মান অসন্তোষ ও ভাবী বিপ্লবকে বন্ধ করিবার জন্য নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হইবে। সরকারের পক্ষ হইতে সে চেষ্টা আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যে পরাজিত তুরস্কের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুসলিম সমাজকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তুরস্কের সম্রাটের ক্ষমতা ও অধিকার সংকোচনের ফলে খিলাফৎ প্রতিষ্ঠানের মূলে আঘাত করা হইল। গান্ধী মুসলিম সমাজের মধ্যে বর্ধমান অসন্তোষ লক্ষ্য করিলেন। খিলাফতের দাবিকে যদি ভারতের জাতীয় দাবি হিসাবে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ভারতের মুসলমানগণ ও মুসলমান সমাজের সহিত একযোগে চলিতে পারিবে, এ আশা তাহার ছিল।

বিদ্রোহ যদি হিংসার পথে চালিত হয় তবে জয়পরাজয় যে শুধু অনিশ্চিত তাহাই নহে, তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে সার্থকতার সহিত হিংসার অস্ত্র ব্যবহার করিলেও শুধুমাত্র ভারতের একটি শ্রেণীবিশেষের হস্তে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হইবে, সমগ্র জনসমূহ ক্ষমতার অধিকারী হইবে না। সেইজন্য তিনি দেশের নিকট রাউলাট আইন প্রবর্তনের প্রতিকারকল্পে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব করিলেন। যদি ঘটনাক্রমে অহিংস আন্দোলন পথচ্যুত হইয়া হিংসার পথ আশ্রয় করে, তবে কোন্ উপায়ে তাহাকে অহিংসার পথে ফিরাইয়া আনা যায় ইহার সম্বন্ধেও তিনি নানাভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আন্দোলনের সূচনাতে ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। ফলে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীনে সারা দেশময় অসহযোগ আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয় ('অসহযোগ আন্দোলন' ও 'খিলাফৎ আন্দোলন' দ্র)।

এই সময়ের মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। কংগ্রেসের সহায়তায় সত্যাগ্রহপ্রচেষ্টার পূর্বে গান্ধীজী অল ইণ্ডিয়া হোম রুল লীগের (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) সভ্য ও সভাপতি হইয়াছিলেন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাহার গঠনতন্ত্র ও নামের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হোম রুল লীগের মুখপত্রিকা স্বরূপ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে গান্ধীজী ইহার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ইহা এবং 'নবজীবন' নামে ইহার গুজরাতী ও হিন্দী সংস্করণ অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারে প্রভূত সহায়তা করে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ গান্ধীজী গ্রেফতার হন এবং ৬ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিছুদিন কারাবাসের পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের গ্রামে গ্রামে গঠনকর্ম বিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে গান্ধীজী প্রস্তাব করেন যে, কংগ্রেসের সদস্যদের চাঁদা নিজ হাতে কাটা সুতার সাহায্যে দিতে হইবে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, দেশের অগণিত জনসাধারণকে যদি এইভাবে কংগ্রেসে আনা যায় তবে সমগ্র প্রতিষ্ঠানের চরিত্রে এক বিপ্লব সাধিত হইবে, দেশের জনগণও জাগিয়া উঠিবে। সে সময়ে দেশে ইতস্ততঃ হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছে, বিপ্লবীগণ এবং নিয়মতান্ত্রিক দলের পথিকগণও নানাভাবে ইংরেজ সরকারকে বিপর্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসও স্বীয় রাজনৈতিক লক্ষ্যের পরিবর্তন সাধন করিতে চাহিলেন, ব্রিটিশ শাসনের পরিপূর্ণ অবসান জাতির লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হইল।

সেই দাবিকে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী এক কর্মপন্থার প্রবর্তন করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ তিনি সবরমতী আশ্রম হইতে ৭৯ জন সহকর্মী সমেত যাত্রা করিয়া ২৪ দিনে ৩৮৫ কিলোমিটার (২৪১ মাইল) হাঁটিয়া ডাণ্ডি নামক সমুদ্রতীরবর্তী এক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গের দ্বারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলেন। মে মাসে ধরসনা নামক স্থানে সরকারি লবণগোলা অহিংসভাবে অধিকার করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। সমগ্র ভারতে এই আন্দোলন নানা আকারে বিস্তারলাভ করে।

অবশেষে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাহাকে এবং

কংগ্রেসের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ বৎসরের শেষে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর গান্ধীজী কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ঐ যাত্রা উপলক্ষে তিনি বহু বক্তৃতার মধ্যে স্বাধীন ভারতের সম্পর্কে নিজের আদর্শের আভাস দেন। লণ্ডন হইতে ফিরিবার পর কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় ও নূতন উদ্যমের সহিত আইন অমান্য আন্দোলন চলিতে থাকে। তিনি যখন কারাগারে অবস্থান করিতেছেন তখন ব্রিটিশ সরকার উচ্চ-নীচ হিন্দু জাতিকে বিভক্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্র ভোটাধিকারের এক প্রস্তাব করেন। ইহার প্রতিকারকল্পে গান্ধীজী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর আমরণ অনশনের সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুসমাজ যেন জাগ্রত ও তৎপর হইয়া অস্পৃশ্যতাকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করে, নহিলে তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চান না। দেশে সর্বত্র সাড়া পড়িয়া গেল এবং ব্রিটিশ সরকারকেও স্বতন্ত্র ভোটের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইল।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মে গান্ধীজী কারামুক্ত হন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল আইন অমান্য আন্দোলনের অবস্থা বুঝিয়া তাহা প্রত্যাহার করিয়া লন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিয়া গ্রাম-সংগঠনের জন্য নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিজন আন্দোলনও পরিচালিত হইতে থাকে। লবণ আইন অমান্যের সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দেশ স্বাধীন না হইলে আর সবরমতীতে ফিরিবেন না। তদনুসারে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওয়ার্ধা শহরের প্রায় ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরে সেগাঁও বা সেবাগ্রামে কর্মের নূতন কেন্দ্র স্থাপনা করিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি স্থগিত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার পরিবর্তে 'হরিজন' পত্রিকার প্রকাশ পুনা শহর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন অস্পৃশ্যতাবর্জন এবং গ্রামশিল্পের বিস্তার সেবাগ্রাম হইতেই পরিচালিত হইতে লাগিল। গান্ধীজীর ধারণা উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইতে লাগিল যে বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদনব্যবস্থা এবং আত্মরক্ষার জন্য অহিংসার প্রয়োগ ব্যতিরেকে প্রকৃত গণতন্ত্র বা জনশক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। এবং তাহাই শুধু রাজনৈতিক স্বারাজ্যসিদ্ধির ভিত্তিভূমি হইতে পারে। সেই চেষ্টায় তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন।

কিন্তু কংগ্রেসের সদস্যপদে ইস্তফা দেওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা রহিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার শাসন সংস্কার করিয়া এক নূতন শাসন পদ্ধতি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত করেন। কংগ্রেস নির্বাচনের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন এবং জয়ী হইয়া ১৯৩৭-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রথমে ছয় ও শেষে আটটি প্রদেশে গভর্নমেণ্ট পরিচালনার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লন। এই সময়ে গান্ধীজী দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারকল্পে এক অভিনব ও বিপ্লবাত্মক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ইহার নাম বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা অল্পসংখ্যক শিক্ষাবিদের সমর্থন লাভ করে। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি ইহা গ্রহণ করিলেও কালক্রমে বুনিয়াদী শিক্ষাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। গান্ধীজী কংগ্রেসকে পরামর্শ দিলেন দেশরক্ষার ব্যাপারে ভারতকে অনন্যশরণ হইয়া অহিংসার উপরে নির্ভর করিতে হইবে এবং অহিংসার দ্বারা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ অবিক্রান্ত দেশের উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থাকেও অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিলে ভারত স্বরাজসাধনার পথ হইতে বিচ্যুত হইবে। কিন্তু গান্ধীজী দেশের নেতৃবৃন্দকে স্বীয় মতে আনিতে সমর্থ হন নাই। নেতৃবৃন্দ কয়েকটি শর্তাধীনে ব্রিটিশ সরকারের সহিত যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইল।

ইতিমধ্যে মালয় ও ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সমরশক্তির উপরে জাপান প্রচণ্ড আঘাত হানে। গান্ধীজী অনুভব করিলেন যে সাধারণ ভারতবাসীর মন একটি নিবৃত্ত পথ অনুসরণ করিতেছে। জাপান ভারত আক্রমণ করিয়া ব্রিটিশকে পরাজিত করিলে যেন তাহারা খুশি হয়। এই হৃদয়নের কলঙ্কের মত আত্মমর্যাদাহীন ভাবকে দূর করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাব করেন যে, ইংরেজ রাজশক্তিকে এখনই ভারত ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ইতিমধ্যে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নির্দেশে দেশব্যাপী এক প্রতীক সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। তাহা নির্বাচিত ব্যক্তি সত্যাগ্রহীতে সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি ব্যাপক গণ-সত্যাগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। জাপানের জয়ে পুলকিত হওয়া অপেক্ষা পরাজয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করিলে আমাদের অন্তর যে মুক্তিলাভ করিবে, তাহাই তাঁহার লক্ষ্য হইল। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' 'আমরা করিব না হয় মরিব'।— এই মন্ত্র প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ যেন পুনরায় আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সূচনাতেই গান্ধীজী এবং

নেতৃবৃন্দ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে তাঁহাকে এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইংরেজ সরকার প্রস্তাব করিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া গেলে তাঁহারা গণপরিষদের মাধ্যমে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা রচনার পূর্ণ দায়িত্ব ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিবেন। পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব লইয়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একদল প্রতিনিধি এ দেশে আগমন করেন।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে কঠিন মতান্তর দেখা দিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট বাংলা দেশের মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট লীগের ডিরেক্ট অ্যাকশনের সহায়তা করিলেন। তাহার ফলে কলিকাতায় হতাহতের সংখ্যা ৮।১০ সহস্র বলিয়া অনুমিত হয়। অক্টোবর মাসে পূর্ব বঙ্গে নোয়াখালি জেলায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ আরম্ভ হয়। তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিহার প্রদেশে অনেক সহস্র ব্যক্তি নিহত হয়। ক্রমে উত্তর ভারতে নানা স্থানে দাঙ্গা বিস্তার লাভ করে।

রাজনীতিক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী স্বীয় চেষ্টার দ্বারা গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে সাহস এবং সমতা স্থাপনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তদনুসারে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর বাংলা দেশে আগমন করিয়া নভেম্বর মাসে তিনি নোয়াখালিতে স্বীয় কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। সঙ্গে কয়েকজন গঠনকর্মী তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত নিরলসভাবে নোয়াখালির গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তিনি স্বীয় আদর্শ ভারতবর্ষের রূপরেখা দেশের সামনে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

১৯৪৭-এর মার্চ মাসে তাঁহাকে বিহার প্রদেশে যাইতে হয়। সেখান হইতে মধ্যে দুই একবার দিল্লী যাত্রা করিতেও হইয়াছিল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট কংগ্রেস ভারতবিভাগে স্বীকৃত হইলে ব্রিটিশ সরকার রাজশক্তি হস্তান্তরিত করিয়া দেন। ঐ তারিখে গান্ধীজী নোয়াখালি যাইবার মানসে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। ১৫ আগস্টের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে দাঙ্গা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে কলিকাতায় দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে দেখিয়া কলিকাতাবাসীর শুভবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য গান্ধীজী ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। ফলে দাঙ্গা তিন দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ থামিয়া যায় এবং গান্ধীজী পাঞ্জাব যাত্রার উদ্দেশ্যে ৭ সেপ্টেম্বর দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাঁহার সিদ্ধ হয় নাই। দিল্লীতেই তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হয় এবং ভারত সরকারকে একদিকে উপদেশ দান ও জনসাধারণকে নূতন ভারত রচনার শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার প্রধান কার্য হইয়া ওঠে।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে মোটামুটি সমর্থন করিলেও তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল যে অল্প কয়েক মাসের মধ্যে সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করিবে যে গভর্নমেন্টের শক্তি সীমাবদ্ধ। তৎসহ জনশক্তি সক্রিয়ভাবে সংযোজিত না হইলে নূতন ভারতের সমাজ ও জনতন্ত্র বা স্বরাজ জন্মলাভ করিবে না। জনসাধারণের মধ্যে অস্পষ্টভাবেও সেই উপলব্ধি ঘটিলে তখন আবার তাঁহার কাজের পালা শুরু হইবে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা ভারত সরকার দ্রুত মিটাইয়া দিতে অস্বীকার করায় গান্ধীজী শেষবার অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি তাঁহার প্রার্থনা সভায় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু কেহ আহত হয় নাই।

ইহার পরে বোধ হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি পুনরায় কর্মে অবতীর্ণ হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে মুছিয়া ফেলিয়া জনগণের মধ্যে নূতন সংগঠন ও রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের নির্দেশ দিয়া পরের দিনই এক প্রবন্ধ লেখেন। গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ২৯ জানুয়ারি তারিখে নূতন এক কর্মব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। নিজেও দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে সেবাগ্রাম এবং পরে হয়ত সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের চিন্তা করিয়াছিলেন। প্রতিবার নূতন কর্মের সূচনায় ইহাই তাঁহার কাজের পদ্ধতি ছিল।

এমন সময়ে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি প্রার্থনা সভায় গমনকালে এক আততায়ীর গুলির আঘাতে ৫-১৫ মিনিটে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী, বারাকপুর, ১৯৬৩, D. G. Tendulkar, *Mahatma*, vols 1-8, Bombay, 1952; Nirmal Kumar Bose, *My Days with Gandhi*, Calcutta, 1953; Nirmal Kumar Bose, *Studies in Gandhism*, Calcutta, 1962

নির্মলকুমার বসু

গান্ধীবাদ গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মচেষ্টার মধ্যে কতকগুলি ভাবধারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় যাহার সমষ্টিকে গান্ধীবাদ আখ্যা দেওয়া অসংগত নয়।

গান্ধীবাদ

যাহারা স্বীয় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা ধনোৎপাদন করে রাষ্ট্রশক্তি তাহাদেরই আয়ত্তে থাকা আবশ্যক, পরশ্রম আশ্রয় করিয়া যাহারা জীবিকানির্বাহ করে, তাহাদের হাতে নয়— ইহা তাহার প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। হিংসার অস্ত্রের দ্বারা মুক্তিসাধন ঘটিলে যে বিশিষ্ট শ্রেণী সেই অস্ত্রের অধিকারী তাহারাই রাজনৈতিক ক্ষমতারও অধিকারী হইবে, অপরে নহে, ইহা গান্ধীজীর স্থির বিশ্বাস ছিল। একমাত্র অহিংস শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্বীয় আয়ত্তে আনা সম্ভব, তিনি এইরূপ মনে করিতেন।

যে-কোনও অর্থনৈতিক বা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অহিংস বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রচ্ছন্ন বা প্রকট হিংসাত্মক বলপ্রয়োগ ভিন্ন পুঁজিবাদের মত উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অতএব সেরূপ সমাজকে রক্ষা করা অহিংসার দ্বারা সম্ভব নয়। আত্মরক্ষায় অহিংসার প্রয়োগ করিতে হইলে যে সমাজ-জীবন ও উৎপাদন ব্যবস্থা অহিংসার উপরে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ যেখানে সমতা আছে, শোষণ নাই, তাহাকেই শুধু অহিংস উপায়ে রক্ষা করা সম্ভব। অতএব অহিংসার প্রস্তুতির প্রথম সোপান স্বরূপ সংগঠনকর্মের দ্বারা সমতাবিশিষ্ট শোষণবিহীন সমাজের নমুনা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু বাক্যের দ্বারা সমতাস্থাপন করিলেই মানুষ নূতন আদর্শে সমাজ-রচনায় সক্ষম হয় না। গঠনকর্মের দ্বারা নূতন সমাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে তবে তাহার মতের প্রকৃত পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়।

ভবিষ্যতে যতদূর দেখা যায়, রাষ্ট্র থাকিবে। অতএব রাজশক্তি এবং অর্থশক্তিকে কেন্দ্রীভূত না করিয়া যথাসম্ভব উত্তরোত্তর বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে সমাজব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা এখন হইতেই কর্তব্য।

যে-কোনও দেশের সীমানার মধ্যে অবস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদরাজির উপরে সমগ্র মানবপরিবারের অধিকার স্বীকৃত হওয়া কর্তব্য। প্রতি দেশের অধিবাসীগণ সমগ্র মানব পরিবারের ব্যবহারের জন্য সেই সম্পদের প্রয়োগ এবং উন্নতিবিধান করিবে, ইহাই গান্ধীজীর উপনিধিবাদ অর্থাৎ 'ট্রাস্টীশিপ'-এর মূল বক্তব্য ছিল।

রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে গান্ধীজী গণতন্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। শেষ বয়সের লেখায় তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রের ভোটাধিকার, পঞ্চায়েত গঠন এবং পরোক্ষ নির্বাচনের নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। রাজনৈতিক দল বা পার্টির উপরে তাঁহার নির্ভর কম ছিল। বিভিন্ন আদর্শপুষ্ট দল স্বীয় বিচার অনুযায়ী সেবার দ্বারা, শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা জনসাধারণকে সংগঠিত করুক, কিন্তু সকলে সুস্থ প্রতিযোগিতা আশ্রয় করিয়া এবং যথাসম্ভব মিলিত হইয়া রাষ্ট্র হইতে নিম্নতম পঞ্চায়েত পর্যন্ত পরিচালনায় ব্রতী হউক, ইহা তাঁহার প্রস্তাব ছিল। বিভিন্ন দল বা পার্টি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করিতে পারে, তাহারই সন্ধান করিবে, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে কোথায় ব্যবধান তাহারই উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়া এক দল অপরের বদলে [illegible] হইতে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে একচ্ছত্র শক্তির অধিকারী হইবে, গান্ধীজী এরূপ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন পার্টির মধ্যে যদি মত বা কর্মপ্রচেষ্টায় দ্বন্দ্ব বাধে তবে সে দ্বন্দ্ব অহিংস উপায়ে পরিচালিত হউক, ইহাই তাঁহার উপদেশ ছিল।

সত্যাগ্রহের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রথমে মানুষকে অহিংসায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে এবং পরে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করিতে হইবে— এরূপ ব্যবস্থাকে সম্ভবপর বলিয়া গান্ধীজী বিবেচনা করিতেন না। সাধারণ, হিংসা অহিংসার ভারসাম্যকে লইয়াই সত্যাগ্রহের গঠনমূলক এবং সংগ্রামাত্মক কর্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে; যে দেশে অবস্থিত চলতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া অহিংসার কর্মপ্রবর্তন করিতে হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় মত ছিল। বুদ্ধিপ্রণোদিত অহিংসায় আস্থাবান কর্মকুশল নেতৃবৃন্দ অগ্রসর হইয়া সাধারণ মানুষ ও সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি উত্তরোত্তর অধিকতরভাবে অহিংস কৌশলে দখল করিতে থাকিবে ইহাই তাঁহার সকল প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল। কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই অহিংসার মাত্রা বৃদ্ধিলাভ করুক— ইহারই জন্য তিনি দেশের সম্মুখে বারংবার নূতন নূতন কর্মসূচির প্রস্তাব করিতেন।

পঞ্চায়েতগঠন বা ভোটাধিকার সম্পর্কে তিনি দুই-একটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিলেও তিনি শুধু তাহাদিগকেই সে অধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন যাহারা কায়িক শ্রমের দ্বারা ধনোৎপাদন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, যেমন ১৮ বৎসর বয়স হইতে মানুষের ভোটাধিকার স্বীকারের তিনি সপক্ষে ছিলেন, তেমনই ৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে মানুষের আর ভোটের অধিকার থাকিবে না, এরূপ প্রস্তাবও তিনি করিয়াছিলেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিগণ শুধু পরামর্শ বা সেবার দ্বারা সমাজকার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধিকার তাঁহাদিগকে বর্জন করিতে হইবে, ইহা তাঁহার উপদেশ ছিল।

সমাজে রাষ্ট্রশক্তির বিকিরণ, সম্ভবমত উৎপাদন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে জীবনযাত্রার নির্বাহ এবং সেরূপ সমাজকে রক্ষার জন্য অহিংস পন্থার আশ্রয়, সংগঠন শক্তির আধিক্য ও সংঘর্ষের স্বল্পতা, পার্টিবিশেষের পক্ষে তাহারাই সকল সত্যের অধিকারী হইয়াছে, এরূপ অভিমানের বর্জন এবং বিভিন্ন খণ্ডসত্য উপলব্ধির সংযোগের দ্বারা একযোগে কাজ করিবার ক্ষেত্র বা সুযোগের সন্ধান প্রভৃতিকে গান্ধীবাদের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

দ্র Richard B. Gregg, *Which way lies hope?* Ahmedabad, 1957; Nirmal Kumar Bose, *Selections from Gandhi*, Ahmedabad, 1957; Richard B Gregg, *The Power of Non-violence*, Ahmedabad, 1960; Nirmal Kumar Bose, *Studies in Gandhism*, Calcutta, 1962.

নির্মলকুমার বসু

গাব কেন্দ। এবেনাসিই গোত্রের (Family-Ebenaceae) অন্তর্ভুক্ত দিয়োস্পাইরোস গণের (Genus-Diospyros) দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। দাক্ষিণাত্য, ওড়িশা, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি স্থানের বনে ও রুক্ষ রুক্ষ অঞ্চলে গাব গাছ দেখা যায়। এই বৃক্ষের কাণ্ড হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাঠ পাওয়া যায়। ভারতীয় এবনি বা আবলুস বলিয়াও ইহা পরিচিত। মূল্যবান শোভনীয় আসবাব, ছবির ফ্রেম প্রভৃতি তৈয়ারির জন্য এই কাঠের যথেষ্ট চাহিদা আছে। ইহার কচি পাতা বিড়ি তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়, এজন্য ওড়িশা ও পশ্চিম বঙ্গে প্রতি বৎসর গাবের কচি পাতা বহু পরিমাণে সংগৃহীত হয়। এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত ইহার ফুল হয় এবং তাহা ফলের আকার ধারণ করে পরবৎসর এপ্রিল মাসে। ফল পীতবর্ণ, সুস্বাদু, মিষ্ট ও বেরি জাতীয়। ফলের আঠা নৌকার পাটা ও মাছধরা জালে ব্যবহৃত হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫১।

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গামা (১৮৮০-১৯৬০ খ্রী) রুস্তম ই হিন্দ মল্লবীর, প্রকৃত নাম গোলাম মহম্মদ। কাশ্মীরী ইহুদী বংশজাত ইহার পূর্বপুরুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া লাহোরের সন্নিকটে বসবাস স্থাপন করেন। কুস্তি ইহাদের বংশানুগত পেশা। আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলে লাহোরের মন্ত্রীর মাধো সিং ইহার শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়া তালিমের জন্য ইহাকে তৎশিষ্য মীরন বখ্‌শের নিকটে পাঠাইয়া দেন। আঠার বৎসর বয়সে পেশাদারী বৃত্তি আরম্ভ করেন এবং তেইশ বৎসর বয়সে দাতিয়া শহরে অমৃতসরের গোলাম মহিউদ্দীনকে পরাস্ত করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরে লাহোরের আলী সাহ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে গোলাম মহিউদ্দীনকে পরাস্ত করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাধর পণ্ডিত এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে হসেন বখ্‌সকে পরাজিত করা গামার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রহিম বখ্‌স তাহার সমকক্ষ মল্লবীর ছিলেন। ১৯০৩, ১৯০৬ এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনবারের কোনও লড়াইতেই রহিমের সহিত তাহার যুদ্ধের মীমাংসা হয় নাই। চতুর্থ বারে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের কংগ্রেস একজিবিশনের লড়াইয়ে রহিম অপ্রত্যাশিতভাবে মঞ্চের ত্রুটিতে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইলে আইনের বিধান অনুসারে তাহাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে একটি মল্লদলের সঙ্গে গামা লণ্ডনে গমন করেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রোলারকে পর্যুদস্ত করেন। সেখানেই অংশগ্রহণ প্রতিযোগিতায় পোল্যাণ্ডের জবিসকোকে কাবু করিলেও চিৎ করিতে না পারায় পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জবিসকো ইহাতে উপস্থিত না হওয়ায় গামা বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জবিসকো ভারতে আসিয়া তাহার লুপ্ত খ্যাতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া পাতিয়ালায় মাত্র নয় সেকেণ্ডের মধ্যে গামার নিকট পরাজিত হন। ইহার দশবৎসর পরে জবিসকো পুনরায় আহ্বান করিলে গামা তাহার নিজস্ব রীতি অনুসারে পরপরাজিত বিপক্ষের সহিত লড়িতে স্বীকৃত হন নাই। পরপরাজিত আলী সাহ-এর চ্যালেঞ্জও অনুরূপভাবে তিনি গ্রহণ করেন নাই। আত্মরক্ষামূলক কুস্তিতে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। স্বভাবে তিনি ধীর, স্বল্পভাষী, সদালাপী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে তাহার মৃত্যু হয়।

দ্র সমর বসু, মল্লজগতে ভারতের স্থান, কলিকাতা, ১৩২৬।

সমর বসু

গামারশ্মি তেজস্ক্রিয়া দ্র

গায়কী কণ্ঠসংগীতের বিভিন্ন কৌশলে বিশেষ বিশেষ শিল্পীকর্তৃক স্থাপিত স্বকীয় পদ্ধতি। বিভিন্ন ঘরানার

গায়নবৈশিষ্ট্য দ্বারাও নানা প্রকার গায়কী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার টপ্পায় রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু নিজস্ব গায়কী দ্বারা একটি বিশিষ্ট শৈলী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা প্রচলিত পাঞ্জাবী টপ্পার অনুরূপ নহে। বাংলার ধ্রুপদ সংগীতে বিষ্ণুপুর ঘরানার একটি বিশেষ গায়কী আছে যাহার জন্য বিষ্ণুপুরের গায়কগণ ধ্রুপদের ক্ষেত্রে এক প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করিয়াছেন। বাংলার কাব্যসংগীতে রবীন্দ্রনাথের গায়নপদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া একটি গায়কী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে বিভিন্নভাবে নানাবিধ গায়কীর প্রকাশ ঘটিয়াছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

গায়কোয়াড় পূর্বতন বরোদা রাজ্যের রাজাদের সাধারণ উপাধি ছিল গায়কোয়াড। গায়কোয়াড পরিবারের আদি নিবাস পুনা। বরোদা রাজ্য ও রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা পিলাজী গায়কোয়াড ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে মারাঠা 'সেনাপতি'র সৈন্যাধ্যক্ষ 'মুতালিক'রূপে গুজরাতের মাহি নদীর দক্ষিণবর্তী কয়েকটি জেলা জয় করিয়া তাপ্তি নদীর ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) দক্ষিণে সোনগড় নামক স্থানে আপন কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং বিজিত অঞ্চল হইতে চৌথ আদায় করিতে থাকেন। মারাঠা প্রধান 'পেশোয়া'র হস্তক্ষেপের জন্য পিলাজির পক্ষে সমগ্র গুজরাত জয় করা সম্ভবপর হয় নাই। ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'সেনাপতি'র স্থলে গায়কোয়াডই প্রকৃত শাসক হইয়া ওঠেন।

তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের (১৭৬১ খ্রী) পর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া মারাঠা রাজ্য প্রধানতঃ 'সিন্ধিয়া', 'পওয়ার', 'হোলকার', 'ভোসলে' ও 'গায়কোয়াড' – এই পাঁচটি পরিবারের নেতৃত্বে পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। পিলাজীর পুত্র দমাজী সোনগড় হইতে বরোদায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৭৬৬ খ্রী)। ভারত স্বাধীন হইবার পর অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় বরোদা রাজ্যও বিলুপ্ত হয়।

দ্র J. N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, vol. I, Calcutta, 1949 ; G. B. Pandya, *Gaikwads of Baroda*, Baroda, 1958

কুমুদরঞ্জন দাশ

গায়ত্রী মূলতঃ বৈদিক ছন্দোবিশেষের নাম। গায়ত্রী ছন্দে রচিত সবিতৃদেবতার স্তুতিমূলক একটি মন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩.৬২.১০) এই নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মন্ত্রটি ওঙ্কার ও ব্যাহৃতি (ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ) যুক্ত হইয়া পঠিত হয়। শাস্ত্রে এই মন্ত্রজপের অসাধারণ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। উপনয়ন সংস্কারে গুরুর নিকট হইতে গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণের পর ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ অবশ্যকরণীয় কর্ম বলিয়া বিবেচিত। জপের পূর্বে দেবীরূপে কল্পিতা গায়ত্রীর ধ্যান বা রূপচিন্তা করিতে হয়। গায়ত্রী বেদমাতা ও ব্রহ্মার পত্নী। ইনি সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থা, ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুরূপা বা শিবরূপা, হংসস্থিতা গরুড়াসনা বা বৃষবাহনা। তন্ত্রে গায়ত্রীদেবীর স্বতন্ত্র উপাসনার ব্যবস্থা আছে। বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রের অনুকরণে বিভিন্ন তান্ত্রিক দেবতার বিভিন্ন গায়ত্রী মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে (যথা, নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ইত্যাদি)। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক গায়ত্রীজপের ব্যবস্থা আছে।

দ্র শারদাতিলক ২১, প্রাণতোষিণী ৩।৪।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গারো[১] উপজাতি অধ্যুষিত আসামে গারোরা অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী। পশ্চিম আসামের দক্ষিণার্ধ গারো পাহাড় জেলা ইহাদের প্রধান বাসভূমি। ভারতবর্ষে গারোদের মোট সংখ্যা ২৬৮৬৭৫ জন। ইহার মধ্যে কেবল আসামেই আছে ২৫৮০২২ জন। ইহা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে ২৫০৫ জন, ত্রিপুরায় ৫৬৮৪ জন এবং নাগাল্যান্ডে ৫০৪ জন গারো বাস করে।

গারোরা নিজেদের 'আচিক' বা 'মান্দে' বলে। 'আচিক' শব্দের অর্থ পাহাড়ী মানুষ। গারোদের মধ্যে আটটি শাখা আছে। ইহাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য খুব না থাকিলেও ভাষাগত প্রভেদ বিদ্যমান। আঞ্চলিক প্রভাবের ফলে বিভিন্ন শাখার জীবনযাত্রার মধ্যেও কিছু কিছু ভেদ দেখা যায়। কামরূপ-গোয়ালপাড়া অঞ্চলে গারোরা রাভা উপজাতিদের প্রতিবেশী রূপে বাস করে বলিয়া তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু রাভা কৃষ্টির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। তেমনই যাহারা প্রধানতঃ খাসি পাহাড়ে বাস করে তাহাদের মধ্যে খাসি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অধিকাংশ উপজাতির মত গারোরাও নদীর ধারে কিংবা পানীয় জলের উৎসের নিকটে বসতি স্থাপন করে এবং বাঁশের নল দিয়া গ্রাম পর্যন্ত জল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করে।

গারোদের ঘর বাঁশ দিয়া তৈয়ারি হয়। গ্রাম

বিন্যাসের কোনও বিশেষ নিয়ম নাই। গারো গৃহে একটি মাত্র ঘরই থাকে— যেন একটি বিরাট হল ঘর। সম্মুখে ও পিছনে দুইটি দরজা। ঘর হইতে সামান্য দূরে— সুবিধামত জায়গায় থাকে শস্যাগার, তাহাকে 'জমনো' বলে। ইহাও আকারে বাসগৃহের অনুরূপ, তবে আয়তনে অনেক ছোট।

গ্রামের অদূরেই জুম চাষের জমি। গারোরা মূলতঃ কৃষিজীবী। তাহাদের ভাষাতে জুমকে বলা হয় 'আবা'। দুই-এক বৎসর পর পর তাহারা জমি পরিবর্তন করে। তবে গ্রামের ৪-৫ কিলোমিটার (২-৩ মাইল) ব্যাসার্ধের মধ্যে তাহাদের চাষের জমি সীমাবদ্ধ থাকে। পাহাড়ী ধান, ভুট্টা, বাজরা আর কার্পাসের চাষই প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে চাষের জমি গ্রাম হইতে দূরে হইলে তাহারা জমির কাছাকাছি গাছের উপরে অস্থায়ী বাসা বাঁধিয়া থাকে।

গারোদের আকৃতি আসামের অন্যান্য মঙ্গোলীয় জাতির অনুরূপ। পেশীবহুল খর্বকায় শক্ত চেহারা, চ্যাপ্টা নাক ও ছোট চোখ। পোশাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। গভীর পার্বত্য অঞ্চলে পুরুষেরা কেবল দুই ঊরুর মধ্যে সামান্য কৌপীনের দ্বারাই লজ্জা নিবারণ করে। মেয়েরা দুই-তিন হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখে। পুরুষের পোশাককে বলা হয় 'গান্দো' আর নারীদের পোশাককে বলে 'রিকিং'। ইদানীং তাহাদের মধ্যে ধুতি ও মেখলার যথেষ্ট প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তাহারা অনেকে ইংরেজী পোশাক পরে।

গারো সংস্কৃতিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ গঠন। মাতৃগোত্র অনুসরণই সমাজের সাধারণ নিয়ম। মেয়েরাই কেবলমাত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিয়া থাকে। সমস্ত সমাজ কতকগুলি 'মাচং'-এ বিভক্ত। মায়ের গোত্রকে 'মাচং' বলিয়া অভিহিত করা হয়। মাচংগুলি আবার কতকগুলি শাখায় বিভক্ত— যেমন, সাংমা, মারাক এবং মোমিন। ইহাদের বলা হয় 'কাটচি'। স্বীয় মাচং-এর মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বহু দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও একই মাচং-এর লোকেরা নিজেদের জ্ঞাতি বলিয়া মনে করে। মাচং-এর ভিতর 'মাহারি' নামেও একটি ক্ষুদ্র শাখা আছে। এক মাহারিভুক্ত লোকেদের মধ্যে বাস্তব ক্ষেত্রে কোনও না কোনও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে। বিবাহব্যাপারে মাহারি বিভাগের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। গারোদের মধ্যে বহু-বিবাহের প্রচলন দেখা যায়।

গারোদের বিবাহ রীতির সঙ্গে সম্পত্তি উত্তরাধিকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সম্পত্তি কখনই মাচং-এর বাহিরে যাইতে পারিবে না বলিয়া মেয়েরাই মাতৃ সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। যে মেয়ে উত্তরাধিকার লাভ করে তাহার স্বামীকে বলা হয় 'নোক্‌মা' বা 'নোক্‌রম'। গারোদের মামাতো ভগিনী ও পিসতুতো ভাইয়ের মধ্যে বিবাহ বহুল প্রচলিত। বিশেষতঃ 'নোক্‌রম' উত্তরাধিকারিণী কন্যার পিতৃসহোদরার পুত্র হওয়া একান্ত আবশ্যক। বাস্তবক্ষেত্রে যদি পিতার সহোদরার পুত্র না থাকে, নিকট সম্পর্কিত অপর কোনও ভগ্নীর পুত্র 'নোক্‌রম' হিসাবে অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্বশ্রুমাতাই সম্পত্তির মূল অধিকারিণী। সেজন্য শ্বশুর অর্থাৎ মামার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার আইনের খাতিরে শ্বশ্রুমাতাকে নামেমাত্র বিবাহ করিতে হয়। নোক্‌রমের সম্পত্তি হস্তান্তর করণের অধিকার না থাকিলেও পরিবারে তাহার স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রীর পরিবারেই তাহাকে বাস করিতে হয় এবং সমস্ত পারিবারিক ব্যাপারে তাহার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রাম শাসনের ভার নোক্‌রম ও সরদারের উপর ন্যস্ত। তাহারা লস্করের অধীনে কাজ করে। সমস্ত গারো পাহাড় জেলা ৬০টি লস্করের অধীনে বিভক্ত।

মৃতদেহ সমাধিস্থ করাই প্রচলিত বিধি। ধর্ম সম্পর্কে গারোদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে স্রষ্টা ও পিতৃদেবতা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা রহিয়াছে। গারোরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

রেখা ঘোষ

গারো২ ২৫°৯′ হইতে ২৬°১′ উত্তর এবং ৮৯°৪৯′ পূর্ব হইতে ৯১°২′ পূর্ব। আসাম রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে শিলং মালভূমির পশ্চিমাংশে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি পর্বতশ্রেণী ও জেলা। জেলার উত্তরে গোয়ালপাড়া জেলা, দক্ষিণে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমে যমুনা নদী ও পূর্বে খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। পর্বতশ্রেণী ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকাকে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণে সুরমা উপত্যকা হইতে তুরা ও আরবেলা পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত উচ্চতা খাড়াইভাবে বাড়িয়াছে। নকরেক (১৪১২ মিটার বা ৪৬৫২ ফুট) সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার (২০০০ ফুট)। উত্তর দিকে উচ্চতা ধীরে ধীরে কমিয়াছে। খাড়া পর্বতশিরাগুলি সুগভীর নদী ও উপত্যকা দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন।

কৃষিকার্যের জন্য পরিষ্কৃত এলাকা ছাড়া প্রায় সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের ঘন বনভূমি। বনভূমিতে

হস্তী, চিতা, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষী বিরাজমান।

অধিকাংশ স্থান আর্কিয়ান যুগের (Archaean), কোয়ার্টজাইট (quartzite), স্লেট (slate), শিস্ট (schist) দ্বারা গঠিত। দক্ষিণ দিকে ক্রিটেশস (Cretaceous) যুগের বেলে পাথর ও কংগ্লোমারেট (Conglomerate) দেখা যায়। উচ্চাংশে পরবর্তী যুগের নিউমুলিটিক (Nummulitic) চুনা পাথর ও বেলে পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত।

জুম প্রথায় চাষ-আবাদ করা হয় ('আদিবাসী' দ্র)। ধান, ডাল, তুলা ও অন্যান্য সবজি প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। কয়লা ও কিছু পরিমাণ চুনাপাথর প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গারো পার্বত্য এলাকায় ৮০৭৮ বর্গ কিলোমিটার (৩১১৯ বর্গ মাইল) আয়তন -বিশিষ্ট একটি জেলার সৃষ্টি হয়, ইহা পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ রাজবংশের অধীন ছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৩০৭২২৮। অধিকাংশই গারো উপজাতিভুক্ত। সদর শহর তুরা (২৫°৩০′ উত্তর এবং ৯০°১৫′ পূর্ব) গোয়ালপাড়ার সহিত যুগবাড়ি হইয়া একটি পথের দ্বারা যুক্ত। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান ফুলবাড়ি, চেবান, বরেঙ্গাপাড়া ও মহেন্দ্রগঞ্জ।

রঞ্জন বসু

গারো² বোড়ো দ্র

গার্গী বৈদিক যুগের অতি বিদুষী সর্বজনশ্রদ্ধেয়া রমণী। বচক্নু মুনির কন্যা। ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন কালে যে কয় জন বৈদিক মহর্ষিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নির্দেশ আছে গার্গী বাচক্নবী তাঁহাদের অন্যতমা। গার্গী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন— আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া শাস্ত্র চর্চায় জীবন যাপন করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত রাজর্ষি জনকের ব্রহ্মযজ্ঞ সভায় সমবেত মহর্ষিগণের মধ্যে গার্গী আহূত হন। জনক নির্দেশিত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞের প্রাপ্য গাভীসহস্র যাজ্ঞবল্ক্য গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হওয়া মাত্র তেজস্বিনী গার্গী প্রতিবাদ করিয়া ওঠেন এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে গার্গী মুক্তকণ্ঠে যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন।

দ্র আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ৩।৪।৪, শাঙ্খায়ণ গৃহ্যসূত্র, ৪।৭, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬,৩।৮।

সংযুক্তা গুপ্ত

গার্ডেনরীচ ২২°৩২′৩৫″ উত্তর ও ৮৮°২১′৪০″ পূর্ব। কলিকাতা বন্দর এলাকার পশ্চিম পার্শ্বে হুগলি নদীর তীরে মেটিয়াবুরুজ থানায় ইহা অবস্থিত। খিদিরপুরের সন্নিকটে ভাগীরথী নদী সমকোণ সৃষ্টি করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া হাওড়া জেলার বাক্সাড়ের নিকট পুনরায় দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। খিদিরপুর বন্দর এবং গার্ডেনরীচ এই পশ্চিমবাহিনী ভাগীরথীর দক্ষিণ পার্শ্বে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৮৯৭ সালে গার্ডেনরীচ পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য ইহা কলিকাতা পৌরসভার সহিত যুক্ত হইয়াছিল, বর্তমানে স্বতন্ত্র পৌর প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। সমগ্র পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তন (৫ বর্গ মাইল) এবং পঁচিশটি উপবিভাগে (ওয়ার্ড) বিভক্ত। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম সার্বজনিক ভোটে পঁচিশ জন কমিশনার নির্বাচিত হন। এই অঞ্চলের কিছু অংশ কলিকাতা পুলিশের পোর্ট পুলিশ ডেপুটি কমিশনারের অধীন এবং অবশিষ্ট অংশ চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের অধীন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের গণনা অনুযায়ী এখানকার মোট জনসংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। অধিকাংশ লোক স্থানীয় কলকারখানায় ও ডক অঞ্চলে নিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুপাত শতকরা ৫০ ভাগ। স্থানীয় বাঙালী মুসলমানেরা প্রায় সবই দরজী এবং অবাঙালী মুসলমানেরা কল কারখানায় কাজ করে।

কথিত আছে, নবাবী আমলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য এখানে মাটির দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল তদনুসারে স্থানটির নাম হয় 'মেটিয়াবুরুজ' (মাটির দুর্গ)। সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌কে ('ওয়াজিদ আলী শাহ্‌' দ্র) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই স্থানে নজরবন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া নূতন এক সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। এই বংশকে কেন্দ্র করিয়া আরও দুই-এক জন জমিদার নদীর তীরে আমোদ-প্রমোদের জন্য বাগানবাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আন্দুলের রাজা অন্যতম।

কলিকাতার অব্যবহিত উপকণ্ঠে এত বিশাল কলকারখানার সমাবেশ আর কোথাও নাই। বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শিল্প গড়িয়া উঠিবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। বন্দরের পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর তীর ধরিয়া যতদূর সম্ভব কারখানাগুলি বিস্তৃত। তিনটি চটকলে ১০৫০০ শ্রমিক কাজ করে। একটি কাপড়ের কারখানায় ১২০০০ শ্রমিক আছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে আই জি. এন আব এবং আব. এস. এন কোম্পানির দুইটি কারখানায় ৭০০০ শ্রমিক স্টিমার মেরামত ও স্টিমার তৈয়ারির কাজে নিযুক্ত আছে।

ইহা ব্যতীত আরও বারটি ছোট ও মাঝারি কারখানা আছে। ইহাদের ভিতর পাঁচটিতে এক হাজারের উপর শ্রমিক কাজ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্থানাভাব ও রাস্তাঘাটের অসুবিধার জন্য অন্য অঞ্চলের মত নূতন নূতন কারখানার সম্প্রসারণ খুব বেশি হইতে পারে নাই, কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকসংখ্যা বাড়িয়াছে।

শ্রমিক-সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ এই এলাকাতেই বসবাস করে। আট হাজার শ্রমিকের জন্য কোম্পানি নির্মিত বাসস্থান (কোয়ার্টার) আছে। বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক হাওড়া হইতে নদী পার হইয়া ও চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া থাকে। কলিকাতার 'এসপ্লানেড' অঞ্চল হইতে বর্তমানে মেটিয়াবুরুজ অভিমুখে তিনটি রুটে বাস ছাড়ে। দুই জায়গায় নিবাস [illegible] আছে। শ্রমিকদের জন্য দুইটি কারখানায় স্টিমারের ব্যবস্থা আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা বড় দরজীর সমাবেশ এইখানে। [illegible] সম্প্রদায় [illegible]। [illegible] কাপড়ের সাবলীল পোশাক এই স্থান হইতে সরবরাহ করা হয়। হাওড়া হাট ও উত্তর কলিকাতার [illegible] বাজার ইহাদের প্রধান পাইকারী বাজার। দরজীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ হয় নাই।

কা[illegible] আদি বাসিন্দাদের মধ্যে পাল (কুম্ভকার) সম্প্রদায়ের প্রায় দুই শত পরিবার এখনও এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করিতেছে। ইহাদের ভিতর নারী পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত। এখনও কিছু অংশ পুরুষানুক্রমে পেশা ত্যাগ করে নাই। কলিকাতার জন্য বহু সুদৃশ্য ফুলের টব এখানে নির্মিত হয়। ইহারা নিজেদের কাজকর্মে বৈদ্যুতিক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করে। পুরাতন অধিবাসীদের মধ্যে জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব খুবই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অনেকেই কলকারখানায় নিযুক্ত আছে।

সমগ্র পৌর এলাকার মধ্যে ৫টি স্থায়ী বাজার আছে। প্রতি বুধবার ও শনিবার হাট বসে। ভাগীরথীর বিপরীত দিকে হাওড়া অঞ্চল হইতে বহু চাষী এখানে আসে।

সম্প্রতি খিদিরপুরে কিং জর্জেস ডক, দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত হইয়াছে। গার্ডেনরীচ এলাকার সংলগ্ন তারাতলা অঞ্চলে জি.ই.সি. ও এল মি প্রভৃতি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ও অন্যান্য বহু নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে।

দিলীপ ভাদুড়ী

গার্বে, রিখার্ট কার্ল ফন (১৮৫৭-১৯২৭ খ্রী) ভারততত্ত্ববিদগণের মধ্যে গার্বের নাম সুবিদিত। জার্মানির প্রাশিয়া অঞ্চলে ব্রেণ্ডাউতে গার্বের জন্ম হয় (৯ মার্চ, ১৮৫৭ খ্রী)। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ গ্রাসমান (Grassmann) এবং রোট (Roth) এর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। কোনিগ্‌সবের্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। পরে বারাণসীতে আসিয়া হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন। জার্মানিতে ফিরিবার পর গার্বে টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ধর্মশাস্ত্র ও সাংখ্য যোগ দর্শনে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল অসামান্য। রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (রুদ্রদত্তের টীকা ভাষ্য সহ, কলিকাতা ১৮৮১-১৯০৩ খ্রী), অথর্ববেদ (পৈপ্পলাদ শাখা, ১৯০১ খ্রী), সাংখ্যপ্রবচনসূত্র (কপিল), বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য, ১৮৮৮ খ্রী, সাংখ্যকারিকা (ঈশ্বরকৃষ্ণ), সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বাচস্পতি মিশ্র (১৮৯২ খ্রী), সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য (১৮৯৫ খ্রী) ইত্যাদি।

গালিচা পশমের নামদ জাতীয় পুরু বস্ত্রনির্মিত [illegible]। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে কোনও পুরু [illegible] বিশেষতঃ [illegible] আচ্ছাদনকে গালিচা বলা হইত। বর্তমানে প্রধানতঃ মেঝের আবরণ হিসাবেই গালিচার ব্যবহার হইলেও গৃহসজ্জার অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে বর্তমানে ইহা একটি বিরাট শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

গালিচা দুই প্রকারে নির্মিত হয়, হাতের দ্বারা ও যন্ত্রসহযোগে। প্রাচ্য দেশের হস্তনির্মিত গালিচা প্রাচীনযুগ হইতে অদ্যাবধি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করিয়া আসিতেছে। অন্ততপক্ষে ২৫০০ বৎসর পূর্ব হইতে গালিচার ব্যবহার ও তাহার নির্মাণ পদ্ধতি প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং বর্তমান ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এখনও এই রীতি অনুসৃত হইতেছে। যন্ত্রনির্মিত গালিচা নির্মাণের রীতি ইওরোপের বিভিন্ন দেশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে — ভারতবর্ষে কাশ্মীরেও হস্তনির্মিত তাঁত ব্যতিরেকে যন্ত্রচালিত গালিচার তাঁত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে

সাইবেরিয়ার আলতাই প্রদেশে নির্মিত গালিচা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম। ভারতবর্ষেও চালুক্য আমলের গালিচা পাওয়া গিয়াছে। তাঞ্জোর, ওয়ারঙ্গল প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন হিন্দু আমলের রীতি অনুসারে এখনও গালিচা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে মধ্য এশিয়া, পারস্য ও তুরস্কের সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত বিভিন্ন রঙের বাহার সমন্বিত গালিচার নকশা আধুনিক যুগের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন তথা অতি আধুনিক ইওরোপীয় নকশাও ভারতে আসিয়াছে।

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে রাজপোষকতায় ভারতবর্ষে, পারস্যের রীতি অনুযায়ী গালিচা প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে তুরস্ক ও পারস্য হইতে আমদানীকৃত গালিচা ব্যবহৃত হইত। ফলে জয়পুর, শ্রীনগর, অমৃতসর, লাহোর, আগ্রা, মীর্জাপুর প্রভৃতি স্থানে নির্মিত গালিচাতে কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্যে পারস্য দেশের কলাবিদ্যা ও পরবর্তী কালের পাশ্চাত্য রুচি উভয়েরই প্রভাব পড়িয়াছে। কাশ্মীরী গালিচা বিগত এক শতকের মধ্যে উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া বিশ্বের প্রায় সর্বত্র আদরণীয় হইয়াছে। হস্তনির্মিত গালিচা রঙের ঔজ্জ্বল্যে এবং নকশার বাহারে রুচিবোধের পরিচায়ক। প্রাচ্যে প্রায় সব গালিচা হস্তনির্মিত।

হস্তনির্মিত গালিচা নির্মাণের মূল নীতি খুব সরল। টানা-র মজবুত সুতা সমান্তরালভাবে স্থাপিত দুইটি কাষ্ঠদণ্ডে (নরাজ) জড়াইয়া টান্-টান্ করিয়া রাখা হয়। এই কাষ্ঠদণ্ড দুইটি খাড়া খুঁটির উপর এমনভাবে বসানো হয় যাহাতে কাষ্ঠদণ্ড দুইটি ঘোরানো যাইতে পারে। খুঁটিগুলির ব্যবধান কম-বেশি করিয়া লইয়া গালিচার প্রস্থ ঠিক করা হয়। তাঁতীরা তাঁতের সম্মুখ ভাগে পাশাপাশি বসিয়া গালিচা বুনিতে থাকে, যেমন যেমন বোনা হয় কাষ্ঠখণ্ডে তাহা গুটাইয়া ফেলা হয়। পোড়েনের জন্য পশমের রঙিন সুতাগুলি প্রায় ৫ সেন্টিমিটার (২ ইঞ্চি) লম্বা করিয়া কাটা হয় এবং এক-এক জোড়া টানার সুতার সঙ্গে তাহার প্রত্যেকটিকে অধোভাগে গ্রন্থি দিয়া বাঁধা হয় এবং পরে কাঁচির মত অস্ত্র দিয়া সেগুলিকে সমান করিয়া কাটা হয়। তাঁতীদের সম্মুখে নকশার নমুনা থাকে, তাহা দেখিয়া রঙিন সুতা মিলাইয়া ঘরগুলি ভর্তি করিয়া তাহারা গালিচা বুনিতে থাকে। কাশ্মীরের কোনও কোনও গালিচার কারখানায় সর্দার-তাঁতী সুর করিয়া ছড়া কাটিয়া একই সঙ্গে বয়ন-রত আট-দশ জন তাঁতীকে বিভিন্ন নকশার রঙ আওড়াইয়া যায় এবং তাহা শুনিয়া আট-দশখানা বিভিন্ন আকারের ও নকশার গালিচা তৈয়ারি হইয়া ওঠে।

বিভিন্ন শ্রেণীর গালিচা প্রাচীন কাল হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে— শিকারের নকশা সংবলিত গালিচার মধ্যে পোল্দি পেৎসোলি (Poldi-pezzoly) মিউজিয়াম-এ রক্ষিত কার্পেটটি সুপ্রসিদ্ধ। পশুচিত্র সমন্বিত আর একটি গালিচাও বিশ্ববিখ্যাত। উহার একাংশ প্যারীর (প্যারিস) ম্যুজে দেজ়ার দেকোরাতিফ্ (Musee des Arts Decoratifs) মিউজিয়ামে, অপরাংশ পোল্যাণ্ডে ক্রাকাও শহরের বিখ্যাত গির্জায় রক্ষিত আছে। এশিয়া মাইনরের আনাতোলিয়া অঞ্চলের, ইরানের সিরাজ অঞ্চলের গালিচা সর্বাধিক আদরণীয়। ভারত, চীন ও অন্য কয়েকটি দেশের গালিচাও সুপ্রসিদ্ধ।

দ্র Hosain Ali, *Oriental Carpets*, Braunschweig, 1956; Igniz Schlosser, *European and Oriental Rugs and Carpets*, London, 1963.

অশোকা সেনগুপ্ত

গালিব, মীর্জা আসদুল্লা খাঁ (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রী) উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক। তাঁহার জন্ম আগ্রায় ও মৃত্যু দিল্লীতে। পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান তুরস্ক। পিতামহ সর্বপ্রথম ভারতে আসেন ও শাহ্ আলমের দরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। পিতা মীর্জা আবদুল্লা খাঁ ছিলেন একজন সেনাধ্যক্ষ এবং পুত্রের যখন ৫ বৎসর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তের বৎসর বয়সে গালিব উর্দু কবি ইলাহী বখ্শ খাঁ-এর কন্যা ও নবাব ফখ্রুদ্দৌলার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। প্রথমে ফারসী সাহিত্যের চর্চা করিলেও ক্রমে তিনি উর্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রথম জীবনের কাব্যসমূহে 'আসদ' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উপাধি পরিত্যাগ করিয়া তিনি গালিব (বা ঘালিব) কবি-নাম ধারণ করেন।

গালিবের কবিতাকে 'তারে রিবাব্' (রেবাব বাদ্যযন্ত্রের তার) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং কবিরের 'পয়ঘম্বরে-সুখুন্' (কাব্য-অবতার) আখ্যা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চিঠিপত্রকে গালিব সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার পত্র-সংকলন 'উদে-হিন্দী', 'উর্দুয়ে মুআল্লা' ও 'নামায়ে-গালিব' প্রসিদ্ধ। এইরূপ অন্যান্য কাব্য-সমালোচনা ও রসপূর্ণ রচনা হিসাবে প্রসিদ্ধ লতায়িফে-ঘয়বী, তেজে-তেষ্, 'মন্দ্-চীন্' ও 'কাত্তি-বুর্হান্'। 'পঞ্জ্-আহঙ্' তাঁহার ফারসী রসপূর্ণ রচনার এইরূপ আর একটি নিদর্শন। ফারসীতে কয়েকটি ইতিহাস-গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছেন: 'দস্তম্বু', 'মিহ্রে-নীমরূজ' ও 'মাহে-

নীমমাহ' (অসম্পূর্ণ)। তাঁহার আর দুইটি ফারসী গ্রন্থ 'কুল্লিয়াতে নসরে ফারসী' ও 'কুল্লিয়াতে-নজমে-ফারসী'।

নানা প্রকার ফারসী ও উর্দু কবিতা লিখিলেও গালিব উর্দু গজলেই (গজল্, প্রেমকাব্য) বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার 'দীওয়ানে-গালিব্' চিরপ্রসিদ্ধ। গালিবের গজল কাব্যের প্রধান গুণ তাঁহার কবি-মানস ও আপন ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁহার অসাধারণত্ব। এই অসাধারণত্ব তাঁহার নিজস্ব চালচলন, স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তাধারা ও প্রেমবিশ্লেষণ প্রভৃতি সব কিছুতেই লক্ষিত হয়। সব বিষয়েই একটি নূতনত্ব প্রকাশ করা কবির একটি বিশেষ প্রকৃতি। অনুভূতির সহজ ও স্বচ্ছ অভিব্যক্তি তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ। শেষতঃ গালিব ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক ও তাঁহার মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামির লেশমাত্রও ছিল না। প্রেমতত্ত্ব প্রকাশে তিনি প্রসিদ্ধ ফারসী সুফী কবি মৌলানা রুমীর ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। গালিব প্রধানতঃ দেহ্লৌবীর রচনাভঙ্গী অনুসরণে আরবী শব্দ বিবর্জিত পারস্য ভাষাতেই লিখিতেন।

দ্র হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৬২

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

গালিলেও, গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রী) ইতালীয় পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। পিসা শহরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি জন্ম। গালিলেও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তথায়, ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ফ্লোরেন্স এ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দোলকের স্পন্দন সংক্রান্ত বিধান সমূহ আবিষ্কার করেন ও পরে উহার সাহায্যে কালমাপক যন্ত্র নির্মাণ করেন। পরীক্ষামূলক ও যুক্তিভিত্তিক গবেষণার দ্বারা গালিলেও আধুনিক বলবিদ্যা সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন ভরযুক্ত দ্রব্যের পতনকালের সমতা তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বলবিদ্যার প্রথম বিধান (স্থিতিজাড্য ও গতিজাড্য সংক্রান্ত) ও দ্বিতীয় বিধান (ত্বরণের বলজন্যতা) প্রকৃত পক্ষে তিনিই আবিষ্কার করেন এবং প্রমাণ করেন যে, ভূপৃষ্ঠে প্রক্ষিপ্ত বস্তুর অবিঘ্নিত গতিপথ সর্বদাই পরাবৃত্তাকার (হাইপারবলিক)। আলোকের গতিবেগ নিরূপণে প্রয়াসী হইয়া তিনি নির্ণেয় কাল পরিমাণের অত্যল্পতা হেতু ব্যর্থ হন। এতদ্ব্যতীত তিনি একটি বায়ুপূর্ণ তাপমান যন্ত্র ও একটি হাইড্রোস্ট্যাটিক ব্যালান্স নির্মাণ করেন। গৃহনির্মাণাদি ব্যাপারেও তিনি গবেষণা করিয়াছিলেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার সংবাদ অবগত হইয়া গালিলেও স্বয়ং একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন এবং তদ্দ্বারা তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রপৃষ্ঠের বন্ধুরতা, বৃহস্পতিগ্রহের উপগ্রহচতুষ্টয়, শনিগ্রহের বলয়, সৌর কলঙ্ক ও তাহার পরিবর্তন ইত্যাদি বহু আবিষ্কারের দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব বিপ্লব আনয়ন করেন। উপযুক্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভাব সত্ত্বেও তিনি এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ছায়াপথ বস্তুতঃ অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি। কোপার্নিকাসের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসমূহের গতি-সম্পর্কিত সৌরকেন্দ্রিক প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া গালিলেও তদানীন্তন ধর্মযাজকদিগের বিরাগভাজন হন। অবশেষে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'বিশ্বদর্শনদ্বয় সম্পর্কিত সংলাপ' প্রকাশিত হইলে ধর্মীয় আদালতে তাঁহার বিচার হয় এবং তিনি সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। অন্ধ অবস্থায় শেষ জীবনে বিশেষ ক্লেশভোগের পর ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। উল্লিখিত 'সংলাপ' ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ডি মোটু' (গতি সম্পর্কিত) এবং 'নব্যবিজ্ঞানদ্বয় সম্পর্কিত সংলাপ' উল্লেখযোগ্য। গালিলেও-এর আবির্ভাবের ফলে ইওরোপীয় বিজ্ঞান আরিস্তোতলবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছিল তিনি পরিকল্পিত পরীক্ষা ও যুক্তিভিত্তিক পরিশোধনের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সাধনের পন্থা অনুসরণ করেন।

দ্র J J Fahie, *Galileo, His Life and work*, [London], 1903, W. W Bryant, *Galileo*, [London], 1918

পরনাথ দাশগুপ্ত

গালোয়া, এভারিস্ত (১৮১১-৩২ খ্রী) প্রসিদ্ধ ফরাসী গণিতবিদ্। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার বিশেষ ছিল না। ফ্রান্সের বিদ্যালয় 'একোল পোলীতেকনীক'-এ দুই বার তাঁহাকে ভর্তি করা হয় নাই। পরে তিনি 'একোল নর্মাল' বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তথা হইতে বিতাড়িত হন। গৃহশিক্ষকতা ছিল তাঁহার জীবিকা, গণিত ও রাজনীতির চর্চায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়।

গালোয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে প্রজাতন্ত্রী দলে যোগদান করিয়া কারারুদ্ধ হন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের কিছুদিনের মধ্যেই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে নিহত হন।

তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশক হারাইয়া ফেলেন। অবশিষ্ট কয়েকটি প্রবন্ধ মৃত্যুর অনেক পরে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে গালোয়া সমীকরণের বীজতত্ত্বের সম্বন্ধে স্বীয় আবিষ্কারগুলি তাঁহার বন্ধুকে পত্রে জানাইয়া যান। কিন্তু উহা সকলের নিকট দুর্বোধ্য হওয়ায় তখন মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু এই মূল্যবান তত্ত্বগুলি আধুনিক বীজগণিতে বিশেষ অধ্যায় হইয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। সসীম ফিল্ডকে এখন অনেকে গালোয়া ফিল্ড বলেন। সমীকরণের বীজের রূপকেও 'গালোয়া সংযোগ' বলা হয়।

অনাদিনন্দ চৌধুরী

গাসের ব্রুম বৃহৎ কারাকোরামের অন্তর্বর্তী চারিটি শৃঙ্গ। ইহাদের উত্তর-পূর্বে উর্দুক ও দক্ষিণে বল্টোরো হিমবাহ। এই চারিটি শৃঙ্গকে প্রথমে কে৫, কে৪, কে৩এ, কে৩ বলা হইত। পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে গাসের ব্রুম I, II, III ও IV বলিয়া আখ্যাত হয়। গাসের ব্রুম কথাটির অর্থ লুক্কায়িত শৃঙ্গ। প্রথমে ১৮৫৭–৫৯ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] (কাশ্মীর) হইতে জরিপ করা হয়। ১৮৮৭ সালে ইয়ংহাজব্যাণ্ড উর্দুক হিমবাহ হইতে ও ১৯০৯ সালে ডিউক অব আবরুজি বল্টোরো হিমবাহ হইতে ৩৫° ৪৩′ উত্তর ও ৭৬°৪১′৪৮″ পূর্বে অবস্থিত গাসের ব্রুম I (৮০৬৮ মিটার বা ২৬৪৭০ ফুট) শৃঙ্গটিকে দেখেন। ২, ৩ ও ৪ সংখ্যক শৃঙ্গ পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত। ১ শৃঙ্গটি ২ শৃঙ্গ হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে খানসাহেব আফ্রাজ গুল এবং মহম্মদ আক্রম ইহাদের ও উত্তর হিমবাহগুলির জরিপ শেষ করেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জি. ও ডাইরেনফুর্থ একটি আন্তর্জাতিক অভিযাত্রী দল লইয়া সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ শৃঙ্গটিতে উঠিতে চেষ্টা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়া তাঁহারা আরোহণ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য প্রায় ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূর হইতে ফিরিয়া আসেন। ফরাসী আলপাইন ক্লাবের এইচ. দ সেগনিব (H de Segogne) নেতৃত্বে একটি ইওরোপীয় অভিযাত্রী দল ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শৃঙ্গ আরোহণ করিতে চেষ্টা করেন। বলটোরো হিমবাহে পৌঁছানোর পর ও ৬৯০০ মিটার (২৩০০০ ফুট) পর্যন্ত উঠিবার পর আবহাওয়া খারাপ হইতে শুরু করে ও রসদ ফুরাইয়া যাওয়ায় ঐ অভিযান পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই আমেরিকান অভিযাত্রী দল পিটার শোয়েনিং (Schoening) এবং আই. কাউফমান (Kauffman) এর নেতৃত্বে গাসের ব্রুম ১ শৃঙ্গটি আরোহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ান অভিযাত্রীদল ফ্রিৎস মোরাভেক-এর নেতৃত্বে ১ ও ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রিকারডো কাসসীন (Riccardo Cassin)-এর নেতৃত্বে ইটালীয়ান দল ৪ শৃঙ্গটিতে ওঠেন। ৩ শৃঙ্গটিতে এখনও ওঠা সম্ভব হয় নাই।

দ্র Kenneth Mason, *Abode of Snow*, London 1955

বরুণ মুখোপাধ্যায়

গাহড়বাল, গাড়বাল বংশ দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে শেষ হিন্দু সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা গাহড়বাল বংশ, মধ্যযুগ হইতেই ইহারা অন্যতম রাজপুত গোষ্ঠী রূপে পরিগণিত। সাধারণতঃ বারাণসী ইহাদের শাসনকেন্দ্র। গাহড়বালদিগের বহু তাম্রলিপি, কিছু স্বর্ণ, তাম্র ও মিশ্রধাতুর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বংশোৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে, গাহড়বাল লিপি অনুসারে যশোবিগ্রহ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। একাদশ শতকে যখন তুর্কী [illegible] ভারতে বারংবার উপদ্রব হইতেছিল তখন গাহড়বাল মহারাজাধিরাজ চন্দ্রদেব (আনুমানিক ১০৮০-১১০০ খ্রী) কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া বারাণসী হইতে দিল্লী [illegible] ভূভাগে স্বাধীন গাহড়বাল রাজ্য স্থাপন করেন ও কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান রক্ষা করেন। তৎপুত্র মদনচন্দ্রকে (১১০০-১৪ খ্রী) গজনীরাজ তৃতীয় মাসুদ পরাজিত ও সম্ভবতঃ বন্দী করেন। তাম্রলিপি এবং সমসাময়িক ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধ কৃত্যকল্পতরু হইতে প্রমাণ হয় যে গোবিন্দচন্দ্র তুরুষ্কদের পুনঃ পুনঃ 'হম্মীর' (আমীর) [illegible] বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যরক্ষা করেন। গৌড় সংঘর্ষের অবসানে গোবিন্দচন্দ্র গৌড়রাজ রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথনদেবের দৌহিত্রী কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। দীর্ঘ রাজত্বকালে (১১১৪-৫৫ খ্রী) গোবিন্দচন্দ্র পশ্চিমে দিল্লী হইতে মুঙ্গের, হিমালয়ের পাদদেশ হইতে যমুনার দক্ষিণ তীর অবধি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়ের পালবংশ ও ত্রিপুরীর কলচুরি বংশ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। তুর্কী বিতাড়নে এবং দশার্ণ অভিযানেও তাঁহার সাফল্য অনুমিত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের সফল পররাষ্ট্রনীতিতে সহায় ছিল মহাসান্ধিবিগ্রহিক লক্ষ্মীধর ভট্টের 'মন্ত্রমহিমা'। লক্ষ্মীধর ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধ কৃত্যকল্পতরু রচনা করেন। পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কৃতির ধারক হইয়াও গোবিন্দচন্দ্র বৌদ্ধ সংঘে গ্রামদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাণী কুমারদেবী সারনাথে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়া অশোক-প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মচক্রজিন' পুনঃস্থাপিত

করেন। গোবিন্দপুত্র বিজয়চন্দ্রের রাজত্বকালে (১১৫৫-৭০ খ্রী) পালরাজ, সেনরাজ ও অন্যরাজ্য গজনীসুলতান কান্যকুব্জ সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। চাহমানবংশের চতুর্থ বিগ্রহরাজ এই সুযোগে দিল্লী অধিকার করিয়া চাহমান গাহড়বাল দ্বন্দ্বের সূচনা করেন। বিজয়চন্দ্র সম্ভবতঃ শাহাবাদ অঞ্চল জয় করেন। তৎপুত্র জয়চন্দ্রের (১১৭০-৯৩ খ্রী) সেনাবলের অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা মুসলিম ঐতিহাসিকগণের রচনায় আছে। 'নৈষধ চরিতম্' ও 'শ্রীবিজয়প্রশস্তি' -রচয়িতা শ্রীহর্ষ ইহার সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত জয়চন্দ্র বৌদ্ধ ধর্মে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি গয়া অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ সেনের আক্রমণ প্রতিহত করেন। পৃথ্বীরাজ কর্তৃক জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে হরণ করা এবং জয়চন্দ্র কর্তৃক তৃতীয় পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে ঘুর সুলতানকে আমন্ত্রণের সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহার সমর্থক কোনও প্রমাণ নাই। ঘুর সুলতানের ভ্রাতা মুইজুদ্দীন মহম্মদ গজনী হইতে আসিয়া পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আজমীর অধিকার করেন, অতঃপর সহকারী কুতুবুদ্দীনের সাহায্যে চন্দাবারের যুদ্ধে তিনি জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বারাণসী লুণ্ঠন করেন। ইহার পরেও জয়চন্দ্রপুত্র হরিশ্চন্দ্র জৌনপুর মীর্জাপুর অঞ্চলে কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরবর্তী লিপিতে জনৈক গাহড়বাল শাসক অবডক্কমল্লের নাম মাত্র পাওয়া যায়। শতাধিক বৎসরের রাজত্বে গাহড়বালগণ তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সংহতি রক্ষা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কৃতির উজ্জীবন, সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করিয়াও ইসলাম বৌদ্ধাদি পরধর্মে উদার শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

দ্র H C Ray, *The Dynastic History of Northern India*, vol I, Calcutta, 1931, R C Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vol V, Bombay, 1957, R Niyogi, *The History of the Gahadavala Dynasty*, Calcutta, 1959

রমা নিয়োগী

গ্যাংটক, গাংতোক ২৭°২০ উত্তর ও ৮৮°৬০ পূর্ব অক্ষাংশে হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সিকিম রাজ্যের রাজধানী। গাংতোক শব্দটির অর্থ শৈলশিরা (Ridge)। ইহার ক্ষেত্রফল ৫·২ বর্গ কিলোমিটার (২ বর্গ মাইল) ও গড় উচ্চতা ১৭১০ মিটার (৫৭০০ ফুট)। দার্জিলিং হইতে ৯৪ কিলোমিটার (২৮ মাইল) উত্তর পূর্বে অবস্থিত। শিলিগুড়ি হইতে বরাবর তিস্তার পূর্ব পার হইয়া কালিম্পংকে পূর্বে রাখিয়া গ্যাংটক যাওয়া চলে। কালিম্প ও দার্জিলিং হইতে এখানে নিয়মিত মোটর গাড়ি যাতায়াত করে। সিকিম রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত সিংগালীলা গিরিশ্রেণীর কাঞ্চনজঙ্ঘা, সিম ভো, সিনোল্চু প্রভৃতি কয়েকটি শৃঙ্গ এইস্থান হইতে দেখা যায়। এখানকার জলবায়ু মনোরম। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩৩৩৫ মিলিমিটার (১৩৭ ইঞ্চি)। এখানে ম্যাগনোলিয়া বৃক্ষ প্রচুর আছে। ধান, কলাই, কমলালেবু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি চনা পাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এখানকার লোকসংখ্যা ১২০০০। লেপচা এবং ভোটিয়ারা স্থানীয় অধিবাসী। তদ্ভিন্ন ভারতীয় (পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী বিহারী ও বাঙালী) এবং নেপালীদের মধ্যে নেওয়ার, গুরুং, লোহার ও ছেত্রি প্রভৃতি জাতিও বাস করে। পাঞ্জাবীরা সৈন্য বিভাগে, মাড়োয়ারী ও বিহারীরা ব্যবসায় বাণিজ্যে, বাঙালীরা পূর্ত বিভাগে, ডাকঘরে ও শিক্ষা বিভাগে কাজ করে। ইহা ভিন্ন ভোটিয়াদের মধ্যে জমিদার বা 'কাজি' এবং নেপালীদের মধ্যেও বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী কিছু লোক দেখা যায়। বর্তমানে বহু তিব্বতী শরণার্থী এখানে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত আছে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-সিকিম চুক্তি অনুসারে সিকিমের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ভারত সরকার অর্থসাহায্য করিয়াছেন। পরসীমান্তে অবস্থিত নাথুলা, জেলেপলা গিরিপথগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভারত সরকারের উপরে ন্যস্ত আছে। ছেলেমেয়েদের জন্য দুইটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি জুনিয়র স্কুল আছে। এই সব বিদ্যালয়ে সিকিমী বা তিব্বতী, নেপালী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন পরলোকগত মহারাজার নামানুসারে পলডেন থণ্ডুপ কুটিরশিল্প শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষালয়ে দৈনিক মজুরিতে স্থানীয় শিক্ষার্থীগণ স্থানীয় কুটিরশিল্পে শিক্ষা লাভ করে ও জীবিকা অর্জন করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গতঃ মহারাজা তাশী নামগিয়ালের আনুকূল্যে তিব্বতী ভাষা ও ধর্ম পঠন-পাঠন ও বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষার নিমিত্ত শহর হইতে ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) দক্ষিণে দেওরালী নামক স্থানে ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি স্থাপিত হইয়াছে। এখানে তিব্বতী ভাষায় হস্তলিখিত বহু পুথি ও তিব্বতী চিত্র, মূর্তি প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। গাংতোক শহরটি প্রায় ৬০ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমান 'মহারাজা'কে চোগিয়াল বা 'ধর্মরাজ' বলা হয়। রাজপ্রাসাদটি একটি

শৈলশিরার উপরে অবস্থিত। গাংতোকে ২০০ বৎসরের পুরাতন দুইটি এবং আধুনিক কালে নির্মিত একটি গোম্পা আছে। প্রাচীনটির নাম 'ইঞ্চে গোম্পা' অন্যটি 'প্রাসাদ গোম্পা'। সিকিমের মহারাজা এক পরামর্শ সমিতির সহায়তায় রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন।

কমলা মুখোপাধ্যায়

গ্যারিক, ডেভিড (১৭১৭-৭৯ খ্রী) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ নট। স্বাভাবিক অভিনয় রীতি, অদৃশ্য মঞ্চালোক, যথোপযুক্ত বেশবাস ইত্যাদি সংস্কার ইংরেজী মঞ্চে তিনিই প্রথম শুরু করেন। শেক্‌স্‌পিয়রের মূল নাটকের পুনঃপ্রচলন তাঁহার প্রধান কীর্তি অথচ তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রাটফোর্ডে শেক্‌স্‌পিয়র জুবিলি উৎসবে শেক্‌স্‌পিয়রের কোনও নাটকের ব্যবস্থা করেন নাই।

তিনি ছিলেন হুগেনো বংশোদ্ভব এবং লিচফিল্ডের ক্যাপ্টেন পিটার গ্যারিকের পুত্র। ডঃ জনসনের নিকট কিছুদিন পড়াশুনা করেন ও তাঁহার সহিত লণ্ডন যান। সেখানে কিছুদিন মদ্যব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। পরে তাহা ত্যাগ করিয়া থিয়েটারে যোগ দেন। ১১ বৎসর বয়সে প্রথম অভিনয় করেন; ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'তৃতীয় রিচার্ড' হইতে তাঁহার জয়যাত্রা শুরু হয়। পরে তিনি ড্রুরি লেন মঞ্চশালার আংশিক মালিক-পরিচালক হন। কয়েকটি নাটক (বেন টন ইত্যাদি) রচনা করিলেও অন্যের নাটক পরিবর্তন করিয়া তাহা থিয়েটারের উপযোগী করাতেই তাঁহার সমধিক খ্যাতি হয়। তিনি শেক্‌স্‌পিয়রেরও নানা অংশ প্রয়োজনমত বাদ দিয়া মঞ্চস্থ করেন। মঞ্চ হইতে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার চেষ্টা ও প্রতিভার ফলে থিয়েটার অন্য শিল্পকলার মত আদৃত হয় এবং নট-নটীগণ সামাজিক মর্যাদা পায়।

রবি মিত্র

গ্যারিবল্ডি (গারিবল্‌দি), জিউসেপ্‌পে (১৮০৭-৮২ খ্রী) ইতালির বিখ্যাত দেশপ্রেমিক। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই নিস-এ জন্ম হয়। তৎকালে ইতালির উত্তর অংশ ছিল অস্ট্রিয়ার অধীন; মধ্য ও দক্ষিণ অংশ অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দেশের ঐক্য বিধান ও স্বাধীনতার জন্য মাৎসিনির (১৮০৫-৭২ খ্রী) আন্দোলনে গারিবল্‌দি যোগ দেন (১৮৩৪ খ্রী)। কিন্তু সংঘর্ষে আহত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন করেন। সেখানে তাঁহার বীরত্বে ও যুদ্ধকৌশলে আর্জেন্টিনা উরুগয়ে অধিকার করিতে পারে নাই।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে জনজাগরণ হইলে গারিবল্‌দি দেশে ফিরিয়া আসিয়া মাৎসিনির সহিত যোগ দেন এবং রোমে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন। অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপে রোম গণতন্ত্রের পতন হইলে তিনি নিউ ইয়র্কে পলায়ন করেন। অস্ট্রিয়াকে ইতালি হইতে বিতাড়নের জন্য সার্দিনিয়ার মন্ত্রী কাভুর (১৮১০-৬১ খ্রী) ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নাপোলেওঁর (নেপোলিয়ন) সহায়তায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। গারিবল্‌দি দেশে ফিরিয়া এই যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু নাপোলেওঁ যুদ্ধের মধ্যপথে অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি করেন। তখন গারিবল্‌দি দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলি জয়ের সংকল্প করিয়া মাত্র এক সহস্র স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সিসিলি দ্বীপ ও নেপ্‌ল্‌স রাজ্য সার্দিনিয়ার রাজা ভিক্তর এম্মানুয়েলের (১৮২০-৭৮ খ্রী) নামে জয় করিলেন। গারিবল্‌দির রাজনৈতিক জীবনের ইহাই মহত্তম কর্ম। ইতালির অন্যান্য অংশ সার্দিনিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া ঐক্যবদ্ধ ইতালি সৃষ্টি করিলেও রোম পোপ-এর অধীনে পৃথক এবং স্বাধীন থাকিয়া যায়।

তাঁহার শেষ জীবনে তিনি পুরস্কার ও সম্মানের মোহ ত্যাগ করিয়া কাপ্‌রেরা নামক একটি ছোট দ্বীপে কৃষিকর্মে অতিবাহিত করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গ্যালভ্যানোমিটার এই যন্ত্রের দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ (কারেন্ট) নিরূপণ করা হয়। গঠন প্রণালী অনুযায়ী গ্যালভ্যানোমিটার দুইটি প্রধান শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে : ১. চলকুণ্ডলী (মুভিং কয়েল) এবং ২. চলচুম্বক (মুভিং ম্যাগনেট)।

১. চলকুণ্ডলী গ্যালভ্যানোমিটারে সাধারণতঃ একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যে একটি আয়তক্ষেত্রাকার (রেক্ট্যাঙ্গুলার) কুণ্ডলী দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে চৌম্বক ক্ষেত্রটির দরুণ কুণ্ডলীর উপর ব্যাবর্তন (torque) প্রযুক্ত হয় এবং কুণ্ডলীটি কিঞ্চিৎ ঘুরিয়া যায়। ব্যাবর্তনের মান তড়িৎ প্রবাহের মানের আনুপাতিক হয় বলিয়া কুণ্ডলীর কৌণিক বিক্ষেপ মাপিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহের মান নির্ধারণ করিতে পারা যায়।

২. চলচুম্বক গ্যালভ্যানোমিটারে একটি গোলাকৃতি বিদ্যুৎবাহী কুণ্ডলী স্থির অবস্থায় থাকে এবং উহার কেন্দ্রস্থলে একটি চুম্বক পিভটের উপর বসানো থাকে। কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে চুম্বকটির উপরে ব্যাবর্তন কার্য করে এবং উহা পিভটের উপরে ঘুরিয়া যায়। এই

কৌণিক বিক্ষেপের পরিমাপ করিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহের মান নির্ণীত হয়।

বেদান্তকুমার সিংহ

গ্যালাক্সি ব্রহ্মাণ্ড দ্র

গ্যাসট্রিক আলসার পেপটিক আলসার দ্র

গ্যাস মাস্ক বিষাক্ত গ্যাস হইতে প্রতিরক্ষার মুখোশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণ (এপ্রিল, ১৯১৫ খ্রী) প্রতিরোধকল্পে ইহা মিত্রশক্তি পক্ষ কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। কাঠ-কয়লা ও সোডা-লাইম ভর্তি একটি পাত্রের ভিতর দিয়া বিষাক্ত বায়ু পরিশুদ্ধ হইবার পর নল দ্বারা উহা নাসিকায় যায়, ইহাই এই যন্ত্রের বিশেষত্ব। পরবর্তী কালে ইহার গঠন আরও উন্নত হইয়াছে। বর্তমানে প্রতিরক্ষা-বাহিনী ব্যতিরেকে কারখানার শ্রমিক, অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং খনিতে দুর্ঘটনাক্রান্ত ব্যক্তির উদ্ধারকারী দলও গ্যাস মুখোশ ব্যবহার করিয়া থাকে।

দ্র British War Office, *The War Gases*, New York, London, 1939; Chemical Corps Association, *Medical Treatment of Chemical Warfare*, London, 1941

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গোটে (গ্যোটে), য়োহান ভোলফ্‌গাঙ্‌ ফন (Goethe, Johann Wolfgang von, ১৭৪৯-১৮৩২ খ্রী) ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মে আধুনিক যুগের বিশ্বকবি ঔপন্যাসিক নাট্যকার বৈজ্ঞানিক মনীষী ও চিন্তানায়ক গোটে ফ্রাঙ্কফুর্ট আম্‌ মাইন-এর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ করিয়া মাতার সাহচর্যে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গোটে উচ্চশিক্ষার জন্য লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছুদিন পাঠে বিঘ্ন হওয়ার পর অসমাপ্ত আইন শিক্ষা সমাপ্ত করার জন্য তাঁহার পিতা ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। এইখানেই তাঁহার প্রথম জীবনের গুরু য়োহান গট্‌ফ্রিড হের্‌ডের-এর সহিত পরিচয় এবং এই পরিচয়ের ফলে তিনি বিভিন্ন দেশের লোকসংগীত, মধ্যযুগীয় লোকসংস্কৃতি, গথিক ভাস্কর্য, শেক্সপিয়র ও ওসিয়ান -এর মর্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হন।

স্ট্রাসবুর্গে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর জুরিসপ্রুডেন্স বা আইনতত্ত্বে ডিগ্রি লাভ করিয়া গোটে ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরিলেন। তরুণ জার্মানির যে ভাব বিপ্লব স্টুর্ম উণ্ড ড্রাং বা 'বাত্যা ও বিক্ষোভ' নামে পরিচিত— গোটে সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই স্টুর্ম উণ্ড ড্রাং কালে তাঁহার দুইটি যুগান্তকারী রচনার সৃষ্টি। একটি গোয়েট্স ফন বের্লিখিঙ্গেন (১৭৭৩ খ্রী) ও অপরটি লাইডেন দেস যুঙ্গেন ভের্টের্স ('যুবক ভের্থের-এর দুঃখ', ১৭৭৪ খ্রী)। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্ট ছাড়িয়া গোটে আইনজীবী রূপে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভেৎসলার-এ আসিয়া সেখানকার এক ম্যাজিস্ট্রেট কন্যা, অন্যের বাগ্‌দত্তা, শার্লোটে বুফ্‌-এর প্রতি নিষ্ফল প্রণয়ে অভিভূত হইয়া রচনা করিলেন তাঁহার উপন্যাস 'যুবক ভের্থের-এর দুঃখ'। 'ভের্থের' ইওরোপের তরুণ মনে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া দিল।

ইহার ঠিক পরেই তাঁহার 'ফাউস্ট' মহাকাব্যের প্রথম পর্বের রচনা শুরু। এই রচনার শেষ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে। গোটের সমগ্র জীবন-সাধনা এই মহাকাব্যে গ্রথিত। ১৭৭৪ হইতে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ফাউস্ট' প্রথম পর্বের বৃহৎ অংশ রচিত হইল। 'ফাউস্ট' রচনার যথার্থ আরম্ভ কিন্তু গোটের তথাকথিত 'ভাইমার' পর্বে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে গোটে খ্যাতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিলেন এমন সময়ে 'ভের্থের'-এর খ্যাতির সূত্র ধরিয়া গোটে ভাইমার সামন্তরাজ্যের অধিপতি কার্ল আউগুস্ট-এর সহিত পরিচিত হইলেন ও তাঁহারই আমন্ত্রণক্রমে ঐ রাজ্যের রাজধানী, তাঁহার পরবর্তী জীবনের কর্মস্থল, ভাইমারে পৌঁছিলেন (১৭৭৫ খ্রী)। এইখানে তাঁহার বিজ্ঞানসাধনার সূত্রপাত, প্রসার ও পরিণতি। এইখানে কবি একাধারে রাজমন্ত্রী ও বৈজ্ঞানিক রূপে আবির্ভূত হইলেন ও ক্রমে আধুনিক ইওরোপের চিন্তানায়ক রূপে স্বীকৃত হইলেন। বিশ্বমানবতার ধারণায় পরিসমাপ্ত তাঁহার সুবৃহৎ উপন্যাস 'ভিলহেল্‌ম মাইস্টের' রচনার শুরুও এই সময়ে।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গোটে ইতালি যাত্রা করেন। এইখানে তাঁহার ছন্দোময় মধুক্ষরা কাব্য 'ইফিগেনী আউফ টাউরিস' ('টাউরিস-এ ইফিগেনী') নাটকে (১৭৮৬ খ্রী) গ্রীক নাটকের দেবতা-নির্দিষ্ট নিয়তির স্থানে মানুষের (নায়িকা ইফিগেনী) হৃদয়নিহিত সত্যনিষ্ঠা এবং সততা উদ্ভূত নিয়তিকে স্থাপিত করিয়াছেন।

ইতালি হইতে ফিরিবার পর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার শিলের (১৭৫৯-১৮০৫ খ্রী)-এর সহিত তাঁহার সখ্য স্থাপিত হইল। কবি শিলের তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত গোটের জীবনে সক্রিয় সৃজনমূলক প্রভাব রূপে বর্তমান ছিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভিলহেল্‌ম

মাইস্টেরের শিক্ষানবিসী ('ভিলহেল্‌ম মাইস্টের্‌স ল্যেব্‌-ইয়ারে') প্রকাশিত হইল। ইহার সমাপ্তি হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ভ্রাম্যমাণ নট, নায়ক ভিলহেল্‌ম তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া একদিন বসুধৈব কুটুম্বকম এই জ্ঞানে ও মানুষের বিশ্বজনীনতার ধারণায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

নাপোলেঅঁ-র (নেপোলিয়ন) উত্থান হইতে পতন পর্যন্ত ইওরোপীয় ইতিহাসের বিক্ষুব্ধ কালে গ্যেটে তাঁহার আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন রহিলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফাউস্ট প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'নিয়তির নির্বাচন' (ভাল্‌ফের্‌ভান্টশাফটেন)-এ ব্যক্তিজীবনে বাসনাজাত আবেগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন গ্যেটে।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি তাঁহার আত্মচরিত 'আমার জীবন হইতে— কাব্য এবং সত্য' (আউস মাইনেম লেবেন ডিখ্‌টুঙ উণ্ড্‌ ভাব্‌হাইট)-এর রচনা শুরু করিয়া ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহার শেষ পর্ব ছাড়া সমস্ত পর্ব প্রকাশ করিলেন। ইহার শেষ পর্ব প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পর। ১৮১৬ ২০ এই কাল পর্বে তিনি নিজেকে মূলতঃ বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত রাখিলেন। গ্যেটে প্রায় সারা জীবন বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে দুই বাহু দিয়া একত্রে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দশকে ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ড রচনা শেষ করিলেন, সমাপ্তিতে লইয়া আসিলেন ভিলহেল্‌ম মাইস্টেরকে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সাড়ম্বরে তাঁহার ভাইমারে অবস্থানের পঞ্চদশবর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হইল। গ্যেটে তখন ইওরোপের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিশ্বকবি ও মনীষী গ্যেটে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

মানুষ স্বীয় সীমাকে নিঃসীমভাবে অতিক্রম করিয়া যায়, পাস্কালের এই বিখ্যাত উক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহাকবি গ্যেটে। বারংবার শুধু তিনি নিজেকেই অতিক্রম করিয়া যান নাই, তিনি ইওরোপীয় মানসকে প্রাচীন গ্রীক মানসিকতা ও মধ্যযুগের মানসিকতা হইতে আধুনিক কালে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। গ্যেটে ইওরোপীয় সভ্যতার এক বৃহৎ স্তম্ভ এবং এখনও জীবন্ত উৎস।

দ্র কাজী আবদুল ওদুদ, কবি গ্যেটে, ১-২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৬, দেবব্রত রেজ, 'সাহিত্যের সমসাময়িকতার স্বরূপ —ফাউস্ট', 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ; Benedetto Croce, *Goethe*, Emily Anderson, tr., London, 1923, Emily Ludwig, *Goethe*, vols. I-II, Ethel Colburn Mayre, tr., London, 1928; Richard Friedenthal, *Goethe Chronicle*, London, 1949; UNESCO, *Goethe*, homage de l'unesco pour le deuxieme Centenaire de sanaissance, Paris, 1949.

দেবব্রত রেজ

গিটার ছয়টি দুই সারি যুক্ত, তত অথবা তন্ত্রী যুক্ত যন্ত্র। ইহার সহিত বীণা যন্ত্র এবং কচ্ছপী বীণার অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহার নামের উৎপত্তি আরব দেশ হইতে। যন্ত্রটি পারস্য হইতে আরব দেশে গিয়া সামান্য বিভিন্ন অবয়বে গিটার, আসিরিয়ায় এসোর, নিউবিয়ায় কিশোর ও বিভিন্ন দেশে নানাবিধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা স্পেনে মুরদের সঙ্গে প্রবেশ লাভ করে ও পরে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কাহারও কাহারও মতে লায়ার, টেসটিডো ও কচ্ছপী বীণা এই তিনটিই এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। ভারতবর্ষে বর্তমান কালে ইহা অতি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। এককভাবে ও ঐকতানে বাদিত হয়, গানের সহিত রাগালাপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পদ্মুণ পি র

গিব্‌স, যোসিয়াহ্‌ উইলার্ড (১৮৩৯ ১৯০৩ খ্রী) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী। নিউ হেভেনে এ জন্ম। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হইয়া তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য প্যারী (প্যারিস), বেলিন এবং হাইডেলবুর্গে যান। আমেরিকায় ফিরিয়া ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে আঙ্কিক পদার্থবিদ্যার (ম্যাথিম্যাটিক্যাল ফিজিক্‌স) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদেই তিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। গিব্‌স খুব কম গবেষণাপত্র প্রকাশ করিতেন। কিন্তু যাহাই বাহির করিতেন তাহাই অত্যন্ত উচ্চ মানের হইত। কনেক্‌টিকাট্‌ অ্যাকাডেমি পত্রিকায় প্রকাশিত 'অন দি ইকুইলিব্রিয়াম অফ হেটেরজিনিয়স সাব্‌স্টান্‌সেস' (অসমমাত্র পদার্থসমূহের স্থিতাবস্থা) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের পর তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রবন্ধে বর্ণিত তত্ত্বের যুক্তিসংগত বিকাশের ফলেই পরবর্তী কালে রাসায়নিক সাম্যের বিখ্যাত সূত্র 'ফেজ্‌ রুল' ('Phase Rule') আবিষ্কৃত হয়। 'অসমমাত্র পদার্থসমূহের স্থিতাবস্থা' পত্রটি রসায়নবিদ্যায় এক নূতন শাখার উদ্ভব ঘটায়। ওস্টভাল্ট (Ostwald) স্বয়ং ঐ পত্রের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিব্‌সকে 'রাসায়নিক শক্তিতত্ত্বের (এনার্জেটিক্‌স) জনক' আখ্যা দেন। ঐ পত্রের ফরাসী অনুবাদ

করেন লা শাতলিয়ে (Le Chatelier) আলোকের তড়িৎচৌম্বকবাদ ও স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ সংক্রান্ত তত্ত্বগুলির সহিত উহার সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও গিব্‌সের গবেষণাপত্র মূল্যবান। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গিব্‌স রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটি তাঁহাকে কোপ্‌লে পদক দেন এবং বলেন যে ইনিই সর্বপ্রথম অপগতিশাস্ত্রের দ্বিতীয় সূত্রকে রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ও তাপশক্তি এবং ইহাদের সহিত কাজ করিবার ক্ষমতার সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়োগ করেন।

দ্র L. P. Wheeler, *Josiah Willard Gibbs. The History of a Great Mind*, 1952

অমিতাভ সেন

গিয়ার, গিয়ারিং ইংরেজী শব্দ। দুইটি অমসৃণ একতলীয় চাকা বা বেলনকে পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় রাখিয়া একটিকে ঘুরাইলে ঘর্ষণের জন্য অপরটিও বিপরীত দিকে ঘুরিবে। ঘূর্ণনের গতি নির্ভর করিবে চাকা দুইটির পরিধি তথা ব্যাস বা ব্যাসার্ধের অনুপাতের উপর। উল্লিখিত চাকাগুলি দাঁতবিশিষ্ট হইলে দাঁতগুলি কল্পিত পরিধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে এবং পরিধির পরিবর্তে দাঁতের সংখ্যার অনুপাতে ঘুরিবার গতি নির্ণীত হইবে। কল্পিত পরিধিকে পিচ পরিধি বলা হয়। গিয়ার জোড়া হিসাবে কাজ করে। একটি ঘূর্ণায়মান অক্ষদণ্ড হইতে অন্য একটি অক্ষদণ্ডে গতিবেগ রূপান্তরিত করিবার জন্য দাঁতের অনুবর্তনশীল সংযোজন দ্বারা গিয়ার কার্যকর হয়। দাঁতকে আশ্রয় করায় চাকা ঘুরিবে কিন্তু পিছলাইবে না। দুইটি চাকার মধ্যে বড় চাকা চালক হিসাবে একবার ঘুরিলে দাঁতের অনুপাতে ছোট চাকা একাধিকবার ঘুরিবে এবং ইহাতে গতি বৃদ্ধি হইবে। গতি কমাইতে হইলে, ধীরে ঘুরাইতে হইবে যাহাতে একটি দাঁত হইতে পরবর্তী দাঁতে যাইতে বেশি সময় লাগে অথবা ছোট চাকাকে চালক চাকা হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

দাঁতবিশিষ্ট চাকার গিয়ারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— ১. অক্ষদণ্ড সমান্তরাল থাকিলে স্পার অথবা হেলিক্যাল গিয়ার ব্যবহার হয় ২. অক্ষদণ্ড ছেদ করিলে বিভেল গিয়ার ব্যবহার করা হয় ৩. অক্ষদণ্ড একতলীয় না হইলে স্পাইরল অথবা ওয়রম্ গিয়ার ব্যবহার হয়।

কোনও চাকার ব্যাস অনন্ত (ইনফিনিট) হইলে তাহাকে র‍্যাক বলা হয়।

$$\text{গতিবেগের অনুপাত} = \frac{\text{চালক চাকার দাঁত সংখ্যা}}{\text{চালিত চাকার দাঁত সংখ্যা}}$$

গিয়ার চাকার দাঁতের ছাঁচ দুই প্রকার হইতে পারে যথা সাইক্লয়ডেল ও ইনভলুট। দুইটি গিয়ার-এর দাঁত যে বিন্দুতে স্পর্শ করে সেই বিন্দুতে একটি লম্ব টানিলে স্পর্শকের সঙ্গে যে কোণ হইবে, তাহা সাধারণতঃ ১৪.৫ ডিগ্রি হয়। গিয়ার বর্ণনা করিতে হইলে দাঁতের থাক বা গুণান্তর উল্লেখ করা আবশ্যক।

$$\text{মডিউল} \quad \frac{\text{পিচবৃত্তের ব্যাস (মিলিমিটার)}}{\text{দাঁত সংখ্যা}}$$

মডিউল হইতে দাঁতের পরিমাপ পাওয়া যায়। দুই গিয়ার-এর কেন্দ্র বিন্দুর দূরত্ব $= \frac{\text{পিচ বৃত্তের ব্যাস}}{২}$ ।

যখন অক্ষদণ্ডের দূরত্ব বেশি হয়, তখন দুইটি গিয়ার-এর অন্তর্বর্তী স্থানে সমান পিচ বা থাক বিশিষ্ট একটি সংযোজক অলস গিয়ার স্থাপন করা হয়। এই সংযোজক অলস গিয়ার-এর জন্য গতির কোনও তারতম্য হয় না, শুধু গতির দিক পরিবর্তন হয়। দুইটি সংযোজক অলস গিয়ার স্থাপন করিলে গতির দিকও পরিবর্তিত হইবে না।

দুইটি গিয়ার-এর বৃহত্তরটিকে হুইল ও ক্ষুদ্রতরটিকে পিনিয়ন বলা হয়। যেহেতু ক্ষুদ্রতর গিয়ারের দাঁত সংখ্যা কম, ইহা বৃহত্তর গিয়ার একবার ঘূর্ণনের দরুন আনুপাতিক হারে একাধিকবার ঘুরিবে এবং এইজন্যই ক্ষুদ্রতর গিয়ারে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় অপেক্ষাকৃত বেশি হইবে। এই ক্ষয় রোধ করিবার জন্য পিনিয়ন নিকেল ক্রোম সংকর ধাতুর দ্বারা তৈরি করা যাইতে পারে। গিয়ারের দাঁত মিলিং মেশিন বা হবিং মেশিনে কাটা যায়।

লেদ মেশিনে স্ক্রু কাটিবার জন্য, মোটরগাড়ি চালাইবার জন্য, টারবাইন চালিত যন্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, হাপরে হাওয়া দিবার জন্য এবং অন্যান্য বহুবিধ কার্যে গিয়ার অপরিহার্য।

অমূল্যধন দেব

গিয়াসুদ্দীন তোগলক ঐতিহাসিক ফিরিস্তার মতে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের পিতা বলবনের ক্রীতদাস ও মাতা জাঠ রমণী ছিলেন। খুসরু যখন দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন তখন গিয়াসুদ্দীন দীপালপুরের শাসনকর্তা ছিলেন, পরে তিনি খুসরুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লীশ্বর হন। সম্রাট হইয়া তিনি কৃষির উন্নতিসাধন করেন ও রাজার অংশ দশ বা একাদশ ভাগের এক ভাগ নির্ধারিত করেন। হিন্দুদিগের সম্বন্ধে তাহার কঠোর ব্যবস্থা ছিল। তিনি

হিসাব পরীক্ষার, বিচার, পুলিশ ও ডাক -বিভাগের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন সম্রাট হইবার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জৌনা খাঁকে ওয়রঙ্গলরাজ দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় অভিযানে প্রতাপরুদ্রদেব সপরিবারে আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর গিয়াসুদ্দীনকে গৌড়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। গৌড়ের শাসনকর্তা সিহাবুদ্দীন বুঘরা খাঁ তাঁহার ভ্রাতা গিয়াসুদ্দীনের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হইলে অপর ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন সম্রাট গিয়াসুদ্দীনের শরণ লন। দিল্লীশ্বরের সেনাপতি গিয়াসুদ্দীনকে পরাজিত ও বন্দী করিলে নাসিরুদ্দীন গৌড় ও পশ্চিম বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ও পূর্ব বঙ্গ সম্রাটের শাসনে রাখা হয়। গৌড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ত্রিহুতের রাজাকে পরাজিত করেন।

দিল্লীর নিকট আফগানপুরে একটি মণ্ডপে তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়। বর্নীর মতে বজ্রাঘাতে মণ্ডপটি পড়িয়া যাওয়াতে গিয়াসুদ্দীন নিহত হন। কিন্তু ইবন বতুতার মতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জৌনা খাঁর ষড়যন্ত্রের ফলেই মণ্ডপটি এমনভাবে নির্মিত হইয়াছিল যে ইচ্ছা করিলেই উহা ভাঙিয়া পড়িয়া সম্রাটের মৃত্যু ঘটাইতে পারে এবং ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। আবুল ফজল, নিজামুদ্দীন আহমদ ও বদায়ুনেরও এই মত। সম্রাট গিয়াসুদ্দীন সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি বিখ্যাত কবি আমীর খসরুকে মাসে ১০০০ তঙ্কা বেতন দিতেন। তিনি ১৩২০ হইতে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দ্র Ziau-d-din Barni, *Tarikh-i-Firoz Shahi*, Calcutta, 1963.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

গিয়াসুদ্দীন বলবন (রাজ্যকাল ১২৬৬-৮৭ খ্রী) প্রথম জীবনে দিল্লীর সম্রাট ইল্‌তুৎমিস-এর (রাজ্যকাল ১২১১-৩৬ খ্রী) ৪০ জন প্রধান ক্রীতদাসের অন্যতম ছিলেন। সম্রাট নাসিরুদ্দীনের সময় (রাজ্যকাল ১২৪৬-৬৬ খ্রী), তিনি যে অভিযান করেন তাহার ফলে মঙ্গোলগণ উচের (১২৪৫ খ্রী) অবরোধ পরিত্যাগ করে। ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন কিন্তু ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি নির্বাসিত হন ও ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় স্বীয় অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তাঁহার ইচ্ছানুসারে ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে বলবন সম্রাট হন।

সম্রাট হইবার পর গিয়াসুদ্দীন রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও বিদেশীর হস্ত হইতে সীমান্ত রক্ষায় মনোযোগ দেন। দিল্লীর নিরাপত্তার জন্য তিনি মেওয়াতীদের উচ্ছেদ সাধন করেন। গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বর্তী প্রদেশের বিদ্রোহী হিন্দুগণ দিল্লী হইতে বাংলার পথ প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। বলবন তাহাদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। এই সময় পশ্চিম সীমান্তে মঙ্গোলগণের আক্রমণের আশঙ্কা বিশেষভাবে দেখা দেয়। বলবনের রাজত্বের প্রথম দিকে শের খাঁ সুঙ্কর দক্ষতার সহিত সীমান্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর বলবন স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সীমান্ত রক্ষার ভার দেন। বলবন নিজেই বলিয়াছেন যে মঙ্গোলরা সুযোগ পাইলেই গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করিবে এমন কি দিল্লী দখল করিয়া সেখানেও লুঠতরাজ করিবে। এইজন্য তিনি সর্বদা সমস্ত সৈন্য লইয়া মঙ্গোলগণকে বাধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন ও পররাজ্য দখলের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু পূর্ব সীমান্তে বঙ্গের শাসনকর্তা তুঘরিলের বিদ্রোহ তাঁহাকে বিচলিত করে। তুঘরিল প্রথমে আমীর খাঁ ও পরে মালিক তরঘীকে পরাজিত করিলে বলবন নিজেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তুঘরিল পলায়ন করেন কিন্তু বলবন পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন ও পরে তাহার আত্মীয়গণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। অতঃপর স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া যান। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মঙ্গোলরা তৈমুর খাঁর অধীনে ভারত আক্রমণ করে। যুবরাজ মহম্মদ মুলতানের নিকট তাহাদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন। বলবন জ্যেষ্ঠপুত্রের শোকে মর্মাহত হইয়া ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

বলবন বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ও নির্মম হইলেও স্বীয় প্রজাদের প্রতি ন্যায়সংগত ব্যবহার করিতেন। জিয়াউদ্দীন বর্নীর কথায়, 'যেদিন প্রজাদের পিতা বলবনের মৃত্যু হয় সেদিন হইতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিলুপ্ত হয় এবং রাজত্বের স্থায়িত্বে কেহই আর আস্থাবান হন নাই।'

দ্র Minhaj-us-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, Calcutta, 1953; Ziau-d-din Barni, *Tarikh-i-Firoz Shahi*, Calcutta, 1963.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

গিরনার (২১°৩১′ উত্তর এবং ৭০°৪২′ পূর্ব) গুজরাতে জুনাগড় শহরের ১৬ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত একটি

পবিত্র গিরিতীর্থ। ইহাই বৃহৎসংহিতায় উল্লিখিত গিরিনগর ও মহাভারতে বনপর্বের পুণ্যগিরি ও উজ্জয়ন্ত এবং অনেকের মতে রৈবতক। কেহ কেহ অবশ্য বলেন রৈবতক দ্বারকার পূর্বে অবস্থিত অন্য একটি পাহাড়। প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সময়ে ইহা যাদবদের ক্রীড়াভূমি ছিল এবং এখানেই বলরাম দ্বিবিদ বধ করেন। স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে সমগ্র গিরনার অঞ্চলকে শিবের বস্ত্রপথ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া নানা প্রাচীন গ্রন্থে পুষ্পগিরি, বৈজয়ন্ত ও গিরিবর নামেও এই পর্বতকে অভিহিত করা হইয়াছে।

এই পর্বতের পাদদেশ অত্যন্ত উর্বর। নন্দরাজাদের সময় হইতেই এই স্থানে একটি নগর গড়িয়া ওঠে। এই নগরীর নামের ক্রমবিবর্তন এইরূপ: মণিপুর চন্দ্রকেতুপুর রৈবতনগর পুরাতনপুর। মৌর্য, ক্ষত্রপ ও গুপ্ত সম্রাটদের পর বল্লভীরা তিন শত বৎসর এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন। তাহার পর নবম শতাব্দীতে আসেন চূড়াসমরা। ইহারা ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রাচীন সৌরাষ্ট্রের রাজধানী গিরিনগরের গুরুত্ব বিভিন্ন রাজবংশের তিনটি শিলালেখ হইতে সুস্পষ্ট। জুনাগড় শহরের প্রায় ২ কিলোমিটার (প্রায় ১ মাইল) পূর্বে এবং গিরনার পর্বতের পাদদেশস্থ উপত্যকার প্রবেশমুখে একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে তিনটি শিলালেখ বিদ্যমান।

প্রাচীনতম লেখটির বিষয় মৌর্য সম্রাট অশোকের চতুর্দশ অনুশাসন। এই অঞ্চল তখন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অধিকতর তথ্যজ্ঞাপক দ্বিতীয় লেখটি (১৫০ খ্রী) মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের। ইহা শুধু যে এই বিজয়ী শক মহাক্ষত্রপের সফল রাজনৈতিক কর্মকৃতির বিবরণ প্রদান করে তাহা নহে, ইহাতে গিরিনগরের সুদর্শন তড়াগের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। উচ্চ পাহাড়ের গাত্রে পলাশিনী প্রভৃতি নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া এই তড়াগের সৃষ্টি করা হয়। মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শাসনকর্তা পুষ্যগুপ্তের উদ্যোগে ইহা নির্মিত হয় এবং অশোকের অধীনস্থ যবনরাজ তুষাস্ফ কর্তৃক পয়ঃনালী (স্পষ্টতঃই জমিতে জলসেচনের উদ্দেশ্যে) খনন করিয়া ইহার উন্নতিবিধান করা হয়। রুদ্রদামনের রাজত্বকালে প্রচণ্ড বারিপাতে যখন এই বাঁধ ভাঙিয়া যায় এবং বিরাট ফাটলের মধ্য দিয়া তড়াগের সমস্ত জল নির্গত হইয়া যায় তখন দৃঢ়তর বাঁধ নির্মাণ করিয়া তড়াগটির সংস্কার করা হয়। তৃতীয় লেখটি গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের। ৪৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুদর্শন তড়াগের বাঁধ বৃষ্টিপাতের আতিশয্যে পুনরায় ভাঙিয়া গেলে ৪৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তা পর্ণদত্তের পুত্র স্থানীয় শাসক চক্রপালিত বাঁধটিকে পুনরায় নির্মাণ করেন। চক্রপালিত গিরিনগরে চক্রভৃতের (বিষ্ণু) একটি মন্দিরও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি বিলুপ্ত। সুদর্শন তড়াগ এবং ইহার বাঁধেরও আজ কোনও চিহ্ন নাই।

গিরনার পর্বত জৈনদের তীর্থস্থান। ইহার শীর্ষদেশে অনেকগুলি মন্দির আছে, কিন্তু পরিকল্পনাবিহীন। প্রাচীনতম মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে চৌলুক্য ও বাঘেলাদের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ সংস্কারের জন্য ইহাদের অধিকাংশই মূল লক্ষণগুলি হারাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নেমিনাথ মন্দির এবং বস্তুপালবিহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়সিংহ সিদ্ধরাজের রাজত্বকালে (১০৯৪-১১৪৪ খ্রী) দণ্ডনায়ক সজ্জন নির্মিত নেমিনাথ মন্দির গূঢ়মণ্ডপ সহ বিরাট সান্ধার প্রাসাদ। ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বস্তুপালের মন্দিরটির পরিকল্পনা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ইহা সোলাঙ্কী স্থাপত্যের উত্তম দৃষ্টান্ত।

পুরাণে যদিও একুশটিরও বেশি শিখরের উল্লেখ আছে, তবে এখন মাত্র ছয়টিকে উল্লেখযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হয়— প্রত্যেকটিই ১০৬৭ মিটারের বেশি উঁচু। প্রথম শিখর অম্বা দেবী গিরনারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈয়ারি অম্বা মাতার মন্দিরটি গিরনারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু মন্দির। ইহা একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। সতীর উদর এই স্থানে পড়িয়াছিল। নবপরিণীত বর ও বধূ এইস্থানে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের কামনা করিয়া পূজা দেন।

গোরখনাথ গিরনারের সর্বোচ্চ চূড়া (১১১৭ মিটার)। শিখর মন্দিরটি কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ের আদি গুরু শিবভক্ত গোরক্ষনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

গুরু দত্তাত্রেয়ের তপোধন্য শিখর মন্দিরে তাঁহার চরণচিহ্ন ও একটি বৃহৎ ঘণ্টা আছে। নেমিনাথ শিখরে সিঁড়ি নাই— এমনকি মন্দিরও নাই, কেবল নেমিনাথের একটি কালো পাথরের মূর্তি আছে। অপর একটি শিখর কালিকা দেবী বা মহাকালী শিখর — স্থানীয় পাহাড়ী জাতী অঘোরী বা আদমখোরদের প্রিয় ভূমি। ইহা ছাড়াও আছে ভৈরব শিখর।

শিখরতীর্থ ছাড়া গিরনারে তিনটি কুণ্ড আছে— গোমুখী, হনুমানধারা ও কমণ্ডলু কুণ্ড। আর উত্তরতম প্রান্তে আছে ভৈরব ঝম্প – সেখান হইতে ঝাঁপ দিয়া পূর্বে লোকে আত্মহত্যা করিত।

গিরনারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যমান প্রত্নকীর্তি-ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে জুনাগড়স্থ

উপরকোটের ও বাবা পিয়ারা নামে পরিচিত জৈন শৈলখাত গুহারাজি (খ্রীষ্টীয় প্রথম-সপ্তম শতক) এবং ইণ্টোয়া (গিরনার পর্বতের প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তরে) ও বোরিয়ার (গিরনার পর্বত হইতে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে) ব্যাপক বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। ইণ্টোয়াতে খননের ফলে কতিপয় সংঘারাম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহাদের একটি সংঘারামে প্রাপ্ত সীলমোহর হইতে জানা যায় যে ইহা শক ক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রসেনের (১৯৯-২২২ খ্রী) নামানুসারে মহারাজ রুদ্রসেন বিহার নামে অভিহিত হইত।

দ্র J. Burgess, *Report on the Antiquities of Kathiawad and Kachh*, London, 1876; J. H. Dave, *Immortal India*, vol II, Bombay, 1959; Directorate of Information, Government of Gujrat, *See Gujrat*, Ahmedabad, 1960; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vols. II-III, Bombay, 1960, 1964.

দেবলা মিত্র
কমল গুহ

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী (১৮৮৫-১৯৪৮ খ্রী) বাংলার নেতৃস্থানীয় ঠুংরি-শিল্পী। বহরমপুরে জন্ম এবং সেখানে দশ বৎসরের অধিক কাল রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর অধীনে তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। গিরিজাশংকর কিছুকাল মহম্মদ আলী, ছম্মন সাহেব, ইনায়েৎ হোসেনের নিকটেও শিক্ষালাভ করেন। গণপৎ রাও-এর নিকট তিনি ঠুংরি শিক্ষা করেন; শেষে কয়েক বৎসর বাদল খাঁরও শিষ্য ছিলেন। গিরিজাশংকর কয়েকজন কৃতী শিষ্য গঠন করিয়া বাংলায় ঠুংরির প্রচলনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গিরিডি ২৪°১২′ উত্তর এবং ৮৬°১৮′ পূর্বে অবস্থিত। ইহা হাজারিবাগ জেলায় পাহাড়বেষ্টিত গিরিডি মহকুমায় অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু শহর।

গিরিডি চৌপারণ-কোডারমা-গিরিডিহির উপমালভূমির অন্তর্গত। ইহার উত্তর-পূর্ব দিক প্রায় ২৬৫ মিটার (৮০০ ফুট) উচ্চ। উত্তর-পূর্বে উশ্রী নদী। বরাকর নদীর একটি শাখা থাকো নদী গিরিডির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই অঞ্চল ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গণ্ডোয়ানা পর্যঙ্কের অন্তর্গত হওয়ায় এই স্থানটি কয়লা খনি অঞ্চল রূপে প্রসিদ্ধ।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিডি মহকুমা গঠিত হয়। তখন তাহার প্রধান কার্যালয় ছিল বর্তমান গিরিডি শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পচম্বায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পার্শ্ববর্তী কয়লা খাদের কাজের সুবিধার জন্য মধুপুর হইতে গিরিডি পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন স্থাপন করা হয়। স্টেশনের কাছে কোর্ট ও ছোট কয়েক ঘর বসতি লইয়াই গিরিডি শহরের সূত্রপাত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গিরিডিতে মহকুমার সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়।

খনিজ শিল্পের জন্যই গিরিডি শহরের প্রসিদ্ধি। গিরিডি ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তামার আকর পাওয়া যাইত। সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীগণ জঙ্গলের কাঠ পোড়াইয়া দেশীয় প্রথায় তাহা হইতে তাম্র নিষ্কাশিত করিত। সন্ধান পাইয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বারগণ্ডা কপার কর্পোরেশন গঠিত হয়। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে তামার উৎপাদন সফল হয় নাই।

গিরিডির প্রসিদ্ধ কয়লা খাদের অঞ্চল গিরিডি হইতে ১৭·৬ কিলোমিটার (১১ মাইল) দূরে অবস্থিত। এখানে ভাদুয়া পাহাড়ের নিকট জুবিলী পীট ও সেণ্ট্রাল পীট প্রভৃতি বড় বড় কয়লার খনি আছে।

বর্তমানে গিরিডি অভ্রশিল্পের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। গিরিডি শহরে কোনও অভ্রখনি নাই। গাওয়া পাহাড়ে অবস্থিত বহু খনির মালিক একজন জার্মান সাহেবের পরিচালনায় গিরিডিতে অভ্র চেরা ও বাছাইয়ের কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই কাজ ভারতীয়দের হাতে চলিয়া আসিয়াছে। ১২৩টি রেজেস্ট্রিকৃত কারখানা আছে। অধিকাংশ রাজস্থানী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। গিরিডিতে কৃষি অভ্রেরই কারবার বেশি। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে খনিজ অভ্র আনয়ন করা হয়। বিদেশে ইহার চাহিদা প্রচুর।

গিরিডি শহরের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কার্য উল্লেখযোগ্য। ইহারা জঙ্গলপূর্ণ বারগণ্ডা অঞ্চল কিনিয়া ব্রাহ্ম কলোনি স্থাপন করেন। সমাজের চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহা একটি বিরাট কলোনিতে পরিণত হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহার ৬টি ওয়ার্ড। ১৯৫১ সালে ইহার আয়তন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার (৩·০৬ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২৯১৬৭ জন। শতকরা ৯৪·১ ভাগ লোক ব্যবসায় ও অন্যান্য কর্মে লিপ্ত। মাত্র ৫·৯ ভাগ কৃষিজীবী। কাঠের ব্যবসায় এই অঞ্চলের আর একটি বড় কারবার। বেশির ভাগ কারখানা শিখ সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত।

গিরিডিতে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট-এর একটি শাখা আছে।

গিরিডির জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর।

দ্র K. Bagchi & U. Sen, 'Giridih : its Growth and Land use', *Geographical Review of India*, vol. XXV, no. 4, 1963.

উষা সেন

গিরিশচন্দ্র ঘোষ[১] (১৮২৯-৬৯ খ্রী) খ্যাতনামা সাংবাদিক। ১২৩৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য-শিক্ষা প্রধানতঃ গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলেই (ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি) হয়।

ছাত্রজীবন হইতেই তিনি সংবাদপত্রে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', কৈলাসচন্দ্র বসু-সম্পাদিত 'লিটারারি ক্রনিকল' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনাথ ঘোষের প্রকাশিত 'বেঙ্গল রেকর্ডার' (উত্তরকালে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট')-এর সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন'-এর তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজেই 'বেঙ্গলী' (*The Bengalee*) পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ক্যালকাটা মান্থলি' পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রায়ই প্রকাশিত হইত। উক্ত পত্রিকায় সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্কে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', 'ডালহৌসী ইনস্টিটিউট' ও 'বেথুন সোসাইটি' প্রভৃতি আঢ্য ও বিদ্বদ্ জন পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাগ্মী রূপে গিরিশচন্দ্র প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের (১২৭৬ বঙ্গাব্দ) সেপ্টেম্বর মাসে ৪০ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

দ্র Manmathanath Ghosh, ed., *The Life of Gris Chunder Ghose*, Calcutta, 1911.

অশোকা সেনগুপ্ত

গিরিশচন্দ্র ঘোষ[২] (১৮৪৪-১৯১২ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ নট, নাট্যকার এবং রঙ্গালয় পরিচালক। তিনি কলিকাতায় বাগবাজারে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।

১১ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র মাতৃহীন হন এবং তাহার তিন বৎসরের মধ্যে পিতাকেও হারান। পিতা নীলকমল সওদাগরি অফিসে কাজ করিতেন। তিনি পুত্রকে নিঃসম্বল রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু সংসারে অভিভাবক না থাকায় গিরিশচন্দ্র পাঠে অমনোযোগী এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিলেন। বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য পাঠে এবং পুরাণের আলোচনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং এই সকল বিষয়ে নানা গ্রন্থ তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। এই অধ্যয়নস্পৃহা তাহার পরবর্তী জীবনে বিশেষ সুফল প্রসব করে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বিবাহ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীও অল্পকাল পরেই মারা যান। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) উত্তরকালে বিখ্যাত অভিনেতা হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের শৈশবকালেই বাংলা দেশে নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন বন্ধুর সহিত গিরিশচন্দ্র একটি যাত্রার দল গঠন করিয়া 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় করেন। ইহার দুই বৎসর পরে এই দলই বাগবাজারে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করেন। অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া এই শখের নাট্যসম্প্রদায় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়া জোড়াসাঁকোয় প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন এবং দর্শনী লইয়া অভিনয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। দর্শনীগ্রহণ ব্যাপারে দলের সহিত প্রবল মতভেদ হওয়ায় গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করেন। দুই বৎসর পরে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নামে রঙ্গালয়টি যখন বিডন স্ট্রীটে পুনর্গঠিত হইল তখন গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক অভিনেতা হিসাবে এখানে কয়েকটি নাটকের অভিনয় করেন। এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য তিনি 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসকে এবং 'মেঘনাদবধ' ও 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক নাটক 'আগমনী' ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গিরিশচন্দ্র সওদাগরি অফিসের কার্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবন বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতির জন্য সমগ্রভাবে উৎসর্গ করেন। ঐ সালে তিনি প্রতাপচাঁদ জহুরীর অনুরোধে তাঁহার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে বেতনভুক্ স্থায়ী কার্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ইহার পর ১৮৮৩ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরে তিনি স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয় পরিচালনা করিয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মিনার্ভা

থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি পর্যন্ত তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'আগমনী' হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'গৃহলক্ষ্মী' পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র আশীখানিরও বেশি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নিজে অভিজ্ঞ নট ছিলেন বলিয়া তাঁহার সংলাপগুলি অতিশয় স্বাভাবিক, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকসমূহের গম্ভীর সংলাপ রচনার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ আশ্রয়ে তিনি এক-প্রকার নূতন ছন্দ প্রবর্তন করেন। নাটকের অন্তর্গত সংগীত সমূহেও তাঁহার বিশেষ গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নাটকসমূহের মধ্যে 'দক্ষযজ্ঞ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেবচরিত', 'বিল্বমঙ্গল', 'শঙ্করাচার্য', 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'বলিদান', 'গৃহলক্ষ্মী', 'সিরাজদ্দৌলা', 'ছত্রপতি', 'মীর-কাশিম', 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি সমধিক বিখ্যাত। শেক্স্‌পিয়রের নাটকের অত্যাশ্চর্য সার্থক অনুবাদ 'ম্যাকবেথ' তাঁহার আর একখানি বিখ্যাত নাটক।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' অভিনীত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও একবার এই অভিনয় দেখিতে আসেন এবং তখন হইতেই গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রবল ভক্তি অনুভব করেন। এই সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের নাটকে পরমহংসদেবের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটকই রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনের তাগিদে রচিত। নাটক রচনাকালে তিনি নটনটীদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতার কথা মনে রাখিয়া সংলাপ রচনা করিতেন বলিয়া শোনা যায়। এখনও পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট, নাট্যকার এবং রঙ্গালয় পরিচালকের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। নামচিহ্নিত 'গিরিশ-পৌরোদ্যানে' তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার পৈত্রিক বাসভবনে তাঁহার বাসকক্ষটি জাতীয় স্মৃতিসৌধ রূপে সংরক্ষিত হইয়াছে।

দ্র হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, গিরিশ-প্রতিভা, কলিকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

কালীপদ সেন

গিরিশচন্দ্র বসু (১৮৫৩-১৯৩৯ খ্রী) বর্ধমান জেলার বেরুগ্রামে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জানকীপ্রসাদ বসু। হুগলি কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পাশ করেন। তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজে তাঁহাকে উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম. এ. উপাধি লাভ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি পরিচালিত ডিপ্লোমা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন এবং সোসাইটির আজীবন সভ্য মনোনীত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বশেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। গিরিশচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র বঙ্গবাসী স্কুল স্থাপন করেন, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সূচনা হইতেই বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। স্কুলে হাতে-কলমে প্রাথমিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদের জন্য কলেজে জীববিদ্যার ক্লাশ খোলা হয়। ১৮৮৭ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরেও এই কলেজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান প্রণয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট সভার সদস্য ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা প্রধানতঃ কৃষিবিদ্যার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। দেশীয় গাছপালা ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনি 'ম্যানুয়াল অফ বটানি' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য জন-সাধারণকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র 'কৃষি গেজেট' (বৈশাখ ১২৯২ বঙ্গাব্দ) নামে বাংলায় কৃষিবিদ্যা বিষয়ক একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতার বিষয়ে তিনি দুইটি ভ্রমণকাহিনী 'বিলাতের পত্র' (১২৮৩ বঙ্গাব্দ) ও 'ইওরোপ ভ্রমণ' (১২৯১ বঙ্গাব্দ) রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভূবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব গিরিশ-চন্দ্রের। তাঁহার 'ভূ-তত্ত্ব' প্রথম ভাগে (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) প্রত্নজীববিদ্যা সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা আছে। মাতৃভাষায়

উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কৃষি-সোপান' (১২৯৫ বঙ্গাব্দ), 'কৃষিপরিচয়' (১৮৮০ খ্রী), 'কৃষিদর্শন' ১ম ভাগ (১৩০৪ বঙ্গাব্দ), 'গাছের কথা' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ), 'উদ্ভিদ জ্ঞান' প্রথম (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) ও দ্বিতীয় পর্ব (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি। বি. এ. ক্লাশ অবধি গিরিশচন্দ্র মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বটানিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর গিরিশচন্দ্র ইহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, কলিকাতা, ১৯৬০, *Acharya G C Bose Centenary Commemoration Volume*. *Bulletin of the Botanical Society of Bengal*, vol 8, 1954

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২২-১৯০৩ খ্রী) সংস্কৃত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। চব্বিশ পরগনা জেলার রাজপুর গ্রামে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর ইহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, ন্যায় ও স্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। 'সোম প্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের স্থলে তিনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও ঐ পদে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণ অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলংকারের অধ্যাপক রূপে কার্য করেন। 'সংস্কৃত যন্ত্র' স্থাপনে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যারত্ন যন্ত্র' ও পরে 'গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র' নামে প্রেস স্থাপন করেন। তৎকালে বহু সংস্কৃত ও বাংলা পুস্তক ঐ প্রেসে মুদ্রিত হয়। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামের দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য দশ হাজার টাকার 'দরিদ্র-ভাণ্ডার' স্থাপন করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'রঘুবংশ' (মল্লিনাথ টীকা সমেত, ১৮৫২ খ্রী), 'দশকুমার চরিতের বঙ্গানুবাদ' (১৮৫৬ খ্রী), 'বিধবা বিষম বিপদ' (নাটক, ১৮৫৬ খ্রী), 'শব্দসার' (সংস্কৃত-বাংলা অভিধান, ১৮৬০ খ্রী), 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' (সরল সংস্কৃত টীকা সহ, ১৮৭১ খ্রী)।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৩০, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১২৯৮, গোপিকামোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৯৬১।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য

গিরিশচন্দ্র/গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রচারক ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণামূলক বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার আশুজিয়া গ্রামের এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিতবংশে ইহার জন্ম।

খ্যাতনামা তান্ত্রিক সাধক ও গ্রন্থকার পূর্ণানন্দ ইঁহার অন্যতম পূর্বপুরুষ। বংশতালিকায় ইঁহার স্থান পূর্ণানন্দ হইতে দশম। ইঁহার অনুজ সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহার রচিত কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের অন্তর্গত 'কৌলমার্গ রহস্য' ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, দ্রষ্টব্য)। গিরিশচন্দ্র রাজশাহী রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ইঁহার সম্পাদনায় অনেকখানি ব্যাকরণ, তন্ত্র ও স্মৃতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় : পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তি (এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১২ খ্রী), তারাতন্ত্র (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯১৩ খ্রী), কুলচূড়ামণিতন্ত্র (*Tantrik Texts*, vol. IV, ১৯১৫ খ্রী) এবং ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭ খ্রী)।

তিনি পূর্ণানন্দের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির ষট্‌চক্রনিরূপণের বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনীযুক্ত একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রাতা সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের সহিত মিলিতভাবে তন্ত্রকল্পতরু নামে তন্ত্রগ্রন্থমালার সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশের সংকল্প করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ 'সরস্বতী তন্ত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। 'প্রাচীন শিল্পপরিচয়' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ভারতবাসীর ব্যবহৃত নানা জিনিসের পরিচয় দিয়াছেন। 'বঙ্গে দুর্গোৎসব' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) পুস্তিকায় তিনি দুর্গোৎসব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার

তান্ত্রিক দর্শন, পুরাণপরিচয়, বৃক্ষায়ুর্বেদ, প্রাদেশিক দেবতত্ত্ব প্রভৃতি প্রবন্ধ কোনও পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫?-১৯১০ খ্রী) ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে সম্ভবতঃ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাই গিরিশচন্দ্রের জন্ম। ছাত্রজীবনে তিনি ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াছিলেন। কর্মজীবনের প্রারম্ভে ময়মনসিংহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে কিছুকাল নকলনবিশের কাজ এবং ময়মনসিংহের জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। প্রথম জীবনে গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু ময়মনসিংহে কেশবচন্দ্রের (১৮৬৫ খ্রী) ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর (১৮৬৭ খ্রী) প্রচারকার্য তাঁহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্রের নিকট প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। মুসলমান ধর্মই তাঁহার অনুশীলনের বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে কেশবচন্দ্র কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। গিরিশচন্দ্র আরবী ভাষা ও ঐসলামিক ধর্মশাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্যে লখনৌ এ যান (১৮৭৬ খ্রী)। লখনৌ হইতে ফিরিয়া ৬ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৮৮১-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি 'কোর আন্-শরীফ'-এর সটীক অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাই কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আরবী ভাষা ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্র-বেত্তাগণ এই অনুবাদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার ৪র্থ সংস্করণের (১৯৩৬ খ্রী) ভূমিকা লিখিয়া দেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। আরবী-ফারসী-উর্দু হইতে তিনি আরও যে সকল ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ বা সংকলন করেন তন্মধ্যে 'তাপসমালা' (১৮৮০-৯৫ খ্রী), 'মহাপুরুষ চরিত' (১৮৮২-৮৭ খ্রী) ও 'হদিস্ বা মেসকাত্ মসাবিহ্' (১৮৯২-৯৮ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। রামমোহন-প্রণীত 'তুহ্ ফাৎ-উল্-মুয়াহ্ হিদীন' নামক গ্রন্থের গিরিশচন্দ্র-কৃত বঙ্গানুবাদ 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮২০-২১ শকে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৮৭৮ খ্রী) তাঁহার আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নারী-সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণসাধন গিরিশচন্দ্রের অন্যতম ব্রত ছিল। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তিনি 'মহিলা' (শ্রাবণ ১৩০২ বঙ্গাব্দ) মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, আত্ম-জীবন, কলিকাতা, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, কলিকাতা।

সুরথ চক্রবর্তী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪ খ্রী) কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যাহা-কিছু লেখাপড়া, গৃহে পিতা এবং স্বামীর নিকট। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হইলে রচিত হয় বিখ্যাত শোক কাব্য 'অশ্রুকণা'। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল অশ্রুকণার কবিতা নির্বাচন করিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী অন্তঃপুরবাসিনী রূপে থাকিতেন। সেইজন্য তাঁহার কবিতা অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্যচিত্র-সম্পন্ন এবং আত্মগত। পরবর্তী কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সখ্য ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী ছবি আঁকিতেও পারিতেন। ১৩১৪ হইতে ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি 'জাহ্নবী' পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার গ্রন্থসংখ্যা দশ, 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' (১৮৭২ খ্রী), 'কবিতাহার' (১৮৭৩ খ্রী), 'ভারতকুসুম' (১৮৮২ খ্রী), 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭ খ্রী), 'আভাষ' (১৮৯০ খ্রী), 'স্বদেশিনী' (১৯০৬ খ্রী) ও 'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭ খ্রী)।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৫৫, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, ১৯৫৩।

ভবতোষ দত্ত

গিরীন্দ্রশেখর বসু (১৮৮৭-১৯৫৩ খ্রী) জন্ম ৩০ জানুয়ারি ১৮৮৭, মৃত্যু ৩ জুন ১৯৫৩। পিতা চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গা মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পত্নীর ৫ কন্যা ও ৪ পুত্রের মধ্যে গিরীন্দ্রশেখর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। বিহারের দারভাঙ্গাতে তাঁহার জন্ম হয়। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি জাদুবিদ্যা শিখিয়াছিলেন— নানা সভায় ও আত্মীয়-বন্ধুমহলে জাদুক্রীড়া দেখাইয়া আনন্দ দিতেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস্‌সি. পাশ করিয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডিগ্রি লাভ করেন।

সেই সময়ে মানসিক রোগ চিকিৎসার বিশেষ কোনও শিক্ষাকেন্দ্র ভারতে ছিল না। বই পড়িয়া ও নিজের চেষ্টায় তিনি ঐ রোগ চিকিৎসা শুরু করেন। ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা ছাড়া তিনি জাদুবিদ্যায় যে সংবেশন

(হিপ্‌নটিজম) শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা ও মানসিক রোগীর চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতেন। তখনও সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড -প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষা (সাইকো-অ্যানালিসিস) প্রণালীতে মানসিক রোগ চিকিৎসার বিষয় ভারতে বিশেষ কিছু কেহ জানিতেন না। জার্মান ভাষায় লিখিত পুস্তকাদিও তখন ইংরেজীতে অনূদিত হয় নাই। গিরীন্দ্রশেখর নিজে মানসিক রোগ চিকিৎসার যে-প্রণালী ক্রমে উদ্ভাবন করেন পরবর্তী কালে তাহার সহিত ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষার যথেষ্ট সমতা ছিল এবং গিরীন্দ্রশেখরও অনেক ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের প্রণালী ও তত্ত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যায় এম. এসসি. পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এসসি ডিগ্রি লাভ করেন। মানসক্রিয়ায় অবদমন সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার 'কনসেপ্‌ট অফ রিপ্রেসন' (১৯২১ খ্রী) পুস্তকটি বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে।

গিরীন্দ্রশেখর ক্রমে একান্তভাবে মানসিক রোগের চিকিৎসাতেই আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি ফ্রয়েডের সহিত পত্রালাপ শুরু করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সামান্য কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের সহযোগিতায় 'ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি' ১৪ পার্শী বাগান লেন কলিকাতা ৯ ঠিকানায় নিজ বসতবাটীতেই স্থাপন করেন ও সেই বৎসরেই এই সমিতি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সংঘের অনুমোদন লাভ করে। পরে তাঁহার চেষ্টাতেই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর বসুর দান করা বাড়িতে জাতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি চালিত লুম্বিনী পার্ক নামে ৩০ শয্যাযুক্ত মানসিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই হাসপাতালে ১৭৫টি শয্যার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯১১ হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ড. বসু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকতা করেন। ১৯১৭ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগে অস্বভাবী মনোবিদ্যা (অ্যাব্‌নর্মাল সাইকলজি) বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঐ বিভাগে প্রবর্তিত প্রফেসর পদে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করেন।

মনঃসমীক্ষার বিষয় ফ্রয়েডের সহিত তাঁহার মতের মূল পার্থক্য দেখা দেয় মনের অবদমন ক্রিয়া সম্বন্ধে। ফ্রয়েডের মতে সমাজ, ধর্ম, নীতি, শিক্ষা ইত্যাদির প্রভাবে মানুষের সমাজ ধর্ম ইত্যাদির বিরোধী নানা ইচ্ছা অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে (আনকনশস) রুদ্ধ হইয়া যায়। কোনও শক্তিকে দমন করিতে হইলে যেমন কোনমাত্র সেই শক্তির বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারাই তাহা করা সম্ভবপর, সেইরূপই মনের নানা ইচ্ছাশক্তির সম্বন্ধেও গিরীন্দ্রশেখর ঐ একই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া বলেন, কোনও ইচ্ছার অবদমন হইয়া থাকিলে সেই ইচ্ছার ঠিক বিরুদ্ধ ইচ্ছাই এই অবদমন ঘটাইয়াছে। যেমন শ্যামকে আঘাত করিবার ইচ্ছা যখন রামের জাগে, তখন শ্যামের দ্বারা আঘাত পাইবার ইচ্ছাও রামের মনের অন্তরালে থাকিয়া কাজ করে— এই দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার (যথা আঘাত করা ও আঘাত পাওয়া) প্রভাবে উভয় ইচ্ছাই রামের মনে অবদমিত হইয়া যায়, ফলে কোনও ইচ্ছাই সক্রিয় হইতে পারে না। এই দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার মধ্যে যদি কোনও একটি ইচ্ছা প্রবলতর হয় তবে তাহা কার্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। গিরীন্দ্রশেখরের মতে আমাদের প্রত্যেক ইচ্ছারই বিরুদ্ধ ইচ্ছা আমাদের মনে আছে। ইহারা যুগ্মভাবে মনে অবস্থান করে। গিরীন্দ্রশেখর তাঁহার এই মতবাদকে 'বিরুদ্ধ ইচ্ছাবাদ' (থিয়োরি অফ অপজিট উইশ) নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই মতবাদ অনুসরণ করিলে ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষার অতি জটিল ধারণার অনেকগুলিই অনেকাংশে সহজ হইয়া যায়। ফ্রয়েড এই বিরুদ্ধ ইচ্ছাবাদকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে না পারিলেও এই মতবাদ যে বিশেষ ও বিস্তৃত -রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন তাহা গিরীন্দ্রশেখরকে লিখিত তাঁহার চিঠিতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যৎ মনোবৈজ্ঞানিকগণ এই মতবাদের মূল্য নিরূপণ করিবেন।

গিরীন্দ্রশেখর কেবল বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না। 'স্বপ্ন' (১৯২ খ্রী) ইত্যাদি বাংলা ও ইংরেজী মনোবিদ্যার পুস্তক ছাড়াও 'লাল কালো' (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), 'পুরাণ প্রবেশ' (১৩৪১ বঙ্গাব্দ), 'ভগবদ্ গীতা' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইংরেজীতে লেখা যোগসূত্র (১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) ইত্যাদি অন্যান্য গ্রন্থ তাঁহার বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। ভারতীয় দর্শন তাঁহার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকেও যে কত পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক এবং 'নিউ থিয়োরি অফ মেন্টাল লাইফ' (১৯৩৩ খ্রী) ও অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

গির্জা খ্রীষ্টানদের সমবেত উপাসনা গৃহ বা প্রার্থনা-মন্দির। ইংরেজী চার্চ (*church*) শব্দের অর্থ যখন উপাসনাগৃহ তখন তাহার বাংলা প্রতিশব্দ রূপে গির্জা শব্দ

ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চার্চ বলিতে যেখানে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংঘ বুঝায়, সেখানে মণ্ডলী কিংবা খ্রীষ্টমণ্ডলী শব্দ ব্যবহৃত হয়।

গির্জা শব্দটি পর্তুগীজ ইগ্রেজা (*igreja*) এবং মূলতঃ গ্রীক একলেসিয়া শব্দ হইতে উৎপন্ন। বাইবেলের দ্বিতীয় ভাগে এই গ্রীক শব্দের অর্থ ছিল খ্রীষ্টবিশ্বাসী সংঘ, পরবর্তী কালে গ্রীক, লাতিন এবং লাতিন-উদ্ভূত ভাষাসমূহে এই শব্দের দ্বারা বিশ্বাসী-সংঘ এবং উপাসনাগৃহ — এই দুই অর্থই সূচিত হয়। ইংরেজী জার্মান ডাচ প্রভৃতি ভাষায় অপর একটি গ্রীক শব্দ ক্যুরিয়াকোন (অর্থাৎ প্রভুর গৃহ) হইতে কার্ক (*kirk*), চার্চ (*church*) ইত্যাদি শব্দগুলি আসিয়াছে।

প্রথম যুগের খ্রীষ্টভক্তেরা ইহুদীদের সমাজগৃহে (সিনাগগ) কিংবা নবদীক্ষিত কোনও গৃহস্থের বাড়িতে 'প্রভুর দিবসে' সমবেত হইত 'প্রভুর ভোজ' (লর্ড্‌স-সাপার) অনুষ্ঠানের জন্য। খ্রীষ্টানদের নিজস্ব প্রথম গির্জাগুলি রোমীয় অট্টালিকার অনুকরণে নির্মিত হয়, এইরূপ রোমীয় আকারের প্রাচীন গির্জার নাম বাসিলিকা। চতুর্ভুজ বাসিলিকা পরবর্তী কালে অষ্টকোণ এবং বৃত্তাকার গির্জায় রূপান্তরিত হয়। ক্রমে ক্রমে গির্জার বাহ্য আকার বিভিন্ন দেশ ও জাতির স্থাপত্যবিদ্যা অনুসারে পরিবর্তিত হইয়াছে। মধ্যযুগে পাশ্চাত্ত্য জগতের বহু নগরে যে সব ধর্মমন্দির নির্মিত হয়, সেই বিরাট ও সুন্দর গির্জাগুলি (গথিক ক্যাথিড্রাল্‌স) বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

ভিন্ন ভিন্ন গির্জার নানাবিধ নাম প্রচলিত। ধর্মপাল (বিশপ)-এর ধর্মাসন যে গির্জায় প্রতিষ্ঠিত সেই গির্জার নাম ক্যাথিড্রাল, মঠ বা আশ্রম-সংলগ্ন গির্জার নাম মিনস্টার, বড় গির্জার অন্তর্গত কিংবা পৃথক ও ক্ষুদ্র ভজনালয়ের নাম চ্যাপেল, তীর্থস্থানের প্রার্থনালয়ের নাম 'শ্রাইন'। এক একটি গির্জা খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টজননী মারীয়া, কিংবা কোনও সাধু সাধ্বীর নামে পরিচিত, যথা ক্রাইস্ট্‌স চার্চ, সেন্ট মেরীজ, সেন্ট পিটার্‌স্ ইত্যাদি।

প্রত্যেক গির্জার প্রধান স্থানে একটি বেদি থাকে, এই বেদিতে 'প্রভুর ভোজ' অনুষ্ঠানের সময় খ্রীষ্টের স্মরণার্থে উৎসর্গীকৃত রুটি ও দ্রাক্ষারস রাখা হয়, বেদিতে বা বেদির উপরে একটি ক্রুশ-মূর্তি থাকে। বহু গির্জায় উপদেশমঞ্চ (পুলপিট) আছে, এই মঞ্চে দাঁড়াইয়া ধর্মযাজক উপাসকমণ্ডলীকে উপদেশ দান করেন। গির্জার আর একটি বিশেষ স্থান লক্ষণীয় : দীক্ষাকুণ্ড (ব্যাপ্‌টিস্‌ট্রি) অর্থাৎ একটি জলকুণ্ড বা জলভাণ্ডার, যেখানে দীক্ষার্থীরা খ্রীষ্টের নামে দীক্ষাস্নাত হয়। গির্জায় উপাসনাকালে যাজক ও সেবকদের পরিধেয় বস্ত্র এবং ব্যবহার্য পাত্রগুলি যে স্থানে সংরক্ষিত হয়, তাহার নাম ভেস্ট্রি (vestry) বা স্যাক্রিস্‌টি (sacristy)। সাধারণতঃ প্রত্যেক গির্জায় এক বা একাধিক ঘণ্টা থাকে, এই ঘণ্টাধ্বনিতে পল্লীবাসীদের গির্জার উপাসনায় আহ্বান করা হয় কিংবা দিনের বিভিন্ন সময়ে প্রার্থনার কর্তব্য স্মরণ করানো হয়। অনেক খ্রীষ্টধর্মীর বিশ্বাস, খ্রীষ্টযাগ (ম্যাস হোলি কমিউনিয়ন) বা 'প্রভুর ভোজ'-এর সময় উৎসর্গীকৃত রুটি-রূপে স্বয়ং খ্রীষ্ট অদৃশ্যভাবে বিরাজ করেন, তাই সেই পুণ্য প্রসাদরূপী রুটি যে সব গির্জায় সসম্মানে রক্ষিত হয় সেখানে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ বেদির কাছে রাখা থাকে খ্রীষ্টের অতীন্দ্রিয় উপস্থিতির প্রতীক স্মারক রূপে।

বাংলাদেশের অন্যতম সুপ্রাচীন গির্জা ব্যাণ্ডেলে আছে। কলিকাতা শহরে প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের গির্জা আছে। প্রতি রবিবারে খ্রীষ্টানেরা গির্জায় সম্মিলিত হইয়া উপাসনা করে, অনেক গির্জায় প্রতিদিনই উপাসনা হইয়া থাকে। গির্জার প্রধানতম উপাসনা 'প্রভুর ভোজ', ক্যাথলিক খ্রীষ্টানেরা 'প্রভুর ভোজ'কে খ্রীষ্টযাগ বা মাস বলে। উপাসনার সময় ধর্মসংগীত গাওয়া হয় এবং অনেক গির্জায় অর্গ্যান বাজানো হয়, পাশ্চাত্ত্যে এই 'চার্চ মিউজিক' -এর বিশেষ চর্চা বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছে। বাংলা দেশের নানা গির্জায় ভারতীয় সংগীতের আদর্শ ও রীতিতে খ্রীষ্টীয় উপাসনাগীত প্রবর্তিত হইয়াছে।

গির্জার পরিচালনা ও ব্যয়নির্বাহের ভার প্রত্যেকটি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সভ্যগণ বহন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এক-একটি গির্জার পরিচালক রূপে একজন ধর্মযাজক নিয়োজিত হন বিশপ বা মণ্ডলীবিশেষের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। সকল খ্রীষ্টভক্ত গির্জার উপাসনায় বিনা দক্ষিণায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, যাহারা খ্রীষ্টধর্মী নয় তাহারাও সেই উপাসনায় উপস্থিত থাকিতে পারে। গির্জা বা ধর্মযাজককে দক্ষিণা দেওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। চাঁদা হিসাবে অনেকে নিজ সামর্থ্য অনুসারে কিছু না কিছু দান করে। অনেক গির্জার সঙ্গে নানাবিধ শিক্ষা ও সেবা -কেন্দ্রের যোগ আছে।

পিয়ের ফালোঁ

গিলগিট ৩৫°৫৫´ উত্তর ও ৭৪°২২´ পূর্ব। ইহা কাশ্মীরের অন্তর্গত বহু হিমবাহ ও তুষারপর্বতপূর্ণ স্থান। হুনজা ও গিলগিট নদীসংগমস্থলে অবস্থিত এই স্থানটির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকগুলি গিরিপথ দিয়া মধ্য এশিয়ার সহিত ইহার বাণিজ্য চলে। গিলগিটের প্রায় ৩৮ কিলোমিটার (২৪ মাইল) দক্ষিণে সিন্ধু নদী। ইহার

নদীধৌত উচ্চ উপত্যকা অঞ্চলেও কৃষিকার্য হয়। ধান ও তুলাই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ইহা ছাড়া নানা প্রকার ফলও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

অধিবাসীদের অধিকাংশই এখন মুসলমান। এককালে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল ছিল।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XII, Oxford, 1908

উমা সেন

গিলগিটের বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের প্রতি সর্বপ্রথম ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গিলগিটের সেনানিবাসের সন্নিকটে নৌপুর নামক স্থানে অতি আকস্মিকভাবে বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। অধিকাংশই ভূর্জপত্রের উপর লিখিত, কয়েকটি মাত্র কাগজের উপর লেখা। এগুলি একটি স্তূপের মধ্যের অভ্যন্তরে ২ ৩ মিটার (৭ ফুট ৯৫ ইঞ্চি) ব্যাসের একটি গোলাকার কক্ষে আবিষ্কৃত হয়। এইরূপ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল মধ্য এশিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্থানে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লেখা এই পুথিগুলি 'গিলগিট পাণ্ডুলিপি' (ম্যানাস্ক্রিপ্ট) নামে পরিচিত। ইহাদের মূল্য অপরিসীম, কারণ মূল সংস্কৃত পাঠ সংবলিত এই পুথিগুলি এতকাল শুধু চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের মাধ্যমেই জ্ঞাত ছিল। অনিরুদ্ধ ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এই শ্রেণীর পুথির ইহাই সর্বপ্রথম আবিষ্কার। এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে রহিয়াছে বহু সূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক এবং সর্বাস্তিবাদীদের সংস্কৃত বিনয়পিটক। অনেক পুথিতেই দাতাদের নাম গোত্র লেখা। নৃপতি শ্রীদেবশাহি সুরেন্দ্র বিক্রমাদিত্য নন্দ দাতাদের অন্যতম। শাহি বংশীয় এই রাজা সম্ভবতঃ গিলগিট অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন।

এই বিশিষ্ট স্তূপের অভ্যন্তরীণ কক্ষ হইতে পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপি ছাড়াও অজস্র ক্ষুদ্রাকার উদ্দেশিক স্তূপিকাও পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে আবার বৌদ্ধ ধর্মসার-গাথা লেখা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক এবং উৎকীর্ণচিত্রযুক্ত ফলক রহিয়াছে।

অপর ৩টি স্তূপসহ এই স্তূপটি উত্তর দক্ষিণমুখী এক সারিতে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটিরই দুইটি করিয়া অধিষ্ঠান। উত্তর দিকের দুইটি, গোলার্ধ অণ্ডসহ, মোটামুটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তৃতীয়টি বৃহত্তম, ইহারই অভ্যন্তরে পুথিগুলি ছিল। ইহার উচ্চতা ১২ হইতে ১৫ মিটার (৪০-৫০ ফুট)। নিম্নের অধিষ্ঠানটির প্রত্যেকটির পার্শ্ব ৬ মিটার ৬০ সেন্টিমিটার (২০ ফুট ২৪ ইঞ্চি) করিয়া আর অপসৃয়মান উপরকার অধিষ্ঠানটির চতুর্দিকে ৬০ সেন্টিমিটার (২৪ ইঞ্চি) প্রশস্ত উন্মুক্ত চত্বর। পাণ্ডুলিপি ও স্তূপিকাসমূহের নিধান কক্ষের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে একটি কাঠের যষ্টি, ইহাদের মধ্যস্থিত ছত্রিকা ভেদ করিয়া চত্বরের অবলম্বন স্বরূপ ছিল।

বুদ্ধদেবের প্রস্তর মূর্তি, স্তূপ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ গিলগিটের সন্নিকটে নানা জায়গায় (যথা হুনজা, পুনিয়াল, ইশকুমান, ইয়াসিন এবং কিরগা নালার মুখ) ছড়াইয়া আছে।

দেবলা মিত্র

গিলান্দী পশ্চিম ভুয়ার্সের নদী। প্রবাহিত হয়ে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত জলঢাকার উপনদী। গিলান্দী নদী ভুটান ও কুচবিহারের সীমান্ত নির্দেশ করিতেছে। এই নদীটি বহুবার গতি পরিবর্তন করিয়াছে। গিলান্দীর পুরাতন ও নূতন খাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিকার লইয়া কুচবিহার ও ভুটানের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। নদীটি খরস্রোতা। ইহা বহুবার প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছে। 'জলঢাকা' দ্র।

হেনা ঘোষ

গীতগোবিন্দ জয়দেব দ্র

গীতা সাধারণতঃ বলিতে মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত (২৫–৪২ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ রূপে গ্রথিত অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবরণাত্মক ভগবদ্গীতা নামক গ্রন্থাংশকে বোঝায়।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিভিন্ন পুরাণে উচ্ছ্বসিত ভাষায় গীতা-মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতার আদর্শে কল্পিত শিবগীতা, রামগীতা, অষ্টাবক্রগীতা প্রভৃতি নানা পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গীতাপাঠ পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। সম্প্রদায়ভেদে গীতার বিবিধ ব্যাখ্যা বিরচিত হইয়াছে। বিভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সাহিত্যে গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে।

গীতার প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে শংকরভাষ্য অন্যতম ও অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ, শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা বৈষ্ণব সমাজে বিশেষভাবে আদৃত, শংকরাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের সমন্বয়ে অপূর্ব টীকা রচনা করেন।

গীতা প্রায় সমস্ত প্রচলিত ভাষায় অনূদিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত

গীতা বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ১৩শ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠী ভাষায় মহারাষ্ট্রের স্বামী জ্ঞানেশ্বর বিরচিত জ্ঞানেশ্বরী টীকা অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করিয়া রচিত। ভারতে উর্দু ভাষায় গীতার অনুবাদ হয় আকবরের সময়ে। তাহারও পূর্বে আরবী ও আরবী হইতে ফারসী ভাষায় গীতার অনুবাদ হইয়াছিল। চার্লস উইল্‌কিন্‌স (১৭৪৯।৫০-১৮৩৬ খ্রী) সর্বপ্রথম গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। তাহার অনুবাদ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এফ. লরিঙ্গর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় মন্তব্য সহ জার্মান ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এ ডব্‌লিউ. শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫ খ্রী) নাগরী অক্ষরে গীতার মূল ও লাতিনে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইউর্জীন বুর্নুফ (১৮০১-৫২ খ্রী) ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দোমোত্রিয়া নামক একজন গ্রীক পণ্ডিত গ্রীক ভাষায় গীতার তর্জমা করেন। বর্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর টিলক ও শ্রীঅরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যা জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ভক্তি গীতার একটি প্রধান শিক্ষার বিষয়, গুরু স্বয়ং কৃষ্ণ এবং শিষ্য অর্জুন। গীতার শিক্ষার বিষয় সর্বজনীন এবং বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এই শিক্ষার ভিত্তি। গীতায় তদানীন্তন ভারতচিন্তাজগতে বিরাজিত সমস্ত দর্শনের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। একদিকে যেমন বেদ-উপনিষদের সুপ্রাচীন আদর্শে গীতা উদ্বুদ্ধ, তেমনই অন্য দিকে সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত ও ভাগবতদর্শনের প্রভাবে ইহার চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত। এইজন্য গীতাকে সমন্বয় গ্রন্থ বলা হয়। বৌদ্ধ-দর্শনের প্রভাবও ইহাতে বিবৃত। কিন্তু মূলতঃ গীতা উপনিষদভিত্তিক। গীতায় ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ ফল বেদান্ততত্ত্বের সঙ্গে ভক্তিরসের স্বচ্ছন্দ সমন্বয় হওয়ায় উহা যুগে যুগে ভারতের ভক্তদার্শনিকদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ইহারই ফলশ্রুতি গীতার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রচিত টীকাসমূহ।

গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব। শুধুমাত্র তত্ত্ব-প্রদর্শনেই গীতার বিশ্রান্তি নহে, সেই পরমতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কি উপায়ে এই মায়ামোহাচ্ছন্ন সংসারের পরপারে অভয়লোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহাও গীতায় দেখানো হইয়াছে। এইরূপে সাধন ও সাধ্য এই উভয় প্রদর্শন দ্বারা গীতা একটি সুসম্পূর্ণ দর্শন আলোচনা করিয়াছে। জীব স্বভাবতঃ পূর্ণ স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও মায়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এবং তাহার এই পরিচ্ছিন্নতার প্রকাশ কর্ম ও তৎফলাসক্তিতে। জীব পরিচ্ছিন্নতাজনিত অপূর্ণতার জন্য কর্মজনিত ফললাভে পূর্ণতা লাভ করিতে আগ্রহান্বিত হয়, কিন্তু পূর্ণতার যথার্থ স্বরূপ না জানায় তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কর্ম ফলপ্রসূ, ফল ভোগপ্রসূ ও ভোগ পুনরায় কর্মপ্রসূ হওয়ায় কর্ম দ্বারা জীব অনন্ত কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কর্মই সর্বদুঃখের মূল। কর্মের মূল অজ্ঞান। একমাত্র জ্ঞানই এই অজ্ঞান ধ্বংস করিতে সমর্থ। অতএব জ্ঞানই একমাত্র শরণ। কর্মবন্ধন কিরূপে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয় তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়া শেষে গীতা ঐ বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছে। কামই ক্রমশঃ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কাম ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া বিস্তার লাভ করে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধ হইতেই বিষয় সম্বন্ধে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ ও তৎপরিণামে ধ্বংস - এইরূপে জীব স্বীয় বিনাশ সাধন করে। বিষয়াসক্তি নিবন্ধন এই যে কর্মবন্ধন তাহা ক্ষয় করিবার উপায় বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই কর্মবন্ধন নষ্ট হয়। কর্মবন্ধনমুক্তির প্রথম সোপান নিষ্কাম কর্ম সাধন ও জ্ঞানানুশীলন। ইহাকেই কর্মযজ্ঞ বলা হইয়াছে। জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন স্তরবিভাগ রহিয়াছে। সর্বপ্রথম আত্মিকত্ব-বুদ্ধি দ্বারা বৈরাগ্য সাধন করিতে হয়। তামসিকতা ও রাজসিকতা উত্তীর্ণ করিয়া জ্ঞান তখন সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ হইয়া ওঠে। ক্রমে ভক্তি দ্বারা অহংকাররূপ অশুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মবুদ্ধির প্রভাবে আত্যন্তিক মুক্তিলাভ হয়। ইহাই গীতার কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ক্রমিক স্তর। এই ব্রহ্মবুদ্ধির বলে জীব বাহ্য ও আন্তর সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি পরিবর্জন করিয়া আত্মস্বরূপে স্থির হয় ও সর্বপাশমুক্ত পরমানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়। এই উপলব্ধিই পরম পুরুষার্থ। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে কর্মস্তর হইতে ক্রমে পরমবুদ্ধির বিকাশ আলোচিত হইয়াছে। আর ইহার বিস্তৃত বিবরণ গীতার সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে উপদিষ্ট আছে।

ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতে সর্বকর্মের পরি-সমাপ্তি ঘটাইয়া তাঁহার আরাধনা করিলে তৎপ্রসাদে কর্ম ও গুণ-বন্ধন উন্মোচিত হইবে। এইরূপে কর্মদ্বারা জ্ঞানোৎকর্ষ ও জ্ঞানের দ্বারা মোহচ্ছেদ তথা তত্ত্বলাভ হয়। তত্ত্বলাভেই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ অভেদজ্ঞান। প্রথমে আধ্যাত্মিক অভেদ ও আধিভৌতিক অভেদ নিশ্চয় করিয়া পরে এতদুভয়ের অভেদ নিশ্চয় দ্বারা যথার্থ অভেদতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হয়। এই পরমতত্ত্বের পরা ও অপরা দ্বিবিধ প্রকৃতি বা শক্তি। পরা প্রকৃতি জীবপ্রকৃতি ও অপরা

জড়প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি ঈশ্বরের নিকটতর প্রকৃতি। পরা-প্রকৃতির দ্বারাই অপরা প্রকৃতি বিধৃত হইয়া আছে। অপরা ও পরা-প্রকৃতিই যথাক্রমে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে পরিচিত। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ নির্বিশেষে ঈশ্বর সর্বত্র অনুস্যূত। পুরুষোত্তম ঈশ্বর এই জগৎ প্রপঞ্চের আদি সনাতন বীজ। সমগ্র জগৎ তাঁহাতেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মন্দবুদ্ধি জীব নানা রূপধারী রূপে তাহার ভজনা করিয়া থাকে। এবং সাধনোচিত ফল মাত্র লাভ করে। পুরুষোত্তমকে কেবল মুমুক্ষু জ্ঞানীগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। অধ্যাত্ম পরমব্রহ্মস্বরূপ সর্বজীবে আত্মান্তর্যামীরূপে বিদ্যমান অক্ষর-তত্ত্ব। সেই অবিনাশী ব্রহ্মের বিনাশী ক্ষররূপ ভৌতিক দেহ অধিভূত। তিনি অবিযজ্ঞ। অক্ষর পরমব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ কর্ম, অধিভূত প্রভৃতি ক্ষর বা জ্ঞান স্বরূপ। বহু রূপে প্রকাশমান হইয়াও তিনি এক শাশ্বত কূটস্থ। কর্মের ভূমিতে বিধিরূপে, শক্তির ভূমিতে প্রকৃতি রূপে এবং জ্ঞানের ভূমিতে পুরুষোত্তম রূপে যিনি বিদ্যমান তাঁহাকে উপলব্ধি করারও বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। প্রথম স্তরে বিহিত হইয়া কর্ম করিতে হবে। দ্বিতীয় স্তরে কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রণ। তখন তত্ত্ববিষয়ে জিজ্ঞাসা ও বিচার কর্মের সহিতই চলিবে। তৃতীয় স্তরে ধ্যানের মাধ্যমে সেই পরমতত্ত্ব উপলব্ধির প্রচেষ্টা। এই স্তরে ধীরে ধীরে কর্ম পরিত্যক্ত হইবে। সর্বশেষ জ্ঞানের স্তর। এই ভূমিতে জ্ঞানের সাহায্যে সর্বমোহছিন্ন হওয়ায় পরমার্থলাভ অক্ষর ভেদ সিদ্ধি। ইহাই সমাধি বা পরম মুক্তি, যাহা গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য।

গান্ধীজীর মতে গীতার চরম সার্থকতা কর্মে, শ্রীঅরবিন্দ তথা ভক্তিমার্গীয়গণের মতে গীতার পরম সার্থকতা ভক্তিতে। শংকরাচার্য প্রমুখ দার্শনিকমতে জ্ঞানযোগই গীতার চরম লক্ষ্য।

দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, হিন্দুশাস্ত্র, ২য় খণ্ড, ৮ম ভাগ, কলিকাতা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত, শ্রীমদভাগবদগীতা, কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কলিকাতা, ১৯০২, বাল-গঙ্গাধর তিলক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত, কলিকাতা, ১৩২৫, Sri Aurobindo, *Essays on the Gita*, Pondicherry 1950; M K Gandhi, *The Message of the Gita*, Ahmedabad, 1959; Sarvepalli Radhakrishnan, *The Theism of the Bhagavad Gita*, Benaras

সংযুক্তা গুপ্ত

গীতিকা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে গীতিকা (ব্যালাড) অন্যতম। ইহা আখ্যানমূলক রচনা, কিন্তু লোকসাহিত্যের অন্যান্য আখ্যানমূলক রচনার সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, কাহিনীর অপ্রয়োজনীয় অংশ ইহা হইতে সতর্কতার সঙ্গে পরিত্যক্ত হইয়া কেবলমাত্র যাহা একান্ত আবশ্যকীয় তাহাই ইহাতে বর্ণিত হয় এবং ক্ষিপ্র গতিতে কাহিনী এক সংকটময় পরিণতির মধ্যে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করে। ইহার মধ্যে কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করে, চিত্রবর্ণনা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। কাহিনীর উপস্থাপনার দিক দিয়া গীতিকা অনেকটা নাট্যধর্মী। নাটকের মতই ইহাতে সংলাপেরও বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ইহাতে কাহিনী বর্ণিত হয় না, সার্থক নাটকের মধ্যে যেমন কেবলমাত্র জীবনের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য মুহূর্তের উপর আলোকসম্পাত করিয়া ইহার সমগ্রিক রূপটি প্রকাশ করা হয়, ইহাতেও সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হইয়া থাকে। তবে গীতিকার মধ্যে একটি মাত্র ঘটনা প্রাধান্য লাভ করে, ইহার কোনও শাখা কাহিনী কিংবা উপ-কাহিনী থাকে না— মূল কাহিনীর একটি মাত্র ধারা অবিমিশ্রভাবে পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া যায়। গীতিকার রস প্রধানতঃ কাহিনীর রস, কাহিনীর অগ্রগতি ও পরিণতির মধ্যেই শ্রোতার সমগ্র কৌতূহল ন্যস্ত হয়, সেইজন্যই অবান্তর বর্ণনা কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ইহার মধ্যে সহজে স্থান লাভ করিতে পারে না। অনেক সময় আভাস, ইঙ্গিত কিংবা সংকেতের সহায়তায় কাহিনীর সংক্ষিপ্ততার গুণ সৃষ্ট হয়।

ত হইবার উদ্দেশ্যেই গীতিকা রচিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও নৃত্যসহ সংগীতের মধ্য দিয়া পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই গীতিকা রচিত হইত বলিয়া মনে হয়। ইহার গীতের সঙ্গে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়, ইহার গীত পদ্ধতি নিতান্ত গতানুগতিক, সুরের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নাই। কাহিনী যত দীর্ঘই হউক না কেন, একই সুরে তাহা আদ্যোপান্ত গীত হয়। বাংলা গীতিকার ছন্দ স্বরবৃত্ত ছন্দ বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ, ইহা ছড়ার ছন্দ বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু একই ছন্দের রচনা হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্য দিয়া বিভিন্ন রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কাহিনীর ধারায় শ্রোতার সকল ঔৎসুক্য ন্যস্ত হয় বলিয়া সুরের বৈচিত্র্যহীনতা ইহার ত্রুটি বলিয়া মনে হইতে পারে না।

সাধারণতঃ যে সমাজ মননশীলতার দিক দিয়া একটু অগ্রসর হইয়াছে, অর্থাৎ আদিম সমাজের স্তর হইতে উন্নত হইয়াছে, তাহাতেই গীতিকার উদ্ভব সম্ভব। আদিবাসীর

সমাজে গীতির প্রাচুর্য থাকিলেও যে আদিবাসীর সমাজ উন্নততর সমাজ-জীবনের প্রভাবের বশবর্তী না হইয়াছে, তাহার মধ্যে গীতিকা বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ যে জাতির সমাজ জীবনের মধ্যে সংহতি দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে পারে নাই, সেই জাতির মধ্যে গীতিকাও জন্মলাভ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

গীতিকা জাতির লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং লোকসাহিত্যের যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ইহা যে ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হইবার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে সমাজের রচনা বলিয়া মনে হইবে, গীতিকার এই গুণ নাই বলিয়া কোনও কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস গীতিকা সচেতন কবিমনের সৃষ্টি, তাহা নিরক্ষর হইতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে সতর্ক শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর যে সমাজের কোনও একটি প্রাচীন ঐতিহ্য থাকে এবং সেই ঐতিহ্য সম্পর্কে জাতির সচেতনতা থাকে, কেবলমাত্র সেই সমাজেই গীতিকা রচিত হইতে পারে। সমাজ-জীবনে সুদৃঢ় সংহতি এবং জীবন সম্পর্কে নাটকীয় কৌতূহলের অস্তিত্ব না থাকিলে সেই সমাজে কদাচ গীতিকা জন্মলাভ করিতে পারে না। লোকগীতি (ফোক-সং) কিংবা কথা (ফোক-টেল) র সঙ্গে ইহার কোনও যোগ নাই। এমন কি, লোকসাহিত্যের মধ্যে যে সাধারণ কাহিনীমূলক রচনা পাঁচালি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেও ইহা রসের দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহা অন্য কোনও দিক হইতে লোকসাহিত্যের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। কোনও কোনও গীতিকার কাহিনীর মধ্যে জীবনের উচ্চ আদর্শ মূলক ভাব প্রকাশ পায়, সেই ভাব কোনও কোনও সময় এত উচ্চ বলিয়া বোধ হয় যে তাহা যে নিতান্ত সাধারণ নিরক্ষর সমাজ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা মনে হয় না।

কোনও কোনও গীতিকার মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক হইতে মহাকাব্য বা 'এপিক'-এর গুণ প্রকাশ পায় বলিয়া ইহার সঙ্গে জাতির মহাকাব্য বা 'এপিক'-এর সম্পর্ক আছে বলিয়াও অনেকে মনে করেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে ইহা মহাকাব্য বা 'এপিক' রচনার পূর্ববর্তী কালীন রচনা, আবার কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইহা মহাকাব্য বা 'এপিক' রচনার পরবর্তী কালীন রচনা। সুতরাং যে ভাবেই হউক জাতির মহাকাব্য কিংবা 'এপিক'-এর সঙ্গে যে ইহার সম্পর্ক আছে তাহা সর্ববাদিসম্মত। সাধারণভাবে গীতিকার যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা এই যে, ইহাতে দ্রুত সঞ্চারিত এক কাহিনীর সংকটপূর্ণ কোনও পরিণতি-নির্দেশ থাকে। ঘটনার বর্ণনা ও প্রত্যক্ষ সংলাপের মধ্য দিয়া নাটকীয় কাহিনী অগ্রসর হয়, আত্মনির্লিপ্ত হইয়া লেখক বস্তুধর্মী একটি কাহিনীর বর্ণনা করেন, পার্থিব জীবনের মধ্যেই কাহিনী সীমাবদ্ধ থাকে— পারলৌকিক কোনও আশ্বাস কাহিনীর পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করে না।

বাংলা সাহিত্যে ইহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' এবং 'নাথ-গীতিকা'। ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের আরও কয়েকটি অঞ্চল হইতে আরও কিছু গীতিকা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহা 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। নাথ-গীতিকার মধ্যে 'গোপীচন্দ্রের গান' উত্তর বঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্যর জর্জ গিয়ার্সন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নাথ গীতিকার একটি পাঠ 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

গুঙ্গা (১৮৯৬-১৯৫৪ খ্রী) ভারতের খ্যাতনামা মল্লবীর। আসল নাম গিয়াসুদ্দীন। শৈশবে রোগাক্রান্ত হইয়া বাক্ ও শ্রবণ -শক্তিহীন হওয়ায় গুঙ্গা নামে পরিচিত হন। সতের বৎসর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক কুস্তিতে নামেন, আঠার বৎসর হইতে পেশাদার কুস্তিগির হন। লাহোর, অমৃতসর এবং বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ৩টি প্রতিযোগিতায় ছোট গামাকে পরাস্ত করেন। বিখ্যাত মল্ল ইমাম বখ্স-এর সহিত তাঁহার ৬ বার কুস্তি হয়। ইহার মধ্যে প্রথম বার ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া গুরুজবন্ধ হন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বারে গুঙ্গা পরাজিত হন, পঞ্চম ও শেষ কুস্তি দুইটি অমীমাংসিত বলিয়া ঘোষিত হয়। লাহোরের এই শেষ কুস্তিটি ৫ ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলায় এক রেকর্ডের সৃষ্টি হয়। গুঙ্গার সহিত হামিদ-এর দুইবার কুস্তি হয় এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ তিনি জয়ী হন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সর্বভারতীয় কুস্তির দঙ্গলে তিনি দ্বিতীয়বার গুরুজবন্ধ

হইয়াছিলেন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাস দুর্ঘটনায় গুঙ্গার মৃত্যু হয়।

সমর বসু

গুজব অলীক বিবৃতি যখন সত্য সংবাদ রূপে প্রচারিত হয় তখন তাহাকে গুজব বলা হয়। অনেক সময় অবশ্য গুজবে ঘটনা বিশেষের বিকৃত প্রতিফলন থাকে।

নূতন নূতন গুজবের প্রচার সর্বাপেক্ষা বেশি হয় যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মড়ক ইত্যাদি সামাজিক বিপর্যয়ের সময়। মানুষের মনের রুদ্ধ আবেগ গুজবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

অধিক কাল স্থায়ী হইলে এবং বিস্তৃতি লাভের সুযোগ পাইলে গুজব ক্রমশঃ নিশ্চিত সত্য রূপে প্রতীত হয় এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

গুজবের প্রচার বন্ধ করিবার প্রধান উপায় যথাযথভাবে সত্য সংবাদ পরিবেশন করা। 'প্রচার' দ্র।

দ্র R. L. La Piere & P. R. Farnsworth, *Social Psychology*, New York, 1936; F. C. Bartlett, *Political Propaganda*, Cambridge, 1940; W. Allport Gordon & Leo Postman, *Psychology of Rumor*, New York, 1948; Guy E. Swamson, Theodore, M. New Comb & Eugene L. Hartly, ed., *Readings in Social Psychology*, New York, 1952.

সুধীরকুমার বসু

গুজরাত ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং ২০°১' হইতে ২৪°৭' উত্তর এবং ৬৮°৪' হইতে ৭৪°৪' পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ। গুজরাতের পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পূর্বে রাজস্থান, দক্ষিণ-পূর্বে মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র ও উত্তরে পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমানে গুজরাতের আয়তন ১৮৭১১৫ বর্গ কিলোমিটার (৭২২৪৫ বর্গ মাইল)।

গুজরাত প্রদেশ ১৭টি জেলা, ১৮৫টি তালুক ও মহাল এবং ১৯০১৭টি গ্রাম লইয়া গঠিত। গুজরাত প্রদেশে বরোদা ও রাজকোট দুইটি বিভাগ। রাজকোট বিভাগে ৭টি জেলা, যথা: জামনগর, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর, ভবনগর, অমরেলি, জুনাগড় এবং কচ্ছ। বরোদা বিভাগে বানসকন্থা, সবরকন্থা, মেহসানা, আমেদাবাদ, খেড়া, পাঁচমহল, বরোদা, ব্রোচ, সুরাট এবং দাঙ্গ—এই ১০টি জেলা আছে। প্রদেশের সর্ববৃহৎ জেলা কচ্ছের আয়তন ২২৫০ বর্গ কিলোমিটার (৯০০ বর্গ মাইল)। এই প্রদেশে ১৭৫টি শহর আছে।

ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে এই রাজ্যকে সমভূমি ও উচ্চভূমি—এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। বরোদা বিভাগে গুজরাত প্রধান ভূমি ও রাজকোট বিভাগে গুজরাত উপদ্বীপ অবস্থিত। গুজরাত প্রধান ভূমি উত্তর গুজরাত সমভূমি, মধ্য গুজরাত সমভূমি ও দক্ষিণ গুজরাত সমভূমি—এই তিন ভাগে বিভক্ত। গুজরাত উপদ্বীপ সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ লইয়া গঠিত। সৌরাষ্ট্র কিছু উচ্চভূমি, অন্তর্বর্তী সমভূমি এবং উপকূলভূমি লইয়া গঠিত। কচ্ছ সৌরাষ্ট্রের অংশ হইলেও কচ্ছের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি তাহাকে সৌরাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়াছে। কচ্ছ সম্পূর্ণ সমতল নহে, ইহার বৃহত্তম অংশে লবণাক্ত ভূমি এবং তিনটি প্রধান পর্বতশ্রেণী আছে। পর্বতগুলির উচ্চতা ৩১৫ মিটার (১০৫০ ফুট)-এর অধিক নহে। গুজরাতের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত কচ্ছের রনের নিম্নভূমি বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে পরিণত হয়।

গুজরাত প্রধান ভূমির উত্তরে পালনপুর হইতে পূর্বে সাতপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বতমালা সহ কয়েকটি উচ্চভূমি গুজরাতকে মহারাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। গুজরাতের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত নিরবচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণীগুলি সাতপুরা, সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য এবং আরাবল্লী পর্বতমালার বিচ্ছিন্ন অংশ। তাপ্তীর তীরে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ২৭৪ মিটার (৮০০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশ্রেণী সাতপুরার সহিত যুক্ত আছে। রাজপিপ্‌লা পর্বত (উচ্চতা ৬১০ মিটার বা ২০০০ ফুট) সাতপুরা পর্বতের পশ্চিমস্থ অংশ এবং ইহা তাপ্তী ও নর্মদার জলবিভাজিকা। রতনমল এবং পাভাগড়ের মধ্যে ২৪৪ মিটার (৮০০ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট বিন্ধ্য পর্বতের শৈলবাহু (spur) অবস্থিত।

সৌরাষ্ট্র বা গুজরাত উপদ্বীপ একটি সংকীর্ণ ভূভাগ দ্বারা প্রধান ভূমির সহিত যুক্ত। গুজরাত উপদ্বীপের প্রাকৃতিক গঠনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। গুজরাত উপদ্বীপে অনুচ্চ পাহাড়গুলি পলিমাটি গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নভূমির সহিত পর্যায়ক্রমে অবস্থিত। আরাবল্লী পর্বতমালার অন্তর্গত অনেকগুলি খাড়া পাহাড় ও ক্ষুদ্র পাহাড় ছাড়াও দক্ষিণ ও মধ্য সৌরাষ্ট্রে আরও দুইটি পাহাড় এই অংশে অবস্থান করিতেছে। গুজরাত উপদ্বীপের দুইটি পাহাড়ের মধ্যে উত্তর-পূর্বের পাহাড় হইতে মাণ্ডব শ্রেণী উত্তরে এবং থাঙ্গা শ্রেণী দক্ষিণে বাহির হইয়াছে। মাণ্ডব শ্রেণী মার্ভি সমভূমিতে আসিয়া শেষ হইয়াছে, থাঙ্গা আরব সাগরের তীরে পোরবন্দরের নিকট বিচ্ছিন্ন বান্দা পাহাড়ে গিয়া মিশিয়াছে। এই অংশে অধেপুর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। দ্বিতীয় শ্রেণীটিতে

গুজরাতের সর্বোচ্চ শিখর গিরনার (১০৮০ মিটার বা ৩৬০০ ফুট) অবস্থিত।

উপকূলভাগ লবণাক্ত জলাভূমি, বালুময় ভূমি ও প্রস্তরময় ভূমিতে পরিপূর্ণ। সমভূমির উর্বরতা এবং সমতা ভূমিক্ষয়ের উপর নির্ভরশীল। উপকূলভাগে বহু খাঁড়ি আছে।

গুজরাতের শিলা অপেক্ষাকৃত নব্যযুগের (আপার টার্শিয়ারি)। প্রদেশের অধিকাংশেই দাক্ষিণাত্যের লাভা (ব্যাসাল্ট) জাতীয় আগ্নেয় শিলা দেখা যায়। কোনও কোনও স্থানে যেমন পাঁচমহল ও ব্রোচ জেলায় গ্রানাইট ও নিস শিলা আছে। উত্তরাংশের শিলা ভারতের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির শিলার অনুরূপ। দাক্ষিণাত্যের শিলা মধ্য গুজরাতে ও কচ্ছে ও নর্মদার দক্ষিণে দেখা যায়। বাড়-পিপ্‌লা ও পাভাগড়ের শিলা রূপান্তরিত কোয়ার্টজাইট ও বেলে পাথরে গঠিত। পাভাগড়ে স্থানে স্থানে গ্রানাইট পাথরের ঢিবি দেখা যায়।

গুজরাত প্রদেশের দক্ষিণাংশে গাঢ় কৃষ্ণ মৃত্তিকা, উত্তরে ও মধ্য ভাগে পুরাতন পলিমাটিযুক্ত অঞ্চল। উপকূলভাগ লবণাক্ত পলিমাটিযুক্ত মৃত্তিকা অঞ্চল।

গুজরাতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের পর্বত হইতে নির্গত নদীসমূহের মধ্যে তাপীর নাম উল্লেখযোগ্য ('তাপ্তী' দ্র)। ইহা গুজরাতের দাঙ্গ জেলার অরণ্যসংকুল স্থানে প্রবেশ করিয়া গুজরাত সমভূমি বহিয়া আরব সাগরে পড়িতেছে। ভেরেলী ইহার উপনদী। নর্মদা নদী মধ্য প্রদেশের অমরকণ্টকে উত্থিত হইয়াছে। ইহা সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া গুজরাত সমভূমিতে প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পড়িতেছে ('নর্মদা' দ্র)। সবরমতী আরাবল্লী পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া সবরকান্থা, মেহ্‌সানা ও আমেদাবাদ জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্যাম্বে উপসাগরে পড়িতেছে ('সবরমতী' দ্র)। অন্যান্য ছোট নদীর মধ্যে সরস্বতী, রুপেন, রিসা, মাহী, বানস উল্লেখযোগ্য। গুজরাত উপদ্বীপের ভাদর, সেতুরঞ্জী, মাচ্ছু এবং ভোগাও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী।

গুজরাত প্রদেশের জলবায়ু মৌসুমীবায়ুর প্রভাবাধীন হইলেও এখানে সমুদ্রের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। গুজরাত প্রদেশের দক্ষিণাংশের জলবায়ু উত্তরাংশের জলবায়ু অপেক্ষা আর্দ্র। উত্তরাংশের জলবায়ু সমুদ্রপ্রভাবমুক্ত এবং মরুভূমির নিকটস্থ হওয়ায় অনেকটা উষ্ণ ও শুষ্ক। এই প্রদেশের দক্ষিণ দিকেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রদেশের দক্ষিণাংশের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা উত্তরের জেলাগুলি অপেক্ষা অনেক কম। এই প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প এবং পরিবর্তনশীল। গুজরাত প্রদেশের উত্তরাংশে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০'৩ সেন্টিমিটার হইতে ১০৪'৭ সেন্টিমিটার। কিন্তু গুজরাতের দক্ষিণাংশে ১১২'২ সেন্টিমিটার হইতে ১৯৪'২ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে (১৯৫১-৬০ খ্রী)। কচ্ছের রনে হঠাৎ বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং এই স্থানের নদীবাহিত অতিরিক্ত পলিমাটির জন্যই কচ্ছে প্রায়ই বন্যা হয়।

গুজরাত প্রদেশের নামটি এই প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসী 'গুর্জর' উপজাতীদের নাম পরিবর্তিত হইয়া গুজরাত হইয়াছে। প্রাচীন কালে খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষের পরে প্রস্তরযুগের মানুষের আগমন হয়। এই সভ্যতা বিলুপ্তির পর সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব দেখা যায়। গুজরাতে মৌর্য বংশই প্রথম ঐতিহাসিক বংশ। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রদেশপাল পুষ্যগুপ্ত কর্তৃক জুনাগড়ের নিকট সুদর্শন হ্রদ নির্মিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের পরে ক্রমান্বয়ে গ্রীক, ক্ষত্রপ, সাতবাহন ক্ষত্রপ, গুপ্ত, বাকাটক, কলচুরি, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চৌলুক্য এবং পরমার-বংশীয় রাজারা সমগ্র গুজরাত প্রদেশে বা তাহার অংশবিশেষে রাজত্ব করেন।

১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উলুঘখানের গুজরাত আক্রমণই গুজরাতে প্রথম তুর্কী অনুপ্রবেশ। গুজরাতের রাজা কর্ণদেবের স্ত্রী কমলাদেবী ধৃত হইয়া দিল্লীতে নীত হন। মালিক কাফুরের দেবগিরি অভিযানে (১৩০৬ খ্রী) দেবলাদেবী ধৃত হইলে গুজরাতে মুসলমানদের পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হয়। তৈমুরের আক্রমণের ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দিলে গুজরাতের শাসনকর্তা জাফর খাঁ মুজাফর খাঁ নামে (১৪০১-১১ খ্রী) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পৌত্র আহম্মদ শাহ্‌ (১৪১১-৪২ খ্রী) মালব, খান্দেশ ও অন্যান্য রাজপুত রাজাদের সহিত যুদ্ধ করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মামুদ বেগড়া (১৪৫৮-১৫১১ খ্রী) গিরনার ও চম্পানীর জয় করেন এবং ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের দিউ-এর নিকট নৌ-যুদ্ধে পরাস্ত করেন। বাহাদুর শাহ্‌ ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে মালব ও ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর জয় করেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের আমেদাবাদে প্রবেশে গুজরাতে মোগল আধিপত্য স্থাপিত হয়। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে গুজরাতের এক দুর্ভিক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় হয়। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ বালাজী বাজীরাও-এর অধীন হয়। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট ইংরেজদের অধীন হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রোচে ইংরেজ সৈন্য প্রবেশ করে।

গুজরাত

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়াদের পরাজয়ের ফলে ইংরেজরা ৭টি জেলা ও অসংখ্য স্বাধীন রাজ্যে গুজরাতকে বিভক্ত করে। ১৯০৫-১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গুজরাতে জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর গুজরাত ভারতের মধ্যে দুইটি রাজ্যে বিভক্ত হইল—'খ' পর্যায়ভুক্ত রাজপ্রমুখ-শাসিত সৌরাষ্ট্র ও 'গ' পর্যায়ভুক্ত কচ্ছ রাজ্য। পরে (১৯৫৬ খ্রী) রাজ্য পুনর্গঠন আইনে বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বিভাগের ফলে সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও বোম্বাইয়ের কিছু অংশ লইয়া নূতন গুজরাত রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে গুজরাত প্রদেশের লোকসংখ্যা ২০৬৩৩৩৫০। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১২ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৯০ জন) লোকের বাস। সর্বাপেক্ষা ঘন বসতি আমেদাবাদ এবং খেড়া অঞ্চলে। এই অঞ্চলে যথাক্রমে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৪৮ ও ২৮৫ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৬৬২ ও ৭৪০ জন) লোক বাস করে। সর্বাপেক্ষা কম বসতিপূর্ণ অঞ্চল কচ্ছ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৬ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৪২ জন)-এর বাস। প্রতি বর্গ মাইলে ৫০০-এর অধিক লোকের বাস বরোদা (৫০৭) ও সুরাটে (৫০৩)। ঘন বসতির কারণ প্রতি ক্ষেত্রেই শিল্পোন্নয়ন। দাঙ্গের অরণ্যাঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ১০৪ জন)-এর বাস। গুজরাতের শহরাঞ্চলে ৫৩১৬৬২৪ জন এবং গ্রামাঞ্চলে ১৫৩১৬৭২৬ জন বাস করে। মোট লোকসংখ্যার ১০৬৩৩৯০২ পুরুষ, ৯৯৯৯৪৪৮ জন স্ত্রীলোক। উপজীবিকা অনুসারে গুজরাতের জনসংখ্যা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। মোট জনসংখ্যার ৫৬৮৫৭৭৬ পুরুষ কর্মী, ২৭৮৮৮১২ স্ত্রী কর্মী। কর্মীদের মধ্যে ৪৫১৯০৬০ কৃষক, ১২৫২০০০ কৃষিকর্মে নিযুক্ত শ্রমিক, ১০৬৮৫০ খনিতে নিযুক্ত, ১০৯১৭৬৫ কারখানায় নিযুক্ত, ৯০০৪৩ জন গঠনমূলক কার্যে, ৪১১১৫৬ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে, ১৫৯০৬১ জন যানবাহন ও সংরক্ষণে এবং ৮৪৬৫৫৩ জন অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত।

১৯৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে মোট জমির ৯৩৯৭৪৫৮ হেক্টর (২৩২২০৮০০ একর) কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয় এবং ৮৯০২০৬৪ হেক্টর (২১৯০৬৭০০ একর) অকৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। অকৃষিকার্যে ব্যবহৃত জমির ১৮০৬১৩৬ হেক্টর (৪৪৬২৯০০ একর) কৃষিযোগ্য পতিত ও পশুচারণ ক্ষেত্র, ৭০৯৪৭১৫ হেক্টর (১৭৫৩০৮০০ একর) অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত হয়। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান ৫৩৩১৯২ হেক্টর (১৩১৭৫০০ একর), গম ৩৫৭৫১১ হেক্টর (৮৮৩৪০০ একর), বার্লি ৪৭৭৫ হেক্টর (১১৮০০ একর), ভুট্টা ২২২৫৪৫ হেক্টর (৫৪৯৯০০ একর), রাগি, জোয়ার, বাজরা ২৮৩৫০৮৫ হেক্টর (৭০০৫৪০০ একর), ছোলা ৫৭৬৭০ হেক্টর (১৪২৫০০ একর), ডাল ৩৬৯০৮৬ হেক্টর (৯১২০০০ একর), রাই, সরিষা, তিসি, তিল ১৪৪১১৪ হেক্টর (৩৫৬১০০ একর), তৈলবীজ ৭৬৪৪৮ হেক্টর (১৮৮৯০০ একর), তুলা ও অন্যান্য তন্তু ১৮১১৩৫৬ হেক্টর (৪৪৭৫৮০০ একর) ভূমিতে উৎপন্ন হয়।

গুজরাত প্রদেশের বনাঞ্চলকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১. আর্দ্র পত্র পতনশীল বন ২. শুষ্ক পত্র পতনশীল বন ৩. কাঁটা জাতীয় বৃক্ষ ৪. সমুদ্রোপকূলবর্তী বন। দক্ষিণ-পূর্বাংশে দাঙ্গ, রাজপিপলা এবং ছোট উদয়পুরের জঙ্গল উল্লেখযোগ্য। বাঁশ গাছের জন্য উত্তর গুজরাতের পালনপুর জঙ্গল খ্যাত। প্রদেশের মোট আয়তনের ৮·৬৬% অরণ্যাবৃত।

গুজরাতের বনাঞ্চলে বিশেষতঃ সংরক্ষিত গির অরণ্যের সিংহ বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত বাঘ, হরিণ, বন্যবরাহ, নীল গাই, লাঙ্গুর, বনবিড়াল, কাঠবিড়াল, সম্বর ইত্যাদি দেখা যায়।

গুজরাত প্রদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। সমগ্র গুজরাতে ১৯৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ৬·৯৯ কোটি, ৫·২৮ কোটি ও ৬·০১ কোটি টাকা মূল্যের খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয়। গুজরাত প্রদেশ ভারতের মধ্যে বক্সাইট, লবণ এবং অ্যাজেট উৎপাদনে প্রথম স্থান, চীনামাটিতে দ্বিতীয় এবং ক্যালসাইট উৎপাদনে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ আকর, চুনা পাথর, কোয়ার্টজ, ফেলস্পার, ডলোমাইট ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ফ্লুওরাইট নামক খনিজের বিরাট অংশ ভূ-পৃষ্ঠের নীচে দেখা গিয়াছে।

সম্প্রতি গুজরাতে খনিজ তৈল, স্বাভাবিক গ্যাস এবং কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আঙ্কলেশ্বর হইতে ক্যাম্বে পর্যন্ত ১৬১ কিলোমিটার বিস্তৃত খনিজ তৈলের একটি স্তর আছে। এই তৈলস্তর গড়ে মাটির ১০৫২ মিটার নীচে অবস্থিত। বরোদার নিকট মাত্র ২০০-৩০০ মিটার নীচে এবং আমেদাবাদ অঞ্চলে ১৩০০ মিটার নীচে তৈলস্তর পাওয়া গিয়াছে।

স্বাভাবিক গ্যাস ধোঘো, হাজাত, বরোদা এবং ঝাগদিয়া অঞ্চলে এবং লুনেজ, ক্যাম্বে এবং আঙ্কলেশ্বরের নিকট মাচভেজে পাওয়া যায়। আঙ্কলেশ্বরে বৎসরে ২০৪০ মেট্রিক টন (২০০০ টন) অপরিশোধিত তৈল উত্তোলিত হয়। এই তৈল বরোদা হইতে ১৩ কিলোমিটার

(৮ মাইল) দূরে অবস্থিত গুজরাতের কোয়ালী শোধনাগার খোলা পর্যন্ত ট্রম্বের শোধনাগারে পাঠানো হইত।

লিগনাইট জাতীয় কয়লা উমারশর নামক স্থানে পাওয়া যায়। গুজরাতে ১০৪০৪০০০ মেট্রিক টন (১০২০০০০০ টন) উৎপন্ন হয়। গুজরাত ভারতে উৎপাদিত বক্সাইট-এর শতকরা ৫৭ ভাগ উৎপন্ন করে। জামনগরের কল্যাণপুরে সর্বাপেক্ষা অধিক বক্সাইট পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া খেড়া, বানসকন্থা, সুরাট ও কচ্ছ জেলাতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানিজ পাঁচমহল এবং বরোদা জেলায় পাওয়া যায়— ২৯৭৮৪০০ মেট্রিক টন (২৯২০০০০ টন) উত্তোলিত হয়। তামা বানসকন্থা জেলার অম্বাজীতে, রাজকোট জেলার ভৈয়বদার নিকটে, বরোদা জেলায় এবং সঙখেদা তালুকের খান্দিযায় পাওয়া যায়। লৌহ আকর পাঁচমহল জেলার জামুঘোদা এবং নারুকোট অঞ্চলে দেখা যায়। ল্যাটেরাইট জাতীয় লৌহের আকর জামনগর, পোরবন্দর, জুনাগড, ভবনগর, কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রে প্রচুর পাওয়া যায়। সৌরাষ্ট্র, খেডা জেলা, রানাভাভ এবং আদিত্যনা অঞ্চলে প্রচুর চুনা পাথর আছে। রানাভাভে চক পাওয়া যায়। কেলাসিত চুনা পাথর বানসকন্থা এবং সবরকন্থা জেলায় আছে। মার্বেলপাথর বানসকন্থা জেলার অম্বমাতার ও পাঁচমহল জেলায় আছে। ফ্লুওরাইট বরোদায় এবং ক্যালসাইট সৌরাষ্ট্র, ভবনগর, রাজকোট, জুনাগড় ও জামনগর জেলায় পাওয়া যায়। জিপসাম পাওয়া যায় কচ্ছের রনে। ইহা ছাড়াও গুজরাতে কাচ নির্মাণে প্রয়োজনীয় বালি ও কোয়ার্টজ বরোদা ও পাঁচমহল জেলায় পাওয়া যায়। বেলে পাথর হাতমতী নদীগর্ভে পাওয়া যায়। অ্যাজবেস্টস ও স্টিয়াটাইট সবরকন্থা জেলার দেবমোরী কুণ্ডলে দেখা যায়। লবণ পাওয়া যায় ধরসেনা ও মাগোদ হইতে। সমগ্র গুজরাতে গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বেলে পাথর হিম্মৎনগরে পাওয়া যায়।

গুজরাত প্রদেশের শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের স্থান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রদেশের ৮৭৫টি বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠানে ২০১২৫৮ শ্রমিক অর্থাৎ মোট শ্রমিকের ৫৬·৯৭% নিযুক্ত আছেন। বস্ত্রশিল্পের পরেই কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল শিল্প উল্লেখযোগ্য।

এই প্রদেশে ১৩৫৭·৫৯১ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ও খরচা হয় ১১৩৮·৯৯৭ কিলোওয়াট।

বরোদায় প্রাপ্ত বালি ও কোয়ার্টজের উপর নির্ভর করিয়া কাচশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। খেড়া জেলার চুনা পাথরের জোগান হইতে সেভালিয়া এ.সি.সি. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি সিমেন্টের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পোরবন্দর, দ্বারকা ও জামনগরে সিমেন্টের কারখানা আছে। গুজরাতে তিনটি সোডা-অ্যাশ তৈয়ারির কারখানা আছে। ধারঙ্গাদরায় রাসায়নিক কারখানা, মিঠাপুরে ও পোরবন্দরে টাটার রাসায়নিক শিল্প বিখ্যাত। বড়পাদিতে কাগজের কল আছে।

গুজরাত প্রদেশে সুরাটের নিকট তাপ্তী নদীতে ৬২১ মিটার (২০৩৮ ফুট) দীর্ঘ কাকরাপাব বাঁধ হইতে ২২৭৫৪৩ হেক্টর (৫৬২২৫০ একর) জমিতে জলসেচ হইবে। উকাই, কাদানা ও নর্মদায়র বাঁধ হইতে ৪৩৭০৬৮ হেক্টরে (১০৭৯৯৮০ একর) জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। মাহী নদীতে বাঁধ দিয়া ১৮৬১৬২ হেক্টরে (৪৬০০০০ একর) জলসেচ হইবে। এইরূপ আরও বাঁধের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

গুজরাতের মৎস্যের ব্যবসায় অত্যন্ত উন্নত। প্রায় ৭৬৫০০ মেট্রিক টন (৭৫০০০ টন) মৎস্য প্রতি বৎসর ধরা হয়। তন্মধ্যে ৮৫% অন্যান্য প্রদেশে প্রেরিত হয়।

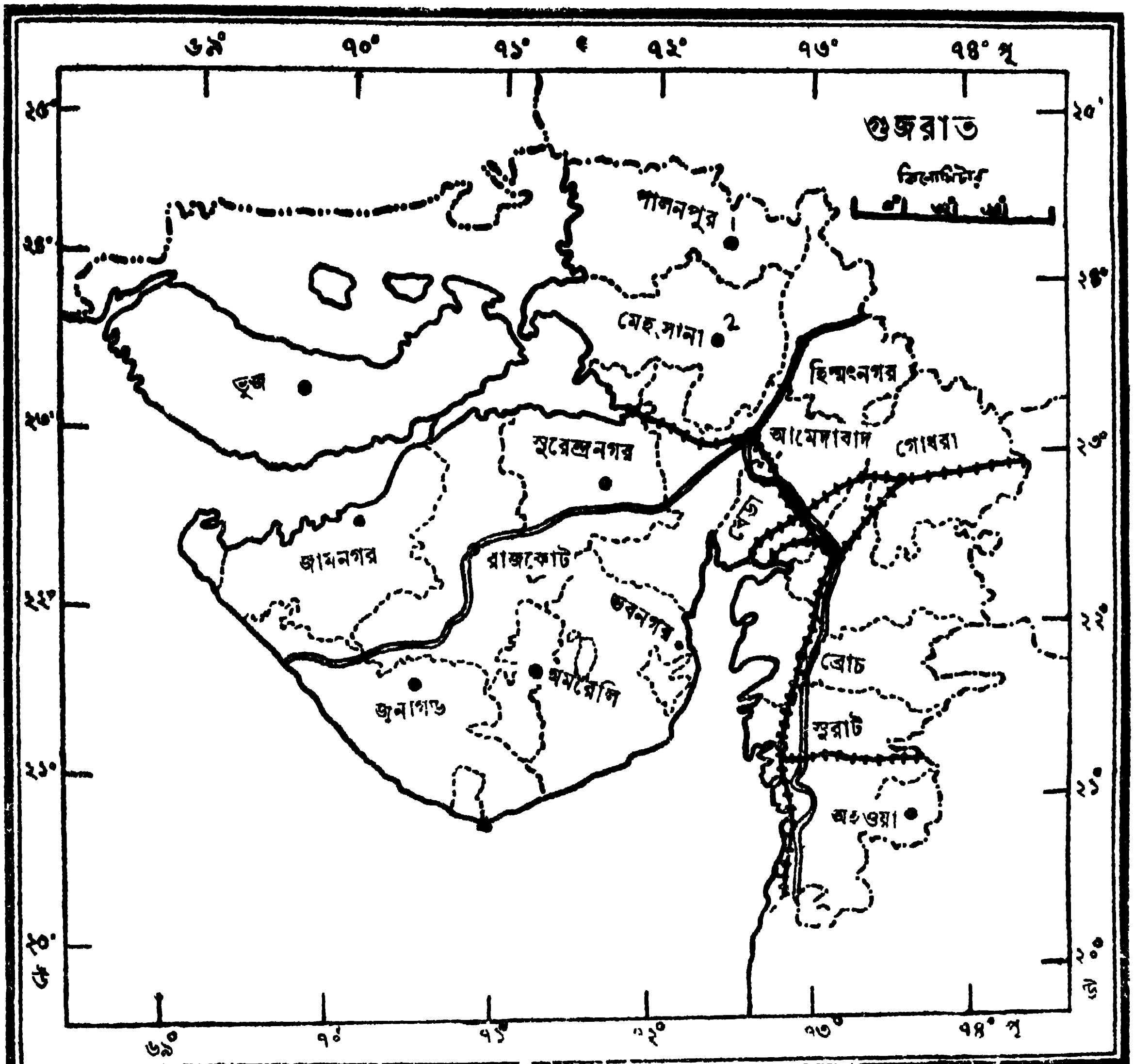
সমগ্র গুজরাত প্রদেশে পশ্চিম রেলপথের ৫৩৬২ কিলোমিটার (৩৩১৬ মাইল) রেলপথ আছে। প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে ৩ কিলোমিটার রেলপথ আছে। এই প্রদেশে মোটর যাতায়াতের উপযোগী ১১৯৩২·৩৫ কিলোমিটার রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা ১১৩৬৭ কিলোমিটার (৭০৪৯ মাইল) এবং কাঁচা রাস্তা ১১৩৭৯ কিলোমিটার (৭০৭১ মাইল)। প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা আছে। গুজরাতে কোনও জাতীয় সড়ক নাই।

গুজরাতে ৫০টি মাঝারি ধরনের ছোট বন্দর আছে। ১৩টি বন্দরে স্টিমার চলাচলের ব্যবস্থা আছে। বেদী, নবলক্ষ্মী, সিক্কা, ওখা এবং ভবনগর সারা বৎসরই খোলা থাকে।

আমেদাবাদের বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। ইহা ভিন্ন জামনগরে (২২°২৭´ উত্তর ও ৭০°৭´ পূর্ব ; 'জামনগর' দ্র) সামরিক বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে।

গুজরাত প্রদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৮·৮০%। সমগ্র প্রদেশে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৫৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭৪০০ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় আছে। গুজরাত প্রদেশের ভাষা গুজরাতী।

গুজরাত প্রদেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতই বহু উৎসব হয়। এই উৎসবগুলিতে ১৭৭১টি মেলা হয় ও তাহাতে ২৩২৮৩৮২ লোকের সমাগম হয়। গুরুপূর্ণিমা, নবরাত্রি, শিবরাত্রি, সাবিত্রী পূর্ণিমা, গণেশ চতুর্থী, জন্মাষ্টমী, ত্রিপুরী



পূর্ণিমা, মকর সংক্রান্তি, হোলী, রামনবমী, নাগপঞ্চমী, ভীম একাদশী, রথযাত্রা ইত্যাদিতে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গুজরাতের নবরাত্রি বা নয়রাত্রির উৎসব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব। এই উৎসব বৎসরে চারবার—আষাঢ়, আশ্বিন, মাঘ ও চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বিখ্যাত গরবা নৃত্যে নৃত্যকারীরা কখনও জোড়ে কখনও দলবদ্ধভাবে একটি বাতির চতুর্দিকে বৃত্তাকারে নৃত্যসহকারে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই বাতি অনন্ত শক্তির প্রতীক স্বরূপ। এইসব গরবা গানে কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলা গীত হয়। দণ্ডিয়া রাসে ঘুঙুর বাঁধা লাঠির ব্যবহার হয়। জনম পঞ্চাই, অষ্টাহ্নিকা, কার্তিক পূর্ণিমা, ওলি, মৌন একাদশী এবং মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে জৈনদের প্রধান উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

গুজরাতের বহু দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: সবরমতী নদীর তীরে আমেদাবাদ (২৩°২′ উত্তর ও ৭২°৩৮′ পূর্ব)। ইহা গুজরাতের সাময়িক রাজধানী ও প্রধান শহর। এখান হইতে ২৪ কিলোমিটার (১৫ মাইল) দূরে গান্ধীনগরে স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হইবে ('আমেদাবাদ' দ্র)।

আমেদাবাদের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত বরোদা (২২° উত্তর, ৭৩:৩০ পূর্ব) গুজরাতের দ্বিতীয় বৃহত্তম

শহর। ইহার লোকসংখ্যা ২৯৮৩৯৮ জন। ইহা মারাঠা রাজা গায়কোয়াডদের রাজধানী ছিল ('বরোদা' দ্র)।

ব্রোচ নর্মদা নদীর মোহানায় (২১°৪১' উত্তর এবং ৭৩°১' পূর্ব) অবস্থিত প্রাচীন শহর ; লোকসংখ্যা ৬৩৮৪০ জন। একদা ব্রোচ বর্ধিষ্ণু বন্দর ছিল। পেরিপ্লাসে বারুগজ নামে তাহার উল্লেখ আছে। পূর্বে এই বন্দরের সহিত রোমের ও অন্যান্য এশীয় ও ইওরোপীয় বন্দরের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। এখানে ভৃগু মুনির মন্দির আছে।

সুরাট (২১°১২' উত্তর এবং ৭২°৫২' পূর্ব) তাপ্তী নদীর মোহানায় অবস্থিত ভারতের পশ্চিম উপকূলের একটি বন্দর ('সুরাট' দ্র)।

পোরবন্দর (২১°৩৭' উত্তর এবং ৬৯°৪৯' পূর্ব) গান্ধীজীর জন্মস্থান ও বন্দর। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান লাইট হাউস, অশ্ববতী ঘাট, বাজরাজী, আর্যকন্যা, গুরুকুল, কীর্তিমন্দির ইত্যাদি।

ওখা আরব সাগরের তীরে দ্বারকার সহিত রেলপথে যুক্ত বিখ্যাত বন্দর। ওখেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ওখা হইতে ৪৩৫০১১ মেট্রিক টন (৪২৬৪৮১ টন) পণ্য রপ্তানি হয়।

দ্বারকা (২২°১৪' উত্তর এবং ৬৯°১' পূর্ব) আরব সাগরের তীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ('দ্বারকা' দ্র)।

প্রধান শহর (১৯°৫২' উত্তর এবং ৮২°৫৯' পূর্ব ; 'জুনাগড়' দ্র) জুনাগড় জেলায় গিরনার বা রৈবতক পর্বত মহাভারত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ('গিরনার' দ্র)। গিরনার পর্বতের নিকটে দাতার পাহাড় মুসলমানদের তীর্থস্থান।

প্রভাস পত্তনে দ্বারকা হইতে ৬৪ কিলোমিটার (৪০ মাইল) দূরে সোমনাথের মন্দির হিন্দুদের তীর্থস্থান। বর্তমানের মন্দির ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অহল্যাবাঈ কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন মন্দির তৈয়ারি শুরু হয়। প্রভাস বৌদ্ধ তীর্থ হিসাবেও উল্লেখযোগ্য।

রাজকোট (২২°১৮' উত্তর, ৭০°৫৬' পূর্ব) পূর্বে সৌরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এখানে একটি ভাল হ্রদ আছে। লোকসংখ্যা ১৯৪১৪৫, রাজকোটে বিমানকেন্দ্রও নির্মিত হইয়াছে।

কানড্‌লা কচ্ছ উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি নবনির্মিত পোতাশ্রয়। ইহা দিশার সহিত রেলপথে যুক্ত। এক্ষণে খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে ('কানড্‌লা' দ্র)।

ভবনগর ক্যাম্বে উপসাগরের পশ্চিম কূলে একটি খাঁড়ির ভিতর অবস্থিত। ছোট স্টিমার আসিতে পারে কিন্তু বড় স্টিমার ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) দূরে নঙ্গর করে। লোকসংখ্যা ১৭৬৪৭৩ জন।

ভুজ (২৩°১৫' উত্তর, ৬৯°৪৯' পূর্ব) পূর্বতন কচ্ছ রাজ্যের রাজধানী ছিল।

দ্র Superintendent of Government Printing, Calcutta, *Imperial Gazetteer of India, Provincial Series*, Calcutta, 1909 ; K. M. Munshi, *Glory that was Gurjara Desa*, parts I & II, Bombay, 1955 ; R. K. Trivedi, Superintendent of Census, Gujarat, *Census of India 1961*, vol. V, part I-A(i), Delhi, 1965 ; R. K. Trivedi, Superintendent of Census, Gujarat, *Census of India 1961*, vol V, part VII-B, fairs and festivals ; National Council of Applied Economic Research, *Techno Economic Survey, Gujarat*, New Delhi, 1961 ; *Souvenir of the 66th Session of Indian National Congress*, part III, Bhabanagar, January, 1961 ; Sankar Sengupta and K. D. Upadhyay, ed., *Studies in Indian Folk Culture, Folk Songs, Folk Arts and Folk Literature*, Calcutta, 1964.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গুজরাতী ভাষা গুজরাত-কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে কথিত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা। রাজস্থানী ভাষা, বিশেষতঃ মাড়বারী ভাষার সহিত এই ভাষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী ও প্রাচীন গুজরাতী অভিন্ন ছিল। সাধারণ গুজরাতীর (আমেদাবাদ) তুলনায় পারসীদের গুজরাতীতে (বোম্বাই) আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার একটু বেশি এবং ব্যাকরণগত অল্পস্বল্প পার্থক্যও আছে। ইহা ছাড়া কাথিয়াওয়াড়ী ভাষারও কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। সিন্ধীর মত নিপীড়িত (recursive) ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহার ; স-কে হ-রূপে উচ্চারণ ; অগ্ন, অগ্নি, অই>এ্যা ; মারাঠীর মত পুং স্ত্রী ও ক্লীব লিঙ্গের ব্যবহার ; তির্যক বিভক্তি একবচনে (পুং লিঙ্গে)-আ, বহুবচনে (সাধারণভাবে)-ও, + কর্মসম্প্রদানে-নে, সম্বন্ধে—নোঁ,—নী, নুঁ, অপাদানে—থী, অধিকরণে—মাঁ ; বাংলার 'আছে'-র মত 'ছে'-র প্রয়োগ ; পশ্চিমা পাঞ্জাবী ও কিছু কিছু রাজস্থানী ভাষার মত ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদে স্-এর ব্যবহার—হুঁ উতরীশ্, অমে উতরীশুঁ, তু উতরশে, তমে উতরশো, তে উতরশে, তেও উতরশে ; ইত্যাদি

গুজরাতী সাহিত্য

এই ভাষার বৈশিষ্ট্য। দেবনাগরী হইতে কিছু পৃথক ইহার নিজস্ব লিপি আছে। এই ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। নরসিংহ মহতা (১৪১৫-৮১ খ্রী) এই ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ইঁহার রচনা বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তুলনীয়।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IX, part II, Calcutta, 1908; S. K Chatterjee, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

গুজরাতী সাহিত্য অদ্য হইতে প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে গুজরাতী সাহিত্যের উৎপত্তি ঘটে। অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত এই ভাষা চালুক্য রাজগণের সময় হইতেই সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে এবং ইহার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। এই দেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই গুর্জর অপভ্রংশ আধুনিক গুজরাতী রূপ লাভ করে এবং মারোয়াড়ী নামে ইহার একটি অপ্রচলিত শাখার উৎপত্তিও এই সময়ে। গুজরাতী সাহিত্য বিশিষ্ট রূপ লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজের ঐতিহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করে। এই পরিবর্তন চরম রূপ লাভ করে ১২৫০ হইতে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। প্রেমানন্দের (১৬৩৬-১৭৩৪ খ্রী) পর হইতে গুজরাতী ভাষা আধুনিক রূপও লাভ করিয়াছে। নরসিংহ এবং ভালণের সময়ে যে বিশিষ্ট ধারার সূত্রপাত, অখো, প্রেমানন্দ এবং দয়ারামের রচনায় তাহার পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে গুজরাতী সাহিত্যে আধুনিক যুগের আরম্ভ।

আচার্য হেমচন্দ্র (১০৮৯-১১৭৩ খ্রী) তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে বিশদ উদাহরণসহ অপভ্রংশের ব্যাকরণেরও আলোচনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের দোহাতে গুজরাতী ভাষার সূচনা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। হেমচন্দ্রের পর হইতে গুজরাতী সাহিত্যের উপর সংস্কৃত এবং প্রাকৃত গাথার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, জৈন ধর্মের প্রভাবও প্রবল। এই যুগে রামচন্দ্র, সোমেশ্বর বস্তুপাল এবং তেজপাল প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে এমন লেখকেরও সন্ধান মেলে যাঁহারা সমসাময়িক চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। ‘স্থূলিভদ্র ফাগু’ (১৩৩৪ খ্রী) এবং ‘বসন্তবিলাস’ (আনুমানিক ১৩৫০ খ্রী) ইত্যাদি ‘ফাগু’ জাতীয় কাব্য এই সময়ে রচিত হয়। ‘নেমিনাথ চতুষ্পদিকা’ (১২৬৯ খ্রী) নামক ক্ষুদ্র কবিতা (eclogue) এবং ‘রেবন্তগিরি রাস’ (১২৩১ খ্রী) নামক রাস কাব্য এই যুগেরই সৃষ্টি। রাসের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ঐতিহাসিক ‘প্রবন্ধ’ লিখিবার প্রচেষ্টাও স্মরণীয়, ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ পদ্মনাভের ‘কান্হডদে প্রবন্ধ’ (১৪৫৬ খ্রী)।

পদ্মনাভের ‘কান্হড়দে প্রবন্ধ’ শুধু সাহিত্যমূল্যের দিক দিয়া নহে, ভাষাতত্ত্বের বিচারেও বিশেষ স্মরণীয়। ইহার পর হইতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হিন্দু প্রাধান্যের (অথবা অ-জৈন প্রাধান্য) যুগ বলা যাইতে পারে। নরসিংহ (১৪১৪-৮০ খ্রী), মীরা (আনুমানিক ১৪৯৮-১৫৪৬ খ্রী), দয়ারাম (১৭৭৭-১৮৫২ খ্রী), প্রীতমদাস এবং প্রেমসখী কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য লিখিয়াছেন। মীরার সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, দয়ারামের গীতিময়তা ও লাবণ্য, নরসিংহের ভাষাসমৃদ্ধি গুজরাতী সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। ক্রমে ‘আখ্যান’ নামক একটি নূতন কাব্যরূপ উদ্ভূত হয়। ইহা রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের বাহন হইয়া ওঠে। ভালণ (পঞ্চদশ শতাব্দী) এই আখ্যান কাব্যের স্রষ্টা। বাণের কাদম্বরীর তিনি একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করেন। তাঁহার পর ‘আখ্যান’কাব্যকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন নাকর, বিষ্ণুদাস এবং বিশ্বনাথ। এই শাখার প্রধান কবি প্রেমানন্দ (১৬৩৬-১৭৩৪ খ্রী)। সামাজিক রীতি নীতি এবং বাস্তব চিত্রণের জন্যও এই ‘আখ্যানগুলি’ বিশেষভাবে মূল্যবান। গল্পের আকর্ষণ থাকায় প্রেমানন্দ প্রমুখের আখ্যান কাব্য জনশিক্ষার বাহন হইয়া ওঠে। অবশ্য নরসিংহ, দয়ারাম প্রমুখ গীতি কবি অথবা ভালণ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি আখ্যায়িক কাব্য লেখক যে কেবল ধর্মের কথাই বলিয়াছেন তাহা নহে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাতেই হউক, তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের সৌন্দর্যের গানও গাহিয়াছেন। এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাতের সময়ে ভজন, গরবি এবং গরবা, ছপ্পা এবং বাত (পদে) (রোমান্টিক কাহিনী) প্রভৃতি হইতে গৃহীত হাজার হাজার শব্দ লোকের মুখে মুখে ফিরিত। জনপ্রিয় এবং কিয়দংশে আখ্যানজাতীয় এক ধরনের রোমান্টিক কাহিনী জৈন প্রাধান্যের সময় হইতে গুজরাতী সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। পদ্যে এই জাতীয় কাহিনী রচনায় শামল (১৬৯৯-১৭৬৯ খ্রী) সারল্য এবং সাবলীলতায় অদ্বিতীয়।

মধ্যযুগের গুজরাতী কবিগণ তাঁহাদের ভাবনা চিন্তা পদ্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন— সামাজিক কুপ্রথা এবং ভণ্ডামিকে তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এইসব কবির মধ্যে প্রধান হইলেন অখো।

মধ্যযুগের গুজরাতী সাহিত্যের প্রধান সম্পদ হইল

নরসিংহ এবং মীরার ভজন। ভালণের 'কাদম্বরী', অখোর 'ছপ্পা', 'অখে-গীতা', প্রেমানন্দের কাহিনী-কাব্য 'নলাখ্যান', 'কুবের-বাই-নু মামেরু', 'সুদামা চরিত্র', 'ওখা-হরণ' এবং 'দশম স্কন্ধ'। এতদ্ব্যতীত স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের বিবিক্ত-সেবীগণের শান্ত-মধুর গীতাবলী এবং দয়ারামের আনন্দোচ্ছল গরবি ঐ যুগের সাহিত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন।

এইসব কথা স্বীকার করিলেও সামগ্রিক বিচারে মধ্যযুগের গুজরাতী সাহিত্যে বৈদগ্ধের লক্ষণ সংকীর্ণ, এবং বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন বিকাশের সুযোগ অনুপস্থিত। কল্পনাও তখন অবাধ স্ফূর্তি লাভ করে নাই। এ যুগের সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব প্রবল ও পরিব্যাপ্ত।

আধুনিক গুজরাতী সাহিত্য. ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুদয় এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে গুজরাত প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার সংকীর্ণতার বিষয়ে সচেতন হইল। কুসংস্কার যে দেশের সর্বত্র বদ্ধমূল ইহা সকলে হৃদয়ংগম করিল। সুতরাং এই পর্বে প্রধান চেষ্টা হইল নূতন শিক্ষাধারার প্রসার এবং তাহার সাহায্যে ধর্ম ও সমাজের সংস্কার সাধন। সাহিত্যিকেরা এই উদ্দেশ্যে সকল উদ্যম নিয়োগ করিলেন। দলপতরাম এবং তাঁহার সহযোগীগণ গুজরাতী ভাষাকে এমন এক সর্বজনীন রূপ দিলেন যাহা সহজেই সকলের নিকট গ্রহণীয় হইল। তাঁহারা সুষম ছন্দোরীতি গড়িয়া তুলিলেন। 'নর্মকোষ' (গুজরাতী অভিধান, ১৮৭৩ খ্রী) -প্রণেতা কবি নর্মদকে জাতীয় চেতনার উদ্গাতা বলা যাইতে পারে। নবলরাম সাহিত্য, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তা ও অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। নর্মদ এবং নবলরামের যুগ্ম প্রচেষ্টায় গুজরাতী গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয়। নর্মদের বিবিধ সাহিত্য-পরীক্ষা, রণছোড়ভাই ও নবলরামের নাটকাবলী, নন্দশংকরের উপন্যাস 'করণ ঘেলো' (১৮৬৬ খ্রী) ইত্যাদির মূল সুর হইল সমাজের পুনরুজ্জীবন। উপরি-উক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে প্রশংসনীয় রচনাশৈলীর জন্য কয়েকটি কবিতা, একটি কি দুইটি নাটক এবং 'করণ ঘেলো'র নাম উল্লেখ করা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থটি গুজরাতী ভাষায় লিখিত প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। পরবর্তী পর্ব অর্থাৎ 'পণ্ডিত যুগের' (১৮৮৫-১৯২০ খ্রী) তুলনায় এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: এই যুগের লেখকগণ সাধারণ পাঠক এবং সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে প্রার্থনাসমাজ, আর্যসমাজ এবং থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রচেষ্টায় দেশের মধ্যে ধর্মের প্রভাব সুদৃঢ় হইল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জাগিল স্বাজাত্যবোধ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পঠন পাঠনের ফল দেখা দিল এবং ইংরেজী কাব্য ও সেই সূত্রে ইংরেজী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রভাব দেশীয় সাহিত্যে ফলপ্রসূ হইল।

নরসিংরাও (১৮৫৯-১৯৩৭ খ্রী), কন্ত, কলাপি, নানালাল, (১৮৭৭-১৯৪৭ খ্রী), খবরদার, ঠাকোর এবং অন্যান্য কবির কাব্যে পাওয়া গেল মাধুর্য, বিস্ময় এবং সমুন্নত ভাব। তাঁহারা আনিলেন গীতিকবিতা, কাহিনীমূলক গীতিকবিতা, এলিজি, সনেট প্রভৃতি কবিতার বিচিত্র রূপ। সনেট, ভজন এবং গান ইত্যাদি বিচিত্র ধারায় তাঁহারা প্রাণের আবেগকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। সংস্কৃত অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইলেন কেশবলাল ধ্রুব। রমণভাই নীলকণ্ঠ লিখিত 'রাইনো পর্বত' (১৯১৬ খ্রী) নাটকে সংস্কৃত ও ইওরোপীয় নাট্যরীতির সমন্বয় দেখিতে পাই এবং উক্ত নাটকটি অভিনয়যোগ্য গুজরাতী নাটকের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই পর্বে বহু বিশিষ্ট গদ্য লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, যেমন মণিলাল, গোবর্ধনরাম, নরসিংরাও, কেশবলাল ধ্রুব, রমণভাই নীলকণ্ঠ, আনন্দশংকর এবং ঠাকোর। গোবর্ধনরামের (১৮৫৫ ১৯০৭ খ্রী) চারি খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস 'সরস্বতীচন্দ্র' এবং নানালালের 'জয়াজয়ন্ত', 'ইন্দুকুমার', 'বিশ্বগীতা' প্রভৃতি নূতন ছন্দে রচিত কাব্য নাট্যসমূহ এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি। নানালালের বর্ণাঢ্য রোম্যান্টিকতায় আমরা পাইলাম চিত্রকল্পের সমৃদ্ধি, শব্দপ্রয়োগে অভিনবত্ব এবং ছন্দের অননুকরণীয় মাধুর্য। এই যুগের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মণিখণ্ড হইল 'সরস্বতীচন্দ্র'— খুব সম্ভব সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে ইহা অদ্বিতীয়। 'সরস্বতীচন্দ্রে' ঊনবিংশ শতাব্দীর গুজরাতী সমাজ-জীবন নিপুণভাবে বর্ণিত এবং তাহার সঙ্গে প্রতিফলিত হইয়াছে জাতির তৎকালিক আশা-আকাঙ্ক্ষা।

যদিও এই যুগের সাহিত্য সাধারণ মানুষের জীবন হইতে কিয়দংশে বিচ্ছিন্ন, তাহা হইলেও এই সাহিত্য-সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। দার্শনিক চিন্তা, মননশীলতা ও সমাজহিতকর রচনার উন্মেষ এই সময়ে। নিঃসন্দেহে গোবর্ধনরাম এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় হইতে গুজরাতে জাতীয় এবং রাজনৈতিক চেতনা সুদৃঢ় হইল। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি বিদ্বেষ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে উগ্রপন্থা বৃদ্ধি পাইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী দেশবাসীর হৃদয় জয় করিলেন। এতদিনে জাতীয় কর্মধারা একটি সর্বজনীন অথচ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল। এই পর্বের ঔপন্যাসিক মুন্সী এবং রমণলালের রচনাও সহজ সাবলীল

ও সাধারণের রুচির উপযোগী। মেঘানির প্রচেষ্টায় লোকসাহিত্যও সাহিত্যে পাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া গণ্য হইল এবং ইহার প্রভাবও বিস্তৃত হইতে লাগিল। পল্লীজীবনের দৈন্য ও সৌন্দর্যের নিপুণ চিত্রণ দেখিতে পাই ধূমকেতুর ছোট গল্পে, চন্দ্রবদন মেহ্‌তার 'অগগাদি' নাটকে এবং পান্নালালের উপন্যাসে। উপন্যাসে রমণলাল দেশাই, ছোটগল্পে ধূমকেতু এবং আর. ভি পাঠক, প্রবন্ধে কালেলকর, ভুরকল, যতীন্দ্র দবে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিজয়রাজ বৈদ্য, বিশ্বনাথ ভট্ট, বিষ্ণুপ্রসাদ ত্রিবেদী প্রমুখের সাহিত্য সমালোচনায় রসবোধের সহিত সৌন্দর্যতত্ত্বের সুচারু সমন্বয়ের ফলে উহা মৌলিক রূপ ধারণ করিয়াছে।

সুন্দরম এবং উমাশংকরের কাব্যে এই যুগের চিন্তা-ভাবনার সহিত ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে। এই পর্বের অগ্রণী কবি এই দুই জন। সূক্ষ্ম এবং মহৎ ভাবের সঙ্গে নিখুঁত শৈলীর সমাবেশ উমাশংকরের কাব্যে লক্ষণীয়। তাহার কাব্যসাধনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় হইয়াছে বলা যায়। সুন্দরম-এর বাস্তবতাবোধ আরও প্রখর, উহা আরও প্রবল। কিন্তু তাঁহার কাব্য-সাধনার দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালে তিনি শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদে অভিনিবিষ্ট। মনসুখলাল ঝাবেরি এবং বেতাই এ যুগের দুই জন বিশিষ্ট কবি।

আলোচ্য পর্বের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তি হইলেন গান্ধীজী। তাহার রচনাশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জলতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য। গান্ধীজীর অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার আত্মজীবনী বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। ভাষাগত ঐশ্বর্য ছাড়াও আত্মজীবনীতে বর্ণিত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তো আছেই। সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন: প্রবন্ধকার কালেলকর, দার্শনিক মসরুওয়ালা, দিনপঞ্জী-লেখক মহাদেবভাই, সমালোচক রামনারায়ণ পাঠক, জৈন পণ্ডিত ও চিন্তানায়ক সুখলালজী। মহাদেবভাই এর একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত দিনপঞ্জী, মসরুওয়ালার 'সমূলি ক্রান্তি (পূর্ণ বিপ্লব)' এবং 'দর্শকে'র উপন্যাসাবলী চিন্তা-উদ্দীপক। যুগ-ধর্মকেও উহারা পরিস্ফুট করিয়া তোলে। তাঁহাদের রচনাবলী আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যকে আরও ভাস্বর করিয়াছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে নূতন কাব্যসৃষ্টিতে সমসাময়িক ইওরোপীয় কাব্যের আধুনিকতার অনুকরণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অবশ্য ঐতিহ্য, রোম্যান্টিকতা এবং আদর্শবাদের প্রভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই। হৃদয়গ্রাহী ভাষায় রচিত আবেগপ্রবণ কাব্য এখনও চোখে পড়ে। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ আধুনিকতারই যুগ। নূতন মনস্তত্ত্বের নামে শৈলীগত শৈথিল্য, অস্তিবাদের নামে অরাজকতা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণভাবে বলা চলে বিষয়বস্তু ও পারিপার্শ্বিকের দিক দিয়া, জীবন-সত্যের নৈকট্য ও বিন্যাসরীতির নূতনত্বে উপন্যাস, ছোটগল্প এবং একাঙ্কিকা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে চুনিলাল মদিয়ার রচনায় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গুলাবদাস ব্রোকার হইলেন এই যুগের একজন বিশিষ্ট গল্পলেখক। নাট্যকার রূপে শিবকুমার যোশীর সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: এ. এম. বাওয়াল, এম. জে ঝাবেরি, উমাশংকর যোশী, ভোগীলাল সন্দেশরা, কে. বি. ব্যাস, যশোবন্ত শুক্ল এবং সুরেশ যোশী। ইহাদের প্রভাব বিদ্যাচর্চা এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে অধিকতর পরিলক্ষিত হইতেছে। উমাশংকর যোশী প্রমুখের মত রাজেন্দ্র শাহের কাব্যে পুরাতন রোম্যান্টিকতার সহিত নব্য বাস্তবতার সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। 'গজল' এখন খুব জনপ্রিয়।

আমাদের চতুর্দিকে নিবিড় আঁধারকে দূর করিবার ব্যাপারে আলোকরশ্মি (তাহা যতই ক্ষীণ হউক না কেন) দেখা যাইতেছে। এমন সংগ্রামী মানুষও আছেন যিনি আদর্শের জন্য অনায়াসে প্রাণবিসর্জন দিতে পারেন। এমন এক দর্শনের অভ্যুদয় হইতেছে যাহা সব অপূর্ণতা ও মালিন্য দূর করিয়া জীবনকে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। নব জীবনধারা যে রকমই হউক না কেন এ কথা নিশ্চিত যে ইহা হইতে গুজরাতী প্রবন্ধ, সমালোচনা, জীবনী, কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখা সৌন্দর্য ও মনস্বিতার নব নব শিখরে আরোহণ করিবে।

দ্র Narasimharao Divatia *Gujarati Language and Literature*, vols. I-II, Bombay, 1921; Sahitya Akademi, *Contemporary Indian Literature*, New Delhi, 1957, Suniti Kumar Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

বিষ্ণুপ্রসাদ রণছোড়লাল ত্রিবেদী

গুটিপোকা বিভিন্ন পতঙ্গের শুককীট রূপান্তরের এক বিশেষ পর্যায়ে রেশমগ্রন্থি (সিল্ক গ্ল্যাণ্ড) নামে একজোড়া বিশেষ গ্রন্থি হইতে রস ক্ষরণ করে। এই রস বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া কঠিন সুতার মত তন্তুতে পরিণত হয়।

শুককীট নিজ দেহের চারিদিকে এই তন্তু বুনিয়া ডিম্বাকার আবরণী বা গুটি (কোকুন) প্রস্তুত করে, এই গুটির দ্বারা বেষ্টিত কীটটিকেই গুটিপোকা বলে। গুটির মধ্যে কিছুদিন নিশ্চল অবস্থায় থাকিবার পর গুটিপোকাটি পূর্ণাবয়ব পতঙ্গে রূপান্তরিত হয় এবং গুটি কাটিয়া বাহিরে আসে।

কয়েক প্রকার গুটিপোকার গুটির তন্তু হইতে রেশম, মুগা, তসর, এণ্ডি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এইজন্য বিভিন্ন প্রকার গাছে এই সকল গুটিপোকার চাষ করা হয়। গাছের পাতা খাইয়া শুককীটগুলি বড় হয় ও গুটি প্রস্তুত করে। গুটি কাটিয়া বাহির হইবার পূর্বে ফুটন্ত জলে উহাকে মারিয়া গুটি হইতে তন্তু বাহির করিয়া লওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বোম্বিসিদী গোত্রের (Family-Bombycidae) অন্তর্ভুক্ত বোম্বিক্স মোরি (*Bombyx mori*) নামক প্রজাতির গুটিপোকা হইতে রেশম, সাতুর্নিইদী গোত্রের (Family-Saturniidae) অন্তর্ভুক্ত আন্থেরীয়া মিলিত্তা (*Antheraea mylitta*) প্রজাতির গুটিপোকা হইতে তসর, ঐ একই গোত্রের আনথেরীয়া আস্সামা (*Antheraea assama*) নামক গুটিপোকা হইতে মুগা এবং সমগোত্রীয় আস্তাকস রিসিনি (*Attacus ricini*) প্রজাতির গুটিপোকা হইতে এণ্ডি উৎপন্ন হয়। 'এণ্ডি', 'তসর', 'মুগা' ও 'রেশম' দ্র।

দ্র A. D. Imms, *A General Text-Book of Entomology* London, 1946.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গুড় আখ, তাল, খেজুর, সাগু ও নারিকেল গাছের রস জাল দিয়া রসের রূপান্তর ঘটাইলে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহাই গুড়। গুড় প্রয়োজন মত পাতলা, ঘন বা শক্ত তৈয়ারি করা যায়, তবে আখের গুড় সাধারণতঃ পাতলা করা হয় না, ঘন দানাদার অথবা শক্তই ব্যবহৃত হয়। পাতলা তাল ও খেজুর গুড়কে পয়রা গুড় এবং শক্ত তাল ও খেজুর গুড়কে পাটালি বলে। গুড় উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে আখপেষা যন্ত্রে আখ পিষিয়া, তাল সাগু ও নারিকেল গাছের মোচার অগ্রভাগ খুব মিহি করিয়া কাটিয়া এবং খেজুর গাছের মাথার নরম অংশ চাঁছিয়া রস বাহির করিতে হয়। গাছ হইতে নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের তাপে রসে অম্লত্ব ঘটিতে থাকে, তৎক্ষণাৎ পরিমাণমত চুন মিশাইয়া ইহা রোধ করা যায়। পরে গুড় করিবার জন্য জ্বালে চাপাইবার আগে অ্যাসিডের সাহায্যে এই চুন অংশ বাদ দিয়া লইতে হয়। এক কিলোগ্রাম গুড় উৎপাদন করিতে কম-বেশি ৭ কিলোগ্রাম আখের রস, ৮ কিলোগ্রাম তালের রস, ১০ কিলোগ্রাম খেজুর রস, ৯ কিলোগ্রাম সাগুর রস বা ৬ কিলোগ্রাম নারিকেলের রস লাগে। ভারতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন আখের গুড় ও প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন তাল, নারিকেল, সাগু ও খেজুরের গুড় উৎপন্ন হয়।

স্মরণাতীত কাল হইতেই বাংলা দেশে আখ, খেজুর ও তালের এবং দক্ষিণ ভারতে আখ, তাল, নারিকেল ও সাগুর গুড়ের উৎপাদন ও প্রচলন আছে। অন্যান্য অঞ্চলে কেবল আখ হইতেই গুড় হইত। ইংরেজ আমলে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় প্রধানতঃ বিহার, ওড়িশা, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে তাল ও খেজুরের গুড় তৈয়ারির প্রচেষ্টা চলে, বর্তমানে সরকারের অধীনে অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, কেরল, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ ও ওড়িশা — এই সকল রাজ্যে প্রচুর তাল ও খেজুর গুড় উৎপন্ন হইতেছে।

তাল, খেজুর, সাগু ও নারিকেল রসের সর্বভারতীয় নাম 'নীরা'। আখের রস, নীরা ও গুড় স্বাস্থ্যপ্রদ; উহাদের মধ্যে শর্করা, ক্যালসিয়াম পটাসিয়াম ফসফরাস প্রভৃতি ঘটিত অজৈব লবণ, ভিটামিন বি প্রভৃতি থাকে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধে, মদ্য উৎপাদনে, দুগ্ধ ও নারিকেল -জাত মিষ্টান্নে, মুড়ি চিড়া খই প্রভৃতির মোয়ায় এবং অন্ন-ব্যঞ্জনের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য গুড় ব্যবহৃত হয়।

গুড় হইতেই চিনি তৈয়ারি হয়। কৃষকদের কুটিরে আখের গুড় হইতে খান্দসারি চিনি উৎপন্ন হয়। ইক্ষু-দণ্ড স্থানান্তরযোগ্য বলিয়া আখের গুড়ের উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব, কিন্তু তালজাতীয় গাছের ক্ষেত্রে এই শিল্প সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত।

দ্র গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'পশ্চিমবঙ্গ গুড় শিল্প', গ্রামীণ, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৯৬৪, E. Bonavia, *The Date-Palm in India*, Calcutta, 1885 ; H. Chatterjee, *Date Sugar Industry and Agriculture in Central India*, Calcutta, 1913.

জনরঞ্জন সেন

আখের গুড় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। সমস্ত দেব-কার্যে ইহা অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খেজুরের গুড় সেরূপ হয় না; ইহাকে অপেক্ষাকৃত অপবিত্র মনে করা হয়। বিধবাদের পক্ষে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত নয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য গৌরীশংকর ভট্টাচার্য দ্র

গুণ 'গোলাপ ফুলটি লাল' এই বাক্যের উদ্দেশ্য গোলাপ ফুলটি 'দ্রব্য' ও বিধেয় লাল রঙ তাহার 'গুণ'। কিন্তু বাক্যের উদ্দেশ্য যে সকল সময়ে দ্রব্যই হইবে এবং বিধেয় যে গুণ হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। বাক্যের উদ্দেশ্যও অনেক ক্ষেত্রে 'গুণ' পদার্থকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন 'নীল রঙ লাল রঙ হইতে পৃথক' এই বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়ই 'গুণ' পদার্থ। অতএব বাক্যের বিধেয় স্থল অধিকার করিয়াছে বলিয়াই যে কোনও পদার্থ গুণ হইবে এমন নহে। ন্যায় বৈশেষিক দার্শনিকেরা বলেন, লাল রঙ গুণ পদার্থ, কারণ কোনও দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া ইহা থাকিতে পারে না। লাল ফুল, লাল বস্ত্র, লাল পুস্তক ইত্যাদিকে অবলম্বন না করিয়া লাল রঙ-এর অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব দ্রব্যাশ্রিতত্ব গুণের একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু দ্রব্যের আশ্রয় ছাড়া গুণের অস্তিত্ব অসম্ভব হইলেও দ্রব্য ও গুণ ভিন্ন পদার্থ, কারণ একত্রে থাকিলেও ভিন্ন পদার্থ রূপেই উহাদের প্রতীতি হয়। কর্মও দ্রব্যাশ্রিত কর্মের সহিত গুণের পার্থক্য করিব কিরূপে? নৈয়ায়িকগণ বলেন, কর্ম দ্রব্যাশ্রিত এবং সংযোগ ও বিভাগের কারণ, কিন্তু গুণ দ্রব্যাশ্রিত হইলেও সংযোগ ও বিভাগের কারণ নহে। এই গুণ ২৪ প্রকার— রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার।

বৈদান্তিক দার্শনিকগণও ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়-সম্মত দ্রব্য ও গুণ পদার্থের পার্থক্য স্বীকার করিয়া দ্রব্য ও গুণকে পৃথক পদার্থ রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাহাদের মতে, দ্রব্য ও গুণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সমবায় নহে — তাদাত্ম্য বা ভেদসহিষ্ণু অভেদ।

অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকেরা কিন্তু দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক পৃথক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'পৃথিবীতে গন্ধ আছে' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ আমরা করি বটে কিন্তু ইহা সংগত নহে। পৃথিবী নামক দ্রব্যে গন্ধ নামক গুণ আছে, এ কথা ঠিক নহে, কারণ পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-ভিন্ন পৃথক বস্তু নহে। জগতের সৎ পদার্থ মাত্রই দ্রব্য, যদিও এক মুহূর্ত মাত্র স্থায়ী—'বিদ্যমানং দ্রব্যম্'। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-গুলিকে আমরা সাধারণতঃ দ্রব্যাশ্রিত গুণ বলিয়া মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারাও দ্রব্য, ধর্ম, অথবা স্বলক্ষণ উহারাও অন্য কোনও বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে না।

সাংখ্য দর্শনের গুণ নামক পদার্থও দ্রব্য-নির্ভর কোনও ধর্ম নহে— নিজেরাই দ্রব্য। প্রকৃতির উপাদান হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রকৃতির এই তিন উপাদানকেই সাংখ্যদর্শনে গুণ বলে। এখানে গুণ শব্দের অর্থ অনেকে গৌণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সাংখ্য দ্বৈতবাদী দর্শন হইলেও পুরুষকে প্রকৃতি অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দিয়াছে। তাই প্রকৃতির উপাদানীভূত পদার্থগুলি পুরুষের তুলনায় গৌণ তত্ত্ব। আবার অনেকে মনে করেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তিন উপাদানে গঠিত যে প্রকৃতি তাহা গুণ বা রজ্জুর ন্যায় পুরুষকে বন্ধন করে— তাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন পদার্থকে গুণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

দ্র জয়ন্ত ভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী, বৈশেষিক সূত্র ১।১।১৬, অভিধর্মকোষ, ৯, বিজ্ঞান ভিক্ষু, সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য ১।৬১, পতঞ্জলি, যোগসূত্র ২।২৩, ব্যাস, যোগসূত্র ভাষ্য ১।১৪।

কণা ভট্টাচার্য

গুণরাজ খাঁ মালাধর বসু দ্র

গুণাঢ্য বৃহৎ কথা দ্র

গুণ্টূর অন্ধ্র প্রদেশের জেলা ও শহর। গুণ্টূর জেলা ১৫°১৮´ ও ১৬°৫০´ উত্তর ও ৭৯°১০´ ও ৮০°৫৫´ পূর্বে অন্ধ্র প্রদেশের মধ্য ভাগে ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। গুণ্টূরের উত্তরে নলগোণ্ডা ও কৃষ্ণা জেলা, পূর্বে কৃষ্ণা জেলা ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে নেলোর জেলা এবং পশ্চিমে কুর্নুল ও মহবুবনগর জেলা অবস্থিত।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী এই জেলার আয়তন ১৪৯৭০ বর্গ কিলোমিটার (৫৭৮০ বর্গ মাইল) ও জনসংখ্যা ৩০০৯৯০০। গুণ্টূর, তেনালী, রিপল্লী বাপট্লা, ওঙ্গোল, নরসরাওপেট, ভিনুকোণ্ডা, পাল্‌নাদ ও সাত্তেনাপল্লী— মোট ৯টি তালুক লইয়া এই জেলাটি গঠিত। শহরের সংখ্যা ২০ এবং গ্রামের সংখ্যা ৯৭০।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই জেলাটিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। তেনালী, রিপল্লী, বাপট্লার বৃহদংশ ও গুণ্টূর তালুকের কিছু অংশ লইয়া ব-দ্বীপ অঞ্চল, ভিনুকোণ্ডা, সাত্তেনাপল্লী তালুকের সহিত গুণ্টূর তালুকের বৃহৎ অংশ লইয়া প্রস্তরময় উচ্চভূমি অঞ্চল এবং অবশিষ্টাংশ লইয়া কৃষ্ণমৃত্তিকাযুক্ত সমভূমি অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। কৃষ্ণা নদী এই জেলার উত্তর দিক ও পূর্বের কিয়দংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। অন্যান্য নদীর মধ্যে গুনড্‌লাকাম্মা, নাগুলের, চন্দ্রবাঁকা ও মুসী উল্লেখযোগ্য।

মৌর্যদের পরে যে সাতবাহনবংশের প্রাধান্য হয় বর্তমান গুন্টুর জেলায় ধান্যকটক তাহাদের অন্যতম রাজধানী ছিল। তৎপরে যে ইক্ষ্বাকুরা এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন তাহাদেরও রাজধানী ছিল এই জেলার বর্তমান নাগার্জুন-কোণ্ডার নিকট অবস্থিত বিজয়পুরে। ইহার পর এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া কোনও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইহা নানা হিন্দু ও মুসলমান রাজবংশের অধিকার-ভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুন্টুর উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। গুন্টুর জেলা পূর্বে মাদ্রাজ রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৯৫৩ সালে অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হওয়ায় ইহা অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে।

গুন্টুর জেলার পার্বত্য অঞ্চলের নিকটে গ্রীষ্ম বেশ প্রখর। কোনও কোনও স্থানের উত্তাপ প্রায় ৪৭° সেন্টিগ্রেড (১১৬° ফারেনহাইট) পর্যন্ত ওঠে। অন্যান্য অঞ্চলে গ্রীষ্মের তীব্রতা কম। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮২১·৯ মিলিমিটার (৩২·৩ ইঞ্চি)। সমগ্র জেলার প্রায় ৮৫% ভূমি কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল। এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর।

কৃষিই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৪ ভাগ কৃষিজীবী। ধান এখানকার প্রধান ফসল, ছোলা ও কুম্বু বিস্তীর্ণ অংশে উৎপন্ন হয় এবং রাগি, কোরা ও ভুট্টাও সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তামাক, লংকা, চীনাবাদাম, হলুদ, ধনিয়া ও তুলা এই জেলার উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক পণ্য। লংকা, তামাক ও হলুদ বিদেশে রপ্তানি হয়। তেনালী তালুকে হলুদ প্রচুর উৎপন্ন হয়। ওঙ্গোল, বাপট্লা ও রিপল্লী তালুকের উপকূলবর্তী অঞ্চলে কাজুবাদামের বন আছে। গুন্টুরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোঙ্গুরা বৃক্ষপত্র হইতে সুস্বাদু চাটনি এবং তন্তু হইতে রজ্জু ও ফিতা প্রস্তুত হয়।

তামাকের উপরই জেলার প্রধান শিল্প নির্ভরশীল। গুন্টুর, পারচুর, চিলাকালুরপেট, চিরালা, প্রোভাগুন্টা ও মঙ্গলগিরির বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৬৬টি তামাকশিল্পকেন্দ্র এবং সমগ্র জেলায় মোট ১০১টি চালকল ও ৪৯টি তৈলকল আছে। গুন্টুরের পাটশিল্পকেন্দ্র, থাড়েপল্লী মঙ্গলগিরি ও মাচারলার সিমেন্ট কারখানা এবং রিপল্লী তালুকের নাগরমের চিনির কারখানাও উল্লেখযোগ্য। সমগ্র জেলা, বিশেষতঃ বাপট্লা তালুক, হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত; চিরালা-পেরালা তাঁতের সুবৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। বিড়ি প্রস্তুতকরণ, মাদুর বুনন, রজ্জু ও ফিতা শিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি প্রধান কুটিরশিল্প। এতদ্ব্যতীত তেনালীর রঙ, ভেটাপালেমের দেশলাই, ভিনুকোণ্ডার চর্মদ্রব্য, রেমিডি-চাবলার স্লেটশিল্প এবং তেনালী ও গুন্টুরের কলম শিল্পও প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে সাত্তেনাপল্লী তালুকের কোল্লুর হীরকখনি হইতে সুপ্রসিদ্ধ কোহিনূর হীরক পাওয়া গিয়াছিল। কিছুকাল পূর্বে ওঙ্গোলের কোন্ডেডু পাহাড়ে লৌহ আকরিক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিভিন্ন তালুকের প্রধান কার্যালয়গুলি রেলপথে যুক্ত। দক্ষিণ রেলপথের ২১৪ কিলোমিটার (১৩৩ মাইল) ব্রড গেজ ও ২৬১ কিলোমিটার (১৬২ মাইল) মিটার গেজ পথ এই জেলায় রহিয়াছে। জেলার মোট ২৯০৮ কিলোমিটার (১৮০৭ মাইল) রাস্তার মধ্যে ১৫৯ কিলোমিটার (৯৯ মাইল) জাতীয় সড়ক।

শিক্ষাক্ষেত্রে গুন্টুর জেলা বিশেষ উন্নত। মোট ৪৮১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলা ও বিজ্ঞান কলেজের সংখ্যা ৯, বৃত্তিমূলক কলেজ ২, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭২, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৩৭২ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ২১৭৮। কোণ্ডাভীড় আমলের রাজকবি ও তেলুগু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি শ্রীনাথ গুন্টুরে বাস করিতেন। প্রত্যেক তালুকের প্রধান কার্যালয়ে সরকারি হাসপাতাল ও মঙ্গলগিরিতে একটি যক্ষ্মা আরোগ্য কেন্দ্র আছে। বাপট্লায় একটি কৃষি কলেজ ও কাজুবাদাম গবেষণা কেন্দ্র আছে।

গুন্টুর জেলার প্রধান শহর গুন্টুর ১৬°১৮´ উত্তর ও ৮০°২৮´ পূর্বে মাদ্রাজ হইতে প্রায় ৩৫৪ কিলোমিটার (২২০ মাইল) উত্তরে অবস্থিত। ইহা জেলার সদর কার্যালয়। শহরের আয়তন ৩০·০১ বর্গ কিলোমিটার (১১·৫৯ বর্গ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ১৮৭১২২ জন হয়। অনুমান করা হয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসীরা এই শহরের পত্তন করেন। তেলুগু 'গুন্টা' (পুষ্করিণী) শব্দ হইতেই গুন্টুর নামের উৎপত্তি। ইহা রেল জংশন এবং তুলা ও তামাক ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। কাগজ কার্পাস বস্ত্রশিল্প, সিমেন্ট ও চর্মশিল্প উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনটি কলেজ আছে তন্মধ্যে ১টি মহিলাদের জন্য। গুন্টুর শহরের ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরে লামেতে একটি কৃষি গবেষণা ক্ষেত্র ও পশু-পালন কেন্দ্র আছে ('অন্ধ্র প্রদেশ' দ্র)।

গুন্টুর জেলায় ভট্টিপ্রোলু ও অমরাবতীতে বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ আছে। পালনাদ তালুকের নাগার্জুনকোণ্ডার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনেক; এখানে অনেক প্রাচীন শিলালেখ, মন্দির প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু

বর্তমানে একটি পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের প্রয়োজনে এই স্থান সম্পূর্ণ রূপে জলপ্লাবিত হইয়াছে। কিছু কিছু প্রত্নসম্পদ পর্বতের শীর্ষদেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। নরসারাওপেট তালুকের কোটা-প্পাকোণ্ডা পর্বত ও পালনাদের গুট্টিকোণ্ডা গুহা অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। পালনাদের তাল্লাপল্লীর নিকটে ইথিপোথালা নামক একটি জলপ্রপাত আছে। ওঙ্গোল ষাঁড় প্রজননের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। প্রতি বৎসর ওঙ্গোল শহরের নিকট একটি পশুমেলা হয়।

দ্র A Chandrasekhar, *District Handbook*. *Guntur District*, Hyderabad, 1965

দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী

গুপ্তচর (গোয়েন্দা) প্রাচীন যুগ. পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিয়োগের প্রথা প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যায়। কৌটিল্য, কামন্দক এবং যাজ্ঞবল্ক্য দূত এবং গুপ্তচরকে দুইটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কামন্দক বলিয়াছেন, প্রকাশ্যে সর্বজন সমক্ষে কাজ করে তাহারা দূত এবং যাহারা অপ্রকাশ্যে কাজ করে তাহারা গুপ্তচর। কৌটিল্য গুপ্তচর বৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তাহার অর্থশাস্ত্রে ৪ অধ্যায়ে এই বৃত্তির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কামন্দক চর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহারা হইতেছে 'রাজার চক্ষু' (চারচক্ষুর্মহীপতিঃ ১২, ২৪)। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বেও অনুরূপ উক্তি করা হইয়াছে (চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ ৩৪, ৩৪)। শুক্রনীতিসারে রাজাকে প্রত্যহ রাত্রে গুপ্তচরের নিকট হইতে প্রজাসাধারণ, অমাত্য, আত্মীয়বর্গ এবং অন্তঃপুরিকাদের মনোভাব জানিতে বলা হইয়াছে।

এই কাজের জন্য তীক্ষ্ণধী, মধুরভাষী, পরিশ্রমী এবং অপরের মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইত। কৌটিল্যের বিবরণ হইতে অনুমান করা যায় যে চরেরা ছাত্র (কাপটিক) উদাসী পুরুষ (উদাস্থিত) গৃহস্থ (গৃহপতিক) বণিক (বৈদেহক) তাপস প্রভৃতির ছদ্মবেশে তথ্যাদি সংগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সন্ন্যাসিনী, পরিব্রাজিকা, গণিকা, জ্যোতিষী প্রভৃতির মধ্য হইতেও চর নিয়োগ করা হইত। কৌটিল্য চরেদের মুখ্যতঃ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন. ১. সংস্থা অর্থাৎ যাহারা কোনও একটি স্থানে বাস করিয়া স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করে ২. সঞ্চার অর্থাৎ যাহারা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করে।

এই চরদের কোন্ কোন্ স্থানে নিয়োগ করিতে হইবে মহাভারতে (শান্তিপর্ব ১৪০ ৪১) তাহার বর্ণনা আছে — 'পাষণ্ড তাপস প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর। লোকের কণ্টক-স্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান, শূন্যাগার, পানাগার, তীর্থ ও দ্যূতসভায় প্রতিনিয়ত গমন করিয়া থাকে।'

একই খবর সংগ্রহের জন্য একাধিক চর নিয়োগের উল্লেখ কৌটিল্য করিয়াছেন। যাহাতে এই চরেরা পরস্পর পরস্পরকে না চিনিতে পারে তাহার জন্য যত্ন লওয়া হইত। মহাভারতে ও বিষ্ণুধর্মোত্তরেও পরস্পরের অজানিতভাবে চর প্রেরণের উল্লেখ আছে।

দুর্নীতি দমনে এবং শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখায় চরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কোনও বিচারক অথবা কোনও বিভাগীয় অধ্যক্ষ উৎকোচ গ্রহণ করিতেছে কি না ইহারা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিত। শান্তিবিঘ্নকারী, জালমুদ্রা প্রস্তুতকারক, অপদ্রব্য (ভেজাল) মিশ্রণকারী তস্কর, অপহারক এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে চরের সহায়তা গ্রহণ করা হইত। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে রাজাকে অবহিত করা চরদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। যখন কোনও গুপ্তচর প্রেরিত সংবাদ অন্যের দ্বারা সমর্থিত হইত তখন তাহাকে পুরস্কৃত করা হইত। অনুরূপভাবে সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে ঐ চর শাস্তি পাইত।

গ্রীক এবং রোমক ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্থে ভারতীয় চরদের কার্যাবলীর বর্ণনা আছে। এই সকল গ্রন্থে 'এপিসকোপাই' (Episcopoi) নামধারী একশ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ আছে যাহারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের খবরাখবর সংগ্রহ করিত এবং রাজাকে অথবা যে দেশে গণতন্ত্র সেখানে শাসন পরিচালককে জানাইত। স্ট্রাবোর গ্রন্থে ইহাদের 'এফোরি' (Ephori) বলা হইয়াছে। দুই শ্রেণীর পরিদর্শকের কথাও স্ট্রাবো বলিয়াছেন ১. নগর পরিদর্শক ২. শিবির পরিদর্শক। ইহারা এই পরিদর্শনের কাজে গণিকাদের নিয়োগ করিত। কৌটিল্য যে চরবৃত্তিতে গণিকা নিয়োগের ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কৌটিল্য বলেন যে রাষ্ট্রে কি ধরনের জনবাদ প্রচারলাভ করিতেছে, কাহারা বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং কাহারা অসন্তুষ্ট, এইসব তথ্যাদি চরেরা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া সংগ্রহ করিবে ও রাজাকে জানাইবে। রাজা ঐ সংবাদ অনুযায়ী সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করিবেন ও অপরাপরদের স্ববশে আনিবার ব্যবস্থা করিবেন। প্রয়োজনবোধে বিবাদ ও বিভেদের বীজ বপন করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষকে দুর্বল করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত কার্যেও চর নিযোগ করা হইত। কৌটিল্য বলেন যদি চর প্রদত্ত সংবাদ বাদী অথবা বিবাদীর বক্তব্য সমর্থন না করে তাহা হইলে বিচারক ঐ বাদী অথবা বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দিবেন।

বর্তমান যুগের ন্যায় প্রাচীন কালেও গুপ্তচর মারফৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের খবরাখবর সংগ্রহের প্রথা সুপ্রচলিত ছিল। মহাভারতে পাষণ্ড ও প্রচ্ছন্ন তাপসদিগকে পররাষ্ট্রে সংবাদ সংগ্রহে নিযোগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে বিদেশে অবস্থানকারী রাজদূতও গুপ্তচর রূপে কার্য করিতেন। তিনি স্থানীয় রাজকর্মচারীদের সহিত মিত্রতা করিয়া কৌশলে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে বিভেদের সুযোগ লইয়া রাজবিরোধী দল হইতে গুপ্তচর নিযোগ করা হইত। সাধারণতঃ কোনও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সৈন্যবল সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্যই গুপ্তচর নিযোগ করা হইত। ইহা ব্যতীত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং দুর্গ ইত্যাদির সংস্থানও জানিবার জন্য গুপ্তচরেরা সচেষ্ট থাকিত। মহাভারতের দ্রোণ পর্বে বলা হইয়াছে যে কুরু এবং পাণ্ডব উভয় পক্ষের চরই পরস্পর সৈন্য-বাহিনীতে কার্যরত ছিল। বিদেশস্থ চরেরা গুপ্ত সংবাদাদি গূঢ় লেখের বা গুপ্ত লিপির সাহায্যে নিজ নিয়োগকর্তার কাছে প্রেরণ করিত।

গুপ্তচরেরা সংবাদ সংগ্রহ করা ছাড়া শত্রুরাষ্ট্রকে দুর্বল করার কাজেও নিযুক্ত হইত। কথিত আছে লিচ্ছবি-মগধ যুদ্ধে মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী বস্সকারকে লিচ্ছবিদের ঐক্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বস্সকারের প্ররোচনায় লিচ্ছবি-গণ বিবাদে লিপ্ত হইল এবং অজাতশত্রুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

শিশিরকুমার মিত্র

আধুনিক যুগে ছদ্মবেশে গোপনে তথ্য সংগ্রাহকদের গোয়েন্দা বলা হয়। মধ্যযুগে প্রয়োজনবোধে যে কোনও ব্যক্তি দ্বারা ঐ কার্য সমাধা করা হইত বটে কিন্তু অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা ব্যবসায় বংশানুক্রমে ভারতের খোজী সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান শাসক, ভূস্বামীগণ, সাধারণ গৃহস্থ শ্রেষ্ঠীগণ, স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন হিন্দু রাজন্যবর্গ অপরাধ নির্ণয়ার্থে উহাদের নিয়োগ করিত। প্রাক্‌ ব্রিটিশ জমিদারি পুলিশে দুই শ্রেণীর ভূমি-উপস্বত্বভোগী কর্মী ছিল, যথা: ১. চৌকিদারি চাকরান (চৌকিদারি, থানাদারি ইত্যাদি) তথা সাধারণ পুলিশ এবং ২. রঙ্গান্তী চাকরানি তথা গোয়েন্দা পুলিশ। এই শেষোক্ত শব্দটির দ্বারা ঐ সম্পর্কিত ভূমি-স্বত্বভোগী এক শ্রেণীর বংশগত স্থানীয় গোয়েন্দা পর্যায়ভুক্ত খোজী গোষ্ঠীকে বুঝাইত। কোম্পানির রাজত্বকালে পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে ইহাদের সম্বন্ধে অবগত হন। উহার কিছু পরে বাংলার নদিয়া জেলার এক ম্যাজিস্ট্রেট নদিয়াতে অনুরূপ এক শ্রেণীর খোজী গোষ্ঠীর সন্ধান পান। এই উভয় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উহাদের সাহায্যে বহু দুরূহ মামলার কিনারা করিতে সক্ষম হন। ঐ সময় গোয়েন্দা বলিতে ব্যাপকভাবে এই জাত-ব্যবসায়ী খোজীদিগকেই বুঝাইত।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পদচিহ্ন বিদ্যা এই খোজী সম্প্রদায়েরই আবিষ্কার। পুরুষানুক্রমে অর্জিত এই গোপন বিদ্যা ইংরেজ শাসকগণ উহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া ভারতীয় পুলিশ বিভাগে উহার প্রচলন করেন। এই শাস্ত্রের ইংরেজী পরিভাষাগুলি উহাদের ব্যবহৃত 'এডী, তল, পেষ, সাঁকো' প্রভৃতি দেশীয় পরিভাষার অনুবাদ মাত্র। সন্দেহজনক ব্যক্তির যাতায়াতের পথ জলসিক্ত করিয়া উহারা ছদ্মবেশে সন্নিকটে অপেক্ষা করিত। অকুস্থলে প্রাপ্ত পদচিহ্নের সহিত ঐস্থানে প্রাপ্ত পদচিহ্নের মিল দেখা গেলে উহারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিত। রাজ-স্থানের মরু অঞ্চলের খোজী গোষ্ঠী চিহ্নানুসন্ধান (ট্র্যাকিং) নামে অপর এক গোপন বিদ্যায় পারদর্শী। এই খোজী গোয়েন্দারা অপরের অবোধ্য চিহ্নানুসরণ করিয়া লোপাট মানুষ ও নিখোঁজ পশুদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিত। ভারত সরকারের পুলিশ বিভাগের কতিপয় পুলিশ কর্মচারী ঐ বিদ্যার কিছু অংশ উহাদের নিকট হইতে আয়ত্ত করেন। সুখের বিষয় এই যে উহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই বিদ্যা এক্ষণে সর্বজনস্বীকৃত একটি বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে ভারত সহ বিশ্বের বিবিধ রাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগে উহাদের আরও অনুশীলন হইতেছে।

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব সংহত হইলে এই গোয়েন্দাদের নামানুসারে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রথমে জেলা হাকিমদের অধীনে গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করা হয়। পরে এই বিভাগগুলি জমিদারদের নিকট হইতে অধিকৃত রাষ্ট্রায়ত্ত পুলিশের বিশেষ বিভাগ রূপে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। বেতনভুক সরকারি শিক্ষিত গোয়েন্দা পুলিশ কর্মীদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বংশানুক্রমিক গোয়েন্দা গোষ্ঠীসমূহ রাজস্থান ব্যতীত অন্যত্র বিরল হইয়া ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। অধুনা

সরকারি ডিটেক্‌টিভ কর্মীগণ স্বকার্য সাধনে সাধারণ মানুষ এবং অপরাধীদের মধ্য হইতে এককালীন বা মাসিক অর্থের বিনিময়ে সংবাদ সংগ্রহার্থে অস্থায়ী চর নিযুক্ত করে। বর্তমানে সাধারণভাবে এই শ্রেণীর গুপ্তচরদিগকেও গোয়েন্দা বলা হইয়া থাকে। সরকারি পুলিশী গোয়েন্দা বিভাগ এক্ষণে অপরাধ-নির্ণয়ার্থে বহুবিধ উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'তদন্তকার্য' দ্র।

পঞ্চানন ঘোষাল

গুপ্তবীজী যে সকল সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে, তাহাদের গুপ্তবীজী উদ্ভিদ (অ্যান্‌জিওস্পার্ম) বলে। বীজপত্রের সংখ্যানুসারে ইহাদের দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যে সকল গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে, তাহাদিগকে একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয়, যথা— ধান, গম, ভুট্টা, তাল, সুপারি, নারিকেল, কলা, অর্কিড, কচু ইত্যাদি। আবার যে সকল গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে, তাহাদিগকে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে, যথা— ছোলা, মটর, শিম, আম, কাঁঠাল, নিম, কুল, তেঁতুল ইত্যাদি।

আদর্শ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের দেহে প্রধানতঃ দুইটি অংশ : মূল ও বিটপ। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের একটি প্রধান মূল থাকে; তাহার চারিধার হইতে বহু শাখামূল বাহির হয়। কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল ও শাখামূলগুলি সাধারণতঃ অল্পদিনের মধ্যেই মরিয়া যায় এবং কাণ্ডের নিম্নভাগ হইতে কতকগুলি সরু সরু গুচ্ছ গুচ্ছ অস্থানিক মূল বাহির হইয়া মূলের কার্য নির্বাহ করে।

বিটপ ও মাটির উপরের অংশে কাণ্ড, পাতা ও ফুল থাকে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে কাষ্ঠল অংশ থাকে; প্রতি বৎসর গৌণবৃদ্ধির (সেকেণ্ডারি গ্রোথ) ফলে কাষ্ঠল অংশে বর্ষবলয় (অ্যানুয়ল রিং) নামক গোলাকার দাগের সৃষ্টি হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে সাধারণতঃ কাষ্ঠল অংশ থাকে না; ক্ষেত্র বিশেষে কাষ্ঠল অংশ থাকিলেও তাহার গৌণবৃদ্ধি হয় না। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে রসবাহী প্রণালীগুলি (ভ্যাস্‌কুলার বাণ্ডল্) সাধারণতঃ কাণ্ডের কেন্দ্রভাগ দিয়া যায়, কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদে সেগুলি কাণ্ডের নানা অংশে ছড়াইয়া থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় প্রধান শিরাগুলি পরস্পর সমান্তরালভাবে থাকে, কিন্তু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে শিরাগুলি পাতায় জালের মত সজ্জিত থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফুলের প্রতি অংশে সাধারণতঃ ৩টি দল থাকে; দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফুলের প্রতি অংশে ৪টি কিংবা ৫টি দল দেখা যায়।

বিশেষ ঋতুতে গাছের ফুল হয়, ফুল হইতে ফল হয় এবং সেই ফলে বীজ আবৃত থাকে। ফুল, ফল ও বীজের সাহায্যেই গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয়।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

গুপ্তযুগ বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে (১৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ক্রমে ক্রমে আর্যাবর্তে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। বহ্লীক দেশ হইতে যবন (গ্রীক), কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণস্থিত ভূখণ্ড হইতে পহ্লব (পার্থিয়ান) এবং মধ্য এশিয়া হইতে প্রথমে শক ও পরে কুষাণগণ এই সুযোগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং উত্তর-পশ্চিমে রাজ্য স্থাপন করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে এবং দাক্ষিণাত্যের কতকাংশে আধিপত্য স্থাপন করে। ভারতে বিদেশী আধিপত্য প্রায় ৫০০ বৎসর পরে শেষ হয়।

এই নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা শ্রীগুপ্ত এবং তাঁহার পুত্র মহারাজা ঘটোৎকচের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা বিহারের পূর্ব অঞ্চল ও উত্তর বঙ্গের কতকাংশ লইয়া গঠিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত পার্শ্ববর্তী দেশ জয় করিয়া ইহার আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্যারম্ভ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটি নূতন অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অব্দ গুপ্তাব্দ নামে পরিচিত এবং ইহার আরম্ভ কাল সম্ভবতঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ৩২০ খ্রী (মতান্তরে ২০ ডিসেম্বর, ৩১৮ খ্রী)। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে বহু অভিযান করিয়া এই রাজ্যকে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুজরাতের শক রাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের চিহ্ন বিলুপ্ত করেন এবং বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্তের সময়েও সমগ্র উত্তর ভারত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই সময়ে মধ্য এশিয়ার হূন জাতি ভারত আক্রমণ করে কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ঘোরতর যুদ্ধের পর তাহাদিগকে পরাজিত করেন। আনুমানিক ৪৫৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে কুমারগুপ্তের মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে সিংহাসনের অধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বিবাদ ঘটে। তবে স্কন্দগুপ্তই সিংহাসন লাভ করেন। হূনগণ পুনরায় ভারত আক্রমণ করে, স্কন্দগুপ্ত পুনরায় তাহাদিগকে পরাজিত করেন। আনুমানিক ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা

পুরুগুপ্ত রাজা হন। তাঁহার পুত্র বুধগুপ্ত সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যকালেই গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে গুপ্তরাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর গোলযোগ বাড়িয়াই চলিল। রাজকুমারদের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় একই কালে একাধিক রাজা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্ত রাজগণ স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে হূনগণ পুনরায় ভারত আক্রমণ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের এক বিস্তৃত অংশ অধিকার করিল। বুধগুপ্তের ভ্রাতা গুপ্তসম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ও সামন্তরাজ যশোধর্মা হূনদিগকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু যশোধর্মা বিদ্রোহী হইয়া প্রায় গুপ্ত সাম্রাজ্যে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। যশোধর্মার মৃত্যুর পরই তাহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যও আর বেশিদিন টিকিল না। নরসিংহ গুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র, তৃতীয় কুমারগুপ্ত ও বিষ্ণুগুপ্ত, যথাক্রমে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বা তৃতীয় পাদে রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহার পরই গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

দুই শত বৎসরেরও অধিক কাল স্থায়ী গুপ্ত সাম্রাজ্য ভারতের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। মৌর্য বংশের পরে প্রায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের রাজনৈতিক গগনে যে দুর্যোগ দেখা দিয়াছিল তাহা অপসারিত করিয়া সমস্ত উত্তর ভারতে একটি অখণ্ড রাজ্য স্থাপন খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু আরও নানা কারণে গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। মহাকবি কালিদাস সম্ভবতঃ গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভা অলংকৃত করিতেন। এতদ্ব্যতীত শূদ্রক, বিশাখদত্ত এবং ভারবিও এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ভাসও এই যুগের প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। পঞ্চতন্ত্র, চান্দ্র ব্যাকরণ, অমরকোষও এই যুগের রচনা। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রধান দুই পণ্ডিত আর্যভট ও বরাহমিহির এই যুগেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই যুগেই মহাভারত পরিবর্ধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে এবং নূতন নূতন স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ রচিত হইয়া বৈদিক ধর্মকে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত করে। গুপ্তযুগে রসায়ন ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেরও অনেক উন্নতি হয়। এই যুগেই ভাস্কর্য শিল্পের চরম উন্নতি হয় এবং এই যুগের দেব দেবীর মূর্তিগুলিই পরবর্তী কালের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই যুগে চিত্রকলাও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে, অজণ্টার (অজন্তা) গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই যুগে কয়েকটি সুন্দর মন্দিরও নির্মিত হইয়াছিল। এই যুগে ভারতীয়গণ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে (ইন্দোনেশিয়া) বড় বড় রাজ্য স্থাপন করে এবং ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার করে।

গুপ্ত রাজগণের নামাঙ্কিত বহু স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ উৎকৃষ্ট শিল্পের পরিচায়ক মুদ্রা ভারতীয় আর কোনও রাজবংশের আমলে প্রস্তুত হয় নাই। 'অজণ্টা', 'আর্যভট', 'কালিদাস', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'বরাহমিহির' ও 'সমুদ্রগুপ্ত' দ্র।

দ্র R. C Majumdar ed, *The History and Culture of the Indian People*, vol III, Bombay, 1954; R C Majumdar and A S Altekar, *A New History of the Indian People*, vol VI, Lahore, 1946

নরেন্দ্র মজুমদার

গুপ্ত সমিতি বিপ্লব আন্দোলন দ্র

গুপ্তাব্দ অব্দ দ্র

গুপ্তিপাড়া হুগলি জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রাম ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে নদী হইতে প্রায় দুই কিলোমিটার (১ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনের একটি স্টেশন, কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার (৪৭ মাইল)।

গুপ্তিপাড়া একসময়ে সংস্কৃত চর্চা ও তর্কশাস্ত্রের অন্যতর কেন্দ্র ছিল। আজও গুপ্তিপাড়ায় যে কয়েক ঘর স্থায়ী ব্রাহ্মণ বাসিন্দা আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে কৃতবিদ্য। বর্তমানে এখানে দুইটি হাইস্কুল আছে। ভারত বিভাগের পর বহু পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু এখানে আসিয়া তাঁতশিল্পের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। বেশির ভাগ মোটা শাড়ি বাহিরে বিক্রয়ের জন্য চালান হয়।

গুপ্তিপাড়ার লোকসংখ্যা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী ৬৮৩ জন এবং ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদেরই এই গ্রামে প্রাধান্য। আয়তন ৭৩ হেক্টর (১৮০'৪৮ একর)। জগদ্ধাত্রী পূজা এখানে মহা আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন, গুপ্তিপাড়াতেই বাংলা দেশে প্রথম (১৭৫৯-৬০ খ্রী) বারোয়ারি পূজার অনুষ্ঠান হয়।

দ্র বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৭ ; L. S. S O' Malley, *Bengal District Gazetteer : Hooghly*, Calcutta, 1912.

উষা সেন

চৈতন্যদেব, কৃষ্ণচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত ৪টি ইটের তৈয়ারি মন্দিরের জন্য গুপ্তিপাড়া বিখ্যাত। মন্দিরগুলি একই প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। বাংলার নিজস্ব মন্দির স্থাপত্যের ছাদে অর্থাৎ চালাঘরের আদর্শে এগুলি নির্মিত। চৈতন্যদেবের মন্দিরটির নির্মাণকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগ। ইহা জোড়-বাংলা মন্দির, অর্থাৎ ইহার গড়ন দেখিয়া মনে হয় যেন দুইটি দোচালা কুটির পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে। বর্তমানে ইহার অধিকাংশ কারুকার্য পলস্তরায় ঢাকা পড়িয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র ও বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির চারচালা, ইহাদের উপরিভাগে আর একটি ছোট চারচালা আছে। এই মন্দির দুইটি উঁচু বেদির উপরে প্রতিষ্ঠিত। গর্ভগৃহের সামনে একটি বারান্দা আছে। বারান্দার ৩টি প্রবেশপথেই খিলান আছে। খিলানগুলি কারুকার্যখচিত স্তম্ভ ও উপস্তম্ভের উপর ন্যস্ত। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরটি নির্মিত হয় সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগে আর বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটি ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটির উচ্চতা ১৮ মিটার (৬০ ফুট)। ইহার গর্ভগৃহের ভিতর দিক এবং বারান্দার পশ্চাদ্‌ভাগ অলংকরণের দ্বারা সমৃদ্ধ। কারুকার্যের জন্য রামচন্দ্রের মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। ইহাও চারচালা। তবে ইহার ছাদের মধ্য ভাগে আটকোণা মন্দিরের একটি ক্ষুদ্রাকার অনুকৃতি আছে। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দেওয়াল পোড়ামাটির ফলকে শোভিত। কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী পোড়ামাটির অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্যে রূপায়িত হইয়াছে। এই মৃৎফলকগুলি সেকালের শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাধারণের বিশ্বাস, শেওড়াফুলির রাজা হরিশচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ইহার গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠব বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবের মন্দিরটির (১৬৭৯ খ্রী) সমগোত্রীয়।

দেবলা মিত্র

গুরদিৎ সিংহ পাঞ্জাবী-শিখ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিঙাপুরে গমন করিয়া তথায় ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ক্যানাডায় তাঁহার দেশবাসীর পক্ষে উপার্জনের যথেষ্ট সুযোগ আছে বিবেচনা করিয়া তিনি একটি দল লইয়া ক্যানাডায় বসবাস করিবেন স্থির করেন। ক্যানাডার তৎকালীন আইন অনুসারে এশিয়ার কোনও দেশ হইতে জাহাজ বদল না করিয়া সোজা সে দেশে পৌঁছাইতে না পারিলে কোনও এশিয়াবাসীকে অবতরণ করিতে দেওয়া হইত না। আইনের এই শর্ত এড়াইবার জন্য গুরদিৎ সিংহ 'কোমাগাতা মারু' নামে একটি জাপানি জাহাজ চুক্তিতে ভাড়া করেন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হংকং হইতে একটি বৃহৎ দল লইয়া এই জাহাজ ক্যানাডার ভ্যাংকুভার বন্দরে উপস্থিত হন। কিন্তু দলটিকে অবতরণ করিতে দেওয়া হয় নাই। যাত্রীরা জোর করিয়া নামিবার চেষ্টা করিলে ক্যানাডা সরকারের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে। সরকারের শক্তির নিকট বাধ্য হইয়া নতি স্বীকার করিয়া জাহাজটি সকল যাত্রীসহ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। ইহারা আমেরিকার 'গদর' দলের সভ্য এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাইতে আসিতেছে এইরূপ আশঙ্কার বশে ব্রিটিশ সরকার ইহাদিগকে সোজা পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে জাহাজটি বজবজে পৌঁছিলে যাত্রীগণকে সোজাসুজি ট্রেনে পাঞ্জাবে যাত্রা করিতে আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ অমান্য করিয়া যাত্রীগণ পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতায় পৌঁছাইবার চেষ্টা করিলে তাহাদের বাধা দেওয়া হয় এবং ফলে দাঙ্গা বাধে। আঠার জন শিখ নিহত হয়, ইংরেজ সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর ছয় জন মারা যায়। যাত্রীদের মধ্যে মাত্র সাত জন ট্রেনে চাপিতে সম্মত হয়। বহু যাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়—উনত্রিশ জন সহচরসহ গুরদিৎ সিংহ পুলিসকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করেন।

ব্রিটিশ সরকার এই দলটিকে 'গদর' দলের ভারত অভিযানকারী বিপ্লবী দল বলিয়া অভিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেও প্রকৃতপক্ষে 'গদর'-এর সহিত ইহাদের সংস্রব ছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অস্ত্রশস্ত্র বহন করা প্রভৃতি সরকারের প্রত্যেক অভিযোগ গুরদিৎ অস্বীকার করেন এবং স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। প্রাপ্ত দলিলাদি হইতে মনে হয় যে গুরদিৎ সিংহ স্বীয় সহযাত্রী শিখেদের সুখ-সুবিধার জন্যই ক্যানাডায় যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দ্র R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. II, Calcutta, 1963.

গুরলা মান্ধাতা ৩০°২৬´১৮´´ উত্তর ও ৮১°১৭´৫৭´´ পূর্ব। উচ্চতা ৭৭২৮ মিটার (২৫৩৫৫ ফুট)। লদাখ পর্বতের

সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। মানস-সরোবরে যাইবার পথে যাঁহারা গার্বিয়ঙ ও লিপুলেখ গিরিপথ হইয়া যান তাঁহারা এই তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গটি দেখিতে পান।

গুরলা মান্ধাতা মানস-সরোবরের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজা মান্ধাতা এই পর্বতমূলে বসিয়া অনন্তকাল ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন, এইরূপ কিংবদন্তি আছে। মান্ধাতার কাহিনীর সহিত জড়িত বলিয়াই ইহার এই প্রকার নাম হইয়াছে। এই পর্বতশৃঙ্গ হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ পবিত্র বলিয়া গণ্য করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ লংস্টাফ যখন তরুণ বয়সে এই শৃঙ্গ আরোহণ করিতে যান, তখন হিমানী সম্পাতের জন্য নামিয়া আসিতে বাধ্য হন। ইহার পর ঐ বৎসর জুলাই মাসে তিনি আলমোড়া জেলার ডেপুটি কমিশনারকে লইয়া তিব্বত যাইবার পথে গুরলা মান্ধাতার পশ্চিম দিক পর্যবেক্ষণ করেন ও ৬৯০০ মিটার (২৩০০০ ফুট) পর্যন্ত আরোহণ করিয়া এক রাত্রি বিনা সাজ সরঞ্জামে অতিবাহিত করেন। এই সময়েই তিনি মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল পর্যবেক্ষণ করেন। এখন পর্যন্ত কেহ গুরলা মান্ধাতার শৃঙ্গ আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

দ্র Swami Pranabananda, *Exploration of Tibet*, Calcutta, 1950; Kenneth Mason, *Abode of Snow*, London, 1955.

কমলা মুখোপাধ্যায়

গুরু অতি প্রাচীন কাল হইতে গুরু ভারতীয় সমাজে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। অল্প বয়স হইতেই শিষ্য গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া গুরু শুশ্রূষা ও বিদ্যাশিক্ষা করিত। গুরু শুশ্রূষার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিষ্য বিদ্যালাভের অধিকার অর্জন করিত। এই প্রসঙ্গে উদ্দালক-আরুণি, উপমন্যু প্রভৃতির কাহিনী (মহাভারত, ১৩) প্রসিদ্ধ ('আরুণি' ও 'উপমন্যু' দ্র)। বিদ্যালাভের পর গুরুকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দেওয়া হইত। একলব্যকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দিয়া ধনুর্বিদ্যার প্রয়োগ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল ('একলব্য' দ্র)। শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণার কাহিনী বাংলা দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। গুরুপত্নীর আগ্রহে তিনি তাঁহার দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত পুত্রকে যমের গৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া গুরুদক্ষিণা রূপে উপহার দেন। গুরুর নিকট হইতে একটি অক্ষর লাভ করিলেও পৃথিবীতে এমন দ্রব্য নাই যাহা দ্বারা গুরুর ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে গুরু হইবেন শান্ত, দান্ত, সদ্বংশজাত, বিনীত, শুদ্ধাচার, শুদ্ধবেশযুক্ত, সুবুদ্ধিমান, তন্ত্র-মন্ত্র বিশারদ। রোগী, অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ, বহুভোক্তা, বহুভাষী, পুত্রহীন, শঠ ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা উচিত নয়।

কুলগুরু প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর হইতে গুরুর গুণাগুণ বিচারের প্রয়োজন হয় না। শিষ্যের পুত্র নির্বিচারে তাঁহার গুরুর পুত্রকে গুরুরূপে বরণ করেন। তবে বর্তমানে এই প্রথা সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না। তন্ত্রমতে গুরু দেবস্বরূপ— গুরুকে মানুষ মনে করিলে নরকগামী হইতে হয়। চলিত ভাষায় গুরুকে ইষ্টদেব বলা হয়। গুরুপূজা ও গুরুমন্ত্রজপ নিত্যকর্তব্য কর্ম। গুরুর উপস্থিতিতে নিত্যপূজা না করিয়া গুরুর পাদপূজা করিতে হয়। গুরু উপস্থিত থাকিলে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে সে ঘোর নরকে গমন করে এবং তাহার পূজা নিষ্ফল হয়। গুরুর উপস্থিতিতে গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। গুরুর মৃত্যুতে অশৌচ পালন ও হবিষ্যান্ন গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। সমস্ত হৃদয় দিয়া গুরুর আরাধনা করিবা, গুরু রুষ্ট হইলে পরিত্রাণের উপায় নাই।

বর্তমান সমাজে গুরু বলিতে সাধারণতঃ পারিবারিক গুরু বা দীক্ষাগুরু অর্থাৎ যাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে তাঁহাকেই বুঝায়। তিনিই গুরুর শাস্ত্রোক্ত সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। শিক্ষাগুরু বা আচার্যগুরুর পক্ষে সে সম্মান কল্পনার অতীত। যাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করা হয় তিনি শিক্ষাগুরু, যিনি উপনয়ন কালে বেদমন্ত্র শিক্ষা দেন তিনি আচার্যগুরু।

দ্র মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, তন্ত্রসার।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গুরুকুল সম্পূর্ণ নাম গুরুকুল কাঙ্গড়ী বিশ্ববিদ্যালয়। গুরুকুল কাঙ্গড়ী একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তর প্রদেশের হরিদ্বার হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) দূরে ইহা অবস্থিত। আর্যসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৭-১৯২৬ খ্রী) ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮১৪-৮৩ খ্রী) শিক্ষাদর্শ রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রথমে পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালায় একটি ক্ষুদ্র বিদ্যাশ্রম স্থাপন করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৩৪ জন ব্রহ্মচারী ছাত্রসহ উহা কাঙ্গড়ীতে আনীত হয়। গঙ্গার বন্যায় (১৯২৪ খ্রী) গুরুকুল কাঙ্গড়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাভবন স্থানান্তরিত হইয়া বর্তমান জায়গায় আসে এবং তখন আরও বড় ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপে স্বীকৃতি

গুরুগোবিন্দ সিংহ

দান করেন। ঐ বৎসরের এপ্রিল মাসে গুরুকুল কাঙড়ীর ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হীরক জুবিলি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

'গুরুকুল' নামটির মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শের মূল কথাটি নিহিত আছে। মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে গুরুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষার যে আদর্শ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাহারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির— বিশেষ করিয়া বৈদিক ও সংস্কৃত শাস্ত্রের— চর্চার উপর এখানকার পঠন-পাঠনে সমধিক গুরুত্ব অর্পিত হয়। শিক্ষার বাহন হিন্দী। ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুশীলনের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মিলন সাধন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। বেতন বাবদ ছাত্রদের কোনও দক্ষিণা দিতে হয় না, শুধু থাকা-খাওয়ার খরচ হিসাবে তাহারা কিছু টাকা দেয়।

গুরুকুল কাঙড়ীর কয়েকটি অনুমোদন-প্রাপ্ত বা শাখা প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঘটকেশ্বর (হায়দরাবাদ) ও কুরুক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানটি এবং দেরাডুনের কন্যা গুরুকুল মহাবিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র *Gurukul Kangri Vishwavidyalaya : an Introduction*, Gurukul Kangri, 1962.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গুরুগোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৮ খ্রী) নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র ও দশম ও অন্তিম গুরু (১৬৭৬-১৭০৮ খ্রী)। গুরু হরগোবিন্দের সময় হইতে শিখ গুরুর প্রাধান্য হ্রাস, বিভিন্ন প্রতিযোগী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, জাঠগণের অনুপ্রবেশ, ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির ফলে শিখ ধর্মের বিনাশের ভয়, বংশ ও জাতি-ভেদ-এর প্রাবল্য প্রভৃতি নানা আভ্যন্তরীণ বহির্বিপদ দেখা দেয়। এই সমুদয় নিবারণ করিয়া শিখদের মধ্যে একতা আনিবার প্রচেষ্টা করেন। ইহা ব্যতীত ইসলামের সহিতও খোলাখুলি বিবাদ আরম্ভ হয়। পিতার প্রাণদণ্ডের প্রতিশোধ, ইসলাম ধর্মে দীক্ষার প্রতিরোধ ও সামরিক শক্তি সংঘটন— ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। ঔরঙ্গজেবের কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পিতামহের সামরিক প্রতিরোধের নীতি পুনরুদ্দীপন করিয়া তিনি মাখোয়াল-আনন্দপুরে সেনা সংগ্রহ করেন ও পার্বত্য নৃপতিগণের সহিত মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রথমে পরাজিত হইলেও ঔরঙ্গজেব ঐ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করেন।

এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও গোবিন্দ তাহাকে বিপর্যস্ত করিতে প্রয়াস পান। যে কোনও সময়ে মোগল আক্রমণ একাকী প্রতিরোধ করিবার মানসে তিনি শিখ সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য ও ইসলামের অনমনীয় ও দুর্দম শত্রু করিয়া তোলেন। সামাজিক অবনতি ও ধর্মসংক্রান্ত দুর্নীতির প্রতিষেধক রূপে তিনি সারল্য অথচ দৃঢ় সংকল্পের সহিত নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত কার্যপন্থার সূচনা করেন। ইহারই ফলে 'খালসা'র উদ্ভব হয়।

গোবিন্দ বলেন যে তাঁহার সংস্কারকার্য ঐশী প্রেরণা-প্রসূত, শুধু ধর্ম প্রচারের জন্য নহে, অত্যাচারীকে ধ্বংস করিবার ও পাপাচার বিনষ্ট করিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেবার পুরাতন রীতি অর্থাৎ বিনয় ও প্রার্থনার পরিবর্তে তিনি ভগবান ও পবিত্র তরবারির উপর আস্থা স্থাপন করেন। তরবারিই ভগবান, ভগবানই তরবারি। গুরু অর্জুনের সময় মসন্দগণ ও সংগৎ গুরুর সহায়তা করিত, কিন্তু এখন তাহারা গুরুর প্রতিরোধী হইয়া ওঠে। বিরোধী দলগুলিও মোগলদের সহায়তা লাভের চেষ্টা করে। সুতরাং গোবিন্দ সকলকে সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৭৫৬ সম্বৎ-এর ১ বৈশাখ (১৬৯৯ খ্রী) কেশগড়ের সম্মেলনে গুরু তাঁহার জন্য জীবনপাত করিতে পারেন এরূপ 'পঞ্চপিয়ারে'কে লইয়া ধর্মের নূতন ভিত্তি স্থাপনা করেন। দীক্ষার জন্য নানকের 'চরণপাহুলে'র স্থলে 'অমৃতপাহুল' প্রবর্তিত করেন। গুরুও 'পঞ্চপিয়ারে' দ্বারা দীক্ষিত হন। এই নব দীক্ষিত সম্প্রদায়ই খালসা নামে অভিহিত হইল। সকলেই 'ওয়া গুরুজীকা খালসা, ওয়া গুরুজীকা ফতহ' (জয়) ঘোষণা করেন। বংশ জাতি নির্বিশেষে সকলেই 'সিংহ' হন। খালসাই গুরু, গুরুই খালসা। এইরূপে সমগ্র সম্প্রদায় গুরুর মহিমা প্রাপ্ত হইল। সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বিরাজমান।

ধর্মজীবনে এই একতার গ্রন্থি জাতিধর্মভেদাভেদ বিলোপ সাধনে সুদৃঢ় হইল। পানাহারের বাধা-নিষেধ আনুষ্ঠানিক ভোজনের মাধ্যমে দূর হইল। তামাক সেবন বন্ধ হইল। প্রত্যেক শিখকে বিশেষ বেশ ও পরিচ্ছদ —কেশ, কচ্ছ, কঙ্কন, কৃপাণ ও কঙ্কতিকা ব্যবহার করিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সংগঠন, কুচকাওয়াজ ও পার্বত্য দুর্গ নির্মাণও চলিল। লাঙল, তন্তু ও লেখনী ত্যাগ করিয়া শিখদের অসি ধারণ করিতে হইবে। সমর প্রবণতাই ধর্মবিশ্বাসের অংশ বলিয়া গণ্য হইল। এইরূপে ধর্মসম্প্রদায় সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। সেবার প্রতীক (দেগ) ও শক্তির প্রতীক (তেগ)-এর সমন্বয় সাধিত হইল। অন্ন

দিকে সম্প্রদায়ের সমস্ত মনোদর্শনই পরিবর্তিত হইয়া গেল। শান্তিপূর্ণ ধর্মপ্রচারের স্থলে আসিল অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গোবিন্দের সৃষ্ট খালসা এক পূর্ণ, দৃঢ়, গণতান্ত্রিক, শস্ত্র সজ্জিত সম্প্রদায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর।

এই মনোভাব নূতন হইলেও খালসার ভিত্তি ছিল পুরাতনের উপর আধারিত। শিখ ধর্মের মৌলিক বাণীর সহিত ঐক্য রাখিয়াই গোবিন্দ এক নূতন সুর অনুবর্তিত করেন। প্রকৃতপক্ষে খালসা শিখদের সকল সামাজিক ও ধর্ম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি এক গ্রন্থ সংকলন করেন 'দশবেঁ পাদশা কা গ্রন্থ'। ক্যানিংহাম-এর মতে 'গোবিন্দ এক বিজিত জনসমাজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করেন ও তাহাদের মনে সামাজিক স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রাধান্যের এক উচ্চ আশার উদ্বোধন করেন।' তিনি খালসাকে সাম্রাজ্য দান করিবার স্বপ্ন দেখেন।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি জম্মু হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত উত্তর পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজাদের সহিত সাফল্যে যুদ্ধ করেন। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য মোগল সৈন্য প্রেরিত হইলেও তাহারা পরাজিত হয়। তাঁহার সৈন্যবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আনন্দপুর গড় বার বার অবরুদ্ধ হয়। শেষবার গুরু ইহা পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান। মৃত্যুর পূর্বে ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। গোবিন্দ সম্রাটের নিকট যাইবার পথে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পান। গোবিন্দ বাহাদুর শাহকে সাহায্য করেন। অবশেষে তিনি এক আফগানের হস্তে প্রাণ হারান (১৭০৮ খ্রী)। কলহ নিবারণের জন্য গোবিন্দ গুরুর পদ বিলুপ্ত করিয়া বান্দাকে কেবল সামরিক নেতা করেন ও ধর্মজীবনে নেতৃত্ব পাঁচ জন শিখের হস্তে অর্পণ করেন, অর্থাৎ জনসমাজের নেতৃত্ব সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত হয়।

দ্র T. P. Hughes, *Dictionary of Islam*, London, 1896; M. A. Macauliffe, *The Sikh Religion*, vols 1-6, Oxford, 1909; J. D. Cunningham, *A History of the Sikhs*, Oxford, 1918; W. Irvine, *Later Mughals*, vol 1, Calcutta, 1922; Jadunath Sarkar, *Auranzib*, vol III, Calcutta, 1928; Teja Singh, *Sikhism, its Ideals and Institutions*, Calcutta, 1938; Gokulchand Narang, *Transformation of Sikhism*, New Delhi, 1960; I. B. Banerjee, *Evolution of the Khalsa*, vol. 2, Calcutta, 1963.

জগদীশনারায়ণ সরকার

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮ খ্রী) ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা সোনামণি দেবী। প্রায় আড়াই বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। সোনামণি দেবীর উপরে পুত্রের লালন-পালনের ভার পড়ে। গুরুদাস প্রথম ওরিয়েন্টাল সেমিনারি এবং পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (বর্তমান হেয়ার স্কুল) অধ্যয়ন করেন। ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ., বি. এ, এম এ এবং বি. এল. পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন-এ গণিতের অধ্যাপক হন। পরে বহরমপুর কলেজে আইন ও গণিতের অধ্যাপক হইয়া যান। বহরমপুরে অবস্থান কালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী রূপে যোগ দেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ডি. এল উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদে বৃত হন। এই অধ্যাপক রূপে প্রদত্ত বক্তৃতা 'হিন্দু ল অফ ম্যারেজ অ্যাণ্ড স্ত্রীধন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে ইহাই প্রামাণিক গ্রন্থ। ১৮৮৮ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে স্যর উপাধি লাভ করেন।

সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য রূপে বহু বৎসর কার্য করিবার পর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। দুই বৎসর (১৮৯০-৯২ খ্রী) তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার এবং আনুষঙ্গিক বহুবিধ কর্মে তিনি এই সময় হইতে লিপ্ত হইয়া পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা ভাষা সাহিত্যের স্থান নির্দিষ্ট করিবার কার্যে তিনি হাত দেন। এই কার্যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং পরোক্ষভাবে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কর্তৃপক্ষের সহায়তা লাভ করেন। সাহিত্য পরিষদের বাংলা ভাষা সাহিত্য প্রচার ও প্রসারকল্পে আবদ্ধ প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে গুরুদাস প্রথম হইতে যুক্ত হন। গুরুদাস কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠার অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম। ইহার প্রথম নাম ছিল— 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অফ ইয়ং মেন'। তিনি আমৃত্যু ইহার সভাপতি প্রভৃতি

দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যুবসমাজের সংঘবদ্ধভাবে চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও সেবাকার্যে প্রোৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ কমিশন-এর সদস্য হন। কমিশনের সকল সিদ্ধান্তের সহিত তিনি একমত হইতে পারেন না। সেইজন্য স্বীয় বক্তব্য পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার এই মতানৈক্য লিপি (Note of Dissent) জাতীয় শিক্ষার সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-৬ খ্রী) জাতীয় আদর্শে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হয়। গুরুদাস এই শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় প্রচেষ্টা কার্যকর করিতে যত্নবান হন। তিনি আজীবন ইহার পরিচালনা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ভিন্ন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভাগবৎ চতুষ্পাঠী ও 'ডন' পত্রিকার সহিত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই গুরুদাস সংযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা ন্যাশন্যাল কলেজ ও স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন (১৪ আগস্ট, ১৯০৬ খ্রী)-সভায় তিনি জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্যক রূপে ব্যক্ত করেন। পরে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক স্বীয় চিন্তা কয়েকখানি বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত আইন গ্রন্থ এবং অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কীয় কয়েকখানি পাঠ্য বই ব্যতীত তাঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক: 'শিক্ষা' (১৯০৭ খ্রী), 'জ্ঞান ও কর্ম' (১৯১০ খ্রী), 'এ ফিউ থট্স অন এডুকেশন' (১৯০৪ খ্রী), 'দি এডুকেশন প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া' (১৯১৫ খ্রী)। গুরুদাস নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বর কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

দ্র শরৎকুমার রায়, বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯২১, Anath Nath Basu, ed., Sir *Gooroodass Centenary Commemoration Volume*, Calcutta, 1948.

যোগেশচন্দ্র বাগল

গুরুপ্রসাদ মিশ্র উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে একজন নেতৃস্থানীয় ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক রূপে সুপরিচিত ছিলেন। জন্ম বারাণসীতে। বিহারের বেতিয়া সংগীতকেন্দ্রে প্রধানতঃ শিক্ষালাভের জন্য তিনি বেতিয়া ঘরানাদার-রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। গুরুপ্রসাদ দীর্ঘকাল কলিকাতায় অবস্থান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। খেয়াল-গায়ক শশিভূষণ দে (কৃষ্ণচন্দ্র দে-র প্রথম সংগীতগুরু), গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরও অন্যতম সংগীতশিক্ষক ছিলেন গুরুপ্রসাদ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গুরুপ্রসাদ সেন (১৮৪৩-১৯০০ খ্রী) জন্ম ৮ চৈত্র ১২৪৯ বঙ্গাব্দ, ২০ মার্চ ১৮৪৩ খ্রী, মৃত্যু ১৩ আশ্বিন ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০ খ্রী। পিতা কাশীচন্দ্র সেনের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রাম। গুরুপ্রসাদ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়বারের এম. এ. পরীক্ষায় (১৮৬৭ খ্রী) ইতিহাসে এবং পরবৎসর বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুই বৎসর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিবার পর পাটনা আদালতে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিয়া ক্রমশঃ তত্রত্য ব্যবহারজীবীদের মধ্যে নেতৃত্বের আসন লাভ করেন।

এককালে বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া যে সকল বাঙালী তত্তৎপ্রদেশবাসীদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ পূর্বক তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, গুরুপ্রসাদ সেনের নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। পঁচিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল তিনি বিহার অঞ্চলে নানা সার্বজনিক আন্দোলনে সর্বসাধারণের নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিহারে তিনি বহু সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বেহার হেরাল্ড' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে জনবাণী প্রচারের ও বিহারের দুঃখমোচন চেষ্টার প্রধান মুখপত্র রূপে পরিগণিত ছিল— এই সাপ্তাহিক পত্র বিহারে প্রথম ইংরেজী সাময়িক পত্র। এই পত্রে মুদ্রিত সার্বজনিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ 'নোট্স অন সাম কোয়েশ্চেন্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইণ্ডিয়া' (১৮৯৩ খ্রী) নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (কলিকাতা, ১৮৮৬ খ্রী) তিনি বিহারের প্রতিনিধি রূপে যোগ দেন এবং আজীবন ইহার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স নামে যে বার্ষিক সম্মিলন দীর্ঘকাল বাংলা দেশে রাষ্ট্রীয় আলোচনার একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার কৃষ্ণনগর অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদে বৃত হন, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা অধিবেশনে উহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব

করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন বেঙ্গল লেজিস-লেটিভ কাউন্সিল বা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

তাঁহার রচিত হিন্দু ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যান 'অ্যান ইনট্রোডাক্‌শন টু দি স্টাডি অফ হিন্দুইজম' (১৮৯১ খ্রী) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দ্র হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মহাপ্রাণ গুরুপ্রসাদ, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; Sachchidananda Sinha, *Some Eminent Behar Contemporaries*, Patna, 1944.

পুলিনবিহারী সেন

গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১ খ্রী) শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলে তাঁহার স্বীয় জেলার শ্রীহট্ট সম্মিলনীর প্রতিশ্রুত অর্থ লাভ করিয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমন করেন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সাফল্যের সহিত উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৎসরই আরা জেলার এস. ডি. ও. পদে যোগদান করিয়া কর্মজীবন আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাউন্সিল অফ স্টেট-এর সরকার-মনোনীত সভ্য হন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরে অধিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষি সম্মেলন এবং কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত নিখিল বিশ্ব বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

কার্যব্যপদেশে বঙ্গ দেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। গ্রামবাসীকে কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকারি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহাদের সহিত একত্রে মাঠে মাঠে কাজ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কি উপায়ে পল্লী বাংলার সর্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য তিনি এশিয়ার সর্বোন্নত দেশ জাপানে গমন করেন (১৯২০ খ্রী)। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি স্থাপন করিয়া তিনি অবহেলিত লোকসংস্কৃতি-পরিচায়ক শিল্পবস্তু সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। ঐ বৎসরেই ব্রতচারী আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া তিনি গ্রাম বাংলার জনগণের খণ্ডিত ও আনন্দহীন জীবনে সমগ্রতা আনয়ন ও জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করেন। এই আন্দোলন সফল করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে তিনি ব্রতচারী কেন্দ্র স্থাপনা করেন এবং বেহালার নিকটবর্তী ঠাকুরপুকুর গ্রামে প্রচুর জমি সংগ্রহ করেন। শিক্ষামূলক ও লোকরঞ্জক সংগীত ও ছড়া ইত্যাদি রচনা করিয়া তিনি ব্রতচারী আন্দোলনে প্রাণসঞ্চালন করিয়াছিলেন। বরোদা, হায়দরাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে তিনি ব্রতচারী দল লইয়া পরিভ্রমণ করেন। লণ্ডনেও তিনি ব্রতচারী সমিতি স্থাপন করেন। পট, কাঠ ও পাথরের মূর্তি, পুতুল, আলপনা, দেওয়ালচিত্র ইত্যাদি বহু প্রকারের শিল্পবস্তুর নমুনা তিনি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ব্রতচারী সমিতিগুলির সহিত একটি সংগ্রহশালায় এই প্রকারের শিল্পসামগ্রীগুলি সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থার সংকল্প তিনি করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই শিল্পসম্পদ ব্রতচারী গ্রামে ব্রতচারী সমিতির তত্ত্বাবধানে—'গুরুসদয় মিউজিয়ামে' সংরক্ষিত আছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বি. দে র চতুর্থ কন্যা সরোজনলিনীকে বিবাহ করেন। সরোজনলিনী ও স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরোজনলিনীর মৃত্যু হইলে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করেন এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে একটি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠা করেন। স্বভাব কবি হিসাবে গুরুসদয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গুরুসদয় 'ভজার বাঁশি' (১৯২২ খ্রী), 'চাঁদের বুড়ি' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), 'সরোজনলিনী' (১৯২৫ খ্রী), 'ব্রতচারী সখা' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), 'পটুয়া সঙ্গীত' (১৯৩৯ খ্রী) প্রভৃতি বাংলা কবিতা ও সংগ্রহ-পুস্তক রচনা ও সংকলন করেন। 'ওইমেন অফ ইণ্ডিয়া' (১৯৩৯ খ্রী), 'ইণ্ডিয়ান ফোক ডান্স অ্যাণ্ড ফোক লোর মুভমেণ্ট' (১৯৩৩ খ্রী), 'দি ব্রতচারী সিন্থিসিস' (১৯৩৭ খ্রী) এবং 'দি ফোক ডান্সেস অফ বেঙ্গল' (১৯৫৪ খ্রী) প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গুর্জর গুর্জরগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন তাঁহারা একটি বৈদেশিক জাতি—হূনদের পশ্চাৎ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ও পাঞ্জাব রাজপুতানা হইয়া গুজরাতে বসবাস করে। অন্য মতে গুর্জরগণ আদৌ বৈদেশিক নয়, ভারতের অন্তর্গত গুর্জর দেশের অধিবাসী। এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

ভারতে গুর্জর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিচন্দ্র ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে যোধপুরে রাজ্য স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ হিউএন্‌-ৎসাঙ বর্ণিত কিউ-চে-লো গুর্জর দেশেরই নাম। তিনি ইহার রাজধানীর নাম পি-লো-মো-লো বা ভিল্লমাল বলিয়াছেন; ভিল্লমাল বর্তমান ভিনমাল বা বাড়মের। এই বংশের নবম রাজা শীলুক ভট্টিরাজ দেবরাজকে পরাজিত

করেন। শীলুককে 'বস্ত্র-মণ্ডল পালক' বলা হইত। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ তিনি একটি গুর্জর সংঘের অধিনায়ক ছিলেন। শীলুক বা তাহার উত্তরাধিকারীর সময়ে আরবগণ ভারত আক্রমণ করিয়া যোধপুর রাজ্য দখল করে কিন্তু অবন্তির রাজা প্রতীহার বংশীয় নাগভট তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। ইহার পরে যোধপুর রাজ্যে নাগভটের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

সম্ভবতঃ হরিচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র প্রথম দদ্দ গুজরাতে রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী নান্দীপুরী বুলার (Buhler) এর মতে ব্রোচ ও ভগবানলাল ইন্দ্রজীর মতে নান্দোদ। ইহার রাজা দ্বিতীয় দদ্দ হর্ষবর্ধনের হস্তে পরাজিত বলভীর রাজাকে আশ্রয় দেন। পরবর্তী কালে এই বলভীর রাজা দুই বার নান্দীপুরী দখল করেন ও শেষবার চালুক্যরাজের সহায়তায় তাহাকে বিতাড়িত করা হয়। এই বংশের শেষ রাজা চতুর্থ জয়ভটের সময়ে আরবগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে চালুক্যরাজ অবনিজনাশ্রয়-পুলকেশিরাজের সাহায্যে জয়ভট তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। ইহার পরে এই রাজত্ব যথাক্রমে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহারগণের আয়ত্তে আসে। প্রতীহার নামে গুর্জরগণের আর একটি শাখা সম্ভবতঃ অবন্তিতে রাজত্ব করিতেন ও তাঁহাদের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। ইহার রাজা প্রথম নাগভট আরবগণকে বিতাড়িত করিয়া ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই প্রতীহার রাজগণের সময়ে গুর্জরদিগের শক্তি ও সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল। 'গুর্জর প্রতীহার' দ্র।

দ্র K M Munshi, *The glory that was Gurjaradesa*, Bombay, 1944; R. C Majumdar, ed., *The Classical Age*, Bombay, 1954.

বিশ্বাক্ষ দত্ত

গুর্জর প্রতীহার সাধারণতঃ গুর্জরদিগকে ভারতে আগন্তুক মধ্য এশিয়ার একটি উপজাতি বলিয়া মনে করা হয়। সম্প্রতি অনেকে তাহাদিগকে মূলতঃ রাজপুতানার একটি অখ্যাত উপজাতি বলিয়া মনে করেন। মন্দর (যোধপুর)-এ হরিচন্দ্র প্রথম গুর্জর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। একটি শাখা লাট (গুজরাট) দেশেও প্রাধান্য স্থাপিত করে। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহার যে শাখা অবন্তি রাজ্যে শক্তিশালী হইয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে তাহারা নিজেদের গুর্জর প্রতীহার নামে অভিহিত করিত। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই বংশীয় প্রথম নাগভট (আনুমানিক ৭৩০-৫৬ খ্রী) আরব আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইহার অর্ধ শতাব্দী পরে এই বংশের একজন শক্তিশালী রাজা বৎসরাজ (৭৮৩ খ্রী) রাজপুতানা ও মধ্য ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার ফলে পাল রাজগণের সহিত যুদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ গোপাল অথবা ধর্মপালের সহিত গঙ্গা যমুনা দোয়াবে এই যুদ্ধ হইয়াছিল এবং পালরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর বৎসরাজ স্বয়ং রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক পরাজিত হন এবং রাজপুতানায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

বৎসরাজের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্ধ্র, সৈন্ধব, বিদর্ভ ও কলিঙ্গরাজ তাঁহার অধীন হন এবং তিনি আনর্ত মালব, কিরাত, তুরস্ক, বৎস ও মৎস্য দেশের দুর্গগুলি জয় করেন। তিনি লাট দেশের রাষ্ট্রকূট ইন্দ্র ও গুর্জররাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

নাগভট অতঃপর কনৌজ জয়ে মনোনিবেশ করেন। গৌড়রাজ ধর্মপাল কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া তৎস্থলে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নাগভট ধর্মপাল ও চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। কিন্তু অতঃপর রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে তিনি পরাজিত হন। ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সম্ভবতঃ কনৌজে নিজেদের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করেন। কিন্তু জৈন 'প্রভাবক চরিত' হইতে জানা যায় যে ৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগাবলোক (নাগভট) কনৌজে রাজত্ব করিতেন। নাগভটের রাজ্যসীমা রাজপুতানা ও কাঠিয়াওয়াড় উপদ্বীপ হইতে পূর্বে গোয়ালিয়র, কনৌজ ও সম্ভবতঃ কালঞ্জর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্র দুর্বল নৃপতি ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ গৌড়াধিপ দেবপাল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র মিহিরভোজ (৮৩৬-৮৫ খ্রী) সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমাবধি তাঁহার রাজধানী ছিল কনৌজ, কিন্তু রামভদ্রের দুর্বল শাসনে যোধপুর গুর্জরগণ কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়। ঐ অঞ্চলে ভোজ স্বীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর তিনি গৌড়রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

ভোজ মালব আক্রমণ করেন কিন্তু গুজরাত রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় ধ্রুব ধারাবর্ষের হস্তে পরাজিত হন। তিনি রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণকে প্রথমে পরাজিত করিলেও পরে তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। কিন্তু মোটের উপর আর্যাবর্তে তিনি সমসাময়িক রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী

ছিলেন। আরবদেশীয় সুলেমানের বর্ণনা হইতে গুর্জররাজের সামরিক শক্তি, ধনপ্রাচুর্য ও সুশাসনের কথা জানা যায়। গুর্জররাজগণ মুসলমানগণের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া 'প্রতীহার' নাম সার্থক করিয়াছিলেন। ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপালও খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্য হিমালয় হইতে বিন্ধ্য এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে আরব সাগর হইতে উত্তর বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলা যায়। প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

মহেন্দ্রপালের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভোজ রাজা হন কিন্তু অল্পকাল মধ্যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহীপাল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজধানী কনৌজ দখল করেন। তৃতীয় কৃষ্ণ যুবরাজ অবস্থায় সম্ভবতঃ মহীপালকে পরাজিত করিয়া চিত্রকূট ও কালঞ্জর জয় করেন। মহীপালের সভাকবি তাঁহাকেও অনেক রাজ্য বিজয়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অতিশয়োক্তি আছে। তবে মহীপালের রাজ্য শেষ পর্যন্ত কাঠিয়াওয়াড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ইহার পরেই এই রাজ্যের শেষ পতন হয়। মহীপালের পরে উল্লেখযোগ্য রাজা হইলেন রাজ্যপাল।

১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহমুদ কনৌজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে রাজ্যপাল পলায়ন করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দেল-রাজের সামন্ত কচ্ছপঘাত বংশীয় অর্জুন রাজ্যপালকে হত্যা করেন। অতঃপর ত্রিলোচন পাল রাজা হন। কিন্তু রাজধানী কনৌজ আর তাঁহার অধিকারে ছিল না। সুলতান মহমুদ কর্তৃক পরাজিত হইলেও তিনি ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে রাজত্ব করেন। তিনিই এই বংশের শেষ রাজা, ইহার পর প্রতীহার রাজ্য চন্দেল্ল, চাহমান, চৌলুক্য ও পরমারদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়।

দ্র R. C Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IV, Bombay, 1955; R. C Tripathi, *History of Kanauj to the Moslem Conquest*, Banares, 1959.

অবীর চক্রবর্তী

গুলমার্গ ৩৪°১০´ উত্তর ও ৭৪°১৫´ পূর্ব। শ্রীনগর হইতে ৪৬ কিলোমিটার (২৯ মাইল) পশ্চিমে বারমুলা জেলায় পীর-অঞ্চলের উত্তর গাত্রে গুলমার্গ (২৬১০ মিটার বা ৮৭০০ ফুট) অবস্থিত। জনসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২০৬, পুরুষ ১৮৩ ও নারী ২৩। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা ১২৬ মাত্র। শ্রীনগর হইতে বাস বা মোটর যোগে ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দূরে টাংমার্গ ২১৬০ মিটার (৭২০০ ফুট) পর্যন্ত যাওয়া যায়। টাংমার্গ হইতে খাড়া চড়াই পথ প্রায় ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) ঘুরিয়া গুলমার্গে পৌঁছিয়াছে। গুলমার্গের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কাশ্মীরের কবি-মহিষী হবো খাতুন। গুলমার্গের পূর্বনাম গোরী-মার্গ। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর সুলতান ইউসুফ শাহ্ ইহার নাম বদলাইয়া রাখেন গুল (গোলাপ)-মার্গ। ঢেউ খেলানো প্রায় সমতল ভূমি বিশিষ্ট গুলমার্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। বৎসরে ছয় মাস ইহা তুষারে ঢাকা থাকে। মে-অক্টোবর মাস ভ্রমণের প্রশস্ত সময়।

গুলমার্গের বনজ সম্পদ প্রচুর। ইহা পাইন, পপলার, ফার দেওদার প্রভৃতি বৃক্ষে পূর্ণ। হালকা ও সহজদাহ্য পপলারের কাষ্ঠে ভাল দিয়াশলাইয়ের কাঠি তৈয়ারি হয়। গাছ কাটিয়া ঝিলামের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয় ও পাঞ্জাবে নীত হয়। অধিবাসীরা সরল ও দরিদ্র। কৃষিকার্য বিশেষ কিছু হয় না। কথ্য ভাষা কাশ্মীরী, লিখিত ভাষা পারসী।

ব্রিটিশ যুগে গুলমার্গ কাশ্মীর রেসিডেন্টের গ্রীষ্মবাস হয়। খেলার মাঠ, হকির মাঠ, গল্‌ফ্ খেলার ময়দান ও স্কী প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। ভারতের স্কী খেলার প্রধান কেন্দ্র গুলমার্গ। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের আক্রমণে গুলমার্গের বহু কাঠের ঘর বাড়ি পুড়িয়া যায় ও লুটতরাজ হয়। গুলমার্গের ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) দূরে তোষময়দান। এখানে কিছু ভগ্ন মন্দির আছে। গুলমার্গ হইতে ৬·৪ কিলোমিটার (৪ মাইল) চড়াই উঠিয়া পাওয়া যায় খিলানমার্গ। ইহার একপার্শ্বে শুভ্র তুষারে ঢাকা আফারওয়াৎ পাহাড়, অন্য দিকে দিগন্তবিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকার শ্যামল সমতল ও তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড এক নীলার ন্যায় উলারের নিথর নীলাম্বু। এই স্থান হইতে নাঙ্গা পর্বত ৮১৩৭ মিটার (২৬৭৯২ ফুট), হরমুখ পর্বত ৫০৭০ মিটার (১৬৯০০ ফুট) ও কোলহাই পর্বত ৫৪২৫ মিটার (১৭৭৯২ ফুট) দেখা যায়।

দ্র নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশ্মীর, কলিকাতা, ১৯৫৬, নলিনীকিশোর গুহ, কাশ্মীর পরিক্রমা, কলিকাতা, ১৯৫৯, ধীরেন্দ্রলাল ধর, কাশ্মীর, কলিকাতা, ১৯৬৪, F. Younghusband, *Kashmir*, London, 1917; *Census of India: Paper No. I of 1962: 1961 Census: Final Population Totals*, Delhi 1962.

সলিলকুমার চৌধুরী

গুল্ম গাছ দ্র

গুলাব সিং মহারাজা গুলাব সিং ডোগরা রাজপুত ছিলেন এবং প্রথমে মহারাজা রঞ্জিৎ সিং এর অধীনে কাজ করিতেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রঞ্জিৎ সিং তাঁহার প্রতিভা দর্শনে তাঁহাকে জম্মুর রাজা নির্বাচিত করেন। ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধের পূর্বে গুলাব সিং ভদরওয়া, কিস্ট্ওয়ার, লদাখ ও বালটিস্থান জয় করেন ও প্রায় কাশ্মীর ঘিরিয়া ফেলেন। লাহোর দরবারের প্রতিনিধি হইলেও তিনি প্রথম শিখ যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি লাল সিং ও তেজ সিং-এর সহিত যোগ দেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে ইংরেজ শিখদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধ জয়ের পর মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরেজ গুলাব সিংকে কাশ্মীরের স্বাধীন রাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করে এবং লাহোর দরবার ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়া ইংরেজদের সহিত সন্ধি করে। এইরূপে কাশ্মীর গুলাব সিং-এর দখলে আসে। ইহার পর তিনি আমরণ ইংরেজদের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদিগকে সাহায্য করিবার আয়োজন করিতেছিলেন এমন সময় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *British Paramountcy & Indian Renaissance*, part I, Bombay, 1963.

বিশ্বরূপ দত্ত

গুহক গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুরের এক সমৃদ্ধিশালী নিষাদজাতীয় নৃপতি। ইনি গুহ নামে বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছেন। গুহ অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের পরম মিত্র ছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০।৩২, বঙ্গবাসী সংস্করণ)। রাম বনগমনকালে ইঁহার আশ্রমে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করেন। গুহ রামচন্দ্রের আগমন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করেন, রামও অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন (ঐ ৫০।৩৬)। গুহ রামচন্দ্রের গঙ্গা অতিক্রম করার জন্য উত্তম নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দেন (ঐ ৫০।৬-৭)। রামচন্দ্র বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালে গুহের নিকট হনুমানের দ্বারা বিজয়বার্তা প্রেরণ করেন (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১২৭।৪)।

সীতানাথ গোস্বামী

গুহা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নির্মিত ভূনিম্নস্থ যে কোনও প্রকার গহ্বরকেই গুহা বলা যায়। অধিকাংশ গুহাই ভূগর্ভস্থ জলের দ্রবীভবনের ফলে রচিত হইয়া থাকে। যে সব অঞ্চলে চুনা পাথরের আধিক্য আছে সেখানে এই প্রকারে সহজেই গুহা হইতে পারে, কারণ জলে ঈষৎ অম্ল থাকিলেই চুনা পাথর দ্রবীভূত হয়। ইহা ছাড়া ভৃগুর (ক্লিফ) উপর বিষমবিক্ষেপের (ডিফারেনশল ওয়েদারিং) ফলে অপেক্ষাকৃত নরম শিলাগুলি ক্ষয়িত হইয়া গহ্বরের সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষতঃ সমুদ্র উপকূলে তরঙ্গের আঘাতে ভৃগুর পীঠবর্তী স্থানে এই প্রকারে গহ্বর নির্মিত হইতে পারে। তরল লাভা কঠিন হইবার সময় উপরের স্তরটি আগে কঠিন হয়, ফলে উপরে একটি শক্ত আবরণ পড়ে। তখন নিম্নের তরল লাভা নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে গহ্বরের সৃষ্টি হয়। ভারতের বিখ্যাত অজন্টা ও এলোরা গুহা সম্ভবতঃ এইরূপে সৃষ্ট।

গুহাই ছিল আদিম মানুষের আশ্রয়। এজন্য অনেক গুহায় আদিম মানুষের জীবাশ্ম ও বিচিত্র শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গুহার মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অজন্টা, এলোরা ও এলিফ্যান্টা সর্বাধিক বিখ্যাত। ‘অজন্টা’, ‘এলিফ্যান্টা’ ও ‘এলোরা’ দ্র।

শিবশান্তি মুখোপাধ্যায়

গুহাচিত্র গুহার গাত্রে ক্ষোদিত বা অঙ্কিত অলংকরণকে গুহাচিত্র বলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে গুহাচিত্রের প্রচলন ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সে যুগের গুহাচিত্রের অন্তপ্রেরণা ছিল যাদুাচরণ, ভাবপ্রকাশ বা সৌন্দর্যসাধন। উত্তর স্পেনে আলটামিরাতে, দক্ষিণ ফ্রান্সে লা মথ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা ও উত্তর আফ্রিকায় এবং ভারতে মধ্য ভারত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র পাওয়া গিয়াছে। মধ্য প্রদেশের বেত্রবতী ও চম্বল উপত্যকায়, ছত্তিশগড়ের সিংহানপুর ও রায়গড় ইত্যাদি স্থানে, উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুরের লিখুনিয়া, কহবর ও ভালদরিয়ায় এবং ওড়িশার চক্রধরপুরের কাছে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে গুহাচিত্র পৃথিবীর নানা দেশে এবং বিশেষতঃ ভারতে একটি বহুব্যবহৃত শিল্পের মাধ্যম রূপে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য -ধর্মসম্প্রদায়ের চেষ্টায় উৎকর্ষ লাভ করে। অঙ্কিত গুহাচিত্রের জন্য ভারতের অজন্টা, বাঘ, বাদামি, সিত্তনবসাল, পিঠালখোড়া এবং এলোরার গুহাচিত্র বিশেষ খ্যাত। সিংহলের সিগিরিয়া ও পোলান্নারুয়া,

চীনের তুং হুয়ান (Tun-Huang), মধ্য এশিয়ার খোটান (Khotan) ও তুরফান (Turfan) অঞ্চলে, কিজিল (Qizil), বাজাকলিক (Bezeklik), তয়ুক (Toyuk), আফগানিস্তানের বামিয়েন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ইহা ভিন্ন বিহারের লোমশ ঋষি, ওড়িশার উদয়গিরি খণ্ডগিরি ও ললিতগিরি, গুজরাতের জুনাগড, কাঠিয়াওয়াড, তলাজ, ঢক ও সান, মহারাষ্ট্রের কার্লে, ভাজা, বেদসা, নাসিক, জুনার, পুনার পাতালেশ্বর গুহা, কানহেরি, মহাকাল, যোগেশ্বরী ও এলিফ্যান্টা, ঔরঙ্গাবাদ ও আইহোলি প্রভৃতি, অন্ধ্র প্রদেশের শংকরম, কোট্টিপল্লী, উণ্ডবল্লী, পেনমগ, সীতারামপুরম প্রভৃতি এবং মাদ্রাজের মহাবলীপুরম, তিরুক্কলুক্কুনরম, সিংহপেরুমলকোবিল, সিংহ-ববম এবং মাতুবাই প্রভৃতির গুহাগুলিতে ক্ষোদিত চিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সকল গুহার অধিকাংশই যে একদা চিত্রিত ছিল তাহা বহু ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন চিত্রের অবশেষ ও প্রাচীন গুহার স্থাপত্য রীতির অনুধাবন হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

গুহামন্দির গুহামন্দির বা পর্বতগাত্র খনন করিয়া নির্মিত দেবমন্দির, চৈত্যগৃহ বা বিহার ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। পর্বতের স্বাভাবিক ফাটল বা কন্দর সন্ন্যাসী ও সাধকগণ স্বভাবতই পছন্দ করেন। রাজগিরে বুদ্ধজীবনের সহিত জড়িত এইরূপ কয়েকটি গুহা বর্তমান। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রিয়দর্শী রাজা অশোক (ও তাঁহার পৌত্র দশরথ) গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে যে গুহামন্দির নির্মাণ করেন তাহাই ভারতে প্রাচীনতম বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রসঙ্গে মিশর, আসিরিয়া, লিসিয়া (গ্রীক) পেত্রা (রোমীয়) ও আকামেনিয় ও সাসানীয় শাসনকালীন পারস্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। অনুমান হয় যে পারস্যরাজ দরেইওসের আদর্শে সম্রাট অশোক বরাবর পর্বতে গুহামন্দির খনন করান এবং উহা আজীবিক সন্ন্যাসীগণকে দান করেন। ইহার পরে মধ্যে মধ্যে সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিলেও এই স্থাপত্য রীতি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ভারতে এরূপ মন্দিরের সংখ্যা মোট বার শতের মত হইবে।

গুহামন্দিরগুলিকে বৌদ্ধ হিন্দু ও জৈন— এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বৌদ্ধ গুহা আবার হীনযান ও মহাযান— এই দুই সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে বিভিন্ন। ব্রহ্মজাল সূত্রের নির্দেশানুযায়ী হীনযান বৌদ্ধ গুহামন্দিরগুলিতে বুদ্ধের মূর্তি নাই, কিন্তু মহাযানগুলিতে বুদ্ধের মূর্তি এবং চিত্র বর্তমান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যথা কানহেরিতে হীনযান চৈত্যগৃহগুলিকে উত্তরকালে মহাযান সম্প্রদায় পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। বৌদ্ধমন্দিরগুলিতে একটি প্রার্থনা সভা বা চৈত্য-গৃহ এবং তৎসংলগ্ন ভিক্ষুদের বাসস্থান বা বিহার স্থাপিত হইত। প্রার্থনা সভা বা চৈত্যগৃহে একটি স্তূপ (চৈত্য) ও তাহার দুই পার্শ্বে দুই সারি স্তম্ভ ও উপরে খিলান করা ছাদ থাকিত। বিভিন্ন সময়ের নির্মিত চৈত্যগৃহ-গুলি দেখিলে কিরূপে সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে আবশ্যক পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা বুঝা যায়। বিহারগুলিতে প্রথমে একটি বড় চতুষ্কোণ হল ঘর এবং তাহার চারি পার্শ্বে ভিক্ষুদের বাসের জন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কক্ষ থাকিত। বিহার এবং চৈত্যগৃহগুলি তৎকালে প্রচলিত কাষ্ঠনির্মিত গৃহের অনুকরণে নির্মিত হইত, ইহা বলা যাইতে পারে। হীনযান বৌদ্ধ মন্দিরগুলির নির্মাণকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। নির্মাণকাল অনুযায়ী পশ্চিম ভারতের বৌদ্ধ গুহামন্দিরগুলিকে নিম্নলিখিত পর্যায় অনুসারে সাজানো যায়. ভাজা, কোণ্ডানে, পিতলখোড়া, অজন্টা (১০ নং গুহা), বেদসা, অজন্টা (৯ নং), নাসিক ও কার্লা (কার্লে)। গয়ার নিকট বরাবর পর্বতের সুমসৃণ পালিশ যুক্ত গুহার প্রাচীরে পাশাপাশি সজ্জিত কাষ্ঠফলকের অনুকরণে খাঁজ কাটা রহিয়াছে। ভাজা, কোণ্ডানে প্রভৃতি চৈত্যগৃহগুলিতে দারুশিল্পের অনুকরণের ছাপ সুস্পষ্ট। অপর পক্ষে অজন্টা ও কার্লাতে শিল্পী স্বীয় স্বাধীনতা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। ওড়িশার গুহা-মন্দিরগুলিও এই সময়ের সৃষ্টি এবং ইহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের চৈত্য ও বিহারগুলি প্রধানতঃ অজন্টা ও এলোরায় অবস্থিত। ইহাদের নির্মাণ-কাল আনুমানিক ৪৫০ হইতে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এখানে শিল্পী দারুশিল্পের প্রভাবমুক্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ করিয়াছেন। অজন্টা ও এলোরার গুহামন্দিরগুলি ভাস্কর্যের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ।

উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর্য ও নির্মাণ কৌশলের জন্য মাদ্রাজে পল্লব যুগের (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) গুহামন্দিরগুলিও সুবিখ্যাত। এক-একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড ক্ষোদিত করিয়া এক বা দুইতল গড়া মন্দিরের আকার দান করা হইয়াছে। ইহার পরে নিকটবর্তী স্থানসমূহে আরও দুই শতাব্দী ধরিয়া গুহামন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এলোরায়

রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ (৭৫৭-৮৩ খ্রী) নির্মিত কৈলাশ মন্দির একটি নাতিবৃহৎ পর্বতগাত্রকে সম্পূর্ণরূপে খনন করিয়া অপরূপ মন্দিরের গড়ন দেওয়া হইয়াছে ('এলোরা' দ্র)।

এলোরায় জৈনদের নির্মিত ৫টি গুহামন্দির বর্তমান। অলংকরণের উৎকর্ষ সত্ত্বেও ঐগুলিকে স্বচ্ছন্দযুক্ত বলা যায় না। উহাদের মধ্যে ইন্দ্রসভা নামে দ্বিতল গুহামন্দির উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রসভার দ্বিতল ও উপরের অংশ সম্পূর্ণ, অথচ কোনও কারণবশতঃ পরিত্যক্ত হওয়াতে উহার নিম্নাংশ অর্ধসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন তলগুলি হয়ত স্বতন্ত্রভাবে খনিত হইত।

দ্র J. Fergusson & J Burgess, *The Cave Temples of India*, London, 1880, Percy Brown, *Indian Architecture, (Buddhist and Hindu)*, Bombay, 1912

নী বা বে

গূঢ়ৈষা কমপ্লেক্স। মনঃসমীক্ষার মতে মানুষের মনে এমন বহু ইচ্ছা আছে যেগুলি পরস্পরবিবদ্ধ, আবার কতকগুলি ইচ্ছা এমন আছে যাহা ধর্ম, সমাজ বা নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধ। সেই সকল ইচ্ছা যাহাতে সংজ্ঞানে (কনসাস) আসিয়া দুঃখ বা অশান্তির বোধ না জাগায় এইজন্য মনই ইহাদের বিশেষ ক্রিয়ায় অবদমন (রিপ্রেস্) করিয়া আসজ্ঞানে (প্রি কনসাস) বা নির্জ্ঞানে (আন কনসাস) চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অবদমিত যে ইচ্ছাগুলির মধ্যে ভাব ও আবেগের মিল বা উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য থাকে তাহার মধ্যে কতকগুলি নির্জ্ঞানে পরস্পর যুক্ত হয়। এই প্রকার জটিল ইচ্ছার নির্জ্ঞানে যুক্ত অবস্থাকেই গূঢ়ৈষা বলা হয়। একক ইচ্ছা অপেক্ষা এই যুক্ত ইচ্ছার শক্তি বৃদ্ধি পায় ও কোনও একটি মাত্র ইচ্ছার রূপ বদল করিয়া সমষ্টিগত রূপে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও একটি ইচ্ছাই অন্য সহায়ক ইচ্ছার সাহায্যে প্রবল হইয়া আবার সংজ্ঞানে আসিয়া ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করে।

এই অবদমিত ইচ্ছাগুলির মিলিত বা একক রূপে সহজ প্রকাশও যদি মন বাধা দিয়া অবদমন প্রবল রাখে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ গূঢ়ৈষা বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া মনের প্রহরীকে (সেন্‌সর) ফাঁকি দিয়া মানসিক রোগ লক্ষণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। মনঃসমীক্ষণের ফলে সুস্থ ও মানসিক রোগগ্রস্ত— এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই পিতার প্রতি কন্যার ও মাতার প্রতি পুত্রের আকর্ষণ-জনিত ঈডিপাস গূঢ়ৈষা (কম্‌প্লেক্স) এবং হীন ভাব (ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স) অন্য গূঢ়ৈষা অপেক্ষা সাধারণতঃ বেশি পরিমাণে প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশু অবস্থায় মন যে পিতামাতাকে কেন্দ্র করিয়া নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা গড়িয়া তোলে ও সুখ ভোগ করে, বয়স হইলেও আমাদের এই আকর্ষণ মনের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া থাকে ও বিভিন্ন কাযে ও রোগ লক্ষণে তাহার প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা নিজের অহম্ সম্বন্ধে নানা কাল্পনিক মূল্য, মান, মর্যাদা, সুখের স্বপ্ন ইত্যাদি রচনা করিয়া সেই অনুসারে প্রাত্যহিক জীবনে অপরের নিকট হইতে বা প্রকৃত অবস্থা হইতে আমাদের উক্ত প্রকারের নানা ইচ্ছা পূরণের দাবি করিয়া চলি। যে ক্ষেত্রে আমাদের এই আত্মমূল্য প্রাপ্তির দাবি পূর্ণ না হয় সেই ক্ষেত্রেই অপমান বোধ জাগে। নিজের আরোপিত মর্যাদার স্তরে উঠিতে না পারিলে নিজেকে হীন বলিয়া মনে হয়। এই সকল ক্ষেত্রেই আমাদের হীন ভাব গোপনে থাকিয়া কাজ করে। সজ্ঞানে ইহার ফলেই আমরা নানা রকম মানসিক কষ্ট ভোগ করি।

তরুণচন্দ্র সিংহ

গৃধ্রকূট রাজগৃহ দ্র

গৃহনির্মাণ শীত, উত্তাপ, রৌদ্র, বৃষ্টি, তুষারপাত, ঝড়-ঝাপটার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আদিম মানুষ গুহায় বাস করিত, কোথাও পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে বাস করিত। উত্তর মেরুদেশের এস্কিমোরা বরফ নির্মিত গৃহে বাস করে। ক্রমে যখন মানুষ সভ্যতর হইল এবং তামা, কাঁসা ও লোহের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে শিখিল, তখন হইতে কাঠ, বাঁশ, শর, তৃণ, পত্র, মাটি, পোড়ামাটির ইট প্রভৃতির সহযোগে গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। যন্ত্রপাতির আরও উন্নয়নের সঙ্গে চাকা, কপিকলের সাহায্যে প্রস্তরের উপর প্রস্তর সাজাইয়া সমাধিগৃহ অথবা দেবগৃহের নিদর্শন, মিশরের পিরামিড, গ্রীসের প্যানথিওন আজও দণ্ডায়মান আছে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অন্ততঃ ৪।৫ হাজার বৎসরের প্রাচীন, সেখানকার পোড়ামাটির ইষ্টকের নির্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ আজও রহিয়াছে। আবার মিশরীয় আবুসিমবেলের মন্দিরগুলি যেমন পাহাড় খোদাই করিয়া নির্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ নিদর্শন পশ্চিম গোলার্ধে যুকাটানেও দেখা যায়, ভারতবর্ষের মহাবলী-পুরমে, এলোরা বা অজন্টাতেও বর্তমান।

মৃত্তিকার সহিত খড়, তুষ, গোবর প্রভৃতি মিশাইয়া জল দিয়া যথোপযুক্ত 'পাট' করিয়া গৃহের দেওয়াল নির্মাণের

সঙ্গে আমরা পরিচিত। পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ মাটির দেওয়ালে নির্মিত দুই-তলা, তিনতলা গৃহ পল্লী অঞ্চলে কিছু কিছু আছে। নীচে দেওয়াল মোটা, উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু। মিশরের প্রস্তর নির্মিত মন্দিরগুলির দেওয়ালও মাটির এইরূপ দেওয়ালের অনুকরণে গঠিত। তেমনই বাংলা দেশের বাঁশ-খড়ের আটচালার অনুকরণে এখানকার ইষ্টকনির্মিত দেউলগুলি নির্মিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী যুগের স্থাপত্য পদ্ধতি পরবর্তী যুগের নূতন নূতন মালমসলায় নির্মিত স্থাপত্যের উপরে এইভাবে ছাপ রাখে। গিরিগুহার বৃত্তাকৃতি ছাদই যে রোমের খিলান ও গম্বুজের জন্ম সম্ভব করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্থানীয় সহজলভ্য মালমসলার সহযোগে প্রধানতঃ গৃহ নির্মাণ করা হয়। আধুনিক যুগে দ্রুততর যানবাহন ও যন্ত্রপাতির কল্যাণে দূরবর্তী স্থানের মালমসলা ও তাহাদের ব্যবহার-পদ্ধতি অন্যত্র সহজেই ব্যবহৃত হইতেছে। অট্টালিকা নির্মাণের জন্য পূর্বে যেখানে কয়েক বৎসর সময় লাগিত, সেখানে কংক্রিট মিক্সচার, ক্রেন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র কয়েক মাস সময় লাগে। সুউচ্চ অট্টালিকায় ইস্পাতের অথবা রিইন ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রিটের কাঠামো যাবতীয় ভার বহন করে, দেওয়ালগুলি শুধু আবরণ ও বিভাজনের কাজ করে। পূর্বে দেওয়ালগুলি ৭।৮ তলবিশিষ্ট বাটীর ভারবহনেরও কাজ করিত। এখন কাঠামোর সাহায্যে ৫০।৬০ তলা গৃহনির্মাণও সহজ হইয়াছে। দেওয়াল, বিভিন্ন তল ও ছাদের অংশগুলি কারখানায় প্রস্তুত হইয়া (প্রিফেবরিকেটেড ইউনিট্‌স) কাঠামোতে সংযুক্ত করিলেই সম্পূর্ণ গৃহটি অতি অল্প সময়ে নির্মিত হয়। আধুনিক যুগের গৃহনির্মাণে ভিত্তি প্রস্তুত বিশেষ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের কাজ। নানারূপ খিল বা পাইল (pile) ঠুকিয়া ভিত্তির ভারবহন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন সম্ভব হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের পলিময় ভূখণ্ডে কলিকাতায় আকাশচুম্বী অট্টালিকার ভিত্তি নির্মাণ আজ খুবই সহজ।

অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ও নানা জাতীয় লঘু, টেকসই, দৃঢ় প্ল্যাস্টিকের মালমসলার ব্যবহার ভবিষ্যতের গৃহের রূপান্তর করিবেই। পারমাণবিক শক্তি ও সৌরশক্তির ব্যবহার সুলভ হইলে এবং সহজ আয়ত্তে আসিলে ভবিষ্যতের গৃহনির্মাণ-বিদ্যায় যুগান্তর আসিবে। শীত-গ্রীষ্মে, ঝড়-ঝঞ্ঝায়, অগ্নিকাণ্ডে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, সর্বক্ষেত্রে সমনিরাপদ ভবিষ্যতের আশ্রয় যে শুধু ভূপৃষ্ঠেই নির্মিত হইবে তাহা নয়, ভূগর্ভে ও বায়ুমণ্ডলে গৃহ নির্মান ও নগর পত্তন সম্ভব হইবে। 'ইঞ্জিনিয়ারিং' দ্র

কপিল ভট্টাচার্য

গৃহনির্মাণের সহিত ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশ কর্মকে গৃহ্যসূত্রে 'শালাকর্ম' বলা হয়। এই কর্মদ্বয়ের অপর নাম 'বাস্তু প্রতিষ্ঠা'। নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হইলে প্রথমতঃ গৃহের স্থান নির্বাচন করা দরকার। গৃহ্যসূত্রগুলিতে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আছে। গৃহ্যসূত্রের এই অংশকে 'বাস্তুপরীক্ষা' (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ২।৭।১) বলা হয়।

গৃহনির্মাণ ভূমিতে গৃহকর্তার অবিসংবাদিত স্বত্ব থাকা চাই। যে স্থানের মাটি ঊষর নহে, যাহাতে প্রচুর লতা-গুল্ম জন্মিয়া থাকে, যেখানে কুশ ও বেনা ঘাস (উশীর) উৎপন্ন হয়, যেখানে ভালভাবে জল নিকাশ হয় সেইরূপ ভূমি বাসগৃহ নির্মাণের উপযুক্ত। লক্ষ্য রাখিতে হইবে এই ভূমিখণ্ডের চারি দিকে অপরের বাড়ি থাকায় উহার আলো বাতাস বন্ধ হইয়াছে কি না। ইহার পূর্ব বা উত্তর দিকে নদী বা অন্য জলাশয় থাকা চাই। এই সকল জলাশয় থাকার জন্য গৃহনির্মাণভূমি ধসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই স্থানের নিকটে ক্ষীরী বৃক্ষ (আকন্দ প্রভৃতি), কণ্টকী বৃক্ষ (বৈঁচি প্রভৃতি বৃক্ষ) বা কটু বৃক্ষ (নিম্বাদি তিক্ত বৃক্ষ) থাকিবে না। ভূমিখণ্ডটি সমতল হওয়া চাই।

ব্রাহ্মণগণ গৌরবর্ণ বালুকাযুক্ত ভূমিতে, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ বালুকাসমন্বিত স্থানে, বৈশ্যগণ কৃষ্ণমৃত্তিকাযুক্ত স্থানে গৃহারম্ভ করিবেন। গৃহারম্ভের পূর্বে প্রস্তাবিত ভূমি হাল দ্বারা চাষ করিয়া উহা হইতে আগাছা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। গোভিল গৃহ্যসূত্রের মতে (প্রপাঠক ৪) বাসগৃহ পূর্ব, উত্তর বা দক্ষিণদ্বারী করা বিধেয়, কিন্তু পশ্চিমদ্বারী করিতে নাই। ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক মাসে গৃহনির্মাণ করিতে হইলে উহা উত্তর মুখ করিতে হইবে, অগ্রহায়ণাদি তিন মাসে পূর্ব মুখ, ফাল্গুনাদি তিন মাসে দক্ষিণ মুখ, জ্যৈষ্ঠাদি তিন মাসে গৃহ পশ্চিম মুখ করিতে হয়।

গৃহারম্ভের প্রশস্ত মাস হইতেছে বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক এবং ফাল্গুন। শুক্লপক্ষে গৃহারম্ভে সুখ, কৃষ্ণপক্ষে ভয় হইয়া থাকে। রিক্তা এবং বিষ্টি ভিন্ন তিথিতে গৃহারম্ভ মঙ্গলজনক। এই কার্যে রবি ও মঙ্গল-বার পরিত্যাজ্য। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে গৃহারম্ভের জন্য বাস্তুপূজা ও অন্যান্য দেবতার পূজা করিতে হয়। অগ্নিকোণে দীর্ঘ ও প্রস্থে এক হস্ত পরিমিত স্থানে চারি অঙ্গুলি গভীর গর্ত জলপূর্ণ করিয়া উহাতে একখানি আস্ত ইট রাখিয়া উহার উপর দধি দূর্বা পুষ্প তণ্ডুল মৃত্তিকা দিয়া স্তম্ভারোপণ করিবে।

নবনির্মিত গৃহে পুত্রকলত্রাদি সহিত গৃহকর্তার

প্রবেশের অনুষ্ঠানকে গৃহপ্রবেশ বলে। নূতন গৃহের নির্মাণ শেষ হইলে শুভদিনে গৃহপ্রবেশ করিতে হয়। কন্যা, কুম্ভ, বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ এবং মিথুন লগ্নে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে গৃহপ্রবেশ করিলে শুভ হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে গৃহকর্তা আচার অনুসারে এক আঢক পরিমাণ ধান্য লইয়া, জলপূর্ণ কলসযুক্ত পত্নীকে অগ্রে রাখিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন। যজুর্বেদীয় মতে গৃহপ্রবেশে বিপরীত যাত্রা হেতু পত্নী স্বামীর আগে আগে গমন করিয়া থাকেন। সামবেদীয় মতে গৃহকর্তা পত্নীকে তাঁহার বামপার্শ্বে লইয়া গৃহে প্রবেশ করেন। পত্নীর বামকক্ষে জলপূর্ণ কলস ও মস্তকে ধান্যপূর্ণ কুলা থাকিবে। ঋগ্‌বেদীয় মতে গৃহকর্তা জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পত্নীর সহিত গৃহে প্রবেশ করিবেন।

কর্তা গৃহে প্রবেশপূর্বক বাস্তুদোষ প্রশমনের জন্য বাস্তুপূজা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠানসহ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও হোমাদি করিবেন। বর্তমানে এ সব অনুষ্ঠানের তেমন প্রচলন নাই।

দ্র গোভিল, আশ্বলায়ন ও পারস্কর গৃহ্যসূত্র, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পুরোহিত দর্পণ, কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. II, part II, Poona, 1941.

…লাল নিয়োগী

গৃহ্যসূত্র গৃহকর্ম বা জাতকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার এবং গৃহস্থের কর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির বিধান ও বিবরণ, যে গ্রন্থে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাহার নাম গৃহ্যসূত্র। ইহা বেদাঙ্গ কল্পসূত্রের অঙ্গ ('কল্পসূত্র' দ্র)। গৃহ্যসূত্র অবলম্বনে পরবর্তী কালে রচিত পদ্ধতিগ্রন্থ হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানের নিয়ামক।

বিভিন্ন বেদ বা তাহাদের শাখা বিশেষের জন্য বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র রহিয়াছে, আবার কোনও কোনও বেদে একাধিক শাখার গৃহ্যকর্ম মাত্র একখানি গৃহ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদের সহিত সংশ্লিষ্ট দুইখানি গৃহ্যসূত্র প্রসিদ্ধ: ১. শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র ২. আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে ছয়টি অধ্যায় আছে। ইহাতে বাষ্কল শাখার গৃহ্যকর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৌষীতকী গৃহ্যসূত্র নামে পরিচিত আর একখানি গ্রন্থ শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া রচিত হওয়ায় উহাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র— ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহার গ্রন্থকার আশ্বলায়ন আচার্য শৌনকের শিষ্যগণের অন্যতম। সামবেদের সহিত সংশ্লিষ্ট গৃহ্যসূত্র তিনখানি—১. গোভিল গৃহ্যসূত্র ('গোভিল' দ্র) ২. খাদির গৃহ্যসূত্র— ইহা গোভিল গৃহ্যসূত্রে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহের সারসংকলনমাত্র ৩. জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র— ইহা সামবেদের জৈমিনীয় শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই গ্রন্থ তেত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত।

শুক্লকৃষ্ণভেদে যজুর্বেদ দ্বিবিধ। শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার গৃহ্যসূত্রের নাম পারস্কর গৃহ্যসূত্র। গ্রন্থকার পারস্কর। ইহা কাত্যায়নের নামান্তর। এই কারণে এই গৃহ্যসূত্রকে কাতীয় গৃহ্যসূত্রও বলা হয়। কৃষ্ণযজুর্বেদের প্রকাশিত গৃহ্যসূত্রের সংখ্যা হইতেছে নয়। ১. বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ২. ভারদ্বাজ গৃহ্যসূত্র ৩. আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র ৪. হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্র ৫. বৈখানস গৃহ্যসূত্র ৬. আগ্নিবেশ্য গৃহ্যসূত্র ৭. মানবগৃহ্যসূত্র ৮. কাঠক গৃহ্যসূত্র ৯ বারাহগৃহ্যসূত্র। কৃষ্ণযজুর্বেদের কল্পসূত্রগুলির মধ্যে বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রই হইতেছে সর্বপ্রাচীন। ১. বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ইহারই অংশ-বিশেষ। ২. ভারদ্বাজ গৃহ্যসূত্র তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলির নাম প্রশ্ন। ৩. আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র— আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং উহার সপ্তবিংশতিতম প্রশ্ন (খণ্ড) হইতেছে এই গৃহ্যসূত্র। গোভিল গৃহ্যসূত্রের মত ইহা স্বকীয় সংহিতার উপর নির্ভরশীল না হইয়া মন্ত্রপাঠ নামক স্বতন্ত্র মন্ত্র সংগ্রহকে অনুসরণ করে। ৪. হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্র। ইহার অপর নাম সত্যাষাঢ় গৃহ্যসূত্র। ইহা হিরণ্যকেশি শ্রৌতসূত্রের অংশ বিশেষ। ৫. বৈখানস গৃহ্যসূত্র— ইহাতে উল্লিখিত মন্ত্রগুলি মূল তৈত্তিরীয় সংহিতা হইতে গৃহীত হয় নাই। ইহার উপজীব্য গ্রন্থ হইতেছে বৈখানসীয় মন্ত্র সংহিতা। ৬. সূত্রকার অগ্নিবেশের নামানুসারে পরিচিত আগ্নিবেশ্য গৃহ্যসূত্রে 'নারায়ণ বলি', 'যতি সংস্কার', 'বানপ্রস্থবিধি', 'সন্ন্যাসসংস্কার' প্রভৃতি কর্মের বিধান আছে। এই কর্মগুলি অন্য গৃহ্যসূত্রে আলোচিত হয় নাই। ৭ মানবগৃহ্যসূত্র — ইহাকে মৈত্রায়ণী মানবগৃহ্যসূত্রও বলা হয়। ইহা সাধারণতঃ মৈত্রায়ণী সংহিতার মন্ত্রকে অনুসরণ করে। ৮. কাঠক গৃহ্যসূত্র— ইহা কৃষ্ণ যজুর্বেদের কাঠক শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহার অপর নাম লৌগাক্ষী গৃহ্যসূত্র। ইহাতে পাঁচটি অধ্যায় আছে। ইহা মূল সংহিতাকে অবলম্বন করে না। ইহার উপজীব্য স্বতন্ত্র মন্ত্রসংহিতা রহিয়াছে। ৯. বারাহগৃহ্যসূত্র— বারাহ শাখা মৈত্রায়ণী শাখার অবান্তর ভেদ। প্রথমোক্ত শাখার নামানুসারে ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। অথর্ববেদের একখানি মাত্র গৃহ্যসূত্র আছে। উহার নাম কৌশিক

গৃহ্যসূত্র। ইহাতে সাধারণ গৃহ্যকর্ম ছাড়া শান্তিক, পৌষ্টিক ও আভিচারিক কর্মেরও বিবরণ আছে।

দ্র Mahendale, '*Sutra*' *in Vedic Age*, Bombay, 1957; *Sacred Books of the East (Grihya Sutras)*, parts I-II, 1964.

সুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

গেজেট প্রাথমিক ভাবে গেজেট-এর অর্থ কতকগুলি খবরের পাতা (নিউজ শিট্স্) অথবা সংবাদপত্র যাহার মধ্যে চলতি ঘটনা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়। ইহাকে বর্তমান কালের খবরের কাগজের পথপ্রদর্শক বলা হয়। গেজেট শব্দটি ইতালীয় গেজেটা (*gazzetta*) হইতে উদ্ভূত। ইহাতে কতকগুলি খবর অথবা গালগল্প থাকিত ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইহা প্রথমে ভেনিসে প্রচলিত হয়। এই প্রকার কতকগুলি খবরের পাতা ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডেও প্রকাশিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে শব্দটি প্রথম সরকারি কাগজপত্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ছাপা 'অক্সফোর্ড গেজেট' ইংল্যাণ্ডের প্রথম গেজেট। পরবর্তী কালে ইহা 'লণ্ডন গেজেট' নাম গ্রহণ করে। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'এডিনবরা গেজেট' ও ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ডাবলিন গেজেট' বাহির হয়। এই সমস্ত কাগজ সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত। ইহাতে সরকারি পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, সাধারণের জ্ঞাতব্য বিজ্ঞপ্তি ও বিশেষভাবে দেউলিয়াদের তালিকা প্রকাশিত হইত।

ভারতবর্ষে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট 'ক্যালকাটা গেজেট' নামে প্রথম গেজেট বাহির করেন এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা সরকারের মুখপত্র ছিল, যদিও এই কাগজে বাংলা সরকারের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি থাকিত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'গেজেট অফ ইণ্ডিয়া'র প্রচলন হয় ও 'ক্যালকাটা গেজেট' তখনকার বাংলা সরকারের মুখপত্র হয়। ইহাতে বর্তমান বাংলা ছাড়া তৎকালীন বঙ্গ দেশের অন্তর্গত অন্য প্রদেশেরও খবর থাকিত। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ক্যালকাটা গেজেটে'র নাম ছিল 'ক্যালকাটা গেজেট অ্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল অ্যাডভারটাইজার'।

বাংলা দেশে ইহা ব্যতীত ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা সরকার 'গভর্নমেণ্ট গেজেট' নামে ইংরেজী ভাষায় গেজেট বাহির করিতেন। আরম্ভে ইহা ছিল সাপ্তাহিক। কিন্তু ১৮২৮-৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সপ্তাহে দুই বার বাহির হইত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা গেজেট' ইহার স্থান অধিকার করে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল গেজেট' ইংরেজী ও বাংলা এই দুই ভাষায় শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং অনেক দিন পর্যন্ত ইহা চলিয়াছিল।

ভারতবর্ষে প্রাদেশিক গেজেটগুলি নিম্নলিখিত পর্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছিল: ১৮০১ খ্রী—'ফোর্ট সেণ্ট জর্জ গেজেট' (সাপ্তাহিক)—১৮০১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট গেজেট' নামে অভিহিত হইত। ১৮৩১ খ্রী—'বম্বে গভর্নমেণ্ট গেজেট' (সাপ্তাহিক)। ১৮৫৬ খ্রী—'পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট গেজেট' (সাপ্তাহিক)। ১৮৫৬-১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'গভর্নমেণ্ট গেজেট' পাঞ্জাব অ্যাণ্ড ইট্স ডিপেনডেনসিজ' বলিয়া পরিগণিত হয়, ১৮৫৮ খ্রী—'গভর্নমেণ্ট গেজেট', উত্তর প্রদেশ (সাপ্তাহিক), প্রথমে ইহা 'নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সেজ গেজেট' নামে পরিচিত ছিল। ১৯০২-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 'গভর্নমেণ্ট গেজেট অফ দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস অফ আগ্রা অ্যাণ্ড আউধ' এবং ১৯৩৭-৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'গভর্নমেণ্ট গেজেট অফ ইউনাইটেড প্রভিন্সেজ' ও বর্তমানে শুধু উত্তর প্রদেশ নামে পরিচিত। ১৮৬৯ খ্রী—'সিন্ধ অফিসিয়াল গেজেট' (সাপ্তাহিক)। ১৮৭৩ খ্রী—'সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেজ অ্যাণ্ড বেরার গেজেট' (সাপ্তাহিক)। ১৮৭৪ খ্রী—'আসাম গেজেট'।

অশোকা সেনগুপ্ত

গেজেটিয়ার, গ্যাজেটিয়ার যে গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত থাকে তাহাকে গেজেটিয়ার বা ভৌগোলিক অভিধান বলে। ইহাতে নানা দেশ, অঞ্চল, জেলা, নদ নদী, পাহাড়, গ্রাম, শহর ইত্যাদি সম্পর্কে বহুবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট থাকে। এতদ্ভিন্ন দেশের বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবরণও লিপিবদ্ধ থাকে। এই অভিধানগুলিতে ভৌগোলিক নামসমূহ বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকে বলিয়া যে কোনও জায়গা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য খুব সহজে বাহির করা যায়।

গেজেটিয়ার এমন একটি গ্রন্থ যাহার আধুনিক সংশোধিত সংস্করণ ও পুরাতন সংস্করণ উভয়ই মূল্যবান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একশত বৎসরের পুরাতন গেজেটিয়ারে কোনও স্থানের তখনকার শিল্পব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ থাকিলে ইহা ঐ স্থানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের আকর হয়। যে সকল দেশের পুরাতন গেজেটিয়ার পাওয়া যায় না তাহাদের ক্ষেত্রে পুরাতন কোষগ্রন্থই গেজেটিয়ারের অভাব পূর্ণ করে, কারণ গেজেটিয়ার পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হইলেও কোষ,

অভিধান ও মানচিত্রে উহা অংশ হিসাবেও প্রকাশিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গেজেটিয়ার শব্দটি বর্তমান অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীকে গেজেটিয়ার রচনার স্বর্ণ যুগ বলা যায়। আজকাল যে প্রথায় ভৌগোলিক অভিধান লেখা হয় তাহা ইওরোপেই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভূগোল বিজ্ঞানী যোহান হাসেল প্রণীত গেজেটিয়ারই সম্ভবতঃ পথ-প্রদর্শক। বিখ্যাত কতকগুলি গেজেটিয়ারের মধ্যে জনস্টন (স্কটল্যাণ্ড, ১৮৫০ খ্রী), ব্ল্যাকি (স্কটল্যাণ্ড, ১৮৫০ খ্রী), বুই.ই (Bouillet ফ্রান্স, ১৮৫৭ খ্রী), রিটার (জার্মানি, ১৮৭৪ খ্রী), লংম্যান (ইংল্যাণ্ড, ১৮৯৫ খ্রী), গ্যারোলো (ইতালি, ১৮৯৮ খ্রী) -প্রণীত গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লিপিনকট গেজেটিয়ার (ইউ. এস. এ., ১৯৫২ খ্রী) একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক গেজেটিয়ার।

আমাদের দেশের প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য সিলাক্‌স্‌, মেগাস্থিনিস, আরিয়ান এবং টলেমির বিবরণ হইতে জানা যায়। প্রাচীন ভারতীয় গেজেটিয়ারের মধ্যে এডওয়ার্ড থর্নটন এর 'গেজেটিয়ার অফ দি টেরিটোরি অফ দি গভর্নমেণ্ট অফ ই.আই. কোং অ্যাণ্ড আদার নেটিভ স্টেটস অফ দি কন্টিনেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৫৮ খ্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টারদের স্বল্পমূল্যে ও সুবিধাজনক আকারে ব্রিটেনের সাধারণ দেশবাসীর জন্য একটি নির্ভুল গেজেটিয়ারের প্রকাশ পরিকল্পনার ফল। ইতিপূর্বে থর্নটন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চারি খণ্ডে এইরূপ একটি গেজেটিয়ার প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫-৮৭ সালে স্যর উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার প্রণীত পনের খণ্ডে প্রকাশিত 'দি ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া' আর-একটি উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক অভিধান। ১৯০৮ সালে ইহা পুনরায় সংশোধিত ও সংকলিত হইয়া ম্যাপ খণ্ডসহ ছাব্বিশ খণ্ডে তৎকালীন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে ম্যাপ খণ্ডটি পুনরায় পরিবর্তিত আকারে সংকলিত হয়। ১৯০৮-৯ সালে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের একটি প্রভিনশল সিরিজ বাহির হয়। ইহা ছাড়া ১৯১০-২১ সালে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলার তথ্য ভিন্ন ভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত হয়। ইহার পর বহুকাল জেলা বা ভারতের গেজেটিয়ার সংকলিত হয় নাই। ১৯৫১ সালের 'ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ড-বুক' এ কোনও কোনও রাজ্যের জেলার আদমশুমারের সহিত উহার গেজেটিয়ারের কিছু অংশও সন্নিবেশিত হয়। ১৯৬১ সালেও অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া ও ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারগুলি পুনরায় সংকলন করার বিশেষ প্রয়োজন বোধে ১৯৫৫ সালে ২ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তরের অধীনে একটি 'পারদর্শী কমিটি' (Expert) গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পারদর্শী কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে প্রত্যেক রাজ্য সরকারের একটি গেজেটিয়ার দপ্তর থাকিবে ও তাহাদের তত্ত্বাবধানে জেলার গেজেটিয়ারগুলি সংশোধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইবে। সেই হিসাবে প্রত্যেক রাজ্যেই গেজেটিয়ার দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সংশোধন ও পুনর্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার 'অফ ইণ্ডিয়া'ও পুনরায় সংকলিত হইতেছে। ইহা 'গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া' নামে চারি খণ্ডে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ডে দেশ ও লোক (কাণ্ট্রি অ্যাণ্ড পিপ্‌ল্‌) সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। ইহা ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ২য় খণ্ডে ইতিহাস ও সংস্কৃতি (হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার) ৩য় খণ্ডে অর্থনৈতিক গঠন ও কর্মচেষ্টা (ইকনমিক স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড অ্যাক্টিভিটিজ) ও ৪র্থ খণ্ডে সরকার ও প্রশাসন (গভর্নমেণ্ট অ্যাণ্ড অ্যাডমিনস্ট্রেশন) সম্বন্ধে লিখিত হইবে।

দ্র E Thornton, *Gazetteer of the Territories and the Government of India*, London, 1858 ; Constance M. Evinchell, *Guide to Reference Books*, Chicago, 1951 ; Louis, Shores, *Basic Refeience Sources*, Chicago, 1954 ; J. C. Sen Gupta, *West Bengal District Gazetteer : West Dinajpur*, Calcutta, 1965.

শিবপ্রসাদ দাসগুপ্ত
অশোকা সেনগুপ্ত

গেঁটে বাত বাত দ্র

গেস্‌টল্‌ট্‌ মনোবিদ্যা দ্র

গৈরিক এক প্রকার প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পুঞ্জীভূত রঙিন খনিজ। সাধারণতঃ ইহা গেরিমাটি (red ochre) বা এলামাটি (yellow ochre) নামে পরিচিত। ইহা সাধারণতঃ লাল, পীত বা পিঙ্গল বর্ণের নরম ডেলা বা গুটির আকারে পাওয়া যায়। ইহার রাসায়নিক সংযুক্তি (কম্পোজিশন) প্রধানতঃ জলযুক্ত লৌহ অক্সাইড

(হাইড্রেটেড আয়রন অক্সাইড)—হিমাটাইট, লিমনাইট ও গোয়েথাইট মণিক কিছু কর্দম বা ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। লৌহপ্রধান শিলার আবহ-বিকারের ফলেই সাধারণতঃ গৈরিক উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের বিহার, ওড়িশা, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে গৈরিক পাওয়া যায়। পূর্বে ভারতীয় গৈরিক বিদেশে রপ্তানি করা হইত। ভারতের সর্বত্রই রঙের কার্যে ইহার বহুল ব্যবহার আছে।

দ্র W. Lindgren, *Mineral Deposits*, London, 1933; J. Coggin Brown and A. K Dey, *India's Mineral Wealth*, London, 1955.

অনিলকুমার দত্ত

গোইয়া (গোয়া) (১৭৪৬-১৮২৮ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপে, মুখ্যতঃ ফ্রান্সে, চিত্রের যে অভিনব ভাবধারার সূচনা হয়, স্পেনীয় শিল্পী ফ্রান্সিস্কো হোসে দে গোয়া ই লুসিএন্তেস (Francisco Jose de y Lucientes)-কে তাহার পথপ্রদর্শক বলা চলে। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের আরাগঁ প্রদেশের এক কৃষক কিংবা এক শিল্পী পরিবারে তাঁহার জন্ম। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সারাগোসার এক চিত্রকর ও ভাস্করের নিকট শিক্ষানবিসি শুরু করেন এবং নানা ব্যর্থতা ও শিল্পবিষয়ক বিভিন্ন কর্মের অভিজ্ঞতার পর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রিদে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় চার্লসের প্রতিকৃতি অঙ্কনের পর হইতেই স্পেনীয় রাজ পরিবার ও তাহার পারিপার্শ্বিক চরিত্রদের যে প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন, তাহার মধ্যে রাজ দরবারের নৈতিক অবনতি ও স্ফীতকায় পচনশীলতার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সমকালীন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদের স্থূল দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে নাই, কিন্তু পরবর্তী যুগের সূক্ষ্মদর্শী কলারসিকদের নিকট তাহা স্পষ্ট। অশ্বারোহী পঞ্চম চার্লস বা চতুর্থ চার্লসের পরিবারের চিত্রগুলি এই ধরনে অঙ্কিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গোয়া উচ্চ শ্রেণীর সমাজে তাঁহার প্রণয়িনী ও বান্ধবীদের চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কয়েকটি অসাধারণ চিত্রে যাহাদের মধ্যে আলবা (Alba)-র ডিউক-পত্নীর ছবি বলিয়া পরিচিত 'লা মাজা নিউড্' (La Nude Maja) বিখ্যাত। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া কাপ্রিকস বা খামখেয়াল অনুসারে অনেকগুলি ছবি আঁকিতে শুরু করেন। ইহার বিষয়বস্তু— কল্পনার অবাধ সৃষ্টি ও জনজীবনে প্রচলিত কুসংস্কার, মোহান্তদের অপকীর্তি ও এই জাতীয় সামাজিক অনাচারের প্রতি তীব্র রেখার টানে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। সমসাময়িক পরিবেশ সম্বন্ধে গোয়ার এই যে তিক্ততা ক্রমশঃই পরিব্যাপ্ত হইতেছিল তাহা চরম রূপ পাইল ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা (ডিজ্যাস্টার্স অফ ওয়র) নামক এচিং ছবিগুলিতে। নেপোলিয়ন (নাপোলেঅঁ) কর্তৃক স্পেন আক্রমণের পরে স্বদেশে অত্যাচারের বন্যার বলিষ্ঠ তৈলচিত্র ও এচিংগুলিতে বোধ হয় চিত্রজগতে সর্বপ্রথম যুদ্ধের বীভৎসতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ গর্জিয়া উঠিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ মাদ্রিদে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য গোয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে ক্রমশঃই আস্থাহীন হইয়া পড়েন এবং তাঁহার শেষ বয়সের প্রাচীর-চিত্র 'স্যাটার্নের স্বীয় পুত্র ভক্ষণ' মানুষ কর্তৃক স্বজাতি নিধনের এক ভয়াবহ প্রতিলিপি। স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু, নিজের বধিরতা, নিঃসঙ্গতা ও স্বদেশের দুরবস্থায় গোয়া প্রচণ্ড নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে চলিয়া যান। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অঙ্কিত শেষ ছবিগুলির মধ্যে একটির উপর স্বহস্তে লিখিত ছিল – 'আমি এখনও শিখিতেছি'।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

গোকুল মথুরা দ্র

গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণবদাস দ্র

গোখলে, গোপালকৃষ্ণ (১৮৬৬-১৯১৫ খ্রী) অধ্যাপক, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতা। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কোলহাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানেই তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। এলফিন্‌স্টোন কলেজ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। রানাডে প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় স্থাপিত 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি'তে যোগদান করিয়া ঐ বৎসরেই সোসাইটির আদর্শানুযায়ী মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনে কুড়ি বৎসর চাকুরি করিবার অঙ্গীকারে পুনার ফার্গুসন কলেজে ইতিহাস ও রাজনৈতিক অর্থবিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। রানাডের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দেশসেবার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং গভীর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করেন।

ভারত সরকারের ব্যয় কি উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হওয়া বিধেয় তাহা স্থির করিবার জন্য 'রয়্যাল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান এক্সপেনডিচার' নামে যে সমিতি গঠিত হয়

তাহাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর বিশিষ্ট নেতা ওয়াচার সহিত ইংল্যাণ্ডে গমন করেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গঠনমূলক প্রস্তাবসমূহ ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে মহামারী রূপে প্লেগ দেখা দেয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক-করণের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার বিশেষ আটকস্থানে (কোয়ারেনটাইন) রাখিবার ব্যবস্থা করে। রোগীকে তাহার বাসস্থান হইতে লইয়া যাইবার কালে কিংবা আটকস্থানে পাহারা দিবার সময় ইংরেজ প্রহরী নানা প্রকার অনাচার-অত্যাচার করিতেছে বলিয়া এ দেশে এবং ইংল্যাণ্ডে সংবাদ প্রকাশিত হয়। কোনও বন্ধুর প্রেরিত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া গোখলে এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন বলিয়া গোখলে সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হন। সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করিতে না পারায় বাধ্য হইয়া গোখলেকে সরকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাতে তিনি খুব নিন্দাভাজন হন— কিন্তু কিছুকাল পরে নিষ্ঠা সহকারে দেশসেবার ফলে আবার দেশবাসী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

১৯০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে গোখলে বোম্বাই আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক আইন সভার পক্ষ হইতে গোখলে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বেসরকারি সদস্য মনোনীত হন। বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তিনি যেভাবে সরকারি শাসন পরিচালনার সমালোচনা করিতেন তাহাতে কর্তৃপক্ষ বিব্রত বোধ করিতেন। তাঁহার বিশেষত্ব ছিল এই যে তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংশয়শূন্য না হইয়া তিনি কখনও আলোচনায় যোগদান করিতেন না। বাজেট সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান এবং তথ্য উপস্থাপন করিবার কৌশল তৎকালীন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণের বিস্ময় উৎপাদন করিত। দেশরক্ষার ব্যয় প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিলেও সামরিক বিভাগের কোনও উচ্চ পদে তখন ভারতবাসীর নিয়োগ হইত না। বাজেট আলোচনা-কালে প্রতি বৎসর গোখলে এই ভেদনীতির তীব্র সমালোচনা করিতেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য লর্ড কার্জন যে আইন উপস্থাপিত করেন তাহা শিক্ষাবিস্তারের পরিপন্থী হইবে বুঝিয়া গোখলে তাহার প্রবল প্রতিবাদ করেন— তৎসত্ত্বেও আইনটি বিধি-বদ্ধ হয়। ইহার পর তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সার্ভেন্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে প্রসিদ্ধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া নানাবিধ শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রধান নায়ক বলিয়া পরিগণিত হন।

তৎকালে কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশের বিশ্বাস ছিল যে, বিলাতের রাজনৈতিক মহলে ভারতবর্ষের সমস্যাগুলি উপস্থাপিত করিতে পারিলে সুরাহা হইতে পারে। বিশেষতঃ এই সময়ে পার্লামেণ্ট-এর নূতন নির্বাচন পর্বে উদারপন্থী (লিবারাল) দলের জয়লাভের সম্ভাবনা থাকায় জাতীয় কংগ্রেস গোখলেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। যোগ্যতার সহিত কার্য করিলেও গোখলের প্রয়াস রাজনৈতিক কোনও সুবিধা অর্জন করিতে পারে নাই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বারাণসীতে অনুষ্ঠিত মহাসভার তিনি সভাপতি মনোনীত হন। এই সময়ে লর্ড কার্জন জনমত উপেক্ষা করিয়া বঙ্গ দেশ বিভক্ত করেন। ইহার প্রতিবাদে শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে— বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস এ যাবৎ আইন-সম্মত পন্থায় আন্দোলন করিতেছিল। এই পন্থা নিষ্ফল হওয়ায় উগ্রপন্থা গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশকে বাধ্য করিবার জন্য একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। টিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি এই দলের নেতা হইলেও গোখলে এই মতের সমর্থন করেন নাই, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ভারতবর্ষ এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয় নাই এবং ইংরেজ গভর্নমেণ্টের সহযোগিতায়ই ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করিতে হইবে। ইহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশবাসীর কাছে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেকটা হ্রাস পায়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থাকল্পে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রস্তাব শিক্ষিত দেশবাসী আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সম্বন্ধে বড়লাটের ব্যবস্থাপরিষদে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করেন। কিন্তু গভর্নমেণ্টের বিরোধিতার ফলে ইহা গৃহীত হয় নাই।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে উচ্চপদে নিয়োগ সম্বন্ধে যে কমিশন (রয়্যাল কমিশন অন দি পাবলিক সার্ভিস কমিশন) নিযুক্ত হয়, গোখলে তাহার সদস্য নিযুক্ত হন এবং অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া ভারতীয়দের দাবি সমর্থন করেন।

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু ভারতীয় শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ী স্থায়ীভাবে বাস করিত, কিন্তু ইহার শ্বেতাঙ্গ শাসনকর্তাগণের দুর্ব্যবহারে তাহারা লাঞ্ছিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়। তাহাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় গমনাগমন বা স্থায়ী বসবাসের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের বিধি-নিষেধমূলক আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং ইহার ফলে ভারতবর্ষেও বিক্ষোভ শুরু হয়। জাতীয় কংগ্রেসের তরফ হইতে এই আইন সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য গোখলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হন। কিন্তু গোখলের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই।

রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাচীনপন্থী হইলেও গোখলে দেশসেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং অনেককে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। কোনরূপ প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা গোখলে কখনই চালিত হন নাই। তাঁহার প্রসিদ্ধ উক্তি ‘আজ বাঙ্গালী যাহা ভাবে কাল সমগ্র ভারত তাহাই ভাবিবে’ (‘হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্ক্‌স্‌ টুডে, ইণ্ডিয়া থিঙ্ক্‌স্‌ টু-মরো’) এ বিষয়ে তাঁহার সর্বভারতীয় মনোভাব ব্যক্ত করে। মহাত্মা গান্ধীও গোখলেকে তাঁহার রাজনৈতিক গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনা শহরে গোখলে লোকান্তরিত হন।

দ্র R. P. Paranjpye, Gopalkrishna Gokhle, 1915.

শ্রীপদ রামচন্দ্র টিকেকর

গোগ্যাঁ, পল (১৮৪৮-১৯০৩ খ্রী) ফরাসী শিল্পী, পারী শহরে জন্ম। পারিবারিক নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পালিত হন। কিছুদিন নৌ-বাণিজ্যের জাহাজে চাকুরি করিয়া পরে এক মহাজনী অফিসে নিযুক্ত হন। ২৭ বৎসর বয়সে নিজের আঁকা একটি ছবি প্রদর্শনীতে পাঠান। ক্রমে পিসারো, সেজাঁ ও দেগাস প্রভৃতি শিল্পীদের সহিত পরিচিত হন। ইহারা ‘ইম্প্রেশনিস্ট’ সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিলেন। গোগ্যাঁ কিন্তু ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও চিত্রকলায় স্বাধীন পথ অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরি ছাড়িয়া তিনি একান্তভাবে শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে বাসা বাঁধেন। অবশেষে পানামা খাল খননে কিছুদিন মাটিকাটার কাজ করিবার পর মার্টিনীপ দ্বীপে পৌঁছান। পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেও পুনরায় প্রশান্ত মহাসাগরে তাহিতি দ্বীপে গমন করেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সূর্যালোকের প্রখরতা, রঙের গাঢ়ত্ব এবং মানবসমাজের মধ্যে বন্ধনের আতিশয্যের অভাব তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তাঁহার শিল্পরীতির মধ্যে এক নূতন মুক্তির আস্বাদ বহন করিয়া আনে। এই নূতন শৈলীর দ্বারা কিছু যুবক শিল্পী আকৃষ্ট হইলেও গোগ্যাঁ জীবদ্দশায় স্বদেশে সমাদৃত হন নাই। দারিদ্র্য, রোগ ও নানাবিধ বিপর্যয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া এই বিপ্লবী শিল্পী জীবনলীলা সংবরণ করেন।

মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রভাব এবং খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের একজন শ্রেষ্ঠ স্বাধীনচেতা শিল্পী বলিয়া গণ্য হন।

দ্র John Rewald, *Paul Gauguin (1848-1903)*, New York, 1954.

নির্মলকুমার বসু

গোঁজলা গুঁই প্রাচীনতম কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় (১৮৫৭ খ্রী) হইতে প্রায় ১৪০ বা ১৫০ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহার একটি মাত্র গান ঈশ্বরচন্দ্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য লালু নন্দলাল, রঘু এবং রামজী হইতেই পরবর্তী বিখ্যাত কবিওয়ালাদের উদ্ভব। অনুমান করা হয় যে গোঁজলা গুঁই পেশাদারী কবির দল করিয়াছিলেন এবং তিনি গানের সময়ে টপ্পার রীতিতে প্রথমে মহড়া তৎপরে চিতেন এবং পরে অন্তরা লাগাইতেন, সংগত হইত টিকারায়।

দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫৮; S. K. De, *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1962.

ভবতোষ

গোটুবাদ্যম দক্ষিণ ভারতীয় তার-যুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ইহা উত্তর ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র চিত্রা, বিপঞ্চি ও বিচিত্র বীণার পঙ্‌ক্তি ভুক্ত। ইহাকে মহানাটক বীণাও বলা হয়।

ঐতিহাসিক দিক হইতে ইহাকে সাম্প্রতিক কালীনই বলা চলে এবং গত চার শতাব্দী ধরিয়া ইহা জনপ্রিয় রহিয়াছে। ১৭শ শতাব্দীতে তেলুগু লেখক রঘুনাথ নায়কের ‘শ্রীনগর সাবিত্রী’তে ‘গোটি বাদ্যম’ রূপে ইহার উল্লেখ আছে।

তামিল শব্দ কোড়ু অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র বেলনাকার কাঠি এই যন্ত্রটি বাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতেই এই নামটি আসিয়াছে: কোড়ুবাত্তম> কোটুবাত্তম> গোটুবাত্তম।

আকৃতিতে দক্ষিণ ভারতীয় বীণার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। ইহার লাউ নির্মিত খোলটি (বা অনুরণনকারী, resonator) ও দণ্ডীটি ফাঁপা ও কাঁঠাল কাঠ দিয়া প্রস্তুত। ঐ খোলটি পাতলা কাঠের বোর্ড দিয়া আবৃত। বোর্ডে একটি কাষ্ঠের সংযোজক (ব্রিজ) আছে যাহা রূপা বা চালাই ধাতব দ্রব্য দ্বারা আবৃত। প্রধান সংযোজকের সহিত সারণীর (drone strings) জন্য একটি পার্শ্ব সংযোজক আছে। দণ্ডীর অপর প্রান্তে স্বরধ্বনি করিবার কীলক আছে— যাহার অন্তঃভাগে একটি পৌরাণিক জন্তুর মুখাবয়ব (যতি) অঙ্কিত থাকে। দণ্ডীরও একটি প্রতিধ্বন্যাত্মক খোল আছে এবং দণ্ডীতে কোনও ঘর্ষণ সম নাই।

বিভিন্ন রাগ বাজাইবার জন্য ৫টি তন্ত্রী আছে, ইহারা প্রধান সংযোজকের উপর দিয়া গিয়াছে এবং সা, সা, পা, সা, পা এই কয়টি স্বরগ্রাম যুক্তধ্বনি যুক্ত। মৃদু গুঞ্জন ধ্বনির তিনটি তন্ত্রী পার্শ্ববর্তী সংযোজকে প্রসারিত। সেগুলি সা, পা, সা স্বরগ্রাম ধ্বনি যুক্ত।

ভূমিতে স্থাপন করিয়া এই যন্ত্রটি বাজাইতে হয়। স্বর তুলিবার জন্য দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি ব্যবহার করিতে হয়। একটি সমগোলাকার কাষ্ঠখণ্ড (কোতু) বাঁ দিকে আছে। প্রধান তন্ত্র বা অন্যান্য তারগুলির ওঠানামার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিধ্বন্যাত্মক তন্ত্রীগুলি (তরফ) প্রধান তারগুলির নীচ দিয়া গিয়াছে।

বি চৈতন্যদেব

গোঁড়, গোণ্ড গোঁড বা গোণ্ড জাতির ভাষার নাম গোণ্ডী। গোণ্ডী দ্রাবিড় বর্গের ভাষা এবং মধ্য-দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। গোঁড জাতির অনেকে নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে সুতরাং গোঁড় মাত্রেরই ভাষা গোণ্ডী নহে। সংস্কৃত অভিধানে (যেমন হেমচন্দ্রের) গোণ্ড নীচজাতিসূচক একটি শব্দ রূপে উল্লিখিত। মধ্য প্রদেশের গোণ্ডয়ানা অঞ্চলের নাম গোণ্ড জাতির নামানুসারেই হইয়াছে। উত্তরে নর্মদা উপত্যকা হইতে দক্ষিণে নাগপুরের সমভূমি পর্যন্ত অঞ্চল গোঁড় বা গোণ্ড জাতির বহু কালের বাসভূমি। গোণ্ডী প্রধানতঃ মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ ও ওড়িশায় বলা হয়। গোণ্ডীর কতকগুলি উপভাষা আছে, যেমন: কোই বা কোয়া, মাড়িয়া, মুরিয়া, ডোরলী, য়োটমালের গোণ্ডী, আদিলাবাদের গোণ্ডী, সিরোঞ্চার গোণ্ডী, গড়-চিরোলির গোণ্ডী, ছিন্দওয়াড়ার গোণ্ডী, বেতুলের গোণ্ডী, মাণ্ডলার গোণ্ডী, সিওনির গোণ্ডী প্রভৃতি। গোণ্ডীর লোকসাহিত্য আছে কিন্তু নিজস্ব কোনও লিপি নাই।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IV and vol. I, part I, 1906 & 1927; T. Burrow and S. Bhattacharya, *A Comparative Vocabulary of the Gondi Dialects*, Calcutta, 1960.

দীপংকর দাশগুপ্ত

গোণ্ড গোণ্ড মধ্য ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী। বস্তার জেলা ইহাদের প্রধান আবাসভূমি। এতদ্ভিন্ন সাতপুরা মালভূমির পার্বত্য এলাকায় প্রধানতঃ ছিন্দওয়াড়া, বেতুল, সিওনি এবং মাণ্ডলা জেলায়ও ইহারা বাস করে। গোণ্ডদের সংখ্যা মোট ৩৯৯১৭৬৭ জন। মধ্য প্রদেশেই ২৭১২৫৬৪ জন। ওড়িশায় ৫৫৪৭০৫ জন, বিহারে ৩৩৫২১ জন, মহীশূরে ৮৬২ জন, অন্ধ্র প্রদেশে ১৬৩৬৮০ জন, পশ্চিম বঙ্গে ৭৩৫ জন এবং গুজরাতে ৮৭ জন গোণ্ড আছে।

গোণ্ডরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। গোণ্ড শব্দের অর্থ বা ব্যুৎপত্তি জানা যায় না। তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা জেলার নাম এই জাতির নাম হইতে আগত। গোণ্ডরা নিজেদের কোই নামে অভিহিত করে। মধ্য প্রদেশে বহু সুপ্রাচীন কাল হইতেই ইহাদের বাস। রাজপুতরা ৯ষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোণ্ড দেশে রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার পর গোণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহাদের রাজত্ব দুই শতাব্দীর উপর চলিয়াছিল। গোণ্ডরা দক্ষিণ দিক হইতে চাঁদা ও বস্তারের মধ্য দিয়া হয়ত এখানে প্রবেশ করে। অর্ধেকেরও বেশি গোণ্ড দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী। গ্রিয়ার্সনের মতে গোণ্ড ভাষাতে তামিল ও কানাড়ীর সহিত বেশি সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ রাজ্য কতকগুলি সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কালক্রমে গোণ্ডদের রাজ্য চলিয়া যায়; অবশ্য বস্তারে এখনও গোণ্ড রাজা বর্তমান বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। গোণ্ডদের রাজত্বকালে নির্মিত কিছু কিছু দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান।

গোণ্ড একটি বিরাট জাতি। ইহাদের অনেক উপ-বিভাগ আছে। ইহাদের আবার দুইটি উন্নততর শাখা—

রাজগোণ্ড ও খাটোলা। কেহ কেহ মনে করেন রাজগোণ্ডরা রাজপুত ও যোদ্ধগোণ্ডের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। ইহারা প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং স্থানীয় হিন্দু চাষীদের সমপর্যায়ভুক্ত। ব্রাহ্মণেরা তাহাদের জল গ্রহণ করে। অনেকে আবার উপবীতও ধারণ করে। কোনও কোনও জায়গায় রাজগোণ্ড ও সাধারণ গোণ্ডদের মধ্যে বিবাহাদির প্রচলন আছে, তবে সবত্র নয়। খাটোলা গোণ্ডরা বুন্দেলখণ্ডের খাটোলা জেলার নামের সঙ্গে নিজেদের জড়িত মনে করে। সাগর অঞ্চলে রাজগোণ্ডদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ চলে। কিন্তু ছিন্দওয়াড়া অঞ্চলে সাধারণ গোণ্ডরা খাটোলাদের হিন্দু ও গোণ্ডের মিশ্রণসম্ভূত বলিয়া সন্দেহ করে এবং কোনও সামাজিক সম্পর্ক অনুমোদন করে না। ইহা ছাড়াও গোণ্ডদের অনেক ছোট ছোট আঞ্চলিক বিভাগও আছে। কোয়া গোণ্ডরা অন্ধ্র প্রদেশ সীমান্তে বাস করে। তাহাদের নামও 'কোই' বা কোইটুরের অপভ্রংশ।

গোণ্ডদের মধ্যে বস্তারের গোণ্ডরাই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহারাও দুইটি শাখায় বিভক্ত মাড়িয়া গোণ্ড ও মুরিয়া গোণ্ড। মাড়িয়ারা পাহাড় অঞ্চলে বাস করে এবং মুরিয়াদের অপেক্ষা বন্য। 'মাড়' কথার অর্থ পাহাড়ী অঞ্চল। অপর পক্ষে 'মুর' অর্থ পলাশ গাছ — যাহা বস্তারের সমতল ভূমিতে প্রচুর জন্মে। মুরিয়ারা সমতলবাসী। মাড়িয়াদের আবার দুইটি শাখা আছে অবুঝমাড়ের পাহাড়ী মাড়িয়া এবং বাইসন শৃঙ্গ মাড়িয়া। এই পাহাড়ী মাড়িয়ারা প্রাণবন্ত ও নৃত্যবিলাসী। বাইসন শৃঙ্গ মাড়িয়ারা একটু মেজাজী হইলেও খুব আমোদপ্রিয়। নাচের সময় ময়ূরের পালক -সজ্জিত বাইসন-শৃঙ্গ পরে বলিয়াই ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। জাতি হিসাবে সকল গোণ্ডরাই অত্যন্ত সজীব, হাসিখুশির সারল্যে মুখর, আমোদপ্রিয় এবং অতিথিপরায়ণ।

গোণ্ডগ্রাম সাধারণতঃ নদীর নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুষ্কোণ আঙিনাকে কেন্দ্র করিয়া বাড়ি তৈয়ারি করে। এক বাড়িতে একাধিক পরিবারও বাস করে। বিবাহিত ছেলেরা স্বাভাবিক নিয়মে পিতা মাতার সঙ্গে থাকে। গোণ্ডরা ছোঁয়াছুঁয়ি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। অন্য কোনও জাতি এমন কি ব্রাহ্মণও তাহাদের রন্ধনকক্ষে যাইতে পারে না।

মাড়িয়া গোণ্ডদের পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত। তবে বাইসন শৃঙ্গ মাড়িয়ারা ছোট কাপড় পরে। ছেলেরা ছোট লাংগুটি কোমরে জড়াইয়া রাখে। নিজেদের তাঁত নাই বলিয়া কাপড়ের জন্য স্থানীয় তাঁতীদের উপরে নির্ভর করে। মেয়েরাও পোশাক সম্পর্কে বিশেষ সচেতন নয়। ঊর্ধ্বাঙ্গ সাধারণতঃ অনাবৃত থাকে। নিম্নাঙ্গে ছোট লুগরা পরে। তবে গলায় প্রচুর কড়ির মালা পরে। যেখানে আদিবাসীর সংখ্যা বেশি সেখানে জামার প্রচলনও দেখা যায়। গোণ্ডদের চিরুনি গড়িবার শিল্প বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বয়োবৃদ্ধিকালে চিরুনি হৃদয়-বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত ও বিবেচিত হয়। যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে চিরুনি উপহার দেয়। উলকির প্রচলন মেয়েদের মধ্যেই বেশি।

রাজগোণ্ডরা স্থায়ী চাষবাস করিলেও গোণ্ডদের অনেকেই বিশেষতঃ মাড়িয়ারা তাহাদের চিরাচরিত জঙ্গল পোড়াইয়া ঝুম প্রথায় চাষ করিতে অভ্যস্ত। গোণ্ড ভাষায় ঝুম চাষকে বলা হয় 'পেণ্ডা' বা 'বেওয়র' চাষ। বস্তারের অবুঝমাড় অঞ্চলে পেণ্ডা চাষেরই প্রচলন অধিক। সেজন্য মাড়িয়ারা এক জায়গায় চার পাঁচ বছরের বেশি থাকে না। পেণ্ডা-চাষে কাহারও পৃথক জমি থাকে না। অবুঝমাড়ের গ্রামের জমিতে গোষ্ঠীস্বত্বই প্রধান। গ্রামগুলিও সাধারণতঃ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। কিন্তু বাইসন শৃঙ্গ মাড়িয়াদের গ্রামে একাধিক গোষ্ঠী থাকে। তাহাদের গ্রামে জমিজমার ব্যাপারে অধিকতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

গোণ্ড সমাজ কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। এই গোত্রগুলি অবশ্যই 'টোটেম' ভিত্তিক। 'মারকাম' বা আম, 'টেকাম' বা সেগুন, 'নেতাম' বা কুকুর প্রভৃতি গোত্র বিশেষভাবে প্রচলিত। এইসব গাছ বা প্রাণীকে টোটেম মনে করা হয়। এইগুলি ইহারা শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষা করিয়া থাকে। কখনই কোনও আঘাত করে না। গোণ্ডদের সাধারণ নিয়মানুযায়ী সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। পুরুষদের গোত্র অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা গোত্রান্তরিত হয়। সগোত্রে বিবাহ দণ্ডনীয়। সচরাচর এক গ্রামে একই গোত্রভুক্ত লোকেরা বাস করে বলিয়া স্বগ্রামে বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহে কন্যাপণ দেওয়াই প্রচলিত বিধি। গোণ্ড সমাজে শ্রম বিনিময়ে বিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহের সকল খরচ কন্যাপক্ষই বহন করে। শ্রম বিনিময়ে বিবাহে বরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কন্যার বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করিতে হয়। তিন হইতে পাঁচ বৎসর এইরূপ শ্রমের নির্দিষ্ট সময়। কোনও কারণে বিবাহ না হইলে কন্যার পিতাকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রচলিত হারে অমনোনীত বরকে পারিশ্রমিক দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন পাল্টা বিবাহের প্রচলনও আছে। এইরূপ বিবাহে একটি বাড়ির ছেলেমেয়ের সঙ্গে অপর বাড়ির ছেলেমেয়ের বিবাহ দিলে কোনও পক্ষকেই কন্যাপণ

দিতে হয় না। ইহাকে বলা হয় 'কুঠি লোটানা'। প্রাচীন রীতি অনুসারে বলপূর্বক বিবাহরীতিও স্বীকৃত। স্বাভাবিকভাবে এরূপ বিবাহে পূর্বরাগের ইতিহাস থাকে। অবশ্য ইহার জন্য গ্রামপঞ্চায়েতকে জরিমানা বাবদ টাকা দিতে হয়। স্বজন বিবাহ অর্থাৎ মামাতো বোন পিসতুতো ভাইয়ের মধ্যে বিবাহও বেশ প্রচলিত। এইসব বিভিন্ন রীতি ছাড়াও কখনও কখনও মেয়েরা জোর করিয়া বরের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। বিধবা বিবাহে এবং বহু-বিবাহে কোনও বাধা নাই।

যৌথ পরিবার সাধারণ সামাজিক নিয়ম। পরিবারে স্বামীই সর্বময় কর্তা। স্ত্রীর সম্মান মাঝামাঝি। মেয়েরা বিবাহের সময় যে যৌতুক পায় তা একান্তভাবেই তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্ত্রীর অমতে স্বামী উহা বিক্রয় করিতে পারে না। তবে তাহার অবর্তমানে স্বামী ও পুত্রদের সেই সম্পত্তিতে অধিকার জন্মায়। কিন্তু কখনও কোনও স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ দাবি করিতে পারে না। পিতার সম্পত্তিতে কেবলমাত্র ছেলেদেরই অধিকার। কন্যা কখনও সম্পত্তির অধিকার লাভ করে না। এমন কি পুত্রের অবর্তমানেও নয়। সেই ক্ষেত্রে ভ্রাতৃপুত্রদের অধিকার অগ্রগণ্য। যখন কোনও পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকে না, কেবল তখনই মেয়েরা সম্পত্তি পাইয়া থাকে। পৈতৃক সম্পত্তি সকল ছেলেদের মধ্যে সমভাবে বণ্টনই প্রচলিত বিধি।

প্রতি গ্রামে একজন গ্রামপ্রধান থাকেন, তাঁহাকে বলা হয় 'মুকদ্দম'। তিনি সাধারণতঃ বিচক্ষণ ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। গ্রামপ্রধানের পরই 'পাণ্ডা' বা পুরোহিতের স্থান। পুরোহিত ছাড়া 'বাইগা'রও গ্রামে প্রাধান্য আছে। গ্রাম্য ওঝাকে 'বাইগা' বলা হয়। অসুখ-বিসুখে সেই ঝাড়ফুঁক-তুকতাক করিয়া চিকিৎসা করে।

গোণ্ডসমাজে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংস্থা হইল 'ঘোতুল'— অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের যৌথ শয়নাগার। কেবল শয়নগৃহ ছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবেও 'ঘোতুল' উল্লেখযোগ্য। তবে সকল গোণ্ডগ্রামে ঘোতুল থাকে না। বিশেষতঃ মাণ্ডলা, বেতুল, বালাঘাট, ছিন্দওয়াড়া ইত্যাদি জেলার গোণ্ডগ্রামে কোনও 'ঘোতুল' নাই। চাঁদা জেলার মাড়িয়াদের মধ্যে এবং বস্তারের মাড়িয়া ও মুরিয়াদের ঘোতুল বিখ্যাত। কোনও কোনও গ্রামে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ঘোতুল থাকে। কিন্তু মুরিয়া ঘোতুলে ছেলেমেয়েদের যৌথ অধিকার। 'ঘোতুলে'র দলপতিকে বলা হয় সরদার কোতওয়াল বা কার্যনির্বাহক, সকল অনুষ্ঠানের কর্তা।

ঘোতুলের ছেলেদের বলে 'চেলিক' আর মেয়েদের 'মতিয়ারি'। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর তাহারা সকলে একে একে ঘোতুলে সমবেত হয়। ঘোতুলে প্রথম প্রবেশ উপলক্ষে কোনও অনুষ্ঠান হয় না—কিন্তু ঘোতুলে আসা বাধ্যতামূলক এবং কেহই কোনও কারণে ঘোতুলের নিয়ম কানুন অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হয় না। ঘোতুল সংগঠনে মুরিয়াদের রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষণীয়। বয়োজ্যেষ্ঠ একজন দলপতি নির্বাচিত হয়। তাহাকে বলে শিলাদার বা 'চালাও'— সেই ঘোতুলের ছেলেমেয়েদের প্রধান নেতা এবং চেলিক ও মতিয়ারিদের পরিচালনা করে। 'চালাও'র পরের স্থান 'দেওয়ানে'র, তাহার পর একে একে 'গইতা', 'তহশীলদার', 'সুবেদার', 'কোতওয়ার'। ইহাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ আছে। মেয়েদেরও কতকগুলি পদে নিযুক্ত করা হয় যেমন, 'চালানিন', 'তহশীলদারিন', 'কোতওয়ারিন' ইত্যাদি। তাহাদেরও নির্দিষ্ট কাজ থাকে। গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে দলপতি তাহার সাথীদের লইয়া সহায়তা করে। মাড়িয়া ঘোতুল অবশ্য এমন সুসংবদ্ধভাবে সংগঠিত নয়।

গ্রামে গ্রামপ্রধান ও গ্রাম-পুরোহিত দুইটি ভিন্ন পদ থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একই ব্যক্তি উভয় পদে আসীন। গ্রাম পুরোহিত গোণ্ডদের পূজা-অর্চনা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে। অবশ্য গোণ্ডদের ধর্মমত খুব স্পষ্ট নয়। তবে তাহাদের প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুভাবাপন্ন বলা চলে। মধ্য প্রদেশের কোনও কোনও গোণ্ডগ্রামে ছোট ছোট গৃহদেবতা থাকে, তাহাকে বলে 'ছুদার পেন্'। গৃহস্বামীর ঘরে মাটির পাত্রে এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামে পবিত্র সাজা গাছের নীচে 'পেন্করা' থাকে। অনেক সময় নুড়িতে সিঁদুর মাখাইয়া মহাদেও বা নারায়ণদেও নামে পূজা হয়। চাঁদা জেলাতে 'ছুদার পেন্' পূজা প্রচলিত আছে, কিন্তু বস্তারে এই পূজার প্রচলন নাই। সেখানে তিনটি দেবতা প্রধান – ধরিত্রী-দেবতা, গোত্র-দেবতা বা 'পেন' এবং গ্রামমাতৃকা। গোণ্ডরা নিজেদের 'ভূম' অর্থাৎ ধরিত্রীর সন্তান বলিয়া মনে করে। প্রতি গ্রামে গাছের নীচে গোত্র-দেবতা ও গ্রামমাতৃকার পূজা হয়। গাছের নীচে দেবতার প্রতীক হিসাবে পাথর বা পাথরের স্তূপ অবশ্যই থাকে। বাইসন শৃঙ্গরা 'ভূম'কে বলে 'পেরমা'। অনেক সময় তিনটি দেবতাই একীভূত হইয়া যায়। মাড়িয়ারা ধরিত্রীকে প্রকৃতি এবং গোত্র-দেবতাকে পুরুষ-শক্তির প্রকাশ বলিয়া মনে করে। এই দুই জনের আশীর্বাদেই জীবনের প্রবাহ ও ক্রমবৃদ্ধি রক্ষিত হয়।

গোত্রদেবতার পূজারীকে বলে 'ওয়াদাই' বা 'মদুল ওয়াদাই' (Modul Waddai)। কতকগুলি সমান্তরাল কাষ্ঠখণ্ড এক সঙ্গে বাঁশ বা সাজা গাছ দ্বারা বাঁধিয়া গোত্রদেবতার পরিকল্পনা করা হয়। পরে তাহাকে ময়ূরের পালক ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এইভাবে কাষ্ঠখণ্ড সাজাইয়া 'অপদেও', 'পটদেও' ইত্যাদি অন্যান্য দেবতাদের পূজা দেওয়া হয়। বাইসন-শৃঙ্গীরা প্রধানতঃ প্রকৃতিকে শক্তি কল্পনায় পূজা করে— যেমন বনদেবতা, জলকামিনী —বা নদীর দেবতা ইত্যাদি।

শবদেহ দাহ করাই নিয়ম। তবে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইলে সমাধিস্থ করা হয়। বস্তারে চার দিন অশৌচ পালন করা হয়। পরিবারবর্গ ঐ কয়দিন কাজে বিরত থাকে। দাহের সময় মৃতকে পূর্ব-পশ্চিমে শোয়ানো হয়। চার দিনের দিন বা তাহার পরে কাঠ বা পাথর দিয়া সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হয়। এইসব ক্রিয়াকর্মে আঞ্চলিক প্রভেদ ও বিভিন্নতা প্রচুর। মাণ্ডলাতে গোণ্ডরা দশ দিন অশৌচ পালন করে। তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল শেষকৃত্যের ক্রিয়াকর্মে কুটুম্বদের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। তাহাদের বলা হয় 'নাট'। তাহারাই শবাধার বহন করে এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ করে। মামাতো ভাই বা ভাগিনেয় মৃতের অস্থি সংগ্রহ করিয়া দশ দিনের দিন জলে বিসর্জন দেয়। সামাজিক ভোজে 'নাট' বা কুটুম্বদের বিশেষভাবে সমাদৃত করা হয়।

দীপালি ঘোষ

গোত্র, প্রবর বংশের পূর্বপুরুষ ঋষির নামানুসারে গোত্রনাম প্রচলিত, যেমন কাশ্যপ গোত্র কশ্যপ ঋষির বংশ। হিন্দুর আনুষ্ঠানিক জীবনে গোত্রের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাঁহারা একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (=সগোত্র) তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোক বিবাহের পর স্বামীর গোত্র লাভ করে।

বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে আট জন গোত্র প্রবর্তক ঋষির নাম পাওয়া যায়— ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ (বশিষ্ঠ), কশ্যপ এবং অগস্ত্য। উত্তরকালে বহু পরবর্তী পুরুষের নামেও গোত্র প্রচলন করা হয়। শ্রৌতসূত্র রচনাকালেই মূল আট জন ঋষি হইতে বহু গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই নূতন গোত্রগুলির সহিত মূল গোত্রকার ঋষির সম্পর্ক বাহির করা অসম্ভব। তবে সাধারণতঃ প্রবরের নাম হইতে তাহা নির্ধারণ করা যায়।

প্রবর শব্দের দ্বারা প্রাচীন পূর্বপুরুষ ঋষিগণের নামতালিকা বুঝায়। এই তালিকাগুলি বহু প্রাচীন এবং বৈদিক যুগ হইতেই এইগুলিকে যজ্ঞের সময় পড়া হয়। প্রত্যেক প্রবরে এক, দুই, তিন বা পাঁচ জন ঋষির নাম থাকে। যথা, কাশ্যপ গোত্রের কাশ্যপ-আবৎসার-নৈধ্রুব; জাতুকর্ণ ও পরাশর গোত্রের যথাক্রমে বাসিষ্ঠ (বাশিষ্ঠ)-আত্রি-জাতুকর্ণ্য এবং বাসিষ্ঠ (বাশিষ্ঠ)-শাক্ত্য-পারাশর্য প্রভৃতি। শেষোক্ত দুই প্রবরে বসিষ্ঠের (বশিষ্ঠ) অপত্যের নাম থাকায় গোত্র প্রবর্তক ঋষি বসিষ্ঠের (বশিষ্ঠ) নাম পাওয়া গেল ও গোত্র দুইটির অভিন্নত্বও প্রতিপন্ন হইল। সাধারণতঃ একটি নাম গোত্রপ্রবর্তক আদি ঋষিগণের একজনের অপত্যের নাম হইয়া থাকে। দুইটি প্রবরে একটি নাম সাধারণ থাকিলেই তাহাদের সমান প্রবর বলিয়া ধরা হয়। সমান প্রবর পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ।

বাংলা দেশে বর্তমানে কন্যা সম্প্রদানকালে বর ও কন্যার গোত্রনামের সঙ্গে প্রবর উল্লিখিত হইয়া থাকে।

ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণের গোত্র লইয়াই অধিক আলোচনা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের গোত্র কুল-পুরোহিতের গোত্র অনুসারে স্থির করার নির্দেশ আছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণের মধ্যেও গোত্রবিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমানগণের মধ্যে গোত্রের অনুরূপ বিভাগের নাম ছিল 'জেন্‌স'।

দ্র গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বম্‌, মহীশূর, ১৯০০, P V. Kane, *History of Dharmasastras*, vol II, Poona, 1941.

দীপক চট্টোপাধ্যায়

গোথিক ভাষাগোষ্ঠী দ্র

গোদ ফাইলেরিয়া দ্র

গোদাবরী দাক্ষিণাত্যের এই প্রসিদ্ধ নদীটি ভারতের পবিত্র নদীগুলির অন্যতম। সিদ্ধপুরুষসেবিত এই নদীতে স্নান করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল ও বাসুকিলোক লাভ হয় (মহাভারত, বনপর্ব, ৮৫।৩৩-৩৪)। রাজা যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই সাগরাভিমুখী নদী সমীপে গমন করেন। (ঐ ১১৮।৩)। রামচন্দ্র বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যে গোদাবরীতীরস্থ পঞ্চবটীতে দীর্ঘকাল বাস করেন (রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড ১৫।১২)। ধর্মকার্যানুষ্ঠানের সময় অন্যান্য নদীর সঙ্গে গোদাবরীকে পূজার জলমধ্যে অবস্থান করিয়া উহাকে শুদ্ধ করিবার জন্য আবাহন করা হয়।

সীতানাথ গোস্বামী

এই সুবিশাল নদী পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়া

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। পবিত্রতা, ও প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া সিন্ধু ও গঙ্গার পরেই ইহার স্থান। ইহার দৈর্ঘ্য ১৪৪০ কিলোমিটার (৯০০ মাইল) এবং ইহার উপত্যকার বিস্তৃতি প্রায় ২৮০৫০০ বর্গ কিলোমিটার (১১২২০০ বর্গ মাইল)। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ত্র্যম্বক গ্রামের নিকট দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। নাসিকে প্রবেশ করিবার পূর্বে ইহা সংকীর্ণ পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়া এবং আরও পূর্বে নিম্নতর ও অধিক মৃত্তিকাময় ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। নাসিকের ২৪ কিলোমিটার (১৫ মাইল) পরে ইহা ইগাৎপুরী পর্বতাগত দারনা নদীর সহিত দক্ষিণ তীরে মিলিত হয় এবং ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) পরে দিনদোরী হইতে আগত কাডভা নদীর সহিত মিলিত হয়। এই দ্বিতীয় সংগমে নান্দের নামক স্থানে নদীটিতে জলসেচের জন্য বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। নেভাসার নিকটে দক্ষিণ তীরে ইহা আকোলার পর্বত হইতে আগত প্রভারা ও মুলার সম্মিলিত জলধারার সহিত মিলিত হয়।

পাইথানের (প্রতিষ্ঠান) প্রাচীন নগরী বাম তীরে অতিক্রম করিবার পর গোদাবরী বাম তীরে পূর্ণা ও দক্ষিণ তীরে মঞ্জীরা ও মানের নদীর সহিত যথাক্রমে মিলিত হয়। সিরোঞ্চার পরে ইহা প্রাণহিতার সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পরেই নদীটি একটি সুস্পষ্ট দক্ষিণ পূর্বমুখী বাঁক লয় এবং ৭৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) পরেই বস্তার অঞ্চল হইতে আগত ইন্দ্রাবতী ও তাল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। গোদাবরী নদীর নিম্ন অংশে নদীবক্ষ ১ কিলোমিটার হইতে ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ও বালুকাবিস্তীর্ণ এবং মধ্যে দুইটি স্থানে শিলাখণ্ডের প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ইহা ওয়ার্ধা ও ওয়েনগঙ্গা (বেনুগঙ্গা) নদীর মাধ্যমে সাতপুরা মালভূমি ও নাগপুরের সমতল ভূমির সমগ্র জলধারার এক বিশাল অংশ গ্রহণ করে। সিরোঞ্চার কিছু পরে গোদাবরী শবরী নদীর সহিত মিলিত হয় এবং সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূমির মধ্য দিয়া শান্তভাবে প্রবাহিত হইবার পর পূর্বঘাট পর্বতমালায় প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং ইহা বন্ধুর পার্বত্য ও সুগভীর গিরিখাত সৃষ্টি করিয়া পর্বতমালা অতিক্রম করে। ইহার পরেই গোদাবরী সুপ্রসারিত উপত্যকায় মাঝে মাঝে দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়া যায়। এই অঞ্চলটি তামাক উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত অঞ্চল। রাজমন্দ্রীর কিছু পর হইতে ব-দ্বীপ আরম্ভ হয়। এইখানে নদীটি দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়— পূর্বে গৌতমী গোদাবরী ও পশ্চিমে বশিষ্ঠ গোদাবরী সুপ্রশস্ত দীর্ঘকাল-সঞ্চিত পাললিক ব-দ্বীপের দুই পার্শ্ব দিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া বিলীন হইয়াছে। এই দ্বিভাগের কিছু পূর্বে দৌলাইশ্বরমে একটি বিশাল বাঁধ থাকায় বড় খাল দ্বারা এই সুবিস্তৃত ব-দ্বীপের জলসেচন করা হয়।

ব-দ্বীপের মুখের বাঁধটিকে অতিক্রম করিয়া খালপথটি নাব্য, কিন্তু গোদাবরীর উচ্চ অংশ নাব্য নহে।

পূর্বে গোদাবরী ব-দ্বীপে বহু ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজ উপনিবেশ এবং বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল, কিন্তু শাখা-প্রশাখাগুলি অবক্ষেপণ দ্বারা শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির পতন হইয়াছে।

ব-দ্বীপে যে সুবিশাল বাঁধ রহিয়াছে তাহার নিকট হইতে তিনটি খাল বাহির হইয়া অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র অঞ্চলকে (২৬৪৮০০ হেক্টর বা ৬৬২০০০ একর) সেচন করিতেছে। প্রধান খালগুলি ৭৮০ কিলোমিটার (৪৯৩ মাইল) দীর্ঘ ও ইহাদের শাখা-প্রশাখা ৩০৮৬ কিলোমিটার (১৯২৯ মাইল) দীর্ঘ।

উত্তরা ঘষ

গোধূলি সূর্যাস্তের পরেও বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুটা সূর্যের আলো পাইয়া থাকি। এই সময়কে গোধূলি বলা হয়। ইহা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে ভাসমান অসংখ্য ধূলি ও জল-কণা হইতে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত সূর্যের আলো। এই আলোর তীব্রতা ক্রমে ক্রমে কমিয়া অবশেষে অবলুপ্ত হয়। সূর্যাস্ত হইতে গোধূলির আরম্ভ। আর, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মধ্য আকাশে শুধু চোখে ষষ্ঠ প্রভার তারা ('তারা' দ্র) দেখা গেলে গোধূলির অবসান।

সূর্যোদয়ের পূর্বে গোধূলির অনুরূপ একটি পর্ব থাকে, তাহাকে ঊষা বলে। ঊষার সূচনা হয় যখন সূর্য পূর্ব দিগন্ত রেখার ১৮° দূরত্বের মধ্যে আসে, আর সূর্যোদয়ে ঊষার পরিসমাপ্তি।

গোধূলি বা ঊষার দৈর্ঘ্য সর্বত্র সকল সময়ে একরূপ নয় - স্থান ও তারিখ অনুযায়ী তাহার তারতম্য হয়। এই দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা কম হয় নিরক্ষ অঞ্চলে, আর মেরু অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশি। ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর প্রথমোক্ত অঞ্চলে গোধূলি বা ঊষার স্থায়িত্ব-কাল মাত্র একঘণ্টা বারো মিনিট, শেষোক্ত অঞ্চলে ছয় মাস ব্যাপী রাত্রির প্রথম দুই মাস ধরিয়া গোধূলি ও শেষ দুই মাস ধরিয়া ঊষা।

পৃথিবীর কোথাও কোথাও বৎসরের কোনও কোনও সময়ে গোধূলি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, আর গোধূলির

অবসানেই উষার সূচনা হয়। এই অবস্থায় সারারাত্রি ধরিয়াই কিছুটা আলো পাওয়া যায়। অক্ষাংশ (ল্যাটিটিউড) ৪৮°৩৩′-এর কম হইলে এই ঘটনা সম্ভব নয়।

রমাতোষ সরকার

গোনিওমিটার কেলাসের পার্শ্বকোণ মাপিবার যন্ত্রকে গোনিওমিটার বলে। ইহা প্রধানতঃ দুই প্রকারের— বড় কেলাসের জন্য স্পর্শ গোনিওমিটার (কনট্যাক্ট গোনিওমিটার) এবং ছোট কেলাসের জন্য প্রতিফলন গোনিওমিটার (রিফ্লেক্টিং গোনিওমিটার)।

স্পর্শ-গোনিওমিটারে একটি অংশাঙ্কিত অর্ধবৃত্তের কেন্দ্রে কীলকবিদ্ধ দুইটি রুলার থাকে। রুলার দুইটির সংস্পর্শে কেলাসের দুইটি তল (ফেস) আনিলে উহাদের মধ্যস্থ পার্শ্বকোণ জানা যায়।

প্রতিফলন গোনিওমিটারে কেলাস-ধারক এবং তাহাকে কেন্দ্রীকরণের ও চারিটি বিভিন্ন অংশাঙ্কিত বৃত্ত ঘুরাইবার ব্যবস্থা থাকে। সমন্বয়সাধন ও ফোকাস করিবার ব্যবস্থা -সংবলিত একটি অক্ষিকাবক (কলিমেটর) ও একটি দূরবীন আছে। কেলাসধারকের কেলাসের দুইটি বিভিন্ন তলে অক্ষিকারক হইতে আগত আলোকরশ্মির প্রতিফলন দূরবীনে দেখিয়া উহাদের মধ্যস্থ পার্শ্বকোণ নির্ণয় করা হয়।

বর্ধমান কেলাসের পরিমাপ, কেলাসকে নির্দিষ্ট দিকে কাটা, মণিকে পালিশ করা, আলোকরশ্মির সমাবর্তন (পোলারাইজেশন) মাপা, বন্ধন-রশ্মি বিশ্লেষণ, অণুবীক্ষণের সহিত ব্যবহার প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিশেষ গোনিওমিটার তৈয়ারি করা হয়।

সত্যকীরাম চন্দ

গোপথ ব্রাহ্মণ গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ। যজ্ঞীয় বিধির আলোচনা এবং যজ্ঞীয় কর্মের স্তুতি সাধারণতঃ বেদের ব্রাহ্মণ অংশের বিষয়বস্তু। কিন্তু গোপথ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন অথর্ববেদ সংহিতায় আভিচারিক মন্ত্রের প্রাচুর্য থাকিলেও গোপথ ব্রাহ্মণে অভিচার কর্মের প্রসঙ্গ নাই বলিলেই চলে। এজন্য এই ব্রাহ্মণ অন্যান্য বেদের ব্রাহ্মণ হইতে বিশিষ্ট। ইহা বৈদিক যুগের একেবারে শেষ ভাগে রচিত বলিয়া মনে হয়। কোনও কোনও পণ্ডিত ইহাকে কল্পগ্রন্থগুলিরও পরবর্তী বলিয়া মনে করিয়াছেন। অথর্ববেদের শৌনকীয় শাখার ব্রাহ্মণ হইলেও গোপথ ব্রাহ্মণে পৈপ্পলাদ শাখার মন্ত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে।

পূর্ব ও উত্তরভাগে বিভক্ত গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব ভাগে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, অথর্ববেদীয় ঋত্বিক ব্রহ্মার মহিমা কীর্তন, ওঁকার ও গায়ত্রী মন্ত্রের মহিমা ব্যাখ্যা, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য নিরূপণ, ভৃগু, অঙ্গিরা, অথর্বা প্রভৃতি ঋষি সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি বিষয় স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি যজ্ঞের সামগ্রিক তাৎপর্য রূপকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ভাগেই অথর্ববেদ ঘোর এবং শান্ত —এই দুই উপাদানে গঠিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদের ভাবধারার যথেষ্ট পরিচয় মেলে। পূর্ব ভাগের দুইটি অংশ (১ ১. ১৬ ৩০, ৩১-৩৮) স্বতন্ত্র উপনিষদ হিসাবেও গৃহীত।

পূর্ব ভাগের যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহা উত্তর ভাগে তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই। এই ভাগে বিবিধ কর্ম বিষয়ে এবং আথর্বণ মন্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা আছে। উত্তর ভাগটি বহুল পরিমাণে অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বিষয়ের সাহায্যে রচিত।

দীপক ভট্টাচার্য

গোপা রাহুলমাতা দ্র

গোপাল পালবংশ দ্র

গোপাল উড়ে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কটক জেলার জাজপুরে চাষী পরিবারে জন্ম। পিতার নাম মুকুন্দ কর। তরুণ বয়সে কলিকাতায় ফল বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। একদিন চাঁপা কলা ফেরি করিবার সময় তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া বউবাজারের রাধামোহন সরকার কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দলের কর্তৃপক্ষ তাহাকে আহ্বান করেন এবং তিনি উহাতে যোগদান করেন। হরিকিষণ মিশ্র নামক একজন ওস্তাদের নিকট তাঁহাকে সংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে তিনি ভালভাবে বাংলা আয়ত্ত করিয়া রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রথম আসরে মালিনী সাজিয়া নৃত্য গীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর তিনি নিজে দল গঠন করেন এবং কৃতিত্বের সহিত নূতনভাবে রূপায়িত বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অভিনয় করিতে থাকেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৩২?-১৯০৩ খ্রী) নুলো গোপাল নামে সংগীত সমাজে সুবিখ্যাত এবং উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক। তাঁহার জন্ম আনুমানিক ১৮৩২

খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় কলিকাতায় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে গোপালচন্দ্র সংগীত শিক্ষার বিশেষ সুযোগ পান। বারাণসীর ধ্রুপদ গুণী গোপালপ্রসাদ মিশ্রের শিক্ষাধীনে প্রধানতঃ তাঁহার সংগীত-জীবন গঠিত হয়। গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য খেয়াল গায়ক হস্সু খাঁর নিকটেও গোপালচন্দ্র শিখিয়াছিলেন। সংগীত জীবনে তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রধান সভাগায়ক ছিলেন। তাঁহার সংগীতকৃতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা— তিন অঙ্গেই পারদর্শী। তিনি কলিকাতার অন্যতম আদি খেয়াল গায়ক। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অন্ধ গায়ক সাতকড়ি মালাকর, লালচাঁদ বড়াল, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিক্রমপুর), শশী কর্মকার (কৃষ্ণনগর), আলাউদ্দীন খাঁ (প্রথম জীবনে), রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (প্রথম জীবনে), বিনোদকৃষ্ণ মিত্র (শোভাবাজার), ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব (এণ্টালি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সংগীতের আসরে, কলিকাতা, ১৯৭৬।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৭৩ খ্রী) সুচিকিৎসক, জনসমাজসেবী এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রখ্যাত গবেষক। চব্বিশ পরগনা জেলার সুখচর গ্রামে আদি বাসস্থান ছিল। প্রথম জীবনে তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এ এবং কারমাইকেল (বর্তমানে আর. জি. কর) মেডিক্যাল কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোটোজুওলজির অবৈতনিক অধ্যাপক, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি ও ব্যাকটিরিওলজির সহকারী অধ্যাপক এবং পরে সরকারের সহকারী ব্যাকটিরিওলজিস্ট রূপেও তিনি কর্ম করেন।

গোপালচন্দ্র ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কালাজ্বর সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা সম্পর্কে তাঁহার গবেষণামূলক আলোচনা সুবিদিত। সার্থক গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ লণ্ডনের রস ইন্‌স্টিটিউট তাঁহাকে ফেলো নির্বাচন করেন।

ম্যালেরিয়া দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি গঠন করেন। সমগ্র বঙ্গ দেশে এই সমিতির শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়ে। সোসাইটির মুখপত্র 'সোনার বাংলা' মাসিকেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মৎস্য চাষ ও নদী-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধাদি লেখেন। নিজ গ্রাম সুখচরে তিনি কুটির শিল্প সমিতি গঠন করেন। তিনি ২২ বৎসর পানিহাটি পৌরসভার কমিশনার ছিলেন।

তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা: 'রোমান্স অফ দি গ্যাঞ্জেটিক ডেল্টা', 'মডার্ন সায়েন্টিফিক এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড কো-অপারেটিভ ওয়াটার সাপ্লাই' এবং 'কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেয়ারি হোম ক্র্যাফ্‌টস অ্যাণ্ড কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ'।

যোগেশচন্দ্র বাগল

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৪১ খ্রী) প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ও ধ্রুপদাচার্য। কাশীতে ইঁহার জন্ম এবং প্রথম জীবন সেইখানে অতিবাহিত। কাশীতেই তিনি বিভিন্ন কলাবতের অধীনে সংগীত শিক্ষা করেন। বীণকার মিঠাইলালের নিকট খেয়াল ও কিছু ধ্রুপদ, টপ্পা গায়ক বাখর আলীর নিকট টপ্পা এবং (শেষ বয়সে কাশীবাসী) অঘোরনাথ চক্রবর্তীর নিকট ধ্রুপদ ও ভজন — ইহাই গোপালচন্দ্রের প্রধান কণ্ঠ সংগীত শিক্ষা। তাহা ভিন্ন ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ধ্রুপদী দীপেন্দ্রনাথ রায়, খেয়াল গায়ক রহমৎ খাঁ, খেয়াল ও টপ্পা গায়ক লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্যের নিকটেও কিছুকাল শিক্ষা পান। উবরঙ্গ যোধ সিং এবং বিনায়ক মিশ্রের অধীনে তবলা শিক্ষাও করেন। সংগীতে এমন বহুমুখী শিক্ষা পাইলেও আসরে গোপালচন্দ্র ধ্রুপদী রূপেই গুণপনা প্রদর্শন করিতেন। উত্তর জীবনে প্রধানতঃ কলিকাতাবাসী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যু হয় কাশীতে। তাঁহার তুল্য রাগ সিদ্ধ এবং তাল লয়ে পারদর্শী ধ্রুপদ গায়ক অধিক ছিলেন না।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সংগীতের আসরে, কলিকাতা, ১৯৭৬।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গোপালচন্দ্র মল্লিক (১৮৩৬-১৯২০ খ্রী) গুণী মৃদঙ্গ-বাদক। নিমাই চক্রবর্তীর শিষ্য অনন্তরাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট গোপালচন্দ্র প্রথমে মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন এবং পরে মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের শিষ্য হন। তাহা ভিন্ন তিনি ছন্দে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বারাণসীতে অবস্থানপূর্বক ধ্রুপদও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে চর্চা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিনচন্দ্রও কৃতী মৃদঙ্গী রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র (বিশ্বনাথ রাও-এর শিষ্য) বিনোদবিহারী ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গোপাল নায়ক ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে নিবাস ছিল বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার জীবিতকাল সম্পর্কে কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। ফকীরুল্লাহ্ প্রণীত ফারসী 'রাগদর্পণ' গ্রন্থে (১৬৬৬ খ্রী) তাঁহাকে নায়ক গোপাল বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অনুসারে জানা যায় তিনি সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে থানেশ্বরের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্রে আসেন এবং ঐ সুযোগে বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে দিল্লীতে আসেন। সুলতানের সম্মুখে তিনি ছয় দিন গান করেন। সপ্তম দিনের অনুষ্ঠানে আমীর খুসরৌ-এর সহিত তাঁহার একটি প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে গোপাল হরগীত ও স্বরবর্তনী প্রবন্ধ গাহিয়া শোনান এবং প্রত্যুত্তরে খুসরৌ, কওল ও বসিৎ নামক দুই প্রকার গান করেন। সংগীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ তাঁহার টীকায় বলেন যে গোপাল বত্রিশটি রাগ ও তালে নিবদ্ধ গদ্যাত্মক ভ্রমর নামক স্বস্তিক শ্রেণীর রাগকদম্ব নামক প্রবন্ধের অনুষ্ঠান করিতেন।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

গোপালপুর ১৯°১৮´ উত্তর এবং ৮৪°৫৮´ পূর্ব। ওড়িশা রাজ্যের গঞ্জাম জেলায় বহরমপুর তালুকের অন্তর্গত গোপালপুর বঙ্গোপসাগরের তীরে একটি ছোট শহর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। সাগরপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ৩·০৪৮ মিটার (১০ ফুট)। ইহার মোট আয়তন ২·৫৬ বর্গ কিলোমিটার (১ বর্গ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী এই স্থানের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫৩৬ জন।

উপকূল বাণিজ্যে গোপালপুর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি কর্তৃক পূর্বে স্টিমার বন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু পরে রেলগাড়ির প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দর হিসাবে ইহার ক্রমাবনতি ঘটে। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন বহরমপুর গোপালপুর হইতে ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) উত্তরে এবং কলিকাতা হইতে ৬০০ কিলোমিটার (৩৭৫ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে দক্ষিণ-পূর্ব (সাউথ-ঈস্টার্ন) রেলপথে অবস্থিত। মোটরপথে কলিকাতা হইতে গোপালপুরের দূরত্ব প্রায় ১০৩৭ কিলোমিটার (৬৪৮ মাইল)।

গোপালপুরের জলবায়ু মৃদু ও সমভাবাপন্ন। শীত ও গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৮·৯° সেন্টিগ্রেড এবং ৩৫·৫° সেন্টিগ্রেড, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ১৬·১° সেন্টিগ্রেড এবং ২২·৬° সেন্টিগ্রেড। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১৮·৫৯ সেন্টিমিটার (৪৬·৬৯ ইঞ্চি)। একমাত্র বর্ষাকাল ব্যতীত গোপালপুরের আবহাওয়া প্রায় সব ঋতুতেই মনোরম ও আরামদায়ক। গোপালপুরের সমুদ্র এবং বিস্তীর্ণ বেলাভূমি ভ্রমণকারীদের নিকট খুবই আকর্ষণীয়।

গোপালপুরের নিকটবর্তী অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে বরকুলের নিকট চিল্কা হ্রদ (৮৮ কিলোমিটার বা ৫৫ মাইল), উষ্ণ গন্ধক প্রস্রবণ 'তপ্তপানী' (৬৭·২ কিলোমিটার বা ৪২ মাইল) রাসেলকোণ্ডার জলাধার (৯৬ কিলোমিটার বা ৬০ মাইল) এবং তারাতারিণী (৪৩·২ কিলোমিটার বা ২৭ মাইল) গোপালপুরের সহিত মোটরপথে যুক্ত। ইহা ব্যতীত গোপালপুরের গোপালজীর মন্দির, বহরমপুরের হনুমান মন্দির, সত্যনারায়ণ মন্দির ও ঠাকুরানীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই স্থানে কয়েকটি রোমান ক্যাথলিক গির্জাও আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ওড়িয়া এবং তেলুগু - ইংরেজী ভাষারও কিছু কিছু চলন আছে। গোপালপুরে একটি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XII, Oxford, 1908; *District Census Handbook: Ganjam District*, 1961.

সুরেশ সরকার

গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। 'হরিভক্তিবিলাস' নামক বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থে গোপাল ভট্টের নাম সংকলয়িতা রূপে ও সনাতন গোস্বামীর নাম উহার টীকাকার রূপে পাওয়া যায়। গোপাল ভট্ট কৃষ্ণকর্ণামৃতের কৃষ্ণবল্লভা নামে টীকা লেখেন। উহাতে তাঁহার পিতার নাম হরিবংশ ভট্ট দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নরহরি চক্রবর্তী লেখেন যে গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। গোপাল ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবা গোপাল ভট্ট কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। তিনি 'বৃন্দাবন যমক' রচনা করেন। বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী (প্রবোধানন্দ) ইহার পিতৃব্য ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

গোপালভাঁড় নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ এবং হাস্যরসিক হিসাবে অনেকে গোপালভাঁড়কে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে তো দূরের কথা উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক

পর্যন্ত গোপালভাঁড়ের নাম কোথাও পাওয়া যায় নাই। বটতলা হইতে প্রকাশিত রহস্য-গল্পের ও চুটকি-ঠাট্টার বইগুলিতে গোপালভাঁড়ের প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটে। বটতলার আসরে যখন গোপালভাঁড়ের সজ্জা হইতেছিল তখন কলিকাতায় গোপাল উড়ের যাত্রার খুব পসার। হয়ত সেই সূত্রেই কোনও অঞ্চলের গোপাল নামক বাক্যবাগীশ রসিক গোপালভাড়ের সাজ পাইয়াছিলেন। গোপালভাঁড় নামটি হইতে গোপালের জাতি ও বৃত্তি কল্পিত হইয়াছে নাপিত। কিন্তু নাপিত ক্ষুর ভাঁড় লইয়া জাতিবৃত্তি করিলেও কোথাও কদাপি সে 'ভাড' নামে খ্যাত, পরিচিত অথবা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। আসলে ভাঁড় অর্থে-- বহুরূপী নট (সংস্কৃত ভণ্ড), বাংলায় যে নানারূপ কথায় মনোরঞ্জন বা তোষামোদ করে। ভাঁড়ের এই কাজ হইল ভাঁড়ামি।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপালভাঁড় ছিল না বটে কিন্তু এমনই একজন সভাসদ ছিলেন। তিনি ভাঁড় ছিলেন না, ছিলেন শক্তিশালী, সাহসী, চতুর ও বাগ্‌বিদগ্ধ ব্যক্তি। ইঁহার নাম শংকরতরঙ্গ। ইনি ছিলেন মহারাজার পার্শ্বচর, শরীররক্ষী। কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার সভায় ঘটিত, গোপাল ভাঁড়ের কোনও কোনও চুটকি-গল্প আসলে শংকরতরঙ্গেরও হওয়া সম্ভব। শংকরতরঙ্গের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রথম সংখ্যা 'দিগ্‌দর্শন' এর প্রথম সংস্করণে (১৮১৮ খ্রী) বাহির হইয়াছিল। তাহাতেই ইঁহার পরিচয় মিলিয়াছে।

বটতলা হইতে প্রকাশিত গোপালভাঁড়ের রহস্য লহরী কালে কালে পুষ্টকায় হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক ব্যক্তির ও অনেক স্থানের চতুরতার ও বিদগ্ধ বাণীর সংযোজন ঘটিয়াছে। তাহার বেশির ভাগই গ্রাম্য, মাঝে মাঝে অশ্লীলও। তবুও কোনও কোনও চুটকি কাহিনী ও উক্তি চমৎকার, উজ্জ্বল। যেমন 'সড়া অন্ধা', 'কাদের সাপ' ইত্যাদি।

সুকুমার সেন

গোপী গোপী শব্দটি গোপ-স্ত্রী মাত্রেরই বোধক হইলেও সাধারণতঃ ব্রজসুন্দরী কৃষ্ণপ্রেমময়ী গোপরমণীগণকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি রক্ষণার্থক গুপ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে সকল রমণী কৃষ্ণকে বশীভূত করিবার উপযোগী প্রেম বা মহাভাব রক্ষা করেন তাঁহারাই গোপী। মহাভাববতী কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের মধ্যে রাধাই প্রধান। মহাভাবস্বরূপিণী রাধার একমাত্র কার্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করা।

বহুকান্তা ব্যতীত রসিকশেখর কৃষ্ণের সেবার উপযোগী রসবৈচিত্র্যের উল্লাস ঘটিবে না এবং লীলার পুষ্টি হইবে না ভাবিয়া লীলাসঙ্গিনী রাধাই অসংখ্য গোপী রূপে আত্মপ্রকট করেন। গোপীগণ তাহার কায়ব্যূহ রূপ। গোপীরা নিজেদের সুখের প্রতি উদাসীন। তাহাদের নিজ নিজ দেহের মার্জন ভূষণ এবং কৃষ্ণকে তাহাদের অঙ্গসঙ্গদান শুধু কৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত, আত্মসুখের নিমিত্ত নহে। কৃষ্ণ গোপীকে প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন করিলেও গোপী ভাবেন যে, তিনি তাঁহার দাসী হইয়াই কৃতার্থ। রাধার ন্যায় গোপীরাও কৃষ্ণের সুখ ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন না। তাঁহারা রাধার প্রাণসখী। পরস্পরের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নাই। সখীরা রাধা কৃষ্ণের লীলার পুষ্টিবিধান করিতে ব্যস্ত, কৃষ্ণের সহিত রাধিকার মিলন এবং সম্ভোগ ঘটাইতে পারিলেই তৃপ্ত। ভগবান কৃষ্ণের নিকট গোপীদের দেহদান এবং কৃষ্ণকর্তৃক তাহাদের দেহাদির সম্ভোগকে কামক্রীড়া বলা চলে না, কারণ কামের তাৎপর্য নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। এই ক্রীড়া স্বার্থগন্ধহীন প্রেমের বিলাস বৈচিত্রী বিশেষ। প্রেমের তাৎপর্য নিজের সুখ নহে, প্রিয়ের প্রীতিসম্পাদন। গোপীদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম কুব্জার প্রেম কিংবা দ্বারকার মহিষীদিগের প্রেমের ন্যায় স্বার্থপ্রসূত কিংবা স্বার্থমিশ্রিত নহে। কুব্জার মধুরারতির মধ্যে কৃষ্ণকে সম্ভোগ করিবার ইচ্ছাই প্রধান উপাদান। মহিষীদিগের কৃষ্ণরতিতে পত্নীত্বের অভিমান এবং কখনও কখনও সম্ভোগতৃষ্ণাও পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু গোপীদিগের কৃষ্ণরতিতে স্বসুখবাসনা কিংবা পত্নীত্বাভিমানের গন্ধমাত্রও নাই। গোপীদিগের এই রতির চরম পরিণতি শুধু রাধাতেই ঘটিয়াছে। গোপীরা কৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি। তাঁহাদের সহিত ক্রীড়ারস আস্বাদনে কৃষ্ণের আত্মারামতার হানি হয় না। গোপীদের মধ্যে যাঁহারা অনাদি কাল হইতে কান্তাভাবে কৃষ্ণসেবা করিতেছেন— তাঁহারা নিত্য-সিদ্ধা গোপী, আর যাহারা সাধনপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রজে গোপীত্বলাভ করিয়াছেন তাহারা সাধনসিদ্ধা গোপী। কৃষ্ণসেবার প্রকারভেদে গোপীদিগকে সখী এবং মঞ্জরীতে বিভক্ত করা হয়। সখীরা নিত্যসিদ্ধা ও মঞ্জরীরা সাধনসিদ্ধা। মঞ্জরীরা সখীদের ন্যায় অঙ্গদানাদির দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। রাধা কৃষ্ণের মিলনের এবং সেবার আনুকূল্য সম্পাদনই তাহাদের প্রধান কাজ। তাঁহারা সকলেই রাধার কিঙ্করী, অন্তরঙ্গসেবার অধিকারিণী এবং সখীদের অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীরা প্রায় রাধার সমজাতীয়া। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী। মঞ্জরীদের সেবা আনুগত্যময়ী।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

গোপীচন্দ্র নাথ ধর্মের গুরুগণের আলৌকিক শক্তি-মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার অস্তঃপাতি মেহেরকুলের রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি পল্লীগীতি বা গাথা রচিত হয়। প্রধানতঃ এগুলি পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) নাথযোগী ভক্তগণ কর্তৃক গীত হইত এবং মুসলমান ভক্তগণও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিত। এ বিষয়ে একাধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে। কাহার দ্বারা প্রথমে এই সকল গান বা গাথা রচিত হইয়াছিল জানা না গেলেও ঐতিহাসিক অভিমত অনুসারে গোবিন্দচন্দ্র একাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন এবং গাথাগুলি তাঁহার তিরোধানের অত্যল্প পরেই রচিত হয়। বিস্তর পাঠান্তর সত্ত্বেও এগুলি যে একই গাথার রূপান্তর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ: গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতী তাঁহার গুরু গোরক্ষনাথের কৃপায় অল্প বয়সেই মহাজ্ঞানের অধিকারিণী হন। যোগবলে তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপীচন্দ্র স্বল্পায়ু এবং সে যদি নিজে মহাজ্ঞান অর্জন করিতে না পারে তাহা হইলে ঊনবিংশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই মহাজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহাকে নীচবৃত্তিসম্পন্ন অলৌকিক-শক্তিধর হাড়িপা সিদ্ধাই-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস লইতে হইবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাতৃ-প্রভাবে গোপীচন্দ্রকে ১২ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস লইতে হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর হাড়িপা-র প্রবোচনায় গোপীচন্দ্রকে নানা প্রকারের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হয়। সন্ন্যাসকাল অতিবাহিত করিয়া গোপীচন্দ্র রাজসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

গোপীচন্দ্রের এই গীত বা গাথাগুলি বঙ্গ দেশে প্রায় অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং স্থানীয় কবিগণ এই মূল গাথার উপর নিজ নিজ কবিত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছিল। কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া কাহিনীটি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রায় সর্বত্রই নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় সরস ভাবে গ্রথিত হইয়া নাথ ধর্ম প্রচারে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের গীত ময়ূরভঞ্জে পাওয়া গিয়াছে। উহা ওড়িয়া ভাষায় লিখিত। ভাগলপুর, কাশী ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দী ভাষায় বিরচিত 'সিহরকী গোপীচান্দ', 'পদুমাবৎ', 'গোপীচন্দ্ রাজাকে খেল' প্রভৃতি কাব্য নাটক বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। মহারাষ্ট্রীয় কবি মহীপতি এই কাহিনী অবলম্বনে তাঁহার 'সন্তলীলামৃত' এবং পুনার আপ্লাজী গোবিন্দ 'গোপীচাঁদ নাটক' রচনা করিয়াছেন। গুজরাতেও গরবা নাচের সহিত গোপীচাঁদের গান স্থানীয় ভাষায় গীত হইয়া থাকে।

দ্র দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, কল্যাণী মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, কলিকাতা, ১৯৫০।

কল্যাণী মল্লিক

গোপীনাথ সাহা (১৯০৬-২৪ খ্রী) বাংলার সুপরিচিত বিপ্লবী। জন্মস্থান শ্রীরামপুর। পিতার নাম বিজয়কৃষ্ণ সাহা। শৈশবে শ্রীরামপুরেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। পরে হুগলি বিদ্যামন্দির, কলিকাতার সরস্বতী লাইব্রেরি ও প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বরিশাল শংকরমঠ, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। এই সময়ে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়া গোপীনাথ তাঁহাকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি পার্ক স্ট্রিট ও চৌরঙ্গী রোডের সংযোগ স্থলে টেগার্ট ভ্রমে কিলবার্ন কোম্পানির ডে সাহেবকে গুলি করেন। ধরা পড়িয়া তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অসম্মত হন এবং স্বীকার করেন যে, টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ তাঁহার ফাঁসি হয়। এই বৎসরেই সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে গোপীনাথের স্বদেশপ্রেমের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শীলনাথ চট্টোপাধ্যায়

গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬০-১৮১৯ খ্রী) কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশে ১১৬৭ বঙ্গাব্দে দানবীর গোপীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি করিতেন। পুত্রও পিতার ন্যায় সরকারের অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গোপীমোহনের বিদ্যাবত্তা বহুমুখী ছিল। তিনি নানা ভাষা ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন। সংস্কৃত, উর্দু, পারসী, ইংরেজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল।

দানশীলতা ও আশ্রিত বাৎসল্য গুণের জন্য তিনি বহুল খ্যাতি অর্জন করেন। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া মূলাজোড় গ্রামে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা

করেন। তৎকালীন হিন্দু কলেজ (অধুনা প্রেসিডেন্সি কলেজ) স্থাপনার্থে প্রচুর অর্থদান করিয়া তিনি হিন্দু সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। সংগীত ও কবিতার প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ১২২৬ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র কালিদাস মুখোপাধ্যায়, গীত-লহরী, কলিকাতা, ১৯০৪।

অশোকা সেনগুপ্ত

গোপীযন্ত্র তত-শ্রেণীর একতারা বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। সগ্রন্থি সার্ধহস্ত পরিমিত সরু বংশদণ্ডের প্রান্তে আনন্দলহরীর খোলের মত একটি অলাবু নির্মিত খোল সংলগ্ন করিয়া তাহাতে আনন্দলহরীর রীতিতে একটি লৌহ তার সংলগ্ন থাকে। তারটি মধ্য ভাগে অবস্থিত ও একটি প্রান্ত অখণ্ডিত প্রান্তে কীলক-বদ্ধ ও অপরটি খোলে আবদ্ধ থাকে। তারের অপর প্রান্ত উক্ত বংশদণ্ডের অবিকৃত ভাগে প্রোথিত একটি কীলকে সংবদ্ধ থাকে। যন্ত্রটির মধ্য ভাগে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী বাদ দিয়া অন্য সব অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া তর্জনীর দ্বারা তারে আঘাত করিয়া বাজানো হয়। অঙ্গুলির প্রসারণ ও আকুঞ্চনে ইহার স্বরের উচ্চ নিম্নতা প্রকাশ পায়। এই যন্ত্রটি, বিশেষতঃ বীরভূমে, বাউল ও ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে। 'আনন্দলহরী' ও 'একতারা' দ্র।

প্রদ্যুৎ মিত্র

গোপুর, গোপুরম্ প্রবেশপথের নিকটে বা উপরে নির্মিত অট্টালিকা বিশেষ, অমরকোষে প্রদত্ত গোপুরের সংজ্ঞা— 'পুরদ্বারন্তু গোপুরম্' (অমর, ২।২, ১৬) এবং 'দ্বারমাত্রে তু গোপুরম্' (৩।৩, ১৮২)। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বলা হইয়াছে— প্রাকারের উপর হইতে প্রবেশ-দ্বারের উপর পর্যন্ত তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত উচ্চ মকরমুখাকৃতি গোপুর নির্মাণ কর্তব্য (২৪।০৫৩)। ইহা ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারত, কামিকাগম, মানসার প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান হয় যে গোপুর বলিতে বিশেষভাবে মন্দিরের প্রবেশপথের সম্মুখে নির্মিত দ্বারশালা বুঝাইত না। প্রাসাদ, নগর বা বিহারের প্রবেশপথের উপরে বা সন্নিকটেও গোপুর নির্মিত হইত। ইহাদের যে কোনটির পরপর পাঁচটি সমকেন্দ্রিক প্রাঙ্গণের প্রত্যেকটির সম্মুখেই গোপুর নির্মিত হইতে পারে। ইহাদের পারিভাষিক নাম যথাক্রমে প্রথম প্রাঙ্গণের বা অন্তর্মণ্ডলের সম্মুখের গোপুর— দ্বার-শোভা, দ্বিতীয়— দ্বারশালা, তৃতীয়— দ্বারপ্রাসাদ, চতুর্থ —দ্বারহর্ম্য এবং পঞ্চম— মহাগোপুর। এই পাঁচ রকম গোপুরের প্রত্যেকটিকে আবার ছোট, মাঝারি এবং বড় —এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই পনের রকমের গোপুরের অতি বিশদ বিবরণ প্রাচীন স্থাপত্য শাস্ত্র মানসারে দেওয়া আছে। শিখর, স্তূপিকা, গলকূট, ক্ষুদ্রনাসী, মহানাসী ইত্যাদি স্থাপত্যের অঙ্গানুসারে গোপুরগুলিকে আবার দশ ভাগেও ভাগ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রীতি অনুসারে নির্মিত গোপুরের নাম শ্রীভোগ, শ্রীবিশাল, বিষ্ণুকান্ত, ইন্দ্রকান্ত প্রভৃতি।

এই সকল প্রকার গোপুরই ১ হইতে ১৬ বা ১৭ তল পর্যন্ত হইতে পারিত, ইহার মধ্যে ১ হইতে ৫ তল পর্যন্ত নির্মাণের বিষয় শিল্পশাস্ত্রে বলা হইয়াছে। বিভিন্ন গোপুরের আনুপাতিক মাপ, প্রতি তলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা ও অলংকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অভ্যন্তরস্থ গর্ভগৃহ, কক্ষসকল, স্তম্ভ, প্রাকার, হর্ম্যতল, দালান, দ্বার প্রভৃতির নির্মাণ ও অবস্থানের বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। গোপুর প্রধানতঃ দক্ষিণী স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভবতঃ পল্লব স্থাপত্যশৈলী হইতেই ইহার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন যুগের স্থাপত্যরীতি পর্যালোচনা করিলে গোপুরের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এলোরায় কৈলাস মন্দির এই ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। বর্তমানে দাক্ষিণাত্য ভিন্ন অন্যত্র এই বিশেষ স্থাপত্যশৈলীর কোনও নিদর্শন নাই। মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর মন্দির, তাঞ্জোরের নটরাজ মন্দির প্রভৃতিতে নির্মিত গোপুর দর্শকের সম্ভ্রম ও বিস্ময় জাগ্রত করে।

অমরকোষ, অগ্নিপুরাণ, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, কামিকাগম, রামায়ণ, মহাভারত, মানসার লিপি এবং কৃষ্ণরাজ হাম্পি অনুশাসন, সুন্দর রঙ্গনাথ লিপি, মঙ্গলগিরি স্তম্ভ লিপি, চেব্রোলু লিপি, কৃষ্ণদেবরায়ের কোত্তবিদু লিপি, সদাশিব রায়ের কৃষ্ণপুর লিপি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও লেখের মধ্যে গোপুরের উল্লেখ রহিয়াছে। মালাবল্লী তালুকের লিপিতে উৎকীর্ণ শ্লোক— 'মহাবীর শ্রীচিক দেবরায় নৃপতি ধরিত্রী-বধূর ভূষণস্বরূপ শোভন গোপুর-সংবলিত সুন্দর শ্রীরঙ্গ নগরীতে বাস করিতেন'— পাঠ করিলে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না যে, মন্দিরের প্রবেশপথ ব্যতীত নগরাদির সম্মুখেও গোপুর নির্মিত হইত।

নীল দে

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬২ খ্রী) আধুনিক কালে বিষ্ণুপুর ঘরানার সুপরিচিত ধ্রুপদী এবং উক্ত ঘরানার গীতি রীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। পিতা অনন্তলালের অধীনে বাল্যকালে প্রথম সংগীতশিক্ষার আরম্ভ, পরে জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা রামপ্রসন্নের নিকট এবং কলিকাতায় গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকটেও শিক্ষা করিয়াছিলেন। সংগীত জীবনে দীর্ঘকাল বর্ধমান মহারাজার সভাগায়ক এবং কলিকাতায় 'সংগীত সংঘ' র অন্যতম সংগীত শিক্ষক ছিলেন। 'সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা' মাসিক পত্রের অন্যতম সম্পাদক এবং 'আনন্দ সংগীত পত্রিকা'র শেষ পর্যায়ে সম্পাদক থাকেন। তিনি বাংলা ও ব্রজ ভাষায় অনেকগুলি গান রচনা করেন এবং তাঁহার কয়েকটি গ্রামোফোন রেকর্ডও আছে। 'সংগীত-চন্দ্রিকা' (১ম, ২য় ভাগ), 'গীতমালা', 'তানমালা', 'গোপেশ্বর-গীতিকা', 'বহুভাষা গীত', 'গীত দর্পণ', 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস' (১ম, ২য় খণ্ড) ইত্যাদি স্বরলিপি পুস্তকের তিনি রচয়িতা।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর ঘরানা, কলিকাতা, ১৯৬৩।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গোবর্ধন মথুরা জেলার অন্তর্গত বৃন্দাবন হইতে ২৯ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দূরে অবস্থিত পর্বত। কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ করিয়া ব্রজবাসীগণ গিরিযজ্ঞের অর্থাৎ গোবর্ধনগিরির পূজা প্রবর্তন করিলে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র সপ্তাহকাল বৃন্দাবনে প্রভূত বৃষ্টিপাত করেন। ইহার জন্য গোপগণ ও গাভীদের দুর্দশা দর্শনে ব্যথিত কৃষ্ণ বামহস্তের এক অঙ্গুলিতে গোবর্ধন পর্বত ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করেন, ফলে ইন্দ্রের দর্প নাশ হয় (হরি, ২।১৮, ভাগবতপুরাণ ১০।২৪-৫, ব্রহ্ম, ১৮৮)। বরাহ-পুরাণে গোবর্ধন তীর্থমাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে (বরা, ১৬৪)। হরিভক্তিবিলাসে বলা হইয়াছে যে কার্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে বৈষ্ণবগণকর্তৃক পূর্বাহ্নে গোবর্ধন পূজা অনুষ্ঠেয়। মথুরাবাসী বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ গোবর্ধন পর্বতের অর্চনা ও প্রদক্ষিণ প্রশস্ত এবং অন্য স্থানে গোময় বা অন্ন দ্বারা গোবর্ধন পর্বত নির্মাণ করিয়া পূজানুষ্ঠানের বিধি আছে। গোবর্ধনের স্তুতিযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ভক্তি সহকারে পূজা করিলে ভক্ত বৈষ্ণবধাম প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে আনন্দ লাভ করেন (হরিভক্তি-বিলাস, ১৬, স্মৃতিকৌস্তুভ, ধর্মসিন্ধু)। 'অন্নকূট' দ্র।

যূথিকা ঘোষ

গোবর্ধন আচার্য গোবর্ধন বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভা-কবি ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী'তে আর্যা ছন্দে রচিত সপ্তশতাধিক শৃঙ্গার-রসপ্রধান পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোক বর্ণানুক্রমে বিভিন্ন বিভাগ বা ব্রজ্যায় গ্রথিত আছে। হালের প্রাকৃত 'গাথাসপ্তশতী'র প্রভাব ইহাতে সুস্পষ্ট। গোবর্ধনের রচনাচাতুর্য সম্বন্ধে জয়দেব গীতগোবিন্দে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। 'আর্যাসপ্তশতী' হইতে কিছু শ্লোক 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি', 'সূক্তিমুক্তাবলী' ও 'পদ্যাবলী' প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। হিন্দী কাব্য 'সৎসঈ'-এর রচয়িতা বিহারীলাল গোবর্ধন-প্রভাবিত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবি এশিয়া দ্র

গোবিন্দ, তৃতীয় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ ৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র না হইলেও রাজা ধ্রুব তাহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সামন্তগণের সহায়তায় গোবিন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। গোবিন্দ এই বিদ্রোহ দমন করিয়া দাক্ষিণাত্যে নিজের প্রভুত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর তিনি উত্তর ভারতে অভিযান করেন। তাঁহার পিতা ধ্রুব উত্তর ভারতের প্রধান দুই রাজাকে অর্থাৎ গুর্জর প্রতীহার বংশীয় বৎসরাজ এবং পালবংশীয় ধর্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরিবার পর ধর্মপাল আবার শক্তিশালী হইয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন এবং তাহার অনুগত চক্রায়ুধকে ইহার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৎসরাজের পুত্র নাগভট ঐ দুই জনকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ দখল করেন। গোবিন্দ প্রথমে কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইয়া নাগভটকে পরাজিত করেন এবং নাগভট রাজপুতানায় পলাইয়া যান। আরও কয়েকজন রাজাকে পরাজিত করিয়া গোবিন্দ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া হিমালয় পর্বতের পাদমূলে পৌছেন। ধর্মপাল ও নাগভট বিনা যুদ্ধেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর গোবিন্দ দক্ষিণাপথে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করার পথে মালব, দক্ষিণ কোশল, কলিঙ্গ, ওড়িশা প্রভৃতি দেশ জয় করেন। এই অদ্ভুত সাফল্যমণ্ডিত বিজয় অভিযান সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। সম্রাট গোবিন্দের অনুপস্থিতির সুযোগে দাক্ষিণাত্যের পল্লব, পাণ্ড্য, কেরল, গঙ্গ প্রভৃতির রাজন্যবর্গ একযোগে বিদ্রোহ করে, কিন্তু গোবিন্দ তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার বিজয়ী সৈন্য কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সিংহলের রাজাও গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করেন। ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যু হয়।

দ্র R. C. Majumdar, *History and Culture of the Indian People*, vol. IV, Bombay, 1955.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

গোবিন্দ অধিকারী (১৮০০?-৭২) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণ বংশে প্রখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী নদিয়া জেলার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়া গ্রামে আনুমানিক ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি আমতা জেলার অন্তর্গত ধুরখালি গ্রামের গোলকদাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন। জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাদলের 'ছোকরা' বলিয়া গোবিন্দ অধিকারী খ্যাত ছিলেন। উত্তরকালে তিনি নিজে একটি দল গঠন করিয়া কীর্তন গান করিয়া বেড়াইতেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'কালীয় দমন' যাত্রার দলটি তাঁহার সৃষ্টি। 'রাধা-কৃষ্ণের লীলা' অভিনয়ে স্বয়ং দূতী রূপে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার রচিত 'শুকসারীর পালা' এবং 'চড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব' নাটক দুইখানি পাঠক সম্প্রদায়কে চমৎকৃত করিয়াছে। একাধারে যাত্রা, কীর্তন ও কথকতা বিষয়ে গোবিন্দ অধিকারী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকা সেনগুপ্ত

গোবিন্দচন্দ্র[১] নাথ ধর্ম দ্র

গোবিন্দচন্দ্র[২] গাহড়বাল দ্র

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮ খ্রী) পূর্ব বঙ্গের ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ভাওয়ালের রাজপরিবারেই প্রতিপালিত হন, পরে সেখানেই চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজাদের অত্যাচার এবং ম্যানেজার সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র কঠিন বিপদে পতিত হন। ভাওয়াল হইতে তিনি বিতাড়িত হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। তাঁহার আশ্রয়েই 'মগের মুলুক' নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি রচিত হয়। অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়, তাঁহার কবিতাতে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র উচ্চতর ইংরেজী অথবা সংস্কৃত শিক্ষা পান নাই। সেইজন্য তাঁহার কবিতা কিঞ্চিৎ অমার্জিত হইলেও তীব্র আবেগ এবং গভীর আন্তরিকতায় পূর্ণ। তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য পূর্ব বঙ্গের প্রাকৃতিক বর্ণনা, গভীর বাস্তববোধ এবং প্রগাঢ় পত্নীপ্রেম, কবিতার ভাষাতেও আঞ্চলিক রীতি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নূতন স্বাদ আনিয়াছে। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ: 'প্রসূন' (১৮৭০? খ্রী), 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮ খ্রী), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২ খ্রী), 'মগের মুলুক' (১৮৯৩ খ্রী), 'কস্তুরী' (১৮৯৫ খ্রী), 'চন্দন' (১৮৯৬ খ্রী), 'ফুলরেণু' (১৮৯৬ খ্রী), 'বৈজয়ন্তী' (১৯০৫ খ্রী), 'শোক ও সান্ত্বনা' (১৯০৯ খ্রী), 'শোকোচ্ছ্বাস' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)।

দ্র হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭৪, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

ভবতোষ দত্ত

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭ খ্রী) পিতা গৌরসুন্দর রায় ঢাকায় দেওয়ান ছিলেন। বিখ্যাত আনন্দচন্দ্র রায় ইঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা। গোবিন্দচন্দ্র স্কুল-কলেজে বেশি দূর পড়েন নাই। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তিনি পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র কাশীতে এবং সেখান হইতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় চলিয়া আসেন। সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রূপে তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' এবং 'যমুনালহরী' সুপরিচিত কবিতা। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ: 'গীতিকবিতা' (প্রথম ভাগ ১৮৮১ খ্রী, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮২ খ্রী, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ ১৮৮৩ খ্রী), 'রোমিও জুলিয়েত' (১৮৮৭ খ্রী) এবং 'ভিষক-দুহিতা' (১৮৮৮ খ্রী)। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও তিনি রচনা করেন।

দ্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, উত্তর ভারত, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ-চন্দ্র রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৪২, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

ভবতোষ দত্ত

গোবিন্দদাস[১] শ্রীচৈতন্যের সেবক ও দ্বারপাল। অনেকের মতে এই গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত দাক্ষিণাত্যভ্রমণে যান এবং একখানি কড়চাতে সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। জয়গোপাল গোস্বামীর প্রকাশিত কড়চাখানি

সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের কড়চায় বর্ণিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া লিখিত। এ সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে।

বিমানবিহারী মজুমদার

গোবিন্দদাস[২] (আনুমানিক ১৫৩৭-১৬১৩খ্রী) শ্রীচৈতন্যের পরিকর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র এবং শ্রীখণ্ডবাসী মহাকবি দামোদর কবিরাজের দৌহিত্র। জন্ম আনুমানিক ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নিকট তেলিয়া বুধুরি গ্রামে ইঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ। দুই জনেই অধিক সময়ে শ্রীখণ্ডে থাকিতেন এবং দুই জনেই প্রথমে শক্তি-উপাসক ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার কিছুকাল পরে (আনুমানিক ১৫৭৭ খ্রী) গোবিন্দদাসও আচার্যের কাছে দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা করিয়া পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কবিখ্যাতি অচিরেই সমগ্র বাংলা দেশে ও সুদূর বৃন্দাবনেও ব্যাপ্ত হয়। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে শ্রীজীব গোস্বামী গোবিন্দদাসকে 'কবীন্দ্র' বলিয়া সংবর্ধিত করিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ধারা অনুসরণ করিয়া অলংকারপূর্ণ পদ রচনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বহু উদ্ভট কবিতার, বিশেষ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত পদ্যাদির ভাব লইয়া অনেক সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের শব্দচয়নের নৈপুণ্য ও স্বল্প কথায় বিচিত্রধর্মী পদরচনার বিচিত্র ক্ষমতা বিদগ্ধ শ্রোতা ও পাঠককে মুগ্ধ করে। পারিপার্শ্বিক বহিঃপ্রকৃতি ও নায়ক-নায়িকার অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনায় গোবিন্দদাস সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

গোবিন্দদাস তাঁহার কয়েকটি পদে সমসাময়িক কবি দ্বিজ বসন্ত, বল্লভ, চম্পতি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি পদে যশোহরের অধিপতি প্রতাপাদিত্যেরও নাম দেখা যায়। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় যে তিনি নরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতা সন্তোষ দত্তের প্রীত্যর্থে 'সঙ্গীতমাধব' নামক নাটক রচনা করেন। ঐ নাটক এখন পাওয়া যায় না।

মৈথিল কবি লোচন ঝার 'রাগতরঙ্গিনী'তে গোবিন্দদাস নামে এক মৈথিল কবির দুইটি পদ পাওয়া যায়। শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রবর্তিত উপাসনা প্রণালী অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস পদের ভণিতায় যুগলসেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। এরূপ ভজনপ্রণালী মিথিলায় কখনও প্রচারিত হয় নাই। সেইজন্য গোবিন্দদাস কবিরাজের পদকে কখনই গোবিন্দদাস ঝার রচনা বলা চলে না।

দ্র সুকুমার সেন, 'গোবিন্দদাস কবিরাজ', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ; কালিদাস নাথ সম্পাদিত, গোবিন্দদাস-পদাবলী, কলিকাতা, ৪১৬ চৈতন্যাব্দ; বিমানবিহারী মজুমদার, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, কলিকাতা, ১৯৬১।

বিমানবিহারী মজুমদার

গোবিন্দপুর কলিকাতা দ্র

গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাণিক্য কল্যাণমাণিক্যের পুত্র। কয়েক বৎসর রাজত্ব করিবার পরে বিদ্রোহী ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া (মতান্তরে ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া) গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামে আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নক্ষত্র রায় 'ছত্রমাণিক্য' নাম লইয়া ত্রিপুরার রাজা হন।

কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া ছত্রমাণিক্য পরলোক গমন করেন। তখন গোবিন্দমাণিক্য আবার ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। 'রাজমালা' গ্রন্থের মতে, গোবিন্দমাণিক্য মেহেরকুলে একখান প্রাসাদ বানাইয়াছিলেন, গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথের শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের অনেক তাম্রশাসন মিলিয়াছে, একটির তারিখ ১৫৯৮ শকাব্দ (১৬৭৬ খ্রী)।

কথিত আছে, সুজা আরাকানে যাইবার পূর্বাহ্ণে গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া 'নিমচা' নামক বহুমূল্য তরবারি ও একটি হীরার আংটি উপহার দিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যকে লেখা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একটি ফার্সী পত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, সুজা গোবিন্দমাণিক্যেরই রাজ্যে আছেন বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, গোবিন্দমাণিক্য যেন সুজাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করেন।

'রাজমালা'র তৃতীয় খণ্ড গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হয়।

গোবিন্দমাণিক্য রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটকের নায়ক।

দ্র কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, ১৮৭৬।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

গোবিন্দরাম মিত্র, গোবিন্দ মিত্তির (?-১৭৬৬ খ্রী) ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বড়িশার সাবর্ণ

চৌধুরীদের নিকট হইতে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর— এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিয়া জমিদারির মালিক হইয়া ওঠেন। ঐ তিনটি গ্রাম একত্র করিয়া জমিদারির নাম হইল কলিকাতা জমিদারি। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ তিনটি গ্রাম লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জমিদারি পরিচালনার নিমিত্ত কলিকাতা কাউন্সিলের একজন সদস্যকে বিশেষভাবে ঐ কার্যে নিযুক্ত করা হয়। দেশী প্রথা অনুসারে তাঁহার নাম হয় জমিদার। অতঃপর অতি অল্প কালের মধ্যে কলিকাতায় এতদ্দেশীয় অধিবাসীদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজ জমিদারের সাহায্যের নিমিত্ত একজন দেশীয় সহকারী নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কাউন্সিলের দপ্তরে এই সহকারীকে 'ব্ল্যাক জমিদার' নামে ডাকা হইত। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ্ ফরুকশিয়র-এর ফরমানের বলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতার নিকটবর্তী আরও কয়েকটি গ্রাম ক্রয় করিয়া সেইগুলিকেও কলিকাতা জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। এই সময়ে কলিকাতার প্রথম 'ব্ল্যাক জমিদার' নন্দরাম সেনের পদচ্যুতি ঘটায় গোবিন্দরাম মিত্র ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া পলাশির যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী চানক গ্রাম হইতে আসিয়া গোবিন্দরাম প্রথমে সুতানুটি গ্রামের কুমারটুলি অঞ্চলে বাস করেন এবং বৈধ অবৈধ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে অতি অল্প কালের মধ্যে প্রভূত ধনশালী হইয়া ওঠেন। জমিদার হিসাবে তাঁহার এরূপ প্রবল প্রতাপ ছিল যে, বঙ্গভাষায় 'গোবিন্দরামের ছড়ি' বলিয়া একটি প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি হয়। তাঁহার উপরিতন 'জমিদার' হল্‌ওয়েল সাহেব তাঁহার দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থপরতার নিমিত্ত তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসৃত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও বিফল হন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে তিনি কুমারটুলিতে গঙ্গার ধারে নয়টি চূড়া-বিশিষ্ট একটি বিরাট কালীমন্দির স্থাপনা করেন। উহা এতদ্দেশীয়দের নিকট গোবিন্দ মিত্তিরের 'নবরত্ন মন্দির' নামে এবং 'দ প্যাগোডা' নামে বিদেশীয়গণের নিকট পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে নির্মিত অক্টার্লোনি মনুমেন্ট অপেক্ষা ইহার উচ্চতা অধিক ছিল। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রচণ্ড ঝড়ে ইহার কয়েকটি চূড়া খসিয়া পড়িয়া যায় এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার সামান্য ভগ্নাবশেষ বাগবাজারের 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে'র পশ্চিম পার্শ্বে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আনুমানিক ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দরামের মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধরগণের একটি শাখা 'কুমারটুলির মিত্তির' এবং আর একটি শাখা বারাণসীর 'চৌখাম্বার মিত্তির' নামে প্রসিদ্ধ।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

গোভিল সামবেদের কৌথুমী শাখার গৃহ্যসূত্রকার। ইঁহার গ্রন্থ 'গোভিল-গৃহ্যসূত্র' বা 'গোভিলীয় গৃহ্যসূত্র' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থ চারিটি প্রপাঠকে এবং উনচল্লিশটি কণ্ডিকায় বিভক্ত, ইহার মোট সূত্রসংখ্যা ১০৬৯। ইহার প্রথম প্রপাঠকে সামান্যবিধি, গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য ব্রহ্মযজ্ঞ এবং দর্শ-পূর্ণমাসাদি যজ্ঞের বিধি আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তকরণ, জাতকর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি কর্ম আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রপাঠকে গোদান (কেশান্তকরণ), আদিত্যব্রত, উপাকরণ (বেদাধ্যয়ন ব্রত), সমাবর্তন, গোযজ্ঞ, অশ্বযজ্ঞ, শ্রাবণী, আশ্বযুজী, আগ্রহায়ণী অষ্টকা প্রভৃতির বিবরণ আছে। চতুর্থ প্রপাঠকে বিভিন্ন প্রকারের অন্বষ্টকা, নানা প্রকার কর্মসিদ্ধির উপযোগী কর্ম এবং গৃহারম্ভ প্রভৃতি কর্ম আলোচিত হইয়াছে।

আশ্বলায়ন, পারস্কর প্রভৃতির গৃহ্যসূত্রগুলিতে ব্যবহৃত মন্ত্র যেমন স্ব স্ব শাখার বেদ-সংহিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, গোভিল-গৃহ্যসূত্রে তাহা করা হয় নাই। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত মন্ত্রসমূহ আংশিকভাবে সামবেদ-সংহিতা হইতে গৃহীত। অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি 'মন্ত্রব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে আচার্য সায়ন সামবেদীয় তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যার ভূমিকায় সামবেদীয় আটখানি ব্রাহ্মণের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'মন্ত্রব্রাহ্মণ' প্রকৃতপক্ষে সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণগণের বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারসমূহে যে সমস্ত মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার পেটিকাস্বরূপ।

গোভিলগৃহ্যসূত্র অতি প্রাচীন সূত্র-সাহিত্যের ভাষা-শৈলী অবলম্বনে বিরচিত। এই গ্রন্থে অতি প্রাচীন কালের আচার-অনুষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কারণে সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে গোভিল-গৃহ্যসূত্রকে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকার করা হয়। গোভিলকে সামবেদের 'নৈগেয়-সূত্র' এবং 'পুষ্পসূত্রে'র রচয়িতা বলিয়াও গণ্য করা হয়।

দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত, হিন্দুশাস্ত্র, ৩য় ভাগ (সত্যব্রত সামশ্রমী), ১৩০০ বঙ্গাব্দ; চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, গোভিলীয় গৃহ্যসূত্র, কলিকাতা, ১৯০৮; সত্যব্রত সামশ্রমী, ঊষা, কলিকাতা, ১৮১১ শক; H. Oldenburg, *Grihya*

Sutras, Sacred Books of the East Series, vol. XXX, Delhi, 1964

সুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

গোমতী উত্তর প্রদেশের এই নদীটি পীলীভীতের ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল) পূর্বে ২৮°৩৭ উত্তর ও ৮০°৭′ পূর্বে উৎপন্ন হইয়া গাইহাহ ও জোকনাই নদীর সহিত মিলিত হইবার পর বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মুহাম্দির পর ইহার উপত্যকা ৩০ মিটার হইতে ৬০ মিটার (১০০ হইতে ২০০ ফুট) বিস্তৃত। ইহার উপনদী কাথনা ১৪৪ কিলোমিটার (৯০ মাইল) ও সারাইযান ১৯২ কিলোমিটার (১২০ মাইল) দীর্ঘ। গোমতী লখনৌ, বারবাকি, সুলতানপুর ও জৌনপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বারবাকিতে ইহার বিস্তৃতি ৩৬ মিটার (১২০ ফুট) এবং জৌনপুরে ১৮০ মিটার (৬০০ ফুট) পর্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সাই নদী ৫৬০ কিলোমিটার (৩৫০ মাইল) গোমতীর সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইবার পর জৌনপুরের নিকট উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর নদীটি জৌনপুর ও বারাণসী জেলার মধ্য দিয়া গাজীপুর জেলার সৈয়দপুরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এইরূপে গোমতী গঙ্গার সহিত মিলিত হইবার জন্য ৮০০ কিলোমিটার (৫০০ মাইল) দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছে।

শাখা প্রশাখাসহ গোমতী নদী ১৯৪২৫ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৭৫০০ বর্গ মাইল) অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উৎপত্তিস্থলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত এবং সেই জলরাশির অতি দ্রুত পরিবহনে নদী-উপত্যকাটির অক্ষমতার দরুন ইহাতে প্রায়ই প্রলয়ংকরী বন্যা দেখা যায়। গোমতী মুহাম্দি পর্যন্তই নাব্য। ইহা হইতে জলসেচ হয় না।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XII, Oxford, 1908

উৎবা বসু

গোমল আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্তের একটি গিরিপথ ও নদী।

গোমল নদী গজনী হইতে প্রায় ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দক্ষিণ-পূর্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া সিন্ধু নদে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষা কাল ব্যতীত ইহাতে জল থাকে না। ঋগ্‌বেদে ইহাই গোমতী নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপনদী জোয়াব (Zhob)। গোমল গিরিসংকট গোমল নদীকে অনুসরণ করিয়া সুলেমান পর্বত ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরে থাইবার গিরিপথ ও দক্ষিণে বোলান গিরিপথ, মধ্যে অবস্থিত এই গোমল গিরিপথ বাণিজ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ডেরা ইসমাইল খাঁকে আফগানিস্তানের সহিত যুক্ত করিয়াছে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জোয়াব উপত্যকাকে ব্রিটিশ সরকার নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনার সিদ্ধান্ত করেন এবং গোমল গিরিপথটি খুলিবার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অভিযানের পরে গোমল ও ওয়াজিরিস্তান প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে আনিবার কথা হয়, কিন্তু ঐ সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে গঠিত হওয়ায় উহা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান মিলিশিয়ার অধীনে থাকে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় আফগান যুদ্ধের পর হইতে এই পথটিকে ব্যবহার করা হয় ও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। গোমল গিরিপথের নিকট গোমল শহর অবস্থিত।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XII, Oxford, 1908

কমলা মুখোপাধ্যায়

গোম্মট গোম্মট শব্দের অর্থ লইয়া বাদানুবাদ থাকিলেও, এ কথা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে ইহার অর্থ ছিল 'উৎকৃষ্ট', 'চিত্তাকর্ষক', 'হৃদয়ানন্দকর', 'দর্শনীয়' ইত্যাদি। প্রায় এই অর্থেই ইহা আধুনিক মারাঠী, কোঙ্কণী, কন্নড, তেলুগু প্রভৃতি ভাষাতে প্রচলিত আছে।

গঙ্গাবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মারসিংহ (৯৬৭ খ্রী) ও তৎপরে দ্বিতীয় রাজমল্লের (৯৭৪-৮৪ খ্রী) মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন চামুণ্ড রায়। তাঁহার দ্বারা (৯৮০-৮৩ খ্রী) শ্রবণবেলগোলায় প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের পুত্র বাহুবলির বিশাল মূর্তি স্থাপিত হয়। চামুণ্ড রায়ের আর-একটি নাম ছিল গোম্মট। সুতরাং তৎকর্তৃক স্থাপিত হওয়ায় এই মূর্তির নাম হয় গোম্মটেশ্বর। নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী জৈনতত্ত্বমূলক 'পঞ্চসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ লিখিয়া চামুণ্ড রায়ের নামে সমর্পণ করায় এই গ্রন্থের অপর একটি নাম হইল 'গোম্মটসার'।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়া, দমান, দীউ ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দমান, দীউ, দাদরা, নগর হাভেলী ও আঞ্জিডিভ দ্বীপটি পূর্বে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইগুলিতে একজন গভর্নর জেনারেল সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের

প্রধান কর্তা ছিলেন। ইহাদের রাজধানী নোভা গোয়ায় অবস্থিত ছিল। অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিকার্য, মৎস্য-শিকার, আকরিক লৌহের উৎপাদন প্রভৃতি পেশাগত কর্মে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বর্তমানে গোয়া, দমান ও দীউ এবং দাদরা ও নগরহাভেলী নামে দুইটি পৃথক কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গোয়া, দমান ও দীউ ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর হইতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার সদর দপ্তর পনজীতে (নোভা গোয়া) অবস্থিত এবং ইহা বর্তমানে একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নরের দ্বারা শাসিত। আয়তন ৩৭০৫ বর্গ কিলোমিটার (১৪৩১ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ৬২৬৯৭৮ (১৯৬১ খ্রী)।

এই প্রাক্তন পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া ১৪°৫৩´ উত্তর হইতে ১৫°৪৮´ উত্তর ও ৭৩°৪৫´ পূর্ব হইতে ৭৪°২৪´ পূর্বে অবস্থিত। ইহা ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই নগরী হইতে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার (২৫০ মাইল) দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। ইহার উত্তরে মহারাষ্ট্র রাজ্য, পূর্বে ও দক্ষিণে মহীশূর রাজ্য এবং পশ্চিমে আরব সাগর। উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ৮৩ কিলোমিটার (৬২ মাইল) ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ৬৪ কিলোমিটার (৪০ মাইল)। বর্তমান আয়তন প্রায় ৩৩৭৫বর্গ কিলোমিটার (১৩২৪ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ৫৮৯৯৯৭ (১৯৬০ খ্রী)। দমান অঞ্চলটি বোম্বাই শহর হইতে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার (১০০ মাইল) উত্তরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভগবান নদী ও পূর্বে গুজরাত রাজ্য, দক্ষিণে কালেম নদী এবং পশ্চিমে রহিয়াছে ক্যাম্বে (খম্বাত) উপসাগর। বর্তমান আয়তন প্রায় ৫৭ বর্গ কিলোমিটার (২২ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ২২৩৯০ (১৯৬০ খ্রী)।

দীউ ক্যাম্বে উপসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপটিকে একটি সংকীর্ণ পয়ঃপ্রণালী কাঠিয়াওয়াড় উপদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ কিলোমিটার (৭ মাইল) এবং উত্তর-দক্ষিণে ইহার প্রস্থ হইতেছে প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল)। বর্তমান আয়তন হইতেছে প্রায় ৩৯ বর্গ কিলোমিটার (১৫ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ১৪২৮০ (১৯৬০ খ্রী)।

গোয়া দ্বীপটির নাম হইতে এই উপনিবেশটির গোয়া নামকরণ হইয়াছিল। গোয়ায় মোট ১১টি কন্‌সেল্‌হোজ (Concelhos— জেলা অথবা কাউন্টিতুল্য বিভাগ) রহিয়াছে।

গোয়া পাহাড়িয়া দেশ। পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে গিরিশ্রেণী ও শাখাপর্বতসমূহ পশ্চিমে নির্গত হইয়া ইহার দক্ষিণে ও মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। উল্লেখযোগ্য শিখরগুলি হইতেছে সোনসাগর, কাটলানচি-মাউলি এবং দুধসাগর। নদীগুলির মধ্যে মাণ্ডভি, জুয়ারী, তেরেখোল, বেতুল এবং চাপোরা উল্লেখযোগ্য। শিখর-গুলির উচ্চতা ১২০০ মিটার (৪০০০ ফুট) হইতে কম ও নদীগুলির দৈর্ঘ্য ৬৪ কিলোমিটার (৪০ মাইল)-এর মধ্যে। বৃহৎ নদীসমূহ সাধারণতঃ নাব্য।

দমানের উত্তর ও পূর্বাংশে কয়েকটি পাহাড় আছে। উত্তরাংশে অবস্থিত দমানের উচ্চতম শিখরটির উচ্চতা ১০৯ মিটার (৩৬৫ ফুট)। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চলটি প্রায় সমভূমি। দামনগঙ্গা নদী দমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। একটি অংশের নাম বৃহৎ দমান এবং অপরটির নাম ক্ষুদ্র দমান। পশ্চিমবাহিনী ক্যাম্বে উপসাগরে পতিত ভগবান, কালেম ও দামনগঙ্গা এই তিনটি নদীর মধ্যে দামনগঙ্গা উল্লেখযোগ্য। দামনগঙ্গা নদীটির দৈর্ঘ্য ৪৮ কিলোমিটার (৪০ মাইল)। ইহা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে নির্গত হইয়াছে। এই নদীটি নৌ চলাচলের উপযুক্ত।

দীউ দ্বীপের পশ্চিমাংশ পূর্বাংশ অপেক্ষা অধিকতর বন্ধুর। পাহাড়গুলির উচ্চতা কোথাও ৩০০ মিটারের (১০০ ফুট)-এর অধিক নহে। উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ পঙ্কিল নিম্নভূমি রহিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে গোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে এই অঞ্চল গোমনচাল, গোপপুরী, গোপকাপুর, গোপকা পাটনা প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী যুগে ইহা বাণাভসির কদম্বদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী কালে গোয়া বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের পতনের পর ইহা বিজাপুরের সুলতানের রাজ্যভুক্ত হয়। আলবুকের্ক (১৪৫৩-১৫১৫ খ্রী) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানের নিকট হইতে গোয়া অধিকার করিয়াছিলেন। আরব সাগরে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পর্তুগীজগণ ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দীউ ও ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দমান অধিকার করে। দীউ দ্বীপ ব্যতীত গোগোলা ও সিম্বর দুর্গ দীউ-এর অন্তর্গত ছিল। দমান উপনিবেশটিতে দাদরা ও নগরহাভেলী অঞ্চলদ্বয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাল-ক্রমে গোয়া, দমান, দীউ পর্তুগালের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হইত। গোয়া, দমান ও দীউ-এর গভর্নর জেনারেল ছিলেন গোয়ার গভর্নর। ইহার অধীনস্থ একজন গভর্নর দীউ ও দমানের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের

প্রধানকর্তা ছিলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর গোয়া, দমান ও দীউ পুনরায় ভারতভুক্ত হয়।

গোয়ার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তাপমাত্রা প্রায় ২২° সেন্টিগ্রেড হইতে ৩২° সেন্টিগ্রেড (৭০° ফারেনহাইট হইতে ৯০° ফারেনহাইট) এবং পশ্চিমাঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত হইতেছে ২২৫০ মিলিমিটার (৯০ ইঞ্চি)। দুধসাগর শিখর অঞ্চলে প্রায় ৭৫০০ মিলিমিটার (৩০০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

জীবিকার জন্য অধিবাসীগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ ভূমিতে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে ধান, নারিকেল, সুপারি, মুগ, কাজুবাদাম এবং আলু। গোয়ার পার্শ্ববর্তী সমুদ্র মৎস্যে সমৃদ্ধ। মৎস্যশিকারে ৪৮৯১ জন নিযুক্ত রহিয়াছে। অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জনই মৎস্যভোজী।

অরণ্য আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ ভূমিতে নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত পূর্বাংশের পাহাড়িয়া অঞ্চল বিস্তৃত রহিয়াছে। অরণ্য হইতে সেগুন কাষ্ঠ আহৃত হইয়া থাকে। গোয়ার বাঁশ বিখ্যাত।

দমানের জলবায়ু সাধারণতঃ আর্দ্র ও স্বাস্থ্যকর। মৃত্তিকা উর্বরা, কৃষিকার্যের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা রহিয়াছে। আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্য ধান, গম ও তামাক।

অতীতে দমান বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জনশিল্পের জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বর্তমানে বস্ত্রবয়ন, মাদুরশিল্প ও বাঁশের কাজে বহু লোক নিযুক্ত আছে। কৃষিকার্যব্যতীত গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকার, লবণতৈয়ারি ও শিকার অধিবাসীদের জীবিকা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। শুষ্ক লবণাক্ত মৎস্য ও পশুচর্ম বাহিরে রপ্তানি হয়।

দীউ দ্বীপটির জলবায়ু সাধারণতঃ শুষ্ক ও অত্যুষ্ণ। এই দ্বীপটির প্রায় অর্ধাংশ অনুর্বরা এবং জলও দুষ্প্রাপ্য। ফলে কৃষিকার্য দীর্ঘকাল অবহেলিত রহিয়াছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে গম, জোয়ার, বাজরা ও নারিকেল।

বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জন এই দ্বীপবাসীদেরও প্রধান উপজীবিকা ছিল। বর্তমানে গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকার হইতেছে অন্যতম উপজীবিকা। সুপারি, নারিকেল ও লবণ ছাড়া দমানের ন্যায় এখানেও শুষ্ক লবণাক্ত মৎস্য বাহিরে রপ্তানি হয়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, খাদ্যশস্য, চা ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য প্রধান।

গোয়ায় উচ্চ শ্রেণীর আকরিক লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ প্রচুর পাওয়া যায়। বিকোলিম, সানগুয়েম ও সাত্তারি অঞ্চলে লৌহের আকর আছে; সানগুয়েম অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজও পাওয়া যায়। খনিজশিল্পে ৩০০০ হইতে ৪০০০ জন নিযুক্ত রহিয়াছে। গোয়ার উল্লেখযোগ্য শিল্প হইতেছে ধানকল, ময়দাকল, লবণ, বরফ, সাবান ও দিয়াশলাই তৈয়ারি, বিদ্যুৎ ও হস্তচালিত তাঁতশিল্প।

দীউ ও দমানে কোনও খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পথ, জলপথ ও রেলপথের দ্বারা গোয়া সুসংযোজিত হইয়াছে। গোয়ায় ৬৪৭ কিলোমিটার উচ্চ শ্রেণীর পথ নির্মিত হইয়াছে। ৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মিটারগেজ রেলপথটি ক্যাশেল রক হইতে মার্মুগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিদিন ডাবোলিম বিমান বন্দর হইতে বোম্বাই-এ বিমান যাতায়াত করে। মার্মুগাঁও ও আগাউদা দুইটি উল্লেখযোগ্য পোতাশ্রয়।

দমানে মাত্র ৮৬ কিলোমিটার রাস্তা রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশ বর্ষা কালে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এই অঞ্চলে কোনও রেলপথ নাই।

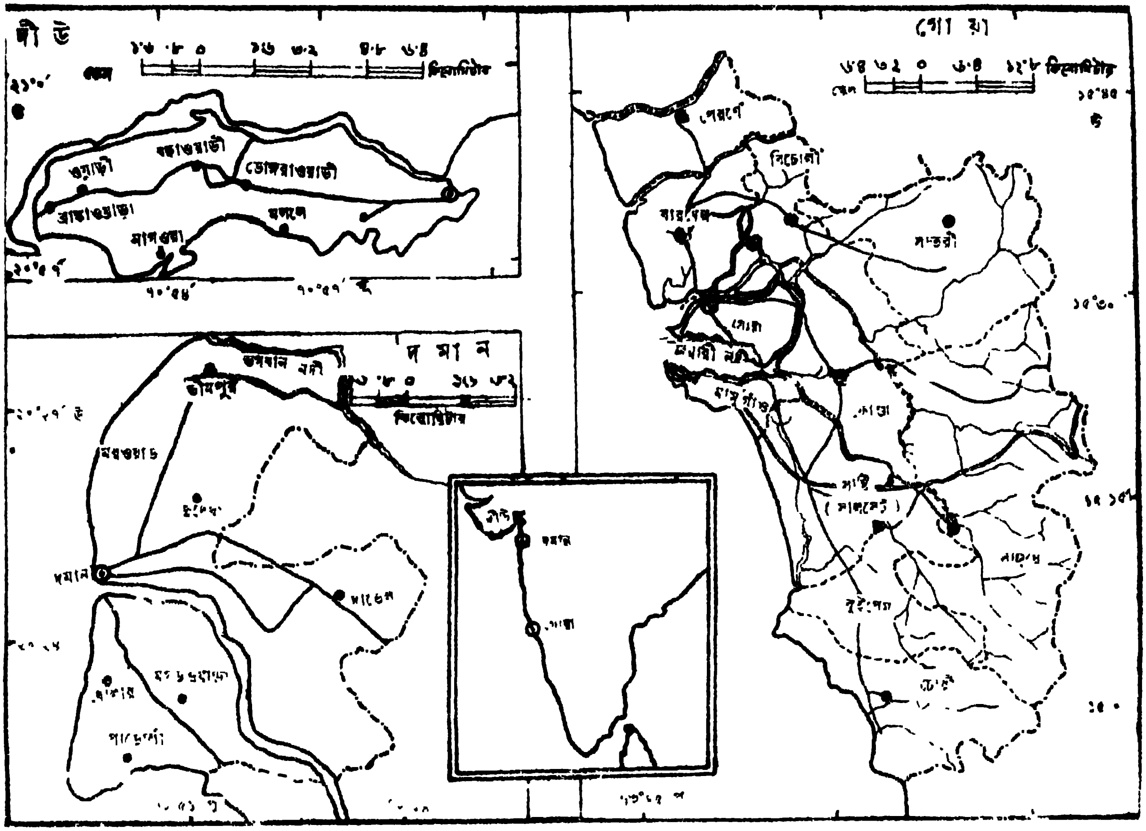
দীউ-এ মাত্র ২৩ কিলোমিটার রাস্তা আছে। পূবে দীউ হইতে পশ্চিমে ব্রাঙ্কাওয়াড়া গ্রাম পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা বিস্তৃত আছে।

গোয়া মনোহর নৈসর্গিক শোভায় সমৃদ্ধ। গ্যাসপারডিয়াস, কোল্‌ভা, কালানগুটে সমুদ্র-সৈকত, দুধসাগর, আরভালাম জলপ্রপাত; মাহেম, বণ্ডোল ও নারোলিম হ্রদ; আগুয়াদা দুর্গ অগণিত ভ্রমণকারীদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে।

বোম জেসাস-এর ব্যাসিলিকা, গোয়া ক্যাথিড্রাল, সেন্ট কাজেতান কনভেন্ট গির্জাগুলি বিখ্যাত। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দেহ বোম জেসাস ব্যাসিলিকায় এবং আর্চবিশপ ও পর্তুগীজ বড়লাটের দেহ সেন্ট কাজেতান কনভেন্টে রক্ষিত আছে। গ্রিওলে অবস্থিত শ্রীমঙ্গেশের মন্দির, শ্রীশান্তা দুর্গা, শ্রীরামনাথ, সপ্তকোটেশ্বর এবং মহাদেবের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য, উহারা বিভিন্ন শতাব্দীর হিন্দু-স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

গোয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার পূর্বেই লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি দুইটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। অধিবাসীরা কোলবালি ভাষায় কথা বলে।

গোয়ার উল্লেখযোগ্য শহর ও পোতাশ্রয়ের মধ্যে পনজী প্রথম। পনজী প্রাক্তন ও বর্তমান রাজধানী। প্রকৃত পক্ষে ইহা— ভেলহা গোয়া, পুরাতন গোয়া ও নোভা গোয়া তিন সময়ের এই তিনটি শহর লইয়া গঠিত ('পনজী দ্র)।



ভেলহা গোয়া: জুয়ারী নদীর তীরে গোয়া দ্বীপে অবস্থিত এই শহরটি কদম্বদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। গোয়া দ্বীপে ইহাই ছিল প্রধান নগরী। মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্বে ইহা সমৃদ্ধিশালী নগরী ও রাজধানী ছিল। বর্তমানে ইহার অট্টালিকাদির বিশেষ কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরাতন গোয়া: এই শহরটিকে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানেরা ভেলহা গোয়ার পাঁচ মাইল উত্তরে নির্মাণ করিয়াছিল। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকের্ক নগরটিকে অধিকার করিয়া পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। এশিয়ায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের ইহাই প্রথম রাজধানী ও একদা লিসবনের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা সমৃদ্ধির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। পরবর্তী কালে পর্তুগীজ ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহার গুরুত্বও কমিয়া যায়। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে বাণিজ্যের ইহা ছিল একটি অন্যতম কেন্দ্র। আলবুকের্ক গোয়াবিজয়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে নির্মিত সেন্ট ক্যাথারিনের ক্যাথিড্রালটি ছাড়া বোম জেসাসের ব্যাসিলিকা ও সেন্ট কাজেতান কনভেন্ট এই শহরে অবস্থিত। অপরাপর ঐতিহাসিক অট্টালিকাসমূহ ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই শহরটি অদ্যাপি প্রাচ্যের রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান জগতের সর্বপ্রধান ধর্মকেন্দ্র হইয়া আছে।

নোভা গোয়া (Nova Goa) প্রাক্তন পর্তুগীজ সাম্রাজ্য গোয়া, দমান ও দীউ-এর রাজধানী এই শহরে অবস্থিত ছিল। আয়তন ছিল ১৫·৫ বর্গ কিলোমিটার (৬ বর্গ মাইল)। পনজী, রিবাণ্ডার ও পুরাতন গোয়া লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল। পনজী শহরটি ছিল ইহার একটি পল্লী।

মার্মাগাঁও: গোয়ার একটি প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় ও বন্দর। গোয়ার অন্যান্য শহরের মধ্যে মার্মাগাঁও, মাপুকা ও ভাস্কো-ডা-গামা উল্লেখযোগ্য।

দামনগঙ্গা নদীর দুই তীরে দমান শহরটি অবস্থিত। এই শহরে (২০°১৫′ উত্তর ও ৭২°৫৬′ পূর্ব) একটি পৌরসভা আছে। ইহার আয়তন প্রায় ৫০০ বর্গ কিলো-

মিটার (১৯৩ বর্গ মাইল)। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ৯১৯৭ জন ছিল। ডক এবং জাহাজনির্মাণের জন্য দমান সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

দীউ শহরটি ২০°৪৩′ উত্তর ও ৭১°২′ পূর্বে ও দীউ দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই শহরে একটি পৌরসভা আছে। ইহার লোকসংখ্যা ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৪১৩৮ জন ছিল। ইহার আয়তন প্রায় ২ বর্গ কিলোমিটার (¾ বর্গ মাইল)। পর্তুগীজ শাসনকালে ইহার প্রসিদ্ধি থাকিলেও বর্তমানে ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XII, Oxford, 1908 ; *Census of India : part IIA (i), 1961*, New Delhi, 1964 ; National Council of Applied Economic Research, *Techno-Economic Survey of Goa, Daman and Diw*, New Delhi, 1964 ; State Bank of India, *Goa*, Bombay, 1964 ; V. T. Gune, *Ancient Shrines of Goa*, Panjim, 1965 ; R. P. Rao, *Portugeese Rule in Goa*, Bombay, 1963.

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

গোয়ালিয়র মধ্য প্রদেশের একটি জেলা ও শহর। জেলাটি ২৫°৩৪′ উত্তর হইতে ২৬০°২১′ উত্তর এবং ৭৭°৪০′ পূর্ব হইতে ৭৮°৫৪′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। গোয়ালিয়র জেলার আয়তন ৫১৮৫ বর্গ কিলোমিটার (২০০২ বর্গ মাইল)। বর্তমান গোয়ালিয়র জেলাটি গোয়ালিয়র, পিছোর এবং ভাণ্ডার— এই তিনটি তহসিল লইয়া গঠিত। এই তিনটি তহসিল কুড়িটি থানায় বিভক্ত।

গোয়ালিয়র জেলা দক্ষিণ-পশ্চিমে মালবের মালভূমি এবং উত্তর ও পূর্বের বৃহৎ গাঙ্গেয় সমভূমির সংযোগস্থলে অবস্থিত। জেলাটির মধ্যে চারিটি প্রাকৃতিক বিভাগ আছে : ১. পশ্চিমের মালভূমি— এই অংশ মালবের মালভূমির অন্তর্গত। এখানকার সর্বোচ্চ স্থান টর পাহাড় ৪৩৬ মিটার (১৪৩৪ ফুট) উচ্চ। উহা শিবপুরী সংরক্ষিত অরণ্যে অবস্থিত। ২. মধ্যের পার্বত্য অঞ্চল— পশ্চিমের মালভূমির বর্ধিত অংশ, ইহা গোয়ালিয়র জেলার জলবিভাজিকার কার্য করিতেছে। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ২৪০ মিটার (৮০০ ফুট)। ৩. দক্ষিণ-পূর্বের সিন্ধু নদী ও তাহার উপনদী-বিধৌত সমভূমি অঞ্চল— ইহার পশ্চিমে পশ্চিমের মালভূমি ও দক্ষিণে মধ্যের পার্বত্য অঞ্চল।

এই জেলার শিলা আর্কিয়ন (Archeans), গোয়ালিয়র ও বিন্ধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত।

জেলার সব নদীগুলি যমুনার সহিত সংযুক্ত ; উত্তরের নদীগুলি চম্বলে ও দক্ষিণের নদীগুলি সিন্ধুতে পতিত হইয়া অবশেষে যমুনায় মিশিয়াছে। প্রধান নদীর মধ্যে সিন্ধু বিদিশায় উৎপন্ন হইয়া ৩২০ কিলোমিটার (২০০ মাইল) জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যমুনায় পড়িতেছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে শঙ্খ, সোনরেখা, মোরার, বৈশালী ও নুন, আসান, চাপের পার্বতী এবং পাহুজ উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু-ব্যতীত সকল নদীই গ্রীষ্ম কালে ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে নদীগুলি সেচন বা নৌবাহনের যোগ্য থাকে না।

এই জেলার মৃত্তিকা পলিমাটির অন্তর্ভুক্ত এবং পারওয়া (বালুকাময় দোআঁশ), দোমাট (কর্দমময় দো-আঁশ) ও মার (কর্দমযুক্ত গভীর মৃত্তিকা) এই তিন ভাগে বিভক্ত।

গোয়ালিয়র জেলার জলবায়ু শুষ্ক। আষাঢ়-শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বর্ষা কাল। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ৭৩২ মিলিমিটার (২৮·৮২ ইঞ্চি)। কার্তিক মাস হইতে আবহাওয়া শীতল ও আরামদায়ক হয়। শীতকালীন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬° সেন্টিগ্রেড (৪২° ফারেনহাইট) গ্রীষ্মকালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লু (গরম) বাতাস বহিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৪৮·৩° সেন্টিগ্রেড (১১৮° ফারেনহাইট)।

গোয়ালিয়র নাম গোয়ালিয়র দুর্গের নামানুসারে হইয়াছে। ইহা পৌরাণিক যুগে ‘গোপপর্বত’, ‘গোপগিরি’ বা ‘গোপাদ্রি’ নামে পরিচিত ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা সূরযসেন এক পর্বতবাসী সাধুর কৃপায় কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইলে প্রতিদানস্বরূপ ঐ পর্বতের উপর ‘গোয়ালিপার’-নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং পরে ইহারই উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটিয়া বর্তমান ‘গোয়ালিয়র’ নাম হইয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন দুর্গ। এখানে অবস্থিত ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি মন্দিরের শিলালিপিতে ইহার প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

গোয়ালিয়রের প্রথম শাসকমণ্ডলী নাগেরা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজধানী ঐতিহাসিক নগরী পদ্মাবতী— বর্তমান পদ্মম পওয়ায়া, গোয়ালিয়র জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কুষাণেরা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতকে রাজ্যশাসন করেন। পরে গুপ্ত বংশ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত শাসন করিয়া হুন-কর্তৃক পরাজিত হন। হুনেরা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে গোয়ালিয়র প্রতীহারদের অধীন ছিল।

১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সঙ্গে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস ও ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বলবন গোয়ালিয়র দখল করেন। এই দুর্গে ইব্‌ন বতুতা ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণ করিয়া ইহাকে অজেয় আখ্যা দেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র মধ্য ভারত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের গণনায় ইহার লোকসংখ্যা ৬৫৭৮৭৬, গ্রামের সংখ্যা ৮৪৩ ও শহরের সংখ্যা ৪ হয়। জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২২ জন (বর্গ মাইলে ৩২৬ জন) লোকের বাস। শিল্পোন্নতির জন্য লোকবসতির ঘনত্ব শহরাঞ্চলেই অধিক।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলায় কৃষিজ ভূমির পরিমাণ ২৩৪৪৩৪.৮ হেক্টর (৫৪৬০৭৭ একর), তন্মধ্যে ১০৫৮৬.৮ হেক্টর (২৬৪৬৭ একর) দোফসলা। গমই এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার, ধান, ইক্ষু, ডাল, ফল ও সবজি প্রধান। এখানে (১২৩২৩ হেক্টরে, ৩০৮০৮ একর) তৈলবীজও প্রচুর উৎপন্ন হয়। মোট বনভূমির পরিমাণ ১০৮৭৯৬ হেক্টর (২৭১৯৬৫ একর)। জেলার প্রধান সংরক্ষিত বনগুলির নাম আন্ত্রী, সিংপুর, সাম্বাউ, দেওগড়, সোনসা ও শিরকোনী।

এখানকার বেলে পাথর, গিরিমাটি ও নরম মৃত্তিকা প্রসিদ্ধ। বেলে পাথর গৃহনির্মাণ কার্যে ও গিরিমাটি চীনামাটির বাসনপ্রস্তুত কার্যে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

জেলার শিল্পগুলি গোয়ালিয়র শহরেই অবস্থিত। ৬টি বড় কাপড়ের কল ও একটি ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, একটি চর্মশিল্প কেন্দ্র, বিখ্যাত মঙ্গারামের বিস্কুট কারখানা, দিয়াশলাই কারখানা ও পাঁচটি করাত কল ও কাঠের আসবাব তৈয়ারির কারখানা গোয়ালিয়র শহরে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত শহরে বিখ্যাত মৃৎশিল্প ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাইকেল নির্মাণের কারখানা আছে।

ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে কার্পেট, দড়ি, ছাতা এবং কুটিরশিল্পের মধ্যে পাথরের মূর্তিখোদাই, বাঁশ হইতে ঝুড়ি, পাখা, চিক, খসখস ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। গোয়ালিয়রের জরি ও চান্দেরী শাড়ি বিখ্যাত।

গোয়ালিয়র শহর মধ্য রেলপথের জংশন স্টেশন। জেলায় ন্যারো গেজ লাইনের দৈর্ঘ্য ৪৭০ কিলোমিটার (২৯৪ মাইল)। ইহা গোয়ালিয়র শহরকে শিবপুরী, সেওপুর ও ভিন্দ-এর সহিত যুক্ত করিয়াছে।

এই জেলার মোট পাকা রাস্তার পরিমাণ ৩৯৩ কিলোমিটার (২৪৬ মাইল)। বেসরকারি বাসের সংখ্যা ২২৩ এবং সরকারি ৬৮, বেসরকারি রুট ২১৫ ও সরকারি ৪৪টি।

নদীগুলিতে সারা বৎসর জল না থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইহাদের কোনও গুরুত্ব নাই। গোয়ালিয়রে একটি বিমান বন্দর আছে। এখান হইতে সপ্তাহে তিন বার ইন্দোর, ভূপাল ও দিল্লীতে বিমান যাতায়াত করে।

জেলায় ভাদ্র মাসে রক্ষাবন্ধনের মেলা ও মাঘ মাসে তানসেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে উৎসব হয়। কোটীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে শিবরাত্রির মেলা, ওখমে ভূতেশ্বর মহাদেব-মন্দিরের মেলা ও মহম্মদ গৌসের স্মৃতি উৎসবই প্রধান।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষিতের সংখ্যা ১৮৩৩৩৬, তন্মধ্যে ১৩৭৯৮৯ পুরুষ ও ৪৫৩৪৭ স্ত্রী। জেলার প্রধান শহর গোয়ালিয়র ২৬°১৩´ উত্তর ও ৭৮°১২´ পূর্বে আগ্রা হইতে ১০৪ কিলোমিটার (৬৫ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা লস্কর, মোরার ও গোয়ালিয়র— এই তিন অংশে বিভক্ত। শহরের আয়তন ৭০ বর্গ কিলোমিটার (২৮ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০০৫৮৭ জন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা গোয়ালিয়র কর্পোরেশনের অধীনে আসে।

শিক্ষা হিসাবে গোয়ালিয়র অত্যন্ত উন্নত। এই শহরে কৃষি কলেজ ও বিজ্ঞান কলেজ ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৯৬, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭৮, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৫ ও কলেজ ২০টি।

গোয়ালিয়রের দুর্গ বিখ্যাত। গোয়ালিয়র তানসেনের জন্মস্থান, এখানে তানসেনের সমাধি বর্তমান। জেলার অন্যান্য শহর দাবরা, ভাণ্ডার ও পিছোর।

দ্র Jagathpathi, *Census of India, 1961, District Census Handbook Gwalior District*, Bhopal, 1964 , V. S Krishnan, *District Gazetteers, Madhya Pradesh : Gwalior*, Bhopal, 1965 , Directorate of Economics and Statistics, *Economic Survey of Madhya Pradesh, 1964-65*, Bhopal, 1965

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সংগীত ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে, বিশেষতঃ ধ্রুপদ ও খেয়াল পদ্ধতির পুনরুদ্ধার, চর্চা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সূত্রে গোয়ালিয়র রাজ্যের নৃপতি, সংগীতবিদ্‌ ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক মান সিং তোমরের (রাজাকাল ১৪৮৬-১৫১৭ খ্রী) অবদান স্মরণীয়। তিনি নায়ক বখ্‌শু, নায়ক ভানু, মাহ্‌মুদ প্রভৃতি গুণী

গায়কদের সহযোগিতায় স্বীকৃত রীতি রূপে ধ্রুপদের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে স্বনামধন্য তানসেন গোয়ালিয়রের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এই স্থানে তাঁহার সমাধিস্থলে তাঁহার স্মৃতিকল্পে বাৎসরিক সংগীত-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাত সংগীত-শিল্পী তাহাতে যোগ দেন। আরও উত্তর কালে সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদগায়ক ও সুরকার নায়ক চিন্তামন মিশ্র গোয়ালিয়রে আগমন ও বাস করিয়া কৃতী শিষ্য-মণ্ডলী গঠন করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন নারায়ণ শাস্ত্রী ও দেবজী বুয়া। উক্ত দুইজনের শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত হন তাতু ভাইয়া, বামন বুয়া ফল্তনকর প্রভৃতি ধ্রুপদী। তাঁহাদের পরবর্তী পর্যায়ের ধ্রুপদ গুণীদের মধ্যে লালজী বুয়া, কেশব রাও আপ্‌টে, বিষ্ণুপন্থ ছত্রে, গোগতে বুয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়রে ধ্রুপদচর্চায় তাঁহাদের শিষ্যধারা লুপ্ত হয় নাই।

গোয়ালিয়রের খেয়ালসাধনাও ভারতবিখ্যাত। গমক এবং নানা প্রকার তানকর্তবে সমৃদ্ধ গম্ভীর চালের গোয়ালিয়রী খেয়াল ভারতীয় সংগীতক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এ সম্পর্কে গোয়ালিয়র ঘরানা কথাটি প্রচলিত হয়। কথিত আছে যে, তানসেনের কন্যা বংশীয় মহাগুণী শদারঙ্ (নিয়ামৎ খাঁ) এর শিষ্যধারা হইতে গোয়ালিয়রে খেয়ালচর্চা বিস্তার লাভ করে। গোয়ালিয়রী চালের খেয়াল গানের যে যুগ সম্বন্ধে নিশ্চিত জানা যায় তাহাতে শক্কর, বড়ে মহম্মদ খাঁ ও নথন পীর বখ্‌সের (মখ্‌থন) নাম সুবিদিত। এই ধারায় নথন পীর বখ্‌শের পৌত্রত্রয় হস্‌সু খাঁ, হদ্দু খাঁ এবং নথন খাঁ স্বনামধন্য খেয়াল গায়ক হন। ক্রমপর্যায়ে তাঁহাদের খেয়াল সাধনার ঐতিহ্য যে শিষ্যপরম্পরায় রক্ষিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে দীক্ষিত, বাসুদেব বুয়া জোশী, ছোটে মহম্মদ খাঁ, রহিমৎ খাঁ, নিসার হুসেন খাঁ, ভাইয়া সাহেব জোশী, বড়ে ও ছোটে বালকৃষ্ণ বুয়া, শংকর পণ্ডিত প্রভৃতি স্মরণীয়। ছোটে বালকৃষ্ণ বুয়ার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর, পণ্ডিত অনন্তমনোহর জোশী, পণ্ডিত আন্না বুয়া এবং মিরাশি বুয়া সমধিক খ্যাতিমান হন। শংকর রাও পণ্ডিতের শিষ্যবর্গের মধ্যে কৃষ্ণ রাও পণ্ডিত ও রাজাভাইয়া পুঁছওয়ালে বিশেষ কৃতী হন। তাঁহাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে গোয়ালিয়রী খেয়াল চর্চা আজও অব্যাহত আছে।

লচাও ঠুংরি নামে কথিত এবং বিশিষ্ট ভাব ও মাধুর্যমণ্ডিত ঠুংরি রীতির প্রচলনকর্তা স্বনামপ্রসিদ্ধ গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব) গোয়ালিয়রের সন্তান। 'গণপৎ রাও' দ্র।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গোরক্ষনাথ নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের গুরু এবং নাথপন্থ সুপ্রতিষ্ঠাকারী নেতৃগণের মধ্যে প্রধানতম। কথিত আছে, ইনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে আদিগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত। গোরক্ষনাথ সম্ভবতঃ কবীরের ন্যায় কোনও অখ্যাত বংশোদ্ভূত। তাঁহার জন্মসম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। 'গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহে' ইহাকে ঈশ্বরসন্তান এবং 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে মহাদেবের জটা হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। অন্য বৃত্তান্তানুসারে কোনও এক পুত্রকামা রমণী শিববরপূত ভস্ম গোময়স্তূপে নিক্ষেপের ফলে বার বৎসর পরে সেই স্তূপ হইতে তাঁহার জন্ম হয় এবং সেই কারণে তিনি গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হন।

তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙালী এবং বঙ্গ দেশ তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের লীলাক্ষেত্র হইলেও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনও স্থানে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া যোগী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাঁহার রচিত কোনও বাংলা পদ বা পুথি পাওয়া যায় নাই, যেগুলি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি মিশ্রিত হিন্দী ভাষায় লিখিত এবং গোরক্ষের নামের সহিত জড়িত স্থানগুলির অধিকাংশই উত্তর ভারতে অবস্থিত। তাঁহার শিষ্যা ময়নামতী বাংলা দেশের কোনও রাজার মহিষী হইলেও তিনি উজ্জয়িনীর রাজকন্যা, ভর্তৃহরি, জালন্ধর প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত শিষ্যগণও বঙ্গদেশীয় নহেন বলিয়া বিবেচনা করা হয়। তাঁহার প্রবর্তিত কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি এখনও পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলে সমধিক।

গোরক্ষনাথের আবির্ভাবের কালসম্বন্ধেও মতভেদ আছে। অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ বিভিন্ন অভিমত প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হইয়াছে। তবে তাঁহাকে একাদশ শতকের লোক বলিয়াই মনে হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ দশম-একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 'গোরক্ষবোধ' গ্রন্থখানি নাথ সম্প্রদায়ের গীতা, ইহাতে গোরক্ষের ধর্মমত আলোচিত হইয়াছে। গ্রিয়ার্সন ও সিং উভয়েই গ্রন্থখানি একাদশ শতকে রচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে কিংবদন্তিসমূহ উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের প্রায় সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে। গোর্খা (গুর্খা) জাতির তিনি ইষ্টদেবতা এবং কথিত হয়, তাঁহার নাম হইতেই গোর্খা জাতি স্বীয় নাম গ্রহণ করিয়াছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ব্যাহত হইলে পরবর্তী কালে তিনি সমগ্র নেপাল রাজ্যের পূজার্হ হইয়াছেন। উত্তর প্রদেশের

গোরক্ষপুর তাঁহার পীঠস্থান। এখানে তাঁহার মন্দির আছে। স্থানীয় নাথপন্থীদের বিশ্বাস, গোরক্ষনাথ এবং পরমপুরুষ একই সত্তা — সত্য যুগে তিনি পাঞ্জাবে, ত্রেতাতে গোরক্ষপুরে, দ্বাপরে হরমুজ-এ এবং কলি যুগে কাঠিয়াওয়াড়ের গোরক্ষমঢী-তে বাস করিতেন। নেপালেও তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে, নেপালে, মধ্য প্রদেশে, রাজস্থানে, গুজরাতে, মহারাষ্ট্রে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রায় সর্বত্রই গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে কাহিনী ও লোক-সংগীত রচিত হইয়াছে। বঙ্গ দেশে মানিকচন্দ্রের গীত প্রভৃতি লোক সংগীতে তাঁহার শক্তি ও কীর্তি ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শিবের অবতাররূপে পূজ্য হইয়া উঠিয়াছেন। পশুপতিনাথ নেপাল রাজ্যের দেবতা, তথাপি সেখানকার মুদ্রায় তাঁহার নাম অঙ্কিত হইয়া তাঁহার দেবত্বের পরিচয় বহন করিতেছে।

হঠযোগ বা কায়সাধন দ্বারা দেহকে পরম সত্তা উপলব্ধির উপযোগী করিয়া তোলা নাথপন্থের পন্থা। হঠযোগ গ্রন্থে গোরক্ষাসনম এবং গোরক্ষনাথ-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ 'গোরক্ষশতক' গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকে নাথযোগীদের হঠযোগসাধনের ইঙ্গিত আছে। তাঁহার নাদানুসন্ধানও এই সাধনার অঙ্গবিশেষ। নাথমার্গে তন্ত্র ও রহস্যবাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে, ইহাতে গোরক্ষনাথের বিশেষ অবদান আছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য 'গোরক্ষনাথ কী গোষ্ঠী' হিন্দী পুস্তকে কবীরের সহিত তাঁহার বিতর্কের কাহিনী এ বিষয়ে আলোকপাত করে। 'গোরক ধাঁধা' শব্দটি গোরক্ষের সাংকেতিক ভাষায় লিখিত পদাবলী 'গোরক্ষ ধন্ধা' হইতে উৎপন্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত আছে। হিন্দী ভাষার তিনি অন্যতম স্রষ্টা ইহাও অনেকে মনে করেন। 'নাথপন্থ' দ্র।

দ্র কল্যাণী মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী, কলিকাতা, ১৯৫০, *Encyclopaedia of Religion & Ethics*, vol. VI, Edinburgh, 1913.

কল্যাণী মল্লিক

গোরখপুর ২৫°৩৮´ উত্তর হইতে ২৭°৩০´ উত্তর এবং ৮২°১৩´ পূর্ব হইতে ৮৬°২৬´ পূর্ব। উত্তর প্রদেশের একটি বিভাগ। নিম্নোক্ত চারিটি জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত — গোরখপুর, বস্তী, আজমগড় ও দেওরিয়া। সমগ্র বিভাগের আয়তন ২৪৬৯৩ বর্গ কিলোমিটার (৯৫৩৪ বর্গ মাইল)।

গোরখপুর জেলা ২৬°২২´ উত্তর হইতে ২৭°২৯´ উত্তর এবং ৮৩°৪´ পূর্ব। ইহা গোরখপুর বিভাগের উত্তরাংশে ও উত্তর প্রদেশের উত্তর পূর্ব ভাগে অবস্থিত। বর্তমান গোরখপুর জেলার আয়তন ৬৩১৭ বর্গ কিলোমিটার (২৪৩৭ বর্গ মাইল)। জেলায় ১৯টি থানা ও ৮টি শহর বর্তমান।

জেলার গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা প্রায় ৩৪° সেন্টিগ্রেড (৯২° ফারেনহাইট) এর ঊর্ধ্বে থাকে না। শীতকালীন তাপমাত্রাও প্রায় কখনই ১৬° সেন্টিগ্রেড (৬০° ফারেনহাইট) এর নিম্নে নামে না। জেলার গড় বৃষ্টিপাত ১১২০ মিলিমিটার (৪৪ ইঞ্চি)। কিন্তু উত্তরের তরাই অঞ্চলে ১৩৫০ মিলিমিটার (৫৪ ইঞ্চি) এর অধিক বৃষ্টিপাত দেখা যায় এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে বৃষ্টিপাত প্রায়ই ১১০০ মিলিমিটার (৪৩ ইঞ্চি) এর কম থাকে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের প্রসর নিতান্ত স্বল্প নয়।

প্রায় সমগ্র জেলাই পললগঠিত। মৃত্তিকায় লবণাধিক্য ও তজ্জনিত কার্বনেট সঞ্চয়ের তেমন প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় না। ফলে মৃত্তিকা মোটামুটি উর্বরা, তবে উত্তরাঞ্চল কিছুটা কঙ্করময়। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জের মধ্যে পর্ণমোচীর সংখ্যাই সমধিক। আম, নানা জাতীয় ডুমুর, শিশু, মহুয়া, পেয়ারা, কাঁঠাল এবং জাম বৃক্ষই প্রধান।

উত্তর-পশ্চিমের এঁটেল মাটি ধান চাষের উপযোগী, তবে পূর্বাঞ্চলের 'ভাট' মৃত্তিকাই সর্বাপেক্ষা উর্বর। এখানে সেচের প্রয়োজন হয় না। জেলার দক্ষিণাঞ্চলের বালুকাময় দো-আঁশ মাটি এবং নদীবাহিত পলি মাটিও কৃষির বিশেষ উপযোগী। ধান, যব, জোয়ার, গম, মটর, ছোলা, ভুট্টা, তৈলবীজ এবং ইক্ষুই প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। পূর্বে এই অঞ্চলে নীলের চাষ হইত। বর্তমানে স্থানে স্থানে [illegible] চাষ শুরু হইয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধানই প্রধান। বর্তমানে গম অপেক্ষা যব ও ইক্ষুর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ভারতের এই জেলা চিনি উৎপাদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান। অধিকাংশ স্থানেই কৃষি সেচের উপর নির্ভরশীল।

জেলার উত্তর ভাগে বিস্তীর্ণ গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র রহিয়াছে। মেষ পালন এবং দুগ্ধ ও মাংসের ব্যবসায় একটি প্রধান জীবিকা, যদিও উৎপাদনের পরিমাণ খুবই অল্প।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী এই জেলার লোকসংখ্যা ২৫৬৫১৮২। তন্মধ্যে পুরুষ ১২৯৭২৯৭ এবং স্ত্রীলোক ১২৬৭৮৮৫ জন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০০ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ১০৫১) লোক বাস করে। বর্তমান জনসংখ্যার প্রায়

শতকরা ৯২ ভাগ গ্রামবাসী, শতকরা ৯৫ ভাগেরও অধিক জেলার প্রধান শহর গোরখপুরে বাস করে। জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ হিন্দু এবং শতকরা ৯২ ভাগ বিহারী ভাষাভাষী। জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক কৃষিজীবী। অন্যান্য জীবিকার মধ্যে কুটিরশিল্প প্রধান। বর্তমানে নানা স্থানে চিনির কল ও শহরাঞ্চলে কতকগুলি বড় বড় কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

চিনির কলগুলিই জেলার প্রধান শিল্প প্রচেষ্টা। এতদ্ব্যতীত বহুবিধ কুটিরশিল্পও বিদ্যমান। চাউল, যব, গম ও চিনিই এই অঞ্চলের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। তৈলবীজ ও শালকাঠও রপ্তানি হয়। আমদানির মধ্যে বস্ত্রজাত ও নানাবিধ শিল্পজ দ্রব্যাদি প্রধান। নেপাল রাজ্যের সহিত গোরখপুরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক আছে। রেলপথই যাতায়াতের প্রধান উপায়। উৎকৃষ্ট রাজপথ বিশেষ নাই। ঘর্ঘরা ইত্যাদি নদীগুলি নাব্য এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক। নদীপথে প্রচুর কাঠ পরিবাহিত হয়। গোরখপুরই জেলার সদর শহর।

(গোরখপুর শহর। ২৬°৪৫′ উত্তর এবং ৮৩°২২′ পূর্ব) রাপ্তী নদীর বাম কূলে অবস্থিত। ইহা উত্তর প্রদেশের একটি প্রধান শহর। ইহার বর্তমান জনসংখ্যা ১৮০২৫৫। তন্মধ্যে পুরুষ ১০২৬১০ ও স্ত্রীলোক ৭৭৬৪৫।

১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে গোরক্ষনাথের মন্দিরের নিকট এই শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবরের সময় ইহা অযোধ্যা সুবার প্রধান সরকার ছিল। গোরখপুরের মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহা একটি শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন ও শিক্ষা কেন্দ্র। ইহা উত্তর পূর্ব রেলপথ পরিবহনের প্রধান কেন্দ্র এবং বড় রেলওয়ে স্টেশন। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৮১৪ কিলোমিটার (৫০৬ মাইল)। বহু ব্যাঙ্কের অফিস গোরখপুরের বাণিজ্যিক তৎপরতার সাক্ষ্য দেয়। গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গোরখপুর জেলায় বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার রহিয়াছে। সবগুলি খনন করা সম্ভব হয় নাই। কাসিয়ার নিকট স্তূপটি বিখ্যাত। এখানে মন্দিরের ভিতর বুদ্ধের শায়িত মূর্তি বর্তমান। জেলার দক্ষিণে স্কন্দগুপ্তের সময়কার একটি স্তম্ভ আছে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬৬০ অব্দ)। এখানে কনৌজ হিন্দু রাজগণের অনেকগুলি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে।

দ্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নব জ্ঞান-ভারতী, কলিকাতা, ১৯৫৮, *The Imperial Gazetteer of India*, vol XII, Oxford, 1908

অরূপরতন চট্টোপাধ্যায়

গোরাচাঁদ পীর ইসলাম ধর্মের প্রসিদ্ধ প্রচারক ছিলেন। চব্বিশ পরগনা জেলার উত্তর-পূর্বাংশে হাড়োয়া নামক স্থানে ইহার প্রকৃত সমাধি থাকিলেও বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতীক সমাধি আছে। তিনি বহু অলৌকিক বা ঐশী শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। সে শক্তির দ্বারা তিনি বহু ব্যক্তিকে ব্যাধি বিপদ প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিতেন। বর্তমান কালেও (তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ছয় শত বৎসর পরে) বিশ্বাসী ব্যক্তিরা তাঁহার উদ্দেশ্যে 'পীর গোরাচাঁদ মুস্কিল আসান' বাক্যটি সময় বিশেষে আবৃত্তি করেন।

পীর গোরাচাঁদের প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্বাস আলী, তিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন।

আরবের ধর্মনেতা শাহ্ জালাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ৩৬১ জন শিষ্যসহ ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে ভারতবর্ষে আসেন, সৈয়দ আব্বাস বা গোরাচাঁদ সেই দলভুক্ত ছিলেন।

ভারতবর্ষে উক্ত প্রচারকগণ বহু দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে যাত্রা করেন।

বাইশ জন প্রচারক বা আউলিয়া দলের নেতা হইয়া পীর গোরাচাঁদ বর্তমান চব্বিশ পরগনা জেলার [illegible] নামক স্থানে আসিয়া একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন, উহা 'বাইশ আউলিয়া বিদ্যাপীঠ' নামে বর্তমান কালে পরিচিত।

প্রথমে পীর গোরাচাঁদ বালান্দার রাজা চন্দ্রকেতুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পান, পরে হাতিয়াগড় নামক অঞ্চলে প্রবেশ করিলে সে স্থানের রাজার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়, ইহাতে গোরাচাঁদ ভীষণ আহত হইয়া ভার্গবপুর অরণ্যে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার হিন্দু ভক্তেরা ঐ স্থানেই তাঁহাকে কবরস্থ করেন। বর্তমানে ঐ কবর স্থান হাড়োয়া নামে খ্যাত। প্রবাদ যে পীরের হাড় থাকায় ঐ স্থানের নাম 'হাড়োয়া' হইয়াছে।

হাড়োয়া পল্লীতে পীর গোরাচাঁদের কবর (সমাধি-সৌধ) আছে, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে তাঁহার মৃত্যু-দিবসে সম্মানার্থে বিরাট মেলা হয়।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

গোরু স্তন্যপায়ী শ্রেণীর আর্টিওড্যাকটিলা বর্গের (Order-Artiodactyla) অন্তর্ভুক্ত বোভিডী গোত্রের (Family-Bovidae) প্রাণী। এই গোত্রের অন্যান্য প্রাণীর মতই গোরুও যুগ্মক্ষুর রোমন্থক প্রাণী। ইহাদের প্রতি পায়ের পাঁচটি আঙুলের মধ্যে মাত্র দুইটি সুগঠিত হয়, এই দুই আঙুলের ক্ষুরে ঢাকা প্রান্তে ভর দিয়াই ইহারা চলাফেরা করে। গাভী ও ষাঁড় উভয়েরই

মাথায় ফাঁপা শাখাবিহীন এবং স্থায়ী শিং থাকে। উপরের মাড়ির সামনের অংশটি বেশ কঠিন এবং এ অংশে দাঁত নাই। গোরু তৃণভোজী, দীর্ঘ জিভ দিয়া ঘাসের গুচ্ছ জড়াইয়া মুখের মধ্যে আনে ও দুই চোয়ালের মধ্যে চাপিয়া ছিঁড়িয়া খায়। আহারের পরে বিশ্রামের সময়ে ইহারা গিলিয়া ফেলা খাদ্য পাকস্থলী হইতে উদ্‌গার করিয়া মুখে লইয়া আসে ও ধীরে ধীরে চিবাইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত করে। ইহাকেই জাবর কাটা বা রোমন্থন বলে। এ সময়ে খাদ্যের সহিত যথেষ্ট লালাও মিশ্রিত হয়। রোমন্থনের পর গোরু চর্বিত খাদ্যের পিণ্ডটিকে আবার গিলিয়া ফেলে।

গোরুর পাকস্থলীতে চারিটি কক্ষ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি কক্ষে বহু ব্যাকটিরিয়া ও এককোষী প্রাণী (প্রোটোজোয়া) বাস করে এবং তাহাদের সাহায্যে খাদ্যের দুষ্পাচ্য কার্বোহাইড্রেট সেলুলোজের পরিপাক ঘটে। রোমন্থনের সময় এই দুইটি কক্ষ হইতেই খাদ্য মুখে ফিরিয়া যায়। পাকস্থলীর তৃতীয় কক্ষে খাদ্য হইতে অতিরিক্ত জল ও খাদ্যের লবণ রক্তে বিশোষিত হয়। পাকস্থলীর এই তিনটি কক্ষে কোনও পাচক রস ক্ষরিত হয় না। পাকস্থলীর চতুর্থ কক্ষটি ঘোড়া বা মানুষের পাকস্থলীর মত, শুধু এখানেই পাচক রস ক্ষরিত হয়।

গোরু প্রায় ১৮-২০ বৎসর বাঁচে। প্রায় তিন বৎসর বয়স হইতে গাভী প্রজননক্ষম হয়। সারা বৎসর এবং সকল ঋতুতেই ইহারা গর্ভধারণ করিতে পারে। ইহাদের প্রতিটি যৌনচক্রের (ঈস্ট্রাস সাইকল) কাল গড়ে ২১ দিন। গাভী প্রায় ২৮২ দিন গর্ভধারণ করিয়া সাধারণতঃ একটি শাবক প্রসব করে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই গোরু মানবসভ্যতার সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। আনুমানিক ৪০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মিশরে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, গগনমণ্ডল এক বিশাল গাভী এবং তাহার তারকাখচিত উদরই আকাশ। মিশরে দ্বিতীয় রাজবংশের আমলে (আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত ষণ্ডকে শিল্পী, স্থপতি ও কারিগরদের দেবতা প্টাহ্‌-এর পুত্র ও প্রতিনিধি এবং সৃষ্টি ও কল্যাণের দেবতা হেসিরি (Osiris)র প্রতীক রূপে গণ্য করা হইত, এই ষণ্ডদেবতার নাম ছিল হাপি (Apis)। পঞ্চবিংশতিতম ও ষড়্‌বিংশতিতম রাজবংশের যুগে (আনুমানিক ৭১২-৫২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ষণ্ডদেবতার পূজা মিশরে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। উপযুক্ত দৈহিক লক্ষণযুক্ত ষাঁড় পাওয়া গেলে তাহাকে শোভাযাত্রা করিয়া মেম্‌ফিস শহরে প্টাহ্‌-এর মন্দিরে আনিয়া রাখিয়া হাপি বা ষণ্ডদেবতা রূপে ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করা হইত। মৃত্যুর পরে মেম্‌ফিসে সেরাপিয়ুম নামক সমাধিসৌধে দেবতা রূপে পূজিত এই ষণ্ডগুলির মৃতদেহ সমাবিষ্ট করা হইত। ছিল। মিশরে পিরামিড যুগের (আনুমানিক ৩০০০-২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বিভিন্ন সমাধিমন্দিরের দেওয়ালে বলদের সাহায্যে হলকর্ষণের ও গোদোহনের চিত্র উৎকীর্ণ ছিল। সমকালীন সুমেরীয় সীলেও কৃষিকার্যে বলদ ব্যবহারের দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। ক্রীটে মিনোয়ান যুগের খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকের (আনুমানিক ১৫৫০-১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) [illegible] যে সকল দেওয়াল-চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে এ সময় ষাঁড়ের পিঠের উপর দিয়া [illegible] একটি সুপ্রচলিত ক্রীড়া ছিল এবং [illegible] অংশগ্রহণ করিত। [illegible] (আনুমানিক ১৭০০-১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) [illegible] দেবতার পবিত্র প্রতীক রূপে [illegible], [illegible] ধাতুক এবং পাত্রের উৎকীর্ণ। [illegible] প্রতীক [illegible] [illegible] হিন্দু আইনের [illegible] প্রভৃতির উল্লেখ [illegible], গাভী ষাঁড় চাষের বলদ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দিষ্ট আছে এবং গোরু চুরির [illegible] বিধান আছে, ইহা হইতেই [illegible] অর্থনীতিতে গোরুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা [illegible]। কিন্তু আমেরিকার মায়া, ইন্‌কা, [illegible] সভ্য [illegible] অধিবাসীদের নিকট গোরু অজ্ঞাত ছিল।

দ্র H. H. Dukes, *The Physiology of Domestic Animals*, London, 1955

[illegible]

বর্তমান বিশ্বে প্রধানতঃ দুইটি প্রজাতির গৃহপালিত গোরু আছে: ১. 'বোস ইন্ডিকস' (*Bos indicus*) প্রজাতির অন্তর্গত ভারত ও অন্যান্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের গোরুর ঘাড়ের উপর সুবৃহৎ মাংসপিণ্ড বা ককুদ ও গলার নীচে প্রলম্ব গলকম্বল থাকে। ২. 'বোস টরাস' (*Bos taurus*) প্রজাতির অন্তর্গত নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চলের গোরুর সাধারণতঃ ককুদ থাকে না এবং গলকম্বলটিও স্বল্পপরিসর হয়।

প্রতীচ্যে প্রধানতঃ দুধ ও মাংসের জন্য এবং ভারতে মুখ্যতঃ দুধের জন্য ও চাষ করা, গাড়ি টানা প্রভৃতি কাজের

জন্য গোরু পালন করা হয়। ইহা ছাড়া গোচর্ম হইতে জুতা ও অন্যান্য চর্মনির্মিত দ্রব্য এবং গোরুর যকৃতের নির্যাস হইতে রক্তবর্ধক ঔষধ উৎপন্ন হয়। গোরুর হাড়ের গুঁড়া বিভিন্ন শিল্পে ও জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোময়ও সার হিসাবে উত্তম, ইহা জ্বালানি হিসাবেও প্রচলিত।

ভারত সরকারের ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের পশুগণনা অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৫৬৮ লক্ষ ষাঁড় ও বলদ, ৪৪৮ লক্ষ গাভী এবং ৩৮৬ লক্ষ বাছুর ছিল। ভারতীয় গোরু কর্মঠ, কিন্তু প্রতীচ্যের গোরুর তুলনায় দুধ দেয় কম। ভারতের গোরু বিভিন্ন জাতের অন্তর্ভুক্ত। পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, মহীশূর, অন্ধ্র প্রদেশ ও মাদ্রাজের কোনও কোনও অঞ্চলে উৎকৃষ্ট জাতের গোরু পাওয়া যায়। কিন্তু আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, ওড়িশা, কেরল প্রভৃতি অঞ্চলের গোরু নিকৃষ্ট জাতের। ভারতে অঙ্গোল, অমৃতমহল, আলমবাদী, কাঁকরেজ, কাঙ্গাইয়াম, কেংকথা, খিল্লাড়ী, খেড়িগড়, গাওলাও, গীর, ডাঙ্গি, থরপারকর, দেওনি, নাগোরী, বছৌর, বারগুর, মালবী, মেওয়াটি, রাথ, লাল সিন্ধী, শাহীওয়াল, সিরি, হরিয়ানা, হাল্লিকর, হিসার প্রভৃতি জাতের গোরু উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির দুগ্ধদান ক্ষমতা ভাল (দুধেল জাত বা ডেয়ারি ব্রিড), যথা সিন্ধু দেশের গোরু লাল সিন্ধী ও পাঞ্জাবের গোরু শাহীওয়াল, কতকগুলি বেশ কর্মঠ এবং মোটামুটি ভালই দুধ দেয় (উভয়গুণসম্পন্ন জাত বা ডুয়াল পারপাস ব্রিড), যথা হরিয়ানা অঞ্চলের গোরু হরিয়ানা ও সিন্ধু দেশের গোরু থরপারকর, অবশিষ্ট কতকগুলি জাতের গোরু খুব কর্মঠ, কিন্তু দুধ দেয় কম (কর্মী জাত বা ড্রাফ্‌ট ব্রিড), যথা মহীশূরের গোরু অমৃতমহল ও হাল্লিকর, মাদ্রাজের গোরু কাঙ্গাইয়াম এবং মধ্য ভারতের গোরু মালবী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও বিহার সরকার বিভিন্ন গোশালায় যথাক্রমে হরিয়ানা ও থরপারকর জাতের গোরু পালন করেন, এই সকল রাজ্যে ইহারা স্থানীয় গোরুর তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর হইয়াছে।

প্রতীচ্যের গোরুও বিভিন্ন জাতের অন্তর্গত, ইহাদের কতকগুলির দেহ এমনভাবে গঠিত যে প্রধানতঃ মাংসের জন্যই তাহাদের পালন করা হয় (মাংসের জাত বা মিট ব্রিড), যথা— স্কটল্যাণ্ডের অ্যাবার্ডিন-অ্যাঙ্গাস, ইংল্যাণ্ডের শর্টহর্ন প্রভৃতি, অন্য কতকগুলি জাতের গোরু খুব বেশি দুধ দেয় (দুধেল জাত), যথা— ইংলিশ চ্যানেলের জার্সি ও গের্নসী দ্বীপের যথাক্রমে জার্সি ও গের্নসী গোরু, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ব্রাউন সুইশ, উত্তর হল্যাণ্ডের হল্‌স্টাইন-ফ্রীসিয়ান প্রভৃতি। শর্টহর্ন ও ব্রাউন সুইশ জাতের গোরু দুধ ও মাংস— উভয় বস্তুই মোটামুটি ভালই উৎপাদন করে, তাই অনেকে ইহাদের উভয়গুণসম্পন্ন জাত বা ডুয়াল পারপাস ব্রিড নামে অভিহিত করেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উষ্ণ অঞ্চলগুলিতে অ্যাবার্ডিন-অ্যাঙ্গাস ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের গোরুর মধ্যে সংকর উৎপাদন করিয়া ব্র্যাঙ্গাস প্রভৃতি নূতন জাতের গোরু সৃষ্টি করা হইয়াছে, এরূপ সংকর জাতের গোরু ঐ সকল অঞ্চলের উষ্ণ জলবায়ুতে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গোরুর তুলনায় অনেক সহজেই খাপ খাওয়াইয়া থাকে, অথচ নিরক্ষীয় অঞ্চলের গোরুর তুলনায় ইহাদের মাংস দিবার ক্ষমতা অনেক বেশি হয়।

দুধেল জাতের ষাঁড় ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতের গাভীর প্রজননের ফলে যে গোবৎস জন্মায় তাহার দুধের পরিমাণ মাতার তুলনায় অধিক হইতে পারে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জার্সি গোরু ও স্থানীয় গোরুর মধ্যে সংকর করিয়া এভাবে দুধের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা হইয়াছে।

উন্নত জাতের গোরু সৃষ্টি করার জন্য কৃত্রিম গর্ভাধান (আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন) পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, এই পদ্ধতিতে উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের শুক্র সংগ্রহ করিয়া তাহা কৃত্রিম উপায়ে ও যোনিপথ দিয়া প্রবেশ করাইয়া গাভীর জননতন্ত্রে সঞ্চারিত করা হয়। গাভীর গর্ভ উৎপাদন করা হয়। 'দুধ' ও 'পশুপালন' দ্র।

দ্র The Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Animal Husbandry*, New Delhi, 1962

অমলচন্দ্র চৌধুরী

হরপ্পা সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভারতীয় গোরুর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। উদ্ধৃত সীলগুলিতে ককুদসহ ও ককুদ বিহীন ষণ্ডের ছাপ আছে। বৈদিক যুগের জীবনযাত্রা পশুপালন, বিশেষতঃ গোপালনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোরুর মাধ্যমেই সম্পদের পরিমাপ করা হইত। এই অত্যধিক নির্ভরশীলতা সামাজিক জীবন ও ভাষার উপর ছাপ রাখিয়া যায়। যেমন জ্ঞাতিসমষ্টি-বোধক 'গোত্র' শব্দটির মূল অর্থ গোশালা। পূষা ছিলেন পথহারা গোরুর উদ্ধারকারী দেবতা। কোন্‌টি কাহার সম্পত্তি তাহা বুঝাইবার জন্য গোরুর কানের উপর চিহ্ন দেওয়া হইত। ঋগ্বেদের পরবর্তী সংহিতাগুলি হইতে ক্রমবর্ধমান কৃষিকার্যে এবং শকট বহন করার জন্য

গোরুর ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। ছয়, আট, বার, এমনকি চব্বিশটি গোরু জুড়িয়া লাঙল (সীর) কর্ষণ করা হইত। এই সকল কাজে ষাঁড়, গাভী ও বলদ ব্যবহৃত হইত। সার হিসাবে গোময়ের ব্যবহার জ্ঞাত ছিল। গোচর্ম হইতে ধনুকের ছিলা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। কৃষ্ণ, শুক্ল, লোহিত ও মিশ্র বর্ণের গোরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎপাদন ব্যবস্থায় অতীব প্রয়োজনীয়তার জন্য গোরু পবিত্রতা অর্জন করে। রাজগণ বহু গোরু একসঙ্গে দান করিতেন। গোরু অভুক্ত থাকিলে অন্যায় বিহিত হইত।

পরবর্তী কালে গোরুর গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে নাই। মধ্য যুগীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে মহীশূর, পশ্চিম ভারত ও পূর্ব ভারত প্রভৃতি দেশজ ও বিভিন্ন গোরুর পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বৃহৎসংহিতায় (৬১ অধ্যায়) গোরুর অবয়ব-সংস্থান বিষয়ক কিছু আলোচনা পাওয়া যায়।

[illegible]

গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে গোরু সর্বাপেক্ষা উপকারী ও পবিত্র। ইহার মলমূত্র পর্যন্ত পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। পঞ্চগব্য (শাস্ত্রোক্ত বিধিমত মিশ্রিত গোমূত্র গোময় দুগ্ধ দধি ও ঘৃত) দেহশুদ্ধি ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। দেববিগ্রহকে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করানো হয়। পঞ্চগব্য পানে দেহপবিত্রতা ও পাপ দূরীভূত হয়। কোনও স্থানে গোবর জল ছিটাইলে বা ঐ স্থানটি গোবর দিয়া নিকাইলে উহা শুদ্ধ হয়। গোশরীরে দেবতারা বিরাজ করেন। গোরুর দন্তে মরুৎ, জিহ্বায় সরস্বতী, চক্ষুতে চন্দ্র সূর্য, খুরে জাহ্নবী নদী, যেখানে গোরু সেখানেই লক্ষ্মী বিরাজিত। গাভীকে স্বয়ং ভগবতীস্বরূপা মনে করা হয়। গাভী সপ্তমাতার অন্যতমা। আত্মমাতা গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী ও পৃথিবী ইঁহারা সপ্তমাতা। এইজন্য গোপালন ও গোসেবা পুণ্য কর্মরূপে পরিগণিত। নানা উপলক্ষে গোপূজারও ব্যবস্থা আছে। কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদ ও অষ্টমীতে গোপূজার বিশেষ বিধান আছে। গোপূজার বিশিষ্ট অঙ্গ গোগ্রাস দান। চান্দ্রায়ণ ও প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানেও গোগ্রাস দানের রীতি আছে। এই উপলক্ষে কচি ঘাস, বাঁশপাতা প্রভৃতি মাথায় লইয়া গোরুর সামনে ধরিতে হয়। গোরু স্বচ্ছন্দে ইহা গ্রহণ করিলে তাহা শুভসূচক মনে করা হয়। শাস্ত্রে গোদানের মাহাত্ম্য ও গোদানের প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান সমাজে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পক্ষে গোদান গ্রহণ নিন্দনীয়। বর্তমানে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে গোদান বা তাহার অনুকল্প হিসাবে সামান্য মূল্য দানের রীতি আছে। মরণোন্মুখ হইয়া যমদ্বারে অবস্থিত উগ্র বৈতরণী নদী সুখে পার হইবার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পূর্বে সবৎসা ধেনু দানের বিধান আছে। এখন সাধারণতঃ শ্রাদ্ধ দিনে শ্রাদ্ধাধিকারী মৃতের উদ্দেশে বৈতরণী ধেনু বা ধেনুমূল্য দান করিয়া থাকেন। মৃতের স্বর্গ কামনায় যে ষোড়শ দানের নিয়ম আছে তাহার মধ্যে গোদান অন্যতম। বৃষোৎসর্গ ও চন্দনধেনু দান শ্রাদ্ধের অঙ্গ।

বৈদিক যুগে শূলগব, গবাময়ন প্রভৃতি নানা যজ্ঞে গোরু বধ করা হইত ও মাংস খাওয়া হইত, বাড়িতে বিশিষ্ট অতিথি আসিলে মধুপর্কের মাংসের জন্য গোরু বধ করিতে হইত। সেইজন্য অতিথির এক নাম ছিল গোঘ্ন। কালক্রমে এই সমস্ত অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়া যায় এবং গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণ পাপকার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। জানিয়া বা না জানিয়া গোবধ করিলে বা মালিকের কোনও ত্রুটির জন্য, এমন কি গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায়, গোরুর মৃত্যু ঘটিলে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। বর্তমানে ব্রাহ্মণকে সামান্য কিছু অর্থ দান করিয়া প্রায়শ্চিত্তের কর্তব্য নির্বাহ করা হয়। গোবধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দড়িতে 'কণ্ঠা' করিয়া নির্বাক ভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার প্রথা আছে। গোমাংস ভক্ষণেও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে।

দ্র [illegible] সেন, [illegible], রঘুনন্দন, প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব, Rajendralal Mitra, 'Beef in Ancient India', Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1872

[illegible] দেবী

গোরেসিও, গ্যাসপারে (Gorresio, Gaspare) মূল সংস্কৃত রামায়ণ গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সমগ্র রামায়ণের এই প্রথম সংস্করণ প্যারিসে (প্যারিস) ছাপা হইয়া পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৪৩ ৫০ খ্রী)। গোরেসিওর সংস্কৃত ভিন্ন ইতালীয় তাঁহার রামায়ণের ভূমিকা ও টীকাটিপ্পনী ইটালীয় ভাষায়। গোরেসিও বাংলা বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের রাজকীয় ইনস্টিটিউটের কোরেসপন্ডিং মেম্বর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। গোরেসিওর জীবৎকালে রামায়ণের আর একটি সংস্করণ হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় সংস্করণের শেষ খণ্ড উত্তরকাণ্ড ১৮৬৭ সালে প্যারিসে ছাপা হয়।

সুভদ্রকুমার সেন

গোর্কি, মাক্‌সিম (১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রী) ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম আলেকসেই মাকসিমোভিচ্ পেশ্‌কভ্। প্রখ্যাত রুশ গল্পকার, কবি ও ঔপন্যাসিক।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজ্‌নি নভ্‌গরদ্ (এক্ষণে গোর্কি) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে পিতৃহীন হন পরে মাতামহের কাছে কিছুকাল প্রতিপালিত হন কিন্তু দারিদ্র্যবশতঃ কিশোর বয়সেই আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু প্রকার কাজ করেন ও নানা শ্রেণীর লোকের সম্পর্কে আসেন। তিনি প্রায় সমগ্র রুশ দেশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লোকপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া তদানীন্তন রুশ চরিত্র সম্বন্ধে যে অপরিমেয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহারই ফলে পরবর্তী কালে গোর্কির রচনাকে স্বদেশে ও বহির্বিশ্বে সমান আদরণীয় করে।

১৮৯২ সালে তাঁহার প্রথম ছোটগল্প, ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২ খণ্ড গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়। গোর্কি প্রধানতঃ গল্প লেখক হইলেও কবিতা ও কিছু নাটকও প্রণয়ন করেন। নাটকগুলি রূপ চরিত্রের না হইলেও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'না দ্নে' (নীচের তলা) বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। গোর্কি রুশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য হন এবং ১৯০৫ সালের বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তৎপরে গোর্কি কাপ্রিতে নির্বাসিত হন, সেখানে লেনিনের সঙ্গে গোর্কির বন্ধুত্ব হয়। এই সময়ে গোর্কির চিন্তাধারা ও রচনাশৈলী বিকশিত হয়। এর পরে তিনি প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোভিয়েত প্রচার দপ্তরের পরিচালনা করেন।

শ্রমিক জীবন লইয়া 'মাত্' (মা, ১৯০৬ খ্রী) বোধহয় ইঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আত্মজীবনীমূলক ত্রয়ী 'দিয়েৎস্তভো' (শৈশব, ১৯১৩-১৪ খ্রী), 'ভ্ ল্যুদিয়াখ' (সংসারে, ১৯১৫ খ্রী) এবং 'মই য়ুনিভের্সিতেতি' (আমার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৩ খ্রী) সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের সময় ইনি বলশেভিকদের সমর্থন করেন, যদিও তাহাদের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদও করিয়াছেন। বহু লেখক ও শিল্পী ইঁহার আশ্রয় না পাইলে বিশেষ বিপদে পড়িতেন।

১৯২২ সালে রুশিয়া ত্যাগ করিয়া জার্মানিতে এবং ইতালির সাক্রামেন্তো ডাক্তারের অনুরোধে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

১৯২৮ সালে রুশ দেশে ভ্রমণে আসিলে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। গোর্কিকৃত 'দ্ভাদ্‌ৎসাৎ শিয়েস্‌ত্ ই অদনা' (২৬ জন পুরুষ ও ১টি মেয়ে, ১৮৯০ খ্রী) এবং 'দেলো আর্তামোনোভীখ' (আর্তামোনোভের ব্যবসায়, ১৯২৫ খ্রী) তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর অন্যতম। গোর্কি প্রণীত তলস্তয় প্রমুখের স্মৃতিকথাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সাধনা দাস

গোর্খা নেপাল দেশের সৈনিকমাত্রকেই সচরাচর গোর্খা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। গোর্খা সৈনিক শৌর্য বীর্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু ইহারা সকলেই গোর্খা বা ক্ষত্রিয় নহে। সাধারণতঃ গুরুঙ্, মানগর বা মাগার, থামাঙ্, রাই (কিরাতির অপভ্রংশ) ও লিম্বু জাতি হইতে সৈন্য লইয়া বাহিনী গঠন করা হইত। ইহারাই ব্রিটিশ সৈন্যদলে গুর্খা বা গোর্খা সৈন্য বলিয়া বিখ্যাত ও পরিচিত।

গোর্খা শব্দটি আসিয়াছে গোর্খা শহরটির অধিবাসী হিসাবে। কয়েকটি গোষ্ঠী নামে বাহিনীর ইতিহাসে গোর্খা বলিয়া প্রচলিত হইলেও ইহা কোনও বিশিষ্ট জাতির নাম নহে। গোর্খা শহরটি কাঠমাণ্ডু হইতে [illegible]৯ কিলোমিটার ([illegible]৮ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে বহু পুরাকাল হইতে নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধযোগী গুরু গোরক্ষনাথের গুহামন্দির অবস্থিত। এই মন্দির হইতেই এই স্থানের নাম হয় গোর্খা। গোরক্ষনাথের প্রভাব তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছেন্দ্রনাথের অপেক্ষা অধিক, নাথ সম্প্রদায়ের ৮৪ গুরুর মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ গুরু হিসাবে পূজনীয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান বিজয়ের ফলে, বিশেষ করিয়া যখন আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন তখন চিতোর ও রাজপুতানার রাজবংশীয় বহু রাণা ও ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ব্রাহ্মণ উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে আশ্রয় লইতে শুরু করেন। কুমায়ুন, গাড়ওয়াল ও হিমাচল প্রদেশের বহু অংশে ইহার সাক্ষ্য মিলিবে। ব্রাহ্মণেরা বহুদিন অবধি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেও ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতি স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। তাহাদের সন্তানগণ খাস (ক্ষত্রিয় বা ক্ষেত্রির অপভ্রংশ) জাতি বলিয়া পরিচিত। তাহারা গোরক্ষনাথের মন্দিরের নিকটে লামজুঙ্, নওয়াকোট প্রভৃতি স্থানে বসবাস করিতে থাকে। পরে ১৫৫৯ সালে যখন কুমায়ুন হইতে শাহ্ বংশের রাজপুত রাজা দ্রব্য শাহ্ এখানে আসেন তখন এই খাসগণ তাঁহার সহায়তা করে ও স্থানীয় খাড়গা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাহ্ বংশের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয়।

খাসদের মধ্যে ক্ষত্রি বা ছত্রী, কুনওয়ার, থাপা, পাণ্ডে

গোর্খা

প্রভৃতি গোষ্ঠী প্রধান। ইহারাই গত দুই শতাব্দী ধরিয়া নেপাল তথা কাঠমণ্ডুর ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ইহারাই গোর্খা শহর হইতে পরবর্তী কালে কাঠমণ্ডু বা নেপাল উপত্যকার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ জয় করিয়া স্বীয় রাজ্য প্রসারিত করিয়াছে। ইহাদের ভাষার সহিত হিন্দীর সাদৃশ্য আছে, লিপিও নাগরী এবং ধ্বনিও সংস্কৃতের মত। প্রাচীন নেওয়ারী ভাষাকে হটাইয়া ইহা সমগ্র নেপালের রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। এই ভাষা নেপালী বা গোর্খালী বলিয়াও পরিচিত। গোর্খা রাজাদের নিজস্ব মুদ্রাও ছিল ও গোর্খালী জাতীয় সংগীতও আছে।

মল্ল রাজাদের (১২০০ হইতে ১৭৭৬ খ্রী) কালে নেপাল উপত্যকা বা কাঠমণ্ডুর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে, কিন্তু যক্ষ মল্লের সময়ে তাহার রাজত্ব তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে: পাটন, কাঠমণ্ডু ও ভাতগাঁও। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ছিল না।

রাণা বংশীয়েরা গোর্খা শহরে ২০০ বৎসর বসবাস করিবার পরে, রাজ্যজয়ের দিকে মন দেয়। ইহাতে নরভূপাল শাহের চেষ্টা খুব ফলবতী হয় নাই, পরে তাহার বংশধর অতিশয় উচ্চাভিলাষী পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্, কুমায়ুন, তরাই, সিকিম ও তিব্বতের সীমান্তবর্তী অংশসমূহ জয় করিয়া ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাঠমণ্ডুর পর প্রান্তের শহর কীর্তিপুর আক্রমণ করেন এবং মল্ল রাজাদের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া অবশেষে ১৭৬৬ সালে কাঠমণ্ডু অধিকার করেন। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথ্বীনারায়ণের রাজ্য-সীমা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়। ঐ সময় হইতেই গোর্খালী ভাষা রাজভাষা হিসাবে চালু হয়। ইনি একজন পরাক্রম-শালী রাজা ছিলেন এবং নেপাল রাজ্যকে এক বাঁধনে বাঁধেন। বর্তমান রাজা মহেন্দ্রবিক্রম শাহ্ ইহারই বংশধর। গোর্খা রাজাদের সহিত ইহার পর ইংরেজদের কয়েকবার সংঘর্ষ হইয়াছিল। ১৮০০ সালে সুযোগ্য মন্ত্রী ভীমসেন থাপার সময়ে গোর্খারা তরাই অঞ্চল আক্রমণ করে। গোর্খা সৈন্যদল অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও সেনাপতি অক্টারলোনির নিকটে অবশেষে পরাজিত হয়। কলিকাতার অক্টারলোনি মনুমেণ্ট ঐ বিজয়ের স্মারক। শেষে ১৮১৫ সালে সগৌলির চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে নেপালকে সিকিম ও তরাই এর কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া কাঠমণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখিতে বাধ্য হইতে হয়। তবে ব্রিটিশেরা ইহাদের শৌর্যে এত মুগ্ধ হন যে নিজ সৈন্যদলে ইহাদের ভর্তি করিয়া লন। পরবর্তী কালে গোর্খা সৈন্যদের বেতন ও পেন্সন ইহাদের আর্থিক সমৃদ্ধির মূল কারণ হইয়াছিল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পারিবারিক ষড়যন্ত্রের ফলে একজন পরাক্রমশালী সামন্ত জঙ্গ বাহাদুর রাণা তৎকালীন রাজা ও রানীকে নির্বাসিত করিয়া সমগ্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। তখন হইতে রাজ্য-শাসনের সমস্ত ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর হাতে চলিয়া যায় ও রাজা কার্যত বন্দী অবস্থায় বাস করিতে থাকেন। রাণা সম্প্রদায় এইভাবে প্রায় ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহারা সৈন্যবাহিনীর পরিচালকও ছিলেন।

সমসাময়িক বিচারে জঙ্গ বাহাদুরকে বেশ প্রগতিশীল শাসক বলা চলে ('নেপাল' দ্র)। জঙ্গবাহাদুর মহারানী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক সময়ে ১৮৫০ সালে লণ্ডনে যান। ১৮৫৬ সালে তিনি মহারাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদটি বংশানুক্রমিক করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় গোর্খা সৈন্যদল ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করে। পুরস্কার স্বরূপ গোর্খারা ৪১ বৎসর পূর্বে হৃত তরাই অঞ্চলের ভূখণ্ড ফিরিয়া পায় ও অস্ত্র নির্মাণের কারখানা খুলিবার সুযোগ লাভ করে। ইংরেজ বাহ্যশক্তি মিত্র হইলেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা তাহাকে হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই, ইহাতে বহু বিদ্রোহী সিপাহী ও নানা সাহেব এবং তাঁহার পরিবার এখানে পালাইয়া আসেন। ১৮৭৮ সালে জঙ্গবাহাদুরের মৃত্যু হইলে পুনরায় গৃহবিবাদ ও ষড়যন্ত্র শুরু হয় ও তাঁহার ভ্রাতাদের বংশ ক্ষমতাসীন হন।

এই বংশের চন্দ্র সামশের (১৯০১-২৯ খ্রী) নানা দিক দিয়া কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি [illegible] বিদ্রোহ দমন করেন, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের বরখাস্ত করে কাঠমণ্ডুতে বিদ্যুৎশক্তি আনয়ন করেন, টেলিফোন সংযোগ করেন, সীমান্ত হইতে ভীম পেডী অবধি রাস্তা নির্মাণ করেন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনয়নের জন্য [illegible] রোপওয়ে নির্মাণ করান। তিনি দাস-প্রথা উচ্ছেদ করিয়াছিলেন কিন্তু জমিদারি ও সামন্ত প্রথার কোনও পরিবর্তন ঘটান নাই। পোখরা, ধানকুটা ও বাজারকোটে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও একমাত্র হাই স্কুল 'চন্দ্র কলেজ' তাঁহার সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার শাসনে ধর্মগত ভাব বা অন্য কোনও কারণের জন্যই হউক চুরি ডাকাতি ও হত্যার মাত্রা খুবই কম ছিল। সেনাবাহিনীতে সমস্ত গোষ্ঠীর লোক থাকিলেও সৈন্যবাহিনীর উচ্চতম পদগুলি রাণা-বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মল্ল রাজগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিছু বজায় রাখিলেও শিক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলি রাণাগণ গ্রহণ করেন নাই। ঐ সময়ে শিক্ষার হার মাত্র

শতকরা ৫ ছিল। প্রাচীন নেওয়ারী ভাষাকে একেবারে দমন না করিলেও চালু রাখিতে দেওয়া হয় নাই।

১৯১৪-১৯ সালে সাহায্যের ফলে ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে রাজদূতের পদে উন্নীত করা হয়। পরিবর্তে ব্রিটিশরা দশ লক্ষ মুদ্রা দান করেন এবং নেপাল সরকারকে বহু অস্ত্র, গোলা গুলি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি বিনা শুল্কে আমদানি করিবার অধিকার দান করেন। নেপাল সরকারকে অস্ত্রের কারখানা করিতে যে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাহা নিদর্শকের প্রভূত কাজে লাগিয়াছিল। গোর্খা সৈন্যদল ১৯৪৭ সালে বিভক্ত করিয়া ৬টি দলকে ভারত সামরিক বাহিনীতে ও ৪টিকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে ১০টি সিপাহী দলের মধ্যে ২টি রেজিমেণ্ট পূর্ব নেপালের রাই ও লিম্বু জাতির দ্বারা গঠিত, একটি খাস, বাকি গুরুং ও মাগার জাতির সিপাহী লইয়া গঠিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও পরে ইহারা আফ্রিকা, সাইপ্রাস এবং এশিয়ার বর্মা, মালয় ইত্যাদি প্রভৃতি স্থানে বীরত্বের জন্য ক্রশ ও অন্যান্য ভাবে প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

১৯৫১ সালে মোহন সামশেরের প্রধান মন্ত্রিত্বের সময় রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ্ ও তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র বিক্রম শাহ্ (বর্তমান রাজা) ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় লইয়া ভারতের সহায়তা গ্রহণ করেন। ইহার পূর্বে নেপালী কংগ্রেস গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। ফলে রাণারা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন ও নেপালী কংগ্রেস ত্রিভুবন বিক্রম শাহ্‌কে নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে গ্রহণ করিয়া শাসনের ভার দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্র বিক্রম শাহ্ রাজা হন এবং নেপালের উন্নতির জন্য রাস্তা, স্কুল, কলেজ, নদীর বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া দ্রুত আধুনিক যুগের সহিত তাল রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তিনি পূর্ণ অধিকারী।

দ্র Perceval, *Nepal*, vols. 1-2, London, 1928; Francis Tuker, *Gorkha*, London, 1957; Erika Leuchtag, *With a King in the Clouds*, London, 1958; Toni Hagen, *Nepal*, London, 1963.

বন্দ্য মুখোপাধ্যায়

গোলকোণ্ডা ১৭°২২′ উত্তর ও ৭৮°২৭′ পূর্ব। অন্ধ্র প্রদেশে কৃষ্ণা নদীর উপনদী মুসী নদীর উত্তর তীরে প্রাচীন দুর্গ এবং শহর। ইহা হায়দরাবাদ জেলায় বর্তমান হায়দরাবাদ শহরের ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। গোলকোণ্ডার বর্তমানে কোনও গুরুত্ব নাই। পাহাড়ের চূড়ায় গ্রানাইট পাথরের দুর্গ প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) পরিধি ব্যাপিয়া পাথরের প্রাকারে বেষ্টিত। অভ্যন্তরে ভগ্ন প্রাসাদস্তূপ, মসজিদ ও বালাহিসার (সিটাডেল) বিদ্যমান। প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) উত্তরে কুতুবশাহী রাজ বংশের বহু স্মৃতিসৌধ বর্তমান— সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৩৬০ মিটার (১২০০ ফুট), গড় বৃষ্টিপাত ৮৮০ মিলিমিটার (৩৫·২ ইঞ্চি)। কঙ্করময় লাল রেগুর মাটির দেশ। কৃষিজ শস্যের মধ্যে জোয়ার জোয়ার ও তুলা। শিল্পের প্রসার হয় নাই।

১১৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ওয়ারঙ্গলের কাকতীয় বংশের রাজত্বের সময় গোলকোণ্ডা উঁহাদের অধীনে একটি ক্ষুদ্র দুর্গমাত্র ছিল। আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে এ দেশ দুইবার লুণ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক আমীর খসরু লিখিয়াছেন হাজার উট অতি কষ্টে সে বিপুল সম্পদ দিল্লীতে বহন করিয়া আনে। ১৩৬৪ সালে বাহ্‌মনী রাজ বাহ্‌মন শাহের পুত্র মহম্মদ শাহ্ কাকতীয়দের পরাজিত করিয়া গোলকোণ্ডা নিজ দখলে আনেন।

বাহ্‌মনী রাজবংশের পতনের পর গোলকোণ্ডা কুতুবশাহ্ শাহী রাজার অধীনে আসে। শাহী বংশ দুই শত বৎসর রাজত্ব করেন। শেষ ভাগে শিবাজী এই স্থান হইতে চৌথ কর আদায় করেন (১৬৭৭ খ্রী)। শেষ সুলতান আবুল হাসানের রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেব ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গোলকোণ্ডা অবরোধ করেন ও আটমাস অবরোধের পরে দুর্গ অধিকার করিতে পারেন।

শাহী আমলে গোলকোণ্ডা ছিল হীরক-শহর, এখানে হীরক কাটা ও পালিশ করা হইত। ভুবন-বিখ্যাত কোহিনূর হীরা সম্ভবতঃ এখানেই পাওয়া যায়।

দ্র R. C Mazumdar, *An Advanced History of India*, 1953, *The Columbia Lippincott Gazetteers of the World*, Columbia University, 1952; *The Imperial Gazetteer of India*. vol. XII, oxford, 1908.

সলিলকুমার চৌধুরী

গোলটেবিল বৈঠক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম তথা সংবিধান বিবর্তনের ইতিহাসে ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের বিশেষ স্থান আছে। কারণ এই বৈঠকগুলিতে ভারতীয় রাজন্যবর্গ, ইংরেজ-শাসিত ভারতের এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের

প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইহার পূর্বে বা পরে এইরূপ সম্মেলন আর কখনও হয় নাই।

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের (১৯১৯ খ্রী) পরবর্তী দশকে প্রতিশ্রুত নবসংস্কারের ব্যবস্থা করিবার জন্য একমাত্র শ্বেতাঙ্গ সদস্য লইয়া সাইমন কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন ভারতে আসিলে কংগ্রেস কর্তৃক সর্বতোভাবে বর্জিত হয় ('কংগ্রেস' দ্র)। এই কমিশনের প্রস্তাবগুলি আলোচনা করিবার জন্য প্রথম গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়। তখন ব্রিটেনে লেবার পার্টির শাসন চলিতেছিল।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক (১২ নভেম্বর ১৯৩০ খ্রী - ১৯ জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রী), এই বৈঠকে কংগ্রেস দল ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দলের ও মতবাদের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হন। মোট ৮৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জন ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলি হইতে, ১৬ জন ভারতীয় রাজন্যকুল হইতে এবং ৫৭ জন ব্রিটিশ অধিকৃত ভারত হইতে প্রেরিত হন।

বৈঠকের ফলাফল প্রসঙ্গে বলা চলে যে একদিক হইতে আংশিক রূপ অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল। পূর্ব পূর্ব আলোচনাকালে সাইমন কমিশন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রভৃতি এই মত প্রকাশ করেন যে, অদূরভবিষ্যতে ফেডারেশন চালু করা যাইবে না, কিন্তু এই বৈঠকে বিকানীরের মহারাজা ও ভোপালের নবাবের নেতৃত্বে ভারতীয় রাজন্যবর্গ অবিলম্বে ফেডারেশন গঠনসম্পর্কে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করায় এ সিদ্ধান্ত লওয়া সম্ভব হয়। অন্য দিকে মুসলিম, অনুন্নত হিন্দু ও ইঙ্গ ভারতীয় ইত্যাদি সংখ্যালঘু দল তাহাদের নিজ নিজ দাবি পুনর্বার পেশ করাতে ব্রিটিশ সরকার সহজেই ভেদনীতি গ্রহণের পক্ষে আরও জোরালো যুক্তির সন্ধান পান।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খ্রী - ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রী), ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের অনুমোদন ব্যতিরেকে সংবিধানসম্পর্কে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত লওয়া অসম্ভব মনে করিয়া ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে এই বৈঠকে যোগদান করিতে সম্মত করান ('কংগ্রেস' দ্র)। কংগ্রেসদল এই বৈঠকে একমাত্র প্রতিনিধি স্বরূপ গান্ধীজীকে প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনেকাংশে নৈরাশ্যেরই কারণ হয়। প্রথম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই গান্ধীজী (কংগ্রেসদলের 'পূর্ণ স্বরাজ' সংকল্পানুযায়ী) কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবি করেন। কিন্তু গান্ধীজীর উচ্চ আদর্শবাদ সমবেত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌ ও ভারতীয় অন্যান্য প্রতিনিধিদিগের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে পরবর্তী ঘটনা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ রূপে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলিয়া যায়। কংগ্রেস ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ গুরুতর আকার ধারণ করে। সংবিধানের ধারা রচনাতেও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কোনও বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায় নাই, পূর্বগৃহীত কতকগুলি সিদ্ধান্তের সামান্য অদল-বদলমাত্র করা হয়।

গান্ধীজী আশাহত ও ব্যথিত চিত্তে প্রত্যাবর্তন করিলে আইন অমান্য আন্দোলন পুনঃপ্রবর্তন করা হয় এবং তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস কোনও অংশ গ্রহণ করেন না।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৭ নভেম্বর - ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩২ খ্রী) অল্পসংখ্যক (৪৬ জন মাত্র) সদস্য যোগদান করেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের কোনও প্রধান এই অধিবেশনে উপস্থিত হন নাই। তৎকালীন ভারতসচিব স্যামুয়েল হোর ঘোষণা করেন যে, ভারতের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত হইতে সদস্যসংখ্যার ৩৩⅓%-সংখ্যক আসন মুসলিমগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে এবং তাহাদের দাবি অনুযায়ী সিন্ধু প্রদেশ নামে ভিন্ন প্রদেশও গঠিত হইবে।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও সরকারি প্রস্তাব-সম্বলিত 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করা হয়, যদিও বৈঠকগুলির প্রকৃত সিদ্ধান্তসমূহের সহিত এই 'শ্বেতপত্রে'র কার্যতঃ অনেক অমিল ছিল।

দ্র V P. Menon, *The Transfer of Power in India*, Calcutta, 1957 , R. C Majumdar, *The History of Freedom Movement in India*, vol. III, Calcutta, 1963.

চন্দন দাস

গোলমরিচ পিপেরাসিই গোত্রের (Family-Piperaceae) অন্তর্ভুক্ত বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ বিরীজগাত্রী লতা নে গাত্রীয় উদ্ভিদ, বিজ্ঞানসম্মত নাম পিপের নিগ্রম (*Piper nigrum*)। গাছের নীচের দিকে কাণ্ড শক্ত, উপরের দিকে কাণ্ড হইতে বিস্তৃত শিকড়ের সাহায্যে অন্য গাছকে আঁকড়াইয়া বর্ধিত হয়। পাতা সরল, মোটা ও ডিম্বাকৃতি, ফুল সাদা। উভলিঙ্গ, স্ত্রী ও পুরুষ—তিন প্রকারের গোলমরিচ গাছ হয়। নির্ভরযোগ্য অধিক ফলনের জন্য উভলিঙ্গ লতা চাষের সুপারিশ করা হয়। ফল গোলাকৃতি ও লাল, এই ফলই শুষ্ক অবস্থায় বাজারে

গোলমরিচ নামে পরিচিত। ভারতে ফলন এবং উৎকর্ষের জন্য কালুভালি এবং বালানকোট্টা জাতই সর্বোৎকৃষ্ট। বাণিজ্যে মালাবার, পেনাং, কোচিন প্রভৃতি নানা জাতের গোলমরিচ সুপ্রচলিত। গোলমরিচের ফলে পাইপেরিন নামক উপক্ষার (অ্যাল্‌কালয়েড), রজনজাতীয় পদার্থ প্রভৃতি থাকে।

যবদ্বীপ, বোর্নিও, মালয়, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতের আসাম, কেরল, পশ্চিম বঙ্গ, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে গোলমরিচের চাষ হইয়া থাকে। ভারতেই চাষের পরিমাণ সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। সমুদ্রসমতল হইতে ১২০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢালু পাহাড়ের গায়ে এবং সমতল ভূমিতেও ইহা চাষ করা যায়। দো আঁশ বা বেলে-দো আঁশ মাটি, আর্দ্র আবহাওয়া (বৎসরে ২০০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত), ১০°-৩৭° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে তাপমাত্রা ও অন্য গাছের আওতায় আলো ছায়া এবং লতার সহায়ক ইহার চাষের জন্য প্রয়োজন। কোনও কোনও অঞ্চলে অল্প ছায়া, সহায়ক এবং গবাদির হাত হইতে রক্ষার জন্য কাঁটা মাঁদার (এরিথ্রিনা ইন্ডিকা, *Erythrina indica*) গাছ লাগানো হয়। গুটিকলম বা কাটিং-এর দ্বারা গোলমরিচের চাষ করা হয়। তৃতীয় বৎসর গাছে ফল ধরে। ফল তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে ফলগুলি কালো হইয়া কুঁকড়াইয়া যায়। প্রতি হেক্টর জমিতে গোলমরিচের গড় বার্ষিক ফলন প্রায় ৭৫০ কুইন্টাল। উপযুক্ত সার প্রয়োগে শতকরা ৫৭ ভাগ ফলন এবং ৪০ ভাগ আয় বাড়ানো সম্ভব। রন্ধনে ও আয়ুর্বেদে গোলমরিচের যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২, A S. Khedkar, 'Pepper and the National Economy', *Farmer*, 1959, Fazlullah Khan, 'Her's how to push up your yields', *Indian Farming*, 1960

মুরারিপ্রসাদ গুহ

গোলাপ রোসাসিঈ গোত্রের (Family-Rosaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী পর্ণমোচী গুল্ম। সাধারণতঃ ইহা ঋজু ও কণ্টকময়, ক্ষেত্রবিশেষে ব্রততী বা রোহিণী জাতীয়ও হইতে পারে। পাতা যৌগিক, একান্তর ও পাতার প্রান্ত খাঁজকাটা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখার প্রান্তে একক পুষ্প অথবা কোরিম্ব জাতীয় পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। ফুলের বৃত্যাংশ ও দল পঞ্চবর্গীয়। অসংখ্য পুংকেশর এবং কয়েকটি গর্ভকেশর একটি ঘণ্টাকৃতি পুষ্পাধারে রক্ষিত, এই পুষ্পাধারই পরে রসাল বেরি জাতীয় ফলে পরিণত হয়।

রোসা গণে (Genus-Rosa) শতাধিক প্রজাতি থাকিলেও প্রধানতঃ সাতটি প্রজাতি হইতেই আধুনিক সংকর গোলাপের (হাইব্রিড রোজ) উৎপত্তি। বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত নির্বাচন (সিলেকশন), অঙ্গজ বিস্তার (ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন) এবং সংকরায়ণ (হাইব্রিডাইজেশন) এর দ্বারা নানা বর্ণের সহস্রাধিক জাতের (ভ্যারাইটি) আধুনিক গোলাপের উদ্ভব। উদ্যান-বিদ্যার (হর্টিকালচার) বিভাগ অনুযায়ী গোলাপকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ১. ঝুপ গোলাপ বা বুশ রোজ—ক হাইব্রিড টি রোজ খ হাইব্রিড পারপেচুয়াল গ ফ্লোরিবান্ডা রোজ ২. লতানে গোলাপ বা ক্লাইম্বিং রোজ—ক র‍্যাম্বলার খ ক্লাইম্বার গ পিলার ৩. গুল্ম গোলাপ বা শ্রাব রোজ ৪. ক্ষুদ্রাবয়ব গোলাপ বা মিনিয়েচার রোজ।

কয়েকটি প্রজাতির বন্য গোলাপের উৎপত্তি স্থান হিমালয়ের পাদদেশ, কিন্তু সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের পরোক্ষ প্রভাবেই উদ্যানজাত গোলাপ পারস্য হইতে ভারতে আসে।

বিচিত্র বর্ণের মনোহর সুগন্ধি নয়নাভিরাম ফুলের জন্যই গোলাপের চাষ করা হয়। গামলায় বা অন্য পাত্রে কিংবা যে কোনও জমিতে গোলাপ গাছ রোপণ করা যায়। উন্মুক্ত, উঁচু, ঝোড়ো বাতাসবিহীন এবং জলনিকাশের সুব্যবস্থাযুক্ত উর্বর জমিতে ইহার চাষ ভাল হয়। ঈষৎ বালুকাযুক্ত দোঁ আঁশ মাটি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ভারতবর্ষে মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম, ছোটনাগপুর, মীর্জাপুর, সাহারানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গোলাপের চাষ করা হয়। অন্যান্য দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ইটালী, ইরান প্রভৃতি দেশ গোলাপের চাষের জন্য বিখ্যাত।

বাজারে গোলাপ ফুলের চাহিদা প্রচুর। তাহা ছাড়া গোলাপ হইতে আতর, গোলাপ জল, রোজ সিরাপ প্রভৃতি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়।

গোলাপের গবেষণায় লণ্ডনের ন্যাশন্যাল রোজ সোসাইটির (স্থাপিত ১৮৭৬ খ্রী) অবদান উল্লেখযোগ্য।

দ্র B. S Bhattacharji, *Rosegrowing in the Tropics*, Calcutta, 1959 ; F. Fairbrother, *Roses*, London, 1962.

সুব্রত রায়

গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী (১৮৪৬-১৯১৫ খ্রী) আইনজীবী ও হিন্দু আইন-বিষয়ক বহু গ্রন্থের প্রণেতা। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই তারিখে গোলাপচন্দ্র সরকারের জন্ম হয়। পিতার নাম শম্ভুনাথ সরকার। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষালাভ করেন। পূর্বে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। গোলাপচন্দ্রকেই প্রথম ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ছাত্র রূপে ভর্তি করা হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এম এ. পাশ করিয়া তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। আইনপরীক্ষা পাশ করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাই কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। হিন্দু আইন এবং হিন্দু আইনসম্পর্কিত মূল স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। হিন্দু আইনসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বাংলা দেশের বাহিরেও তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং অনেক মকদ্দমায় তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইত। প্রিভি কাউন্সিলে হিন্দু আইন এবং মুসলমানী আইনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাহাকে লওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়েও বিলাত হইতে একবার তাঁহার পরামর্শ চাওয়া হইয়াছিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দত্তক বিষয়ক হিন্দু আইনসম্বন্ধে ঠাকুর ল' লেকচার দেন। তাঁহার প্রণীত 'হিন্দু আইন' হিন্দু আইনবিষয়ক একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। মূল স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র এবং তাহার পরম্পরাগত ব্যাখ্যা অধিকাংশ বিচারকের জানা না থাকায় হিন্দু আইনসম্পর্কে হাই কোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিলের অনেক নজির যে ভ্রমাত্মক এবং শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা গোলাপ শাস্ত্রী দেখাইয়া দেন। তিনি 'বীরমিত্রোদয়', 'দায়তত্ত্ব', 'বিবাদ-রত্নাকর' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং 'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা'র এক প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট তারিখে গোলাপ শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

গোলাম পালোয়ান (১৮৬০-১৯০০ খ্রী) অপ্রতিদ্বন্দ্বী মল্লবীর। প্রকৃত নাম গোলাম মহম্মদ। পিতা আলিয়া বকস বরোদার খাণ্ডে রাও গায়কোয়াড়ের বেতনভুক্ মল্লাচার্য ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় কাল্লু এবং রহমানও শীর্ষস্থানীয় কুস্তিগির ছিলেন। এই বংশের ছোট গামা এবং হামিদও প্রথম শ্রেণীর মল্লযোদ্ধা ছিলেন। মাতুল অমৃতসরের সুলেমান যোধপুর মহারাজার মল্লনায়ক ছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে দশ বৎসর বয়সে মাতুলের নিকট যোধপুরে কুস্তিশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং আঠারো বৎসর বয়সে পেশাদারী কুস্তির আসরে নামিলে তাঁহার অপ্রতিহত জয়যাত্রার আরম্ভ হয়। কেবলমাত্র যোধপুরে চিরাগ আলীওয়ালা ও লাহোরে কিবোজ পালোয়ানের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সমান সমান থাকেন। পরে গোলাম কিক্কড় সিং-এর সহিত মোট চারিবার প্রতিযোগিতায় নামেন। প্রথমবার ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জম্মু শহরে প্রায় দুই ঘণ্টা লড়িয়া কিক্কড়কে পরাজিত করেন। পর বৎসর লাহোরে দ্বিতীয় সংঘর্ষে কিক্কড় গোলামকে বিরূপ অবস্থায় ফেলিলেও আধ ঘণ্টার মাথায় ভয়ে পিছাইয়া যাওয়ায় গোলামের জয় হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে তৃতীয় লড়াইটি দুই ঘণ্টা চলিয়াও অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরে শেষ লড়াইয়ে মাত্র কুড়ি মিনিটে গোলাম জয়ী হন। কিক্কড়-এর গুরুভাই করিম বকস গোলামকে বারংবার আহ্বান করিলেও নানা কারণে তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে গোলামকে পারী শহরে (প্যারিস) লইয়া যান এবং গোলামের পক্ষ হইতে পৃথিবীর যাবতীয় মল্লবীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। একমাত্র তুরস্কের কাডরা আলী ব্যতিরেকে কেহই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নাই। ইতিপূর্বে ভারত হইতে (দিগ্‌বিজয়ী হইবার উদ্দেশ্যে) কোনও গুরুজবন্ধ কুস্তিগির বিদেশে যান নাই। ইওরোপীয় কুস্তির নিয়মাদি গোলামের অগোচর থাকায় তুর্কি মল্লকে চিৎ করার প্রশ্নে মতানৈক্য হয়। শেষে উপস্থিত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে পুনরায় লড়াই হয়। গোলাম পুনর্যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়াই শোনা যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র সমর বসু, মল্লজগতে ভারতের স্থান, কলিকাতা, ১৯৫৬।

সমর বসু

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রী) জন্মস্থান যশোহর জেলার মনোহরপুর গ্রাম। রিপন কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। পরে বি. টি. পাশ করিয়া শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা স্কুল হইতে প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণীর রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম 'রক্তরাগ', 'খোশ্‌রোজ', 'হাস্নাহেনা', 'কাব্যকাহিনী', 'সাহারা', 'বুলবুলিস্তান' (সংকলনগ্রন্থ) 'বনি আদম' (১৯৫৮ খ্রী) এবং 'কাব্যে কোরআন'। উল্লেখযোগ্য

গদ্যগ্রন্থ হজরত মুহম্মদের জীবনী 'বিশ্বনবী'। তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ইসলাম ও প্রেম। পাকিস্তান-আন্দোলনের পটভূমিকায় তিনি প্রচুর ইসলামী সংগীত ও দেশাত্মবোধক গানও রচনা করিয়াছিলেন।

দ্র মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭; মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহম্মদ আবদুল হাই

গোলাম হোসেন খাঁ, সৈয়দ অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ১১৪০ হিজরা (১৭২৭ খ্রী) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়া ইনি পাটনায় বসতি স্থাপন করেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে অনেক নবাব, আমীর-ওমরাহ ও ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মুঙ্গেরে তাঁহার জায়গির ছিল, কিন্তু এক বন্ধুর জামিন থাকার ফলে সর্বস্বান্ত হন এবং ইংরেজ সেনাপতি গডার্ডের অধীনে চুনারে ও লখনৌ নগরীতে চাকুরি করেন।

'সিয়র-উল-মুতাখেরীন' ('আধুনিক কালের বিবরণ' বা 'আধুনিকগণের আচার-ব্যবহার') নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনাই তাঁহার প্রধান কীর্তি। ইহার প্রথম খণ্ডটি গ্রন্থকারের মূল আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকা স্বরূপ ও মৌলিকতা বর্জিত। ইহাতে সাধারণভাবে হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষের জনপদ ও নগরসমূহ, উৎপন্নদ্রব্যাদি, বিভিন্ন জাতি ও প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। এই খণ্ডের তথ্যভাগ ও বর্ণনাভঙ্গীর সহিত সুভান্ রায় কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত 'খুলাসাতুৎ-তওয়ারিখ্' গ্রন্থের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই গ্রন্থে তিনি ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল হইতে তাঁহার নিজের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার অনেক ঘটনাই তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার সমসময়কার— সুতরাং এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি। ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি পর্যবেক্ষণ শক্তি, সত্যনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অধীন থাকিলেও তাঁহাদিগের অপ্রীতিকর হইতে পারে এই আশঙ্কায় তথ্য গোপন করেন নাই বা তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অত্যুক্তি ও চাটুকারিতার আশ্রয় লন নাই। মীরকাশেম-এর নিকট সর্বদা সুবিচার না পাইলেও তাঁহার গুণাবলীর ন্যায্য প্রশংসা তাঁহার লেখনী হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ইংরেজ মহলে তাঁহার সুনাম ও প্রতিপত্তি এবং ইংরেজ রাজপুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল; তথাপি বার দফা নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনের কুফল তিনি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তির গভীরতা ও মনের বিশ্লেষণধর্মিতা উত্তম রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের সংকীর্ণ ধর্মনীতির তিনি যে প্রকার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার নিরপেক্ষ ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা ও রচনাশৈলী সরল দৃঢ়সংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট অর্থবহ। এই সকল কারণে ঐতিহাসিক রূপে তিনি মেকলে, জেম্‌স মিল, উইল্‌সন, চার্লস স্টুয়ার্ট, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আধুনিক মনীষীবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি ১১৯৪ হিজরা (১৭৮০ খ্রী) এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন এবং পরবর্তী বৎসর ইহা শেষ হয়। পারসীক ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। হাজি মুস্তাফা এই ছদ্মনামধারী ফরাসী রেমণ্ড ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। উত্তরকালে জন ব্রিগ্‌স ইহার একটি নূতন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে তৎপর হন, কিন্তু প্রস্তাবিত অনুবাদের মাত্র প্রথম খণ্ডটি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হওয়ার পর এই অনুবাদ কার্য বন্ধ হইয়া যায়। লখনৌ নিবাসী মুনশী নওলকিশোরের যত্নে এই গ্রন্থের একটি উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] 'বঙ্গাল' নামী হোসেন ও মৌলবী আবদুল করিম যথাক্রমে 'খুলাসাতুৎ-তওয়ারিখ্' ও 'জুবদাতুৎ-তওয়ারিখ্' নামে ফারসী ভাষায় এই গ্রন্থের দুইটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করিয়াছেন। গোলাম হোসেন তাঁহার মূল গ্রন্থে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী সংযোগ করিয়াছিলেন। প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে বা অনুবাদগুলিতে এখন আর ইহা দৃষ্ট হয় না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক অ্যানুয়াল রেজিস্টার' পত্রিকায় এই অংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রেমণ্ড-এর দুষ্প্রাপ্য অনুবাদগ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত হয়।

দ্র 'Seir Mutaqherin', Raymond, tr., *Asiatic Annual Register*, 1801; H. M. Eliot and J. Dowson, *The History of India as told by its own Historians*, vol VIII, London, 1877.

রমেশচন্দ্র মজুমদার
দিলীপকুমার বিশ্বাস

গোলাম হোসেন সলীম জৈদপুরী (?-১৮১৭ খ্রী) অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষীয় মুসলমান ইতিবৃত্তকার।

অযোধ্যার অন্তর্গত জৈদপুর ইহার জন্মস্থান হওয়াতে ইনি 'জৈদপুরী' অভিধায় সুপরিচিত হইয়াছেন। ইনি পরবর্তী জীবনে উত্তর বঙ্গের মালদহে আসিয়া বসবাস করেন ও তথাকার ইংরেজ বাণিজ্যকুঠির অধ্যক্ষ জর্জ উড্‌নীর অধীনে ডাক মুনশী বা পোস্টমাস্টারের কর্মে অধিষ্ঠিত হন। অবশিষ্ট জীবন তিনি মালদহেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মালদহে অবস্থান কালে উড্‌নীর অনুরোধে তিনি ফারসী ভাষায় 'রিয়াজ উস সলাতীন' (রাজ্যোত্থান) নামক তাঁহার সুপরিচিত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে চারিটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল হইতে ইংরেজের অধিকার-প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত বঙ্গ দেশের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি ভূমিকায় গ্রন্থকার বঙ্গের ভৌগোলিক সীমানা ও পার্শ্ববর্তী দেশসকল, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, অধিবাসীবৃন্দের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও আচার-ব্যবহার, গুরুত্বপূর্ণ নগরাদি ও মুসলমান-পূর্ব যুগের হিন্দুরাজগণের শাসনকাল সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। হিন্দু যুগ সম্পর্কে তাহার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থরচনা আরম্ভ করিয়া ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উহা সমাপ্ত করেন। 'রিয়াজ উস সলাতীন' ফারসী ভাষায় রচিত বঙ্গ দেশে মুসলমান-অধিকার কালের আদ্যোপান্ত বিবরণ সংবলিত একমাত্র ইতিহাস।

ঐতিহাসিক হিসাবে গ্রন্থকার যে সর্বদা মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন এ কথা বলা যায় না। তাঁহার গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে মনে হয় তিনি সম্ভবতঃ মধ্য যুগের প্রামাণিক ফারসী ইতিহাস-গ্রন্থগুলি হইতেই প্রধানতঃ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অপেক্ষাকৃত অপরিচিত অর্বাচীন ও প্রায় বিস্মৃত কিছু কিছু গ্রন্থের উপরও সময় সময় নির্ভর করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকালের বর্ণনে তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে সলিমুল্লাহ্‌ কর্তৃক ১৭৬৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'তারিখ ই বাঙ্গালা' গ্রন্থকে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত সম্ভবতঃ গৌড়-পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত বঙ্গে মুসলমান-শাসন কালের ক্ষোদিত লেখগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি ঐতিহাসিক সন-তারিখ নির্ণয়ের কিছু চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে 'রিয়াজ উস সলাতীন' তথ্য-গৌরবে হীন, বিস্তারিত বিবরণের ও কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। মৌলভি আবদুস সালাম কর্তৃক গোলাম হোসেন সলীমের গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। কতিপয় বিদগ্ধ মৌলভির সাহায্যে ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত ইহার এক সটীক বঙ্গানুবাদও নিজ-সম্পাদনায় প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'গোলাম হোসেন', সাহিত্য, সপ্তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত 'রিয়াজ্‌ উস সালাতিন' (সটীক বঙ্গানুবাদ), কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, *The Riyazu s-Salatin, A History of Bengal*, Maulavi Abdus Salam, tr, Calcutta, 1902-04

দিব্যসুন্দর বিশ্বাস

গোল্‌ড্‌স্ট্যুকর, থিওডোর (১৮২১-৭২ খ্রী) ঊনবিংশ শতকের প্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারততত্ত্ববিদ্‌। প্রুসিয়ার অন্তর্গত কোনিগসবের্গ শহরে এক জার্মান ইহুদীপরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কোনিগ্‌সবের্গ ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রথমোক্ত স্থানে অধ্যাপক রোজেন এান্‌ৎস ও অধ্যাপক পিটার্‌ ফন বোহ্‌লেনের নিকট যথাক্রমে তাহার দর্শন ও সংস্কৃতশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। পরে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক লেসেন ও সুবিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্‌ মনীষী লাসেনের নিকট উচ্চতর সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ের নিকট পারদর্শী হইয়া চর্চা করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কোনিগ্‌সবের্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠ সমাপনান্তে তিনি 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময় হইতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জ্ঞানতপস্বীর জীবন আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সংস্কৃতচর্চার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ তিনি কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের একখানি জার্মান অনুবাদ তদীয় দর্শন অধ্যাপক রোজেন্‌ক্রান্‌ৎসের ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন, এই গ্রন্থে অনুবাদকের নাম ছিল না। ঐ বৎসরেই তিনি প্যারীতে (প্যারিস) আসিয়া একাদিক্রমে তিন বৎসর তথায় বাস করেন ও প্রখ্যাত ফরাসী মনীষী ও ভারততত্ত্ববিদ্‌ বুর্নুফের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বুর্নুফ তাঁহার ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' (আঁত্রোদ্যুক্‌শিয় আ লিস্তোয়ার দ্য বুদ্ধিস্‌ম্‌ ইন্দিয়েঁ) শীর্ষক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থরচনায় গোল্‌ড্‌স্ট্যুকরের নিকট প্রভূত সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গোল্‌ড্‌স্ট্যুকর প্রথমবার ইংল্যাণ্ডে আগমন করিয়া অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান গ্রন্থাগারে ও লণ্ডনের ঈস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত প্রাচীন সংস্কৃত পুথির বিপুল সংগ্রহদ্বয় পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান। ১৮৪৫ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্বদেশ জার্মানিতে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে বেলিনে তিনি আলেক-

জাণ্ডার ফন্ হুমবোলতের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন ও শেষোক্ত মনীষীর 'কস্‌মস্' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের ভারতীয় প্রসঙ্গের সংকলনে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু উদার রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদপোষণের অপরাধে ক্রমশঃ তিনি তদানীন্তন জার্মানির শাসকবর্গের বিষদৃষ্টিতে পড়িতেছিলেন। সুতরাং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ মনীষী হোরেস হেম্যান উইল্‌সন তৎ-প্রণীত সংস্কৃত অভিধানের একটি নূতন সংস্করণের প্রণয়ন কার্যে গোল্‌ড্‌স্ট্যুকরের সাহায্য চাহিয়া তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডে আহ্বান করিলেন, তখন তিনি সাগ্রহে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক ইংল্যাণ্ডের স্থায়ী অধিবাসী হইতে দ্বিধা করেন নাই। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে উইল্‌সনের প্রস্তাবক্রমে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে অবশিষ্ট জীবনই গোল্‌ড্‌স্ট্যুকরের সংস্কৃত ও ভারতীয় বিদ্যাচর্চার পূর্ণ পরিণতির পর্ব। দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার সুবিস্তীর্ণ অধ্যয়ন, সাহিত্যজ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং উৎকর্ষের মান সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষাকে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইতে বাধা দিয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উইল্‌সন প্রণীত সংস্কৃত অভিধানের পুনঃসম্পাদন কার্যে ব্রতী হন। কিন্তু নিজ পরিকল্পনানুযায়ী ইহাতে তিনি এত নূতন শব্দ ও সেগুলির বিচিত্র প্রয়োগ সকল উদাহরণসহকারে সন্নিবিষ্ট করিতে লাগিলেন যে ১৮৫৬-৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'অ' সংবলিত অংশটুকুই মাত্র ৪৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল, অতঃপর এই উদ্যম পরিত্যক্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গোল্‌ড্‌স্ট্যুকরের সাধারণ সম্পাদনায় লণ্ডনে এক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশন সমিতি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তিনি মাধবাচার্যের মীমাংসা দর্শন-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন, এ কার্যও তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক কাওয়েল (১৮২৬-১৯০৩ খ্রী) তাহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোল্‌ড্‌স্ট্যুকর 'মানবকল্পসূত্র' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থের কুমারিলের টীকাসহ একটি লিথো সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং ইহার ভূমিকাস্বরূপ পাণিনির সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্পর্কিত তাঁহার গবেষণাগ্রন্থটিও 'পাণিনি অ্যাণ্ড হিজ প্লেস ইন স্যানস্ক্রিট লিটারেচার' স্বতন্ত্র প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থখানি পাণিনীয় ব্যাকরণে গোল্‌ড্‌স্ট্যুকরের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে তিনি বেবর, মাক্স্ ম্যুলর, রোট্ ও ব্যট্‌লিঙ্ক প্রমুখ সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মত খণ্ডনপূর্বক স্বীয় মত স্থাপন করিতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, যদিও তাঁহার সমুদয় সিদ্ধান্ত পরবর্তী বিদ্বন্মণ্ডলী-কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব হইতে তিনি তদানীন্তন ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কৈয়ট ও নাগোজিভট্টের টীকা সমেত পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্যের একটি সংস্করণ প্রণয়নের কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রাচীন হিন্দু-ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার এতাদৃশ অধিকার ছিল যে তদানীন্তন প্রিভি কাউন্সিল প্রয়োজনানুসারে হিন্দু আইনঘটিত প্রশ্নে প্রামাণ্যজ্ঞানে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। 'লিটেরারি রিমেইনস' শীর্ষক তাঁহার প্রবন্ধসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু আইনসংক্রান্ত তাঁহার তিনটি আলোচনা সংকলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানা দিক সম্পর্কে 'চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া' নামক ইংরেজী বিশ্বকোষে তিনি অনেকগুলি নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এগুলিও উক্ত প্রবন্ধসংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত। ইংল্যাণ্ডের 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি', 'ফিলোলজিক্যাল সোসাইটি' প্রভৃতির সভ্যরূপে তিনি এইসকল সমিতির অধিবেশনে অসংখ্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার মূল গবেষণাপ্রকাশের পূর্বে এগুলি মুদ্রিত করিতে তিনি স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার অপরাপর বহু পরিকল্পনার মত ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণা প্রকাশের পরিকল্পনাটিও কার্যে পরিণত হয় নাই।

গোল্‌ড্‌স্ট্যুকরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষা সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে কিছু অসহিষ্ণুতা থাকায় জ্ঞানের রাজ্যে সমকালীন অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহাকে বিতর্কে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অসহিষ্ণুতার জন্যই তিনি আলোচনাকালে হয়ত ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। কালের বিচারে তাঁহার রচনাবলী ও মতামতের মূল্যও এই কারণে কতকটা কমিয়া গিয়াছে। তথাপি নিষ্ঠা ও একাগ্রতার প্রতিমূর্তি, চিরকুমার এই জ্ঞানতপস্বীর স্মৃতি ভারতবাসীর নিকট একটি বিশেষ কারণে শ্রদ্ধার বস্তু। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগহেতু গোল্‌ড্‌স্ট্যুকর আধুনিক ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি প্রগাঢ় আত্মীয়তা অনুভব করিতেন। তৎকালীন ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের তিনি স্নেহশীল অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধান ও সৎপরামর্শ তাঁহাদের

প্রবাসী জীবনকে স্বতঃই মধুর করিয়া তুলিত। অপর কোনও পাশ্চাত্ত্য ভারততত্ত্ববিদ্ আধুনিক ভারত ও ভারতবাসীকে সম্ভবতঃ এত ভালবাসেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার একটি চতুর্দশপদী কবিতায় গোল্ড্‌স্টুকরকে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন তাহা তৎকালীন ইংল্যাণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রমাত্রেরই মনের কথা।

দ্র 'পণ্ডিতবর থিয়োডোর গোলড্‌ষ্টুকর', রহস্য সন্দর্ভ, ৭ম পর্ব, ৬৮ খণ্ড, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, 'পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্‌ড্‌স্টুকর', দেশ, ২৩ আশ্বিন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারত বিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫, 'Proceedings of the Fortyninth Anniversary Meeting of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland', *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland*, New Series, vol V, 1873, *Literary Remains of the Late Professor Theodore Goldstucker*, vols I-II, London 1879

দিলীপকুমার বিশ্বাস

গোল্লাছুট দেশজ খেলা। বাংলা দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে ইহা বৌবাসন্তী বা 'চি বুড়ি' নামেও পরিচিত। চল্লিশ পঞ্চাশ গজের ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি দলের মধ্যে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি দলের সংখ্যা সীমাবদ্ধ নহে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে খেলা হইয়া থাকে নিজ সীমানা হইতে দম লইয়া বিপক্ষদলের এক বা একাধিক খেলোয়াড়কে 'মোড়' করিয়া নিজ কোটে পাহারা দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হয়। অপর দলের কাজ হইল বন্দীদের উদ্ধার করা বা এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাহাতে বন্দী নিজেই বিপক্ষ দলের কোট হইতে পালাইতে পারে। ক্রমান্বয়ে খেলা চলিবার পর যে দল বিপক্ষ দলের সকল বা অধিকাংশ খেলোয়াড়কে আটক করিতে পারে সেই দল জয়ী সাব্যস্ত হয়। স্থলবিশেষে নিয়মের ইতরবিশেষ আছে।

মুকুল দত্ত

গোসাল মঙ্খলিপুত্ত পিতার নাম মংখলি (মঙ্খলি) এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল ভদ্দা (ভদ্রা)। একদিন তাঁহারা ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে বর্ষাগমে শ্রাবস্তী নগরের সন্নিকটে সরবণ নামক স্থানের গোবহুল নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের গোশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেই স্থানেই তাঁহাদের এই পুত্রের জন্ম হয়, গোশালাতে জন্ম হওয়াতে তাঁহার নাম রাখা হইল গোসাল এবং মঙ্খলির পুত্র বলিয়া তাঁহাকে বলা হইত মঙ্খলিপুত্র। মহাবীরের সন্ন্যাসগ্রহণের তৃতীয় বৎসরে নালন্দায় একদিন গোসালের সহিত মহাবীরের সাক্ষাৎ হয়। ইহারই নিকটে পণিয়ভূমী নামক গ্রামে গোসাল মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং দুই জনে একসঙ্গে তথায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার কিছুকাল পরে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয় এবং গোসাল শ্রাবস্তীতে যান। সেইস্থানে হালাহল নামক এক কুম্ভকারের বাটীতে ছয় মাস কঠোর তপস্যা করিয়া জিনত্ব প্রাপ্ত হন। জিনত্ব অবস্থায় তিনি 'আজীবিক' নামক এক নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহাবীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হন। একদিন শ্রাবস্তীতে আবার তাহার সহিত মহাবীরের সাক্ষাৎ হয়। তাহার সাত দিন পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। মোট ২৪ বৎসর কাল তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

দ্র উপাসকদশাসূত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় ও ভগবতীসূত্রের পঞ্চদশ শতকের প্রথম উদ্দেশ, A L Basham, *History and Doctrines of the Ajivikas*, London, 1951

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গোঁসাই গোস্বামীর অপভ্রংশ, প্রচলিত অর্থ গো (ইন্দ্রিয়) তাহার স্বামী, জিতেন্দ্রিয়। বাচস্পত্যাভিধানে ঐরূপ অর্থ দেখা যায়, কিন্তু 'অমরকোষ' বা হেমচন্দ্রের দেশী নামমালাতে ঐ অর্থ পাওয়া যায় না। হলায়ুধ উহার মানে দিয়াছেন গোপতি। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন— 'এ হর গোসাঞে নাহ'। এখানে গোসাঞি মানে স্বর্গের পতি বা ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে পারে, কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে শিব মোটেই জিতেন্দ্রিয়রূপে চিত্রিত হন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে গোঁসাই শব্দের খুব প্রচলন দেখা যায়। বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়ে গোঁসাই নামের প্রচলন আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ছয় আচার্য রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব গোঁসাই নামে নিত্য বন্দিত আছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাশীশ্বর, ভূগর্ভ, যাদবাচার্য ও গোবিন্দকেও গোঁসাই আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। (চৈ চ ১।৮।৬০-৬৩)। উত্তর পশ্চিম ভারতে তুলসী দাস গোস্বামী নামে পরিচিত। বল্লভাচার্যের পুত্র পৌত্রাদি বংশধরেরাও গোকুলের গোঁসাই নামে খ্যাত।

বিমানবিহারী মজুমদার

গোঁসাইথান (২৮°২১ ৭ উত্তর ও ৮৫°৪৬ ৫১ পূর্ব) নেপাল তিব্বত সীমান্তে লাঙ টাঙ হিমাল পর্বতশ্রেণীর

শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ৭৮৮৭ মিটার বা ২৬২৯১ ফুট। এই শৃঙ্গটিতে এখনও আরোহণ করা যায় নাই। গোঁসাইথান নামটির অর্থ 'সাধুদের বাসস্থান'। পূর্বে তিব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত 'শিসা পাঙ্‌মা' শৃঙ্গকেই গোঁসাইথান বলিয়া মনে করা হইত। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের জরিপ বিভাগ ইহার উচ্চতা প্রথম নির্ণয় করেন। ঐ বিভাগ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের উত্তরে ইহার অবস্থিতি অনুমান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই জন জার্মান বন্দী পিটার আউফশ্লাইটের ও হাইনরিকহারের দেরাদুন বন্দীশিবির হইতে পালাইয়া তিব্বতসীমান্তে কাইরঙ গ্রামে কিছুদিন অবস্থানপূর্বক এই শৃঙ্গটির স্থিতি সঠিকভাবে অনুসন্ধান করেন ও পূর্বের ধারণাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. ডব্‌লিউ. টিল্‌ম্যানের নেতৃত্বে একটি দল মধ্য-নেপাল অঞ্চল পরিদর্শন করেন। সেই সময় এই শৃঙ্গ সম্বন্ধে আরও বিশদ তথ্য সংগৃহীত হয়।

ত্রিশূলী গণ্ডকী নদীর উপনদী লাঙটাঙ খোলার উত্তরে লাঙ টাঙ হিমাল পর্বত অবস্থিত। এই পর্বতশ্রেণীর সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান শৃঙ্গ গোঁসাইথান। এই পর্বতের ৫৬ কিলোমিটার (৩৫ মাইল) দক্ষিণ পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বিখ্যাত তীর্থ গোঁসাইকুণ্ড হ্রদ অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা তিব্বত হইতে আগত মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা লাং টাঙ জাতি নামে পরিচিত।

দ্র P Lamden, *Nepal*, London, 1928 ; Kenneth Mason, *Abode of Snow*, London, 1955 ; D. Farbes *The Heart of Nepal*, London, 1962.

কমলা মুখোপাধ্যায়

গোসানী কুচবিহার জেলায় গোসানীমারী গ্রামে এক প্রাচীন দেবমন্দির আছে, মন্দিরস্থিত দেবীর নাম গোসানী। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই মন্দির নির্মিত হইলেও গোসানী দেবী তৎপূর্ববর্তী কাল হইতেই সেই গ্রামে পূজিত হইতেছিলেন, দেবীর নামেই গ্রামের নাম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দেবীর কোনও মূর্তি নাই; রুপার কৌটায় আবদ্ধ একটি কবচ গোসানী দেবী বলিয়া পূজিত হয়। এই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া 'গোসানী-মঙ্গল' নামে একটি কাব্য রচিত হইয়াছে, রচয়িতার নাম রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী, কুচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণের রাজত্বকাল অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ইহার রচনাকাল।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

গোসাপ সরীসৃপশ্রেণীর প্রাণী। ইহারা সাউরিয়া উপবর্গের (Suborder-Sauria) অন্তর্ভুক্ত ভারানস (Varanus) গণের প্রাণী। এই গণের অন্তর্ভুক্ত মোট ত্রিশটি প্রজাতির মধ্যে ভারত উপমহাদেশে পাওয়া যায় ছয়টি, বাংলা দেশে সচরাচর 'ভারানস মোনিটোর' (*Varanus monitor*) প্রজাতির গোসাপ দেখা যায়। গোসাপ দেখিতে অনেকটা টিকটিকি বা গিরগিটির মত, তবে আকারে অনেক বড — লেজসহ প্রায় ১৮০ সেন্টিমিটার (৬ ফুট) পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের জিহ্বার অগ্রভাগ চেরা, দেহ আঁশে আবৃত এবং গাত্রবর্ণ হলুদ, বাদামি, কালো অথবা মিশ্রিত। ইহাদের সাধারণ বাসস্থান মাঠ বা ঝোপ-জঙ্গলে গর্তের ভিতর, তবে ইহারা গাছেও উঠিতে পারে, জলেও নামিতে পারে। ছোট জীবিত প্রাণী, তাহাদের ডিম এবং মৃত শরীর ইহাদের খাদ্য। সাধারণ ধারণা অনুরূপ হইলেও আসলে ইহাদের বিষ নাই। ফসলের ক্ষতিকারক বিভিন্ন প্রাণীকে খাইয়া ফেলিয়া গোসাপ মোটের উপর মানুষের উপকারই করে। ইহাদের চামড়া দিয়া নানা প্রকার শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

দ্র M. A. Smith, *Fauna of British India Reptilia and Amphibia*, vol. II, London, 1935.

বংশীধর হাজরা

গোসাবা চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত সুন্দরবনে অবস্থিত একটি গ্রাম। ক্যানিং হইতে মোটরলঞ্চ-যোগে গোসাবায় যাওয়া যায়। এইখানে সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ-আবাদ প্রবর্তনের জন্য স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন বাংলা দেশের গভর্নমেন্টের নিকট হইতে বহু জমি গ্রহণ করিয়া একটি আদর্শ কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি শিক্ষিত ও ভদ্র বেকার যুবকগণকে অতি সুলভে বাসস্থান ও কৃষিকার্য করিবার জন্য জমি বিলির ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়া থাকে। সুন্দর পথঘাট, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, যৌথ ভাণ্ডার, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত প্রভৃতি থাকায় গোসাবা একটি উন্নত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। গোসাবার আয়তন প্রায় ৩১৫ হেক্টর (৭৮৮'১১ একর) জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে ১২১৪ জন, তন্মধ্যে ৪০৩ জন শিক্ষিত।

দ্র পূর্ববঙ্গ রেলপথ প্রচার বিভাগ, বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪০ ; A. Mitra, *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : 24 Parganas*, 1954.

উষা সেন

গৌড় পশ্চিম বাংলার মালদহ-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রাচীন গৌড় দেশ অবস্থিত ছিল। অনেকে মনে করেন, এই দেশের রাজধানী (অর্থাৎ মালদহের অন্তর্গত গৌড়) খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে রচিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে গৌড়পুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীর গৌড়পুর উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সর্বপ্রথম আমাদের গৌড় দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং গুড় উৎপাদনের প্রাচুর্যই গৌড় নামোৎপত্তির কারণ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড় দেশে শশাঙ্ক নামক জনৈক মহাপরাক্রান্ত নরপতি রাজত্ব করিতেন। বিহার ও দাক্ষিণ ওড়িশা তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং উত্তর প্রদেশেও তিনি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়েই গৌড় কবিগণের রচনাশৈলীর সর্বভারতীয় খ্যাতি দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সুযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরকে কেন্দ্র করিয়া স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। শশাঙ্কের পূর্বে যাঁহারা কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে গোপচন্দ্র সুবিখ্যাত। মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও ওড়িশার কিয়দংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

গৌড়ের রাজনৈতিক মর্যাদাবৃদ্ধির ফলে ক্রমে পূর্ব ভারতের রচনারীতি, ভাষা এবং বর্ণমালা গৌড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং গৌড় বলিতে পূর্ব ভারত বুঝাইতে থাকে। আবার সমগ্র উত্তর ভারত বুঝাইতেও কদাচিৎ গৌড় নামের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু মধ্য যুগে সাধারণতঃ বাংলার পশ্চিমাঞ্চল গৌড় এবং পূর্বাঞ্চল বঙ্গ নামে অভিহিত হইত, কখনও বা সমগ্র বাংলা দেশ বুঝাইতেও গৌড় কিংবা বঙ্গ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়রাজগণ পূর্ব মালবের উত্তরকালীন গুপ্তরাজাদিগের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া কামরূপের ভৌমনারক বংশ এবং উত্তর প্রদেশের মৌখরি বংশের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মহাসেনগুপ্তের সাহায্যপুষ্ট গৌড়রাজ কামরূপের সুস্থিতবর্মা ও তদীয় পুত্রগণকে পরাজিত করিয়া কামরূপ অধিকার করেন এবং কয়েক বৎসর পরে শশাঙ্কের সহায়তায় মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কান্যকুব্জ জয় করেন। কিন্তু শীঘ্রই গ্রহবর্মার শ্যালক থানেশ্বরপতি হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া উত্তর প্রদেশে ও বিহারে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। তদানীন্তন গৌড়েশ্বরকে এই মিত্রদ্বয়ের নিকট অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হর্ষ ও ভাস্করের মৃত্যুর পর গৌড়রাজ পুনরায় মগধে আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মা মগধেশ্বর গৌড়রাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে বাংলায় অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে অরাজকতা দূর করিবার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ গোপাল নামক জনৈক নায়ককে রাজা নির্বাচিত করেন। এই গোপাল বাংলা ও বিহারের সুবিখ্যাত পাল-রাজবংশের স্থাপয়িতা। পালরাজগণকে গৌড়, বঙ্গ এবং বঙ্গাল দেশের অধীশ্বর বলা হইত। গোপালের পুত্র ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রী) পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি শশাঙ্কের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং শশাঙ্কের মতই উত্তর প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন এবং নিজের আশ্রিত চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই রাজস্থানের গুর্জর প্রতীহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া বিহারের অন্তর্গত মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) পর্যন্ত অগ্রসর হন। পালরাজগণ পশ্চিম বিহার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মপালের প্রপৌত্র নারায়ণপাল (আনুমানিক ৮৫৪-৯১০ খ্রী) দ্বিতীয় নাগভটের প্রপৌত্র প্রথম মহেন্দ্রপালের হস্তে পরাজিত হন এবং কিয়ৎকালের জন্য বিহার এবং উত্তর বাংলায় গুর্জর প্রতীহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তরকালীন পালরাজগণের মধ্যে প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৮৮-১০৩৮ খ্রী) বাংলার কম্বোজ ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিদিগকে দমন করেন এবং তীরভুক্তি ও বারাণসীর অধিকার লইয়া কলচুরিবংশীয় গাঙ্গেয়দেবের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। মহীপালের পুত্র নয়পাল গাঙ্গেয়ের পুত্র কর্ণের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নয়পালের পৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল প্রজাবিদ্রোহে নিহত হন। ফলে উত্তর বাংলায় কৈবর্তজাতীয় দিব্বোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়

মহীপালের ভ্রাতা রামপাল (আনুমানিক ১০৮০-১১২৩ খ্রী) কৈবর্তরাজ ভীমকে নিহত করিয়া বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি গৌড় নগরের নিকটে রামাবতী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

পালবংশীয় মদনপালের রাজত্বকালে (১১৪৩-৬১ খ্রী) বাংলা দেশে সেনবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বিহারে গাহড়বাল-রাজগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি সেনরাজের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ক্রমে সেনরাজগণ গৌড়েশ্বর রূপে উল্লিখিত হইতে থাকেন এবং লক্ষ্মণ সেন (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৬ খ্রী) গৌড়ের পার্শ্বে লক্ষ্মণাবতী নগরী স্থাপন করেন। তিনি পশ্চিম বিহারে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন এবং অনুগত পালরাজের সাহায্যার্থে গাহড়বাল-নরপতির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পূর্বে তুর্কীজাতীয় মুসলমান সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খলজী বিহার অধিকার করিলেন। কয়েক বৎসর পর লক্ষ্মণ সেন তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে পলায়ন করেন এবং পশ্চিম বাংলায় তুর্কী মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী হইতে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে গৌড়ের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইতেন।

গৌড়ের মুসলমান শাসকেরা দিল্লীর সুলতানের অধীন ছিলেন; কিন্তু সুযোগ পাইলেই তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন। সুলতান ঘিয়াস উদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৭ খ্রী) গৌড়ের বিদ্রোহী শাসক তুগ্রিল খাঁকে নিহত করিয়া স্বীয় পুত্র বুঘ্‌রা খাঁকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন; পরে বুঘ্‌রা খাঁ এবং তদীয় বংশধরগণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সমগ্র বাংলা দেশে মুসলমান-অধিকার প্রসারিত হইবার পর তুঘলুক সুলতানগণের আমলে পশ্চিমে গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী, পূর্বে সোনারগাঁ এবং দক্ষিণে সপ্তগ্রাম, এই তিন স্থানে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহাতেও বিদ্রোহের সম্ভাবনা নির্মূল হয় নাই। তুঘলুক-আমলেই ফকরুদ্দীন ইলিয়স্ শাহ্ (আনুমানিক ১৩৪২-৫৭ খ্রী) সমগ্র বাংলার স্বাধীন সুলতান হন। ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর গণেশ নামক উত্তর বাংলার এক হিন্দু জমিদার ইলিয়স্ শাহের বংশধরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় পুত্র যদু বা জলাল উদ্দীনকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ স্বয়ং রাজা হইয়া পাণ্ডুনগর (গৌড়ের পার্শ্ববর্তী পাণ্ডুয়া), সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম টাঁকশাল হইতে দনুজমর্দনদেব নামে মুদ্রা প্রচারিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই গৌড়ে মুসলমান-অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড়ের সিংহাসন হাবশী মুসলমানদিগের করতলগত হওয়ায় দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। অতঃপর রাজ্যের প্রধানেরা আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌কে গৌড়ের রাজা নির্বাচিত করেন। আনুমানিক ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের সুরবংশীয় পাঠান শের খাঁ গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ আকবর বাংলা দেশ অধিকার করেন। মোগল-আমলে গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব বিলুপ্ত হয়। রাজমহল, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদে ক্রমান্বয়ে মোগল-বাংলার শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গৌড়ের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জন্য 'ধর্মপাল', 'নসরৎ শাহ্', 'পাণ্ডুয়া', 'পালবংশ', 'বল্লাল সেন', 'শশাঙ্ক', 'সেনবংশ', ও 'হুসেন শাহ্' প্রভৃতি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

দ্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১-২ ভাগ, কলিকাতা, ১৯৩০, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ; *Cambridge History of India*, vol. III, 1928; Dacca University, *History of Bengal*, vols. I-II, Dacca, 1943, 1948; R. C. Majumdar, ed., *History and Culture of the Indian People*, vols. III & VI, Bombay, 1954, 1960; D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1960.

দীনেশচন্দ্র সরকার

প্রাণচাঞ্চল্যহীন বর্তমান গৌড় ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ; চারি দিকে ভগ্ন সৌধ ও শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণী। বহু স্থল ইষ্টকে পরিপূর্ণ। ইতস্ততঃ প্রাপ্ত পাল ও সেন -যুগের দেব-দেবীর মূর্তি এই রাজবংশদ্বয়ের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষ্য প্রদান করে। মুসলিম সৌধাবলীর গাত্রে দেখা যায় প্রাক্তন হিন্দু-মন্দিরের ক্ষোদিত প্রস্তর ও মূর্তি। নগর-প্রাকারের উত্তর দিকে বল্লালবাড়ি-নামধেয় স্থলটি সেনরাজ বল্লাল সেনের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

মুসলিম যুগের সৌধসংখ্যা যথেষ্ট ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ -কর্তৃক সংরক্ষিত হইবার পূর্বে বহু বৎসর ধরিয়া ইষ্টক অপসারণের ফলে অনেক সৌধ আজ বিলুপ্ত। গ্রান্ট সাহেবের রিপোর্ট হইতে জানা যায় মুর্শিদাবাদের নিজামৎ দপ্তর স্থানীয় জমিদারদের সৌধ ভাঙিয়া প্রস্তর ও মিনা-করা ইট লইবার অনুমতি দিয়া প্রতি বৎসর বহু টাকা উপার্জন করিত। ইহা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি মসজিদ ও সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান। এইসকল সৌধ ও ভগ্নাবশেষ শুধু যে

প্রাক্তন সমৃদ্ধির পরিচয় দেয় তাহা নহে, ইহা হইতে সমসাময়িক স্থাপত্য-রীতি ও অলংকরণের ধারণা জন্মে। সৌধাবলীর অবস্থিতি ও নগর-প্রাকার হইতে জানা যায় মুসলিম যুগে গৌড় নগরীর আয়তন যথেষ্ট ছিল, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩ কিলোমিটার (২ মাইল)। নগর-প্রাকারের বহির্ভাগে, বিশেষ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বসতি ছিল আরও অনেক দূর পর্যন্ত। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার দিকে শাসক-বর্গের প্রখর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কোতোয়ালী দরওয়াজা প্রভৃতি কতিপয় সুদৃঢ় তোরণ দ্বারের মাধ্যমে গঙ্গা ও মৃত্তিকার প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত নগরীর সঙ্গে বহিরাঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। নগর-প্রাকারের অভ্যন্তরে ছিল পরিখা ও প্রাকার -বেষ্টিত অন্তর্দুর্গ শাসকদের বাস-ভূমি ও কর্মস্থল। দুর্গ প্রাকারের উচ্চতা ৯ মিটারের (৩০ ফুট) অধিক, চওড়ায় ইহার নিম্নতম অংশ ৫৭ মিটারের (১৯০ ফুট) মত, প্রতি কোণে বুরুজ। অন্তর্দুর্গের প্রবেশিকাগুলি ইষ্টক-নির্মিত ও সুদৃঢ়। দাখিল, লুকোচুরি ও গুমতি দরওয়াজা প্রভৃতি তোরণদ্বার হইতে শাসকদের উত্তম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রহরীকক্ষ সংবলিত বিরাট দাখিল দরওয়াজা (সলামী দরওয়াজা নামেও খ্যাত) আজও দর্শকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গুমতি দরওয়াজার মিনা করা ইটের সাহায্যে অলংকরণ দর্শনীয়। সুউচ্চ ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ ও দরবারগৃহ এখন ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীরের কিছু অংশ অদ্যাপি বিদ্যমান, বাইস-গজী নামে উক্ত এই অংশটির বর্তমান উচ্চতা প্রায় ১৩ মিটার (৪২ ফুট)। রাজপথের মধ্যে মধ্যে মুসলিম যুগের ক্ষুদ্রাকার সেতুর চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

স্থাপত্যকৃতি মুখ্যতঃ ইষ্টকের। প্রস্তরের ব্যবহার সীমিত। সৌধাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: ১. সুলতান নুসরৎ শাহ্-কর্তৃক ইষ্টকনির্মিত ও প্রস্তর-আচ্ছাদিত বিশাল জামী মসজিদ (বারাদ্বারী ও বড় সোনা মসজিদ নামে পরিচিত, নির্মিত হয় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে) ২. প্রায় ২৪ মিটার (৮০ ফুট) উচ্চ ফিরুজ-মিনার (নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতক) ৩. সুলতান নুসরৎ শাহ্-কর্তৃক নির্মিত কদম রসুল (১৫৩১ খ্রী) ৪. দো-চালা ঘরের অনুকরণে ইষ্টকনির্মিত ফতে খানের সমাধিগৃহ ৫. চীকা মসজিদ নামে পরিচিত একগুম্বজবিশিষ্ট চতুষ্কোণ বিরাট সৌধ। সাধারণের বিশ্বাস, ইহা ছিল বন্দীশালা, পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি-সৌধের সহিত ইহার সাদৃশ্যবশতঃ অনেকে অনুমান করেন মূলে ইহা সমাধি-সৌধ ছিল, যদিও ইহাতে কোনও সমাধির চিহ্ন নাই ৬. চামকাটি মসজিদ (আনুমানিক ১৪৭৫ খ্রী) ৭. তাঁতীপাড়া মসজিদ (আনুমানিক ১৪৮০ খ্রী) ৮. মিনা করা ইটের জন্য প্রসিদ্ধ লট্টন মসজিদ (আনুমানিক ১৪৭৫ খ্রী) ৯. গুণমন্ত মসজিদ (আনুমানিক ১৪৮৪ খ্রী)। নগর পরিধির বহির্ভাগের সৌধাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম হইতেছে কোতোয়ালী দরওয়াজার প্রায় ১·৬ কিলোমিটার (১ মাইল) ১০. দক্ষিণে (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী) রাজত্বকালে নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ।

গৌড় এলাকার অন্তর্গত রামকেলির তমালতলা বৈষ্ণবদের নিকট অতি পবিত্র স্থান। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রী) বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে জ্যৈষ্ঠ মাসে এই তমালতরুতলে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় সুলতানের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার ধর্মালাপ হয়, চৈতন্যদেবের স্থানত্যাগের পর তাঁহারা রাজকার্য পরিত্যাগ করেন ও চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া রূপ ও সনাতন নামে খ্যাত হন। চারিটি কেলি-কদম্ব বৃক্ষের মধ্য ভাগে তমালগাছটি বিরাজ-মান। রূপ সাগর ও সনাতন সাগর ভিন্ন শ্যামকুণ্ড, রাধা-কুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড নামক চারিটি ক্ষুদ্রাকার পুষ্করিণী তমালতলার সন্নিকটে বিদ্যমান, জনপ্রবাদ, জীব-গোস্বামী এই কুণ্ডগুলি খনন করাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের রামকেলিতে পদার্পণের স্মরণে আজও প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি বিরাট মেলা হয়।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India*, *Report*, vol XV, Calcutta, 1882, M Abid Ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua*, Calcutta, 1931.

গৌড়পাদ প্রাচীন অদ্বৈতসম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য। সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যে শ্রীশংকরাচার্যের 'পরমগুরু'।

অথর্ববেদীয় 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ'-এর উপর গৌড়পাদ একটি বিবরণাত্মক কারিকা-গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা চারিটি প্রকরণে বিভক্ত: ১. আগম (২৯ কারিকা) ২. বৈতথ্য (৩৮ কারিকা) ৩. অদ্বৈত (৪৮ কারিকা) ৪. অলাতশান্তি (১০০ কারিকা), মোট কারিকা ২১৫।

ইহার মধ্যে আগম প্রকরণেই মূল উপনিষদের ১২টি মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অপর তিনটি প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা শ্রুতির প্রতিপাদ্য অর্থ

সমর্থন করা হইয়াছে। মূল উপনিষদের গদ্যময় মন্ত্রগুলি ও সমগ্র 'গৌড়পাদ-কারিকা'র উপর শ্রীশংকরাচার্যের ভাষ্য আছে।

গৌড়পাদ নামক কোনও গ্রন্থকারের নামে উক্ত গৌড়পাদকারিকা ব্যতিরেকেও অন্যান্য গ্রন্থ প্রচলিত আছে: ১. উত্তরগীতা-বৃত্তি ২. সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য ৩. নৃসিংহপূর্বতাপিনী-উপনিষদ্-ভাষ্য ৪. দুর্গাসপ্তশতী-ভাষ্য ৫. সুভগোদয় ৬. শ্রীবিদ্যা-রত্নসূত্র। এইসকল গ্রন্থের রচয়িতা ও গৌড়পাদকারিকার রচয়িতা এক নাও হইতে পারেন, ইহা পণ্ডিতসমাজের মত।

গৌড়পাদকারিকার রচয়িতা গৌড়পাদ অবিসংবাদিরূপে এক অতি প্রাচীন অদ্বৈতবাদের আচার্য। তবে গৌড়পাদ নামে মাত্র একজন গ্রন্থকার বা আচার্যকে না বলিয়া একটি সম্প্রদায়গত মতবাদের বিভিন্ন আচার্যকে উল্লেখ করা হইয়া থাকিতে পারে।

দ্র Max Walleser, *Der altere Vedanta*, Heidelberg, 1910; Swami Nikhilananda, *Mandukyopanisad with Gaudapada's Karika and Samkara's Commentary*, Mysore, 1936; Vidhusekhara Bhattacharya, *The Agamashastra of Gaudapada*, Calcutta, 1943; T. M. P. Mahadevan, *Gaudapada: A study in Early Advaita*, Madras, 1960.

ব্রতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

গৌড় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ দ্র

গৌড়ী সংস্কৃত ভাষায় এক বিশিষ্ট রচনারীতির নাম গৌড়ী। প্রাচীন আলংকারিকেরা সেকালের গৌড় দেশের অর্থাৎ পূর্ব ভারতের (আধুনিক বাংলা-বিহার-ওড়িশা-আসাম) কবিদের সংস্কৃত ভাষায় একটি বিশেষ ঝোঁকের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীনতম আলংকারিক দণ্ডী গৌড়ী রীতির এই তিনটি বিশেষত্ব নির্দেশ করিয়াছেন —অনুপ্রাসবাহুল্য-প্রিয়তা, দুরূহ শব্দের বহুলতা এবং শ্লেষ ও অতিশয়োক্তি প্রিয়তা (কাব্যাদর্শ, প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৪, ৪৫, ৫৪, ৯২)।

পূর্ব ভারতে (অর্থাৎ আধুনিক বাংলা-বিহার-ওড়িশা-আসাম) প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা দণ্ডীর কাব্যাদর্শে গৌড়ী নামে উল্লিখিত। দণ্ডীর মতে শ্রেষ্ঠ এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত হইল মহারাষ্ট্রী এবং প্রধান আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা হইল শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটী ইত্যাদি। বররুচির প্রাকৃত প্রকাশে ও অন্যান্য প্রাকৃত ব্যাকরণে গৌড়ী প্রাকৃতের নাম পাওয়া যায় না। তবে কেহ কেহ গৌড়ী অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। দণ্ডীর গৌড়ী প্রাকৃত পরবর্তী বৈয়াকরণদের মাগধী প্রাকৃত বলিয়া মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার প্রমুখ পণ্ডিত লেখকেরা বাংলাকে গৌড়ীয় ভাষা বলিয়াছেন।

সুকুমার সেন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দ্র

গৌণ সমৃদ্ধি আকরিক খনিজ অবক্ষেপ (ডিপজিট) অনেক সময় ম্যাগমা-র প্রভাবে সৃষ্ট হয়। এইরূপ অবক্ষেপকে মুখ্য অবক্ষেপ (হাইপোজিন ডিপজিট) বলা হয়। মুখ্য অবক্ষেপ বিকীর্ণ খনিজ জল এবং বায়ুর প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী অঞ্চলে সমৃদ্ধ হইতে পারে। এই প্রক্রিয়াটিকে গৌণ সমৃদ্ধি (সুপারজিন এনরিচমেণ্ট) বলে।

উষ্ণ আবহাওয়ায় আকরিক খনিজগুলির রাসায়নিক বিকার ঘটে। ফলে কতকগুলি মৌল আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই দ্রবণ ফাটলযুক্ত শিলার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া জলপাঠ (ওয়াটার টেব্‌ল) পর্যন্ত নামে। জলপাঠের নীচে ইহা বিজারিত (রিডিউস্‌ড) হয় এবং অনেক যৌগ অধঃক্ষেপিত হয়। ফলে শিলাটিতে আপেক্ষিকভাবে অনেক মৌলের সমৃদ্ধি ঘটে।

এই পরিবর্তনের পর ভূপৃষ্ঠের উপর মুখ্য শিলাটি একটি বিশেষ গঠন ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে গস্যান (Gossan) বলে।

সাধারণতঃ গন্ধকঘটিত আকরে গৌণ সমৃদ্ধি বেশি ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইজাতীয় কোনও উল্লেখযোগ্য অবক্ষেপ নাই।

দ্র W. Lindgren, *Mineral Deposits*, U. S. A, 1933; A. M. Bateman, *Economic Mineral Deposits*, Bombay, 1962.

দীপংকর লাহিড়ী

গৌতম[১] শাস্ত্রে একাধিক গৌতমের উল্লেখ পাওয়া যায়: ১. ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদ গোতম ২. মন্ত্রদ্রষ্টা গোত্র-প্রবর্তক এবং সংহিতাকার ৩. রামায়ণোক্ত অহল্যাপতি ৪. মহাভারতে কৃপাচার্য ৫. জনক-বংশের পুরোহিত শতানন্দ ৬. মৎস্যপুরাণে ঋষি দীর্ঘতমারও গোতমত্বলাভ বর্ণিত হইয়াছে।

আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়দর্শনের সূত্রকার মহর্ষির নাম

গৌতম অথবা গোতম— ইহা লইয়া বিতর্ক আছে। সর্বদর্শন-সংগ্রহ, ন্যায়সূত্রবৃত্তি, ন্যায়সূচীনিবন্ধ, নৈষধচরিত ও বাচস্পত্যাদি গ্রন্থে মহর্ষিকে গোতম বলা হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, শিষ্য বেদব্যাস ন্যায়মত খণ্ডন করিলে মহর্ষি তাঁহার মুখদর্শন করিতে চাহেন নাই। শেষে ব্যাসদেবের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া যোগবলে পাদে অক্ষির সৃষ্টি করিয়া অক্ষপাদ নামে প্রসিদ্ধ হন। অন্যমতে দীর্ঘতমা ঋষিই সূত্রকার। সুরভির প্রসাদে অন্ধত্বমুক্ত হইয়া তিনি গোতম-রূপে খ্যাত হন ও তপস্যাবলে ব্রহ্ম লাভ করেন। জন্মান্ধ আচার্যরূপে অক্ষপাদ আখ্যা লাভ করেন।

ন্যায়দর্শন পাঁচটি অধ্যায়ে ও দশটি আহ্নিকে বিভক্ত। সমুদয়ে ৫৩৮টি (অথবা ৫২১টি) সূত্র আছে। জ্ঞান কিরূপে অনুকূল ও প্রতিকূল তর্কদ্বারা বিশুদ্ধ ও ভ্রমশূন্য হয় তাহাই ইহার প্রতিপাদ্য।

দ্র নরেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ, অক্ষপাদ গোতম, কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায় পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

গৌতম² বিখ্যাত গোত্রপ্রবর্তক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং বিংশতিসংখ্যক ধর্ম-সংহিতাকারগণের অন্যতম। অনেকে বলেন ভরদ্বাজ ইহারই নামান্তর। গৌতমপ্রণীত ধর্মসূত্র এবং সংহিতা উভয় শাস্ত্রই বর্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্মসূত্রকার এবং সংহিতাকারকে কোনক্রমেই এক যুগের বলা চলে না। ইয়লি (Jolly) গৌতমধর্মসূত্রের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী। গৌতম-সংহিতার ভাষা আধুনিক এবং বক্তব্য বিশেষত্ব-বর্জিত। ইহা গদ্যে ঊনত্রিশ অধ্যায়ে রচিত। রচনাকাল হিন্দুযুগের, সম্ভবতঃ হিন্দুযুগের মধ্য বা শেষ ভাগ।

দ্র পঞ্চানন তর্করত্ন, ঊনবিংশ সংহিতা মূল ও অনুবাদ, কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি অন্ধ্রজাতীয় শাতবাহন রাজবংশ কাণ্ববংশীয় রাজগণের সামন্তরূপে প্রতিষ্ঠান নগরীতে (বর্তমান মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত ঔরঙ্গাবাদ জেলার পৈঠন গ্রামে) রাজত্ব করিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে অন্তিম কাণ্বরাজকে উৎখাত করিয়া যখন শাতবাহনবংশীয় সিমুক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তর দিকে মালব এবং গুজরাতের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই সময়ে শকেরা সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যকা হইতে রাজ্য বিস্তার করিতে-ছিল। ক্রমে মালব-গুজরাত-রাজস্থান অঞ্চলে একটি শক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ভারতের এই শকরাজগণ শীঘ্রই শাতবাহনদিগকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণে মহারাষ্ট্র প্রদেশের নাসিক-পুনা অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করিয়া লন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে শাতবাহনবংশে একজন মহাপরাক্রান্ত নরপতির আবির্ভাব ঘটে। তাহার নাম গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি (আনুমানিক ১০৬-৩০ খ্রী)। তিনি শকদিগকে পরাজিত করিয়া উত্তরে মালব এবং কাঠিয়াওয়াড় পর্যন্ত অধিকার করেন। এই অপূর্ব কৃতিত্বের জন্য উত্তর ভারতের শকারি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দক্ষিণ ভারতে শালিবাহন (শাতবাহন) নরপতির কিংবদন্তি গড়িয়া ওঠে।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি যে শকপতিকে উৎখাত করিয়াছিলেন, তিনি ক্ষহরাত বংশীয় মহাক্ষত্রপ নহপান। তাহার রাজধানী ছিল নর্মদা নদীর মোহানায় অবস্থিত ভৃগুকচ্ছ নগর। নহপানের জামাতা হিন্দুভাবাপন্ন ঋষভদত্ত শকরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে নাসিক-পুনা অঞ্চল শাসন করিতেন। ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত নহপানের রাজত্বকালীন লেখাবলীর তারিখ ৪১-৪৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১১৯-২৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৪ খ্রীষ্টাব্দে অথবা উহার অব্যবহিত পরে গৌতমীপুত্রের রাজত্বের ১৮শ বৎসরে তিনি শক, যবন এবং পহ্লবদিগকে পরাজিত করিয়া ক্ষহরাত বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। নহপানের রাজকোষ অধিকার করিয়া তিনি শকরাজ কর্তৃক প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা স্বনামাঙ্কিত করিয়া পুনঃপ্রচলিত করেন।

নাসিক গুহাতে প্রাপ্ত তাঁহার মাতা গৌতমী বলশ্রীর শিলালেখ হইতে তাহার পুত্র শাতকর্ণির সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির সাম্রাজ্য নিম্নলিখিত দশটি জনপদে বিভক্ত ছিল: ১. ঋষিক (কৃষ্ণা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত); ২. অশ্মক (প্রধান নগর— পোদন্য অর্থাৎ বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের নিজামাবাদ জেলাস্থিত বোধন); ৩. মূলক (প্রধান নগর— শাতবাহন বংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠান), ৪. সুরাষ্ট্র (প্রধান নগর— কাঠিয়াওয়াড়স্থিত জুনাগড়ের নিকটবর্তী প্রাচীন গিরি-নগর); ৫. কুকুর (উত্তর কাঠিয়াওয়াড়ের অংশ), ৬. অপরান্ত (প্রধান নগর শূর্পারক অর্থাৎ উত্তর কোঙ্কণের ঠানা জেলার অন্তর্গত সোপারা); ৭. অনূপ (প্রধান নগর— নর্মদা তীরবর্তী মাহিষ্মতী অর্থাৎ আধুনিক নিমাড় অঞ্চলস্থিত মান্ধাতা কিংবা মহেশ্বর); ৮. বিদর্ভ (আধুনিক বেরার), ৯. আকর (প্রধান নগর— বিদিশা অর্থাৎ পূর্ব-মালবের

অন্তর্গত ভেলসার নিকটবর্তী বেসনগর) এবং ১০. অবন্তি (প্রধান নগর— বর্তমান পশ্চিম মালবের অন্তর্গত উজ্জয়িনী)। ইহার মধ্যে সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, আকর এবং অবন্তি— এই ছয়টি জনপদ পূর্বে নহপানের অধিকারভুক্ত ছিল। যাহা হউক, উল্লিখিত দশটি জনপদ গৌতমীপুত্রের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু তিনি দাবি করিতেন যে, উত্তরে বিন্ধ্যপর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর— এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তাঁহার রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

পশ্চিম ভারতীয় জনপদসমূহের উপর শাতবাহন অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নহপান কনিষ্ক বংশীয় কুষাণ সম্রাটের সামন্ত ছিলেন, তাই গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি কর্তৃক তাঁহার পরাভবের সংবাদ পাইয়া কুষাণ-সম্রাট্ কার্দমকবংশীয় শক মহাক্ষত্রপ চষ্টনকে গৌতমীপুত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আনুমানিক ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির মৃত্যু ঘটিবার পূর্বেই চষ্টন এবং তদীয় পৌত্র রুদ্রদামা আকর, অবন্তি, অনূপ, আনর্ত, সুরাষ্ট্র, কুকুর এবং অপরান্ত অধিকার করিয়া লন। রুদ্রদামার একখানি শিলালেখে দাবি করা হইয়াছে যে, তিনি দুইবার যুদ্ধে দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণিকে পরাজিত করিয়াও সম্বন্ধের নৈকট্যবশতঃ তাঁহাকে উচ্ছেদ করেন নাই। এখানে যে নিকট সম্পর্কের উল্লেখ দেখা যায়, কান্‌হেরিতে প্রাপ্ত একখানি শিলালেখ হইতে উহার স্বরূপ বুঝা যায়। শক-শাতবাহন যুদ্ধের অবসানে যখন উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয় তখন গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির দ্বিতীয় পুত্র বাসিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণির সহিত রুদ্রদামার কন্যার বিবাহ হয়। যাহা হউক, রুদ্রদামা অপরান্ত জনপদের উপর আধিপত্য দাবি করিলেও, গ্রীক ভূগোলবেত্তা টলেমির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ঐ জনপদের উত্তরাঞ্চলস্থিত (বর্তমান গুজরাতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত) লাট দেশে মাত্র উজ্জয়িনীপতি চষ্টনের অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল ; প্রকৃতপক্ষে অপরান্তের বিস্তৃত অঞ্চলে শাতবাহন অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। নাসিক, পুনা ও ঠানা জেলায় গৌতমীপুত্রের উত্তরাধিকারীদের শিলালেখ এবং মুদ্রাদির আবিষ্কারেও টলেমির সাক্ষ্য সমর্থিত হয়।

দ্র R. G. Bhandarkar, *Early History of the Deccan*, Section IV, Poona, 1927 ; H. C. Ray Chaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1950 ; R. C. Majumdar, ed., *The Age of Imperial Unity*, Bombay, 1951 ; K. A. Nilakanta Sastri, ed., *Comprehensive History of India*, vol. II, Calcutta, 1957 ; G. Yazdani, ed., *The Early History of the Deccan*, part II, London, 1960 ; D. C. Sircar, 'Ariake', *Journal of Indian History*, vol. XLIII, 1965.

দীনেশচন্দ্র সরকার

গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২ খ্রী) কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ধর্মপ্রচারক ও গ্রন্থকার। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ঘোড়াচরা গ্রামে বৈদ্য পরিবারে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। পিতা গৌরমোহন রায়। খুল্লতাতের পোষ্যপুত্ররূপে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রংপুর হাই স্কুলে এনট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। কৈশোরের শেষে এক মুসলমান সাধুর নিকট 'দরশ' শিক্ষা করেন ও জপ অভ্যাস করিতে থাকেন। ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুলিশ বিভাগে সাব ইন্সপেক্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। অঘোরনাথ গুপ্তের প্রভাবে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরি ছাড়িয়া কেশবচন্দ্রের দলে যোগ দিয়া প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন ('কেশবচন্দ্র সেন' দ্র)। 'কমল কুটির'-সংলগ্ন প্রচারকদের আবাস 'মঙ্গল বাড়ি'তে গৌরগোবিন্দ বাস করিতেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পত্নীবিয়োগের পর 'প্রচারাশ্রমে' গিয়া বাস করেন এবং বিশ্রামহীন কর্মে নিবিষ্ট হন।

তাঁহার 'শ্লোক সংগ্রহ' (১৮৬৬ খ্রী) গ্রন্থের হিন্দু ধর্ম অংশের সংকলনে সহায়তা, 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার সম্পাদনা (১৮৮৯ খ্রী হইতে) 'ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়'-এর পরিচালনা প্রভৃতি কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম ধর্মের ভাবনামন্ত্র (মটো) 'সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রাহ্মমন্দিরম্' ইত্যাদি শ্লোকটি তাঁহারই রচনা। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যাতা নির্বাচন করেন এবং 'উপাধ্যায়' উপাধি দেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসমন্বয়ভাষ্য' (১৮৯৮ খ্রী), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রপূর্ত্তি' (১৯০২ খ্রী), 'বেদান্তসমন্বয়ভাষ্য' (১৯০৬ খ্রী), 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' (১৮৮৯ খ্রী), 'প্রেরিত কালীশংকর দাসের জীবন চরিত' (১৯০৩ খ্রী), 'আচার্য কেশবচন্দ্র' (১৯০৫ খ্রী) এবং 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার স্বভাব-নিষ্ঠযোগ' (১৯১০ খ্রী)।

জীবনের শেষ দুই বৎসর তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গভীর যোগসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, কলিকাতা, ১৯৬১।

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

গৌরদাস বসাক (১৮২৬-৯৯ খ্রী) কলিকাতার বড়-বাজারস্থ বিখ্যাত বসাক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজকৃষ্ণ বসাক। হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র কবিবর মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম গ্রহণ করিয়া বালেশ্বর, মালদহ, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করেন এবং তথাকার ঐতিহ্য ও প্রত্ন-বিষয়ে তথ্যমূলক প্রবন্ধ লেখেন, 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় তাঁহার এমন রচনা বিস্তর প্রকাশিত হয়। তাঁহার হাত দিয়াই মধুসূদন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি' কাব্যগ্রন্থখানি উপহার দেন। বেথুন গৌরদাসকে লেখেন মধুসূদন ইংরেজীর পরিবর্তে মাতৃভাষায় কাব্যগ্রন্থ লিখিলে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। এইরূপে প্রোৎসাহিত হইয়াই মধুসূদন বাংলা কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রবাসকালে বিপন্ন অবস্থায় মধুসূদনকে গৌরদাস সাহায্য করিয়াছিলেন।

নিজ সমাজের সংস্কারকল্পেও তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের একজন সমর্থক। বেলগাছিয়া ভিলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালায় অভিনীত 'রত্নাবলী'তে গৌরদাস যৌগন্ধরায়ণের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

গৌরদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বিলাতের ফিলসফিক্যাল সোসাইটি, বুদ্ধিস্ট টেক্‌স্‌ট সোসাইটি, বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জেনেরেল সেক্রেটারিরূপেও তিনি কিছুকাল কার্য করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বরে স্থাপিত পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি নামক সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সভার দীর্ঘকাল সভাপতি ছিলেন। তিনি বরাহনগরে একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও তিনি সদস্য ছিলেন। অবসরগ্রহণের পর তিনি কলিকাতায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি জে. পি.-ও হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, কলিকাতা, ১৮৯৩; নগেন্দ্রনাথ শেঠ, কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস, ১৯৫০; যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্য-সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৮, *Presidency College Register*, 1927.

যোগেশচন্দ্র বাগল

গৌরমোহন আঢ্য (১৮০২ ?-৪৬ খ্রী) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেকালের প্রসিদ্ধ ইংরেজী বিদ্যালয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ স্থাপিত হয়। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি (তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও আছেন) এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ গৌরমোহন-এর মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

যোগেশচন্দ্র বাগল

গৌরমোহন বিদ্যালংকার খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নদীয়া জেলার বজরাপুর গ্রামের এক পণ্ডিত-বংশে ইহার জন্ম। ইহার পিতা রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ ও পিতামহ কেবলরাম তর্কপঞ্চানন নাটোরের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকারের (১৭৭৫-১৮৪৬ খ্রী) অগ্রজ।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি' ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে গৌরমোহন বিদ্যালংকার এই প্রতিষ্ঠান দুইটির সহিত যুক্ত হলেন। তিনি 'স্কুলবুক সোসাইটির' গ্রন্থপ্রকাশনাদি কার্যে সাহায্য করিতেন এবং 'স্কুল সোসাইটি'র হেড পণ্ডিত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার কর্মপটুতার খুব সুনাম ছিল। গৌরমোহন বঙ্গ দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম। তিনি 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' (১৮২২ খ্রী) ও 'কবিতামৃতকূপ' (১৮২৬ খ্রী) নামে দুইখানি পুস্তক রচনা করেন।

১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'স্কুল সোসাইটি'র অর্থসংকট দেখা দেয় ও কয়েকজন প্রাচীন কর্মচারীকে বিদায় দিবার কথা ওঠে। গৌরমোহনের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া সোসাইটির কর্তৃপক্ষস্থানীয় ডেভিড হেয়ার ও পীয়ার্স বিদায় দিবার পূর্বে তাঁহাকে অন্যত্র চাকুরি যোগাড় করিয়া দিবার প্রস্তাব আনয়ন করেন। এই প্রস্তাবের ফলে কিছুদিন পরে রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় গৌরমোহন সুখসাগরে মুন্সেফ নিযুক্ত হন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১৭, কলিকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

গৌর, হরি সিং (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রী) বিখ্যাত আইনজ্ঞ শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। সাগর গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল, নাগপুর হিসলপ কলেজ ও পরে কেমব্রিজের ডাউনিং কলেজে তিনি বিদ্যা অর্জন করেন। লণ্ডনের ইনার টেম্পল হইতে তিনি ব্যারিস্টার হন। ১৯১৮ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নাগপুর পৌরসভার সভাপতি ছিলেন। গৌর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর। দ্বিতীয়বার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হইবার পরে তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯২১ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মধ্য প্রদেশ বিধান সভার বিরোধী দলের নেতৃত্ব করেন। তিনি এম্পায়ার পার্লামেণ্টারি অ্যাসোসিয়েশনের ভারতীয় শাখার সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং পার্লামেন্টের জয়েন্ট কমিটির প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পঞ্চবার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। গৌর ভারতের গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁহারই প্রবর্তনায় অসবর্ণ বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ২০ লক্ষ টাকা দান করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর। গৌর-প্রণীত 'ল অফ ট্রান্সফার ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' (৩ খণ্ড), 'পিনাল ল অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' (২ খণ্ড), 'হিন্দু কোড', 'দি স্পিরিট অফ বুদ্ধিজম', 'দি ট্রুথ অ্যাবাউট ইণ্ডিয়া', 'স্টোরি অফ দি ইণ্ডিয়ান রেভলিউশন' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

গৌরাঙ্গ চৈতন্যদেব দ্র

গৌরীদান অষ্টবর্ষীয়া কন্যার বিবাহদান। ইহা অতি প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত ছিল। অষ্টবর্ষীয়া কন্যা গৌরী, নববর্ষীয়া রোহিণী, দশবর্ষীয়া কন্যকা এবং তাহার বেশি বয়সের কন্যা রজস্বলা নামে অভিহিত হইত।

দ্র রঘুনন্দন, উদ্বাহতত্ত্ব, বিবাহকাল ও বিবাহপ্রশস্তকাল প্রকরণ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গৌরীদাস পণ্ডিত নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত। কবিকর্ণপুর ইঁহাকে ব্রজলীলায় সুবলসখা বলিয়াছেন। গৌর-নিত্যানন্দের মূর্তি বোধ হয় সর্বপ্রথম ইঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত এবং অম্বিকা-কালনায় এই মূর্তিদ্বয় এখনও পূজিত হয়। গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যদাস সারখেলের বসুধা ও জাহ্নবা নামে দুই কন্যাকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

> গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
> সংগীত প্রবন্ধে যাঁর পদে পদে ধ্বনি ॥

এখন পদকল্পতরুতে গৌরীদাসের মাত্র দুইটি পদ দেখা যায়। তাহার মধ্যে শ্রীরাধার অনুরাগের পদটি (পদকল্পতরু ১৬১) ভাবে ও ভাষায় অনবদ্য। অপর পদটি হাটপত্তনের।

বিমানবিহারী মজুমদার

গৌরীমা (১২৬৪-১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী গৌরীপুরী দেবী ১২৬৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যনাম মৃড়ানী, পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাতা গিরিবালা ছিলেন বিদুষী, সাধিকা এবং বহু ধর্ম-সংগীতের রচয়িত্রী। আঠারো বৎসর বয়সে গৌরীমাতা সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে এবং ভারতের অগণিত তীর্থে কঠোর তপস্যা করেন।

বাল্যে দীক্ষালাভের পর পচিশ বৎসর বয়সে গৌরীমা দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে গুরুসকাশে উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় বাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে এদেশীয় মাতৃজাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে নির্দেশ দেন। সেই অনুপ্রাণনাতেই তিনি ১৩০১ বঙ্গাব্দে গুরু পত্নীর নামে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। মাতৃজাতিকে শিক্ষাদান এবং ধর্মপথে ও স্বমহিমায় উদ্বুদ্ধ করাই তাঁহার আশ্রমপ্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহার মাতৃজাতিসেবার কীর্তি অদ্যাপি উত্তর কলিকাতায় এবং বিভিন্ন স্থানে দীপ্তিমান। গুরুনির্দিষ্ট লোককল্যাণ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আশি বৎসর বয়সে এই মহীয়সী তপস্বিনী ইহলোক ত্যাগ করেন।

তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা, তপস্বিনী, কর্মশীলা ও আচার্যা ছিলেন এবং তাঁহার বাগ্মিতা ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল অসামান্য।

সুব্রতাপুরী দেবী

গৌরীশংকর ৭১৪৫ মিটার (২৩৪৪০ ফুট) এভারেস্ট শৃঙ্গ হইতে ৩৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত আনুমানিক

৮৬°১৮' পূর্ব ও ২৩°১০' উত্তর অক্ষাংশে স্থিত। ইহা য়োওয়ালিঙ্গ হিমালের উচ্চতম শৃঙ্গ এবং নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত। নেপালীদের নিকট ইহা পবিত্র বলিয়া গণ্য। তিব্বতীদের তিনটি পবিত্র শৃঙ্গের মধ্যেও ইহা অন্যতম। ইহার তিব্বতী নাম ত্রাশি-শেরিং। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বহু দূর হইতে ইহাকে জরিপ করা হয় তবে ইহার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান অভিযাত্রী হারমান শ্লাগিনট্‌ভাইট নেপালের কৌলিয়া হইতে ইহার জরিপ করেন এবং ভ্রমবশতঃ ইহাকেই এভারেস্ট বলিয়া মনে করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের সময়ে নেপাল সরকারের বিশেষ অনুমতি লইয়া এভারেস্ট ও গৌরীশংকর-এর সঠিক অবস্থিতি নির্ণয় করা হয়। বহু দিন অবধি জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল এভারেস্টের নামই গৌরীশংকর। ১৯২১ সালে এই ভ্রম নিরসন করা হয়। ১৯২৫ ও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দক্ষিণ দিকের পথগুলি ঠিক ভাবে নির্ণীত হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দেও ইহাতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করা হয় ও আরও সঠিক জরিপ করা হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি জাপানী অভিযাত্রীদল গৌরীশংকরে আরোহণ করিবার চেষ্টা করেন এবং তুষারঝড়ে অবরুদ্ধ হন, পরে এরোপ্লেনে অনুসন্ধানদল পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা হয়— তাঁহাদের মতে দক্ষিণ দিক হইতে ওঠা অসম্ভব। অদ্যাবধি কেহ এই শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার বাম পার্শ্বে তাম্রকোশী প্রবাহিত ও দক্ষিণে প্রসিদ্ধ রোংবুক গুম্ফা অবস্থিত।

দ্র Kenneth Mason, *Abode of Snow*, London, 1955; A. Huxley, *Standard Encyclopaedia of World's Mountains*, London, 1962

কমলা মুখোপাধ্যায়

গৌরীশংকর (ভট্টাচার্য) তর্কবাগীশ (১৭৯৯-১৮৫৯ খ্রী) সাংবাদিক ও সমাজ-সংস্কারক। খর্বাকৃতি বলিয়া 'গুড়গুড়ে ভটচাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের পঞ্চগ্রামে জন্ম। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন গৌরীশংকর নৈহাটির নীলমণি ন্যায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা লাভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিলে তিনি রামমোহন রায়, 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন। সতীদাহ-প্রথার লোপের পক্ষে তিনি রামমোহনের সহযোগী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনেও তাঁহার উৎসাহ ছিল।

'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১ খ্রী) পত্রের গৌরীশংকর কার্যতঃ সম্পাদক ছিলেন। গৌরীশংকরের রচনারীতি সহজ ও মতামত নির্ভীক ছিল। তিনি 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৩৯ খ্রী), 'সম্বাদ রসরাজ' (১৮৩৯ খ্রী), 'হিন্দুরত্ন কমলাকর (১৮৫৭ খ্রী) ইত্যাদি পত্রিকার সহিতও যুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত পত্রিকাটির তিনি সম্পাদক, অন্য দুইটিরও তিনিই মূলতঃ পরিচালক ছিলেন। 'সম্বাদ রসরাজ'-এর গৌরীশংকরের সহিত 'পাষণ্ড পীড়ন'-এর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রায়ই তর্কযুদ্ধ হইত এবং অনেক সময়ে তাহা শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিত। অশ্লীল রচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ ইত্যাদির জন্য গৌরীশংকরের অর্থদণ্ড ও একাধিকবার কারাবাস ঘটে।

গৌরীশংকরের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি প্রথমে রামমোহন রায়ের অনুরাগী ছিলেন, পরে রামমোহন বিরোধী ধর্মসভার সমর্থক হন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে প্রগতিশীল ভূমিকা লইয়াছিলেন, আবার 'রসরাজ'-এর পৃষ্ঠায় অশ্লীল আক্রমণে দ্বিধাহীন ছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ 'ভগবদ্‌গীতা' (১৮৫২ খ্রী), 'জ্ঞানপ্রদীপ' (১-২ খণ্ড, ১৮৪০, ১৮৫৩ খ্রী), 'ভূগোলসার' (১৮৫৩ খ্রী), 'নীতিরত্ন' (১৮৫৪ খ্রী), 'কাশীরাম দাসের মহাভারত' (১২৬২ বঙ্গাব্দ)। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশংকর তর্কবাগীশ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা (১৮৬৩-১৯৪৭ খ্রী) খ্যাতনামা লিপিতত্ত্ববিদ্‌। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি তাঁহার পিতা হীরাচাঁদ ওঝার নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং পরবর্তী কালে বোম্বাই শহরে ইতিহাস, লিপিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষান্তে উদয়পুরে সরকারি পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর নগরীর জাদুঘরের অধ্যক্ষ পদে নিযোজিত হন এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। এই সময় তিনি বহু স্থানে ভাষণ দান করেন। তিনি কিছুদিন বরোদার প্রাচ্য ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষপদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশী নাগরী-প্রচারিণী সভার সম্পাদক হিসাবেও একদা কাজ করেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রায়বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত হন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। বিদ্যাচর্চার জন্য তিনি 'সাহিত্য-বাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন এবং বিদ্বন্মণ্ডলী কর্তৃক সংবর্ধিত হন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক ডি. লিট.

এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক পুরাতত্ত্ববিদ্ উপাধিতেও ভূষিত হন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত পুস্তক: 'কর্নেল টডের ইতিহাস' (১৯০২ খ্রী), 'পৃথ্বীরাজ বিজয়' (১৯০৮ খ্রী), 'করমচন্দ্র বংশ', 'প্রাচীন লিপিমালা' (১৯১৮ খ্রী), 'রাজপুতনা কা ইতিহাস' (১৯২৩ খ্রী) এবং 'ওঝা নিবন্ধ সংগ্রহ'।

দ্র হিন্দী সাহিত্যকোষ, প্রথম ভাগ, বারাণসী, ১৯৬৩।

অশোকা সেনগুপ্ত

গৌরী সেন প্রসিদ্ধ ধনী ও দানশীল ব্যক্তিরূপে ইঁহার নাম 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলি জেলার বালি গ্রামে (কোনও কোনও মতে বহরমপুর) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সুবর্ণবণিক-সমাজভুক্ত। বিখ্যাত ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ সেনের সহায়তায় প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়া কলিকাতা আহিরীটোলার বদান্য ধনী ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। দেনার দায়ে বা অন্যায়ভাবে রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া কারামুক্ত করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকায় সম্ভবতঃ তাঁহার নামে উপরি-উক্ত প্রবাদ বাক্যটির উদ্ভব হইয়াছে। হুগলি জেলার গৌরীশংকর দেব-এর মন্দিরটি ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

দ্র সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, আর্যাবর্ত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

গৌহাটি আসাম রাজ্যের কামরূপ জেলার মহকুমা, থানা ও শহর। শহরটি ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরে বিস্তৃত, তবে মূল শহর ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে ২৬°১১´ উত্তর এবং ৯১°৪৫´ পূর্বে অবস্থিত। বর্তমান গৌহাটির ক্ষেত্রফল ১১ বর্গ কিলোমিটার (৪·৪ বর্গ মাইল)। গৌহাটির অধিকাংশ স্থানের উচ্চতা সমুদ্র-সমতল হইতে ৪৯·৫৫ মিটার (১৬৫-১৮৫ ফুট) এর মধ্যে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬৬২·২১ মিলিমিটার (৬৫·৪ ইঞ্চি)। সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ ৩১° সেন্টিগ্রেড (৮৮° ফারেনহাইট) ও সর্বনিম্ন উত্তাপ ১৯° সেন্টিগ্রেড (৬৬° ফারেনহাইট)।

জেলা-শাসনকার্যের কেন্দ্র গৌহাটি আসাম রাজ্যের বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ নগর। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই শহরের কেন্দ্রীয় অবস্থান ইহাকে অদ্বিতীয় গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে গৌহাটি আসামের প্রবেশদ্বাররূপে পরিগণিত।

গৌহাটির আদি নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। বর্তমান গৌহাটি নাম 'গুহার সারি' কিংবা 'গুয়া-হাটি'— কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহা বলা কঠিন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর মহাভারতে উল্লিখিত রাজা ভগদত্তের রাজধানী ছিল এবং পরে ইহা কোচ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী হয়। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা অহম জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়। অহমগণের প্রাচীন নগরের অবশেষ ব্রহ্মপুত্রের তীরে ইতস্ততঃ দেখা যায়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটি আসামের অনেকাংশসমেত ইংরেজ-অধিকারে আসে। ১৮৭৪ সালে আসামের রাজধানী গৌহাটি হইতে শিলঙে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটি মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্ট হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌহাটি ৬·৬ বর্গ কিলোমিটার (২·৫৫ বর্গ মাইল) ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ছোট শহর ছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটির জনসংখ্যা ছিল ১১৬৬১; ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২১৭৯৭। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কারণে, বিশেষতঃ স্বাধীনতার পরবর্তী কালে, এই শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটির জনসংখ্যা ১০০১০৭ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৬৭২৭৮ জন পুরুষ এবং ৩৩৪২৯ স্ত্রী। সুতরাং গৌহাটি (প্রতি হাজারে ৪৯৭ জন স্ত্রীলোক লইয়া) মূলতঃ পুরুষ-অধ্যুষিত শহর। বৃহত্তর গৌহাটি এবং উহার নিকটবর্তী পাণ্ডু এবং কামাখ্যা শহর লইয়া লোকসংখ্যা ১৩৬২৩৯, তাহার মধ্যে ৮৮৮৮২ জন পুরুষ এবং ৪৭৩৫৭ স্ত্রী। স্ত্রী-পুরুষের এই অসম অনুপাত এবং জনগণের মধ্যে কর্মী ও শিক্ষার্থীগণের আধিক্য শহরের বৃদ্ধির প্রকৃতি নির্দেশ করিতেছে।

রাজনৈতিক হিসাবে গৌহাটি আসাম রাজ্যের রাজধানী না হইলেও ইহা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। শহরটি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আসামের অন্যান্য অংশের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী অবস্থান ইহাকে জল পরিবহনের সুবিধা দিয়াছে, অধিকন্তু শিলং শহরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ইহাকে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব দান করিয়াছে। কলিকাতা ও গৌহাটির মধ্যে বিমান চলাচল করে। ১৯৪৮ সালে পাণ্ডুর নিকটে জালুক-বাড়িতে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কলেজসমূহ ব্যতীত গৌহাটিতে সাধারণ শিক্ষার জন্য একটি কলেজ, একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটি পশুচিকিৎসার কলেজ এবং শিল্পশিক্ষার জন্য কতকগুলি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। গৌহাটিতে আকাশবাণীর এক কেন্দ্র বর্তমান।

গত দশ বৎসরে শিল্পকর্মের দিক দিয়া শহরটি খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের তৈল-পরিশোধনাগার শহরটির শিল্পগত উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক খুলিয়া দিয়াছে।

পর্বত ও ব্রহ্মপুত্র বেষ্টিত গৌহাটি শহরের অবস্থান একত্র সমাবিষ্ট বহু দৃশ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ চিত্রের ন্যায়। গৌহাটি প্রাচীন কাল হইতে তীর্থরূপে পরিগণিত। এখানে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত মন্দির বর্তমান। তন্মধ্যে নীলাচলের কামাখ্যা দেবীর মন্দির সর্বপ্রধান। ইহা একটি পীঠস্থান ('কামাখ্যা' দ্র)। উত্তর গৌহাটি গ্রামে অশ্বক্রান্ত কুণ্ড আছে। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে উমানন্দ, নবগ্রহ, শুক্রেশ্বর ও উগ্রতারার মন্দির উল্লেখযোগ্য। শহরের দক্ষিণে বশিষ্ঠ আশ্রম অবস্থিত। মন্দির এবং পবিত্র স্থানসমূহ ভিন্ন আসাম রাজ্যের সচিবালয়, সেতু এবং পরিশোধনাগার পূর্ব ভারতের এই দ্রুত উন্নতিশীল শহরটির বিশেষ আকর্ষণ।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XII, Oxford, 1908, F H Pankyntein *Census of India, 1961 Assam District Census Handbook Kamrup*, Gauhati, 1964.

[illegible]

গ্রথন (টেক্সচার)। সাধারণ অর্থে কোনও বস্তুর বুনানি বা গাঁথুনি। ভূবিদ্যায় শিলার গ্রথন বলিতে গাঁথুনি ছাড়াও শিলার কেলাসিত খনিজ পদার্থের পরিমাণ, কেলাসিত, অর্ধকেলাসিত (হিপোক্রিস্টালাইন), অকেলাস (অ্যামর্ফাস) ও কাচিক (গ্লাসি) পদার্থের অনুপাত এবং পৃথক পৃথক খনিজকণার আয়তন, বিন্যাস ও পারস্পরিক সম্পর্কও বুঝায়। গ্রথনের বিজ্ঞানসম্মত বিচার শিলাজনি (পেট্রোজেনেসিস) নির্ণয়ের এক প্রকৃষ্ট উপায়। অণুবীক্ষণের সাহায্যে গ্রথনের পরীক্ষা দ্বারা শিলার বংশ, জন্মকথা ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কেলাসনের ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়।

শিলার গ্রথন খনিজ পদার্থের কেলাসনের নিয়ম ও গতির উপরে নির্ভর করে। বিভিন্ন বংশের শিলার গ্রথনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে, যেমন — আগ্নেয় শিলার গ্রথন রূপান্তরিত বা পাললিক শিলা হইতে পৃথক, আবার আগ্নেয় শিলার মধ্যে উদবেধী (ইনট্রুসিভ) এবং নিঃসারী (এক্সট্রুসিভ) জাতির গ্রথনে প্রচুর প্রভেদ।

শিলার নির্ভুল গ্রথন বর্ণনায় বা শিলাবীক্ষণে কেলাসিত খনিজের পরিমাণ, পৃথক পৃথক খনিজকণার প্রকৃত পরিমাপ, আনুষঙ্গিক খনিজকণাগুলির সংস্থান এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিক্রিয়া প্রভৃতির বিচার প্রয়োজন।

সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত আগ্নেয়সঞ্জাত শিলার গঠন ঘনসংবদ্ধ খনিজকণার সমষ্টি, তন্মধ্যে গ্র্যানাইটের গ্রথনে অধিকাংশ কণার কেলাসতল আংশিক দৃশ্য এবং ব্যাসল্টের গ্রথন সম্পূর্ণ কাচিক (হলোহায়ালাইন) বা কাচিক ভিত্তির মধ্যে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত কেলাসকণার সংশ্রয় (হায়ালোপাইলিটিক)। রূপান্তরিত শিলার শিস্টের (schist) গ্রথন শিস্টীয় (schistose) অর্থাৎ চ্যাপ্টাকার বা দীর্ঘায়ত খনিজকণাগুলি সমান্তরালভাবে অবস্থিত। মার্বেলের গ্রথন সমকণ (ইকুইগ্র্যানিউলার) মোজাইক জাতীয়।

দ্র H Williams F J Turner & C M. Gilbert, *Petrography*, San Francisco 1955

[illegible]

গ্রন্থসাহেব আদিগ্রন্থ দ্র

গ্রন্থাগার সংগৃহীত গ্রন্থের কোনও একটি সুরক্ষিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানই গ্রন্থাগার, সংগৃহীত গ্রন্থের সংরক্ষণই গ্রন্থাগারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। প্রগতির যুগে সমাজকে শিক্ষিত ও উন্নত করার ব্যাপারে গ্রন্থাগারের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সমাজকে আত্মচেতন করা, সমাজজীবনে জ্ঞান বিধানের অনুশীলন সম্বন্ধে সচেতন তথা সেই অনুসন্ধিৎসাকে চরিতার্থতার পথে ক্রমবর্ধমান কারো তোলা গ্রন্থাগারের অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব। পুস্তক এবং পাঠক এতদুভয়ের মধ্যে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিক সংযোগ স্থাপন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থাগারের কাজ যুগপৎ সংগ্রহণ, সংরক্ষণ এবং সংগঠন। সংগ্রহণ কেবলমাত্র পুস্তকেই সীমিত থাকিবে না, বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক যে কোনও বিষয় লিপিবদ্ধ, মুদ্রিত অথবা যে কোনও ভাবেই ধৃত হউক না কেন গ্রন্থাগারের পক্ষে তাহা সংগ্রহণীয়। সংগৃহীত পুস্তকাদি যত্নসহকারে সংরক্ষণ এবং তাহাদিগকে ব্যবহারযোগ্য ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য সংগঠন।

অতি প্রাচীন কালে আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের পোড়া মাটির ফলক অর্থাৎ পাতলা ইট, ভারতে তাম্রপাত ও শিলা, মিশরে প্যাপিরাস প্রভৃতি এবং পরবর্তী কালে ভারতে তালপাতা ও ভূর্জপত্র প্রভৃতি, ইওরোপে গবাদির চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য লেখনের কার্যে ব্যবহৃত হইত। এইসব লিপিবিধারক দ্রব্যকেই তদানীন্তন পুস্তকরূপে অভিহিত

করা যায়, সে সময়েও সেগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, পুরাকালের ব্যাবিলন, আসিরিয়া, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া তথা প্রাচীন ভারতের নালন্দা, তক্ষশিলা ও বিক্রমশিলার গ্রন্থাগারগুলি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই সভ্যতার উপাদান হিসাবে গ্রন্থাগারের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে।

মুদ্রণযন্ত্র যেমন আধুনিক সভ্যতাকে রূপায়িত করিয়াছে, তেমনই গ্রন্থাগারের বর্তমান রূপও তাহারই ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিদিন শতসহস্র পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের নির্বাচন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা তথা পাঠকের প্রয়োজন অনুসারে তাহাদিগকে ব্যবহারোপযোগী উপায়ে বিন্যস্ত করা এ যুগে গ্রন্থাগারের পক্ষে উত্তরোত্তর গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ম হইয়া উঠিতেছে।

গ্রন্থাগারকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: ১. সংহত এবং ২ ক্রমবর্ধমান। সংহত গ্রন্থাগার কোনও নির্দিষ্ট সংগৃহীত গ্রন্থ সম্ভারের মধ্যে সীমিত থাকে এবং ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাগার গ্রন্থসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত হইতে থাকে। ইহাকে আবার মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে

১. জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার— ইহা সাধারণতঃ সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হয় এবং দেশের যে কোনও নাগরিক ইহার পুস্তকসমূহ ব্যবহার করিতে পারেন। এই গ্রন্থাগারে দেশের প্রায় সমস্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তকাদি আইন-বিধান বিনামূল্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। ফলে ইহার আকার নিয়তই বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম', ফ্রান্সের 'বিব্লিওথেক ন্যাশন্যাল', যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস', সোভিয়েৎ রাশিয়ার 'লেনিন লাইব্রেরি' এবং ভারতের কলিকাতাস্থ 'জাতীয় গ্রন্থাগার' উল্লেখযোগ্য।

২. বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার— ইহাকে পুরাতন এবং নূতন কালানুক্রমিক এই উপভাগে ভাগ করা যায়। পুরাতন গ্রন্থাগার অনেক সময় সংগ্রহের ঐশ্বর্যে প্রায় জাতীয় গ্রন্থাগারের সমকক্ষ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নাম করা যাইতে পারে। এগুলি গবেষণার উপযোগী গ্রন্থরাজিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

৩-৪. স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরি— ইহাদের সংগ্রহ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে অধীত বিষয়-সম্পর্কিত তথা পাঠ্য ও সাধারণ পুস্তকেই সীমিত থাকে। প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র ও শিক্ষকগণই ইহাদের ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৫. বিশেষ গ্রন্থাগার— সাধারণ স্কুল-কলেজ ছাড়া অন্য যে কোনও প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন গ্রন্থাগারকে বিশেষ গ্রন্থাগার বলা যায়। ইহা গবেষকদের পক্ষে কিংবা কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠেচ্ছুর পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার বিশেষ বিদ্যা সংক্রান্ত সর্বপ্রকার প্রকাশন সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। ইহা ছাড়া বিশেষ শ্রেণীর পাঠকদের ব্যবহারের জন্য এরূপ গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে, যথা অন্ধদের গ্রন্থাগার, বন্দীশালার গ্রন্থাগার, হাসপাতালের গ্রন্থাগার, নাবিকদের গ্রন্থাগার ইত্যাদি।

৬ সাধারণ গ্রন্থাগার— এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার সম্পূর্ণরূপে আধুনিক গণতান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি। প্রকৃত সাধারণ গ্রন্থাগার অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে পাবলিক লাইব্রেরি বলে, তাহা সরকারি আইন অনুসারে জনসাধারণের অর্থে গঠিত ও পরিচালিত হয়। ইহার ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে কোনও চাঁদা বা অন্য কোনরূপ অর্থ দিতে হয় না। এ জাতীয় গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার আন্দোলন ইংল্যাণ্ডে প্রথম শুরু হয়, অধুনা সেখানকার ব্যবস্থা এত উন্নত যে অন্য যে কোনও দেশের পক্ষে তাহা আদর্শরূপে গণ্য হইতে পারে। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার নাই। সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে যাহা আছে সেগুলি কিঞ্চিৎ সরকারি সহায়তা লাভ করিলেও প্রধানতঃ চাঁদার উপরে নির্ভরশীল, সকলের নিকট গ্রন্থাগারের ব্যবহার নিঃশুল্কভাবে খুলিয়া দিবার সামর্থ্য তাহাদের এখনও নাই।

সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শ হইল ইহার নির্বাধ ও নিঃশুল্ক ব্যবহার। দেশের যে কোনও স্থানে যে কোনও ব্যক্তি অবস্থান করুন, তিনি চাহিলে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্য গ্রন্থাদি পাইবার ব্যবস্থা করা, এজাতীয় গ্রন্থাগারের লক্ষ্য, ইহার জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার-সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে।

সর্বসাধারণের শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার প্রসারকল্পে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন এত গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) সর্বদেশে, বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলিতে গ্রন্থাগার-আন্দোলন সংঘটিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

দ্র W. E Doubleday, *A Manual of Library Routine*, London, 1933; A. Broadfield, *A Philosophy of Librarianship*, London, 1949; James Duff Brown, *Manual of Library Economy*, W. C. Berwick Sayers, ed., London, 1949; S. R. Ranganathan, *The Five Laws of Library Science*, Bombay, 1963.

অশোকা সেনগুপ্ত

গ্রন্থাগারবিদ্যা। আধুনিক যুগে সাধারণ জনশিক্ষা হইতে শুরু করিয়া মহত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তথা তৎসংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যে সক্রিয় ভূমিকা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার ফলে গ্রন্থাগার- ব্যবস্থা ও পরিচালনার কাজ এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। এই কাজ একদিকে যেমন ক্রমশঃ গুরুদায়িত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, অন্য দিকে তেমনই ইহার পরিচালনা বিধিবদ্ধ তথা বিজ্ঞানসম্মত হইয়া উঠিতেছে। আজকাল তাই গ্রন্থাগারিকের কাজ একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই শিক্ষণীয় বিষয়কে গ্রন্থাগার বিদ্যা বলা হয়।

প্রখ্যাত ভারতীয় গ্রন্থাগারিক এস. আর. রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পাঁচটি মূলসূত্র ধরিয়া দিয়াছেন: ১. ব্যবহারের নিমিত্তই গ্রন্থের অস্তিত্ব ২. প্রত্যেক পাঠকের প্রয়োজনীয় প্রকৃত পুস্তকপ্রাপ্তি ৩. প্রত্যেক পুস্তকের উপযুক্ত পাঠকযোগ ৪. পাঠকের সময়ের মূল্য ৫. গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান সংস্থা। এই মূলসূত্রগুলি গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আধুনিক যুগোপযোগী তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছে এবং গ্রন্থাগার- ব্যবস্থা ও পরিচালনার কাজকে সর্ববিষয়ে সৌষ্ঠবময় করিতে সহায়ক হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে আধুনিক গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা ও পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত: ক. পুস্তক-নির্বাচন ও পরিগ্রহণ; কোনও গ্রন্থাগারই সমস্ত পুস্তকাদি ক্রয় বা সংগ্রহ করিতে পারে না, তাই নির্বাচন প্রয়োজন। জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী দেশে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক, সাময়িকী, সংবাদপত্র ও বিভাগীয় দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় -সংবলিত নথিপত্র প্রাপ্তির অধিকারী। ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে স্ব স্ব প্রয়োজনে বিদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ কিংবা দেশীয় পুস্তক অধিক সংখ্যায় ক্রয় করিবারও প্রয়োজন হয়। নির্বাচন-কালে গ্রন্থাগারিককে মোটামুটি তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়: ১. পুস্তকের নির্বাচন এমন হওয়া উচিত যাহাতে সমধিক পাঠকের নিকট নির্বাচিত পুস্তক আদৃত হইতে পারে ২. সমধিক পাঠকের আদৃত পুস্তক একাধিক সংখ্যায় গ্রন্থাগারে থাকিতে পারে ৩. পাঠকের বিভিন্ন রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক সংগৃহীত হইতে পারে।

পুস্তকের নির্বাচন বিষয়ে গ্রন্থাগারিককে প্রকাশকের পুস্তক-তালিকা, সাময়িকী, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য-পত্রিকা, প্রামাণিক পুস্তক-তালিকা, বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী, বড় বড় গ্রন্থাগারের সংগ্রহতালিকা প্রভৃতি সাহায্য করে। পুস্তকের সংগ্রহকালে তাহার আকৃতিগত গুণাবলী অর্থাৎ কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদিও বিচার্য।

নির্বাচন তথা সংগ্রহের কাজ সমাধার পর পরিগ্রহণ (Accession) প্রক্রিয়া। পরিগ্রহণ খাতায় পুস্তকের লেখক, নাম, প্রকাশক, প্রকাশকাল ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়।

খ. বর্গীকরণ— পরিগৃহীত পুস্তককে বিষয়গতভাবে শ্রেণীবিভাগ করার প্রথাকে বর্গীকরণ বলা হয়। এই বর্গীকরণ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বিষয়সংক্রান্ত পুস্তকাদি অল্প সময়ে পরিবেশন করা।

আধুনিক গ্রন্থবর্গীকরণ পদ্ধতির পথিকৃৎ হিসাবে আমেরিকার প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক মেলভিল ডিউইর নাম স্মরণীয়। তাঁহার প্রণীত দশমিক পদ্ধতি আজও সর্বাধিক প্রচলিত আছে। ইহা ছাড়া আরও একাধিক বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণীত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ভারতের খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক এস. আর. রঙ্গনাথনের কোলন বর্গীকরণের নাম উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতির সাহায্যে কোনও বিষয়ের অতি সূক্ষ্ম অনুভাব সম্বন্ধীয় পুস্তককেও বর্গীকৃত করা যায়।

গ. সূচীকরণ— গ্রন্থসূচী পাঠকের পুস্তক অনুসন্ধানের কাজকে সহজ করিয়া দেয়। সূচীর উপাদান: ১. গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থকার বলিতে অনেক সময় অনুবাদক, সংকলয়িতা, সম্পাদক প্রভৃতির নামও বোঝায় ২. গ্রন্থের নাম ৩. গ্রন্থের বিষয়বস্তুর নাম ৪. নির্দেশক, যাহা একটি বিষয় বা নাম হইতে অন্বয়সূচক অপর বিষয় বা নামের নির্দেশ দেয়; এই সূচীর বিন্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকার: ১. অনুবর্ণানুযায়ী, উপরি-উক্ত উপাদানের অভিধানের মত বর্ণানুক্রমে অবস্থান ২. অনুবর্গ সূচী, বিষয়ানুযায়ী সূচীর শ্রেণীপর্যায় অনুসারে অবস্থান। সূচী হইতে পাঠক পুস্তকাদি সম্বন্ধে নূতনতমভাবে নিম্নলিখিত তথ্য পাইয়া থাকেন: ১. লেখকের নাম ২. আখ্যা (পুস্তকের নাম) ৩. প্রকাশন বিবরণী, স্থান, প্রকাশক ও প্রকাশকাল ৪. পত্রাঙ্কাদি বিবরণী, পত্রসংখ্যা, চিত্রাবলী, ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি ৫. টীকা, আখ্যা হইতে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তু স্পষ্ট না হইলে টীকা দ্বারা তাহা পাঠকের গোচরীভূত করা।

ঘ. পুস্তক আদান-প্রদান ব্যবস্থা— ইহা দ্বারা পাঠক ও গ্রন্থাগারের মধ্যে সাক্ষাৎ সংযোগ সাধিত হয়। এই কাজ সুষ্ঠু ও সুপরিচালিত করিবার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। তন্মধ্যে আমেরিকার 'নেয়ার্ক' প্রথা ও বিলাতের 'ব্রাউন' পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত। আজকাল

যান্ত্রিক উপায়ে এই আদান প্রদানের কাজ ত্বরান্বিত হইয়েছে।

এই আদান প্রদানের সাংবাৎসরিক পরিসংখ্যান হইতে কাজের পরিমাণ, পাঠকের রুচি প্রভৃতির সহিত গ্রন্থাগারিকের পরিচিতির বিশেষ সুবিধা।

আকর গ্রন্থাদি যথা: বিশ্বকোষ, অভিধান, বর্ষপঞ্জী নিঘণ্ট গ্রন্থ নামধামপঞ্জী, বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি সাধারণতঃ গ্রন্থাগার হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।

চ অনুলয় . সেবা বা নির্দেষ্টার কাজ— আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারিক জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই বন্ধু। জ্ঞান বিদ্যা ও তথ্য সংক্রান্ত নানা প্রকার প্রশ্ন ও সমস্যাসমাধানের জন্য পাঠক যাহাতে গ্রন্থাগারিকের নিকট হইতে সক্রিয় সাহায্য পাইতে পারেন তাহারই জন্য অনুলয় সেবার ব্যবস্থা। নির্দেষ্টার কাজ সাধন করিবার বিশেষ প্রাকর্ষ গ্রন্থাগারিক আয়ত্ত করেন বিভিন্ন আকর গ্রন্থ ও তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দ্বারা।

ছ. সংরক্ষণ - গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি কেবল সংগ্রহ করিলেই চলে না, তাহাদের যথাযোগ্য সংরক্ষণ করা চাই। পুস্তক অপহৃত না হইলেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঠিক আছে, এমন বুঝায় না। সংরক্ষণের অর্থ সকল পুস্তককেই ব্যবহার্য অবস্থায় রাখা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা খুব ভালভাবে গ্রন্থাগারে অবলম্বিত হইতে পারে। পুরাতন গ্রন্থাদি জীর্ণ হইবার আগেই ফোটোগ্রাফির সাহায্যে তাহাদের প্রতিচ্ছবি গৃহীত হইতে পারে। যে গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্যতার বা অন্য কোনও কারণবশতঃ গ্রন্থাগারের বাহিরে যাইতে পারে না তাহার প্রতিচ্ছবি (ফোটোকপি) পাঠককে দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিচ্ছবির ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারে স্থানাভাব-সমস্যা কিয়দংশে দূর করিতে সক্ষম। সংবাদপত্রাদির বিশাল স্তূপ যাহা বড় বড় গ্রন্থাগারে গবেষণা কর্মের সাহায্যকল্পে রক্ষিত হইয়া থাকে— অনায়াসে অণু প্রতিচ্ছবির (মাইক্রোফিল্ম) মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে সুসংরক্ষিত হইতে পারে।

জ. গ্রন্থাগার প্রচার ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থা— এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারের অস্তিত্বসম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা ও তাহাদের মনে পাঠস্পৃহা জাগ্রত করা ও যাহাদের পক্ষে গ্রন্থাগারে আসা সম্ভব নয়, তাহাদের কাছে পুস্তকাদি পৌঁছাইয়া দেওয়া।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ছাড়া আরও একটি বিষয়ে গ্রন্থাগারিককে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তাহা হইল গ্রন্থের উপাদান-সম্পর্কিত। গ্রন্থ লইয়া যেহেতু গ্রন্থাগারিকের কাজ সুতরাং গ্রন্থের উপাদান, অর্থাৎ কাগজ, মুদ্রণ, চিত্রণ ও বাঁধাই সম্বন্ধে বিস্তৃত পঠন-পাঠনও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত। 'গ্রন্থাগার' দ্র।

অশোকা সেনগুপ্ত

গ্রন্থি গ্ল্যাণ্ড। জীবদেহে রসনিঃসারক অঙ্গ। গ্রন্থি প্রধানতঃ দুই প্রকারের, বহিঃস্রাবী ও অন্তঃস্রাবী। অশ্রুগ্রন্থি, অন্ত্র ও পাকস্থলীর গ্রন্থি, যকৃৎ, লালাগ্রন্থি, স্তন, স্বেদগ্রন্থি প্রভৃতিকে বহিঃস্রাবী গ্রন্থি এবং অ্যাড্রিন্যাল, থাইরয়েড, পিটুইটারি, প্যারাথাইরয়েড প্রভৃতিকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বলে।

বহিঃস্রাবী গ্রন্থির ক্ষরিত রস নির্দিষ্ট নালী দিয়া গ্রন্থির বাহিরে আসিয়া দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে পৌঁছায় এবং রসের ক্রিয়া প্রধানতঃ দেহের ঐ অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে, যথা - লালাগ্রন্থির রস শুধু মুখবিবর ও পাকস্থলীতে, অশ্রুগ্রন্থির রস কেবল চোখে বা যকৃতের রস শুধু অন্ত্রেই কাজ করিতে পারে। বহিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির অধিকাংশই নার্ভের নিয়ন্ত্রণাধীন। অবশ্য যকৃৎ, স্তন প্রভৃতি গ্রন্থির নিয়ন্ত্রণ ইহার ব্যতিক্রম, তথ্যতঃ রক্তে বাহিত রাসায়নিক পদার্থের দ্বারাই ইহারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্মক্ষম বহিঃস্রাবী গ্রন্থির রসে এনজাইম থাকায় পাচন, বিপাক প্রভৃতি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্য হয়, কয়েকটি আবার দেহ হইতে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির রসনিঃসরণের জন্য কোনও নালী থাকে না। ইহাদের রস ক্ষরিত হয় রক্তে, রক্তে বাহিত হইয়া সেই রস সর্বশরীরে ছড়াইয়া পড়ে, ফলে দেহের বহু অংশেই তাহার প্রভাব পড়ে। এই রসে যেসকল সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তাহাদের 'হর্মোন' বলা হয়। অধিকাংশ অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগের হর্মোনগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন— অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কেন্দ্রীয় অংশ ও পিটুইটারির পশ্চাদ্ভাগ নার্ভের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পিটুইটারির সম্মুখভাগের নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস হইতে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের উপর। 'অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি', 'ক্ষরণ' ও 'হর্মোন' দ্র।

দ্র C. H. Best & N B. Taylor, *The Physiological Basis of Medical Practice*, Baltimore, 1961

দেবজ্যোতি দাশ

গ্রন্থ উপত্যকা পর্বত দ্র

গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আবর্তিত হইতেছে। গ্রহ বলিতে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় সাধারণতঃ ঐ জ্যোতিষ্কগুলিকে বুঝাইয়া থাকে। সূর্য ছাড়া অন্য কোনও তারার চারি দিকে অনুরূপভাবে আবর্তনকারী কোনও জ্যোতিষ্ক থাকিলে তাহাকেও অবশ্য গ্রহ বলিয়া অভিহিত করা যায়, কিন্তু সেরূপ জ্যোতিষ্কের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকিলেও নিশ্চয়তা নাই।

গ্রহ নয়টি। সূর্য হইতে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুসারে সাজাইলে সেগুলি যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। শেষোক্ত তিনটি গ্রহ বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে দূরবীক্ষণের সহায়তায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাকিগুলি খালি চোখেই দেখা যায় এবং স্মরণাতীত কাল হইতেই সুপরিচিত। প্রাচীন কালে অবশ্য পৃথিবীকে গ্রহ বিবেচনা করা হইত না, পক্ষান্তরে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহ বিবেচিত হইত। প্রাচীন ভারতবর্ষে অধিকন্তু রাহু ও কেতু নামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুইটি নভোবিন্দুকে গ্রহের মর্যাদা দেওয়া হইত। এইভাবেই প্রাচীন ভারতে 'নবগ্রহ'র পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছিল।

কেপলারীয় সূত্র নামে পরিচিত তিনটি সূত্র দ্বারা সূর্যের চারি দিকে গ্রহগুলির প্রদক্ষিণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সূত্রগুলি নিম্নোক্ত রূপ :

১ প্রত্যেকটি গ্রহের কক্ষপথ একটি উপবৃত্ত (এলিপস) এবং সূর্য সেই উপবৃত্তের একটি নাভি (ফোকাস)-তে অবস্থিত।

২. প্রতিটি গ্রহের ক্ষেত্রগত গতিবেগ (এরিয়াল ভেলসিটি) অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ, সূর্য ও গ্রহটির সংযোজক সরলরেখা সমান সমান সময়ে সমান সমান ক্ষেত্রফল উৎপন্ন করে।

৩. প্রতিটি গ্রহের আবর্তনকাল এবং বর্গফল সূর্য হইতে গ্রহটির গড় দূরত্বের ঘনফলের আনুপাতিক।

গ্রহগুলি প্রধানতঃ কঠিন পদার্থে গঠিত। ইহাদের নিজস্ব তাপ বা আলো নাই। দেখিতে অবশ্য গ্রহগুলি বেশ উজ্জ্বল, কতকগুলি তো খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্যের কারণ গ্রহপৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত সূর্যের আলো।

আকাশে তারা হইতে গ্রহগুলিকে পৃথক করিবার কতকগুলি সহজ স্থূল উপায় আছে। পৃথিবী হইতে দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে প্রতিটি গ্রহের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রহগুলি প্রায়শঃই তারাদের তুলনায় উজ্জ্বলতর। গ্রহগুলির আলো স্থির, অপরপক্ষে তারাদের আলো স্পন্দমান। তারাগুলিকে দেখিতে বিন্দুর মত, গ্রহগুলিকে অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়। দূরবীনের মধ্য দিয়া দেখিলেও তারাগুলি আকারে বাড়ে না, পক্ষান্তরে গ্রহগুলির আকার অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। গ্রহদের আপেক্ষিক অবস্থানের দ্রুত পরিবর্তন হয়, তারাদের ক্ষেত্রে প্রায় কোনও পরিবর্তন হয় না। যে কোনও তারাকে প্রতি বৎসর একই সময়ে আকাশের প্রায় একই স্থানে দেখা যায়, কিন্তু কোনও গ্রহের সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য নয়। শেষ কথা, আকাশের সর্বত্র তারা আছে, কিন্তু গ্রহ থাকে একটি বিশেষ সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে, সেই অঞ্চলের নাম রাশিচক্র।

নয়টি গ্রহ ছাড়াও গ্রহাণুপুঞ্জ (অ্যাসটেরয়েড) নামে অভিহিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অবস্থান করিয়া কেপলারীয় সূত্র অনুসারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। গ্রহাণুদের মধ্যে সীরিস বৃহত্তম।

দ্র W M Smart, *The Origin of the Earth*, Harmondsworth, Middlesex, 1959, E A. Fath, *The Elements of Astronomy*, New York, 1955

[illegible]

পুরাণ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এই নয়টিকে নবগ্রহ বলা হয়। ইহাদের শাস্ত্রোক্ত রূপাদি বর্ণনা এইরূপ—

	বর্ণ	জাতি	জন্মস্থান	পুষ্প	বস্ত্র	বাহন
রবি	রক্ত	ক্ষত্রিয়	কলিঙ্গ	করবী	[illegible]	[illegible]
সোম	শুক্ল	বৈশ্য	যমুনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মঙ্গল	রক্ত	ক্ষত্রিয়	অবন্তী	[illegible]	[illegible]	মেষ
বুধ	[illegible]	বৈশ্য	মগধ	চম্পক	[illegible]	সিংহ
বৃহস্পতি	পীত	বিপ্র	সিন্ধু	পদ্ম	[illegible]	হস্তী
শুক্র	শুক্ল	বিপ্র	ভোজকট	[illegible]	[illegible]	অশ্ব
শনি	কৃষ্ণ	শূদ্র	সৌরাষ্ট্র	[illegible]	নীল	[illegible]
রাহু	কৃষ্ণ	শূদ্র	বর্বরক	কুন্দ	[illegible]	সিংহ
কেতু	চিত্র	শূদ্র	অন্তর্বেদী	[illegible]	ধূম্র	[illegible]

বিষ্ণুধর্মোত্তর, চতুর্বর্গচিন্তামণি এবং বৃহৎসংহিতায় ইহাদের অধিদেবতার পূজাবিধান এবং বেদভেদে মন্ত্রভেদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণে ইহাদের স্তোত্র ও মাহাত্ম্য এবং নানা বিচিত্র উপাখ্যান কথিত হইয়াছে।

দ্র রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়, গরুড়পুরাণ, কলিকাতা, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, পঞ্চানন তর্করত্ন, স্কন্দপুরাণ, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পঞ্চানন তর্করত্ন, বৃহৎসংহিতা, কলিকাতা,

১৮১৫ শক ; শব্দকল্পদ্রুম, হিতবাদী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৫০ শক ; বাচস্পত্যম্, চৌখাম্বা সংস্করণ, কাশী, ১৯৬২ ।

কল্যাণী দত্ত

গ্রহণ পৃথিবী হইতে সূর্যের কোনও অংশ চন্দ্রদ্বারা আবৃত দেখাইলে তাহাকে সূর্যগ্রহণ বলে। ভাষান্তরে সূর্যকর্তৃক উৎপন্ন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর কোনও অংশে পড়িলে তথায় সূর্যগ্রহণ হয়। তদ্রূপ সূর্য কর্তৃক উৎপন্ন পৃথিবীর ছায়াব অভ্যন্তরে চন্দ্র প্রবেশ করিলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র পৃথিবীব চতুর্দিকে আবর্তন করিতে করিতে প্রতি মাসে অমাবস্যার দিন একবার করিয়া সূর্যের দিকে যায়, তখনই সূর্যগ্রহণের সম্ভাবনা। সেইরূপ পূর্ণিমার দিনে চন্দ্র সূর্যেব বিপরীত দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়ার নিকটে উপস্থিত হয়। সেই সময় চন্দ্রের অবস্থান-ভেদে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। সূর্যগ্রহণের সময় সম্পূর্ণ সূর্য বা তাহার অংশবিশেষ এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় পূর্ণচন্দ্র বা তাহার অংশবিশেষ কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়।

পৃথিবী হইতে দৃশ্যমান সূর্যবিম্বের মধ্যম ব্যাস ৩২ কলা (মিনিট) পরিমিত। বৎসরের বিভিন্ন মাসে উহার কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া এই ব্যাসের পরিমাণ ৩১½ কলা হইতে ৩২½ কলার মধ্যে থাকে। সেইরূপ চন্দ্রবিম্বের মধ্যম ব্যাস ৩১ কলা ; মাসিক হ্রাস-বৃদ্ধি ধরিলে উহা ২৯½ কলা হইতে ৩৩½ কলার মধ্যে থাকে। সুতরাং চন্দ্র-সূর্যের অবস্থানভেদে সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র কর্তৃক সূর্যবিম্ব সম্পূর্ণ আবৃত হইতে পারে, এরূপ গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বা সর্বগ্রাস সূর্যগ্রহণ বলে। চন্দ্রবিম্ব সূর্যবিম্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে চন্দ্র সূর্যকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিতে পারে না, গ্রহণের মধ্য সময়ে সূর্যের চতুর্দিকে অঙ্গুরীয়কের ন্যায় কিছু অংশ দৃশ্যমান থাকিয়া যায়। এই প্রকার গ্রহণকে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ বলে। আবার যখন চন্দ্র কর্তৃক সূর্যের সামান্য অংশমাত্র আবৃত হয় তখন আংশিক বা খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ। কোনও সূর্যগ্রহণই পৃথিবীর সকল স্থান হইতে দেখা যায় না, কারণ পৃথিবীর ব্যাস ১২৮৭৪ কিলোমিটার (৮০০০ মাইল), কিন্তু গ্রহণকালে চন্দ্রের যে ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, তাহার ব্যাস ৩৭০১ কিলোমিটার (২৩০০ মাইল)-এর অধিক নহে। সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ধরিলে সূর্যগ্রহণের সর্বাধিক স্থিতিকাল ৬ ঘণ্টার অনধিক ; আবার কোনও বিশেষ স্থানে ৪ ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া কোনও গ্রহণ দেখা যায় না। পূর্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ ভূপৃষ্ঠের উপরে দীর্ঘ অথচ স্বল্পপরিসর স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ অঞ্চলের বাহিরে উহা মাত্র খণ্ডগ্রাস গ্রহণরূপে দেখা যায়। কোনও বিশেষ স্থান হইতে বলয়গ্রাস বা পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখিবার সুযোগ বহু কাল অন্তরে আসিয়া থাকে ; কিন্তু খণ্ডগ্রাস গ্রহণ অল্পকাল পরেই পুনরায় সেই একই স্থানে দৃশ্য হইতে পারে। সূর্যগ্রহণ সর্বপ্রথম পৃথিবীর যে স্থান হইতে দেখা যায় সেখানে তখন সূর্যোদয়কাল, তাহার পর চন্দ্রের ছায়া ঘণ্টায় ৮-৯ হাজার কিলোমিটার (৫-৬ হাজার মাইল) বেগে পূর্ব দিকে চলিতে থাকে। ছায়ার এই আপাত-গতিবেগ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে ঘণ্টায় ১৬০৯ কিলো-মিটাব (১ হাজার মাইল)-এ পরিণত হইয়া পুনরায় বাড়িতে থাকে। পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব দিকে প্রায় ১৫০° দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সূর্যগ্রহণ দেখা যাইতে পারে। পৃথিবীতে গ্রহণ যেমন সূর্যোদয় কালে আরম্ভ হয়, সেইরূপ গ্রহণের সমাপ্তি হয় প্রথমোক্ত স্থানের প্রায় ৯০° দ্রাঘিমা পূর্ব দিকে এবং সূর্যাস্তকালে।

পৃথিবীর ছায়াতে পূর্ণিমাব চন্দ্র প্রবেশ কবিলে চন্দ্রবিম্ব অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাকে চন্দ্রগ্রহণ বলে। চন্দ্রবিম্বের তুলনায় পৃথিবীর ছায়ার পরিমাণ প্রায় পৌনে তিন গুণ। চন্দ্র সম্পূর্ণভাবে ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করিলে সম্পূর্ণ চন্দ্রই অদৃশ্য হয়, তখন তাহাকে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বলে, মাত্র আংশিকভাবে প্রবেশ করিলে খণ্ডগ্রাস বা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণ প্রায় চার ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে, তন্মধ্যে পৌনে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত পূর্ণগ্রাস। চন্দ্রগ্রহণ হইলে তখন পৃথিবীর যে অর্ধাংশে রাত্রিকাল, তাহাব সকল স্থান হইতেই গ্রহণ দেখা যায়, কিন্তু সূর্যগ্রহণে সেরূপ হয় না।

খগোল-এ সূর্যের বার্ষিক আপাত পরিক্রমার পথ ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ নামে অভিহিত। চন্দ্রও যদি ঐ একই পথে পৃথিবীকে আবর্তন করিত, তাহা হইলে প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ ও প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইত। কিন্তু চন্দ্রকক্ষ রবিকক্ষের সহিত একই সমতলে অবস্থিত নহে, উহারা কিঞ্চিৎ বক্রভাবে উভয়েব মধ্যে ৫°৯′ কোণ উৎপন্ন করিয়া অবস্থিত। সেইজন্য প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না। এই উভয় কক্ষের দুইটি ছেদবিন্দু আছে, উহাদিগকে সম্পাৎ বা পাত-বিন্দু (নোড) বলে। যে পাত-বিন্দু অতিক্রম করিয়া চন্দ্র রবিকক্ষের উত্তরে গমন করে তাহাকে রাহু (অ্যাসেণ্ডিং নোড) এবং উহার বিপরীত দিকস্থ পাত-বিন্দুকে কেতু (ডিসেণ্ডিং নোড) বলা হয়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার শেষমুহূর্তে চন্দ্র উক্ত পাত-বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে কোনওটির অর্থাৎ রাহু বা কেতুর সন্নিকটে আসিয়া পড়িলে পৃথিবী চন্দ্র এবং সূর্য একই সমতলে আসার জন্য যথাক্রমে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ

অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য একই দিকে এবং পূর্ণিমায় উভয়ে পৃথিবীর বিপরীত দিকে আসে; আবার সেই সময় চন্দ্র কোনও একটি পাত-বিন্দুর নিকটস্থ হইলে সূর্যও সেই পাত-বিন্দুটির বা তদ্বিপরীত পাত বিন্দুর সন্নিহিত হইয়া পড়ে। সুতরাং অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময়ে কোনও একটি পাত বিন্দুর (রাহু অথবা কেতুর) সহিত সূর্যের সান্নিধ্য বিচার করিয়া গ্রহণের সম্ভাব্যতা নির্ণয় করা যায়। অমান্ত বা পূর্ণিমান্ত কালে নিকটস্থ পাত বিন্দু হইতে সূর্যের উক্ত দূরত্ব নিম্নরূপ :

	গ্রহণের সম্ভাবনা	গ্রহণ নিশ্চিত
সূর্যগ্রহণ	১৭°২৫	১৫°২৩´
চন্দ্রগ্রহণ	১১ ৪৮	৯°২৯´

দেখা যাইতেছে যে রবি ও চন্দ্র যুগপৎ রাহু বা কেতুর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেই যে গ্রহণ হয় তাহা অতি প্রাচীন কালেও জ্যোতির্বিদগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্যই এ দেশে রাহু সূর্য এবং চন্দ্রকে লইয়া নানা প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল এবং গ্রহণকালে রাহুই যে সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে এই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদগণ কিন্তু গ্রহণের প্রকৃত কারণ সম্যক অবগত ছিলেন এবং তাঁহারা গ্রহণ গণনার যে সূত্রাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহাও অতি উচ্চাঙ্গের।

যে কোনও বৎসরে গ্রহণের সম্ভাবনা অন্ততঃ দুইটি এবং দুইটিই সূর্যগ্রহণ। সেইরূপ গ্রহণের সর্বোচ্চ সংখ্যা বৎসরে ৭টি — ৫টি সূর্যগ্রহণ এবং ২টি চন্দ্রগ্রহণ, অথবা ৪টি সূর্যগ্রহণ এবং ৩টি চন্দ্রগ্রহণ। গড় হিসাবে প্রতি ১০০ বৎসরে ২৩৭টি সূর্যগ্রহণ এবং ১৫৪টি চন্দ্রগ্রহণ হয়, অর্থাৎ মোট ৩৯১টি গ্রহণ হইয়া থাকে।

ক্যালডীয় জ্যোতির্বিদগণ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার পাঁচ শত বৎসর পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ১৮ বৎসর ১০ বা ১১ দিন পরে (প্রকৃতপক্ষে ৬৫৮৫ দিন ৮ ঘণ্টা পরে) গ্রহণের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাকে স্যারোস চক্র (Saros cycle) বলে। এই ১৮ বৎসরের যুগে সাধারণতঃ ২৯টি চন্দ্রগ্রহণ এবং ৪২টি সূর্যগ্রহণ হইয়া থাকে। প্রতিটি গ্রহণ এই চক্রের নির্দিষ্ট তারিখে নিয়মিতভাবে ঘটিতে থাকে, কিন্তু গ্রহণের কাল (অর্থাৎ স্পর্শ, মোক্ষ প্রভৃতি কাল) পূর্ববর্তী গ্রহণের কাল হইতে ৮ ঘণ্টা পরে ঘটে বলিয়া কোনও নির্দিষ্ট স্থান হইতে প্রতিবার গ্রহণটি দৃশ্য না হইতেও পারে। অবশ্য এইরূপ তিনটি যুগের পর (অর্থাৎ ৫৪ বৎসর ১ মাস পরে) প্রতি গ্রহণই একই স্থানে এবং প্রায় একই সময়ে দেখা যাইতে থাকে। এইরূপে প্রায় ১২০০ বৎসর ধরিয়া একটি গ্রহণ স্যারোস চক্রের নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহার পর অবশ্য গ্রহণটি আর দেখা যায় না।

সূর্যগ্রহণের সর্বপ্রাচীন লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় চীন দেশে খ্রীষ্টপূর্ব ২১৩৭ অব্দের ২২ অক্টোবর তারিখের গ্রহণ সম্বন্ধে। কথিত আছে যে রাজকীয় জ্যোতির্বিদদ্বয় হি এবং হো এই গ্রহণের কথা পূর্বে বলিতে না পারায় এবং গ্রহণকালে অন্যান্য কর্তব্যে অবহেলা করায় তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির জন্য সূর্যগ্রহণের নির্ভুল পর্যবেক্ষণলব্ধ স্পর্শ ও মোক্ষকালের প্রয়োজন হয়। মেসোপটেমিয়া, মিশর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় খ্রীষ্টজন্মের সময় হইতেই অনেক সূর্যগ্রহণ কালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইগুলির সহিত বর্তমানের পর্যবেক্ষণলব্ধ তুলনা করিয়া রবি ও চন্দ্রের সূক্ষ্ম গতি নির্ণয় করা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই এই বিদ্যার ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে।

দ্র W. M. Smart, *Text Book on Spherical Astronomy*, Cambridge, 1940; Harold Spencer Jones, *General Astronomy*, London, 1951; Samuel Alfred Mitchell, *Eclipses of the Sun*, New York, 1951; Cecilia Payne-Gaposchkin, *Introduction to Astronomy*, London, 1956

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি আক্রোশবশতঃ রাহু সুযোগ মত উহাদিগকে গ্রাস করায় গ্রহণ হয়। দেবরূপধারী দৈত্য রাহু সমুদ্রমন্থন উপলক্ষে সমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃত দেবতাদের সঙ্গে পান করিতে থাকিলে সূর্য ও চন্দ্র তাহাকে বিষ্ণুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও অমৃত রাহুর গলদেশ অতিক্রম করিবার পূর্বেই বিষ্ণুর চক্রের আঘাতে রাহুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। তবে অমৃত পানে উহা অমরত্ব লাভ করে এবং মস্তকমাত্রে পর্যবসিত রাহুর সহিত সূর্য-চন্দ্রের শাশ্বত শত্রুতার সৃষ্টি হয় (মহাভারত, আদিপর্ব, ১৯)।

গ্রহণের সময় অতি পুণ্যকাল বলিয়া বিবেচিত। এই সময় স্নান দান শ্রাদ্ধ জপ প্রশস্ত। বলা হয় গ্রহণ কালে সমস্ত দান ভূমিদান তুল্য, সকল ব্রাহ্মণ ব্যাসসদৃশ, সমস্ত জল গঙ্গাজলের সমান। সাধারণ স্নানদান অপেক্ষা চন্দ্রগ্রহণে স্নানদানাদি লক্ষগুণ অধিক ফলদায়ক, সূর্যগ্রহণে

চন্দ্রগ্রহণের দশগুণ ফল। আর গঙ্গাতীর্থে চন্দ্রগ্রহণে কোটিগুণ, সূর্যগ্রহণে দশকোটিগুণ ফললাভ হয়। স্নানদানাদির প্রচলন এখনও আছে— শ্রাদ্ধের প্রচলন নাই। অনেক ব্রাহ্মণ গ্রহণকালে দান গ্রহণ করেন না, তবে গ্রহণকালে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণান্তে স্বীকার করেন।

গ্রহণের সময় এবং তাহার অব্যবহিত পূর্বে ভোজন নিষিদ্ধ। সাধারণ নিয়ম এই যে বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত কেহ সূর্যগ্রহণের পূর্বে চারি প্রহর ও চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে তিন প্রহর ভোজন করিবে না। চন্দ্রের গ্রস্তোদয় হইলে পূর্ববর্তী দিবাভাগে ভোজন করিবে না। বালক, বৃদ্ধ ও আতুরের পক্ষে সায়াহ্নে গ্রহণ হইলে অপরাহ্নের ভোজন নিষিদ্ধ, অপরাহ্নে গ্রহণ হইলে মধ্যাহ্নে, মধ্যাহ্নে হইলে সংগবকালে বা প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্তব্যাপী সময় পর্যন্ত, সংগবে হইলে তৎপূর্বে ভোজন অবিধেয়। গ্রহণ শেষ হইলে মুক্তগ্রহের পুনরুদয়ের পর ভোজন বিধেয়। গ্রহণ সময়ে গৃহে স্থিত পাক করা অন্ন পরিত্যাজ্য। বর্তমানেও অনেকে গ্রহণের সময় ভোজন করেন না। অনেক বাড়িতে গ্রহণের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া গ্রহণ শেষে রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রহণে এক অহোরাত্র বা তিন দিন অনধ্যায় পালনের নিয়ম আছে। গ্রহণের পর সাত রাত্রি বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ। গ্রহণদর্শন সকলের পক্ষে বিহিত নয়। গ্রহণকালের রাশি নক্ষত্রের সহিত দর্শনেচ্ছুর জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্র মিলাইয়া স্থির করিতে হয় গ্রহণদর্শন তাহার পক্ষে বৈধ কি অবৈধ।

রবিবারে সূর্যগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ চূড়ামণি যোগ নামে পরিচিত। ইহা অতি প্রশস্ত। অন্য গ্রহণ হইতে ইহাতে কোটিগুণ ফললাভ হয়।

দ্র রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গ্রহবর্মা মৌখরিরাজ অবন্তীবর্মার পুত্র। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে এই রাজবংশ উত্তর ভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রভাবশালী হইয়া ওঠে, কিন্তু দীর্ঘকাল বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবার ফলে প্রবল কোনও রাজশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া ইহার শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়া ওঠে। স্থানীশ্বর বা স্থানেশ্বর এর (থানেশ্বর) পুষ্যভূতিবংশীয় প্রভাকরবর্ধনের কন্যা, রাজ্যবর্ধন ও পরে স্বনামধন্য সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রহবর্মা এই অভিলাষ পূরণ করেন। তথাপি তিনি মালবাধিপতি দেবগুপ্তের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার রানী রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হন। রাজ্যবর্ধন মালবাধিপতিকে পরাজিত করেন এবং রাজ্যশ্রীও মুক্তিলাভ করেন কিন্তু গ্রহবর্মার সঙ্গে সঙ্গেই মৌখরি রাজবংশের অবসান হয়। পিতৃরাজ্যের সহিত গ্রহবর্মার রাজ্য লাভ করিয়া হর্ষবর্ধন তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ লাভ করেন।

গ্রাফাইট রসায়ন, অজৈব দ্র

গ্রাবরেখা হিমবাহ দ্র

গ্রাম[১] তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'শব্দস্তোম মহানিধি' গ্রন্থে গ্রাম শব্দের অর্থ পাওয়া যায়— যেখানে বিপ্র, বিপ্রভৃত্য এবং শূদ্রগণও বাস করেন তাহাই গ্রাম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

ব্যুৎপত্তিগতরূপে গ্রামের অর্থ লোকালয় বা জনসমষ্টির বাসস্থানকে বুঝাইলেও বর্তমানে গ্রাম শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করা হয়। শহর হইতে পৃথক মূলতঃ কৃষিনির্ভর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত নাতিবৃহৎ লোকালয়কে গ্রাম বলা হয়। অবশ্য এই জনপদবাসীদের কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। ইহা দেশভেদে এবং কালভেদে বিভিন্ন যথা, ইওরোপে দুই হাজারের কম লোকসংখ্যা হইলে গ্রাম ধরা হয়, আমেরিকায় আট হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকেও গ্রাম বলা হয়। ভারতীয় আদমশুমারের নিয়ম অনুসারে লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার না হইলে ভারতে শহর বলিয়া গণ্য করা হয় না। আবার লোকবসতিহীন মৌজাকেও গ্রাম বলিয়া ধরা হয়। কাজেই কেবলমাত্র লোকসংখ্যা অনুসারে গ্রামকে পৃথক করা চলে না। গ্রামের উৎপত্তিসম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও মোটামুটিভাবে ধরা হয় যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের প্রথম অবস্থায় অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষকেও খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। নব্য প্রস্তর যুগে কৃষির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রথম স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে বাধ্য হইল। গ্রামজীবনের ইহাই সূচনা।

গ্রামসম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হয়। ডেনমার্কের সমাজতত্ত্ববিদ্ ওলুফ সেনকে এই বিষয়ের অগ্রণী বলিয়া গণ্য করা হয়। তিনি মনে করেন যে স্বাধীন অরণ্যচারী আদিম মানবগোষ্ঠীর গ্রামীণ সমাজ আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ মাউরের বলেন যে নিরাপত্তার জন্য আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ দলগুলি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কৃষি

ও পশুচারণের জমির কেন্দ্রস্থলে বসতি স্থাপন করিত এবং সকলে সম্মিলিতভাবে কর্ষণের ও পশুচারণের জমি রক্ষণাবেক্ষণ করিত। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত এইভাবে নূতন নূতন গ্রামের পত্তন হয়।

প্রাচীন ভারতের গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজের রূপ কি ছিল তাহা আমাদের বিশেষ জানা নেই। হেনরি মেইন ভারতবর্ষের ভূমি-সংক্রান্ত আইন ও ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া অনুমান করেন যে তখন ভূমির স্বত্ব ছিল গোষ্ঠীগত। কিন্তু বেডেন পাওয়েল বলেন যে ভারতবর্ষের কর্ষিত জমির এক-তৃতীয়াংশের উপর গোষ্ঠীগত মালিকানা থাকিলেও দুই-তৃতীয়াংশের উপর ব্যক্তিগত অথবা রায়তওয়ারি মালিকানা কায়েম ছিল। বৈদিক যুগের ও বেদোত্তর যুগের সমাজের দণ্ডনীতি ও অর্থনীতির আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া নির্মলকুমার বসু দেখাইয়াছেন যে আর্থিক সাম্যের ভাব না থাকিলেও রাজাকে মেরুদণ্ডস্বরূপ বিবেচনা করিয়া গ্রামেই নানা জাতি স্বীয় বৈদিক ধর্ম পালন করিয়া যাইত।

গ্রামের মধ্যে যেমন নানা জাতি বাস করে, তেমনই গ্রামেরও আবার নানাবিধ প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও গ্রাম চাষীর বাসস্থান ও উৎপন্নদ্রব্য সংরক্ষণের কেন্দ্রস্বরূপ বিরাজ করে। তাহা ছাড়া দুইটি পথের সংযোগস্থলে বা অবস্থানের অন্যবিধ সুবিধার কারণে কোনও কোনও গ্রামে নিয়মিতভাবে হাট বা বাজার বসে। বাংলা দেশের কোনও কোনও গ্রামে দেব-মন্দির বা পূজা-পার্বণকে উপলক্ষ করিয়াও মেলা বসে এবং সেখানে আমোদ-আহ্লাদ ছাড়া যথেষ্ট কেনা-বেচার কাজও হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাম ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে। তৃতীয় শ্রেণীর গ্রাম শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে। কুমোরের গ্রাম, তাঁতীর গ্রাম, কামারের গ্রাম, এমন কি কাঁসারি-প্রধান গ্রামও বঙ্গ দেশ, ওড়িশা বা অন্যান্য রাজ্যেও বর্তমান। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে চোর-ডাকাতের উৎপাত বেশি সেখানে জমিদারের বাসভবন বা দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া গ্রাম গড়িয়া ওঠে। ইহাকে চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাম বলা যায়। প্রাচীন কালে দেশের শাসকগণ সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিদ্যাচর্চার জন্য অগ্রহার বা ব্রাহ্মণশাসন বসাইতেন। ইহাও একপ্রকার গ্রাম।

গ্রামের আর একটি প্রকারভেদ আছে। বাড়িগুলি সারিবন্দী, জমাট বা বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত হইতে পারে।

আধুনিক যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের ফলে নগরের সঙ্গে গ্রামের আদান-প্রদানের ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের গ্রামীণ সমাজের প্রাচীন অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িতেছে। গ্রাসাচ্ছাদন মিটাইবার জন্য আর কেবলমাত্র কৌলিক বৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়া নূতন নূতন বৃত্তি গৃহীত হইতেছে। প্রাচীন পঞ্চায়তী ব্যবস্থার পরিবর্তে সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারাই গ্রামগুলি শাসিত হইতেছে। স্বাধীনতা-লাভের পর গ্রামীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামগুলিকে 'কম্যুনিটি ডেভেলপ-মেণ্ট ব্লক'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী জানা যায় যে বর্তমান ভারতবর্ষের শতকরা বিরাশী জন অধিবাসী মোট পাঁচ লক্ষ দুই শত আটান্নটি গ্রামে বাস করিতেছেন।

দ্র তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য, শব্দস্তোম মহানিধিঃ, কলিকাতা, ১৯১৬, নির্মলকুমার বসু, হিন্দুসমাজের গড়ন, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ভারতের গ্রাম জীবন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ১-৪, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, Henry Maine, *Village Communities in the East and West*, London, 1895, B. H Baden-Powell, *The Indian Village Community*, London, 1896; M. N. Srinivas, *India's Villages*, Calcutta, 1960; *India: Census Report*, 1961, Mckim Marriott, *Village India*, Calcutta, 1961; Publication Division, Government of India, *India 1963*, Delhi, 1964

বিনয় ভট্টাচার্য

গ্রাম[২] সংগীত দ্র

গ্রামদেবতা পল্লীবাসী জনসাধারণের পূজা পার্বণের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে প্রচলিত দেব-দেবীর সহিত গ্রামদেবতা নামে অপর এক শ্রেণীর দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। গ্রামদেবতাদের সংখ্যা অগণিত। ইহাদের মধ্যে নাম, রূপ, প্রতীক ও পূজাবিধির বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও কতকগুলি ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যেও কিছু প্রভেদ চোখে পড়ে।

উত্তর ভারতের গ্রামদেবতার মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক; সাপ, বাঘ, হনুমান, চিল ইত্যাদি পশুপাখি; ভূত-প্রেত, ডাকিনী যোগিনী, বেতালাদি; ভীম, ভীষ্ম, দ্বার-গোসাই, ক্ষেত্রপাল, সুরা-

ভাণ্ডেশ্বরী, বনদুর্গা, শীতলা, ওলাদেবী ইত্যাদি বহু দেবতার সমাবেশ দেখা যায়। ইহা ব্যতীত অপঘাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা ইত্যাদি তো আছেই।

দাক্ষিণাত্যে প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাববশতঃ দুই চারিটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ গ্রামদেবতাই স্ত্রী-জাতীয়। তাঁহাদের নামের সহিত আর্য দেবদেবীগণের নামের কোনও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, যথা – স্বত্যালাম্মা, মামিলাম্মা, চিন্নিনতাম্মা, মারিআম্মা ইত্যাদি। অবশ্য অনেক সময় আর্য দেবীদের নামান্তর বলিয়া বা কোনও পৌরাণিক দেবদেবীর সহিত ইঁহাদের নাম যুক্ত করিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। উত্তর ও দক্ষিণের এই আঞ্চলিক বৈষম্যব্যতীত যে ঐক্যগুলি পাওয়া যায় তাহার বিবরণ মোটামুটি এইরূপ: ১. গ্রামদেবতার প্রত্যেকটিই স্থানীয় দেবতা, সর্বভারতীয় নহেন। ইঁহাদের পূজা ও প্রতিষ্ঠা নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ২. এই দেবতাদের কিছুসংখ্যক শান্ত প্রকৃতির, কিছু উগ্র প্রকৃতির। মানব প্রকৃতির সহিত ইঁহাদের প্রকৃতির অনেক মিল কল্পিত হয়, যথা - অতি অল্প ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে অথবা দীর্ঘ দিন ইঁহাদের পূজায় বিরত থাকিলে ইঁহারা রুষ্ট হন এবং রোগ, শোক, অপমৃত্যু, মড়ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ঘটাইয়া ইঁহারা রোষ প্রকাশ করেন, তখন পূজা, বলি, মানত ইত্যাদির দ্বারা ইঁহাদের শান্ত ও তুষ্ট করিতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ প্রভৃতি উচ্চভাব অপেক্ষা গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও গ্রামবাসীদের সাধারণ সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, রোগ উদ্বেগ লইয়াই তাঁহাদের সম্পর্ক। ফসলের প্রাচুর্য, বন্ধ্যাত্ব, রোগ-শোক, মহামারী ভূত প্রেত ও বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ইঁহাদের পূজা করা হইয়া থাকে ৩. অনেক সময়ে গ্রামদেবতার বিশেষ কোনও মূর্তির পরিবর্তে নানারূপ প্রতীক ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আকার ও পরিমাপের একটি বা একাধিক নুড়ি কিংবা পাথর, কোনও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে সংগৃহীত খোদাই করা পাথরের টুকরা, মাটিতে প্রোথিত বর্শা, ঘট, কলস, প্রদীপ, হাতি বা ঘোড়ার মূর্তি, মাটির কয়েকটি ঢিপি ইত্যাদি বহু বৈচিত্র্যময় প্রতীকের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় ৪. এই দেবতাদের আবাসস্থল সম্পর্কেও বৈষম্যের অন্ত নাই। দেবস্থান কোথাও বা ছোটখাটো মন্দিরের তুল্য, কোথাও বড় একটি কুলুঙ্গির মত, কোনও কোনও গ্রামে চালাঘর, কোথাও বা শুধু পাথর দিয়া ঘেরা একটু জমি, কোথাও বড় বড় পাথর সাজাইয়া খোপের মত তৈয়ারি স্থান। ইহা ব্যতীত মাটির বেদি, বট-অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের তলা, অথবা বড় বড় কয়েকটি শাল প্রভৃতি গাছের সমষ্টি ইত্যাদি স্থানে গ্রামদেবতার আবাস কল্পিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্রামের দক্ষিণে দেবমন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ। কিন্তু গ্রামদেবতার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে ৫. এই গ্রামদেবতাদের পূজার জন্য কোনও বিশেষ পুরোহিতশ্রেণী দেখা যায় না। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় 'অস্পৃশ্য' জাতীয় অথবা উপজাতির অন্তর্গত অব্রাহ্মণ পূজারী এই সকল দেবতার পূজায় অংশগ্রহণ করে, যথা ভুইয়াঁ, মুচী, মুসলমান, দফালী, দোষাদ, মড়িগা, মাল, চেরো, বৈগা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেতর বিভিন্ন জাতি এই সকল পূজায় যোগ দিয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে বলির মাংস তাহারা গ্রহণ করে না। ইহার একটি কারণ ধূপ ধুনা, আতপ চাল ইত্যাদি শুদ্ধ উপচারের সহিত ব্রাহ্মণ প্রথায় নিষিদ্ধ মোরগ, শূকর, মহিষ বলি অনেক সময় গ্রামদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। পূজা-পদ্ধতিও সাধারণ প্রচলিত দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি হইতে বহুলাংশে পৃথক ৬ গ্রামদেবতার পূজার কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নাই, দুই এক বৎসর পর পর, অথবা যখনই সংক্রামক ব্যাধি, মড়ক বা দৈবদুর্বিপাক দেখা দেয় তখনই কেবল পূজার ব্যবস্থা হয়। কিংবা বৎসরান্তে ফসল কাটা শেষ হইলে যখন চাষী-গৃহস্থের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্যের সময় তখনই কোনও এক দিনে পূজার আয়োজন হয়।

জ্যোতি সেন

গ্রাসমান, হেরমান গুন্‌থের (১৮০৯-৭৭ খ্রী) ভাষাতাত্ত্বিক, সংস্কৃতজ্ঞ এবং গণিতবিদ। বাল্টিক সমুদ্র কূলে স্টেটিন শহরে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল গ্রাসমান এর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। গ্রাসমান ১৮ বৎসর বয়সে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বৎসরে পাঠ সমাপন করিয়া স্টেটিনে ফিরিয়া আসেন এবং লাতিন, গ্রীক ও গণিতের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন বের্লিন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে শিক্ষকতা করার পর তিনি বিখ্যাত এটো স্কুলে গণিতের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। তিনি আমরণ ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গ্রাসমান ছিলেন সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ গাণিতিক। তবে ভারতবাসীর নিকট সংস্কৃতজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিদ্-রূপেই তাঁহার সমধিক খ্যাতি।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। উহা 'গ্রাসমান ল' বা গ্রাসমান সূত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সংস্কৃতই ইন্দো-জার্মান গোষ্ঠীর আদিভাষা— এই তাৎকালিক ধারণার পরিবর্তন সাধনে, সংশ্লিষ্ট ভাষার মধ্যে ধ্বনি-পরিবর্তন বিষয়ে গ্রাসমানের

আবিষ্কৃত সূত্রটি বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল। গ্রাসমানের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ঋগ্‌বেদের অভিধান ('ভোর্টেরবুখ ৎসুম ঋগ্‌বেদ') বিখ্যাত এবং দুই খণ্ডে প্রকাশিত (১৮৭৯ ৮১ খ্রী) ঋগ্‌বেদের অনুবাদও তাঁহার স্মরণীয় কীর্তি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর গ্রাসমানের মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত

গণিতবিদ্যায় গ্রাস্‌মান কৃত মৌলিক গবেষণাবলী তাঁহার মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়। বিন্দু, রেখা ও তলের বিশ্লেষণে তিনি লাইব্‌নিট্‌স আবিষ্কৃত সমাকলনের (ক্যালকুলাস) পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি স্থানাঙ্কের (কো অর্ডিনেট) সাহায্যে প্রদত্ত দেশের উপদেশ স্থাপন করার পদ্ধতিরও আবিষ্কর্তা। তাঁহাকে আধুনিক বীজগণিতের অন্যতম প্রবর্তক বলা হয়। তাঁহার গবেষণার ফলেই পরবর্তী কালে 'ভেক্টর বিশ্লেষণে'র আবিষ্কার সুগম হইয়াছে।

অমিতাভ সেন

গ্র্যানভিল-বার্কার, হার্লি (১৮৭৭-১৯৪৬ খ্রী) একজন প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও সমালোচক। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর লণ্ডনে তাঁহার জন্ম। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মার্গেট থিয়েটার প্ল্যাস পরিচালিত অভিনয় কেন্দ্রে যোগদান করেন ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস হট্রির পরিচালনায় লণ্ডনের নাট্যশালায় আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্যাত পরীক্ষা সংস্থা ইন্‌কর্পোরেটেড স্টেজ সোসাইটিতে যোগদান করিয়া উইলিয়াম পোয়েল এর সহিত একযোগে ব্রিটিশ নাট্যশালার সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোর্ট থিয়েটারের পরিচালনা গ্রহণ করিয়া ইব্‌সেন, গলস্‌ওয়ার্দি, মেটারলিংক, মেস্‌ফিল্ড, গিলবার্ট মারে কৃত গ্রীক নাটকের অনুবাদ এবং বার্নার্ড শ এর কিছু নূতন নাটকের সহিত দর্শকদিগের পরিচয় ঘটান। নিজের নাটকগুলির মধ্যে—'দি ভয়সি ইনহেরিটেন্স' (১৯০৫ খ্রী), 'প্রুনেলা' (লরেন্স হাউসম্যানের সহিত যুগ্ম রচনা ১৯০৬ খ্রী), 'ওয়েস্ট' (১৯০৭ খ্রী) এবং 'দি ম্যাড্রাস হাউস' (১৯১০ খ্রী) তিনি এই থিয়েটারেই প্রযোজনা করেন।

তিনি শেকস্‌পিয়ার এর 'দি উইন্টার্স টেল' এবং 'টুয়েলফ্‌থ নাইট'-এর প্রযোজনায় প্রচলিত আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্যসজ্জা ও অতিনাটকীয় কথনভঙ্গী ত্যাগ করিয়া ফাঁকা মঞ্চে দ্রুত কথোপকথনের রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে তাঁহাকেই যুগ-প্রবর্তক মনে করা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে রেড ক্রসে অংশ গ্রহণ করার পর গ্র্যানভিল বার্কার আর নাট্যশালায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই। পারীতে (প্যারিস) বসবাস করিয়া তিন পর্যায়ে 'প্রেফেসেস টু শেকস্‌পিয়ার' (১৯২৭ ৪৫ খ্রী) প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ আগস্ট পারীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র Charles Benjamin Purdom, *Harley Granville-Barker*, Cambridge, 1956

উৎপল দত্ত

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ষোড়শ শতকে আফগান সম্রাট শের শাহ্‌ কর্তৃক গঙ্গা নদীর উপকূলবর্তী বাংলা দেশ হইতে দিল্লী পর্যন্ত সংযোগকারী এক সুদীর্ঘ রাস্তা নির্মিত হয়। এই রাস্তাই পরবর্তী কালে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত হয়।

ইহাকে বাংলা দেশের সোনারগাঁ হইতে আগ্রা, দিল্লী ও লাহোর অতিক্রম করিয়া সিন্ধু দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। পথচারীদের সুবিধার্থে শের শাহ্‌ এই পথের উভয় পার্শ্বে নানা প্রকার বৃক্ষরোপণ এবং বিশ্রামাগার ও সরাইখানা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বৃটিশ যুগে লর্ড ডালহৌসি দেশরক্ষায় সৈনিকদের গতিবিধি সহজ করিবার প্রয়াসে এবং ডাক সরবরাহের সুবিধার্থে এই রাস্তাটির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন। তিনি ইহাকে কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই রাস্তার সংস্কারকার্য আরম্ভ হয় এবং নাম দেওয়া হয় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভারতে বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রথম ২৬ কিলোমিটার (১৬ মাইল) অর্থাৎ কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা ছিল। জব্বলপুর হইতে মির্জাপুর এবং এলাহাবাদ হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কতকগুলি রাস্তা ছিল। ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঐ বৎসরই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার পরিকল্পনা করেন।

সেই সময়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রধান প্রধান অংশ বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির মিলিটারি বোর্ডের শাসনাধীন ছিল। কলিকাতার মিলিটারি বোর্ডের উপর বাংলা দেশের ও উত্তর ভারতের অংশ সংস্কার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা

হয় এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে কলিকাতা ও দিল্লীর বিভিন্ন পথ-নির্মাণ এবং পুরাতন পথ-সংস্কারের দায়িত্বও ন্যস্ত হয়। সেই সময়ে ৩৭৭ কিলোমিটার (২৩৪ মাইল) পথ পাকা করা হয়। পরবর্তী কালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহার সংস্কারকালে পাকা রাস্তা ক্রমশঃ দীর্ঘ রূপ ধারণ করে। যদিও প্রারম্ভিক কালে এই দীর্ঘপথ-নির্মাণের ব্যয় আনুমানিক ৩৩ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কার্যকালে ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পর ইহার গঠন-কার্য ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাধা হইয়াছিল।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol III, Oxford, 1908

অশোকা সেনগুপ্ত

গ্র্যাভিটেশন অভিকর্ষ দ্র

গ্রিফিথ, ডেভিড ওয়ার্ক (১৮৭৫-১৯৪৮ খ্রী) আমেরিকার প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। চলচ্চিত্রকার-রূপে গ্রিফিথের প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটে 'বার্থ অফ এ নেশন' (১৯১৫ খ্রী) ছবিতে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত এই ছবিতে গ্রিফিথের ক্যামেরার ব্যবহার, দৃশ্য-পরিকল্পনা ও সম্পাদনার কাজ চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ, ভাষা ও প্রকরণরীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করিল। চলচ্চিত্রক্ষেত্রে গ্রিফিথের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান 'ইন্‌টলারেন্স' (১৯১৬ খ্রী)। বিভিন্ন যুগের চারিটি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গ্রিফিথ এই ছবিতে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে অসহিষ্ণুতা ও সামাজিক বৈষম্যের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেন। বক্তব্য ও মানবিক আবেদনের গভীরতায় ও দৃশ্যকল্পের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এই ছবিকে সমালোচকেরা পৃথিবীর প্রথম 'দার্শনিক চলচ্চিত্র' (ফিলসফিক্যাল ফিল্ম) আখ্যা দিয়াছেন। গ্রিফিথ-কৃত আরও কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র হইল 'ব্রোকেন ব্লজমস্' (১৯১৯ খ্রী), 'ওয়ে ডাউন ঈস্ট' (১৯২০ খ্রী), 'অর্ফ্যান্‌স অফ দি স্টর্ম' (১৯২২ খ্রী) ও 'ইজ নট লাইফ ওয়াণ্ডার-ফুল' (১৯২৪ খ্রী)।

ক্যামেরার নিকট-দৃষ্টির (ক্লোজ-আপ) শিল্পসম্মত প্রয়োগ ও সম্পাদনার মাধ্যমে ছবিতে গতিময়তা এবং সুষম নাট্যছন্দের সৃষ্টি গ্রিফিথের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব শিল্পভঙ্গিমা ও তাহার স্বাধীন বিকাশের পথ সুগম হয়।

অমিতাভ ঘোষ

গ্রিফিথ, র‍্যাল্‌ফ টমাস হচ্‌কিন (১৮২৬-১৯০৬ খ্রী) প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদকরূপে যে কয়জন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত খ্যাতিমান হইয়াছিলেন, র‍্যাল্‌ফ টমাস হচ্‌কিন গ্রিফিথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইংল্যাণ্ডের উইল্টশায়ারের অন্তর্গত কোরস্লেতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে বি. এ এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. উপাধি প্রাপ্ত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালে তিনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেম্যান উইল্‌সন এর সংস্পর্শে আসেন এবং তিনিই তাঁহাকে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করেন। ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে যোগদান করিয়া তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর কুইনস কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কুইনস কলেজের অধ্যক্ষের পদে আসীন হন। বারাণসীতে অবস্থানকালীন তিনি আট বৎসর একটি সংস্কৃত পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। কুইনস কলেজ হইতে তিনি যুক্ত প্রদেশের অস্থায়ী শিক্ষা-অধিকর্তার (ডি পি আই) পদে উন্নীত হন এবং সেই কর্মক্ষেত্র হইতেই তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি জেলার কোটাগিরি নামক স্থানে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি রামায়ণ (১৮৭০-৭৪ খ্রী), ঋগ্বেদ (১৮৮৯-৯২ খ্রী), অথর্ববেদ (১৮৯৫-৯৬ খ্রী) এবং বাজসনেয়ি যজুর্বেদ সংহিতার (১৮৯৯ খ্রী) ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। কোটাগিরিতে ৮০ বৎসর বয়সে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর তারিখে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'স্পেসিমেন অফ ওল্ড ইণ্ডিয়ান পোয়েট্রি' (১৮৫২ খ্রী), 'দি বার্থ অফ দি ওয়র গড' (১৮৫৩ খ্রী), 'সিনস ফ্রম দি রামায়ণ' (১৮৬৪ খ্রী) এবং 'আইডিল্‌স ফ্রম দি স্যানসক্রীট' (১৮৬৬ খ্রী)।

দ্র G A Natesan, *Eminent Orientalists*, Madras, 1922

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় ইয়াকব লুডভিগ কার্ল গ্রিম (১৭৮৫-১৮৬৩ খ্রী) ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিলহেল্‌ম (১৭৮৬-১৮৫৯ খ্রী) অষ্ট্রিয়ার হেস্ ক্যাসেলে হানাউ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভাই-ই মারবুর্গে আইন শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সাভিনি (Savigny) র নিকট রোমক আইন বিষয়ে অনুশীলন করিতে করিতে ইয়াকব

পুরাতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও নানা প্রাচীন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি লইয়া ঐতিহাসিক গবেষণা ও ভাষাতত্ত্ব এবং লোককথা সম্পর্কে যথেষ্ট চর্চা করিয়াছিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াকব পণ্ডিত সাভিনির আহ্বানে পারীতে (প্যারিস) তাঁহার সাহিত্যিক কর্মে সহায়তা ও সেইসঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্য অনুশীলন করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওয়েস্টফালিয়ার রাজা জেরোম বোনাপার্টের গ্রন্থশালার তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

ইহার পর কিছুকাল নানা স্থানে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দপ্তরে চাকুরি করিয়া দুই জনেই গোটিঙ্গেনের পুস্তকাগারে নিয়োজিত হইলেন। ইয়াকব তদ্ভিন্ন অধ্যাপকের পদও পাইলেন। পুরাতত্ত্ব, ভাষার ক্রমোন্নয়ন, প্রাচীন সংস্কার ও কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে ইয়াকবের অনলস গবেষণা তখনও চলিতেছিল।

মধ্যে ইয়াকব ও ভিলহেল্‌মকে রাজরোষে পড়িয়া গোটিঙ্গেন ত্যাগ করিতে হইলে তাঁহারা পুনরায় কাসেল-এ ফিরিয়া যান। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে দুই জনে বের্লিন নগরে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন ও সেখানেই তাঁহাদের বাকি জীবন অতিবাহিত হয়। এই সময় হইতে তাঁহারা তাঁহাদের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্বমূলক অভিধানের কাজ আরম্ভ করেন।

পৃথিবীর সকল দেশের লোকে ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইয়াকব গ্রিমকে যত না চেনে, তাহার অনেক বেশি চেনে জার্মান উপকথা-রচয়িতা গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়কে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি দুই জনে অক্লান্তভাবে নানা গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি পড়িয়া ও লোকের মুখে গল্প শুনিয়া উপকথার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, আজও এই গ্রন্থের আদর কমে নাই।

উপকথা সম্পর্কে ইহার আগে কেহ এমন গভীরভাবে গবেষণা করে নাই, ফলে নূতন একটি বিজ্ঞানের প্রবর্তন হইল। অন্যদিকে ইয়াকবের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভাষায় একই শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি কি ভাবে ও কি নিয়মে পরিবর্তিত হয়, এই সম্পর্কে বিখ্যাত 'গ্রিম্‌স ল' প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রিম প্রণীত তিন খণ্ডে প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রামার একটি অভাবনীয় কীর্তি। এই গ্রন্থে জার্মানিক ও সমগোত্রীয় ভাষার যাবতীয় নিয়ম এবং যাবতীয় শব্দ, শব্দাংশ ও অক্ষরের উচ্চারণ-পদ্ধতির সদৃষ্টান্ত উল্লেখ আছে।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়াকব প্রায় ত্রিশটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ও নিজের জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক গবেষণার কাজেই তিনি ভিলহেল্‌ম-এর অশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি গভীর স্নেহ সকলকে মুগ্ধ করিত। ইয়াকব চিরকুমার, ভিলহেল্‌ম বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি একই বাড়িতে বাস করিয়া, যাবতীয় সম্পত্তি সমানভাবে ভোগ করিয়া, সব চিন্তা ও দায়িত্ব সমানে বহন করিয়া অতি আশ্চর্য জীবন তাঁহারা যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দ্র W. Scherer, *Melchior Grimm*, Paris, 1925.

লীলা মজুমদার

গ্রিয়র্সন, জর্জ আব্রাহাম (১৮৫১-১৯৪১ খ্রী) আয়রল্যাণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিনের সন্নিকটে একটি পল্লীতে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়র্সন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রিয়র্সন ডব্‌লিন, কেম্‌ব্রিজ ও হালে (জার্মানি) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ডব্‌লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার কালেই তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রিয়র্সন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতে আসেন।

১৮৭৩ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রিয়র্সন বাংলা প্রদেশের (অর্থাৎ সমগ্র বাংলা এবং বিহার ও ওড়িশা) বিভিন্ন অঞ্চলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কলেক্টর, স্কুল ইন্স্‌পেক্টর, অহিফেন-এজেন্ট রূপে কাজ করেন। কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রাকৃত, পুরাতন হিন্দী, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, ছত্রিশগড়ী এবং বাংলা প্রভৃতি কথ্য ভাষার অনুশীলনে তিনি ব্যাপৃত থাকেন। উত্তর বঙ্গে অবস্থানকালে গ্রিয়র্সন রংপুরের উপভাষা লইয়া আলোচনা করেন। সে আলোচনা বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৭ খ্রী)। গ্রিয়র্সন উত্তর বঙ্গের জনপ্রিয় লোক-কাব্য 'মানিকচন্দ্রের গান' সংগ্রহ করিয়া, পরবর্তী বৎসরে ইংরেজী অনুবাদ-সহ নাগরী লিপিতে এবং পরে 'গোপীচাঁদের গীত'ও অনুবাদ-সহ ঐ পত্রে প্রকাশ করেন। বিহারের পল্লী অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রিয়র্সন মৈথিলী ভোজপুরী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় নিবদ্ধ পুরাতন সাহিত্য ও লোক-গীতির নিদর্শনও সংগ্রহ করেন। ভাষা বিষয়ে গ্রিয়র্সনের আলোচনা ও তাঁহার সংগৃহীত সাহিত্য-নিদর্শন বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় এশিয়াটিক

গ্রিয়র্সন, জর্জ আব্রাহাম

সোসাইটির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত (১৮৮১-৮২ খ্রী) *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar* এবং কলিকাতা হইতে স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে আট খণ্ডে প্রকাশিত (১৮৮৩-৮৭ খ্রী) *Seven Grammars of the Dialects and Subdialects of the Bihari Language*। গ্রিয়র্সন প্রথমোক্ত গ্রন্থে, মৈথিলী ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দাবলী ছাড়াও, মৈথিলী ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির পদাবলী পরিবেশন করেন, ইহাই বিদ্যাপতির পদের প্রথম সংকলন। বিহারের মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, প্রত্যেকের বিশিষ্ট লক্ষণ ইত্যাদি গ্রিয়র্সন পূর্বোক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে নির্দেশ করেন। এই সময়েই (১৮৮৫ খ্রী) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় গ্রিয়র্সনের যৌবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি *Bihar Peasant Life*, এই বৃহৎ গ্রন্থখানি বিহারের জন-জীবনের এক তথ্য সমৃদ্ধ আলেখ্য এবং গ্রাম্য শব্দাবলীর এক অভিনব সংগ্রহ।

ভারতে অবস্থান কালেই ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মানির প্রাচ্যবিদ্যা-সমিতির মুখপত্রে (ZDMG) প্রকাশিত হয় গ্রিয়র্সনের *On the Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernaculars*। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার তুলনামূলক আলোচনায় গ্রিয়র্সনের এই সন্দর্ভটি অন্যতম পথ-প্রদর্শক রূপে গণ্য হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনাতে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পরে গ্রিয়র্সনকে কর্ণধার করিয়া ভারতে একটি ভাষা-সমীক্ষার সংস্থা (Linguistic Survey of India) গঠিত হয়। ইহাতে তিনি ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, ভারতে ভাষা-সমীক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় মাল-মসলা সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

গ্রিয়র্সন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান এবং লণ্ডনের নিকটে ক্যাম্বারলে পল্লীতে স্বীয় বাসভবনে তিনি ভারতীয় বিদ্যার সাধনাতেই জীবনের শেষ আটত্রিশ বৎসরকাল একান্ত ব্যাপৃত থাকেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গ্রিয়র্সনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি *Linguistic Survey of India* প্রকাশিত হইতে থাকে এবং পঁচিশ বৎসরে একে-একে ইহার কুড়ি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহাতে ভারতে প্রচলিত ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি ভাষার ক্ষেত্রেই গ্রিয়র্সন তাহার ব্যাকরণের একটি সাধারণ ছক এবং কিছু কিছু বাঙ্ময় নিদর্শনও দিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির কুলপঞ্জী, একই কুলের বিভিন্ন ভাষার পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, প্রত্যেকের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং সর্বভারতীয় বৃহৎ পটভূমিকায় কোন্‌টির কোথায় স্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ই গ্রিয়র্সনের বিরাট গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোথাও এই জাতীয় ভাষা-সমীক্ষার প্রচেষ্টা হয় নাই।

ভারতে আর্যভাষা ছাড়াও অনেকগুলি অনার্য ভাষা প্রচলিত আছে, গ্রিয়র্সনের গ্রন্থে এই ভাষাগুলিও বাদ পড়ে নাই। অনার্যভাষাগুলির বর্ণনায় ও বিচারে গ্রিয়র্সন কতিপয় সুযোগ্য পণ্ডিতের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নরওয়ের বিশিষ্ট ভারত-বিদ্যাবিদ্ স্টেন কনো (Sten Konow)। যে খণ্ডে কোল (মুণ্ডা) ও দ্রাবিড় ভাষাগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই খণ্ডটি ইনিই প্রস্তুত করেন।

গ্রিয়র্সনের বিচারে দরদ গোষ্ঠীর আর্যভাষা ইন্দো ইরানীয় বা আর্যভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা। আর্যভাষার অন্য দুই শাখার, ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যের, মধ্যবর্তী কাশ্মীরী ভাষাকে গ্রিয়র্সন দরদ শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ভারতে থাকিতেই গ্রিয়র্সন কাশ্মীরী ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক লইয়া *Journal of the Asiatic Society of Bengal*-এ ও অন্যত্র প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেন। এইরূপ কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ *Essays on Kasmiri Grammar* নামে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। পরে ব্যাকরণ ও শব্দাবলী-সংবলিত কাশ্মীরী ভাষার ভূমিকা স্বরূপ তাঁহার *A Manual of the Kasmiri Language* গ্রন্থখানি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কাশ্মীরী ভাষার ব্যাকরণ লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার পরিণত ফল চারি খণ্ডে প্রকাশিত *A Dictionary of the Kasmiri Language* (১৯১৬-৩২ খ্রী)। গ্রিয়র্সন কাশ্মীরী ভাষায় রচিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থেরও সম্পাদনা করেন। এইরূপ একখানি সম্পাদিত গ্রন্থ *The Kasmiri Ramayana Comprising the Sriramavataracarita and the Lavakusayuddhacarita of Divakara Prakasa Bhatta* ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজীতে লিখিত ভূমিকা ও কাব্যের সারাংশ সংযোজিত হওয়াতে এই সংস্করণের মূল্য অধিকন্তু বৃদ্ধি পায়।

গ্রিয়র্সন সাধারণ্যে মুখ্যতঃ অসাধারণ ভাষাবিদ্‌রূপেই পরিচিত। কিন্তু ভারতের উত্তরাখণ্ডের আধুনিক আর্য-

ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্য ও লোক-গীতির সংগ্রহ ও পরিবেশনের (কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইংরেজী অনুবাদ-সহ) মূলে ছিল যুগপৎ ভাষা-বিজ্ঞানীর ভাষা-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য-রসিকের রস-পিপাসা। মধ্যযুগের উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তুলসীদাসের কাব্য অবলম্বনে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সারগর্ভ আলোচনা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ হইতে প্রকাশিত গ্রিয়র্সনের *The Mediaeval vernacular literature of Hindustan, with special reference to Tul'si Das*-শীর্ষক সন্দর্ভে সংরক্ষিত হইয়া আছে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রের একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রিয়র্সনের *The modern vernacular literature of Hindustan* প্রকৃতপক্ষে উত্তর ভারতের তথাকথিত 'হিন্দী সংসার'-এর সাহিত্য কর্মের একখানি লঘু কোষ-গ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীর সহযোগিতায় গ্রিয়র্সন মধ্যযুগের উত্তর ভারতের অন্য এক বিশিষ্ট কবি মালিক মুহম্মদ জয়সি-র পুরাতন অবধীতে রচিত আখ্যান-কাব্য 'পদুমাবতি'-র একটি (অসম্পূর্ণ) সংস্করণও প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে গ্রিয়র্সনের সম্পাদকতায় প্রকাশিত বিহারীলালের অলংকারবহুল কাব্য 'সতসৈয়া'-র সংস্করণ উল্লেখযোগ্য।

গ্রিয়র্সনের রচনার বিষয় বিচিত্র। নব্বই বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে প্রায় সত্তর বৎসরই গ্রিয়র্সন ভারত-বিদ্যার সাধনাতে উৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতের ন্যায় বিরাট দেশ ও তাহার বিচিত্র মানুষ ও বিচিত্রতর জীবন-ধারা সম্পর্কে গ্রিয়র্সনের ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধিৎসার বাঙ্ময় সাক্ষ্য তাহার বিপুল রচনা-সম্ভার।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ গ্রিয়র্সনের মৃত্যু হয়।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে জার্মান পণ্ডিত শ্লীমান (Schliemann) ও ডর্পফেল্ডের (Dorpfeld) মিকেনাই ও ট্রয় অঞ্চলের খনন কার্যের সঙ্গে যে অনুসন্ধান শুরু হয়, তাহার শেষ হইয়াছে এই শতাব্দীর ব্লেগেনের ট্রয় অঞ্চলের খনন সমাপ্তিতে (৩য় ও ৪র্থ দশক) ও ইতিপূর্বে অপঠিত অজ্ঞাত কোনও ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রীসের Linear B (রেখাত্মক খ) লিপির ইংরেজ পণ্ডিত ভেন্ট্রিস (Ventrys) কর্তৃক পাঠোদ্ধারে (৫ম দশক)। এখন জানা গিয়াছে যে, হোমরের আকিয়ানরা নিঃসংশয়ে গ্রীকভাষী ছিল এবং তাহারা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বর্ষ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে গ্রীসে প্রবেশ করিতে শুরু করে। ১৬০০-১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মিকেনাই, টিরিনস ও পিলস্ অঞ্চলে এক অতি উন্নত ব্রঞ্জ সভ্যতার বিকাশ হয়।

ব্রঞ্জ যুগের এই মহাসমৃদ্ধ সভ্যতার কিছু পরিচয় পাই গ্রীক মহাকাব্যদ্বয় ইলিয়াড ও অডিসিতে, আর কতকটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে। গ্রীস তখন কতকগুলি অল্পবিস্তর স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটির কেন্দ্রস্থলে ছিল দুর্গপ্রাকারবেষ্টিত প্রাসাদ। প্রত্যেক অঞ্চলেই আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য, ক্রীতদাস-প্রথা ও শ্রম-বিভাগ রীতিমত প্রচলিত ছিল। ভূমিব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল। বাণাকৃতিক ও মধুচক্রাকৃতিক সমাধিগুলিতে (shaft and beehive graves) যে ঐশ্বর্য সম্ভারের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার সাক্ষ্য হোমরের মহাকাব্য দুইটিতে বিদ্যমান।

খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দের কাছাকাছি গ্রীক বংশীয় এক নূতন আক্রমণকারীর দল দোরীয় (Dorian)-রা সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে (পিলস লিপির সাক্ষ্য অনুসারে) উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে গ্রীসে প্রবেশ করে। এবার লৌহ যুগ শুরু হয়। কিন্তু ইহার পরে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০-৭০০ অব্দ পর্যন্ত আমরা গ্রীস সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না, এই যুগকে প্রাচীন গ্রীসের 'তমিস্রাময় যুগ' বলা হয়।

হোমরের মহাকাব্যে এক নবীন সভ্যতার সমুজ্জ্বল অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর হইতে গ্রীক- (এবং তাহার উত্তরাধিকারী) ইওরোপীয় সভ্যতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ইলিয়াডে দেখি মহৎ চরিত্রসৃষ্টি, অপূর্ব গঠনক্ষমতা, মনুষ্য চরিত্রে গভীর ও সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টি, কঠোর শৌর্যের সঙ্গে কোমলতা ও মমতার অপূর্ব বিন্যাস। একদিকে বীর নায়ক আখিল্লেউস বা আকিলীস— যাঁহার নিকট আত্মগৌরবের অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই, অন্য দিকে হেক্টর যিনি আত্মাভিমানকে বৃহত্তর স্বার্থের নিকট অবনমিত করিতেছেন। মহাযুদ্ধের আখ্যান দীর্ঘ অথচ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া অবশেষে একটি গাঢ় গম্ভীর সুরে সমাপ্ত হইয়াছে। অডিসির নায়ক অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার সহিত দুর্গতি ও দেবতার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়াও অবশেষে দেশে ফিরিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। সমস্ত কাহিনীটি ইলিয়াড অপেক্ষা লঘুসুরে রচিত হইলেও অডিসিতে ঘটনাবৈচিত্র্য অনেক বেশি এবং এই কারণেই ইহা এত মনোজ্ঞ।

হোমরের দেব-দেবীগণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন, তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। দুটি যুধ্যমান দল, উভয়েরই সমর্থক দেব-দেবী আছেন। এই

দেবতারা দ্যুলোকবাসী, বজ্রধারী জেউস ইহাদের রাজা। মানুষের অপেক্ষা শুধু ক্ষমতায় ও অমরতায় ইহারা শ্রেষ্ঠ, নৈতিক দিক দিয়া একেবারেই নয়। হোমরের অব্যবহিত পরের যুগে বিওতিয়ার আস্ক্রা শহরের হেসিওড— তাঁহার 'থেওগনি' (Theogony) নামক মহাকাব্যে ওলিম্পীয় দেবসভার একটি পূর্ণায়ত আলেখ্য পাওয়া যায়। কিন্তু জেউস্, পোসেইদোন, আপোল্লো, আরেস্, হেরা, আর্তেমিস্, আথেনা, দেমেতের্ প্রভৃতি ওলিম্পীয় দেব-দেবী ছাড়াও গ্রীক দেবলোকে আর একটি পরাক্রান্ত দেবতা আছেন, ইনি দিওনুসস, একজন বহিরাগত দেবতা, সম্ভবতঃ এশিয়া হইতে থ্রেসের পথে গ্রীসে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে সমগ্র দেশের ধর্মজগতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। এ ছাড়াও গ্রীসে আরও নানা রকম প্রাচীন পূজা ও উপাসনা-প্রথা প্রচলিত ছিল— যেমন পবিত্র বৃক্ষ, শিলাখণ্ড ও জীবজন্তুর পূজা। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে গোপন দীক্ষাসংবলিত উপাসনা পদ্ধতির (মিস্ট্রি কাল্ট্স্)-এর উদ্ভব হয়। গ্রীক ধর্ম বা ধর্মচিন্তায় ব্যক্তিগত মোক্ষের কোনও স্থান ছিল না। কিন্তু অর্ফিক (Orphic) হইতে পিথাগোরীয় (Pythagorean) সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত প্রত্যেকটিরই মোক্ষই লক্ষ্য ছিল এবং এই ধর্মানুষ্ঠান-গুলির প্রচুর প্রভাব গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনে পাওয়া যায়। যে আত্মানুভূতি ও অন্তর্মুখিনতার পরিচয় আমরা গ্রীক ট্রাজেডির বা প্লাতোর দর্শনে পাই তাহার অনেকটাই সম্ভবতঃ এইসব উপাসনা (কাল্ট) হইতে আসিয়াছে। তাহা ছাড়া ছিল দৈববাণীর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস, আপোল্লো ছিলেন দৈববাণীর প্রধান দেবতা। দেলফির আপোল্লো মন্দির, সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া গ্রীসে দৈববাণীর প্রধান কেন্দ্র ছিল।

হেসিওডের অপর মহাকাব্য 'এর্গা কায় হিমেরা'— অর্থাৎ 'কৃত্য ও দিনচর্যা'। ভ্রাতা পের্সেসের উদ্দেশে লেখা এই কাব্যে নানা রকম নৈতিক উপদেশ ছাড়াও গ্রীক চাষীর সুকঠোর জীবন ও কৃষিপদ্ধতির পরিচয় পাই। এইজন্য কবি হিসাবে হেসিওড হোমারের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হইলেও অন্য কারণে ইহার কাব্য মূল্যবান।

গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি সিটি স্টেট বা নগররাষ্ট্রের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক নবম শতাব্দী হইতে রাজতন্ত্রের পতন শুরু হয় ও অভিজাত-শ্রেণী ক্ষমতা হস্তগত করিতে থাকেন। এখন হইতে নগররাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। তবে শুধু শ্রেণী-সংগ্রাম বা অর্থনৈতিক পটভূমিকা নয়, গ্রীসের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সংস্থানও নগররাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের কারণ। উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর দ্বারা বহুধাবিভক্ত এই দেশ মাকেদনের সার্বভৌমত্বের পূর্বে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) কখনও একজনের আধিপত্যভুক্ত হয় নাই।

গ্রীক সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি সর্বব্যাপী অনুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা, মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতি অপরিসীম আস্থা, তাহার পর কাব্য, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পে গ্রীসের উন্নতমানের সৃষ্টিসাফল্য। এ সবেরই উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছে নগররাষ্ট্রিক সভ্যতায়— প্রথমে ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ও এশিয়া মাইনরে ঈজিয়ান উপকূলবর্তী শহরগুলিতে, তাহার পরে আথেন্সে এবং কিছু পরিমাণে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীয় উপনিবেশগুলিতে। গ্রীকদের সর্বাপেক্ষা বড় গর্বের বিষয় ছিল ধর্মনীতির শাসন— স্বৈরাচারী শাসন কখনও মানিয়া না লওয়া। গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগের পতন পর্যন্ত— অর্থাৎ মাকেদনের রাজা ফিলিপের অভ্যুত্থান পর্যন্ত— নীতির, লিপিবদ্ধ আইনের মর্যাদা গ্রীসে কখনও লুপ্ত হয় নাই।

আথেন্সের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠপর্বে পেরিক্লেসের যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক) মাত্র কয়েক দশকের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও নারী, বিদেশী ও ক্রীতদাসের কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাধিকার ছিল না, তথাপি স্বাধীন গ্রীক নাগরিকদের সমত্বের ভিত্তিতেই এই শহরে শিল্প বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ও বিকাশ দেখা গিয়াছিল। স্পার্টায় ছিল কঠোর অভিজাততন্ত্র এবং এখানে নাগরিক রাষ্ট্রাধিকার ও চিন্তার স্বাধীনতা না থাকায় বিজ্ঞান, শিল্প, চারুকলা ও দর্শন ইত্যাদির কোনও বিকাশ ঘটে নাই।

অভিজাততন্ত্রের পর্বে মহাকাব্য ছাড়া গীতিকাব্য রচনা শুরু হয়। এই কাব্যে কথা ও সুর সমানভাবেই মুখ্য। তাহা ছাড়া ছিল কোরাল (Choral) অর্থাৎ সমবেত-সংগীতের গীতিকাব্য যাহাতে দলবদ্ধ নৃত্য সংগীত ও ছন্দোবদ্ধ কথা এক অপূর্ব সাহিত্য-শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছিল— ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই পিন্দারের (খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৮-৪৩৮ অব্দ) কাব্যে। আর্কিলোকস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দ) সাপ্ফো বা প্সাপ্ফা (জন্ম আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২) ও সিমনিদেসের (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫৬-৪৬৪) নাম গীতিকবিদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের কাহারও রচনার বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র টুকরা অংশের বেশি পাওয়া যায় নাই। ব্যক্তিসত্তার এইপ্রকার অকুণ্ঠ প্রকাশ পরবর্তী গ্রীক কাব্যে কখনও পাই না। বিশেষ করিয়া সাফোর কবিতায় আবেগের যে নিঃসংকোচ তীক্ষ্ণতা দেখা যায় তাহা পৃথিবীর বহু দেশের কাব্যসাহিত্যে বিরল।

পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০-৪৮০ অব্দ) জয়লাভ করার পর একটি নগরী আথেনাই বা আথেন্স— গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া ওঠে (পেরিক্লেসের ভাষায় the School of Hellas 'গ্রীসদেশের গুরুকুল')। এই সময়ে সুবিখ্যাত গ্রীক ট্রাজেডির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। আজ ইহার অল্পই অবশিষ্ট আছে। মাত্র ৩২ খানি গ্রীক ট্রাজেডি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। আইস্খুলস্ বা ঈসকাইলাসের (খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৫-৪৫৬ অব্দ) সাতখানি, সোফোক্লেসের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৬-৪০৬) সাতখানি, এউরিপিদেসের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৫-৪০৬) আঠারোখানি (ট্রাজেডি ও একখানি 'সাতির' নাটক), আরিস্তোফানেসের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০-৩৮৫) এগারোখানি সম্পূর্ণ 'কমেডি' পাওয়া যায়। সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, সংলাপ, কাব্য, গভীর উপলব্ধি ও চিন্তা— এইসবের সমন্বয়ে গ্রীক নাটক, বিশেষতঃ গ্রীক ট্রাজেডি এক অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি। পরিচিত উপাখ্যান হইতে উপাদান ও চরিত্র সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটি নাট্যকার নিজস্ব দৃষ্টি ও শিল্পভঙ্গীতে সেগুলি উপস্থিত করিয়াছেন ও সমসাময়িক জীবনের জটিলতা ও সন্তাপকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত করিয়াছেন। আইস্খুলস ও সোফোক্লেসে ধর্মানুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট; এউরিপিদেসে পাই পতনোন্মুখ এক মহতী সভ্যতার আত্মসমালোচনা, যে সব প্রত্যয় ও নিশ্চিতির উপরে এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল সেগুলির উপরে নির্মম সন্দেহ এখানে প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রীক কমেডির চরম উৎকর্ষ হয় আরিস্তোফানেসের হাতে। পেলোপোনেসীয় মহাযুদ্ধ দীর্ঘদিন চলিবার জন্য যে সব নেতা দায়ী ছিলেন তাঁহাদের তিনি নির্মম হাতে কশাঘাত করিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরসের পিছনে আছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ। আথেনীয় রক্ষণশীলতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এই নাট্যকার। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য তিনি যাহাদের দায়ী মনে করেন— ক্লেওন, এউরিপিদেস, সোক্রাতেস— তাঁহাদের প্রত্যেককেই তিনি নাটকে নিষ্করুণ কঠোরভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। আধুনিক মতে তাঁহার নাটক অশ্লীলতাদোষদুষ্ট, কিন্তু এই অশ্লীলতার উৎস সুস্থ বলিষ্ঠতায়, তাই ইহা আমাদের জুগুপ্সা উৎপাদন করে না। একেবারে শেষ পর্যায়ে রচিত নাটকের সম্বন্ধে (যখন আথেন্স-সভ্যতার ধ্বংস আসন্ন) অবশ্য এ কথা প্রযোজ্য নয়— এখানে অশ্লীলতা সুস্থ নয়, ইহা আসিয়াছে বিকৃত রুচির প্রয়োজনে, ইহার পিছনে কোনও বলিষ্ঠ জীবনবোধ নাই।

আরিস্তোফানেস ও এউরিপিদেসের পরে গ্রীক সাহিত্যের স্বর্ণযুগ অবসিত হয়। মেনান্দর ও তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারদের (হেলেনিষ্টিক বা অর্বাচীন-গ্রীক যুগের) মধ্যে পূর্ব যুগের বাস্তববোধ, মহান চরিত্র ও গভীর কাব্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা অতি দ্রুত লুপ্ত হয়। থেওক্রিতসের (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) অথবা কাল্লিমাকসের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫-২৪০ অব্দ) কবিতায় আমরা নূতনত্ব পাই, থেওক্রিতস দৈনন্দিন নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের মনোজ্ঞ আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সৃজন-ক্ষমতার অভাব ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

হেরোদোতস (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) ও থুকিদিদেস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০-৪০০) ইতিহাসশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। হেরোদোতস গ্রীক ও পারস্যের সংগ্রামের বিবরণের সঙ্গে আরও বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। থুকিদিদেস্ প্রথম রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন; তাঁহার অসম্পূর্ণ রচনা— 'পেলোপোনেসীয় মহাযুদ্ধ'র ঐতিহাসিক মূল্য আজও অক্ষুণ্ণ আছে। সাহিত্য ও শিল্পে স্বর্ণযুগের অবসানের পরেও ইতিহাস ও ভূগোল চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল। হেলেনিষ্টিক যুগে পোলিবিয়স্-এর রচিত (খ্রীষ্টপূর্ব ২০৩-১২০ অব্দ) রোমের ইতিহাস আজও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। স্ত্রাবোর (খ্রীষ্টপূর্ব ৬৪/৬৩-২১ খ্রী) ইতিহাস ও ভূগোল অতি মূল্যবান রচনা।

থালেস্ (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) গ্রীক দর্শনের সূত্রপাত করেন। থালেস হইতে প্লাতো ও আরিস্তোতল পর্যন্ত গ্রীক দর্শন এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়াছে, যদিও দর্শনের প্রশ্ন সমস্যা ও সমাধান সমস্তই বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে। থালেস আনাক্সিমান্দর, আনাক্সিমেনেস, পিথাগোরাস, হেরাক্লিতস, পার্মেনিদেস, এম্পিদোক্লেস, আনাক্সাগোরাস— ইহারা গ্রীকদর্শনের নানা প্রস্থানের আদিগুরু এবং ইঁহারা একটি ধারাকে শেষ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেন। থালেস হইতে আনাক্সিমেনেস পর্যন্ত— বিশ্বের উপাদান কি, পিথাগোরাস হইতে এম্পিদোক্লেস পর্যন্ত— বিশ্বের প্রকৃতি কি, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, বহু ও এক, শাশ্বত ও পরিবর্তনশীলের দ্বন্দ্বের কোনও সমাধান আছে কিনা, না থাকিলে কোন্‌টা সত্য— এই তত্ত্বের আলোচনা গ্রীক দর্শনকে যে সংকটাবস্থায় লইয়া আসে তাহার একটা পরিচয় পাই। গ্রীক দর্শনের প্রথম পর্বে বিজ্ঞানের সহিত তাহার যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তাহা এখন লোপ পাইতেছে। তাহার পরিবর্তে যে নূতন দর্শন প্লাতোতে পরিণতি লাভ করিল তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী ও বিজ্ঞানবিরোধী এবং বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য

গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি

করিয়া ফর্মস অ্যাণ্ড আইডিয়াজ্ অর্থাৎ রূপ ও তত্ত্বের জগতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্লাতোর দর্শনে অধ্যাত্মজগৎ ও বুদ্ধিজগতের কোনও দিকই বাদ যায় নাই। পরস্পরবিরোধী বহু উক্তি ও তত্ত্বের সমাবেশ সত্ত্বেও তাঁহার দর্শন-চিন্তা সুসংবদ্ধ— ইওরোপীয় আদর্শবাদের প্রথম সম্পূর্ণ ও সুসংহত একটি বিবৃতি। তাঁহার বিদ্যাগৃহ আকাদেমিতে শিক্ষিত আরিস্তোতল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অস্বীকার করেন নাই। বরং পদার্থবিজ্ঞান, বায়লজি বা জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদির যে আলোচনা তিনি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বস্তুজগতের একাগ্র পর্যবেক্ষণের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্য দিকে তাঁহার নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও রাজনীতিবিজ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান রচনা এবং ইওরোপীয় চিন্তায় এগুলির গুরুত্ব বোধ হয় প্লাতোর অনুরূপ রচনার চেয়েও বেশি। পরবর্তী হেলেনিস্টিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা নিও-প্লেটোনিয়ম অর্থাৎ নব্যপ্লাতো-প্রস্থান ও প্লোতিনসের রচনা (২০৫-২৬৯/৭০ খ্রী)— ইহার মূল প্রশ্ন: মানুষ কিভাবে ঈশ্বরানুভূতি বা অখণ্ডানুভূতিতে পৌঁছিতে পারে। প্রাথমিক গ্রীক দর্শনজিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয় ইওনিয়ার থালেসের সহিত— প্লাতো, আরিস্তোতল ও প্লোতিনস-এর চিন্তা ও রচনায় গ্রীক দর্শন বহু পথ পরিক্রমা করিয়া আসিয়া সম্পূর্ণ অন্য পথ ধরিয়াছে, বিজ্ঞান ও বাস্তবকে বর্জন করিয়া নূতন চিন্তার ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

বিজ্ঞানেও গ্রীকজাতির দান অসামান্য। গণিত শাস্ত্রের সূচনা করেন পিথাগোরাস (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী)। এউক্লিদেস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের কাছাকাছি), পের্গার আপোল্লোনিয়স (খ্রীষ্টপূর্ব ২৬২-১৯০ অব্দ) এবং আর্কিমেদেস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২ অব্দ) গণিতের বিভিন্ন বিভাগের চর্চা করিয়া গণিতচিন্তাকে অতি উচ্চস্তরে পৌঁছাইয়া দেন। সামস্-এর আরিস্তার্কাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০-২৩০ অব্দ) কোপার্নিকাসের আগে পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রিক পরিক্রমণ অনুমান করেন। হিপ্পোক্রাতেস্ (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯ অব্দ) চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ যুগে গালেন (১২৯-৯৯ খ্রী) মোটামুটিভাবে এই ধারার বাহক। এ কথা বলিলে ভুল হইবে না যে গ্রীকদের পর রেনেসাঁস বা ইওরোপের পুনর্জাগৃতির যুগ পর্যন্ত ইওরোপে বিজ্ঞানের আর কোনও রকম উন্নতি হয় নাই বরং অবনতিই ঘটিয়াছিল।

গ্রীক স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সূত্রপাত খ্রীষ্টপূর্ব দশম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। গ্রীক সংগীত অতি উচ্চস্তরে পৌঁছিলেও ইহার অতি অকিঞ্চিৎকর নিদর্শনমাত্র অবশিষ্ট আছে। মৃৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্র ছাড়া গ্রীক-চিত্রকলার আর কোনও নিদর্শন নাই। এই শিল্প অতি অল্পকালের মধ্যে আশ্চর্য উন্নতি লাভ করে এবং বাস্তবতা, বিষয়-বৈচিত্র্য ও রেখার সাবলীলতায় আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। গ্রীক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সত্যই এক অপূর্ব কীর্তি। কিন্তু অভগ্ন অবস্থায় কিছুই পাওয়া যায় না, যেটুকু খণ্ডিত অংশ পাওয়া যায়, তাহাও নিতান্ত সামান্য। আথেন্সের নগরদুর্গ আক্রোপোলিসে যে স্থাপত্যকর্ম আছে তাহা সৌন্দর্যে ও গম্ভীর মহিমায় অবিনশ্বর। পার্থেনোন আজও আমাদের স্বল্পায়ু অথচ বলদৃপ্ত আথেনীয় সাম্রাজ্যের গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। পেন্টেলিক মর্মরে নির্মিত এই দোরিক মন্দিরটি সূর্যালোকে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে কারণ মর্মরের মধ্যে মধ্যে লৌহস্তর আছে। গজদন্ত ও স্বর্ণে রচিত ফেইদিয়াসের সৃষ্ট দেবী আথেনার মূর্তির অনুকৃতি পাওয়া যায়, মূলটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পার্থেনোনে মন্দিরের একটি অবয়বে আথেন্সের উপর আধিপত্যের জন্য আথেনা ও পোসেইদোনের সংগ্রাম, অন্য দিকে উৎকীর্ণ আথেনার জন্ম— চারি দিকে দেব-দেবীগণ মুগ্ধবিস্মিত নয়নে চাহিয়া আছেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩৮ অব্দে উৎসর্গীকৃত এই মন্দির সংশ্লিষ্ট অন্য কতকগুলি সুবিখ্যাত মন্দির ও অন্য ইমারত আথেনীয় সাম্রাজ্যের ও ভাবধারার গৌরবের প্রতীক। স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসাবে আথেন্সে দিওনুসস প্রেক্ষাগৃহ এবং সিসিলি দ্বীপের সিরাকুস নগরের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ) ও গ্রীসের এপিদোরস-এর প্রেক্ষাগৃহদ্বয় (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) উল্লেখযোগ্য। গ্রীক শিল্পের স্বর্ণযুগে ব্রঞ্জে যে সব বিরাট বিরাট মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল সেগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে বলিলেও হয়। রোমান আমলে নির্মিত যে মর্মর অনুকৃতিগুলি পাওয়া যায় তাহা হইতে মূল শিল্পকৃতিগুলি সম্বন্ধে আমাদের সামান্যই ধারণা হয়। প্রাক্সিতেলেসের অতিবিখ্যাত ক্নিদস দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত আফ্রোদিতির ব্রঞ্জ মূর্তির একটিমাত্র প্রস্তর অনুকৃতি পাওয়া যায়, তাহাও ভগ্ন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার শ্রীহস্তরচিত একটি মর্মর মূর্তি অনেকটা অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে— শিশু হেরাক্লেস-ক্রোড়ে হের্মেস-দেব। পার্থেনোন ও ওলিম্পিয়া জেউসের মন্দিরে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ প্রচুর পাওয়া যায়; দেলফিতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বর্ণনা করিয়া এগুলির সৌন্দর্যের কোনও রকম আভাস দেওয়া সম্ভব নয়।

গ্রীক মানবতাবোধ কত উপরে উঠিয়াছিল তাহা গ্রীক ভাস্কর্য হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রণিধান করিতে পারা যায়। দেহের লাবণ্যের সঙ্গে শক্তির এরকম সংমিশ্রণ আগে বা পরে কখনও হয় নাই। বাস্তবতা ও আদর্শের এক অপূর্ব ঐক্য দেখিতে পাই প্রাক্সিতেলেসের হের্মেসের দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর ক্রিদস দ্বীপীয় বালকের আনন্দগম্ভীর মুখের ভাবে, পার্থেনোনে উপবিষ্ট দেবগণের উপবেশন-ভঙ্গীর সুষমামণ্ডিত ছন্দে। সব কিছুই নিখুঁত, সংযত অথচ সজীব। বাস্তব জীবন ও বাস্তব মানুষের মধ্যেই এই পূর্ণতা নিহিত, শিল্পী এই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে প্রস্তর ও ধাতুতে রূপায়িত করিয়া মানুষের জীবনকেই এক নূতন গৌরব দান করিয়াছেন।

শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য— প্রত্যেকটি বিষয়েই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার কীর্তি মহান ও অবিনশ্বর। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ, মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা (অবশ্য ক্রীতদাসদের বাদ দিয়া) আধ্যাত্মিক ও বস্তুজগতের সমন্বয়, আধুনিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন, সংযম, সবপ্রকার আতিশয্য বর্জন (দি গোল্ডেন মীন—'শ্রেষ্ঠ মধ্যম পন্থা') ইহাই ছিল গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ। ইহার মৌল দুর্বলতা ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক: জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা না করিতে পারা ও ক্রীতদাসের শ্রমের উপর ও অনগ্রসর কৃষির উপর নির্ভরতা। এই ভিত্তির উপর কোনও মহৎ সভ্যতা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না। এই সব কারণে গ্রীক সংস্কৃতির স্বর্ণযুগস্বল্পায়ু হইয়াছিল। কিন্তু এই স্বল্পপরিসরে গ্রীক শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের যাহা শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাহা নিজের গ্রীক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও চিরন্তন মানবিক আবেদনে এমন এক স্তরে উন্নীত হইয়াছিল যাহার তুলনা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে একান্তই বিরল।

দ্র George Derwent Thompson, *Aeschylus and Athens*, London, 1946; J B. Bury, *History of Greece*, 3rd. Edn., London, 1951; W.W. Tarn and C.J.Griffiths, *Hellenistic Civilization*, 3rd. Edn., London, 1952; B. Farrington, *Greek Science*, London, 1953; W. C. K. Guthric, *Greeks and their God*, London, 1954; A. H. Armstrong, *An Introduction to Ancient Philosophy*, London, 1957; C. M. Bowra, *The Greek Experience*, London, 1957; T. B. L. Webster, *From Mycenae to Homer*, London, 1958; G. M. A Richter, *A Handbook of Greek Art*, London, 1959; H C Baldry, *Greek Literature for the Modern Reader*, Cambridge, 1960.

অমল ভট্টাচার্য

গ্রুপ থিওরি গ্রুপ থিওরির উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে বীজগণিতের রীতিগুলি (অপারেশন্স) পর্যালোচনা করা। প্রথম হইতেই অঙ্কশাস্ত্রে সংখ্যা পদ্ধতির সাহায্যে প্রবেশ করিতে শেখানো হয়। প্রথমে শেখানো হয় যোগ ও গুণ, তাহার পর তাহার বিপরীত বিয়োগ ও ভাগ। এই চারিটি প্রয়োগই যুক্তিবিদ্যাগ্রাহ্য (লজিক্যাল)। অন্য কোনও যুক্তিসিদ্ধ প্রয়োগ সম্ভব কি না ও থাকিলে এই চারিটির সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক তাহার বিবরণ বিশ্লেষণ করা— মোটামুটি ইহাই গ্রুপ থিওরির লক্ষ্য। এই ভাবে নানা নূতন প্রয়োগ সম্ভব। যেমন, রোটেশন অফ কো-অর্ডিনেট্স. যত প্রকার ঘূর্ণন সম্ভব তাহার পর্যালোচনাই ইহার বিষয়-বস্তু। আসলে এই শাস্ত্র যুক্তিবিদ্যার আশ্রয়ে চারিটি জানা প্রয়োগ পর্যালোচনা করে ও অন্যান্য অজানা প্রয়োগকৌশল (অপারেশন্স) সৃষ্টি ও তাহাদের কার্যকারিতা বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে গ্রীকদের এই বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পবিদ্যায় ও জিয়েট্রির আলোচনায় ইহার উন্মেষ দেখা যায়।

বর্তমান কালে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। বিভিন্ন প্রাথমিক কণাকে (এলিমেণ্টারি পার্টিক্‌ল্‌স) তাহাদের গুণ অনুযায়ী সাজাইবার জন্য যে বিশ্লেষণ প্রয়োজন তাহা এই গ্রুপ থিওরির সাহায্য ব্যতীত এখনও সম্ভব হয় নাই।

পিনাকীশংকর রায়

গ্রেকো, এল (১৫৪১-১৬১৪ খ্রী) খ্রীষ্টধর্ম-প্রণোদিত শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। আসল নাম: দমিনিকস থেয়োটোকপুলস। ক্রীট-এ সম্ভবত: পোদেলা নামক গ্রামে ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে এল গ্রেকো জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইটালীতে শিল্পশিক্ষার্থে যান এবং বিখ্যাত শিল্পী তিৎসিয়ান তিন্‌তোরেত্তোর কর্মশালায় শিক্ষানবিসী করেন। রোম-এ অবস্থান কালে মাইকেলএঞ্জেলোর চিত্রাবলীর অভিজ্ঞতা পরোক্ষভাবে তাঁহার রচনাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেকো ইটালী ত্যাগ করিয়া স্পেন-এর তোলেদো শহরে যান। এই তোলেদোই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের কর্মক্ষেত্র হইয়াছিল।

এল গ্রেকো-এর চিত্রগুলি অধিকাংশে খ্রীষ্টধর্মের কাহিনী ও ঘটনাবলীর রূপায়ণ হইলেও মৌলিকত্বের গুণে সেগুলি এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্পের মহা অবদান হিসাবে আধুনিক রুচি অনুযায়ী রসোত্তীর্ণ রচনার মর্যাদা পাইয়াছে। তাঁহার অঙ্কিত পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের বা নৈসর্গিক দৃশ্যের চাক্ষুষ রূপের প্রতিফলন নয়, স্বকীয় অভিনব এই চিত্ররূপ বাহ্য আকৃতির গভীরে জীব-স্বভাব ও সত্তার অনুভূতিকে যেন দর্শকের চোখে ও অন্তরে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। বারোক-শিল্পের চর্চায় বস্তু ও ব্যক্তিবিশেষের প্রতিরূপকে মুখ্য স্থান দিয়া চিত্ররচনায় তাঁহাকেই অগ্রণী দেখা যায়। তাঁহার ছবিগুলির অধিকাংশই গাঢ় রঙের উপর হালকা রঙের আবরণে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল এবং তাঁহার তুলিকা-সম্পাতের স্পন্দনময় মূর্ছনা ইম্‌প্রেসনিস্ট চিত্রশৈলীর অঙ্কনবৈশিষ্ট্যের যেন পূর্বাভাষ। মানবশরীর ও তাহার পারিপার্শ্বিক সজ্জাকে চিত্রসংগতির অভিপ্রায়ে অতি দীর্ঘ ও লীলায়িত ভঙ্গিমা দেওয়ায় তাঁহার চিত্রগুলি একাধারে গতিতরঙ্গোচ্ছল ও আধ্যাত্মিক ভাব-ব্যঞ্জনায় সমাহিত হইয়াছে। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ শিল্প-সংগ্রহশালায়, প্রাসাদে, গির্জায় তাঁহার রচনা-সম্ভার সংরক্ষিত রহিয়াছে। তোলেদোর 'সান্তোতোমে' গির্জায় কাউন্ট ওর্‌গাথ-এর সমাধিদানের ছবিটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম হিসাবে জগদ্‌বিখ্যাত। যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও ধনলাভ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে জীবনের শেষ অধ্যায়ে দরিদ্রদশায় ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেকোর মৃত্যু ঘটে।

চিন্তামণি কর

গ্রোটেফেণ্ড, জর্জ ফ্রেডরিখ (১৭৭৫-১৮৫৩ খ্রী) জার্মান প্রত্নলিপিবিশারদ্‌। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন মুনডেনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে গোটিঙ্গেন শহরে বিদ্যাভ্যাসের পর ফ্রাঙ্কফুর্ট জিমন্যাসিয়ামের কনরেক্টর এবং কিছুকাল পরে হ্যানোভার জিমন্যাসিয়ামের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। অস্কান ও উম্‌ব্রিয়ান ভাষা বিষয়ে গবেষণা করিতে থাকেন। পরে ব্যাক্‌ট্রিয়ার মুদ্রা সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পাশ্চাত্ত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত গ্রোটেফেণ্ডের যুগান্তকারী গবেষণার বিষয়বস্তু কিন্তু প্রাচ্য-দেশীয়।

পারস্যের বাণমুখ বা কিউনিফর্ম লিপিমালা কিছুকাল ধরিয়াই ইওরোপীয় বিদ্বৎসমাজে নব নব চিত্তাকর্ষক চিন্তা ও গবেষণার উপজীব্য বিষয় হইয়া উঠিতেছিল। সেই সময়ে নীবুর (Niebuhr) উপরি-উক্ত লিপিমালায় রচিত লেখমালার পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেন। গ্রোটেফেণ্ডের বন্ধু টাইখ্‌সেন এই লিপি পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। বাণমুখ লিপিমালার জটিলতা এই সময়ে গ্রোটেফেণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮০০ সালে গ্রোটেফেণ্ড গোটিঙ্গেনের রয়্যাল সোসাইটিতে এই বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন পারসিক লিপি সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Neue Beitrage Zur Erlauterung der Persepolitanischen Keilsehrift* প্রকাশিত হয়। ইহার ৩ বৎসর পরে তিনি বাবিলোনীয় প্রত্নলিপি বিষয়ে গ্রন্থ (*Neue Beitrage Zur Erlauterung der Babylonischen Keilschrift*) বাহির করেন। বাণমুখ প্রত্নলিপির প্রথম পাঠোদ্ধারকারী বলিয়া গ্রোটেফেণ্ড চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

সুভদ্রকুমার সেন

গ্রোসিয়াস হিউগো (হুইগ্‌ দা গ্রুট, Huigh de Groot, ১৫৮৩-১৬৪৫ খ্রী) জন্মস্থান হল্যাণ্ড। শৈশবাবস্থা হইতেই মেধাবী হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পনর বৎসর বয়সে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি অর্জন করেন। কিছুদিন আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার পর তদানীন্তন রাজনৈতিক ও ধর্মসম্প্রদায়-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িত হন। ইহার ফলে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিছুদিন পরে ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীর সাহায্যে ও পরামর্শে কারাগার হইতে পলায়ন করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। ইতিহাস, ধর্ম, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব ও সরকার সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মত ও ভাবধারা ছিল। তাঁহার 'মারে লিবেরুম' (*Mare Liberum*, ১৬০৯ খ্রী) ও 'দ্য জুরে বেলিআক পাসিস' (*De Jure Belliac Pacis*, ১৬২৫ খ্রী)— গ্রন্থ দুইটি উল্লেখযোগ্য এবং সর্বজনবিদিত। এই দুইটি গ্রন্থের জন্য তিনি আজও বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইনের জনক হিসাবে খ্যাত আছেন। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে আন্তর্জাতিক আইনের একটি বিশেষ রূপ দেখা যায়। আন্তর্জাতিক আইনকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন: প্রকৃতির আইন হইতে জাত ও মনুষ্যসৃষ্ট। প্রকৃতির আইনকে তিনি ধর্ম-সংস্কারের কবল হইতে মুক্ত করিয়া মানবের ন্যায় ও সত্য-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং আন্তর্জাতিক আইনের এই উৎসের উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাই আজও আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে

কোনও দ্বন্দ্ব অথবা অনিশ্চয়তায় সত্য, ন্যায় ও নিষ্ঠা -প্রসূত আইনের প্রতি আনুগত্যকে 'গ্রোসিয়ানিজম' বলা হয়।

সুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্লাইডার বাতাস অপেক্ষা ভারি ইঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেনের মত একপ্রকার উড্ডয়ন যন্ত্র। বেলুনে চড়িয়া আকাশ-ভ্রমণ কতকটা সাফল্য লাভ করিবার সময়েই বাতাসে ভর করিয়া উড়িয়া বেড়াইবার জন্য কেহ কেহ প্রসারিত ডানাযুক্ত উড্ডয়ন যন্ত্র নির্মাণে উৎসাহিত হইয়া ওঠেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ল্য ব্রি (Le Bris) নামে একজন ফরাসী নাবিকই বোধহয় সর্বপ্রথম ছোট একটি হালকা নৌকার মত আসনের সঙ্গে ডানা জুড়িয়া গ্লাইডার নামে একটি উড্ডয়ন যন্ত্র নির্মাণ করিয়া সাফল্যের সঙ্গে আকাশে উড়িয়াছিলেন। অটো লিলিয়েন্টাল ও তাঁহার ভ্রাতা গুস্তাভ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বাতাস অপেক্ষা ভারি যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে উড়িবার জন্য নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। পাখিদের আকাশে উড়িবার কৌশল পর্যবেক্ষণ এবং যাহারা গ্লাইডারের সাহায্যে আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা একটি গ্লাইডার নির্মাণ করেন। উড়িবার সময় লিলিয়েনটাল গদিযুক্ত দুইটি চোঙের মধ্য দিয়া বাহু দুইটি প্রবেশ করাইয়া শয়ানভাবে স্থাপিত একটা রড ধরিয়া থাকিতেন। তাঁহার শরীর এবং পা দুইটি গ্লাইডারের নীচে ঝুলিয়া থাকিত। তিনি মনে করিতেন, প্রয়োজনমত দেহ ও পদসঞ্চালন করিয়া গ্লাইডার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। এই সময়ে পার্সি পিলচারও তাঁহার নিজের তৈয়ারি গ্লাইডারের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডের আকাশে অনেকবার সফলভাবে উড়িবার পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন। লিলিয়েন-টাল ও পিলচার উভয়েই গ্লাইডারে উড়িবার সময় প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

ইহার পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়সে অকটেভ ক্যানিউট যুক্তরাষ্ট্রে গ্লাইডারের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। উপর্যুপরি পাঁচটি তল সংযোজন করিয়া তিনি একটি গ্লাইডার নির্মাণ করেন। পরে তিন তলের গ্লাইডার নির্মিত হয়। ইহার কিছুকাল পরেই আবার তিনি 'ক্যানিউট বাইপ্লেন' নামে দ্বিতল গ্লাইডার নির্মাণ করেন। এই গ্লাইডারের ওজন ছিল মাত্র ২৩ পাউণ্ড। ইহার পর আমেরিকান জন জে. মণ্টগোমেরি এবং আরও কয়েকজন গ্লাইডারের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর আমেরিকাবাসী দুই ভাই অরভিল ও উইলবার রাইটই সর্বপ্রথম ইঞ্জিনস্থাপিত গ্লাইডার বা এরোপ্লেনে চড়িয়া আকাশভ্রমণে সাফল্য অর্জন করেন।

গ্লাইডার প্রসারিত ডানার সাহায্যে অল্প সময়ের জন্য বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে। আকাশে উড়িবার জন্য প্রথমতঃ লম্বা দড়ির সাহায্যে গ্লাইডারকে কোনও ঢালু পাহাড়ের উপরে টানিয়া লওয়া হয়। তাহার পর দড়ির সাহায্যে নীচের দিকে টানিয়া নামাইবার সময় ক্রমশঃ গতি বৃদ্ধি পাইবার মুখেই বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া যায় এবং ঐ গতি-বেগেই সম্মুখস্থ পাখনা ও পুচ্ছ নিয়ন্ত্রণের ফলে উহা আকাশে উঠিয়া পড়ে। পরবর্তী কালে জল হইতে উপরে উঠিবার জন্য গ্লাইডারকে মোটর লঞ্চের পিছনে বা ডাঙা হইতে উড়িবার জন্য মোটর গাড়ির পিছনে বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্লাজেনাপ্, হেল্মুট ফন্ (Helmuth von Glasenapp, ১৮৯১-১৯৬৩ খ্রী) ভারতবিদ্যাবিশারদ্। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর বের্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। 'ভিল্হেল্ম গিম্‌নাজিউম' বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অল্প বয়সে স্কুলে অধ্যয়ন কালেই শোপেনহাউঅর-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধ্যান ধারণার একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি গ্লাজেনাপ্-এর তরুণ মানসে প্রতিফলিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জার্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া মূল সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নয়মানের 'বুদ্ধের উপদেশাবলী' পাঠ করিয়া পালি ভাষা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে ডয়্সেনের ভারতীয় দর্শনের উপর লিখিত গ্রন্থগুলি তাহার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে এবং তিনি ওল্ডেনবুর্গের 'বুদ্ধ চরিত'ও পাঠ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে গ্লাজেনাপ্ ট্যুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র রূপে যোগদান করেন এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক রিখার্ট গার্বের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করেন। গ্লাজেনাপ্ এই বৎসরই ম্যুনশেন (মিউনিক) বিশ্ববিদ্যালয়ে রিখার্ট জিমোনের নিকট নিয়মিতভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি যথাক্রমে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বের্লিনে হাইনরিখ্ ল্যুডের্সের নিকট এবং বনে হেরমান য়াকোবির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বন বিশ্ববিদ্যালয়েই 'জৈনধর্মে কর্মবাদ' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া ডক্টর বা আচার্য উপাধি লাভ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বন-এ 'মধ্বের বৈষ্ণব দর্শন' বিষয় লইয়া প্রাক্-অধ্যাপক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন

কিন্তু বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিবার পূর্বেই প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায় ও তাঁহাকে বের্লিনে চলিয়া যাইতে হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বের্লিনে 'বরাহমিহিরের জ্যোতিষশাস্ত্র' বিষয়ে প্রাক্-অধ্যাপক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই তিনি বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কোনিক্‌স্‌বের্ক-এ সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাজেনাপ্ ট্যুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে বৃত হন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুন গ্লাজেনাপ্ আকস্মিক দুর্ঘটনায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

গ্লাজেনাপ্-এর বহু রচনার মধ্যে প্রায় বত্রিশটি বিশিষ্ট গ্রন্থ ও সমসংখ্যক প্রবন্ধ মূল্যবান। ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম তাঁহার রচনাবলীর বিষয়বস্তু। ভারতীয় দর্শনের তিনি জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত, শাংকর ও মাধ্ব-মত, বল্লভচারী সম্প্রদায় এবং যোগদর্শনবিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ভারতের দর্শন, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পরিচিতি', 'জৈন দর্শন, একটি ভারতীয় মোক্ষ ধর্ম', 'ভারতীয় মননের ক্রমবিকাশ, ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন-সমীক্ষা', 'ঈশ্বর মার্গ,' শংকর দর্শনে সর্ব-একাত্মবাদ', 'মধ্বের বৈষ্ণব দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও ধর্ম বিষয়ক সাধারণ ও তুলনামূলকভাবে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ব্রহ্ম ও বুদ্ধ, ভারতীয় ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রম-বিবর্তন', 'ভারতের পুণ্য-তীর্থসমূহ', 'ভারতীয় ধর্ম সমূহ', 'পাঁচটি বৃহৎ ধর্ম', 'অখ্রীষ্টীয় ধর্ম-সমূহ', 'ধর্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান-চিন্তক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমাজ-ব্যবস্থা বিষয়েও গ্লাজেনাপ্ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন— 'বর্তমান ভারতে হিন্দুধর্ম ও সমাজ', 'বর্তমান ভারতে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রথম-প্রথম গ্লাজেনাপ্ 'আনন্দবর্ধন শাস্ত্রী' এই ছদ্মনাম আশ্রয় করিতেন।

ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়া গ্লাজেনাপ্ ভারতীয় চিন্তা-ধারার প্রতিফলন কোথায় কিভাবে হইয়াছে তাহা তাঁহার পরিণত বয়সের 'কান্ট ও প্রাচ্য ধর্ম' ও 'জার্মান চিন্তাবিদ্-দের ভারত-চিন্তন' গ্রন্থে নিজ লেখনীর সাহায্যে অঙ্কিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ভারত-প্রেমিক গ্লাজেনাপ ছিলেন এ যুগের অন্যতম প্রধান ভারতবিদ্যাবিদ্। তিনি তত্ত্বের গভীরতায় মাথা না ঘামাইয়া তথ্যের বিপুল বিন্যাসে ও সর্বতোমুখী বিশ্লেষণে আজীবন একনিষ্ঠভাবে ভারতবিদ্যার সার্থক পরিপোষণ ও পরিবর্ধন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত

গ্লিসারিন স্নেহপদার্থ দ্র

ঘজালী (১০৫৯-১১১১ খ্রী) সম্পূর্ণ নাম আবু হামিদ মুহম্মদ বিন মুহম্মদ অল্ তুসী অল্ শফী'ঈ অল্-ঘজালী। প্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্মশাস্ত্রবিদ্। ১০৫৯ খ্রীষ্টাব্দে (৪৫১ হিজরা) খোরাসানের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুন্নী মতাবলম্বী পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাগদাদে নিজামিয়া মাদ্রাসায় ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ঘজালী শাফি'ঈ আইন শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ধর্মকে শুধু বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়া বিচার করিতে চাহেন নাই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা ঈশ্বরোপলব্ধি তাঁহার অভিষ্ট ছিল। তাঁহার সুফী মত গ্রহণ করিবার কাহিনী তিনি স্বীয় আত্মচরিতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুফী দর্শন ও বিচার-ধারা সম্বন্ধে ঘজালী পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ 'ইহ্‌য়া উলুম অল্-দীন' ১০৯৯-১১০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। ঘজালী ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে (৫০৫ হিজরা) তুস নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

দ্র D B. Macdonald, 'Life of al-Ghazzali', *Journal of American Oriental Society*, vol XX, 1899; Margaret Smith, *Al-Ghazali*, London, 1945.

সেখ মহম্মদ নামাজী

ঘট পটের উপর ছবি আঁকার শিল্পটি যেমন পুরাতন তেমনই মৃৎপাত্রের উপর চিত্রণও একটি বড় পুরাতন শিল্প। মাটির পাত্র পোয়ানে পোড়াইবার আগে তাহাতে চিত্রাঙ্কন করা যাইতে পারে অথবা পোড়ানোর পরে পাত্রের গায়ে চিত্র আঁকা সম্ভব, একটি পাকা অপরটি কাঁচা। চিত্রিত মাটির পাত্রে জ্যামিতিক নকশা, ফুল পাতা, পশু-পাখি, ও দেব-দেবীর মূর্তি, এমন কি মনুষ্যমূর্তিও দেখা যায়। ব্রত-পূজার আলপনা ও মূর্তি, পুতুল ইত্যাদির সঙ্গে চিত্রিত ঘট, সরা, পিঁড়ি, কুলা ইত্যাদির যোগ খুবই নিবিড়। পূর্ব বঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের ঘটের চিত্রময়তা অপরূপ এবং লোকসংস্কৃতি ও চিত্রকলার এক পরিপূর্ণ সমন্বয়।

চিত্রের অঙ্কন কার্য সাধারণতঃ মেয়ে পটুয়ারাই করিত।

শিল্পীরা লাল, নীল, হলুদ, শাদা, কালো ও মেটে রঙ ব্যবহার করিত। হরীতকী, গিরিমাটি, হিঙ্গুল, নীল, চকখড়ি, ভুসাকালি ইত্যাদি হইতে রঙ তৈয়ারি হইত। রঙ স্থায়ী ও উজ্জ্বল করার জন্য গর্জন তৈল, তেঁতুল বিচির গাদ মাখাইয়া তাহার উপর রজন-গোলা বা তার্পিন তেলের প্রলেপ লাগানো হইত।

মনসার ঘটের গায়ে শাদা রঙের ভিতের উপর লাল, কালো, নীল ও হলুদ রঙ দিয়া দেবীর মূর্তি আঁকা হয়। দেবী রক্তাম্বর পরিহিতা চতুর্ভুজা, তাঁহার চারি হস্তে চারিটি সাপের ফণারূপী আয়ুধ। তাঁহার গায়ের রঙ হরিদ্রাতুল্য। মস্তকে সপ্তফণাবিশিষ্ট সর্পছত্র। ঘটগুলি লম্বা, গলার অংশ সরু, কানা চওড়া। বরিশাল ও ফরিদপুরের মনসাঘটের নিম্নাংশ গোল, গলার ঘট সরু — অনেকটা ফুলদানির মত। মনসার ঘট ছাড়া বাংলা দেশে বাতিকঘট, নবগ্রহঘট প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটের প্রচলন ছিল।

দ্র কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার লোকশিল্প, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

হাসীম বসু

ঘটক শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘটনার সংঘটয়িতা, কিন্তু বাংলা ভাষায় 'ঘটক' শব্দের দ্বারা যে ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের যোগস্থাপন করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা করেন তাহাকেই বুঝায়।

বাংলা দেশে পেশাদার ঘটক অনেক আছে। ইহারা বিভিন্ন জাতির লোক, তবে ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ঘটকের সংখ্যা কিছু অধিক। হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের লোকেদের মধ্যেও ঘটক আছে। এ দেশে নারী ঘটক বা ঘটকীর সংখ্যাও অল্প নয়।

প্রাচীন কালে বাংলা দেশে ঘটকদের প্রাধান্য এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তখন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘটকের পেশা গ্রহণ করিতেন। ইহাদিগকে 'কুলাচার্য' বলা হইত। ইহারা কুলজিগ্রন্থও রচনা করিতেন ('কুলজি' দ্র)। পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার সময় লোকে উচ্চ কুলের সন্ধান করিত। তাহা ছাড়া বাংলা দেশে প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এবং পরে বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তিত হয়। ঘটকেরা বিভিন্ন বংশের মর্যাদা এবং বিশুদ্ধ কুলীনদের পরিচয় সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ জানিতেন। এজন্য তাঁহাদের সমাদর ছিল।

প্রাচীন যুগের ঘটক বা কুলাচার্যের মধ্যে 'কারিকা'-রচয়িতা এড়ু মিশ্র ও হরি মিশ্র (ত্রয়োদশ শতক ?), 'মহাবংশাবলী'-রচয়িতা ধ্রুবানন্দ মিশ্র ও 'মেল-বন্ধন' কার দেবীবর ঘটক (পঞ্চদশ শতক) এবং নুলো পঞ্চাননের (অষ্টাদশ শতক) নাম সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

ঘটকর্পর, -খর্পর কিংবদন্তি অনুসারে বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম। ইনি ঘটকর্পর কাব্যের প্রণেতা। ২৩টি শৃঙ্গাররসাত্মক শ্লোকে কাব্যটি রচিত। ইহার প্রথম ৬টি শ্লোকে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিরহিনী স্ত্রী-কর্তৃক মেঘকে দূত করিয়া স্বামীর নিকট সংবাদ প্রেরণের বর্ণনা আছে। ইহাতে যমক অলংকারের সুনিপুণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাই ইহা যমক কাব্য নামে পরিচিত। অভিনবগুপ্ত (৯৫০-১০২০ খ্রী) -রচিত ঘটকর্পর কাব্যবিবৃতি ইহার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন টীকা। ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবি মদনের 'কৃষ্ণ-লীলা' কাব্য ঘটকর্পরের দ্বারা প্রভাবিত। ঘটকর্পর নাট্যকার ভাসের নামান্তর— এইরূপ জনশ্রুতির কথা হেমচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন।

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

ঘটপত্রী পতঙ্গভুক উদ্ভিদ দ্র

ঘটোৎকচ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের ঔরসে হিড়িম্ব রাক্ষসের ভগিনী রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভে মহাবল বেগশীল, কামরূপ-ধর রাক্ষস ঘটোৎকচের জন্ম হয়। তাহার বিশাল দেহ, বিকৃত নয়ন, শঙ্কুবৎ কর্ণযুগল, তীক্ষ্ণ দন্ত ও বিকট কণ্ঠস্বর ছিল। জন্মগ্রহণ মাত্রই যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া ইনি মাতা-পিতার চরণ বন্দনা করিলে মাতা বলেন, 'ঘটোহাস্যোৎকচ' অর্থাৎ ইহার মাথা ঘটের ন্যায় ও 'উৎকচ' অর্থাৎ কেশহীন। এইজন্য তাঁহার নাম হয় ঘটোৎকচ (মহাভারত, আদি. ১৪৯।৩৮)। ঘটোৎকচ পাণ্ডবপক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে তাঁহার প্রথম কীর্তি অলম্বুষ বধ। বক রাক্ষসের ভ্রাতা মহামায়াবী যোদ্ধা অলম্বুষের মায়াযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ অভিভূত হইলে মহাবল ঘটোৎকচ তাহাকে নিহত করেন (মহাভারত, দ্রোণ ২৩)। ঘটোৎকচের দ্বিতীয় কীর্তি অলায়ুধ নিধন। বক রাক্ষসের জ্ঞাতি ও রাক্ষস হিড়িম্বের সখা অলায়ুধ বৈরনির্যাতনের অভিপ্রায়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমকে আক্রমণ করিলে কৃষ্ণের নির্দেশে ঘটোৎকচ অমেয় বিক্রমে অলায়ুধকে আকর্ষণ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করেন (মহাভারত, দ্রোণ. ১৫৭)। কর্ণের এক-পুরুষ বিঘাতিনী শক্তির আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটোৎকচ

মৃত্যু বরণ করেন, যুদ্ধে অর্জুনকে নিহত করিবার জন্য কর্ণ এই অস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ইহা জানিয়া ঘটোৎকচকে কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত করেন। 'কূটযোধী' ঘটোৎকচের প্রচণ্ড বিক্রমে কৌরবপক্ষ বিপর্যস্ত ও কর্ণের অলৌকিক অস্ত্রসকল প্রতিহত হইলে কর্ণ বাধ্য হইয়া দীপ্যমানা, লেলিহানা সেই একবিঘাতিনী বৈজয়ন্তী শক্তির দ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত করেন। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ শোকে বিহ্বল হন, কিন্তু কৃষ্ণ আনন্দে সিংহনাদ করিয়া অর্জুনকে আলিঙ্গন করেন, কারণ একবিঘাতিনী শক্তিযুক্ত কর্ণকে নিহত করা বজ্রধর ইন্দ্রেরও অসাধ্য ছিল, ঘটোৎকচ বধে সেই শক্তি ব্যয়িত হওয়ায় রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ বধ্য হইলেন (মহাভারত, দ্রোণ ১৫৪-৫৫)।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

ঘড়ি সময় নির্দেশক যন্ত্র বিশেষ। পৃথিবীর স্বকীয় অক্ষদণ্ডের উপর আহ্নিক আবর্তনের সময়কে ২৪ ভাগে ভাগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রতি ঘণ্টাকে ৬০ ভাগে ভাগ করিয়া মিনিট ও প্রতি মিনিটকে ৬০ ভাগে ভাগ করিয়া সেকেণ্ড গণনা করা হয়। সাধারণতঃ ১ হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সময় গণনা করা হয় না, ১২ ঘণ্টা করিয়া দুই ভাগে দিন-রাত্রিকে ভাগ করিয়া লওয়া হয়। ঘড়ির ১২টা বাজিলে মধ্যাহ্ন-কাল সূচিত হয়। তদ্রূপ বাত্রিতেও ১২টা দ্বারা মধ্যরাত্রি নির্দেশিত হয়।

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে দিবা রাত্রির মধ্যে সময় পরিমাপের কোনও না কোনও ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষেও বৈদিক যুগ হইতেই সময় নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সূর্যসিদ্ধান্ত ও নিদান-সূত্রে কাল পরিমাপের উল্লেখ আছে। ত্রুটি, লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, নালিক, মুহূর্ত, প্রহর প্রভৃতির দ্বারা দিবা-রাত্রির অংশ নির্দেশিত হইত। সময়ের অনুবর্তন আকাশে সূর্যের দৃশ্যত অবস্থান দ্বারাই নির্ণীত হইত। ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ একটি শঙ্কুর উপর সূর্যকিরণ পড়িলে যে ছায়া পড়ে, সেই ছায়ার দৈর্ঘ্য যখন ১২ অঙ্গুলি হয়, তখন তাহাকে ১ ছায়া পৌরুষ বলা হইত। ছায়ার দৈর্ঘ্য ৮ ছায়া পৌরুষ (৯৬ অঙ্গুলি) হইলে, তাহা দিবার $\frac{১}{১৮}$ ধরা হইত, ৬ ছায়া পৌরুষ (৭২ অঙ্গুলি) হইলে দিবার $\frac{১}{১৪}$ ধরা হইত। এইরূপে যখন কোনও ছায়া পড়িত না, তখন মধ্যাহ্ন হইত। সূর্যের ছায়ার সাহায্যে কাল পরিমাপের উপাদানকে সূর্যঘড়ি, ছায়াঘড়ি, শঙ্কুপট বা রবিচক্র বলা হইত। কাল গণনার জন্য সূর্যঘড়িই প্রাচীনতম। ভারতবর্ষ ছাড়াও খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে মিশর, গ্রীস এবং রোম সাম্রাজ্যে সূর্যঘড়ির প্রচলন ছিল।

জলঘড়ির আবিষ্কারও খুব প্রাচীন। জলপূর্ণ ঘটি বা আধার দেখিতে কপালের মত, এজন্য ইহাকে কপালক-ঘড়িও বলা হইত। ৪ মাষা স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত জলপূর্ণ আধারের ৪ অঙ্গুলি ব্যাস একটি রন্ধ্র হইতে জল নির্গত হইয়া আধারটি জলশূন্য হইতে যে কালক্ষেপ হইত, তাহার পরিমাপ ছিল ৪০ কাল বা ১ নালিক (২৪ মিনিট)। মালয় দেশের নাবিকরা নারিকেলের খোলের অর্ধাংশের মধ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখিত। ছিদ্রের ভিতর দিয়া জল প্রবেশ করিয়া যখন পাত্রটি জলমগ্ন হইত, তখন এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইত। ব্যাবিলন, রোম, মিশর প্রভৃতি দেশেও জলঘড়ির প্রচলন ছিল। একটি পাত্র হইতে অন্য একটি পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ বালু চালিত বা চালনা করিতে যে কাল অতিবাহিত হইত, তাহার দ্বারাও কালের পরিমাপ হইত। এই পদ্ধতিকে বলা হইত বালুঘড়ি। রাজা অ্যালফ্রেড নাকি একটি মোমবাতির ক্ষয় হইতে কাল নিরূপণ করিতেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক ঘড়ির সূচনা হয়। এই যান্ত্রিক ঘড়ি তিন প্রকারের হইতে পারে - মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক। মেকানিক্যাল ঘড়ির জন্য অবশ্যপ্রয়োজন ১. ঘড়ি চালাইবার বল ২. গণনার ক্রমনির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন হিসাবের দাঁতওয়ালা চক্র ৩. ঘড়ি চালাইবার বলকে সমান সময়ের ব্যবধানে প্রতিহত ও মুক্ত করিবার কৌশল। ঘড়ি চালাইবার বল জোগাইবার জন্য মাধ্যাকর্ষণের বল বা সংকোচিত স্প্রিং-এর সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টা ব্যবহৃত হয়। মাধ্যাকর্ষণের দরুন কোনও দোলকের স্বাভাবিক দোলায়মান গতির বেগ ঘড়ি চালাইবার বল সরবরাহ করে। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে গালিলেও দোলকের সমান সময় রক্ষণ ক্ষমতা আবিষ্কার করেন। দোলনকাল দোলকের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ ঘড়ি দোলকের দোলন গণনা করে এবং আনুপাতিক দাঁতওয়ালা চক্রের মাধ্যমে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, পট-এ প্রদর্শন করে। তারিখ, সপ্তাহ, মাস ও বৎসর চক্রের দাঁতের অনুপাত নির্ণয় করিয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থাও কোনও কোনও ঘড়িতে আছে। দোলক ঘড়ির একটি অসুবিধা এই যে দোলকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হইলে ঘড়ি আস্তে চলে। সংকর ধাতু— যেমন ইনভার দ্বারা দোলক তৈয়ারি করিলে তাপ-প্রভাবজনিত অনিশ্চয়তা দূর হয়। বায়ুর চাপও দোলকের গতির উপর প্রভাব বিস্তার

করে। সময় জ্ঞাপনের নিমিত্ত ঘড়িযন্ত্রের সহিত ঘণ্টাযন্ত্রও সন্নিবেশিত হয়। ঘড়ির বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গে ধারণ করিবার বা পকেটে রাখিবার উপযোগী ছোট ঘড়িও নির্মিত হইয়াছে। ছোট ঘড়িতে দোলকের স্থান লইয়াছে ভারসাম্য রক্ষাকারী চক্র ও সূক্ষ্ম স্প্রিং। চাবি দিয়া স্প্রিংকে সংকুচিত করা হয় এবং সংকুচিত অবস্থা হইতে সম্প্রসারিত অবস্থায় যাইতে যে বল প্রয়োজন হয় তাহাই ঘড়ি চালাইবার বল জোগায়। স্প্রিং-এর দৈর্ঘ্য যাহাতে ঠিক থাকে অর্থাৎ ঘড়ি যাহাতে কখনও দ্রুত কখনও মন্থর না চলে, সে ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যুতের সাহায্যেও দোলককে দোলানো যায়। কারখানা বা রেল স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রক ঘড়ি হইতে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ঘড়ি চালনা করা যায়। বস্তুতঃ এই উপঘড়িগুলি নিয়ন্ত্রক ঘড়ির স্পন্দনেরই রূপান্তর।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যেও সময় নিরূপণ করা যায়।

সূক্ষ্ম এবং সমগতিতে বহমান সময় নির্ধারণের জন্য পৃথিবীর বড় বড় মানমন্দিরে বর্তমানে পরমাণু ঘড়ি বা আণবিক ঘড়ি ব্যবহৃত হইতেছে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাল পরিমাপের ঘড়ি ইচ্ছামত বন্ধ করা যায় এবং বন্ধ করিলেই তাহা 'শূন্য সময়' নির্দেশ করে। কারখানার কাজের পরিমাপের জন্য বা মেশিনের গতি নির্ণয় করিবার পক্ষে এই রকম ঘড়ি উপযোগী। ঘড়িকে বোমা ফাটানোর কাজে বা কারখানার হাজিরা জানিবার কাজে লাগানো যায়।

একটি ঘড়িতে প্রায় ১৭৫টি অংশ থাকে। ঘড়ি নির্মাণের কৌশল এত উন্নত হইয়াছে যে ০·০০১ মিলিমিটার পর্যন্ত নিখুঁত নির্মাণ করা যায়। কৃত্রিম হীরকের কোণে দাঁত-ওয়ালা চাকাগুলির অক্ষদণ্ড আবর্তন করে, এই কারণে ঘর্ষণজনিত শক্তিক্ষয় ও যন্ত্রক্ষয় নিবারিত হয় এবং ঘড়ি দীর্ঘায়ু হয়। যেমন সময়ের জন্য, সজ্জার জন্যও ঘড়ি ব্যবহৃত হয়।

অমূল্যধন দেব

ঘণ্টাকর্ণ শিবের প্রিয় গণ বা অনুচর বিশেষ। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন উষাকালে কোথাও কোথাও লৌকিক অনুষ্ঠানের সহিত ইহার পূজার প্রচলন আছে। চলতি ভাষায় ইনি ঘেঁটু নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও তুলসীতলায় ঘেঁটু ফুল দিয়া সাজানো কালিপড়া মাটির হাঁড়ির উপর মেয়েরাই ইহার পূজা করেন। দেবপূজায় নিষিদ্ধ সিদ্ধ চাউল ও মসুর ডাল দিয়া ইহাকে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পূজার পর হাঁড়িটি বাড়ির সদর দরজার সামনে রাখা হয় ও ছেলেরা উহা ভাঙিয়া ফেলে। 'ঘেঁটু যায় যোম পালায়' প্রভৃতি ছড়া গাহিয়া তাহারা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়। নানা স্থানে ঘেঁটুর নানা কাহিনী ও ছড়া প্রচলিত আছে। পঞ্জিকায় এই পূজার উল্লেখ আছে। রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে চৈত্রমাসে ঘণ্টাকর্ণের পূজার কথা বলিয়াছেন। আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে সংক্রান্তিতে স্নুহীমূলে বা মনসা গাছের গোড়ায় এই পূজা করার বিধান দেওয়া হইয়াছে। মিথিলা দেশেও বিস্ফোটকের উপশমন-কামনায় চৈত্রসংক্রান্তিতে স্নুহীমূলে এই পূজার ব্যবস্থা আছে। মিথিলার বর্ষকৃত্য গ্রন্থে বলা হইয়াছে কোথাও কোথাও মেষসংক্রান্তিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঘণ্টাকর্ণ মুখ্যতঃ বিস্ফোটকের দেবতা। ঘণ্টাকর্ণের প্রণামমন্ত্রে বিস্ফোটকের ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঘণ্টাকর্ণের নিকট প্রার্থনা করা হয়। বসন্তরূপী বিস্ফোটকে অমৃতবর্ষণকারিণী শীতলা দেবীর পূজার সঙ্গেও ঘণ্টাকর্ণের পূজা করা হয়। চণ্ডী, মনসা এবং লৌকিক দেবতা হাচড়া-প্যাচড়ার সহিতও ক্ষত এবং বিস্ফোটকের যোগ আছে। পূর্ব বঙ্গের কোথাও কোথাও ফাল্গুন মাসে খোড়া ও পাঁচড়ার দেবতা হাচড়া-প্যাচড়ার ব্রত ও পূজার প্রচলন ছিল। এই উপলক্ষে ছড়াগান করা হইত।

দ্র আলোকনাথ চক্রবর্তী, ঘেঁটুর কথা, কলিকাতা, ১৩৫৭।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ঘনরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধর্মমঙ্গল শাখার একজন কবি। তিনি ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৩৩ শকাব্দ) তাঁহার সুবৃহৎ ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতাদেবী। ঘনরাম বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন, কাব্যের মধ্যে বার বার তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ কীর্তিচন্দ্র কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি রামভক্ত ছিলেন, ভণিতায় তিনি নিজের সম্পর্কে সর্বদাই 'প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্' উল্লেখ করিয়াছেন। ঘনরামের কাব্যভাষায় পরবর্তী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (অপরার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৩, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ঘনশ্যাম কবিরাজ গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি এবং আলংকারিক। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঘনশ্যাম-ভণিতা-যুক্ত ৪২টি পদ 'পদকল্পতরু'তে ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে ২৫টি পদ তাঁহার 'গোবিন্দ-রতি-মঞ্জরী' গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে সেগুলি তাঁহারই রচনা। অবশিষ্ট ১৭টি পদের মধ্যে কয়েকটি 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতার লেখা হইতে পারে। ইঁহার নাম নরহরি, নামান্তর ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার কবিতা গোবিন্দদাসের ন্যায় অত সুন্দর না হইলেও যথেষ্ট ভাবসমৃদ্ধ। 'গোবিন্দ-রতি-মঞ্জরী'তে ঘনশ্যাম সংক্ষেপে রসশাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

ঘরানা উত্তর ভারতীয় সংগীত-জগতে ঘরানা কথাটির অনেক তাৎপর্য আছে। ইহা শুধু সাংগীতিক পরিবারকে বুঝায় না; পরন্তু ইহাতে বংশপরম্পরার সঙ্গে শিষ্য-প্রশিষ্যের প্রবাহও যুক্ত হয়। সংগীত গুরুর বিশিষ্ট শিষ্য-মণ্ডলী গঠিত হইলে একটি ঘরানার প্রবর্তন হয়। ঘরানার নামের সঙ্গেই এক-একটি বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্য থাকে। ইহা একটি বিশিষ্ট সংগীতরীতির চর্চাকারী পরম্পরাকে বুঝায়। এক-একটি ধারায় অনুষ্ঠিত সংগীতচর্চা কালক্রমে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে অর্থাৎ এক ঘরানার সহিত অন্য ঘরানার সংগীত-কৃতিতে পার্থক্য সূচিত হয়। সংগীতের মূল তত্ত্ব অভিন্ন হইলেও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগরীতিতে বিভিন্নতার জন্য অনেক সময় এক-একটি ঘরানা চিহ্নিত হইয়া থাকে। এই চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য অর্থে 'চাল' এবং 'ঢং' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল ধারাবাহিকতা। কোনও বিশিষ্ট সংগীতধারা উত্তরাধিকার-সূত্রে আগত অর্থাৎ বংশপরম্পরায় অনুসৃত না হইলে ঘরানার মর্যাদা লাভ করে না। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ঘরানার নিজস্ব বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি আছে বলিয়াই 'ঘরানা-গায়ক' বা 'ঘরানা-যন্ত্রী'র প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করা হয়। অপর পক্ষে, কোনও গায়ক বা বাদক 'ঘরানাদার' না হইলে তাঁহার পক্ষে সংগীত-সমাজে মর্যাদা লাভ করা কঠিন হইয়া থাকে। ফলতঃ ঘরানা শব্দটি সংগীতক্ষেত্রে আভিজাত্যের সূচক। প্রত্যেক ঘরানায় এক-একটি স্থানীয় সংগীতকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। গোষ্ঠীবদ্ধ সংগীতচর্চা এক-একটি গণ্ডীতে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহা আঞ্চলিক নামে পরিচিত হয়। যথা— আগ্রা-ঘরানা, ইন্দোর-ঘরানা, আত্‌রাউলি-ঘরানা, তিলমণ্ডী-ঘরানা ইত্যাদি। ধ্রুপদ সংগীতে গবরহার (গোয়ালিয়র), খাণ্ডার, ডাগর ও নওহার নামে যে চারিটি বাণীর প্রসিদ্ধি আছে, তাহাও মূলতঃ চারিটি বিশিষ্ট সংগীতকেন্দ্রের জ্ঞাপক। স্থানের নামে যেমন ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই এক একটি সংগীত-পদ্ধতি কিংবা সংগীত-যন্ত্রের নামেও ঘরানা চিহ্নিত হইয়া থাকে। যথা— জয়পুরের সেতার-ঘরানা, গোয়ালিয়রের খেয়াল-ঘরানা, আগ্রার ধামার-খেয়াল-ঘরানা, ফরুখাবাদের তবলা-ঘরানা, সাহারানপুরের সরোদ-ঘরানা, লখনৌ-এর তবলা-ঘরানা, ইন্দোরের বীণকার-ঘরানা ইত্যাদি।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর ঘরানা, কলিকাতা, ১৯৬৩।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘর্ঘরা সরযূ; এই সুবৃহৎ নদীটি ৩০°৪০′ উত্তর ও ৮০° ৫৮′ পূর্বে হিমালয়ের সু-উচ্চ পর্বতমালায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা নেপালে কার্ণালি ও কাউরিয়ালা নামে প্রবাহিত হইয়া শিষাপানি নামক স্থানে হিমালয় ভেদ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব দিকে গিরওয়া ইহার একটি প্রধান শাখানদী। নেপালসীমান্ত অতিক্রম করিবার কিছু পরেই কার্ণালি সারদা নদীর একটি শাখা সুহেলীর সহিত মিলিয়াছে। সারদার প্রধান শাখা দাহাওয়ারের সহিত ইহা মালানপুরে মিলিত হইয়া ও অতঃপর সরযূ নদীর সহিতও মিলিত হইয়াছে। বাহরামঘাটে সারদার তৃতীয় শাখা চৌকার সহিত মিলিবার পর ইহার নাম হয় সরযূ বা ঘর্ঘরা। কিছুদূর পর উত্তর হইতে রাপ্তি ও ছোট গণ্ডকের সহিত ইহা মিলিয়াছে। এইভাবে প্রায় ৯৬০ কিলো-মিটার পথ প্রবাহিত হইবার পর ঘর্ঘরা ২৫°৪৪′ উত্তর ও ৮৪°৪২′ পূর্বে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। রেলপথ উদ্বোধনের পূর্বে এই সুপ্রশস্ত নদীপথে নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে শস্য, কাঠ ও মশলা আমদানি করা হইত। ফৈজাবাদ ও অযোধ্যা ইহার প্রধান তীরবর্তী নগর এবং টাণ্ডা ও বরহজ বাণিজ্যকেন্দ্র।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXII, Oxford, 1908.

উত্তরা বসু

ঘসিটি বেগম নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, সিরাজুদ্দৌলার মাতৃষসা ও আলীবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস

মহম্মদ খাঁর স্ত্রী। ঘসিটি বেগম বরাবরই সিরাজের সিংহাসনারোহণের বিরোধী ছিলেন। নওয়াজেসের মৃত্যুর (১৭৫৫ খ্রী) পর হইতে তিনি আত্মরক্ষার ও সিরাজের সিংহাসনারোহণে বাধাদানের জন্য মোতিঝিল প্রাসাদটি সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের সাহায্যে ইংরেজদের সহিত মন্ত্রণা করিতে থাকেন। এইজন্য নবাব হইয়াই সিরাজ মোতিঝিল প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন (১৭৫৬ খ্রী)। মীর জাফরের রাজত্বকালে তাঁহার পুত্র মীরণের আদেশে ঘসিটিকে ঢাকার নিকট জলমগ্ন করিয়া হত্যা করা হয় (১৭৬০ খ্রী)।

দ্র নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, কলিকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

কুমুদরঞ্জন দাস

ঘাট ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুতে অশৌচের শেষ দিনে কর্তব্য কর্ম। সাধারণতঃ নদী বা পুষ্করিণীর ঘাটে বা তীরে এই কর্ম সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহা ঘাট নামে পরিচিত। অনুষ্ঠান কর্মের মধ্যে ক্ষৌরকর্ম প্রধান। মৃতের স্বজন এই দিনে ক্ষৌরকর্ম ও স্নান করিয়া শুদ্ধ হন এবং পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডন করেন ও নববস্ত্র পরিধান করেন। শ্রাদ্ধাধিকারীর পক্ষে দশ দিনে দশটি পূরক পিণ্ড দানের যে নিয়ম আছে সে নিয়মও অনেকেই এই দিনে পালন করেন। মৃতের উদ্দেশে এই দিনে পর পর দশটি পিণ্ড দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ভাতের ও অন্যান্যদের জাতির পক্ষে চাউলের পিণ্ড দেওয়ার প্রথা আছে। বলা হয়, এক একটি পিণ্ডদানের ফলে মৃতের এক এক অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে। তাই ইহার নাম পূরক পিণ্ড।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ঘাটপ্রভা কৃষ্ণার একটি বিশিষ্ট শাখানদী হিসাবে পরিচিত। হিরণ্যকেশী ও তাম্রপর্ণী নামে দুইটি শাখানদীকে লইয়া ঘাটপ্রভা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া বিজাপুর জেলায় কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ঘাটপ্রভা বর্ষাপুষ্ট নদী। বর্ষায় উহাতে প্রচুর জল থাকে, কিন্তু শীতকালে নদীটি প্রায় শুকাইয়া যায়। ঘাটপ্রভার পশ্চিম দিকের উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু পূর্ব উপত্যকায় হয় না। বেলগাঁও, বিজাপুর প্রভৃতি স্থান বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া প্রায়ই দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়া থাকে। সুতরাং ঘাটপ্রভার পশ্চিম অংশের জল যাহাতে বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার জন্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত পরিকল্পনায় এই নদী হইতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্র Publications Division, Government of India, *Our River Valley Projects*, Delhi, 1961.

রত্না বসুচৌধুরী

ঘাটশিলা ২২°৩৬´ উত্তর এবং ৮৬°৩১´ পূর্ব। ইহা বিহারের সিংভূম জেলার পূর্ব দিকে ধলভূম মহকুমার অন্তর্গত একটি থানা ও শহর। শহরটি সুবর্ণরেখা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা শহরের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ইহার বর্তমান আয়তন ৯ বর্গ কিলোমিটার (৩·৬৫ বর্গ মাইল) ও লোকসংখ্যা ৮৫৮৭ জন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের উপরে ঘাটশিলা স্টেশনটি অবস্থিত। প্রাচীন কালে ইহা ধলভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমানে এই শহরে উর্দু নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, লাইব্রেরি, একটি কলেজ এবং একটি সরকারি হাসপাতাল আছে।

ঘাটশিলা অঞ্চল খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শহরের ২·৪ কিলোমিটার (১·৫ মাইল) দূরে অবস্থিত মৌভাণ্ডারে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের বৃহৎ তাম্র উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহার ৯·৬ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূরে মোসাবনি ও রাখায় ২৭ বর্গ কিলোমিটার (১০·৮ বর্গ মাইল) ব্যাপিয়া খনি অঞ্চল অবস্থিত। তাম্রপিণ্ড ও নিকেলের চাদর প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বাৎসরিক গড় উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ১৬০০ মেট্রিক টন। এখানে তামার সহিত নিকেল ও ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। ঘাটশিলায় প্রচুর কায়নাইট পাওয়া যায়।

ঘাটশিলা হইতে ১৭ কিলোমিটার দূরে জাদুগোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাটমিক মিনারেল প্রজেক্ট নামে একটি আণবিক ধাতু নিষ্কাশনের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্তী ভাটিন গ্রামেও ইউরেনিয়ামের খনি আছে।

ঘাটশিলার অন্যতম আকর্ষণ ধলভূমরাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্কিণীর সুপ্রাচীন মন্দির। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিশেষতঃ সাঁওতালদের অতি প্রিয় 'দিন মেলা' পনর দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মেলার আরম্ভে মহিষ বলি দেওয়া হইয়া থাকে। স্মরণাতীত কালে ধলভূমরাজের পূর্বপুরুষগণ এই মেলার সূচনা করেন। ভাদ্র মাসে ইন্দ্র দেবের সম্মানে 'ইন্দ্র পরব'ও উদ্‌যাপিত হয়।

শহরের ৯·৬ কিলোমিটার (৬ মাইল) উত্তরে ধারা-

গিরি জলপ্রপাত অবস্থিত। ১২·৮ কিলোমিটার (৮ মাইল) দূরে টিকরীর প্রস্তরখনিতে বাসনপত্র তৈয়ারি হয়।

দ্র P. C. Roy Chowdhury, *Bihar District Gazetteer : Singhbhum*, Patna, 1958.

দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী

ঘাটু পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব ভাগ এবং শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমাংশের নিম্নভূমি বা ভাটি অঞ্চলের এক গীতি-অনুষ্ঠানের নাম ঘাটু গান। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন মনসার ভাসান ও বিজয়া দশমীর দিন শারদীয়া দেবীর ভাসান উপলক্ষে এবং সমগ্র বর্ষাকাল ব্যাপিয়া অন্যান্য কোনও কোনও সময়েও ইহার ব্যাপক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই গীতি অনুষ্ঠানের কেন্দ্র একটি সৌম্যদর্শন কিশোর— ঘাটু নামে পরিচিত। তাহার মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল এবং মেয়েদের মত কাপড় থাকে। আসরে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সংগীতকালে সে নৃত্য করিয়া সংগীতের ভাব নীরবে ব্যক্ত করে।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ঘানি জাতি দ্র

ঘাম স্বেদগ্রন্থির ক্ষরণ। স্বেদগ্রন্থিগুলি দেহের প্রায় সকল স্থানের ত্বকেই বর্তমান। মানবদেহে ইহাদের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ লক্ষ। আকৃতিতে এই গ্রন্থিগুলি প্যাঁচানো নলের মত। ইহারা সমব্যথী (সিমপ্যাথেটিক) নার্ভের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইহা ছাড়া অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স্‌ গ্রন্থির হর্মোনের দ্বারা ঘামে অজৈব লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

ঘামে জলের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ। ইহা রক্তরস অপেক্ষা পাতলা— আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৩। ইহাতে যে কঠিন পদার্থ থাকে তাহার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অজৈব লবণ (যথা সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম -ঘটিত ক্লোরাইড ও ফসফেট) এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ জৈব পদার্থ (অর্থাৎ ইউরিয়া, ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি)। দৈনিক ঘাম ক্ষরণের পরিমাণ পারিপার্শ্বিক উত্তাপ, দৈহিক শ্রম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ দৈনিক প্রায় ১ লিটার ঘাম ক্ষরিত হয়। অত্যধিক গরমে ইহার পরিমাণ দৈনিক ১০-১২ লিটার পর্যন্ত হইতে পারে।

ঘাম দেহ হইতে অজৈব লবণ এবং ইউরিয়া, ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি কিছু জৈব পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু ইহার প্রধান কাজ হইল দেহের তাপ-নিয়ন্ত্রণ। গরমের সময় ত্বকের উপর প্রচুর ঘাম ক্ষরিত হয়। সেই ঘামের জলীয় অংশটুকু বাষ্পে পরিণত হইবার সময় দেহ হইতে উত্তাপ শোষণ করিয়া লয়, ফলে দেহ শীতল হয়।

মানসিক উত্তেজনার সময় প্রধানতঃ হাত ও পায়ের তালু এবং কক্ষপুটের স্বেদগ্রন্থিগুলি হইতেই ঘাম ক্ষরিত হয়। কিন্তু গরমে বা দৈহিক শ্রমের সময় দেহের প্রায় সকল স্বেদগ্রন্থি হইতেই ঘাম নিঃসৃত হইয়া থাকে।

অত্যধিক ঘাম ক্ষরণের সময় দেহে জল ও লবণ উভয় বস্তুরই অভাব ঘটে, সেইজন্য সে ক্ষেত্রে কেবল জল পান না করিয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণও গ্রহণ করা প্রয়োজন, নচেৎ লবণের অভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উদরের পেশীতে তীব্র টান ধরিতে পারে।

পশুদের মধ্যে অশ্বের দেহে প্রচুর ঘাম ক্ষরণ হয়। কিন্তু গো-মহিষাদি পশুর দেহে ঘাম প্রায় ক্ষরিত হয় না বলিলেই চলে।

দ্র Y. Kuno, *The Physiology of Human Perspiration*, London, 1934; C H Best & N B. Taylor, *The Physiological Basis of Medical Practice*, Baltimore, 1961.

প্রিয়কুমার চৌধুরী

ঘাস উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ 'গ্রামিনিয়া' বা ধান্য গোত্রের (Family- Gramineae) সকল উদ্ভিদকে ঘাস বা তৃণ বলেন। কয়েকটি বিশেষ ধরনের ঘাসের দানাকে শস্য বলা হয়। বাঁশ এবং আখও এই গোত্রের অন্তর্গত।

সাধারণতঃ ঘাস বলিতে অবশ্য বুঝায় দূর্বা, চোরকাঁটা, কুশ, কাশ, নল, শর, বেনা, মুথা প্রভৃতি উদ্ভিদ। ইহারা তৃণভূমি অথবা জঙ্গলে জন্মাইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশে তৃণভূমির নাম বিভিন্ন - উত্তর আমেরিকার প্রেয়ারি, দক্ষিণ আমেরিকার সাভানা ও পাম্পা, রাশিয়ার স্টেপ (Steppe) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ট (Veldt) উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় ঘাস জন্মিয়া থাকে। শুষ্ক মরুভূমি, জলমগ্ন ক্ষেত্র, উচ্চ পর্বত ও শীতল বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘাস বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহারা প্রধানতঃ বীরুৎ (হার্ব) অথবা গুল্ম হইয়া থাকে। গুচ্ছমূল দ্বারা ইহারা মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে। ঘাসের কাণ্ড গাঁটযুক্ত, পত্র অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ, পত্রবিন্যাস দ্বিসারি, পুষ্প অতি ক্ষুদ্র এবং পুষ্পবিন্যাস অনুমঞ্জরী (স্পাইক্‌লেট)

জাতীয়। ইহাদের পরাগসংযোগ বায়ুর দ্বারা ঘটিয়া থাকে। ঘাসের ফল 'ক্যারিয়প্সিস' নামে পরিচিত। ফলটিতে একটি বীজ থাকে, বীজটি একবীজপত্রী এবং ফলের আবরণ বীজত্বকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। শ্বেতসারপূর্ণ শস্য বা এন্ডোস্পার্ম বীজের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া থাকে; ভ্রূণটি থাকে একপ্রান্তে।

মুথাকে সাধারণতঃ ঘাস বলা হইলেও ইহা ধান্য-গোত্রের উদ্ভিদ নহে। ইহা মুস্তক-গোত্রের (ফ্যামিলি-সিপেরাসিঈ, Family-Cyperaceae) উদ্ভিদ। মুথার মূল আয়ুর্বেদীয় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি উদ্ভিদ শস্যজাতীয় ঘাসের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য তৃণজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে আখ উল্লেখযোগ্য।

ঘাস বা তৃণজাতীয় উদ্ভিদ নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়। শর বা খাগড়া ঘাসের শাখা হইতে প্রাচীন কালে লিখিবার কলম তৈয়ারি হইত। কুশের অপ্রশস্ত ও তীক্ষ্ণাগ্র পত্র পূজা-পার্বণে বহু যুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; ইহারা বহুবর্ষজীবী দীর্ঘ ঘাস এবং ভারতের সর্বত্রই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। উলু ঘাস ও খড় আদিম কাল হইতেই কুটির নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ঘাস হইতে কয়েক প্রকার গন্ধ তৈল উৎপন্ন হয়, যেমন— সিট্রোনেলা, লেমন, ভার্টিভার প্রভৃতি তৈল। খসখস নামক তৃণজাতীয় উদ্ভিদের মূল হইতেই মূল্যবান সুগন্ধি ভার্টিভার তৈল উৎপন্ন হয়। খসখসের উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ভার্টিভার তৈল ও খসখসের মূল বিদেশে রপ্তানি হয়। খসখসের সুগন্ধি মূল হইতে পরদা, মাদুর, পাখা ইত্যাদিও তৈয়ারি হয়।

কাগজ তৈয়ারির মণ্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘাস ও বাঁশ ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে ভারতের সাবই ঘাসের নাম উল্লেখযোগ্য। পশুখাদ্য হিসাবে গিনি ঘাস, ভুট্টা, হাতি ঘাস, নেপিয়ার ঘাস প্রভৃতির চাষ করা হয়। বহু প্রকার শাদা ও রঙিন পাতাবাহার ঘাস বাগানে লাগানো হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২; U. S. Dept. of Agriculture, *Grass, Year-book of Agriculture*, Washington, 1948; A. F. Hill, *Economic Botany*, New York, 1951; A. K. Y. N. Aiyer, *Field Crops of India*, Bangalore, 1958.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ঘি দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থ। দুধ হইতে পৃথকীভূত মাখন স্নেহপদার্থ, ইহাতে শতকরা ১৬ ভাগ পর্যন্ত জল ও স্বল্প পরিমাণ প্রোটিন, ল্যাক্টোজ (শর্করা) ও অজৈব লবণও থাকে। তাপ দিলে মাখন হইতে জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়, চাঁচির আকারে অবাঞ্ছিত দ্রব্যাদি দূর হয় এবং তপ্ত তরল অবস্থায় পাওয়া যায় ঘি। উষ্ণপ্রধান দেশে মাখন অপেক্ষা ঘি বেশিদিন অবিকৃত থাকে। গোদুগ্ধজাত মাখন হইতে প্রস্তুত হয় গব্য বা গাওয়া ঘি, মহিষদুগ্ধজাত মাখন হইতে হয় ভয়সা ঘি। গাওয়া ও ভয়সা ঘি-এর মিশ্রণও এ দেশে প্রচলিত আছে।

এ দেশে বৎসরে প্রায় ৪০০০০০ মেট্রিক টন ঘি তৈয়ারি হয়; তন্মধ্যে প্রায় ৩২০০০০ মেট্রিক টন ঘি বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে, বাকি অংশ উৎপাদনকারীরা নিজেরাই ব্যবহার করে। উত্তর প্রদেশে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ ঘি উৎপন্ন হয়—বৎসরে প্রায় ৯০০০০ মেট্রিক টন।

রসায়নের মতে ঘি হইল একাধিক গ্লিসেরাইড-এর মিশ্রণ। এইজন্য ঘি উদ্বিশ্লেষণ (হাইড্রোলিসিস) করিলে গ্লিসেরল এবং বিবিধ চর্বিজাতীয় অ্যাসিড (ফ্যাটি অ্যাসিড) পাওয়া যায়। ঘি হইতে সাধারণতঃ বিউটিরিক, ক্যাপ্রইক, ক্যাপ্রাইলিক, ক্যাপ্রিক, লরিক প্রভৃতি চর্বি-জাতীয় অ্যাসিড পাওয়া যায়।

মাখন বা ঘি খাদ্যের অন্যতম উপাদান। ইহা দেহে শক্তির উৎস। গ্লিসেরাইড যৌগিক ছাড়া ইহাতে ভিটামিন এ এবং ডি থাকে।

সাধারণতঃ চিনাবাদাম তৈল নিকেল অনুঘটকের সাহায্যে হাইড্রোজেনায়িত করিয়া বনস্পতি তৈয়ারি করা হয়। বনস্পতি দেখিতে ঘিয়ের মত হইলেও খাদ্য হিসাবে কখনই ঘিয়ের তুল্য নয়। বনস্পতি ঘিয়ের তুলনায় সুলভ। ঘিয়ে নারিকেল তৈল, জান্তব চর্বি বা বনস্পতি ভেজাল দেওয়া হয়। কেবল দেখিয়া কিংবা ঘ্রাণ লইয়া এইসব ভেজাল বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। এজন্য কতকগুলি পরীক্ষা করিতে হয়:

১. বিউটিরো রিফ্র্যাক্টোমিটার রিডিং (বি. আর. রিডিং): স্নেহপদার্থগুলির রিফ্র্যাকটিভ ইন্‌ডেক্স বা প্রতিসরণাঙ্ক সমান নয়। ৪০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তরল ঘিয়ের প্রতিসরণাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়।

২. মুক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিডের শতকরা পরিমাণ: ঘিয়ে সামান্য মুক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিড থাকে। ইহাদের পরিমাণ বেশি হইলে ঘি পুরাতন, অখাদ্য বা ব্যবহারের অযোগ্য বিবেচিত হয়।

৩. সাবানভবন গুণ (স্যাপোনিফিকেশন ভ্যালু:

স্নেহপদার্থের সহিত পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ মিশাইয়া তাপ দিলে চর্বিজাতীয় অ্যাসিডের পটাসিয়াম ঘটিত লবণ (অর্থাৎ সাবান) এবং গ্লিসেরল উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষা করিয়া ঘিয়ের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায়।

৪. রাইখার্ট-মাইসল ভ্যালু (আর. এম. ভ্যালু). ঘিয়ে এমন অনেক অ্যাসিড থাকে যেগুলি বিমুক্ত হইবার পর তপ্ত জলীয় বাষ্পের সহিত চোলাই হইয়া আসে। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি আছে যাহারা জলে দ্রবনীয়, যেমন বিউটিরিক অ্যাসিড। ঘিয়ে এই জাতীয় অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি থাকে, বনস্পতি, নারিকেল তৈল বা চর্বিতে এই জাতীয় অ্যাসিডের পরিমাণ খুবই কম। এজন্য ঘিয়ে এই জাতীয় অ্যাসিডের পরিমাণ দ্বারা তাহার বিশুদ্ধতা নির্ধারণ করা যায়।

৫. পোলেনস্কে ভ্যালু. এই পরীক্ষায় ৫ গ্রাম ঘিয়ে কি পরিমাণ উদ্বায়ী অথচ জলে অদ্রবনীয় অ্যাসিড আছে তাহা নির্ণয় করা হয়।

৬. বডুইন পরীক্ষা (Baudouin Test)· ঘিয়ে যাহাতে বনস্পতি ভেজাল দেওয়া সম্ভব না হয় সেজন্য সরকারি নির্দেশ অনুসারে বনস্পতির সহিত শতকরা ৫ ভাগ তিল তৈল মিশাইতে হয়। ঘিয়ের সহিত যদি শতকরা মাত্র ১ ভাগ পরিমাণে এইরূপ বনস্পতি ভেজাল দেওয়া হয় তবে বডুইন পরীক্ষার দ্বারা তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। তরল ঘি লইয়া তাহার সহিত সমপরিমাণ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং ফুরফুর্যাল দ্রবণ মিশাইয়া ঝাঁকাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। তিল তৈল মিশ্রিত থাকিলে অ্যাসিড স্তরে লাল রঙ দেখা দেয়।

বর্তমানে অবশ্য 'আগমার্ক স্ট্যাণ্ডার্ড গ্রেড' ছাপ দিবার প্রতি বেশি ঝোঁক পড়িয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে

ভারতে 'আগমার্ক' ঘি-এর নিরিখ

পরীক্ষা	গ্রেড: স্পেশাল	গ্রেড: জেনারেল
বি. আর. রিডিং	৪০·০-৪৩·০	৪০·০-৪৩·০
মুক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিড (শতকরা পরিমাণ)	১·৪ (ইহার বেশি নহে)	২·৫ (ইহার বেশি নহে)
জলীয় অংশ (শতকরা পরিমাণ)	০·৩ (ইহার বেশি নহে)	০·৩ (ইহার বেশি নহে)
আর. এম. ভ্যালু	২৮ (ইহার কম নহে)	২৮ (ইহার কম নহে)
পোলেনস্কে ভ্যালু	১·০-২·০	১·০-২·০
বডুইন পরীক্ষা	নেগেটিভ	নেগেটিভ

অন্ধ্র প্রদেশ এবং সৌরাষ্ট্রের জন্য অন্য নিরিখ অনুসরণ করা হয়।

কয়েকটি অঞ্চলের আগমার্ক স্ট্যাণ্ডার্ড গ্রেড ঘি-এর নিরিখ

অঞ্চলের নাম	বি. আর. রিডিং	অ্যাসিড শতকরা পরিমাণ (ইহার বেশি নহে)	জলীয় অংশ শতকরা পরিমাণ (ইহার বেশি নহে)	আর. এম. ভ্যালু (অন্যূন)
অন্ধ্র প্রদেশ	৪০·০-৪৩·০	৩·০	০·৩	২৪·০
পশ্চিম বঙ্গ	৪০·০-৪৩·০	৩·০	০·৩	২৮·০
সৌরাষ্ট্র	৪১·৫-৪৫·৫	৩·০	০·৩	২৮·০
উত্তর প্রদেশ	৪০·০-৪৩·০	৩·০	০·৩	২৮·০
বিহার	৪০·০-৪৩·০	৩·০	০·৩	২৮·০
পাঞ্জাব	৪০·০-৪৩·০	৩·০	০·৩	২৮·০

প্রতিটি নমুনা লইয়া বডুইন পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহা নেগেটিভ হইতে হইবে।

সরকার এখন ভেজাল নিবারণে কিছুটা সক্ষম হইয়াছেন বলা যায়। 'স্নেহপদার্থ' দ্র।

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
মনীষীপ্রসাদ গুহ

ঘি অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া পরিগণিত। গাওয়া ঘি দেবকার্য পিতৃকার্য ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপরিহার্য। নানা উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত ও মধুপর্কের ইহা অন্যতম উপকরণ। যজ্ঞের মুখ্যকার্য অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। অগ্নিপূজার নৈবেদ্য ঘৃত। অন্য দেবতার নৈবেদ্যেও ঘৃতের ছিটা দিয়া উহাকে দেবতার গ্রহণযোগ্য করা হয়। ভবিষ্যান্নে দুগ্ধ ও ঘৃত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ঘরের দেওয়ালে বসুধারা বা বসুরাজের উদ্দেশে ঘৃতের ধারা দেওয়া বিবাহাদি শুভকার্যের একটি অঙ্গ। দেবকার্যাদিতে ঘৃতের প্রদীপ তৈলের প্রদীপ অপেক্ষা প্রশস্ততর বলিয়া বিবেচিত হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ঘুঘু কোলম্বিফর্মিস বর্গের (Order-Columbiformes) অন্তর্গত কোলম্বিডী গোত্রের (Family-Columbidae) পাখি। দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ২৩ হইতে ৩০ সেন্টিমিটার। ছোট বাদামি ঘুঘু (ছোট ঘুঘু), রাম ঘুঘু, তিলে ঘুঘু, কণ্ঠি ঘুঘু এবং রাঙা কণ্ঠি ঘুঘু (গোলাপি ঘুঘু)—এই পাঁচ রকমের ঘুঘু ভারতবর্ষে সুপরিব্যাপ্ত। ইহারা প্রধানতঃ আবাসিক। ইহাদের আহার সাধারণতঃ তৃণবীজ ও শস্য। ইহারা মাটিতে দ্রুত চলাফেরা করিতে ও আকাশে ক্ষিপ্র উড়িতে পারে, প্রণয়নিবেদনের সময় বিচিত্র ভঙ্গীতে নড়ে ও গ্রীবা সঞ্চালন করে। দেহের গঠন কমনীয়, বর্ণ ধূসর, বাদামি অথবা আরক্তিম, অধিকাংশের পা দুইটি লাল এবং পুচ্ছের প্রান্ত শ্বেত বা ধূসর। বাদামি ও রাম ঘুঘুর গ্রীবার পশ্চাতে দ্বিধাবিভক্ত দ্বিবর্ণ পাশার ছকের মত নকশা, তিলে ঘুঘুর গ্রীবায় ঐরূপ অবিভক্ত নকশা এবং কণ্ঠি ও রাঙা কণ্ঠি ঘুঘুর গ্রীবায় কৃষ্ণবর্ণ অবিভক্ত অর্ধবৃত্ত রেখা থাকে।

উপরি উক্ত পাঁচটি জাতের ঘুঘু ছাড়া ভারতবর্ষের নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত অরণ্যে রাজ ঘুঘু (নীল ঘুঘু) পাওয়া যায়। ইহার পিঠ ও ডানা উজ্জ্বল পান্না-সবুজ, কপোল ও মুকুট শ্বেত-ধূসর, পা ও ঠোঁট লাল। ইহা ছাড়া প্রধানতঃ হিমালয়ের পর্বতাঞ্চলে ও গহন অরণ্যে তুষাল ঘুঘু বাস করে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার। পুরুষ উজ্জ্বল এবং স্ত্রী অনুজ্জ্বল বাদামি, গোলাপি, হলুদ ও সবুজের মিশ্রণ। দেহের সর্বত্র তরঙ্গায়িত রেখা থাকে। আন্দামানে ইহাদের আর একটি উপজাতি পাওয়া যায়—ইহাদের রঙ হালকা বাদামি এবং দেহ রেখাঙ্কিত। বিভিন্ন জাতের ঘুঘুর বিশেষ বিশেষ কূজনধ্বনি আছে।

দ্র E C Stuart Baker, *The Fauna of British India: Birds* vol. V, London, 1928; Hugh Whistler, *Popular Handbook of Indian Birds*, London, 1949; S Dillon Ripley, *A Synopsis of the Birds of India and Pakistan*, Bombay, 1961.

প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

ঘুটিয়ারী-শরিফ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার বাঁশড়া গ্রামের অন্তর্গত একটি রেলওয়ে স্টেশন। ইহা পীর মোবারক গাজীর পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত পশ্চিম বঙ্গের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদিগের একটি তীর্থক্ষেত্র। ঘুটিয়ারী পল্লীর পূর্ব নাম বাঁশড়া, এই স্থানে উক্ত পীরের কবর, মসজিদ, দরগাহ, আস্তানা প্রভৃতি আছে।

পীর মোবারক গাজী খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সমগ্র বাংলা দেশে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ফকির ও মানবপ্রেমিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন, সে কারণে তিনি অন্যতম বড়খাঁ (শ্রেষ্ঠ) গাজী বলিয়াও পরিগণিত হইতেন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইতেন। প্রবাদ আছে যে, বন্য পশুরাও তাঁহার বশীভূত ছিল।

পীর মোবারকের কৃপায় ঐ অঞ্চলের মেদনমল্ল পরগণার ভূস্বামী মদন রায় তৎকালীন মুসলমান শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁর (মতান্তরে মুর্শিদকুলী খাঁর) দণ্ড হইতে রক্ষা পান, উক্ত ভূস্বামী কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পীর মোবারকের উদ্দেশে দরগাহ, মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দেন।

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে পীর মোবারকের মৃত্যুদিবসে ঘুটিয়ারী শরিফে বিরাট ধর্মোৎসব (ফাতেহা) ও মেলা হয়। পঞ্চাশ-ষাট সহস্র পুণ্যার্থী ও আরোগ্যকামী ব্যক্তি সমবেত হইয়া উক্ত পীরের উদ্দেশে সিন্নী উৎসর্গ করেন এবং কামনাদি জ্ঞাপন করেন।

দ্র L. S S O'Malley, *Bengal District Gazetteers: 24 Parganas*, Calcutta, 1914.

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ঘুড়ি কাগজ ও চাঁচাড়ি দিয়া তৈয়ারি আকাশে উড়াইয়া খেলা করিবার জিনিস। অনেকে মনে করেন ইহা প্রাচীন

কালে চীন দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল। কোরিয়া, চীন, জাপান, মালয় প্রভৃতি পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এবং ভারতবর্ষে ইহার ব্যাপক প্রচলন আছে। চীন ও জাপানে প্রায় ১ মিটার বৃহৎ ঘুড়ি উড়ানো হয়। ভারতবর্ষে এই-রূপ ঘুড়িকে চাউস বলে। তিব্বতে খাঁচার আকারের বৃহৎ ঘুড়ি দুর্গম স্থানে মনুষ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হইত। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য, যুদ্ধের সময়ে ও ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজে ঘুড়ির ব্যবহার হইত। বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলীন ঘুড়ির মারফত মেঘে অবস্থিত বিদ্যুতের সন্ধান পান।

প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ঘুড়ির প্রচলন থাকিলেও মুসলমান আমলে ইহা ক্রমশঃ জনসাধারণের প্রিয় হইয়া ওঠে। সুতায় মাঞ্জা দিয়া ধারালো করিয়া ঘুড়িতে-ঘুড়িতে প্যাঁচ লড়া অতি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। বিনা মাঞ্জার সুতায় হাতের বা শুধু আঙুলের কৌশলে প্যাঁচ লড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলিকাতার ধনী সমাজের কোনও কোনও অংশে অত্যন্ত বাহাদুরির খেলা ছিল। অনেক সময়ে পাঁচ দশ এমন কি একশত টাকার নোট ঘুড়িতে বাঁধিয়া প্যাঁচ লড়া এই সমাজের বড়মানুষি দেখাইবার রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছিল। ঘুড়ির প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ভারতে কয়েকটি শহরে সংস্থা আছে।

ঘুম দৈহিক অবস্থাবিশেষ। ঘুমের সময় শরীরে নানা প্রকার পরিবর্তন দেখা যায়। চোখের পাতা বন্ধ হয়। চক্ষুগোলক দুইটি সামান্য উপরে ঘুরিয়া যায় অর্থাৎ শিবনেত্র হয়। তারারন্ধ্র (পিউপিল) দুইটি সংকুচিত হয়। দেহতাপ, হৃৎস্পন্দন, নাড়ীর গতি ও রক্তের চাপ কমিয়া যায়। শ্বসন মন্থর ও গভীর হয়। শরীরের সকল ক্রিয়াকলাপই স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিশ্রামকালীন পর্যায়ে নামিয়া আসে। কোনও কোনও প্রতিবর্ত (রিফ্লেক্স) ক্রিয়ার উৎপাদন কঠিন হয়। পাচকরসের ক্ষরণ হ্রাস পায়, কিন্তু পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংকোচন কিছুটা বর্ধিত হয়। হালকা ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক বিজ্ঞানীর মতে ঘুম জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু অপরিহার্য নহে, অবশ্য বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা ঘুম আবশ্যক। শিশুদের নিদ্রার প্রয়োজন প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় অনেক বেশি, আবার বৃদ্ধের ঘুমের প্রয়োজন কম। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে দৈনিক ২০ ঘণ্টা নিদ্রা আবশ্যক।

মানুষ প্রধানতঃ রাত্রে একবার একটানা ঘুমায়। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যেতর প্রাণী দিন ও রাত উভয় সময়েই বহুবার কিছুক্ষণ করিয়া নিদ্রা যায়। মানুষের প্রধানতঃ রাত্রে ঘুমাইবার প্রথা জন্মগত নহে, ইহা বহুল পরিমাণে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

দীর্ঘ অনিদ্রার ফলে চিন্তার অসংলগ্নতা, স্মৃতিভ্রংশ, মনঃসংযোগে অসামর্থ্য, নাড়ী ও পেশীর অবসাদ, রক্তচাপের বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে।

বিজ্ঞানীরা নিদ্রার কারণ সম্বন্ধে নানা প্রকার তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। হাওয়েল ভাবিয়াছেন মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন হ্রাস পাইলে মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে ও ঘুম আসে। পিয়েরোঁ র মতে, হিপ্নোটক্সিন নামক দেহজ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবেই নিদ্রার উদ্রেক হয়। ব্রোমিনঘটিত হর্মোনের ক্রিয়াই ঘুমের কারণ বলিয়া ৎসোন্দেক এবং বিয়ের মনে করেন। কিন্তু এ সকল মতের স্বপক্ষে প্রমাণের অভাব আছে।

পাভ্লভ (১৮৪৯-১৯৩৬ খ্রী) এর মতে নিদ্রার জন্য মস্তিষ্কে কোনও নির্দিষ্ট নাড়ীকেন্দ্র নাই, অবসাদ বা একঘেয়েমি প্রভৃতির ফলে গুরুমস্তিষ্কে নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়, এই অবস্থা ক্রমশঃ মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়িয়া নিদ্রার উদ্রেক করে। তাঁহার বিশ্বাস নিদ্রা ও সংবেশন (হিপ্নোসিস) মূলতঃ অভিন্ন এবং উভয় অবস্থারই কারণ মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা, মস্তিষ্কে এই নিষ্ক্রিয়তার বিস্তার ও গভীরতার পার্থক্যই নিদ্রা ও সংবেশনের মধ্যে প্রভেদের উল্লেখযোগ্য কারণ। কিন্তু হেস, র‍্যানসন প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, নিদ্রা নির্ভর করে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস-এ অবস্থিত নাড়ীকেন্দ্রের উপর। মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহ বা রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা অথবা যান্ত্রিক উপায়ে মস্তিষ্কের এই অংশ উদ্দীপিত হইলে ঘুমের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়, আঘাত কিংবা প্রদাহের ফলে এই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অতিনিদ্রার উদ্ভব ঘটে। অবশ্য হেস্ এর মতে হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত কেন্দ্রটি নিদ্রাকেন্দ্র এবং ইহার উদ্দীপনাই নিদ্রার কারণ, কিন্তু র‍্যান্সন, হ্যারিসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মনে করেন হাই-পোথ্যালামাসে অবস্থিত কেন্দ্রটি জাগরণকেন্দ্র এবং বিভিন্ন কারণে ইহার সাময়িক নিষ্ক্রিয়তাই নিদ্রার উদ্রেক করে। আবার ক্লাইট্ম্যান-এর মতে, জাগ্রত অবস্থায় পেশী হইতে উদ্ভূত আবেগ (ইমপাল্স) মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত ও সক্রিয় রাখে, কিন্তু ক্লান্তির ফলে পেশী হইতে আবেগের আগমন হ্রাস পায়, ইহাতে মস্তিষ্কের উদ্দীপনা কমিয়া সাময়িক কর্মবিরতি ঘটে এবং ঘুম আসে। মনে হয়,

ক্লান্তির ফলে অথবা দৈনিক বিশ্রামের অভ্যস্ত সময়ে পেশী ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে আবেগের আগমন কমিয়া গেলে গুরুমস্তিষ্ক হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত নিদ্রাকেন্দ্রকে (মতান্তরে জাগরণকেন্দ্রকে) আর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, তখন নিদ্রাকেন্দ্রের অপ্রতিহত ক্রিয়ার (মতান্তরে জাগরণকেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার) ফলে নিদ্রার উদ্রেক হয়।

দ্র N. Kleitman, *Sleep and Wakefulness*, Chicago, 1939, I. P. Pavlov, *Selected Works*, Moscow, 1955.

দেবজ্যোতি দাশ

ঘুরীবংশ ঘুর রাজ্য আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে হিরাটের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল ফিরোজ কুহ্। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শান্‌সাবাণী-বংশের নৃপতিগণ এইস্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই রাজবংশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ায় ঘুরের আলাউদ্দীন হোসেন গজনি নগরটি অগ্নিসংযোগে বিধ্বস্ত করেন।

১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ ঘুরের অধিপতি হন। ইতিমধ্যে গুজ তুর্কমান জাতি গজনি অধিকার করিয়াছিল। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া গজনি উদ্ধার করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা শিহাবুদ্দীন বা মুইজুদ্দীন মহম্মদকে গজনির শাসক নিযুক্ত করিলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। দুই ভ্রাতার মধ্যে খুবই সৌহার্দ্য ছিল।

গিয়াসুদ্দীনের উচ্চাশা তাঁহাকে মধ্য এশিয়ার খারাজ্ম শাহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করিল। প্রথম দিকে তাঁহার সুবিধা হইলেও পরে ভীষণভাবে পরাস্ত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিমে তিনি যে বিরাট অঞ্চল লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শুধু হিরাট ও বাল্‌খ্ প্রদেশ তাঁহার অধিকারে থাকে। উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ-নীতি ব্যাহত হওয়ায় ঘুর রাজ্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল ভারতের দিকে। মহম্মদ ঘুরী প্রথমে জয় করিলেন মুলতান (১১৭৫ খ্রী), তাহার পরে উচ্ দুর্গ, কিন্তু গুজরাতে তিনি পরাজয় বরণ করিলেন। ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার ও ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাহোর অধিকার করেন। তাহার পরে তিনি দিল্লী-আজমীরের চৌহান-নরপতি পৃথ্বীরাজের সীমান্ত-দুর্গ ভাতিণ্ডা দখল করিলেন। উভয়ের মধ্যে ভাতিণ্ডার অনতিদূরে তারাইনের প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হইল (১১৯১ খ্রী)। মহম্মদ পরাস্ত ও ভীষণ আহত হইয়া গজনিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু পরবৎসর ঐ প্রান্তরেই তিনি পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিলেন। পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত হন। তাঁহার পরাজয় মহম্মদের হিন্দুস্তান-বিজয়ের পথ সুনিশ্চিত করিল।

ইহার পরে আজমীর, দিল্লী ও অন্যান্য বহু স্থান ঘুরের করতলগত হইল। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী ভারতে নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইল। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ ও বারাণসীর নৃপতি জয়চাঁদও পরাস্ত ও নিহত হইলেন। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাত এবং ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অধিকৃত হইল। ইতিমধ্যে বিহার ও বাংলার একাংশও বিজিত হইল। এইভাবে উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল ঘুরের শাসনাধীন হইল।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পরে মহম্মদ ঘুরী গজনি, ঘুর ও দিল্লীর অধিপতি হইলেন। পাঞ্জাবের খোকর জাতির বিদ্রোহ দমন করিয়া লাহোর হইতে গজনি প্রত্যাবর্তনের পথে সিন্ধু নদের তটে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মার্চ তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন। এইভাবে তিনিই প্রথম ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহা পরে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। তিনি যে শুধু সমরবিজয়ী ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে, তিনি সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন।

তাঁহার কোনও পুত্রসন্তান না থাকাতে শেষ পর্যন্ত প্রদেশপালগণই উত্তরাধিকারী হইলেন। কিরমানের শাসনকর্তা তাজউদ্দীন গজনির সিংহাসনে এবং ভারতে ঘুরের শাসনকর্তা কুতবুদ্দীন আইবক সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আরোহণ করেন।

দ্র A. B. M. Habibulla, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Lahore, 1945, Minhaj-us-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, Calcutta, 1953; R. C. Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vol V, Lahore, 1962; A. L Srivastava, *The Sultanate of Delhi*, Bombay, 1962.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

ঘৃতকুমারী ভৈষজ্য উদ্ভিদ দ্র

ঘৃতাচী স্বর্গের লাবণ্যময়ী অপ্সরা। হরিবংশ, রামায়ণ ও মহাভারতে ঘৃতাচী সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনীর উল্লেখ আছে। রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচীর গর্ভে শতকন্যা উৎপাদন করেন, এই কাহিনী রামায়ণের আদিকাণ্ডে পাওয়া যায়।

চ্যবনপুত্র প্রমতি ইহার গর্ভে রুরু-নামক সন্তানের জন্মদান করেন (মহাভারত ১।৮।২)। দ্রোণাচার্য ও শুকদেবের জন্মকাহিনীও এই অপ্সরার সহিত যুক্ত। ভরদ্বাজ মুনি ঘৃতাচীকে দর্শন করিয়া বিভ্রান্ত হইলে দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে নিজ ক্ষরিত শুক্র ধারণ করেন, তাহাতে দ্রোণাচার্যের জন্ম হয় (মহাভারত ১।১২১।৩-৫)। ব্যাসদেব অরণি-মন্থন-কালে এই অপ্সরাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হন। তাঁহার স্খলিত শুক্র অরণিমধ্যে পতিত হওয়ায় অগ্নিতুল্য তেজস্বী শুকদেবের আবির্ভাব ঘটে (মহাভারত ১২।৩১১।১-১২)।

যূথিকা ঘোষ

ঘেঁটু ঘণ্টাকর্ণ দ্র

ঘোড়দৌড় নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা অঙ্গনে অশ্বারোহীর প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। পণ বা বাজি রাখিয়া অর্থলাভ খেলাটির মূল আকর্ষণ। কয়েক প্রকারের ঘোড়দৌড়-এর প্রচলন দেখা যায়. ১. কয়েক মাইলের নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রের মধ্যগত নালা, বেড়া ইত্যাদির বাধা ডিঙাইয়া ন্যূনতম সময়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো (স্টিপ্‌ল চেজ) ২. কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকারের বেড়া ডিঙাইয়া ন্যূনতম সময়ে ক্ষেত্র উত্তরণ (হার্ড্‌ল রেস) ৩. সমতল ভূমির উপর ন্যূনতম সময়ে সোজা দৌড়। শেষোক্ত খেলাটি বর্তমানে ঘোড়দৌড় এর আদর্শ এবং লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বন্য অশ্বকে বশীভূত করিবার অল্পকাল মধ্যে খেলাটি প্রবর্তিত হইয়াছিল মনে হয়। ৬২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ওলিম্পিকে ঘোড়দৌড় হইয়াছিল। কিন্তু সমসাময়িক কালে সভ্যজাতিগুলির মধ্যে আরোহী-পৃষ্ঠ ঘোড়ার দৌড় অপেক্ষা অশ্বচালিত রথের দৌড় সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল, এরূপ অনুমান করিবার সংগত কারণ আছে। বৈদিক সাহিত্যে 'আজিধাবন' বা ঘোড়দৌড়ের যে বিবরণ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ তাহা ঘোড়ায় টানা রথের দৌড়। অর্ধ-বৃত্তাকার দৌড়ের অঙ্গনটিকে 'আজি' বলা হইত। 'কাষ্ঠা' বা 'গাষ্ঠা' শব্দেরও এই অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। 'কার্ষ্ম' অর্থে লক্ষ্যস্থল (উইনিং পোস্ট) বুঝাইত। বাজি রাখিয়াই প্রতিযোগিতা হইত। বাজি-লব্ধ ধন প্রাপ্তির জন্য ঋগ্‌বেদে প্রার্থনা আছে। রথগুলিকে 'আজিসৃৎ' বলা হইত। ম্যাকডোনেল-এর মতানুসারে অবশ্য 'আজিসৃৎ' ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠাতার নাম। যজ্ঞকর্মের অঙ্গ হিসাবেই আজিধাবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে এশিয়া মাইনর-এর হিটাইট-জাতি ঘোড়ায়-টানা রথের দৌড়-প্রতিযোগিতা করাইতেন বলিয়া কোনও কোনও পুরাতত্ত্ববিদ্‌ অনুমান করেন। হোমর-এর ইলিয়াড মহাকাব্যে রথের দৌড় প্রতিযোগিতার বর্ণনা আছে। ঘোড়ায়-টানা রথই মহাভারত ও পুরাণাদিতে অধিক গৌরবের বস্তু ছিল, রথের সারথি বড় সম্মানিত ব্যক্তি হইতেন। রোমানরা অশ্বারোহী হিসাবে খ্যাতিলাভ করিলেও রথের দৌড় (চ্যারিয়ট রেস) লইয়াই তাহারা মাতামাতি করিত। এরূপ অনুমান একবারে অসংগত নহে যে মধ্য এশিয়ার অশ্ব খ্রীষ্টপূর্ব কাল হইতেই গতিবেগের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং এই জাতের অশ্ব হইতেই বর্তমান কালের কুলীন অশ্ব (থরোব্রেড) জন্মলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন কালের বিভিন্ন জাতি অশ্বারোহণে পারদর্শী হইলেও বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইংল্যাণ্ডেই প্রথম বর্তমানে প্রচলিত ঘোড়দৌড়ের উদ্ভব হয়। ইংল্যাণ্ডের জমিদার বা নাইট শ্রেণীর মধ্যেই ঘোড়দৌড়ের আদর ছিল— সম্ভবতঃ ক্রুসেড অভিযান হইতে নাইটগণ মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলির অশ্বারোহণ চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের দেশীয় ব্যসন 'জুয়া খেলা' ইহার সহিত যুক্ত করিয়া এ যুগের ঘোড়দৌড়ের প্রবর্তন করেন। এই সময় হইতেই ইংল্যাণ্ডে মধ্যপ্রাচ্যের অভিজাত ঘোড়ার আমদানি আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় হেনরির রাজত্বকালে ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরের প্রবেশদ্বারের বাহিরে স্মিথফিল্ড পল্লীতে প্রতি শুক্রবার ঘোড়া বেচাকেনার মেলা বসিত। প্রথম রিচার্ড এর রাজত্বকালে নগদ বাজি রাখিয়া ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়, সম্ভবতঃ ইহাই ইংল্যাণ্ডে বর্তমানে প্রচলিত রীতির প্রথম ঘোড়দৌড়। তাহার পর অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে ঘোড়দৌড়ের বাৎসরিক সমাবেশ হইলেও প্রকৃতপক্ষে স্টুয়ার্ট-এর রাজত্বকালেই ইংল্যাণ্ডে ঘোড়দৌড় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম জেম্‌স-এর রাজত্বকালে এপসম, নিউ মার্কেট প্রভৃতি ঘোড়দৌড়ের মাঠগুলির পত্তন হয়। এ সময়ের রাজাদের প্রায় সকলেরই ছোট-বড় কয়েকটি কারয়া রেস-এর ঘোড়ার আস্তাবল থাকিত এবং তাঁহারা ভাল জাতের ঘোড়ার কেনা বেচা করিতেন।

ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজজাতি এ দেশে ঘোড়দৌড় প্রবর্তন করে। তৎ-কালীন নথিপত্রে উল্লেখ না থাকিলেও ইংরেজদের বৃহৎ উপনিবেশ মাদ্রাজেই প্রথম ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়, এ অনুমান অসংগত নহে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ইংরেজদের ঘোড়দৌড় একটি সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল তৎকালীন কাগজপত্রে এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে

গার্ডেনরীচে আক্রার মাঠে এবং ১৩ মাইল উত্তর-পূর্বে বারাসতে তখন ঘোড়দৌড় হইত। সে সময়ে বারাসতে ইংরেজ শিক্ষানবিশদের জন্য একটি মিলিটারি কলেজ ছিল, কলেজের ছাত্রদের উৎসাহেই সম্ভবতঃ এখানে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। খাস কলিকাতায় কেল্লার দক্ষিণে সদ্যোনির্মিত মাঠে দুই হাজার টাকার বাজির একটি ঘোড়দৌড় হইবে তাহার ঘোষণা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এই মাঠেই ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে টুসে (Touchet) সাহেবের গর্গন (Gorgon) ও হেঙ্ক্‌ল্ (Hencle) সাহেবের ম্যাচ-এম-পিটার (Match-em-Peter) ঘোড়ার রেস হয়। রেসের পর অশ্বারোহণকারীর দল নিভিয়াস সাহেবের বেলভেডিয়ার-এর বাগানবাড়িতে গিয়া চা, কফি, লেমনেড ইত্যাদি পানান্তে বাগানে ব্যাণ্ড সহযোগে নাচগান করিতে থাকে। হিকি লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যায়, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দেও এই ময়দানে ঘোড়দৌড় হইত এবং মাঠে দর্শকমঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। ১৭৯৪, ১৭৯৫ ও ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের বিজ্ঞাপনগুলি হইতে জানা যায় যে ঘোড়দৌড়ের সন্ধ্যাগুলিতে প্রাতরাশ ও সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকিত। রেস-এর শেষ দিনে বল নাচেরও ব্যবস্থা থাকিত। এই সময়ে রবিবার পূর্বাহ্নে ঘোড়দৌড় হইত। বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লি রবিবারে কলিকাতার ঘোড়দৌড় বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পরে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল জকি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইলে ঘোড়দৌড় আবার লোকপ্রিয় হইয়া উঠিলেও বড়লাট লর্ড মিন্টো কলিকাতায় ঘোড়দৌড় বন্ধ করেন। কিন্তু আক্রা এবং ব্যারাকপুরে (তাহার নিজ বাগানবাড়ির নিকটেই) ঘোড়দৌড় বন্ধ হয় নাই। লর্ড হেস্টিংসের শাসনকাল হইতেই কলিকাতায় ঘোড়দৌড় পাকাপাকিভাবে শিকড় গাড়িয়াছে বলা যাইতে পারে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে মাঠে শীতের কুয়াশা কাটিয়া গেলে প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে রেস হইত। এই বৎসরেই কলিকাতায় প্রথম 'ডার্বি' রেস হয়। অপরাহ্ণে ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হইবার প্রথা ইহার কাছাকাছি সময় হইতে চালু হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান রেস-কোর্সটির নির্মাণ আরম্ভ হয় এবং মাঠের পূর্ব দিকে পুরাতন প্রেসিডেন্সি জেল-এর কাছে একটি দর্শক-মঞ্চ স্থাপিত হয়। পরে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত রেস-কোর্স অ্যাস্কট (Ascot)-এর অনুকরণে বর্তমান বৃহৎ দর্শক-মঞ্চটি নির্মিত হয়। পুরাতন মঞ্চটি গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হইত। পরে এটি ভাঙিয়া ফেলা হয়। কলিকাতার উৎসাহী বাঙালী ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঘোড়দৌড়ের জন্য নিজস্ব মাঠ প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। হিন্দুমেলার ১৭৯১ শকাব্দের (১৮৬৯ খ্রী) আয়-ব্যয় বিবরণে দেখা যায় যে মণিপুরে ঘোড়দৌড়ের জন্য একশত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ঘোড়দৌড় ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিলে খেলাটির নিয়ন্ত্রণ-প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ভারতে এই উদ্দেশ্যের সাধনকল্পে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা টার্ফ ক্লাব-এর পত্তন হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ঘোড়দৌড় ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল এবং ইহার কয়েকটি শহরে ঘোড়দৌড়ের ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। কলিকাতার টার্ফ ক্লাবের ন্যায় রয়াল ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া টার্ফ ক্লাব বোম্বাই ও পুনা শহরে, মাদ্রাজের সাউথ ইণ্ডিয়া টার্ফ ক্লাব, মহীশূর ও বাঙ্গালোর-এ এবং ঐ শহরের মাদ্রাজ রেস ক্লাব, মাদ্রাজ, উটাকামণ্ড ও হায়দরাবাদ এ ঘোড়দৌড় পরিচালনা করেন। এই চারিটি ক্লাব প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ এলাকায় রেস সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহের নিয়ামক। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জ কলিকাতার টার্ফ ক্লাবে আগমন করিলে ইহা 'রয়াল' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব নামে পরিচিত হইতে থাকে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় এলিজাবেথ কলিকাতার মাঠে উপস্থিত হওয়ায় ক্লাবটির মর্যাদাবৃদ্ধিকল্পে বিশেষ সহায়তা করেন। কলিকাতার এই মাঠটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ময়দান। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এই ক্লাবটির পরিচালনাধীনে এশিয়ান রেসিং কনফারেন্স এর অধিবেশন হয়। ভারতবর্ষে ইহাই প্রথম ঘোড়দৌড়ের আন্তর্দেশিক সভা।

ঘোড়দৌড় বর্তমান যুগের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। ইংল্যাণ্ড, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রায় সকল রাজ্যেই ইহার আকর্ষণ সমধিক। প্রজননের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ঘোড়ার দৌড়ের গতি বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং এ বিষয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নাই। ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। মধ্যপ্রাচ্যের ঘোড়ার সহিত অন্য দেশের ভাল জাতের অশ্বের প্রজনন করাইয়া 'থরোব্রেড' নামে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এক শ্রেণীর ঘোড়ার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষেও উচ্চ স্তরের ঘোড়া-প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসনকালে কয়েকটি প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে বিদেশজাত ঘোড়া আমদানি বন্ধ হইবার ফলে এখন আরও অধিক প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, ভূপাল, পুনা, বোম্বাই, কোলহাপুর, মীরাট ও পাঞ্জাবের কয়েকটি জেলা উচ্চ স্তরের অশ্ব উৎপাদনে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

ঘোড়দৌড়ের প্রধান আকর্ষণ ও উত্তেজনা হইল বাজি ধরা। ঘোড়দৌড়ের প্রায় আরম্ভকাল হইতে বাজি ধরিবার মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপক হিসাবে 'বুকমেকার' নামে একশ্রেণীর উদ্ভব হয়। প্রতি ঘোড়ার দর স্থির করিয়া দেওয়া ও লগ্নিকারীর নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া জয়ীকে দর অনুযায়ী মুনাফা ফেরত দেওয়াই এই শ্রেণীর কাজ ছিল। অবশ্য টার্ফ ক্লাব-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে ইহাদের কাজ করিতে হইত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই পদ্ধতিতে নানারূপ অসুবিধা ও অসন্তোষ-সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পরে যন্ত্রের সাহায্যে বাজি ধরিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। প্রথমে এই যন্ত্রগুলি হস্তচালিত ছিল, বর্তমানে এইগুলি বিদ্যুৎচালিত ও স্বয়ংক্রিয় হইবার ফলে বাজি রাখিবার পদ্ধতির অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই যন্ত্র প্রথমে এক ফরাসী-কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। ইহাকে টোটালাইসেটর (Totalisetor) বা সংক্ষেপে টোট বলা হয়। বিভিন্ন ঘরে যন্ত্রগুলি বসানো থাকে। ইহাতে সুবিধা এই যে, কোনও দৌড়ের প্রথম ও অন্য ক্রমগুলির জন্য বাজি ধরা যায় এবং যে কোনও যন্ত্র হইতেই টিকিট কেনা হউক না কেন তাহা কেন্দ্রে অবস্থিত যন্ত্রে রেকর্ড হইয়া যায় এবং প্রত্যেক ঘোড়ার উপর ও একটি রেস-এর সবগুলি ঘোড়ার উপর মোট টিকিটের মূল্যের পরিমাণ জানা যায়। দৌড়ের ক্রমাবস্থিতি জানা হইয়া গেলে টার্ফ ক্লাব-এর প্রাপ্য কমিশন ও গভর্নমেণ্ট ট্যাক্স বাদ দিয়া মোট টাকা নিয়মানুযায়ী বণ্টন করিয়া দিতে অধিক সময় লাগে না। কয়েক প্রকারের বাজি ধরিবার ব্যবস্থা আছে, যেমন— কুইনেলা (Quinela), ডাব্‌ল্ ইভেণ্ট, ট্রিব্‌ল্ ইভেণ্ট ইত্যাদি। টিকিট ক্রয় করিবার সময় ক্রেতাকে এক কিংবা একাধিক রেসের বিজয়ী ঘোড়া স্থির করিতে হয়। তাহা ছাড়া কোনও কোনও রেসে ক্রেতাকে প্রথম দুইটি বা তিনটি ঘোড়া নির্বাচন করিতে হয়।

দৌড় শুরু হইবার সময় প্রস্থান-সংকেতানুযায়ী ঘোড়াগুলি দৌড় আরম্ভ করিয়াছে কি না ইহা লইয়া পূর্বে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হইত। স্টার্টিং স্টল-এর প্রবর্তনের ফলে ঘোড়াগুলিকে ছাড়া এখন সহজ হইয়াছে। ফোটো-ফিনিশ ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ফলে বিজয়ী ঘোড়াকে অভিহিত করা এখন সুসাধ্য হইয়াছে। লক্ষ্য স্তম্ভের (উইনিং পোস্ট) উপর দর্পণের সাহায্যে দৌড়ের ছবি উত্তেজনার খোরাক জোগায় এবং কোন্ ঘোড়া কোন্ স্থান লাভ করিল তাহা লইয়াও বাদানুবাদের অবসর থাকে না।

ভারতের টার্ফ ক্লাবগুলি তাহাদের আয় হইতে জনহিতকর অনেক কাজে অর্থসাহায্য করিয়া থাকে।

দ্র হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা : সেকালের ও একালের, কলিকাতা, ১৯১৫ ; W. H. Carey, *Good Old Days of Honourable John Company*, Calcutta, 1906 ; Lord Curzon, *British Government in India*, London, 1925 ; Dennis Craig, *Horse-Racing*, London, 1949.

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঘোড়াঘাট ২৫°১৫′ উত্তর ও ৮৯°১৮′ পূর্ব। বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার একটি শহর। ইহা করতোয়ার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। মুসলমান-রাজত্বকালে ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ার অংশবিশেষ লইয়া ইহার সরকার গঠিত ছিল। এই সরকারের ৮৩টি মহল ছিল ও ইহার আয় ২০২০৭৭ টাকা ছিল। ঘোড়াঘাট মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের সময় স্থাপিত, ইহা মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার সময়ের বলিয়াও কিংবদন্তি আছে। আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁর আদেশে মজেনুন খাঁ ঘোড়াঘাট দখল করিয়া আফগানদিগের জায়গায় স্বীয় মোগল অনুচরদের দেন। পরে জায়গীর হস্তান্তরের কথায় ঐ মোগল জায়গীরদারগণ বিদ্রোহী হন। এই বিদ্রোহীদের নেতা জলেশ্বরের খলেদী খাঁ ও ঘোড়াঘাটের বাবা খাঁ শীঘ্রই গৌড় ও তাণ্ডা দখল করেন। টোডরমল্ল বিদ্রোহদমনে আসিয়া বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে জায়গীরদারদের নেতা বাবা খাঁর মৃত্যু হয়। টোডরমল্লের পর আজিম খাঁর সময় শাহবাজ খাঁ একবার এবং পরে রাজা মানসিংহের সময় ঘোড়াঘাটের মোগলরা অত্যাচার আরম্ভ করিলে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ আর একবার তাহাদিগকে দমন করেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খাঁ বঙ্গ জয়ে বহির্গত হইয়া ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন ঘোড়াঘাটে পৌছান ও ১৫ অক্টোবর ঘোড়াঘাট হইতে করতোয়া বাহিয়া পূর্ব বঙ্গে রওনা হন। ঔরঙ্গজেবের সময় মীর জুমলা ঘোড়াঘাট হইয়া কুচবিহার অভিযান করেন। বঙ্গের নবাব সুজাউদ্দৌলার সময়ে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁর তরফ হইতে মহম্মদ সঈদ চাকলা ঘোড়াঘাট, রংপুর ও কুচবিহারের ফৌজদার নিযুক্ত হন। মধ্যযুগে ঘোড়াঘাটে প্রচুর কাঁচা রেশম বিক্রয় হইত। ঘোড়াঘাটের অন্য সকল কীর্তি এখন করতোয়ার গর্ভে, শুধু গাজী ইসমাইলের কবর বিদ্যমান আছে।

দ্র যদুনাথ সরকার, 'বাংলার স্বাধীন জমিদারদের পতন', প্রবাসী, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ; Ghulam Husain, *The Riyaz-u-s Salatin*, Maulavi Abdus Salam tr., Calcutta, 1902; *The Imperial Gazetteer of India*, vol XII, Oxford, 1908

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ঘোষপাড়া নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার চাকদহ থানার অন্তর্গত গ্রাম। ইহা কাঁচরাপাড়া স্টেশন হইতে প্রায় ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে ও কল্যাণী স্টেশন হইতে প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা নিত্যধন নামেও পরিচিত। ঐ গ্রামটি কর্তাভজা উপাসক-সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল ('কর্তাভজা' দ্র)। এখানে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের রামশরণ পালের মৃত্যুতিথিতে আষাঢ় মাসে, তাঁহার পুত্র রামদুলালের মৃত্যুতিথিতে চৈত্র মাসে এবং তাঁহার স্ত্রী সতী মার মৃত্যুতিথিতে আশ্বিন মাসে রথযাত্রা হয়। ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার মেলায় এখানে বহু দূরদূরান্তর হইতে লোকসমাগম হয়। ঘোষপাড়ার প্রধান দ্রষ্টব্য সতী মার সমাধিগৃহ, রামশরণ ও রামদুলালের ভগ্ন কক্ষ, ডালিমতলা ও হিমসাগর নামে দুইটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণী দুইটির সহিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু আউলেচাঁদ ফকিরের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে।

দ্র L S S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers Nadia*, Calcutta, 1910; A K. Mitra, *West Bengal District Handbooks: Nadia*, Calcutta, 1951.

মুক্তি দাশগুপ্ত

ঘোষযাত্রা প্রাচীনকালে নিজ অধিকারভুক্ত ঘোষপল্লী-সমূহ পরিদর্শন করা রাজগণের অন্যতম কর্তব্য ছিল এবং এই ঘোষপল্লীতে গমন ঘোষযাত্রা নামে অভিহিত হইত। প্রকৃত গণনা দ্বারা গোসমূহের সংখ্যা পুনরায় নির্ধারণ করা এবং বৎসগুলির বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যা নিরূপণ করা হইত। নবজাত বৎসগুলিকেও গণনা করা এবং ত্রিবর্ষবয়স্ক বৃষগুলি ও শিক্ষাযোগ্য সবল গোরুগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা এই ঘোষযাত্রায় সম্পন্ন হইত। গোপগণ ও তাহাদের ভার্যাগণ রাজার উপস্থিতিতে প্রীত হইয়া নৃত্যবাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার আনন্দবিধানের আয়োজন করিত। রাজা অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিতেন। মহাভারতের বনপর্বে ঘোষযাত্রার পরিপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। বনবাসী পাণ্ডবগণের দুরবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আনন্দলাভের জন্য ও নিজ সমৃদ্ধি তাঁহাদের সম্মুখে প্রকটিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুচরগণের সহিত দুর্যোধন ঘোষযাত্রার ছলে দ্বৈতবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন (মহাভারত, পুনা সংস্করণ, ৩।২২৯।৪-৯)।

[illegible] ঘোষ

ঘ্রাণ নাসিকা দ্র

চকমকি খুব শক্ত ধূসর বর্ণের পাথর। চা-খড়ির অন্তভূমিক স্তরের মধ্যে পিণ্ডাকারে ইহা পাওয়া যায়। চকমকির প্রধান উপাদান সিলিকন ডাইঅক্সাইড। বিশুদ্ধ চকমকি কতকটা স্বচ্ছ হইলেও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকায় ইহা অস্বচ্ছ হইয়া যায়। ইহার উপর ইস্পাতের দ্বারা আঘাত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। দিয়াশলাই আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ চকমকি ও ইস্পাতের সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন করিত। চকমকি পাথরের কাঠিন্যের জন্য প্রস্তর যুগের মানুষ ইহার দ্বারা ছুরি, তীরের ফলা, কুঠার প্রভৃতি নির্মাণ করিত।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচা

চক্র তন্ত্র দ্র

চক্রতীর্থ পুরী দ্র

চক্রপাণি দত্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বঙ্গ দেশের একজন খ্যাতিমান প্রাচীন চিকিৎসক। তিনি একাদশ শতকের শেষার্ধে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে লোধ্রবলী বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহার পিতা নারায়ণ দত্ত গৌড়াধিপতি মহারাজ নয়পাল দেবের (১০৪০-৭০ খ্রী) সমসাময়িক এবং তাঁহার রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে চক্রপাণি 'চিকিৎসা সংগ্রহ', 'দ্রব্যগুণ', 'সর্বসার সংগ্রহ' নামে তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই 'চিকিৎসা সংগ্রহ' নামক পুস্তকটিই চক্রদত্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উহা বৃন্দ-বিরচিত 'সিদ্ধ যোগে'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। এই গ্রন্থে 'নাবনীতক-সংহিতা', 'চরকন্যাস', 'বৃদ্ধবিদেহ', 'বৃদ্ধসুশ্রুত', 'বৃদ্ধবাগ্ভট', প্রভৃতি বর্তমানে লুপ্তপ্রায় বহু গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। চক্রপাণি দত্ত 'চরকসংহিতা'র উপর 'চরকতত্ত্বপ্রদীপিকা' নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা ও

সুশ্রুতের উপর 'ভানুমতী' টীকা রচনা করিয়া 'চরক-চতুরানন' ও 'সুশ্রুতসহস্রনয়ন' উপাধি লাভ করেন। মাধব-নিদানের উপরও চক্রপাণির একটি টীকা পাওয়া যায়।

চিকিৎসা-শাস্ত্র ছাড়া অন্য বিষয়েও তাঁহার রচিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। 'ব্যাকরণতত্ত্বচন্দ্রিকা' নামে একটি ব্যাকরণের গ্রন্থ এবং 'শব্দচন্দ্রিকা' নামে একটি কোষগ্রন্থও তাঁহার রচিত বলিয়া জানা যায়।

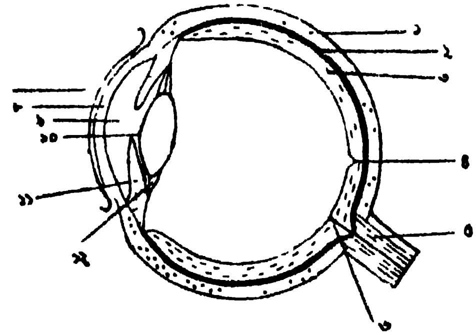
ন্যায়সূত্রের উপর চক্রপাণি একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া চক্রদত্তের শিবদাস সেন কৃত টীকা 'তত্ত্ব-চন্দ্রিকা' হইতে জানা গিয়াছে।

দ্র গুরুপদ হালদার, বৈদ্যকবৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১৯৫৪।

বিমলানন্দ তর্কতীর্থ

চক্রায়ুধ পাল যুগ দ্র

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। প্রাণীকুলে অঙ্গুরীমাল গোষ্ঠীর (ফাইলাম-অ্যানেলিদা, Phylum-Annelida) অন্তর্ভুক্ত কোনও কোনও প্রাণীর মধ্যেই চক্ষুর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। অঙ্গুরীমাল গোষ্ঠীর নিরিইস (Nereis) জাতীয় প্রাণী হইতে শুরু করিয়া প্রায় সকল উচ্চতর পর্যায়ের অমেরুদণ্ডী প্রাণীর চক্ষুই সরলাক্ষি (সিম্প্‌ল আই), তন্মধ্যে স্কুইড, অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণীর সরলাক্ষি যথেষ্ট উন্নত। সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্থ্রোপোদা, Phylum-Arthropoda) অন্তর্ভুক্ত কোনও কোনও প্রাণীর (যেমন —পতঙ্গ, চিংড়ি প্রভৃতি) চক্ষু সরলাক্ষি নহে, ইহাদের চক্ষু অনেকগুলি সরলাক্ষির মত দর্শনযন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত ও পুঞ্জাক্ষি (কম্পাউণ্ড আই) বলিয়া পরিচিত। অপরিণত অবস্থায় পতঙ্গের দর্শনেন্দ্রিয় সরলাক্ষি, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের চোখ দুইটি পুঞ্জাক্ষ। পতঙ্গের সরলাক্ষির বহিঃপৃষ্ঠটি স্বচ্ছ কৃত্তিক (কিউটিকল) দিয়া আবৃত, ইহার একাংশ পুরু ও লেন্স নামে অভিহিত। লেন্সটি আলোকরশ্মিকে সরলাক্ষির মধ্যে কয়েকটি সুবেদী (সেন্‌সিটিভ) কোষের উপর ফোকাস করে ও দৃষ্টির অনুভূতি জাগায়। চিংড়ির পুঞ্জাক্ষি সহস্র সহস্র সরল দর্শনযন্ত্রের (ওম্যাটিডিয়াম) সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি দর্শনযন্ত্র দীর্ঘ দণ্ডাকৃতি এবং একটি রঙ্গকপ্রধান স্তর (পিগ্‌মেন্ট লেয়ার) দিয়া বেষ্টিত। প্রত্যেক দর্শনযন্ত্রের মধ্যে আলোকরশ্মি সমাহরণের ব্যবস্থা এবং আলোকসুবেদী (ফোটোসেনসিটিভ) কোষ বর্তমান। শেষোক্ত কোষগুলি দৃষ্টিবহ নার্ভের সহিত সংযুক্ত। দর্শন-যন্ত্রের স্বচ্ছ কৃত্তিক (কিউটিকল) দ্বারা আবৃত বহিঃপ্রান্তটিও আলোক সমাহরণে সাহায্য করে। পুঞ্জাক্ষির স্বচ্ছ বহিঃপৃষ্ঠ বা অচ্ছোদ পটল (কর্নিয়া) এরূপ বহু দর্শনযন্ত্রের বহিঃপ্রান্তগুলির মিলনে গঠিত। আলোকরশ্মি প্রতিটি সরল দর্শনযন্ত্রের বহিঃপ্রান্তের স্বচ্ছ কৃত্তিকের মধ্য দিয়া আসিয়া প্রত্যেক দর্শনযন্ত্রে এক-একটি স্বতন্ত্র প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে ও দর্শনযন্ত্রের সুবেদী কোষগুলি উদ্দীপিত হয়। ফলে সবকয়টি দর্শনযন্ত্রের পৃথক প্রতিবিম্ব মিলিয়া বহির্বিশ্বের যেন একটি বহু খণ্ডে বিভক্ত ও বর্ণহীন রূপ (অনেকটা বর্ণহীন মোজেইক-এর মত) চোখে ধরা পড়ে। পুঞ্জাক্ষির সাহায্যে অবশ্য সচল বস্তু দেখা অপেক্ষাকৃত সহজ।



মানব চক্ষু

১. শ্বেতমণ্ডল ২ কৃষ্ণমণ্ডল ৩ অক্ষিপট ৪ পীতবিন্দু ৫ দৃষ্টিনাড়ী ৬ অন্ধবৃত্তক ৭ নেত্রবর্ত্মকলা ৮ অচ্ছোদপটল ৯ তারারন্ধ্র ১০. লেন্স ১১ কনীনিকা ১২. সূক্ষ্মনালী

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চক্ষু সরলাক্ষি বা অমেরুদণ্ডীদের তুলনায় অনেক উন্নত। মানুষের নেত্রগোলক দুইটি মোটামুটি গোলাকার ও করোটির অক্ষিকোটরে অবস্থিত। সংলগ্ন ঐচ্ছিক পেশীগুলির সাহায্যে চোখ নড়াইতে ও ঘুরাইতে পারা যায়। চোখের সম্মুখে দুইটি পেশীযুক্ত পাতা আছে। তাহাদের ভিতরে চোখের সম্মুখপৃষ্ঠকে আবৃত করিয়া রাখে নেত্রবর্ত্মকলা (কনজাংকটাইভা) নামে একটি স্বচ্ছ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি। নেত্রগোলকের গাত্র তিনটি টিস্যুস্তরে গঠিত: ১. বাহিরের তন্তুপ্রধান অস্বচ্ছ স্তর বা শ্বেতমণ্ডল (স্ক্লেরা)। ইহার সামনের স্বচ্ছ অংশ বা অচ্ছোদ পটল (কর্নিয়া) ভেদ করিয়া আলোক চোখে প্রবেশ করে ২. মধ্যের রক্তবাহপ্রধান কৃষ্ণবর্ণ স্তর বা কৃষ্ণমণ্ডল (কোরয়েড)। ইহার সম্মুখপ্রান্তসংলগ্ন পেশীবহুল বৃত্তাকার কালো পর্দা কনীনিকার (আইরিস) কেন্দ্রে তারারন্ধ্র (পিউপিল) নামক ছিদ্র থাকে। অত্যধিক আলোকে কনীনিকার পেশীর সংকোচনের ফলে তারারন্ধ্র সংকুচিত হয় ও চোখে আলোকের প্রবেশ কমিয়া যায়।

চক্ষু

অন্ধকারে তারারন্ধ্র সম্প্রসারিত হইয়া যতটা সম্ভব আলোককে চোখে প্রবেশ করিতে দেয়। তারারন্ধ্রের ঠিক পিছনে থাকে একটি স্বচ্ছ উভোত্তল (বাইকনভেক্স) লেন্স; কৃষ্ণমণ্ডল সংলগ্ন সিলিয়ারি বাড নামক অঙ্গ হইতে কয়েকটি ঝুলনবন্ধনীর (সাসপেন্সরি লিগামেন্ট) সাহায্যে ইহা যথাস্থানে ঝুলিয়া থাকে ৩. ভিতরের আলোক-সুবেদী নার্ভকোষপ্রধান স্তর বা অক্ষিপট (রেটিনা)। অক্ষিপটের দণ্ড (রড) ও শঙ্কু (cone) নামক কোষগুলি আলোকের গ্রাহকযন্ত্র (রিসেপ্টর)। তারারন্ধ্র দিয়া চোখে আলোক প্রবেশ করিলে লেন্স সেই আলোকরশ্মিকে ফোকাস করিয়া অক্ষিপটের উপর দৃষ্ট বস্তুর একটি উলটা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে, আলোকরশ্মির স্পর্শে দণ্ড ও শঙ্কুগুলি উদ্দীপিত হয় এবং দৃষ্টিবহ নার্ভ (দ্বিতীয় করোটিক নার্ভ) বাহিয়া আবেগ (ইম্পাল্‌স) গুরুমস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছায়। ফলে দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায়। অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্বটি উলটা হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্ট বস্তুটিকে সোজাই দেখা যায়। অক্ষিপটের যে অংশ দিয়া দৃষ্টিবহ নার্ভ বাহিরে যায়, সেখানে শঙ্কু বা দণ্ড কিছুই না থাকায় অক্ষিপটের সে অংশের দৃষ্টিশক্তি নাই (অন্ধবিন্দু বা ব্লাইন্ড স্পট)। ইহার নিকটে অন্য একটি ক্ষুদ্র পীতাভ অংশে (পীতবিন্দু বা ম্যাকিউলা লুটিয়া) শঙ্কুর সংখ্যা দণ্ডের তুলনায় অনেক বেশি, এই অংশের কেন্দ্রস্থলে কেবল শঙ্কুই থাকে। নেত্রগোলকের অভ্যন্তরে অচ্ছোদ পটল ও লেন্সের মধ্যবর্তী স্থানটুকু অ্যাকুয়াস হিউমার নামক স্বচ্ছ জলীয় পদার্থে এবং লেন্স ও অক্ষিপটের মধ্যের স্থানটুকু ভাইট্রিয়াস হিউমার নামক স্বচ্ছ জিলাটিন জাতীয় বস্তুতে পূর্ণ থাকে। অক্ষি-কোটরের অস্থির অন্তরালে অশ্রুগ্রন্থি অবস্থিত। ইহার রস অক্ষি চোখের পাতার সঞ্চালনে অচ্ছোদ পটলের উপর ছড়াইয়া পড়ে এবং অচ্ছোদ পটলকে পরিষ্কার ও সিক্ত রাখিয়া অক্ষিপল্লবের সহিত অচ্ছোদ পটলের অস্বাভাবিক ঘর্ষণ নিবারণ করে। অশ্রুতে জল, অজৈব লবণ, প্রোটিন, শর্করা, জীবাণুনাশক লাইসোজাইম এন্‌জাইম প্রভৃতি থাকে।

মানুষের চোখ দুইটি মাথার সম্মুখে থাকায় দৃশ্য জগতের অনেকটাই এক সঙ্গে দুই চোখের দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ দ্বিনেত্র দৃষ্টির (বাইনকিউলার ভিজন) ফলে দৃষ্ট বস্তুর ঘনত্ব, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায় (ঘনত্ববোধক দৃষ্টি বা স্টেরিওস্কোপিক ভিজন)।

দূরাগত পরস্পর-সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুলিকে অক্ষিপটের উপর ফোকাস করিতে স্বাভাবিক চোখে আয়াসের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু নিকটের আলোকরশ্মি-গুলি পরস্পর-অপসারী (ডাইভার্জেন্ট) বলিয়া সেগুলিকে অক্ষিপটের উপর সঠিক ফোকাস করিতে লেন্সের উত্তলতার (কন্‌ভেক্সিটি) কিছুটা পরিবর্তন করিতে হয়। প্রতিবর্ত (রিফ্লেক্স) ক্রিয়ার সাহায্যে লেন্সের এই সাময়িক পরিবর্তনকে উপযোজন (অ্যাকমোডেশন) বলে।

দ্র F. H. Adler, *Physiology of the Eye*, London, 1953; G. S. Brindley, *Physiology of the Retina and Visual Pathway*, London, 1959.

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়
দেবজ্যোতি দাশ

অক্ষিপটে দণ্ড ও শঙ্কু নামে যে দুই প্রকার কোষ থাকে, তাহাদের মধ্যে কর্মবিভাগ আছে। ফন ক্রিজ-এর দ্বৈত দৃষ্টিবাদে (ডুপ্লিসিটি থিওরি অব ভিজন) বলা হইয়াছে যে, দণ্ড মৃদু আলোক বা অন্ধকারে এবং শঙ্কু উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া বর্ণবোধ (কালার ভিজন) নির্ভর করে শঙ্কুগুলির উপর। নিশাচর পেঁচার চোখে কেবল দণ্ড থাকায় তাহারা রাত্রে ভালই দেখিতে পায়, কিন্তু দিনের আলোয় বিশেষ দেখিতে পায় না। দিনের পাখি পায়রার অক্ষিপটে শঙ্কুর প্রাধান্য, তাই তাহারা দিনের আলোয় ভাল দেখে, কিন্তু রাত্রে প্রায় দৃষ্টিহীন। বিড়াল বা কুকুরের চোখে মানুষের চোখের তুলনায় দণ্ড অধিক থাকে, তাই রাত্রে তাহারা মানুষের তুলনায় পরিষ্কার দেখে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণালীর বেগুনী প্রান্তের হ্রস্ব আলোক-তরঙ্গ দ্বারাই দণ্ডগুলি সর্বাপেক্ষা সহজে উদ্দীপিত হয়, গোধূলির মৃদু আলোকে যখন দণ্ডের কাজের প্রাধান্য তখন লাল ফুলকে কালো মনে হয়, কারণ লাল আলোক দণ্ডকে উদ্দীপিত করিতে পারে না। অন্য দিকে বর্ণালীর লোহিত প্রান্তের দীর্ঘ আলোকতরঙ্গগুলি সহজেই শঙ্কুকে উদ্দীপিত করে, তাই দিনের আলোয় শঙ্কুগুলি সক্রিয় থাকায় সে সময়ে লাল বা হলুদ রঙ সর্বাধিক উজ্জ্বল দেখায়। মানুষের অক্ষিপটের প্রান্তীয় অংশে কেবল দণ্ড থাকায় সে অঞ্চলে বর্ণবোধের ক্ষমতা নাই।

আলোক হইতে অন্ধকারে আসিলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না, পরে ক্রমশঃ দণ্ডগুলির কাজের সাময়িক উন্নতি হওয়ায় অন্ধকারের মধ্যেও কিছুটা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কিছুক্ষণ উজ্জ্বল আলোকে চোখ মেলিয়া থাকিলে দণ্ডের ক্রিয়া সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। দণ্ডের ভিতর ভিটামিন এ -ঘটিত রঙিন রাসায়নিক পদার্থ ‘রডপ্সিন’

থাকে, ইহাই দণ্ডের কার্যের মূল উৎস। সেজন্যই দেহে ভিটামিন এ-র অভাব হইলে চোখে দণ্ডের কার্য ব্যাহত হয় ও রাত্রান্ধতা ঘটে।

সকল প্রাণী রঙ দেখিতে পায় না, মানুষ ও অন্য কয়েকটি প্রাণীর বর্ণবোধ আছে। বর্ণালীর নির্দিষ্ট কয়েকটি বর্ণকে মূল বর্ণ (প্রাইমারি কালার) বলে, বিশ্বাস যে ইহাদের উপযুক্ত অনুপাতে মিশ্রণের ফলেই অন্যান্য বর্ণ উৎপন্ন হয়। টমাস ইয়ং (১৭৭৩-১৮২৯ খ্রী) এবং হেরমান ফন হেলমহোলৎস্ (১৮২১-৯৪ খ্রী)-এর মতে মূল বর্ণ মাত্র তিনটি – লাল, সবুজ ও নীল। এভাল্ট হেরিং-এর মতে মূল বর্ণ চারিটি– লাল, হলুদ, সবুজ ও নীল। বিশেষ দুইটি মূল বর্ণকে উপযুক্ত অনুপাতে মিশাইলে উৎপন্ন হয় বর্ণহীন ধূসর বা শ্বেত, এরূপ দুইটি বর্ণকে পরস্পরের পূরক বর্ণ (কমপ্লিমেণ্টারি কালার) বলে, যথা— লাল ও সবুজ, কিংবা নীল ও হলুদ। সবকয়টি মূল বর্ণের উপযুক্ত অনুপাতে সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় বর্ণহীন ধূসর বা শ্বেত। কোনও রঙিন বস্তুর উপর শাদা আলোক পড়িলে এক বা একাধিক বর্ণের আলোকরশ্মি শোষিত হইয়া যায় ও অবশিষ্ট আলোকরশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত রঙিন আলোকরশ্মিগুলি চোখে আসিয়া বস্তুটিকে সেই অনুসারে রঙিন দেখায়। বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ সম্বন্ধে আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রী) -বর্ণিত সূত্রগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

বর্ণবোধের সর্বজনগ্রাহ্য কোনও ব্যাখ্যা এপর্যন্ত নাই। এখানে কয়েকটি প্রধান মতবাদের আলোচনা করা হইল। ইয়ং এবং হেলমহোলৎস -এর মতে, লাল সবুজ ও নীল আলোক অক্ষিপটে তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহকযন্ত্রকে উদ্দীপিত করে, ইহার উপর নির্ভর করিয়াই লাল সবুজ বা নীলের অনুভূতি জন্মে। একাধিক প্রকার গ্রাহকযন্ত্রের যুগপৎ উদ্দীপনায় বিভিন্ন মিশ্র বর্ণের এবং তিন প্রকার গ্রাহকযন্ত্রই সমান উদ্দীপিত হইলে শ্বেত বা বর্ণহীন আলোকের অনুভূতি সৃষ্ট হয়। হেরিং-এর মতে চোখে তিন প্রকার আলোকসুবেদী পদার্থ আছে, যথাক্রমে শ্বেত, লোহিত ও পীত আলোকের সংস্পর্শে ইহারা ভাঙিয়া পড়ে ও যথাক্রমে অন্ধকারে এবং সবুজ ও নীল আলোকের স্পর্শে আবার গড়িয়া ওঠে। চোখে এই তিন বস্তুর এক বা একাধিকের ভাঙা বা গড়ার উপর নির্ভর করিয়া বর্ণের অনুভূতি জন্মে। লাড-ফ্রাঙ্কলিন-এর মতে বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অক্ষিপটে বর্ণের বোধশক্তিহীন একপ্রকার গ্রাহকযন্ত্রের ক্রমাগত রূপান্তরের ফলে চারিটি মূল বর্ণের বোধশক্তিসম্পন্ন চারি প্রকার গ্রাহকযন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। গ্রানিট মনে করেন যে, অক্ষিপটে দুই প্রকার গ্রাহকপদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতির গ্রাহকযন্ত্রগুলি (ডোমিনেটর্স) বর্ণালীর যে কোনও আলোকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় এবং বর্ণহীন আলোক বা ঔজ্জ্বল্যের অনুভূতি জাগায়। দ্বিতীয় পদ্ধতির গ্রাহকযন্ত্রগুলি (মডিউলেটর্স) বহু প্রকার, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লোহিত সবুজ অথবা নীল আলোকে উদ্দীপিত হয় ও বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

বর্ণবোধের অক্ষমতাই বর্ণান্ধতা। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ রোগী সকল বর্ণকেই বিভিন্ন ধরনের ধূসর দেখে। আংশিক বর্ণান্ধ ব্যক্তি বিশেষ কয়েকটি রঙ দেখিতে পায় না, যথা —নীল-পীত বর্ণান্ধতায় রোগী ঐ রঙ দুইটি ঠিকমত দেখিতে পায় না। অবশ্য লাল-সবুজ বর্ণান্ধতাই সর্বাধিক দেখা যায়।

অনেক সময় ১৫-২০ সেকেণ্ড একদৃষ্টে কোনও রঙিন বস্তুর দিকে তাকাইয়া তাহার পর ধূসর বা শাদা পটভূমিকার দিকে চাহিলে কিছুক্ষণ দৃষ্ট বস্তুটির প্রতিবিম্ব যেন চোখের সামনে ভাসিতে থাকে, ইহাকে অনুবেদন (আফ্‌টার-ইমেজ) বলে। সাধারণতঃ অনুবেদনের বর্ণ মূল বস্তুটির বর্ণের পূরক হয় (অসবর্ণ অনুবেদন বা নেগেটিভ আফ্‌টার-ইমেজ)। আলোকের উৎস অত্যুজ্জ্বল হইলে কখনও কখনও তাহার অনুবেদনটি একই বর্ণের হইতে পারে (সবর্ণ অনুবেদন বা পজিটিভ আফ্‌টার ইমেজ), কিন্তু শীঘ্রই এই সবর্ণ অনুবেদনটি রঙ বদলাইয়া অসবর্ণ অনুবেদনে পরিণত হয়। কতকগুলি স্থির ছবি দ্রুত পরপর দেখাইয়া চলচ্চিত্রে যে গতিশীলতার বোধ সৃষ্টি করা হয়, তাহা বহুল পরিমাণে সবর্ণ অনুবেদনের উপর নির্ভর করে।

অনেক সময় দুইটি রঙ কাছাকাছি থাকিলে একটির উপর অন্যটির পূরক বর্ণের ছাপ পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় (যুগপৎ বর্ণ বৈসাদৃশ্য বা সাইমালটেনিয়াস কালার-কণ্ট্রাস্ট)। কখনও কখনও অসবর্ণ অনুবেদনকে অনুবর্তী (সাক্সেসিভ) বর্ণ-বৈসাদৃশ্য বলে।

দ্র H. F. Brandt, *The Psychology of Seeing*, New York, 1945 ; Y. Le Grande, *Light, Colour and Vision*, London, 1957.

আরতি দাশ

চক্ষুরোগ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চক্ষুরোগের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ছানি (ক্যাটার‍্যাক্ট) : চোখের স্বচ্ছ লেন্সটি ক্রমশঃ অস্বচ্ছ হইলে দৃষ্টিশক্তি কমিতে থাকে ; ইহাকেই ছানি

পড়া বলে। এ অবস্থায় চোখের তারার মধ্যভাগ ধূসর দেখায়। বার্ধক্যই ছানির প্রধান কারণ; তাহা ছাড়া জন্মগত অসুখ, আঘাত, বিভিন্ন চক্ষুরোগ, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি কারণেও ছানি পড়িতে পারে। ছানি পাকিলে অস্ত্রোপচার দ্বারা ধূসর ও অস্বচ্ছ লেন্সটি সরাইয়া দেওয়া হয়। প্রয়োজনবিশেষে ছানি কাঁচা অবস্থাতেও কাটা যায়।

গ্লকোমা : চোখের ভিতরে অ্যাকুয়াস হিউমার নামক জলীয় পদার্থের চাপ বৃদ্ধির জন্য গ্লকোমা রোগ হয়; প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যেই ইহার প্রবণতা বেশি। ধীরে ধীরে রোগীর অজ্ঞাতসারে চোখের দৃষ্টি কমিতে থাকে এবং দৃশ্যপট (ভিজুয়াল ফিল্ড) সংকুচিত হইতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে সামান্য মাথাধরা বা সামান্য দৃষ্টিহীনতার সহিত আলোর চারি দিকে রামধনুর মত রঙ দেখিলে গ্লকোমা হইয়াছে এরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে। পাইলোকার্পিন-এর প্রয়োগে জলীয় পদার্থের চাপ না কমিলে সত্বর অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

ট্র্যাকোমা : ভাইরাস-ঘটিত একপ্রকার সংক্রামক চোখ ওঠা। রোগের পূর্বাবস্থায় চোখ ফুলিয়া যায়, লাল হয়, জল ও পিচুটি পড়ে। ক্রমে চোখের পাতায় একরূপ ব্রণ হয় এবং অচ্ছোদ পটলের (কর্নিয়া) স্বচ্ছতা নষ্ট হয়, শেষ অবস্থায় অচ্ছোদ পটল সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হইয়া যায় এবং অন্ধত্ব ঘটে। অস্ত্রোপচার, সাল্‌ফ্যাসিট্যামাইড অথবা অ্যান্টিবায়োটিক মলম দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া রোগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও প্রয়োজন।

কেরাটোম্যালাশিয়া : ভিটামিন এ-র অভাবে শিশু প্রথমে রাত্রে কম দেখিতে আরম্ভ করে, পরে চোখের শাদা অংশের উপর একপ্রকার ফেনার মত পদার্থ জমিতে থাকে, ক্রমশঃ স্বচ্ছ অচ্ছোদ পটল নরম হইয়া গলিয়া যায়। ভিটামিন এ ইন্‌জেক্‌শন এবং চোখের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন এ-প্রধান খাদ্য পথ্য হিসাবে দিতে হয়।

ট্যারা চোখ (স্কুইন্ট) : সাধারণতঃ তিন হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। প্রথমাবস্থায় বিকালের দিকে চোখে ক্লান্তি অনুভব হয়, চোখ ছোট হইয়া যায় ও মাঝে মাঝে চোখ ট্যারা হইয়া যায়। কখনও কখনও একটি জিনিসকে দুইটি দেখায়। সূচনা হইতে চিকিৎসা না করিলে ট্যারা চোখটির দৃষ্টি সম্পূর্ণ লোপ পায়। বহু ক্ষেত্রে চশমার সাহায্যে ট্যারা চোখের চিকিৎসা করা হয়। অস্ত্রোপচারের দ্বারা ট্যারা চোখকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়।

প্রতিসরণঘটিত দোষ (রিফ্র্যাক্টিভ এরর) : ইহা প্রধানতঃ তিন প্রকার— ১. মাইওপিয়া ২. হাইপার্‌মেট্রোপিয়া এবং ৩. অ্যাসটিগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্। ১. মাইওপিয়া : নেত্রগোলক লম্বা হইয়া গেলে, অচ্ছোদ পটলের উত্তলতার (কন্‌ভেক্‌সিটি) পরিবর্তন ঘটিলে, ছানি পড়িবার পূর্বে এবং মধুমেহ রোগে চোখে মাইওপিয়া হইয়া থাকে। এই রোগে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের (রেটিনা) উপর ফোকাস না হইয়া তাহার সম্মুখে পড়ে। সেজন্য অবতল (কন্‌কেভ) লেন্সের চশমা ধারণ করিলে দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব আবার অক্ষিপটের উপরে পড়ে ২. হাইপার্‌মেট্রোপিয়া : সাধারণতঃ চোখ অস্বাভাবিক ছোট হইলে বা অচ্ছোদ পটল সমতল হইলে এই রোগের উদ্ভব হয়। ছানি কাটানোর পরও হাইপার্‌মেট্রোপিয়া ঘটিয়া থাকে। চল্লিশ বৎসর বয়সে নিকটের জিনিস কম দেখাকে চলতি ভাষায় 'চালশে ধরা' বলে, ইহাও এক প্রকারের হাইপার্‌মেট্রোপিয়া এবং ইহা পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। এই রোগে প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের পিছনে ফোকাস হয়, সেজন্য উত্তল (কন্‌ভেক্স) লেন্স দ্বারা দৃষ্টিকে স্বাভাবিক করা হয় ৩. অ্যাসটিগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্ : চক্ষু ঠিক গোল না হইয়া ডিম্বাকৃতি হইলে বিশেষ কোনও একটি অক্ষে হাইপার্‌মেট্রোপিয়া বা মাইওপিয়া -ঘটিত দোষ হইয়া থাকে, ইহাকেই অ্যাসটিগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্ বলে। প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তল অথবা অবতল বেলনাকৃতি (সিলিন্‌ড্রিক্যাল) লেন্স ব্যবহার করিয়া দৃষ্টি সংশোধন করা সম্ভব।

অন্ধত্ব : সমগ্র পৃথিবীর অন্ধজনের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ ভারতের অধিবাসী, পশ্চিম বঙ্গেই অন্ধের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। বয়স অনুসারে অন্ধত্ব বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। অন্ধত্বের প্রধান কারণ কেরাটোম্যালাশিয়া। বসন্ত রোগে এক বা দুই চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। আঘাতের দ্বারা অন্ধত্ব ঘটিতে পারে। জন্মগত কারণেও বহু শিশু অন্ধ হয়। ইহা ছাড়া প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে, ছানি ও গ্লকোমা রোগে, অথবা মধুমেহ রোগে অক্ষিপটে রক্তক্ষরণের ফলে অন্ধত্ব ঘটিতে পারে।

চক্ষু ব্যাঙ্কে মৃত ব্যক্তির অচ্ছোদ পটল সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহা অন্ধব্যক্তির চোখে বসানো হয়। বিগত ২০ বৎসর যাবৎ কলিকাতায় এইরূপ অচ্ছোদ পটল অধিরোপণ (কর্নিয়া গ্রাফ্‌টিং) করা হইতেছে।

ইন্দ্রশেখর রায়

চটকল চট পাটজাত দ্রব্য। পাট গাছের তন্তু হইতে পাট উৎপন্ন হয়। ভারত ও পাকিস্তান কাঁচা পাটের প্রধান

উৎপাদক। সম্প্রতি বহু দেশে পাট চাষের চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু এক ব্রাজিল ছাড়া কোথাও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয় নাই। পাট চট-তৈয়ারির জন্যই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। চটের বস্তায় বা থলিতে ভর্তি করিয়া শস্য, ময়দা, চিনি, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি রাখা বা চালান করা হয়। ইহা ছাড়া দড়ি, কাছি, গদি, 'রাগ' কার্পেট, ত্রিপল, জামার লাইনিং, জুতার তলা, বৈদ্যুতিক ইনসুলেশন কেবল্‌ প্রভৃতি আরও নানা প্রকারের পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার আছে, বালির বস্তা যুদ্ধে ও নদীর বাঁধে ব্যবহৃত হয়।

বাংলা দেশে ইংরেজদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই পাটের চাষ ও কুটিরশিল্পে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার অর্থনীতিতে পাটের ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর। উহার শেষার্ধেও বাংলার হাতে-বোনা পাটদ্রব্য রপ্তানি হইতে থাকে। ১৮২৫ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত কুটিরশিল্পের স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্পটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও ক্রমে অস্তমিত হয় এবং তাহার জায়গায় প্রধানতঃ বিদেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রচালিত আধুনিক চটশিল্প জুড়িয়া বসে।

চটকলের সূত্রপাত ঘটে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি শহরে। ভারতের প্রথম চটকল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের রিষড়ায় শ্যামসুন্দর সেন এবং জর্জ অকল্যাণ্ড কর্তৃক স্থাপিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই ভারতীয় চটশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটিতে থাকে। ভারতের চটকলগুলি হুগলি, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনা জেলায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষে যত চটকল আছে তাহার মধ্যে ৪/৫ অংশ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। কলিকাতা হইতে প্রায় ১০৫ কিলোমিটার (৬০ মাইল) উত্তর ও দক্ষিণে ভাগীরথীর দুই তীর ইহার কেন্দ্রস্থল। নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে : ১. উৎপাদন ক্ষেত্রের নিকট বসিয়া সুলভে কাঁচা মাল পাওয়ার সুবিধা ২. রানীগঞ্জ হইতে সস্তায় কয়লা আনয়নের সুবিধা ৩. সুলভ মূল্যে শ্রমিক সংগ্রহের সুবিধা ৪. কলিকাতা বন্দর মারফত কল-কবজা আমদানির ও তৈয়ারি পাটদ্রব্যের রপ্তানির সুবিধা, স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ভারতের মোট উৎপাদনের ৭০ হইতে ৮০ শতাংশই রপ্তানি করা হয়।

পশ্চিম বঙ্গ ব্যতীত অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশেও কিছু কিছু চটকল দেখা যায়। ভারতে চটকলের বিস্তৃতি এইরূপ : পশ্চিম বঙ্গে ১০২, অন্ধ্র প্রদেশে ৪, বিহারে ৩, উত্তর প্রদেশে ৩, মধ্য প্রদেশে ১, মোট ১১৩। দেশবিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতের কাঁচা পাট-অঞ্চলের ৭৩ শতাংশ পড়িল পাকিস্তানের ভাগে কিন্তু চটকলগুলি সমস্ত রহিয়া গেল ভারতে। এই কারণে ভারতের চটশিল্পে কাঁচা পাটের গুরুতর অভাব ঘটিয়াছিল। পরে পাট চাষ বিস্তারের দ্বারা ভারত কাঁচা পাটের ব্যাপারে প্রায় স্বাবলম্বী হইয়াছে। পাটের অভাব মেস্তা চাষের দ্বারাও অনেকটা দূর হইয়াছে। বর্তমানে ভারত স্বীয় কাঁচা পাটের চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ (ভাল জাতের পাট) পাকিস্তান হইতে আমদানি করে। ১৯৬৩-৬৪ বৎসরে ভারতে পাটদ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টন এবং ৯ লক্ষ টন।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাট বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পাট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা সর্বাধিক অর্জিত হইয়া থাকে। ১৯৬২-৬৩ বৎসরে ভারত ১৫৩ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিল। ভারতীয় পাটদ্রব্যের প্রধান ক্রেতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ক্যানাডা ইত্যাদি।

পাটশিল্পে বর্তমানে কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে। কিছুকাল পূর্বেও ভারত পাটদ্রব্যের উৎপাদনে পৃথিবীতে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান অধিকার করিত আজ তাহা আর নাই, যদিও পাটদ্রব্যের উৎপাদনে ভারতের স্থান আজও সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পাকিস্তানে আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত চটকল গড়িয়া উঠিয়াছে। আমেরিকায় ও ইওরোপের বহু দেশে, জাপানে এবং ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জেও চটকল সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; পাকিস্তানের পাট ভারতের তুলনায় সুলভ এবং চটকলগুলিও অত্যাধুনিক। ভারতে চটকলগুলির কল-কবজা অত্যন্ত পুরাতন ধরনের, সেইজন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চটশিল্পে যন্ত্রসজ্জার আধুনিকীকরণের ও 'র‍্যাশনালাইজেশন'-এর বিরাট উদ্যোগ চলিতেছে। পাটের সুতা কাটিবার কলগুলির অধিকাংশই ইতিমধ্যে আধুনিক ধরনের করা হইয়াছে। উপরন্তু রপ্তানির জন্য অনুপযোগী পাটের চালান বন্ধ করার চেষ্টায় উপস্থিত কিছু সাফল্যও দেখা দিয়াছে।

পাটের বদলে অনেক প্রকার বিকল্প ব্যবহৃত হইতে পারে, যেমন র‍্যামি, কেনাফ, সিসাল, শণ ইত্যাদি। পাটের থলির বদলে কাগজের থলিও ব্যবহৃত হইতেছে। ইদানীং উন্নতিশীল দেশে কৃষিজ শস্য বস্তাবন্দী না করিয়া

একেবারে ঢালিয়া ওয়াগনে ও জাহাজে বোঝাই করা হয়। পাটের দাম বাড়িলে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমিবে এবং তাহার বিকল্পের চাহিদাও বাড়িবে। সুতরাং ভাল জাতের পাট উৎপাদন করিয়া এবং উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া উহার দামকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে রাখা আবশ্যক। অবশ্য মাল বাঁধাই-এর উপাদান হিসাবে এখন পর্যন্ত পাটই সর্বাপেক্ষা সস্তা। পাটকে অন্যান্য প্রকারে ব্যবহার করার সম্ভাবনাও প্রচুর, সে বিষয়ে গবেষণাও হইতেছে।

সাধারণ অর্থনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার এবং দামের উত্থান পতন ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা পাটের চাহিদা ও দামেরও ওঠানামা দেখা যায়। ভারতীয় চটশিল্পের সমগ্র ইতিহাসটাই এইরূপ উত্থান-পতনের ইতিহাস। ইহারই ফলে চটকল-গুলিতে মন্দা দেখা দিলেই তাতগুলির একাংশ বন্ধ রাখা হয় এবং কাজের ঘণ্টা কমানো হয়।

ভারতে আজকাল প্রায় প্রতি বৎসর চটকলগুলিতে গড়ে প্রায় ১২½% তাঁত বন্ধ রাখিয়া কাজ করা হইতেছে। চটশিল্প ও পাটচাষী উভয়েরই স্বার্থে পাটের চাহিদার সহিত যোগানের সামঞ্জস্যসাধন করা বাঞ্ছনীয়। চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলে দাম অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তবে সুবিধা প্রধানতঃ ভোগ করে ফাটকা-বাজারের ব্যবসায়ীরা, কিন্তু উহার ফলে ক্রেতাকে বেশি দামে পাটদ্রব্য কিনিতে হয়। অন্য দিকে অত্যধিক পাটের উৎপাদন ঘটিলে দর অত্যন্ত নামিয়া যায়, তখন চাষীদের সর্বনাশ হয়। পাটের দাম স্থিতিশীল করার জন্য কয়েক বৎসর হইতে স্বেচ্ছামূলক পাটক্রয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং এইজন্য ইণ্ডিয়ান জুট মিল্স অ্যাসোসিয়েশন ন্যূনতম বাঁধা দরে (৩০ টাকা মন) পাট কেনার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

দ্র D. R. Wallace, *The Romance of Jute*, London, 1928; N. C. Chaudhury, *Jute and its Substitutes*, Calcutta, 1933; *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee*, Calcutta, 1934; *Report of the Jute Enquiry Commission*, Delhi, 1954; D. R. Gadgil, *The Industrial Evolution of India*, 1959; N. Das, *Industrial Enterprises in India*, Calcutta, 1961.

লীনা চট্টোপাধ্যায়

চট্টগ্রাম ২০°৩৫´ উত্তর হইতে ২২°৫৯´ উত্তর এবং ৯১°৩০´ পূর্ব হইতে ৯২°২৩´ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব পাকিস্তানের জেলা। জেলার আয়তন ৬৬৮২ বর্গ কিলো-মিটার (২৫৭০ বর্গ মাইল)। সদর ও কক্সবাজার মহকুমা লইয়া চট্টগ্রাম জেলা গঠিত। জেলায় ২৯টি থানা আছে। জেলার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে নাফনদী, উত্তরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম। জেলার পূর্বাংশে অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী উপকূলরেখার সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এইরূপ তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। ইহার কোনটির উত্তরাংশের নাম সীতাকুণ্ড পাহাড়। জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান চন্দ্রনাথ পাহাড় (উচ্চতা ৩৮৬ মিটার বা ১১৫৫ ফুট)। পর্বতগুলি বেলে ও কর্দম হইতে উৎপন্ন শিলায় গঠিত। ঐ অঞ্চল ব্যতীত জেলার সর্বত্রই নদীবাহিত উর্বর পলিমাটি দ্বারা আবৃত। চট্টগ্রাম জেলার নদীগুলির মধ্যে ফেণী, কর্ণফুলি, সেঙ্গু ও মাতামুহুরি উল্লেখযোগ্য ('কর্ণফুলি' দ্র)। নদীগুলি জেলাটির মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। ফেণী নদী জেলার উত্তর সীমানায় অবস্থিত।

চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা শাসিত বলিয়া এখানে আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০৫০ মিলিমিটার (১২২ ইঞ্চি) ও গড় আর্দ্রতা ৮১%। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ২৮° সেন্টিগ্রেড (৮২° ফারেনহাইট) ও শীত-কালীন গড় উত্তাপ ২১° সেন্টিগ্রেড (৬৮৫° ফারেনহাইট)। জেলায় প্রায়ই ঘূর্ণিবাত্যা দেখা দেয়।

পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে চট্টগ্রাম 'চট্টল' নামে অভিহিত আছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতা চট্টগ্রাম শহরকে 'ছাৎগাও' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে চট্টগ্রামের নাম 'চাটিগ্রাম'। বৌদ্ধ শ্রমণগণ ইহাকে 'রম্যাবতী' ও পর্তুগীজগণ 'পোর্তো গ্রান্দো' বা বড় বন্দর আখ্যা দিয়াছেন। চট্টগ্রাম জেলা পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল। নবম শতকে ইহা আরাকানরাজ কর্তৃক অধিকৃত এবং ত্রয়োদশ শতকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর কাশিম ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চট্টগ্রাম এলাকা প্রদান করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইলে ইহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে জেলার জনসংখ্যা ২৯৮৩০০০। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৩৮৬ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৯০০ জন) লোকের বাস। অধিবাসীদের মধ্যে ৮০% মুসলমান, ২০% হিন্দু ও ১০% পার্বত্য আদিবাসী। ১৯৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দে জেলার লোকসংখ্যা

১৮% বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপজীবিকা অনুসারে এই জেলায় কৃষিকর্মে নিযুক্তের সংখ্যা ৫১৪৩৩৫ জন, অন্য কর্মে নিযুক্ত ২৬৮০৬৩ জন।

জেলার মোট কৃষিভূমির পরিমাণ ১৫১৯০ হেক্টর (৩৭৯৭৬ একর)। তন্মধ্যে কৃষির অধীন ৪৪·৫০%, বনভূমি ৪৪·৮৩%। জেলার প্রধান শস্য ধান। ৩২৮০০০ হেক্টর (৮২০০০০ একর) জমিতে ইহার চাষ হয়। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাট, ইক্ষু, তামাক, সরিষা, ডাল, গম, যব, লঙ্কা ও চা উল্লেখযোগ্য।

বনভূমির পরিমাণ ২৭২৮ বর্গ কিলোমিটার (১০৯২ ২ বর্গ মাইল)। তন্মধ্যে সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ২৩৮৫ বর্গ কিলোমিটার (৯৫৪ বর্গ মাইল)। বনে গর্জন, চাপলাস, গাম্ভারী, নাগেশ্বর, জারুল, তুং ইত্যাদি বৃক্ষ পাওয়া যায়।

জেলার মোট ৭৫৬টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে প্রধান হইল কাগজের কল। দুইটি অতিবৃহৎ কাচের কারখানাও চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা, তৈল, দিয়াশলাই, পাট, কাপড়, ময়দা, ধান, চা ইত্যাদির কলও চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত। জেলায় ১৮টি চা-বাগান আছে।

বর্তমানে কর্ণফুলি নদীতে বাঁধ দিয়া ১২০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

জেলায় ১৫২ কিলোমিটার (৯৫ মাইল) রেলপথ। পাকা রাস্তার পরিমাণ ৮১ কিলোমিটার (৫১ মাইল)। চট্টগ্রাম হইতে একটি রেলপথ সীতাকুণ্ড, মিরসরাই ও ফেণী নদী পার হইয়া ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে। আর একটি রেলপথ কর্ণফুলি নদী পার হইয়া দোহাজারী গিয়াছে। তৃতীয় রেলপথটি সোজা উত্তরে গিয়া নাজিরহাট গিয়াছে। এগুলির প্রধান কেন্দ্র চট্টগ্রাম। এখানে রেলের কারখানা আছে। কর্ণফুলি নদীর অনেকাংশে নৌকা চলে। কর্ণফুলি হইতে কয়েকটি খাল দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। বন্দরগুলির মধ্যে কক্সবাজার, টেকনাফ ইত্যাদি প্রধান। চট্টগ্রাম বিদেশের সহিত বিমানপথের দ্বারা যুক্ত। চট্টগ্রাম এবং ঢাকার মধ্যে বিমান চলাচল করে। চট্টগ্রাম শহর ও কক্সবাজারে বিমানবন্দর আছে।

চন্দ্রনাথের বিখ্যাত শিব মন্দির চট্টগ্রাম হইতে ৩৬ কিলোমিটার (২৩ মাইল) দূরে ৩৪৬ মিটার (১১৫৫ ফুট) উচ্চ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবস্থিত। পাহাড়ের তলদেশ হইতে শিখর পর্যন্ত ৭০০ সোপান আছে। মন্দিরে যাইবার পথে ব্যাসসরোবর, সীতাকুণ্ড, ভবানীমন্দির, স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির, গয়াকুণ্ড বা পাদগয়া ও উনকোটি শিবমন্দির বিখ্যাত। শিবরাত্রির সময় চন্দ্রনাথে মেলা হয়। বৌদ্ধগণও চন্দ্রনাথ পাহাড়কে তীর্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। কথিত হয় যে এই পর্বতে বুদ্ধের অঙ্গুলির অস্থি সমাহিত আছে। চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে একটি বৌদ্ধ মেলা হয়। বাড়বাকুণ্ডের জলে সতত বিরাজমান অগ্নিশিখা মহাদেবের তৃতীয় নেত্র নামে খ্যাত। এই কুণ্ডের জল উষ্ণ। কুমিরা ও অগ্নিকুণ্ডের জন্য বিখ্যাত। চট্টগ্রাম হইতে ৬·৪ কিলোমিটার (৪ মাইল) দূরে কৈবল্যধাম মহাদেবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

চট্টগ্রাম জেলায় শিক্ষিতের হার ২৬·১৩%, তন্মধ্যে পুরুষ ৫০৮৮৬৬ ও স্ত্রীলোক ১৬৭২৬৩ জন। এখানে ৬টি কলেজ, ৭৯৩টি মাধ্যমিক ও ৬৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৮০টি মাদ্রাসা আছে। জেলার সর্বসমেত কুটিরশিল্পের সংখ্যা ২৫০৭২টি।

চট্টগ্রাম শহর (২০° ২১′ উত্তর ও ৯১° ৫০ পূর্ব) বিভাগ ও জেলার সদর। লোকসংখ্যা ২৯৬·৭৬ জন। এই বিখ্যাত বন্দরটি কর্ণফুলি নদীর মোহনা হইতে ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) দূরে নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ হইতে চট্টগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। শহরের মধ্যে নানা স্থানে উচ্চ টিলা ও পাহাড় আছে। এইরূপ একটি উচ্চ পাহাড়ে চট্টগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চট্টেশ্বরী কালীর মন্দির অবস্থিত। পীর বদরউদ্দীনের দরগাহ অন্যতম প্রসিদ্ধ মসজিদ। অন্যান্য মসজিদের মধ্যে আন্দরকিল্লা পল্লীতে জামে মসজিদ, পীর সুলতান বায়েজিদ বস্তামীর দরগাহ প্রভৃতি বিখ্যাত।

এই শহর চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মুকুন্দ দত্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখ বহু বৈষ্ণব ভক্তের জন্মস্থান, আধুনিক যুগের নবীনচন্দ্র সেন, শশাঙ্কমোহন সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তেরও জন্মভূমি। এখানে ১৯৩০ সালে সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবী কর্তৃক ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে চট্টগ্রাম বন্দর অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দর হইতে চা, পাট, ধান প্রভৃতি কাঁচা মাল রপ্তানি ও খনিজ দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, মোটরগাড়ি, ইঞ্জিন, রাসায়নিক দ্রব্য, সার ইত্যাদি আমদানি করা হয়। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪৫৭২৭৬ মেট্রিক টন (২৪৩২৯৪৭ টন) এবং বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ ১১৭১৭৪ মেট্রিক টন (৩২৪৮৬০ টন) ও স্বদেশে ৩২৮১৪৮ মেট্রিক টন (১১৬০১৪ টন) ছিল।

কক্সবাজার চট্টগ্রাম হইতে ৭৮ কিলোমিটার (৪৯

মাইল) দূরে অবস্থিত। ইহা জেলার অন্যতম মহকুমার সদর। লোকসংখ্যা ৫৯২০ জন।

নাজিরহাটঘাট পীর হজরত গোলাম রহমান শাহের সমাধিস্থান। ইহা নাজিরঘাট শাখা লাইনের শেষ স্টেশন।

ধর্মঘাট চট্টগ্রাম হইতে ৩০.৭ কিলোমিটার (১৯ মাইল) দূরে অবস্থিত ও চণ্ডীতে বর্ণিত মেধস্ মুনির সমাধির জন্য খ্যাত। দুর্গাপূজার সময় এখানে উৎসব হয়।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India, Provincial Series: Eastern Bengal & Assam*, Calcutta, 1909; H. H. Nomani, *Census of Pakistan*, 1951, vols 3 & 8, Dacca, 1951; Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan* London, 1958; Government of Pakistan, *Outline of the Third Five Year Plan, 1965-70*, 1964; East Pakistan Bureau of Statistics, *Statistical Digest of East Pakistan: 1963-64*, Dacca, 1964.

সৌরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চড়ক চড়কের উৎসব চড়কপূজাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই পূজা মহা আড়ম্বরপূর্ণ। ইহার বিভিন্ন অংশ (মুদ্রাভঞ্জন বা গম্ভীরপূজা, অধিবাস বা গৃহসন্ন্যাস বা গিরিসন্ন্যাস, ধারণা পূজা, পাটস্নান, সন্ন্যাসী, বালা, সাঙ্গ বা সাংদের দেবতা প্রণাম) উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সকলগুলি একই স্থানে একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ সমাজের তথাকথিত 'নিম্নস্তরের' মধ্য হইতে আগত সন্ন্যাসী বা সাংদের প্রণাম বিশেষ চিত্তাকর্ষক। বিশেষ বিশেষ ফল ও ফুল হাতে লইয়া এক-একজন সন্ন্যাসীকে বিবিধ বাদ্য ও মুদ্রাসহযোগে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রণাম করিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে শিবের পূজা হইলেও পূজিত দেবতাদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং পূজাব্যাপারে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রধান অংশগ্রহণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রধান দেবতার নাম কালার্করুদ্র। ইনি ভীষণাঙ্গ, কোটিমার্তণ্ডের মত ইঁহার দেহের দীপ্তি, চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি ইঁহার তিন নেত্র। ইনি প্রণতদের ভয় হরণ করেন, ইঁহার মুখে অট্টহাস্য। ইঁহার বা ইঁহার শক্তির উদ্দেশে পশুবলির রীতি আছে। এই প্রসঙ্গে অর্চিত দেবীর নাম নীলচণ্ডিকা বা নীলপরমেশ্বরী। নীলা বা নীলাবতী নামে ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত। কোনও কোনও স্থানে অর্ধকায় ভীষণাকৃতি, অশ্বারূঢ়, নীলবর্ণ নীল নামে এক পুরুষদেবতার পূজার ব্যবস্থা আছে। কোথাও কোথাও গম্ভীর নামে এক দেবতার পূজা হইয়া থাকে। গম্ভীর বায়ুপুত্র, বায়ুর মত বেগবান, রিপুবিনাশকারী, সৈকতালিপ্তকায়, শুভ্রবর্ণ এবং ত্রিনেত্র। সমগ্র উৎসবটি যে নানা স্থানে নীল বা গম্ভীর নামে পরিচিত তাহার মূলে এই দুই দেবতার পূজার সম্পর্ক থাকা সম্ভব। মন্দিরের বহির্দেশে গম্ভীরের পূজার বিধান। গ্রামের বাহিরে আর এক দেবতার পূজার ব্যবস্থা আছে। ইঁহার নাম হাজরা। ইনি শ্বেতবর্ণ, চতুর্ভুজ, দিগম্বর ও জটাজূটধারী।

জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত এই পূজা এবং উৎসব কত প্রাচীন তাহা জানা নাই। লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চৈত্র মাসে শিবারাধনার প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদি উৎসবের উল্লেখ থাকিলেও পূজা ও উৎসবের বিবরণ নাই, চড়কাদি নামের উল্লেখও ইহাদের মধ্যে নাই। বর্ষের বিভিন্ন সময়ে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অনুষ্ঠিত ছোট বড় নানা ধর্মোৎসবের বিবরণে পূর্ণ পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ও রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে এই উৎসবের ইঙ্গিতমাত্র নাই। মনে হয়, উচ্চস্তরের লোকের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন তেমন প্রাচীন নয়। তবে এই জাতীয় পন্থা ও ইহার অন্তর্ভুক্ত উদ্দাম অনুষ্ঠান অভিজাত সমাজে অবজ্ঞাত প্রাচীন পাশুপতদিগের সম্প্রদায়বিশেষের সহিত যুক্ত থাকা অসম্ভব নহে।

দ্র Chintaharan Chakrabarti, 'The Cult of Kalarkarudra (Cadakapuja)', *Journal of the Asiatic Society of Bengal, Letters*, 1935.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চড়ক উৎসব উপলক্ষে প্রায় ৬-৭.৫ সেন্টিমিটার (২০-২৫ ফুট) উচ্চ একটি শাল গাছের খুঁটি মাটিতে প্রোথিত করা হয়, তাহাকে চড়ক গাছ বলে। আর একটি দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড এমনভাবে ইহার শীর্ষে স্থাপন করা হয় যাহাতে ইহাকে বেষ্টন করিয়া কাষ্ঠদণ্ডটি শূন্যে বৃত্তাকারে আবর্তিত হইতে পারে। তাহার একপ্রান্তে গাজুনে সন্ন্যাসীকে গামছা দিয়া বাঁধিয়া আর এক প্রান্তে একটি দড়ির সাহায্যে শূন্যে চক্রাকারে আবর্তিত করা হইয়া থাকে। ঐ সময়ে কোথাও কোথাও একটি বড় বাঁকানো লোহার কাঁটা তাহার পিঠের চামড়ার মধ্যে বঁড়শির মত গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ইংরেজ আমলে আইনের দ্বারা এই রীতি নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় হইবার পর হইতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে

কেবলমাত্র একটি বঁড়শি সন্ন্যাসীর গায়ে ছোঁয়াইয়া তাহাকে শূন্যে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তার পর যথারীতি তাহাকে শূন্যে আবর্তিত করা হয়।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, J N. Powell, 'Hook-Swinging, Mysore', *Folk lore*, vol XXV, 1914, K. P. Chattopadhyaya, 'Cadak festival in Bengal', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1935.

আশুতোষ ভট্টাচার্য

চড়াই চড়ুই বা চটক। পাসেরিফর্মেস বর্গের (Order-Passeriformes) অন্তর্গত ফ্রিনজিলিদী গোত্রের (Family-Fringillidae) ভূমি ও শাখা-চারী ক্ষুদ্রকায় পাখি। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ১৮ সেন্টিমিটার (৫½ ৭ ইঞ্চি)। প্রতি পায়ে চারটি আঙুল, তাহার মধ্যে একটি পিছনের দিকে ও অন্য তিনটি সামনের দিকে প্রসারিত, আঙুলের এইপ্রকার সন্নিবেশ যুগপৎ ভূমির উপর চলাফেরা ও বৃক্ষশাখায় বিহারের সহায়ক। চঞ্চু হ্রস্ব, সুদৃঢ়, খাড়া এবং তৃণ ও শস্যের বীজ বিদীর্ণ করিয়া খাইবার উপযোগী। আহার্য শস্যবীজ, নবপল্লব, মুকুল, ছোট ফল এবং কীট-পতঙ্গ। মাটিতে বিচরণের সময় লাফাইয়া চলে, সারাদিন বিশেষতঃ সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কলরব করে।

ভারতে বিভিন্ন জাতের চড়াই দেখা যায়। গৃহচটক (হাউস স্প্যারো) এবং পীতগণ্ডচটক (ইয়েলোথ্রোটেড-স্প্যারো) সমভূমি অঞ্চল হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র, তরুচটক (ট্রি স্প্যারো) ও খয়রা তরুচটক (ব্রাউন ট্রি স্প্যারো) সমভূমির বনস্থল হইতে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, কাশ্মীরী গৃহচটক কাশ্মীর হইতে সিকিম, মালয় তরুচটক পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ হইতে প্রায় ২১০০ মিটার (৭০০০ ফুট) উচ্চতা পর্যন্ত এবং তিব্বতীয় তরুচটক নেপাল, ভুটান ও পার্বত্য আসামে বাস করে। ইহা ছাড়া শীতঋতুতে সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের জলাভূমি ও তৃণভূমিতে যাযাবর স্পেনীয় চটককে আসিতে দেখা যায়।

গৃহচটক মানবসমাজের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ইহারা লোকালয়ে নীড় নির্মাণ করে এবং লোকালয় হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করে। সারা বৎসরে ইহারা কয়েকবার বাসা বাঁধে ও প্রতিবারে ৩ হইতে ৫টি ডিম পাড়ে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বাসা বাঁধার কাজে অংশ গ্রহণ করে। পীতগণ্ডচটক বনস্থলে বাস করে ও বৃক্ষের কোটরে নীড় রচনা করে। তরুচটক ও খয়রা তরুচটক লোকালয়ের সংলগ্ন আবাদী জমিতে ও বনভূমিতে বিচরণ করে।

ভারতীয় পুরুষ চড়াইয়ের গণ্ডদেশ শ্বেত, চিবুক কৃষ্ণবর্ণ, ডানা কৃষ্ণরেখাযুক্ত খয়রা ও তাহাতে কয়েকটি আড়াআড়ি শ্বেতরেখা, দেহের বর্ণ প্রজাতি-ভেদে ধূসর ও বাদামী। স্ত্রী-চড়াইয়ের বর্ণ অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল, প্রায়শঃ ধূসর। পীতগণ্ড চড়াইয়ের কণ্ঠে হলুদ ছোপ থাকে।

দ্র E C. Stuart Baker, *The Fauna of British India. Birds*, vol III, London, 1926, S. Dillon Ripley, *A Synopsis of the Birds of India and Pakistan*, Bombay, 1961.

প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

চণ্ড প্রদ্যোত বুদ্ধদেবের জীবিত কালে রাজা চণ্ড প্রদ্যোত মহাসেন ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম অবন্তিতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। মগধের হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রুর সহিত প্রদ্যোতের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। একবার বিম্বিসার তাঁহার চিকিৎসার জন্য স্বীয় চিকিৎসক জীবককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ছিলেন প্রদ্যোতের ঘোর শত্রু। উদয়ন প্রদ্যোতের কন্যাকে হরণপূর্বক বিবাহ করেন। রাজা প্রদ্যোতের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বুদ্ধদেব মহাকাচ্চান নামক জনৈক শিষ্যকে অবন্তি রাজ্যে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত করেন। চণ্ড প্রদ্যোত পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করায় অবন্তি বিশেষ শক্তিশালী হয়।

দ্র R. C Majumdar ed, *The History and Culture of the Indian People*, vol II, Bombay, 1951.

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

চণ্ডাল স্মৃতিশাস্ত্রে চণ্ডাল হিন্দুসমাজের নিম্নতম ও অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত। মনুসংহিতা অনুসারে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ইহাদের জন্ম। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহারা কোনও অনার্য জাতি হইতে সম্ভূত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহাদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ জাতকে বহু কাহিনীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে চণ্ডালকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা তাহার ছায়া পড়িলেও উচ্চ-শ্রেণীর দেহ অশুদ্ধ হয়। অনেক স্থলে এই অপরাধের জন্য চণ্ডালকে নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা, এমন কি প্রহার পর্যন্ত

ভোগ করিতে হইত। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে চণ্ডালের স্পর্শজনিত দোষ স্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে চণ্ডালেরা নগরের বাহিরে বাস করে এবং শহরে বা বাজারে প্রবেশ করিবার সময় দুইটি কাঠির আঘাতের দ্বারা শব্দ করিয়া স্বীয় আগমনবার্তা ঘোষণা করে, যাহাতে অন্য লোক তাহাদের সংস্পর্শ পরিহার করিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতেও দক্ষিণ ভারতে পারিয়া জাতি এবং বাংলায় চাঁড়াল জাতির অবস্থা এইরূপ ছিল। চণ্ডাল ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর প্রতি এইরূপ আচরণ ব্রাহ্মণ্য সমাজের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। বর্তমান বাংলার চাঁড়াল শব্দ প্রাচীন চণ্ডাল শব্দেরই রূপান্তর। 'অস্পৃশ্যতা' দ্র।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

চণ্ডী[1] শিবগৃহিণী শক্তি দেবতার নাম। নামটি রূপান্তরে চণ্ডিকা। এই নাম মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য (বাংলা দেশে 'চণ্ডী' নামে, বৈষ্ণব 'গীতা'র শাক্ত প্রতিরূপ হিসাবে প্রসিদ্ধ) অংশে মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভের বধ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। চণ্ডিকা বা চণ্ডীর অর্থ প্রচণ্ডা দেবী। ঋগ্বেদে রুদ্রের ক্রোধকে কিয়ৎপরিমাণে মূর্ত করিয়া তাঁহাকে 'মন্যু' বলা হইয়াছে। ইহাই চণ্ডিকা বা চণ্ডী কল্পনার বীজ বলিয়া মনে হয়।

দেবীর প্রাচীনতর নাম দুইটি হইতেছে উমা হৈমবতী ও দুর্গা। হিমবৎ দুহিতা উমা শিবগৃহিণীর আসল নাম ও রূপ। ইনিই পার্বতী, গৌরী। উমা নাম প্রথম পাওয়া যায় কেন উপনিষদে। দুর্গা (ইহার রূপান্তর দুর্গি) নাম প্রথম পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। দুর্গা (দুর্গ) নামের আসল অর্থ ছিল দুর্গম স্থানের অধিষ্ঠাত্রী। পরে অর্থ হইয়াছে দুর্গে অর্থাৎ সংকটে ত্রাণকর্ত্রী। তুলনীয় দেবীমাহাত্ম্যে, "দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিম্ অশেষজন্তোঃ।" এই দেবীকে (অথবা এইরকম অপর এক দেবীকে) ঋগ্বেদের একটি সূক্তে অরণ্যানী বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। মধ্য কালের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের বিশিষ্ট কাহিনী দুইটিতে এই দুর্গা—অরণ্যানী চণ্ডীর মাহাত্ম্য গীত হইয়াছে। সেখানে ইহার বিশিষ্ট নাম অভয়া (অর্থাৎ অভয়দায়িনী) চণ্ডী। ইনি বিন্ধ্যবাসিনী (অর্থাৎ অরণ্যনিবাসিনী) এবং ইহার বাহন (ও প্রতীক) গোধা।

উমা-হৈমবতী (গৌরী-পার্বতী) ও দুর্গা-চণ্ডী নামের মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। কেন-উপনিষদে উমা-হৈমবতী "বহুশোভমানা" অর্থাৎ সুবেশা সুন্দরী এবং তিনি ব্রহ্মের মর্মজ্ঞা। সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি সুন্দরী পর্বতরাজকন্যা, পরমপুরুষ শিবের গৃহিণী। পুরাণে দুর্গা-চণ্ডী সরাসরি শিবগৃহিণী নহেন, শিবগৃহিণীর রূপান্তর। ইনি শিবপ্রমুখ দেবতাদের দেহ হইতে নিষ্কাশিত তেজের পিণ্ডীভূত রূপ— উগ্রা, বহুপ্রহরণ-ধারিণী, দৈত্যবধকালে অষ্টাদশভুজা (অথবা দশভুজা কিংবা অষ্টভুজা)। ইহার বাহন সিংহ। বাংলা দেশে প্রচলিত পুরাতন কাহিনীতে চণ্ডী বিন্ধ্যবাসিনী দ্বিভুজা। তাঁহার বাহন গোধা। (এখানে মনে রাখিতে হইবে যে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে পার্বতী চণ্ডী প্রায় এক হইয়া গিয়াছেন, চণ্ডীও দশভুজা ও সিংহবাহিনী হইয়াছেন।) এই দুই দেবীস্বরূপের মধ্যে পণ্ডিতেরা যথাক্রমে আর্যত্বের ও অনার্যত্বের কল্পনা করিয়া থাকেন।

বাংলা দেশের লোকবিশ্বাসে, বিশিষ্ট স্থানে অথবা বৃক্ষে এবং বিশিষ্ট দৈব উৎপাতে উগ্র দৈবসত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। এই দৈবসত্তা প্রায়ই দেবী চণ্ডীর বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া মানা হইয়াছে। সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামও দেওয়া হইয়াছে। শেওড়া গাছে অধিষ্ঠিত দেবী সাধারণতঃ বনদুর্গা নামে প্রচলিত। পাকুড় গাছে অধিষ্ঠিত দেবী ষষ্ঠী। কোনও কোনও স্থানে বিশেষ বৃক্ষে অধিষ্ঠিত বলিয়া কল্পিত চণ্ডীর কাছে মানত করিতে গেলে গাছের ডালে বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া দিতে হয়। সে দেবীকে বলা হয় নেকড়াই চণ্ডী। আবার কোনও কোনও স্থানে চণ্ডী অধিষ্ঠিত বৃক্ষের তলায় ঢিল অথবা ইষ্টকখণ্ড দিলেই পূজা করার শামিল হয়। সে দেবীকে বলে ইটাল চণ্ডী বা ঢেলাল-চণ্ডী। বসন্ত রোগের উপশমকারিণী দেবী হইলেন বসন্ত-চণ্ডী (বা বসন্-চণ্ডী)। কোনও কোনও গ্রামের প্রসিদ্ধ দেবী সেই গ্রামের নামেই সমধিক পরিচিত, যেমন বোয়াঁই-চণ্ডী, সগড়াই-চণ্ডী।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবতা অভয়া মঙ্গলচণ্ডী নামেই প্রসিদ্ধ। বাংলার বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলার নারীসমাজে মঙ্গলচণ্ডী গৃহকল্যাণের প্রধান দেবতা। সধবা মেয়েরা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে ফলাহার করেন ও দেবীর ব্রতকথা শোনেন, এই রীতি বহু পরিবারে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এইসব পরিবারে প্রত্যেক নববধূর একটি করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর 'ঝাঁপি' থাকে। তাহাই দেবীর প্রতীক।

সুকুমার সেন

চণ্ডী[2] মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশ (৮১-৯৩ অধ্যায়) বাংলা দেশে চণ্ডী নামে পরিচিত। ইহার

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেবী মহামায়া বা চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মন্ত্রসংখ্যা সাতশত, তাই ইহার অপর নাম সপ্তশতী। যুগে যুগে দেবী আবির্ভূত হইয়া কিভাবে দেবগণকে অসুরের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার তিনটি কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। কাহিনী তিনটিতে যথাক্রমে মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর বধ এবং অনুচর ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড ও রক্তবীজের সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ-বধের কথা বলা হইয়াছে। এই দেবী সমস্ত জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই মানুষের সংসার-বন্ধন ও মুক্তির হেতু। তিনি দেবতাদের মিলিত শক্তি-রূপা। তিনি নিত্যা হইলেও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন তখনই তিনি উৎপন্না হইলেন বলা হয়। দেবীর প্রকৃতি ও স্বরূপের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মেধস্ মুনি সুরথ রাজা ও সমাধি নামক বৈশ্যের নিকট কাহিনীগুলি বলিয়াছিলেন। দেবীপূজা উপলক্ষে বা গৃহস্থের মঙ্গল-কামনায় এক বা একাধিক বার (একাবৃত্তি, দ্বিরাবৃত্তি, শতাবৃত্তি) চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা আছে। চণ্ডীর প্রত্যেকটি মন্ত্রের সহিত আগাগোড়া অপর একটি মন্ত্র যোগ করিয়া পাঠ করাকে পুটিত চণ্ডীপাঠ বলা হয়। এখন আর এইরূপ পাঠের প্রচলন নাই। বাংলা দেশে রাত্রিতে চণ্ডী পাঠের নিয়ম নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোকের দ্বারা রচিত চণ্ডীর অজস্র টীকার সন্ধান পাওয়া যায়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চণ্ডীগড় ৩০°৪৫′ উত্তর ও ৭৬° ৫৫′ পূর্ব। পাঞ্জাবের রাজধানী। আয়তন প্রায় ৩৭·৫ বর্গ কিলোমিটার (১৫ বর্গ মাইল)। দিল্লী হইতে ২৪৯ কিলোমিটার (১৫৬ মাইল) দূরে, আম্বালা-কালকা রোডের ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা সমুদ্র হইতে ৩৬০ মিটার (১২০০ ফুট) উচ্চ। হিমালয়ের অন্তর্গত শিবালিক ও কোশলী পর্বতমালার পাদদেশে এক মালভূমির উপরে চণ্ডীগড় শহরের অবস্থান। গড় উত্তাপ ৩৭° সেন্টিগ্রেড হইতে ৪০° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ ৯° সেন্টিগ্রেড হইতে ১১° সেন্টিগ্রেড হইয়া থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ১০৮ সেন্টিমিটার। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের গণনা অনুসারে লোকসংখ্যা ৯৯২৬২ জন।

দেশবিভাগের পর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব পাঞ্জাবের রাজধানী হিসাবে ইহার নির্মাণকার্য শুরু হয়। বিখ্যাত ফরাসী স্থপতি লে করবুজিয়ে ইহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সমগ্র শহরটি কতকগুলি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত। আবাসিক অঞ্চলগুলি দৈর্ঘ্যে ৫·৬ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ২·৩ কিলোমিটার বিস্তৃত। এরূপ প্রত্যেক অঞ্চলে বিদ্যালয়, দোকান, উদ্যান ইত্যাদি বর্তমান। শহরের দুইটি প্রধান রাস্তার সংযোগস্থলে ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র রচিত হইয়াছে। শহরের আবাসিক অঞ্চল হইতে কিছু দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে কলকারখানা, পূর্ব দিকে এক কৃত্রিম হ্রদের ধারে হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট, বিধানসভা ইত্যাদি এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

চণ্ডীগড় ভারতের প্রথম সুপরিকল্পিত নগর। স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট ও বিধানসভা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের বাসগৃহ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রবীন্দ্র রঙ্গালয়, পাঠাগার ও কয়েকটি সংস্কৃতি-কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। চণ্ডীগড়ে অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বপন ঘোষ

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৬ খ্রী) চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার নওয়াঁড়া গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থায় পিতা রামকমল পারিবারিক গোলযোগে গৃহত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। চণ্ডীচরণ বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগের অভাবে স্বল্প শিক্ষালাভের পরেই অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হন। অতঃপর নড়াইলের জমিদারদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে তিনি আরও কিছু বিদ্যালাভের সুযোগ পান। যৌবনের প্রারম্ভে চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মমতে অসবর্ণ বিবাহ করেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনা করিয়া সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত 'মা ও ছেলে', 'দু'খানি ছবি', 'মনোরমার গৃহ', কমলকুমার' প্রভৃতি উপন্যাস ও কাহিনী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'পাপীর জীবনলাভ' নামে গ্রন্থখানিকে তাহার আত্মজীবনী বলিয়া অনেকে মনে করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (পৌষ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) তিনি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অশোকা সেনগুপ্ত

চণ্ডীচরণ মুনশী (১৭৬০? ১৮০৮ খ্রী) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতম শিক্ষক। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাদির বখশ প্রণীত ফার্সী পুস্তক 'তুতীনামা'-র

বঙ্গানুবাদ 'তোতা ইতিহাস' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর চণ্ডীচরণের মৃত্যু হয়।

অশোকা সেনগুপ্ত

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬ খ্রী) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পূর্ব বঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে জন্ম। পিতা নিমচাঁদ সেন ও মাতা গৌরী দেবী। পঁচিশ বৎসর বয়সে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে মুন্সেফ ও সাব-জজ রূপে নানা স্থানে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে 'আঙ্কল টম্‌স্ ক্যাবিন'-এর 'টমকাকার কুটীর' (১৮৮৫ খ্রী) নামক অনুবাদেই তাঁহার প্রথম প্রসিদ্ধি। পরে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা রূপে নাম করিয়াছিলেন। 'মহারাজা নন্দকুমার' (১৮৮৫ খ্রী), 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' (১৮৮৬ খ্রী), 'অযোধ্যার বেগম' (১৮৮৬ খ্রী), 'ঝান্সীর রানী' (১৮৮৮ খ্রী) প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। স্বদেশপ্রেম তাঁহার রচনাবলীর প্রধান সুর। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ সেন, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭৭, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ; বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

পল্লবরঞ্জন ঘোষ

চণ্ডীদাস পুরানো বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধতম কবিনাম। কিন্তু এই নামে একজন কবি না অনেকজন চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত সুপ্রসিদ্ধ পদগুলি লিখিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও মতৈক্য নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে তিন জন প্রাচীন গীতকর্তা (পদকার) সর্বাধিক সম্মানিত তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীদাস আছেন, আর আছেন বিদ্যাপতি ও জয়দেব। শেষ জীবনে চৈতন্যদেব ঈশ্বর-বিরহ-ব্যাকুল অবস্থায় এই তিন কবির গান শুনিয়া কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিতেন। সেই হইতেই এই তিন কবির অপরিসীম মর্যাদা বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্বস্বীকৃত। চণ্ডীদাসের গান চৈতন্যদেবের জানা ছিল, সুতরাং চণ্ডীদাসের কাল চৈতন্যদেবের পরবর্তী হইতে পারে না। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমাদের জানা খাঁটি খবর এইটুকুই।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর কানে চণ্ডীদাসের নাম সর্বপ্রথম শুনাইয়াছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র একটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রসঙ্গে। তাহার পর জগদ্বন্ধু ভদ্র বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশ করিয়া চণ্ডীদাসের ও অন্যান্য বৈষ্ণব-কবির পদাবলী পাঠকদের গোচরে আনেন। ইহার অনতিবিলম্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ নাম দিয়া প্রাচীন সাহিত্যের সম্পাদিত সংস্করণ বাহির করিতে থাকেন। তাহাতেই চণ্ডীদাসের (ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবির) পদের রস শিক্ষিত কাব্যরসিক প্রথম আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আধুনিক কালে, অ-বৈষ্ণব সমাজে, চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিষ্ঠা সেই হইতে। তখন হইতে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির রচনা-সন্ধানে অনেকে উৎসুক হইলেন। পুথিপাতড়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত প্রচুর পদও বাহির হইতে লাগিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দে নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী' সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইল। এই সংগ্রহে যে প্রচুর নূতন পদ দেখা গেল তাহার অনেকগুলিতে কবির ভণিতায় 'দীন' বিশেষণ ব্যবহৃত (পূর্ব-পরিচিত পদগুলিতে সাধারণতঃ 'দ্বিজ' বিশেষণ ছিল)। ভাবে ও ভাষায় এই নূতন পদের অধিকাংশই খেলো ও অর্বাচীন। তখনকার মত মর্মজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া গেলেও কিছুকাল পরে এই পদগুলির এবং পূর্ব-পরিচিত পদগুলিরও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাইল বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক একটি নামহীন 'চণ্ডীদাস-পদাবলী' পুথির আবিষ্কার (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়া এবং টীকা ও জ্ঞাতব্য তথ্যাদি দিয়া ভালভাবে সম্পাদন করিয়া বসন্তরঞ্জন রায় পুথিটিকে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিলেন (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। এই সালেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' বাহির হইল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদাবলীর ভাষা পরিচিত পদাবলীর ভাষার তুলনায় অত্যন্ত পুরানো, এমন কি দুর্বোধ্য, বৌদ্ধগানের ভাষা তো প্রায় প্রাকৃতের কাছাকাছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির লিপিছাঁদ পুরানো, ভাষাও পুরানো। সুতরাং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিশেষজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির তথা পদকর্তার কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে নির্দেশ করিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কবির নিকট জয়দেবকে ঋণী করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বিচার করিয়া ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদাবলীর ভাব মাঝে মাঝে এমন গ্রাম্য যে অশ্লীল বলিতে হয়। এই কারণে কাব্যরসিক শিক্ষিত পাঠক এবং ভক্ত বৈষ্ণব

সাহিত্যরসিক বইটিকে প্রামাণিক মনে করিতে পারেন নাই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শহীদুল্লাহ ও অন্যান্য পণ্ডিতের সিদ্ধান্তে ইঁহাদের অস্বীকার গুঞ্জন থামিয়া আসিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে পুথির লিপি রাধাগোবিন্দ বসাক পরীক্ষা করেন। ইঁহার অভিমত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যে প্রাচীন ছাঁদের লিপি আছে তাহা ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী হইবে না। কিন্তু রাখালদাস, রাধাগোবিন্দ প্রমুখ প্রত্নলিপিবিশারদদের অভিমতের মধ্যে দুইটি গুরুতর গলদ আছে। ইঁহারা পুথির একটি লিপিছাঁদই বিচার করিয়াছেন, অন্য ছাঁদকে বিবেচনা করেন নাই। পুথিতে তিন ছাঁদের লিপি আছে, প্রাচীন, অর্বাচীন ও অর্বাচীনতর। দ্বিতীয়তঃ, পুথির কাগজ ও কালি পরীক্ষা করা হয় নাই। কাগজ পুরানো নহে, মাড়োল, প্রায় কলের তৈয়ারি। কালি আধুনিক। ভাষায় প্রাচীনতার পরিচয় খুবই আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেশ আধুনিকতার ছিটে ফোঁটাও বিরল নয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি বিচার করিয়া চণ্ডীদাসের কাল নির্ণীত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটা নূতন সমস্যা জাগিল। বইটির পদগুলিতে কবির ভণিতা প্রায় ‘বড়ু চণ্ডীদাস’, দৈবাৎ শুধু ‘চণ্ডীদাস’, বার পাঁচেক ‘আনন্ত (অনন্ত) বড়ু চণ্ডীদাস’ এবং প্রত্যেক পদের ভণিতায় দোহাই আছে তান্ত্রিক দেবী বাশুলীর অর্থাৎ চামুণ্ডার ‘গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ’। কবির নাম যদি ‘আনন্ত’ বা ‘অনন্ত’ হয় তবে ‘(বড়ু) চণ্ডীদাস’ বিশেষণ, আর যদি ‘আনন্ত’ বা ‘অনন্ত’ নামটি প্রক্ষেপ হয় তবে ‘(বড়ু) চণ্ডীদাস’ নাম। মনে হয়, যিনি চণ্ডীদাসের রচনা ভাঙিয়া চুরিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন ‘আনন্ত’ বা ‘অনন্ত’ তাঁহারই নাম।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সাধনার যে পন্থাকে বলা হয় রাগাত্মিক বা সখী-অনুগত অথবা পরকীয়া তাহা পরে রস-সাধনা-পদ্ধতি বলিয়া পরিচিত। এই পদ্ধতির সাধনায় চৈতন্য-আস্বাদিত গানের তিন কবির এক নূতন আধ্যাত্মিক স্বরূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। ইঁহারা ‘রসিক’ পরিগণিত এবং সমসাময়িক ও ঈষৎ পূর্ববর্তী রস-সাধনার সিদ্ধ গুরু রসিকদের সঙ্গে পরকীয়-সাধনায় সিদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইলেন। এই ভাবনা অনুসারে চণ্ডীদাসের এক সাধনসঙ্গিনী কল্পনা করিয়া অনেক আখ্যান প্রচলিত হইয়াছে। সে সব গল্পে চণ্ডীদাসের এই সাধনসঙ্গিনী প্রিয়ার নামে ঐক্য নাই (তারা, রামী, রামতারা ইত্যাদি) কিন্তু জাতিতে মিল আছে— ধোবিনী। চণ্ডীদাসের কবিত্ব ও সংগীত প্রতিভা এবং ধোবিনীর প্রতি তাঁহার গাঢ় অনুরাগ লইয়া যে সব গল্প-কাহিনী সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সবই আধুনিক নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরচিত বিবর্তবিলাস প্রভৃতি রাগাত্মিক সাধনার কড়চা-গ্রন্থে চণ্ডীদাস-ধোবিনীর প্রেমকাহিনীর ইঙ্গিত কিছু কিছু আছে। তবে বেশির ভাগ গল্প উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত। এইসব গল্পের অধিকাংশে এবং যেগুলি প্রাচীনতর তাহাতে চণ্ডীদাসের নিবাস পাওয়া যায় নান্নুড় (বা নান্নুর) গ্রাম। নান্নুর গ্রাম বীরভূম জেলায় বোলপুরের অনতিদূরে। কোনও কোনও গল্পে চণ্ডীদাসকে বাঁকুড়া জেলার ছাতনানিবাসী বলা হইয়াছে। একটি নিতান্ত আধুনিক পুথিতে (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-সম্পাদিত চণ্ডীদাস চরিত) নান্নুর ও ছাতনার যোগাযোগ করিয়া ও অপর কিছু কিছু গল্প মিলাইয়া নূতন অনেক কিছু জোগান দিয়া বাড়াইয়া চণ্ডীদাসকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

নীলরতন মুখোপাধ্যায় ‘দীন চণ্ডীদাস’ ভণিতার যেমন পদ পাইয়াছিলেন তেমনই অনেক নূতন পদের এক ২৬ পুথি মণীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদনায় ‘দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী’ নামে প্রকাশিত হইয়াছে (কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। পুথিখান আমলের। রচনা পরিকল্পনায় অকিঞ্চিৎকর।

‘চণ্ডীদাস’, ‘বড়ু চণ্ডীদাস’, ‘দ্বিজ চণ্ডীদাস’, ‘দীন চণ্ডীদাস’ ইত্যাদি বিবিধ ভণিতার অন্তরালে কয়জন পদকর্তার রচনা ছড়ানো আছে তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। সে বিষয়ে চেষ্টা যে হয় নাই তাহা নয় তবে তাহার ফল বিশেষ ফলে নাই।

দ্র চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, ৮ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, যোগেশচন্দ্র রায়, “‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ সংশয়”, সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬ বর্ষ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, “‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি’ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মন্তব্য”, সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৩০ বর্ষ, যোগেশচন্দ্র রায়, ‘চণ্ডীদাস’, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ‘বড়ু চণ্ডীদাসের পদ’, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, “‘বড়ু চণ্ডীদাসের পদ’ সম্পর্কে বক্তব্য”, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮৩ বর্ষ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, “‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের’ কয়েকটি পাঠবিচার”, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী-সম্পাদিত, বীরভূম-বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, হেতমপুর-রাজবাটী, বীরভূম, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস পদাবলী, ১ম খণ্ড, কলিকাতা,

১৩৪১ বঙ্গাব্দ ; সুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৬ ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৩।

সুকুমার সেন

চণ্ডীমঙ্গল মঙ্গলকাব্য দ্র

চতুরঙ্গ ভারতীয় সংগীতের একটি গীতিরীতি। চারিটি নির্দিষ্ট অঙ্গে বিভক্ত বলিয়া এই নামকরণ। কাব্যপদ, সরগম, পাখোয়াজের বোল এবং তারানায় চতুরঙ্গ গীত গঠিত হয়। উক্ত চারিটি অঙ্গের পর্যায়ক্রম কখনও কখনও পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু বিষয়গুলি যথাযথ থাকে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে চতুরঙ্গ গানের প্রচলন এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

চতুরঙ্গক্রীড়া সতরঞ্চ দ্র

চতুরাশ্রম আশ্রম দ্র

চতুর্বর্গ চতুর্বর্গ শব্দে চারিটির শ্রেণী বা সমূহ বুঝায়। উহা নিখিল প্রবৃত্তির কারণরূপে বহুশঃ বিচারিত ও অতিপ্রসিদ্ধ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক পুরুষার্থ (পুরুষের প্রয়োজন- যাহার জন্যই জীব প্রবৃত্ত বা ক্রিয়াশীল হয়) বলিয়া ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব পুরুষার্থেরই বর্গ বা চতুষ্টয়ই চতুর্বর্গ শব্দে জ্ঞাতব্য। ভারতীয় শাস্ত্রের আরম্ভে অপর চারিটি প্রসিদ্ধ বস্তু উল্লিখিত হয় তাহা অনুবন্ধচতুষ্টয় বলিয়া খ্যাত হইলেও চতুর্বর্গ নামে অভিহিত নয়।

সুখই সকল প্রাণীর চরম অভীষ্ট ইহাতে মতভেদ নাই, অভীষ্টলাভের জন্যই তাহার সাধনীভূত বস্তুতে জীবের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ইহাও সুবিদিত। সুখস্বরূপ চরম অভীষ্টের সাধক এই পুরুষার্থচতুষ্টয় ; যাবতীয় সুখের কারণ অনুসন্ধান করিলে এই চতুষ্টয়েই তাহা পর্যবসিত হয়। ইহাই প্রাচীন ভারতীয় মনীষীগণের অভিমত। যেরূপ ভোজনজনিত তৃপ্তির (সুখের) উদ্দেশ্যে ভোজনে বা ভোজ্যসাধনে অখিল প্রাণী চেষ্টিত (প্রবৃত্ত) হয়, সেইরূপ ধর্মাদিতেও বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে এই চারিটি বস্তুই সুখের কারণ বলিয়া ইহাতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। দ্বিবিধ সুখ স্বীকৃত হইয়া থাকে, নিত্য ও অনিত্য ; অনিত্য সুখ বিষয়ের সংসর্গজাত, উহা ঐহিক ও পারত্রিকভেদে দ্বিবিধ। এই বৈষয়িক সুখই কামজ সুখ ; ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপভোগই কাম এবং উপভোগের সাধনই (বিষয়-ভোগ্য বস্তুসমূহ ও ইন্দ্রিয়) অর্থ নামক পুরুষার্থ। ফলতঃ বৈষয়িক সুখের অব্যবহিত সাধনকে কাম ও ব্যবহিত সাধনকে অর্থ বলিয়া অভিহিত করা যায়।

মোক্ষ বা মুক্তি শব্দে বিষয়ের সম্পর্কশূন্য আত্মার নিত্য সুখের কারণীভূত দশা অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মা নিত্য ও তদ্গত সুখও নিত্য, কিন্তু বিষয়ের সংসর্গবশতঃ তাহা তিরোহিত বা অনুপলব্ধ থাকে ; বিষয়ের দোষদর্শী চিত্ত বিষয় হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্ত হইলে প্রকৃতি বা আত্মাতে লীন হইয়া যায় এবং নিরুপাধি মোক্ষসুখের অভিব্যক্তি ঘটে। মনের নিত্যত্ববাদী নৈয়ায়িকগণের মতে মনের ধ্বংস না থাকায় বিষয়-বিরহিত মন আত্মামাত্রে সংযুক্ত হইলে মোক্ষসুখের অনুভব ঘটে, ইহাই বিশেষ। এইরূপে মোক্ষটি সুখ নহে, কিন্তু নিত্য সুখের অব্যবহিত কারণ বলিয়া গণ্য হয়। ক্বচিৎ কাম ও মোক্ষকে সুখ বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাহা কার্য-কারণের অভেদ-কল্পনামূলক গৌণ ব্যবহার বলিয়া জানিতে হইবে।

ধর্মটি সকল পুরুষার্থেরই সাধক বলিয়া প্রাধান্য-নিবন্ধন প্রথমেই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। উহা বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন আত্মার গুণাত্মক সংস্কারবিশেষ ; বৈপরীত্যে বেদনিষিদ্ধ কর্মের সংস্কার অধর্ম নামে অভিহিত ; ইহা দুঃখের সাধক বলিয়া পুরুষার্থবিরোধী। কদাচিৎ বেদবিহিত কর্মকেও ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহা পূর্বোক্ত প্রকারে গৌণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ধর্ম ও অধর্ম অদৃশ্যবস্তু বলিয়া অদৃষ্ট নামেও অভিহিত হয়। বিহিত কর্মসকল কামনাপ্রযুক্ত অনুষ্ঠিত হইলে অর্থ ও কাম সম্পাদন করিয়া বৈষয়িক সুখের কারণ হয় এবং ফলের উদ্দেশ্যব্যতীত কর্তব্যমাত্রের বোধেই অনুষ্ঠিত হয় তবে মোক্ষ উৎপাদন করিয়া নিত্য সুখের কারণ হয়। এইজন্য ধর্মের কাম ও মোক্ষরূপ পরস্পর-বিরোধী পুরুষার্থকে সাধন করিতে কোনও বাধা নাই। ধর্ম কুত্রাপি অপর পুরুষার্থকে দ্বাররূপে অবলম্বন না করিয়া সুখের সাক্ষাৎ সাধক হয় না ; সুতরাং ধর্ম জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে।

পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক-গণ 'মুক্তোপসৃপ্যত্ব' ন্যায়ে মুক্ত পুরুষেরও ভক্তিপ্রবৃত্তি দর্শন করিয়া ভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থরূপে উল্লেখপূর্বক চতুর্বর্গতাবাদের ফলতঃ খণ্ডন করিয়াছেন। যেহেতু বীতরাগ পুরুষের বৈষয়িক সুখেচ্ছায় প্রবৃত্তি অসম্ভব, অতএব ভক্তি-

প্রবৃত্তিকে বৈষয়িকপ্রবৃত্তি বলা যায় না। ইহাই এতন্মতের রহস্য

রাধামাধব তর্কতীর্থ

চতুর্ব্যূহ পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে বিষ্ণু বা ভগবান চতুর্ব্যূহ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহ। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত মতে পরব্রহ্ম বাসুদেব অনন্ত-জ্ঞান বলৈশ্বর্য বীর্য শক্তি তেজঃ ষড়্‌গুণে পরিপূর্ণ, সংকর্ষণ অনন্তজ্ঞান-বলযুক্ত প্রকৃতিলীন জীবতত্ত্বের অন্তর্যামী ও জগৎ-স্রষ্টা, প্রদ্যুম্ন অনন্ত ঐশ্বর্য বীর্যযুক্ত মনস্তত্ত্বের অন্তর্যামী ও শুদ্ধবর্গের স্রষ্টা, অনিরুদ্ধ অনন্তশক্তি তেজঃ-যুক্ত মিশ্রসৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা। মাধ্ব বেদান্ত মতে চতুর্ব্যূহ তুল্যগুণশক্তিসম্পন্ন, ন্যূনাধিক গুণশক্তি সম্পন্ন নহেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ভগবানের নিরুপাধি অবস্থা বাসুদেব। অন্য ব্যূহগণ তাঁহার প্রকাশ। সংকর্ষণ প্রকৃতি ও জীবতত্ত্বের অন্তর্যামী। প্রদ্যুম্ন সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্যামী। অনিরুদ্ধ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। চতুর্ব্যূহ ভগবানের ন্যূনাধিক প্রকাশ। তাঁহারা অজ, অমর, অবুদ্ধ, অমুক্ত, পূর্ণ, পরম ও নিত্যানন্দ। তাঁহারা তুল্যরূপ হইলেও বাসুদেব অন্য ব্যূহগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা তাঁহার অবয়ব ও প্রকাশ। অবয়বী অবয়ব অপেক্ষা অধিক ও তাঁহাদের সহিত অভিন্ন (লঘুবৈষ্ণবতোষণী, ১০।১।১৯, ১০।৭০।৫)।

যদুনাথ সিংহ

চন্দন চন্দন দুই প্রকারের শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন। শ্বেতচন্দন গাছ সান্টালাসিঈ গোত্রের (Family-Santalaceae) অন্তর্ভুক্ত বহুশাখাবিশিষ্ট দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত নাম সান্টালম আল্‌বম (*Santalum album*)। চারা অবস্থায় ইহাকে পরভোজী গাছ বলিয়া মনে হয়, বৃদ্ধির সহিত কাণ্ড মোটা ও শক্ত হইতে থাকে। সমতল ভূমি অপেক্ষা পার্বত্য অঞ্চলে ইহা অধিক সারবান হয়। সাধারণতঃ ৬০-৫০ বৎসরের পূর্বে ইহাতে যথেষ্ট সার জন্মায় না। চন্দন বৃক্ষ উচ্চতায় ২·৫ সেন্টিমিটারের ও কম বৃদ্ধি পায়। অন্য গাছের ছায়ায় রাখিলে বৃদ্ধি অধিক হয়। গাছের পাতা লম্বাটে, ছাল পাতলা, ফুল প্রথমে ঈষৎ হলুদ ও পরে গাঢ় বাদামি রঙের হয়, বীজ ক্ষুদ্র গোলাকার মসৃণ ও কালো, কাঠ শক্ত তৈলপ্রধান ও সুগন্ধি। কাঠ অপেক্ষা মূলে তৈলের পরিমাণ বেশি থাকে। প্রস্তর ও কঙ্করময় জমিতে গাছ খর্বকায় হইলেও কাঠে তৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয়ের পূর্বে উহার ছাল ছাড়াইয়া প্রায় দুই মাস মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতে হয়। সামান্য জল দিয়া সারবান কাঠ ঘষিলে যে সুগন্ধি অনুলেপন বাহির হয় তাহাই চন্দন। সকল শুভকার্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। অঙ্গরাগের উপকরণ হিসাবেও ইহার ব্যবহার আছে। বৈদ্যকশাস্ত্রে বিভিন্ন রোগে বিবিধ অনুপানসহ চন্দন সেবন বা লেপন করার ব্যবস্থা আছে।

শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ হইতে তৈল নিষ্কাশনের জন্য কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে চূর্ণ করিয়া তামার পাত্রে দুই দিন জলে ভিজাইতে হয়। তাহার পর ঐগুলিকে বকযন্ত্রের সাহায্যে পাতন করিলে চন্দন তৈল পাওয়া যায়। মহীশূর, মাদ্রাজ, কুর্গ, লখনৌ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে চন্দন তৈল প্রস্তুত হয়। ভারতীয় চন্দন কাষ্ঠ হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া ইওরোপের কয়েকটি দেশ সেই তৈলের কিয়দংশ পুনরায় ভারতেই রপ্তানি করে। অস্ট্রেলিয়া, ফিজি প্রভৃতি স্থান হইতেও চন্দন তৈল আমদানি হয়। অস্ট্রেলিয়া, মালয় প্রভৃতি দেশ হইতে চন্দন কাষ্ঠও রপ্তানি হয়, কিন্তু সেগুলিতে মহীশূরের কাঠের মত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল পাওয়া যায় না।

রক্তচন্দন গাছ লেগুমিনোসী গোত্রের (Family-Leguminosae) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত নাম টেরোকার্পস সান্টালিনস (*Pterocarpus santalinus*), দক্ষিণ ভারত, ফিলিপাইন ও সিংহলে এই গাছ জন্মায়। ছাল ধূসর, কিন্তু রঞ্জক পদার্থ থাকায় কাঠ রক্তবর্ণ, ইহা হইতে রক্তচন্দন পাওয়া যায়। চন্দন হিসাবে ব্যবহার ছাড়া ইহা হইতে রঞ্জক দ্রব্য, ঔষধ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে প্রদাহ ইত্যাদির চিকিৎসায় রক্তচন্দনের প্রয়োগ আছে।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও একক্ড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০, ১৯৫২।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

হিন্দুসমাজে ইহা পবিত্র ও মাঙ্গলিক বস্তু বলিয়া পরিগণিত। শ্রাদ্ধাদি কার্যে ষোড়শ দানের মধ্যে চন্দন-দান অন্যতম। চন্দন কাষ্ঠে শবদাহ প্রশস্ত। বিশিষ্ট ব্যক্তির শবদাহ চন্দন কাষ্ঠেই সম্পন্ন হয়। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে চন্দন কাষ্ঠের টুকরা ব্যবহৃত হয়। ঘষা চন্দন দেবপূজায় অপরিহার্য। শুধু ফুল-চন্দন বা গন্ধপুষ্পের দ্বারাই পূজা নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রসাধন-সামগ্রী হিসাবেও চন্দনের ব্যবহার অপরিচিত নয়। চন্দনানুলেপন বা গায়ে চন্দন মাখার রীতি ছিল।

এখনও দেববিগ্রহে উহা মাখানো হয়। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বর কন্যা প্রভৃতিকে সাজানোর কাজে চন্দন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজায় রক্তচন্দনেরও ব্যবহার আছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চন্দনধেনুদান শ্রাদ্ধ দ্র

চন্দননগর হুগলি জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। চন্দননগর শহর হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে (২২°৫২ উত্তর ও ৮৮°২২ পূর্ব) অবস্থিত। গৌরহাটি নামে একটি ছিটমহলসহ ইহার আয়তন ৯ বর্গ কিলোমিটার (৩.৭ বর্গ মাইল)। জনসংখ্যা ৬৭১০৫ (১৯৬১ খ্রী)।

মোগল আমলের বিবরণীতে চন্দননগর নামে একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বতন এই ফরাসী উপনিবেশটি প্রতিষ্ঠা করেন বুর্ঁ দেলাঁদ্ (Bourong Deslandes)। বাংলার নবাবের দেওয়া সাত বিঘা নিষ্কর জমির উপর [illegible] কুঠি ও গুদাম নির্মাণ করিয়া দেলাঁদ্ ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই উপনিবেশ স্থাপন করেন। দশ বৎসরের মধ্যে এই শহর একটি উৎকৃষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ও ওয়াটসন মিলিতভাবে এখানকার দর্লেয়াঁ দুর্গ (Forte D' Orleans) দখল করেন। অনেকবার ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা চূড়ান্তভাবে শহরটিকে ফরাসীদের হস্তে সমর্পণ করেন। তদবধি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানকার শাসনকার্য পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নরের অধীন একজন প্রশাসকের দ্বারা পরিচালিত হইত।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই শহরের অধিবাসীরাও স্বাধীনতা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন, ফলে ফরাসী সরকার এই শহরকে মুক্ত নগরী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের উপর শাসনাধিকার দান করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের আগ্রহে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গণভোট গৃহীত হয়, তাহারা চন্দননগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হউক, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। তদনুসারে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও ফরাসী সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হস্তান্তর চুক্তির বলে শহরটি চূড়ান্তভাবে ভারতের সহিত সংযুক্ত হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিকটবর্তী শ্রীরামপুর মহকুমার উত্তরাংশ ভদ্রেশ্বর, সিঙ্গুর, হরিপাল ও তারকেশ্বর এই কয়টি থানা লইয়া এই শহরের নামে নূতনভাবে একটি মহকুমার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে শহরটি চন্দননগর মহকুমার সদর শহরে পরিণত হইয়াছে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শহরের পূর্ব দিকে হুগলি নদী ও উত্তর-পূর্ব দিকের কিছু অংশ ভিন্ন সকল দিকেই পরিখা আছে। পশ্চিম ও উত্তরাংশ অপেক্ষাকৃত জনবিরল এবং তথায় উৎকৃষ্ট ফলের বাগান আছে।

হুগলি নদীর তীরবর্তী স্ট্র্যাণ্ড ৬০ বৎসর পূর্বে ভূকৈলাশের রানী তারাসুন্দরীর দ্বারা নির্মিত হয়, শহরের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে লালবাগানে নন্দদুলালের মন্দির, বোড়াই চণ্ডীতলার জোড় বাংলা বেড়াইচণ্ডীর মন্দির, সুউচ্চ রোমান ক্যাথলিক গির্জা, সেণ্ট জোসেফ কনভেণ্টের মধ্যস্থিত প্রায় ২৫০ বৎসরের পুরাতন ছোট গির্জা, প্রাচীন গোরস্থান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রবর্তক সংঘ এখানকার এক উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার প্রসারেও চন্দননগর যথেষ্ট উন্নত। বিখ্যাত ডুপ্লেক্স কলেজের নাম পরিবর্তন করিয়া চন্দননগর কলেজ নাম রাখা হইয়াছে।

বিশেষ শিল্পের মধ্যে চন্দননগরের মিহি ধুতি ও শাড়ি প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া 'ফরাসডাঙার কাপড়' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

চন্দননগরের প্রধান উৎসবের মধ্যে গোস্বামীঘাটে খুস্তির মেলা, প্রবর্তক সংঘের অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. X, Oxford, 1908

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দনা সিত্তাসিফর্মেস বর্গের (Order-Psittaciformes) অন্তর্ভুক্ত সিত্তাসিদী গোত্রের (Family-Psittacidae) পাখি, বিজ্ঞানসম্মত নাম সিত্তাকুলা ইউপাত্রিয়া (*Psittacula eupatria*)। একই গণের (জেনাস) অন্তর্ভুক্ত টিয়া প্রভৃতি শুক পাখিদের মধ্যে চন্দনা বৃহত্তম — দৈর্ঘ্যে পুচ্ছসহ প্রায় ৪৯ সেন্টিমিটার।

চন্দনার দেহের অধোভাগ হালকা সবুজ, পৃষ্ঠদেশ দূর্বা ঘাসের মত সবুজ, ডানা গাঢ়তর সবুজ এবং ললাট উজ্জ্বল সবুজ। কাঁধ ও ডানার সংযোগস্থলে গাঢ় লাল রঙের ছোপ চন্দনার বৈশিষ্ট্য, টিয়ার ক্ষেত্রে ইহা নাই। পুচ্ছ সবুজ, উহার শেষাংশ সংকীর্ণ এবং পীতাভ, অধোভাগ পীত। চন্দনার গলায় গোলাপী কণ্ঠি, চিবুক কালো, চঞ্চু লাল এবং চঞ্চুমূল হইতে কণ্ঠি পর্যন্ত কালো ডোরা— স্ত্রী পাখির কণ্ঠি ও কালো ডোরা উভয়ই নাই। সবুজ

শিরোদেশ, কালো চিবুক ও গোলাপী কণ্ঠি চন্দনাকে টিয়া ভিন্ন অন্যান্য শুক পাখি হইতে পৃথক করিয়াছে।

চন্দনা বৃক্ষচারী ও সংঘপ্রিয়। সমভূমি হইতে হিমালয়ের পাদদেশ (প্রায় ১২০০ মিটার উচ্চতা) পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র এবং সারা বৎসর ধরিয়া দলবদ্ধভাবে চন্দনাকে দেখা যায়। ইহারা ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করে। প্রজনন ঋতুতে (ফেব্রুয়ারি হইতে এপ্রিল) ইহারা জোড়ায় জোড়ায় পৃথক হইয়া পড়ে বটে কিন্তু সুবিধামত পরিবেশে বহু জোড়া পাখিকে একসঙ্গেও থাকিতে দেখা যায়। চন্দনা কোনও নীড় নির্মাণ করে না, গৃহের অলিন্দে বা বৃক্ষের কোটরে ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ ধবধবে শাদা।

ধান যব প্রভৃতি শস্য এবং বন্য ও কৃষিজাত নানা প্রকার ফল ইহাদের খাদ্য। দল বাঁধিয়া আহার সংগ্রহে বাহির হয় বলিয়া ইহারা শস্যের প্রভূত ক্ষতি করে।

দ্র E C Stuart Baker, *The Fauna of British India Birds*, vol IV, London, 1927; Hugh Whistler, *Popular Handbook of Indian Birds*, London, 1949

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

চন্দ বরদৈ (বরদাঈ) হিন্দী সাহিত্যের প্রথম মহাকবি। লাহোরের অধিবাসী হইলেও তাঁহার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অতিবাহিত হয় দিল্লী ও আজমীরে। তিনি দিল্লী সিংহাসনের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের (মৃত্যু ১১৯৫ খ্রী) সভাকবি ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। সম্রাট-বন্ধুর জীবনকাহিনী লইয়া কবি 'পৃথ্বীরাজ রাসো' নামে যে বৃহৎকায় গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা হিন্দী সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্যরূপে বিবেচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করিয়াছে।

১৯৬২ সংবতে কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত 'পৃথ্বীরাজ রাসো'র ভাষা বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহাতে অপভ্রংশ, রাজস্থানী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী ও ব্রজভাষার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। মূল কাব্য দ্বাদশ শতকের রচনা হইলেও পরবর্তী কালে ইহার মধ্যে প্রচুর প্রক্ষেপ যুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। উনসত্তরটি 'সময়' বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের শেষ অংশে প্রদত্ত কবির মৃত্যুবিবরণ স্পষ্টতঃই অপরের রচনা।

পৃথ্বীরাজ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু 'পৃথ্বীরাজ-রাসো'কে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া মনে করা চলে না। ইহার কথাবস্তু সংক্ষেপে এইরূপ: দিল্লীর রাজা অনঙ্গপালের দুই কন্যা সুন্দরী ও কমলাকে যথাক্রমে রাঠোর-বংশীয় কনৌজরাজ বিজয়পাল এবং চৌহানবংশীয় আজমীর-রাজ সোমেশ্বর বিবাহ করেন। অপুত্রক অনঙ্গপাল কমলার পুত্র পৃথ্বীরাজকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিলে দিল্লী এবং আজমীর সম্মিলিত হইয়া একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। ইহাতে সুন্দরীর পুত্র কনৌজরাজ জয়চন্দ ঈর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। পৃথ্বীরাজ এই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত হইলে জয়চন্দ তাঁহার স্বর্ণমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া উহাকে যজ্ঞের দ্বারপালরূপে স্থাপিত করেন। ঐ সময়ে জয়চন্দের কন্যা সংযোগিতার স্বয়ংবর বিবাহেরও ব্যবস্থা হয়। সংযোগিতা পৃথ্বীরাজের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহার স্বর্ণমূর্তিতে মাল্য দান করিলে পৃথ্বীরাজ জয়চন্দের সেনাবাহিনীকে পরাভূত করিয়া সংযোগিতাকে লইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। দিল্লী ফিরিয়া পৃথ্বীরাজ বিলাসে মগ্ন হওয়ায় রাজ্যশাসনে শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময় আফগানিস্তানের তুর্কী সুলতান শহাবুদ্দীন গোরী (ঘোরি) হুসেন নামক এক পাঠান সর্দারের প্রেমিকা চিত্ররেখার প্রতি আসক্ত হইলে তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পৃথ্বীরাজের শরণাপন্ন হন। গোরীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া পৃথ্বীরাজ প্রেমিকযুগলকে আশ্রয় দান করিলে গোরী পর পর ১১ বার দিল্লী আক্রমণ করেন কিন্তু প্রতিবারেই পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজ প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বহু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন (গ্রন্থের 'বিবাহ অধ্যায়' সংযোগিতা ছাড়া ইচ্ছনী, পদ্মাবতী, শশিব্রতা, ইন্দ্রাবতী, হংসবতী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়)। শহাবুদ্দীন গোরী অবশেষে জয়চন্দের সহায়তায় পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া গজনীতে প্রেরণ করেন। সেখানে তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করা হয়। কিছুদিন পরে চন্দ বরদৈ (কবি) তাঁহার কাব্যখানি পুত্র জল্হনের হস্তে অর্পণ করিয়া গজনীতে উপনীত হন। একদিন দৃষ্টিশক্তিহীন পৃথ্বীরাজ চন্দের সংকেত অনুযায়ী শব্দবেধী বাণ ছুড়িয়া গোরীকে হত্যা করেন। অতঃপর চন্দ বরদৈ ও পৃথ্বীরাজের আত্মাহুতিতে কাব্যের সমাপ্তি।

দ্র বিপিনবিহারী ত্রিবেদী, 'চন্দ বরদাঈ ঔর উনকা কাব্য', এলাহাবাদ, ১৯৫২, রামকুমার বর্মা, হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস, এলাহাবাদ, ১৯৬৪।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

চন্দেল্ল প্রতীহার শক্তির দুর্বলতার ফলে মধ্য ভারতে যে কয়টি রাজশক্তির অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল বুন্দেলখণ্ডের

চন্দেল্লগণ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহারা দাবি করিতেন যে চন্দ্রবংশোদ্ভব ঋষি চন্দ্রাত্রেয়ই তাঁহাদের আদিপুরুষ। চন্দেল্ল বংশের পূর্বতন নরপতিগণ প্রতীহার সাম্রাজ্যশক্তির অধীনে 'খর্জুরবাহক' বা বর্তমান খজুরাহোতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল জেজাকভুক্তি। খজুরাহো, মহোবা এবং কালঞ্জর ছিল ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান। কালঞ্জরের সুরক্ষিত দুর্গই ছিল চন্দেল্লদের সামরিক শক্তির কেন্দ্রস্থল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পর পর তিন জন শক্তিশালী রাজার সমরনীতির ফলে চন্দেল্ল শক্তির চরম বিকাশ ঘটে। তাঁহারা হইলেন হর্ষদেব (৯০০-২৫ খ্রী), যশোবর্মা এবং ধঙ্গ (আনুমানিক ৯৫০-১০০৮ খ্রী)। শেষোক্ত রাজার রাজত্বকালে চন্দেল্ল রাজ্য উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যরূপে পরিগণিত হইত। ধঙ্গের রাজত্বের প্রথমাংশে গোয়ালিয়র, যমুনা নদী, কালঞ্জর, জব্বলপুর জেলার উত্তরসীমা এবং ভিলসা ছিল চন্দেল্ল রাজ্যের প্রত্যন্তে অবস্থিত। কিন্তু ধঙ্গ শেষ পর্যন্ত গোয়ালিয়র রক্ষা করিতে পারেন নাই; ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কচ্ছপঘাতবংশীয় বজ্রদামন উহা অধিকার করিয়া লন। আমীর সবুক্তগিন পরিচালিত মুসলিম অভিযানের বিরুদ্ধেও সম্মিলিত হিন্দু শক্তির অন্যতম ছিলেন ধঙ্গ।

ধঙ্গের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার পুত্র গণ্ড (১০০৮-১৭ খ্রী)। পৈতৃক সাম্রাজ্যের উপর তাহার পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় ছিল। গণ্ডের পর বিদ্যাধর (১০১৭-২৯ খ্রী) সিংহাসনে আরোহণ করেন। একজন মুসলিম ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে বিদ্যাধরই ছিলেন সে সময়ে ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি। বিদ্যাধর কেবল-মাত্র প্রতিবেশী পরমার এবং কলচুরি শক্তিকেই দমন করেন নাই, ১০১৯ এবং ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে গজনির সুলতান মামুদের বিরুদ্ধেও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়া-ছিলেন। বিদ্যাধরের মৃত্যুর পর কলচুরি এবং মুসলিম অভিযানের ফলে চন্দেল্ল শক্তির পতন আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কীর্তিবর্মা চেদীরাজ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া চন্দেল্লবংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও কীর্তিবর্মা স্মরণীয় আছেন। পরমর্দি বা পরমাল (আনুমানিক ১১৬৫-১২০২ খ্রী) চন্দেল্ল বংশের শেষ শক্তিশালী নরপতি। ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন আইবকের হস্তে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ফলে চন্দেল্লশক্তির গৌরবও অস্তমিত হয়। স্থানীয় রাজশক্তিরূপে অবশ্য তাঁহারা দীর্ঘদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতি এবং কলার ক্ষেত্রে চন্দেল্লগণের অবদান প্রসিদ্ধ। অনুপম ভাস্কর্যসমন্বিত খজুরাহোর মন্দিরগুলি তাঁহাদের রাজত্বকালেই নির্মিত হইয়াছিল ('খজুরাহো' দ্র)।

দ্র N. S. Bose, History of the Chandellas, Calcutta, 1956.

অমিতাভ ভট্টাচার্য

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ এবং পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ৩৮৪৪০০ কিলোমিটার (২৩৮৯৬০ মাইল)। ইহা একটি গোলাকৃতি জড়পিণ্ড; ব্যাস ৩৪৭৬ কিলোমিটার (২১৬০ মাইল)— পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চতুর্থাংশ, সুতরাং আয়তনে পৃথিবীর আয়তনের $\frac{১}{৬৪}$; ভর পৃথিবীর ভরের $\frac{১}{৮১}$। চন্দ্রপৃষ্ঠের নিকটস্থ বস্তুর উপর চন্দ্রের আকর্ষণবল পৃথিবীর আকর্ষণবলের প্রায় $\frac{১}{৬}$। ইহার নিজের কোনও আলোক নাই, সূর্যের আলোক প্রতিফলিত করে বলিয়াই ইহাকে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রে জল নাই, বায়ু নাই; সুতরাং ইহা জীব বাসের অনুপযোগী।

২৭$\frac{১}{৩}$ দিনে চন্দ্র উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারি দিকে একবার ঘুরিয়া আসে। নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে বিচরণ করে এবং ২৭$\frac{১}{৩}$ দিন পরে পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসে। খ-গোলকের উপর চন্দ্রের ভ্রমণ-পথ একটি গুরুবৃত্ত, ক্রান্তিবৃত্তের সহিত ইহার নতি ৫°৮′। অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্যের ক্রান্ত্যংশ সমান, পূর্ণিমায় চন্দ্রের ক্রান্ত্যংশ সূর্যের ক্রান্ত্যংশ অপেক্ষা ১৮০° অধিক। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত সময় এক চান্দ্রমাস— ২৯$\frac{১}{২}$ দিন। সূর্য হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের প্রত্যেক ১২° ক্রান্ত্যংশ পূর্বাভিমুখে সরণের সময়কে তিথি বা চান্দ্রদিন বলে। এই সরণ সমান নহে বলিয়া তিথিগুলিও সমান নয়। অমাবস্যার পর যে সময় গত হয় তাহা চন্দ্রের বয়স।

পৃথিবী হইতে বিভিন্ন সময়ে চন্দ্রের আলোকিতাংশের বিভিন্ন অংশ দৃষ্ট হয়, এই পরিবর্তনের নাম কলা। শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় পায়।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রপৃষ্ঠের একটিমাত্র দিক সর্বদা দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ, যে সময়ে চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সেই সময়ে সে স্বীয় অক্ষের উপরে একটি আবর্তন শেষ করে। তবে চন্দ্রের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের দোলনহেতু আমরা চন্দ্রপৃষ্ঠের ৫৯ শতাংশ পর্যন্ত দেখিতে পাই।

চন্দ্রপৃষ্ঠে যে সমস্ত কালো চিহ্ন দেখা যায় উহারা প্রায় সমতল। পূর্বে ইহাদিগকে জলময় স্থান মনে করিয়া বিভিন্ন সাগর নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। চন্দ্রের

পৃষ্ঠে বহু পর্বত ও চারি দিকে পর্বতবেষ্টিত গহ্বর আছে। গহ্বরগুলির মুখের ব্যাস প্রায় ১·৫ হইতে ২৪০ কিলোমিটার (১ হইতে ১৫০ মাইল) পর্যন্ত এবং এগুলি আকৃতিতে আগ্নেয়গিরির মুখের মত।

চন্দ্র সূর্য হইতে দৈনিক প্রায় ১২° পূর্ব দিকে সরিয়া যায় বলিয়া সূর্য মধ্যরেখা অতিক্রম করিবার প্রায় ৪৮ মিনিট পরে চন্দ্র মধ্যরেখা অতিক্রম করে। কিন্তু ইহার পরিমাণ সমান নহে, ১৫ মিনিট পর্যন্ত বেশি বা কম হয়। প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণের ফলেই সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা হয়। জোয়ার-ভাঁটার দৈনিক বিলম্বও ঐ পরিমাণে ঘটিয়া থাকে।

কামিনীকুমার দে

সম্প্রতিকালে লুনা নামের সোভিয়েত স্পেস-রকেটগুলির সাহায্যে চন্দ্র সম্বন্ধে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম রকেটটি ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি তারিখে চন্দ্রের দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি ঐ বৎসর ১২ সেপ্টেম্বর নিক্ষেপ করা হয় এবং ইহা ১৪ সেপ্টেম্বর চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছায়। তৃতীয় রকেটটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; ইহা একই বৎসরে ৪ অক্টোবর নিক্ষিপ্ত হয় এবং চন্দ্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান একটি 'স্পেস-স্টেশন' স্থাপনা করে। ইহাতে রক্ষিত ফোটোগ্রাফিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চন্দ্রের যে দিকটি পৃথিবী হইতে কখনও দৃষ্ট হয় না, সেই দিকের ছবি পৃথিবীতে পাঠানো হয়। সর্বশেষে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি লুনা চতুর্থ নামে আর একটি স্বয়ংক্রিয় স্পেস-স্টেশনকে চন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে অবতরণ, বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও পরিশেষে মনুষ্যচালিত 'স্পেস-স্টেশন' প্রেরণ— ক্রমিক পর্যায়ে এই কর্মসূচী সম্পাদন করিবার প্রয়াস করা হইতেছে।

মনোজকুমার পাল

পুরাণ অনুসারে চন্দ্রমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র। বিভিন্ন পুরাণে চন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। কল্পে কল্পে বহু চন্দ্রের উৎপত্তি ও লয় স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া চন্দ্র-কাহিনীগুলির মধ্যেও বিভিন্নতা রহিয়াছে।

প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর শাসনকালে দেব ও দানবগণ মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। তাহা হইতেই দুর্লভ রত্ন চন্দ্রের উদ্ভব। মহাদেব মন্থনজাত হলাহল পান করিলে দেবতাগণ তাঁহার বিষের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য ঐ স্নিগ্ধ রত্নটি তাঁহাকে উপহার দেন। শিব উহা মস্তকে ধারণ করেন। সেই হইতে মহাদেবের নাম চন্দ্রশেখর হইয়াছে (স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১৮শ অধ্যায়)।

অধিকাংশ পুরাণে চন্দ্রকে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিমুনির সন্তানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহর্ষি অত্রি বহু বৎসর অনিমেষনয়নে তপস্যারত ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু হইতে সোমরশ্মি ক্ষরিত হইতে থাকে। দিগঙ্গনাগণ পর্যন্ত যখন ঐ দীপ্তির বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না তখন পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবী পরিক্রমার উদ্দেশ্যে চন্দ্রকে একটি রথে আরোহণ করাইলেন। ক্রমাগত একুশ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার ফলে চন্দ্রের তেজ অনেকাংশে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল এবং সেই তেজে ওষধিবর্গের জন্ম হইল। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে ওষধিবর্গ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের রাজা রূপে অভিষিক্ত করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ রাজা সোমকে তাহার কৃত্তিকা প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্র-কন্যা সম্প্রদান করিয়া অভিনন্দিত করিলেন। গৌরবান্বিত চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অপ্রতিহত তেজে রাজত্ব করিতে লাগিলেন (স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্য ২০শ অধ্যায়)।

ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিতে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার রূপে মুগ্ধ হইয়া চন্দ্র তাহাকে অপহরণ করেন। অপমানিতা তারা ক্রুদ্ধা হইয়া 'তুমি কলঙ্কী, মেঘাচ্ছন্ন, রাহুগ্রস্ত ও ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইবে' বলিয়া চন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। বৃহস্পতির প্রার্থনায় ব্রহ্মা স্বয়ং তারাকে ফিরাইয়া দিতে চন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু চন্দ্র তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ফলে ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে দৈত্যসাহায্যপুষ্ট চন্দ্রের সহিত দেবতাদিগের এক ভয়ানক সংগ্রামের সূচনা হইল। এই অবস্থায় মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া চন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রকে আদেশ করিলেন। লজ্জিত ও অনুতপ্ত চন্দ্র তারার সহিত শিবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। মহাদেব চন্দ্রকে ক্ষীরোদ সাগরে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে আদেশ করিলেন এবং নির্মল অর্ধচন্দ্র নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। কলঙ্কিত অর্ধচন্দ্র লজ্জায় ক্ষীরোদ সমুদ্রের জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। করুণাবশে মহর্ষি অত্রি সেই জলে অশ্রু বিসর্জন করিলে নূতন দেহ হইল। শিব ও ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু পতিব্রতার শাপ ব্যর্থ হইবার নহে বলিয়া তারাহরণ-কলঙ্ক তাঁহার চিরচিহ্নরূপে রহিয়া গেল। ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে চন্দ্র তারাহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ রাত্রে তিনি পাপদৃশ্য 'নষ্টচন্দ্র' রূপে কুখ্যাত হইয়া রহিলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত-

পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড একাশীতিতম অধ্যায়, বায়ুপুরাণ, ৯৭তম অধ্যায়, পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ১১শ অধ্যায়)।

চন্দ্র বিবাহিত দক্ষকন্যাদের মধ্যে রোহিণীর প্রতি অধিক আসক্ত ছিলেন বলিয়া অন্যান্য কন্যাগণ চন্দ্রের বিরুদ্ধে দক্ষের নিকট অভিযোগ করেন। ফলে ক্রুদ্ধ দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার প্রসাদে রোগমুক্ত হইয়া শিবশেখরে আশ্রয় লাভ করেন। চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবার জন্য দক্ষ শিবকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোনও ফল হইল না। শেষে বিষ্ণুর মধ্যস্থতায় রোগযুক্ত অর্ধচন্দ্র দক্ষের সহিত গমন করেন ও পত্নীদের সহিত মিলিত হন। রোগমুক্ত অর্ধচন্দ্র শিবের শিরোভূষণরূপে বিরাজ করিতে থাকেন (শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৫৫শ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ৯ম অধ্যায়)।

চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ সমুদ্র-মন্থনের সময় পারিজাত, ঐরাবত, লক্ষ্মী প্রভৃতির সঙ্গে চন্দ্রেরও আবির্ভাব হয়। তিনি দেবগণের অন্যতম বলিয়া পরিচিত হন। মন্থনশেষে সমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃতের ভাগ পাইবার জন্য দেবতাগণ আসন গ্রহণ করিলে মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণু অমৃত পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন। অসুরগণ অমৃতলাভে বঞ্চিত হইল দেখিয়া অসুর রাহু ছদ্মবেশে দেবগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। চন্দ্র তাহার চাতুরী বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দিলে বিষ্ণু তাহার সুদর্শনচক্রের সাহায্যে রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। ইতিমধ্যে অমৃতসেবনে রাহুর মস্তকটি অমরত্ব লাভ করিয়াছিল। সেই হইতে ঐ মস্তকরূপী রাহুর সহিত চন্দ্রের চিরবৈরিতা। সুযোগ পাইলেই দেহহীন রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে এবং ছিন্নকণ্ঠ দিয়া অবিলম্বেই চন্দ্র আবার বিনির্গত হন। চন্দ্রগ্রহণের সময় রাহু কর্তৃক চন্দ্রের গ্রাস ও মুক্তি সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় (পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১০ম অধ্যায়, ভাগবত ৮ স্কন্ধ ১০)।

চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দক্ষকন্যাদিগের গর্ভে তাঁহার কোনও সন্তান হয় নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র তারার গর্ভজাত বুধ। বুধ হইতে পৃথিবীতে চন্দ্রবংশের উদ্ভব হইয়াছিল। বুধের পুত্র চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত নৃপতি পুরূরবা। বিভিন্ন পুরাণে ও হরিবংশে চন্দ্রবংশের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। পুরূরবার আয়ু, অমাবসু প্রভৃতি সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আয়ুর বংশের বিখ্যাত নরপতি হইলেন আয়ুপুত্র নহুষ এবং নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির পুত্র যদু হইতেই বিখ্যাত যাদব কুলের উৎপত্তি। দ্বাপর যুগে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে কৌরব ও পাণ্ডবগণ এই বংশ অলংকৃত করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু রাজগণের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্যবংশের সহিত নিজ বংশধারা সংযুক্ত করিয়া দিবার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দাক্ষিণাত্যের চোল, কেরল ও পাণ্ড্য বংশের রাজগণ নিজেদের যযাতির পুত্র তুর্বসুর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। মেবারের রাজপুত রাজগণের মূল পুরুষ হিসাবে এখনও সূর্যদেবকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

চন্দ্রের কলঙ্ক চন্দ্রের আশ্রিত শশক বা মৃগের প্রতীক-রূপে কল্পিত হয়। সংস্কৃত কাব্যে ও নাটকে কুমুদিনীকে চন্দ্রের পত্নীরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

সুব্রতা সেনগুপ্ত

স্বতন্ত্র দেবতারূপে চন্দ্রের পূজার তেমন প্রচলন নাই। গ্রহশান্তি উপলক্ষে নবগ্রহের অন্যতম হিসাবে চন্দ্রের পূজার ব্যবস্থা আছে। ধ্যান অনুসারে চন্দ্র দ্বিভুজ— তাঁহার এক হস্তে বর, অপর হস্তে গদা। ইনি শুভ্রবর্ণ শ্বেতবস্ত্র-ধারী। ইঁহার রথে দশ অশ্ব, ইনি শ্বেতপদ্মে অবস্থিত। ইঁহাকে ঘৃতমিশ্রিত পায়সের নৈবেদ্য দিতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে চন্দ্রপূজার নিয়ম ও ফল বর্ণিত হইয়াছে।

দ্র গ্রহযাগতত্ত্ব, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থমালা ১০, শারদাতিলক তন্ত্র, *Tantrik Texts*, vol XVII, চতুর্দশ পটল।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার (১৮৩৬-১৯১০ খ্রী) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম ১৭৫৮ শকাব্দের ১৩ কার্তিক। পিতার নাম রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। পৈতৃক নিবাস পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রাম। চন্দ্রকান্ত পিতার নিকট ব্যাকরণ ও কিছু স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে গমন করেন এবং সেখানে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহা-মহোপাধ্যায় উপাধি প্রবর্তিত হইলে যে কয়জন বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রথমে এই উপাধি লাভ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম 'শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলো' নির্বাচিত হন। তর্কালংকার মহাশয় ৫ বৎসর কাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নির্বাচনের নিয়মানুসারে প্রতি বৎসর হিন্দু দর্শন,

বিশেষ করিয়া, বেদান্ত সম্পর্কে কতকগুলি বক্তৃতা দিতে হইত। বক্তৃতাগুলি খণ্ডে খণ্ডে এক বা একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে (১৮৯৯-১৯০৪ খ্রী)। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য মনোনীত হন। প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই গৌরব লাভ করেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য এবং ১৩১১-১২ বঙ্গাব্দে ইহার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে 'বৈশেষিকসূত্রভাষ্য' (১৮৮৭ খ্রী), 'কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া' (১৮৯৬ খ্রী), 'উদ্বাহচন্দ্রালোক' (১৮৯৭ খ্রী), 'শুদ্ধিচন্দ্রালোক' (১৯০৩ খ্রী), 'ঔর্ধ্বদেহিকচন্দ্রালোক' (১৯০৬ খ্রী) ও 'গোভিলগৃহ্যসূত্র' (১৯০৭-১০ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি তর্করত্ন মহাশয় পরলোক গমন করেন।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, B L Chaudhuri, *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, 1910

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চন্দ্রকীর্তি প্রাচীন ভারতের এক বৌদ্ধ দার্শনিক। তিব্বতীয় ঐতিহাসিকদের মতে তিনি আচার্য দিঙ্নাগের পরবর্তী যুগে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে, দক্ষিণ ভারতে সমন্ত (?) দেশে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রগোমী ও ধর্মকীর্তির সমসাময়িক এই পণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী আচার্যদের অন্যতম ছিলেন। নাগার্জুনের মাধ্যমিক শূন্যবাদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি মূল মাধ্যমিক কারিকার 'প্রসন্নপদা' নামে এক টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ 'শূন্যতাসপ্ততি-টীকা', 'যুক্তিষষ্টিকারিকা টীকা', 'মধ্যমকাবতার' ও 'প্রদীপোদ্দ্যোতনা' তিব্বতী ভাষায় বিদ্যমান।

দ্র M Winternitz, *History of Indian Literature*, vol II, Calcutta, 1931; Bu-ston, *History of Buddhism*, vol II, Heidelberg, 1931-32.

সুনীতিকুমার পাঠক

চন্দ্রকেতুগড় কলিকাতা হইতে উত্তর পূর্ব দিকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দূরে চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যে অবস্থিত। স্থানটি বেড়াচাঁপা নামেও প্রসিদ্ধ। অপর নাম দেবালয় বা দেউলিয়া। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত পেরিপ্লাস (Periplus) গ্রন্থে বর্ণিত গাঙ্গে (Gange) এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর টলেমি কর্তৃক উল্লিখিত গাঙ্গারিদাই (Gangaridai) শহর ('গাঙ্গারিদাই, গঙ্গরিডই' দ্র) এবং চন্দ্রকেতুগড় যে অভিন্ন ইহা কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।

কথিত আছে, মুসলমান আক্রমণের সময়ে এখানে চন্দ্রকেতু নামে কোনও এক রাজা রাজত্ব করিতেন।

এই অঞ্চলে প্রায় ৩ কিলোমিটারের (২ মাইল) অধিক স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন নগরবেষ্টনকারী প্রাচীর ও বসতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনতিদূরবর্তী হাদিপুর, সানপুকুর ও কাঁসীতলা প্রভৃতি গ্রামে এখনও জলাশয় খনন, কৃষিকর্ম ও গৃহনির্মাণের জন্য ভূমিখননের ফলে প্রাচীন লাঞ্ছনময় (পাঞ্চ মার্কড) মুদ্রা, মৃন্ময় মূর্তি, মৃৎ ভাণ্ড ও মসৃণ চাকচিক্যপূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণের মৃৎকপাল প্রভৃতি পুরাবস্তু পাওয়া যায়।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে চন্দ্রকেতুগড়ে খনন কার্য আরম্ভ হয়। বেড়াচাঁপা হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে হাড়োয়া যাইবার পথের পশ্চিম দিকে নগরবেষ্টনকারী প্রাচীন প্রাচীরের ভিতরে ধান খেতের এক স্থানে খননের ফলে ১৩ সেন্টিমিটার (৫ ইঞ্চি), ২০ সেন্টিমিটার (৮ ইঞ্চি) ব্যাসের এবং ০·৭৮ মিটার (২ ফুট ৭ ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যের পোড়ামাটির নল বিশিষ্ট ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে ইহা ৭·৬২ হইতে ৯·১৪ মিটার (২৫ হইতে ৩০ ফুট) পর্যন্ত অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫ মিটার (প্রায় ১৭ ফুট) এবং জলময় স্তর (ওয়াটার লেবেল) হইতে প্রায় ০·৩ মিটার (১ ফুট) নীচে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উল্লিখিত পয়ঃপ্রণালী যে মৌর্য যুগে কিংবা কিছু পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছিল, স্তর বিন্যাস ও সমসাময়িক পুরাবস্তুর সাহায্যে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। উৎখননের ফলে লাঞ্ছনময় তাম্রমুদ্রা, পোড়ামাটির নাগ দেবী, গজদন্ত নির্মিত বলয় ও মালা, উজ্জ্বল ও মসৃণ কৃষ্ণ বর্ণের মৃৎকপাল, খর নলবিশিষ্ট কৃষ্ণ বর্ণের মৃৎপাত্র (পানপাত্র ?) এবং দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার বিভিন্ন প্রকারের মৃৎপাত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানকার কোনও কোনও মৃৎপাত্র বিদেশী প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। মাটির ঢেলা ও মৃৎকপালের মধ্যে মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শুঙ্গ ও পরবর্তী যুগে নির্মিত পোড়ামাটির বহু যক্ষিণী মূর্তি ও নানারূপ সীলমোহর, ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা ও অন্যান্য পুরাবস্তুও এখানে যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গুপ্ত যুগ হইতে এখানে ইষ্টকের দ্বারা দেবমন্দির ও

বাসগৃহ নির্মিত হইত ইহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। এখানে 'খনামিহিরের ঢিপি' নামক স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উৎখননের ফলে ইষ্টকনির্মিত ১৯.২০ মিটার (৬৩ ফুট) দীর্ঘ এবং ১৯.২০ মিটার (৬৩ ফুট) প্রস্থ এক বিশাল উত্তরমুখী মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর দিকে সংলগ্ন ১৪ মিটার (৪৫ ফুট) দৈর্ঘ্য এবং ১৪ মিটার (৪৫ ফুট) প্রস্থের একটি মণ্ডপও রহিয়াছে, তাহার প্রাচীর ১.২ মিটার (৪ ফুট) পুরু। অনুরূপ অপর একটি ক্ষুদ্রায়তন মন্দিরও অল্প দূরে খনামিহিরের ঢিপির মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত বৃহদাকার মন্দিরটি দুই যুগে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই মন্দিরের ঠিক মধ্য স্থলে দৈর্ঘ্যে ২.৪৩ মিটার (৮ ফুট), প্রস্থে ২.১৩ মিটার (৭ ফুট) এবং গভীরতায় ৭.১৬ মিটার (২৩½ ফুট) এক গর্ভগৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বক্রভাবে নিম্নগামী হইয়া জলরেখার প্রায় ০.৬ মিটার (২ ফুট) নীচে চলিয়া গিয়াছে। ইহার তলদেশে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ০.৮৬ মিটার (২ ফুট ১০ ইঞ্চি) পরিমাপের ক্ষুদ্র একটি ইষ্টকবদ্ধ চতুরস্র ক্ষেত্র বর্তমান। যতদূর জানা যায়, এই মন্দিরটিকেই পশ্চিম বঙ্গের সর্বপ্রাচীন মন্দির বলিয়া গণ্য করা চলে।

উক্ত মন্দির হইতে প্রায় ৪৬ মিটার (১৫০ ফুট) উত্তরে গভীর খননের ফলে জলরেখার নিম্নাংশ হইতে কালো রঙে চিত্রিত ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের কয়েকটি খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র, কৌশাম্বী প্রভৃতি স্থানে লব্ধ চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের মত। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম বা ৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত এবং বৈদিক সভ্যতার সহিত সম্পর্কিত।

দ্র সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৪-২২, *Indian Archaeology. A Review*, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61 1961-62, Delhi, 1956-62.

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

চন্দ্রগ্রহণ গ্রহণ দ্র

চন্দ্রগুপ্ত, ১ম খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমে গুপ্তবংশীয় রাজা ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই এই বংশে সর্বপ্রথম মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং ৩২০ (মতান্তরে ৩১৮) খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যারম্ভ কাল হইতে একটি অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। ইহা গুপ্তাব্দ নামে পরিচিত এবং উত্তর ভারতের বহু স্থানে পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশীয়া কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্ণমুদ্রায় রানীর মূর্তি ক্ষোদিত হইত। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের বংশাবলীতে তাঁহার লিচ্ছবি রানীর কথা সগর্বে উল্লিখিত হইত। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসংগত নহে যে লিচ্ছবিদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ তাঁহার উন্নতির মূল অথবা একটি প্রধান কারণ। তাঁহার রাজ্যের সীমানা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে সম্ভবতঃ ইহা পশ্চিমে এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'গুপ্তযুগ' দ্র।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

চন্দ্রগুপ্ত, ২য় (৩৭৬/৮০-৪১৫? খ্রী) সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৬ অথবা ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতার ন্যায় বীর যোদ্ধা ছিলেন। গুজরাতে তিন শত বৎসরের অধিক কাল শকজাতীয় রাজগণের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রগুপ্ত শক বংশের শেষ রাজা তৃতীয় রুদ্রসিংহকে পরাজিত করিয়া ঐ অঞ্চল গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ভারতে বিদেশীয় শাসনের শেষ চিহ্নের বিলোপ সাধন করেন।

দিল্লীতে কুতব মিনারের নিকট একটি লৌহস্তম্ভ প্রোথিত আছে। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে চন্দ্র নামক জনৈক রাজা বঙ্গ দেশে যুদ্ধার্থে সম্মিলিত শত্রুগণকে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে সিন্ধু নদীর সপ্তমুখ অতিক্রম করিয়া বাহ্লিক পর্যন্ত অগ্রসর হন। অনেকে অনুমান করেন যে চন্দ্র নামক এই রাজা গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। উক্ত অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গ সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিলেও পরে বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই বিদ্রোহীগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত যুদ্ধে বিজয়লাভের ফলে বঙ্গ দেশ প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত রাজগণের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। বাহ্লিক দেশ সম্ভবতঃ হিন্দুকুশ পর্বতের অপর পারে অবস্থিত (প্রাচীন বাক্ট্রিয়া, বর্তমান বাল্খ) প্রদেশ। কেহ কেহ মনে করেন যে এই বাহ্লিক দেশ পাঞ্জাবে অবস্থিত ছিল— কিন্তু তাহা হইলে 'সিন্ধুর সপ্তমুখ পার হইয়া' এই কথার সংগত কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দিগ্বিজয়ী রাজা পূর্বে বঙ্গ দেশ হইতে পশ্চিমে হিন্দুকুশের অপর পার পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, ইনি যে গুপ্তবংশীয় রাজা, এই অনুমানই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এদেশে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি আছে। তিনি শক জাতিকে পরাজিত করায় 'শকারি' আখ্যা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সভায় নবরত্ন, অর্থাৎ কালিদাস প্রমুখ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে শকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস যে তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন, এরূপ মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই জনপ্রবাদে উল্লিখিত বিক্রমাদিত্য। ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ অথবা ইহার কিছু পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'গুপ্তযুগ' দ্র।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (আনুমানিক ৩২৭-৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) খ্রীষ্ট জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে যে সাম্রাজ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত হইতে পূর্বে বঙ্গ দেশ এবং দক্ষিণে তামিল দেশের মধ্য ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের বংশ ও বাল্যকাহিনী সঠিক জানা যায় না। পরবর্তী কালে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে মগধের পরাক্রান্ত নন্দবংশের রাজার ঔরসে ও মুরা নাম্নী শূদ্রাণী দাসীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু খুব সম্ভব এই কাহিনীটি সত্য নহে। গৌতম বুদ্ধের সমকালে পিপ্পলীবন নামক স্থানে মোরিয় নামক যে ক্ষত্রিয় বংশের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের কথা প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, চন্দ্রগুপ্ত সেই বংশেই জন্মিয়াছিলেন, ইহাই অধিকতর বিশ্বাসজনক বলিয়া মনে হয়।

অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কূটনীতিবিশারদ চাণক্য ও কৌটিল্য নামে পরিচিত এক ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রণা এবং স্বীয় বাহুবলের উপরে নির্ভর করিয়া চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে আলেকসান্দর কর্তৃক বিজিত পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ হইতে গ্রীক শাসকগণকে বিদূরিত করেন এবং নন্দবংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ দেশ হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। এইরূপে সমগ্র উত্তর ভারতে চন্দ্রগুপ্তের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতের অনেকাংশে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না।

গ্রীক সম্রাট আলেকসান্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লন। ভারতের গ্রীক রাজ্য সেনাপতি সেলিউকসের ভাগে পড়ে। তিনি ইহা অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি মাত্র পাঁচ শত রণহস্তী উপঢৌকনের বিনিময়ে বর্তমান আফগানিস্তানের যে অংশ হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত তাহা এবং সমগ্র বেলুচিস্তানের আধিপত্য চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসের কন্যা হেলেনকে বিবাহ করেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। সেলিউকস প্রেরিত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস বহু দিন চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনা) বাস করিয়াছিলেন এবং এই নগরীর বিবরণ ও সেই সময়কার ভারত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লেখেন। সেই বর্ণনার যে সামান্য অংশটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন প্রণালীর উৎকর্ষ ও তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩২৪ হইতে ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পরবর্তী কালের জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে চন্দ্রগুপ্ত বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর সহিত মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলার চন্দ্রগিরি পর্বতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এবং জৈন প্রথামত অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া মৃত্যু বরণ করেন।

দ্র R K Mookerjee, *Chandragupta Maurya and his Times*, Madras, 1943, R C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol II, London, 1951

রমেশচন্দ্র মজুমদার

চন্দ্রদ্বীপ মধ্যযুগের শেষ দিকে বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ব্যাপিয়া সুবিস্তীর্ণ চন্দ্রদ্বীপ জমিদারি অবস্থিত ছিল। সরকার বাকলার নামানুসারে অনেক সময় ইহাকে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ বলা হইত। প্রথমে কচুয়া এবং পরে মাধবপাশা এই জমিদারির রাজধানী ছিল। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপ নামটি প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

চন্দ্রদ্বীপের বৌদ্ধদেবী তারা গুপ্ত যুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাকরণাচার্য চন্দ্রগোমী চন্দ্রদ্বীপে বাস করিবার সময়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ তারাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। জনৈক চীনদেশীয় লেখক বলিয়াছেন যে, তারাদেবীর মন্দির দক্ষিণ সাগর অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপের তারা মূর্তিই পালরাজগণের পতাকায় শোভা পাইত এবং এই অঞ্চলই পাল বংশের আদি বাসস্থান ছিল।

বাংলার চন্দ্ররাজ বংশের তাম্রশাসনে দেখা যায়, দশম শতাব্দীর সূচনায় ঐ বংশের ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা

হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় পালবংশীয় ধর্মপাল ও চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের বর্ণনা এবং 'আইন-ই-আকবরী'র সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলের অন্য নাম ছিল বঙ্গাল দেশ।

'আইন-ই-আকবরী'তে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ রায়ের উল্লেখ আছে। মোগল সম্রাট আকবর বাংলা দেশ অধিকার করার পর পূর্ব বাংলার যে সকল জমিদার কিছুকালের জন্য মোগল প্রভুত্ব স্থাপনে বাধা দিয়াছিলেন, সেই 'বারভুঁইয়া'র মধ্যে পরমানন্দের পৌত্র কন্দর্পনারায়ণ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মুরাদ খাঁ বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করেন।

স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ বসুবংশীয় জমিদারগণের আদিপুরুষ দনুজমর্দনদেবের অধিকার প্রায় সমগ্র বাখরগঞ্জ জেলায় স্বীকৃত হইত। কথিত আছে, তিনি চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক ব্রাহ্মণের কৃপায় রাজ্য লাভ করেন এবং এই ব্রাহ্মণের নামেই রাজ্যের 'চন্দ্রদ্বীপ' নামকরণ হয়। কাহিনীটির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যাল্‌ফ ফিচ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য পরিদর্শন করিয়া একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরের রূপিয়া খাঁ কর্তৃক নির্মিত এবং কন্দর্পনারায়ণের নামাঙ্কিত কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাত দীর্ঘ একটি পিতলের কামান দীর্ঘকাল পর্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে রক্ষিত ছিল। মগ দস্যুর উপদ্রবে চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ বাখরগঞ্জ স্টেশনের নিকটবর্তী কাছুয়া হইতে মাধবপাশায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

'বারভুঁইয়া'র অন্যতম ছিলেন যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য। কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করেন, কিন্তু ইহার ফলে যশোহর ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। এই বিবাহবিষয়ক কাহিনীর ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বউঠাকুরানীর হাট' রচনা করিয়াছিলেন।

কালক্রমে বসুবংশের বিলোপ ঘটিলে ঢাকার নিকটবর্তী উলাইলের মিত্রমজুমদার বংশ চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি লাভ করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ইংরেজ সরকার কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে চন্দ্রদ্বীপ জমিদারির অধিকাংশ ক্রমে নিলামে বিক্রীত হয় এবং পরিণামে মাধবপাশার রাজা একজন ক্ষুদ্র জমিদারে পরিণত হন।

দ্র H. Blochmann, 'Contributions to the Geography and History of Bengal', *Journal of the Asiatic Society*, part I, no. III, 1873; J. Wise, 'On the Bara Bhuyas of Eastern Bengal', *Journal of the Asiatic Society*, part I, no. III, 1874; D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1960; D. C. Sircar, ed., *The Sakti Cult and Tara* (in the Press).

দীনেশচন্দ্র সরকার

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০ খ্রী) জন্মস্থান হুগলি জেলার কৈকালা গ্রাম। ইতিহাসে এম. এ ও বি. এল. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। দীর্ঘকাল (১৮৮৭-১৯০৩ খ্রী) বঙ্গ সরকারের অনুবাদকের কার্য করেন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হন। চন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ও সাহিত্যশিষ্য ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনে তাঁহার উদ্যোগ স্মরণীয় হইয়া আছে। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বিশেষ করিয়া সাহিত্যসমালোচনা সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত তাঁহার সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট গ্রন্থ 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১ খ্রী), 'ত্রিধারা' (১৮৯১ খ্রী), 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২ খ্রী) ও 'সাবিত্রীতত্ত্ব' (১৯০০ খ্রী)।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৯০৪; চন্দ্রনাথ বসু, পৃথিবীর সুখ দুঃখ, কলিকাতা, ১৯০৯।

সুশীলকুমার গুপ্ত

চন্দ্রবংশ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব বঙ্গে একটি পরাক্রান্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ রোহিতাগিরিতে রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ বলেন উক্ত স্থানটি বিহারের অন্তর্গত রোটাসগড, আবার কাহারও মতে শব্দটি কুমিল্লার নিকটবর্তী লালমাই বা লালমাটির সংস্কৃত রূপ। ত্রৈলোক্যচন্দ্র সম্ভবতঃ প্রথমে চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি হন এবং পরে পূর্ব বঙ্গের অনেক অংশে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তিনি যুদ্ধে গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ও পরবর্তী রাজগণ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি সম্রাটোচিত পদবী গ্রহণ করেন। তিনি ৪৪ বৎসর বা তাহার অধিক কাল রাজত্ব করেন। (আনুমানিক ৯০৫-৫৫ খ্রী) তাঁহার বংশধরগণের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি গৌড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (কামরূপ) রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং গোপালকে

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই গোপাল সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ পাল রাজবংশের রাজা দ্বিতীয় গোপাল। এই সময় পাল রাজ্যের চরম অবনতি ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এই সুযোগেই চন্দ্রবংশীয় রাজারা পূর্ব বঙ্গে রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গেও তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। শ্রীচন্দ্রের পরে এই বংশের আরও চারি জন রাজা রাজত্ব করেন (আনুমানিক ৯৫৫-১০৩৫ খ্রী)। এই বংশের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যগণের হস্তে পরাজিত হন। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই পাল সম্রাট প্রথম মহীপাল পূর্ব বঙ্গে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি চন্দ্রবংশকে ধ্বংস করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ বর্মবংশীয় রাজগণই একাদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে চন্দ্রবংশকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া পূর্ব বঙ্গে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

পালবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ‘চন্দ্র’ উপাধিধারী প্রায় ২০ জন রাজা আরাকানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত উপরি-উক্ত চন্দ্রবংশের কোনও সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

দ্র রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, R. C Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East*, 2nd Edition, Calcutta, 1963.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

চন্দ্রভাগা পঞ্চনদের অন্যতম নদী। গ্রীকদের আকে-সিনেস্ (Acesines) ও বৈদিকদের অশিক্নী, বর্তমান চেনাব নদী। কালিকাপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন দুইটি নদীর মিলিত ধারাই চন্দ্রভাগা। ভারতে অবস্থিত বাড়লাচ গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বের ৪৮৬৬ মিটার (১৬২২১ ফুট) উচ্চ তুষারস্তূপ হইতে নির্গত চন্দ্র নদী ঐ গিরিবর্ত্মের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আগত ভাগা নদীর সহিত তাণ্ডিতে মিলিত হইয়াছে। এই যুক্তধারা চন্দ্রভাগা বা চেনাব নামে পূর্ব পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। আখনুরের পর ইহা নাব্য। পশ্চিম পাকিস্তানে ঝঙ জেলার ট্রিমু-র নিকট চন্দ্রভাগা বিতস্তা (ঝিলম) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত ধারা চন্দ্রভাগা নামেই পরিচিত। সিধুর নিকট ইহা ইরাবতী বা রাবি নদীর সহিত এবং মদওয়ালার নিকট শতদ্রু নদীর (সাটলেজ) সহিত সংযুক্ত হইয়া পঞ্চনদ নামে মিথনকোটের নিকট অবশেষে সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। উৎপত্তি স্থল হইতে সংগম পর্যন্ত চন্দ্রভাগার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ কিলোমিটার (৭৫০ মাইল)।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে খানকির নিকটে খাল কাটা হয়। ইহাতে সারা বৎসর জল থাকে। সমস্ত শাখা-প্রশাখা লইয়া খালগুলির মোট বিস্তার ৩৮৯৯ কিলোমিটার (২৪৩৭ মাইল)। এই জলের সহায়তায় পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মরুভূমিসদৃশ প্রায় ৮০০০০ বর্গ কিলোমিটার (২ মিলিয়ন একর) উর্বরা ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের সু-উচ্চ অংশে মারলোর নিকটে চন্দ্রভাগায় অপর একটি খাল কাটা হইয়াছে। ইহার জল গুজরান-ওয়ালা শিয়ালকোট ও শেইখপুরা অঞ্চলে সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতেও সারা বৎসর জল থাকে।

চন্দ্রভাগা নদী কয়েকবার স্বীয় গতি পরিবর্তিত করিয়াছে। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চন্দ্রভাগা মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র মুলতান শহরের পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চন্দ্রভাগা এই শহরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মুলতানে চন্দ্রভাগার তীরে মহাভারতীয় রাজা শাম্বের খ্যাতিমণ্ডিত সূর্যমন্দির নির্মিত হয়। ১১শ শতাব্দীতে অল্‌বীরুনী ইহা দর্শন করেন। ইহার অনুকরণে পুরীর অনতিদূরে কণারকেও এক চন্দ্রভাগার সৃষ্টি হয়। তাহা এখনও বর্তমান এবং অনেকে ভুল করিয়া ইহাকে শাম্ব-উপাখ্যানের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন।

দ্র নির্মলকুমার বসু, কণারকের বিবরণ, কলিকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, *The Imperial Gazetteer of India*, vol. X, Oxford, 1908

ইরা সেন

চন্দ্রমল্লিকা গাঁদা গোত্রের (ফ্যামিলি কোম্পোসিটী, Family-Compositae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী এবং সাধারণতঃ বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার উৎপত্তি স্থান সম্ভবতঃ চীন দেশ, বর্তমানে ইহা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রমল্লিকার ফুল ভারতবর্ষে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইহা খুব সহজে জমিতে ও টবে চাষ করা যায় এবং একবার ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইলে বহুদিন ধরিয়া ফোটে। কৃত্রিম উপায়ে আলোক-সম্পাত করিয়া চন্দ্রমল্লিকা গাছে সারা বৎসর ফুল ফোটানো সম্ভব। ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির ও বিচিত্র সুন্দর বর্ণের চন্দ্রমল্লিকার ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে ইহার খুব চাহিদা আছে।

চন্দ্রমল্লিকার পুষ্পবিন্যাস মুণ্ডক (ক্যাপিটিউলম) জাতীয়। দেখিতে ফুলের মত বলিয়া সাধারণতঃ ইহাকেই ফুল বলা হয়; প্রকৃতপক্ষে ইহা বহু ক্ষুদ্র ফুল বা পুষ্পিকার (ফ্লোরেট) দ্বারা গঠিত। বাগানে যে সকল চন্দ্রমল্লিকার চাষ করা হয় তাহা প্রধানতঃ ক্রিসান্থেমম নোরিফোলিয়ম (*Chrysanthemum norifolium*), ক্রিসান্থেমম ইনদিকম (*C. indicum*) এবং ক্রিসান্থেমম অর্নাতুম (*C ornatum*)— এই তিন প্রজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফুলের আকৃতি অনুসারে চন্দ্রমল্লিকার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা হয়: ১. অ্যানিমোন ২. কাসকেড ৩. সিঙ্গল ৪. পম্পন ৫. কোরিয়ান ৬. ইন্‌কার্‌ভ্‌ড ৭. রিফ্লেক্স্‌ড।

চন্দ্রমল্লিকা গাছ সাধারণতঃ শাখাকলম, দাবাকলম বা গাছের চারি পাশে যে ছোট ছোট চারাগাছ জন্মায় তাহা হইতে বংশ বিস্তার করে। কয়েক প্রকার চন্দ্রমল্লিকা গাছের বংশ বিস্তার বীজ হইতেও হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫১, D. Prain, *Bengal Plants*, vol 1, Calcutta, 1963

তরুণকুমার বসু

চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪ খ্রী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী মহিলা এম. এ.। খ্রীষ্টান পরিবারে জন্ম। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুন নেটিভ খ্রীষ্টান স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল হইতে এফ. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। বেথুন স্কুলে সে সময়ে কেবল হিন্দু বালিকাগণকে লওয়া হইত, কিন্তু কলেজের ক্লাশগুলিতে ঐরূপ বাধা নাই বলিয়া স্বীকৃত হইলে তিনি কলেজে ভর্তি হইয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন এবং অতঃপর ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবার পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজটি যখন বেথুন কলেজ নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীন হয় তখন চন্দ্রমুখী ইহার প্রথম অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। পণ্ডিত কেশ্বরানন্দ মমগায়েনকে বিবাহ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি দেরাদুনে শান্তিময় পরিবেশে জীবন যাপন করেন।

শান্তি রাঘবন

চন্দ্রশেখর আজাদ (১৯০৫-৩১ খ্রী) দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা সীতারাম তেওয়ারী ও মাতা জগরানী দেবীর পুত্র চন্দ্রশেখর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের অলিরাজপুর স্টেটের ভাওরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কাশীতে তিনি সংস্কৃতে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আদালতে আনীত হইলে ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রশেখরকে বেত্রাঘাতের দণ্ডাদেশ দান করেন।

১৯২৩ সালে তিনি কাশীতে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। বাংলার বিপ্লবীদের এক প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল কাশীতে। এখানেই রামপ্রসাদ বিস্মিল-এর সহিত চন্দ্রশেখরের পরিচয় ঘটে। তাঁহারা বিপ্লবী আদর্শের পুস্তিকা ও পত্রিকা ছাপাইয়া সবত্র প্রচার করিতেন। আজাদ তাহা ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেন।

বিপ্লবীদলের খরচ চালাইবার জন্য ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ আগস্ট উত্তর প্রদেশের কাকোরি নামক স্টেশনের অদূরে ট্রেন থামাইয়া মেল ব্যাগ লুঠ করা হয়। চন্দ্রশেখর এবং তাঁহার দুই বন্ধু ব্যতীত সকলেই পরে গ্রেফতার হন এবং রামপ্রসাদ বিস্মিল, রাজেন লাহিড়ী, আসফাকুল্লা ও রৌশনলালের ফাঁসি হয়, অন্যেরা দ্বীপান্তরিত হন। আজাদ বোম্বাইয়ে পলাইয়া যান। সেখানে তিনি কুলির কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। পরে উত্তর প্রদেশে ফিরিয়া আসেন এবং পরবর্তী কালে বিখ্যাত ভগৎ সিং এর সহিত একযোগে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান দল সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৯ খ্রী) ভগৎ সিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বন্দী হইলে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান দলের পরিচালনা ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব চন্দ্রশেখর আজাদ গ্রহণ করেন। লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বড়লাটকে হত্যার চেষ্টা ঐ পুনর্গঠিত দলের প্রথম কাজ হয়। দিল্লীর নিকট বড়লাটের স্পেশাল ট্রেনে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কয়েকটি বোমা পড়ে। তাহাতে ট্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হইল বটে, কিন্তু বড়লাটের দেহে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। চন্দ্রশেখর এবার সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টায় ব্রতী হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক ডাকাতির তদন্তকালে ব্রিটিশ সরকার তাঁহার সংকল্পের কথা জানিতে পারেন। কয়েক দিন পরে তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী গ্রেফতার হন এবং পুলিশ দিল্লীতে একটি বোমার কারখানাও আবিষ্কার করে। চন্দ্রশেখর গোপনে পাঞ্জাবে চলিয়া যান এবং সেখানে তাঁহার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত থাকে। পুলিশ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই। তবে তাঁহার বহু সহকর্মী এই সময় ধরা পড়েন। বিপ্লবীদের কয়েকটি বন্দুক-পিস্তলের ডিপো এবং বোমার কারখানাও পুলিশ

খুঁজিয়া বাহির করে। ইংরেজ সরকার তখন দ্বিতীয় লাহোর ষড়্‌যন্ত্র এবং নয়াদিল্লী-ষড়্‌যন্ত্র নামে দুইটি মামলা রুজু করেন। চন্দ্রশেখর যদিও এইসব মকদ্দমার মুখ্য আসামী ছিলেন তথাপি পুলিশ তাঁহার নাগাল পায় নাই। তখন সরকার ঘোষণা করেন, ফেরারী চন্দ্রশেখরকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের অ্যাল্‌ফ্রেড পার্কে চন্দ্রশেখরকে পুলিশ ঘিরিয়া ফেলে। সেখানে তাঁহার আর একজন সহকর্মী ছিলেন। জোর করিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া চন্দ্রশেখর একটি গাছের আড়াল হইতে গুলি ছুঁড়িতে থাকেন। প্রায় বিশ মিনিট লড়াইয়ের পর আজাদ পুলিশের বহু গুলিতে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর অ্যাল্‌ফ্রেড পার্কে এই বীর বিপ্লবীর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

দ্র R C Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol III, Calcutta, 1963

কমলা দাশগুপ্ত

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২ খ্রী) নিবাস নদিয়া। বাল্যকালে টোলে সংস্কৃত পড়েন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ (১৮৭২ খ্রী) পাশ করার পর কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া বি. এল. (১৮৮০ খ্রী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে থাকেন, কিন্তু তাহাতে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া ওকালতি ছাড়িয়া দেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চন্দ্রশেখরকে আমৃত্যু মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিয়াছিলেন। অকাল-মৃত প্রথমা পত্নীর স্মরণে চন্দ্রশেখর তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচনা করেন। চন্দ্রশেখর বাংলা সাহিত্যের যশস্বী প্রবন্ধলেখক। বিভিন্ন মাসিক পত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' তিনি নিয়মিতভাবে সাহিত্য সমালোচনা করিতেন। চন্দ্রশেখরের গ্রন্থাবলী : 'মসলা-বাঁধা কাগজ', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬ খ্রী), 'সারস্বত কুঞ্জ' (১৮৮৬ খ্রী), 'স্ত্রী- মিত্র' (১৮৯০ খ্রী), 'কুঞ্জলতার মনের কথা' (১৯০২ খ্রী), 'রসগ্রন্থাবলী' (১৯০৫ খ্রী)।

বিজিতকুমার দত্ত

চন্দ্রশেখর, শশিশেখর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই দুই ভ্রাতা (?) উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে শশী ও চন্দ্র একার্থবাচক বলিয়া এই দুই নাম একই কবির। অনেকে মনে করেন ইহাদের জন্মস্থান বীরভূম জেলার কাঁদড়া গ্রামে। পদকল্পতরুতে ইহাদের রচিত কোনও পদ ধৃত হয় নাই, তাই মনে হয় ইহারা বৈষ্ণবদাসের পরবর্তী।

বিমানবিহারী মজুমদার

চন্দ্রাবলী বাংলার বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধা, শ্রীকৃষ্ণের সহচরী বৃন্দাবনের একজন প্রধানা গোপী। কৃষ্ণপ্রেমের অভিলাষিণী চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার প্রতিপক্ষস্বরূপা। চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া। উভয়েই নিত্যসৌন্দর্যে ও বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি গুণরাশিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনীয়া ছিলেন (উজ্জ্বলনীলমণি, হরিপ্রিয়াপ্রকরণ ৫২)। চন্দ্রাবলী ও রাধার মধ্যে পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণুতার মনোভাব বৈষ্ণব নাটকে ও অলংকারগ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় (বিদগ্ধমাধব নাটক ৭ম অঙ্ক, উজ্জ্বলনীলমণি, মানপ্রকরণ)। রাধিকার পিতা বৃষভানুর অগ্রজ চন্দ্রভানু ইহার পিতা। ইহার মাতার নাম বিন্দুমতী ও স্বামীর নাম গোবর্ধনমল্ল।

নরনাথ গোস্বামী

চব্বিশ পরগনা ২১°৩১′ উত্তর হইতে ২৩°১৩′ উত্তর ও ৮৮°২′ পূর্ব হইতে ৮৯°৬′ পূর্বে অবস্থিত পশ্চিম বঙ্গের একটি জেলা। এই জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ও পশ্চিমে যথাক্রমে ইছামতী কালিন্দী ও হুগলি নদী, উত্তরে নদিয়া জেলা। সদর বা আলিপুর, বসিরহাট, বারাসত, বনগাঁ, ব্যারাকপুর এবং ডায়মণ্ডহারবার এই ছয়টি মহকুমা, ৪৯টি থানা এবং ৪১১৩টি মৌজা লইয়া এই জেলাটি গঠিত। ইহার আয়তন ১৩২১২ বর্গ কিলোমিটার (৫২৮৫ বর্গ মাইল)।

এই জেলার নদীগুলি প্রধানতঃ গঙ্গার শাখা বা উপশাখা। বর্তমানে ইহারা মূল নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি ম্রিয়মাণ অবস্থায় প্রবাহিত হইতেছে। প্রধান নদী হুগলি, বিদ্যাধরী ও ইছামতী। জেলার উত্তরাংশের নদীতীরে পলি দ্বারা গঠিত স্বাভাবিক বাঁধ দেখা যায়। দক্ষিণাঞ্চলে বা সুন্দরবনে বহুসংখ্যক খাঁড়ি, ব-দ্বীপ, খাল ইত্যাদি আছে। বিদ্যাধরী পূর্ব দিকে ক্যানিং-এর নিকট মাতলা নদীতে পড়িতেছে। পিয়ালী ইহার একটি শাখা। জেলার পূর্ব দিকে প্রবাহিত ইছামতী একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। ইহার শাখা যমুনা গোবরডাঙার নিকট জেলায় প্রবেশ করিয়া স্বরূপনগরের নিকট ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কালিন্দী যমুনা হইতে বাহির হইয়া রায়মঙ্গল

মোহানায় পড়িয়াছে। সুন্দরবনাঞ্চলে মুড়িগঙ্গা, সপ্তমুখী, মাতলা, গোসাবা, হরিভাঙা— এই মোহানা নদীগুলি বিখ্যাত।

জেলার মৃত্তিকাকে দো-আঁশ, এঁটেল, বেলে ও নোনা —এই চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

চব্বিশ পরগনার জলবায়ুতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব সর্বাধিক। শীতকালীন গড় উত্তাপ ২০° সেন্টিগ্রেড (৬৮° ফারেনহাইট), সমুদ্রতীরে ২০·৭° সেন্টিগ্রেড (৬৯.৪° ফারেনহাইট), গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ২৯.৫° সেন্টিগ্রেড (৮৪° ফারেনহাইট)। বর্ষা কালে তাপমাত্রার অল্পই পরিবর্তন হয়।

বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণে ২৫০০ মিলিমিটার (১০০ ইঞ্চি) হইতে ক্রমশঃ কমিয়া উত্তরে ১২৪০ মিলিমিটারে (৫০ ইঞ্চি) পরিণত হয়। বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসেই বেশি।

সপ্তম শতাব্দী হইতেই এই স্থানের ইতিহাস জানা যায়, কিন্তু ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইহার বিশদ ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই জেলা সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফর কোম্পানিকে নির্দিষ্ট রাজস্বের পরিবর্তে জেলার বর্তমান আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ ভাগের জমিদারি ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে ইহা চব্বিশটি মহাল বা পরগনায় বিভক্ত ছিল বলিয়া ইহার নাম চব্বিশ পরগনা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নদিয়া ও যশোহরের কয়েকটি পরগনা ইহার সহিত যুক্ত হয় ও কলিকাতাকে এই জেলা হইতে পৃথক করা হয়। ১৯৪৮ সালে ভারত বিভাগের পর নদিয়া জেলার বনগাঁ বিভাগের ৩টি থানা ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের গণনা অনুসারে জেলার লোকসংখ্যা ৬২৮০৯১৫ জন। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৪৩০ (বর্গ মাইলে ১১১৮)। লোকসংখ্যার অর্ধাংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত। ইহার পরেই শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য। মৎস্য, বনজ সম্পদ এবং খনিজ সম্পদ আহরণে নিযুক্ত লোকের সংখ্যাও কম নহে।

জেলার কৃষিজ ভূমির পরিমাণ ৭৫৩০০০ হেক্টর। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দো-ফসলী জমির পরিমাণ ২০০০ হেক্টর ও পতিত জমি ৩৭৬০০ হেক্টর ছিল। চাষের অযোগ্য জমি ৯৫১০০ হেক্টর। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধানই প্রধান। ইহা প্রায় ৫৭৫৯০০ হেক্টর জমিতে উৎপন্ন হয়। ইহার পরেই পাট ও তৈলবীজ উল্লেখযোগ্য। কৃষি ভিন্ন অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ২৫৯০০০ হেক্টর। বনাঞ্চল প্রায় ৪১৭২ বর্গ কিলোমিটার (১৬০৯ বর্গ মাইল) অধিকার করিয়া আছে। সুন্দরবনের জঙ্গলে শিমুল, সুন্দরী, গরান, কেওড়া, হিন্তাল প্রভৃতি গাছ আছে।

চব্বিশ পরগনায় পশ্চিম বঙ্গের সর্বাধিক শিল্পের সমাবেশ হইয়াছে। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের শতকরা ৭০টি চটকল এই জেলায় অবস্থিত। জেলায় ১৩৩টি প্রধান কাপড়ের কল, রাসায়নিক শিল্পের কারখানা ১৩৩টি, চর্মশিল্প ৭৮টি, রবার শিল্প ৩৩টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ১১৩টি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের প্রস্তুতকারী শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ১২৫টি। এতদ্ভিন্ন কাগজের কল, আসবাব তৈয়ারি, ছাপাখানা, দিয়াশলাই শিল্প, বৈদ্যুতিক শিল্প প্রভৃতি আছে।

এই জেলার পরিবহন ব্যবস্থা আশাব্যঞ্জক নহে। সমগ্র জেলায় ৩০০০ কিলোমিটার রেলপথ আছে। নৈহাটি একটি বড় রেল জংশন। কাঁচড়াপাড়ায় রেলের ইঞ্জিন মেরামতের কারখানা আছে।

জেলায় প্রায় ১৭৩১ কিলোমিটার পাকা রাস্তা আছে, তন্মধ্যে ডায়মণ্ডহারবার রোড ও ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডই প্রধান। বারাসত বসিরহাট রোড, যশোর রোড, টাকী রোড ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। জাতীয় সড়ক ৩১ (কলিকাতা শিলিগুড়ি) এবং ৩৫ (কলিকাতা বনগাঁ) এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। প্রধান রাস্তাগুলিতে বাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে, গ্রামাঞ্চলে গোরুর গাড়ি এবং নৌকাই সম্বল।

নদীপথে, সুন্দরবনের মধ্য ও দক্ষিণ তিনটি প্রধান জলপথের দ্বারা চব্বিশ পরগনা কলিকাতার সহিত যুক্ত। পোর্ট ক্যানিং মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি বন্দর।

জেলায় শিক্ষিত পুরুষের হার শতকরা ৪৩.৯, স্ত্রীলোকের ১৯.৫। জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১, কলেজের সংখ্যা ৯ ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩১৫। কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইহা কৃষি শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। জেলার সদর কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে আলিপুরে অবস্থিত।

চব্বিশ পরগনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান নিম্নে দেওয়া হইল

আগরপাড়া— কলিকাতা হইতে ১৩.৬ কিলোমিটার (৮½ মাইল) দূরে অবস্থিত। এখানে তারাপুকুরের পীরের আস্তানায় সপ্তাহব্যাপী মেলা হয়। ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী – বাংলা দেশের সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্র। পানিহাটির নিকট কাঁঠালপাড়া— বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। খড়দহ— কলিকাতা হইতে ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল)

দূরে অবস্থিত একটি বৈষ্ণব তীর্থ। এখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ আসিয়া বসবাস করেন। রাসযাত্রা, দোল-পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমায় মেলা হয়। গরিফা গ্রাম— কেশবচন্দ্র সেনের জন্মস্থান। গোসাবা— একটি আদর্শ কৃষি উপনিবেশ। ঘুটিয়ারী-শরিফ— কলিকাতা হইতে ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল) দূরে মুসলমানদের একটি তীর্থস্থান ('ঘুটিযারী-শরিফ' দ্র)। জয়নগর মজিলপুর —কলিকাতা হইতে ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল) দক্ষিণে শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মস্থান। এখানে দোল উপলক্ষে ১০ দিন ব্যাপী মেলা হয়। টিটাগড়— কাগজের কলের জন্য খ্যাত, এখানে বিশালাক্ষীর মন্দির আছে। দেগঙ্গা - কলিকাতা হইতে ৩৩.৬ কিলোমিটার (২১ মাইল) দূরে, প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে গাঙ্গারিদাই ('গাঙ্গারিদাই' ও 'চন্দ্রকেতুগড়' দ্র) বলিয়া উল্লিখিত।

গঙ্গাসাগর— একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান। ('গঙ্গাসাগর' দ্র)। মন্দিরাদির মধ্যে কালীঘাটের মন্দির প্রসিদ্ধ ('কালীঘাট' দ্র)। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়ের মন্দির, ফুলিয়ার পাটের মন্দির বিখ্যাত।

দ্র শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চব্বিশ পরগনা ও কলিকাতা, কলিকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পূর্ববঙ্গ রেলপথ প্রচার বিভাগ, বাংলায় ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪০, A. Mitra, *District Handbook 24 Parganas, 1951*, Calcutta, 1954, Government of West Bengal, *State Statistical Abstract 1961*, Calcutta, 1965.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চম্পা (আনাম) ইন্দোচীনের পূর্ব উপকূলে যে দেশ এখন ভিয়েৎনাম নামে পরিচিত তাহার মধ্য ভাগে, ভূতপূর্ব আনাম নামক প্রদেশে, প্রাচীন কালে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ চম্পা নামে এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সংস্কৃত ভাষায় এবং ভারতীয় অক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপিতে শ্রীমার নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। এইরূপ আরও অনেক লিপি এবং চীন দেশের ইতিহাস হইতে এই হিন্দু রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তরে চীন ও আনাম জাতি এবং পশ্চিমে কম্বুজ দেশের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্য স্বাধীন ছিল। তাহার পর আনাম জাতি এই দেশ জয় করে এবং চম্পা রাজ্য ধ্বংস হয়। শম্ভু বর্মন, সত্য বর্মন, ইন্দ্র বর্মন, হরি বর্মন প্রভৃতি অনেক পরাক্রান্ত রাজা এই দেশে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। ভারতের ভাষা, শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, শিল্পকলা ও শাসনপ্রণালী এই দেশে প্রচলিত ছিল। এখানে বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির এবং দেব দেবীর মূর্তি প্রাচীন ধর্ম ও শিল্পের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এ দেশে যে বেদ, ষড়দর্শন, বৌদ্ধদর্শন, পাণিনীয় ব্যাকরণ ও কাশিকা বৃত্তি, শৈব আখ্যান ও উত্তর কল্প এবং রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য ও ধর্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল, শতাধিক সংস্কৃত লিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর হইতে দক্ষিণে এই রাজ্যের চারিটি প্রদেশের নাম ছিল অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার ও পাণ্ডুরঙ্গ।

দ্র R. C Majumdar, *Ancient Indian Colonies in the Far East*, vol 1, Lahore, 1927 (?), R. C Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East*, Calcutta, 1963

রমেশচন্দ্র মজুমদার

চম্পারন সত্যাগ্রহ সত্যাগ্রহ দ্র

চম্পূ গদ্যপদ্যময় সংস্কৃত কাব্য। চম্পূকাব্যের উল্লেখ দণ্ডীর কাব্যাদর্শে অষ্টম শতকে পাওয়া যায়। বর্তমানে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্বে রচিত কোনও চম্পূকাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। উপলভ্যমান চম্পূকাব্যের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

ত্রিবিক্রমভট্টের 'নলচম্পূ' বা 'দময়ন্তী কথা' প্রাচীনতম। খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকের কোনও সময়ে ত্রিবিক্রমভট্ট জীবিত ছিলেন। 'নলচম্পূ' মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে সাত 'উচ্ছ্বাস'-এ রচিত। এই গ্রন্থ দ্ব্যর্থক ও দুরূহ শব্দবহুল। ইহাতে বাণ ও সুবন্ধুর রচনার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

দশম শতকের অপর একটি চম্পূ জৈন সোমপ্রভসূরির আট 'আশ্বাস'-এ রচিত 'যশস্তিলকচম্পূ'। অবন্তিরাজ যশোধরের পত্নীর চক্রান্তে রাজার মৃত্যু ও বারংবার জন্ম এবং পরিশেষে পুনর্জন্মবোধের কামনায় তৎকর্তৃক জৈন ধর্ম অবলম্বনের কাহিনী আশ্রয় করিয়া ইহা রচিত। সোমদেবের রচনায় বাণভট্টের কাদম্বরীর প্রভাব লক্ষণীয়।

জৈনগণের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও স্বীয় মতবাদ ও কৃষ্ণভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি চম্পূকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ৭০টি 'পূরণে' রচিত জীবগোস্বামীর 'গোপাল-

চম্পূ'র পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও উত্তরার্ধে মথুরা ও দ্বারকার লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপুরের ২২ স্তবকে রচিত 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'র বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবনস্থ নিত্যলীলা।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের 'চিত্রচম্পূ'তে বাংলার বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চম্বল যমুনার প্রধান উপনদী মাউ শহরের নিকটে ২২°২৭´ উত্তর ও ৭৫° ৩১´ পূর্বে অবস্থিত ৬০৫ মিটার (২০১৯ ফুট) উচ্চ জনপাও পর্বতে উৎপন্ন হইয়া মধ্য প্রদেশে ৩১২ কিলোমিটার (১৯৫ মাইল) অতিক্রম করিবার পর ইহা রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়াছে। বিন্ধ্য পর্বত হইতে নির্গত চম্বলা ও শিপ্রা ইহার প্রধান উপনদী। রাজপুতানায় চম্বল নদী একটি মালভূমির মধ্যে ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) প্রবাহিত হইবার সময়ে খরস্রোতা, কিন্তু [illegible] শহরের নিকটে ইহা প্রশস্ত ও শান্ত রূপ ধারণ করিয়াছে। অতঃপর দক্ষিণ হইতে কালীসিন্ধ ও পার্বতী এবং পশ্চিম হইতে বনাস্ আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর সু-উচ্চ শিলাপ্রাচীর ভেদ করিয়া ইহা ঢোলপুর শহরের দক্ষিণে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। নদীতীর অসংখ্য কন্দরের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ইহার কোন কোনটি ২৭ মিটার (৯০ ফুট) পর্যন্ত গভীর ও ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) পর্যন্ত দীর্ঘ। উৎপত্তিস্থল হইতে ১০৪০ কিলোমিটার (৬৫০ মাইল) পথ অতিক্রম করার পর ইহা এটাওয়া শহরের ৩৮ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দক্ষিণ পশ্চিমে যমুনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য নদীর ন্যায় চম্বল নদীতে বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকে। কিন্তু অন্য সময়ে ইহা অতি ক্ষীণকায়া হইয়া পড়ে। তখন সমগ্র অঞ্চল শুষ্ক হইয়া যায়। ফলে এই অঞ্চলে বর্ষাকাল ব্যতীত কৃষিকার্য সম্ভব নয়। অঞ্চলটিকে জলসিঞ্চিত করার জন্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশন এর পরিকল্পনা অনুসারে চম্বল নদীতে তিনটি বাঁধ ও একটি ব্যারেজ নির্মিত হইবার কথা আছে। অনুমান করা যায় যে ইহার ফলে বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর (১১ লক্ষ একর) ভূমিতে জলসেচনের দ্বারা ৪'৮২ লক্ষ মেট্রিক টন (৪ ৭৫ লক্ষ টন) খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে। তৎসহ ৩০১০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. X, Oxford, 1908.

উত্তরা বসু

চরক ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা গ্রন্থ। ইহার রচয়িতার নাম 'চরক' বলিয়া গ্রন্থখানির নামও 'চরকসংহিতা' বা সংক্ষেপে চরক। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে কায়-চিকিৎসা ও শল্য শালাক্য চিকিৎসা নামে যে দুইটি ধারা চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রথমোক্ত ধারাটির অন্যতম প্রবর্তক আত্রেয় মুনি। আত্রেয়ের অগ্নিবেশ, ভেড, জাতূকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত নামে ছয় জন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। ঐ ছয়জন ঋষিই নিজ নিজ নামে এক একখানি চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু যথাযথ সব গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। আলোচ্য 'চরকসংহিতা'খানি 'অগ্নিবেশসংহিতা'রই সংস্কৃত রূপ। এই গ্রন্থের অংশবিশেষ আত্রেয় ও অগ্নিবেশকে বক্তা ও শ্রোতা রূপে উল্লেখ করিয়া রচিত দেখা যায়। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ বচন হইতে জানা যায় অতি বুদ্ধিমান চরক অগ্নিবেশ রচিত গ্রন্থখানির অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত বিষয়কে স্পষ্ট ও বিস্তৃত এবং অতিবিস্তৃত বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করিয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করায় গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই গ্রন্থখানি 'চরকসংহিতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই অনন্তজ্ঞানের অধিকারী মহর্ষি চরক যে কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে উল্লিখিত কপিলবলের চরক উপাধি দেখিয়া কেহ কেহ 'চরকসংহিতা'কার বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তিনি সম্রাট কনিষ্কের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বর্তমানে উপলব্ধ 'চরকসংহিতা' আচার্য দৃঢ়বল চরকের পুনঃসংস্কৃত। এই গ্রন্থের সিদ্ধিস্থানের সপ্তদশ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশটি তাঁহারই রচিত। সম্ভবতঃ এই অংশটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল অথবা ছিল না। কেহ কেহ দৃঢ়বলকে কপিলবলের পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ উভয় নামে বল যুক্ত থাকাই ইহার কারণ। কিন্তু কপিলবল দৃঢ়বলের পিতা হইলে এবং 'চরকসংহিতা'র রচয়িতা হইলে দৃঢ়বল নিশ্চয়ই কপিলবলের নামোল্লেখ করিতেন। এইসকল তথ্য হইতে অনুমিত হয় যে সংহিতাকার মহর্ষি চরক এই চিকিৎসককুলের গোত্রপ্রবর্তক ছিলেন এবং তদীয় বংশধরেরা চরক উপাধিধারী ছিলেন। দৃঢ়বল চরক ব্যতীত এই বংশীয় অপর কেহ ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না।

চরকসংহিতাকে আটটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান,

চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান, ও সিদ্ধিস্থান। এই আটটি স্থানের বক্তব্য বুঝিবার জন্য তিন প্রকারের নির্দেশ দেওয়া আছে। গুরু-সূত্র, শিষ্য-সূত্র ও প্রতিসংস্কার সূত্র বা একীয় সূত্র। অর্থাৎ কোনও হেতু না দেখাইয়া যে অংশ আদিষ্ট তাহাই গুরুসূত্র, প্রশ্ন ও উত্তরের ক্রমে সাজাইয়া যাহা নির্দিষ্ট তাহাই শিষ্য সূত্র এবং উভয় ধারার সমন্বয় বিধানের জন্য সব দিক বিবেচনা করিয়া যাহার উল্লেখ হইয়াছে তাহাই একীয় সূত্র বা প্রতিসংস্কারক সূত্র।

সমগ্র গ্রন্থের রচনাশৈলীতে বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। প্রথমেই সূত্রস্থানে খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ ভেদে দ্রব্যবিজ্ঞান অভিহিত হইয়াছে। খনিজ দ্রব্যগুলিকে পুনরায় পৃথকভাবে ক্রমবিন্যস্ত করা হইয়াছে। এইরূপে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যগুলিও বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুৎ ও ওষধি — এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি দ্রব্যকে বিভিন্ন শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়া বস্তুর ভ্রান্তি নিরাস করা হইয়াছে। দ্রব্যগুলির রোগ-অপনোদনে উপযুক্ত প্রয়োগ, মিশ্রণজ ফল ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাণীজ দ্রব্যগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, ও স্বেদজ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই ত্রিবিধ প্রাণজ দ্রব্যের আবির্ভাব, প্রকৃতি, অবস্থান এবং অন্য প্রাণীর দেহে জীবন্ত ও মৃত অবস্থায় প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহারও বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় নিদানস্থান। এখানে ব্যাধির লক্ষণ বা পরিচয় বক্তব্য। কোনও ব্যাধি কারণ বিনা বাহ্যরূপে লক্ষণ প্রকাশ করে না, সেই কারণগুলি কিরূপে অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহার মুখ্য ও গৌণ কারণ কিরূপে নিহিত থাকে এবং সংক্রমিত হয়, প্রসর্পিত হয়, পরিবর্তিত হয়, সংকর রূপ ধারণ করে, মুখ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া পরে গৌণকে প্রধান করিয়া মুখ্যটি অন্তর্হিত হয়, অপরের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কোন স্থানে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে — এ সমস্তের বিশদ পরিচয় এই নিদানস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

তৃতীয়, বিমানস্থান। এই বিভাগে মানবীয় দেহ ও মনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভৌতিক দেহ ও মনের উপাদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পরিবেশ, আচরণ প্রভৃতি বোধের জন্য ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিগত রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিচিত্র পরিবেশ, তাহাদের প্রভাব, তাহাদের যোগজ ক্রিয়া এবং মানবদেহ ও মনে তাহাদের প্রতিক্রিয়া এবং ভাবী কালে কিরূপ ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয় ও হইতে পারে সে বিষয়ে উদাহরণসহ বিশদ ও বিপুল পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রাসঙ্গিকরূপে এ অধ্যায়টিতে তৎকালের রাজতন্ত্র ও জনপদের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনই সমাজতন্ত্র, মনঃসমীক্ষার পদ্ধতি এবং মনোবিচারণের পদ্ধতিও জানা যায়। তদ্দ্বারা দৈহিক ব্যাধিগুলির উপাদান, নিয়মন এবং প্রশমনের ক্ষেত্রে অবলম্বনীয় নীতি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-গবেষণার ক্ষেত্রগুলি কিরূপ হইতে পারে তাহাও জানা যায়।

চতুর্থ শারীরস্থান। এই অধ্যায়টি এক বিস্ময়কর রচনা।

পঞ্চম ইন্দ্রিয়স্থান। চরকসংহিতার ইন্দ্রিয়স্থানে দেখানো হইয়াছে যে শরীরে ও মনে একটি বা কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে, দেহীর অদূর ভবিষ্যতে অথবা দূর ভবিষ্যতে কোনও বিশেষ ব্যাধি প্রকাশিত হইবে অথবা তাহার মৃত্যু অবধারিতভাবে ঘটিবে কি না।

ষষ্ঠ চিকিৎসাস্থান। মানবদেহে কত প্রকারের ব্যাধি জন্মিতে পারে এবং সেগুলি কি কি উপায়ে প্রশমিত হয়, কোন্গুলি অসাধ্য, কোন্গুলি সাধ্য, কোন্গুলি যাপ্য তাহার বিস্তৃত পরিচয় দান করা হইয়াছে। ভৈষজ্য-বিদ্যার নিয়ন্ত্রণ, ভৈষজ্য বিদ্যার উপাদান, ভেষজ ও ধাতব মিশ্রণে কেমন ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহারও বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তম ও অষ্টম স্থানদ্বয়ে কায়চিকিৎসকের শেষ একান্তভাবেই অনুসরণীয় কর্মের উপদেশ আছে। রোগীর আকস্মিক সংকটকালে চিকিৎসকের পক্ষে হতবুদ্ধি হইয়া পড়া স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় ভিষকের কি করণীয় তদ্বিষয়ে সপ্তম ও অষ্টম স্থানে সাবধানে ও আনুপূর্বিক উপদেশ ও নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

মহামতি চরক তাঁহার বিশাল গ্রন্থে চিকিৎসাশাস্ত্র, তাহার দর্শন, রোগ ও রোগের আরোগ্য — এই চতুর্ব্যূহ লইয়াই আরম্ভ ও সমাপ্তির নির্দেশ করিয়া বিষয় বিভাগে শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি জন্মাইয়াছেন। দর্শনবাদ চরকের এই চতুর্ব্যূহবাদের অন্যতম। এই বাদে তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রাণিদেহের আগমন, অবস্থান, রোগসংক্রমণ ও আরোগ্যের বিবরণ দিয়া মোক্ষের সাধনাই চরকীয় দর্শন। প্রাণিদেহের আগমন ও অবস্থানের মধ্যবর্তী কাল আয়ু বা জীবন। এই অংশে তিনি জীবন ও দেহের অভিন্নভাব স্থাপন করিয়া একটি আয়ুঃপুরুষবাদের স্থাপনা করিয়াছেন। ইহার অপর নাম দিয়াছেন আয়ুর্বাদ। ইহাকে যিনি জানিতে পারেন তিনিই আয়ুর্বাদবেত্তা আয়ুর্বেদিক। অতঃপর আয়ুঃপুরুষ-বাদের অন্তর্গত করিয়া কর্মফলবাদ, আত্মবাদ অথবা রাশি-

পুরুষবাদ অথবা চেতনাষষ্ঠীবাদের প্রবর্তন করিয়া একটি নূতন দর্শনবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে চরক সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন 'আয়ু' একটি সংযোগ-ক্রিয়া হইলেও তাহা আকস্মিক নয়, উহা অদৃষ্টজন্য, উক্ত অদৃষ্টই অচেতন দেহ এবং সচেতন আত্মার সহিত অভেদ ঘটাইয়া থাকে। এজন্য আত্মা দেহের পরিমিতি, অবয়ব ও আবস্থানিক পরিমণ্ডলের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। চরকের এই আয়ুঃপুরুষবাদ নামক দার্শনিক মতবাদটি 'আস্তিক' যৌগিক ও সাংখ্যিক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করিয়া বস্তুবাদের অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ভট্টার হরিচন্দ্ররচিত 'চরকটীকা', নবম শতাব্দীর আষাঢ়বর্মা রচিত 'পরিহার বার্তিকা' ও দশম শতকের জেজ্জট নির্মিত 'নিরন্তরপদব্যাখ্যা' প্রাচীন টীকাগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঐ সময়ে 'কার্তিককুণ্ড', 'গয়দত্ত', 'তীসট' এবং 'চন্দ্রট' এর চরকটীকাও নির্মিত হয়। এইগুলির মধ্যে কয়েকখানির পুঁথি লাহোর, তিরুমনগরম, বারাণসীর সরস্বতী গ্রন্থাগারের পুঁথি বিভাগে বিদ্যমান আছে। অন্যগুলি বোম্বাই ও পুনা হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। একাদশ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার খ্যাতনামা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত চরকের একখানি মনোজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। ষোড়শ শতকে বাংলার আরও একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক শিবদাস সেন চরকের উপর 'তত্ত্বপ্রদীপিকা' টীকা প্রণয়ন করেন। ঊনবিংশ শতকে বাংলার গঙ্গাধর রায় 'জল্পকল্পতরু' নামে বিশদ আলোচনাসহ একখানি টীকা নির্মাণ করেন। বিংশ শতাব্দীতে যোগীন্দ্রনাথ সেন 'চরকোপস্কার' নামে একটি সংক্ষিপ্ত সরল টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সন্দর্ভলেখকও 'ঠাকুর টীকা' নামে চরকের বিবৃতিমূলক একটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

দ্র A B Keith, *A History of Sanskrit Literature*, Oxford, 1923, Prafullachandra Ray, *History of Hindu Chemistry*, Calcutta, 1903-25,
R. C Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vol II, Bombay, 1953

কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী

চরক কতকাল পূর্বে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে একজন চরকের উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন— সংহিতাকার চরক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী। আবার বৌদ্ধ ত্রিপিটকের চীনা অনুবাদের সাক্ষ্য অনুসারে অনেকে স্থির করিয়াছেন চরক ছিলেন খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে কুষাণরাজ কনিষ্কের রাজবৈদ্য। চরকাচার্য এবং নবীন চরক নামে দুই ব্যক্তির অস্তিত্বও কেহ কেহ স্বীকার করেন।

চরকের নাম দেশবিদেশের প্রাচীন গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার উক্তি প্রমাণরূপে স্বীকৃত পাইয়াছে। মধ্য এশিয়ার মিন্দাক প্রদেশে আবিষ্কৃত 'নাবনীতক' নামে এক চিকিৎসাগ্রন্থের পুঁথিতে যে সকল মন্তব্য আছে, সেগুলি চরকের উক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। 'নাবনীতক' খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পরে রচিত নয়। সে সময়েই এই দেশেও চরকের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছিল। ৭ম ৮ম শতকে আরব দার্শনিকদিগের অভ্যুদয় যুগে আরবী ও ফারসী ভাষায় চরকসংহিতার অনুবাদ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আরবীতে চরকের নাম 'সরক'। ৯ম শতকে 'রাজী' নামে এক আরবী চিকিৎসক তাঁহার গ্রন্থে 'চরকসংহিতা' উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবুসীনা, অবরুসী ও অবুসরাবী নামে আরবী চিকিৎসা গ্রন্থের লাতিন অনুবাদে একাধিকবার চরকের উল্লেখ পাওয়া যায়। অলবেরুনী চরকের সর্পচিকিৎসা প্রকরণের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তারীকনামার উক্তি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার গ্রন্থশালায় 'চরকসংহিতার একখানি অনুবাদ রক্ষিত ছিল। ইহা ছাড়া এক হাজার বৎসর পূর্বে লিখিত 'জ্বরসমুচ্চয়' এবং পরবর্তী কালের প্রায় সমস্ত আয়ুর্বেদ গ্রন্থে চরকের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

চরক উপদেশ দিয়াছেন— আতুরের আরোগ্যের জন্য চিকিৎসক সমস্ত অন্তর দিয়া যত্ন করিবেন, নিজের জীবন সংশয় উপস্থিত হইলেও রোগীর অপকার হয় এমন কোনও কাজ করিবেন না। রোগীর পারিবারিক বৃত্তান্ত কখনও বাহিরে প্রকাশ করিবেন না। ইহাই হইল চরকের বৈদ্যনীতি।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

চরকা আন্দোলন চরকা দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত সুতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহার প্রচলন অত্যন্ত কমিয়া যায়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের পাশাপাশি গান্ধীজী ইহার পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলন শুরু করেন।

চরকা আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজী এক বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত হইলে

চরকা আন্দোলন

জনসাধারণের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার সংরক্ষিত হয় ও প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক বিকাশের সুযোগ লাভ করে। গান্ধীজী তাঁহার এই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার নাম দিয়াছিলেন 'সর্বোদয়'। 'হিন্দ স্বরাজ্য' (১৯০৯ খ্রী) পুস্তকে গান্ধীজী চরকা দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্রসমস্যার সমাধান করা যায় বলিয়া মন্তব্য করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া সবরমতী আশ্রমে তিনি নিজ অনুগামীদের মধ্যে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে চরকার সাহায্যে সর্বপ্রথম খদ্দর উৎপাদন করেন।

সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে চরকার কাজ সংগঠিত করিবার জন্য কোকোনদ কংগ্রেসের প্রস্তাবক্রমে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'খাদি বোর্ড' এবং তাহার পর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর 'অখিল ভারত চরকা সংঘের' প্রতিষ্ঠা হয়। শেষ জীবনে গান্ধীজী বিচ্ছিন্নভাবে খাদির কার্য না চালাইয়া তাঁহার আদর্শ সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে খাদিসহ অপরাপর গঠনমূলক কার্যের প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন বোধ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি তাঁহার আকস্মিক পরলোকগমনের জন্য তাঁহার জীবিতকালে তাহা সম্ভবপর না হইলেও ঐ বৎসর মার্চ মাসে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত গঠনমূলক কর্মী-সম্মেলনে এই জাতীয় এক প্রতিষ্ঠান — 'সর্বসেবা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'চরকা সংঘ'-সহ গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত গঠনমূলক কাজের যাবতীয় অখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ইহার সদস্য হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চরকা সংঘ সম্পূর্ণভাবে সর্বসেবা সংঘের মধ্যে আত্মবিলোপ করে। বর্তমানে সর্বসেবা সংঘের 'খাদি গ্রামোদ্যোগ গ্রাম স্বরাজ সমিতি' খাদিকার্যের নীতিনির্ধারণের জন্য ভারপ্রাপ্ত উপসমিতি।

স্বাধীনতাসংগ্রামের পাশাপাশি গঠনমূলক কাজ হিসাবে চরকা সংঘের কাজ বিকশিত হয়। স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে সমগ্র দেশে যে পরিমাণ খদ্দর উৎপন্ন হইত তাহার মূল্য ছিল ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। খদ্দর বা খাদি বলিতে কার্পাস, রেশম ও পশমের হাতে-কাটা ও হাতে-বোনা কাপড় বোঝায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর গঠনমূলক কর্মীদের প্রভাবে সরকার খাদির বিকাশের জন্য সাহায্য দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইহার ফলে ভারত সরকার ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অখিল ভারত খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড' স্থাপনা করেন, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে একটি সংবিধিবদ্ধ কমিশনের রূপ দেওয়া হয়। রাজ্যসরকার-গুলিও অনুরূপভাবে নিজ নিজ রাজ্যে এই কার্য করিবার জন্য 'সংবিধিবদ্ধ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষৎ'-এর স্থাপনা করিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ হইল খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের প্রবর্তন দ্বারা অধিকতম কর্মসংস্থান করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধভুক্ত দাতব্যপ্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতিসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দেওয়া। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী (১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দ বাদে) পরিকল্পনাকালে সরকার খাদির উন্নয়নের জন্য ১৪৬·৮২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন ও ইহার ফলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বৎসরে মোট প্রায় ২৩ কোটি টাকা মূল্যের খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই কার্যের দ্বারা ১৯ লক্ষ জনেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান সম্ভবপর হইয়াছে। চতুর্থ পরি-কল্পনাকালে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প-কমিশনের লক্ষ্য হইল ৫০ কোটি টাকা মূল্যের ২৫ কোটি বর্গমিটার খদ্দর উৎপাদন করা এবং দেশের ২৫০০০ গ্রামে খাদির বিকাশসাধন করা। সাম্প্রতিক কালে অম্বর চরকার আবিষ্কার (১৯৫৬ খ্রী) খাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা কাটুনিদের পক্ষে একটা ন্যূনতম মজুরি পাওয়াও সম্ভবপর হইয়াছে। বর্তমানে চার, ছয় ও আট টাকুর অম্বর চরকা পাওয়া যায়।

সম্প্রতি খাদিকার্যের সাংগঠনিক রূপের একাধিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'নয়া মোড়' ও পরবর্তীকালীন 'গ্রাম একাই' ও 'সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা' (ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম) অন্যতম। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে আচার্য বিনোবা ভাবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত খাদিকর্মীদের সম্মেলনে খাদির উপর সরকার-প্রদত্ত রিবেটের পরিবর্তে বিনা ব্যয়ে চরকায় কাটা সুতা বুনাইয়া দিবার সিদ্ধান্তটিও এই একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। অবশ্য এইসব বাহ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও চরকা আন্দোলনকে তাহার মূল আদর্শের সন্নিকটবর্তী করিবার জন্য এখনও বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন।

দ্র মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, হিন্দ স্বরাজ্য, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত -অনূদিত, কলিকাতা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, Richard B Gregg, *Economics of Khaddar*, Ahmedabad, 1927|, M. K Gandhi, *Economics of Khadi*, Ahmedabad, 1941; J. C. Kumarappa, *Economy of Permanence*, Wardha, 1946, 1948; J. C Kumarappa. *Why the Village Movement?* Varanasi, 1958; Richard B. Gregg, *Which Way Lies Hope*, Ahmedabad, 1958; Richard |B. Gregg, *A Philosophy of Indian Economic Development*, Ahmedabad, 1958.

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চরণদাসী ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়। আলওয়ার জেলার দহরা নামক স্থানে রণজিৎ (জন্ম ১৭০৩ খ্রী) নামে এক উদাসী থক্ক চরণদাস নামে দীক্ষিত হইবার পর লোক-সমাজে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গুরুপ্রদত্ত নামে সম্প্রদায়টি পরিচিত হইতে থাকে। দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলেই ইহার অনুগামীগণ ও গদিগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রদায়ের অনুগামীদের সংখ্যা অল্প হইলেও হিন্দী ভাষায় ভাগবত ও গীতা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের নিগূঢ় ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক কবিতাদি রচনার জন্য চরণদাস ও তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ও শিষ্যা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হিন্দী ভাষার প্রসারের জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবীর ও নানকের ন্যায় এই সম্প্রদায় গুরু ও নামশক্তির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গুরুর মধ্যেই সকল শক্তি নিহিত এবং তিনিই মোক্ষলাভের উপায়, নাম গানেরও গুহ্য শক্তি আছে। ইঁহারা নিজেদের শব্দ মার্গের অনুগামী বলিয়া থাকেন। শব্দ বা নামই ব্রহ্ম, ইহা শুধু অক্ষর বা ধ্বনি নহে, ইহা পরব্রহ্মস্বরূপ। মনকে অন্তর্মুখী করিয়া হরি বা রামনাম গান করিতে করিতে ধ্যানে বিলীন হইতে পারিলেই তাঁহার সাযুজ্য লাভ হয়। বেদ-পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস, মূর্তিপূজা ও তীর্থ ভ্রমণ কতকাংশে কাজের হইলেও গুরুকৃপা লাভ করিয়া নামরসের মধ্যে ডুবিয়া সাধনার সহিত সেগুলি সমতুল্য নহে। মিথ্যাকথন, পরনিন্দা, কটুভাষণ, অনর্থক বচন, পরদ্রব্যহরণ, পরস্ত্রীগমন, জীবহনন, অনিষ্টকল্পনা, দ্বেষ ও অহংকার প্রভৃতির বর্জন এই সম্প্রদায়ের অবশ্য-আচরণীয় নীতি। সম্প্রদায়ে গৃহী ও সন্ন্যাসী দুইই আছে। সন্ন্যাসীগণ পীতবস্ত্র পরিধান করেন, ললাটে চন্দন বা গোপীচন্দনের ঊর্ধ্বরেখা, কণ্ঠে ও গলদেশে তুলসীকাষ্ঠের মালা, মস্তকে পীতবর্ণ বস্ত্রবেষ্টিত কোণাকৃতি ক্ষুদ্র টুপি ও হস্তে তুলসীর জপমালা ধারণ করেন।

চরণদাস ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। তিনি ভক্তি-সাগর, জ্ঞান-স্বরোদয়, সন্দেহ-সাগর, ধর্মজাহাজ, ব্রহ্মবিদ্যা-সাগর ও নাসিকেতোপাখ্যান (নচিকেতা-উপাখ্যান) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত তিনি ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্গীতার কিছু কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার শিষ্যাদের মধ্যে সহজী (সহজা?)-বাই ও দয়াবাই ভক্তিরসাশ্রিত কবিতাদি রচনার জন্য কবি হিসাবে হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭০।

চরিত্র ব্যক্তিত্ব দ্র

চরু শাস্ত্রীয় প্রণালীতে পক্ব, যজ্ঞের আহুতি দ্রব্যরূপে ব্যবহার্য, দুগ্ধমিশ্রিত, ঘৃতসংযুক্ত তণ্ডুল বা যবাদিশস্যজাত অন্ন। ইহার প্রধান উপকরণ হইতেছে তণ্ডুল, যব, গবেধুকা (একপ্রকার নিকৃষ্ট ধান্য)। বিশেষ বিশেষ যাগে, বা দেবতাবিশেষের জন্য বিশেষ উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত চরু ব্যবহৃত হয়, যেমন 'গবেধুক চরু' পশুপতি রুদ্রদেবকে প্রদান করিতে হয় (শতপথব্রাহ্মণ ৫।৩।৩।৭)। যে মৃন্ময় বা তাম্রনির্মিত পাত্রে চরু প্রস্তুত হয় উহার নাম চরুস্থালী। অধ্বর্যু নামক ঋত্বিক্ চরু পাক করিয়া থাকেন। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ধান্য হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া উহা দ্বারা চরু পাক করিতে হয়। চরুস্থালীর মধ্যে তণ্ডুল, তদুপযুক্ত দুগ্ধ, কিয়ৎপরিমাণে জল দিয়া অন্তরোষ্ম পক্ব (ভাপে তৈয়ারি) অন্নকে সুসিদ্ধ করা হয়। ইহা অতিশয় কঠিন অথবা শিথিল করিতে নাই, লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন চরু আগুনে পুড়িয়া না যায়, চাউলগুলি আস্ত থাকে এবং গলিয়া জল ও দুধের সঙ্গে মিশিয়া না যায়। পাক সমাপ্ত হইলে চরুর উপরে আজ্যধারা (গলানো ঘি) নিক্ষেপ করিয়া পক্ব চরু অগ্নি হইতে উঠাইয়া রাখিতে হয়। ইহার পর এই চরু দ্বারা হোমকার্য সম্পন্ন হয়।

বহু স্মার্তকর্মে (গৃহ্যকর্ম) চরুহোমের বিধি আছে। বিবাহে চরুপাক নাই, তবে বিবাহের পর চতুর্থী কর্মে চরুপাক করা হয়। সীমন্তোন্নয়ন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও গৃহপ্রবেশে (শালাকর্ম) চরুহোমের বিধি আছে। বৃষোৎসর্গে চরুহোম বিহিত। ইহা ছাড়া কাম্য চরুহোমেরও ব্যবস্থা আছে। নিরগ্নিক যজমান পুত্রকামনায় এবং আয়ুষ্কামনায় চরুহোম করিতে পারেন (আশ্বলায়ন গৃহ্যকারিকা)।

দ্র ভটকুমারিল স্বামী, আশ্বলায়ন গৃহ্যকারিকা, বোম্বাই, ১৯০৯, বিধুশেখর ভট্টাচার্য-অনূদিত, মাধ্যন্দিন শতপথ-ব্রা°, সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ২৮, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামেন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, Macdonell, & Keith, *Vedic Index*, vol I, Varanasi, 1958; Eggeling Julius, *Satapatha Brahmana*, parts I & II, Delhi, 1963.

সুরেন্দ্র প্রসাদ নিয়োগী

চর্বি, মেদ স্নেহ পদার্থ বিশেষ। ইহা প্রাণীদেহের

মেদ-টিস্যুতে সঞ্চিত থাকে। এই মেদ বৃক্কের চারি পাশে, উদর-গহ্বরের ঝিল্লিতে, জননাঙ্গের নিকটে এবং উপত্বক ও পেশীর ফাঁকে ফাঁকে ছড়াইয়া আছে। প্রাণীভেদে ও দেহের স্থানভেদে মেদে চর্বির রাসায়নিক প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যের জন্য সমশ্রেণীভুক্ত প্রাণীর চর্বিতেও কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

কেবল খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত তৈল, চর্বি প্রভৃতি স্নেহপদার্থ হইতেই নহে, উপরন্তু খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট নামক উপাদান হইতেও দেহে চর্বি উৎপন্ন হইতে পারে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালরি-যুক্ত খাদ্য আহার করিলে উদ্বৃত্ত খাদ্য প্রধানতঃ চর্বিরূপে দেহে সঞ্চিত হয়। প্রয়োজনের সময় দেহে সঞ্চিত চর্বির জারণের (অক্সিডেশন) ফলে প্রতি গ্রাম চর্বি হইতে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দেহের ভিতরে বিভিন্ন অঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ করিয়া সেগুলিকে যথাস্থানে রাখিবার কার্যে ও দেহের উত্তাপনিয়ন্ত্রণের কার্যে চর্বি সাহায্য করিয়া থাকে।

কঠিন পরিশ্রম, উপবাস প্রভৃতি অবস্থায় যখন গ্লুকোজ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় না, তখন মেদে সঞ্চিত চর্বি হইতে চর্বিজাতীয় অ্যাসিড বাহির হইয়া রক্তের সাহায্যে যকৃতে পৌঁছায়, যকৃতে জারণের ফলে এই অ্যাসিডগুলি কিটোন-জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় ও শক্তির উৎপাদন ঘটায়। কিটোন-জাতীয় পদার্থগুলি যকৃতে জীর্ণ হয় না, রক্তের দ্বারা পেশী ও অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছিয়া সেখানে জারিত হয়। যকৃতে অত্যধিক মাত্রায় চর্বিজাতীয় অ্যাসিডের জারণ হইতে থাকিলে রক্তে কিটোন-জাতীয় পদার্থের আধিক্য ঘটে।

দেহে অত্যধিক চর্বি জমিলে মেদরোগ হয়। ইহার প্রধান কারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ। কতিপয় হর্মোনের বৈকল্যের ফলেও মেদরোগ ঘটিতে পারে।

পিটুইটারি গ্রন্থির বৃদ্ধিকারক হর্মোন (গ্রোথ হর্মোন), অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন প্রভৃতি হর্মোন ও রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মেদে অবস্থিত চর্বির ভাঙাগড়া নিয়ন্ত্রণ করে।

পরিমলবিকাশ সেন

চর্ম পশুদেহের বহিরাবরণ। পশুদেহে চর্ম তিন প্রকার টিস্যুর দ্বারা গঠিত— বহিস্ত্বক, অন্তস্ত্বক ও উপত্বকের মেদ-টিস্যু ('ত্বক' দ্র)। পশুচর্মের অন্তস্ত্বকই শিল্পে চামড়া হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শিল্পে ব্যবহৃত চর্মের মধ্যে গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও উহাদের শাবকের চর্মই উল্লেখযোগ্য। কুমির, হরিণ, সীল, ঘোড়া, সাপ, কাঙারু প্রভৃতির চামড়াও কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চামড়া হইতে নানা প্রকারের পাদুকা, উট বা অশ্বের সাজ, সুটকেস ও বিভিন্ন প্রকারের ব্যাগ, দস্তানা, পরিধেয় বস্ত্রাদি, ক্রীড়া-সামগ্রী, বই বাঁধাইয়ের সরঞ্জাম ও বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়।

চামড়া বলিতে সাধারণতঃ কাঁচা ও পাকানো উভয় প্রকার চামড়াকেই বুঝায়। কাঁচা চামড়া স্বভাবতঃই পচনশীল। সংগ্রহের পরেই শুকাইয়া বা শুধু লবণ মাখাইয়া ইহাকে সাময়িকভাবে পচন হইতে রক্ষা করা হয়। এই অবস্থায় চামড়া পাকাইয়ের জন্য আসে। চামড়া পাকাই-বার পূর্বে কয়েকটি প্রাথমিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমে চামড়াকে নরম করিবার জন্য জলে ভিজাইতে হয়। অনেক সময় পচন নিরোধের জন্য জলে সোডিয়াম সাল্‌ফাইড, কস্টিক সোডা প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ মিশানো হইয়া থাকে। ইহার পর চামড়াটিকে চুনের জলে ডুবাইয়া লোম আলগা করা হয় এবং লোমগুলি চামড়া হইতে চাঁচিয়া ফেলা হয়। তাহার পর সদ্য গোলা চুনের জলে চামড়াটিকে পুনরায় ডুবাইয়া রাখা হয়, ফলে উহা কিঞ্চিৎ ফুলিয়া ওঠে। চামড়ার গায়ে যে সমস্ত মাংস লাগিয়া থাকে সেগুলি ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলা হয়। ইহার পর অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও বোরিক অ্যাসিড প্রয়োগে চামড়া হইতে চুন নিষ্কাশন করা হয়। জীবাণুর সাহায্যে চামড়ার ভিতরের জালির মধ্যে অবস্থিত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নষ্ট করিতে হয় (বেটিং)। ইহার পর ছুরি দিয়া চাঁচিলে চামড়া হইতে বহু ক্লেদ বাহির হইয়া আসে। চুন তাড়ানো ও বেটিং-এর পর চামড়াকে সময় সময় লবণ ও সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের জলে ডুবানো হয় (পিকলিং)। তখন চামড়াটি পাকাই-এর জন্য তৈয়ারি হয়।

পাকাই বলিতে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে চামড়ার বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন বুঝায়। পাকাই সাধারণতঃ দুই প্রকারের— ছাল পাকাই ও ক্রোম পাকাই। ছাল পাকাই-এ চামড়াকে ট্যানিন নামক উপক্ষারপূর্ণ গাছের ছাল, কাঠের নির্যাস (যেমন— ওক কাঠের নির্যাস) প্রভৃতির সাহায্যে পাকানো হয়। ক্রোম পাকাই-এ দ্রবীভূত সোডিয়াম বা পটাসিয়াম -ডাইক্রোমেট এবং অন্যান্য খনিজ লবণের সাহায্যে চামড়া পাকানো হয়; গ্লেস কিড ও অন্যান্য নরম ও হালকা চামড়ার পাকাই-এ বর্তমানে এই পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রযুক্ত হয়। ইহা ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম, জার্কোনিয়াম প্রভৃতি ঘটিত লবণের দ্বারাও চামড়া পাকানো সম্ভব। পাকাই-এর ফলে চামড়ার নমনীয়তা,

স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি গুণ বিকশিত হয়, জীবাণুঘটিত পচন নিবারিত হয় এবং জলবায়ুর তারতম্য সহিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পাকাই-এর কাজ সুসম্পন্ন হইলে চামড়াটিকে ছিলিয়া, রঙ ও চর্বি খাওয়াইয়া এবং ঘষিয়া মসৃণ করিয়া শুকানো হয়। পরে যন্ত্রের সাহায্যে নরম করিয়া পালিশ করা হয়।

ভারতে বহু কাল হইতে বাদ্যযন্ত্র, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য চামড়া ব্যবহৃত হইত। এদেশে বিশেষ একটি জাতির উপরে চর্ম শোধন ও চর্মদ্রব্য প্রস্তুতের ভার ছিল। পাশ্চাত্য দেশে চর্মের ব্যবহার অনেক বেশি হইত এবং চর্মশিল্পও অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহার অনুকরণে ভারতে চর্মশিল্প ও চর্ম উৎপাদনের কারখানা গড়িয়া ওঠে। এক সময়ে ভারত হইতে শুধু কাঁচা চামড়া রপ্তানি হইত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এদেশে চামড়া শোধনের কাজও আরম্ভ হয়। মাদ্রাজের ছাল পাকাই চামড়া ও কলিকাতার ক্রোম পাকাই চামড়া আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে স্থান লাভ করে। এই দুই প্রকার চামড়া যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। বর্তমান কালে কাঁচা চামড়া রপ্তানির উপর নানা প্রকার বাধা নিষেধ থাকায় 'ক্রোম ব্লু' নামে পরিচিত নূতন ধরনের আধা-তৈয়ারি চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইতে শুরু হইয়াছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২০.৭০ লক্ষ গো চর্ম, ২২.৬৯ লক্ষ ছাগচর্ম ও শাবচর্ম (কিড স্কিন), ১৬.০০ লক্ষ মেষচর্ম এবং ৬.১৭ লক্ষ মহিষচর্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬৫-৬৬ আর্থিক বৎসরে ভারত হইতে ৯৫৫১৮৩৬ টাকা মূল্যের কাঁচা চামড়া, ২৮২১৪৬৩৭৫ টাকা মূল্যের পাকাই চামড়া এবং ২৩০৫১০৬ টাকা মূল্যের চর্মদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি হয়। ঐ সময়ে শুধু চামড়ার জুতা রপ্তানি হইয়াছিল ২৫০৭৮৬৮ জোড়া, ইহার মূল্য ছিল ৩২০৫৭৮২০ টাকা।

কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে চর্মপ্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণকেন্দ্র আছে। ভারত সরকার মাদ্রাজে চর্মশিল্প সম্বন্ধে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। 'চর্মশিল্প' দ্র।

মণি বন্দ্যোপাধ্যায়

চর্মরোগ ত্বকের বিভিন্ন প্রকারের রোগ। ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত চর্মরোগগুলি প্রধান।

পাঁচড়া : সংক্রামক রোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই রোগের সম্ভাবনা বেশি। এই রোগে আকারস স্কাবিএই (*Acarus scabiei*) প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণী রোগীর ত্বকের উপরিভাগে নালা কাটিয়া ডিম পাড়ে। খুব বেশি চুলকানির ফলে পাকিয়া ইহাতে পুঁজ হইতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চিকিৎসার প্রথম ও মূল সোপান। ইহা ছাড়া সালফার মলম, বেন্‌জিল বেন্‌জোয়েট ইমাল্‌শন অথবা ক্রোটামিটন ক্রীম ব্যবহার করা হয়।

উকুন : মাথায়, গায়ে অথবা তলপেটের নীচে চুলের গোড়ায় আশ্রয় লয়। ডি.ডি.টি. লোশন প্রয়োগ ও পরিচ্ছন্নতা ইহার প্রতিকারের উপায়।

খোস : স্ট্যাফাইলোকক্কাস ও স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস জীবাণুর দ্বারা ইহা সংক্রামিত হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের মুখের উপর বেশি দেখা যায়। অ্যান্টিবায়োটিক ও বীজবারক (অ্যান্টিসেপ্‌টিক) ঔষধের দ্বারা সহজেই এ রোগ সারানো যায়।

দাদ : ইহা ছত্রাকের সংক্রমণের ফলে হইয়া থাকে। দেহের বিভিন্ন স্থানে দাদ হইতে পারে। হুইট্‌ফিল্‌ড মলম এবং গ্রিসিয়োফালভিন এই রোগে খুবই কার্যকর।

ছুলি : ছত্রাকের সংক্রমণের ফলে জন্মিয়া থাকে। ইহাতে ত্বকে শাদা শাদা দাগ পড়ে। ছুলি সাল্‌ফার-জাতীয় মলমে সারিয়া যায়।

খুশকি : ত্বকের সিরাম ক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলির অস্বাভাবিক ক্রিয়া বৃদ্ধির ফলে খুশকি হইয়া থাকে। খুশকি হইতে এক প্রকার একজিমা (সিবোরিক ডার্মাটাইটিস) দেখা দিতে পারে। নিয়মিত শ্যাম্পু দ্বারা মাথা পরিষ্কার করিলে খুশকি সারিয়া যায়।

কাউর (একজিমা) : ইহা কোনও জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হয় না এবং সংক্রামক রোগও নহে। একজিমা নানা প্রকারের হইতে পারে, অধিকাংশের কারণ জানা যায় নাই। বিভিন্ন উদ্ভিদ, ফুল, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ প্রভৃতির প্রভাবে একজিমার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেক সময় মানসিক অবস্থা ও বংশগতির (হেরিডিটি) প্রভাবে একজিমা ঘটিতে পারে।

শ্বেতি : সংক্রামক ব্যাধি নহে। পেটের অসুখ ব্যতীত এই রোগে স্বাস্থ্যের অপর কোনও অবনতি ঘটে না। কারণ অজ্ঞাত, চিকিৎসাও আশাপ্রদ নয়, তবে অল্প বয়সে হইলে এবং অল্পদিনের অসুখ হইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা আছে।

ব্রণ : সাধারণতঃ যৌবনের প্রারম্ভে এবং কখনও কখনও অধিক বয়সেও দেখা দেয়। ইহার ফলে মুখে বিশ্রী দাগ হইতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অত্যধিক মিষ্ট দ্রব্য ও ঘি-এর ব্যবহার এই রোগের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। ব্রণ হইলে মুখের ত্বকের যত্ন লওয়া এবং ত্বক পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া সালফার-জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আমবাত . এক প্রকার অ্যালার্জি। আমবাতে শরীর চুলকাইলে লাল চাকা চাকা দাগ হইয়া ফুলিয়া ওঠে। এই রোগে ত্বকে হিস্টামিন-জাতীয় পদার্থ নির্গত হয়, সেজন্য হিস্টামিন নাশক (অ্যান্টিহিস্টামিন) ঔষধে ইহার দ্রুত উপশম হয়।

সোরাইয়াসিস (Psoriasis) সংক্রামক ব্যাধি নহে। কারণ অজ্ঞাত। এই রোগে ত্বকে দাগ হয় এবং তাহা হইতে রুপালি চাকা চাকা ছাল উঠিয়া যায়। কখনও ইহার সহিত আর্থ্রাইটিস হইতে পারে। শীতে সোরাইয়াসিসের প্রবলতা বাড়ে। আলকাতরা-বর্গীয় অথবা কর্টিকোস্টেরয়েড জাতীয় মলমে ইহার সাময়িক উপশম হয়।

চর্মের ক্যান্সার ভারতে খুব কমই দেখা যায়। অন্যান্য অঙ্গের ক্যান্সারের তুলনায় ইহার চিকিৎসা অনেক আশাপ্রদ এবং বহু ক্ষেত্রে রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়।

দ্র A C Roxburgh, *Common Skin Diseases*, London, 1955

[illegible]কুমার পাঁজা

চর্মশিল্প ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে বহুবিধ চর্মদ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে মার্কো পোলো ভারতীয় চর্মজাত দ্রব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক ভারতে বৃহদায়তন চর্মশিল্পের পত্তন ঘটে। ঐ বৎসর সরকারি উদ্যোগে মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে সেনা-বাহিনীর সজ্জা নির্মাণের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে দুইটি ট্যানারি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে 'কানপুর হারনেস অ্যাণ্ড স্যাড্‌লারি ফ্যাক্টরি' সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়। ভারতে প্রথম বেসরকারি ট্যানারি কানপুরে 'কুপার অ্যালেন অ্যাণ্ড কোম্পানি' কর্তৃক ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরে ভারতীয়দের উদ্যোগে কানপুর, বোম্বাই ও আগ্রায় অনেকগুলি আধুনিক ট্যানারি স্থাপিত হইয়াছে।

গবাদি পশুর কাঁচা চামড়া ('হাইড') এবং ছাগাদি পশুর কাঁচা চামড়া ('স্কিন') রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চর্মে পরিণত হয় ('চর্ম' দ্র)। সুতরাং চর্মশিল্পের দুই শাখা· ১. চামড়া পাকানো ২. প্রস্তুত চর্মের দ্বারা নানাবিধ দ্রব্যের নির্মাণ। দুই প্রকারে চামড়া পাকানো হয়. ১. উদ্ভিজ্জ ট্যানিং ২. ক্রোম ট্যানিং। ভারতে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক মাদ্রাজ শহরে প্রথম ক্রোম ট্যানারি স্থাপিত হয়। ইহার ২-৩ বৎসরের মধ্যে বেসরকারি উদ্যোগে মাদ্রাজ, কলিকাতা, বাঙ্গালোর ও কটকে কয়েকটি ক্রোম ট্যানারি গড়িয়া ওঠে।

পৃথিবীর মধ্যে ভারত গো মহিষচর্মের উৎপাদকরূপে দ্বিতীয় স্থান (আমেরিকার নীচে) এবং ছাগচর্মের উৎপাদকরূপে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গো মহিষচর্মের উৎপাদন মাংসের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। ভারত ইহার ব্যতিক্রম। ভারতে গো-মহিষের চর্ম প্রধানতঃ ভাগাড়ে পতিত মৃত পশুর গাত্র হইতেই লব্ধ হয়। ছাগচর্মের প্রধান উৎস, নিহত পশু। ব্রিটিশ রাজত্বকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারত প্রধানতঃ কাঁচা চামড়া রপ্তানি করিত এবং বহুল পরিমাণে কারখানা-জাত চর্মদ্রব্য আমদানি করিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতে আধুনিক চর্মশিল্পের বিকাশকে উদ্দীপিত করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চর্মশিল্প ভারতের একটি মুখ্য শিল্প হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশ এই শিল্পে অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে।

দ্র All India Manufacturers' Organisation, *Leather Industry in India*, Bombay, 1948, D. R Gadgil, *The Industrial Evolution of India*, Calcutta, 1959, *Annual Survey of Industries*, Delhi, 1963.

[illegible] মিত্র

চর্যাগীত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপটি যে গানগুলির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সে গানগুলির নাম 'চর্যাগীত' বা 'চর্যাপদ'। 'গীত' বা 'পদ' অর্থে গান। 'চর্যা' শব্দের অর্থ কাহারও মতে আচরণীয়। শব্দটি বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের একটি পারিভাষিক শব্দও বটে, আবার এক শ্রেণীর গানের নামও বটে।

চর্যাগানগুলি নেপাল রাজদরবার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত একখানি নামহীন পুথিতে প্রথম পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথিখানি আবিষ্কার করেন এবং 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', সংক্ষেপে 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চারখানি পুথি প্রকাশ করিয়াছিলেন— 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', 'সরোজবজ্রের দোহাকোষ', 'কাহ্নপাদের দোহাকোষ' এবং 'ডাকার্ণব'। ইহার মধ্যে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামীয় পুথিখানিতেই চর্যাগানগুলি বর্তমান। পুথির নামকরণ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি নামটির আভাস পুথির সূচনার একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পুথির যথার্থ নাম 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'।

'বৌদ্ধগান ও দোহা'-য় প্রকাশিত চারখানি পুথির

ভাষাকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। সাধারণভাবে সে অনুমান ভুল নয়। তবে সূক্ষ্মবিচারে 'দোহাকোষ' এবং 'ডাকার্ণব'-এর ভাষাকে অবহট্ট বলা উচিত। সর্বপ্রথম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সূক্ষ্মবিচার করেন।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' আসলে চর্যাগানের টীকার পুথি। টীকার সঙ্গে মূল গানগুলি উদ্ধৃত হওয়ায় পুথিখানি সংকলনের আকার ধারণ করিয়াছে। টীকা সংস্কৃতে লেখা। পুথিমধ্যে কিছু খণ্ডিত এবং শেষে দুই-একটি পাতা নাই। তাই টীকাকারের নাম ইহাতে পাওয়া যায় না। টীকাকার মুনিদত্ত। টীকাটির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথিতে অনুল্লিখিত হইলেও চর্যাগানগুলি এবং সংস্কৃত টীকা তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। টীকাকারের নাম এই তিব্বতী অনুবাদের সহায়তায় জানা গেল এবং সেই সঙ্গে খণ্ডিত পুথিতে লুপ্ত গানগুলির বিষয়ও জানা গেল। তিব্বতী অনুবাদ প্রকাশ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' খণ্ডিত পুথি। পুথির প্রাপ্ত অংশে ৪৬টি সম্পূর্ণ গান এবং একটি গানের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। এই ৪৬টি গান ২৪ জন কবির রচনা। গানগুলির দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ১২ লাইনের মধ্যে; দুই-একটি দীর্ঘতর গানও আছে। গানে 'ভণিতা' আছে। 'ভণিতা'-য় রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। তদুপরি প্রত্যেক গানের শুরুতে রাগ-রাগিণীরও উল্লেখ আছে।

গানগুলি যে ভাষায় লেখা সে ভাষা অধুনা প্রচলিত বাংলা ভাষার দুই পুরুষ পূর্বতন রূপ। গানে ব্যবহৃত অনেক শব্দ বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে, যেমন— 'জান', 'নিল', 'গেল', 'রাতি', 'দুই', 'ঘরে', 'করি', 'বিনু', 'মাঝে', 'চড়িলে', 'ছাড়ি'।

গানগুলি 'সন্ধাভাষা'-য় রচিত বলা হয়। 'সন্ধাভাষা' কোনও ভাষার নাম নয়। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সংস্কৃত-অবহট্ট-বাংলা রচনায় অবলম্বিত বিশিষ্ট রীতির নাম 'সন্ধা'। এই রীতিতে শব্দের বাচ্যার্থের এক অর্থ, গুহ্যার্থের আর এক অর্থ। শব্দের গুহ্যার্থের সাহায্যে সাধকেরা সাধন-পদ্ধতির নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কোনও কোনও গানের রচনারীতি প্রহেলিকাত্মক, যেমন— রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই। / (গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়)। / 'বলদ বিআঅল গবিয়া বাঝে। / (বলদ প্রসব করিল গাভী বন্ধ্যা)।

কোনও কোনও গানে তত্ত্বকথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, যেমন— জইসো জাম মরণবি তইসো। / জীবন্ত মঅলেঁ নাহি বিশেসো॥ / (জন্মও যেমন মরণও তেমনি। / জীবন্ত ও মৃতে পার্থক্য নাই॥)।

চর্যাগানগুলিতে ব্যবহৃত রূপক প্রতিভাসের ভিতর দিয়া তদানীন্তন বাঙালী জীবনের একটি নিখুঁত ছবিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গানগুলির রচনাকাল অনিশ্চিত, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় একাদশ-ত্রয়োদশ শতকে লেখা।

দ্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী ৫৫, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, চর্যাগীতিপদাবলী, বর্ধমান, ১৯৫৬, Suniti Kumar Chatterji, *Origin and Development of the Bengali Language*, Calcutta, 1926; P. C. Bagchi & Santi Bhiksu-Sastri, ed., *Carya-gitikosa*, Visva-Bharati, 1956; Sashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1963; Tarapada Mukherji, *The Old Bengali Language and Text*, Calcutta, 1963.

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

চর্যা প্রকীর্ণক শ্রেণীর প্রবন্ধের অন্তর্গত। যে সব গীত দেশে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান ছিল মধ্যযুগে সেগুলিকে প্রকীর্ণক বলা হইত এবং কলি দ্বারা নিবদ্ধ গীতকে প্রবন্ধ বলা হইত। চর্যা, পদ ও তাল— এই দুই অঙ্গযুক্ত তারাবলী-জাতীয় প্রবন্ধ। শাস্ত্রানুসারে চর্যা উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং আভোগ এই তিনটি কলি দ্বারা নিবদ্ধ। শার্ঙ্গদেব রচিত 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে (১২১০-৪৭ খ্রী ?) চর্যাগীতির যে লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে ইহার বিষয় আধ্যাত্মিক, পাদান্ত অনুপ্রাসযুক্ত, ইহা পদ্ধড়ী (পজ্‌ঝটিকা) ও তৎপর্যায়ের ছন্দে রচিত এবং দ্বিতীয় বা অনুরূপ তালে নিবদ্ধ। চর্যাগীতি দুই প্রকার। ছন্দ-প্রধান গীতিগুলিকে বলা হইত পূর্ণ এবং যেগুলিতে ছন্দের প্রাধান্য থাকিত না সেইগুলিকে বলা হইত অপূর্ণ। চর্যার আরও দুইটি প্রকারভেদ ছিল: একটি সমধ্রুবা, অপরটি বিষমধ্রুবা। সমধ্রুবা অর্থে সবগুলি পদের এবং বিষমধ্রুবা অর্থে কেবলমাত্র 'ধ্রুব' অংশের সমকণ্ঠে আবৃত্তি বুঝাইত। চর্যায় রাগের ব্যবহার ছিল কিন্তু ইহা মুখ্যতঃ রাগসংগীত নহে। যে সমস্ত চর্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় চর্যায় ব্যবহৃত রাগের মধ্যে পটমঞ্জরী রাগের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্ব্যতীত মল্লারী, ভৈরবী, কামোদ, বরাড়ী, গুর্জরী, কহ্নুগুর্জরী,

গৌড়ী, দেশাখ, রামক্রী, শবরী, অরুদেবক্রী, ধানশ্রী, মালশ্রী এবং বঙ্গাল— এই রাগগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাগীতির সহিত মণ্ডি ডক্কা (মড্ডু বা মোড়া) নামক তন্ত্রীযুক্ত চর্মবাদ্য বাজানো হইত। হরিপাল (ত্রয়োদশ শতক) জানাইয়াছেন যে চর্যা বহু প্রকারের হইত এবং ইহা যোগীরা গাহিতেন —'যোগিভির্গীয়তে চর্যা প্রকারৈর্বহুভিস্তসৌ'।

দ্র শার্ঙ্গদেব, সংগীত রত্নাকর, ঐ টীকা, কল্লিনাথ, সিংহভূপাল, রামকৃষ্ণ কবি -সম্পাদিত, ভরতকোষ, তিরুপতি, ১৯৫১।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

চলচ্চিত্র বিখ্যাত ইংরেজী শব্দকোষ থেসরাস্ এর সংকলক পিটার মার্ক রজেট ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক অভিনব সূত্র আবিষ্কার করেন: মানুষ যে কোনও দৃশ্যই দেখুক, তাহা অপসৃত হইবামাত্র চক্ষু হইতে বিলীন হয় না। এই মূলসূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া চলচ্চিত্রের আবিষ্কার ও নির্মাণ সম্ভবপর হইয়াছে।

পৃথক পৃথক আলোকচিত্র পরপর অল্প দূরত্বে সাজাইয়া দ্রুতগতিতে চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিলে রজেট এর উক্ত সূত্র অনুযায়ী দৃশ্যটি চলমান বলিয়া ভ্রম হয়। স্বচ্ছ সেলুলয়েডের ফিতার উপর ছাপা আলোকচিত্র প্রজেক্টর বা প্রক্ষেপণ যন্ত্রের দ্বারা বৃহদাকারে পর্দার উপর ক্ষেপণ করিলে আরও নিখুঁতভাবে ঐ গতিশীলতার বোধ সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

চলচ্চিত্র গ্রহণ ও প্রদর্শনের কৌশল যে কে উদ্ভাবন করেন তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি মোটামুটি একই সময়ে এই বিষয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ফরাসী দেশের এতিয়েন্ ঝুল্ মারে, ইংল্যান্ডের এড্ওয়ার্ড মাইব্রিজ এবং আমেরিকার টমাস্ এডিসন এর গবেষণাগারে নিযুক্ত ইংরেজ গবেষক ডিক্সন্ এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা বলা যাইতে পারে যে চলচ্চিত্র বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন আবিষ্কারের সমষ্টি — কোনও একজন আবিষ্কর্তার একক উদ্ভাবন নহে। সম্ভবতঃ ইংল্যাণ্ডে ফ্রীজগ্রীন ও ফরাসী দেশে রেনো (Raynaud) একই সময়ে ছবির ফিতার দুই পার্শ্বে ছিদ্রস্থাপনের দ্বারা দুই চিত্রের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে স্থিরীকৃত করিতে সক্ষম হন। ইহার ফলে দর্শকের চোখে গতির ছন্দ দ্রুত বা মন্থর না হইয়া স্বাভাবিকভাবে প্রতিভাত হয়। এডিসন-এর পরীক্ষাগারে ডিক্সন সেলুলয়েডের উপরে চলচ্চিত্রের ছবিগুলিকে ছাপার ও উপর হইতে নীচের দিকে চালিত করিবার কৌশল আবিষ্কার করেন।

বিভিন্ন আবিষ্কারকের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্বগুলিকে একত্রিত করিয়া পর্দার উপরে চিত্রপ্রক্ষেপণের কৌশল সর্বপ্রথম আয়ত্ত করেন ফরাসী দেশের লুমিয়ের ভ্রাতৃবৃন্দ। ইহাদেরই চেষ্টায় বোম্বাই নগরীতে অবস্থিত তৎকালীন ওয়াট্সন্স্ হোটেলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। পৃথিবীর নানা দেশে ঐ সময় হইতে চলচ্চিত্রপ্রদর্শন প্রবর্তিত হয়। সেকালের চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য ছিল অতি অল্প এবং বিষয় ছিল সহজ। ট্রেন চলিতেছে, তীরের উপর ঢেউ আছড়াইয়া পড়িতেছে, এজাতীয় দৃশ্যই চলচ্চিত্রের প্রথম দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নিউজ রীল বা সংবাদচিত্র এই যুগেই প্রথম নির্মিত হয়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের জর্জ মেলি (Georges Melies) নামে জাদুকর চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আকস্মিকভাবে চলচ্চিত্রের জাদুকরী সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত নানাবিধ কৌশল এখনও চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন, একব্যক্তিকে দুই বেশে একই চিত্রের মধ্যে উপস্থিত করা প্রভৃতি, কিন্তু মেলি চলচ্চিত্রের জাদুবিস্তার মধ্যেই আবদ্ধ রহিলেন না, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চিত্রনাট্যের রীতিতে পরিকল্পিত চলচ্চিত্রগ্রহণে ব্রতী হন। এই রীতির ফলে তাঁহার সৃষ্ট সিন্ডরেলা ও অন্যান্য ছবি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। উহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'দি লাইফ অফ অ্যান অ্যামেরিকান ফায়ারম্যান' নামক চলচ্চিত্রে আমেরিকাবাসী এডউইন পোর্টার মেলি-র রীতিকে আরও প্রসারিত করিয়া বর্তমান কালের ঘটনাবর্ণনা রীতির ভিত্তি স্থাপনা করেন। পোর্টারের প্রধান অবদান হইল সম্পাদনা বা এডিটিং। ইহা বর্তমান চলচ্চিত্র-রীতির অন্যতম আবশ্যিক উপাদান। তিনি পূর্বোল্লিখিত চিত্রে ক্লোজ আপ বা নিকটদৃষ্টিরও অবতারণা করেন। সম্পাদনা এবং প্রয়োজন অনুসারে ক্যামেরার দূরত্ব পরিবর্তনের সাহায্যে আধুনিক চলচ্চিত্রের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড্ ওয়ার্ক গ্রিফিথ এর আবির্ভাবের ফলে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়। সিনেমাকে মঞ্চরীতি হইতে মুক্ত করিয়া এবং ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা— নিকটদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির (লং শট) উপযুক্ত ব্যবহার— দৃশ্য বস্তুর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, আলোকসম্পাতের নাটকীয় বৈচিত্র্য ইত্যাদি কলাকৌশলের সুনিপুণ প্রয়োগের দ্বারা তিনি চলচ্চিত্রকে এক নূতন 'ভাষা' ও 'শিল্পের' মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 'বার্থ অফ এ নেশন', 'ইনটলারেন্স' প্রভৃতি ছবি তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের

দৃষ্টান্ত। চলচ্চিত্রের এই ভাষা চার্লি চ্যাপ্‌লিন-এর হাস্য-রসোচ্ছল অথচ অর্থময় চলচ্চিত্রে নব রূপ পরিগ্রহ করিল। চ্যাপ্‌লিনের 'দি গোল্ড রাশ্‌' (১৯২৫ খ্রী) এক অনবদ্য সৃষ্টি। ঐ বৎসরেই রুশ দেশের যশস্বী আইজেনস্টাইন 'ব্যাটেল্‌শিপ্‌ পোটেম্‌কিন'-এ চলচ্চিত্রের সম্পাদনরীতিকে বিমূর্ত ভাব ও অর্থদ্যোতনার উদ্দেশ্যে অপূর্বরূপে নিয়োগ করিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কবাসী কার্ল ড্রাইয়র 'দি প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক' ছবিতে নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রশিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

নির্বাক যুগে উপরি উক্ত বিকাশের পরে ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে সবাক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব হইল। তাহার অল্পকাল পরেই বহুবর্ণ চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশ করে এবং একবর্ণ ও বহুবর্ণ উভয়বিধ চলচ্চিত্রেই আঙ্গিকগত উন্নতির ফলে উহার বাস্তব রূপায়ণক্ষমতা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে গৃহে গৃহে টেলিভিজন যন্ত্রের প্রচলনের পরে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৃহদায়তন প্রেক্ষাপটের ব্যবহার বাড়িয়াছে। থ্রি ডাইমেন্‌শ্যনাল অথবা স্টেরিওস্কোপিক চলচ্চিত্রও দেখা দেয়, যদিও আজ পর্যন্ত ইহার বিশেষ প্রসার ঘটে নাই। বৃহদায়তন প্রেক্ষাগৃহে ব্যবহারের জন্য চলচ্চিত্র সাধারণতঃ ৩৫ মিলিমিটার চওড়া ফিতায় ছাপা হয়, কিন্তু অল্পসংখ্যক দর্শকের মধ্যে দেখানোর জন্য ১৬ মিলিমিটারে ছাপা চলচ্চিত্র আজকাল সর্বত্র নির্মিত হইতেছে। ঘরোয়াভাবে ব্যবহারের জন্য ৮ মিলিমিটারের চলচ্চিত্র অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে এখনও পর্যন্ত ধ্বনিসংযোগ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। নূতন নূতন টেকনিক-এর আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্র অধুনা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাষার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ ভাষাতে গদ্য, কাব্য, সংবাদ-সাহিত্য, বিজ্ঞান সাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি নানাজাতীয় রচনা সম্ভব। আধুনিক কালের প্রামাণ্য-চিত্র বা দলিল-চিত্র (ডকুমেন্টারি ফিল্ম), সংবাদ-চিত্র (নিউজ রীল), কাহিনী-চিত্র (ফিচর ফিল্ম), শিক্ষামূলক চিত্র (এডুকেশনাল ফিল্ম), বিজ্ঞাপন-চিত্র, সঞ্চালিত-চিত্র (অ্যানিমেটেড ফিল্ম, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত চিত্রের ভিত্তিতে চলচ্চিত্র প্রস্তুত হয়), পুতুল-চিত্র (পাপেট ফিল্ম) ইত্যাদির প্রসার দেখিলে তাহা হৃদয়ংগম করা যায়। কাহিনী-চিত্রের মধ্যেও বহু প্রকারভেদ আছে।

চলচ্চিত্র-নির্মাণ অন্যান্য শিল্পকলার অনুপাতে অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ এবং তাহাতে বহুজনের সংঘবদ্ধ শ্রমের প্রয়োজন ঘটে। এই কারণে এবং রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে নির্মিত জটিল যন্ত্রপাতিকে আশ্রয় করার ফলে চলচ্চিত্র শ্রমশিল্প ও শিল্পকলার দ্বৈত চরিত্র পরিগ্রহণ করিয়াছে। তদুপরি, চলচ্চিত্রের প্রমোদবিতরণ ক্ষমতা অতি ব্যাপক, বিশাল দর্শক-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। আমেরিকান চলচ্চিত্র 'গন উইথ দ্য উইণ্ড' হইতে সাড়ে চার কোটি টাকা আয় হইয়াছিল।

নির্মাণ, পরিবেশন ও প্রদর্শন এই তিনটি প্রধান বিভাগে চলচ্চিত্রশিল্প বিভক্ত। নির্মাণ বিভাগের প্রথম সোপান অর্থবিনিয়োগের ব্যবস্থাপনা। ইহাতে প্রযোজকের ভূমিকাই প্রধান, তৎপরে পরিচালক। প্রযোজকের দ্বারা নির্ধারিত অর্থ ও উদ্দেশ্য গত সীমানার মধ্যে রাখিয়া চলচ্চিত্রটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে রূপায়িত করা পরিচালকের কর্তব্য। বিশেষ খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী পরিচালকেরা প্রায়শঃ প্রযোজকের ভূমিকাও অনেকাংশে নিজেরাই গ্রহণ করেন, অথবা সাধারণতঃ যাহা প্রযোজকের সিদ্ধান্তের এলাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয় তাহার মধ্যে নিজেদের প্রভাব কাহিনী অথবা নটনটী নির্বাচনের মত ক্ষেত্রেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। পরিচালকের নির্দেশে ও তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন বিভাগের ভার বিভিন্ন আঙ্গিক কুশলীর উপর ন্যস্ত হয়, যেমন চিত্রনাট্য রচনা (ক্ষেত্রবিশেষে পরিচালক নিজেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন), চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, শব্দপুনর্যোজন, পরিস্ফুটন, আবহসংগীত রচনা ইত্যাদি। বিভিন্ন বিভাগের কর্তার অধীনে তাঁহার সহকারীবর্গের স্থান। সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে একটি চলচ্চিত্রের নির্মাণকার্যে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা— বিশেষতঃ যেখানে অধিক সংখ্যক পাত্রপাত্রী ও চিত্রস্থ স্থান কালের নানা ভেদাভেদ— যন্ত্রশিল্পের কোনও কারখানার সমান হওয়া বিচিত্র নহে। ফলতঃ পরিচালকের শিল্পীভূমিকার গুরুত্ব যেরূপ, নেতৃভূমিকার গুরুত্ব তদপেক্ষা ন্যূন নহে। পরিচালক যত মহৎ শিল্পীই হউন না কেন, তাহার ম্যানেজার ভূমিকা তিনি কখনই সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারেন না।

চলচ্চিত্র নির্মাণের অপরাংশ, অর্থাৎ পরিবেশন ও প্রদর্শন, সম্পূর্ণভাবে ব্যাবসায়িক কর্ম। প্রযোজকের নিকট হইতে নির্মিত চলচ্চিত্রটির ভার লইয়া পরিবেশক বিভিন্ন স্থানে তাহা দেখানোর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শক, অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহের মালিক, পরিবেশকের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। অধিকাংশ দেশে প্রদর্শনের পূর্বে চলচ্চিত্র অনুমোদনের জন্য স্থাপিত বিশেষ একটি সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার অনুমতিগ্রহণ আবশ্যক হয়। প্রয়োজনবোধে এই সংস্থা জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোনও চলচ্চিত্রের প্রদর্শন আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ

করিতে পারেন, বা তাহার পরিবর্তনসাধনে প্রযোজককে বাধ্য করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য যে, উপরি-উক্ত পরিবেশন ও সন্দর্শন -প্রক্রিয়ার অধিকাংশই কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রামাণিক চিত্রের পরিবেশনের ভার অনেক সময় সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্রের গুণবিচার, আদান-প্রদান, ভাব-বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বহু দেশে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পালিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ইটালীতে ভেনিস, ফরাসী দেশে ক্যান ও জার্মানিতে বের্লিনের চলচ্চিত্র উৎসব সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্তমানকালের চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হইলেও চিত্রভাষার ব্যাপক বোধগম্যতার গুণে ইহাতে একটি আন্তর্জাতিকতার ছাপ পড়িয়াছে। তদুপরি অন্য দেশে প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্রের বাক্যাংশ চিত্রের নিম্নভাগে লিখিত টীকা অর্থাৎ সাব্-টাইটেল অথবা যে দেশে প্রদর্শিতব্য সেই দেশের ভাষায় ভাষান্তরিত (ডাব্‌ড) করা হয়।

সবাক চলচ্চিত্রের যুগে বহু কৃতী পরিচালকের ছবি পৃথিবীব্যাপী প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম আমেরিকায় ও ফরাসী দেশে সবাক চলচ্চিত্রের অধিকতম পরিপুষ্টি সাধিত হয়। ফরাসী দেশে রেনোয়ার (Renoir), কার্ন্ (Carne) ও ক্লেয়ার (Clair) তাঁহাদের বহু চলচ্চিত্রের দ্বারা এই শিল্পকে উন্নত করেন, আমেরিকায় জন ফোর্ড (John Ford), লুইস মাইলস্টোন (Lewis Milestone) প্রমুখ চলচ্চিত্রকারের কীর্তি শিল্পমূল্য অর্জন করিয়াছে। যুদ্ধকালীন ইংল্যাণ্ড, যুদ্ধোত্তর ইটালী, তৎপরে সুইডেন, জাপান, পোল্যাণ্ড ও ফরাসী দেশ পুনরায় চলচ্চিত্র-শিল্পে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্যাবসায়িক সাফল্য অপেক্ষা শিল্প-মূল্যের স্বীকৃতিতে এই প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়। ভারতের সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' প্রভৃতি চলচ্চিত্র বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, সুইডেনের ইঙ্গমার বার্গ্‌মান্ (Ingmar Bergman), জাপানের মিজোগুচি (Mizoguchi), কুরোসাওয়া (Kurosawa), গোশো (Gosho) ও ওজু (১৯০৩-৬৩খ্রী), ইটালীর ভিত্তোরিও দে-সিকা (Vittorio de Sica), রসেলিনি (Rosselini), ফেলিনি (Fellini) ও আন্তোনিয়োনি (Antonioni); ফ্রান্সের আর্লা রনে (Alan Renais), ফ্রাঁসোয়া ক্রফো (Francois Truffant) ও ঝাঁ-ল্যুক্ গোদার (Jean-Luc Godard), পোল্যাণ্ডের আন্দ্রেই ওয়ায়্দা (Andrej Wajda) প্রমুখ চলচ্চিত্রকার আজ শিল্পী হিসাবে প্রভূত যশের অধিকারী। ইহাদের শিল্পকর্ম এবং চলচ্চিত্রের শিল্প ও সমাজগত প্রভাব বিষয়ে বহু গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। 'চিত্রনাট্য' দ্র।

দ্র Maurice Bardeche & Robert Brasillach, *The History of Motion Pictures*, New York, 1938; Roger Manvell, *Film*, London, 1950; Bela Balaz, *Theory of the Film*, London, 1952; V. I. Pudovkin, *Film Technique and Film Acting*, New York, 1954; S M Eisenstein, *Film Form, Film Sense*, New York, 1957.

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

চলচ্চিত্র, ভারতে চলচ্চিত্র বর্তমানে শিল্পের পর্যায়ভুক্ত। শিল্প হিসাবে ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা এই শতকের একটি সৃজনশীল ও জীবন্ত শিল্প। বর্তমানে চলচ্চিত্র এদেশে এবং বিদেশে, শুধুমাত্র প্রমোদ পরিবেশনের কার্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই, ইহার শিল্পগত এবং আঙ্গিকগত উৎকর্ষসাধনেও অনেকে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন।

চলচ্চিত্র অবশ্য পশ্চিম দেশের দান এবং ইহার সূচনার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের নামও যুক্ত। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর লুমিয়ের ব্রাদার্স পারী শহরে তাঁহাদের 'সিনেমাটোগ্রাফ' প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহাদের এজেন্টের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে সিনেমাটোগ্রাফ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই রাশিয়ার জার-কে দেখানোর জন্য মস্কোতে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন হয় এবং ঐ একই দিনে লুমিয়ের ব্রাদার্সের আর-একটি দল বোম্বাই শহরেও প্রবেশমূল্য লইয়া সাধারণকে ছবি দেখান। তাঁহাদের অনুষ্ঠানসূচীতে 'চলন্ত রেলগাড়ির আগমন', 'সমুদ্র স্নান' ইত্যাদির দৃশ্য ছিল। বলা যায় — বিটিশ, আমেরিকান ও রুশদের সঙ্গে ভারতের দর্শকও ঠিক একই সময়ে ছবি দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী ইহার পর শহর হইতে ক্রমশঃ গ্রামাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে এবং শহরগুলিতে কয়েকটি চিত্রগৃহ নির্মিত হয়। এই সব চিত্রগৃহে যে সমস্ত ছবি দেখানো হইত তাহার বেশির ভাগই আসিত ব্রিটেন, ইওরোপ, আমেরিকা ও ফ্রান্স হইতে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সখারাম ভাটবাডেকর (Sakharam Bhatvadekar) এই সময় কতকগুলি সংবাদচিত্র তোলেন ও প্রদর্শন করেন। চিত্রনির্মাতা বাইবেলের বিভিন্ন অধ্যায় লইয়া

চিত্র নির্মাণ করেন। বাইবেলেরই একটি কাহিনী অবলম্বনে তৈয়ারি 'লাইফ অফ ক্রাইস্ট' জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও জি. ডি. ফাল্‌কে (১৮৭০-১৯৪৪ খ্রী) এই চিত্রটি দেখেন এবং ভারতীয় ভাষায় চিত্রনির্মাণে ব্রতী হন। ফাল্‌কের প্রথম ছবি 'হরিশ্চন্দ্র' ১১২৮ মিটার (৩৭০০ ফুট)। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নির্বাক চিত্রটি মুক্তিলাভ করে এবং দাদা সাহেব ফাল্‌কে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের জনকরূপে অভিহিত হন, কিন্তু সম্প্রতি বিষয়টি লইয়া মতান্তর দেখা দিয়াছে। 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের লেখক কালীশ মুখোপাধ্যায় তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে বাংলার হীরালাল সেনই প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্রের জনক আখ্যালাভের অধিকারী। কিন্তু বিষয়টির এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই।

পরবর্তী দশ বৎসরেও ফাল্‌কে আরও বহু চিত্র নির্মাণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে ফাল্‌কে-নির্মিত সব চিত্রই ছিল পৌরাণিক। ফলে এই ছবিগুলি অতি সহজেই জনচিত্ত জয় করিতে সমর্থ হয়, যাহা বিদেশাগত চিত্রের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না।

ফাল্‌কের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অতঃপর ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেকেই পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে কাহিনীচিত্র নির্মাণে ব্রতী হন। কলিকাতার ধীরেন গাঙ্গুলীর নাম ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধীরেন গাঙ্গুলী কয়েকজন অংশীদার লইয়া সমকালীন পটভূমিকায় 'ইংল্যাণ্ড রিটার্নড্‌' নামে একখানি কমেডি-চিত্র তৈয়ারি করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রটি রসা (অধুনা পূর্ণ থিয়েটার) প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। হাস্যরসাত্মক এই সামাজিক চিত্রখানির সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ধীরেন গাঙ্গুলী নিজেই কয়েকখানি চিত্র নির্মাণ করেন।

এই প্রসঙ্গে বোম্বাই-এর চন্দুলাল শা-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে সামাজিক চিত্র তৈয়ারি করিয়া তিনি সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু এই সময় পৌরাণিক চিত্রেরই আদর ছিল সর্বাধিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইওরোপীয় ও ব্রিটিশ চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে যেমন গুরুতর সংকট দেখা দেয় অথচ এই সময় ছবি দেখার ব্যাপারে দর্শকদের আগ্রহও আশ্চর্যজনকভাবে বাড়িয়া যায়। ফলে আমেরিকার যে চিত্রপ্রযোজকগণ ইতিমধ্যে হলিউডে স্থায়ীভাবে চিত্র-নির্মাণের কাজ শুরু করিয়াছিলেন তাঁহারা সারা বিশ্বে তাঁহাদের ছবি পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ইওরোপের চিত্র-প্রযোজকগণ বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহাদের বাজারে হলিউড-চিত্রেরই প্রাধান্য। তখন তাঁহারা নিজেদের চলচ্চিত্রশিল্পকে উৎসাহদানে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটেন 'কোটা' পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া নির্দিষ্টসংখ্যক ব্রিটিশ চিত্রপ্রদর্শন আবশ্যিক এই হুকুম জারি করিল এবং সেইসঙ্গে ভারতের বাজারের কথাও ভাবিতে লাগিল। এই অবস্থার মধ্যে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হইল 'সিনেমাটোগ্রাফ কমিটি'। কমিটি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া একটি রিপোর্ট তৈয়ারি করিলেন। রিপোর্টে সেন্সরশিপের ব্যাপারে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাগঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। কমিটি ভারতীয় চিত্র-নির্মাণে সরকারকে আর্থিক সাহায্যদানের প্রস্তাব দেন এবং কলাকুশলীদের (টেক্‌নিসিয়ান্‌স্‌) জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র তৈয়ারির পরামর্শ দেন। কিন্তু এই মূল্যবান রিপোর্টটি শেষ পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে চাপা পড়িয়া যায়।

এই ঘটনার অনেক পরে স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ফিল্ম এন্‌কোয়্যারি কমিটি' নামে ঐ একই ধরনের আর-একটি কমিটি গঠন করেন, উহার চেয়ারম্যান হন এস. কে. পাতিল। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে এই শিল্পটিতেও এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে— বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্রে শব্দ-প্রবর্তনের ফলে। কলিকাতায় প্রথম সবাক ছবি 'মেলডি অফ লাভ' অধুনালুপ্ত এল্‌ফিন্‌স্টোন পিকচার প্যালেসে দেখানো হয় (১৯২৯ খ্রী)। শব্দ ও ধ্বনি-প্রবর্তনের ফলে নির্বাক চিত্র ক্রমশঃ সবাক হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সমস্যাও দেখা দিয়াছে। নির্বাক চিত্রের যুগে ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানেরই ছবি হউক তাহা ভারতবর্ষে তো বটেই এমন কি ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলেও প্রদর্শিত হইত। ছায়াছবি সবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাজার ক্রমেই সংকুচিত হইতে লাগিল। চিত্র নির্মাতা এবং চিত্র-প্রদর্শকগণ নিত্য নূতন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। এই সমস্যায় এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণে বহু চলচ্চিত্র সংস্থার দরজা বন্ধ হইয়া গেল। এমন কি সমগ্র ভারতে যাঁহাদের ১২০টি চিত্রগৃহ ছিল সেই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটারও নানা কারণে ধীরে ধীরে তাঁহাদের ব্যবসায় গুটাইয়া লইতে লাগিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে জন এফ. ম্যাডান (১৮৫৬-১৯২৩ খ্রী) ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ময়দানে তাঁবু খাটাইয়া প্রথম ছবি দেখানো শুরু করেন।

আর্দেশীর ইরানী কৃত প্রথম হিন্দী সবাক চিত্র 'আলম আরা' ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মার্চ মুক্তি পায় এবং মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি অভূতপূর্ব সফলতাও অর্জন করে। ঐ একই বৎসরে ২২টি হিন্দী, ৩টি বাংলা এবং একটি তেলুগু ও

চলচ্চিত্র, ভারতে

একটি তামিল চিত্র নির্মিত হয়। ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষার ছবি জনপ্রিয় হইয়া ওঠায় চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি নবযুগের সূচনা দেখা দেয়। চলচ্চিত্র সবাক হওয়ার ফলে বিদেশী চিত্রের প্রতিও দর্শকসাধারণের আগ্রহে ভাটা পড়িতে থাকে।

'আলম আরা'-তে প্রায় ১২টি গান ছিল। ছবিটির জনপ্রিয়তার ইহাও একটি বড় কারণ বলিয়া অনুমান করা হয়। শুধুমাত্র 'আলম আরা'-ই নহে, সেই সময়ের বেশির ভাগ ছবিতেই নৃত্য-গীতের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। পরে অবশ্য আঞ্চলিক ভাষার চলচ্চিত্রে নৃত্য গীতের সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু বর্তমান কালেও এমন ছবি অল্পই দেখা যায় যাহাতে নৃত্য-গীতাদি নাই।

সবাক চিত্রের প্রথম যুগে বিশেষ করিয়া তিনটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলিকাতায় বীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড এর নাম সর্বাগ্রগণ্য। দেবকী-কুমার বসুর পরিচালনায় এই সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ভক্তিমূলক চিত্রগুলি বিপুল জনসমাদর লাভ করে।

এই সূত্রে বলা যাইতে পারে, প্রমথেশ বড়ুয়ার নামও ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রমথেশ বড়ুয়া কর্তৃক পরিচালিত 'দেবদাস' ছবিটি (হিন্দী ও বাংলা) সমগ্র ভারতে অসামান্য জন সংবর্ধনা লাভ করে। বৈপ্লবিক রূপে 'দেবদাসে'র মত নিউ থিয়েটার্স এর আরও অনেক ছবি বাংলা ও হিন্দী ভাষায় গৃহীত হয়।

অপর দুইটি সংস্থার একটি হইল পুনার প্রভাত ফিল্ম কোম্পানি, অপরটি বোম্বাই-এর বম্বে টকিজ। প্রভাত ফিল্মস কর্তৃক নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে ভি. শান্তারাম পরিচালিত ছবিগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'অমর-জ্যোতি' চিত্রটি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। প্রভাত ফিল্মের 'দামলে' এবং ফতেলাল পরিচালিত 'দুনিয়া না মানে' চিত্রটিও ভেনিস উৎসবে একটি পুরস্কার পায়। বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইহাই প্রথম পুরস্কার লাভ।

বম্বে টকিজের মূলে ছিলেন বাংলার হিমাংশু রায় ও তাঁহার অভিনেত্রী পত্নী দেবিকারানী। বেশ কয়েক বছর ইংল্যাণ্ডে কাটানোর পর তাঁহারা ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং চিত্র-প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করেন। হিমাংশু রায় জার্মানির সহযোগিতায় বুদ্ধের কাহিনীর ভিত্তিতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'লাইট অফ এশিয়া' নামে একটি নির্বাক চিত্র নির্মাণ করেন। ছবিটি ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল কম্যাণ্ড পারফরমেন্স ছাড়াও ইওরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত হয়। দেবিকারানী সিনেমায় যোগদানের ফলে আরও অনেক মহিলা অভিনয়ের জন্য চলচ্চিত্রে আসিতে থাকেন। বম্বে টকিজ কর্তৃক প্রযোজিত একটি সফল ছবি হইল 'অচ্ছুৎকন্যা'। এই সময় চিত্র-নির্মাণের ব্যাপারে প্রাধান্য ছিল প্রযোজক এবং পরিচালকের। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই শিল্পের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দিল। বৈধ ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত রাশি রাশি টাকা এই শিল্পে নিয়োজিত হইতে লাগিল। স্টার সিস্টেম বা তারকা প্রথার প্রবর্তন হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছকে বাঁধা ছবি তৈয়ারির প্রবণতাও দেখা দিল। ফলে বহু প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গেল এবং কিছু কিছু নূতন প্রতিষ্ঠানেরও গোড়াপত্তন হইল। উদীয়মান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অন্যতম হইলেন রাজ কাপুর। তাঁহার 'আওয়ারা' ছবিটি ভারত ছাড়া বিদেশেও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এই ধারার বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা বোম্বাই এ ভিন্ন রীতির চলচ্চিত্র প্রযোজনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁহাদের মধ্যে বিমল রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'দো বিঘা জমিন' ছবিটি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কান চলচ্চিত্রোৎসবে পুরস্কৃত হয়। সাংবাদিক চলচ্চিত্রকার কে. এ আব্বাস-কৃত 'মুন্না' ছবিটি এডিনবার্গ চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৫৫ খ্রী) প্রশংসিত হয়।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সত্যজিৎ রায় নির্মিত 'পথের পাচালী' ছবিটির মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। চলচ্চিত্র ভাষার সার্থক প্রয়োগ এবং ভারতীয় জন জীবনের বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে 'পথের পাচালী' যে নব্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের সৃষ্টি করে, ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব অভূতপূর্ব। এই আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখ পরিচালকের নাম করা যায়। তাঁহাদের শিল্প সাফল্য ভারতীয় চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের আলোচনায় আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। যেমন, ফিল্ম সেন্সর। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে সেন্সরের ব্যাপারে রাজনৈতিক কড়াকড়ি ছিল এবং তাহা বহুলাংশে পুলিশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখন বিষয়টি কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের হাতে আসিয়াছে। চেয়ারম্যান এবং অনধিক নয় জন সদস্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত। ফিল্ম সেন্সরের ফি ধার্য হইয়াছে প্রতি হাজার ফিটে ৪০ টাকা। দেশী ও বিদেশী উভয় ক্ষেত্রেই সেন্সরের নীতির অনমনীয়তা লইয়া অনেকবার অভিযোগ উঠিয়াছে।

বিভিন্ন দেশের ফিল্ম ফেস্টিভাল-এ ভারতীয় চলচ্চিত্রের আদর হইতেছে, বিদেশী ফিল্ম ফেস্টিভালও এদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি ও ফিল্ম ক্লাব বিদেশী ভালো ছবি দেখাইয়া দর্শককে উন্নততর শিল্পমানের সহিত পরিচিত করাইতেছে।

তৃতীয় বিষয়টি, করভার। প্রমোদকর, আয়কর, যন্ত্রপাতি ও কাঁচা ফিল্ম আমদানির শুল্ক ইত্যাদি করের বোঝা বর্তমান কালে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায়, টিকিট বিক্রয় বাবদ বক্স অফিসে যত টাকা পড়ে তাহার শতকরা ৬০ ভাগ ট্যাক্স দিতে খরচ হয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য গভর্নমেণ্ট অনেক কিছু করিতেছেন। এইদিক দিয়া 'চিলড্রেন্‌স ফিল্ম সোসাইটি'র গঠন (১৯৫৫ খ্রী) একটি সৎপ্রয়াস। চিত্রপ্রযোজকদের আর্থিক সহায়তাদানের জন্য ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা এবং ফিল্ম উপদেষ্টা বোর্ড গঠন (১৯৪৯ খ্রী) সরকারের অন্যতর প্রশংসনীয় কাজ। ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া (১৯৬১ খ্রী) পুনায় প্রভাত ফিল্ম এর পরিত্যক্ত স্টুডিও ক্রয় করিয়া সেখানে শিক্ষার্থীদের ফিল্ম শৈলী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে – ইহাও একটি সাধু প্রয়াস। ইতিমধ্যে কাঁচা ফিল্মের ফ্যাক্টরিরও উদ্‌বোধন হইয়াছে। ফিল্ম শিল্পের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ব্যবস্থার (১৯৫৪ খ্রী) মধ্যেও সরকারের শুভেচ্ছার প্রমাণ লক্ষিত হয়।

দ্র দর্শক, চলচ্চিত্র সংখ্যা, Eric Barnouw & S. Krishnaswamy, *Indian Film*, Calcutta, 1963

মন্মথনাথ সরকার

চলচ্চিত্র উৎসব বিদেশী পর্যটকগণের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টায় বেনিতো মুসোলিনী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস নগরীতে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবের প্রচলন করেন। ইহার দ্বারা দেশ বিদেশের চলচ্চিত্রের সহিত পরিচিত হইবার, তাহার মান নির্ণয়ের, চলচ্চিত্রকার ও সমালোচকবর্গের ভাব-বিনিময়ের এবং ক্রয়বিক্রয়ের যে সুযোগ উপস্থিত হয় তাহা মুসোলিনীর প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে চলচ্চিত্র উৎসবের সংখ্যা প্রায় একশতের কোঠায় পৌঁছিয়াছে। ইহার মধ্যে কিছু প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্যান্যগুলি প্রদর্শন উৎসব মাত্র। কাহিনীচিত্র ব্যতীত প্রামাণ্য চিত্র, শিশুচিত্র, সঞ্চালিত চিত্র (অ্যানিমেটেড ফিল্ম), বিজ্ঞান অথবা ধর্মসম্বন্ধীয় চিত্র ইত্যাদি বহুতর বিশিষ্ট চলচ্চিত্র উৎসব নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভেনিস, ফরাসী দেশে ক্যান, জার্মানিতে বের্লিন, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে লোকার্নো, রাশিয়ায় মস্কো ও চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্গত কার্লোভি ভারি ইত্যাদি নগরীতে অনুষ্ঠিত কাহিনীচিত্রের প্রতিযোগিতা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান উৎসবে ফরাসী দেশের নূভেল ভাগ অথবা নবধারার চলচ্চিত্র সমগ্র বিশ্বের চলচ্চিত্রমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভেনিসের গোল্ডেন লায়ন অথবা 'স্বর্ণসিংহ' পুরস্কারপ্রাপ্তির ফলে আকিরা কুরোসাওয়া কৃত 'রশো মন' চলচ্চিত্র জাপানের চলচ্চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সমগ্র বিশ্বে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। সত্যজিৎ রায় 'অপরাজিত' চিত্রে ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার পরেই তাঁহার জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। ক্যান উৎসবের পাল্‌মে দ'র (Palme d'or) অথবা 'স্বর্ণপত্র' ও বের্লিনের গোল্ডেন বেয়ার (Golden Bear) বা 'স্বর্ণভল্লুক' বহু কৃতী চলচ্চিত্রকারকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি দান করিয়াছে।

ভারতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রদর্শিত ইতালীয় নিও-রিয়্যালিস্ট চলচ্চিত্র ভারতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় উৎসবটি সেরূপ সমৃদ্ধ না হইলেও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও প্রথম প্রতিযোগিতামূলক উৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তেমন উৎকৃষ্ট চিত্রের সমারোহ না ঘটিলেও বহু বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার বাহিরে প্রদর্শিত হয়। অন্যান্য চলচ্চিত্র উৎসবের ন্যায় ভারতেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈদেশিক চলচ্চিত্রবিদদের লইয়া বিচারকসভা গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ভারতের সত্যজিৎ রায়। প্রামাণিক চিত্রের একটি স্বতন্ত্র বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত চলচ্চিত্র-আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে দেশ বিদেশের বহু বিখ্যাত মনীষী অংশ গ্রহণ করেন। প্রধান উৎসব দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবার পর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে চলচ্চিত্র-সপ্তাহ পালিত হয়। বৈদেশিক অতিথিগণ এই শহরগুলি পরিভ্রমণ করেন ও উৎসবের অধিকাংশ চিত্র একই সময়ে সেই সকল শহরে প্রদর্শিত হয়। আলোচনা-চক্র এবং পত্রিকাদির সহায়তায় দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রবিদগণের মধ্যে ভাববিনিময়ের সুযোগ ঘটে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নবধারা-প্রবর্তনে এই তিনটি উৎসবের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

চসার, জেয়োফ্রে (আনুমানিক ১৩৪০-১৪০০ খ্রী) মধ্য যুগের ইংরেজী সাহিত্যে জেয়োফ্রে চসারের স্থান সবাগ্রগণ্য। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইংল্যাণ্ডের আদালতে ও পার্লামেন্টে ইংরেজী ভাষা সরকারি-ভাবে স্বীকৃত হওয়ায় সাহিত্যিকগণের একটি অভূতপূর্ব সুযোগ আসে এবং চসার সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। যুগের সাহায্য তিনি পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহা ব্যতীত কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সাহিত্যিককে কত বেশি সাহায্য করে চসার তাহারও একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ১৩৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশে যুদ্ধবন্দী হইয়া থাকায় ও ১৩৬৯-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পিকার্ডি, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, ফ্ল্যাণ্ডার্স, মিলান প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন কাজকর্মে ভ্রমণের ফলে তিনি বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সাহিত্যপ্রচেষ্টার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ফলে ফরাসী রূপক কাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি প্রথম জীবনে 'দি বুক অফ দি ডাচেস' (১৩৬৯ খ্রী), 'দি পার্লামেণ্ট অফ ফাউল্স' (আনুমানিক ১৩৮২ খ্রী), 'দি হাউস অফ ফেম' (১৩৭৮-৮৪ খ্রী), 'দি লিজেণ্ড অফ গুড উইমেন' (১৩৮৬-৮৭ খ্রী) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার ইটালীতে ভ্রমণের ফলে 'ট্রইলাস্ অ্যাণ্ড ক্রিসিড' (১৩৮০-৮৩ খ্রী) প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়। 'দি 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্স' (১৩৮৭-১৪০০ ? খ্রী) তাঁহার প্রতিভার সবশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আখ্যায়িকার মুখবন্ধে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আগত ২৯ জন তীর্থযাত্রী তাঁহার সরস অতুলনীয় বর্ণনাগুণে আজও জীবন্ত রহিয়াছে। যুগের সংকীর্ণ সংস্কারের গণ্ডি পার হইয়া সহানুভূতি ও সরস কৌতুকপ্রিয়তার সহিত সে যুগের ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের দোষত্রুটি যেভাবে তিনি মেলিয়া ধরিয়াছেন ও পূর্ব যুগের বাস্তবতা-লেশহীন কাহিনীর পরিবর্তে রক্ত-মাংসের মানুষগুলিকে তিনি যে স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব দান করিয়াছেন তাহা চসারের আধুনিকত্বের প্রমাণ।

দ্র H. S. Bennett, *Chaucer and the Fifteenth Century*, Oxford, 1947; Nevil Coghill, *The Poet Chaucer*, London, 1955; J. L. Lowes, *Geoffrey Chaucer*, Oxford, 1956.

নীতীশকুমার বসু

চা চা-গাছের পাতা হইতে চা উৎপন্ন হয়। চা-গাছ থেয়াসিঈ গোত্রের (Family-Theaceae) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী চিরহরিৎ বৃক্ষ; বিজ্ঞানসম্মত নাম থেয়া সিনেন্সিস (*Thea sinensis*)। ইহা আসলে প্রায় ১০-১৫ মিটার দীর্ঘ বৃক্ষ, কিন্তু নিয়মিত ছাঁটাই করার জন্যই গাছটি ৬০ হইতে ১৫০ সেন্টিমিটার উচ্চ বহুশাখাবিশিষ্ট ঝোপাকৃতি গুল্মের আকার ধারণ করে। চা-গাছের কচি পাতাগুলি রোমশ, কিন্তু পরিণত পাতা মসৃণ ও চিক্কণ। পাতার ফলকে অনেক তৈলগ্রন্থি থাকে। সুগন্ধি শাদা ফুল এককভাবে অথবা গুচ্ছাকারে বাহির হয়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তৎকালীন চীন সম্রাট তাঁহার সম্মানিত অতিথিদের চা পানে তৃপ্ত করিতেন বলিয়া জানা যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চীন দেশে চায়ের নিয়মিত প্রচলন হয়। জাপানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চায়ের চাষ শুরু হয়। ভারতে হিমালয় অঞ্চলে বহুকাল হইতে চায়ের প্রচলন ছিল, তবে ইংরেজ আমলেই ইহার ব্যাপক প্রচার হইয়াছে।

ভারত, সিংহল, জাপান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া চীন ও তাইওয়ানে চায়ের চাষ হইয়া থাকে। রোডেশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, পেরু, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলেও চায়ের কিছু কিছু চাষ হয়। ভারতবর্ষে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আসাম, নীলগিরি পর্বত, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা প্রভৃতি স্থানে চায়ের সমধিক চাষ হইয়া থাকে।

চা-গাছ সাধারণতঃ ২০০০-২৫০০ মিটার উচ্চে বেশ ভালভাবে জন্মায়। চায়ের ভাল চাষের জন্য প্রয়োজন মাটির সামান্য বেশি অম্লত্ব, বাৎসরিক ২৫০-৫০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি, ২১°-৩২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং জমি হইতে জলনিকাশের সহজ ব্যবস্থা।

বীজ বপন বা কলম করিয়া চা গাছের চাষ হয়। মার্চ এপ্রিল মাসে বীজতলায় উর্বর মাটিতে বীজ বপন করা হয়। ছয় মাস বৃদ্ধির পর চারা গাছগুলি ১২-২০ সেন্টিমিটার উঁচু হইলে প্রচুর সার দেওয়া জমিতে সারিবদ্ধভাবে প্রায় ১৪০-১৫০ সেন্টিমিটার ব্যবধানে এই গাছগুলিকে রোপণ করা হয়। অনেক সময়ে চা-বাগানে ছায়ার জন্য বাবলা, শিরিষ, শিশু, মাদার প্রভৃতি গাছ রোপণ করা হয়। নাইট্রেট অফ পটাস সার চা-গাছের পক্ষে ভাল।

চারা রোপণের ৪-৫ বৎসর পরে পাতা তোলা শুরু হয়। মার্চ মাসের শেষ দিক হইতে অক্টোবরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পাতা তোলা চলে। পাতা তোলার পদ্ধতি ও পাতায় ট্যানিন নামক রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণের উপরই চায়ের গুণাগুণ নির্ভর করে। কচি পাতা ও কুঁড়ি হইতে সর্বোৎকৃষ্ট চা তৈয়ারি হয়। পাতার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চায়ের গুণ কমে।

ভারত ও সিংহলে সাধারণতঃ কালো চা-ই ব্যবহৃত হয়। চা-বাগানের সংলগ্ন কারখানায় ৪টি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা কালো চা তৈয়ারি হয়। প্রথমে পাতাগুলিকে তাকের উপর ছড়াইয়া বাতাসের সাহায্যে সেগুলিকে শুকাইয়া সামান্য শক্ত করিয়া লওয়া হয় (উইদারিং)। পরে এই পাতাগুলিকে রোলার মেশিনের দ্বারা পিষ্ট ও খণ্ড খণ্ড করা হয় (রোলিং); ইহার ফলে পাতার কোষগুলি ভাঙিয়া কোষ-মধ্যস্থ রস, এন্‌জাইম প্রভৃতি বাহির হইয়া

ভারতে চা উৎপাদন: ১৯৬৪-৫ খ্রী

(টি বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্যের নাম	চা চাষের জমির পরিমাণ		চা উৎপাদনের পরিমাণ	
		১৯৬৪ খ্রী হেক্টর	১৯৬৫ খ্রী হেক্টর	১৯৬৪ খ্রী মেট্রিক টন	১৯৬৫ খ্রী* মেট্রিক টন
১.	আসাম	১৬৬২৫১	১৬৯৬৫৯	১৯৫৫৩২	১৮০০৩৪
২.	পশ্চিম বঙ্গ	৮৪৮৩০	৮৫০৩১	৮৯৫৪১	৮৮২৩২
৩.	ত্রিপুরা	৫২৮৮	৫৫০২	২৯১৬	৩৬৬২ (ত্রিপুরা, বিহার, উত্তর প্রদেশ)
৪.	বিহার	৫৩৪	৪৭৬	৫৭	
৫.	উত্তর প্রদেশ	২০১২	১৯৭২	৭২৬	
৬.	পাঞ্জাব (কাংড়া)	৩৭৬৩	৩৭৬৩	১০৭০	১০৭০
৭.	হিমাচল প্রদেশ (মাণ্ডী)	৪২০	৪২০	১০৬	১০৬
৮.	মাদ্রাজ	৩৩০২৯	৩৩১৫৩	৪১৭৫৫	৪৭৮০৪
৯.	মহীশূর	১৭৮৯	১৭৯৫	১৮১৭	২২৬৮
০.	কেরল	৩৯৯৫৮	৩৯৮৬৩	৩৮৫৯৭	৪৪২৭১
	মোট সর্বভারতীয় পরিমাণ	৩৩৭৮৭৪	৩৪১৬৩৪	৩৭২১১৭	৩৬৭১১৭

*হিসাব চূড়ান্ত নয়

ভারতের চা বিক্রয়ের হিসাব

(টি বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	মোট উৎপাদনের পরিমাণ মেট্রিক টন	দেশের বাজারে চায়ের পরিমাণ* মেট্রিক টন	বিদেশে রপ্তানি মেট্রিক টন
১.	১৯৫৬	৩০৮৭১৯	৮৭৪৪৪	২৩৭৪৮৪
২.	১৯৫৭	৩১০৮০২	১১২৪৯৭	২ ০৭৮৬
৩.	১৯৫৮	৩২৫২২৫	১০৮৮০৫	২২৯৫০৩
৪.	১৯৫৯	৩২৫৯৫৫	১১৫৯২৬	২১৩৬৮০
৫.	১৯৬০	৩২১০৭৭	১২৬৮০৬	১৯৩০৬৩
৬.	১৯৬১	৩৫৪৩৯৭	১৩৯৬৪২	২০৬২৯২
৭.	১৯৬২	৩৪৬৭৩৫	১৩৫৭১৪	২১৪০০০
৮.	১৯৬৩	৩৪৬৪১৩	১৪২১৩৭	২২৩৫৪২
৯.	১৯৬৪	৩৭২১১৭	১৪৯১০৪	২১০৫২৩
০.	১৯৬৫	৩৬৭৪১৭	অপ্রাপ্ত	১৯৯৩৬৫

* যথাক্রমে ১৯৫৬-৭, ১৯৫৭-৮ প্রভৃতি আর্থিক বৎসরের বিক্রয়ের হিসাব

আসে। অতঃপর পাতাগুলিকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রচুর বাষ্পের সহায়তায় প্রায় ২৫°-২৭° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রাখিয়া গাঁজানো হয় (ফার্মেন্টেশন)। ফলে পাতায় অবস্থিত ট্যানিনের কিয়দংশ লালচে বাদামি রঙের রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয় এবং পাতাগুলি কালো হইয়া যায়। সর্বশেষে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে পাতাগুলিকে ক্রমশঃ প্রায় ৫৪° হইতে ৯৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিয়া শুকাইয়া লওয়া হয় (ফায়ারিং)।

পৃথিবীর রপ্তানি চায়ের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগই ভারতবর্ষ হইতে যায়। চা রপ্তানিতে ভারতের স্থান সর্বোচ্চ, তাহার পরেই সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার স্থান। টি বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চা চাষে ব্যবহৃত জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ এবং দেশ ও বিদেশের বাজারে চা বিক্রয়ের হিসাব ৩০৯ পৃষ্ঠার তালিকায় প্রদত্ত হইল।

দ্র L. S. Cobley, *Introduction to the Botany of Tropical Crops*, London, 1956; A. K. Y. N. Aiyer, *Field Crops of India*, Bangalore, 1958.

সন্তোষকুমার পাত্র

চীন ও জাপানে একই প্রজাতির চা-গাছের পাতা হইতে বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে কালো চায়ের পরিবর্তে সবুজ চা উৎপন্ন করা হয়। সবুজ চা তৈয়ারির সময় পাতাগুলিকে গাঁজানো হয় না, বরং উত্তপ্ত বাষ্পের সাহায্যে পাতার এনজাইমগুলিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ফলে পাতার সন্ধান (ফার্মেন্টেশন) বন্ধ থাকে এবং ট্যানিন হইতে রঙিন রাসায়নিক পদার্থগুলির উদ্ভব হয় না, তাই পাতার রঙ সবুজ থাকিয়া যায় এবং ইহাতে ট্যানিনের পরিমাণ কালো চায়ের তুলনায় বেশি থাকে।

চা-পাতায় নানা উদ্বায়ী তৈল (ভোলাটাইল অয়েল) ও জৈব অ্যাসিড থাকে, ইহাদের জন্যই চায়ের সুবাস ও সুস্বাদ। ইহা ছাড়া থাকে ক্যাফিন, থিওফাইলিন, ট্যানিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ। কালো চায়ে সাধারণতঃ শতকরা প্রায় ১-৪·৮ ভাগ ক্যাফিন এবং শতকরা প্রায় ৮-১০ ভাগ ট্যানিন থাকে।

ক্যাফিন ও থিওফাইলিন পিউরিন-ঘটিত উপক্ষার বা অ্যাল্‌কালয়েড। ইহারাই চায়ের মৃদু উত্তেজক গুণের কারণ। সম-ওজনের কফির তুলনায় চা-পাতায় ক্যাফিনের পরিমাণ বেশি। ক্যাফিন নার্ভতন্ত্র ও অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে, তাই চা-পান ক্লান্তি অপনোদন ও রাত্রি-জাগরণের পক্ষে সহায়ক। ইহারই প্রভাবে চা-পানের পর কর্মের উদ্যম বৃদ্ধি পায়। ক্যাফিন পাকস্থলীর পাচক-রসের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, এইজন্য বিশেষতঃ শূন্য উদরে অত্যধিক চা-পানে পাকস্থলীর প্রদাহ সৃষ্টি হইতে পারে। ক্যাফিন মস্তিষ্কের শ্বসনকেন্দ্র ও রক্তসঞ্চালনকেন্দ্রকেও কিছু পরিমাণে উদ্দীপিত করে। থিওফাইলিনও ক্যাফিনের মত নার্ভতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে। ইহা ছাড়া থিওফাইলিন বৃক্কে মূত্রক্ষরণের পরিমাণ বাড়ায়, এ প্রভাব ক্যাফিনেরও কিছু পরিমাণে দেখা যায়। চায়ের এই দুইটি উপক্ষার যকৃতে ইউরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য পিউরিন-ঘটিত পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়, ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় বলিয়া অত্যধিক চা পান গেঁটে বাতের রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে।

ট্যানিন ক্যাটেচল (Catechol)-ঘটিত জটিল ও বৃহদণুপদার্থ। সাধারণতঃ চায়ের লিকার তৈয়ারির সময় চা-পাতা হইতে অল্পমাত্রায় ট্যানিন দ্রবীভূত হইয়া লিকারে আসে। লিকারে দুধ মিশাইলে দুধের প্রোটিনের সহিত ট্যানিনের বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন প্রোটিন ও ট্যানিনের মিলিত অণুগুলি লিকারের তলদেশে পাতিত হয়। চা-পাতা জলে ফুটাইলে বা বহুক্ষণ গরম জলে ভিজাইয়া রাখিলে লিকারে ট্যানিনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়, ইহা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর।

ট্যানিনের বিষনাশক, শান্তিকর ও মৃদু বীজবারক (অ্যান্টিসেপ্টিক) গুণের জন্য অনেক সময় প্রাথমিক চিকিৎসার অন্য আয়োজনের অভাবে দেহের দগ্ধ অঙ্গে জলে ফুটানো চা পাতার প্রলেপ দেওয়া হয়।

চায়ে যে দুধ ও চিনি মিশানো হয় তাহা ছাড়া চায়ের বিশেষ কোনও খাদ্যমূল্য নাই।

দ্র T. A. Henry, *The Plant Alkaloids*, New York, 1949.

দেবজ্যোতি দাশ

চীন হইতে ইংল্যাণ্ডে চা রপ্তানি হইত। ইহাতে অসুবিধা হওয়ায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ উদ্ভিদবিদ্ জোসেফ ব্যাঙ্ককে ভারতে চা চাষের সমস্যা অনুধাবন করিতে বলিলে তিনি ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পূর্ব ভারত চা চাষের অনুকূল বলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আসামের কমিশনার ডেভিড স্কট আসামে চা পাওয়া যায় বলেন এবং শিবসাগরের বীসা গাউম (Gaum)-এর নিকট মেজর ব্রুস ও তাঁহার ভ্রাতা কর্তৃক সংগৃহীত চায়ের নমুনা কলিকাতায় পাঠান। উহা 'চা' বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন

জেন্‌কিন্‌স চা উত্তর আসামের সম্পদ বলিয়া আন্দোলন করেন। এই সময় লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতে চা প্রচলনের জন্য একটি কমিটি স্থাপিত করেন (১৮৩৪ খ্রী) ও চীন হইতে বীজ ও উপযুক্ত লোক আনার জন্য ব্যবস্থা করেন। এই কমিটি জেন্‌কিন্‌সের কথামত অনুসন্ধান করিয়া আসাম প্রদেশ চা চাষের উপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ফলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসামে পরীক্ষামূলকভাবে চায়ের চাষ আরম্ভ করেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বন্ধ হয়) এই প্রচেষ্টার ফলে ১ পাউণ্ড চা বিলাতে চালান যায়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে আসাম কোম্পানি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাগানগুলির ভার লইবার জন্য গঠিত হয় ও আজও এই কোম্পানি বর্তমান আছে। এইভাবে ভারতে চা-শিল্পের পত্তন হয়।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আসামের সরকারি বাগান বিক্রয় করিয়া বেসরকারি কোম্পানিকে আবাদের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে বাংলা, আসাম ও অন্যান্য প্রদেশে চা বাগান বিস্তারিত হয়। কিছুকাল পরে দক্ষিণ ভারতে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। কিছুকাল পূর্বেও চীন দেশই ছিল পৃথিবীতে চায়ের সর্বপ্রধান উৎপাদক, বর্তমানে ভারত সেই স্থান অধিকার করিয়াছে বলা যায়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ৮০০০ চা-বাগান আছে। এই বাগানগুলি পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, হিমাচল প্রদেশ, কেরল ও মাদ্রাজে সীমাবদ্ধ। ভারতে মোট ৮ লক্ষ একর জমিতে চা চাষ করা হয়। এই জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রায় ৬০% চা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বহির্বাণিজ্যে চা অতি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারত হইতে প্রায় ১৩০ কোটি টাকার চা বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

ভারতে মোট চা উৎপাদনের প্রায় ৮০% উত্তর ভারত (পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি) হইতে লব্ধ হয়। দক্ষিণ ভারতের চা-বাগান মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরল ও কুর্গে সীমাবদ্ধ।

বর্তমানে ভারতের চা-শিল্প নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। সেজন্য ভারতে চায়ের উৎপাদন বাড়ানো দরকার, কিন্তু উৎপাদন-ব্যয়ের ক্রমিক বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চা কে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। চায়ের আন্তর্জাতিক দর বাঁধিয়া দেয় লণ্ডনের নিলামওয়ালারা। ভারতের অভ্যন্তরেও চায়ের দাম এই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রতিযোগিতামূলক দরে বিদেশে চায়ের বিক্রয় বাড়াইতে হইলে উৎপাদনের ব্যয় কমাইতে হইবে। ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে যে 'আন্তর্জাতিক চা চুক্তি' ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাতিল হইয়া গিয়াছে তাহারও পুনঃসম্পাদন করা আবশ্যক। চায়ের গুণগত মানের উন্নয়ন আর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ইহার উপর বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় চায়ের প্রতিযোগিতাশক্তি নির্ভর করে। এই সব সমস্যা মিটাইবার জন্য ভারত সরকার টি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান চা-শিল্পের সর্বাঙ্গীণ তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত চা-পরিষদগুলি ইওরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বর্ধিত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

চা-শিল্পে বহুকাল হইতে কতকগুলি রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চা-বাগানের মালিক ভাবী চা-বাগান লগ্নি করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। এই ব্যাপার চায়ের দালালের অনুমোদনসাপেক্ষ। পূর্বাঞ্চলের বাগানের চা কলিকাতায় খিদিরপুর অঞ্চলে ওয়্যার হাউসে জমা হয়। চা পৌঁছানোর তারিখ অনুযায়ী দালালেরা নিলামের দিন ধার্য করে ও ফেব্রুয়ারি হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে বিশেষ স্থানে চায়ের নিলাম হয়। কেবলমাত্র চা-ব্যবসায়ী সংস্থা (সি. টি. টি. এ.) এই নিলামে অংশগ্রহণ করিতে পারেন এবং ক্রীত চায়ের মূল্য ১৫ দিনের মধ্যে দিতে হয়। দালালরাই বিক্রয়লব্ধ অর্থে ব্যাঙ্কের টাকা মিটাইয়া দেন ও এইভাবে আবার উৎপাদন ও বিক্রয়চক্র চলে। উত্তর ভারতের চা কলিকাতায় ও দক্ষিণ ভারতের চা কোচিন এবং লণ্ডনে প্রধানতঃ নিলাম হইয়া থাকে।

নৈনা চট্টোপাধ্যায়

চাকমা[1] চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। চাকমাগণ জুম চাষ করে এবং মাচার উপর বাঁশের ঘর তৈয়ারি করে। ইহাদের দেহ-গঠন মগ বা আরাকানীদের মত। ইহারা চাকমা, ডোইংনাক এবং তুংগঞ্জাইন্যা অথবা তাংগঞ্জালগ্যা এই তিনটি শাখায় বিভক্ত। সমতলের বাঙালীদের সহিত বৈবাহিক সূত্রে ইহাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছে; এরূপ বিবাহ চাকমা সমাজের অনুমোদিত।

উল্লিখিত তিনটি শাখা কতকগুলি উপশাখা বা 'গোছায' বিভক্ত। কোনও কোনও গোছা আদিপুরুষের নামে এবং কোনওটি নদীর নামে পরিচিত। নিজ নিজ গোছার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। পরিণত বয়সে চাকমাদের

বিবাহ হয়। বিবাহে কন্যাপণ দেওয়ার রীতি বিদ্যমান। সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে।

প্রত্যেক গোছায় একজন করিয়া প্রধান বা 'দেওয়ান' থাকে। দেওয়ান গোছার অন্তর্গত ব্যক্তিগণের সুখসুবিধা বিধান করেন। বৃহৎ গোছায় 'খেজা' নামে দেওয়ানের একজন সহায়ক থাকে। দেওয়ানকে বৎসরে একবার চাউল, মুরগি এবং বাঁশের চোঙায় করিয়া মদ্য উপহার দেওয়া হয়।

চাকমাগণ সাধারণতঃ শবদাহ করে। তৎপূর্বে রথে মৃতদেহকে বহন করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও উহাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ লক্ষ্মী পূজা করিয়া থাকে। ভূত-প্রেত ইত্যাদিতে তাহাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ার পরে অনেক চাকমা মণিপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছে।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

চাকমা[২] চাকমা জাতির ভাষা। চাকমাকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ বাংলা ভাষারই একটি উপভাষারূপে গণ্য করেন। বাংলার দক্ষিণ পূর্ব উপভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ হইলেও চাকমার মধ্যে কতকগুলি এমন বৈশিষ্ট্য আসিয়া গিয়াছে যে ইহাকে প্রায় একটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায়। ব্যাকরণের দিক দিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাংলার সহিত চাকমার খুব সাদৃশ্য রহিয়াছে। চাকমা খমের লিপিতে লেখা হইয়া থাকে।

দ্র সতীশচন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি, সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী ২৪, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. V, part 1, Calcutta, 1903.

দীপংকর দাশগুপ্ত

চাণক্য নাম হইতে মনে হয়, ইনি ছিলেন চণকের পুত্র বা বংশধর। ইনি বিষ্ণুগুপ্ত ও কৌটিল্য নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। পালিগ্রন্থ 'মহাবংশ' এবং চাণক্যের নামাঙ্কিত প্রচলিত কতকগুলি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে চাণক্য তক্ষশীলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং উপার্জনের উদ্দেশ্যে রাজধানী পাটলিপুত্রে গমন করেন। তখন নন্দবংশীয় রাজা চাণক্যকে পণ্ডিত-সভায় অপমানিত করেন। ইহাতে কুপিত চাণক্য নন্দবংশের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হন। কালক্রমে ঐ বংশের উচ্ছেদপূর্বক তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার মন্ত্রীরূপে রাজকার্য পরিচালনা করেন। চাণক্যের কাহিনী অবলম্বনে 'মুদ্রারাক্ষস' নামে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছে। রাজনীতিতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কৌশলের জন্য তাঁহাকে প্রাচ্যের মাকিয়াভেলি বলা হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয় চাণক্যের নামের সহিত যুক্ত: ১. অর্থশাস্ত্র ২. চাণক্য-রাজনীতিশাস্ত্র (ভোজরাজের আদেশে সংকলিত)। 'অর্থশাস্ত্র' দ্র।

দ্র Ludwik Sternback, *Canakya-Niti, Text Tradition*, Hoshiarpur, 1963.

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চাণক্যের নামাঙ্কিত নীতিবিষয়ক শতাধিক শ্লোকের সংগ্রহ শিশুপাঠ্য হিসাবে বাংলা দেশে বহুল প্রচলিত ছিল। দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে একজাতীয় বিভিন্ন সংগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়: ১. চাণক্য নীতি দর্পণ (সতেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত, মোট শ্লোকসংখ্যা ৩৭২) ২. বৃদ্ধ-চাণক্য (আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত, বিভিন্ন সংস্করণে মোট শ্লোকসংখ্যা ১০৯ হইতে ১১৩) ৩ চাণক্যনীতি শাস্ত্র ৪. চাণক্য-সার সংগ্রহ বা বোধচাণক্য (তিনটি শতকে বিভক্ত, ৩০০ শ্লোক) ৫. লঘুচাণক্য (আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত, শ্লোকসংখ্যা ৮৩ হইতে ৯৭) ও ৬ চাণক্য-রাজনীতিশাস্ত্র (আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত, শ্লোকসংখ্যা ২৫৩ হইতে ৬৫৮)।

সংগ্রহের সহিত যে চাণক্যের নাম সংযুক্ত তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার সহিত শ্লোকগুলির সম্বন্ধ কিরূপ তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চাতক নামান্তরে পাপিয়া। কুকুলিফর্মেস বর্গের (Order-Cuculiformes) অন্তর্গত কুকুলিদী গোত্রের (Family-Cuculidae) পাখি, বিজ্ঞানসম্মত নাম ক্ল্যামাতোর জাকোবিনস (*Clamator jacobinus*)। দৈর্ঘ্য পুচ্ছসহ প্রায় ৩৩ সেন্টিমিটার। দেহের সমগ্র উপরিভাগ কালো, মাঝে মাঝে সবুজের আভা, দেহের অধোদেশ সাদা। মাথায় কালো শিখা। ডানার বড় পালকগুলি গাঢ় পিঙ্গল ও সাদা ডোরাকাটা। দীর্ঘ লেজের অগ্রভাগ সাদা। ওঠাপড়ার সময় ডানার সাদা ডোরা ও শ্বেত পুচ্ছাগ্র সহজেই চোখে পড়ে। চঞ্চু কালো। স্ত্রীপক্ষীর দেহসজ্জা পুংপক্ষীর অনুরূপ।

নিম্নভূমি হইতে হিমালয়ের প্রায় ২৪০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্র চাতক দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় চাতক স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ভারতের অবশিষ্টাঞ্চলে বর্ষা ঋতুতে অপর এক উপপ্রজাতির বৃহত্তর চাতক (*Clamator jacobinus pica*) আগন্তুক হইয়া আসে। বর্ষায় মেঘসমাগমে চাতক চঞ্চল হয় ও তীব্র কণ্ঠে আকাশ মুখরিত করে। বর্ষাশেষে ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মুখরতা ও চাঞ্চল্য দূর হয়। শীতকালে ইহারা আফ্রিকায় চলিয়া যায়।

চাতক প্রধানতঃ পতঙ্গভুক। ইহাদের খাদ্যের মধ্যে ফড়িং, শুঁয়াপোকা প্রভৃতি প্রিয়, ইহারা টেপারি প্রভৃতি ফলও খাইয়া থাকে। কোকিলের মত চাতকও পরভৃত। ছাতারে জাতীয় পাখির বাসায় ইহারা ডিম পাড়ে, ডিমের দুই প্রান্ত চাপা ও চকচকে, রঙ আকাশী।

চাতক মুখ্যতঃ জলবহুল বিশেষতঃ স্যাঁতসেঁতে স্থান পছন্দ করে। এ দেশের প্রাচীন কবিরা যে ইহাকে 'অম্বোবিন্দুগ্রহ' এবং বৃষ্টিবিন্দু ভিন্ন অন্য জল পানে অক্ষম বা অনিচ্ছুক বলিয়াছেন, পক্ষীবিজ্ঞানে তাহার কোনও সমর্থন পাওয়া যায় না।

বঙ্গ দেশের পক্ষীপ্রেমীদের মতে ফটিকজল ও চাতক অভিন্ন পাখি। কিন্তু পাশ্চাত্যের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও পক্ষীবিজ্ঞানীরা এই মত সমর্থন করেন না।

দ্র E. C Stuart Baker, *The Fauna of British India Birds* vol IV London, 1927, Hugh Whistler *Popular Handbook of Indian Birds*, London 1949

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

চাতুর্মাস্য বর্ষার ৪ মাস এবং সে সময়ে পালনীয় নিয়ম। এই সময় হরির শয়নকালরূপে পরিগণিত। বিষ্ণু আষাঢ়ের শুক্ল একাদশীতে শয়ন করেন। ভাদ্রের শুক্ল একাদশীতে তাঁহার পার্শ্বপরিবর্তন ও কার্তিকের শুক্ল একাদশীতে উত্থান। সন্ন্যাসীদের দীর্ঘকাল একস্থানে অবস্থান নিষিদ্ধ হইলেও চাতুর্মাস্যকালে অর্থাৎ বর্ষার ৪ মাস, অন্ততঃপক্ষে ২ মাস, তাঁহারা একস্থানে বাস করিতে পারেন। মনে হয় ব্রতপালনের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা। এই সময়ে মানুষকে বিশেষভাবে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হয় এবং নানা ভোগাবস্তু ত্যাগ করিতে হয়। সাধারণ নিয়ম এই যে এই কালের রুচিকর ফলমূল ত্যাগ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্তিকে আমিষ বর্জনীয়। পটোল, বেগুন ও কলমীশাকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোনও কোনও বিধবা এই সময়ে তাল ভক্ষণ করেন না। কতকগুলি বস্তুর ত্যাগে বিশিষ্ট ফললাভ হয়, সুতরাং উহা বিশেষ প্রশংসার বিষয়। যথা, গুড় বর্জনে মানুষ মধুস্বর হয়, তৈল বর্জনে সুন্দর দেহ লাভ হয়। স্থালীপক্ব বস্তু ভক্ষণ না করিলে বহু সন্ততি লাভ হয়। মদ্য মাংস বর্জনে আধিব্যাধি নাশ হয়। একদিন অন্তর উপবাসের দ্বারা বিষ্ণুলোক লাভ হয়। এইরূপ নখলোম ধারণ বা ক্ষৌর বর্জন, তাম্বুল বর্জন, ঘৃত ত্যাগ ও ফল ত্যাগ, একাহার-গ্রহণ, ভূমিশয্যা বা প্রস্তরশয্যাগ্রহণ প্রভৃতি নানাবিধ ত্যাগের ও ক্লেশ স্বীকারের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

উল্লিখিত এক একটি বিষয়ে এক একজন ব্রত ধারণ করেন। সাধারণতঃ আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্তিকের শুক্লা দ্বাদশীতে ব্রত শেষ করার কথা। তবে আষাঢ়ের পূর্ণিমা বা সংক্রান্তি এবং আশ্বিনের সংক্রান্তিতেও ব্রতারম্ভের ব্যবস্থা আছে।

দ্র রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব, গোপালভট্ট, হরিভক্তিবিলাস, ১৫শ বিলাস, P V Kane, *History of Dharmasastra*, vol V, part I, Poona, 1958.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চাঁদ কবি চন্দ বরদৈ দ্র

চাঁদ রায় বাংলার বিখ্যাত বারভুঁইয়ার অন্যতম, তাঁহার ভ্রাতার নাম কেদার রায় ('কেদার রায়' দ্র)। চাঁদ রায় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, পদ্মাতীরবর্তী শ্রীপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। প্রবাদ এই যে, মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বের ১৫০ বৎসর পূর্বে তাঁহার পূর্বপুরুষ কর্ণাটবাসী জনৈক নিম রায় শ্রীপুরে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। চাঁদ রায় অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। চাঁদ রায় বাদশাহ্ আকবরের অধীনতা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং আমৃত্যু স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেও সমর্থ হন।

দ্র যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, J Wise, 'Bara Bhuiyans', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol 3, 1874.

কুমুদরঞ্জন দাস

চাঁদ সুলতানা (?-১৬০০ খ্রী) আহ্‌মদনগর রাজ্যের তৃতীয় সুলতান হোসেন নিজাম শাহের দুহিতা। তাঁহার জন্ম

হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, এবং চতুর্দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বিজাপুরের সুলতান প্রথম আলী আদিল শাহের সহিত। তাঁহার স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যু হয় (১৫৮০ খ্রী)। আলী ছিলেন নিঃসন্তান। তাহার নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌ বিজাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বালক রাজার শিক্ষার ভার চাঁদ সুলতানার উপরে ন্যস্ত হইল। তখন তাঁহাকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য সম্পাদন করিতে হয় তাহাতে তিনি যথেষ্ট দৃঢ়তা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

চাঁদ সুলতানা ৩৫ বৎসর বয়সে স্বীয় মাতৃভূমি আহ্‌মদনগরে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান ইব্রাহিম নিজাম শাহ্‌ পরলোক গমন করিলে তাঁহার শিশুপুত্র বাহাদুরকে বৈধ সুলতান ঘোষণা করিয়া চাঁদ সুলতানা স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। আরও তিনটি দল সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই সুযোগে মোগলবাহিনী ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়া আহ্‌মদনগর দুর্গ অবরোধ করিল। ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতে শত্রুর সমাবেশ সত্ত্বেও তিনি নেতৃসুলভ নৈপুণ্যের সহিত নির্ভয়ে দুর্গরক্ষায় ব্রতী হন। তাঁহার সাহস, সামরিক দক্ষতা ও আত্মত্যাগ শত্রু মিত্র সকলকে মোহিত করিয়াছিল। তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে নিহত হইবার পর (১৬০০ খ্রী) মোগলেরা আহ্‌মদনগর দুর্গ অধিকার করিলে ঐ রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।

দ্র Muhammad Qasim Ferishta, *Tarik-i-Ferishta*, V A. Smith, *Akbar the Great Mogul*, Oxford, 1919, A. L Srivastava, *Akbar the Great*, Agra, 1962.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

চান্দ্রায়ণ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে খাদ্য নিয়ন্ত্রণরূপ ব্রত। ইহাতে শুক্লপক্ষে প্রতি তিথিতে এক এক গ্রাস খাদ্য বাড়ানো ও কৃষ্ণপক্ষে প্রতি তিথিতে এক এক গ্রাস কমানো হয়। খাদ্যের পরিমাণ ও হ্রাস বৃদ্ধির ক্রমানুসারে চান্দ্রায়ণ নানা প্রকারের। কৃষ্ণপক্ষে আরম্ভ হইলে কৃষ্ণপ্রতিপদে চতুর্দশ গ্রাস হইতে প্রতিদিন এক এক গ্রাস কমিয়া কৃষ্ণচতুর্দশীতে মাত্র এক গ্রাস ও অমাবস্যায় উপবাস, শুক্লপ্রতিপদে পুনরায় এক গ্রাস ও পরে প্রতিদিন এক এক গ্রাস বাড়িয়া পূর্ণিমায় পঞ্চদশ গ্রাসে সমাপ্তি। ইহার নাম পিপীলিকামধ্য, কারণ ইহার মধ্য ভাগ অর্থাৎ অমাবস্যা খাদ্যের তুলনায় পিপীলিকার মত ক্ষীণ। আবার শুক্লপক্ষে আরম্ভ হইলে শুক্লপ্রতিপদে এক গ্রাস হইতে বাড়িয়া বাড়িয়া পূর্ণিমায় পঞ্চদশ গ্রাস এবং কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ হইতে কমিয়া কমিয়া অমাবস্যায় উপবাস। ইহার নাম যবমধ্য, কারণ ইহার মধ্য ভাগ অর্থাৎ পূর্ণিমা খাদ্যের তুলনায় যবের মত স্থূল। যতিচান্দ্রায়ণে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ৮টি করিয়া হবিষ্যান্নের গ্রাস গ্রহণ করিতে হয়। শিশুচান্দ্রায়ণে প্রতিদিন প্রাতে ৪ গ্রাস ও সন্ধ্যায় ৪ গ্রাস করিয়া খাদ্য গ্রাহ্য। ঋষিচান্দ্রায়ণে প্রতিদিন ৩টি করিয়া হবিষ্যান্নের গ্রাস বিহিত। আর একরূপ চান্দ্রায়ণে যে কোনও প্রকারে এক মাসে ২৪০ গ্রাস পরিমিত অন্নগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। এক এক গ্রাস অন্নের পরিমাণ এক একটি ময়ূরের ডিমের মত। চান্দ্রায়ণে ভোজননিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সংযত শুদ্ধ জীবনযাপন এবং ৩ বেলা ৩ বার স্নান ও মন্ত্রজপাদি কর্তব্য। যে পাপের কোনও প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট নাই সেই পাপেও চান্দ্রায়ণের দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়। দেবতারাও চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। বর্তমানে এ অনুষ্ঠান একরূপ বিলুপ্ত। ইহার অনুকল্প হিসাবে কেহ কেহ সার্ধ সপ্ত পয়স্বিনী ধেনুর মূল্যস্বরূপ ব্রাহ্মণকে পাঁচ টাকা দশ আনা দান করিয়া থাকেন।

দ্র মনু-সংহিতা, ১১।২১৫-২০, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ৩।৩২৩-২৫, P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol IV, Poona, 1953

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চাপড়াষষ্ঠী ষষ্ঠী দ্র

চাঁপা সুগন্ধি ফুলের গাছ। আর্দ্র উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে, যেমন বঙ্গ দেশে বিভিন্ন জাতের চাঁপা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য – চম্পক গোত্রের (ফ্যামিলি-ম্যাগ্নোলিয়াসিঈ, Family-Magnoliaceae) অন্তর্ভুক্ত চাঁপা (মিশেলিয়া চাম্পাকা, *Michelia champaca*) ও ডুলি চাঁপা (ম্যাগ্নোলিয়া টেরোকার্পা, *Magnolia pterocarpa*), কোকো গোত্রের (ফ্যামিলি স্টেরকুলিয়াসিঈ, Family-Sterculiaceae) অন্তর্ভুক্ত কনক চাঁপা (টেরোস্পের্মম আসেরিফোলিয়ম, *Pterospermum acerifolium*) ও মুচকুন্দ চাঁপা (টেরোস্পের্মম সুবেরিফোলিয়ম, *Pterospermum suberifolium*), আদা গোত্রের (ফ্যামিলি-জিঙ্গিবেরাসিঈ, Family-Zingiberaceae) অন্তর্ভুক্ত ভুঁই চাঁপা (কেম্প্‌ফেরিয়া রোতুন্দা, *Kaempferia rotunda*) ও দুলাল চাঁপা (হেদিকিয়ম কোরোনারিয়ম, *Hedychium coronarium*), করবী গোত্রের (ফ্যামিলি-আপোসীনাসিঈ, Family-Apocynaceae) অন্তর্ভুক্ত

গরুড় চাঁপা (প্লুমিয়েরা আকুটিফোলিয়া, *Plumiera acutifolia*), আতা গোত্রের (ফ্যামিলি-আনোনাসিঈ, Family-Anonaceae) অন্তর্ভুক্ত কাঁঠালি চাঁপা (আর্টাবোট্রিস ওদোরাতিস্‌সিমা, *Artabotrys odoratissima*) এবং নাগকেশর গোত্রের (ফ্যামিলি-গুটিফেরাঈ, Family-Guttiferae) অন্তর্ভুক্ত সুলতান চাঁপা (কালোফিল্লুম ইনোফিল্লুম, *Calophyllum inophyllum*)। ইহাদের মধ্যে ভুঁই চাঁপা ও দুলাল চাঁপা একবীজপত্রী বীরুৎ, কাঁঠালি চাঁপা দ্বিবীজপত্রী রোহিণীজাতীয় লতা এবং অবশিষ্টগুলি দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্র সরল ও একান্তর। ফুল সুগন্ধি এবং সাধারণতঃ উভলিঙ্গ। মুচকুন্দ চাঁপার ফুল শীতকালে, দুলাল চাঁপার ফুল বর্ষাকালে এবং অবশিষ্টগুলির ফুল গ্রীষ্মকালে ফোটে। চাঁপার ফুল পীত বা কমলা বর্ণ, ডুলি চাঁপার ফুল বৃহৎ ও শ্বেত বর্ণ, কনক চাঁপার ফুল হরিদ্রাভ শ্বেত বর্ণ, মুচকুন্দের ফুল শ্বেত ও পীতের মিশ্রিত বর্ণ, ভুঁই চাঁপার ফুল গাঢ় পীত বা বেগুনী, দুলাল চাঁপার ফুল শ্বেত, গরুড় চাঁপার শ্বেত বর্ণের ফুলের ভিতরে ফিকে হলুদ বা লাল রং এবং সুলতান চাঁপার ফুল বৃহৎ ও শ্বেত বর্ণ। তীব্র গন্ধযুক্ত কাঁঠালি চাঁপার ফুল প্রথমে সবুজ ও পরে পীত বর্ণ ধারণ করে। শাখা, বীজ, জোড় কলম প্রভৃতির সাহায্যে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫০-৫২; W Burns, *Firminger's Manual of Gardening*, Calcutta, 1918

চামচিকা বাদুড় দ্র

চামুণ্ডা মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে দৈত্যবাহিনীসহ চণ্ড ও মুণ্ড নামে অসুরদ্বয় দেবী অম্বিকাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে অতিক্রুদ্ধা দেবীর ললাটফলক হইতে ইনি আবির্ভূত হন। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, করালবদনা, অসি-পাশ-খট্বাঙ্গধারিণী, মুণ্ডমালালংকৃতা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, শুষ্কমাংসা, অতিভীষণা, অতিবিস্তারবদনা, লোলজিহ্বা, তাঁহার আরক্ত নয়ন কোটরগত। তাঁহার নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ, চণ্ড ও মুণ্ডকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহাদের মুণ্ড মহাদেবীকে উপহার দেওয়ায় ইঁহার নাম হয় চামুণ্ডা। যুদ্ধে আহত রক্তবীজের দেহ-নির্গত প্রতি রক্তবিন্দু হইতে তত্তুল্য অসুরের সৃষ্টি হইতে থাকিলে ইনি মুখ বিস্তৃত করিয়া সেই রক্ত পান করেন এবং মুখের মধ্যে উৎপন্ন অসুরগণকে ভক্ষণ করেন। ফলে বহু অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত রক্তবীজ রক্তহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য, ৭, ৮)। তন্ত্রসারে বশীকরণকার্যে ইঁহার মন্ত্রপ্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে। তন্ত্রসারোক্ত ধ্যান অনুসারে ইঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল কোটি দন্তে বিশাল, ইনি ঘনান্ধকারে অবস্থান করেন, ইঁহার দক্ষিণ করে খট্বাঙ্গ ও বজ্র, বাম করে পাশ ও নরমুণ্ড, ইঁহার কেশ পিঙ্গল বর্ণ। ইনি শববাহনা।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চামুণ্ডা বা চামুণ্ডী মাতৃকাগণের অন্যতম অথবা সামান্যতঃ গণবোধক। চামুণ্ডা সহ মাতৃকাগণের সংখ্যা সাধারণতঃ ৭ হইলেও কোনও কোনও পুরাণে ৮ ও ৯ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চামুণ্ডা ছাড়া অন্যান্য মাতৃকা হইলেন: ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী এবং ইন্দ্রাণী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৮৮ অধ্যায়) শিবদূতী এবং নারসিংহী নামে আরও দুই জন মাতৃকার নাম পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণে (১৪৬ অধ্যায়) চামুণ্ডা ছাড়া মাতৃকাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে আবার 'চামুণ্ডা' যুক্ত দেখা যায়, যেমন চামুণ্ডা মাহেশ্বরী ইত্যাদি এবং শেষ দুই জনের নাম চামুণ্ডা-চণ্ডী এবং চামুণ্ডা ঈশানী। সুতরাং অগ্নিপুরাণে মাতৃকাদের সংখ্যা ৮।

যদিও চামুণ্ডাকে কখনও কখনও যাম্যী (যমের শক্তি) বলিয়া মনে করা হয়, তথাপি ব্রহ্মাণী প্রমুখ মাতৃকা যেমন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের শক্তি, সেইরূপ শিবের ঘোর রূপ ভৈরবের শক্তি বলিয়া তিনি পরিগণ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বাজসনেয় সংহিতায় (৫, ১১) প্রাপ্ত মনোজবাকে ('মনোজবস্‌') যমের অন্যতম শক্তি বলিয়া ধরিলে মুণ্ডকোপনিষদে (১,২,৪) উক্ত 'মনোজবা'কে যমের পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে অসুবিধা হয় না।

ভারতে শক্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আজ আর সংশয়ের অবকাশ নাই এবং সেই হিসাবে চামুণ্ডা বা তাঁহার কোনও আদি রূপের কল্পনাও বেশ প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, বিশেষতঃ রূপচিন্তার দিক হইতে উল্লিখিত মনোজবাকে চামুণ্ডার সঙ্গে অভিন্ন ধরিলে দেবীর প্রাচীনত্ব খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব পর্যন্ত টানা যাইতে পারে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশ, অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত দেবী মাতৃশক্তিরই সর্বোচ্চ রূপ। তাঁহার বিভিন্ন রূপ-সংক্রান্ত বিবরণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের আলোকে মনে হয়, চামুণ্ডা ও দেবীর বিভিন্ন রূপের অনেকগুলি অনার্য জাতির নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। চামুণ্ডা বা তাঁহার আদিরূপ তাহাদের রুধির সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়, কারণ পুরশ্চর্যার্ণবের

তৃতীয় খণ্ডে ব্রহ্মাণী, কালিকা, চামুণ্ডা ইত্যাদিকে বিভিন্ন ফল-শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। চামুণ্ডা সেখানে মানকচুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরশ্চর্যার্ণব গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের হইলেও চামুণ্ডাদি দেবীর সহিত বিভিন্ন ফল-শস্যের সম্পর্কিত তথা প্রাচীন অনার্যসমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের অবশিষ্টাংশ বলিয়া মনে করা অসংগত নহে।

চামুণ্ডাদেবী পুরাণ ও আগমাদি গ্রন্থের সর্বত্রই ভীষণ-দর্শনারূপে চিত্রিত আছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত চামুণ্ডার মূর্তিগুলিও তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভীষণ-দর্শনা। ওড়িশার যাজপুরে (প্রাচীন বিরজাক্ষেত্র) আবিষ্কৃত এইরূপ একটি মূর্তিতে দেবী শবাসীনা. তাঁহার চারি হাতে কর্ত্রি, শূল, কপাল ও নরমুণ্ড, তিনি অস্থি-চর্মসারা, কৃশোদরী, শিথিলস্তনী এবং কোটরাক্ষী। চামুণ্ডার আর একটি সুপরিচিত মূর্তি ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের গর্ভগৃহে বর্তমান। ইনিও শবাসনা ও কৃশোদরী, এই দেবীমূর্তির দুই পাশের প্রাচীরগাত্রে অন্যান্য মাতৃকা-গণের এবং বীরভদ্র ও গণেশাদির মূর্তিও ক্ষোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাজপুরে আর একটি ভয়াবহ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তবে এই মূর্তিতে দেবীর কর্ণদ্বয় অতিশয় দীর্ঘ এবং তিনি উবু হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর হাসিটিও লক্ষণীয়। মূর্তিতত্ত্বের বিচারে এই মূর্তিতে চামুণ্ডার দন্তুরা নামক একটি বিভেদ রূপায়িত হইয়াছে।

দেব-দেবীদের ব্যাপারে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের পারম্পরিক আদান-প্রদান সুপরিচিত ঘটনা। বৌদ্ধ 'নিষ্পন্নযোগাবলী'তে বিভিন্ন দেব দেবীর মধ্যে চামুণ্ডারও উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক ক্লার্ক চীনের পিপিঙ্‌ শহরে প্রাপ্ত কপালধারিণী একটি মূর্তিকে চামুণ্ডা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতে আবিষ্কৃত দেবীমূর্তিগুলি ব্যতীত সাহিত্যগত সাক্ষ্যের দ্বারাও চামুণ্ডা পূজার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়, ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে করালা চামুণ্ডার মন্দিরের উল্লেখ আছে। দেবীর চামুণ্ডাদি ঘোর মূর্তিগুলি স্বভাবতঃ তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যেই অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে চামুণ্ডা দেবীর পূজা অদ্যাপি প্রচলিত। মহীশূর শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের শীর্ষে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির আছে এবং হায়দর আলীর রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত ঐ মন্দিরে নরবলি হইত। বাংলা দেশে বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর-এর চামুণ্ডা পূজা সুপ্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত এই সর্বজনীন পূজায় ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিই প্রধান উদ্যোক্তা। এই উপলক্ষে ব্যাপক ও নির্বিচার বলিদান প্রচলিত আছে।

সংক্ষেপে চামুণ্ডার সামগ্রিক রূপ কল্পনা ও সংশ্লিষ্ট কাহিনী, কিংবদন্তি ও পূজা-পদ্ধতি বিচার করিলে সন্দেহ থাকে না যে, আদি পর্বে চামুণ্ডা ছিলেন অনার্যদের আরাধ্য দেবতা। কালক্রমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সূত্রে তিনি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবতামণ্ডলীর মধ্যে পরি-বর্তিত আকারে স্থান লাভ করেন।

দ্র জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬২, T. A. Gopinath Rao, *Elements of Hindu Iconography*, vol. I, Madras, 1914, Benoytosh Bhattacharya, ed, *Nispannayogavali* Baroda, 1949; T. A Clarke, *Two Lamaistic Pantheons*, Harvard University Press 1937, J N Banerjea, *Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

চারণ পশ্চিম ভারতের একটি জাতির নাম। স্কন্দ-পুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে (২৬।৫০) বলা হইয়াছে যে বৈশ্যের ঔরসে এবং শূদ্রার গর্ভে চারণ জাতির জন্ম। রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের গুণ কীর্তন, সংগীত ও কামশাস্ত্র চর্চা ইহাদের উপজীবিকা।

প্রাচীন ভারতে রাজসভায়, বিশেষতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে, অতীত যুগের বীরগণের কাহিনী সংগীতের মাধ্যমে বর্ণনা করার প্রথা ছিল। এই সংগীত-কাহিনীকে 'নারাশংসি' বা বীরগাথা বলা হইত। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও এইভাবে সংগীতকারগণের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। অনুমান করা যাইতে পারে যে যাহারা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া গাথা কাহিনীগুলি প্রচার করিত পরবর্তী কালে তাহারাই চারণ, ভাট, নট, কুশীলব ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। চারণগণ নিজেরা দাবি করে যে তাহারা মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট। একদা মালব এবং গুজরাত অঞ্চলে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে পথভ্রমণে শিববংশোদ্ভব চারণ সঙ্গে থাকিলে দস্যুগণ পথিককে আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না। তৎসত্ত্বেও আক্রান্ত হইলে চারণগণ দস্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 'আমি শিববংশোদ্ভূত, আমার সম্মুখে যেন কোনওরূপ পাপকর্ম না হয়' এই বলিয়া পথিককে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত। ইহাতে কৃতকার্য না হইলে দস্যুকে অভিসম্পাত করিয়া আত্মহত্যা করিত। আত্মহত্যার এই প্রথা 'ত্রাগা'

নামে পরিচিত। লুণ্ঠনকারীদের কবল হইতে গৃহস্থের গবাদি পশু রক্ষা করিতে না পারিয়া এইরূপ আত্মবিসর্জনকারী চারণদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত ‘পালিয়া’ বা প্রস্তরফলক পশ্চিম ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চলের, প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশপথে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

চারণগণ কাচিলি ও মরু নামক দুইটি শাখায় বিভক্ত। কাচিলি চারণগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। মরু চারণগণ রাজবংশাবলী ও বীরগণের যশোগানের মাধ্যমে প্রাচীন যুগের ইতিহাস প্রচার করে। রাজপুতগণের শৌর্যবীর্যের কাহিনী চারণগণের গাথায় কীর্তিত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ এইগুলি অবলম্বনেই টড সাহেব রাজপুতগণের ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ইহাদের সহিত গিবনবর্ণিত বেপজিক বংশাবলী কীর্তনকারীদের তুলনা করিয়াছেন।

কথিত আছে যে, মেবারের রাণা হামীর কচ্ছ ভুজ হইতে চারণদিগকে আনাইয়া চিতোরের নিকট এক স্থানে বাস করান এবং সম্মানসূচক কার্যে নিযুক্ত করেন। রাজপুতজাতির নিকট অতীত গৌরবকাহিনী বর্ণনাকারী এই চারণগণ অত্যন্ত সম্মাননীয়।

দীপকরঞ্জন দাস

চারমিনার হায়দরাবাদ দ্র

চারুচন্দ্র দত্ত (১৮৭৭-১৯৫২ খ্রী) বিপ্লব প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষের সহকর্মী, লেখক ও সিভিলিয়ন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে চারুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালীনাথ ছিলেন কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান। কুচবিহার রাজ্যেই তিনি বাল্যশিক্ষা লাভ করেন এবং স্বাদেশিকতার দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ঐ স্থানে শিকারও শিখিয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। চারুচন্দ্র বি. এ পাশ করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে বিলাত যান। পরীক্ষায় সফল হইয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফেরেন এবং বোম্বাই অঞ্চলে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে জজের পদে নিযুক্ত হন। বোম্বাইয়ে কর্মজীবন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাঁহার স্বদেশব্রত পালন। বোম্বাই প্রদেশের কয়েকটি স্থানে তিনি জনসেবা সঙ্ঘ এবং শিল্প ও ব্যায়ামের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ঠানায় নিয়োগকালে অরবিন্দের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় এবং সেই সময়েই অরবিন্দ-স্থাপিত ভবানী-মন্দিরের কর্মী হিসাবে বৃত হন। ১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ, বারীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গ্রেফতার হন। অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য তাঁহাকে কুচবিহারে প্রায় দুই বৎসর কাল অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বোম্বাই প্রদেশে নিজ কাজে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ‘পরিচয়’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তদবধি তিনি ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন ও তাঁহার আত্মজীবনী এবং আই সি এস. কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ‘পুরানো কথা’ নামে লিখিতে থাকেন। এই স্মৃতিকথা দুই-খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১ম খণ্ড ১৩৪৩, ২য় খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)। এই সময়ে কিছুকাল তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ দেন এবং সেখানেই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ‘পুরানো কথা’ ব্যতীত তিনি অনেকগুলি গল্প রচনা করেন, যাহা একত্রিত হইয়া ‘কৃষ্ণরাও’ নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ‘দেবাকু’, ‘দুনিয়াদারী’, ‘মায়ের আলাপ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিপ্লবী জীবনের কাহিনী, ‘পুরানো কথা — উপসংহার’ প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। অরবিন্দ, বারীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার বহু অপ্রকাশিত কাহিনী চারুচন্দ্র ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রী) পিতা গোপালচন্দ্র, মাতা মুক্তকেশী। আদি নিবাস যশোহর জেলায়। জন্ম ২৫ আশ্বিন ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, ১১ অক্টোবর ১৮৭৭ খ্রী, মৃত্যু ১ পৌষ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮ খ্রী। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কবিতা ও সংকলন-প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তাঁহার সাহিত্যজীবনের সূচনা, ক্রমশঃ ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনা দ্বারা তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি ইণ্ডিয়ান প্রেস/ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে যোগ দিয়া রুচিমান প্রকাশক, কৃতী সম্পাদক ও দক্ষ অনুবাদকরূপে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি প্রবাসীতে সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেন, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, সাহিত্যপত্ররূপে প্রবাসী যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল তাহার ভিত্তিরচনায় চারুচন্দ্রের দান আধুনিক বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। ‘ভারতী’-

সাহিত্যগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার একান্ত সহমর্মিতা ছিল, তরুণ রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রধান ছিলেন, তাঁহার রচিত রবীন্দ্র-পরিচয়গ্রন্থ 'রবি-রশ্মি' উল্লেখযোগ্য পুস্তক, ইহার সূত্রে ধৃত চারুচন্দ্রকে লিখিত পত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার স্বকৃত ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রপাঠক সমাজ উপকৃত হইয়াছেন।

'চুড়িওয়ালা', 'বায়ু বহে পুরবৈয়া' প্রভৃতি স্নিগ্ধ সকরুণ ছোট গল্প এবং 'চটির পার্টি', 'গুণী' প্রভৃতি হাসির গল্প লিখিয়া চারুচন্দ্র একদা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, 'পুষ্পপাত্র', 'সওগাত', 'ধূপছায়া', 'বরণ ডালা', 'চাঁদমালা' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার রচিত গল্পগুলি সংগৃহীত। ঔপন্যাসিকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, পঁচিশখানি উপন্যাস তিনি রচনা করেন তন্মধ্যে 'স্রোতের ফুল', 'পরগাছা', 'দুই তার', 'হেরফের' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'জয়শ্রী' নামে একটি নাটিকাও তিনি লিখিয়াছিলেন।

অনুবাদ ও রূপান্তরণ-কর্মে চারুচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহার অনূদিত কোনও কোনও উপন্যাসে ও কয়েকখানি কিশোরপাঠ্য গ্রন্থে এই ক্ষমতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে। 'অবিমারক' নাটকের অনুবাদ করিয়া (প্রবাসী, ১৩২১) তিনি মহাকবি ভাস-এর রচনার সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় করাইয়া দেন। পদ্যে লিখিত তাঁহার 'ভাতের জন্মকথা' একখানি হিতকর ও মনোহারী শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

বাংলা ভাষা ও শব্দতত্ত্বের চর্চাতেও তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল, তাঁহার সম্পাদিত কয়েকখানি গ্রন্থে তিনি তাঁহার দক্ষতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এই পরিচয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৯ সালে তাঁহাকে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, ১৯২৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকপদে বৃত হন। ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাম্মানিক এম. এ. উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তার সমাদর করেন।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, বর্ধমান, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, [কনক বন্দ্যোপাধ্যায়], 'চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, বুদ্ধদেব বসু, 'চারু বন্দ্যোপাধ্যায়', দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

পুলিনবিহারী সেন

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৩-১৯৬১ খ্রী) জন্ম ১৬ আষাঢ় ১২৯০ বঙ্গাব্দ, ২৯ জুন ১৮৮৩ খ্রী; মৃত্যু ৯ ভাদ্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৬ আগস্ট ১৯৬১ খ্রী। পিতা বসন্তকুমার, মাতা মেনকা, আদি নিবাস হরিনাভি, চব্বিশ পরগনা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা-কার্যে যোগ দেন এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহাতেই নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কর্মজীবন কেবল অধ্যাপনা-কার্যেই নিঃশেষিত হয় নাই, কলিকাতার বহু সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন এবং ইহার অনেকগুলির কর্তৃত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ', ইহার বিস্তারের মূলে তাঁহার সংগঠনক্ষমতা বিশেষভাবে ক্রিয়াবান ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে সংগঠনশক্তির দুইটি মহৎ নিদর্শনের জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য থাকিবেন: ১ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্র প্রকাশের উদ্যোগ (প্রথম খণ্ড, ১৯৩৯ খ্রী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), মূলতঃ তাঁহার সমর্থনেই আর্থিক অনটনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের বহু বিস্মৃত রচনা-সংগ্রহের উদ্যম ফলপ্রসূ হইলে উত্তরকালে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়াছে ২ শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার একটি উদ্যোগ তাঁহার চেষ্টায় প্রচারিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা (প্রথম খণ্ড বৈশাখ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) স্বল্পমূল্যে বহু বিষয়ে জ্ঞানের প্রচারে সহায়ক হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ প্রভৃতি মনীষী বাংলায় 'বিজ্ঞানের সহজসাধ্য ভূমিকা' রচনার যে ধারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার অনুবর্তনে চারুচন্দ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের ইতিহাস ও আবিষ্কারকাহিনী বিবৃত করিয়া 'নব্যবিজ্ঞান' (১৯১৮ খ্রী), 'বাঙালীর খাদ্য' [১৯২৬ খ্রী], 'বিশ্বের উপাদান' (১৯৪১ খ্রী), 'তড়িতের অভ্যুত্থান' (১৯৪৮ খ্রী), 'ব্যাধির পরাজয়' (১৯৪৯ খ্রী), 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' (১৯৫১ খ্রী), কিশোরবয়স্কদের জন্য 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকাহিনী' (১৯৫৩ খ্রী) প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'বিজ্ঞানপ্রবেশ' (১৯৪৯ খ্রী) ও 'পদার্থবিদ্যা' (তিন খণ্ড ১৯৪৯-৫০ খ্রী) গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার-প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন। বিজ্ঞান-পরিষদে প্রদত্ত 'পরমাণুর নিউক্লিয়স' নামে রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় (১৯৬২ খ্রী)। বিভিন্ন সময়ে বাংলায় তিনখানি পুস্তিকা

রচনা করিয়া তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-কাহিনী প্রচার করেন।

তাঁহার রচনার প্রধান গুণ তাহার উজ্জ্বল সরসতা, কঠিন বিষয়েও চিত্তকে আকর্ষণ করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা। তাঁহার ভাণ্ডার বৈজ্ঞানিক কৌতুক-কাহিনীতে পূর্ণ ছিল, তথ্যবিবরণের মধ্যে এগুলিকে কৌশলে ব্যবহার করিয়া তিনি রচনায় সরসতা অবতারিত করিতেন, যাহাতে দুরূহ বিষয়ের আলোচনাতেও পাঠকের ঔৎসুক্য অব্যাহত থাকে।

তাঁহার রসরচনা এবং স্মৃতিচারণও উল্লেখযোগ্য, যথা 'কবিস্মরণে' (১৯৬১ খ্রী)— এই গ্রন্থে বর্ণিত কোনও কোনও চিত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ আগামীকালের মানুষের নিকট উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, ছদ্মনামে লিখিত 'অথ নটঘটিত' (১৯৬১ খ্রী) গ্রন্থে শ্রুতি-স্মৃতির সাহায্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অনেক বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় গত-যুগের পরিবেশের একটি খণ্ড নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সাময়িক-পত্র সম্পাদনাতেও তিনি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক হইতে আমৃত্যু তিনি 'বসুধারা' মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি-প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' পত্রও তিনি কয়েক বৎসর সম্পাদন করেন।

দ্র বসুধারা, ভাদ্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, কলিকাতা, ১৯৬০, Chittapriya Mukhopadhyya, 'In Memoriam Charuchandra Bhattacharya', *Visva-Bharati News*, September, 1961.

পুলিনবিহারী সেন

চারুব্রত রায় (১৮৮৬-১৯৫১ খ্রী) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পাটনায় চারুব্রত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার নাম মহিমানাথ রায়। চারুব্রত রায় মেডিক্যাল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন। এম. বি পাশ করিবার পরই ইনি মেডিক্যাল কলেজের শারীর-বিদ্যা বিভাগের ডেমনস্ট্রেটাররূপে প্রবেশ করেন এবং সেখানে প্রাণ-রসায়ন বিষয়ে অধ্যাপনা এবং গবেষণা করেন। মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিদ্যার তদানীন্তন অধ্যাপক কর্নেল ম্যাকে ইঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। পরে তাঁহারই সহিত চারুব্রত ডায়াবিটিজ ও খাদ্যবিষয়ে গবেষণা করিয়া মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। চারুব্রত রায় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন, তাহার পর ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে (অধুনা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) শারীরবিদ্যার শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করেন। বহু কৃতী শিষ্যসৃষ্টিই ইঁহার প্রধান কীর্তি। ভারতবর্ষের চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রেও ইঁহার একটি উজ্জ্বল স্থান আছে। ইনি কিছুকাল বেঙ্গল ইমিউনিটির সহিত যুক্ত ছিলেন। সে সময়ে ইনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ডিপ্‌থিরিয়া রোগের প্রতিষেধক ইনজেকশন— ডিপ্‌থিরিয়া অ্যান্টিটক্সিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। বেঙ্গল ইমিউনিটি ছাড়িয়া ইনি পরে নিজে বেঙ্গল বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রধানতঃ জীব-শরীরের নানা গ্রন্থির নির্যাস হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হইত। এই প্রতিষ্ঠানও কিছুদিন পরে উঠিয়া যায়। চারুব্রত কর্তব্যনিষ্ঠ, দয়ালু, মিতবাক এবং রাশভারী লোক ছিলেন। কর্ম হইতে অবসর লইবার পরও তিনি বাড়িতে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াইতেন। তাঁহাকে গুরুরূপে পাইয়া অনেকেই বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর কলিকাতায় তাহার মৃত্যু হয়।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

চার্চিল, উইনস্টন লেনার্ড স্পেন্সার (১৮৭৪-১৯৬৫ খ্রী) প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাজনৈতিক নেতা। তাঁহার পিতার নাম লর্ড র‍্যানডল্‌ফ চার্চিল। হ্যারো এবং স্যাণ্ডহার্স্ট-এ শিক্ষা সমাপন করিয়া চার্চিল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁহার প্রথম জীবনেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মালাকান্দ (১৮৯৭ খ্রী) এবং সুদান (১৮৯৮ খ্রী) এর যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়। বুয়র-যুদ্ধের সময় (১৮৯৯-১৯০২ খ্রী) তিনি বিলাতের 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। বুয়রগণ তাঁহাকে একবার বন্দী করিয়াছিল, কিন্তু চার্চিল পলায়ন করিতে সক্ষম হন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চার্চিল ওল্ড্‌হ্যাম কেন্দ্র হইতে কনজারভেটিভ দলের প্রার্থীরূপে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। যে বিতর্ক নৈপুণ্য, বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক চাতুর্য তাঁহাকে প্রসিদ্ধ করিয়াছে, তখন হইতে তাহার উন্মেষ হয়। অবশ্য, কনজারভেটিভ দলের সহিত তাঁহার মতৈক্য সর্বদা অক্ষুণ্ণ ছিল না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিবারেল পার্টিতে যোগ দেন। চার্চিল ১৯০৮-১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট অফ দি বোর্ড অফ ট্রেড (বাণিজ্যমন্ত্রী), ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে হোম সেক্রেটারি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) এবং ১৯১১-১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফার্স্ট লর্ড অফ দি অ্যাড্‌মিরাল্টি (নৌ-মন্ত্রী)-র পদে নিযুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়

তিনি জার্মানীর সহিত সংঘর্ষ প্রত্যাসন্ন জানিয়া নৌবহরের শক্তিবর্ধনে যত্নবান হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮ খ্রী) ইংল্যাণ্ডের নৌ-বাহিনী যে রণদক্ষতার পরিচয় দেয় তাহা অনেকাংশে চার্চিলের দূরদৃষ্টি ও সংগঠন-নৈপুণ্যের ফল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া যান। ডেভিড লয়েড জর্জের আহ্বানে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে চার্চিল মিউনিশন্‌স বা যুদ্ধসম্ভার দপ্তরের দায়িত্ব লইয়া আবার মন্ত্রীসভায় ফিরিয়া আসেন। ১৯১৮ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ এবং বিমান দপ্তর পরিচালনা করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে চার্চিল লিবারেল দল ত্যাগ করেন এবং নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় তখন হইতে দুই বৎসর তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন না। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টিটিউশনালিস্ট বা নিয়মতন্ত্রবাদী প্রার্থীরূপে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে চার্চিল কন্‌জারভেটিভ দলে প্রত্যাবর্তন করেন। বল্ড্‌উইনের মন্ত্রীসভায় তিনি চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার (অর্থমন্ত্রী)-এর পদে বৃত ছিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫ খ্রী) সূত্রপাত পর্যন্ত তিনি আর কোনও মন্ত্রীসভায় স্থান পান নাই। প্রধানতঃ ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুদয়-সম্পর্কিত এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নীতি লইয়া দলের সহিত চার্চিলের তীব্র মতান্তরকে ইহার কারণ বলিয়া ধরা যায়। ১৯৩৬-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসী জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা-সম্বন্ধে জাতিকে তিনি বারংবার সাবধান করিতে থাকেন। এই সময়ে তোষণনীতির বিপদ সম্পর্কেও তিনি অক্লান্তভাবে দেশবাসীকে অবহিত করিয়াছিলেন। চার্চিল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা-গঠনের এবং মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত মৈত্রী-সম্পাদনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন কর্তৃক উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে জনমতের চাপে চেম্বারলেন তাঁহাকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে জার্মানীর হাতে নরওয়ে নির্জিত হইতে থাকিলে চেম্বারলেন ব্রিটিশ জনগণের আস্থা সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলেন। জার্মান সৈন্য ১০ মে লুক্সেমবুর্গ, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে প্রবেশ করিল। তখন চেম্বারলেন পদত্যাগ করিলেন এবং চার্চিলের উপর রাষ্ট্রিক নেতৃত্বভার ন্যস্ত হইল। চার্চিল সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। ১৯৪০-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ জাতিকে অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে কন্‌জারভেটিভ দল পরাস্ত হইলে চার্চিল বিরোধী দলের নেতৃপদ গ্রহণ করেন। ১৯৫১-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁহাকে 'নাইট অফ দি অর্ডার অফ দি গার্টার' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি চার্চিলের মৃত্যু হয়।

চার্চিল শুধু রাজনীতিবেত্তা বা বাগ্মী ছিলেন না, লেখকরূপেও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'লাইফ অফ লর্ড র‍্যান্‌ডল্‌ফ চার্চিল' (১৯০৬ খ্রী), 'দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়র' (৬ খণ্ড, ১৯৪৮-৫৪ খ্রী) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্রকর হিসাবেও তিনি বহুজনের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সংরক্ষণই চার্চিলের অনুসৃত রাজনীতির মূল বনিয়াদ ছিল। ঐ মূল সূত্রের সাহায্যেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁহার অনমনীয় মনোভাবের বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী-রচনার অথবা তাঁহার কমিউনিজম-বিরোধিতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

চার্নক, জোব (?-১৬৯৩ খ্রী) আধুনিক কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাত জোব চার্নকের জন্ম, বংশ-পরিচয় বা প্রথম জীবন-সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। ১৬৫৫ বা ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ দেশে প্রথম পদার্পণ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিতে নিযুক্ত হন। প্রথমে কাশিমবাজার, পরে পাটনা এবং পুনরায় কাশিমবাজারের কুঠিতে কাজ করেন। বাংলা দেশে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে এই সময়ে তাঁহার স্থান ছিল দ্বিতীয়। কাশিমবাজারে অবস্থানের সময়েই মোগল সরকারের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। দেশীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ-ক্রমে চার্নক ও কুঠির অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। এ সময়ে চার্নকই প্রধান হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া গোপনে হুগলির কুঠিতে পলায়ন করেন (এপ্রিল, ১৬৮৬ খ্রী)। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলির মোগল ফৌজদার আবদুল গনির সহিত স্থানীয় ইংরেজ সৈন্যদের সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে জয়ী হইলেও চার্নক বাংলার শাসনকর্তা নবাব শায়েস্তা খাঁর ভয়ে অল্প দিনের মধ্যেই হুগলি পরিত্যাগ করেন (২০ ডিসেম্বর, ১৬৮৬ খ্রী) ও বালেশ্বর যাইবার পথে সুতানুটিতে কিছুদিন

বসবাস করেন। ইহার পর শায়েস্তা খাঁর অনুমতি লইয়া চার্নক প্রথমে উলুবেড়িয়ায় ও পরে সুতানুটিতে ফিরিয়া আসেন (সেপ্টেম্বর, ১৬৮৭ খ্রী) এবং প্রায় এক বৎসর কাল সেখানে থাকিয়া কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনা করার পর ঘটনাচক্রে মাদ্রাজে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে শায়েস্তা খাঁর পরবর্তী নবাব শান্তিপ্রিয় ইব্রাহিম খাঁ মাদ্রাজ হইতে চার্নককে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান ও বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে এদেশে কোম্পানির বাণিজ্যের সর্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঐ মর্মে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে একটি ফরমান বা আদেশপত্র লাভ করে। ইতিমধ্যে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট রবিবার বেলা দ্বিপ্রহরে চার্নক পুনরায় সদলবলে সুতানুটিতে পদার্পণ করেন। সেদিন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা এখানে উত্তোলিত হয়। ঐ দিনই ইংরেজদের পক্ষ হইতে আধুনিক কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা দিবস বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। এ কথা কিন্তু বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, ইহার পূর্বেই কলিকাতায় শেঠ ও বসাক উপাধিধারী ব্যবসায়ীদের বসবাস ছিল এবং আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ বণিকও এখানে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন।

জোব চার্নক ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। সাহস ও বিশ্বস্ততার জন্য তিনি কোম্পানির কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও দিন সর্বোচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন নাই। বহুদিন বাংলা দেশে বসবাসের ফলে চার্নক ব্যক্তিগত জীবনে কিছু কিছু দেশী আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। জনশ্রুতি অনুযায়ী পাটনার কুঠিতে বসবাসকালে চার্নক এদেশীয় একজন বিধবা রমণীকে সতীদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন (আনুমানিক ১৬৭৮ খ্রী)। উক্ত পত্নীর গর্ভে তাঁহার ৩ কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। চার্নকের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কলিকাতা সেন্ট জন্স চার্চের সমাধিক্ষেত্রে জোব চার্নকের এবং তাঁহার স্ত্রীর সমাধি বিদ্যমান আছে।

দ্র M. N. Raye, *The Annals of the Early English Settlement in Bihar*, Calcutta, 1927.

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

চার্বাক নামান্তরে বার্হস্পত্য বা লোকায়ত। মহাভারতে চার্বাক দুর্যোধনের সখা যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিহত্যাকারী বলিয়া নিন্দার অপরাধে ব্রাহ্মণ-সমাবেশ দ্বারা নিহত জনৈক রাক্ষস; মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ ও বিষ্ণুপুরাণ-মতে অসুরদের অবনতিকল্পে তাহাদের মধ্যে স্বয়ং দেবগুরু প্রচারিত মোহজালই বার্হস্পত্যমত, অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা) হিসাবে সাংখ্য ও যোগের সমগোত্রীয়। পালি ত্রিপিটকে 'তিরচ্ছান-বিজ্জা' (নীচবিদ্যা) হিসাবে লোকায়ত শাস্ত্র নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইলেও বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের বর্ণনায় লোকায়তে পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ত্রিপিটক, রামায়ণ ও মহাভারতে লোকায়তিক ব্রাহ্মণ এবং সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক, দিব্যাবদান প্রভৃতিতে লোকায়তিকদের যন্ত্র ও মন্ত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। শংকরাচার্য ও শ্রীধরের ব্যাখ্যা অনুসারেও গীতা-বর্ণিত 'নামেই যজ্ঞকারী' অসুরগণ বস্তুতঃ লোকায়তিক। গুণরত্নের বর্ণনায় চার্বাকেরা 'কাপালিকা ভস্মোদ্ধূলনপরা যোগিনঃ' অর্থাৎ কাপালিক ও ভস্ম-মণ্ডিত যোগী।

এ জাতীয় বিচিত্র তথ্য হইতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সম্প্রদায়টির আদিরূপ-সংক্রান্ত বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন: ১. প্রাচীন ভারতে চিন্তাস্বাধীনতার মুখপাত্র ২. প্রাচীন সুমেরীয় অন্ত্যেষ্টি-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের ভারতীয় সংস্করণ (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) ৩. ভারতীয় রাষ্ট্র-বিদ্যার আদিরূপ (তুচ্চি) ৪. ফোকলোর বা নেচারলোর মাত্র (রিস ডেভিড্স্) ৫. দেহতত্ত্ব ও কায়া-সাধনায় আস্থাবান সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদি সংস্করণ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।

মধ্যযুগের দার্শনিক সাহিত্যে কিন্তু এক নির্দিষ্ট দার্শনিক মতেরই এবং সেই মতাবলম্বী সম্প্রদায়েরই নাম চার্বাক। নানা দার্শনিকের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণিত মতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য: ১. ক্ষিতি প্রভৃতি চতুর্ভূতই চরম সত্য ২. দেহাতিরিক্ত আত্মা অলীক— চতুর্ভূতই দেহাকারে পরিণত হইলে চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, যেমন কিণ্ব প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুতের উপকরণগুলি মদ্যাকারে পরিণত হইলে মদশক্তি-বিশিষ্ট হয় ৩. কর্মফল, জন্মান্তর, পরলোক প্রভৃতির পরিকল্পনা লোকবঞ্চনার্থে রচিত, তাই পরলোকে বা পরকালে সুখভোগের আশায় ইহলোকের সুখকে অবহেলা করা মূর্খতা ৪. স্বভাবই জগৎকারণ ৫. প্রত্যক্ষই প্রমাণ— প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ ছাড়া অনুমানকেও অসিদ্ধ বিবেচনা করেন, কিন্তু পুরন্দর ও জয়ন্তভট্টের ব্যাখ্যা অনুসারে লৌকিক অনুমানের (যথা ধূম হইতে বহ্নির) বিরোধিতা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁহারা মূলতঃ অলৌকিক ও প্রত্যক্ষাতীত বিষয়ের (যথা আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির) অনুমানই অস্বীকার করেন।

পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়ত-মতের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শান্ত রক্ষিত, বাচস্পতি মিশ্র ও গুণরত্ন প্রমুখ দার্শনিক নানাবিধ সূক্ষ্ম ও জটিল দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে চার্বাকেরা কি জাতীয় বিচারের উপর নির্ভর করিয়া স্বমত সমর্থন করিতেন সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া আজ কঠিন। কেননা, চার্বাকের এ জাতীয় বর্ণনায় নানা লোকগাথা, এমন কি 'বৃহস্পতিসূত্র' উদ্ধৃত হইলেও তাঁহাদের নিজস্ব রচনাবলী বিলুপ্ত হইয়াছে, যদিও প্রাচীন কালে সে রচনার যে প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

অবশ্য, জনৈক জয়রাশিভট্ট (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) -রচিত 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' নামে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদক সুখলালজী সংঘবী গ্রন্থকারকে চতুর্ভূতে বিশ্বাসী, দেহাত্মবাদী ও প্রত্যক্ষ প্রমাণাশ্রয়ী প্রসিদ্ধ চার্বাকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না হইলেও চার্বাকদেরই এতাবৎ অজ্ঞাত কোনও এক উপসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গ্রন্থকার কোথাও নিজেকে চার্বাক বলেন নাই, মধ্যযুগের অন্যান্য দার্শনিকগণও তাঁহাকে তত্ত্বোপপ্লববাদী আখ্যা দিয়াছেন, গ্রন্থের নামকরণ হইতেও মনে হয় তত্ত্বোপপ্লববাদই তাঁহার অভিপ্রেত।

চার্বাকদর্শনের অধুনালভ্য পরিচিতিটুকু বিরুদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবেই সংরক্ষিত, বিরুদ্ধ পক্ষের রচনায় মতটি নিন্দিত ও অনাদৃত হইলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার মানদণ্ডে তাহার নূতন মূল্যায়নের প্রস্তাবও অবাস্তর নয়।

দ্র H P. Sastri, *Lokayata*, Dacca, 1925; D R Sastri, *A Short History of Indian Materialism*, Calcutta, 1930; S N Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, vol IV, Cambridge, 1955, D Chattopadhyaya, *Lokayata*, New Delhi, 1959; W. Ruben, *Studies in Ancient Indian Thought*, Calcutta, 1966.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চার্বাকগণ মোটামুটি চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। পরমতখণ্ডনই এক সম্প্রদায়ের চার্বাকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, ইঁহাদের স্বতন্ত্র কোনও আগম বা উপদেশ ছিল না। সর্বত্র সন্দেহের উৎপাদনেই এই মতের চরিতার্থতা। কোনও তত্ত্বকেই ইঁহারা 'তত্ত্ব' বলিয়া মানিতেন না। ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, আপ্ত প্রভৃতি তো দূরের কথা, সর্বজনস্বীকৃত প্রত্যক্ষকেও ইঁহারা প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন নাই। অনেকের মতে ইঁহারাই আদি চার্বাক। এই সম্প্রদায়ের চার্বাকগণই নাস্তিক, বৈতণ্ডিক, হৈতুক, লোকায়ত, তত্ত্বোপপ্লববাদী প্রভৃতি নামে পরিচিত।

আর একটি সম্প্রদায় 'ধূর্ত চার্বাক' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহারা উচ্ছেদবাদী ও দেহাত্মবাদী নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় অনুমানাদিকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন না, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া মানেন। ইঁহাদের মতে দেহই আত্মা; পরিদৃশ্যমান জগৎ আকস্মিক ও চাতুর্ভৌতিক। অচেতন ভূতচতুষ্টয়ের মিলনে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখই পুরুষার্থ, ঐহিক, দৈহিক ও ক্ষণিক সুখই স্বর্গ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, পরলোক এবং জন্মান্তর বলিয়াও কিছু নাই। তাঁহাদের মতে কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং কর্মফলও স্বীকার্য নহে।

ইহার পর সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য যেরূপ অনুমান অবশ্যস্বীকার্য তাহা মানেন এবং লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য যতটুকু কার্যকারণভাব মানা অপরিহার্য, ততটুকু কার্যকারণভাবও মান্য করেন। কিন্তু যেরূপ অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল, স্বর্গ প্রভৃতি প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ অনুমানের প্রামাণিকতা ইঁহারা স্বীকার করেন না। ইঁহারা স্বভাবকে জগতের কারণ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। পশুসুলভ ঐহিক ও ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে পবিত্রতর, সূক্ষ্মতর মানসিক সুখকে ইঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া মানিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের চার্বাকগণ নানা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। কেহ দেহকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়কে, কেহ ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া মনকে, কেহ বা মনকেও অতিক্রম করিয়া প্রাণকে আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন। ইঁহারাই যথাক্রমে ইন্দ্রিয়াত্মবাদী মনআত্মবাদী এবং প্রাণাত্মবাদী চার্বাক।

আর একশ্রেণীর চার্বাকপন্থী আকাশকেও পঞ্চম মহাভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহারা ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

বৃহস্পতিকে চার্বাকমতের প্রবর্তক বলা হয়। ঐ বৃহস্পতি কে, তদ্‌বিষয়ে মতান্তর আছে। ঋগ্বেদে (১০ মণ্ডল, ৭২ সূক্ত, ৩ ঋক্) লৌক্য বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যদি অসৎ শব্দের অর্থ জড় এবং সতের অর্থ চৈতন্য হয়, তাহা হইলে ঐ উক্তির অর্থ দাঁড়ায়: জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব হইয়াছে। 'জড়স্বভাব ভূতচতুষ্টয় হইতে

চৈতন্যের উৎপত্তি'— ইহা চার্বাকেরই মত। সুতরাং উক্ত লৌক্য বৃহস্পতিকে চার্বাকমতের প্রবর্তকরূপে কল্পনা করা সম্পূর্ণ অমূলক নহে।

দ্র দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, কলিকাতা, ১৯৫৯।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

চাল ধান্যজাত খাদ্য। কেহ কেহ মনে করেন ভারতে অষ্ট্রিকভাষী আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই আহার্যরূপে চালের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয়। হরপ্পা সংস্কৃতির যুগে সিন্ধু দেশের অধিবাসীগণ অন্নাহার করিত বলিয়া জানা গিয়াছে। ঋগ্বেদের যুগে প্রথম দিকে বোধ হয় আর্যদের মধ্যে ধান চাষ বিশেষ প্রচলিত ছিল না, ঐ যুগের শেষ দিক হইতেই আর্যগণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চাল ব্যবহার করিতে থাকে। পরবর্তী সংহিতাগুলির সময়ে ক্রমশঃ চালের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, চালভাজা, চালের তৈয়ারি পিষ্টক, মাষ, তিল বা দুধ মিশ্রিত অন্ন ইত্যাদি খাদ্য ক্রমশঃ প্রচলিত হয়। উপনিষদের যুগে চাল দৈনন্দিন আহার্যের প্রধান উপাদানে পরিণত হয়, তিল বা ঘৃত মিশ্রিত অন্ন, খই, পায়স, এমন কি ভাতের ফেন পর্যন্ত আহারের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হইয়া ওঠে।

বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশ, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে চাল মুখ্য আহার্য। পূর্ব পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্ম দেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান, ফিলিপ্পীন, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগের দ্বীপগুলিতেও চাল আহার্যের প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

চাল দুই প্রকার—আতপ ও সিদ্ধ। ধান কেবল রৌদ্রে শুখাইয়া ভানিয়া লইলে আতপ এবং ধান প্রথমে সিদ্ধ করিবার পর শুখাইয়া ভানা হইলে সিদ্ধ চাল উৎপন্ন হয়। ধান ভানিবার সময় ধানের খোসা ও খোসার অভ্যন্তরে অবস্থিত ভুষির (ব্র্যান) স্তরটি অপসারিত হয়, শস্যের বহিঃস্তর এবং ভ্রূণটিও চাল হইতে পৃথক হইয়া যায়। যে চাল যত শাদা, তাহার বহিঃস্তরটি তত বেশি অপসারিত হইয়াছে। লাল চালে বা ঢেঁকিছাঁটা চালে কলে-ছাঁটা চালের তুলনায় শস্যের বহিঃস্তরটি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অবশিষ্ট থাকে। ভুষি পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ধানের ভ্রূণ ও ভুষি হইতে উদ্ভিজ্জ তৈল নিষ্কাশিত হয়। চালের ভগ্ন খণ্ডকে খুদ বলে, খুদ হইতে শ্বেতসার (স্টার্চ) নিষ্কাশন করা যায়। চাল ও খুদ গাঁজাইয়া মদ্য তৈয়ারি করা হয়। শুষ্ক বালির খোলায় চাল ভাজিলে মুড়ি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন মিষ্টান্ন ও পিষ্টকে চালের গুঁড়ার ব্যবহার প্রচলিত।

চাল কার্বোহাইড্রেট প্রধান খাদ্য। ঢেঁকিছাঁটা বা লাল চালে শতকরা ৭৭ ভাগ ও কলে-ছাঁটা শাদা চালে শতকরা ৭৯.৪ ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে। এই কার্বোহাইড্রেটের অধিকাংশই শ্বেতসার, দুষ্পাচ্য তন্তুর পরিমাণ অতি সামান্য— শতকরা ০.২ হইতে ০.৬ ভাগ মাত্র। চালে প্রোটিনের পরিমাণ গমের তুলনায় কম— শতকরা প্রায় ৭.৫ ভাগ মাত্র। কিন্তু চালের প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে থাকায় ইহা গমের প্রোটিন গ্লায়াডিন বা ভুট্টার প্রোটিন জাইন অপেক্ষা পুষ্টিকর। চালে গ্লায়াডিন জাতীয় কোনও প্রোটিন নাই, চালের প্রোটিন ওরিজেনিন গ্লুটেলিন-জাতীয় প্রোটিন। চালে স্নেহপদার্থের পরিমাণ সামান্য, লাল চালে শতকরা ১.৭ ভাগ ও শাদা চালে শতকরা ০.৩ ভাগ মাত্র। লাল ও শাদা চালে যথাক্রমে শতকরা ১.১ ভাগ ও ০.৪ ভাগ অজৈব লবণ থাকে, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি উপাদান এ সকল অজৈব লবণে বর্তমান। চালে ভিটামিন এ, সি এবং ডি এর অভাব আছে, কিন্তু থিয়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন প্রভৃতি বি বর্গীয় ভিটামিন চালে বিদ্যমান। বি-বর্গীয় ভিটামিনগুলি প্রধানতঃ শস্যের বহিঃস্তর ও ভ্রূণেই থাকে। অজৈব লবণেরও অনেক অংশ শস্যের বহিঃস্তরে পাওয়া যায়। কলে ছাঁটা শাদা চালে ভ্রূণ ও শস্যের বহিঃস্তরটি থাকে না, কিন্তু লাল চালে বা ঢেঁকিছাঁটা চালে শস্যের বহিঃস্তরের কিছু অংশ থাকিয়া যায়। সেইজন্য শাদা চালে লাল চাল বা ঢেঁকিছাঁটা চাল অপেক্ষা অনেক কম ভিটামিন ও অজৈব লবণ থাকে। শাদা চাল আহার্যের প্রধান উপাদান হইলে বি বর্গীয় ভিটামিন, বিশেষতঃ থিয়ামিনের অভাবে বেরিবেরি হইতে পারে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল দেশে চালই প্রধান আহার্য, সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রায় এক-দশমাংশ থিয়ামিনের অভাবজনিত রোগে ভুগিয়া থাকে। তবে শাদা চালের সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণে কলাই-শুঁটি, মটর, ডাল, শাকসবজি, শিম, ফল প্রভৃতি থিয়ামিন-প্রধান খাদ্য আহার করিলে বেরিবেরির সম্ভাবনা থাকে না। শাদা চালের পরিবর্তে লাল চাল ব্যবহার করিলেও বেরিবেরির আশঙ্কা কম থাকে। শাদা চালের পরিবর্তে লাল চাল অথবা অতিরিক্ত ভিটামিনযুক্ত চাল ব্যবহার করিয়া জাপান ফিলিপ্পীন ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে বেরিবেরির প্রকোপ কমানো সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে

ধান হইতে চাল উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়া চালে ভিটামিনের পরিমাণ অব্যাহত রাখার প্রয়াস করা হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সিদ্ধ চালে আতপের তুলনায় ভিটামিন অধিক থাকে, কারণ সিদ্ধ চাল উৎপাদনের জন্য ধান সিদ্ধ করিবার সময় অধিকাংশ ভিটামিন শস্যের বহিঃস্তর হইতে কেন্দ্রীয় অংশে চলিয়া যায় এবং ইহার পর ধান ভানিবার সময় ভিটামিনের বিশেষ অপচয় ঘটে না।

ভাত রাঁধিবার সময় কিছু শ্বেতসার, বেশ কিছু প্রোটিন এবং অজৈব লবণ ও ভিটামিনের কিয়দংশ জলে দ্রবীভূত হইয়া ফেনের অন্তর্ভুক্ত হয়, ফেন ফেলিয়া দিলে এ সকল খাদ্যবস্তুর অপচয় ঘটে। ভাতে শতকরা ৭০ ভাগেরও অধিক জল, প্রায় ২৬৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ২৫ ভাগ প্রোটিন এবং কিছু ভিটামিন ও অজৈব লবণ বর্তমান। ১০০ গ্রাম চালের খাদ্যমূল্য প্রায় ৩৬০ কিলোক্যালরি, ১০০ গ্রাম ভাতের খাদ্যমূল্য মাত্র ১২০ কিলোক্যালরি।

পাচনতন্ত্রে ভাতের অল্পাধিক সন্ধানের (ফার্মেন্টেশন) ফলে অ্যালকোহল জাতীয় পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে। ইহার ফলে অনেক সময় ভাত খাওয়ার পর ঘুম পায়। ভাতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া মধুমেহ রোগে অন্নাহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 'ধান' দ্র ।

দ্র M C. Kik and F B. Landingham, 'The influence of processing on the thiamine, riboflavin and niacin content of rice', *Cereal Chemistry*, vol 20, 1943 ; J. Salcedo (Jr) & Others, 'Artificial enrichment of white rice as a solution to endemic beriberi', *Journal of Nutrition*, vol 42, 1950 , R. C Majumdar, ed , *The History and Culture of the Indian People*, vol. I, Bombay, 1951.

দেবজ্যোতি দাশ

বাংলা দেশে সিদ্ধ চালের প্রচলন ও আদর বেশি হইলেও ইহা আতপ বা আলো চালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্মকার্যে এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারে মুখ্যতঃ আলো চাল ব্যবহৃত হয়। আচারনিষ্ঠ উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাগণ আলো চালের ভাত খাইয়া থাকেন। দেবপূজায় নৈবেদ্য এবং অর্ঘ্যে আলো চালের প্রয়োজন হয়। অবশ্য শক্তিপূজায় সিদ্ধ চালের ভাতের ভোগেরও প্রচলন আছে। ভোজ্য দানে সিদ্ধ চালের ব্যবহার ইহার জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়। কখনও কখনও ফুলের পরিবর্তে অক্ষত বা আলো চালের ব্যবহার দেখা যায়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

চালচিত্র বাংলা দেশের দুর্গাদি প্রতিমার পশ্চাৎপট রূপ সুবিস্তৃত চিত্র সমন্বিত চাল। ঐতিহাসিক বিচারে ইহাকে প্রাচীন ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তির পশ্চাদ্‌বর্তী পরিমণ্ডলেরই এক পরিবর্ধিত রূপ বলিয়া মনে হয়। গুপ্ত যুগের বুদ্ধমূর্তির মস্তকের পিছনে ইহার অবস্থান লক্ষণীয়। এই পরিমণ্ডলের আদিতম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কুষাণ নৃপতিদের মুদ্রায়। হুবিষ্কের ত্রিমস্তক শিবমূর্তি সমন্বিত মুদ্রায় শিবের ত্রিমস্তক বেষ্টিত এই পরিমণ্ড। স্পষ্টরূপে নির্ণয় করা যায় (খ্রীষ্টীয় ২য় শতক)। খজুরাহোর (১০ম হইতে ১২শ শতাব্দী) বিভিন্ন মন্দিরে স্থাপিত দেবমূর্তির পশ্চাতে ক্ষোদিত সচ্ছিদ্র পরিমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চাতে অগ্নিপ্রজ্জ্বলনের দ্বারা আলোক বিচ্ছুরণ করিয়া দেবমূর্তিকে ঘিরিয়া এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করা হইত। মৃত্তিকা রচিত প্রতিমার ক্ষেত্রে চালচিত্র প্রধানতঃ কঞ্চি ও দরমার তৈয়ারি মাটির প্রলেপ দেওয়া কাঠামোর উপর চিত্রিত হইত। বিভিন্ন দেবদেবীর সমাবেশ হওয়ায় চালচিত্রে দেবলোকের আভাস পাওয়া যায়। হুগলি জেলার চন্দননগরে বৃহদাকার জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার পশ্চাৎপটরূপে অতি মনোরম শোলার চালচিত্র গড়া হয়—ইহা সাধারণতঃ ডাকের সাজের অংশরূপে পরিগণিত। এই রীতি কমবেশি অন্যান্য জেলাতেও দেখা যায়।

অশোক ভট্টাচা

চালমুগরা ভৈষজ্য উদ্ভিদ দ্র

চালুক্যবংশ ভারতের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় রাজগণ সুবিখ্যাত। বংশটির নাম চলুক্য, চলিক্য, চল্ক্য, চালুক্য প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে লিখিত দেখা যায়। চালুক্য রাজবংশের বহু শাখার মধ্যে বাতাপি, বেঙ্গী এবং কল্যাণের শাখাত্রয় সমধিক প্রসিদ্ধ। বেঙ্গী ও কল্যাণের চালুক্যগণ আপনাদিগকে বাতাপির চালুক্যবংশের শাখা বলিয়া জানিতেন। গুজরাতের সোলঙ্কী বা চৌলুক্য রাজবংশকে উহার অপর একটি শাখা বলিয়া বোধ হয়।

সম্ভবতঃ চলিকি নামক ব্যক্তির নাম হইতে তদীয়

বংশধরগণের চলিক্য প্রভৃতি আখ্যার উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালীন চালুক্য রাজগণের সভাপণ্ডিতেরা কোনও দেবতা বা ঋষির 'চুলুক' বা কমণ্ডলু হইতে এই রাজবংশের আদিপুরুষের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন।

বাতাপির প্রাচীন চালুক্যবংশ (আনুমানিক ৫৩৫-৭৫৭ খ্রী)। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনায় বর্তমান মৈসূর প্রদেশের অন্তর্গত বিজাপুর জেলার বাতাপি বা বাদামিকে কেন্দ্র করিয়া এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের আদিরাজ জয়সিংহ বল্লভ, তাঁহার পুত্র ছিলেন রণরাগ। ইঁহারা সম্ভবতঃ তদানীন্তন কদম্ববংশীয় রাজগণের সামন্ত ছিলেন। রণরাগের পুত্র প্রথম পুলকেশী (আনুমানিক ৫৩৫-৬৬ খ্রী) পরাক্রান্ত হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং বাদামির সুদৃঢ় দুর্গের নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মা (৫৬৬-৯৮ খ্রী) কদম্ব, নল এবং দক্ষিণ কোঙ্কণের মৌর্যদিগকে দমন করেন। কীর্তিবর্মার পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গলেশ (৫৯৮-৬১০ খ্রী) সিংহাসন লাভ করেন। তিনি কলচুরি-বংশের নরপতি বুদ্ধরাজকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রকে উত্তরাধিকারী স্থির করায় কীর্তিবর্মার পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হন। পরিণামে মঙ্গলেশকে নিহত করিয়া পুলকেশী (৬১০-৪২ খ্রী) পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিলেন। গৃহযুদ্ধের সুযোগে সামন্তরাজগণ অনেকেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুলকেশীর বাহুবলে কদম্ব, মৌর্য, গঙ্গ, আলুপ প্রভৃতির দেশে চালুক্যপ্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। উত্তর দিকে লাট, মালব এবং গুর্জরদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি বর্তমান গুজরাতের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। এই অঞ্চলেই নর্মদা নদীর তীরে পুলকেশীর হস্তে উত্তরাপথেশ্বর হর্ষবর্ধন পরাজিত হন। অতঃপর চালুক্যরাজ দিগ্বিজয়-উপলক্ষে পূর্ব দিকে কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, বেঙ্গী প্রভৃতি দেশের রাজগণকে পরাজিত করেন এবং বেঙ্গী দেশে স্বীয় ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ে কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশের সহিত চালুক্য রাজগণের যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, শীঘ্র উহার সমাপ্তি ঘটে নাই। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মা সম্ভবতঃ কদম্ব ও গঙ্গদিগকে চালুক্যরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশী মহেন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করেন এবং পল্লবরাজের অনুগতমিত্র চোল, কেরল ও পাণ্ড্য-রাজকে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হন। কিছুকালের জন্য সমগ্র পল্লব রাজ্যে চালুক্যরাজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পুলকেশীর এই গৌরব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রবর্মার পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মা পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন। প্রায় তের বৎসরকাল পুলকেশীর পুত্রগণ পল্লবরাজের হস্ত হইতে হৃত রাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পুলকেশীর অন্যতম পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৮১ খ্রী) পল্লবদিগকে বিতাড়িত করিয়া বাতাপি অধিকার করেন। তিনি পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা এবং তদীয় পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মা ও পৌত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মাকে পরাজিত করিয়া পল্লবরাজ্যে চালুক্যপ্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরমেশ্বরবর্মা স্বরাজ্য হইতে চালুক্যদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের দুইখানি তাম্রশাসন কাঞ্চীর সমীপবর্তী গ্রাম বিশেষ এবং কাবেরী নদীর দক্ষিণে অবস্থিত চোল রাজধানী হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রথম বিক্রমাদিত্যের পর তদীয় পুত্র বিনয়াদিত্য (৬৮১-৯৬ খ্রী) এবং পৌত্র বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩ খ্রী) ক্রমান্বয়ে সিংহাসন লাভ করেন। বিজয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময়ে (৭৩৩-৪৫ খ্রী) পল্লবদিগের সহিত সংঘর্ষ পুনরায় প্রবলাকার ধারণ করে। পিতার জীবৎকালেই তিনি একবার পল্লবরাজ প্রথম পরমেশ্বরবর্মার পৌত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সিংহাসনলাভের পর দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পুনরায় পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেন এবং পল্লবরাজ নন্দিবর্মা পল্লবমল্লকে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজধানী কাঞ্চী নগরী অধিকার করেন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যই বাতাপির চালুক্যবংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। দীর্ঘকাল পল্লবদিগের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় ক্রমে উভয় বংশই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার রাজত্বকালে (৭৪৪-৫৭ খ্রী) চালুক্যবংশের গৌরব লুপ্ত হয় এবং দাক্ষিণাত্যের সাম্রাজ্য রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গের করতলগত হয়।

বাতাপির চালুক্যরাজগণ সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাসদ রবিকীর্তি উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। বাদামি এবং অন্যান্য স্থানের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনসমূহ ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে বিখ্যাত। পারস্যরাজ দ্বিতীয় খুসরু দ্বিতীয় পুলকেশীর সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্ মহারাষ্ট্র দেশের অধিপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন।

বেঙ্গীর প্রাচ্য চালুক্য বংশ (৬৩০-১০৭৫ খ্রী): বাতাপির চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশী কৃষ্ণা-গোদাবরীর মোহানার নিকটবর্তী অঞ্চলস্থিত বেঙ্গী দেশ অধিকার করিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শীঘ্রই এই শাখার সহিত মূল বংশের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রকূট সম্রাটগণের সহিত প্রাচ্য চালুক্যদিগের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ চলিয়াছিল।

চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধনের পুত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য (আনুমানিক ৭৯৯-৮৪৭ খ্রী) পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে পরাজিত হন। তখন তাঁহার ভ্রাতা ভীমসালুক্কি গোবিন্দের সামন্তরূপে বেঙ্গী রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার বালকপুত্র আমোঘবর্ষ রাষ্ট্রকূটসিংহাসন লাভ করেন। এই সুযোগে দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য ভ্রাতাকে বিতাড়িত করিয়া বেঙ্গীর সিংহাসন পুনরধিকার করেন। তিনি বারবার রাষ্ট্রকূটসৈন্য পরাজিত করিয়া আমোঘবর্ষের সাময়িক রাজধানী স্তম্ভতীর্থ অর্থাৎ গুজরাতের অন্তর্গত খম্বাত নগরী ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে যে, বিজয়াদিত্য ১২ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রকূট এবং গঙ্গবংশীয় রাজগণের সহিত ১০৮ বার সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যের পৌত্র তৃতীয় বিজয়াদিত্যও (আনুমানিক ৮৪৪-৯২ খ্রী) পিতামহের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি পল্লব, পাণ্ড্য, নোলম্ব, গঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের রাজগণের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং রাষ্ট্রকূট সম্রাট দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথম চালুক্য-ভীমকে পরাজিত করিয়া কিছুকালের জন্য কৃষ্ণ বেঙ্গী দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ চতুর্থ গোবিন্দের রাজত্বকালেও বারবার বেঙ্গী দেশে রাষ্ট্রকূটপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চালুক্যভীমের দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় অম্ম বেঙ্গীর সিংহাসন লাভ করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। দ্বিতীয় অম্ম কিছুকাল পরে সিংহাসন পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেও ৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা দানার্ণব কর্তৃক নিহত হন। কিন্তু ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তেলুগু-চোড়-বংশীয় জটাচোড়-ভীম দানার্ণবকে নিহত করিয়া বেঙ্গী রাজ্য অধিকার করেন। দানার্ণবের পুত্র প্রথম শক্তিবর্মা এবং বিমলাদিত্য চোলবংশীয় প্রথম রাজরাজের সভাতে আশ্রয় লাভ করিলেন। চোলরাজ নিজ কন্যার সহিত বিমলাদিত্যের বিবাহ দেন এবং জটাচোড়-ভীমকে নিহত করিয়া শক্তিবর্মাকে (৯৯৯-১০১১ খ্রী) বেঙ্গীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতে প্রাচ্য চালুক্যরাজ চোলরাজের সামন্তরূপে গণিত হইতে থাকেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকূট বংশ উচ্ছেদ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উত্তরকালীন চালুক্যগণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেঙ্গী দেশে রাষ্ট্রীয় প্রভাব-বিস্তারের চেষ্টায় তাঁহারা চোলদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেন।

বিমলাদিত্যের পুত্র এবং রাজরাজচোলের দৌহিত্র প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় প্রথম রাজরাজ (১০১৯-৬১ খ্রী) তদীয় মাতুল রাজেন্দ্রচোলের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ চোল-সিংহাসনের আশায় চোল-রাজধানীতে অবস্থান করিতে থাকেন। তাই পিতার মৃত্যুর পর কুলোত্তুঙ্গ তদীয় পিতৃব্য সপ্তম বিজয়াদিত্যকে বেঙ্গী রাজ্য শাসন করিতে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রকুলোত্তুঙ্গ চোল-সিংহাসন অধিকার করেন। ফলে প্রাচ্য চালুক্যবংশ চোল বংশে বিলীন হইল। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম বিজয়াদিত্যের মৃত্যু হয়।

কল্যাণের উত্তরকালীন চালুক্যবংশ (৯৭৩-১২০০ খ্রী): রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে চালুক্যবংশীয় সামন্ত-রাজ দ্বিতীয় তৈল (৯৭৩-৯৭ খ্রী) রাষ্ট্রকূট-রাজধানী মান্যখেট নগরী অধিকার পূর্বক দাক্ষিণাত্যে চালুক্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আপনাকে বাতাপির চালুক্যবংশের উত্তরপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিতেন। ক্রমে তৈল রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্যের নানা অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। পরমার-বংশীয় বাক্‌পতি মুঞ্জের পরাজয় তাঁহার একটি প্রধান কীর্তি।

তৈলের উত্তরাধিকারীদিগের সময়ে চোলবংশীয় পরাক্রান্ত রাজগণ বারবার চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় জয়সিংহের রাজত্বকালে (১০১৫-৪৩ খ্রী) মান্যখেট হইতে কল্যাণনগরে (বীদর জেলার অন্তর্গত কল্যাণী) চালুক্য-রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। জয়সিংহের পুত্র প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল (১০৪৩-৬৮ খ্রী) বহুবার চোল আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিবারেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ১০৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী কোপ্পম্ নামক স্থানে চোল ও চালুক্যপক্ষে এক ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে চোল-সম্রাট রাজাধিরাজ রণক্ষেত্রে নিহত হন; কিন্তু তদীয় ভ্রাতা রাজেন্দ্র প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ চালাইয়া চালুক্যসৈন্য পরাজিত করিয়া-

ছিলেন। ইহার পর সোমেশ্বর কয়েকবার চোলরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে তুঙ্গা নদীর তীরবর্তী মুডকারু নামক স্থানের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি বেঙ্গী রাষ্ট্রের অনেকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে চোলরাজ বীররাজেন্দ্র কোপ্পমের নিকটবর্তী কুডলসঙ্গমম্ নামক স্থানে সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। কিন্তু সোমেশ্বর পুনরায় বীররাজেন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে চোলরাজ সসৈন্যে কুডলসঙ্গমম্ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, কিন্তু সোমেশ্বর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। তিনি তখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সোমেশ্বর তুঙ্গভদ্রা নদীর পবিত্র সলিলে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রথম সোমেশ্বরের পর তদীয় পুত্র দ্বিতীয় সোমেশ্বর (১০৬৮-৭৬ খ্রী) সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহাকে অপসারিত করিয়া প্রথম সোমেশ্বরের অপর পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৬ খ্রী) রাজ্য অধিকার করিলেন। কথিত আছে, পিতার রাজত্বকালে তিনি পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য চোলরাজ বীররাজেন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ইহাতে চোল-চালুক্য বিবাদের সমাপ্তি হয় নাই। কারণ এই সময়ে চোল সিংহাসন বিক্রমাদিত্যের শত্রু রাজেন্দ্র-কুলোত্তুঙ্গের হস্তগত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য বেঙ্গী রাজ্যের অনেকাংশে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হন। 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' রচয়িতা বিহ্লণ এবং 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার সভাসদ ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৬-৩৮ খ্রী) 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলষিতার্থচিন্তামণি' সংজ্ঞক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা।

বিক্রমাদিত্যের পর চালুক্যবংশের গৌরব স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। তৃতীয় তৈলের রাজত্বকালে (১১৫১-৫৬ খ্রী) কলচুরি বংশীয় বিজ্জল চালুক্যসাম্রাজ্য অধিকার করেন। তৈলের পুত্র চতুর্থ সোমেশ্বর (১১৮১-১২০০ খ্রী) কলচুরিদিগের হস্ত হইতে হৃতরাজ্যের কিয়দংশ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সেউন-যাদব এবং হোয়সল যাদবদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্র J F Fleet, 'Dynasties of the Kanarese Districts', *Bombay Gazetteer*, vol. I, part II, Bombay, 1896; R. G Bhandarkar, *Early History of the Deccan*, Poona, 1927; R. Sewell, *The Historical Inscriptions of Southern India*, Madras, 1932; D. C. Ganguly, *The Eastern Chalukyas*, Benares, 1937; N. Venkataramanayya, *The Eastern Chalukyas of Vengi*, Madras, 1950, R. C. Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vols. III, IV and V, Bombay, 1954, 1955 & 1957; G. Yazdani, ed, *The Early History of the Deccan*, New York, 1960.

দীনেশচন্দ্র সরকার

চাহিদা কোনও দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণই উহার চাহিদার জ্ঞাপক। ইহাকে দুইভাবে দেখা যাইতে পারে— ব্যক্তির চাহিদা ও সমষ্টির চাহিদা বা বাজারের চাহিদা। অর্থনীতিতে বাজারের চাহিদার গুরুত্ব প্রধান, সকল ব্যক্তির চাহিদাকে যোগ করিলে যোগফলটি বাজার চাহিদা হয়। এই প্রবন্ধে ব্যক্তির চাহিদার কথাই আলোচিত হইবে এবং ক্রেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিবর্তন না হইলে চাহিদার উপর ক্রেতার আয় এবং দ্রব্যমূল্য— কেবল এই দুইটির প্রভাবই ধরিয়া লওয়া হইবে।

কোনও দ্রব্যের মূল্য এবং তাহার চাহিদার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। যদি আয় অপরিবর্তিত থাকে এবং মূল্য জানা থাকে তবে ক্রেতার চাহিদাও স্থির করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, হয়ত আমার আয় ১০০ টাকা এবং আমার মাত্র ২ প্রকারের দ্রব্য— ক. কাপড় এবং খ. খাদ্য কেনারই আগ্রহ, তদুপরি কিছু সঞ্চয়ের আগ্রহ নাই। ক-এর মূল্য (প্রতি খণ্ড) ১০ টাকা এবং খ-এর মূল্য (প্রতি কিলোগ্রাম) ৫ টাকা ধরা যাক। এই ক্ষেত্রে আমার নির্দিষ্ট চাহিদা ধরা যাক ক ৩খণ্ড এবং খ ১৪ কিলোগ্রাম বা ৩ক, ১৪খ, এখন যদি ক-এর মূল্য কমিয়া ৭·৫০ হইয়া যায়, তবে হয়ত আমার চাহিদা হইবে ৫ক, ১২½খ। এইভাবে আমার ১০০ টাকা আয়ে বস্ত্রের ও খাদ্যের মূল্য জানিলেই আমার চাহিদা নির্দিষ্ট করা যায়।

ইহাও ধরা যাইতে পারে যে, ক্রেতার আয় ও যে কোনও দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে অমনই আরও একটি সুনিশ্চিত সম্পর্ক আছে। উপরের উদাহরণে যদি মূল্য না কমিয়া শুধু আমার আয় বাড়িয়া ২০০ হয় তবে হয়ত আমার চাহিদা ৩ক, ১৪খ হইতে ১০ক, ২০খ তে পরিবর্তিত হইবে। অর্থাৎ (মূল্য স্থির থাকিলে) এবং আয় জানিলে আমার চাহিদাও নির্দিষ্ট করা যায়।

প্রথমোক্ত নিশ্চয়টিকে আমরা মূল্যের সহিত চাহিদার সম্পর্ক অথবা সাধারণতঃ মূল্য-চাহিদা সম্পর্ক বলিব। এইরূপ দ্বিতীয় নিশ্চয়টির নাম দেওয়া যায় আয়-চাহিদা

চাহিদা

সম্পর্ক। যদি মূল্যকে (ক্ষেত্রান্তরে আয়কে) কর্তা এবং চাহিদাকে কর্ম বলি তবে কর্তার দ্বারাই কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, উভয়ের মধ্যে এইরূপ সম্পর্ক বর্তমান, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আয় চাহিদা এবং মূল্য চাহিদা সম্পর্কদুইটিকে আরও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাক। যদি সমস্ত মূল্য অপরিবর্তিত থাকে তবে দেখা যায়, আমার আয় বাড়িলেই ক এর চাহিদা বাড়ে, আয় কমিলেই চাহিদা কমে। এইরূপ সম্পর্ককে আমরা 'একমুখী' সম্বন্ধ বলি। অধিকাংশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় চাহিদা সম্পর্ক একমুখীই হইয়া থাকে। আয় বাড়িলে চাহিদা বাড়ে, আয় কমিলে চাহিদা কমে। ইহাই আয়ের সহিত চাহিদার সম্পর্কের সাধারণ নিয়ম।

এইরূপ যদি আয় অপরিবর্তিত থাকে তবে হয়ত দেখা যায় কেবল ক-এর মূল্য বাড়িলেই তাহার চাহিদা কমে, মূল্য কমিলেই চাহিদাও বাড়ে। এই নিশ্চিত সম্পর্কটিকে সে ক্ষেত্রে আমরা 'বিপরীতমুখী' বলিতে পারি। প্রায় সর্বত্র মূল্য চাহিদা সম্পর্ক বিপরীতমুখীই হইতে দেখা যায়। মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে, মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। ইহাই মূল্যের সহিত চাহিদার সম্পর্কের সাধারণ নিয়ম। অ্যালফ্রেড মার্শাল (১৮৯০ খ্রী) মূল্যের সহিত চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ককে প্রায় একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের মর্যাদা দিয়াছিলেন।

মার্শালের আলোচনা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যক্ত করা যাক: যখন ক-এর মূল্য ১০ টাকা তখন যদি আমার চাহিদা ৩ হয়, তবে বুঝিতে হইবে আমি চতুর্থটি ক কিনিতে ১০ টাকা দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু তৃতীয়টির মূল্য ১০ টাকা দিতে আমার আগ্রহ ছিল। যতই ক কিনিতেছি আর একটি কেনার আগ্রহ ততই কমিতেছে। যদি মূল্য ১০ হইতে ৭·৫০ টাকায় নামে তবে যতক্ষণ আমার আর একটি কেনার আগ্রহ ৭·৫০ টাকা ব্যয় করার অনাগ্রহ হইতে প্রবল থাকিবে ততক্ষণ আরও ক কিনিব। হয়ত পঞ্চম ক পাওয়ার আগ্রহ ৭·৫০ টাকার সমান। তাহা হইলে ৫ কই চাহিদা, ষষ্ঠ ক কেনা চলিবে না, আগ্রহ কমিতেছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানবস্বভাবের এই নিয়মকে আশ্রয় করিয়া মার্শাল মূল্য-চাহিদা সম্পর্ককে সর্বত্র বিপরীতগামী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার 'চাহিদার নিয়ম'।

অবশ্য বস্ত্রের উপর ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে এবং আমার আয়-ব্যয় এবং খাদ্যের মূল্য অপরিবর্তিত থাকিলে যে খাদ্যের চাহিদা হ্রাস হইবেই এই সহজ কথাটির গুরুত্ব মার্শাল দেন নাই। বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার এইরূপ পরস্পর সম্পর্কের বিচার অধ্যাপক হিক্স ও অ্যালেন (১৯৩৪ খ্রী) এবং তাঁহাদের অজ্ঞাতে আরও পূর্বে স্লুট্স্কি একটু অন্যভাবে করিয়াছিলেন। ক ও খ-এর মধ্যে যতই একটি কিনিতেছি ততই আর সেইটি না কিনিয়া অন্যটি কিনিবার আগ্রহ একটু বাড়িতেছে। নির্দিষ্ট মূল্যে যখন চাহিদা স্থির করিয়াছি তখন সেই মূল্যে একটু ক না কিনিয়া খ কেনার আগ্রহ এবং একটু খ না কিনিয়া ক কেনার আগ্রহ সমান বলিয়া ধরা যায়। এখন যদি ক এর মূল্য কমে তবে প্রথমতঃ বেশি ক এবং কম খ কেনার ইচ্ছা হইবে, কেননা দুইটি সমান আগ্রহের জিনিসের একটির দাম কমিয়া গেল। আবার দ্বিতীয়তঃ ভাবিয়া দেখিলে এখন অবস্থা একটু ফিরিয়াছে, সেই একই ব্যয়ে পূর্বাপেক্ষা ক এবং খ – দুই-ই ইচ্ছা করিলে বেশি কিনিতে পারি। অর্থাৎ কেবল আয় বাড়িলে যে সুযোগ পাইতাম তাহাও পাইতেছি। যদি প্রথম ইচ্ছার মর্যাদা দিই তবে ক বেশি এবং খ কম কিনিব। দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করিলে বেশি ক এবং বেশি খ কিনিব। মোট কথা মনে হয়, ক বেশি কিনিবই।

কিন্তু ক যদি আমার আগ্রহের সামগ্রী না হয়, কেবল অবস্থাবিপাকে কিনিতে বাধ্য হইয়া থাকি, তবে দ্বিতীয় সুযোগটি কি একটু অন্য প্রলোভন দেখাইবে না? এক্ষেত্রে ক সস্তা হইলে সস্তা বলিয়া যেমন তাহা বেশি কিনিতে ইচ্ছা করিবে তেমনই বাজে বা খেলো জিনিস বলিয়া তাহা কম কিনিয়া খই একটু বেশি কিনিতে ইচ্ছাও করিবে। অর্থাৎ ক বাজে জিনিস হইলে ইহার আয় চাহিদা সম্পর্কটি হইবে বিপরীতমুখী। যদি এই সম্পর্কটি প্রবলতর হয় তবে কেবল মূল্য কমিয়াছে বলিয়াই ক-এর চাহিদা না-ও বাড়িতে পারে, এমন কি কমিতেও পারে। অর্থাৎ মার্শালের নিয়ম বাজে ক এর ক্ষেত্রে অসিদ্ধ হইতেও পারে।

হিক্স প্রভৃতির আলোচনাও ক্রেতার মানসপ্রকৃতির বিচার। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মার্শালের নিয়ম অসিদ্ধ, ইহার আলোচনা তাঁহারা করিয়াছেন মাত্র মানসিক বিচারের দ্বারা। অর্থনৈতিকতত্ত্ব প্রত্যক্ষগোচর তথ্যের সঙ্গে সংগত হওয়া চাই। এই দিক হইতে হিক্স প্রমুখের সংশোধিত চাহিদার নিয়মও ঠিক পূর্ণাঙ্গ নয়।

কিন্তু তাঁহাদের পরে পল স্যামুয়েলসন (১৯৫২ খ্রী) দেখান যে, যদি কোনও দ্রব্যের আয়-চাহিদা সম্পর্ক (ইহা তো প্রত্যক্ষ করা চলে) একমুখী হয় তবে ক্রেতা অস্থিরমতি নয় এইটুক মানিয়া লইলেই প্রমাণ করা যায় যে, ঐ দ্রব্যের মূল্য-চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। উদাহরণ-

স্বরূপ ধরা যাক, আমার আয় ১০০ টাকা, ক-এর মূল্য ১০ টাকা, খ-এর মূল্য ৫ টাকা। আমার চাহিদা ৩ক ১৪খ, এবং জানা আছে যে আমার ক-এর আয়-চাহিদা সম্পর্ক একমুখী। এখন যদি ক-এর মূল্য ৯ টাকা হয় তবে ঐ ৩ক ১৪খ কিনিতে ৯৭ টাকা খরচ পড়িবে। মনে করা যাক আমার আয় ৯৭ টাকাই হইল অর্থাৎ ১০০ টাকা হইতে ৩ টাকা যেন আমার জরিমানা ধরা হইল। এখন কি আমি ক ৩ অপেক্ষা কম কিনিতে পারি? যদি কিনি তবে তাহা একই খ-এর সহিত (খ-এর মূল্য পরিবর্তিত হয় নাই) আগেই আরও কম দামে কিনিতে পারিতাম। কিন্তু কিনি নাই, কেনা যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। সুতরাং এখন ক কম কিনিলে অস্থিরমতি প্রতিপন্ন হইব। অতএব ক ৩টিই কিনিলাম। এইবার যদি সেই জরিমানার ৩ টাকা ফেরত পাইতাম তো আরও ক কিনিতাম। কেননা আমার আয়-চাহিদা সম্পর্ক একমুখী। অর্থাৎ ১০০ টাকা আয়ে ক-এর মূল্য ৯ টাকা হইলে চাহিদা ৩ অপেক্ষা বেশি দেখা যাইত। কিন্তু ঐ আয়ে ক-এর ১০ টাকা মূল্যে কেবল ৩ চাহিদা ছিল। সুতরাং দেখা গেল যে, যদি আমি অস্থিরচিত্ত প্রতিপন্ন না হই তবে ক-এর আয় চাহিদা সম্পর্ক একমুখী হইলেই মূল্য-চাহিদা সম্পর্ক বিপরীতমুখী হইবে। এইরূপে ক্রেতার কেবল স্থিরমতিত্বের স্বতঃসিদ্ধটি লইয়া স্যামুয়েলসন চাহিদার নিয়ম পুনঃরচনা করিলেন— সূক্ষ্মতর মানস-পর্যালোচনার প্রয়োজন হইল না।

দ্র A. Marshall, *Principles of Economics*, Book III, London, 1890; J. R. Hicks & R. G. D. Allen, 'A Reconstruction of the theory of Value', *Economica*, 1934; E. Slutsky, 'Sulla Teoria del bilancco del Consumatore', *Giornale degli Economisti*, 1952, reprinted in English Translation, *Readings in Price Theory*, London, 1953.

তাপস মজুমদার

চিংড়ি সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্থ্রোপোদা, Phylum-Arthropoda) অন্তর্ভুক্ত কবচী শ্রেণীর (ক্লাস-ক্রুস্তাসিয়া, Class-Crustacea) প্রাণী। গলদা, বাগদা, কুচা প্রভৃতি নানা জাতীয় চিংড়ি এদেশের নদী, খাল, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। চিংড়ির শরীরে মূলতঃ দুইটি অংশ: শিরোবক্ষ (কেফালো-থোরাক্স) ও উদর। সর্ব শরীর চুন-জাতীয় পদার্থে প্রস্তুত খোলকের দ্বারা আবৃত। শিরোবক্ষের খোলকের অগ্রভাগটি সূক্ষ্মাগ্র বাঁকা তলোয়ারের মত এবং ইহার উভয় প্রান্তে করাতের মত দাঁত থাকে। ইহাদের দেহে ১৯ জোড়া উপাঙ্গ (অ্যাপেন্ডেজ) আছে, তন্মধ্যে ১৩ জোড়া শিরোবক্ষের ও ৬ জোড়া উদরের নিম্নদেশে অবস্থিত। শিরোবক্ষের সম্মুখভাগের দুই দিকে শরীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও পর্বসন্ধিবিশিষ্ট দুইটি দাড়া থাকে, ইহাদের অগ্রভাগ সূক্ষ্মাগ্র সাঁড়াশীর মত। দাড়াগুলি আত্মরক্ষায় এবং খাদ্য-সংগ্রহে সাহায্য করে। শিরোবক্ষের আবরণীর দুই পাশে দুইটি ছোট ছোট সচল দণ্ডের উপরে চিংড়ির চোখ দুইটি অবস্থিত, প্রত্যেক চক্ষু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শনাংশের সমন্বয়ে গঠিত পুঞ্জাক্ষি ('চক্ষু' দ্র)। চিংড়ির পাচন, রক্ত-সংবহন, শ্বসন, রেচন, জনন ও নাড়ি-তন্ত্র সুগঠিত। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে হিমোসায়ানিন থাকায় রক্তের রং নীল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, মাছের ডিম, ছোট মাছ, উদ্ভিদ প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। চিংড়ির স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। স্ত্রী-চিংড়ির শিরোবক্ষের উপাঙ্গগুলি নিষিক্ত ডিম্ব ধরিয়া রাখে।

প্রয়োজনমত উদর-নিম্নের উপাঙ্গগুলির সাহায্যে জলে সাঁতার কাটিয়া ইহারা যাতায়াত করে। শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনায় ইহারা শক্তিশালী লেজের এক ঝাপটায় তীর বেগে সরিয়া গিয়া কোনও কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করে। জল হইতে উঠিয়া ইহারা ডাঙায় হাঁটিতে পারে। জলের নীচেও অনেক সময় ইহারা হাঁটিয়া বেড়ায়।

খাদ্য হিসাবে চিংড়ি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। চিংড়ির মাংসে যথেষ্ট প্রোটিন, অল্প স্নেহপদার্থ, যৎসামান্য কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম ফসফরাস লৌহ প্রভৃতি ঘটিত অজৈব ~ ণ, বি-বর্গীয় বিভিন্ন ভিটামিন ইত্যাদি বর্তমান।

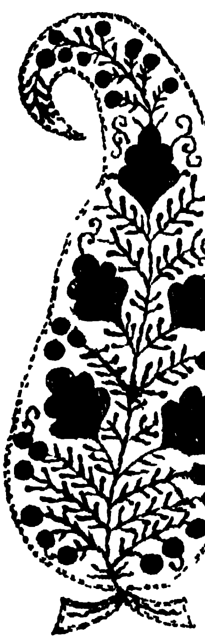
দ্র E. Mayo, *The Story of Living Things and Their Evolution*, London, 1952; T. J. Parker & W. A. Haswell, *A Textbook of Zoology*, vol. I, New York, 1961.

সীমানন্দ অধিকারী

চিকন শাদা মসলিন কাপড়ের উপর সূচের সাহায্যে শাদা সুতার সূক্ষ্ম জালি কাজ করাকেই চিকন বলে। অনেকের মতে ভারতবর্ষে চিকনের কাজ ঢাকায় মুসলমান নবাবদের আমলে প্রথম শুরু হয়। এখন অবশ্য চিকন কাজের জন্য লখনৌ শহরই বিখ্যাত হইলেও ঢাকা হইতেই ক্রমে এই কাজ লখনৌ, দিল্লী ও রামপুরে ছড়াইয়া পড়ে। ১৭-১৮শ শতাব্দীতে ঢাকায় অতি উৎকৃষ্ট চিকনের কাজ হইত। মনে হয় ঢাকার নবাবগণই এই শিল্প পারস্য হইতে

আনেন, আরব দেশের সহিত ঢাকার বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল এবং সেই সূত্রেও চিকনের বঙ্গ দেশে আসা অসম্ভব নহে।

লখনৌ-এ চিকনের কাজ প্রায় ২০০ বৎসরের পুরাতন। কথিত আছে, বর্তমানের অন্যতম বিখ্যাত চিকন-শিল্পী ফৈয়জ খাঁর (১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চিকন-শিল্পী) কোনও পূর্বপুরুষ ওস্তাদ মহম্মদ শের খাঁ লখনৌ শহরে আগত এক বিদেশী পর্যটক চিকন-শিল্পীর নিকট এই কাজ শেখেন। ইহাও শোনা যায় যে অযোধ্যার নবাব মুর্শিদাবাদের নবাবপরিবারে বিবাহ করেন এবং এই বেগম নবাবকে সন্তুষ্ট করার জন্য চিকনের কাজ করা একটি টুপি নিজের হাতে তৈয়ারি করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। পরে তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া হারেমের অন্যান্য বেগমও চিকনের কাজ শুরু করেন। এইভাবে এই শিল্পের বিস্তার হয়।



চিকন কল্কার নকশা

চিকনের কাজ ৬ প্রকারের: তয়প্‌চী, খাটোয়া, বুখিয়া, মুড়ী, ফাঁড়া ও জালি। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর কাজ বুখিয়া, সর্বাপেক্ষা সাধারণ হইল তয়প্‌চী, জালি কাজ মাঝারি ধরনের। ইহারও নানা ভাগ বিদ্যমান, যেমন মাদ্রাজী জালি, সিধুরী, কলকত্তা জালি ইত্যাদি। একখণ্ড কাপড়ের টানা ও পোড়েন উভয় দিকেরই সুতা সরাইয়া সূচের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম জালি কাটা হয়। এই গোল জালির ব্যাস সাধারণতঃ ১/৮ ইঞ্চি হইয়া থাকে। মাদ্রাজী জালি ১/৬ ইঞ্চি হয়। একটি জালিতে নকশা ও অপরটি বন্ধ এইভাবে মাদ্রাজী জালি রচিত হয়। পরেরটিতে আবার ৪ ভাগে কাটা একটি বন্ধ থাকে— এইভাবে নকশা তোলা হয়।

পুরুষ ও নারী উভয়বিধ শিল্পীই চিকনের কাজ করিয়া থাকে। তবে মহিলাদেরই সংখ্যা বেশি। নানা প্রকার পোশাক-পরিচ্ছদ — রুমাল, চাদর, শাড়ি, জামা, পাঞ্জাবীতে, এমন কি টেবিলের ঢাকা, চায়ের পাত্রের ঢাকা ইত্যাদিতেও চিকনের কাজ হয়। মসলিন কাপড়ে চিকনের কাজ-করা একটি শাড়ির দাম ৫০০ টাকা বা তাহারও বেশি হইতে পারে।

দ্র K S Dongerkery, *The Romance of Indian Embroidery*, Bombay, 1951, *Marg*, vol. XVII, no 2, March. 1964.

আশীস বসু

চিকাকোল শ্রীকাকুলম দ্র

চিকিৎসাবিদ্যা যে বিজ্ঞানে রোগের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাহাকে চিকিৎসা বিদ্যা বলে। বর্তমান কালে বহুল প্রচলিত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি ছাড়া আয়ুর্বেদ, ইউনানি, প্রাকৃতিক, যৌগিক, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নানা প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি আছে ('আয়ুর্বেদ', 'ইউনানি' ও 'হোমিওপ্যাথি' দ্র)।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে চিকিৎসা বিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল, ইহা বৈদিক সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে বিভিন্ন রোগের উল্লেখ এবং ভেষজের সাহায্যে রোগ নিবারণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। রোগসমূহের বর্তমান যুগোপযোগী বিচার-বিশ্লেষণ ও উন্নত প্রণালীতে চিকিৎসার ধ্যান ধারণা তাৎকালিক যুগে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, শল্য, শালাক্য, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ— এই আটটি শাখায় বিভক্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের প্রতিটি শাখায় গ্রন্থ-প্রণয়ন, অধ্যয়ন, যুক্তির সাহায্যে অবগাহন ও দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের প্রয়োগ বিচার করিলে চিকিৎসাবিদ্যা সেই প্রাচীন কালেও কিরূপ উন্নত ছিল তাহা অনুধাবন করা যায়। শাস্ত্রানুযায়ী চিকিৎসার দ্বারা যে কেবলমাত্র মনুষ্যসমাজকে নিরাময় করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল তাহাই নহে, পশু-পক্ষী এবং গাছপালার চিকিৎসাপদ্ধতিও সেযুগে প্রচলিত ছিল, ইহা শালিহোত্র-সংহিতা, পালকাপ্যসংহিতা, বৃক্ষায়ুর্বেদ প্রভৃতি হইতে জানা যায়। কালক্রমে বিভিন্ন তন্ত্রের প্রাচীন মূলগ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলে, সময়োপযোগী

পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের তাগিদে পরবর্তী কালে সংকলন-গ্রন্থসমূহের আবির্ভাব অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। বর্তমানে আয়ুর্বেদের যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে 'চরকসংহিতা' ও 'সুশ্রুতসংহিতা'কে বোধ হয় এই জাতীয় প্রাচীনতম সংকলন-গ্রন্থ বলা চলে।

'চরকসংহিতা' কায়চিকিৎসাপ্রধান আত্রেয়সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা আত্রেয়শিষ্য অগ্নিবেশের রচিত 'অগ্নিবেশসংহিতা'র রূপান্তর ('চরক' দ্র)। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী ইহার সংকলন-কাল।

'সুশ্রুতসংহিতা' শল্যচিকিৎসাপ্রধান ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। ধন্বন্তরির মূর্তবিগ্রহ কাশীরাজ দিবোদাসের শিষ্য সুশ্রুত যে গ্রন্থটি লিখিয়াছিলেন তাহা নাগার্জুন প্রতিসংস্কৃত ও সংকলিত করেন। উহাই এক্ষণে 'সুশ্রুত-সংহিতা' নামে পরিচিত। সুশ্রুতের কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী হইলেও 'সুশ্রুতসংহিতা'র সংকলন-কাল 'চরকসংহিতা'র কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। সুশ্রুতে কর্তিত নাসিকার স্থলে কৃত্রিম নাসিকা স্থাপন, ত্বক সন্নিরোপণ ও শবব্যবচ্ছেদের সাহায্যে অঙ্গের সংস্থান নির্ণয়ের উল্লেখ আছে।

দক্ষ চিকিৎসক ও শল্যবিদ্‌রূপে জীবকেরও প্রসিদ্ধি শোনা যায়। কথিত আছে যে তিনি বুদ্ধ, বিম্বিসার ও চণ্ড প্রদ্যোতের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। অনেকের মতে জীবক ছিলেন শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং তিনি 'কোমারভচ্চ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

আত্রেয়সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরিসম্প্রদায় ছাড়াও পরবর্তী কালে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগার্জুন আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে রসবৈদ্যসম্প্রদায় বা সিদ্ধসম্প্রদায় নামে আর একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন; কাহারও কাহারও মতে পতঞ্জলি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ঔষধে লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। 'কক্ষপুট-তন্ত্র' ও 'রসরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন নাগার্জুন।

চরক ও সুশ্রুতের পর খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গসংগ্রহ' ও 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' অপর দুইটি সংকলন-গ্রন্থ। আনুমানিক ৭ম শতাব্দীতে মাধবকর 'রুগ্‌বিনিশ্চয়' নামে রোগসমূহের একটি নিদানগ্রন্থ লেখেন, ইহা 'মাধব-নিদান' নামে প্রচলিত। মাধবকরের পরে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকারবৃন্দ (৯ম-১০ম শতাব্দী) এবং ১১শ শতাব্দীতে বঙ্গ দেশে চক্রপাণি দত্ত। চক্রপাণি দত্ত 'চক্রদত্ত' বা 'চিকিৎসাসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। চক্রপাণির পর চতুর্দশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গধর 'শার্ঙ্গধরসংহিতা' ও 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' নামে দুইটি আয়ুর্বেদের গ্রন্থ রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভাবমিশ্র 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থটি রচনা করিয়া শরীরে রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন এবং উপদংশের চিকিৎসায় পারদ ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করেন। 'ভাবপ্রকাশেই' সর্বপ্রথম পর্তুগীজদের দ্বারা আনীত ফিরঙ্গ (সিফিলিস) রোগের চিকিৎসার বিধান এবং তোপচিনি, আফিম প্রভৃতি ব্যবহারের নির্দেশ আছে।

প্রাচীন মিশরের নৃপতি জোসের-এর মন্ত্রী ও স্থপতি ইম্‌হোতেপ (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০) চিকিৎসকরূপে খ্যাত ছিলেন। এবেরস কর্তৃক আবিষ্কৃত প্যাপিরাসে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫০) তৎকালীন মিশরীয় চিকিৎসাপদ্ধতির বিবরণ আছে এবং হৃৎপিণ্ডকে রক্ত-সঞ্চালনের অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীন মিশরে আফিম, খমির, খেজুর, তামা, পেঁয়াজ, মধু প্রভৃতি ঘটিত ঔষধ ও বিরেচক, পুলটিস প্রভৃতির ব্যবহার হইত এবং টিমুবৃদ্ধির (টিউমার) শল্যচিকিৎসাও প্রচলিত ছিল।

সুমেরীয় সভ্যতায় (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০) চিকিৎসা মুখ্যতঃ জাদুবিদ্যার উপর নির্ভর করিত। পরবর্তী যুগে ব্যাবিলোনিয়ার রাজা হাম্মুরাবি (খ্রীষ্টপূর্ব ১৮শ শতাব্দী) কর্তৃক ক্ষোদিত আইনের ধারায় চিকিৎসকের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশাবলী বর্তমান। আসিরীয় যুগে আরাদ নিনাই (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬৮১-৬৬৯) নামক চিকিৎসকের বহু ব্যবস্থাপত্র পাওয়া গিয়াছে।

গ্রীক বা ইউনানি চিকিৎসাপদ্ধতির অন্যতম উদ্ভাবক দার্শনিক পিথাগোরাস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮০-৪৮৯) মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে রোগচিকিৎসার নীতি প্রয়োগ করেন। হিপোক্রাতেস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭৭) প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রচলন করেন। তিনিই প্রথম রোগের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, তাই তাঁহাকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক আখ্যা দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের অনুসরণার্থে তিনি দশটি মূলনীতি নির্দিষ্ট করেন। আরিস্তোতেল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) তুলনামূলক শারীরসংস্থান (কম্প্যারাটিভ অ্যানাটমি) ও ভ্রূণবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। রোমক যুগে গ্রীক চিকিৎসক ক্লাউদিয়স গালেন (আনুমানিক ১৩০-২০১ খ্রী) শারীরসংস্থান সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করেন; কয়েকটি করোটিক নার্ভ আবিষ্কার ও চেষ্টীয় (মোটর) এবং সংবেদ (সেন্‌সরি) নার্ভের মধ্যে পার্থক্যনির্দেশ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

আরব-সভ্যতার যুগে হারুন অল্ রশীদের (৭৬৩-৮০৯ খ্রী) সময় বাগদাদে হাসপাতালের অস্তিত্ব ছিল। ইব্‌ন-ইস্‌হাক (৮০৯-৭৩ খ্রী) হিপ্পোক্রাতেস ও আরিস্তোতলের চিকিৎসাগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন, আবু বকর মুহম্মদ ইব্‌ন জকরিয়া (৮৬৫-৯২৫ খ্রী) ব্যাবহারিক চিকিৎসাবিদ্যার কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ইব্‌ন-সীনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রী) হিপ্পোক্রাতেস, গালেন ও আরিস্তোতলের চিকিৎসা সম্বন্ধে মতবাদের আলোচনা করেন। ইব্‌ন সীনা 'কানুন' নামে একটি প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ্যাকোষ সংকলন করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগে ইওরোপে প্রধানতঃ খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণই চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগ করিতেন। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ধর্মযাজকদের চিকিৎসা বন্ধ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্লেগ মহামারীর সময় ইটালীতে সর্বপ্রথম রোগীদের পৃথক করণের ব্যবস্থা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রী) শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা শারীরসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসার ঘটান। ষোড়শ শতাব্দীতে বেলজিয়ামের ভেসালিয়ুস (১৫১৪-৬৪ খ্রী) নরদেহের গঠন সম্বন্ধে 'দে হুমানি কর্পোরিস ফাব্রিকা' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের পারাসেলসুস (১৪৯৩-১৫৪১ খ্রী) চিকিৎসায় অ্যান্টিমনির প্রয়োগ প্রচলিত করেন, ফ্রান্সের আঁব্রোয়াজ পারে (১৫১৭-৯০ খ্রী) মাতার জননালীতে আবদ্ধ শিশুর প্রসবপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং লণ্ডনে লিনেকার-এর সভাপতিত্বে রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্‌স প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শারীরসংস্থানবিদ্ হার্ভের (১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রী) গবেষণার ফলে দেহে রক্ত সঞ্চালনের তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীয় চিকিৎসক মাল্‌পিগি (১৬২৮-৯৪ খ্রী) প্রাণীদেহ সম্বন্ধে গবেষণায় অনুবীক্ষণ ব্যবহার করেন। ইংরেজ চিকিৎসাবিজ্ঞানী সিডেনহাম (১৬২৪-৮৯ খ্রী) বিজ্ঞানসম্মত রোগনির্ণয় পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ইটালীয় বিজ্ঞানী মোর্‌গাঞি (১৬৮২-১৭৭১ খ্রী) শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা দেহে রোগকেন্দ্র নির্ণয়ের প্রথা প্রচলন করেন। লেনেক ও চেম্বার্লেন যথাক্রমে স্টেথোস্কোপ ও প্রসবকাঁড়াশি (ফরসেপ্‌স) আবিষ্কার দ্বারা নবযুগের সূচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইংরেজ চিকিৎসক জেনার (১৭৪৯-১৮২৩ খ্রী) কর্তৃক বসন্তের টিকা আবিষ্কার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (১৮২২-৯৫ খ্রী) অ্যান্‌থ্রাক্স ও জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা ও কলেরা জীবাণুর আকৃতি আবিষ্কার করেন, জার্মান বিজ্ঞানী ফির্‌খভ (১৮২১-১৯০২ খ্রী) কর্তৃক কোষভিত্তিক নিদানতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়, ইংরেজ শল্যচিকিৎসক লিস্টার (১৮২৭-১৯১২ খ্রী) শল্যচিকিৎসার সময় জীবাণুর সংক্রমণ রোধের জন্য রাসায়নিক বীজবারক পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ করেন, জার্মান জীবাণুবিদ রোবের্ট কোখ (১৮৪৩-১৯১০ খ্রী) যক্ষ্মা ও অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু আবিষ্কার করেন, স্কটিশ স্ত্রীরোগবিদ্ সিমপ্‌সন (১৮১১-৭০ খ্রী) কর্তৃক অবেদনকারক পদার্থ হিসাবে ক্লোরোফর্ম ব্যবহৃত হয় এবং কলিকাতায় ইংরেজ চিকিৎসাবিদ্ রোনাল্ড রস (১৮৫৭-১৯৩২ খ্রী) ম্যালেরিয়ার পরজীবী ও তাহার জীবনবৃত্তান্ত আবিষ্কার করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই জার্মান বিজ্ঞানী এহ্‌র্‌লিখ (১৮৫৪-১৯১৫ খ্রী) চিকিৎসায় রাসায়নিক ঘটিত ঔষধ প্রয়োগের সূচনা করেন ('কেমোথেরাপি' দ্র) এবং স্কটিশ জীবাণুতত্ত্ববিদ্ লীশ্‌ম্যান (১৮৬৫-১৯২৬ খ্রী) কর্তৃক কালাজ্বরের পরজীবী আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৫-১৯৪৬ খ্রী) কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' আবিষ্কার করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বান্টিং (১৮৯১-১৯৪১ খ্রী) ও তাঁহার সহকর্মীগণ কর্তৃক মধুমেহের ঔষধ ইনসুলিন আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ডোমাগ (১৮৯৫ খ্রী) প্রন্টোসিল নামক ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সালফা-বর্গীয় ঔষধের গোড়াপত্তন করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী ফ্লেমিং (১৮৮১-১৯৫৫ খ্রী) একপ্রকার ছত্রাক হইতে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ আবিষ্কার করেন, ক্রমে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, টেরামাইসিন, ক্লোরামফেনিকল প্রভৃতি বহু অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অরিওমাইসিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক এবং স্প্রু ও অন্যান্য রক্তাল্পতা রোগের সম্বন্ধে গবেষণায় ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্বারাও-এর অবদান উল্লেখযোগ্য। রয়েন্টগেন (১৮৪৫-১৯২৩ খ্রী), মারি কুরী (১৮৬৭-১৯৩৪ খ্রী) প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে এক্স-রে ও নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থও চিকিৎসায় প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা নানা শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শাখাগুলি উল্লেখযোগ্য. ১. শারীরসংস্থান (অ্যানাটমি). অঙ্গাদির গঠন, বিন্যাস ও সংস্থান -সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ২. শারীরবিদ্যা (ফিজিওলজি): অঙ্গাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া -সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ৩. ভেষজবিদ্যা (ফার্মাকোলজি). ঔষধের শ্রেণীবিভাগ ও ক্রিয়া -সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ৪. প্রাণরসায়ন (বায়োকেমিষ্ট্রি): দেহের রাসায়নিক

উপাদান ও তাহাদের বিপাক -বিষয়ক বিদ্যা ৫. নিদানতত্ত্ব (প্যাথলজি) : অঙ্গাদির রোগজনিত ক্রিয়াবিপর্যয় -সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ৬. জীবাণুবিদ্যা (ব্যাকটিরিওলজি) : রোগজীবাণু ও তাহাদের ক্রিয়া -বিষয়ক বিদ্যা ৭. চিকিৎসাতত্ত্ব (মেডিসিন) : বিভিন্ন রোগে প্রযোজ্য ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা -সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ৮. শল্যশাস্ত্র (সার্জারি). অস্ত্রোপচার, অঙ্গাদি-অধিরোপণ (ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন) প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ৯. স্ত্রীরোগবিদ্যা (গাইনেকোলজি অ্যাণ্ড অব্স্টেট্রিক্স). স্ত্রীজননতন্ত্রের রোগ ও সন্তান জন্ম-বিষয়কবিদ্যা ১০. জনস্বাস্থ্য (হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্থ). মহামারী প্রতিরোধ, পৌরস্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ১১. চিকিৎসা সংক্রান্ত আইন (মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স). শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা সন্দেহজনক মৃত্যুর কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসাসম্পর্কিত অন্যান্য আইনের আলোচনা।

ভারতে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সূচনা হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, ঐ বৎসর কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন মধুসূদন গুপ্ত। কলিকাতার পর মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এবং ক্রমে অন্যান্য স্থানেও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লিওনার্ড রজার্স নিরক্ষীয় অঞ্চলের রোগ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য কলিকাতায় স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্থাপন করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাধাগোবিন্দ করের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ (আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) স্থাপিত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রকফেলার-এর সহায়তায় কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেল্থ স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় কলিকাতার শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হস্পিট্যাল-এ ভারতের প্রথম স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যায়তনের সূচনা হয়। ইহা ছাড়া ভারতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কলিকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল ও কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল, বোম্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার রিসার্চ ইন্স্টিটিউট, পুনার ভাইরাস রিসার্চ ইন্স্টিটিউট, চণ্ডীগড়, আমেদাবাদ ও পণ্ডিচেরীর স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যায়তন, কসৌলি ও কুন্নুরের জলাতঙ্ক রোগ গবেষণার প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, গণনাথ সেন, কুমুদশংকর রায়, সুবোধচন্দ্র মিত্র, প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বহু প্রথিতযশা চিকিৎসকের অবদানও স্মরণীয়।

দ্র A Castiglioni, *A History of Medicine*, E. B. Krumbhaar, ed., & tr., New York, 1958.

কমলকুমার মল্লিক
ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত
রথীন্দ্রকুমার পাল

চিড়া ধান দ্র

চিড়িয়াখানা কলিকাতার আলিপুরে অবস্থিত পশুশালা। প্রকৃত নাম 'জুঅলজিক্যাল গার্ডেন, ক্যালকাটা', কিন্তু সাধারণের নিকট 'চিড়িয়াখানা' নামেই ইহা সুপরিচিত। প্রতিষ্ঠানটি টালির নালার তীরে এবং জীরাট সেতুর নিকটে অবস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বঙ্গ দেশের ছোট লাট রিচার্ড টেম্প্‌ল জনসাধারণের সহযোগিতায় চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রিন্স অফ ওয়েল্স ও পরবর্তী কালের ব্রিটিশ সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন এবং ১ মে হইতে জনসাধারণের জন্য ইহার দ্বার উন্মোচিত হয়। সূচনায় রিচার্ড টেম্প্‌লের উৎসাহে কার্ল শোয়েণ্ডলার তাঁহার সংগৃহীত বহু মূল্যবান ও দর্শনীয় প্রাণী এই চিড়িয়াখানার জন্য দান করেন। বহু উৎসাহী দাতার অকুণ্ঠ দানে এবং সরকার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তায় চিড়িয়াখানার প্রসার সম্ভব হইয়াছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় ২০ হেক্টর (৫০ একর) পরিমিত জমিতে চিড়িয়াখানাটি অবস্থিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে চিড়িয়াখানার কার্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। অধিকাংশ বৃহৎ পশুকে মারিয়া ফেলা হয় অথবা অন্যান্য পশুশালায় প্রেরণ করা হয় এবং তখন চিড়িয়াখানার উদ্যানটি ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। যুদ্ধসমাপ্তির পর সেনাবাহিনী উদ্যানটি ছাড়িয়া দেন, তখন পুনর্গঠনের কার্য শুরু হয় ও অত্যল্প কালের মধ্যেই পশুপক্ষী সংগ্রহের দ্বারা ইহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বর্তমানে 'আলিপুর জুঅলজিক্যাল গার্ডেন (ম্যানেজমেণ্ট) রুল্স' (১৯৫৭ খ্রী) অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি অবৈতনিক কমিটির উপর চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত আছে। দ্বারে সংগৃহীত প্রবেশ-মূল্য এবং রাজ্য সরকারের প্রদত্ত অর্থসাহায্যের দ্বারা চিড়িয়াখানার ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। উন্নয়নকার্যের জন্য সরকার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮·০৫ লক্ষ টাকা ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন। বন্য প্রাণী পালনের আধুনিক ব্যবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনায় কিছু কিছু পশুপক্ষীর বাসস্থলের পুনর্গঠন করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই জেব্রাভবন, পক্ষীশালা, মাংসাশী প্রাণীর জন্য মুক্তাঙ্গন, ঝুলন্ত ছায়ামণ্ডপ, শিশুদের জন্য পশুশালা, একটি আধুনিক হাসপাতাল, অডিও-ভিজুয়াল সেন্টার প্রভৃতির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছে বা অদূর ভবিষ্যতে পরিসমাপ্ত হইবে। অন্যান্য কয়েকটি পশুভবনের উন্নয়নও সম্পন্ন হইয়াছে। নূতন সরীসৃপভবন, অ্যাকোয়ারিয়াম, অল্পবয়স্কদের জন্য পশুপক্ষী সম্পর্কীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির নির্মাণও শীঘ্রই শুরু হইবে। দর্শকদের সুবিধার জন্য বসিবার আসন, পানীয় জলের আধার, বিশ্রামমণ্ডপ, বনভোজনের স্থান, একটি নূতন প্রবেশদ্বার প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। বহু দুর্লভ ও উল্লেখযোগ্য প্রাণী সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রার অকুলানবশতঃ প্রাণীসংগ্রহের কার্য কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হইতেছে।

চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্য হিসাবে লোকরঞ্জন, বন্য প্রাণীর (বিশেষতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের বন্য প্রাণীর) স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ, পশুপক্ষীর প্রতিপালন প্রজনন প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহদান, বন্য প্রাণীর বিনিময় ও আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে প্রাণীবিদ্যার প্রচার ও প্রসারে সাহায্য প্রভৃতির চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ১৫টিরও অধিক বেষ্টিত অঙ্গনে বহু দুর্লভ ভারতীয় এবং বিদেশী প্রাণী পালিত ও প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে নানা প্রজাতির হরিণ, অ্যান্টিলোপ, নীলগাই, লামা, গণ্ডার, জলহস্তী, বামন জলহস্তী, হাতি, উট, জেব্রা, আফ্রিকার সিংহ, ভারতীয় সিংহ, বাঘ, রেওয়ায় প্রাপ্ত শাদা বাঘ, জাগুয়ার, পুমা, চিতা, কালো চিতা, ক্যারাকাল, সোনালি বিড়াল, চিতা বিড়াল, ভালুক, শাদা ভালুক, পাণ্ডা, শাদা নেউল, কাঁকড়াভোজী নেউল, বনমানুষ, বানর, হনুমান, ক্যাঙ্গারু, একিড্‌না, বজ্রকীট, উটপাখি, এমু, ফেজ্যান্ট, ফিঞ্চ, তোতা, টিয়া, পায়রা, ঘুঘু, শাদা কাক, ফ্ল্যামিঙ্গো, নানা জাতের সাপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারাকপুরের বাগান হইতে যে সকল স্থলচর কচ্ছপ আনা হইয়াছিল, তাহাদের কতকগুলি আজও সুস্থ ও সবল অবস্থায় আছে, ইহারাই চিড়িয়াখানার প্রাচীনতম বাসিন্দা। চিড়িয়াখানার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৎসরের সর্বসময়ে শান্ত ও অভীষ্ট পরিবেশ থাকায় ছোট হাঁস ও অন্যান্য জলচর পাখি এবং বক, পানকৌড়ি প্রভৃতি শাখাচারী পাখি এখানে বাসা বাঁধে। কৃত্রিম হ্রদের চারিপাশে বনস্পতির ছায়াঘন পরিবেশে ইহাদের বসতি, সেখানেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। ছোট জাতের শরাল পাখিরা (লেসার হুইস্‌লিং টীল) শীতের সময়ে চিড়িয়াখানায় আসে, বড় হ্রদটিতে নভেম্বর হইতে মে মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইহাদের ভিড় থাকে। তাহাদের আগমন শীত ঋতুর আবির্ভাবের দ্যোতক। তাহাদের বিদায় শীতশেষে প্রজনন ঋতুর সংকেত।

চিড়িয়াখানার উদ্যানে বহু দুর্লভ বৃক্ষ বিদ্যমান। ইহারা একাধারে ছায়া দান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। শীতকালে ডালিয়া ও অন্যান্য মরসুমী ফুলের শোভার জন্য উদ্যানটির প্রসিদ্ধি আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এখানে সামান্য দক্ষিণার দর্শকদের হাতি ও ঘোড়ায় চাড়বার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। 'পশুশালা' দ্র।

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী

চিৎপাবন ব্রাহ্মণ শাকান্নভোজী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের যে মূল পাঁচটি শাখা মহারাষ্ট্রে দেখা যায় চিৎপাবন সম্প্রদায় তাহার অন্যতম। কোঙ্কণ অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সাধারণতঃ ইহাদের কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ বলা হয়। ইহাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র দেশে কয়েকটি মত প্রচলিত থাকিলেও ইহারা যে বিদেশ হইতে আসিয়া পরবর্তী কালে মহারাষ্ট্রের সমাজ-জীবনে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল অধিকাংশ মতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি-খণ্ডে এ বিষয়ে যে উপাখ্যানের উল্লেখ আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, কোঙ্কণ সমুদ্রোপকূলে যে চতুর্দশটি বিদেশীর মৃতদেহ ভাসিয়া আসে পরশুরাম চিতাগ্নিতে তাহাদিগকে পূত করিয়া পুনর্জীবন দান করেন। চিতাগ্নিতে পবিত্রীকৃত বলিয়া ইহারা চিৎপাবন। ইহারা গৌরবর্ণ ও শিষ্টাগ্রত। বৈদিক ঐতিহ্যপুষ্ট এই সম্প্রদায় ইতিহাসের সূচনাকাল হইতেই পশ্চিম সমুদ্রোপকূলের বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী এবং পরিবারনিষ্ঠ। আদিতে কেবল শৈব সম্প্রদায়ের দেবতাদের গৃহসেবা করিলেও পরবর্তী কালে অন্যান্য দেবদেবীগণও ইহাদের দ্বারা পূজিত হইতেন। কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও ইহাদের অধিকাংশ সংস্কার ও ধর্মীয় ক্রিয়া-কাণ্ড দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের অন্যান্য শ্রেণীর অনুরূপ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ছত্রপতি সাহু এই সম্প্রদায়ের বালাজী বিশ্বনাথকে তাঁহার পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করার সময় হইতে এই সম্প্রদায় মহারাষ্ট্রের জনসমাজে প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। তীক্ষ্ণধী যুবক বালাজী বিশ্বনাথ অর্থ ও যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় মারাঠার ঘাট বা গিরিদরী অতিক্রম করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হন। পরবর্তী কালে প্রথম বাজিরাও এবং প্রথম মাধব রাও-এর ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসকদের অভ্যুত্থানের ফলে চিৎপাবন

বংশীয় পেশোয়ারাই বংশপরম্পরায় মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর হইয়া উঠিল। পেশোয়ারা নিজ গোষ্ঠীর যুবকদিগকে রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করিত। নানা ফড়নবিশ এর ন্যায় অমাত্য এবং ফড়কে ও গোখলের ন্যায় বহু বীর যোদ্ধা ও সরদার এর অভ্যুদয় এই নিয়োগেরই ফল। মারাঠা সাম্রাজ্য বিজিত হইবার পরও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রিটিশ অধিকারকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল।

ব্রিটিশ শাসনকালেও এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সুফললাভে অগ্রণী হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যও ইহারা অগ্রণী ছিল। বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে ও বিনায়ক দামোদর সাবরকর-এর ন্যায় বিপ্লবী, মহাদেব গোবিন্দ রাণডে, বালগঙ্গাধর টিলক ও গোপালকৃষ্ণ গোখলের ন্যায় রাজনীতিবিদ্, গোপাল গণেশ আগরকর ও ঢোণ্ডো কেশব কর্বের ন্যায় সমাজ সংস্কারক, বিষ্ণুকৃষ্ণ চিপলুণকর, শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে, নরসিংহ চিন্তামন কেলকর, কৃষ্ণাজি প্রভাকর খাডিলকর, হরিনারায়ণ আপ্টে ও কেশবসুত-এর ন্যায় সাহিত্যিক ও লেখক এবং বিশ্বনাথ-কাশীনাথ রাজওয়াড়ে, শ্রীধর বেঙ্কটেশ কেটকর ও পাণ্ডুরং বামন কানের ন্যায় দার্শনিক সন্ত এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভারতের জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে স্বীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাতে অধিক কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন।

চিন্তামণ বামন দাতার

চিৎপুর কলিকাতা শহরের পত্তনকালে শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত গ্রাম, বর্তমানে শহরের অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে দক্ষিণ বঙ্গ শক্তি-পূজার অন্যতম কেন্দ্র হইয়া ওঠে। চণ্ডীকাব্যে (১৫৪৫ খ্রী) চিত্তেশ্বরী মন্দির এইরূপ এক শক্তি-উপাসনার স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মন্দিরে চিত্তেশ্বরী কালী বিগ্রহটি চিতে ডাকাত কর্তৃক স্থাপিত। দেবীর নামানুসারে গ্রামটিরও নাম হয় চিৎপুর। এক সময় চিৎপুর রোড (বর্তমান রবীন্দ্র সরণী) চিত্তেশ্বরী ও কালীঘাট মন্দিরের মধ্যে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের আদি পথ ছিল।

মীরা গুহ

চিন্তা শবসংকার দ্র

চিতোরগড় ২৪°৫৩ উত্তর ও ৭৪°৩৯ পূর্বে রাজস্থানের চিতোরগড় জেলার সদর কার্যালয়। ইহা রাজপুতানার অন্তর্গত একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর ও পূর্বতন রানাগণের রাজধানী। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ইহার জনসংখ্যা ১৬৮৮৮ জন। চিতোরের প্রাচীন মন্দির ও কীর্তিস্তম্ভাদির মধ্যে কুম্ভ রানার কীর্তিস্তম্ভ, খোরাসিন স্তম্ভ, মোকলজীর মন্দির ও সিঙ্গার চওরি প্রধান। ভীম সিংহ ও রানী পদ্মিনীর প্রাসাদ সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। একটি উচ্চ জমির উপরে মেবারের অধিষ্ঠাত্রী কালিকা দেবীর মন্দির স্থাপিত। ইহা বহু প্রাচীন।

চিতোরগড় জেলাটি মধ্য প্রদেশের সীমানার নিকট দক্ষিণ রাজস্থানে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১০০৮২ ৫ বর্গ কিলোমিটার (৪০৩৩ বর্গ মাইল) ও লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ৭১০১৩২ জন। ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চল সমতল। ইহার গড় উচ্চতা ৪০১ মিটার। চম্বল, বনাস, গম্ভীর, বামনী, বেরাক প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নদী। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। তাপমাত্রা ৪৪° সেন্টিগ্রেড হইতে ৪৩°৩° সেন্টিগ্রেড এর মধ্যে ওঠানামা করে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭৫ মিলিমিটার। চিতোরগড় জেলার কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ভুট্টা, জোয়ার, গম, যব, তুলা, তৈলবীজ, ডাল ও আফিম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জেলার মোট আয়তনের ৮°৯% অরণ্যভূমি। জনসংখ্যার ৮০৩% কৃষিজীবী, ৯৩৪% হিন্দু, ৪০ মুসলমান।

চিতোরের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ একটি পাহাড়ের উপর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমভূমি হইতে প্রায় ১২০ মিটার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। শহরটি ঐ পাহাড়ের পাদদেশে স্থাপিত। দুর্গটির আয়তন প্রায় ২৭৬ হেক্টর (৬৯০ একর)। ইহার নির্মাণকাল অনিশ্চিত। কথিত আছে, ৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্পারাওয়ল ইহা অধিকার করেন। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা মেবার রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই দুর্গটি মোট ৪ বার মুসলমান নৃপতিগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের আক্রমণের পর ইহা পরিত্যক্ত হয় ও রাজধানী উদয়পুরে স্থানান্তরিত হয়। দুর্গস্থিত জয়স্তম্ভটি স্থাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। মালব ও গুজরাতের যুগ্ম আক্রমণের বিরুদ্ধে বিজয়চিহ্ন হিসাবে রানা কুম্ভ ইহা নির্মাণ করেন (১৫শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ)।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India Provincial Series Rajputana*, Calcutta, 1908, *District Census Handbook*. Chitorgarh, 1951

রমেন্দ্রকুমার দাস

চিত্তরঞ্জন ২৩°৫৩ উত্তর এবং ৮৭°৫৪ পূর্ব। একটি সুপরিকল্পিত আধুনিক শিল্পনগরী। কারখানা ও সংলগ্ন

শহর লইয়া ইহার আয়তন ১৮ বর্গ কিলোমিটার (৭ বর্গ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে লোক-সংখ্যা ২৮৯৫৭। স্থানটি সমুদ্রতল হইতে পূর্ব দিকে ১২০ মিটার (৪০০ ফুট) এবং পশ্চিমে ১৬৫ মিটার (৫৫০ ফুট) উচ্চ। চিত্তরঞ্জনের উত্তর-পূর্বে অজয় নদী, দক্ষিণে নামকেসিয়া গ্রাম এবং পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনা। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৩২৫ মিলিমিটার (৫৩ ইঞ্চি)। সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ ২৬° সেন্টিগ্রেড (৭৯° ফারেনহাইট) ও সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ ১২° সেন্টিগ্রেড (৫৪° ফারেনহাইট)। মহুয়া ও শাল গাছ এখানে প্রচুর। ইহা ভিন্ন এখানে পলাশ, হরীতকী, দেবদারু ও সেগুন বৃক্ষ দেখা যায়। এখানকার মাটি প্রধানতঃ দো-আঁশ।

বাংলা-বিহার সীমানায় বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার সালানপুর থানার উত্তর-পশ্চিমাংশে সুন্দর-পাহাড়ী, আমলদহী, আপারকেসিয়া প্রভৃতি মৌজা লইয়া এই শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল মিহিজাম। ইহা পূর্বাঞ্চলের কয়লা-বলয়ের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং পশ্চিম বঙ্গের ইস্পাতশিল্পের কেন্দ্রগুলি, কলিকাতা বন্দর, অজয় নদী এবং মাইথন বাঁধের নিকটবর্তী হওয়ায় চিত্তরঞ্জন একটি আদর্শ শিল্পনগরীতে পরিণত হইয়াছে। পাথুরে মাটি থাকায় এখানে ভারি শিল্প স্থাপনের সুবিধা হইয়াছে। বন্ধুর ভূমি শহরের জল-নিষ্কাশন সমস্যার সমাধান সহজ করিয়াছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি ও জল পাওয়া সহজসাধ্য হইয়াছে।

ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত লোকোমোটিভ ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানাটি এখানে অবস্থিত। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ লইয়া ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য বর্তমান স্থানটি মনোনীত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কারখানার নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে উহার উদ্বোধন হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে কারখানা ও শহরটির নামকরণ হয় 'চিত্তরঞ্জন'। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্‌স-এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল মালগাড়ি টানিবার উপযুক্ত (ডবলিউ. জি.) ইঞ্জিন তৈয়ারি করা; কিন্তু পরবর্তী কালে এখানে অন্যান্য ধরনের ইঞ্জিনও নির্মিত হইতেছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাল টানিবার ইঞ্জিন ১৭২৯টি, যাত্রীবাহী গাড়ি টানিবার উপযুক্ত ইঞ্জিন ১০০টি এবং শান্টিং ও শাট্‌ল -এর জন্য ব্যবহার্য ইঞ্জিন ১০টি নির্মিত হইয়াছে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের নির্মাণকার্যও আরম্ভ হয় এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে উহার উৎপাদনও সম্ভব হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর ১৫০টি বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন নির্মাণের প্রস্তুতি চলিতেছে।

ভারতীয় রেল বিভাগের গবেষণা, নকশা এবং মান-নির্ণয়কারী সংস্থা (রিসার্চ, ডিজাইন অ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডার্ড অর্গ্যানাইজেশন) ইঞ্জিনগুলির নমুনা ঠিক করেন। বর্তমানে ডবলিউ. জি. ইঞ্জিন-সংক্রান্ত উপাদানগুলির মধ্যে মাত্র শতকরা ১.৯ ভাগ মূল্যের উপাদান বিদেশ হইতে আনীত হয়।

রেলপথের বৈদ্যুতীকরণে ব্যবহৃত গ্যাল্‌ভ্যানাইজ্‌ড ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একটি গ্যাল্‌ভ্যানাইজিং প্ল্যাণ্ট নির্মিত হইতেছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর দুইটি আর্ক মেল্‌টিং ফার্নেস নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের ইস্পাত ঢালাই কারখানায় বার্ষিক ১০১৬০ মেট্রিক টন (১০০০০ টন) ছাঁচ তৈয়ারি সম্ভব হইবে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানার মোট কর্মীসংখ্যা প্রায় ১০০০০। যাতায়াত-ব্যবস্থা ও যানবাহনের সুবিধার পক্ষ হইতে ইহা একটি আদর্শ স্থান। চিত্তরঞ্জন আসানসোল হইতে ৩২ কিলোমিটার এবং কলিকাতা হইতে ২২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। চিত্তরঞ্জন বিস্তৃত পাকা রাস্তার দ্বারা কলিকাতা, আসানসোল, বার্নপুর, রূপনারায়ণপুর, সিন্ধ্রি ও ধানবাদের সহিত সংযুক্ত। সমস্ত শহরটি ৬টি কলোনিতে বিভক্ত। এখানে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আছে, যথা সেণ্ট্রাল মেটালার্জিক্যাল অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি; কর্মীদের কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় (টেক্‌নিক্যাল স্কুল); কর্মীদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্মিত বাসন্তী ও শ্রীলতা ইন্‌স্টিটিউট প্রভৃতি।

দ্র A. Mitra, *Cesus 1951 : West Bengal District Handbook : Burdwan*, Alipore, 1953; M. M. Basu, 'Chittaranjan Locomotive Works: its Past, Present and Future', *Chittaranjan*, April 16, 1965.

মিত্রা দত্ত

চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে অবস্থিত ক্যান্সার রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র। ইরেন জ্লোলিও-কুরি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ইহার উদ্বোধন করেন। শয্যাসংখ্যা ১৬১। শল্য-চিকিৎসা, এক্‌স-রে, গামা রে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রভৃতির সাহায্যে

আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানটির ১০ লক্ষ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন এক্স-রে যন্ত্র এবং সিজিয়াম যন্ত্র যথাক্রমে এশিয়া ও ভারতে অদ্বিতীয়। রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের বহির্বিভাগে দৈনিক গড়ে ২১ জন নূতন এবং ৫৬ জন পুরাতন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হয়। চিকিৎসা-সমাপ্তির পরও নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, জনসাধারণ, কলিকাতা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশন, দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এবং দাতাদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি ইহার কার্য পরিচালনা করেন।

অমিয়কুমার সেন

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ খ্রী) ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর কলিকাতার পটলডাঙা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভুবনমোহন ও মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী। ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। ভুবনমোহন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় ইল্‌বার্ট বিল, সংবাদপত্রের উপর নিষেধাত্মক আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাইতেছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্টুডেন্ট্‌স অ্যাসোসিয়েশন' নামক ছাত্র-সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন ছিলেন উহার উৎসাহী সভ্য। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বি. এ. পাশ করিয়া ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন এবং সেখানেও রাজনৈতিক কর্মে তৎপর হইয়া ওঠেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার পর তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ব্যারিস্টারি শুরু করেন। রাজনীতির সহিত তিনি যোগ রাখিয়া চলিয়াছিলেন এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার পি. মিত্র 'অনুশীলন সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হন। অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় আসিয়া যখন 'বন্দে মাতরম্' (১৯০৬ খ্রী) পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন তখন হইতে তিনি ইহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ সালে পিতার সঙ্গে একযোগে তিনি এক পিতৃবন্ধুর ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার ফলে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে উভয়কে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলা শুরু হইলে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষসমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এই কার্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অবশ্য তৎপূর্ব হইতেই তিনি রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলার নিষ্পত্তির পর তাঁহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর হইতে সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাতেও চিত্তরঞ্জন প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে থাকেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতৃঋণ পরিশোধ করিলে দেউলিয়া খাতা হইতে তাঁহার নাম অপসারিত হয়। ১৩২১ বঙ্গাব্দে চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণ' নামে মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার, পাঞ্জাবে সরকারি চণ্ডনীতি ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন অদম্য উৎসাহে আন্দোলনে যোগদান করেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইনপ্রয়োগের ফলাফল বিচারের জন্য কংগ্রেস যে তদন্ত-কমিটি গঠন করেন, চিত্তরঞ্জন তাহার অন্যতর সভ্য ছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করেন তখন চিত্তরঞ্জন আইনসভায় প্রবেশের পক্ষপাতী হওয়ায় প্রথমে আইন-সভা-বর্জনের বিরোধিতা করেন। পরে তিনি স্বয়ং কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাতে সমগ্র ভারতে সাড়া পড়িয়া যায়। এই সময়ে ব্যারিস্টারিতে তাঁহার বহু সহস্র টাকা মাসিক আয় ছিল, কিন্তু গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এইরূপ ত্যাগ সত্যই দুর্লভ। ইহাতে বাংলার নরনারী এক নূতন প্রেরণা লাভ করে এবং তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি নিজের এবং সমগ্র পরিবারের জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্তিত করিয়া দেন। প্রভূত বিত্তশালী ব্যক্তি হইতে তিনি প্রায় একদিনে ফকিরের জীবনে নামিয়া আসেন। প্রথমেই তিনি ছাত্রদের 'গোলামখানা' (বিশ্ববিদ্যালয়) ত্যাগ করিতে আহ্বান জানাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। আইনভঙ্গের দ্বারা যখন কারাবরণের সময় আসিল তখন চিত্তরঞ্জন প্রথমেই পাঠাইলেন সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী ঊর্মিলা দেবীকে। এই অভাবনীয় ব্যাপারে তদানীন্তন সমাজে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে

আইন অমান্যের জন্য তাঁহার ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়। এই সময় তাঁহার আমেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল।

কারামুক্ত হইয়া ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে চিত্তরঞ্জন গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি হিসাবে তিনি আইনসভায় প্রবেশ করিয়া সরকারি নীতির বিরোধিতা করিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। গান্ধীজী এই সময়ে কারাগারে। তাঁহার অনুরাগীদের বিরুদ্ধতায় এই নীতি তখন কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। গয়াতেই দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া আইনসভায় প্রবেশের অনুকূলে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহার ফলে কংগ্রেস-কর্মীরা আইনসভায় প্রবেশের অনুমতি পান। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের জন্য দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল মুসলমান নেতাদের সহিত উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার-বিষয়ক একটি চুক্তি সম্পাদন করে। ইহাই বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩ খ্রী) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল আশাতীত সাফল্য লাভ করে। তারকেশ্বরের মোহান্তের নানা অনাচারের বিরুদ্ধে ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বরাজ্য দল বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সরকার প্রথম বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের প্রবর্তন করিয়া সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ নেতাকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন। তখন দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তিনি সিমলায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়াছিলেন। সেখান হইতে কলিকাতায় নিজ গৃহে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভা আহ্বানের অনুরোধ জানাইয়া ফিরিয়া আসেন। উক্ত সভায় নানা প্রমাণ পাইয়া গান্ধীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে স্বরাজ্য দলের শক্তিকে পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যেই সরকার নূতন অর্ডিন্যান্সের প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে দেশবন্ধুর নীতিকে সমর্থন জানান। অতিরিক্ত পরিশ্রম, কারাবাস ও অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন দার্জিলিং-এ তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ পৈতৃক বসতবাটী দেশসেবায় দান করিয়া যান। গান্ধীজী আরও অর্থ সংগ্রহ করিয়া এখানে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠা করেন।

কেবল রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আইন-ব্যবসায়েই দেশবন্ধুর জীবন অতিবাহিত হয় নাই। কবি ও লেখক-রূপেও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। 'মালঞ্চ' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), 'সাগরসঙ্গীত' (১৯১৩ খ্রী) এবং 'অন্তর্যামী' (১৯১৪ খ্রী) তাঁহার প্রণীত কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মসমাজের আবেষ্টনে লালিত হইয়াও পরবর্তী জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাকে এদিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর ঔদার্য ও দানশীলতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তিনি অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, আবার তাহা অকাতরে দান করিয়াও গিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহার নেতৃত্ব যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা প্রায় তুলনাহীন। তাঁহার শবযাত্রা উপলক্ষ্যে অভূতপূর্ব জনসমাগম হইয়াছিল।

দ্র মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, অপর্ণা দেবী, মানুষ চিত্তরঞ্জন, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, P C. Ray, *The Life and Times of Chittaranjan Das*, London, 1927.

সত্যেন্দ্র গুপ্ত

চিত্রকলা রেখা ও বর্ণের সাহায্যে কোনও বস্তু বা ঘটনার অনুকৃতি বা বিমূর্ত ভাবপ্রকাশ চিত্রকলা বলিয়া পরিচিত। চিত্র সাধারণতঃ তুলি বা বর্তিকা (রঙ পেন্সিল) দ্বারা অঙ্কিত হয়। ইওরোপে মধ্যযুগে মোজেক দ্বারা চিত্রাঙ্কণের প্রচলন ছিল। চোখে দেখা বাস্তব রূপ শিল্পীর মানসলোকে প্রতিভাত রূপ হইতে ভিন্ন। এই দুই রূপের সমন্বয় সাধন করিয়া উহা শিল্পী তাঁহার চিত্রে প্রতিফলিত করেন। প্রাচীন প্রাচ্যদেশীয় শিল্পবিদ্‌দেরও এই নির্দেশ।

রেখাচিত্র অঙ্কন (ড্রয়িং) এবং মণ্ডন-শিল্প (ফুল-লতা-পাতা ও নানাবিধ জ্যামিতিক নকশায় অলংকৃত চিত্রণ-শিল্প) বস্তুতঃ চিত্রকলার অন্তর্গত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইওরোপে শুধু পেন্সিল দ্বারা অঙ্কনরীতির (পেন্সিল ড্রয়িং) বহু ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

মানব-ইতিহাসের আদিম যুগ হইতেই সুদক্ষ চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তুতঃ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চিত্রকলার চর্চা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। অনুন্নত মানবসমাজেও চিত্রকলার বহুল প্রচলন আছে। পর্বতগুহাগাত্রে বা ভিত্তিগাত্রে, কাঠের পাটায়, বস্ত্র বা কাগজের উপর, মৃন্ময় পাত্রের গাত্র প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্র অঙ্কিত হয়। বিভিন্ন সময়ে এবং

বিভিন্ন প্রকারের চিত্রে বিভিন্ন করণ (টুল), উপকরণ (মেটিরিয়াল) ও কৌশল (টেকনিক) প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইওরোপে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে করণ, উপকরণ ও কৌশলের দ্রুত উন্নতি হয়। বহু শিল্পী অক্লান্ত চেষ্টায় শারীর স্থানবিদ্যা (অ্যানাটমি), পরিপ্রেক্ষিত (পার্সপেকটিভ) ও সম্মুখভাগকে ক্ষুদ্রাকারে প্রদর্শন (ফোরশর্টেনিং) প্রভৃতি সম্পর্কে অসামান্য কৌশল আয়ত্ত করিয়া বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বাস্তব জগৎকে চিত্রে প্রতিফলিত করিতে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লব্ধ বিদ্যা ও অর্জিত কৌশলই আধুনিক উন্নত চিত্রশিল্পের মূল।

বর্তমান কালে শিল্পীগণ উপকরণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। রঙের ব্যবহারই বহুবিধ। সাধারণতঃ তিন প্রকারে এই সব রঙের প্রয়োগ হয়— জলে দ্রবীভূত রঙ, তৈলমিশ্রিত রঙ ও শুষ্ক রঙ পেন্সিল। চীনে শুধু কালি দ্বারা অনেক চিত্র অঙ্কিত হয়। অনেকে প্রাচীন কালের ন্যায় গঁদ, ডিম ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত রঙের ব্যবহার করেন।

অতি প্রাচীন কালে জীবজন্তু ও শিকারের দৃশ্য প্রধানতঃ চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল। ঐতিহাসিক যুগে চিত্রের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতক হইতে জীবনের সাধারণ ঘটনাসমূহ ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। ইওরোপে মধ্যযুগে আলেখ্য বা প্রতিকৃতি অঙ্কন এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। আলোকচিত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলেখ্য অঙ্কন অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে আলেখ্য অঙ্কনের উল্লেখ দেখা যায়। মোগল যুগেও প্রতিকৃতি অঙ্কন বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন গুহাচিত্র ফ্রান্স ও স্পেনের নানা স্থান হইতে প্রাচীন প্রস্তর যুগের বহু গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে (‘গুহাচিত্র’ দ্র)। আফ্রিকার নানা স্থানে আবিষ্কৃত বুশম্যানদের অঙ্কিত প্রাচীন গুহাচিত্র অতীব চিত্তাকর্ষক। ভারতবর্ষের নানা স্থানে, বিশেষতঃ মধ্য প্রদেশে ও উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলায়, গুহাগাত্রে প্রাচীন চিত্রকলার নিদর্শন আছে।

চিত্রিত মৃৎপাত্র . মৃৎপাত্রের গায়ে চিত্রাঙ্কণরীতি অতি প্রাচীন। সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্তান হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রিত মৃৎপাত্রের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ লাল জমিনের উপর লাল রঙে গাছ, লতাপাতা, ময়ূর, হরিণ, পরস্পর কাটিয়া যাওয়া বৃত্তের নকশা অঙ্কিত হইয়াছে। পারস্য, ইরাক, চীন, জাপান প্রভৃতি নানা দেশ হইতেও চিত্রিত প্রাচীন মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস হইতে মৃৎপাত্রের গায়ে অঙ্কিত অতি উৎকৃষ্ট চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। চিত্রগুলি লাল এবং কালো রঙে দুই রকমে অঙ্কিত। পৌরাণিক কাহিনী ও সাধারণ জীবনের ঘটনা চিত্রের বিষয়বস্তু। চীন দেশে চীনামাটির (পোর্সিলিন) পাত্রের গায়ে বিবিধ সুন্দর চিত্রাবলী অঙ্কিত হয়।

ভিত্তিচিত্র . ঐতিহাসিক যুগে ভিত্তিচিত্রের (ওয়াল পেন্টিং) ব্যাপক ব্যবহার ছিল। মিশর দেশের মন্দিরের ভিত্তিচিত্র সর্বপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ক্রীট দ্বীপ হইতে উন্নত মানের প্রাচীন ভিত্তিচিত্র পাওয়া গিয়াছে। পম্পিয়াই নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত ভিত্তিচিত্রও উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে ইতালীতে ইওরোপীয় ভিত্তিচিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়। গির্জার দেওয়ালে বা ছাদে এইসব ভিত্তিচিত্র অঙ্কিত হইত।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালেই ভিত্তিচিত্রের অঙ্কন পদ্ধতি প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রামগড়ের নিকট (মধ্য প্রদেশ) যোগীমারা গুহাগাত্রে অঙ্কিত ও অজন্তার প্রথম পর্যায়ের চিত্রাবলী আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকের। ভারতীয় চিত্রকরগণ টেম্পেরা পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন মনে হয় (‘অজন্টা’ দ্র)।

ভারতীয় ভিত্তিচিত্রের প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। সিংহলের সিগিরিয়া, মধ্য এশিয়ার দণ্ডন উলিখ, চীনের তুন হুয়াঙ, জাপানের হোরিউজি মন্দির প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত চিত্রে ভারতীয় রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। ভারতীয় ভিত্তিচিত্রধারা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত। অজন্টা, বাঘ, বাদামী, সিত্তনবাসল ও এলোরার গুহা, তাঞ্জোর মন্দির, তিরুপতি কুন্দরম্ মন্দির এবং পদ্মনাভপুর প্রাসাদগাত্রের ভিত্তিচিত্র এবং জয়পুর, নেপাল প্রভৃতি স্থানের প্রচলিত ভিত্তিচিত্রশিল্প এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা সূচিত করে।

চিত্রিত পুস্তক ও ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে পুস্তকশোভনের কাযে চিত্রকলার বহুল ব্যবহার ছিল। ইওরোপের খ্রীষ্টীয় ধর্মপুস্তক, পারস্যদেশীয় কাব্য, বিজ্ঞান ও লোককাহিনী-বিষয়ক পুস্তক, জাপানের জড়ানো পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্রশোভিত বহু পুথি ভারতবর্ষেও পাওয়া গিয়াছে। গুজরাতে ও রাজস্থানে প্রাপ্ত গীতগোবিন্দ, বসন্তবিলাস প্রভৃতি কাব্য, কল্পসূত্র প্রভৃতি জৈন

ধর্মগ্রন্থ এবং নেপালে প্রাপ্ত পাল যুগের বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। চিত্রশোভিত পুস্তক ব্যতীত দেওয়ালে টাঙাইবার জন্য অঙ্কিত ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রের অনেক নিদর্শন আছে। সাধারণতঃ এইসব চিত্র কাগজের উপর জলরঙ দ্বারা অঙ্কিত হয়। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ১৬ ১৮শ শতকের রাজস্থানী ও মোগল ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র সর্বত্র সমাদৃত।

তৈলচিত্র (অয়েল পেন্টিং). ইওরোপে মধ্যযুগে ক্যাম্বিশ কাপড়ের উপর তৈলমিশ্রিত রঙ দ্বারা অঙ্কিত চিত্র ক্রমশঃ প্রচলিত হয়। বর্তমান কালে তৈলচিত্রাঙ্কণ পৃথিবী-বিস্তৃত। বস্তুতঃ অধুনা ছবি বা চিত্র বলিতে ফ্রেমবদ্ধ তৈলচিত্রের কথাই সাধারণ লোকের মনে আসে।

জড়ানো চিত্র (স্ক্রল). এতদ্ব্যতীত রেশম, কাগজ বা কার্পাসবস্ত্রের জড়ানো চিত্র উল্লেখযোগ্য। চীন ও জাপানে ইহার বহুল প্রচলন ছিল। তিব্বতের টঙ্কা এই ধরনের রেশমের উপর চিত্রিত এবং প্রয়োজনমত গুটাইয়া রাখা যায়।

চিত্রের শ্রেণীবিভাগ. সাদৃশ্য, ছন্দ, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি চিত্রের প্রাণ। তদনুসারে চিত্রকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়. ১. অনুকারক বা হুবহু অনুকৃতি অঙ্কন, ২. ব্যঞ্জক বা যে চিত্র ইঙ্গিতে অঙ্কিত হয় ৩. ছান্দসিক বা যে চিত্রে ছন্দই প্রধান গুণ। বস্তুতঃ কোনও চিত্র সম্পূর্ণভাবে স্বভাবের নকল বা ইঙ্গিতময় বা ছন্দোময় হইতে পারে না। শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য চিত্রে কোন্ গুণ প্রধান তাহা বুঝাইয়া বলা।

আদিম মানব-সমাজের বা অনুন্নত সমাজের চিত্রকলাকে বাদ দিলে, শিল্পরীতি ও শিল্পকৌশলের বিচারে চিত্রকলাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়।

পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা: বর্তমান কালে ইওরোপীয় বা পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার প্রভাব বিশ্ববিস্তৃত। সুতরাং বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীক ও রোমের কথা না ধরিলে ইওরোপের খ্রীষ্টধর্মীয় চিত্রে ইঙ্গিতময়তার প্রাধান্য ছিল। ইওরোপে মানুষের মন এই সময় হইতে চিরাচরিত বিধি, সংস্কার ও পরম্পরার (ট্র্যাডিশন) নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে চলিয়াছিল। বস্তুতঃ ইওরোপীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন বা রেনেসাঁস যুগ মানবমনের জাগরণেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-সপ্তদশ শতকের মধ্যে ইটালীতে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীর উদয় হয়। তাহাদের সাধনার ফলে চিত্রশিল্প মহান উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ এই সময়কার চিত্রশিল্প সর্বকালে রসিকজনের সমাদর লাভ করিবে।

এই যুগের চিত্রকলা প্রধানতঃ অনুকারক। অধুনা ইওরোপীয় চিত্রকারগণ অনেকে পেণ্ডুলামের ন্যায় পুনরায় ইঙ্গিতময়তার দিকে ফিরিয়া চলিয়াছেন। শিল্পীমনের সন্দেহ ও অসন্তোষের ফলে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন চিত্ররীতির উদ্ভব হয়। চীন ও জাপানের চিত্রকলা অনেক শিল্পীকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন চিত্রাঙ্কণগোষ্ঠী বিভিন্ন নামে পরিচিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইম্প্রেশনিস্ট, এক্সপ্রেসনিস্ট, রোম্যান্টিকস্, কিউবিস্ট, সুর্‌রিয়ালিস্ট ইত্যাদি নাম করা যাইতে পারে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতি. বর্তমান কালে প্রাচ্য চিত্রকলা বলিতে প্রধানতঃ চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও পারস্যের চিত্রকলা বুঝায়। বস্তুতঃ ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির পার্থক্য মূলগত নহে। এই সময়ের পর হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। পরবর্তী যুগের পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার দৃশ্য জগতের বাস্তব রূপকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিত্রে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। প্রাচ্য মূলসূত্রটি প্রকাশ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, গঠনের খুঁটিনাটি গৌণ। তজ্জন্য পাশ্চাত্ত্য রীতিতে মডেল বা আদর্শের ব্যবহার অপরিহার্য। প্রাচ্য চিত্রকলায় ধ্যানলব্ধ রূপেরই প্রকাশ ঘটে। সুতরাং প্রাচ্য চিত্রকলায় পারিপার্শ্বিক বা পরিপ্রেক্ষিত বা শারীর স্থানবিদ্যার উপর প্রাধান্য আরোপ করা হয় না। প্রাচ্য রীতি প্রধানতঃ ব্যঞ্জক ও ছন্দোময়।

এতদ্ব্যতীত ছায়াতপের (লাইট অ্যাণ্ড শেড) ব্যবহার পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলায় (বিশেষতঃ সপ্তদশ শতকের পর) সমধিক দেখা যায়। প্রাচ্য চিত্রকলায় ছায়াতপের ব্যবহার সামান্য, রেখাই ছবির প্রাণ।

চীন ও জাপানের প্রাচীন শিল্পধারা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত। ধর্মীয় বিষয় ব্যতীত নানা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, পশু-পক্ষী, গাছ ও লতা-পাতার অঙ্কনে শিল্পীগণ অসাধারণ দক্ষ। তাহাদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি বিস্ময়কর।

ইওরোপীয় শিল্পের প্রসারের ফলে ভারতের নিজস্ব রীতির অবনতি ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নিজস্ব রীতি নব কলেবরে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। শিল্পীগণ অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য কলাকৌশল গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে এই নূতন শিল্পের চর্চা হয়। ইহার মধ্যে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চিত্রকলা

শিল্পতত্ত্ব : চিত্রকলা সম্বন্ধে নানা ভাষায় বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে। মধ্যযুগের ইওরোপীয় শিল্পীদের কেহ কেহ আত্মজীবনী-মূলক আখ্যানে নিজস্ব রীতির আলোচনা করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পশাস্ত্রের অনেকাংশই লুপ্ত। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বর বা সোমদেবের কৃত 'অভিলষিতার্থচিন্তামণি' (আলেখ্যকর্ম-প্রসঙ্গ), শ্রীকুমার-কৃত শিল্পরত্ন (চিত্রলক্ষণ প্রসঙ্গ), যশোধর-রচিত কামসূত্রের জয়মঙ্গল টীকা প্রভৃতি প্রচলিত কয়েকটি পুস্তক হইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। জয়মঙ্গল হইতে জানা যায় যে ভারতীয় শিল্পবিদ্‌দের মতে চিত্রের ছয়টি অঙ্গ — রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ। কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তথাপি ইহা হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষে শিল্পতত্ত্বের যে গভীর অনুশীলন ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে চীন দেশের শিল্পশাস্ত্রে (যদিও এক নহে) অনুরূপ ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ আছে।

শিল্পশিক্ষা : প্রাচীন কালে চিত্রশিল্পী অনেক ক্ষেত্রে পেশাদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বংশপরম্পরায় শিল্প-শিক্ষা ও বৃত্তির অনুসরণ প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধভিক্ষুগণের অনেকে সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন। তাঁহারা অন্যান্য ভিক্ষুদের নিশ্চয়ই শিক্ষা দিতেন। মধ্যযুগে ইওরোপের শিল্পীগণ নিজস্ব শিল্পশালার প্রবর্তন করেন। সেখানে শিক্ষানবীশ গ্রহণ করা হইত। চিত্রশিল্পশিক্ষার জন্য অধুনা নানা দেশে বহু বিদ্যালয় আছে।

লোকশিল্প : এযাবৎ বিদগ্ধসমাজে আদৃত চিত্রকলার বিষয়ই মুখ্যতঃ বলা হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত লোকশিল্পের পরিচয় সতত পাওয়া যায়। বাংলা দেশের বহুবিধ পটে (নানা দেব-দেবীর পট, বেহুলার পট, গাজির পট), আলপনায় বা হাঁড়িকুড়ির চিত্রণে এই লোক-শিল্পের অজস্র নিদর্শন বর্তমান। খ্রীষ্টীয় ১৮-১৯শ শতকের কালীঘাটের পট লোকশিল্পীদের সৃষ্টি। কলিকাতার ইংরেজীশিক্ষিতসমাজের রুচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও রীতির আংশিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। লোকশিল্পের অনাড়ম্বর অথচ বলিষ্ঠ রূপ অনেক সময় বিদগ্ধসমাজের চিত্রকরদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রাজস্থানী বা রাজপুত-চিত্রকলা প্রকৃতপক্ষে সমুন্নত লোকশিল্প।

দ্র নন্দলাল বসু, শিল্পকথা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩২, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৬১, কলিকাতা, ১৯৪৭, নন্দলাল বসু, শিল্পচর্চা, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা, কলিকাতা, ১৯৬৩, Roger Fry, *Vision and Design*, London, 1920, Roger Fry, *Transformations*, London, 1926, E. R. Abbott, *The Great Painters in Relation to the European Tradition*, New York, 1927, A. K. Coomaraswamy, *The Technique and Theory of Indian Painting*, Harvard, 1934, A. K. Coomaraswamy, *The Transformation of Nature in Art*, Harvard, 1934, L. Binyon, *The Spirit of Man in Asian Art*, Harvard, 1935; Percy Brown, *Indian Painting*, Calcutta, 1947, Leonhard Adam, *Primitive Art*, London, 1949, E. M. Upjohn, P. S. Wingert and J. G. Mahler, *History of World Art*, New York, 1949.

অমরেন্দ্রনাথ রায়

চীনা চিত্রকলা চীনা চিত্রকলা বিশ্বশিল্পের মহত্তম সৃষ্টিগুলির অন্যতম।

অন্ততঃ দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে চীন দেশে চিত্রাঙ্কণের বিধিসম্মত পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটে এবং সেইসঙ্গে চিত্রকলা সম্বন্ধে রীতিমত বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন শুরু হয়। ফলে, প্রাচীন কাল হইতেই চীনা চিত্রকলায় বিধিবদ্ধ ও প্রথাগত অঙ্কনশৈলী প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনা চিত্রকলা একান্তভাবে চিত্রলিপি বা ক্যালিগ্রাফির সহিত সংযুক্ত। তুলির সাহায্যে লিখিত এই লিপিমালা বহুলাংশে চিত্রাঙ্কণেরই অনুরূপ। চিত্ররচনার জন্য হরিণের লোম হইতে বিশেষভাবে প্রস্তুত তুলি চীন দেশে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে উদ্ভাবিত হয়। চীনেই খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাঠের ব্লক হইতে মুদ্রণের এবং ১৭শ শতাব্দীর পূর্বেই রঙিন চিত্রের মুদ্রণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়।

কনফুশিয়স, খুং ফু জু (৫৫১-৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও লাও জু র (Lao Tzu, জন্ম ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ধর্ম দর্শন চৈনিক চিত্রকরকে বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও ভাবাদর্শের গঠনে অনেকাংশে পরিচালিত করিয়াছিল। ফলে সাধুসন্তদের প্রতিকৃতি, নদী, গাছপালা ও পর্বতমালাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকৃতির অনুধ্যান এবং পূর্ববর্তী সমাজের আধিভৌতিক শক্তির প্রতীক ড্রাগন, বাঘ ইত্যাদির রূপায়ণ সম্ভব হইয়াছিল।

চীনা চিত্রকলার ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বিশিষ্ট কবি ও চিত্রকর কু খাই চি (Ku K'ai-Chi, আনুমানিক ৩৪৪-৪০৬ খ্রী) বিশেষভাবে স্মরণীয়। চিত্রে স্থানগত বিন্যাসের সরলীকৃত সৌন্দর্য এবং তাহার ফলে

সঞ্চারিত এক অপূর্ব সূক্ষ্ম পরিমার্জনারূপ বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁহার রচনাতেই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

থাঙ্ (T'ang) বংশীয় সম্রাটদের রাজত্বকালে (৬১৮–৯০৬ খ্রী) ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক শ্রমণদের মাধ্যমে ভারতীয় বৌদ্ধ চিত্রকলার সহিত চীনা চিত্রকরদের পরিচয় ঘটে। চীনা চিত্রকলায় ভারতীয় চিত্রকলার স্থানবিন্যাসগত ছন্দের প্রবহমানতা, রঙের উজ্জ্বলতা এবং চিত্রিত বিষয়টিতে এক নূতন ধরনের বাস্তবানুগ ত্রৈমাত্রিক ডৌল সঞ্চারিত হয়। থাঙ সম্রাটদের আমল 'চীনা চিত্রকলার স্বর্ণযুগ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

চীনের পশ্চিম প্রান্তে তুন হুয়াঙ (Tun huang) বৌদ্ধ বিহারের 'সহস্র বুদ্ধ গুহা' ভিত্তিচিত্রগুলি চীনা চিত্রকলার ভারতীয় প্রভাবের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নিদর্শন। এগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে দশম শতকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অঙ্কিত হইলেও অধিকাংশই থাঙ্ সম্রাটদের কালে অঙ্কিত।

ভিত্তিচিত্র ব্যতীত পুস্তক শোভনের কার্যে চিত্রকলার বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অনেক কবি চিত্রকলায় দক্ষতা অর্জন করিয়া নিজ নিজ পুস্তক অলংকৃত করেন। তাঁহারা স্বাধীনভাবে স্বকীয় কলাকৌশলের উদ্ভাবন করেন এবং ইচ্ছামত বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। পুস্তকগুলি অধিকাংশই জড়ানো (স্ক্রোল) এবং কাগজ বা রেশমের উপর কালি দ্বারা অঙ্কিত। নিসর্গ দৃশ্যের অঙ্কন এই কবি চিত্রকরদের বিশেষ প্রিয় ছিল।

থাঙ্ আমলের শেষের দিকে চীনা চিত্রকলায় 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' এই দুইটি বিশিষ্ট ধারা বা 'কলম' (school) বিকাশ লাভ করে। লি সু সুন (Li Szu-hsun, সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) এর রচনায় বিকশিত উত্তরাঞ্চলীয় ধারাটির বৈশিষ্ট্য— বস্তুসাদৃশ্য ও আনুরূপ্য এবং ওয়াঙ ওয়েই এর (Wang wei, অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ) প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণী ধারাটির বৈশিষ্ট্য— কাব্যময় লালিত্য এবং অতি সূক্ষ্ম রেখায় ফুটাইয়া তোলা খুঁটিনাটি বিবরণ। থাঙ্ যুগের আর একজন বিখ্যাত চিত্রকর হইলেন হান কান (Han Kan, অষ্টম শতাব্দী)।

পঞ্চ রাজবংশের আমলে (৯০৭-৫৯ খ্রী) এবং তৎপরবর্তী সুঙ সম্রাটদের কালে (৯৬০-১২৭৯ খ্রী) উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ধারাতেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাঙ্কনে এক আশ্চর্য উজ্জ্বল বিকাশ ঘটে, যাহা তদানীন্তন গম্ভীর গিরিখাত, খরস্রোতা নদী, কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতচূড়া, বৃষ্টিস্নানরত বাঁশবন, উষা বা গোধূলির ছোঁয়া-লাগা অরণ্যশীর্ষ ইত্যাদি চিত্রে অনুধাবন করা যায়। এই সময়কার চিত্রকলায় মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের ধ্যানমগ্ন আত্মসমাহিতির ভাব-স্নিগ্ধতাটুকু অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এখনকার চিত্রকরদের মধ্যে লি শেঙ (Li Sheng, দশম শতাব্দীর শেষার্ধ) ও সিয়া কুয়েই (Hsiah Kuei, আনুমানিক ১১৮০-১২৩০ খ্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিঙ (Ming) বংশীয় সম্রাটদের রাজত্বকালে (১৩৬৮–১৬৪৪ খ্রী) প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রাঙ্কণ আকারের দিক দিয়া বিরাট ও পূর্ণ দৃশ্যরূপ লাভ করে এবং অপর দিকে সমৃদ্ধিবহুল জীবন অবলম্বনে অঙ্কিত, রচনাশৈলীর দিক দিয়া অলংকারবহুল চিত্রাবলীর প্রসার হয়।

১৬৬৪ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চিঙ (Ching) বংশীয় সম্রাটদের রাজত্বকালে অঙ্কনের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত প্রথাসিদ্ধ রীতি পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে চীনা চিত্রকরগণ ইওরোপীয় চিত্রকলার প্রবল সংস্পর্শে আসেন এবং উহার বাস্তবানুগ গুরুত্ব প্রতিচিত্রণ ও আলো ছায়ার খেলা তাঁহাদের প্রভাবিত করিতে থাকে।

সমসাময়িক চীনে বড় রকমের এক সমাজবিপ্লব এবং তাহার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহু পূর্ববর্তী মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং চিত্রকলাকেও তাহা প্রভাবিত করিয়াছে। সমকালীন যে সব শিল্পী চীনা চিত্রকলার প্রাণশক্তি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার মহান উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চি পাই-শি (Chi pai-shih) অবশ্য স্মরণীয়।

দ্র Arthur Waley, *An Introduction to the Study of Chinese Painting*, London, 1923, Laurence Binyon, *Painting in the Far East*, London, 1934, George Rowley, *Principles of Chinese Painting*, Princeton, 1947, Laurence Binyon, *The Flight of the Dragon*, London, 1948, Alan H. Brodrick, *An Outline of Chinese Painting*, London, 1949, William Cohn, *Chinese Painting*, London, 1951.

রবীন্দ্র মজুমদার

জাপানী চিত্রকলা প্রাচ্যের শিল্পকলার ক্ষেত্রে জাপানের অবদান অসামান্য ও বিচিত্র। জাপানের কলাশিল্পে বিকশিত হইয়াছে জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বিশিষ্টতা। ইহার মূলে আছে কনফুসীয় দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের প্রভাব। প্রাচীন জাপানের ইয়ামাতোগণ ছিলেন পিতৃপুরুষের পূজা বা সিন্টোবাদে বিশ্বাসী।

আসুকা যুগে (খ্রীষ্টীয় ৫০০-৭০০) কোরিয়া হইতে কতিপয় বৌদ্ধ পুরোহিত কর্তৃক চৈনিকচিত্র পদ্ধতি জাপানে আনীত হয়। কালো কালিতে অথবা একটি রঙে তুলির টানে চিত্রাঙ্কণ সে যুগের চিত্রশিল্পীর বৈশিষ্ট্য ছিল। তুলির এক টানে ছন্দোময় সাবলীল রেখাপাত এই চিত্রের বৈশিষ্ট্য। কালক্রমে জাপানী শিল্পীরা নানা বর্ণের সংযোগে কিছু পরিমাণে বাস্তবানুগ চিত্র রচনা করিলেও প্রকৃতিকে কখনও তাঁহারা হুবহু প্রতিফলিত করেন নাই। জাপানী চিত্র কাগজ ব্যতীত রেশমী কাপড়েও অঙ্কিত হয়, ফলে তুলি-কলম চালনায় স্থৈর্য ও নিশ্চয়তার বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং তুলির এক টানে রেখাঙ্কন ও এক পোঁচে বর্ণপ্রয়োগের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

জাপানী চিত্রপট তিন প্রকারের 'কাকেমোনো' মূলতঃ ধর্মবিষয়ক চিত্র, কাগজ বা সিল্ক এ অঙ্কিত হয় এবং বর্ণাঢ্য মখমলে সংযুক্ত করিয়া কাঠের হাতল বসাইয়া ঝুলানো হয়। 'মাকিমোনো' চিত্র দীর্ঘ ও সমান্তরাল আকারের। ইহা দেওয়ালে না টাঙাইয়া মেঝেতে পর্যায়ক্রমে খুলিয়া দেখানো হয়। মাকিমোনোর বিষয় হইল পার্থিব ও সামাজিক জীবনের ঘটনা। 'গাকু' ফ্রেমে বাঁধাইয়া টাঙানো হয়। নানা রকম স্ক্রীনে, পুথির পাতায়, কাঠ ও প্লাস্টারে এবং হাতপাখাতেও চিত্রকলার এই বিকাশ হইয়াছে।

জাপানের প্রাচীনতম চিত্র নিদর্শন হইল সপ্তম শতকের গোড়াতে কোরীয় পুরোহিত শিল্পীদের রচিত নারার হোরিউজি মন্দিরের ভিত্তিচিত্র। উহার রচনারীতি ঘনিষ্ঠভাবে অজন্তা চিত্রশৈলীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

জাপানের নিজস্ব চিত্ররীতির জন্ম হয় ফুজিওয়ারা যুগে (৯০০-১২০০ খ্রী) এবং পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় কামাকুরা (১২০০-১৪০০ খ্রী) ও আশিকাগা যুগে (১৪০০-১৬০০ খ্রী)। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে সুবিখ্যাত তোসা (Tosa) চিত্ররীতির উদ্ভব হয়। মুরাসাকি শিকিবু নাম্নী একজন রাজপরিচারিকা লিখিত 'গেঞ্জির কাহিনী' নামক গ্রন্থের চিত্রণে এই রীতি আত্মপ্রকাশ করে। কালো রেখাবন্ধনের উপর নানা বর্ণে অঙ্কিত ছবিগুলি অতীব মনোরম। সাধারণতঃ জাগতিক বিষয়ের চিত্রণে তোসারীতির ব্যবহার ছিল। পরবর্তী কালে ধর্মীয় চিত্রেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই যুগসমূহে চিত্রপদ্ধতির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'ইয়ামাতো' অর্থাৎ জাতীয়। ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে জাগতিক বিষয়ের প্রতিকৃতি রচনা এবং ঐতিহাসিক কাহিনীর রূপায়ণও স্থান পাইয়াছিল। আর প্রবর্তিত হইয়াছিল বর্ণবাহুল্য ও জাঁকজমক।

কামাকুরা যুগে 'জেন' বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে চিত্রকলায় কালিতে ও তুলিতে চিত্রাঙ্কণ প্রাধান্য পাইয়াছিল। ফুল, পশু-পক্ষী, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত রূপায়িত হইয়াছিল সূক্ষ্ম মোলায়েম ও চিত্তহারীরূপে।

১৫শ শতকে জাপানের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী শেসশিউ দৃশ্যচিত্র অঙ্কন করিয়াই সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৬শ শতকে জন্ম হয় 'কানো' পদ্ধতির। এই প্রথায় চিত্রাঙ্কণ করিয়া বহু শিল্পী খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যাহ্নলগ্নে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ওগাতা কোরিন নামে জনৈক শ্রেষ্ঠ শিল্পী। চিত্ররচনায় তিনি একটি স্বকীয় বলিষ্ঠ রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

স্বাধীনচেতা শিল্পী গনকুর জন্ম হয় ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি প্রাচীন রীতির সঙ্গে আধুনিক বাস্তবধর্মিতার সমন্বয় করিয়া একটি নব পদ্ধতির সূচনা করিয়াছিলেন। এর পরেই ইওরোপে সর্বাধিক সুপরিচিত জাপানী শিল্পী হোকুসাই-এর নাম উল্লেখ্য। এই শতকেই সাধারণ সৌন্দর্যরচনায় সুনিপুণ উৎমারো এবং দৃশ্যচিত্রের স্রষ্টা হিরোশিগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ইতিমধ্যে সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে প্রচলিত হইয়াছিল বিখ্যাত 'উকিওয়ী' চিত্রপদ্ধতি। কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত এই রীতির শিল্পীরা সামান্য বাস্তববাদী প্রথায় 'চলমান জীবন'কে প্রতিফলিত করিতেন। এই চিত্রকে অবলম্বন করিয়াই অতি জনপ্রিয় 'উকিওয়ী' প্রতিলিপি নির্মাণ-প্রথার জন্ম হইয়াছিল যাহা ইওরোপে জাপানী চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রথম আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই আগ্রহবৃদ্ধির ফলে অবশেষে ইওরোপের শিল্পধারাই জাপানে আসিয়া পৌঁছাইল তোকুগাওয়া যুগের শেষ ভাগে (১৮০০-৫০ খ্রী)। ইটালী হইতে শিল্পশিক্ষক আসিয়া নিযুক্ত হইলেন জাপানের কলাশিক্ষাগারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে (১৮৯৭ খ্রী) 'নিপ্পোঙ বিজিৎসুইঙ' নামক জাতীয় শিল্পসাধনার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত মনীষী ও রূপতাত্ত্বিক কাকুজো ওকাকুরা ('ওকাকুরা, কাকুজো' দ্র)। ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংলা দেশের নব্যচিত্ররীতির সঙ্গেও জাপানী চিত্রশৈলীর ভাববিনিময়ের অবকাশ ঘটিয়াছিল এই শতকের গোড়াতে। জাপান হইতে হিশিদা, তাইকান, কাতসুতা, য়োকোইয়ামা প্রভৃতি শিল্পীরা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে। এই শিল্পীরা ভারতীয় কলাশৈলী ও বিষয়বস্তুর মর্ম উপলব্ধির শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই দেশের

চিত্রকলা

শিল্পীরা আবার তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন জাপানী আঙ্গিকে রেশমী বস্ত্রে চিত্ররচনার প্রথাপদ্ধতি।

দ্র. Okakura, *Ideals of the East*, London, 1903; O. C. Gangoly, 'Indo-Japanese Painting,' *Rupam*, vol. 3, nos, 5, 9-12, Calcutta, 1922.

সুধা বসু

পা র সী ক চি ত্র ক লা: পারস্য বা অধুনা ইরান নামে অভিহিত দেশের চিত্রকলা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। চীনামাটির বাসনে অঙ্কিত বৃক্ষলতা ও জ্যামিতিক নকশা বিশেষভাবে এই দেশেরই শিল্পাদর্শের অনুবর্তী। আলেকসান্দরের আক্রমণের ফলে পারস্যের জাতীয় শিল্প লুপ্ত হইয়া হেলেনিস্টিক শিল্পাদর্শই সমাদৃত হয়। পহ্লব-জাতীয় সাসানিড যুগে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পুস্তক-চিত্রকর মাণির নাম স্মরণীয়। পরবর্তী ইসলাম-পারসীক যুগের পুস্তক-চিত্রণে সাসানিড যুগের অলংকরণ পদ্ধতি বহুল অনুসৃত হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য ইসলামের দখলে আসিলে ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী লিপি ও চিত্র— এই দুই-এর মাধ্যমে শিল্পী নিজ প্রতিভাকে ব্যক্ত করিতে সচেষ্ট হয়। বসরা, কুফা ও পরে বোগদাদ নগরে পুস্তক লিখন ও চিত্রণের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের লিপি ব্যবহৃত হইত। সিজিস্তানের ইব্রাহিম সেগজি (Segzi), উস্তাদ আহ্ওয়াল সেগজি ও তাহাদের শিষ্য ইবন মোকলার নাম উল্লেখযোগ্য। বোগদাদ-শৈলী (সেলজুক তুর্ক আমলে) খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে। পরবর্তী কালের বিখ্যাত পারসীক ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রে এই রীতির প্রভাব উল্লেখযোগ্য। তাহার পরে (১২৫৬-১৩৩৬ খ্রী) ইলখান বা মঙ্গোল যুগে পরিণত চৈনিক শিল্পের সহিত পরিচয়ের ফলে পারসীক শিল্পী যথার্থ সুকুমার অনুকৃতি রচনার সামঞ্জস্য (কম্পোজিশনাল হার্মনি), উপযুক্ত মণ্ডন-নির্বাচন প্রভৃতি শিখিল। তৃতীয় পর্যায়ে তাতার-জাতির অধিনায়ক তৈমুরের অভিযানের ফলে পুস্তক চিত্রণ শিল্পের চরমোৎকর্ষ ঘটে। উত্তম পুস্তকলিখন ও চিত্রণের জন্য হীরাটের খোরাসান নগরে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় ও বিখ্যাত চিত্রকর তব্রিজের মীর আলী উহার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। হীরাট-শৈলীকে পুস্তক চিত্রণের চরমোৎকর্ষ বলা হয়। এই সময় ১৪-১৫শ শতকের চিত্রে পারসীক ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিহ্জাদ (Bihzad খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ)-এর নাম সমধিক পরিচিত। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে বস্তুর রূপকল্পনাপ্রসূত চিত্রগুলির সুসমঞ্জস উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাস ও কাব্যিক সুষমা অতুলনীয়।

পুস্তকচিত্রণের চতুর্থ পর্যায়ে 'সাফাবী' বংশের আমলে (১৬শ শতাব্দী) পুস্তকচিত্রণ ক্রমেই বিশেষ নিয়মবদ্ধ হইতে থাকে ও ব্যক্তিচিত্রণ অঙ্কন প্রচলিত হয়। রাজা ও রাজপরিবারের বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিচিত্র সংবলিত পুস্তক (অ্যালবাম) ও বিভিন্ন কাব্যের দৃশ্য স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে দেখা দিল। এই যুগের ব্যক্তিচিত্রকর রিজা আব্বাসীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পারসীক চিত্র প্রধানতঃ পুস্তকশিল্পের অনুগামীরূপে পরিগণিত। ইহা ধনীর পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিত সাধারণের অনধিগম্য শিল্পকলা। লেখক ও নকশাকারের কাজের সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া পূর্বনির্দিষ্ট বিষয়ের ছবি আঁকিতে হইত এবং তাহার মাপ ও স্থানবিন্যাস পুস্তকের আকারানুযায়ী হইত। একটি পুস্তক প্রস্তুত করিতে একদল সুদক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন হইত। কাগজ, কলম, কালি, বাঁধাই, মলাট, গালার কাজ, লিখন ও চিত্রণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টি দিতে হইত। এই সকল বিভিন্ন শিল্পের সমন্বয়ে পারসীক পুস্তকশিল্প বৈশিষ্ট্যলাভ করিত।

পারসীক চিত্রাঙ্কণ দ্বিমাত্রিক। তাহাতে নারী ও তরুণের পার্থক্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। কোনও ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা প্রযুক্ত হইলেও তাহা পাশ্চাত্ত্য অর্থে স্বাভাবিকতা নহে। বহির্জগতের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য পারসীক শিল্পের লক্ষ্য নহে, তাহার জগৎ স্বপ্ন, সূক্ষ্ম ও সদ্যঃপাতি।

না।। দে

পা শ্চা ত্ত্য চি ত্র ক লা. গ্রীক-রোমান – পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার ইতিহাসের অতীত অনুসরণ করিলে তাহার সূচনা আবিষ্কার করা যাইবে প্রাচীন গ্রীক চিত্রকরদের শিল্পকর্মে। ডোরিয়ান ও আয়োনিয়ান – এই দুই উপজাতি গ্রীসের শহরগুলিতে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে আসিয়া বসবাস করিতে শুরু করে এবং ঐ সময় হইতে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক চিত্রকলা নিত্য-নূতন প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ যুগের বিখ্যাত গ্রীক চিত্রকরদের প্রায় সমস্ত শিল্পকর্মই কালের গর্ভে লুপ্ত; একমাত্র সমসাময়িক সাহিত্যই তাঁহাদের প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

সৌভাগ্যবশতঃ, গ্রীক চিত্রকলার অপর একটি ঢঙ

চিত্রকলা

সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে গ্রীক ভাজ (vase) বা মৃত্তিকানির্মিত আধার বিশেষের গাত্রে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ-খননকালে এই মৃৎপাত্রগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভাজ চিত্রকলার ইতিহাসকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে— প্রথম যুগে খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে দেখা যায়, জ্যামিতিক নকশা অঙ্কনের প্রবণতা, দ্বিতীয় যুগের চিত্রাবলীতে দেব দেবীর মূর্তি ও পৌরাণিক ঘটনার রূপায়ণে নিশ্চল ও সুসমঞ্জস আকারের প্রাধান্য, তৃতীয় পর্বে, অর্থাৎ হেলেনিষ্টিক যুগে, আকারগুলি প্রচণ্ড গতিশীল হইয়া ওঠে এবং দৈনন্দিন জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা, যেমন শিকারকাহিনী, ইত্যাদির রূপায়ণে, গ্রীক চিত্রকলা প্রায় 'জ্যঁর চিত্রাঙ্কণ' (genre painting) বা সাধারণ ও প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার প্রতিফলনের স্তরে আসিয়া পৌঁছায়।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান আক্রমণের পর হইতে গ্রীসের বহু শিল্পী ও শিল্পকর্ম রোমে চলিয়া আসে। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার ও আর্থিক প্রাচুর্যের ছত্র-ছায়ায় যে চিত্রকলা গড়িয়া উঠিল তাহা মূলতঃ গ্রীক প্রাচীর চিত্রকলার অনুকরণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ প্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে উহা অঙ্কিত হইত। পম্পিয়াই (Pompeii) ও হারকুলেনিয়ম (Herculaneum) এর ধ্বংসাবশেষ হইতে দেখা যায় অতিমাত্রায় বাস্তবানুকারী চিত্রাঙ্কণের ও অলংকরণপ্রিয়তার প্রবণতা। গ্রীক চিত্রকলার মৌলিকতার তুলনায় রোমান চিত্রকরদের অঙ্কনশৈলী অনেক পাণ্ডুর এবং রোম সাম্রাজ্যের পরবর্তী যুগের প্রাচুর্যের স্থূলত্বের প্রভাবে এই চিত্রকলা এতজ্জাতীয় সস্তা দৃষ্টিবিভ্রান্তি বা ইলিউশন সৃষ্টির মোহগ্রস্ত ও অবক্ষয়ধর্মী হইয়া পড়িয়াছিল।

অবশ্য রোমান চিত্রকরেরা প্রতিকৃতি অঙ্কনে স্বকীয় মৌলিকত্বের প্রমাণ দিয়াছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের উপনিবেশ মিশরে সংরক্ষিত মৃতদেহ বা মমির শবাধারের কাষ্ঠফলকের উপর অঙ্কিত মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতিতে, আলো ছায়া ও রঙের নিখুঁত পারম্পর্য-পালনের মধ্যে, অনেক কলারসিকের মতে, পরবর্তী যুগের 'ইম্প্রেশনিস্ট' শৈলীর পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়। এই বর্ণবৈচিত্র্যের সূক্ষ্ম তারতম্য প্রাচীন রোমান মোজেয়িক বা রঙিন মর্মরপ্রস্তর, কাচ প্রভৃতির টুকরাসমূহ দ্বারা আস্তরণ-নির্মাণেও পরিস্ফুট। তরল রঙ ব্যবহার না করিয়াও মোজেয়িককে প্রায় রঙিন চিত্রাঙ্কণের সমপর্যায়ে উন্নীত করার এই জাতীয় নিদর্শন বিরল।

মধ্যযুগ— রোমান সভ্যতার অধঃপতনের কালেই যে খ্রীষ্টীয় শিল্পের জন্ম হয়, তাহাতেই মধ্যযুগীয় চিত্রকলার সূচনা। রোমে এবং রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য উপনিবেশে ভূগর্ভস্থিত গুপ্ত আশ্রমের প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত যে চিত্র ক্যাটাকোম্ পেন্টিং নামে পরিচিত, তাহার বিষয় যদিও বাইবেলের ঘটনা, রোমান প্রাচীর চিত্রের অলংকরণপ্রিয়তা এবং গ্রীক ও রোমান দেব-দেবীর মুখাবয়বের অনুকরণ প্রবণতা হইতে তাহা তখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই। আধ্যাত্মিকতার বশবর্তী হইয়া সমতলধর্মী আকার রচনা এবং এক ধরনের কঠোর ও আত্মসংযমী বিশুদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টির প্রবণতাও এই যুগের চিত্রকলায় স্পষ্ট। মনুষ্যদেহের আকারের প্রতি প্রাচীন গ্রীক বা ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পীদের মমত্ববোধও এই সময়ে লুপ্ত হইল।

খ্রীষ্টধর্মের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিত্রকলায় উপরি উক্ত প্রবণতাগুলি আরও শক্তভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে বাইজান্তিয়ামে অনুসৃত শিল্পরীতি অন্যান্য ইটালীয়ান শহরে বিস্তৃতি লাভ করিল। এই শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য— ঋজু ও ভক্তিপূর্ণ নিয়মনিষ্ঠ মূর্তির আড়ষ্ট সম্মুখভাগের চিত্রায়ণ। এইরূপ অনমনীয় শুদ্ধ আকার গঠনের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত মাধ্যম ছিল প্রস্তরের খণ্ডে নির্মিত মোজেয়িক ও গজদন্তের কারুশিল্প। তাই চিত্রকলা ছাড়াও এই দুই জাতীয় শিল্পকর্মের প্রাধান্য এই যুগের বৈশিষ্ট্য।

বাইজেণ্টাইন চিত্রকলায় যীশুখ্রীষ্টকে এইসব চিত্রে প্রায়শঃ রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত সম্রাটরূপে এবং মাতা মেরীকে রানীরূপে গম্ভীর আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রদর্শিত করা হইত। ধর্মীয় মিছিলে যাজকদের নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী যথাযথ স্থানে অবস্থানের ন্যায়, এইসব চিত্রে দেবদূতগণের স্থান নির্দিষ্ট হইত খ্রীষ্টের সিংহাসনের সম্মুখে। এইজাতীয় চিত্রাঙ্কণের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে নির্মিত, রাভেনা শহরের সান ভীটাল গির্জার মোজেয়িক।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে মূর্তিপূজারী ও প্রতিমাপূজা-বিরোধীদের মধ্যে এক দীর্ঘকালব্যাপী বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই যুগে মনুষ্যমূর্তির রূপায়ণের বিরুদ্ধে ব্যাপক মনোভাবের প্রভাবে, চিত্রকলায় জ্যামিতিক নকশা অবলম্বনে অলংকরণের ঝোঁক দেখা যায়। অবশ্য নবম শতকে, আবার মূর্তির চিত্রায়ণের পুনরাবির্ভাব হয়।

খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগীয় চিত্র-কলাকে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে রোমানেস্ক্ এবং তৎপরবর্তী খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত চিত্রকর্ম গথিক নামে পরিচিত। রোমানেস্ক হইতে গথিকে পরিবর্তনের

সহিত মূলতঃ তদানীন্তন স্থাপত্য শিল্পের গঠনশৈলীর ক্রমবিকাশের যোগ রহিয়াছে। রোমানেস্ক্ চিত্রের মূর্তিদের অবিচল কাঠিন্যের পরিবর্তে গথিক চিত্রে দেখা যায় কিছুটা অঙ্গভঙ্গীর স্বাচ্ছন্দ্য, রেখার গতিময়তা এবং অঙ্কিত বসনের ভাঁজের পেলবতা, যদিও গথিক চিত্রে মনুষ্যদেহ দ্বিমাত্রিক সমতলধর্মী রহিয়া গেল।

মোজেয়িক, প্রাচীরচিত্র ও গির্জার রঙিন কাচ ছাড়া চিত্রিত পাণ্ডুলিপি বা পুথিতেও এক ধরনের নকশা অঙ্কিত হইত, যাহা অতি-অলংকরণের জন্য বিখ্যাত।

মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় শিল্প অনেকাংশে প্রতীকধর্মী। শারীর-স্থান সম্বন্ধে উদাসীন দৃষ্টিতে অঙ্কিত কৃশ অসুন্দর মনুষ্যদেহ পবিত্র মানবাত্মার প্রতীক হিসাবেই গৃহীত হইত।

ইহা ব্যতীত, আইকন বা কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র তক্তার উপর অঙ্কিত ধর্মীয় চিত্রও মধ্যযুগের শিল্প-ঐশ্বর্যের বিশেষ সম্পদ।

রেনেসাঁস— বাইজেন্টাইন চিত্ররীতির বৈচিত্র্যহীন ছাঁচ হইতে পাশ্চাত্ত্য চিত্রশিল্পের মুক্তিলাভের প্রথম দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ ইটালীয়ান শিল্পী জোভান্নি চিমাবুয়ে-র (Giovanni Cimabue, ১২৪০-১৩০২ খ্রী) কিয়ৎপরিমাণে মানবিক ও বাস্তবানুগ শিল্পকর্ম।

চিমাবুয়ে-র শিষ্য জোত্তো-র (১২৬৭-১৩৩৭ খ্রী) চিত্র-শিল্পে এই প্রবণতাগুলি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইল। মধ্যযুগীয় চিত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পটভূমি কেবল একটি স্বর্ণবর্ণাত্মক স্বল্প স্থান জুড়িয়া থাকিত। জোত্তোর চিত্র-পটভূমিতে, আধুনিক দৃষ্টিতে যথানুপাতবিশিষ্ট না হইলেও বৃক্ষ, লতাগুল্মাদি, পর্বত ও জন্তু-জানোয়ার নানা রঙের সমাবেশে উপস্থিত। অপর একজন সমসাময়িক শিল্পী দি বুয়োনিন্সেঞ্ঞা দুচ্চো-র (Di Buoninsegna Duccio, আনুমানিক ১২৬০-১৩২০ খ্রী) চিত্রেও স্বাভাবিক গতিময়তা দ্রষ্টব্য, যদিও জোত্তোর ন্যায় উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার নাই। রেনেসাঁসে মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, দৈহিক রূপ ও বুদ্ধির ঐশ্বর্য স্বীকৃতি লাভ করিল এবং এ যুগের শিল্পে তাই কেবল দেব-দেবীর আত্মার প্রকাশ নয়, ব্যক্তি-মানুষের সৌন্দর্যের রূপায়ণ গুরুত্ব পাইল। মধ্যযুগীয় বাস্তব জগৎ পরিহার-প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রেনেসাঁসের শিল্পীরা প্রাকৃতিক জগতের সৌন্দর্যকে তাঁহাদের শিল্পকর্মে স্থান দিলেন। সর্বোপরি, রেনেসাঁসের শিল্পীরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুরাণ ও শিল্পশৈলীর পুনরাবিষ্কার করিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা মানবদেহের আকারের এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতি সযত্ন দৃষ্টিনিক্ষেপে সক্ষম হইলেন।

মধ্যযুগে সমাজে ও শিল্পীদের জীবনে গির্জা তথা আনুষ্ঠানিক ধর্মের যে আধিপত্য ছিল, পঞ্চদশ শতকে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তারের সহিত ইওরোপে ধনতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে আধিপত্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং পূর্বে যে শিল্পী গির্জার প্রাচীরগাত্রে চিত্রাঙ্কণ করিয়া অপ্রকাশিতনামা হইয়া বিস্মৃত হইতে স্বীকৃত হইত, এ যুগে তাহার উত্তরসাধক স্বকৃত শিল্পকর্মের সঙ্গে নিজের নাম চিহ্নিত করিতে উদ্‌গ্রীব। এই শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক আর কেবল খ্রীষ্টীয় পুরোহিত নয়, মেদিচির ন্যায় নব্য ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী।

রেনেসাঁসের এই দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিকরূপে প্রতিফলিত হয় সর্বপ্রথম ১৪২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে মাসাচ্চো-র (Masaccio) ফ্রেস্কোতে। আলো-ছায়ার সমাবেশ, বিষয়বস্তুর অবস্থানে, মনুষ্যদেহের চিত্রায়ণে এবং ভাবাবেগের প্রকাশে তাঁহার ফ্রেস্কোগুলি তদানীন্তন দর্শকদের নিকট এক নূতনত্বের আস্বাদ বহন করিয়া আনে।

পঞ্চদশ শতকে ইটালীর বিভিন্ন শহরে নানা ধনী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পচর্চা উন্নতি লাভ করে। এক এক শহরকেন্দ্রিক শিল্পগোষ্ঠীর ভিন্ন ধরনের অঙ্কনশৈলী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফ্লোরেন্স রেনেসাঁসের প্রারম্ভিক যুগের শিল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল। ইহার প্রধান শিল্পী জোত্তোর শিল্পরীতির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পাডুয়া, বোলোঞ্ঞা ও ভেনিস (Padua, Bologna ও Venice) -এর ন্যায় উত্তর ইটালীয়ান শহরগুলির শিল্পীরা নিসর্গদৃশ্যের চিত্রায়ণে অপূর্ব পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ভেনিসের শিল্পীদের চিত্রে রঙের ব্যবহারের তুলনা সমসাময়িক শিল্পকর্মে দুর্লভ। জোভান্নি বেল্লিনি (Giovanni Bellini, ১৪৩০-১৫১৬ খ্রী), ভিত্তোরে কার্পাচ্চো (Vittore Carpaccio. ১৪৫৫-১৫২৪ খ্রী), জোর্জোনে দা কাস্তেলফ্রাঙ্কো (Giorgione Da Castelfranco, ১৪৭৮-১৫১১ খ্রী) প্রভৃতি ছিলেন ভেনিসের বিখ্যাত শিল্পী।

ক্রমশঃ এই সকল শিল্পীদের চিত্রকর্মে অঙ্কিত চিত্রগুলি বাইবেলের নায়ক-নায়িকা হইলেও, অনেক স্বাভাবিক হইয়া উঠিল ও সাধারণ জীবনের নারী-পুরুষের ন্যায় স্বচ্ছন্দ হইল। পুরাণের ঘটনা বর্ণিত হইলেও, বিষয়বস্তু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বাস্তব জগতের ঘনিষ্ঠ হইয়া দেখা দিল। এই নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম অবশ্য বত্তিচেল্লি (Botticelli)-র চিত্রকর্ম। চিত্রের আবহাওয়ায় তিনি একটি অলৌকিক ভাব আনিতে সচেষ্ট ছিলেন।

হাই রেনেসাঁস (রেনেসাঁসের পরবর্তী যুগ ও সপ্তদশ শতাব্দী)। শারীরস্থান সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান, ত্রিমাত্রিক আকার গঠন এবং পৌরাণিক ঘটনার চিত্রণে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের চূড়ান্ত উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে হাই রেনেসাঁসের যুগে। পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের শুরু লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রী), মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫ ১৫৬৪ খ্রী) ও র‍্যাফেইল (১৪৮৩-১৫২০ খ্রী)— রেনেসাঁসের এই বিখ্যাত ত্রয়ীর শিল্পীজীবনের উন্মেষের যুগ।

চিত্রে আকারের সুষমতা এবং পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকের সহিত তাহাদের সংগতিস্থাপনের প্রশ্ন এ যুগের শিল্পীদের নিকট অঙ্কনশৈলী-সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা ছিল। ইহার সমাধানকল্পে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই নিজস্ব ধারানুযায়ী বিশিষ্ট অঙ্কনরীতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতি উন্নতস্তরে আকারের সুসংগঠনে, বিশেষতঃ মহনীয়তা ও আড়ম্বরপূর্ণ কোনও ঘটনার চিত্রণে, রাফাইল ও মিকেলাঞ্জেলো পারদর্শী। উজ্জ্বল বর্ণের বৃহৎ ঐকতানে এবং আলো-ছায়ার সমন্বয়ে ভেনিসের জোর্জোনে, তিৎসিয়ানো, (Titian, ১৪৭৭ ১৫৭৬ খ্রী) এবং অন্যান্যরা দক্ষ। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের সুঠাম গঠনের প্রভাবে এবং হেলেনিক পুরাণের দেবদেবীর পুনরাবিষ্কারের উৎসাহে অঙ্কিত শিল্পকর্মে আন্দ্রেয়া মান্তেঞা (Andrea Mantegna, ১৪৩১-১৫০৬ খ্রী)-র অবদান অনস্বীকার্য।

এই সময়েই ইওরোপের অপর এক প্রান্তে, চিত্রকলার পক্ষে যুগান্তকারী এক অঙ্কন মাধ্যম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ফান্-এইক্ (van Eyck) ভ্রাতৃদ্বয় ফ্লাণ্ডার্সে পঞ্চদশ শতকের শুরুতে প্রচলিত জল কিংবা গদের পরিবর্তে তৈলের সাহায্যে রঙ ব্যবহারের গোড়াপত্তন করেন। গেন্ট (Ghent)-এর গির্জার পূজাবেদির কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত 'দি অ্যাডোরেশন অফ দি ল্যাম্ব' হুয়েবার্ট ফান-এইক ও য়ান্ ফান-এইক্-এর চিত্রশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কনিষ্ঠ ইয়ানের চিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চরিত্র ও ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে তিনি আধুনিক প্রতিকৃতি-শিল্প এবং ঘরোয়া চিত্রের জনক। ইটালীর ধারা হইতে স্বতন্ত্র এই বাস্তবধর্মী অঙ্কনশৈলীর পরবর্তী ধারক রোখের ফান-দর্ ভাইদেন্ (Roger van der Weyden, ১৪০০-৬৪ খ্রী) এবং মেম্‌লিং (Memling, ১৪৩০-৯৫ খ্রী)।

সমসাময়িক যুগের জার্মান শিল্পে রেখার মাধ্যমে সুস্পষ্ট যথাযথতা প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইটালীয় ও ফ্লেমিশ চিত্রশিল্পের রঙের এবং আলোর জাজ্বল্যমানতা জার্মান চিত্রে দেখা যায় না। আল্‌ব্রেখ্‌ট্ ডুরের (Albrecht Durer, ১৪৭১-১৫২৮ খ্রী) এবং হান্স হল্‌বাইন (Hans Holbein, ১৪৯৭-১৫৪৩ খ্রী) এ যুগের জার্মানীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। রেখাপ্রিয়তার জন্যই কাঠখোদাই এবং অন্য ধাতুর উপর সূক্ষ্ম খোদাই কাজে জার্মান শিল্পীরা কুশলতা অর্জন করিয়াছিলেন। জীবন-মৃত্যুর করাল দর্শন বিষণ্ণাচ্ছন্ন দিকগুলিই ডুরের (যেমন তাহার কাঠখোদাই আপক্যালিপ্‌স) বা হলবাইন (যেমন তাহার ডান্স অফ ডেথ নামধেয় চিত্রাবলী)-কে সর্বাধিক আকৃষ্ট করিত।

ইটালীর রেনেসাঁসের ষোড়শ শতকের প্রথম কয়েক দশকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্রকর্মে যে কঠোর সুষমতা ও সুবিন্যস্তরূপে গঠিত আকারের স্থিতিশীলতা দেখা যায়, কিছুকাল পরে তাহার পরিবর্তে একজাতীয় অতি ভাব-প্রবণতার উদ্দীপ্ত গতিময় অঙ্কনরীতি বা ম্যানারিজ্‌ম দেখিতে পাওয়া গেল। মনুষ্যদেহের অঙ্কনে মাংসপেশীর সংকোচন, প্রতিকৃতিতে মুখভাবের অস্থিরতা এবং নিসর্গদৃশ্যে নদী সমুদ্রের ঢেউয়ের চাঞ্চল্য বা আকাশে বড় বিদ্যুতের প্রকম্পন ইত্যাদির অতিরঞ্জন যাকোপো তিন্তোরেত্তো (Jacopo Tintoretto, ১৫১৮-৯৪ খ্রী) এবং এল গ্রেকো (El Greco, ১৫৪১ ১৬১৪ খ্রী) প্রভৃতির চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ম্যানারিজ্‌ম এর পরবর্তী পর্ব বারোক। এই পর্বে পূর্ববর্তী ধারার উচ্ছলতা কিছু পরিমাণে সুবিন্যস্ত হইল। বারোক চিত্রকলায় আকার স্থির-নিশ্চল নহে, তাহা গতিশীল এবং সদা পরিবর্তনশীল। রেনেসাঁসের প্রারম্ভিক চিত্রে যে পরিবেষ্টনের আবহাওয়া ছিল, তাহার পরিবর্তে অসীম শূন্য, দূরে বিলীয়মান প্রকৃতি হইল বারোক চিত্রের বৈশিষ্ট্য। ম্যানারিজ্‌ম ও বারোকের পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম এবং অনেক সময়ই উভয় ধারার প্রতিনিধির চিত্রে দুইই সহাবস্থান করে বা একে অন্যটিতে বিলীন হইয়া যায়। বারোকের অন্যান্য সমসাময়িক শিল্পী ইটালীর পাওলো ভেরোনেসে (Paolo Veronese, ১৫২৮ ৮৮ খ্রী) স্পেনের ভেলাসকেথ (Velasquez, ১৫৯৯-১৬৬০ খ্রী) এবং ফ্লাণ্ডার্সের রুবেন্‌জ (Rubens, ১৫৭৭-১৬৪০ খ্রী)। আলোছায়া ও রঙের সূক্ষ্ম মাত্রার মাধ্যমে প্রকাশিত ঘনত্ব ইহাদের চিত্রকর্মের বৈশিষ্ট্য।

সপ্তদশ শতকে উপরি উক্ত প্রবণতাগুলির ধারক হল্যাণ্ডে রেমব্রান্ট (Rembrandt, ১৬০৬ ৬৯ খ্রী), স্পেনে মুরীল্যো (Murillo, ১৬১৭-৮২ খ্রী) এবং ইংল্যাণ্ডে হোগার্থ (Hogarth, ১৬৯৭-১৭৬৪ খ্রী)।

ফরাসী বিপ্লব-ভিক্টোরীয় যুগ: বিপ্লবের পূর্বক্ষণে ফরাসী দেশে দুই ধরনের চিত্রাঙ্কণের ধারা প্রচলিত ছিল। প্রথম ধারাটির প্রতিনিধি ঝাঁ আঁতোয়ান ওয়াতো (Jean Antoine Watteau, ১৬৮৪-১৭২১ খ্রী), ঝাঁ বাপ্তিস্ত পাতের (Jean Baptiste Pater, ১৬৯৫-১৭৩৬ খ্রী) ও ফ্রাঁসোয়া বুশে (Francois Boucher, ১৭০৩-৭০ খ্রী), ইহাদের চিত্রকলায় রাজসভা ও পারিষদ প্রভৃতির সাড়ম্বর দিনলিপি পাওয়া যায়। ঝাঁ বাপ্তিস্ত শার্দাঁ (Jean Baptiste Chardin, ১৬৯৯-১৭৭৯ খ্রী) ও ঝাঁ বাপ্তিস্ত গ্রোজ (Jean Baptiste Greuze, ১৭২৫-১৮০৫ খ্রী)-এর চিত্রে অপর ধারাটির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে হোগার্থের শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর ন্যায় সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনধারাই প্রধান।

ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের শিল্পীদের শিল্পকলায় যে প্রবণতা প্রকাশিত হইল তাহা ক্ল্যাসিসিজ্‌ম নামে পরিচিত একজাতীয় নির্মম নিয়মানুগত্য তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুরাকালের রোমান নেতাদের বেশভূষায় এবং তাহাদের কঠিন মুখভাবের অনুকরণে সমসাময়িক যুগের ফরাসী ব্যক্তিদের চিত্রায়ণের রীতিও প্রচলিত হইল। এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ঝাক লুই দাভিদ (Jacques Louis David, ১৭৪৮-১৮২৫ খ্রী)-এর 'ওথ অফ দি হোরেশিয়' (*Oath of the Horatii*), 'নেপোলিয়নের আল্‌প্‌স পর্বতমালা অতিক্রম' প্রভৃতি চিত্র ক্ল্যাসিক্যাল রীতির কঠোর বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বুর্বঁ রাজগোষ্ঠীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দাভিদ নির্বাসিত হন, কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল রীতির ধারকরূপে তাঁহার শিষ্য ঝাঁ ওগ্যুস্ত দমিনিক আঁাগ্রেস (Jean Auguste Dominique Ingres, ১৭৮০-১৮৬৭ খ্রী) প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ক্ল্যাসিক্যাল রীতি অনুযায়ী রেখার শুদ্ধতার উপর আঁাগ্রেস সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করিলেন।

ক্ল্যাসিসিজ্‌মের এই উচ্চ তারে বাঁধা মহাকাব্যীয় প্রবৃত্তি ও আকারের শীতল ভাবসাম্যের বিরুদ্ধে তৎকালীন ফ্রান্সে রোম্যান্টিসিজ্‌মের একটি স্বতন্ত্র ধারাও কার্যকর ছিল। ইহার প্রবর্তক ছিলেন তেয়োদোর জেরিকো (Theodore Gericault, ১৭৯১-১৮২৪ খ্রী) এবং ফের্দিনাঁদ ভিক্তর অ্যাজেন (Ferdinand Victor, Eugene, ১৭৯৮ ১৮৬৩ খ্রী)। ইহাদের চিত্রকর্মে ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসে এবং এক ধরনের রূঢ় বাস্তববাদী ঢঙে অঙ্কিত মানুষ ও জীবজন্তু নূতনরূপে প্রদর্শিত হইল। দলা-ক্রোয়ার বিখ্যাত চিত্র 'লিবার্টি গাইডিং দি পিপ্‌ল' ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পারীর রাস্তায় বিপ্লবের একটি দৃশ্যের বাস্তব রূপায়ণ। রোম্যান্টিক শিল্পীদের চিত্রে ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রের রেখাসর্বস্বতার পরিবর্তে রঙের জাজ্বল্যমানতা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই সময়েই, নিসর্গচিত্র বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাঙ্কণের চর্চা পুনঃপ্রচলিত হয়। ফ্রান্সে কোরো (Corot, ১৭৯৬-১৮৭৫ খ্রী), মিলো (Millet, ১৮১৪-৭৫ খ্রী) প্রভৃতি শিল্পীর চিত্রে গ্রাম্য জীবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সারল্য প্রতিফলিত হইল। ইংল্যাণ্ডে জন কন্‌স্টেব্‌ল (১৭৭৬-১৮৩৭ খ্রী), টমাস গেন্‌স্‌বারো (১৭২৭-৮৮ খ্রী) ও উইলিয়াম টার্নার (১৭৭৫-১৮৫১ খ্রী) প্রভৃতির প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রে রোম্যান্টিসিজ্‌মের ছায়া পাওয়া যায়।

অবশ্য ফ্রান্সের বাহিরে বিপ্লবী রোম্যান্টিসিজ্‌মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্পেনের গোইয়া (Goya, ১৭৪৬-১৮২৮ খ্রী)।

ইংল্যাণ্ডের চিত্রকলার সমসাময়িক যুগে রোম্যান্টিসিজ্‌মের চর্চা বহুলাংশে সাহিত্যসম্পর্কিত ছিল। উইলিয়াম ব্লেক ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আরও কিছু পরে, দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি (১৮২৮-৮২ খ্রী) র নেতৃত্বে প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড-এর শিল্পচর্চায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোম্যান্টিক উপাখ্যানের চিত্রায়ণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই গোষ্ঠীর উইলিয়াম হোলম্যান হান্ট (১৮২৭-১৯১০ খ্রী) এবং এডওয়ার্ড বার্ন জোন্স, (১৮৩৩-৯৮ খ্রী)-এর শিল্পকর্ম রোম্যান্টিক কাব্য বা গল্পের ব্যাখ্যাকর চিত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকলা জগতের বিভিন্ন আন্দোলন. উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিফলন তদানীন্তন শিল্পকলায় বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে দেখা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কিছু কিছু শিল্পী পারিপার্শ্বিক জগতের দরিদ্র মানুষের জীবনের রূপায়ণে সচেতন ভাবে মনোনিবেশ করেন এবং ন্যাচরলিজ্‌ম বা স্বভাববাদ নামে একটি বিশেষ ধারা এই সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মিলো তাঁহার 'দি সোয়ার' বা 'মিনার্স' ইত্যাদি চিত্রে গ্রাম্য কৃষককে নায়করূপে নির্বাচন করিয়াছিলেন। গুস্তাভ কুর্বে (Gustave Courbet, ১৮১৯-৭৭ খ্রী)-র চিত্রকর্মের কৃষক ও মজুরের আপাতদৃষ্ট কুরূপ এবং মধ্যবিত্ত জীবনের স্থূল দৃশ্যাবলী আসলে পূর্ববর্তী যুগের অতিমাত্রায় কল্পনা-প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। অনোরে দোমিয়ে (Honore Daumier, ১৮০৮-৭৯ খ্রী) তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক চিত্রশিল্পের দ্বারা সমসাময়িক যুগের অনৈতিকতা ও দরিদ্র মানুষের দুঃখকষ্ট প্রকাশ করেন।

শিল্পজগতে ইহার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন

'ইম্প্রেশনিজ্‌ম' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রদর্শনী, যাহাতে ক্লোদ মোনে (Claude Monet, ১৮৪০-১৯২৬ খ্রী), ওগ্যুস্ত রনোয়ার (Auguste Renoir, ১৮৪১-১৯১৯ খ্রী), কামিয়্য পিস্‌সারো, (Camille Pissarro, ১৮৩১-১৯০৩ খ্রী), এদ্‌গার দেগা (Edgar Degas, ১৮৩৪-১৯১৭ খ্রী) প্রভৃতির চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। মোনে-অঙ্কিত একটি চিত্র হইতে এই গোষ্ঠীটির নাম 'ইম্প্রেশনিস্ট' রহিয়া গেল।

ব্যক্তিগত অঙ্কনশৈলীর নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীদের চিত্রকর্মে অন্ততঃ কিছুকালব্যাপী কয়েকটি একজাতীয় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের জগতের মুখ্য নায়ক— আলো। দিনের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত একই বস্তুর ছায়াপাত রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় রঙের ব্যবহারে এই শিল্পীরা মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আলো-ছায়ার বিলীয়মানতা দেখাইবার জন্য একটি বস্তুর পার্শ্ববর্তী ছায়ার বিভিন্ন মাত্রাকে কয়েকটি মূল রঙের সন্ধির দ্বারা দেখানো হইত। নিখুঁত বাস্তববাদীদের ন্যায় ইহারা কোনও স্থির বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ ত্রিমাত্রিক চিত্রায়ণে উৎসাহী ছিলেন না, বর্ণনীয় বিষয়ের এক দফা সাধারণ ছাপ প্রস্তুত করিয়া আলো-ছায়ার দ্রুতগামী পরিবর্তন প্রদর্শনের পরীক্ষাতেই ইহারা অধিক মনোযোগী। প্রতিটি ফুল-লতা পাতার নিখুঁত বিবরণের পরিবর্তে একটি বৃক্ষের সমগ্র অবয়বের উপর গুরুত্ব পড়িয়াছিল। দিনের বিভিন্ন সময়ে তাহার বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী রূপের কিছুটা ত্বরিত তুলির প্রলেপে স্পষ্ট চিত্র কর্মেই ইম্প্রেশনিস্টদের সাফল্য।

মূল রঙ ব্যবহার করার ইম্প্রেশনিস্ট প্রবণতার চূড়ান্ত রূপ 'পয়েন্টিলিজ্‌ম'। ইহার প্রতিনিধি ছিলেন ঝর্ঝ্‌ স্যোরা (Georges Seurat, ১৮৫৯-৯১খ্রী), ইনি তুলির টানের পরিবর্তে রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর সমাবেশের দ্বারা চিত্র গঠন করিতেন।

ইম্প্রেশনিজ্‌মের অব্যবহিত পরে নানা ধরনের ঝোঁক বিভিন্ন শিল্পীর চিত্রকর্মে দেখা গেল। পোল সেজান (Paul Cezanne, ১৮৩৯-১৯০৬ খ্রী) বর্ণনীয় বস্তুর ঘনত্ব ও গুরুভারত্ব প্রদর্শনে বেশি উৎসাহী ছিলেন। এইজন্য সেজানের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্য বা প্রতিকৃতি দেখিলে বর্ণিত বিষয়ের অন্তঃস্থ অস্থি, মজ্জা বা কঙ্কালও যেন অনুভব করা যায়। পরবর্তী যুগের পিকাসোর কিউবিজ্‌মের পূর্বসূরী বলা যায় সেজানের অঙ্কনশৈলীকে।

ইম্প্রেশনিজ্‌ম হইতে এক্স্‌প্রেশনিজ্‌মে বা অভিব্যক্তিবাদে পরিবর্তনের প্রতিভূ ভিন্‌সেন্ট ফান্‌-খোখ (Vincent Van Gogh, ১৮৫৩-৯০খ্রী)। নিজস্ব প্রচণ্ড ভাবাবেগ প্রকাশের তাগিদে বিষয়বস্তুর পরিচিত আকারের পরিবর্তন দেখা যায় ফান্‌-খোখের চিত্রে। রঙের অতি ঔজ্জ্বল্যের দ্বারাও ফান্‌-খোখ, তুলুজ লোত্রেক্‌ (Toulouse-Lautrec, ১৮৬৪-১৯০১ খ্রী), জার্মানীতে ব্রুকে (Brücke) গোষ্ঠী (১৯০৫-১৩ খ্রী) এবং নরওয়ের এড্‌ভার্ড মুঙ্খ্‌ (Edvard Munch, ১৮৬৩-১৯৪৪ খ্রী) অভিব্যক্তিবাদের প্রবণতার প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন।

এই প্রবণতার অপর এক প্রতিনিধি বলিয়া পোল গোগ্যা (Paul Gauguin, ১৮৪৮-১৯০৩ খ্রী) কেও বর্ণনা করা যায়। তাহিতির আদিবাসীদিগের জীবনের চিত্রগুলিতে আকারের সরলীকরণ ও রঙের ঔজ্জ্বল্য গোগ্যার শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই আধুনিকতা বা মডার্ন ইজ্‌ম বলা যাইতে পারে। যত প্রকার শিল্পরীতির ক্রমবিকাশ এ শতকের প্রথমার্ধে ঘটিয়াছে, ফোভিজ্‌মই (Fauvism) তাহার মধ্যে সর্বপ্রথম। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মাতিস (Matisse, ১৮৬৯-১৯৫৪ খ্রী) প্রমুখ শিল্পীদের এক প্রদর্শনীতে এই রীতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত অঙ্কনশৈলীর পার্থক্য সত্ত্বেও, ইহারা সকলেই বাদী বিবাদী রঙের নকশা-রচনা, উজ্জ্বল অভিব্যক্তিসূচক রেখা ও বর্ণের ব্যবহার এবং বাস্তবের যথাযথ রূপায়ণের প্রচেষ্টাবর্জনে একমত ছিলেন। আঁরি মাতিস ব্যতীত এই ধারার অন্যান্য প্রতিনিধি— দর্‌ঁয়া (Derain, ১৮৮০-১৯৫৪ খ্রী), রাউল দ্যুফি (Raoul Dufy, ১৮৭৭-১৯৫৩ খ্রী), ভ্লামিঙ্ক (Vlaminck, ১৮৭৬-১৯৫৮খ্রী) প্রভৃতি প্রায় সকলেই মূল রঙগুলির কুশলী সমাবেশের দ্বারা দ্বিমাত্রিক সমতলধর্মী ভূমিকে আলোকিত করিয়া চিত্রাঙ্কণ করিতেন।

কিউবিজ্‌ম এই শতকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জাগতিক আন্দোলন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সূত্রপাত হয়। ঝর্ঝ্‌ ব্রাক (Georges Braque, ১৮৮২ খ্রী-) এবং পাবলো পিকাসো (Pablo Picasso, ১৮৮১ খ্রী-)-কে ইহার স্রষ্টা বলা চলে। কিউবিজ্‌মের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে সেজানের প্রভাবের পর্ব (১৯০৬-০৯ খ্রী), বৈশ্লেষিক পর্ব (১৯১০-১২ খ্রী) এবং সাংশ্লেষিক বা সমন্বয়ী পর্ব (১৯১২-১৪ খ্রী)। সেজানের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ব্রাক্‌ ও পিকাসো আকারের ঘনত্ব প্রকাশের জন্য জ্যামিতিক ঘন ক্ষেত্র ও কোণের শরণাপন্ন হইলেন। গৃহ, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র, ফুলদানি প্রভৃতি যেসব বস্তুকে জ্যামিতিক আকারে রূপান্তরিত করিয়া পরীক্ষা চালানো

চিত্রকলা

যায়, প্রথম দিকে, তাহাই কিউবিস্ট চিত্রকলার বিষয় ছিল।

কিউবিজ্‌মের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত মনুষ্যমূর্তির উপর পরীক্ষা প্রবণতা হইতে। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য পরিচিত আকারের আরও ভাঙন ও রূপান্তর এবং যুগপৎ বিভিন্ন ভঙ্গী দেখাইবার প্রয়াস, একই বস্তুর বিভিন্ন দিক হইতে দৃষ্ট অংশের সমাবেশ, যাহার ফলে মনে হইত বস্তুটি ভাঙিয়া গিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

কিউবিজ্‌মের তৃতীয় ও শেষ পর্বে খুয়ান গ্রিস (Juan Gris, ১৮৮৭-১৯২৭ খ্রী) ও ফের্নাঁ লেজের (Fernand Leger, ১৮৮১-১৯৫৫ খ্রী) এর সক্রিয় অংশগ্রহণ এই ধারার চরিত্র পরিবর্তিত করিল এবং পূর্ববর্তী পর্বে ব্যবহৃত পরিচিত আকারের অংশ বিশেষের সাদৃশ্য রচনার পরিবর্তে, সংকেতপূর্ণ ব্যঞ্জনায় কিছু আকারকে প্রায় স্মারক চিহ্নরূপে ব্যবহারের প্রবর্তন হইল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে কিউবিজ্‌মের প্রবর্তকদের গোষ্ঠী ভাঙিয়া গেল এবং শিল্পীরা নিজস্ব ধারা অনুযায়ী স্ব স্ব শিল্পকার্যে লিপ্ত রহিলেন।

আর একটি স্বল্পকালস্থায়ী আন্দোলন 'ফিউচরিজ্‌ম' (১৯১০ খ্রী)। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চলিষ্ণুতার প্রতিটি পর্যায় প্রদর্শন করিয়া গতিকে রূপদান করা। মার্সেল দ্যুশাঁ (Marcel Duchamp, ১৮৮৭ খ্রী) এবং জাকোমো বাল্লা (Giocomo Balla, ১৮৭৪-১৯৫৮ খ্রী)-এর কতক চিত্র এই ধারার উদাহরণ।

বাস্তব জগতের বা বস্তুর নিখুঁত রূপায়ণের ঝোঁক ত্যাগ করিয়া শিল্পীর অন্তর্নিহিত ভাবের প্রকাশ বা বস্তুর অন্তর্নিহিত কাঠামোর রূপায়ণের যে প্রচেষ্টা গত শতকের শেষ হইতে শুরু হইয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত পর্যায় অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত শিল্প। ইহার প্রধান দুই প্রতিভূ ভাসিলি কান্দিন্‌স্কি (Vasily Kandinsky, ১৮৬৬-১৯৪৪ খ্রী) এবং পীট মণ্ড্রিয়ান (Piet Mondrian, ১৮৭২-১৯৪৪ খ্রী) বিমূর্ত চিত্ররীতির দুই শাখার প্রবর্তক। কান্দিনস্কি বিমূর্ত রেখা ও রঙের ছন্দোবদ্ধ বিন্যাসে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শিল্পীর অজ্ঞাতেই কখনও কখনও এই বিমূর্ত রেখাগুলি ফুলের অর্ধ পরিচিত আভাসে বা সাদৃশ্যে পরিণত হইত। অপর পক্ষে মণ্ড্রিয়ান ও তাঁহার শিষ্যেরা বাস্তব আকৃতি লইয়াই পরীক্ষা শুরু করিলেন। তাঁহারা কোনও বৃক্ষের পরিচিত আকারকে কুরিয়া কুরিয়া তাহার দেহ হইতে সাদৃশ্যের সমস্ত চিহ্ন লোপ করিয়া, বিমূর্তীকরণের শেষ ধাপ, মাত্র কয়েকটি রেখা ও কোণের সমাবেশে আনিয়া উপস্থিত করিতেন।

বিমূর্ত শিল্প বাস্তবকে বর্জন করিবার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই ইওরোপের চিত্রকলায় এক নূতন ধরনের রোম্যান্টিক আন্দোলন শুরু হইল যাহা সুর্‌রিয়ালিজম নামে পরিচিত। ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া জোর্জো দি কিরিকো (Giorgio di Chirico, ১৮৮৮ খ্রী) এবং সাল্‌ভাদর দালি (Salvador Dali, ১৯০৪ খ্রী) যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন তাহাতে বাস্তব জগতের কিছু আকারের নিখুঁত রূপায়ণ থাকিত, কেবল তাহাদের বিস্ময়জনক, অনেক সময় উদ্ভট সান্নিধ্য, অবচেতন মনে এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর বা অনুভবের অনুষঙ্গকে বা কোনও মনোভাবকে প্রতীকরূপে প্রকাশিত করিত। দালির চিত্রে ভাঁজ করা ঘড়ি বা দেরাজ সংবলিত মহিলা বা চায়ের পেয়ালার তলা হইতে একটিমাত্র বিস্ফারিত নয়ন ইত্যাদি চিত্র সুর্‌-রিয়ালিজমের পরিচিত নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গে পোল ক্লে (Paul Klee, ১৮৭৯-১৯৪০ খ্রী) র নাম স্মর্তব্য। মনের খেয়ালের রূপদানের জন্য তাঁহার চিত্রে সূক্ষ্ম আকারগুলি, এবং রেখার সরল গতিময় সমাবেশগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব বিবর্জিত হইয়া প্রায় প্রতীকধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

দ্র J. A. Hammerton, ed., *Universal History of the World*, vols I-II, London 1928; William Orpen, ed., *The Outline of Art*, London, 1933; Paul Zucker, *Styles in Painting*, New York, 1963

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় চিত্রকলা ভারতে প্রস্তরযুগীয় চিত্রকলার অভাব নাই। মধ্যভারতের বিন্ধ্য ও কৈমুর অঞ্চলে, রায়গড়ের সিংহনপুর (Singhanpur) গ্রামের নিকটে, উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলায়, মধ্য প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষত: বেতোয়া ও চম্বল নদীর কণ্টকগুল্মাকীর্ণ উপত্যকায় কয়েক শত চিত্রসমন্বিত গুহাবাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গুহাচিত্রকে মধ্য ও নব্য-প্রস্তরযুগীয় মনে করা হয় এবং ইহাদের সময় খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৪০০ পর্যন্ত ধরা হইয়াছে। এই সকল গুহায় মানুষ ও নানাবিধ পশুর চিত্রই বিশেষ প্রাধান্য লাভ

করিয়াছে, বহু ক্ষেত্রেই তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রের সাহায্যে বাইসন, মহিষ, নীলগাই, হরিণ প্রভৃতি পশু-শিকারে নিরত এক বা একাধিক ব্যক্তির এবং কোনও কোনও স্থানে হস্তী, ব্যাঘ্র ও গণ্ডারের চিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাল পাথরের গুঁড়ায় প্রস্তুত রঙে, কাঁটা গাছের সরু ডালের কলমে চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রগুলি দ্বিমাত্রিক, বাস্তবানুগ ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন।

প্রস্তরযুগীয় চিত্রকলার পাশাপাশি (সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত) ভারতের তাম্র-প্রস্তর যুগের চিত্রকলার কিছু পরিচয় মহেঞ্জো দড়ো, হরপ্পা, লোথাল ও কালিবাঙ্গানে প্রাপ্ত চিত্রিত মৃৎপাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রক হইতে দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথম পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত কালের এই সকল মৃৎপাত্রচিত্রে প্রধানতঃ পশু-পক্ষী, লতা বৃক্ষ এবং বস্ত্রবুননজাত নকশার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সভ্যতারই সীলগুলিতে প্রাপ্ত নকশাগুলির সহিত মৃৎপাত্রচিত্রে প্রাপ্ত নকশার সাদৃশ্য লক্ষণীয় এবং উভয় ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এমন নকশার অন্যতম হইল অশ্বত্থপত্র।

মধ্য ভারতের সরগুজা-র (Surguja) রামগড় পর্বতের যোগীমারা গুহাগাত্রে প্রাপ্ত চিত্রই সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্ররূপ চিহ্নিত হইয়াছে। এই গুহাচিত্রের প্রথম পর্যায়ের চিত্রগুলিকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। গুহাগাত্রের এককেন্দ্রাভিমুখী চিত্রিত প্যানেলগুলিতে এখনও স্থাপত্য, পশু ও মনুষ্যের রূপ এবং এই সকল প্যানেলের প্রান্তে প্রান্তে মৎস্য, মকর ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর অলংকরণ দেখা যায়।

অজন্টার প্রাচীনতম চিত্রিত গুহা দুইটি (গুহা সংখ্যা ৯ ও ১০) প্রায় যোগীমারা গুহার সমকালবর্তী, উহা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের। এই গুহা দুইটির চিত্রাবলীও অবলুপ্তির পথে, তবু ইহারা নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু বৌদ্ধ। এই দুইটি গুহার চিত্র প্রাচীন ভারতের ক্ল্যাসিক চিত্ররীতির প্রথম দুইটি। বর্তুলতা ও ঘনত্ব সৃষ্টিতে, গতিশীলতার সঞ্চারণে এবং ভিত্তির গভীরতা হইতে উপরিভাগে চিত্রিত বস্তুর ক্রমাগ্রসরতায় চিত্রগুলি সমুদ্ভাসিত। সারিবদ্ধভাবে পৃথক পৃথক দৃশ্যে কাহিনী বিবৃত করিয়া এবং নর-নারী, পশু-পক্ষী, লতা-বৃক্ষ ইত্যাদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া ইহারা সমকালীন ভারহুত ও সাঁচীর তোরণ ও রেলিং-এর ভাস্কর্যকর্মগুলিকে স্মরণ করায়।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যার বিশেষ প্রাচীন যুগের নিদর্শন না পাওয়া গেলেও অজন্টা গুহায় অঙ্কিত গুপ্ত যুগের চিত্রগুলি দেখিয়া এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উহা সে যুগের ভাস্কর্যের ন্যায়ই উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।

এগুলির বিষয়বস্তু বৌদ্ধ, তবে মহাযান মতের বলিয়া এ যুগের চিত্রে বুদ্ধদেবের অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের করুণাময় চিত্রটিতে (গুহা নং ১) কিংবা বিপুলকায় বুদ্ধের সমীপবর্তী রাহুল ও যশোধরার চিত্রটিতে (গুহা নং ১৭) মানবিকতার ভাব বিশেষ পরিস্ফুট।

অজন্টার শিল্পী শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে যে মনোযোগে চিত্রিত করিয়াছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণও ঠিক অনুরূপ মনোযোগেই তাহার তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে (গুহা নং ১৭)। এই সকল চিত্রের কোনও স্থানেই নর-নারীর সমাবেশে রুচিহীনতা বা ক্লেদকর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না, বরং সর্বত্রই এক উচ্চাঙ্গের পবিত্রতা দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকন্তু চিত্রগুলিতে শাস্ত্রোক্ত মুদ্রা ও ভঙ্গীর দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

বস্তুর সংস্থাপনায় ও বিন্যাসে পূর্বযুগের ছবির তুলনায় এ যুগের ছবি অধিকতর জটিল ও উন্নত পর্যায়ের। শিল্পী দৃশ্যের পর দৃশ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে অবতারণা করিয়া দর্শকের মনকে অধিকতর আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে।

বাঘ গুহার (গুহা নং ৪ ও ৩) চিত্র শৈলীর বিচারে অজন্টার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রাবলীর সমগোত্রীয়। বাঘ গুহার চিত্র অধিকতর লৌকিক ও বিশেষভাবেই বাস্তবানুগ এবং ইহাতে যে মানবিক শোক তাপ ও দুঃখ আনন্দ চিত্রিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ, যদিও বাঘ গুহাচিত্রের বিষয়ও বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী। কিন্তু ইহাতে অজন্টা-চিত্রাবলীর অনির্বচনীয় রস মাধুর্য নাই। শোক-সন্তপ্ত নারীর ছবিতে (গুহা নং ৭) চিত্রকরের দক্ষতা বিশেষভাবে প্রতিভাত হইয়াছে।

বাদামীর গুহামন্দিরটি (গুহা নং ৩) বৈষ্ণব দেবতাকে উৎসর্গীকৃত (৫৭৮ খ্রী) হইলেও ইহার চিত্রগুলি শৈব-বিষয়ক মনে হয়, ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চিত্র হইল 'শিব পার্বতীর বিবাহ'। রীতি ও আঙ্গিকের বিচারে বাদামীর গুহাচিত্র অজন্টা ও বাঘ গুহাচিত্রের সমগোত্রীয় হইলেও শৈলীর বিচারে উহার স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনীয়। ইহাতে বর্তুলতা ও নমনীয়তা অধিকতর পরিস্ফুট এবং অজন্টার রেখা অপেক্ষা বাদামীর রেখা অধিকতর কমনীয়।

অজন্টা, বাঘ ও বাদামীর 'ক্ল্যাসিক' চিত্ররীতির বিশেষ লক্ষণ হইল: রেখা ও বর্ণের বর্তুলতা সৃষ্টিকারী প্রয়োগ

এবং বহিঃ-রেখার প্রবহমান ও ছন্দোময়, সতেজ ও নমনীয় চরিত্র। এই লক্ষণগুলি প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় চিত্রকলার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ধারাকেই চিহ্নিত করে। সুদূর দক্ষিণে মাদ্রাজ রাজ্যে অবস্থিত সিওনবসাল-এর জৈনমন্দিরের চিত্রাবলীও এই রীতিতে রচিত। গুপ্তপরবর্তী যুগেও দাক্ষিণাত্যের এলোরার কৈলাসমন্দিরে (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক), তিরুমলয়পুরমের বিষ্ণুমন্দিরে (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক), কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরে (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক) এবং তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক) প্রাপ্ত চিত্রাবলীতে এবং আরও সুস্পষ্টরূপে ১০ম হইতে ১৩শ শতকের বাংলা, বিহার ও নেপালের বৌদ্ধ পুথি-চিত্রণে এই ক্ল্যাসিক চিত্রলক্ষণগুলি বিদ্যমান। ভারতীয় চিত্রকলার সামগ্রিক বিকাশে এবং বহির্ভারতে তাহার সম্প্রসারণে এই লক্ষণগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যযুগে এক নূতন ভারতীয় চিত্রাদর্শ দেখা যায়, কোনও কোনও শিল্প-ঐতিহাসিক মনে করেন, মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে ইহা উত্তর হইতে ভারতে আনে। সেজন্য ইহাকে সাধারণভাবে নর্দার্ন বা 'উদীচী' প্রভাব বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

এলোরায় ও সুদূর দক্ষিণে চোল ভাস্কর্য রূপাদর্শে রচিত চিত্রাবলীতে এই শৈলীর স্পষ্ট চিহ্ন প্রাপ্ত হইলেও পশ্চিম ভারতে গুজরাতের জৈন পুথিচিত্রে এই মধ্যযুগীয় চিত্ররীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই পুথিচিত্রণ সাধারণতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ায় সূচিত হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চারি শত বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া প্রথমে তালপাতায় এবং পরে (চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে) কাগজে জৈন ধর্মাধিষ্ঠানসমূহ ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহুল পরিমাণে অঙ্কিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ মুসলমান-আক্রমণের ফলে মালব, রাজপুতানা ও গুজরাতের পূর্বাঞ্চলের চিত্রকরগণ সুদূর কাথিয়াওয়াড়, ইদর, আবু, অচলগড়, ডুংগারপুর প্রভৃতি স্থানে জৈন ও হিন্দু শাসকদের আশ্রয় লাভ করিয়া জৈন ধর্মাধিষ্ঠান-সমূহের তত্ত্বাবধানে পুথিচিত্র রচনায় ব্রতী হন। এই পুথিচিত্রগুলি সর্বদাই ক্ষুদ্রাকারের এবং সেই কারণে মিনিয়েচার চিত্ররূপে পরিচিত। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ: বর্ণ ও রেখা প্রয়োগের চারিত্রিক সমতলতা, রেখার সূচ্যগ্রতা ও তীক্ষ্ণতা, অবয়বসমূহের দ্বিমাত্রিকতা এবং সর্বশেষে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরচনায়, বিশেষতঃ কনুই, হাঁটু, নাক ও চোখের ক্ষেত্রে, কৌণিকতার প্রয়োগ। গুজরাতী পুথিচিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ হইল প্রোফাইল বা সাচীকৃত মুখাবয়বেও দুইটি চক্ষুর উপস্থিতি, অর্থাৎ পশ্চাৎবর্তী চক্ষুটিকেও মুখাবয়বের বাহিরে লইয়া রূপদান করা।

চিত্রভূমিকে কয়েকটি স্তরে, উপর হইতে নীচে কিংবা পাশাপাশি ভাগ করিয়া চিত্রবিন্যাস সংগঠিত করা হয়। মূল ছবির চারিদিকে পশু-পক্ষী, লতা-পাতা, ফুল ও নানাবিধ জ্যামিতিক অলংকরণের সমাবেশ দেখা যায়। এই সকল অলংকরণে এবং মূলচিত্রের বিন্যাসেও একটি বিশিষ্ট রীতি লক্ষণীয়— স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও বাস্তবানুগতার অভাব প্রায় সর্বত্র। গুজরাতী পুথিচিত্রণে অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে স্বর্ণবর্ণের বহুল প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

পুথিচিত্রণপ্রসঙ্গে পূর্ব ভারতের বাংলা, বিহার ও নেপালের বৌদ্ধ পুথিচিত্রগুলির কথাও বলিতে হয়। ১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত পাল সেন যুগের এই সকল চিত্রে ভারতীয় 'ক্ল্যাসিক' রীতির ছন্দোময় রেখা এবং বর্ণ ও রেখার বর্তুলতা সুস্পষ্ট। সেই কারণে, ক্ষুদ্র পটে ইহারা অজন্টা ও বাঘ চিত্রাদর্শের শেষ প্রতিনিধি স্বরূপ।

জৈন পুথিচিত্রণের পর ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে যে দুইটি চিত্ররীতি প্রায় একই কালে বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা হইল মোগল ও রাজপুত রীতি। ইদানীং মোগল পূর্ববর্তী মালবের খিলজী (১৪৩৬-১৫৩. খ্রী), গুজরাতের সুলতান (১৩৯৬-১৫৭২ খ্রী) এবং জৌনপুরের শার্কি (১৩৯৪-১৪৭৯ খ্রী) শাসকদের অধীনে রচিত কিছু চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহার ফলে নূতন একটি চিত্ররীতির (সুলতানী বা আফগানী) অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ষোড়শ শতকের সূচনায় মালবে চিত্রিত ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত নিমৎনামার চিত্রাবলীতে স্পষ্টতঃই স্বতন্ত্র এক চিত্রধারার (যাহা সম্ভবতঃ তৎকালীন পারস্য চিত্রধারারই সমগোত্রীয়) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মোগলদের পূর্বেই পারস্য চিত্ররীতির প্রভাব এ দেশে সূচিত হইয়াছিল— এ সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ অমূলক নহে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পারস্য হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে মোগল সম্রাট হুমায়ুন দুই জন পারসীক শিল্পীকে সঙ্গে লইয়া আসেন (১৫৫৩ খ্রী)। তাঁহার পুত্র আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী) যুগে মোগল চিত্ররীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় কালমাকের ফাররুক, শিরাজীর আব্দুল সামাদ, তাব্রিজের মীর সৈয়দ আলী প্রমুখ শিল্পী আকবরের শিল্পী-সংস্থায় কার্যরত ছিলেন এবং এই সকল শিল্পীর পূর্ববর্তী কর্মস্থানের উল্লেখ হইতে জানা যায় পারস্য চিত্ররীতির কোন্ কোন্ শৈলী মোগল চিত্ররীতির উপর প্রভাব বিস্তার

চিত্রকলা

করিয়াছিল। আকবর বহু গ্রন্থের চিত্রায়ণ করাইয়াছিলেন। বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত একটি প্রতিকৃতি সংগ্রহ (অ্যালবাম) তিনি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। সূচনায় পারস্য রীতি-সঞ্জাত হইলেও কালক্রমে মোগল চিত্ররীতি পারসীক ও ভারতীয় চিত্রকলার সংশ্লেষণজাত চিত্ররীতিরূপে বিকাশ লাভ করে। এই কারণে ইহার ‘ইন্দো-পারসীক’ বিশেষণ যথার্থ। আকবরের অধীনে কর্মরত বহু শিল্পীর মধ্যে বসাওয়ান, দসওয়ান্ত, কেশুদাস প্রমুখ হিন্দু শিল্পীও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-২৭ খ্রী) মোগল রীতির চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। জাহাঙ্গীর চিত্রকলার বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে শিল্পীগণ শিকার, প্রমোদ, বনভোজন প্রভৃতির ছবি এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের আলেখ্য অঙ্কন করেন। বিশেষতঃ, দুষ্প্রাপ্য পশু পক্ষী, লতা-পুষ্প ইত্যাদির প্রকৃতিবাদী চিত্রের প্রতি তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। যে সকল পশু পক্ষী তাহাদের দুষ্প্রাপ্যতা ও বর্ণবাহারের জন্য সম্রাটকে বিশেষ আকৃষ্ট করিত, তাহাদের চিত্র সযত্নে অঙ্কিত ও রক্ষিত হইত। মনসুর ছিলেন এজাতীয় চিত্ররচনায় বিশেষ পারদর্শী। জাহাঙ্গীরের আমলেই মোগল শিল্পীগণ ইওরোপীয় চিত্রকলার সংস্পর্শে আসেন এবং তখন হইতেই মোগল চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত ব্যঞ্জনা ও নিসর্গকে বিষয়বস্তু হিসাবে অধিকতর প্রাধান্যদানের প্রবণতা দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশও এই সময় হইতে মোগল চিত্রে স্পষ্ট। জাহাঙ্গীরের যুগে মোগল চিত্ররীতি সম্রান্ত মোগল ও রাজপুত অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শিল্পীগণ অভিজাত ব্যক্তিদের সম্মুখে বসাইয়া অথবা তাঁহাদের খসড়ার সাহায্যে প্রতিকৃতি রচনা করিয়া বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

শাহ্‌জাহানের আমলে (১৬২৭-৫৮ খ্রী) মোগল স্থাপত্য চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও চিত্রকলা প্রাণশক্তির অভাব ও রীতিবদ্ধতা জনিত দোষে নিখুঁত দক্ষতা এবং বর্ণ তথা বস্তুসমাবেশের বিশেষ আড়ম্বর সত্ত্বেও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। তাঁহার আমলে শোভাযাত্রা, শিকার, বিবাহ ইত্যাদি আড়ম্বরপূর্ণ বিষয়বস্তুর চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সাধু ও সন্তদের প্রতিকৃতিরও আধিক্য ঘটে। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী) মোগল চিত্ররীতির অবনতি দ্রুততর হয় এবং তিনি চিত্রসংস্থা তুলিয়া দিলে (১৬৬৫ খ্রী) শিল্পীগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করে। অযোধ্যার নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতে মোগল চিত্ররীতির একটি বিশেষ কলম বা রীতি গড়িয়া উঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষাবধি মোগল রীতি কোনও ক্রমে টিকিয়া থাকিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পাশ্চাত্য চিত্ররীতির সংঘাতে অবলুপ্ত হয়।

মোগল চিত্রকলার লক্ষণ তাহার বাস্তবানুগতা এবং বিষয় ও রচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এই চিত্রকলায় প্রধানতঃ মোগল শাসক ও তাঁহাদের অমাত্যদের বিলাসজীবন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঘটনার নাটকীয়তা ও প্রতিকৃতির চরিত্রসৃষ্টিতে মোগল শিল্পীর বিশেষ দক্ষতা লক্ষণীয়।

রাজস্থানের মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজাদের দরবারগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় উদয়পুর, চিতোর, বিকানীর, জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুত চিত্ররীতি জন্মলাভ করে। কালক্রমে এই চিত্ররীতি আরও প্রসার লাভ করিয়া বুন্দি, আলোয়ার, জয়শালমীর, কিষণগড়, কোটা এবং মালওয়াতেও ছড়াইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে সূচিত এই চিত্ররীতি অষ্টাদশ শতকের শেষাবধি, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। রাজপুত চিত্রে প্রধানতঃ ভক্তি ও প্রেমমার্গীয় বৈষ্ণব বিষয় অঙ্কিত হইয়াছে। পুরাণ এবং প্রচলিত গাথা হইতে আহৃত উপাদান অবলম্বনে এবং রাজপুত শাসকদের আলেখ্য, যুদ্ধযাত্রা, শিকার, যুদ্ধ ও প্রণয় লইয়াও চিত্র রচিত হইয়াছে। আরও বলা যায় রাজপুত চিত্রের প্রারম্ভে ‘রাগমালা’ চিত্রগুলির যে সমাবেশ দেখা যায় তাহা ইতিহাসে দুর্লভ।

রাজপুত চিত্ররীতির আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল মেবারে ষোড়শ শতকের শেষ দশক হইতে সপ্তদশ শতকের প্রথম দুই দশকে। একক চিত্রপটে বিন্যস্ত, প্রায় সমতল, এই আমলের ছবিগুলির সাদাসিধা রূপ দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় গ্রামীণ শিল্পধারা হইতেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। একটি গাঢ়বর্ণের পশ্চাৎপটের উপর তীক্ষ্ণ-কোণবিশিষ্ট নমনীয় রেখার রূপবন্ধনে এবং প্রতিটি রূপ-বন্ধনে এক একটি একহারা বর্ণের প্রলেপে এই চিত্রগুলি উজ্জ্বল। মেবারের এই সকল চিত্রের প্রধান দুইটি লক্ষণ হইল, রেখা ও বর্ণের দ্বিমাত্রিকতা এবং প্রতিটি বর্ণের স্বীকৃত স্বাতন্ত্র্য। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য পশ্চিম ভারতের জৈন ও সুলতানী চিত্রধারাতেও পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু রেখা ও বর্ণের প্রয়োগে রাজপুত চিত্রকরগণ যে ছন্দোময়তা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহার দ্বারা যে গীতিকবিতার আস্বাদদানে সফল হইয়াছেন, অপর দুই ধারায় তাহা লক্ষ্য করা যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজপুত চিত্ররীতি বিভিন্ন কেন্দ্রে সম্প্রসারিত হইয়া এবং মোগল চিত্ররীতির সংস্পর্শে আসিয়া, অধিকতর সূক্ষ্ম কলাকৌশলের অধিকারী হয়

এবং এই শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। রূপবন্ধে ও রেখাবিন্যাসের ছন্দোময়তায় আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিলেও একালের রাজপুত চিত্ররীতিতে মোগল-প্রভাবজনিত বস্তুসংস্থাপনের নাটকীয়তা ও বাস্তবানুগতা দেখা দেয় এবং ইহার ফলে সামগ্রিকভাবে এই চিত্ররীতির সমৃদ্ধি ঘটে। এই রীতিতে চিত্রের জমিবিভাজন, বর্ণিকা-ভঙ্গ, রেখার ছন্দোময়তা, রূপবন্ধের অর্থবহ ভঙ্গিমা এবং সামগ্রিকভাবে চিত্রতলে বিন্যস্ত বর্ণ ও রেখার সমাবেশ— সব কিছু মিলিয়া যে ভাব উদ্‌বোধিত হয়— তাহা মূলতঃ ব্যঞ্জনধর্মী, মোগল শিল্পীর ন্যায় বিষয়ধর্মী নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল চিত্ররীতির প্রভাবে রাজস্থানী চিত্রে ত্রিমাত্রিকতানির্দেশক পশ্চাৎপট ও নিসর্গ গুরুত্ব লাভ করে এবং রাজপুত শিল্পীগণ প্রতিকৃতিচিত্রণে অধিকতর আকৃষ্ট হন। ইহা ভিন্ন জয়পুর ও যোধপুরের শিল্পীগণ যুদ্ধবিগ্রহ ও শিকার দৃশ্যের অঙ্কনে অধিকতর মনোযোগী হইয়া বিষয়নির্বাচনের দিক দিয়া মোগল রীতির নিকট অধিকতর ঋণী হইয়া পড়ে।

উত্তর ভারতে মোগল ও রাজপুত চিত্ররীতি যখন বিকাশলাভ করিতেছিল, সেই সময়েই দাক্ষিণাত্যে অপর একটি রীতি আত্মপ্রকাশ করে, ইহা বর্তমানে দক্ষিণী চিত্ররীতি নামে পরিচিত। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম হইতেই বিজাপুর, আহ্‌মদনগর ও গোলকোণ্ডায় এবং পরবর্তী কালে হায়দরাবাদে যথাক্রমে আদিলশাহী (১৪৮৯-১৬৮৬ খ্রী), নিজামশাহী (১৪৯-১৬৩৩ খ্রী), কুতুবশাহী (১৫১২-১৬৮৭ খ্রী) বংশের এবং নিজাম উল-মুল্ক আসফজাহ (১৭২৪-৪৮ খ্রী) শাসনাধীনে পারস্য ও তুর্কীস্থানের চিত্রকরদের সাক্ষাৎ প্রভাবে দক্ষিণী চিত্রকলার উদ্ভব ও প্রসার ঘটিয়াছিল। পরে মোগল চিত্ররীতির সংস্পর্শে আসিয়া দক্ষিণী রীতি তাহার দ্বারা প্রভাবিত হয়, অপরপক্ষে, দক্ষিণী রীতির শিল্পীগণও মোগল রীতিকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

নাদির শাহের দিল্লী-লুণ্ঠনের পর মহম্মদ শাহের মোগল রীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু হিন্দু চিত্রকর পাঞ্জাব হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলের ছোট বড় হিন্দু রাজাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার ফলে, এই পাহাড়ী অঞ্চলের চিত্রকলার উন্নতি হয়। মোগল চিত্ররীতি এবং পূর্বপ্রচলিত রাজপুত চিত্ররীতির সংমিশ্রণের ফলে পাহাড়ী চিত্রকলা ভারতীয় মিনিয়েচার চিত্রের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বাসোলী, গুলের ও কাংড়া— এই তিনটি অঞ্চলে পাহাড়ী চিত্রকলার ক্রমবিকাশে তিনটি সুচিহ্নিত পর্যায় সংঘটিত হইয়াছিল। মোগল চিত্ররীতির অনুপ্রবেশের বহুদিন পূর্বেই বাসোলীর রাজা কিরপাল পাল এর আমলে (১৬৭৮-৯৫ খ্রী) ভানুদত্তের রচিত সংস্কৃত কাব্য 'রসমঞ্জরী'র দেবীদাসকৃত চিত্রাবলীতে পাহাড়ী রীতির সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত বাসোলী শৈলীই ছিল পাহাড়ী চিত্ররীতির প্রধান প্রতিনিধি। রাজপুত চিত্ররীতির সবল বস্তুসংস্থাপনা, ঘন রঙের মোটা ব্যবহার এবং চিত্রতলের দ্বিমাত্রিক বিন্যাস— এই চারিত্রিক লক্ষণগুলি বাসোলী চিত্রে পরিস্ফুট। পাহাড়ী চিত্ররীতির দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকেন্দ্র হইল গুলের। গুলেরের রাজা গোবর্ধন সিং (আনুমানিক ১৭৪৪-৭৩ খ্রী)-এর অধীনে বাস্তুহারা মোগল চিত্ররীতির হিন্দু চিত্রকরদের দ্বারা গুলের শৈলী সৃষ্ট হয় এবং প্রায় ৩০ বছর (১৭৪০-৭০ খ্রী) ইহা পাহাড়ী চিত্ররীতির প্রতিনিধিত্ব করে। গুলের শৈলীকে কাংড়া পূর্ব পাহাড়ী চিত্রশৈলী বলিয়াও চিহ্নিত করা হয়, কারণ, কাংড়া শৈলীতে গুলের শৈলীরই চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। মোগল চিত্রের স্বরূপ নিসর্গের ব্যবহার, প্রতিকৃতিচিত্রের আধিক্য, চিত্রতলের বিন্যাস ও বস্তুসংস্থাপনায় ত্রিমাত্রিকতা, নবতর বর্ণ ও সূক্ষ্মতর রেখার সমাবেশ গুলের শৈলীর বৈশিষ্ট্য।

সংসার চাঁদ (১৭৭৫-১৮২৩ খ্রী) ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শক্তিশালী কাংড়া দুর্গটি অধিকার করিয়া পাঞ্জাব হিমালয়ের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতি হইয়া উঠেন এবং তিনি গুলের হইতে শিল্পীগণকে নিজ দরবারে আনিয়া পাহাড়ী চিত্ররীতির শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহার দাক্ষিণ্যে শিল্পীগণ হিন্দু পুরাণ, বিশেষতঃ কৃষ্ণোপাখ্যান অবলম্বনে চিত্রাঙ্কণে রত হন। কি সংখ্যার বিচারে, কি গুণের বিচারে কাংড়া শৈলী কেবল যে পাহাড়ী চিত্ররীতির চরম উৎকর্ষ লাভ করে তাহাই নহে, মোগল চিত্রকলার অবক্ষয়ের পর ভারতীয় শিল্পমনীষাকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারিত করিয়াছে। কাংড়া শৈলী ধর্মশালার ভূমিকম্প পর্যন্ত (১৯০৫ খ্রী) এবং বিচ্ছিন্নভাবে তাহার পরেও প্রচলিত ছিল। বস্তুসংস্থাপনের কৌশলে, বর্ণিকাভঙ্গের আভিজাত্যে এবং রেখার ছন্দোময়তায় যে অসাধারণ রূপমাধুর্য কাংড়া শৈলীতে অনুধাবন করা যায় তাহা রাজপুত ও মোগলচিত্ররীতির সংশ্লেষণের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি-স্বরূপ। রাজপুত চিত্ররীতির পরম্পরায় কাংড়া চিত্রের নারীরূপে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের এক সজীব সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই শৈলীর শিল্পীদের বিশেষ কৃতিত্ব হইল বিষয়বস্তু ব্যতিরেকেও চিত্রতল, রেখা ও বর্ণের বিন্যাসে তাহারা যে পারদর্শিতা ও সংযম দেখাইয়াছেন তাহা

চিত্রকলা

সহজেই যে কোনও চিত্ররসিককে চিত্রগুণের বিচারেও তৃপ্ত করিতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ই. বি. হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নব্য ভারতীয় চিত্রকলার এক নব উন্মেষ ঘটিল। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যদিগের প্রযত্নে নব্য ভারতীয় চিত্রকলা অতি অল্পকালের মধ্যেই, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে, একটি বিশেষ প্রাচ্যাদর্শনির্ভর চিত্ররীতিরূপে গড়িয়া ওঠে এবং দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়। এই চিত্রান্দোলনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ('ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট' দ্র)। অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত এই চিত্ররীতিতে দেশজ, জাপানী ও মোগল তথা পারসীক চিত্ররীতির এক অসাধারণ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন শিল্পীবিশেষের রচনায় পাশ্চাত্ত্য চিত্ররীতির অভিজ্ঞতাও কার্যকর হইয়াছিল। অবনীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ শিল্পীই হইলেন এই চিত্ররীতির শ্রেষ্ঠ সংরক্ষক। হিন্দু দেব-দেবী, পুরাণ, মহাকাব্য এবং সমকালীন সাহিত্যের চিত্রায়ণে ও ভারতের বিভিন্নাঞ্চলের নিসর্গচিত্ররচনায় নব্য ভারতীয় চিত্রকলা সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। বাংলার পটচিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন সচেতন। পরবর্তী কালে নন্দলাল এই লৌকিক ধারাতেও বহু চিত্র আঁকিয়াছিলেন। সামগ্রিকভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশক ধরিয়া নব্য ভারতীয় চিত্রকলা ছিল ভারতীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং এই ধারার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরবর্তী চিত্ররীতিগুলি ইহার ইতিবাচক বা নেতিবাচক স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

এই শতাব্দীর মোটামুটিভাবে ৪র্থ দশকে চিত্রচর্চার নূতনতর আদর্শের আবির্ভাব ঘটে। ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলনে যে সকল শিল্পী এই সময়ে বিশেষ অগ্রণী হন তাঁহারা হইলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নব্য ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম প্রবর্তক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যামিনী রায়। ইঁহারা আপন আপন পথে চিত্রকে তাহার নিজস্ব গুণে, বিষয় হইতে স্বাধীন করিয়া, রেখা ও বর্ণের সংমিশ্রণজাত একটি বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রণী হইলেন। ইহা ভিন্ন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আর্ট রিবেল সেণ্টার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভোলা চট্টোপাধ্যায়, গোবর্ধন আশ, অবনী সেন প্রমুখ শিল্পী পাশ্চাত্ত্য চিত্রাঙ্গিককে দেশীয় ভাবনির্ভর চিত্ররচনায় অগ্রণী হইয়া এ দেশে পাশ্চাত্ত্য রীতিকে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ দেশে পাশ্চাত্ত্য চিত্ররীতির একটি ধারা কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাহাদের সূত্রপাত হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কলিকাতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পী অন্নদাচরণ বাগচীর পরম্পরায় ইহা বিশেষ করিয়া প্রতিকৃতিচিত্রণে গুরুত্ব লাভ করে। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্ত্য রীতিতে নিসর্গ ও প্রতিকৃতির রচনায় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র বসু, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ললিতমোহন সেন প্রমুখ শিল্পী বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। বাংলার বাহিরে পাশ্চাত্ত্য রীতিতে চিত্রাঙ্কণ করিয়া যাঁহারা কৃতী হইয়াছেন, তাহাদের অন্যতম হইলেন অমৃতা শেরগিল। এই মহিলা শিল্পী তাহার চিত্রে পাশ্চাত্ত্য ইম্প্রেশনিজ্‌ম-এর সহিত প্রাচ্যের বিদগ্ধতার সংযোগে কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্র রচনা করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নন্দলাল স্থায়ীভাবে যোগদানের পর হইতে উহা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র রূপে গড়িয়া ওঠে। নন্দলাল এবং তাহার শিষ্যবর্গ হীরাচাঁদ দুগার, বিনায়ক মাসোজী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজ প্রমুখ ভারতীয় নব্য চিত্ররীতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। ইহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, নূতনতর মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন শিল্পী ক্যালকাটা-গ্রুপ নামে একটি শিল্পী-সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার শিল্পীগণ চিত্রকলাকে দেশগত গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া নূতন আন্তর্জাতিকতার পথে, সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। পরবর্তী কালে এই সংস্থার অধিকাংশ শিল্পীই পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করিয়া এদেশে সমকালীন চিত্ররীতির চর্চাকে সম্প্রসারিত করিতে সহায়তা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে অপর এক ধারার শিল্পীগণ বাস্তবধর্মী জীবনাশ্রয়ী চিত্র রচনা করিয়া শিল্পীর মানবিক কর্তব্য পালন করেন। এই ধারার জয়নুল আবেদিন, গোপাল ঘোষ, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী পরবর্তী কালে বিভিন্ন পন্থায় স্বাতন্ত্র্যধর্মী চিত্র-রচনাতেও পারদর্শিতা দেখান। এই প্রসঙ্গে নিসর্গ-চিত্র-রচনায় গোপাল ঘোষের কৃতিত্ব বিশেষরূপে উল্লেখ্য। যুদ্ধের পরবর্তী কালে এদেশের চিত্রচর্চায় আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং তাহার অভিব্যক্তি-স্বরূপ বিমূর্ত চিত্রের অনুশীলন বিশেষতঃ প্রসার লাভ করিয়াছে।

দ্র অসিতকুমার হালদার, ভারতের শিল্প-কথা, কলিকাতা, ১৯৩৯, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, A K Coomaraswamy, *Indian Painting*, London, 1910-12, A. K Coomaraswamy, *Rajput Painting*, Oxford, 1916, E. B. Havell *Indian Sculpture and Painting*, London, 1921; L Binyon and T. W. Arnold, *The Court Painters of the Grand Moguls*, Oxford, 1921, Percy Brown, *Indian Painting under the Great Mughals*, Clarendon Press, 1924, N C. Mehta, *Studies in Indian Painting*, Bombay, 1926, The India Society, *The Bagh Caves*, London, 1927, J C. French, *Himalayan Art*, London, 1931, S Kramrisch, *A Survey of Painting in the Deccan*, London, 1937; Mati Chandra, *Jain Miniature Paintings from Western India*, Ahmedabad, 1949, W.G Archer, *Kangra Painting*, London, 1952, W. G. Archer, *Garheval Painting*, London, 1954; Karl Khandalwala, *Pahari Miniature Painting*, Bombay, 1958, Mati Chandra, *Mewar Painting*, New Delhi, 1958, W. G Archer, *Indian Painting in Bundi and Kotah*, London, 1959, Pramod Chandra, *Bundi Painting*, New Delhi, 1959, Erich Dickinson and Karl Khandalwala, *Kishangarh Painting*, New Delhi, 1959; M S. Randhawa, *Basahli Painting*, New Delhi, 1959, Percy Brown, *Indian Painting*, Calcutta, 1960, Pulinbihari Sen, ed, *Abanindranath Tagore Golden Jubilee Number, The Journal of the Indian Society of Oriental Art*, Calcutta, 1961, Douglas Barret and Basil Gray, *Painting of India*, Geneva, 1963; Mulke Raj Anand, ed, *Lalitkala Contemporary*, vol. I, New Delhi, 1964.

অশোক ভট্টাচার্য

মধ্য এশিয়ার চিত্রকলা মধ্য এশিয়া বলিতে প্রাচ্য-তুর্কীস্তান বা প্রাচীন কাশগরিয়াকে বোঝায়। এই স্থানে মরুবালু খনন করিয়া বহু প্রাচীন নগর ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে এবং উহা হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের স্থান শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি বহু বিষয় জানা যায়।

বামিয়েন: কপিশ (কাফিরিস্তান) হইতে বাহ্লীক যাইবার পথে অবস্থিত নানা জাতীয় বণিকের আবাসস্থল ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ। এই উপত্যকার পূর্ব ও পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতগাত্র কাটিয়া নির্মিত বহু গুহামন্দির দৃষ্ট হয়। এইগুলিতে কিয়ৎপরিমাণে গ্রীক, ইরানী ও কুশান প্রভাব লক্ষিত হইলেও গুহার প্রাচীরচিত্রের বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনাশৈলী প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ('অজন্টা' দ্র)। রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী।

খোটান: প্রাচীন কালে ভারতীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত কেন্দ্র খোটানের চিত্রকলা ভারতীয় প্রভাবাচ্ছন্ন। খোটান হইতে নিয়ার পথে দণ্ডন উলিখের (Dandan Wilik) চিত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত ভারতীয় শৈলীতে অঙ্কিত। রেশমী বস্ত্রের উপর অঙ্কিত বজ্রপাণি মূর্তির শ্মশ্রু ও লম্বাবুট পারসীক। নিয়া হইতে দক্ষিণবাহী পথে মিরানের চিত্রাবলীর প্রথমে গ্রীক ও ভারতীয় প্রভাব ও পরে (৮ম ও ৯ম শতাব্দী) চীনা ও তিব্বতীয় প্রভাব লক্ষিত হয়। কিজিলের (Qizil) গুহামন্দিরগুলিকে মিউচ্ং বা হাজার মন্দির বলা হয়। পারসীক, রোমক ও চীনা প্রভাব থাকিলেও এই চিত্রকলা ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। তুর্ফান, তোয়ুক, চিকগান কোল, বাজাক্লিক প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধশিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতে ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পের অনুপ্রেরণা এবং পারসীক গ্রীক ও রোমক প্রভাব থাকিলেও উহা মুখ্যতঃ চৈনিক।

তুনহুয়াং: মধ্য এশিয়ার দক্ষিণবাহী এবং উত্তরবাহী দুই পথের সংযোগস্থলে চীনের পশ্চিম সীমান্তের প্রান্তে তুন হুয়াং অবস্থিত। কালক্রমে এখানে বৌদ্ধ-সংঘ গড়িয়া ওঠে ও ভারতীয় প্রথানুযায়ী গুহামন্দির ক্ষোদিত হয়। তুন হুয়াং পর্বতগাত্র কঠোর এবং অমসৃণ হওয়ায় উহাতে প্রথমে মাটি ও পরে চকমিশ্রিত কেওলিনের প্রলেপ দিয়া পরে তাহাতে গঁদের সহিত রং মিশাইয়া ছবি আঁকা হইত। এই অঙ্কনরীতিকে ফ্রেস্কো না বলিয়া টেম্পেরা বলাই সংগত। চিত্রাঙ্কণে নানাবিধ রঙের ব্যবহার দেখা যায়। উহার মধ্যে কোনও কোনওটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কালক্রমে বিবর্ণ ও একাকার হইয়া গেলেও তুন হুয়াং-এর শুষ্ক আবহাওয়া এবং সংকীর্ণ গুহাপথ দিয়া অভ্যন্তরে সূর্যালোক বিশেষ প্রবেশ না করার ফলে চিত্রগুলির বর্ণ বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। তুন হুয়াং-এর শিল্পীরা স্টেন্সিল বা পাউন্স-এর সাহায্যে মোটামুটি

চিত্রকলা

আকৃতি আঁকিয়া পরে রঙ ও অন্যান্য সূক্ষ্ম কাজ করিতেন। তুন হুয়াংকে হাজার বুদ্ধের গুহাবলী বলা হয়। ঐ স্থলে প্রায় ৫০০টি গুহামন্দিরের ভিতর ৩০০টি ভাস্কর্য ও চিত্রে শোভিত। ভিতরে সারিবদ্ধ শত শত বুদ্ধমূর্তি চিত্রিত আছে। উহাদের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৩য় হইতে ১০ম শতাব্দী। মুসলমানদের বৌদ্ধ নির্যাতনের ফলে ঐ সকল গুহামন্দির পরিত্যক্ত হয় এবং প্রায় সহস্র বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার পর বর্তমানে ঐগুলি পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মধ্য এশীয় সভ্যতা ও চিত্রকলার নিদর্শন দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। শিল্পের ইতিহাসে তুন হুয়াং-এর গুহাচিত্রগুলি স্মরণীয়। ইহার পরিকল্পনা ও মূর্তিশাস্ত্র ভারতীয় হইলেও চৈনিক ভাবাদর্শ ও চৈনিক শৈলীর প্রাধান্য সহজেই লক্ষিত হয়। প্রথম দিকে বুদ্ধমূর্তিতে চীনা প্রভাবই অধিক থাকিলেও মধ্য পর্যায়ে ভারতীয় প্রভাব অধিকতর। জাতকের গল্প ও বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্রকেও শিল্পীগণ চৈনিকভাবে ভাবিত ও স্বাঙ্গীকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সাধারণতঃ চিত্রগুলিতে বিভিন্ন শৈলীর সংমিশ্রণই লক্ষিত হয়।

তুন হুয়াং এর কয়েকটি চিত্রে ছায়াতপ, রীতি বা কোন এক দিকে প্রক্ষেপের দ্বারা (শেডেড মডেলিং) ত্রিমাত্রিক আভাস দেওয়া হইয়াছে, নিঃসন্দেহে এই শৈলী ভারত বা পশ্চিম হইতে আগত। তৎ যুগে চীনারা এই রীতিতে [illegible] ও অন্যান্য ছবি আঁকিলেও এভাবে ত্রিমাত্রিক আভাস দেওয়া দূর প্রাচ্যের শিল্পাদর্শের বিরোধী বলিয়া পরবর্তী যুগে বুদ্ধমূর্তির চিত্রণ বা [illegible] অপর ক্ষেত্রে এই রীতি পরিত্যক্ত হয়।

দ্র প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ভারত ও মধ্য এশিয়া, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ ৭৯, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, Aurel Stein, *Thousand Buddhas Ancient Buddhist Painting from Cave Temples of Tun Huang*, London, 1921, Basil Gray, *Buddhist Cave Paintings at Tun Huang*, London, 1959.

নীর দে

মধ্য প্রাচ্যের চিত্রকলা এই বিবরণে ইস্‌রাএল, আরব, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের চিত্রকলা আলোচ্য।

ইহুদী-শিল্পকৃতিত্বের সাহিত্য ব্যতীত কোনও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রচলিত মত এই যে, ইহুদী জাতির মাত্রিক জ্ঞান (প্ল্যাস্টিক সেন্স) বা শিল্পবোধের ঐতিহ্য নাই।

আরব. প্রাক্-ইসলাম যুগের অর্ধসভ্য আরবেরও উল্লেখযোগ্য শিল্প-ঐতিহ্য নাই। মহম্মদীয় ধর্মে চিত্রকলা নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হওয়াতে মসজিদগুলিতে মনুষ্য বা পশু-পক্ষীর কোনও প্রতিকৃতি নাই তবে কদাচিৎ প্রাসাদ ও পুস্তকের অলংকরণে মনুষ্যচিত্র দেখা যায়, ইসলামীয় শিল্পের অলংকরণ তরঙ্গ ও জ্যামিতিক নকশা। ইওরোপীয় ভাষায় গৃহীত অ্যারাবেস্ক শব্দটি আরবীয় মণ্ডনশিল্পের সার্থকতাসূচক। ইসলামীয় শিল্প মুখ্যতঃ অনুকরণ, বিজিত দেশের শিল্পীদের দ্বারা রচিত ও ইসলামের প্রয়োজনে পরিবর্তিত।

ব্যাবিলন. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা জগতের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা, আসিরীয়, পারসীক, সৈন্ধব ও ভারতীয় সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। চীনামাটি বা মাটির বাসনে অঙ্কিত নানাবিধ নকশা অতি প্রাচীন কাল হইতেই মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিশেষত্ব। সুমেরে প্রাপ্ত প্রাচীন শিল্পে মনুষ্যচিত্রগুলিতে পার্শ্ব দিক হইতে মুখ (প্রোফাইল) দেখানো হইয়াছে এবং চক্ষু, ভ্রূ ও মুখ প্রায় জুড়িয়া রহিয়াছে, পদদ্বয় সম্পূর্ণভাবে ভূমিগ্র ([illegible]), মূর্তিগুলির উপরার্ধ নগ্ন ও নিম্নার্ধ পশুলোমের গাউন দেওয়া ঘাঘরাসদৃশ পোশাকে পূর্ণ আবৃত। প্রাচীন চিত্রগুলিতে পুরুষমূর্তির কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত। পরবর্তী যুগে মুণ্ডিত মস্তক মূর্তির পরিবর্তে সেমিটিক জাতিসুলভ কুঞ্চিত কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও ক্ষীণতনু (স্লেণ্ডার) চিত্র দেখা যায়। চিত্রগুলি অধিকাংশ ব্যাস্ রিলিফ (bas-relief) ও দেহ সঞ্চালন ও গতিবেগ প্রদর্শনে নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়।

আসিরিয়া. ব্যাবিলনীয় শিল্প ও সভ্যতার উত্তরসাধক আসিরিয়া। আসিরিয়ার শিল্প ব্যাবিলনীয় ও হিটাইট শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও উহাদের স্বাঙ্গীকৃত করিয়া নূতন শিল্পাদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন। আসুর নাসির পালের প্রাসাদে প্রাপ্ত ধর্ম এবং যুদ্ধ বা শিকার বিষয়ক রেখাচিত্রাবলী আসিরীয় চিত্রকলার আদিমতম নিদর্শন। ভারী পোশাকে আবৃত চিত্রণে দেহের সীমারেখার (contour) আভাস পাওয়া যায় না এবং হস্তের স্বাভাবিক অবস্থানকৌশল শিল্পীর তখনও অনায়ত্ত লক্ষিত হইলেও শিল্পীর স্বকীয়তা এবং অলংকরণের ক্ষেত্রে নিপুণতা বোঝা যায়। অন্যান্য-জগতের প্রতীককল্পে অর্ধমানুষ, অর্ধপক্ষী বা অর্ধপশুর মূর্তিরচনে ও চিত্রণে আসিরীয় শিল্পী বিশেষভাবে পটুত্ব দেখাইয়াছেন। সম্রাট শালমানাজার, সারগণ, আসুর, বানিপাল প্রভৃতি রাজগণের প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরে মৃন্ময় বা প্রস্তর-ফলকে স্বীয় কীর্তিসূচক বর্ণসমুজ্জ্বল রিলিফ

চিত্রগুলি তাহাদের শিল্প-কীর্তির নিদর্শন। মৃন্ময় বা প্রস্তর-ফলকের উপর পালিশের হালকা আস্তরণ কৌশলের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। আসিরীয় শিল্পে প্রতিকৃতি-চিত্র দেখা যায় না, কিন্তু যুদ্ধের বা হিংস্রজন্তু শিকারের দৃশ্য-চিত্রণে পটুত্ব দেখা যায়। তাঁহাদের রচিত পশু ও অর্ধপশু-মানব চিত্র প্রাচীন যুগের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হইয়াছে।

দ্র *Cambridge Ancient History*, vol. III, Cambridge, 1925; Hermann Leicht, *History of the World's Art*, London, 1952

[illegible]

মিশরীয় চিত্রকলা. প্রাচীনকালের চিত্রশিল্পে মিশরের স্থান প্রায় শীর্ষদেশে, পণ্ডিতেরা মনে করেন, মিশরীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ, তাহার ধর্মীয় বিশ্বাস-সম্ভূত। মিশরীয়গণ দেহ অবিকৃত থাকা পর্যন্ত মানুষের অনন্তজীবনে বিশ্বাস করিত। যত্নরক্ষিত মৃতদেহের আধারে তাহার যথার্থ প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইত। স্বাভাবিকতা ও নৈপুণ্যে অতি প্রাচীন কালের এই চিত্রণ বিস্ময়কর। ৪র্থ ও ৫ম রাজবংশের কালে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১৩-২৩৪৫) ব্যক্তিচিত্রের (মুখ) অঙ্কনে মিশরীয় শিল্পী বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। সমাধিমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে মৃতব্যক্তির ও তৎকালীন জীবনযাত্রার যে চিত্র ক্ষোদিত ও অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাতে স্বাভাবিকতা ও গতিবেগ থাকিলেও বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রকাশের অভাব লক্ষিত হয়। মিশরীয় শিল্পীর শিল্পকার স্বাভাবিক শিল্পপ্রীতি অপেক্ষা দক্ষতার সূচক।

একাদশ রাজবংশের কালে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২১৩৩-১৯৯১) ব্যক্তিচিত্রের অঙ্কন বিশেষ উন্নতি লাভ করে। দ্বাদশ রাজবংশের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৯১-১৭৮৬) সময়কে মিশরীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ কাল বলা যায়। যথার্থ্য, সৌকুমার্য, সমতা ও অনুপাতে এই যুগের শিল্প অতুলনীয়। এই যুগের সমাধি চিত্রগুলি সৌন্দর্য ও সৌকুমার্যে শ্রেষ্ঠ গ্রীকশিল্পের সহিত তুলনীয়। গতানুগতিকতা সত্ত্বেও ব্যক্তি-চিত্রগুলি শক্তিমত্তার ব্যঞ্জক।

ইহার পরে হিকসস জাতির আক্রমণ ও অন্যান্য কারণে শিল্পের অবনতি ঘটে। অষ্টাদশ রাজবংশের কালে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৬৭-১৩২০) শিল্পে স্বাভাবিকতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফ্যারাও ৩য় আমেনহোটেপ ও তৎপুত্র ইখন্যাটনের কালের চিত্রকলায় এই স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট ইখন্যাটনের ও তাহার পরিবারের বিভিন্ন প্রমোদরত অবস্থার স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইখন্যাটনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার প্রবর্তিত শৈলী লুপ্ত হয় ও শিল্পের অবনতি ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম ও ৭ম শতাব্দীতে সাইট যুগে র‍্যামসিড যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শিল্পী প্রাচীন রাজবংশের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, সহজ ও সুন্দর চিত্রণে এই যুগের অনুকারী শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে। নিয়ম ও শৃঙ্খলা মিশরীয়দের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। অভ্যস্ত দক্ষতায় মিশরীয় শিল্পী অতুলনীয়, শিল্পবোধ কদাচিৎ তাহার সহজাত না হইলেও অভ্যাস ও পরিশ্রমের দ্বারা সে তাহাকে স্বাঙ্গীকৃত করিয়াছিল, সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের চিত্রকলার উপর মিশরীয় প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

দ্র *Cambridge Ancient History*, vol III, Cambridge 1925, H. R. Holland Hall, *Ancient History of the Near East*, London, 1927.

[illegible]

চিত্রকল্পবাদ ইমেজিজ্‌ম। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ইঙ্গ মার্কিন কবিতায় এক আলোড়নকারী আন্দোলন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের ফরাসী প্রতীকী (সিম্বলিস্ট) কবিদের নিকট এবং প্রাচীন জাপানী কবিতা 'হাইকু' হইতে চিত্রকল্পবাদী কবিগণ প্রধানত আদর্শ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। চিত্রকল্পবাদীদের লক্ষ্য সার্থক চিত্রকল্পের উপস্থাপন, বিষয়গত ও বিষয়ীগত ব্যাপারের স্পষ্ট, বিশদ ও সমুজ্জ্বল রূপায়ণ।

উক্ত মতবাদের প্রধান গুরু মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ড ইহার লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, চিত্রকল্প তাহাই যাহা মুহূর্তের মধ্যে মনন ও ভাবের একটি প্রক্রিয়া পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করে। চিত্রকল্পবাদী বিশ্বাস করেন যে, রচনারীতির বিশেষ ধর্ম রক্ষাই কবিতার চূড়ান্ত লক্ষ্য। কবিতায় কথ্য ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, কবি ছন্দের অন্তর্নিহিত দাবি ব্যতীত অন্য কিছুই মানিবেন না (সুতরাং অন্ত্যমিল পরিহার), সর্বপ্রকার ছন্দ ও কাব্যরীতির অনুশীলন করিবেন ও তাহাতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করিবেন এবং রচনায় যাথাতথ্যের চূড়ান্ত মূল্য দিবেন। প্রচলিত কাব্যপ্রথা, নিরর্থক বাক্যধারা ও অলংকারাদির বর্জন, ভাবালু প্রলাপ ও কাব্যিকতার পরিহার এবং সর্বোপরি ঋজু, কঠিন, সত্য ও মননধর্মী কবিতারচনার আদর্শ গ্রহণ করিলে রোমান্টিকতার নেশা হইতে আধুনিক কবিগণ মুক্ত হইতে পারিবেন, ইহাই চিত্রকল্পবাদীর বিশ্বাস।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে চিত্রকল্পবাদী কবিদের অভ্যুদয় ঘটে। পরবর্তী কালে মার্কিন দেশেও ইহার প্রভাব

বিস্তৃত হয়। টি. ই. হিউম, এফ. এস. ফ্লিণ্ট, জন গুল্ড ফ্লেচার, হিল্ডা ডুলিটল, রিচার্ড অল্ডিংটন, এমি লোয়েল প্রভৃতি কবি এবং সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত চিত্রকল্পবাদী এজরা পাউণ্ড বর্তমান শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এই আন্দোলনকে সজীব রাখেন। ডব্লিউ বি. য়েটস্ কিছুকাল চিত্রকল্পবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। টি. এস. এলিয়ট কবিতারচনার প্রথম পাঠ লন এজরা পাউণ্ডের নিকট, তাঁহার প্রথম জীবনের রচনায় চিত্রকল্পবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে চিত্রকল্পবাদের প্রভাব বাঙালী কবিদের উপর পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে-র কবিতায় ইহার প্রভাব সহজলভ্য।

দ্র Ezra Pound, ed., *Des Imagistes : An Anthology of the Imagists*, New York & London, 1914; Glenn Hughes, *Imagism & Imagists*, London, 1931

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

চিত্রকূট ২৫°১´ উত্তর ও ৮০°৫৬´ পূর্ব। উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায় অবস্থিত পাহাড় ও তীর্থস্থান। মানিকপুর ঝাঁসি রেললাইনে করবী স্টেশন হইতে ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরে অবস্থিত সীতাপুর গ্রামই প্রাচীন চিত্রকূট। কামতানাথ, হনুমানধারা, রামঘাট, রাঘবপ্রয়াগ, জানকীকুণ্ড, রামশয্যা ইত্যাদি চিত্রকূট-পরিক্রমার প্রায় সব স্থানই রামচন্দ্রের স্মৃতিপূত।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

চিত্রগুপ্ত ধর্মরাজ যমের লেখক। তাঁহার বিচারণা সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত। পরলোকগত জীবের কৃতকর্মের আমূল বিচার করিয়া তিনি যে শুভাশুভ ফল নিরূপণ করেন, ধর্মরাজ তদনুসারে নরক বা স্বর্গভোগের বিধান দিয়া থাকেন (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ৩ অধ্যায়)। কায়স্থকুলপঞ্জীর মতে চিত্রগুপ্ত আদি কায়স্থ। আদি সর্গে ব্রহ্মার 'সর্বকায়' হইতে প্রাণীদের সদসৎ কর্ম নিরূপণের জন্য লেখনী ও মসীহস্ত যে 'অতীন্দ্রিয়জ্ঞানী' পুরুষের উদ্ভব হয়, তিনিই চিত্রগুপ্ত। তিনি যমসভায় জীবের ন্যায়-অন্যায় বিচারে নিযুক্ত। তাঁহারই বংশাবলী বিভিন্ন কায়স্থকুলে বিভক্ত। ব্রহ্মকায় হইতে জন্মহেতু ইঁহারা কায়স্থ। চিত্রগুপ্ত জীবের সকল কর্মই লিপিবদ্ধ করেন বলিয়া বা লাভ খুঁটিনাটি হিসাব বুঝাইতে 'চিত্রগুপ্তের খাতা' কথাটি প্রচলিত হইয়াছে।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

চিত্রনাট্য যে লিখিত নকশাটি অনুসরণ করিয়া একটি চলচ্চিত্র রচিত হয়, তাহাকে বলা হয় চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের ভিত্তিস্বরূপ, সুতরাং চিত্রনাট্যের পরিকল্পনা হইতেই চিত্রনির্মাণ কার্যের শুরু।

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে চিত্রনাট্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল না। কথিত আছে, চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ মার্কিন পরিচালক ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ বিনা চিত্রনাট্যেই তাহার বিশাল চিত্রসৃষ্টি 'দি বার্থ অফ এ নেশন' রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু নির্বাক যুগে যাহা সম্ভব ছিল, সবাক যুগে তাহা প্রায় অসম্ভব, কারণ নির্বাক চলচ্চিত্রের তুলনায় সবাক চলচ্চিত্রের গঠনপ্রণালী অনেক বেশি জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ। নকশা ব্যতীত এই গঠনপ্রণালীতে শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব নয় এবং শৃঙ্খলার অভাবে যুগপৎ শিল্পের হানি ও অর্থের অপচয় অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই সবাক যুগে চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

চিত্রনাট্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে: ১. নির্বাচিত কাহিনীকে কিভাবে অংশে ও দৃশ্যে ভাগ করা হইবে তাহার ইঙ্গিত ২. দৃশ্যগুলি কিভাবে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত ক্যামেরার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে গৃহীত হইবে তাহার ইঙ্গিত ৩. দৃশ্যপটের বর্ণনা ৪. পাত্রপাত্রীর ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা ৫. পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ৬. নেপথ্যে ব্যবহার্য বিশেষ বিশেষ ধ্বনি ও সংগীতের ইঙ্গিত ৭. দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে যাইবার বিশেষ প্রণালীর ইঙ্গিত।

চিত্রনাট্যের সহিত নাটকের আপাতসাদৃশ্য লক্ষণীয়। মূল ভেদ এই যে, নাটকের রস বহুলাংশে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব, কারণ তাহা প্রধানতঃ সংলাপেই পরিস্ফুট। কিন্তু চলচ্চিত্রের রস মূলতঃ তাহার চিত্রভাষায় নিহিত। সংগীতের মতই চলচ্চিত্রের রস অন্য কোনও ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র-উদ্ভাবন ও সংলাপ-রচনা এই তিনেরই প্রয়োজনহেতু চিত্রনাট্যরচনার দায়িত্ব অনেক সময়েই সাহিত্যিক বা নাট্যকারের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রকৃত উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহারই উপর যিনি এই সাহিত্যভাষাকে চিত্রভাষায় অনূদিত করেন— অর্থাৎ চিত্রপরিচালক।

বর্তমান যুগে চলচ্চিত্রের সাহিত্যনির্ভরতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। বিশ্বের অধিকাংশ কৃতী পরিচালক হয় স্বয়ং চিত্রনাট্য রচনা করিতেছেন, না হয় উক্ত রচনার কার্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতেছেন। ফলে চলচ্চিত্র-

শিল্প ক্রমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিভাত হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে।

সত্যজিৎ রায়

চিত্রল ৩৫°৫১′ উত্তর ও ৭১°৫০′ পূর্ব। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম পাকিস্তানের শহর (পূর্বতন দেশীয় রাজ্য)। চিত্রল নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর পূর্বে চিত্রল রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমে আফগানিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্বে ডির রাজ্য ও পূর্বে কাশ্মীরের গিল্‌গিট এজেন্সি অবস্থিত। ইহার আয়তন ১৪৮২৮ বর্গ কিলোমিটার (৫৭২৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী ১০৫৭২৯ জন। এই স্থানে টিরিচ নদী প্রায় ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল) পথ অতিক্রম করিয়া টুরিখো নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উভয়ে আরও ৬৪ কিলোমিটার (৪০ মাইল) অতিক্রম করিয়া মাসটুজ শহরের দক্ষিণে খো নদীর সহিত মিলিয়াছে।

চিত্রলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে গঠিত বহু বিশিষ্ট শিলারাশি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রাচীন কোয়ার্ট্‌জাইট, লোহিত বেলে পাথর ও কনগ্লোমারেট স্তরের উপর অবস্থিত চুনা পাথরের গভীর স্তর উল্লেখযোগ্য। চিত্রলের নিকট পার্বত্য অঞ্চলে একটি বিশাল চ্যুতির সৃষ্টি হওয়ায় এখানে শিলাস্তরে নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চিত্রল নদীর সমভূমি অঞ্চলে স্থানে স্থানে প্রবালও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই স্থানের উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্য হইতেছে গম, যব, ভুট্টা ও ধান এবং প্রধান খনিজ সম্পদ লৌহ, তাম্র ইত্যাদি। থাসকর-এর কতিপয় গ্রামের অধিবাসীগণের অধিকাংশই খনির কাযে নিযুক্ত। কাপাস তুলার কার্পেট এই স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিত্রলে নির্মিত তরবারির বাঁট বিখ্যাত ও নিকটবর্তী উপত্যকায় ইহার চাহিদাও যথেষ্ট আছে।

চিত্রলের দাস ব্যবসায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। চিত্রল রাজ্য ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে নবম খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মের যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাহা মাসটুজ শহরের নিকটে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায়।

চিত্রল সামরিক দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথগুলি আয়ত্তাধীনে রাখার জন্য ও নিরাপত্তার জন্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গিল্‌গিট ব্রিটিশ এজেন্সি গঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-বিভাগের পর ইহা পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. X, Oxford, 1908; O. H K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1961.

প্রণীতা ভট্টাচার্য

চিত্রলিপি সুচারু লিপি রচনাশিল্পকে চিত্রলিপি (ক্যালি-গ্রাফি) বলা হয়।

গ্রীস, ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, আরব, ইরান, চীন, জাপান ইত্যাদি ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় ভারতেও মধ্যযুগে এই শিল্পের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান আমলে ভারতে ফার্সী ভাষার প্রচলন শুরু হয় এবং এই ফার্সী বা আরবী লিপিকে আশ্রয় করিয়া এখানে চিত্রলিপির বিকাশ হইয়াছিল। দিল্লীর সুলতানগণের সময়ে শুরু হইলেও সৌন্দর্যপ্রিয় মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে এই শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। ভারত, ইরান, আরব, চীন প্রভৃতি দেশে ক্যালিগ্রাফিকে চিত্রশিল্প অপেক্ষা উন্নত প্রকারের কলা বলিয়া গণ্য করা হইত এবং খুশনবীশগণ (ক্যালিগ্রাফিস্ট) চিত্রকরগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও উপহারে ভূষিত হইতেন।

মধ্যযুগে ইরান, আরব, তুর্কীস্তান ও ভারতে কুফী, মকালি, থুলুস, তৌকী, মুহক্কক, নসখ, রইহান, রিকা, তা'লিক, নস্তালিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। কোন্ লিপিতে কি পরিমাণ বৃত্তাকার, বক্র ও সরল রেখা বর্তমান, তদনুসারে ঐ প্রকারভেদ নির্দিষ্ট হইত। যেমন, কুফীতে এক ষষ্ঠাংশ বক্র রেখা এবং পঞ্চ ষষ্ঠাংশ সরল রেখা থাকিত, কিন্তু মকালি লিপিতে কোনও বক্র রেখা নাই। আবার নস্তালিক সম্পূর্ণভাবে বৃত্তাকার রেখা-সমন্বিত। ভারতে নস্তালিকের প্রচলন ছিল সর্বাধিক।

চিত্রলিপি ভারতে নানাভাবে ব্যবহৃত হইত। অসংখ্য মুদ্রার উপর চমৎকার অক্ষরে লিখিত বাদশাহের নাম, রাজত্বকাল, স্থান ইত্যাদি চিত্রলিপির প্রভাবের নিদর্শন। চিত্র, রাজকীয় সীল, প্রাসাদ, সমাধি সৌধ, মসজিদ প্রভৃতির সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য কোরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের বয়েত এই সমস্ত শিল্পকর্মের উপর এমন নৈপুণ্যের সহিত লিখিত বা উৎকীর্ণ হইত যে লেখাগুলিকে সাধারণ অলংকরণের অঙ্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ভারতীয় খুশনবীশগণের সৌন্দর্যবোধ ও মাত্রাজ্ঞান ছিল অসামান্য। প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদিতে উপর হইতে নীচে আনুপাতিক ক্ষুদ্রাকারে উৎকীর্ণ তাঁহাদের লেখা দর্শকের চক্ষুতে এখনও সমান,

সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। দিল্লীর কুওয়াৎ-উল ইসলাম মসজিদ ও সেকেন্দ্রার সমাধি সৌধ ইত্যাদির উপর অলংকরণরূপে চিত্রলিপির প্রয়োগ দক্ষতা আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। 'কিতাব' অর্থাৎ সুন্দর হস্তাক্ষরে শোভিত পুস্তক এই শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন।

দ্র দর্শক, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, V A. Smith, *A History of Fine Art in India and Ceylon*, Oxford, 1911.

কুমুদরঞ্জন দাস

চিত্রাঙ্গদা দ্রৌপদীর বিবাহের শর্তভঙ্গ করিয়া অর্জুন যখন বনবাসে যান তখন তিনি মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখেন ও রাজা চিত্রবাহনের নিকটে তাঁহাকে বিবাহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু চিত্রবাহন তাঁহার পূর্বপুরুষ অপুত্রক প্রভংকরের তপস্যায় তুষ্ট শিবের বরে এই বংশের প্রত্যেক রাজার একটি মাত্র সন্তানলাভের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার একমাত্র সন্তান চিত্রাঙ্গদা। বিবাহের শর্ত হইল চিত্রাঙ্গদার পুত্র পুত্রিকাপুত্র হইয়াও মণিপুর রাজ্যের কুলকর রাজা হইবে। অর্জুন সম্মত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়া তিন বৎসর মণিপুরে বাস করেন। চিত্রাঙ্গদার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জাত হয়। পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব মণিপুরে গেলে নাগকন্যা উলূপীর প্রেরণায় বভ্রুবাহন যুদ্ধে অর্জুনকে মূর্ছিত করেন। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া বহু-বিলাপ ও প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলে উলূপী মণিপ্রভাবে অর্জুনের চৈতন্য সম্পাদন করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে চিত্রাঙ্গদা হস্তিনাপুরে যান ও অর্জুনের সঙ্গে বাস করেন (মহাভারত আদি পর্ব ২০৭ অধ্যায় ও আশ্বমেধিক পর্ব ৭৮-৮২ অধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নামে এ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যনাট্য রচনা করিয়াছেন।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

চিনি আখ, বীট, মেপ্‌ল প্রভৃতির রস হইতে নিষ্কাশিত কার্বোহাইড্রেট-প্রধান খাদ্য। ইহা জলে দ্রবণীয়, কেলাসিত ও সুমিষ্ট পদার্থ। মিষ্টত্ব গ্লুকোজের প্রায় ১০ গুণ। আখ বা বীট হইতে উৎপন্ন শাদা চিনিতে শতকরা ৯৯ ভাগেরও অধিক কার্বোহাইড্রেট, প্রায় ০·৫ ভাগ জল এবং অতি অল্প পরিমাণে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ঘটিত অজৈব লবণ থাকে। লাল চিনিতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ শতকরা ৯৫·৫ ভাগ, ইহাতে শাদা চিনির তুলনায় কিছু অধিক অজৈব লবণ থাকে, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি উপাদান এ সকল অজৈব লবণে বর্তমান। মেপ্‌ল হইতে উৎপন্ন চিনিতে কার্বোহাইড্রেট শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ, জল ৭·৫ ভাগ এবং অজৈব লবণ প্রায় ১ ভাগ। চিনিতে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও ভিটামিনের সম্পূর্ণ অভাব আছে। আখ বীট বা মেপ্‌ল হইতে উৎপন্ন চিনিতে কার্বোহাইড্রেটের প্রায় সবটুকুই গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সমন্বয়ে গঠিত সুক্রোজ বা ইক্ষুশর্করা। সুক্রোজের গলনাঙ্ক ১৬০° সেন্টিগ্রেড, প্রায় ২০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে চিনি হইতে জল বাহির হইয়া যায় ও সুক্রোজ হইতে বাদামি বর্ণ অনিয়তাকার সুগন্ধি পদার্থ ক্যারামেল এর উদ্ভব ঘটে। খমিরের সাহায্যে সহজেই চিনির সন্ধান (ফার্মেন্টেশন) ঘটিয়া অ্যাল্‌কোহল উৎপন্ন হইতে পারে। অন্ত্রে চিনির পরিপাকের ফলে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।

চিনিতে অতি সামান্য জল ও যথেষ্ট খাদ্যবস্তু থাকায় ইহাকে ঘনীভূত খাদ্য বলা যায়, আখ বা বীট হইতে উৎপন্ন ১০০ গ্রাম শাদা চিনি হইতে প্রায় ৩৮৫ কিলো-ক্যালরি ও ১০০ গ্রাম লাল চিনি হইতে প্রায় ৩৭০ কিলো-ক্যালরি এবং মেপ্‌ল হইতে উৎপন্ন ১০০ গ্রাম চিনি হইতে প্রায় ৩৫০ কিলোক্যালরি শক্তি দেহে জন্মাইয়া থাকে। মধুমেহ ও মেদবৃদ্ধিতে চিনি খাওয়া কমাইতে হয়।

অধিক চিনি খাইলে মুখে ভুক্তাবশিষ্ট চিনির প্রভাবে দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা ও ক্রিয়া বাড়িয়া যায় এবং এ সকল ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন অ্যাসিড ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে দন্তক্ষয় (দাঁতে পোকা ধরা) রোগ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যে চিনির পরিমাণ কমাইয়া দন্তক্ষয় নিবারণ করা সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন ইওরোপের বিভিন্ন দেশে চিনির পরিবর্তে অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট প্রধান খাদ্যই অধিক খাওয়া হইত, সে সময় ঐ সকল দেশে শিশুদের দন্তক্ষয় রোগ যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছিল।

নিজস্ব খাদ্যমূল্য ছাড়া খাদ্যের মিষ্টত্ব ও স্বাদ বর্ধনের জন্যও চিনি ব্যবহৃত হয়। ইহার গাঢ় রসে দ্রব্য সংরক্ষণের পদ্ধতি বহুকাল হইতেই প্রচলিত। কেক, পেস্ট্রি প্রভৃতি সেঁকিবার সময় চিনি ঐ সকল খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ জল ধরিয়া রাখিতেও সাহায্য করে। 'আখ' 'কার্বোহাইড্রেট' দ্র।

দ্র N Deerr, *The History of Sugar*, vols I-II, London, 1949-50, J Haldi, W Wynn, J. H. Shaw & R F. Sognnaes, 'The relative cariogenicity of sucrose when ingested in the solid form and in solution by the albino rat', *Journal of Nutrition*, vol 49, 1953; J D. King,

M Mellanby, H. H Stones & H. N. Green, *The Effect of Sugar Supplements on Dental Caries in Children*, London, 1955

দেবজ্যোতি দাশ

চিনিশিল্প চিনির মিষ্ট আস্বাদ নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের কাছেও লোভনীয় ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মানুষের আহার্যতালিকায় চিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নাই। আহার্য চিনি মুখ্যতঃ দুই প্রকার ১. ইক্ষুজ চিনি ২ বীট চিনি। ইক্ষুজ চিনি প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞাত। বীট চিনির উৎপাদন শুরু হয় ইওরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং নেপোলিয়নের উদ্যমে প্রসার লাভ করে। এশিয়া, আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও লাতিন আমেরিকায় ইক্ষুজ চিনি প্রস্তুত হয়। বীট চিনি প্রস্তুত হয় প্রধানতঃ ইওরোপ ও আমেরিকায়। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে বীট চিনির উৎপাদন ইক্ষুজ চিনির উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ।

ভারতে আখের গুড় হইতে চিনির উৎপাদন সুদূর অতীত কাল হইতেই প্রচলিত আছে। ভারতই চিনির জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে চিনির বহুতর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্লিনি ও সেনেকা ভারতীয় চিনির প্রশংসা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন সম্রাট তাই ৎসাং ভারতীয় আখচাষ ও চিনি উৎপাদন পদ্ধতি শিক্ষা করার জন্য একদল চীনা ছাত্রকে বিহার প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুসলিম আমলে বাংলা দেশের বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে অযোধ্যায় গোরক্ষপুর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে শাদা চিনি প্রস্তুত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা দেশে প্রস্তুত চিনি প্রচুর পরিমাণে ব্রিটেনে রপ্তানি হইত। তৎকালীন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ চিনির কারখানা কাশিপুরে অবস্থিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটেনের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে ভারত হইতে ব্রিটেনে চিনির রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য দেশজ উপায়ে চিনির উৎপাদন চলিতে থাকে। আজও উত্তর প্রদেশে 'রব' (একপ্রকার পাতলা গুড় বা চিনির সিরাপ) দেশীয় পদ্ধতিতে শোধন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে খণ্ডসারি চিনি উৎপন্ন করা হয়।

ভারতে আখের রস হইতে প্রত্যক্ষভাবে চিনি উৎপাদনের জন্য আধুনিক চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এরূপ ৩১টি চিনির কারখানা এবং ৬৪টি শোধনাগার ছিল। ইহারা মিলিতভাবে প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টন শাদা চিনি উৎপাদন করিত। ঐ বৎসর বিদেশ (প্রধানতঃ যবদ্বীপ) হইতে প্রায় ১০.২ লক্ষ মেট্রিক টন শাদা চিনি আমদানি হইয়াছিল। উক্ত বৎসরে ট্যারিফ বোর্ডের নির্দেশক্রমে আখচাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতীয় চিনিশিল্পকে পনর বৎসরের জন্য সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই প্রধানতঃ ভারতীয় মূলধনে চিনিশিল্পের দ্রুত ও বিপুল বিকাশ ঘটিতে থাকে। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই চিনির কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭ এবং উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিক। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চিনির সংরক্ষণ নীতি রদ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ভারতে চিনির উৎপাদন ১০ লক্ষ মেট্রিক টন হইতে বাড়িয়া কিঞ্চিদধিক ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে চিনির উৎপাদন প্রথম দিকে হ্রাস পায় কিন্তু পরে তাহা বাড়িয়া পুনরায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি হয়। ভারত বর্তমানে প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন পর্যন্ত চিনি রপ্তানি করিতেছে। এ দেশে প্রায় ২০০টি চিনির কারখানায় আনুমানিক ৫০০০০ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ভারতীয় চিনিশিল্প প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ ও বিহার, এই দুই রাজ্যে কেন্দ্রীভূত, কিন্তু সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজের দিকে এই শিল্পের প্রসার লক্ষণীয়। 'আখ' দ্র।

দ্র *Report of the Indian Sugar Committee*, Calcutta, 1921, *Report of the Tariff Board on the Indian Sugar Industry*, Calcutta, 1931, M P. Gandhi, *The Indian Sugar Industry Its Past, Present and Future*, Calcutta, 1934, Ramani Ranjan Chatterjee, *Prospects of the Cane Sugar Industry in Bengal*, Calcutta, 1937; G L. Spencer & G. P. Meade, *Cane Sugar Handbook*, New York, 1948, Andrew Van Hook, *Sugar Production Technology and Uses*, New York, 1948, *Report of the Tariff Board on the Continuance of Protection to the Indian Industry*, Delhi, 1951.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

আখ উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। ইহাতে ৯-১৫% চিনি থাকে। ফসল কাটিবার অনধিক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ইক্ষুদণ্ডের মাড়াই হওয়া প্রয়োজন;

নতুবা চিনির রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়া যায়। ভারতে প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র প্রদেশে চিনিকলগুলি অবস্থিত।

চিনিকলে প্রথমতঃ ইক্ষুদণ্ডগুলিকে কলে ঘূরন্ত ছুরির সাহায্যে কাটিয়া বিভিন্ন খাঁজকাটা রোলার যন্ত্রে মাড়াই করা হয়। আখের উদ্বৃত্ত ছিবড়াকে ব্যাগাস (bagasse) বলে। ইহা চিনিকলে জ্বালানিরূপে অথবা প্যাকিং কাগজ, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়।

আখের রস হইতে প্রথমে ভাসমান ময়লাগুলি ছাঁকনির সাহায্যে পৃথক করিয়া পরে দ্রবীভূত ময়লাগুলি কাটাইবার জন্য চুন দেওয়া হয়। ক্ল্যারিফায়ার অথবা থিক্‌নার যন্ত্রে ময়লাগুলি থিতাইয়া ঘূর্ণায়মান নিম্নচাপ পরিস্রুতি যন্ত্রে (রোটারি ভ্যাকুয়াম ফিল্‌টার) অথবা সাধারণ ফিল্‌টার প্রেসে ছাঁকা হয়। এই পরিষ্কৃত আখের রসে শতকরা ৮৫ হইতে ৯০ ভাগ জল থাকে। ত্রিপাদ অথবা চতুষ্পাদ বাষ্পীকরণ যন্ত্রে (ট্রিপ্‌ল/কোয়াড্‌প্‌ল এফেক্ট ইভাপোরেটর) জলের পরিমাণ কমাইয়া শতকরা ৬০-৫০ ভাগ করা হয়। এই বাদামি রঙের ঘন রসকে এবারে নিম্ন বায়ুচাপের পাত্রে (ভ্যাকুয়াম প্যান) চিনি দানা হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দেওয়া হয়। পরে কেলাসীকরণ যন্ত্রে (ক্রিস্ট্যালাইজার) দানা চিনি তৈয়ারি করা সম্পূর্ণ হয়। সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে চিনির দানাগুলিকে সিরাপ (ঘন দ্রবণ) হইতে পৃথক করা হয়। সিরাপ পুনরায় জ্বাল দিয়া আরও ২-৩ বার চিনির দানা তৈয়ারি করা হয়। অবশিষ্ট সিরাপকে চিটাগুড় বলে, ইহা হইতে অ্যালকোহল প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারি হয়। এইভাবে লব্ধ অপরিশুদ্ধ চিনিকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য প্রথমে চিনিদানার উপরের গুড়ের স্তরটি ভারী চিনির রসে নরম করা হয়, পরে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে চিনির দানাগুলি জলে ধোওয়া হয় এবং গরম জলে অথবা চিনির গাদ ধোওয়া 'মিষ্টি জলে' গলানো হয়। অদ্রবীভূত ময়লা দূর করিবার জন্য এই চিনির রসে চুন দেওয়া হয়, পরে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সাহায্যে অম্লের মাত্রাকে পরিমিত করা হয়। ময়লাগুলি একবার ছাঁকিয়া ফেলিয়া চিনির রসে আর একবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় বার ছাঁকা হয়। এই পরিস্রুত চিনির রসকে জান্তব অথবা উদ্ভিজ্জ কয়লার সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া স্বল্প বায়ুচাপের পাত্রে জ্বাল দিয়া পরিস্রুত চিনিদানা তৈয়ারি করা হয় ও সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে চিনির দানাগুলি সিরাপ হইতে পৃথক করা হয়। সিরাপ ২-৩ বার এইভাবে জ্বাল দিয়া আরও চিনির দানা বাহির করা হয়। অবশেষে গরম বাতাসের সাহায্যে দানাগুলি শুখাইয়া থলিতে ভরা হয়।

এদেশে এক ধাপেই মোটামুটি পরিস্কৃত চিনি তৈয়ারি করা হয়। এজন্য আখের রসে চুন দিয়া এবং দুইবার কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিয়া ময়লাগুলি ছাঁকিয়া পরিষ্কার করা হয়। পরে সালফার-ডাইঅক্সাইড দিয়া আরও পরিস্রুত করা হয় এবং বহুপাদ বাষ্পীকরণ যন্ত্রের সাহায্যে রসকে ঘনীভূত করিয়া নিম্নবায়ুচাপের পাত্রে চিনির দানা তৈয়ারি করা হয়। 'আখ' দ্র।

রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

চিন্তা[১] চিন্তার কয়েকটি বিশেষ ধর্ম আছে: ১. চিন্তা এক দিকে বস্তুর শ্রেণী ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অপর দিকে প্রত্যক্ষণ ও কল্পনার ভিত্তিতে বস্তুর বিশেষ লক্ষণগুলির সঙ্গে জড়িত ২. চিন্তা সেই কারণে কোনও বস্তুকে পৃথকভাবে না দেখিয়া তাহার শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখে ৩. চিন্তার যেন দেন বিমূর্ততার সঙ্গে, কিন্তু প্রত্যক্ষণ এবং কল্পনা সাধারণতঃ বস্তুধর্মাশ্রয়ী ৪. চিন্তা অবগতি এবং বোধশক্তির সর্বাপেক্ষা সক্রিয় রূপ ৫. চিন্তার আর একটি বিশেষ ধর্ম হইল সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ এই দুইটি পদ্ধতিকে গ্রহণ করা এবং কাজে লাগানো। প্রত্যক্ষণ এবং কল্পনার ক্ষেত্রে যদিও এই দুইটি পদ্ধতি কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাহা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত। অপর দিকে, চিন্তার ক্ষেত্রে এই দুই পদ্ধতি বিশেষভাবে স্বেচ্ছাধীন ৬. সবশেষে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভাষা সাধারণ চিন্তার অনিবার্য সহচর।

এই প্রসঙ্গে দেখা যাক ধারণা (কনসেপ্ট) কিরূপে গঠিত হয়। এক কথায় ধারণা হইতেছে একটা 'ভাব' (আইডিয়া) যাহা অনেকগুলি বস্তুর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে। যেমন, গোলাপ একটি ফুল, আবার পদ্মও একটি আর এক রকমের ফুল, ইহাদের কোনওটিকেই ফুল বলিয়া চিনিতে ভুল হয় না এবং এই দুই জাতের ফুলের মধ্যে ফুলের শ্রেণীগত কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

ধারণা যখন স্বেচ্ছাকৃতভাবে গঠিত হয় তখন নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়: ১. তুলনা ২. অ্যাবস্ট্রাক্‌শন বা বস্তুগুলির কোনও বিশেষ ধর্ম হইতে মনোযোগ সরাইয়া আনিয়া যে সমস্ত বিষয়ে বস্তুগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেই দিকে মনঃসংযোগ করা ৩. সাধারণীকরণ বা একটি সাধারণ ধারণার গঠন এবং ৪ পরিশেষে এই ধারণার একটি যোগ্য নামকরণ।

চিন্তার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কয়েকটি বিশেষ কার্যক্রম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ১. নার্ভতন্ত্র এমনভাবে গঠিত যে, যে কোনও প্রতিক্রিয়ায় অন্ততঃ দুইটি নার্ভকোষ কাজ করে, মানসিক প্রক্রিয়া সংবেদ (সেন্সরি)-নার্ভকোষ এবং চেষ্টীয় (মোটর) নার্ভকোষের মধ্যবর্তী অনুষঙ্গ নার্ভপথগুলির (অ্যাসোসিয়েশন পাথ-ওয়েজ) ক্রিয়াফল ২ চিন্তা অনেকগুলি জটিল নার্ভঘটিত প্রক্রিয়ার মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেমন ক্রমাগত মস্তিষ্কে সংবেদ উদ্দীপনাগুলির প্রবেশ, ক্রমান্বয়ে পেশীর ক্রিয়াসমন্বয় (কো অর্ডিনেশন), বিভিন্ন দৈহিক এবং আবেগ সম্বন্ধীয় কার্যের নিয়ন্ত্রণ, ইহারই সঙ্গে নাড়ীতন্ত্রের অন্যান্য অংশগুলির সক্রিয় অবস্থা ইত্যাদি। মানসিক ক্রিয়া এই সামগ্রিক রূপের একটি ছোট অংশ ৩ মানসিক প্রক্রিয়াগুলি শরীরের আভ্যন্তরিক কতকগুলি রীতির সাহায্যে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, এজন্যই এগুলি হঠাৎ বা দৈবাৎ ঘটে না ৪. মস্তিষ্কের অংশগুলি অতীত অভিজ্ঞতাকে ধরিয়া রাখে এবং চিন্তা এই অতীত অভিজ্ঞতাকে বহুলাংশে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে।

দ্র W J S Krieg, *Functional Neuro-anatomy*, Philadelphia, 1942, W E Vinacke, *The Psychology of Thinking*, New York, 1952.

অলককুমার মজুমদার

চিন্তা শ্রীবৎস দ্র

চিন্তামণি, চিরবাবুরি যজ্ঞেশ্বর (১৮৮০-১৯৪১ খ্রী) প্রখ্যাত সংবাদপত্রসেবী। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল জন্ম। বিজয়নগর মহারাজ কলেজে শিক্ষালাভের পর চিন্তামণি ১৯০৯ ২০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত 'লিডার' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকপদে নিযোজিত ছিলেন। তিনি ন্যাশন্যাল লিবর্যাল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সহ-সভাপতিও ছিলেন। তিনি ১৯১৬ ও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশের (উত্তর প্রদেশ) আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯২১-২৩ খ্রীষ্টাব্দে তথাকার শিক্ষা ও শিল্প -বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন এবং ভারতের ভোটাধিকার-নির্ণয় কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়ান স্টেট্‌স পিপ্‌ল্‌স কন্‌ফারেন্স-এর সভাপতিপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'ইণ্ডিয়াজ কন্‌স্টিটিউশন অ্যাট ওয়ার্ক' (১৯৪০ খ্রী), 'ইণ্ডিয়ান পলিটিক্‌স সিন্‌স দি মিউটিনি' (১৯৪০ খ্রী) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আশোকা সেনগুপ্ত

চিন্তামণি ঘোষ (১৮৪৪ ১৯২৮ খ্রী) মুদ্রণ-শিল্পকুশল। হাওড়া জেলার বালি গ্রামে জন্ম। পিতার কর্মস্থল বারাণসীতে শিক্ষারম্ভ হয়, কিন্তু তের বৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তাঁহাকে এলাহাবাদের ইংরেজী সংবাদপত্র 'পাইওনিয়র' আপিসে চাকুরি গ্রহণ করিতে হয়। মুদ্রা যন্ত্রের কাজ এই সময়ে বিশেষভাবে তাঁহার শিক্ষা ও গবেষণার বিষয় হইয়া ওঠে। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি সরকারের মেল সার্ভিস বিভাগে অল্পকালের জন্য চাকুরি করেন এবং পরে সরকারেরই হিসাব আপিসে চাকুরি লইয়া হেড ক্লার্ক পদে উন্নীত হইয়া চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের সৈন্যবিভাগ হইতে তিনি একটি হ্যাণ্ড প্রেস ক্রয় করিয়া 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' নামে মুদ্রণপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশে তিনিই প্রথম শক্তিচালিত মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন করেন। লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে মুদ্রণ তিনিই প্রথম আরম্ভ করেন। দীনেশচন্দ্র সেন কৃত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পী-গণের বহুবর্ণ চিত্রাদি এবং কিছুকালের জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' এলাহাবাদে তাঁহার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইত। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 'সরস্বতী' নামে একটি হিন্দী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি হিন্দী সাহিত্যের উন্নয়ন ও প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগস্ট এলাহাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র *Souvenir : The Indian Press Limited*, Calcutta, 1950.

চিরঞ্জীব শর্মা (১৮৪০-১৯১৬ খ্রী) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারকমণ্ডলীর বিশিষ্ট ষোল জনের মধ্যে চিরঞ্জীব শর্মা অন্যতম। তাঁহার আসল নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। তিনি যখন ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন রচনা করিয়া ও গাহিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ভক্তিরসে পুষ্ট করিতে থাকেন তখন হইতে কেশবচন্দ্র তাঁহার নাম দেন 'চিরঞ্জীব শর্মা'।

নবদ্বীপের নিকটস্থ চক পঞ্চানন গ্রামে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চিরঞ্জীবের জন্ম। পিতা রামনিধি সান্যাল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরে আসিলে চিরঞ্জীব তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে আর

একজন ব্রাহ্ম প্রচারক সাধু অঘোরনাথের সহিত পরিচিত করান। চিরঞ্জীব ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হন এবং কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে'র ভিত্তি-স্থাপনের দিন তিনি একটি নূতন সংগীত রচনা করিয়া অনুষ্ঠান পরিচালনার নেতৃত্ব লইলেন এবং এখন হইতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংগীতাচার্যের পদ পূর্ণ করিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রচারকদলের অন্তর্ভুক্ত হন। 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭১ খ্রী) তাঁহার প্রথম রচনা। কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও বক্তৃতার ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি সহস্রাধিক ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন রচনা করেন। এইগুলি 'গীত-রত্নাবলী' (চারি খণ্ড, ১৮৮৪-১৯০০ খ্রী) ও 'পথের সম্বল' (১৯১১ খ্রী) পুস্তকে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেই গান ও কীর্তনের সুর দিতেন, সুর ও তালে ধ্রুপদ, বেহাগের সঙ্গে ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী, ভজন, কীর্তন আনিয়া সাধারণ মানুষদের গাহিবার উপযোগী করিয়া দিলেন। তাঁহার গান গাহিবার একটি নিজস্ব রীতি ছিল। এই সকলের সংমিশ্রণে ব্রহ্মসংগীতের একটি নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। স্বামী বিবেকানন্দও চিরঞ্জীব রচিত 'চিন্ময় মম মানস', 'নিবিড় আঁধারে মা তোর' প্রভৃতি সংগীত প্রায়ই গাহিতেন। চিরঞ্জীবের বহু গান বাউল ভিখারীদের কণ্ঠে আজও শ্রুত হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে 'ভক্তির অগ্রবর্তী' ব্রত দেন। তাঁহাকে যে সাধন ও অধ্যয়ন করিতে হয় তাহার ফলস্বরূপ 'শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম' বা 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' (১৮৭৮ খ্রী) রচনা করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য কেশবচন্দ্র 'সমন্বয় অধ্যয়ন' এবং 'সাধুসমাগম' সাধন প্রবর্তন করিলে চিরঞ্জীব ঈশার জীবন অধ্যয়ন ও তাঁহার সহিত একাত্মতার সাধন আরম্ভ করেন। ইহারই ফলস্বরূপ 'ঈশাচরিতামৃত' গ্রন্থ রচিত হয় (১৮৮২-৮৩ খ্রী)।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'সমন্বয় ধর্ম' বা 'নববিধান' ঘোষণা করেন। চিরঞ্জীব সে অনুসারে 'বিধান ভারত' মহাকাব্য রচনা করিলেন। কেশবচন্দ্রের নির্দেশে চিরঞ্জীব 'নবশিখা' প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। 'নববৃন্দাবন' নাটক (১৮৮১ খ্রী) লিখিয়া নাট্যকার হিসাবে চিরঞ্জীব খ্যাতি লাভ করেন। স্বয়ং কেশবচন্দ্র নাটকটি সদলে নিজগৃহ 'কমল কুটিরে'র উদ্যানে কয়েকবার অভিনয় করিয়াছিলেন। 'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত' (১৮৮২ খ্রী) ও 'কেশবচরিত' (১৮৮৫ খ্রী) প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থগুলিও তাঁহার রচনানৈপুণ্যের নিদর্শন। চিরঞ্জীব চারিটি আধ্যাত্মিক ভাবের গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন —'গরলে অমৃত' (মহারসোপন্যাস, ১৮৮৯ খ্রী), 'বিংশ শতাব্দী বা আশা কাব্য' (গল্প, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ), 'ইহকাল পরকাল' (১৩০২ বঙ্গাব্দ), 'ব্রহ্মগীতা' (যোগ ভক্তি কর্ম জ্ঞানতত্ত্ব, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থগুলির মূল প্রেরণা ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ।

দ্র ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা, ১৬ মাঘ, ১ ফাল্গুন ও ১৬ ফাল্গুন, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বর্ধমান, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

নতীবনব চট্টোপাধ্যায়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলা, বিহার ও ওড়িশার (মেদিনীপুর জেলা) দেওয়ানি লাভ করার পর ৭ বৎসর কাল পূর্বতন ভূমিরাজস্ব প্রশাসনই বলবৎ থাকে এবং কোম্পানির নায়েব দেওয়ানরূপে মহম্মদ রেজা খাঁ ভূমিরাজস্বের পরিচালনা করিতে থাকেন। এই দ্বৈত শাসনের যুগে কোম্পানির অত্যধিক রাজস্ব দাবি, ভূমিরাজস্বকে বাৎসরিক ইজারা দান প্রথা, মূর্তিমান অরাজকতা রূপে এক নূতন বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব, এই সকল কারণে বঙ্গদেশে কৃষি ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটিল এবং কোম্পানির রাজস্ব প্রত্যাশারও পূরণ হইল না, জমা ও উসুলের মধ্যে মীর জাফর ও কাশেম আলীর সময়ের মতই ঘাটতি চলিতে লাগিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিল 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। ফলে বাংলার কৃষকদের অর্ধেক মরিল এবং আবাদী জমির অর্ধাংশ অনাবাদী হইয়া পড়িল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হইল যে, কোম্পানি সরাসরিই দেওয়ানরূপে কাজ করিবে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কেন্দ্রীয় সার্কিট কমিটির তত্ত্বাবধানে জমিদারি মহালগুলিকে নিলামে চড়াইয়া ইজারাদারদের সঙ্গে পাঁচসালা বন্দোবস্ত সম্পাদন করিলেন। যাহারা ইজারা লইয়াছিল তাহারা অনেকেই ছিল কোম্পানির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের বেনিয়ান। ইহাদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন হেস্টিংসের নিজ বেনিয়ান 'কান্তবাবু'। পাঁচসালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইল, অধিকাংশ অজ্ঞ ফাটকাবাজ নিলামে অত্যন্ত চড়া ডাক দিয়া শেষে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিল না। জমিদারদের মধ্যে যাহারা ইজারা লয় নাই তাহাদিগকে মালিকানা ভাতা দিয়া জমিদারি পরিচালনার কাজ হইতে অপসারিত করা হইল। যে সকল জমিদার ইজারা লইয়াছিল তাহারাও প্রতিশ্রুতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

পূরণে অসমর্থ হইল। পাঁচসালা বন্দোবস্তের শোচনীয় বিফলতার পর ১৭৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যথাসম্ভব জমিদারদের সঙ্গে, অন্যথা কলিকাতার নব্য ধনিকদের সঙ্গে বাৎসরিক বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। বস্তুতঃ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর (১৭৬৫ খ্রী) হইতে প্রবর্তিত ইজারাদারি বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপেই জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী পরিকল্পনা জন্মলাভ করিয়াছিল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল আলেকজাণ্ডার ডাউ বাণিজ্যবাদী (মার্ক্যান্টালিস্ট) চিন্তাধারার বশে এবং স্কটল্যাণ্ডের প্রখ্যাত কৃষিকলাবিদ্ হেন্‌রি পাটুলো (Pattulo) ফিজিওক্র্যাট ভাবধারার প্রভাবে ভারতীয় জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করিয়াছিলেন। পাঁচসালা বন্দোবস্তের কালে মিড্‌লটন, ডেকার্স, ডুকারেল, রাউস (Rous)-প্রমুখ কোম্পানির বহু স্থানীয় কর্মচারী জমিদারদের জমা চিরতরে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। তাঁহার ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরিকল্পনাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নটিকে বাস্তব রাজনীতির জগতে আনয়ন করিল। ফ্রান্সিস-এর বিচারে ভারতীয় বিধি-বিধান অনুসারে জমিদারেরাই জমির মালিক। ফিজিওক্র্যাট ভাবধারার প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, কৃষিই সামাজিক ধনবৃদ্ধির একমাত্র উৎস এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদের ভূস্বামিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের উদ্যোগে কৃষির পুনরভ্যুদয় ঘটিবে এবং কোম্পানির আর্থিক সমস্যারও সমাধান হইবে। তিনি অভিযোগ করিলেন যে, হেস্টিংসের ইজারাদারি বন্দোবস্ত এবং পাট্টার দ্বারা রায়তী খাজনাকে বাঁধিয়া দেওয়ার চেষ্টা জমিদারদের ভূস্বামিত্বের উপর আক্রমণ। হেস্টিংস জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত ভূস্বত্বাধিকারকে অস্বীকার করেন নাই। তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের চিরায়ত বিধি অনুসারে রাষ্ট্রই চরম ভূস্বামী। তিনি মনে করিতেন, ভারতীয় জমিদারেরা অকর্মণ্য ও অনুদ্যোগী। তিনি ভূস্বত্ব সম্বন্ধে অধিকতর অনুসন্ধান ও রায়তদের অধিকার রক্ষার উপর জোর দিতেন এবং রায়তদের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন।

ফ্রান্সিসের লেখার প্রভাবেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ পিট-এর ভারত আইনে রাজা, জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য ভূস্বামীদের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী আদেশ বহন করিয়া লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। পরবর্তী ৩ বৎসর কাল ভারতের ভূস্বত্বব্যবস্থা, ভূমিরাজস্বের ইতিহাস ও ন্যায্য জমার পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধান চলে এবং জেম্‌স গ্র্যাণ্ট ও জন শোর-এর সঙ্গে বিসংবাদ ঘটে। গ্র্যাণ্ট বলিলেন, রাষ্ট্রই চরম ভূস্বামী এবং জমার পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের আদায়ের অপেক্ষা অনেক উচ্চতর হারে ধার্য হওয়া উচিত। শোর উত্তর দিলেন, রাষ্ট্র রাজস্বভোগী মাত্র, জমিদারেরাই ভূস্বামী এবং ন্যায্য জমার পরিমাণ সম্বন্ধে গ্র্যাণ্টের হিসাব ভুল ও অবাস্তব। অবশেষে শোর এর সঙ্গে একমত হইয়া কর্নওয়ালিস ১৭৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের সঙ্গে দশসালা বন্দোবস্ত সম্পাদন করেন। ইহাকেই কর্নওয়ালিস কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টার্সের অনুমতিক্রমে কয়েকটি রেগুলেশন জারি করিয়া ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। শোর আরও কিছুকাল অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। রংপুরের কালেক্টর টমাস ল (Law) কর্নওয়ালিস পরিকল্পনার প্রবল সমর্থক ছিলেন। জমির ক্রয় বিক্রয়ের অবাধ বাজার সৃষ্টি করার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারেরা ও 'স্বাধীন' তালুকদারেরা জমির মালিক ঘোষিত হন। জমিদারেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল. ১. কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজাদের মত মোগল আমলের করদ নৃপতি ২. রাজশাহী, বর্ধমান ও দিনাজপুরের রাজাদের মত পুরাতন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ৩. মোগল বাদশাহদের সময় হইতে বংশানুক্রমিক ভাবে রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদভোগী পরিবার ৪. কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানি লাভের পর ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ইহাদের সকলকেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়া বলা হইল যে, ইহারা সকলেই জমির মালিক। বলা হইল যে জমিদারেরা জমিকে দান, বিক্রয় ও বন্ধকের দ্বারা অবাধে অর্থাৎ সরকারের অনুমোদন বিনাই হস্তান্তরিত করিতে পারিবে। ইহা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইল যে, এই অধিকার পূর্বে তাহাদের ছিল না। কর্নওয়ালিস তদানীন্তন স্থিতাবস্থাকেই (স্টেটাস কুও) মানিয়া লইয়াছিলেন, ইহা ঠিক কথা নয়। তিনি ইংল্যাণ্ডের অভিজাত ভূস্বামীশ্রেণীর আদর্শে এক নূতন ভারতীয় ভূস্বামীশ্রেণী সৃষ্টি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ভারতে আগমনের পর যে সকল অনুসন্ধান চলিয়াছিল তাহার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'মিনিট'-এ

তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন : 'আমার সুদৃঢ় মত এই যে, ভূমিতে জমিদারগণকে সম্পত্তির অধিকার দান করা জনহিতার্থে আবশ্যক এই অধিকার কতদূর সুপ্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা আমি অনাবশ্যক মনে করি।'

বাংলা প্রদেশে জমিদারদের জমার পরিমাণ ২৬৮ লক্ষ টাকা (সিক্কা) বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। পর বৎসরের (১৭৮৭-৮৮ খ্রী) আদায় দেখিয়া এবং কানুনগোদের সহিত তাড়াতাড়ি পরামর্শ করিয়া জমার পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল। তৎকালীন অনুমিত রায়তী খাজনার ১১ ভাগের ১০ ভাগ পাইবে রাষ্ট্র এবং এক ভাগ ভোগ করিবে জমিদারেরা, এই নীতি অবলম্বিত হইল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত পঞ্চম রিপোর্ট অনুসারে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মোট ফসলের তিন পঞ্চমাংশ হারে রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্ধারিত হইয়াছিল, ইহারই এক-দশমাংশ অর্থাৎ মোট ফসলের ৬% ভাগ জমিদারদের দেওয়া হইয়াছিল। তখনকার পক্ষে জমার পরিমাণ ছিল অত্যধিক। জমিদারদের ভবিষ্যৎ লাভের কিছু অংশ তাহাদের জমার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কোম্পানির আর্থিক প্রয়োজন বিচার করিয়াই জমার পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা বহন করিতে জমিদারদিগকে প্রলোভিত করার জন্য তাহাদের মহলগুলির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বাকি সকল অনাবাদী পতিত ও আরণ্য জমির ভূস্বামিত্ব জমিদারদের দান করা হইল। মহলগুলি কতদূর বিস্তৃত এবং তাহাদের প্রকৃত সীমানা কোথায়, এ ব্যাপারে অবশ্য সরকারের নিজস্ব কোনও জ্ঞান ছিল না। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে জমার পরিমাণকে ভবিষ্যতে কখনও বর্ধিত করা হইবে না। কৃষির বিস্তারের ও উন্নতির ফলে জমিদারির লাভ বৃদ্ধি পাইলে তাহা জমিদারেরাই কেবল ভোগ করিবে। যাহাতে নিয়মিতভাবে ভূমিরাজস্ব দাখিল করা হয় তদুদ্দেশ্যে এই মর্মে একটি নিলাম আইন ('সূর্যাস্ত আইন') জারি হইল যে কিস্তি দেওয়ার শেষ দিনে সন্ধ্যার পূর্বে কোনও মহলের জমা না পড়িলে মহলটিকে তৎক্ষণাৎ নিলামে চড়ানো হইবে। এ ব্যাপারে অনাদায়, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কোনও অজুহাতই চলিবে না।

কোর্ট অফ ডিরেক্টার্স তাঁহাদের ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডেসপ্যাচে বলিয়াছিলেন যে জমিদার ও রায়ত, উভয়েরই প্রথাগত অধিকারকে সমভাবে রক্ষা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অল্পসংখ্যক মোকররী রায়তদের খাজনাকে নির্দিষ্ট হারে চিরতরে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। খুদকস্ত (বাসিন্দা) রায়তদের সম্বন্ধে স্থির হইল যে তাহারা প্রথাগত 'নিরখ-বন্দী' বা পরগনা হারে খাজনা দিতে থাকিবে এবং ইহা জমিদারদের দ্বারা স্বাক্ষরিত পাট্টায় ও কবুলিয়তে লিখিত থাকিবে। পাট্টা রেগুলেশনে বলা হইল যে জমিদারেরা রায়তগণকে অনধিক দশ বৎসরের মেয়াদে পাট্টা দিতে বাধ্য থাকিবে। খুদকস্ত রায়তদের উচ্ছেদকে সীমিত করার জন্য কয়েকটি শর্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল। পাইকস্ত (অ-বাসিন্দা) রায়তগণকে শুধু চুক্তিবন্দী রায়তরূপেই দেখা হইয়াছিল। ইহা ঘোষিত হইল যে রায়তদের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য সরকার ভবিষ্যতে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূমিরাজস্বের সুনিশ্চিত আদায় ও কৃষির বিস্তার। আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ তখন ছিল কর্নওয়ালিসের হিসাব মত মোট জমির এক তৃতীয়াংশ, গ্র্যান্টের হিসাব মত মোট জমির চার পঞ্চমাংশ। প্রত্যাশা করা হইয়াছিল যে, সম্পত্তির জাত ও চিরস্থায়ী জমা মিলিতভাবে একটি 'উৎপাদিকা শক্তি' রূপে কাজ করিবে। মূলধন জমির দিকে আকৃষ্ট হইবে, জমির মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে, কৃষির বিস্তার ও উন্নতির ফলে দেশের সমৃদ্ধি ঘটিবে, লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িবে এবং ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্যের বাজার ভারতে প্রসারলাভ করিবে। ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব তখন যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল এবং ভারতে দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ব্রিটিশ শিল্পপতিদের তাগিদ জোরালো হইয়া উঠিতেছিল। ভূমি-রাজস্ব বাবদ রাষ্ট্রের ত্যাগ ক্ষতি পণ্যবিক্রয় এবং তজ্জনিত শুল্কাদি কর জাতীয় আয়ের স্ফীতির দ্বারা পূরিত হইবে ইহাই ছিল কর্নওয়ালিসের যুক্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বৃটিশরাজের অনুগত শ্রেণীগুলি শক্তিশালী হইবে এই রাজনৈতিক বিবেচনার দ্বারাও কর্নওয়ালিস চালিত হইয়াছিলেন।

কর্নওয়ালিসের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা সিদ্ধ হয় নাই। ব্রিটিশ সমাজের সম্পত্তিগত ধারণাকে ভারতীয় সমাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ভারতে সৃষ্ট হইল কার্ল মার্কসের ভাষায় ব্রিটিশ ভূস্বামিত্বের এক ব্যঙ্গ রূপ (ক্যারিকেচার)। ভূমিরাজস্বের জমা নিয়মিতভাবে কোষাগারে আসিতে লাগিল না। নিলাম আইনের নির্মম প্রয়োগের দ্বারাই ভূমিরাজস্বকে সুনিশ্চিত করা হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আদি জমিদারদের অর্ধেক অন্তর্ধান করিল। তাহাদের জায়গা জুড়িয়া বসিল কলিকাতার বেনিয়ানসম্প্রদায়ের নব্য ধনিকেরা। কৃষিকর্মবিদ্, উদ্যোগী, ইংরেজ জমিদারশ্রেণীর পরিবর্তে সৃষ্ট হইল এক প্রবাসী,

আধা-সামন্ততান্ত্রিক, ‘আইরিশ’ জমিদারশ্রেণী। অশুভ উপ-জমিদারত্ব-প্রথার উদ্ভবের ফলে জমিদার ও রায়তের মধ্যে দেখা দিল পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার, সে পত্তনীদার ইত্যাদি ক্রমে পত্তনীদারদের এক সুদীর্ঘ শৃঙ্খল। উদিত হইল বাংলার খাজনাভোগী মধ্যবিত্তশ্রেণী। বিপুলসংখ্যক পরভৃত জমিদার ও উপ-জমিদারদের বহন করার বোঝা কৃষকদের স্কন্ধে পড়িল। ইহা বাঙালীর সংস্কৃতি ও জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে একটা দুর্ভাগ্যের বিষয়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালীর শ্রমবিমুখতা ও শিল্পবিমুখতার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমির ক্রয়-বিক্রয়ের অবাধ বাজার সৃষ্টি মূলধনকে শিল্প ও বাণিজ্য হইতে টানিয়া আনিল জমির দিকে। জমিদারগণ হইয়া উঠিল একটা কৌলীন্যের ব্যাপার। ভারতকে কৃষিসর্বস্ব দেশে পরিণত করার ব্রিটিশ পরিকল্পনার সহায়ক ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

কৃষির বিস্তার অবশ্য দ্রুতবেগে ঘটিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অন্তে বাংলার প্রায় সমস্ত আবাদযোগ্য পতিত ও আরণ্য জমিই কর্ষণাধীন হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকগণ বলিতেন, জমিদারদের উদ্যোগ ও অর্থব্যয়ের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা সত্য যে জমা চিরস্থায়ী হওয়ার ফলে কৃষির বিস্তার জমিদারদের স্বার্থের অনুকূল ছিল। কিন্তু কৃষকদের সংখ্যাবৃদ্ধি, জমির জন্য তাহাদের অপরিমেয় ক্ষুধা, তাহাদের শ্রম ও উদ্যোগ – এইগুলিই ছিল কৃষির বিস্তারের প্রধান কারণ। জমিদারেরা বহু স্থলে কৃষকদের বেগার খাটাইত। সচরাচর যাহা ঘটিত তাহা এই যে, প্রথম কয়েক বৎসরের জন্য জমিদারেরা কৃষকদিগকে বিনা খাজনায় জঙ্গল কাটিয়া বসতি স্থাপন ও কৃষিকার্য আরম্ভ করিতে দিত এবং তাহার পর উচ্চ হারে খাজনা ধার্য করিয়া কৃষকদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করিত ও অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের উচ্ছেদ করিত।

জমির উন্নতিসাধন ও উন্নত কৃষিকলার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জমিদারেরা মূলধন বিনিয়োগ করিবে, এই প্রত্যাশা পূরিত হয় নাই। আজও পর্যন্ত সনাতন কৃষিকলা-ই চলিয়া আসিতেছে। জমিদারেরা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অতিথিশালা ইত্যাদি বাবদ প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের মঙ্গলসাধন করিলেও জমির উন্নতি সম্বন্ধে তাহারা একান্ত উদাসীন ছিল। জমিতে মূলধন-বিনিয়োগের আত্যন্তিক অভাব সম্বন্ধে ক্ষোভ বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত একটানা শোনা গিয়াছে। পুষ্করিণী-খনন ও কূপ-খনন যেখানে যতটুকু ঘটিয়াছিল তাহার মূলে ছিল প্রধানতঃ কৃষকদের চেষ্টা ও অর্থব্যয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার, জমিদার, পত্তনীদার ও রায়ত সকলকেই জমির উন্নতিসাধন হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বাংলার ভূমিরাজস্ব কমিশন (১৯৩৮ খ্রী) এই মর্মে বিলাপ করিয়াছিলেন যে জমি সম্বন্ধে কাহারও কোনও মাথাব্যথা নাই। ভূমিরাজস্বের অপরিবর্তনীয়তার দরুন ক্ষতি অন্যান্য খাতে রাজস্ববৃদ্ধির দ্বারা পরিপূরিত হইবে, এই আশাও সার্থক হয় নাই। ভোগব্যয়ের আশানুরূপ বৃদ্ধিও ঘটে নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকদের অভিমতে, উহার ফলে বাংলা প্রদেশে স্ট্যাম্প শুল্ক, কাস্টমস শুল্ক, আয়কর ইত্যাদি বাবদ রাজস্ব বাড়িয়াছিল, কিন্তু স্ট্যাম্প শুল্ক বাদ দিলে ঐ যুক্তি ভিত্তিহীন।

কৃষকেরা পরগনা হারে খাজনা দিতে থাকিবে বলা থাকিলেও দেখা গেল যে, ইহা একটি কথার কথা। পরগনা হারকে আইনের দ্বারা সংখ্যাঙ্ক ও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। জেলার কালেক্টরগণ বলিল, পরগনা হার এক এক জেলায়, এক এক গ্রামে এক এক রকমের। আকবরের ‘আসল জমা তুমার’ একটা স্বর্ণযুগের চিহ্ন রূপে মানুষের মনেই বিরাজ করিতেছিল, স্বভাবতঃই বিচারকেরা অনির্দিষ্ট পরগনা হারকে বলবৎ করিতে পারিলেন না। ব্রিটিশ শাসকেরা এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন যে, ভারতে জমিদার রায়ত সম্পর্কের মূলে ছিল পারস্পরিক সম্মতি। মোগল শাসনে খুদকাস্ত রায়তেরা নির্দিষ্ট হারে ভূমিরাজস্বের দাবী মিটাইলে বংশানুক্রমিক ভাবে দখলী স্বত্ব ভোগ করিতেন এবং পাইকস্ত রায়তদের রাজস্বে সরকার সুবিধা দিতেন। জমিদারের নিকর মহল ছাড়া ‘রেন্ট’ অর্থে খাজনা বলিয়া মোগল আমলে কোনও কিছু ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রেগুলেশনে রকমারি কথার আড়ালে রায়তদের চিরাচরিত অধিকারকে চুপিসাড়ে বলি দেওয়া হইল। যাহা ছিল রাজস্ব তাহা হইয়া পড়িল খাজনা (‘রেন্ট’)। দশ বৎসর পরে তাহাদের উচ্ছেদ করা হইবে এই ভয়েই রায়তেরা পাট্টা লইতে চাহিল না, জমিদার ইচ্ছামত হারে খাজনা ধার্য করিয়া পাট্টা লিখিতে এবং নিজ কাছারিতে রাখিয়া দিয়া কয়েক দিন পরে পাট্টাগ্রহণে রায়তদের অসম্মতির অজুহাতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিত। পাট্টা রেগুলেশন রায়তপীড়নের যন্ত্র হইয়া পড়িল।

জমিদারদের খাজনাবৃদ্ধির ক্ষমতা মোগল আমলে ছিল কি না, এই কেতাবী আলোচনার আড়ালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকগণ এই মূল সত্যটিকে এড়াইয়া যাইতেন যে, কর্নওয়ালিসের রেগুলেশন কার্যতঃ জমিদারগণকে খাজনা বাড়াইবার যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়াছিল তাহা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

নূতন ও অভূতপূর্ব। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সিস ও কর্নওয়ালিস উভয়েই এই 'লেসে ফেয়ার' পোষণ করিতেন যে চাহিদা ও জোগানের নিয়মাবলীই খাজনার একটি 'স্বাভাবিক' ও ন্যায়সংগত হার ধার্য করিবে, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ চাহিদা ও জোগানের নিয়ম জমিদারদের খাজনাবৃদ্ধির ও কৃষক উচ্ছেদের অপ্রতিহত ক্ষমতারই সহায়ক হইল। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আসিল কিন্তু জমিদারদের স্বপক্ষে। জমিদারদের জমা যাহাতে নিয়মিতভাবে দাখিল হয়, তাহা সুনিশ্চিত করার জন্য রায়তদের ফসল আটক করা, তাহাদের উপর জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজদের চড়াও হওয়া, তাহাদিগকে জমিদারের কাছারীতে কয়েদ করা ইত্যাদি নিষ্ঠুর প্রথাগুলি আইনের সমর্থন লাভ করিল। আইনের দ্বারা রায়তদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া যাওয়া হইল। আসিল ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের 'কানুন হফ্‌তম' ও ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের 'কানুন পঞ্চম'। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই লর্ড হেস্টিংসের মিনিটে বলা হইয়াছিল যে বাংলা প্রদেশে গ্রাম্য ভূম্যধিকারী রায়তশ্রেণী অবলুপ্ত হইয়াছে। জমিদারি [illegible] দশ বৎসরে দ্বিগুণ হইল ও ত্রিশ বৎসরে সরকারী জমার সমান হইল। রায়তেরা কোনও মতে শুধু টিকিয়া রহিল। তাহাদের উৎপন্ন ফসলের 'উদ্বৃত্ত' সমস্তটাই জমিদারেরা আত্মসাৎ করিত এবং নানাভাবে তাহাদিগকে বেগার খাটাইত, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে রাজা রামমোহন এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রেগুলেশনে পূর্বতন আবওয়াব জমার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং জমিদার কর্তৃক রায়তদের উপর কোনও আবওয়াব বা 'সেস' বসানো নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই আইন কাগজের টুকরায় পর্যবসিত হয়, জমিদারেরা যে-কোনও অজুহাতে রায়তদের উপর অবাধে 'সেস' বসাইতে লাগিল। জমিদারের শিকারে বহির্গমন, পুত্রসন্তান লাভ, মাতৃবিয়োগ দুঃখ, সমস্তই রায়তের উপর নূতন 'সেস' আরোপের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আইনের দ্বারা রায়তদের অধিকারকে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। নিলাম আইন প্রথমে এমনভাবে কাজ করিত যে পুরাতন জমিদারের কোনও চুক্তির দ্বারা জমিদারির নূতন ক্রেতা বাধ্য থাকিত না। ফলে কৃষকদের পাট্টা নাকচ হইয়া যাইত। পরে ইহার সংশোধন হয়। বহুতর কৃষক-বিদ্রোহের ও দুর্ভিক্ষের চাপে বাংলা প্রদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। প্রজাস্বত্ব আইন রচনা চরম পরিণতি লাভ করে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনে। ইহা সত্য যে ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলার দখলী রায়তদের খাজনার হার ভারতের রায়তওয়ারি অঞ্চলে রায়তী খাজনার হারের চেয়ে নিম্নতর হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলরূপে গণ্য করা স্পষ্টতঃই অযৌক্তিক।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতের সর্বত্র জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধনের একটা হিড়িক পড়িয়া যায়। বারাণসী অঞ্চলে, মাদ্রাজের উত্তর সরকার জেলায় এবং আসামের একাংশে এই বন্দোবস্ত প্রসারিত হয়। মাদ্রাজের যেখানে জমিদার নাই সেখানেও কৃত্রিম উপায়ে জমিদার সৃষ্টি করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চেষ্টা হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই ব্রিটিশ শাসকদের মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিরাগ জন্মায়। ইহার পিছনে নানাবিধ কারণ ছিল, যথা— মলথস ও রিকার্ডোর অর্থনীতিতত্ত্বের প্রভাব, হিতবাদী (ইউটিলিটেরিয়ান) বেন্থাম ও মিল পিতা-পুত্রের শিক্ষা, ব্রিটিশ শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের বাজারবিস্তারের এবং ভারত হইতে কাঁচামাল সংগ্রহের আবশ্যকতা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূস্বত্বব্যবস্থার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানার্জন, কোম্পানির সামরিক ও অসামরিক ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং ভারতবিজয়ের অগ্রগতির ফলে রাজনৈতিক কারণে রাজা ও জমিদারের উপর নির্ভরশীল মনোভাবের ক্রমক্ষয়। শেষোক্ত ব্যাপারটির চরম অভিব্যক্তি ঘটে অযোধ্যার তালুকদারগণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অধিকারচ্যুত করার ঘটনায়। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্রিটিশ শাসকদের সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে এবং রাজভক্ত জমিদার-শ্রেণীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিশ্বাসযোগ্য সামাজিক ভিত্তি সন্ধান করার ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি পুনরায় জাগ্রত হয়। ব্যাপক ও পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ, নিয়ত বর্ধমান কৃষক বিক্ষোভ এবং কৃষির অবনতি— এইগুলিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমীচীনতা সম্বন্ধে সংশয় উৎপাদন করে। এই সকল কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনার পুনরভ্যুদয় ঘটে। কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং ঐ বৎসর ভারতসচিব স্যর চার্লস উডের ডেসপ্যাচে ঘোষিত হয় যে, ব্রিটেনে মহারানীর সরকার ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ফলপ্রসূ হয় নাই। অবশেষে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন

ভারতসচিবের ডেস্‌প্যাচ-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধারণার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিল। রমেশচন্দ্র দত্ত এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতবাসীরা পুনর্বার বিদ্রোহ করিল না বলিয়াই তাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একনিষ্ঠ, প্রবল ও সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক। ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্তগুলি যে কৃষকশোষণ ও ভারতলুণ্ঠনের উপায়, দুর্ভিক্ষের জনক এবং কৃষিগত উন্নতির অন্তরায়, এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বহুলাংশে সত্য। কৃষি ও ভূমির পরিচালনা সম্পর্কে সরকারি ঔদাসীন্য ও ব্যয় কৃচ্ছ্রতাই কৃষির উন্নতির প্রধান অন্তরায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকদের এই অভিযোগও ভিত্তিহীন ছিল না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষির ও কৃষকদের দিক হইতে উৎকৃষ্টতর এবং দুর্ভিক্ষনিবারক ছিল, ইহা রমেশচন্দ্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক অন্যান্য ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের সহিত বিতর্কে রমেশচন্দ্র জয়ী হইতে পারেন নাই। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবলোপের কোনও চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহাকে প্রজাস্বত্ব আইনের খুঁটির সাহায্যে খাড়া রাখিবার চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লাউড কমিশন কৃষির উন্নতিকল্পে রায়তদের সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ সংযোগের একান্ত আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া বাংলা প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবলোপ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সমস্ত মধ্যস্বত্ব ক্রয়ের সুপারিশ করিয়াছিল। ব্রিটিশ-আমলে ইহা কাজে পরিণত হয় নাই। স্বাধীন ভারতে পশ্চিম বঙ্গে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৬০ বৎসর পরে জমিদারি-ক্রয় আইনের দ্বারা চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের বিলোপ ঘটিল এবং রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।

পূর্বে রায়ত বলিতে বুঝাইত সত্যসত্যই নিজের শ্রমের দ্বারা চাস করে এমন কৃষক। সে অবস্থা এখন আর নাই। এখন রায়তদের অনেকেই অ-শ্রমিক খাজনাভোগী জমিদার। প্রকৃত কৃষক হইল অসংখ্য ভূমিহীন খেত-মজুর ও ভাগ-চাষী। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে খেত-মজুর জমি পায় নাই, ভাগচাষীরা রায়ত বলিয়া, এমন কি প্রজা বলিয়াও গণ্য হয় নাই। ভাগচাষীকে আজও উৎপন্ন ফসলের ৪০ শতাংশ খাজনারূপে দিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর একান্ত উৎপীড়িত রায়তের অবস্থাও ইহার চেয়ে খারাপ ছিল না। দুর্ভিক্ষ আজও অগণিত ভূমিহীন কৃষকদের দ্বারপ্রান্তে সর্বদাই ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। খাজনাভোগী জমিদার ও শ্রমজীবী কৃষক— এই দুইয়ের বিরোধ এবং কৃষির উপর তাহার অশুভ প্রভাব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নাই।

দ্র প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; C. H. Baden-Powell, *Land Systems of British India*, vol. I, Oxford, 1892; R.C. Dutt, *Economic History of India*, vols. I-II, London, 1908; C. D. Field, *Introduction to the Code of Bengal Regulations*, Calcutta, 1925; Dwijadas Datto, *Landlordism in Bengal*, Bombay, 1931; *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, vols. I-II, Calcutta, 1940; Ranajit Guha, *A Rule of Property for Bengal*, Paris, 1963; S. C. Gupta, *Agrarian Relations and Early British Rule*, Calcutta, 1963; S. C. Sarkar, ed., *Rammohun Roy on Indian Economy*, Calcutta, 1965; K. Marn and F. Engels, *On Colonialism*, Moscow.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

চিরুনি মানবসভ্যতার আদি যুগ হইতেই কাঠ বা পশুর শিঙের তৈয়ারি চিরুনির প্রচলন দেখা যায়। বর্তমান যুগেও গোণ্ড, টোডা, সাঁওতাল প্রভৃতি অধিবাসীদের মধ্যে কাঠের চিরুনির চলন আছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, সম্ভবতঃ মিশর দেশেই চিরুনির প্রথম প্রচলন হয় এবং সেগুলি গজদন্তের দ্বারা তৈয়ারি হইত। পরে গ্রীক ও রোমানগণ একপ্রকার কাঠের তৈয়ারি চিরুনি ব্যবহার করিত। ইংল্যাণ্ডের লাইন (Lyne) নামক একজন শিল্পী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভালকানাইট ও জাইলোনাইট হইতে চিরুনি প্রস্তুত করেন। কাঠ, শিঙ বা গজদন্ত ছাড়াও অস্থি, কচ্ছপের খোলা, নানা প্রকারের ধাতু, ইণ্ডিয়া রবার, গাটাপার্চা, সেলুলয়েড, প্লাস্টিক ইত্যাদি দিয়াও চিরুনি প্রস্তুত করা হয়। চুল ছাঁটিবার জন্য টিনের চিরুনিও ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে চিরুনির ব্যবহার বহু প্রাচীন। পূজা বা অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও চিরুনির দরকার হয়। পাঞ্জাবে শিখসম্প্রদায় মাথার চুলে চিরুনি বা কাঙ্গি ধারণ করাকে ধর্মীয় বিধি বলিয়া মানেন। বহু জাতির মধ্যে অশৌচকালে চিরুনির ব্যবহার নিষিদ্ধ। বঙ্গের মহিলাগণ পূর্বে অন্যান্য অলংকারের সহিত 'সুখে থাক' বা 'আশীর্বাদ' ইত্যাদি লেখা-যুক্ত সোনা-বাঁধানো চিরুনি খোঁপায় পরিতেন।

বাংলা দেশে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি স্থানে হাতে তৈয়ারি গজদন্তের চিরুনি একদা বিখ্যাত ছিল। মন্মথনাথ ঘোষ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপান হইতে চিরুনিশিল্প শিক্ষা করিয়া তাঁহার জন্মভূমি যশোহরে চিরুনির যন্ত্রচালিত কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই 'যশোহরের চিরুনি' সারা ভারতে প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ভারতের বাহিরেও ইহা রপ্তানি করা হয়। ক্রমে এদেশে বিলাতি চিরুনির আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই চিরুনি সেলুলয়েড-চাদর হইতে প্রস্তুত এবং যান্ত্রিক গোল-করাত দিয়া ইহার প্রত্যেকটি দাঁত সযত্নে কর্তিত হয়; সেজন্য ইহা খুবই মজবুত, দেখিতেও মনোরম। সেই তুলনায় ছাঁচ বা 'মোল্ড'-এ তৈয়ারি প্লাস্টিকের চিরুনি দামে সস্তা হইলেও তেমন মজবুত নহে।

বঙ্গ-বিভাগের পর পশ্চিম বঙ্গে বহু স্থানে সেলুলয়েডের চিরুনি তৈয়ারি হইতেছে এবং সেগুলিও 'যশোহরের চিরুনি' নামেই বাজারে প্রচলিত আছে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার অনটনের জন্য সেলুলয়েড চাদর জার্মানী বা জাপান হইতে চাহিদা অনুযায়ী আমদানি করিতে না পারায় পশ্চিম বঙ্গের এই চিরুনিশিল্প সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে।

কুমারেশ ঘোষ

চিল ফাল্‌কোনিফর্মেস বর্গের (Order-Falconiformes) অন্তর্গত আক্কিপিত্রিদী গোত্রের (Family-Accipitridae) সুবৃহৎ আবাসিক শিকারী পাখি। উপরের ঠোঁটটি বেশ শক্ত, ধারালো ও বক্রাগ্র। পায়ের শক্তিশালী আঙুলগুলি তীক্ষ্ণ নখর-যুক্ত। দিনের বেলায় বলিষ্ঠ ডানা মেলিয়া বহু উচ্চে বৃত্তাকারে ভাসিয়া বেড়ায় ও তীক্ষ্ণ চক্ষে শিকার সন্ধান করে, শিকার দেখিতে পাইলে ক্ষিপ্রগতিতে ছোঁ মারিয়া সুদৃঢ় পায়ের সাহায্যে শিকার ধরে ও ধারালো চঞ্চুর আঘাতে ছিঁড়িয়া খায়। ইহাদের ডাক সুতীক্ষ্ণ ও সুউচ্চ।

গোদাচিল বা সাধারণ চিল (মিল্‌ভস মিগ্রান্‌স, *Milvus migrans*) দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার। ইহারা লোকালয়ের মধ্যেই বাস করে। মানববসতি ও হাটবাজার হইতে নিঃক্ষিপ্ত আবর্জনা, মৃত প্রাণী প্রভৃতি এবং জীবিত পতঙ্গ, ইঁদুর, পাখি প্রভৃতি ছোঁ মারিয়া সংগ্রহ করিয়া আহার করে। হেমন্ত হইতে বসন্ত কাল পর্যন্ত বাসা বাঁধিতে পারে।

শঙ্খচিল (হালিআস্তর ইন্‌দস, *Haliastur indus*) জলাশয় নদী প্রভৃতির নিকটে থাকে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার। ডানা বাদামী, মাথা ও বুক শাদা, পুচ্ছের প্রান্ত গোলাকার। পতঙ্গ ব্যাঙ সরীসৃপ ও মাছ শিকার করিয়া খায়। শীত ও বসন্তে বাসা বাঁধে।

কৃষ্ণপক্ষ চিল (এলানস সীরুলিয়স, *Elanus caeruleus*) দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার। হালকা ধূসর দেহ ও ডানা। ডানার স্কন্ধদেশ কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু রক্তবর্ণ। ইহারা লঘু বনস্থলী ও ক্ষেত-খামারের নিকট বাস করে।

দ্র জগদানন্দ রায়, বাংলার পাখি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ; যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পশুপক্ষী, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ; E. C. Stuart Baker, *The Fauna of British India : Birds*, vol. V, London, 1928; Hugh Whistler, *Popular Handbook of Indian Birds*, London, 1949.

পদ্মোত্তমকুমার সেনগুপ্ত

চিল্‌ডার্স, রবার্ট সীজার (১৮৩৮-৭৬ খ্রী) ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চিল্‌ডার্স জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রেভারেণ্ড চার্লস্ চিল্‌ডার্স ছিলেন ইটালীর নীস্ শহরের ইংরেজ ধর্মযাজক। চিল্‌ডার্স অক্সফোর্ডের ওয়াড্‌হ্যাম্ কলেজ-এ হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বৃত্তি লাভ করেন। এখানকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলের সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ায় তাঁহাকে স্বদেশ ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া তিনি ইণ্ডিয়া অফিস-এ সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের (পালি) অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

সিংহলে অবস্থানকালে পালি ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। লণ্ডনে ফিরিবার পর রস্ট নামক তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ভাষাবিদ্ ও প্রত্নতাত্ত্বিকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া চিল্‌ডার্স অল্পকালের মধ্যেই পালি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদসমেত 'খুদ্দক পাঠ' নামক গ্রন্থ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে রস্টের প্রেরণায় ও উৎসাহে চিল্‌ডার্স পালি ভাষার অভিধান-সংকলনে ব্রতী হন। ১৮৭২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পালি অভিধানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। এই অভিধানে ১৭০০০ শব্দের ইংরেজী অনুবাদ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; প্রত্যেক শব্দের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, ভেদাভেদ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি সংযোজন করিয়াছেন এবং

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের সারমর্মের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার পালি অভিধানে ৩০ হাজার গ্রন্থের নাম এবং উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উক্তিগুলি সিংহলী অক্ষরে লিখিত তালপত্রের পুথি হইতে সংগৃহীত। প্রথম পালি শব্দকোষ প্রকাশিত হইবার ৫০।৬০ বৎসর পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রীস্‌ ডেভিড্‌স্‌ এবং স্টীড-এর সম্পাদনায় দ্বিতীয় পালি শব্দকোষ রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত চিল্‌ডার্স পালি ও সিংহলী ভাষার উপর কয়েকটি প্রবন্ধ এবং ১৮৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপরিনির্বাণসূত্ত ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। তিনি ফাউসবোলকে জাতকের সম্পাদনা কার্যে সহায়তা করেন।

দ্বিতীয় পালি শব্দকোষে ৪০ হাজার শব্দ সংগৃহীত হইলেও ইহা প্রথম অভিধানের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় অভিধানকে চিল্‌ডার্সের অভিধানের খিল বা পরিশিষ্টরূপে গণ্য করা চলে। চিল্‌ডার্সের অভিধানকে বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বকোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুলাই তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর হইয়াছিল।

নলিনাক্ষ দত্ত

চিল্‌ড্রেন্‌স অ্যাক্ট শিশু-অপরাধ দ্র

চিলিয়ানওয়ালা শিখ যুদ্ধ দ্র

চিল্কা লবণহ্রদ। ভারতের পূর্ব উপকূলে পুরী ও গঞ্জাম জেলার মধ্যে (১৯°২৮′ উত্তর হইতে ১৯°৫৬′ উত্তর এবং ৮৫°৯ পূর্ব হইতে ৮৫°৩৮′ পূর্ব মধ্যবর্তী অঞ্চলে) অবস্থিত। উত্তর-পূর্বে মহানদীর ব-দ্বীপ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালার সানুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হ্রদটির দৈর্ঘ্য ৭০ ও উত্তর দিকের প্রস্থ ৩০ কিলোমিটারের কম, আয়তন প্রায় ৮৭৫ বর্গ কিলোমিটার, কিন্তু গভীরতা গ্রীষ্মকালে গড়ে প্রায় ১·২ মিটারে নামিয়া আসে। পূর্বে ইহা বঙ্গোপসাগরের অংশবিশেষ ছিল, ক্রমে সমুদ্রস্রোতে তাড়িত বালুকা ও নদীর পলি পড়িয়া সমুদ্র হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। হ্রদে প্রচুর মাছ ও নানারকম পাখি পাওয়া যায়। মাছধরা ও লবণ-উৎপাদন স্থানীয় লোকের প্রধান উপজীবিকা। কলিকাতা-মাদ্রাজ রেলপথ হ্রদের পাশ দিয়া গিয়াছে, চিল্কা স্টেশন হ্রদের নিকটবর্তী হইলেও রম্ভা স্টেশনে নামিয়া হ্রদে যাওয়াই সুবিধাজনক।

দ্র *The Imperial Gazetteers of India*, vol X, Oxford, 1908.

অনিলকুমার কুণ্ডু

চীন ১৮° উত্তর হইতে ৫৩° উত্তর ও ৭৪° পূর্ব হইতে ১৩৪° পূর্ব। খাস চীন, অন্তর্মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং, মাঞ্চুরিয়া ও তিব্বত লইয়া চীন সাধারণতন্ত্র গঠিত। আয়তন ৯৭৬১০১২ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৪৩০০০০০ বর্গ মাইল)। ইহার উত্তরে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও বহির্মঙ্গোলিয়া, পশ্চিমে আফগানিস্তান, দক্ষিণে ভারতবর্ষ, নেপাল, ব্রহ্ম দেশ, লাওস ও উত্তর ভিয়েৎনাম, পূর্বে উত্তর কোরিয়া, পীত সমুদ্র, পূর্ব চীনসমুদ্র ও দক্ষিণ চীনসমুদ্র।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে চীন দেশকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, পূর্ব ভাগের নিম্নসমভূমি এবং পশ্চিম ও দক্ষিণের মালভূমি ও পর্বতসংকুল উচ্চভূমি। নিম্ন সমভূমি মাঞ্চুরিয়ার সমভূমি, হোয়াং-হো নদীর উপত্যকা-সহ উত্তর চীনের সমভূমি, ইয়াং-ৎসে কিয়াং নদীর উপত্যকা, সি-কিয়াঙ্‌ নদীর ব দ্বীপ অঞ্চল লইয়া গঠিত। ইহা সমগ্র ভূভাগের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র। নিম্নভূমির পশ্চিমে ১২০০ মিটার (৪০০০ ফুট) হইতে ১৫০০ মিটার (প্রায় ৪৯২০ ফুট) উচ্চ মালভূমি। উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় যথাক্রমে মঙ্গোলিয়ার মালভূমি, লোয়েস ইয়াং-ৎসে কিয়াঙ্‌ মালভূমি ও য়ুনান মালভূমি বর্তমান। মালভূমির পশ্চিমে বৃহৎ পর্বতমালা ও তিব্বতের ৪৫০০ মিটার (প্রায় ১৫০০০ ফুট) উচ্চ মালভূমি। তিব্বত মালভূমি উত্তরে ক্যানলুন ও দক্ষিণে হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। পামীর গ্রন্থি হইতে আলতাই, থিয়েনশান, ক্যানলুন, হিমালয় প্রভৃতি পর্বত শাখা-প্রশাখা-সহ চীন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। চীনের মধ্য ভাগে অবস্থিত চিন্‌-লিং-শান (পূর্বতন ৎসিংলিংসান) পর্বত হোয়াং-হো ও ইয়াং-ৎসে-কিয়াঙ্‌ নদী-অববাহিকাকে পৃথক করিয়াছে। সেইরূপ দক্ষিণেও কয়েকটি মালভূমি ও পাহাড় অবস্থিত থাকিয়া সি-কিয়াঙ্‌ নদী-অববাহিকাকে ইয়াং-ৎসে-কিয়াঙ্‌ অববাহিকা হইতে পৃথক করিয়াছে। চীন দেশের উত্তর-পশ্চিমের সীমা আলতাই ও দক্ষিণ-পশ্চিমের সীমা হিমালয়।

চীন দেশের ভূতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। বর্তমানে ইহার সম্বন্ধে বহু সমীক্ষা চলিতেছে। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় চীন দেশের উত্তর-পূর্বে শান-টুং উপদ্বীপ ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পূর্বের প্রাচীন কেলাসিত শিলায় গঠিত। উত্তর-পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের শিলা কার্বনিফেরাস ও

তাহার পূর্ব যুগের। কিন্তু এই অঞ্চল প্রায় ৩০০ মিটার (প্রায় ১০০০ ফুট) গভীর চুনমিশ্রিত নরম লোয়েস মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। মালভূমি ও উত্তর-পূর্বের প্রাচীন শিলাগঠিত অঞ্চলের মধ্য ভাগের প্রায় সমস্ত অংশের শিলা টার্শিয়ারি যুগের বেলে পাথর দ্বারা গঠিত। ইহার উপরিভাগ পাললিক শিলায় আবৃত। লোহিত অববাহিকা অঞ্চলটিতে ভূতত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের সময় এক বৃহৎ হ্রদ ছিল। ইহা টার্শিয়ারি ও রক্তবর্ণ বেলে পাথর দ্বারা পূর্ণ। চিন-লিং শান পর্বতের দক্ষিণে প্রায় সমস্ত অঞ্চলে চুনা পাথরের শৈলশিরা প্রক্ষিপ্তভাবে বর্তমান।

চীনের প্রধান নদীগুলি পশ্চিমের উচ্চ মালভূমি অঞ্চল হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হইতেছে। আমুর নদী য়াব্‌লোনোই পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া চীনের উত্তর পূর্বে মাঞ্চুরিয়ার সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িতেছে। অপর নদীগুলির মধ্যে হোয়াং হো, ইয়াং ৎসে কিয়াঙ্‌ ও সি কিয়াঙ্‌ প্রধান। এই তিনটি নদী খাস চীনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উহাকে উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য— এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে। উত্তর চীন হোয়াং-হো বা পীত নদীর অববাহিকা দ্বারা গঠিত। এই নদী তিব্বতের মালভূমি হইতে উত্থিত হইয়া মঙ্গোলিয়ার মালভূমি ও লোয়েস মৃত্তিকা অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে ('এশিয়া' দ্র)।

তিব্বতের মালভূমি হইতে ইয়াং ৎসে কিয়াং (নীলনদ) -এর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা মধ্য চীনের উপর দিয়া প্রবাহিত। ইহার অববাহিকা অতিশয় উর্বর। সি কিয়াঙ্‌ নদী (ওয়েস্ট রিভার) য়ুনান মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণ চীনে শাখা প্রশাখা-সহ এই নদী অতি গুরুত্বপূর্ণ জলপথের সৃষ্টি করিয়াছে। ইয়াং ৎসে-কিয়াঙ্‌ এর শাখা-নদী মিন জলপথ ও জলসেচ হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নদী। অন্যান্য শাখা নদীর মধ্যে কিয়া-লিঙ্‌-কিয়াঙ্‌, হান, সিয়াঙ্‌ ও কান নদী উল্লেখযোগ্য।

চীন দেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, কিন্তু ভূভাগের উচ্চাবচতা, সমুদ্র-সান্নিধ্য প্রভৃতি নানা কারণে ইহার তাপ ও বৃষ্টিপাত সর্বত্র সমান নহে। শীত ও গ্রীষ্মকালে মধ্য এশিয়ার বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের উপর চীন দেশের জলবায়ু সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শীতকালে জানুয়ারি মাসে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বায়ুমণ্ডলে সর্বাপেক্ষা অধিক চাপ সৃষ্টি হয়। সেই সময় উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে নিম্ন চাপের ফলে বৃষ্টি হয়। চীনের উত্তরে উচ্চ পার্বত্য বাধা না থাকায় উচ্চ চাপ হইতে নিম্ন চাপের দিকে যাইবার সময় অতি শীতল বায়ু অবাধে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ফলে সমগ্র চীন বিশেষ করিয়া উত্তর চীন প্রবল শীতের প্রকোপে পড়ে। ৩২° উত্তর অক্ষাংশের উত্তর অঞ্চলে জানুয়ারি মাসের তাপ ০° সেন্টিগ্রেড (৩২° ফারেনহাইট) পর্যন্ত হয়। শীতকালে দেশের আভ্যন্তরীণ নিম্ন অঞ্চলগুলি তীরবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ থাকে।

গ্রীষ্মকালে বায়ুমণ্ডলের চাপ ইহার বিপরীত অবস্থার হয়। সমুদ্রের উপর হইতে জলকণাসংপৃক্ত মৌসুমী বায়ু দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মকালে সমগ্র চীনে তাপের পরিমাণ প্রায় একই মাত্রায় হয়। গ্রীষ্মকালে পেকিং-এর তাপমাত্রা ২৬° সেন্টিগ্রেড (৭৯° ফারেনহাইট) সাংহাই-এর ২৬.৫° সেন্টিগ্রেড (৮০° ফারেনহাইট) ও হংকং-এর ২৭.৭° সেন্টিগ্রেড (৮২° ফারেনহাইট) হয়। মে হইতে সেপ্টেম্বর মাস বর্ষাকাল। দক্ষিণ ও পূর্বে সর্বাপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত হয়। ইয়াং ৎসে কিয়াঙ্‌-এর উত্তর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতেরই পরিমাণ ১০০ মিলিমিটারেরও (৪০ ইঞ্চি) অধিক। উত্তর চীন অতি শুষ্ক থাকে। এখানে পেকিং শহরে ৬২৫ মিলিমিটার (২৫ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়। মধ্য চীনে মৃদু ঘূর্ণবাতের প্রভাবে জুন ও আগস্ট এই দুই মাসে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত ঘটে। আগস্ট মাসের বৃষ্টিপাত টাইফুন ঝড়ের জন্য আরও প্রবল হয় এবং টাইফুনের জন্য ঐ অঞ্চলে সময়ে সময়ে বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে। চীনের পশ্চিমাংশের পার্বত্য ভূমির জলবায়ু শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন।

চীনের কৃষিসভ্যতা অতি প্রাচীন। বহু শতাব্দী ধরিয়া উহারা প্রাচীন প্রথায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একই ভূমিতে বহু প্রকার শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। জমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য রাসায়নিক সার বিশেষ ব্যবহার না করিয়া উর্বরা শক্তিসৃজনকারী উদ্ভিদের (শুঁটি-জাতীয়) ও মানুষের মলমূত্রের বিশেষ ব্যবহার করিয়া থাকে। দক্ষিণ ও মধ্য চীনের বৃষ্টিবহুল ও উর্বরা নিম্ন ভূমি অঞ্চলে ধানই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ছাড়া সি-কিয়াঙ্‌ নদী উপত্যকায় চা, ইক্ষু, তুঁতে, তামাক ও নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রাচীন কাল হইতেই চীনে চায়ের চাষ প্রচলিত। তিনটি নদী-উপত্যকা তুলার জন্য প্রসিদ্ধ। উত্তরের উচ্চ ভূমিতে নিকৃষ্ট প্রকারের ধান গম, বার্লি, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা উৎপন্ন হয়। চীন দেশের আর একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য সোয়াবিন ('এশিয়া' দ্র)। বনজ দ্রব্যের মধ্যে টাং তৈল ও কর্পূর উল্লেখযোগ্য।

চীনের অধিবাসীদের প্রায় ৭৫% কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল। সমগ্র চীনের প্রায় ১১২ মিলিয়ন হেক্টর (২৮০ মিলিয়ন একর) জমি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। চীন দেশ কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে আসার পর ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে আইন করিয়া বড় বড় জমিদারি লুপ্ত করিয়া সমগ্র কৃষিভূমি প্রকৃত চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাম অঞ্চলে পরস্পর সাহায্য-প্রতিষ্ঠান ও পরে যৌথ খামার স্থাপন করিয়া ছোট ছোট খামারগুলিকে একত্রিত করা হয়। এই যৌথ খামারগুলিতে ছোট ছোট খামারগুলির স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকে। যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও চীনে কৃষিকার্য এখনও পর্যন্ত মানুষের শ্রম ও পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই যৌথ খামারগুলি বিশালায়তন 'পিপল্‌স কমিউন' নামক নূতন ধরনের গ্রাম-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। উহারা কৃষির সহিত বয়নশিল্প, কার্পাসশিল্প, রেশম, চিনি, সোয়াবিন ও অন্যান্য কুটিরশিল্পও করিয়া থাকে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৪·৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন হইতে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত হয়। মৎস্যশিকার চীন দেশের অধিবাসীদের আর একটি প্রধান জীবিকা। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪৫৭০০০০ জন মৎস্যশিকারে নিযুক্ত ছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কুআন্‌-তুঙ্, ফু-কিয়ান্ ও চেকিয়াঙ্ প্রদেশ মৎস্যশিকারের জন্য প্রসিদ্ধ।

চীনের পার্বত্য অঞ্চল খনিজ সম্পদে পূর্ণ। কয়লা, অ্যান্টিমনি, টাংস্টেন ও তাম্র প্রধান খনিজ দ্রব্য। ইহা ছাড়া আকরিক লৌহ, গন্ধক, কেওলিন ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা হয়। শানসি, শেনসি ও হুনান অঞ্চলে চীনের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা পাওয়া যায়। উত্তর কিয়াংসি অঞ্চল টাংস্টেন-উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ। পারদ ও গন্ধক য়ুনান, হুনান ও সাণ্টুং প্রদেশে পাওয়া যায়।

১৯৫১-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে চীন দেশে মাঞ্চুরিয়াতে মাত্র একটি বৃহৎ লৌহ-শিল্পাঞ্চল ও কয়েকটি ছোট ছোট লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ছিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন লৌহের পরিমাণ ১·৯৬ ও ইস্পাতের পরিমাণ ১·৩৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছিল। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মধ্য চীনে আর একটি বৃহৎ লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া লৌহ ২০·৫ ও ইস্পাত ১৩·৩৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ৮·২৫ মিলিয়ন গাঁট সুতা উৎপন্ন করে। ইহা ছাড়া যন্ত্রপাতি-নির্মাণশিল্প, রাসায়নিক নানাবিধ শিল্প, সার প্রভৃতি শিল্পে উৎপাদনও প্রভূত বৃদ্ধি পায়।

খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক হইতেই চীন দেশ রেশমশিল্পে পৃথিবীর মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। চীন-ই রেশমশিল্পের প্রথম আবিষ্কারক। রেশম প্রধানতঃ চেকিয়াং, কিয়াংসু, কুআন্‌-তুঙ্ ও সেচুয়ানে উৎপন্ন হয়। কাগজের উৎপাদনেও চীন প্রথম পথপ্রদর্শক। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীন দেশে কাগজের উদ্ভাবন ঘটে। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বে বারুদের আবিষ্কার, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে মুদ্রণ-যন্ত্র ও দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কারের জন্যও চীন বিখ্যাত। অন্যান্য প্রাচীন শিল্পের মধ্যে অতুলনীয় চীনামাটির শিল্প ও লাক্ষাশিল্প উল্লেখযোগ্য। চীন দেশের অন্যান্য শিল্পগুলির মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত, কাষ্ঠশিল্প, কার্পাস, সিমেণ্ট, রবার প্রভৃতি প্রধান। পূর্বে লৌহ ও ইস্পাত ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান চীন দেশের দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া এবং পূর্ব উপকূলে অবস্থিত সাংহাই, ৎসিংতাও, তিয়েন্‌ৎসিন, মুকডেন, হারবিন প্রভৃতি বন্দর অঞ্চলেই ছিল কিন্তু বর্তমানে পেকিং, তাইয়ুআন, লান্‌চোও, সিয়ান প্রভৃতি দেশের অন্তর্বর্তী শহরে নূতন শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ('এশিয়া' দ্র)। সাম্প্রতিক বৎসরে চীন আণবিক শক্তির উৎপাদনে অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। পরবর্তী কালে আরও দুই বার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। রকেট টেক্‌নলজিতেও চীন যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। চীন বর্তমানে যন্ত্রপাতির নানাবিধ সরঞ্জাম, ইস্পাতের জন্য কাঁচামাল, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি আমদানি করার দিকে জোর দিয়াছে।

উর্বরা পীত নদীর অববাহিকায় চীন অধিবাসীদের আদি বসতি ছিল। অনুমান করা হয় যে শিয়া রাজবংশ প্রথম চীন দেশে রাজত্ব স্থাপন করেন (খ্রীষ্টপূর্ব ২২০৫-১৭৬৬)। ইহার পর আসে শাঙ্ রাজবংশ (খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৬৬-১১২২)। ইহাদের সময়ের ব্রঞ্জের উপর অপূর্ব কারুকার্য লোকের বিস্ময় উদ্রেক করে। চৌ-রাজবংশের রাজত্বে (খ্রীষ্টপূর্ব ১১২২-২৪৯) সামন্ত কৃষিসমাজ গঠিত হয়। সেচ ও অন্যান্য পদ্ধতি দ্বারা কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করা হয়। লৌহ ও অন্যান্য অনেক ধাতুর ব্যবহার এই সময় প্রবর্তিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী হইতেই চৌ-রাজাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় এবং চৌ-রাজত্ব পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া কয়েকটি যুধ্যমান অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই

বিশৃঙ্খলার যুগেই চীনে বহু চিরস্মরণীয় ধর্মগুরু ও দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত দার্শনিক কনফুশিয়স ও লাও-ৎসু এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দর্শন ও সাহিত্য দ্বারা চীন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এক নূতন আলোক প্রদান করেন ('কন্‌ফুশিয়স' দ্র)।

পরবর্তী ছিন রাজত্বের কালে (খ্রীষ্টপূর্ব ২২১-২০৭) চীনে প্রথম অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশের নামেই চীন দেশ অভিহিত। এই বংশের প্রথম সম্রাট ছিন-শি-হুয়াঙ্‌তী (প্রথম সম্রাট) উপাধি ধারণ করিয়া চৌদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্মূল করিয়াছিলেন এবং রাজ্যের সর্বত্র প্রবল কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যাযাবর মঙ্গোলীয়দের আক্রমণ হইতে উত্তর সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য তিনি বিখ্যাত 'চীনের প্রাচীর' নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পণ্ডিতদের চিন্তার প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য তিনি বিপুল গ্রন্থদাহ অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬ অব্দ হইতে ২২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হানবংশের রাজত্বকাল। হান রাজত্বকালেই কেন্দ্রীয় আমলা নিয়োগের জন্য চীনের সুবিখ্যাত রাষ্ট্রীয় পরীক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। হান যুগে যে অর্ধ সামন্ততান্ত্রিক সম্ভ্রান্ত জমিদারি প্রথা স্থাপিত হয়, তাহাই হেরফেরসহ বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই সময়ে চীন দেশে প্রভূত উন্নতি দেখা দেয়। রাজ্যের বিস্তৃতি পশ্চিমে আরও বৃদ্ধি পায়। বিদেশের বহু রাজ্যের সহিত এমন কি রোম পর্যন্ত বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাহিত্য, শিল্পকলা, সামরিক বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের পুনরুজ্জীবন ঘটে ও তাহাদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

হান রাজত্বের অবসানের পর সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া চীনে বহু খণ্ড রাজ্য ও নিরন্তর যুদ্ধ দেখা দেয়। যাযাবর জাতিরা উত্তর ও পশ্চিম চীন বার বার লুণ্ঠন করে। চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর অঞ্চলে ইহারা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। তদানীন্তন সম্রাটগণ মধ্য ও দক্ষিণ চীনে 'উ' (wu) রাজ্য স্থাপন করিয়া নানকিং-এ তাহাদের রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের ফলে কন্‌ফুশীয় প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় চীনে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানচর্চার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সুই রাজত্বকালে (৫৯০-৬১৮ খ্রী) ও টাং রাজত্বকালে (৬১৮-৯০৬ খ্রী) চীনকে পুনরায় একত্রিত করা হয়। দ্বিতীয় টাং সম্রাট তাই-সুঙ্‌-এর রাজত্বকালে (৬২৭-৪৯ খ্রী) চীন দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী ও পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া ওঠে। টাং যুগে কাব্য ও চিত্রকলার উত্তুঙ্গ বিকাশ ঘটে।

টাং সাম্রাজ্যের পতনের পর চীনের রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনরায় ভাঙিয়া যায় এবং পঞ্চরাজ্যের যুগ (৯০৭-৬০ খ্রী) ও উত্তর চীনে অবিরাম যুদ্ধ দেখা দেয়। টাং সাম্রাজ্যোত্তর নৈরাজ্যের কালেই চীনে পুস্তকমুদ্রণ ও পুস্তকপ্রচার শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতক হইতে চীনে বাণিজ্যের, বিশেষতঃ চা-বাণিজ্যের প্রসার ও বড় বড় হস্তচালিত কারখানা স্থাপিত হয়। সুং রাজত্বকালে (৯৬০-১২৭৯ খ্রী) চীন সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, দক্ষিণ দিকে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে এবং চীনে দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তার উৎকর্ষ ও চিত্রকলার বিকাশ সাধন হইতে থাকে। কিন্তু সামরিক শক্তির দিক হইতে সুং সাম্রাজ্য ছিল দুর্বল। তাতারেরা ইয়াংৎসির উত্তরাঞ্চল দখল করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিজ খাঁ চীন আক্রমণ করিয়া উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম চীনে আধিপত্য স্থাপন করেন। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোল সেনাপতি কুবলাই খাঁ সমগ্র চীনে মঙ্গোল সাম্রাজ্য (১২৬০-১৩৬৮ খ্রী) স্থাপন করেন। কুবলাই খাঁর সময়েও চীন দেশ অনেক উন্নত হয় ('কুবলাই খাঁ' দ্র)। ইওরোপীয় মার্কো পোলো প্রভৃতি পর্যটকগণ, বণিকগণ ও বিদেশী মিশনারীগণ উহাদের রাজধানী কাম্বালুকে আগমন করেন। পরবর্তী কালে নানা বিপর্যয়ের পর মিঙ্‌ রাজবংশ (১৩৬৮-১৬৪৪ খ্রী) নানকিং-এ তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহারা সম্পূর্ণ চীন দেশের অধিবাসী। এই সময়ে দেশের সংস্কৃতিকে বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার প্রয়াস চলে। কৃষক-বিদ্রোহের ফলে মিঙ্‌ রাজত্বের অবসানের পর উত্তর-পূর্ব দিকের উপজাতিগণ চীন দেশে আসিয়া মাঞ্চু রাজত্ব (১৬৪৪-১৯১২ খ্রী) স্থাপন করেন। ইঁহারা বিদেশী হইলেও পরবর্তী কালে চীনা সংস্কৃতি, শাসনপদ্ধতি, আইন প্রভৃতি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেন। ইঁহাদের সময়ে তিব্বত, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া চীন দেশের সহিত যুক্ত হয়। তখনকার বাণিজ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যান্টনে একটিমাত্র বন্দর খোলা হয়। ব্রিটিশদের অবাধ বাণিজ্য বৃদ্ধি, তাহাদের জবরদস্তি আফিম আমদানি নীতির ফলে ১৮৩৯-৪২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত আফিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়। নানকিং চুক্তিতে ক্যান্টন, আময়, ফু-চাউ, সাংহাই এবং নিঙ্‌-পো— এই পাঁচটি বন্দর বিদেশীদের সুবিধাজনক শর্তে খুলিতে বাধ্য করা হয়। হংকং-এর উপর ব্রিটিশের আধিপত্য কায়েম হইয়া বর্তমান কাল অবধি বজায়

আছে। ১৮৫৬-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে চীনের পুনরায় যুদ্ধ বাধে এবং চীন আবার পরাজিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের তিয়েন-ৎসিন চুক্তি এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে আরও অনেক বন্দর বিদেশী বাণিজ্যের জন্য খোলা হয়, বিদেশীরা পেকিং-এ দূতাবাস-স্থাপনের অধিকার পায় ও আফিম-বাণিজ্যকে আইনতঃ বৈধ করা হয়। দুর্বল ও অত্যাচারী মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইল হুং সিউ-চুয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত তাইপিং বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা নানকিং অধিকার করিয়া একাদিক্রমে প্রায় বারো বৎসরের জন্য স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। অবশেষে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী শক্তির সাহায্যে মাঞ্চুরা এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী চীনের কয়েকটি বন্দর অধিকার করিয়া লয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী প্রভাব অপসারণের জন্য প্রথম বক্সার বিদ্রোহ হয়। পরবর্তী কালে ক্রমাগত অন্তর্বিদ্রোহ করিয়া মাঞ্চু রাজত্বের অবসানের চেষ্টা চলে। জাতীয় দলের নেতৃত্বে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা বালক সম্রাটকে রাজ্যচ্যুত করিয়া চীন প্রজাতন্ত্র গঠিত করে। প্রথমে ইহার শাসন-কর্তা ছিলেন সান-ইয়াৎ-সেন। কিন্তু ইউয়ান-শি-কাই চীন-প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে অন্তর্বিদ্রোহের ফলে পেকিং অঞ্চল যুদ্ধের অধিনায়কদের হাতে চলিয়া যায়। সান ইয়াৎ-সেন ক্যাণ্টনে তাঁহার জাতীয় দলকে সুদৃঢ় করিতে থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পেকিং গভর্নমেণ্ট ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। দক্ষিণে ক্যাণ্টনে কমিউনিস্টদের সহায়তায় জাতীয় দল আরও সুদৃঢ় হয়। সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাইশেক দেশকে জাতীয় শাসনের অধীনে একত্রিত করিয়া নানকিং-এ রাজধানী স্থাপন করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট ও জাতীয় দলের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় এবং বিবাদ গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। ১৯৩১-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়া জাপান উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়া ও কয়েকটি বন্দর দখল করে। এই জাপানী অনুপ্রবেশের ফলে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন ও জাপানে যুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে সাময়িকভাবে গৃহযুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে একত্রে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবধি চলে এবং জাপান বেশির ভাগ অর্থনৈতিক অঞ্চল অধিকার করে। ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাহায্যে জাতীয়তাবাদী চীনাগণ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ও কমিউনিস্টরা উত্তরে জাপানকে প্রতিহত করে। ইহার ফলে কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুনরায় এই দুই দলে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় দল হারিয়া তাইওয়ানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টগণ চীন-সাধারণ-তন্ত্র ঘোষণা করে। বর্তমানে মূল ভূখণ্ডে সর্বত্র কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেবল তাইওয়ান, মাৎসু, কুইময় প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ হইতে জাতীয় দল ক্ষমতাচ্যুত হয় নাই।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুসারে লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি। শহরে ১৩·৫% ও গ্রামাঞ্চলে ৮৬·৫% লোকের বাস। ইয়াংৎসে-কিয়াঙ উপত্যকায় লোক-সংখ্যার ঘনত্ব সবাপেক্ষা বেশি, প্রতি বর্গ মাইলে ৬৫০ জন। পর্বতসংকুল পশ্চিম দিকে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১০০০০০ লোকসংবলিত শহরের সংখ্যা ১৫৯টি ছিল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে চীনের জনসংখ্যা ৭৫ কোটি।

পেকিং চীন সাধারণতন্ত্রের রাজধানী। অন্যান্য শহরের মধ্যে সাংহাই, তিয়েন-ৎসিন, চুংকিং, ক্যাণ্টন, উহান, হারবিন, নানকিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চীনের অধিবাসীরা প্রায় ৫২টি জাতিতে বিভক্ত হইলেও উহাদের ইন্দো-চৈনিক ও আল্তাই, এই দুইটি প্রধান গোষ্ঠী হিসাবে ভাগ করা যায়। ইন্দো চৈনিকগণ অধিকাংশ চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আল্তাই গোষ্ঠী উত্তর-পশ্চিমে বসবাস করেন। চীনা ভাষা চীনা তিব্বতী ভাষার অন্তর্গত ('চীনা ভাষা' দ্র)।

বহু দিন ধরিয়া চীনে কনফুশিয়স প্রবর্তিত কনফুশীয়, লাওৎসু-প্রবর্তিত তাও ও বৌদ্ধ, এই তিনটি ধর্মমত প্রচলিত রহিয়াছে। জনসাধারণের ধর্ম এই তিনটি মতের সংমিশ্রণে গঠিত।

কমিউনিস্ট-শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ১৫% ছাত্রের উপযুক্ত স্কুল ছিল। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়-সহ ২২৭টি উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ৪৮টি টেকনলজি ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ৩১টি কৃষিশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ৩৭টি চিকিৎসাশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ছিল। উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কোনও বেতন গ্রহণ করা হয় না। বয়স্ক-শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয়, আংশিক প্রাথমিকশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নানারূপ ব্যবস্থা আছে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সাধারণতন্ত্রে ২৯৩৯৩ কিলোমিটার (১৮৩৭১ মাইল) রেলপথ ছিল। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাস্তার

পরিমাণ প্রায় ৪৮০০০০ কিলোমিটার (২৯৮২৪০ মাইল) ও জলপথের পরিমাণ প্রায় ১৬০০০০ কিলোমিটার (৯৯৭৪০ মাইল) ছিল। তিনটি প্রধান নদী জলপথের প্রধান সহায়। পেকিং-এর সহিত রেঙ্গুন, হ্যানোয়, মস্কো প্রভৃতি শহর আকাশপথ দ্বারা যুক্ত। চীনের আয়তনের তুলনায় বিমানপথের দৈর্ঘ্য কম। পেকিং হইতে লাসা, কাশগর, গোবি পর্যন্ত প্রাচীন পায়ে চলা পথ আছে। বর্তমানে 'লাসা কাঠমণ্ডু' ও অন্যান্য আধুনিক পথ নির্মিত হইয়াছে।

চীন দেশের চিত্রকলা অনবদ্য সম্ভারে পূর্ণ ('চিত্রকলা' প্রবন্ধে 'চীনা চিত্রকলা' অনুচ্ছেদ দ্র)।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী বৌদ্ধ ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত। তুন হুয়াং গুহার প্রাচীন বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও চিত্র এবং ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত ৬টি ঘোড়াযুক্ত সম্রাট ৎসাং (Tsang) এর কবর সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। ইহা ছাড়া প্রাচীন ব্রঞ্জের পাত্রগুলি ঐ সময়কার শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে।

প্রাচীন যুগ হইতে চীনা সাহিত্য সম্পদ সাহিত্য-জগতে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। কনফুসিয়স, লাও ৎসু, লিপো প্রভৃতি মনীষীগণ তাঁহাদের অমূল্য অবদানের দ্বারা চীনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছেন ('চীনা সাহিত্য' দ্র)।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভ হইতেই ভারত ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে ও একাদশ শতক পর্যন্ত চলিতে থাকে। ভারতীয় পণ্ডিতগণ চীনে গমন করিয়া চীনা ভাষায় অসংখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কুমারজীব (খ্রীষ্টপূর্ব ৪ ৫), পরমার্থ (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ শতাব্দী), বোধিধর্ম (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক), অতীশদীপংকর শ্রীজ্ঞান (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক) সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠার সময়ে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের নাম বিশেষভাবে জড়িত। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক হইতে চীনা পরিব্রাজকগণ ভারতে আসিতে শুরু করেন। ফা-হিয়েন (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতক), হিউএন ৎসাং এবং ই ৎসিঙ (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) প্রমুখ পরিব্রাজকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান উৎস।

দ্র L. C. Goodrich & H. C. Fenn, *A Syllabus of the History of Chinese Civilization and Culture*, New York, 1951; J Needham, *Science and Civilisation in China*, vol. I, Cambridge, 1954; L. Carrington Goodrich, *A Short History of the Chinese People*, London, 1957; L. D Stamp, *Asia: A Regional and Economic Geography*, London, 1959, Edgar Snow, *The Other Side of the River*, London, 1963.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
উষা সেন

চীন কিলীচ খাঁ (১৬৭১-১৭৪৮ খ্রী) মীর কমরুদ্দীন চীন কিলীচ খাঁ ছিলেন দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁহার পিতামহ ও পিতা বোখারা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। মীর কমরুদ্দীনের জন্ম হইয়াছিল ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগস্ট। তের বৎসর বয়সে তিনি মোগল বাহিনীতে যোগদান করেন এবং তাঁহার কর্মদক্ষতায় পদোন্নতি ত্বরান্বিত হয়। ১৬৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন কিলীচ খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন এবং ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময়ে (১৭০৭ খ্রী) তিনি ছিলেন বিজাপুরের শাসনকর্তা। পরে তিনি অযোধ্যা, দাক্ষিণাত্য, মোরাদাবাদ এবং মালব প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তারূপে কার্য করিয়া মোগল সম্রাটের উজীরের পদও লাভ করিয়াছিলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৭২২ খ্রী)। খান-ই-খানান এবং নিজাম-উল-মুল্ক প্রভৃতি আরও উপাধি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে দরবারের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি নিজ সুবা দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সভাসদগণের প্ররোচনায় প্রেরিত সম্রাটের বাহিনীকে পরাজিত করিয়া (অক্টোবর, ১৭২৪ খ্রী) স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। সম্রাট তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং 'আসফ জা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার সুশাসনে রাজত্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ন্যায্য হারে রাজস্ব নির্ধারণ এবং বে-আইনি শুল্ক রহিত করায় কৃষক ও বণিকগণ উপকৃত হয়।

সমর বিশারদ এবং সুশাসক ব্যতিরেকে তিনি ছিলেন কবি (ফরাসী ভাষায়)। তিনিই নিজামাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র W. Irvine, *Later Mughals*, Jadunath Sarkar, ed., Calcutta, 1922, *The Cambridge History of India*, vol IV, Cambridge, 1937

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

চীন বিপ্লব চীন দ্র

চীনাবাদাম শিম্ব গোত্রের (ফ্যামিলি লেগুমিনোসী, Family-Leguminosae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী

বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ, বিজ্ঞানসম্মত নাম আরাকিস হিপোগীয়া (*Arachis hypogaea*)। বর্তমানে প্রায় সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ চীন আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকায় চীনাবাদামের যথেষ্ট চাষ হয়। কাণ্ড দুর্বল, মাটির উপর লতানে উদ্ভিদের মত জন্মায়। পত্র যৌগিক। ফুল দেখিতে শণ ফুলের মত। ১-৩টি বীজযুক্ত শিম্ব-জাতীয় ফলটি কঠিন আবরণে আবৃত। ফুল মাটির উপরেই হয়, গর্ভাধানের পর ডিম্বাশয়ের তলদেশ বৃন্তের মত বর্ধিত হইয়া ফলটিকে মাটির নীচে ঠেলিয়া দেয় এবং প্রায় দুই মাস ভূগর্ভে থাকিয়া ফলটি পূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেকটি বীজে বাদামী খোসার দ্বারা আবৃত ও খাদ্যপূর্ণ দুইটি শ্বেত বীজপত্র থাকে।

চীনাবাদামের বীজে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন বি প্রভৃতি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। চীনাবাদামের বীজ ঘানিতে পিষিয়া বাদাম তৈল নিষ্কাশন করা হয়, শোধিত উৎকৃষ্ট তৈল রন্ধন ও বনস্পতি উৎপাদনে এবং নিকৃষ্ট তৈল সাবানশিল্পে, যন্ত্রাদিতে ও আলো জ্বালাইবার কার্যে ব্যবহৃত হয়। বাদাম তৈলের অণুগুলি অনেকাংশে অসংপৃক্ত, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অণুগুলিকে হাইড্রোজেনের দ্বারা সংপৃক্ত করিয়া 'বনস্পতি' প্রস্তুত করা হয়। চীনাবাদাম ভাজিয়া খাইবার প্রথা সুপ্রচলিত। মিষ্টান্ন প্রভৃতিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫১।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে এশিয়া এবং আফ্রিকায় চীনাবাদাম আনীত হয়। তৈলবীজের মধ্যে মূল্য বিচারে ইহার স্থান সর্বাগ্রে। চীনাবাদামের চাষ এবং উৎপাদন ভারতেই প্রথম শুরু হয়। পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ১৭২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইহার চাষ হয় এবং প্রায় ১৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতে বার্ষিক চাষ হয় প্রায় ৭১ লক্ষ হেক্টর জমিতে এবং ফলন প্রায় ৬২ লক্ষ মেট্রিক টন। হেক্টর প্রতি খোসাযুক্ত চীনাবাদামের ফলন গড়ে বৃষ্টির চাষে ৯-১৬ কুইন্টাল এবং সেচের চাষে ৩৪ কুইন্টাল। চীনাবাদামের দানার ভাগ ওজনের শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ হইয়া থাকে এবং দানা হইতে পাওয়া তৈলের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত।

প্রধানতঃ খরিফ শস্য হিসাবেই চীনাবাদামের চাষ হয়। চাষের পক্ষে দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, এঁটেল মাটি অনুপযুক্ত। তুহিন, অত্যধিক খরা বা জল জমা ক্ষতিকর। বার্ষিক প্রায় ৫০-১২৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতে সাফল্যের সহিত চাষ করা যায়। জমি চার-পাঁচ বার চাষ দিয়া ঝুরঝুরা করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণেই খোসাবিহীন দানা সারিবদ্ধ ভাবে বপন করা হয় এবং প্রকার অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ৮২ ১১২ কিলোগ্রাম বীজ লাগে। শিম্ব গোত্রের ফসল বলিয়া শিকড়ের অর্বুদ হইতে নাইট্রোজেন মাটিকে উর্বর করে এবং এই কারণেই জমি সরস হইলে কোনও সার প্রয়োগ করা হয় না। তবে ভাল ফসলের জন্য হেক্টর প্রতি বৃষ্টির চাষে ২২ কিলোগ্রাম ফসফেট এবং সেচের চাষে ১৭ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন ও ৩৪ কিলোগ্রাম ফসফেট-ঘটিত সার প্রয়োগ অনুমোদন করা হয়। কার্তিক মাস হইতে ফসল তোলা আরম্ভ হয়।

চীনাবাদামের তৈলই বর্তমানে বনস্পতি প্রস্তুতের প্রধান উপাদান। তৈল নিষ্কাশনের পর খইল উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য ও জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। চীনাবাদামের খইলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং কতকগুলি ভিটামিন থাকে। আমাদের খাদ্যে প্রোটিনের নিতান্ত অভাবের দরুন স্বল্প-স্নেহপদার্থযুক্ত চীনাবাদাম খইলের ময়দার সহিত ভাজা ছোলাচূর্ণ অথবা আটা মিশাইয়া সর্বার্থসাধক খাদ্য, বিস্কুট ইত্যাদি তৈয়ারির অনেক গবেষণার ফলে বর্তমানে বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সকলের বিশেষ খাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

দ্র Central Food Technological Research Institute, *Groundnut and its utilization*, Mysore, 1959, Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966; Food and Agriculture Organisation, United Nations, *Production Year Book, 1965*, vol. 19, Rome, 1966.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

চীনা ভাষা চীনা ভাষা বলিতে প্রধানতঃ চীন দেশের হান (Han) জাতির ভাষাকেই বুঝায়। সুতরাং এই ভাষাকে হান-যু (Han-yu) বা হান ভাষা বলিয়া অভিহিত করা হয়। হান ভাষার অন্তর্গত আটটি উপভাষা আছে; যথা — উত্তর চীনের পেকিঙ ভাষা, হুনান ভাষা, কিয়াংসু-চেকিয়াঙ ভাষা, কিয়াংসি ভাষা, উত্তর ফুকিয়েন

ভাষা, দক্ষিণ ফুকিয়েন ভাষা, হাক্কা ভাষা এবং তুঙ ভাষা।

চীনের রাজকর্মচারীবৃন্দ উত্তর চীনের পেকিঙ ভাষায় প্রশাসনিক কার্য চালাইতেন বলিয়া ইহা কোয়ান-হোয়া (Kuan-Hua) বা ইংরেজীতে 'ম্যাণ্ডারিন ল্যাঙ্গোয়েজ' নামে পরিচিত। চীনা ভাষায় কোয়ান শব্দের অর্থ রাজকর্মচারী। উত্তর চীনের হান জাতি-অধ্যুষিত সমগ্র প্রদেশগুলি এবং ইয়াং-ৎসী (Yang-tse) নদের দক্ষিণ-কূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার শতকরা ৯০জনের অধিক অধিবাসী কোয়ান-হোয়ায় কথা বলে। এই ভাষা এবং পেকিঙ শহর ও শহরতলির অধিবাসীদের মুখ কথিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বর্তমান চীনা সরকার সঠিক পেকিঙ ভাষাকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র চীনে ফু তুঙ-হোয়া (P'u-t'ung-hua) বা সর্বজনীন ভাষা চালু করিতেছেন। পেকিঙ ভাষার বিশেষত্ব এই যে, শব্দের অন্তে n ও -ng ছাড়া অন্য কোনও ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে না। হান ভাষার দ্বিতীয় প্রধান ভাষা হইতেছে কাণ্টন-অঞ্চলের (Cantonese dialect)। ইহাতে শব্দের অন্তে ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে শব্দের অন্তে p, -t, k উচ্চারিত হয়।

হান ভাষার উপভাষা সমূহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে কোনও এক শব্দের উচ্চারণের টোনের (Tone) বা স্বরের ওঠা নামার পার্থক্যে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন হয়। পেকিঙ ভাষায় কথিত শব্দগুলি চারি প্রকার স্বরে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন মা (ma) এই শব্দটি স্বরের কোনও ওঠা নামা না করিয়া দীর্ঘ স্বরে মা (mā) উচ্চারণ করিলে ইহার অর্থ হইবে মাতাও, স্বর ঊর্ধ্বগামী হইলে মা (má) ইহার অর্থ হইবে পাট বা শণ, স্বর ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে আসিয়া পুনরায় ঊর্ধ্বে উঠিলে অর্থ হইবে অশ্ব, এবং ক্ষিপ্রতার সহিত স্বর নিম্নাভিমুখী হইলে (mà) ইহার অর্থ হইবে ভর্ৎসনা করা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন চীনা ভাষা মনোসিলেবিক বা এক-স্বরযুক্ত হইলেও আধুনিক ভাষা বস্তুতঃ পলিসিলেবিক বা বহুস্বরযুক্ত।

চীনা লিপি দুই প্রকারের – পিক্টোগ্রাফ বা চিত্রলিপি এবং ইডিওগ্রাফ বা ভাবলিপি। প্রবাদ আছে চীন সম্রাট ফু-শি (খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৫২-২৭৩৮) চীনা লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বস্তুজগতের বহু জিনিস চিত্রলিপির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত খাংশি (Khangshi) অভিধানে এইরূপ সবসমেত ৪০৫৪৫টি শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। বর্তমান চীনা সরকার 'সর্বজনীন ভাষা'-র উচ্চারণ রোমান লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করিবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

নারায়ণচন্দ্র সেন

চীনামাটি সেরামিক দ্র

চীনা সাহিত্য জগতের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে চীনা সাহিত্যের স্থান অতি উচ্চে, চীনা ভাষার অক্ষুণ্ণ ধারাবাহিকতা ইহার একটি প্রধান কারণ। মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী হইতে অধুনাতন কাল পর্যন্ত চীনা সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, অবশ্য চীনা সাহিত্যের মধ্যে নিহিত গভীর দর্শন, ইহার সৌন্দর্য ও ইহার মানবিকতাই ইহাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়াছে। চীনা ভাষা যখন একেবারে গোড়ার দিকে হাড়ে ও কচ্ছপের খোলায় এবং তামার পাত্রে খোদাই করিয়া শুরু হয়, তখন হইতেই সাহিত্যের ঝোঁক হয় ঐতিহাসিকত্বের দিকে। সেইজন্য ইতিহাসরচনাকে চীনা সাহিত্যে বরাবর উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তবে সাধারণ মানুষের আমোদ আহ্লাদকেও যথেষ্ট সম্মান দিয়া সাহিত্যের অংশ হিসাবে ধরা হইয়াছে। কিংবদন্তি আছে যে খুঙ্‌ফু-ৎস (K'ung-Fu-tse, কনফুশিয়স, খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১ ৪৭৯) স্বয়ং 'শি-চিং' (*Shih-ching*) পুস্তকে পুরাতন গানের সংকলন করেন। তাহা ছাড়া 'শু-চিং' (*Shu ching*) এবং 'য়ী-চিং' (*Yi-ching*) এই দুইটি পুরাতন সংকলনে ইতিহাস এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা রহিয়াছে। সাধারণ মত অনুসারে এই গ্রন্থগুলি একজনের রচিত নহে, পুরুষানুক্রমে বহু ব্যক্তির রচনা এইগুলিতে গ্রথিত রহিয়াছে।

চৌ রাজবংশের (১১শ শতাব্দী-২৭৯ খ্রীষ্টপূর্ব) শেষ সময়ে সেই যুগে তাওবাদীদের অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের প্রচারের মধ্যে 'তাও-তেঃ-চিং' (*Tao-teh ching*) গ্রন্থ এবং চুআং-ৎস গ্রন্থই প্রধান হইয়া ওঠে। এই দুইটি গ্রন্থের মধ্যে কাব্য ও দর্শনের অপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ্য করার বিষয়। চীন দেশের দক্ষিণে সেই সময়ে চু-রাজ্যে যে কাব্য-ধারার প্রচলন ছিল, সেই জাতীয় কবিতাগুলিই 'চু-ৎস' (*Ch'u-Tse*) বা চু-রাজ্যের গাথা-পুস্তকটিতে সংকলিত হইয়াছে। চু-রাজ্যের কবিদের মধ্যে চু-ইউয়ানের (Ch'u-Yuan) রচিত লি-সাও (*Li-Sao*) কাব্যটিকে জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যের অংশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

হান রাজত্বের শেষ সময়ে (২২০ খ্রী) দর্শন হইতে

সাহিত্যের ঝোঁকটা ব্রহ্মবিদ্যার উপর আসিয়া পড়ে। খুঙ্ ফু ৎস দর্শন এই সময়ে সর্বপ্রধান হইয়া পড়ে এবং খুঙ্ বাদী ও তাও-বাদীদের মধ্যে প্রচুর বাদানুবাদ চলে। এ সম্পর্কে ওয়াঙ্ চুঙ্ (Wang-c'hung, ২৭ ৯৭ খ্রী) এর 'লুন-হঙ্' একটি প্রসিদ্ধ আলোচনা পুস্তক। স্যু মা-ছিয়েনের (১৪৫ ৯৭ খ্রী) প্রসিদ্ধ 'শ্র চি'ও এই সময়ে লেখা হয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু শতক ধরিয়া ইহা চীনা ভাষায় আদর্শ পুস্তক বলিয়া অনুসৃত হয়। হান রাজত্বের কাব্যসম্ভারের মধ্যে কবি মেই সঙ্ (মৃত্যু খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০) এবং কবি সামা শিয়াঙ রু (মৃত্যু খ্রীষ্টপূর্ব ১১৭) রচিত 'ফু' (*Fu*) নামক কাব্য চীনা সাহিত্যে বাক্য-সম্ভার এবং ধ্বনিপ্রাচুর্যে বিখ্যাত। অপর দিকে হান রাজত্বের 'ইউয়ে ফু' কাব্যগুলি 'ফু' কাব্যের বাক্য এবং শব্দের ঢেউ হইতে উঠিয়া আসিয়া সোজা ভাষায় মনের কথা বলিবার পদ্ধতি লইয়াছে। প্রায় একই সময়ে এই দুই ধরনের কাব্যে দুই ধরনের ভাষা একই দেশে লিখিত হইতেছে ইহা বড় একটা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

হান রাজত্বের পতনের পর চীনা কাব্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। থাও ছিয়েন (৩৭২-৪২৭ খ্রী) তাহার কবিতায় একটির পর একটি দৃশ্যপট আঁকিয়া চলিয়াছেন অথচ তিনি নিজে যেন সেই পটভূমিকার বাহিরে। থাও ছিয়েনের এই বন্ধনমুক্ত উদাসীন ভাবটি তাঁহার কাব্যকে দেশ কালের বহু ঊর্ধ্বে উঠাইয়া রাখিয়াছে। থাও ছিয়েনের সময় হইতে চীনা কবি এবং চিত্রকরদের মধ্যে দলাদলির ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দলগুলি চীন দেশের কাব্য, দর্শন ও চিত্রপটরচনা ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে চলে। তৃতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ 'বাঁশবনের সাত মনীষী' দলটি এখনও প্রসিদ্ধ আছে।

তৃতীয় শতাব্দী হইতে চীনা কাব্যে একটা বাঁধাধরা কাঠামো তৈয়ারির দিকে কবিরা ঝুঁকিয়া পড়েন। এই কাঠামোটিকে 'সমান্তরলতা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই কাঠামোর মধ্যে শব্দের ভিতর দিয়া ছন্দের আভাষও দেওয়া হইয়াছে। চীনা ভাষায় এই ছন্দের গুরু শেন ইও (Shen-Yo, ৪৪১ ৫১৩ খ্রী) কাব্যে যে নিয়মানুবর্তিতা শুরু করেন তাহা চরমে পৌঁছায় থাং (T'ang) রাজত্বের সময়ে (৬১৮-৯০৭ খ্রী) এবং সুং (Sung) রাজাদের সময়ে (৯৬০-১২৭৯ খ্রী)। এই সময়ে কাব্যে লী-পো (Li Po, ৭১০ ৬২ খ্রী), তু ফু (Tu Fu, ৭১২-৭০ খ্রী) এবং পো চূ ই (Po Chu-i, ৭৭২ ৮৪৬ খ্রী) তিন জনেই বিশ্বকবির সম্মান পাইয়াছেন। থাং রাজত্বের সময় লেখা ছোয়ান থাং শ্র (Ch'uan Tang) সংকলনের মধ্যে ৫০ হাজার কবিতার স্থান হইয়াছে। এদিকে গদ্যরচনায় থাং রাজত্বের লিও ৎসুং ইউয়ান (Liu-Tsung-Yuan, ৭৭৩ ৮১৯ খ্রী), হান ইউ (Han-Yu, ৭৬৮ ৮২৪ খ্রী) এবং ঔ ইয়াং শিউ (Ou-Yang-hsiu, ১০০৭ ৭২ খ্রী) ইহারা সকলেই কু ওয়েন (*Ku-Wen*) বা প্রাচীন গদ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। অথচ এই গদ্যকারগণ সকলেই নাম করা কবিও ছিলেন। চীনা সাহিত্যে কাব্যের স্থান বরাবরই সর্বোচ্চে। সুং রাজত্বের সময় নূতন ধরনের ৎস (Tsze) কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। ইহার প্রধান রচয়িতা ছিলেন সু শ্যঃ (Su-Shih, ১০৩৬ ১১০১ খ্রী)। এই ধরনের কবিতায় ধ্বনি এবং আবেগেরই প্রাধান্য।

থাং রাজত্বকালে গল্পরচনার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে লিখিত গল্পগুলির ছোয়ান চি (ch'uan chi) বা বিস্ময়কর ঘটনা বলা হইয়া থাকে। ক্রমে নবম শতাব্দীতে প্রেমের গল্পও দেখা দেয়। প্রেমের গল্পের সংকলন 'যিং যিং চুয়ান' (Ying Ying Chuan) [illegible] প্রসিদ্ধ। থাং রাজত্বের পর হইতে চীনা সাহিত্যে [illegible] উৎকৃষ্ট গল্পের বড় আর রচিত হয় নাই। [illegible] সপ্তদশ শতাব্দীতে পু সুং [illegible] লিন (Pu Sung-lin, [illegible] খ্রী) -এর রচিত [illegible] (*Liao chai-chih I*) [illegible] হুইটে গল্পগুলি আমাদের [illegible] ছোয়ান ছি (*ch'uan ch'i*) গল্পগুলির কথা [illegible] করাইয়া দেয়।

থাং রাজত্বের সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের [illegible] এবং গাথার সমন্বয়ে পিয়েন ওয়েন (Pien Wen) বা রূপান্তরিত কথামালার আশ্রয় লওয়া হয়। এই ধরনের সাহিত্যরচনার উপর জাতকের গল্পের প্রভাব দেখা যায়। ধীরে ধীরে পিয়েন ওয়েন ধর্মপ্রচারে ব্যবহৃত না হইয়া ঐতিহাসিক গাথায় পরিণত হইতে থাকে। পিয়েন-ওয়েনের গদ্য এবং কাব্যের সংমিশ্রণ ইউয়ান (Yuan) রাজত্বকালে (১২৮০ ১৩৬৭ খ্রী) নাটকে পরিণত হয়। চীনা সাহিত্যে এতকাল পর নাটকের আগমন সত্যই বিস্ময়কর। চীনা নাটকে সংগীতের অতি প্রধান স্থান এবং এই সংগীতের উপর নির্ভর করিয়া ইউয়ান (Yuan) নাটকগুলিকে উত্তর চীনের ৎসা চ্যু (Tse-chyu) এবং দক্ষিণ চীনের ছোয়ান ছিতে (*ch'uan ch'i*, থাং গল্পের চীনা নাম আবার এই নাটকগুলিতেও ব্যবহার করা হইয়াছে) ভাগ করা হইয়াছে। ওয়াং শ্যু ফু (Wang Shih-fu) রচিত 'শী শীয়াং চী' (*Hsi-Hsiang chi*, ১৩শ শতাব্দী) থাং রাজত্বের প্রেমের

গল্প ‘মিঙ্‌-মিঙ্‌ চুয়ানে’র অনুকরণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দক্ষিণী ‘ছোয়ান-ছি’ নাটকের মধ্যে চে-চিয়াং ওয়েন চৌ (Che-Chiang Wen-Chou) বাসী কাও মিং (Kao-Ming, ১৩৫০ খ্রী)-রচিত ‘পি-কা-চি’ (*Pi-Fa-Chi*) অতি প্রসিদ্ধ নাটক। চীনা নাটককে ঠিক মিলনান্ত কিংবা বিয়োগান্ত নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেননা একই নাটকে এই দুইয়েরই সমন্বয় দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণী ‘খুন-ছ্যু’ (*K'un-Ch'yu*) নাটকের প্রচলন হয় এবং ক্রমে এই নাটক চীনা সমাজ হইতে অন্য সব নাটককে হটাইয়া দেয়। এই খুন-ছ্যু পরে পেই চিং (Pei-Ching) বা পেকিঙ্‌ শহরে আসিয়া চিং-সীতে (*Ching Si*) পরিণত হয় এবং বিদেশে ‘পেকিঙ্‌ অপেরা’ বলিতে এই চিং-সীকেই বুঝায়।

আধুনিক চীনা সাহিত্যের শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। বিশেষ করিয়া ইওরোপ-ফেরৎ ছাত্রদের মধ্যেই এই নব্য সাহিত্য সৃষ্টি প্রথমে নাড়া দেয়। অধ্যাপক হু শুঃ (Hu-Shih, ১৮৯১-১৯৬২ খ্রী) কথ্য ভাষায় লেখা নতুন ধরনের কবিতার প্রচলন করিয়া চীনা সাহিত্যের মোড় আধুনিক কালের দিকে ঘুরাইয়া দেন। তবে মিং রাজত্বের (১৩৬৮-১৬৪৪ খ্রী) সময় হইতেই কথ্য ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা শুরু হয়। লো কোয়ান-চু (Lo-Fuang Chung, ১৩৩০ ?-১৪০০ খ্রী)-রচিত ‘সান-কো চিঃ’ (*San Ko Chih*) এবং ‘সুই-লু চুয়ান’ (*Sui-Lu-Chuan*), উ চ্‌ং-এন (Wu Ch'ang-en, ১৫০৫ ? ৮০ খ্রী) রচিত ‘শী ইউ চী’ (*Hsi Yu Chi*) ইত্যাদি উপন্যাস প্রায় কথ্য ভাষায় রচিত। তাহা ছাড়া ছিং (Ch'ing) রাজত্বকালে (১৬৪৪-১৯১১ খ্রী) রচিত উপন্যাস ‘চিন পিং মেই’ (*Chin Ping Mei*), পণ্ডিতদের আক্রমণ করিয়া লেখা ‘য্যু-লিন-ওয়েই শুঃ’ (*Ju-li-Wei-Shih*) এবং চীনা পরিবারের অধঃপতন লইয়া রচিত ৎসাও চানের (Tsao Chan, ১৭১৫ ? ৬৩ খ্রী) ‘হুং লৌ-ম’ (*Hung Lou Meng*) প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যেই কথ্য ভাষার প্রাবল্য লক্ষণীয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে নূতন সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাঁহারা নাম করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে জীবন শুরু করেন। ইঁহাদের মধ্যে লু-শুন (Lu Shun), ওয়েন-ই-তো, চৌ-ৎসো ঝান্‌ (Cho Tso Jen), ইউ-তা-ফু (Yu Ta Fu), চিয়াং-ফোয়াং-ৎস (Chiang Fuang Tse), মাও-তুন (Mao Tun), শু-চ্যঃ মো (Su Chih mo) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য, তবে পুরাপুরি রাজনীতিবিদ্যার সঙ্গে জড়াইয়া না থাকিলে শুদ্ধ সাহিত্যিক হওয়া আজ আধুনিক চীন দেশে সম্ভব নয়।

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীফ কমিশনার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন পাশ হইয়া কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অংশ (প্রদেশ) বিভিন্ন প্রথা অনুসারে শাসিত হইত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন পাশ হওয়ার পরেও প্রায় দশ বৎসর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্রভাবে শাসিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিভিন্নতাই ভারত-শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনটি প্রদেশে (যে প্রদেশগুলিকে প্রেসিডেন্সি বলা হইত : বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) শাসনকর্তার নাম ছিল গভর্নর এবং আর কয়েকটি প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর (যেমন পাঞ্জাব, বিহার-ওড়িশা, যুক্ত প্রদেশ)। আবার আরও কয়েকটি প্রদেশ ছিল যেখানে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে চীফ কমিশনার বলা হইত (যেমন পাঞ্জাবে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, পুরাতন মধ্য প্রদেশ ও আসামে কিছুকাল এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চীফ কমিশনার শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত ছিল)।

চীফ কমিশনারদিগের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করার উদ্দেশ্য ছিল ভারত সরকারের হাতেই মূল দায়িত্ব রাখা। ভারত সরকারই চীফ কমিশনার নিযুক্ত করিতেন এবং এই সরকারের নিকটই চীফ কমিশনারকে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বশীল থাকিতে হইত। এই কারণে চীফ কমিশনারের সরকারকে গভর্নমেণ্ট বা সরকার আখ্যা দেওয়া হইত না। ইহা ছিল কেবলই একটা অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসনিক-সংস্থা।

নরেন্দ্রচন্দ্র রায়

চুঁচুড়া ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত হুগলি জেলার একটি থানা ও শহর। কলিকাতা হইতে শহরটির (২২°৫৩´ উত্তর ও ৮৮°২৪´ পূর্ব) দূরত্ব ৩৮ কিলোমিটার (২৪ মাইল)। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চুঁচুড়াতে বর্ধমান বিভাগের প্রধান কার্যালয় ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি ও চুঁচুড়া এই দুইটি শহরকে প্রায় একত্রিত করিয়া হুগলি-চুঁচুড়া পৌর সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার ৬টি ওয়ার্ড। তন্মধ্যে দক্ষিণের তিনটি চুঁচুড়ার অন্তর্ভুক্ত। হুগলি-চুঁচুড়ার বর্তমান

আয়তন ১৫ বর্গ কিলোমিটার (৬ বর্গ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ইহার লোকসংখ্যা ৮৩১০৪।

সেকালের বাংলার প্রধান ওলন্দাজ উপনিবেশ রূপেই ইতিহাসে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত 'ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসে। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোগলকর্তৃক হুগলির পর্তুগীজদের প্রাধান্য চিরতরে বিনষ্ট হইলে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান চুঁচুড়ায় তাহাদের কুঠি নির্মাণের সনন্দ দেন। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় 'গ্যাসটেভ্‌স' দুর্গ নির্মাণ করে। পলাশির যুদ্ধের পর ক্লাইভের আদেশে কর্নেল ফোর্ড কর্তৃক ইহা বিধ্বস্ত হয়। হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধের সময় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা চুঁচুড়া দখল করিয়া ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফিরাইয়া দেয়। ১৮২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা সুমাত্রা উপনিবেশের পরিবর্তে চুঁচুড়া ইংরেজদের নিকট হস্তান্তর করে।

ইংরেজরা ওলন্দাজদের দুর্গটি ভাঙিয়া উহার কড়ি-বরগার সাহায্যে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যদের ব্যারাক নির্মাণ করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যেরা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এটি তখন বাসিন্দাদের নীজ দেওয়া হয় এবং পর্যায়ক্রমে এখানে স্কুল, ডাকঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান হইতে বিভাগীয় কমিশনারের দপ্তর ও হুগলি হইতে আদালতসমূহ তুলিয়া আনিয়া ঐ ব্যারাকে প্রতিষ্ঠিত হয়। হাজি মহম্মদ মহসীনের 'ফাণ্ড' হইতে তাহার নামে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগস্ট চুঁচুড়ায় হুগলি মহসীন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার ইমামবাড়া হাসপাতাল উক্ত 'ফাণ্ড' হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় একটি কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আর্মেনিয়ান গির্জা চুঁচুড়ার একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ। হুগলি মহসীন কলেজের অংশবিশেষ ওলন্দাজ গির্জারই অংশ। ইহার উপরে তৎকালে যে ঘটিঘড়ি ছিল তাহারই নামানুসারে পার্শ্ববর্তী ঘাটের নাম 'ঘণ্টাঘাট' হইয়াছে। চুঁচুড়ার শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বরজীউ মহাদেবের মন্দিরে অবস্থিত পিতলের দুইটি ঢাক ওলন্দাজ গভর্নরের অবদান। জ্যৈষ্ঠ মাসের অরণ্যষষ্ঠীর দিন হইতে দশমী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মহিষমর্দিনীর পূজা চুঁচুড়ার একটি বিখ্যাত উৎসব।

দ্র সুধীরকুমার মিত্র, হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১-২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২, *The Imperial Gazetteer of India*, vol. X, Oxford, 1908; *Census Hand-book : Hooghly*, 1951

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

চুন ক্যালসিয়াম অক্সাইড-প্রধান রাসায়নিক পদার্থ। চুনা পাথর বা খড়িমাটি পোড়াইয়া চুন প্রস্তুত করা হয়। চুনা পাথর হইল ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ইহাকে দহন করিলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও চুন উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্ট চুনে শতকরা ৯৯·০ ভাগ ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ০·০৫ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ০·২ ভাগ বালি, ০·০৫ ভাগ ফেরিক অক্সাইড, ০·০১ ভাগ ফসফোরিক অক্সাইড প্রভৃতি থাকে। চুনের দলাতে জল দিলে ফুলিয়া ফাঁপিয়া তপ্ত হইয়া জলের অনেকটা অংশ বাষ্প হইয়া উবিয়া যায় ও দলা ফাটিয়া সাদা কলিচুন চূর্ণ উৎপন্ন হয়। কলিচুন গৃহনির্মাণে ইট গাঁথার মশলা হিসাবে বা জল মিশাইয়া দেওয়ালে কলি ফিরাইতে ব্যবহার করা হয়। সাঁতো কলিচুনে ক্লোরিন গ্যাস শোষণ করাইলে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত করা হয়। কঠিন কলিচুনে খানিক জল দিয়া চুনের কাদা প্রস্তুত করা চলে। তাম্বুলে খয়ের, সুপারি প্রভৃতি মশলার সহিত এই কাদাটে চুন ব্যবহৃত হয়। বেশি পরিমাণে জল দিলে কাদাটে চুন দ্রবীভূত হয়, এই দ্রবণ চুনের জল বলিয়া পরিচিত। দানের একথককে সত্ত্ব জমাট বাঁধাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্ষার ধর্মের জন্য চুনের জল অম্লরোগের নিবারণে সেবন করা হয়। রসায়ন বিদ্যা অনুসারে কলিচুন, কাদাটে চুন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নহে, ইহারা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড নামে পরিচিত।

এদেশে ঘুটিং, গেঁড়, গুগলি, ঝিনুক ও শামুকের খোলা পোড়াইয়াও চুন উৎপাদন করা হয়।

সিমেন্ট-উৎপাদনে চুন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশনে চুন ও গন্ধকচূর্ণের মিশ্রণ প্রয়োগ করা হয়। বিশুদ্ধ চুন ক্যালসিয়াম কার্বাইড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। চর্মশিল্পে কাঁচা চামড়া হইতে লোম অপসারণে খর জল কোমল করিতে, পয়ঃপ্রণালীর দুর্গন্ধ জল থিতাইতে এবং বিবিধ শিল্পে জলীয় বাষ্প হইতে অম্ল বা অ্যাসিড দূর করিতে চুন ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে চুন উৎপন্ন হয়। রাজস্থানের চুনা পাথর হইতে উৎপন্ন চুন সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

চুনার উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলার অন্তঃপাতী শহর ও তহসিল। চুনার তহসিলটির অবস্থান ২৪°৪৭´ হইতে

২৫°১৫′ উত্তর এবং ৮২°৪২′ হইতে ৮৩°১২ পূর্ব। ইহার আয়তন ১৬৪৭৫ বর্গ কিলোমিটার (৬৩৬ বর্গ মাইল) চুনার শহর লইয়া দুইটি শহর ও ৭৪৩টি গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

গঙ্গা নদী এই তহসিলের মধ্য দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত। চুনার তহসিলের দক্ষিণাংশ বিন্ধ্য-মালভূমির মধ্য ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে বিন্ধ্য পর্বত গঙ্গা নদী পর্যন্ত আসিয়াছে। পূর্বাংশে বহু দূর বিস্তৃত সমভূমি। জিরগো পাহাড় এই তহসিলটির দক্ষিণ হইতে উত্তরে চুনার শহরের নিকট গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত। চুনার তহসিলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮৫৭ মিলিমিটার (৩২৭ ইঞ্চি)। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপ ৩২° সেন্টিগ্রেড (৯০° ফারেনহাইট)।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ছিল ৩০৭৪২০ জন, তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৫৬৬২৮ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৫০৭৯২।

তহসিলের মোট জমির মাত্র ½ অংশ কৃষিযোগ্য ও ৩১% জমি বনাবৃত। অন্যান্য অংশ বন্ধুর ও অনুর্বর।

চুনার তহসিলে ২৫% শিক্ষিত। ১৮১টি বিদ্যালয়ে প্রায় ১০০০০ ছাত্র ছাত্রী আছে।

ঐতিহাসিক চুনার শহর ২৫°৭′ উত্তর ও ৮২°৫৪′ পূর্বে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ইহা চুনার তহসিলের প্রধান শহর ও কার্যালয়। চুনার রেলপথে কাশী ও এলাহাবাদের সহিত যুক্ত।

বিখ্যাত চুনার দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া এই তহসিল ও শহরের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। কথিত আছে, উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃনাথ দুর্গটি স্থাপিত করেন। মুসলমান আমলে শের শাহ্ দুর্গটি বিবাহের যৌতুকরূপে প্রাপ্ত হন। এই দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে মোগল ও পাঠানদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে বাংলা ও বিহারের মধ্যে অবস্থিত চুনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক এই দুর্গ অধিকৃত হওয়ার পর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা মোগলদের অধিকারে থাকে। পরে ইহা অযোধ্যার অধীন হয়। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে চুনার ইংরেজদের অধিকারে আসে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে চুনার শহরের লোকসংখ্যা ৮৯০৪ জন। ইহার মধ্যে শতকরা ২০·৯ জন লোক ব্যবসায় ও নানা শিল্পকার্যে নিযুক্ত। শিল্পগুলির মধ্যে প্রস্তরশিল্প ও মৃৎশিল্পই প্রধান। বহু প্রাচীন কাল হইতেই চুনারের এই দুই শিল্পের খ্যাতি আছে।

চুনার দুর্গসহ শহরটি গঙ্গার উপর বিন্ধ্য পর্বতের একটি প্রলম্বিত অংশের উপর অবস্থিত। এই অংশের আকৃতি মানুষের পায়ের মত বলিয়া ইহার নাম ছিল চরণাদ্রি, পরবর্তী কালে চুনার নাম হইয়াছে। চুনার দুর্গটি ৩৬০ মিটার (৪০০ গজ) দীর্ঘ, ১২০ ২৭০ মিটার (১৩৩-৩০০ গজ) বিস্তৃত। দুর্গের বেশির ভাগই হিন্দুগৃহ ও মন্দিরাদির উপকরণের দ্বারা প্রস্তুত। রেল-স্টেশনের নিকটে দুর্গাকুণ্ড এবং জীর্ণা নালার ধারে কামাক্ষী-মন্দির অবস্থিত। নিকটের পর্বতগাত্রে হাতি, সিংহ ও ঘোড়ার বহু মূর্তি ক্ষোদিত, পিছনের দেওয়ালের শিলালিপি গুপ্ত যুগের বলিয়া অনুমিত হয়। আরও উত্তরে অবস্থিত দুর্গাখো নামক গুহাতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার নবমীর দিন একটি মেলা হয়। এখানেও গুপ্ত যুগের শিলালিপি আছে।

চুনারে মীজা মুখাজিনের জুম্মা মসজিদ, গণেশ্বরনাথের (মহাদেব) মন্দির, শাহ্ কাসিম ফকিরের দরগাহ, শহরের প্রান্তে জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক কালে নির্মিত ইফ্‌তিখাঁর মসজিদ ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান আছে। চুনার স্বামী বল্লভাচার্যের জন্মস্থান।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India* vol X, Oxford, 1908; P P Bhatnagar, *Census of India, 1961 : Uttarpradesh*, vol. XV, part II, Delhi, 1964, P. P. Bhatnagar, *Census of India 1961 Uttarpradesh, Handicrafts Survey Monograph*, vol XV, part VII A, no 3, Delhi, 1964.

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

চুনীলাল বসু (১৮৬১-১৯৩০ খ্রী) রসায়নবিদ্ ও চিকিৎসক। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মার্চ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দীননাথ বসু। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকাল কলেজ হইতে এম বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চুনীলাল উক্ত কলেজের অস্থায়ী অ্যাসিস্টান্ট সার্জেনপদে যোগদান করেন এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সেই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গ সরকারের প্রধান রসায়ন পরীক্ষকপদে ১৮৮৯-১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ীভাবে ও ১৯১৫-২০ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদ্ এবং আদর্শ চিকিৎসক ও অধ্যাপকরূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নয়নমূলক কার্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। চুনীলাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স প্রতি-

স্থানের সহকারী সভাপতি, 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নাল'-এর সম্পাদক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। সাহিত্যসাধনা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

বাংলা ভাষায় তাঁহার রচিত বিজ্ঞান-গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ফলিত রসায়ন' (১৮৯৫ খ্রী), 'রসায়ন-সূত্র' ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৯৭-৯৮ খ্রী), 'জল' (১৯০০ খ্রী), 'বায়ু' (১৯০৩ খ্রী), 'কাগজ' (১৯০৬ খ্রী), 'আলোক' (১৯০৯ খ্রী), 'খাদ্য' (১৯১০ খ্রী), 'পল্লীস্বাস্থ্য' (১৯১৬ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভাষার সারল্য ও সুখপাঠ্যতা এবং প্রকাশভঙ্গীর সংযম তাঁহার বৈজ্ঞানিক রচনার বৈশিষ্ট্য। ইংরেজী ভাষাতেও তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট তিনি রাঁচিতে পরলোক গমন করেন।

দ্র যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রসায়নাচার্য চুনীলাল, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ; বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, কলিকাতা, ১৯৬০।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

চুম্বক যে কোনও লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিবার গুণ-সম্পন্ন লৌহ বা খনিজ লৌহপ্রস্তরকে চুম্বক বলে। কাঠ কাগজ কাচ এবং অন্য পদার্থের ভিতর দিয়াও চুম্বক লোহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে। চুম্বকের চতুর্দিকে একটি সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে চুম্বকত্বের প্রভাব দেখা যায়, ইহাকে সাধারণতঃ চৌম্বক ক্ষেত্র বলে। একটি চুম্বকশলাকার মধ্য স্থলে সুতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলে উহা শেষ পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে মুখ করিয়া অবস্থান করে, উত্তরাভিমুখী প্রান্তটিকে চুম্বকের উত্তর মেরু ও অপর প্রান্তটিকে দক্ষিণ মেরু বলে। এরূপ চুম্বকশলাকা বা সূচীচুম্বকের সাহায্যেই দিগ্‌দর্শন যন্ত্র প্রস্তুত হয়। চুম্বকের এরূপ ব্যবহার হইতেই ভূ-চুম্বকত্বের কথা জানা যায়। ভূগোলক একটি চুম্বক বিশেষ, ইহার চৌম্বক মেরু ভৌগোলিক মেরু হইতে কিছুটা দূরে অবস্থিত হওয়ায় চুম্বকশলাকা ভৌগোলিক মেরু বরাবর না থাকিয়া একটু কৌণিকভাবে স্থির হইয়া থাকে।

দুইটি চুম্বকের সমধর্মী মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। চুম্বককে কয়েক খণ্ডে ভাঙিয়া ফেলিলে প্রত্যেক খণ্ড উত্তর ও দক্ষিণ মেরু -বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র চুম্বকে পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে একমেরু বিশিষ্ট কোনও চুম্বক হয় না। উত্তাপ প্রয়োগে অথবা বার বার জোরে আঘাত করিলে চুম্বকত্ব হ্রাস পায়।

চুম্বক দুই প্রকার - স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। ম্যাগনেটাইট নামক ধূসর কালো রঙের লৌহপ্রস্তরকে স্বাভাবিক চুম্বক বলে। ইহার নির্দিষ্ট কোনও আকার নাই, আকর্ষণ শক্তিও তীব্র নয়। কৃত্রিম উপায়ে লৌহ ও কতকগুলি সংকর ধাতুকে তীব্র শক্তি সম্পন্ন কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায়। কাঁচা লোহার তৈয়ারি কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না, স্থায়ী কৃত্রিম চুম্বক তৈয়ারি করিতে ইস্পাতের প্রয়োজন। প্রধানতঃ ঘর্ষণ ও বৈদ্যুতিক প্রণালীতেই কৃত্রিম চুম্বক তৈয়ারি করা হয়। প্রথম প্রণালীতে ইচ্ছামত আকারের ইস্পাত খণ্ডকে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম চুম্বকের একটি নির্দিষ্ট প্রান্ত দিয়া ২০-২৫ বার একই দিকে ঘর্ষণ করিলে ইস্পাত খণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়, প্রথম চুম্বকের যে প্রান্তের সাহায্যে ইস্পাত খণ্ডটিকে ঘর্ষণ করা হইয়াছিল ইস্পাত খণ্ডের প্রথম প্রান্তটি তাহার সমধর্মী মেরুতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক প্রণালীতে ইচ্ছামত আকারের কাঁচা লোহার দণ্ডকে তড়িৎ-অপরিবাহী পদার্থে আবৃত তার দিয়া জড়াইয়া সেই তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে লৌহদণ্ডটি সাময়িকভাবে চৌম্বকধর্ম প্রাপ্ত হয়, বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করিলেই চৌম্বক শক্তি অন্তর্হিত হয়। কাঁচা লোহার পরিবর্তে ইস্পাত ব্যবহার করিলে তাহা স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। গুরুভার দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতে কাঁচা লোহার বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করা যায়। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা প্রভৃতি যন্ত্রপাতির জন্যও অস্থায়ী বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঁচা লোহার দণ্ডকে কোনও চুম্বকের সংস্পর্শে রাখিলে তাহা সাময়িকভাবে চুম্বকত্ব লাভ করে, স্থায়ী চুম্বকটি সরাইয়া লইলে চুম্বকত্ব লোপ পায়। ইস্পাতদণ্ডকে দীর্ঘকাল শক্তিশালী চুম্বকের নিকটে রাখিলে দণ্ডটি কিছুটা স্থায়ী চুম্বকত্ব লাভ করে। এ ব্যবস্থায় উৎপন্ন চৌম্বক শক্তিকে আবিষ্ট চুম্বকত্ব বলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, একটি চুম্বককে টুকরা করিয়া ফেলিলেও প্রত্যেকটি টুকরাই স্বতন্ত্র চুম্বকে পরিণত হয়। আরও টুকরা করিয়া আণবিক পর্যায়ে উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে— প্রত্যেকটি অণুই স্বতন্ত্র এক-একটি চুম্বকের মত ব্যবহার করে। প্রত্যেকেরই দুইটি চৌম্বক মেরু থাকে। যে সকল পদার্থ চৌম্বকিত হইতে পারে, অচৌম্বকিত অবস্থায় তাহাদের অণু চুম্বকগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকিয়া পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখে। কোনও

স্থায়ী চুম্বকের নিকটবর্তী হইলে অণুচুম্বকগুলি তাহার প্রভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হইয়া পদার্থটিতে চুম্বকত্বের সৃষ্টি করে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

চুল্লবগ্‌গ পাঁচটি গ্রন্থ বা বিভাগ লইয়া সংগঠিত বিনয়-পিটকের প্রথম বিভাগের নাম 'মহাবগ্‌গ', দ্বিতীয়ের নাম 'চুল্লবগ্‌গ' (ক্ষুদ্রবর্গ)। 'মহা' ও 'চুল্ল' এই শব্দ দুইটির দ্বারা বুঝায় 'প্রথমে' রচিত এবং 'তৎপরে' রচিত। ভিক্ষু-জীবনের সমগ্র নিয়মাবলী বিনয়পিটকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে 'চুল্লবগ্‌গে' নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে

প্রথম অধ্যায়ে বিনয়ের সামান্য নিয়মাদির ব্যতিক্রমের জন্য ভিক্ষু দোষী কি না তাহার বিচার প্রণালী এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে কিরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে তাহার নির্ধারণ বিবৃত হইয়াছে।

প্রাতিমোক্ষ সূত্রের (পাতিমোকখ) ১৩টি বিশেষ নিয়মের নাম 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। উহার বিধানাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ভিক্ষুসংঘ প্রথমে বিচার করিবেন, যে ভিক্ষুর নামে দোষারোপ করা হইয়াছে তিনি বাস্তবিক দোষী কি না এবং যদি দোষী সাব্যস্ত হন তবে তাহার 'পরিবাস' কি হওয়া উচিত। পরিবাস অর্থে বুঝায় যে দোষী ভিক্ষুকে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্য ভিক্ষুসংঘের অধিকারাদি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে এবং তৎসহ আরও কয়েকটি ভিক্ষুজীবনের প্রতিবন্ধক পালন করিতে হইবে। দোষী ভিক্ষু যদি পরিবাসের নির্দেশসমূহ ঠিকভাবে পালন করেন তাহা হইলে ভিক্ষুসংঘ তাহাকে পুনরায় আহ্বান করিয়া ভিক্ষুসংঘের সমানাধিকার দেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংঘের ভিক্ষুদের মধ্যে যদি বিবাদ-বিসংবাদের উদ্ভব হয়, তাহা আপসে মিটাইবার ৭টি প্রণালীর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ভিক্ষুদের দৈনিক জীবনযাপনের সূক্ষ্ম আচার-বিচারের নিয়মাবলী আলোচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিহার নির্মাণের নিয়মাবলী এবং বিহারের আসবাব ও শয্যা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আলোচিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ে রাজকুমার অজাতশত্রুর সাহায্যে দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ে আগন্তুক ভিক্ষুদের প্রতি বিহারবাসীর কিরূপ ব্যবহার প্রযোজ্য তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অরণ্যবাসী ভিক্ষুগণ গ্রামে বা শহরে আসিলে কি কি নিয়ম পালন করিবেন, তাহা এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। সর্বশেষে উপাধ্যায়ের ও তাহার সার্ধবিহারিক অর্থাৎ শিষ্যের পারস্পরিক কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা বিবৃত হইয়াছে।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় যে উপোসথক্রিয়ার প্রথা আছে, তাহাতে প্রাতিমোক্ষসূত্র আবৃত্তি করিবার সময় কোন কোন ভিক্ষুকে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না তাহার নির্দেশ আছে নবম অধ্যায়ে। উপোসথক্রিয়ার সময়ে প্রত্যেক ভিক্ষুকে জানাইতে হইবে যে তিনি ইতিপূর্বে ১৪ দিনের মধ্যে প্রাতিমোক্ষসূত্রের ২২৭টি নিয়ম পালনে ব্যতিক্রম করেন নাই। যদি কেহ লঘু নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন তিনি তাঁহার দোষ অন্য ভিক্ষুদের নিকট স্বীকার করিয়া তাহা স্খালন করাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু যদি কোনও গুরু নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে উপোসথাগার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।

দশম অধ্যায়ে ভিক্ষুনীসংঘ কোন সময়ে এবং কি ভাবে গঠিত হয় তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং তৎসহ ভিক্ষুনীদের করণীয় বিশেষ নিয়মাবলীও উল্লিখিত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ে প্রথম ধর্মসংগীতির বিবরণ আছে। অজাতশত্রুর রাজত্বকালে স্থবির মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহায় ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষু লইয়া অনুষ্ঠিত এই সংগীতিতেই ধর্ম ও বিনয়পিটক সংকলন করা হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ধর্মসংগীতির বিবরণ আছে। এই সংগীতি প্রথম সংগীতির শতাধিক বৎসর পরে বৈশালীতে সমাহূত হয়। এই সংগীতিতেই বৌদ্ধ ধর্মের সাম্প্রদায়িক ভেদের সূত্রপাত হয়।

[illegible] দত্ত

চুল্লি ফার্নেস দ্র

চুয়াড় হাঙ্গামা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল মহল ও তাহার সংলগ্ন পশ্চিম ও উত্তরের অরণ্যভূমি অঞ্চলে যে সকল বন্য জাতি বাস করিত সমগ্রভাবে তাহাদের চুয়াড় বলা হইত। তাহারা কৃষিকার্য করিত না। পশুপক্ষী শিকার ও বনে জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া এবং সুযোগ পাইলে ডাকাতি-রাহাজানি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহারা এমন

নির্বোধ ও নৃশংস ছিল যে চুয়াড শব্দটিই বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার বোধক হইয়া দাঁড়ায়। বেতনের পরিবর্তে নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বভোগের শর্তে ইহাদের অনেকে স্থানীয় জমিদারবর্গের পাইক-বরকন্দাজের কাজ করিত ও তাহাদের লুণ্ঠনে সহায়তা করিত। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হইলে শান্তিস্থাপন ও নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে জমিদার ও তৎসঙ্গে চুয়াডদের দমন করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। চুয়াডদের নিষ্কর জমিকে পাইকান জমি বলা হইত। এই সকল জমি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে জীবিকার উপায় বন্ধ হওয়ায় চুয়াডেরা উপর্যুপরি কয়েকটি হাঙ্গামা বাধায়, বিশেষ করিয়া ১৭৯৮ ও ১৭৯৯-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করিয়া চুয়াডেরা কয়েকটি গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় এবং শস্যাদি নষ্ট করে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মাধব সিংহের অধীনে মেদিনীপুর জেলায় তাহারা বহু স্থানে উপদ্রব করে এবং তাহাদিগকে দমন করিতে ইংরেজ সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সম্পূর্ণভাবে ইহাদের আয়ত্তে আনিতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় লাগিয়াছিল।

দ্র যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ , *Bengal District Gazetteers Midnapore*, Calcutta, 1911 , S. B. Chaudhury, *Civil Disturbance During the British Rule in India 1765-1857*, Calcutta, 1955

চূড়াকরণ উপনয়ন দ্র

চূড়ামন জাঠ দ্র

চূড়ামণি যোগ গ্রহণ দ্র

চূর্ণী মাথাভাঙা নদীর নিম্নাংশ চূর্ণী নামে পরিচিত। পশ্চিম বঙ্গের রানাঘাট শহর চূর্ণীর তটে অবস্থিত। মাথাভাঙা পদ্মা হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া চূর্ণী নামে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। পদ্মার উৎসস্থানে চরের সৃষ্টি হওয়ায় ইহার জলধারা প্রাচীন কালের ন্যায় অব্যাহত নহে। উৎসের পূর্ব দিকে নদীপথে প্রায় ৩২-৪৫ কিলোমিটার (২০-২৫ মাইল) দূরে পদ্মার প্রসিদ্ধ সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হওয়ায় চর ক্রমশঃ কাটিতেছে।

দ্র H E. Garrett, *Bengal District Gazetteers : Nadia*, Calcutta, 1910.

কপিল ভট্টাচার্য

চেখভ্, আন্তন পাভ্‌লোভিচ (১৮৬০-১৯০৪ খ্রী) রুশ লেখক ও নাট্যকার। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি তাগানরগ নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। ১৮৬৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাগানরগের বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন। অতঃপর মস্কোয় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জন্মস্থান তাগান্‌রগে চিকিৎসক বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করেন। 'স্ত্রেকোজা', 'বুদিলনিক', 'অস্কোলকি' ও অন্যান্য সাহিত্য-পত্রিকায় চেখভ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রচনা প্রকাশ করিতে শুরু করেন, প্রথম জীবনে তিনি প্রায়শঃ 'আন্তশা চেখন্তে' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন।

ছোটগল্প, ছোট উপন্যাস, নাটক, একাঙ্ক নাটক ও পত্রাবলী— সাহিত্যের এই শাখাগুলিতে চেখভের মৌলিক অবদান রহিয়াছে। তাঁহার প্রায় সকল রচনাই একটি বিশেষ পদ্ধতিতে লিখিত। লেখায় এমন একটি পরিস্থিতিতে ঘটনা (গল্প) আরম্ভ হয় যাহার ফলে পাত্র পাত্রীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রাসঙ্গিক ঘটনা, মনোবৃত্তি, চরিত্র ইত্যাদি তাহারা নিজেরাই কথোপকথনে উল্লেখ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ফলে প্রায় সকল গল্পই একাঙ্ক নাটকের মত একটি নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্যে পরিণত হয়। পাত্র-পাত্রীর জীবনে এই প্রকারের পরিস্থিতি সন্ধান করিয়া পাওয়ায় বা সৃষ্টি করায় চেখভ অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। চেখভ এমন একটি চরিত্রও সৃষ্টি করেন নাই যাহা সম্পূর্ণ আদর্শায়িত বা নিষ্কলুষ। তাঁহার অবলম্বিত শতাধিক প্রকারের বিভিন্ন জীবিকাবলম্বী পাত্র পাত্রীর প্রত্যেকের চরিত্রেই একযোগে প্রশংসনীয় ও অত্যন্ত নিন্দনীয় দিক দেখা যায়। চেখভের অন্যান্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, যে কোনও রচনার পাত্র ও পাত্রী স্বীয় দৃষ্টিকোণ হইতে পরিস্থিতি ও অবস্থাবিচারে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত বলিয়া নিজেরাই নিজেদের উপস্থাপিত ও ব্যক্ত করে, লেখক নিজে কখনই কাহারও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ মন্তব্য বা বিশ্লেষণ করেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের পরস্পরের ভিতরকার স্বাভাবিক সংঘাত চেখভের সকল রচনারই উৎপত্তিস্থল।

প্রবন্ধ বা সাহিত্যের সমালোচনাধর্মী রচনা তিনি একটিও লেখেন নাই, তবে তাঁহার পত্রাবলীতে মাঝে মাঝে সাহিত্য-সমালোচনাও দেখা যায়।

মধ্যবয়সে চেখভ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সেই অসুস্থ অবস্থাতেই (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে) চেখভ মস্কো আর্ট থিয়েটারের এবং তাঁহার নাট্যাবলীতে অভিনয়কারিণী ওল্‌গা

এস. ক্লিপ্পের-কে বিবাহ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য জার্মানীর অন্তর্গত বাডেন্‌ভেইলের্‌-এর স্বাস্থ্যনিবাসে যান এবং সেই স্বাস্থ্য-নিবাসেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুলাই, নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মস্কোতে তাহার সমাধি আছে।

মস্কো, ইয়াল্‌তা, তাগান্‌রগ, মেলিখোভো এই চারিটি স্থানে তাঁহার জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত চারিটি বাড়িতে চেখভের নামে মিউজিয়াম আছে।

দ্র গোপাল হালদার, রুশ সাহিত্যের রূপরেখা, কলিকাতা, ১৯৬৬।

বিনয় মজুমদার

চেঙ্গিজ খাঁ (চিঙ্গিজ খান, ১১৫৫/১১৬২-১২২৭ খ্রী) মঙ্গোল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা। আদি নাম তেমুজিন বা তেমুচিন (অর্থ— শ্রেষ্ঠ লৌহ বা ইস্পাত অথবা কর্মকার)। বর্তমান পূর্ব সাইবেরিয়ার অন্তর্গত ওনন (Onon) নদীর নিকট ডোলন বোলডক-এ ইঁহার জন্ম হয় (মঙ্গোল পঞ্জিকানুসারে ১১৫৫ খ্রী, কিন্তু চীন পঞ্জিকানুসারে ১১৬২ খ্রী)। প্রকৃত মঙ্গোলদের শেষ খান (খাঁ) বা উপজাতি-সংঘের নায়ক ইয়েসুকাই বাতুর ছিলেন তাঁহার পিতা।

তিনি নিজ প্রাণবলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গোল উপজাতির মধ্যে একতা আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত করেন। বন্য তাতার উপজাতির অন্তর্গত তরগুতাই ও তৈজুইৎদের দমন করিয়া তিনি খান পদে বৃত হন (১১৮৮ খ্রী)। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বহু যুদ্ধের ফলে পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম মঙ্গোলিয়ায় তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয় (১২০৬ খ্রী)। তাঁহার প্রথম পার্লামেন্টে (কুরীলতাই আমীর-সংসদ) মঙ্গোল নৃপতিগণ তাঁহাকে 'খাকান' (প্রধান খান) বলিয়া গ্রহণ করেন ও তিনি চেঙ্গিজ বা জেঙ্গিজ খাঁ (অর্থ— ঈশ্বর-পুত্র, সম্পূর্ণ বীর বা রাজচক্রবর্তী) উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর পেকিং-এর পশ্চিমে সী-শিয়া (Hsi-Ssia) রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (১২০৭ খ্রী) জয়লাভের পর তিনি কিন সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করেন (১২১১-১৬ খ্রী) ও পেকিং অধিকার করিয়া (১২১৫ খ্রী) চীন দেশের উক্ত ভাগ জয় করেন। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া তিনি ক্রমে ক্রমে কারা খিতাই (১২১৭ খ্রী) উইঘুর, কাশ্‌গর, ইয়ারকন্দ ও খোটান প্রভৃতি দেশ জয় করেন। ফলে মঙ্গোল সাম্রাজ্য খোয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর খোয়ারিজমের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় (১২১৯-২২ খ্রী) এবং খোয়ারিজমের বহু নগর তিনি অধিকার ও ধ্বংস করেন (সমরকন্দ ১২২০ খ্রী, বোখারা ১২২০ খ্রী, বলখ ১২২১ খ্রী, নিশাপুর) পরাজিত ও মৃত খোয়ারিজম রাজার পুত্র জালাল-উদ্‌ দীন মংগবর্নী আত্মরক্ষার জন্য সিন্ধু প্রদেশে পলাইয়া আসিলে চেঙ্গিজ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন ও ভারতের সীমান্তে সিন্ধু উপত্যকায় তাহাকে পরাজিত করেন। চেঙ্গিজ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার এক সেনাপতি ইওরোপ আক্রমণ করিয়া রুশগণকে পরাজিত করেন। এইরূপে চেঙ্গিজের সময়ে মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগর হইতে কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত ও সাইবেরিয়া হইতে হিমালয় ও আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু হয় ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। দুর্দমনীয় সাম্রাজ্য বিজেতা চেঙ্গিজ খাঁ কে সচরাচর দৈব অভিশাপরূপে গণ্য করা হয়, কিন্তু হাওর্থ (Howorth) প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন আলেকসান্দর (আলেকজাণ্ডার), তৈমুর ও নাপোলেঅঁ (নেপোলিয়ন) রণকৌশলে তাঁহার সমকক্ষ হইলেও সাম্রাজ্যসংগঠকরূপে চেঙ্গিজ তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আলেকসান্দর বা তৈমুরের সাম্রাজ্য অচিরেই ধ্বংস হয়, কিন্তু চেঙ্গিজ তাঁহার বিজিত সাম্রাজ্য সুসংগঠিত করেন ও তাঁহার মৃত্যুর পরও ইহার বৃদ্ধি হইয়াছিল। একজন চীনা দার্শনিক তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে অভূতপূর্ব শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তিত হয়। তিনি ইয়সক (Yasak) বা আইন প্রণয়ন করেন ও লৌহফলকে উইঘুর লিপিতে ইহা উৎকীর্ণ করেন। তিনি প্রধান প্রধান রাজপথে ডাক বিভাগের ব্যবস্থা করেন, ইহাতে পর্যটক, হরকরা ও রাজপুরুষগণের সুবিধা হয়। পুলিশ প্রহরীর বন্দোবস্তের দ্বারা পথঘাট সুরক্ষিত হয়। নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি ও ব্যভিচার মঙ্গোলদের মধ্যে অনেক কমিয়া যায়। ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর চীন লিপি প্রবর্তিত হয়। সামরিক সংগঠনেও চেঙ্গিজের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি জীবদ্দশাতেই তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত করিয়া দেন, কিন্তু সাম্রাজ্যের একতা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কেননা তাহারা পিতার আজ্ঞাবাহী শাসকমাত্র ছিলেন, বিভিন্ন অঞ্চলের নৃপতি নহে। চেঙ্গিজের পৌত্রদের মধ্যে হুলাগু ও কুবলাই খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্র H. H. Howorth, *History of the Mongols, from the Ninth to the Nineteenth Century,* vol. I-IV, London, 1876-1927.

জগদীশনারায়ণ সরকার

চেতনা কোনও কোনও দার্শনিকের মতে চৈতন্য সম্পূর্ণ অনন্য ; সেইজন্য ইহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা অসম্ভব। জড়বাদীর মতে চৈতন্য জড়ের উচ্চতর স্তর। চৈতন্যকে কেহ কেহ দ্রব্যরূপে গ্রহণ করেন, কেহ-বা ইহাকে নিছক গুণরূপেই গণ্য করেন।

আত্মা বা মনের স্বরূপ চৈতন্য। জাগ্রত অর্থেও চেতন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে একমাত্র পুরুষই চেতন ; মন, অহং ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির পরিণামমাত্র। বৈদান্তিকদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপ এবং পরম তত্ত্ব।

পূর্বে মনোবিজ্ঞানে মন বলিতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ, কল্পনা, জ্ঞান ইত্যাদি চেতনক্রিয়া বা ঘটনাক্রমই বুঝাইত ; অর্থাৎ মন ও চৈতন্য সমব্যাপক অর্থে গৃহীত হইত। মনঃসমীক্ষা বিদ্যার মতে মনের বিস্তার চৈতন্যের তুলনায় ব্যাপকতর ; সংজ্ঞান (কন্‌শাস) স্তর ব্যতীত মনের আরও দুইটি স্তর— আসংজ্ঞান (প্রিকন্‌শাস) এবং নির্জ্ঞান (আন্-কন্‌শাস) রহিয়াছে। নির্জ্ঞান স্তরের বিস্তার ও গভীরতা সর্বাধিক। ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতার বিভিন্ন যোগাযোগে চৈতন্যের বিষয় এক স্তর হইতে অন্য স্তরে নামিয়া যায় বা উঠিয়া আসে। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী চৈতন্যের নিরবচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী ; চৈতন্যকে তাঁহারা প্রবাহরূপে কল্পনা করেন।

চৈতন্যের সাহায্যে মানুষ শুধু যে জানে তাহাই নহে, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষিক পরিমণ্ডলের সহিত নিজের সমন্বয়সাধনেরও চেষ্টা করে।

তরুণচন্দ্র সিংহ

চেতনাপ্রবাহ স্ট্রীম অফ কন্‌শাসনেস। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে ইংরেজী উপন্যাসে প্রবর্তিত একটি নূতন গদ্য-ধারা। যদিও সূক্ষ্ম বিচারে ডরথি রিচার্ডসন (১৮৭৩-১৯৫৭ খ্রী), জেম্‌স জয়স (১৮৮২-১৯৪১ খ্রী) এবং ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (১৮৮২-১৯৪১ খ্রী) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের রচনায় চেতনাপ্রবাহ এবং ভাবানুসঙ্গপ্রবাহ এই দুই রীতির পার্থক্য করা যাইতে পারে, তবুও তাঁহাদিগকে সচরাচর চেতনা-প্রবাহীধারার উপন্যাসকার বলিয়াই অভিহিত করা হয়।

চেতনা যে প্রবাহস্বরূপ এই ধারণার জনক মার্কিন দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌স (১৮৪২-১৯১৪ খ্রী)। ফরাসী দার্শনিক আঁরি বের্গসঁ-র (Henri Bergson, ১৮৫৯-১৯৪১ খ্রী) রচনাতেও এই ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই রীতিতে রচিত উপন্যাস সাধারণতঃ ঘটনা এবং চরিত্রের প্রত্যক্ষ বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ পরিহার করিয়া থাকে। ঘটনার স্থান অধিকার করে স্মৃতি, চেতনায় প্রতিফলিত চিত্ররূপ, চিন্তা এবং অনুভব, চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে ভূতভবিষ্যতে মগ্ন চেতনাখণ্ড। স্বভাবতঃই উপন্যাসগুলি কাব্যময়।

ইংরেজী উপন্যাসে এই ধারণার প্রথম প্রয়োগ আমরা দেখি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডরথি রিচার্ডসনের 'পয়েন্টেড রুফ্‌স' উপন্যাসে, যদিও জেমস জয়স ইতিমধ্যেই 'ইউলিসিস' লিখিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন। জয়স এই প্রকার রচনার প্রেরণা পান আনুমানিক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পারি শহরে, এদুয়ার দ্যুজাঁর্দা (১৮৬১-১৯৪৯ খ্রী)-রচিত উপন্যাস 'লে লরিয়ে সঁ কুপে' পাঠ করিয়া।

যাঁহারা ইংরেজী চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসের সহিত পরিচয় লাভ করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য : ডরথি রিচার্ডসনের উপন্যাসমালা 'পিল্‌গ্রিমেজ', ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-রচিত 'দ্য ওয়েভ্‌স' ও 'মিসেস ড্যালোয়ে' এবং জেমস জয়স-রচিত 'ইউলিসিস'।

উপরি-উক্ত ঔপন্যাসিকদের প্রথম পূর্বসূরী সম্ভবতঃ লরেন্স স্টার্ন (১৭১৩-৬৮ খ্রী) যাঁহার 'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি' উপন্যাসে দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে চেতনাপ্রবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক পূর্বসূরীদের মধ্যে মার্কিন ঔপন্যাসিক হেনরি জেম্‌স (১৮৪৩-১৯১৬ খ্রী) অগ্রগণ্য। উত্তরসূরীদের বিশেষ উল্লেখ নিরর্থক, মনস্তত্ত্ব-মূলক অধিকাংশ আধুনিক উপন্যাসেই চেতনাপ্রবাহী ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। 'জয়স, জেম্‌স' দ্র।

দ্র V. Woolf, 'Modern Fiction', *The Common Reader*, first series, London, 1918; R. Humphrey, *Stream of consciousness in the Modern Novel*, Los Angeles, 1955.

নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

চেদি প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ ও জাতির নাম। ঋগ্‌বেদের একটি স্তোত্রে চেদি ও তাহাদের রাজার দান-শীলতার ভূয়সী প্রশংসা আছে। গৌতম বুদ্ধের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদ (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ রাজ্য) ছিল চেদি তাহার অন্যতম বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে যমুনা নদীর শাখা শুক্তিমতী (বর্তমানে 'কেন' নামে পরিচিত) নদীর তীরে ঐ নামে (পালি সোৎথিবতী) নগরী চেদির রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদিরাজ শিশুপালের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পুরাণে চেদিরা যদুবংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পৌরব-বংশীয় রাজা বসু চেদি রাজ্য জয় করেন এবং বিস্তৃত

সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন, এইজন্য তিনি 'চৈদ্যোপরিচর' নামে খ্যাত হন। কলিঙ্গের বিখ্যাত রাজা খারবেল (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম-২য় শতাব্দী) চেদিরাজবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ২৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতে যে একটি নূতন অব্দ প্রচলিত হয় তাহা কলচুরি ও চেদি অব্দ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে বিখ্যাত কলচুরি-বংশীয় রাজগণ চেদি রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ত্রিপুরী। উক্ত রাজবংশের লিপিতে ব্যবহৃত এবং চেদি দেশে প্রচলিত বলিয়া উল্লিখিত অব্দ এই উভয় নামে পরিচিত। কলচুরি রাজগণ পুরাণোক্ত প্রাচীন হৈহয় বংশীয় বলিয়া দাবি করিতেন এবং চেদির অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 'কলচুরি' দ্র।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

চেনচু চেনচুগণ অন্ধ্রপ্রদেশের পার্বত্য এলাকার অধিবাসী। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী সমগ্র মাদ্রাজ এবং হায়দরাবাদে চেনচুগণের সংখ্যা মোট ১২৮৬৮ জন। ইহারা খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিতকেশ। অরণ্যের মধ্যে পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে ইহাদের গ্রামগুলি অবস্থিত। সাধারণতঃ তিন হইতে দশটি করিয়া গৃহ লইয়া চেনচু গ্রাম গঠিত। বাঁশ, খড়, পাতা ইত্যাদির দ্বারা ইহারা গোলাকৃতি কুটির নির্মাণ করে। কুটিরের অভ্যন্তরে একটি চুল্লি থাকে। চেনচুদের কিয়দংশ খাদ্য সংগ্রহের জন্য অরণ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করে এবং কখনও পর্বতের গুহায় কখনও বা লতা পাতার দ্বারা রচিত কুটির সদৃশ আবাসে দিন যাপন করে।

যে সকল চেনচু গ্রামে বাস করে তাহারা পাহাড়ে জুম চাষ, ছাগল মহিষাদির প্রতিপালন ও দুধের ব্যবসায়ের দ্বারা দিনাতিপাত করে। তাহারা স্থানীয় বেনিয়াদের মাধ্যমে মধু, ঝুড়ি, বনজাত ফলমূল ইত্যাদির ব্যবসায় করিয়া থাকে। চেনচুরা গ্রাম হইতে জীর্ণ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লজ্জা নিবারণ করে। পরিবারগুলি স্বামী স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যা লইয়া গঠিত। কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি স্থানীয় সংস্থা গঠিত হয়। প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বিবাহের পর স্বামীর গৃহে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বামীও স্ত্রীর সহিত বসবাস করিতে আসে। ইহারা মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে দাহও করিয়া থাকে। দশ দিন মৃতের অশৌচপালনান্তে শেষের দিনে পেড্ডা-ডিনাল' বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

শিকারের দেবতা 'গারেলা মাইসামা' আকাশ-বিহারী 'ভগভন্তরা' ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্বে ইহারা বিশ্বাসী। চেনচু-সমাজে পুরোহিত নাই, পরিবারের কর্তা দেবদেবীর পূজার্চনা করিয়া থাকে। মন্ত্রতন্ত্রে উহাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়

চেনাব চন্দ্রভাগা দ্র

চেভিশেভ, পাফনুতিই ল্ভোভিচ (১৮২১-৯৪ খ্রী) বিখ্যাত রুশ গণিতজ্ঞ। বোরোভস্ক শহরে চেভিশেভের জন্ম হয়। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা সমাপন করিয়া সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা চেভিশেভ সম্মানিত হন, মৌলিক সংখ্যা সংক্রান্ত গবেষণার জন্যই তাহার সর্বাধিক খ্যাতি। ইহা ভিন্ন দ্বিপদ রাশিসমূহের বিভিন্ন রূপ, সমাকলন ও সম্ভাব্যতার বিভিন্ন সূত্র, ভৌগোলিক মানচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি, আয়তন বাহির করিবার কতকগুলি সূত্র, দাঁতওয়ালা চাকা বা 'গিয়ার' এর কর্মপদ্ধতি এবং কতকগুলি দণ্ডসংযোগে সরলরৈখিক গতি সৃষ্টি করিবার পদ্ধতি-সম্বন্ধে তিনি নানা গবেষণা করেন।

[illegible]

চেম্বার অফ কমার্স বণিক সংঘ। শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার স্বেচ্ছামূলক যৌথ প্রতিষ্ঠান। বণিক সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য সংঘবদ্ধভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে ও উন্নতিসাধনে সাহায্য করা এবং সংঘের সভ্যগণের ব্যাবসায়িক স্বার্থরক্ষায় সহায়তা করা। সাধারণ জন বণিক-সংঘের উদ্দেশ্যবহির্ভূত। পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত ও অনুন্নত দেশেই এইজাতীয় একাধিক বণিক সংঘ বর্তমান। বিভিন্ন দেশের বণিক-সংঘগুলি সরকারি স্বীকৃতি পাইয়া থাকে।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্যবসায় গুটাইয়া লইলে ইওরোপীয় বণিকগণ তাহাদের ব্যাবসায়িক স্বার্থরক্ষার্থে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম বণিক সংঘ স্থাপন করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এই নাম গ্রহণ করে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরেও ইওরোপীয় ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক অনুরূপ বণিক সংঘ স্থাপিত হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসরেই (১৮৮৫ খ্রী)

ক্ষুদ্র শহর কোকোনদে নেটিভ মার্চেন্টস চেম্বার নামে প্রথম ভারতীয় বণিক-সংঘ স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে এই সংঘটির নাম হয় গোদাবরী চেম্বার অব কমার্স। আদি প্রতিষ্ঠান হইলেও এই বণিক-সংঘটি উত্তরকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় স্থাপিত বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্সই প্রকৃতপক্ষে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় বণিক-সংঘ। ইহার বর্তমান নাম বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি। দেশীয় ব্যবসায়িগণের ব্যাবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতে তাঁহাদের বণিক সংঘগুলির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোন স্থাপন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সিলোন চেম্বার অফ কমার্সের পৃথকীকরণের পর ইহার নাম হয় অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি। ইহার কার্যালয় বর্তমানে কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের দপ্তরেই অবস্থিত। ভারতীয় বণিক সংঘগুলির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতীয় বণিক সংঘগুলির ভূমিকা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্র The Eastern Chamber of Commerce, Calcutta, *Indian Chambers of Commerce and Commercial Association Prospect and Retrospect*, Calcutta, 1946; G. W. Tyson, *Bengal Chamber of Commerce & Industry 1853 1953 A Centenary Survey*, Calcutta, 1953; The Bengal National Chamber of Commerce and Industry, Calcutta, *Bengal National Chamber of Commerce and Industry. Souvenir Volume 1887-1962*, Calcutta, 1962

পবিত্রব্রত সরকার

চের কেরল দ্র

চেরাপুঞ্জী আসামের 'সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পার্বত্য জেলার অন্তর্গত একটি থানা ও গ্রাম। চেরাগ্রাম (২৪°১৫′ উত্তর ও ৯১°৪৭′ পূর্ব) শিলং মালভূমির দক্ষিণে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৩৫৮ মিটার (৪৪৫৫ ফুট) উচ্চ চেরা মালভূমির উপর অবস্থিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে চেরাপুঞ্জী থানার আয়তন প্রায় ২৮৭৫ বর্গ কিলোমিটার (১১১০ বর্গ মাইল) ও জনসংখ্যা ৯৯৬২৯। এখানেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে প্রায় ২২৬২ সেন্টিমিটার (৯০৫ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। সাধারণতঃ বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১০৬৫ সেন্টিমিটার (৪২৬ ইঞ্চি)। কোনও কোনও সময়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭৬-১০২ সেন্টিমিটার (৩০-৪০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পূর্ব বঙ্গ ও শ্রীহট্টের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হঠাৎ চেরাপুঞ্জী মালভূমিতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতেই বারিবর্ষণ হয়। বর্ষাকালেই চেরাপুঞ্জীতে অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। শীতকালে বৃষ্টি প্রায় হয় না।

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্ট সমভূমি হইতে চেরা মালভূমি খাড়াভাবে উঠিয়াছে। চেরাপুঞ্জী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রধানতঃ নিস শিলায় গঠিত। উপরে ক্রিটেশাস যুগের বেলে পাথর ও কনগ্লোমারেট স্তর রহিয়াছে, এই স্তরের স্থানে স্থানে কয়লার সূক্ষ্ম স্তর আছে। প্রাচীন শিলাস্তর ও ক্রিটেশাস যুগের শিলাস্তর ভেদ করিয়া গ্রানাইট শ্রেণীর শিলা উপরে উঠিয়াছে। চেরাপুঞ্জীর নিকটে কয়েকটি চূনা পাথরের গুহা আছে। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্তী বিভিন্ন নদীর জলপ্রপাত চেরাপুঞ্জীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে, শহরের অল্প দক্ষিণে নুশাং ও প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) পশ্চিমে নাহ্‌কালিকাই জলপ্রপাত বিখ্যাত।

পূর্বে চেরাপুঞ্জী শহর 'সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পার্বত্য জেলার প্রধান কার্যালয় ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জেলার সদর দপ্তর শিলং শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। চেরা বাজারকে কেন্দ্র করিয়া চেরাপুঞ্জী গ্রামটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ৫৩ কিলোমিটার (৩৩ মাইল) উত্তরে অবস্থিত শিলং শহরের সহিত সর্বঋতুতে ব্যবহারের উপযোগী পাকা রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। চেরার বেলে পাথর হইতে মৃৎশিল্প ও কাচশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পাওয়া যায়। দৈনিক প্রায় ২৫৫ মেট্রিক টন (২৫০ টন) সিমেন্ট উৎপাদনক্ষম একটি কারখানাও এখানে আছে। চেরাপুঞ্জীতে বর্তমানে ওয়েল্‌স মিশন থিওলজিক্যাল কলেজ, মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol X, Oxford. 1908, E. H. Pakyntein, *Census of India 1961 : Assam, United Khasi Jaintia Hills*, Gauhati, 1965.

দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী

চৈৎ সিংহ কাশী বা বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহ প্রথমে অযোধ্যার নবাবের সামন্ত ছিলেন। অযোধ্যার নবাব আসফুদ্দৌল্লা ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্য ইংরেজ গভর্নমেন্টকে দান করেন এবং ইহার রাজা চৈৎ সিংহ নির্ধারিত বার্ষিক করদানের অঙ্গীকার করায় উনি ইংরেজ সরকার-কর্তৃক স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮ খ্রী) অর্থাভাবে চৈৎ সিংহের নিকট অতিরিক্ত কর দাবি করেন এবং তিন বৎসর পর্যন্ত চৈৎ সিংহ এই টাকা দেন। কিন্তু চতুর্থ বৎসরে হেস্টিংস এই অতিরিক্ত টাকা ছাড়াও দাবি করিলেন যে চৈৎ সিংহকে একদল অশ্বারোহী সেনাও দিতে হইবে। এই দাবি মিটাইতে বিলম্ব হয় এবং এই অজুহাতে হেস্টিংস চৈৎ সিংহকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। এই টাকা আদায় করিবার জন্য হেস্টিংস বারাণসীতে যাইয়া চৈৎ সিংহকে তাহার প্রাসাদে বন্দী করেন (১৭৮১ খ্রী)। ইহাতে জনতা বিশেষ উত্তেজিত হয় এবং গঙ্গার অপর তীরস্থ রামনগর হইতে বহু সশস্ত্র লোক নদী পার হইয়া ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করে। চৈৎ সিংহ পলাইয়া যান। ইংরেজ সৈন্য রামনগর আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হেস্টিংস প্রাণভয়ে চুনার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৈৎ সিংহের সৈন্যদল প্রবল শক্তিতে নানা স্থানে যুদ্ধ করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংরেজরা চৈৎ সিংহের তিনটি প্রধান দুর্গ দখল করায় তিনি পলাইয়া প্রথমে দাক্ষিণাত্য, পরে রেওয়া ও বুন্দেলখণ্ডে এবং অবশেষে গোয়ালিয়র দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে অযোধ্যা ও বিহারের নানা স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। ভারতের কয়েকজন রাজাও ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। ইহার সহিত চৈৎ সিংহের বিদ্রোহের কোনও যোগ ছিল কিনা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু ইংরেজের অসন্তোষ অগ্রাহ্য করিয়া মারাঠারাজ সিন্ধিয়া চৈৎ সিংহকে আশ্রয় দেন এবং মৃত্যুকাল (১৮১০ খ্রী) পর্যন্ত চৈৎ সিংহ সপরিবারে গোয়ালিয়রে ছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ দ্র

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রী) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তক। ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রী) ফাল্গুনী গ্রহণ-পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপে জন্ম। পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী নবজাতকের রূপলাবণ্য দেখিয়া ডাকিনী শাঁকিনীর কুদৃষ্টি-আশঙ্কায় ইহাকে "নিমাই' (অর্থাৎ নিমের মত তিক্ত) নামে অভিহিত করেন। বাল্যে তিনি এই নামে এবং পরবর্তী কালে নিমাই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ হন। ভক্তগণ তাঁহাকে 'প্রভু' ও 'মহাপ্রভু' বলিয়াও অভিহিত করেন। ইহা ছাড়া দেহলাবণ্যের জন্য তিনি "গৌর গৌরাঙ্গ, গৌরহরি" প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধ হন। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, পদবী পুরন্দর। মাতা নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচী দেবী। জগন্নাথের পিতা উপেন্দ্র মিশ্রের নিবাস ছিল শ্রীহট্টে, জগন্নাথ গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। তখন শ্রীহট্ট হইতে আগত মহাপণ্ডিত ও ধনী অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে বাস করিয়া অধ্যাপনা ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের চর্চা করিতেছিলেন। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের অভিভাবকের মত ছিলেন। চৈতন্যের বয়স যখন ছয় সাত বৎসর, তখন অগ্রজ বিশ্বরূপ গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ও নিরুদ্দিষ্ট হন।

বাল্যে নিমাইয়ের খুবই দুরন্তপনা ছিল, কিন্তু অদ্ভুত বালককে দেখিলে লোকে সব দোষ ভুলিয়া যাইত, ছোট বড়, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই শিশু নিমাইকে দেখিয়া প্রসন্ন হইত। উপনয়ন হইলে বিশ্বম্ভর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে একাগ্রমনে পড়িতেছিলেন। অভিধান ব্যাকরণ, কাব্য ও অলংকার তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করিলেন। কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করিলে মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বিশ্বম্ভর অধ্যয়ন রসে মগ্ন রহিলেন। যখন তাহার বয়স ষোল হইল তখন অধ্যাপনা করিতে এবং বিবাহ করিয়া মাতার পরিশ্রম লাঘব করিতে তিনি নিজেই পছন্দ করিয়া সামান্য গৃহস্থ এক আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে কন্যাকর্তার ও মাতার সম্মতিক্রমে অনাড়ম্বরে বিবাহ করিলেন। ইতিপূর্বে বিশ্বম্ভর অধ্যয়ন শেষ করিয়া অধ্যাপনা শুরু করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে তিনি টোল খুলিয়া 'কলাপ ব্যাকরণ' পড়াইতে লাগিলেন। মুকুন্দের পুত্র পুরুষোত্তমও পড়িতে লাগিল। ইনিই বিশ্বম্ভরের ছাত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিছুদিন নবদ্বীপে পড়াইবার পর তিনি 'বঙ্গদেশে' অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গে এবং পিতৃভূমি শ্রীহট্টে গিয়া কিছুকাল বিদ্যা বিতরণ করেন। 'বঙ্গদেশে' ভ্রমণকালে তিনি তাহার প্রথম অনুরক্ত ভক্ত লাভ করেন। ইহার নাম তপন মিশ্র। তপন মিশ্র বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সপরিবারে নবদ্বীপে চলিয়া আসিতে চাহিলে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে কাশীতে যাইতে উপদেশ দেন। সন্ন্যাসের পর কাশীতে গিয়া চৈতন্য এই

চৈতন্যদেব

তপন মিশ্রের ঘরেই ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। ইহারই পুত্র রঘুনাথ ভট্ট চৈতন্যের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

কয়েক মাস পরে বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া শুনিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ঘরের টান ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। এবার শচীদেবী বড়লোক সনাতন রাজ-পণ্ডিতের সুন্দরী বয়স্থা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন।

বিবাহের কিছুকাল পরেই বিশ্বম্ভর কয়েকজন ছাত্র-শিষ্যসহ পিতৃক্রিয়া করিতে গঙ্গাতীর-পথে গয়ায় যাত্রা করিলেন। ভাগলপুর হইয়া তিনি মন্দারে গেলেন এবং মধুসূদন দর্শন করিয়া পুনপুনের পথে গয়ায় পৌছিয়া সমস্ত তীর্থকৃত্য করিলেন। এইখানে তিনি ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরম-ভাগবত একান্ত-ঈশ্বরপ্রেমী মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বম্ভরের চরিত্র যেন বদলাইয়া গেল। তিনি ভক্তির প্লাবনে যেন দিশাহারা ও উন্মাদপ্রায় হইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর বৈষ্ণনাথ হইয়া নবদ্বীপে ফিরিলেন, কিন্তু যে মানুষটি গিয়াছিলেন তেমনটি ফেরেন নাই।

অনেক কাল আগেই নবদ্বীপে একটি ঈশ্বরপ্রেমী বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিলেন তিন জন – অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস (যাহার জন্ম মুসলমানবংশে) এবং শ্রীবাস পণ্ডিত (বিশ্বম্ভরের অত্যন্ত হিতৈষী প্রতিবেশী)। আর ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক মুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাসের তিন ভাই, মুরারি গুপ্ত, সদাশিব পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ইত্যাদি। গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে একদিন ইহারা বিশ্বম্ভরের ভক্তিবিহ্বলতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বিশ্বম্ভর অধ্যাপনা ছাড়িলেন এবং ছাত্র-শিষ্যদের এই পদ গাহিয়া সংকীর্তন শিক্ষা দিলেন— 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'

এদিকে হরিসংকীর্তন দিন দিন জমিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর প্রথমে নিজগৃহে, তাহার পর শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে সারারাত্রি ধরিয়া কৃষ্ণকথা ও নামসংকীর্তন হইতে লাগিল। অবাঞ্ছিত লোক এড়াইবার জন্য দ্বারে খিল লাগানো হইল। ইহাতে কেহ কেহ এই নূতন বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধবাদী হইতে লাগিল। এই সময়ে অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া বিশ্বম্ভর ও তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। অদ্বৈত সপরিবারে নবদ্বীপে আসিয়া মিলিলেন। এইসঙ্গে হরিদাসও যোগ দিলেন। বিশ্বম্ভরের অন্তরঙ্গ পরিষৎ সম্পূর্ণ হইল। প্রতি রাত্রে সংকীর্তন শ্রীবাসের গৃহে, কোনও কোনও দিন তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে, কোনও দিন বা নিজগৃহে। একদিন বিশ্বম্ভর যখন ঈশ্বরভাবে পূর্ণমাত্রায় আবিষ্ট তখন ভক্তেরা বিশ্বম্ভরকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়া পূজা করিলেন।

অতঃপর তিনি জনসাধারণকে হরিনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিবার জন্য নিত্যানন্দ ও হরিদাসপ্রমুখ ভক্তগণকে প্রেরণ করিলে একদিন তাঁহারা দুর্মতি দুরাচার মদ্যপ দুই ভাই জগাই ও মাধাই (নগর-কোতোয়াল)-এর সম্মুখে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইলেন। নিত্যানন্দ শারীরিক আঘাত পাইলেও প্রসন্নতা ও হরিনাম-উপদেশ ছাড়িলেন না। ইহাতে মদ্যপদের নেশা ছুটিয়া গেল এবং তাহাদের জীবনধারাও সেই হইতেই পাল্টাইয়া গেল। এই ঘটনায় বিশ্বম্ভরের প্রতিষ্ঠা বাড়িল। বিশ্বম্ভর সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে শাঁখ-ঘণ্টা বাজাইয়া হরিনাম-কীর্তন করিতে নগরের লোককে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে বিরোধীরা (বিশেষ করিয়া মুসলমানেরা) শঙ্কিত হইয়া নবদ্বীপের কাজীর নিকট গিয়া নালিশ করিলে কাজী নগরে উচ্চ সংকীর্তন নিষেধ করিলেন, কিন্তু বিশ্বম্ভর এক বিরাট দল লইয়া সন্ধ্যায় নবদ্বীপের পথে পথে শোভাযাত্রা করিয়া সংকীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া কাজী নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন। নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরের মহিমা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল।

পরিশেষে গৃহাশ্রম ছাড়িয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লইতে সংকল্প করেন এবং মাতৃভক্ত বিশ্বম্ভর বিনয়ে ও কৌশলে মায়ের অনুমতি লইয়া চব্বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার মুখে ১৪৩১ শকাব্দের (১৫১০ খ্রী) মাঘ মাসে কাটোয়ায় গিয়া সন্ন্যাস লইলেন। সেখানে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং মুকুন্দ দত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। গুরু কেশব ভারতী শিষ্যের নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সন্ন্যাস লইয়া চৈতন্য দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইলে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনযাত্রার ছলে তাঁহাকে ভুলাইয়া দিনদশেক পরে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে তুলিলেন। নবদ্বীপ হইতে শচী দেবী ও ভক্তবৃন্দও আসিয়া মিলিলেন। চৈতন্যের ইচ্ছা মথুরা-বৃন্দাবনে চলিয়া যান কিন্তু শচী ও ভক্তদের ইচ্ছা তিনি নিকটে পুরীতে থাকেন। চৈতন্য মায়ের ইচ্ছা মানিয়া লইলেন ও দিনকতক শান্তিপুরে কাটাইয়া তিনি গঙ্গাতীর-পথে ছত্রভোগ হইয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে রহিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত। মন্দিরে আসিয়া দূর হইতে জগন্নাথের মূর্তি দেখিয়া চৈতন্য প্রেমে বিহ্বল

চৈতন্যদেব

হইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই সময়ে মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য দেবদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যকে নিজগৃহে আতিথ্যদান করিলেন এবং এই ভাবুক নবীন সন্ন্যাসীকে বেদান্ত পড়াইবার উদ্যোগ করিলে চৈতন্য তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়া বৈষ্ণবমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

ফাল্গুন মাসে চৈতন্য নীলাচলে পৌঁছিয়াছিলেন ও বৈশাখ মাসে তিনি দক্ষিণ দেশে তীর্থ করিতে গমন করেন। আলালনাথ হইতে যাত্রা শুরু করিয়া প্রথমে কূর্মস্থান (শ্রীকাকুলমের নিকট), তাহার পর জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র (সীমাচলম্), তাহার পর গোদাবরী পার হইয়া রাজমহেন্দ্রীতে উপস্থিত হন। এখানে তিনি ওড়িশার রাজার প্রাদেশিক প্রতিনিধি রামানন্দ রায় গোদাবরী-স্নানে আসিলে তাঁহার সহিত মিলিত হন। রামানন্দ যে একজন পরম ভাবুক বৈষ্ণব তাহা সার্বভৌমই চৈতন্যকে বলিয়াছিলেন। রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় দশ রাত্রি যাপন করিয়া চৈতন্য অগ্রসর হইলেন। মল্লিকার্জুন তীর্থ, অহোবল নৃসিংহক্ষেত্র ইত্যাদি ঘুরিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিয়া চাতুর্মাস্য যাপন করেন। এখানে তিনি এক নিষ্ঠাবান ভক্তের হৃদয় জয় করেন, তাহার নাম বেঙ্কট ভট্ট। এখান হইতে তিনি ঋষভ পর্বতে গেলেন। সেখানে মাধবেন্দ্র পুরীর এক প্রধান শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সহিত মিলিত হন। পরমানন্দ চৈতন্যের একান্ত অনুরক্ত হইয়া গেলেন এবং নীলাচলে বাস স্বীকার করিলেন। সেখান হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত গেলেন এবং কেরল দেশের তীর্থসমূহ পর্যটন করিয়া মহারাষ্ট্রে কোলাপুর এবং সেখান হইতে পঢ়রপুরে আসিলেন। এখানে মাধবেন্দ্র পুরীর আর এক শিষ্য রঙ্গ পুরীর সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তাহার নিকট অগ্রজ বিশ্বরূপের তিরোভাবের সংবাদ শুনিলেন। তাহার পর চৈতন্য নাসিক প্রভৃতি তীর্থ হইয়া গোদাবরী ধরিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আবার রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। সেখান হইতে পুরীতে ফিরিলেন। তাহার সঙ্গলাভের জন্য রামানন্দ চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া পুরীতে নিজগৃহে অবস্থিত হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র চৈতন্যের অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কাশী মিশ্রের নির্জন বাগান-বাড়িতে চৈতন্যের বাসা হইল। এখানেই তিনি শেষ পর্যন্ত ছিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রও চৈতন্যের ভক্ত হইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে পরমানন্দ পুরীও আসিলেন। দামোদর-স্বরূপ ও পরমানন্দ পুরী এই দুই জন নীলাচলে চৈতন্যের পার্শ্বচরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

চৈতন্যের প্রত্যাগমন-সংবাদে গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে আসিলেন। তাঁহাদের সকলকে লইয়া জগন্নাথ মন্দিরে সন্ধ্যার পরে সংকীর্তন, গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন, রথের আগে আগে চৈতন্যের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নৃত্যগীতবাদ্য ওড়িশা দেশকেও মাতাইয়া তুলিল। স্নান-যাত্রার পূর্বে আসিয়া রথযাত্রার পর গৌড়ীয় ভক্তেরা প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রতি বৎসর গৌড়ীয়দের এইরূপ গমনাগমন হইত, হরিদাস ঠাকুর আসিয়া আর ফিরিয়া গেলেন না। চৈতন্য তাঁহার সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং নিজে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব মাতাকে ও পত্নীকে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই সর্বত্যাগী সর্বংসহ নিঃস্ব মহত্তম মানুষটির ভার সস্নেহে বহন করিয়াছিলেন।

নীলাচলে দুইটি রথযাত্রা উৎসব কাটাইয়া চৈতন্য বিজয়া দশমীর দিনে (অক্টোবর ১৫১৪ খ্রী) মথুরা বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন পরমানন্দ পুরী, দামোদর স্বরূপ, মুকুন্দ দত্ত, হরিদাস ঠাকুর ইত্যাদি কয়েকজন মুখ্য ভক্ত ও অন্যান্য লোক। নিত্যানন্দ আগেই গৌড়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। ওড়িশা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত স্থলপথে ও গৌড়ের বাদশার অধিকারে নদীপথে অগ্রসর হইলেন এবং পিছলদায় নৌকায় উঠিয়া তাহারা পানিহাটিতে নামিলেন। সেখান হইতে স্থলপথে কুমারহট্ট ও ফুলিয়া হইয়া শান্তিপুরে আসিলেন। শচী এবারও সেখানে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলে রাজমন্ত্রী 'সাকর মল্লিক' সনাতন ও তাঁহার ভাই 'দবির খাস' রূপ চৈতন্যের পদধূলি লইতে আসিয়াছিলেন। এবার তিনি রামকেলী হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পথে শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে পুনর্বার দিন দশ কাটাইলেন। মাতার নিকট বৃন্দাবন যাত্রার অনুমতি লইয়া চৈতন্য পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পুরীতে বর্ষার কয়েক মাস কাটাইয়া চৈতন্য বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে গেলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তাহার ব্রাহ্মণ পরিচারক। চৈতন্য ঝারিখণ্ড ছোট-নাগপুরের বনপথ ধরিয়া বারাণসীতে পৌঁছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন কাটাইয়া প্রয়াগে গেলেন, সেখান হইতে মথুরা বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে চৈতন্যের ভাবাবেগ প্রবল হওয়ায় বলভদ্র ভট্টাচার্য তাঁহাকে লইয়া শীঘ্রই ফিরিবার পথ ধরিলেন। যমুনার পারে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান সেনানী চৈতন্যের ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণবভাব আশ্রয় করিয়াছিলেন।

রামকেলী গ্রামে চৈতন্যের দর্শন পাইবার পর হইতে সনাতন ও রূপ দুই ভাইয়ের সংসারে মন আর টিকিল না। আগে পলাইলেন রূপ ও তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম মল্লিক (নামান্তর বল্লভ)। ইঁহারা চৈতন্যের ফিরিবার পথে প্রয়াগে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রয়াগে দশ দিন কাটাইয়া রূপকে মথুরা যাইতে বলিয়া চৈতন্য বারাণসীতে আসিলেন এব সেখানে দুই মাস রহিলেন। বাসা হইল বৈদ্য চন্দ্রশেখরের গৃহে ও আহার তপন মিশ্রের গৃহে। এইখানে সনাতন পলাইয়া আসিয়া চৈতন্যদেবের দেখা পাইলেন। চৈতন্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়া মথুরায় রূপের সঙ্গে মিলিতে পাঠাইয়া দিলেন। কাশী হইতে চৈতন্য সেই বনপথেই নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ন্যাসের পর এইভাবে দক্ষিণ দেশে, গৌড়ে ও উত্তরাপথে তীর্থযাত্রায় তাঁহার ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। প্রকটকালের শেষ আঠার বৎসর তিনি নীলাচল ছাড়িয়া কোথাও যান নাই।

গৌড়ীয় ভক্তেরা যথারীতি বৎসর বৎসর আসিতেন। চৈতন্য রথাগ্রে কীর্তন-নর্তন করিতেন, ভাগবত-পাঠ শুনিতেন। প্রত্যহ গরুড়স্তম্ভের নিকটে দাড়াইয়া জগন্নাথ দর্শনকালে তাঁহার চোখ হইতে জল ঝরিত। ইহা ছাড়া মর্ম-সঙ্গীদের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় এবং দামোদর-স্বরূপের কণ্ঠে কৃষ্ণলীলা শ্লোক ও গান-শ্রবণে তাঁহার বেশি সময় কাটিত। কিছুদিন পরে রূপ আসিয়া মিলিলেন, তিনি চলিয়া গেলে সনাতন। তাহার পর আসিলেন রঘুনাথ দাস— সপ্তগ্রাম মুলুকের ইজারাদার দুই ভাই হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাসের একমাত্র বংশধর, নববিবাহিত তরুণ যুবক বৈরাগী। চৈতন্য তাঁহার ভার দামোদর-স্বরূপের উপর ন্যস্ত করিলেন। কিছুকাল পরে বল্লভ ভট্ট নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যদেবের কৃপা পাইলেন। তাহার পর আসিলেন তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট। রঘুনাথকে তিনি দশ মাস কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিয়া বারাণসীতে পিতৃসেবা করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

হরিদাস ঠাকুর দেহত্যাগ করিলে তাঁহার দেহ চৈতন্যদেব স্বহস্তে তুলিয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিলেন এবং নিজে ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের নিবাণ-কৃত্য, বৈষ্ণব-ভোজনাদি করাইলেন। অতঃপর চৈতন্যদেব প্রায় সর্বদা অন্তর্মনা হইয়া কাল কাটাইতেন। তাঁহার আচরণ সাধারণ লোকের কাছে অবোধ্য ছিল।

সমসাময়িক যাঁহারা চৈতন্যদেবের জীবন-কথা পদাবলীতে ও চরিত-গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার তিরোধানের বিবরণ উল্লেখ করেন নাই। শুধু পরবর্তী কালের একটি জীবনীকাব্যে— জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে— এরূপ উল্লেখ আছে যে, রথাগ্রে নর্তনকালে চৈতন্যের পায়ে ইটের কুচি বিদ্ধ হয়। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যাধির প্রকোপ ঘটে এবং তিনি ১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ় মাসে (জুলাই ১৫৩৩ খ্রী) অপ্রকট হন।

হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে চৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরেজী মতে 'রিলিজন' বলা বোধ হয় খুব সংগত হয় না, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলাই ঠিক হয়। জনসাধারণের জন্য চৈতন্যদেব যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা সর্বজনীন চিরন্তন আদর্শের অন্তর্গত। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং সে ভক্তি-উদ্দীপনের জন্য নাম-সংকীর্তন— ইহারই উপর চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জাতি-বর্ণনির্বিচারে সকল মানুষই যে সমান আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে, ইহা তিনি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে অপূর্ব প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া বাঙালীর প্রতিভা কি ধর্মে, কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি সংগীত-কলায় সর্বত্র বিচিত্রভাবে স্ফুরিত হইতে থাকে। ইহাই বাঙালী জাতির প্রথম জাগরণ।

চৈতন্যদেব যে প্রেমধর্মের দৃষ্টি দান করিলেন, তাহাতে বর্তমান কাল এবং জীবিত মানুষ স্বমহিমায় গোচর হইল। সত্যযুগের কল্পিত মরীচিকার প্রত্যাশায় মানুষ বর্তমানকে আর উপেক্ষা করিতে পারিল না। তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণব বলিলেন— বর্তমান কালই তো সাধনার কাল, যাহা করিবার তাহা তো এখনই করিতে হইবে; অতএব 'প্রণমহোঁ কলিযুগ সবযুগসার।' সৃষ্টির পর্যায়ে প্রাণের ব্যক্ততম প্রকাশ হইয়াছে মানুষে, আর দেবতা তো মানুষেরই আদর্শে গড়া, সুতরাং 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।' এইরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কল্পনার অতীত হইতে আনিয়া বাস্তব বর্তমানের উপর নিবিষ্ট করাইয়া শ্রীচৈতন্য বাঙালীর চিন্তাধারাকে আধুনিকতার দিকে বহাইয়া দিলেন। 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', 'বৈষ্ণব ধর্ম' ও 'ভক্তি' দ্র।

দ্র বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'; কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'; চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'; জয়ানন্দের শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল, নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ-সম্পাদিত, পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ৭, কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

সুকুমার সেন

চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনদাস দ্র

চৈতন্যমঙ্গল লোচনদাস দ্র

চৈতি উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে (মীর্জাপুর, বারাণসী প্রভৃতি জেলা) এবং বিহার প্রদেশের পশ্চিমাংশে প্রচলিত লোকসংগীত-বিশেষ। হোলি উৎসবের পরে এবং চৈত্র মাসে চৈতি গীত হইয়া থাকে। লৌকিক প্রেম, সম্ভোগ, শৃঙ্গার ইত্যাদি এবং গার্হস্থ্য ও অন্যান্য জনপ্রিয় প্রসঙ্গও চৈতির বিষয়বস্তু। সম্মেলক অথবা একক— দুইভাবেই চৈতি গাহিবার রীতি আছে। মূলতঃ লোকসংগীত হইলেও রাগের আশ্রয়ে এবং ঠুংরির ধরনে রাগমিশ্রণ করিয়াও ইহা সংগীতের আসরে পরিবেশিত হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

চৈত্য স্তূপ দ্র

চোলবংশ মাদ্রাজ প্রদেশের তঞ্জোর ও তিরুচ্চিরাপ্পল্লী অঞ্চলের চোল রাজবংশ অতি প্রাচীন। কাত্যায়নের বার্তিক (খ্রী-পূ ৪র্থ শতাব্দী) এবং অশোকের শিলালেখে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী) চোলগণের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন তামিল কিংবদন্তিতে চোলরাজ করিকালের নাম সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত চোল-রাষ্ট্রের আয়তন অতি ক্ষুদ্র ছিল। সুদূর দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চির পল্লব-বংশের আধিপত্যকালে চোলেরা পল্লবসম্রাটগণের সামন্ত বা নৃপতিরূপে ছিলেন।

উত্তরকালীন চোলসম্রাট বংশের আদি পুরুষ বিজয়ালয় ৯ম শতাব্দীর ৩য় পাদে পল্লবরাজের সামন্তরূপে তিরুচ্চিরাপ্পল্লীর নিকটবর্তী উরৈয়ুর হইতে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি তঞ্জোর অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রী) পল্লবরাজ অপরাজিতের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া শ্রীপুরম্বিয়ম্ নামক স্থানের মহাযুদ্ধে পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করেন, কিন্তু ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অপরাজিতকে পরাজিত করিয়া তিনি পল্লবরাজ্য অধিকার করিলেন। এইরূপে চোল-সাম্রাজ্যের পত্তন হইল।

আদিত্যের পুত্র পরান্তক (৯০৭-৫৩ খ্রী) সিংহলীয় সেনার সাহায্যপুষ্ট পাণ্ড্যরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া পাণ্ড্য-রাজধানী মদুরা অধিকার করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ চোল-রাজ্য আক্রমণ করিয়া বল্লাল (দক্ষিণ আর্কটের অন্তর্গত তিরুবল্লম্) নামক স্থানে পরান্তকের হস্তে পরাজিত হন। কিন্তু শেষ জীবনে পরান্তক রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হন। তক্কোলমের যুদ্ধে চোলসেনাপতি যুবরাজ রাজাদিত্য নিহত হন এবং চোলসাম্রাজ্যের উত্তরাংশে রাষ্ট্রকূট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৬ খ্রী) এবং তৎপুত্র প্রথম রাজেন্দ্রের শাসনকাল (১০১২-৪৪ খ্রী) চোলসাম্রাজ্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। রাজরাজ তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ দিক্‌বর্তী সমগ্র ভূভাগে আধিপত্য সুদৃঢ় করেন। তাঁহার সময়ে বেঙ্গী ও কলিঙ্গরাষ্ট্রে চোলপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিংহল দ্বীপের উত্তরাংশ চোল-সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তিনি বহুবার তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরস্থিত উত্তরকালীন চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১০১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র তাঁহাকে রাজ্যশাসনে সহায়তা করিতে-ছিলেন। তঞ্জোরের বৃহদীশ্বর বা রাজরাজেশ্বর এর মন্দির রাজরাজের অতুলনীয় কীর্তি। তিনি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতি মারবিজয়োত্তুঙ্গ-বর্মাকে নাগপট্টনে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে রাজেন্দ্রচোলের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বিরল। তিনি সমগ্র সিংহল দ্বীপে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার সেনাদল পূর্ব দিকে দক্ষিণ বাংলা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তাঁহার লেখমালায় যে সকল পূর্বদেশীয় রাজার নামোল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে যযাতি নগরের সোমবংশীয় নরপতি ইন্দ্ররথ, দণ্ডভুক্তিপতি ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, বঙ্গাল দেশের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ের অধিপতি পালবংশীয় প্রথম মহীপাল প্রসিদ্ধ। এইরূপে গঙ্গাতীর পর্যন্ত চোলপ্রভাব বিস্তার করিয়া রাজেন্দ্র 'গঙ্গৈকোণ্ড' (গঙ্গাবিজয়ী) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নৌসেনা ভারত মহাসাগরের মানক্কবারম্ (নিকোবর) দ্বীপ এবং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চল স্থিত বহুসংখ্যক জনপদ অধিকার করে। শৈলেন্দ্র-বংশীয় সংগ্রামবিজয়োত্তুঙ্গবর্মাকে পরাজিত করিয়া তিনি কটাহ বা কডারম্ (পেনাঙের নিকটবর্তী কেডা) এবং সুমাত্রার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত শ্রীবিজয় (বর্তমান পালেম্বং) অধিকার করেন। সম্ভবতঃ নৌ-সেনার এই অভিযানের সহায়ক হিসাবেই রাজেন্দ্রের স্থলসৈন্য বাংলা দেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

পিতার ন্যায় রাজেন্দ্রও বহুবার চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চালুক্যরাজ জয়সিংহ মুসঙ্গির যুদ্ধে রাজেন্দ্রের হস্তে পরাজিত হন। রাজেন্দ্রের পর তাঁহার তিন পুত্র— রাজাধিরাজ (১০১৮-৫২ খ্রী), দ্বিতীয় রাজেন্দ্র (১০৫২-৬৪ খ্রী) এবং বীররাজেন্দ্র (১০৬৩-৭০ খ্রী)

ক্রমান্বয়ে চোলসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহারা সকলেই চালুক্যদিগের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কোপ্পমের যুদ্ধে রাজাধিরাজ নিহত হন, কিন্তু দ্বিতীয় রাজেন্দ্রের বীরত্বে চালুক্যসেনা পরাজিত হইয়াছিল। বীররাজেন্দ্র পাঁচবার চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বীররাজেন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে সংঘর্ষের অবসান ঘটে নাই। কারণ শীঘ্রই চোল-সিংহাসন বিক্রমাদিত্যের শত্রু রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গের করতলগত হয়। কুলোত্তুঙ্গ (১০৭০-১১২০ খ্রী) প্রথম রাজেন্দ্রের দৌহিত্র এবং বেঙ্গীর চালুক্যরাজ প্রথম রাজরাজের পুত্র ছিলেন।

ক্রমে চোলসাম্রাজ্যের অবনতি ঘটিতে থাকে। সিংহল এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অনেক অংশ চোলসম্রাটের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। তৃতীয় রাজরাজ (১২১৬-৪৬ খ্রী) তদীয় সামন্ত কোপ্পেরুঞ্জিঙ্গের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। হোয়সলরাজ নরসিংহ তাহাকে উদ্ধার করেন। এই সময়ে সুদূর দক্ষিণ ভারতে আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে হোয়সল এবং পাণ্ড্যরাজগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। তৃতীয় রাজেন্দ্র (১২৪৬-৭৯ খ্রী) পাণ্ড্যরাজ জটাবর্মা সুন্দরপাণ্ড্যের (১২৫১-৬৮ খ্রী) অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে পরাক্রান্ত চোলবংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়।

দ্র R Sewell, *The Historical Inscriptions of Southern India*, Madras, 1932; V. V. Ayyar, *South Indian Inscriptions*, vol. XII, Madras, 1943, K A. Nilkanta Sastri, *The Cholas*, 2nd Edn, Madras, 1955, R C. Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vols. IV & V, 1955 & 1957.

দীনেশচন্দ্র সরকার

চৌথ শিবাজী তাঁহার আক্রান্ত শত্রু বা প্রতিবেশীদের রাজ্য হইতে রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দাবি করিতেন। ইহাই চৌথ। ইহা ছিল তাঁহার অর্থসংগ্রহের অন্যতর উপায়। এই প্রথা শিবাজীর অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রামনগরের ক্ষুদ্র রাজপুত রাজা দমানের পর্তুগীজদের নিকট হইতে বার্ষিক চৌথ আদায় করিতেন ও সেইজন্য তিনি 'চৌথিয়া রাজা' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

শিবাজীর এইভাবে অর্থসংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মহারাষ্ট্রের পার্বত্য প্রদেশগুলিতে আশানুরূপ ভূমিরাজস্ব পাওয়া যাইত না। এইজন্য তিনি প্রায়ই নিকটবর্তী ও মধ্যে মধ্যে দূরবর্তী অন্যরাজ্যভুক্ত প্রদেশ আক্রমণ করিয়া গ্রাম ও নগরবাসীদের নিকট চৌথ আদায় করিতেন।

সাধারণ বিধি অনুযায়ী চৌথের পরিমাণ আক্রান্ত জেলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ছিল বটে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার হেরফেরও ঘটিত। সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন যে চৌথিয়া রাজা ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে রাজস্বের মাত্র ১৭-১২½% পাইতেন এবং শিবাজীও প্রকৃতপক্ষে এক-চতুর্থাংশের কম লইয়াও সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু যদুনাথ সরকার বলেন যে চৌথের প্রকৃত পরিমাণ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা কখনও কখনও অধিক হইত।

শিবাজীর সময় হইতে মারাঠাগণ কখনও দাক্ষিণাত্যে চৌথের দাবি পরিত্যাগ করে নাই, হয় সম্রাটের সনদ অনুসারে নচেৎ নিছক বাহুবলে চৌথ আদায় করিয়াছে।

চৌথের স্বরূপ বা চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, তবে ইহা সত্য যে বিভিন্ন সময়ে ইহার স্বরূপের পরিবর্তন হইয়াছে। চৌথ কখনও দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তার উপায় ('গ্রাসো'), কখনও দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী বাবদ আদায় করা কর, কখনও বা পেন্সন বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

রানাডের মতে চৌথ ছিল তৃতীয় শক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার মূল্য। তিনি ইহাকে ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতির সহিত তুলনা করেন। তবে যদুনাথ সরকার ও সুরেন্দ্রনাথ সেন উভয়েই এই মত ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন।

চৌথ আদায়ের প্রথা শুধু মারাঠাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। চম্পৎরাও ও ছত্রশাল বুন্দেলা চৌথ আদায় করিতেন। শিখগণও শতদ্রুর দক্ষিণে চৌথের অনুরূপ ('রাখী') পাওনা আদায় করিত। এমন কি ইংরেজগণও বেসিন-এর (১৮০২ খ্রী) সন্ধি অনুযায়ী বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দুই জন ক্ষুদ্র সর্দারের নিকট চৌথ লইয়াছিল। মারাঠারাও একবার তাহাদের চিরশত্রু জাঞ্জিরার সিদ্দিগণকে চৌথ দিয়াছিল (১৭৫৫ খ্রী)।

দ্র J. N. Sarkar, *Shivaji & His Times*, Calcutta, 1919; James Grant Duff, *History of the Marathas*, vols. I-III Oxford, 1921; S. N. Sen, *Administrative System of the Marathas*, Calcutta, 1925; Govind Sakharam Sardesai, *Main Currents of Maratha History*,

Calcutta, 1926 ; S. N. Sen, *Military System of the Maharastras*, Bombay, 1958

জগদীশনারায়ণ সরকার

চৌরঙ্গী কলিকাতার একটি শৌখিন অঞ্চল। কলিকাতার পত্তনসময়ে অঞ্চলটি ঘনজঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী নামে নাথসম্প্রদায়ের এক সাধু এতদঞ্চলে বসবাস করিতেন, সম্ভবতঃ তাঁহার নামানুসারে 'চৌরঙ্গী' নামের উদ্ভব হইয়াছে। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পরগনায় 'চেরঙ্গি' ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পত্তি ছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম-এর নির্মাণকালে এই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের 'আপ্‌জন'-কৃত মানচিত্রে চৌরঙ্গীকে বর্তমান পার্ক স্ট্রীট এর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলরূপে দেখানো আছে।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের 'উড্‌'-কৃত কলিকাতার মানচিত্রে দেখা যায় যে চৌরঙ্গী রোড ময়দানের পূর্ব-সীমা ও উত্তরে ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে দক্ষিণে লোয়ার সার্কুলার রোড পর্যন্ত বিস্তৃত। চিৎপুর হইতে কালীঘাট যাইবার তীর্থযাত্রীদের যে পুরাতন হাঁটা-পথ ছিল, যাহাকে হলওয়েল 'রোড টু কলিঘাট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই রাস্তাটি তাহার অংশবিশেষ।

দ্র হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, কলিকাতা ১৯১৫, W K Firminger, *Thacker's Guide to Calcutta*, Calcutta, 1906

প্র। চ

চৌরপঞ্চাশিকা বসন্ততিলক ছন্দোময় পঞ্চাশটি শ্লোকে রচিত একখানি সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ইহা 'চৌরী সুরত-পঞ্চাশিকা', 'চোরপঞ্চাশৎ', 'বিহ্লন কাব্য' নামেও পরিচিত। অধিকাংশ পুথিতেই দেখা যায় যে, মূল 'পঞ্চাশীর' সঙ্গে কয়েকটি শ্লোক জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিবৃতি নায়ক-কর্তৃক নায়িকার মিলন বিলাসের স্মৃতি বর্ণন কাব্যটির বিষয়বস্তু। কাব্যখানি বিহ্লন কবির (খ্রী। ১১শ শতক) রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু চোর কবি, সুন্দর কবি এবং বররুচির নামেও ইহা আরোপিত হইয়া থাকে।

কাব্যের উৎপত্তিসম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীগুলির মূল বক্তব্য— এক রাজকন্যার সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ এক যুবক রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে বধ্যভূমিতে রাজকুমারীর সহিত প্রণয়লীলার বিবরণপূর্ণ কাব্যখানি আবৃত্তি করেন। ফলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করেন। বাংলা দেশে ইহা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র কালীপক্ষে ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করিয়াছেন।

দ্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৮৮।

করুণাময় বসু

চৌরিচৌরা অসহযোগ আন্দোলন দ্র

চৌর্যশাস্ত্র চতুঃষষ্টিকলার অন্যতমরূপে স্বীকৃত চৌরকলার প্রবর্তক স্কন্দ বা কার্তিকেয়। 'হারাবলী' নামক অভিধান, 'বেতালপঞ্চবিংশতি', ক্ষেমেন্দ্রের 'কলাবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে চৌর্যশাস্ত্রের প্রবর্তকরূপে মূলদেবের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাকে ধূর্তপতি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি বাদ্যপটু ও সংগীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কালীও চোরগণের উপাস্য দেবতা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চৌর্যও যুবরাজগণের শিক্ষণীয় বলিয়া গণ্য হইত।

চৌর্যশাস্ত্র সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থের পুথি পাওয়া যায়, কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত 'ষন্মুখকল্প' ও পুনার ভাণ্ডারকর ইন্‌স্টিটিউটের 'চৌরচর্যা'। ইহাদের মধ্যে 'ষন্মুখকল্প' সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে। ষন্মুখকল্পের বিবরণস্থ চোরের প্রয়োজ্য মন্ত্র ও নানাবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রণালী। এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রধান আলোচ্য বিষয় এইরূপ —অন্তর্ধান, মানসংহরণ, ভেলকি, কপাটোদ্ঘাটন, দৃষ্টিস্তম্ভন, দেবনবাদি বশীকরণ, বন্ধনমোক্ষ, দ্রব্যাদিলাভ ইত্যাদি।

চোর ও চৌর্য সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে তথ্য পাওয়া যায়। কোনও কোনও গ্রন্থে সপ্তবিধ চোরের উল্লেখ আছে, যথা— প্রকৃত চোর, চোরের বিশ্বাসঘাতক, মন্ত্রী, ভেদজ্ঞ, চোরাই মালের ক্রেতা, চোরের আশ্রয়দাতা ও অন্নদাতা।

চৌর্যপ্রসঙ্গে সুড়ঙ্গ বা সিঁধের উল্লেখ আছে। 'মৃচ্ছকটিকে' (৩।১৩) সপ্তপ্রকার সুড়ঙ্গের নাম আছে, যথা— পদ্মব্যাকোশ, ভাস্কর, বালচন্দ্র, বাপী, বিস্তীর্ণ, স্বস্তিক ও পূর্ণকুম্ভ।

চোরের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি হিসাবে সন্দংশনিকা, কর্কটরজ্জু প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। চোর যোগচূর্ণের সাহায্যে নিজেকে অদৃশ্য করিতে পারে এবং যোগবর্তিকা দ্বারা সমস্তকিছু দেখিতে পায়। একপ্রকার কজ্জলের সাহায্যে অন্ধকার রাত্রি কোটি সূর্যের আলোকোদ্ভাসিত বলিয়া মনে হয়। অবস্বাপিকা নামক মন্ত্র দ্বারা চোর লোককে নিদ্রাভিভূত করিতে পারে এবং তালোদ্ঘাটিনী বিদ্যার সাহায্যে অনায়াসে তালা ভাঙিতে পারে।

ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ছাড়াও চোরের নিরাপত্তার কয়েকটি পদ্ধতি কৌতূহলোদ্দীপক। কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সে সুড়ঙ্গের যে দিক ঘরের মধ্যে থাকে তাহাতে প্রথম একটি প্রতিপুরুষ (ডামি) প্রবেশ করাইবে। এতদ্ব্যতীত তাহার সঙ্গে প্রজাপতি বা ভ্রমরপূর্ণ একটি বাক্স থাকিবে, সে ঐ বাক্স খুলিয়া দিলে ঐগুলি উড়িয়া গিয়া গৃহস্থিত প্রদীপ নির্বাপিত করিবে। চুরির কৌশল সম্বন্ধে নানা কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা দেশে এক সময়ে চোরচক্রবর্তীর কথা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল মনে হয়।

দ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'চোরের পাঁচালি', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, *Sanmukhakalpa*; Bloomfield, 'Character & Adventures of Muladeva', *Proceedings of the American Philosophical Society*, vols. I-II, Philadelphia, 1840; Bloomfield, 'The Art of Stealing in Hindu Fiction', *American Journal of Philology*, vol 44, Chintaharan Chakravarti, *The Art of stealing in Bengali Folklore*, Siddha Bharati, V.V.R I, Hoshiarpur, 1950

[illegible]

চৌলুক্য সোলাঙ্কি দ্র

চৌঁসার যুদ্ধ শেরশাহ্ দ্র

চৌহানবংশ রাজপুত বা চাহমানবংশ। ইহাদের বিভিন্ন শাখা খ্রীষ্টীয় ৭ম এবং ৮ম শতাব্দীতে গুজরাত এবং রাজপুতানা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইলেন সাম্ভরের চৌহানগণ। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর সূচনায় তাঁহারা শাকম্ভরী প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের রাজ্য 'সপাদলক্ষ' নামে পরিচিত ছিল। শাকম্ভরী বা বর্তমান জয়পুরের অন্তর্গত সাম্ভর ছিল তাঁহাদের রাজধানী। বাসুদেব ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর প্রথম দিকেও তাঁহারা প্রতীহারগণের অধীন ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটগণের হস্তে প্রতীহাররাজ মহীপালের শোচনীয় পরাজয়ের পর তাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে তাহাদের রাজ্যের বিস্তার ছিল উত্তরে সিকর হইতে দক্ষিণে পুষ্পর এবং পূর্বে জয়পুর হইতে পশ্চিমে যোধপুর পর্যন্ত।

শাকম্ভরীর চৌহানবংশ ভারতের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের রাজা বিগ্রহরাজ এবং তাঁহার পুত্র প্রথম পৃথ্বীরাজ (১১০৫ খ্রী) পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। পরবর্তী রাজা অজয়রাজ মালবরাজকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন এবং অজয়মেরু (বর্তমান আজমীর) নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র অর্ণোরাজ একদল তুর্কী মুসলমান আক্রমণকারীকে পরাজিত করেন। অর্ণোরাজের পুত্র চতুর্থ বিগ্রহরাজ বা বীশলদেব (১১৫৩-৬৩ খ্রী) তোমরদিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। মুসলমানদিগের সহিত বহু যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন এবং গর্বের সহিত ঘোষণা করেন যে তিনি 'আর্যাবর্ত' নাম পুনরায় সার্থক করিয়াছেন। পার্শ্ববর্তী বহু রাজাকে এবং চৌহানবংশীয় অন্যান্য শাখার রাজগণকে পরাজিত করিয়া তিনি একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেন।

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চন্দেল্লরাজকে পরাজিত করেন। মুসলমান আক্রমণকারী সিহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরাইনের প্রথম যুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন (১১৯১ খ্রী), কিন্তু পরবৎসর পৃথ্বীরাজ এ স্থানেই তাঁহার সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। ইহার ফলে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের পদানত হয় ('পৃথ্বীরাজ' দ্র)।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হরিরাজ দুই বৎসর আজমীরের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে কুতবুদ্দীন এই চাহমান রাজ্য জয় করেন।

শাকম্ভরীর চৌহানবংশের প্রথম রাজা বাক্‌পতিরাজের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণ নড্ডুল বা বর্তমান যোধপুরের অন্তর্গত 'নডোলে' অপর একটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পশ্চিম ভারতীয় ইতিহাসে তাঁহারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৌহানবংশের আরও দুইটি পরিবার প্রতীহারগণের অধীনে 'ধবলপুরী' বা ধোলপুর এবং প্রতাপগড়ে রাজত্ব করিতেন।

চাহমানদের অপর একটি শাখা খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে জয়পুরের রণস্তম্ভপুর বা বর্তমান 'রণথম্ভোরে' রাজত্ব করিতেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোবিন্দরাজ। এই বংশের আর একটি শাখা ছিল জাবালিপুর বা বর্তমান ঝালোর-এ। নডোলের রাজা আস্থণের পুত্র বিজয়সিংহ ছিলেন চৌহানদের সত্যপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং মালোরের সমরসিংহের পুত্র বিজর বা দেবরাজ আবার দেবড়া শাখার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দ্র R. C Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IV-V, Bombay, 1955 & 1957.

অমিতাভ ভট্টাচার্য

চ্যবন মহর্ষি ভৃগুর পুত্র এবং প্রমতি ঋষির পিতা। ভৃগু পুলোমা-নাম্নী ঋষিকন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের বিবাহের পূর্বে এক রাক্ষস পুলোমাকে ভার্যারূপে কামনা করিয়াছিল। কিন্তু পুলোমার পিতা রাক্ষসকে কন্যাদান না করিয়া ভৃগুর সহিতই যথাশাস্ত্র কন্যার বিবাহ দেন। পুলোমা গর্ভবতী হইলে একদা আশ্রমে ভৃগুর অনুপস্থিতি কালে ঐ রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইয়া পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকে। তখন গর্ভস্থ শিশু কুপিত হইয়া অকালে মাতৃগর্ভচ্যুত হওয়ায় তাহার নাম হইল চ্যবন। শিশু চ্যবনের তেজে সেই রাক্ষস তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। চ্যবন পরে সুকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাহার গর্ভে প্রমতির উৎপত্তি হয় (মহাভারত, আদিপর্ব, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম অধ্যায়)। অতিশয় কামাসক্ত বৃদ্ধ চ্যবন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রদত্ত যে ঔষধ সেবনে পুনর্যৌবন লাভ করেন সেই ঔষধটি আয়ুর্বেদে চ্যবনপ্রাশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বাণীপদ সেন

ছট্ বিহার প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত একটি লৌকিক ব্রত। ছট্ শব্দটি ষষ্ঠী হইতে জাত। উত্তর বিহারে এই ব্রতকে রবিষষ্ঠী বলা হয়। কার্তিক মাসে, দীপাবলী অমাবস্যার পরবর্তী শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য দেবতাকে এই উপলক্ষে অর্ঘ্য দান করা হয়। সাধারণতঃ সন্তানবতী নারীগণ সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করেন। মান-রক্ষার জন্য পুরুষগণও এই ব্রত পালন করিয়া থাকেন। এই ব্রত পালন করার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, তবে ব্রত উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে পুরোহিতগণ উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করেন ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পঞ্চমী তিথিতে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ব্রতিনীগণ নানাবিধ সুখাদ্য গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠী তিথির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ষষ্ঠী তিথিতে নিরম্বু উপবাস। সেই দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দলে দলে ব্রতিনী, হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, ঝুড়িতে বা কুলায় ফলমূল, দুধ, গুড় ও কলা-নারিকেলাদি উপকরণ বহন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কোনও পুষ্করিণীতে বা নদীতে উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে 'ঠেকুয়া' নামক একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলে নামিয়া ব্রতিনীগণ গান গাহিতে গাহিতে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সেই সময়ে তীরবর্তী পুরোহিতগণ মন্ত্রপাঠ করেন। সূর্য অস্তমিত হইলে ব্রতিনীগণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন সপ্তমী তিথির প্রভাতে পুনরায় গান গাহিতে গাহিতে ব্রতিনীগণ পূর্বোক্ত স্থানে অর্ঘ্যাদি লইয়া গমন করেন এবং সূর্যকে শেষ অর্ঘ্য প্রদান করেন। তাহার পর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে ব্রতিনীগণ গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উপবাস ভঙ্গ করিয়া ব্রত সমাপন করেন।

সুনীল বর্মণ

ছড়া লোকসাহিত্য, বাংলা দ্র

ছত্তিশগড়ী কোশলী দ্র

ছত্রভোগ চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি পল্লী। শাক্ত ও বৈষ্ণবদের তীর্থ হিসাবেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে। এই স্থানের ভূগর্ভ হইতে বহু প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ও স্তম্ভাদি পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধ নগর এবং বৃহৎ বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল।

ঐ সময়ে গঙ্গা নদীর আদি ধারা উত্তর দিক হইতে আসিয়া ছত্রভোগ হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইত। পরে ঐ ধারা লুপ্ত হইলে বন্দর নষ্ট হইয়া যায় এবং মগ ফিরিঙ্গি প্রভৃতি জলদস্যুদিগের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়, ফলে ছত্রভোগের খ্যাতি হ্রাস পাইতে থাকে।

ছত্রভোগ বন্দর ও তীর্থের উল্লেখ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', কৃষ্ণরামের 'রায় মঙ্গল', বিপ্রদাসের 'মনসার ভাসান' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব সপার্ষদ নীলাচলে যাইবার উদ্দেশ্যে ছত্রভোগে আসিয়া একদিন অবস্থান করেন। ছত্রভোগের ত্রিপুরসুন্দরী বিখ্যাত দেবতা।

গো· পদ্মাক বসু

ছত্রাক থ্যালোফাইটা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সমাঙ্গদেহী অপুষ্পক উদ্ভিদ ('থ্যালোফাইটা' দ্র)। ক্লোরোফিল না থাকায় ইহাদের রঙ সবুজ নয়, তাই সহজেই শ্যাওলা হইতে ইহাদের পৃথক করা যায়। ক্লোরোফিলের অভাবে

ইহারা সালোকসংশ্লেষের (ফোটোসিন্থেসিস) দ্বারা নিজ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না, ফলে ইহারা কখনও অন্য জীবিত জীবদেহে পরজীবী (প্যারাসাইট)-রূপে এবং কখনও মৃতদেহে বা পচনশীল জৈব পদার্থে মৃতজীবী (স্যাপ্রোফাইট)-রূপে বাস করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের দেহে বিপাকক্রিয়ার (মেটাবলিজ্‌ম্) ফলে কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন না হইয়া স্নেহজাতীয় খাদ্যাদি তৈয়ারি হয়।

সমাঙ্গদেহী হইলেও ছত্রাকের দেহে নানাবিধ গঠন-বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোনও কোনও ছত্রাকের দেহ অতি সরল ও একটি মাত্র কোষ দিয়া গঠিত, কাহারও বা বহুকোষী দেহ লম্বা ফিতার ন্যায়, আবার কাহারও বা দেহের গঠন বেশ জটিল ও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। অধিকাংশ ছত্রাকের দেহই সরু সুতার ন্যায় অংশ দিয়া গঠিত, ইহাদের প্রত্যেকটিকে 'হাইফা' বলে এবং অনেকগুলি হাইফা একত্র হইয়া সূক্ষ্ম নলের ন্যায় দেখিতে হইলে তাহাকে 'মাইসেলিয়াম' বলে। মৃত বা জীবিত জীবদেহে যেখানেই ছত্রাক জন্মায়, সেখানেই এই মাইসেলিয়াম ঐ দেহের ভিতরে বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া পড়ে ও তথা হইতে ছত্রাকের খাদ্যশোষণে সহায়তা করে।

দেহের গঠন অনুযায়ী ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ১. ফিকোমিসিটিস (Phycomycetes): ইহাদের দেহের আকার বেশ সরল, মিউকর নামক যে ছত্রাক সাধারণতঃ পচা রুটি, চামড়া প্রভৃতির গায়ে হইয়া থাকে তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ২. অ্যাস্কোমিসিটিস (Ascomycetes): সরল ও জটিল নানা প্রকারের হইয়া থাকে, প্রজননের সময়ে বিশেষ ধরনের থলির মধ্যে ইহাদের রেণু বা স্পোর উৎপন্ন হয়, খমির (ঈস্ট), আর্গট ও পেনিসিলিয়ম এই শ্রেণীর ছত্রাক ৩. বাসিডিওমিসিটিস (Basidiomycetes)— সাধারণতঃ ইহাদের দেহের আকার কিছুটা জটিল, ইহাদের রেণু থাকে কোষের বিশেষ প্রকার প্রত্যঙ্গের (আউটগ্রোথ) মধ্যে, ব্যাঙের ছাতা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ৪. ফুঙ্গী ইম্‌পের্‌ফেক্‌তী (Fungi imperfecti): ইহাদের জীবনেতিহাস সম্পূর্ণ জানা নাই; এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছত্রাক হেলমিন্‌থোস্পোরিয়ম ধান গাছের বিশেষ এক রোগের সৃষ্টি করে।

ছত্রাকের সংক্রমণে জীবদেহে নানা রোগের সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময়ে ফসলের প্রভূত ক্ষতি হয়। অন্য দিকে আবার পেনিসিলিয়ম-জাতীয় ছত্রাক হইতে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্‌টোমিসিস-জাতীয় ছত্রাক হইতে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, আর্গট হইতে আর্গোমেট্রিন প্রভৃতি নানা ঔষধ পাওয়া যায়। ভিটামিন ও অ্যাল্‌কোহল উৎপাদনে এবং পাঁউরুটি তৈয়ারি করিতে খমির ব্যবহৃত হয়। মানুষের খাদ্য হিসাবেও কয়েকটি ছত্রাকের ব্যবহার প্রচলিত। বিশেষতঃ আগারিকাস, ফোলিওটা, লেপিওটা, মরুচেল্লা, ক্লাভারিয়া প্রভৃতি ব্যাঙের ছাতা বিভিন্ন দেশে আহার্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমানিটা, কয়েক প্রজাতির লেপিওটা, রুসুলা প্রভৃতি কয়েকপ্রকার ব্যাঙের ছাতায় আবার মারাত্মক বিষ থাকে; এ সকল ছত্রাক খাইলে উদরাময়, নার্ভ ও রক্তের নানাবিধ রোগ, এমনকি মৃত্যু ও ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ যে সকল ব্যাঙের ছাতার দুগ্ধবৎ রস থাকে, দেহ আঁশযুক্ত বা খুব রঙিন হয় এবং কাটিলেই কাটা অংশ শীঘ্র নীল হইয়া যায়, সেগুলি বিষাক্ত ছত্রাক। পাশ্চাত্যে খাদ্যের জন্য ছত্রাকের প্রচুর চাষ হয়। 'অ্যান্টিবায়োটিক্‌স', ক্রিপ্টোগ্যাম' ও 'খমির' দ্র।

দ্র H. C. I. Gwynne-Vaugham & B. Barnes, *The Structure and Development of Fungi*, Cambridge, 1937; J. P Srivastava, *An Introduction to Fungi*, Allahabad, 1962.

সন্তোষকুমার পাইন

ছন্দ ব্যাপকার্থে বস্তু বর্ণ রেখা ধ্বনি প্রভৃতি সব কিছুরই সুপরিকল্পিত ও সুনিয়মিত বিন্যাসকে ছন্দ বলা হয়। কিন্তু বিশেষার্থে কবিতার ভাষায় উক্তপ্রকার ধ্বনি-বিন্যাসকেই বলা হয় ছন্দ। সুপরিকল্পিত প্রণালীতে ধ্বনিবিন্যাসের ফলে যে তরঙ্গায়িত ভঙ্গী বা স্পন্দন উৎপন্ন হয় তাহাই ছন্দের প্রাণবস্তু।

আদিম অবস্থায় সব ভাষার ছন্দই গানের সুর ও নাচের তালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। পরে ভাষার ক্রমবিকাশের ফলে ছন্দ নিজের স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন বৈদিক ও গ্রীক ছন্দের উৎপত্তির ইতিহাস অনুধাবন করিলে এই কথার যাথার্থ্য বোঝা যাইবে। ছন্দের এই স্বাতন্ত্র্য ঘটে প্রত্যেক ভাষার বাক্‌রীতির বিশিষ্ট ভঙ্গীগত প্রভাবের ফলে। গানের সুর বাক্‌রীতিসাপেক্ষ নয়। কিন্তু ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয় বাক্‌রীতির বিশিষ্টতার দ্বারাই। ভাষার বিশেষ বিশেষ উচ্চারণভঙ্গী ছন্দকে ক্রমে নাচের তালের প্রভাব হইতেও মুক্তি দান করে। এইভাবে ভাষার বিবর্তনের সঙ্গে ছন্দের রূপও ক্রমপরিণতি লাভ করে।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বাক্‌রীতি অনুসারে ছন্দের প্রকৃতিও বিভিন্ন রকম হয়। ছন্দের মূল উপাদান চারটি— দল বা

সিলেব্‌ল্‌, কলা বা কালমাত্রা, প্রস্বর বা অ্যাক্‌সেণ্ট ও মিল। বিশেষ বিশেষ ভাষা এই চারটির মধ্যে যে কোনও একটি বা একাধিক উপাদানের সহায়তায় আপন আপন ছন্দ উৎপন্ন করে। প্রাচীন আর্য ভাষা ও আধুনিক ফরাসী ভাষায় ছন্দের প্রধান অবলম্বন দলসংখ্যার বিভিন্নপ্রকার বিভাগ। ছন্দোগঠনের এই রীতিকে বলা যায় 'দলবৃত্ত' রীতি। চৈনিক ছন্দও মূলতঃ দলবৃত্ত। ইংরেজী ছন্দের প্রধান অবলম্বন প্রস্বর। ছন্দোগঠনের এই রীতিকে বলা যায় 'প্রস্বরবৃত্ত' বা 'প্রাস্বরিক'। প্রস্বরের দুই প্রধান রূপ— দলবিশেষের উপরে উচ্চারণের ঝোঁক-জাত 'বল-প্রস্বর' (স্ট্রেস্ অ্যাক্‌সেণ্ট) ও কণ্ঠস্বরের তীব্রতা-প্রসূত 'গীতি-প্রস্বর' (মিউজিক্যাল অ্যাক্‌সেণ্ট)। বল-প্রস্বরের দ্বারা ইংরেজী ছন্দ নিয়মিত হয়। গীতি-প্রস্বর বিশেষভাবে লক্ষিত হয় প্রাচীন বৈদিক, গ্রীক, লাতিন এবং আধুনিক চীন, নরওয়ে ও সুইডেনের ভাষায়। কিন্তু একমাত্র চৈনিক ভাষা ছাড়া বোধ করি আর কোনও ভাষাতেই ছন্দোগঠনে গীতি প্রস্বরের প্রভাব দেখা যায় না। বিশুদ্ধ কলাসংখ্যাত এবং কালমাত্রাগত ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায় অবাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায়। ছন্দোগঠনের এই রীতিকে বলা যায় 'কলাবৃত্ত'। এই রীতির ছন্দ সর্বতোভাবেই দলসংখ্যানিরপেক্ষ। ভারতীয় প্রাচীন পরিভাষায় ইহার নাম 'মাত্রাবৃত্ত' বা 'জাতি'। গাথা, পজ্‌ঝটিকা, পাদাকুলক প্রভৃতি এই ছন্দোধারার অন্তর্গত। প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার প্রধান ছন্দগুলি দলসংখ্যাত হইলেও ইহারা কালমাত্রানিরপেক্ষ নয়। কারণ এইজাতীয় ছন্দের সব দলই লঘু-গুরুভেদে সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে বিন্যস্ত থাকে। ফলে প্রত্যেক ছন্দোবিভাগের ধ্বনিপরিমাণও নির্দিষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ এই সকল ছন্দ মুখ্যতঃ দলসংখ্যাত হইলেও গৌণতঃ কলাসংখ্যাতও বটে। সুতরাং এই ছন্দোরীতিকে বলা যায় 'নিয়ন্ত্রিত দলবৃত্ত' রীতি। প্রাচীন ভারতীয় পরিভাষায় এই রীতির নাম 'অক্ষরবৃত্ত' বা 'বর্ণবৃত্ত'। ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা প্রভৃতি এই ছন্দোরীতির নিদর্শন। গ্রীক, লাতিন, আরবী, ফারসী ও উর্দু ছন্দ এই রীতিতে রচিত হইলেও সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সহিত ইহাদের কিছু পার্থক্য আছে। ঐ সব ভাষায় ছন্দোরূপ নিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে গঠিত পঙ্‌ক্তিপর্বের দ্বারা। পক্ষান্তরে সংস্কৃত তথা প্রাকৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপ নির্ভর করে সমগ্র পঙ্‌ক্তির দলবিন্যাস প্রণালীর দ্বারা। আধুনিক হিন্দী, মারাঠী এবং গুজরাতী ছন্দেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। কিন্তু বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার উচ্চারণে সংস্কৃতের মত স্বর বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ নাই, ফলে এই তিন ভাষার ছন্দে উক্ত-প্রকার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আদর্শ অনুসৃত হইতে পারে নাই।

অধিকাংশ ভাষার ছন্দই ধ্বনিবিন্যাসের প্রধান নীতির সঙ্গে একটি দ্বিতীয় নীতিকেও আশ্রয় করিয়া থাকে। গ্রীক-লাতিন এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার অক্ষরবৃত্ত-জাতীয় ছন্দ মূলতঃ দলসংখ্যাত হইলেও গৌণতঃ কালমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত। এই সব ছন্দ স্বভাবতঃই প্রস্বর ও মিল -নিরপেক্ষ। ইংরেজী ছন্দ মুখ্যতঃ প্রাস্বরিক হইলেও পুরাপুরি দল-সংখ্যানিরপেক্ষ নয়। মিল ইংরেজী ছন্দের অত্যাজ্য অঙ্গ নয়, অলংকরণমাত্র। পক্ষান্তরে ফরাসী ছন্দ মূলতঃ দলসংখ্যাত এবং প্রস্বরনিরপেক্ষ, কিন্তু মিল ইহার পক্ষে অলংকরণমাত্র নয় অত্যাজ্য অঙ্গস্বরূপ। চৈনিক ছন্দেও দলগুচ্ছনিয়ন্ত্রণের পরেই মিলের স্থান। সে ছন্দের তৃতীয় নীতি ত্রিবিধ গীতি-প্রস্বরের সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাস। ভারতীয় মাত্রাবৃত্ত বা জাতি-বর্গের ছন্দেও মিলের গুরুত্ব কম নয়, কালমাত্রানিয়ন্ত্রণের পরেই ইহার স্থান। বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ কালবিভাগের দ্বারা এবং একটি বিশেষ ধারায় দলগুচ্ছের দ্বারা। উভয় ক্ষেত্রেই মিল ছন্দের দ্বিতীয় নীতি বলিয়া স্বীকৃত। তবে আধুনিক কালে স্থলবিশেষে মিলবর্জিত ছন্দ-রচনার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে। কবি মধুসূদন দত্ত এই অমিল ছন্দ-রচনার প্রবর্তক। বাংলা ছন্দের প্রায়শঃ অলক্ষিত তৃতীয় অনুষঙ্গ ধ্বনিস্পন্দসূচক বল-প্রস্বর।

বৈদিক ছন্দ মূলতঃ দলসংখ্যাত। লঘু-গুরুভেদে দল-বিন্যাসের নীতি দেখা দেয় ঋগ্‌বেদের যুগেই। এরকম দলবিন্যাসের আরম্ভ হয় ছন্দপঙ্‌ক্তির শেষাংশে। পরবর্তী কালে এই নীতির প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং ফলে সমগ্র পঙ্‌ক্তিতেই নানা প্রণালীতে লঘু-গুরুভেদে দলবিন্যাসের রীতি দেখা দেয়। কিন্তু প্রধানতম সংস্কৃত ছন্দ অনুষ্টুভ্‌ এই রীতির অধীন হয় নাই। বৈদিক ছন্দের ন্যায় এই উত্তরকালীন অনুষ্টুভ্‌ ছন্দেও প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষাংশের দলবিন্যাসই নিয়ন্ত্রিত, বাকি অংশের দলবিন্যাস অনিয়ন্ত্রিত। বাঁধাবাঁধি নিয়মের বন্ধন হইতে এইভাবে অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকার ফলে অনুষ্টুভ্‌ ছন্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। ঋগ্‌বেদের যুগেই অনুষ্টুভ্‌ ছন্দের উৎপত্তি। কিন্তু তখন তাহার স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নে। ঋগ্‌বেদে পনের প্রকার ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্‌, ত্রিষ্টুভ্‌ ও জগতী— এই চারটিই প্রধান। ঋগ্‌বেদের অধিকাংশই এই চার ছন্দে

রচিত। ইহাদের মধ্যে ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের প্রয়োগই সর্বাধিক। তাহার পরেই গায়ত্রীর স্থান। অনুষ্টুভের স্থান তাহারও নীচে। উত্তর কালে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বৈদিক গায়ত্রী ছন্দের বিলোপ ঘটে এবং অনুষ্টুভ্ ছন্দ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এই উত্তরকালীন নূতন অনুষ্টুভ্ ছন্দেরই নামান্তর 'শ্লোকছন্দ'। চিরাগত জনশ্রুতি অনুসারে আদি কবি বাল্মীকি এই শ্লোকছন্দের প্রবর্তক।

বৈদিক গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপঙ্ক্তিক, প্রতি পঙ্ক্তির দল-সংখ্যা আট। অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্, জগতী প্রভৃতি অন্যান্য ছন্দ চতুষ্পঙ্ক্তিক। এই তিন ছন্দের প্রতি পঙ্ক্তির দলসংখ্যা যথাক্রমে আট, এগারো ও বারো। জগতী ছন্দ বস্তুতঃ ত্রিষ্টুভেরই পরিবর্ধিত রূপমাত্র। অনুষ্টুভাদি বৈদিক ছন্দ হইতেই উত্তরকালীন ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত-বর্গীয় সমস্ত ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহা দুই উপায়ে—প্রতি পঙ্ক্তিতে লঘু-গুরুভেদে দলবিন্যাসবৈচিত্র্যের দ্বারা এবং পঙ্ক্তিদৈর্ঘ্যবৃদ্ধির দ্বারা। আর আর্যা, পজ্ঝটিকা প্রভৃতি মাত্রাবৃত্তবর্গীয় ছন্দগুলি উৎপন্ন হইয়াছে প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে এবং সম্ভবতঃ তাহারও মূলে রহিয়াছে সংগীতের তালবিভাগের প্রভাব।

ভারতীয় সাহিত্যে যেমন ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব নাই, তেমনই ছন্দোবিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থেরও অভাব নাই। বস্তুতঃ ছন্দঃশিক্ষা বেদচর্চার অঙ্গ বলিয়াই স্বীকৃত ছিল। ফলে অন্যতম বেদাঙ্গ হিসাবে অতি প্রাচীন কালেই ছন্দঃশাস্ত্রচর্চার সূত্রপাত হয়। এই চর্চার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যসূত্র, সামবেদের নিদানসূত্র, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থে। পরবর্তী যুগেও দীর্ঘকাল ধরিয়াই ছন্দঃশাস্ত্ররচনার কাজ চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র, গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী, কেদারভট্টের বৃত্তরত্নাকর এবং মধ্যযুগের প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্রগুলি অনেকাংশে সাংকেতিক পদ্ধতিতে রচিত এবং ব্যাবহারিক প্রয়োজনসাধনই এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্য এগুলিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অভাব লক্ষিত হয়। ছন্দের নামকরণেও এই অভাব দেখা যায়। ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্রে পরিভাষা রচনার দুর্বলতার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, প্রত্যেক ছন্দঃস্তবকের পূর্ণ রূপবিভাগকে বলা হয় পদ, পাদ বা চরণ, কিন্তু যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন পদখণ্ডের নামকরণের কোনও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

দ্র পিঙ্গলাচার্য, ছন্দঃসূত্রম্; কেদারভট্ট, বৃত্তরত্নাকরম্; গঙ্গাদাস, ছন্দোমঞ্জরী, রামতারণ শিরোমণি-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৭৫; চন্দ্রমাধব ঘোষ, ছন্দঃসারসংগ্রহ; চন্দ্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত, প্রাকৃতপৈঙ্গলম্, কলিকাতা, ১৯০২; ভোলাশংকর ব্যাস-সম্পাদিত, প্রাকৃতপৈঙ্গলম্, প্রাকৃত টেক্সট সোসাইটি সিরিজ ২, বারাণসী, ১৯৫৯ খ্রী; জগন্নাথ প্রসাদ ('ভানু'), ছন্দঃপ্রভাকর (হিন্দী), বিলাসপুর, ১৯৩১, পুত্তুলাল শুক্ল, আধুনিক হিন্দী কাব্য মেঁ ছন্দ-যোজনা, লখনৌ, ১৯৫৮; শিবনন্দন প্রসাদ, মাত্রিক ছন্দোঁ কা বিকাস; পাটনা, ১৯৫৮; মাধবরাও পটবর্ধন, ছন্দোরচনা (মারাঠী), বোম্বাই, ১৯৩৭, George Saintsbury, *Historical Manual of English Prosody*, London 1930.

প্রবোধচন্দ্র সেন

ছন্দ, বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত বাগ্‌রীতি বা উচ্চারণ-ভঙ্গীই ছন্দের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাভূমি, কিন্তু পুরাগত ঐতিহাসিক প্রভাব ছন্দকে অনেক সময়েই বিপথে চালিত করে। অন্যান্য অনেক ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই – হয় খাঁটি সংস্কৃত, না হয় সংস্কৃতজ অর্থাৎ তদ্ভব। কিন্তু বাংলা ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি সর্বতোভাবে না হইলেও অধিকাংশেই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বাংলা স্বর বর্ণের উচ্চারণে ও প্রস্বর (অ্যাক্সেন্ট)-স্থাপনের পদ্ধতিতে। আর ছন্দের গতি ও প্রকৃতি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত হয় ভাষার এই দুই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। কিন্তু বাংলা সাহিত্য যেহেতু সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকার লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য বাংলা ছন্দও প্রথমাবধি সংস্কৃত ও বিশেষতঃ প্রাকৃত ছন্দের আদর্শকেই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। অথচ সে আদর্শ বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক অর্থাৎ বাংলা উচ্চারণ-রীতির অনুযায়ী ছিল না। ফলে প্রাচীন বাংলা ছন্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দের আদর্শেও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, নিজের স্বাভাবিক আদর্শেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ইওরোপীয় বহু ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষার পক্ষেও আপন স্বাভাবিক ছন্দের সন্ধান পাইতে বহুশতাব্দী-কাল লাগিয়াছে। বর্তমান কালেও বাংলা ছন্দ সর্বতোভাবে আপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে কিনা বলা শক্ত। আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যের পক্ষেও সংস্কৃত আদর্শের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। বাংলা ছন্দে সে প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে স্বভাবতঃই আরও দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। গদ্যের

পক্ষে বাগ্‌ভঙ্গীর অনুসরণ যতখানি প্রয়োজন, পদ্যের পক্ষে তাহা হইতে আরও বেশি প্রয়োজন।

বাংলা ছন্দের উক্ত অব্যবস্থিত দশার নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের সমস্ত পর্বেই। চর্যাগীতির আদর্শ ছিল প্রাকৃত ছন্দের অনুসরণে দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘতা বজায় রাখা, কিন্তু—

'কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ।'

এই পঙ্‌ক্তিটিতে তিনটি দীর্ঘ স্বর বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক টানে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর -

'জই তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামী
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর স্বামী।'

এই দুই পঙ্‌ক্তিতে শুধু যে কোনও কোনও দীর্ঘ স্বর আপন আপন দীর্ঘত্ব হারাইয়াছে তাহা নয়, 'জই' এবং 'হোইব' শব্দের 'ই'-ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে, আর 'অনুত্তর' শব্দের গুরু দলটির (নুৎ) গুরুত্বও লুপ্ত হইয়াছে। এইসব আদর্শচ্যুতি ঘটিয়াছে একই স্বাভাবিক কারণে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচনার সময়ে বাংলা ছন্দ প্রাচীন আদর্শ হইতে আরও অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রাচীনের টান একেবারে লোপ পায় নাই—

'নীলজলদসম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।'

পক্ষান্তরে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের প্রভাবও স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ,

১. 'তাহার হাতে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।'
২. 'পাকিল দাড়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥'

বাংলার এইজাতীয় স্বাভাবিক উচ্চারণ আরও সন্দেহাতীতরূপে ধরা পড়িয়াছে কৃত্তিবাসের রচনায়। 'চর্যাগীতি ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যেভাবে গীত হইত, কৃত্তিবাসের কাহিনী সেভাবে গীত হইবার জন্য রচিত নয়। সেইজন্য তাহাতে স্বাভাবিক বাগ্‌ভঙ্গী প্রতিফলিত হইবার অধিকতর অবকাশ ছিল—

'রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥'

মনে হয়, সেই যুগে লোকসমাজের মৌখিক রচনার ছন্দপ্রভাবই 'চর্যাগীতি, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও কৃত্তিবাসের রচনায় উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে ধরা পড়িয়াছে। অবশেষে লোচনদাস (১৬শ শতক) তাহার ধামালী-রচনায় এই লৌকিক বা মৌখিক ছন্দকে অসংকোচেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন—

'আমার প্রাণ ছমছম করে সখি,
মন ছমছম করে।
আর-কপাহলা মাথার বিষে
রইতে নারি ঘরে॥'

কিন্তু লোচনদাসও তাহার চৈতন্যমঙ্গলের সাধু রচনায় এই লৌকিক রীতির ছন্দকে স্বীকার করিয়া লইতে সাহসী হন নাই। ভারতচন্দ্রের রচনায় এই রীতির একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু তাহাও নারদের উক্তিরূপে রচিত। অধুনাপূর্ব যুগে এই ছন্দের সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে রামপ্রসাদের গানে—

'আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই।'

অতঃপর ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র-প্রমুখ অনেকের রচনায় এই ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু ইহার প্রথম সুমার্জিত ও সুগঠিত রূপ প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যে (১৯০০ খ্রী)—

'বসন্তী-রঙ বসনখানি
নেশার মতো চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা
স্তুতির মতো বক্ষে পড়ে।'

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যে এবং সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের রচনায় এই ছন্দের বিবর্তন ঘটিয়াছে আরও বিচিত্র রূপে ও অপূর্ব শক্তিতে। বোধ করি, এই ছন্দের সর্বাধিক শক্তিময় প্রকাশ ঘটিয়াছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যে (১৯০৭ খ্রী)—

'আমি দেখছি যেন দূরে, দূরত্বে অস্পষ্ট একটা
আলোকিত স্থান,—
যেখানে সৌন্দর্য উৎস উঠছে, ও ঝংকৃত হচ্ছে
অবিশ্রান্ত গান।'

বিশ্লেষণাত্মক পরিভাষায় এই লৌকিক (রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় 'প্রাকৃত') ছন্দোরীতিকে বলা যায় 'দলবৃত্ত'। অমূল্যধনের পরিভাষায় এই রীতির নাম 'শ্বাসাঘাত-প্রধান'। চর্যাগীতি-রচনাতেই এই ছন্দের পরোক্ষ প্রভাব নিঃসন্দেহে অনুভব করা যায়। কিন্তু সাধু সাহিত্যের আসরে ইহার প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে বিংশ শতকে 'ক্ষণিকা' কাব্যের সময় হইতে। মনে হয়, এই ছন্দ এখনও পূর্ণশক্তিতে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

'চর্যাগীতি'তে অনুসৃত ছন্দোরীতির প্রাচীন শাস্ত্রীয় নাম 'মাত্রাবৃত্ত' বা 'জাতি'। আধুনিক পরিভাষায় ইহাকে বলা যায় 'কলাবৃত্ত'। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এই রীতিকে

বলা যায় 'সংস্কৃত-ভাঙা'। অমূল্যধন ইহাকে বলেন 'ধ্বনি-প্রধান'। এই রীতির ছন্দ গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ বাহন। পরবর্তী কালের বহু গীতিকবিতা রচিত হইয়াছে এইজাতীয় ছন্দে। তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় বৈষ্ণবপদাবলীতে। এইজন্য এই শ্রেণীর ছন্দকে 'গীতিকা' ছন্দ নাম দিলেও অনুচিত হইবে না। প্রধানতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের ছন্দই উক্ত পদাবলীর আদর্শরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু স্বর বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ যথাযথভাবে রক্ষা করা পদকর্তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে অনেক স্থলেই প্রাচীন দীর্ঘ উচ্চারণের নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে।

'স্ফুট চম্পক দল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনুশোভা।
পদপঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা॥'

এই অপেক্ষাকৃত নির্দোষ দৃষ্টান্তটিতেও চারটি দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় নাই। সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বর বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই গীতিকা ছন্দের রচনায় এই জয়দেবী রীতি কালক্রমে বাংলা সাহিত্য হইতে প্রায় বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে 'মানসী' কাব্যরচনার যুগে (১৮৮৭-৯০ খ্রী) রবীন্দ্রনাথ এই গীতিকা ছন্দকে নূতনরূপে পুনরুজ্জীবিত করেন। রবীন্দ্র-প্রবর্তিত এই নব্য রীতিতে প্রাচীন ধরনে স্বর বর্ণের দীর্ঘতা রক্ষার কৃত্রিমতা সর্বতোভাবেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু রুদ্ধ দলকে (ক্লোজড সিলেব্‌ল্) গুরুত্বদানের নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, কেননা রুদ্ধ দলের প্রসারণ বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির বিরুদ্ধ নয়।

'নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন
রক্তকমল ফুটে।'

রবীন্দ্র-প্রবর্তিত এই নব কলাবৃত্ত রীতির ছন্দই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রধানতম বাহন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে গীতিকা ছন্দের প্রাচীন জয়দেবী পদ্ধতিকেও অস্খলিতরূপে নূতন শক্তি দান করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রয়োগকে সুরতালযুক্ত গীতিরচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক', 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'মাতৃমন্দিরপুণ্য-অঙ্গন' প্রভৃতি সুপরিচিত গানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চর্যাগীতির যুগে মৌখিক ভাষা ও লৌকিক ছন্দের আকর্ষণে বাংলা কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে যে পরিবর্তন-প্রবণতার সূত্রপাত হয়, তাহার পরিণতি দেখা যায় চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের রচনায়। কিন্তু নির্দিষ্ট আদর্শের অভাবে এই নূতন ছন্দোরীতি তাঁহাদের হাতেও স্থিরতা লাভ করিতে পারে নাই। এক দিকে প্রাচীন আদর্শ অনুসরণের সজ্ঞান প্রয়াস ও অন্য দিকে স্বাভাবিক উচ্চারণের অলক্ষ্য আকর্ষণ, এই দুই-এর মধ্যে ছন্দকে স্থিরত্ব দান করা সহজ ছিল না।

অবশেষে অষ্টাদশ শতকে ছন্দশিল্পী ভারতচন্দ্রের হাতে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটে। তিনি এই ছন্দকে যে নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা হইতেছে অক্ষর-গণনার রীতি। কিন্তু বলা বাহুল্য 'অক্ষর' বলিতে শুধু যে সংস্কৃতের মত স্বতন্ত্র অযুক্ত ও যুক্ত বর্ণ বোঝায় তাহা নয়, স্বাতন্ত্র্যহীন স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণও স্বতন্ত্র অক্ষর বলিয়া স্বীকৃত হয়। যেমন — সঞ্চিত ও কিঞ্চিৎ, বন্দনা ও চন্দন, পশমী ও কাশ্মীর শব্দে সমভাবে তিন অক্ষরের গণনাই বাংলা রীতি। এই রীতিতে 'শৈব' শব্দে দুই অক্ষর, কিন্তু 'হইব' শব্দে তিন অক্ষর ধরিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই রীতি নির্দোষ নয়। ভারতচন্দ্রের সময় হইতে এই বাংলা 'অক্ষরবৃত্ত' রীতি প্রায় বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ফলে এই রীতির ত্রুটি ও দুর্বলতা হইতে বাংলা ছন্দ আজও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের হাতে এই অক্ষরগণনার ত্রুটি অনেকাংশেই সংশোধিত হইয়াছে। তাই আজকাল আর কেহই 'আনন্দ' শব্দে দুই মাত্রা এবং 'বাংলাই' শব্দে তিন মাত্রা গণনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, পাগড়ি, হালকা প্রভৃতি শব্দেও অনায়াসেই দুই মাত্রা গণনা করা চলে।

শুধু অক্ষরগণনার ত্রুটি নয়, যতিস্থাপনের শৈথিল্যও দেখা যায় তৎকালীন কবিদের রচনায়। ঈশ্বর গুপ্তের রচনা—

১. 'কেহ নও হাড়ি মুচি,
সবাই সমান শুচি,
'কখনই' না হও মলিন।'

২. 'আছে বটে অমৃত অমরাবতীপুরে।'

৩. 'সমুদয় জগৎ তোমার বশে রয়।'

এই উভয়বিধ ত্রুটিই বহুলাংশে অপনীত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে।

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এই ছন্দোরীতির নাম 'সাধু' রীতি। বাংলা ছন্দের এই সাধু রীতিই বহু শতাব্দী ধরিয়া কবিদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কারণ ইহার ধ্বনি-সন্নিবেশ প্রণালীর কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ, বাংলা উচ্চারণে প্রয়োজন-মত রুদ্ধ দলের সংকোচন-প্রসারণ দুই-ই চলে, তবে

ছন্দ, বাংলা

শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধ দলের প্রসারণ-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি। সাধু রীতির ছন্দে এই শব্দান্তিক প্রসারণ-প্রবণতাকে বিশেষ করিয়া কাজে লাগানো হয়। তাহাতে প্রত্যেক শব্দকে পরবর্তী শব্দ হইতে পৃথক করিয়া রাখিবার এবং ফলে সহজে অর্থ গ্রহণের সহায়তা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই রীতির ছন্দে পর্বের আদিস্থিত প্রস্বরকে সংযত রাখা ও পর্বের অন্তস্থিত যতিকে প্রয়োজনমত লুপ্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ঘন ঘন প্রস্বর ও যতিস্থাপনের দ্বারা ছন্দে যে লঘু নাচুনি তাল দেখা দেয়, এই রীতির ছন্দে তাহা সহজেই এড়াইয়া চলা যায়। ফলে গভীর ও গম্ভীর ভাব-প্রকাশের পক্ষে এই রীতি খুবই সহায়ক হয়। তাই উচ্চাঙ্গের ভাব-প্রকাশের জন্য কবিরা এই সাধু রীতিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইজন্য মধুসূদনের পক্ষে এই রীতিতে অমিত্রাক্ষর বন্ধ প্রবর্তন করা এবং সেই বন্ধে মহাকাব্য রচনা করাও সম্ভব হইয়াছিল।

এই জাতীয় ছন্দের বৈচিত্র্য ও শক্তি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে। বোধ করি তাঁহার 'বলাকা' কাব্যের (১৯১৬ খ্রী) মুক্তবন্ধ কবিতাগুলিকেই এই পরিণতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

'নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?'

বিশ্লেষণাত্মক পরিভাষায় এই সাধু ছন্দোরীতির নাম দেওয়া যায় 'মিশ্র কলাবৃত্ত'। কেননা, এই ছন্দ মূলতঃ রুদ্ধ দলের সংকুচিত ও প্রসারিত— উভয়বিধ উচ্চারণ রূপের যোগে গঠিত। অমূল্যধনের মতে এই রীতির নাম 'তানপ্রধান'।

ছন্দোরচনার উদ্দেশ্য হইতেছে বিবিধ উপায়ে প্রস্বর, যতি, মাত্রা ও মিলস্থাপনের দ্বারা কবিতার ভাষায় এক-একপ্রকার তরঙ্গভঙ্গী বা স্পন্দলীলা (রিদ্‌ম) উৎপন্ন করা। এই স্পন্দলীলাই ছন্দের প্রাণ। দেখা গিয়াছে ছন্দোরচনায় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন না মানিয়াও কবিতার ভাষায় ছন্দের স্পন্দনটুকু রক্ষা করা যায়। এইপ্রকার ছন্দোবন্ধহীন স্পন্দনময় ভাষাকে গদ্যই বলা হয়, পদ্য বলা হয় না। তথাপি একটু শিথিল পরিভাষায় কবিতার ভাষার এই স্পন্দভঙ্গীকেই বলা হয় 'গদ্য কবিতার ছন্দ', সংক্ষেপে 'গদ্য ছন্দ'। আধুনিক কালে এইরূপ স্পন্দনময় গদ্য ভাষাতে কবিতারচনার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাসমূহ এইরূপ গদ্য কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দ্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ছন্দ-সরস্বতী', ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেন-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬২, প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, বাংলা ছন্দের মূল-সূত্র, কলিকাতা, ১৯৫৭, মোহিতলাল মজুমদার, বাংলা কবিতার ছন্দ, কলিকাতা, ১৯৪৫, নীলরতন সেন, আধুনিক বাংলা ছন্দ, কলিকাতা, ১৯৬২, প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দপরিক্রমা, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

প্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলা তদ্ভব ভাষা হইলেও সংস্কৃত ছন্দ হইতে বাংলা ছন্দের উদ্ভব হয় নাই। বাংলা ছন্দ মাত্রাগত (কোয়ান্‌টিটেটিভ) এবং মূলতঃ মাত্রাসমকত্বই (কোয়ান্‌টিটেটিভ ইকুইভ্যালেন্স) ইহার ভিত্তি। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের ছন্দে মাত্রার গুরুত্ব থাকিলেও সেই ছন্দ ছিল অক্ষরগত (সিলেবিক)। ছন্দোবন্ধের এক-একটি পাদে নির্দিষ্টসংখ্যক হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরকে একটা বিশিষ্ট পারম্পর্য অনুসারে সন্নিবেশ করিতে হইত। এইরূপ ছন্দোবন্ধকে বলা হইত 'বৃত্ত' ছন্দ। 'বৃত্ত' ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের মূলতঃ কোনও সংগতি নাই।

অর্বাচীন সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে অন্য এক প্রকারের ছন্দের প্রচলন দেখা যায়। এক-একটি ছন্দোবিভাগের মোট মাত্রাসংখ্যাই তাহার ভিত্তি।

এইজন্য উত্তরকালে রচিত 'ছন্দোমঞ্জরী'তে স্বীকৃত হইয়াছে যে,

'পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥'

এই 'মাত্রাকৃতা' ছন্দের নাম 'জাতি' দেওয়াতে ধারণা হয় যে আর্যেতর যে সমস্ত জাতি ভারতে বাস করিত, তাহাদের মধ্যেই এই 'মাত্রাকৃত' ছন্দ বা মাত্রাচ্ছন্দ প্রচলিত ছিল। যে সমস্ত অঞ্চল মুখ্যতঃ অনার্য অধ্যুষিত ছিল, সেখানে আর্য ধর্ম ও আর্য ভাষার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইলেও আর্য বা 'আর্য' ছন্দ পরিগৃহীত হয় নাই। কারণ, ছন্দের সহিত রক্তের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। পক্ষান্তরে কালক্রমে অনার্য ভাষিত হওয়াতে আর্য ভাষাতেও অনার্য ছন্দোরীতি অনুপ্রবেশ করে। শংকরাচার্য সংস্কৃতে গ্রন্থাদি রচনা করিলেও 'পজ্‌ঝটিকা' প্রভৃতি 'জাতি' ছন্দে পদ্য রচনা করিয়াছিলেন।

মাত্রাগত হইলেও বাংলা ছন্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দের সর্বথা অনুরূপ নহে। বাংলা কাব্যের প্রাচীন যুগ হইতেই দেখা যায় যে হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের যে বিভেদ

পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহা শিথিল হইয়া আসিতেছে, মধ্যযুগ হইতে ইহা উঠিয়াই গিয়াছে। বস্তুতঃ বাংলায় দীর্ঘ অক্ষরের (সিলেব্‌ল্) উচ্চারণ নাই, কেবল বাংলায় শব্দ-সন্ধি অচল বলিয়া শব্দের অন্ত্যাক্ষর হলন্ত (ক্লোজ্‌ড্) হইলে সেই অক্ষরটি দ্বিমাত্রিক বা দীর্ঘ বলিয়া গণ্য হয়। তবে বাংলায় ছন্দের লয় ও প্রয়োজন অনুসারে স্বভাব-হ্রস্ব অক্ষর দ্বিমাত্রিক এবং স্বভাব-দীর্ঘ অক্ষর একমাত্রিক বা হ্রস্ব হইতে পারে।

ভারতীয় সংগীতের ন্যায় বাংলা ছন্দও 'যতিতালাভ্যাং' অর্থাৎ যতি ও তালের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এবং বাংলা ছন্দের গঠন ও গতি তালের গঠন ও গতিরই অনুরূপ। তালের 'বিভাগ'-এর অনুরূপ, ছন্দের উপকরণ-স্থানীয় এক-একটি বিভাগকে বলা হয় 'পর্ব', কয়েকটি পর্ব দিয়া গঠিত হয় তালের 'আবর্তে'র অনুরূপ ছন্দের এক-একটি 'চরণ' (লাইন অফ ভার্স)। প্রত্যেকটি পর্বের পরে থাকে 'জিহ্বেষ্ট বিরামস্থান' বা যতি এবং প্রত্যেকটি চরণের শেষে থাকে দীর্ঘ বা পূর্ণ যতি, ইহার দ্বারা বাক্যার্থের পূর্ণতা সূচিত হয়। প্রত্যেকটি পর্ব একটি শ্বাস-বিভাগ (ব্রেথ গ্রুপ), একই ঝোঁকে (ইম্‌পাল্‌স্) উচ্চারিত কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। বাংলা ছন্দের পর্ব সংস্কৃতের পাদ কিংবা গণ নহে, ইংরেজী ছন্দের ফুট (foot)-ও নহে। পর্বের মাত্রাসংখ্যা সাধারণতঃ হয় সমরাশিক (৪, ৬, ৮ বা ১০), কখনও কখনও মাত্রাসংখ্যা বিষমরাশিকও (৫ বা ৭) হইয়া থাকে। মাত্রাসংখ্যা ও গঠনের উপর পর্বের ছন্দোগুণ নির্ভর করে।

পর্বে পর্বে মাত্রাসংখ্যার ঐক্যই বাংলা ছন্দের ভিত্তি। যেখানে প্রত্যেকটি পর্ব সমান নয়, সেখানে তালের বিভাগের ন্যায় বিভিন্ন পরিমাপের পর্বগুলিকে কোনও একটা সুষম পরিপাটি (প্যাটার্ন) অনুসারে সন্নিবেশ করা হয়। চরণের শেষে পূর্ণ যতির পূর্বস্থ পর্বটি প্রায়ই হ্রস্ব হইয়া থাকে। প্রতি চরণে সাধারণতঃ দুইটি হইতে পাঁচটি পর্যন্ত পর্ব থাকে।

সংগীতের 'বিভাগে'র ন্যায় ছন্দেরও প্রত্যেকটি বিভাগ অর্থাৎ পর্ব কয়েকটি অঙ্গের সমবায়ে গঠিত। প্রতি পর্বে দুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গ থাকে; ইহাদের মাত্রা ও বিন্যাসের উপরই পর্বের ছন্দোলক্ষণ নির্ভর করে। পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে, কদাচ এক মাত্রারও হয়। এক-একটি পর্বাঙ্গ এক বা একাধিক মূল শব্দ দ্বারা গঠিত হয়। পর্বাঙ্গ আবৃত্তি-তরঙ্গের ক্ষুদ্রতম এক-একটি গতির প্রতিরূপ। পর্বাঙ্গই ছন্দের পরমাণু।

পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গগুলিকে সমান বা মাত্রার ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করিতে হয়। অর্থাৎ তাহাদের বিন্যাসের মধ্যে রৈখিক সমীকরণের (লিনিয়ার ইকুয়েশন) অনুযায়ী একটা সরল গতি থাকা প্রয়োজন। নহিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটে।

ছন্দোবন্ধের পরিপাটি ও পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গবিন্যাসের রীতির প্রয়োজন অনুসারেই বাংলা ছন্দে অনেক সময়ে মাত্রা বিচার করিতে হয়। বাংলা উচ্চারণে কোনও কোনও প্রকারের অক্ষরের মাত্রা স্থিতিস্থাপক, সংস্কৃতের ন্যায় সুনির্দিষ্ট নহে, এইজন্যই ছন্দের প্রয়োজনে কোনও কোনও অক্ষরের প্রসারণ বা সংকোচন করা যাইতে পারে।

ছন্দের লয়ের উপরও মাত্রা-বিচার অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বাংলা ছন্দে তিন প্রকারের লয় (টেম্পো) প্রচলিত: ধীর, বিলম্বিত ও দ্রুত। ধীর লয়ের ছন্দই বাংলা কাব্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতেই অক্ষরের স্বাভাবিক মাত্রা যথাসম্ভব রক্ষিত হয়। ইহাতে প্রতি অক্ষরের সহিত একটা তান জড়িত থাকে বলিয়া ইহাকে তান-প্রধান বলা যায়। ইহার গতি সংযত ও পরিক্রম দীর্ঘ। বাংলা লিপির এক একটি হরফ বা তথাকথিত অক্ষর ধরিয়া গণিলে এই ছন্দে মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন অক্ষরমাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত, কিন্তু এইরূপ নামকরণ একান্ত অসংগত। বিলম্বিত লয়ের ছন্দে হলন্ত ও অপর কোনও কোনও অক্ষরের প্রসারণের প্রবৃত্তি থাকে। ইহাকে ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্তও বলা হয়। মধ্যযুগে এই লয়ের ছন্দোবন্ধে মাত্রাপদ্ধতি সুনির্দিষ্ট ছিল না, কিন্তু আজকাল প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া একটা নির্দিষ্ট মাত্রাপদ্ধতিতে এই ছন্দে পদ্যরচনা হইতেছে, রবীন্দ্রনাথই ইহার প্রবর্তক। দ্রুত লয়ের ছন্দে পুনঃপুনঃ শ্বাসাঘাত (স্ট্রেস) পড়ে ও মাত্রাসংকোচের একটা প্রবৃত্তি থাকে। এই ছন্দে প্রতি পর্ব হ্রস্বতম বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। পূর্বকালে ইহা মাত্র গ্রাম্য-ছড়া, প্রবচন ইত্যাদিতে চলিত ছিল, আদিবাসীদের বাদ্যের তালের সহিত ইহার সংগতি আছে। পরবর্তী কালে ইহা সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহাকে শ্বাসাঘাত-প্রধান, বল-প্রধান বা ছড়ার ছন্দ বলা হয়।

মিত্রাক্ষরের (রাইম) ব্যবহার বাংলায় বহুপ্রচলিত, পূর্বে মিত্রাক্ষর বিনা পদ্য রচিত হইত না। মিত্রাক্ষরের দ্বারাই কয়েকটি চরণের সংশ্লেষ করিয়া পদ্যের এক-একটি স্তবক (স্ট্যাঞ্জা) গঠিত হইত। সুপ্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি মিত্রাক্ষর দুই চরণের স্তবকই বাংলায় প্রধানতঃ

প্রচলিত আছে, ইহার মধ্যে পয়ার ও লাচাড়ী (ত্রিপদী) সুবিদিত। পয়ার সম্ভবতঃ পদাকার শব্দ হইতে উদ্ভূত, সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। লাচাড়ী লাচ (নাচ) বা নৃত্যের সংকেত হইতে সৃষ্ট। কালক্রমে, বিশেষতঃ আধুনিক যুগে নানা বিচিত্র সংকেতের স্তবকের প্রচলন হইয়াছে।

চিরাচরিত ঐক্যমূলক ছন্দের পথ ছাড়িয়া বৈচিত্র্য-প্রধান ছন্দের সন্ধান ও সৃষ্টি আধুনিক যুগের বাংলা কাব্যের এক অদ্ভুত কীর্তি। ইহার পুরোধা ছিলেন মধুসূদন। 'জিহ্বেষ্ট-বিরামস্থান' বা বিরাম-যতি ব্যতীত বাংলা ছন্দে বিচ্ছেদ-যতি (যতিবিচ্ছেদ) বা ছেদও থাকে এবং এই ছেদ সর্বত্র যতির (অর্থাৎ বিরাম-যতির) অনুগামী হয় না— বাংলা ছন্দের এই অন্তর্গূঢ় প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন মিল্টনের অনুকরণে বাংলা অমিত্রাক্ষর (ব্ল্যাঙ্ক ভার্স) সৃষ্টি করেন। এই ছন্দে মিত্রাক্ষরের বর্জন নহে, ছেদ ও যতি একান্ত বি-যোগই প্রধান লক্ষণ। যেমন যতির দ্বারা ছন্দ শ্বাসবিভাগে, তেমনই ছেদের দ্বারা ছন্দ অর্থবিভাগে (সেন্স গ্রুপ) বিভক্ত হয়; যতির দ্বারা ঐক্য ও ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য একই সঙ্গে সমাবেশ করিয়া মধুসূদন বাংলা ছন্দে একটা অভিনব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এক তান-প্রধান ছন্দেই এই অভিনব ছন্দোবন্ধ সম্ভব; কারণ, এই ছন্দেই যে-কোনও শব্দের পর স্বেচ্ছাকৃত ছেদস্থাপন সম্ভব। মধুসূদন যে পথের সন্ধান দিয়াছিলেন সেই পথেই তাঁহার উত্তরসাধকেরা অগ্রসর হইয়া নূতন নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গিরিশচন্দ্র-প্রবর্তিত 'গৈরিশ ছন্দ' ও রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত 'বলাকার ছন্দ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল ছন্দোবন্ধে ছেদের অবস্থান নির্দিষ্ট নহে এবং যতির দিক দিয়াও কোনও নিয়মানুসারিতা নাই। তবে পদ্য ছন্দের পর্বই ইহাদের উপকরণ এবং একটা আদর্শ (মৌলিক রূপ) স্থানীয় পরিপাটির আভাস সর্বত্রই থাকে।

যেখানে পরিপাটির আভাস নাই, শুধু পদ্যের পর্বকে ভাবের গতি অনুসরণে সমাবেশ করা হইয়াছে সেইজাতীয় চরম বৈচিত্র্যপন্থী ছন্দোবন্ধ অর্থাৎ ফ্রি ভার্স বা মুক্তবন্ধ ছন্দও সাম্প্রতিক কালে বাংলায় রচিত হইয়াছে।

বৈচিত্র্যপন্থী ছন্দোবন্ধের সৃষ্টিতেই বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট গৌরব। এ গৌরব সংস্কৃতেরও নাই।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

ছন্দঃশাস্ত্র ছন্দ দ্র

ছবি বিশ্বাস (১৯০০-৬২ খ্রী) চিত্র ও মঞ্চের অভিনেতা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ভূপতিনাথ দে-বিশ্বাস। ছবি বিশ্বাস প্রথম যৌবনে শৌখিন অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ তাঁহার প্রথম চলচ্চিত্রাভিনয় (১৯৩৬ খ্রী)। সাধারণভাবে ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের রূপায়ণে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার অভিনীত বিশিষ্ট কয়েকটি ছবি হইতেছে 'চোখের বালি', 'কাবুলিওয়ালা', 'প্রতি-শ্রুতি', 'শুভদা', 'জলসাঘর', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', ও 'হেডমাস্টার'। মঞ্চেও বহু নাটকে ('সমাজ', 'ধাত্রীপান্না', 'মীরকাশিম', 'দুই পুরুষ', 'বিজয়া' প্রভৃতি) তিনি স্মরণীয় অভিনয়-কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি 'প্রতিকার' (১৯৪৪ খ্রী) ও 'যার যেথা ঘর' (১৯৪৯ খ্রী) নামে দুইটি চলচ্চিত্রেরও পরিচালক ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ছবি বিশ্বাস সংগীত-নাটক আকাদমি-কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-রূপে সম্মানিত হন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জুন মধ্যমগ্রামের নিকট এক মোটর-দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র নিত্যানন্দ সাহা-সম্পাদিত, 'শিল্পীমহল', কলিকাতা, ১৯৬১; 'দেশ', ১ আষাঢ় ও ৮ আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

ছাগল আর্তিওদাক্তিলা বর্গের (Order-Artiodactyla) অন্তর্ভুক্ত গো-গোত্রের (ফ্যামিলি—বোভিডী, Family—Bovidae) চতুষ্পদ রোমন্থক প্রাণী। পায়ে যুগ্ম-সংখ্যক খুর, মাথায় স্থায়ী ফাঁপা শিং, ত্বকে অল্পাধিক লোম। পুরুষ ছাগলের চিবুকের নীচে একগুচ্ছ দাড়ি থাকে। ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি ইহাদের স্বাভাবিক খাদ্য। ছাগী প্রায় ১০-১২ মাস বয়সে প্রজননক্ষম হয়। প্রজনন-ঋতু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে হেমন্ত; গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সারা বৎসরই প্রজনন করিতে পারে। যৌনচক্রের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ২১ দিন। গর্ভধারণ-কাল গড়ে ১৫১ দিন। ছাগী একবারে ১-৫টি শাবক প্রসব করে।

ছাগলের মাংস ও দুধ আহার্যরূপে, লোম মূল্যবান বস্ত্রাদি উৎপাদনে, চর্ম দস্তানা পাদুকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং হাড়ের গুঁড়া সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ছাগলের আদি জন্মভূমি সম্ভবতঃ প্রাচ্যের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল। বর্তমানে প্রায় সারা পৃথিবীতেই ইহা পালিত হয়। ভারতে সুপরিচিত ছাগলের জাত হিসাবে বঙ্গ দেশের কালো, বাদামী ও শাদাদাড়ি ছাগল, উত্তর প্রদেশের ইটাওয়া জেলা ও যমুনা-চম্বল অঞ্চলের যমুনাপারী, পাঞ্জাবের বীতাল, দিল্লী আগ্রা মথুরা ও কুর্ণাল অঞ্চলের বার্বেরি, উত্তর গুজরাতের সিরহোই, রাজস্থানের মাড়ওয়াড়ী ও মেহ্সানা, দক্ষিণ ভারতের মালাবারী ও সুরতী, কাশ্মীরের

ভাক্রাওয়াল, আলমোড়া, টিহরী ও লদাখের পশমিনা ছাগল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দুধেল ছাগল হিসাবে যমুনাপারী, বীতাল ও বার্বেরি উত্তর ভারতে সুপরিচিত, ইহাদের দৈনিক গড় দুগ্ধোৎপাদন যথাক্রমে ২·৫, ২ ও ১ কিলোগ্রাম। মাংসের জন্য বার্বেরি, বাংলার কালো ছাগল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কালো ছাগলের চর্মও উচ্চস্তরের। পশমিনা ছাগলের লোম হইতে মোহেয়ার নামক সূক্ষ্ম পশমের মত তন্তু পাওয়া যায়। বর্তমানে সানেন, টোগেনবার্গ প্রভৃতি বিদেশী দুধেল জাতের ছাগলের সহিত দেশীয় ছাগলের সংকরায়ণ দ্বারা উন্নত দুধেল জাতের ছাগল উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। উত্তর প্রদেশে আংগোরা জাতের বিদেশী পশমী ছাগলের সহিত দেশীয় গাদ্দী ও পার্বত্য ছাগলের সংকর-প্রজনের সাহায্যে মোহেয়ার উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে।

ছাগপালনের জন্য ছাগলকে ছোলা, গমের ভুষি, যবচূর্ণ, ভুট্টাচূর্ণ, তিসির খোল, অড়হর, চুনি, মাখন-তোলা দুধ প্রভৃতি সুসার খাদ্যের মিশ্রণ এবং কপিপাতা অড়হর নেপিয়ার লুসার্ন বরসীম গিনি প্রভৃতি সবুজ ঘাস, বাবলা কাঁঠাল জাম পিপুল নিম প্রভৃতি গাছের পাতা ইত্যাদি তন্তুপ্রধান স্বল্পসার খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। খনিজ পদার্থের অভাব পূরণের জন্য সুসার খাদ্যমিশ্রণে জীবাণুমুক্ত অস্থিচূর্ণ, খড়ি-গুঁড়া, লবণ, গন্ধক, লৌহঘটিত লবণ প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে মিশাইয়া দিতে হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানীয় জলও সরবরাহ করা দরকার। বেশি দিন একপ্রকার খাদ্য দিলে কিংবা আহার্য অপরিচ্ছন্ন, ভিজা বা দুর্গন্ধযুক্ত হইলে ইহারা খাইতে চায় না।

দুধে পুং ছাগলের দেহের দুর্গন্ধ প্রতিরোধ করিবার জন্য পুরুষ ছাগলকে দুধেল ছাগী হইতে পৃথক রাখিতে হয়। প্রাপ্তবয়স্কা ছাগীদের নিকট হইতে শাবকদের সরাইয়া রাখা প্রয়োজন। ছাগচারণের ক্ষেত্র কাঁটা তার দিয়া বেষ্টন করা চলে না, কারণ উহাতে ছাগলের আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকসংখ্যক ছাগল একস্থানে রাখিতে হইলে প্রায় ৫০-৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক জলবায়ুতে সুপ্রচুর আলোবাতাসযুক্ত এবং আংশিকভাবে উন্মুক্ত দীর্ঘ কক্ষে বাসস্থান নির্মাণ করা সমীচীন। ভারতের ক্রান্তীয় জলবায়ুতে বাসস্থানের বিশেষ কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। 'দুধ' দ্র।

অঞ্জন সিংহ

ছাড়পত্র পাশপোর্ট দ্র

ছাতিম করবী-গোত্রের (ফ্যামিলি—আপোসিনাসিঈ, Family—Apocynaceae) অন্তর্ভুক্ত চিরহরিৎ দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম আলস্তোনিয়া স্কোলারিস (*Alstonia scholaris*)। দীর্ঘল কাণ্ডের গায়ে বৃক্ষ-শাখাগুলি আবর্তের মত সজ্জিত থাকায় সুন্দর দেখায়। পত্র গুচ্ছের আকারে, প্রতি গুচ্ছে প্রধানতঃ সাতটি গাঢ়-সবুজ পাতা বর্তমান।

এই বৃক্ষবিশেষের বিস্তৃতি ভারতবর্ষের সমতলের প্রায় সর্বত্র। উত্তর বঙ্গের বনাঞ্চলে শাল, চাঁপা প্রভৃতি গাছের মাঝে মাঝে ছাতিম দেখা যায়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফুলের সম্ভারে ভরিয়া ওঠে এবং মার্চ-এপ্রিলে সেই ফুল দীর্ঘ ফলে পরিণত হয়।

এই বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্রহ্ম দেশে লিখিবার শ্লেটের জন্য ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে অধুনা দিয়াশলাই তৈয়ারির জন্য ইহার চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫১।

অর্ধেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাতু খাদ্য হিসাবে ছাতু বাংলা দেশে প্রচলিত না হইলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইহার ব্যবহার আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে দেবতাকে ছাতু (যবচূর্ণ) দিয়া উহা খাওয়ার রীতি আছে। এই দিনে ছাতুসহ জলপূর্ণ কলসীদানের বিধান আছে। কেহ কেহ এই দিন কালকুমার ফালকুমার দৈত্যের পূজা করিয়া চৌরাস্তার মোড়ে 'শত্রুর মুখে ছাই মিত্রের মুখে ছাতু' বলিয়া ছাতু উড়াইয়া থাকেন। ছাতু-ব্যবহারের জন্য এই সংক্রান্তি ছাতু সংক্রান্তি নামেও পরিচিত। ক্ষেত্রপাল-ব্রতে ক্ষেত্রপালকে ছাতু দেওয়া হয়। গয়ায় পিতৃলোকের উদ্দেশে ছাতুর পিণ্ড দেওয়ার রীতি আছে। তবে সম্পন্ন বাঙালী গৃহস্থ কেহ কেহ ভাতের পিণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বাংলা দেশে যবের ছাতু অপেক্ষা গম-এর ছাতুর প্রচলন বেশি, তিলের ছাতুর ব্যবহারও আছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ছাত্র-আন্দোলন বস্তুতঃ যুব-আন্দোলনেরই রূপান্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপে যুব-আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে ও বিংশ শতাব্দীতে ইহার বিশ্বব্যাপী প্রসার ও পূর্ণবিকাশ সাধিত হয়। সাধারণতঃ ১৬-২২ বৎসর-বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী যুব-আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং ছাত্র-সংঘের মাধ্যমে এই আন্দোলন অভিব্যক্তি লাভ করে। প্রাচীন ও নবীনের বিরোধ চিরন্তন। শিল্প-বিপ্লব ও নব্য বিজ্ঞানের পটভূমিকায় সংঘবদ্ধ ও আত্ম-নির্ভরশীল যুবশক্তির প্রাচীন রীতি-নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে নূতন সমাজ গঠন করিবার সক্রিয় প্রয়াস যুব-আন্দোলন বা যৌবনের বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত।

রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন-সাধন এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংঘবদ্ধ ছাত্রশক্তি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তদ্ব্যতীত স্বাবলম্বন, আত্মগঠন ও জাতিগঠনমূলক কর্মধারাও এই আন্দোলনে প্রাধান্য লাভ করে।

সাধারণতঃ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর সমধিক গুরুত্ব অর্পিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন ক্রমশঃ রাজনৈতিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। অবশ্য পরাধীন দেশে আন্দোলন প্রথম হইতেই রাজনীতিমুখী। শেষ পর্যায়ে মার্ক্সীয় ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে মার্ক্সবাদী, ফ্যাসিবাদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল আন্দোলনকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র সংঘগুলি বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া যায় এবং আন্দোলনের প্রথম যুগের ঐক্য বিপর্যস্ত হয়। ছাত্র-আন্দোলনের বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী হইলেও জার্মানী ও চীনে ইহা সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। চীনের জনগণের মুক্তি সংগ্রামে ছাত্র আন্দোলনের দান অসামান্য। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রসংঘ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জাপানেও জাতীয় ছাত্র-সংঘ বিশেষ শক্তিশালী।

ভা র তে ছা ত্র - আ ন্দো ল ন ১৮৭৪-১৯৪৭: ইওরোপীয় আদর্শে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার ভারতের মধ্যে বাংলা দেশেই আরম্ভ হয় এবং এখানেই ভারতীয় ছাত্র-আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও কর্মোদ্দীপনা সহজেই তরুণ মনকে আকৃষ্ট করে এবং চিরাচরিত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশঃ সক্রিয় আকার ধারণ করে।

১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মিলিত চেষ্টায় কলিকাতায় ছাত্র সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি বিবিধ শিক্ষামূলক বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বোম্বাই নগরেও এই সময়ে অনুরূপ ছাত্র সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

শিক্ষার প্রসারের ফলে ধীরে ধীরে বাংলার ছাত্রগণ পরাধীনতার অভিশাপ উপলব্ধি করিতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারের কালে এবং ইলবার্ট বিল সম্পর্কে আন্দোলনের সময়ে কলিকাতার ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বাংলার ছাত্রদের কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে। ঐ বৎসর ৭ আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে এক জনসভায় বিলাতী দ্রব্যবর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যব্যবহারের সংকল্প অনুমোদিত হয়। সভার পূর্বে ছাত্রগণ কলেজ স্কোয়্যারে সমবেত হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন প্রায় বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। বহু ছাত্র নিঃশঙ্কচিত্তে এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু স্থানে জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব এবং যাদবপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এই আন্দোলনের ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ইহার পূর্বেই মহারাষ্ট্র ও বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের সূত্রপাত হয়। বিপ্লবী-সমিতিগুলির অধিকাংশ কর্মীই ছিল ছাত্র এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্র-সমিতিগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুতরাং বাংলা দেশে ছাত্র-আন্দোলন ও বিপ্লব-আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী কালেও বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে এবং নানা আকারে অনেক ছাত্র সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যমে রাদাবজার নামে কলিকাতায় একটি ছাত্র সমিতি স্থাপিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও মেঘনাদ সাহার চেষ্টায় গঠিত আর একটি ছাত্র-সমিতির কথা জানা যায়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ও নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর বাংলার ছাত্রগণ সর্বপ্রথম গান্ধীজীর নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী স্কুল-কলেজ বর্জন করিয়া বাহির হইয়া আসে। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অনেক ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেয়, অনেকে অসহযোগ আন্দোলনে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া কারারুদ্ধ হয় এবং কেহ কেহ গান্ধীজী-নির্ধারিত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে দেশের সর্বত্র অল্পাধিক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি দৃষ্ট হয়। এই সময়ে উপর্যুপরি কয়েক বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনের কালে নিখিল ভারত ছাত্র-সম্মিলনীর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা দেশেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনের সময়ে কয়েক বৎসর প্রাদেশিক ছাত্র-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। তৎসত্ত্বেও আত্মনির্ভরশীল ও সংঘবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন তখন গড়িয়া ওঠে নাই। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইবার কার্যকর প্রয়াস বিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগিতায় ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে 'কলিকাতা ছাত্র-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯২৬ খ্রী)। কয়েকটি জেলাতেও ছাত্র সমিতি গঠিত হয় এবং উদ্যোক্তাদের কয়েকজন 'স্টুডেন্ট'-নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। পত্রিকাটি কয়েক মাস পরে বন্ধ হইয়া যায়।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশনের ভারতভূমিতে পদার্পণ উপলক্ষে যে সর্বভারতীয় হরতাল ঘোষিত হয়, বাংলার ছাত্রগণ তাহাতে সোৎসাহে যোগ দেয়। সেই সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পিকেটিং হয়। পিকেটিং এর সময় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে ঐ কলেজের ছাত্র সমিতির সম্পাদক প্রমোদকুমার ঘোষাল জনৈক ইউরোপীয় পুলিশ কর্মচারী কর্তৃক অকারণে গুরুতরভাবে প্রহৃত হন। ইহার পূর্বেই তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাসপেণ্ড হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল যে তিনি বিনানুমতিতে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ দিন তাঁহার প্রহারের সংবাদে ছাত্রদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল। শত শত সহস্র ছাত্র অনতিবিলম্বে প্রেসিডেন্সি কলেজপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে এবং কলেজের চতুর্দিকে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে। ছাত্রদের অনেকের চেষ্টায় কলেজের অধ্যক্ষ অব্যাহতি পান।

৩ ফেব্রুয়ারির ঐ ঘটনার এখানেই সমাপ্তি ঘটিল না। এই সম্পর্কে প্রেসিডেন্সি কলেজের আরও ১৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে এবং বেথুন, মুরারিচাঁদ (শ্রীহট্ট), শ্রীরামপুর ও হুগলি কলেজের বহু ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে ছাত্রদের অসন্তোষ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

১৭ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর সভাপতিত্বে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে এক ছাত্রসভায় সারা বাংলার ছাত্রদিগকে একটি সংঘে সংগঠিত করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আর স্থির হয় যে তদুদ্দেশ্যে প্রাথমিক কর্তব্য হইল কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া একটি সংগঠক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। সভায় প্রমোদকুমার ঘোষাল, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অমরেন্দ্রনাথ রায়— এই ৩ জনকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। ৬ মার্চ অপর একটি ছাত্রসভায় আহ্বায়ক কমিটিকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং শচীন্দ্রনাথ মিত্র, রেবতীমোহন বর্মন ও অক্ষয়কুমার সরকার এই কমিটিতে যোগ দেন। শচীন্দ্রনাথ মিত্র স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্র সমিতির সভাপতি ছিলেন। ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অভিযোগে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে সাসপেণ্ড করা হয়। উক্ত আদেশের প্রতিবাদে ঐ কলেজের ছাত্রগণ ধর্মঘট করে। ক্রমশঃ বাংলার সর্বত্র ছাত্র বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করিল।

কলিকাতার সভার নির্দেশ অনুযায়ী মার্চ মাসেই ঐ সংগঠক সমিতি (স্টুডেন্ট্‌স অর্গানাইজিং কমিটি) গঠিত হইল। বিস্তারিত বিচার বিবেচনার ফলে সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির খসড়া গঠনতন্ত্র রচিত হইল। সমিতির উদ্যোগে ঐ বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ৩ দিনব্যাপী নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলার [illegible] সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন। সারা বাংলা হইতে বহু ছাত্র প্রতিনিধি এই সম্মিলনীতে যোগ দেন। সভার শেষ দিন প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি (অল বেঙ্গল স্টুডেন্ট্‌স অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে এ. বি. এস. এ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদ এবং সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করেন।

এ বি এস. এ. -র জন্ম হইতেই (১৯২৮ খ্রী) নানা ও ভাবেই আত্মনির্ভরশীল ও পূর্ণাঙ্গ ছাত্র আন্দোলনের উন্মেষ হয়। এ. বি. এস. এ. নানা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনে এ বি এস. এ. বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই গঠনমূলক কাজও চলিতেছিল। যেমন

১. এ বি. এস. এ. -এর উদ্যোগে কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু পুস্তকালয়, প্রাপ্তবয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয় ও সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ২ কলিকাতায় ছাত্রকর্মীদের শিক্ষার জন্য একটি ওয়ার্কার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। এখানে সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ইহার পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন ৩. বিদেশীয় ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছিল এবং একটি স্টুডেন্ট্‌স ইন্‌ফরমেশন

ব্যুরোর মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছুক ছাত্রদের সাহায্য করার ব্যবস্থা হইয়াছিল ৪. প্রথম পর্যায়ে এ. বি. এস. এ.-এর 'ইণ্ডিয়া টু-মরো' (১৯৩০ খ্রী) নামে একটি ইংরেজী পাক্ষিক ও 'ছাত্র' (১৯২৮ খ্রী) নামে বাংলা মাসিক পত্র পরিচালনা করে। মেদিনীপুর জেলায় সরকারি জুলুম সম্পর্কে 'যতীন্দ্রনাথ বসু অনুসন্ধান কমিটি'র রিপোর্ট সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রকাশ করার জন্য 'ইণ্ডিয়া টু-মরো'-র প্রকাশ সরকারি আদেশে বন্ধ হইয়াছিল। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর পত্রিকাটি পুনঃ-প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ভয়েস অফ ইয়ুথ' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক এবং 'ভাবী কাল' নামে বাংলা মাসিক পত্র এ. বি. এস. এ.-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ৫. গ্রামাঞ্চলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ছাত্রকর্মীদের পদযাত্রার একটি কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল ৬. ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিভিন্ন জেলায় ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনের জন্য এবং আর্তত্রাণ ও সেবার জন্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হইয়াছিল ৭. বার্ষিক সম্মিলনীর সময়ে খেলাধুলা, সংগীত ও বিতর্কের প্রতি-যোগিতা এবং ব্যায়াম-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত। এ. বি. এস. এ.-এর উদ্যোগে বাংলার ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক বিশেষ সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এ. বি. এস. এ.-এর উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়ের জন্মদিবস উপলক্ষে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি বিরাট স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কেও একটি সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় ৮. ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর বঙ্গের বন্যার সময়ে এ. বি. এস. এ. কয়েকটি স্থানে নিজস্ব সেবাকেন্দ্র পরিচালনা করে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে ভূমিকম্পের পর এ. বি. এস. এ.-এর কর্মীদের একটি দল আতত্রাণের কার্যে বিহার প্রদেশে কয়েক মাস অবস্থান করে ৯. ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টুডেণ্ট্‌স পার্লামেণ্ট' নামে একটি স্থায়ী বিতর্ক-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ইহার উদ্বোধন করেন। কয়েক বৎসর সভার নিয়মিত অধিবেশন চলিয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনীর পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হয়। পাঞ্জাবের মহম্মদ আলম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; কিন্তু দলীয় কলহ গুরুতর আকার ধারণ করায় সভাপতি এই অধিবেশনের কার্য বন্ধ করিয়া দেন। বিরোধী দলের ছাত্রগণ ইহার পর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্টুডেণ্ট্‌স অ্যাসো-সিয়েশন নামে অন্য একটি সমিতি গঠন করে। এই সমিতি এ. বি. এস. এ.-এর অনুরূপ একটি কার্যসূচী প্রণয়ন করে এবং প্রচারের জন্য 'স্টুডেণ্ট ওয়ার্ল্ড' নামে একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বাহির করে।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ছাত্রসম্মিলনীতে একটি সর্ব-ভারতীয় ছাত্রপ্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য এ. বি. এস. এ.-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ধীরে ধীরে ছাত্রগণ সংঘবদ্ধ হইতেছিল। বোম্বাই প্রদেশে যুব-সমিতির মাধ্যমেই ছাত্রগণ সংঘবদ্ধ হয়। ইউসুফ মেহেরালী ও নরিম্যানপ্রমুখ নেতার পরিচালনায় সমিতিটি ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া ওঠে। ইঁহারা 'ভ্যান-গার্ড' নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন (১৯২৯-৩০ খ্রী)। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সময়ে এ. বি. এস. এ. এবং পাঞ্জাব ছাত্র-ইউনিয়নের মিলিত চেষ্টায় একটি নিখিল ভারত ছাত্র-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নানা কারণে ইহা বিশেষ কার্যকর হয় নাই। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ডাণ্ডি অভিযান করেন। ছাত্রদের কর্তব্য নির্ধারিত করিবার নিমিত্ত এ. বি. এস. এ.-এর উদ্যোগে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে ৬ এপ্রিল সারা বাংলা ছাত্র-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাবেশের নির্দেশ-অনুযায়ী ছাত্রকর্মীদের প্রথম দল কাঁথিতে লবণ-সত্যাগ্রহের জন্য প্রেরিত হয়। মহিষবাথান, কুমিরা প্রভৃতি স্থানের লবণ-সত্যাগ্রহেও এ. বি. এস. এ.-এর কর্মীগণ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে বহু ছাত্রকর্মী কারারুদ্ধ হয়।

বাসন্তী দেবীর সভানেত্রীত্বে ১ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত এক সারা বাংলা ছাত্র-সমাবেশে স্কুল-কলেজ বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয়ে পিকেটিং-এর ব্যবস্থা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় এক মাসব্যাপী পিকেটিং-এর ফলে শত শত ছাত্র কারারুদ্ধ হয় এবং নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বড়বাজারের পাইকারী বিলাতী বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় হইতে নিরস্ত করিবার জন্য এক ব্যাপক কার্যসূচী গৃহীত হয়। তাহার ফলেও কয়েক শত ছাত্রকর্মী কারারুদ্ধ ও নিগৃহীত হয়। মফঃস্বলেও ব্যাপক-ভাবে অনুরূপ কর্মসূচী অনুসরণ করা হইয়াছিল। বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে এ. বি. এস. এ. এবং বি. পি. এস. এ.-এর

একটি যুক্ত কমিটি এই আন্দোলন পরিচালনা করে। এই আন্দোলনের গুরুত্ব ভারত-সচিব ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাঁহার সাপ্তাহিক বিবরণীতে উল্লেখ করেন।

এ. বি. এস. এ.-এর বিবরণী অনুসারে ১৯৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অন্যূন ১২০০০ ছাত্র কারাবরণ করে। ছাত্র-আন্দোলনের এই পর্যায়ের ইতিহাস ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই শেষ।

পরবর্তী পর্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা: সক্রিয় সর্বভারতীয় ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা। অন্যান্য প্রদেশেও ছাত্র-আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট ছাত্র-সমাবেশে অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্ট্‌স ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্যতঃ কলেজ ইউনিয়ন-গঠন, কলেজের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনার অধিকার ইত্যাদি কয়েকটি দাবির জন্য ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা এই সময়ের ছাত্র আন্দোলনে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্রমশঃ মার্ক্‌সীয় চিন্তাধারার প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক মতদ্বন্দ্ব প্রকট হইয়া ওঠে। মতবিরোধের ফলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নাগপুর অধিবেশনের সময়ে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র ফেডারেশনের উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষভাবে কমিউনিস্ট দলের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস নামক একটি জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই সমিতিও দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। রাজনৈতিক দলগত বিভেদের ফলে বাংলা দেশে আরও কয়েকটি ছাত্র-সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ নানাভাবে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। বিভেদ সত্ত্বেও ছাত্র-সমিতিগুলি এই ব্যাপক আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে, বোম্বাই নৌবিদ্রোহের সহানুভূতিতে ও ভিয়েৎনাম দিবস উপলক্ষে ছাত্রসমাজে বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বহু ছাত্র এই সকল আন্দোলনে মৃত্যু বরণ করিয়াছিল।

দ্র সমরেন্দ্রনাথ বসু, বাংলা দেশের ছাত্র আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৪৫, অমিতাভ চৌধুরী, 'জাতীয় মুক্তি-প্রয়াসে ছাত্রসমাজ', যুগান্তর, কংগ্রেস সংখ্যা, ১৯৪৮, Stanly High, *The Revolt of Youth*, Cincinnati, 1923; T. C. Wang, *The Youth Movement in China*, New York, 1927; G. D. Overstreet & M. Windmiller, *Communism in India*, Berkeley, 1959; Amarendranath Roy, *Students Fight For Freedom*, Calcutta, 1967.

অমরেন্দ্রনাথ রায়

ছান্‌হু-দড়ো হরপ্পা দ্র

ছানা দুধ দ্র

ছানি চক্ষুরোগ দ্র

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ সামবেদীয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের ১০টি প্রপাঠকের (অধ্যায়) মধ্যে প্রথম দুইটি গৃহ্যকর্মোপযোগী মন্ত্রের সমষ্টি ও মন্ত্রব্রাহ্মণরূপে পরিচিত। শেষ ৮টি অধ্যায় লইয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ্। প্রতি প্রপাঠক বহু খণ্ডে বিভক্ত।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলির অন্যতম এবং বহু স্থলে আরণ্যকধর্মী। যে ঔপনিষদাশ্রয়ী দর্শন পরবর্তী কালে বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ইহাতে তাহার মূল তত্ত্বগুলি বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত। আরণ্যক-ধর্মিতা প্রথম দিকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। যেমন, প্রথম অধ্যায়ে উদ্‌গীথোপাসনার কথা আছে। যজ্ঞে গেয় সামের প্রধান অংশ উদ্গীথ। কিন্তু এখানে তাহা ওকারের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিপাদিত। প্রথম অধ্যায়ের শেষে সামগানের অন্তর্গত স্তোভাক্ষরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ও সামোপাসনা নানা প্রকারের সামের রূপক-বহুল ব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে আদিত্যোপাসনা। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশে (১৩-১৯) রূপক ও রহস্যের মাধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে। এই অংশে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই ঘোষণা আছে। ইহার পর বিভিন্ন আখ্যানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা দেখা যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের আখ্যানগুলির মধ্যে পড়ে রৈক্ব-জানশ্রুতি সংবাদ, জাবাল সত্যকাম ও গৌতমের উপাখ্যান এবং সত্যকাম ও উপকোসল কামায়নের উপাখ্যান। চতুর্থ অধ্যায়ের একস্থানে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর আর মানবলোকে প্রত্যাবর্তন ঘটে না। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদ এবং অশ্বপতি কৈকেয় ও আরুণি প্রভৃতির কথোপকথন পাওয়া যায়। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ভাগে কর্মফল ও পুনর্জন্মের তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে আর আরণ্যকধর্মিতা নাই, শুদ্ধ দার্শনিক প্রজ্ঞাবচনসমূহই পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক-শ্বেতকেতু সংবাদের মাধ্যমে এক এবং অদ্বিতীয় চিন্ময় সৎ হইতে দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। দেহত্যাগের ফলে আত্মার বিনাশ হয় না, যেরূপ লবণাক্ত জলে লবণভাব সেরূপ ব্রহ্মও জগতের সর্বত্র বিরাজিত— ইত্যাদি তত্ত্ব এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যটি পাওয়া যায়। সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথনের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়নির্দেশ। অষ্টম অধ্যায়ে দেহসর্বস্ববাদের খণ্ডন। অসুরগণ দেহ ও আত্মা অভিন্ন এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছে, কিন্তু দেবগণ লাভ করিয়াছেন প্রকৃত আত্মতত্ত্ব– দেহ বিনাশশীল, আত্মা অবিনশ্বর, দেহ আত্মার অধিষ্ঠানস্থল মাত্র।

দ্র দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-সম্পাদিত, ছান্দোগ্যোপনিষদ্, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, Durgamohan Bhattacharya, 'Introduction', *Chhandogya-brahmanam*, Calcutta, 1960.

দীপক ভট্টাচার্য

ছাপাখানা মুদ্রাযন্ত্র দ্র

ছায়া সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া গোপনে নিজের সদৃশ এক নারীকে সৃষ্টি করেন এবং পুত্রকন্যার ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া পিতৃগৃহে গমন করেন। ঐ নারীই ছায়া। বশংবদ ছায়া নিতান্ত বাধ্য না হইলে এই ব্যাপার গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনুর উৎপত্তি হয়। শনি, তপতী, বিষ্টি প্রভৃতি তাহার অন্যান্য সন্তান। ছায়া স্বীয় পুত্রগণকে অধিক স্নেহ করেন এই ধারণায় সংজ্ঞার পুত্র যম তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। ছায়া যমকে অভিশাপ দেন। যম সূর্যের নিকট অভিযোগ করিলে, তাড়নার সম্ভাবনা দেখিয়া ছায়া সমগ্র ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দেন ও সূর্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানে বাহির হন।

দ্র হরিবংশ, ১।৯, মৎস্যপুরাণ, ১১।৫ ৯, বাংলায় প্রচলিত সূর্যব্রতকথা।

দীপক ভট্টাচার্য

ছায়ানৃত্য পুতুলের ছায়ানৃত্য প্রাচীন যুগে প্রাচ্যের এক দর্শনীয় অনুষ্ঠান ছিল। চীন, জাভা, তুরস্ক, শ্যাম, মালয় প্রভৃতি দেশে ইহার প্রচলন আছে। তন্মধ্যে জাভা ও বলির ছায়ানৃত্য সমধিক বিখ্যাত।

আনুমানিক ৯৬০ হইতে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী যুগে চীন দেশে 'সুঙ্' রাজবংশের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ এই ছায়ানৃত্যের প্রথম সূচনা হয়। অনেকের মতে ইহার সূচনাস্থল ভারতবর্ষ। ১৫শ শতকে মুসলমান রাজত্বকালে জাভার ছায়ানৃত্য নূতন এক রূপ গ্রহণ করে। ১৭শ শতকে ইহার প্রচলন শুরু হয় ইটালীতে। সেখান হইতে সমগ্র ইংল্যোপে এই নৃত্য-পরিকল্পনা বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮শ শতাব্দীতে আমেরিকাতে ইহার প্রচলন শুরু হয়।

ইহাতে নানা প্রকার চিত্র সমন্বিত মুখস ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্থানে ছায়ানৃত্য আজও প্রচলিত আছে। জাভার ছায়ানৃত্যে মহাভারতের কাহিনী ঈষৎ ভিন্নরূপে পরিবেশিত হইয়া থাকে।

দ্র শান্তিদেব ঘোষ, জাভা ও বলীর নৃত্যগীত, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৯৭, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, Olive Blackham, *Shadow Puppets*, London, 1960.

অপর্ণা সেনগুপ্ত

ছায়াপথ আকাশগঙ্গা দ্র

ছারপোকা সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্থ্রোপোডা, Phylum-Arthropoda) অন্তর্ভুক্ত পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী। ছারপোকা মনুষ্য-অধ্যুষিত স্থানে বাস করে এবং মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ছারপোকার রঙ মেহগনি কাঠের মত। পরিণত অবস্থায় ছারপোকা সাধারণতঃ ৪-৬ মিলিমিটার লম্বা ও ২-৩ মিলিমিটার চওড়া হইয়া থাকে। শরীর ৩টি অংশে বিভক্ত: মাথা, বুক ও পেট। মাথায় এক জোড়া চক্ষু ও দুই জোড়া স্পর্শ উপাঙ্গ বা শুং আছে। মুখটি শিকারের দেহ কাটিয়া রক্ত চুষিয়া খাইবার উপযোগী। তিনটি খণ্ড লইয়া বুক গঠিত। বুকের দ্বিতীয় খণ্ডের উপরের দিকে এক জোড়া লুপ্তপ্রায় ডানার চিহ্ন দেখা যায়। বুকের নীচের দিক হইতে ৩ জোড়া পা বাহির হইয়াছে। উদরদেশে ৮টি খণ্ড আছে। ছারপোকার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে, স্ত্রী ছারপোকার উদরের নীচের দিকে পঞ্চম খণ্ডের দক্ষিণাংশে একটি কাটা দাগের মত চিহ্ন থাকে। স্ত্রী-ছারপোকা একসঙ্গে ১৩৩-১৭৩টি ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবার সময় পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সহিত সম্পর্কিত। ১৩° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বাচ্চা বাহির হইতে ৭ সপ্তাহ এবং ২৮° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বাচ্চা বাহির হইতে ৪ দিন সময় লাগে।

ছারপোকা কখনও কখনও প্যাস্টুরেলা রোগের বাহক হইতে পারে, কিন্তু ইহারা লিস্ম্যানিয়া রোগ ছড়ায় না।

দ্র N. H. Swellengrebel & M M Sterman, *Animal Parasites in Man*, Princeton, 1960, T. J Parker & W. A. Haswell, *A Textbook of Zoology*, vol I, London, 1961.

[illegible] অধিকারী

ছিদ্রালী প্রাণী স্পঞ্জ। প্রায় ৩ হাজারেরও অধিক প্রজাতির ছিদ্রালী প্রাণী আছে। এই গোষ্ঠীর (পরিফেরা) প্রাণীগুলি অধিকাংশই লবণাক্ত জলে বাস করে। দীর্ঘকাল ইহারা মানুষের নিকট উদ্ভিদরূপে পরিচিত ছিল। কিন্তু অন্য প্রাণীদের মত চলাফেরা করিতে না পারিলেও ইহাদের কোষগত গঠন ও ক্রিয়াকলাপ প্রাণীদের মত। তাই ইহাদের এখন প্রাণী বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদের শরীরে বহু কোষ একত্র থাকিলেও কাজের বিভাজন সুস্পষ্ট নয় ও অন্যান্য বহুকোষী প্রাণীর মত বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্রের দেখা পাওয়া যায় না।

ছিদ্রালী প্রাণী বা স্পঞ্জ বহুবিধ আকার ও বর্ণের হইতে পারে। প্রথম দর্শনে গাছপালা বা উদ্ভিদ বলিয়া মনে হইলেও একটু লক্ষ্য করিলেই ইহাদের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছিদ্রগুলির কতকগুলি দিয়া জলস্রোত দেহে প্রবেশ করে ও কতকগুলি দিয়া বাহির হইয়া যায়। এক টুকরা স্পঞ্জকে যদি দিয়া আড়াআড়িভাবে কাটিলে দেখা যাইবে যে বাহিরের ছিদ্রগুলি হইতে বহু জল নালী দেহের অভ্যন্তরকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই নালীর গাত্র এক বিশেষ ধরনের কোষ দ্বারা আবৃত। এই কোষগুলি হইতে একটি করিয়া চাবুকের মত 'ফ্ল্যাজেলা' নালীর মধ্যে বাহির হইয়া থাকে। এই সকল ফ্ল্যাজেলার সমবেত নড়াচড়ার ফলে যে স্রোতের সৃষ্টি হয় তাহাতেই নালীর মধ্যে জল প্রবাহিত হয়। জলস্রোতের সঙ্গে ব্যাকটিরিয়া, এককোষী প্রাণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব নালীর ভিতরে আসিলে স্পঞ্জের দেহকোষ সেগুলিকে জলস্রোত হইতে আত্মসাৎ করে। খাদ্যসংগ্রহের এই কার্যে ফ্ল্যাজেলাধারী কোষগুলিকে সাহায্য করে অ্যামিবার মত ক্ষণপদযুক্ত আর এক প্রকারের কোষ।

স্পঞ্জের দেহের অপর বৈশিষ্ট্য হইল কঠিন ও সূঁচের মত ধারালো অসংখ্য 'স্পিকিউল' নামক বস্তু। ক্যালসিয়াম, সিলিকন অথবা স্পঞ্জিন নামক রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা গঠিত এই স্পিকিউলগুলির আকৃতি স্পঞ্জভেদে বিভিন্ন প্রকার। ইহারা স্পঞ্জের দেহের কাঠামো গঠন করে ও প্রতিরক্ষাতেও সাহায্য করে। ধারালো স্পিকিউল থাকায় অধিকাংশ স্পঞ্জই স্নানাদিতে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। কেবল যাহাদের দেহে স্পঞ্জিন দিয়া গঠিত নরম তন্তু থাকে, সেগুলিই জলশোষণ, গাত্রমার্জন প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত হয়, ফ্লোরিডার সমুদ্রোপকূলে এইজাতীয় স্পঞ্জের চাষ করা হয়।

চলৎশক্তিহীন স্পঞ্জের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ইহাদের দেহ দুর্গন্ধযুক্ত ও স্পিকিউল দ্বারা আকীর্ণ হওয়ায় অধিকাংশ প্রাণীই ইহাদিগকে আহারের অনুপযুক্ত মনে করে। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের শরীরে ছোট ছোট কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণী বাস করে, ইহারা পরোক্ষভাবে শত্রুর আক্রমণ হইতে স্পঞ্জকে রক্ষা করে।

যৌন ও অযৌন— উভয় পদ্ধতিতেই স্পঞ্জের বংশবৃদ্ধি হয়।

স্পঞ্জের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। এক খণ্ড স্পঞ্জকে নিষ্পেষিত করিলে উহার দেহের সকল কোষ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পৃথক থাকিবার পর কোষগুলি আবার পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নূতন একটি স্পঞ্জ গঠন করে। এই প্রকার পুনর্বিন্যাসের দৃষ্টান্ত প্রাণী-জগতের অন্যত্র বিরল।

দ্র L. Hyman, *The Invertebrates*, vol I, New York, 1959, E D. Hanson, *Animal Diversity*, New Jersey, 1961.

বৃ হীৎ দা । গ

ছিন্নমস্তা দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত শক্তির দশ রূপভেদের অন্যতম। ইহার অপর নাম প্রচণ্ড চণ্ডিকা। ইনি ভীষণাকৃতি। ইনি নিজের ছিন্ন মস্তক নিজ বাম করে ধারণ করিয়া নিজ কণ্ঠবিনির্গত রক্তধারা পান করিতেছেন এবং বামে ও দক্ষিণে অবস্থিত সহচরী ডাকিনী ও বর্ণিনীকে পান করাইতেছেন। বিপরীত বিহাররত রতি ও কামদেবের উপর প্রত্যালীঢ়পদে তিনি অবস্থিত। তাঁহার দেহের দীপ্তি কোটি সূর্যের দীপ্তিতুল্য। ডাকিনী ও বর্ণিনীর বর্ণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। উঁহারা যথাক্রমে অতি শুভ্রবর্ণা বা কৃষ্ণবর্ণ এবং রক্তবর্ণ বা অতি শুভ্রবর্ণ। ইহারা সকলেই দিগম্বরা, মুণ্ডমালাধারিণী, মুক্তকেশী। ছিন্নমস্তার উৎপত্তিকাহিনী এইরূপ : একদিন দেবী পার্বতী দুই সহচরীর সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সহচরীদ্বয় ক্ষুধা-পীড়িত হইয়া বার বার তাঁহার নিকটে খাদ্য চাহিতে থাকিলে দেবী বাম নখাগ্রের দ্বারা নিজের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনটি ধারায় রক্ত বাহির হইতে লাগিল, দুইটি ধারা দুই সখীর মুখে এবং একটি ধারা

নিজের মুখে দেওয়া হইল। দেবীর মস্তক ছিন্ন হওয়ায় নাম হইল ছিন্নমস্তা। মহাভাগবত পুরাণের মতে (অষ্টম অধ্যায়) যজ্ঞরত পিতা দক্ষের আলয়ে গমনেচ্ছু দেবী মহাদেব কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়া নিজের বিভূতি-প্রদর্শনের কামনায় মহাদেবের সম্মুখে ছিন্নমস্তা সহ দশ রূপ প্রকট করেন। তখন ভীত ও অভিভূত শিব তাহাকে দক্ষালয়ে গমন করিতে অনুমতি দেন। 'দশমহাবিদ্যা' দ্র।

দ্র তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী, ৫১৬।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১১৭৬-৭৭ বঙ্গাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্রী) যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া প্রায় মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিহেতু খাদ্যশস্যের আশানুরূপ ফলন না হওয়াতে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতেই বঙ্গদেশে চালের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই বৎসরও বৃষ্টির অভাবে বোরো, আউস ও আমন কোনও প্রকার ধানের ফলন না হওয়ায় দেশে এক নিদারুণ অজন্মা দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এইভাবে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতে থাকিলেও প্রথম দিকে অস্পষ্ট হওয়ায় কোম্পানির শাসকবর্গ বিপদ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হন নাই। বরং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়া আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। অনাবৃষ্টির ফলে দেশের জলাশয়গুলি শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় খাদ্যাভাবের সহিত দেশে তীব্র জলাভাবও উপস্থিত হয় ও বহুস্থানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে জনসাধারণ বিপদগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি মন্বন্তরের পশ্চাতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব জনজীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষ প্রায় এক বৎসর কাল চলিয়াছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইহার প্রকোপ ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে আরম্ভ করে। এই দুর্ভিক্ষে তদানীন্তন বাংলা দেশের নদিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, যশোহর, রাজশাহী, মালদহ, রাজমহল, পুর্নিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রভূত লোকক্ষয় হইয়াছিল ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পূর্ণমাত্রায় বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, রংপুর, ইদ্রাকপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রসার লাভ করিলেও এই সকল স্থানে ক্ষতির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। অন্নাভাবগ্রস্ত ও মারীভীত জনগণ ব্যাপকভাবে বাসভূমি ত্যাগ করায় দেশের বহু অঞ্চল জনশূন্য হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ত্রিহুত, মোরাং, কুচবিহার, প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল উত্তর বঙ্গে ব্যাপকভাবে দস্যুতা ও লুণ্ঠনকার্য চালাইত। [illegible] কৃষকগণ ইহাদিগের দলবৃদ্ধি করিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই দস্যুদল স্থানীয় জমিদারগণের সাহায্যও লাভ করিত।

এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় দেশে নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানি শাসনের শোষক রূপটিও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি লোকের মৃত্যু হইলেও ভূমিরাজস্ব আদায় কোনও ভাবে ব্যাহত হয় নাই। সরকারের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা ইংরেজ শাসকবর্গ, নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ বা তাহার অধীন রাজস্ববিভাগের কর্মচারীবৃন্দ কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই। দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবমাত্র সরকার সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রায় ৬০ হাজার মণ শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখেন। মফঃস্বল হইতে কলিকাতা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে চাল নিয়মিত আমদানি হওয়ায় রপ্তানি কেন্দ্রসমূহের দুর্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দুর্ভিক্ষের বৎসর ও তাহার পর কিছুকাল রাজস্ব মকুব করিবার বা অন্ততঃপক্ষে রাজস্বের হার কিছু কমানোর পরিবর্তে তাহা ক্রমশঃ বর্ধিত করা হয়। জনসাধারণের দুর্দশার সুযোগ লইয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী ও তাহাদের গোমস্তাগণ চালের ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইয়াছিলেন। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাইয়াও গভর্নর ও তদীয় শাসনপরিষদ এই ব্যক্তিগত মুনাফাবাজী বন্ধ করিতে অগ্রসর হন নাই। কোম্পানির পক্ষ হইতে যে ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। বরঞ্চ দেশীয় অভিজাতশ্রেণী এই ব্যাপারে অধিকতর বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 'সীয়ার উল্ মুতক্ষরীণ' গ্রন্থে বিহার অঞ্চলে সীতাব রায় আয়োজিত দুর্ভিক্ষত্রাণব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

এই মন্বন্তরে বঙ্গদেশে কৃষকশ্রেণী অপেক্ষা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষেরই অধিক সংখ্যায় মৃত্যু হয়। চাষী অপেক্ষা ফসলভোগকারী মনুষ্যগণের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হওয়ায় দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও শস্যের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কর্মক্ষম কৃষকের সংখ্যার আনুপাতিক হ্রাস হওয়াতে ও আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে দুর্ভিক্ষের পরে চাষীকে নিজ জমিতে বসানোর ব্যাপারে জমিদারগণের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইহার

ফলে বঙ্গ দেশে তখন হইতে খোদকস্ত রায়ত অপেক্ষা পাইকস্ত রায়তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাও উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে পরোক্ষতঃ এই মন্বন্তরের ফলেই কোম্পানি পূর্বতন দ্বৈত শাসনব্যবস্থা অপসারিত করিয়া ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেওয়ানির ভার সম্পূর্ণ স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

দ্র নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর', ইতিহাস, ৯ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১০ম খণ্ড, ১ম ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ও ভাদ্র-মাঘ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, W.W Hunter, The *Annals of Rural Bengal*, London, 1868, N K Sinha, *Economic History of Bengal*, vol. I, Calcutta, 1956, N K Sinha, 'The Famine of 1769 70', *Bengal Past & Present*, July-Dec 1958

দিলীপকুমার বিশ্বাস

ছুটি খাঁ বাংলার সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রী) সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান-এর পুত্র নসরৎ খান। তাঁহার সভাকবি শ্রীকর নন্দী-বিরচিত কাব্যে ইনি 'ছুটি খাঁ' (অর্থাৎ ছোট খান) নামেই উল্লিখিত। পিতা-পুত্র দুই জনেই হোসেন শাহের পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। ত্রিপুরার ও চট্টগ্রামের যুদ্ধে পিতা পুত্রের কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া সুলতান দুই জনকেই সম্মান দান করিয়াছিলেন। পরাগলের মনোরঞ্জনের জন্য 'কবীন্দ্র' পরমেশ্বর দাস 'মহাভারত পঞ্চালিকা' রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে অশ্বমেধ পর্বের কথা সংক্ষিপ্ত থাকায় পরাগল-পুত্র নিজের কবিকে দিয়া 'জৈমিনীয় সংহিতা' অনুসারে বিস্তৃততর 'অশ্বমেধ পর্ব' লিখাইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক এই বইটি বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (পূর্বার্ধ), কলিকাতা, ১৯৫৯।

সুকুমার সেন

ছো-ওয়ু ২৮°৫'৩১" উত্তর এবং ৮৬°৩৯'৫৯" পূর্ব। নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। হিমালয়ে ৭৮০০ মিটারের (২৬০০০ ফুট) বেশি উঁচু যে ১৪টি শৃঙ্গ আছে, ছো-ওয়ু তাহাদের অন্যতম। পৃথিবীর পর্বতশৃঙ্গগুলির মধ্যে উচ্চতায় ইহার স্থান ষষ্ঠ। ইহার উচ্চতা ৮১৮৮ মিটার (২৬৮৬৭ ফুট)।

তিব্বতীরা ছো-ওয়ুকে চোমো উ (chomo yo) বলে। তিব্বতী ভাষায় 'চোমো উ' কথার অর্থ ভগবানের মস্তক।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া হইতে হারবার্ট টিচি, সেপ্ যোখ্লার ও হেলমুট হিউবারজার নামে ৩জন অভিযাত্রী ছো-ওয়ু আরোহণ করিতে আসেন। বিখ্যাত পর্বতারোহী পাসাং দাওয়া লামা ছিলেন এই অভিযাত্রী দলের শেরপা সরদার। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানা প্রকারের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ১৯ অক্টোবর অপরাহ্ণ তিনটার সময় হারবার্ট টিচি, সেপ যোখ্লার ও পাসাং দাওয়া লামা সর্বপ্রথম ছো-ওয়ু শিখরে আরোহণ করেন।

ছো-ওয়ু শিখর হইতে হিমালয়ের নয়নাভিরাম দৃশ্যের তুলনা বিরল। পৃথিবীর অনেকগুলি সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এখান হইতে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কে এফ. বুনশার নেতৃত্বে ছো ওয়ু অভিমুখে প্রথম ভারতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। ১৫ মে তারিখে সোনাম্ গিয়াৎসো ও পাসাং দাওয়া লামা ছো-ওয়ু শিখরে আরোহণ করেন। কিন্তু অভিযানকালে মেজর এন. ডি জয়ালের অকালমৃত্যু ঘটে।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ছো ওয়ু অভিমুখে একটি মহিলা অভিযাত্রীদল ৭৫০০ মিটার (২৫০০০ ফুট) পর্যন্ত আরোহণ করেন। এভারেস্ট বীর তেনজিং নোরকের দুই কন্যা নীমা ও পেম্ পেম্ এই দলে ছিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা, এই অভিযানে দুই জন শেরপা সহ ৩৯ বৎসর বয়স্কা নেত্রী ম্যাডাম এম. ই. ক্লদ কোগান ও সদস্যা ক্লদ ভ্যানডার স্ট্র্যাটেন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ছো ওয়ু ২ ৭৮৯২ মিটার (২৬১২৬ ফুট) উঁচু। ইহা এভারেস্ট হইতে ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত। তাকাহাশার নেতৃত্বে একটি জাপানী অভিযাত্রী-দল ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার উপর আরোহণ করেন।

দ্র Herbert Tichy, *Cho-Oyu*, Vienna, 1955, *Himalayan Mountaineering Journal*, vol. I, no 2, 1966.

প্রাণেশ চক্রবর্তী

ছোটগল্প ছোটগল্প ছোট হইবে, আবার গল্পও হওয়া চাই, এই রকম একটা ধারণা থাকিলেই পাঠকের কাজ চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু আধুনিক কালে, বিচিত্র বিবর্তনের পথ অতিক্রম করিয়া ছোটগল্প যে পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, তাহাতে তাহার কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা-নির্ধারণ করাই সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন শতাধিক

পৃষ্ঠাব্যাপী ছোটগল্প লিখিত হইতে পারে, গল্পত্ব বা ঘটনার বিস্তারও তাহার পক্ষে আবশ্যিক নয়, একটি সামান্য সংঘটন বা 'ইন্‌সিডেন্ট', কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত, কোনও বিশেষ ভাব বা আবেগের বিস্তার— সবই তাহার বিষয়বস্তু হইতে পারে। আধুনিক ছোটগল্পের জনক এড্‌গার অ্যালান পো হইতে আরম্ভ করিয়া জেম্‌স জয়স কিংবা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে পর্যন্ত, এমন কি অতি সাম্প্রতিক বাংলা গল্পের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করিলেও এই সত্য আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইবে। ঘটনাশ্রয়ী ছোটগল্প যে আজও লেখা হয় না তাহা নয়, কিন্তু কয়েকপৃষ্ঠাব্যাপী বিশুদ্ধ আত্মবিশ্লেষণ অথবা গীতিকবিতাধর্মী কিঞ্চিৎ ভাববিস্তার— সবই আজ ছোটগল্পের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই মার্কিন গল্পকার ও সমালোচক উইলিয়াম সারোয়ান ছোটগল্পকে সর্বাপেক্ষা স্বাধীন শিল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পকার রূপে লেখক আন্তন চেখভ দাবি করিয়াছিলেন, একটি সামান্য ছাইদানিকে অবলম্বন করিয়াও তিনি গল্প লিখিতে পারেন। আবার ইংরেজ লেখক সমারসেট মম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে 'গল্পত্ব' বর্জন করিয়া যাহাই লিখিত হউক তাহাকে অন্য যে কোনও নামে ভূষিত করা চলে, কিন্তু কোনও মতেই ছোটগল্পের গৌরব দেওয়া যায় না।

এই সমস্ত রীতি-পার্থক্য এবং মতবিভেদ সত্ত্বেও যে কোনও পর্যায়ের ছোটগল্পের মধ্যেই এমন কয়েকটি সাধারণ ধর্ম আছে যে তাহাকে অবশ্যই একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। প্রথমতঃ ছোটগল্পের বাহন হইবে গদ্য - এই কারণে ইহা 'ব্যালাড' বা ফরাসী 'শাঁজ পপ্যুল্যার' (*Chanson populaire*) অর্থাৎ 'গণগীতি' হইতে পৃথক। দ্বিতীয়তঃ, তাহার একটি একমুখী সরল গতি থাকিবে, উপকরণ বাহুল্যের দ্বারা সেই একাগ্র লক্ষ্যটিকে ব্যাহত করা চলিবে না, প্রতিটি বাক্য প্রতিটি ব্যঞ্জনা এই প্রয়োজনে সুমিত ও সুসংবদ্ধ থাকিবে এবং এই উপায়ে বিস্তারধর্মী উপন্যাসের সহিত তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইবে। তৃতীয়তঃ, ঘটনা বা ভাবগত একটি নাট্যমুহূর্ত তাহাতে অবশ্যই থাকিবে কিন্তু বিবরণই ছোটগল্পের পরিবাহ হইবে বলিয়া তাহার নাটক হওয়াও চলিবে না। অল্প কথায় বলিতে পারা যায়, লক্ষ্যভেদী তীরের মত একটি পরিণামের 'মহামুহূর্ত' (ক্লাইম্যাক্স)কে বিদ্ধ করিয়াই ছোটগল্প তাহার চরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে আধুনিক ছোটগল্প তাহার প্রথম রূপ লাভ করে ১৯শ শতাব্দীর মার্কিন লেখক এড্‌গার অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯ খ্রী)-এর হাতে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত কাহিনী যাহা ছোটগল্পের আদি বীজ, তাহা আদিম মানবের মতই প্রাচীন। ঋগ্‌বেদ, গ্রীক পুরাণ, প্রাচীন মিশরীয় পুথির প্যাপিরাস পত্র, বাইবেল, রামায়ণ-মহাভারত এবং লোকমুখে প্রচারিত উত্তরাধিকারলব্ধ অসংখ্য খণ্ড কাহিনীতে ছোটগল্পের সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীতিমূলক এবং ধর্মশিক্ষাত্মক (ফেব্‌ল ও প্যারাব্‌ল) ছোট ছোট আখ্যান উপাখ্যানে, বীরত্ব, মহত্ত্ব এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারণার উত্তেজক ঘটনাসংকুল বিবরণে অথবা রসাত্মক এবং সমাজমূলক গল্পাদিতে ছোটগল্পের প্রাথমিক পর্যায়। অতঃপর ভারতীয় 'জাতক' (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় বা ৩য় শতক), বিষ্ণুশর্মা-বিরচিত সুনামধন্য 'পঞ্চতন্ত্র' (সময় অনিশ্চিত, খ্রীষ্টজন্মের কিছু পরবর্তী বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন), ঈশপ (কাল অনিশ্চিত) রচিত গল্পসমূহ, লুসিয়ুস আপেলেইউসের 'স্বর্ণ-গর্দভের কাহিনী' (খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী), তাইতুস পেত্রনিউসের ব্যঙ্গরচনা 'সাটিরিকন' বা শ্লেষ-গল্প (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী), দামাস্কাসের সেন্ট জন-প্রণীত 'বারলাম ও জোসাফট' (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী), খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীগণের সংকলিত (১৩শ শতাব্দী) 'গেস্তা রোমানোরুম', স্যার টমাস ম্যালোরী-কর্তৃক গ্রথিত কিংবদন্তী প্রসিদ্ধ 'মর্ত্‌ দার্থর' (আর্থারের কাহিনীসম্ভার, ১৫শ শতাব্দী) এবং দেশ-বিদেশের উপকরণ অবলম্বনে সংকলিত বহু বিচিত্র রস সমৃদ্ধ 'আরব্য রজনী' (১২-১৫শ শতাব্দী) মধ্যযুগ পর্যন্ত মানুষের গল্প শুনিবার আকাঙ্ক্ষাকে নানাভাবে চরিতার্থ করিয়াছে।

ইওরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে শিল্পে ও সাহিত্যে মানবতাবাদের যে চৈতন্য জাগ্রত হইল, তাহার প্রথম কলধ্বনি বাজিল ইতালীয় লেখক জোভান্নি বোক্কাচ্চো-রচিত 'দেকামেরন' (১৪শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ) গল্পসম্ভারে। গল্পগুলির বাস্তবতা, সমাজ-সমালোচনা, লোকচরিত্র সমীক্ষা, বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকময়তা এবং সরল সাবলীল গদ্য ভাষা পরবর্তী কালের গল্প, উপন্যাস এবং নাটকের দিশারা যেন মুক্ত করিয়া দিল। বোকাচ্চো যথেচ্ছভাবে তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, গ্রীক পুরাণ হইতে ভারতীয় কথা-সাহিত্য, সমকালীন সামন্ত-জীবন হইতে সাধারণ গৃহস্থ-জীবন - সর্বস্থান হইতেই তিনি মধু আহরণ করিয়া এই মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ফল হইল সুদূরপ্রসারী, পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই-জাতীয় বহু সংকলন রচিত হইল, যথা জোভান্নি ফিওরেন্তিনো-এর 'ইল্ পেকোরোনে' (গর্দভ), স্ত্রাপারোলা-র 'পিয়াচেভোলি নোত্তি' (খুশির রাত), নাভারের রানী

মার্গেরীৎ-এর 'হেপ্টামেরোন' (সাত দিনের কাহিনী) ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে এনসাইক্লোপিডিস্ট্', দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর দল আবির্ভূত হইলে তাহাদের কেহ কেহ নিজেদের গম্ভীর এবং ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্যগুলি উপস্থাপিত করিবার জন্য সাহিত্যের মাধ্যমও অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে স্মরণীয় প্রখ্যাত ভল্‌তেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রী) এবং দিদেরো (১৭১৩-৮৪ খ্রী)। ভল্‌তেয়ার এর 'জাদিগ' এবং 'কাঁদীদ' আয়তনে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও গল্পরূপে বিশ্বসাহিত্যে অমর হইয়া আছে। দিদেরোও ব্যঙ্গাত্মক কয়েকটি তীক্ষ্নধার ছোটগল্প রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর আধুনিক ছোটগল্পকে কিঞ্চিৎ রূপ লাভ করিতে দেখি পৃথিবীর অন্যতম মহান ঔপন্যাসিক বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০ খ্রী)-এর রচনায়। কয়েকটি চমৎকার ছোটগল্প তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'মরু-কামনা', 'এল ভের্দুগো' এবং 'ফ্ল্যাণ্ডার্সে খ্রীষ্ট' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আধুনিক ছোটগল্পের সফল পথিকৃৎ হইলেন মার্কিনী কবি ও গল্পকার এড্‌গার অ্যালান পো। যে একমুখী অনিবার্যতা এবং সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতময় রচনাভঙ্গী ছোটগল্পের ঐশ্বর্য, অ্যালান পোই তাহার সার্থক উদ্গাতা। সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে থাকিয়া, গল্পবুভুক্ষু সাধারণ পাঠকের দাবি মিটাইবার প্রয়োজনে, অ্যালান পো-র উজ্জ্বল প্রতিভা স্বশক্তিতেই একটি দীপ্ত ও অভিনব শিল্পবস্তু গড়িয়া তুলিল। হৃৎস্তম্ভন-কারী আতঙ্ক, গোয়েন্দার বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্বের অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণতা এবং তৎসহ অসাধারণ ভাষাবিন্যাস দেখিতে দেখিতে বিশ্বব্যাপী পাঠকের চিত্ত জয় করিয়া লইল। তাহার 'দি পিট অ্যাণ্ড পেণ্ডুলাম', 'কালো বিড়াল', 'ঘূর্ণিগর্ভে অবতরণ', 'দি গোল্ড বাগ' (সোনার পোকা) অথবা 'মারি রজার্সের মামলা' পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।

এই প্রসঙ্গে ন্যাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪-৬৪ খ্রী)-এর নামও স্মরণীয়। এই মার্কিনী লেখক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক, কিন্তু গল্পকার হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব সমভাবেই উজ্জ্বল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত অ্যালান পো-র সহধর্মিতা আছে, তাঁহার গল্পেও জীবনের এক বিষাদ-গম্ভীর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যালান পো যেখানে তীব্র ও প্রবলভাবে মানবিক হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়িত-বিলোড়িত করিয়াছেন সেখানে হথর্নের কাহিনী আলো-অন্ধকার-বিজড়িত এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক জগতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। 'বিষণ্ণ পরাভূত এক নির্বেদের মধ্যে অশরীরীর সঞ্চরণে শিহরিত যেন কোনও প্রাচীন প্রাসাদে হথর্নের নিঃসঙ্গ রাত্রিযাপনা।' তাঁহার অনেক-গুলি গল্পই স্মরণীয়, তাহাদের মধ্যে 'রাপ্পাচ্চিনির কন্যা', 'জন্মচিহ্ন', 'ডাক্তার হেইডেগারের পরীক্ষা' এবং 'ডেভিড সোয়ান' প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা যায়।

ফরাসী লেখক প্রস্পের মেরিমে (১৮০৩-৭০ খ্রী)-ও ছোটগল্পে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়বস্তুও প্রায়শঃ নিদয় এবং প্রবল, কিন্তু সুচারু ভাষাশিল্পী মেরিমে গল্পগুলিকে চমৎকার শিল্পসুরভি দিয়াছেন। তাঁহার 'লা ভেনাস দিল' (দ্বীপের ভেনাস), 'কলোবা', 'কার্মেন' এবং 'মাতেও ফাল্‌কোনে' সুপরিচিত।

ইহার অব্যবহিত পরেই ইওরোপের দুই দেশে পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের আবির্ভাব ঘটিল। একজন ফরাসী লেখক গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-৯৩ খ্রী), অপর জন রুশ লেখক আন্তন পাভ্‌লোভিচ্ চেখভ (১৮৬০-১৯০৪ খ্রী)।

বস্তুতান্ত্রিকতার গুরু গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার (১৮২১-৮০ খ্রী)-এর শিষ্যরূপে মোপাসাঁ সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিছু ব্যর্থ কাব্যপ্রয়াস এবং বিশৃঙ্খলভাবে কিছু সাংবাদিকতা সমাপ্ত করিয়া মোপাসাঁ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তাঁহার 'বুল দ্য সুইফ' (চর্বির গোলা) নামে অনন্য ছোটগল্পটি রচনা করিলেন। জার্মান বিজিত ফ্রান্সের কয়েকটি নরনারীর বিশেষভাবে একটি দুর্ভাগিনী পতিতার লাঞ্ছনা ও অবমাননা— এই গল্পে যেভাবে পরিস্ফুটিত হইল, তাহাতে একই সঙ্গে মোপাসাঁর বাস্তবতা এবং অন্তর্দৃষ্টি, শক্তিমত্তা এবং সৌন্দর্যবোধ বিদ্যুৎশিখার মত উদ্ভাসিত হইল। ইহার পর মোপাসাঁ তাহার বিভ্রান্ত এবং বিড়ম্বিত স্বল্পজীবিতার মধ্যেও অসংখ্য ছোটগল্প লিখিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব দেশে বার বার তাহা অনূদিত এবং পঠিত হইয়াছে, অগণিত লেখক গল্প রচনা করিতে গিয়া তাঁহার আদর্শ ও প্রেরণাকে শিরোধার্য করিয়াছেন। গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে মোপাসাঁ নাট্যকার শেক্সপীয়র এবং ঔপন্যাসিক তল্‌স্তয়ের মত সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

পরাজিত ফরাসী জাতির অন্তর্বেদনা ও স্বদেশপ্রেম, সমাজের উচ্চস্তরের দুর্নীতি, সমকালীন অবক্ষয় ও ব্যভিচার, দুর্গত শ্রমিক কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার ইতিবৃত্ত এবং অন্তর্ভেদী মনোবিকলন— কখনও অশ্রুপূর্ণ, কখনও কাব্যময়, কখনও অগ্নিক্ষরিত, কখনও বা শাণিত ব্যঙ্গের রূপে মোপাসাঁর ছোটগল্পে প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার গল্পগুলি আমাদের বাঙালী পাঠকের নিকট এতই

সুপরিচিত যে তাহাদের সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলিতে যাওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার অগণিত উৎকৃষ্ট গল্প হইতে কয়েকটির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে. 'লা পারুর' (মুক্তামালা), 'ল্য ওর্লা' (ওরলা), 'মাদমোয়াজ্যাল ফিফি', 'মাবোকা', 'স্যুর লো' (জলের উপর) এবং 'ল্য পাপা দ্য সিমঁ' (সাইমনের বাবা)।

নাট্যকার চেখভের খ্যাতি তাঁহার গল্পসাহিত্যকে কিছুটা আচ্ছন্ন করিলেও, বস্তুতঃ গল্পে বা নাটকে কোন ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক মহিমার অধিকারী হইয়াছেন, তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সুকঠিন। চেখভ তাহার পূর্বগামী শিল্পী রুশীয় সাহিত্যের জনক পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭ খ্রী) এর উত্তরাধিকার অবশ্যই লাভ করিয়াছিলেন। পুশ্‌কিনের কিছু উৎকৃষ্ট গল্প— যথা 'তুষার ঝড়', 'ইস্কাপনের বিবি' এবং 'পোস্টমাস্টার'— রুশ ছোটগল্পের সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিল। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মহামনীষী লেও নিকোলায়েভিচ তল্‌স্তয় (১৮২৮-১৯১০ খ্রী) বহু উৎকৃষ্ট ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন, যথা 'যেখানে প্রেম সেখানে ঈশ্বর', 'মানুষের কতটা জমি দরকার', 'তুই তীর্থযাত্রী' ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত গোগোল (১৮০৯-৫২ খ্রী) এর 'ওভার কোট' গল্পটিও সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পরূপে রুশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

এই পটভূমিতেই চেখভের আবির্ভাব। মোপাসাঁর প্রায় সমবয়সী লেখক হইয়াও চেখভ এই তুরন্ত ফরাসী প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। ছোটগল্পে সম্পূর্ণ একটি নূতন ধারার তিনি সূত্রপাত করিলেন।

মোপাসাঁ গল্প রচনায় প্রধানতঃ কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াছেন, গল্পের পরিণতিতে একটি অপ্রত্যাশিত চমক দিয়া পাঠককে চকিত করিয়া তুলিয়াছেন। চেখভ যেন সচেতনভাবেই এই রীতির বিরোধিতা করিয়াছেন। গল্পত্ব বর্জিত গল্পরচনা যাহা সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্পের একটি মূল বৈশিষ্ট্য তাহা প্রত্যক্ষভাবে চেখভেরই দান। একটি চরিত্র, নামমাত্র কোনও ঘটনা, বিশেষ একটি ভাবের বিস্তার – ইহাদের যে কোনও একটি উপকরণ অবলম্বন করিয়াই চেখভ অনন্যসাধারণ শিল্পবস্তু রচনা করিতে পারিতেন। সমসাময়িক ইওরোপীয় সাহিত্যে চেখভ মোপাসাঁর মহিমায় অনেকখানি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে সর্ব দেশের লেখক ও পাঠকের নিকটে তিনি ছোটগল্পের 'গুরু'রূপে অভিনন্দিত ও স্বীকৃত হইয়াছেন।

চেখভের রচনাশৈলী অপূর্ব, সংযত, পরিমিত, বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল, কবিচেতনায় সুরভিত। ইহার সহিত প্রতীকের সুচিন্তিত প্রয়োগ আধুনিক ছোটগল্পের পথের রেখা যেন নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল। সমকালীন আমলা ও ধনতন্ত্রের প্রতি মর্মভেদী ব্যঙ্গের আক্রমণ, মধ্যবিত্ত-মানসের বিবিধ সংকট, মনস্তাত্ত্বিক কোমল ও মধুর মুহূর্ত, লোকচরিত্রের বহুমুখী উদ্‌ঘাটন এবং সর্বব্যাপী একটি বিষাদ চেতনায় তাঁহার গল্পগুলি এক অভিনব শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত গল্পের উল্লেখ করা হইল 'কোরাস গার্ল', 'চুম্বন', 'কুকুরসহ মহিলা', 'প্রধানা শিক্ষিকা', 'মেজেনাইন বাংলো', 'ডার্লিং' এবং 'স্টেপ'।

মোপাসাঁ এবং চেখভের আবির্ভাবের পরে পৃথিবীর দিকে দিকে ছোটগল্পের যেন প্লাবন বহিয়া গেল। এতকাল ধরিয়া শিল্প হিসাবে ছোটগল্পের বিশেষ কোনও মর্যাদা ছিল না, তাহাকে সাধারণভাবে 'সংক্ষিপ্ত উপন্যাস' এবং 'হীনতর শিল্প' (লেসার আর্ট) বলিয়াই গণ্য করা হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তুই দশকের মধ্যেই একটি স্বাধীন ও প্রবল শিল্পশক্তিরূপে ছোটগল্পের স্থান সাহিত্যে চিরনির্ধারিত হইয়া গেল। তাহার নীতিগত স্বাতন্ত্র্য, ব্যঞ্জনাধর্মী তীক্ষ্ণতা, ন্যূনতম উপকরণের সাহায্যে বিপুলতম সত্যের উদ্ভাসন, তাহার তীব্র অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি তাহাকে বিশ্বসাহিত্যধারার তুঃসাহসী নবজাতকরূপে নির্ণীত করিল। যদি ছোটগল্প লিখিয়াই কথাসাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করা ইহার পূর্বে অকল্পনীয় ছিল, মোপাসাঁ এবং চেখভের সাফল্যের পর পৃথিবীর বহু শক্তিমান শিল্পীই ছোটগল্পের সাহায্যে তাহাদের আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইলেন।

ছোটগল্পের যে বিশেষ ধর্ম ও লক্ষণের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, এই সময় হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া গেল। কেহ মোপাসাঁর ধারা অবলম্বন করিলেন, কেহ বা চেখভের রীতি পদ্ধতিতে অগ্রসর হইলেন, কেহ বা উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় করিয়া লইলেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেকের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, সমাজ চেতনা এবং দার্শনিকবোধের বৈচিত্র্য, আধুনিক ছোটগল্পকে সর্বাত্মকভাবে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিল।

রুশ লেখক মাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রী) নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিকরূপে প্রথিতযশা হইলেও গল্পসাহিত্যে তাঁহার স্মরণীয় ভূমিকা রহিয়াছে। বিপ্লবপূর্ব এবং বিপ্লবোত্তর রুশীয় জনসাধারণ, বিশেষভাবে শ্রমিক, কৃষক এবং তুর্গত জনগণের চরিত্র, তাহাদের সংগ্রাম, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা এবং সংকল্পের রূপ কঠোর বাস্তবতার

সহিত গোর্কির লেখনীতে রূপায়িত হইয়াছে। তাঁহার 'চেল্‌কাশ', 'মানুষের জন্ম', 'একটি শরতের সন্ধ্যা' এবং 'মাল্‌ভা' বিশেষ স্মরণীয় গল্প।

গোর্কির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছদ্মনামী মার্কিনী লেখক ও. হেনরি (উইলিয়াম সিড্‌নি পোর্টার, ১৮৬২-১৯১০ খ্রী) নিছক গল্পলেখকরূপেই তাঁহার খ্যাতি গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলির জনপ্রিয়তা অসাধারণ। সমালোচকেরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু মোপাসাঁ এবং চেখভের পরে খুব সম্ভব তাঁহার গল্পই সর্বাপেক্ষা পঠিত ও আদৃত হইয়াছে। দরিদ্র, ক্ষুধিত এবং অপরাধী-সম্প্রদায়ের জীবন প্রধানভাবে তাঁহার গল্পে চিত্রিত হইয়াছে। সুখপাঠ্যতা ও 'কাহিনী'-রস তাঁহার গল্পের প্রধান আকর্ষণ। 'ম্যাজাইদের উপহার', 'হুইস্‌লিং ডিকের ক্রিসমাস', 'সবুজ দরজা', 'সজ্জিত কক্ষ' ইত্যাদি তাঁহার সুপরিচিত গল্প।

ও. হেনরির কিঞ্চিৎ পরবর্তী মার্কিনী লেখকদের মধ্যে জ্যাক লণ্ডন (১৮৭৬-১৯১৬ খ্রী) আর একটি স্মরণীয় নাম। অভিযানকামী যাযাবরচিত্ত এই লেখক মেরু অঞ্চলের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া অনেকগুলি অতুলনীয় গল্প লিখিয়াছেন।

ইওরোপের দেশ-বিদেশের এই তালিকা আর বিস্তৃত করিয়া লাভ নাই। যাঁহারা ঔপন্যাসিক, কবি বা নাট্যকাররূপেই সমধিক কীর্তিমান, তাঁহারা অন্যত্র আলোচিত হইবেন। পূর্বোক্ত লেখক ছাড়াও তাঁহাদের সমকালীন বা পরবর্তী এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের কিছু কিছু নাম স্মরণ করা যাইতে পারে: চেক লেখক কারেল চাপেক (১৮৯০-১৯৩৮ খ্রী), ইংরেজ লেখক ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০ খ্রী), ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফীল্ড (১৮৮৮-১৯২৩ খ্রী), গ্রাহাম গ্রীন (১৯০৪ খ্রী—), ইতালীয় লেখক লুইজি পিরানদেল্লো (১৮৬৭-১৯৩৬ খ্রী), রুশ লেখক আলেক্সেই তল্‌স্তয় (১৮৮২-১৯৪৫ খ্রী), ফরাসী লেখক জাঁ পোল সার্ত্র (১৯০৫ খ্রী—), মার্কিনী লেখক উইলিয়াম সারোয়ান (১৯০৮ খ্রী—), মার্কিনী লেখক ব্রেট হার্ট (১৮৩৬-১৯০২ খ্রী), আইরিশ লেখক অস্কার ওয়াইল্‌ড (১৮৫৪-১৯০০ খ্রী) প্রভৃতি।

বর্তমান কালের ছোটগল্পে সর্বাধিক বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন ইংরেজ গল্পকার সমারসেট মম (১৮৭৪-১৯৬৫ খ্রী)। উন্নাসিক সমালোচনায় ও হেনরির মতই তিনি কিছুটা অস্বীকৃত হইয়া থাকেন, কিন্তু গল্প-রসের দিক হইতে এবং চরিত্রবৈচিত্র্যে তাঁহার ছোটগল্পগুলি প্রভূত জনাদর লাভ করিয়াছে। মমকে আধুনিক কালের মোপাসাঁ বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে। তাঁহার 'বৃষ্টি', 'মিঃ নো-অল' (শ্রী সবজান্তা), 'অসময়েই বন্ধু' প্রভৃতি গল্প সর্বজনপঠিত।

সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্পে মার্কিনী লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১ খ্রী) সর্বাপেক্ষা প্রভাববিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাকে মমের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বলা যাইতে পারে। কঠিন বস্তুতান্ত্রিকতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বুদ্ধিজীবী চেতনার বিষাদ ও সংক্ষোভ, স্বল্পরেখায় কঠিন চরিত্র-নির্মাণ, প্রতীক-ব্যবহার, দেশ ও মানবগত বৈচিত্র্য তাঁহার রচনার বিবিধ সম্পদ। তাঁহার নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৫৪ খ্রী) রচনা 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' (বৃদ্ধ ও সমুদ্র), আয়তনে কিছু দীর্ঘ হইলেও একটি অনন্যসাধারণ ছোটগল্প ব্যতীত আর কিছুই নয়। হেমিংওয়ের কয়েকটি প্রখ্যাত গল্প: 'কিলিমানজারোর তুষার', 'ঘাতকেরা', 'ফিফ্‌টি গ্র্যাণ্ড', 'জগতের আলো' ইত্যাদি।

এই আলোচনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গল্পকাররূপে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিশ্বের ছোটগল্পে তাঁহার দানও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। তাঁহার 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং [illegible] আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে ('ছোটগল্প, বাংলা' দ্র)।

কথাশিল্পের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে ছোটগল্পের পূর্ণ পরিচয় এখন পর্যন্তও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে নাই। তাহার ভাষা, তাহার রূপ, তাহার বৈচিত্র্য লইয়া নানা দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। কখনও কবিতার সহিত তাহার আত্মীয়তা ঘটিতেছে, কখনও সে নিভৃত মনঃসমীক্ষায় পরিণত হইতেছে, কখনও চেতন-অচেতনের ছায়ালোকে তাহার সঞ্চরণ চলিতেছে। আধুনিক ছোটগল্প লইয়া তর্ক বিতর্কেরও অন্ত নাই। এই সমস্ত পরীক্ষা ও বিতর্কের ফলাফল যাহাই হউক, ভবিষ্যতের ছোটগল্প যে পরিণতিই লাভ করুক, ইহাতে সন্দেহ নাই যে ছোটগল্প আজ আর 'হীনতর শিল্প' নহে, উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণও নহে, ইহা স্ববলেই শিল্পলোকে তাহার নিজের জন্য একটি মহিমার আসন অধিকার করিয়াছে।

দ্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, কলিকাতা, ১৯৬২, Brander Matthews, *The Philosophy of the Short Story*, New York, 1901; H. E. Bates, *The Modern Short Story*, London, 1941; Sean O'Faolain, *The Short Story*, London, 1948.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটগল্প, বাংলা ইওরোপীয় শিক্ষা এবং সাহিত্য-চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে এই শিল্পের অভ্যুদয় এবং বিংশ শতাব্দীর তিন দশকের মধ্যেই বিবিধ বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভ করিবার মত গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। বস্তুতঃ বাংলার বিবিধ সাহিত্যশাখার মধ্যে ছোটগল্পই যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান, ইহা আমরা পরম শ্লাঘার সহিত স্মরণ করিতে পারি।

আধুনিক গল্পসাহিত্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালী রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ উপপুরাণের কাহিনী হইতে— নল দময়ন্তী, সাবিত্রী সত্যবান, প্রহ্লাদ এবং ধ্রুব চরিত্র ইত্যাদি ঐতিহ্যগত বিষয় অবলম্বন করিয়া গল্প শুনিবার তৃষ্ণা মিটাইত। [illegible] গল্পরস ও নীতিশিক্ষা পরিবেশন করিত। তৎসহ ছিল লোককথার 'মধুমালা', 'কাঞ্চনমালা' প্রভৃতি রোমান্স, গোপাল ভাঁড়ের কৌতুক কাহিনী, 'অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়', অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়', '[illegible]' প্রভৃতি বিভিন্ন 'ন্যায়ের (দৃষ্টান্তের) গল্প। পারস্য উপন্যাসের গল্পগুলিও বাঙালীর নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল বলিয়া মনে হয়, ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত [illegible] 'গুল-এ-বকাওলি', [illegible]' অথবা 'আরব্য রজনীর কাহিনী' বাঙালী শ্রোতা ও পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিত। বিখ্যাত পারস্য লেখক সাদীর 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তাঁ' হইতে অনেক গল্প নীতিশিক্ষার জন্য সংগৃহীত হইত। ইহা ছাড়া 'হিতোপদেশ', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'বত্রিশ সিংহাসন' জাতীয় গল্প তো ছিলই।

ইংরেজী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিস্তারের ফলে সাহিত্য-[illegible] পরিবর্তিত হইতে লাগিল, কাব্যে নাটকে, উপন্যাসে বিবর্তন দেখা দিল। আসিলেন মাইকেল মধুসূদন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র। স্বভাবত অনিবার্যভাবেই বাংলা ছোটগল্প রচনার প্রাথমিক দায়িত্ব আসিয়া পড়িল বঙ্কিমচন্দ্রের উপর। উপন্যাস রচনার অবকাশে তিনি তিনটি খণ্ড কাহিনী রচনা করিলেন, একটি 'ইন্দিরা' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ), দ্বিতীয়টি 'যুগলাঙ্গুরীয়' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) এবং তৃতীয়টি 'রাধারানী' (বঙ্গদর্শন, কার্তিক অগ্রহায়ণ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ)। 'ইন্দিরা'কে বঙ্কিমচন্দ্র পরে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'রাধারানী' তাহাদের ক্ষুদ্র আয়তনেই রহিয়া গিয়াছে।

আকৃতিতে গল্পাকার হইলেও 'রাধারানী' অথবা 'যুগলাঙ্গুরীয়' বস্তুতঃ সংক্ষিপ্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসের খসড়া। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্পায়তন কাহিনী রচনার প্রেরণা বাংলা সাহিত্যে আসিয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিলেন 'মধুমতী' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করিলেন 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (ভ্রমর, বৈশাখ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ) এবং 'দামিনী' (ভ্রমর, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ)।

'মধুমতী' গল্পটির বৈশিষ্ট্য আছে, কাহিনী কল্পনায় পূর্ণচন্দ্র মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। একটি স্মৃতিভ্রষ্টা নারীর বেদনা ও বৈচিত্র্যময় আখ্যান ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। 'গৃহিণীপনাহীন প্রতিভা'র অধিকারী সঞ্জীবচন্দ্রও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত পালিত হয় নাই।

বাংলা ছোটগল্প বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সার্থকভাবে জাত, বিধৃত এবং বিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পর হইতেই যাঁহারা গল্পসাহিত্যের সাধনা করিতেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের একজন হইলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রী), অপর জন হইলেন প্রখ্যাত প্রবাসী সমালোচক ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০ খ্রী)।

স্বর্ণকুমারী বেশ কয়েকটি ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রপ্রভাবিত রোমান্স যেমন আছে, তেমনই কিছু পারিবারিক গল্পও আছে। শিল্প হিসাবে তাহাদের বিশেষ সার্থকতা না থাকিলেও লেখিকার আন্তরিকতা এবং মার্জিত রুচির পরিচয় সর্বত্র উজ্জ্বল। 'আমার জীবন', 'সন্ন্যাসিনী' এবং 'গহনা' তাঁহার উল্লেখযোগ্য গল্প।

শিল্পী হিসাবে নগেন্দ্রনাথ অনেক বেশি সাফল্য লাভ করিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ গল্পনির্মাণে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, বিস্ময় এবং রোমান্সের উপাদানকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। ভাবভঙ্গীতে বঙ্কিমের অনুবর্তী হইয়াও পরিবেশ রচনায় নগেন্দ্রনাথ মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। তাঁহার 'জাল কুরণা', 'ব্রাহ্মণাবাদ' এবং 'লক্ষ্মীহারা' গল্প আজও স্মরণীয়।

গল্পকাররূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রী) 'ভিখারিণী' নামে গল্পটি একটি প্রাথমিক প্রয়াস। উহা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্রের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই রচনার কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। ১২৯১ বঙ্গাব্দের 'নবজীবন' পত্রিকায় তাঁহার আরও দুইটি গল্প প্রকাশিত হয়, একটি 'ঘাটের কথা' (কার্তিক), অপরটি

ছোটগল্প, বাংলা

'রাজপথের কথা' (অগ্রহায়ণ)। প্রথমটিতে একটি গল্পের আভাস আছে, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ ভাবধর্মী রচনা। বস্তুতঃ এই দুইটিই আন্তর ধর্মে কাব্য-সুরভিত, ইহাদের মধ্যে 'লিপিকা'র পূর্বাভাস অনুভব করা যায়।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকা প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন। কিন্তু সাহিত্য সম্পাদকের একটিমাত্র করণীয় ছিল। স্থির হইয়াছিল যে, পত্রিকার পাঠক পাঠিকাদের প্রীতি বিধানার্থে তিনি প্রতি সংখ্যায় একটি করিয়া ছোটগল্প রচনা করিবেন। রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মাচারী। সেই অবাধ প্রাকৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা এক নূতন মুক্তির স্বাদ পাইল। পরিপার্শ্বের সাধারণ মানুষ তাহাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনা লইয়া কবিকে আপ্লুত করিল, একটির পর একটি ছোটগল্প তিনি 'সাপ্তাহিক হিতবাদী'র জন্য রচনা করিয়া চলিলেন। 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার' ইত্যাদি ৭টি গল্প এইভাবে জন্মলাভ করে।

১২৯৮ বঙ্গাব্দেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি হইতে সাধনা মাসিক পত্রটি প্রচারিত হয় এবং 'হিতবাদী'র পরিবর্তে 'সাধনা'য় গল্পের ধারা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। এই সমস্ত গল্প লইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংগ্রহ 'ছোটগল্প' (১৩০০ বঙ্গাব্দ) সংকলিত হয়। ইংরেজী শর্ট স্টোরির অনুসরণে এই জাতীয় রচনার 'ছোটগল্প' নামকরণ রবীন্দ্রনাথেরই কৃতিত্ব।

১২৯৮ হইতে ১৩২৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' হইতে 'সবুজপত্র' পর্যন্ত কখনও দ্রুত, কখনও বা বিলম্বিত লয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচিত্র প্রবাহী কর্মধারা ও সাহিত্য সাধনার সহিত ছোটগল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই অনন্য প্রতিভার মায়ামন্ত্রে বাংলা ছোটগল্প শৈশব হইতে একেবারে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। প্রকৃতি, প্রেম, সমাজ সমস্যা, মনস্তত্ত্ব, রোমান্স, পারিবারিক জীবন, রাজনীতি, নারীর মুক্তি-চেতনা, ব্যক্তিত্বের বোধন প্রভৃতি যাহা কিছু তিনি তাঁহার শিল্পীসত্তার দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাই সোনা হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, তাঁহার শেষতম গল্প সংকলন 'তিন সঙ্গী' (পৌষ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত অস্তোন্মুখ রবির শেষ রশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল।

'কাবুলিওয়ালা', 'দুরাশা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'ছুটি', 'পোস্টমাস্টার', 'অতিথি', 'নষ্টনীড়', 'হালদারগোষ্ঠী', কিংবা 'ল্যাবরেটরি'র স্রষ্টা মাত্র গল্পলেখক হিসাবেই বিশ্বসাহিত্যে স্মরণীয় হইতে পারিতেন। একটি ভাব বা ভাবনার একলক্ষ্য গতি, একাঙ্ক নাটকের মত স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্যনির্ণয়, ইঙ্গিতধর্মী তীক্ষ্ণতা, প্রতীক এবং ব্যঞ্জনার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ধীরে ধীরে বিবর্তিত এবং পরিণত হইয়াছে। তাঁহার রচনায় কখনও মোপাসাঁ-সুলভ বিস্ময়ের চমক, কখনও চেখভের বিষাদ-মাধুর্য, কখনও অ্যালান পোর কাহিনী চাতুর্য, কখনও আলফঁস দোদের কাব্য-সুরভি, কখনও অলডাস হাক্সলির শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সহিত কাহারও তুলনা করা চলে না, তিনি অনন্যসাধারণ। দীর্ঘ ৩৯ বৎসরের ছোটগল্প চর্চার বিষয়ে এবং ভাষার যে ক্রমপরিণতিতে তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং সস্নেহ প্রশ্রয়ে একে একে শক্তিমান গল্প লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে দেখা দিতে লাগিলেন। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের অমর স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রী) তাঁহার 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' এবং 'ডমরুচরিত' এর গল্পমালায় যে উদ্ভট কল্পনা এবং রঙ্গকৌতুকের প্লাবন বহাইয়া দিয়াছিলেন, সেই কৌতুক হাস্যের ধারায় আবির্ভূত হইলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২ খ্রী)। কিন্তু তিনি অদ্ভুতের গল্পের আসর বসাইলেন না, প্রাত্যহিক পরিচিত জীবনে যে স্বতঃস্ফূর্ত রঙ্গ ও আনন্দরস উচ্ছ্বসিত হয়, ঘটনাচক্রে যে পরম কৌতুককর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তাহারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলেন। প্রভাতকুমারের সরস গল্পের আকর্ষণ আজও অব্যাহত, তাঁহার 'প্রণয় পরিণাম', 'নিষিদ্ধ ফল', 'রসময়ীর রসিকতা', 'বলবান জামাতা' অথবা 'বাজীকর' তুলনারহিত। গভীর ও করুণ গল্পেও তিনি কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার 'দেবী', 'আদরিণী' এবং 'বোনের মূল্য'ও সমভাবে সমাদৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রগোষ্ঠীর অন্যান্য যে সমস্ত বিশিষ্ট লেখক বাংলা গল্প সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের একটি তালিকা এবং কিছু উৎকৃষ্ট গল্পের নামোল্লেখ হইল : ক. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রী)—'বায়ু বহে পূরবৈঁয়া', 'বন্ধু', 'চুড়িওয়ালা' ও 'গাড়ির আড়ি' খ. সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯ খ্রী)—'পোড়ারমুখী', 'সন্তোষিণীর ডায়ারি', 'পাগল' গ. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯ খ্রী)—'টুকনি', 'খেয়ালের খেসারৎ', 'দুই অধ্যায়' ও 'রংছুট' ঘ. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬ খ্রী)—'হারামণি', 'প্রথম প্রণয়' ও 'কোষ্ঠীর ফল' ঙ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির, ১৮৯০-১৯৬৪ খ্রী)—'নিশির ডাক', 'কালীপূজার রাত্রি' এবং চ. দীনেন্দ্রকুমার

রায় (১৮৬৯-১৯৪৩ খ্রী)—'জাল ডিটেকটিভ' ও 'চক্ষুদান'।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮ খ্রী)-কেও রবীন্দ্র-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বারা যে তিনি বিপুলভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব স্বীকৃতিতেই প্রকট। কিন্তু মূলতঃ ঔপন্যাসিক বলিয়াই শরৎচন্দ্র ছোটগল্প রচনায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নাই। যে কয়টি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পথ নির্দেশ' বা 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্পগুলি স্পষ্টই উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু ছোটগল্পে যে তিনি কতখানি কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন, 'মহেশ', 'মামলার ফল', 'অভাগীর স্বর্গ', 'ছবি' এবং 'অনুরাধা'ই তাহার প্রমাণ।

কৌতুক গল্পপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯ খ্রী) ও স্মরণীয়। তাঁহার নিজস্ব ভাষাভঙ্গীতে গল্পগুলি সরস ও উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। 'আমরা কি ও কে', 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি' অথবা 'দাদার দুরাভসন্ধি' তাঁহার রচনানৈপুণ্যের নিদর্শন।

প্রসঙ্গতঃ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রী) বা 'বীরবল'-কেও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হয়। সাংবাদিকতা এবং বহুমুখী লেখনীচর্চার ফলে ছোটগল্প-রচনায় তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬ খ্রী)-র চারিটি ছোটগল্প বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ও রচনার পারিপাট্যে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হইয়া আছে।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৫-১৯২৫ খ্রী) 'কল্লোল' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা বাংলা দেশে একটি প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি বিদ্রোহ, বর্হিজীবনের তীব্র তিক্ত নৈরাশ্যবাদ, যৌন চিন্তার স্বাধীনতা এবং ফরাসী প্রকৃতিবাদী বা ন্যাচরালিস্টদের মত অকুণ্ঠভাবে জীবনের কুশ্রী ও অসুন্দরের উদ্ঘাটন - এইগুলিই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন হইল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইওরোপীয় সাহিত্যের অবক্ষয় এবং নৈরাজ্যচেতনায় প্রভাবিত হইয়া ইঁহারা উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে এবং কবিতায় যেন পরিপূর্ণ বিপ্লব আনিতে চাহিলেন।

'কল্লোলে' যাঁহারা নবীন কল্লোল আনিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য অন্ততঃ দুই জন পূর্ব-ভূমিকা রচনা করিতেছিলেন। একজন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭ খ্রী) ও অপর জন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০ খ্রী—)। জগদীশ গুপ্তকে বাংলায় নিষ্ঠুরতম বাস্তবতার প্রথম শিল্পী বলা যাইতে পারে, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মবিশ্লেষণায়, মমতাহীন নিয়তির মত অমোঘ পরিণাম-নির্দেশে এবং ভাষার নিরাবরণ মোহহীনতায় তাঁহার রচনার স্বাদই স্বতন্ত্র। এই সূক্ষ্মতা এবং বিরসতা স্বভাবতঃই তাঁহাকে জনপ্রিয়তায় উত্তীর্ণ করে নাই, কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের আধুনিকতার ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত নমস্য হইয়া থাকিবেন। তাঁহার 'জননী', 'ঠিকানায় বুধবার', 'পারাপার' এবং 'দিবসের শেষে' কয়েকটি বিশিষ্ট গল্প।

কয়লাখনি অঞ্চলের অপূর্ব অভিজ্ঞতার পাথেয় লইয়া, পল্লীজীবনের বিচিত্র মানব চরিত্রকে বিষয়বস্তু করিয়া প্রবল নবীনতায় শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যে পদক্ষেপ করিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রধানতঃ মনস্তত্ত্বকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, শৈলজানন্দ ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বস্তুতন্ত্রতাকেই তাঁহার উপজীব্য করিলেন। কয়লাকুঠির কুলি হইতে মধ্যবিত্ত-জীবন, বীরভূমের বৈরাগী বাউল হইতে কলিকাতার চাকুরিজীবী সবই তাঁহার ছোটগল্পের উপাদানরূপে দেখা দিল। 'কল্লোল' পত্রিকার সহিত যুক্ত হইয়া শৈলজানন্দ যেন আত্মপ্রকাশের আরও আনুকূল্য লাভ করিলেন। তাঁহার 'মা', 'অতি বড় বৃদ্ধপতি', 'নন্দিনী' এবং 'রাজপথের যাত্রী যারা' প্রভৃতি গল্পগুলি তাঁহার শক্তিমত্তায় উজ্জ্বল।

'কল্লোল' পত্রিকার নবীন বিদ্রোহীদের মধ্যে গল্পকার-রূপে সর্বপ্রধান প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ খ্রী—)। সম্ভবতঃ বাঙালী জীবিত গল্পকারদের মধ্যে তাঁহার নাম আজও সর্বাগ্রে। খ্যাতিমান কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পেও কাব্যের মাধুর্য ও কল্পনার বিস্তার ঘটাইলেন, অথচ তাহা সংযমের সীমা অতিক্রম করিল না। বাস্তবতা, মনস্তত্ত্ব, দুঃসাহসিকতা এবং কাব্যময়তা তাঁহার রচনায় অপূর্বভাবে সমন্বিত হইল, ছোটগল্পের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকার তিনিই বহন করিলেন। তাঁহার 'পুন্নাম', 'হয়তো', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'ভস্মশেষ', 'সহস্রাধিক দুই' এবং 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া আছে।

কল্লোলের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩ খ্রী -) প্রেমেন্দ্রের ন্যায় কবি ও ঔপন্যাসিক কিন্তু তাঁহার শক্তির দীপ্তিও সর্বোজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হইয়াছে ছোটগল্পে। অচিন্ত্যকুমার দুঃসাহসী লেখক, আঙ্গিক ও বিষয়ে প্রতিনিয়ত পরীক্ষাপরায়ণ, সরকারি কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল বাংলা দেশ ঘুরিয়া লোক-চরিত্রসম্পর্কে তিনি অসাধারণ অভিজ্ঞতার অধিকারী। তিনি একটি নিজস্ব অনবদ্য স্টাইলের অধিকারী। এই সকল কারণেই আজও তিনি বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম

ছোটগল্প, বাংলা

শীর্ষস্থানীয় লেখক। পরিণত বয়সেও তাঁহার ভাবময় সুতীব্র গল্পগুলির আকর্ষণ অসামান্য। তাঁহার কয়েকটি সার্থক ছোটগল্প. 'রুদ্রের আবির্ভাব', 'অরণ্য', 'ছুরি', 'ইতি', 'দাঙ্গা' ও 'প্রাসাদ-শিখর'।

বুদ্ধদেব বসুও (১৯০৮খ্রী—) 'কল্লোলগোষ্ঠী'র একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা বুদ্ধদেব আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ছোটগল্পেও নিজের স্থান নিশ্চিত করিয়া লইলেন। তাঁহার 'রজনী হলো উতলা' গল্পটি প্রকাশিত হইবামাত্র সুনীতি দুর্নীতির প্রশ্ন লইয়া প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক বুদ্ধদেব বুদ্ধিশাণিত এবং ব্যঞ্জনা গভীর স্বকীয়তায় এক নূতন ধরনের ছোটগল্প প্রবর্তন করিলেন। তাঁহার অনেকগুলি গল্পই বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী ঐশ্বর্য। কয়েকটির উল্লেখ করা হইল . 'নেশা', 'তুলসীগন্ধ', 'আমরা তিনজন' এবং 'মাস্টারমশাই'।

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪খ্রী—) উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-সাহিত্যেই সমধিক খ্যাতিমান হইলেও ব্যঙ্গশাণিত কিছু চমৎকার ছোটগল্পও লিখিয়াছেন। 'কল্লোলে'র সহিত তাঁহারও ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, পাশ্চাত্য মনন ও সত্যনিষ্ঠ নির্মোহ তীক্ষ্ণতা এই গল্পগুলিকে স্বয়ংদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার 'উপযাচিকা', 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া' এবং 'রূপদর্শন' উল্লেখযোগ্য রচনা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬ খ্রী) আর একটি প্রবল এবং বিদ্রোহী প্রতিভা। কল্লোলের সহিত তাঁহার যোগ না থাকিলেও মনোধর্মে তিনি ছিলেন কল্লোল ধারারই ঐতিহ্যবাহী। জগদীশ গুপ্তের নিষ্ঠুর বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণের তিনিই যোগ্যতম অধিকারী। তাঁহার গল্পে মানুষের আত্মিক অন্ধকার এবং বিচিত্র জটিলতা যেভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির পর্যায়ী। তাঁহার 'সরীসৃপ', 'মহাকালের জটার জট' 'শৈলজ-শিলা' বা 'আত্মহত্যার অধিকার' অনন্য-সাধারণ। দুরন্ত দস্যু ভিখুর জীবন চরিত যেভাবে তাঁহার 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে চিত্রিত হইয়াছে, বাংলা-সাহিত্যে দ্বিতীয় কোনও লেখকের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। মধ্যবিত্ত জীবন ও তাহার অসংগতির প্রতি সুতীব্র ঘৃণায় গণ-মানবের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিতে উত্তর জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্ক্‌সবাদে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্যাধি এবং দারিদ্র্যে তাঁহার জীবন অকালে খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু জীবনের শেষ পর্বেও তাঁহার প্রতিভায় চিহ্নিত হইয়াছে 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুল-পুরের যাত্রী' গল্প।

ইহারই পার্শ্বপ্রবাহে আরও যাঁহারা বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে 'পরশুরাম' অথবা রাজশেখর বসু (১৮৮০ ১৯৬০ খ্রী) অগ্রগণ্য। 'তিনি বাংলা কৌতুক গল্পের রবীন্দ্রনাথ' এইরূপ মন্তব্যই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত। অসাধারণ মনীষী, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক রাজশেখর ত্রৈলোক্যনাথ এবং প্রভাতকুমারের ধারায় কৌতুক এবং ব্যঙ্গগল্পে একাই বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার ভরিয়া দিয়াছেন। পরিমার্জিত কৌতুকে, চরিত্র-চিত্রণের নৈপুণ্যে এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে তিনি একাধারে বাঙালীর জেরোম কে জেরোম এবং ষ্টিফেন লিকক। 'ভুশণ্ডীর মাঠে', 'জাবালি', 'কচি-সংসদ', 'লম্বকর্ণ', 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'নীলতারা', 'বটেশ্বরীকুমার' এবং 'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট'-এর লেখক বহুকাল ধরিয়া বাঙালী পাঠকের সানন্দ কৃতজ্ঞতা দাবি করিবেন।

কৌতুক, ব্যঙ্গ এবং বিচিত্রমুখী গল্পধারায় আরও তিন জনকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিতে হয়। একজন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯২খ্রী -), দ্বিতীয় জন 'বনফুল' বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯খ্রী —) এবং তৃতীয় জন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯খ্রী -)। এই তিন জনের একই বৎসরে জন্ম, আবার ইহাদের মধ্যে প্রতিভার সাধর্ম্য সত্ত্বেও পার্থক্য অনেক।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের অনুগামী। পারিবারিক কাহিনীর মাধুর্য ও সৌন্দর্য তাঁহার গল্পে অপূর্ব স্নেহরসে সঞ্জীবিত হইয়াছে। 'রাণুর প্রথম ভাগ' এবং 'ননীচোরা'র সেন মশায়রা উচ্ছলিত। অন্য দিকে তাঁহার শিবপুরের গণেশ ঘোৎনা, গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত এবং কবি রাজেন বাংলা সাহিত্যে রসিক। 'বরযাত্রী' এবং 'পাকা দেখা'র উদ্ভাবিত রঙ্গরসের তুলনা হয় না। তাঁহার 'চৈতালি' নামে গভীর গল্পটিও আশ্চর্য সুন্দর। অপর শিল্পী বনফুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার আঙ্গিকে। অপরিমিত বাক্‌সংযম এবং স্বল্পতম আয়তনে কি অপূর্ব গল্প রচনা করা যায়, বাংলা-সাহিত্যে বনফুল তাহার দিগ্‌দর্শক। শাণিত ব্যঙ্গ তাঁহার প্রধান অবলম্বন, কখনও কখনও জগদীশ গুপ্ত এবং মানিকের মতই তিনি নিষ্ঠুর। এই প্রচণ্ড শক্তিমান লেখক পরিণত বয়সে আজও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অক্লান্ত - এখনও তিনি বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শীর্ষচারী। তাঁহার 'অর্জুন মণ্ডল', 'রায় মহাশয়', 'ব্রহ্মার খড়ম', 'তিলোত্তমা', 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' অসংখ্য উৎকৃষ্ট গল্পের কয়েকটি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার রঙ্গ ব্যঙ্গের কিছু গল্প লিখিয়াছেন, তাঁহার 'প্রাগ্‌-জ্যোতিষ', 'ভেনডেটা', 'কানু কহে রাই' তাহার নিদর্শন।

কিন্তু তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সম্ভবতঃ তাঁহার অতীতাশ্রয়ী রোম্যান্টিক গল্পে— 'মৃৎ-প্রদীপ' বা 'চুয়া-চন্দন' এক কথায় অপরূপ। শরদিন্দু বৈচিত্র্যের সন্ধানী ; তাঁহার গোয়েন্দাকাহিনীর ব্যোমকেশ বাঙালী কোনান ডয়েল, তাঁহার পারলৌকিক কাহিনীর বরদা আমাদের অতীন্দ্রিয়-লোকে উত্তীর্ণ করে।

ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮ খ্রী—) ছোটগল্পেও তাঁহার নিজস্ব দীপ্যমান। রাঢ়-বাংলার ঈর্ষাযোগ্য অভিজ্ঞতা, লোকচরিত্রে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রাকৃতিক পরিবেশ-রচনায় স্থিরচিত্র রচনার নৈপুণ্য, কখনও নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত মহাপরিণতির দার্শনিক বোধ, কখনও আশা এবং আদর্শে উজ্জ্বল তাঁহার ছোটগল্পগুলি আঙ্গিকে কিঞ্চিৎ বিবৃতিধর্মী হইয়াও প্রায়শঃ অসাধারণ শিল্পোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বাংলার অগ্রণী কথাকারের এই গল্পগুলির পরিচয় অনাবশ্যক, তথাপি কয়েকটির উল্লেখ করা হইল: 'নারী ও নাগিনী', 'অগ্রদানী', 'বেদেনী', 'ডাইনি', 'জলসাঘর', 'পৌষলক্ষ্মী' এবং 'ইমারত'.

'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র মৃত্যুঞ্জয়ী স্রষ্টা বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮৯৪ ১৯৫০ খ্রী) আর একজন অদ্বিতীয় গল্পকার। প্রকৃতিবিভোর বিভূতিভূষণের গল্পে পল্লী-বাংলার অকৃত্রিম সরল প্রকাশ, চরিত্রগুলি লেখকের অকৃত্রিম মমতা এবং অশ্রুধারায় অভিষিক্ত – তাহারা যেন বনপুষ্পের মতই উন্মীলিত, বিকশিত এবং নিমীলিত হইয়াছে। তাঁহার 'কিন্নরদল', 'পুঁইমাচা', 'মৌরীফুল', 'আপদ', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' অথবা 'ডাকগাড়ি' চিরায়ত সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে।

আরও তিন জন গল্পলেখকও বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা হইলেন যথাক্রমে: মনোজ বসু (১৯০১ খ্রী —), সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০২ খ্রী—) এবং প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭ খ্রী—)। মনোজ বসুও মুখ্যতঃ পল্লী-বাংলার লেখক, ভাষায় অনায়াস কৃতিত্বের অধিকারী, সরসতা ও বাক্-চাতুর্যে উজ্জ্বল, রোম্যান্টিক চেতনায় মধুর। 'নববধূ', 'রায়রায়ানের দেউল', 'মাধুর' এবং মন্বন্তরকালীন অসাধারণ গল্প 'নিমন্ত্রণ' তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম। সরোজকুমার বিভূতিভূষণের মতই সহজ ও অনাড়ম্বর অথচ মিতভাষিতা এবং ব্যঞ্জনায় গভীর। 'ম্যালেরিয়া', 'মৃত্যুর রূপ' এবং 'অকালবসন্ত' তাঁহার প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। প্রবোধকুমার মনোধর্মে অনেকখানি নাগরিক, তাঁহার রচনা প্রখর এবং গতিময়, আবেগে এবং নবীনতায় উদ্দীপিত। তাঁহার 'সিংহাসন' ও 'গুহায় নিহিত' চমৎকার গল্প, মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত 'অঙ্গার' যুগান্তকারী সৃষ্টি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাংলা-সাহিত্যে ছোটগল্পে আবার কিছু নূতন প্রতিভার পদক্ষেপ ঘটিল। ইঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান সুবোধ ঘোষ (১৯০৯ খ্রী —)। ইঁহারও বস্তুবৈচিত্র্য ব্যাপক— ইনিও এক অসাধারণ ভাষাশৈলী রচনা করিয়াছেন। সুবোধ ঘোষের গল্পগুলি যেন এক নিপুণ ভাস্করের হাতুড়ি-বাটালিতে ঋজু ও নির্ভুল রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি অসামান্য গল্প হইল. 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'বারবধূ' এবং 'তিন অধ্যায়'। তাঁহার 'ভারত প্রেমকথা'র গল্পগুলি বাংলা-সাহিত্যে এক নবীন সম্ভাবনাকে মুক্তি দিয়াছে।

কথনও কখনও মনে হয়, সম্ভবতঃ ছোটগল্পই বাঙালীর প্রতিভার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সেই প্রতিভা-সমুচ্চয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল না। তবে ইঁহারা ছাড়া আরও যাঁহারা ছোটগল্পের সাধনা করিয়াছেন এবং করিয়া চলিয়াছেন, যাঁহাদের স্বীকৃতি বাংলা-সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়াছে, এখানে তাঁহাদের কয়েকজনের নামোল্লেখ করা হইল:

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১ খ্রী), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (?—১৯৩১ খ্রী), অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮ খ্রী), শান্তা দেবী (১৮৯৪ খ্রী —), সীতা দেবী (১৮৯৫ খ্রী—), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪ খ্রী), রবীন্দ্র মৈত্র (১৮৯৬-১৯৩৩ খ্রী), পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭ খ্রী —), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২ খ্রী), প্রমথনাথ বিশী (১৯০২ খ্রী—), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪ খ্রী —), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫ খ্রী—), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ খ্রী —), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৯ খ্রী—), বিমল মিত্র (১৯১২ খ্রী —), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২ খ্রী—), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬ খ্রী —), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮ খ্রী —), বাণী রায় (১৯১৯ খ্রী —), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০ খ্রী—), ননী ভৌমিক (১৯২১ খ্রী—), সমরেশ বসু (১৯২১ খ্রী—), বিমল কর (১৯২১ খ্রী —); রমাপদ চৌধুরী (১৯২২ খ্রী —)।

ইহাদের অনেকের রচনাই এখনও পূর্ণতর বিকাশের অপেক্ষা রাখে। নূতনতর যে শক্তিমান সাহিত্যিকেরা বাংলা ছোটগল্পের আসরে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইতিহাস ভবিষ্যতেই রচিত হইবে।

দ্র শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, ১৯৪৭, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের

ইতিহাস, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২-১৯৫৮; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা-সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, কলিকাতা, ১৯৬২; শিশিরকুমার দাস, বাংলা ছোটগল্প, কলিকাতা, ১৯৬৩।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছোলা শিম্ব গোত্রের (ফ্যামিলি-লেগুমিনোসী, Leguminosae) অন্তর্ভুক্ত শিম্বি উপগোত্রীয় (সাব ফ্যামিলি-পাপিলিওনাসিঈ, Papilionaceae) দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী বহুশাখাযুক্ত বীরুৎ, বিজ্ঞানসম্মত নাম সিসের আরিয়েতিনম (*Cicer arietinum*)। যৌগ পত্রের (কম্পাউণ্ড লিফ) ফলকের প্রান্ত দাঁতের মত কাটা। ক্ষুদ্র ফুলে পাঁচটি যুক্ত বৃত্যংশ, পাঁচটি অযুক্ত প্রজাপতির ন্যায় পাপড়ি, দশটি পুংকেশর ও একটি গর্ভপত্র থাকে। ফল ২-২·৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ শুঁটি, শুঁটির ভিতর দুইটি বীজ বা ছোলা থাকে। সাধারণ ছোলার বীজত্বকের রঙ বাদামী, কাবুলি ছোলার বীজ অপেক্ষাকৃত বড় ও বীজত্বক প্রায় শাদা।

ছোলার উৎপত্তি সম্ভবতঃ দক্ষিণ ইওরোপে। বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকায় চাষ করা হয়। ভারতের প্রায় সকল উষ্ণ অঞ্চলে, বিশেষতঃ গুজরাত, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে রবিশস্যরূপে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এঁটেল বা দো-আঁশ মাটিতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ইহার বীজ বপন করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে শুঁটি ফাটিবার পূর্বে শস্য সংগ্রহ করা হয়। ত্বকমুক্ত বীজপত্রগুলি ছোলার ডাল নামে পরিচিত। ছোলা পুষ্টিকর খাদ্য; ইহাতে যথেষ্ট কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ভিটামিন বি থাকে। ছোলার অঙ্কুরে ভিটামিন ই পাওয়া যায়। 'ডাল' দ্র।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০, A. F. Hill, *Economic Botany*, New York, 1952.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ভারতে বৎসরে গড়ে ৯৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ছোলার চাষ করা হয় এবং প্রায় ৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন ছোলা উৎপন্ন হয়। মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ উত্তর ভারত হইতে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে হালকা দো-আঁশ জমিতে এবং দক্ষিণ ভারতে কালো মাটিতে ছোলার চাষ করা হয়। খরিফ শস্যের পর শীতকালে, কখনও বা অন্যান্য রবিশস্যের সঙ্গে, আবার কখনও আমন ধান কাটিবার মাসখানেক আগে সেই জমিতে ছোলার বীজ বপন করা হয়। জমি খুব বেশি কর্ষণের প্রয়োজন নাই। ছিটাইয়া বা লাঙ্গলের পিছনে বীজ বপন করা হয়। খুব বেশি খরার সময় দুই-একবার সেচ দিলে ফলন ভাল হয়।

ভারতে প্রধানতঃ কাঁচা, অঙ্কুরিত ও ভাজা ছোলা, ছোলার ডাল, ছাতু, বেসন প্রভৃতি খাওয়া হয়।

নীলমণি মিত্র

ছৌ বীরধর্মী লোকনৃত্য। পুরুলিয়ার ছৌ নাচে যতটুকু গান আছে তাহাতে ছত্রিশগড়ী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। 'ছউ', 'ছো' বা 'ছৌ' শব্দটি আসিয়াছে 'উৎসব' হইতে: 'উৎসব > উচ্ছব > উচ্ছউ > চ্ছউ > ছউ'। আবার অনেকের মতে 'ছুপই' (লুকানো) কথা হইতে 'ছউ' শব্দের উৎপত্তি। একদলের মতে এককালের উৎসব উপলক্ষে এই নাচ হয় বলিয়া এবং অন্য দলের মতে মুখসের আড়ালে মুখ লুকাইয়া নাচ হয় বলিয়া এই নৃত্যের নাম ছৌ। বাস্তবিক পক্ষে ছৌ নাচ উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে মুখসের ব্যবহার আছে।

প্রধানতঃ চৈত্র মাসের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত হইলেও সারা বছরই বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এই নাচ হইয়া থাকে। ছৌ নাচ বাদ্যনির্ভর। ঢাক-ঢোলের বোল ও ছন্দে নাচ চলে। পাদকর্ম জটিল কিন্তু গ্রীবাকর্ম বিশেষ লক্ষণীয় নয়। হাত ও অঙ্গচালনা স্বাভাবিক ক্রিয়াত্মক।

[illegible] লাহিড়ী

ছৌ নাচ ময়ূরভঞ্জ, সরাইকেলা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকনৃত্যের প্রকারভেদ। পৌরাণিক কাহিনীর পুনঃকথন, দেবচরিত্র চিত্রণ এই নৃত্যের বিষয়-বস্তু। জন্তু-জানোয়ার, দেব-দেবী, নাগরিক ও দৈত্য-দানব-চরিত্রের মুখসই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

দ্র মণি বর্ধন, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, কলিকাতা, ১৯৬১।

অশোকা সেনগুপ্ত

জগৎ প্রাণিগণের আশ্রয় বা অবলম্বনরূপে অনুভূত সমুদয় পদার্থই এককথায় বিশ্ব, জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়। এই সুবিশাল পৃথিবী ও তদ্গত অনন্ত বিস্ময়কর বস্তুনিচয় সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও ইহার রহস্য সুদুর্জ্ঞেয়। এই বিশ্বসম্বন্ধে অনেক রহস্য বেদ-পুরাণ প্রভৃতিতে উল্লিখিত থাকিলেও সেই সকলের তথ্য অবধারণ করা দুঃসাধ্য, কারণ অনেক স্থলে বর্ণনার বিরোধও দেখা যায়।

স্থূল দৃষ্টিতে এই বিশ্বকে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুরূপে অনুভব করা যায়। চার্বাক প্রভৃতি দার্শনিকগণ (নাস্তিক) জগৎকে এই ভূতচতুষ্টয়েই পর্যবসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই চিন্তাধারা যে প্রত্যক্ষমাত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রসূত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। বেদ-পুরাণ প্রভৃতিতে জগৎ বিষয়ে যে সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের উপদেশ আছে সেই সকলের সমন্বয় সাধন করিয়া বেদবাদী দার্শনিকগণ আনুভবিক করিবার জন্য প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন, এইরূপ ছয়টি প্রধান দার্শনিক ধারাকে পূর্ব ও উত্তর অঙ্গরূপে তিনটি প্রস্থান বলা যাইতে পারে। যথা সাংখ্য-যোগ, বৈশেষিক-ন্যায় ও মীমাংসা-বেদান্ত। এই প্রস্থানত্রয়ের পূর্বাঙ্গে জগতের স্থূলরূপ এবং উত্তরাঙ্গে সূক্ষ্মরূপ বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই স্থূল বিষয়ের বিবরণও চার্বাক প্রভৃতির চিন্তাধারাকে অতিক্রম করিয়াছে।

জগৎসম্বন্ধে সাংখ্যমত এই যে, দৃশ্যমান বিশ্ব মূলতঃ চেতন ও জড়েরই বিলাস। এইমতে চেতনকে পুরুষ ও জড়কে প্রকৃতি বলা হয়। স্থূল পঞ্চভূতের কারণরূপে ভৌতিক গুণের অনুসারী রূপ-তন্মাত্র প্রভৃতি পাঁচটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়, কিন্তু জড় বস্তুতে জ্ঞান ও ক্রিয়া উপলব্ধি করণ। চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও ইহাদের অধিপতি মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ও স্বীকৃত হয়, ফলতঃ স্থূলের অভ্যন্তরে এই ষোড়শ পদার্থ স্বীকৃত হয়। ইহাদের কারণরূপে মূলে একটি অহংকারতত্ত্ব স্বীকৃত হয়। ইহাই চেতন ও জড়ের গ্রন্থিস্বরূপ ও এই বিশ্বের মূল কারণ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রকৃতি জড় বলিয়া ক্রিয়াশীল হইতে পারে না, পক্ষান্তরে পুরুষ চেতন বলিয়া ক্রিয়াসমর্থ হইলেও স্বতন্ত্র হওয়ায় সৃষ্টিকার্যে অসমর্থ, এইজন্যই 'পঙ্গু ও অন্ধ' রীতিতে জড় ও চেতনের সম্বন্ধে এই বিশ্বসৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব থাকায় ইহাদের সংসর্গ দুর্ঘট বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের একটি অবাস্তব সংসর্গের কথা বলা হয়, চেতন পুরুষ ভোগসম্পাদনের জন্য জড় প্রকৃতিকে ঈক্ষণ (অবলোকন) করিলে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির গুণক্ষোভ অর্থাৎ গুণসাম্যের বিচ্যুতি ঘটে। প্রকৃতির এইরূপে প্রথম সৃষ্ট সত্ত্বপ্রধান পরিণামকে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব বলা হয়, সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় প্রকাশধর্মী বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্বপাত হয়, ফলে প্রকৃতিগত প্রতিবিম্বে পুরুষ 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' বলিয়া অভিমান করে বলিয়াই সৃষ্ট অহংকারতত্ত্ব জগৎসৃষ্টিতে সক্ষম হয়। ইহা হইতে ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তি পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' গ্রন্থে জগৎসৃষ্টির এই সকল তথ্য প্রামাণিকভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

যোগদর্শনে ইহার উপরের অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্বের রহস্য বিবৃত হইয়াছে। স্থূল জগৎসম্বন্ধে যোগদর্শনে বিশেষ কিছু উল্লিখিত না থাকিলেও সমানতন্ত্র সিদ্ধান্ত হিসাবে সাংখ্যসিদ্ধান্ত অনভিমত নহে। ফলতঃ এই প্রস্থানে জগতের জড়াংশ সাংখ্যে এবং চেতনাংশ যোগে বিবৃত হইয়াছে।

বৈশেষিকগণ জগৎকে ছয়টি পদার্থে বিভাগ করিয়া সমুদয়কে প্রমাণপূর্বক বিবৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বৈশেষিকোক্ত সিদ্ধান্তই ভারতীয়গণের জীবনে ও সংস্কৃতিতে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বৈশেষিকে ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং বিশেষ নামক পরমাণুর ব্যাবর্তক একটি পদার্থ স্বীকারপূর্বক এই জগতের বৈচিত্র্যের কারণতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এই বিশেষ পদার্থ স্বীকার করার দরুনই বৈশেষিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৈশেষিক শাস্ত্রও স্থূল জগতের আগাগোড়া বিশ্লেষণে প্রতিপাদন করিয়া ন্যায়ের সর্বাঙ্গ সাধিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনে জ্ঞানের বস্তুগত বিশ্লেষণও বিবৃত হইয়াছে।

মীমাংসকগণের মতে এই জগতের ব্যক্তিবিশেষের উৎপাদ বিনাশ ঘটিলেও বিশ্বের উৎপাদ বা বিনাশ নাই, তাহা হইলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের ক্রমভঙ্গ ঘটে। অতএব মহাপ্রলয় বা বিশ্বধ্বংস মীমাংসকমতে স্বীকৃত নহে। উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত পূর্বোক্ত নীতি অনুসারে জ্ঞানবিচারে পর্যবসিত। তবে এই অন্তিম প্রস্থানটিতে বেদার্থ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট পদার্থেরই অনিত্যতা এবং নিত্যতার তথ্য বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শব্দ প্রমাণেরই প্রাধান্য এবং তাহার বিশেষ বিবরণ আছে।

রা. ব.

চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈত বেদান্ত পর্যন্ত প্রতিটি ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ে জগৎসম্বন্ধে আলোচনা আছে।

চার্বাকমতে কার্যকারণ শৃঙ্খলা স্বীকৃত হয় নাই। দ্রব্যের গুণাগুণ স্বভাব-জাত এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চারিটি ভূতই তত্ত্ব হিসাবে চার্বাকমতে স্বীকৃত। ব্যোমের অস্তিত্ব এই মতবাদে স্বীকৃত হয় নাই। পূর্বোক্ত চারিটি ভূতের সংমিশ্রণে জগৎ-এর সবকিছুর উৎপত্তি হয়। রূপ, রস, গন্ধাত্মক জগতের পশ্চাতে কোনও চেতন-সত্তা

চার্বাক সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। জড় উপাদান হইতে জগতের উৎপত্তি এবং জড় উপাদানেই ইহার বিলুপ্তি।

জৈনমতে জগতের নিমিত্ত বা উপাদান-কারণ হিসাবে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। জড় জগৎ জৈনমতে অ-জীব। জীবভিন্ন সবকিছুই অজীব বা জড়। ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্‌গল সবই অজীব— এক হিসাবে ইহাদের দ্রব্য বলা যায়। অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম দ্রব্য অণু, অণু একত্রে যুক্ত হইয়া স্কন্দের সৃষ্টি করে। এইভাবে জৈনেরা জগতের ব্যাখ্যা করেন। জগৎসৃষ্টি-ব্যাপারে জৈনেরা জড়বাদী।

মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে বৌদ্ধদের ভাবনা-চতুষ্টয়-এর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদের জগৎ-সম্পর্কে ধারণা ও ভাবনা-চতুষ্টয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এক বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে আমরা বাস করি এবং সাধারণতঃ ইহাকেই আমরা জগৎ বলি। জগতের ধারণা বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিকট এক নয়। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, বৈভাষিক সম্প্রদায় সর্বাস্তিত্ববাদী, ইহাদের মতে বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষগম্য এবং উহা ঠিক যেমন, আমরা ঠিক তেমনই জানি। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় বাহ্যানুমেয়বাদী, তাহাদের বাহ্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে এবং তাহা হইতে আমরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করি। উভয় মতবাদানুসারে অনুভূতির বিষয়টি পৃথক ও একক— কোনও জাতির অন্তর্গত নয় — 'স্বলক্ষণ'।

যোগাচার সম্প্রদায়মতে বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, বাহ্য-জগৎ অলীক— 'বিজ্ঞান' প্রসূত সৃষ্টিমাত্র। ইহাকে বিজ্ঞানবাদ বলিয়াও অভিহিত করা হয়। এই মতবাদে 'বিজ্ঞান'-ই একমাত্র সৎ পদার্থ।

মাধ্যমিক সম্প্রদায়মতে সবই শূন্য (সর্বং শূন্যং), জগৎ নাই, আত্মা নাই— যাহা কিছু প্রত্যক্ষগম্য সবই অলীক, কাল্পনিক প্রবাহমাত্র।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে বৌদ্ধমতে শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রমেয় জগৎ বলিয়া কোনও কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

ন্যায়-বৈশেষিকমতে পরমাণু হইতে স্থূল পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। পরমাণু নিত্য পদার্থ, সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ। তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ দুইটি পরমাণুর সংযোগ হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। তিনটি দ্ব্যণুক-সংযোগে ত্রসরেণুর উদ্ভব হয়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্যের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। এক-একটি খণ্ড প্রলয়ের পরে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও জীবগণের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুদ্বয়ের সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া পরমাণুতেই জন্মে এবং পরমাণু-সকল পরস্পর সংযুক্ত হইতে থাকে এবং ক্রমে স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়। ন্যায় ও বৈশেষিক সমতন্ত্র, ফলে পৃথক আলোচনা করা হইল না।

সাংখ্য-যোগমতবাদে জগতের মূল উপাদান হইল অব্যক্ত প্রকৃতি— সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। ইহা অচল ও নিষ্ক্রিয়। অবস্থাবিশেষে প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে আসে এবং সক্রিয় হইয়া ওঠে, ফলে এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সাংখ্যে স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়সকল : বল্লভের (শুদ্ধাদ্বৈত) মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ-পরিণাম। এই মতবাদের সাহায্যে তিনি জগৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন— কার্য কারণসম্বন্ধযুক্ত।

নিম্বার্ক (দ্বৈতাদ্বৈত) মতে জগৎতত্ত্ব অচিৎতত্ত্ব। অচিৎ ত্রিবিধ : ১. প্রাকৃত বা জড় - ইহার মূলে আছে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ২. অপ্রাকৃত বা ব্রহ্মলোক এবং ৩ কাল। এই সবই অচিৎতত্ত্ব ও জগতের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্ব (দ্বৈত) মতে জগৎ বিষ্ণুর সৃজনী শক্তির প্রকাশ ও তাঁহার সর্ব-কর্তৃত্বের বিকাশ। বিভিন্ন বস্তু ও চেতন আত্মা লইয়া জগৎ গঠিত। জগৎ ঈশ্বরের অধীন — ঈশ্বর নিজে ক্রিয়া করেন ও অপরকে করান তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি।

রামানুজ (বিশিষ্টাদ্বৈত) মতানুসারে শূন্য হইতে জগৎ-সৃষ্টি হয় নাই, সৃষ্টি হইল অব্যক্তাবস্থা বাস্তবে প্রকাশিত হওয়া। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর নাম রূপহীন এক ও অভেদ। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করেন এবং অন্তঃস্থ সৃষ্টিপ্রেরণায় নাম রূপাত্মক জগতে পরিণত হইয়া থাকেন। রামানুজ-মতে এই সু-শৃঙ্খল বিশ্ব-জগৎ জড় ও নৈতিক নিয়মের অধীন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় চালিত। সৃষ্টি ও সংহার চক্রবৎ চলিতেছে। জীবের মুক্তি সমগ্র সংসারচক্রের উদ্দেশ্য।

শাঙ্কর বেদান্ত (অদ্বৈত) মতে মায়া বা প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ নয়, ইহা ব্রহ্মাশ্রিত। এই মতবাদে ঈশ্বরকে কখনও কখনও জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ বলা হইয়া থাকে, কারণ ঈশ্বর তাঁহার মায়া-শক্তির প্রভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন ও চালনা করেন। অদ্বৈত-বেদান্তমতে জগৎ পূর্ণ সৎ নহে, আবার অ-সৎও নহে; সদসদ্-বিলক্ষণ, ইহার ব্যাবহারিক সত্তা আছে। এই ব্যাবহারিক

সত্তা পারমার্থিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা অনির্বচনীয়, মায়িক ও মিথ্যাভূত। এই মতবাদে ব্রহ্মকে বাদ দিলে জগতের কোনও অস্তিত্ব থাকে না, কারণ জগৎ ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল, ব্রহ্ম জগতের উপর নির্ভরশীল নহে। ব্রহ্মকে বাদ দিলে জগতের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। শংকরমতে জগৎ স্বপ্নাদিবৎ নহে, জগৎ নিয়মের অধীন ও কতকগুলি ঘটনাসমবায়ের সুসংহত রূপ। দেশ, কাল ও কারণের সংযুক্ত প্রভাব ঐ সকল ঘটনার পশ্চাতে আছে।

শৈব ও শাক্ততন্ত্রমতে অধ্যাত্ম মুক্তির পক্ষে অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বীর শৈব দার্শনিকেরা স্থলকে জগতের মূল কারণ ও আধার বলিয়া স্বীকার করেন। সমস্ত জাগতিক ক্রমবিকাশের মূলে আছে স্থলের ধারণা। প্রাত্যক্ষিক জগৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ শাশ্বত সংবিদ্ বা স্থলের অপূর্ণ কালিক প্রকাশ।

কাশ্মীর শৈববাদ অনুসারে প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ও পরিকল্পনা বিদ্যমান, বিশ্বাত্মার ইচ্ছারূপ বৈশিষ্ট্যের স্থূল অভিব্যক্তি হইতে বিশ্বের প্রকাশ।

শৈব সিদ্ধান্তীদের মতে মায়া এই জগতের উপাদান কারণ, জগৎ জড় বা অচিৎ। বিবর্তনের ধারা দ্বিবিধ — শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ মায়া হইতে পাঁচটি শুদ্ধ তত্ত্ব ও অশুদ্ধ মায়া হইতে অবশিষ্ট তত্ত্বসকল সৃষ্ট হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে চিত্ত ও বুদ্ধি উদ্ভূত হয়, বুদ্ধি হইতে অহংকার, তৈজস অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল ও মন এবং বৈকৃত অহংকার হইতে কর্মেন্দ্রিয়সকল এবং ভূতাদি হইতে তন্মাত্রসকল সৃষ্ট হয়, সিদ্ধান্তীদের সৃষ্টিপরিকল্পনায় ছত্রিশটি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

ভারতীয় চিন্তাধারায় দৃশ্যমান ভোগ্য জগতের ধারণার সহিত কর্মবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত। এখানে বিশ্ব-জগৎকে নৈতিক বলা হইয়াছে। জীব তাহার কর্মানুসারে দেহ, ইন্দ্রিয়াদি, পরিবেশ ও ভোগ্য দ্রব্য লাভ করে ও সংসার-আবর্তে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঈশ্বর জীবের কর্মফল ভোগের জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেন। দেশ ও কালের দিক দিয়া এই জগৎ অনাদি। বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মাণ্ড বলিতে চতুর্দশ লোকের কথা বলা আছে, ভূতল ইহাদের মধ্যে একটি। ইহাদের ব্যবধান কোটি কোটি যোজন এবং লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া এই বিশ্ব-জগৎ।

মনোরঞ্জন বসু

জগৎশেঠ উপাধিবিশেষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুর্শিদাবাদে শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের ফতেচাঁদ নামক এক শ্রেষ্ঠী দিল্লীর বাদশাহ্ কর্তৃক এই বংশানুক্রমিক উপাধিতে ভূষিত হইবার ফলে উক্ত পরিবারের সকলেই 'জগৎশেঠ' নামে পরিচিত হইতে থাকেন। বাংলার মসনদ লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল কূট চক্রান্ত ও যুদ্ধাদি চলে এই বংশের কয়েকজন উপর্যুপরি সেগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জগৎশেঠ নামটি প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহাদের আদি পুরুষ হীরানন্দ রাজস্থান হইতে পাটনায় আসিয়া মহাজনী কারবার করিয়া অর্থশালী হইয়া ওঠেন এবং বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ের কুঠি স্থাপন করেন। তাঁহার ৭টি পুত্রের কনিষ্ঠ মানিকচাঁদ উত্তরাধিকার সূত্রে ঢাকার কুঠির মালিক হন। তিনি মুর্শিদাবাদে গদি স্থাপিত করেন। মুর্শিদাবাদে স্থাপিত সরকারি টাঁকশালটির সুপরিচালনা করিয়া এবং রোকার মারফত তাঁহাদের দিল্লীর কুঠি হইতে বাংলার রাজস্ব বাদশাহের কোষাগারে জমা দিবার সহজ পন্থা প্রবর্তন করিয়া তিনি অধিক সমৃদ্ধ হইয়া ওঠেন। শেষে বাংলা সুবার সরকারি কোষাধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান মানিকচাঁদের মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র ফতেচাঁদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইনি মুর্শিদকুলী খাঁর আস্থাভাজন মন্ত্রণাদাতা হইয়া ওঠেন। ফলে এই নবাবই দিল্লীর বাদশাহের নিকট সুপারিশ করিয়া তাঁহাকে বংশানুক্রমিক জগৎশেঠ খেতাব আনাইয়া দেন। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীন খাঁরও তিনি আস্থাভাজন ও অন্যতম মন্ত্রণাদাতা হন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হন। সরফরাজের কার্যকলাপে বিরক্ত হইয়া যে কয়জন তাঁহার স্থলে আলীবর্দী খাঁকে বাংলার নবাব পদে বসাইবার ষড়যন্ত্র করেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফতেচাঁদ জগৎশেঠ। নবাব হইয়া আলীবর্দীকে প্রথমে ওড়িশা ও বিহারের আফগানদের দৌরাত্ম্য এবং পরে বর্গীর হাঙ্গামা প্রভৃতি লইয়া বিশেষ বিব্রত থাকিতে হয়। এ সময়ে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ অর্থ যোগাইয়া ও সুপরামর্শ দিয়া সর্বপ্রকারে তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর না হইলে তাঁহার পক্ষে রাজ্য রক্ষা করা কিংবা সুশাসনে রাখা সম্ভব হইত না। একবার আলীবর্দীর অনুপস্থিতিতে বর্গীরা রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহর লুণ্ঠন করে এবং শেঠদের গদি হইতে নগদ দুই কোটি আকট মুদ্রা লুঠ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও জগৎশেঠের ব্যবসায় চালাইতে বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় নাই। ইহার পরেও তাঁহারা প্রতি বছর এক কোটি টাকা নবাব-সরকারে উপহার দিতেন। ইহাদের অগাধ বিত্তের পরিমাণ বুঝাইতে বলা হইত যে, ইহারা নগদ টাকার স্তূপে সূতীতে গঙ্গার মোহানায় বাঁধ

বাঁধাইয়া দিতে পারেন। ১৭৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে ফতেচাঁদের মৃত্যু হইলে তাঁহার পৌত্র (মৃত আনন্দীরামের পুত্র) মহাতাবচাঁদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইনিও আলীবর্দীর একজন বিশ্বাসী পরামর্শদাতা ছিলেন এবং পিতামহের ন্যায় ইনিও তাঁহাকে প্রয়োজনানুসারে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন, কিন্তু ইংরেজ বণিকগণের সহিত ইঁহার হৃদ্যতা ঘটে এবং বাংলা দেশে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা-স্থাপনে ইঁহার চক্রান্ত বিশেষ কার্যকর হয়। আলীবর্দীর জীবিতকালেই তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজের বাংলার মসনদ প্রাপ্তির বিরুদ্ধে যে গোষ্ঠী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, মহাতাবচাঁদ তাহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর মীর জাফর ও ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদকেই আশ্রয় করিয়া সিরাজকে সিংহাসন হইতে অপসারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সিরাজের স্থলে মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার রাজকার্যের প্রয়োজনে অর্থ-সরবরাহ করিলেও নিজের প্রয়োজনে মীর জাফরের পতনে সহায়তা করিতে মহাতাবচাঁদ পশ্চাৎপদ হন নাই। মীর জাফরের স্থলে মীর কাশিম নবাব হইলে মহাতাবচাঁদ তাঁহার সহিত যে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ মীর কাশিমের ইংরেজ-বিরোধিতা। নবাবের সন্দেহ হওয়ায় ইংরেজদের সহিত মহাতাবচাঁদের যোগাযোগ রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মীর কাশিম তাঁহাকে মুঙ্গের দুর্গে আটক করিয়া রাখেন। পরে গিরিয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইয়া মীর কাশিম যখন সপরিবারে মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া যান তখন তাঁহার আদেশে অন্যান্য বন্দীদের সহিত মহাতাবচাঁদকেও গলায় বালির বস্তা বাঁধিয়া দুর্গপ্রাকার হইতে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া ডুবাইয়া মারা হয়। এই সময় হইতেই জগৎশেঠ বংশ দিন দিন হীনগৌরব হইতে থাকে। মহাতাবচাঁদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে শ্রীভ্রষ্ট হরকচাঁদ ও ইন্দ্রচাঁদ নামে আরও দুই জন জগৎশেঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদের বিশাল প্রাসাদ ও কীর্তিগুলি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। তবে পরেশনাথ তীর্থে ইঁহাদের নির্মিত কয়েকটি মন্দির এখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দ্র নিখিলনাথ রায়, জগৎশেঠ, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

জগদানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার-ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন হইতে পঞ্চম অধস্তন পুরুষ নিত্যানন্দ জগদানন্দের পিতা। ইনি বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকটস্থ জোফলাই গ্রামে বাস করিতেন। জগদানন্দের অনুপ্রাস-যুক্ত ললিত-মধুর পদগুলি কীর্তনের গায়ক ও শ্রোতাদের খুব প্রিয়। ইনি হরেকৃষ্ণ নাম লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমা-সূচক পদরচনায় অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস নাথ এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ধীরানন্দ ঠাকুর জগদানন্দের পদাবলী এবং অন্যান্য রচনা প্রকাশ করেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩ খ্রী) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর, ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ৩ আশ্বিন, কৃষ্ণনগরে জন্ম। তাঁহার পিতার নাম অভয়ানন্দ রায়। স্থানীয় স্কুল এবং কলেজে পাঠ সমাপ্ত করার পর তিনি কিছুকাল গড়াই-এর মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং পর্যবেক্ষণক্ষমতা তাঁহার সহজাত ছিল। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাময়িক পত্রাদিতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রেই 'সাধনা'র (প্রথম প্রকাশ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ) সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। প্রথমে কবির শিলাইদহের জমিদারিতে এবং পরে তাঁহার পুত্রকন্যাদের জন্য স্থাপিত গৃহবিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকরূপে কাজ করার পর তিনি কবির আহ্বানে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে তাঁহার অন্যতম সহযোগীরূপে যোগদান করেন (১৯০১ খ্রী)। শিক্ষকরূপে তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা ছিল।

অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জন্য সরল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনায় তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এ ক্ষেত্রে তাঁহার আদর্শ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), 'প্রাকৃতিকী', 'বৈজ্ঞানিকী', 'গ্রহ-নক্ষত্র', 'গাছপালা', 'পোকামাকড়', 'পাখী', 'বাংলার পাখী', 'শব্দ'। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের নৈহাটি অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) নির্বাচিত হন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তিনি প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুন শান্তিনিকেতনে তাঁহার দেহাবসান হয়।

দ্র মনোরঞ্জন চৌধুরী, 'অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়', সুপ্রভাত, মাঘ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

অমিয়কুমার সেন

জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৬ খ্রী) জন্ম ৪ কার্তিক ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, ২১ অক্টোবর ১৮৬৮ খ্রী ; মৃত্যু ২১ পৌষ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ জানুয়ারি ১৯২৬ খ্রী। পিতা শ্রীনাথ রায়। জগদিন্দ্রনাথের পূর্বনাম ব্রজনাথ, শৈশবেই তিনি নাটোরের মহারাজ গোবিন্দনাথের পত্নী ব্রজসুন্দরী কর্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন।

তরুণ বয়সেই মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ দেশের প্রাগ্রসর রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত নির্ভয়ে ও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হইয়া বাংলার ভূম্যধিকারীসমাজে দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন এবং ১৯০৩ সালে এই সম্মিলনীর বহরমপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯০১ সালে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে বৃত হন।

জগদিন্দ্রনাথের পরিশীলিত মনের ঔৎসুক্য কেবল রাজনীতির আয়তনে সীমাবদ্ধ ছিল না, সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে তাহা প্রকাশবান্ ছিল। গীতবাদ্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন, ক্রীড়াপটু ও ক্রীড়ামোদীরূপে তিনি গণনীয় ছিলেন, দেশীয় খেলোয়াড়দের সমবায়ে গঠিত তাঁহার নাটোর ক্রিকেটদল একদা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সর্বোপরি তাঁহার অনুরাগ লক্ষণীয় ছিল সাহিত্য পাঠে ও রচনায়। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। সংস্কৃতশব্দবহুল ঝংকারময় গদ্য তাঁহার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল— তাঁহার 'নূরজাহান' গ্রন্থ (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) এই রীতির নিদর্শন। তিনি কবিতাও রচনা করিতেন, 'সন্ধ্যাতারা' (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। সাময়িক পত্রে মুদ্রিত তাঁহার বহু রচনা গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত আছে।

১৩২০ বঙ্গাব্দে 'মানসী' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ হইতে তিনি উহার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন ; ১৩২২ বঙ্গাব্দে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহযোগে 'মর্মবাণী' সাপ্তাহিকপত্র সম্পাদন করেন, কিছুকাল পরে 'মর্মবাণী' 'মানসী'র সহিত যুক্ত হয়। ১৩২২ বঙ্গাব্দ হইতে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে আমৃত্যু তিনি 'মানসী ও মর্মবাণী'র সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-সংবর্ধনায় প্রধান উদ্যোগীদের তিনি অন্যতম ছিলেন, উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে (১৩২০ বঙ্গাব্দ) ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মুনশীগঞ্জ অধিবেশনে (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) তিনি সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন।

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জগদিন্দ্র-বিয়োগে', মানসী ও মর্মবাণী, মাঘ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ , রমাকান্ত ভট্টাচার্য, 'জগদিন্দ্র-জীবন-পঞ্জী', মানসী ও মর্মবাণী, শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ , মানসী ও মর্মবাণী, মাঘ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ ও ফাল্গুন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ , হারাধন দত্ত, 'বিস্মৃত সাহিত্যসাধক জগদিন্দ্রনাথ রায়', উত্তরা, ভাদ্র, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

পুলিনবিহারী সেন

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭ খ্রী) ছোটগল্প-লেখক এবং ঔপন্যাসিক। জগদীশচন্দ্র ফরিদপুর জেলার খোর্দ-মেঘচামী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ইঁহার জন্ম কুষ্টিয়ায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। পিতা কৈলাসচন্দ্র, মাতা সৌদামিনী , শিক্ষা কলিকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুলে এবং রিপন কলেজে , বীরভূম জেলার সিউড়িতে জজ-আদালতের টাইপিস্টরূপে তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত। তিনি বোলপুর আদালতে দীর্ঘকাল কাজ করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মূলতঃ কথা-সাহিত্যিকরূপে পরিচিত হইলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবি হিসাবেই জগদীশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটে — 'অক্ষরা' (১৯৩২ খ্রী) তাঁহার কবিতার বই। তাঁহার প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট' 'বিজলী'-তে (২৯ ফাল্গুন, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের 'কালিকলমে' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) তাঁহার ৯টি গল্প, পরে 'কল্লোল' এবং 'বঙ্গবাণী'তেও কয়েকটি গল্প বাহির হইয়াছিল। 'বিনোদিনী' (পৌষ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) তাঁহার প্রথম গল্প-সংকলন, অপর গল্পের বই 'রূপের বাহিরে' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), 'উদয়লেখা' (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (বৈশাখ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ), 'মেঘাবৃত অশনি' (পৌষ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯ খ্রী), 'লঘুগুরু', 'দুলালের দোলা' (১৯৩১ খ্রী), 'নিষেধের পটভূমিকায়' (আষাঢ়, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। জগদীশচন্দ্রের জীবনচেতনা এবং রচনাভঙ্গীর তীক্ষ্ণ ও অভিনব বৈশিষ্ট্য সমকালীন সাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। নিষ্ঠুর দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্টের আঘাত-চেতনায়, মানবজীবনের বাস্তব স্বরূপ-উন্মোচনে এবং প্রকাশকলার প্রযত্ননিষ্ঠ নৈপুণ্যে তাঁহার রচনা স্বাতন্ত্র্যোজ্জ্বল।

দ্র জগদীশ গুপ্ত, 'ভূমিকা', স্বনির্বাচিত গল্প, কলিকাতা, ১৮৮১ শকাব্দ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লঘুগুরু', পরিচয়,

কার্তিক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য-বিতান, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, 'জগদীশ গুপ্ত পরিচিতি', জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ; জগদীশ গুপ্তের পত্রগুচ্ছ, বিংশ শতাব্দী, আষাঢ়-কার্তিক, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, বর্ধমান, ১৯৫৮।

নারায়ণচন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭ খ্রী) প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্ ও জীববিজ্ঞানী। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর পূর্ব বঙ্গের মৈমনসিংহে জন্ম। জগদীশচন্দ্র প্রথমে ফরিদপুরের গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ও পরে কলিকাতায় (১৮৭০-৮০ খ্রী) সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন ও ঐ বৎসরেই ইংল্যাণ্ড-যাত্রা করেন। বিলাতে শিক্ষাকাল ১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। জগদীশচন্দ্র কেম্‌ব্রিজ হইতে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি. এ. ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস্‌সি. পাশ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের ডি. এসসি. উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'এমেরিটাস' অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণাবলীকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে:

প্রথম পর্যায়ে (১৮৯৫-৯৯ খ্রী) বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গসম্বন্ধে গবেষণা। ক্ষুদ্র মৌলিক যন্ত্র তৈয়ারি করিয়া জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেন যে, তৎসৃষ্ট ২·৫ হইতে ০·৫ সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গে দৃশ্য-আলোকের সকল ধর্মই বিদ্যমান। এই যন্ত্রটি জে. জে. টমাস কর্তৃক 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বিটানিকা' (নবম সংস্করণ) গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে পোয়াঁকারে (H. Poincare)-রচিত পুস্তকেও ইহা বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯০০-০২ খ্রী) জগদীশচন্দ্র জৈব ও অজৈব পদার্থে উত্তেজনার ফলে সাড়ার সমতার বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পারীতে (প্যারিস) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার বিষয় ছিল 'জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনাপ্রসূত বৈদ্যুতিক সাড়ার সমতা'। একই বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-সংস্থায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সকল গবেষণার বিষয় তাঁহার 'রেস্‌পন্‌সেস ইন দি লিভিং অ্যাণ্ড নন্‌-লিভিং' (১৯০২ খ্রী) পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'কম্‌প্যারেটিভ ইলেক্‌ট্রোফিজিওলজি' (১৯০৭ খ্রী) নামক পুস্তকে ধাতু এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশী লইয়া সমশ্রেণীর বহু পরীক্ষার বর্ণনা দিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় ঐ তিনজাতীয় পদার্থ একইরূপ সাড়া দেয়। সম্ভবতঃ তিনিই মানুষের স্মৃতিশক্তির প্রথম অজৈব মডেল বা যান্ত্রিক নমুনা তৈয়ারি করেন। পরবর্তী কালে বহুবিধ ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রপাতি (যথা রেডার যন্ত্র, ইলেকট্রনিক হিসাব যন্ত্র বা কম্‌পিউটার ইত্যাদি)-র সাহায্যে মানুষের ঐচ্ছিক কার্যাবলীর অনুকরণ করা হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের অনুরূপ পরীক্ষাগুলিকে তাহাদের অগ্রদূত বলা চলে।

তৃতীয় পর্যায়ে (১৯০৩-৩২ খ্রী) জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশীর মধ্যে তুলনামূলক শারীরবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন।

জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বস্তু হিসাবে উদ্ভিদের উপর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উত্তেজনার ফলাফলসম্বন্ধে তিনি বিশদ গবেষণা শুরু করেন। প্রাকৃতিক উত্তেজনার মধ্যে তাপ, আলোক ও মাধ্যাকর্ষণের ফলাফল এবং কৃত্রিম উত্তেজনার মধ্যে বৈদ্যুতিক ও তাপীয় আঘাত তাঁহার পর্যালোচনার বিষয় ছিল। সূক্ষ্মতম সঞ্চালনকে বহুগুণ বর্ধিত করিয়া দেখিবার যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ-এর দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন, তথাকথিত অনুত্তেজনীয় উদ্ভিদও বৈদ্যুতিক আঘাতে কুঞ্চিত হইয়া সাড়া দেয়।

উত্তেজনক্ষম উদ্ভিদ লজ্জাবতীর ব্যবহারের দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার সমতা বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রমাণ করা যায়। লজ্জাবতীর পাতা অথবা শাখার যে কোনও স্থলে বৈদ্যুতিক আঘাত করিলে দূরবর্তী বৃন্তগ্রন্থিসমূহে কুঞ্চন ঘটিয়া পত্রযুক্ত বৃন্ত আনত হইয়া পড়ে। প্রাণী-দেহের পেশী-সংযুক্ত তন্তু বিদ্যুৎশক্তি, উত্তাপ অথবা রাসায়নিক দ্রব্য-প্রয়োগে উত্তেজিত করা হইলে পেশীর যে সংকোচন ঘটে, জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন যে, তাহার সহিত লজ্জাবতীর ঐ ব্যবহারের তুলনা করা চলে। বনচাড়াল দেসমোদিয়ম গীরান্‌স (*Desmodium gyrans*) নামক উদ্ভিদের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র পত্রগুলির ছন্দোবদ্ধ ওঠানামা সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, ঐ সঞ্চালন প্রাণী-দেহের হৃদযন্ত্রের গতির সহিত তুলনীয়। ক্ষীণ গতিকে বহুগুণ বর্ধিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার নানাবিধ স্বয়ংলেখ যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ক্রেস্কোগ্রাফ ব্যতীত স্ফিগ্‌মোগ্রাফ, পোটোমিটার ও ফোটোসিন্থেটিক-বাব্‌লার প্রভৃতি যন্ত্র উল্লেখযোগ্য। তিনি উদ্ভিদের

জলশোষণ ও সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্থেসিস) সম্বন্ধে বিশদভাবে গবেষণা করিয়াছিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপনার কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ২ বৎসরের মধ্যে জগদীশচন্দ্র 'বসুবিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন (৩০ নভেম্বর, ১৯১৭ খ্রী)। তিরোধানকাল পর্যন্ত তিনি এই বিজ্ঞানমন্দিরের গবেষণা-কার্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর গিরিডিতে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

জগদীশচন্দ্র ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য, ১৯২৬ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লীগ অফ নেশন্‌স-এর ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনার আকাদেমি অফ সায়েন্স এর বৈদেশিক সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেরও সভাপতি (১৩২৩-২৫ বঙ্গাব্দ) হইয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের বাংলা লেখায় শিল্পীজনোচিত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বাংলা রচনাবলী 'অব্যক্ত' নামক পুস্তকে (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) সংকলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলীও প্রকাশিত হইয়াছে। নিঃসঙ্গ জগদীশচন্দ্র যখন এদেশে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন, সেই কালের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় ঐ পত্রাবলীর মধ্যে। তিনি ভারতীয় প্রাচীন পুরাণাদির বিশেষ অনুরাগী পাঠক ছিলেন। যৌবনকালে তদানীন্তন বৃহৎ আকারের ক্যামেরা বহন করিয়া ভারতের বিভিন্ন তীর্থে, প্রাচীন গুহামন্দিরগুলিতে, প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ধ্বংসাবশেষগুলিতে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধারভূমিতে তিনি ভ্রমণ করিতেন। 'অব্যক্ত' পুস্তকে এই সকল ভ্রমণকাহিনী কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। যখন তিনি বসুবিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেই গৃহের নানা স্থানে ঐ সকল প্রাচীন স্থাপত্যের অনুসরণ ও প্রাচীন গুহামন্দিরের দেওয়ালচিত্রের অনুকরণে চিত্রাবলী অঙ্কিত করাইয়াছিলেন।

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত তাঁহার বিশেষ পরিচিত রচনাবলীর মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য : *Plant Responses as a Means of Physiological Investigations* (১৯০৬ খ্রী), *Physiology of the Ascent of Sap* (১৯২৩ খ্রী), *Physiology of Photosynthesis* (১৯২৪ খ্রী), *Nervous Mechanism of Plants* (১৯২৫ খ্রী), *Collected Physical Papers* (১৯২৭ খ্রী), *Motor Mechanism of Plants* (১৯২৮ খ্রী), *Growth and Tropic Movement in Plants* (১৯২৯ খ্রী)।

দ্র জগদানন্দ রায়, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-সংকলিত, জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ৬, কলিকাতা, ১৯৫৭, জগদীশচন্দ্র বসু, পত্রাবলী, কলিকাতা, ১৯৫৮, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা, জগদীশচন্দ্র বসু, অব্যক্ত, শতবার্ষিক সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৮, মনোজ রায় ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, [১৯৬৩], Patrick Geddes, *The Life and Work of Jagadis C. Bose*, London, 1920, D. M. Bose, *Jagadish Chandra Bose : A Life Sketch*, Calcutta, 1958; Amal Home, ed., *Acharya Jagadis Chandra Bose. Birth Centenary 1858-1958*, Calcutta, 1958

দেবেন্দ্রমোহন বসু

জগদীশ তর্কালংকার নব্য ন্যায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতির উপর ইঁহার রচিত টীকা সারা ভারতে প্রসিদ্ধ। এই টীকা প্রচারিত হইলে দীধিতির অন্যান্য টীকার গৌরব ম্লান হইয়া যায়। জগদীশ তত্ত্বচিন্তামণির উপর ময়ূখ নামে স্বতন্ত্র টীকা ও বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের উপরও টীকা রচনা করেন। তাঁহার রচিত মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে শব্দশক্তিপ্রকাশিকা সুপ্রসিদ্ধ।

জগদীশ কাশ্যপগোত্রীয় যজুর্বেদী পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্র জগদীশের প্রপিতামহ ছিলেন। জগদীশের জন্মাব্দ ১৫৪০-৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত করা যায়। নবদ্বীপে জগদীশের বংশধরগণ আজিও বর্তমান আছেন। সম্ভবতঃ জগদীশ পণ্ডিতসমাজের সর্বোচ্চ সম্মান 'জগদ্গুরু' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

দ্র দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান. বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জগদ্দল বাংলার যে বৌদ্ধ বিহারগুলি জ্ঞানচর্চার জন্য দেশে-বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিল দ্বাদশ শতাব্দীর জগদ্দল মহাবিহার তাহার অন্যতম। গঙ্গা ও করতোয়ার সংগমস্থলে রামপালের (আনুমানিক ১০৭৭-১১২০ খ্রী) গড়া মহাচম্পা রাজধানী রামাবতীর একাংশে ইহা অবস্থিত ছিল। বহু

প্রতিভাবান্ জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশে এই মহাবিহার তৎকালীন বাংলার বৌদ্ধ-সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হইয়া ওঠে। শুধু ভারতীয় পণ্ডিতগণই নহেন, তিব্বতী জ্ঞানান্বেষীগণও এখানে দলে দলে সমবেত হন। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকরগুপ্ত, শুভাকরগুপ্ত, ধর্মাকর-প্রমুখ মনীষীর নাম এই বিহারের সহিত যুক্ত। মুসলমান আক্রমণের ফলে জগদ্দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও ইহার যশ বহু দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগদ্ধাত্রী দুর্গার রূপভেদ। 'মায়াতন্ত্রে' (দ্বিতীয় ও চতুর্থ পটল) ও কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসারে' দুর্গাপ্রসঙ্গে ইহার কথা বলা হইয়াছে। কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে ইহার বিশেষ পূজার বিধান ১৫-১৬শ শতাব্দীর বৃহস্পতি রায়মুকুটের 'স্মৃতিরত্নহার' ও শ্রীনাথ আচার্য-চূড়ামণির 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। হুগলির চন্দননগর ও নদিয়ার কৃষ্ণনগরে সাড়ম্বরে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইহার জনপ্রিয়তা দুর্গাপূজা অপেক্ষা বেশি। চন্দননগরে দেবীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়। অন্যত্র পূজার প্রচলন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এক দিনেই দেবীর তিনবার পূজা হয়। কেহ কেহ দুর্গাপূজার মত তিন দিন পূজা করিয়া থাকেন। পূজার ধ্যান-অনুসারে দেবী সিংহস্কন্ধে সমাসীনা, নানালংকারভূষিতা, চতুর্ভুজা, রক্তবস্ত্র-পরিহিতা। ইহার দেহের বর্ণ অরুণ সূর্যের মত। সর্প ইহার যজ্ঞোপবীত। ইহার বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনুক, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ। কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তরূপে ধ্যানটি 'তন্ত্রসারে' পাওয়া যায়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জগদ্বন্ধু (১৮৭১-১৯২১ খ্রী) পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ সাধক জগদ্বন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন, মাতা বামা দেবী। কিশোরকাল হইতেই জগদ্বন্ধুর জীবনে অসামান্য ভক্তিভাবের স্ফুরণ দেখা যায়। কোথাও কীর্তন বা ভাগবত পাঠ হইলেই তিনি সেখানে ছুটিয়া যাইতেন, ভগবানের লীলাকথা শ্রবণমাত্রই ভাবাবিষ্ট হইতেন, সারা দেহে সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিত। যৌবনে এই ভাব আরও প্রবল হইয়া ওঠে, প্রেমভক্তি-সাধনার বিগ্রহরূপে জনমনে তিনি আসন গ্রহণ করেন।

অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁহার প্রেম ও করুণা ছিল অপরিসীম। এক সময়ে ফরিদপুরের বুনো-বাগ্দীরা সামাজিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া খ্রীষ্ট-ধর্মগ্রহণে উদ্যোগী হইলে জগদ্বন্ধু তাহাদের নিবৃত্ত করেন এবং তাঁহার উপদেশ ও প্রেরণায় বুনোরা হরিভক্ত-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কলিকাতায় রামবাগানের ডোমবস্তীতে জগদ্বন্ধু একবার কিছুকাল বাস করেন। তাহার সাহচর্য ও উপদেশে ডোমেরা নামকীর্তনে মাতিয়া ওঠে ও বৈষ্ণবীয় আচার-আচরণ গ্রহণ করে।

রাধাকৃষ্ণের ভজনই জগদ্বন্ধুর উপদেশের মূলকথা। এই ভজনের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে শুদ্ধাচার, ব্রহ্মচর্য ও নামকীর্তনের উপর জগদ্বন্ধু গুরুত্ব দিতেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুর-আশ্রমে সমাধিলাভ করেন।

দ্র গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীবন্ধুলীলাতরঙ্গিণী, ১-৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০-৫৮, শঙ্করনাথ রায়, ভারতের সাধক, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য

জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২-১৯০৬ খ্রী) চব্বিশ বৎসর বয়সে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিয়া জগদ্বন্ধু ১০ বৎসর পরে প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দে ৮০ জন প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন-লিখিত ১২১৭টি পদ 'গৌরপদতরঙ্গিণী' নামে সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে খ্যাত হন। বৈষ্ণব কবিদের জীবনী অনুসন্ধানে তিনিই প্রথম অগ্রসর হন। ১২৮০ বঙ্গাব্দে ইনি 'মহাজন-পদাবলীসংগ্রহ' নাম দিয়া বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ করেন। জগদ্বন্ধু নিজেও বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অপর উল্লেখযোগ্য রচনা হইল: দুইটি কাব্য—'ভারতের হীনাবস্থা' (১৮৬৬ খ্রী) ও 'তপতী-উদ্বাহ'; দুইটি নাটক — 'দেবলা-দেবী' (১৮৭০ খ্রী) ও 'বিজয়সিংহ' (১৮৭০ খ্রী) এবং একটি ব্যঙ্গ কবিতা—'ছুছুন্দরীবধ কাব্য'।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ; মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত, গৌরপদতরঙ্গিণী, ভূমিকা ও পরিশিষ্ট, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

বিমানবিহারী মজুমদার

জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্র বা পুরী ধামে পূজিত পাণিপাদবিহীন দারুময় দেবতা। সঙ্গে সুভদ্রা ও বলরাম একত্রে পূজিত হইয়া থাকেন।

পুরীর বর্তমান মন্দির আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত হয়।

প্রবাদ, বসু শবর নামে এক অনার্য বংশোদ্ভব ভক্ত নীলাচলে নীলমাধবের পূজা করিতেন। তাহাই কালক্রমে জগন্নাথ-মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়। বসু শবরের কন্যার বংশোদ্ভব দইতাপতিগণ এখনও জগন্নাথদেবের বিশেষ বিশেষ সেবায় নিযুক্ত আছেন।

কানিংহ্যাম, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতানুসারে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক, পরে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে রূপান্তরিত হন। ওড়িশার লোকগীতিতে জগন্নাথ ও বুদ্ধকে অভিন্ন মনে করা হয়। জয়দেব বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ওড়িশা ও বাংলার কোনও কোনও মন্দিরে নবম অবতারস্থলে স্থাপিত জগন্নাথের মূর্তি দেখা যায়।

পক্ষান্তরে, পুরী-মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ বিমলার মন্দির একটি পীঠস্থান। বিমলা তত্রত্য মহাদেবী এবং জগন্নাথ তাহার ভৈরব। জগন্নাথের নিত্যসেবায় পঞ্চ ম-কার বিকল্পে নিবেদিত হইয়া থাকে। ওড়িশার শৈব বা শাক্তগণ জগন্নাথকে ভৈরব মনে করিলেও অধিকাংশ ভক্তের দ্বারা জগন্নাথ বিষ্ণুজ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকেন।

পাণিপাদবিহীন জগন্নাথ মূর্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া গঙ্গোদ্ধারণ প্রভৃতি অনেকগুলি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শোনা যায়, কোনও সময়ে নাকি তিনি বুদ্ধবেশও ধারণ করিতেন, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

নিম্বকাষ্ঠ নির্মিত দারুব্রহ্মের মূর্তি মাঝে মাঝে সমাধিস্থ করিয়া নূতন মূর্তি স্থাপিত হয়। ইহাকে নবকলেবর-উৎসব বলে। পুরাতন মূর্তি হইতে কোনও একটি পদার্থ নূতন মূর্তির অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করা হয় বলিয়া প্রকাশ। যে পুরোহিত স্থানান্তরিত করেন তিনি হাতে ও চোখে আচ্ছাদন বাঁধিয়া রাখেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। ইহা কোন্ পদার্থ তাহা লইয়া অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন।

নির্মলকুমার বসু

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৭ খ্রী) বাংলার অসাধারণ প্রতিভাশালী বহুপ্রশংসিত দীর্ঘজীবী পণ্ডিত। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্ন সভার তিনি অন্যতম রত্ন ছিলেন। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে ইঁহার জন্ম। পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। পিতার নিকট ব্যাকরণ ও জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালংকারের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ত্রিবেণীর রঘুদেব বাচস্পতির নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। পাঠ-সমাপনান্তে ত্রিবেণীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তাহা হইতে বিরত হন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

নব্য ন্যায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর বিভিন্ন পত্রিকা ছাড়া গ্রন্থরচনায় তাঁহার অক্ষয়কীর্তি 'বিবাদভঙ্গার্ণব (১৭৮৮-৯২ খ্রী), স্যর উইলিয়াম জোন্স-এর অনুরোধে ও আনুকূল্যে সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া এই গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইহার ইংরেজী অনুবাদ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিচারালয়ে হিন্দু আইনের আকরগ্রন্থরূপে দীর্ঘকাল গৃহীত ছিল।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য

জগন্নাথ দাস, অতিবড় (১৪৯০-১৫৫০ খ্রী) ওড়িয়া ভাগবতের লেখক ও ধর্মপ্রচারক। জগন্নাথ দাস ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্র শুক্লা অষ্টমী তিথিতে পুরীর প্রায় ১০ কিলোমিটার (৩ ক্রোশ) পশ্চিমে কপিলেশ্বরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভগবান দাস, মাতা পদ্মাবতী। ভগবান দাস জগন্নাথ মন্দিরে পুরাণ-পাঠক ছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সের মধ্যেই জগন্নাথ দাস পণ্ডিত ও ভাগবতধর্মনিষ্ঠ হইয়া উঠেন এবং প্রত্যহ জগন্নাথমন্দিরে ভাগবত পাঠ করিতে থাকেন। এই সূত্রেই চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। চৈতন্যদেবের নির্দেশে জগন্নাথ বলরাম দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিচর্যা করিতে থাকেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'অতিবড়' বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি 'অতিবড় জগন্নাথ দাস' নামে খ্যাত হন। তাঁহার শিষ্যপরম্পরা 'অতিবড়ী সম্প্রদায়' নামে পরিচিত।

সুকবি জগন্নাথ ওড়িয়া ভাষায় নবাক্ষরী ছন্দে ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ওড়িয়া ভাষায় অন্য কোনও গ্রন্থে অধ্যাত্মতত্ত্বের এরূপ সহজ-সুন্দর বিশ্লেষণ নাই। ইহা উৎকলের প্রায় প্রতি গৃহে পঠিত হয়। জগন্নাথ দাস ওড়িয়া ভাগবত ব্যতীত আরও ৮খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন: 'কৃষ্ণভক্তি-কল্পলতা', 'কৃষ্ণভক্তিকল্পলতাফল', 'নিত্যগুপ্তমালা', 'উপাসনা-

শতক', 'প্রেমসুধাম্বুধি', 'নিত্যাচারাদিদীক্ষাসহিতোপাসনা-বিধি', 'শ্রীরাধারসমঞ্জরী' ও 'শ্রীজগন্নাথচরিতাম্ভোনিধিসরণী'। ইহা ছাড়া ওড়িয়া ভাষায় রচিত 'ষোল চৌপদী', 'শৈবাগম ভাগবত', 'সৎসঙ্গ-বর্ণনা', 'গুপ্তিচাবিজে' ও 'গোলোকসারোদ্ধার' তাঁহার রচনাশক্তির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উপলব্ধ কয়েকখানি চন্দ্রিকা-গ্রন্থে রচয়িতার নামোল্লেখ না থাকিলেও রচনাসাদৃশ্যে তাহাও জগন্নাথ দাসের বিরচিত বলিয়া অনুমান হয়, যথা— 'রাধাকৃষ্ণ মহামন্ত্রচন্দ্রিকা', 'অদ্ভুতচন্দ্রিকা', 'নীলাদ্রি-চন্দ্রিকা', 'পূর্ণামৃত-চন্দ্রিকা'।

জগন্নাথ দাস ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্র ভক্তির উপাসক ছিলেন। ষাট বৎসর বয়সে সমুদ্রতীরবর্তী যে স্থানে তাঁহার দেহাবসান ঘটে সেই স্থানে বর্তমানে 'সাতলহরী মঠ' স্থাপিত হইয়াছে।

দ্র ঈশ্বরদাস, জগন্নাথচরিতামৃত, সদাশিব মিশ্র, অতিবড় জগন্নাথ দাস, পুরী, ১৯২১, চিন্তামণি আচার্য সম্পাদিত, শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, (ভূমিকা), কটক, ১৯৪৩।

বৈষ্ণব চরণ দাস পর্যটক

জগাই-মাধাই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সন্তান দুই ভাই চৈতন্য-দেবের সমসাময়িক। এই অনাচারী ও মদ্যপ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভয়ে নবদ্বীপের লোক সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে কোটাল হইয়াও ইঁহারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। চৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাদের উদ্ধার করিতে গেলে মাধাই তাঁহাকে কলসীর কানা মারিয়া রক্তপাত ঘটান, কিন্তু জগাই অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে প্রহার হইতে বিরত করেন। চৈতন্যদেব ইঁহাদের শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে নিতাই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। নিতাই-এর মহত্ত্ব দেখিয়া উভয়ে পরম ভক্ত হইলেন। তাঁহারা প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম করিতেন। জনমজুরের মত শরীর খাটাইয়া বৈষ্ণব জগাই ও মাধাই নবদ্বীপে গঙ্গায় একটি ঘাট বাঁধাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহাদের নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

বিমানবিহারী মজুমদার

জটায়ু রাজা দশরথের প্রিয় বয়স্য এক গৃধ্র (রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ১৪।১,১৪।৩)। ইনি বিনতানন্দন অরুণের দ্বিতীয় পুত্র। মাতার নাম শ্যেনী, সম্পাতি তাঁহার অগ্রজ (রামায়ণ, ১৪।৩৩)। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার পঞ্চবটী অভিমুখে গমনকালে পথে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। জটায়ু রামচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন যে, এই গহন বনে তিনি তাঁহাদের সহায়ক হইবেন ও সীতাকে রক্ষা করিবেন (ঐ ১৪।৩৪)। সীতার অপহরণকারী রাবণকে জটায়ু বাধা দেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রাবণের রথ ও ধনু ভগ্ন হইল, সারথি ও অশ্বও নিহত হইল (ঐ ৫১।১৯)। পরিশেষে রাবণ খড়্গের দ্বারা জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিল (ঐ ৫১।৪২)। সীতার অন্বেষণে ব্যাকুল রামচন্দ্রকে রাবণ-কর্তৃক তাঁহার অপহরণ সংবাদ দিয়াই জটায়ু প্রাণত্যাগ করেন (ঐ ৬৮।১৬)।

সীতানাথ গোস্বামী

জটার দেউল চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশে মথুরাপুর থানার অন্তর্গত পশ্চিম জটা নামক গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচীন ইষ্টকনির্মিত মন্দির। মথুরাপুর স্টেশন হইতে বাসে ২৫ কিলোমিটার (১৬ মাইল) দূরে রায়-দীঘি, এখানে ঠাকরুন নদী পার হইয়া ৬·৫ কিলোমিটার (৪ মাইল) দূরে ইহা অবস্থিত। মন্দিরটি পূর্বাস্য এবং আনুমানিক ৩ মিটার (১০ ফুট) উচ্চ একটি ঢিপির উপর অবস্থিত। শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী ইহা শিখর বা রেখ জাতির অন্তর্গত। মন্দিরের বর্তমান উচ্চতা ১৮ মিটার (৬০ ফুট), গর্ভগৃহ চতুরস্র, প্রতি দিকের মাপ ৩·২ মিটার (১০ ফুট ৯ ইঞ্চি)। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সংস্কার হয়। সংস্কারের পূর্বে গৃহীত আলোকচিত্রে দেখা যায় যে মন্দিরের গাত্রে ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি, ফুল, লতা ও চৈত্য-গবাক্ষের অলংকরণ বিন্যস্ত ছিল। সংস্কারের ফলে মন্দিরের পূর্বতন রূপ অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। অলংকারের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা সামান্য। কথিত আছে, মন্দিরটির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ছিলেন জটেশ্বর মহাদেব, বর্তমানে গর্ভগৃহে কোনও মূর্তি নাই। চৈত্র-সংক্রান্তিতে মন্দিরে শিবপূজা হয় ও সম্মুখের প্রাঙ্গণে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দ্র নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, *Annual Report of the Archaeological Survey, Bengal Circle, for the Year-ending with April, 1903*, Calcutta, 1903; R. C. Majumdar, ed., *History of Bengal*, vol. I, Dacca, 1943.

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

জটাসুর জরাসুর দ্র

[জটিলা]-কুটিলা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় প্রসিদ্ধ মাতা ও কন্যা। জটিলা বৃন্দাবনের অন্তর্গত জাবট গ্রাম-নিবাসী গোপ

নামক গোপের পত্নী ও কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকার লৌকিক স্বামী অভিমন্যু র (আয়ান ঘোষ) মাতা। ইনি রূপ-গোস্বামী-রচিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ-দীপিকায় (৪৭, ঐ পরিশিষ্ট ১৭৪) কাকতুল্য কৃষ্ণবর্ণা ও মহোদরী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি নিজ পুত্রের প্রতি রাধিকার চিত্ত আকর্ষণের সর্বদা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। রাধিকা যাহাতে কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ না হন তাহার জন্য তিনি ললিতা, কুন্দলতা প্রভৃতি রাধিকার সখীদের নিকট কাতর অনুরোধ জানান (কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৫।৬৮)। জটিলার কন্যা কুটিলা রাধিকার ননদিনী। রাধিকা-চরিত্রে দোষ আবিষ্কার করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইহার কুটিল মনোভাবের দ্বারা রাধিকার কৃষ্ণপ্রেম পরাকাষ্ঠার বিশেষতঃ অভিব্যক্তি ঘটে।

যূথিকা ঘোষ

জড়বাদ বস্তুবাদ দ্র

জড়বুদ্ধি বুদ্ধির অসম্পূর্ণ বিকাশ। মনঃ-চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে (ক্লিনিক্যাল-স্ট্যাণ্ডপয়েণ্ট) দেখিলে বলিতে হয়: একই বয়সের স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক যে কাজগুলি সাধারণভাবে সম্পাদন করিতে পারে জড়বুদ্ধি লোক তাহা সেইরূপে পারে না। ফলতঃ জড়বুদ্ধি ব্যক্তি বয়ঃক্রমানুযায়ী পরিপক্কতা-লাভে, শিক্ষণে এবং সামাজিক প্রয়োজন-জনিত সমন্বয়-সাধনে অসমর্থ হয়। দৈহিক বয়সের অনুপাতে মানসিক বয়স না বাড়ার দরুন সমবয়স্ক স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের তুলনায় ইহারা পিছাইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক জড়বুদ্ধি ব্যক্তির মানসিক বয়স ০ হইতে ১২-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বুদ্ধ্যঙ্ক (আই. কিউ.) হয় ৭০-এর নিম্নে। ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধিন্যূনতার সহিত দৈহিক বিকলাঙ্গতারও সম্বন্ধ দেখা যায়। মানসিক রোগী বা উন্মাদ হইতে ইহারা স্বতন্ত্র; মানসিক রোগীর বুদ্ধি স্বাভাবিক বিকাশলাভের পরে কারণবিশেষে বিনষ্ট হয়; অন্যপক্ষে জড়বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধি বিকাশলাভের পথে জড়ত্বপ্রাপ্তিহেতু কখনই স্বাভাবিক মানে উন্নীত হয় না। বংশগতি অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত কোনও ব্যাঘাত অথবা উভয়বিধ কারণে এবং আপাততঃ অজ্ঞাত কোনও কারণেও বুদ্ধির এইরূপ জড়ত্ব ঘটে। বুদ্ধ্যঙ্কের তারতম্য ও উহার সহিত ব্যবহারগত কয়েকটি লক্ষণ যুক্ত করিয়া জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা: ১. মৃদু জড় ২. মধ্য জড় ৩. পূর্ণ জড়। ইহাদের বুদ্ধ্যঙ্কের সীমা যথা মৃদু জড় ৫০-৬৯; মধ্য জড় ২০-৪৯ এবং পূর্ণ জড় ০-১৯।

দ্র S. B. Sarson, *The Psychological Problems in Mental Deficiency*, New York, 1953; Rick Heber, 'A Manual of Terminology and Classification', *American Journal of Mental Deficiency*, vol. 64, no. 2, 1959; A. F. Tredgold, *A Text-book of Mental Deficiency*, London, 1959; *World Health Organisation: Technical Report Series*, No 75.

সুবিমল দেব

জড়-ভরত ভগবান ঋষভের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজর্ষি ভরত। পরিণত বয়সে ভরত সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করিয়া তপস্যার জন্য হরিক্ষেত্রে গমন করেন এবং এক মৃতমাতৃক হরিণ-শিশুর স্নেহে আবদ্ধ হন। এই হরিণশিশুই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইয়া দাড়ায়। মৃত্যুকালেও এই হরিণশিশুর কথা ভাবিতে ভাবিতে দেহ ত্যাগ করার ফলে পরজন্মে তিনি মৃগশরীর প্রাপ্ত হন। মৃগজন্মে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরূক থাকায় মৃগীভূত ভরত আত্মকর্মের ফলাফল চিন্তা করিয়া সংযত ও অসঙ্গ হন। মৃগদেহ ত্যাগ করার পর তিনি বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং যাহাতে আর কর্মবন্ধ হইতে না হয় তাহার জন্য বাহিরে নিজেকে জড়বৎ দেখাইতেন। জড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য তিনি জড-ভরত নামে পরিচিত হন। ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে জড়মতি বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে ক্ষেতের কদমমর্দনাদি কার্যে নিযুক্ত করেন। ভরত সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই করিতেন এবং যদৃচ্ছালব্ধ আহারে পরিতৃপ্ত থাকিতেন।

একদিন সিন্ধুসৌবীরপতি রহূগণ শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন। ভরতকে স্থূল ও বলিষ্ঠ দেখিয়া তাঁহাকে শিবিকা-বহনের জন্য নিযুক্ত করেন। ভরত জীবহিংসা-ভয়ে সংযত পদক্ষেপে শিবিকা বহন করিতে থাকিলে শিবিকার গতি পুনঃপুনঃ ব্যাহত হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ রাজা পরিশেষে ভরতকে দণ্ডভয় দেখান। তখন ভরত ঈষৎ হাস্য করিয়া রহূগণের প্রত্যেকটি কথা অবলম্বনে আত্ম-উপদেশ দিলেন। এই প্রত্যুত্তর সুগভীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ। জ্ঞানী রহূগণ তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারেন এবং শিবিকা হইতে নামিয়া ভরতের পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

দ্র শ্রীমদ্ভাগবত, ৭ম স্কন্দ, ৭-১৩ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ১৩-১৬ অধ্যায়।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

জনক মিথিলার অধিপতি, বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, ব্রহ্মবিদ্, রাজর্ষি, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

রাজর্ষি জনক নিঃস্পৃহ হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন। সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখ রাজর্ষির শাস্ত্রগুরু। তাঁহার প্রসাদেই রাজর্ষি ছিন্নসংশয় হন (মহাভারত, শান্তি, ৩২০।২৫)।

ব্যাসদেবের নির্দেশে পুত্র শুকদেব মিথিলায় গিয়া রাজর্ষির নিকট হইতে মোক্ষশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন (শান্তি, ৩২৫তম অধ্যায়)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ মহাপুরুষগণও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার নিমিত্ত এই রাজর্ষির সভায় প্রায়ই সমবেত হইতেন। রাজর্ষির অনন্যসাধারণ দানশীলতাও বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্যক্ত আছে। ব্রহ্মচারিণী সুলভার সহিত রাজর্ষির মোক্ষতত্ত্ব-আলোচনার প্রসঙ্গটি অতি মূল্যবান (শান্তি, ৩২০তম অধ্যায়)।

সুনয় শীল।

জনতত্ত্ব লোকসমষ্টির সংখ্যাগত এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তনের স্বরূপ, কারণ ও ফলাফলের গবেষণাই জনতত্ত্বের উদ্দেশ্য। উন্নত আদমশুমারের উপর ইহা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার যথার্থ লক্ষ্য লোকগণনাকে অতিক্রম করিয়া জনসমষ্টির বিবর্তনের সহিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক মহাবিবর্তনের বিবিধ কার্যকারণ সম্পর্কের অনুসন্ধান। এই উদ্দেশ্যে এক দিকে মানবের প্রজনন শক্তির এবং বংশগত গুণাবিকারের বৈজ্ঞানিক বিচার প্রয়োজন, অপর দিকে মোট জনসংখ্যার সহিত বহুবিধ প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সম্পর্ক (প্রত্যেক দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে) নির্ণয় করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এরূপ সর্বতোমুখী জনতত্ত্বের আজিও প্রতিষ্ঠা হয় নাই, যদিও জাতিসংঘের এফ এ ও, ডবলিউ এইচ ও, ইউনেস্কো ইত্যাদি সংস্থার অধীনে বহু প্রকার তথ্যানুসন্ধান চলিতেছে এবং আধুনিক পণ্ডিতদিগের গবেষণায় নানা প্রকার আংশিক সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই জনতত্ত্ব ও জননিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বহুবিধ চিন্তা ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধি সম্পর্কে বৈদিক আর্যগণের আগ্রহে আমরা পরবর্তী লোকবলবাদের পূর্বাভাস পাই। অনুরূপভাবে গ্রীক দার্শনিক প্লাতো ও আরিস্তোতলের জননিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত চিন্তায় আধুনিক জননিয়ন্ত্রণবাদের ছায়াও লক্ষ্য করা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন এবং বর্তমানের অনেক অসভ্য-সমাজে নানা প্রকার ধর্মীয় ও আচারভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সমতা রক্ষা করার চেষ্টা দেখা যায়। রোমক সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের যুগে লোকবলবাদ প্রাধান্য পায় এবং সম্রাট আগুস্তুস-এর আইনে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। মধ্যযুগোত্তর কালে ইওরোপে জাতিরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অভ্যুত্থানের সময় লোকবলবাদ পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু কারখানাভিত্তিক ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পরে চাহিদার 'অতিরিক্ত' জনসংখ্যা এবং গণদারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মনিয়ন্ত্রণবাদের আলোচনা শুরু হয় এবং এই মতের অবদান ঘটে। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হইলেন পাদ্রী মল্থস (১৭৬৬-১৮৩৪ খ্রী)।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মল্থস তাঁহার বিখ্যাত 'জনতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ' প্রকাশ করেন। তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য ছিল এইরূপ ক. যেহেতু জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে সমানুপাতী (যথা ১, ২, ৪, ৮, ১৬) শ্রেণীতে কিন্তু ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মাধীনে খাদ্যোৎপাদন বাড়ে সমান্তর (যথা ১, ২, ৩, ৪, ৫) শ্রেণীতে, সেহেতু শীঘ্রই জনসংখ্যা খাদ্যসরবরাহের তুলনায় 'অতিরিক্ত' হইয়া পড়ে যাহা খ. মানুষের সংপ্রবৃত্তি নৈতিক সংযম (নিবারণাত্মক প্রতিবন্ধ) জনসংখ্যার 'স্বাভাবিক' বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি তাহাই চিন্তাশীল মানুষী প্রচেষ্টা জনসংখ্যাবৃদ্ধির রোধ করিতে অক্ষম হয় তবে গ. প্রকৃতিদেবী স্বয়ং দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি দুঃখজনক ঘটনা ('পজিটিভ' প্রতিবন্ধের মাধ্যমে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে সমতা স্থাপন করেন। মল্থস যদিও গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশনে নিবারণাত্মক 'নৈতিক সংযম এর উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা ও দারিদ্র্যকে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবার্য মনে করিতেন।

মল্থসের মতের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তিগুলি এইরূপ. ক উৎপাদনে মানুষের ভূমিকাকে মল্থস অবহেলা করিয়াছিলেন, ইহা ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের অনুকূল খ. শিল্পবিপ্লব ও কৃষিবিপ্লব যে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে মল্থস তাহা বুঝিতে পারেন নাই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে উৎপাদন-সম্ভাবনার বিপুল বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য দেশে জীবনযাত্রার মান দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে গ. দুঃখ-দুর্দশা নয়, বরং অবস্থার উন্নতিই মানুষকে পরিবার-নিয়ন্ত্রণে প্রণোদিত করে। মল্থসের কালে তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬-১৮৩৬ খ্রী)। গডউইনের বক্তব্য ছিল এই যে, দ্রুত বংশবৃদ্ধি নয়,

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিই নির্ধনতার কারণ এবং এইগুলির প্রতিকার হইলে প্রজনন-হারের হ্রাস বিনাই দারিদ্র্য দূর হইতে পারে। কার্ল মার্ক্সের জনতত্ত্বও ছিল গড্উইনের অনুরূপ। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, চাহিদার 'অতিরিক্ত' জনসংখ্যা ধনতান্ত্রিক সমাজেরই লক্ষণ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনশক্তির বিকাশ অবিরাম ও শ্রমের চাহিদা অসীম বলিয়া উচ্চ হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি কোনও সমস্যার সৃষ্টি করে না। অধিকাংশ আধুনিক জনতত্ত্ববিদের মতে মল্থস নানা ভুল করিলেও তাঁহার জনতত্ত্বে কিছু সত্যাংশ আছে এবং তাহা সমসাময়িক কালে সিংহল, ভারত প্রভৃতি দেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে বুঝিতে সাহায্য করে।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিংশ শতকের পূর্ব ভাগে ইওরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি যথেষ্ট হ্রাস পাওয়ায় মল্থসীয় মত সাময়িকভাবে অবজ্ঞাত হয়। এই সময়ে কার সণ্ডার্স (Carr--Saunders) প্রমুখ কয়েকজন উপযুক্ত জনসংখ্যাতত্ত্ব ('অপ্টিমাম থিওরি অব পপুলেশন') প্রতিপাদন করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ এবং বিজ্ঞান ও শিল্পব্যবস্থার অনুপাতে যে জনসংখ্যা মাথাপিছু সর্বোচ্চ আয় দেয় তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। জনসংখ্যা ইহার অধিক হইলে ঘটে জনবাহুল্য এবং কম হইলে ঘটে জনস্বল্পতা।

বিংশ শতকের মধ্য ভাগের পর হইতে অনুন্নত দেশসমূহে বৈদেশিক সাহায্যাদির সূত্রে উন্নত চিকিৎসা বিদ্যার বহুল প্রসারের ফলে ঐসব দেশে মৃত্যুহার কমিয়া যাওয়ায় জনসংখ্যা সহসা দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে নব্য মল্থসীয় মতের উদ্ভব হইয়াছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে আর্থিক উন্নতির অসম্ভাব্যতা এই মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য।

সংখ্যাতাত্ত্বিক জনতত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বে জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির প্রতিবন্ধন উচ্চ জন্ম ও মৃত্যুহারের মাধ্যমে সাধিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির প্রথম স্তরে জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কেবল মৃত্যুহারের হ্রাস হয়। এই স্তরে অর্ধোন্নত দেশগুলিতে 'জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ' ঘটে এবং খাদ্যসংকটের পরিস্থিতিতে মল্থসের সতর্কবাণী তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া ওঠে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে জন্মহার হ্রাস পায় এবং সময়ে উভয়েই নিম্নমান লাভ করিয়া পুনরায় সাম্যস্থিতির সৃষ্টি করে। এজন্য নব্য মল্থসবাদের নৈরাশ্যময় চিত্রটি অনেকের কাছে অগ্রাহ্য হয়।

তবে ইহা অনস্বীকার্য যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হয় ('আর্থিক উন্নতি' দ্র)। ইহা ভিন্ন একশ্রেণীর সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ ভেরহুল্স্ট (Verhulst) ও কেৎলে (Quetlet)-র মত অনুসরণ করিয়া জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গাণিতিক (লজিস্টিক) সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। জনসংখ্যা অতিমানবীয় শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহা না মানিলে এ মত স্বীকার করা কঠিন। তবে ইহাদের আলোচনায় জনতত্ত্বের সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্র T R. Malthus, *An Essay on the Principle of Population*, vols. I-II, London, 1826; A. B. Wolfe, 'Population (Theory)', *Encyclopaedia of Social Science*, vols. XII, New York, 1954; W. A. Lewis, *The Theory of Economic Growth*, London, 1960, J. A. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, London, 1961

অমৃতানন্দ দাস

জনমত গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে দেশশাসনসম্বন্ধে জনচেতনার পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং শাসনব্যবস্থাকে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের উপায়রূপে এবং গণ ইচ্ছার বাহকরূপে দেখা হইতেছে। বর্তমানে শাসকবৃন্দ জনসাধারণের সেবকমাত্র, প্রভু নহে— জাগ্রত জনমতই এই ধারণা পরিবর্তনের কারণ। গণতন্ত্রকে এইজন্যই জনমত-নির্ধারিত শাসনব্যবস্থা বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু জনমতের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত লক্ষণসম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

এই আলোচনায় যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় তাহা এই যে, ইহা কি জনসংখ্যার অধিকাংশের মত অথবা সুসংস্কৃতিসম্পন্ন প্রভাবশালী সংখ্যালঘুর মত, শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবিত মত অথবা বিরোধীগোষ্ঠীর মত? কোনটি প্রকৃত জনমত তাহার যথার্থ প্রতিফলক নির্ণয় করা সহজ নহে। অনেক মতই ভ্রান্তি, দুর্বলতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও সংবাদ-পত্রের মতামত প্রভৃতির এক বিরাট সংমিশ্রণ। মুষ্টিমেয় লোকেরই কঠিন বিষয়-সম্পর্কে জ্ঞান বা চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে, অধিকাংশ লোকই অন্যের কল্পিত আদর্শকে অনুসরণ করে বা গ্রহণ করে। জনমতের স্থায়িত্ব রাজনৈতিক নেতাদের জ্ঞান ও নিঃস্বার্থতার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত জনমত হইল সর্বসাধারণের কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিপূর্ণ ও সচেতন মত। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত

হইলেই তাহা জনমত বলিয়া গণ্য হইবে না যদিনা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাহা স্বেচ্ছায় মোটামুটি মানিয়া লয় — ভয়ে অথবা নিপীড়নে নহে। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য যে ঘটিবেই তাহার কোনও স্থিরতা নাই, মৌলিক ব্যাপারগুলির সম্বন্ধে মতের ঐক্য থাকিলেই জনমত গঠিত হইতে পারে এবং এই ঐক্য তখনই থাকিতে পারে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের আদর্শ সামগ্রিকরূপে জনগণের কল্যাণের সহিত সংলগ্ন হয়।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক উন্নতির স্তরভেদে বিভিন্ন দেশে জনমত বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। শুধু সংবিধানগত মত-প্রকাশের স্বাধীনতাই প্রকৃত জনমত গঠনের কোনও শর্ত নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে সুষ্ঠু জনমত-গঠন সম্ভব নহে। অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন যে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় জনমত তাহার নৈতিক মূল্য হারাইয়া ফেলে, সমাজে উপযুক্ত শিক্ষার প্রসারও জনমত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার জনমত সৃষ্টি করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। জনমত-নিয়ন্ত্রিত সরকারেই জনগণের ধ্যান-ধারণা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় এবং জাগ্রত জনমনের দ্বারাই স্বৈরাচারের প্রবণতা রুদ্ধ হইতে পারে। জনমত কতটা সুচিন্তিত, সুগঠিত এবং সরকারীনীতি-নিয়ন্ত্রণে কার্যকর তাহার উপর গণতন্ত্রের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

একটি রাষ্ট্রে জনমত গড়িয়া ওঠার বিভিন্ন মাধ্যম রহিয়াছে, যেমন — মুদ্রাযন্ত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি, রাষ্ট্রনৈতিকদল ও আইন সভা।

জনমত-গঠনে মুদ্রাযন্ত্রের দান অপরিসীম। সেইজন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত আবশ্যক।

চলচ্চিত্র ও বেতারও মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরকরূপে কাজ করে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সংবাদপত্র অচল, চলচ্চিত্র ও বেতার সেখানে সক্রিয় শক্তি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বিভিন্ন আদর্শে গড়িয়া তোলে। সভা-সমিতির দ্বারাও জনসাধারণকে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যাসম্পর্কে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করা হয়, যাহার ফলে জনমত গঠন সহজ হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের আদর্শবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনমত গঠনের মাধ্যম হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমান যুগে আইন সভায় সরকারি দল এবং বিরোধী দলের বিতর্ক, সমালোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও জনমত প্রভাবিত হয়। এইরূপ বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে জনমত গঠিত ও প্রতিফলিত হয়। তবে বর্তমান যুগে গতিশীল এবং জনমতগঠনকারী যে কোনও মাধ্যমকেই জনমতের সদা-পরিবর্তমান গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া পথনির্দেশ দিতে হয় যাহাতে প্রকৃতই জনমত-নিয়ন্ত্রিত যথার্থ গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্র A V. Decey, *Law & Public Opinion in England*, London, 1914; W. Lippmann, *Public Opinion*, New York, 1922.

রানী মুখোপাধ্যায়

জনমেজয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রপৌত্র ও পরীক্ষিতের পুত্র। তক্ষক উতঙ্কের কুণ্ডল অপহরণ করায় তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ উতঙ্কের মুখে একদিন তক্ষকের দংশনে পিতা পরীক্ষিতের প্রাণ ত্যাগের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রুদ্ধ জনমেজয় তক্ষকসহ সর্পকুল ধ্বংসের জন্য সর্পসত্র অনুষ্ঠানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

যজ্ঞের প্রথমে ঋত্বিগ্‌গণের মন্ত্রবলে বহু সর্প যজ্ঞাগ্নিতে দেহত্যাগ করার পর শেষ দিকে দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রিত ও রাজার প্রধান শত্রু তক্ষক ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞাগ্নির সমীপবর্তী হইলে, ইন্দ্র সেই যজ্ঞ দেখিয়া ভীত মনে স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন এবং তক্ষক মন্ত্রশক্তিতে ঘূর্ণিত হইয়া যজ্ঞাগ্নির দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকিল। এই সময়ে জরৎকারু ও নাগকন্যা মনসার পুত্র আস্তীক মুনি জনমেজয়ের নিকট যজ্ঞনিবৃত্তি বর প্রার্থনা করিলেন এবং রাজা তাঁহাকে বরদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায় ঋত্বিক্‌ ও ব্রাহ্মণগণের সম্মতিক্রমে সর্পযজ্ঞ নিবৃত্ত হইলে তক্ষকের প্রাণ রক্ষা পায়। তৎপরে জনমেজয় ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের নিকট ব্যাস রচিত মহাভারত শ্রবণ করেন।

দ্র মহাভারত, আদি পর্ব।

মধুসূদন গুপ্ত

জনসংখ্যা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব যখনই হউক না কেন, ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে ১ লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের অস্তিত্ব ছিল এবং তখন মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার যুগে মানুষের বংশবৃদ্ধি খুব কম হারে হইত। মানুষের বংশবৃদ্ধির হার যদি প্রতি দশকে হাজার করা ২ ধরি আর এই হার বরাবর ১ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ছিল ধরি, তাহা হইলে ২৫ জন হইতে পৃথিবীর জনসমষ্টি ২৫০ কোটিতে পরিণত হইবে। জনসংখ্যা কখনও বাড়িয়াছে, কখনও কমিয়াছে। মানুষ যখন চাষ-বাস জানিত না, পশুপালন করিতে শেখে নাই, তখন ক্রোবার (Kroeber)

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে (৩৯ বর্গ মাইল) শিকার ও ফলপাকড় পাওয়া যায় এমন স্থানে ৮ হইতে ১৬ জন লোক ছিল। সভ্যতার ঐরূপ স্তরে মানুষ যখন ছিল, তখন সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যা ২৫-৩০ লক্ষের বেশি হইতে পারে না, ছিল আরও কম। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০০ বৎসর পূর্বে স্থানে স্থানে, যেমন মিশরে, ইরাকে ও ভারতে, সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে ও জনবসতি বাড়িয়াছে। নব্যপ্রস্তর যুগের গ্রাম ৭/৮-ঘর লোক লইয়া, আবার কোথাও কোথাও ২৫/৩৫-ঘর লোক লইয়া হইত। গর্ডন চাইল্ড লিখিয়াছেন যে প্রত্নপ্রস্তর যুগ অপেক্ষা পরবর্তী যুগে ৫গুণ বেশি মানুষের হাড় পাওয়া গিয়াছে। অথচ মধ্যযুগের স্থিতিকাল পূর্ব যুগের এক-পঞ্চমাংশমাত্র। সভ্যতার উন্নতি ও বিস্তৃতির সহিত জনসংখ্যা এই হারে বাড়িতেছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন মিশরে (আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) যখন খুফুর পিরামিড নির্মিত হয়, তখন পিরামিডের কার্যের জন্য ৪ লক্ষ লোক ২০ বৎসর ধরিয়া খাটিয়াছিল। ইহা হইতে মিশরে তখন কত বেশি লোক ছিল তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে। সিন্ধু-সভ্যতা ৫১৮০০০০ বর্গ কিলোমিটার (২০০০০০০ বর্গ মাইল) জুড়িয়া, ইহার শতকরা দশ ভাগ জমিতেও যদি চাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক কথায় ৫০ লক্ষ লোক হয়।

বেলক (Beloch) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে সিজার অগাস্টসের মৃত্যুকালে (১৪ খ্রী) রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল প্রায় ৩৩৬৭০০০ বর্গ কিলোমিটার (১৩ লক্ষ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি। পরবর্তী দুই শত বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া সম্রাট মার্কাস আউরেলিয়সের মৃত্যুকালে (১৮০ খ্রী) হইয়াছিল ১৫ কোটি। তাহার পর আবার কমিয়া যায়। চীন দেশের হিসাব অনুযায়ী ২ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি, ১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিয়া হয় ৫ কোটি। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০ অব্দে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা ছিল ১৮ কোটি। বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু জনসংখ্যা আন্দাজ করিতে পারিলেও সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা আন্দাজ করা সম্ভব নয়।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৪৭ কোটি, অন্য হিসাবে ৫৪.৫ কোটি হইয়াছে। ৩৫০ বৎসরে তিন গুণ বাড়িয়াছে। এই হিসাবের পার্থক্যের প্রধান কারণ, পৃথিবীর একটা বিস্তৃত অংশে এমন কি বর্তমান যুগে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেও আদৌ সেন্সাস হয় নাই।

জাতিসংঘের হিসাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা

বৎসর	জনসংখ্যা / কোটি
১৯২০ খ্রী	১৮৩.৪
১৯৩০ খ্রী	২০০.৮
১৯৪০ খ্রী	২১১.৬
১৯৫০ খ্রী	২৪০.৬
১৯৬২ খ্রী	৩১৮

জনসংখ্যা ৪০ বৎসরে দেড়গুণের উপর বাড়িয়াছে, আয়ুবৃদ্ধির হারও বাড়িতেছে। এইভাবে জনসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে আগামী দুই-তিন শত বৎসরে ভূপৃষ্ঠে মানুষের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। তবে আশা হয় যে বৃদ্ধির হার বরাবর এইরূপ থাকিবে না।

ভারতবর্ষ বরাবরই জনবহুল দেশ বলিয়া খ্যাত। খ্রীষ্টের ৩০০০ বৎসর পূর্বে সিন্ধু-সভ্যতার কাল, ঐ সভ্যতার এলাকায় ৭০/৮০টি শহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, দুইটি রাজধানী হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো শহরে যথাক্রমে ৩৭০০০ ও ৩৩৫০০ জন লোক বাস করিত, এইরূপ অনুমান করা হয়। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হেরোদোতস (৪৮৫-৪২০ খ্রীষ্টপূর্ব) লিখিয়াছেন যে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ জনবহুল, পাঞ্জাব হইতে মিশর ও রোম পর্যন্ত বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব কেবল পাঞ্জাব হইতেই অর্জিত হয়। স্ট্রাবো (Strabo, ৬৭-২৪ খ্রীষ্টপূর্ব) লিখিয়াছেন যে পাঞ্জাবে ঝিলম ও বিয়াস নদের মধ্যে ৫০০০ শহর আছে এবং প্রত্যেকটি গ্রীসের কিয়স (Chios) শহর অপেক্ষা বড় বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু তাঁহার মতে ইহা অতিশয়োক্তি। প্রত্যেক শহরে গড়ে ১০০০ লোক ধরিলে এই অঞ্চলে ৫০ লক্ষ লোক হয় — এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে ছিল ৫৭ লক্ষ লোক। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৬০০ হইতে ৭০০ লক্ষ। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের (৩২৪-৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) সময়ে জনসংখ্যা ১৮৬০ লক্ষ। অশোকের (২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপূর্ব) সময়ে জনসংখ্যা ১০০০ হইতে ১৪০০ লক্ষ ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

আকবরের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা ফেরিশ্‌তা বলেন, মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৬০ কোটি ছিল। কিন্তু তিনি এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। আমরা তাঁহার তিনগুণ ভুল হইয়াছে বলিয়া যদি আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ কোটি লোক ছিল ধরি, তাহা হইলেও দেখা যায় যে পরবর্তী ৬০০ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া কমিয়া গিয়াছিল। মোরল্যাণ্ড সাহেবের মতে আকবরের মৃত্যুকালে (১৬০৫ খ্রী) জনসংখ্যা ১০ কোটি

ছিল, কাহারও কাহারও মতে এই সময়ে জনসংখ্যা ১১ কোটি বা ১২ কোটি ছিল।

১০০০ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা কমিবার যথেষ্ট হেতু আছে। সুলতান মামুদ ১৭বার ভারত আক্রমণ করিয়া ব্যাপক নরহত্যা, লুণ্ঠন ও বহু নারীকে বন্দী করিয়া চালান করেন। তৈমুরলঙ্গও ঐরূপ ব্যাপক নরহত্যা ও বহু নর নারীকে বন্দী করিয়া সমরখন্দে লইয়া যান। এক লক্ষ বন্দীকে তিনি কোতল করেন। মহম্মদ তোগলক ব্যাপকভাবে প্রজা হত্যা করিতেন। মহম্মদ তোগলক কনৌজ হইতে ডালঘাট পর্যন্ত সমস্ত ভূ ভাগ শ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্য দিয়া জঙ্গল ঘিরিয়া ১৮০০০০ সবল লোককে হত্যা করেন। ফিরোজ তোগলক ওড়িশা আক্রমণ করিয়া ওড়িশার অন্ততঃপক্ষে দুই আনা লোককে হত্যা করেন।

১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'গুটি' মহামারীরূপে আসে বলিয়া মনে করিবার সংগত কারণ আছে। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ মহামারীরূপে পাঞ্জাবে দেখা দেয় ও ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ আছে। দাক্ষিণাত্যে ১৭০৩ ০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ দেখা দেয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ন্যায় ব্যাপক ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা যায়। এই সমস্ত কারণ একত্রীভূত হইয়া জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কম হওয়া অসম্ভব তো নয়ই, বরং হওয়াই সংগত বলিয়া মনে হয়।

মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার মুখে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সব স্থানেই যুদ্ধবিগ্রহ, বর্গীর অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

পূর্বে জনবৃদ্ধির হার খুব কম ছিল। সিন্ধু সভ্যতার সময়ে বৃদ্ধির হার প্রতি ১০০ বৎসরে শতকরা ৪ হইতে ৬ ছিল। এই হারে মহাভারতের যুগের ৭ কোটি, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ১৪ কোটি হয়, কিন্তু হিসাবে হইয়াছে ১৮ ৬ কোটি। বৃদ্ধির হার কিছু বাড়িয়াছিল ধরিলে অসংগত হয় না। মোগল যুগে বা পরে বৃদ্ধির হার প্রতি ১০ বৎসরে শতকরা দুই এরও কম ছিল। এই হারে ১৫০ বৎসর ধরিয়া সর্বভারতের বৃদ্ধি ধরিলে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা ১৩ ৪ কোটি হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫০ বৎসরে ভারতবর্ষে যে হারে লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল, তৎপূর্ববর্তী ৫০ বৎসরে সেই হারে লোকবৃদ্ধি ধরিলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ কোটি ১৭ লক্ষ। ১৮৩১ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শত বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৭৬'৪ জন।

সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম আদমশুমার বা সেন্সাস হয় ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে কিছু কিছু জায়গা ছাড় পড়িয়াছিল। ইহার পূর্বে ১৮৫৩ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনও কোনও প্রদেশে বা শহরে সেন্সাস হইলেও সর্বভারতীয় সেন্সাস প্রথম হয় ১৮৭১ ৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই গণনার সময়ে লোকে ভীত হইয়া সঠিক সংখ্যা লিখায় নাই। অতঃপর প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর সেন্সাস হইতেছে।

সেন্সাস অনুযায়ী ব্রিটিশ অধীন ভারতবর্ষে

খ্রীষ্টাব্দ	জনসংখ্যা / লক্ষ
১৮৭২	২০৪৯
১৮৮১	২৫০২
১৮৯১	২৭৯৬
১৯০১	২৮৩৭
১৯১১	৩০৩১
১৯২১	৩০৫৭
১৯৩১	৩৩৮১
১৯৪১	৩৮৯০

স্বাধীনতা লাভের পর

	ভারত	পাকিস্তান	
১৯৫১	৩৬১১	+ ৭৫৮	৪৩৬৯ লক্ষ
১৯৬১	৪৩৯২	+ ৯৩৮	৫৩৩০ লক্ষ

উক্ত হিসাবে ব্রহ্ম দেশের জনসংখ্যা বরাবর বাদ দিয়া হিসাব করা হইয়াছে। তালিকায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি সবটাই স্বাভাবিক নহে। নূতন নূতন স্থানে সেন্সাস হওয়ায় জনসংখ্যা খানিকটা বাড়িয়াছে, আবার খানিকটা বাড়িয়াছে গণনা পদ্ধতির উন্নতির জন্য। নিজামরাজ্যে প্রথম সেন্সাস হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, বেলুচিস্তানে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উপরি উক্ত হিসাবে নেপাল, ভুটান, ফরাসী ও পর্তুগাল অধিকৃত ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ধরা হয় নাই। এখন ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ও পর্তুগাল -অধিকৃত ভারতবর্ষ ভারতের অঙ্গে মিশিয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের জনসংখ্যা / লক্ষ

ভারত ও পাকিস্তান	৫৩৩০
নেপাল	৯২
ভুটান	৭
মোট	৫৪২৯ লক্ষ

বর্তমান ভারতের আয়তন ৩১৪০৬৭০·২৬ বর্গ কিলোমিটার (১২১২৬১৪ বর্গ মাইল), পাকিস্তানের আয়তন ৯৪৩৭২৬·০৭ বর্গ কিলোমিটার (৩৬৪৩৭৩ বর্গ মাইল), নেপালের ১৪৮০০০·৩৭ বর্গ কিলোমিটার (৫৭১৪৩ বর্গ মাইল) এবং ভুটানের ৫০৫০৫·০০ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ১৯৫০০ বর্গ মাইল)।

ভৌগোলিক ভারতবর্ষের আয়তন প্রায় ৪২৮২৯০১·৭০ বর্গ কিলোমিটার (১৬৫৩৬৬৩ বর্গ মাইল)।

ভারতের গত ৬০ বৎসরের জনসংখ্যার হিসাব

খ্রীষ্টাব্দ	জনসংখ্যা	শতকরা হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+)
১৯০১	২৩৬২৮১২৪৫	—
১৯১১	২৫২১২২৫১০	+ ৫·৭৩
১৯২১	২৫১৩২২২৬১	০·৩১
১৯৩১	২৭৯০১৫৪৯৮	+১১·০১
১৯৪১	৩১৮৭০১০১২	+১৪·২২
১৯৫১	৩৬১১২৯৬২২	+১৩·৩১
১৯৬১	৪৩৯২৩৫০৮২	+২১·৫০

৬০ বৎসরে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৮৫·৯ জন।

অখণ্ড বঙ্গের জনসংখ্যা

খ্রীষ্টাব্দ	জনসংখ্যা	শতকরা হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+)
১৮৭২	৩৪৬৯১৭৯৯	-
১৮৮১	৩৭০২০৫৬৩	+ ৬·৭
১৮৯১	৩৯৮১২১৬৫	+ ৭·৫
১৯০১	৪২৮৮৮১৯৪	+ ৭·৭
১৯১১	৪৬৩১২২৬২	+ ৮·০
১৯২১	৪৭৫৯৯২৩৩	+ ২·৮
১৯৩১	৫১০৮৭৩৩৮	+ ৭·৩
১৯৪১	৬২৪৫১৩৫৭	+২২·২

বিভাগোত্তর কালের জনসংখ্যা

খ্রীষ্টাব্দ	পশ্চিম বঙ্গ	বৃদ্ধি%	পূর্ব পাকিস্তান	বৃদ্ধি%
১৯৫১	২৬৩০২৩৮৬	—	৪২০৬৩০০০	—
১৯৬১	৩৪৯২৬২৭৯	৩২·৮	৫০৮৪৪০০০	২০·৯

উক্ত জনসংখ্যার মধ্যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কিছু লোক গণনা হইতে বাদ পড়িয়াছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুগণ সেন্সাসে নাম না লিখাইবার জন্য জনসংখ্যা কিছু কম হইয়াছে, আবার ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ তাঁহাদের সংখ্যা স্ফীত করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের সহিত পূর্ব পাকিস্তান যোগ করিলে অখণ্ড বঙ্গ হইবে না, কারণ অখণ্ড বঙ্গ হইতে ত্রিপুরা বাদ গিয়াছে, আবার পুরুলিয়া ও কিষণগঞ্জের সামান্য অংশ পশ্চিম বঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানেও শ্রীহট্ট জেলার বেশির ভাগ অংশ যুক্ত হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের গত ৬০ বৎসরে জনসংখ্যার (১৯৬১ খ্রী.) তারতম্য

খ্রীষ্টাব্দ	জনসংখ্যা	শতকরা হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+)
১৯০১	১৬৯৪১৮৭৩	—
১৯১১	১৮০০০৬৬১	+ ৬·২৫
১৯২১	১৭৪৭৪৬৭৩	− ২·৯১
১৯৩১	১৮৮৯৯১১৮	+ ৮·১৪
১৯৪১	২৩২৩১৮২৯	+২২·৯৩
১৯৫১	২৬৩০২৩৮৬	+১৩·২২
১৯৬১	৩৪৯২৬২৭৯	+৩২·৭৯

উপরে যে সব শতকরা বৃদ্ধির হার দেওয়া হইল, তাহার সবটাই জনসংখ্যার স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির দরুন নহে, কিন্তু বেশ খানিকটা দেশের বা অঞ্চলের বাহির হইতে লোকের আগমনহেতু। যেমন দেশে বাহির হইতে লোক আসে, তেমনই কিছু লোক দেশের বাহিরে যায়। বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে বাহির হইতে আসা লোকের সংখ্যা বাহিরে চলিয়া যাওয়া লোকের সংখ্যা অপেক্ষা ঢের বেশি।

উল্লিখিত কারণে পূর্ববর্তী হিসাব সঠিক না হওয়ায় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনুপাত প্রতি ১০ হাজারে হিন্দু ৮৩৫১, মুসলমান ১০৬৯, খ্রীষ্টান ২৪৪, শিখ ১৭৯, বৌদ্ধ ৭৭, জৈন ৪৬, অন্যান্য ৩৭। পারসীকদের সংখ্যা দেওয়া না থাকায় হিসাব করা গেল না।

নরনারীর অনুপাত কোনও দেশেই কোনও সময়ে সমান সমান থাকে না, কখনও বেশি, কখনও কম। তবে মোটামুটি কাছাকাছি হইবার লক্ষণ দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫৬, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫৮, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৬৩, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫৩, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৪৪, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৪০, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৩৫।

জনসংখ্যা

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৯৪৬, পাকিস্তানে ৮৯২, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৯৪০, পাকিস্তানে ৯০৮।

খাদ্যভেদে অঞ্চলভেদে ও জাতিভেদেও নরনারীর অনুপাতের তারতম্য দেখা যায়। যাহারা গম, বাজরা প্রভৃতি খায় তাহাদের মধ্যে নারীর অনুপাত কম, আর যাহারা ভাত খায় তাহাদের মধ্যে বেশি। কোনও কোনও অঞ্চলে নারীর অনুপাত খুবই কম, আবার কোনও কোনও অঞ্চলে নারীর অনুপাত বেশি। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল অশোক মিত্র বলেন যে ২২° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে নারীর অনুপাত কম, দক্ষিণে বেশি।

ভারতে প্রতি হাজারে নারীর অনুপাত নিম্নে দেওয়া হইল:

১৯০১খ্রী ৯৭২, ১৯১১খ্রী ৯৬৭, ১৯২১খ্রী ৯৫৫, ১৯৩১খ্রী ৯৫০, ১৯৪১খ্রী ৯৪৫, ১৯৫১খ্রী ৯৪৬, ১৯৬১খ্রী ৯৪০। অনুপাত ৬০ বৎসরে হাজারকরা ৩২ জন কমিয়াছে।

যতদূর তথ্য পাওয়া যায়, বাংলা দেশে পূর্বে নারীর অনুপাত কম ছিল, মধ্যে বাড়িয়াছিল, আবার কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে নারীর অনুপাত বেশি কমিবার প্রধান কারণ, বাহির হইতে কলকারখানার জন্য শ্রমিকদের আগমন। ইহা বাদ দিলেও হিন্দুদের মধ্যে নারীর অনুপাত মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি কমিতেছে বলিয়া মনে হয়।

যাহারা পাগল, বোবা, অন্ধ বা চোখে ভাল দেখিতে পায় না বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত তাহাদের আমরা 'কর্মাক্ষম' ব্যক্তিদের হিসাবে ফেলিয়াছি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পর এই বিষয়ে কোনও তথ্যাদি ব্যাপকভাবে সংগৃহীত হয় নাই, সংগৃহীত বিবরণের মধ্যে বহু ভুলভ্রান্তি ঘটে বলিয়া সরকার এই প্রকারের তথ্যাদি সংগ্রহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে ১৮৮১ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫০ বৎসরের তথ্যের সার সংকলন করিয়া দেওয়া হইল।

প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে

	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
পাগল	৩৭	২৮	২৬	২৩	২৭	৩৫
কালা-বোবা	৬৬	৬০	৬৪	৫২	৭৫	৮৬
কানা	১৭২	১৩২	১৪২	১২১	১৬৭	২২৯
কুষ্ঠগ্রস্ত	৪২	৩২	৩৫	৩৩	৪৬	৫৭
মোট	৩১৪	২৫২	২৬৭	২২৯	৩১৫	৪০৭

ইংরেজ-অধীন ভারতবর্ষে জনসংখ্যা হিসাবে মুসলমানদিগের অনুপাত ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছিল। নিম্নে অনুপাত দেওয়া হইল:

প্রতি ১০ হাজারের অনুপাতে মুসলমান জনসংখ্যা

১৮৮১ খ্রী	১৯৭৪
১৮৯১ খ্রী	১৯৯৬
১৯০১ খ্রী	২১২২
১৯১১ খ্রী	২১৭৬
১৯২১ খ্রী	২৯৭৪
১৯৩১ খ্রী	২২১৬
১৯৪১ খ্রী	২৩৮১

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে মুসলমানদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হিন্দু বা অপরাপর জাতি অপেক্ষা বেশি বলিয়া এই আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটিতেছে। মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাহ, বিশেষ করিয়া বিধবা বিবাহ চলিত থাকায় ও উহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার না থাকায় কিছুটা বৃদ্ধি স্বাভাবিক কারণবশে হইয়াছে। কিন্তু বেশির ভাগ আনুপাতিক বৃদ্ধি নূতন নূতন মুসলমান অধ্যুষিত স্থানে সেন্সাস হওয়ায় এবং মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব বঙ্গ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হওয়ার দরুনই হইয়াছে।

মুসলমানদিগের অনুপাত বরাবর স্বাভাবিক কারণে বাড়ে নাই। জাহাঙ্গীর বাদশাহ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে প্রত্যেক ৫ জন হিন্দুতে একজনমাত্র মুসলমান। এখনে তাহাদের অনুপাত হয় ১৬৬৭ (১৬২ খ্রী)। তাহার পর ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বহু হিন্দুকে মুসলমান হইতে হয়। নাদিরশাহ ও আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী বহু হিন্দুকে হত্যা ও বন্দী করিয়া লইয়া যান। তথাপি ২৫০ বৎসরে তাহাদের অনুপাত বাড়িয়াছিল ১০ হাজারে ৩০৭, আর ৬ বৎসরে বাড়িয়াছে ৪০৭— ইহা হইতেই পারে না। পুনিয়ায় বুকানন-হ্যামিলটন (১৮০৭ ১২ খ্রী) মুসলমানদিগের যে অনুপাত দেখিয়াছিলেন, এখন তাহা অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। আরও একটি ছোট কারণে সেন্সাস যুগে মুসলমানদিগের অনুপাত বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ণভাবে মুসলমান না এমন জাতিকে মুসলমান বলিয়া ধরা হইয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মুসলমানদিগের সংখ্যা ৪৬৯৩৯৩৫৭ জন। পাকিস্তানে মুসলমানদিগের চূড়ান্ত সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই বলিয়া মোটামুটি হিসাব এইরূপ: পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৯৯.৫ এবং

পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৮০ ৪, পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁহাদের অনুপাত ৭০-৭২ ছিল এখন বহু হিন্দু ভারতে চলিয়া আসায় তাঁহাদের অনুপাত বাড়িয়াছে। ভারতে মুসলমানদিগের অনুপাত ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল শতকরা ৯.৯১ জন, এক্ষণে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ১০.৬৯। মুসলমানদিগের বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ২৫.৬১ জন, ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২১.৫১ জন। এই অতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণ, বহু মুসলমান পাকিস্তান হইতে ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এই অনুপ্রবেশ সরকারি হিসাব মতে ১০৩৩০০০। আমাদের মতে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা আরও বেশি। এই অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দিলে বৃদ্ধি হয় শতকরা ২২ ৬ জন।

মুসলমানদিগের মধ্যে শিয়া ও সুন্নীর বিভেদ আছে। শিয়ারা নিজেদের ধর্মমত গোপন বা 'তাকিয়াঃ' করিতে পারেন। এইজন্য শিয়াদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের সর্বভারতীয় সেন্সাস রিপোর্টের ১২০ পৃষ্ঠায় যে হিসাব দেওয়া আছে, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল

প্রদেশ	মুসলমানদের মধ্যে শতকরা	
	সুন্নী	শিয়া
আসাম	১০	—
বেলুচিস্তান	৯৬	১
বাংলা	৯৯	১
বিহার ও ওড়িশা	৯৯	১
বোম্বাই	৮৮	৩
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৯৮	২
মাদ্রাজ	৯৪	২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯৫	৪
পাঞ্জাব ও দিল্লী	৯৭	২
বরোদা	৮৮	১০
কাশ্মীর	৯১	৫
রাজপুতানা ও আজমীর	৯৮	২

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে (ব্রহ্ম দেশ বাদ দিয়া) শিখদের অনুপাত ছিল হাজারকরা ১২.৮। বর্তমানে (১৯৬১ খ্রী) উহাদের অনুপাত হাজারকরা ১৭.৯, এই অনুপাত বাড়িবার দুইটি কারণ বলা যায়: ১. পাকিস্তান হইতে সমস্ত শিখ বিতাড়িত হইয়া ভারতে আসিয়াছে এবং ২. বহু হিন্দু শিখ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি / শতকরা

পাঞ্জাব (দেশীয় রাজ্যসমেত)	৯৩.৯
উত্তর প্রদেশ	১.০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১ ৯
সিন্ধু	০ ৪
জম্মু ও কাশ্মীর	১.২
বোম্বাই প্রদেশ	০ ৪
মোট	৯৮.৮

অন্যান্য প্রদেশে তাঁহারা ছড়াইয়াছিলেন খুব অল্প সংখ্যায়।

পারসীক: ভারতবর্ষে যাহারা পারসীক বলিয়া পরিচিত তাহারা জরথুশত্রের ধর্ম ও অনুশাসন মানিয়া চলেন। আদি বাড়ি ইরান বা পারস্য হইতে তাহারা খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগে (আনুমানিক ৮৫০ খ্রী) অধিক সংখ্যায় ভারতে আসিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ০০৩ এরও কম ছিলেন। ইহার পরে আর তাঁহাদের পৃথক করিয়া গণনা করা হয় নাই। ইহাদের মধ্যে প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৭২ জন স্ত্রীলোক (১৯৫১ খ্রী), ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৯৪০, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৯৪৩।

বোম্বাই, বরোদা, গুজরাত ও পশ্চিম ভারতের দেশীয় রাজ্যে তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ৯৫০৭৩ বা সমস্ত পারসীক জাতির শতকরা ৮২ ৭ ভাগ। আর ইহার মধ্যে কেবলমাত্র বোম্বাই শহরে ৫৯৮১৩ জন বা শতকরা ৫২জন বাস করেন। পারসীকেরা শহরবাসী, গ্রামে বাস করিতে চাহেন না। ইহারা অন্যান্য ভারতবাসী অপেক্ষা গড় দীর্ঘজীবী।

বৌদ্ধ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্ম দেশ বাদ দিয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল ৪৪০৭৬৯ জন। অখণ্ড বঙ্গে ছিল ৩৩০৫৬৩ জন। যে অংশ পাকিস্তানে পড়িয়াছে তাহার মোটামুটি হিসাব এইরূপ। ঢাকা বিভাগে ১২৪১৭, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩৩২৪২, মোট ২৪৫৬৫৯ জন। ইহাদের বাদ দিলে বাকি ভারতে বৌদ্ধদের সংখ্যা ১৯৫১১০ জনের বেশি হইতে পারে না। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল ৩৮৭২৫। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ৪০৬৯৬। দশ বৎসরে বৃদ্ধি শতকরা ৫.২২। পূর্ব পূর্ব দশকে শতকরা বৃদ্ধি এইরূপ হইয়াছিল

১৯০১-১১ খ্রী	৪ ২
১৯১১-২১ খ্রী	৩.২
১৯২১-৩১ খ্রী	২ ৭
১৯৩১-৬১ খ্রী	৫.২
গড় বৃদ্ধি	৩ ৮

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর ও জম্মুতে সেন্সাস হয় নাই। শতকরা ৫ ভাগ বাড়িলে বৌদ্ধদের সংখ্যা হয় ৪২৭৩৫ জন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী কাশ্মীর ও জম্মু বাদ দিয়া বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল ১৮০৮২৩। এখন কাশ্মীর ও জম্মুতে বৌদ্ধদের সংখ্যা ৪৮৩৬০। ভারতে সর্বমোট বৌদ্ধদের সংখ্যা হইতেছে ৩২৫০২২৭ জন। অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮০৮২৩-এর পরিবর্তে হইয়াছে ৩২০২১৩৩ জন। বৃদ্ধি শতকরা ১৬৭১.৭।

দশ বৎসরে বৌদ্ধদের বৃদ্ধি ৩০২১৩১০ জনের মধ্যে একমাত্র মহারাষ্ট্রেই বাড়িয়াছে ২৭৮৭০১৪ জন। তাঁহারা ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ০.৭৪ জন হইয়াছেন। বৌদ্ধদের সংখ্যা এইরূপভাবে বাড়িবার কারণ ভীমরাও আম্বেদকারের নেতৃত্বে বহু তফসিলী হিন্দু রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি পাইবার আশায় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে বর্ণ-হিন্দুদের বৈষম্যমূলক ব্যবহার ইহার একটি প্রধান কারণ। এই অনুমান ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে মাদ্রাজে ও কেরলে যেখানে বৈষম্যমূলক ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশি, সেখানে বৌদ্ধদের সংখ্যা নগণ্য হইত না বা কমিয়া যাইত না। বাংলায় মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন যে বর্ণ-হিন্দুদের অত্যাচারে দলে দলে লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এ যুক্তিও ঠিক নহে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে বর্ণ-হিন্দুদের অপেক্ষা তফসিলী হিন্দুরা আনুপাতিক হিসাবে বেশি ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন। ফলে ১৯৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দ— এই দশ বৎসরে যেখানে বর্ণ-হিন্দুদের বৃদ্ধি হইতেছে শতকরা ৪.৭৬, সেখানে তফসিলী হিন্দুরা কমিয়া গিয়াছেন শতকরা ১.১৭ জন। আর ইঁহারা যে দলে দলে মুসলমান হইয়া যাইতেছেন সে সংবাদও পাওয়া যাইতেছে না।

সিকিম, লদাখ প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধদের মধ্যে বহু মঠ, লামা-সরাই আছে। বহু লামা বা শ্রমণ বা ভিক্ষু আছেন। কিন্তু আম্বেদকারী বৌদ্ধদের মধ্যে কেহ শ্রমণ বা ভিক্ষু হন নাই বা কোনও মঠ বা সংঘারাম স্থাপিত করেন নাই। ইঁহারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে বৌদ্ধ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেছেন।

দ্র United Nations, *Demographic Yearbook*, New York, R R Kuozynski, *Measurement of Population Growth*, London, 1935; A. M. Carr-Saunders, *World Population*, London, 1936; S. Chandrasekhar, *Population and Planned Parenthood in India*, London, 1955; *Census of India: 1961*, Delhi.

যতীন্দ্রমোহন দত্ত

জনসংঘ, ভারতীয় সংক্ষেপে জনসংঘ। ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক দল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই দলটি প্রথম গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃবর্গ জনসংঘের সঙ্গে প্রথম হইতেই যুক্ত ছিলেন। অখণ্ড ভারত ও অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তা এই দলের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতাকালীন ভারত বিভাগ জনসংঘ চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন না। জনসংঘের মতে ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতিই ভারতীয় জাতীয়তার উৎস এবং পরমত সহিষ্ণুতা ও ধর্মবিষয়ে উদারতা এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ধর্মনির্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের লোকই ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। সুতরাং ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগ নিরর্থক ও ক্ষতিকারক। এই বিচ্ছেদের অবসান ঘটানো জনসংঘের পক্ষে এক প্রধান কর্তব্য। অবিভাজ্য অঙ্গরাজ্যরূপে কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত পূর্ণতঃ সংযুক্ত হউক, এই দাবির পক্ষে জনসংঘ অবিরত প্রচার-কার্য চালাইয়াছেন।

জনসংঘ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। জনসংঘ সমগ্র ভারতকে একটি কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র (ইউনিটারি স্টেট) হিসাবে গঠিত করিতে চাহেন। বর্তমান সংবিধানের মাধ্যমে জনসংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী সফল হইতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে গণতান্ত্রিক উপায়েই এই সংবিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া জনসংঘের নেতৃবর্গ ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতীয় জাতীয়তার পূর্ণবিকাশের জন্য রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীর আশু প্রচলন জনসংঘের মতে অপরিহার্য। ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচলিত সংস্কার লক্ষ্য করিয়া এবং অর্থনৈতিক কারণবশে জনসংঘ আইনগতভাবে গোহত্যা-নিবারণের পক্ষপাতী। সকল সম্প্রদায়ের লোকই জনসংঘের সভ্য হইতে পারে। জনসংঘের কার্যসূচী সাম্প্রদায়িকতাদোষদুষ্ট বলিয়া কেহ কেহ যে অভিযোগ করিয়া থাকেন, জনসংঘের নেতৃবর্গ তাহা অস্বীকার করেন।

প্রচারিত কার্যসূচী অনুসারে জনসংঘের অর্থনৈতিক নীতি সংক্ষেপে দেওয়া হইল—

ক. মূল লক্ষ্য : ১. সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান ২. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং প্রত্যেক পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ৩. আয়বৈষম্য হ্রাস করা

৪. প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে জাতিকে স্বাবলম্বী করা ৫. দেশের সকল অংশের সমভাবে উন্নয়ন।

খ. অগ্রাধিকার: ১. সামরিক অস্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ২. কৃষির উন্নয়ন ৩. ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনে স্বল্প মূলধন-সাপেক্ষ শিল্পের দ্রুত প্রসার ৪. মৌলিক ও সর্বপ্রয়োজনীয় শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা।

জনসংঘ অর্থনীতির বিরোধী এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, কিন্তু বর্তমান আকারের পরিকল্পনা কমিশন বা তাহার কর্মপদ্ধতি জনসংঘ সমর্থন করেন না। বিশেষতঃ সরকারি ও বেসরকারি শিল্পসম্পর্কে বর্তমান সরকার যে তারতম্য অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহা জনসংঘের নীতি-বিরুদ্ধ। কতকগুলি নির্ধারিত ক্ষেত্রব্যতীত বেসরকারি উদ্যমেই ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়ন হওয়া উচিত বলিয়া জনসংঘ মনে করেন।

জনসংঘের মতে মূল শিল্পব্যতীত ক্ষুদ্র শিল্প, কুটিরশিল্প ও কৃষির উপর সমধিক জোর দেওয়া প্রয়োজন এবং বৃহৎ যন্ত্রশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের পৃথক পৃথক ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃষিনীতি সম্পর্কে কংগ্রেস বা বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে জনসংঘের মৌলিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কৃষকদের বহুযুগের অভিজ্ঞতা অনুসারে জৈব সারের প্রয়োগ ও ক্ষুদ্র সেচের পরিকল্পনা ভারতের পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলিয়া জনসংঘ মনে করেন। প্রকৃত চাষীই জমির মালিক এই নীতি জনসংঘ সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু পরিবার প্রতি জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ তাঁহাদের মতে অনেক বেশি হওয়া উচিত। উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন সম্পর্কে জনসংঘের নীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করার নীতি জনসংঘ সমর্থন করেন না। জনসংঘের মতে যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক কৃষক-পরিবারকে কৃষিকাজ লাভজনক হইতে পারে এরূপ ন্যূনতম পরিমাণ জমি সর্বাগ্রে দিতে হইবে। উদ্বৃত্ত জমি তদনুযায়ী অল্পজমির মালিক কৃষক-পরিবারদের মধ্যে বণ্টন করাই জনসংঘের নীতি। জনসংঘ যৌথ বা সমবায় প্রথায় চাষের বিরোধী।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন করা জনসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। জনসংঘের মতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ও সম্পূর্ণ ভারতের স্বার্থে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত। 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' এই চাণক্য-নীতি জনসংঘের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা। কিন্তু ভারতকে এই নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রভূত সামরিক বল অর্জন করিতে হইবে। তজ্জন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনীর গঠন ও নিজস্ব আণবিক বোমা-নির্মাণ জনসংঘের মতে ভারতের পক্ষে অপরিহার্য।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে জনসংঘ কয়েকটি রাজ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছেন। দিল্লী মেট্রোপলিটান কাউন্সিলে জনসংঘ এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে জনসংঘ কংগ্রেস-বিরোধী সংযুক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়াছেন। হরিয়ানাতেও জনসংঘ সংযুক্তদলের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু জনসংঘের কেহ মন্ত্রীসভার সদস্য নহেন। এতদ্ব্যতীত রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে জনসংঘ অন্যতম শক্তিশালী দল।

দ্র *Bharatiya Jana Sangha: Principles and Policy*, Delhi, 1965; Balraj Madhok, *What Bharatiya Jana Sangh Stands For*, Delhi, 1966

অমরেন্দ্রনাথ দাস

জনস্বাস্থ্য মহামারী-নির্মূলন, বিশুদ্ধ পানীয় জল-সরবরাহ, উন্নত মাতৃকল্যাণ ও শিশুপরিচর্যার ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রসারের সাহায্যে দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা হয়। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের। রাজ্য-সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে চিকিৎসক, নার্স, সমাজসেবিকা, টিকাদার প্রভৃতির সাহায্যে জেলা, মহকুমা, গ্রাম প্রভৃতি পর্যায়ে এ কার্য নিষ্পন্ন হয়। শহরগুলিতে পৌরপ্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব বহন করে। জন্মমৃত্যুর হার, বিশেষতঃ ১ বৎসরের শিশুর মৃত্যুহারের পরিবর্তন জনস্বাস্থ্যের উন্নতির মাপকাঠি বলিয়া পরিগণিত হয়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে মহামারী নির্মূলন ব্যবস্থার মধ্যে চিকিৎসাব্যবস্থা ও মশক নিবারণের সাহায্যে ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়ার প্রসার রোধের চেষ্টা, গণটিকা অভিযানের দ্বারা বসন্তরোগ নির্মূলনের প্রয়াস, বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, দ্রুত আবর্জনা অপসারণ, মক্ষিকা নিবারণ ও টিকাদানের সাহায্যে কলেরা-নিরোধের প্রচেষ্টা, রোগীর পৃথকীকরণ ও দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার দ্বারা কুষ্ঠ নিবারণের প্রয়াস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণকে স্বাস্থ্য ও রোগনিবারণ সম্বন্ধে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, চিত্রপ্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রসারও জনস্বাস্থ্য কার্যসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ।

বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশের উন্নতিবিধানের দ্বারা শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন শিল্পস্বাস্থ্যের

কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শিল্পে নানা প্রকার বিষাক্ত গ্যাস, ধূলিকণা প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়া কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হয়। এ সকল ক্ষতিকর পদার্থের প্রভাব হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা এবং যন্ত্রাদির উপর নিরাপত্তামূলক আচ্ছাদনী ব্যবহার শিল্পে স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুর্ঘটনা নিরোধের জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রশান্তকুমার বিশ্বাস

জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইমারতের পরিকল্পনা ও নির্মাণই জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং। সে হিসাবে খাদ্য প্রস্তুতি, গৃহ নির্মাণ ও জীবন যাপনের অনেক কিছুই ইহার অন্তর্গত হওয়া উচিত, কিন্তু সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বলিতে এইগুলিকে বুঝায় নিরাপদ ও পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, বসতির জঞ্জাল ও মলমূত্র পরিষ্কার এবং ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ আধুনিক জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজের মধ্যে এই বিষয়গুলি প্রধান. প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ নির্ণয়, জলের উৎস সন্ধান ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয়, জলকল (পাম্পিং স্টেশন), কৃত্রিম হ্রদ নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, নর্দমা ও ভূনিম্নস্থ পয়োনালীর ও তাহার আনুষঙ্গিক ম্যানহোল প্রভৃতির নির্মাণ ও পরিচালনা, বৃষ্টির জল নিকাশের ব্যবস্থা, নগরের জঞ্জাল দূরীকরণ, নোংরা জল পরিশোধনের জৈব রাসায়নিক বিভিন্ন পদ্ধতি, নানা বস্তুর ড্রেন পাইপ বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিক পায়খানার সরঞ্জাম খাটানো ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

যেখানে ঝরনা, প্রস্রবণ অথবা নদী হ্রদ নাই, সেখানে বসতির প্রয়োজনে জল সরবরাহের জন্য অনতিগভীর কূপ ও পুষ্করিণী খনন অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। চীন দেশের সুপ্রাচীন গভীর কূপ আজও বর্তমান। দূরের ঝরনা অথবা নদী হইতে নগরে জল-সরবরাহের কৃত্রিম প্রণালী নির্মাণের বহু প্রাচীন নিদর্শন পৃথিবীর প্রায় সর্ব দেশেই আছে। রোমের জলনালী ভুবনবিখ্যাত। রোম সভ্যতার পতনের পরে ইওরোপীয় নগরগুলিতে জলসরবরাহের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় এবং দূষিত জল ব্যবহারের ফলে বহু স্থানে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মহামারীর ধ্বংসলীলা চলে। মহেঞ্জো দড়ো-হরপ্পার যুগ হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্রই নগর-পত্তনের পরিকল্পনায় জল সরবরাহ ও ময়লা জলের নিকাশ ব্যবস্থা কখনও উপেক্ষিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য বর্তমান যুগের কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মত অতিবসতিসংকুল নগরের সমস্যা অতীত যুগে ছিল কিনা সন্দেহ। মহেঞ্জো দড়ো, হরপ্পা, আসীরীয় নিমরুদের পয়ঃপ্রণালীর ইমারত হইতে আরম্ভ করিয়া রোমের বড় নালা (ক্লোয়াকা ম্যাক্সিমা), পাটলিপুত্র ও সারনাথের পয়ঃপ্রণালী প্রাচীন যুগের ময়লা জল-নিকাশ ব্যবস্থার নিদর্শন।

লণ্ডন ও পারী শহরে আধুনিক যুগের জল সরবরাহ ব্যবস্থার যদিও পত্তন হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, তথাপি ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত পাম্প ব্যবহারের পূর্বে ইহার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। আধুনিক ভূনিম্নস্থ পয়োনালী (Sewers)-প্রবর্তনের যুগ আসিয়াছে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ হইতে পয়ঃপরিশোধনের (Sewage Purification Plant) দিকে নজর পড়িয়াছে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরিকল্পনা আরম্ভ করিয়া দশ বৎসর পরে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পরিশুদ্ধ জল সরবরাহের (কলের জলের) ব্যবস্থা হয়। ভূনিম্নস্থ পয়োনালীর কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। কলিকাতার অনেক পরে পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য শহরে পরিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। আধুনিক দুর্গাপুর শহর ও কল্যাণী উপনগরী এবং হাওড়ার কোনও কোনও স্থান ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য শহরে ভূনিম্নস্থ পয়োনালীর ব্যবস্থা নাই। তবে এ সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এর বহু পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে।

আধুনিক গভীর নলকূপের সাহায্যে সহজ নিরাপদ জল সরবরাহ সম্ভব হইতেছে। এদিকে শিল্পায়নের ফলে নদীর জল ক্রমশঃ অধিক দূষিত হইয়া অব্যবহার্য হইয়া পড়িতেছে। প্রচলিত পরিশোধন প্রক্রিয়া অথবা ক্লোরিন প্রভৃতি রাসায়নিক নদীর দূষিত জলকে কোনও কোনও ব্যাধি বীজাণু (ভাইরাস) হইতে মুক্ত করিতে পারে না। ফলে পারীর মত সুসভ্য শহরেরও কলের জল নিরাপদ নয়। দূষিত যমুনার জলের জন্য দিল্লীতে ন্যাবা রোগের প্রাদুর্ভাব। অগ্নিনির্বাপণের জন্যও শহরে জল সরবরাহের প্রাচুর্য ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা অপরিহার্য।

কপিল ভট্টাচার্য

জনা মাহিষ্মতীরাজ নীলধ্বজের তেজস্বিনী মহিষী ও প্রবীরের জননী। পাণ্ডবদের অশ্বমেধের অশ্ব নিরোধ করিয়া প্রবীর অর্জুনের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে প্রতিহিংসাপরায়ণা ক্ষুব্ধা জনা নীলধ্বজকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন। নীলধ্বজ অসম্মত হইলে জনা নিজ ভ্রাতার শরণাপন্ন হন। ভ্রাতাও ভগ্নীর প্রস্তাব সমর্থন না করায় ক্ষুব্ধ জনা গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন। কাশীদাসী

মহাভারতের এই কাহিনী বাংলা দেশে বিশেষ সমাদৃত। জৈমিনিভারতের ঈষৎ-পরিবর্তিত আখ্যানে মহিষীর নাম জ্বালা, তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন (জৈমিনিভারত, ১৪ ১৫ অধ্যায়)।

কুমারী ভট্টাচার্য

জনার্দন কর্মকার প্রসিদ্ধ লৌহশিল্পী। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত (বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান) পাচগাও-এ জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি মুর্শিদাবাদের ২১২ মন ওজনের ও ১২ হাত দৈর্ঘ্য ও তিন হাতের অধিক ব্যাস-বিশিষ্ট বিখ্যাত 'জাহানকোষা' নামক কামানের নির্মাতা (১৬৩৭ খ্রী)। শাহ্ জাহানের সময় জাহাঙ্গীর নগরে (বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান-এর অন্তর্গত ঢাকা শহর) ইসলাম খাঁর শাসনকালে তিনি লৌহশিল্পের দক্ষতার বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার বংশের উত্তরপুরুষ 'জনাইয়ের গোষ্ঠী' নামে খ্যাত।

অশোকা সেনগুপ্ত

জন্মতিথি যে মাসের যে তিথিতে কোনও মানুষ জন্মগ্রহণ করে, আমাদের দেশের প্রাচীন রীতি অনুসারে সেই মাসের সেই তিথি তাহার জন্মতিথি বা জন্মদিন বলিয়া পরিগণিত। জন্মতিথিতে তিল বাটা গায়ে মাখিয়া তিলযুক্ত জলে স্নান, জন্মনক্ষত্র ও জন্মতিথিসহ ব্রহ্মা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবতা ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি চিরজীবী মহাপুরুষদের পূজা এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করণীয়। এই দিন নববস্ত্র পরিধান করিতে হয় এবং গুগ্গুল, নিমপাতা, শাদা সরিষা, দূর্বা ও গোরোচনাযুক্ত জন্মগ্রন্থি হাতে বাঁধিতে হয়। নখ চুল-কাটা, মৈথুন, দাম্পত্য পথভ্রমণ, আমিষভোজন, কলহ ও হিংসা এই দিন নিষিদ্ধ। এই দিন জীবিত মৎস্য জলে ছাড়িয়া দেওয়া ও ব্রাহ্মণকে দান করা এবং ছাতু খাওয়ার বিধান আছে। এইসব বিধি নিষেধের কিছু কিছু প্রচলন এখনও আছে। তবে জন্মতিথির পরিবর্তে জন্মতারিখে সাধারণ উৎসব করাই এখন প্রথা হইয়া দাড়াইয়াছে।

দ্র রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পুরোহিত-দর্পণ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিবার পরিকল্পনা দ্র

জন্মান্তরবাদ কর্ম ও জন্মান্তরবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একমাত্র জড়বাদী চার্বাক ভিন্ন প্রত্যেক ভারতীয় সম্প্রদায়ই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। চার্বাকমতে আত্মা বলিয়া কোনও নিত্য পদার্থ নাই। জড়সৃষ্ট দেহ মৃত্যুর পরে জড় ভূতেই মিলাইয়া যায়—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পরলোক বলিয়া প্রাত্যক্ষিক জড় জগৎ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোনও লোক নাই।

জৈনেরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জৈনমতে দেহ পুদ্গল সৃষ্ট এবং বিশেষ বিশেষ দেহ বিশেষ বিশেষ পুদ্গল সৃষ্ট। দেহ ধারণের পক্ষে আত্মার বাসনাই বিশেষ কার্যকর। অতীত জীবনের কর্ম, ভাবনা ও বাক্য আত্মায় এক অন্ধ আবেগের সৃষ্টি করে এবং আত্মা তখন বিশেষ দেহ ধারণের উপযোগী পুদ্গল আকর্ষণ করে। ফলে দেহের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রিয়াদি, মন ও প্রাণ সবই এই দেহের অন্তর্ভুক্ত হয়। জীবের জন্ম, জাতি, কুল ও স্বভাব জৈন-মতে নাম কর্ম নির্ধারিত। জৈনেরা গোত্রকর্ম, আয়ুকর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম স্বীকার করেন, কর্মানুসারেই পরবর্তী জন্ম হয়। জৈন তীর্থংকরদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিবার ক্ষমতা ছিল।

বৌদ্ধেরা আত্মার স্থায়ী সত্তা স্বীকার না করিলেও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাঁহারা জীবের কর্মের উপরেই সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছেন, বৌদ্ধমতে কর্মভোগের জন্যই জীবের বার বার দেহপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধ নিজে কর্ম ও পুনর্জন্ম স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধের নিজের পূর্বজন্মসমূহের বৃত্তান্ত জাতক গ্রন্থে সংগৃহীত আছে।

ন্যায় বৈশেষিকমতেও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বৈশেষিকমতে আত্মা বস্তু। বিভিন্ন গুণ ছাড়াও আত্মায় 'অদৃষ্ট' বলিয়া একটি গুণ স্বীকৃত আছে, ইহা অনুষ্ঠিত সৎ বা অসৎ কর্মের সংস্কারবিশেষ। আত্মার দেহত্যাগ (অপসর্পণ) ও নূতন দেহে প্রবেশ (উপসর্পণ) অদৃষ্টের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রারব্ধ শেষ হইলেই দেহান্তর গ্রহণের গতি বন্ধ হয় এবং আত্মা মুক্ত হয়।

সাংখ্য যোগসম্প্রদায়ের মতে বিবেক জ্ঞান উদয়ের পূর্বে প্রকৃতির প্রভাবে জীব বার বার জন্মগ্রহণ করে। আত্মা নিত্য শুদ্ধ হইলেও দেহাদিযুক্ত হইয়া সুখ, দুঃখ ও মোহের অধীন হইয়া পড়ে। ফলে কৃত কর্মের ফলস্বরূপ তাহাকে বার বার জন্ম লইতে হয়।

মীমাংসকদের মতে বেদোক্ত কর্মের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি চরম লক্ষ্য। সুতরাং কর্মফল মীমাংসকেরা স্বীকার করেন। প্রত্যেক ক্রিয়া কর্মই একটি 'অপূর্ব' সৃষ্টি করে এবং পরিণামে ফল দেয়। সৎকর্মজনিত অপূর্ব পুণ্য এবং অসৎ-কর্মজনিত অপূর্ব পাপ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই পুণ্য বা পাপ বলেই জীব যথাসময়ে উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হইয়া

স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। স্বর্গলাভের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন স্তরে জীবকে বিভিন্ন দেহান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। জন্মান্তরবাদ মীমাংসকদের একটি স্বীকৃত তত্ত্ব।

উপনিষদ্‌ ও গীতায় জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই দেহ ধারণ করিবার পূর্বে আমি আরও অনেক দেহে বাস করিয়া আসিয়াছি — এ কথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন। তিনি পূর্বেকার সেই সমস্ত জন্ম মনে করিতে পারিতেন। যাঁহারা যোগ-শক্তি কিংবা তপঃ-শক্তির প্রভাবে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারেন তাঁহাদের জাতিস্মর বলা হয় ('জাতিস্মর' দ্র)। ভারতীয় চিন্তাধারায় জাতিস্মর-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন বর্তমান জন্ম ও অব্যবহিত পূর্ব ও পর — এই তিনটি জন্ম ভৃগু-গণনা মতে স্বীকৃত। অবতারবাদের ধারাও জন্মান্তরের সহিত জড়িত।

অদ্বৈত বেদান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈত প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিকসম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন।

শৈব শাক্তসম্প্রদায়গুলি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মের ক্রম অনুসারে জীব বিভিন্ন অবস্থান্তর বা দেহান্তরের মধ্য দিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। স্থূল দেহবিশিষ্ট সংসারবদ্ধ জীব 'সকল' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জীব তাহার কর্মোপযোগী স্ব, স্ব তত্ত্ব ও ভুবন অনুরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি লাভ করে। পরবর্তী অবস্থা বা স্তরের নাম 'প্রলয়াকল' — এই অবস্থায় জীব সমস্ত সৃষ্টিবাদী তত্ত্ব হইতে মুক্ত থাকে — সেই সকল জীবের কোনও দেহ থাকে না — ইহারা কর্ম সংস্কার ও মূল অবিদ্যাযুক্ত কতকগুলি অশরীরী অণু। জীবের তৃতীয় বা সর্বোচ্চ অবস্থা 'বিজ্ঞান কল' বলিয়া বিদিত। এই অবস্থায় জীব অবোমায়ার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শুদ্ধমায়ায় অবস্থান করে। ইহা কৈবল্যের অবস্থা। কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবসমূহের মধ্যে যাঁহারা উন্নততর, তাঁহারা পরবর্তী কল্পের প্রারম্ভে ঐশ্বরিক জ্ঞানলাভের যোগ্য হয়। ঐশ্বরিক জ্ঞানলাভের পরে বা শিবাবস্থায়ও বিভিন্ন অবস্থান্তরের বিষয় শৈব-শাক্ত মতবাদে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'লোক' বা জগতের বিভিন্ন স্তরে অবস্থানের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন আত্মা : ১. বিদ্যেশ্বর ২. মন্ত্রেশ্বর ও ৩. লোকেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শৈব শাক্ত আগমে বর্ণিত আত্মার ত্রিবিধ অবস্থান্তর বা জন্মান্তর প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারায় বিশেষভাবে ওর্‌ফাইট (Orphite) ও তাঁহাদের পূর্ববর্তী ওরফিসি (Orphici)-এর অনুরূপ।

সেমিটিক ধর্মসমূহে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। খ্রীষ্ট ধর্মে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক প্রভৃতির উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আত্মা পুনর্বার দেহ ধারণ করে বা জন্মান্তর প্রাপ্ত হয় এ কথার উল্লেখ নাই। ইসলাম ও ইহুদী ধর্ম একেশ্বরবাদী — কিন্তু ইহারা জন্মান্তর স্বীকার করে না। এইসব সম্প্রদায়ের মতে আত্মা অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় সৃষ্ট দ্রব্য — নিত্য পদার্থ নয়।

দ্র হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কর্মবাদ ও জন্মান্তর, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

মনোরঞ্জন বসু

জন্মাষ্টমী মুখ্য শ্রাবণ বা গৌণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি। এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই ইহা পবিত্র উৎসবের দিন বলিয়া বিবেচিত। এই উপলক্ষেও ভারতের নানা স্থানে নানারূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে ইহা সাধারণ ছুটির দিন। এখানে উৎসব ছাড়া উপবাস ও রাত্রিতে কৃষ্ণের সাড়ম্বর পূজার ব্যবস্থা আছে। কোথাও কোথাও মৃন্ময় মূর্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী প্রদর্শন করা হয়। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল।

জন্মের পরই কংসের হাত হইতে রক্ষার জন্য কৃষ্ণকে গোপনে রাত্রির অন্ধকারে নন্দগোপের ঘরে রাখিয়া আসা হয়। নন্দরাজার পুত্রলাভের আনন্দ স্মরণে জন্মাষ্টমীর পরের দিন গোয়ালাদের মধ্যে নাচগানের মধ্য দিয়া নন্দোৎসব প্রতিপালিত হয়। জন্মাষ্টমী কোথাও কোথাও গোকুলাষ্টমী নামে পরিচিত।

শিবাচরণ চক্রবর্তী

জপ দেবতার নাম বা মন্ত্রের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ। ইহা উপাসনার বিশিষ্ট অঙ্গ। শান্তিস্বস্ত্যয়নে নামজপের ব্যবস্থা আছে। দুর্গানাম জপ পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের একটি অঙ্গ। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত তান্ত্রিক পুরশ্চরণে জপ মুখ্য স্থান অধিকার করে। সমস্ত ধর্মকর্মের মধ্যে জপ শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া পবিত্রভাবে একাগ্রমনে জপ বিধেয়। জপে উচ্চারণ দ্রুত বা বিলম্বিত হইবে না। জপ চারপ্রকার : বাচিক, উপাংশু, জিহ্বা ও মানস। বাক্যের দ্বারা উচ্চারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জপ করার নাম বাচিক জপ, ইহা নিম্নস্তরের জপ। মনে মনে স্তোত্র পাঠ করা ও উচ্চৈঃস্বরে জপ করা উভয়ই ভগ্ন পাত্রস্থিত জলের মত নিরর্থক। জিহ্বা ও ওষ্ঠের চালনার দ্বারা কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য এবং নিজের কর্ণগোচরভাবে জপ

করার নাম উপাংশু জপ, ইহা মধ্যম শ্রেণীর। ইহা বাচিক জপ হইতে দশগুণে শ্রেষ্ঠ। কেবল জিহ্বার দ্বারা জপ করা জিহ্বা জপ। ইহা বাচিক জপ হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মানস জপ বা মনে মনে নিজ কর্ণের অগোচরভাবে জপ করা উত্তম জপ। ইহা বাচিক জপ হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

জপ করিবার সময় বুকের উপর হাত রাখিয়া উহা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া জপ করিতে হয়। তাই গোমুখ, ঝুঁড়ো জালি প্রভৃতি নামে পরিচিত বিশেষ বিশেষ ধরনে প্রস্তুত থলির মধ্যে হাত রাখিয়া জপ করার রীতি আছে। জপের সময় বুড়া আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলগুলি ফাঁক করার নিয়ম নাই। বুড়া আঙুল অনামিকার মধ্য পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অনামিকার নিম্ন পর্ব, কনিষ্ঠার নিম্ন পর্ব, মধ্য পর্ব ও অগ্রভাগ, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনীর অগ্রভাগ ঘুরাইয়া তর্জনীর মধ্য ও নিম্ন ভাগ স্পর্শ করাইয়া আনিতে হয়। ইহাতে দশবার জপ হয়। শক্তিমন্ত্রে বুড়া আঙুল মধ্যমার অগ্রভাগ পর্যন্ত আসিয়া উহার মধ্য ও নিম্ন পর্ব দিয়া তর্জনীর নিম্ন পর্ব স্পর্শ করিবে। হাতের আঙুলে হিসাব রাখিয়া জপ করার চেয়ে মালায় জপ করা প্রশস্ত। এক এক জিনিসের মালার এক-এক রকম গুণ এবং এক এক দেবতা বা এক এক কাজে এক এক রকম মালা ব্যবহৃত হয়। রুদ্রাক্ষ, জীবপুত্রিকা, তুলসীকাষ্ঠ প্রভৃতির মালা প্রসিদ্ধ। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানবিশেষে মহাশঙ্খের মালা ব্যবহারের বিধান আছে। মানুষের কপালের হাড় বা কান ও চক্ষুর মধ্যস্থিত হাড়কে মহাশঙ্খ বলা হয়। মানুষের আঙুলের হাড়ের মালা নাড়ী দিয়া গাঁথিয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে।

দ্র কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার মালা নির্ণয় ও পুরশ্চরণ প্রসঙ্গ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জবলপুর মধ্য প্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত জবলপুর বা জব্বলপুর একটি বিভাগ, জেলা, তহসিল ও শহর। জবলপুর বিভাগে মোট আটটি জেলা আছে, যথা— বালাঘাট, সিওনী, ছিন্দওয়ারা, মণ্ডলা, নরসিংহপুর, দামোহ সাগর ও জবলপুর। বিভাগের মোট আয়তন ৭৫৬৯৯ বর্গ কিলোমিটার (২৯২২৭·৪ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ৫৭২১৬০২ (১৯৬১ খ্রী)। লোকবসতিযুক্ত গ্রামের সংখ্যা ১৩১০৮ এবং শহরের সংখ্যা চল্লিশ।

জবলপুর জেলা ২২°৪৯′ হইতে ২৩°৮′ উত্তর পর্যন্ত এবং ৭৯°২১′ হইতে ৮০°৫৮′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। জেলার আয়তন ১০১২২ বর্গ কিলোমিটার (৩৯০৮·২ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ১২৭৩৮২৫ (১৯৬১ খ্রী)। জেলার এগারটি শহরাঞ্চলের মোট আয়তন ২৩২ বর্গ কিলোমিটার (৮৯·৫ বর্গ মাইল), বাকি ৯৮৯০ বর্গ কিলোমিটার (৩৮১৮·৭ বর্গ মাইল) ব্যাপিয়া গ্রামাঞ্চল।

জবলপুর জেলার সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত জানা দুরূহ। সিহরা তহসিলের রূপনাথ নামক স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে মৌর্যবংশীয় সম্রাট অশোকের নাম পাওয়া যায় (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী)। মৌর্যবংশের পর শুঙ্গবংশীয় রাজা পুষ্যমিত্রের সময়ে নর্মদা উপত্যকা তাঁহার অধিকারে ছিল। অতঃপর শাতবাহন রাজগণের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অধিকাংশই ছিল তাঁহাদের শাসনাধীন। গুপ্ত যুগে সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে জবলপুর দামোহ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও স্থানীয় পরিব্রাজক-মহারাজগণের শাসনাধীন ছিল। একাদশ শতাব্দীতে অল্‌বীরুনীর সময়ে এই অঞ্চল হৈহয় কলচুরির শাখা চেদি রাজগণের অধিকারে আসে। অতঃপর গণ্ড রাজবংশ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। গণ্ডরাজ সংগ্রামশাহের পুত্রবধূ ইতিহাসখ্যাত রানী দুর্গাবতী তাঁহার পুত্রের নাবালকত্বের জন্য শাসন পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু আসফ খাঁর আক্রমণে রানী নিহত হওয়ার পর গড়া মণ্ডলা অঞ্চল সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে জবলপুর অঞ্চল পেশোয়াদের অধিকারে আসে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দেই জেলার অধিকাংশ অঞ্চল ব্রিটিশের অধিকারে আসে। কেবল বিজেরাগড় রাজ্য সিপাহী-বিদ্রোহের পর এই জেলার সহিত যুক্ত হয়।

জবলপুর জেলার মধ্য দিয়া একটি দীর্ঘ সমতলভূমি উত্তর পূর্ব হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। উক্ত পার্বত্য ভূমিসমূহ এই সমভূমিকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের বেলে পাথরে গঠিত বিন্ধ্য পার্বত্যভূমি সমভূমির অতি সন্নিকটেই সুউচ্চরূপে দণ্ডায়মান। দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে মহাদেও পাহাড় এবং উত্তর দিকে রূপান্তরিত শিলায় গঠিত ও ল্যাটেরাইটে আবৃত উচ্চভূমি।

বিন্ধ্য পর্বতের শাখা ভানরের পাহাড় জবলপুর ও দামোহ জেলার সীমা নির্ধারণ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব দিকে বিস্তৃত। মধ্য ভাগে উহা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া কাটাঙ্গীর নিকট ৬০০-৭৫০ মিটার (২০০০-২৫০০ ফুট) সুউচ্চরূপ ধারণ করিয়াছে। ভানরের পাহাড়ের উত্তর হইতে প্রায় সমান্তরালভাবে বিস্তৃত কাইমুর পাহাড় ও বিন্ধ্য যুগের পলল শিলায় গঠিত। পূর্ব দিকে রূপান্তরিত শিলায় গঠিত ভি[illegible]গড় পাহাড়

জেলার মধ্য ভাগ হইতে উত্তর পূর্ব দিকে বিস্তৃত। ইহা ছাড়া মাড়ওয়ারা তহসিলের উত্তরাংশে অনুচ্চ কহেনজুয়া পাহাড়ও উল্লেখযোগ্য।

জেলার দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে নর্মদা নদী ('নর্মদা'দে) ও তাহার উপনদী হিরণ ও গোড় প্রবাহিত। মাহী নদী উত্তরাংশে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার উপনদী শোণে মিশিয়াছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে কাটনী ও কেন উল্লেখযোগ্য।

এই অঞ্চলে সুপ্রাচীন আর্কিয়ান যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের শিলা দেখা যায়। আর্কিয়ান যুগের গ্রানিট ও নিস্, ধারওয়ার যুগের মার্বেল ও শিস্ট, গণ্ডোয়ানা যুগের পলল শিলা ও ব্যাসল্ট শিলা যুগের ব্যাসল্ট বহু স্থানে দেখা যায়। সুপ্রাচীন গ্রানিট শিলায় গঠিত অঞ্চল জবলপুর শহরের দক্ষিণাঞ্চলে আবহবিকারের ফলে এক বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। গড়ার উপকণ্ঠে অবস্থিত মদনমহল পাহাড়ে গোলাকৃতি-বিশিষ্ট গ্রানিট পাথরের অভাব নাই।

জেলার অরণ্যাবৃত অঞ্চলের আয়তন মাত্র ৮৩৭ বর্গ কিলোমিটার (৩২৫ বর্গ মাইল)। সেগুন এই এলাকার উল্লেখযোগ্য কাঠ। সামান্য লাক্ষার চাষও এখানে হইয়া থাকে।

জেলার দক্ষিণ ভাগে উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকা কৃষিকার্যের উপযোগী। নর্মদা উপত্যকা অঞ্চলে লাল ও বাদামী বালুকাময় পলিমাটি দৃষ্ট হয়। ভিত্রিগড় অঞ্চলের উচ্চ ভাগে ল্যাটেরাইট এবং উত্তর দিকে লাল কঙ্করময় অনুর্বর অঞ্চল।

সমগ্র জেলাতেই মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব দৃষ্ট হয়। বৃষ্টিপাত দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলেই অপেক্ষাকৃত বেশি (১০০-১৫০ সেন্টিমিটার) এবং ক্রমশঃ উত্তর ও পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাত কমিয়া যায়। জবলপুর শহরে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩৩ সেন্টিমিটার। জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর এই চারি মাস বর্ষাকাল হইলেও জুলাই মাসেই বৃষ্টিপাত সর্বাধিক। গড় সর্বোচ্চ উষ্ণতা দেখা যায় মে মাসে (৪১° সেন্টিগ্রেড) এবং গড় সর্বনিম্ন উষ্ণতা ডিসেম্বর মাসে (৮.২° সেন্টিগ্রেড)।

জেলার অধিকাংশ অঞ্চল পার্বত্য হওয়া সত্ত্বেও কৃষিকার্যে এই অঞ্চল উল্লেখযোগ্য। জেলার পূর্ব দিকে ধান ও পশ্চিম দিকে গম ও জোয়ার প্রধান কৃষিজাত ফসল। তাহা ছাড়া বিভিন্ন রকমের ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু, ছোলা ও সামান্য কার্পাস বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। অগভীর ও অনুর্বর মৃত্তিকার প্রভাবে অধিকাংশ অঞ্চলেই উৎপাদন কম হইয়া থাকে।

জবলপুর জেলার খনিজ সম্পদ: চুনা পাথর, বক্সাইট, ফেলস্পার, ট্যাল্ক ও সাবান পাথর, সামান্য লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ। মধ্য প্রদেশের শতকরা ৬৫ ভাগ চুনা পাথর এই জেলায় উত্তোলিত হয়। ভেরাঘাটে মার্বেল অঞ্চলের পাশেই সাবান পাথরের খনি খুবই উল্লেখযোগ্য। সমগ্র জেলায় ৬৬০৫ জন (১৯৫১ খ্রী) শ্রমিক বিভিন্ন খনিজ উৎপাদনে নিযুক্ত।

জবলপুর শহর (২৩°১০' উত্তর ও ৭৯°৫৭' পূর্ব) নর্মদা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এই শহরটির দূরত্ব রেলপথে বোম্বাই হইতে ৯৮৪ কিলোমিটার (৬১৬ মাইল) ও কলিকাতা হইতে ১২৫৬ কিলোমিটার (৭৮৪ মাইল)। ইহা ছাড়া ছোট রেলপথে দক্ষিণ পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে।

জবলপুর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে আরবী শব্দ জবল (অর্থাৎ পাথর) হইতে এই নামের উৎপত্তি, কারণ শহরটির অবস্থান প্রস্তরময় অঞ্চলে। কিন্তু মহাভারত-বর্ণিত চেদি রাজগণের রাজধানী ত্রিপুরীতে (তেওয়ার) প্রাপ্ত শিলালিপিতে 'জাবালি পট্টন' বা জাবালিপত্তন নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনও কোনও মতে দার্শনিক ঋষি জাবালির নামানুসারে ঐ শহরটির বর্তমান নাম জবলপুর।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মারাঠা শক্তির অধিকারে আসার পর জবলপুর মারাঠাদের শাসনকেন্দ্র হইয়া ওঠে। শহরের একাংশে (বর্তমান গারহা) একটি দুর্গ স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জবলপুর ব্রিটিশ শক্তির অধীনস্থ হওয়ার পর এখানে নর্মদা কমিশনারের প্রধান কার্যকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং শহরটি দ্রুত প্রসারলাভ করে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই শহর পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। বর্তমানে জবলপুর শহরগোষ্ঠীর আয়তন [illegible] বর্গ কিলোমিটার ([illegible] বর্গ মাইল), লোকসংখ্যা ৬৭১০১৪। এই শহরগোষ্ঠী জবলপুর, জবলপুর ক্যান্টনমেন্ট ও খামারিয়া—এই তিনটি অঞ্চল লইয়া গঠিত।

জবলপুর শহরে প্রায় সকল শিল্পই খনিজ, বনজ ও কৃষিজ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। কোনও ভারী শিল্প এখানে গড়িয়া ওঠে নাই। কাষ্ঠশিল্প, চর্মশিল্প, তাঁতশিল্প ও চিনামাটিশিল্প উল্লেখযোগ্য।

জবলপুর শহরের উপকণ্ঠে ভেরাঘাট নামক স্থানে ধুঁয়াধার জলপ্রপাত ও তাহার কিছু দূরে প্রসিদ্ধ মার্বেল রক অবস্থিত। মার্বেল রকের পাশে বিভিন্ন রঙের মার্বেল পাথরে গঠিত অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত নর্মদার গিরিসংকট

আর একটি দর্শনীয় স্থল। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে গড়ায় সংগ্রামশাহের নির্মিত সংগ্রামসাগর ও ভৈরব-মন্দির এবং মদন পাহাড়ের শীর্ষদেশে বিরাট গোল পাথরের উপর গণ্ডরাজ মদন সিংহের নির্মিত মহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XIV, Oxford, 1908; National Council of Applied Economic Research, *Techno Economic Survey of M P*, New Delhi, 1960; *Census of India · Madhya Pradesh*, vol. VIII, part. IIA, 1961; *The Gazetteer of India*, vol. I, 1965.

সুবর্ণকুমার বসু

জবা মালভাসিঈ গোত্রের (Family-Malvaceae) অন্তর্ভুক্ত বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম হিবিসকস রোসা-সিনেনসিস (*Hibiscus rosa-sinensis*)। বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র এই বহুশাখাবিশিষ্ট গাছ দেখা যায়। গাছগুলি প্রায় ৩ মিটার লম্বা হইয়া থাকে। গাছের পাতা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পাতার প্রান্তে করাতের দাঁতের মত খাঁজ আছে। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ফুটিতে দেখা যায়। রক্তজবা, শ্বেতজবা, হরিদ্রা বা পাণ্ডুজবা, নীল জবা, পঞ্চমুখী জবা, কুঁড়ি জবা প্রভৃতি একদল, দ্বিদল বা বহুদল-বিশিষ্ট নানা বর্ণের জবাফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের গর্ভদণ্ড বাহিরের দিকে অনেকটা প্রলম্বিত। গর্ভকেশরের কিছুটা নীচেই পরাগকোষগুলি গর্ভদণ্ডের চতুর্দিকে সংলগ্ন থাকে। সাধারণতঃ শাখাকলম দ্বারা ইহাদের বংশবিস্তার ঘটে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে জবার পাতা, মূল ও ফুলের ব্যবহার আছে।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

জবালা উপনিষদে উল্লিখিত সত্যবাদিনী রমণী। তাঁহার পুত্র সত্যকাম গুরুগৃহে বিদ্যালাভের জন্য উৎসুক হইয়া মাতাকে আপন গোত্র-পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। জবালা বলেন: 'বৎস, তুমি কোন্ গোত্রের তাহা আমি জানি না। যৌবনে আমি বহুচারিণী পরিচারিকা ছিলাম, সেই সময়ে তোমাকে পাইয়াছি, কাজেই তোমার যে কি গোত্র তাহা জানি না। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, তুমি জাবাল সত্যকাম বলিয়া নিজের পরিচয় দিও।' মাতার নির্দেশ অনুসারে সত্যকাম গুরুর নিকট প্রকৃত আত্মপরিচয় দিলে গুরু তাঁহার সত্যভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপনীত করিয়া গ্রহণ করেন। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৪।৪)।

[illegible]কুমারী ভট্টাচার্য

জমদগ্নি ভৃগুবংশজাত ঋষি। রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। পঞ্চপুত্রবতী রেণুকার পঞ্চম পুত্র পরশুরাম বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য হন। রেণুকা একবার জলকেলিরত রাজা চিত্ররথকে দেখিয়া মুগ্ধ ও বিষণ্ণ চিত্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার পাতিব্রত্যে সন্দিহান ঋষি জমদগ্নি পুত্রগণকে মাতৃহত্যার আদেশ দেন। তাঁহার প্রথম চারি পুত্র মাতৃহত্যা করিতে অস্বীকার করায় পিতৃশাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হন। পঞ্চম পুত্র পরশুরাম কুঠারা-ঘাতে মাতৃবধ করেন। জমদগ্নি তাঁহার পিতৃভক্তিতে পরম প্রীত হইয়া বরদানের ইচ্ছা করিলে পরশুরাম মাতার পুনর্জীবন, ভ্রাতৃগণের জড়ত্বলোপ, আপনার মাতৃহত্যা-পাপ নির্মুক্তি, অজেয়ত্ব এবং দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করেন। জমদগ্নি পুত্রের প্রার্থনা পূরণ করেন। এক সময়ে রেণুকা রৌদ্রের মধ্যে স্বামীর নিক্ষিপ্ত বাণ আনা-নেওয়া করায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে জমদগ্নি সূর্যকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হন, সূর্য রেণুকাকে ছত্র ও পাদুকা দিয়া তাঁহার ক্লেশ-অপনোদনে সহায়তা করেন। সেই হইতে পৃথিবীতে ছত্র ও পাদুকার ব্যবহার প্রচলিত হয় (মহাভারত, বনপর্ব)। 'পরশুরাম' দ্র।

[illegible] গুপ্ত

জমিয়তুল্-উলেমা-ই-হিন্দ প্রথম মহাসমরের (১৯১৪-১৮ খ্রী) সুযোগে ইংরেজ সরকারকে বিব্রত করিবার চেষ্টায় মওলানা মাহমুদুল হাসান মওলানা উবায়দুল্লাহকে কাবুল প্রেরণ করেন এবং তুরস্ক সরকারের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে স্বয়ং হেজাযে যাত্রা করেন। ইংরেজের অনুচর শরীফ হুসাইনের বেইমানিতে শেখুল-হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান তদীয় ছাত্র মওলানা হুসাইন আহমদ মদনী এবং আরও তিন জন সঙ্গীসহ গ্রেফতার হন এবং মালটার বন্দীশালায় সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কিছু দিন পূর্বে অমৃতসরে জমিয়তে-উলামার দ্বিতীয় নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন ও প্রথম পরামর্শ-সভা অনুষ্ঠিত হইলেও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে জমিয়তে-উলামার প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সদ্যো-মুক্ত মওলানা মাহমুদুল হাসান এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব

করেন। দেশবাসী তাঁহাকে শেয়খুল হিন্দ নামে অভিহিত করে।

জমিয়তে-উলামার উদ্দেশ্য হইল: ক. ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও মুসলমানের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং পুণ্যস্থান-সমূহের হেফাজত খ. মুসলমানদের ধর্ম, তমদ্দুন এবং শিক্ষানৈতিক অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণ গ. মুসলমান সমাজের ধর্ম, শিক্ষা এবং সমাজ-বিষয়ক সংস্কার-সাধন ঘ. ইসলামী তালিমের আলোকে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের প্রয়াস ঙ. ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার এবং যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারকে এবং ইংরেজ সেনাদলে ভর্তিকে বয়কট করিবার জন্য জমিয়তে-উলামা ফতোয়া দেন। সরকার-কর্তৃক উহা বাজেয়াপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ফতোয়া বারংবার প্রকাশিত হয়। ১৯১৯-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জমিয়তে-উলামার সদস্যগণ জাতীয় কংগ্রেসের মহৎ স্বাধীনতা-সংগ্রাম-পরিচালনায় সর্ববিধ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে (১৯৩৯-৪৪ খ্রী) পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে জমিয়তে-উলামার নেতৃবৃন্দ পূর্ণোদ্যমে অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতালাভের পর জমিয়তে-উলামা এখন শুধু সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছেন এবং রাজনীতি ত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মত জমিয়তে উলামা লোকসভা বা বিধানসভার জন্য নিজের নামে কোনও প্রার্থী মনোনয়ন এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন না। তাহার অর্থ ইহা নয় যে জমিয়তের সভ্যগণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে এবং লোকসভা, বিধানসভা প্রভৃতিতে সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না। রাজনীতিতে জমিয়তে উলামার সভ্যগণ স্বাধীন। কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ জমিয়তে-উলামার সভ্য হইতে পারেন অথবা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারেন।

জমিয়তু ল্-উলেমা-ই-হিন্দ শুধু আলেমদের প্রতিষ্ঠান নয় বরং উলামাগণের দ্বারা পরিচালিত মুসলমান সর্ব-সাধারণের প্রতিষ্ঠান। জমিয়তের উদ্দেশ্যাবলীর সহিত একমত প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলমান নরনারী ইহার সভ্য হইতে পারেন। প্রতি দুই বৎসর অন্তর একবার জমিয়তের সভ্যসংগ্রহ এবং কর্মকর্তাদের নির্বাচন হয়। জমিয়তের চাঁদা বাবত প্রত্যেক সদস্যকে এককালীন পঁচিশ পয়সা দান করিতে হয়। কমপক্ষে একশত সদস্য লইয়া স্থানীয় জমিয়ত গঠিত হয় এবং একাধিক স্থানীয় জমিয়ত লইয়া জেলা জমিয়ত গঠিত হইয়া থাকে।

আবুল হায়াত

জম্বুদ্বীপ খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাট অশোকের অনুশাসনে তাঁহার সাম্রাজ্যকে কখনও কখনও পৃথিবী এবং জম্বুদ্বীপ বলা হইয়াছে। ভারত, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের বহুলাংশে অশোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিংহলের পালি গ্রন্থাবলীতেও প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ (অর্থাৎ আধুনিক ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান) অর্থে জম্বুদ্বীপ নামের ব্যবহার দেখা যায়।

পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে পৃথিবীকে অনেক সময় চক্রবাল-রাজ্য বলা হইত। ইহার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্বত এবং উহার চতুর্দিকে সমুদ্র মধ্যে চারিটি দ্বীপ— উত্তরে কুরু বা উত্তর কুরু, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পূর্বে পূর্ব বিদেহ এবং পশ্চিমে অপর-গোদান। পুরাণাদিতেও এই চতুর্দ্বীপা বসুমতীর কল্পনা দেখা যায়, কিন্তু এখানে পৃথিবীর নাম জম্বুদ্বীপ এবং সুমেরুর চতুর্দিকস্থিত দ্বীপ চারিটির নাম— উত্তরে কুরু বা উত্তর কুরু, দক্ষিণে ভারতবর্ষ বা জম্বুদ্বীপ, পূর্বে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমাল।

কিন্তু পুরাণাদি গ্রন্থে ক্রমে চতুর্দ্বীপা বসুমতী স্থলে সপ্ত-দ্বীপা বসুমতীর কল্পনা প্রাধান্য লাভ করে। তদনুসারে সমুদ্র-দ্বারা বেষ্টিত সাতটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার দ্বীপদ্বারা পৃথিবী গঠিত: যথা ১. লবণসমুদ্র বেষ্টিত জম্বুদ্বীপ ২. উহার চতুর্দিকে ইক্ষুসমুদ্র বেষ্টিত প্লক্ষ দ্বীপ ৩. উহার চারি দিকে সুরাসমুদ্র বেষ্টিত শাল্মলি দ্বীপ ৪. উহার চতুর্দিকে ঘৃত সমুদ্র-বেষ্টিত কুশ দ্বীপ ইত্যাদি। পরবর্তী প্রত্যেকটি দ্বীপ ও সমুদ্র আকারে পূর্ববর্তী দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ। এই জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্বত এবং উহার চতুর্দিকে ইলাবৃত বর্ষ অবস্থিত। উহার উত্তর ও দক্ষিণে বর্ষপর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন তিনটি তিনটি করিয়া ছয়টি বর্ষ অবস্থিত। দক্ষিণে ভারত, কিম্পুরুষ ও হরি বর্ষ এবং উত্তরে রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তর-কুরু। সুমেরুর পূর্বে ভদ্রাশ্ব ও পশ্চিমে কেতুমাল। জম্বুদ্বীপ এই নবটি বর্ষে বিভক্ত। দক্ষিণ দিক হইতে জম্বুদ্বীপের সাতটি বর্ষ পর্বতের নাম— হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্।

উল্লিখিত পৌরাণিক বর্ণনার অনেকটাই কাল্পনিক। জৈন সাহিত্যের জম্বু দ্বীপ বর্ণনায় কল্পনার বাহুল্য দেখা যায়।

দ্র W. Kirfel, *Die Kosmographie der Inder*, Bonn, 1920; H. C. Raychaudhuri, *Studies*

জম্মু ও কাশ্মীর

in Indian Antiquities, Calcutta, 1958; D. C. Sircar, *Cosmography and Geography in Early Indian Literature*, Calcutta, 1967.

দীনেশচন্দ্র সরকার

জম্মু ও কাশ্মীর ৩২°১৫′ হইতে ৩৭°৫′ উত্তর ও ৭২°৩০′ হইতে ৮০°২২′ পূর্ব। ভারতের অন্তর্গত একটি রাজ্য। আয়তন ২২২০৫৭ বর্গ কিলোমিটার (৮৬০২৩ বর্গ মাইল)। এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থান, উত্তরে চীনের সিন-কিয়াঙ্ প্রদেশ, পূর্বে তিব্বত, পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্থান, দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাব। প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা দুইটি সংসদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রদেশের বর্তমান সংবিধান ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি গৃহীত হয়। বিচারের জন্য একজন প্রধান বিচারপতির অধীনে শ্রীনগর ও জম্মুতে হাইকোর্ট আছে।

পার্বত্যময় কাশ্মীরে দক্ষিণ হইতে উত্তরে ক্রমশঃ কয়েকটি সিঁড়ির ধাপের মত পর্বতমালা পর পর উঠিয়া পরে তিব্বত ও রাশিয়ার সীমান্তের নিকট ক্রমশঃ নিচু হইয়া গিয়াছে। প্রথম ধাপে দক্ষিণ দিকে পাঞ্জাবের সমতল ভূমির নিকট শিবালিক পর্বতমালা অবস্থিত। কাশ্মীরের প্রায় সকল পর্বতশ্রেণীই উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত। শিবালিক পর্বতমালার উচ্চতা গড়ে মাত্র ৩০৪ মিটার (১০০০ ফুট) এবং বিস্তার ১৬ কিলোমিটারের (১০ মাইল) মধ্যে। শিবালিকের উত্তরে দ্বিতীয় ধাপে পীর পঞ্জল পর্বতশ্রেণী প্রায় সমান্তরালভাবে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত। ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ৩৬৫৭ মিটার (১২০০০ ফুট) ও সর্বোচ্চ স্থানের উচ্চতা ৪৬৫৬ মিটার (১৫৫২৩ ফুট)। এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ পীর পঞ্জল গিরিপথ এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইহা ছাড়া বানিহাল প্রভৃতি সুড়ঙ্গপথ পীর পঞ্জল পর্বতশ্রেণীর উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। এই পর্বতশ্রেণী প্রায় ২৮১.৭ কিলোমিটার (১৮০ মাইল) দীর্ঘ এবং প্রস্থে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল)। ইহার উত্তরে তৃতীয় ধাপে মূল হিমালয় পর্বতশ্রেণী অন্যান্য পর্বতশ্রেণীর ন্যায় সমান্তরালভাবে প্রসারিত, কিন্তু ইহার উচ্চতা দক্ষিণের পর্বতশ্রেণীগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি। অনেক স্থান চিরতুষারময় ও ৬০০০ মিটার (২০০০০ ফুট) এর উপর এবং তন্মধ্যে নাঙ্গা পর্বত (৭৯৮৬ মিটার বা ২৬৬২০ ফুট) প্রধান চূড়া। মূল হিমালয়শ্রেণী হইতে কয়েকটি শাখাও একই দিকে প্রসারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জাসকার ও লদাখ পর্বতশ্রেণী প্রধান। গাসের ব্রুম ('গাসের ব্রুম' দ্র) গুরলা মান্ধাতা ('গুরলা মান্ধাতা' দ্র) প্রভৃতি এই স্থানের উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ। জোজিলা এই অঞ্চলের গিরিপথ। মূল হিমালয় পর্বতমালার উত্তরে চতুর্থ ধাপে সু-উচ্চ কারাকোরম পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত। পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গড্উইন অস্টিন বা কে২ এবং অনেক বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ ইহার উপর রহিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীতেই পৃথিবীর বৃহত্তম হিমবাহ বল্‌তারো অবস্থিত। কারাকোরম পর্বতশ্রেণীর উত্তর অঞ্চল ক্রমশঃ নিচু হইয়া রাশিয়ার পর্বতশ্রেণীর সহিত মিশিয়াছে। প্রধান পর্বতশ্রেণী ও কাশ্মীরের উপত্যকা ছাড়া উত্তর-পূর্ব দিকে লদাখের বিস্তীর্ণ মালভূমি।

কাশ্মীর প্রদেশের প্রধান নদী সিন্ধু, বিতস্তা বা ঝিলম ও চন্দ্রভাগা। মূল হিমালয়শ্রেণী উত্তরের সিন্ধু নদকে দক্ষিণের ঝিলম নদী হইতে পৃথক করিয়াছে ('সিন্ধু' দ্র)। ঝিলম নদী কাশ্মীর উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র ('ঝিলম' দ্র)। পীর পঞ্জল পর্বতের উত্তরে ঝিলম ও দক্ষিণে চন্দ্রভাগা নদী ('চন্দ্রভাগা' দ্র)। এই তিনটি নদী ব্যতীত ইরাবতী নদীর শাখানদী উজ্ এই প্রদেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত।

কাশ্মীরের পর্বতমালা ও ভূ-প্রকৃতিতে নানা প্রকারের বৈশিষ্ট্য থাকায় নানা উপায়ে অনেক বড় বড় হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। লদাখ অঞ্চলে অনেক স্থান হিমবাহ-গোবরেখার বাঁধের দ্বারা হ্রদে পরিণত হইয়াছে। কাশ্মীর উপত্যকায় বিখ্যাত উলার ('উলার' দ্র) ও ডাল হ্রদ অবস্থিত। ঝিলম নদীর পলিমাটি জমিয়া বাঁধের মত হওয়ায় উলার হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। কাশ্মীর প্রদেশে বহু প্রস্রবণ ও উষ্ণ প্রস্রবণ বর্তমান। ইহাদের মধ্যে অছাবল, ভেরনাগ, অনন্তনাগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রস্রবণগুলি অনেক নদীর উৎস স্থল এবং কৃষিকার্যের সহায়ক।

কাশ্মীরের দক্ষিণ প্রান্তে কোনও পর্বতমালার বাধা না থাকায় সহজেই মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এবং এই অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০৫০ মিলিমিটারেরও (৪২ ইঞ্চি) অধিক। কিন্তু যতই উত্তরে যাওয়া যায় এক-একটি পর্বতশ্রেণী মৌসুমী বায়ুর প্রবেশপথে বাধার সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিপাতের মাত্রা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে লদাখের প্রধান শহর লেহ তে বৎসরে মাত্র ৭৫ মিলিমিটার (৩ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমী বায়ু ব্যতীত ভূমধ্যসাগরীয় হাওয়ার প্রভাবেও কাশ্মীর উপত্যকায় শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং এই উপত্যকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৭৫ মিলিমিটার (২৭ ইঞ্চি)। সোনমার্গে

বৎসরে ১৮০৩·৪০ মিলিমিটার (৭১ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাতও দেখা যায়। শীত-প্রধান অঞ্চলে শীতকালে তুষারপাত হয়। শ্রীনগর এলাকায় শীতকালে তুষারপাতের সময়ে হ্রদগুলির উপর বরফ জমিয়া থাকে। লদাখ প্রভৃতি শুষ্ক ও শীতপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকায় যদিও অপেক্ষাকৃত কম তুষারপাত হয় তবুও এইসব অঞ্চলে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। স্থানীয় উচ্চতার বিভিন্নতার জন্য কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে তাপের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ১৫৯১ মিটার (৫২০৫ ফুট) ঊর্ধ্বে অবস্থিত শ্রীনগরের গড় উচ্চতাপের পরিমাণ প্রায় ২০° সেন্টিগ্রেড (৬৭·৮° ফারেনহাইট) ও গড় নিম্নতাপ ৬·৬° সেন্টিগ্রেড (৪৩·৯° ফারেনহাইট)। প্রায় ৩৫৫০ মিটার (১১৫০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত লেহ তে গড় উচ্চতাপ ১২·৭° সেন্টিগ্রেড (৫৫·৯° ফারেনহাইট) ও গড় নিম্নতাপ— ১·৩° সেন্টিগ্রেড (২৯·৭° ফারেনহাইট) হইয়া থাকে। প্রধান পর্বতশ্রেণীগুলির উপরিভাগে অনেক স্থানের তাপমাত্রা বৎসরের প্রায় সকল সময়ে ০° সেন্টিগ্রেডের নীচে থাকে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কাশ্মীরের জন্ম মাত্র ১০০০ লক্ষ বৎসর পূর্বে। পৃথিবীর সূত্রপাত ধরা হয় সাধারণভাবে ১০০০০ লক্ষ বৎসর পূর্বে। সুতরাং ৯০০০ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই পার্বত্য অঞ্চল 'টেথিস' নামক সমুদ্রের তলদেশে ছিল। ডিভনিয়ান, কারবনিফেরাস ও টার্শিয়ারি প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে ক্রমশঃ ইহার উত্থান হয়। কাশ্মীরের ভূমি আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। এইস্থানে বহুমূল্য পাথর প্রচুর পাওয়া যায়। নানা প্রকার পাথর ও খনিজ পদার্থের মধ্যে ট্যাল্ক, অভ্র, কয়লা, অ্যাজ্‌বেস্টস, চুনা পাথর, জেড, বিড়ালাক্ষ, নীলকান্তমণি, শেল, স্লেট, তামা, নিকেল, বক্সাইট, গোল্ড স্টোন, চুনি, জিপসাম, গ্রাফাইট, কেওলিন, সোডিয়াম সল্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের নানা স্থানে গাছ ও প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায়।

আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য থাকার জন্য কাশ্মীরের বনজ সম্পদের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। দক্ষিণে নিম্ন অঞ্চল অথবা কাশ্মীর উপত্যকা বা পীর পঞ্জল, মূল হিমালয় ইত্যাদি পর্বতশ্রেণীর নানা স্থানে ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালারও পরিবর্তন দেখা যায়। ট্রান্স হিমালয় অঞ্চলে উইলো অথবা সীডর গাছই বেশি। ৩৩০০ মিটার হইতে ৪২০০ মিটারের (১১০০০ হইতে ১৪০০০ ফুট) মধ্যে অ্যালপাইন অঞ্চলে ক্ষুদ্রকায় গাছপালা, ঘাস ও সামান্য উইলো, বার্চ, জুনিপার ইত্যাদি জন্মায়। খিলানমার্গ প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত রডডেনড্রন গাছও দেখা যায়। আরও নীচে অর্থাৎ ২২৫০ মিটার (৭৫০০ ফুট) হইতে ৩০০০ মিটারের (১০০০০ ফুট) মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেবদারু, ওক, চীনার ইত্যাদি গাছ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বার্চ ও ব্লু-পাইনের জঙ্গলের দৃশ্য পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। শিবালিক অঞ্চলে চীর, ফার ও ব্লু পাইন গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রকার ফুলগাছের মধ্যে টিউলিপ, গোলাপ, প্রেমুলা, ফরগেট-মি-নট, ইয়েলো বাস্‌কেট ইত্যাদি প্রধান। মোট কাশ্মীরের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ অঞ্চলে বনজ সম্পদ আছে। এইসব বনজ সম্পদের মধ্যে দেবদারু ও ব্লু পাইন, সিলভার ফার প্রভৃতি গাছ কাঠের কাজ ও জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয়। উইলো গাছের পাতা পশুর খাদ্য ও গাছের ডাল ঝুড়ি বোনার কাজে লাগানো হয়। ইহা ছাড়া বনাঞ্চল নানাবিধ ভেষজ উদ্ভিদে পূর্ণ।

কাশ্মীরের ইতিহাসের মধ্যে কয়েকটি যুগের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে পৌরাণিক যুগ, হিন্দু রাজত্বকাল, মুসলমানের আগমন, পুনরায় হিন্দু ও শিখদের আগমন ও বর্তমান অবস্থা প্রধান। কবি কহ্লণের লেখা 'রাজতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে হিন্দুদের রাজত্ব সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু যুগের ইতিহাস প্রায় ১৫০০ বৎসরের ঘটনা এবং মোটামুটি ৭টি প্রধান বংশ এই যুগে রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে পাণ্ডু, মৌর্য, কুষাণ, গোনান্দ, শ্বেত হুন, কারকোট, এবং লোহারা প্রধান। এই যুগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজাদের নাম অশোক (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭২), কনিষ্ক (১২০ খ্রী), মিহিরকুল (৫২৮ খ্রী), প্রভর সেন ২য় (৫৮০ খ্রী), দুর্লভ বর্ধন (৬২৭ খ্রী), ললিতাদিত্য (৭২৫ খ্রী) ও হর্ষ (৬০৬ খ্রী)। হিন্দু-রাজত্বের অবসানের পর ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সামসুদ্দীনের সময় হইতে প্রকৃত মুসলমান রাজত্ব শুরু হয়। সুলতানদের রাজত্ব মোটামুটি ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। পরে দিল্লীর মোগল সম্রাটদের দ্বারাও কাশ্মীর শাসিত হয়।

মুসলমান শক্তি নিস্তেজ হইলে পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং অতি শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং-এর সেনাপতি ও গোলাব সিং নামে এক ডোগরা সেনাপতি কাশ্মীর উপত্যকা দখল করেন। ক্রমশঃ গোলাব সিং সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনকর্তা হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সন্ধি অনুযায়ী সিন্ধু নদের পূর্ব হইতে ইরাবতী নদীর পশ্চিম-পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল গোলাব সিং-এর হস্তগত হয়।

ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর এই ডোগরা বংশের রাজাদের অধীনে থাকে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হইলেও কাশ্মীরের মহারাজা তৎক্ষণাৎ ভারত বা পাকিস্তানের সহিত যোগদান করেন নাই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান কাশ্মীরকে তাহার সহিত যুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে হানাদার পাঠাইয়া শ্রীনগরের ২৮ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত দখল করিয়া লয়। এই অবস্থায় কাশ্মীরের মহারাজা ও সরকার ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর ভারত সরকারের সহিত চুক্তি করিয়া কাশ্মীরকে ভারতের সহিত যুক্ত করেন এবং হানাদারগণকে প্রতিরোধ করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন পর দিনই কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঘোষণা করিয়া সামরিক সাহায্য প্রেরণ করেন এবং এই বাহিনী হানাদারদের কিছুদূর পর্যন্ত বিতাড়িত করে। কিন্তু বিবাদ চলিতে থাকে এবং ভারত বিচারের জন্য ইউনাইটেড নেশনস এর দ্বারস্থ হয়। সে সময়ে ঠিক হয় যে ইউনাইটেড নেশনস এর মধ্যে থাকিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু নানা কারণে তাহাতে বিলম্ব ঘটে।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কাশ্মীরের জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা বিধানসভা পরিচালিত হইতে থাকে। কাশ্মীর বিধানসভায় যখন বক্সী গোলাম মহম্মদ নেতা ও প্রধান মন্ত্রী সেই সময়ে (১৯৫৪খ্রী) বিধানসভার অনুমোদনে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হয়। যদিও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি আইনসম্মত উপায়ে সমাধান হইয়াছে তথাপি আজিও কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমের কিছু অংশ পাকিস্তানের কবলিত আছে এবং সেই স্থানে পাকিস্তান সরকার আজাদ কাশ্মীর নামে এক সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জম্মু কাশ্মীর উপত্যকা ও লদাখ ইত্যাদি অঞ্চলে ভারতের শাসন প্রচলিত রহিয়াছে। অদ্যাবধি কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইয়া থাকে।

শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর ১৪টি জেলায় বিভক্ত। ইহার মধ্যে অনন্তনাগ, বরামুলা, জম্মু, কাথুয়া, লদাখ, ডোডা, পুঞ্চ রাজৌরী, উধামপুর ও শ্রীনগর --এই ৯টি জেলা ভারতের অধীনে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী এই ৯টি জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৫৬০৯৭৬।

আয়তনে কাশ্মীর বিশাল দেশ হইলেও জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। বরামুলা, অনন্তনাগ, জম্মু ও শ্রীনগর এই চারটি জেলার আয়তন সমগ্র কাশ্মীরের প্রায় এক দশমাংশ হইলেও সমগ্র দেশের দুই তৃতীয়াংশ লোক এই অঞ্চলে বাস করে। যদিও লদাখ অঞ্চল সমগ্র কাশ্মীরের প্রায় অর্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে, তথাপি শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়া এবং প্রতিকূল প্রকৃতির জন্য এই স্থানের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ৭৩ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ১৯) লোক বাস করে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দিকেও ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া জনবসতির উপযুক্ত নয় বলিয়া জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। জনসংখ্যাবৃদ্ধির গতিও বেশি নয়। ১৯১১ হইতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ৫৫·৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের শতকরা ১১ জন শিক্ষিত এবং নারীদের মধ্যে কেবল শতকরা ৪·৩ জন শিক্ষিতা। দেশের শতকরা ৮৩ জন গ্রামে এবং ১৭ জন শহরে বাস করে। প্রতি ১০০ জন কর্মক্ষম লোকের মধ্যে ৮৫.২২ জন কৃষিকর্মে নিযুক্ত।

সাধারণভাবে মুসলমান, হিন্দু, শিখ এবং বৌদ্ধ এই কয়টি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক কাশ্মীরে বাস করে। ইহার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক সর্বাপেক্ষা বেশি। হিন্দুদের বসতি সাধারণতঃ দক্ষিণ কাশ্মীর অর্থাৎ জম্মু ও শ্রীনগর উপত্যকায়। লদাখ অঞ্চলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস। ইহা ব্যতীত প্রায় সকল স্থানেই মুসলমান ধর্মের লোকেরা বাস করেন। এইসব সম্প্রদায়ের লোকেরা নানা জাতি ও নানা বর্ণে বিভক্ত। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত এবং ঠাকুর ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক আছে। ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিত নামে পরিচিত। জম্মু অঞ্চলে ডোগরা রাজপুত-জাতির বাস। ডোগরা অঞ্চলের উত্তর দিকে ঝিলম পর্যন্ত স্থানকে বলা হয় 'চিবল' অর্থাৎ চিব নামক জাতির এলাকা। চিবেরা প্রধানতঃ মুসলমান, কিন্তু কিছু হিন্দু চিবও আছে। ঝিলম উপত্যকায় 'বম্বা' ও 'খখা' নামে দুইটি মুসলমান সম্প্রদায় আছে। কাশ্মীরের দক্ষিণ পূর্ব ও জম্মুর পূর্ব এলাকা জুড়িয়া মুসলমান সম্প্রদায় গুজর নামে এক জাতি বাস করে। ইহাদের প্রধান উপজীবিকা গো মহিষপালন ও দুগ্ধের ব্যবসায়। চাষ আবাদ ইহাদের গৌণ উপজীবিকা। গদ্দী নামে অর্ধ-যাযাবর এক হিন্দুজাতি আছে। যদিও হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা ইহাদের প্রধান আবাসস্থল তথাপি কাশ্মীরের দক্ষিণ পূর্বে অনেক গদ্দী বাস করে। ইহাদের প্রধান উপজীবিকা নানা স্থানে ঘুরিয়া পশু পালন করা। পার্বত্য এলাকায় ইহাদের একটি নিজস্ব গ্রাম থাকে, তথাপি পশু-চারণের জন্য বৎসরের বেশির ভাগ সময়ে তৃণভূমির সন্ধানে

জম্মু ও কাশ্মীর

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ছাগ ও মেষপালনই গদ্দীদের মুখ্য ব্যবসায়, চাষ-আবাদ গৌণ।

কাশ্মীরী বলিতে যে মুসলমান সম্প্রদায় আছে তাহার মধ্যে কয়েকটি ভাগ আছে, যথা – শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে শেখ-সম্প্রদায়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। কথিত আছে যে ইহারা হিন্দু-বংশোদ্ভূত। মোগল-সম্প্রদায়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। মোগলদের তুলনায় পাঠানদের সংখ্যা বেশি এবং ইহারা কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাস করে। ওয়াটাল নামে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি যাযাবর-শ্রেণী আছে। ইহারা চর্মকার জুতা ইত্যাদি তৈয়ারি করে, কিন্তু ইহারা কখনও এক স্থানে বাস করে না, প্রয়োজন অনুসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সমগ্র লদাখ অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের জন্য চার্চ মিশনারি সোসাইটি শ্রীনগরে মিশন গঠন করেন। লদাখের লেহ শহরে মোরাভিয়ান এবং রোমান ক্যাথলিক মিশনের প্রচারকার্য শুরু হয়। কাশ্মীরে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অতি নগণ্য।

কাশ্মীরের অর্থনীতি সাধারণতঃ চাষ আবাদ, কুটির-শিল্প ও পর্যটকদের আগমনের উপর নির্ভর করে। সরকারের বন বিভাগ হইতেই সর্বাধিক আয় হয়। জঙ্গলের কাটা গাছ নদীপথে চালান যায় এবং শহরের নিকটে আসিলে উহা নানা শিল্পের কাজে লাগানো হয়। পার্বত্য কাশ্মীরের সকল স্থান চাষের উপযোগী নয়। চাষের সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত জমি দেখা যায় প্রধানতঃ কাশ্মীর উপত্যকায়। প্রধানতঃ সমতলভূমির অভাব এবং পরিপন্থী আবহাওয়ার জন্য প্রায় সকল স্থানই চাষের অনুপযোগী। বিশাল লদাখের মোট ভূমির অতি নগণ্য এলাকাই চাষের কাজে আসে। জম্মু ও কাশ্মীরকে মোটামুটি কয়েকটি কৃষি-অঞ্চলে ভাগ করা যায়। জম্মু অঞ্চলে গম, বার্লি, জাফরান ও নানাবিধ ফল উৎপন্ন হয়। কাশ্মীর উপত্যকা নানা প্রকারের ধান, ভুট্টা, গম, বার্লি, সবজি ও পেস্তা, বাদাম, আপেল, আঙুর, আখরোট প্রভৃতি ফলের জন্য বিখ্যাত। ঝিলম নদীর দক্ষিণে করেওয়া নামে অভিহিত ধাপে ধাপে সজ্জিত কর্দম-মৃত্তিকাময় অঞ্চলে তুলা, জাফরান ও বাজরার চাষ হয়। পুঞ্চ রাজৌরী প্রভৃতির উচ্চ স্থানে জাফরান ও আফিম জন্মায়। হ্রদ অঞ্চলের ভাসমান উদ্যানে প্রচুর সবজি উৎপাদন করা হয়। ইহা ছাড়া কাশ্মীরের কয়েকটি স্থানে প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্যে কেবল কাশ্মীরে চাল প্রধান খাদ্যদ্রব্য। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে প্রধান ফসলের মধ্যে ২০৪৪০০ হেক্টর (৫১১০০০ একর) জমিতে ধান, ২১৩৬০০ হেক্টর (৫৩৪০০০ একর) জমিতে ভুট্টা, ১৬৪০০ হেক্টর (৪১০০০ একর) জমিতে গম, ১৫৬০০ হেক্টর (৩৯০০০ একর) জমিতে সরিষা, ১০৪০০ হেক্টর (২৬০০০ একর) জমিতে তিসি উৎপন্ন হয়। শীতের সময় জমি বরফে ঢাকা থাকে বলিয়া গরমের সময়েই কেবল চাষ-আবাদ হয়। লাঙল ও সাধারণ যন্ত্রপাতিই চাষের সম্বল।

সিল্ক ও উলের কার্পেট, শাল ইত্যাদি কাশ্মীরের কুটিরশিল্পের প্রধান উৎপাদন। কাশ্মীরের কার্পেট বিশ্বের বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে। ইহা ছাড়া কুটির-শিল্পের মধ্যে সুন্দর সুন্দর কাষ্ঠশিল্প, কাগজের মণ্ড শিল্প, তাম্র রৌপ্যশিল্প উল্লেখযোগ্য।

কাশ্মীরকে অনেকে ভূস্বর্গ বলে। প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের বহু পর্যটক এই স্থানে আগমন করেন। এই পর্যটকেরা কাশ্মীরভ্রমণের জন্য মুক্ত হস্তে খরচ করেন বলিয়া দেশের কুটিরশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কাশ্মীরের সর্বত্র বিনা খরচায় শিক্ষাদান করা হয়। প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও স্থানেই ছাত্রদের বেতন লাগে না। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়েদের শিক্ষার জন্য দুইটি কলেজ, ২৭টি উচ্চ, ৭১টি মাধ্যমিক ও ৩৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ছেলেদের জন্য ২২৬৫টি প্রাথমিক, ২৮১টি মাধ্যমিক ও ১০৯টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৬টি কলেজ আছে।

কাশ্মীরের কোথাও রেলসংযোগ নাই; পাঞ্জাবের পাঠানকোটই কাশ্মীর যাইবার পথে শেষ রেল-স্টেশন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পাঠানকোট হইতে রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর পর্যন্ত বরামুলা হইয়া একটি পাকা রাস্তা ছিল কিন্তু তাহার কিছু অংশ পাকিস্তান-অধিকৃত হওয়ায় বর্তমানে একটি পৃথক রাস্তা তৈয়ারি করা হইয়াছে। ৩৯৮ কিলোমিটার (২৪৯ মাইল) পাকা রাস্তাটি পাঠানকোট হইতে বানিহাল গিরিপথ হইয়া শ্রীনগর পর্যন্ত গিয়াছে এবং বৎসরের কোনও সময়েই ইহা তুষারাবৃত থাকে না। বর্তমানে শ্রীনগর হইতে লদাখের প্রধান শহর লেহ পর্যন্ত একটি গাড়ি চলার উপযোগী রাস্তা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছোট রাস্তা দ্বারা পহলগাঁও, গুলমার্গ, খিলানমার্গ ইত্যাদি স্থান যুক্ত। পূর্বে কাশ্মীর হইতে নানা গিরিপথের মধ্য দিয়া তিব্বত ও অন্যান্য স্থানে মালপত্র পাঠানো হইত। বর্তমানে ইহার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে।

জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগরে বিমানবন্দর আছে এবং বিশেষ প্রয়োজনে লেহ ও অন্যান্য স্থানের বিমানবন্দরগুলিরও ব্যবহার হয়। পর্যটকদের সুবিধার জন্য পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলিতে বাস চলাচল করে। কাশ্মীরের প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

শ্রীনগর. কাশ্মীরের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর ('শ্রীনগর' দ্র)।

জম্মু. ৩২°৪৪′ উত্তর ও ৭৪°৫৫′ পূর্বে অবস্থিত কাশ্মীরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। শীতকালে এই শহরেই কাশ্মীরের রাজকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। এই শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৬০ মিটার (১২০০ ফুট) উচ্চে এবং চন্দ্রভাগা নদীর উপনদী তাওয়াই নদীর ধারে অবস্থিত। রঘুনাথজীর বৃহত্তম মন্দির ছাড়াও এই শহরে অনেক মন্দির আছে এবং অনেকে ইহাকে মন্দিরের শহরও বলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ১০২৭৩৮ জন।

অমরনাথ শ্রীনগর হইতে ১২৭ কিলোমিটার (৭৯ মাইল) দূরে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩৯০০ মিটার (১২০০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত হিন্দুদিগের তীর্থস্থান ('অমরনাথ' দ্র)।

গুলমার্গ : শ্রীনগরের ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত পর্যটকদের গ্রীষ্মকালের প্রমোদ-কেন্দ্র ('গুলমার্গ' দ্র)।

বরামুলা শ্রীনগর হইতে ৫৪ কিলোমিটার (৩৪ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত এই শহর। ঝিলম নদীর ধারে অবস্থিত বলিয়া পূর্বে ইহা নদী-বন্দর হিসাবে ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। বর্তমান বরামুলার ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) দক্ষিণ পূর্বে এবং ঝিলম নদীর অপর পারে কুষাণরাজ হুবিষ্কের তৈয়ারি হুষ্কপুরা শহর দেখা যায়।

পুঞ্চ. সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০৫ মিটার (৩৩৫০ ফুট) উচ্চে পুঞ্চ নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর রাওয়াল-পিণ্ডির সহিত পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। শহরের মধ্যে একটি দুর্গে পুঞ্চ জায়গিরের রাজার বাসস্থান।

লেহ ৩৪৫০ মিটার (১১৫০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত লদাখের প্রধান শহর। এই শহরের মাধ্যমে খচ্চর ও ঘোড়ার পিঠে (বর্তমান পরিস্থিতির পূর্বে) মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের সহিত বাণিজ্য চলিত। এই শহরের ৩৩ কিলোমিটার (২১ মাইল) দূরে কাশ্মীরের বিখ্যাত বুদ্ধমন্দির হিমিস গুম্ফা অবস্থিত।

ইসলামাবাদ : শ্রীনগর হইতে ৬৪ কিলোমিটার (৪০ মাইল) দূরে মার্তণ্ড মালভূমির উপর অবস্থিত। ঝিলম নদীপথে এই শহরের ১৬ কিলোমিটার (১ মাইল) দূরের স্থান পর্যন্ত যাওয়া যায়। শহরের নিকটে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। জনসংখ্যা ১০০০০এরও বেশি। এই স্থানের বিখ্যাত শিল্প ও সূচের কাজ।

তখ্ত্-ই-সুলেমান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯১৪.১৪ মিটার (৬২৮০ ফুট) উচ্চে শ্রীনগরের নিকট একটি দর্শনীয় স্থান। তখ্ত্-ই-সুলেমান অথবা সুলেমানের সিংহাসন একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে স্থাপিত একটি পুরাতন মন্দির আছে। এইস্থান হইতে শ্রীনগরের দৃশ্য সুন্দর দেখায়।

হরি পর্বত ডাল হ্রদ হইতে ৭৫ মিটার (২৫০ ফুট) উচ্চে এই পর্বতে সম্রাট আকবর কোহ্-ই-মারান নামে এক দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার উপর হইতে বহু দূরের দৃশ্য অতি সুন্দররূপে দেখা যায়। স্বামী অভেদানন্দ, আর্থার লিলি এবং নিকলাস নটভিচ ইত্যাদি মনীষীগণের ধারণা এই যে, হরি পর্বতের পাদদেশে খানাইয়ারি বস্তিতে যীশুর সমাধি মন্দির আছে।

কারগিল শ্রীনগর হইতে লেহ যাইবার পথে ২৬৩৬ মিটার (৮৭৮৭ ফুট) উচ্চে এবং ওয়াক্কা ও সুরু নদীর সংগমে ইহার অবস্থান। কারগিলের পর লেহ-র পথে বিখ্যাত জোজিলা গিরিপথ। সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে ইহার সব স্থানই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্কারদু ৩৫°৭′ উত্তর ও ৭৫°৬′ পূর্ব এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৭৫ মিটার (৭২৫০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত এই শহর। সিন্ধু নদের সহিত সাইয়ক নদীর সংগমের পর সিন্ধু নদের ধারে এই শহর প্রাচীন বালটিস্থানের রাজধানী ছিল। এই স্থান হইতে পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ হিমবাহ যথাক্রমে বল্টারো, বিয়াফো, হিসপার ইত্যাদি স্থানে অভিযান করার সুবিধা আছে।

মার্তণ্ড : ৩৩°৪′ উত্তর ও ৭৫°১′ পূর্বে অবস্থিত। এই শহরে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রাচীন সূর্যদেবের মন্দির ভারত তথা পৃথিবীতে বিখ্যাত। মার্তণ্ড ইসলামাবাদ হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) পূর্বে অবস্থিত।

পহলগাঁও শ্রীনগর হইতে পূর্বে ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল) ৭২০০ ফুট উচ্চে একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পূর্ণ স্থান ও পর্যটকগণের প্রমোদকেন্দ্র। ('পহলগাঁও' দ্র)।

দ্র কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, *The Imperial Gazetteer of India Kashmir and Jammu*, Calcutta, 1909, V. Smith, *The Oxford History of India*, London, 1923, M B Pithawalla, *An Intro-*

duction of Kashmir, London, 1953; D. N. Wadia, *Geology of India*, London, 1957; Publication Division, Government of India, *India 1963*, Delhi, 1963; *The Statesman Yearbook*, London, 1963; *Census of India: Paper No 1, 1962* New Delhi, 1963; Department of Tourism, Government of India, *Pamphlets on Kashmir*, Delhi, 1964

শরদিন্দু বসু

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-৮৮ খ্রী) হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাল্যকালে অল্প কিছুদিন তিনি কলিকাতার হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া পিতার কর্মস্থল মীরাটে যান এবং সেখানে সামরিক অফিসে কেরানীর চাকুরি করেন। প্রচুর ধন সম্পত্তি লইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি বিস্তর ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক জাল দলিল-সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত হইয়া প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

বিদ্যাচর্চার উৎসাহদাতা হিসাবে জয়কৃষ্ণ প্রভূত যশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় উত্তরপাড়ার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, উত্তরপাড়া কলেজ, সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার অর্থ সাহায্যে প্রায় ৩১টি বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। ইহা ছাড়া কৃষক প্রজাদের সুবিধার্থে তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয় এবং উত্তরপাড়ায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। তাঁহার ঘোষণা অনুসারে হুগলি কলেজের অধ্যাপক লালবিহারী দে ইংরেজী ভাষায় 'গোবিন্দ সামন্ত' নামক পুস্তক রচনা করিয়া পাঁচ শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

দেশের সর্বপ্রকার উন্নতিশীল আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের স্থাপয়িতাদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ অন্যতম প্রধান ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকা সেনগুপ্ত

জয়গোপাল গোস্বামী শান্তিপুরবাসী অদ্বৈতবংশীয়, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, বৈষ্ণবশাস্ত্র-নিষ্ণাত। পণ্ডিত-সমাজে ইহার খ্যাতি 'গোবিন্দদাসের কড়চা' পুস্তিকাটির (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫ খ্রী) সম্পাদকরূপে। অনেকে সন্দেহ করেন বইটি ইহারই রচনা। জয়গোপালের অপর গ্রন্থের মধ্যে কবিতার বই 'চারুগাথা' (১৮৭১ খ্রী) এবং উপন্যাস 'শৈবলিনী' (১৮৬৯ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। 'শৈবলিনী'র কিছু সমাদর হইয়াছিল।

সুকুমার সেন

জয়গোপাল তর্কালংকার (১৭৭৫-১৮৪৬ খ্রী) পণ্ডিত ও বিশিষ্ট বঙ্গ-সাহিত্যসেবী। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর নদিয়া জেলার বজ্রাপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। জয়গোপাল প্রথম তিন বৎসর প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হেন্‌রি টমাস কোল্‌ব্রুক-এর পণ্ডিতরূপে কাজ করেন। ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উইলিয়াম কেরির অধীনে শ্রীরামপুর মিশনে চাকুরি করেন। ১৮১৮ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জে. সি. মার্শম্যান-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন। ঐ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সংস্কৃতবহুল কঠিন বাংলাকে দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগীরূপে সহজ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ৬০ টাকা মাহিনায় ইনি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সুদীর্ঘ ২২ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, তারাশংকর তর্করত্ন ও মদনমোহন তর্কালংকার উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ইহার মৃত্যু হয়।

জয়গোপাল ১৮৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণের এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীরাম দাসের মহাভারতের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্তি।

ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এইগুলি প্রধান: 'শিক্ষাসার' (১৮১৮ খ্রী, ২য় সংস্করণ), বিল্বমঙ্গল-কৃত 'কৃষ্ণবিষয়ক-শ্লোকাঃ' (১৮১৭ খ্রী), 'চণ্ডী' (১৮১৯ খ্রী), 'পত্রের ধারা' (১৮২১ খ্রী), 'বঙ্গাভিধান' (১৮৩৮ খ্রী)। এতদ্ব্যতীত এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 'মহাভারতে'র (১৮৩৭ খ্রী) তৃতীয় খণ্ডের তিনি অন্যতর সংশোধক ছিলেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাল তর্কালংকার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৩, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য

জয়চন্দ্র গাহড়বাল বংশের রাজা জয়চন্দ্র ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের যে

সকল লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের তারিখ ১১৭০ হইতে ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা এবং গয়া প্রভৃতি অঞ্চল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলার সেনবংশের সম্রাট লক্ষ্মণসেন কাশীরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কাশীরাজ বলিতে এ স্থলে জয়চন্দ্রকেই বুঝিতে হইবে। তাঁহার সহিত চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের বিরোধ এবং পৃথ্বীরাজ কর্তৃক তাঁহার কন্যা সংযুক্তাকে (বা সংযোগিতা) স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিবার যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী জয়চন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গাহড়বাল-অধিপতি পরাজিত এবং নিহত হন। জয়চন্দ্র ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। কেহ কেহ মনে করেন যে নৈষধ চরিতের রচয়িতা শ্রীহর্ষ তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন।

অমিতাভ ভট্টাচার্য

জয়দুর্গা দুর্গার লৌকিক রূপভেদ। ইঁহার বর্ণ প্রলয়-কালীন মেঘের মত। ইনি ত্রিনেত্রা। কটাক্ষের দ্বারা ইনি অরিকুলের ভীতি উৎপাদন করেন। ইঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা আবদ্ধ। ইনি চতুর্ভুজা— হস্তে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ এবং ত্রিশূল। ইনি সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া, দেবতাদের দ্বারা পরিবৃতা এবং সিদ্ধসংঘের দ্বারা পূজিতা। ত্রিভুবন ইঁহার তেজে পূর্ণ। বিপত্তারিণী ব্রত, সুবচনী-ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সাধারণভাবে ইঁহার পূজা হয়। কোথাও কোথাও অনুষ্ঠিত ইঁহার বিশেষ পূজার রীতিনীতি বিচিত্র। এই পূজার নাম পত্রাবলী পূজা। পূজার পূর্বে পত্রাবলীর সং বা ঢুঙ্গিরা উলঙ্গনৃত্যের দ্বারা দেবীকে আবাহন করে— দেবী না আসিলে নানারূপ লাঞ্ছনা করিবার ভয় দেখায়। দেবীকে প্রচুর সিদ্ধ চাউলের ভাত ও মাছপোড়া ভোগ দেওয়ার নিয়ম আছে। পূজায় নাচ গান, বাজনা ও নাটকের সহিত মহোৎসবের বিধি আছে। দেবীর সঙ্গে অন্যান্য অপরিচিত দেবতা ও দানবদের পূজা করা হয়। গ্রামের বাহিরে পূজার অনুষ্ঠান করার নিয়ম আছে।

দ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'বাংলার লৌকিক দেবদেবী', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জয়দেব 'গীতগোবিন্দে'র রচয়িতা জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ কবি। বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব (বা কেঁদুলি) গ্রাম তাঁহার জন্মভূমিরূপে স্বীকৃত। কেহ কেহ তাঁহাকে মিথিলা বা ওড়িশার অধিবাসী বলিয়া মনে করেন।

'প্রসন্নরাঘব' নামক নাটক, 'চন্দ্রালোক' নামক অলংকারগ্রন্থ এবং 'রতিমঞ্জরী' নামক কামশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা জয়দেব ও আলোচ্য জয়দেব এক নহেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভায় গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি ও জয়দেব এই পঞ্চরত্ন বর্তমান ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু 'গীতগোবিন্দে' উক্ত কবিগণের নাম থাকিলেও লক্ষ্মণসেনের নাম নাই। ঐ যুগের কোশকাব্য 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' গীতগোবিন্দের পাঁচটি শ্লোক ছাড়া জয়দেবের নামাঙ্কিত আরও ছাব্বিশটি শ্লোক পাওয়া যায়।

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের সমাপ্তি-শ্লোক হইতে জানা যায়, কবির পিতার নাম ভোজদেব ও মাতা রামাদেবী। পত্নীর নাম পদ্মাবতী। 'ভক্তমাল', 'সেক শুভোদয়া'দি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থে এবং প্রচলিত জনশ্রুতিতে জয়দেব ও পদ্মাবতীর সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও এ বিষয়ে কোনও যথার্থ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

জয়দেব প্রধানতঃ 'পদ্ম' ও 'ব্রহ্মবৈবর্ত'পুরাণ এবং 'গর্গসংহিতা'র অনুসরণে 'ভাগবতে'র শরৎকালীন রাসের পরিবর্তে 'গীতগোবিন্দে' বাসন্ত রাসের বর্ণনা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। ইহা কোনও প্রাচীন কাব্য-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা উল্লেখযোগ্য। ইহার গৌরব কেবলমাত্র সাহিত্য-রসিক-সমাজে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জগন্নাথ মন্দিরে ইহা প্রত্যহ গীত হইয়া আসিতেছে। সহজিয়াগণ জয়দেবকে আদিগুরু এবং নবরসিকের অন্যতম বলিয়া থাকেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রচিত 'গীতগোবিন্দে'র টীকার সংখ্যা চল্লিশেরও অধিক। পূজারী গোস্বামী এবং রাণা কুম্ভের টীকাবই প্রসিদ্ধি সমধিক। 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে 'গীতগৌরীশ' প্রভৃতি বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন সময়ে 'গীতগোবিন্দে'র বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের এবং বিদেশের নানা ভাষায় ইহার বহু অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গানুবাদগুলির মধ্যে রসময় দাসের পদ্যানুবাদ অতি মধুর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

দ্র S. K. De, *History of Sanskrit Literature*, Calcutta, 1947.

কল্যাণী দত্ত
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়দেব-কেঁদুলি ২৩°৩৮´ উত্তর ও ৮৭°২৪´ পূর্ব। কেঁদুলি বা কেন্দুবিল্ব বীরভূম জেলার একটি গ্রাম। আয়তন ২৪·৯ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৭৯০ জন। ইহা বোলপুর স্টেশন হইতে ২৮ কিলোমিটার দূরে অজয় নদের তীরে অবস্থিত। 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জয়দেবের নিবাসস্থল বলিয়া এই গ্রামটি 'জয়দেব-কেঁদুলি' নামে বৈষ্ণবগণের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কবির পূজিত রাধা বিনোদবিগ্রহ ও সিদ্ধিলাভের স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে মকর সংক্রান্তির দিনে পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আউল বাউলের সমাবেশই কেঁদুলিমেলার বিশেষ আকর্ষণ।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

জয়দ্রথ বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র ও সিন্ধু দেশের রাজা। ইনি দুর্যোধনের ভগ্নী দুঃশলাকে বিবাহ করেন। কাম্যক বনে দ্রৌপদীর রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মৃগয়ারত পাণ্ডবগণের অনুপস্থিতিতে তাহাকে হরণ করেন। ধাত্রী-কন্যার নিকট দুঃসংবাদ জানিয়া পাণ্ডবগণ জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন করিলে দ্রৌপদীকে ত্যাগ করিয়া পলায়নরত জয়দ্রথ পরাজিত ও ভীম কর্তৃক অপমানিত হন। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে জয়দ্রথের অনুষ্ঠিত তপস্যায় প্রীত মহাদেব, অর্জুন-ভিন্ন চারি পাণ্ডবকে যুদ্ধে একটি দিন পরাভূত করিতে পারিবেন, জয়দ্রথকে এই বর দেন। সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে নিরত অর্জুনের অনুপস্থিতিতে জয়দ্রথ চারি পাণ্ডবকে পরাভূত করিলে অভিমন্যুকে দুঃশাসনের পুত্র বধ করেন। শোকার্ত অর্জুন পর দিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথ বধ নতুবা অগ্নি প্রবেশের প্রতিজ্ঞা করেন। দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্য -কর্তৃক আশ্বস্ত ও ব্যূহমধ্যে নিরাপদে অবস্থিত জয়দ্রথ পর দিন সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া প্রীত হন। সেই সময়ে অসতর্ক জয়দ্রথকে অর্জুন বধ করেন এবং শরদ্বারা উৎক্ষিপ্ত তাঁহার মস্তক প্রথমে তপস্যারত বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে এবং তথা হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া শতধা বিদীর্ণ হয়।

দ্র মহাভারত ৩।২৪৯ ৫৬, ৭।১২০-২১।

মৃণিকা ঘোষ

জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৭৫২-১৮২০ খ্রী) দক্ষিণ কলিকাতার ভূকৈলাসের বিখ্যাত রাজা। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১১৫৯ বঙ্গাব্দ) প্রাচীন কলিকাতার গোবিন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল।

জয়নারায়ণের শৈশবাবস্থায় পিতামহ কন্দর্পনারায়ণ গোবিন্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া খিদিরপুরে চলিয়া আসেন। সেই হইতে তাঁহাদের খিদিরপুরে স্থিতি।

অতি অল্প বয়সেই জয়নারায়ণ সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের অধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পরে রাজস্ব সংক্রান্ত কোনও বিষয়ের মীমাংসার জন্য তিনি কর্নেল সেক্সপীয়ারের অধীনে যশোহর গমন করেন। তাঁহার কর্মকুশলতায় কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশে দিল্লীর তদানীন্তন বাদশাহ্ মহম্মদ জাহন্দার শাহের নিকট হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও তিন হাজারী মনসবদারী সনন্দ লাভ করেন।

অতঃপর জয়নারায়ণ ব্যবসায় বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়া স্বীয় ধন-সম্পত্তি বর্ধিত করেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে শারীরিক অসুস্থতার জন্য জয়নারায়ণ কাশীবাসী হন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে স্বীয় বাসভবনে ভারতের প্রাচীনতম ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে (১৮১৮ খ্রী) কাশীর 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'র হস্তে ইহার পরিচালন ভার অর্পিত হয়।

ভূকৈলাসের বিরাট প্রাসাদে তিনি বহু দেব দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করেন। কাশীধামে গুরুকুণ্ড পুষ্করিণী ও ধাতুময় গুরুপ্রতিমা স্থাপন করেন।

তিনি সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'শঙ্করী সঙ্গীত', 'ব্রাহ্মণার্চন চন্দ্রিকা', 'জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম', 'কাশী-খণ্ডের বঙ্গানুবাদ', 'করুণানিধান বিলাস' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। মহাভারতের হিন্দী অনুবাদে কাশীর রাজাকে তিনি সাহায্য করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর (কার্তিক, ১২২৮ বঙ্গাব্দ) মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকা সেনগুপ্ত

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮০৬-৭২ খ্রী)। উনিশ শতকের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মুচাদিপুর গ্রামে জন্ম। পিতা হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রথমে পিতার নিকট ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি এবং পরে 'প্রাণতোষণী লতা'র প্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালংকারের নিকট অলংকারশাস্ত্র, জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র ও পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ-পণ্ডিতপদে নিয়োগের জন্য প্রশংসাপত্র পান (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও একই বৎসরে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন)। পরে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের

১১ আগস্ট সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত কলেজে প্রায় ৩০ বৎসর ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর অবসর গ্রহণ করেন ও শেষ জীবন কাশীতে কাটান। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: 'উদয়নাচার্যকৃত আত্মতত্ত্ব বিবেক' (১৮৪৯ খ্রী), 'কণাদসূত্র বিবৃতি' (কণাদরচিত বৈশেষিক সূত্রের টীকা, ১৮৬১ খ্রী), 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' (মাধবাচার্যকৃত সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের বাংলায় লিখিত সারার্থ, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত, ১৮৬১ খ্রী), 'ন্যায়দর্শন' (বাৎস্যায়নভাষ্যসমেত, ১৮৬৫ খ্রী), 'পদার্থতত্ত্বসার' (১৮৬৭ খ্রী, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আনুকূল্যে প্রকাশিত), 'ভৈরব-পঞ্চাশিকা' (১৮৬৮ খ্রী)। ইহা ছাড়া তাঁহার 'পদার্থতত্ত্বসার' গ্রন্থে উল্লিখিত 'নীরাজনপ্রকাশ', 'সুর-সংক্রমদীপিকা', 'শরকেশস্তব' ও 'বচঃপুষ্পাঞ্জলি' (চামুণ্ডা-শতক) উল্লেখযোগ্য।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য

জয়নারায়ণ তর্করত্ন (১৮৫৫-১৯০৭ খ্রী) একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইঁহার পৈতৃক বাসভূমি ফরিদপুর জেলার পণ্ডিতবহুল স্থান কোটালিপাড়া। ইনি ফরিদপুর কোড়কদির কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন ও নবদ্বীপের ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি কাশীতে ও নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন। কাশীতে ইনি কাশীরাজের সভাপণ্ডিত পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপের পাকা টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমসাময়িক পণ্ডিতসমাজে ইনি পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রবিচারে নৈপুণ্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'তর্করত্নাবলী' ১২৯৫ সনে (১৮৮৮ খ্রী) কাশী হইতে প্রকাশিত হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জয়ন্তী দেবী জয়ন্তী বা বৈজয়ন্তী দেবী মধ্যযুগের বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ বিদুষী মহিলা। ইঁহার পিতা 'কুলার্চনদীপিকা'-প্রণেতা জগদানন্দ তর্কবাগীশ এবং স্বামী 'আনন্দলতিকা', 'দেবীশতক' প্রভৃতির রচয়িতা কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। ইঁহারা দুই জনেই পূর্ব বঙ্গের ধান্যকা ও কোটালিপাড়ার দুই প্রসিদ্ধ বৈদিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি কৃষ্ণনাথ ১৫৭৪ শকাব্দে (১৬৫২ খ্রী) পত্নীর সহযোগিতায় 'আনন্দলতিকা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাড়া জয়ন্তী দেবীর রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সংস্কৃত কবিতারও সন্ধান পাওয়া যায়।

দ্র হরিদেব শাস্ত্রী, ভারতের শিক্ষিত মহিলা, কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় অংশ, বৈদিক ব্রাহ্মণ বিবরণ, কলিকাতা, [১৩১১ বঙ্গাব্দ], দেবীশতক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থমালা।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জয়পাল পাঞ্জাবের শাহীবংশের রাজা। ইনি ভীমের (৯৫০-৫৮ খ্রী) পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ফেরিশ্‌তার মতে জয়পালের পিতা ছিলেন ইস্তপাল বা ইষ্টপাল। তাঁহার রাজ্যের প্রসার ছিল এক দিকে সিরহিন্দ হইতে লামঘান, অন্য দিকে কাশ্মীর হইতে মুলতান। মিনহাজউদ্দীন বলিয়াছেন যে জয়পালই ছিলেন সমসাময়িক হিন্দের মহত্তম নরপতি। মুসলমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জয়পাল পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভাতিণ্ডা দুর্গেই অবস্থান করিতেন। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পর গজনীর অধিপতি সবুক্তগীন বিনা প্ররোচনায় জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া জয়পাল সমস্ত সামন্ত ও মিত্রশক্তির সহায়তায় গজনী অভিমুখে অগ্রসর হন। অপর পক্ষে বিপদ বুঝিয়া সবুক্তগীন হিন্দু রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং শেষপর্যন্ত হিন্দুসৈন্যগণ পরাজিত হইলে জয়পাল সন্ধি প্রস্তাব করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে জয়পাল সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া সবুক্তগীনের দূতগণকে বন্দী করিয়া রাখেন এবং সবুক্তগীন জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া নির্বিবাদে সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লন। নিরুপায় হইয়া জয়পাল দিল্লী, আজমীর, কালিঞ্জর, এবং কনৌজের ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়পাল বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়াও পরাজিত হন। ইহাই ছিল জয়পালের সর্বশেষ গজনী অভিযান। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর মাহমুদ ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় জয়পালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে জয়পাল পুনরায় পরাজিত ও বন্দী হন। বহু অর্থ ও ২৫টি হস্তী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি বন্দীদশা হইতে মুক্ত হন। কিন্তু স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনঃপুনঃ পরাজয়ের গ্লানিতে স্বেচ্ছায় পুত্র আনন্দপালের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন।

শিশির মিত্র

জয়পুর রাজস্থানের একটি জেলা, তহসিল ও শহর। জেলাটি ২৬°৪১ হইতে ২৮°৩৪ উত্তর এবং ৭৪°৫১ হইতে ৭৭°১৩' পূর্বে অবস্থিত। আয়তন ১৩৪৪৭ বর্গ কিলোমিটার (৫৩৭৯ বর্গ মাইল)। উত্তরে পাঞ্জাব, পশ্চিমে সিকর, ঝুনঝুনা, নাগাউর ও আজমীর জেলা, দক্ষিণে টোঙ্ক ও সোবাই মাধোপুর জেলা এবং উত্তর পূর্বে আলোয়ার জেলা। জেলাটি কোটাপুতলী, বৈরাট, অম্বর, জামোয়া-রামগড, বাসি, দৌসা, বাসওয়া, সিকরোল, লালসট, চাকসু, ফাগী, সেনগানের, দুদু, ফুলেরা ও জয়পুর তহসিল লইয়া গঠিত।

এই জেলার প্রায় সমস্তই সমতল, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। মধ্য ভাগে ত্রিকোণাকার মালভূমি ৪২০-৬৪০ মিটার (১৪০০ ১৬০০ ফুট) উচ্চ। পূর্ব ভাগে আলোয়ার জেলার সীমান্তে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী আছে। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় সম্বর হ্রদ হইতে উত্তর পূর্বে অবস্থিত।

জয়পুর জেলার প্রধান নদী বনাস। ইহার অসংখ্য উপনদীর মধ্যে ডাইন, মাসী, বীল, গলওয়া ও মোরেল প্রধান। এই জেলার আর একটি প্রধান নদী বাণগঙ্গা (১৪৪ কিলোমিটার) জেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পূর্বে ও পরে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মাসীর উপনদী বান্দী, মোরেলের ও আমিন ই শাহর উপনদী ঢুন্দ, ঘারী উল্লেখযোগ্য। এই নদীগুলি সম্বর হ্রদে পড়িতেছে। সমস্ত ক্ষুদ্র নদীই গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। জেলার একমাত্র হ্রদ সম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত।

জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণের কিছু অংশের ভূমি অনুর্বর ও বালুকাময়। পূর্ব ও পূর্ব দক্ষিণের অঞ্চল কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। উত্তর ও পূর্বে আরাবল্লী শ্রেণীর শিস্ট পাথর দিল্লী শ্রেণীর নিস ও কোয়ার্টজাইট শিলার উপর সজ্জিত আছে। উত্তর পূর্বে গ্র্যানিট শিলা দেখা যায়।

জেলার জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ। গ্রীষ্মকালে পশ্চিম দিক হইতে বায়ু সবেগে প্রবাহিত হয়। দিবাভাগ উষ্ণ হইলেও রাত্রি শীতল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ২৫° সেন্টিগ্রেড (৭৭° ফারেনহাইট)। শীতকালে তাপমাত্রা ১৫° সেন্টিগ্রেড (৫৯° ফারেনহাইট) এবং গ্রীষ্মকালে ৩৩° সেন্টিগ্রেড (৯১° ফারেনহাইট) হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ৫৭৫ মিলিমিটার (২৩ ইঞ্চি)।

জেলার নাম শহরের নাম হইতেই হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দেও ইহার সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা অম্বর রাজ্যের ধুন্দুদের অধীন ছিল। বিখ্যাত কাছওয়া রাজবংশ ৮০০ বৎসর ধরিয়া শাসন করেন। এই বংশের প্রথম রাজা বজ্রদমন গোয়ালিয়রের শাসক ছিলেন। গোয়ালিয়রের শিলালিপি (৯৭৭ খ্রী) হইতে জানা যায় যে ইনি কনৌজের অধিকার বিনষ্ট করিয়া জয়পুর দখল করেন। তাঁহার পর তেজকরণ বা দুলা রায় ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র ত্যাগ করিয়া আসেন ও দৌসাতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে দুলা রায়ের উত্তরাধিকারীগণ অম্বর দখল করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

ভারতে মোগলশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে অম্বর রাজ্যের প্রধান বাহাক মাল (১৫৪৮-৭৪ খ্রী) হুমায়ুনের নিকট বশ্যতা স্বীকারের ফলে ৫০০০ মনসবদারী লাভ করেন এবং বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ আকবরকে কন্যাদান করেন। প্রথম জয়সিংহ মির্জা রাজা নামে পরিচিত। ইনি শিবাজীকে কৌশলে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান। দ্বিতীয় জয়সিংহ (১৬৯৯ ১৭৪৩ খ্রী) মোগলদের নিকট হইতে 'সোবাই' উপাধি লাভ করেন। ইনি ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুর নগরী স্থাপন করেন এবং মানমন্দির 'যন্তরমন্তর' নির্মাণ করেন। তিনি বিজ্ঞানচর্চার জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জাঠগণ জেলার কিছু অংশ দখল করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা জয়পুরকে পাকাপাকিভাবে করদরাজ্যে পরিণত করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইবার পর রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে ইহা রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ইহার লোক সংখ্যা ১৯০১৭৫৬, তন্মধ্যে ১০০৬১৩৪ পুরুষ এবং ৮৯৫৬২২ স্ত্রীলোক। ১৯৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ২৪ ৭৫%। গ্রামবাসী ১৪ ২৫৪১ এবং শহরবাসী ৪৯৯৩১৫। কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা মোট ৮৭৭৫৪৩ জন। তন্মধ্যে ৫৪৫২৯৭ কৃষিতে, ২৬২৬৫ খনিতে, ২৬৫৮৭ শিল্পে, ৩৬৬০৩ ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে।

জেলার মোট ৭৮৬৮০০ হেক্টর (১৯৬৭০০০ একর) কৃষিজমির মধ্যে ১২২ হেক্টরে (৩০৫ একর) দো-ফসলা, অকৃষিযোগ্য ১২০০০ হেক্টর (৩০০০০ একর) এবং পতিত ৬০০০ হেক্টর (১৫০০০ একর) জমি আছে। প্রধান শস্যের মধ্যে বাজরা ২৬%, ছোলা ও ডাল ৩৭·৪%, তৈলবীজ ৫% জমিতে উৎপন্ন হয়। মোট ৬২৮০০ হেক্টর (১৫৭০০০ একর) জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। জেলায় ১১৩টি ট্রাক্টর আছে। মৎস্য ধরিয়া বৎসরে ১১৬৮৭ টাকা আয় হয়।

জয়পুর খনিজ সম্পদে মোটামুটি সমৃদ্ধ। রামগড ও কিষণগড়ে তাম্র এবং জয়পুর শহর হইতে ৫৭ কিলোমিটার (৩৬ মাইল) পূর্বে ভাঁকরী ও দক্ষিণ পশ্চিমে টোডা রাজসিংহের খনিতে অভ্র পাওয়া যায়। আলোয়ার সীমান্তে ধূসর রঙের মারবেল পাথর, কোটপুতলীর নিকট কালো মারবেল এবং জয়পুরের ২০ কিলোমিটার (১৪ মাইল) উত্তর-পূর্বে রহোরীতে উত্তম চুনা পাথর পাওয়া যায়। জেলার মধ্যে লৌহের পরিমাণ ১৩১৩০০০০ মেট্রিক টন (১৩০০০০০০ টন)। সম্বর হ্রদ হইতে লবণ উত্তোলিত হয়।

জয়পুরে অরণ্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম, মাত্র ২২৮০০ হেক্টর (৫৭০০০ একর)। এখানে বয়নশিল্প, রেলের যন্ত্রাদি মেরামতের কারখানা, ময়দা, তৈল ও কাগজের কল প্রভৃতি লইয়া মোট ৮টি কারখানা আছে। প্রাচীন কাল হইতেই জয়পুর শহর নানাবিধ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। মূল্যবান প্রস্তরাদি বা কৃত্রিম প্রস্তরে খোদাই ও পালিশ এখানকার বৈশিষ্ট্য। পিতলের শিল্প, বিভিন্ন ধরনের খোদাই, এনামেলের কাজ ও গালা শিল্পের জন্য জয়পুরের নাম সুবিদিত। ভারতবর্ষে একমাত্র জয়পুরেই স্বর্ণ এনামেলের সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ হয়। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে বস্ত্রের উপর মুদ্রণ, সুতা ও রেশমের রঞ্জন শিল্প, চন্দন-কাষ্ঠ ও হস্তীদন্তের বিভিন্ন শিল্প, অলংকরণ, সূচীশিল্প, ফুলদানিতে মিনার কাজ ও কাগজের মণ্ডের কাজও উল্লেখযোগ্য। জয়পুর কার্পেটের জন্যও প্রসিদ্ধ।

বহু দিন ধরিয়া জয়পুর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। জয়পুরের রাজবংশ বরাবরই সংস্কৃতের অনুশীলন ও পাঠে উৎসাহ দিয়াছেন। বর্তমান সংস্কৃত কলেজটি মহারাজা রামসিংহের সময়ে স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলাদের জন্য একটি ডিগ্রি কলেজ, 'সোয়াই' মানসিংহ চিকিৎসা-বিদ্যা কলেজ ও বহু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। বেসরকারি সংস্থা ভিন্ন রাজস্থান কলা সংস্থা ও রাজস্থান কলা মন্দিরে সংগীত, নৃত্য ও চিত্রাঙ্কণবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ও চারু শিল্পের একটি স্কুলও আছে।

জয়পুর জেলায় ৯৯১ কিলোমিটার (৬৮২ মাইল) রাস্তা আছে। প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে ৮ কিলোমিটার (১০০ বর্গ মাইলে ১২.৫ মাইল) রাস্তা এবং ৩৪৬ কিলোমিটার (২১৯ মাইল) রেলপথ আছে। জয়পুরে বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে।

জয়পুর রাজস্থানের রাজধানী। ইহা ২৬°৫৫´ উত্তর ও ৭৫°৫০´ পূর্বে অবস্থিত, আয়তন ৬২৫ বর্গ কিলোমিটার (২৫০ বর্গ মাইল) ও লোকসংখ্যা ৪০৩৪৪৪ (১৯৬১ খ্রী)। ইহা চতুর্দিকে পর্বত বেষ্টিত। পর্বতশীর্ষে এক প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত। ইহা ৮টি প্রবেশদ্বার দ্বারা সুরক্ষিত। শহরটি সুবিন্যস্ত ও প্রশস্ত রাস্তা এবং সুদৃশ্য হর্ম্যের জন্য বিখ্যাত। জয়পুরের মহারাজার প্রাসাদটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। প্রাসাদের উত্তরে প্রাচীর-বেষ্টিত রাজা মালকা কাটোরা জলাশয়। সোয়াইরাজ জয়সিংহ কর্তৃক মানমন্দির বা যন্তরমন্তর প্রাসাদের মুবারক মহলের বাহিরে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের একটি অংশের নাম হাওয়া মহল। প্রতাপসিংহ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্মাণ করেন। ইহা উচ্চ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও অনেকগুলি প্রাঙ্গণ, অলিন্দ ও ঘেরা প্রকোষ্ঠের দ্বারা গঠিত। ইহা পঞ্চতল ও ইহার ছিদ্রযুক্ত ঝুলন্ত গবাক্ষগুলি খুবই সুন্দর।

নগর প্রাসাদের (সিটি প্যালেস) পূর্ব দিকের প্রবেশদ্বার সিরেহি দেউড়ি ও শহরের কেন্দ্রে দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বার ত্রিপোলী দরওয়াজা অবস্থিত। বহিঃস্থিত আয়তাকার জালেব চক প্রাঙ্গণ ও ইহার দক্ষিণ পূর্বে বিধানসভা ভবন। প্রাসাদের প্রধান মহল মুবারক মহল বর্তমানে পরিচ্ছদ ও বস্ত্রশিল্পের প্রদর্শনী কক্ষ। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ মহল বা দেওয়ানি খাস আচ্ছাদিত রাস্তা দ্বারা যুক্ত। পশ্চিমে সাততলা শ্বেতচন্দ্র মহল। চন্দ্র মহলে ভারতের পুরাতন অস্ত্রশস্ত্রের একটি সংগ্রহশালা আছে।

রামনিবাস উদ্যান সাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ইহার অভ্যন্তরে অ্যাল্‌বার্ট হল ও জাদুঘর অবস্থিত। জাদুঘরের পূর্ব দিকে উদ্যানের মধ্যেই একটি পশুশালা আছে।

শহরে জৈন ও হিন্দুদের বহুসংখ্যক মন্দির আছে। ইহার মধ্যে প্রাসাদেই বারোটি মন্দির, তন্মধ্যে গোবিন্দজীর মন্দির, আনন্দকৃষ্ণজীর মন্দির, গঙ্গামন্দির এবং গোপাল, রাজরাজেশ্বরী ও গোবর্ধনজীর মন্দির উল্লেখযোগ্য।

জয়পুর জেলার অম্বরে জয়গড় দুর্গ ৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। জেলার অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে কোটপুতলী, সঙ্গনের, জবনের, রামগড ও সম্বর হ্রদ উল্লেখযোগ্য।

জয়পুরের মেলা ও উৎসবগুলিতে রঙের প্রাধান্য বেশি। তীজ গাঙ্গুর প্রভৃতি উৎসব ও প্রথাগুলি যথাক্রমে মৌসুমী বা বর্ষায় ও বসন্তে পালিত হয়। অন্যান্য উৎসব দেওয়ালি ও হোলি। বৎসরে মোট ১৩১টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XIII, Oxford, 1908, C. S. Gupta, *Census of India* :

Rajasthan, vol XIV, part II, *A General Report & Population Table*, 1961; Milap Chand Dandia, ed., *Rajasthan Yearbook & Who's Who*, Jaipur, 1903; National Council of Applied Economic Research, *Techno-Economic Survey of Rajasthan*, New Delhi, 1963.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়
ঈশ্বরপ্রসাদ মুবাকা

জয়পুরী রাজস্থানী দ্র

জয়মল্ল বেদনরের রাঠোর-বংশসম্ভূত জয়মল্ল মধ্যযুগীয় ভারতে রাজপুত বীরগণের মধ্যে অন্যতম। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে যখন আকবর মের্থা দুর্গ অধিকার করেন তখন জয়মল্ল ইহার অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু খাদ্যাভাবহেতু অবশেষে দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মেবার অভিযানে রাণা উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করায় চিতোর রক্ষার জন্য জয়মল্ল ও শিশোদিয়া পত্ত ৮০০০ সৈন্য ও ১০০০ গোলন্দাজসহ অসামান্য বীরত্বের সহিত মোগলদের প্রতিরোধ করেন। জয়মল্ল আকবরের 'সংগ্রাম' নামক বন্দুকের গুলিতে নিহত (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৫৬৮ খ্রী) হইলে দুর্গরক্ষার ভার পত্তের উপর ন্যস্ত হইল। রাজপুতগণ মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। পত্তও প্রাণ দিলেন। নায়কদের মৃত্যুতে নিরাশ হইয়া অবরুদ্ধ রাজপুতগণ যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন ও রমণীগণ জহরব্রত পালন করেন। চিতোর বিধ্বস্ত হইল। জয়মল্ল ও পত্তের বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া আকবর ইঁহাদের হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় প্রস্তরমূর্তি তৈয়ারি করাইয়া আগ্রার প্রধান তোরণের দুই পার্শ্বে স্থাপিত করেন। স্মিথ বলেন, 'শাহ্‌জাহান পরে শাহ্‌জাহানাবাদে মূর্তি দুইটি স্থানান্তরিত করেন।' ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ে ও থেভেনো সেখানে ইহা দেখিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব পরে ইহা নষ্ট করিয়া দেন।

দ্র J. Tod, *Annals & Antiquities of Rajasthan*, vols. I-II, Calcutta, 1879; V. A. Smith, *Akbar the Great Mogul*, Oxford, 1919; A. L. Srivastava, *Akbar the Great*, Agra, 1962.

জগদীশনারায়ণ সরকার

জয়স, জেম্‌স (১৮৮২-১৯৪১ খ্রী) ইংরেজ উপন্যাসকার। জন্ম আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাব্‌লিন শহরের উপকণ্ঠে; বিদ্যালাভ জেসুইট ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া জয়স প্রবাসী হন এবং ত্রিয়েস্ত, রোম, জুরিখ ও পারী শহরে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। বিদেশে জীবিকার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াও তিনি অবিরত সাহিত্যানুশীলন করিতে থাকেন। প্রথম জীবনে তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রকাশক সংগ্রহ করা জয়সের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'চেম্বার মিউজিক' (কবিতাগুচ্ছ, ১৯০৭ খ্রী)। 'ডাব্‌লিনার্স' গল্পগুচ্ছ, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'এগ্‌জাইল্‌স' (১৯১৮ খ্রী) তাঁহার একমাত্র নাটক। 'পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' (১৯১৬ খ্রী) জয়সের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। ইহার প্রথম খসড়া 'স্টিভ্‌ন হীরো' নামে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। জয়সের পরবর্তী এবং সর্বপ্রধান রচনা 'ইউলিসিস' পারী শহরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা চৈতন্যপ্রবাহী ধারায় লিখিত, বইটি বহু দিন অশ্লীলতার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। 'পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট'-এর নায়ক স্টিভ্‌ন ডেডালাস 'ইউলিসিস' উপন্যাসের একটি চরিত্র।

'ইউলিসিস' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন তারিখে ডাব্‌লিন শহরের কতিপয় ব্যক্তির জীবন লইয়া লিখিত। উক্ত তারিখের কোনও বিশেষ মূল্য নাই, কাহিনীর চরিত্রেরাও কেহ অসাধারণ নহে, তাহারা ডাব্‌লিন শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। উপন্যাসটিতে ঘটনা বলিতে কিছু নাই, প্রথম অধ্যায়ে প্রধান চরিত্র লিওপোল্ড ব্লুম স্ত্রীর প্রাতরাশ প্রস্তুত করিয়া কাজে বাহির হইতেছেন এবং সারা দিন বিষয়-কর্ম, পান-ভোজন ও প্রমোদচর্চার পর শেষ অধ্যায়ে তিনি মধ্য রাত্রের পর বাড়ি ফিরিতেছেন-- এই দীর্ঘ একটি দিনের পরিক্রমায় হোমারের ইউলিসিস চরিত্রের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য।

জয়সের শেষ রচনা 'ফিনিগ্যান্‌স ওয়েক' (১৯৩৯ খ্রী), পূর্ববর্তী গ্রন্থের ন্যায় চৈতন্যপ্রবাহী ধারায় লিখিত উপন্যাস।

আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের ইতিহাসে জয়সের নাম শ্রদ্ধাসহকারে স্মৃত হয়। তিনি যে কেবল ইংরেজী গদ্য রচনায় একটি নূতন রীতি— চৈতন্যপ্রবাহ রীতি— প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহাই নহে, 'ইউলিসিস' উপন্যাসে তিনি চেতন-অবচেতন মনের যে আলেখ্য রচনা করিয়াছেন তাহা উপন্যাস-রচনার ইতিহাসে প্রথম।

জয়সের গদ্যরীতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রভাব ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসত্রয়— 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' এবং 'মোহানা'য় লক্ষণীয়।

দ্র অমিয় চক্রবর্তী, 'জয়স প্রাসঙ্গিক', কবিতা, কার্তিক, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, Stuart Gilbert, *James Joyce's Ulysses*, London, 1931; John J. Slocum, *A Bibliography of James Joyce 1882-1941*, Yale, 1953; Richard Ellmann, *James Joyce*, New York, 1959.

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

জয়সওয়াল, কাশীপ্রসাদ (১৮৮১-১৯৩৭ খ্রী) যৌবনে বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। বিদেশে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহিত যুক্ত থাকার জন্য বহু দিন পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের সন্দেহভাজন ছিলেন।

ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইলেও রাজনৈতিক কারণবশতঃ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আইন ছিল তাঁহার পেশা এবং ইতিহাস ছিল তাঁহার নেশা — পাটনাতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই দুই ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ ও কয়েকখানি গ্রন্থ লেখেন। ইহাতে তিনি অনেক চমকপ্রদ অভিনব-তথ্য প্রচার করেন ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার মতগুলির অধিকাংশই বর্তমান যুগে ঐতিহাসিকেরা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন না।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহার-ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি স্থাপিত হয়। প্রথম হইতে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি উহার সভ্য ছিলেন। পাটনা মিউজিয়াম স্থাপনেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। আয়কর এবং হিন্দু আইন বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারি ডক্টরেট অফ ফিলসফি উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের নাম: *Imperial History of India in a Sanskrit Text* (Lahore); *History of India 150-350 A.D.* (Lahore, 1933); *Hindu Polity* (Bangalore); *Chronology and History of Nepal: 600 B. C-880 A. D.* (Patna); *Introduction to Hindu Polity* (Calcutta, 1912); *History of Indian Commerce— Vikramaditya to Later Guptas*; *Manu & Yajnavalka* (Calcutta, 1930); *Descriptive Catalogue of Manuscripts in Mithila* (Patna B. O. R. S., 1927)।

দ্র Bihar and Orissa Research Society, *Jaysawal Commemorative Number*, Patna, 1937.

জয়সিংহ ১. মালবের পরমারবংশের রাজা ভোজের মৃত্যুর পর ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মালব কলচুরি এবং চৌলুক্য শক্তির অধীন হইলে জয়সিংহ কল্যাণের চালুক্যবংশের যুবরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সহায়তায় কলচুরি এবং চৌলুক্য শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। কিন্তু চালুক্যাধিপতি দ্বিতীয় সোমেশ্বর গুজরাতের চৌলুক্য কর্ণের সহযোগিতায় অচিরেই জয়সিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জয়সিংহ পরাজিত এবং নিহত হন।

২. গুজরাতের চৌলুক্যবংশের শাসক জয়সিংহ 'সিদ্ধরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৩. সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিতে' উল্লিখিত সামন্ত নরপতি। কৈবর্তদের বিরুদ্ধে তিনি পাল-সম্রাট রামপালের সহায়ক ছিলেন। রামচরিতের টীকাকার তাহাকে দণ্ডভুক্তির শাসকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

৪. চেদিরাজ্যের কলচুরিবংশের অধিপতি। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৫. কাশ্মীরের লোহরবংশের শাসক। খ্রীষ্টীয় ১১২৩ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। দরদ দেশের অধিপতি যশোধরের মৃত্যুর পর কাশ্মীরের রাজনৈতিক শক্তি দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বিরোধী শক্তির নেতা বিড্ডসীহ সুস্সলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লোথনকে জয়সিংহের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন। শেষ পর্যন্ত জয়সিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ইহার পর ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৬. মেবারের গুহিলবংশের নরপতি। তিনি জৈত্রসিংহ নামেই সমধিক পরিচিত। ১২১৩-৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৭. অম্বরের অধিপতি। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে দিলীর খাঁর সহিত শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সেই সময় জয়সিংহ উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সেনানায়করূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি শিবাজীর পুরন্দর দুর্গ অধিকার করেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন শিবাজীর সহিত জয়সিংহের সন্ধি হয়। ইহার পর জয়সিংহ বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেও তাহা বিফল হয়। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যেই তিনি পরলোক-

গমন করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি এবং বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন।

অমিতাভ ভট্টাচার্য

জয়াকর, মুকুন্দ রামরাও (১৮৭৩-১৯৫৯ খ্রী) ব্যবহারজীবী, শিক্ষা-সংস্কারক, উদারপন্থী দলের (লিবারেল পার্টি) মহারাষ্ট্রীয় নেতা। জয়াকর বোম্বাই শহরে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বোম্বাই হাইকোর্ট এবং প্রাদেশিক জেলাগুলিতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। রাণাডে, টিলক, গোখলে, কর্বে প্রভৃতি তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নেতা এবং সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারকদের সংস্পর্শে আসিয়া জনকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠাসহকারে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেডারেল কোর্টে বিচারপতিপদে ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রিভিকাউন্সিল-এর সভ্যপদে নিযুক্ত হন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌ-এর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি জিন্নাহ্-র সহিত অ্যানি বেসান্ত এর হোমরুল লীগ-এ যোগদান করেন এবং ঐ লীগ এর বোম্বাই শাখার সহকারী সভাপতির পদে বৃত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়াকর নাসিক শহরে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র সোশ্যাল কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। রাউলাট অ্যাক্টের প্রতিবাদ করায় পাঞ্জাবে যে হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক যে সমিতি নিযুক্ত হয় জয়াকর তাহার অন্যতম সভ্য মনোনীত হন এবং অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত থাকার কালে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। রাজনীতির চরম পন্থায় আস্থা না থাকায় তিনি বিধানসভার নিয়মতান্ত্রিক পন্থাই অনুসরণ করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের বিধানসভায় নির্বাচিত হইয়া স্বরাজ্য পার্টির নেতা মনোনীত হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার জাতীয়তাবাদী দলের সহকারী নেতারূপে নির্বাচিত হন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইংরেজ সরকারের সহিত ব্যাবহারিক সহযোগিতার তিনি পরিপোষক ছিলেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে তেজবাহাদুর সপ্রু-র সভাপতিত্বে নির্দলীয় নেতাদের যে সম্মেলন হয় তাহাতে জয়াকর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র-নিয়ামক সভার সভ্য ছিলেন, কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সভ্যপদ ত্যাগ করেন। মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪১ খ্রী) স্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠিত পরামর্শ-সভার সভাপতি হিসাবে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনকার্যে তাঁহার ভূমিকাই প্রধান ছিল। জয়াকর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত 'আসপেক্টস অফ বেদান্ত ফিলসফি' (১৯২৪ খ্রী) এবং 'স্টোরি অফ মাই লাইফ' (১৯৫৮ খ্রী) পুস্তক দুইটি তাঁহার দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোকপাত করে। সংগীত, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

চিন্তামন বামন দাতার

জয়াদিত্য পাণিনি দ্র

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলের কবি। জন্ম কুলীন ব্রাহ্মণ ('বন্দিঘাটি') বংশে রাম উপাসকের ঘরে। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদনী। নিবাস 'বর্ধমান' (পাঠান্তরে 'মান্দারন') সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রামে - আমাইপুরায়। এ গ্রামের সন্ধান মেলে নাই। জয়ানন্দ আত্ম পরিচয়ে বলিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব তাঁহাদের ঘরে একদা আতিথ্য লইয়াছিলেন। জয়ানন্দ তখন শিশু, নাম ছিল 'গুহিয়া' (গুয়ে)। চৈতন্যদেব এ নাম পাল্টাইয়া দিয়া জয়ানন্দ রাখিয়াছিলেন। জয়ানন্দের জীবৎকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ বলিয়া মনে হয়।

সুকুমার সেন

জয়াপীড় (৭৭০-৭৯৭,৮ খ্রী) কাশ্মীরের কার্কোটবংশীয় রাজা। বজ্রাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় শৌর্যে পিতামহ ললিতাদিত্যের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহার অপর নাম ছিল বিনয়াদিত্য। কহ্লণের মতে রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি প্রয়াগ বা এলাহাবাদ পর্যন্ত সমস্ত রাজা জয় করিয়াছিলেন। তথায় স্বীয় সৈন্য-সামন্তের ভার মন্ত্রী দেবশর্মার স্কন্ধে অর্পণ করিয়া একাকী দেশভ্রমণে বাহির হন। পুণ্ড্রবর্ধনে অবস্থানকালে জয়াপীড় তথাকার অধিপতি জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। অতঃপর জয়ন্ত এবং জয়াপীড় সম্মিলিতভাবে গৌড়ের পাঁচ জন সামন্তকে পরাজিত করেন। ফিরিবার পথে কনৌজরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার শ্যালক জজ্জ

কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। যুদ্ধে জজ্জ জয়াপীড়ের হস্তে নিহত হন।

কহ্লণের মতে জয়াপীড় পূর্বদেশীয় রাজা ভীমসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে বন্দী হন। নেপালাধীশের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মন্ত্রী দেবশর্মা তাঁহাকে রক্ষা করেন। একের পর এক যুদ্ধের ফলে জয়াপীড়ের রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছিল। ফলে শেষ জীবনে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া ওঠেন এবং প্রজাদের সর্বস্ব শোষণ করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় অনশনে প্রাণ বিসর্জন করিলে জয়াপীড়ের উপরেও দেবতার অভিশাপ নামিয়া আসে এবং তিনি প্রাণত্যাগ করেন। জয়াপীড় জয়পুর নামে এক শহর নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন— কল্যাণদেবী এবং কমলাদেবী। জয়াপীড় নিজেও যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনই শিল্প এবং শাস্ত্রচর্চার একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুপণ্ডিত দামোদর গুপ্ত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ভট্ট উদ্ভট। মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চাতক, সন্ধিমৎ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন।

শিশির মিত্র

জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি যৌথ কোম্পানি দ্র

জরৎকারু মনসা দ্র

জরথুশ্‌ত্র, ষ্ত্র (Zarathushtra, Zoroaster) প্রাচীন ইরানের তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ। Zoroaster 'জোরোআস্তের' মূল ইরানী নামের গ্রীক রূপান্তর। তিনি ইরানের আদি ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হইয়া নিজ রচিত কবিতা 'গাথা' (Gatha) সমূহের মাধ্যমে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। গাথার ভাষার সহিত বৈদিক ও ঔপনিষদ ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া বিশেষজ্ঞগণের কেহ কেহ জরথুশ্‌ত্রের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে বলিয়া নির্ণয় করেন। তিনি পশ্চিম ইরানের মিডিয়া (Media) বা 'মদ' নামক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহার গোত্রানুসারে তিনি 'স্পিতম' (সংস্কৃত 'শ্বিতম্‌', 'শ্বেত') এই নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতা রাজবংশজাত ছিলেন এবং তিনি পুরোহিতগোষ্ঠীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার পিতার নাম পৌরুষস্প (=পুরু+অশ্ব), মাতার নাম 'দুঘ্‌দ্‌হোবা' (='দুগ্ধবতী গাভী'), পত্নীর নাম হোবোবো (=গবী), তাঁহার নিজের নাম 'জরথুশ্‌ত্র' (=সংস্কৃতে 'জরদ্‌ উষ্ট্র' ='যাহার বুড়া উট আছে', তুলনীয় 'জরদ্‌গব')— এই নামগুলি হইতে বুঝা যায় যে তাঁহাদের পরিবারবর্গ কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের পালিত গো-মহিষাদি পশুসম্পদ্‌ ছিল। কিন্তু 'জরথুশ্‌ত্র' এই নামের অন্য ব্যাখ্যাও আছে— 'জরথ' শব্দের অর্থ 'স্বর্ণময়' অথবা 'প্রোজ্জ্বল' এবং 'উষ্‌' ধাতু জাত 'উষ্‌ত্র' শব্দের অর্থ 'উদার কিরণ', অর্থাৎ তাঁহার নামটি 'প্রদীপ্ত জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন', অথবা 'ঈশ্বরানুগৃহীত তত্ত্বজ্ঞানীর' এইরূপ অর্থের দ্যোতক হইতে পারে। গ্রীক ভাষায় ইঁহার নামের যে বিকৃত রূপ প্রচলিত ছিল, তাহার শেষ অংশ 'আস্তের' (aster) শব্দের অর্থ হইতেছে 'তারা', ইহাও তাঁহার জ্ঞান জ্যোতির পরিচায়ক।

পনর বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া উশি-দারায়ণ পর্বতে তপশ্চর্যায় রত হন। সেখানে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরমেশ্বর 'অহুরমজ্‌দা' তাঁহার সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। ঈশ্বরলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রচারকল্পে তিনি পর্বত হইতে অবতরণ করেন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহাকে নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। বেয়াল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পূর্ব ইরানের অন্তর্গত বাখ্‌ত্রিয়া বা বাহ্লীক প্রদেশে পলায়নপূর্বক কবি বিশ্‌তাস্প (বিষ্টাশ্ব) নামে রাজা ও তাঁহার রানী হুতোসার দরবারে উপনীত হন। সেই দেশে তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল ধরিয়া তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন। সাতাত্তর বৎসর বয়সকালে অবশেষে তুর্‌ব্রাতুর নামে জনৈক তুরানী ধর্মান্ধ ব্যক্তি কর্তৃক বাল্‌খ্‌ বা বাহ্লীকের অগ্নিমন্দিরে তিনি নিহত হন। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র 'মগ' (Maga) বা জরথুশ্‌ত্রীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'মগ' (Maga) শব্দ গ্রীকে Magos – বহুবচনে Magoi এবং লাতীনে Magus— বহুবচনে Magi-রূপে গৃহীত হয়— পশ্চিম ইওরোপে Magi শব্দ 'প্রাচ্যের জ্ঞানীব্যক্তিগণ' অর্থে প্রযুক্ত হইত। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টজন্মের ২১ শতকের মধ্যে এই মগ গণ আগমন করেন এবং ইহারা 'মগ ব্রাহ্মণ' বা 'শাকদ্বীপীয়' ব্রাহ্মণ নামে জ্যোতির্বিদ্‌ বলিয়া ভারতের হিন্দুসমাজে গৃহীত হন। এই মগ গণ ভারতের ব্রাহ্মণদের মত ইরানের ধর্মচিন্তা, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, সভ্যতা ও সর্ববিধ উন্নয়নে অগ্রণী ছিলেন। ভারতের পারসীক সম্প্রদায় জরথুশ্‌ত্রের অনুগামী, ইঁহাদের পুরোহিতদের দস্তুর (Dastur) ও মোবদ্‌ (Mobad অর্থাৎ মগ-পতি Magapati) বলা হয়।

অংশেশর দানশা

জরথুশ্‌ত্র (জরথুষ্ত্র) ধর্ম পারসীক বা জরথুষ্ত্রীয় (অথবা জরতোস্তী) ধর্মের ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত এই ধর্মের আদি নাম হইল 'মজ্‌দা যস্‌ন' (Mazda-yasna), অর্থাৎ 'মজ্‌দা ধর্ম' বা 'অহুর মজ্‌দা' নামে এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস। বস্তুতঃ পারসীক বিশ্বাস মতে জগতে ইহা সর্বপ্রথম প্রচারিত একেশ্বরবাদ। ইন্দো ইরানীয় আর্যগণ নানা প্রাকৃতিক শক্তি (যথা সূর্য, চন্দ্র, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি) লইয়া সেগুলিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া দেবতাজ্ঞানে তাহাদের পূজা করিত। তাহারা মনে করিত, ঐ সকল দেবতা ঊর্ধ্বে অবস্থিত স্বর্গ হইতে মানুষের কার্য-কলাপ ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। পরে ক্রমশঃ এই ধর্মাচরণের মধ্যে কুসংস্কার, পূজা বা যজ্ঞে পশু বলিদান এবং নানা প্রকার উৎপীড়ন প্রবেশ করে। 'করপন্' (Karapan) এবং 'উসিজ' (Usij) নামে পুরোহিতগণ এইসব ক্রিয়াকাণ্ড হইতে লাভবান হইতে থাকে এবং 'কবি' নামে পরিচিত শাসক প্রভুগণকে, হানা দিয়া গোহরণ ও যজ্ঞে পশুবধ এবং প্রজার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও তাহাদের প্রতি নানা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত করে। ইহাদের মধ্যে গোধনের রক্ষকরূপে ও সমাজের সংস্কারকরূপে তথা শাসকবর্গের নেতা ও শিক্ষা-গুরুরূপে ঋষি জরথুষ্ত্রের আবির্ভাব হয়। তিনি ঘোষণা করিলেন যে 'অহুর মজ্‌দা' (=সংস্কৃত 'অসুর মেধস্' অর্থাৎ শক্তিময় ও জ্ঞানময় ঈশ্বর) হইলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা: প্রকৃতির অন্তর্গত যাবৎ বস্তু ও শক্তি তাঁহার সৃষ্টির নিয়মের বা ধর্মের অধীন, যে নিয়ম বা ধর্ম আদি আর্যভাষায় 'ঋত' নামে অভিহিত হইত, এই নাম সংস্কৃতে 'ঋত' রূপেই বিদ্যমান এবং ইরানে প্রাচীন পারসীক ভাষায় ইহার রূপ হইতেছে 'অর্ত' (arta) ও অবেস্তার (আবেস্তা) ভাষায় 'অষ' (ash)। ঈশ্বর মানুষের মনে চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন। মানুষকে 'স্পেন্ত মইন্যু' (শুদ্ধ শক্তি) এবং 'অঙ্গ্র মইন্যু' (অসৎ শক্তি)— এই দুই শক্তির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইয়া চলিতে হয়। সৎপথে চালিত মানুষের পক্ষে ছয়টি 'অমেষ-স্পেন্ত' (Amesha-spenta) অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আদর্শ অবলম্বন করা আবশ্যক— এই ছয়টি হইতেছে— 'বোহুমনো' (Vohumano, সংস্কৃত 'বসুমনস্' বা শ্রেষ্ঠ মনন), 'অষ' (asha ='ঋত' অর্থাৎ সত্য ও সততা), 'খ্‌ষত্র' (Khshathra ='ক্ষত্র' অর্থাৎ দৈবশক্তি), 'আরমইতি' (armiti =ভক্তি, ঈশ্বরে অনুরাগ), 'হউর্বতাৎ' (haurvatat ='সর্বতাৎ' অর্থাৎ পরিপূর্ণতা), 'অমেরেতাৎ' (ameretat ='অমৃতাৎ' বা অমৃতত্ব)। এইগুলি প্রত্যেক ধর্মাগ্রহী ব্যক্তির সাধনা করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। জীবৎকালে মানুষ তিনটি নীতি পালন করিত— 'হুমত' (humata), 'হুখ্‌ত' (hukhta) ও 'হ্বর্স্ত' (hvarsta, সংস্কৃতে 'সু-মত, সু-উক্ত, সু-বৃক্ত') অর্থাৎ শুভমনন, শুভবচন বা কথন এবং শুভকর্ম। মানুষ সর্বদাই এইগুলির আচরণ করিবে। জীবনশেষে মানুষের 'উর্বন' (urvan) বা আত্মা সুবিচার লাভ করিয়া 'পইরিদএজ়' বা স্বর্গলোক-লাভের পুরস্কার প্রাপ্ত, অথবা নরকের শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক যুগ বা কালচক্রের আবর্তন অন্তে 'ফ্রষোকেরেতি' (frashokereti) বা আত্মার পুনর্জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। পরবর্তী যুগে মানুষের পথনির্দেশের জন্য অপর এক 'সওশ্যন্ত' (Saoshyant) বা ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হয়। জরথুষ্ত্র তাঁহার পাঁচটি 'গাথা'য় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধিময় বাণীতে উপরি উক্ত ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। অহুর মজ্‌দার প্রসাদে ঋষি জরথুষ্ত্রের নিকট প্রকাশিত এই নূতন ঐশ্বরিক বিধান যাহারা গ্রহণ করিলেন, তাহাদিগকে 'মজ্‌দা য়সনান্' আখ্যা দেওয়া হইল এবং যাহারা প্রাকৃতিক শক্তির আধারে কল্পিত দেবতার পূজা লইয়া পুরাতন ধারা ধরিয়া রহিল, তাহারা 'দএব যসনান' (Daeva-yasnan) অর্থাৎ 'দেব পূজক' ('দেব' শব্দ এখানে 'দানব' বাচক হইয়া গিয়াছে) নামে পরিচিত হইল। মজ্‌দা ধর্মানুষ্ঠানে বলিদান, মূর্তিপূজা অথবা কর্মবাদের কোনও স্থান রহিল না। ইহার একেশ্বরবাদের মূল তত্ত্বগুলি বিশ্বের চিন্তা-রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। মজ্‌দা যস্ন ধর্মের স্বর্গ ও নরকের কল্পনা ইহুদী ধর্মে ও তদনুকরণে খ্রীষ্ট ধর্মে ও মুসলমান ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়। গাথায় আছে, মানবাত্মাকে মৃত্যুর পরে ঈশ্বর কর্তৃক বিচারের জন্য 'চিনবৎ পেরেতু' (Chinvat Peretu) নামে সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। এই ধারণা ইসলামের মধ্যে 'পুল্-সিরাত' সেতুর কল্পনা রূপে মিলে। গ্রীক ও রোমক দর্শন কোনও কোনও বিষয়ে ইরানীয় ধর্মবিচার ধারা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে জরথুষ্ত্র ছিলেন সর্বপ্রথম জগৎগুরু যিনি জনসমাজে মানবজীবনের নৈতিক দায়িত্বের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ঋষি জরথুষ্ত্রের মহাপ্রয়াণের পরে তাঁহার পুত্র প্রধান 'আথ্রবান্' বা ধর্মনেতা এবং পুরোহিত হইলেন। মগ (Maga) নামে পরিচিত পুরোহিতগণ এই ধর্ম জনগণের মধ্যে প্রচার করেন এবং ইহার প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহারা অবেস্তার ধর্মগ্রন্থাবলী ('আবেস্তা' দ্র), যথা 'যস্‌ন, বেন্দিদাদ, যষ্‌ৎ' প্রভৃতি এবং জরথুষ্ত্রের 'গাথা' অনুসারে

দার্শনিক বিচার, ধর্মাচারবিধি ও প্রার্থনাবলীর সংরক্ষণ করেন। ঋষি জরথুশ্ত্র তাঁহার রচিত গাথাগুলিতে প্রাচীন আর্য দেব-দেবীর কোনরূপ উল্লেখ বিচার-পূর্বকই বর্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মগ-পুরোহিতগণ যখন দেখিলেন যে জনগণের কল্পনা সুপরিচিত প্রাচীন দেব দেবীর নানা নাম ধরিয়া থাকিতে চাহে, তখন 'যজত' (Yazata, সংস্কৃত 'যজত') বা 'দেবদূত' এই নামে প্রাচীন দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবতাদের এই বিভিন্ন নামগুলি কেবল পুণ্যের প্রতীক হইয়া রহিল, তাহাদের সহিত কোনও মূর্তিপূজা অথবা বলিদানাদি সংশ্লিষ্ট রহিল না। 'মিথ্র' (মিত্র) এবং 'বেরেথ্রঘ্ন' (বা বৃত্রঘ্ন), 'অর্তবহিশ্ত' (বা ঋত বসিষ্ঠ), 'অর্দ্বি-সূর', 'অনাহিত' প্রভৃতি নামের মাধ্যমে নূতন কল্পনায় অহুরমজদার আশ্রিত কতকগুলি দেবদূতের আরাধনামূলক 'যশ্‌ৎ' (yasht) অর্থাৎ প্রার্থনাস্তোত্রাদি মগ-পুরোহিতগণ সংগ্রহ করিলেন ও রচনা করিয়া দিলেন।

জরথুশ্ত্র 'আতর্‌' (সংস্কৃত 'অথর্‌' -'অথর্বান্‌' শব্দে -অগ্নি) মন্দির স্থাপন করেন। ঐ অগ্নির প্রহরীগণকে 'আথ্রবান' (অথর্বান্‌) নাম দেওয়া হয়। মগ-পুরোহিতগণ মৃত মানুষের দেহকে অনাবৃত স্থানে স্থাপনের জন্য 'দখ্‌মা' বা সৎকার গৃহ স্থাপন করেন।

এইভাবে 'মজ্‌দ-যসন' দ্বারা ইরানীয় সমাজের ধর্মাচরণের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় অভিনব প্রাণসঞ্চার হইল, এবং মগ পুরোহিতেরা গ্রীস ও ইটালীতেও তাহাদের জ্ঞানের জন্য মাগোই (Magoi) বা মাগি (Magi) নামে সম্মানিত হইতে লাগিলেন। ইরানীয় সভ্যতার স্তম্ভস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন এই মগ পুরোহিত, ভারতের ব্রাহ্মণের মত। ইরানীয় জগতে মধ্যে মধ্যে কিন্তু পরাভব ও নৈরাশ্যের যুগও দেখা দিয়াছিল। মধ্য এশিয়ার তুর্কী ও মোঙ্গোল জাতীয় তুরানীগণ এবং ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার কোমীয় জাতির লোক সমৃদ্ধিশালী ইরান দেশ আক্রমণ করিয়া বহুবার সংকটের সৃষ্টি করে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীকরাজা আলেকসান্দর আসিয়া পারস্য সাম্রাজ্য জয়কালে ইরানীয় ধর্মগ্রন্থসমূহের সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস করেন। যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম পাদ হইতে সাসানী বংশীয় জরথুশ্ত্র মতাবলম্বী রাজগণ ইরানকে পূর্ববৎ সভ্যতার শীর্ষস্থানে উন্নীত করেন এবং খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে জরথুশ্ত্রীয় শাস্ত্রসমূহকে পহ্লবী ভাষায় 'দীন্‌-কর্ত' বা 'ধর্মবিধানসমূহ' এই নবরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রার্থনাস্তোত্রগুলি পাজন্দ অর্থাৎ আধুনিক ফার্সীর প্রথমরূপে পুনরায় রচিত হয়। পাজন্দ ভাষা হইতে আধুনিক ফার্সী ভাষা উৎপন্ন হয়। (ভারতে যেমন বৈদিক ও সংস্কৃত, পরে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ, এবং শেষে আধুনিক আর্য ভাষা – তেমনই ইরানে প্রথম ছিল প্রাচীন-পারসীক ও অবেস্তার ভাষা, মধ্যযুগে পহ্লবী (Pahlavi) ও পাজন্দ (Pazand) এবং শেষে আধুনিক ফার্সী)। অবশেষে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী আরবদের আক্রমণের ফলে ইরানীয়দের চরম অবনতি ঘটে এবং অগ্নি মন্দিরসমূহ ও ধর্মগ্রন্থসমূহ পুনরায় অবলুপ্ত হইয়া যায়। মগ পুরোহিতদের গ্রন্থাবলীর ২১ 'নস্ক্‌' বা খণ্ডসমূহের মধ্যে পারসীক ধর্মগ্রন্থাদি এক্ষণে মাত্র দেড় খণ্ডে পর্যবসিত হইয়া বর্তমান আছে। 'প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, এবং কেশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ এই যে ধর্ম' তাহার রক্ষণকল্পে বহু জরথুশ্ত্রীয় ইরানী দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইহারাই ভারতে 'পার্শী' নামে পরিচিত। সন্‌জান্‌-এর উদারচেতা হিন্দু রাণার আশ্রয় লাভ করিয়া ভারতে পার্শী পুরোহিতগণ 'রেওয়ায়ৎ' (Riwayat) বিধানাবলী ও আচার-আচরণাদির ব্যাখ্যা এবং ফার্সী ও গুজরাতী ভাষায় নূতন জরথুশ্ত্রীয় সাহিত্য (মুখ্যতঃ অনুবাদময় ও টীকাত্মক) সৃষ্টি করেন। পরিশেষে আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবাদ-এর প্রভাবে ফরাসী পণ্ডিত আকেতিল দ্যু পেরঁ, (Anquetil du Perron), বাল গঙ্গাধর টিলক, জীবনজী মোদি, ও দার্মেস্তেতর (Darmesteter), ওয়েস্ট (West), জ্যাক্‌সন (Jackson), টোল্‌মান (Tolman), কেণ্ট (Kent), বার্থোলোমায় (Bartholomae), রাইখেল্ট (Reichelt), তারাপুরবালা (Taraporewala), কাঙ্গা (Kanga), উনবালা (Unvala), তাবাদিয়া (Tavadia) প্রমুখ সুবিখ্যাত ভাষাবিদ্‌ ও ইরানবিদ্‌গণের সহযোগিতায় এই প্রাচীন কাহিনী ও অপ্রচলিত বা অল্প প্রচলিত প্রাচীন ইরানীয় ভাষার উদ্ধারকার্য ঘটিয়াছে, এবং তাহার ফলে নব দিগ্‌দর্শনের সহিত জরথুশ্ত্র ধর্মের জয়যাত্রার পথে নব উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আদেশ্বর দীক্ষা

জরায়ু অন্যতম স্ত্রীজননাঙ্গ। স্তন্যপায়ীর দেহে জরায়ুর প্রধান কাজ গর্ভকালে ভ্রূণকে ধারণ করা এবং তাহার পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করা।

বয়ঃপ্রাপ্তির পর নারীদেহে প্রতি ঋতুচক্রে ডিম্বাশয় হইতে ক্ষরিত স্ত্রী-যৌন-হর্মোনের প্রভাবে জরায়ুগাত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, গ্রন্থি প্রভৃতি বর্ধিত হয় এবং ঋতু চক্রের অন্তে এসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত টিস্যু কিছু কিছু ভাঙিয়া

রক্তের সহিত যোনি দিয়া বাহির হইয়া ঋতুস্রাব ঘটায় ('ঋতু[২]' দ্র)।

গর্ভসঞ্চার হইলে ডিম্বাশয়ের স্ত্রী-যৌন-হর্মোনগুলির প্রভাবে জরায়ুর পেশী, গ্রন্থি ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করে এবং জরায়ুর সংকোচন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ভ্রূণটি জরায়ুর অভ্যন্তরে সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং ঐ সংযুক্তির স্থলে ফুল (প্লাসেন্টা) নামক বিশেষ এক টিস্যুর সৃষ্টি হয়, ফুল মাতার রক্তে যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্মোন ও স্ত্রী-যৌন-হর্মোন ক্ষরণ করে ('গর্ভ' দ্র)। গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে রিল্যাক্সিন নামক একটি হর্মোন ক্ষরিত হয়, মাতার শ্রোণীচক্রের (পেল্‌ভিস) উপর ইহার ক্রিয়ার ফলে সন্তানজন্মের পথ প্রশস্ত হয়। গর্ভকালের অন্তে পিটুইটারি গ্রন্থির হর্মোন অক্‌সিটোসিন জরায়ুর সংকোচন ঘটায় ও সন্তান জরায়ু হইতে যোনি দিয়া বাহিরে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে।

দেবজ্যোতি দাশ

জরাসন্ধ মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র। বৃহদ্রথ কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন, কিন্তু দীর্ঘকাল নিঃসন্তান থাকায় গৌতমপুত্র চণ্ডকৌশিক মুনির সেবা করেন, তাঁহারই অনুগ্রহে প্রাপ্ত একটি মন্ত্রসিদ্ধ আম্রফল মহিষী-দ্বয়কে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়ায় প্রত্যেকে অর্ধদেহ পুত্র প্রসব করেন। বিষণ্ণ নৃপতির আদেশে ধাত্রীদ্বয় দেহখণ্ড দুইটি চতুষ্পথে নিক্ষেপ করে। জরা নামে রাক্ষসী খণ্ড দুইটি সংযোজিত করায় পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত রাজকুমার ক্রন্দন করিয়া ওঠে। তাহা শুনিয়া সেখানে উপস্থিত রাজা ও মহিষীদ্বয়কে জরা রাক্ষসী পুত্র সমর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হয়। জরা রাক্ষসী কর্তৃক সংযুক্ত হওয়ায় নাম জরাসন্ধ। বৃহদ্রথ পুত্রকে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সস্ত্রীক বনবাসী হন। জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির সহিত কংসের বিবাহ হয়। জরাসন্ধ যুদ্ধে পরাজিত ও কারারুদ্ধ নৃপতিদের দ্বারা মহাদেবের যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন। স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ভীম ও অর্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া ক্ষত্রিয় নৃপতিদের মুক্তির জন্য যুদ্ধেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে ভীমের সহিত জরাসন্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভীম জরাসন্ধের দেহ শতবার ঘুরাইয়া ভূমিতে নিষ্পেষণ করেন এবং পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন করিয়া পা ধরিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলেন।

দ্র মহাভারত, ২।১৩ ২২।

যূথিকা ঘোষ

জরিপ যে পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠের আকার, আয়তন ও উচ্চতা প্রভৃতির পরিমাপ করা হয় তাহাকে জরিপ বলে। ভূ-পৃষ্ঠের এই পরিমাপ অনুপাত হিসাবে ছোট করিয়া মানচিত্র, নকশা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

জরিপের আরম্ভ কোথায় ও কখন হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ তাহাদের ভ্রমণের পথ বা সম্পত্তির পরিচয় ও সীমানা নির্ধারণ করিতে জানিত, এ কথা বলা যায়। মিশরের অষ্টম রাজবংশের স্থাপত্যে জরিপের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমের পম্পিয়াই শহরে জরিপের প্রাথমিক যন্ত্র 'গ্রোমা' পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৬শ শতকে চীন দেশে চুম্বক শক্তি পরিচিত ছিল ও সেখানে এক প্রকার কম্পাসেরও প্রচলন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জমির মাপের কথা উল্লিখিত আছে। প্রকৃত জরিপের ফলে মানচিত্র তৈয়ারি আরবদের অ্যাস্ট্রোলাব যন্ত্র ব্যবহার করার পর হইতে প্রচলিত হয়। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় আরবেরা যে সকল সমুদ্রতীরে যাইত তাহার মানচিত্র রচনা করিতে পারিত। ইওরোপে জরিপ আরবদের নিকট হইতেই আসিয়াছিল।

পরিমাপের আয়তনের মাত্রা হিসাবে জরিপকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পৃথিবীর আকার প্রায় গোল। ইহার পৃষ্ঠ বক্র। ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষুদ্রস্থান পরিমাপ করার সময়ে ইহাকে সমতল কল্পনা করিয়া জরিপ করা যাইতে পারে। এইরূপ জরিপকে সমতলিক জরিপ (প্লেন সার্ভেয়িং) বলে। কিন্তু বৃহৎ-ব্যাপ্তিবিশিষ্ট স্থানের পরিমাপের সময় এই বক্রতল অগ্রাহ্য করিলে চলে না। বিভিন্ন যন্ত্রের ও গোলীয় ত্রিকোণমিতির জ্ঞানের সাহায্যে বক্রতলের উপর নির্দিষ্ট আয়তনের যথাসম্ভব নির্ভুল পরিমাপ করিতে হয়। এইরূপ জরিপকে ভূমিতিক জরিপ বলা হয়।

জরিপ করিবার সময় দৈর্ঘ্য ও দূরত্ব মাপিবার জন্য অতি সহজ প্রণালীস্বরূপ পদক্ষেপ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিমাপক দণ্ড, চেন, ফিতা ইত্যাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। দিক্‌-নির্ণয়ের কোণ ও দূরত্বমাপক কোণ নির্ণয় করা জরিপের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। দিক্‌-নির্ণয় সাধারণতঃ পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা অথবা পূর্ব হইতে পরিমিত রেখা হইতে করা হয়। এই সকল কোণ যখন উত্তর হইতে ঘড়ির কাঁটা ঘোরার (ক্লক ওয়াইজ) দিকে মাপা হয় তখন তাহাদের অধিষ্ঠান (বেয়ারিং) বা দিগংশ (অ্যাজিমথ) বলা হয়। দুইটি রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব-নির্দেশক কোণ নির্দিষ্ট রেখা হইতে একই ভাবে পরিমাপ করিতে হয়। দিক্‌-নির্ণয় ও দূরত্ব-নির্দেশক

কোণ পরিমাপের জন্য দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (কম্পাস) ত্রিপার্শ্বীয় দিক্‌সূচক যন্ত্র (প্রিজ্‌ম্যাটিক কম্পাস) সেক্সট্যান্ট, অ্যালিডেড, থিয়োডোলাইট প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। সেক্সট্যান্ট, থিয়োডোলাইট, লেভেল, অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতা মাপা হয়। কোনও স্থানের অক্ষাংশ বাহির করিবার জন্য থিয়োডোলাইট প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক হয়।

বিভিন্ন যন্ত্রের বা বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার হিসাবে জরিপকে চেন, প্রিজ্‌ম্যাটিক কম্পাস, থিয়োডোলাইট, লেভেলিং বা সমতলকরণ, ত্রিকোণমিতিক ও ফোটো-গ্রামেট্রিক জরিপ বলা হয়।

বিভিন্ন ধরনের জরিপের মধ্যে কম্পাস অনুপ্রস্থগামী (কম্পাস ট্র্যাভার্স) জরিপই সহজ। সমতলের উপর শ্রেণীবদ্ধ ধারাবাহিক সরল রেখার জরিপকে অনুপ্রস্থগামী জরিপ বলে। ইহাদের দৈর্ঘ্য ও দিক্‌-নির্ণয় কোণের পরিমাণ নিরূপণ করাই এই জরিপের উদ্দেশ্য। যখন এই অনুপ্রস্থগামী জরিপ আরম্ভের স্থানেতেই আসিয়া শেষ হয় তাহাকে বদ্ধ অনুপ্রস্থগামী (ক্লোজ্‌ড ট্র্যাভার্স) জরিপ বলে।

প্লেন টেব্‌ল জরিপ দ্বারা দ্রুত জরিপ করা সম্ভব। ইহার প্রধান সুবিধা এই যে ইহাতে নকশাটি জরিপের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কিত হইয়া যায়। একটি তে-পায়ার উপর মেজটি (টেব্‌ল) রাখা হয় ও দিক নির্দেশক অ্যালিডেড দিয়া দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়া জরিপ করা হয়। টেলিসকোপিক অ্যালিডেড ও পরিমাপক দণ্ডের সাহায্যে মাঠেই দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব।

বর্তমানে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় অর্ধেকই ত্রিকোণীয় বা ত্রিকোণমিতিক জরিপ-পদ্ধতির দ্বারা মাপা হইয়া গিয়াছে। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ভূমির আয়তনকে কয়েকটি ত্রিভুজে বিভক্ত করিয়া জরিপ করিতে হয়। ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাযথ নির্ণয় করিয়া সেইটিকে ভূমি হিসাবে ব্যবহার করিয়া ত্রিভুজটির ২টি কোণ জরিপ করা হয়। একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ ও একটি বাহুর মাপ জানা থাকিলে অপর কোণ ও বাহু দুইটি জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির সাহায্যে নির্ধারণ করা সম্ভব। পরিমিত ত্রিভুজ অবলম্বনে অন্যান্য ত্রিভুজ পর পর জরিপ করা হইয়া থাকে। ত্রিভুজের কোণ বা স্টেশনগুলির অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা গণনার জন্য প্রামাণিক হিসাবে পরিগণিত অন্য একটি স্টেশনের (স্থান) অবস্থান জানা অত্যাবশ্যক। ভারতে এইরূপ নির্দিষ্ট ত্রিকোণমিতিক স্টেশন মধ্য প্রদেশের কল্যাণপুর।

বর্তমানে বিমান হইতে গৃহীত জরিপচিত্রের সাহায্যে মানচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হইয়াছে।

জরিপের সাহায্যে ভূ পৃষ্ঠের পরিমাপকে প্রায় নির্ভুল করার জন্য বিভিন্ন জরিপে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বার বার জরিপ করিয়া কয়েকবারের জরিপের সম-পরিমাপের গড় লইলে প্রায় নির্ভুল পরিমাপ দাঁড়ায়। বদ্ধ অনুপ্রস্থগামী প্রিজ্‌ম্যাটিক কম্পাস জরিপে সঠিক অঙ্কন না হইলে পরিসীমার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য অঙ্কন করিয়া উহার উপর ভুলের পরিমাণ স্থাপন করিয়া বিশেষ উপায়ে সংশোধন করা সম্ভব। থিয়োডোলাইটের বদ্ধ অনুপ্রস্থগামী জরিপে গৃহীত দূরত্ব নির্ণায়ক কোণগুলি জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে সংশোধন করিতে হয়। ত্রিকোণমিতিক জরিপের সময়ে ত্রিভুজের আকার বৃহৎ হইলে উহা বক্রতলীয় ত্রিভুজ হিসাবে গণ্য হয় এবং অক্ষাংশের উপর নির্ভর করিয়া বক্রতা বাদ দিতে হয়।

জরিপের সাহায্যে রচিত মানচিত্রগুলি তাহাদের স্কেল অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত. ১ ক্যাডাস্ট্রাল বা জমি-জরিপের মানচিত্র। ইহাদের স্কেল ৬ ইঞ্চি. ১ মাইল ২. স্থান-বিবরণ-মূলক মানচিত্র (টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ম্যাপ). ইহাদের স্কেল ৬ ইঞ্চি : ১ মাইলের কম ধরা হয়।

ভারতে প্রস্তুত মানচিত্রগুলি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত :

১. ত্রিকোণমিতিক জরিপে প্রস্তুত ভারতের মানচিত্র। ইহাদের স্কেল ১ : ৬৩৩৬০ এবং ১ : ২৫০০০। এইগুলি স্থানবিবরণ-মূলক মানচিত্র ২. জমি-জরিপের মানচিত্র, ইহা রাজস্বের হার নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় ৩. জল-জরিপ বা উপকূলীয় জরিপ প্রস্তুত মানচিত্র বন্দর-নির্মাণের কাজে লাগে ৪ ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপ দ্বারা প্রস্তুত মানচিত্র রেলপথ প্রভৃতির নির্মাণে সহায়তা করে ৫. সামরিক জরিপের মানচিত্র রচনায় বিমান হইতে ফোটোগ্রাফ লওয়া হইয়া থাকে।

দ্র W. Norman Thomas. *Surveying*, London, 1952; E. Raisz, *Principles of Cartography*, London, 1962.

জল পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল অপেক্ষা জল বেশি। গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন — এই তিন অবস্থায়ই জল পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ স্থান জুড়িয়া জল তরল অবস্থায় রহিয়াছে। কঠিন অবস্থায় জল বরফ আকারে উচ্চ পর্বত-শিখরে ও বিস্তৃত মেরুপ্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। কেবল ধরা-পৃষ্ঠে নয়, ভূমির নীচেও অদৃশ্যভাবে জল রহিয়াছে। কূপ

খনন করিয়া বা নলকূপ বসাইয়া সেই জলের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক খনিজ পদার্থে জল রাসায়নিকভাবে যুক্ত হইয়া আছে। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প দৃশ্যভাবে মেঘের আকারে ভাসিয়া আছে। উষ্ণতা ও আবহাওয়ার তারতম্যে শরতের শিশিরে, শীতের কুয়াশায়, বর্ষার বৃষ্টিতে, চৈত্রের শিলাবর্ষণে এবং পর্বতপ্রদেশে তুষারপাতে বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্য বাষ্পাংশের নিদর্শন পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে জল আছে বলিয়াই গাছপালা ও প্রাণী বাঁচিতে ও বাড়িতে পারিতেছে। জীবদেহের ভিতরেও জল আছে। মৃত্তিকা হইতে শোষিত খাদ্যাংশ উদ্ভিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চালনের জন্য জলের প্রয়োজন। প্রাণীরও জলের প্রয়োজন। জল রক্তের দ্রাবক, দেড় মন ওজনের মানুষের দেহে অন্ততঃ চার সের রক্ত থাকে এবং রক্তের বেশির ভাগই জল। রক্ত জলীয় দ্রবণ না হইলে সারা দেহে উহার চলাচল সম্ভব হইত না, রক্তকণিকাগুলি দেহকলায় অক্সিজেন চালিত করিতে পারিত না। সুস্থ অবস্থায় দেহ হইতে মল, মূত্র, ঘর্ম ও নিঃশ্বাসে দৈনিক ২ হইতে ৩ লিটার জল নির্গত হয়, ইহার অর্ধেক পরিমাণ জল মল-মূত্রে, এক পঞ্চমাংশ নিঃশ্বাসে ও বাকি অংশ ঘর্মে নিঃসৃত হয়। ইহা পূরণ করা হয় জল ও অন্যান্য পানীয়ের সাহায্যে এবং উপযুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে। দেহের ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়াতেও জল উৎপন্ন হয়।

বিশুদ্ধ জল স্বচ্ছ, ইহার কোনও বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ থাকে না। বিশুদ্ধ জল উত্তম তাপ ও তড়িৎ-পরিবাহক নয়। জল অন্যান্য তরল পদার্থের মতই যে আধারে থাকে, সেই আধারের গাত্রে ও তলদেশে চাপ দেয়। আধারে জলের উচ্চতা যেমন বৃদ্ধি পায়, আধারের তলদেশে জলের চাপও তেমনই বাড়িতে থাকে। আধুনিক কালে নদীর গতিপথে বাঁধ নির্মাণ করিয়া সঞ্চিত জলের প্রচণ্ড চাপের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬০ মিলিমিটার পারদ থাকিলে বিশুদ্ধ জলের হিমাঙ্ক ০° সেন্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সেন্টিগ্রেড। বায়ুমণ্ডলের চাপ কমিলে স্ফুটনাঙ্ক কমে, চাপ বাড়িলে বাড়ে। উচ্চ পর্বতশিখরে বায়ুমণ্ডলের চাপ কম, তাই সেখানে জল অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় ফোটে। গৌরীশংকরের সমান উচ্চতায় জলের স্ফুটনাঙ্ক ৭১° সেন্টিগ্রেড। প্রেসার কুকার ও অটোক্লেভে জল রাখিয়া তাপ দিলে বায়ু ও বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে জলের স্ফুটনাঙ্কও ১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের অধিক হইয়া যায়।

তাপ পাইলে তরল পদার্থের আয়তন সাধারণতঃ বাড়ে আর শীতল হইলে কমে, কিন্তু জল ইহার ব্যতিক্রম। ৪° সেন্টিগ্রেডের ঊর্ধ্বে জলের আয়তন তাপ পাইলে বাড়ে, শীতল হইলে কমে। কিন্তু ৪° সেন্টিগ্রেডের নিম্নে শীতল হইতে থাকিলে জলের আয়তন বাড়িতে থাকে, ক্রমে তরল জল কঠিন অবস্থায় বরফে পরিণত হয়, তখন ইহার আয়তন এক-দশমাংশ বৃদ্ধি পায়। শীতপ্রধান দেশে শীতকালে জলবাহী নলের ভিতরকার জল বরফে পরিণত হওয়ায় আয়তন বৃদ্ধির ফলে নল ফাটিয়া যায়। পাহাড়ের ফাঁকে জল প্রবেশ করিয়া শীতঋতুতে বরফে পরিণত হইলে আয়তনের বৃদ্ধিবশতঃ ফাঁকে চাপ পড়ে, ক্রমে বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়। কঠিন অবস্থায় জলের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে ঘনত্ব কমে, তাই জল অপেক্ষা বরফ হালকা, বরফ জলে ভাসে। এই কারণে শীতপ্রধান দেশে শীতকালে যখন হ্রদ, নদী ও সাগরের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় তখনও উপরিস্থ বরফের নীচে জল থাকে, তাহার ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন রক্ষা পায়।

দুই শত বৎসর পূর্বেও জলকে মৌলিক পদার্থ বলা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরোভাগে বিজ্ঞানীসমাজ মানিয়া লইল যে জল যৌগিক পদার্থ, ২ ভাগ হাইড্রোজেনের সহিত ১ ভাগ অক্সিজেন তড়িতের সাহায্যে যুক্ত করিলে জল উৎপন্ন হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দীর্ঘ পনর বৎসর ধরিয়া মার্কিন বিজ্ঞানী মলে জলের রাসায়নিক সংযুতির অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া বলেন যে জলে আছে– অক্সিজেন : হাইড্রোজেন ৭·৯৩৯৬ : ১ অর্থাৎ এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সহিত প্রায় ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেন যুক্ত আছে।

জলের ব্যবহার বিবিধ। জল হইতে রাসায়নিক উপায়ে হাইড্রোজেন গ্যাস বিচ্ছিন্ন করিয়া কাজে লাগানো হইয়াছে। অটোক্লেভে সুতপ্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে তৈলকে বিযুক্ত করিয়া গ্লিসারিন উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। জলের অণুর সংযোগ ব্যতিরেকে কতকগুলি কঠিন পদার্থ কেলাসাকার গ্রহণ করে না। যেমন ১ অণু কপার সালফেট ৫ অণু জলসংযোগে কেলাসিত হয়, এই জলকে কেলাসোদক (ওয়াটার অফ ক্রিস্ট্যালাইজেশন) বলে।

তরল পদার্থ হিসাবে জল সহজলভ্য। ইহাকে সহজে শোধনও করা যায়। ইহাতে অনেক পদার্থ দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবীভূত অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া সহজ হয়। এজন্য জলের বিবিধ রাসায়নিক ব্যবহার প্রচলিত আছে।

তরল পদার্থের বিবিধ ধর্ম পরীক্ষায় তরল জলের ধর্ম মানদণ্ডরূপে ব্যবহৃত হয়। কোনও পদার্থের আপেক্ষিক

গুরুত্ব নির্ণয়ে জলের ঘনত্বকে মাপকাঠি ধরা হয়—৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন এক গ্রাম বলিয়া একক ধরা হয়। জলের হিমাঙ্ক ০° ও স্ফুটনাঙ্ক ১০০° ধরিয়া সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার একশত সমান ভাগে ভাগ করিয়া দাগ কাটা হয়। এমন কি তাপের পরিমাণ মাপিবার একক ধরা হয় এক ক্যালরি—এক গ্রাম জলের উত্তাপ ১° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপ লাগে তাহার পরিমাণকে ধরা হয় এক ক্যালরি।

প্রাকৃত জলে বিবিধ খনিজ পদার্থ ও গ্যাস দ্রবীভূত থাকে, ব্যাক্টিরিয়া ও অন্যান্য জৈব পদার্থেরও অভাব থাকে না। বৃষ্টির জল ধরাপৃষ্ঠে পড়িবার পথে বায়ুমণ্ডল হইতে ধুলা, কার্বনচূর্ণ, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য পদার্থ গ্রহণ করে। ধরাপৃষ্ঠ হইতে অনেক খনিজ পদার্থ, লৌহযৌগিক, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এর সাল্ফেট ক্লোরাইড প্রভৃতি এই জলে দ্রবীভূত হয়। বিশেষ করিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইলে সেই জলে সহজে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেট আকারে দ্রবীভূত হয়। নদীর জলে প্রতি দশ হাজার ভাগে প্রায় সতের ভাগ কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত থাকে, গভীর কূপের জলে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ থাকে, আর সাগরের জলে থাকে ইহার প্রায় সতরগুণ, তাই সাগরজলের আস্বাদ লবণাক্ত।

জল খর হইলে ঐ জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় না। এমন কি কারখানায় বয়লারে খর জল ফুটাইয়া বাষ্প প্রস্তুতকালে বয়লারের ভিতরে পুরু আস্তরণ পড়ে, তাহাতে জল গরম করিতে বেশি তাপ লাগে এবং জ্বালানির খরচ বাড়িয়া যায়। খর জলে ডাল ভাল সিদ্ধ হয় না, ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ভাল হয় না, চামড়া উত্তমরূপে ট্যান করা (পাকানো) যায় না। তাই ব্যাপকভাবে জলশোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কেবলমাত্র ফুটাইয়া জল সামান্য পরিমাণে শোধন করা যায়। ইহাতে ব্যাক্টিরিয়া নষ্ট হয় এবং দ্রবীভূত গ্যাস দূর হয়, কাদা, বালি বা অদ্রবীভূত ময়লা এমন কি দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যৌগিক এবং জৈব পদার্থও দূর হয় না। পাতন প্রণালীর সাহায্যে শোধন করিলে প্রায় সর্বজাতীয় ময়লা, জৈব ও অজৈব পদার্থ, ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতি দূরীভূত হয়। বালির স্তরের ভিতর দিয়া চুয়াইয়া (ফিল্টার) জল সহজে শোধন করা হয়। ইহাতে অন্যান্য পদার্থ ও কতক ব্যাক্টিরিয়া দূর হইলেও দ্রবীভূত অজৈব পদার্থ জলে থাকিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা কাঠ-কয়লাচূর্ণের স্তর দিয়া জল ফিল্টার করা ভাল। তাহাতে জৈব পদার্থও অনেকাংশে দূর করা যায়। বড় বড় শহরে জল সরবরাহের জন্য ফিল্টার-প্রণালী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কাদামাটি সহজে থিতাইবার জন্য জলে ফটকিরি মিশানো হয়। ইহাতে কাদামাটির সঙ্গে ব্যাক্টিরিয়াও অনেকাংশে দূর হয়। ইহাকে ব্যাক্টিরিয়া ও অন্যান্য পদার্থ -ক্ষেপণ পদ্ধতি বলে। দ্রবীভূত অজৈব পদার্থও দূর করিয়া জলের খরতা কমানো হয়। জল ফিল্টার করিবার স্তরে পার্মিউটিট (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, সিলিকা এবং সোডিয়াম অক্সাইডের যৌগিক) নামক রাসায়নিক পদার্থ মিশানো হয়, পার্মিউটিটের উপাদানের সহিত খর জলের ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেট, ক্যালসিয়াম সাল্ফেট, ম্যাগনেসিয়াম সাল্ফেট প্রভৃতি উপাদানের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট অদ্রাব্য কঠিন যৌগিকের আকারে জল হইতে পৃথক হইয়া স্তরে আসিয়া জমে। পার্মিউটিট প্রণালীতে সহজে জলের খরতাদোষ কমানো যায়। ব্যাক্টিরিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট করিবার জন্য শোধিত জলে ক্লোরিন দেওয়া হয়। নলের গাত্রে সরু সরু অসংখ্য ছিদ্রপথে জলের ধারা বাহির করিলে জলকণা বায়ু ও রৌদ্রের সংস্পর্শে আসে, তাহাতে সূর্যকিরণ ও অক্সিজেনের প্রভাবে ব্যাক্টিরিয়া নষ্ট হয়, স্বাদ ভাল হয়, অবাঞ্ছিত কোনও গন্ধ থাকিলে তাহাও দূর হয়। এই প্রণালীতে বড় বড় শহরে পানীয় জল শোধনের ব্যবস্থা করায় কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো সম্ভব হইয়াছে।

আজকাল বিবিধ শিল্পে বিশেষ করিয়া ভেষজ শিল্পে জলের খরতাদোষ দূর করিবার জন্য আয়ন বিনিময় প্রণালী ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে জল ফিল্টার করিবার স্তরে আয়ন-বিনিময় রজন থাকে, ইহা জলে দ্রবীভূত যৌগিকগুলির ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন এবং সাল্ফেট ও ক্লোরাইড আয়ন গ্রহণ করিতে পারে। তাহাতে জলের খরতার কারণ দূরীভূত হয়। এইভাবে শোধিত জল প্রায় পাতিত জলের মতই বিশুদ্ধ হয়।

ইন্‌জেক্‌শনে ব্যবহারের জন্য জল বিশেষভাবে শোধন করিতে হয়। পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট জলে দ্রবীভূত করিলে জলস্থ জৈব পদার্থ নষ্ট হয়। তাই পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত জল পাতন প্রণালীর সাহায্যে শোধন করা হয়। শোধনকালে ক্ষারদোষহীন কাচের তৈয়ারি যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। ইহার পর শোধিত জল একরূপ বিশেষ কাচের তৈয়ারি বীজবারিত অ্যাম্পিউলে ভরিয়া রাখা হয়।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা জলের

অন্যতম উপাদান হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার ১'০ বলিয়া মনে করিতেন। বর্তমানে বার্জ, মেঞ্জাল, উরে প্রভৃতি বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে সাধারণ হাইড্রোজেনের সহিত অল্প পরিমাণে ভারী হাইড্রোজেন মিশিয়া থাকে। ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার সাধারণ হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ।

ভারী হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন যুক্ত হইলে ভারী জলের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুইস দেখাইলেন যে প্রতি ৪৫০০ জলের অণুতে একটি করিয়া ভারী জলের অণু মিশিয়া থাকে। সাধারণ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'০০০০০০, ভারী জলের ১'১০৭৬৪। সাধারণ জলের হিমাঙ্ক ০° সেন্টিগ্রেড, গলনাঙ্ক ১০০°, সেই স্থলে ভারী জলের ৩'৮০২° ও ১০১'৪২°। ভারী জলে তামাকের বীজ অঙ্কুরিত হয় না, ব্যাঙাচি ভারী জলে বাঁচে না। প্রাকৃত জলে সামান্য পরিমাণে ভারী জল মিশ্রিত থাকে। নারিকেলের জল, আনারস, টম্যাটো, ইক্ষুরস ও মাৎগুড়ে স্বল্প পরিমাণে ভারী জল সাধারণ জলের সহিত মিশ্রিত আছে। এমন কি মাতৃদুগ্ধেও ভারী জল বিদ্যমান। তিব্বতের প্রায় ৪১০০ মিটার (১৩৫০০ ফুট) উচ্চ এক অঞ্চলের জলে ভারী জল আছে বলিয়া প্রকাশ। মেরুপ্রদেশের সাগরজলে ভারী জল কিছু বেশি পরিমাণে আছে। তড়িৎবিশ্লেষণে সাধারণ জলের অণু সহজে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুতে বিচ্ছিন্ন হয়, ভারী জলের অণু অত সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই তড়িৎবিশ্লেষণ করিলে সাধারণ জল বেশি পরিমাণে থাকিলেও, উহা হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস আকারে সহজে পৃথক হইয়া যায়, ভারী জলের অংশ তরলাকারে অবশিষ্ট থাকে। এইভাবে তড়িৎবিশ্লেষণ করিয়া নরওয়েতে সাগরজল হইতে ভারী জল পৃথক করা হইতেছে। পাঞ্জাবে ভাকরা বাঁধের গোবিন্দসাগর জলাধারের জল হইতে তড়িৎবিশ্লেষণে ভারী জল উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা বোম্বাইয়ে পারমাণবিক শক্তিশিল্পে ব্যবহৃত হইবে। ভারী জল হইতে উৎপন্ন ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু ভাঙিয়া প্রচণ্ড শক্তিধর হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত করা যায়, আবার হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভাজনে লব্ধ শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাপ ও তড়িৎ উৎপাদন করা যায়। কেবল তাহাই নয়, উৎপন্ন হাইড্রোজেন ও বায়ুলব্ধ নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া ও তাহা হইতে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সাগরের জল লবণাক্ত। মরু অঞ্চলে পানীয় ও নিত্যব্যবহার্য জল পারমাণবিক উৎসসম্ভূত তাপের সাহায্যে পাতন করিয়া শোধন ও ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, সাগরজলে দ্রবীভূত রাসায়নিক আহরণ করা হইতেছে। সাগরজলের সম্পদ কম নয়। এক লিটার সমুদ্রের জল ফুটাইলে যে কঠিন পদার্থগুলির মিশ্রণ পাত্রে পড়িয়া থাকে তাহাতে ২৭'৮৭ গ্রাম খাদ্যলবণ থাকে। আর থাকে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ৩'৭৮ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট বা এপ্‌সম সল্ট ২'৩৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম সালফেট ১'৭৫ গ্রাম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড ০'৭৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ০'০৩ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড ০'০৩ গ্রাম ও আয়োডাইড সামান্য পরিমাণে। গত মহাযুদ্ধে বিমানের গাত্রাবরণের জন্য ম্যাগনেসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে সাগরজল হইতে ম্যাগনেসিয়াম যৌগিক সংগ্রহ করিয়া ম্যাগনেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

জল প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের অন্যতম প্রধান ও অত্যাবশ্যক উপাদান। সম্ভবতঃ অতীতে একদা সলিলময় পরিবেশেই জীবনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। জীবদেহের ভিতরে সেই আদিম পরিবেশ রচনায় জলের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

যখন জীবের বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে, সাধারণতঃ তখনই জীবদেহে জলের আপেক্ষিক পরিমাণ সর্বাধিক হয়। নবীন তৃণাঙ্কুর ও নবগঠিত ভ্রূণে বৃদ্ধির হার খুব বেশি এবং ইহাদের দেহে জলের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। বিভিন্ন টিস্যুতে জলের পরিমাণে পার্থক্য থাকে, সক্রিয় পেশীতে জলের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ, অথচ সঞ্চিত মেদকলায় ইহার পরিমাণ শতকরা ৬ ২০ ভাগ মাত্র। ৬৫ কিলোগ্রাম ওজনের একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহে জল থাকে প্রায় ৪০ লিটার; ইহার মধ্যে ২৫ লিটার থাকে কোষের মধ্যে — কোষের উপাদান হিসাবে; অবশিষ্ট ১৫ লিটার থাকে কোষের বাহিরে- রক্ত, লসিকা, কোষমধ্যরস (টিস্যু-ফ্লুইড) এবং মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত রসে (সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইড)।

স্বেদ, মূত্র, নিঃশ্বাস ও মলের সহিত প্রতিনিয়ত প্রাণীদেহ হইতে জল বাহির হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ উষ্ণ ও শুষ্ক পরিবেশে এবং কঠিন দৈহিক শ্রমের ফলে স্বেদ ও নিঃশ্বাসের সহিত প্রচুর জল বাহির হইয়া যায়। দেহে জলের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অব্যাহত রাখিবার জন্য

খাদ্য ও পানীয়ের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে জল গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া কিছু পরিমাণে জল দেহে বিপাকক্রিয়ার (মেটাবলিজ্‌ম) ফলে উৎপন্ন হয় , জারণের (অক্সিডেশন) ফলে এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হইতে ০·৬০ মিলিলিটার, এক গ্রাম স্নেহপদার্থ হইতে ১·০৭ মিলিমিটার ও এক গ্রাম প্রোটিন হইতে ০·৪১ মিলিলিটার জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাদ্‌ভাগের একটি হর্মোন মূত্রের সহিত অত্যধিক জলের নির্গমন রোধ করিয়া দেহের জলের পরিমাণ অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বহিরাংশের কতিপয় হর্মোনও দেহে জলের বিপাককে প্রভাবান্বিত করে।

দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ জল থাকে, তাহার শতকরা ৫ ভাগ দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলে ক্লেশ বোধ হয় ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া গেলে কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং শতকরা ২০ ভাগ জল কমিয়া গেলে প্রাণী দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। 'তৃষ্ণা' দ্র।

পরিমলবিকাশ সেন

জলঙ্গী নদিয়া জেলার প্রধান নদীগুলির অন্যতম জলঙ্গী গঙ্গার একটি শাখানদী। ইহা এই জেলার উত্তর সীমানায় গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ এই দুইটি জেলার সীমানা দিয়া কিছুদূর অতিক্রম করিয়া নদিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং পরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই সংগম হইতে দক্ষিণে ভাগীরথীর নাম হুগলি। জলঙ্গীর তীরে কৃষ্ণনগর একটি বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে জলঙ্গীও গতি পরিবর্তন করিয়াছে। ইহা পূর্বে নাব্য ছিল, বর্তমানে স্থানে স্থানে মজিয়া গিয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India · Bengal*, vol. I, 1909; A. Mitra, *Census 1951 West Bengal : District Handbook : Nadia*, Calcutta, 1954.

হেনা ঘোষ

জলঢাকা একটি পার্বত্য নদী। ইহা ভুটান হিমালয়ে উৎপন্ন হইয়া ভুটান ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের মধ্য দিয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের রংপুরে ইহা ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা বরফগলা জল ও অত্যধিক বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলিয়া অন্যান্য পার্বত্য নদীর ন্যায় প্রায়ই বন্যা ঘটাইয়া থাকে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমার এই নদীর উপর বিন্দুতে একটি বাঁধের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। ইহা বর্তমানে (১৯৬৬ খ্রী) সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। উক্ত বিদ্যুৎশক্তির কেন্দ্র দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের শহর ও শিল্পাঞ্চলে প্রায় ৫১০০ বর্গ কিলোমিটার (২০০০ বর্গ মাইল) স্থানে ১৮০০০ কিলোওয়াট ও চা-বাগানগুলিতে অতিরিক্ত ১৮০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে এবং উত্তর বঙ্গের শিল্পোন্নতিতে বিশেষতঃ চা শিল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

দ্র S P. Chatterjee, *Bengal in Maps*, Calcutta, 1949; A. Mitra, *Census 1951 : West Bengal : District Handbook, Darjeeling*, Alipore, 1954

বেলা চন্দ

জলতরঙ্গ পোর্সিলেননির্মিত স্পষ্ট শব্দ-যুক্ত ১৮টি বাটি অর্ধ চক্রাকারে বসাইয়া দুইটি বংশনির্মিত কাঠি দ্বারা বাজানো হয়। যন্ত্রী বাটিগুলিতে ভিন্ন পরিমাণে জলপূর্ণ করিয়া স্বরের উচ্চ-নিম্নতা অনুসারে বাম হইতে ডান দিকে সাজাইয়া একক বাজাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে ইহাকে উদক-বাদ্যম্ কহে। ইহা ঐকতানের সহিত বা একক বাজানো হয়। শাস্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে এই যন্ত্র বাদন একটি বিশিষ্ট স্থান (বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে) অধিকার করিয়া আছে।

প্রফুল্ল মিত্র

জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯ খ্রী) সাময়িক পত্রের প্রখ্যাত সম্পাদক ও বিশিষ্ট লেখক। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মার্চ নদিয়ার কুমারখালি গ্রামে ইহার জন্ম, পিতার নাম হলধর সেন। জলধর সেন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমারখালি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে এল এ পর্যন্ত পড়েন। তিনি ফরিদপুরের রাজবাড়িস্থিত গোয়ালন্দ স্কুলে, দেরাদুনে এবং মহিষাদলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। জলধরের হিমাচল ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁহার 'প্রবাসচিত্র' (১৩০৬ বঙ্গাব্দ), 'হিমালয়' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থে সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিবৃত। তিনি কাঙাল হরিনাথের সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্তা' (১২৮৯-৯২ বঙ্গাব্দ) এবং 'বঙ্গবাসী'

(১৮৯৯ খ্রী), সাপ্তাহিক 'বসুমতী' (১৩০৬ বঙ্গাব্দ), 'সন্ধ্যা', 'হিতবাদী' (১৯০৭ খ্রী), 'সুলভ সমাচার' (১৯০৯ খ্রী) প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদনায় সহায়তা বা সম্পাদনা করেন। অতঃপর তিনি ১৩২০ বঙ্গাব্দ হইতে দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'নৈবেদ্য' (গল্প, ১৯০০ খ্রী), 'দুঃখিনী' (উপন্যাস, ১৯০৯ খ্রী), 'অভাগী' (উপন্যাস, ১ ও ২ খণ্ড, ১৯১৫ ৩২ খ্রী), 'পাগল' (উপন্যাস, ১৯২০ খ্রী), 'কাঙ্গালের ঠাকুর' (গল্প, ১৯২০ খ্রী), 'বড় মানুষ' (গল্প, ১৯২৯ খ্রী), 'উৎস' (উপন্যাস, ১৯৩২ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'কাঙাল হরিনাথ' (১ম খণ্ড, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) তাঁহার জীবনীগ্রন্থ। নিরভিমান বন্ধুবৎসল ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি তদানীন্তন সাহিত্যিক সমাজে সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৬৯, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জলপথ মানুষের ইতিহাসে জলপথ অর্থাৎ নাব্য নদ, হ্রদ এবং খালের ব্যবহার অতি প্রাচীন। স্থলপথের মত জলপথ নির্মাণে কোনও ব্যয় হয় না। ভারতীয় সভ্যতায় গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র, চীনে ইয়াংসিকিয়াং, মিশরে এবং ইওরোপে জনপদগঠনে যথাক্রমে নীল অথবা রাইন ও দানিয়ুব, ভল্গা, উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরে বসতি-স্থাপনে বৃহৎ হ্রদদেশ, মিসিসিপি ও সেন্ট লরেন্স প্রভৃতি জলপথগুলির অবদান স্বতঃস্বীকৃত। অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নাব্য নদীপথের অভাবে অভ্যন্তর ভাগে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই।

ব্যয়বহুল জল কপাট, সেতু, বাঁধ এবং পরিখনন ইত্যাদির প্রয়োজন না পড়িলে জলপথের ব্যবহার স্থল, আকাশ কিংবা রেলপথ অপেক্ষা অনেকাংশে অল্প ব্যয়-সাপেক্ষ। যে মালের পরিবহনে দ্রুতগতির প্রয়োজন হয় না, যেমন কয়লা, শস্য, গৃহপালিত পশু, কাঠ এবং খনিজ পদার্থ ইত্যাদি, সেই সব ক্ষেত্রে জলপথের ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক।

প্রাকৃতিক জলপথকে অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে সম্প্রসারিত করা হয়। এইভাবে কীল খালের মারফত বাল্টিকের সহিত উত্তর সাগরের, পানামা খালের দ্বারা আট্লান্টিক মহাসাগরের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের, সেন্ট লরেন্স সমুদ্রপথের দ্বারা বৃহৎ হ্রদগুলির সহিত আট্লান্টিক মহাসাগরের এবং সুয়েজ খালের দ্বারা ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগরের যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে। সেন্ট লরেন্স সমুদ্রপথ এবং পানামা খালে অনেকগুলি জল-কপাট বর্তমান, কিন্তু সুয়েজ খালে একটিও জল কপাট নাই।

আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জলপথগুলি অর্থাৎ যে যে জলপথ একাধিক দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে অথবা যেগুলি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সীমানা নির্দিষ্ট করে অথবা যে সব জলপথ বিশেষ কোনও রাষ্ট্র আপন বাণিজ্যের জন্য বিশেষ লাভজনক মনে করে, সেইগুলি ইতিহাসে বহু বার আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটাইয়াছে। সমুদ্রপথে যেমন আন্তর্জাতিকতা স্বীকৃত হইয়াছে, নদী এবং খালপথেও তাহা সম্প্রসারণের চেষ্টা বর্তমানে করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ সমুদ্রপথেই সম্পাদিত হয় কিন্তু আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে কেবলমাত্র গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদই উল্লেখযোগ্য।

দ্র Osborne Mance, *International River and Canal Transport*, London, 1944, *Canals and Inland Waterways Report of the Board of Survey*, 1955.

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

জলপাইগুড়ি পশ্চিম বঙ্গের উত্তরে অবস্থিত জেলা, মহকুমা ও শহর। জেলাটি ২৬°১৬´ হইতে ২৭°০´ উত্তর এবং ৮৮°২৫´ হইতে ৮৯°৫৩´ পূর্বে অবস্থিত। ইহার উত্তরে দার্জিলিং জেলা ও ভুটান রাজ্য, দক্ষিণে কুচবিহার জেলা ও পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলা, পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা ও পূর্ব পাকিস্তানের অংশবিশেষ এবং পূবে আসাম। জেলায় দুইটি মহকুমা, সদর বা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার। জলপাইগুড়ি (কোতোয়ালি), রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, মাল ও মাতীয়ালী— এই সাতটি থানা লইয়া সদর মহকুমা এবং আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট, ফালাকাটা, কালচিনি ও কুমারগ্রাম— এই পাঁচটি থানা লইয়া আলিপুরদুয়ার মহকুমা গঠিত। শহরের সংখ্যা ২টি এবং গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৭৭৬টি।

জেলার আয়তন ৬৩৩৪ বর্গ কিলোমিটার (২৪০৭ বর্গ মাইল)। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিভাগের পূর্বে এই জেলার আয়তন ছিল ৭৯০৫·০৬ বর্গ কিলোমিটার (৩০৫০ বর্গ মাইল), কিন্তু দেশবিভাগের পর দক্ষিণের কয়েকটি থানা পূর্ব পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার আয়তন

কমিয়া গিয়াছে। জলপাইগুড়ি নামের উৎপত্তি সম্ভবতঃ 'জলপাই' ফলের নাম হইতে হইয়াছে। এখানে 'স্থান'কে স্থানীয় ভাষায় 'গুড়ি' বলা হয়।

এক সময়ে এই জেলার অধিকাংশ কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ-শাসনের পূর্বে ভুটিয়ারা ডুয়ার্স অঞ্চলকে কুচবিহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশদের দখলে আসে ('ডুয়ার্স' দ্র)। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সামান্য রদবদলের পর ইহা জলপাইগুড়ি জেলা নামে অভিহিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিভাগের সময়ে এই জেলার দক্ষিণের কিয়দংশ পূর্ব পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হইয়া বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

এই জেলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য পাহাড়শ্রেণী সিঞ্চুলা জেলার উত্তর-পূর্ব কোণে ভারত-ভুটান সীমান্তে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৮৯৬ মিটার (৬২২২ ফুট)। ইহার দক্ষিণে কয়েকটি সমান্তরাল পাহাড়শ্রেণী রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে বক্সা-জয়ন্তী পাহাড়ই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই পার্বত্য এলাকা ব্যতীত জেলার অধিকাংশ অঞ্চলই নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা সমৃদ্ধ সমভূমি। উত্তরাঞ্চলের মৃত্তিকাতে কাঁকরের ভাগ বেশি হইলেও দক্ষিণ অঞ্চলের মাটিতে বালুকণাই অধিক।

এই জেলার মধ্য দিয়া অসংখ্য নদ-নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাদের উৎপত্তিস্থল অধিকাংশই উত্তরের পর্বত। ইহাদের মধ্যে মহানন্দা ('মহানন্দা' দ্র), তিস্তা ('তিস্তা' দ্র), জলঢাকা ('জলঢাকা' দ্র), তোরষা, রায়ডাক, সংকোশ, করতোয়া, মুজনাই, কালজানি, ডুডুইয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য নদী হিসাবে করলা, লিশ, গিশ, চেল, নেওড়া, গদাধর, পাঙ্গা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই সকল নদীতে প্রবল জলস্ফীতি দেখা দেয় ও বন্যার দুর্বিপাকে প্রায় প্রতি বৎসরই প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়। বর্ষাকালে জলের প্রবল স্রোতে বাহিত হইয়া পাহাড়ী অঞ্চল হইতে প্রচুর নুড়ি, পাথর ও বালুকণা নীচে সমভূমিতে নদীর মধ্যে সঞ্চিত হইয়া চড়ার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ অঞ্চলেই নৌকা যাতায়াতের পক্ষে ইহারা প্রতিবন্ধক হয়। বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য ঋতুতে অনেক নদীতে অতি অল্প পরিমাণ জলই থাকে।

জেলার বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০০০ মিলিমিটার (২০০ ইঞ্চি)। শীতকাল প্রধানতঃ শুষ্ক থাকে, তবে কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টিপাতও হয়। এই জেলার সর্বোচ্চ গড় তাপ ৩২° সেন্টিগ্রেড (৯০° ফারেনহাইট) ও সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ ১৭° সেন্টিগ্রেড (৬২° ফারেনহাইট)। এখানকার শীতকালই মনোরম এবং স্বাস্থ্যোপযোগী।

পাহাড় ও সমভূমির বিস্তীর্ণ বনরাজি এই অঞ্চলের আর্থিক সম্পদ বর্ধিত করিয়াছে। বনভূমির আয়তন প্রায় ১৭১৫ বর্গ কিলোমিটার (৬৬২ বর্গ মাইল)। শাল, শিমূল প্রভৃতি গাছই প্রধান। বনজ সম্পদের মধ্যে নানা ধরনের কাঠ, মোম, মধু, বাঁশ, বেত, জ্বালানি কাঠ, ওষধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নানা ধরনের কাঠ হইতে আসবাব-পত্র তৈয়ারি হয়। জলদাপাড়ার সরকারি সংরক্ষিত বনে জীবজন্তু দেখিবার জন্য বহু পর্যটকের সমাগম হয়।

এই জেলার কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, সরিষা, চা ও তামাক প্রধান। তবে চা ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৩৯৬৩ হেক্টর (৪৩৪৯০৯ একর) ভূমিতে ধান, ১৪১৮৩ হেক্টর (৩৭৯৫৮ একর) ভূমিতে সরিষা, ২১৯২ হেক্টর (৭২৩০ একর) ভূমিতে তামাক, ২০২২ হেক্টর (৫০৫৫ একর) ভূমিতে চা উৎপন্ন হইয়াছিল। পশ্চিম ডুয়ার্সে প্রচুর পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট তামাকের চাষ হয়। অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, তৈলবীজ, সুপারি, নানাবিধ ডাল, পাট ও সবজি উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচুর কমলালেবুর চাষ হয়। বঙ্গবিভাগের পর এই জেলার অনেক স্থানে বিশেষ করিয়া পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চলে পাটের চাষ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জেলার নদ নদী কৃত্রিম জলসেচের বিশেষ সহায়ক।

খনিজ সম্পদের মধ্যে চুনা পাথরই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বক্সা-জয়ন্তী পাহাড়ে প্রচুর চুনা পাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া কয়লা, লৌহপিণ্ড, তামা, গন্ধক প্রভৃতিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানকার চুনা পাথর পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। পার্বত্য নদীগুলি হইতে রেলপথের জন্য প্রচুর পরিমাণে পাথর ও নুড়ি রপ্তানি করা হয়।

প্রধানতঃ চা-শিল্পের জন্যই জলপাইগুড়ি জেলার খ্যাতি ('চা' দ্র)। মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চা-শিল্পের উপর নির্ভরশীল। প্রায় একশত আশিটি চা-বাগান আছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে চট-কাপড়, সুতী কাপড়, রেশম-কাপড়, তাঁতশিল্প, কাঠচেরাই কল, আসবাবপত্র, প্লাইউড, ইঞ্জিনিয়ারিং কলকারখানা, নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য, বাঁশ ও বেতের দ্রব্য নির্মাণ, টালিশিল্প ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। প্রধানতঃ কলিকাতার সহিতই এই জেলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক। চা, পাট, কাঠ, চুনা পাথর, তামাক প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং চাল, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, টিন, জ্বালানি তৈল, কয়লা প্রভৃতি প্রধান আমদানি দ্রব্য।

পূর্ব দিকে ভুটান সীমান্তে অবস্থিত চামুর্চি ও বক্সার পথে ভুটানের সহিত বাণিজ্য চলে। জেলার মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের শিলিগুড়ি গৌহাটি শাখাটি গিয়াছে। ইদানীংকালে তিস্তার উপর সেতুনির্মাণের ফলে শিলিগুড়ি হইতে ব্রডগেজ রেলপথ চালু হওয়ায় আসামের সহিত যোগাযোগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সামরিক গুরুত্বও এই অঞ্চলের যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন-সংস্থা-চালিত যানবাহনের দ্বারা জেলার প্রায় সর্বত্রই যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে এই জেলার মোট লোকসংখ্যা ১৩৫৯২৯২। জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ এই জেলায় বাস করে এবং লেপচা, ভুটিয়া, নেপালী, টোটো, রাজবংশী, গারো, রাভা, মেচ্‌, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি নানা উপজাতি বাস করে। দেশ-বিভাগের পর অনেক বাস্তুহারা নর-নারী পূর্ব বঙ্গ ত্যাগ করিয়া এই জেলায় পুনর্বাসন লাভ করায় জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া চা শিল্পের প্রসার, সামরিক গুরুত্ব, যোগাযোগ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতিও ইদানীংকালে জনসংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

পূর্বে ডুয়ার্স অঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল কিন্তু বর্তমানে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে এইসব রোগের বিস্তার বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসাকেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল, শিশু-কল্যাণ-কেন্দ্র এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-সংস্থা আছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে এই জেলার মোট শিক্ষিত নর-নারীর সংখ্যা ২৬১২০১। উত্তর বঙ্গের অন্যান্য জেলার অনুপাতে এই জেলায় শিক্ষিতের হার সর্বাধিক। শিলিগুড়ি শহরের নিকটে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই জেলায় ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১টি পলিটেকনিক, ৩টি কলেজ, ৩২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫৫টি জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি সিনিয়র বুনিয়াদী স্কুল, ১টি সরকারি শিক্ষণ-শিক্ষায়তন, ২টি সরকারি চিকিৎসা-শিক্ষালয়, ২টি শিল্প-বিদ্যালয়, ৩টি টোল, বা প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষায়তন, ২টি শিশু-শিক্ষায়তন, ২৪টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র এবং ২১টি সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

জেলার উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানের মধ্যে ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্ভুক্ত জল্পেশ্বরের মন্দির এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মহাকালের মন্দিরই সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহর, আলিপুরদুয়ার শহরের ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) উত্তর পূর্বে অবস্থিত মহাকালগুড়ির প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ, বক্সা সেনানিবাস, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ময়নাগুড়ির মূর্তি, শিকারপুরের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বক্সা সেনানিবাস বর্তমানে তিব্বতী উদ্বাস্তুদের আশ্রয়-শিবিরে পরিণত হইয়াছে।

এই জেলার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ চা-বাগানে এবং বড় শহরে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় শতাধিক উল্লেখযোগ্য হাটবাজার আছে। উল্লেখযোগ্য মেলার মধ্যে শিবরাত্রিতে জল্পেশ্বরের মেলা, মহাকালের মেলা, জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে বিজয়া দশমীর মেলা, রাজবাড়িতে মনসাপূজার মেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান শহর জলপাইগুড়ি। ইহা ২৬°৩১′ উত্তর ও ৮৫°৪৩′ পূর্বে তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে পৌরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ইহার লোকসংখ্যা ৪৮৭৩৮ জন। বর্তমান আয়তন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার (৩ বর্গ মাইল)।

দ্র A. Mitra, *Census 1951 West Bengal: District Handbook Jalpaiguri*, Calcutta; *The Imperial Gazetteer of India*, vol XIV, Oxford, 1908

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

জলপ্রপাত নদী দ্র

জলপ্লাবন বন্যা দ্র

জলবায়ু নির্দিষ্ট স্থান-কালবিশেষে পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের বহুকালব্যাপী সমষ্টিগত মান প্রকৃত জলবায়ু নির্দেশ করে বলিয়া ইহা অপরিবর্তনশীল, কিন্তু যে কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানের যে কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলের সাময়িক প্রকৃতি ঐ স্থানের ঐ সময়ের আবহাওয়া নির্দেশ করে বলিয়া ইহা সর্বদা পরিবর্তনশীল। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, চাপ, গতি বা নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহ, মেঘ, বৃষ্টি, আর্দ্রতা, স্থানীয় অক্ষাংশ, সমুদ্র হইতে স্থানের দূরত্ব ও সমুদ্রস্রোত জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু এক নয়।

স্থানের অবস্থান, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, সমুদ্রতল হইতে

উচ্চতা, শিলাগঠন ও বায়ুপ্রবাহ সৌর তাপের বিভিন্নভাবে রূপান্তর ঘটায়। সূর্য একটি জ্বলন্ত তারকাবিশেষ, ইহা শূন্যে সর্ব দিকে তাপ বিকিরণ করে। অবস্থানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতার তারতম্য লক্ষিত হয়। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে দূরত্ব বৎসরব্যাপী সমান না থাকায় পৃথিবী-পৃষ্ঠের উষ্ণতা সর্বত্র এক থাকে না। সূর্য হইতে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ১ জানুয়ারি এবং সর্বাপেক্ষা বেশি দূরত্ব ১ জুলাই তারিখে ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ ব্যাস মেরুরেখা বা অক্ষরেখা কক্ষসমতলের সহিত ৬৬½ ডিগ্রি কোণ করিয়া স্থির ধ্রুবনক্ষত্রের অভিমুখী হইয়া একই দিকে সর্বদাই হেলিয়া আছে এবং পৃথিবী এই অবস্থাতে থাকিয়া সূর্যকে বৃত্তাভাস পথে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্য এই বৃত্তাভাস বা উপবৃত্তের এক নাভিতে অবস্থিত। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিবারাত্রি ও সৌর তাপের হ্রাস বৃদ্ধি এবং ঋতুপরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ('ঋতু'' দ্র)। দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতুপর্যায় উত্তর গোলার্ধের মতই, তবে ঋতুকাল ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্যরশ্মি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে বিভিন্ন বায়ুস্তরে পরিবেশিত হওয়ার ফলে জলবায়ু সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত হয়।

স্থানবিশেষে সূর্যরশ্মি কত ঘণ্টা তাপ বিকিরণ করে তাহা বৈজ্ঞানিকগণ জলবায়ুর তুলনায় 'সূর্যরশ্মি ঘণ্টা' হিসাবে গণনা করেন।

পৃথিবীতল ও বায়ুস্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার ফলে ইহাদের মধ্যে সৌর তাপের আদান প্রদান হয়। ইহা জলবায়ু সম্বন্ধে একটি মূলসূত্র। পৃথিবী যে তেজশক্তি বিকিরণ করে তাহার অনেক অংশই মেঘ ও জলীয় বাষ্প অপহরণ করে এবং পরে আবার তাহার অনেক অংশই পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে, এইরূপে পৃথিবীর তাপমাত্রার সমতা রক্ষিত হয়। এই সকল কারণে এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতি বা আবর্তন ও বার্ষিক গতি বা সূর্যপরিক্রমণের ফলে কয়েকটি বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং বিষুবরেখা অঞ্চলে উষ্ণতার বৃদ্ধি ও মেরু অঞ্চলে উষ্ণতার হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে বিষুবরেখার শান্তবলয়, ক্রান্তীয় অঞ্চলে উচ্চ চাপ ও তদনুসারে বায়ুপ্রবাহ, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পশ্চিমা বায়ু ও তুন্দ্রা অঞ্চলে মেরুপ্রবাহ ইত্যাদি যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে, গতিবিজ্ঞান অনুযায়ী তাহা অবশ্যম্ভাবী। এইগুলি উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নিয়ত বায়ু। নিয়ত বায়ুপ্রবাহ (আয়ন বায়ু বা বাণিজ্য-বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু বা পশ্চিমা বায়ু, মেরুপ্রবাহ), সাময়িক বায়ু (স্থল-বায়ু, সমুদ্র-বায়ু, মৌসুমী বায়ু,) আকস্মিক বায়ু (ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত, কালবৈশাখী, আশ্বিনের ঝড়, টাইফুন, হারিকেন, টর্নেডো ইত্যাদি বায়ুপ্রবাহ) বৃষ্টি-পাতের পার্থক্য ঘটায়, সেজন্য আঞ্চলিক এবং স্থানীয় জলবায়ুর তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানসমূহে অক্ষরেখার অনুপাতে গড় তাপমাত্রা কম হয় এবং বন্ধুরতা অনুসারে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য জলবায়ু ও উষ্ণতার বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলে পূর্ব দিক হইতে পূর্ববায়ুপ্রবাহ ও নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে পশ্চিম দিক হইতে পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। ইহাদের গতিপথে পাহাড় পর্বত থাকিলে প্রতিবাত ঢালে বৃষ্টিপাত বেশি ও অনুবাত ঢালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। এজন্য গ্রীষ্মমণ্ডলে পশ্চিমে ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে পূর্বে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। জলবায়ুর উপর মহাদেশ ও সমুদ্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ স্থানীয় প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যও জলবায়ুকে প্রভাবান্বিত করে। হ্রদ বা অনুরূপ জলাশয় এবং নদ নদীও স্থানীয় বা আঞ্চলিক জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। সাধারণ উদ্ভিজ্জ ও মানুষের ক্রিয়াকলাপও জলবায়ুর তারতম্য ঘটায়, বৃক্ষ কাটিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা, কল-কারখানা স্থাপন করা ইত্যাদি জলবায়ুর তারতম্য ঘটায় বলিয়া এইগুলি জলবায়ু সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গবেষণার বিচার্য বিষয়। বৃক্ষ রোপণ করিলে বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং বৃক্ষ ছেদন করিলে ঐ আর্দ্রতার মাত্রা হ্রাস পাইয়া বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইয়া যায়। সাধারণতঃ মানুষের জীবনকালে যে কোনও নির্দিষ্ট স্থানের জলবায়ুর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না, কিন্তু বহু পূর্বে পৃথিবীর জন্ম হইবার কিছু কাল পরে বর্তমান গ্রীষ্মমণ্ডলে, মেরুদেশীয় জলবায়ু বিদ্যমান ছিল, ভূবৈজ্ঞানিক-গণ তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, এইরূপ বৃহৎ পরিবর্তন পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন, অক্ষের পরিবর্তন কিংবা স্থলভাগ ও সমুদ্রের অবস্থান, আয়তন বা আকারের পরিবর্তনের ফল।

কোনও দেশের উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহের গতি ও বৃষ্টি-পাতের গড়পড়তার অবস্থানুযায়ী জলবায়ুকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা মহাদেশীয়, সামুদ্রিক ও উপকূল-গত জলবায়ু। আঞ্চলিক জলবায়ু বায়ুমণ্ডলের গতিবিধির উপর নির্ভর করে। আঞ্চলিক জলবায়ুকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়, যথা— নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আর্দ্র, উপ-মণ্ডলীয় বা সুদানী, মৌসুমী, উষ্ণ মরুদেশীয়, নাতিশীতোষ্ণ মরুদেশীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, উষ্ণতর নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক, অধিকশীতযুক্ত মহাদেশীয়, অধিকতর-শীতযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ, মেরুদেশীয় ও পার্বত্য।

দ্র T. Trewartha Glenn, *An Introduction to Weather and Climate*, New York, 1943.

শুভনাথকর চট্টোপাধ্যায়

জলবিদ্যুৎ জলশক্তির সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি 'জলবিদ্যুৎ' (হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি) নামে পরিচিত। উচ্চস্থানে আবদ্ধ জল মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে নীচে নামে। সেই শক্তির দ্বারা টারবাইন অথবা পেল্টন চাকা ঘুরানো হয়।

দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্রায়তন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঝরনার জল একটি উচ্চ স্থানে স্থাপিত কৃত্রিম জলাশয়ে মজুত করা হয়। সেখান হইতে পেনস্টক নলের মাধ্যমে উচ্চ চাপে জল নামিয়া নীচে পেল্টন চাকা, অথবা টারবাইন ও জেনারেটর ঘরায়। নৈনিতালে স্বাভাবিক হ্রদের ('তাল') জলই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সর্বত্র এইরূপ জলাশয়ের জন্য স্বাভাবিক উচ্চ স্থান পাওয়া যায় না। অনেক নদীই বৎসরের মাত্র কয়েক মাস প্রচুর জল বহন করিয়া সমুদ্রে যায়। এই-সব নদীর প্রচুর জলসম্পদ অপচয় হইতে না দিয়া, পার্বত্য অংশে বাঁধ নির্মাণ করিয়া কৃত্রিম উচ্চ জলাধার সৃষ্টি করা হয়। কৃত্রিম জলাধারের জল ব্যবহারের পূর্বে 'পলিনিরোধক' ব্যবস্থার সাহায্যে, নুড়ি, বালি, মাটি প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিতে হয়— যাহাতে যন্ত্রপাতির ক্ষতি না হয়। পেনস্টক নলের সাহায্যে সেই পরিষ্কৃত জল নীচে শক্তি ঘাঁটিতে (পাওয়ার স্টেশন) নীত হইয়া টারবাইন ঘুরায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পেনস্টকে পূর্ণ চাপে জল ঢুকাইতে বহু ব্যয়ে পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কাটিতে হয়। পেনস্টক ১ মাইল কি বা ২ মাইলও দীর্ঘ হয়। সাধারণত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট মজবুত লৌহপাত দিয়া পেনস্টক নির্মিত হয়। দীর্ঘ যাত্রাপথে মাঝে মাঝে পেনস্টককে 'নোঙর' করা হয়, যাহাতে পাহাড়ের সানুদেশ হইতে অভ্যন্তরস্থ জলের চাপে, উঠিয়া না পড়ে, অথবা বাঁকিয়া না যায়। জলের সহিত বায়ু মিশ্রিত থাকে। পেনস্টকের দীর্ঘ যাত্রাপথে, জলের চাপের তারতম্যে, সেই বায়ু পৃথক হইয়া জমা হয় এবং জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। ইহার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে এবং মাঝে মাঝে বায়ুনিকাশের জন্য পেনস্টকে 'এয়ার-ভাল্ব' লাগানো থাকে। শক্তি ঘাঁটিতে পেনস্টকের মুখ ক্রমশঃ সংকীর্ণ করিয়া জেনারেটরের সহিত এক 'ধুরে' (অ্যাক্সল্) লাগানো পেল্টনচক্র (পেল্টন হুইল) অথবা টারবাইনের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট করানো হয়। এইরূপে উচ্চ চাপে জল চাকা ঘুরাইয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

শক্তি-ঘাঁটিতে উচ্চ চাপেই (হাই ভোল্টেজ) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বহু দূরে পাঠাইবার ব্যয়-সংকোচের তাগিদে ট্রান্সফরমারের সাহায্যে বিদ্যুতের চাপ উচ্চতর ৩৩০০০ ভোল্ট বা আরও বেশি করা হয়। সাধারণতঃ ৪৪০ ভোল্ট বা ২২০ ভোল্টে বিদ্যুতের ব্যবহার হয় এবং সেইজন্য ব্যবহারের উপযোগী করিতে আবার ট্রান্সফরমারের সাহায্যে বিদ্যুতের চাপ নামাইয়া লইতে হয়।

ভারতবর্ষে প্রথম ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরবর্তী যুগে নদীর খাতে আড়াআড়ি বাঁধ বাঁধিয়া কাবেরী, নর্মদা, উল প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হয়। বোম্বাই অঞ্চলে বৃষ্টির জল বাঁধের আড়ালে সঞ্চিত করিয়া প্রথমে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন পরিকল্পনার কৃতিত্ব টাটা কোম্পানির। স্বাধীন ভারতে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে বিগত পনর বৎসরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনা। কিন্তু তাপবিদ্যুৎ-উৎপাদনই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

নিম্নের তালিকায় ভারতের প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অবস্থান ও উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ কিলোওয়াটের হিসাবে দেওয়া হইল:

কেন্দ্র	অবস্থান	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
তুঙ্গভদ্রা	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	১২০০০
[illegible]	[illegible]	১০০০০
[illegible]	[illegible]	১০০০০
[illegible]	[illegible]	১৮০০০০

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ২০০ লক্ষ কিলোওয়াট। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত প্রায় ৮ কোটি কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রধান কর্তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাষ্ট্র। 'জলশক্তি' দ্র।

কপিল ভট্টাচার্য

জলযান গাছের গুঁড়ি কুঁদিয়া যে জলযান প্রস্তুত হইত তাহাই পৃথিবীর আদিমতম জলযান। পরে নানা রকম পশুর চর্ম দ্বারাও জলযানের বহিরাচ্ছাদন নির্মাণ করা হইত। ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে পালতোলা জাহাজ। ব্যাবিলন, মিশর, চীন ও ভারতের পালতোলা জাহাজগুলি বিশেষ উন্নত ছিল।

বাষ্প চালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার এবং অবয়ব গঠনে ইস্পাতের ব্যবহারহেতু জলযানের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। ক্রমশঃ জলযানচালনে টারবাইন ('টারবাইন' দ্র), ডিজেল ইঞ্জিন এবং পারমাণবিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

বিভিন্ন প্রয়োজনে পৃথিবীর সর্বত্র নানা রকম জলযান প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রমোদযান. সংকীর্ণ নদীপথে বা ক্ষুদ্র জলাশয়ে যেমন ক্ষুদ্রাকৃতির দাঁড়টানা বা পালতোলা নৌকা দেখা যায়, তেমনই সমুদ্রে মোটরচালিত অথবা পালতোলা প্রমোদযানগুলি অতীব জনপ্রিয়।

মৎস্যযান: বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকার মৎস্যযানের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরার ক্ষেত্রও ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে এবং সেইসঙ্গে মাছধরা জাহাজের সংখ্যা, আকার ও আয়তন এবং গতিবেগ বর্ধিত হইতেছে, কেননা দীর্ঘপথহেতু যাত্রাতেই মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

বাণিজ্যপোত: অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে মালপত্র এবং যাত্রীর পরিবহনে বাণিজ্যপোত ব্যবহার করা হয়। মালবাহী ও যাত্রী জাহাজের মাঝামাঝি যে শ্রেণীর জলযান অধুনা দেখা যায়, তাহাকে মিশ্র জাহাজ বলে। এই জাহাজগুলিতে যেমন যথেষ্ট পরিমাণে মাল চালান দেওয়া যায়, তেমনই আবার বহুসংখ্যক যাত্রীও দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে পারে।

সাধারণতঃ মালবাহী জলযানগুলি পূর্বনির্দিষ্ট বিশেষ এক গমনপথে চলাচল করে। অধিকাংশ আধুনিক মালবাহী জাহাজের নিজস্ব ভারোত্তোলন যন্ত্র থাকে। ফল অথবা অপরাপর সহজে পচনশীল বস্তু পরিবহনের জন্য জলযানের খোল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মালবাহী জাহাজের চালনায় সমুদয় খরচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ বন্দর, মাল খালাস ও গ্রহণ অথবা গুদামজাত করা ইত্যাদিতে, পঁচিশ ভাগ নাবিকদের মাহিনা বাবদ এবং বিশ ভাগ ইঞ্জিনের জ্বালানি ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। এই ব্যয়ভার হ্রাসের নিমিত্ত অধুনা আধার-জাহাজ অর্থাৎ কেবলমাত্র আধারের সাহায্যে মাল চালান দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইতেছে।

তৈলবাহক জলযানের সমগ্র তৈলাধার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা হয় এবং জাহাজের ইঞ্জিন ও কিছু কেবিন সাধারণতঃ জলযানের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত থাকে। মহাসাগরীয় তৈলবাহক জাহাজগুলি বৎসরের প্রায় নব্বই ভাগ সময় সমুদ্রেই অতিবাহিত করে। তৈলবাহক জলযানের আয়তন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

সবকালেই পৃথিবীর সর্বত্র যাত্রীজাহাজ সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় জলযান। যাত্রীজাহাজ কেবল যাত্রীপরিবহনে ব্যবহৃত হয় না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহাকে জাতীয় সম্মানের প্রতীক হিসাবেও গণ্য করা হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, আন্তর্জাতিক জলদেশে জাতীয় সম্মানসূচক ভারতের এমন কোনও জলযান নাই। পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীজাহাজ ব্রিটেনের কুইন এলিজাবেথ (৮৩৬৭৩ টন) এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস (ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটারেরও বেশি)। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অ্যাটলান্টিক পারাপারের জন্য উড়োজাহাজের যাত্রীসংখ্যা যদিও নৌযাত্রী অপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপি এ কথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই যে, যাত্রীজাহাজ অদূর ভবিষ্যতে অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে। যাত্রীজাহাজের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভ্রমণজনিত বিশেষ অভিজ্ঞতা কোনও কালেই আকাশপথে পূরণ করা সম্ভব হইবে না।

যুদ্ধযান নৌযুদ্ধের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সকল জলযানকে যুদ্ধযান নামে অভিহিত করা হয়। বিশেষ কয়েকটি জলযানের নাম হইতেছে – বিমানবাহক রণতরী, ভারী অথবা হালকা দ্রুতগামী রণপোত, জাহাজধ্বংসী পোত, [illegible], টর্পেডো, ডুবোজাহাজ ('ডুবোজাহাজ' দ্র), মাইন সন্ধানী পোত ইত্যাদি। যুদ্ধযান সর্বদা বহুবিধ নৌচালন, অবস্থানস্থল নির্ণয়ক ও আক্রমণাত্মক যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। যুদ্ধযানের সাহায্যার্থে নিযুক্ত মালবাহক অথবা রসদযোগানকারী এবং মেরামতের জন্য ব্যবহৃত জলযানগুলি বাহিনীতে থাকে।

উপরে উল্লিখিত জলযান ব্যতীত বিশেষ ক্রিয়াকলাপের জন্য কয়েকটি স্বতন্ত্র জলযানের নামোল্লেখ করা যায়: বরফ-ভাঙা, বয়া কিংবা সমুদ্রগর্ভে টেলিগ্রাফের তার ('কেব্ল্' দ্র) স্থাপনকারী জলযান, উদ্ধারযান, ভারোত্তোলনকারী, গুণটানা অথবা মাটিতোলার কাজে ব্যবহৃত জলযান, পরিমাপক কিংবা খেয়াতরী, অগ্নি-নির্বাপক পোত,

পাইলটপোত ইত্যাদি। নির্মাণ কৌশলে যে দুইটি অভিনব দ্রুতগামী জলযানের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাদের নাম হইতেছে হাইড্রোফয়েল বোট বা হোভার্‌ক্র্যাফ্‌ট্‌ বা পক্ষবাহক এবং ঝুলন্ত জলযান। বর্তমানে পৃথিবীর বহু স্থানে যাত্রীবাহী পোত হিসাবে পক্ষবাহক জলযান উড়োজাহাজের সহিত সাফল্যজনকভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছে। বিশেষ এক গতিবেগ অর্জনের পর এই জলযানটি জল হইতে উঠিয়া আসে এবং কেবলমাত্র জলযানের পাখাটি জলের নীচে অবস্থান করে। হোভার্‌ক্র্যাফ্‌ট বা ঝুলন্ত জলযান কয়েক বৎসর পূর্বে ব্রিটেনে আবিষ্কৃত হয়, নীচের দিকে হাওয়া পাম্পের ব্যবস্থা থাকায় এই জলযানটি মাটি বা জলের কয়েক সেন্টিমিটার ঊর্ধ্বে থাকিয়া যাতায়াত করে। এই জলযানটি উভচর, সেইজন্য অনেকে এই যানটিকে জলযান বলিতে অস্বীকার করেন। তবে ঝুলন্ত জলযান চলাচলের সময় প্রচণ্ড আওয়াজ করে বলিয়া এখনও তেমন জনপ্রিয় হইয়া ওঠে নাই।

স্বাধীনতালাভের পর অন্তর্ এবং বহির্বাণিজ্যে পরিবহনের জন্য পণ্য দ্রব্য আশাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্য ভারত সরকার পণ্যবাহী জলযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছেন বটে, তবে এখনও ভারতীয় জলযান বহির্বাণিজ্যে ভারতীয় পণ্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ মাত্র বহন করে।

দ্র D Arnot, ed., *The Design and Construction of Steel Merchant Ships*, New York, 1959, Van Lammeren, ed, *Ships and Engines*, vols, I-X, Holland, 1907

[illegible]

জলরঙ জলমিশ্রিত রঙ, যে রঙ জলে দ্রবণীয়। চিত্ররচনায় ব্যবহৃত পদ্ধতিবিশেষ। একমাত্র বিশেষ ধরনের নির্মিত জমির উপর কাঁচা জমিতে শুদ্ধ জলমিশ্রিত রঙই ব্যবহার করা হয় (frescobuon), অন্য সব ক্ষেত্রে জলের সঙ্গে রঙ এবং বন্ধনী আঠা ব্যবহার করা বিধেয়, কারণ তাহা না হইলে রঙ ঝরিয়া যায়, স্থায়ী হয় না।

পৃথিবীর প্রাচীনতম চিত্রণ পদ্ধতি বা উপকরণগুলির মধ্যে জলরঙ অন্যতম। আদিম গুহাবাসী প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকরেরাও অনেক ক্ষেত্রে কাঠকয়লা বা হেমাটাইট এর সঙ্গে জলরঙ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচ্য দেশে পরম্পরাগত চিত্রনির্মাণ-পদ্ধতিতে জলরঙের প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতবর্ষের পরম্পরাগত চিত্র-পদ্ধতিগুলিও স্বভাবতঃই জলরঙের উপর নির্ভরশীল। কিছু প্রাচীন ভারতীয় ভিত্তিচিত্রে শুদ্ধ জলরঙের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে ভারতীয় জলরঙ পদ্ধতিতে ঘন জলরঙ (টেম্পেরা, গুয়াস) -এর ব্যবহারই রীতিসিদ্ধ। পাশ্চাত্যের জলরঙ পদ্ধতিতে স্বচ্ছ বা অর্ধস্বচ্ছ জলরঙের ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতবর্ষ, চীন, জাপান বা পারস্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সব মহৎ চিত্রকর্মই জলরঙে আঁকা। মোগল যুগের শেষ ভাগে ভারতে পাশ্চাত্য সওদাগরদের আনাগোনার ফলে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিত্রের আমদানি-রপ্তানি ঘটে। তাহারই ফলে ভারতের পাশ্চাত্য জলরঙ-শৈলীর অনুপ্রবেশ হয়। তাহার কিছু কিছু প্রমাণ লখনৌ ও পাটনার কলম বা কালীঘাটের পট প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় শিল্প-পরম্পরায় নবজাগরণের সময়ে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ আবার জলরঙে চিত্র রচনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় চিত্র আন্দোলন শুরু করেন। 'চিত্রকলা' দ্র।

সোমনাথ হোর

জলশক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে উচ্চস্থ জল যখন নীচে প্রবাহিত হয় তখন তাহার চাপ প্রতিষ্ঠিত হয়। জল কার্যতঃ অনমনীয় বলে জল বাহিরে যে কোনও স্থানে জলের চাপ সকল দিকে সমান হয়।

জল বহির্গমনের সুযোগ পাইলে আবদ্ধ দশায় সুপ্ত শক্তি (পোটেনশিয়াল এনার্জি) গতিশক্তিতে (কাইনেটিক এনার্জি) পরিণত হয় ('জলবিদ্যুৎ' দ্র)।

নদী, নালা, নল প্রভৃতির মধ্যে প্রবাহিত জলের কণাগুলি যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে প্রতিটি কণায় মোট শক্তি পরিমাণে সমান হইবে। ইহাই বার্নুলির উপপাদ্য (থিয়োরেম)। জলশক্তি ব্যবহারের সহিত সম্পৃক্ত নানাবিধ ইমারত (হাইড্রলিক স্ট্রাকচার্স), যথা খালের স্লুইস গেট, পাইপ লাইন, ভাল্‌ব প্রভৃতি ও উদ যন্ত্রপাতি (পাম্প, টারবাইন প্রভৃতি) নির্মাণের প্রযুক্তিবিদ্যায় বার্নুলির উপপাদ্য প্রযোজ্য। একটি নলের মধ্য দিয়া ৫৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত জলধারা হইতে প্রতি ঘণ্টায় নিরবচ্ছিন্নভাবে যদি ৩৬০০ গ্যালন (৩৬০০০ পাউণ্ড) জল নামে, তাহা হইলে প্রতি সেকেণ্ডে ১ গ্যালন বা ১০ পাউণ্ড জল নামিবে এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৫ × ১০ = ৫৫০ ফুট পাউণ্ড 'কাজ' (ওয়র্ক) হইবে। এই হারে কাজ হইলে, তাহাকে ১ অশ্ব ক্ষমতা (হর্স পাওয়ার) বলে। ঐ জল নলের নিম্ন প্রান্তে সংলগ্ন টারবাইন-জেনারেটরকে

যদি ধরায়, তাহা হইলে ৭৪৬ ওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। অবশ্য, নলের মধ্যে ও যন্ত্রের মধ্যে ঘর্ষণ প্রভৃতির বাধায় পূর্ণ কাজ পাওয়া যায় না। গাণিতিক হিসাব অপেক্ষা তাই বাস্তবক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত জল অথবা জলের উচ্চতার প্রয়োজন হয়। জলের মোট পরিমাণ ও উচ্চতা জানা থাকিলে এবং কি হারে তাহা প্রবাহিত হইতেছে জানা থাকিলে, জলশক্তি কত অশ্বক্ষমতা উৎপাদন করিবে, হিসাব করিয়া বাহির করা যায়। সচরাচর জলশক্তির হিসাব অশ্বক্ষমতাতে রাখা হয় না, কিলোওয়াটে রাখা হয়। ১ কিলোওয়াট ১৩৪/১০ অশ্বক্ষমতার সমান। এইভাবে হিসাব করিয়া বলা হইয়াছে ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ৬ লক্ষ কিলোওয়াট।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে যান্ত্রিক উপায়ে ব্যবহারযোগ্য জলশক্তির মোট পরিমাণ প্রায় ২০০ কোটি কিলোওয়াট। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ৮ কোটি কিলোওয়াট জলশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতের অংশ আগামী ৪।৫ বৎসরের মধ্যে হইবে ২০০ লক্ষ কিলোওয়াট।

আমেরিকা ও সোভিয়েট দেশের মত অতি অগ্রসর দেশে কয়লা, গ্যাস, তৈল, জলশক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবহৃত শক্তির মোট পরিমাণে জলশক্তির অংশ আজও মাত্র ১ শতাংশ।

কল্যাণী ভট্টাচার্য

জলস্তম্ভ উষ্ণমণ্ডলীয় সাগর, হ্রদ ও নদীর উপর ইহার সৃষ্টি। ইহার সৃষ্টিপ্রণালী প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, জলভরা মেঘপুঞ্জের তলদেশ হইতে ফানেল আকৃতির মেঘরাশি অবতরণ করিবার সময় সমুদ্রজলের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাকে সঞ্চালিত করে, ফলে জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ জলাশয়ের উপর সংঘটিত নিম্ন চাপের জন্য সৃষ্ট ঘূর্ণিবায়ুর মাধ্যমে জলবাহী স্তম্ভের সৃষ্টি করিয়া মেঘে বাহিত হয়।

হিমাংশুকুমার সরকার

জলাতঙ্ক ভাইরাসঘটিত প্রাণঘাতী ব্যাধি। পাগলা কুকুর, বিড়াল, নেকড়ে, শৃগাল, ভ্যাম্পায়ার বাদুড় প্রভৃতির লালায় এই ভাইরাস বর্তমান। সাধারণতঃ ইহাদের দংশনে ঐ ভাইরাস সুস্থ প্রাণীদেহে সংক্রামিত হয় ও নার্ভতন্ত্রকে আক্রমণ করে। কোনও ক্ষতস্থানে পাগলা কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি লেহন করিলেও ঐ রোগের সংক্রমণ ঘটে।

কুকুরের জলাতঙ্ক রোগ দুই প্রকারের হইতে পারে. ১. উগ্র জলাতঙ্ক – ইহাতে কুকুরটি উন্মত্ত অবস্থায় থাকে ও যাহা পায় দংশন করে ২ মূক জলাতঙ্ক – ইহাতে কুকুরটি ঝিমাইয়া পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। অধিকাংশ সময়ে রোগটি সূচনায় উগ্র জলাতঙ্করূপে প্রকাশ পায় এবং মৃত্যুর পূর্বে মূক জলাতঙ্কে পরিণত হয়। জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত প্রাণীর মস্তিষ্ক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করিলে নার্ভকোষের মধ্যে 'নেগ্রি বডি' নামক পদার্থ দেখা যায়। ইহাই জলাতঙ্করোগ নির্ণয়ের সর্বোত্তম উপায়।

পাগলা কুকুর কামড়াইবার ১০ হইতে ৭০ দিন পরে রোগের চিহ্ন প্রকট হয়। কখনও কখনও সংক্রমণের এক বৎসর পরেও রোগ দেখা দিতে পারে। ক্ষতস্থানের স্ফীতি, জ্বর, অযথা ভয়, ক্রোধ বা উত্তেজনা, পেশীর বেদনাদায়ক সংকোচন ও প্রবল আক্ষেপ, সর্বদেহে আড়ষ্টতা, গলার পেশী সংকোচনের ফলে জলপানে অসামর্থ্য প্রভৃতি উপসর্গ উল্লেখযোগ্য। পরে পেশীর শৈথিল্য ও কর্মশক্তির বিলুপ্তি ঘটে। সাধারণতঃ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার ৩ হইতে ৫ দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

লুই পাস্তুর (১৮২২-৯৫ খ্রী) জলাতঙ্কের প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কার করেন। জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত প্রাণী দংশন করিলে রোগ প্রতিরোধের জন্য এই টিকার ইনজেকশন লইতে হয়। কোনও কুকুর পাগলা সন্দেহ হইলে তাহাকে ধরিয়া রাখা কর্তব্য, ১০ দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার মস্তিষ্কে 'নেগ্রি বডি' সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া রোগের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

কমলানারায়ণ মালিক

জহরব্রত মধ্য যুগে রাজপুত রমণীগণ মুসলমান আক্রমণকারীদের হস্ত হইতে নিজেদের সতীত্বরক্ষার জন্য অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিতেন। এইভাবে মৃত্যুবরণের প্রথাকে জহরব্রত বলা হইত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক বীর আলেকসান্দ্রের (আলেকজাণ্ডার) ভারত আক্রমণকালে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার আর এক প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সিন্ধু দেশের ইতিহাসে, মুসলমান সেনাপতি সিন্ধু রাজধানী আক্রমণ করেন (৭১২ খ্রী)। যুদ্ধে রাজা দাহির নিহত হন এবং রানী অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও রাজধানী রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় অন্যান্য মহিলাগণের সহিত সম্মান রক্ষার জন্য জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

রাজপুত কথা-কাহিনী হইতে 'বীর রাজপুত' রমণীদের

জহরব্রত-পালনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কথিত আছে, আলাউদ্দীন খিলজীর হস্তে চিতোরের পতন আসন্ন দেখিয়া রানী পদ্মিনী এবং অন্যান্য পুরনারীগণ জহরব্রত অনুষ্ঠান করেন। এইরূপ বহু জহরব্রতের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

দীপকরঞ্জন দাস

জাইরোস্কোপ (Gyroscope) একটি বেগবান চক্র জাইরোস্কোপের মর্মস্থল। কোনও বিঘ্নকারী বল না থাকিলে ইহার ঘূর্ণন বেগ অপরিবর্তিত থাকা উচিত, কিন্তু বিঘ্নকারী বল প্রকৃতির মজ্জাগত, সুতরাং বিদ্যুৎ ইত্যাদির সাহায্যে জাইরোস্কোপ চালিত হয়। নানা প্রকার অবলম্বনের সাহায্যে জাইরোস্কোপের অক্ষদণ্ডটির (অ্যাক্সিস) গতি নিয়ন্ত্রিত করা হয় ও জাইরোস্কোপকে (সংক্ষেপে জাইরো) তদনুরূপ আখ্যা দেওয়া হয়। 'মুক্ত জাইরো' (ফ্রি জাইরো) র অক্ষদণ্ড যে কোনও দিকে ঘুরিতে পারে, পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাইরোকে 'ভূ জাইরো' (আর্থ জাইরো) বলা যায় ইত্যাদি।

বলবিদ্যার নিয়ম-উদ্ভূত দুইটি গুণ জাইরোস্কোপকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে ১. বেগে ঘূর্ণিত জাইরোস্কোপের অক্ষদণ্ডের দিক-পরিবর্তন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ২. দক্ষিণমুখী অক্ষদণ্ডকে বলপ্রয়োগে ঊর্ধ্বমুখী করিতে চেষ্টা করিলে উহা পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হওয়ার প্রবৃত্তি দেখাইবে, অর্থাৎ অক্ষদণ্ডটিকে এক দিকে ঘুরাইতে গেলে উহা বিশেষ আরও একটি দিকে ঘুরিয়া যাইবে বা ঘুরিতে চাহিবে।

উক্ত গুণগুলির মধ্যে প্রথমটি যানের গতি সুস্থিত (স্টেবল্) করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি চাকা দাঁড় করাইয়া রাখিলে উহা মাটিতে পড়িয়া যায় কিন্তু অল্প বেগের সহিত গড়াইয়া দিলে উহা আর মাটিতে পড়ে না। ইহাই দ্বিচক্রযানের (বাইসিক্‌ল্) সুস্থিত গতির মূল। জাহাজ ও বিমানের গতির লক্ষ্য স্থির রাখিতে জাইরোস্কোপ সহায়তা করে। তাহার কারণও উক্ত ১ সংখ্যক গুণ।

দ্বিতীয় গুণটির সাহায্যে জাইরো ঘূর্ণিত বস্তুর ঘূর্ণন-গতি মাপিয়া দিতে পারে, জাইরোকে কম্পাস হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

ঘূর্ণনবেগ সেকেণ্ডে সহস্র বা দশ সহস্র পরিমাণ না হইলে উচ্চশ্রেণীর জাইরোস্কোপিক ক্রিয়া হয় না, তবে দ্বিচক্রযানে সুস্থিত গতি হইতেই বুঝা যায় যে অল্প বেগবিশিষ্ট ঘূর্ণন-গতিতেও কিছু কিছু জাইরোস্কোপিক ক্রিয়া দেখা যায়। আনুমানিক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে জাইরোর প্রথম ব্যবহার হয়।

ঘূর্ণিত বস্তুর জাইরোস্কোপিক ক্রিয়া মাঝে মাঝে অসুবিধার সৃষ্টিও করে। বিমানের আবর্তক চালক যন্ত্রের (প্রপেলার) জাইরোস্কোপিক ক্রিয়াহেতু বিমানটিকে উঠাইতে বা নামাইতে গেলে বিমান আপনা হইতে দক্ষিণে বা বামে ঘুরিয়া যায়।

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

জাইলোফোন ঘনজাতীয় প্রাচীন সংগীত-যন্ত্রবিশেষ। পূর্ব ইওরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কোনও কোনও দেশে বহু কাল হইতে প্রচলিত। সাধারণতঃ দশটি এবং কখনও অধিকতর সংখ্যক ক্রম নির্দিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড বৃহৎ হইতে ক্রমিক ক্ষুদ্রাকারে তারের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে। বাদক তাহাদের উপর দুইটি কাঠির আঘাতে স্বরগ্রামের নানা ধ্বনি সৃষ্টি করেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জাকাত জাকাত শব্দের অর্থ আত্মার পবিত্রীকরণ এবং ধনবানের ধনরত্নের পবিত্রতা সংরক্ষণ। জাকাত ইসলামের চতুর্থ ভিত্তি। কোরান শরীফে নামাজ এবং জাকাতের জন্য তাগিদ সমানভাবে দেওয়া হইয়াছে। হিজরীর নবম সনে মুসলমানদের উপর জাকাতের আদেশ প্রযোজ্য হয়। সাংসারিক আবশ্যক। খাওয়া-পরা বাদে যখন মানুষের নিকট কোরান শরীফ নির্ধারিত মাল বা অর্থসহ চান্দ্রমাস হিসাবে এক বৎসর মজুত থাকে, সেই মাল ও অর্থের মালিককে সাহেবেনেসাব বলা হয়। সংসারের যাবতীয় আবশ্যক ব্যয় বাদে যাহার নিকট ৫২।০ তোলা রৌপ্য কিংবা ৭।০ তোলা স্বর্ণ কিংবা ২০০ দেরহাম মজুত থাকে তাঁহাকে শতকরা ২½ টাকা হিসাবে জাকাত দিতে হইবে। বাণিজ্যের বস্তু যাহাই হউক না কেন সাহেবে-নেসাব হইলেই তাহার জন্য জাকাত দিতে হইবে। পশুর মধ্যে উট, গোরু ও ছাগলের জন্য জাকাত দিতে হয়। অন্য কোনও পশুর জাকাত দিতে হয় না। কৃষিকার্যহেতু যে পশু প্রয়োজন হয় তাহার জাকাত নাই। যদি দুগ্ধ কিংবা বংশের উদ্দেশ্যে পশু পালিত হয় এবং উহারা মাঠে চরিয়া খায় তবে উহার জাকাত লাগিবে, গৃহপালিত পশুদের খোরাকির জন্য ব্যয় করিলে জাকাত লাগে না। উৎপন্ন ফসলেরও নির্দিষ্ট পরিমাণ জাকাত দিতে হয়। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে প্রাপ্ত ধনরত্নেরও জাকাত দিতে হয়। নিম্নলিখিত সাত ব্যক্তি জাকাত পাইবার অধিকারী— ফকির (আবশ্যকীয় বস্তু যাহার নাই এবং কাহারও নিকট তিনি প্রার্থীও নহেন), মিস্কিন (অত্যন্ত দুঃস্থ), আমেল (রাজকীয়

কর্মচারী জাকাত সংগ্রহ করিয়া অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করেন), মোকাতিব (ক্রীতদাস, যাহারা নিজেদের মুক্তির জন্য জাকাত সংগ্রহ করে), ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে ব্যক্তি-বিশেষদের অর্থাৎ গাজী বা ধর্মযোদ্ধা, গরিব ছাত্র প্রভৃতি এবং নিঃস্ব পর্যটক। জাকাতের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য মানবের ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত ধন যেন সর্বস্তরের মানবের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং আর্তের সেবায় নিয়োজিত হয়।

আব্দুস সোবহান

জাগ-গান, জাগের গান অধুনা উত্তর বঙ্গে, একদা পূর্ব বঙ্গেও প্রচলিত লোকগীতবিশেষ। কয়েকজনে মিলিয়া রাত্রিকালে গায়। গান ধরিবার আগে মূল গায়েন 'জাগ' বলে, অর্থাৎ এই বলিয়া যেন শ্রোতাদের ঘুম ভাঙায়, তাহার পর সকলে মিলিয়া গান ধরে। এই কারণে এবং/অথবা রাত্রি জাগিয়া গাওয়া হয় বলিয়া এই গানরীতির নাম হইয়াছে জাগ গান। গানের প্রধান বস্তু হইল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। পরে অন্যান্য বস্তুও আসিয়া গিয়াছে। যেমন চৈতন্যলীলা, সত্যপীরের কাহিনী, বিবিধ সামাজিক ও আঞ্চলিক ঘটনা ইত্যাদি। রাধালীলার গানে আদিরসের বাড়াবাড়ি আছে। এই ধরনের গান বাংলা দেশের সংলগ্ন আসামে একদা 'ধামালী', 'ধামালি বা ধেমালি' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

দ্র যাদবেশ্বর তর্করত্ন, 'রঙ্গপুরের জাগের গান', রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, প্রিয়রঞ্জন সেন, 'শ্রীরাধাকীর্তন ও জাগের গান', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ঊনচত্বারিংশ ভাগ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, 'কয়েকটি জাগগান', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

[illegible]

জাঠ জাতিবিশেষ। জাঠগণ দৈহিক, অক্লান্ত শ্রম, অসীম বীরত্ব এবং সামরিক শক্তির জন্য বিখ্যাত। তাহাদের উৎপত্তি বা প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত। জাঠগণ যাদব বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কোনও তথ্য জানা যায় না। তাহারা আফগানিস্তান হইতে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নানা অঞ্চলে বাস করে এবং প্রধানতঃ কৃষিজীবী।

বিভিন্ন সময়ে নানা স্থানে তাহাদের বেআইনি কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সুলতান ও মোগল সরকার অনেক দিন পর্যন্ত তাহাদের দমন করিয়া রাখিয়াছিল।

ঔরঙ্গজেবের গোঁড়া ধর্মনীতির বিরুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কুশাসন ও অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা জেলায় জাঠগণ তিলপতের জমিদার গোকলার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। কিন্তু মোগল সরকার তাহাদের দমন করে এবং গোকলাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে ধর্মান্তরিত করে।

কয়েক বৎসর পরে রাজারামের নেতৃত্বে জাঠগণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত মোগল বাহিনীর হস্তে নিহত হন (১৬৮৮ খ্রী)। ইহার পরে তাঁহার ভ্রাতা চূড়ামণের নেতৃত্বে জাঠগণ আরও শক্তিশালী হয়। তিনি তাহাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাদশাহের জায়গির লুট করিয়া আর্থিক সংস্থানও করেন। কিন্তু তাঁহার অক্ষমতায় এক মূল দুর্গ মোগলদের হস্তে পতিত হইয়া যায় (১৭২২ খ্রী) তাহার আরব্ধ কার্য বিনষ্ট হয়।

ইহার পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বদনসিংহ তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। কখনও বলপ্রয়োগে এবং কখনও কিছু কিছু ক্ষমতাশালী পরিবারের (বিশেষতঃ ঠাকুর) সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি করেন। জাঠগণকে একত্রিত করা এবং তাহাদের সামরিক শক্তি সুগঠিত করা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনিই ভরতপুর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ইহার আয়তনও বর্ধিত করেন। প্রায় সমগ্র মথুরা ও আগ্রা জেলা তাঁহার অধীন হয়।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বদনসিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দত্তক পুত্র সুরজমল রাজা হন। ভরতপুরের রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও বীর যোদ্ধা। বিবাদের মধ্যেও অতি নিপুণতার সহিত তিনি রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে ভরতপুর রাজ্য সম্পদে ও আয়তনে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি ধোলপুর, মৈনপুরী, হাথরাস, আলীগড়, ইটাওয়া, মীরাট, রোহতক, ফররুখনগর, মেওয়াট, গুড়গাঁও প্রভৃতি অঞ্চল রাজ্যভুক্ত করেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার পুত্র জওহরসিংহ দক্ষ শাসক হইলেও পরবর্তী কালে যোগ্য শাসকের অভাবে এই রাজ্যের অধোগতি হয় এবং ইহার শক্তি ও আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এই দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজগণ ইহার উপরে প্রভাব বিস্তার করে।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

জাতক পালি ভাষায় রচিত সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক-নিকায়ের দশম গ্রন্থ এবং প্রাচীন নবাঙ্গ-বিভাগের অন্যতম অঙ্গ 'জাতক'। বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জাতক' শব্দটি এক বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। ইহার দ্বারা গৌতম বুদ্ধের (বোধিসত্ত্ব অবস্থায়) অতীত জন্ম জন্মান্তরবৃত্তান্ত সূচিত হয়। বৌদ্ধদের বিশ্বাস যিনি বুদ্ধ হন, তাঁহাকে কোটি-কল্পকাল বুদ্ধাঙ্কুর বা বোধিসত্ত্বরূপে জন্ম জন্মান্তর-গ্রহণপূর্বক দান-শীলাদি দশ-পারমিতায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। এইভাবে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হইবার অধিকারী হন এবং পরিশেষে পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। জাতকের আখ্যানগুলিতে বোধি-সত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন জন্মের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই সমস্ত বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধযুক্ত আখ্যায়িকায় বোধিসত্ত্বকে কখনও প্রধান নায়ক, কখনও বা কোনও ঘটনার পর্যবেক্ষক কিংবা কোনও গৌণ চরিত্রের ভূমিকায় প্রদর্শিত করা হইয়াছে।

অধ্যাপক ফৌসবোল (Fausbøll) সম্পাদিত 'জাতকত্থবণ্ণনা' নামক গ্রন্থে পঞ্চাঙ্গযুক্ত গদ্য পদ্যাত্মক যে সমস্ত জাতক-কাহিনী দেখা যায়, এগুলি মূল জাতকের প্রাচীন রূপ বলিয়া ধরা যায় না। এই কাহিনীসমূহ পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল এবং 'গন্ধবংস' নামক পালি গ্রন্থানুযায়ী এই বিরাট 'জাতকত্থবণ্ণনা'র রচয়িতা ছিলেন ভাষ্যকার আচার্য বুদ্ধঘোষ। তবে এই গ্রন্থ বুদ্ধঘোষের (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) লেখনীপ্রসূত কিনা সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই সমস্ত জাতক-কাহিনীর সুপ্রাচীন রূপ দীঘ মজ্ঝিম সংযুত্তাদি নিকায়গ্রন্থে ও বিনয়পিটকের মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ প্রভৃতি গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিদর্শনগুলির কয়েকটিতে (বোধিসত্ত্ব বর্জিত) পশুপক্ষী সংক্রান্ত গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, নীতিকথা প্রভৃতিও পরিলক্ষিত হয়, যথা মহাবগ্গের দীঘাবুকুমার কথা, চুল্লবগ্গের 'তিত্তির ব্রহ্মচরিয়' প্রভৃতি। আবার নিকায়গ্রন্থগুলির কয়েকটি সুত্তে এমন কতকগুলি আখ্যায়িকা পাওয়া যায় যেখানে বুদ্ধের সহিত আখ্যানবর্ণিত কোনও এক প্রধান নায়কের অভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে, যেমন দীঘনিকায়ের কূটদন্ত ও মহাসুদস্সন সুত্তন্তগুলি, মজ্ঝিম নিকায়ের মখাদেব সুত্ত ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত কাহিনীর কোথাও বুদ্ধকে কোনও প্রাণী বা জন্তুর সঙ্গে সনাক্ত করা হয় নাই। ইহাদের কয়েকটি ব্যতীত প্রায় সমস্তই পূর্ণাঙ্গ জাতকে রূপান্তরিত হইয়া 'জাতকত্থবণ্ণনা'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইগুলিকে সাধারণতঃ 'সুত্তন্ত-জাতক' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রাচীন 'নবাঙ্গে'র অন্তর্ভুক্ত 'জাতক' নামক অঙ্গটি 'পিটক' গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত জাতকাকাররূপ কাহিনীগুলিকেই নির্দেশ করে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অনেকের মতে পিটকভুক্ত খুদ্দকনিকায়ের যে গ্রন্থ 'জাতক' নামে অভিহিত, তাহাতে কেবল গাথাই সংরক্ষিত আছে, গদ্যাকার আখ্যানাংশ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র এই গাথার দ্বারা অনেক সময়ে কোনও গল্পের মর্ম বুঝিতে না পারার জন্য গদ্যে আখ্যান-রচনার প্রয়োজন স্বীকৃত হইল এবং গাথার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মুখে মুখে আখ্যানগুলিও প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এইভাবে 'জাতকত্থবণ্ণনা'র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' নামক মহাযান-সূত্র এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোক সম্পাত করে। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের অধিকারভেদ বিবেচনা করিয়া সূত্র, গাথা, পৌরাণিক কাহিনী কিংবা জাতকের সহায়তায় বিভিন্নভাবে ধর্ম দেশনা করিতেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং কতকগুলি আখ্যান রচনা করিয়া অথবা প্রচলিত কথা কাহিনীর মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করিতেন। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণও যে অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ধর্মের ব্যাখ্যা বা প্রচার করিতেন তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। এইভাবে অনেক নূতন নূতন কাহিনীর উদ্ভব হওয়ায় 'জাতক' সমৃদ্ধ হইয়া পরিবর্ধিত আকার ধারণ করে। জাতকগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'চুল্লনিদ্দেস' নামক প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থে ৫০০ জাতকের (পঞ্চ জাতকসতানি) উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) বিবরণও ইহা সমর্থন করে। ফৌসবোলের জাতকে ৫৪৭টি জাতক দেখা যায়। আচার্য বুদ্ধঘোষও ৫৫০টি জাতকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাতকসমূহের সংকলন কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে না পারা গেলেও, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, কতকগুলি জাতকের আখ্যান-ভাগ খ্রীষ্টের আবির্ভাবের দুই কি তিন শতাব্দীর পূর্বেই জনসমাজে সুবিদিত ছিল। ভারহুত ও সাঁচী স্তূপ-প্রাচীরের গাত্রে অনেক জাতকের শিলাচিত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। এমন কি কোনও কোনও চিত্রের পার্শ্বে জাতকের নাম পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

'জাতকত্থবণ্ণনা'র প্রত্যেক জাতকে পাঁচটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। প্রারম্ভিক অংশের নাম প্রত্যুৎপন্ন-বস্তু বা

বর্তমান কাহিনী। এই অংশে বুদ্ধ কোথায় এবং কোন্ প্রসঙ্গে জাতক-কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণী দেখা যায়। দ্বিতীয় অংশের নাম অতীতবস্তু, ইহাই প্রকৃত জাতক এবং এই অংশেই বুদ্ধের অতীত জন্ম-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। অধিকাংশ জাতকের এই অংশ ‘অতীতকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে’ এইরূপ বাক্যাংশ দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। অনেকের মতে এইপ্রকার বাক্যাংশে উল্লিখিত ব্রহ্মদত্ত নামের দ্বারা কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায় না, প্রাচীন কাশীরাজ্যের নৃপতিদের ইহা ছিল রাজবংশীয় উপাধি বা কুলনাম। গদ্য-পদ্যমিশ্রিত অতীতবস্তুর মধ্যে যে পদ্যাংশ বা শ্লোক বিদ্যমান, উহা ‘গাথা’ নামে পরিচিত। কোনও কোনও প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতেও এইরূপ গাথা পরিলক্ষিত হয়। এই গাথার সহিত সংশ্লিষ্ট টীকা বা ব্যাখ্যা -সমন্বিত অংশের নাম ‘বেয্যাকরণ’ বা ব্যাকরণ। প্রত্যেক জাতকের পরিশেষে উপসংহার-সূচক যে অংশটি রহিয়াছে তাহা ‘সমোধান’ বা সমবধান নামে অভিহিত, ইহাতে ‘অতীত-বস্তু’-বর্ণিত ব্যক্তিগণের সহিত ‘প্রত্যুৎপন্ন বস্তু’তে উল্লিখিত পাত্রদের অনন্যতা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

‘জাতকত্থবণ্ণনা’র সহিত সংযোজিত সূচনায় প্রারম্ভিক কথাস্বরূপ আর একটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ‘নিদানকথা’ নামে অভিহিত। ইহা তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত - দূরে নিদান, অবিদূরে নিদান ও সন্তিকে নিদান। প্রথম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দূরে নিদানাংশে গৌতম বুদ্ধের বোধি-সত্ত্ব অবস্থায় সুমেধ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ এবং ইহার পর হইতে তুষিতস্বর্গে উৎপত্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনাসমূহ বিবৃত হইয়াছে। তুষিতস্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া শুদ্ধোদন-পুত্র সিদ্ধার্থের বোধিমণ্ডপে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাবলী অবিদূরে নিদানে পরিদৃষ্ট হয় এবং পরবর্তী কালে বুদ্ধজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিস্তৃত বিবরণসমূহ সন্তিকে নিদান নামে পরিচিত।

এই জাতকগুলি গাথার সংখ্যানুসারে ২২টি নিপাত বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত। বৌদ্ধ ধর্মকে জনপ্রিয় করা এবং পারমিতাগুলির মহিমাকীর্তন জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য। জাতকের সমস্ত আখ্যানই উপদেশাত্মক এবং এইগুলি নানা প্রকার তথ্যে পরিপূর্ণ। সাহিত্য, শিল্প এবং ঐতিহাসিক উপাদানের দিক দিয়া বিচার করিলে জাতকের মূল্য অপরিসীম।

দ্র ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ‘জাতক’, ১ম ২য় খণ্ড, ১৩২৩, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, T. W. Rhys Davids, *Buddhist India*, London, 1903, M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol II, Calcutta, 1933, B. C Law, *A History of Pali Literature*, vol I, London, 1933

সুকুমার সেনগুপ্ত

জাতকর্ম সংস্কার দ্র

জাতাপহারিণী বর্তমানে অপরিচিতপ্রায় শিশু-ধ্বংস-কারিণী লৌকিক দেবী। বাড়ির বাহিরে ইহার পূজার বিধান, পূজার প্রসাদ গ্রহণ করার নিয়ম নাই। দেবতার নৈবেদ্যাদি পূজার স্থানেই ফেলিয়া রাখা হয়। বলির কাটা পাঁঠা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মূর্তি তৈয়ারি করা হয় না, ঘটের উপর পূজা করা হয়। ধ্যান অনুসারে দেবীর ৮ মুখ, ৮ হাতে বর, অভয়, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ ও অসি। ইনি বিবসনা, ঊর্ধ্বকেশা, উগ্রদংষ্ট্রা, ত্রিনেত্রা, উগ্রনয়না, ভীষণা, বিরূপাকৃতি, শিশুহারিণী।

ইহার সঙ্গে অন্য যে সমস্ত দেবতার পূজা করা হয় তাঁহাদেরও বেশির ভাগই ভীষণাকৃতি। আশ্চর্যের বিষয়, এই উপলক্ষে পূজিত সুপরিচিত ষষ্ঠীদেবীর রূপও ভীষণ। ইনি করালদংষ্ট্রা কিন্তু শ্যামা, অত্যন্ত ভীষণা এবং মানবের ভয়দাত্রী। রক্তমাত্রী নামে দেবতা অত্যন্ত রক্তনেত্রা, রক্তবসনা, কৃশাঙ্গী, রক্তপানরতা এবং ভয়দা। ইনি ডাম্বরের পত্নী। ডাম্বর শ্মশ্রুবেশধারী, উগ্রবিশালনেত্রযুক্ত, চর্মাম্বর পরিহিত, ঘোরঘনশব্দপূর্ণ। জলকুমার সুশীতল জলের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁহার বস্ত্র চন্দ্রের মত শুভ্র, তাহার চক্ষু অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে। তাঁহার দুই হাত, হাতে শক্তি ও শরাসন। শোধক নীল বর্ণাভ, রক্তনেত্র, মদশালী, সদাপ্রমত্ত, রক্তাশ্ববাহন, রক্তকেশ, পিঙ্গললোচন, শূলচর্মধারী, ক্রূরহৃদয়, ভীষণ ও মহাকায়, ইনি চতুঃষষ্টি যোগিনী ও দানবগণের দ্বারা পরিবৃত, ইহার ধ্বনি সিংহের মত, মুখে সর্বদা কটমট শব্দ, নিজমদে নয়ন সর্বদা ঘূর্ণিত। বনদুর্গা ও দ্বাদশ দানবপ্রাণাদের বিবরণ ‘বনদুর্গা’ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জাতি¹ শব্দটি বাংলা ভাষায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থে ইহা ইংরেজী ‘নেশন’ শব্দের প্রতিশব্দ। নেশন বলিতে সময়ে সময়ে রাষ্ট্র বুঝায়, যেমন ‘লীগ অফ নেশনস’ (জাতিসংঘ) বা ‘ইউনাইটেড নেশনস’ (রাষ্ট্রসংঘ)। আইনতঃ ন্যাশন্যালিটি বলিতে বুঝায় কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের সভ্যত্ব (মেম্বারশিপ)। এই অর্থে ন্যাশন্যালিটি শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়ায় জাতিত্ব। ন্যাশন্যালিটি শব্দটির

অন্যতর অর্থ হইল এক অবিকশিত জাতি বা এমন একটি জাতি যাহা এখনও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করে নাই।

জাতি এবং রাষ্ট্র এক নয়। রাষ্ট্রত্বের ধারণা অতীতের স্মৃতি বা বর্তমান সত্য অথবা ভবিষ্যৎ আশা ও আদর্শরূপে জাতিমানসে বিরাজ করে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্ধন জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। মূলতঃ জাতি হইল প্রথর সমূহচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ এক পরস্পরসান্নিধ্যে বাসকারী অল্পবিস্তর জনবহুল মানবসমাজ। নিজেদের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ এবং অপরাপর মানুষ সম্পর্কে ঐকান্তিক ভেদবুদ্ধি জাতীয় চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অপর জাতির সহিত একযোগে এক রাষ্ট্রে বাস জাতির পক্ষে অসুখকর। জাতি চায় স্বাধীন, স্বকীয় জাতি-রাষ্ট্র।

শেষ বিশ্লেষণে, জাতীয় ঐক্যের অনুভূতিই জাতিত্বের ভিত্তি। জাতীয় ঐক্যবোধ অবশ্যই এক মনোজাগতিক ব্যাপার। রেনাঁ জাতিকে 'আত্মা' আখ্যা দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, জাতি 'মানস পদার্থ'। কিন্তু জাতি কেবল বিশুদ্ধ আত্মিক বা মনস্তাত্ত্বিক সত্যই নয়। অনেক বস্তুজাগতিক কারণ আবার অনেক রূপকথা ও উপকথা, উভয়ের সংমিশ্রণে জাতি ও জাতীয় চেতনার উৎপত্তি ঘটে। বাসস্থানের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, বংশের ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, ইতিহাসের ঐক্য, অর্থনৈতিক জীবনের ঐক্য। চরিত্রের ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য, এইগুলি জাতির ও জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টির কারণ।

এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জাতির বাস। ইহা তাহার মাতৃভূমি বা স্বদেশ। বাসভূমির সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা তীক্ষ্ণ জাতীয় চেতনার অনুকূল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় ভূখণ্ডের সীমানা প্রকৃতিনির্দিষ্ট নয়। কোনও মানবসমূহের ঐক্যবোধ অন্যান্য দিক হইতে যতই তীব্র হউক, তাহাদের নির্দিষ্ট বাসভূমি না থাকিলে তাহারা জাতিরূপে গণ্য নয়, কেননা তাহাদের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্র গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়।

ভাষার ঐক্য স্বভাবতঃই কোনও এক মানবসমূহের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতির বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে চিত্তসংযোগ ও ভাববিনিময় ঘটে। জাতীয় ভাষায় গড়িয়া ওঠে জাতীয় সাহিত্য। ইহাতে রচিত হয় জাতির যশোগাথা, অভিব্যক্ত হয় জাতির ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনপদ্ধতি। প্রতিভাশালী জাতীয় লেখকগণ জাতির গর্বের বিষয় হইয়া পড়েন। কিন্তু এক ভাষা না হইলে এক জাতি হইতে পারে না, ইহা সত্য নয়। সুইট্জারল্যাণ্ডে তিন ভাষা প্রচলিত, ক্যানাডায় দুই ভাষা। ভারতে চৌদ্দটি ভাষা জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত।

আমরা সকলেই একই পূর্বপুরুষের সন্তান, এই ধারণা জাতীয় চেতনার অন্যতম উপাদান। বংশের ঐক্য বহু জাতির সৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহা অধিকাংশ পণ্ডিতের মত। কিন্তু কোনও জাতির রক্তই বিশুদ্ধ নয়। সকল জাতির মধ্যেই বংশ-সংকর ঘটিয়াছে। কুলোদ্ভবের ঐক্য একটা উপকথা, ভুল বিশ্বাস-মাত্র। কিন্তু ভুল হইলেও বিশ্বাসটার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব জাতীয় ঐক্যসাধনে বিশেষ কার্যকর।

ধর্মের ঐক্য কোনও মানবসমূহের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ সৃষ্টি করিতে পারে। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ আছে। ধর্ম প্রথম দিকে কোথাও কোথাও জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধকে উদ্বুদ্ধ ও পরিপুষ্ট করার সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রবণতা হইল সকল ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি ও রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে জাতির সংগঠসাধন। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতি, এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের মানবসমূহ। ভারতবর্ষে মুসলিম লীগের দ্বারা প্রচারিত ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্ব একান্তই অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক।

অতীত সাম্রাজ্যের কাহিনী, অতীত জয়ের গর্ববোধ, অতীত পরাজয়ের ব্যথা, বিদেশী আক্রমণের ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে একযোগে সংগ্রাম, এই সকল ঐতিহাসিক স্মৃতি জাতিমানসের সম্পদ এবং জাতির সকলেই তাহার অংশীদার। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত ইতিহাস বাস্তব ঘটনা ও রূপকথার বিচিত্র সংমিশ্রণ। জাতীয় ঐক্যসাধনে ইহা ভাষায় প্রভাবশালী।

বণিকশ্রেণীর উদ্ভব, পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতির প্রবর্তন, শ্রমবিভাগের প্রসার, স্থানীয় অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান, জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মনীতি, এইগুলি জাতিকে এক ঐক্যবদ্ধ অর্থনৈতিক সমাজে পরিণত করিয়াছে। এক-একটি জাতি অর্থনৈতিক বিকাশের এক-একটি ইউনিট। ভারতের বিভিন্ন অংশের নিবিড় অর্থনৈতিক পরস্পরনির্ভরতা এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিকাশের একান্ত আবশ্যকতা ভারতে জাতীয় ঐক্যের অন্যতম বন্ধনসূত্র।

জাতীয় চারিত্রের পিছনে কোনও বংশগত কারণ নাই, আছে পরিবেশ ও ঐতিহ্যের প্রভাব। প্রতিটি জাতির একটি বিশেষ চরিত্র আছে, ইহা কিছুটা বাস্তব সত্য, কিছুটা রূপকথা, জাতীয় চারিত্র অপরিবর্তনীয় নয়, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য জাতির লক্ষ্য, ইহা আবার জাতিগঠনের এক প্রধান শক্তি। একই আইন-কানুন ও রাজনৈতিক

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান জাতিত্বের উদ্ভবের একটি প্রধান কারণ। প্রবল কেন্দ্রীয় রাজশক্তি জাতিকে বাঁধিয়া রাখে ও গড়িয়া তোলে।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, রামেন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, J. S Mill, *Representative Government*, London, 1865, A E Zimmern, *Nationality and Government*, London, 1918, Ernest Barker, *National Character and the Factors in its Formation*, London, 1927, M. Spahr, *Readings in Recent Political Philosophy*, New York, 1935, Hans Kohn, *The Idea of Nationalism* New York, 1946, C. Boyd Shaffer, *Nationalism, Myth and Reality*, London, 1955, *Nationalism : An R I. I. A Report*, London, 1953

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

জাতি[২] বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিদ্যমান অনুগত ধর্মই জাতি বা সামান্য। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ইহাকে ইউনিভার্সাল বলা হয়। ইহা বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সপ্ত পদার্থের অন্যতম। জাতি একটি নিত্য পদার্থ এবং অনেকের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বর্তমান একটি ধর্ম বলিয়া ইহাকে স্বীকার করা হয়।

ন্যায়দর্শন বৈশেষিকের সমান তন্ত্র বলিয়া বৈশেষিকোক্ত জাতি ন্যায় দর্শনের অভিমত হইলেও ষোড়শ পদার্থের নিরূপণকারী গৌতম (ন্যায়সূত্রকার) জাতিকে অসদুত্তর-রূপে একটি পৃথক পদার্থ হিসাবেও উদ্দেশ ও নিরূপণ করিয়াছেন।

ভাট্ট ও প্রাভাকর মীমাংসকগণও সামান্য বা জাতি স্বীকার করেন, কিন্তু ভাট্টেরা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের ন্যায় জাতি ও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে জাতি ব্যক্তি হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। প্রাভাকরেরা জাতিকে ব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তির উৎপত্তির সঙ্গেই জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধও উৎপন্ন হয়।

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা 'সামান্য' নামক অনেকানুগত কোনও সৎ পদার্থ মানেন না। তাঁহারা বলেন, যাহা এক, তাহা একই সঙ্গে অনেকানুগত হইতে পারে না।

ন্যায়-বৈশেষিকবিদ্ দার্শনিকেরা বলেন, সামান্য বা জাতির স্বরূপই এই যে তাহা এক হইয়াও অনেকানুগত হইতে পারে। একত্র থাকিলে অন্যত্র থাকিতে পারিবে না, এই নিয়ম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও জাতির ক্ষেত্রে নহে। এই জাতি বা সামান্য 'সর্বসর্বগত', উহা 'ব্যক্তি-সর্বগত' নহে। কিন্তু সর্বত্র বর্তমান থাকিলেও সমবায় সম্বন্ধ ভিন্ন অন্যত্র ইহা ব্যক্ত হইতে পারে না। যেমন 'গোত্ব' অপ্রকট অবস্থায় সর্বত্র আছে, কিন্তু শুধু 'গো' ব্যক্তিতেই উহা প্রকট বা অভিব্যক্ত হয়।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, যাহা সৎবস্তু তাহার কোনও না কোনও রূপে অনুভব হইবেই, গোত্ব বলিয়া যদি একটি সর্বগত পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে সর্বত্র উহার অনুভব হইত, তাহা হয় না, সুতরাং গোত্ব বলিয়া একটি সর্বগত পদার্থকে স্বীকার করা যায় না। তাঁহারা বলেন, অনুগত প্রতীতির জন্য 'জাতি' পদার্থ স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বিজাতীয় ব্যবচ্ছেদই অনুগত প্রত্যয়ের হেতু।

বৌদ্ধদের জাতি বা সামান্যসম্পর্কে এই মত নির্দোষ নহে।

দ্র ১ মাধবাচার্য, সর্বদর্শনসংগ্রহ (বৌদ্ধ০), বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, কারিকাবলী (মুক্তাবলীসহ, কারিকা— ৮, ৯ ও ১০), ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য (২য় অ, ২য় আ, ৬৯ সূ)।

ক ভট্টাচার্য

জাতি[৩] রাগসংগীতে ব্যবহার্য সপ্তস্বরের সবগুলির প্রয়োগ বা কোনও কোনওটির বিলোপ দ্বারা নির্দিষ্ট স্বরের সংখ্যা অনুসারে তিনটি জাতি নির্ণীত হইয়াছে, যথা— সম্পূর্ণ, ষাড়ব (খাড়ব) এবং ঔড়ব। স্বরগ্রামে সাতটি স্বরের প্রয়োগ হইলে তাহা সম্পূর্ণ জাতীয়, ছয়টি স্বরের প্রয়োগ হইলে তাহা ষাড়ব এবং পাঁচটি স্বরের প্রয়োগ হইলে তাহা ঔড়ব জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। রাগসংগীতে ঔড়ব অপেক্ষা কম স্বর ব্যবহৃত হয় না। স্বরের আরোহণ এবং অবরোহণক্রম অনুসারে সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ ষাড়ব, সম্পূর্ণ-ঔড়ব, ষাড়ব সম্পূর্ণ, ষাড়ব ষাড়ব, ষাড়ব ঔড়ব, ঔড়ব-সম্পূর্ণ, ঔড়ব ষাড়ব এবং ঔড়ব ঔড়ব— এইরূপে জাতির বিভিন্নতা ঘটে।

জাতি গান : রাগসংগীতের অভ্যুদয়ের পূর্বে প্রাচীন ভারতে জাতিগায়ন প্রচলিত ছিল। জাতির লক্ষণগুলিই পরবর্তী কালে রাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভরত তদীয় নাট্যশাস্ত্রে জাতির সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

'বৃহদ্দেশী'-প্রণেতা মতঙ্গ বলিয়াছেন যে শ্রুতি, স্বর ও গ্রামসমূহ হইতে যে গীতরূপ জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম জাতি। শুদ্ধ জাতি সাত প্রকার— ষাড্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী এবং নৈষাদী। এতদ্ভিন্ন এগারোটি বিকৃত জাতি ছিল— ষড্জ-কৈশিকী, ষড্জোদীচ্যবা, ষড্জমধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্মারবী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী এবং নন্দয়ন্তী। ইহার কতকগুলি ষড্জগ্রামে এবং কতকগুলি মধ্যমগ্রামে গাওয়া হইত। জাতির প্রধান লক্ষণ ছিল দশটি— গ্রহ (আদি স্বর), অংশ (বহুলপ্রযুক্ত স্বর), তার, মন্দ্র, ন্যাস (সমাপ্তি নির্দেশক স্বর), অপন্যাস (গীতখণ্ডের সমাপ্তিনির্দেশক স্বর), সংন্যাস (গীতের প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসূচক স্বর), বিন্যাস (গীতখণ্ডের মধ্যস্থ স্বর), বহুত্ব এবং অল্পত্ব।

সঙ্গীতরত্নাকরে প্রদত্ত বিভিন্ন জাতির উদাহরণ হইতে জানা যায় যে জাতিগুলি সুপ্রাচীন নাট্যগীতি প্রবাহে বিনিযোগ করা হইত এবং মাগধী শ্রেণীর গীতেও বিন্যস্ত হইত।

দ্র ভরত, নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্কৃত সিরিজ), মতঙ্গ, বৃহদ্দেশী, শার্ঙ্গদেব, সঙ্গীতরত্নাকর।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

জাতিকর্ম সংস্কার দ্র

জাতিব্যবস্থা হিন্দুসমাজে বর্ণের সংখ্যা চার, কিন্তু জাতির সংখ্যা সমগ্র ভারতবর্ষে তিন সহস্রের কম নয়।

ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত) একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহুস্বরূপ এবং উরু বৈশ্য ছিলেন এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র জাত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এগুলি বর্ণ, জাতি নহে। উক্ত মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা করিলে মনে হয়, চারিটি বিশেষ গুণসম্পন্ন ও বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত বর্ণের সমাবেশে সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হইয়াছে। সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন মাত্রার সংযোগের ফলে চারি বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রাচীন বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ এবং রাজন্য ও বিশ্ বা বৈশ্য বা জনসাধারণের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বে বেদের ব্রাহ্মণাংশের রচনা সমাপ্ত হয়। তখন আর্যগণের মধ্যে যজন-যাজনবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ, রাজন্যবর্গ, বৈশ্য এবং তদ্ভিন্ন দাস বা দস্যু জাতিবৃন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। দাস বা দস্যু জাতিবৃন্দ পরে শূদ্রের স্থান অধিকার করে, এরূপ অনুমান করিবার সংগত কারণ আছে। সে যুগে একই বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তির প্রচলন ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে সমাজে সমৃদ্ধি ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের এবং প্রতি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির বৃত্তি ক্রমশঃ একান্তভাবে কুলগত হইয়া উঠিল। প্রাচীন যুগে পরস্পরের সহিত অন্ন বা বিবাহ-সম্পর্ক অবাধে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী কালের বিধি নিষেধ তখনও অপ্রচলিত ছিল।

উত্তর কালে বর্ণবিভাগ শুধু নরসমাজে আবদ্ধ না থাকিয়া ভূমি, মন্দির, এমন কি নক্ষত্রাদির মধ্যেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সহযোগে শ্রেণীভেদ করা হইত। বস্তুতঃ তখন বর্ণবিভাগ মানবসমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ বস্তুর মধ্যে বর্গবিভাগের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন ভারতে মানুষ যখনই বিভিন্ন জাতির সহিত পরিচিত হইয়াছে তখনই গুণ এবং কর্ম অনুসারে তাহাদিগকে কোনও না কোনও বর্ণের মধ্যে সেই জাতিকে স্থান দিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কোনও জাতির কর্ম যদি ঠিক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কোনওটির সঙ্গে মিলিয়া না যায় তখন সেই মিশ্রগুণসম্পন্ন জাতিকে কোন বর্ণে স্থান দেওয়া হইবে, এই প্রশ্ন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম প্রভৃতি স্মৃতিকারগণকে বেশ আলোড়িত করিত। মনুসংহিতায় স্পষ্ট নির্দেশ আছে 'বর্ণবহির্ভূত সবিশেষ অবিদিত সংকরজাতিসম্ভূত ব্যক্তির কর্মদর্শনে জাতি নির্ণয় করিবে' (১০.৫৭)। মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে ৫৯ ৬০ এবং ৭০ ৭৩ শ্লোকে এ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ আছে।

মনুসংহিতায় আরও বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট বৃত্তি আছে। বৈদিক কালে বৃত্তিসম্পর্কে যে স্বাধীনতা ছিল স্মৃতি রচনার কালে ইহা সঙ্কুচিত করিয়া স্থির নির্দিষ্ট হয়, ইহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যায়। উপরন্তু স্মৃতিকারগণ অসংখ্য জাতির মধ্যে কোন বর্ণে কাহাকে স্থান দিতে হইবে, তাহা যেমন স্থির করিলেন, প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা বা সমাজে উচ্চ নীচ ভেদে কাহার কোথায় স্থান সে বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া গেলেন। শব্দের যেমন সন্ধিবিচ্ছেদ হয়, প্রতি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধেও তেমনই সন্ধিবিচ্ছেদের প্রয়াস করা হইল। যথা 'ক্ষত্রিয়কর্তৃক শূদ্রাগর্ভসম্ভূত সন্তান উগ্র নাম প্রাপ্ত হয় এবং জনক-জননীর স্বভাবানুসারে ক্রূরচেতা ও ক্রূরকর্মা হইয়া থাকে' (মনু ১০।৯)। 'বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। পৌণ্ড্রক ঔড্র দ্রাবিড় কম্বোজ যবন শক পারদ পহ্লব চীন কিরাত দরদ এবং খশ— এ সকল

জাতিব্যবস্থা

দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্বোক্ত কর্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়— সাধু-ভাষীই হউক অথবা ম্লেচ্ছভাষীই হউক— উহারা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে' (মনু ১০।৪৩-৪৫)।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ৮৮।৮৯ অধ্যায়ে দেখা যায় রামচন্দ্র শম্বুক নামক শূদ্রকে ব্রাহ্মণোচিত তপস্যায় নিরত হইবার অপরাধের জন্য 'সুরুচিপ্রভ বিমল খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।' অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের অধিকার লঙ্ঘন করা তখন চরম অপরাধস্বরূপ গণ্য হইত। মহাভারতের শান্তিপর্বে ৬৫ অধ্যায়ে দেখা যায়, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে লিঙ্গান্তর গ্রহণ করিয়া অবস্থিত 'যবন কিরাত গান্ধার চীন শবর বর্বর শক তুষার কঙ্ক পহ্লব অন্ধ্র মদ্র পুলিন্দ রমঠ ও কাম্বোজগণ তথা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন ইতরজাতিসকল' রাজার দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। 'দস্যুগণকে ধর্মে কিরূপে সংস্থাপিত করা যায়' রাজা তদ্বিষয়ে ভগবান ইন্দ্রের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন। হিন্দুসমাজ এইরূপে বহুদিন যাবৎ নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা গঠিত ও পরিবর্তিত হইতে থাকে। কালক্রমে কৃষি-শিল্পাদি ব্যাপারেও যথেষ্ট উৎকর্ষ ঘটিতে থাকে এবং যে সকল কুল নূতন বৃত্তি অবলম্বন করিত অথবা উচ্চ বর্ণের অনুকরণে স্বীয় আচারকে সংস্কৃত করিত তাহারা অপরের সহিত অন্ন ও বিবাহ -সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া এক বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইত। রাজশক্তি ব্রাহ্মণগণের উপদেশমত প্রতি জাতিকে বিশিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিবার বিষয়ে সহায়তা করিত, প্রত্যেকের কুলাচার, লোকাচার বা দেশাচারের পালনে সাহায্য করিত। বিভিন্ন জাতি স্ববৃত্তি ও স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিত এবং পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত না। এরূপ উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করাই রাজধর্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

প্রতিযোগিতা নিরুদ্ধ হইলেও উক্ত বর্ণাশ্রয়ী সমাজে উচ্চ-নীচের মধ্যে শ্রেণীগত প্রভেদ দেখা দিল। কিন্তু সে শ্রেণীভেদ জন্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, অর্থের বা ক্ষমতার অধিকারের দ্বারা নয়।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে কতকগুলি গুণকে উত্তম, কতক গুলিকে অধম বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কুক্কুট, শূকর ইত্যাদি হেয় জীব, মৎস্যজীবী হেয় জাতি, গর্দভপালক হেয়, কিন্তু গোপালক বা অশ্বপালক শুদ্ধ। চর্মজীবী অশুদ্ধ, পশম বা রেশমের বস্ত্র শুদ্ধ, কাপাসনির্মিত বস্ত্র সহজে অশুদ্ধ হয়। কেন একটি বৃত্তি বা জাতি শুদ্ধ, কেন অপরটি অশুদ্ধ, ইহার ঐতিহাসিক কারণ বিচারের প্রয়োজন নাই। উপস্থিত ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শুদ্ধি ও অশুদ্ধির মানদণ্ডে সমাজে বিভিন্ন জাতির মর্যাদা বা স্থান নির্ণীত হইত। হেয় জাতির মধ্যে আবার কেহ জলাচরণীয় নহে, কেহ স্পর্শের অযোগ্য, কাহারও বা দর্শনও দোষজনক ('অস্পৃশ্যতা' দ্র)।

এইরূপে মান্য ও হেয় বহু জাতির সংশ্লেষের দ্বারা বৃত্তির ব্যাপারে প্রতিযোগিতার ভাবকে সংকুচিত করিয়া এবং প্রতি জাতিকে স্বীয় লোকধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠিল। কিন্তু প্রত্যেক জাতিকেই মৌলিক চারি বর্ণের মধ্যে কোনও না কোনওটির মধ্যে স্থান দেওয়া হইত, কেননা মনুষ্য সমাজে চারি বর্ণের অতিরিক্ত আর কোনও বর্ণের স্থান নাই।

বৈদিক যুগের শিথিল বর্ণবিভাগ উত্তর কালে একদিকে বহিরাগত জাতিবৃন্দের অন্তর্ভুক্তির ফলে এবং অপর দিকে বৃত্তিগত বিবর্তন ও বিকাশ এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিল। এই বিবর্তন আজও হিন্দুসমাজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্থগিত হয় নাই।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বর্ণব্যবস্থায় জাতি-নিচয়ের স্থান কিন্তু ঠিক এক প্রকারের নহে। উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের অস্তিত্ব আজিও বর্তমান। কিন্তু বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অপর দুইটি বর্ণ নাই। এতদ্ভিন্ন জলচল অজলচল, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জাতিবৃন্দের স্থান বিভিন্ন অঞ্চলে একরূপ নহে। পূর্বকালে হিন্দু রাজকুলের শাসনে জাতির মর্যাদা ও স্থানের ইতরবিশেষ ঘটিত। কেহ আচারগত সংস্কার সাধন করিলে ব্রাহ্মণের উপদেশে রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সমাজে মর্যাদার স্তরে এক স্থান হইতে অপর স্থান লাভ করিতে পারিত। কিন্তু আধুনিক কালে যখন রাজশক্তি সমাজে মর্যাদা স্থিরীকরণের দায়িত্ব আর স্বীকার করেন না তখন আচার পরিবর্তন করিয়া যে কোনও জাতি যে কোনও মর্যাদার অধিকারী হইয়া বসিতেছে। রাজধর্মের দায়িত্ব অপসৃত হইবার ফলে হিন্দুসমাজে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন আরও দুইটি কারণে জাতিভেদ-প্রথায় নানা প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। মনুসংহিতার সময়ে যে প্রতিযোগিতাবিহীন উৎপাদনব্যবস্থার চেষ্টা স্পষ্টতঃ করা হইয়াছিল, যখন একই জাতির জন্য একটি বিশেষ বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তখনও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দেশের সর্বত্র জীবিকা-নির্বাহ হয়তো সম্ভব হইত না।

সেইজন্য বিভিন্ন বর্ণের জন্য মনু আপদ্ধর্মের সুদীর্ঘ বিধান দিয়া গিয়াছিলেন।

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুসমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অনেকাংশে হারাইয়া বসে, কারণ রাজশক্তি যাহাদের আয়ত্তে তাহারা প্রতিযোগিতাবিহীন, কুলগত বৃত্তিনির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নহে। পরবর্তী কালে ইংরেজদের শাসনকালে এবং বিদেশী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতামূলক এক নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে, কল-কারখানা নির্মাণ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিকাশের সহায়ক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ফলে প্রাচীন জাতিগত বৃত্তি অনুসরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা আর সম্ভব হইতেছে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে বাংলা দেশের উপার্জনশীল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৪·৫৭ জন স্ববৃত্তি অর্থাৎ যজন যাজনাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কিন্তু বারুজীবী অর্থাৎ পানের চাষী ও ব্যবসায়ীগণের মধ্যে শতকরা ৪৪·১৫ ও কুম্ভকারের মধ্যে শতকরা ৬১·৬৯ জন তখনও স্ববৃত্তি আশ্রয় করিয়া ছিলেন। একই রাজ্যের মধ্যে এইরূপে যেমন স্তরভেদে পরিবর্তনের মাত্রায় তারতম্য দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আবার সেইরূপ তারতম্য যথেষ্ট বর্তমান। পাশ্চাত্য উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রভাব নানা রাজ্যে অত্যন্ত অসমানভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্বত্রই প্রাচীন উৎপাদন-ব্যবস্থার আশ্রয় উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইয়া চলিয়াছে। ফলে প্রাচীন সমাজে মর্যাদার যে তারতম্য ছিল তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কুলগত বৃত্তি পরিহার করিয়া যখন ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র বর্ণ পর্যন্ত সকলকেই নূতন এক উৎপাদন-ব্যবস্থায় নূতন নূতন আসনের সন্ধান করিতে হইতেছে, যখন জন্মগত মর্যাদা অপেক্ষা ধনগত মর্যাদা সমধিক আদর লাভ করিতেছে, তখন পুরাতন সমাজে নির্দিষ্ট বৃত্তি ও মর্যাদার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

দুর্ভাগ্যক্রমে যে নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিতেছে তাহা গ্রামের অগণিত বৃত্তিহারা ও শহরের দিকে ধাবমান জনগণের সকলকে কাজ দিবার পক্ষে আজও পর্যাপ্ত নহে। তাই আধুনিক ভারতে উৎপাদন-ব্যবস্থায় খণ্ড বিপ্লব সাধিত হইলেও গ্রামদেশের বহু মানুষকেই পুরাতন জাতিগত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। এই দোটানার মধ্যে মানুষ একদিকে জাতিভেদ-প্রথাকে সম্পূর্ণ ভুলিতেও পারিতেছে না আবার নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থার উপরে পূর্ণ আস্থাও স্থাপন করিতে পারিতেছে না। ফলে বর্ণগত মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে ধননির্ভর শ্রেণীগত মর্যাদা একত্র বৃদ্ধি পাইয়া সমাজকে আরও বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়া তুলিতেছে।

ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা বা জাতিগত বৈষম্য আইনানুসারে বিদূরিত হইলেও সমাজে সমভাবের অভিলষিত প্রসার ও নানা ফল ঐতিহাসিক কারণে বিলম্বিত হইতেছে।

দ্র মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, নির্মল কুমার বসু, হিন্দুসমাজের গড়ন, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, Jogendranath Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects*, Calcutta, 1896, Saratchandra Roy, *Caste, Race and Religion in India*, Ranchi, Reprinted from *Man in India*, vols. 14-18, 1934-38, R C Majumdar, *Ancient India*, Delhi, 1964.

নির্মলকুমার বসু

জাতিসংঘ বিংশ শতাব্দীর দুইটি মহাযুদ্ধের অবসানে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ নিবারণের জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়: প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাতিসংঘ (লীগ অফ নেশনস) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাষ্ট্রসংঘ (ইউনাইটেড নেশনস)।

ভার্সাই-সন্ধির শর্ত অনুসারে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি জাতিসংঘ স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরে সদস্যসংখ্যা ছিল ৪২। জাতিসংঘের পরিকল্পনা প্রধানতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সনের হইলেও এ দেশ নিজেদের মতভেদের জন্য সংঘে যোগ দেয় নাই। আফগানিস্তান ও রাশিয়া সংঘে যোগদানকারী (১৯৩৪ খ্রী) সর্বশেষ সদস্য। অনেকে রাষ্ট্রসংঘ ছাড়িয়াও দিয়াছিল। কোস্টারিকা (১৯২৪ খ্রী) চাঁদা দিতে অক্ষমতার জন্য, জাপান ও ইটালী (১৯৩৭ খ্রী) চীন ও ইথিওপিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজনে সদস্যপদ ত্যাগ করে। জার্মানী দ্বারা বিজিত হওয়াতে অস্ট্রিয়ার সদস্যপদ লোপ পায় (১৯৩৮ খ্রী)।

জাতিসংঘের শাসনবিধিতে বলা হইয়াছে, সদস্যগণ পারস্পরিক উন্নতির ও লোকহিতের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিবে। সদস্য রাষ্ট্র তাহার আন্তর্জাতিক বিবাদ সংঘকে জানাইবে। সালিসীর জন্য তিন হইতে নয় মাস অবধি

অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। এই বিধি-লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্র আইনচ্যুত বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার সহিত সকলে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

জাতিসংঘের শাসনব্যবস্থায় পাঁচটি অংশ ছিল— কাউন্সিল, অ্যাসেম্বলি, সেক্রেটারিয়েট, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা এবং আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালত। সদস্যগণের চাঁদায় জাতিসংঘের ব্যয়নির্বাহ হইত। জার্মানী ও তুরস্কের সাম্রাজ্যের অনেক অংশ, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জাপান প্রভৃতি দেশ জাতিসংঘের নামে অছিরূপে শাসন করিত।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা শ্রমজীবীদের কর্মের সময়, পরিবেশ ও জীবনচর্যার মান-উন্নয়ন সম্পর্কে কর্মরত ছিল। এই সংস্থার অধিবেশনে জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন দেশও প্রতিনিধি পাঠাইত। আন্তর্জাতিক আদালত হল্যাণ্ডের হেগ শহরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর ১৫ জুন অথবা পূর্বঘোষিত সময়ে এই আদালতের বৈঠক বসে।

প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইলেও জাতিসংঘ রাজনৈতিক দিক ভিন্ন অন্য দিকে কিছু ভাল কাজও করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য-উন্নয়নে, ঔষধ এবং স্ত্রীলোক লইয়া আন্তর্জাতিক ব্যবসায়নিয়ন্ত্রণে সংঘের প্রচেষ্টা ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিলের অধিবেশনে জাতিসংঘের অবসানের এবং স্থাবর ও অস্থাবর এক কোটি সতেরো লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রসংঘে (ইউ. এন. ও.) প্রদানের সিদ্ধান্ত করা হয়। 'রাষ্ট্রসংঘ' দ্র।

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

জাতিস্মর যাহারা পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। জন্মান্তরবাদের উপর এই ধারণার ভিত্তি; অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে ইহা ধর্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত হইয়া আছে। জন্মান্তর স্বীকার করিলে জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিতে পারাও সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মহাভারতে কয়েক স্থানে জাতিস্মরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতিস্মর নামে এক হ্রদ ছিল, এই হ্রদে স্নান করিলে মানুষ জাতিস্মর হইত (মহাভারত, বনপর্ব ৮১৮০ শ্লোক)। জাতিস্মরত্বলাভের অন্য উপায়ও মহাভারতে বর্ণিত আছে। সূর্যোদয়কালে সমাহিত চিত্তে যে অষ্টোত্তর শতবার সূর্যনাম পাঠ করে সে ধন-পুত্র-রত্নাদি, প্রাপ্ত হয়; স্মৃতি, মেধা ও জাতিস্মরত্ব লাভ করে (মহাভারত ঐ ৩১৬০)। ভগবদ্গীতায় জাতিস্মরবাদ স্বীকৃত; শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, 'অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সকল জানি, পরন্তপ, তুমি জান না' (৪।৫)।

রামায়ণে জাতিস্মরত্বের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। হরিবংশে জাতিস্মর প্রসঙ্গ আছে, একটি উপাখ্যানও পাওয়া যায়; কুরুক্ষেত্রের ৭ জন ব্রাহ্মণ পথে গমনকালে ক্ষুধায় কাতর হইয়া গোহত্যা করে। পরে পাপক্ষালনার্থ উহারা গোমাংস পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া ভোজন করে। এই পাপ ও পুণ্যের ফলে তাহারা পরজন্মে সাত জন ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং অতিশয় ধার্মিক ও পিতৃভক্ত হয়; বৃথা প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকে। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাহারা স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করে এবং পুনরায় জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করে (হরিবংশ, ১২০২-৩ শ্লোক)।

মনুসংহিতায় (৪।১৪৮) উক্ত হইয়াছে যে বেদপাঠ, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, তপস্যা ও সর্বভূতে অদ্রোহের দ্বারা পূর্বজন্ম স্মরণ করা যায়। যোগসূত্রে (৩।১৮), লিখিত আছে অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা পূর্বজন্মের জ্ঞান জন্মিতে পারে। ভাগবত পুরাণে (৫.৯) জড়ভরতের জাতিস্মরত্বের উপাখ্যান আছে এবং অন্যত্র (৯।৮।১৬) সূর্যবংশীয় অসমঞ্জকে জাতিস্মর বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলি বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনারূপে জাতিস্মর-শৈলীতে লিখিত: বুদ্ধদেব জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিয়া কাহিনী বলিতেছেন। পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে (কথাসরিৎসাগরাদি) জাতিস্মর মানুষ ও পশুপক্ষীর নানা কাহিনী পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বে বহু কথা-উপকথায় জাতিস্মর মানুষ ও পশুপক্ষীর প্রসঙ্গ আছে।

খ্রীষ্টধর্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে না। তাই পাশ্চাত্য দেশে জাতিস্মরতার সংস্কার নাই। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যে জাতিস্মরত্ব অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে। জ্যাক লণ্ডন, কোনান ডয়েল, সমারসেট মম প্রভৃতি লেখকের নাম এই সূত্রে স্মরণীয়। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যেও জাতিস্মরত্বমূলক কাহিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

জাতিস্মরত্বের কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় আয় দেশের যাবতীয় পণ্যসম্ভারের বাৎসরিক প্রবাহের মুদ্রামূল্য। জাতীয় আয়-পরিমাপের একাধিক

পদ্ধতির প্রচলন আছে। প্রথমতঃ, মোট উৎপাদনের পরিমাণ হইতে একটি হিসাব পাওয়া যাইতে পারে। বৎসরে মোট যত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের বাজার দর লইয়া উহা হইতে অসম্পূর্ণ দ্রব্য বা যাহা অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার মূল্য বাদ দিলে পাওয়া যায় স্থূল জাতীয় উৎপাদন (গ্রস ন্যাশন্যাল প্রোডাক্ট)। ইহা হইতে যন্ত্রপাতি ক্ষয় ক্ষতি বাবদ ধার্য অর্থ বাদ দিলে পাই নিট জাতীয় উৎপাদন (নেট ন্যাশন্যাল প্রোডাক্ট)। ইহা বাজারদরে নির্ধারিত জাতীয় আয়। অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ঐ লব্ধ আয় পদ্ধতি দ্বারা একই জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ বাৎসরিক উৎপাদনে নিযুক্ত সব শ্রমিকের মজুরি (পেশাদার ব্যক্তির আয়সহ), জমির মালিকের প্রাপ্য মোট খাজনা (যাহারা নিজেদের বাড়িতে বাস করে তাহাদের আনুমানিক ভাড়াসহ), পুঁজিদারের প্রাপ্য মোট সুদ ব্যবসায়ের মোট মুনাফা (যৌথ কোম্পানির অবণ্টিত লভ্যাংশসহ) – এই চারিটির সমষ্টি হইবে নিট জাতীয় আয়। ইহা উপকরণ মূল্যে নির্ধারিত জাতীয় আয়। এই আয়সমষ্টিতে অবশ্য এমন কোনও আয় ধরা হইবে না যাহা বৎসরের চলতি উৎপাদনের দ্বারা অর্জিত হয় নাই, (যথা প্রাক্তন কর্মচারীর পেনশন)। নিট জাতীয় উৎপাদন হইতে পরোক্ষ কর বাদ দিলে তাহা নিট জাতীয় আয়ের সমান হইবে। জাতীয় আয় নির্ণয়ের এক তৃতীয় পদ্ধতি হইতেছে আভ্যন্তরীণ ভোগ্য পণ্যের উপর ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ বাবদ ব্যয়— এই উভয়ের সমষ্টি গ্রহণ।

মোট জাতীয় আয়কে দেশের জনসংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

মুদ্রার ক্রয়শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি বিভিন্ন বৎসরের চলতি মূল্যস্তরে নির্ধারিত জাতীয় আয়ের হিসাবকে প্রভাবিত করে। দেশে প্রকৃত জাতীয় আয়ের কিরূপ বৃদ্ধি (বা হ্রাস) ঘটিতেছে তাহা নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন বৎসরের জাতীয় আয়কে একটি বিশেষ বৎসরের অপরিবর্তিত মূল্য স্তরে হিসাব করা হয়।

বর্তমান কালে জাতীয় আয়ের হিসাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা হইতে জাতীয় অর্থনীতির স্বল্পকালীন উত্থান পতন, দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন হার এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহার জীবনধারণ মান জানিতে পারা যায়। জাতীয় আয়ের হিসাব ব্যতীত অর্থনৈতিক যোজনা অসম্ভব।

ভারতবর্ষের মত দেশে জাতীয় আয়গণনার প্রচুর পরিসংখ্যানগত ত্রুটি থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ, এখানে উৎপন্ন দ্রব্যের একটা বৃহৎ অংশের লেনদেন মুদ্রার বিনিময়ে হয় না, যে অংশটুকু বাজারে আসে তাহারও পরিমাণ এবং মূল্য-সম্পর্কিত যথেষ্ট হিসাবপত্র পাওয়া কঠিন। ফলে, কৃষিজাত দ্রব্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমিত মুদ্রামূল্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকায় বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ও সঠিক গণনায় অসুবিধা হয়। ইহা ছাড়া, ক্ষুদ্র-শিল্পজাত আয়, পেশাদার ব্যক্তির আয়, যন্ত্রপাতির ক্ষয় ক্ষতি বাবদ অর্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়গণনার কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হয়। তাহার মধ্যে কয়েকটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

গণনাকারীর নাম	বৎসর	ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় আয় (কোটি টাকা) (চলতি মূল্যে)	মাথাপিছু আয় (টাকা)
দাদাভাই নওরজী	১৮৬৭-৬৮	৩৪০	২০
মেজর বেয়ারিং	১৮৮১	৫২৫	২৭
উইলিয়াম ডিগবি	১৮৯৮	৩৯০	১৮
লর্ড কার্জন	১৯০১	৬৭৫	৩০
ভাকিল ও মুরঞ্জন	[illegible]	১৭১০	[illegible]
ওয়াদিয়া এবং যোশী	১৯১৩-১৪	১০৮৭	৪৪.৫
ফিণ্ডলে শিরাস	১৯২১	২৬০০	১১৬
শাহ এবং খাম্বাটা	১৯২১-২২	২৩৬৪	৭৪
ভি কে আর ভি রাও	১৯২৫-২৯	২৩০০	৭৮
ভি কে আর ভি রাও	১৯৩১-৩২	১৬৮৯	৬২
আর সি দেশাই	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	১৯৪৬-৪৭	[illegible]	২২৮

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন গণনাকারী জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করায় তাঁহাদের হিসাব পারস্পরিকভাবে তুলনীয় নয়।

১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী হিসাব পাওয়া যায়। জাতীয় আয় কমিটির হিসাবে কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ আয় দ্রব্যসমষ্টি পদ্ধতিতে এবং পরিবহন, প্রশাসন, বাণিজ্য ও পেশাগত আয় আয়সমষ্টি পদ্ধতিতে নির্ণীত হইয়াছে। ইদানীং জাতীয় আয়সংস্থা (ন্যাশন্যাল ইন্‌কাম ইউনিট) গণনাপদ্ধতির কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছেন।

ভারতের জাতীয় আয়

(১৯৪৮-৪৯-এর মূল্যস্তরে : একশত কোটি টাকায়)

বিভিন্ন উৎস	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৩-৬৪
১. কৃষি ইত্যাদি	৪৩·৪	৫০·২	৫৯·১	৫৯
২. খনিশিল্প (ক্ষুদ্র বৃহৎ) ইত্যাদি	১৪·৮	১৭·৬	২১·১	২৬·৪
৩ বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ	১৬·৬	১৯·৭	২৪·৬	২৭·৭
৪. প্রশাসন, বিভিন্ন পেশা ইত্যাদি	১৩·৯	১৭·৩	২৩·২	২৮·৯
৫. বিদেশ হইতে উপার্জিত আয়	-০·২	০·০	-০·৫	-০·৯
৬. নিট জাতীয় আয়	৮৮·৫	১০৪·৮	১২৭·৫	১৩৯·১
৭. মাথাপিছু আয়	২৪৭·৫	২৬৭·৮	২৯৩·২	২৯৯·৮

দ্র V. K. R V. Rao, *An Essay on India's National Income, 1925-29*, London, 1939; V. K. R. V. Rao, *The National Income of British India, 1931-32*, 1940; *National Income in British India and the Union Provinces 1945-46*, Delhi, 1949; G. B. Jathar and S G Beri, *Indian Economics*, vol. II, Bombay, 1952; *Final Report of the National Income Committee*, New Delhi, 1954; Statistical Office of the United Nations, *Methods of National Income Estimation*, New York, 1955; *Papers on National Income and Allied Topics*, vol. I, Bombay, 1960, Central Statistical Organization, *Proposal for a Revised Series of National Income Estimates for 1955-56 to 1959-60*, New Delhi, 1961; *Estimates of National Income: 1948 to 1962-63*, Delhi, 1964; V B Singh, ed, *Economic History of India, 1857-1956*, Bombay, 1965.

[illegible] বর্মন

জাতীয় ঋণ জাতীয় ঋণ কথাটি প্রায় সর্বদা সরকারি ঋণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জাতির লোক অন্য জাতির লোকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে 'জাতীয় ঋণ' বলা যাইতে পারিত, কিন্তু এরূপ বলা রীতি নাই। কোনও দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার, এই উভয়বিধ শাসনকেন্দ্র বিদ্যমান থাকিলে অনেক সময়ে মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণকেই জাতীয় ঋণ বলিয়া গণ্য করা হয়। সরকার নিজ দেশের জনসাধারণ অথবা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বলা হয় 'আভ্যন্তরীণ' ঋণ, অপর দেশের জনসাধারণ, ব্যাঙ্ক অথবা ঐ দেশের সরকারের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিলে তাহাকে বলা হয় 'বৈদেশিক' ঋণ। কোনও আন্তর্জাতিক ঋণভাণ্ডার (যথা বিশ্বব্যাঙ্ক) হইতে ঋণ সংগৃহীত হইলে তাহাও 'বৈদেশিক' ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে।

যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা অন্যান্য আকস্মিক কারণে সরকারি ব্যয়ের অঙ্ক নিয়মিত রাজস্বকে অতিক্রম করিয়া গেলে সরকারকে ঋণ সংগ্রহে উদ্যোগী হইতে হয়। ইংরেজ-শাসিত ভারতে জাতীয় ঋণের সম্প্রসারণ প্রধানতঃ এই-ভাবেই হইয়াছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের হিসাব অনুযায়ী উনিশ শতকের আদি হইতে মধ্য ভাগ পর্যন্ত জাতীয় ঋণ ১ কোটি পাউণ্ড হইতে ৫২ কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎকালীন শিখযুদ্ধ, আফগানযুদ্ধ ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ এই উপায়েই করা হয়। ইহার পর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহাতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় ঋণের পরিমাণ ১০ কোটি পাউণ্ডেরও উপরে ওঠে।

কিন্তু আকস্মিক ব্যয়বাহুল্যই সরকারি ঋণের একমাত্র কারণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে ঋণের সাহায্যে নূতন নূতন সম্পদ গঠন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সরকারি নীতি গঠিত হয়। সে ক্ষেত্রে ঋণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকার এই নীতির অনুসরণে গত শতাব্দীতে রেলপথ, সেচের খাল ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের কারখানা নির্মাণেও এই নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে। এই ধরনের ঋণ 'উৎপাদনশীল'। যুদ্ধ-বিগ্রহজনিত ঋণ 'অনুৎপাদনশীল' বলিয়া অবাঞ্ছনীয় হইলেও অনেক সময়ে এই ধরনের ঋণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

অনেক সময়ে রাজস্বের অপেক্ষায় না থাকিয়া সরকারকে

সাময়িকভাবে ঋণ করিয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। এই ধরনের স্বল্পমেয়াদী ঋণ সাধারণতঃ তিন মাসের 'ট্রেজারি বিল' নামে পরিচিত। ইহা ছাড়াও ঋণের পরিশোধ কাল এবং অন্যান্য বিষয় অনুসারে সরকারি ঋণকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। প্রতিটি সরকারি ঋণপত্রের নির্ধারিত মূল্য যদি উচ্চ মানের হয় তবে তাহাকে 'বণ্ড', 'কোম্পানির কাগজ' ইত্যাদি বলা হয়, যদি অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের হয় তবে তাহাকে স্বল্প সঞ্চয়ের 'সার্টিফিকেট' বলা হইয়া থাকে।

ডাকঘরের 'সেভিংস ব্যাঙ্কে' জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ কিংবা 'প্রভিডেণ্ট ফণ্ড' ইত্যাদিতে গচ্ছিত অর্থের জন্যও সরকার জনসাধারণের নিকট দায়াবদ্ধ। ইহার জন্যও সরকারকে সুদ দিতে হয়। সুতরাং সরকারের মোট দায়ের হিসাবে নিম্নোক্ত চার প্রকার দায়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়: ১. দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র ২. স্বল্প সঞ্চয়ের সার্টিফিকেট ৩. ট্রেজারি বিল এবং ৪. নানারূপ গচ্ছিত অর্থ ও আমানত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯৩৮-৩৯ খ্রী) ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১২০৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে বৈদেশিক (প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ডের নিকট পরিশোধ্য) ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৬৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অতিরিক্ত পণ্যরপ্তানি, প্রাচ্য রণাঙ্গনে ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়ভারবহন ইত্যাদি কারণে ভারত প্রচুর ইংল্যাণ্ডীয় মুদ্রা (স্টার্লিং) অর্জন করে এবং তাহার সাহায্যে বৈদেশিক ঋণ অনেকাংশে পরিশোধ করে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সাধারণতঃ অপরিহার্য। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সরকার তাহার কর নির্ধারণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সর্বদাই অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারেন এবং ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য, এই করভার দুর্বহ হইয়া উঠিলে আভ্যন্তরীণ ঋণের জন্যও দেশে নানারূপ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

ইদানীং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত কর্মসূচীকে রূপ দিবার চেষ্টায় ভারত সরকার জাতীয় ঋণবৃদ্ধির নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কেবল আভ্যন্তরীণ ঋণ নয়, বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনও এজন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের জাতীয় ঋণের বৃদ্ধি পরবর্তী তালিকা হইতে সুস্পষ্ট হইবে:

বংসর	আভ্যন্তরীণ ঋণ	বৈদেশিক ঋণ (কোটি টাকা)	মোট জাতীয় ঋণ
১৯৫০-৫১	২৫০০'৭৩	৬০'৭৭	২৫৬১'৫৯
১৯৫৫-৫৬	৩১৭০'৮২	১৪০'৭৭	৩৩১১'৫৯
১৯৬০-৬১	৫৪৫৫'০৩	৮২৫'৫৭	৬২৮০'৬০
১৯৬৫-৬৬	৮৭৫৩'৪৫	২৬২৯'১৮	১১৩৮২'৬৩

জাতীয় ঋণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি উদ্যোগে গঠিত নূতন জাতীয় সম্পদের পরিমাণও সম্প্রসারিত হইতেছে। ভারতের জাতীয় ঋণের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি অংশ সরকারি আয় বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কঠিন প্রশ্ন ওঠে।

দ্র R C. Dutt, *The Economic History of India Under Early British Rule*, London, 1906; R C Dutt, *The Economic History of India in the Victorian Age*, London, 1908, P. E. Taylor, *The Economics of Public Finance*, New York, 1953, P. N Banerjea, *Indian Finance in the Days of the Company*, Calcutta, 1928; Reserve Bank of India, *Annual Report on Currency and Finance, 1965-66*.

বীরেশ ভট্টাচার্য

জাতীয় গ্রন্থাগার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি দ্র

জাতীয় পতাকা রাষ্ট্র ও জাতির বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার প্রতীক। জলজগতে জাহাজের পরিবাহকের পরিচিতি এবং স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথম পতাকা ব্যবহৃত হয়। স্থলজগতে পতাকার ব্যবহার হয় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকালে—খ্রীষ্টান সৈন্যগণ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে ক্রুশচিহ্নযুক্ত পতাকা ব্যবহার করিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তর ইওরোপে নৌবহরের জন্য জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিধি প্রযুক্ত হয়। জলজগতে ব্যবহৃত পতাকার আধুনিক রূপ ষোড়শ শতকে পরিগৃহীত হয়। দুর্গ-প্রাচীরের উপর পতাকা উত্তোলন প্রথার সূচনা হয় মধ্যযুগে। ফরাসী-বিপ্লবের যুগে জাতীয় পতাকা রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক চিহ্নস্বরূপ গৃহীত হয়। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের পতাকা ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা রাখিবার অধিকার আছে।

ব্রিটিশ-শাসনের প্রতিবাদে জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয়

পতাকা উত্তোলিত হয়। লাল, হলুদ এবং সবুজ এই তিন রঙে রঞ্জিত পতাকায় লাল রঙের উপর সারিবদ্ধ ৮টি পদ্ম এবং হলুদ রঙের উপর নীল কালিতে 'বন্দে মাতরম্' কথাটি নাগরী অক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদাম কামা পারীতে (প্যারিস) যে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তাহাতে ৮টি পদ্মের পরিবর্তে ৭টি তারকা অঙ্কিত ছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলিন সোস্যালিস্ট কনফারেন্সে এই পতাকা প্রদর্শিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানি বেসান্ট এবং বালগঙ্গাধর টিলকের নেতৃত্বে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনে ব্যবহৃত পতাকা নূতন রূপ গ্রহণ করে। ইহাতে ৭টি তারকাচিহ্ন এবং চন্দ্রের নকশা-সংবলিত ৫টি রক্তবর্ণ এবং ৪টি সবুজ ডোরা থাকে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মিলিত এক জাতির প্রতীক হিসাবে ত্যাগ, সততা এবং প্রগতির ধারক জাতীয় পতাকার পরিবর্তিত রূপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জালন্ধরের লালা হংসরাজের পরামর্শে এবং মসুলিপট্টম কলেজের পিঙ্গালি বেঙ্কাইয়া-র দায়িত্বে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পতাকার নূতন রূপের খসড়া প্রস্তুত হইল। ইহাতে গেরুয়া, শাদা এবং সবুজ রঙের ডোরা এবং শাদা রঙের উপর চরকার চিহ্ন অঙ্কিত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে এই ত্রিবর্ণ পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইল। স্বাধীনতার পরে গোপালকৃষ্ণ আয়ারের পরামর্শে চরকার পরিবর্তে অশোকচক্র ব্যবহার করিয়া ঐ পতাকাটি ভারতের জাতীয় পতাকারূপে গৃহীত হইয়াছে।

দ্র G. P. Rajaratnam, *Introducing Our Flag*, Bombay, 1949; P. Kannik, *A Handbook of Flags*, London, 1958.

অশোকা সেনগুপ্ত

জাতীয় মহাফেজখানা ন্যাশন্যাল আর্কাইভ্স্। ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্র এবং দলিলাদি যেগুলির কোনও বর্তমান ব্যবহার নাই অথচ শাসনতান্ত্রিক অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনে ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে অথবা যে সব কাগজপত্রের ঐতিহাসিক মূল্য আছে সেগুলি জাতীয় মহাফেজখানায় একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাফেজখানার প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য তখন এই বিভাগের নাম ছিল ইম্পিরিয়্যাল রেকর্ড ডিপার্ট্মেন্ট। ইহার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্রের কোনও কেন্দ্রীভূত সংগ্রহালয় ছিল না। প্রত্যেক বিভাগের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিভাগীয় মহাফেজখানায় থাকিত। কিন্তু যোগ্য পরিচালনার অভাবে এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ও নানাভাবে কীটপতঙ্গাদির দ্বারা অমূল্য দলিলগুলির বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল বলিয়া কিভাবে দলিলগুলির উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তাহা নির্ণয়ের জন্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত একটি কমিটি সরকারকে জানান যে অধিকাংশ কাগজপত্রেরই আর কোনও সরকারি প্রয়োজনে লাগিবার সম্ভাবনা নাই; বরং পরিসংখ্যান এবং ঐতিহাসিক দিক হইতে সেগুলির বিশেষ মূল্য আছে। কমিটির মতে যে সকল দলিলপত্রের এই ধরনের মূল্য আছে সেগুলিকে যত্নের সহিত বাছাই করিয়া এবং বিভিন্ন দপ্তরের রেকর্ড রূমে ছড়াইয়া না রাখিয়া একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। ইহারও দীর্ঘ দিন পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এবং গবেষক জি. ডব্লিউ. ফরেস্টকে ইম্পিরিয়্যাল রেকর্ড ডিপার্ট্মেন্ট গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মহাফেজখানা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালনাধীনে ছিল, পরে ইহা শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃত্বাধীনে যায় এবং কলিকাতা হইতে নূতন দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পরে ইহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ইহার নূতন নামকরণ হয় জাতীয় অভিলেখালয় বা জাতীয় মহাফেজখানা (ন্যাশন্যাল আর্কাইভ্স্ অফ ইণ্ডিয়া)।

ভারতবর্ষের জাতীয় মহাফেজখানা পৃথিবীর বৃহত্তম মহাফেজখানাগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে রক্ষিত দলিলাদির মোট সংখ্যা বর্তমানে ৫০ লক্ষেরও অধিক এবং ইহা ব্যতীত এখানে বহু মানচিত্র সংরক্ষিত আছে। এই মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলগুলি কেবল ভারতবর্ষ নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিরও শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমূল্য আকর। মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল এবং কাগজপত্রগুলির নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন। কেবলমাত্র কাগজপত্রগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে যে যে দলিলের আবশ্যক তাহা সরবরাহ করা মহাফেজখানার প্রধান দায়িত্ব।

জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত কাগজপত্রের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মধ্যে আছে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের দলিলপত্রগুলি। কাগজপত্রগুলির মূল-সংগ্রহ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু হইলেও এখানে পূর্ববর্তী সময়েরও বহু মূল্যবান কাগজপত্র আছে। ইহার মধ্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানি ও তাহার কর্মচারীদের মধ্যে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কোম্পানির পরিচালক এবং এখানকার সভার বিবরণ, সভায় গৃহীত প্রস্তাব এবং স্মারকলিপি সবই কোম্পানির কাগজপত্রের সংগ্রহে আছে। জাতীয় জীবনের এবং শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকেরই মোটামুটি এক অখণ্ড বিবরণ এই দলিলপত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এই সময়ের সমস্ত দলিলপত্রই হাতে লেখা।

পররাষ্ট্র দপ্তরের কাগজপত্রসমূহে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া মধ্য এশিয়া, মধ্য প্রাচ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রাচ্য বিভাগে ভারতীয় এবং বিভিন্ন এশীয় ভাষায় বহু দলিল এবং চিঠিপত্র আছে। ইহার অধিকাংশ ফার্সীতে হইলেও সংস্কৃত, আরবী, বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু, এমন কি চীনা, শ্যামদেশীয় ও তিব্বতী ভাষায় লিখিত দলিল এবং চিঠিপত্রের সংখ্যাও কম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রেসিডেন্সির কাগজপত্রগুলির সংগ্রহ মহাফেজখানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বহু কাগজপত্র বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে বিদেশ হইতে মূল্যবান দলিলপত্রাদির মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করা জাতীয় মহাফেজখানার আর এক কৃতিত্ব এবং ইতিমধ্যে বহু দলিলের মাইক্রোফিল্ম বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ভারতীয় ইতিহাসের এই অমূল্য আগারটি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস-গবেষকদিগের নিকটে উন্মুক্ত করা হয়। গবেষকদিগের সাহায্যের জন্য মহাফেজখানার প্রকাশন বিভাগ এখানে রক্ষিত দলিলপত্রগুলির 'হ্যাণ্ডবুক', 'প্রেস লিস্ট' এবং 'ইন্‌ডেক্স' ইত্যাদি মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রের সংকলনও প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাফেজখানার আর একটি প্রধান কাজ হইল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুরাতন দলিলপত্রের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, জীর্ণ দলিলগুলিকে নিশ্চিত ক্ষতি হইতে বাঁচাইয়া সেগুলিকে পুনর্জীবন দান করা এবং নানা প্রকার পোকামাকড় বা কীটপতঙ্গের হাত হইতে দলিলপত্রগুলিকে নিরাপত্তা দান করা। ইহা ছাড়া কিছুদিন হইল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দলিলপত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মহাফেজখানার প্রশাসন-ব্যবস্থাসম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য একটি পাঠ্যক্রম মহাফেজখানায় চালু করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত মহাফেজখানায় রক্ষিত ব্যক্তিগত চিঠি এবং কাগজপত্রের সংগ্রহটি ইহার একটি প্রধান আকর্ষণ।

শিবনাথ রায়

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় আন্দোলনে যে কয়টি ভাবধারার বিবর্তন ঘটে, তন্মধ্যে 'বাংলার ঐক্য', 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'র সহিত জাতীয় শিক্ষার আদর্শও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার নানাবিধ কুফলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আবির্ভূত হয় জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের সঙ্গে এই শিক্ষা-আন্দোলনের সম্পর্ক নিবিড়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হইলে দেশের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্লাবন দেখা দেয়। বিলাতি পণ্য বয়কটের সংকল্প গৃহীত হইবার অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজ সরকার পরিচালিত ও বিজাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা বয়কটের প্রতিজ্ঞাও গৃহীত হয়। ইহার পর শুরু হয় ব্যাপক ছাত্র-দলন। ছাত্রদলনের প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনও ব্যাপক রূপ ধারণ করে। সরকারি স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কৃত ছাত্রদের গুরুতর শিক্ষাসমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে বাংলার জননায়কগণ স্থাপন করিলেন 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ' (মার্চ ১৯০৬ খ্রী) নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার অধীন 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল' (আগস্ট ১৯০৬ খ্রী)। উভয়েরই মূল কর্মকেন্দ্র হইল কলিকাতায়। রাসবিহারী ঘোষ মনোনীত হইলেন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি এবং বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল-এর প্রথম অধ্যক্ষ হইলেন অরবিন্দ ঘোষ। তৎকালে এদেশে এমন কোনও জননায়ক ছিলেন না যিনি কোনও না কোনও ভাবে এই শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পড়েন নাই। কিন্তু এই পরিষদ-স্থাপনে ও প্রাথমিক সংগঠনে ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের পরিচালনাধীনে যে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তাহার মূল কথা ছিল জাতীয় স্বার্থে এবং সম্পূর্ণভাবে জাতীয় কর্তৃত্বে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থাসাধন। এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ছিল যথার্থ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার সঙ্গে গভর্নমেন্টের কোনও সম্পর্ক ছিল না। সাংস্কৃতিক স্বরাজের কর্মকেন্দ্র হিসাবেই ইহার জন্ম। জাতীয় শিক্ষার দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইল কারিগরি

শিক্ষার সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। প্রাথমিক বিভাগ হইতে ম্যাট্রিকের সমান ক্লাস পর্যন্ত এই ব্যবস্থার জের চলিয়াছিল। এমন কি কলেজ বিভাগেও কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত। তৃতীয় বিশেষত্ব ছিল স্কুল বিভাগে ভাষা, সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাগুলির সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। চতুর্থ বিশেষত্ব ছিল কলেজ বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস দর্শন, সুকুমার-শিল্প ও সাহিত্যে শিক্ষাদান ও গবেষণার বন্দোবস্ত। পঞ্চম বিশেষত্ব হইল কলেজ বিভাগে পালি, হিন্দী ও মারাঠী এবং যুগপৎ স্কুল ও কলেজ বিভাগে সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী শেখানোর ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া উচ্চতর গবেষণার সুবিধার জন্য কলেজ বিভাগে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থাও ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে ছাত্রদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করানোর লক্ষ্য ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সপ্তম বিশেষত্ব। আর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হইল স্কুল বিভাগের নিম্নতম শ্রেণী হইতে কলেজ বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সব কিছু শিখাইবার জন্য বাংলা ভাষাকেই বাধ্যতামূলক ও সার্বজনিক বাহন হিসাবে গ্রহণ। ইংরেজী ছিল বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা। শিক্ষা-পরিষদের আর একটি লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব কম পরীক্ষাগ্রহণ ও যথাসম্ভব কম সময়ে নিম্নতম হইতে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত (এম. এ ক্লাসের সমান) শিক্ষাপ্রদান। মোটের উপর, ছাত্রদের সত্যকার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, তাহাদের মনে যথার্থ জ্ঞান স্পৃহার সঞ্চার এবং জাতীয় চেতনার পূর্ণ বিকাশই ছিল জাতীয় শিক্ষার গোড়ার কথা। বস্তুতঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত শিক্ষা-আন্দোলন তৎকালে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর সাধন করিয়াছিল। শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর টিলক ও পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় অবাঙালী নেতাদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দ্র হরিদাস মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত, বিনয় সরকারের বৈঠকে, কলিকাতা, ১৯৪২, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, কলিকাতা, ১৯৬১।

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ সমাজতন্ত্রবাদ ও ফ্যাসিবাদ দ্র

জাতীয়তাবাদ মূলতঃ এমন একটি অনুভূতি যাহাকে লয়েড বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কারণ ধর্মের মতই জাতীয়তাবাদ গভীর প্রেরণাপ্রসূত এবং ধর্মোন্মাদনায় যেরূপ মানুষ যুদ্ধ করে বা আত্মাহুতি দেয়, জাতীয়তাবাদও সেরূপ প্রেরণাদায়ক। জাতীয়তাবাদ বলিতে লাস্কি বুঝিয়াছেন এক বিশেষ ঐক্যানুভূতি, যে-অনুভূতির সম-অংশভাগী মানবগোষ্ঠী পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন। জাতীয়তাবোধ একযোগে মানবচিত্তে ঐক্যবন্ধন এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ আনে। ব্রাইসের মতে জাতীয়তা জাগ্রত হয় ভাষা, সাহিত্য ও আদর্শ গত ঐতিহ্যবন্ধনে গ্রথিত জনসমাজে এবং এই ঐক্যবন্ধন বর্তমান যুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল।

মধ্যযুগের পূর্বে জাতীয়তাবাদের মত সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব ছিল বলা যায় না। চতুর্দশ শতকেই এই চেতনার প্রথম সূচনা দেখা যায়। ম্যাকিয়াভেলীকে জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষকারী বলা যাইতে পারে—তাঁহার ইতালীকে একীভূত করিবার প্রচেষ্টায় ইটালীর জাতীয় জাগরণ ঘটে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডকেই প্রথম দেশ বলা যায় যেখানে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য ইংরেজ জাতির মধ্যে বিশেষ ঐক্যানুভূতির উন্মেষ হয়। অতঃপর ফ্রান্সের উপর ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসে জোয়ান অফ আর্কের কার্যকলাপের মধ্যে ফ্রান্সে জাতীয়তার অভ্যুদয় হয়। অষ্টাদশ শতকে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের বিভাজন পোলিশ জাতির জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে। পোল্যাণ্ডের বিভাজনের পর ফ্রান্সের বিপ্লব ও নাপোলেঅঁর (নেপোলিয়ন) অভ্যুত্থান এবং রাশিয়া, জার্মানী, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি ইওরোপের বিভিন্ন দেশে নেপোলেঅঁর রাজনৈতিক প্রভাববিস্তারের চেষ্টায় বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোধ জাগিয়া ওঠে এবং এই সময়ে কান্ট, হেগেল, শিলার, গ্যেটে প্রভৃতির রচনায় রোম্যান্টিক আন্দোলনের ফলে জাতীয়তার নব রূপায়ণ ঘটে। অতঃপর ভিয়েনা কংগ্রেসের অবিচার এই আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে জাতীয়ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলেও বর্তমান জাতীয়তাবাদের জনক বলা যাইতে পারে ইটালীয় স্বদেশ-প্রেমিক মাৎসিনিকে, তাঁহার মতে প্রত্যেক জাতির কোনও না কোনও বিষয়ে প্রতিভা আছে এবং জাতীয়তা-বাদের মধ্যে তিনি এই প্রতিভা বিকাশের সম্ভাবনা

দেখিযাছিলেন। মাৎসিনির সঙ্গে জার্মান দার্শনিক ফিখ্‌টের নাম করা যাইতে পারে— যিনি জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ও প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জাতীযতাবোধ বিভিন্ন সূত্রে গ্রথিত হইযা ওঠে। মানুষের সংঘ-প্রবণতার মধ্যেই এই ঐক্যানুভূতির প্রকৃত ভিত্তি। আরও বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে। ভৌগোলিক সান্নিধ্যকেও অনেকে ঐক্যবোধের কারণ বলিযা থাকেন। আবার ইহা ব্যতিরেকেও জাতীয়ভাব গড়িয়া ওঠে, প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ইহুদিদের মধ্যেও এই জাতীয়ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কুলগত ঐক্যও অন্যতম উপাদান, যদিও বর্তমান যুগে অবিমিশ্রতা আমরা কোনও জাতির মধ্যেই দেখি না। ধর্মগত ঐক্যও এই বোধকে অনেক ক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত করিতে সাহায্য করে। ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রেই আমরা তাহা দেখিতে পাই। এক ভাষা ও দেশাত্মবোধক সাহিত্য এই সমানুভূতি সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। লয়েড বলিযাছেন শেক্‌সপীযর, মিল্টন, ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থ-এর রচনা ব্যতীত ইংল্যাণ্ডবাসীর জাতীয়তাবোধ এত জাগ্রত হইত কিনা সন্দেহ। এক রাষ্ট্রীয় সংগঠনও অনেক সময়ে জাতিগঠনে সহায়তা করে। কিন্তু অতীতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদানরূপে কার্যকর, অতীতের গৌরবগাথা, পররাষ্ট্রের নিপীড়ন, শহীদের আত্মবলিদানের স্মৃতি প্রভৃতি এই বোধকে জাগাইয়া তুলিতে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করে। এইরূপে জাতীয়তাবোধ বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের পরিণতি।

বর্তমান কালে জাতীয়তাবোধ ভাল এবং মন্দ উভয়ত: সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তি। রাজনৈতিক অগ্রসরতা জাতীয়ভাবের দ্বারা গতিশীল হইয়া ওঠে। বিভিন্ন জাতি নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটাইবার প্রচেষ্টার দ্বারা বিশ্বসভ্যতার সম্প্রসারণ ঘটায়। বার্ন্‌স বলিয়াছেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থের এবং চারিত্রিক বৈচিত্র্য এবং সমতায় সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। তাহা ছাড়া এই চেতনা দেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব আনে। এই জাতীয়তাবোধ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইওরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে প্রেরণা দিয়াছে। এইরূপ জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার বা মানবতাবোধের কোনও বাস্তব বিরোধ নাই। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু জাতীয়তাবাদ আজ এক সংকীর্ণ ও বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে যাহা আন্তর্জাতিকতাবিরোধী ও সভ্যতাধ্বংসকারী। বিকৃত জাতীযতাবাদের পরিণতি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ, যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ ও সংঘাত। জাতীয়তাবাদ পবিত্রতার ছদ্মবেশে জাতির অহংবোধকে প্রশ্রয় দেয় এবং শান্তির পথকে সমস্যাসংকুল করিয়া তোলে। ম্যাকিয়াভেলী জাতীযতাবাদের নামে যে 'রাষ্ট্রীয় নীতি' প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্তিগত নীতিবোধ হইতে রাষ্ট্রীয় নীতিবোধকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, জাতির স্বার্থরক্ষার্থে উহা যে কোনও নীচতার সমর্থক, জাতীয় স্বার্থে যুদ্ধকে প্রশ্রয় দিয়া উহা মানবতার অকল্যাণ ডাকিয়া আনে। সেইজন্য লাস্কি বলিযাছেন 'হয় আমরা আন্তর্জাতিকভাবে চিন্তা করিতে শিখিব নহিলে ধ্বংস হইযা যাইব, ইহা ছাড়া কোনও পথ নাই।' সুতরাং আমরা দেখি প্রকৃত জাতীয়তাবাদ যেরূপ মানবকল্যাণপ্রসূ ইহার বিকৃতি সেইরূপই মানবতা ও সভ্যতার ধ্বংসের কারণ।

দ্র C Lloyd, *Democracy and Its Rivals*, Bombay, 1943, C D Burns, *Political Ideals*, London, 1949, Harold J Laski, *A Grammar of Politics*, London, 1957

বাণী মুখোপাধ্যায়

জাদুঘর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম দ্র

জাপানী ভাষা লুচু দ্বীপপুঞ্জ (জনসংখ্যা ৯ কোটি) ও জাপান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা সব সময়েই জাপানী ভাষা ব্যবহার করে। হোক্কাইডো দ্বীপের বাসিন্দা আইনু জাতি এবং আমেরিকা, ব্রাজিল ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে (জনসংখ্যা ৮ লক্ষ) যে সব জাপানী স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং প্রাচীনপন্থী প্রায় সমগ্র কোরিয়া-বাসী (জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি), ইহারা সকলেই জাপানী ভাষা বেশ ভালভাবেই বুঝিতে পারে।

পৃথিবীর প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে জাপানী ভাষার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। জাপানী ভাষা ও আল্‌তাই ভাষাগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও এগুলিকে সমগোত্রীয় বলা যায় না। চীনা অক্ষর, শব্দ ও অভিধান জাপানী ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কোরিয় ও আইনু ভাষার শব্দ, চীনা ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে গৃহীত সংস্কৃত শব্দ জাপানী ভাষার শব্দভাণ্ডারকে অনেকখানি পুষ্ট করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে জাপানী ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ বিদেশী শব্দই বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত।

সামাজিক স্তর অনুসারে শব্দব্যবহারের বৈষম্য জাপানী ভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ— অর্থাৎ একই ভাব যে বলিতেছে এবং যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে— তাহার সামাজিক পদমর্যাদা, বয়স, বৃত্তি ও সে পুরুষ না স্ত্রীলোক ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়— (যেমন একই শব্দ সম্মানসূচক, সাধারণ ও বিনীতভাবে ব্যক্ত হইতে পারে— স্ত্রী-পুরুষের ভেদও এইভাবে স্বীকৃত হয়)। জাপানে বহু উপভাষা প্রচলিত, কিন্তু টোকিওর ভাষা জাপানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বিদ্যালয়ে, অফিসে ও বেতারে ব্যবহৃত হয়। জাপানের সকল অধিবাসীই টোকিওর ভাষা সম্পর্কে অবহিত।

জাপানী ভাষায় ধ্বনি-পারম্পর্য হিসাবে ১০২ প্রকারের শব্দাংশ আছে। তাহা আট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: CV, CVV, CVN, CVQ, CSV, CSVV, CSVN, CSVQ (C- ব্যঞ্জন বর্ণ, V—স্বর বর্ণ, S--অর্ধস্বর, N--অনুস্বার, Q বিসর্গ)। জাপানী ভাষার স্বর অনুসারে কখনও কখনও শব্দার্থ নির্ভর করে। যেমন কামি (Kámi - উঁচু-নিচু) অর্থ—'ঈশ্বর', কামি (Kami—সম) অর্থ—'কাগজ', কামি (Kamí—নিচু উঁচু) অর্থ- 'চুল', কুমো (Kûmo) অর্থ—'মেঘ', কুমো (Kumó) অর্থ -'মাকড়সা', ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় একমাত্র সর্বনাম ব্যবহারের রীতি ছাড়া অন্যত্র বাংলা ও জাপানী ভাষার বাক্যরচনার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

উদ্দেশ্য +বিধেয় (বা সম্পূরক) +ক্রিয়া (বা সহকারী ক্রিয়া) প্রভৃতি সকল শব্দকেই ব্যাকরণের দিক দিয়া স্বতন্ত্র ও স্বতন্ত্র-সাপেক্ষ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। স্বতন্ত্র সাপেক্ষ শব্দসকল একমাত্র স্বতন্ত্র শব্দগুলির সহিত একযোগে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন গ (ga) কর্তৃকারক (nominative), ব (wa) উদ্দেশ্যমূলক (subjective), ও (o) কর্মকারক (accusative), দে (de) করণ (instrumental), ই (e) সম্প্রদান (dative), কর (kara) অপাদান (ablative), নো (no) সম্বন্ধ (genitive), নি (ni) অধিকরণ (locative) ইত্যাদি।

জাপানী ভাষায় তিন প্রকার হরফ ব্যবহৃত হয়: ১. প্রাচীন চীনা হরফ (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহা অনেক সরল করা হইয়াছে) ২. হিরগন (Hiragana, ১০৮টি বর্ণ) ৩. কটকন (Katakana, ১০৮টি বর্ণ)। প্রথমটি নাম-বর্ণহীন প্রতীক-চিহ্ন (ideograph), শেষোক্ত দুইটি অর্ধ-উচ্চারিত ধ্বন্যাত্মক বর্ণ, এইগুলি চীনা হরফ হইতে গৃহীত হইয়াছে। একমাত্র বিদেশী শব্দ লিখিবার সময় শেষোক্ত দুইটি ব্যবহৃত হয়।

শ্রেয়সী নাবা

জাফরান মশলা দ্র

জাবালি জবালা দ্র

জাভা যবদ্বীপ দ্র

জাম জাম বলিতে সাধারণতঃ কালোজামকেই বুঝায়। কালোজাম জাম-গোত্রের (ফ্যামিলি-মিৰ্টাসিঈ, Family-Myrtaceae) অন্তর্ভুক্ত বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ইউজিনিয়া জাম্‌বোলানা *(Eugenia jambolana)*। ইহা বঙ্গ দেশে প্রায় সর্বত্র জন্মে। গাছগুলি প্রায় ৯-১২ মিটার উচ্চ, শাখা-প্রশাখা ঘন পত্রে আচ্ছাদিত এবং ভিতরের কাঠের রঙ লাল। মে জুন মাসে গুচ্ছাকারে শ্বেত বর্ণ ফুল ধরে। ফল সাধারণতঃ ১-৩ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হয়। সুপক্ব ফলগুলি কৃষ্ণ বর্ণ।

ইহা ছাড়া পার্বত্য ও সমুদ্র-সন্নিহিত অঞ্চলে উৎপন্ন বৃহদাকৃতি রাজজম্বু, নদীতীরে উৎপন্ন ক্ষুদ্রাকৃতি বনজাম, ক্ষুদ্র মটরাকৃতি কুকুরজাম প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

জাম-গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গোলাপজাম কালোজামের সহিত একই গণের (জেনাস) অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানসম্মত নাম ইউজিনিয়া জাম্বোস *(Eugenia jambos)*। ইহা বঙ্গ দেশে সর্বত্র উৎপন্ন হয়। ইহার পাতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ। শীতকালে সবুজাভ শ্বেত বর্ণ ফুল হয় এবং গ্রীষ্মশেষে ফল পাকে। ফল সবুজাভ পীত বর্ণ, গোলাপের মত সুবাসযুক্ত ও সুমিষ্ট।

জামনগর বা নবনগর গুজরাত রাজ্যের একটি জেলা ও জেলা সদর, জেলার আয়তন ৯৮৮০ বর্গ কিলোমিটার (৩৯৪৪ বর্গ মাইল)। জেলাটি ২১°৪৭′ হইতে ২২°৫৭′ উত্তর এবং ৬৮°৫৭′ হইতে ৭০°৩৭′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। লোকসংখ্যা ৮২৮৪১৯ (১৯৬১ খ্রী), তন্মধ্যে পুরুষ ৪২৪৩০০ ও নারী ৪০৪১১৯। লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৩ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২০৬)। শিক্ষিতের হার শতকরা ২৬·৬। জামনগরের তটভাগের গড় উচ্চতা ৭৫ মিটারের নিম্নে এবং অভ্যন্তর ভাগের গড় উচ্চতা ৩০০ মিটারের মধ্যে। বর্দা পাহাড়ের

দুই-তৃতীয়াংশ এই জেলায় বিস্তৃত। মাউণ্ট ভেন্তর (বদার সর্বোচ্চ স্থান) উচ্চতা ৬১৭ মিটার (২০৫৭ ফুট)। অজি, ভাগেরী, ভেন্তু, উন্দ্, ফুলজুর, ভারতু প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নদী। নদীগুলিতে সারা বৎসর জল থাকে না। অধিকাংশ অঞ্চলে লাল দো-আঁশ মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র পশ্চিমে স্থানে স্থানে ল্যাটেরাইট এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে কৃষ্ণ মৃত্তিকা অবস্থিত।

এই জেলার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০০ হইতে ৭৫০ মিলিমিটার (২০ হইতে ৩০ ইঞ্চি)। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তর-পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত কম। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগ জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসেই বর্ষিত হয়। জানুয়ারি এবং জুলাই মাসের গড় উষ্ণতা যথাক্রমে ২০° ও ২৯° সেন্টিগ্রেড।

একেবারে দক্ষিণ অংশে শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষ এই জেলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য বনজ সম্পদ। কৃষি-দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, বাগী, ভুট্টা, যব, তৈলবীজ, বাদাম, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ধান এবং গম অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হয়। মোট ৫৬১৪৮০ হেক্টর (১৪০৩৭০০ একর) জমিতে চাষ হয়। ২৭৬০০ হেক্টর (৬৯০০০ একর) অর্থাৎ কৃষিভূমির শতকরা মাত্র ৪·৯৮ ভাগে জলসেচনের সুবিধা আছে।

কচ্ছ উপসাগর মৎস্য চারণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সোদিয়া, সাচানা, বেদী, শারমাদ, শালয়া, শিক্কা, ওখা প্রভৃতি স্থান জামনগরের প্রধান মৎস্যকেন্দ্র। উত্তর তট-ভাগে নবলাখী হইতে ওখা পর্যন্ত অঞ্চলের সন্নিকটে বেয়াল্লিশটি প্রবালক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা-ঝিনুক পাওয়া যায়। খনিজ সম্পদের মধ্যে চুনা পাথর, জিপসাম, ক্যালসাইট্, বক্সাইট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভীরপুর, রান, গার্গেট, করুঙ্গা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জিপসাম সঞ্চিত আছে। জেলার অধিকাংশ শিল্প জামনগর শহর ও ইহার উপকণ্ঠে কেন্দ্রীভূত। সিমেন্ট-শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে দ্বারকা ও শিক্কা এবং রাসায়নিক শিল্পে মিঠাপুরই প্রধান। ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে সূচীশিল্প, জরী-এমব্রয়ডারি, বস্ত্র-রঞ্জন, বন্ধনী, ডাই, সাবান ও সুগন্ধী দ্রব্য, বোতাম প্রভৃতি প্রধান।

সম্প্রতি জেলার যোগাযোগ-ব্যবস্থার খুবই উন্নতি হইয়াছে। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৩৭৬ কিলোমিটার। জেলার রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৮৭ কিলোমিটার এবং স্টেশনের সংখ্যা ৪৭। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স্ কর্পোরেশনের বিমান জামনগর হইয়া বোম্বে হইতে ভুজ পর্যন্ত প্রত্যহই যাতায়াত করে। ওখা, শিক্কা, বেদী, দ্বারকা প্রভৃতি এই জেলার প্রধান বন্দর।

জামনগরের জাম বা শাসক ছিলেন জাদেজা শাখার রাজপুত। তাঁহারা প্রথমতঃ সিন্ধু দেশের নগরতট অঞ্চলে ছিলেন, পরে কচ্ছে চলিয়া আসেন। জাম রাবল গুজরাতের জেঠওয়ালদের পরাজিত করিয়া ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে জামনগরের প্রতিষ্ঠা করেন। মোগলরা জামনগর অধিকার করিলেও এক বৎসর পরে আবার জামকে কয়েকটি শর্তাধীনে ইহা প্রত্যর্পণ করে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-বাহিনী দ্বারা জামনগর আক্রান্ত হয় এবং তদানীন্তন জাম ইংরেজদের সহিত এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন।

ব্রিটিশ ভারতে জামনগর কাঠিয়াওয়াড় এজেন্সিতে একটি প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য হিসাবে গণ্য ছিল। ইহা হালার ডিভিসনের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভের পর কাঠিয়াওয়াড়ের সমস্ত দেশীয় রাজ্যকে একত্রীভূত করা হয়। সম্মিলিত দেশীয় রাজ্যের নাম হয় ইউনাইটেড স্টেট্স অব সৌরাষ্ট্র এবং ইহা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের পার্ট বি স্টেট্স এর অন্তর্গত হয়। জামনগরের শাসক ইহার রাজপ্রমুখ মনোনীত হন। পরে ঐ সম্মিলিত রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে এবং ইহা বোম্বাই রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া যায়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয় এবং গুজরাত একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। তখন জামনগর জেলা হিসাবে ঐ রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়।

জাম রঞ্জিৎ সিংজী (১৮৭২-১৯৩৩ খ্রী) ছিলেন অদ্বিতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়। 'রনজি ট্রফি' ভারতের জাতীয় ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা তাঁহারই নামানুসারে হইয়াছে। প্রিন্স দলীপ সিংজী, বিনু মানকড়, অমর সিং প্রভৃতি বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা জামনগরেরই সন্তান।

প্রধান শহর জামনগরের অবস্থান ২২°৯' উত্তর এবং ৭০°৭' পূর্ব। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগননা অনুযায়ী মোট লোকসংখ্যা ১৪৮৫৭২ জন। জামনগর শহরে ভারতীয় নৌ-বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর কেন্দ্র আছে। স্বাধীনতার পর জামনগর দ্রুত একটি শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে জামনগর পশম, রাসায়নিক দ্রব্য, তৈল, লবণ, ছুরি, কাঁচি, তালা, ট্রাঙ্ক, সাবান, বাদ্যযন্ত্র, বোতাম, পাথর খোদাই, জরী, বন্ধনী, বস্ত্র রঞ্জন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কেন্দ্রস্থল।

জামনগর একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতীয় দেশরক্ষা-বাহিনীর তিনটি শাখার শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত জামনগরে বিভিন্ন বিভাগের কলেজ রহিয়াছে; যেমন কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, আইন, আয়ুর্বেদীয়, মেডিক্যাল

কলেজ প্রভৃতি। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গান্ধী-উদ্যোগ-মন্দিরে কৃষি, হাতে তৈয়ারি কাগজ, ছাপা, দর্জির কাজ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। জামনগরের একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হইল ইহার সৌর চিকিৎসাগৃহ (Solarium)। এই গৃহটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে ইহাই একমাত্র সৌর-চিকিৎসাগৃহ।

জামনগরের অপর নাম ছোট কাশী। কারণ সেখানে অনেক বিখ্যাত মন্দির আছে। নাগনাথ-মন্দিরে জন্মাষ্টমী তিথিতে বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জামনগরে অনেক সুরম্য মসজিদও বর্তমান। জামনগরের অপর দ্রষ্টব্য হইল —সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপত্য, জামসাহেবের প্রাসাদের মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময়ে অঙ্কিত চিত্র-গ্যালারি, লাখোটা প্রাসাদের জাদুঘর, সরকারি অতিথি-শালা, লালবাগ, ক্রিমেটোরিয়ামের উদ্যান ও গ্রন্থাগার, টাউন হল ইত্যাদি।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India, Provincial Series*, Oxford, 1908; National Council of Applied Economic Research, *Techno-Economic Survey of Gujarat*, New Delhi, 1963; *District Census Handbook, Jamnagar*, Ahmedabad, 1964.

নীহারেন্দু রায়

জামরুল জাম গোত্রের (ফ্যামিলি-মির্টাসিঈ, Myrtaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ইউজিনিয়া জাভানিকা (*Eugenia javanica*)। আদি জন্মস্থান মালয়। বঙ্গদেশের প্রায় সবত্রই এই গাছ দেখা যায়, তবে পার্বত্য অঞ্চলে ভাল হয় না। বর্ষায় বীজ বা গুটিকলম হইতে গাছ জন্মানো যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় রসাল, স্বল্প মিষ্ট এবং সুগন্ধি ফল হয়। শাদা ও লাল দুই জাতের জামরুল দেখা যায়।

শচীন্দ্রমোহন সেন

জামসেদপুর ২২°৪৯´ উত্তর ও ৮৬°১১´ পূর্ব। বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলার ধলভূম পরগনার একটি প্রসিদ্ধ শিল্পনগরী। ইহা খড়কাই ও সুবর্ণরেখা নদীর সংগমস্থলে অবস্থিত। ইহার বর্তমান আয়তন ৭৯ বর্গ কিলোমিটার (৩১ বর্গ মাইল)। ইহা ধলভূম পরগনার উত্তর পশ্চিমাংশে খুন্তাডি, সাকচি, মহুলবেড়া, সুসনিগাড়িয়া এবং জুগসলাই গ্রাম লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরে সুবর্ণরেখা, পশ্চিমে খড়কাই, দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, পূর্বে বিভিন্ন গ্রামের সীমানা। জামসেদপুর দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-খড়্গপুর শাখায় কলিকাতা হইতে ২৫০ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত।

জামসেদপুরের জলবায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ। বার্ষিক সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ ৩২° সেন্টিগ্রেড (৯০° ফারেনহাইট), বার্ষিক সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ ৩১° সেন্টিগ্রেড (৮৮° ফারেনহাইট), বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩৭০ মিলিমিটার (৫৪ ইঞ্চি)।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইহা সাকচি নামে একটি গণ্ডগ্রামমাত্র ছিল। বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু গোরুমহিষানীতে লৌহ আকরিকের সন্ধান দেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত শিল্পপতি জামসেদজী টাটার মৃত্যু হইলে তাঁহার নির্দেশে দোরাবজী টাটা গোরুমহিষানী খনি হইতে ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল) উত্তর-পূর্বে সিনিতে কারখানা স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করেন। এখানে স্থানের অভাব ও জলের সমস্যা থাকায় কালিমাটি স্টেশন (বর্তমান টাটানগর) হইতে ৪ কিলোমিটার (২½ মাইল) দূরে বর্তমানের সাকচিতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইস্পাত-কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি জামসেদপুরের পত্তন শুরু হয়। ১৯০৬ ও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নগরীর উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাস ঘটে। বর্তমানে নগরীতে (১৯৬১ খ্রী) ৩০০৫১৬ জনের মধ্যে ১৬৯৮৬৫ পুরুষ ও ১৩০৬৫১ স্ত্রীলোক। প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে জামসেদপুর কো-অপারেটিভ কলেজ, জামসেদপুর উইমেন্‌স কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। শহরে শিক্ষিতের হার শতকরা ৭৭। ইহা ছাড়াও এখানে প্রায় ১১টি বিদ্যালয় আছে। চিকিৎসার জন্যও হাসপাতাল ও অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যক্ষ্মা-রোগীদের স্বাস্থ্যাবাসটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

নগরে ২৪০ কিলোমিটার (১৫০ মাইল) পাকা রাস্তা আছে। বিহার সরকারের বাস শহরের মধ্যে ও শহরের বাহিরে জামসেদপুর হইতে ওড়িশার বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করে। এখানে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১টি বিমানক্ষেত্র নির্মিত হইয়াছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্পাতকারখানার নির্মাণকার্য ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের ইস্পাত আনয়নে অসুবিধা হইলে টাটার কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই সময় কালিমাটি স্টেশন ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলের নাম টাটানগর এবং সাকচি গ্রাম ঘিরিয়া শিল্পকেন্দ্রটির নাম জামসেদপুর হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পুনরায় কারখানার সম্প্রসারণ

ঘটে। কারখানার আকরিক লৌহ ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দূরে গোরুমহিষানী, সালাইপাট, বাদামপাহাড ও নোয়ামুণ্ডির লৌহখনি হইতে আনা হয়। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুনা পাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি আনিবার সুবিধা থাকায় কারখানার দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে।

সুবর্ণরেখা ও খড়কাই নদীতে বাঁধ দিয়া ডিমনা হ্রদ হইতে কারখানায় ব্যবহারযোগ্য এবং পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। জামসেদপুরে প্রায় ৪১০০০ শ্রমিক কাজ করে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢালাই লৌহ ১৯৩৬১৭০ মেট্রিক টন (১৯১৭০০০ টন) ও ইস্পাত ১৫৮৩৬৮০ মেট্রিক টন (১৫৬৮০০০ টন) উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ২২০০০০০ মেট্রিক টন (২০০০০০০ টন) ইস্পাতের উৎপাদন ধার্য আছে। কারখানায় টিন প্লেট, করোগেটেড সিট, রড, রেলের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা, টাটা মার্সেডিজ ট্রাক তৈয়ারির কারখানা, ইণ্ডিয়ান হিউম পাইপ, টিন প্লেট কোম্পানি, ইণ্ডিয়ান ওয়ার প্রোডাকশন কোম্পানি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেশিন তৈয়ারির কারখানা, ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন ও অ্যাসেটিলিন, ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল্ ও তারের নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

এখানকার বহু দর্শনীয় স্থানের মধ্যে, জামসেদজীর মর্মরমূর্তি, গোলাপবাগ, মোগল গার্ডেন প্রভৃতি-সহ জুবিলী পার্ক এবং ডিমনা লেক উল্লেখযোগ্য।

দ্র P. C Roychaudhury, *Bihar District Gazetteer : Singbhoom*, Patna, 1958, S D Prasad, *Census of India : Bihar 1961*, vol IV, part IIA, Patna, 1963.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জামাইষষ্ঠী অরণ্যষষ্ঠী দ্র

জামি মসজিদ স্থাপত্য দ্র

জামোরিন পর্তুগীজ, ভারতে দ্র

জাম্ববতী জাম্ববান্ দ্র

জাম্ববান্ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ব্রহ্মার পুত্র। ইনি বানর-রাজ সুগ্রীবের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। সীতা-উদ্ধারের জন্য তিনি দশ কোটি সৈন্যের সহিত রামচন্দ্রের সহায় হন (রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৩৯।২৬, বঙ্গবাসী সং)। প্রসেনজিৎকে বধ করিয়া এক সিংহ সত্রাজিতের মহামূল্য স্যমন্তক মণি গ্রহণ করে। জাম্ববান্ সিংহকে বধ করিয়া মণি উদ্ধার করেন। কৃষ্ণ আবার জাম্ববানকে পরাস্ত করিয়া সেই মণি ও জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে লাভ করেন (হরিবংশ, ৩৮।৪১)।

সীতানাথ গোস্বামী

জায়গির জায়গির প্রথা মধ্যকালীন ভারতের একটি বিশিষ্ট ভূমি পুরস্কার ব্যবস্থা। তুর্ক-আফগান যুগে অমরাহ্‌, রাজকর্মচারী, বিত্তশালী, বিদ্বান ও ধর্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ সরকারের নিকট হইতে জমি পুরস্কারস্বরূপ পাইতেন। আলাউদ্দিন খিলজী অধিকাংশ দত্ত জমিই পুনরায় গ্রহণ করেন। জায়গির প্রথার বিকাশ হইয়াছিল মোগল যুগেই। তখন নগদ বেতন প্রচলিত থাকিলেও জায়গির প্রদান দ্বারা বেতন দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। জায়গির শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ 'জা' -স্থান, 'গির' গ্রহণ।

এইরূপ ব্যবস্থায় উভয় পক্ষেরই সুবিধা হইত। সরকার দূর দেশের রাজস্ব-আদায়ের ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তিলাভ করিতেন। জায়গিরদারগণও ঐ জমি হইতে লাভবান হইতেন ও সরকারের মর্জি অনুসারে নগদ বেতনের উপর তাঁহাদের অসহায়ভাবে নির্ভর করিতে হইত না।

আকবরের পূর্বে সম্রাটগণ জায়গির প্রথার বিরোধিতা করেন। কেননা ইহাতে খালসা জমি হ্রাস পাইত ও ইহা ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। উপরন্তু জায়গিরদার আমীরগণ অত্যধিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভ করিতেন। প্রত্যেক জায়গিরদার নিজ নিজ ক্ষেত্রে ছোটখাটো রাজার ন্যায় আচরণ করিতেন। জায়গির সাম্রাজ্যের মধ্যে সাম্রাজ্য (ইম্পেরিউম ইন ইম্পেরিও) তে পরিণত হইত। সুতরাং আকবর জায়গিরকে খালসায় পরিণত করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা করেন। অর্থাৎ যেখানেই সম্ভব, তিনি মনসব-দারদের নগদ বেতন দিতেন, জায়গির দিতেন না।

কিন্তু আকবরও এই প্রথার উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। বলা যাইতে পারে যে, ইহা মোগল রাজত্বের সমৃদ্ধির যুগেও প্রচলিত ছিল। আকবরের পরে ইহা উত্তরোত্তর আরও শক্তিশালী হইয়া ওঠে। ঔরঙ্গজেবের ১৪৪৪৯ মনসবদারের মধ্যে প্রায় ৭০০০ জায়গিরদার ও ৭৪৫০ নগদী ছিলেন।

জায়গির-প্রথার আর একটি কুফল পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জায়গিরদের প্রতিনিধিগণ বা একই জায়গিরদারের আনুক্রমিক প্রতিনিধিগণ কৃষকদের সম্পত্তি লুটপাট করিত।

যদুনাথ সরকারের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, [বাস্তব প্রশাসনের ক্ষেত্রে] মোগল জায়গিরের অপেক্ষা কৃষকদের পক্ষে অধিকতর অহিতকর (ও অন্তিমে রাষ্ট্রের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর) ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না।

দ্র W. Irvine, *Army of the Indian Moghuls*, London, 1903 ; V. A. Smith, *Akbar the Great Mogul*, Oxford, 1919 ; H Blochman, *Ain-i-Akbari*, vol 1, Calcutta, 1939.

জগদীশনারায়ণ সরকার

জায়ফল মসলা দ্র

জারমেনিয়াম ট্রানজিস্টর দ্র

জারি বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রচলিত লোকনৃত্য ও সংগীত। জারি নৃত্যের সঙ্গে জারি গান গীত হয়। কারবালা প্রান্তরের যুদ্ধ সম্পর্কিত গান ইহার বিষয়বস্তু। ইহার সুর করুণ, মাঝে মাঝে সংলাপ থাকে। অঞ্চলপ্রান্ত ধরিয়া কখনও বা রুমাল হাতে লইয়া মণ্ডলাকারে নাচ চলে। পায়ে নূপুর বাঁধিয়া তালে তালে পদক্ষেপ করা হয়। মূল গায়েন হাতে চামর লইয়া গানের প্রথম কলি গাহিয়া থাকেন, তাহার পর সকলে সমবেত কণ্ঠে উহার পুনরাবৃত্তি করেন।

দ্র মণি বর্ধন, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, কলিকাতা, ১৯৬১।

মণি বর্ধন

জারুল দাড়িম্ব-গোত্রের (ফ্যামিলি লিথরাসিঈ, Lythraceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম লাগেরস্ট্রোমিয়া ফ্লোস-রেজিনী (*Lagerstroemia flos-Reginae*)। জারুল উত্তর বঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স, আসাম, মহারাষ্ট্র, কেরল এবং সামান্য কিছু ছোটনাগপুরের বনাঞ্চল, নদীতীর ও জলাভূমিতে জন্মায়। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫-২০ মিটার, পত্র সরল, পত্রবিন্যাস দ্বিসারী ও অভিমুখী। এপ্রিল-জুন মাসে অসংখ্য সুন্দর বেগুনি ফুল ফোটে, ফল উভলিঙ্গ। ছায়া এবং ফুলের সৌন্দর্যের জন্য রাজপথের পাশে জারুল গাছ লাগানো হয়। ইহার কাণ্ড দীর্ঘ ও স্থূল। জারুল কাঠ গৃহের খুঁটি, নৌকা, গোযানের বিভিন্ন অংশ, রেলপথের স্লিপার প্রভৃতির নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

অন্য এক প্রজাতির জারুল (লাগেরস্ট্রোমিয়া ইন্ডিকা) দৈর্ঘ্যে ও আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র, ইহা উদ্যানশোভার জন্য লাগানো হয়। ইহার ফুলের রঙ শাদা, ফিকে লাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫১।

অভিজিৎনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জার্মপ্লাজ্‌ম জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আউগুস্ত ভাইজ্‌মান (১৮৩৪-১৯১৪ খ্রী) জার্মপ্লাজ্‌ম মতবাদের প্রবর্তক। তাঁহার মতে দুইটি স্বতন্ত্র ধারা জীবজগতে বর্তমান, দেহজ ধারা বা সোম্যাটোপ্লাজ্‌ম ও বীজধারা বা জার্মপ্লাজ্‌ম। সোম্যাটোপ্লাজ্‌ম দেহকোষের যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে, ইহা ক্ষণস্থায়ী ও দেহের অবসানে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। জার্মপ্লাজ্‌ম শাশ্বত, ইহা দেহ হইতে দেহান্তরে বহিয়া চলে। সোম্যাটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে জার্মপ্লাজ্‌ম নিহিত থাকে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু এই জার্মপ্লাজ্‌মের ধারক। ইহাদের মিলনে যে নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হয়, তাহার দেহে এই জার্মপ্লাজ্‌ম হইতে নূতন সোম্যাটোপ্লাজ্‌ম উৎপন্ন হয়। সোম্যাটোপ্লাজ্‌মের কোনও পরিবর্তন উত্তর পুরুষে পরিব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু জার্মপ্লাজ্‌মে কোনও পরিবর্তন ঘটিলে তাহা উত্তর পুরুষের দেহে প্রকাশ পায়।

ভাইজ্‌মান জার্মপ্লাজ্‌ম বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তদুপরি সুপ্রজননবিদ্যার (জেনেটিক্‌স) অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারের মূলে ক্রোমসোম ও ডি. এন. এ. র গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হইবার পর বর্তমানে বিজ্ঞানজগতে ভাইজ্‌মানের জার্মপ্লাজ্‌ম মতবাদের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। 'কোষ[২]' ও 'ক্রোমসোম' দ্র।

শিবশংকর মুখোপাধ্যায়

জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠী দ্র

জালন্ধর, জলন্ধর ৩০°৫৬′ হইতে ৩১°৩৭′ উত্তর ও ৭৫°৫′ হইতে ৭৬°১৮′ পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যের একটি বিভাগ, জেলা ও প্রসিদ্ধ শহর। সম্রাট কনিষ্কের পৌরোহিত্যে খ্রীষ্টযুগের সূচনায় যেখানে যে বৌদ্ধ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় তাহার বিবরণে জালন্ধরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। জেলার আয়তন ৩৪৭৬ বর্গ কিলোমিটার (১৩৩৫ বর্গ মাইল)। ইহা জালন্ধর, নাকোদর, ফিল্লৌর এবং নবাশহর নামক চারিটি তহসিলে বিভক্ত। জেলার দক্ষিণে লুধিয়ানা

জেলা, পূর্বে এবং উত্তরে হোশিয়ারপুর জেলা এবং পশ্চিমে কর্পূরতলা জেলা অবস্থিত।

জালন্ধর জেলা বিপাশা এবং শতদ্রু নদীর অববাহিকার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। জেলার উত্তরাংশে হিমালয়ের পাদদেশে মালভূমি, ইহার পূর্ব কোণে সর্বোচ্চ স্থান রাহোন সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০৪ মিটার (১০১২ ফুট) উচ্চে অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে জমির ঢাল ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে বিপাশা নদীর অভিমুখে নামিয়া আসিয়াছে। শতদ্রু এই জেলার প্রধান নদী। বর্ষার সময়ে প্লাবন হয়। নদীগর্ভ পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে প্রায় ৭.৬২ মিটার (২৫ ফুট) নীচে অবস্থিত। শীতকালে নদী প্রায় শুষ্ক থাকে এবং সহজেই পারাপার হওয়া যায়। শতদ্রুর উপনদীর মধ্যে পূর্ব বেনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা রাহোনের পূর্ব দিক হইতে উত্থিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বিপাশা সংগমের নিকটে শতদ্রুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। জেলার অধিকাংশ অঞ্চল এই নদী দ্বারা বিধৌত, বর্ষায় বন্যা হয় ও অন্য সময় শুষ্ক থাকে।

জালন্ধর জেলার প্রায় ৫৪ উর্বর পলিমাটি এবং ২৪ % বালিমাটির দ্বারা আবৃত। সামান্য অংশ বালুকাবৃত হওয়ায় কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযোগী। মৃত্তিকা উর্বর, কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণের।

সমভূমি অঞ্চলে জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। জানুয়ারি ও জুন মাসের গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ১৩° সেন্টিগ্রেড (৫৬° ফারেনহাইট) ও ৩৪° সেন্টিগ্রেড (৯৩° ফারেনহাইট)। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত গড়ে প্রায় ৭৮৭ মিলিমিটার (৩১ ইঞ্চি)। গ্রীষ্মে বৃষ্টি অধিক হয় এবং পার্বত্য অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় বর্ষণ স্থায়ী হয়। মে মাসে মাঝে মাঝে ধূলি ঝঞ্ঝা হয়।

এই জেলায় কৃষিকার্যই প্রধান। সেচ ব্যবস্থার সহায়তায় এই অঞ্চলকে পাঞ্জাব রাজ্যের প্রধান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। কূপ, নদী, খাল, পুষ্করিণী ইত্যাদি দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা আছে। শতদ্রু, বেন প্রভৃতি নদী হইতে খাল কাটিয়া সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশুচারণের উপযোগী ক্ষেত্র কেবলমাত্র শতদ্রু নদীর তীরে এবং বেন নদীর নিকটে দেখা যায় এবং ঐ স্থানে গবাদি পশু, অশ্বতর, মেষ, ছাগল ও উট পালন করা হয়। প্রধান শস্যাদির মধ্যে গম, ছোলা, যব, ভুট্টা, ডাল, ইক্ষু, কার্পাস, ধান, তামাক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষিজ মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম ৩৫.৯%, ছোলা ১২.৭% ও ভুট্টা ১১.৭% উৎপন্ন হয়।

এই অঞ্চলে বৃহৎ শিল্প নাই। অধিকাংশ শিল্পই স্থানীয় কাঁচা মালের এবং কৃষিজ দ্রব্যের উপরে নির্ভর করে। কার্পাস ও পশমের বস্ত্র বয়ন, রেশম বস্ত্র, সোনা রুপার কাজ, কাঠের কাজ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, বাসন ও ধাতুর কাজ, টালি নির্মাণ, খেলনা, চামড়ার কাজ, মৃৎপাত্র নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বত্রই সহজসাধ্য। উত্তর রেলপথের বিভিন্ন শাখা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং আরও কয়েকটি প্রধান রাস্তা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুসারে জেলার অধিবাসীর সংখ্যা ১২২৭৬৬১, তন্মধ্যে পুরুষ ৬৫৫৮৯৩ এবং নারী ৫৭১৮৭৪। শহরের সংখ্যা ১১, গ্রামের সংখ্যা ১১৮৪। মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৪১৩০১০। প্রধান ভাষা পাঞ্জাবী। অধিবাসীদের মধ্যে জাট, রাজপুত, খোখর, আরান, সৈনি, কাম্বো, গুজর, ক্ষত্রী, বনিয়া, চামার ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যে নাকোদারের সমাধি এবং নুরমহলে নুরজাহানের সরাইখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবরাত্রি, হোলি, বৈশাখী, দেওয়ালি, দশহরা এবং মহরম জেলার প্রধান উৎসব। মেলার মধ্যে জালন্ধরের হরিবল্লভ সংগীত মেলা এবং বাবা সোলান মেলা এবং শাহ দৌলার মেলা, বৈশাখী দেবীর মেলা, ইমাম নাসিরুদ্দীনের সমাধির মেলা, রাহোনে বৈশাখী ও সুরজকুণ্ডের মেলা, নানকপুরে ভাইজাবী মেলা উল্লেখযোগ্য।

জালন্ধর শহর (৩১°২০ উত্তর এবং ৭৫°৩৫ পূর্ব) জেলার প্রধান কার্যালয়। উত্তর পশ্চিম রেলপথ এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দ্বারা ইহা দিল্লীর সহিত সংযোজিত। কলিকাতা হইতে দূরত্ব ১৮৯৯.৮ কিলোমিটার (১১৮০ মাইল)। শহরের আয়তন ৪৪.০৩ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ২২২৫৬৯। পুরুষের সংখ্যা ১২০৪৫৪ এবং নারীর সংখ্যা ১০২১১৫ জন। শহরের ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) দক্ষিণ পূর্বে সেনানিবাস অবস্থিত। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সেনানিবাস স্থাপিত হয়। এই শহরে রেশম, লোহ, পিতল এবং কাঠের নানা প্রকার দ্রব্যাদি নির্মাণের উপযোগী কল কারখানাও আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XIV, Oxford, 1908, *Census : 1961, Punjab*, vol. 13, part IIA, Delhi, 1964.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ হিন্দু গৌড়েশ্বর গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র। নূরকুৎব্ আলম প্রভৃতি দরবেশদের অনুরোধে জৌনপুররাজ ইব্রাহিম শর্কী গণেশকে দমন করিতে বাংলায় আসিলে ইনি পিতার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার বিনিময়ে ইব্রাহিম তাহাকে মুসলমান করিয়া বাংলার সিংহাসনে বসান (১৪১৫ খ্রী)।

জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ নাম লইয়া ইনি সিংহাসনে বসেন এবং বাংলায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। চীন-সম্রাটের দূতেরা তাঁহার সভায় আসিয়া সংবর্ধনা লাভ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে গণেশ ক্ষমতা পুনরধিকার করেন এবং 'দনুজমর্দনদেব' নাম লইয়া রাজা হইয়া জালালুদ্দীনের 'শুদ্ধি' করান।

গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রদেব রাজা হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জালালুদ্দীন তাঁহাকে অপসারিত করেন।

দ্বিতীয়বার সুলতান হইয়া (১৪১৮ খ্রী) জালালুদ্দীন হিন্দুদের উপর কিছু অত্যাচার করেন। ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম শর্কী আবার বাংলা আক্রমণ করিলে জালালুদ্দীনের অনুরোধে চীন ও পারস্যের সম্রাটগণ ইব্রাহিমকে বিরত করেন। জালালুদ্দীন আরাকানরাজ মেঙ্সোআমুনের রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেন ও তাঁহাকে নিজের সামন্ত করেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান জালালুদ্দীন গণেশ কর্তৃক বিধ্বস্ত মসজিদগুলি পুনর্নির্মাণ করান, মক্কায় কয়েকটি ভবন ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করান এবং মিশরের বাদশা ও খলিফার নিকট উপহার পাঠাইয়া খলিফার 'অনুমোদন' লাভ করেন। জালালুদ্দীন 'খলীফৎ আল্লাহ্' উপাধি লন ও মুদ্রায় কলমা খোদাই করান। তবে তিনি রায় রাজ্যধর নামে জনৈক হিন্দুকে সেনাপতিত্ব দিয়াছিলেন ও সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে সমাদর করিয়াছিলেন। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর. স্বাধীন সুলতানদের আমল : ১৩৩৮-১৫৩৮, শান্তিনিকেতন, ১৯৬২. Jadunath Sarkar, ed, *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948

সুখময় মুখোপাধ্যায়

জালিয়ানওয়ালাবাগ অমৃতসর শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি উদ্যান। এই স্থানে একটু চওড়া একটি-মাত্র প্রবেশপথ ও চারটি বা পাঁচটি ক্ষুদ্র বহির্গমনের পথ ছিল ও তাহার কোনওটি সাড়ে চার ফুটের বেশি চওড়া ছিল না। ইহা প্রায় চতুর্দিকে অট্টালিকাবেষ্টিত ছিল, মাত্র এক দিকে প্রায় ৩০ মিটার (১০০ ফুট) লম্বা ও ২ মিটার (৫ ফুট) উচ্চ একটি প্রাচীর ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল সন্ধ্যাবেলায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে অমৃতসরে সভা সমিতি নিষেধের আজ্ঞা প্রচারিত হয়। ইহা না জানিয়া অথবা ইহা সত্ত্বেও অমৃতসরের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য পর দিন বহু লোক এই স্থানে এক সভায় যোগদান করে। ইহাদের সংখ্যা কাহারও মতে ছয় হাজার আবার কাহারও মতে দশ হাজার বা তাহারও বেশি, কিন্তু এই বিশাল জনতা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিল। জেনারেল ডায়ারের সৈন্যগণ কোনরূপ সতর্কবাণী ঘোষণা না করিয়া এই জনতার উপর ১০ মিনিট কাল গুলি চালান। ১৫০০ রাউণ্ড গুলি ছোড়া হয়। সরকারি মতে ৩৭৯ জন নিহত ও ১২০০ জন আহত হয়, কিন্তু অনেকে মনে করেন সহস্রাধিক লোক নিহত হইয়াছিল। ইহার পরও পাঞ্জাবে আরও অত্যাচার হয়, ফলে সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হান্টারের সভাপতিত্বে আরও চার জন ইওরোপীয় ও তিন জন ভারতীয়কে লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিও মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন। হান্টার কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতে জেনারেল ডায়ারের গুলিবর্ষণ নিতান্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় সভ্যবৃন্দ ইহাকে অমানুষিক অত্যাচার বলেন ও তীব্র নিন্দা করেন। কংগ্রেস উপসমিতির মতে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরস্ত্র জনতার উপর স্বেচ্ছাকৃত এই অমানুষিকতা ইংরেজশাসনের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। ভারত সরকার জেনারেল ডায়ারের কার্য পুরাপুরি সমর্থন করেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষ ডায়ারের কার্যের মৃদু প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়া তাহাকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ হইতে অপসৃত করেন। বিলাতে হাউস অফ কমনস-এ ২৩২ জন এই শাস্তি সমর্থন করেন, কিন্তু ১৩১ জন ডায়ারের শাস্তি অনুমোদন করেন নাই। হাউস অফ লর্ডসের অধিকাংশ সভ্য ডায়ারের পদচ্যুতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। এদেশের ইংরেজ নরনারী ডায়ারকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা বলিয়া অভিনন্দিত করেন ও বিশ হাজার পাউণ্ড উপহার দেন। খুব অল্পসংখ্যক ইংরেজ ডায়ারের কার্যের নিন্দা করেন। ভারতে জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

দ্র B. G. Horniman, *Amritsar And Our Duty to India*, London, 1920; R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. III, Calcutta, 1963.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

জাসকার উচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণীর একটি শাখা। এই নামে একটি নদীও আছে। জাসকার পর্বতশ্রেণী ভারতের উত্তরে উচ্চ হিমালয় ও সিন্ধু উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে লদাখের মালভূমির উপর উত্তর কাশ্মীর সীমান্তে অবস্থিত। ইহা প্রায় ৮০০ কিলোমিটার (৫০০ মাইল) দীর্ঘ। পর্বতশ্রেণীর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৩৯০০ মিটার (১৩০০ ফুট) উচ্চ দেওসাই সমভূমি। জাসকার পর্বতের শৃঙ্গগুলি ৫৭০০ মিটার (১৯০০০ ফুট) অধিক উচ্চ। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কামেট ৭৭৫৬ মিটার (২৫৮৪৭ ফুট) উচ্চ। জাসকার শ্রেণীতে অসংখ্য ক্ষুদ্র হিমবাহ আছে। নাঙ্গা পর্বতের উত্তর-পশ্চিম ঢালে অনেক বৃহৎ হিমবাহ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে দিয়ামির একটি উল্লেখযোগ্য হিমবাহ। জাসকারের দক্ষিণ-পূর্বে সো-মোরারি হ্রদ ৪৯৮০ মিটার (১৬৬০০ ফুট) উচ্চ রুপসু উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। জাসকার শ্রেণীর মধ্যে সিপকি, লিপুলা ও মালা গিরিপথ অবস্থিত। এই পর্বতের শিলা কেলাসিত গ্র্যানিট, নিস্ ও শিস্ট দ্বারা গঠিত। স্থানে স্থানে চুনা পাথর ও ডলোমাইট শিলাও দেখা যায়। এখানে তাম ও সোরা পাওয়া যায়।

শতদ্রু, জাসকার, দ্রস প্রভৃতি নদী এই শ্রেণীকে ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। জাসকারে পর্বতারোহণের উপযুক্ত টাট্টু ঘোড়া পাওয়া যায়। জাসকার অঞ্চলের অধিবাসীরা যাযাবর ও পশুপালক। পর্বতের ঢালে কিছু বার্লি উৎপন্ন হয়।

দ্র Kenneth Mason, *Abode of Snow*, London, 1955; O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1957.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জাহাঙ্গীর (১৫৬৯-১৬২৭ খ্রী) যুবরাজ সেলিম ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর নূরুদ্দীন-মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্-গাজী উপাধি গ্রহণ করিয়া আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রিতে তাহার জন্ম হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনি আরবী, ফার্সী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষা এবং ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা সংগীত ও চিত্রশিল্প প্রভৃতিতেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; অপর দিকে প্রয়োজনীয় সামরিক শিক্ষাও তিনি লাভ করেন।

পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেন এবং উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

সিংহাসনারোহণের পর জাহাঙ্গীর প্রজাদের হিতার্থে শাসনব্যবস্থা অনুসৃত হওয়ার জন্য দ্বাদশ ঘোষণাপত্র (দস্তুর-উল্ আমল) জারী করেন। তাহাদের বিনাকষ্টে ন্যায় বিচারের সুবিধার জন্য তিনি আগ্রা দুর্গের শাহ্ বুর্জ এবং যমুনার তীরে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যে ষাটটি ঘণ্টাযুক্ত স্বর্ণশৃঙ্খল স্থাপিত করিলেন যাহাতে বিচারপ্রার্থী যে কোনও ব্যক্তি ঐ শৃঙ্খল টানিয়া তাহার প্রার্থনা সম্রাটকে সরাসরি জানাইতে পারে। এই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে তিনি প্রজাদিগের মঙ্গল এবং হৃদয় জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজত্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরুর বিদ্রোহ (১৬০৬ খ্রী) কিন্তু তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহাকে আশীর্বাদ করার অপরাধে শিখগুরু অর্জুন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, ধর্মগুরুকে এইরূপ শাস্তি দিবার ফলে শিখজাতি মোগল সরকারের শত্রুতে পরিণত হয়। এই কঠোর শাস্তি প্রদান জাহাঙ্গীরের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাঁহার আমলে বাংলা দেশে মোগলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, মেবারের রাণা অমরসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেন (১৬১৫ খ্রী) এবং দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গ বিজিত হয় (১৬২০ খ্রী)। অপর দিকে আহ্মদনগর রাজ্যের মন্ত্রী মালিক অম্বরের বিরোধিতায় দাক্ষিণাত্যে মোগল অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যরাজ শাহ্ আব্বাস কান্দাহার দুর্গ অধিকার করেন। সুতরাং এই সম্রাটের শাসনকালে জয় ও পরাজয় দুইই সংঘটিত হইয়াছিল।

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেহেরুন্নেসাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে নূরজাহান উপাধিতে ভূষিত করেন। দৈহিক সৌন্দর্য ব্যতীত নূরজাহান নানা গুণের অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতালিপ্সার জন্য রাজকুমার কুররম ও পরে সৈন্যাধ্যক্ষ মহবৎ খাঁ বিদ্রোহী হওয়াতে সাম্রাজ্যের বহু ক্ষতি সাধিত হয়।

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে জাহাঙ্গীর পরলোকগমন করেন।

তাঁহার চরিত্রে আকবরের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ

না ঘটিলেও তিনি বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন যথেষ্ট শিক্ষিত, তাঁহার আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। তিনি অতি নিপুণতার সহিত বিভিন্ন ফল, ফুল, নদী, পর্বত, উপত্যকা এবং পশুপক্ষীরও বর্ণনা করিয়াছেন। মোগল চিত্র-শিল্প তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাঁহার সংগীতপ্রীতিও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রাজত্ব-কালে স্থাপত্যবিদ্যার সুন্দর নিদর্শন পাই সেকেন্দ্রাতে আকবরের সমাধি-সৌধে, আগ্রায় ইতিমাদউদ্দৌলার সমাধি-সৌধে এবং লাহোরে নির্মিত মসজিদে। মনোরম উদ্যান রচনাতেও যে তিনি সুদক্ষ ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার রচিত কাশ্মীর ও লাহোরের কতিপয় মোগল উদ্যানে।

তাঁহার চরিত্রে স্নেহ দয়া ও কোমলতার যথেষ্ট স্থান ছিল, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তিনি চরম নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দিয়াছেন। মোটামুটিভাবে, ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সাধুসন্ত-দিগের প্রতি সাধারণতঃ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আকবরের মত তিনি হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করিতেন এবং বিচারক হিসাবে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ করিতেন না। কিন্তু আমোদ ও আরামপ্রিয়তা এবং অতিরিক্ত সুরাপান তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল। তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শাসক ও দূরদর্শী রাজনৈতিক হিসাবে আকবরের মত এত উচ্চস্থানের অধিকারী না হইলেও জাহাঙ্গীর ছিলেন প্রজাহিতৈষী ও তাহাদের কল্যাণের প্রতি তাঁহার মনোযোগ ছিল।

দ্র H. Beveridge, ed., *Tuzuk-i-Jahangiri*, tr., A. Rogers, vol. I-II, London, 1909; H. Beveridge, tr., *Akbarnama*, Calcutta, 1897-1912; *The Cambridge History of India*, vol. IV, Cambridge, 1937; A. L. Srivastava, *The Mughal Empire, 1526-1804 A.D.*, Agra, 1957; Beni Prasad, *History of Jahangir*, Allahabad, 1962

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

জাহাজ সামুদ্রিক বাণিজ্যাদিতে ব্যবহৃত বৃহৎ জল-যানের নাম জাহাজ। জাহাজ কেন জলে ভাসে, ইহার তথ্য গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্খিমেদেস (আর্কিমিডিস) সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। যখন কোনও বস্তু জলের উপর রাখা হয়, তখন সেই বস্তু কর্তৃক স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান এক শক্তি উপরের দিকে কার্য করে। এই ঊর্ধ্বগামী শক্তিকে প্লাবমান শক্তি (বয়েন্ট ফোর্স) নামে অভিহিত করা হয়। যদি কোনও বস্তুর ওজন ঐ বস্তু কর্তৃক স্থান-চ্যুত জলের ওজনের অপেক্ষা কম হয়, তবে সেই বস্তুটি জলে ভাসে।

জাহাজের কাঠামো, প্রধান ডেকের উপরিস্থ অবয়ব, ইঞ্জিন, চালক পাখা (প্রপেলার), পাল এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম – প্রধানতঃ এই কয়েকটি অংশে জাহাজকে ভাগ করা চলে।

জাহাজের কাঠামো একটি জলরোধক অবয়ব। সমগ্র কাঠামোটি কয়েকটি জলরোধক দেওয়ালের দ্বারা বিভক্ত করা হয়, যাহার ফলে কোনও একটি বা একাধিক খোলে দুর্ঘটনাজনিত জলপ্রবেশ বা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইলেও সমগ্র জাহাজটি বিনষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। খোলের উপরিভাগে আচ্ছাদনকারী যে ডেকটি বর্তমান, তাহাকে সাধারণতঃ প্রধান ডেক বলা হয়। এই প্রধান ডেকের উপর আরও কয়েকটি ডেক থাকে।

জাহাজ শুধুমাত্র জলে ভাসিলেই চলিবে না, জাহাজের গতিবেগ থাকা চাই। জলের ভিতর দিয়া দ্রুত চলিবার জন্য জাহাজের অগ্রভাগ সূচ্যগ্র এবং জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগ গোলাকার করা হয়, যাহাতে সম্মুখভাগের স্থানচ্যুত জল-পাখা দুইটি জাহাজের দুই পার্শ্ব বরাবর প্রবাহিত হইয়া পুনরায় পশ্চাতে মিলিতে পারে।

জলের ভিতর দিয়া চলাচলহেতু জাহাজ যে বাধা পায়, তাহা অতিক্রম করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা পাল অথবা ইঞ্জিনের দ্বারা সংগৃহীত হয়। তৈল অথবা বাষ্প দ্বারা চালিত জাহাজের প্রধান ইঞ্জিন যে শক্তি উৎপাদন করে, তাহা এক আবর্তনশীল চালকদণ্ড মারফত চালক পাখা (প্রপেলার) কর্তৃক গৃহীত হয় এবং এই চালক পাখার ঘূর্ণনে পাখাগুলির সম্মুখ এবং পশ্চাদ্‌ভাগে চাপের যে পার্থক্য ঘটে, তাহাই জাহাজচালনে সহায়তা করে। সাধারণ মালবাহী জাহাজের একটিমাত্র চালক পাখা থাকে, কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী জাহাজে, যেমন যাত্রীজাহাজ বা রণপোত ইত্যাদিতে একাধিক চালক পাখার ব্যবহার দেখা যায়। কয়লা অথবা তৈল ব্যতিরেকে অধুনা পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে জাহাজ চালাইবার প্রচেষ্টা উন্নতিশীল সামুদ্রিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুলিতে পরিলক্ষিত হইতেছে। অধিকতর শক্তি, উচ্চতর গতিবেগ, স্থানসঞ্চয় এবং স্বল্প নাবিকসংখ্যা ইত্যাদি পারমাণবিক

শক্তিচালিত জাহাজের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নৌবাণিজ্যে এইসব গুণাবলী অপেক্ষা অর্থনৈতিক সাফল্যই মুখ্য। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিশাল আকারের এবং দীর্ঘপথ-পরিভ্রমণকারী বাণিজ্যজাহাজেও পারমাণবিক শক্তি বিশেষরূপে কার্যকর। ডুবোজাহাজগুলি ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশ্র জাহাজ 'সাভানা', রাশিয়ার বরফভাঙা জাহাজ 'লেনিন' এবং জার্মানীর নির্মীয়মাণ বাণিজ্যযান 'অটোহান্' এখনও পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তির দ্বারা চালিত একমাত্র সামুদ্রিক জাহাজ।

জাহাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মধ্যে নোঙর, ভারোত্তোলক যন্ত্র এবং নৌচালনসম্পর্কীয় ব্যবস্থাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন চৌম্বক দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র, আবর্তনশীল দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র, বেগমাপক ও জলের গভীরতামাপক যন্ত্রপাতি, কৌণিক ব্যবধান মাপার জন্য বৃত্তের এক-ষষ্ঠাংশ-পরিমাণ চাপযুক্ত যন্ত্র, কালপরিমাপক যন্ত্র এবং রেডার ইত্যাদি।

যে কোনও জাহাজের বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে কয়টি বিষয় উল্লিখিত হয় তাহা হইতেছে সর্বাধিক দৈর্ঘ্য, পরিকল্পিত জলরেখায় জাহাজের দৈর্ঘ্য, অগ্র এবং পশ্চাদ্‌ভাগের লম্ব হইতে পরস্পরের ব্যবধান, জাহাজের প্রস্থ, তলি হইতে প্রধান ডেক পর্যন্ত পার্শ্বদেশের উচ্চতা, জলরেখা হইতে জাহাজের তলদেশের গভীরতা, জলরেখা হইতে সাধারণতঃ প্রধান ডেকের উচ্চতা, সর্বোচ্চ বহনযোগ্য মালের ওজন, মাল বোঝাই করার নিমিত্ত প্রাপ্য জায়গা এবং সর্বোচ্চ বহনযোগ্য মালপত্রসহ জাহাজের ওজন ইত্যাদি। জাহাজের সর্বোচ্চ ওজন, সর্বোচ্চ বহনক্ষমতা এবং প্রাপ্তিযোগ্য জায়গার মধ্যে কোনও সরাসরি সম্পর্ক নাই। সাগরে নির্ভরযোগ্যতা অনুযায়ী জাহাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বীমা কোম্পানির স্বার্থে এই শ্রেণীবিভাজন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমিতি-কর্তৃক এই শ্রেণীবিভাজন সম্পাদন করা হয়। সমিতির প্রদত্ত শ্রেণীচিহ্ন জাহাজের গুণাগুণ চূড়ান্তভাবে নির্দেশ করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জাহাজের ব্যবহার নৌচালনা ও পরিবহনসংক্রান্ত যাবতীয় অনুশাসন এবং আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের প্রবর্তন করিয়াছে— তন্মধ্যে সাগরে জীবনের নিরাপত্তামূলক নিয়মাবলী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য জাহাজ কোম্পানিগুলির বিরোধিতায় এই সম্পর্কে আইনকানুন এখনও যথেষ্ট নয়, তবে টাইটানিক ইত্যাদি জাহাজের নিমজ্জন অথবা বিপর্যয় পৃথিবীব্যাপী যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, বর্তমানের কঠোর বিধি-ব্যবস্থা তাহারই পরিণতি। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির অন্তর্ভুক্ত করা হয়— জল এবং অগ্নিরোধক পৃথককরণ দেওয়াল, দৃঢ় তলদেশ এবং জলাশয়ভেদে বিভিন্ন ঋতুতে ভার-রেখার সর্বোচ্চ অবস্থান। সাধারণতঃ জাহাজের দুই পার্শ্বে প্লিম্‌সল-চিহ্নের দ্বারা জাহাজ বোঝাই করার সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়। এতদ্ব্যতীত লাইফ-বোটের, প্রত্যেক যাত্রী এবং নাবিকের জন্য স্থানব্যবস্থা ও অগ্নিকাণ্ড-নির্বাপক ইত্যাদি নিয়মাবলী এই চুক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যাত্রীজাহাজ এবং তৈলবাহকের নিমিত্ত আইনকানুন অধিকতর কঠোর। আন্তর্জাতিক সংস্থার (ইউ. এন. ও.) অধীনে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নৌ উপদেশক সংস্থার (আই. এম. সি. ও.) প্রধান কার্যালয় লণ্ডনে অবস্থিত এবং ভারতবর্ষও এই সংঘের এক সভ্য। সাগরে নিরাপত্তা, সামুদ্রিক নৌ-চালন এবং আন্তর্জাতিক জলদেশে উদ্ধারকার্য সম্পর্কীয় বিধি ব্যবস্থার জন্য এই সংস্থা সরকারিভাবে দায়ী। পৃথিবীর প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ জলবাণিজ্য এই সংস্থার বিধি-নিষেধের মধ্যে পড়ে।

ইওরোপের দেশগুলিতে জাহাজচালনার পরম্পরা সর্বজনবিদিত। গ্রীক এবং রোমানদের যুদ্ধজাহাজ হইতে শুরু করিয়া মধ্যযুগে দাঁড় এবং পালের দ্বারা চালিত ভাইকিংদের জাহাজের বিবরণ নৌশিল্পের গৌরবময় কাহিনী। নৌ কম্পাসের প্রবর্তন, পর্তুগীজ নাবিকদের আফ্রিকা-প্রদক্ষিণ এবং কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কার নৌ-শিল্পের নূতন বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে এ দেশীয় জাহাজশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে সিরিয়া, মিশর, গ্রীস ও ইণ্ডিয় দেশগুলিতে ভারতীয় অর্ণবপোত নিয়মিত যাতায়াত করিত। ভারতের সমুদ্রযাত্রার বিশেষতঃ বহির্ভারতে ভারতীয় জাহাজচলাচলের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাহিনী যবদ্বীপে হিন্দুদের উপনিবেশ স্থাপন। যবদ্বীপের বরোবুদুরের মন্দির-গাত্রের স্থাপত্যকলা পর্যবেক্ষণ করিলে অতীতে ভারতীয় জাহাজ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়। একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাহাজ সম্পর্কে খুঁটিনাটি যেমন অল্-বীরুনীর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনই আবার বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে ভারতীয় নৌ-শিল্পের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন। মোগল যুগেও এদেশে যে নৌযুদ্ধগুলি সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তৎকালীন নৌ-তৎপরতা সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ থাকে না। তন্মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নৌবহরের কার্যাবলী তদানীন্তন বাংলা দেশের নৌ-প্রতিপত্তির

বিশেষ পরিচায়ক। পরবর্তী কালে মারাঠা-যুদ্ধযান এবং ভারতে নির্মিত ব্রিটিশ জলপোতগুলি পৃথিবীর বহু দেশে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের বাণিজ্যপোত এবং যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত উল্লেখযোগ্য ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানির নাম হইতেছে— সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, ইণ্ডিয়া স্টিমশিপ কোম্পানি, গ্রেট ঈস্টার্ন শিপিং কোম্পানি, জয়ন্তী শিপিং কর্পোরেশন এবং ভারত সরকারের নিজস্ব শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, এতদ্ব্যতীত এদেশে জাহাজ-নির্মাণ, জাহাজচালনা এবং জাহাজের ইঞ্জিন -সম্পর্কীয় শিক্ষাকেন্দ্রের নামগুলি হইতেছে যথাক্রমে খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ টেক্‌নলজি, বোম্বাই-এর ডাফ্‌রিন শিক্ষা জাহাজ এবং কলিকাতার মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সমুদ্র জাহাজ নির্মাণের জন্য ভারতবর্ষের একমাত্র জাহাজ-কারখানা অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখপট্টনম নগরে স্থাপিত। তবে জাহাজের সমগ্র অংশ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে ভারতবর্ষ এখনও স্বাবলম্বী নহে।

দ্র বালাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ভারতের নৌ শিল্প, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, A C Hardy, *The Book of the Ship*, London, 1949, Verlag Hansa, *Das Schiff*, Hamburg, 1964; H E. Rossel and L B. Chapman, *Principles of Naval Architecture*, vols. I-II, New York, 1967.

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

জাহাজনির্মাণ-শিল্প প্রাচীন কাল হইতেই ভারত জাহাজনির্মাণে সুপরিচিত ছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্তও ভারতে নানা ধরনের জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। এই সময়ে কলিকাতা ও সুরাটে দুইটি সমুদ্রগামী জাহাজ-নির্মাণের কারখানা ছিল। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের পর যখন পালতোলা জাহাজের পরিবর্তে ইস্পাত-নির্মিত ও শক্তিচালিত জাহাজের ব্যবহার আরম্ভ হইল তখন হইতেই ভারতীয় শিল্পটির পতন শুরু হইল। বিদেশী শাসককুলের বিরোধিতায় উন্নততর পদ্ধতি গ্রহণ করা দেশীয় শিল্পটির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতকের পরেও যে-সকল জাহাজ এদেশে নির্মিত হইয়াছে তাহা শুধুমাত্র অন্তর্দেশীয় জলপথ ও উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রে পরিবহনের যোগ্য ছিল।

আধুনিক ধরনের শক্তিচালিত জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই কম-বেশি চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রমুখ শিল্পপতিগণের উদ্যোগে বিশাখপট্টনমে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর প্রধানতঃ সরকারি আনুকূল্যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কারখানায় সমুদ্রগামী প্রথম জাহাজ ‘জল-উষা’র নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। তাহার পর অদ্যাবধি প্রায় চল্লিশটি জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে আসে। অন্তর্দেশীয় জলপথ ও উপকূল-বাণিজ্যের উপযোগী ছোট ছোট জাহাজনির্মাণের নূতন ও পুরাতন প্রায় চল্লিশটি সংস্থা আছে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতীব নগণ্য।

বিশ্বের মোট বাণিজ্যপোতের শতকরা এক ভাগও ভারতের নাই। বৈদেশিক বাণিজ্যের এক পঞ্চমাংশও ভারতীয় জাহাজগুলি বহন করে না। ভারতের নৌ-বাহিনীও মোটামুটি বিদেশী জাহাজের মুখাপেক্ষী। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশাখপট্টনমের কারখানাটির সম্প্রসারণ ও কোচিনে দ্বিতীয় জাহাজনির্মাণ কারখানা স্থাপনের কার্য অগ্রসর হইতেছে।

দ্র Tariff Board, Government of India, *Report on Ship-Building*, Delhi, 1926, Radhakamal Mukherjee, *Indian Shipping*, Calcutta, 1937, B Srinivasa Rao, *A Survey of Indian Industries*, vol. II, Calcutta, 1958; Indian Industries, *Indian Industries Annual*, Bombay, 1963, Engineering Association of India, *Annual 1963*, Calcutta, 1963, *Shipyard Review*, vol I, parts I-II, Vishakhapatnam

[illegible] সেন

জাহানকোষা, -কোশ একটি বৃহৎ কামানের নাম। মুর্শিদাবাদ শহরের অনতিদূরে তোপখানা নামে পাড়ায় একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের কাণ্ডে ভূমি হইতে প্রায় ৫২ ৭২ ৫৮ ২৬ সেন্টিমিটার (১৮/১৯ ইঞ্চি) উচ্চ একটি কামান শায়িত আছে। ইহা জাহানকোষা নামে পরিচিত। কামানটি দৈর্ঘ্যে ৫৪৮ সেন্টিমিটার (১৮ ফুট) ও পরিধিতে ১৩৭·১৬ সেন্টিমিটার (৪½ ফুট)। মাটিতে পড়িয়া থাকা-কালে ইহার ঠিক নিম্নতল হইতে একটি অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়া ইহাকে উপরে তুলিয়াছে এবং এখনও তুলিতেছে। কামানের গাত্রে প্রোথিত নয় খণ্ড পিতলের ফলক-লেখ হইতে জানা যায় যে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে এবং

ইসলাম খাঁ (মসনদি)-র বাংলার সুবেদারিকালে জাহাঙ্গীর নগরে দারোগা শের মহম্মদ ও হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে ১০৪৭ হিজরা জমাদিয়স সানি মাসে অর্থাৎ ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রধান কর্মকার জনার্দন দ্বারা এই কামান নির্মিত হয়। ইহার ওজন ৭৯১২৭০৯২ কিলোগ্রাম (২১২ মন) ও ইহা দাগিতে ২৬১২৭ কিলোগ্রাম (২৮ সের) বারুদ প্রয়োজন হয় বলিয়া লিখিত আছে। বর্তমানে কামানটি সিন্দুরলিপ্ত হইয়া পুষ্প, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে।

দ্র নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ , বাংলায় ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭০।

জাহানারা (১৬১৪-৮১ খ্রী) শাহ্‌জাহান ও মমতাজ মহলের দ্বিতীয় সন্তান জাহানারা অতীব সুন্দরী, উদারহৃদয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি সুফী মোল্লা মহম্মদ শাহের শিষ্যা ছিলেন এবং 'মুনীস উল আরওয়া' নামে খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়াছিলেন।

মমতাজ মহলের মৃত্যুর (১৬৩১ খ্রী) পর হইতে সাতাশ বৎসর ধরিয়া জাহানারা মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান মহিলা এবং রাজকার্যে সম্রাট শাহ্‌জাহানের অন্যতম পরামর্শদাত্রী ছিলেন। শাহ্‌জাহানের রাজ্যচ্যুতির (১৬৫৮ খ্রী) পর বন্দী অবস্থায় তিনি তাঁহার সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর (১৬৬৬ খ্রী) পর হইতে ঔরঙ্গজেব রাজকার্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। জাহানারা শেষ জীবন ধর্মাচরণ ও দানধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁহার জীবনাবসান হয়।

দিল্লী শহরের বাহিরে তাঁহারই নির্দেশে নির্মিত একটি তৃণাচ্ছাদিত সমাধিতে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। সেখানে জাহানারা কর্তৃক পারস্য ভাষায় রচিত নিম্নলিখিত সমাধিলিপিটি উৎকীর্ণ আছে .

বহুমূল্য আবরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন আত্মা জেহানারা
সম্রাট-কন্যার ॥
—(নবীনচন্দ্র সেন কৃত অনুবাদ)।

দ্র J. N. Sarkar, *History of Aurangzib*, vols. I-II, Calcutta, 1912 , J. N. Sarkar, *Studies in Aurangzib's Reign*, Calcutta, 1933.

কুমুদরঞ্জন দাস

জাহ্নবা দেবী ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী বসুধা নিত্যানন্দের পত্নী ও সূর্যদাস সরখেলের কন্যা। বসুধার গর্ভে নিত্যানন্দের একমাত্র পুত্র বীরভদ্রের জন্ম হইয়াছিল। জাহ্নবা বংশীবদন ভট্টের পৌত্র রামচন্দ্র বা রামভদ্রকে পালিতপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবেরা জাহ্নবাকে রাধার সহোদরা আনন্দমঞ্জরীর অবতার বলিয়া মনে করেন। বৃন্দাবনের গোপীনাথ বিগ্রহের এক পার্শ্বে রাধিকার অপর পার্শ্বে জাহ্নবার মূর্তি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

জাহ্নবা দেবী যে খেতুরির মহোৎসবে বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। তিনি মাতৃভাব প্রণোদিত হইয়া ঐ মহোৎসবে

পরম উৎসাহে কৈলা অপর রন্ধন।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন ॥
-(ভক্তিরত্নাকর, দশম অধ্যায়)।

জাহ্নবা দেবী দুইবার বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। রাধাকুণ্ডে এখনও প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে তাহার শুভাগমন উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

দ্র ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দ।

বিমানবিহারী মজুমদার

জাহ্নবী গঙ্গা দ্র

জি. এম. কাউন্টার কণাসন্ধানী যন্ত্র দ্র

জিওডেসি (geodesy) ভূমিতি। জিওডেসির প্রধান বিষয়বস্তু হইল ভূপৃষ্ঠের আকৃতি ও পৃথিবীর আয়তন নির্ণয়। উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণার দ্বারা অবশ্য পৃথিবীর অভ্যন্তরসম্পর্কেও অনুমান সম্ভব হয়। বাস্তবে জিওডেসির প্রয়োগক্ষেত্র হইল ভূপৃষ্ঠের নির্ভরযোগ্য মানচিত্রের নির্মাণ।

সভ্যতার আদিতে (মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগে) পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। যতদূর মনে হয়, গ্রীক বিজ্ঞানী পাইথাগোরাস ই সর্বপ্রথম পৃথিবী যে গোলাকার এইরূপ অনুমান করেন। গ্রীক বিজ্ঞানী এরাটোস্থিনিস ('এরাতোস্থেনেস' দ্র) দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব মাপিয়া ও তাহাদের কৌণিক দূরত্ব সূর্যের অবস্থানের সাহায্যে জানিয়া প্রথম পৃথিবীর ব্যাসার্ধনির্ণয়ের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্ধতিতে ত্রুটি

থাকিলেও তাঁহাকেই পৃথিবীর প্রথম ভূমিতি-বৈজ্ঞানিক বলা যায়। পৃথিবী যে যথার্থ গোলাকার নয় এ সম্বন্ধে ধারণা হয় বহু পরে যখন নিউটনের বলবিদ্যা ও মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে দেখানো হয়, ঘূর্ণনশীল জলরাশি একটি উপগোলের আকার (oblate spheroid) ধারণ করে, যাহার মেরু ব্যাসার্ধ বিষুবীয় ব্যাসার্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। পৃথিবীপৃষ্ঠে যেহেতু অধিকাংশই জলরাশি, অতএব সিদ্ধান্ত করা হয় পৃথিবীর আকার এইরূপ উপগোলের ন্যায় হইবে।

কোনও দেশের বিভিন্ন স্থানের পারস্পরিক দূরত্ব ও অবস্থান নির্দেশ করিবার জন্য প্রথমেই যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহার নাম ত্রিভুজীকরণ (triangulation)। সমগ্র দেশকে কিছু দূরে দূরে অবস্থিত (সাধারণতঃ ৫০ কিলোমিটারের বেশি নহে) নিরীক্ষণস্থান দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। কোনও নিরীক্ষণস্থান পার্শ্ববর্তী নিরীক্ষণস্থান-সমূহ হইতে দৃষ্ট হইবার জন্য নিরীক্ষণস্থানগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ে বা উচ্চ স্থানে লওয়া হয়। থিয়োডোলাইট নামক যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেকটি নিরীক্ষণস্থান হইতে পার্শ্ববর্তী নিরীক্ষণস্থানগুলির মধ্যে কৌণিক দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। এইভাবে ত্রিভুজসমূহের সমস্ত কোণ জানা যায়। অতঃপর একটি বাহু বা মূলরেখা (base line) অতিশয় সাবধানতার সহিত মাপিয়া লওয়া হয়। এইবার গোল ত্রিকোণমিতির (spherical trigonometry) সাহায্যে ত্রিভুজগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা হয়। এখন যে কোনও দুইটি স্থানের দূরত্ব সহজেই গণনা করিয়া বাহির করা যায়।

গড় সমুদ্র-তল (mean sea-level) ও স্থলভাগে কাল্পনিক সমুদ্রতল (যদি সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ও সমুদ্রে বিলীন কোনও খালের সাহায্যে কোনও স্থানে সমুদ্র জল আনা যায় তবে তাহার তল) লইয়া যে ভূপৃষ্ঠ মনে করা হয় তাহাকে জিওয়েড (geoid) বা পৃথ্বীকল্প বলা হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভরের অসম বণ্টনের ফলে জিওয়েড-এর তলে বিশেষ অসমতা দেখা যায়। এই কারণে একটি গাণিতিক তল এলিপ্সয়েড অফ রেভলিউশন (ellipsoid of revolution)-কে অনুষঙ্গ-তল বা রেফারেন্স সারফেস (reference surface) হিসাবে লওয়া হইয়াছে, ইহা জিওয়েডের যতদূর সম্ভব সমীপবর্তী। জিওডেসির একটি প্রধান বিষয় এই অনুষঙ্গতলের সম্যকরূপে নির্ধারণ। কোনও স্থানের লম্বরূপ রেখা (plumb line) জিওয়েডের উপর লম্বভাবে বিদ্যমান। অনুষঙ্গতলের উপর লম্ব ও লম্বরূপ রেখার মধ্যস্থ কোণকে বলা হয় লম্বরূপের চ্যুতি বা ডিফ্লেকশন অফ দি ভার্টিক্যাল (deflection of the vertical)। এই চ্যুতির পরিমাপ এবং জিওয়েড ও অনুষঙ্গতলের মধ্যে দূরত্বনির্ণয় জিওডেসির উদ্দেশ্য। ভূমাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ জি (g), অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি (acceleration due to gravity) বিভিন্ন যন্ত্র সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে মাপা হয়। দোলন-যন্ত্রের (pendulum apparatus) অথবা আধুনিক গ্র্যাভিমিটার যন্ত্র (gravimeter) ব্যবহৃত হয়। ভূপৃষ্ঠ সর্বত্র সমঘন হইলে জি (g) এর যে মান হইত তাহা হইতে কোনও স্থানে জি (g)-এর মান পৃথক হইলে, নিকটবর্তী অঞ্চলে ভরের অসম বণ্টন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এইভাবে দেখা যায় সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী অঞ্চলে জি (g)-এর মান অপেক্ষাকৃত কম, আবার পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চলে g-এর মান অপেক্ষাকৃত বেশি। স্পিরিট লেভেল (Spirit level) এর সাহায্যে দুইটি স্থানের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন স্থানের জি (g)-এর মান জানা থাকিলে তাহা হইতে গতিতাত্ত্বিক উচ্চতা নির্ণয় করা যায়। উচ্চতা বলিতে জিওয়েড হইতে উচ্চতা বুঝায়। হিমালয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলের জরিপের (Survey) তথ্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাট (Pratt) দেখান যে হিমালয় পর্বতের জন্য যে পরিমাণ চ্যুতি বা ডিফ্লেকশন অফ দি ভার্টিক্যাল (deflection of the vertical) হওয়ার কথা তাহা অপেক্ষা বাস্তবে অনেক কম পাওয়া যাইতেছে। ইংল্যাণ্ডের জি. বি. এয়ারি (G. B. Airy) এই সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর উপরের স্তর অপেক্ষাকৃত একটি ঘন স্তরের উপর ভাসমান। সমুদ্রতল হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত পর্বতসমূহের মূলদেশ ঐ অন্তঃস্তরের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় একটি গভীরতা (depth) হইতে আরম্ভ করিয়া ভূপৃষ্ঠ অবধি ভরপরিমাণ যে কোনও স্থানে সমান থাকে। উপরিস্থ ভর আধিক্য অন্তঃস্থ ভর-স্বল্পতা দ্বারা ও উপরিস্থ ভরস্বল্পতা অন্তঃস্থ ভরাধিক্য দ্বারা পূরিত হইয়া একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে সমস্থিতি (আইসোস্টাসি) বলে।

জিওডেসির জরিপ (geodetic survey) দ্বারা প্রাপ্ত পৃথিবীর বিভিন্ন মান :

a = বিষুববৃত্তীয় ব্যাসার্ধ = ৬৩৭৮·৩৮৮ কিলোমিটার

b = মেরুব্যাসার্ধ = ৬৩৫৬·৯১১ কিলোমিটার

f = উপবৃত্তীয় মান (ellipticity) ১/২৯৭

পৃথিবীর ভর (Mass) ৫·৯৮৮ × ১০^{২১} মেট্রিক টন

$g = g_0 (1 + \beta \sin^2\phi + \gamma \sin^2 2\phi)$, $g_0 = 978{\cdot}0373 \pm 0{\cdot}0000024$ Cm/Sec²

$\beta = 0{\cdot}0052891 + 0{\cdot}0000041,$
$\tau = -0{\cdot}0000059$

দ্র W. Bowie, *Isostasy*, New York, 1927; G. Bomford, *Geodesy*, Oxford, 1952; W. A. Heiskanen and F. A. Vening Meinesz, *Earth and its Gravity Field*, New York, 1957; Jeffreys, *The Earth*, Cambridge, 1959.

শক্তিকান্ত চক্রবর্তী

জিওত্তো, জোত্তো (আনুমানিক ১২৭৬-১৩৩৭ খ্রী) ইটালীর বিশিষ্ট শিল্পী। ফ্লোরেন্সের উত্তরে কোলে (Colle)-তে জন্ম। পিতা বন্দোনে (Bondone) ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত, মতান্তরে মেষপালক। কিংবদন্তি অনুসারে শোনা যায় যে তিনি বিখ্যাত শিল্পী চিমাবুয়ের ছাত্র ছিলেন, ইতিহাসের বর্তমান-লব্ধ নজির ইহা সমর্থন করে না। ইটালীয় শিল্প-ইতিহাসে ইহার স্থান শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের মধ্যে এবং ইনি ছিলেন সেকালের নব-শিল্পধারার প্রথম প্রবর্তক।

জিওত্তোর প্রবর্তিত চিত্ররূপকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, শিল্পধারণার সঙ্গে সমগোত্রীয় হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনিই প্রথম ইটালীয় বাইজান্তিয়াম-চিত্রধারার আড়ষ্ট ও নির্জীব রূপকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক মানুষের স্বরূপ-চেতনা ও ভাবব্যঞ্জনাময় রূপায়ণ সূচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচনায় ইটালীয় রেনেসাঁস-এর বোধন হইয়াছিল বলা চলে। জিওত্তোর সমসাময়িক দান্তে, পেত্রার্ক, বোক্কাচ্চো প্রভৃতি মনীষীগণ -কর্তৃক তাঁহার রচনা সমাদৃত হইয়াছিল।

জিওত্তোর কয়েকটি স্মরণীয় শিল্পকীর্তি— আসিসির গির্জায় সাধু ফ্রান্সিসের জীবন-কাহিনীর ছবি। তাঁহার বহু শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে উল্লেখ করিতে হয় পাদোভার আরেনা গির্জায় ৩৮টি দৃশ্যে সাধু জোয়াকিম ও আন্না, ভার্জিন ও খ্রীষ্টের জীবনের ঘটনাচিত্রগুলি এবং ফ্লোরেন্সে সান্তাক্রোচে গির্জার সাধু ফ্রান্সিস, জন প্রভৃতির জীবনচিত্রগুলি।

১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে পোপের আমন্ত্রণে রোমে জিওত্তো প্রায় দশটি ভিত্তিচিত্র রচনা করেন, তবে তাহার বেশির ভাগই হয় অবলুপ্ত নতুবা পরবর্তী যুগের সংস্কার-প্রচেষ্টার দ্বারা বিকৃত। তাঁহার রচনাসম্ভারে ইটালী ও ফ্রান্সের যে সকল শহর অলংকৃত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে রোম, নাপোলি, আভিঞঁ, পাদোভা, আসিসি, রিমিনি, রাভেনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া কয়েকটি চিত্রখণ্ড (প্যানেল পিক্‌চর) ইওরোপের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে কয়েকটিতে শিল্পীর নামও চিহ্নিত আছে। যথা— ইটালীর বোলঞা (Bologna), লণ্ডনের জাতীয় সংগ্রহশালা, পশ্চিম জার্মানীর মিউনিক শহরের পিনাকোথেক সংগ্রহশালা, ফ্রান্সের ল্যুভ্‌র্ সংগ্রহশালা। ইহা ছাড়া আমেরিকাতেও কিছু আছে।

পঞ্চদশ শতকে ইওরোপের শিল্প-আন্দোলনে তাঁহার প্রভাব সমকালীন অনেক শিল্পী ও তাঁহাদের শিল্পকর্মের মধ্যে প্রতিভাত হইয়াছে। তখনকার জিওত্তো প্রভাবান্বিত শিল্পীদের মধ্যে বিখ্যাত শিল্পী মাসাচ্চো (Masaccio)-র নাম উল্লেখ করা যায়।

শিপ্রা আদিত্য

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ভারতীয় ভূ-বৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই কাজের সূচনা হইলেও সরকারিভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। যে কয়জন ভূবিজ্ঞানী এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে টি. ওল্ডহ্যাম, টি. এইচ. হল্যাণ্ড এবং এইচ. এইচ. হেডেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতে কয়লাস্তর সম্বন্ধে অনুসন্ধানই ছিল জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠার আপাত কারণ। প্রথম হইতেই বহু খ্যাতনামা ব্রিটিশ ভূবিজ্ঞানী গবেষণার জন্য ভারতে আসেন। ভারত উপমহাদেশ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলির ভূবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণায় তাঁহাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। এ. এম হেরন ছিলেন তাঁহাদের একজন, ১৯২১ ও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ-এভারেস্ট অভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অন্যতম প্রমথনাথ বসুর আকরিক লৌহ স্তর সম্বন্ধে আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য, ইহার ফলেই টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল ওয়ার্কস এর প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়।

প্রথমে অল্প কর্মী লইয়া স্থাপিত হইলেও এই প্রতিষ্ঠান গত ১১৬ বৎসরের প্রসারের ফলে বর্তমানে বিশ্বের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আয়তনে ও প্রাচীনতায় তৃতীয় স্থানের অধিকারী। বর্তমানে ইহার মোট কর্মীসংখ্যা প্রায় ৭০০০ জন, তন্মধ্যে প্রায় ১০০০ বিজ্ঞানী। প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত, ইহা ছাড়া ইহার পাঁচটি আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রতি রাজ্যে কর্মকেন্দ্র (সার্কল অফিস) আছে। এম এস. কৃষ্ণণ এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় অধিকর্তা ছিলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃসংগঠনের সময় মহাধিকর্তার পদ সৃষ্ট হয় ও ভবেশচন্দ্র রায় উক্তপদে প্রথম অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এবং ডি. এন. ওয়াদিয়ার

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

পৌরোহিত্যে আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বাবিংশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়; উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম উক্ত বৎসর আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল অধিবেশন সংঘটিত হয়।

রীতিসম্মত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রণয়ন, গ্রন্থ প্রকাশন, খনিজের সন্ধান ও পরিমাণ নির্ধারণ, ভূবিদ্যা-ঘটিত ইঞ্জিনিয়ারিং, ভৌমজলের পরিমাণ (গ্রাউণ্ড ওয়াটার) নিরূপণ এবং ভূপদার্থসম্পর্কীয় (জিওফিজিক্যাল) অনুসন্ধান এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

এই সংস্থার মানচিত্র নির্মাণ বিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার খনিজ এবং ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র সংকলিত করিয়া বিশেষ বিশেষ এলাকার এবং সর্বভারতীয় ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়। জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য এইভাবে প্রস্তুত রানীগঞ্জ কয়লা অঞ্চলের প্রথম ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সংস্থা কর্তৃক সংকলিত এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় ভারতবর্ষের 'টেক্‌টোনিক অ্যাণ্ড মেটালোজেনিক-মিনারেজেনেটিক' মানচিত্রের প্রথম সংস্করণ এবং ভারতের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের পরিশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব ও ইহার অন্যান্য শাখা-প্রশাখা ও কার্যবিবরণী সম্পর্কে এই বিভাগ হইতে নানাবিধ গ্রন্থ প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে রেকর্ড্‌স, মেময়ার্‌স, প্যালিওন্টলজিয়া ইন্দিকা, বুলেটিন্‌স এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান মিনরল্‌স' উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল হইতেই এই বিভাগ ইংরেজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ও বক্তৃতামালার আয়োজন করিয়া সাধারণ মানুষকে ভূবিদ্যা সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়াস করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের মধ্যে খনিজ বিষয়ক জ্ঞান বিতরণের পরিকল্পনা (লেমেন্‌স মিনার‍্যাল কনশ্যাস স্কিম) গ্রহণ করা হয় এবং ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত ছোট ছোট পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বণ্টন করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি সম্ভবতঃ এশিয়ায় অনুরূপ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ— ইহার পুস্তক ও পত্র -সংখ্যা আনুমানিক ৩০০০০০ এবং এখানে দ্রুত অনুলিপি ও মাইক্রোফিল্ম প্রণয়নের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারগুলিতে প্রয়োজনমত এক্‌স-রে, বর্ণালী-বীক্ষণ, জীবাশ্ম (ফসিল) -বিচার প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা শিলা ও খনিজ পরীক্ষা করা হয়। রসায়নশালায় ভূরাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে ধাতব ও অধাতব আকর, স্বল্প পরিমাণে প্রাপ্ত উপাদান, জল প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। কয়লা ও গ্যাসের বিশ্লেষণাদিও সম্পাদিত হয়। খনিজ ও জলের যথাযথ অনুসন্ধানের জন্য এবং ভূবিদ্যা-ঘটিত ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভৌমজলের বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে বহু ভূপদার্থ-বিজ্ঞানী নিযুক্ত আছেন। ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি সহ কিছু যন্ত্রও এখানে প্রস্তুত করা হয়। কয়লার অনুসন্ধান, বিভিন্ন খনিজের সন্ধানে বেধন (ড্রিলিং) প্রভৃতি কার্যের জন্য পৃথক পৃথক ইউনিট আছে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি হইতে কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন হওয়ায় ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্‌স-এর প্রস্‌পেক্‌টিং শাখা এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

স্বাধীনতার পর হইতে বিভিন্ন পর্বত অভিযানে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ গোপেন্দ্রনাথ দত্ত (ব্রিটিশ-এভারেস্ট অভিযান, ১৯৫১ খ্রী), বিশ্বনাথ রাইনা (জাপানী মানসালু অভিযান, ১৯৫৬ খ্রী), বিজয়কুমার রাইনার (কারাকোরাম অভিযান, ১৯৫৬ খ্রী) নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রপ্রকাশ ভোরা (ভারতীয় এভারেস্ট অভিযান, ১৯৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ খ্রী) এবং বি. এস. জঙ্গপঙ্গীর (ত্রিশূলী অভিযান, ১৯৬৬ খ্রী) কৃতিত্বও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহারা উভয়েই যথাক্রমে এভারেস্ট ও ত্রিশূলী -চূড়ায় আরোহণ করিবার গৌরব অর্জন করেন।

ভারতীয় জাদুঘরে (কলিকাতা) এই প্রতিষ্ঠানের গ্যালারি বিভাগ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় জাদুঘরের ভূতত্ত্ব বিভাগ ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণের সহিত যুক্ত হয় এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে চৌরঙ্গী রোডস্থ ভবনে ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্যালারি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে খনিজ, নানাবিধ পাথর, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি অন্যূন ১৫টি ক্রমে ইহার পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জীবাশ্ম গ্যালারিও ইহার অন্যতম আকর্ষণ।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে বহু নূতন কয়লাক্ষেত্র, গুজরাতের খম্বাত (ক্যাম্বে) ও পাঞ্জাবের কাংড়া-তে তৈল, মধ্য প্রদেশে ম্যাঙ্গানিজ আকর, রাজস্থানের জাওয়ার-এ সীসা-দস্তা আকর এবং বিহারের সিংভূম ও মহীশূরের চিত্রদুর্গে গন্ধক-ঘটিত আকর আবিষ্কৃত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের স্তরে কয়লা লিগ্‌নাইট ম্যাঙ্গানিজ আকর, পাইরাইট প্রভৃতি খনিজের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নূতন নূতন কয়লাস্তর,

বিহারের সিংভূমে তামা, অন্ধ্র প্রদেশের গুণ্টুরে তামা ও সীসা, মাদ্রাজের দক্ষিণ আরকটে দস্তা তামা ও সীসা, মধ্য প্রদেশের বস্তারে লৌহ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। তাহা ছাড়া মহীশূরের কোলার ও অন্ধ্র প্রদেশের রামগিরি স্বর্ণক্ষেত্রের উৎপাদন সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের স্তরে বক্সাইট, জিপ্‌সাম, ক্রোমাইট, তামা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির পরিমাণও নিরূপিত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ন্যাশন্যাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ১১৫০৩৯ মিটার পরিমাণ বেধন (ড্রিলিং) সম্পন্ন হয়। বিহারে রোয়াম-সিদ্ধেশ্বর অঞ্চলে প্রায় ১৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং তামাপাহাড় ও রামচন্দ্র পাহাড়ে মোট ৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন তাম্র আকরের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজস্থানের সালাদিপুরায় ৬০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও অধিক গন্ধক ঘটিত আকর এবং উদয়পুর জেলায় তামা সীসা দস্তা আকরের অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়। ওড়িশার মালাঙ্গটোলি অঞ্চলে মোট ১৫৫০ লক্ষ টন লৌহ আকর এবং গুজরাতের অম্বা ডোঙ্গরি ও মধ্য প্রদেশের চণ্ডী ডোঙ্গরিতে ফ্লুয়োরস্পার পাওয়া গিয়াছে। ফুটকাপাহাড় ও অমরকণ্টকে অ্যালুমিনিয়াম আকর, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও মহীশূরে চুনা পাথর এবং পশ্চিম বোকারো কয়লাক্ষেত্রে ধাতুসংক্রান্ত কাযের উপযোগী ৪০০০ লক্ষ মেট্রিক টন পরিমাণ কয়লা আবিষ্কৃত হয়। ইহা ছাড়া কলিকাতা মেট্রোপলিটান অঞ্চল সহ বহু অঞ্চলে ভৌমজলের বিস্তারিত অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে এই প্রতিষ্ঠানকে আরও সম্প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের জন্য চতুর্থ আঞ্চলিক ও মধ্য অঞ্চলের জন্য পঞ্চম আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ভূবৈজ্ঞানিক প্রশাখায় বিশেষজ্ঞ বিনিয়োগ, মহাসাগরীয় ভূতত্ত্ব, সমুদ্রতট-সন্নিহিত সামুদ্রিক খনিজ সন্ধান এবং ভূবিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণের প্রসার প্রভৃতিও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তামা সীসা দস্তা প্রভৃতি অবর ধাতুর (বেস মেটাল্‌স) সন্ধান এই পরিকল্পনায় বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে, ভারতে এইসব পদার্থের অনটন থাকায় ইহাদের বিদেশ হইতে আমদানি করিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। সারা ভারতবর্ষে ৪৫৮০০০ বর্গ কিলোমিটার প্রাথমিক খনিজ সন্ধান সহ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রণয়ন করা হইবে। উন্নয়নের জন্য অ্যাজবেসটস, বক্সাইট, চীনামাটি, তাপসহিষ্ণু মৃত্তিকা (ফায়ার ক্লে), জিপ্‌সাইট, আকরিক লৌহ, সিমেণ্ট ও লৌহ নিষ্কাশনের উপযোগী চুনা পাথর ও ডলোমাইট প্রভৃতির জন্য বিশেষ অনুসন্ধান কার্য চালানো হইবে। ইহার জন্য আনুমানিক ২১৩০০০ মিটার বেধন প্রয়োজন হইতে পারে। উত্তর প্রদেশ ও হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চলে হিমবাহ সমীক্ষা সহ বিভিন্ন প্রদেশে ভৌমজল, ভূবিদ্যা ঘটিত ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভূপদার্থ-বিজ্ঞানের বিস্তৃত সমীক্ষাও উল্লিখিত পরিকল্পনার অন্তর্গত করা হইয়াছে।

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জিজাবাঈ শিবাজী দ্র

জিজিয়া মুসলমান রাজ্যে বাস করিতে হইলে অমুসলমানকে একপ্রকার কর দিতে হইত, ইহার নাম জিজিয়া। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানে উক্ত হইয়াছে যে মুসলমানেরা অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা বিনীতভাবে জিজিয়া কর দিতে স্বীকার করে। মুসলমানী আমলে ভারতে প্রত্যেক হিন্দুর মাথাপিছু এই কর ধার্য হইয়াছিল। ভারতের প্রথম মুসলমান বিজেতা মহম্মদ ইব্‌ন কাশিম সিন্ধু দেশ জয় করিবার পর হিন্দুদের নিকট হইতে এই কর আদায়ের প্রথা প্রবর্তন করেন। আকবর এই কর রহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেব ইহার পুনঃ-প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক হিন্দুকে নিজেদের দেশে বাস করিয়াও মুসলমান রাজাকে এই কর দিতে হইত।

জিজিয়া করের হার সম্বন্ধে যদুনাথ সরকার বলেন যে দরিদ্রদিগকে তাহাদের আয়ের শতকরা ৬ টাকা, মধ্যবিত্ত-গণকে ইহার কিছু বেশি এবং ধনীদিগকে হাজার করা আড়াই টাকার কম দিতে হইত। সবচেয়ে দরিদ্রকেও অন্ততঃ ৩½ টাকা দিতে হইত এবং সে যুগে এই টাকায় নয় মন গম পাওয়া যাইত। অর্থাৎ প্রতি দরিদ্র হিন্দুকে এক বৎসরের খোরাক জিজিয়া কর হিসাবে দিতে হইত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে এই কর হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্য কার্যতঃ অনেকটা সফল হইয়াছিল। স্ত্রীলোক, ১৪ বৎসরের কম বয়সের শিশু এবং দাস, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতিকে জিজিয়া দিতে হইত না।

কোনও কোনও মুসলমান লেখক বলেন যে ইহা হিন্দু ধর্মের উপর ধার্য কর নহে। হিন্দুরা সৈনিক-বৃত্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এই কর দিত। আবার কেহ কেহ বলেন যে জিজিয়া কর দেওয়ার রীতি ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক সুলতানই ইহা আদায় করিতেন না এবং ইহার পরিমাণও ছিল সামান্য। এই উভয়

ধারণাই ভুল। মধ্যবিত্ত ও গরিব লোকের পক্ষে এই কর দেওয়া বেশ কষ্টকর ছিল এবং হিন্দুমাত্রেই ইহা চূড়ান্ত অপমান ও লাঞ্ছনার চিহ্ন বলিয়া মনে করিত।

দ্র Jadunath Sarker, *History of Aurangzib*, vol III, Calcutta, 1928, P Saran, *Studies in Medieval Indian History*, Delhi, 1952, R C Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vols III & VI, Bombay, 1954, 1960

রমেশচন্দ্র মজুমদার

জিতাষ্টমী গৌণ আশ্বিন (মুখ্য ভাদ্র) মাসের কৃষ্ণাষ্টমী। এই দিনে সূর্যপুত্র জীমূতবাহন, জীবিতবাহন, জিতবাহন বা জিতার পূজা ও ব্রত পালন করা হয়। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত ব্রতকথায় জীমূতবাহনের জীবনকাহিনী ও অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা দেশের বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ও বাংলার বাহিরে [illegible] বিহারে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে এই ব্রতের প্রচলন আছে। ব্রত উপলক্ষে উপবাসী থাকিবার নিয়ম আছে। একটি ক্ষুদ্র জলাশয় তৈয়ারি করিয়া তাহার পাশে বটের ডাল, হলুদ, কলা ও ধানের চারা পুঁতিয়া দিতে হয়। সামনে ঘট বসাইয়া সারা রাত্রি জাগিয়া চারবার পূজা করার নিয়ম, পরদিন ভোরে স্নান করিয়া শশায় কামড় দিতে হয়। মাটির মূর্তি স্থাপনের কথাও আছে। মূর্তিটি অশ্বারূঢ়, হাতে খড়্গ, ছুরি, ধনুক ও বাণ, মাথায় মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ ও বলয়। 'শুকিনী শৃগাল' এর মূর্তি স্থাপন করিয়া প্রাতে স্নানের সময়ে উহা ভাসাইয়া দিতে হয়। ব্রতকথায় ইহাদের বিবরণ আছে।

দ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'বাংলার জীমূতবাহনের কাহিনী', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন (১৮৬০-১৯৩৫ খ্রী) ব্যায়ামবীর। বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা। বাল্যকাল হইতেই শরীরচর্চায় উৎসাহিত হইয়া জিম্‌নাস্টিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। কুস্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অম্বিকাচরণ গুহ-র আখড়ায় কিছুকাল যাপন করেন। স্বদেশে পাঠান্তে তিনি আইন পড়িবার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে ব্যায়ামবীর ও বিশেষ শক্তিমান পুরুষ বলিয়া সে দেশে খ্যাতি অর্জন করেন এবং সেই সময়েই পশ্চিমী পদ্ধতিতে মুষ্টিযুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কিছুকাল রিপন কলেজে আইনের অধ্যাপনাও করেন। তিনি রিপন কলেজের পরিচালক সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর উহার সভাপতিপদে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বৃত থাকেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি রাইফেল ব্যাটালিয়ন এ সৈন্যদলের সর্বনিম্ন স্তরে (প্রাইভেট) ভর্তি হইয়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন এর পদে উন্নীত হন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে দরবার মেডেল ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ভলান্টিয়ার্স সার্ভিস মেডেল ও 'ওয়ার ব্যাজ' দেওয়া হয়। বঙ্গ দেশে শরীরচর্চায় যাঁহারা অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন, জিতেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অগ্রণী। বৃদ্ধ বয়সেও কলিকাতার বিভিন্ন ক্লাব ও আখড়ায় উপস্থিত হইয়া তিনি শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহ দিতেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যায়ামচর্চার প্রসারকল্পে অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি ট্রাস্ট সম্পাদনা করিয়া ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক লক্ষ পচিশ হাজার টাকা ঐ প্রতিষ্ঠানে দান করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

দ্র সমর বসু, 'ব্যায়ামে বাঙালী', সংহতি, কার্তিক, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

সমর বসু

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রী)। অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থানীয় সুরবাহার ও সেতারবাদক। দীর্ঘ মীড়ের কারুকর্মে, আলাপচারিতে, তারপরণ ও বিলম্বিত লয়ের বাদনরীতিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। প্রতিভা দেবীর স্থাপিত 'সঙ্গীত সংঘের' তিনি যন্ত্রসঙ্গীতের অধ্যাপক ছিলেন।

জিতেন্দ্রনাথ রানাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন ও সেতারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁহার পিতা রামাচরণ ভট্টাচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন। জিতেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য (১৯১৭-৫২ খ্রী) সেতারে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

দ্র Hirendra Kishore Roy Choudhury, *Musicians of India*, part I, Calcutta, 1929

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জিন জিন শব্দের অর্থ জয়ী বা বিজেতা অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি অরাতিদের যিনি নির্মূল করেন তিনিই জিন। রাগ-দ্বেষাদি: রাগ-দ্বেষ, কষায়, ইন্দ্রিয়পরিষহ, উপসর্গ ও অষ্ট প্রকার কর্ম। জৈনদর্শনে কর্ম দুই প্রকার: ১. ভাবকর্ম ও ২. দ্রব্যকর্ম। রাগ-দ্বেষ বা আসক্তি এবং বিরক্তি ভাবকর্ম। এই ভাবকর্ম বা রাগ-দ্বেষরূপ বিকারের ফলে যে সত্তা-সমন্বিত দ্রব্য (পুদ্‌গল) আকৃষ্ট হইয়া আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তাহা দ্রব্যকর্ম। এই যোগের নামই বন্ধ। রাগ-দ্বেষ-জনিত জীবের প্রত্যেক কায়িক, বাচিক ও মানসিক অধ্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দ্রব্যকর্ম অহরহ আকৃষ্ট হইয়া আত্মার সহিত আসিয়া যুক্ত হয়। আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় বলিয়াই এই দ্রব্যকর্মকে জৈনদর্শনে 'কর্ম' এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এই কর্মই পরবর্তী কালে কার্যকর হইয়া শুভ বা অশুভ ফল দান করে। এই কর্ম আট প্রকারের: জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র ও অন্তরায়। জ্ঞানাবরণীয় কর্ম আত্মার অনন্ত জ্ঞানশক্তিকে ও দর্শনাবরণীয় কর্ম আত্মার সামান্য বোধরূপ দর্শনশক্তিকে আবৃত করে। বেদনীয় কর্ম আত্মার আনন্দময় সত্তা আবৃত করিয়া সুখদুঃখের অনুভব করায় ও মোহনীয় কর্ম আত্মার নিজ স্বভাবের প্রতি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। আয়ুকর্মে আত্মা স্বীয় অক্ষয় অস্তিত্ব আবৃত হওয়ায় নির্দিষ্টকালের জন্য জীব-শরীর ধারণে বাধ্য হয় এবং নামকর্ম আত্মার অরূপত্ব আবৃত করিয়া রূপ পরিগ্রহণ করায়। গোত্রকর্মে আত্মার অগুরুলঘুত্ব গুণ আবৃত হইয়া উচ্চ বা নীচ-কুলে জন্মগ্রহণ নিরূপিত হয় ও অন্তরায়কর্ম আত্মার অনন্ত বীর্য আবৃত করিয়া সাফল্যে বিঘ্ন বা বাধার সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রথম চারিটি কর্ম আত্মার স্বাভাবিক গুণ নষ্ট করে বলিয়া 'ঘাতী' কর্ম এবং শেষ চারিটি কর্ম বিপাকের সময়েও আত্মার স্বাভাবিক গুণ নষ্ট করে না বলিয়া 'অঘাতী' কর্ম বলা হয়। অর্হন, তীর্থংকর ও কেবলীগণ ঘাতী কর্ম নষ্ট করিয়াই কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। তখনও তাঁহাদের অঘাতী কর্ম অবশিষ্ট থাকে। যখন তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকের ঊর্ধ্বভাগস্থিত সিদ্ধশীলায় প্রবেশ করেন তখনই তাঁহাদের অঘাতী কর্ম নষ্ট হয়। জিন অর্থে যদি রাগ-দ্বেষ ও অষ্ট প্রকার কর্মের উপর জয়লাভ বুঝায়, তবে একমাত্র সিদ্ধশীলায় প্রবিষ্ট মুক্ত সিদ্ধাত্মাদেরই জিন বলা যায়; কিন্তু অর্হন, তীর্থংকর বা কেবলীগণও আয়ুশেষে অবশ্যই সিদ্ধশীলায় প্রবেশ করিবেন, এইজন্যই জিন পদবাচ্য হন। কষায়— রাগ-দ্বেষজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ। ইন্দ্রিয়-পরিষহ— শীতোষ্ণাদিরূপ-দ্বন্দ্ব। উপসর্গ— সাধনকালে দেব, মানব ও প্রকৃতির সৃষ্ট পীড়ন ও প্রলোভন। জিন-প্রচারিত ধর্মকে জৈন ধর্ম ও জিন-এর উপাসকদের জৈন বলা হয়। অন্য তৈর্থিকদের মধ্যেও জিন শব্দের ব্যবহার আছে। সর্বদা জয়শীল বলিয়া জিন বিষ্ণুরও একটি অভিধা।

গণেশ লালওয়ানী

জিন২ ক্রোমসোম ও বংশধারা দ্র

জিনেন্দ্রবুদ্ধি পাণিনি দ্র

জিন্নাহ্, মুহম্মদ আলী (১৮৭৬-১৯৪৮ খ্রী) প্রখ্যাত আইনজীবী ও বাগ্মী মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের পুরোধা হিসাবে পরিচিত। জিন্নাহ্-র অগ্রগণ্যতার কারণ এই যে তিনি ছিলেন দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভাষ্যকার, ভারতবিভাগ ও পাকিস্তানপরিকল্পনার রচয়িতা এবং পাকিস্তান ডোমিনিয়নের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। ধনীর সন্তান জিন্নাহ্-র শিক্ষাবস্থা অতিবাহিত হয় প্রধানতঃ এদেশেই, বিলাতের লিংকনস ইন হইতে প্রভূত সাফল্যের সহিত ব্যবহারজীবী হইয়া এদেশে তিনি আইন-ব্যবসায় করিতে থাকেন। যৌবনে মুহম্মদ আলী গোখলে ও টিলকের ন্যায় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে 'ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল'-এর সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌ প্যাক্টের মাধ্যমে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনে যাঁহারা তৎপর হন, জিন্নাহ্ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জিন্নাহ্ দীর্ঘদিন মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাঁহারই নেতৃত্বে দিল্লীতে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগে'র অধিবেশনে ভারতের মুসলমান-সমাজের স্বার্থে চৌদ্দ দফা দাবি উপস্থাপিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মুসলিম অল পার্টিজ কনফারেন্সে জিন্নাহ্ চৌদ্দ দফা দাবির উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় মুসলমানগণের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা ও আসন-সংরক্ষণ, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রিক শাসনতন্ত্র ও প্রদেশে স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জিন্নাহ্-র সভাপতিত্বেই লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান-প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঠিক দুই বৎসর পরে তিনি ইংরেজকে দেশ ভাগ করিয়া দিয়া ভারত ত্যাগ করিতে বলেন। মুখ্যতঃ তাঁহারই নির্দেশে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে প্রত্যাখ্যান

করেন ও ভারতীয় গণপরিষদ-বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল থাকাকালীন (১৯৪৭-৪৮ খ্রী) জিন্নাহ্‌ 'করিডর দাবি' সমুপস্থিত করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর করাচিতে পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নাহ্‌ পরলোকগমন করেন। পাকিস্তানে তাঁহাকে 'কায়েদ-ই-আজম' বা মহান নেতা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অশোক মুস্তাফি

জিপ্‌সী, যাযাবরী ইওরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এবং ইওরোপের সংলগ্ন এশিয়ার কোনও কোনও প্রত্যন্তে (আর্মেনিয়া, সিরিয়া ও তুর্কী দেশে) যে যাযাবরেরা আছে তাহাদের ভাষা এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন স্থানের ভাষার প্রভাবে পড়িয়া অল্প-বিস্তর পৃথক রূপ পাইলেও সে ভাষা যে মূলতঃ ভারতীয় আর্য তাহা অবিসংবাদী। এই যাযাবরেরা ভারতবর্ষ হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে ইরানে যায়, সেখান হইতে এশিয়া মাইনর দিয়া ইওরোপে প্রবেশ করে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে যাযাবরদের পূর্বপুরুষ একাধিক দলে এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল। যাযাবরী ভাষার কয়েকটি লক্ষণ, যেমন পদের আদি অক্ষরে র-ফলা রক্ষণ, ইহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গান্ধারী প্রাকৃতের অনুযায়ী। এই কারণে পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে ইহারা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। কিন্তু অনেক বিষয়ে, বিশেষ করিয়া শব্দগঠন প্রণালীতে এবং মৌলিক শব্দভাণ্ডারে যাযাবরীর আরও বেশি মিল পাওয়া যায় বাংলার মত মগধীয় ভাষায়। ইওরোপ-এশিয়ার সব যাযাবরীই নিজেদের পরিচয় দেয় 'রোম' (পুরুষ) ও 'রোম্‌নি' (নারী) বলিয়া। এই শব্দ দুইটির মূল হইল 'ডোম' ও 'ডোমনী'। ডোম-জাতির পুরাতন ঐতিহ্য বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে রক্ষিত আছে এবং সে ঐতিহ্যের সমর্থন যাযাবরী ভাষায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। এইসব বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে যাযাবরীদের পূর্বপুরুষ পূর্ব ভারতের অধিবাসী ছিল। তাহারা বাহিরে যাইবার পূর্বে বেশ কিছুকাল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ও পূর্ব দক্ষিণ ইরানে রহিয়া গিয়াছিল। সেই সূত্রে তাহাদের ভাষায় গান্ধারীর ছাপ পড়িয়া থাকিবে।

বাংলা প্রভৃতি পূর্ব ভারতীয় আর্য ভাষার সঙ্গে মিল দেখাইবার জন্য কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল:

'মে' (আমি), 'মঞ্জে' (আমাকে, চতুর্থী), 'মেরো' (আমার), 'অমে(ন্‌)' (আমরা), 'অমেঞ্জে' (আমাদের, চতুর্থী), 'অমরো' (আমাদের), 'মানুষ' (পুরুষ), 'মানুষ্‌নি' (নারী), 'মুই' (মুখ), 'নই' (আঙুল, নখ), 'নক' (নাক), 'বই' (বাহু), 'বাসরু' (বাছুর), 'বুক' (বুক), 'শিংগ' (শিঙ), 'ফক (পখ)' (পাখি), 'পেন (পেন)' (বহিন, ভগিনী), 'পেন্থকেরো শাবো' (ভগিনীপুত্র), 'ভোক' (ভুখ), 'ভোখেলো' (ভুখিল, ক্ষুধার্ত), 'দেবেল' (দেবতা, দেবল), 'ত্রিন' (তিন), 'দেবু পনংস' (পনর), 'পানি' (জল), 'শিল' (শীতল), 'তত্তো (তত্তো)' (গরম), 'পিআস' (পান করা, খাওয়া), 'পুংশাব' (জিজ্ঞাসা করা), 'বিকিনাব' (বিক্রয় করা), 'মে নস্তে খাব' (আমি খাইতে পাই না = অস্মে নাস্তি খাদঃ)।

দ্র John Sampson, *The Dialect of the Gipsies of Wales*, Oxford, 1926.

সুকুমার সেন

জিমখানা ইংরেজী জিমনাস্টিক্‌স শব্দের প্রথমাংশ 'জিম' ও ফার্সী 'খানা' শব্দ দুইটির সমন্বয়ে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের প্রবর্তিত জিমখানা শব্দটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের সেনানিবাসগুলিতে অশ্বারোহণ ও দৌড়ঝাঁপ সংসৃষ্ট (অ্যাথলেটিক্‌স) সাহস ও সহনশীলতার পরিচায়ক নানাবিধ ক্রীড়ার যে সকল সমাবেশ হইত তাহা জিমখানা নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। অসামরিক ক্রীড়া প্রদর্শন সমাবেশগুলিও ক্রমশঃ এই নামে পরিচালিত হইতে থাকে এবং বিপজ্জনক ক্রীড়া-কৌশলপ্রদর্শন ব্যতিরেকেও হালকা ধরনের নিছক কৌতূহলোদ্দীপক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও জিমখানার অন্তর্ভুক্ত হয়। শব্দটি ইঙ্গ ভারতীয়দের নিকট এতই আকর্ষক হইয়া ওঠে যে নানাবিধ ক্রীড়া-প্রদর্শন সমাবেশের পরিবর্তে তাহাদের সাধারণ খেলার ক্লাবও এই নাম গ্রহণ করিতে থাকে। ক্রিকেট ও টেনিস খেলার ক্লাব 'বোম্বে জিমখানা' নামকরণ এই রেওয়াজ এরই অভিব্যক্তি। হিন্দু জিমখানা, পার্শী জিমখানা, বেঙ্গল জিমখানা প্রভৃতি ক্রীড়া সংস্থাগুলির নাম ইংরেজী রীতির দেশীয় অনুকরণ।

আমেরিকার কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া সমাবেশগুলি বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে এই নামে পরিচালিত হইতেছে।

পূর্ণেন্দুকুমার বসাক

জিম্‌নাস্টিক্‌স দেহসৌষ্ঠব গ্রীক জাতির মর্যাদার বস্তু ছিল এবং সুঠাম ও সুপটু দেহগঠনকল্পে তাঁহারা বিভিন্ন ব্যায়ামাদির প্রবর্তন করেন। ইংরেজী ভাষায় এই সকল

ব্যায়ামকে 'জিম্‌নাস্টিক্‌স' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গ্রীক জিমনস (*gymnos*) শব্দ ইহার মূল, অর্থ 'নগ্ন'। অর্থাৎ নগ্ন দেহে যে ব্যায়াম করিতে হয় তাহা জিম্‌নাস্টিকস এবং যে পরিবেষ্টিত স্থানে ব্যায়ামগুলি অনুশীলিত হয় তাহা জিম্‌নেসিয়াম। গ্রীক জাতি শরীরচর্চার ব্যাপারকে এতই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছিলেন যে নাগরিকগণ ব্যায়ামাদি ব্যতিরেকেও অন্যান্য কোনও কোনও কার্য এখানে বসিয়া সম্পন্ন করিতে ভালবাসিতেন, সেই কারণে ব্যায়ামাগার ব্যতীত স্নানাগার, সভাকক্ষ, দর্শকমঞ্চ প্রভৃতি ইহার অঙ্গীভূত হওয়ায় এই সকল জিম্‌নেসিয়াম-এর মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তদ্ভিন্ন নানা প্রকারের আলোচনাচক্র জিম্‌নেসিয়াম-এ অনুষ্ঠিত হইত। দেহ-সৌষ্ঠব অর্জনের সকল প্রকার এমন কি চিকিৎসা নির্ভর ব্যায়ামসমূহের ব্যবস্থাও জিম্‌নেসিয়াম এ থাকিত।

রোমান ও পরবর্তী কালে অন্যান্য জাতি দেহচর্চা সম্বন্ধে উৎসাহিত থাকিলেও গ্রীকদের প্রবর্তিত জিম্‌নাস্টিক্‌স পদ্ধতিতে তাঁহারা অনুশীলন করিতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাপোলেঁও (নেপোলিয়ন)-এর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য সুদক্ষ সৈন্যশ্রেণী গঠন করিবার উদ্দেশ্যে জার্মান জাতি গ্রীক-পদ্ধতির জিমনাস্টিক্‌স এর পুনঃ প্রবর্তন করেন এবং জার্মানদের মাধ্যমে জিম্‌নাস্টিক্‌স ক্রীড়া পদ্ধতি ইওরোপের অন্যান্য দেশে ও আমেরিকায় প্রসার লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে সুইডেন-এর শুধু হাতের ব্যায়াম এবং চেকোস্লোভাকিয়ার বহু জনের সমবেত ব্যায়াম 'সোকোল' জার্মান জিম্‌নাস্টিক আন্দোলনের পরিণতি বলা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের স্কুল কলেজে ইংরেজ সরকার জিম্‌নাস্টিক্‌স শিক্ষার প্রবর্তন করেন। অধিকাংশ সরকারি স্কুলেই সে সময়ে জিম্‌নাস্টিক্‌স এর জন্য সংলগ্ন জিম্‌নেসিয়াম থাকিত। এই সময়ে দেহচর্চা বাঙালী কিশোর ও যুবকদের মধ্যে এমনই অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত যে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে ও মফঃস্বলের প্রায় প্রত্যেক শহরে সে সময়ে জিম্‌নাস্টিক ক্লাব গঠিত হইতে আরম্ভ করে। ইহার জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাইলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত বঙ্গ দেশে জিম্‌-নাস্টিক্‌স-চর্চার আদর ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রের জিমনাস্টিক্‌স অত্যন্ত আদৃত ব্যায়াম ছিল এবং এদেশীয় সার্কাসগুলির জিম্‌-নাস্টিক ক্রীড়া-প্রদর্শনকারীর অধিকাংশই মহারাষ্ট্র ও বঙ্গ দেশ হইতে সংগৃহীত হইত।

ইন্টারন্যাশন্যাল জিম্‌নাস্টিক্‌স ফেডারেশন অনুমোদিত নিম্নোক্ত ক্রীড়াগুলিই বর্তমানে জিম্‌নাস্টিকসরূপে গৃহীত : অপেশাদার পুরুষের জন্য ফ্লোর এক্‌সারসাইজ, হরাই-জনটাল বার, প্যারালাল বার, রিঙ, পামেল্‌ড হর্স ও ভল্‌টিং হর্স।

অপেশাদার মহিলার জন্য ফ্লোর এক্‌সারসাইজ, ভল্‌টিং হর্স, বীম ব্যালেন্‌স ও আনইভ্‌ন প্যারালাল বার।

ইন্টারন্যাশন্যাল জিম্‌নাস্টিক ফেডারেশনের আদর্শে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইণ্ডিয়ান জিম্‌নাস্টিক ফেডা-রেশন গঠিত হইলে পর বৎসর মাদ্রাজে সর্বভারতীয় জিম্‌নাস্টিক প্রতিযোগিতায় বঙ্গ দেশ হরাইজনটাল ও প্যারালাল বারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। সেই বৎসরে (১৯৫২ খ্রী) হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় দল প্রেরিত হয় কিন্তু সেই বার অথবা তাহার পরেও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই।

বর্তমানে রাশিয়া, জাপান ও জার্মেনী জিম্‌নাস্টিক্‌স ক্রীড়ায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

... রায়

জিয়াউদ্দীন বরনী ভারতে তুর্ক-আফগান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসাবে জিয়াউদ্দীন বরনী সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বরন প্রদেশে জন্ম (১২৮৫ খ্রী) বলিয়া তাঁহাকে বরনী বলা হয়। তৎকালীন এশিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র দিল্লীতেই তাঁহার শিক্ষালাভ ঘটিয়াছিল। প্রথম জীবনে প্রাচুর্যের মধ্যে কাল যাপন করিলেও বৃদ্ধ বয়সে তিনি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় অসহায় হইয়া পড়েন। মহম্মদ তোগলকের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার কোনও সমালোচনা হয় নাই। কোনও কারণবশতঃ তিনি রাজদরবার হইতে বহিষ্কৃত হন। ফিরোজ তোগলকই তাঁহাকে এই দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার করেন। বিবেকের তাড়নায় আত্মবিশ্লেষণ করিয়া বরনী নিজ নৈতিক ত্রুটিকেই দুর্ভাগ্যের কারণ বলিয়া মনে করেন। অতএব তিনি দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া ভগবান ও সুলতানের নিকট নৈবেদ্যস্বরূপ তাঁহার এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন . প্রথমটি, ভগবানের নিকট পাপস্খালন ও দ্বিতীয়টি সুলতানের প্রসাদভিক্ষা অর্থাৎ দারিদ্র্য হইতে মুক্তি ও শত্রুনিন্দা হইতে অব্যাহতি। ফিরোজের নামানুসারেই তাঁহার গ্রন্থের নাম হইয়াছিল 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'। যখন তিনি এই গ্রন্থ শেষ করেন (১৩৫৮-৫৯ খ্রী) তখন তাঁহার বয়স ৭৪।

ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে বরনীই সর্বপ্রথম ভারতের

ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতা মুইদ্দুলমুল্‌ক ও পিতৃব্য আলাউলমুল্‌ক উভয়েই খিলজী দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। অন্যান্য রাজকর্মচারী ও আমীর খুসরৌ এর সহিতও তাঁহার যথেষ্ট সংস্রব ছিল। সুতরাং সমসাময়িক ঘটনা সংগ্রহ করা ও ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করার তাঁহার প্রচুর সুযোগ ও সুবিধা ছিল। কিন্তু তিনি ইহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি খিলজী ও তোগলক যুগের আট জন সুলতানের (বলবন, কায়কোবাদ, জালালুদ্দীন, আলাউদ্দীন, কুতুবুদ্দীন মবারক শাহ, গিয়াসুদ্দীন, মহম্মদ ও ফিরোজ) সমসাময়িক ছিলেন। বিশেষতঃ আলাউদ্দীন হইতে ফিরোজের রাজত্বের প্রথম ৬ বৎসর পর্যন্ত ঘটনাবলীর তিনি প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন।

প্রথমে বরনী সৃষ্টির প্রথম অর্থাৎ আদম হইতে তাঁহার কাল পর্যন্ত এক বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু পরে সিরাজের বর্ণিত ঐতিহাসিক কাহিনী যেখানে শেষ হইয়াছিল সেইখান হইতেই তিনি বিবরণ শুরু করেন, অর্থাৎ বলবন হইতে ফিরোজের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরের ইতিহাস রচনা করেন। বস্তুতঃ বরনীর গ্রন্থ মিনহাজের ইতিহাসেরই 'প্রসারণ'।

বরনীর পিতা শেখ ও মাতা সৈয়দ ছিলেন। বরনী নিজে ছিলেন শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার বিশিষ্ট বন্ধু। সুতরাং তিনি ধর্ম ও ঈশ্বরদর্শনবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইতিহাস দর্শন এই ধর্মবোধের উৎস হইতে নিঃসৃত। তাঁহার নিকট ইতিহাস ছিল ধর্মবিদ্যা, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রকাশের বাহনমাত্র, মানবকার্যের আলোচনা নহে। বরনী গল্প লেখকের মতই লিখিয়াছেন, প্রামাণিক তথ্যের আলোচনা বা বিবেচনা করেন নাই। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ কিছু অপরের মুখে শোনা কথা ও কিছু নিজের পর্যবেক্ষণের ফল। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তিনি সামগ্রিক রূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার কালক্রম (ক্রোনলজি) সন্তোষজনক নহে, তবে খিলজীদের রাজত্বের ঘটনাবলীর কালক্রম অপেক্ষাকৃত ভ্রমশূন্য। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তিনি তাঁহার গ্রন্থে সতেজ, তীক্ষ্ণ ও নির্ভীকভাবে স্বীয় ইতিহাস দর্শন প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা তাঁহাকে কেবল বিবরণ ও পুরাবৃত্তের সংকলকশ্রেণী হইতে অনেক ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিয়াছে। ইতিহাসেই তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল এবং ইতিহাসকে তিনি বিজ্ঞান বলিয়া, এমন কি সকল বিজ্ঞানের রানী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে ঐতিহাসিককে সত্যবাদী, সৎ ও নির্ভীক হইতে হইবে, শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বরের নিকট তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

মধ্যযুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত তিনি কেবল রাজদরবার ও সামরিক অভিযানের বিবরণই লেখেন নাই, সুলতানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থান, প্রশাসন-ব্যবস্থা ও বিচারপদ্ধতির কথা, তৎকালীন সাধুসন্ত, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, কবি, চিকিৎসক ও জ্যোতিষীদের নাম প্রভৃতি লিখিয়াছেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই খিলজী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সাহিত্যে নিজের অবদানসম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। 'তারিখ ই-ফিরুজশাহী' ব্যতীত বরনী অন্যান্য কয়েকটি পুস্তকেরও রচয়িতা। তাঁহার 'ফতোয়া ই জাহান্দারী' আদর্শ মুসলমান নৃপতির কর্তব্যের নির্দেশ সংহিতা ও রাজনীতি বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিকের পক্ষে যে কর্তব্যের আদর্শ তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বরনী বিচ্যুত হইয়াছেন। বর্তমান যুগের মাপকাঠিতে বিচার করিলে বরনীর রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইবে। তবে তুর্ক-আফগান যুগে সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে বরনীর গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হয়।

দ্র H M Elliot and J Dowson, *History of India as told by its own Historians*, vol 3, Allahabad, 1867-77, P Hardy, *Historians of Medieval India*, London, 1960, J N Sarkar, 'Ideas of History in Medieval India', *Quarterly Review of Historical Studies*, vol IV, nos. 1-2, Calcutta, 1964-65

নীহাররঞ্জন সরকার

জিরা মশলা দ্র

জিহ্বা মুখ্য স্বাদেন্দ্রিয়। খাদ্য চিবাইতে ও গিলিতে এবং গো মহিষাদির ক্ষেত্রে, খাদ্য গ্রহণ করিতেও ইহা সাহায্য করে। তাহা ছাড়া কথা বলাও বহুলাংশেই জিহ্বার উপর নির্ভর করে।

জিহ্বা পেশীবহুল অঙ্গ। ইহার পশ্চাদ্ভাগ গলবিলে (ফ্যারিংস) অবস্থিত ও হায়োইড অস্থির সহিত সংযুক্ত, অগ্রভাগ মুক্ত ও মুখগহ্বরে অবস্থিত। জিহ্বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দ্বারা আবৃত, উপর পৃষ্ঠের ঝিল্লিতে বহু ক্ষুদ্র শিখরাকৃতি পিডকা (প্যাপিলা) থাকায় উহা অমসৃণ। অনেক পিডকার গাত্রে কয়েকটি গোলাকৃতি স্বাদকোরক

(টেস্‌ট্‌বাড) থাকে। প্রতিটি স্বাদকোরকের মধ্যে কয়েকটি স্বাদকোষ দেখা যায়। স্বাদকোরকের মুখে থাকে একটি ছিদ্র, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান লালায় দ্রবীভূত হইয়া এই ছিদ্রপথে স্বাদকোরকে প্রবেশ করে ও স্বাদ-কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে। তখন স্বাদকোষগুলি হইতে আবেগ (ইম্‌পাল্‌স) সপ্তম ও নবম করোটিক নার্ভের দ্বারা গুরুমস্তিষ্কের স্বাদকেন্দ্রে পৌঁছিয়া স্বাদের অনুভূতি জাগায়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে গুরুমস্তিষ্কের যে অংশে মুখ ও জিহ্বার স্পর্শ, উত্তাপ, ব্যথা প্রভৃতি অনুভূতির কেন্দ্র অবস্থিত, স্বাদকেন্দ্রের অবস্থিতিও তাহার নিকটেই।

জিহ্বা ব্যতীত গলবিল ও মুখের অন্যান্য অংশেও স্বাদকোরক থাকে, এই সকল স্বাদকোরক হইতে সংবেদন দশম করোটিক নার্ভ দিয়া স্বাদকেন্দ্রে যায়।

স্বাদ মুখ্যতঃ রাসায়নিক অনুভূতি। মিষ্ট, অম্ল, লবণ ও তিক্ত স্বাদকে প্রাথমিক স্বাদ বলা হয়। প্রাথমিক চার প্রকার স্বাদ গ্রহণের জন্য চারি প্রকার স্বাদকোরক জিহ্বার বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো আছে বলিয়া বিশ্বাস। জিহ্বাগ্রে মিষ্ট ও লবণ, জিহ্বার পার্শ্বদেশে অম্ল ও পিছনের দিকে তিক্ত স্বাদ বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। একাধিক প্রাথমিক স্বাদের সংমিশ্রণে বহু রকম স্বাদের অনুভূতি জন্মায়। একই পদার্থ দুই প্রকার স্বাদকোরককে উদ্দীপিত করিয়া তিক্তমধুর বা অম্লমধুর স্বাদের অনুভূতি ঘটাইতে পারে। অনেকে ক্ষার স্বাদকে পৃথক একটি স্বাদ বলিয়া মনে করেন।

ঘ্রাণের সহিত স্বাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অনেক সময়েই এই দুই অনুভূতিকে পরস্পর হইতে পৃথক করা কঠিন। এইজন্যই ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক বন্ধ হইয়া গেলে খাদ্যের স্বাদও যেন কমিয়া যায়।

দ্র C H Best & N B Taylor, *The Physiological Basis of Medical Practice*, Baltimore, 1961

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়
অসিতকুমার চৌধুরী

জীদ (ঝীদ), আঁদ্রে পোল গিয়োম (১৮৬৯-১৯৫১ খ্রী) প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পারী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আইনবিদ ও অধ্যাপক ছিলেন। সে সময়ের অন্যতম প্রতিভাবরূপে বিস্তীর্ণ খ্যাতির অধিকারী আঁদ্রে জীদ সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৪৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নাটক, কবিতা, উপন্যাস, জীবনী, রম্যরচনা, অনুবাদ ইত্যাদিতে পঞ্চাশেরও অধিক-সংখ্যক গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। তন্মধ্যে *Les Nourritures terrestres* (১৮৯৭ খ্রী), *La Porte étroite* (১৯০৯ খ্রী) *La Symphonie pastorale* (১৯১৯ খ্রী) এবং *L' Immoraliste* (১৯০২ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। আত্মজীবনীমূলক *Si le grain ne meurt* (১৯২৪ খ্রী) ও *Les Faux monnayeurs* (১৯২৫ খ্রী) গ্রন্থ ইঁহার বহু আলোচিত রচনাশৈলীর— যাহাতে তিনি নানারূপ কাব্যময় ও নাটকীয় ভঙ্গীতে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন – তাহার উদাহরণ-স্বরূপ। ইঁহার রচনার ধারা প্রধানতঃ প্রটেস্টান্ট নীতিবোধ বর্জন ও সমকামিতা এই দুই বিষয়ে বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

পারীতে সমকালীন সাহিত্যিক তথা সমগ্র সমাজের উপর জীদের ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। ইহা তাঁহার সমাজের সর্বস্তরে অবাধ বিচরণের ক্ষমতা ও *La Nouvelle Revue Francoise* নামক পত্রিকা-পরিচালনার ফল। তৎকৃত 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' ও 'হ্যামলেট' এর অনুবাদ ও দিনলিপি বিদগ্ধজনের আনন্দদায়ক। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইলেও তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্তনশীলতা অনেক সময়ে বিতণ্ডা ও নৈরাশ্যের কারণ হইয়াছে। জীদ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার সবকিছুরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, কিন্তু স্বদেশে ফিরিয়া তাহার পরেই অনুরূপ উৎসাহ সহকারে সেই মত খণ্ডন করিয়াছিলেন (*Le Retour de l' URSS*, ১৯৩৬ খ্রী)।

পাবনা দাশ

জীন্‌স, জেম্‌স হপ উড (১৮৭৭-১৯৪৬ খ্রী) গণিতজ্ঞ, পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও লেখক। ইংল্যাণ্ডের সাউথপোর্টে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জীনস জন্মগ্রহণ করেন। জীনস কেমব্রিজে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় র‍্যাংলার হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ট্রিনিটির ফেলো নিযুক্ত হন। জীনস কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর আমেরিকার প্রিন্স্‌টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন তিনি গবেষকরূপে মাউণ্ট উইল্‌সন মানমন্দিরের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং স্মিথ প্রাইজ, অ্যাডাম প্রাইজ, ফ্রাঙ্কলিন প্রাইজ এবং আরও বহু সম্মান লাভ করেন। তাঁহাকে বহু দেশে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান জানাইয়া সম্মানিত করা হয়। মাত্র আঠাশ বৎসর বয়সে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন ও পরে রয়্যাল সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক হন। জীনস রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিকের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। জীনসের মৌলিক অবদান অসংখ্য।

পদার্থবিদ্যা, ব্যোমবিজ্ঞান ও আরও নানা ক্ষেত্রে তিনি গণিতকে সফলভাবে প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানে ঐ শাস্ত্রের সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই কাজে তাঁহাকে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী পিথাগোরাসের সহিত তুলনা করা হয়। গ্যাস-অণুর গতির ক্ষেত্রে তিনি ম্যাক্সওয়েলের বণ্টনসূত্র সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। বিকিরণ ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের তিনি আঙ্কিক বিশ্লেষণ করেন, সৌরজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে লাপ্লাস ও কান্টের তত্ত্বের ভুল প্রমাণ করেন এবং একটি নূতন তত্ত্বকে গণিতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা দেন। জীন্‌সের মতানুযায়ী অন্য কোনও নক্ষত্র সূর্যের নিকট দিয়া যাইবার সময় সূর্যদেহে যে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই শক্তিতেই সূর্যদেহের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞান গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেও জীন্‌স বিখ্যাত। তাঁহার রচনাগুলি অধিকাংশ স্থানে গণিতবর্জিত, সহজবোধ্য, হৃদয়গ্রাহী ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম— 'অ্যাটমিসিটি অ্যাণ্ড কোয়ান্টা' (১৯২৬ খ্রী), 'দি ইউনিভার্স অ্যারাউণ্ড আস' (১৯২৯ খ্রী), 'দি মিস্টেরিয়াস ইউনিভার্স' (১৯৩০ খ্রী), 'দি স্টার্স ইন দেয়ার কোর্সেস' (১৯৩১ খ্রী), 'দি নিউ ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ সায়েন্স' (১৯৩৩ খ্রী), এবং 'থ্রু স্পেস অ্যাণ্ড টাইম' (১৯৩৪ খ্রী)। করোনারি থ্রম্বোসিসের আক্রমণে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমিতাভ সেন

জীব, জীবাত্মা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। দেহবিশিষ্ট আত্মার নাম জীব। দেহেন্দ্রিয়াদি-বর্জিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অসীম আত্মার নাম পরমাত্মা, ব্রহ্ম। জীব বা জীবাত্মা জড়দেহ ও ইন্দ্রিয়ের চেতনাসম্পাদক, দেহাভিমানী চেতন পদার্থ। জীবাত্মা স্বরূপতঃ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহংকার হইতে ভিন্ন হইলেও সংসারদশায় দেহাদির সংযোগে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সংসারদশায় জীবাত্মায় নানাবিধ দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক ধর্ম উপচরিত হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ -ভেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবের বিভিন্ন অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। জ্ঞান, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি মানসিক গুণগুলির আশ্রয় জীবাত্মা। জড় পদার্থে এই সকল গুণ থাকে না। অদ্বৈতবেদান্তমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, বৈষ্ণবমতে জীবাত্মা স্বরূপতঃ অণুচৈতন্য ও বহু। 'আত্মা' দ্র।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

জীবক বুদ্ধের সমসাময়িক একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক। পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে জীবকের বহুমুখী কর্মপ্রতিভার উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে বিম্বিসারের রাজত্বকালে তিনি রাজগৃহের বারবনিতা শালবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও আবর্জনাস্তূপে পরিত্যক্ত হন। রাজকুমার অভয় (মতান্তরে বিম্বিসার স্বয়ং) তাঁহাকে উদ্ধার ও লালন পালনের ব্যবস্থা করেন। এইজন্য জীবককে কুমারভৃত্য (কোমার ভচ্চ) বলা হইত। অন্যমতে, কুমারতন্ত্র বা শিশু চিকিৎসায় পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম হইয়াছিল।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জীবক তক্ষশিলায় গিয়া আচার্য আত্রেয়ের নিকট ৭ বৎসর ধরিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষান্তে তাঁহার এই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, ভেষজ অনুপযোগী কোনও বৃক্ষ বা লতাগুল্ম পৃথিবীতে নাই।

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া জীবক অচিরেই একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক, অস্ত্রোপচারক ও ভেষজবিশারদরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন রোগ ও পায়ের ক্ষত (দেবদত্ত কৃত) তিনি অতি সহজ উপায়েই আরোগ্য করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া জীবক ভিক্ষুদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এমন কি স্বীয় আম্রবনে প্রভূত ধনব্যয়ে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। রুগ্‌ণ ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাঁহার দেওয়া বিনয় নিয়ম বহির্ভূত অনেক বিধান বুদ্ধ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালে জীবক রাজা অজাতশত্রুর মন্ত্রী এবং প্রধান উপদেষ্টারূপেও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই চিন্তাদগ্ধ অজাতশত্রুকে বুদ্ধসমীপে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার চিত্তকে শান্ত করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ জীবককে সর্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ উপাসক আখ্যা দিয়াছিলেন।

দ্র অঙ্গুত্তরনিকায় টীকা, ১ম, বিনয় পিটক, ১ম, ধম্মপদ-টীকা, ২য়, অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম, মজ্‌ঝিমনিকায়, ১ম, দীঘনিকায় টীকা, ১ম, মজ্‌ঝিমনিকায় টীকা, ২য়, Nalinaksha Dutta, *Gilgit Manuscripts*, vol. III, Calcutta.

সুকমল চৌধুরী

জীবগোস্বামী (আনুমানিক ১৫১০ খ্রী - আনুমানিক ১৬০০ খ্রী) সনাতন ও রূপ গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা

বল্লভের (নামান্তর অনুপম মল্লিক) জ্যেষ্ঠ পুত্র। রূপ ও সনাতন যখন গৌড় সুলতানের চাকুরি এবং সংসার ত্যাগ করিয়া যান তখন জীব গোস্বামী শিশু ছিলেন। বল্লভের মৃত্যু হয় ১৫১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে চলিয়া গেলে জীব গৌড়ে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। বিবাহের বয়স হইলে ইনি নিত্যানন্দের আদেশ লইয়া বৃন্দাবনে জ্যেষ্ঠতাতদের নিকট চলিয়া আসেন। রূপ গোস্বামী তাঁহাকে দীক্ষা দেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ রচনায় জীব সাহায্য করিতেন। পাণ্ডিত্যে ও বৈষ্ণবতায় তাঁহার সমধিক প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সনাতন ও রূপের তিরোভাবের পর জীবগোস্বামীই বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রধান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব স্বীকৃত অধিনায়ক পরিগণিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমূর্তির বামে রাধামূর্তি বসাইয়া যুগল-রূপের পূজা প্রবর্তন জীবের বিশেষ আগ্রহ ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যে শেষ শাস্ত্রকর্তা জীবগোস্বামী ভাগবতের এবং ব্রহ্মসংহিতার ও রূপ গোস্বামীর ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকা লিখিয়াছিলেন এবং প্রভূত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক ছয়টি গ্রন্থ ('ষট্‌সন্দর্ভ' নামে খ্যাত)—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ও পরমাত্মসন্দর্ভ রচনা করেন। গদ্যে ও পদ্যে লেখা গোপালচম্পূ বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে কৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আছে। রচনাকাল পূর্ববিভাগ ১৬৪৫ সংবতে (১৫৮৮ খ্রী), উত্তর বিভাগ ১৬৪৯ সংবতে (১৫৯২ খ্রী)।

বৈষ্ণব পরিবারের বালকবালিকার অধ্যয়নের জন্য ইনি নূতনভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, নাম 'হরিনামামৃত'। ইহার সূত্র ও বৃত্তি সর্বত্র বিষ্ণু-কৃষ্ণ-নারায়ণ-হরি-কেশব-গোপাল-মধুসূদন ইত্যাদি ভগবৎ-নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জীব অনেক স্তোত্র ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের যাবৎ রচনার মত ইঁহারও সব লেখা সংস্কৃতে।

সুকুমার সেন

জীবন জীবনের সর্বজনগ্রাহ্য ও অবিসংবাদী সংজ্ঞা দেওয়া আজও সম্ভব হয় নাই। জগতে জড় ও জীব পাশাপাশি রহিয়াছে। যাহাদের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ নাই, তাহারা জড়, নির্জীব, অসাড় ও অনড়। অন্য দিকে যাহাদের জীবন আছে তাহাদের মধ্যে প্রাণের নিত্যস্ফুরণ ঘটে; তাহারা চলিষ্ণু, পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মূলতঃ কতকগুলি জৈবগুণের উপস্থিতি বা অভাবের দ্বারা জড় ও জীবের মধ্যে প্রভেদ সূচিত হয়। প্রাণধারণের জন্য জীবদেহে নানাবিধ বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজ্‌ম্) ঘটিয়া থাকে। আহার্য গ্রহণ করিয়া জীব নিজ দেহের পুষ্টি সাধন করে, শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা অক্সিজেন লইয়া তাহার সাহায্যে দেহে শক্তি উৎপাদন করে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বাহির করিয়া দেয়, চলৎশক্তির সাহায্যে স্থানপরিবর্তন করিয়া আহার সংগ্রহ ও দেহরক্ষা করে, খাদ্যবস্তুর সাহায্যে নূতন নূতন দেহকলা (টিস্যু) গড়িয়া তুলিয়া স্বীয় দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, প্রজননের দ্বারা আপনার বংশবৃদ্ধি করে, বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসের জন্য অভিযোজন (অ্যাডাপ্‌টেশন)-এর সাহায্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটায়, অবশেষে জীবনের লক্ষণ হারাইয়া পুনর্বার জড়পদার্থে পর্যবসিত হয়। এ সকল গুণ জীবনের বিশেষ লক্ষণরূপে পরিগণিত হয়, জড়ের মধ্যে এই সকল লক্ষণ দেখা যায় না।

আপাতপার্থক্য সত্ত্বেও, চূড়ান্ত দৈহিক বৈষম্যের মধ্যেও প্রতিটি জীবের জীবনের মূল রাসায়নিক পদার্থ হইল নিউক্লিইক অ্যাসিড। এই নিউক্লিইক অ্যাসিড দিয়া গঠিত 'জিন' নামক বস্তু প্রতিটি জীবদেহের মর্মমূলে বর্তমান। নিউক্লিইক অ্যাসিডই জীবনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। জীবনের স্ফুরণ, জীবনের আকৃতি-প্রকৃতি ও দোষ-গুণ, বংশপরম্পরায় বিভিন্ন গুণের উত্তরাধিকার সবই কিছুই নির্ভর করে জিনগুলির উপর ('ক্রোমোসোম' দ্র)। কখনও কখনও অকস্মাৎ জিনের রূপান্তর (মিউটেশন) ঘটে, ফলে জীবের আকৃতি প্রকৃতিতে নূতন বৈচিত্র্য আসে, নূতন জীব সৃষ্ট হয়।

জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, বহু যুগ পূর্বে কতকগুলি জৈব রাসায়নিক পদার্থের অপূর্ব আকস্মিক মিলনে পৃথিবীতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটে। তখন পৃথিবীর অবস্থা আজকার মত শান্ত ছিল না, উষ্ণতা ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ ছিল অবিশ্রান্ত। তাহারই মধ্যে অবিরাম গতিতে বিভিন্ন রাসায়নিক অণু-পরমাণুর মিলন ও বিয়োজন চলিয়াছিল। অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে রাসায়নিক পদার্থের আকস্মিক কোনও একটি সমন্বয়ে এমন এক পদার্থের সৃষ্টি হয় যাহা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থকে প্রভাবিত করিয়া নিজের অনুরূপ পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে— জীবনের উদ্‌বোধন ঘটিল, অর্থাৎ জড় পদার্থই বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়া জীবনময় হইয়া উঠিল।

সেই আদি সনাতন প্রাণকণা ক্রমে অগণিত জীবের সৃজন করিয়াছে, বিচিত্রভাবে বিবিধ আকারে বিভিন্নরূপে যুগযুগান্ত অতিক্রম করিয়া বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। অতীতের সেই প্রথম প্রাণের উৎস হইতে ক্রমে অসংখ্য

উন্নত ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকারপ্রাপ্তিকে জীবনের অভিব্যক্তি বলা হয় ('অভিব্যক্তিবাদ' দ)।

জড় হইতে জীবনের উৎপত্তির এই মতবাদের একটি প্রমাণ জড় ও জীবের মাঝামাঝি প্রকৃতির বিচিত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস ('ভাইরাস' দ্র)। ইহারা প্রাণময় অণু মাত্র, নিউক্লিওপ্রোটিনের অণু দ্বারা ইহারা গঠিত। জড় ও জীব দুই অবস্থাতেই ইহারা বিরাজ করিতে পারে। এমন কি অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের মত ইহাদের কেলাসিত (ক্রিস্ট্যালাইজ্‌ড) করাও সম্ভব, ভাইরাসের নিউক্লিওপ্রোটিনের এই কেলাসগুলি উপযুক্ত পরিবেশ পাইলেই আবার বংশবৃদ্ধি করিতে শুরু করে, জীবনের যাত্রা আবার আরম্ভ হইয়া যায়।

অদ্যাবধি প্রায় ৩৫০০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ১২০০০০০ প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান মিলিয়াছে, ইহাদের মধ্যে প্রায় ২০০০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ সপুষ্পক এবং প্রায় ৭৫০০০০ প্রজাতির প্রাণী পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোনও এক জীববিজ্ঞানীর মতে, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং প্রাণী বা উদ্ভিদ কোনও দলেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব— সব মিলাইয়া প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩০০০০০০০ হইতে পারে।

প্রত্যেক জীবের চতুঃপার্শ্বিকের সঙ্গে মানাইয়া চলিবার এক অমোঘ ক্ষমতা বর্তমান, ইহাকেই অভিযোজন বলে। এই ক্ষমতার বলেই প্রয়োজনমত জীবের আকৃতি-প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। স্থানকালপাত্রভেদে এই ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এই ক্ষমতার আধিক্য বা অভাবে পৃথিবীতে বহু জীবের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে। নূতন জীবের আবির্ভাবের পিছনেও থাকে নূতন অভিযোজনশক্তি।

কোনও একটি বিশেষ জীবের ভবিষ্যৎ শুধু তাহার নিজের আচরণ বা অভিযোজনক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, অন্যান্য প্রজাতির জীবের সঙ্গেও উহার নিবিড় সংযোগ ও সম্বন্ধ থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য ও স্থানের অধিকার লইয়া নিত্য দ্বন্দ্ব চলে, সেই প্রতিযোগিতা হইতেই জীবের ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয়। এই জীবনযুদ্ধে একের সহিত অন্যকে এক প্রাকৃতিক নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হয়, জীবনসংগ্রামে যে জীবের সামর্থ্য সর্বাধিক, প্রকৃতি যেন তাহাকেই জীবনের অধিকার প্রদান করে (ন্যাচরল সিলেকশন), অক্ষম জীবের অস্তিত্বের উপায় নাই।

বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে জড় পদার্থ হইতে জীবন সৃজনের চেষ্টা চলিতেছে। নিষ্প্রাণ পদার্থ হইতে যেদিন জীবনের অভিষেক সম্ভব হইবে, সেদিন ভাইরাস জাতীয় কোনও প্রাথমিক পর্যায়ের জীবই সৃষ্ট হইতেও পারে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রজননশক্তি বিশিষ্ট নিউক্লিইক অ্যাসিড ঘটিত পদার্থের সার্থক সৃষ্টি হয়ত বা কোনও দিন সম্ভব হইবে।

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

জীবনবীমা বীমা দ

জীবনযাত্রার মান কোনও দেশের মানুষ কিরূপ খাইতে পরিতে পায়, কিরূপ গৃহে বাস করে, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ প্রমোদ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ কতদূর লাভ করে, জীবনযাত্রার মান বলিতে এই সমস্তই বুঝায়। দেশের মাথা-পিছু আয় তাহার জীবনযাত্রার মানের সূচক। ভারতের গড় জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। পৃথিবীর কয়েকটি সমৃদ্ধ দেশের সহিত তুলনায় ভারতের মাথা-পিছু আয় নিতান্তই অল্প।

১৯৬৫ সালের মাথা-পিছু আয় [illegible]	
দেশ	
ভারতবর্ষ	৬৯
জাপান	১৮৭
আর্জেন্টিনা	৩২০
পশ্চিম জার্মানী	৫[illegible]
ফ্রান্স	৭৩০
যুক্তরাজ্য	৭৭৮
ক্যানাডা	১২২৬
যুক্তরাষ্ট্র	১৮৬৪

ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর হিসাবমত ভারতে মাথা-পিছু বাৎসরিক আয় ১৯২৫-২৯ সালে ছিল ৭৮ টাকা, ১৯৩১-৩২ সালে ৬৫ টাকা এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ১১৪ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে এ আয় ছিল ২৫৫.৪ টাকা এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ২৮৮.৪ টাকা (উভয়ই ১৯৪৮-৪৯ এর দ্রব্যমূল্য অনুসারে)। ১৯৫১-৬০ দশকে মাথা-পিছু আয়ের গড়পড়তা বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩ শতাংশ। গত এক শতাব্দীতে ঐ হার ছিল ০.৪ শতাংশ।

ভারতে আয়বণ্টনের বৈষম্য সুগভীর বলিয়া মাথা-পিছু আয়ও দেশের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মানের সঠিক নির্দেশক নয়। মোট জনসংখ্যার যে ৭০ শতাংশেরও অধিক কৃষির উপরে নির্ভরশীল তাহাদের মাথা-পিছু আয় ১৯৫৯-৬০ সালে ছিল প্রায় ২১৫ টাকা, অর্থাৎ সমগ্র দেশের মাথা পিছু আয় অপেক্ষা প্রায় ২৫ শতাংশ কম। ইহাদের মধ্যে আবার যাহারা কৃষি-

শ্রমিক— মোট গ্রামীণ লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ —তাহাদের গড়পড়তা মাথা-পিছু বাৎসরিক আয় ১০০ টাকার মত ছিল।

ভোগ্যপণ্যের উপর মাথা-পিছু ব্যয় ১৯৩১-৩২ সালে ছিল ৭১·৮ টাকা, ১৯৪০-৪১ সালে ৬৮·৩ টাকা (উভয়ই ১৯৩৮-৩৯-এর দ্রব্যমূল্যে), ১৯৫০-৫১ সালে ২১৯ টাকা এবং ১৯৬০-৬১ সালে ২৪৬ টাকা (উভয়ই ১৯৪৮-৪৯-এর দ্রব্যমূল্যে)। ১৯৫২-৫৩ সালে মোট লোকসংখ্যার অর্ধেকের (১৯৫৬-৫৭ সালে ৬৬ শতাংশের) মাথা-পিছু ব্যয় ছিল বৎসরে ২০১ টাকার নীচে। মাথা-পিছু ব্যয় যাহাদের বৎসরে ৫০০ টাকার উপরে তাহারা ১৯৫২-৫৩ সালে ছিল মোট লোকসংখ্যার ৮ শতাংশ, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪ শতাংশ। ১৯৫৬-৫৭ সালে খেতমজুরদের মাথা-পিছু ভোগব্যয় ছিল ১৩৭ টাকা (দৈনিক ব্যয় ছয় আনা)।

মাথা-পিছু আয় বা ব্যয়ের মুদ্রামূল্য হইতে জীবনযাত্রার প্রকৃত মান নির্ধারণে অসুবিধা আছে, কেননা ভোগ্যপণ্যের মূল্য পরিবর্তনশীল। ভারতে গত বারো বৎসর ধরিয়া ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়াছে। সাধারণের ভোগ্যপণ্যের মূল্যাস্তর ১৯৪৯ সালে ১০০ ধরিলে ১৯৬০-৬১ সালে উহা ১২৭-৫ দাঁড়ায় এবং ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে দাঁড়ায় ১৫৯।

ভারতবর্ষে দৈনিক মাথা-পিছু খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১৮০০, ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ২১০০ ('খাদ্য' দ্র)। দৈনিক মাথা-পিছু দুগ্ধ পানের পরিমাণ (দুগ্ধজাত দ্রব্যসহ) ১৯৫১ সালে ছিল ·১৩৫১৮৪ লিটার (৪·৭৬ আউন্স), ১৯৬০-৬১ সালে ·১৩৯১৬ লিটার (৪·৯ আউন্স), অথচ পুষ্টির জন্য দুগ্ধের নিম্নতম প্রয়োজনের মাত্রা দৈনিক মাথা-পিছু ২৮৪ লিটার (১০ আউন্স)। বাৎসরিক মাথা-পিছু বস্ত্রের পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সালে ছিল ১৬ গজ, ১৯৫০-৫১ সালে ৯·২ গজ, ১৯৬০-৬১ সালে ১৫·৫ গজ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গৃহসমস্যাও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কেবল নগরাঞ্চলেই ১৯৫১ সালে আরও অন্ততঃ ২৫ লক্ষ গৃহের প্রয়োজন ছিল, ১৯৬১ সালে এই অভাবের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ও চিকিৎসা-ব্যবস্থাও নিতান্তই স্বল্প। এত বৃহৎ একটি দেশে হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১১৩০০০, ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ১৮৬০০০ (প্রতি ২৩৬০ জনে ১টি শয্যা), কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ৫৬০০০, ১৯৬০-৬১ সালে ৭০০০০ (প্রতি ৬২৭০ জনে ১ জন ডাক্তার)।

পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে বটে কিন্তু মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি এখনও নিরক্ষর।

বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের উপর ব্যয়ের বণ্টন হইতে দেখা যায়, মোট ব্যয়ের বেশি অংশ খাদ্যসংগ্রহেই ব্যয়িত হয়, ইহা আমাদের দারিদ্র্যের পরিচায়ক। ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষ, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ্যব্যয়ের বণ্টনপ্রণালী এইরূপ ছিল :

দ্রব্য	মোট ভোগ্যব্যয়ের শতাংশ		
	ভারতবর্ষ (১৯৩৮-৩৯)	যুক্তরাজ্য (১৯৩৮)	যুক্তরাষ্ট্র (১৯৩৮)
খাদ্য	৬০·৫	২৯·১	২২·৩
বস্ত্র	৯·৮	৯	৮·৫
গৃহ	৬	১১·৮	১৬·১
তামাক, পানীয় দ্রব্য ইত্যাদি	৫·৮	১০·৭	৭·২
আমোদ-প্রমোদ ও অন্যান্য	৬·৯	১২·৯	১৯·২

আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় ভারতে অদূর ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান কিছু বৃদ্ধি পাইবে। গত দশকের অভিজ্ঞতা হইতে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলিবে।

১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মোট ভোগ্যব্যয়ের বণ্টন-প্রণালী ছিল এইরূপ: খাদ্যের উপর ব্যয়িত হইয়াছিল গ্রামাঞ্চলে ৬৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬১ শতাংশ, বস্ত্রের উপর ব্যয়িত হইয়াছিল গ্রামাঞ্চলে ৮ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৬·২ শতাংশ, জ্বালানি ও আলোকের উপর ব্যয়িত হইয়াছিল গ্রামাঞ্চলে ৬ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৬·৩ শতাংশ ইত্যাদি। ঐ বৎসর খেতমজুরদের ভোগব্যয়ের ৮৭ শতাংশ খাদ্যের উপর ব্যয়িত হইয়াছিল। ভারতের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান এত নিম্নে যে বলা চলে যে তাহারা কায়ক্লেশে বাঁচিয়া আছে মাত্র। হয়ত বা তাহারা অনশনের কষ্ট ভোগ করিয়াই বাঁচিয়া আছে। তবু গড় হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৬১ দশকে মাথা-পিছু ভোগব্যয় ২½ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ১·১ শতাংশ হারে বাড়িয়াছিল।

দ্র R C. Desai, *Standard of Living in India and Pakistan, 1931-32 to 1940-41*, Bombay, 1953; Planning Commission, Government of India, *Third Five Year Plan*, New Delhi, 1961; Government of India, *Report of the Committee*

on Distribution of Income and Levels of Living, part I, New Delhi, 1964.

প্রণবকুমার বর্ধন

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪ খ্রী) ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৬ ফাল্গুন) পূর্ব বঙ্গের বরিশাল শহরে জন্ম। পিতা সত্যানন্দ দাশ, মাতা কবি কুসুমকুমারী দাশ। জীবনানন্দ এম. এ. পাশ করার পর বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত (অধুনালুপ্ত) দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগেও কিছুদিন কাজ করিয়াছেন।

জীবনানন্দের কবিকৃতি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। যুগ লক্ষণ তাঁহার কাব্য ভাবনাকে চিহ্নিত করিয়াছে, বিশ শতকীয় মানবতার বিপন্ন মুখচ্ছবি তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত। বর্তমান যুগে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক দারুণ শূন্যতা দেখা দিয়াছে। সেই শূন্যতা ও তজ্জনিত বেদনাবোধ জীবনানন্দ বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্যক্ত করিতে গিয়া মানবজীবন সম্পর্কে যে উপলব্ধি ও আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুগভীর, জীবনপরিবেশের অমোঘতা সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টির আভাস দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

জীবনানন্দের কবিতা, বিশেষতঃ প্রথম পর্যায়ের কবিতা, এক নিঃসঙ্গ বিষাদে আপ্লুত। শব্দ ধ্বনি পরিবেশ রূপকল্প ইত্যাদিতে সেই ধূসর নিঃসঙ্গতার ব্যঞ্জনাই যেন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

তাঁহার ইতিহাস চেতনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জীবনের ও সময়ের নিরবচ্ছিন্নতায় আস্থাশীল ছিলেন বলিয়াই তাহাকে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন নাই, অতীতের সহিত বর্তমানকে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রে তিনি গাঁথিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

জীবনানন্দের কবিতা, যেমন ভাবনায় তেমনই প্রকাশ রীতিতেও স্বতন্ত্র। যেমন বিষয়ে তেমনই বহিরঙ্গেও তিনি নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়াছেন। শব্দ ধ্বনি ছন্দের বিন্যাস, উপমা ইত্যাদি লইয়া তাঁহার পরীক্ষার অন্ত ছিল না কিন্তু কোথাও তাহা প্রকট কিংবা 'উচ্চারিত' নয়। সর্বোপরি কবিতার ভাষাকে 'কাব্যিকতার' সংস্কার হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে তিনি গদ্যের কাছাকাছি লইয়া আসিয়াছেন, কবিতার জোর তাহাতে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পরবর্তী কালের কবিদের উপরে তাঁহার এই প্রয়াসের প্রভাব অবশ্যই লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার কাব্য 'চিত্ররূপময়'। বুদ্ধদেব বসু বলিয়াছেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ। জীবনানন্দের কবিকর্ম যিনি উপলব্ধি করিতে চান, এই দুইটি উক্তি যে তাহাকে সাহায্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর তারিখে দক্ষিণ কলিকাতার রাজপথে তিনি ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হন। ২২ অক্টোবর হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার নামে ঘোষণা করা হয়।

কাব্যগ্রন্থ: 'ঝরা পালক' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'মহা পৃথিবী' (১৩৫১ বঙ্গাব্দ), 'সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), 'বনলতা সেন' (কবিতা ভবন সংস্করণ, ১৯৪২ খ্রী, সিগনেট প্রেস সংস্করণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭ খ্রী), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), কবিতা বিষয়ক আলোচনা, 'কবিতার কথা' (কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।

দ্র বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, ১৯৫৮, বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, কলিকাতা, ১৩৬৬।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জীববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা দ্র

জীবাত্মা জীব দ্র

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য (১৮৪৪-?)। গত শতকের প্রখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত ও সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রকাশক। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি। জীবানন্দ সংস্কৃত কলেজে পিতার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা, জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর অধ্যক্ষতাকালে সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি পিতার অনুবর্তন করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা ও সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তিনি এইরূপে ১০৮ খানি গ্রন্থ স্বকৃত টীকাসমেত মুদ্রিত করেন। তাঁহার রচিত এই সকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: কথাসরিৎসাগর (সরল সংস্কৃত গদ্যে, ১৮৮৩ খ্রী), বেতালপঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, কাদম্বরীকথাসার,

মুদ্রারাক্ষসপূর্বপীঠিকা, সংক্ষিপ্ত হর্ষচরিত, সংক্ষিপ্ত-দশকুমারচরিত, শব্দরূপাদর্শ, তর্কসংগ্রহ (ইংরেজী অনুবাদ)।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য

জীবাশ্ম ফসিল। প্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তরের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত প্রাচীন কালের উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ বা চিহ্নকে জীবাশ্ম বলা হয়। জীবাশ্ম নানা প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত হয় এবং তদনুসারে উহার মূল উপাদানের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। জীবাশ্মকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. কোমল অংশ (লোম, চর্ম, মাংস ইত্যাদি) সহ সংরক্ষিত পূর্ণ জীবাশ্ম – যেমন সাইবেরিয়ার তুন্দ্রায় প্রাপ্ত অতিকায় হস্তী বা ম্যামথের জীবাশ্ম ২. জীবদেহের কঠিন অংশের অপরিবর্তিত জীবাশ্ম – ঝিনুক ও শামুক জাতীয় কিছু জীবাশ্ম এই প্রকার ৩ প্রস্তরীভূত অবস্থায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম – ইহাতে জীব দেহের মূল উপাদানগুলি নানা প্রকার খনিজদ্রব্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ড ইহার উদাহরণ। উদ্ভিদের অঙ্গারীভূত জীবাশ্মও এই জাতীয়। ইহা ছাড়া জীবদেহের মুদ্রণ ও ছাচ, প্রাণীর পুরীষ, ভুক্তাবশেষ, পায়ের ছাপ এবং উহাদের অবস্থিতির অন্য প্রকার পরোক্ষ চিহ্নাদিও জীবাশ্ম।

মৃত জীবের দেহে কঠিন অংশ না থাকিলে এবং ঐ কঠিন অংশ সত্বর অবক্ষেপ দ্বারা আবৃত না হইলে উহা সাধারণতঃ জীবাশ্মরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে না। ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা সংক্রান্ত বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপকরণ হিসাবে জীবাশ্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডারউইনের বিবর্তনবাদ জীবাশ্ম দ্বারা প্রায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। জীবাশ্ম হইতে নানা প্রকার লুপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হয়। পাললিক শিলার স্তরবিন্যাস, বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তিকাল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শিলাস্তরগুলির সমসাময়িকতা নির্ণয়ে জীবাশ্মের ব্যবহার অপরিহার্য। জীবাশ্মরূপে সংরক্ষিত প্রাণী বা উদ্ভিদের নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলে পুরাকালের ভূসংস্থান ও জলবায়ু নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনায় জীবাশ্মের দান প্রভূত।

চিত্তরঞ্জন সেন

জীমূতবাহন প্রসিদ্ধ বাঙালী স্মৃতিকার। গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁহাকে 'পারিভদ্রীয় মহামহোপাধ্যায়' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্যবহার-মাতৃকায় তিনি 'পারিভদ্র-কুলোদ্ভব' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। 'রাঢ়' অঞ্চলকে তাঁহার জন্মস্থান মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবকাল ১১শ হইতে ১৬শ শতকের মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় কানের মতে আনুমানিক ১০৯০ হইতে ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল।

এ পর্যন্ত জীমূতবাহনের তিনটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম গ্রন্থ কালবিবেক। ইহাতে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের কাল নিরূপণ করা হইয়াছে। গ্রন্থটিতে লেখকের মীমাংসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জীমূতবাহনের বহু পূর্বসূরীর নামোল্লেখ থাকায় গ্রন্থটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে মূল্যবান। দ্বিতীয় গ্রন্থ ব্যবহার মাতৃকা। ব্যবহার বা মামলা-সংক্রান্ত প্রাথমিক বিষয়গুলির পরিচয় প্রদানই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য। ইহার অপর নাম ন্যায়রত্নমাতৃকা বা ন্যায়মাতৃকা। নারদ, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি সহ ইহাতে মোট কুড়ি জন স্মৃতিকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। জীমূতবাহন রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'দায়ভাগ'। ইহাকে 'ধর্মরত্ন' গ্রন্থের অংশবিশেষ বলিয়া মনে করা হয়। দায় বা উত্তরাধিকারের বিভাগ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর মীমাংসা করিয়া গ্রন্থটি এক অসাধারণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। জীমূতবাহন পিণ্ডদানের সহিত উত্তরাধিকার যুক্ত করেন ও সম্পাদিত কর্ম নিয়মমত না হইলেও তাহা সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করার রীতির প্রচলন করেন। বাংলা দেশের উত্তরাধিকার বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান করিতে দায়ভাগই ছিল মুখ্য নিয়ামক। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত মিতাক্ষরা প্রতিপাদিত বিধানের সহিত তীব্র মতপার্থক্য ও সিদ্ধান্তের স্বকীয়তা গ্রন্থটিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের মত এই মৌলিক চিন্তা-সম্পন্ন গ্রন্থটিতে ন্যায় ও মীমাংসা সহ বিভিন্ন দুরূহ শাস্ত্রে জীমূতবাহনের পাণ্ডিত্যের প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বিষয়বস্তু বিচার ও গ্রন্থনা দেখিয়া মনে হয় 'কালবিবেক' জীমূতবাহনের প্রথম রচনা। তাঁহার ব্যবহার মাতৃকাকে দায়ভাগ গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে বিবেচনা করা চলে। দায়ভাগ গ্রন্থের মধ্যে ঋণদান বা ঋণসমস্যার উপর গ্রন্থ রচনার ইচ্ছার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু মনে হয় শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করা জীমূতবাহনের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

সুব্রতা সেন

জুঅলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ভারতীয় প্রাণী-বিদ্যা-সমীক্ষা বিভাগ। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের তদানীন্তন

অধ্যক্ষ নেল্‌সন অ্যানাণ্ডেল এর উদ্যোগে ভারত সরকার ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে এই বিভাগ স্থাপন করেন। অ্যানাণ্ডেল ইহার প্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হন। সে সময়ে এই প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৪ জন বিজ্ঞানী ও কতিপয় সহকারী ছিলেন। বর্তমানে এই বিভাগের বিভিন্ন শাখায় ৫৮ জন বিজ্ঞানী ও ১০৮ জন সহকারী কাজ করিতেছেন। বিভাগের অধিকর্তা ভারত সরকারের প্রাণীবিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেন।

প্রাণীবিদ্যার গবেষণা এই বিভাগের প্রধান কার্য। তাহা ছাড়া সারা ভারতে বিভিন্ন প্রাণীর সমীক্ষার দ্বারা প্রাণীকুল (ফনা, fauna) এর পরিচিতি গড়িয়া তোলার জন্য নিদর্শন (স্পেসিমেন) সংগ্রহ, বিভিন্ন প্রাণীর ইকলজি বা বাস্তুসংস্থান, আচরণ, বসতি, জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান, ভারতের জাতীয় প্রাণীসংগ্রহের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান, নূতন প্রাণী সনাক্তকরণ, প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য দান, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রাণী প্রদর্শনীর তত্ত্বাবধান এবং প্রামাণিক গবেষণা-পত্রিকা ও গ্রন্থের প্রকাশনও এই বিভাগের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি প্রাণীর বিধিসম্মত শ্রেণীবিভাগ ও পশুচর্ম সংরক্ষণ বিদ্যা (ট্যাক্সিডার্মি) সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

এই বিভাগের প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। প্রাণীকুল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রাণীর নিদর্শন সংগ্রহের জন্য বর্তমানে যথাক্রমে দেরাদুন, পাটনা, শিলং, জব্বলপুর, মাদ্রাজ, পুনা এবং যোধপুরে ৭টি আঞ্চলিক শাখা আছে। ইহার তত্ত্বাবধানে জাতীয় প্রাণীসংগ্রহে প্রায় ৭ লক্ষ প্রাণীর নিদর্শন সংরক্ষিত হইয়াছে, বর্তমানে এখানে প্রায় ১২৫০০ জাতিরূপের (টাইপ) নিদর্শন সংগৃহীত আছে। এই বিভাগের গ্রন্থাগারটি গবেষণার কাজে অত্যন্ত মূল্যবান, এখানে ৩৫০০০ এরও অধিক পুস্তক আছে এবং প্রায় ৭০০ সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত গৃহীত হয়। এই বিভাগ ‘রেকর্ডস’ ও ‘মেমোয়ার্স অফ দি জু-অলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া’ (পূর্বনাম ‘মেমোয়ার্স অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম’) নামক দুইটি সাময়িক গবেষণা-পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতীয় প্রাণীকুলের পরিচিতি সম্বন্ধে ‘ফনা অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া’ নামে যে গ্রন্থাবলী পূর্বে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইত, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতে তাহা ‘ফনা অফ ইণ্ডিয়া’ নামে এই বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

বিশ্বময় বিশ্বাস

জু-জুৎসু, জিউ-জিৎসু, জুদো জাপানী মল্লবিদ্যা। অধিকতর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ আত্মরক্ষার্থমূলক কৌশলকে আক্রমণাত্মক উপায়ে পর্যবসিত করিয়া বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করাই ইহার মূল নীতি। চীন দেশের লামা সন্ন্যাসীগণ দস্যুদলের আক্রমণ হইতে শুধু হাতে রক্ষা পাইবার উপায় হিসাবে বিদ্যাটির মূলনীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরে ১৭শ শতকে জাপানে নীত হইয়া তথাকার যোদ্ধৃসম্প্রদায় সামুরাইগণ কর্তৃক ইহার উন্নতি সাধিত হয় এবং নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বহু শতবৎসর ধরিয়া তাহারা বিদ্যাটি গোপন রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজপ্রচেষ্টায় জাপানের সর্বজনের অনুশীলনীয় বিদ্যা হিসাবে ইহা উন্মুক্ত হয়। দেহের বিভিন্ন স্নায়ু, শিরা, অস্থি প্রভৃতির দুর্বল সংস্থানগুলি সম্বন্ধে সম্যকরূপে জ্ঞানার্জন করিয়া বন্ধনী (লকস অ্যাণ্ড হকস), আছাড় (থ্রোজ) ইত্যাদির সাহায্যে বিপক্ষের সেই দুর্বল স্থানগুলিকে নিপীড়িত করিয়া নিজ কাজে লাগানো হইল বিদ্যাটির মূল কৌশল। ইহার কতকগুলি প্যাঁচ এমনই মারাত্মক যে সেগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা আবশ্যক এবং এই সকল প্যাঁচ-এর প্রয়োগের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী আহত হইলে তাহার সুস্থতা বিধানের জন্য ‘কুয়াৎসু’ নামে আর একটি কৌশল প্রয়োগ করিতে হয়। এই কৌশলটিও ওস্তাদ মল্লগণের শিক্ষণীয় বিষয়। জিগুরো কানো জুজুৎসুর কয়েকটি নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং সর্বসাধারণের শিক্ষার সুবিধার জন্য জাপানের টোকিও নগরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কোডোকান (Kodokan) জুদো বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহাই এখন জুদো শিক্ষার কেন্দ্র। কানোর প্রবর্তিত [illegible] জুদো নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে।

রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪ খ্রী) ক্ষুদ্রকায় জাপানী সৈন্যদের হাতাহাতি লড়াই এর কৌশল লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধানের ফলে বিদেশীগণ বিদ্যাটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমশঃ ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ইহার প্রবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন জাপানী জু-জুৎসুবিদকে তাঁহার শান্তিনিকেতন আশ্রমে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে বিদ্যাটির প্রসারের চেষ্টা করেন। ইহার পরেও (১৯২৮-২৯ খ্রী) তিনি আর একবার তাঁহার বিদ্যালয়ে জাপানী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বগুড়ার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ও ময়মনসিংহের (মুক্তাগাছা) জমিদার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীও জাপানী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পূর্ব বঙ্গে বিদ্যাটি চালু করিবার চেষ্টা

করেন। পুলিনবিহারী দাস 'অনুশীলন সমিতি'র মাধ্যমে অনুরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যায় ভারতবাসীদের মধ্যে মনোমোহন দেব প্রথম জাপানী ডিপ্লোমা লাভের অধিকারী হন। মনোমোহন সহ অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তি এবং কয়েকজন জাপানী বিশেষজ্ঞদের চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা কলিকাতা তথা বঙ্গ দেশে লোকপ্রিয় হয় নাই।

দ্র বাংলার বাণী, জন্মাষ্টমী সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, মনোমোহন দেব, 'জিউ-জিৎসু কৌশল', হানাকী, মাঘ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পুলিনবিহারী দাস, আত্মরক্ষায় লাঠি ও যুযুৎসু, শচীন্দ্র মজুমদার, যুযুৎসু ও আত্মরক্ষা, এলাহাবাদ, ১৯৩৫, S. K. Uyenishi, *The Text Book of Ju-Jutsu*, London, [1936].

সমর বসু

জুট টেকনলজি পাটশিল্প দ্র

জুতা পোশাক-পরিচ্ছদ দ্র

জুনাগড় গুজরাতের রাজকোট বিভাগের অন্তর্গত জেলা, তালুক ও শহর। জেলাটি ২০°৪৪ হইতে ২১°৫৩ উত্তর ও ৭১°৫´ হইতে ৬৯°১৯´ পূর্বে অবস্থিত। আয়তন ১০৪২০ বর্গ কিলোমিটার (৪১৬৮ বর্গ মাইল)। এখানকার একমাত্র উচ্চভূমি গিরনারের পার্বত্য অঞ্চল ('গিরনার' দ্র)। এই জেলার প্রধান নদী ভাদার ও সরস্বতী। ভাদার হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরস্বতী নদীকে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। সারা ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র এই জেলার অন্তর্গত গির বনভূমিতেই বন্যসিংহের বাস।

জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। গিরনারের উচ্চভূমি ছাড়া আর সব জায়গায় এপ্রিলের শুরু হইতে জুলাই-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত খুব গরম হয়। উষ্ণতা এপ্রিলে ৪৬° সেন্টিগ্রেড এবং ডিসেম্বরে ১৭° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০ মিলিমিটার (৪০ ইঞ্চি) হইতে ১২৫ মিলিমিটার (৫০ ইঞ্চি)।

পূর্বে জুনাগড় চৌদাসামা (Chaudasama) উপজাতিদের অধীনে একটি রাজপুত রাজ্য ছিল। ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরনার শহরের নিকট ইহার রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের সুলতান মামুদ এই রাজ্য অধিকার করিয়া দুর্গ নির্মাণ করিয়া পূর্ব রাজধানীকে সুরক্ষিত করেন এবং ইহার নাম মুস্তফাবাদ রাখেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে জুনাগড়ের শাসনকর্তা ব্রিটিশের সহিত শর্তাধীনে আবদ্ধ হন ও ইহা একটি স্বাধীন করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য সংগঠনের ফলে ইহা জুনাগড় জেলা নামে অভিহিত হয়। শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য জেলাটিকে ৪টি মহকুমায় এবং ৮টি তালুকে ভাগ করা হইয়াছে।

লোকসংখ্যা ১২৪৫৬৪৩ (১৯৬১ খ্রী), তন্মধ্যে ৬৩৮২৯৬ জন পুরুষ ও ৬০৭৩৪৭ জন স্ত্রীলোক। প্রধানতঃ কৃষি, পশুপালন ও অন্যান্য বৃত্তির দ্বারা লোকে জীবিকানির্বাহ করে। ভূমি বেশ উর্বর। দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের মধ্যে ইহা অবস্থিত। খাদ্যশস্যের মধ্যে জোয়ার ও বাজরাই প্রধান। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা জন্মে।

জুনাগড়ের বন্দরগুলির মধ্যে ভেরাবল ও পোরবন্দর প্রধান। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে গিরনার পর্বত ও সোমনাথের মন্দির উল্লেখযোগ্য। গুপ্তপ্রয়াগ ও প্রভাসপত্তন দুইটি তীর্থস্থান।

জেলার প্রধান শহর জুনাগড়। ইহা গিরনার পর্বত ও দাতার পর্বতের পাদদেশে ২১°৩১´ উত্তর ও ৭০°৩৬ পূর্বে অবস্থিত। রাজকোট হইতে ইহার দূরত্ব ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল)। আয়তন ১৮ বর্গ কিলোমিটার (৭·২ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭৪২৯৫ (১৯৬১ খ্রী), তন্মধ্যে পুরুষ ৩৮৮৮২ ও স্ত্রীলোক ৩৫৪১৩।

জুনাগড়ে বহু প্রাচীন দর্শনীয় স্থান আছে। উপরকোট বা প্রাচীন দুর্গের পরিখার নিকটবর্তী অঞ্চল বৌদ্ধ যুগের বহু গুহায় পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে শহরের উত্তরাংশে খাপ্রাখোদিয়া নামক গুহামণ্ডলী উল্লেখযোগ্য। একদা ইহা ২।৩ তলা-বিশিষ্ট বৌদ্ধবিহার ছিল। উপরকোটে চৌদাসামা শাসনের আমলে নির্মিত অপরূপ কারুকার্য বিশিষ্ট ৬টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত অলিন্দ বেষ্টিত পুকুর এবং প্রকোষ্ঠ-সহ একটি দ্বিতল গৃহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিখাটি সম্পূর্ণ প্রস্তর খনন করিয়া নির্মিত ও অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। উপরকোট হইতে কিছুদূরে সুলতান মামুদ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ অবস্থিত। পরবর্তী কালের রচিত বহু সৌধ জুনাগড়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XIV, Oxford, 1908; *Census of India*. 1961, *Final Population table*, Delhi, 1962

কৃষ্ণা গুপ্ত

জুভেনাইল কোর্ট শিশু অপরাধ দ্র

জুয়া খেলা সংস্কৃত ভাষায় জুয়া খেলা দ্যূত নামে পরিচিত। পণ রাখিয়া অক্ষ (পাশা), চর্ম পট্টিকা, হস্তীদন্ত-

নির্মিত গুটি প্রভৃতি প্রাণহীন বস্তু দ্বারা প্রতিযোগিতা-মূলক খেলাকে দ্যূত বলে। কুক্কুট, পারাবত, মেষ, মহিষ, বৃষ, ঘোটক প্রভৃতি প্রাণী দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক খেলা অথবা বাজি রাখিয়া কুস্তিগিরদের খেলাকে বলা হয় সমাহ্বয় (মনুস্মৃতি, ৯।২২৩ , নারদস্মৃতি, ২৯।১)। দ্যূতের প্রতিশব্দ অক্ষবতী, কৈতব, পণ, দেবন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে জুয়া খেলা চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদসংহিতার অক্ষসূক্তে (১০।৩৪) দেখা যায়, জনৈক জুয়াড়ী (কিতব) সর্বনাশা পাশা দ্বারা খেলিয়া সর্বস্বহীন অবস্থায় পিতা মাতা পত্নী দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অন্ন ও বাসস্থানের অভাবে দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১।৫১।৯, ১০।৪১।৯ এবং ১০।৪৩।৫ মন্ত্রে অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদের ৪।১৬।৫ এবং ৪।৩৮ মন্ত্রে অক্ষক্রীড়া দ্বারা সৌভাগ্যলাভের কথা জানা যায়। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার (৩০।১৮) পুরুষমেধ যজ্ঞে উপকল্পিত বহু পশুর মধ্যে অক্ষরাজের বলি-স্বরূপ কিতব (জুয়াড়ী) নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞে সভ্যাগ্নিস্থাপনের অন্যতম অঙ্গীয় কার্য হইতেছে যজমান কর্তৃক প্রদত্ত গাভী পণ রাখিয়া ঋত্বিকগণ কর্তৃক দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান (শতপথব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় কাণ্ড)। পরবর্তী কালে দ্যূত প্রতিপদাদি উপলক্ষে জুয়া খেলার ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথির নাম দ্যূত প্রতিপদ। প্রসিদ্ধি আছে ঐ দিনে পাশা খেলিয়া পার্বতী শংকরকে জয় করিয়াছিলেন। তাই শংকর সর্বরিক্ত আর পার্বতী সর্ব ঐশ্বর্যের অধিকারিণী (রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব, ব্রাহ্মপুরাণ বচন)। নলরাজা ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাহিনীর মধ্য দিয়া মহাভারতে দ্যূতক্রীড়ার বিষময় পরিণতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তবে স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ জুয়া খেলা সমর্থন বা উহা সম্পূর্ণরূপে বর্জনের সম্পর্কে সকলে একমত নহেন।

মনু (৯।২২১ ২৬) রাজশক্তি দ্বারা দ্যূত এবং সমাহ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জুয়া খেলা প্রত্যক্ষ চৌর্য, ইহা রাষ্ট্র-নাশের কারণ। সুতরাং যাহারা নিজে জুয়া খেলে বা অপরকে উহা খেলিবার প্ররোচনা দেয় রাজা তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক দণ্ড প্রদান করিবেন। তিনি কিতবগণকে স্বনগর হইতে নির্বাসিত করিবেন কারণ ইহারা সদাচারনিষ্ঠ নাগরিকগণকে প্রবঞ্চনা দ্বারা নানা-ভাবে বিপন্ন করিয়া থাকে। যেখানে কোনও প্রতারণার প্রশ্ন ওঠে না এরূপ আনন্দোৎসবেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও জুয়া খেলায় যোগ দিবেন না। নারদস্মৃতির মতে (১৯।৮) রাজার প্রাপ্য কর প্রদান করিয়া তদীয়-নিয়ন্ত্রণে সভিকাধিষ্ঠিত প্রকাশ্যস্থানে দ্যূতক্রীড়া চলিতে পারে। জুয়া খেলা দ্বারা চোর ধরিবার সুবিধা হয় এবং রাজকোষ কর দ্বারা বর্ধিত হয় বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য রাজনিয়ন্ত্রণে নগরের কেন্দ্রস্থলে জুয়া খেলার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ২।২৩০)।

দ্যূতক্রীড়ার অধ্যক্ষের নাম 'সভিক'। সভিকের কার্য হইতেছে দ্যূত সভায় খেলিবার সাজসরঞ্জাম জোগাড় করিয়া রাখা, গোলমাল মিটানো, পণের টাকা আদায় ও উহার বণ্টন ব্যবস্থা।

বর্তমানে প্রধানতঃ ঘোড়দৌড়ে বাজি রাখিয়া জুয়া খেলা হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাত, সোনা, রুপা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির এবং শেয়ারের বাজারদরের ওঠা-নামার উপর যে খেলা হয় তাহাকে ফাট্‌কা বলা হয়। অনেক সময়ে ইহাও জুয়া খেলা পর্যায়ে গিয়া দাঁড়ায় বলিয়া ইহার নিয়ন্ত্রণকল্পে আইনের বিধি আছে। বর্তমান কালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে তাস ও অন্যান্য যন্ত্রাদির সাহায্যে গেম-অফ-চান্স নামে যে খেলাটি বিশেষ জনপ্রিয় তাহাও জুয়া খেলা।

[illegible] সান্যাল

জুরিপ্রথা ফৌজদারি মকদ্দমা জুরির সাহায্যে বিচারের যে পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাহাতে জনসাধারণের মধ্য হইতে গৃহীত কতিপয় ব্যক্তি রাষ্ট্রনিযুক্ত বিচারক বা জজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। এই কতিপয় ব্যক্তিকে সমষ্টিগতভাবে জুরি বলা হয়। এই জুরি এবং জজ লইয়া গঠিত বিচারপরিষদ ট্রিবিউন্যাল (সেশন) আদালতে বিচার্য অর্থাৎ কতকগুলি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর বিচার করিয়া থাকেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং জজের বক্তব্য শুনিয়া জুরি অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কি নিরপরাধ সে বিষয়ে মতামত দেন। জজ আইন ঘটিত প্রশ্নের মীমাংসা করেন এবং তথ্য-প্রমাণ সম্বন্ধে জুরির সিদ্ধান্ত অনুসারে অপরাধীর দণ্ড বিধান বা মুক্তিদান করিয়া থাকেন। তথ্য-প্রমাণ সম্পর্কে জুরির বাক্যই চূড়ান্ত— ইহাই জুরি বিচারের মূল কথা। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম আছে।

জুরি বিচারের এই প্রথা ব্রিটিশ আমলেই ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত হয়। প্রাচীন ভারতে ঠিক অনুরূপ কোনও প্রথা ছিল বলিয়া জানা যায় না। রাজা স্বয়ং 'কার্যবিনির্ণয়' অর্থাৎ বিচার করিতে না পারিলে সেই কার্যের জন্য জনৈক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন এবং সেই ব্রাহ্মণ তিন জন সভ্য

দ্বারা পবিত্র হইয়া বিচার করিবেন (মনু ৮।১০)। ইহাকে কিন্তু আধুনিক অর্থে ঠিক জুরির বিচার বলা চলে না। বরঞ্চ ঐ তিন জন সভ্য মাত্র পরামর্শদাতা বা সহায়ক (যাহাদিগকে আমরা এখন অ্যাসেসার বলিয়া জানি) ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সীমাবিবাদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ক্ষেত্রবিবাদ গ্রামবৃদ্ধেরা মীমাংসা করিবেন, যে পক্ষে বহুতর (অর্থাৎ মেজরিটি) হইবে সেই পক্ষেরই জয় হইবে (৩।৯।৬১)। পরেও আছে সমস্ত বিবাদই সামন্ত বা প্রতিবেশীদের প্রত্যয় বা প্রমাণ সাপেক্ষ (৩।৯।৬১)। গ্রামবৃদ্ধের এই বিচার বা প্রত্যয়কেই পরম্পরাগত প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত গ্রামপঞ্চায়েতের বিচারের মূল বলা যাইতে পারে। জুরি বিচারও প্রাচীন কালে প্রতিবেশীদের প্রত্যয়ের উপরেই নির্ভর করিত। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে যাঁহারা অভিযোগের বিষয় অবগত থাকিতেন তাঁহারাই জুরি নিযুক্ত হইতেন।

জুরি বিচারের বিশেষ পদ্ধতির ক্রমোদ্ভব ইংল্যাণ্ডেই হইয়াছিল। তথা হইতে আমেরিকা ভারতবর্ষ প্রভৃতি অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে। বিদেশীয় নরম্যান রাজারা ইংল্যাণ্ডের আইন কানুন বা দেশাচার অবগত না থাকায় দেশাঞ্চলের লোকদের তলব করিয়া ও হলফ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে দেশাচার জানিয়া লইতেন। কোনও তথ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক হইলেও তাঁহারা স্থানীয় লোকেদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইহা হইতেই ইংল্যাণ্ডে জুরি বিচারের সূত্রপাত হয়। দেশাচার বা তথ্য অবগত আছেন এইরূপ স্থানীয় ১২ জন লোক লইয়া জুরি গঠিত হইত। রাজাজ্ঞায় যে জুরি বিচারের সূত্রপাত তাহাই কালক্রমে রাজনিযুক্ত রাজতুষ্টি-বিধানপ্রণোদিত বিচারকের অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের বর্মস্বরূপ হইয়া তাহাদের এক মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। বিবাদ বিষয়ক কোনও প্রশ্ন, কি দেওয়ানি কি ফৌজদারি, উপস্থিত হইলে আমাদের নিজ সমাজের এবং সমশ্রেণীর সত্যবাদী প্রধানেরা তাহার বিচার করিবেন, লোকসাধারণ এই দাবি উপস্থিত করিত।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোম্পানির চাকুরিয়া ও অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজার বিচারের জন্য ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মেয়রের আদালত নামে এক আদালত স্থাপিত হইয়াছিল। সেই মেয়র আদালতের বিচারেই জুরিপ্রথা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানেও জুরি বিচার প্রচলিত হইয়াছিল। জুরি বিচার অবশ্য ফৌজদারি মকদ্দমাতেই আবদ্ধ ছিল। পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে জুরি বিচার প্রবর্তিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে হাইকোর্টের সেশনের বিচার জুরিগণের সাহায্যেই হইবে এইরূপ বিধান করা হয়। ঐ বৎসরেই ফৌজদারি কার্যবিধি বিষয়ক আইনে মফঃস্বলে প্রথম জুরিপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। গভর্নমেণ্ট স্থান কাল বিবেচনা করিয়া মফঃস্বল আদালতে জুরিপ্রথা প্রবর্তন করিতে পারিবেন, আইনে এই কথা ছিল। পরবর্তী ফৌজদারি কার্যবিধি বিষয়ক আইনগুলিতেও অনুরূপ বিধান করা হয়। এই ক্ষমতার বলে গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে (সর্বত্র নহে) জুরি বিচার প্রবর্তিত করেন। বাংলা দেশেই জুরি বিচার বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। জুরিপ্রথা প্রবর্তনের প্রায় একশত বৎসর পরে (১৯৫৮ খ্রী) ভারতীয় আইন কমিশন ভারতবর্ষে জুরিপ্রথা সার্থকতা লাভ করে নাই, পরন্তু বহু ক্ষেত্রে এই প্রথার অপব্যবহার হইয়াছে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া জুরি বিচার তুলিয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। ফলে মফঃস্বলের প্রায় সর্বত্রই জুরি বিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র তিনটি প্রেসিডেন্সি শহর, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্টের সেশনের বিচারে জুরিপ্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ঐ তিনটি শহরে সিটি সেশন আদালতেও কোনও কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে জুরি বিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডে দেওয়ানি মকদ্দমায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে জুরি বিচার উঠিয়া গিয়াছে। ফৌজদারিতেও কতকগুলি গুরুতর অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের বিচার জুরির সাহায্য ব্যতীতই হইয়া থাকে।

জুরি বিচারের মূল কথা স্থানীয় সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা তথ্য বিচার। কতকগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোক (যেমন উকিল) ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিকই জুরির কাজ করিতে বাধ্য। স্থানীয় লোকের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া জুরি তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আদালতে বিচারের প্রয়োজন হইলে ঐ তালিকা হইতে কয়েক জন লোককে তলব করা হয়। জুরি সাধারণতঃ অযুগ্ম সংখ্যক, তিন হইতে নয় জন ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয়। বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বে যাহার তলব করা হইয়াছে এক এক জন করিয়া তাহাদের নাম ডাকা হয়। আসামী পক্ষ হইতে কোনও ব্যক্তিকে জুরির মধ্যে লইতে কতকগুলি নির্দিষ্ট হেতুতে আপত্তি করা যায় এবং আপত্তি উত্থিত হইলে সেই ব্যক্তিকে জুরিতে লওয়া হয় না। হাইকোর্টের

বিচারে হেতু না দর্শাইয়া আট জন ব্যক্তি সম্বন্ধে আপত্তি চলে। তথ্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করাই জুরির কর্তব্য এবং তথ্য সম্বন্ধে জুরির সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে এই সম্বন্ধে একটু পার্থক্য আছে। ইংল্যাণ্ডে জুরির সিদ্ধান্ত অবশ্যগ্রাহ্য, জুরির সিদ্ধান্ত অনুসারেই তথ্য সম্বন্ধে জজকে রায় দিতে হয়। ভারতবর্ষে জুরির সিদ্ধান্ত সর্বত্র অবশ্যগ্রাহ্য নহে। হাইকোর্টে সেশনের বিচারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত জুরির সিদ্ধান্ত জজ মানিয়া লইতে বাধ্য। সর্ববাদীসম্মত না হইলে জুরির সিদ্ধান্ত জজ মানিতে বাধ্য নহেন। জুরির সিদ্ধান্তের সহিত একমত না হইলে ঐরূপ ক্ষেত্রে জজ ঐ জুরির পরিবর্তে নূতন জুরির সাহায্যে পুনর্বিচারের আদেশ দিতে পারেন। মফঃস্বলে সেশন আদালতে জুরির সিদ্ধান্ত কোনও ক্ষেত্রেই অবশ্যগ্রাহ্য নহে। জুরির সিদ্ধান্তের সহিত জজের মতভেদ হইলে দণ্ড অভিযোগের বিচারের জন্য নথিপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করিতে পারেন। নথিপত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিয়া হাইকোর্ট জুরির সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে পারেন, জুরির সিদ্ধান্তের প্রতিকূলেও রায় দিতে পারেন। সেশন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হইলে জজ জুরিকে ভ্রমাত্মক নির্দেশ না দিয়া থাকিলে, আপিলে জুরির সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। তবে প্রাণদণ্ডের আদেশ যখন হাইকোর্টে অনুমোদনের জন্য আসে তখন হাইকোর্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ দৃষ্টে জুরির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে অ্যাসেসারের সাহায্যে বিচারের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। জুরির বিচার না হইলে অ্যাসেসারের সাহায্যেও সেশন আদালতের বিচার হইতে পারিত। জুরির মত অ্যাসেসারগণ জনসাধারণের মধ্য হইতে গৃহীত হইতেন। জুরির সাহায্যে বিচার ও অ্যাসেসারের সাহায্যে বিচারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জুরি সমষ্টিগতভাবে (সর্বসম্মতিক্রমে অথবা বহুতরভাবে) তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন, জুরির মধ্যে কাহারও স্বস্ব সিদ্ধান্ত জানিবার উপায় নাই। অ্যাসেসারগণ প্রত্যেকে তাঁহাদের নিজ নিজ অভিমত জ্ঞাপন করেন। জজ জুরির সিদ্ধান্ত দ্বারা যেরূপভাবে আবদ্ধ, অ্যাসেসারের অভিমত দ্বারা সেরূপ আবদ্ধ নহেন। জজ অ্যাসেসারগণের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মতানুযায়ী বিচার করিতে পারেন। ইংরেজ জজদের এ দেশীয় লোকের রীতিনীতি-আচার প্রভৃতি জানা না থাকায় তাঁহাদিগকে সহায়তা করিবার জন্য ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে প্রথম অ্যাসেসারের সাহায্যে বিচারের প্রবর্তন হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অ্যাসেসারের সাহায্যে বিচার উঠিয়া গিয়াছে।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

জে. কে. নগর পূর্বতন নাম অরুপনগর। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় অবস্থিত শিল্পনগরী ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের কেন্দ্র। শহরের আয়তন প্রায় ৪০ হেক্টর ও বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০০০। এই শহরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানেই ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম দেশজ বক্সাইট আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন শুরু হয়। এখানে রাঁচি জেলার লোহারডাগা ও পালামৌ জেলার খামার অঞ্চলের খনি হইতে সংগৃহীত অ্যালুমিনিয়াম আকরিকের সাহায্যে শুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম ধাতুপিণ্ড (ইনগট), অ্যালুমিনিয়াম ঘটিত সংকর ধাতুর পিণ্ড, অ্যালুমিনিয়ামের পাত, চং, তার, পরিবাহী (কনডাক্টর) প্রভৃতি সামগ্রী উৎপন্ন হয়। বর্তমানে শহরের কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা বৎসরে প্রায় ৭৫০০ মেট্রিক টন।

মিনা দত্ত

জেকব, জর্জ অগস্টস শ্রী (১৮৪০-১৯১৮) ভারততত্ত্ববিদ্। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ আগস্ট ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের চাকুরি লইয়া ইনি ভারতে আসেন এবং অল্পকালের মধ্যেই নিজের চেষ্টায় মারাঠী, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৬৫ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি পুনার সামরিক বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতে বাসকালেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা ও সম্পাদন করিয়া ইনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র এবং যোগ, মীমাংসা ও বেদান্তদর্শনে ইহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াও ইনি সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল স্বদেশে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'এ ম্যানুয়াল অফ হিন্দু প্যান্থেইজ্ম্' (১৮৮১ খ্রী), 'মহানারায়ণ উপনিষদ্' (নারায়ণ কৃত দীপিকা ও ইংরেজী টীকা সহ সম্পাদিত, ১৮৯১ খ্রী), 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' (সুরেশ্বরাচার্য রচিত, জ্ঞানোত্তম-কৃত 'চন্দ্রিকা' টীকাসহ সম্পাদিত, ১৮৯১ খ্রী), 'কন্‌কর্ড্যান্স টু দি প্রিন্সিপ্যাল উপনিষদ্‌স্ অ্যাণ্ড দি ভগবদ্গীতা' (১৮৯১ খ্রী), 'বেদান্তসার' (সম্পাদিত, ১৮৯৪ খ্রী)।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারত বিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

জেট প্লেন জেট ইঞ্জিন অতি আধুনিক ('এরোপ্লেন' দ্র), তথাপি জেট পরিচালনের মূল তত্ত্ব প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো নামক পণ্ডিত বাষ্প চালিত এক ইঞ্জিনের উদ্ভাবন করেন। জেট ইঞ্জিন যে তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, উহাতে সেই তত্ত্বকেই আশ্রয় করা হইয়াছিল। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইটালীয় ইঞ্জিনিয়ার জোভান্নি ব্রান্কা (Giovanni Branca) প্রথম টারবাইন নির্মাণ করেন। অষ্টাদশ শতকে জেম্‌স র‍্যামজে ও জন বারবার এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হুইট্‌লে তাঁহার গবেষণাগারে জেট ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট জার্মানীতে হাইনকেল এয়ারক্র্যাফ্‌ট কোম্পানি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে জেট চালিত বিমান নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাংশে সামরিক প্রয়োজনে জেট শক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। যুদ্ধের অন্তে, বিগত প্রায় পনর বৎসরের মধ্যে যাত্রীবাহী এরোপ্লেনেও ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অতিরিক্ত শক্তিসম্পন্ন জেট চালিত বিমান যে সব ধাতুর দ্বারা তৈয়ারি হয়, তাহা ফাটিয়া বা গলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, সেইজন্য এমন বিশেষ উন্নত ধরনের ধাতুর প্রয়োজন যাহাতে বিমানটির কোনও ক্ষতি না হয়। জেট চালিত বিমানের জন্য নিম্ন পর্যায়ের জ্বালানি (লো গ্রেড ফুয়েল) ব্যবহার করা হয় এবং এ প্রকার বিমান আকাশের খুব উচ্চ স্তরে যাইতে পারে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

জেতবনবিহার প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীর দক্ষিণ উপকণ্ঠে অবস্থিত জেতবনে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার। কথিত আছে যে অনাথপিণ্ডিক শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের বাসোপযোগী বিহার নির্মাণের জন্য রাজকুমার জেতের উদ্যানভূমি জেতবনটি মনোনীত করেন এবং বহু অর্থ ব্যয়ে সুবৃহৎ জেতবনবিহার নির্মাণ করেন। সারিপুত্ত ইহার নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। জেতবনবিহারে ভিক্ষুদের জন্য বাসগৃহ, উপস্থানশালা (বৈঠকখানা), অগ্নিশালা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা ছিল। এই বিহারে অনাথপিণ্ডিক 'গন্ধকুটি', 'করোরি মণ্ডলমাল', 'কোসম্বকুটি', 'চন্দনমাল' প্রভৃতি কয়েকটি কুটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডিকের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জেতকুমারও বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দান করিলেন এবং ঐ অর্থে দ্বিতলবিশিষ্ট প্রবেশতোরণ নির্মাণ করাইলেন। যথাসময়ে অনাথপিণ্ডিক সপরিজন জাঁকজমক সহকারে বুদ্ধের নিকট জেতবনবিহার উৎসর্গ করিলেন। বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে গন্ধকুটিতে বাস করিতেন।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে জেতবনবিহার প্রসিদ্ধ। এখানে বুদ্ধ তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রায় পঁচিশটি বর্ষা তিনি এই বিহারে যাপন করেন এবং বহু সূত্র ও জাতক দেশনা এবং বিনয়নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। জেতবনবিহারে রাজা প্রসেনজিৎ 'সললঘর' নামে একটি বৃহৎ কুটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বিহারের বাহিরে একটি রাজবন ছিল। প্রবেশপথের নিকট অনাথপিণ্ডিক একটি বোধিবৃক্ষের চারা রোপণ করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তী কালে আনন্দবোধি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েনের মতে জেতবনবিহার ছিল সপ্ততলবিশিষ্ট এবং সর্বদা পূজার দ্রব্য ও প্রদীপমালায় শোভিত। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে জেতবন পবিত্র স্থানরূপে পরিগণিত হয়।

প্রাচীন শ্রাবস্তী বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা ও বহরাইচ জেলার সীমানায় রাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে স্থানটি সাহেত (জেতবন) ও মাহেত (শ্রাবস্তী) নামে পরিচিত এবং স্থানটি গোরখপুর গোণ্ডা লাইনের বলরামপুর স্টেশন হইতে ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) দূরে অবস্থিত। এখনও সাহেতে জেতবনবিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

দ্র বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, G P. Malalasekara *Dictionary of Pali Proper Names* vol. I, London, 1937. N Dutta *Development of Buddhism in Uttarpradesh*, Lucknow, 1956

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

জেন (Zen) মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম অনুপ্রাণিত প্রাচীন চীনে ও অধুনা প্রধানতঃ জাপানে অনুসৃত সাধনমার্গ। শব্দটি মূলে সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দ হইতে উদ্ভূত—'ধ্যান'—প্রাকৃতে 'ঝাণ'—চীনা বিকারে 'ছান্'-- তাহা হইতে জাপানিতে 'জেন্'। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষার্ধে বোধিধর্ম নামে ধর্মগুরু ভারতবর্ষ হইতে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম

প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তিনিই জেন পন্থার প্রবর্তক বলিয়া অভিহিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জেন চীন দেশের প্রাচীনতর 'তাও' মতের দ্বারা প্রভাবিত মহাযানের একটি অনন্যসাধারণ বিকাশ। এই মতানুসারে বাহ্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ হয় না, বুদ্ধির দ্বারা যুক্তির সাহায্যে পরম সত্যের স্পর্শ লাভ হয় না। মন বা চিত্তকে শূন্যতার চরম গভীরে স্থাপিত করিতে না পারিলে পরম সত্য স্ফুরিত হইতে পারে না। কেবল ধ্যানের সাহায্যে শূন্যতার অচঞ্চলতার মধ্যে সংজ্ঞাবোধ লুপ্ত হইলে বোধি লাভ বা সত্য দর্শন হইতে পারে। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষ হইতে জেন পন্থা জাপানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে আরম্ভ করে। ক্রিয়াকাণ্ড বিবর্জিত ইহার বিবিক্ত আত্মবিদ্যা জাপানের যোদ্ধসম্প্রদায় সামুরাইগণকে বিশেষ আকৃষ্ট করে এবং তাহাদের প্রভাবে রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া জাপানের বিভিন্ন প্রদেশে এই ধর্মসম্প্রদায়ের মঠ ইত্যাদি স্থাপিত হইতে থাকে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পরম্পরাগতভাবে ইহার ধারা প্রবহমান। যদিও এই পন্থার মতানুসারে পরলব্ধ অনুভূতির ব্যাখ্যান বা পর-আচরিত সাধনার অনুসরণ সাধকের কাজে লাগে না তথাপি মনকে শূন্যতার পথে চালিত করিতে বিবিধ দার্শনিক ও ধর্মীয় মত, মনোবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের প্রয়োজন ও গুরুর সাহায্যের আবশ্যক হয়। বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়া যাহা পূরণ করা যায় না, গুরু অনেক সময়ে সেইরূপ সমস্যা শিষ্যের নিকট উপস্থাপিত করেন। একাগ্র-ভাবে চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন মন এক সময়ে শূন্যতার গভীরে ডুবিয়া যায় এবং অনেক সময়ে নিস্তরঙ্গ মনের উপর ক্ষণিকের জন্য অকস্মাৎ সত্য উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। ইহাই জেন-এর বিশেষত্ব। আধুনিক কালে ইওরোপ ও আমেরিকায় জেন সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছে।

দ্র D. T. Suzuki, *The Collected Works of D. T. Suzuki*, London · Ruth S. McCandless and Nyogen Senzaki, *Buddhism and Zen*, New York, 1953.

জেনার, এডওয়ার্ড (১৭৪৯-১৮২৩ খ্রী) ইংরেজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এবং বসন্তের টিকার আবিষ্কর্তা। ইংল্যাণ্ডের গ্লস্টারশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডনে দুই বৎসর কাল তিনি অস্ত্রচিকিৎসক জন হাণ্টার-এর ছাত্র ছিলেন। ডাক্তারি ছাড়া প্রকৃতিবিজ্ঞানে তাঁহার ঝোঁক ছিল।

কাহারও দেহে গোবসন্তের আক্রমণ ঘটিলে তাহার আসল বসন্ত হয় না— এ বিষয়ে জেনারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরীক্ষামূলকভাবে তিনি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক গোয়ালিনীর হাতের গোবসন্তের গুটি হইতে রস লইয়া একটি সুস্থ বালকের ত্বকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, কয়েক দিন পরে বালকের হাতের ক্ষত শুকাইয়া গেলে তাহার দেহে আসল বসন্তের বীজ প্রবিষ্ট করানো সত্ত্বেও বসন্তের আক্রমণ ঘটিল না। আরও দুই বৎসর এরূপ পরীক্ষার পর সপ্রমাণ হয় যে, গোবসন্তের টিকা দিয়া আসল বসন্তের প্রতিরোধ সম্ভব। এ সম্বন্ধে জেনার একটি যুগান্তকারী পুস্তিকা লেখেন।

নিজ দেশে প্রথমে তেমন সমাদর না মিলিলেও ইওরোপ ও আমেরিকায় জেনারের আবিষ্কার যথেষ্ট প্রশংসিত হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জেনার রয়্যাল জেনারিয়ান ইনস্টি-টিউশন নামক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গোবসন্তের বীজ উৎপাদন করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করিতে থাকেন। ঐ প্রতিষ্ঠান অচল হওয়ার পর ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল ভ্যাকসিন এস্ট্যাবলিশমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, জেনার তাহার প্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড-এর এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনার সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করেন। 'টিকা' দ্র।

নন্দগোপাল মজুমদার

জেনারেটর জেনারেটর দ্বারা সাধারণভাবে তাপ অথবা যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

জেনারেটর বা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের মূল নীতি তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র দুই প্রকারের হইতে পারে: ১. পরিবর্তী প্রবাহ জেনারেটর (অল্টারনেটর) ২. সমপ্রবাহ জেনারেটর (ডি. সি. জেনারেটর)।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যারাডে লক্ষ্য করেন যে একটি চুম্বক তড়িৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি সংহত বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বল সৃষ্টি করা যায়। এই তড়িচ্চালক বলকে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল এবং এই ঘটনাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ বলা হয়। ফ্যারাডের এই আবিষ্কারের ফলেই জেনারেটর মোটর প্রভৃতি তড়িৎ যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে। উপরি উক্ত আবিষ্কার হইতে ফ্যারাডে যে দুইটি সূত্রে উপনীত হন তাহা যথাক্রমে: ১. চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হইলে চৌম্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত যে কোনও কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট হয় ২. যে হারে কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া অতিক্রান্ত বলরেখা পরিবর্তন করে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল তাহার সমানুপাতিক।

একটি বদ্ধ কুণ্ডলীকে যদি কোনও চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অবিরত ঘুরানো যায় তবে ঐ কুণ্ডলীর তল ভেদ করিয়া যে বলরেখাগুলি নিষ্ক্রান্ত হয় তাহাদের সংখ্যার পরিবর্তন হইবে। যদি ঐ কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত একটি বহির্বর্তনীর সহিত যুক্ত থাকে তবে ঐ বর্তনীতে পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই তড়িৎপ্রবাহকে সমপ্রবাহ করিতে হইলে কমিউটেটর নামক একটি যন্ত্রাংশের সাহায্য লইতে হয়।

পরিবর্তীপ্রবাহ জেনারেটর একটি নরম লোহার চোঙের উপর কয়েক পাক তার জড়াইয়া আর্মেচার তৈয়ারি করা হয়। এই আর্মেচার একটি শক্তিশালী চুম্বকের মেরুদ্বয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ঘুরিতে পারে। আর্মেচারের শেষ দুই প্রান্ত দুইটি আংটার সহিত যুক্ত থাকে। কার্বন নির্মিত দুইটি ব্রাশ এমনভাবে রাখা থাকে যে যখন আর্মেচার দুইটি ঘুরিতে থাকে তখন ব্রাশ দুইটি সর্বদা আলগাভাবে আংটার সহিত ঠেকিয়া থাকে। যখন আর্মেচার ঘুরানো হয় তখন আর্মেচার কুণ্ডলী চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখাগুলিকে ছেদ করে এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের নিয়মানুযায়ী কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হয়। এই আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের অভিমুখ কোন্ দিকে হইবে তাহা ফ্লেমিং-এর ডান হাত নিয়ম দ্বারা নির্ণয় করা যায়। ফ্লেমিং-এর ডান হাত নিয়মানুসারে দেখিলে দেখা যায় যে কুণ্ডলী একবার পূর্ণ আবর্তন করিলে প্রবাহ অর্ধেক সময় যে দিকে চলে বাকি অর্ধেক সময় প্রবাহ তাহার উলটা দিকে চলে এবং ইহার ফলে বহির্বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তী হয়।

সমপ্রবাহ জেনারেটর: সমপ্রবাহ জেনারেটরের ক্ষেত্রে ধাতব আংটার বদলে কুণ্ডলীর দুই প্রান্তে দুইটি অর্ধবৃত্তাকার তামার পাত যুক্ত থাকে। বহির্বর্তনীকে দুইটি ব্রাশের সাহায্যে কমিউটেটরের সহিত যুক্ত করা হয়। আর্মেচার যখন ঘুরানো হয় আর্মেচার কুণ্ডলীতে তখন পরিবর্তী তড়িচ্চালক বল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ব্রাশ দুইটি এমনভাবে অবস্থিত হয় যে আর্মেচার কুণ্ডলীতে যখন তড়িচ্চালক বলের অভিমুখ বদলায় তখন ব্রাশ দুইটিও পরস্পর কমিউটেটরের পাত বদলায়, অর্থাৎ যে কোনও একটি বিশেষ পাতকে ছাড়িয়া অপর পাতটিকে স্পর্শ করে। ফলে একটি নির্দিষ্ট পাত সর্বদা ধনাত্মক ও অপরটি ঋণাত্মক তড়িৎ সংগ্রহ করে এবং বহির্বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ সর্বদা একমুখী হয়।

বর্তমানে জেনারেটর সাধারণতঃ একটু জটিল হইয়া থাকে। পরিবর্তীপ্রবাহ জেনারেটরের আর্মেচারের উপরে ১২০° অন্তর আলাদাভাবে তিনটি তার কয়েক পাক জড়ানো হয়। ইহাদের তিনটির একটি দিক এক সঙ্গে আটকাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহাকে 'থ্রি ফেজ' পরিবর্তী প্রবাহ ব্যবস্থা বলা হয়। সমপ্রবাহ জেনারেটরের ক্ষেত্রে তারটি চোঙের কোনও একটি স্থানে না জড়াইয়া তারটিকে বিস্তৃতভাবে জড়ানো হয়। এই কারণে কমিউটেটর যন্ত্রাংশটি কিছুটা জটিল আকার ধারণ করে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে একটি আধুনিক জেনারেটরের তড়িৎশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

১ অশ্বশক্তি—৬ জন মানুষের শক্তি (সাধারণভাবে)।

একটি আধুনিক পরিবর্তী প্রবাহ জেনারেটরের তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০ মেগাওয়াট হইতে পারে।

১৫০ মেগাওয়াট	-	১৫০ × ১০⁶ ওয়াট
৭৪৬ ওয়াট	—	১ অশ্ব ক্ষমতা
১৫০ মেগাওয়াট	-	২ লক্ষ অশ্ব ক্ষমতা
	-	১২ লক্ষ মানুষের সমান

সুতরাং দেখা যাইতেছে একটি আধুনিক পরিবর্তীপ্রবাহ জেনারেটরের ক্ষমতা ১২ লক্ষ মানুষের ক্ষমতার সমান হইতে পারে।

[illegible] রায়

জেনারেল উইল সামাজিক চুক্তি মতবাদ দ্র

জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন ট্যারিফ্স অ্যাণ্ড ট্রেড

ইহা একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে পূর্বেকার বাধা নিষেধের বেড়াজাল হইতে মুক্ত করার জন্য এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (আই. টি. ও.) প্রস্তাবিত হয় এবং তাহার সনদ (হাভানা চার্টার ১৯৪৮ খ্রী) তৈয়ারি করার জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রস্তুতিসমিতি নিয়োগ করে। প্রস্তুতি-সমিতির সভ্যগণ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা শহরে আমদানি শুল্কের হ্রাস সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে ৭ মাস ধরিয়া সাফল্যের সহিত আলোচনা করে এবং উক্ত সনদ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ঐ বৎসর ৩০ অক্টোবর তারিখে জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন ট্যারিফ্স অ্যাণ্ড ট্রেড নামে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি হইতে চুক্তিটি বলবৎ হয়। ইহাতে ছিল চৌত্রিশটি ধারা, আটটি সংযোজন ও কুড়িটি শুল্ক তপশিল ('ট্যারিফ সিডিউল')। ভারত ও পাকিস্তান সমেত তেইশটি রাষ্ট্র ছিল ইহার

আদি চুক্তিকারী পক্ষ। প্রতিটি রাষ্ট্র (অথবা ইউনিয়ন) কর্তৃক প্রদত্ত শুল্ক সুবিধাগুলি তাহার নিজ তপশিলে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তপশিলগুলিতে সর্বসমেত ছিল বিশ্ব-বাণিজ্যের অর্ধাংশ জুড়িয়া ৪৫০০০ শুল্ক দফা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা স্থাপিত হয় নাই, জেনারেল এগ্রিমেন্টই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

জেনারেল এগ্রিমেন্ট অনুসারে ইহার সভ্যেরা পরস্পরের নিকট হইতে 'মোস্ট ফেভার্ড নেশন'-এর আচরণ পায়। এক সভ্য অপর সভ্যকে যে শুল্ক সুবিধা দেয় তাহা সকল সভ্য সমভাবে ভোগ করে। সাধারণ ও পছন্দমূলক ('প্রেফারেনশ্যল') শুল্কের হ্রাসসাধন, ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদের অবলোপ, শুল্কের প্রচলিত হারের আবদ্ধীকরণ ('বাইণ্ডিং'), এইগুলি জি এ টি টি র প্রধান উদ্দেশ্য। আমদানির পারিমাণিক সীমা নির্দেশ তুলিয়া দেওয়াই জি এ. টি টি-র সাধারণ নীতি কিন্তু লেনদেন সম্পর্কে ব্যালেন্স রক্ষার জন্য এবং জাতীয় শিল্পবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় হইলে উহা অনুমোদিত। আমদানি শুল্কের দ্বারা জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণ অবৈধ নয়, তবে আভ্যন্তরিক করের বোঝা দেশজ ও বিদেশজ দ্রব্যের উপর সমভাবে পড়িবে, ইহা জেনারেল এগ্রিমেন্টের অন্যতম নীতি। একাধিক সভ্য রাষ্ট্রের 'কাস্টম্‌স ইউনিয়ন' জি এ টি টি র দ্বারা স্বীকৃত। ইহার বৈঠকগুলি সভ্য রাষ্ট্রগুলিকে বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রশ্নে পরস্পরের সহিত নিয়মিত পরামর্শের সুবিধা দান করে।

জি এ টি টি র প্রধান সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ১৯৪৭, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫৬, ১৯৬০-৬২ ও ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইহার চুক্তিকারী পক্ষের সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ৬৭ (আরও ১৩টি রাষ্ট্র নানা বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ইহার আলোচনাদিতে অংশগ্রহণ করিত)। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে জি এ. টি. টি র একটি প্রতিনিধি পরিষদ স্থাপিত হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যাবারলার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে জি এ টি. টি. র কার্যকলাপে বিকাশমান দেশগুলির রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধি সাধনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রাথমিক দ্রব্যের উপর শুল্কের অবলোপের সিদ্ধান্ত ইহা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। উন্নত দেশগুলির প্রায় সকলেই আমদানির উপর পারিমাণিক বাধা দূর করিয়াছে। জি এ টি টি.-র সভ্যরূপে ভারত ইওরোপের বারোয়ারি বাজারে ('কমন মার্কেট'), আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে বিনা শুল্কে অথবা অল্প শুল্কে নানা দ্রব্য রপ্তানি করার সুবিধা লাভ করিয়াছে। বিকাশমান দেশগুলিকে রপ্তানি বাজার সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহের জন্য এবং রপ্তানি সংবর্ধনের কলাকৌশলের উন্নতিসাধনে সাহায্য করার জন্য ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র ('ইণ্টারন্যাশন্যাল ট্রেড সেণ্টার') স্থাপিত হইয়াছে। সভ্যদের উদ্দেশ্যসমূহকে ও বাধকতাগুলিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জি এ টি টি র কয়েকটি নূতন ধারা ('আর্টিক্‌ল্‌স') অবলম্বিত হইয়াছে। বিকাশমান দেশগুলির তথা ভারতের রপ্তানি সমস্যার সমাধানে জি. এ টি টি র অবদান তর্কের বিষয়। জি. এ টি টি-র কেনেডি রাউণ্ড আলোচনা প্রায় চারি বৎসর চলার পর সম্প্রতি সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে, বিশেষ করিয়া উন্নত দেশগুলির পারস্পরিক বাণিজ্যকে বাধামুক্ত করার ব্যাপারে এক অভূতপূর্ব কৃতিত্ব। অনুমান করা হইতেছে যে, জি. এ. টি. টি দেশগুলিতে ভারতীয় রপ্তানির ১০ শতাংশ ইহার দ্বারা উপকৃত হইবে।

দ্র *General Agreement on Tariffs and Trade*, vol I, Geneva, 1948, *Progress Report on the Operation of GATT*, Geneva, 1949, *Report of the Indian Fiscal Commission*, vol I, 1949-50, *United Nations Yearbook*, 1953, 1960, 1963, 1966

দেবপ্রসন্ন মিত্র

জেনেটিক্‌স বংশধর দ্র

জেনো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। ইলিয়ার অধিবাসী। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে জন্ম। টেলেউটো-গোরাসের পুত্র এবং বিখ্যাত দার্শনিক পারমেনিডেসের বন্ধু ও শিষ্য। প্লাতোর আলোচনায় জেনোর মতবাদের পরিচয় আছে। চিন্তাজগতে জেনোর যুক্তিকৌশলের অবদান সুদূর-প্রসারী। পারমেনিডেস অখণ্ড একের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস ছিল বহু বিভিন্ন গুণ ও গতির উপরে। এই প্রচলিত মতকে খণ্ডন করিবার জন্য জেনো যুক্তিজাল বিস্তারের এক অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিরুদ্ধবাদীর মত হইতে শুরু করিয়া উহা হইতে যুক্তিতর্কের সাহায্যে নানা অসম্ভব সিদ্ধান্ত বাহির করা হয়। তখন ঐ মত স্বতঃই নস্যাৎ হইয়া যায়। এই পদ্ধতি দ্বন্দ্ববাদ (ডায়ালেকটিক্স) বলিয়া খ্যাত। আরিস্টোটলই জেনোকে 'দ্বন্দ্ববাদের জনক' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। জেনো কতকগুলি কূটের সাহায্যে তাহার বিশ্লেষণ উপস্থিত করিতেন। যেমন—

'কচ্ছপটি চলিতে শুরু করিল। একিলিস কিছু পিছন হইতে দৌড় শুরু করিলেন। একিলিস কখনই কচ্ছপটিকে ধরিতে পারিবেন না। কারণ একিলিস্ যতক্ষণে কচ্ছপটির যাত্রাবিন্দুতে পৌঁছাইবেন কচ্ছপটি ততক্ষণে খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। আবার একিলিস যতক্ষণে অবশিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করিবেন ততক্ষণে কচ্ছপটি কিছুটা অগ্রসর হইবে। এইভাবে অনন্তকাল দৌড়াইলেও একিলিস্ কচ্ছপটিকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না।'

অমিতাভ সেন

জেবউন্নিসা (১৬৩৮-১৭০২ খ্রী) মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও তাঁহার ইরানীয় স্ত্রী দিলরস বানু বেগমের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেবউন্নিসা সুপণ্ডিত, কবি ও সুদক্ষ লেখনকুশলী (ক্যালিগ্রাফিস্ট) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং সমগ্র কোরান তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের অধিকারী জেবউন্নিসা বহু পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বহু লেখক জেবউন্নিসার নামানুসারে তাঁহাদের গ্রন্থের নামকরণ করেন।

রাজধানীতে জেবউন্নিসা তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতা যুবরাজ আকবরের সমর্থক ছিলেন। আকবরকে প্রেরিত তাঁহার চিঠিগুলি আবিষ্কৃত হইলে ক্রুদ্ধ ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন (১৬৮১ খ্রী)। কারারুদ্ধ অবস্থায় সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়া জেবউন্নিসার জীবনাবসান ঘটে। দিল্লী শহরের কাবুলী দরওয়াজার বাহিরে জাহানারার বিখ্যাত 'তিস্ হাজারী' উদ্যানে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

দ্র J N Sarkar, *History of Aurangzeb*, vol I, & III, Calcutta, 1912; J N. Sarkar, *Studies in Aurangzeb's Reign*, Calcutta, 1933

কুমুদরঞ্জন দাস

জেভিয়ার, সেন্ট (১৫০৬-৫২ খ্রী) খ্রীষ্টের ভক্ত সাধক ও বাণীপ্রচারক ফ্রান্সিস জেভিয়ার ভারতবর্ষের বহু স্থানে বিশেষভাবে সম্মানিত। তাঁহার নামে অনেক গির্জা ও শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এবং অসংখ্য ভারতীয় খ্রীষ্টানের নামকরণ হইয়াছে।

স্পেনের অন্তর্গত নাভার রাজ্যে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া লৌকিক বিদ্যালাভ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে সেন্ট ইগ্নেসিয়াস লয়োলার সংস্পর্শে আসিয়া খ্রীষ্ট সাধনায় ও সন্ন্যাসগ্রহণে প্রেরণা লাভ করেন। ১৫৩৪ হইতে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেভিয়ারের জীবন খ্রীষ্টের ধ্যানে ও সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত হয়। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত যীশু সংঘের (সোসাইটি অফ জিসাস) একজন প্রথম সদস্যরূপে তিনি প্রাচ্য জগতে খ্রীষ্টের নাম ও বাণী প্রচার করিতে প্রেরিত হন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি গোয়া নগরে, পরে কন্যাকুমারীকার পূর্বাঞ্চলে এবং ত্রিবাঙ্কুরে খ্রীষ্টীয় ধর্মশিক্ষা দান করিতে থাকেন। সুদূর প্রাচ্যের দিকে যাত্রা করিয়া তিনি মালয় দেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে এবং জাপানে (১৫৪৯-৫০ খ্রী) খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া (১৫৫২ খ্রী) পুনরায় চীন দেশে ধর্ম প্রচার মানসে যাত্রা করেন, ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ক্যান্টনের নিকট চীনের উপকূলস্থ একটি দ্বীপে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে তাঁহার মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় গোয়া নগরে আনীত হয় এবং সেখানে আজও পর্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে সংরক্ষিত হইয়া আছে। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সেন্ট আখ্যা দেওয়া হয়।

জেভিয়ার ভারতবর্ষ, জাপান ও চীন সম্বন্ধে যসব পত্র ইওরোপে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকে ধর্মপ্রচারকার্যে উৎসাহিত হইয়াছিল। তিনি প্রাচ্য দেশের মধ্যে প্রথম খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারকার্যের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার গভীর খ্রীষ্টভক্তি ও অক্লান্ত নাম প্রচারোৎসাহে জেভিয়ার সন্ত, মিশনারির আদর্শস্বরূপ। ভক্ত ও প্রার্থী সাধক হিসাবে তিনি সর্বদেশের শ্রদ্ধেয়।

দ্র এম. সি চক্রবর্তী, ভারতে খ্রীষ্টের বাণীপ্রচারক, কলিকাতা, ১৯৫৯; J Brodrick, *Saint Francis Xavier*, London, 1952.

পিয়ের ফালোঁ

জেম্‌স, উইলিয়াম (১৮৪২-১৯১০ খ্রী) মার্কিন দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ। প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম (pragmatism) নামক মতবাদের প্রবক্তা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম ডি উপাধি লাভ করেন। তৎপূর্বে ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্থিবিদ্যা (অ্যানাটমি), শারীরবিদ্যা (ফিজিওলজি) ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন।

মনোবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে উইলিয়াম জেম্‌সের মুখ্য অবদান সংবিৎ (কন্‌সাসনেস্) সম্বন্ধে তাঁহার নূতন মতবাদ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সংবিৎ এর অস্তিত্ব বিচার বিষয়ক একটি

প্রবন্ধ ('ডাজ কনসাস্‌নেস্‌ একজিস্ট') প্রকাশিত হয়। জ্ঞান ক্ষেত্রে প্রচলিত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর দ্বৈত জেম্‌স অস্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞেয় বস্তু মন নিরপেক্ষ এ কথা জেম্‌স স্বীকার করেন নাই। জেম্‌স বলেন যে সংবিৎ কোনও সত্তা ('এনটিটি') নহে। সংবিৎ বলিতে এমন কোনও মৌলিক পদার্থকে বুঝায় না যাহা জ্ঞেয় বস্তু হইতে গুণগতভাবে পৃথক। মৌলিক পদার্থ একটি যাহাকে তিনি 'শুদ্ধ অভিজ্ঞতা' (পিয়োর এক্সপিরিয়েন্স) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই শুদ্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারাই জগতের যাবতীয় বস্তু গঠিত। এই শুদ্ধ অভিজ্ঞতার দুইটি বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধকে জ্ঞান বলে। এক অবিভাজ্য শুদ্ধ অভিজ্ঞতাই ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইয়া ওঠে।

সংবিৎ মূলতঃ এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান শুদ্ধ অভিজ্ঞতা। আমাদের মন (মাইণ্ড) ব্যাবহারিক সুবিধার জন্য ইহাকে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে, কিন্তু কোনও কিছু প্রত্যক্ষ করিবার কালে মনে কোনও বিক্ষিপ্ত আণবিক সংবেদন-এর উদয় হয় না। শুদ্ধ অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎ প্রাণ প্রবাহ (ইম্মিডিয়েট ফ্লাক্স অফ লাইফ)। বহির্জগতের বস্তুপুঞ্জ এই প্রবহমান শুদ্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা গঠিত বলিয়া ঘটনাবলী (ইভেণ্টস) এবং সংবিৎ প্রবাহের মধ্যে সমতা বিদ্যমান।

দৈনন্দিন ব্যাবহারিক কাজের সুবিধার জন্য মন অখণ্ড অভিজ্ঞতা প্রবাহকে আত্মগত পরমাণুতে পরিণত করিয়া দেখে। কারণ পরিবর্তনশীল ও প্রবহমান অভিজ্ঞতা দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের পক্ষে অনুপযুক্ত। সেজন্য অভিজ্ঞতার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। এই পুনরুক্তি অভিজ্ঞতা প্রবাহে অনুপস্থিত হইলেও মন ইচ্ছার (উইল) দ্বারা চালিত হইয়া অভিজ্ঞতার পুনরুক্তি কল্পনা করিয়া লয়। এই উপায়ে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ জীবনে সার্থকতার অন্বেষণ করে। যখন সে দুইটি বিরোধী বিন্যাসের সম্মুখীন হয়, তখন মানুষ সেই বিশ্বাসটিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে যাহার দ্বারা অধিকতর ব্যাবহারিক সার্থকতা লাভ করা সম্ভব। ইহাই প্র্যাগ্‌মাটিজ্‌ম্‌।

জেম্‌সের মতে সত্য বস্তুর সহিত মানসিক ধারণার (আইডিয়া) সাদৃশ্যের উপরে নির্ভর করে না। আমরা যাহা পাই তাহা কেবল বহির্বস্তু সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ কোনও অনুভূতির মনের অপরাপর অনুভূতিসমূহের সহিত সংগতি (কোহারেন্স) থাকিলেই উক্ত অনুভূতি সত্যদ্যোতক হয় না। সত্য বিশ্বাসের অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব। সত্য কোনও বিষয়মুখ (অবজেকটিভ) গুণ নহে, তাহা অভিজ্ঞতাপূর্ব-ভাবে (*a priori* আপ্রিয়োরি) বর্তমানও থাকে না। প্র্যাগ্‌মাটিজ্‌ম্‌ অনুসারে যে-কোনও ধারণা স্বীয় ব্যাবহারিক সাফল্যের দ্বারা সত্য হইয়া ওঠে। অভিজ্ঞতাই সত্য-বিচারের মানদণ্ড। এই মতবাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে জেম্‌স ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদসমূহ গ্রহণ করেন নাই। মানুষ তাহার প্রয়োজনানুসারে যুক্তির বৈচিত্র্য ও বিন্যাস সাধন করিয়া থাকে। তাই ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে কেবল সেই মতগুলিই সার্থক ও স্বীকার্য যাহার দ্বারা মানুষের বাসনা, বিশ্বাস ও প্রয়োজন সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করে।

জেম্‌সের মতবাদে ইচ্ছার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। সত্যকেও তিনি জ্ঞাতৃ নিরপেক্ষ বলিয়া কখনও ভাবেন নাই। সত্য বিষয়গত (অবজেকটিভ) নহে, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল, জ্ঞাতার সন্তোষসাপেক্ষ। তাঁহার মতে, বিজ্ঞানের বিবরণাত্মক সত্যতা আমাদের ইচ্ছা বা লক্ষ্যনিরপেক্ষ নহে।

দ্র William James, *Pragmatism*, New York, 1914, Ralph Barton Perry, *The Thought and Character of William James*, vols I-II, London, 1935; Bertrand Russel, *History of Western Philosophy*, London, 1946

বিশ্বনাথ রায়

জেম্‌স, হেনরি (১৮৪৩-১৯১৬ খ্রী) আমেরিকান ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মযাজক পিতা ধর্মতত্ত্বের বিখ্যাত লেখক। শিশু জেম্‌স পিতার নিকটেই শৈশবে শিক্ষালাভ করেন। মাতাপিতার সাহচর্যে তিনি নিউ ইয়র্ক, প্যারী ও জেনিভায় শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেন। পরে হার্ভার্ডে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সাহিত্যজীবন শুরু হয় এবং ঐ বৎসরেই তিনি 'স্টোরি অফ এ ইয়ার: এ টেল অফ দি আমেরিকান সিভিল ওয়র' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ড ও ইটালীতে বসবাস করেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুর এক মাস পূর্বে ইংল্যাণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ তাঁহাকে 'অর্ডার অফ মেরিট' দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'রোডেরিক হাড্‌সন' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার অজস্র উপন্যাসের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য, 'ডেইজি মিলার' (১৮৭৮

খ্রী), 'দি পোর্ট্রেট অফ এ লেডি' (১৮৮১ খ্রী), 'প্রিন্সেস কোসামাসিমা' (১৮৮৬ খ্রী), 'দি অ্যাসপার্ন পেপার্স অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' (১৮৮৮ খ্রী), 'দি ট্র্যাগজিক মিউজ' (১৮৯২ খ্রী), 'দি স্পয়েল্‌স অফ পয়েণ্টন' (১৮৯৭ খ্রী), 'হোয়াট মেইজি নিউ' (১৮৯৭ খ্রী), 'দি উইংস অফ এ ডাভ' (১৯০২ খ্রী)। তাঁহার অসমাপ্ত উপন্যাস 'দি সেন্স অফ দি পাস্ট' তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। তিনি কয়েকটি নাটকও রচনা করেন। কিন্তু সেগুলি তেমন সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেই দিক হইতে বলা যাইতে পারে নাট্যকার হিসাবে তিনি সফল হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'ইটালিয়ান আওয়ার্স, ইংলিশ আওয়ার্স', 'ফ্রেঞ্চ পোয়েট্‌স অ্যাণ্ড নভেলিস্ট্‌স', 'পার্শাল পোর্ট্রেট্‌স', 'নোট্‌স অন দি নভেলিস্ট্‌স' এবং 'দি আর্ট অফ দি নভেল'।

হেনরি জেম্‌সকে ঔপন্যাসিকের ঔপন্যাসিক বলা হয়। তিনিই সবপ্রথম উপন্যাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি হিসাবে উপস্থাপিত করেন। জেম্‌সের প্রতিভা স্বভাবতঃই অনুসন্ধানী। তাঁহার সেই খবরসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের তুচ্ছতম খুঁটিনাটির প্রতি সমভাবে প্রসারিত ছিল। তিনি ছিলেন কথাকুশলী ও বাক্যরচনার দক্ষ রূপকার। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার জেম্‌স তুর্গেনেভ, ফ্লোবেয়ার, মোপাসাঁ, জোলা ও দদে র দ্বারা অনুপ্রাণিত।

দ্র Michael Swan, *Henry James*, London, 1950.

শিশির চট্টোপাধ্যায়

জেরুসালেম, যেরুসালেম ৩১°২৮′ উত্তর ও ৩৫°৮′ পূর্বে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা ভূমধ্যসাগর হইতে ৫৫ কিলোমিটার (৩৪ মাইল) দূরে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৮০ মিটার (২৬০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত। জেরুসালেম ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের পবিত্র নগরী বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীন কালে নির্বাসিত ইহুদীগণ এই স্থানে তাঁহাদের রাজ্য স্থাপন করিয়া আদর্শ নগরী গড়িয়া তোলেন। যীশুখ্রীষ্টের জীবনের প্রথম ভাগ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বহু ঘটনার সহিত এই স্থান জড়িত। মুসলমান-দিগের ইহা তৃতীয় পবিত্র নগরী।

আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইহা এক সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ডেভিড এই নগর অধিকার করিয়া ইহুদী রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র সোলোমোন এখানে রাজপ্রাসাদ, মন্দির, সরকারি কার্যালয় প্রভৃতি নির্মাণ করেন ও নানাভাবে নগরের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই যুগেই ইহুদী রাজত্বের বিকাশ সাধিত হয়। সোলোমোন, জেরোবোয়াম, হেরোদ দি গ্রেট প্রভৃতি শাসকদিগের সময়ে বহু দুর্গ এবং ইহুদী মন্দির এখানে নির্মিত হয়।

৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট টিটস জেরুসালেম অধিকার করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। পরবর্তী কালে ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হাড্রিয়ান ইহা পুনর্গঠন করেন। ইহার নাম হয় আএলিয়া কাপিতোলিনা। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কন্‌স্টান্‌টীন-এর সময় হইতে জেরুসালেমের নানা স্থানে গির্জা ও অন্যান্য সৌধ গড়িয়া ওঠে। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা খলিফা ওমরের হস্তগত হয়। ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুসেড যোদ্ধাগণ বুইয়ঁ (Bouillon) এর গডফ্রের নেতৃত্বে জেরু-সালেম জয় করিয়া ইহাকে লাতিন রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সালাদীন ইহা পুনরধিকার করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অ্যালেনবি ইহা জয় করিয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আড়াই বৎসর সামরিক সরকারের অধীনে থাকিবার পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই ইহা প্যালেস্টাইনের রাজধানী হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইসরায়েল ও জর্ডনের মধ্যে বিভক্ত হয়। জেরুসালেমের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য:

ইহুদীদের রোদন প্রাচীর (ওয়েলিং ওয়াল), মাউণ্ট অফ অলিভ্‌জ এর উপর বিখ্যাত গেথসেমানি (Gethse-mane) উদ্যান, ক্রুশ বহনকারী খ্রীষ্টের পদধূলিতে ধন্য 'ভিয়া দোলোরোজা' বা দুঃখময় পথ, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্থান গোল্‌গোথা এবং তাঁহার সমাধিস্থল আরিমাথেয়ার যোজেফের উদ্যান। তাহা ছাড়া এখানে মুসলমানদিগের অল্‌-অক্‌সা (El Aksa) মসজিদ এবং ওমর মসজিদ অবস্থিত। মসজিদ দুইটি ইহুদী মন্দিরের বেদিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্র George B Cressey, *Cross Roads Land and Life in South-West Asia*, Chicago, 1960.

পল দাশুপ্ত

জেল অপরাধ, শাস্তি, জেল, কারাগার এই সবই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কারাগার বা বন্দীশালার উল্লেখ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাওয়া যায়, কিন্তু এইসব বন্দীশালা বা কারাগার অপরাধীর চূড়ান্ত শাস্তির দিন পর্যন্ত তাহাকে আটক রাখার ব্যবস্থামাত্র ছিল। বর্তমান যুগের জেলখানা পূর্বতন বন্দীশালা বা কারাগার অপেক্ষা অনেক উন্নত ও সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান। বর্তমান অপরাধ ও

শাস্তিবিজ্ঞানে অপরাধীর প্রতি প্রতিহিংসার মনোভাবের পরিবর্তে প্রতিবেদনার মানসিকতা স্পষ্টতর। ফলে, অপরাধী, অপরাধবিজ্ঞান ও জেল-ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীর অপরাধের বিচার নয়, বরং পুনর্গঠনে সামাজিক জীবনে পুনর্বাসনে তাহাকে সাহায্য করা— এই গঠনমূলক মনোভাব সর্বপ্রথম দেখা যায় ইংল্যাণ্ডের 'হাউস অব করেকশন' বা 'ওয়ার্ক হাউস' -গুলিতে। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে সর্বপ্রথম 'হাউস অব করেকশন' স্থাপিত হয়।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের জন হাওয়ার্ড ইওরোপের সমস্ত জেলখানা পরিদর্শন করেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'স্টেট অফ প্রিজ্‌নস' বইটি প্রকাশিত হয়। জন হাওয়ার্ডও গঠনমূলক শাস্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তবে, সৃজনমূলক কায়িকশ্রম, শিক্ষা, আনুগত্য ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে নির্জন বাসের ব্যবস্থাটিও তিনি অনুমোদন করেন। 'খুপরি' অথবা 'সেলুলার' জেলের পরিকল্পনাটি জন হাওয়ার্ডেরই।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়ার্ডের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'পেনিটেনশ্যারি' আইনের প্রবর্তনা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপেও বিশেষভাবে প্রুসিয়ার জেলের উন্নতি দেখা দিয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শাস্তিব্যবস্থার মানবিক দিকটি অপরাধবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর চোখে আরও স্বচ্ছ, স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই নূতন ব্যবস্থায় অপরাধীকে জেলখানায় পাঠানো হয় শাস্তি দিবার জন্য নয়, তাহার 'অপরাধ রোগের' চিকিৎসার জন্য। মানুষ তাহার স্বভাবে অপরাধ করে না, করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অসুস্থ পরিস্থিতির প্রভাবে। অপরাধের মুহূর্তে মানুষ তাহার সামাজিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয়, কিন্তু এই স্খলন সাময়িক মাত্র।

পরীক্ষামূলকভাবে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে 'খোলা-জেলখানা' সফল হইয়াছে।

অপরাধ ও শাস্তি বিজ্ঞানের নূতন নূতন গবেষণার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবর্ষেও জেলখানার নানা প্রকার পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের জেলখানাগুলিকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায়— সেন্ট্রাল জেল, ডিস্ট্রিক্ট জেল, সাবসিডিয়ারি জেল। এক বৎসরের বেশি দণ্ড-প্রাপ্ত অপরাধীদের সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। ডিস্ট্রিক্ট জেলে সব রকম অপরাধীই আসে। অপরাধ নির্ধারিত হয় নাই অথবা অল্প সময়ের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের জন্য আছে সাবসিডিয়ারি জেল বা লক-আপ। তরুণ অপরাধীদের জন্য আলিপুর ও বেরিলীতে জুভেনাইল জেল আছে। জুভেনাইল জেলে ১৮ বৎসরের বেশি অপরাধীকে রাখা হয় না। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের লখনৌ শহরে একটি আদর্শ জেলখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই ধরনের জেলে অপরাধীর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় যাহাতে অপরাধী নিজকে সামাজিকভাবে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে পারে।

দ্র P K Sen, *Penology Old and New*, Calcutta, 1943, P W Tappan, *Contemporary Correction*, New York, 1951, G M Sykes, *The Society of Captive*, 1958, G. Rose, *The Struggle for Penal Reform*, Chicago, 1961

বে সেনগুপ্ত

জেলা রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার্থে রাজ্যকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করা হয়, ইহাদেরই জেলা বলে। প্রত্যেক জেলা সাধারণতঃ একজন জেলা শাসক ও সমাহর্তার (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ড কালেক্টর) শাসনাধীন থাকে। প্রতি জেলা এক বা একাধিক মহকুমা লইয়া গঠিত, আবার কয়েকটি জেলা লইয়া একটি বিভাগ।

গুপ্তপূর্ব যুগে দেশবিভাগে আমরা জেলার উল্লেখ পাই না। গুপ্ত যুগে প্রথম জেলা (বিষয়)র সাক্ষাৎ মেলে। রাজ্যশাসনের জন্য দেশ তখন কতকগুলি প্রদেশ বা ভুক্তিতে আবার প্রত্যেক ভুক্তি কতকগুলি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত ছিল। গুপ্ত যুগে বীথি কি ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। পরবর্তী যুগে ইহা ভুক্তি ও মণ্ডলের অংশ বুঝাইত। মণ্ডল আবৃত্তিতে, আবৃত্তি চতুরকে এবং চতুরক পাটকে বিভক্ত ছিল। পাটক বলিতে অর্ধগ্রাম বুঝাইত। বিষয় বলিতে সাধারণতঃ জেলা বুঝাইত কিন্তু কোনও কোনও সময়ে বিষয় ও মণ্ডল এক বিভাগ বুঝাইত, যেমন খাড়ি বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইলেও লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রশাসনে মণ্ডল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সময় সময় বিষয় মণ্ডলের অংশ বুঝাইত, আবার মণ্ডলও কোনও ক্ষেত্রে বিষয়ের অংশ বুঝাইত। গুপ্ত যুগের বিষয়গুলির মধ্যে ত্রিপুরী, অরিকিন, মহাখুষাপার, গয়া, কোটিবর্ষ ব্যতীত লাট ও অন্তর্বেদী সম্ভবতঃ জেলা ছিল। পাল আমলে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির স্থালীকট, কুদ্দালখাত, কোটিবর্ষ, খেদিরবল্লী, ইক্কডাসী, সতটপদ্মাবাটি ও খাড়িবিষয়ও কয়েকটি মণ্ডলের জেলা হওয়া সম্ভব। এতদ্ব্যতীত বর্ধমান

প্রভৃতি কয়েকটি ভুক্তির কয়েকটি মণ্ডল জেলা হইতে পারে। গুপ্ত যুগে বিষয় বিষয়পতির অধীনে ছিল। সাধারণতঃ কুমারামাত্য আয়ুক্তক, সামন্তমহারাজগণ বিষয়পতি হইতেন। কোনও বিষয়পতি (যেমন অন্তর্বেদীর সর্বনাগ) সরাসরি সম্রাটের অধীন ছিলেন আবার কোটিবর্ষ ও ত্রিপুরীর বিষয়পতিরা প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীন ছিলেন। জেলায় বিষয়পতিকে সাহায্য করিবার জন্য প্রায়ই বিষয়াধিকরণ ছিল। ১, ২, ৪ ও ৫ -সংখ্যক দামোদরপুর তাম্রশাসনে কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিকরণে বিষয়পতির সহায়করূপে নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ এবং প্রথম সার্থবাহের উল্লেখ আছে।

মুসলমান যুগে তুর্ক-আফগানদিগের সময় দেশবিভাগে জেলার উল্লেখ দেখা যায় না। শেরশাহের সময় সরকার ও পরগনার উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার সাম্রাজ্যে ৪৭টি সরকার ছিল ও আব্বাসের মতে ১১৩০০০ পরগনা ছিল। এত পরগনা হইতে পারে না, সম্ভবতঃ এগুলি গ্রাম। সরকার সম্ভবতঃ জেলা নয়, প্রদেশ। আকবরের সময় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র সাম্রাজ্যে ১২টি সুবা, ১০৫টি সরকার ও ২৭৩৭টি পরগনা ছিল। পরে বেরার, খান্দেশ ও আহ্‌মদনগর— এই তিনটি সুবা যোগ হয় ও সরকার মহলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সরকারগুলি জেলা হইতে পারে। কিন্তু আকবরের সরকার ছিল রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ নয়।

ব্রিটিশভারতে ২৫০টির অধিক জেলা ছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ভারতে জেলার সংখ্যা ৩৩০। দেশবিভাগের পূর্বে অখণ্ড বঙ্গ দেশে রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি – এই পাঁচটি বিভাগে কলিকাতাসহ ২৮টি জেলা ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট দেশবিভাগের পর সম্পূর্ণ বর্ধমান বিভাগ ও পুনর্গঠিত প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মোট ১৪টি জেলা (কলিকাতাসহ) লইয়া পশ্চিম বঙ্গ গঠিত হয়। পরবর্তী কালে বিহার রাজ্য হইতে সিংভূম জেলার অধিকাংশ লইয়া গঠিত পুরুলিয়া এবং দেশীয় রাজ্য কুচবিহার পশ্চিম বঙ্গের যথাক্রমে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি— এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৫টি জেলা— কলিকাতা, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ। বর্ধমান বিভাগে ৬টি জেলা যথা— মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও বর্ধমান। জলপাইগুড়ি বিভাগে ৫টি জেলা— কুচবিহার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং। ইংরেজ আমলে প্রত্যেক জেলায় জেলা-শাসক ও সমাহর্তা এবং জেলা-বিচারক এই দুই জন পদস্থ অধিকারিক থাকিতেন। দেশবিভাগের পরে জেলা শাসক ও সমাহর্তা জেলার শাসনকার্য এবং জেলা-বিচারক জেলার বিচারকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও পুরুলিয়া জেলায় জেলা-শাসক ও সমাহর্তার পরিবর্তে উপ ভুক্তিপতি (ডেপুটি কমিশনার) জেলার শাসনকার্য চালাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া কলিকাতা জেলা হিসাবে পরিগণিত হইলেও এখানে জেলা শাসক ও সমাহর্তা বা উপ ভুক্তিপতি নাই।

দ্র H. Blochmann, tr., *Ain-i Akbari*, vol I, Calcutta, 1939, H C Raichaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1940, R C Majumdar, ed. *History of Bengal*, vol. I, Dacca, 1943, H S Jarrett, *Ain-i Akbari*, Calcutta, 1949

বিজয়চন্দ্র দত্ত

জেলা পরিষদ স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হইবার পূর্বেই উত্তর প্রদেশে পঞ্চায়েতী রাজপ্রথা প্রবর্তনের প্রাথমিক চেষ্টা হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কিভাবে এই প্রথা সম্যক কার্যকর করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। বাংলার বাহিরে অনেক প্রদেশে এখন তিনটি স্তরে পঞ্চায়েতী রাজের ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে এই রাজ প্রবর্তিত হইয়াছে চার স্তরে। দুই তিনটি গ্রাম লইয়া একটি গ্রামসভা ও গ্রামপঞ্চায়েত, পাঁচ ছয়টি গ্রামপঞ্চায়েত লইয়া একটি অঞ্চলপঞ্চায়েত, প্রতি ব্লক (Bloc) অঞ্চলে একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ এবং প্রতি জেলায় একটি জেলা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিম বঙ্গ পঞ্চায়েত আইন এবং ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জেলা পরিষদ আইন অনুসারে এইগুলির প্রবর্তন হইয়াছে। এই চারিটি স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির সামগ্রিক নাম পঞ্চায়েত-রাজ।

জেলা পরিষদের সভাসংখ্যা ঠিক যে নির্দিষ্ট আছে তাহা নহে। জেলার মধ্যে যতগুলি আঞ্চলিক পরিষদ আছে সেগুলির প্রেসিডেন্ট সকলেই এই জেলা পরিষদের সদস্য। একটি জেলা যতগুলি মহকুমায় বিভক্ত তাহার প্রত্যেকটি মহকুমা হইতে দুই জন করিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ জেলা পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন। প্রতি জেলা হইতে নির্বাচিত লোকসভার ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যরাও ঐ পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইবেন। অবশ্য তাঁহারা মন্ত্রী হইলে ঐ পদাধিকার থাকিবে না।

সেইভাবে রাজ্যসভার অথবা প্রাদেশিক আইন পরিষদের কোনও সদস্য যদি ঐ জেলার বাসিন্দা হন তাহা হইলে তাঁহারাও পরিষদের সভ্য হইবেন। মন্ত্রী হইলে সভ্য থাকিতে পারিবেন না। ইহা ছাড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত শহরগুলিতে যে সব মিউনিসিপ্যালিটি আছে তাহাদের চেয়ারম্যানদের মধ্য হইতে একজন জেলা পরিষদের সদস্য মনোনীত হইবেন। জেলা শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদাধিকারে ইঁহারা সকলে জেলা পরিষদের সদস্য। যদি মহিলা সদস্য বিশেষ না থাকেন তাহা হইলে দুই জন মহিলা সদস্য পর্যন্তও মনোনীত হইতে পারিবেন। জেলার মহকুমা হাকিমেরা ও জেলা পঞ্চায়েত অফিসার জেলা পরিষদের অ্যাসোসিয়েট সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন। জেলা পরিষদের সদস্যরা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান ও আর একজনকে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

জেলা পরিষদগুলি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলি কিভাবে কাজকর্ম চালান তাহা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই।

নরেশচন্দ্র রায়

জেলা বোর্ড ব্রিটিশ আমলের প্রথম এক শতাব্দীতে যে শাসনের কাঠামো গড়িয়া উঠে তাহাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। এদিক ওদিক দুইচারিটি শহরে মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা মাত্র হইয়াছিল। জেলা শাসন সমগ্রভাবে সরকারি আমলাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ১৮৭০ ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সামান্য কিছু পরিবর্তন হইলেও লর্ড রিপনের সময় পর্যন্ত মোটামুটি আমলাতন্ত্র বজায় থাকে।

লর্ড রিপন ভারতে গভর্নর জেনারেল থাকা কালীন ভারত গভর্নমেন্ট এক সিদ্ধান্ত (১৮৮১ খ্রী) গ্রহণ করেন যাহাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইতে পারে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার তখনকার প্রাদেশিক আইন পরিষদে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের প্রস্তাব করেন। প্রায় এক বৎসর পরে এই প্রস্তাব নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া এক নূতন প্রস্তাবের আকার ধারণ করে এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনে পরিণত হয় (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং আইন)।

এই আইন অনুসারে প্রতি জেলায় একটি জেলা বোর্ড ও প্রতি মহকুমায় একটি স্থানীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হইল। জেলা বোর্ডগুলির দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিবর্তন হয়) সদস্য বা স্থানীয় বোর্ডগুলির দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারিত। অর্ধ শতাব্দীর উপর এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকার পর স্থানীয় বোর্ডগুলি তুলিয়া দিবার বন্দোবস্ত হয় এবং সেই কারণে জেলা বোর্ডগুলির সদস্যদের পরোক্ষ নির্বাচন বন্ধ করিয়া সোজা নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হইবার ৩৪।৩৫ বৎসর পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বা অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করিতেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারত সরকার আইন প্রবর্তিত হইবার পর বেসরকারি সদস্যদের মধ্য হইতে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইতে থাকে।

জেলা বোর্ডগুলির প্রধান কর্তব্যগুলির মধ্যে ছিল: ১. রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত ২. স্থানে স্থানে চিকিৎসার ব্যবস্থা ৩. রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব নিবারণ এবং ৪. প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার। কিন্তু সংগতির অভাবে কোনও জেলা বোর্ডই সকল কর্তব্য কোনও দিন সুসম্পন্ন করিতে পারে নাই। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জেলা বোর্ডগুলি তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়।

নরেশচন্দ্র রায়

জেলিমাছ একনালী প্রাণীগোষ্ঠীর (ফাইলাম-কোএলেন্টেরাটা, Phylum-Coelenterata) অন্তর্ভুক্ত সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্বের শিলাস্তরেও জেলিমাছের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে।

জেলিমাছের দেহের কোষগুলি দুইটি স্তরে সজ্জিত, এই দুই স্তরের মধ্যে মেসোগ্লিয়া নামক অর্ধতরল একপ্রকার পদার্থ থাকে। এই অর্ধতরল পদার্থের জন্যই ইহাদের দেহ জেলির মত নরম হইয়া থাকে। দেহে জৈব পদার্থ মাত্র শতকরা ১ ভাগ, অজৈব পদার্থ ৩ ভাগ ও অবশিষ্ট ৯৬ ভাগই জল। ইহাদের দেহের আকৃতি খোলা ছাতার মত। এই ছাতার চারি দিকে অনেক শুঁড়ের মত অঙ্গ বা কর্ষিকা (মার্জিন্যাল টেনটাকল) থাকে। জেলিমাছ মাংসাশী প্রাণী। শিকার ধরিবার সময় ও আত্মরক্ষার্থে কর্ষিকার কতকগুলি কোষ অন্য প্রাণীর দেহে সংলগ্ন করিয়া বিষনিঃসরণে তাহাদের অবশ করিয়া দেয়, এই কোষগুলি মানুষের দেহে লাগিলে ভয়ানক জ্বালা অনুভব হয়। ছাতার মত দেহের নীচের দিকে ইহাদের মুখ, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া খাদ্য ধরিবার জন্য চারিটি মাংসল মুখ-বাহু (ওর‍্যাল আর্ম) থাকে। খাদ্যনালীটি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। সমুদ্রজল হইতে খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ও দেহ হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিয়া এই নালী একযোগে খাদ্যনালী, রক্তসংবহনতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র

ও রেচনতন্ত্রের কাজ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ জেলি-মাছের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। পুরুষ প্রাণীর দেহে চারিটি অণ্ডকোষ এবং স্ত্রী প্রাণীর দেহে চারিটি ডিম্বাশয় থাকে, সেগুলি অশ্বক্ষুরাকৃতি এবং খাদ্যনালীরই চারিটি থলিতে অবস্থিত।

জেলিমাছ আলোক ও অন্ধকারের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে। জল ও বায়ুর স্রোতে এবং কর্ষিকাগুলির সাহায্যে ইহারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। দেহের মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা ইহারা জলের মধ্যে ওঠানামা করে।

প্রায় ২ মিলিমিটার হইতে ২ মিটার পর্যন্ত ব্যাসের জেলিমাছ দেখা যায়। উত্তর অ্যাটলান্টিকের সর্ববৃহৎ জেলিমাছ 'কিয়ানেয়া আর্কটিকা'র (*Cyanea arctica*) কর্ষিকার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ মিটার ও ওজন প্রায় ১০ কুইন্টাল। 'পেলাগিয়া নক্‌টিলুকা' (*Pelagia noctiluca*) প্রজাতির জেলিমাছের শরীর হইতে একপ্রকার জৈব আলো বিকিরিত হইয়া থাকে।

ভারতীয় সমুদ্রোপকূলে জেলিমাছ পাওয়া যায়। চীন ও জাপানে কতকগুলি প্রজাতির জেলিমাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'একনালী প্রাণী' দ্র।

দ্র L. H Hyman, *The Invertebrates, Protozoa through Ctenophora*, vol I, New York, 1940.

অসীমকুমার চক্রবর্তী

জেসুইট ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সোসাইটি অফ জিসাস-এর সদস্যগণের লোকপ্রসিদ্ধ নাম। ইগনাশিয়ুস লয়োলা (১৪৯১-১৫৫৬ খ্রী) এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। মধ্যযুগীয় নাগর-ঐতিহ্যে লালিত ইগনাশিয়ুস প্রথম জীবনে সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দীর্ঘদিন দূরে থাকিবার অবসর সময়ে যীশুখ্রীষ্টের এবং সাধুসন্তগণের জীবনী পাঠ করিয়া তিনি সংকল্প করেন যে ঐহিক কোনও রাজার জন্য যুদ্ধ না করিয়া তিনি যীশুখ্রীষ্ট-প্রদর্শিত পথে আত্মনিয়োগ করিবেন। কয়েক জন শিষ্য তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসেন—সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় পল সোসাইটিকে সরকারি স্বীকৃতি দান করেন। প্রথম দীক্ষিত জেসুইটগণ ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারে আজীবন আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প করিয়া পোপকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি পৃথিবীর সেখানেই তাঁহাদের পাঠাইবেন যেখানেই তাঁহারা যাইতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিবেন। আজ্ঞাপালনের এই বিশেষত্ব জেসুইটগণ আজও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সোসাইটির সদস্যসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তাঁহারা খ্রীষ্টের বাণী প্রচারে, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যে এবং তাঁহাদের স্বীয় ক্যাথলিক সমাজের সেবাকার্যে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ চতুর্দশ ক্লিমেন্ট জেসুইটদের প্রতিহত করেন, কিন্তু ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পোপ সপ্তম পায়াস তাহাদের পুনরায় স্বীকৃতি দান করেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই আজ জেসুইটদের কর্মভূমি। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫৮২৯, বিভিন্ন মহাদেশে নিম্নলিখিত সংখ্যায় তাঁহারা বিস্তৃত: ইওরোপ ১৬১২৬, এশিয়া—৫০৩৯ (ভারতবর্ষ ২৬৯৫), আফ্রিকা—৬৫২, উত্তর আমেরিকা—৯৫২৫ এবং দক্ষিণ আমেরিকা—৬৪৫৫।

বর্ণার ব্রাগোয়ান

জেহাদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ, সর্বস্ব-ত্যাগ, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া ন্যায়, নীতি, আদর্শ ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করিবার নামই জেহাদ। জেহাদ অর্থে শুধু তরবারির যুদ্ধ নয়, শেষ পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মোস্তফা (সা.) আদেশ করিয়াছেন যে ইসলামের জন্য বিধর্মীর সাথে যে যুদ্ধ তাহা ক্ষুদ্র জেহাদ এবং মানবের ষড়্‌রিপুর সহিত বিবেকের যে অবিরত সংগ্রাম উহা বৃহত্তর জেহাদ। মানবের সৎ গুণরাজিকে ও খোদার উপর বিশ্বাসকে যে শক্তি ধ্বংস করিতে চাহে তাহাকে নির্মূল করিবার জন্য যে সংগ্রাম এবং অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, অবহেলিত, শোষিত ও ঘৃণিত মানুষকে অত্যাচারী ও শোষকের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সংগ্রাম তাহা ইসলামে জেহাদ নামে খ্যাত। নাস্তিক ও কপটাচারী সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তি যখন পৃথিবীর বুকে শাশ্বত ও চিরন্তন ধর্মকে উৎখাত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, তখনই শান্তির সেবকগণ আল্লাহ্‌ কর্তৃক জেহাদ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। কোরান শরীফ ও হাদিস শরীফে (পয়গম্বরের উপদেশ-সমূহ) পুনঃপুনঃ ঘোষিত হইয়াছে যে জেহাদের নামে কোনরূপ পাশবিক অত্যাচার, নারী শিশু ও দুর্বলের প্রতি নির্যাতন এবং বৃথা ও অন্যায় হত্যাকাণ্ড করা চলিবে না। জেহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পর জেহাদ বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শত্রুর প্ররোচনা কিংবা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত জেহাদ কখনই আরম্ভ করা হয় না। জেহাদে মৃত্যুবরণকারীদের

জৈন আচার-অনুষ্ঠান

শহীদরূপে গণ্য করা হয়। মক্কা বিজয়ের সময়ে দেশত্যাগী, অত্যাচারিত পয়গম্বর প্রভৃতি ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও মক্কার বিধর্মী শত্রুদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে তাঁহাদিগকে ইসলামের ছায়াতলে স্থান দান করিয়া জেহাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আবদুস সোবহান

জৈন আচার-অনুষ্ঠান জৈন ধর্মের লক্ষ্য মুক্তি বা মোক্ষলাভ। মোক্ষ জৈনমতে জ্ঞান এবং ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এইজন্য প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থে এক দিকে যেমন জ্ঞানের, অন্য দিকে তেমনই আচার আচরণের বিবৃতির প্রাধান্য দেখা যায়। তবে এই আচার বা আচরণ শুদ্ধ সংযত ও চারিত্র সম্পন্ন হইতে সাহায্য করে। লোকাচার সম্পর্কে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা পরবর্তী কালের জৈনদের লোকাচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় আচারের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং সেজন্য স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

জৈনসংঘ সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা (গৃহী শিষ্য ও শিষ্যা) দ্বারা রচিত হয়। সাধু ও সাধ্বীদের জন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ — এই পাঁচটি মহাব্রতের বিধান আছে। অহিংসাকে প্রাণাতিপাত বিরমণ ব্রতও বলা হয়। দ্বিতীয় ব্রত সত্য বা মৃষাবাদ বিরমণ অর্থাৎ মিথ্যা কথা না বলা। তৃতীয় ব্রত অচৌর্য বা অদত্তাদান বিরমণ। অপ্রদত্ত কোনও জিনিস গ্রহণ না করা এই ব্রতের অন্তর্গত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষা গ্রহণও চৌর্য। এই ব্রতের জন্য বনে গাছের তলায় পড়িয়া থাকা ফলও তুলিয়া লওয়া সাধু সাধ্বীদের পক্ষে নিষিদ্ধ। চতুর্থ, ব্রহ্মচর্য বা মৈথুন বিরমণ ব্রত। পঞ্চম অপরিগ্রহ বা পরিগ্রহ বিরমণ ব্রত। সাধু বা সাধ্বীরা ধন, ধান্য ভূমি, গৃহ, সমস্ত রকম পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিবে। এই পাঁচটি মহাব্রত ছাড়া জৈন সাধু ও সাধ্বীদের জন্য ক্ষমা মার্দব প্রভৃতি দশ প্রকার যতিধর্মের বিধান আছে।

জৈন শ্রাবকদের জীবনধারণ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য দ্বাদশ ব্রতের বিধান আছে।

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যকর্ম পর্যন্ত গৃহীর যে ষোলটি অবশ্যকরণীয় কর্ম আছে যাহাদের আমরা 'সংস্কার' বলি তা 'আচার দিনকরে' দেওয়া আছে। 'আচার দিনকর' শ্বেতাম্বর গ্রন্থ। দিগম্বরদের গ্রন্থ 'আদি পুরাণে'— গর্ভাধান হইতে ৫৩ রকম সংস্কারের উল্লেখ আছে।

জৈনদের উপাসনা পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। জৈন ধর্ম সর্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। এজন্য জৈন ধর্মে ঈশ্বরোপাসনার স্থান নাই। জৈনেরা সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষয় করিয়া যিনি 'জিন' বা অর্হৎ পদবাচ্য হন বা সেই পথের পথিক তাঁহাদের উপাসনা করেন ('অর্হৎ' ও 'জিন' দ্র)। জৈন পরিভাষায় ইঁহাদের পরমেষ্ঠী বলা হয়। পরমেষ্ঠী পাঁচ জন সিদ্ধপরমেষ্ঠী বা বিদেহী মুক্তাত্মা, অর্হৎ বা তীর্থংকর পরমেষ্ঠী বা মুক্ত জীবাত্মা, আচার্য পরমেষ্ঠী, উপাধ্যায় পরমেষ্ঠী ও সাধু পরমেষ্ঠী। শেষ তিন পরমেষ্ঠী মুক্তাত্মা নহেন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে দিয়া আমরা অর্হৎ পরমেষ্ঠীকে জানি বলিয়া ইঁহাদেরও পরমেষ্ঠী বলা হয়। এই পরমেষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই জৈনদের মহামন্ত্র 'নমো অরিহন্তানং' ইত্যাদি সৃষ্ট হইয়াছে।

জৈন উপাসনার উদ্দেশ্য কৃপালাভ নয়, কারণ জৈন মতে জীবের শুভাশুভ নিজের কর্মের উপর নির্ভরশীল। তীর্থংকরেরও ক্ষমতা নাই যে কাহারও কর্মক্ষয়ে সাহায্য করেন। এজন্য জৈন উপাসনা আদর্শ বা লক্ষ্যের উপাসনা।

সকল জৈনই যে বিগ্রহের উপাসনা করেন তাহা নহে। যাঁহারা করেন তাঁহাদের মন্দিরমার্গী বলা হয়। যাঁহারা করেন না তাঁহারা 'সাধুমার্গী'। মন্দিরমার্গীদের সাধুরা বন্দনাদির দ্বারাই বিগ্রহের উপাসনা করেন। যাঁহারা গৃহী তাঁহাদের জন্য জল, চন্দন, ফুল, ধূপ, দীপ, অক্ষত, নৈবেদ্য ও ফল— এই অষ্ট প্রকারী পূজার বিধান।

জৈন উপবাস ও পর্বদিনের সংখ্যাও অনেক। শ্বেতাম্বরদের প্রতি মাসের দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা অমাবস্যাতে উপবাস বিধেয়। ইহার মধ্যে অষ্টমী ও চতুর্দশী প্রধান। দিগম্বরেরা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা বাদে বাকি দশ দিন উপবাস করেন। যাঁহারা সমস্ত বৎসর ধরিয়া এই উপবাস করিতে না পারেন, চাতুর্মাস্যে (শ্রাবণ কার্তিক) এই উপবাস তাঁহাদিগকে অবশ্যই করিতে হয়। উপবাস জৈনদের অবশ্যকরণীয়। অনশনে মৃত্যুবরণ জৈনদের নিকট আজও শ্লাঘ্য।

তীর্থংকরদের জন্ম ও নির্বাণাদির দিন জৈনদের পর্বদিন। চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশী মহাবীরের জন্মদিন। সেই দিন মহাবীর-জয়ন্তী পালিত হয়। দীপাবলী মহাবীরের নির্বাণ দিন। অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের বার্ষিক ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। পৌষী কৃষ্ণা দশমী ভগবান পার্শ্বনাথের জন্মদিন।

শ্বেতাম্বর জৈনদের আর একটি বিশিষ্ট পর্ব 'ওলি' বা 'আমিল'। আমিল বৎসরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়— আশ্বিন ও চৈত্র মাসে। সপ্তমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানের বিষয় সিদ্ধচক্রের পূজা। নয়বার

আমিল করিলে একটি ব্রত পূর্ণ হয়। ব্রত উদ্‌যাপনের শেষের দিন নব পদের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আমিলের সময় সিদ্ধচক্র যন্ত্রকে স্নান করাইবার জন্য জলাশয়ে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাকে জলযাত্রা বলে।

অষ্টাহ্নিকা দিগম্বরের পর্বাদন। আষাঢ়, কার্তিক ও ফাল্গুন মাসে অষ্টাহ্নিকা পালিত হয়। অষ্টাহ্নিকায় আট দিন উপবাস করা বিধেয়। শ্রবণবেলগোলায় স্থিত গোম্মটেশ্বরের স্নানাভিষেক আবার দিগম্বর জৈনদের একটি বিশেষ পর্বাদন। এই স্নানাভিষেক বারো বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হয়।

জৈনদের সমস্ত পর্বের মধ্যে পর্যুষণ পর্ব চাতুর্মাস্যের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। শ্বেতাম্বরদের পর্যুষণ শ্রাবণী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে আরম্ভ হইয়া শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে শেষ হয়। এই সময়ে ভদ্রবাহু রচিত 'কল্পসূত্র' পাঠ করা হয়। যাঁহারা আট দিন উপবাস করেন না তাঁহারা এই শেষের দিন অবশ্যই উপবাস করেন। এই দিনটিকে 'সংবৎসরী' বলা হয়। সেদিন সমস্ত বৎসরে কৃত কর্মের পর্যালোচনা করা হয়। সংবৎসরীর পরের দিন ক্ষমা-যাচনীর দিন। দিগম্বরদের এই পর্যুষণ শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে আরম্ভ ও চতুর্দশীতে শেষ হয়। এই দশ দিন উমাস্বাতী রচিত 'তত্ত্বার্থসূত্রের দশটি অধ্যায়ের পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। দশ দিনে দশ ধর্মের ব্যাখ্যা হয় বলিয়া দিগম্বরেরা পর্যুষণকে 'দশলক্ষণা' বলেন। দশলক্ষণার শেষ দিন অনন্ত চতুর্দশী। সেদিন দিগম্বর জৈনেরা শ্বেতাম্বরদের মত সংবৎসরী পালন করেন এবং পরের দিন পরস্পরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

গণেশ লালওয়ানী

জৈন দর্শন ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা বেদকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতবাদ নাস্তিক-দর্শন নামে পরিচিত। জৈন দর্শন ভারতীয় নাস্তিক-দর্শনসমূহের অন্যতম ('জৈন ধর্ম' দ্র)। জিনের প্রবর্তিত ধর্ম ও দর্শনের নাম জৈন ধর্ম ও জৈন দর্শন। বিশ্বের যে অংশে জীব ও জড় পদার্থ বিদ্যমান জৈনেরা সেই অংশকে 'লোক' আখ্যা দিয়া থাকেন। 'লোকে'র চতুর্দিকে যে অনন্ত বিস্তৃত শূন্য বিদ্যমান তাহার নাম অলোক। জৈন দর্শনে নয়টি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, যথা জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা এবং মোক্ষ। জৈন মতে এই বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত। ইহার সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য নহে, অবতারবাদও স্বীকার্য নহে। জৈনেরা জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে তীর্থংকরগণ জীবন্মুক্ত। তাঁহারাই দেবতার ন্যায় পূজ্য। জৈনেরা কর্মফলে আস্থাবান। তাঁহারা বলেন যে, কর্মের ফলদাতা আর কেহ নাই, কর্মই কর্মের ফলদাতা। সাধনের ফলে কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মোক্ষলাভ হয়।

বৌদ্ধমতের সহিত কোনও কোনও বিষয়ে জৈন মতের সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনেরা বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন, সংসারকে দুঃখময় বলিয়া মনে করেন ও ঈশ্বর মানেন না বলিয়া অনেকে মনে করেন যে জৈন মতটি বৌদ্ধ মতেরই শাখামাত্র। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ অনেক মৌলিক বিষয়েই বৌদ্ধ দর্শনের সহিত জৈন দর্শনের মৌলিক পার্থক্য আছে। বৌদ্ধেরা ক্ষণ-ভঙ্গুরবাদী, জৈনেরা ক্ষণিকত্ববাদে বিশ্বাসী নহেন। বৌদ্ধেরা কোনও স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, জৈনেরা আস্তিক দার্শনিকদিগের ন্যায় আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী। বৌদ্ধমতে জড় জগতের উপাদানস্বরূপ কোনও স্থায়ী জড় বস্তু নাই, জৈনেরা পুদ্‌গল নামক জড় উপাদানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

জৈনেরা বলেন যে তাঁহাদের মতটি অতি প্রাচীন। তাঁহারা সাধারণতঃ চব্বিশ জন পূর্বাচার্যের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। আচার্যদিগের নামের তালিকায় প্রথমেই ঋষভদেবের নাম ('ঋষভদেব' ও 'মহাবীর' দ্র) এবং পরিসমাপ্তিতে মহাবীরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবীর বর্ধমানের পূর্ববর্তী আর একজন প্রসিদ্ধ আচার্যের নাম পার্শ্বনাথ (খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী, 'পার্শ্বনাথ' দ্র)।

কালক্রমে জৈনদিগের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুইটি সম্প্রদায় উদ্ভূত হইলেও দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। ইহাদের পার্থক্য আচারমূলক।

জৈন মতে জ্ঞান আত্মার ধর্ম। ইহা সূর্যের আলোকের ন্যায় স্বপ্রকাশ ও অন্য বস্তুর প্রকাশক। আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা আত্মার জ্ঞানের গতি প্রতিহত হইয়া থাকে, কারণ দেহেন্দ্রিয়াদি কর্মফল হইতে উৎপন্ন এবং কর্মফলই আত্মার সংকোচনের হেতু। কর্মমল অপসারিত হইলে আত্মা স্বীয় অনন্ত জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকেন। অপরোক্ষ ও পরোক্ষ ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানই সাধারণতঃ অপরোক্ষ জ্ঞান নামে পরিচিত হইয়া থাকে। জৈনেরা এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানকে ব্যাবহারিক অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া থাকেন। প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞানের সময়ে আত্মা ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্য ব্যতিরেকে সাক্ষাৎভাবে বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার অপরোক্ষ

জ্ঞানের নাম পারমার্থিক অপরোক্ষ জ্ঞান। আত্মা যখন কতক পরিমাণে কর্মপ্রভাবমুক্ত হয় তখন ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সুদূরবর্তী ও সূক্ষ্ম পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি জন্মে — জ্ঞানের ইহাই অবধি। আত্মা যখন রাগ-দ্বেষাদি জয় করিতে সমর্থ হন তখন তিনি অপরের মনের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিতে পারেন - ইহা মনঃপর্যায় জ্ঞান। অবশেষে যখন জ্ঞানাবরক সকল কর্মমল অপসারিত হয় তখন আত্মার সর্বজ্ঞত্ব প্রকাশিত হয়।

জৈনেরা দুই প্রকার লৌকিক জ্ঞানের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম 'মতি'। জৈন মতে লৌকিক প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, এমনকি অনুমানও মতির অন্তর্গত। লৌকিক আপ্তবাক্যজাত জ্ঞানকে 'শ্রুত' বলা হইয়া থাকে। মনঃ-পর্যায় ও কেবলপ্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর সকল প্রকার জ্ঞানেই ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে। জৈনেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র-বাক্যের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তীর্থংকর-দিগের প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ই তাঁহাদের শাস্ত্রের উপাদান।

জৈন মতে প্রত্যেক বস্তুই অনন্তধর্মক, অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই অনেকগুলি দিক বা বিভাব আছে। সিদ্ধপুরুষ-দিগের দৃষ্টিতে বস্তুর সকল ধর্মই এককালে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন কোনও বস্তুর একটি বিভাবের দিকে লক্ষ্য করে তখন তাহার নিকট অন্য বিভাবগুলি প্রকাশিত হয় না। কোনও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা সাধারণ মানুষ কোনও বস্তুর একটিমাত্র বিভাবের যে অপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে তাহা 'নয়' জ্ঞান। যে বাক্য বা বচন দ্বারা এইপ্রকার 'নয়' প্রকাশিত হয় সেই বাক্যও 'নয়' নামে অভিহিত। জিনদিগের জ্ঞান ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞান পূর্ণ নহে। প্রত্যেক নয় বাক্যের সত্যতাই আপেক্ষিক। এইজন্য জৈনেরা প্রত্যেকটি নয়ের পূর্বে 'স্যাৎ' পদটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'স্যাৎ' ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যিনি যে বাক্যই বলুন না কেন তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বস্তুটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং উহার যে দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন সে দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেই দিক গ্রহণ করিলে তাঁহার বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে তাঁহার বাক্য সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। জৈনেরা জ্ঞাতার দৃষ্টিবৈচিত্র্য এবং বস্তুর বিভাব-বহুত্বে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে কোনও নয় বাক্যই একমাত্র সত্য বাক্য নহে, প্রত্যেক বাক্যের সত্যতাই আপেক্ষিক।

কোনও বস্তুর অস্তিত্বাদি ধর্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে জৈনেরা সেই বস্তুর নানা দিক পর্যালোচনা করিয়া আপেক্ষিকতার সহিত বিরোধরহিত ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত সাত প্রকার বচন বিন্যাস করিয়া থাকেন। এই সাত প্রকার বচন বিন্যাসকে 'সপ্তভঙ্গী নয়' বলা হইয়া থাকে। সপ্তভঙ্গী নয়ের অন্তর্গত সাতটি বাক্য এইরূপ ১ স্যাৎ অস্তি ২ স্যাৎ নাস্তি ৩. স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ ৪ স্যাৎ অবক্তব্যম্ ৫ স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যং চ ৬. স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যঞ্চ এবং ৭ স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যঞ্চ। ঘরে ঘট আছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতঃ 'হাঁ' কিংবা 'না' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু জৈনদিগের মতে 'ঘট আছে' বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনও বিশেষ স্থানে ও কোনও বিশেষ কালে দেখিতে গেলে উক্ত গৃহে একটি বিশেষ ঘট আছে, অন্যথা 'ঘট আছে' বাক্যটির কোনও অর্থ হইবে না। এইজন্য জৈনেরা শুধু 'অস্তি' না বলিয়া 'স্যাৎ অস্তি' বলিয়া থাকেন। ঘটটির রঙ যতক্ষণ লাল না হয় ততক্ষণ সাধারণ মানুষ বলে যে, ঘটটি রক্তবর্ণ নহে। কিন্তু জৈনেরা বলেন যে, কোনও এক নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কাল এবং নির্দিষ্ট অবস্থায় উহা রক্তবর্ণ নহে। তাহারা এইরূপ ক্ষেত্রে শুধু 'নাস্তি' না বলিয়া 'স্যাৎ নাস্তি' বলিয়া থাকেন। ঘটটি যদি কখনও রক্তবর্ণ হয় এবং কখনও রক্তবর্ণ না হয়, যদি কোনও অবস্থায় লাল হয় আবার কোনও অবস্থায় কাঁচা বা অরক্ত থাকে তাহা হইলে জৈনেরা সেই দুইটি অবস্থাই প্রকাশ করিয়া বলেন —'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ রক্তঘটঃ'। ইহা জৈনদিগের তৃতীয় নয়। চতুর্থতঃ জৈনেরা বলেন যে, এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে বস্তুর স্বরূপ অবক্তব্য, অর্থাৎ বলার যোগ্য নহে। ঘটটি যখন কাঁচা থাকে তখন উহার রঙ কালো থাকে আবার যখন উহা অগ্নিদগ্ধ হয় তখন উহার রঙ লাল হইয়া যায়। কেবল কাঁচা অবস্থা কিংবা কেবল পাকা অবস্থার কথা না বলিয়া ঘটের সকল অবস্থার ঘটটির স্বরূপ বর্ণন করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে উহা অবক্তব্য। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জৈনেরা 'স্যাৎ অবক্তব্যম' নামক নয়টি স্থাপন করিয়াছেন। এই চতুর্থ নয়ের সহিত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নয় যোগ করিয়া জৈনেরা আরও তিনটি নয়বিন্যাস করিয়াছেন। কোনও একটি বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে, বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ কালে ঘটটি রক্তবর্ণ, সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত স্থান, কাল ও অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলে ঘটটি অবক্তব্য। সুতরাং প্রথমে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে রক্তবর্ণ ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পরে নির্বিশেষ দৃষ্টিতে ঘটটির যে রূপ মনে হইতে

পারে সেই রূপটি উহার সহিত যোগ করিলে ইহাই মনে হইবে যে, ঘটটি লালও বটে, অবক্তব্যও বটে। ইহাই পঞ্চম নয়। কোনও একটি বিশেষ দৃষ্টিতে, বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে এবং বিশেষ অবস্থায় লাল ঘটটির অস্তিত্ব নাই; কিন্তু দেশ-কালবর্জিত স্বরূপের অবস্থায় উহা অবক্তব্য। এক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে লাল ঘটটি নাই; আর এক হিসাবে ঘটটির স্বরূপ অবক্তব্য। ইহাই ষষ্ঠ নয়। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে লাল ঘটটি আছে, আর একদিক দিয়া বিচার করিলে উহা নাই, কিন্তু সকল প্রকার দেশ, কাল ও অবস্থার কথা বাদ দিলে উহার স্বরূপ অবক্তব্য। ইহা জৈনদের সপ্তম নয়ের দৃষ্টান্ত। উক্ত সাত প্রকার নয়ের অতিরিক্ত আর কোনও প্রকার যুক্তি-সংগত বাক্য হইতে পারে না।

জৈনেরা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। তাঁহাদের মতে মানুষ যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে তাহাদের বাস্তবতা স্বীকার্য। বস্তু সংখ্যায় অনেক। ইহাদিগকে প্রধানতঃ জীব ও অজীব -ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জীবিত সত্তারই আত্মা আছে। জৈন মতে কোনও বস্তুই একান্তক নহে; প্রত্যেক বস্তুই অনেকান্তক। আমরা কোনও বস্তুকে যতটুকু জানি ততটুকু জ্ঞান দ্বারা আমাদের জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও এমন কথা বলা যায় না যে, বস্তুর স্বরূপের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। সকল বস্তুর জ্ঞান না হইলে এক বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। যিনি একটি বস্তুরও পূর্ণ স্বরূপ বুঝিয়াছেন তিনি বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত পরিচিত হইয়াছেন। বস্তুর পূর্ণ স্বরূপের জ্ঞান শুধু সিদ্ধ পুরুষদিগের বা কেবলীদিগেরই আছে, অন্যের নাই।

প্রত্যেক দ্রব্যেরই দুই প্রকারের ধর্ম আছে। কতকগুলি ধর্ম দ্রব্যের স্বরূপগত এবং সেইজন্য যতদিন দ্রব্যটি থাকে ততদিন সেই ধর্মগুলিও তাহাতে বর্তমান থাকে; এই শ্রেণীর ধর্মগুলিকে বাদ দিলে দ্রব্যের অস্তিত্বই থাকে না। জৈন মতে এই শ্রেণীর ধর্মের নাম গুণ। জৈনেরা চৈতন্যকে এই শ্রেণীর ধর্ম বলিয়া থাকেন। চৈতন্য আত্মার গুণ, কারণ চৈতন্যবিহীন আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব। আবার কতকগুলি ধর্ম আগন্তুক; ইহারা কখনও দ্রব্যে থাকে কখনও বা থাকে না। এই শ্রেণীর ধর্মকে জৈনেরা 'পর্যায়' বলেন। দ্রব্যের লক্ষণ দিতে গিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যাহা গুণ ও পর্যায় -বিশিষ্ট তাহাই দ্রব্য। দ্রব্য সত্য বা সদ্বস্তু। সদ্বস্তুর উৎপাদ (জন্ম বা উৎপত্তি), ব্যয় (মৃত্যু) এবং ধ্রৌব্য (স্থায়িত্ব) আছে। জৈনদের এই উক্তির মর্ম এই যে, সদ্বস্তু নিত্য হইলেও উহার কতকগুলি ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ পরিলক্ষিত হয়। জীবাত্মাকে দ্রব্যের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা এক-এক জন্মে এক-এক দেহ ধারণ করিয়া থাকে; মৃত্যু-কালে তাহার দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়; তথাপি জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থায় জীবাত্মা নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্রব্য নানা প্রকার। জৈনেরা ইহাদিগকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যে সকল দ্রব্যের দেহায়তন আছে, অর্থাৎ যাহারা আকাশাদি দেশ অধিকার করিয়া থাকে তাহা 'অস্তিকায়' দ্রব্য। অস্তিকায় দ্রব্যের সংখ্যাই অধিক। একমাত্র কালই অনস্তিকায় দ্রব্য। কালের দেহায়তন বা আকাশাদিদেশাধিকার ধর্ম নাই; তথাপি ইহা দ্রব্যের মধ্যে গণ্য, যেহেতু ইহার গুণ ও পর্যায় আছে। অস্তিকায় দ্রব্যমাত্রই বিভাজ্য, কিন্তু কাল অবিভাজ্য। ইহা এক অখণ্ড রূপে সকল দেশে বিদ্যমান। কাল দুই প্রকার। প্রকৃত কালের নাম 'পারমার্থিক কাল' এবং মানুষের মনগড়া কালের নাম সময়। পারমার্থিক কাল অরূপ এবং নিত্য। সময় মানুষের কল্পনানুযায়ী পল, দণ্ড, দিবা, মাস, বৎসর ইত্যাদিতে বিভক্ত। কাল প্রত্যক্ষ-গম্য নহে, অনুমানগম্য। কাল স্বীকার না করিলে বস্তুর স্থায়িত্বের অর্থ বুঝা যায় না। কাল আছে বলিয়াই গতকল্য যে গাছটি দেখিয়াছিলাম আজও অনেক ক্ষণ ধরিয়া সেই গাছটি দেখিতে পাইতেছি। কাল নামক কোনও দ্রব্য না থাকিলে 'বর্তনা' (কিছুকালের জন্য অবস্থান) সম্ভব হইত না। 'পরিণাম'ও কালসাপেক্ষ। অস্তিকায় দ্রব্য-সমূহ প্রধানতঃ জীব ও অজীব নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জীবেরা বদ্ধ ও মুক্ত -ভেদে দুই প্রকার। বদ্ধ জীবেরও দুইটি শ্রেণী আছে— 'ত্রস' ও 'স্থাবর'। ত্রস জীবেরা চলচ্ছক্তি-সম্পন্ন। স্থাবর জীবেরা অচল। ইহারা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও বৃক্ষাদি দেহে অবস্থান করে। ইহারা একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট। ইহাদের শুধু স্পর্শচেতনা আছে। 'ত্রস' জীবেরা নানা প্রকার ও নানা ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। উচ্চ শ্রেণীর জীবেরা পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট। অজীবেরও নানা শ্রেণী আছে। পূর্বে যে অনস্তিকায় কালের কথা বলা হইয়াছে তাহা অজীব শ্রেণীর অন্তর্গত। জৈনেরা অনস্তিকায় অজীব দ্রব্যের অতিরিক্ত অস্তিকায় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধর্ম, অধর্ম, আকাশ এবং পুদ্গল নামে চারিটি অজীব দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

জৈন দর্শনে আত্মাকে জীব নামে অভিহিত করা হয়। চৈতন্য জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু সকলের চেতনা সমভাবে পরিস্ফুট নহে। চেতনার অভিব্যক্তির তারতম্য অনুসারে জীবদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করা যাইতে

পারে। জীবদিগের মধ্যে যাঁহারা কর্মবন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহারা সম্যক্‌রূপে রাগ-দ্বেষ জয় করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বোচ্চ শ্রেণীর জীব। তাঁহারাই মুক্তাত্মা। সর্ব-নিম্ন স্তরের জীবেরা পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি এবং বৃক্ষাদি দেহে বিদ্যমান। ইহারা স্পর্শেন্দ্রিয়বিশিষ্ট। অপরাপর জীবদিগের মধ্যে কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ চতুরিন্দ্রিয়, আবার কেহ কেহ পঞ্চেন্দ্রিয়। ইহাদিগকে মধ্য স্তরের জীব বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও পূর্ণতার তারতম্য আছে। জীব শুধু জ্ঞাতা নহে, তাহার কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বও আছে। জীব প্রদীপের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অপরেরও প্রকাশক। উহা নিত্য বস্তু, কিন্তু উহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। উহা স্বরূপতঃ দেহাতিরিক্ত বস্তু। উহা স্ব-সংবেদ্য, অর্থাৎ উহা নিজেই নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। পূর্বজন্মের রাগ-দ্বেষাদি দোষজনিত কর্মের ফলে জীব জন্মে জন্মে নানা দেহে আবদ্ধ হইয়া থাকে। জীবের কোনও মূর্তি নাই, কিন্তু উহা যখন যে দেহে বদ্ধ হয় তখন সেই দেহের আকার লাভ করে। প্রদীপের আলো যেমন ক্ষুদ্র গৃহে স্থাপিত হইলে ক্ষুদ্রগৃহান্তর্বর্তী স্থানকে এবং বৃহত্তর গৃহে স্থাপিত হইলে সেই গৃহান্তর্বর্তী স্থানকে পরিব্যাপ্ত করে জীবও সেইরূপ দেহের আয়তন অনুসারে সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। জীব বিভু নহে, অণুও নহে, উহা দেহপরিমাণ।

বদ্ধ জীবেরা যে জগতে বাস করে সেই জগৎ জড় উপাদানে গঠিত। জড় উপাদান গঠিত দেহগুলি আকাশে অবস্থান করে। ইহারা কাল প্রভাবে পরিবর্তিত হয়।

যে উপাদান দ্বারা দেহটি প্রস্তুত হইয়াছে তাহার নাম 'পুদ্গল'। ইহা আত্মায় সংলগ্ন হইতে পারে, আবার আত্মা হইতে খসিয়াও যাইতে পারে। স্পর্শ, রস ও বর্ণ নামে ইহার তিনটি গুণ আছে। 'অণু' ও 'স্কন্ধ' ভেদে পুদ্গল দুই প্রকার। যে পুদ্গল ভোগ করা যায় না, যে পুদ্গল সূক্ষ্মতাবশতঃ অবিভাজ্য, তাহার নাম 'অণু'। যে পুদ্গল দুই কিংবা ততোধিক অণুর সংযোগে উৎপন্ন হয় তাহাকে 'সংঘাত' বা 'স্কন্ধ' বলা হয়। বহির্জগতের দ্রব্যাদি, এমন কি মানুষের দেহ, মন, বাক্য, শ্বাসবায়ু প্রভৃতিও পুদ্গল গঠিত।

আকাশের অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ। অস্তিকায় দ্রব্য মাত্রেরই আয়তন আছে। আকাশ না থাকিলে আয়তনের ধারণা করা সম্ভব হইত না। যে কোনও বিস্তৃত পদার্থের অবস্থান আধার-সাপেক্ষ। আকাশই অস্তিকায় দ্রব্যের আধার। বস্তু অপসারিত হইলেও আকাশ বস্তু ধারণের যোগ্যতা লইয়া স্বস্থানে বিদ্যমান থাকে।

ধর্ম এবং অধর্মের অস্তিত্বও অনুমানগম্য। গতি হইতে ধর্মের এবং স্থিতি হইতে অধর্মের অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'ধর্ম' এবং 'অধর্ম', এই দুইটি শব্দ জৈন শাস্ত্রে পারিভাষিক। জল না থাকিলে যেমন মৎস্যাদি জলচর প্রাণিগণের সন্তরণ সম্ভব হইত না, সেইরূপ ধর্ম না থাকিলে জীব বা অজীব কোনও দ্রব্যের গতি সম্ভব হইত না। মৎস্যাদি প্রাণীগণ নিজ নিজ শক্তিতেই সন্তরণ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু জলের সদ্ভাবব্যতীত সন্তরণ সম্ভব নহে। চলমান দ্রব্য মাত্রেরই শক্তি আছে, কিন্তু ধর্মের অভাব হইলে তাহাদের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। অচল দ্রব্যকে সচল করা ধর্মের কাজ নহে, সচল দ্রব্যের গতি সম্ভব করিয়া দেওয়াই ধর্মের কাজ। অধর্ম স্থিতির সহায়ক। উহা স্থির বস্তুসমূহকে ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু চলমান বস্তুর গতিরোধ করে না। ধর্ম এবং অধর্মের কোনটিই অনিত্য বস্তু নহে, উহারা উভয়েই নিত্য দ্রব্য, উভয়েই নিরবয়ব, উভয়েই স্থির এবং উভয়েই লোকাকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান। উহারা যথাক্রমে গতি ও স্থিতির কারণ হইলেও কোনও কিছুতে লিপ্ত নহে। উহারা উদাসীন কারণ'।

জীব স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইলেও সংসারদশায় বদ্ধ, দুর্বল ও দুঃখীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। মেঘ এবং কুয়াশা যেমন সূর্যের স্বরূপ প্রকাশে বিঘ্ন উৎপাদন করে সেইরূপ জীবের দেহ তাহার স্বরূপ প্রকাশের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। জীব যে দেহের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে সেই দেহই তাহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত আনন্দকে সংকুচিত করিয়া রাখে। জীব নিজের অনুরাগ বা আসক্তির ফলে পুদ্গল-পরমাণু গঠিত দেহ দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। পূর্ব পূর্ব জন্মের কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্মসমূহের প্রভাবে আত্মায় একপ্রকার অস্ফুট বাসনার সৃষ্টি হয়। এইসকল বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যই পুদ্গল গঠিত দেহ আত্মায় সংলগ্ন হইয়া থাকে। জীবের গোত্র, আয়ু, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহার পূর্বজন্মের কর্মের ফল। জীবের সুখ দুঃখাদিও তাহার কর্মাধীন। জীব চিৎস্বভাব, কর্ম জড়, উহারা পরস্পর পৃথক। দুগ্ধ ও জল পৃথক পৃথক পদার্থ হইলেও যেমন পরস্পরের সংমিশ্রণে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ জীবও কখনও কখনও কর্মের সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে তাহার আর স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকে না। জীব যখন জড় কর্মের সহিত মিশিয়া উহার অধীন হয় তখন তাহার বদ্ধাবস্থা। বাসনার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধনের সূত্রপাত হয়। আন্তরিক আসক্তির নাম ভাববন্ধ। ইহার ফলে যখন পুদ্গল-গঠিত দেহসংযোগ ঘটে তখন তাহাকে দ্রব্যবন্ধ বলা হয়। জীবের অনুরাগকে আশ্রয় করিয়া কর্ম-

পুদ্গলসমূহ আত্মায় সংলগ্ন হইয়া থাকে। যে জীবের মধ্যে ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ থাকে সেই জীবে কর্মরাশি সঞ্চিত হইয়া দেহ সৃষ্টি করে। জৈন শাস্ত্রে ক্রোধাদি রিপুগণ 'কষায়' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা আঠার মত। কর্মগুলি বাহির হইতে আসিয়া কষায়ের সাহায্যে জীবে সংলগ্ন হইয়া থাকে। জীবে বা আত্মায় কর্মপুদ্গলের আগমনের নাম 'আস্রব'।

কর্ম সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নামই মুক্তি। সর্বতোভাবে কর্মসম্বন্ধবিহীন হইতে হইলে জীবে বা আত্মায় যে সকল পুদ্গল পরমাণু সঞ্চিত হইয়াছে তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং বাহির হইতে কর্মপুদ্গলের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিতে হইবে। আত্মায় সঞ্চিত কর্মরাশির ক্ষয়কে 'নির্জরা' বলে। কর্ম-পুদ্গলের আগমন রোধ করার প্রণালীর নাম 'সম্বর'। জীবের সহিত পুদ্গলের সংযোগের কারণ বাসনা, বাসনার কারণ অবিদ্যা, সুতরাং অবিদ্যাই জীবের বন্ধনের মূল কারণ। অবিদ্যার নিবৃত্তি না ঘটিলে মোক্ষ লাভ হয় না। অবিদ্যা নিবৃত্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্বজ্ঞ জিনদিগের উপদেশ শ্রবণ ও পালন করিতে হয়। আজ যাঁহারা জিন নামে পরিচিত তাঁহারাও একদিন বদ্ধ জীব ছিলেন। তাঁহারা সুকৃতির বলে রাগ দ্বেষমুক্ত হইয়া তত্ত্বোপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বদ্ধজীবদিগের আদর্শ। তাঁহারা আচরণ ও উপদেশ দ্বারা তত্ত্বোপলব্ধির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে তীর্থংকর বলা হয়। তীর্থ পদটি সংঘ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যিনি সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে নিয়মানুসারে পরিচালিত করেন তাঁহাকেও তীর্থংকর বলা হয়। মুক্তি কাহারও অনুগ্রহসাপেক্ষ নহে। ঈশ্বর নামক এমন কেহ নাই যিনি সুকর্মের পরিবর্তে সুফল কিংবা কুকর্মের পরিবর্তে কুফল প্রদান করিতে পারেন। জীব বদ্ধাবস্থায় আছে তাহার মুক্তির চেষ্টা তাহাকেই করিতে হয়। তীর্থংকরেরা পথপ্রদর্শক মাত্র।

মুক্ত জীব শুভাশুভ এবং ধর্মাধর্মের অতীত অবস্থা লাভ করেন। যাঁহারা ইহ জীবনেই সাধনবলে সঞ্চিত কর্মরাশি বিনষ্ট করিয়া নিজের অনন্তজ্ঞানাদিগুণ উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহাদিগকে 'জীবন্মুক্ত' পুরুষ বলা হয়।

'সম্যক্ দর্শন', 'সম্যক্ জ্ঞান' এবং 'সম্যক চারিত্র' — এই তিনটি মোক্ষলাভের উপায়। ইহাদিগকে 'ত্রিরত্ন' বলা হয়। সম্যক্ দর্শনের প্রকৃত অর্থ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। কর্মবন্ধনের ক্ষয় আরম্ভ না হইলে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে না। আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের নাম সম্যক্ জ্ঞান। যে সকল কর্ম ও সংস্কার জ্ঞানের পথ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সম্যক্ জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। সুতরাং কর্মাপসারণ একান্ত আবশ্যক। সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ জ্ঞান অভ্যাসে পরিণত হইলে সম্যক্ চারিত্রের পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। যে আচরণ দ্বারা জীব বন্ধন ও দুঃখের মূল কারণ বর্জন করিতে সমর্থ হয় তাহারই নাম সম্যক্ চারিত্র। উক্ত তিনটি রত্ন যথাযথভাবে পুষ্টিলাভ করিলে তাহাদের সমবেত শক্তিতে জীবের রাগ-দ্বেষ ও কর্মশক্তি অভিভূত হইয়া পড়ে এবং পুদ্গলবন্ধন খসিয়া যায়।

সঞ্চিত মলরাশির অপসারণ ও অনাগত পুদ্গলের আগমন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে জীবকে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। তন্মধ্যে পঞ্চমহাব্রত, সমিতি, গুপ্তি, দশবিধ ধর্ম, আত্মতত্ত্বানুসন্ধান, শম, দম, তিতিক্ষা, সমতা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈনেরা সাধারণতঃ অহিংসাদি পঞ্চ মহাব্রতের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা গৃহত্যাগী সাধু তাঁহাদিগকে পঞ্চমহাব্রত এবং ক্ষমা প্রভৃতি দশটি যতি-ধর্ম পালন করিতে হয়। জৈন ধর্মাবলম্বী গৃহস্থদিগকে 'শ্রাবক' বলা হয়। শ্রাবকেরা দ্বাদশ ব্রত পালন করিয়া থাকেন। ব্রতাদি পরিপালনের ফলে সাধু ও শ্রাবকদিগের চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'জৈন আচার অনুষ্ঠান' দ্র।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

জৈন ধর্ম অর্হৎ বা তীর্থংকরদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম। জৈন শাস্ত্রে কালকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে— 'উৎসর্পিণী' ও 'অবসর্পিণী'। উৎসর্পিণী ক্রমিক অভ্যুদয়ের যুগ ও অবসর্পিণী ক্রমিক অবনতির। এই উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীকে আবার ছয়টি ভাগে বা 'অরে' ভাগ করা হয়। জৈন মান্যতা অনুসারে প্রত্যেক উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ অরে ২৪ জন করিয়া তীর্থংকর জন্মগ্রহণ করেন ও জৈন ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচার করেন। বর্তমান অবসর্পিণীর প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেব ও শেষ তীর্থংকর মহাবীর। জৈন ধর্মকে আবার অর্হৎ বা নির্গ্রন্থ ধর্মও বলা হয়।

জৈন ধর্মের প্রধান কথা আত্মার ক্রমিক বিকাশের ভিতর দিয়া মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করা। মুক্তি বলিতে কর্মের যে আবরণ শুদ্ধ ও নির্মল আত্মার সঙ্গে অনাদি কাল হইতে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাহা হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করা। এইভাবে বিযুক্ত করার জন্য আত্মার স্বরূপই

বা কি, বন্ধনই বা কিসের, আত্মা কিভাবে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, এই জ্ঞানেরও প্রয়োজন। এই জ্ঞান জৈন দর্শনে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ —এই নয়টি তত্ত্বের ভিতর দিয়া পরিবেশিত হয়। প্রথম তত্ত্ব জীব। জীবের লক্ষণ চেতনা। জ্ঞান, দর্শন, বীর্য, আনন্দ প্রভৃতিও জীবের লক্ষণ। জৈন মতে জীব অনন্ত ও প্রত্যেক জীবের পৃথক সত্তা রহিয়াছে। একেন্দ্রিয় প্রাণী হইতে মুক্ত আত্মা পর্যন্ত সকলেই জীবের পর্যায়ভুক্ত। জীবের বিপরীত তত্ত্ব অজীব বা জড়। অজীব পাঁচ প্রকার, যথা— ধর্ম অধর্ম আকাশ পুদ্গল ও কাল। ধর্ম ও অধর্ম এখানে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। জীব বা পুদ্গল চলিতে আরম্ভ করিলে যাহা তাহার গতির সহায়ক হয় তাহাই ধর্ম এবং গতিরোধে উদ্যত হইলে যাহা তাহাকে স্থিত হইতে সহায়তা করে তাহাই অধর্ম। যাহা জীব ও পুদ্গলকে অবস্থিতি দান করে তাহা আকাশ। পুদ্গল পরমাণু বা পরমাণু সমবায়ে রচিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ পদার্থ। কাল সময়। কালের বাস্তব কোনও সত্তা নাই। চন্দ্র সূর্যের গতির দ্বারা কাল কল্পিতভাবে নিরূপিত হয়। এই পাঁচটি জড় পদার্থের মধ্যে একমাত্র পুদ্গলেরই রূপ আছে। পুদ্গল সংখ্যায় অনন্ত ও রূপ রসাদি গুণযুক্ত। তৃতীয় তত্ত্ব আস্রব। যে যে কারণে আত্মার সঙ্গে বন্ধনের জন্য শুভাশুভ কর্মের আগমন হয় তাহাকে আস্রব বলে। মিথ্যাত্ব (অবিদ্যা), অবিরতি (অসংযম), কষায় (ক্রোধ মান মায়া ও লোভ), প্রমাদ (অনবধানতা) ও যোগ (মন, বচন ও কায়ার ব্যাপার) সেই কারণ। চতুর্থ তত্ত্ব বন্ধ। উপরি উক্ত কারণে আকৃষ্ট হইয়া কর্মপরমাণুর আত্মার সহিত আসিয়া যুক্ত হওয়ার নাম বন্ধ। বন্ধ চার প্রকার. প্রকৃতি বন্ধ, স্থিতি বন্ধ, অনুভব বন্ধ ও প্রদেশ বন্ধ। প্রকৃতি বন্ধে আত্মার বিশেষ বিশেষ গুণ আবৃত হয়। প্রকৃতি বন্ধ আট প্রকার, যথা, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র ও অন্তরায়। স্থিতি বন্ধে বন্ধনের কাল বা সময় নিরূপিত হয়। অনুভাব বন্ধে কর্ম কি ফল দান করিবে তাহা নিরূপিত হয়। প্রদেশ বন্ধে কি পরিমাণ কর্মপরমাণুর আগমন হইবে তাহা নির্ধারিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ তত্ত্ব পুণ্য ও পাপ। এই দুইটি তত্ত্ব বন্ধতত্ত্বেরই প্রকারভেদ। যখন কর্ম বন্ধ শুভ ফলদায়ী তখন তাহা পুণ্য, যখন অশুভ ফলদায়ী তখন তাহা পাপ। এইজন্য অনেকে এই দুইটি তত্ত্বকে পৃথক তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না। সপ্তম তত্ত্ব সংবর। যে সমস্ত কার্যের দ্বারা নূতন কর্মের আগমন নিরোধ হয় তাহাদের সংবর বলা হয়। শুভ ধ্যান, সংযম, ইচ্ছানিরোধ ইত্যাদি সংবরের অন্তর্গত। অষ্টম তত্ত্ব নির্জরা। নির্জরা পূর্বকর্মের ক্ষয়। পূর্বকর্ম বন্ধ যথাসময়ে ফলদান করিয়া আপনা হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ক্ষয় হইবার সময় নূতন কর্মেরও আবার বন্ধ সৃষ্টি হইতে থাকে। এজন্য যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা পূর্ববন্ধ কর্মকে ফলদান করিবার পূর্বেই উপবাসাদি বাহ্য ও ধ্যানাদি অভ্যন্তর তপ দ্বারা ক্ষয় করেন। এই ক্ষয় করার নামই নির্জরা। নবম বা শেষ তত্ত্ব মোক্ষ। নূতন কর্ম বন্ধের আগমন নিরোধ ও পূর্বকর্ম বন্ধের সম্পূর্ণ ক্ষয়ে জীব বা আত্মার স্বরূপ লাভের নামই মোক্ষ। এই অবস্থায় জীব ঊর্ধ্ব গতির দ্বারা লোকের ঊর্ধ্ব ভাগস্থিত সিদ্ধশিলায় গমন করে ও অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করে। এই অবস্থার নামই নির্বাণ।

মুক্তিলাভের জন্য এই নয়টি তত্ত্বের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। তাহার জন্য চাই আচরণ। এজন্য জৈন দর্শনে নবতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভের উপায়ও আলোচিত হইয়াছে। সেই উপায়, সম্যক দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক চারিত্রের। সম্যক্ দর্শন তত্ত্বার্থে শ্রদ্ধা বা পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা। সম্যক জ্ঞান সেই সম্যক্ দর্শন বা সত্য-শ্রদ্ধার ফল। জ্ঞান জীব মাত্রেরই রহিয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ সম্যক দর্শন উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ সেই জ্ঞান সম্যক জ্ঞানে পর্যবসিত হয় না। জৈন মতে জ্ঞান পাঁচ প্রকার, যথা, মতি (ইন্দ্রিয়জ), শ্রুত (শব্দ ও অর্থের পর্যালোচনাজাত), অবধি (একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রূপবিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান), মনঃপর্যায় (একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রাণীর মনোভাবকে জানিতে পারা) ও কেবল (সম্পূর্ণ লোক ও অলোকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান রূপী ও অরূপী সমস্ত পদার্থের পরিপূর্ণ জ্ঞান)। পাঁচটি জ্ঞানের শেষ তিনটি জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। পূর্ব কথিত জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় কর্মের ক্ষয়ে কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তীর্থংকরগণ এই কেবল জ্ঞানসম্পন্ন হয়। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেন তিনি আয়ুশেষে অবশ্যই নির্বাণ লাভ করেন। সম্যক্ চারিত্র পদার্থের শুদ্ধ জ্ঞান জনিত শুদ্ধ আচরণ। সংযম, ত্যাগ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সম্যক্ চারিত্রের অন্তর্গত। হিংসাদি পাঁচ প্রকার আস্রব পরিত্যাগ, রূপ রসাদি পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত না হওয়া, ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চার প্রকার কষায় দমন এবং মন বচন কায়ার অশুভ প্রবৃত্তিকে নিয়মন করা রূপ ত্রিবিধ সংযম — এই সপ্তদশ প্রকার চারিত্র। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক চারিত্রকে পূর্ণরূপে আরাধনা করিলে মুক্তি লাভ হয়। একত্রে এই তিনটিকে জৈনশাস্ত্রে 'ত্রিরত্ন' বলা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে জীব আত্মার ক্রমিক বিকাশের

ভিতর দিয়া মুক্তিলাভ করে। এই বিকাশের স্তরগুলিকে জৈন দর্শনে ১৪টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের গুণস্থান সমারোহ বলে। প্রথম গুণস্থান মিথ্যাত্ব ও শেষ গুণস্থান কেবলি সমুদ্‌ঘাত। শেষ গুণস্থানে জীব নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

জৈন ধর্ম সর্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। জৈন মতে সৃষ্টি অনন্ত ও অনাদি। এজন্য জৈন ধর্মে ঈশ্বরোপাসনার স্থান নাই।

গণেশ লালওয়ানী

জৈন সাহিত্য প্রাকৃত অপভ্রংশ সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় রচিত জৈন সাহিত্য বিশাল রূপ ধারণ করিয়াছে। জৈনদের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম পূর্ব। কথিত আছে যে এই পূর্ব সাহিত্য ভগবান্ মহাবীর তাঁহার গণধরদের শিক্ষা দেন এবং গণধরেরা সেই পূর্ব সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া আগম রচনা করেন। মহাবীর-উপদিষ্ট পূর্ব সাহিত্য বর্তমানে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র চতুর্দশ পূর্বের নাম মাত্র আগম সাহিত্যে পাওয়া যায়। দীর্ঘ দিন এই আগম সাহিত্য গুরু শিষ্যের মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় বা ৪র্থ শতকে আর্য স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে পাটলিপুত্রে যে পণ্ডিতসভা আহূত হয় সেই পণ্ডিতসভায় আগম সাহিত্য গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তবে খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে বলভীতে যে পণ্ডিতসভা আহূত হইয়াছিল সেই পণ্ডিত-সভায় গৃহীত পাঠই বর্তমানে প্রচলিত আগম সাহিত্যের ভিত্তি।

জৈনদের এই আগম সাহিত্য বহু ভাগে বিভক্ত। যথা, অঙ্গগ্রন্থ ১১টি, উপাঙ্গ ১১টি, ছেদসূত্র ৬টি, মূলসূত্র ৪টি, প্রকীর্ণক ১০টি এবং চূলিকাসূত্র ২টি।

অর্ধমাগধী প্রাকৃতে রচিত এই আগম সাহিত্যের উপর প্রচুর ব্যাখ্যা গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা সাহিত্যের মধ্যে ভদ্রবাহু রচিত (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়-৪র্থ শতক) নির্যুক্তিই প্রাচীন। এই নির্যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া পরবর্তী কালে ভাষ্য ও চূর্ণী এবং আরও পরবর্তী কালে টীকা ও অবচূর্ণী রচিত হয়। ভাষ্য, চূর্ণী, টীকা, অবচূর্ণী ও নির্যুক্তি -সহ সমগ্র আগম সাহিত্যকে পঞ্চাঙ্গি সিদ্ধান্ত বলা হয়। যাঁহারা আগম সাহিত্যের ভাষ্যটীকাদি রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে অভয়দেব, হরিভদ্র ও মলয়গিরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত আগম সাহিত্য শ্বেতাম্বরদের দ্বারা সংরক্ষিত। দিগম্বরগণ এই আগম সাহিত্যকে প্রামাণিক বা প্রাচীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে আগম সাহিত্য সম্পূর্ণই লুপ্ত। প্রাচীন আগম সাহিত্যের জ্ঞান গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় যতটুকু বর্তমান ছিল তাহা পুষ্পদন্ত ভূতবলি (খ্রীষ্টীয় ২য় শতক) আচার্য ধরসেনের নিকট প্রাপ্ত হন ও তাহাকে ভিত্তি করিয়া ষট্‌খণ্ডাগম রচনা করেন। ষট্-খণ্ডাগমই দিগম্বর জৈনদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। ষট্‌খণ্ডাগম শৌরসেনী ভাষায় রচিত ও ছইটি খণ্ডে বিভক্ত। শেষ খণ্ড মহাবন্ধ এত বৃহৎ যে উহাকে মূল স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। ষট্‌খণ্ডাগমের উপর বীরসেন রচিত ধবলা-টীকা প্রসিদ্ধ। ষট্‌খণ্ডাগমকে অবলম্বন করিয়া নেমিচন্দ্র (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক) গোম্মটসার রচনা করেন।

আগম-বহির্ভূত জৈন সাহিত্যকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়: ১. প্রথমানুযোগ— পুরাণ চরিতাদি আখ্যানমূলক গ্রন্থ ২ করণানুযোগ— জ্যোতিষ-গণিতাদি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ ৩. চরণানুযোগ— সাধু সাধ্বী শ্রাবক-শ্রাবিকাদের আচার সংবলিত গ্রন্থ ৪. দ্রব্যানুযোগ — জীব অজীব আদির তত্ত্বমূলক গ্রন্থ।

গণেশ লালওয়ানী

জৈনুল আবেদীন কাশ্মীরের মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। গান্ধার, সিন্ধু, মদ্র ও বাদ্ধপুরী প্রভৃতি দেশে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি পুনঃপুনঃ উদভাণ্ডপুরের রাজাকে পরাজিত করেন এবং লদাখ ও সেই প্রদেশ অধিকার করেন।

জৈনুল আবেদীনের পূর্ববর্তী ছই জন সুলতান - তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা— হিন্দুদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন— ফলে কাশ্মীরের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ হত অথবা নির্বাসিত হন এবং বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। জৈনুল আবেদীন যথাসাধ্য ইহার প্রতিকার করেন। তিনি নির্বাসিত ব্রাহ্মণগণকে কাশ্মীরে ফিরাইয়া আনেন এবং সকল ধর্মই রক্ষা করিবেন এইরূপ প্রকাশ্য ঘোষণা করেন। তিনি মন্দির নির্মাণ করিতে অনুমতি দেন এবং কোনও ধর্মের প্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

জৈনুল আবেদীন, পারসীক, সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক আরবী ও পারসীক গ্রন্থ কাশ্মীরী ভাষায় এবং মহাভারত ও রাজতরঙ্গিনী পারসীক ভাষায় অনূদিত করেন। অনেক হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন। জোনরাজ তাঁহার রাজ্যকালেই রাজতরঙ্গিনীর দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন। জৈনুল আবেদীন অনেক সামাজিক সংস্কার করেন এবং তাঁহার রাজ্য সুশাসনের জন্য বিখ্যাত ছিল।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1951.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

জৈব আলোক গভীর সমুদ্রের কয়েক জাতীয় মাছ, নিম্নস্তরের বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী প্রাণী, কোনও কোনও পতঙ্গ, কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ, জীবাণু এবং কীটাণুর শরীর হইতে অন্ধকারে এক রকম স্নিগ্ধ আলো বিকিরিত হইতে দেখা যায়। ইহাকে জৈব আলো বা ঠাণ্ডা আলো বলে। ইহার দীপ্তি আছে, কিন্তু উত্তাপ অত্যন্ত সামান্য। আলোক-চিত্রের ফিল্ম এর উপর এই আলোক ক্রিয়া করে। কিন্তু ইহাতে অতিবেগুনী, অবলোহিত প্রভৃতি রশ্মি নাই।

বর্ষার অন্ধকার রাত্রে ঘাস পাতা, লতা গুল্ম ও মৃত উদ্ভিদাদি হইতে কেবল ভিজা অবস্থায় এক প্রকার স্নিগ্ধ সবুজাভ আলো নির্গত হইতে দেখা যায়। এই আলো মৃত উদ্ভিদাদির মধ্যে অনুপ্রবেশকারী এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম ছত্রাক সূত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার নোনা জলের চিংড়ির মৃতদেহ, বিভিন্ন পাখির মাংস এবং একদিন পূর্বে কাটিয়া রাখা ইলিশ, ভাদশ প্রভৃতি মাছের টুকরায় সময়ে সময়ে অন্ধকারে আলোকবিন্দু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সমুদ্র এবং বড় বড় নদীর মোহানার জলও আলোড়িত হইলে তরল আগুনের মত দেখায়। আলোক-বিকিরণকারী জীবাণু ও কীটাণুই সমুদ্রের জল, মাছ, মাংস বা চিংড়ির শরীরে এরূপ আলোক উৎপত্তির কারণ। এতদ্ব্যতীত জোনাকি, কেঁচো এবং খড়কে-বিছার জৈব আলোর সহিত কম বেশি অনেকেই পরিচিত।

রাসায়নিক বিক্রিয়াই জৈব আলোক উৎপত্তির কারণ। জোনাকি এবং অনুরূপ প্রাণীর শরীরে আলোক-উৎপাদক কোষের মধ্যে বাহিরের অক্সিজেনের সমন্বয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এই আলোক উৎপন্ন হয়। জোনাকির শরীরে আলোক-উৎপাদক পদার্থের মধ্যে লুসিফেরিন ও লুসিফেরেজ উল্লেখযোগ্য, লুসিফেরেজ একপ্রকার এনজাইম।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

জৈমিনি জৈমিনি 'মীমাংসাসূত্রে'র প্রণেতা। তিনি পূর্ববর্তী ধর্মাচার্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা বিষয়ে সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জৈমিনি তাঁহাদের সূত্রগুলি সুসংবদ্ধ ও সংশোধিত করেন ও একমাত্র প্রামানিক সূত্রকার বলিয়া গণ্য হন। (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র)। ভাগবতে জৈমিনি পরাশর পুত্র ব্যাসের শিষ্য (১২।৬।৪৯-৫৫), সুমন্তুর গুরু ও সামবেদের সংকলনকারী বলিয়া কথিত হইয়াছেন (১২।৬।৭৫)। বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যার নিয়ম ও ধর্ম 'মীমাংসাসূত্রে'র প্রতিপাদ্য বিষয়। জৈমিনির মতে বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও স্বতঃপ্রমাণ, ঈশ্বরকৃত নহে। 'যজ্ঞকর্তা স্বর্গলাভ করেন' এই সূত্রে তিনি অমর জীবাত্মা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মোক্ষ ও ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। জৈমিনি 'ব্রহ্মসূত্র'-প্রণেতা বাদরায়ণের সমকালীন। আধুনিক পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দী তাঁহাদের আবির্ভাবকাল মনে করেন। 'ছান্দোগ্যানুবাদ'ও জৈমিনির প্রণীত বলা হয় (তন্ত্রবার্তিক, ১।৩।২)।

যদুনাথ সিংহ

জোঁক অঙ্গুরীমাল গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আন্নেলিদা Phylum-Annelida) অন্তর্ভুক্ত হিরুদিনিয়া শ্রেণীর (Class-Hirudinea) অমেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহারা লবণাক্ত বা মিষ্ট জলে কিংবা স্থলে বাস করে। ঝিনুক ও শামুকের শ্বাসযন্ত্রেও একপ্রকার ছোট ছোট জোঁক পরজীবীরূপে বাস করে।

এই গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাণীর মতই জোঁকের দেহটি কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক খণ্ডে গঠিত, দেহখণ্ডগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার অঙ্গুরীর মত। দেহের সম্মুখ ও পশ্চাদ্-ভাগে সাধারণতঃ একটি করিয়া শোষক থাকে, সম্মুখের শোষককে মুখ ও পিছনের শোষককে পায়ু অবস্থিত। দেহের সম্মুখ ভাগে কালো কালো বিন্দুর মত পাঁচজোড়া চোখ আছে, ইহাদের সাহায্যে জোঁক আলোক ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝিতে পারে, কিন্তু পরিষ্কার দেখিতে পায় না। জোঁক উভলিঙ্গ প্রাণী, কেঁচোর মত ইহাদেরও কোকুনের মধ্যে ডিম্ব নিষিক্ত হয় ও ভ্রূণ বৃদ্ধি পায় ('কেঁচো' দ্র)।

জলচর ও স্থলচর— উভয় প্রকারের জোঁকই মানুষ, পশু ও অন্যান্য প্রাণীর রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। দেহের অগ্রভাগের শোষকের সাহায্যে শিকারের ত্বক কাটিয়া ক্ষতস্থানে ইহারা লালা ঢালিয়া দেয়, এই লালায় হিরুডিন (hirudin) নামক রক্ত-তঞ্চন নিরোধক পদার্থ থাকায় ক্ষতমুখে রক্ত জমাট বাঁধিতে পারে না ও রক্ত শোষণ করিতে ইহাদের কোনও অসুবিধা হয় না। সুযোগ পাইলে ইহারা নিজদেহের ওজনের তিনগুণ রক্ত একবারেই শোষণ করিয়া পাচনতন্ত্রের পাতলা থলির মত অংশে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং দীর্ঘ দিন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে সেই রক্ত পরিপাক করে।

কোনও কোনও প্রজাতির জোঁক রক্তশোষণ করে না, ইহারা কেঁচো, ক্ষুদ্র শম্বুকজাতীয় প্রাণী প্রভৃতি ধরিয়া খায়।

স্থলের জোক আকারে ছোট হয় এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলাফেরা করিতে পারে। হিরুদিনারিয়া গণভুক্ত জোঁক আকারে বেশ বড় হইয়া থাকে, এই গণভুক্ত ভারতীয় জোঁক ১৫ হইতে ৩৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

জোগান কোনও দ্রব্যের বাজার দর নিরূপণ করিতে হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবহার জানা প্রয়োজন। ক্রেতাদের ব্যবহার যেমন চাহিদা সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়, উৎপাদক ও বিক্রেতাদের ব্যবহার সেইরূপ জোগানের অবস্থায় প্রতিফলিত হয়। ধরা যাক একটি সাধারণ শাড়ির জন্য ক্রেতারা পনর টাকা দিতে প্রস্তুত আছে, সেই মূল্যে বিক্রেতারা যদি দুই হাজারখানি শাড়ি জোগান দিতে প্রস্তুত থাকে তবে আমরা বলিতে পারি পনর টাকায় দুই হাজারখানি শাড়ির জোগান হইবে। এইভাবে ক্রেতাদের প্রতিটি মূল্যের উত্তরে বিক্রেতারা যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জোগান দিতে প্রস্তুত থাকে তবে আমরা সেই অবস্থাকে 'জোগান-সম্পর্কে'র সাহায্যে বর্ণনা করিতে পারি। সাধারণভাবে বলা যায় যে জোগান সম্পর্ক জিনিসের উৎপাদনের ব্যয়, বাজারে প্রতিযোগিতার অবস্থা এবং বিক্রেতাদের লাভের প্রত্যাশা দ্বারা নির্ণীত হয়। বাজারে কত জন উৎপাদক বা বিক্রেতা আছে তাহার উপরও জোগানের অবস্থা নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রতিযোগিতা যত বেশি হইবে কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিসের জোগানমূল্য তত কম হইবার সম্ভাবনা।

বাজারের সকল ব্যবসায়ীর জোগান সম্পর্ক সাধারণতঃ একরূপ হয় না। অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমী ও কুশলী ব্যবসায়ী যে মূল্যে যে-পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে, অপেক্ষাকৃত অলস বা আনাড়ী ব্যবসায়ী সেই পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে আরও অধিক মূল্য চাহিবে কারণ তাহার উৎপাদন ব্যয় বেশি হইবে। সুতরাং কোনও একটি বিক্রেতার জোগান-সম্পর্ক জানিলেই সমস্ত বাজারের জোগান-সম্পর্ক জানা যায় না। এক্ষেত্রে আমরা একজন প্রতিনিধি স্থানীয় বিক্রেতাকে মনের মধ্যে কল্পনা করিতে পারি। তাহার সরবরাহের অবস্থা জানিলেই আমরা সমগ্র বাজারের সরবরাহের অবস্থা মোটামুটি রকম বুঝিতে পারি।

শিল্পবিশেষে জোগানের অবস্থাগুলিকে আমরা প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি: স্বল্পদিননির্ণীত জোগান, দীর্ঘদিননির্ণীত জোগান এবং দেশের আর্থিক সম্প্রসারণশক্তি নির্ণীত জোগান। উৎপাদকগণ অল্পদিনের মধ্যে বাজারে যে পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে সক্ষম হন তাহা অনেকখানিই তাৎকালিক ঘটনার দ্বারা নির্ণীত হয়। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতা শহরে কোনও একদিনের মৎস্য সরবরাহ ধরা যাইতে পারে। ইহা নির্ভর করিবে তাহার পূর্বদিনের মাছ ধরার পরিমাণ, ঠাণ্ডা ঘরে রক্ষিত মাছের পরিমাণ, সেইদিনের যানবাহনাদির অবস্থা, সেইদিন মৎস্য সরবরাহের উৎসের নিকটে বা কাছাকাছি অন্য শহরে চাহিদার অবস্থা ইত্যাদির উপর। মূল্যনিয়ন্ত্রণ না থাকিলে কলিকাতা শহরে সেইদিনের মাছের মূল্য নির্ভর করিবে তাৎকালিক সরবরাহ ও সেইদিনের চাহিদার উপর।

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দিন ধরিয়া সরবরাহের অবস্থা পর্যালোচনা করিতে গেলে শুধু আকস্মিক বা তাৎকালিক অবস্থাকে দায়ী করা চলে না। সেখানে দেখিতে হইবে সেই বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন সামগ্রী সহজে বাড়ানো যায় কিনা। সেই দ্রব্যের উৎপাদকগণ বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কিনা। তাহারা লাভ হিসাব করার সময় দীর্ঘকালীন অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন কিনা। সাধারণতঃ ধরা হয় যে দীর্ঘকালীন অবস্থাতেও সকল উৎপাদন সামগ্রী সমানভাবে বাড়ানো যায় না, সে ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মে জোগান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে পারে এবং জোগানমূল্য হয় সমান থাকে (যদি প্রতিযোগিতা প্রবল হয়) অথবা বাড়ে। দীর্ঘ দিনের জোগান ব্যবস্থা আলোচনা করার সময় দীর্ঘ দিনের চাহিদার কথাও আসিয়া পড়ে। এমন কিছু শিল্প আছে (যথা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কৃত্রিম সার শিল্প এবং শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক সামগ্রী) যেখানে উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। সেই সকল শিল্পে চাহিদা বাড়িতে থাকিলে উৎপাদকগণ দ্রুত উৎপাদন বাড়াইয়া উৎপাদন ব্যয় এবং (যদি সেই শিল্পে প্রতিযোগিতা থাকে) দ্রব্যমূল্য কমাইতে পারে।

যুগ যুগ ব্যাপী জোগান ব্যবস্থা প্রধানতঃ দেশের আর্থিক সম্প্রসারণশক্তি ও প্রগতির উপরে নির্ভরশীল। কোনও বিশেষ জিনিসের জোগানে ঘাটতি পড়িলে খুব দ্রুত প্রগতিশীল দেশ তাহার উৎপাদনশক্তি সেই জিনিসের উৎপাদনে বা আমদানিতে নিয়োগ করিয়া সেই ঘাটতি দূর করিতে পারে। অন্য দিকে ধীরগতি দেশের সাধারণ প্রগতিও এই ধরনের ঘাটতির দ্বারা ব্যাহত হয়। যে

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান থাকিলে নূতন নূতন জোগান-সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহাও দ্রুত প্রগতিশীল দেশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। এই আলোচনা অন্যান্য শিল্পের ন্যায় কৃষির বেলায়ও প্রযোজ্য।

সাধারণভাবে বলা যায় যে আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় আয় যদি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে তবে কোনও বিশেষ দ্রব্যের মূল্য এবং তাহার জোগানের মধ্যে সম্পর্ক অর্থনীতির দিক হইতে তত গুরুতর সম্পর্ক বোধ হয় না। তাহার স্থলে বিভিন্ন শিল্পের সম্প্রসারণের আপেক্ষিক বেগ জানা অনেক বেশি দরকারি হইয়া পড়ে।

দ্র Alfred Marshall, *Principles of Economics*, Book IV and V, London, 1920; Nichols Kaldor, *Essays in Economic Stability and Growth*, London, 1960; Joan Robinson, *Exercises in Economic Analysis*, London, 1961.

অমিয় বাগচী

জোন্‌স, উইলিয়াম (১৭৪৬-৯৪ খ্রী) ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর উইলিয়াম জোন্‌সের জন্ম হয়। অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারসীক ভাষায় লিখিত নাদির শাহের জীবনী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পর বৎসর পারসীক ভাষার ব্যাকরণ লেখেন। কিছুদিন পরে তিনি একখানি আরবী গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। এক বৎসর পরেই তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীবন ইহার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। সমগ্র এশিয়া খণ্ডে যাহা কিছু মানুষের কীর্তি এবং প্রকৃতির সৃষ্টি তাহার সম্বন্ধে গবেষণা করাই এই সোসাইটির কার্য — এই কয়টি কথায় তিনি ইহার ব্যাপক কার্যপ্রণালীর ইঙ্গিত এবং উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি জীবনের অবশিষ্ট দশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু মনস্বী এই কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রাচ্য দেশ সম্বন্ধে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে অগণিত রত্ন আহরণ করিয়া গিয়াছেন। গত ১৭৫ বৎসরের কলিকাতায় অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টায় জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছে।

জোন্‌স বহু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, জার্মান, ইটালীয়, স্পেনিস্‌, পর্তুগীজ প্রভৃতি ইওরোপীয় এবং হিব্রু, ফারসী, আরবী, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা তিনি বেশ ভাল জানিতেন। এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৭৮৬ খ্রী) সভাপতি জোন্‌স হিন্দু জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। ইহাতে তিনি সংস্কৃত ভাষার সহিত গ্রীক, লাতিন, গথিক, কেল্‌টিক প্রভৃতি ইওরোপীয় ভাষার প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই সমুদয় ভাষা এবং প্রাচীন ফারসী ভাষা এক মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আবিষ্কারের মূল্য অত্যন্ত গুরুতর এবং ইহার ফল সুদূরপ্রসারী। ইওরোপীয় জাতিসমূহ এবং ভারতের হিন্দু ও পারস্যের অধিবাসীগণের পূর্বপুরুষগণ যে এক ভাষায় কথা বলিতেন এবং সম্ভবতঃ একজাতীয় ছিলেন, এই নূতন মতবাদ মনুষ্যজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলেই 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' নামে নূতন এক বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে এবং বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বতন ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। এই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে প্রাচীন কালে মানবজাতির ধর্মবিশ্বাস, সমাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছি। একমাত্র এই আবিষ্কারের জন্যই জোন্‌স ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য।

জোন্‌স বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ইহাদের মধ্যে শকুন্তলা, মনুসংহিতা, হিতোপদেশ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু প্রবন্ধও লেখেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এর প্রথম চারি বৎসরে তাঁহার ২৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সমুদয় প্রবন্ধে তিনি বহু বিষয় আলোচনা করেন, যথা: রোমান অক্ষরে সংস্কৃত লেখার পদ্ধতি, গ্রীস, ইটালী ও ভারতের দেবদেবী, হিন্দুরাজগণের কালক্রম, হিন্দু সংগীত, জ্যোতিষ ও সাহিত্য এবং প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতি। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কলিকাতা সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল নামক গির্জায় তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

দ্র Arthur John Arberry, *Asiatic Jones: the Life & Influence of Sir William Jones*, London, 1946; *Sir William Jones, Bicentenary of His Birth, Commemoration Volume*, 1746-1946,

Calcutta, 1948 ; Garland H. Cannon, *Sir William Jones Orientalist, An Annotated Bibliography of his Works*, Honolulu, 1952 ; Garland H. Cannon, *Oriental Jones*, Calcutta, 1964

রমেশচন্দ্র মজুমদার

জোনাকি জৈব আলোক দ্র

জোয়ান মশলা দ্র

জোয়ান অফ আর্ক (১৪১২-৩১খ্রী) ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে মিউজ নদীর তীরে দরেমি (Domremy) গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি প্রত্যাদেশ পাইলেন, তাঁহাকে দেশোদ্ধার করিতে ও ফ্রান্সের যথার্থ রাজাকে রীমস গির্জায় অভিষিক্ত করিতে হইবে। জোয়ান অনেক চেষ্টার পর সপ্তম চার্লসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। তথায় প্রথমে চার্লসকে পরে পোয়াতিয়েরের (Poitiers) ঈশ্বরবিদগণকে সন্তুষ্ট করিয়া শ্বেতবর্মে সজ্জিতা হইয়া, পক্ষক্রুশধারী তরবারি হস্তে ও ৪০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে অবরুদ্ধ নগরী অরলেয়াঁর (Orleans) উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল শহরে প্রবেশ করিলেন।

জোয়ানের উপস্থিতি ফরাসী সৈন্যগণকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিল ও তাহারা মহোৎসাহে শহর হইতে বহির্গত হইয়া ইংরেজ সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিয়া তুরেলবুরুজ (Tourelles Tower) দখল করিল। নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম ইংরেজগণ ইহার পরে পাতের (Patay) যুদ্ধে পরাজিত হইল। সপ্তম চার্লস আনন্দে লিয়ঁতে (Lyons) জোয়ানকে সংবর্ধিত করিলেন ও সসৈন্য চার্লস ও জোয়ান রীমস অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৪ জুলাই রীমসে প্রবেশ করিলেন ও ১৬ জুলাই ফ্রান্সের যথার্থ রাজা বলিয়া স্বীকৃত ও অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু ইহার পর ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরেজদের প্রতি প্রসন্না হইলেন। জোয়ানের পারী (প্যারিস) আক্রমণ ব্যর্থ হইল। ইহার পর কঁপিয়েনি (Compiegne) শহর হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ কালে জোয়ান শত্রুহস্তে বন্দী হন এবং বিচারের ফলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ; পরে এক তুচ্ছ মিথ্যা ওজরে তাঁহাকে ডাইনী ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলিয়া রুয়াঁতে (Rouen) জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয় (১৪৩১ খ্রী)।

ইওরোপের প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ জোয়ানকে অমরত্ব দান করিয়াছেন। তিনি দেবতা-প্রেরিতই হউন বা 'স্থিরমস্তিষ্কা বিচক্ষণা, অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্না গ্রাম্য বালিকা'ই হউন, তিনি যে ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিপন্ন ও অবসাদগ্রস্ত ফ্রান্সের উদ্ধারকর্ত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্র W. P. Barrett, *The Trial of Joan of Arc*, New York, 1931 , *Cambridge Mediaeval History*, vol. Cambridge, VIII, 1936.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

জোয়ার ধান্য গোত্রের (ফ্যামিলি-গ্রামিনিঈ, Family-Gramineae) অন্তর্গত একবীজপত্রী বর্ষজীবী উদ্ভিদ, বৈজ্ঞানিক নাম সোরঘম ভুলগারে (*Sorghum vulgare*)। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মধ্য ভারতে জোয়ারের চাষ প্রচলিত আছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে দরিদ্র শ্রেণীর ইহাই প্রধান খাদ্য। ভারতবর্ষে জোয়ারের চাষের জমির পরিমাণ ১৮ কোটি হেক্টর এবং বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন, উৎপাদনের পরিমাণে ধান এবং গমের পরেই ইহার স্থান। ধানের মতই জোয়ার ভানিয়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। উত্তর ভারতে গমের রুটির পরেই জোয়ারের আটা হইতে তৈয়ারি রুটির ব্যবহার দেখা যায়। জোয়ারের খড় পুষ্টিকর পশুখাদ্য এবং তাজা অথবা শুষ্ক অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

জোয়ার বেশি বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না এবং বপন হইতে ফসল কাটা পর্যন্ত ৩০-১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের মধ্যেই ইহার চাষের অঞ্চল সীমাবদ্ধ। সমতল ভূমি হইতে ৯০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ইহার চাষ করা চলে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর মাটিতে ইহার চাষ সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি শুখা খারিফ ফসল হিসাবে জোয়ার উৎপন্ন করা হয়। সাধারণতঃ মাটিতে রস থাকিলে সারা বৎসরই জোয়ারের চাষ করা সম্ভব। ভাল ফসলের জন্য প্রয়োজন মত জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। উত্তর ভারতে জোয়ার সাধারণতঃ দুই বৎসরের শস্য পর্যায়ে বাজরা, যব এবং গম অথবা জলদি ধান এবং মটরের সহিত চাষ করা হয়। এককভাবে অথবা অন্য ফসল যেমন অড়হর-এর সহিত মিশ্র চাষ করা হয়। কোনও কোনও সময় এক বা একাধিক ডাল শস্য, তৈলবীজ, এমন কি সবজি ফসলের সহিত চাষ করা হয়। সাধারণতঃ দানা শস্য ৪-৫ মাসেই কাটার উপযোগী হয়। পশুখাদ্য ফুল ফোটার পর কাটিতে হয়, কারণ তাহার পূর্বে গাছে একটি বিষাক্ত পদার্থ (প্রুসিক অ্যাসিড) থাকে।

সাধারণতঃ গাছ গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া জমিতেই শুকানো হয় এবং পরে শিষ কাটিয়া গোরু দিয়া অথবা উন্নত ব্যবস্থায় মাড়াই করা হয়। মাড়াইয়ের পর দানা ভাল করিয়া শুখাইয়া গুদামজাত করা উচিত। বৃষ্টির চাষে সাধারণতঃ প্রতি হেক্টর জমিতে ৪৫০-৯৫০ কিলোগ্রাম দানা এবং ৩৩৫০-৪৫০০ কিলোগ্রাম খড় পাওয়া যায়। সেচ ও সারের প্রয়োগে প্রতি হেক্টর জমিতে ১৭০০-২২৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দানা পাওয়া যায়। কেবলমাত্র পশুখাদ্যের চাষে প্রতি হেক্টর জমিতে ২২½-৩৩½ মেট্রিক টন পশুখাদ্য পাওয়া যায়। সেচের ফসলে ফলন ইহার দ্বিগুণ হইয়া থাকে।

দ্র H. H. Martin, *The Millets*, *World Crops* 2, New York, 1952; A. K Jegna Narayan Aiyer, *Field Crops of India*, Bangalore, 1951; Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

জোয়ার ঘাসজাতীয় বীরুৎ, দেখিতে ভুট্টার ন্যায়, উচ্চতা প্রায় ১-৪·৫ মিটার। পত্র সরল ও রেখাকার। পত্রের তলদেশ কাণ্ডকে ঘিরিয়া থাকে। জোয়ারের পত্রবিন্যাস দ্বিসারী। পুষ্পমঞ্জরী অনেকগুলি অনুমঞ্জরীর (স্পাইকলেট) সমষ্টি। পুষ্প অন্যান্য ঘাসের ফুলের ন্যায় ক্ষুদ্র ও অনুজ্জ্বল। পুষ্পে দুইটি পুষ্পপুট, তিনটি পুংকেশর ও একটি গর্ভপত্র কয়েকটি মঞ্জরীপত্র দ্বারা আবৃত থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার জোয়ারের চাষ করা হয়. ১. ডাব্‌রা: উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও ভারতের কোনও কোনও স্থানে প্রচুর চাষ হয়; ইহার ফলন দ্রুত ২. কাফির: আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলের শস্য, বর্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানেও চাষ করা হয় ৩. মাইলো: উৎপত্তিস্থল আফ্রিকা, শস্য হলুদ বা শাদা; প্রধান ১২টি জাতের মাইলোর মধ্যে খর্বাকৃতি হলুদ জাতটি উল্লেখযোগ্য ৪. শালু: ভারতে শীতের শস্য হিসাবে চাষ হইয়া থাকে, শস্য ক্ষুদ্র কঠিন ও শাদা, পাকিতে অধিক সময় লাগে ৫. কাওলিয়া: প্রাচীন কাল হইতে চীনে শস্য, শর্করা ও পশুখাদ্যের জন্য চাষ করা হইতেছে; শস্য শাদা বা বাদামী এবং ফলন দ্রুত। এতদ্ব্যতীত সুদানের ফেটেরিযা ও দক্ষিণ আফ্রিকার হেগারি উল্লেখযোগ্য।

দ্র A. F. Hill, *Economic Botany*, New York, 1952.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

জোয়ার-ভাঁটা ভূপৃষ্ঠের জলরাশি প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক এক স্থানে ধীরে ধীরে স্ফীত হইয়া ওঠে এবং এক এক স্থানে ধীরে ধীরে অবনমিত হয়। জলের এই নিয়মিত স্ফীতিকে জোয়ার এবং অবনমনকে ভাঁটা বলে।

বহিঃসমুদ্রে বড় বড় সাগর বা উপসাগরে জোয়ারের জল ০·৬/০·৯ মিটার (২।৩ ফুট) অধিক উচ্চ হয় না, কিন্তু সমুদ্রখাত, প্রশস্ত নদীমুখ ও অগভীর মহীসোপানে ইহা ৯/১২ মিটার (৩০।৪০ ফুট) পর্যন্ত উচ্চ হয়। ফণ্ডি উপসাগরে জোয়ারের জল প্রায় ১৯/২৭ মিটার (৬৫ হইতে ৯০ ফুট) পর্যন্ত উচ্চ হয়।

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণই জোয়ার-ভাঁটার প্রধান কারণ। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর অধিক নিকটবর্তী বলিয়া চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি অধিক। সেইজন্য চন্দ্রের আকর্ষণে মুখ্যতঃ জোয়ারের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর আবর্তনকালে যে স্থান চন্দ্রের সম্মুখীন হয় সে স্থানে মুখ্য এবং তাহার প্রতিপাদ স্থানে গৌণ জোয়ার এবং ইহার সমকোণে অবস্থিত স্থানে ভাটা হয়। প্রত্যেক মুখ্য বা গৌণ জোয়ারের পরবর্তী মুখ্য বা গৌণ জোয়ার ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পর অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী এক সরল রেখায় অবস্থিত থাকে বলিয়া উভয়ের আকর্ষণে এই দিনে জলের স্ফীতি অধিক হয়, ইহাকে ভরা কটাল বলে। বর্ষাকালে ভরা কটালের সময় সমুদ্র হইতে আগত জোয়ারের জল সরু নদীপথে প্রবেশ করিলে নদী-প্রবাহিত জলের সহিত সংঘর্ষ হয়, ফলে জল ৩/৩·৬ মিটার (১০।১২ ফুট) উচ্চ দেওয়ালের মত নদীপথে অগ্রসর হয়। ইহাকে বান বলে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হুগলি নদীর ষাড়াষাড়ি বান বিখ্যাত। অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য সমকোণে থাকে বলিয়া পৃথিবীর উপর উভয়ের আকর্ষণের বেগ কমিয়া যায়, ফলে ঐ দুই তিথিতে জোয়ার মৃদু হয়। ইহাকে মরা কটাল বলে।

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ ছাড়াও পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সৃষ্ট অপকেন্দ্র বল জোয়ার-ভাঁটার আর একটি কারণ।

জোয়ার ভাঁটার ফলে নদীপথে সমুদ্রগামী জাহাজ যাতায়াতের সুবিধা হয়— নদীমুখ আবর্জনা, পলিমাটিমুক্ত থাকে, মোহানায় সহজে চড়ার সৃষ্টি হইতে পারে না।

স্বদেশ সরকার

জোলা, এমিল (১৮৪০-১৯০২ খ্রী) বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক, 'নাতুরালিস্‌ম' (প্রকৃতিবাদী) আন্দোলনের প্রবর্তক ও প্রবক্তা। জন্ম পারী নগরীতে। পিতা ছিলেন

ইটালীয়, মাতা ফরাসী। ২০ বৎসর বয়সে কর্মজীবন আরম্ভ করিয়া সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাসমালা 'লে রুগঁ-মাকার' (*Les Rougon-Macquart*) ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এইগুলির মধ্যে কয়লা খনির শ্রমিকদের লইয়া লিখিত 'ঝের্মিনাল' (*Germinal*) তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি রূপে স্বীকৃত। বংশপ্রভাব বা কুল-সংক্রমণের গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্য পরিকল্পিত এই উপন্যাসমালায় জোলা একটি পরিবারের বংশানুক্রমিক কাহিনীসূত্রে বস্তুতঃ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর চরিত্র উদ্ঘাটিত করেন। তাঁহার প্রবর্তিত 'নাত্যুরালিস্‌ম্‌' বা প্রকৃতিবাদ বাস্তববাদেরই এক প্রকারভেদ। বাস্তবের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তিনি যোগ করেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে জোলার প্রতিভা সংশয়াতীত। জোলার চিন্তায় ও রচনায় ক্রমে সর্বমানবের ভ্রাতৃত্ব এবং সমাজে ন্যায়বিচারের প্রশ্ন প্রধান হইয়া ওঠে। বিখ্যাত দ্রেফুস মামলা সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া 'ঝাক্যুজ্‌' (J'accuse—'আমি অভিযুক্ত করিতেছি') নামক বিখ্যাত যে খোলা চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, তাহাও এই চেতনারই এক সাক্ষ্য। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জোলা তাঁহার শয়নকক্ষে গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আকস্মিকভাবে প্রাণ হারান।

দ্র E A Vizetelly, *Emile Zola, Novelist and Reformer*, 1904.

অরুণ মিত্র

জোলাপ কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার ঔষধ। কোনও কোনও কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগের পরে জোলাপ ব্যবহার করা হয়। অন্ত্রের প্রদাহে, অন্ত্রের শল্য চিকিৎসার পরে, যে সকল ক্ষেত্রে অন্ত্রের সংকোচন ক্ষতিকর, যে ক্ষেত্রে উদরের রোগ নির্ণীত হয় নাই অথবা কঠিন মল দ্বারা মলদ্বার রুদ্ধ হইলে জোলাপ দেওয়া উচিত নহে। যে সকল জোলাপ ক্ষুদ্রান্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের ক্রিয়া ৪-৬ ঘণ্টার মধ্যে এবং যাহারা বৃহদন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের ক্রিয়া ৮-১০ ঘণ্টার মধ্যে আরম্ভ হয়।

সাধারণতঃ আগার-আগার এবং আটার রুটি শাক-সবজি ইত্যাদি সেলুলোজ-প্রধান খাদ্য মৃদু জোলাপের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা বিশোষিত হয় না বলিয়া অন্ত্রের মধ্যেই পড়িয়া থাকে এবং অন্ত্রের সংকোচন বৃদ্ধি করে। তরল প্যারাফিনও মৃদু জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ইহা অন্ত্রে পিচ্ছিলতার সৃষ্টি করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করে। ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম পটাসিয়াম টার্টারেট প্রভৃতি লবণঘটিত জোলাপ অন্ত্রে অভিস্রবণের (অসমোসিস) সাহায্যে জল ধরিয়া রাখিয়া মল রেচনে সাহায্য করে। ক্যাস্টর অয়েল, অ্যাম্বাসিন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ উত্তেজক জোলাপ যথাক্রমে ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শেষোক্তটি বেদনাদায়ক সংকোচন ঘটায়।

তীব্র উদ্ভিজ্জ জোলাপ পোডো-ফাইলাম ও কলোসিন্থ সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ব্যতীত উত্তেজক জোলাপের মধ্যে ফিনলপ্থালিন ও ক্যালোমেল উল্লেখযোগ্য।

কমলকুমার মল্লিক

জোলিও-কুরি, ইরেন (১৮৯৭-১৯৫৬ খ্রী) বিখ্যাত পদার্থবিদ্, পিয়ের ও মারী (মারিয়া) কুরির ('কুরি, পিয়ের' ও 'কুরি, মারিয়া স্ক্লোডোভ্স্কা' দ্র) কন্যা। সরবোন্-এ শিক্ষালাভ করিয়া পিতামাতার গবেষণাগারে গবেষণায় নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তিনি ফ্রেদেরিক জোলিও র ('জোলিও-কুরি, জঁ ফ্রেদেরিক' দ্র) সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বামীর সহযোগিতায় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদনে সমর্থ হন ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কমিউনিস্ট মতাবলম্বী বলিয়া ফরাসী গভর্নমেণ্ট ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী অ্যাটমিক কমিশন হইতে ইহাকে অপসারিত করেন।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

জোলিও-কুরি, জঁ ফ্রেদেরিক (১৯০০-৫৮ খ্রী) ফরাসী পদার্থবিদ্। জন্ম প্যারী শহরে। প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া পরে রসায়ন অধ্যয়ন করেন ও রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রী ইরেন-এর ('জোলিও-কুরি, ইরেন' দ্র) সহযোগিতায় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তী কালে কেন্দ্রক-বিভাজন সম্পর্কে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করিয়াছিলেন এবং 'চেন-রিয়্যাকশন'-এর ('কেন্দ্রক বিভাজন' দ্র) সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের পরমাণুশক্তি বিভাগের হাই কমিশনার নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট মতাবলম্বী বলিয়া ঐ পদ হইতে তিনি অপসৃত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং পারমাণবিক অস্ত্র

নিষিদ্ধকরণের দাবিতে যে বৃহৎ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে, জোলিও-কুরি তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন।

দ্র M. Rouze, F *Joliot-Curie*, Paris, 1950.

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

জোনপুর উত্তর প্রদেশের একটি জেলা, থানা ও শহর। জেলাটির আয়তন ৩৮৮৭ বর্গ কিলোমিটার (১৫৪৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ১৭২৭২৬৪ জন।

জেলার প্রধান শহর জোনপুর। শহরটি গোমতী নদীর তীরে ২৫°৪৫′ উত্তর ও ৮২°৪১′ পূর্বে অবস্থিত। আয়তন ২০·৬ বর্গ কিলোমিটার (৮০৭ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৬১৮৫১ জন। জোনপুর একটি বড় রেলওয়ে জংশন। শহরটি বারাণসী, এলাহাবাদ মীর্জাপুর, ফৈজাবাদ প্রভৃতি শহরের সহিত রাস্তা দ্বারা যুক্ত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। জলবায়ু আর্দ্র ও মনোরম।

জোনপুর শহরের পত্তন হয় দিল্লীতে তোগলক বংশের রাজত্বকালে। ফকর উদ্দীন মহম্মদ জুনা খাঁর (মহম্মদ-বিন-তোগলক) মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাত ফিরোজ শাহ্ তোগলক ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। ফিরোজ শাহ্ ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও গোমতী নদীর তীরে ছয় মাস কাল অবস্থান করেন। সেই সময়ে জাফরাবাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনি এক নূতন নগর পত্তন করেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র জুনা খাঁর সম্মানে নামকরণ করেন জোনপুর। ফিরোজের মৃত্যুর পর তোগলক বংশ কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে খাজা জহান দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া মালিক উস শর্ক বা পৃথিবীর রাজা উপাধি লইয়া জোনপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং শর্ক হইতে বংশের নামকরণ হয় শার্কীবংশ। শার্কীবংশের রাজত্বকালে জোনপুর ইসলাম ধর্মের বিরাট শিল্প ও শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুলতান ইব্রাহিমের সময় (১৪০২-৩৬ খ্রী) সম্পদে শিল্পে সাহিত্যে জোনপুর এতদূর সমৃদ্ধ হইয়াছিল যে তখন ইহাকে 'ভারত জ্যোতি' বলা হইত। ১৪০০-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপত্য শিল্পের হিন্দু ভাব যুক্ত এক নূতন ধারার উদ্ভব হয়। সম্রাট আকবরের সময় জোনপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

জোনপুরের বিখ্যাত আটালা মসজিদ, ঝানঝরি মসজিদ, জামি মসজিদ, লালদরওয়াজা মসজিদ প্রভৃতি বহু মসজিদ ইসলামী স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আটালা মসজিদ (১৪০৮ খ্রী) প্রাচীন আটালা দেবীর মন্দির ভাঙিয়া গৃহীত প্রস্তরাদি দ্বারা প্রস্তুত। ইহা ছাড়া গোমতী নদীর উপর ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ১৯৯ মিটার (৬৫৪ ফুট) দীর্ঘ পাথরের সেতু আর একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু। জোনপুর নানারূপ সুগন্ধি প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত।

দ্র P. Brown, *Indian Architecture*. *Islamic Period*, Bombay, 1942.

সলিলকুমার চৌধুরী

জ্ঞান ভারতীয় চিন্তাধারায় জ্ঞানের আলোচনা জীবের মুক্তির সহিত একান্ত সম্পর্কিত। ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক উভয় জ্ঞানই কার্য কারণভাবে বিচারিত।

চার্বাকমতে ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। চার্বাকরা বলেন যে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কেবল বর্তমানকেই জানা যায়— অতীত, ভবিষ্যৎ জানা যায় না— ফলে অতীত বা ভবিষ্যৎ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া এইমতে সর্ব দেশ কালিক জ্ঞান অসম্ভব ('চার্বাক' ও 'বস্তুবাদ' দ্র)।

জৈনরা অপরোক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞান স্বীকার করেন। সাধারণভাবে যাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়, জৈন মতে তাহা আপেক্ষিক। ব্যাবহারিক জ্ঞান ছাড়াও জৈনরা পারমার্থিক জ্ঞান স্বীকার করেন। কর্মসংস্কার দূরীভূত হইলে আত্মার সাক্ষাৎ বিষয় প্রতীতি হয়। পারমার্থিক জ্ঞানের পক্ষে কোনও ইন্দ্রিয়াদি মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। একমাত্র কর্মসংস্কারমুক্ত পুরুষ পারমার্থিক (কেবল) জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ইহা ভিন্নও জৈনরা মতি ও শ্রুতি বলিয়া দুইটি ব্যাবহারিক জ্ঞান স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ জৈন মতে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত ('জৈন দর্শন' দ্র)।

বৌদ্ধ মতে জ্ঞান যখন জ্ঞেয় বিষয়টি পাওয়াইয়া দেয়— সেই জ্ঞান হইল অবিসংবাদী বা সত্য – অবিসংবাদী জ্ঞানই প্রমাণ। বৌদ্ধ মতে প্রত্যক্ষ চারি প্রকার – ইন্দ্রিয় জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্ম সংবেদন ও যোগীজ্ঞান— জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই এগুলি উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও বৌদ্ধ মতে প্রমাণ ছাড়া প্রমেয়র জ্ঞান হয় না সত্য কিন্তু প্রমাণের অভাব হইলেই যে প্রমেয় নাই এ কথা বলা যায় না। প্রত্যক্ষক্ষেত্রে বৌদ্ধরা একমাত্র স্বলক্ষণ যুক্ত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক যোগাচার ও মাধ্যমিক প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় জ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন লক্ষণের কথা বলিয়াছেন।

ন্যায়ের বাস্তব সত্তা ন্যায়ানুমোদিত জ্ঞান বা প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় মতে জ্ঞানলাভের পক্ষে ৭টি প্রমাণ

স্বীকৃত হইয়াছে— জ্ঞান কি, জ্ঞানের প্রকার ভেদ, প্রমা ও অপ্রমার বিভেদ প্রভৃতি আলোচনা ন্যায়ের প্রমাণশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বিষয়ের প্রকাশ হইল জ্ঞান বা বুদ্ধি। আলোক-রশ্মি যেমন পদার্থজগতে বস্তুনিচয়কে প্রকাশ করে, জ্ঞানও সেইরূপ ইহার সম্মুখস্থ বিষয়াদিকে প্রকাশ করে। জ্ঞান নানা প্রকার, প্রথমতঃ, প্রমা বা প্রমিতি, ইহা চারি ভাগে বিভক্ত— প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ। দ্বিতীয়তঃ, স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম ও তর্ক প্রভৃতি অপ্রমা। প্রমা হইল অসন্দিগ্ধ যথার্থ বিষয়ানুভব, স্মৃতি অপ্রমা, কারণ স্মৃতি অতীত অভিজ্ঞতার স্মরণ মাত্র— অতীত অভিজ্ঞতা অবশ্য সত্য, মিথ্যা হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকট বা বিশেষ সম্বন্ধ হইলেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়— আত্মা, মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংযোগ মিলিতভাবে প্রত্যক্ষের কারণ। বিষয় ও বিষয়ানুভব উভয়ের যখন যথার্থ মিল থাকে তখন ইহা যথার্থ অনুভব, অন্যথায় অযথার্থ। জ্ঞানের বাস্তব কার্যকারিতা বা অর্থ ক্রিয়া-কারিত্ব অংশে ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় বহুলাংশে একমত। ন্যায় মতে জ্ঞান-আলোচনা ও মুক্তি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আত্মপদার্থ প্রত্যক্ষ হইলেই মুক্তি হয়। ন্যায় মতে জ্ঞান বিষয়ানুগত। বৈশেষিক ও ন্যায় সমতন্ত্র— তবে বৈশেষিক মতে উপমান ও শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত হয় নাই— বৈশেষিক মতে উপমান একপ্রকার অনুমান।

সাংখ্য মতে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমার পক্ষে তিনটি স্বতন্ত্র প্রমাণ— যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ— স্বীকৃত হইয়াছে। উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে সাংখ্যে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্য মতে প্রত্যেক প্রমায় তিনটি অংশ আছে, ১. প্রমাতা ২. প্রমেয় ও ৩. প্রমাণ। প্রমাতা হইল শুদ্ধচিৎরূপ আত্মা, ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয় হইল প্রমেয়, বুদ্ধিবৃত্তি হইল প্রমাণ। বুদ্ধির মাধ্যমে আত্মার বৃত্তির ভান হয়। দর্পণে যেমন আলোকরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া জাগতিক বিষয়াদিকে প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মার নিকটতম অচিৎ অথচ স্বচ্ছ সাত্ত্বিক বুদ্ধির উপর আত্মার চেতনরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্ঞেয় বিষয়কে প্রকাশ করে। সাংখ্য মতে জ্ঞান প্রকাশাত্মক ও আত্মগত ব্যাপার। আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ সাক্ষী চৈতন্য। আত্মা ও অনাত্মার অবিবেকজনিত অজ্ঞান জীবের ত্রিবিধ দুঃখের কারণ— বিবেকজ্ঞান হইলেই জীব কৈবল্য লাভ করে।

বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মীমাংসকরা বিস্তৃতভাবে জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় মীমাংসক সম্প্রদায় অপরোক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞান স্বীকার করেন। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান, বিষয় সম্পর্কে নূতন সংবাদ দেয়— অপর কোনও জ্ঞানের দ্বারা যাহা বাধিত হয় না এবং যাহার উপকরণে কোনও ত্রুটি নাই। প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানের বিষয় অবশ্যই কোনও সৎবস্তু, জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ মীমাংসা-চিন্তাধারার ভিত্তিস্থানীয়। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ— এই মত প্রতিষ্ঠা করিয়া মীমাংসকরা জ্ঞানের অপরাপর ক্ষেত্রেও স্বতঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রভাকর সম্প্রদায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ত্রিপুরী স্বীকার করেন। জ্ঞান সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় ভট্টগণ এ কথা স্বীকার করেন না। মুরারি মিশ্রের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নয়, অনুব্যবসায় জ্ঞাত হয়। একমাত্র প্রভাকর সম্প্রদায় ভিন্ন মীমাংসা সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি প্রভৃতি ছয়টি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রভাকর মতে অনুপলব্ধি প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যের মতে জ্ঞেয় বস্তুটি যেরূপ, সেই রূপেই যদি উহা জ্ঞানের গোচর হয় তবে সেই জ্ঞান যথার্থ বা প্রমা হইবে। এই সম্প্রদায়ের মতে সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষই সবিকল্পক-বোধ বা বিশিষ্ট বোধ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অসম্ভব কল্পনা। মধ্ব মতে যথার্থ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে উহাতে বুদ্ধি ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য বা সংবাদ থাকে। এই সংবাদের অভাব হইলে মিথ্যাত্বের অনুমান করা হয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বিষয়ের স্বরূপের সহিত অসংগত। প্রত্যক্ষ আলোচনায় দ্বৈতবাদী মাধ্বগণ ন্যায় মত অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ন্যায় স্বীকৃত ছয়টি প্রত্যক্ষ ছাড়াও সাক্ষী প্রত্যক্ষ বলিয়া আর একটি প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। স্মৃতি জ্ঞান এই মতে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত।

রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ন্যায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ— ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার — ১. লৌকিক ও ২. অলৌকিক। প্রত্যক্ষ-আলোচনা ক্ষেত্রে নিম্বার্ক সম্প্রদায় ন্যায়ের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন।

ব্যাবহারিক বিষয় সম্পর্কে অদ্বৈত বেদান্তে ছয় প্রকার বৃত্তি জ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানের বৃত্ত্যংশ পরিবর্তনশীল, জ্ঞানাংশ অপরিবর্তনীয়। অপরিবর্তনীয় জ্ঞানই পরমার্থ সৎবস্তু— এই সৎই চিৎ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ— স্বাংশে জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ— 'জ্ঞানত্বং প্রত্যক্ষ ধ্রুং'।

পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় জ্ঞান, বিশ্বাস প্রভৃতি শব্দ একান্ত সম্পর্কিত। জ্ঞান কি, ইহার উৎপত্তি, প্রাক্‌-উপকরণ,

সীমা, জ্ঞানের স্বরূপ ও বৈধতা প্রভৃতি বিষয় জ্ঞান-সম্পর্কীয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মনন-সাপেক্ষ সচেতনতা সোক্রাতেস (সক্রেটিজ্, আনুমানিক ৪৭০-৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)এর মতে জ্ঞান-পদবাচ্য। জ্ঞান আলোচনায় তিনি ডায়ালেকটিক ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতনতা জ্ঞান-অন্বেষণের প্রথম ধাপ। জ্ঞান বলিতে তিনি কোনও বিশেষ মানসিক অবস্থা বা স্তরের কথা বলেন নাই। সাধারণ-স্বীকৃত কোনও বিষয় লইয়া তাঁহার আলোচনা শুরু হইত— খণ্ডন-মণ্ডনের মধ্য দিয়া একদিকে তিনি পূর্ব স্বীকৃত ধারণার ত্রুটি-বিচ্যুতি শোধন করিতেন এবং অন্য দিকে আলোচ্য বিষয়কে সুসংহত ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইতেন। আলোচ্য বিষয়ের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা ছিল তাঁহার আলোচনার লক্ষ্য। সর্বস্তরে সত্যান্বেষণের উপায় হিসাবে সোক্রাতেস জ্ঞান বা মনন-ক্রিয়াকে ব্যবহার করিয়াছেন।

জ্ঞান ও ইহার পদ্ধতি আলোচনায় প্লাতো (প্লেটো, আনুমানিক ৪২৭-৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পুরাপুরি সোক্রাতেস-ধারা অনুসরণ করিয়াছেন— তবে তিনি এই পদ্ধতি জীবনের বিভিন্ন স্তরে পল্লবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্লাতোর মতে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোনও সত্য দিতে পারে না —এই ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে স্থায়ী সত্য বিদ্যমান। প্লাতোর জ্ঞান আলোচনায় 'সামান্য'-র ধারণা মৌল. 'সামান্য' কোনও ব্যক্তি মানস সাপেক্ষ বস্তুর বাহ্য রূপ বা আকার নয়— ইহাকে বস্তুর আন্তর সত্তা বলা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারায় এইগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম (ল অফ নেচার) বলা যায় না। 'সামান্য' নৈর্ব্যক্তিক ও শাশ্বত-জ্ঞানের বিষয়। এই অর্থে প্লাতো বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী।

বিভিন্ন অংশে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে বলা যায় জ্ঞান আলোচনায় আরিস্তোতল (৩৮৪-৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কোনও কোনও অংশে প্লাতোর ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। আরিস্তোতল বিশেষ নিরপেক্ষ কোনও 'সামান্য'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। বস্তুর আকার ও উপাদান প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে প্লাতো ও আরিস্তোতলের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় ('আরিস্তোতল' দ্র)।

আকুইনাস্ (১২২৬-৭৪ খ্রী)-এর জ্ঞান তত্ত্ব বহুলাংশে আরিস্তোতলের অনুরূপ। জ্ঞান-আলোচনায় ফ্রান্সিস্ বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রী) পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। জ্ঞান বলিতে তিনি বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন— ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানই ছিল তাঁহার আলোচ্য বিষয়।

জ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রে লক্ (১৬৩২-১৭০৪ খ্রী) এর মধ্যে একদিকে বেকন ও অপর দিকে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রী) -এর প্রভাব দেখা যায়। জ্ঞানের উৎপত্তি-ক্ষেত্রে তিনি সহজাত ধারণা নিরপেক্ষ বাহ্য ও আন্তর ঐন্দ্রিয়ক সংবেদনকেই জ্ঞানের প্রাক্ উপকরণ হিসাবে মৌল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লকের মতে মন একান্ত শুভ্র কাগজের ন্যায় – উদ্দীপক হইতে আগত ঐন্দ্রিয়ক সংবেদন মনের উপর ছাপ রাখিয়া যায়— সেই সকল আন্তর ধারণা ও বহির্বিষয়গত ধারণা উভয়ের মধ্যে যথাযথ মিল বা অমিল হইতেই সাধারণভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় বার্ক্‌লে (১৬৮৫-১৭৫৩ খ্রী) সাধারণভাবে লকের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বস্তুর অস্তিত্ব ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। হিউম (১৭১১-৭৬ খ্রী) ঐন্দ্রিয়ক সংবেদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাপ্তি জ্ঞানের সম্ভাব্যতার প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

ঐন্দ্রিয়ক সংবেদন-নিরপেক্ষ কতকগুলি সার্বিক স্বতঃসিদ্ধ আন্তর ধারণার উপর নির্ভর করিয়া দেকার্ত তাঁহার জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেকার্ত সহজাত ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন – ধারণার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা তাঁহার নিকট সত্য নিরূপণের মাপকাঠি। লাইব-নিট্‌স (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রী) দেকার্তের সহজাত ধারণা সম্পর্কে পূর্ণতঃ একমত না হইলেও ঐন্দ্রিয়ক সংবেদন-নিরপেক্ষ চিন্তার মূল সূত্রাবলী জ্ঞানোৎপত্তির প্রাক্-উপকরণ হিসাবে মৌল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ইমান্যুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রী) পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-দর্শনে নবযুগের সূচনা করেন। কান্টের পূর্বে জ্ঞানের আলোচনায় মনের ভূমিকা ছিল কাহারও কাহারও মতে নিষ্ক্রিয় ও কাহারও কাহারও মতে সক্রিয়। কান্টের মতে জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে গ্রহণাংশে মন নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সমন্বয়াংশে উহা সক্রিয়। জ্ঞানের প্রাক্ উপকরণ হিসাবে বিষয়াংশে ঐন্দ্রিয়ক সংবেদনের একটা অংশ আছে সত্য কিন্তু আন্তর চিন্তার সূত্রাবলী (ক্যাটিগরিজ্ অফ থট) নিরপেক্ষ ঐন্দ্রিয়ক সংবেদন অর্থহীন— আবার ঐন্দ্রিয়ক সংবেদন-নিরপেক্ষ আন্তর চিন্তার সূত্রাবলী শূন্যগর্ভ। কান্টের নিকট দেশ-কাল সাপেক্ষ জাগতিক বিষয় সম্পর্কেই আমাদের জ্ঞান হয়। পারমার্থিক জ্ঞান সম্ভব নহে। জ্ঞানোৎপত্তির প্রাক্-উপকরণসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই কান্টের মতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান-নির্ভরশীল না জ্ঞান নিরপেক্ষ ইহার কোনও স্বতন্ত্র

অস্তিত্ব আছে কিনা প্রভৃতি বিষয় জ্ঞান-সম্পর্কীয় আলোচনার অন্তর্ভূত।

অধুনা পাশ্চাত্ত্য সম্প্রদায়বিশেষের মতে জ্ঞান-সম্পর্কীয় আলোচনায় জ্ঞানের বৈধতা প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষেই হউক যাচাই করিয়া গ্রহণ করিবার প্রশ্নই মুখ্য। জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয় প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক অংশ বাদ দিয়া জ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষেত্র এখন অনেকখানি সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। শব্দের পরিবর্তে প্রতীক চিহ্ন (সিম্বল) ব্যবহার করিয়া মনন-ক্রিয়াকে অঙ্কের ছকে ফেলিয়া জ্ঞানকে যথাসম্ভব মন-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

মনোরঞ্জন বসু

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৮৯৪-১৯৫৯ খ্রী) রসায়নবিদ্। জ্ঞানচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। গিরিডি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নে এম. এস্‌সি. পাশ করেন। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার সতীর্থ ছিলেন। গাঢ় দ্রবণের ভিতরে লবণের অণুগুলি কিভাবে আয়নিত হইয়া বিদ্যুৎ পরিবহন করে— এই বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্‌সি ডিগ্রি (১৯১৮ খ্রী) লাভ করেন। তাঁহার এই গবেষণালব্ধ তত্ত্ব 'ঘোষের আয়নবাদ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। পরে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং ইংল্যাণ্ডের অধ্যাপক ডোনানের সহকর্মী হিসাবে গবেষণার কার্য করেন। পরবর্তী কালে ডিবাই (Debye) প্রভৃতি বিজ্ঞানী তাহার আয়নবাদের পরিবর্তন সাধন করেন বটে, কিন্তু এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য সঠিক পথের সন্ধান তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে (১৯২১-৩৯ খ্রী) তিনি আরও নানা ধরনের রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার আলোক রসায়ন (ফোটো কেমিস্ট্রি) -সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আর একটি গবেষণার বিষয়— সাধারণ গ্যাস হইতে ফিসার-ট্রপ্‌স্ পদ্ধতিতে অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট) সাহায্যে তরল জ্বালানির উৎপাদন দেশবিদেশে সমাদৃত হইয়াছে। 'সাম ক্যাটালিটিক রিয়্যাকশন্‌স অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইম্‌পরট্যান্স' নামে এই গবেষণা সম্পর্কে তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

ভারতের প্রায় সমস্ত বিজ্ঞান-পরিষদ্ বা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে স্বাধীন ভারতে তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত হন (১৯৫৪ খ্রী)।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিনি প্রধানতঃ নানা প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের পরিচালকরূপে কাজ করেন। কিন্তু গবেষণার সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে নাই। বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধিকর্তা, ভারত সরকারের শিল্প-উৎপাদন বিভাগের অধিকর্তা, খড়্গপুর ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনলজির অধিকর্তা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ইউনেস্কোয় ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৪৯ খ্রী), পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সভ্য— এই-সব পদের দায়িত্ব তিনি বহন করেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি ক্যান্সার রোগে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

পতুলেন্দ্র রক্ষিত

জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯১৮ খ্রী) শৌখিন সংগীতগুণী এবং বাংলার পুষ্টিমেয় সুরবাহার-বাদকদের অন্যতম। সুরবাহার যন্ত্রের প্রথম বাদক গোলাম মহম্মদ ও তাহার পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদের ঘরানাশিষ্য এবং সুরবাহারগুণী মহম্মদ খাঁর নিকট জ্ঞানদাপ্রসন্ন দীর্ঘকাল যাবৎ রাগালাপ শিক্ষা করেন। বাংলাদেশে মহম্মদ খাঁর সংগীতধারার তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ছিলেন। অতিশয় দক্ষ এবং সাহসিক শিকারীরূপেও জ্ঞানদাপ্রসন্নের নাম স্মরণীয়। তিনি গোবরডাঙার ভূম্যধিকারী মুখোপাধ্যায়-বংশীয় ছিলেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানদাস চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রধান পদকর্তাদের অন্যতম। সকল প্রাচীন পদসংকলন-গ্রন্থেই জ্ঞানদাসের পদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য খুব কমই জানা গিয়াছে। মোটামুটি বলা যায় যে ১৫২০ হইতে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বা ঐ সময়ের কাছাকাছি ব্রাহ্মণকুলে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। তাঁহার নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার (পূর্বে বীরভূমের অন্তর্গত) কাঁদড়া গ্রামে।

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের সাক্ষাৎসম্পর্কেও আসিয়া থাকিতে পারেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাকে নিত্যানন্দ-

শাখাতেই গণনা করিয়াছেন। তাঁহার কিছু পদে নিত্যানন্দের সখ্যরসাশ্রিত সাধনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানদাসই প্রথম বৈষ্ণব কবি যিনি 'ষোড়শ গোপাল'-এর রূপ বর্ণনা করিয়া উৎকৃষ্ট পদরচনা করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দলীলাবর্ণনাও প্রত্যক্ষবৎ উজ্জ্বল।

নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' -এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন। খুব সম্ভব, নিত্যানন্দের তিরোধানের পর তিনি জাহ্নবাদেবীর নিকটেই আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাহ্নবাদেবী ও তাঁহার শিষ্যবর্গসহ জ্ঞানদাস কাটোয়া ও খেতুরির বৈষ্ণবমহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। উৎসবের পরে জাহ্নবাদেবী যখন সদলে বৃন্দাবন গমন করেন তখন জ্ঞানদাসও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি শ্রীজীব, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব সাধক এবং পণ্ডিতদিগের সাক্ষাৎসম্পর্কে আসেন।

সাধক হিসাবে জ্ঞানদাসের খ্যাতি ছিল। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে কাটোয়ার উৎসব বর্ণনায় জ্ঞানদাসকে 'মোহান্ত'দের একজন বলিয়া ধরা হইয়াছে। তিনি কৈশোরেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের একটি মঠ আছে। এখনও সেখানে প্রতি বৎসর তাঁহার স্মরণে মেলা ও উৎসব হয়। সংগীতজ্ঞ এবং নূতন কীর্তন পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসাবেও জ্ঞানদাসের খ্যাতির কথা শোনা যায়।

বাংলা পদকর্তারূপেই জ্ঞানদাস সমধিক পরিচিত। ব্রজবুলিতেও তিনি প্রচুর পদরচনা করিয়াছেন। তাহার কোন কোনটিতে উৎকৃষ্ট কলাকৌশলের পরিচয়ও আছে। জ্ঞানদাসের স্বকীয়তা ও কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার সরল ও অলংকারবাহুল্যবর্জিত বাংলা পদে।

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। / প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'॥ অথবা 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আনলে পুড়িয়া গেল', জ্ঞানদাসের এই রকম অনেক পদ সর্বজনবিদিত।

জ্ঞানদাসের পদের সহজ সৌন্দর্য ও সুকুমার স্বচ্ছতা চণ্ডীদাসকে স্মরণ করায়। তাঁহার কিছু পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহার পদে যে মানবিকতার স্পর্শ আছে, যে সহজ লাবণ্য ও অনুভূতির গভীরতা আছে, তাহা চণ্ডীদাস ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ।

সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জ্ঞানদাসের বিষয়-বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। তাঁহার গৌরাঙ্গসম্পর্কিত পদগুলিতে তেমন বিশিষ্টতা না থাকিলেও, রাধাকৃষ্ণপ্রণয়লীলার বিভিন্ন পর্যায়ের পদে বিচিত্র রস-সঞ্চারে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রূপানুরাগ ও আক্ষেপানুরাগেই তিনি যেন স্বধর্ম খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এখানে তিনি অতুলনীয়।

দ্র নরহরি চক্রবর্তী, ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর, ৪২৬ চৈতন্যাব্দ, নরহরি চক্রবর্তী, নরোত্তম বিলাস, কলিকাতা, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, রমণীমোহন মল্লিক -সম্পাদিত, জ্ঞানদাস, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, বৈষ্ণবদাস -সংকলিত, পদকল্পতরু, কলিকাতা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, জগদ্বন্ধু ভদ্র, গৌরপদতরঙ্গিনী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, রাধাগোবিন্দ নাথ -সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত, জ্ঞানদাসের পদাবলী, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা, ১৯৫৯, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৯।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

জ্ঞানদেব, জ্ঞানেশ্বর (১২৭৫-৯৬ খ্রী) মহারাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সন্ত। কবি দার্শনিক ও ভক্ত সাধকের দুর্লভ সমন্বয় তাঁহার জীবনে প্রতিভাত। জ্ঞানেশ্বরের অধ্যাত্ম বিকাশের ধারা আদিনাথ শিবাশ্রয়ী নাথ ধর্ম ও পণ্ঢরপুর সমাজের বিঠোবা বা বিষ্ণু আশ্রয়ী ভক্তিধর্মাচরণের যুক্তধারা হইতে উদ্ভূত। পুনা জেলার আলন্দি গ্রামে ১১৯৭ শকাব্দের (১২৭৫ খ্রী) জন্মাষ্টমী তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পৈঠানের নিকটবর্তী আপেগাঁও এর কুলকর্ণী বা প্রধান করণিক ছিলেন। তাঁহার পিতা বিটঠলপন্ত আলন্দির কুলকর্ণী সিধোপন্ত এর কন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার পরে আলন্দিতে বসবাস আরম্ভ করেন। এইরূপ কথিত হয় যে আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া সিধোপন্ত স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকেই বারাণসীধামে গমন করেন এবং রামানুজের শিষ্য রামানন্দ কর্তৃক সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইয়া চৈতন্যানন্দ নামে অভিহিত হন। দাক্ষিণাত্যে তীর্থপরিক্রমা কালে রুক্মিণীর সহিত রামানন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং 'সৎপুত্রের জননী হও' বলিয়া তিনি রুক্মিণীকে আশীর্বাদ করেন। চৈতন্যানন্দ রুক্মিণীর স্বামী জানিতে পারিয়া রামানন্দ চৈতন্যানন্দকে পুনরায় গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে প্ররোচিত করেন। তাঁহাদের তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়। জ্ঞানেশ্বর ইঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র। পুনর্বার গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করায় স্থানীয় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ বিটঠলপন্তকে সমাজচ্যুত করেন। সামাজিক

নিপীড়নে জ্ঞানেশ্বরের পিতা-মাতা উভয়েই গৃহত্যাগ করিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অনুকূল শাস্ত্রীয় বিধান পাইবার আশায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ অন্যান্য ভ্রাতাদের লইয়া পৈঠান-এ গমন করেন কিন্তু সেখানকার পণ্ডিত-সমাজের পঞ্চায়েত সমাবেশে তাঁহারা সন্ন্যাসী-সন্তান বলিয়া উপহসিত হইতে থাকিলে, জ্ঞানেশ্বর পথ-চলতি একটি মহিষকে দিয়া বেদপাঠ করান। এই অলৌকিক ঘটনা কিশোর জ্ঞানেশ্বরের প্রকৃষ্ট গুণাবলী সম্বন্ধে জনগণের সংশয় নিরসন করে। জ্ঞানদেব সম্বন্ধে আরও অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচলিত আছে। আলন্দিতে প্রত্যাগমন কালে আহ্‌মদনগরের নিকটবর্তী নেওয়াস নামক গ্রামে জ্ঞানেশ্বর 'ভাবার্থদীপিকা' রচনা করেন। ইহাই মারাঠী ভাষায় নয় হাজার শ্লোক -সংবলিত প্রসিদ্ধ 'জ্ঞানেশ্বরী'— ষোড়শবর্ষীয় বালক কর্তৃক মুখে মুখে রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অধ্যায়ানুযায়ী মৌলিক ব্যাখ্যান— মহারাষ্ট্রের সহস্র সহস্র ভক্তের নিত্য পাঠ্য ও আরাধ্য পুস্তক। ইহার পর গুরুপ্রতিম তাঁহার অগ্রজ নিবৃত্তিনাথ-এর আদর্শে তিনি 'অমৃতানুভব' রচনা করেন। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের যুক্তিসম্মত আলোচনা কবিত্বময় ভাষায় ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে এবং শুদ্ধা ভক্তির গুহ্যতত্ত্ব ইহাতে প্রতিভাত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি মহারাষ্ট্রে ভক্তি-সাধনার ভিত্তিভূমিস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে।

যোগী চাঙ্গদেব জ্ঞানেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তিনি 'চাঙ্গদেব-পাসষ্টী' নামে পঁয়ষট্টি শ্লোক-বিশিষ্ট একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে জ্ঞানেশ্বরের দার্শনিক মতবাদ স্বচ্ছ সরলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আঠারোটি গীতিকবিতায় 'হরিপাঠ' নামে তাঁহার আর একটি সংক্ষিপ্ত রচনা আছে। নিত্য হরিনাম গুণ কীর্তন করিলে ভক্তের অপার আনন্দলাভ হয় ও তাঁহার অমৃতসদনে পৌঁছিবার পথ প্রশস্ত হয়, ইহাই এই গাথাগুলির প্রতিপাদ্য। মহারাষ্ট্রের সন্তগণ -রচিত ধর্ম-বিষয়ক গীতিকবিতা 'অভঙ্গ' নামে পরিচিত। জ্ঞানেশ্বরের অভঙ্গগুলি নানা ভাব, নানা প্রসঙ্গ লইয়া রচিত— ভগবান বিট্‌ঠল-এর লাবণ্যময় রূপ, তাঁহার নামের মাধুর্য, অধ্যাত্মগুরুর সর্বব্যাপিত্ব-বিষয়ক বিবিধ ভাব লইয়া এগুলি রচিত। 'বিরহিনী' নামক তাঁহার অভঙ্গ-গুলিতে ভক্তের নিবিড় বিরহবেদনার অনুভূতি স্ফুরিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন তীর্থস্থান পণ্ঢরপুরে গমন করিয়া জ্ঞানেশ্বর বিট্‌ঠল-স্বামীর বা বিষ্ণুর পরম ভক্ত হইয়া ওঠেন। এইখানেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ সন্ত নামদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইয়া ওঠেন। দুই বন্ধু একত্রে বারাণসীধামে তীর্থপর্যটন কালে পথিমধ্যে পুণ্যস্থানগুলি দর্শন করেন। পণ্ঢরপুরে তাঁহাদের উভয়ের প্রত্যাবর্তন তৎকালীন উপস্থিত সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তগণ কর্তৃক মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

একুশ বৎসর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করিবার মানসে জ্ঞানেশ্বর আলন্দি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। ১২১৮ শকাব্দের (১২৯৬ খ্রী) কার্তিক মাসের দ্বিতীয়ার্ধের ত্রয়োদশ তিথিতে তিনি সঞ্জীবন সমাধিতে প্রবিষ্ট হন। গুহাদ্বারের পথ নিবৃত্তিনাথ পাথর দিয়া রুদ্ধ করেন। 'অভঙ্গ' দ্র।

দ্র এস. ডি. পণ্ডসে, জ্ঞানেশ্বরাঞ্চেঁ তত্ত্বজ্ঞান, বোম্বাই, ১৯৪১; জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানেশ্বরী, গিরীশচন্দ্র সেন -অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমী, নয়া দিল্লী, ১৯৬৩; জ্ঞানেশ্বর, অমৃতানুভব ও চাঙ্গদেব পাসষ্টী, গিরীশচন্দ্র সেন -অনূদিত, নয়া দিল্লী, ১৯৬৫; B. P. Bahirat, *The Philosophy of Jnanadeva*, Pandharpur, 1961.

চিন্তামণ বামন দাতার

জ্ঞানশ্রীমিত্র গৌড়দেশীয় বৌদ্ধাচার্য জ্ঞানশ্রীমিত্রপাদ (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দী) বিক্রমশীলা মহাবিহারে অন্যতর মহাস্তম্ভের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ন্যায়ের দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদে জ্ঞানশ্রীমিত্রের উল্লেখযোগ্য অবদানের নিদর্শন সম্প্রতি তিব্বতে আবিষ্কৃত এবং পাটনা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি ধর্মকীর্তিকৃত 'প্রমাণ বার্তিকে'র অন্যতম ব্যাখ্যাতা প্রজ্ঞাকরগুপ্তের প্রস্থানানুসারী ছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ক্ষণভঙ্গাধ্যায়, অপোহ-প্রকরণ, ঈশ্বরবাদ এবং সাকারসিদ্ধিশাস্ত্র প্রধান। ইনি একদিকে শংকর, ভাসর্বজ্ঞ, ত্রিলোচন, বাচস্পতি, বিত্তোক প্রভৃতি হিন্দু নৈয়ায়িকের এবং অপর দিকে বৌদ্ধাচার্য ধর্মোত্তরের মত বিস্তৃতভাবে বিচার ও খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য আত্মতত্ত্ব-বিবেকাদিগ্রন্থে জ্ঞানশ্রীমিত্রকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধন্যায়প্রস্থানে জ্ঞানশ্রীমিত্রই শেষ মৌলিক গ্রন্থকার। জৈন বাদিদেবসূরি, মৈথিল-নৈয়ায়িক শংকরমিশ্র প্রভৃতি জ্ঞানশ্রীমিত্রের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুভাষিতরত্নকোষে জ্ঞানশ্রীমিত্রের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনন্তলাল ঠাকুর

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (১৯০২-৪৭ খ্রী) বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ঠসংগীতশিল্পী। তিনি বিষ্ণুপুরের সন্তান এবং ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই অঙ্গেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ধ্রুপদের আসরে তিনি অনেক সময় গুরুভ্রাতা ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত দ্বৈত গান গাহিতেন। একাধারে বীর্য ও মাধুর্য-মণ্ডিত কণ্ঠসম্পদের জন্য জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সুপরিচিত ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ সংগীতশিক্ষা করেন পিতৃব্য রাধিকাপ্রসাদের অধীনে। কিছুকাল পণ্ডিত বিষ্ণু-দিগম্বর পালুসকরের এবং পরে গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর নিকটেও শিখিয়াছিলেন। বাংলা খেয়াল অঙ্গে তাঁহার গ্রামোফোন রেকর্ডের গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১২৭৯?-১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) বঙ্গভাষী জনগণের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের রচনাবলী বিশেষরূপে প্রামাণিক ও মূল্যবান। বাংলার শ্রেষ্ঠ আভিধানিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম— সার্ধ-লক্ষাধিক শব্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা -সংবলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, দুই ভাগ, প্রয়াগ ও কলিকাতা, ১৯৩৭ খ্রী) তাঁহার বিংশবর্ষব্যাপী একক চেষ্টার ফল।

বাংলার বাহিরে প্রবাসী বাঙালীদের সৎকীর্তি ও অবদান, শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবা প্রভৃতির লুপ্তপ্রায় ইতিহাস জ্ঞানেন্দ্রমোহনের 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' (১৩২২ বঙ্গাব্দ) নামক তথ্যবহুল গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের এক বিরাট সটীক সংস্করণ তাঁহার অন্যতর কীর্তি। 'ইহুদীয় ধর্ম' তাঁহার আর একখানি মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ। ইহাতে ইহুদি ধর্মের ইতিহাস, মতবাদ এবং অনুষ্ঠানের আলোচনা আছে। ইহা ব্যতীত (শিশুদের উপযোগী ও অন্য শ্রেণীর) আরও কিছু গ্রন্থ এবং বহু প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

সরল জীবনযাত্রা ও অমায়িক আচরণের জন্য জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। চাকুরি জীবনে বহু বৎসর ধরিয়া তিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের পুলিশ আই. জি.-র খাস মুন্‌শী। চাকুরিব্যপদেশে উত্তর প্রদেশ ও অন্যত্র স্থানীয় প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল।

দ্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও প্রবাসী', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানদেব দ্র

জ্বর স্বাভাবিক মাত্রার অধিক দেহতাপ। দেহের সর্বাধিক স্বাভাবিক তাপ মলদ্বারে ৯৯°, মুখে ৯৮·৪° এবং কক্ষপুটে ৯৮° ফারেনহাইট। মৌখিক তাপ ১০৬° ফারেন-হাইটের বেশি হইলে অত্যধিক জ্বর এবং ৯৬° ফারেন-হাইটের কম হইলে স্বাভাবিক অপেক্ষা কম দেহতাপ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। প্রথম অবস্থাটি সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া, সর্দিগর্মি, মেনিন্‌জাইটিস প্রভৃতি রোগে এবং শেষোক্ত অবস্থা অ্যাল্‌জিড ম্যালেরিয়া ও বিভিন্ন প্রকার আঘাতে (শক্) সৃষ্ট হইতে পারে।

ব্যাকটিরিয়া, পরজীবী বা ছত্রাক -ঘটিত প্রদাহ, ক্যান্সার, করোনারি থ্রম্বোসিস, সন্ন্যাস রোগ, অ্যালার্জি, বাত, সংক্রামক ব্যাধি, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগে, অত্যধিক উত্তাপে অথবা শিরায় রক্ত বা গ্লুকোজ-দ্রবণ প্রবেশ করাইলে জ্বর হইতে পারে।

জ্বরের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়। স্যালিসিলেট জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিলে সাময়িকভাবে জ্বরের প্রকোপ কমানো যায়।

কমলকুমার মল্লিক

জ্বরাসুর জ্বরের অধিপতি। জ্বরের প্রকোপ দেখা দিলে জ্বরাসুরের মূর্তি তৈয়ারি করিয়া সাড়ম্বরে পূজার অনুষ্ঠান করা হইত। শৈব ও বৈষ্ণব দুই জ্বরাসুরের উল্লেখ আছে (ভাগবতপুরাণ, ১০।৬৩।২২-২৯)। প্রচলিত পূজাপদ্ধতি গ্রন্থেও ইহার দুই রকম ধ্যান পাওয়া যায়। একটি ধ্যান অনুসারে ইনি রুদ্রনিঃশ্বাসসম্ভূত ও মানুষের মৃত্যুর কারণ। ইহার তিনটি পদ, তিনটি মাথা ও নয়টি চক্ষু। ইনি কালান্তক যমের মত, ইহার কেশাগ্র স্বর্ণসদৃশ, শুভ্র রক্তবর্ণ। ইনি ভীষণ ও সংহাররূপী, ইনি সর্বদা ভস্ম নিক্ষেপ করেন। বজ্রাধিক ইহার নখস্পর্শ, দেবতা ও ঋষিগণ ইহার স্তব করেন। ইনি ক্রূররূপী, সুরাসুর-পিশাচের ভয়ের হেতু, মহাকালস্বরূপ। মনে হয়, ইনি শৈব জ্বরাসুর। আর একটি ধ্যান বৈষ্ণব জ্বরাসুরের হইতে পারে। তদনুসারে ইনি কৃশ, কৃষ্ণ কজ্জল সমষ্টির মত ইহার বর্ণ। প্রলয়কালের মেঘের মত ইহার ধ্বনি। ইনি সর্বভূতের ভয় দূর করেন। ইহার তিন পা, তিন মাথা, ছয় হাত ও নয় চক্ষু। ভস্ম ইহার অস্ত্র। জ্বরাসুরের উদ্দেশে ছাগ বলিদানের রীতি ছিল।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জ্বালানি তাপ উৎপাদনের প্রয়োজনে যাহা পোড়ানো হয় তাহাকে জ্বালানি বলে। প্রজ্বলন জনিত তাপ অনেক সময় সরাসরি ব্যবহার না করিয়া উহার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয়। কয়লা

পোড়াইয়া জলীয় বাষ্পের সাহায্যে ইঞ্জিন চালানো, অথবা পেট্রল পোড়াইয়া মোটর গাড়ি চালানো কিংবা বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন দ্বারা তড়িৎ উৎপাদন— জ্বালানির এইরূপ পরোক্ষ ব্যবহারের উদাহরণ।

কঠিন তরল বা গ্যাস, তিন রকমেরই জ্বালানি হইতে পারে। কঠিন জ্বালানি হিসাবে নানা রকমের কয়লা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে বিটুমেন এবং অ্যানথ্রাসাইট -জাতীয় কয়লারই তাপনশক্তি বেশি। সাংসারিক প্রয়োজনে রন্ধনকার্যে ও শহরাঞ্চলে কোকই সচরাচর ব্যবহার করা হয়। লিগ্‌নাইট পোড়াইয়াও অনেক ক্ষেত্রে তাপ সৃষ্টি করা হয়।

পীট (peat) নামক আরও একটি কঠিন জ্বালানি উত্তর আমেরিকা ও ইওরোপের উত্তরাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ইহা ঠিক কয়লা নয়, আংশিক অঙ্গারীভূত জলাভূমির উদ্ভিজ্জ পদার্থ। ইহার তাপনশক্তি খুব বেশি নয়। কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কাঠ ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়। গ্রামাঞ্চলে বিশেষতঃ গৃহকার্যে কাঠই প্রধান জ্বালানি। গাছ কাটিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লইলে দেখা যায় উহার যথেষ্ট তাপনশক্তি রহিয়াছে। কাঠের প্রধান উপাদান সেলুলোজ এবং লিগনিন জাতীয় কার্বন-সঞ্জাত যৌগ। কাঠে মোটামুটি কার্বন ৪৯·৬৬% এবং হাইড্রোজেন ৫·৭৪% থাকে। যে সমস্ত কাঠে রজন জাতীয় পদার্থ থাকে, উহা ভাল জ্বলে এবং অধিকতর তাপ দিতে পারে এইজন্য পাইন-জাতীয় কাঠ উৎকৃষ্ট জ্বালানিরূপে গণ্য। বাতাসের অবর্তমানে কাঠের অন্তর্ধূম পাতন করিলে কাঠ-কয়লা পাওয়া যায়। ইহাও একটি উৎকৃষ্ট কঠিন জ্বালানি, কিন্তু প্রস্তুতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইহা অধিক প্রচলিত নয়।

প্রায় সমস্ত রকম তরল জ্বালানিই পেট্রোলিয়াম খনিজ হইতে উদ্ভূত ('খনিজ তৈল' দ্র)। পেট্রোলিয়ামের পাতনের ফলে নানা প্রকারের পদার্থ পাওয়া যায়। অধিকতর উদ্বায়ী অংশ প্রথমে পাতিত হয়, উহাতে থাকে পেট্রল, গ্যাসোলিন প্রভৃতি। ইহাদের জ্বলনাঙ্ক কম, সেইজন্য এইগুলি মোটর গাড়ির জ্বালানিরূপে সর্বত্র প্রচুর ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়াম পাতনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া যায় সাধারণ লোকের অধিকতর প্রয়োজনীয় জ্বালানি 'কেরোসিন'। কেরোসিন পেট্রল হইতে ভারী এবং জ্বলনাঙ্কও অধিক। নানা রকম স্টোভ ও ল্যাম্প-এ ইহা সর্বদা ব্যবহার করা হয়। আলোক ও তাপ উভয়ের উৎপাদনেই কেরোসিন ব্যবহার করা হয়। আরও উচ্চতর উষ্ণতায় (২০০°-২৫০° সেন্টিগ্রেড) পেট্রোলিয়াম হইতে অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী ঘনতর তৈলসমূহ পাতিত হয়। ইহার সাধারণ নাম জ্বালানি তৈল (ফুয়েল অয়েল)। ইহারই একাংশ হইতে ডিজেল তৈল উৎপন্ন হয়। এই তৈল বায়ুমিশ্রিত করিয়া বাষ্পীভূত অবস্থায় কোনও কোনও ইঞ্জিনে সরাসরি ইন্ধনরূপে ডিজেল ইঞ্জিনে প্রয়োগ করা হয়। জ্বালানি তৈলের তাপ-উৎপাদনী শক্তি সমধিক।

যানবাহনের উন্নতিতে, বিশেষতঃ উড়োজাহাজের প্রয়োজনে, গ্যাসোলিন জাতীয় জ্বালানির চাহিদা খুব বেশি। আজকাল পেট্রোলিয়াম হইতে পাতিত অপেক্ষাকৃত ভারী জ্বালানি তৈলকে বিশেষ ভাঙন-প্রক্রিয়ায় (ক্র্যাকিং) সহজদাহ্য হালকা পেট্রল জাতীয় জ্বালানিতে পরিণত করা হয়। ভারী জ্বালানি-তৈল বাষ্পীভূত অবস্থায় উচ্চতর উষ্ণতায় (প্রায় ৫০০° সেন্টিগ্রেড) সিলিকা-অ্যালুমিনা প্রভাবকের উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে, উহার অণুগুলি ভাঙিয়া হালকা পদার্থে পরিণত হইয়া গ্যাসোলিনে রূপান্তরিত হয়।

পেট্রোলিয়ামের সমস্ত তরল জ্বালানিই বহু রকম প্যারাফিন বা পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। গড়ে পেট্রোলিয়ামে কার্বন ৮৫% এবং হাইড্রোজেন ১৩% থাকে। দহনের ফলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়।

স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কঠিন অথচ মোমের মত নরম বাদামী রঙের একপ্রকার খনিজ পাওয়া যায়। এই 'তৈলবাহী শেল' (শেল নামক পাথর) চোলাই করিলে 'শেল তৈল' পাওয়া যায় এবং উহাও জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার পরিমাণ পেট্রোলিয়াম-জাত জ্বালানির তুলনায় নগণ্য। প্রচুর চাহিদার জন্য কৃত্রিম উপায়েও তরল জ্বালানি, বিশেষ করিয়া পেট্রলের অনুরূপ জ্বালানি প্রস্তুত করা হয়। ইহাদের চলতি নাম কৃত্রিম পেট্রল। প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে এই কৃত্রিম তরল জ্বালানি প্রস্তুত সম্ভব।

বার্জিয়াস প্রক্রিয়ায় বিচূর্ণ কয়লা এবং সামান্য আলকাতরার মিশ্রণের সঙ্গে একটু আয়রন-অক্সাইড মিশাইয়া ৫০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় অতিরিক্ত চাপে হাইড্রোজেনায়িত করিলে এক তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়। তৎপর উহাকে পাতিত করিয়া উহার উদ্বায়ী জ্বালানি অংশ পৃথক করিয়া লওয়া হয়।

ফিসার-ট্রপ্‌স প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ ওয়াটার গ্যাস (বা জল গ্যাস) অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণকে নিকেলচূর্ণ প্রভাবকের সান্নিধ্যে ২০০° সেন্টিগ্রেড

তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনায়িত করিলে তৈলজাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রভাবক, চাপ, উষ্ণতা, প্রভৃতির উপরে উৎপন্ন গুণাগুণ এবং পরিমাণ নির্ভর করে। এই সকল উৎপন্ন তৈল উৎকৃষ্ট জ্বালানির কাজ করে।

কঠিন জ্বালানির তুলনায় তরল জ্বালানি ব্যবহারের অনেক সুবিধা আছে। তরল জ্বালানিতে অবাঞ্ছিত ধোঁয়ার পরিমাণ অনেক কম, জ্বালানি স্বল্পতর স্থানে রাখা সম্ভব এবং প্রজ্বলনের জন্য যে যান্ত্রিক সরঞ্জাম, স্টোভ ইত্যাদি প্রয়োজন সেইগুলিও ছোট আকারের এবং পরিষ্কার করা সহজ। তাহা ছাড়া, তরল জ্বালানির তাপ উৎপাদনের সময় সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হয় না।

গ্যাসীয় জ্বালানি: গ্যাসীয় ইন্ধনের প্রচলন আধুনিক। গ্যাসীয় জ্বালানির তাপনমূল্য সমধিক, উহাতে কোনও ভস্ম এবং ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় না। জ্বালানির নিম্নতম অপচয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এই সকল কারণেই গ্যাসীয় ইন্ধন এত সমাদৃত।

গ্যাসীয় জ্বালানিতে সচরাচর মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), ইথিলীন (C_2H_4), বিউটেন (C_4H_{10}), বিউটিলীন (C_4H_8), প্রপেন (C_3H_8), প্রপিলীন (C_3H_6), অ্যাসিটিলীন (C_2H_2), বেনজিন (C_6H_6) এবং হাইড্রোজেন (H_2) ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) প্রভৃতি দাহ্য গ্যাসের এক বা একাধিক মিশ্রণ থাকে। অনেক সময়ে ইহাদের সঙ্গে অদাহ্য নাইট্রোজেন বা কার্বন ডাইঅক্সাইডও মিশ্রিত থাকে। যে সকল জ্বালানি গ্যাস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য – ১. প্রাকৃতিক গ্যাস ২. কোল-গ্যাস ৩. প্রডিউসার গ্যাস ৪. ওয়াটার-গ্যাস বা জল-গ্যাস এবং ৫. অয়েল-গ্যাস।

প্রাকৃতিক গ্যাস: খনিতে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে বহুল পরিমাণে দাহ্যগ্যাস সঞ্চিত থাকে। ইহা খনি হইতে স্বতঃ-উৎসারিত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে 'প্রাকৃতিক গ্যাস'। এই গ্যাসের পরিমাণ যেমন বেশি, ইহার তাপনমূল্যও তেমন উচ্চ। এই জ্বালানি গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন।

খনি হইতে যে কাঁচা কয়লা পাওয়া যায় তাহাতে কার্বনের অংশই বেশি। কিন্তু উহার সহিত অনেক জৈব পদার্থও মিশ্রিত থাকে। আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে বাতাসের অবর্তমানে অন্তর্ধূম পাতনের ফলে পদার্থগুলি বিয়োজিত হইয়া গ্যাসীয় অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। এই গ্যাস ঠাণ্ডা জলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিলে অ্যামোনিয়া এবং আলকাতরা পৃথক হইয়া যায় এবং বাকি গ্যাস পরিষ্কৃত করিয়া ট্যাঙ্কে সংগ্রহ করা হয়। ইহাই মূল্যবান কোল-গ্যাস। সাধারণতঃ কয়লার ওজনের শতকরা ১৭ ভাগ কোল-গ্যাস পাওয়া যায়। ইহার প্রধান উপাদান, CH_4, C_2H_4, CO প্রভৃতি।

শ্বেততপ্ত কোকের উপর দিয়া নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে বায়ু পরিচালিত করিলে কার্বন মনোক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। ইহাকে বলে 'প্রডিউসার গ্যাস'।

লোহিত তপ্ত কোকের উপর দিয়া জলীয় বাষ্প পরিচালনা করিলে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে ওয়াটার গ্যাস। দুইটি উপাদানই অতি দাহ্য বলিয়া ইহার তাপনশক্তি অধিক।

জ্বালানি তৈল, কেরোসিন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভারী খনিজ তৈল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া লোহিততপ্ত কোনও লৌহপাত্রে ফেলিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিয়োজিত হইয়া বিভিন্ন দাহ্য হাইড্রোকার্বন গ্যাসে পরিণত হয়। অনেক সময়েই ল্যাবরেটরির বুনসেন প্রভৃতি দীপে বাতাসের সহিত মিশাইয়া এই অয়েল-গ্যাস জ্বালানো হয়।

লৌহ নিষ্কাশনের সময় মারুত চুল্লি হইতে যে গ্যাস বাহির হইয়া আসে তাহাতে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ কার্বন মনোক্সাইড থাকে। সেই কারণে এই গ্যাসের দাহিকা-শক্তি থাকে। এই গ্যাসেরই নাম 'মারুত চুল্লি' গ্যাস। ইহার তাপনমূল্য খুব বেশি নয়, সেইজন্য লৌহশিল্পেই উহা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

LP গ্যাস-- পেট্রোলিয়ামের পাতন ও পরিষ্করণের সময় কিছু গ্যাসীয় অংশ পাওয়া যায়। এই গ্যাসের যথেষ্ট

জ্বালানি গ্যাস	H_2	CO	CH_4	অন্যান্য দাহ্য গ্যাস	CO_2	N_2
প্রাকৃতিক গ্যাস	৪৬·৬	৯·৭	৩৭·১	২·৩	১·৪	২·৯
কোল-গ্যাস	৪৭·৯৫	৭·৩৫	২৭·১৫	৩·৭৪	২·৪	১১·৩২
প্রডিউসার গ্যাস	১৪·০	২৭·০	৩·০	০·৬	৪·৫	৫০·৯
ওয়াটার-গ্যাস	৪৭·৩	৩৭·০	১·৩	০·৭	৫·৪	৮·৩
মারুত চুল্লি গ্যাস	১·০	২৭·৫	—	—	১১·৫	৬০·০

তাপনশক্তি থাকে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়। ইহারই নাম 'তরলিত পেট্রোলিয়াম-গ্যাস'।

বিভিন্ন জ্বালানি গ্যাসের উৎপাদনগুলির শতকরা ভাগের মোটামুটি গড় অনুপাতের একটি তালিকা ৫৬৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

বিভিন্ন ইন্ধনের তাপ উৎপাদনী শক্তি এক নয়। এক পাউণ্ড জল এক ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তপ্ত করিতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে 'ব্রিটিশ তাপীয় একক' বলে। তাপ-উৎপাদনী শক্তি বা তাপনমূল্য নির্ধারণ করার ইহাই মাপকাঠি। নানা রকম জ্বালানির গড় তাপন মূল্যের (ব্রিটিশ তাপীয় এককে) একটি তালিকাও নিম্নে দেওয়া হইল। কঠিন ও তরল জ্বালানির তাপনমূল্য প্রতি পাউণ্ডের হিসাবে এবং গ্যাসীয় জ্বালানির তাপনশক্তি সচরাচর প্রতি ঘনফুট হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

জ্বালানি	প্রতি পাউণ্ড	প্রতি ঘনফুট
অ্যানথ্রাসাইট কয়লা	১৩৫০০	--
বিটুমিন কয়লা	১৪৫০০	—
লিগনাইট	৭২০০	--
পীট	৭০০০	—
কাঠ কয়লা	১২০০০	—
জ্বালানি তৈল	১৯০০০	–
প্রাকৃতিক গ্যাস	--	৯০৬
প্রডিউসার গ্যাস	-	৩৩৩
কোল গ্যাস	—	৫৮২
ওয়াটার গ্যাস	—	৩০০
মারুত চুল্লি গ্যাস	—	১১০
ইউরেনিয়াম ২৩৫	৩৩×১০^{১০}	—

তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিভাজনের ফলে প্রচণ্ড তাপ নির্গত হয় ('কেন্দ্রক বিভাজন' ও 'রি-অ্যাক্টর' দ্র)। এক পাউণ্ড কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ পাওয়া যায়, এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ২৩৫ বিভাজনে তাহার ২৬ লক্ষ গুণ তাপ উৎসারিত হয়। হঠাৎ ভাঙনের ফলে এত অধিক তাপের সৃষ্টি হয় যে এখনও বিশেষ গঠনমূলক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় নাই। এইজন্য বর্তমানে এই পরমাণুর বিভাজনটি নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধীরে ধীরে তাপ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উদ্ভূত তাপ জল বা গ্যাসে শোষণ করাইয়া তদ্দ্বারা টারবাইন ও স্টিম বয়লারে প্রয়োগ করা হয়। ফলে উহা হইতে যান্ত্রিক শক্তি এবং তড়িৎ-শক্তি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'নটিলাস' প্রভৃতি ডুবোজাহাজ এইরূপ পারমাণবিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এইরূপ তাপ-উৎপাদনে বস্তুতঃ 'পারমাণবিক জ্বালানি' ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত

জ্বালামুখ আগ্নেয়গিরি দ্র

জ্বালামুখী ৩১°৫২' উত্তর এবং ৭৬°২০' পূর্ব। কাংড়া জেলার ডেরাগোপীপুর তহসিলভুক্ত জ্বালামুখী গ্রামটি কাংড়া হইতে নাদাউন যাইবার পথে অবস্থিত। বিতস্তা নদীর উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলটি শিলা নির্গত স্বাভাবিক গ্যাসের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই সুবিদিত। টার্শিয়ারি অঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও উপযুক্ত আয়তনের তৈল বা গ্যাসের কূপ থাকা সম্ভব নয় বলিয়া মনে করা হয়। গ্যাস বাহির করার জন্য ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শিলাগাত্রে ড্রিল হোল বা গর্ত করা হইয়াছিল। জ্বালামুখীর নিকটবর্তী স্থানে লবণ ও পটাসিয়াম আয়োডাইড পরিপূর্ণ কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

গুপ্ত যুগ হইতে তীর্থস্থান হিসাবেই জ্বালামুখী প্রসিদ্ধ। স্বাভাবিক গ্যাসের নির্গম স্থানে শিখরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমন্দিরটি অধিক প্রাচীন নহে। মন্দিরে কোনও মূর্তি নাই। নির্গমনশীল গ্যাসই দেবীর প্রতীক। মন্দিরের মধ্যস্থলবর্তী কুণ্ডের ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে প্রজ্বলিত গ্যাসকে দেবীর তেজ হিসাবে কল্পনা করা হয়। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে এখানে একটি নবরাত্রের বড় মেলা বসে। প্রায় দুই-তিন হাজার লোকের সমাগম হয়।

এক সময়ে জ্বালামুখী যে একটি সমৃদ্ধশালী শহররূপে পরিগণিত হইত তাহা উহার ধ্বংসাবশেষ হইতেই পরিলক্ষিত হয়। এখানে কয়েকটি ধর্মশালা আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XIV, Oxford, 1909, M. S Krishnan, *Geology of India*, Madras, 1956

উষা সেন

জ্যামিতি 'জ্যা' শব্দের দ্বারা পৃথিবী এবং 'মিতি' অর্থে পরিমাণ বুঝায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'জ্যামিতি' একটি শাস্ত্র যাহার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

প্রধানতঃ ব্যাবহারিক প্রয়োজনে জমি মাপ করিবার জন্য বা যজ্ঞবেদি প্রভৃতি নির্মাণের জন্য সে যুগে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সূত্রের সমষ্টি হিসাবে জ্যামিতির সৃষ্টি হয়। অবশ্য

সেকালে যাহা জ্যামিতি নামে অভিহিত হইত, তাহা এখন মেনসুরেশন বা পরিমিতি নামে পরিচিত। বর্তমানের জ্যামিতিশাস্ত্র তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে ব্যাপকতর হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন যুগে (৩৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব-৭ম শতাব্দী) যে সকল দেশে জ্যামিতির চর্চা হইত, তন্মধ্যে ব্যাবিলন (ব্যাবিলোনীয়া), মিশর, ভারতবর্ষ ও গ্রীসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক ২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলোনীয়গণ জ্যামিতির চর্চা করিতেন। বৃত্তের পরিধিকে তাহার ব্যাসার্ধের দ্বারা ছয়টি সমান ভাগে অথবা ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত করিবার নিয়ম তাঁহারা জানিতেন।

ব্যাবিলন অপেক্ষা মিশরে জ্যামিতির চর্চা হইয়াছিল আরও বেশি। ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (বাজ সাহেবের মতে ৩৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব) আমেস লিখিত প্যাপিরাস (*Ahmes Rhind Papyrus*) হইতে দেখা যায় যে, মিশরীয়গণ বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিতে পারিতেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে রচিত এবং কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার অন্তর্গত শুল্বসূত্রে তৎকালীন ভারতীয় জ্যামিতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতবর্ষে জ্যামিতির চর্চা আরও বহু প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদির গঠনপ্রণালী নির্ণয়ের পদ্ধতি শুল্বসূত্রে আছে। মোট সাতটি শুল্বসূত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। ইহাগুলিতে আমরা ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সূত্রাবলী, বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে অথবা ত্রিভুজকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরের নিয়মাবলী, সদৃশ চিত্র (সিমিলার ফিগর্‌স)-সম্বন্ধীয় বিবিধ সূত্র, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য ইত্যাদির পরিচয় পাই। সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান— এই উপপাদ্য সাধারণতঃ পিথাগোরাসের (৫৮০?-৫০০? খ্রীষ্টপূর্ব) উপপাদ্য নামে পরিচিত। কিন্তু বৌধায়নের শুল্বসূত্রে অনুরূপ প্রতিজ্ঞা আছে এবং বৌধায়ন নিঃসন্দেহে পিথাগোরাসের পূর্ববর্তী।

যথাযথরূপে প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির সূত্রপাত গ্রীস দেশে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মিশরীয়গণের নিকট হইতে গ্রীকগণ জ্যামিতি শিক্ষা করেন। ৬৭০ খ্রীষ্টপূর্ব হইতে ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১২০০ বৎসর যাবৎ গ্রীসে জ্যামিতির চর্চা হইয়াছিল।

থেল্‌স্ (Thales, ৬৬০-৫৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব) প্রধানতঃ ত্রিভুজের শীর্ষকোণ, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ এবং ব্যাসের দ্বারা বৃত্তের দ্বিখণ্ডীকরণ সম্বন্ধে উপপাদ্য প্রণয়ন করেন। পিথাগোরাস ক্ষেত্রফল-সংক্রান্ত বিবিধ উপপাদ্য প্রমাণ করেন।

প্লাতো (Plato, ৪২৯-৩৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) আনুমানিক ৩৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আথেন্স নগরীতে তাঁহার অ্যাকাডেমিতে জ্যামিতির চর্চা করিতেন।

প্রথম আলেকজান্দ্রীয় মণ্ডলীর প্রধানতম পুরুষ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এউক্লিদেস বা ইউক্লিড ('এউক্লিদেস' দ্র)। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'এলেমেন্টস্' সম্ভবতঃ ৩৩০ হইতে ৩২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত, এই গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রকৃত জ্যামিতি চর্চা প্রবর্তন করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে আর্খিমেদেস বা আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, 'আর্খিমেদেস' দ্র) এবং অ্যাপোলোনিয়াসের (Apollonius of Perga, ২৬০?/২০০? খ্রীষ্টপূর্ব) নাম উল্লেখযোগ্য। আপোলোনিয়াস এর প্রধান গ্রন্থ 'কনিক সেকশান'। এই গ্রন্থের আটটি খণ্ডে তিনি উপবৃত্ত (ইলিপ্‌স্), অধিবৃত্ত (প্যারাবোলা), পরাবৃত্ত (হাইপারবোলা), অসীমপথ (asymptote), অক্ষ (অ্যাক্সিস), ব্যাস (ডায়ামেটার), অনুবন্ধ ব্যাস (কন্‌জুগেট ডায়ামেটার), সরল রেখার সমঞ্জসচ্ছেদ (হারমোনিক ডিভিজন), সদৃশ (সিমিলার), কনিকস্ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পর অনেক দিন জ্যামিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায় নাই।

মধ্যযুগে (৭-১৭শ শতাব্দী) বিচ্ছিন্নভাবে ভারতবর্ষ, আরব ও ইওরোপে কিছু জ্যামিতির চর্চা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আর্যভট (৬ষ্ঠ শতাব্দী), বরাহমিহির (৬ষ্ঠ শতাব্দী), ব্রহ্মগুপ্ত (৭ম শতাব্দী), মহাবীরাচার্য (৯ম শতাব্দী) এবং ভাস্করাচার্যের (১২শ শতাব্দী) নাম উল্লেখযোগ্য। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি নিয়ম আর্যভট বাহির করেন। ব্রহ্মগুপ্ত এবং মহাবীরাচার্য এই সূত্রকে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের (সাইক্লিক কোয়াড্রিল্যাটারাল) জন্য সম্প্রসারিত করিয়া এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেন। আর্যভট ও ভাস্করাচার্য $\pi =$ ৩$\frac{১৭৭}{১২৫০}$ $=$ ৩·১৪১৬ লইয়াছিলেন। পিথাগোরাসের উপপাদ্যের একটি প্রমাণ ভাস্করাচার্য দিয়াছিলেন। মহাবীরাচার্যের রচনায় কনিক সেকশান সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

কেপলার (১৫৭১-১৬৩০ খ্রী) ইওরোপে জ্যামিতি চর্চার সূত্রপাত করেন। তিনি বৃত্তকে একটি অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট বহুভুজরূপে এবং গোলককে অসীমসংখ্যক পিরামিডের সমষ্টিরূপে দেখিয়াছিলেন।

মধ্যযুগীয় জ্যামিতির একটি বিশিষ্ট অংশ ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা প্রমাণের প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা প্রমাণের নানা অসফল প্রচেষ্টা হইতে পরে নন্ ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সৃষ্টি হয়।

বর্তমান যুগে (১৭শ-২০শ শতাব্দী) প্রাচীন ও মধ্যযুগের তুলনায় অনেক বেশি জ্যামিতির চর্চা হইয়াছে ও তাহা কতকগুলি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুই জন ফরাসী গণিতজ্ঞ, রেনে দেকার্ত (Rene Descartes, ১৫৯৬-১৬৫০ খ্রী) এবং পিয়ের দ্য ফের্মা (Pierre de Fermat, ১৬০১-৬৫ খ্রী) বৈশ্লেষিক জ্যামিতির সৃষ্টি করেন। ইহাতে প্রথমে যে কোনও সমতলের উপর পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করে এমন দুইটি সরল রেখা লওয়া হয়। এই দুই সরল রেখা হইতে সমতলের উপরিস্থ যে কোনও বিন্দুর দুইটি লম্ব-দূরত্বের মানকে ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক (কো অর্ডিনেট্স) এবং সরল রেখা দুইটিকে অক্ষ (অ্যাক্সিস) বলে। সুতরাং সমতলের উপরিস্থ যে কোনও বিন্দুকে উহার দুইটি স্থানাঙ্ক (x, y) দ্বারা সর্বদাই নির্দেশিত করা যায়। সমতলের উপরিস্থ যে কোনও সরল রেখাকে একটি একঘাত সমীকরণ (লিনিয়র ইকুয়েশন) দ্বারা, যে কোনও কনিক সেকশনকে দ্বিঘাত সমীকরণ (কোয়াড্র্যাটিক ইকুয়েশন) দ্বারা এবং অন্যান্য রেখাকে (কার্ভ) তিন বা তদধিক ঘাতবিশিষ্ট সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বৈশ্লেষিক জ্যামিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার দ্বারা যে কোনও জ্যামিতিক সমস্যাকে অনুরূপ (করেসপণ্ডিং) একটি বীজগণিতের সমস্যায় রূপান্তরিত করা যায়। ফলে ইহার দ্বারা জ্যামিতি ও বীজগণিত, এই দুইটি আপাতভিন্ন শাখার মিলন ঘটে।

যেমন কোনও সমতল বা দ্বিমাত্রিক স্পেসের যে কোনও বিন্দুকে আমরা দুইটি স্থানাঙ্ক (x, y) দ্বারা নির্দেশিত করি, তিন বা তদধিক মাত্রাবিশিষ্ট স্পেসের জ্যামিতিতে সেইরূপ ত্রিমাত্রিক স্পেসের বিন্দুকে তিনটি স্থানাঙ্ক (x, y, z) দ্বারা নির্দেশিত করা যায়। এই স্পেসে যে কোনও সমতল একঘাত সমীকরণদ্বারা, যে কোনও কনিকয়েড দ্বিঘাত সমীকরণ দ্বারা এবং অন্যান্য তল (সারফেস) তিন বা তদধিক ঘাতবিশিষ্ট সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই পদ্ধতিকে ব্যাপকতর (জেনারালাইজ) করিলে আমরা চারি বা তদধিক মাত্রাবিশিষ্ট স্পেসের কল্পনা করিতে পারি। বস্তুতঃ, n যে কোনও ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা (পজিটিভ ইন্টিগার) হইলে, n-সংখ্যক পরস্পর-নিরপেক্ষ স্থানাঙ্ক দ্বারা যে বিন্দু নির্দেশিত হয় তাহাকে n মাত্রিক স্পেসের যে কোনও বিন্দু হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এইরূপ স্পেসকে সাধারণতঃ হাইপার স্পেস বলা হয়। ইহাতে সরল রেখা, সমতল, কনিকয়েড প্রভৃতিকেও অনুরূপভাবে ব্যাপকতর করা হয়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদে (রিলেটিভিটি, 'আপেক্ষিকবাদ' দ্র) আমরা চারিমাত্রাবিশিষ্ট দেশ কাল সন্ততির (স্পেস টাইম-কনটিনিউয়াম) পরিচয় পাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অসংখ্য মাত্রাবিশিষ্ট স্পেসের (স্পেস অফ ইনফিনিট ডাইমেনশনস) কল্পনাও করা হইয়াছে। 'হিলবার্ট স্পেস' এইরূপ একটি স্পেস।

জ্যামিতির অপর এক শাখাকে জটিল জ্যামিতি বলা হয়। বৈশ্লেষিক জ্যামিতিতে বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলিকে সাধারণতঃ বাস্তব সংখ্যা (রিয়্যাল নাম্বার) হিসাবে ধরা হয়। তৎপরিবর্তে যদি উহাদের জটিল সংখ্যা (কম্প্লেক্স নাম্বার) হিসাবে লওয়া হয়, তবে আমরা জটিল জ্যামিতি (কম্প্লেক্স জিওমেট্রি) পাইব। যে কোনও জটিল সংখ্যা z-কে আমরা $z = x + iy$ ($i^2 = -1$) রূপে লিখিতে পারি। ফলে একটি জটিল সংখ্যা দুইটি বাস্তব সংখ্যা x, y এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে কোনও জটিল সরল রেখার (কম্প্লেক্স লাইন) বাস্তব মাত্রা (রিয়্যাল ডাইমেনশন) দুইটি। সেইরূপ যে কোনও জটিল সমতলের (কম্প্লেক্স প্লেন) বাস্তব মাত্রা চারটি। সুতরাং এই দিক হইতেও আমরা চার বা তদধিক মাত্রাবিশিষ্ট স্পেসের কল্পনা করিতে পারি।

জটিল সমতলের একটি বিশিষ্ট উপাদান হইল আইসোট্রপিক সরল রেখা। যে সরল রেখার নতি (স্লোপ) i অথবা i তাহাকে আইসোট্রপিক সরল রেখা বলে। কোনও একটি প্রদত্ত বিন্দু হইতে শূন্য দূরত্বে অবস্থিত সঞ্চারমান যে কোনও বিন্দুর সঞ্চারপথ (লোকাস) সর্বদাই ঐ প্রদত্ত বিন্দুর মধ্য দিয়া যায় এমন দুইটি আইসোট্রপিক সরল রেখা। সুতরাং যে কোনও আইসোট্রপিক সরল রেখার উপরিস্থ দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সর্বদাই শূন্য। ইহা ছাড়া, একই নতিবিশিষ্ট যে কোনও দুইটি আইসোট্রপিক সরল রেখা যুগপৎ পরস্পর সমান্তরাল এবং লম্ব। পুনরপি, যে কোনও সরল রেখা এবং যে কোনও আইসোট্রপিক সরল রেখার মধ্যবর্তী কোণের মান নির্ণয় করা যায় না।

জ্যামিতির যে শাখায় অন্তরকলন ও সমাকলন প্রযুক্ত হয়, তাহাকে অন্তরকলক জ্যামিতি বলে। এই জ্যামিতিতে যে কোনও রেখা বা তলের বিভিন্ন ধর্ম (প্রপারটিজ)

জ্যামিতি

অন্তরকলনের সাহায্যে আলোচিত হইয়া থাকে। যে কোনও রেখার যে কোনও একটি বিন্দুতে বক্রতা (কার্‌ভেচার) বা ব্যাবর্তন (টর্‌শন) নির্ণয় করা, যে কোনও তলের যে কোনও বিন্দুতে স্পর্শক সমতল (ট্যানজেন্ট প্লেন) বাহির করা, কোনও তলের উপরিস্থ কোনও একটি বিন্দুতে উক্ত তলের লম্বচ্ছেদ (নর্‌ম্যাল সেক্‌শন) ও বক্রচ্ছেদের (ওবলিক্‌ সেক্‌শন) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বাহির করা প্রভৃতি এই জ্যামিতির অন্তর্ভুক্ত। অন্তরকলক জ্যামিতিতে আমরা কোনও রেখা বা তলকে সামগ্রিকভাবে না লইয়া উহার উপরিস্থ যে কোনও একটি বিন্দু লই এবং ঐ বিন্দুর চতুষ্পার্শ্বে উক্ত রেখা বা তলের কি বৈশিষ্ট্য আছে তাহাই আলোচনা করি। পক্ষান্তরে বৈশ্লেষিক জ্যামিতিতে আমরা কোনও রেখা বা তলের সামগ্রিক ধর্ম লইয়া আলোচনা করিয়া থাকি। সুতরাং প্রথমটিকে ক্ষুদ্রাংশের জ্যামিতি (জিওমেট্রি ইন দি স্মল) এবং দ্বিতীয়টিকে বৃহদংশের জ্যামিতি (জিওমেট্রি ইন দি লার্জ) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জ্যামিতি চর্চার জন্য বিশেষভাবে জোসেফ আলফ্রেড সেরে (Joseph Alfred Serret, ১৮১৯-৮৫ খ্রী), মঁজ (Monge, ১৭৪৬-১৮১৮ খ্রী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী কালে রিমান (Riemann, ১৮২৬-৬৬ খ্রী) n মাত্রিক স্পেসের জন্য অন্তরকলক জ্যামিতির প্রবর্তন করেন। তাহা রিমানীয় জ্যামিতি নামে পরিচিত। আপেক্ষিকবাদে রিমানীয় জ্যামিতির প্রয়োজন হয়। পরে হেরমান ভাইল (Hermann Weyl, ১৮৮৫-১৯৫৫ খ্রী) এই জ্যামিতিকে একক ক্ষেত্রতত্ত্বে (ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি, 'একক ক্ষেত্রতত্ত্ব' দ্র) প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যাপকতর (জেনারালাইজ) করিয়া নন-রিমানীয় জ্যামিতির (Non-Riemannian geometry) সৃষ্টি করেন।

নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হাঙ্গেরীর বোয়াই (Johann Bolyai, ১৮০২-৬০ খ্রী) এবং রাশিয়ার লোবাচেভ্‌স্কি (Lobachevsky, ১৭৯৩-১৮৫৬ খ্রী) ভিন্ন পথে ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটি বাদ দিয়া উহার বিপরীত একটি প্রতিজ্ঞা লইয়া গবেষণা করেন। পঞ্চম প্রতিজ্ঞার বক্তব্য হইল যে, কোনও সরল রেখার বহিঃস্থ কোনও বিন্দু দিয়া উক্ত সরল রেখার সমান্তরাল মাত্র একটি সরল রেখাই অঙ্কিত করা যায়। সুতরাং বোয়াই এবং লোবাচেভ্‌স্কি উভয়েই ধরিয়া লইলেন যে, উক্ত বহিঃস্থ বিন্দু দিয়া প্রদত্ত সরল রেখার সমান্তরাল দুইটি সরল রেখা থাকিবে। ইউক্লিডের অন্যান্য প্রতিজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ (অ্যাক্সিয়মস্‌) অপরিবর্তিত রাখিয়া কেবল পঞ্চম প্রতিজ্ঞার পরিবর্তে উক্ত বিপরীত প্রতিজ্ঞা লইয়া তাঁহারা উভয়েই পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একটি নূতন জ্যামিতির সৃষ্টি করিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লোবাচেভ্‌স্কি এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বোয়াই এই নূতন আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেন। এই জ্যামিতি হাইপারবোলিক জ্যামিতি (হাইপারবোলিক জিওমেট্রি) নামে পরিচিত। পরে রিমান আর একটি নূতন জ্যামিতির সৃষ্টি করেন যাহাতে কোনও প্রদত্ত সরল রেখার সমান্তরাল আদৌ কোনও সরল রেখাই অঙ্কিত করা যায় না। ইহাকে ইলিপ্‌টিক জ্যামিতি (ইলিপ্‌টিক জিওমেট্রি) বলে। এই দুইটি জ্যামিতি একত্রে নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইউক্লিডীয় এবং নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মধ্যে সমান্তরাল সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাটি ছাড়া অন্যান্য প্রতিজ্ঞা বা স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।

আধুনিক সাংশ্লেষিক জ্যামিতি সাংশ্লেষিক জ্যামিতির সূত্রপাত হইয়াছিল প্রাচীন যুগে। বর্তমান যুগে এই জ্যামিতির বহুলাংশে আধুনিকীকরণ হয়। প্রথমে ফ্রান্সে মঁজ এবং পঁসলে (Poncelet ১৭৮৮-১৮৬৭ খ্রী) ইহার গবেষণা আরম্ভ করেন। ইহাকে চূড়ান্ত রূপদান করেন ফ্রান্সের শাল (Chasles, ১৭৯৩-১৮৮০ খ্রী), জার্মানীর ফন স্টাউট (Von Staudt, ১৭৯৮-১৮৬৭ খ্রী) এবং ইটালীর ক্রেমোনা (Cremona ১৮৩০-১৯০৩ খ্রী)। প্রায় একই সময়ে আধুনিক বৈশ্লেষিক জ্যামিতির চর্চাও হইয়াছিল। ইহার প্রধান স্রষ্টা ছিলেন প্লুকার (Plücker, ১৮০১-৬৮ খ্রী)।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী গণিতজ্ঞ দেজার্গ (Desargues ১৫৯৩-১৬৬২ খ্রী) একটি উপপাদ্য প্রমাণ করেন যাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহাতে দূরত্ব (ডিস্ট্যান্স) বা কোণ (অ্যাঙ্গল) সম্পর্কে কোনও কথা নাই। পূর্ববর্তী সাংশ্লেষিক জ্যামিতিতে এই দুইটি কথাই প্রধান স্থান অধিকার করিত। ফলে দেজার্গের এই উপপাদ্যটি একটি নূতন দিগন্তের সূচনা করিল। পরে এই বিষয়ে আরও গবেষণার ফলে একটি নূতন জ্যামিতির সৃষ্টি হইল। ইহার নাম প্রক্ষেপক জ্যামিতি (প্রোজেকটিভ জিওমেট্রি)। কোনও চিত্রের (ফিগার) যে সকল ধর্ম (প্রপার্টি) অভিক্ষেপ এবং ছেদন (প্রোজেকশন অ্যাণ্ড সেক্‌শান) দ্বারা অপরিবর্তিত থাকে, সেগুলিই এই জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়। পরিমাপ সংক্রান্ত কোনও উপপাদ্যের স্থান ইহাতে নাই। দ্বৈতনীতি বা প্রিন্সিপল্‌

জ্যামিতি

অফ ডুয়ালিটি এই জ্যামিতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমতলীয় জ্যামিতিতে নীতিটি এইরূপ: যে কোনও উপপাদ্যের বিবচনে (ইনানসিয়েশন) যদি 'বিন্দু'র স্থানে 'সরল রেখা' এবং 'সরল রেখা'র স্থানে 'বিন্দু' কথাটি বসানো হয় এবং অন্যান্য অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করা যায় (যথা, 'সমরেখ বিন্দু'র পরিবর্তে 'সমবিন্দু রেখা' ইত্যাদি), তবে প্রদত্ত উপপাদ্য হইতে আমরা নূতন একটি উপপাদ্য পাইব যাহাকে উক্ত উপপাদ্যের দ্বৈত উপপাদ্য (ডুয়াল থিওরেম) বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, 'দুইটি বিন্দুর দ্বারা একটি সরল রেখা নির্ণীত হয়'— এই উপপাদ্যের দ্বৈত উপপাদ্য হইল 'দুইটি সরল রেখার দ্বারা একটি বিন্দু নির্ণীত হয়।' এই দ্বৈত নীতির উদ্ভাবক জারগন (Gergonne, ১৭৭১-১৮৫৯ খ্রী) এবং পঁসলে। প্রক্ষেপক জ্যামিতিতে দ্বৈত সমানুপাতের (ক্রস রেশিও) প্রবর্তন করেন স্টাইনার এবং শাল্।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মঁজ চিত্র-জ্যামিতি (ডেসক্রিপ্টিভ জিওমেট্রি) নামে একটি নূতন শাখার সৃষ্টি করেন। এই জ্যামিতি প্রধানতঃ বাস্তুবিদ্যা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং যন্ত্রবিদ্যায় (মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং) ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহাকে বিশুদ্ধ জ্যামিতির পরিবর্তে ফলিত জ্যামিতির (অ্যাপ্লায়েড জিওমেট্রি) অন্তর্ভুক্ত করাই বিধেয়।

ক্লাইনের এর্লাঙ্গেন প্রোগ্রাম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এর্লাঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে ফেলিক্স ক্লাইন (Felix Kline, ১৮৪৯-১৯২৫ খ্রী) যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাই তাহার বিখ্যাত 'এর্লাঙ্গেন প্রোগ্রাম' নামে পরিচিত। ইহাতে তিনি বলেন যে, যে কোনও জ্যামিতিকে একটি বিশেষ রূপান্তরগোষ্ঠীর (গ্রুপ অফ ট্র্যান্সফরমেশন) নিত্যভাব সমষ্টিরূপে (থিওরি অফ ইনভ্যারিয়ান্টস) দেখা যাইতে পারে। এই রূপান্তরগোষ্ঠীকে ব্যাপকতর বা সংকীর্ণতর করিয়া আমরা একটি জ্যামিতি হইতে অন্য একটি জ্যামিতি পাইতে পারি। ক্লাইনের এই প্রোগ্রামের দ্বারা বিভিন্ন জ্যামিতির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রটি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। সন্তত রূপান্তর-গোষ্ঠীর (কন্টিনিউয়াস ট্র্যান্সফরমেশন) নিত্যতা হইতে টপোলজি নামক একটি নূতন শাখা পাওয়া যায়। ইহাকে পূর্বে 'অ্যানালিসিস্ সিটুস্' (analysis situs) বলা হইত। সন্তত রূপান্তরের দৃষ্টান্তরূপে নমন (বেন্ডিং), পাক (টুইস্টিং), প্রসারণ (স্ট্রেচিং), সংকোচন (কনট্রাক্টিং) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সকল ধর্ম এই-রূপ রূপান্তরে নিত্য থাকে, তাহাই টপোলজির অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইউক্লিড প্রথম সুসংবদ্ধরূপে জ্যামিতি চর্চার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি সর্বসমেত ২৩টি সংজ্ঞা (ডেফিনিশনস), ৫টি প্রতিজ্ঞা (পস্টুলেটস) এবং ৫টি সাধারণ ধারণার (কমন নোশানস) উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার জ্যামিতি রচনা করেন। পরবর্তী কালে জ্যামিতিবিদ্‌গণ ইউক্লিডের রচনার কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করেন। এই সকল ত্রুটি দূরীভূত করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কতিপয় জার্মান এবং ইটালীয় গণিতজ্ঞ জ্যামিতির ভিত্তি রচনার চেষ্টা করেন। ইঁহাদের মূল বক্তব্য হইল যে, যেহেতু প্রতিটি পদের সংজ্ঞা দেওয়া ও প্রতিটি উপপাদ্য প্রমাণ করা সম্ভব নহে, সুতরাং কয়েকটি অসংজ্ঞায়িত পদ (আনডিফাইনড টার্মস) এবং কয়েকটি অপ্রমাণিত উপপাদ্য লইতে হইবে। অতঃপর অন্যান্য সমুদয় পদের সংজ্ঞা উক্ত পদগুলির সাহায্যে এবং সমুদয় উপপাদ্যের প্রমাণ উক্ত উপপাদ্যগুলির সাহায্যে দিতে হইবে। এই ব্যাপারে কোনরূপ স্বজ্ঞা (ইনটুইশন) বা অঙ্গীকারের (অ্যাসাম্পশন) সাহায্য লওয়া চলিবে না। প্রদত্ত অসংজ্ঞায়িত পদ ও অপ্রমাণিত উপপাদ্য হইতে অবরোহ তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী সমগ্র জ্যামিতি রচনা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত এই সকল অসংজ্ঞায়িত পদের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম রাখা প্রয়োজন এবং অপ্রমাণিত উপপাদ্যগুলি যেন পরস্পর নিরপেক্ষ হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পেয়ানো এই বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৮৯৭-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ছাত্র পিয়েরি প্রক্ষেপক জ্যামিতির জন্য মাত্র দুইটি অসংজ্ঞায়িত পদ ব্যবহার করেন। এই সকল গবেষণা জার্মান গণিতজ্ঞ হিলবার্টের (Hilbert, ১৮৬২-১৯৪৩ খ্রী) রচনায় একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হিলবার্ট তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Grundlagen der Geomctrie* (জ্যামিতির ভিত্তি) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ভিত্তি সর্বাঙ্গীণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যামিতির ভিত্তি রচনার জন্য হিলবার্টের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের আঁরি পোয়াঁকারে (Henri Poincare, ১৮৫৪-১৯১২ খ্রী) এবং আমেরিকার অসওয়াল্ড ভেবলেনের (Oswald Veblen, ১৮৮০-১৯৬০ খ্রী) নামও উল্লেখযোগ্য।

জ্যামিতির এই শাখাটির আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, আমরা অসংখ্য প্রকার জ্যামিতি রচনা করিতে পারি। অসংজ্ঞায়িত পদ এবং অপ্রমাণিত উপপাদ্যের পরিবর্তন, পরিবর্জন এবং পরিবর্ধনের দ্বারা আমরা বিভিন্ন জ্যামিতি পাইব। সুতরাং ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই একমাত্র সম্ভাব্য

জ্যামিতি— এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যে জ্যামিতিতে দেজার্গের উপপাদ্য থাকে না তাহাকে নন্‌-দেজার্গীয় জ্যামিতি বলে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ একটি জ্যামিতি রচনা করেন মোল্টন (Moulton, ১৮৭২-১৯৫২ খ্রী)। অনুরূপভাবে নন্‌-আর্কিমিডীয় নন্‌-পাস্‌কালীয় (Non-Pascalian) প্রভৃতি জ্যামিতিও রচনা করা যায়।

সাধারণতঃ জ্যামিতিতে প্রতিটি সরল রেখার উপর অসংখ্য বিন্দু আছে এবং প্রতিটি বিন্দুর মধ্য দিয়া অসংখ্য সরল রেখা টানা যায়, এইরূপ চিন্তা করিতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু জ্যামিতির ভিত্তি নামক নূতন শাখাটির সৃষ্টি হইবার পর গণিতজ্ঞগণ আলোচ্য নূতন শাখাটির প্রতিও আকৃষ্ট হইলেন। যদি এইরূপ একটি স্বতঃসিদ্ধ লওয়া যায় যে, প্রতিটি সরল রেখার উপর একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সংখ্যক বিন্দু আছে তবে আমরা যে জ্যামিতি পাইব তাহাই সীমায়িত জ্যামিতি (ফাইনিট জিওমেট্রি) নামে পরিচিত। যদি প্রতি সরল রেখার উপর (n+1) সংখ্যক বিন্দু থাকে, তবে ঐ ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা n কে উক্ত জ্যামিতির ক্রম (অর্ডার) বলা হয়। বর্তমানে সীমাবদ্ধ জ্যামিতির উপর বহু গবেষণা হইতেছে। এই জ্যামিতিতে প্রতি সরল রেখা, সমতল, কনিক, কনিকছেদ প্রভৃতির উপর সীমাবদ্ধ সংখ্যক বিন্দু থাকে। বস্তুতঃ, যদি কোনও জ্যামিতির ক্রম লওয়া হয় n, তবে প্রতি সমতলে (n^2+n+1)-সংখ্যক বিন্দু, প্রতি কনিকের উপর $(n+1)$-সংখ্যক বিন্দু, ত্রিমাত্রিক স্পেসে (n^3+n^2+n+1)-সংখ্যক বিন্দু থাকিবে। সীমায়িত জ্যামিতির আলোচনায় বর্তমানে স্থানাঙ্কের সাহায্যে বৈশ্লেষিক পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ ঘটিতেছে।

দ্র Bibhutibhusan Dutta, *The Science of the Sulba : A Study in Early Hindu Geometry*, Calcutta, 1932 ; E. T. Bell, *Development of Mathematics*, New York, 1945 ; E T. Bell, *Men of Mathematics*, vols. I-II, New York, 1953 ; F. Cajori, *History of Mathematics*, New York, 1958 ; David Eugne Smith, *History of Mathematics*, vols. I-II, Boston, 1958.

শীতাংশুশেখর মিত্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭৯-১৯২৫ খ্রী) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সারদা দেবীর পঞ্চম পুত্র। জন্ম ২২ বৈশাখ ১২৫৬ বঙ্গাব্দ, ৪ মে ১৮৪৯ খ্রী ; মৃত্যু ২০ ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ৪ মার্চ ১৯২৫ খ্রী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাদেশিকতা সাহিত্য সংগীত অভিনয়-কলা ও চিত্রকলায় বাংলা দেশে নবজাগরণকল্পে যে-সকল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার একজন প্রধান পুরুষ, কোনও কোনও উদ্‌যোগের প্রথম প্রবর্তয়িতাও ছিলেন। প্রধানতঃ ঠাকুর-পরিবারের পোষকতায় ১৮৬৭ সালে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা নামে যে জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহার সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন ; মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে তাঁহার একটি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা পঠিত হয়, নবম বর্ষে তিনি মেলার 'সংশ্লিষ্ট সম্পাদক' নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে আজন্ম তিনি যে স্বদেশাভিমান জাগরূক দেখিয়াছিলেন, হিন্দুমেলায় যাহা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করিয়াছিল সেই আত্মশক্তি সাধনার মন্ত্র তরুণ বয়সেই তাঁহাকে নানা মঙ্গলকর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে। স্বদেশের উন্নতির পন্থা নির্দেশের উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে সঞ্জীবনী সভা নামে একটি 'গুপ্তসভা'র প্রতিষ্ঠা (১৮৭৬ ? খ্রী) হয়। রাজনারায়ণ বসু ইহার সভাপতি ছিলেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিবিধানচেষ্টা এই সভার কর্তব্যসূচীর অন্তর্গত ছিল এবং সভার উদ্‌যোগে দেশলাইয়ের কল, কাপড়ের কল প্রভৃতির সূচনা হইয়াছিল। কার্যক্ষেত্রে এগুলি সার্থক হয় নাই, কিন্তু দেশের চিত্তক্ষেত্রে 'স্বদেশী' চিন্তা ও কল্পনার পথ সুগম করিয়াছে। পরবর্তী কালে (১৮৮৪ খ্রী) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশী স্টীমার সার্ভিস চালনা করিয়া প্রভূত ক্ষতিস্বীকার করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে সার্বজনিক ঐক্যবিধানের জন্য তিনি একটি সার্বজনিক পোশাকেরও পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা শিক্ষা ও ভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে মাতৃভাষায় আলোচনা যে ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনের অন্যতম প্রধান উপায় ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও স্বয়ং মারাঠী ভাষা আয়ত্ত করিয়া এবং মারাঠী রচনা বাংলায় অনুবাদ করিয়া এ বিষয়ে অন্যতম পথপ্রদর্শকও হইয়াছিলেন। প্রবীণ বয়সেও তিনি লোকমান্য তিলকের সুবৃহৎ 'শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতারহস্য' মূল মারাঠী হইতে অনুবাদ করেন (১৯২৪ খ্রী)।

তাঁহার সাহিত্যসাধনাও প্রথম যৌবনে বিশেষভাবে স্বদেশপ্রেম ও দেশের অতীত গৌরব প্রচারের পথেই প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক নাট্য 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪ খ্রী), 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' (১৮৭৫ খ্রী), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯ খ্রী) ও 'স্বপ্নময়ী নাটক' (১৮৮২ খ্রী) একসময় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

ইহার কোনও কোনওটি হিন্দী গুজরাতী মারাঠী ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত প্রহসন কয়খানিও উল্লেখযোগ্য। তাহার 'অলীকবাবু' (প্রথম প্রকাশ 'এমন কর্ম আর করব না' নামে, ১৮৭৭ খ্রী) একালেও নাট্যমঞ্চে সমাদৃত। তরুণ বয়সে তিনি স্বয়ং অভিনয়কলাতেও সুদক্ষতা প্রদর্শন ও পারিবারিক নাট্যশালা গঠনে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তাঁহার সংগঠনশক্তি সাহিত্যক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ১৮৮২ সালে তাহার উদ্যোগে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানার্থ কলিকাতায় 'সারস্বত সমাজ' নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমাজ অচিরস্থায়ী হইলেও কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য বিচারে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পূর্বগামী বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহে ইতিপূর্বে (১৮৭৪ খ্রী) সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্প্রীতিবর্ধনের উদ্দেশ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামে সাহিত্যসেবীদের একটি বার্ষিক সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হইয়া কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। ইহারই বিভিন্ন অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' প্রথম অভিনীত হয়।

'ভারতী' পত্রের প্রতিষ্ঠাও (১৮৭৭ খ্রী) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগেই হইয়াছিল।

সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিকে ফরাসী সাহিত্য অপর দিকে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সহিত বাঙালীর পরিচয়সাধনের চেষ্টার জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যৌবনকাল হইতে তিনি ফরাসী ভাষার বহু শ্রেষ্ঠ রচনা, দর্শন চিন্তা ইতিহাস ভ্রমণকাহিনী গল্প উপন্যাস প্রহসন কবিতা মূল ফরাসী হইতে বাংলায় প্রচার করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকও তিনি বাংলা রূপান্তরে প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এইসকল গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহু রচনা এখনও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি পরিচয় এখনও সাধারণের সমক্ষে সম্পূর্ণ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে, চিত্রশিল্পীরূপে তাঁহার পরিচয়। কিশোর বয়স হইতে পেন্‌সিলের রেখায় প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁহার আগ্রহ ছিল, আর চিরজীবনই এই অভ্যাস অক্ষুণ্ণ ছিল। ফলে তাঁহার খাতায় আত্মীয় বন্ধু, দেশমান্য ও স্বল্পপরিচিত বহু নরনারীর প্রতিকৃতি সংগ্রহ হইতে থাকে। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলাত প্রবাসকালে শিল্পী রদেনস্টাইন এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে তাঁহার একটি নির্বাচিত চিত্রসংগ্রহ 'টোয়েন্টিফাইভ কলোটাইপ্‌স ফ্রম দি অরিজিন্যাল ড্রয়িংস অফ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ টেগোর' নামে রদেনস্টাইনের ভূমিকা সহ ১৯১৪ সালে বিলাতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ দেশে ইহার বিশেষ প্রচার হয় নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলীর অধিকাংশ কলিকাতার রবীন্দ্র-ভারতী-সমিতির সংগ্রহভুক্ত, চিত্রসংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

পুলিনবিহারী সেন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আর এক প্রধান পরিচয় সংগীতের ক্ষেত্রে। সেতার, বেহালা, হারমোনিয়াম, পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্রবাদন, ধ্রুপদাঙ্গে ব্রহ্মসংগীত রচনা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত রচনার যুগে সাক্ষাৎভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রেরণা দান, আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন ও ব্যাপক প্রচলন, একাধিক সংগীত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন, সংগীতপত্রিকাদি সম্পাদন ইত্যাদি বিবিধ কার্যাবলীর জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে।

মহর্ষি ভবনে সাংস্কৃতিক জীবনের গৌরবোজ্জ্বল যুগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম এবং শৈশব ত্যাগ বয়সেই তাহার সংগীতচর্চার সূত্রপাত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং জোড়াসাঁকো পরিবারের সংগীতাচার্য বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৈশোরে সংগীতশিক্ষার সূচনা। তাহার পর দ্বিতীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বোম্বাই অঞ্চলে বাসকালে (১৮৬৭ খ্রী) তিনি এক গুজরাতী ওস্তাদের শিক্ষাধীনে সেতারবাদন আরম্ভ করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর সেতারের সহিত বেহালা, পিয়ানো ও হারমোনিয়াম বাদনকৌশলে সংগীতের অনুশীলন করিতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ এই পর্বের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখেন– 'বেয়ালা কি মিঠে অমৃত ছিটে / ঐ গৎটিতে শুনায় / পিয়ানো চং চং চং চং / সেতার গুনগুনায়।' সমাজমন্দিরে নিয়মিতভাবে গানের সহযোগে হারমোনিয়াম বাদনের জন্য তিনি সে যুগে সুপরিচিত ছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, মৌলা বখ্‌শ প্রভৃতি স্বনামপ্রসিদ্ধ গায়কদের সহিত তিনি সুযোগ্যভাবে হারমোনিয়াম সংগত করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সংগীত রচনায় ও সুরসৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষণীয় বিষয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ সময়ে পিয়ানোতে নূতন নূতন সুর সৃজন করিতেন এবং রবীন্দ্রনাথ 'সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত' থাকিতেন। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে রবীন্দ্রনাথ যেমন নিত্য নূতন গান রচনার প্রেরণা লাভ করিতেন,

তেমনই তাঁহার রচিত সংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির স্বাক্ষর থাকিত। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'র অন্তর্গত ও সমসাময়িক কালে রচিত গীতাবলীর অন্ততঃ ২০টি গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্ট সুরে গঠিত। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও গানের সাংগীতিক গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত গীতবিশেষের সাদৃশ্য বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়. রবীন্দ্রনাথের 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা' (গৌড় মল্লার, চৌতাল) ও 'এ পরবাসে রবে কে' (সিন্ধু) -এর সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত যথাক্রমে 'গাও রে পরব্রহ্মের মহিমা' (গৌড় মল্লার, চৌতাল) ও 'হে অন্তর-যামী ত্রাহি' (সিন্ধু) তুলনীয়।

হিন্দী ধ্রুপদ গানের সাংগীতিক আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণে বাংলায় অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত রচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর একটি অবদান। তাহার রচিত গীতাবলী সেকালে বিশেষ আদৃত হইলেও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই। স্বরচিত 'স্বরলিপি গীতিমালা', কাঙালীচরণ সেন সংকলিত 'ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি' (১-৬ খণ্ড) প্রভৃতি পুস্তকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক গান বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা দেশে আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন ও ইহার প্রচলনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান সর্বাধিক। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' পুস্তকে তাঁহার কৃত ১৬৮টি গানের স্বরলিপি (তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা ৬৮) এবং তাঁহার সম্পাদিত দুইটি সংগীত বিষয়ক মাসিক পত্র 'বীণাবাদিনী' (১৮৯৭-৯৮ খ্রী) ও 'সংগীত প্রকাশিকা' (১৯০১-১১ খ্রী) তে তাঁহার রচিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি এ বিষয়ে তাঁহার নিপুণ ও সার্থক উদ্যমের সাক্ষ্যস্বরূপ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত সংগীত বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা করেন। পুনায় 'গায়ন সমাজ' দেখিয়া তাহার আদর্শে কলিকাতায় কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে 'ভারত সংগীত সমাজ' স্থাপন (১৮৯৭ খ্রী) ও প্রথমাবধি সম্পাদকরূপে তাহার পরিচালনা তাঁহার কীর্তি। তিনি 'ভারত সংগীত সমাজ'-এর মুখপত্র-রূপে 'সংগীত প্রকাশিকা' মাসিকপত্রের প্রকাশ করেন, এবং দীর্ঘকাল উহার সম্পাদনাও করিয়াছিলেন।

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, 'গ্রন্থপরিচয়', কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, জনৈক শিল্পসেবী, 'রেখাচিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', মানসী, বৈশাখ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, কলিকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, মন্মথনাথ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৮, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, কানাই সামন্ত, চিত্রদর্শন, কলিকাতা, ১৮৮১ শক, প্রফুল্লকুমার দাস, 'রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনায় সূচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব', রবীন্দ্রায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্য মধ্যযুগের মিথিলাবাসী পণ্ডিত এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম এবং শীর্ষস্থানীয়। পিতা বীরেশ্বর, পিতামহ রামেশ্বর। জ্যোতিরীশ্বর মিথিলার শেষ স্বাধীন নৃপতি হরিসিংহ দেবের সভাসদ ছিলেন। অতএব তাহার জীবৎকাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। জ্যোতিরীশ্বরের রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল সংস্কৃতে রচিত 'ধূর্তসমাগম' প্রহসন এবং 'পঞ্চসায়ক' (কামশাস্ত্র) আর প্রাচীন মৈথিল ভাষায় গদ্যে লেখা 'বর্ণনরত্নাকর'। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যে মূল্যবান এই পুস্তক জ্যোতিরীশ্বরের বিচিত্র পাণ্ডিত্যের ও সংগীত প্রভৃতি বিভিন্ন কলায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক।

দ্র জ্যোতিরীশ্বর, বর্ণনরত্নাকর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ববুয়াজী মিশ্র -সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৪০।

সুকুমার সেন

জ্যোতির্বিদ্যা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বিদ্যা।

সভ্যতার প্রথম বিকাশকাল হইতেই সূর্য চন্দ্র ও গ্রহাদির গতিবিধি পরম কৌতূহলের বিষয় ছিল। বহু কাল ধরিয়া পর্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতিষগণের বিশেষ করিয়া সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তন ও চলাচলের নিয়মাদি আবিষ্কৃত হইতে থাকে এবং কাল গণনার প্রয়োজনে উহার ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ষপঞ্জী গণনা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

আদিতে সূর্য, চন্দ্র, দৃশ্য গ্রহপঞ্চক (বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি), চন্দ্রপাত বা রাহু এবং তারকাদিগের গমনাগমনের নিয়ম আবিষ্কার, উহাদের ভবিষ্যৎ অবস্থান নির্ণয় এবং গ্রহণাদি গণনাই জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে গ্রহাদির অবস্থান ও চলাচলের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও দেশগত ভাগ্যের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে

জ্যোতির্বিদ্যা

কল্পনা করিতে থাকেন, তাহার ফলেই ফলিত জ্যোতিষের উৎপত্তি হয়। আদিতে গণিত জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ উভয়ই জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। বর্তমান কালে অবশ্য ভাগ্যগণনাশাস্ত্রকে জ্যোতির্বিদ্যার সীমানার বাহিরে রাখা হইয়াছে। অপর পক্ষে গ্রহ ও তারকাদির দূরত্ব, ওজন, বস্তুবিন্যাস, গঠনপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা এই শাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়াছে। ফলে এখন পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুতঃ বর্তমানে তারকা ও নীহারিকাপুঞ্জের আকৃতি, প্রকৃতি ও গতি নির্ণয় ও তৎসহ বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণই জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাড়াইয়াছে।

ভারতবর্ষে বৈদিক কাল হইতেই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হয়। তখন মাত্র সূর্য ও চন্দ্রের গতির পর্যবেক্ষণ করা হইত, সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বিভাগের দ্বারা ঋতুকাল নিরূপিত হইত এবং বৎসরও গণনা করা হইত। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দ্বারা বৎসরকে মাসে ভাগ করা হইত। বৈদিক ঋষিগণ সূর্যগ্রহণও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা চন্দ্রপথকে ২৭ বা ২৮টি নক্ষত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সন্নিহিত সময়ে সূর্য ও চন্দ্রের গতিকে ভিত্তি করিয়া বর্ষপঞ্জী রচনার পদ্ধতিও প্রবর্তিত হয় (বেদাঙ্গ জ্যোতিষ)। কিন্তু তখন গ্রহগতি নির্ণয়ের প্রচেষ্টার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টজন্মের পরে অবশ্য এই প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্য প্রাচ্য ভূমিতে গ্রহগতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কিছু উন্নতি হইয়াছিল এবং যেহেতু এই সময় হইতেই ঐ সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ স্থাপিত হয়, সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে এদেশে গ্রহ-গণিতের যে উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহার মূল উপাদান এশিয়ার পশ্চিমাংশ হইতে আসিয়াছিল। অবশ্য এ দেশের জ্যোতিষিক জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান হইতে কিছু পৃথক এবং কিছু উন্নতও বটে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থকে সিদ্ধান্তগ্রন্থ বলে। আর্যভট (৪৭৬ খ্রী ?) কৃত আর্যভটীয়, বরাহমিহিরের (৫২৭ খ্রী ?) সংকলিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খ্রী ?) কৃত ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত এবং ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রী ?) কৃত গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় সিদ্ধান্তগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ সকল অপেক্ষাও প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হইল, অজ্ঞাতনামা জ্যোতির্বিদ (বা ময়দানব) কৃত সূর্যসিদ্ধান্ত। এই সকল গ্রন্থে রবি, চন্দ্র প্রভৃতির আবর্তনকাল, গ্রহগণের পাত ও মন্দোচ্চের অবস্থান ও গতি, মধ্য গ্রহ হইতে স্পষ্ট গ্রহ আনয়ন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ গণনা, উদয়াস্ত গণনা, প্রভৃতি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সকল বিষয়ই পাওয়া যায়। অবশ্য সূর্যই যে সৌরজগতের কেন্দ্র এ কথা তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশে ক্লাউদিয়স টলেমি (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী) কর্তৃক প্রচারিত ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদই এই সকল সিদ্ধান্তগ্রন্থেরও ভিত্তি।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৪১ অব্দে মিশরীয়গণ ৩৬৫ দিনের এক বর্ষপঞ্জী রচনা করেন, তাহাতে প্রতি মাসে ৩০ দিন হিসাবে ১২ মাস এবং তাহার পরে ৫টি অতিরিক্ত দিন ছিল। ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বেই ব্যাবিলনীয়রা ৩৬০ দিনের এক বৎসরের পরিকল্পনা করিয়াছিল। পরে অবশ্য সৌর-চান্দ্র ভিত্তিতে ১২ চান্দ্র মাসে এবং মাঝে মাঝে একটি অধিক চান্দ্রমাস ধরিয়া বৎসর গণনা আরম্ভ হয়। বর্তমানে যে সপ্তাহ ও বার গণনার চলন আছে তাহা ব্যাবিলনীয়গণ কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। রবিমার্গকে ১২টি রাশিতে বিভক্ত করা এবং তাহাদের পৃথক পৃথক নাম দেওয়ার কৃতিত্বের অধিকারী ব্যাবিলনীয়, চৈনিক ও মিশরীয়গণের সকলেই। ব্যাবিলনীয়গণ আরও আবিষ্কার করেন যে ১৮ বৎসর ১০ বা ১১ দিন পর পর সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের চৈনিক গ্রন্থে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই পঞ্চগ্রহ সংযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়. ২৭১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে সত্যসত্যই ঐ প্রকার এক সংযোগ ঘটিয়াছিল।

ইওরোপে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে নব্য বিজ্ঞান যুগের আবির্ভাব হয়, তাহার পর হইতেই জ্যোতির্বিদ্যারও প্রভূত উন্নতি হইতে থাকে। নিকোলাউস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রী) সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন ও পৃথিবী যে সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহমাত্র এবং উহার ঘূর্ণন ও সূর্য পরিক্রমা আছে তাহা প্রচার করেন। পৃথিবীর এই ঘূর্ণনের কথা ভারতবর্ষে আর্যভট অনেক পূর্বেই অবশ্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিশ্ব পরিকল্পনা ছিল ভূ-কেন্দ্রিক। যোহান কেপলর (১৫৭১-১৬৩০ খ্রী) গ্রহ-কক্ষের প্রকৃত রূপ অর্থাৎ উপবৃত্তীয় কক্ষ আবিষ্কার করিয়া আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে অবশ্য আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রী) ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে গ্রহগতির প্রকৃত কারণ অর্থাৎ 'অভিকর্ষ' আবিষ্কার করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়া জ্যোতিষ্কগণের গতি ও স্থিতি সম্বন্ধীয় প্রায় সকল সমস্যারই বর্তমানে সমাধান হইয়া গিয়াছে।

আনুমানিক ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর এবং গালিলেও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রী)-এর

গবেষণার ফলে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বর্তমানে আবার বর্ণালী বিশ্লেষণের দ্বারা জ্যোতিষ্কগণের মৌলবস্তু, তাপমাত্রা, গতি, বয়ঃক্রম, দূরত্ব প্রভৃতি অতি সহজেই নিরূপিত হইতেছে। এইভাবে জ্যোতিষ্কগণের জন্ম মৃত্যুর ইতিহাস ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্‌গণের প্রায় অধিগত। 'আর্যভট' 'কোপার্নিকাস', 'গালিলেও', 'নিউটন', 'বরাহমিহির' প্রভৃতি দ্র।

দ্র সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৫, ১৯৫৮; H. Spencer Jones, *General Astronomy*, London, 1934.

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রী) পিতার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতার নাম কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। জ্যোতির্ময়ী দেবী সুবক্তা এবং জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন।

বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি বেথুন স্কুল এবং অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষারূপে কাজ করেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৩-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর ছাত্র-শোভাযাত্রায় পুলিশের গুলিতে নিহত রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শবানুগমনের পুরোভাগে ছিলেন এবং সেখানে মিলিটারি ট্রাকের ধাক্কায় আহত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন।

দ্র কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

কমলা দাশগুপ্ত

জ্যোতিষ প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে 'জ্যোতিষ' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। 'জ্যোতির্বিদ্যা' বা 'অ্যাস্ট্রনমি' প্রাচীন কালে 'গণিত জ্যোতিষ' নামে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি শাখা হিসাবে পরিগণিত হইত। জ্যোতিষশাস্ত্রের অপর দুইটি স্কন্ধ—'সংহিতা' ও 'হোরা'—একত্রে 'ফলিত জ্যোতিষ' নামে পরিচিত। জ্যোতিষ্কগণের গতি ও অবস্থান প্রভৃতির দ্বারা মানবজীবনের শুভাশুভ ফলের গণনাই ফলিত জ্যোতিষের বিষয়বস্তু। বর্তমান কালে 'জ্যোতিষ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ এই 'ফলিত জ্যোতিষ' বা 'অ্যাস্ট্রলজি'কেই বুঝাইয়া থাকি।

বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে সংহিতার বিস্তার সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করা যায়: ১. জ্যোতির্বিদ্যা: ক. রবি, সোম, রাহু, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ধূমকেতু, অগস্ত্য সপ্তর্ষির 'চার' বা 'রাশি-সঞ্চরণ' হেতু শুভাশুভ—ফলগণনা খ. কূর্ম বিভাগ (ভারতবর্ষকে নয় ভাগ করিয়া এক এক ভাগে যে যে নক্ষত্রের আধিপত্য তাহার বর্ণনা) গ. নক্ষত্রব্যূহ (ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উপর বিভিন্ন নক্ষত্রের প্রভাব) ঘ. গ্রহভক্তি (অনুরূপ গ্রহের প্রভাব, গ্রহযুদ্ধ বা গ্রহ সমাগমের ফল) ঙ. গ্রহবর্ষফল (যাহা পঞ্জিকায় প্রদত্ত হয়) চ. গ্রহশৃঙ্গাটক (চক্র ধনুঃ শৃঙ্গাটক বা পাণিফল – ত্রিকোণ প্রভৃতি আকারে গ্রহসমাগম হইবার ফল) ছ. শস্যজাতক (গ্রহের অবস্থান বিবেচনা করিয়া ভাবী শস্যের অবস্থা নির্ণয়)।

২. আবহবিদ্যা: ক. গর্ভলক্ষণ, ধারণ, প্রবর্ষণ, রোহিণীযোগ, স্বাতীযোগ, আষাঢ়ীযোগ,—ভাবী বর্ষা গণনা খ. সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ গ সন্ধ্যা, দিগ্‌দাহ, উল্কা, পরিবেশ, ইন্দ্রধনুঃ, গন্ধর্বনগর, প্রতিসূর্য, রজঃ বা আবহে ধূলি, নির্ঘাত লক্ষণ।

৩. উদ্ভিদবিদ্যা: ক. কুসুমলতাধ্যায় (ফল ও লতার বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া ভাবী শস্যাদির অবস্থা গণনা) খ. বৃক্ষায়ুর্বেদ (বৃক্ষরোগ চিকিৎসা)।

৪. প্রাণিবিদ্যা: ক. গো-কুক্কুর-কুক্কুট কূর্ম ছাগ-অজ-গজ-লক্ষণ। ৫. ভূবিদ্যা: ক. ভূকম্পলক্ষণ খ. উদকার্গল (ভূমির নিম্নে কোথায় জল আছে তাহার নির্ণয়)। ৬. আয়ুর্বেদ: ক. কান্দর্পিক বা বাজীকরণ খ. গন্ধযুক্তি (গন্ধদ্রব্যকরণ) গ. পুং স্ত্রী সমাযোগ। ৭. বাস্তু বা শিল্পবিদ্যা: ক. গৃহাদি নির্মাণ খ. প্রাসাদ লক্ষণ গ. বজ্রলেপ (প্রলেপকে বজ্রবৎ দৃঢ়ীকরণ) ঘ প্রতিমা-লক্ষণ ঙ. প্রতিমার কাষ্ঠের নিমিত্ত বনসংপ্রবেশ চ. প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও স্থাপনা। ৮. রাজ-ব্যবহার: ক. পুষ্যস্নানবিধান বা পুষ্যাভিষেক খ. পট্ট বা মুকুট লক্ষণ গ. খড়্গ ঘ. চামর, ছত্র, বস্ত্রচ্ছেদ, শয্যাসন লক্ষণ ঙ. দীপ ও দন্তকাষ্ঠ লক্ষণ চ বজ্র বা হীরক, মুক্তা, পদ্মরাগ, মরকত পরীক্ষা ছ. ইন্দ্রধ্বজসম্পৎ (ইন্দ্রধ্বজ রোপণ) জ. নীরাজন বিধি (যুদ্ধযাত্রার পূর্বে রাজকৃত্য)। ৯. বাণিজ্য: ক. দ্রব্যনিশ্চয় (গ্রহ ও রাশি অনুসারে দ্রব্যাদির সুলভতা নির্ণয়) খ. অর্ঘকাণ্ড

(গ্রহস্থিতি অনুসারে দ্রব্যাদির ভাবী মূল্য নির্ণয়) গ. শস্যজাতক। ১০. অঙ্গবিদ্যা: ক. প্রশ্ন গণনা খ পিটক বা ব্রণলক্ষণ গ পুরুষ, পঞ্চমহাপুরুষ ও কন্যার লক্ষণ (অর্থাৎ সামুদ্রিক)। ১১. শাকুন শাস্ত্র (পশু পক্ষ্যাদির চেষ্টিত বা প্রয়াস দ্বারা শুভাশুভ গণনা) ক. খঞ্জন দর্শন খ. শকুন শব্দ গ. শ্বা, শিবা, মৃগ, গো, অশ্ব, হস্তী, বায়স-চেষ্টিত ও শব্দ। ১২. বিবিধ ক. মণ্ডচিহ্নক (সংহিতায় কথিত ফলসমূহের পুনরাবৃত্তি) খ. উৎপাত লক্ষণ (প্রকৃতির বৈপরীত্য লক্ষণ) গ. পাকাধ্যায় (কতদিনে কোন্ ফল ঘটে)। ১৩. মুহূর্ত বিচার. ক. নক্ষত্র তিথি করণ গুণ খ. বিবাহ নির্ণয় গ. বিবাহ পটল। ১৪. জাতক: ক. রাশি প্রবিভাগ খ. নক্ষত্র জাতক. গ. গ্রহগোচর।

উপরিলিখিত ১০৮ অধ্যায়ে বৃহৎসংহিতা বিভক্ত। উপরি-উক্ত বর্ণনা বিচার করিলে, জ্যোতিষ সংহিতাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে— এক ভাগ প্রাকৃতিক বিবরণের (ফিজিওগ্রাফি) পর্যায়ভুক্ত (গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত এই বিভাগের আলোচ্য বস্তুর সম্পর্ক নাই), অপর বিভাগে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত ফলাফল বিচার আছে। প্রথম বিভাগের ক্রমশঃ বিলোপ ও দ্বিতীয় বিভাগের ক্রমশঃ বিস্তার দেখা যায়। দ্বিতীয় বিভাগকে আবার দুই উপশাখায় ভাগ করা যায়: ১. মুহূর্ত ও ২. যাত্রাদিতে গ্রহগোচর। কালক্রমে গ্রহগোচর ফল হোরা শাস্ত্র বা জাতকের অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

যে শাখায় জন্ম যাত্রা-বিবাহাদি কার্যে লগ্ন ও গ্রহাবস্থানজনিত শুভাশুভ ফল বিবেচিত হয় উহার নাম 'হোরা', বিকল্পে 'অঙ্গবিনিশ্চয়'। 'হোরা' শাখার কয়েকটি উপশাখা আছে, যথা 'জাতক', 'প্রশ্ন', 'চেষ্টা' প্রভৃতি। বরাহ বৃহজ্জাতকে 'হোরা' শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'অহোরাত্র' শব্দের পূর্বাপর বর্ণ লোপ পাইয়া বিকল্পে 'হোরা' হইয়াছে। মেষাদি দ্বাদশ লগ্নরাশি অহোরাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া 'হোরা' নাম। এই 'হোরা' শাস্ত্র দ্বারা শুভাশুভ কর্মের ভোগ সম্পর্কে জানা যায়। 'হোরা' শব্দের অন্য অর্থ রাশির অর্ধ ও লগ্নের অর্ধ। 'হোরা' শাস্ত্রের অন্তর্গত 'জাতক' গণনাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ১. গ্রহগোচর বা গোচরফল ২. অষ্টবর্গ গণনা এবং ৩. দশাফল গণনা।

গোচরফল বিচারকালে 'জাতকে'র (অর্থাৎ জাত ব্যক্তির) জন্মকালে যে রাশি বা গৃহে চন্দ্র অবস্থিত থাকে, সেই রাশি বা গৃহের নামকে জন্মরাশি বলে। গোচরফল গণনায় জন্মরাশি হইতে গ্রহগণের অবস্থান (অর্থাৎ এক গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্য গৃহে গমন) বিচার করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করা হয়।

অষ্টবর্গ গণনাতে সপ্ত গ্রহ ও লগ্ন আবশ্যক। জন্মকালে যে রাশির উদয় হয়, তাহা জন্মলগ্ন। এই অষ্টের (অর্থাৎ সপ্ত গ্রহ ও লগ্নের) অষ্টবর্গ আছে। রবি ধরিয়া অপর সপ্তের অষ্টবর্গ, চন্দ্র ধরিয়া অপর সপ্তের অষ্টবর্গ, এইরূপ অষ্টবিধ অষ্টবর্গ আছে। উদাহরণ স্বরূপ, রবির অষ্টবর্গ করিতে হইলে, জন্মকালে রবি যে গৃহে বা রাশিতে থাকে সেই গৃহ এবং উহা হইতে ২, ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ গৃহে রবি শুভফল দান করিবে। এইরূপ সপ্তগ্রহ ও লগ্নের অষ্টবর্গ নির্ণয় করিতে দ্বাদশ রাশির কোনও কোনও রাশিতে ৪ বা ততোধিক রেখা পড়িবে, কোনও কোনও রাশিতে পড়িবে না। যে গ্রহের অষ্টবর্গ সেই গ্রহ ৪ বা অধিক রেখাযুক্ত রাশিতে শুভফল প্রদান করে। গোচরফল অপেক্ষা অষ্টবর্গ ফল গণনায় সূক্ষ্ম বিচার করিতে হয়।

দশাফল গণনা ও কোষ্ঠী বিচারে জাতকের জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী (যাহাতে কোষ্ঠে বা রাশিগণের গৃহে গ্রহ সন্নিবিষ্ট থাকে) রচনায় বর্তমানে দশাফল বিচারই বেশি স্থান পাইয়া থাকে। কোন গ্রহ কতকাল অবস্থান ভোগ করে, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। যে মতে মানবের পরম আয়ু বা আয়ুর সীমা ১২০ বৎসর (কেবল মত) ধরিয়া গ্রহগণের ভোগ্য কাল বিভাগ করা হয়, তাহাকে বিংশোত্তরী দশাবিভাগ বলে। অষ্টোত্তরী দশাবিভাগে মানবের পরম আয়ু ১০৮ বৎসর ধরা হয়। এইরূপ দশাবিভাগকে নাক্ষত্রিক দশাও বলা হয়। অষ্টোত্তরী দশাবিচারে রাহুর ভোগ আছে কিন্তু কেতুর নাই। প্রাচীন কালে নানাবিধ দশাবিচার প্রচলিত ছিল। পরাশর তাঁহার জাতক পদ্ধতিতে দ্বাদশ প্রকার দশার উল্লেখ করিয়াছেন। 'বৃহৎ পারাশরী' গ্রন্থে ৪২ প্রকার দশার উল্লেখ আছে। এইগুলির মধ্যে কোনও কোনও দশা গণনায় রাহু কেতুর স্থান আছে, কোথাও বা নাই। কোন গ্রহের দশায় জন্ম তাহা জন্মনক্ষত্র অর্থাৎ চন্দ্রাশ্রিত নক্ষত্র দ্বারা নির্ণীত হয়। জন্মদশা নির্ণীত হইলে জন্মসময়ে উক্ত দশাকালের কত বৎসর গত হইয়াছে এবং কত সময় অবশিষ্ট আছে তাহা নিরূপণ করিতে হয়। জন্মদশার ভোগকাল অতীত হইলে পরবর্তী গ্রহের দশাকাল আরম্ভ হয়।

কালবিভাগে ভারতীয় জ্যোতিষে দণ্ড-পলাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৬০ দণ্ডে অহোরাত্র বা ঘণ্টা। রাশির উদয়ের নাম লগ্ন। উদয় পর্বতের অর্থাৎ চক্রবালের পূর্ব বিন্দুর সহিত যখন যে রাশির সংযোগ হয়, তখন সেই রাশিকে লগ্ন আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেক রাশি ৩০

অংশে বিভক্ত। অহোরাত্রের মধ্যে দ্বাদশ রাশির উদয় ও অস্ত হয়। এক বৎসরে সূর্য দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিয়া থাকে। চন্দ্র এক এক রাশিতে ২।০ সওয়া দুই দিন, মঙ্গল এক রাশিতে ১ বৎসর, বুধ এক রাশিতে ১৮ দিন, বৃহস্পতি এক রাশিতে ১ বৎসর, শুক্র এক রাশিতে ২৮ দিন, শনি এক রাশিতে ২।০ বৎসর, রাহু এক রাশিতে ১৷৷০ বৎসর, কেতু রাহুর সপ্তমগ বলিয়া উহারও ভোগকাল ১৷৷০ বৎসর ধরা হয়। সূর্য যে কাল পর্যন্ত এক রাশি ভোগ করে, সেই কালের নাম সৌরমাস। অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রের যে ষোলটি কলা অর্থাৎ ষোড়শ ভাগ তাহাই ১৬টি তিথি নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। শুক্লা প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত চান্দ্রমাস। এক সংক্রান্তি হইতে অপর সংক্রান্তি পর্যন্ত সৌরমাস। ৩০ দিনে এক এক সাবন মাস। নক্ষত্রের আরম্ভ হইতে পুনঃ নক্ষত্রের উদয়কালকে নাক্ষত্রিক দিন এবং ত্রিশ নাক্ষত্রিক দিনে এক এক নাক্ষত্রিক মাস গণনা হয়। মাঘ হইতে আষাঢ় এই ছয় মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ন। ৩৬০ দিনে সাবনবর্ষ, ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে এক এক সৌর বর্ষ হয়। লগ্নরাশিকে (অর্থাৎ লগ্নস্থানকে) তিন ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগকে দ্রেক্কাণ বলে, ৯ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে নবমাংশ বা নবাংশ বলে, ১২ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে দ্বাদশাংশ বলে, এবং ৩০ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে ত্রিংশাংশ বলে।

জন্মকালে চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থান করে সেই নক্ষত্রকে জন্ম নক্ষত্র বলে। যে নক্ষত্রে যাহার জন্ম, সেই নক্ষত্রকে তাহার জন্মনাড়ী বলে। উক্ত জন্ম নক্ষত্র হইতে ১০ম নক্ষত্র কর্মনাড়ী, ১৬শ নক্ষত্র সাংঘাতিক নাড়ী, ১৮শ নক্ষত্র সমুদয় নাড়ী, ২৩শ নক্ষত্র বিনাশ নাড়ী এবং ২৫শ নক্ষত্রকে মানস নাড়ী বলে। ইহা হইতে জাতকের ভাগ্যবিচার রীতি আছে।

ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ও ত্রিংশাংশ —এই ছয়টিকে লইয়া ষড়বর্গ। ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য পাঁচটি সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ক্ষেত্র বলিতে রাশিচক্রের একটি রাশি বিভাগ, গৃহ বা স্থান বুঝায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রের অধিপতি গ্রহকে ক্ষেত্রাধিপতি বা ক্ষেত্রাধিপ বলে। সিংহ রাশি বা ক্ষেত্র রবির, কর্কট চন্দ্রের, বৃশ্চিক ও মেষ মঙ্গলের, মিথুন ও কন্যা বুধের, ধনুঃ ও মীন বৃহস্পতির, তুলা ও বৃষ শুক্রের, মকর ও কুম্ভ শনির ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত। কেহ কেহ কন্যারাশিকে বুধ ও রাহু — উভয়ের ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন। অথর্ব জ্যোতিষে জাতক গণনার সূত্রপাত দেখা যায়, সেই সময়ে ও মহাভারতের যুগে সপ্তগ্রহের উল্লেখ দেখা যায়, বরাহ ও বৃহৎসংহিতায় গ্রহগোচর গণনায় রাহু কেতুর ফল বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সময় হইতে দশা গণনায় রাহু কেতুর গ্রহত্বে বিশ্বাস শুরু হয়। বিচারে, ক্ষেত্রাধিপ বা ক্ষেত্রপতি, হোরাপতি, দ্রেক্কাণপতি, নবাংশপতি, দ্বাদশাংশপতি ও ত্রিংশাংশপতির অবস্থান ও বলাবল দ্বারা ফলাফল নির্দিষ্ট করা হয়।

জাতকের জীবনের শুভাশুভ ফল গণনার সুবিধার জন্য লগ্ন হইতে দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশভাব কল্পনা করা হয়। লগ্ন হইতে দ্বাদশটি রাশি (বা ক্ষেত্র বা গৃহ বা স্থান বা কক্ষ বা ভবন) যথাক্রমে তনু, ধন, ভ্রাতা, মাতা, বন্ধু ও সুখ, পুত্র ও বিদ্যা, শত্রু ও রোগ, জায়া ও বাণিজ্য, মৃত্যু ও আয়ু, ধর্মভাগ্য ও পিতা, কর্মরাশ ও পিতা, আয় ও লাভ এবং ব্যয়ের ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এক এক রাশিতে এক এক গ্রহ সর্বোৎকৃষ্ট ফলদাতা। সেই রাশি সেই গ্রহের তুঙ্গ বা উচ্চস্থান। আবার তুঙ্গ স্থানের অংশবিশেষকে সুতুঙ্গ বা সু উচ্চস্থান বলে। যথা রবির তুঙ্গস্থান মেষ, সু উচ্চ ১ হইতে ১০ অংশ, চন্দ্রের তুঙ্গস্থান বৃষ, সু উচ্চ ১ হইতে ৩ অংশ, মঙ্গলের তুঙ্গস্থান মকর, সু উচ্চ ১ হইতে ২৮ অংশ, বুধের তুঙ্গস্থান কন্যা, সু উচ্চ ১ হইতে ১৫ অংশ, বৃহস্পতির তুঙ্গস্থান কর্কট, সু-উচ্চ ১ হইতে ৫ অংশ, শুক্রের তুঙ্গস্থান মীন, সু উচ্চ ১ হইতে ২৭ অংশ, শনির তুঙ্গস্থান তুলা, সু উচ্চ ১ হইতে ২০ অংশ। এই সকল রাশির সপ্তম রাশি ঐ সকল গ্রহের নীচস্থান— এবং ঐ সকল সপ্তম রাশির অনুরূপ অংশগুলি সুনীচাংশ। 'গণক' দ্র।

ভবানন্দ ভট্টাচার্য

ঝা, গঙ্গানাথ (১৮৭১-১৯৪১ খ্রী) শিক্ষাবিদ্ ও সংস্কৃতে পণ্ডিত। গঙ্গানাথ ঝা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের দারভাঙ্গা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি বারাণসীর কুইন্স কলেজে ভর্তি হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাদশ স্থান দখল করিয়া ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন (১৮৮৮ খ্রী)। ইহার পর তিনি সরকারি বৃত্তি লাভ করিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উপাধি গ্রহণ করেন। গঙ্গানাথ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দারভাঙ্গা রাজ লাইব্রেরিতে যোগদান করেন। ঐ কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ে তিনি দর্শন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণা করেন। তখন তিনি সংস্কৃত দর্শন গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া খ্যাতি অর্জন

করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে মুর সেন্ট্রাল কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানাথ প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ পান এবং কলা বিভাগের সদস্যরূপে বিবেচিত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান থট' নামক একটি ত্রৈমাসিকের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অফ ল' (১৯২৫ খ্রী) এবং কাশী বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টর অফ লিটারেচার' (১৯৩৩ খ্রী) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

১৯২৩ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গঙ্গানাথ ক্রমান্বয়ে তিন বার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে জৈমিনির মীমাংসাসূত্রের অনুবাদ এবং *Philosophical Discipline*, *Shankaracharya and his work for the Uplift of the Country* ও *Vedanta Philosophy* উল্লেখযোগ্য।

অশোকা সেনগুপ্ত

ঝাউ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। বঙ্গ দেশের জলাভূমি, নদীতট, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে তামারিসকিনিঈ গোত্রের (Family-Tamariscineae) তামারিক্স গণভুক্ত (Genus-Tamarix) দুই প্রজাতির ঝাউ গাছ দেখা যায় – বনঝাউ ও লাল ঝাউ। বিজ্ঞানসম্মত নাম যথাক্রমে তামারিক্স গাল্লিকা (*Tamarix gallica*) ও তামারিক্স দিওইকা (*T dioica*)। বনঝাউ উভলিঙ্গ গাছ। ইহার কাণ্ড ও শাখা বাদামী রঙের, পাতা সরু ও সূচাগ্র, শাদা বা লাল ফুলগুলি গুচ্ছাকারে ফোটে, ফল তিন কোনা, কাণ্ডে সঞ্চিত আঠার ভেষজ মূল্য আছে। লাল ঝাউ এর স্ত্রী ও পুরুষ গাছ পরস্পর পৃথক। ইহার কাণ্ড লাল, পাতা গোলাকার, ফুল লাল বা বেগুনি, কাণ্ডে সঞ্চিত আঠা তিক্ত ও মিষ্ট স্বাদযুক্ত।

বিলাতি ঝাউ (ক্যাসুয়ারিনা একুইসেটিফোলিয়া, *Casuarina equisetifolia*) সমুদ্রতীরে জন্মায়। ইহার আদি জন্মভূমি অস্ট্রেলিয়া ও গোত্র ক্যাসুয়ারিনিঈ।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ঝাঁজি জলজ বীরুৎজাতীয় বা শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ। জলমগ্ন বা ভাসমান অবস্থায় পুষ্করিণী, ঝিল প্রভৃতি জলাশয়ে জন্মায়। ইহাদের কোনও কোনওটির মূল নাই, কাহারও বা ক্ষুদ্র মূলটি কেবল উদ্ভিদকে মাটির সহিত আটকাইয়া রাখে। ইহাদের অনেকে সারা দেহ দিয়া জল হইতে খাদ্য শোষণ করে, অনেকে আবার পতঙ্গভুক। নিম্নলিখিত ঝাঁজিগুলি বাংলা দেশের জলাশয়ে প্রায়ই দেখা যায়: ১. কারা শ্যাওলাজাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ। ইহা কারাসিঈ গোত্রের (Family-Characeae) অন্তর্গত। কারা পুরাতন জলাশয়ে জন্মায়। ইহার প্রকৃত মূল নাই, মূলের ন্যায় রাইজয়েড দ্বারা জলাশয়ের মাটিতে ইহা আটকাইয়া থাকে। ইহার পত্রও নাই, শাখাবিন্যাস আবর্তের ন্যায়। ২. হিড্রিলা ভের্টিসিলাটা (*Hydrilla verticillata*): হিড্রোকারিটাসিঈ গোত্রের (Family-Hydrocharitaceae) অন্তর্ভুক্ত জলমগ্ন একবীজপত্রী বীরুৎ। ইহার পত্র ঘন সবুজ, ক্ষুদ্র ও সরল, পত্রবিন্যাস আবর্তের ন্যায় এবং শাখা ক্ষীণ ও কোমল। ৩. সেরাটোফাইলাম ডেমেরসম (*Ceratophyllum demersum*) সেরাটোফিল্লাসিঈ গোত্রের (Family-Ceratophyllaceae) অন্তর্ভুক্ত জলমগ্ন দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। ইহার মূল নাই, পত্র সূক্ষ্ম অংশে খণ্ডিত, পত্রবিন্যাস আবর্তের ন্যায় এবং শাখা ক্ষীণ ও ভঙ্গুর। ৪ আলড্রোভান্ডা ভেসিকুলোসা (*Aldrovanda vesiculosa*) বা মালাকা ঝাঁজি ড্রোসেরাসিঈ গোত্রের (Family-Droseraceae) অন্তর্ভুক্ত ভাসমান দ্বিবীজপত্রী পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। কলিকাতার সন্নিকটে লবণ হ্রদ এলাকায় ইহা দেখা যায়। ইহার পত্রফলকের উপরে কতকগুলি শুঁয়া ও পাচনগ্রন্থি আছে, কোনও পতঙ্গ পত্রের উপর বসিলে পত্রফলকটি মধ্যশিরার নিকটে কবজার মত বন্ধ হইয়া যায় ও আবদ্ধ পতঙ্গের মৃতদেহের সম্পূর্ণ পাচন ও শোষণের পর ফলকটি আবার খোলে। ৫. উট্রিকুলারিয়া (Utricularia) লেন্টিবুলারিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Lentibulariaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী, মূলহীন, ভাসমান, পতঙ্গভুক বীরুৎ। বহু খণ্ডে বিভক্ত যৌগ পত্রের কোনও কোনও অংশ পতঙ্গ ধরিবার জন্য থলি বা 'ব্লাডার'-এর আকার ধারণ করে বলিয়া ইহাদের 'ব্লাডার ওয়ার্ট' বলে। থলির মুখে একটি দ্বার ও কতকগুলি শুঁয়া থাকে। কোনও জলজ পতঙ্গ ঐ শুঁয়া স্পর্শ করিলে দ্বারটি খুলিয়া যায় এবং জলের সহিত পতঙ্গটি থলির ভিতরে প্রবেশ করিলে দ্বারটি আবার বন্ধ হয়। থলির ভিতরে অবস্থিত পাচনগ্রন্থির রসে মৃত পতঙ্গটির পরিপাক সম্পন্ন হয়। 'পতঙ্গভুক উদ্ভিদ' দ্র।

দ্র D. Prain, *Bengal Plants*, vols. I-II, London, 1903; G. H. M Lawrence, *Taxonomy of Vascular Plants*, New York, 1951.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা দ্র

ঝালাই তাপপ্রয়োগে দুইটি ধাতুপত্র বা খণ্ডকে সংযুক্ত বা একীভূত করার নাম 'ওয়েল্ডিং'। এই প্রবন্ধে 'ওয়েল্ডিং' অর্থে 'ঝালাই' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

সুপ্রাচীন সুমেরু সভ্যতায় ঝালাই-এর নিদর্শন আছে। অবশ্য বিজ্ঞান-শাখারূপে ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্থান পায়।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাপপ্রয়োগ ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া বহু প্রকারের ঝালাই করা হয়। কখনও হাতুড়ি, আবতক বা সংচাপকের প্রয়োজন হয়। কখনও বা ধাতুকে বিগলিত করিয়া লওয়া হয়, চাপের প্রয়োজন হয় না। তবে এক্ষেত্রে অপর কোনও স্বল্প গলনাঙ্ক-বিশিষ্ট ধাতুর প্রয়োজন হয় (ফিউজন ওয়েল্ডিং)। এবম্ পদ্ধতিতে প্রয়োজন শুধু সুষ্ঠু তাপমাত্রা বা চাপ-প্রদানের।

ধাতু দুইটি অসদৃশ হইলে সাধারণতঃ একটিকে গলনোত্তাপে উন্নীত করা হয়, ফলে উত্তম বন্ধন সৃষ্ট হয়। থার্মিট ওয়েল্ডিং-এ সংযোজনীয় গলনোত্তপ্ত ধাতু দুইটির মাঝখানে ওয়েল্ড ধাতুতে ঢালাই করা হয়।

ঝালাই-এর ব্যবহার বহুবিধ। মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, যন্ত্রের ফ্রেম, জলাধার, সাধারণ যন্ত্রাদি মেরামত, তৈল শোধনাগার, পাইপ লাইন, জাহাজ নির্মাণ, বাষ্পময় ধাতু-সংগঠন প্রভৃতিতে এই ধাতুসংযোজন-প্রক্রিয়া বহুল ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে নিম্নঅঙ্গার ইস্পাত এবং পিষ্ট লৌহের ক্ষেত্রেই শুধু ওয়েল্ড হইত। অধুনা নূতন তড়িদ্দ্বার (ইলেকট্রোড) এবং নানাবিধ কলাকৌশলের আবিষ্কারের ফলে ধাতু-সংযোজনীয়তা মিশ্র ইস্পাত, ঢালাই লৌহ, পিতল, বহুলৌহ, মোনেল মেটাল, অ্যালুমিনিয়াম, তাম্র ও নিকেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ঝালাই-এর পূর্বে ধাতুতল উত্তমরূপে পরিষ্কার করা হয় এবং যাহাতে অম্লজান যোগ না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থাস্বরূপ ফ্লাক্স ব্যবহৃত হয়।

এখানে বলা যায়, গ্যাস ঝালাই-এ যন্ত্রপাতি দিয়া গ্যাসের পরিমাপের তারতম্য করিয়া ধাতুপত্র কাটা যায়; ইহাকে গ্যাসকর্তন (গ্যাস কাটিং) বলে।

বিভিন্ন প্রকার কাজের সুবিধার জন্য ঝালাইকে মোটা-মুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: ১. গ্যাস ঝালাই ২. ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং ৩. ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং ৪. ফোর্জ ওয়েল্ডিং ৫. থারমিট ওয়েল্ডিং।

গ্যাস ঝালাই নানাভাবে করা যাইতে পারে, অক্সি-হাইড্রোজেন, অক্সি-কোলগ্যাস এবং অক্সি-অ্যাসিটেলিন পদ্ধতিতে।

অক্সি অ্যাসিটেলিন পদ্ধতিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: ১. উচ্চচাপযুক্ত ২. নিম্নচাপযুক্ত। যেখানে উৎপাদনের প্রয়োজন অধিক সেখানে সাধারণতঃ উচ্চচাপ পদ্ধতির সাহায্যে ঝালাই করা হয়।

গ্যাস ঝালাই প্রধানতঃ দুইটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় করা যায়— গলন ও বিনা-গলন প্রক্রিয়া। গলন ঝালাই: এই ধরনের ঝালাই-এ যান্ত্রিক চাপ অথবা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এই প্রক্রিয়াতে যে ধাতু অথবা মিশ্র ধাতুকে ঝালাই করিতে হইবে তাহার পার্শ্বদেশ এত উত্তপ্ত করা হয় যাহাতে উভয় পার্শ্বদেশ গলিত হইয়া জুড়িয়া যায়। বিনা-গলন ঝালাই প্রক্রিয়াতে ধাতু অথবা মিশ্র-ধাতুর যে অংশে জোড়া দেওয়া হইবে, সেই অংশ সামান্য উত্তপ্ত করা হয়। একটি মিশ্র ধাতব শলাকার দ্বারা (যাহার গলনাঙ্ক উক্ত ধাতু অপেক্ষা কম) ধাতুখণ্ড দুইটির মধ্যে সংযোগ সেতু রচনা করা হয়। বিনা-গলন ঝালাইকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ১. ফোর্জ ওয়েল্ডিং ২. থারমিট ওয়েল্ডিং এবং ৩. ব্রেজ ওয়েল্ডিং।

অমিত ভট্টাচার্য

ঝাঁসি উত্তর প্রদেশের একটি জেলা, তহসিল ও শহর। জেলাটি উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ২৫°১১' হইতে ২৫°৫৫' উত্তরে এবং ৭৮°১০' হইতে ৭৯°২৫' পূর্বে অবস্থিত। এই জেলার উত্তরে জালাউন, পশ্চিমে গোয়ালিয়র জেলা, পূর্বে ধাসান নদী এবং দক্ষিণে মধ্য প্রদেশের সগর জেলা। ইহার আয়তন ১০০৬২ বর্গ কিলোমিটার (৩৮৮৫ বর্গ মাইল)। ঝাঁসি জেলায় ৬টি তহসিল ও ১৫টি শহর আছে। লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে ১০৮৭৪৭৯। অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু।

এই জেলার ভূমি নিস্ শিলায় গঠিত। এখানকার ভূপ্রকৃতি আবরণহীন, তরঙ্গায়িত, প্রস্তরময় ও সংকীর্ণ গিরিখাতসংকুল। দক্ষিণে ললিতপুর তহসিলটি বিন্ধ্য মাল-ভূমির অন্তর্গত, উহার উচ্চতা ৬০০ মিটারেরও (২০০০ ফুট) অধিক। দক্ষিণ-পূর্বে কোনও কোনও স্থানে

লোহিত মৃত্তিকা অঞ্চল দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশ স্থান কৃষ্ণ মৃত্তিকাময়। এই জেলার নদীগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত। বেতোয়া বা বেত্রবতী ইহার প্রধান নদী। তালবেহত, বরোয়া সাগর, পাচওয়ারা, মগরওয়ারা প্রভৃতি অনেক কৃত্রিম হ্রদ এই জেলার সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছে।

ঝাঁসির জলবায়ু উষ্ণ ও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ৭৭৫ মিলিমিটার হইতে ১০০৫ মিলিমিটার (৩১ ইঞ্চি হইতে ৮১ ইঞ্চি)। শীতকালে শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে।

চন্দেল ও বুন্দেলা রাজারা পূর্বে ঝাঁসি শাসন করিতেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঝাঁসি বুন্দেলা রাজগণের অধিকারে ছিল। ইহার পর মারাঠারা এই রাজ্য দখল করেন এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা পেশোয়া গঙ্গাধর রাওয়ের নিকট হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লন, কিন্তু রাজার সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঝাঁসি ও চন্দেরী জেলায় বিদ্রোহের সূচনা দেখা যায়। পেশোয়া গঙ্গাধর রাওয়ের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী রানী লক্ষ্মীবাঈকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। রানী লক্ষ্মীবাঈ স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা লইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল ঝাঁসির পতন হয় এবং সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের শাসনাধীনে আসে।

ঝাঁসি জেলায় প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দেল ও বুন্দেলা রাজগণের নির্মিত মন্দির ও প্রাসাদোপম অট্টালিকা ওর্ছা, চাঁদপুর, দেওগড়, দুধাই, লালিতপুর, মদনপুর, সিরণ প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। দেওগড়ের গুপ্তযুগীয় দশাবতার মন্দির প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের কৃষিসম্পদ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য নদীতে বাঁধ দিয়া বর্ষার জল কৃত্রিম হ্রদে সংরক্ষিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে সিঞ্চন করা হয়। কৃষি-সম্পদের মধ্যে গম, ভুট্টা, ধান, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ ও যব প্রধান। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদের মধ্যে বিন্ধ্যপর্বতের গৃহনির্মাণোপযোগী বেলে পাথর উল্লেখযোগ্য। এই পাথর প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। পশমের কম্বল ও রেশমী সুতার বস্ত্র অনেক স্থানে বয়ন করা হয়। মাউ, ঝাঁসি এবং মৌরানা তহসিল পিতলের কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। চন্দেরী শাড়ি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তৈলবীজ ঘি ও পান প্রধান।

ঝাঁসি এই জেলার প্রধান নগর। ইহার দূরত্ব কলিকাতা হইতে রেলপথে ১২৭৮ কিলোমিটার ও বোম্বাই হইতে ১১২৩ কিলোমিটার। ইহা ২৫°২৭′ উত্তর ও ৭৮°৩৫′ পূর্বে অবস্থিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ঝাঁসি শহরের লোকসংখ্যা ১৬৯৭১২। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শহর পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়।

রাজা বীরসিংহদেব ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরীর বাংলবন্ত নগর অংশে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নগরটি গড়িয়া উঠে। প্রাকার বেষ্টিত এই নগরী ছবির ন্যায় মনোরম। ইহার অভ্যন্তরে পাঁচটি প্রস্তর ক্ষোদিত কূপ আছে এবং ইহা হইতে প্রচুর জল সরবরাহ করা হয়। এখানকার রাজপ্রাসাদের কিয়দংশ বর্তমানে থানা ও দপ্তরের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

ঝাঁসি একটি জংশন স্টেশন। ইহা মধ্য রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর-পশ্চিমে আগ্রা ও উত্তর-পূর্বে কানপুরের সাথে ইহা রেলপথে যুক্ত এবং দক্ষিণে একটি রেলপথ বীনা হইয়া ভূপাল গিয়াছে। পাকা সড়ক কানপুর হইতে মউ, ঝাঁসি, ললিতপুর, সাগর হইয়া দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলা পর্যন্ত গিয়াছে। ঝাঁসি হইতে গোয়ালিয়র শিবপুরী হইয়া আর একটি সড়ক দক্ষিণে গিয়াছে।

এখানে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। খোনবার মৃত্তিকা পরীক্ষাগারটি উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি রেলওয়ে কলোনি ও সেনানিবাস আছে।

দ্র The Imperial Gazetteer of India vol XIV, Oxford 1908, District Census Handbook Uttar Pradesh Jhansi District, Allahabad, 1951

মিনতি বোস

ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ দ্র

ঝিঙা সবজি দ্র

ঝিনুক শম্বুক গোষ্ঠীর (মাইলাম মোলাস্কা, Phylum-Mollusca) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্বের শিলাস্তরেও ঝিনুকের জীবাশ্ম (ফসিল) পাওয়া যায়। আধুনিক গোত্রের ঝিনুক প্রায় সেই অতি প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বংশানুক্রমে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করিতেছে। ঝিনুক মিষ্ট ও লবণাক্ত জলে বাস করে। ঝিনুকের নরম ও অখণ্ডিত দেহটি চুনজাতীয় পদার্থের খোলা দিয়া আচ্ছাদিত। ঝিনুকের খোলা দুইটি, দুই খোলার সংযোগরেখায় উঁচু স্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া বৃদ্ধি-রেখার চিহ্ন থাকে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই বৃদ্ধি-

রেখাগুলির সংখ্যাও বাড়ে। অধিকাংশ ঝিনুকেরই চক্ষু নাই, কিন্তু নাভের সাহায্যে ইহারা আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ করিতে পারে। ফোলাস নামক ঝিনুকের দেহ হইতে জৈব আলো নির্গত হয় ('জৈব আলোক' দ্র)। ঝিনুক শ্লথগতি। নিউকুলা নামক ঝিনুক মাত্র ৪ মিলিমিটার দীর্ঘ, আবার প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের ট্রাইড্যাক্না নামক ঝিনুক প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও ওজনে প্রায় ২৫০ কিলোগ্রাম।

মেলেয়াগ্রিনা মার্গারিটিফেরা (*Meleagrina margaritifera*) ও উনিও মার্গারিটিফেরা (*Unio margaritifera*) প্রজাতি দুইটির ঝিনুক দেহাভ্যন্তরের বিশেষ একটি পর্দা হইতে নেকর নামক একটি বিশেষ রস ক্ষরণ করে। এই রস হইতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে এই ধরনের ঝিনুক পাওয়া যায়। জাপানে কৃত্রিম উপায়েও মুক্তার চাষ করা হয়। 'মুক্তা' ও 'শামুক' দ্র।

দ্র T J Parker & W A Haswell, *A Text-book of Zoology* vol I, London, 1951; S F Harmer & A E. Shipley, ed. *The Cambridge Natural History*, vol III, London, 1959.

[illegible]

ঝিলম কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য নদী ও পঞ্চনদের প্রধান নদীগুলির অন্যতম। কাশ্মীর হিমালয়ে অবস্থিত ভেরনাগ প্রস্রবণ ইহার উৎসস্থল। কাশ্মীর বাদেশের উর্বরা সমভূমির ভিতর দিয়া ইহা উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া উলার হ্রদের ('উলার' দ্র) মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। এই অঞ্চলেই ইহার দক্ষিণ তটে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অবস্থিত। পরবর্তী কালে বরামূলা গিরিসংকটের মধ্য দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ও পরে কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশ করে। নদীর দক্ষিণ তটে ঝিলম আর একটি উল্লেখযোগ্য শহর। দক্ষিণে সাহপুর, ঝাঙ্গ প্রভৃতি শুষ্ক ও অনুর্বর জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা ত্রিমু শহরের নিকট চন্দ্রভাগা নদীর সহিত মিলিত হয়। এই পর্যন্ত ঝিলম নদীর দৈর্ঘ্য ৭২০ কিলোমিটার (৪৫০ মাইল)। ইহার দক্ষিণ দিকের উপনদীর মধ্যে লিডার ও কৃষ্ণগঙ্গা এবং বাম দিকের উপনদীর মধ্যে দুধগঙ্গা উল্লেখযোগ্য।

ঝিলম নদী কাশ্মীর অঞ্চলে খানাবল হইতে বরামূলা পর্যন্ত প্রায় ১৯২ কিলোমিটার (১০২ মাইল) ও পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণ অংশে নৌবহনযোগ্য। নদী-উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু শুষ্ক শস্যের চাষ হয়।

ঝিলমের গিরিখাতের মধ্য দিয়া পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত সড়কটি সামরিক দিক দিয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ঝিলম নদী হইতে উচ্চ ও নিম্ন দুইটি খাল কাটিয়া শুষ্ক ও অনুর্বর অংশকে সিক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। শাখা প্রশাখা যুক্ত ৯৩২ কিলোমিটার (৫৮৩ মাইল) দীর্ঘ নিম্ন ঝিলম খালটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা সাহ্‌পুর জেলার 'সাহ্‌পুর কলোনি'র ৩৬৪০০০ হেক্টর ভূমিকে সিক্ত করিয়া উর্বরা কৃষিভূমিতে পরিণত করিয়াছে। কাশ্মীর সীমান্তে অবস্থিত মঙ্গল শহরের নিকট ঝিলম নদী হইতে প্রধান খালটি কাটা হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই খালটির ব্যবহার শুরু হয়। মঙ্গলের নিকট ঝিলম নদীর উপর একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India* vol XIV, Oxford, 1908; O H K Spate, *India and Pakistan*, 1954

[illegible]

ঝুকর হরপ্পা দ্র

ঝুমুর পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্ত জুড়িয়া প্রচলিত বাংলা লোকসংগীত বিশেষ। বাংলা পল্লীগীতির সহিত বাংলার পশ্চিম প্রান্ত এবং ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের সুর মিলিয়া মিশিয়াই ঝুমুরের উৎপত্তি। সুরের গতির মধ্যে হঠাৎ নানা স্থানে লাফাইয়া দূরবর্তী স্বরের সঞ্চার এই গানের বিশেষত্ব। স্বরের বর্জিত প্রয়োগও ইহাতে লক্ষণীয়। ঝুমুরের প্রকারভেদ অনেক। এক পুরুলিয়া জেলাতেই পাঁচশ ছাব্বিশ রকমের ঝুমুর প্রচলিত। অধিকাংশ ঝুমুর সহজ সরল সুরে গঠিত হইলেও কোনও কোনও গানে অলংকারযুক্ত সুরের প্রয়োগও দেখা যায়।

[illegible]

ঝুলন দোলের অনুরূপ বৈষ্ণব উৎসব। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন ইহার অনুষ্ঠান কাল। ইহার সংস্কৃত নাম হিন্দোল। রাধা-কৃষ্ণ বা অন্য বৈষ্ণব বিগ্রহ দোলায় স্থাপন করিয়া দোল দেওয়া এই উৎসবের প্রধান কার্য। উৎসবটি জনপ্রিয়। ইহার

জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়িতেছে মনে হয়। বর্তমানে শুধু ভক্ত বৈষ্ণবেরা নয়— ছোট ছোট ছেলেরাও ঘরে ঘরে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় বাংলা দেশে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থে এই উৎসবের কোনও ব্যবস্থা বা উল্লেখ নাই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

টক্‌সিন অধিবিষ। সাধারণতঃ ইহা ব্যাক্‌টিরিয়া হইতে উদ্ভূত বিষাক্ত পদার্থ এবং ব্যাক্‌টিরিয়া ঘটিত বহু রোগের কারণ। টক্‌সিন বিশুদ্ধ প্রোটিন অথবা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফস্‌ফোলিপিড-এর সমন্বয়। কেবল রোগাক্রান্ত জীবের দেহেই নহে, কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্যেও (কাল্‌চার মিডিয়াম) ব্যাক্‌টিরিয়া হইতে টক্‌সিন উৎপন্ন হইতে পারে। ডিফ্‌থেরিয়া, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগ-জীবাণুর টক্‌সিন ব্যাকটিরিয়ার অক্ষত দেহ হইতেই অনায়াসে ব্যাপনের (ডিফিউজন) সাহায্যে চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু কলেরা, গনোরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগজীবাণুর টক্‌সিন মৃত ব্যাক্‌টিরিয়ার দেহ ভাঙিয়া পড়িবার পরেই শুধু বাহিরে আসিতে পারে। প্রথম প্রকার টক্‌সিনকে এক্সোটক্‌সিন ও দ্বিতীয় প্রকারকে এনডোটক্‌সিন বলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে (যথা ডিফ্‌থেরিয়া রোগে) টক্‌সিন জীবদেহে এনজাইমের কার্য বিপর্যস্ত করে, আবার কয়েক ক্ষেত্রে (যথা যক্ষ্মা রোগে) কোষকে অস্বাভাবিক সুবেদী (সেনসিটিভ) করিয়া তোলে, ফলে দেহের কোষগুলির বিনাশ ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ব্যাকটিরিয়া হইতে দূরে অবস্থিত টিস্যুর উপরেও টক্‌সিনের বিষক্রিয়া ঘটিতে পারে।

রোগাক্রান্ত দেহে টক্‌সিনের প্রভাবে অ্যান্টিটক্‌সিন নামে প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় যাহা টক্‌সিনকে নিষ্ক্রিয় করিতে পারে। অনেক সময় (যথা ডিফ্‌থিরিয়া রোগে) টক্‌সিনকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রোগমুক্তির জন্য রোগীর দেহে অন্য প্রাণী হইতে সংগৃহীত অ্যান্টিটক্‌সিন ইন্‌জেক্‌শন করা হয়।

দ্র W. E van Heyningen, *Bacterial Toxins*, Oxford, 1950

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

টগর করবী গোত্রের (ফ্যামিলি-অ্যাপোসিনাসিঈ, Family-Apocynaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী চির-হরিৎ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম তাবের্‌নীমন্‌তানা করোনারিয়া (*Tabernaemontana coronaria*)। ইহার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ। গাছের উচ্চতা প্রায় ১৮০-২৪০ সেণ্টিমিটার, ফুলের রঙ সাদা এবং উহা গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালেই বেশি ফোটে। ফুল একদলমণ্ডলবিশিষ্ট (সিঙ্গল) বা বহুদলমণ্ডলবিশিষ্ট (ডাবল)— দুই প্রকারের হয়। শাখাকলম (কাটিং) বা গুলকলম (গুটি) প্রক্রিয়ায় টগরের বংশবিস্তার হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫১।

তরুণকুমার বসু

টড, জেম্‌স (১৭৮২-১৮৩৫ খ্রী) ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে জন্ম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনা-বিভাগের ক্যাডেট হিসাবে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমস টড বাংলা দেশে আসেন। ১৮০০ সালে তিনি বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রির লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হন। তাহার তত্ত্বাবধানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জরিপ করা হয় এবং অনেক ভৌগোলিক তথ্য সংগৃহীত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিণ্ডারী দমনের জন্য [illegible] গোয়েন্দা বিভাগটি সংগঠিত করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে টড পশ্চিম রাজপুতানার (রাজস্থান) পোলিটিকাল এজেন্ট নিযুক্ত হন এবং এই অঞ্চলের বহু উন্নতি সাধন করিবার পর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তিনি ঐ পদে ইস্তফা দেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের পদে নিযুক্ত হন। সন্ন্যাসরোগে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে টডের মৃত্যু হয়। রাজস্থানে বসবাসকালে টড রাজপুত জাতির বীরত্ব ও মহত্ত্বের জন্য এই জাতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু পরিশ্রমের পর তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'অ্যানাল্‌স অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান' নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন (১৮২৯-৩২ খ্রী)। পুস্তকটির প্রায় অর্ধাংশে রাজপুতদিগের ইতিহাস বিবৃত আছে। বাকি অংশে বিভিন্ন রাজপুত জাতির বংশাবলী, তাঁহাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, শাসন ব্যবস্থা এবং লেখকের রাজপুতানার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের বর্ণনা আছে। তথ্যাদির অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তি থাকিলেও ভারতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠকের নিকট এই গ্রন্থটির যথেষ্ট মূল্য আছে। টডের রচিত অপর গ্রন্থ 'ট্রাভেল্‌স ইন ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া' তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

দীপকরঞ্জন দাস

টন্‌সিল কয়েকটি লসিকাগ্রন্থির (লিম্‌ফ গ্ল্যাণ্ড) সমাহার। গলার ভিতর আলজিবের দুই পার্শ্বে দুইটি

টন্‌সিল অবস্থিত। মুখ দিয়া কোনও রোগজীবাণু বা বিষের প্রবেশ ঘটিলে টনসিল তাহাদের ছাঁকিয়া রাখিয়া ও বিনষ্ট করিয়া রক্তস্রোতকে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত রাখিতে সাহায্য করে। টন্‌সিলের লসিকাগ্রন্থিগুলিতে লিম্‌ফোসাইট নামক একপ্রকার শ্বেত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। টনসিলের রোগ প্রধানত: দুই প্রকার—প্রদাহ ও টিস্যু-বৃদ্ধি (টিউমার)। প্রদাহ কঠিন বা পুরাতন হইতে পারে; উষ্ণ লবণজলে কণ্ঠ ধৌত করা, পেনিসিলিন ও সাল্‌ফা-বর্গীয় ঔষধ প্রয়োগ এবং প্রয়োজনমত অস্ত্রোপচারের দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত টন্‌সিলের অপসারণ বিধেয়। টনসিলের টিস্যুবৃদ্ধির ফলে সার্কোমা-জাতীয় ক্যান্সার হইতে পারে।

দ্র J. P. Stewart & R. B Lumsden, *Logan Turner's Diseases of the Nose, Throat and Ear*, Bristol, 1961.

জীবনকুমার সেনগুপ্ত

টপ্পা উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরির সহিত টপ্পার একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফকীরুল্লাহ্-এর 'রাগদর্পণ' (১৬৬৬ খ্রী) নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, প্রাচীন টপ্পা পাঞ্জাব অঞ্চলের উষ্ট্রচালকদের গান ছিল। ইহার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রদান করা হয় নাই। টপ্পায় 'জম্‌জমা' নামে একপ্রকার দ্রুত তান প্রচলিত আছে। 'জম্‌জমা' বা 'জির্‌জিমা' শব্দে আরবীয় ভাষায় দলবদ্ধ উষ্ট্র বোঝায়। উষ্ট্রচালকগণ মরুপথ অতিক্রম করিবার সময় একপ্রকার গান করিত। লাহোরে এই সকল উষ্ট্রযূথ বদলানো হইত। এইভাবে পাঞ্জাবের উষ্ট্রচালকগণের মধ্যে একপ্রকার গানের প্রচলন হওয়া স্বাভাবিক এবং এইরূপ ধারণার ইহাই ভিত্তি বলিয়া মনে হয়। পারসীক ভাষায় 'জম্‌জমা' শব্দে সুর করিয়া পাঠ বোঝায় এবং সংগীতেও ইহা প্রযুক্ত হইত। হিন্দীতে 'টপ্পা' শব্দের উদ্ভব কিরূপে হইয়াছে তাহা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা কঠিন। 'টপ্পা' শব্দের অর্থ লম্ফ। ইহার গতি এবং তান উল্লম্ফনযুক্ত হওয়াতে এই নামকরণ হইয়াছে এইরূপ অনুমানও অনেকে পোষণ করেন।

টপ্পার দুইটি তুক—স্থায়ী ও অন্তরা। ইহার সহিত দ্রুত খেয়ালের গভীর সাদৃশ্য বর্তমান। প্রাচীন টপ্পায় প্রায়ই শোরীর নামে ভণিতা পাওয়া যায়। শোনা যায়, অযোধ্যানিবাসী গোলাম নবী টপ্পার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং তদীয় ক্ষুদ্র গীতগুলিতে তাঁহার প্রণয়িনী শোরীর নাম যুক্ত করেন। অনেকের মতে শোরী গোলাম নবীর স্ত্রী ছিলেন। গোলাম নবী ৫০ বৎসর বয়সে অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকের প্রথমে পরলোক-গমন করেন বলিয়া কথিত আছে। টপ্পায় ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, কাফি, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া প্রভৃতি কয়েকটি রাগ ব্যবহৃত হয় এবং ইহা মূলত: করুণ রসাত্মক প্রণয়-সংগীত।

বাংলায় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে টপ্পার প্রচলন হয়। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) বাংলা টপ্পার পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত হন। বাংলা টপ্পা সর্বোতোভাবে পাঞ্জাবী টপ্পার অনুকরণ নহে। ইহাকে বাঙালীর প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী বিন্যাস করা হইয়াছে এবং ইহাতে দ্রুত তানের পরিবর্তে আন্দোলনযুক্ত তান ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলায় টপ্পার আবেদন এত মধুর এবং গভীর হইয়াছিল যে উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সংগীতজ্ঞ সুললিত টপ্পা রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে রাধামোহন সেন, কালী মীর্জা, শ্রীধর কথক, দাশরথি রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আগমনী, শ্যামাসংগীত, ভক্তিরসাশ্রিত সংগীতে টপ্পার প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছে।

দ্র ফকীরুল্লাহ্, রাগদর্পণ, ফার্সী পুঁথি, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা; ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সংগীতসার, কলিকাতা, ১৮৬৯; কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতসূত্রসার, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৩৪, N. Augustus Willard, *A Treatise on the Music of Hindusthan*, 1834.

রাজ্যেশ্বর মিত্র

টপ্পা বলিতে ক্ষুদায়তন আদিরসাত্মক একপ্রকার সংগীত বুঝায়। বাংলায় টপ্পার প্রবর্তক নিধুবাবু ইহাতে আরও বৈচিত্র্য আনিয়াছিলেন।

নিধুবাবু কার্যোপলক্ষে ছিরণ ছাপরায় ছিলেন। সেইখানে তাঁহার হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষা হয়। সেখানে থাকিতে তিনি হিন্দুস্থানী রীতিতে বাংলা গান শিখিতে শুরু করিয়া-ছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি হিন্দুস্থানী টপ্পা বাংলায় চালু করেন।

নিধুবাবুর প্রভাবেই সমসাময়িক চটুল গীতিসাহিত্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও টপ্পা একটি সুন্দর শিল্পরূপ অর্জন করিয়াছিল। ইহা সম্ভব হইয়াছিল সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয়ের ফলে। সংস্কৃতের শ্লোক অথবা

শতক-জাতীয় রচনারীতির মধ্যে যে বুদ্ধিদীপ্তি, গাঢ়বদ্ধতা এবং কৌতুকরসের স্পর্শ পাওয়া যায় টপ্পার পূর্বে বাংলা ভাষায় তাহা ছিল না। টপ্পার শব্দচয়নও কবিগান বা তদনুরূপ অন্যান্য সংগীতের তুলনায় বহু গুণে মার্জিত। নিধুবাবুর পর ভাল টপ্পা রচনাকার এবং গানের রচয়িতাদের মধ্যে শ্রীধর কথক (জন্ম ১৮১৬ খ্রী), রাধামোহন সেন ও কালী মীর্জা উল্লেখযোগ্য।

ভবতোষ দত্ত

টমসন, জর্জ (১৮০৪-৭৮ খ্রী) মানবপ্রেমিক ও ভারত-হিতৈষী জর্জ টমসন ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুন লিভারপুলে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহেই তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় যান। ভারতবর্ষের হিতার্থে লণ্ডনে যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় (জুলাই, ১৮৩৯ খ্রী), টমসন তাহার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিলাতে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাবলী সুবিদিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে টমসনকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং নব্য-বঙ্গের নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহারা টমসনের সহায়তায় বিলাতের সভার আদর্শে কলিকাতায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন (২০ এপ্রিল, ১৮৪৩ খ্রী)। টমসন কলিকাতায় যেসব বক্তৃতা দেন তাহার দ্বারা ভারতীয়গণ বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন (১৮৪৭-৫২ খ্রী)। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে টমসন পুনরায় ভারতবর্ষে আসেন। এই সময় আদালতে বিচার বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্ত যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাতে তিনি ভারতবাসীদের পক্ষে ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাতেও তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদকল্পে তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় আমেরিকায় যান। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে এবং বিলাতে 'অ্যান্টি-কর্ন লীগ' আন্দোলনে তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা স্মরণীয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর টমসনের মৃত্যু হয়।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলিকাতা, ১৯৪০; Bimanbihari Majumdar, *History of Political Thought from Rammohun to Dayanand, 1821-1824*, Calcutta, 1934.

যোগেশচন্দ্র বাগল

টমসন, জোসেফ জন (১৮৫৬-১৯৪০ খ্রী) সুবিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ্। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর ম্যাঞ্চেস্টারের নিকটবর্তী চিঠাম হিল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যাঞ্চেস্টারের ওয়েন্স কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়সেই তিনি অসাধারণ মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ক্যাথোড রে ('ক্যাথোড রে' দ্র) সম্পর্কে গবেষণার ফলে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলেকট্রন ('ইলেকট্রন' দ্র) আবিষ্কার করেন এবং ইহার বিদ্যুৎ পরিমাণ, ভর ও গতিবেগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের রয়্যাল সোসাইটির এক সভায় তিনি এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় মৌলিক অবদানের জন্য তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল তিনি ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন। এখানে তাঁহার এবং তাঁহার সহকর্মীদের গবেষণার ফলে তেজস্ক্রিয়তা এবং পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র জি. পি. টমসনও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট টমসন পরলোকগমন করেন এবং ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

অমরেন্দ্রনাথ রায়

টমাস, ফ্রেডরিক উইলিয়ম (১৮৬৭-১৯৫৬ খ্রী) ইংরেজ ভারততত্ত্ববিদ্। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ জন্ম। কেমব্রিজে গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা অধ্যয়ন সূত্রে কাওয়েল (১৮২৬-১৯০৩ খ্রী) এর নিকট টমাসের প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা। তাঁহার কর্মজীবনের শুরু ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে— তিনি প্রথমে সহকারী গ্রন্থাগারিক (১৮৯৮ খ্রী) ও পরে গ্রন্থাগারিক (১৯০৩ খ্রী) হন। চব্বিশ বৎসর এই পদে নিযুক্ত থাকিবার পর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে টমাস অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বৎসর পরে ঐ পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ইতিহাস, দর্শন ও ভাষা— ভারত-বিদ্যার এই তিনটি শাখা টমাসের গবেষণায় সমৃদ্ধ। ভারত-ইতিহাস বিষয়ে

তাঁহার রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় -প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্তর্গত প্রবন্ধাবলী, 'এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা'-র (১৩-১৬ খণ্ড) সম্পাদনা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডারশিপ বক্তৃতামালা 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইট্স এক্সপ্যানসন' (১৯৪২ খ্রী)।

দেলা-ভালে পুসাঁ (L. de La Vallée Poussin)-এর সহিত যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' (১৯০২ খ্রী) এবং 'আউটলাইন্স অফ জৈনিজম্' (১৯১৬ খ্রী) গ্রন্থে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম সম্পর্কে টমাসের গবেষণার পরিচয় আছে।

টমাস প্রাচীন তিব্বতী ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। শেষজীবনে দীর্ঘ কাল তিনি স্টাইন-সংগ্রহের পুথি লইয়া গবেষণায় রত ছিলেন। এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হইয়াছে 'টিবেটান লিটররি টেক্সটস অ্যাণ্ড ডকুমেন্ট্‌স্ কনসার্নিং চাইনীজ তুর্কিস্তান' গ্রন্থের ৩টি খণ্ডে (১৯৩৩, ১৯৫১, ১৯৫৫ খ্রী)। লুপ্ত 'নাম' ভাষাটিকে তিনি পুনরুদ্ধার করিয়া তাহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন— 'নাম. অ্যান এনশেন্ট ল্যাঙ্গোয়েজ অফ দি সিনো টিবেটান বর্ডারল্যাণ্ড' (১৯৪৮ খ্রী) গ্রন্থে। ইহা ছাড়া উত্তর পশ্চিমা প্রাকৃত সম্পর্কে তাহার মূল্যবান প্রবন্ধাবলী বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যার ব্যাপকতায় এবং গভীরতায় টমাস ঐ যুগের প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫, L. D. Barnett, 'Obituary', *Journal of the Royal Asiatic Society* 1957; Shoson Miyamoto, 'Obituary', *Journal of Indian and Buddhist Studies*, vol. VI, no. 2, 1958

তাপস মুখোপাধ্যায়

টমাটো, টোমাটো বেগুন গোত্রের (ফামিলি সোলানাসিঈ, Family-Solanaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম লিকোপেসিকম এসকুলেন্টম (*Lycopersicum esculentum*)। আদি জন্মভূমি মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো অঞ্চল। টমাটো গাছের পত্র সরল ও একান্তর। ফুল উভলিঙ্গ, ফুলে পাঁচটি যুক্ত বৃত্যংশ ও পাঁচটি যুক্তদল বর্তমান। ফল শাঁসালো, বেরিজাতীয় ও বহু বীজে পূর্ণ। কাঁচা ফল সবুজ, সুপক্ব ফল পীত বা রক্ত বর্ণ। ফলে শতকরা প্রায় ৯৪ ভাগ জল, ৪ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ১ ভাগ প্রোটিন, ০·৩ ভাগ স্নেহপদার্থ, ০·৬ ভাগ অজৈব লবণ ও কিছু পরিমাণে ভিটামিন এ, বি এবং সি আছে। বিভিন্ন ভিটামিনের উৎস হিসাবে ফল পুষ্টিকর খাদ্য। সুপক্ব টমাটো ফল হিসাবে এবং চাটনি, জেলি, সস প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

টর্পেডো সিগারেটের আকৃতিবিশিষ্ট প্রায় ১২০০ হইতে ১৬০০ কিলোগ্রাম ওজনের স্বয়ংচালিত জাহাজধ্বংসকারী একপ্রকারের ডুবো বোমা।

টর্পেডোয় সাধারণতঃ চারিটি অংশ থাকে : ১. সম্মুখভাগ। এই অংশে শ্রবণ এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি থাকে। ইহাদের দ্বারা টর্পেডো শত্রুজাহাজের অনুসন্ধান এবং পশ্চাদ্ধাবন করে। ২. বিস্ফোরক কক্ষ। ঐ স্থানে বারুদ এবং বিস্ফোরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রক্ষিত থাকে। ৩. চালন কক্ষ। এই স্থান ব্যাটারি এবং ইলেকট্রিক মোটর অথবা ইঞ্জিনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ৪. পশ্চাদ্‌ভাগ এই স্থানে নিয়ন্ত্রণ এবং স্বয়ংচালনের যন্ত্রপাতি রাখা থাকে। জলের নীচে বা উপর হইতে টর্পেডো নিক্ষেপ করা যায়। নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লিভারের সাহায্যে চালন-কক্ষের যন্ত্রপাতি সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং টর্পেডো সম্মুখ দিকে ধাবিত হয়। একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার ফলে টর্পেডোর ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পূর্বে স্বয়ংক্রিয় বিস্ফোরক দ্রব্য বিস্ফোরণের উপযোগী হইয়া ওঠে। ইতিমধ্যে দূরবর্তী শত্রু-জাহাজের ইঞ্জিন অথবা চালক-পাখার (প্রপেলার) শব্দ অনুসন্ধানে শ্রবণ-প্রকোষ্ঠ ব্রতী হয়। যখন টর্পেডোর শ্রবণেন্দ্রিয় লক্ষ্যের সন্ধান পায়, তখন টর্পেডো সরাসরি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। জাহাজের সন্নিকটে চুম্বকশক্তির দ্বারা অথবা জাহাজের অবয়বে ধাক্কা খাইয়া টর্পেডোর বিস্ফোরণ ঘটে। যদি কোনও টর্পেডো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইতে না পারে তবে সেই টর্পেডোর নিমজ্জন ব্যবস্থাও টর্পেডোর মধ্যেই সন্নিহিত থাকে। টর্পেডো নিক্ষেপক হিসাবে ডুবোজাহাজ ('ডুবোজাহাজ' দ্র) বিশেষ কার্যকর। জলের উপর হইতে টর্পেডো ছোড়ার জন্য টর্পেডো বোট ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু স্থলপথে ও আকাশপথেও টর্পেডোর ব্যবহার অজ্ঞাত নয়। টর্পেডোর ধ্বংসকারী ক্ষমতা বৃদ্ধি হেতু টর্পেডোর গতিবেগ, পাল্লা, আকৃতি, ওজন এবং যন্ত্রপাতির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধে টর্পেডোর নাম সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়— তখন সমস্ত চলমান বোমাকেই

এই নামে অভিহিত করা হইত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার নৌসেনাধ্যক্ষ লুপিস্ স্বয়ংচালিত টর্পেডোর উদ্ভাবন করেন এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হোয়াইটহেড্ 'মাছ টর্পেডো' নামে সর্বপ্রথম টর্পেডো বিক্রয় করেন। জার্মান নৌবাহিনীতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম টর্পেডোর ব্যবহার আরম্ভ হয়। জাপান ও রাশিয়ার যুদ্ধে জাপান টর্পেডো ব্যবহার করে। কিন্তু টর্পেডোর বিধ্বংসী ক্ষমতা কতদূর ভয়াবহ হইতে পারে তাহা গত দুই মহাযুদ্ধে জার্মানী প্রতিপন্ন করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের টর্পেডো কিন্তু বর্তমানের তুলনায় অনেক সাধারণ ছিল। শত্রুজাহাজকে লক্ষ্য করিয়াই টর্পেডো নিক্ষেপ করা হইত এবং টর্পেডো সোজাপথে অগ্রসর হইত। তবে নিক্ষেপের পর টর্পেডোর পশ্চাতে বাতাসের এক মসৃণ রেখা দেখা দিত। এবং ইহা ছাড়া যাত্রাপথে সর্বক্ষণ টর্পেডো হইতে বিশেষ ধরনের আওয়াজ শোনা যাইত। আধুনিক টর্পেডোতে এই জাতীয় ত্রুটি না থাকায় লক্ষ্যবস্তুর নাগাল পাওয়া সহজতর হইয়াছে।

দ্র Peter Bethell, 'The Development of the Torpedo', *Engineering* vols 159-161, London, 1945-46 ; Bureau of Naval Personnel, *Principles of Naval Ordnanace and Gunnery*, Washington, 1959 ; J. F. Brady 'Torpedo Propulsion', *Astronautics and Aeronautics* 1965 ; M F Perry, *Infernal Machines*, Louisiana, 1965

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

টলস্টয় তলস্তয় দ্র

টলেমি (Ptolemy) ক্লাউডিয়স প্তোলেমায়স। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া নামক নগরে টলেমি তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি একাধারে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল এবং সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি পৃথিবীর যে ভৌগোলিক বিবরণ লিখিয়াছিলেন, প্রায় তের শত বৎসর পর্যন্ত তাহাই পণ্ডিত সমাজে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য ছিল।

টলেমি ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতে বহু জনপদ, নদ-নদী, পর্বত, নগরী ও বন্দরের উল্লেখ আছে। তিনি উহাদের প্রত্যেকটির অক্ষাংশ ও ও দ্রাঘিমাও বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গণনায় অনেক ভুল আছে, সুতরাং অধিকাংশ স্থানই ঠিক কোথায় ছিল এবং তাহাদের বর্তমান নাম কি তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু যে কয়েকটি স্থান সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক ধারণা করা যায় তাহার সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নহে।

দ্র R. C Majumdar, *Classical Accounts of India*, Calcutta, 1960.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের প্রবক্তারূপে টলেমি বিখ্যাত। এই মতানুযায়ী ১ নক্ষত্র ও সূর্য বৃত্তপথে (ডেফারেন্ট) পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ২. প্রতি গ্রহের সহিত সংশ্লিষ্ট এক-একটি কল্পগ্রহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া এক-এক 'ডেফারেন্ট' পথে ঘুরিতে থাকে ও প্রকৃত গ্রহটি ঐ ঐ কল্পগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তপথে (এপিসাইক্ল্) ঘোরে এবং ৩ চন্দ্র কেবলমাত্র 'ডেফারেন্ট' পথে আবর্তিত হয়। কোপার্নিকাসের (১৪৭৩ ১৫৪৩ খ্রী) পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানে, ধর্মে ও দর্শনে এই মতেরই প্রাধান্য ছিল। 'কোপার্নিকাস' ও 'জ্যোতির্বিদ্যা' দ্র।

আনন্দ সেন

টাইপ মেশিন মুদ্রণবিদ্যা দ্র

টাইপরাইটার লিখনযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে যন্ত্রের সাহায্যে পর পর অক্ষর সাজাইয়া হাতে লেখার অপেক্ষা বহু দ্রুতগতিতে লেখা হয়।

অনেক সময় হাতের লেখা পাঠোদ্ধার করায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে, কারখানা ও রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যের বৃদ্ধির জন্য লেখার চলন বাড়ে। এ অবস্থায় ছাপার মত পরিষ্কার অথচ ছাপার সুবৃহৎ যন্ত্রের প্রয়োজন হবে না, প্রতি লোকই ব্যবহার করিতে পারে — এমন যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করে।

ইংরেজী একটি পেটেন্ট ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে লওয়া হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতেই কার্যকরভাবে টাইপরাইটার প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রথম টাইপরাইটারগুলিতে এখনকার মত সাজানো কী বোর্ড ছিল না। নানা উন্নতির পর এখন টাইপগুলি চক্রাকারে বা চক্রাংশে সজ্জিত থাকে ও নির্দিষ্ট 'কী' বা চাবি টিপিলে সংশ্লিষ্ট টাইপটি ছাপা হইবার জন্য প্রস্তুত হয় ও ছাপটি কাগজের উপরে পড়ে। এখন কৌটায় কালিযুক্ত ফিতা (রিবন) থাকে এবং উহা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ কৌটা হইতে যন্ত্রচালিত হইয়া বাহির হয়। প্রথম দিকে কি ছাপা হইল তখনই দেখা যাইত না, পরে যান্ত্রিক কৌশলে তাহা সম্ভব হইয়াছে।

নানা ধরনের টাইপরাইটার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। পোর্টেবল টাইপরাইটার প্রথম কার্যকর যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় প্রত্যেক টাইপরাইটার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানই সহজে বহনযোগ্য মেশিন তৈয়ারি করিতেছে। 'নয়েজ্‌লেস টাইপরাইটার' বা 'নিঃশব্দ টাইপরাইটার' নামক যন্ত্রে শব্দ কম হয়, কিন্তু ইহাতে একসঙ্গে বেশি কার্বন কপি ছাপা যায় না এবং ছাপাও খুব ভাল হয় না। ইলেকট্রিক টাইপ-রাইটারে টাইপিস্ট-এর শ্রম কম হয়। ইহাতে ছাপা ভাল হয় এবং বেশি কপি তৈয়ারিও ইহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে। বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার প্রথম চালু হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে।

তদ্ভিন্ন 'অ্যাকাউন্টিং যন্ত্র' টাইপরাইটারের রূপভেদ মাত্র। আজকাল সভ্যদেশে কম্পোজিং এর খরচ বাড়ার জন্য একধরনের টাইপরাইটার তৈয়ারি হইয়াছে (Vari-type) যাহা কম্পোজিং যন্ত্রের কাজ করে। ইহা ছাড়া স্বয়ংক্রিয় টাইপরাইটিং প্রবর্তিত হইয়াছে – টেলিপ্রিণ্টারে তাহারই রূপভেদ দেখা যায়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একপ্রকার ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে মিনিটে ১০০০০০টি হরফ ছাপা সম্ভবপর।

শিল্প-সম্ভাবনার দিক হইতে দেখিলে টাইপরাইটারের প্রচলন যে একটি বিরাট ঘটনা, এ কথা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে তাহার চলন হইয়াছে ইংরেজ আমলে, এখন শিল্পোন্নতির ফলে ইহার বহুল প্রচার হইতেছে।

বিনয় দত্ত

বাংলা টাইপরাইটারের আদি অর্থাৎ প্রথম যন্ত্রটির ৪৬টি চাবিতে ৯২টি চিহ্ন ছিল। নানা কারণে সেই যন্ত্র চালনা করা সহজ ছিল না, টাইপ করার পদ্ধতিতে জটিলতা থাকায় উহার গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। প্রধানতঃ কোর্ট-কাছারির কাজে এবং মিশনারিদের প্রয়োজনে ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকে।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি ৪২টি চাবি-বিশিষ্ট একটি কী-বোর্ড উদ্ভাবন করেন। তদনুযায়ী টাইপরাইটার তৈয়ারি করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও মুদ্রিত লেখার বানান ও লিখনভঙ্গীর সহিত টাইপকরা লেখার দুস্তর পার্থক্য থাকায় আবার নূতন কী-বোর্ড নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। তাই পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহার মারফৎ কী-বোর্ডের নকশা আহ্বান করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একটি চূড়ান্ত নকশা খাড়া করা হয়। স্বাভাবিক যুক্তাক্ষর রচনার অনুকূল এক বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করিয়া রেমিংটনের বিশেষজ্ঞগণ ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪৬টি চাবি-সমন্বিত এই আধুনিক বাংলা টাইপরাইটারটি নির্মাণ করেন।

অমরেন্দ্রকুমার সেন

টাইফয়েড একপ্রকার আন্ত্রিক ব্যাধি। ভারত এবং অন্যান্য উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে এখনও ইহার প্রকোপ যথেষ্ট।

সাল্‌মোনেল্লা টাইফি (*Salmonella typhi*) নামক রোগজীবাণু টাইফয়েড রোগের কারণ। আন্ত্রিক জ্বর আরও দুই প্রকার জীবাণুর দ্বারা ঘটিতে পারে— সাল্‌মোনেল্লা প্যারাটাইফয়েড 'এ' (*S Paratyphoid A*) এবং সাল্‌মোনেল্লা প্যারাটাইফয়েড 'বি', ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত জীবাণুর প্রকোপ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এবং দ্বিতীয়টির প্রকোপ উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে অধিক দেখা যায়। অবশ্য প্যারাটাইফয়েড জীবাণু জনিত জ্বর সাধারণতঃ টাইফয়েড জ্বরের মত প্রাণান্তকর হয় না।

খাদ্যের মধ্য দিয়া টাইফয়েডের সংক্রমণ ঘটে। অন্ত্র হইতে এই জীবাণু উদরের লসিকাগ্রন্থি, প্লীহা ও যকৃতে গিয়া বাসা বাঁধে ও বংশবৃদ্ধি করে। প্রায় ১৪ দিন পরে জীবাণু রক্তে প্রবেশ করে ও রোগের প্রকাশ পাইতে থাকে। অতঃপর জীবাণুগুলি অন্ত্রের গায়ে লসিকাপুঞ্জের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া সেখানে ঘায়ের সৃষ্টি করে, ইহা হইতেই রোগীর মলের সহিত রক্তপাত হইতে পারে।

রোগের শুরুতে অল্প জ্বর থাকে, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে, মাথা ধরে, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। ক্রমে জ্বর বাড়িতে থাকে। সপ্তাহ-খানেক পরে টাইফয়েডের প্রকৃত রূপ দেখা দেয়— মুখ ও ঠোট শুষ্ক হইয়া যায়, জিভের উপর শাদা প্রলেপ পড়ে এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অংশ লাল দেখায়, পেট ফাঁপে, মল তরল হইতে পারে, প্লীহা প্রায়ই একটু বড় হয়, দেহতাপ ১০৩ ৫° ফারেনহাইট (৩৯ ৭১° সেন্টিগ্রেড) হইতে পারে এবং নাড়ির গতি জ্বরের তুলনায় কম থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে শরীরে ঘামের মত লাল দাগ দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে জ্বর আরও বাড়িতে পারে, সাধারণতঃ মাথাব্যথা কমিলেও রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়, মল তরল হয়, প্লীহা আরও বড় হয়, রোগী ভুল বকিতে শুরু করে এবং অন্ত্রে ফুটা হইয়া অথবা রক্তে রোগজীবাণু-ঘটিত অধিবিষ বা টক্সিনের আধিক্য ঘটিয়া মৃত্যু হইতে পারে।

বাঁচিয়া থাকিলে তৃতীয় সপ্তাহে অবস্থা সাধারণতঃ ভালর দিকে যায়। রোগ সারিবার পথে না গেলে অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটে; অর্ধনিমীলিত চক্ষু, বিড় বিড করিয়া বকা, অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থা, হাত দিয়া বিছানার চাদর ধরা ও ছাড়া, নাড়ির ক্ষীণ গতি, ফুসফুসে জলাধিক্য, পেট ফাঁপা ও অজ্ঞানাবস্থায় জলের মত মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

টাইফয়েড সারিয়া গেলেও শতকরা ২-৪ জনের মল-মূত্রে টাইফয়েডের জীবাণু পাওয়া যায়, ইহাদের স্পর্শে টাইফয়েড ছড়ানো অসম্ভব নয়।

ক্লোরামফেনিকল জাতীয় ঔষধ দ্বারা টাইফয়েডের চিকিৎসা করা হয়। অন্ত্রে ফুটা হইলে বা মলের সহিত রক্তপাত ঔষধ প্রয়োগে বন্ধ না হইলে শল্যচিকিৎসা করা যায়।

টাইফয়েডের প্রতিষেধক টিকায় সাল্‌মোনেল্লা টাইফি, সাল্‌মোনেল্লা প্যারাটাইফয়েড 'এ' এবং সাল্‌মোনেল্লা প্যারাটাইফয়েড 'বি' জীবাণু থাকে। বর্তমানে ইহার সহিত 'ভি-আই' (ইংরেজী কথা 'ভিরুলেন্স' হইতে) রোগজীবাণুও মিশানো থাকে। এরূপ টিকার ইন্‌জেকশন দ্বারা দেহে রোগপ্রতিষেধক পদার্থ সৃষ্ট হয়। 'আন্ত্রিক রোগ' ও 'টিকা' দ্র।

ননীগোপাল মজুমদার

টাউন হল কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। নগরীর উন্নয়নকল্পে প্রবর্তিত লটারি কমিটির লটারি-লব্ধ অর্থে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের ইঞ্জিনিয়ার গার্স্টিন এবং এভারির তত্ত্বাবধানে ভবনটি নির্মিত হয়। দ্বিতল ভবনটি ডোরিক স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। উভয়তলেই প্রায় ৪৯ মিটার (১৬২ ফুট) দীর্ঘ ও প্রায় ২০ মিটার (৬৫ ফুট) প্রশস্ত হলঘর আছে। উত্তর ও দক্ষিণে প্রশস্ত দীর্ঘ সোপানাবলী বর্তমান।

প্রথম দিকে লটারি কমিটি ও তৎপরে সরকার স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধানের ভার বহন করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহা কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

এই প্রতিষ্ঠান বহু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্মৃতিবিজড়িত। এখানে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সভার মধ্যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা, সংবাদপত্র শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রস্তাবের সমর্থনসভা, ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদসভা, বিচার-বৈষম্যের দূরীকরণ সম্বন্ধে মেকলের আইনের প্রতিবাদসভা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই ভবনে হিন্দু মেলার উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র বাঙালীর সামরিক শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৈত্রী সম্পর্কে ভাষণ দিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসের সহিতও টাউন হল জড়িত। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতীদ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট তারিখে এখানেই গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম ও সপ্ততিতম জন্মোৎসব টাউন হলে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ে তিনি এখানে কয়েকবার বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। সেযুগে এই ভবনের সোপানশ্রেণী হইতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় ঘোষণা করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী-র সিংহাসনারোহণের ঘোষণা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন সময়ে টাউন হল নানা সরকারি কার্যেও ব্যবহার করা হইয়াছে। ১৮৬৩-৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতলে হাইকোর্ট বসিত। এই ভবনেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি) পত্তন হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পারিষদের অধিবেশন এখানেই বসিত। বর্তমানে এখানে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ও সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এবং ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের দপ্তর অবস্থিত।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

ম'ব। ৬হ

টাঁকশাল ধাতুনির্মিত মুদ্রা তৈয়ারি করার স্থান টাঁকশাল (< টঙ্কশালা) নামে পরিচিত। ইহা সচরাচর সরকারি অথবা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান।

আনুমানিক ৬৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লিডিয়াতে রাজকীয় টাঁকশাল ছিল। লিডিয়ার নিকট হইতে গ্রীস মুদ্রা-নির্মাণবিদ্যা শিক্ষা করে, গ্রীসের নিকট হইতে রোম। ব্রিটেনে রোমক বিজয়ের পূর্বেও টাঁকশাল ছিল। গ্রীক প্রভাবের ফলেই ভারতে মুদ্রাঙ্কণ প্রবর্তিত হয়, এই মতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যেও স্বর্ণমুদ্রার (নিষ্ক) উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে ভারতে মুদ্রার প্রচলন ছিল তাহার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাঙ্কণ ও টাঁকশাল যেমন চীনে, তেমনই ভারতে স্বাধীনভাবেই উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যৌধেয় মুদ্রার ছাঁচগুলি প্রাচীন রোহিতক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় টাঁকশালকেই সূচিত করে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লক্ষণাধ্যক্ষ নামক এক শ্রেণীর কর্মীর কর্মের যে নির্দেশ আছে তাহা রাজকীয় টাঁকশালের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতে মোগল আমলে প্রধান প্রধান শহরে রাজকীয় টাঁকশাল ছিল। উপরন্তু সম্রাটের জয়-স্কন্ধাবার বা সৈন্যবাহিনীর সহিত যুক্ত ভ্রাম্যমাণ টাঁকশালও ছিল। আইন-ই-আকবরীতে টাঁকশালের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের ও তাহাদের কার্য-কলাপের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। প্রাক্-আধুনিক কালে একটি বিশেষ দেশে বহুসংখ্যক টাঁকশাল কাজ করিত। আকবরের সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নগরে টাঁকশালের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০টি। মুসলমান আমলে দিল্লী ও লাহোরের টাঁকশালই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে টাঁকশালের সংখ্যা খুবই পরিমিত; ভারতে এখন মাত্র তিনটি টাঁকশাল বিদ্যমান।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে টাকা তৈয়ারির দুই প্রকার রীতির সন্ধান পাওয়া যায়: ১. ছাঁচে ঢালা পদ্ধতি (কাস্ট ইন মোল্ড) ২. ছাঁচে আঘাত পদ্ধতি (ডাই-স্ট্রাক)। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে পূর্বনির্মিত ক্ষোদিত ছাঁচের ছিদ্রপথে গলিত ধাতু ঢালিয়া দেওয়া হইত। অনেক সময় মুখ্য ও গৌণ ছাঁচ (অব্ভার্স অ্যাণ্ড রিভার্স মোল্ড্স) মুখোমুখি-ভাবে লাগানো হইত; কখনও কখনও অনেকগুলি মুখ্য ছাঁচবাহী কোনও চাকতির সহিত অনুরূপ সংখ্যার গৌণ ছাঁচবিশিষ্ট আর একটি চাকতি লাগানো হইত। যৌধেয় মুদ্রার ছাঁচগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, কয়েক জোড়া চাকতি একের পর এক সাজাইয়া ঐগুলির চারি পাশে মাটির প্রলেপ লাগানো হইত; গলিত ধাতু ঢালার পর ঠাণ্ডা হইলে চাকতিগুলি ভাঙিয়া টাকা বাহির করা হইত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটির প্রধান অঙ্গগুলি ছিল এইরূপ: ক. গলিত ধাতুকে ঢালাই করিয়া ধাতুর বাট নির্মাণ খ. বাট হইতে পাত তৈয়ারি করা গ. পাত হইতে একটি অংশ কাটিয়া লইয়া নির্দিষ্ট ওজনের ও আকারের পিণ্ড (ব্লাঙ্ক) নির্মাণ ঘ. পিণ্ডের উপর পূর্বনির্মিত উৎকীর্ণ ছাঁচ বসাইয়া হাতুড়ির আঘাতের দ্বারা ঐ ছাঁচের ছাপ পিণ্ডের গায়ে আঁকিয়া দেওয়া। কখনও কখনও ধাতুকে গলাইয়া ও ঢালাই করিয়া সরাসরি পিণ্ড তৈয়ারি করা হইত। প্রাচীন ভারতে ছাঁচে-আঘাত প্রথায় তৈয়ারি টাকাগুলি এখন 'পাঞ্চ-মার্ক্‌ড্' মুদ্রা নামে অভিহিত। মুখ্য ও গৌণ দুইটি ছাঁচের মধ্যে ধাতুপিণ্ডকে রাখিয়া হাতুড়ির আঘাতে মুদ্রাঙ্কণের মধ্যযুগীয় পদ্ধতি ভারতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। টাকা অনেক সময় টাঁকশালের পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন যুগের টাকায় নানা ধরনের নকশা দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন অক্ষরের নকশা (মনোগ্রাম), বিচ্ছিন্ন অক্ষররাজি, প্রতীকচিহ্ন, রাজা বা রানীর মুখ ইত্যাদি।

মধ্যযুগের ইওরোপে 'ছাঁচে-আঘাত' পদ্ধতির দ্বারা টাকা তৈয়ারি করার কলা-কৌশলের উন্নতির জন্য বহু নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। যন্ত্রের সাহায্যে টাকা তৈয়ারি করার সূচনা হয় ইটালীতে। পাত নির্মাণের জন্য রোলিং মিল, পাত হইতে গোলাকার চাকি (ডিস্ক) কাটার যন্ত্র, চাকিকে ছাঁচে ফেলিয়া মুদ্রাঙ্কণের জন্য স্ক্রু-প্রেস— এই সকল আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় পারীতে (প্যারিস) ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বোল্টন ও ওয়াট বাষ্পশক্তির দ্বারা স্ক্রু-প্রেস হইতে টাকা তৈয়ারি উদ্ভাবন করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উলহর্ন (Uhlhorn) লেভার প্রেস আবিষ্কার করেন এবং ক্রমে তাহা স্ক্রু-প্রেসের স্থান অধিকার করে।

আধুনিক মুদ্রানির্মাণ পদ্ধতির বিভিন্ন অঙ্গগুলি এইরূপ: ১. ধাতুর শোধন ও মিশ্রণ ২. সংকর ধাতুকে গলাইয়া ও ঢালাই করিয়া বাট নির্মাণ ৩. বাটকে পেষণ করিয়া পাত তৈয়ারি ৪. পাত হইতে চাকি বা 'ব্লাঙ্ক'-এর কর্তন ৫. চাকিগুলিকে 'টেম্পার' করা ও পরিষ্কার করা ৬. চাকিগুলিকে রোল করিয়া তাহার চারি ধার উঁচু করা ৭. মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্রে দুই ছাঁচের মধ্যে চাকিকে রাখিয়া প্রচণ্ড আঘাতের সাহায্যে তাহার দুই দিকে ছাপ তোলা; একই প্রক্রিয়ায় একটি বলয়ের দ্বারা চাকিটি ধৃত হইয়া তাহার কিনারায় খাঁজ কাটা হয়।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে, ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করে।

দ্র G. Macdonald, *The Evolution of Coinage*, Cambridge, 1916; S. K. Chakrovarti, *A Study of Ancient Indian Numismatics*, Mymensingh, 1931; B. Salmi, *The Technique of Casting Coins in Ancient India*, Bombay, 1945; C. T. Seltman, *Greek Coins*, London, 1955; H. W. A. Linecar, *British Commonwealth Coinage*, London, 1959; H. Mattingly, *Roman Coins*, London, 1960; T. D. Monte, *Fell's International Coin Book*, New York, 1961; U. Thakur, 'Mints and Minting in India', *Journal of Numismatic Society of India*, vol. XXIII,

Varanasi, 1961; T. Hanson, *Coin Collecting*, London and Glasgo, 1965

ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে একটি টাঁকশালস্থাপনের অধিকার দেন। উক্ত আছে যে, নবাবের সহিত চুক্তি অনুসারে কলিকাতায় কোম্পানির প্রথম ভারতীয় টাকা ঐ বৎসর মুদ্রিত হয়। তখনকার রীতি ছিল ধাতুখণ্ডকে দুইটি উৎকীর্ণ ছাচের মধ্যে রাখিয়া উপরের ছাঁচকে হাতুড়ির দ্বারা পিটিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা। কাঠকয়লার খোলা চুল্লিতে ধাতু গলানো হইত। পাত তৈয়ার করার রোলিং মিলকে টানিত বহুসংখ্যক শ্রমিক। বাল্টন যন্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত পুরাদস্তুর আধুনিক টাঁকশাল কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। পাঁচ বৎসর পূর্বে মেজর জেনারেল ফর্বেস কলিকাতার ৪৭ নং স্ট্র্যাণ্ড রোডে ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলা হয় কলিকাতার পুরাতন টাঁকশাল। এখানে দৈনিক দুই লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত হইত। পরে এই টাঁকশালে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা এবং তাম্র, নিকেল প্রভৃতি হীন ধাতুর ও তাহাদের সংকরধাতুর মুদ্রা তৈয়ারি হইতে থাকে। ভারতে মুদ্রা নির্মাণে রৌপ্য কিছুকাল পূর্বেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। সম্প্রতি ভারতীয় মুদ্রায় রৌপ্যের ব্যবহার অন্তর্হিত হইয়াছে, অর্থনৈতিক কারণে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে তাম্র, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।

মুদ্রানির্মাণে সংকর ধাতুর ব্যবহার নিম্নলিখিত বিবেচনাগুলির উপর নির্ভর করে: ক. সংকর ধাতুর উপাদান স্বরূপ হীন ধাতুগুলির পর্যাপ্ততা ও মূল্য খ সংকর ধাতুর প্রস্তুতির অনায়াসসাধ্যতা গ. তাহার চেহারা ও অবিকৃততা ঘ. তাহার অঙ্গবিকৃততা ও ঙ তাহাকে জাল করিতে না পারা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কয়নেজ অ্যাক্ট (পরে যেমন যেমন সংশোধিত হইয়াছে সেইগুলি সমেত ভারতীয় মুদ্রাঙ্কণের আইন) অনুসারে বিভিন্ন মূল্যের ভারতীয় মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতু ও সংকরধাতুগুলি এইরূপ:

এক টাকা, ৫০ পয়সা ও ২৫ পয়সা— বিশুদ্ধ নিকেল
১০ পয়সা— তাম্র নিকেল (৭৫% তাম ও ২৫% নিকেল)
৫, ৩, ২ ও ১ পয়সা—অ্যালুমিনিয়াম ম্যাঙ্গানিজ (অ্যালুমিনিয়াম ও তৎসহ ২.৫ হইতে ৪ ম্যাঙ্গানিজ)।

মুদ্রার নির্মাণকার্য প্রতি ধাপেই এমনভাবে পরিচালিত হয় যাহাতে সামান্যতম ভুল বা ত্রুটি না থাকে। প্রতিটি প্রক্রিয়াই সতর্ক দৃষ্টিসহকারে নিয়ন্ত্রিত হয়। নির্ভুল নির্মাণ ও উচ্চাঙ্গের অঙ্কোৎকর্ষের ফলে টাঁকশালে প্রস্তুত মুদ্রাকে জাল করা খুবই কঠিন। মুদ্রার প্রতিটি শ্রেণীর নিজস্ব নির্মাণ সমস্যা আছে এবং কোনও নূতন ধাঁচের মুদ্রার ঢালাও উৎপাদন সম্ভব হইতে বহু সপ্তাহ বা মাস লাগিয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়া, ভুটান, সিংহল, মিশর, পাকিস্তান, সাউদি আরব, স্টেটস সেট্‌লমেন্ট্‌স প্রভৃতি বহু বিদেশী রাষ্ট্রের মুদ্রাও কলিকাতার টাঁকশালে প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দেশীয় রাজাগুলিও এখানে তাহাদের মুদ্রা তৈয়ারি করাইয়া লইত।

মুদ্রার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য কলিকাতায় একটি নূতন টাঁকশালের স্থাপনা সুদীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হয় এবং যুদ্ধের কারণে বন্ধ হইয়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরারব্ধ হয়। অবশেষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাহার আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন সম্পন্ন হয়। ইহাই কলিকাতার নূতন আলিপুর টাঁকশাল। পরে স্ট্র্যাণ্ড রোডের টাঁকশালটি উঠিয়া যায়। আলিপুর টাঁকশালের কর্মীসংখ্যা প্রায় ২০০০। আলিপুর টাঁকশাল ব্যতীত ভারতে বর্তমানে আরও দুইটি টাঁকশাল আছে, একটি বোম্বাইয়ে এবং অপরটি হায়দরাবাদে।

ইংরেজ আমলে ভারতীয় মুদ্রার সম্মুখ (অবভার্স) দিকে ব্রিটেনের রাজার (বা রানীর) মস্তকের ছাপ থাকিত। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মুদ্রার সম্পূর্ণ নূতন নকশার প্রচলন হয়। মুদ্রার সম্মুখ দিকে অঙ্কিত হইল টাকা, আধুলি ও সিকিতে অশোকস্তম্ভের সিংহশীর্ষের প্রতিরূপ এবং নিম্ন মূল্যের মুদ্রাগুলিতে সিংহশীর্ষের পাদদেশে অঙ্কিত বৃষভের প্রতিকৃতি। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল হইতে নূতন দশমিক মুদ্রা চালু হইল এবং তখন হইতে মুদ্রার নকশাগুলিরও নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আলিপুর টাঁকশালের মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্র হইতে দৈনিক প্রায় ৩০ লক্ষ মুদ্রা নির্গত হয়।

মুদ্রাঙ্কণ ব্যতীত টাঁকশাল সরকারি ও আধা-সরকারি সংগঠনের তরফে মেডেল, সম্মানচিহ্ন, ব্যাজ, ক্রেচ প্রভৃতিও তৈয়ারি করে। ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পরমবীরচক্র, মহাবীরচক্র ইত্যাদি টাঁকশালে নির্মিত হয়। সরকারি দপ্তরগুলির তরফে গৌণ ও প্রচলিত প্রামাণিক বাটখারা তৈয়ারি করার কাজ টাঁকশাল করিয়া থাকে। টাঁকশালের আর একটি বাড়তি কাজ হইল বাজারের বাটখারা ও মাপগুলি ঠিক কিনা পরীক্ষা করা এবং ছাঁচ, ইস্পাতের স্ট্যাম্প ও সীল তৈয়ারি করা। জনসাধারণের পক্ষে টাঁকশাল স্বর্ণ ও অন্যান্য মহার্ঘ ধাতু ও সংকর ধাতুকে

গলাইয়া ও কষিয়া দেয়। জাল মুদ্রা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের অভিমত সরবরাহ করিয়া টাঁকশাল পুলিশ-কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে। টাকশালে দুষ্প্রাপ্য ও জাল মুদ্রার এবং জালিয়াতদের যন্ত্রাদির চিত্তাকর্ষক 'শো-কেস' আছে। এখানে একটি ধাতুপরীক্ষা দপ্তর (অ্যাসে ডিপার্টমেন্ট) ও তাহার পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি ও বিদ্যমান।

প্রতাপচন্দ্র টিকু

টাকা মুদ্রাব্যবস্থা দ্র

টাটা ইন্‌স্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ ভারতের অন্যতম জাতীয় বিজ্ঞান-গবেষণাগার। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বোম্বাই সরকার (বর্তমান মহারাষ্ট্র) ও স্যর দোরাবজী টাটা ট্রাস্টের সম্মিলিত এক প্রচেষ্টায় বোম্বাই-এর অ্যাপোলো পায়ার রোডে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল: পদার্থবিদ্যা ও গণিতের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার পরিচালনা। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ব্যয়ভার ভারত সরকার গ্রহণ করায় ইহার পরিচালন বিষয়ে ভারত সরকার, বোম্বাই সরকার এবং টাটা ট্রাস্টের মধ্যে এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল হইতে কার্যকর এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় গবেষণাগার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং উচ্চতর বিজ্ঞানের বিশেষতঃ পারমাণবিক বিজ্ঞানের ও উচ্চ গণিতের গবেষণার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়। ট্রম্বেতে ভারত সরকারের আণবিক শক্তি-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই ইন্‌স্টিটিউটে ভারত সরকারের সমস্ত পারমাণবিক গবেষণাকার্য পরিচালিত হইত। বর্তমানে পদার্থবিদ্যায় যে সকল গবেষণাকার্য পরিচালিত হইতেছে তাহার মধ্যে মহাজাগতিক রশ্মি (কস্‌মিক রে) ও পারমাণবিক বিজ্ঞানে তত্ত্বমূলক কার্য বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ব্যাবহারিক পদার্থবিদ্যা বিভাগে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাপণ, ভূ পদার্থবিদ্যা (জিওফিজিক্স), নিউটন-বিদ্যা, ইলেকট্রনিক্‌স প্রভৃতি শাখায় বহু গবেষণা সাধিত হইতেছে। সংখ্যাতত্ত্ব এবং বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিত বিভাগেও মৌলিক গবেষণা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

সমীরকুমার ঘোষ

টাটা, জামসেদজী (১৮৩৯-১৯০৪ খ্রী) ইনি বরোদা রাজ্যের নভসারী গ্রামে বিশিষ্ট পার্শী পরিবারে ভূমিষ্ঠ হন। বোম্বাই এলফিন্‌স্টোন কলেজে পাঠান্তে তিনি পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে এম্প্রেস কটন মিলের প্রতিষ্ঠা তাঁহার প্রথম শিল্পপ্রয়াস। এই মিলে প্রথম রিং স্পিণ্ডল চালু করিয়া জামসেদজী ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে নবযুগ আনেন।

দেশের শিল্পোন্নয়নে জামসেদজীর প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় হইল: আধুনিক ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের সূচক জামসেদপুরের টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্ক্‌স, ভারতের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্স ও ভারতের একটি বৃহৎ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ-সংস্থা বোম্বাই-এর টাটা হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার স্কিম। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি শিল্প-নগরী জামসেদপুরের বাস্তব রূপায়ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

ব্যক্তিগত দান ও সেবার পরিবর্তে সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা-অনুযায়ী মানুষের হিতসাধন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তারে জামসেদজী এই দেশে অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাঁহার নির্দেশমত প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন টাটা ট্রাস্টগুলি অর্ধশতাব্দী ধরিয়া আতত্রাণ, শিক্ষাপ্রসার, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ক্যান্সার, সমাজবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় সহায়তা করিয়া আসিতেছে। জামসেদজী যে আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 'জামসেদপুর' দ্র।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

টাটানগর জামসেদপুর দ্র

টাণ্ডা মালদহ দ্র

টার্‌বাইন টার্‌বাইন কথাটির উৎপত্তি লাতিন ভাষা হইতে এবং ইহার অর্থ আবর্তনকারী -- যে বস্তু আবর্তন করে। গতিশীল জল, বাষ্প এবং গ্যাস-জাতীয় কোনও তরল পদার্থের ক্ষমতার দ্বারা যে চক্রকে ঘোরানো যায়, তাহাকে টার্‌বাইন বলে। এই চক্র তরল পদার্থের ক্ষমতাকে শক্তিতে পরিণত করে এবং এই শক্তিকে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। ঘুরন্ত টার্‌-বাইন কল-কারখানায় ব্যবহৃত হয় বা সাধারণের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বিশাল আয়তনের জাহাজ এবং অনেক উড়োজাহাজ চালনায় টার্‌বাইন অপরিহার্য।

টার্‌বাইন প্রধানতঃ তিন প্রকারের: ১. জল ২. বাষ্প

এবং ৩. গ্যাস। এতদ্ব্যতীত হাওয়া-টার্বাইনেরও বিশেষ সীমাবদ্ধ ব্যবহার আছে।

বাঁধের সন্নিকটে কিংবা জলপ্রপাতে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের নিমিত্ত জল-টার্বাইন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। জল-টার্বাইনের শক্তি নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর: ১. প্রবাহিত জলের আয়তন বা পরিমাণ ২. উচ্চ স্থান হইতে জল পড়িয়া টার্বাইন চক্রকে আঘাত করিবার পূর্ব পর্যন্ত জলের পতন পথের দৈর্ঘ্য। বাঁধ দ্বারা আবদ্ধ নদীর ক্ষেত্রে এই দূরত্ব প্রায় ৩০০ মিটার পর্যন্ত হয়, কিন্তু পার্বত্য প্রদেশে ইহা ১৫০০ মিটার হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়।

বাষ্পীয় টার্বাইন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যন্ত্রের অন্যতম। বাষ্পীয় টার্বাইনে জলের পরিবর্তে উচ্চ চাপের বাষ্প ব্যবহার করা হয়। টার্বাইনের একপ্রান্তে বাষ্প প্রবেশ করে ও টার্বাইনের ভিতর ধাবিত হইবার কালে এই বাষ্পের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং টার্বাইন-চক্রকে আবর্তিত করে। টার্বাইনের অপর প্রান্তে বাষ্প তরল করিবার যে যন্ত্র থাকে, তাহা এক শূন্য স্থানের সৃষ্টি করে এবং ব্যবহৃত বাষ্পকে জলে পরিণত করে এবং এই শূন্য স্থান টার্বাইন মারফত বাষ্প শোষণ করে। পিস্টন-ইঞ্জিন অপেক্ষা বাষ্পীয় টার্বাইন অনেক বেশি কার্যকর।

গ্যাস-টার্বাইনও বাষ্পীয় টার্বাইনের মতই কাজ করে, কিন্তু কেবল বাষ্পের পরিবর্তে ইহাতে উত্তপ্ত গ্যাস ব্যবহার করা হয়। গ্যাস-টার্বাইনে ব্যবহার্য জ্বালানি পদার্থ হইতেছে তৈল, কেরোসিন অথবা প্রাকৃতিক গ্যাস। সমপরিমাণ শক্তি উৎপাদনে গ্যাস-টার্বাইন বাষ্পীয় টার্বাইন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ও হালকা। জলযান, উড়োজাহাজ, রেলের ইঞ্জিন, পরীক্ষামূলকভাবে মোটর গাড়ি চালনায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস-টার্বাইন ব্যবহৃত হইতেছে।

জল-টার্বাইন এতই প্রাচীন যে ইহার আবিষ্কর্তার নাম আজও অজ্ঞাত। গ্রীস, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অধিবাসীরা শস্য চূর্ণনে এবং সেচ কার্যে জল-টার্বাইন ব্যবহার করিত। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফুর্নের নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়র সর্বপ্রথম কার্যকরভাবে ৫০ অশ্ব-শক্তিবিশিষ্ট এক জল-টার্বাইন উদ্ভাবন করেন। বাতাস-টারবাইনের প্রথম প্রচলন দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইওরোপে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের লাভাল এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়র পার্সন পৃথকভাবে দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বাষ্পীয় টার্বাইন আবিষ্কার করেন। গ্যাস-টার্বাইনের আবিষ্কার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হইলেও এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা হইতে, কারণ গ্যাস-টার্বাইনে যে উচ্চ তাপ ব্যবহার করা হয় তাহার জন্য টার্বাইন-নির্মাণের উপযুক্ত মিশ্রিত ধাতুর আবিষ্কার হয় গত মহাযুদ্ধের পর। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে গ্যাস-টার্বাইনে পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চলিতেছে।

দ্র J. F. Lee, *The Theory and Design of Steam and Gas Turbines*, 1953; J. J. Doland, *Hydro Power Engineering*, New York, 1954.

রমেশ্বর ভট্টাচার্য

টার্নার, জোসেফ ম্যালর্ড উইলিয়াম (১৭৭৫-১৮৫১খ্রী) ইংরেজ চিত্রকর। টার্নার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ছিলেন নাপিত। টার্নার বিশেষ কিছু লেখাপড়া শেখেন নাই। রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে তাঁহার শিল্প-শিক্ষা শুরু হয়। টার্নার ও গার্টিন জলরঙের চিত্রশিল্পকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি তাহার তেল রঙের কাজ শুরু করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাপোলেঁ-লুণ্ঠিত চিত্রগুলির এক প্রদর্শনী পারার (প্যারিস) ল্যুভ্‌র সংগ্রহশালায় দেখিতে যান এবং প্রদর্শিত ডাচ্‌ ও ভেনিসীয় শিল্পীদের রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর আলোর খেলার বিচিত্র প্রকাশ তাঁহার চিত্রে প্রাধান্য পায়। এই সময় টার্নারকে অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। তিনি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল অ্যাকাডেমির সদস্য হন এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার সহ-সভাপতি হন। মৃত্যুকালে তিনি ২০০০০ পাউণ্ড অ্যাকাডেমিকে দান করেন। টার্নার জাতির প্রতি অর্পিত দানপত্রে প্রায় ৩০০ তেলরঙ এবং ২০০০০ জলরঙ ও রেখাচিত্র দান করিয়া যান। তাঁহার চিত্রের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহগুলি লণ্ডনের ন্যাশন্যাল গ্যালারি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া ও অ্যাল্‌বার্ট সংগ্রহশালায় সংগৃহীত। এইগুলি ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা জাতীয় সংগ্রহশালায় তাঁহার বহু চিত্র ছড়াইয়া আছে। প্রকৃতির সহিত একাত্মতায় টার্নার জল, মাটি, আকাশ-বাতাস, মেঘ-রৌদ্রের এবং বিশেষ করিয়া কুয়াশার রূপ তাঁহার নিসর্গ চিত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শিপ্রা আদিত্য

টার্ফ ক্লাব ঘোড়দৌড় দ্র

টার্শিয়ারি নবজীবীয় অধিকল্পের (cainozoic era, কাইনোজোয়িক্ এরা) দুইটি ভাগের মধ্যে প্রাচীনতর যুগটির নামকরণ হইয়াছে 'টার্শিয়ারি' (tertiary)। এই যুগটি প্রায় সাতকোটিবর্ষ স্থায়ী।

টার্শিয়ারি যুগ ও ঐ যুগের শিলাসমষ্টিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে : প্লায়োসিন (pliocene), মায়োসিন (miocene), অলিগোসিন (oligocene), ইয়োসিন (eocene) ও প্যালিয়োসিন (paleocene)।

এই যুগের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল : ১. পৃথিবীর স্থলভাগের বর্তমান বিন্যাস-সৃষ্টি ২. পাখি, ঘাস, স্তন্যপায়ী জীব, গুপ্তবীজী উদ্ভিদ (অ্যান্জিওস্পার্ম) ইত্যাদির দ্রুত বিকাশ ৩. ব্যাপক আগ্নেয়োচ্ছ্বাস এবং ৪. ভূ-ত্বকে প্রবল আন্দোলন।

হিমালয় ও আল্পস পর্বতমালার উত্তোলন টার্শিয়ারি যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা। এই যুগের শিলা ভারতে হিমালয়ের দক্ষিণাংশে (আসাম হইতে পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর), পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল, রাজস্থান, গুজরাত এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গের পলিমাটির নীচে এই যুগের পাললিক শিলার এক পুরু সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

টার্শিয়ারি যুগকে 'স্তন্যপায়ী জীবের যুগ' বলা হইয়াছে। হাতি, গোরু, ঘোড়া, গণ্ডার, সিংহ, বাঘ, বনমানুষ প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ এই সময়েই ঘটে। ইহাদের অনেকেই (যথা হাতি ও ঘোড়া) বাহির হইতে ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। গুপ্তবীজী উদ্ভিদকুল এই সময়ে দ্রুত বিস্তারলাভ ও আধুনিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। স্তন্যপায়ীর জীবাশ্ম সঞ্চয়ের দিক দিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিবালিক শিলাগোষ্ঠীর গুরুত্ব আছে। এই যুগে জলবায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র ছিল, কিন্তু যুগের শেষে ইহা ক্রমশঃ শীতল হইয়া পড়ে। এই যুগের বিশিষ্ট ভারতীয় খনিজ সম্পদের মধ্যে বিটুমিনাস কয়লা (আসাম), লিগ্নাইট (নেভেলি ও বিকানীর), খনিজ তৈল (আসাম ও গুজরাত) এবং চুনা পাথর প্রধান।

দ্র M. G. Wilmarth, 'Geologic Time Classification of United States Geological Survey Compared with Other Classifications', *U. S. Geological Survey Bulletin*, 769, 1925 ; D. N. Wadia, *Geology of India*, London, 1953 ; M. S. Krishnan, *Geology of India and Burma*, Madras, 1960.

গৌরীশংকর ঘটক

টালি পোড়ামাটির ফলক। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ভারতবর্ষে টালির প্রচলন ছিল। মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় টালির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আজকাল যান্ত্রিক চাপে নির্দিষ্ট-গুণসম্পন্ন মাটিকে বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া ও আগুনে পোড়াইয়া টালি প্রস্তুত হয়। ব্যবহার অনুযায়ী ৪ ধরনের টালি আছে : ১ ছাদ ২. মেঝে ৩. দেওয়াল এবং ৪. নালার টালি। ভারতীয় মানক-সংস্থা টালির মাপ, সংকোচন-সীমা এবং জলশোষণ-সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ছাদের জন্য যে টালি ব্যবহৃত হয়, তাহার মাপ মোটামুটি ৩২ × ২১, ৩৪ × ২১ ও ৩৫ × ২১ সেন্টিমিটার এবং ওজন ২-৩ কিলোগ্রাম। এইসব টালিতে জোড় লাগাইবার জন্য অন্ততঃ দুইটি খাঁজ ও অনুরূপ দুইটি উঁচু শিরা থাকে। মেঝের টালির মাপ ১৫ × ১৫, ২০ × ২০ এবং ২২.৫ × ২২.৫ সেন্টিমিটার হয়। দেওয়ালের টালি, বিশেষ করিয়া স্নানাগারে ও হাসপাতালে ব্যবহৃত হয়। এই টালির মাপ ১০ × ১০, ১৫ × ১৫ সেন্টিমিটার, ইহা ৬.৫, ৮ ও ৯.৫ মিলিমিটার পুরু হয়।

টালি তৈয়ারি করিয়া চিক্কণ প্রলেপ দিয়া আবার আগুনে পোড়াইলে চাকচিক্য বাড়ে। মেঝে ঢাকিবার জন্য যে টালি ব্যবহৃত হয় তাহা নানা আভাযুক্ত ও বর্ণ-বৈচিত্র্য-সমন্বিত হইতে পারে।

তেরাৎসো (terrazo) হইতেছে শাদা বা রঙিন সিমেন্ট ও পাথরের কুচি দিয়া তৈয়ারি মেঝে ঢাকিবার একপ্রকার টালি। ইহাকে ঘষিয়া মসৃণ ও চাকচিক্যময় করা যায়। 'টেরাকোটা' দ্র।

অমূল্যধন দেব

টালির নালা আদিগঙ্গা দ্র

ট্যাঙ্ক সহজভাবে চলাচল, শত্রুসৈন্যের উপর গুলিবর্ষণের ক্ষমতা, যানচালকদের নিরাপত্তা এবং ঝটিকা আক্রমণ প্রভৃতি গুণাবলীসমন্বিত স্বয়ংচালিত যুদ্ধযানকেই ট্যাঙ্ক বলা হয়।

যদিও ট্যাঙ্ক প্রথম মহাযুদ্ধেরই অবদান তবুও এ কথা বলা যাইতে পারে যে ইহার কার্যপ্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ যুদ্ধযান, যথা— আসিরীয় সভ্যতায় রথ অথবা যুবলাই খানের বর্মাবৃত

হস্তী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে, এমনকি রামায়ণ ও মহাভারতেও ইহাদের উল্লেখ আছে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আইনের (Aisne) যুদ্ধে প্রমাণ হইয়া গেল যে মেশিনগানের বাধা অতিক্রম করিতে না পারিলে আধুনিক যুদ্ধ ট্রেঞ্চের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, ফলে এমন একটি যুদ্ধযানের প্রয়োজন অনুভূত হইল যাহা মেশিনগান এবং ট্রেঞ্চের বাধা অতিক্রম করিতে পারিবে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ সৈন্যদলের ই. ডি. স্যুইনটন আমেরিকার হোল্ট্-ক্যাটরপিলার ট্র্যাক্টরকে যুদ্ধযান হিসাবে ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। প্রায় একই সময়ে টি. জি. টুলক (T. G. Tulloch) নামে আর একজন ব্রিটিশ আধিকারিক, সাধারণ গুলিবর্ষণের বাধা অতিক্রমে সক্ষম একপ্রকার স্থলযানের ধারণা দিলেন। ইহাদের ধারণা অনুযায়ী কাজও শুরু হইয়া গেল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম ট্যাঙ্ক তৈয়ারি হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর সোমের (Somme) যুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদল অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে প্রথম ট্যাঙ্ক (৪৯টি) ব্যবহার করে। এই ট্যাঙ্কের নামকরণ হয় মার্ক-১ (Mark-1)। দুইটি ৫৭ মিলিমিটার কামান ও ৬টি মেশিনগান-সংবলিত এই ট্যাঙ্কের ওজন ছিল ৩১ টন। দৈর্ঘ্যে ২৬ ফুট ৫ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৮ ফুট, এই ট্যাঙ্ক ১০৫ অশ্ব-শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘণ্টায় ৩.৭ মাইল চলিতে পারিত। একবার তৈল ভর্তি করিলে ইহা প্রায় ১২ মাইল চলিতে পারিত।

ইহার পরে পর্যায়ক্রমে ফ্রান্স, জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ট্যাঙ্ক তৈয়ারি ও ব্যবহার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত, বিভিন্ন দেশে হালকা ও ভারি উভয় প্রকার ট্যাঙ্কেরই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ভারি ট্যাঙ্কের উন্নতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইহাদের মধ্যে জার্মানীর কিংটাইগার, ব্রিটেনের চার্চিল-৭, যুক্তরাষ্ট্রের এম্-৬ এবং রাশিয়ার টি৩৪ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক ট্যাঙ্কে যানচালকদের সুখ-সুবিধা ও বেতার-যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে। ইহাদের গতিবেগ হালকা ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ঘণ্টায় ৪৫ মাইল ও ভারি ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ২০-২২ মাইল হইয়া থাকে।

দ্র R. J. Icks, *Tanks and Armoured Vehicles*, New York, 1945.

সুধেন্দুপ্রসাদ বসু

ট্যানারি চর্ম ও চর্মশিল্প দ্র

ট্যানিং চর্মশিল্প দ্র

ট্যাপিওকা কাসাভা গাছের মূল হইতে নিষ্কাশিত কার্বোহাইড্রেট-প্রধান খাদ্য। কাসাভা এরণ্ড গোত্রের (ফ্যামিলি-এউফোর্বিয়াসিঈ, Family-Euphorbiaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী, বহুবর্ষজীবী, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। দুই প্রজাতির কাসাভা গাছ দেখা যায়: ১. তিক্ত কাসাভা বা মানিহোত এস্কুলান্তা (*Manihot esculanta*) এবং ২. মিষ্ট কাসাভা বা মানিহোত ডুল্সিস (*M dulcis*)। কাসাভার আদি উৎপত্তিস্থল সম্ভবতঃ দক্ষিণ আমেরিকা। বর্তমানে ব্রাজিল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্র, ক্রান্তীয় পশ্চিম আফ্রিকা, সুদান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে কাসাভার চাষ হয়। গাছের কন্দাল (টিউবেরাস) মূলগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিটার ও ব্যাস প্রায় ১৫-২০ সেন্টিমিটার। এই স্ফীতকায় মূলে শ্বেতসার প্রধান খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে। মূল হইতে এই খাদ্যবস্তু নিষ্কাশন করিয়া তাহা উহাকে উত্তাপে শুষ্ক করিলে নিষ্কাশিত খাদ্যবস্তু ঈষদচ্ছ অনিয়তাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হয়, ইহাকেই ট্যাপিওকা বলে। ট্যাপিওকা আমেরিকার আমাজন অববাহিকার আদিবাসীদের অন্যতম প্রধান খাদ্য, বিশ্বের অন্যান্য নানা দেশেও রুটি, পুডিং, স্যুপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে অল্পাধিক ট্যাপিওকা ব্যবহৃত হয়।

ট্যাপিওকায় শতকরা প্রায় ১২.৬ ভাগ জল, ৮৬.১ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ০.৬ ভাগ প্রোটিন, ০.২ ভাগ স্নেহপদার্থ ও ০.২ ভাগ অজৈব লবণ থাকে। কার্বোহাইড্রেট বলিতে থাকে শ্বেতসার ও শর্করা। অজৈব লবণে স্বল্প পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ প্রভৃতি উপাদান বর্তমান। বস্তুতঃ, ট্যাপিওকায় কার্বোহাইড্রেট ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যবস্তুর পরিমাণ খুব সামান্য। ট্যাপিওকায় ভিটামিন নাই।

খাদ্যে চাল, গম প্রভৃতির পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাহার পরিবর্তে ট্যাপিওকা গ্রহণ করা যায়, সেইজন্য ঐ সকল খাদ্যশস্যের বিকল্প হিসাবে ট্যাপিওকার গুরুত্ব আছে। কিন্তু চাল বা গমের পরিবর্তে ট্যাপিওকা খাইলে প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব পূরণ করিবার উপযোগী অন্য খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা প্রয়োজন।

প্রতি ১০০ গ্রাম ট্যাপিওকা হইতে দেহে প্রায় ৩৬০ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। 'খাদ্য' দ্র।

দেবজ্যোতি দাশ

ট্যারিফ বোর্ড আমদানি-শুল্ক, বিশেষ করিয়া সংরক্ষণ-শুল্ক সংক্রান্ত সব প্রকার প্রশ্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য এবং সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক আইন-অনুসারে বা প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে যে সংস্থা নিযুক্ত হয়, তাহার নাম ট্যারিফ বোর্ড বা ট্যারিফ কমিশন।

ভারতে প্রথম ফিস্‌ক্যাল কমিশন (১৯২১-২২ খ্রী) বিচারশীল সংরক্ষণ নীতিকে কার্যকর করার জন্য একটি চিরস্থায়ী ট্যারিফ বোর্ড স্থাপন করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তদানীন্তন ভারত সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ শিল্প-সংরক্ষণের প্রার্থনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্য 'অ্যাডহক' অর্থাৎ এক-বিষয়ক ও ক্ষণস্থায়ী ট্যারিফ বোর্ড নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইস্পাত-শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম ট্যারিফ বোর্ড নিযুক্ত হয়। পরে নানা শিল্পের সংরক্ষণ-প্রার্থনা অনুসন্ধানের জন্য অনেকগুলি ট্যারিফ বোর্ড বসানো হয়। যুদ্ধকালে উদ্ভূত ভারতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণের জন্য ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ('ইন্‌টরিম') ট্যারিফ বোর্ড গঠিত হয়।

দ্বিতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশনের (১৯৪৯-৫০ খ্রী) সুপারিশ অনুসারে ভারতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ কমিশন অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক চিরস্থায়ী ট্যারিফ কমিশন স্থাপিত হয়। একজন সভাপতি ও দুই জন সভ্যকে লইয়া ইহা গঠিত। একজন কর্মসচিব ও বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ কর্মচারী ইহার কাজে সহায়তা করেন। ট্যারিফ কমিশনের কাজ প্রধানতঃ তিন প্রকার: ১. বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণ-প্রার্থনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ২. বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উপর সংরক্ষণের ফলাফল-অনুসন্ধান এবং ৩. সংরক্ষণ-শুল্ক ও সংরক্ষিত শিল্পগুলি সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে পুনর্বিবেচনা। কমিশন গত পনর বৎসর বহু নূতন শিল্পের সংরক্ষণের ও বহু সংরক্ষিত শিল্পের বিসংরক্ষণের পরামর্শ দিয়াছেন। প্রতি বৎসর ট্যারিফ কমিশন ভারত সরকারের নিকট একটি কার্যবিবরণ দাখিল করেন।

দ্র *Report of the Indian Fiscal Commission : 1922 ; Report of the Fiscal Commission, 1949-50 ; Annual Report of the Indian Tariff Commission.*

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

টি. এন. টি. বিস্ফোরণ দ্র

টিকা মৃত বা জীবিত জীবাণু অথবা ভাইরাস -যুক্ত তরল পদার্থ। এরূপ টিকার মাধ্যমে কোনও রোগের জীবাণু অথবা ভাইরাস যথোপযুক্ত পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে উহা প্রকৃত রোগ সৃষ্টি না করিয়া বরং ঐ বিশেষ রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ফলে ভবিষ্যতে ঐ জাতীয় জীবাণু ও ভাইরাসের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। টিকা দিলে দেহে বিশেষ প্রকারের রোগজীবাণু নাশ করিবার উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ বা অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়, ইহাই টিকার কার্যকারিতার কারণ।

জেনার (১৭৪৯-১৮২৩ খ্রী) ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তের টিকা দিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। ঊনবিংশ শতকে লুই পাস্তুর (১৮২২-৯৫ খ্রী) জলাতঙ্ক রোগের এবং বেহ্‌রিং ও কিটাসাটো ডিফ্‌থেরিয়ার প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে সল্‌ক ও সেবিন পোলিও রোগের টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন।

শিশুদের দেহে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি সৃষ্টির জন্য তাহাদের টিকা দেওয়া অত্যাবশ্যক; এদেশের শিশুদের নিম্নলিখিত টিকাগুলি দেওয়া উচিত— শিশুর ৩-৬ মাস বয়সে বসন্তের প্রাথমিক টিকা, ৬-৮ মাস বয়সে একমাস অন্তর তিন বার ডিফ্‌থেরিয়া, হুপিংকফ ও ধনুষ্টংকার রোগের টিকা ট্রিপ্‌ল অ্যান্টিজেন, ১২-১৩ মাসে একমাস অন্তর দুই বার পোলিও রোগের টিকা, ১৪ মাস বয়সে পুনবার বসন্তের টিকা, ১৮ মাস বয়সে তৃতীয় বার পোলিও রোগের টিকা, ২ বৎসর বয়সে যক্ষ্মার প্রতিষেধক বি. সি. জি. টিকা ইত্যাদি। টিউবারকুলিন পরীক্ষায় কোনও প্রতিক্রিয়া না হইলে তবেই বি. সি. জি. টিকা দেওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত এদেশে মহামারী প্রতিরোধে কলেরা ও টাইফয়েড রোগের টিকার প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। বসন্তের টিকা নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিয়া দেশ হইতে বসন্ত রোগ নির্মূল করা সম্ভবপর। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্লেগ, পীতজ্বর এবং জলাতঙ্কের টিকাও ব্যবহৃত হয়। নানা দেশে সর্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকারও প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।

গলা অথবা টন্‌সিলের প্রদাহে অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে আশানুরূপ ফল না মিলিলে প্রদাহস্থান হইতে জীবাণু সংগ্রহ করিয়া টিকা তৈয়ারি করা হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই টিকা দিয়া প্রদাহের সফল চিকিৎসা করা যায়। এরূপ টিকাকে অটোভ্যাক্‌সিন বলা হয়।

অনেক সময় মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করাইয়া সেই দেহে উৎপন্ন বিষঘ্ন পদার্থ বা অ্যান্টিটক্‌সিন

('টক্‌সিন' দ্র) সংগ্রহ করা হয় এবং এই অ্যান্টিটক্‌সিন-যুক্ত 'সিরাম' রোগীর দেহে প্রবেশ করাইয়া তাহার প্রতিরোধ-শক্তি বর্ধিত করা হয়।

টিকার প্রতিক্রিয়ায় কদাচিৎ কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্ধত্ব এবং মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত রোগ হইতে দেখা যায়।

প্রশান্তকুমার বিশ্বাস

টিটাগড় চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত থানা ও শহর। শহরটি ২২°৪৫ উত্তর এবং ৮৮°২২ পূর্বে অবস্থিত। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বতন্ত্র পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। হুগলি নদীর বাম তীরে ৩.২৪ বর্গ কিলোমিটার (১.২৫ বর্গ মাইল) এলাকায় শহরটি বিস্তৃত। কলিকাতা বন্দরের নিকট অবস্থান, বিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্য, কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবস্থা, শ্রমিকের প্রাচুর্য, বাজারের সুবিধা, স্থল ও জলপথে পরিবহনের সুব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এই স্থানটি জেলার শিল্পাঞ্চল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব মাত্র ২১ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৭৬৪২৯ (১৯৬১ খ্রী)। অধিকাংশ জনগণ স্থানীয় কল-কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল ২৮৩৯৫। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বে স্থানটি নগণ্য ছিল। ব্রিটিশ অধিকারের পর এই অঞ্চল ধনী ইওরোপীয়গণের আবাসস্থল হিসাবে গণ্য হইত। অধুনা ইহার প্রাধান্য শিল্পনগরী হিসাবেই সমধিক। এই শহরে অনেকগুলি কাগজ তৈয়ারির কল, চটকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানা আছে।

স্টেশন হইতে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে গঙ্গাতীরে বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের নিকট গঙ্গাগর্ভে 'বিশালাক্ষীর দহ' নামে একটি অতি গভীর দহ আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXIII, Oxford, 1908; *Census 1961: Paper No. 1 of 1962*, Delhi, 1962.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

টিন একটি মৌলিক ধাতু, বাংলা ভাষায় রঙ বা রাং নামে পরিচিত। রাসায়নিক সংকেত Sn। পারমাণবিক সংখ্যা ৫০, পারমাণবিক ওজন ১১৮.৭০, গলনাঙ্ক ২৩২° এবং স্ফুটনাঙ্ক ২২৬০° সেন্টিগ্রেড। ১১২ হইতে ১২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন পারমাণবিক ভর-বিশিষ্ট আইসোটোপের সংখ্যা দশ। প্রাচীন কাল হইতে মানুষ যে সমস্ত ধাতু ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল, টিন তাহাদের অন্যতম। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংকর ধাতু ব্রঞ্জের উপাদান টিন ও তামা।

ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন মৌল উপাদানের আপেক্ষিক প্রাচুর্য অনুসারে টিনকে বিরল ধাতু বলা সংগত। টিনের আকরিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অক্সিজেন যৌগিক ক্যাসিটেরাইট বা টিন স্টোন (SnO_2) এবং মিশ্র গন্ধক-যৌগিক স্ট্যানাইট (Cu_2FeSnS_4) ও টিলাইট ($Pb(Zn)SnS_2$)। শেষোক্ত দুই আকরিক একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। টিনের প্রধান উৎস হিসাবে ক্যাসিটেরাইটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। ক্যাসিটেরাইটের প্রাথমিক সঞ্চয় (প্রাইমারি ডিপজিট) প্রধানতঃ গ্র্যানিট জাতীয় শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে বিকীর্ণ থাকে। পাললিক শিলার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় যে ক্যাসিটেরাইট দেখা যায় প্রাথমিক সঞ্চয়ের ক্ষয় ও ভাঙনের ফলে তাহার উৎপত্তি। এই অনুসম্ভূত (সেকেণ্ডারি) পাললিক সঞ্চয়ের একটি সমৃদ্ধ স্তর দক্ষিণ চীনের য়ুনান প্রদেশ হইতে ব্রহ্ম দেশ, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), ক্রা যোজক ও মালয় হইয়া ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত। আফ্রিকার নাইজিরিয়া ও কঙ্গো এবং অস্ট্রেলিয়ার কুইনস্‌-ল্যাণ্ডের পাললিক উৎস যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বলিভিয়া ছাড়া অন্য সর্বত্র পাললিক শিলাস্তর হইতে ক্যাসিটেরাইট আহরিত হয়।

ভারতবর্ষে টিন খনিজের পরিমাণ সামান্য। বিহারের গয়া, রাঁচি ও হাজারিবাগ অঞ্চলে ক্যাসিটেরাইট পাওয়া যায়। টিনের ব্যাপারে ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ আমদানির উপর নির্ভরশীল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আমদানিকৃত টিনের পরিমাণ ছিল প্রায় পাঁচ হাজার মেট্রিক টন। টিন উৎপাদনে মালয়ের স্থান প্রথম, তাহার পরে ইন্দোনেশিয়া, বলিভিয়া ও কঙ্গো।

ক্যাসিটেরাইটকে অঙ্গারক সহযোগে উচ্চ তাপাঙ্কে পোড়াইয়া টিন নিষ্কাশন করা হয়। ইহা উজ্জ্বল ও সামান্য নীলাভ। স্ফটিক বিন্যাসের পার্থক্যে ধাতব টিনের রূপভেদ (বহুরূপতা বা অ্যালট্রপি) দেখা যায়। সাধারণ অবস্থার উজ্জ্বল, দৃঢ় ধাতু (হোয়াইট টিন) ০° তাপাঙ্কের নীচে ভঙ্গুর ধাতু (গ্রে টিন)-তে রূপান্তরিত হয়। টিনের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম বা দস্তার অপমিশ্রণে এই রূপান্তর সহজ হয়, কিন্তু অ্যান্টিমনি, বিসমাথ অথবা সীসা থাকিলে ইহা ব্যাহত হয়। জল ও মৃদু অ্যাসিডের সংস্পর্শে বা স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশে টিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া খুব স্বতঃস্ফূর্ত নয়, সেইজন্য ইহার উজ্জ্বলতা দীর্ঘ দিন অবিকৃত থাকে। যথেষ্ট নরম ধাতু বলিয়া টিনকে পিটিয়া পাতে পরিণত করা যায়।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্রঞ্জ উৎপাদনেই টিনের ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। জল, বাতাস বা সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে অবিকৃত থাকিবার যে বিশেষ ক্ষমতা টিনের আছে তাহার প্রয়োগেই বর্তমান টিন-পাতশিল্প প্রতিষ্ঠিত। গলানো টিনের মধ্যে ডুবাইলে ইস্পাতের চাদরের উপর উজ্জ্বল আবরণ পড়ে। বিকল্প পদ্ধতি হইতেছে তাড়িত লেপন (ইলেক্‌ট্রোকোটিং) বা গলানো টিনকে 'স্প্রে' করা। শেষোক্ত দুই পদ্ধতি পরিমিত ঘনত্বের নিখুঁত আস্তরণ সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল এবং ইহাতে টিনের অপচয় কম। এই আবরণ ইস্পাতকে জল-বাতাসের সঙ্গে সম্ভাব্য রাসায়নিক ক্রিয়াজনিত ক্ষয় হইতে রক্ষা করে। টিনের প্রলেপযুক্ত ইস্পাতের চাদর হইতে আমাদের নিত্যব্যবহার্য নানা ধরনের পাত্র তৈয়ারি হয়। শরীরের উপর টিনের তেমন বিষক্রিয়া না থাকাতে খাদ্য-সংরক্ষণের জন্য টিনের কলাই করা ইস্পাতের কৌটা বিশেষ উপযোগী। এক সময়ে সূক্ষ্ম টিনের পাত বা রাংতা পনির, চকোলেট প্রভৃতির মোড়ক হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

তা ছাড়া অ্যান্টিমনি, সীসা প্রভৃতির সহমিশ্রণে টিনের আরও অনেক সংকর ধাতু তৈয়ারি হয়। ঝালাই-এর কাজে টিন ও সীসার সংকর ধাতু (ঝাল) ব্যবহৃত হয়। ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে এমন যন্ত্রাংশ তৈয়ারির জন্য, মরিচারোধক প্রলেপ হিসাবে এবং অলংকরণের কাজে টিনঘটিত বিভিন্ন সংকর ধাতু ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক যোজ্যতা (ভ্যালেন্সি) অনুসারে টিনের যৌগিকসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, স্ট্যানাস ও স্ট্যানিক। সাবানে সুগন্ধ স্থায়ী করিতে স্ট্যানাস ক্লোরাইড, চীনামাটির পাত্র অলংকরণে স্ট্যানিক ক্রোমেট এবং রেশমী বস্ত্র রঙ করার কাজে স্ট্যানিক ক্লোরাইডের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

দ্র Planning Commission, Government of India, *The First Five Year Plan*, Delhi, 1952; J. C. Brown & A. K. Dey, *India's Mineral Wealth*, London, 1955.

মনোজ রায়

টিপু সুলতান (১৭৫০-৯৯ খ্রী) ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর টিপুর জন্ম হয় এবং তিনি উপযুক্ত বয়সে সামরিক ও বেসামরিক উভয় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা হায়দর আলী ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি মহীশূরের স্বাধীন সুলতান হইলেন। অসীম সাহসিকতা ও দক্ষতার সহিত যুদ্ধ চালাইয়া তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান প্রত্যর্পণের শর্তে ইংরেজদের সঙ্গে ম্যাঙ্গালোরে সন্ধি করেন। রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলে রাজ্যের অর্ধাংশ হারাইয়াও টিপু সুলতান ভগ্নোৎসাহ হন নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হইতে পারিলেন না। চতুর্থ ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টনম অধিকার করিলেন এবং তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিলেন (১৭৯৯ খ্রী)।

টিপু সুলতান ছিলেন বীর যোদ্ধা, অক্লান্ত পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা এবং শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তিনি ইচ্ছা করিলেই নিজাম ও অন্যান্য রাজাদের ন্যায় ইংরেজগণের সহিত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারিতেন, কিন্তু এই স্বাধীনতাপ্রিয় সুলতান এইরূপ মিত্রতার প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছেন এবং ফারসী ছাড়া উর্দু ও কানাড়ী ভাষা বলিতে পারিতেন। তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার ছিল এবং ইহাতে আরবী, ফারসী, তুর্কী, উর্দু এবং হিন্দী পুস্তক ছিল। তিনি ছিলেন সুন্নী মুসলমান ও ধর্মভীরু। তাঁহার চরিত্র কলুষমুক্ত ছিল। শাসক হিসাবে তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন, সময়ে সময়ে ভুলত্রুটি হইলেও মোটামুটিভাবে তাঁহার প্রয়োজনীয় শাসন-ক্ষমতা ছিল। তিনি কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধন এবং রাস্তাঘাট তৈয়ারি করেন। তাঁহার সময়ে মহীশূর সমৃদ্ধিশালী ছিল। তাঁহার রাজ্যে যে কিছুসংখ্যক হিন্দুকে জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল ইহা অস্বীকার করা কঠিন, তবে কোনও কোনও ঐতিহাসিক যে তাঁহাকে অতিশয় ধর্মান্ধ ও অত্যাচারী আখ্যা দিয়াছেন তাহা অনেকটা অতিরঞ্জিত।

দ্র Mohibbul Hasan Khan, *History of Tipu Sultan*, Calcutta, 1951; H. H. Dodwell, ed., *Cambridge History of India*, vol. V, Delhi, 1963.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

টিয়া সিত্তাসিফর্মেস বর্গের (Order-Psittaciformes) অন্তর্ভুক্ত সিত্তাসিদী গোত্রের (Family-Psittacidae) পাখি। বিজ্ঞানসম্মত নাম সিত্তাকুলা ক্রামেরি (*Psittacula krameri*)। টিয়ার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার, দেহের উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজ, পিঠ,

মাথার দুই পাশ এবং ডানার সংযোগস্থল নীলাভ। ইহাদের দেহের অধোভাগ পীতাভ সবুজ, পুচ্ছ সবুজ ও সূক্ষ্মাগ্র, পুচ্ছের অগ্রভাগ পীত বর্ণ, নাসারন্ধ্র হইতে চক্ষু পর্যন্ত সরু কালো রেখা, কণ্ঠি গোলাপি, চঞ্চুমূল হইতে কণ্ঠি পর্যন্ত কালো ডোরা। টিয়ার চিবুক কালো, উপরের ঠোঁট লাল এবং নীচের ঠোঁট ঈষৎ কালো। স্ত্রী-পাখির গোলাপি কণ্ঠি ও কালো ডোরা নাই।

হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র প্রধানতঃ সমভূমিতে টিয়া দল বাঁধিয়া স্থায়ীভাবে বাস করে এবং ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। বৃক্ষশাখায় দলবদ্ধভাবে রাত্রিযাপন ইহাদের স্বভাব। প্রজনন ঋতুতে (ফেব্রুয়ারি এপ্রিল) টিয়া বৃক্ষকোটর, গৃহপ্রাচীর, পাহাড়ের গর্ত প্রভৃতি স্থানে বাসা বাঁধিয়া ৪ ৬টি ডিম পাড়ে। বাসা বাঁধা, ডিম ফুটানো ও শাবক-পালনে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান অংশ লয়। মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে পারে বলিয়া এ দেশে পোষা পাখিরূপে টিয়া সমাদৃত।

নীলপক্ষ টিয়া (সিত্তাকুলা কোলম্বোইদেস, *P columboides*) পশ্চিমঘাট ও নীলগিরি পর্বতে দেখা যায়। ইহার মাথা ও বুক ধূসর, কণ্ঠে কৃষ্ণ বলয়, নীলাভ সবুজ ডানা এবং ডানায় হলুদ চিহ্ন। 'চন্দনা' দ্র।

দ্র E C Stuart Baker, *The Fauna of British India Birds*, vol IV, London, 1927, Hugh Whistler, *Popular Handbook of Indian Birds*, London, 1949.

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

টিলক, বালগঙ্গাধর (১৮৫৬ ১৯২০ খ্রী) মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের দেশ রত্নগিরিতে টিলক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পুনা হাই স্কুল ও ডেকান কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বি এ. পাশ করিবার পর তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের উপাধি লাভ করেন। তিনি মারাঠা ভাষার সুলেখক বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলংকর-এর সহযোগে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইংলিশ স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে জাতির উন্নতি সাধন এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক আগরকার তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার অন্যতম উপায় হিসাবে সংবাদপত্রই বিশেষ উপযোগী বিবেচনা করিয়া টিলক ও আগরকার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'কেশরী' নামে মারাঠী ভাষায় এবং 'মারাঠা' (*Mahratta*) নামে ইংরেজী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফার্গুসন কলেজ স্থাপিত হয়। টিলক ঐ কলেজে গণিত ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডেকান এডুকেশন সোসাইটির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকার উপায় হিসাবে সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। সমাজ-সংস্কারের পদ্ধতি সম্বন্ধে টিলকের সহিত তীব্র মতভেদ হওয়ায় আগরকার 'সুধারক' নামে স্বতন্ত্র একটি পত্রিকা বাহির করেন। জনগণের মধ্যে প্রথমে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিলে সমাজের অভ্যন্তর হইতেই পরে সংস্কার-সাধনের চেষ্টা ফলবতী হইবে— টিলক এই নীতিতে বিশ্বাস করিতেন। তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সহবাসসম্মতি আইন-বিষয়ক প্রস্তাবটির খসড়ায় এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, বিদেশী সরকারের এই ধরনের সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

টিলকের প্রধান কৃতিত্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। জাতীয় কংগ্রেস এর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম অধিবেশন হইতেই টিলক ইহার সভাশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস এর বোম্বাই অধিবেশনে ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা অধিবেশনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি ও ধর্মোৎসবের মাধ্যমে মধ্য ও নিম্নবিত্ত জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণপতি ও শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট সভায় টিলক পরাধীন দেশে মুক্তি আনয়নের জন্য শিবাজীর মহিমা কীর্তন করেন এবং আফজল খাঁকে হত্যা করিয়া তিনি যে কোনও অপরাধ করেন নাই এই মত প্রকাশ করেন। ইহার দশ দিনের মধ্যেই পুনায় প্লেগ উপলক্ষে ইংরেজ সৈন্য যে অত্যাচার করে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট নামে দুইজন ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করেন। টিলকের বক্তৃতাই এই হত্যাকাণ্ডের গৌণ কারণ এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া টিলককে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ১৮ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। টিলকের গভীর পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করিয়া মাক্স্ ম্যুলার, উইলিয়াম হাণ্টার -প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষী ইংল্যাণ্ডের মহারানীর নিকট আবেদন করিলে অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি মুক্তি লাভ করেন।

টিলক ও অরবিন্দ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা করেন। কংগ্রেসের অনুসৃত আবেদন-নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের শক্তিতেই কেবল শাসন-সংস্কার নহে স্বরাজলাভের চেষ্টাও করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলনের দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে জাতীয় মনোভাব সঞ্চার করিতে হইবে এবং ইহার জন্য সর্ববিধ কষ্ট সহ্য ও সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে— ইহাই ছিল তাঁহাদের মূল নীতি।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ দেশ বিভক্ত হইলে সারা ভারতবর্ষে, যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় ('স্বদেশী আন্দোলন' দ্র) তাহার সুযোগ লইয়া টিলকের নায়কত্বে একদল রাজনৈতিক নেতা ঐ মত প্রচার করেন। তাহার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে নরম ও চরমপন্থী এই দুই দলের সৃষ্টি হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে 'বয়কট' অর্থাৎ বিদেশী পণ্য দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও জাতীয় প্রথায় শিক্ষাদান কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হউক— টিলকের দলের এই প্রস্তাব নরমপন্থীদলের আপত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে পরবর্তী বৎসরের সুরাট কংগ্রেসে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ ঘটে। এই সময়ে বিপ্লববাদের সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গ দেশের নানা স্থানে রাজনৈতিক খুন ও ডাকাতি হয়। টিলক তাঁহার 'কেশরী' সংবাদপত্রে কি উপায়ে এই বিক্ষোভ ও দুর্দৈব নিবারিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার জন্য তিনি পুনরায় সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হন ও ৬ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মান্দালয় জেলে নির্বাসিত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিলে তিনি 'হোমরুল' বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' এই বাণী ঘোষণা করেন। এই আন্দোলন উপলক্ষে তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া জনসাধারণের মনে জাতীয় মনোবৃত্তির সৃষ্টি ও রাজনৈতিক অধিকার দাবি করিবার প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য সহজ ভাষায় বহু বক্তৃতা করেন। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের এই প্রথম প্রচেষ্টা খুব সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'লখনৌ চুক্তি' নামে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-এর মধ্যে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় যাহা দুই সম্প্রদায়ের মিলনের সেতু বলিয়া তিনি মনে করিতেন। মণ্টেগু ও চেম্‌সফোর্ড কর্তৃক যে শাসন-সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় তিনি তাহা পুরাপুরি অগ্রাহ্য না করিয়া তাহা হইতে যতটুকু সুবিধা ও অধিকার লাভ করা যায় তাহার চেষ্টা করাই সমীচীন এই মতবাদের ভিত্তিতে তাহার সমর্থন করেন। স্যর ভ্যালেন্টাইন চিরল তাঁহার সম্বন্ধে যে অপমানসূচক মন্তব্যাদি করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদে মকদ্দমা আনয়নের জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। মকদ্দমায় হারিয়া গেলেও বিলাতে থাকাকালীন তিনি ভারতে স্বায়ত্তশাসনের দাবির স্বপক্ষে আন্দোলন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগস্ট তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বেদ সম্বন্ধে মৌলিক রচনাগুলি টিলকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিস্তৃত করে। বেদের প্রাচীনতা ও কালক্রম সম্বন্ধে তাঁহার রচিত প্রবন্ধ তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের আন্তর্জাতিক সভায় (ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিস্ট্‌স) প্রেরণ করেন। 'ওরিয়ন' নামে ইহা গ্রন্থাকারে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মান্দালয় জেলের অবসর সময় টিলক এইরূপ গবেষণাকার্যে অতিবাহিত করিতেন। উত্তরমেরু আর্যজাতির আদি বাসভূমি ইহা প্রমাণ করিতে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গীতারহস্য' বা কর্মযোগশাস্ত্র নামে গীতার টীকাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

দ্র বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারহস্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -অনূদিত, কলিকাতা, ১৯২৪ ; অমল হোম, 'বলবন্তরাও গঙ্গাধর টিলক', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ; *Bal Gangadhar Tilak : His writings and speeches*, Madras, 1917 ; *Hindu Philosophy of Life, ethics and religion or Karma-yogashastra*, tr, B S. Sukhatankar, Poona, 1935-36 ; T V. Parvati, *Bal Gangadhar Tilak*, Ahmedabad, 1952 ; D V. Tamhankar, *Lokmanya : Father of Indian Unrest and Maker of Modern India*, London, 1956 ; N. G. Jog, *Lokmanya Bal Gangadhar Tilak*, Delhi, 1962.

চিন্তামণ বামন দাতার

টিস্যু দেহকলা। একই ধরনের কতকগুলি কোষ একত্রে মিলিত হইয়া টিস্যুর সৃষ্টি করে। এইসকল কোষের অন্তর্বর্তী স্থলে সংযোজক পদার্থ থাকে, এই পদার্থই কোষগুলিকে একত্রে ধরিয়া রাখে। টিস্যু প্রধানতঃ ৪ প্রকার— এপিথিলিয়াল বা বহিরাবরক টিস্যু, কানেক্টিভ বা সংযোজক টিস্যু, মাস্‌কিউলার টিস্যু বা পেশী এবং নার্ভ টিস্যু।

বহিরাবরক টিস্যু ত্বক, বিভিন্ন অঙ্গ, নালী প্রভৃতির

আবরণ সৃষ্টি করে। এই টিস্যুর বিভিন্ন কোষের অন্তর্বর্তী স্থানে সংযোজক পদার্থের পরিমাণ খুব কম। কোষগুলি এক বা কয়েক সারিতে বিন্যস্ত থাকে এবং আকৃতিতে লম্বা, চৌকা বা চ্যাপটা হইতে পারে। কোনও কোনও কোষের মাথার দিকে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত উপাঙ্গ বা 'সিলিয়া' থাকে। বিভিন্ন আকৃতির কোষের কাজ বিভিন্ন। এই টিস্যুর কোষগুলি কোথাও দেহে খাদ্যবস্তুর বিশোষণে সাহায্য করে, আবার কোথাও দেহ হইতে বর্জ্যদ্রব্যের রেচনে সহায়তা করে। বিভিন্ন গ্রন্থিতে এই টিস্যুর কোষগুলি রস ক্ষরণ করিয়া থাকে।

দেহের বিভিন্ন অংশ ও টিস্যুর মধ্যে যোগস্থাপনই সংযোজক টিস্যুর কাজ। এই টিস্যুতে কোষগুলির অন্তর্বর্তী স্থলে সংযোজক পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি। অধস্ত্বক (অ্যারিওলার) টিস্যু, মেদ (অ্যাডিপোজ) টিস্যু, তন্তুপ্রধান (ফাইব্রাস) টিস্যু, তরুণাস্থি (কার্টিলেজ), অস্থি প্রভৃতি নানা প্রকার সংযোজক টিস্যু আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মেদ টিস্যুতেই চর্বি সঞ্চিত হয়।

পেশী তিন প্রকার— ঐচ্ছিক পেশী, অনৈচ্ছিক পেশী ও হৃৎপিণ্ডের পেশী। ঐচ্ছিক পেশী অস্থির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং ইচ্ছামত ইহাদের সংকোচনের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করা যায়। অনৈচ্ছিক পেশী পাচনতন্ত্র, ধমনী, শিরা, মূত্রাশয়, মূত্রনালী, পিত্তাশয়, জরায়ু প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গে থাকে এবং তাহাদের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটায়। তৃতীয় প্রকার পেশীও অনৈচ্ছিক, হৃৎপিণ্ড এই ধরনের পেশী দিয়া গঠিত।

নার্ভ টিস্যু দেহের এক অংশ হইতে অন্য অংশে আবেগ ও উদ্দীপনা বহন করে। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, বিভিন্ন নার্ভ প্রভৃতি এই টিস্যু দিয়া গঠিত।

চণ্ডীচরণ দেব

টীকেন্দ্রজিৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের মহারাজা চন্দ্রকীর্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র সুরচন্দ্র মহারাজা, দ্বিতীয় পুত্র কুলচন্দ্র যুবরাজ ও তৃতীয় পুত্র টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হন। টীকেন্দ্রজিৎ বীর, জনপ্রিয় ও সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। কিছু দিন পরে মণিপুরে আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে মহারাজা সুরচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হন (সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ খ্রী) এবং কুলচন্দ্র মহারাজা ও টীকেন্দ্রজিৎ যুবরাজ হন। এই ব্যাপারে টীকেন্দ্রজিতের হাত ছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। আসামের কমিশনার কুইন্টন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ টীকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে মণিপুরে আসিয়া দরবার ডাকিলেন ও টীকেন্দ্রজিৎকে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। টীকেন্দ্রজিৎ অনুপস্থিত থাকেন। উদ্দেশ্য বিফল হওয়াতে কুইন্টন টীকেন্দ্রজিতের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া পুনরায় ব্যর্থ হইলেন। শেষে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কুইন্টন ৪জন ইংরেজ সহকারীর সহিত টীকেন্দ্রজিতের নিকট গেলেন। কিন্তু কোনও নিষ্পত্তি হইল না। প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসার সময় উত্তেজিত জনতা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে। মণিপুরের পোলিটিক্যাল এজেন্ট গ্রীমউড নিহত হন এবং অপর ৪জন ইংরেজকেও হত্যা করা হয়। খুব সম্ভব টীকেন্দ্রজিতের নির্দেশ অমান্য করিয়া এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেনাপতি তোঙ্গল এই হত্যার আদেশ দেন। টীকেন্দ্রজিতের ইহাতে কোনও যোগ ছিল এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। ইহার পর ইংরেজ সেনাবাহিনী মণিপুর আক্রমণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি প্রথমে আত্মগোপন করেন ও পরে সকলেই ধরা পড়েন। টীকেন্দ্রজিৎ সম্ভবতঃ আত্মসমর্পণ করেন। বিশেষ বিচারালয়ে তাঁহাদের বিচার হয়। সেনাপতি তোঙ্গল ও টীকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হয় ও মহারাজা কুলচন্দ্রের ফাঁসির আদেশ পরিবর্তন করিয়া যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়।

বলা বাহুল্য, টীকেন্দ্রজিতের প্রতি সম্পূর্ণ অবিচার করা হয়। ক্যাপ্টেন ডিযাসে এই বিচার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ইহা এক নিদারুণ প্রহসন, এবং ন্যায়বিচারের নামে ভারতবাসীর প্রতি এরূপ ব্যঙ্গ আর কখনও করা হয় নাই।' মহারানী ভিক্টোরিয়াও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IX, Bombay, 1963

বিশ্বেশ্বর দত্ত

টুনটুনি পাসেরিফর্মেস বর্গের (Order-Passeriformes) অন্তর্ভুক্ত সীলভিইডী গোত্রের (Family-Sylviidae) পাখি। বিজ্ঞানসম্মত নাম ওর্থোতোমস সুতোরিয়স (*Orthotomus sutorius*)। টুনটুনির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ সেন্টিমিটার। মাথার তালু পীতাভ লাল, বাকি অংশ পাংশুবর্ণ। ইহাদের পিঠ ও দেহের উপরের অংশ পীতাভ সবুজ, কণ্ঠ হইতে পুচ্ছমূল পর্যন্ত দেহের তলদেশ নিষ্প্রভ শাদা, ঘাড়ের দুই পাশে অস্পষ্ট কালো চিহ্ন। পুচ্ছ ও ডানা খয়েরি। চঞ্চু দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ। প্রজনন-ঋতুতে পুং-পাখির পুচ্ছের কেন্দ্রীয় পালক সূক্ষ্ম ও দীর্ঘতর হয়।

টুনটুনি ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা, সমভূমি হইতে হিমালয়ের প্রায় ১৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় ইহাদের

দেখা যায়। নৃত্যের ভঙ্গীতে পুচ্ছ তুলিয়া ইহারা বাগান, ঝোপঝাড়, এমনকি গৃহের অলিন্দেও ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্ষুদ্র পতঙ্গ, তাহার ডিম এবং শুঁয়াপোকা ইহাদের প্রধান আহার্য, শিমুল ফুলের মধুও প্রিয় খাদ্য। প্রজন-ঋতুতে (এপ্রিল সেপ্টেম্বর) ইহারা ঠোঁট দিয়া তুলা বা উদ্ভিজ্জ তন্তুর সাহায্যে পাতার প্রান্ত সেলাই করিয়া ধানের আকৃতির বাসা তৈয়ারি করে ও তাহার ভিতর নরম তুলা বা তন্তুর উপর ৩-৪টি লম্বা ছুঁচালো রক্তাভ বা নীলাভ শাদা ডিম পাড়ে। বাসা বাঁধা ও শাবক-পালনে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পাখিই অংশ গ্রহণ করে, স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা দেয়।

দ্র Salim Ali, *The Book of Indian Birds*, Bombay, 1943, Hugh Whistler, *Popular Handbook of Indian Birds*, London, 1949.

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

টুসু পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে পূজিতা এক লৌকিক দেবী। মাটির তৈয়ারি প্রতিমা বা রঙিন কাগজের চৌদল টুসুদেবীর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। টুসু-পূজার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে, সমাপ্ত হয় পৌষ সংক্রান্তি বা মকর-সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে। উৎসব একমাস ধরিয়া চলে। কুমারী মেয়েরা টুসু পূজার প্রধান ব্রতী ও উদ্যোগী। এই পূজায় কোনও অভিজ্ঞ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বালিকা ও তরুণীগণ প্রচলিত আচার বিধি অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি নিজেরাই সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা টুসু গানের আসর বসে। উৎসবটির বিশেষ অঙ্গ ও মুখ্য আকর্ষণ এই টুসু সংগীত। গানগুলি গ্রাম্য কবির রচনা এবং আকারে ছোট। টুসু গান পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার অন্তরঙ্গ পরিচয় বহন করে। বাংলার লোক-সংগীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার টুসু-গান ও টুসু-উৎসবের বিশিষ্ট স্থান আছে।

অনেকে মনে করেন, ধান্যের তুষ হইতে 'টুসু' শব্দের উৎপত্তি। পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত অন্যতম পৌষালী উৎসব তুষতুষালি ব্রতকথার মধ্যেও এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সমর্থন পাওয়া যায়।

কালীপদ ঘটক

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বয়নবিদ্যা দ্র

টেথিস পুরাজীবীয় (প্যালিওজয়িক) ও মধ্যজীবীয় (মেসোজয়িক) অধিকল্পে জিব্রাল্টার হইতে আল্‌পস, হিমালয় ব্রহ্ম দেশ হইয়া অস্ট্রেলিয়ার সন্নিকটবর্তী সুন্দাসাগর অবধি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত মহাসমুদ্র বা জিওসিনক্লাইনকে বৈজ্ঞানিক সুয়েস 'টেথিস' নাম দেন।

ইহার ৪০০০ মিটারের অধিক গভীরতাবিশিষ্ট সিন্ধুতলে আর্কিয়ান যুগে পর্যাপ্ত পরিমাণে চূর্ণীকৃত শিলা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। শেষ জুরাসিক, শেষ ক্রিটেশাস এবং টার্শিয়ারি যুগে উত্তর দিক হইতে আঙ্গারাল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ দিক হইতে আফ্রিকা ও দাক্ষিণাত্যের কঠিন শিলা (গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড) চাপ দেওয়াতে ও সরিয়া যাওয়াতে আর্কিয়ান যুগের ঐ অবক্ষেপ সংকুচিত ও ভাঁজযুক্ত হইয়া উত্থিত হয়। উত্তরের লরেসিয়া বা আঙ্গারাল্যাণ্ড (ইউরেশিয়ার অংশ) এবং দক্ষিণের গণ্ডোয়ানার (আফ্রিকা, আরব ও ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চল) সঞ্চরমাণ ভূখণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থিত সমুদ্রের উত্তরে আল্‌পস, কার্পেথিয়ান, ককেশাস এবং দক্ষিণে আট্‌লাস, আপেনাইন, দিনারিক আল্‌পস, টরাস, হিমালয়— এই দুইটি প্রায় সমান্তরাল ভাঁজযুক্ত পর্বতগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। ইহাদের অন্তবর্তী দেশের পশ্চিমাংশে ভূমধ্যসাগর, মধ্যাংশে হাঙ্গেরীয় সমতল ভূমি ও তিব্বতীয় মালভূমি এবং পূর্বাংশে সুন্দাসাগর প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে।

দ্র Edward Suess, *The Face of the Earth*, H. B. C. Sollas, ed, vol III & IV, Oxford, 1908-09, M. S. Krishnan, *Geology of India & Burma*, Madras, 1960; J. A. Steers, *The Unstable Earth*, London, 1964.

সত্যবীরাম চন্দ্র

টেন্‌সর গণিতে কাঠামোর (কো-অর্ডিনেট সিস্টেম) সাহায্যে যে সমস্ত বস্তুর বর্ণনা করা যায় প্রত্যেক কাঠামোতে তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বিশেষ ক্রমে সজ্জিত নির্দিষ্ট-সংখ্যক রাশির একটি পরিচায়ক যুক্ত করা যায়। এই পরিচায়কের রাশিগুলিকে বস্তুটির উপাঙ্গ (কম্পোনেন্ট্‌স) বলা হয় এবং ইহারা সাধারণতঃ কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ একটি বস্তুর উপাঙ্গগুলি কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রকার সূত্রানুযায়ী পরিবর্তিত হইলে বস্তুটিকে একটি টেনসর বলা হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি টেন্‌সরের উপাঙ্গগুলি পরিবর্তিত হইলেও টেনসরটি অপরিবর্তিত থাকে।

মনে করা যাক, A^{i}_{jk} একটি প্রতীক যেখানে i, j, k সূচকের প্রত্যেকটি ১,২,৩ মান গ্রহণ করিতে পারে।

তাহা হইলে এই প্রতীকটি ২৭টি রাশির জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এখন ত্রিমাত্রিক দেশে একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x^1, x^2, x^3) লইয়া বিশেষ কোনও কাঠামোকে X-কাঠামো বলা হউক। মনে করা যাক, এই কাঠামোতে A^{1}_{jk} x^1, x^2, x^3— এই তিনটি চলের একটি অপেক্ষক। উপরন্তু অন্য একটি কাঠামোকে X-কাঠামো বলিয়া X-কাঠামোতে A^{i}_{jk} যে বস্তুটির ২৭টি উপাঙ্গের প্রতীক X-কাঠামোতে A'^{p}_{qr}-কে সেই উপাঙ্গগুলির প্রতীক হিসাবে লওয়া হউক। এখন যদি A'^{p}_{qr} নিম্নলিখিতভাবে নির্ণীত হয় :

১. $$A^{p}_{qr} = A^{1}_{jk} \frac{\partial x^{p}}{\partial x^{i}} \frac{\partial x^{j}}{\partial x^{q}} \frac{\partial x^{k}}{\partial x^{r}}$$

যেখানে ১ চিহ্নিত সমীকরণের দক্ষিণ পক্ষটি

$$A^{1}_{11} \frac{\partial x^{p}}{\partial x^{1}} \frac{\partial x^{1}}{\partial x^{q}} \frac{\partial x^{1}}{\partial x^{r}},\quad A^{1}_{12} \frac{\partial x'^{p}}{\partial x^{1}} \frac{\partial x^{1}}{\partial x^{q}} \frac{\partial x^{2}}{\partial x^{r}},$$

$$A^{1}_{13} \frac{\partial x^{p}}{\partial x^{1}} \frac{\partial x^{1}}{\partial x^{q}} \frac{\partial x^{3}}{\partial x'^{r}} \ldots\ldots$$

ইত্যাদি ২৭টি রাশির যোগফল তাহা হইলে X এবং X-কাঠামোতে যে বস্তুটির উপাঙ্গগুলি যথাক্রমে A^{i}_{jk} এবং A^{p}_{qr} সেই বস্তুটিকে একটি ত্রিপদী (থার্ড অর্ডার) টেন্সর বলে। এইরূপ টেনসরের উপরের সূচকটি প্রতিচল (কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট) সূচক এবং নীচের সূচকগুলি সহচল (কোভ্যারিয়েন্ট) সূচক নামে অভিহিত হয় এবং টেন্সরটিকে একপদী প্রতিচল এবং দ্বিপদী সহচল টেন্সর বলা হয়। অনুরূপভাবে n-মাত্রিক দেশের r-পদী প্রতিচল এবং s-পদী সহচল টেনসরের সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

উপাঙ্গগুলিতে শুধু প্রতিচলসূচক, শুধু সহচলসূচক অথবা উভয় প্রকার সূচক থাকিতে পারে। এই তিন প্রকার সূচক অনুযায়ী তিন শ্রেণীর টেন্সর পাওয়া যায় : প্রতিচল টেনসর, সহচল টেন্সর, মিশ্র টেন্সর। কোনও প্রতিচল অথবা সহচল টেন্সর একপদী হইলে উহাকে যথাক্রমে প্রতিচল ভেক্টর বা সহচল ভেক্টর বলে এবং শূন্য-পদী হইলে উহাকে স্কেলার বা অবিচল বলা হয়।

আপেক্ষিক (রিলেটিভ) টেন্সর : কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিমাত্রিক দেশের কোনও একপদী প্রতিচল এবং দ্বিপদী সহচল মিশ্র টেন্সরের উপাঙ্গগুলি যে সূত্রানুযায়ী পরিবর্তিত হয় তাহা ১ চিহ্নিত সমীকরণে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন যদি ১ চিহ্নিত সমীকরণের পরিবর্তে আমরা নিম্নলিখিত সূত্রটি ধরি :

$$A'^{p}_{qr} = J^{t} A^{i}_{jk} \frac{\partial x'^{p}}{\partial x^{i}} \frac{\partial x^{j}}{\partial x'^{q}} \frac{\partial x^{k}}{\partial x'^{r}}$$

যেখানে J নিম্নলিখিত ছকের প্রতীক (ডিটার্মিন্যান্ট)—

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x^{1}}{\partial x'^{1}} & \frac{\partial x^{2}}{\partial x'^{1}} & \frac{\partial x^{3}}{\partial x'^{1}} \\ \frac{\partial x^{1}}{\partial x'^{2}} & \frac{\partial x^{2}}{\partial x'^{2}} & \frac{\partial x^{3}}{\partial x'^{2}} \\ \frac{\partial x^{1}}{\partial x'^{3}} & \frac{\partial x^{2}}{\partial x'^{3}} & \frac{\partial x^{3}}{\partial x'^{3}} \end{vmatrix}$$

তাহা হইলে আলোচ্য টেনসরটিকে একটি আপেক্ষিক টেন্সর এবং t সংখ্যাটিকে উহার ওজন (ওয়েট) বলা হয়। অনুরূপভাবে n-মাত্রিক দেশের r-পদী প্রতিচল এবং s-পদী সহচল আপেক্ষিক টেন্সরের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই সংজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে কোনও আপেক্ষিক টেন্সরের ওজন শূন্য হইলে উহা একটি টেন্সরে পরিণত হয়। সুতরাং আপেক্ষিক টেন্সর এবং টেন্সরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য কখনও কখনও টেন্সরকে পরম (অ্যাবসলিউট) টেন্সর বলা হয়।

টেন্সর-ঘনাঙ্ক (ডেনসিটি) কোনও আপেক্ষিক টেন্সরের ওজন এক হইলে উহাকে টেন্সর ঘনাঙ্ক বলে।

টেন্সরের প্রয়োগের ক্ষেত্র এখন সমধিক প্রসারিত হইয়াছে এবং টেন্সর-কলন (টেন্সর-ক্যালকুলাস) আজ গণিতের এক অত্যাবশ্যক এবং শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, টেন্সর-কলনের সাহায্য ব্যতীত আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদের সামান্যীকরণ সম্ভব হইত না।

মণীন্দ্রচন্দ্র চাকী

টেনিস লন টেনিস দ্র

টেনিসন, অ্যাল্‌ফ্রেড (১৮০৯-৯২ খ্রী) ইংরেজী সাহিত্যের ভিক্টোরীয় যুগের অন্যতর প্রধান কবি। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ আগস্ট লিংকন্‌শায়ারের সোমার্সবিতে যাজক-পরিবারে টেনিসন জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষালাভ প্রধানতঃ পিতার নিকট এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে। টেনিসনের কেমব্রিজের একাধিক বন্ধু পরবর্তী কালে সাহিত্যযশ অর্জন করেন। প্রধান বন্ধু আর্থার

হেনরি হ্যালামের (১৮১১-৩৩ খ্রী) বাগ্‌দত্তা ছিলেন টেনিসনের সহোদরা।

ইতস্তত: কবিকৃতিত্ব-প্রদর্শনের পর টেনিসন প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ('পোয়েম্‌স, চীফ্‌লি লিরিক্যল') প্রকাশ করেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে। বলা যাইতে পারে ঐ তারিখ হইতেই ইংরেজী সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগের আরম্ভ। এই গ্রন্থে পূর্বসূরী কীট্‌সের প্রভাব অতি প্রত্যক্ষ; কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পোয়েম্‌স' নামক পরবর্তী গ্রন্থে টেনিসন উল্লেখযোগ্য পরিণতি অর্জন করিয়াছেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালামের আকস্মিক মৃত্যু সম্ভবত: টেনিসনের কবিজীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান ঘটনা; 'ইন মেমোরিয়ম' নামক কাব্যগ্রন্থটি (প্রকাশ ১৮৫০ খ্রী) এই শোকচেতনার জাতক। ইতিমধ্যে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে টেনিসন দুই খণ্ডে তাঁহার কবিতার এক সংকলন এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দি প্রিন্সেস' নামক এক কাহিনীকাব্য প্রকাশিত করেন। পরবর্তী কালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মড্' (১৮৫৫ খ্রী), 'ইডিল্‌স অফ দি কিং' (১৮৫৯-৮৫ খ্রী) এবং 'ডিমিটার অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স' (১৮৮৯ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও উত্তর জীবনে টেনিসন কয়েকটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, যদিও 'কুইন মেরি' (১৮৭৫ খ্রী), অথবা 'বেকেট' (১৮৮৪ খ্রী) প্রভৃতি নাটক তাঁহার সাহিত্যযশ বৃদ্ধি করিয়াছিল বলা চলে না।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে টেনিসন রাজকবি (পোয়েট লরিয়েট) পদে বৃত হন এবং এই বৎসরই এমিলি সেলউডের সহিত ১৭ বৎসর প্রতীক্ষার পর তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে টেনিসন রাজসম্মানরূপে ব্যারন উপাধি লাভ করেন।

যদিও টেনিসনের জীবদ্দশাতেই তাঁহার বিরূপ সমালোচনার সূত্রপাত হয় এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি সেই বিরূপতার জের চলে, তথাপি সম্প্রতি টেনিসনের কবিকৃতির পুনর্বিচার আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিধান্বিত, নিঃসঙ্গ এবং পীড়িত কবিচেতনার বিচিত্র প্রকাশে, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সহিত কবিমানসের একাত্মীকরণে এবং কাব্যে গীতলতার স্বচ্ছন্দ অনুশীলনে টেনিসন যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ভিক্টোরীয় যুগের আশা এবং আশঙ্কা, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় আস্থা এবং নাস্তিক জিজ্ঞাসা এবং সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তমানতা টেনিসনের কাব্যে যেমন প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করিয়াছে, ভিক্টোরীয় অন্য কোনও লেখকের রচনায় সম্ভবত: তেমন নাই।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র G. M. Young, 'The Age of Tennyson', *Proceedings of the British Academy*, vol. XXV, London, 1939; P. F. Baum, *Tennyson Sixty Years After*, Chapel Hill, 1948; E. D H. Johnson, *The Alien Vision of Victorian Poetry*, Princeton, 1952; Alfred Lord Tennyson, *The Poetical Works, including the Plays*, Oxford, 1953.

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

টেপ রেকর্ডার শব্দ রেকর্ড করার যন্ত্রবিশেষ। ইহার আবিষ্কর্তা পোল্‌সেন (১৯০০ খ্রী)। টেপ রেকর্ডারে বস্তুর চৌম্বক ধর্মের পরিবর্তন সাধন করিয়া শব্দকে রেকর্ড করা হয়; পরে ইচ্ছানুযায়ী এই শব্দ শোনা যায়। এই ব্যবস্থায় মাইক্রোফোনের সাহায্যে প্রথমে শব্দকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয় এবং ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে একটি তড়িৎ-চুম্বককে শক্তিসম্পন্ন করা হয়। এই তড়িৎ-চুম্বককে বলা হয় 'রেকর্ড হেড'। রেকর্ড হেডের খুব নিকট দিয়া একটি প্লাস্টিক টেপ যায়। এই টেপের উপর আয়রন অক্সাইডের গুঁড়া আটকানো থাকে। শব্দের পরিবর্তনের সহিত রেকর্ড হেডের চুম্বকনের (ম্যাগনেটাইজেশন) যে পরিবর্তন হয়, তাহার জন্য এই আয়রন অক্সাইড চূর্ণের চুম্বক-ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। আয়রন অক্সাইডের নিজস্ব ধর্ম হইতে উহা একবার চুম্বকত্ব লাভ করিলে তাহা সহজে নষ্ট হয় না। সেইজন্য শব্দের অনুলেখন আয়রন অক্সাইডের মধ্যে মোটামুটি স্থায়ীভাবে থাকে। এই অনুলিখিত শব্দকে পুনরায় শুনিতে গেলে, এই টেপকে 'প্লে ব্যাক হেড' নামক এক যন্ত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়। প্লে-ব্যাক হেডের গঠন রেকর্ড হেডেরই মত, কিন্তু এখানে তড়িৎ-চুম্বককে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে শক্তিসম্পন্ন করা হয় না। যখন চুম্বকত্বপ্রাপ্ত টেপ এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া যায়, তখন এই যন্ত্রে চুম্বকীয় আবেশের সৃষ্টি হয় ও টেপের পরিবর্তনশীল চুম্বকত্বের জন্য এই আবেশও পরিবর্তনশীল হয়। ফলে একটি তারের কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে স্পীকারের সাহায্যে আবার শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। অপ্রয়োজনীয় শব্দকে ইচ্ছামত মুছিয়া ফেলিয়া নূতন শব্দ রেকর্ড করিবার ব্যবস্থা টেপ রেকর্ডারে থাকে। মুছিয়া ফেলিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম 'ইরেজ হেড'। ইরেজ হেডেও একটি তড়িৎ-চুম্বক থাকে ও উচ্চ-কম্পাঙ্কসম্পন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে উহাকে শক্তিশালী করা হয়।

এই হেডের মধ্য দিয়া যাইবার সময় টেপ এই উচ্চ কম্পন-সংকেত অনুযায়ী চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় (সাধারণতঃ কম্পাঙ্ক হয় প্রতি সেকেণ্ডে ৪০-৮০ হাজার)। এই অনুলেখনের শব্দ আমরা শুনিতে পাই না, অথচ ইহার সাহায্যে আমরা পূর্বেকার অনুলেখনকে চাপা দিতে পারি। এইভাবে অনুলেখন মুছিয়া ফেলা হয়।

শুভেন্দুকুমার দত্ত

টেপারি বেগুন গোত্রের (ফ্যামিলি সোলানাসিঈ, Family-Solanaceae) অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ফিসালিস পেরুভিয়ানা (*Physalis peruviana*)। আদি জন্মস্থান পেরু। পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত বঙ্গ দেশের সর্বত্রই বর্ষজীবী উদ্ভিদরূপে ইহার চাষ করা যায়, তথাপি এদেশের সর্বত্র ইহা পরিচিত নহে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বীজ হইতে চারা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ করে। সুপক্ব ক্ষুদ্র ফলগুলি গোল, হরিদ্রা বর্ণ এবং শুষ্ক বৃতিগুচ্ছ দ্বারা আবৃত। ফল অম্লমধুর ও মুখরোচক। ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট চাটনি, জ্যাম প্রভৃতি তৈয়ারি করা যায়।

শচীন্দ্র মোহন সেন

টেব্‌ল্ টেনিস ক্রীড়াবিশেষ। ইহা পূর্বতন অন্তর্গৃহবাসী টেনিস খেলার নব সংস্করণ। টেব্‌ল্ টেনিস আনুমানিক ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে। পিংপং ইত্যাদি নামে হালকা ধরনের অল্প পরিশ্রমের খেলা হিসাবে আদি যুগে ইহা পরিচিত ছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উনত্রিশটি দেশের মহাসম্মেলনে ইহার 'টেব্‌ল্-টেনিস' নাম গৃহীত হইবার পর হইতে ইহা প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক খেলা হইয়া দাড়াইয়াছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত আইনানুসারে ইহার পুরুষ ও মহিলাদের প্রতিযোগিতামূলক খেলা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ৯ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও ৩০ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট মসৃণ অথচ অনুজ্জ্বল কালো রঙের টেবিলের মধ্যস্থলে ৬ ফুট লম্বা ও ৬ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন জাল বাঁধা হয়। ৪½ - ৪¾ ইঞ্চি ব্যাস ও ৩৭-৩৯ অথবা ৩৭-৪১ (অ্যামেরিকা) গ্রেন ওজনের ফ্যাকাশে সেলুলয়েড-এর বল বিপক্ষ দুইটি দল তাহাদের ব্যাট দিয়া জালের এপার-ওপার পরস্পরের বিপরীত দিকে পাঠাইতে থাকে এবং যে দল অপারগ হয় সেই দল একটি পয়েন্ট হারায়। প্রথমে যে দল ২১ পয়েন্ট অর্জন করে সেই দল বিজয়ী হয়, কিন্তু উভয় পক্ষের ২০ পয়েণ্ট হইলে পর্যায়ক্রমে সার্ভিস করিয়া দুই পয়েন্ট-এ অগ্রগামী দল বিজয়ী হয়। সাম্প্রতিক কালের ব্যাট কাষ্ঠনির্মিত, কিন্তু উহার উভয় পার্শ্বে চেরা রবার দিয়া মোড়া। এইরূপ ব্যাটে নানা রকম মারের সুবিধা হয় এবং বলটিকেও আয়ত্তে রাখা সহজসাধ্য হয়। টেবিলের প্রান্ত হইতে ব্যাটের মারে বলটিকে প্রথমে নিজের অর্ধাংশে বাউন্স করাইয়া অর্থাৎ ঠিকরাইয়া দিয়া 'সার্ভিস' করিলে খেলা আরম্ভ হয়। উপর্যুপরি ৫ পয়েণ্ট নিষ্পন্ন হইলে 'সার্ভিস' -এর বদল হয়। ডব্‌ল্‌স বা জুড়ি খেলায় জুড়ির প্রত্যেককে পর্যায়ক্রমে 'সার্ভিস' করিতে হয়। ভলি মার এই খেলায় নিষিদ্ধ। নিচক আত্মরক্ষামূলক খেলা আমেরিকায় নিষিদ্ধ।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ স্কুল কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতেই খেলাটির চর্চা হইত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বেঙ্গল টেব্‌ল্ টেনিস অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয় এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে টেব্‌ল্ টেনিস অ্যাসোসিয়েশন-এর পত্তন হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় টেব্‌ল্ টেনিস অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইলে সারা ভারতবর্ষের টেব্‌ল্ টেনিস ইহার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম জাতীয় টেব্‌ল্ টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেব্‌ল্ টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম ভারতীয় দল প্রেরিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অন্যান্য ক্রীড়াগুলির ন্যায় টেব্‌ল্ টেনিসের প্রতিযোগিতাগুলি বন্ধ থাকে। কিন্তু এই সময় হইতেই ভারতে নানা বিখ্যাত বিদেশী খেলোয়াড় আগমন করেন ও ভারতের ক্রীড়ার মান উন্নত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ অংশ গ্রহণ করে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে বিশ্ব টেব্‌ল্ টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রাচ্যের খেলোয়াড়েরা বিশ্ব টেব্‌ল্ টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে সাধারণ তন্ত্রী চীনের খেলোয়াড়রা বিশ্বের সেরা এবং জাপানের খেলোয়াড়রা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

প্রশান্তকুমার গায়েন

টেরাকোটা পোড়ামাটির প্রস্তুত মানুষের ব্যবহার্য সকল প্রকার জিনিসই টেরাকোটা বলিয়া পরিচিত। কাঁচামাটির রাসায়নিক উপাদানের পার্থক্য অনুসারে পোড়ামাটির বর্ণের তফাৎ হইতে পারে। উৎকৃষ্ট আঠালমাটির সঙ্গে বালি, খড়কুটা, তুষ, ভুষি ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনীয় কাদামাটি প্রস্তুত করা হয়। পোড়ামাটির ভাস্কর্য এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কাঁচা মাটিতে প্রস্তুত হইবার পর মূর্তিগুলি রৌদ্রে শুষ্ক

করিয়া আগুনে পোড়ানোই বিধি। এই পোড়াইবার কার্যে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। তাপের অসমতার জন্য মূর্তিগুলি ফাটিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ছোট ছোট মূর্তি বা ফলকগুলি সাধারণতঃ নিরেট, কিন্তু বড় মূর্তিগুলি ফাঁপা না হইলে সুষ্ঠুভাবে পোড়ানো সম্ভব হয় না।

পোড়াইবার পর মূর্তিগুলিকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিবার নিদর্শন অনেক ক্ষেত্রে আছে। বিদেশে চকচকে পালিশকরা (গ্লেজ্‌ড) টেরাকোটার প্রচলন ছিল। মহেঞ্জো-দড়োর প্রাচীনতম স্তর হইতে পালিশকরা মৃৎপাত্রের কিছু টুকরা পাওয়া গিয়াছে এবং মুসলমান যুগে পালিশকরা টালির ব্যবহার ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ভারতবর্ষে পালিশকরা টেরাকোটার নিদর্শন নাই।

মানব-সভ্যতার অতি শৈশব হইতেই পোড়ামাটির ভাস্কর্যের ব্যবহার দেখা যায়। বস্তুতঃ মৃৎপাত্র ও মৃন্ময় ভাস্কর্যই আদিমানব সভ্যতার ইতিহাসের সর্বপ্রধান নিদর্শন। চীন, ভারতবর্ষ, মিশর, ক্রীট, সুমেরিয়া-ব্যাবিলন, গ্রীস, ইটালী, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের বহুল প্রচলন ছিল।

ক্রীট, সাইপ্রাস, গ্রীস, গ্রীসীয় এশিয়া মাইনর ও ইটালীতে টেরাকোটা শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মন্দির অলংকরণের কার্যে টেরাকোটার সমধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়। ইটালীতে অনেক এত্রুস্ক (Etruscan) মূর্তি শবাধারের আচ্ছাদনের উপর স্থাপিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও ফলক দুইই পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে গ্রীসে উৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীসীয় শিল্পের প্রভাব ইটালীয় শিল্পে সুস্পষ্ট। বিষয়বস্তু সাধারণতঃ দেব-দেবী ও দাতার মূর্তি এবং ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-দ্বিতীয় শতকে গ্রীস ও ইটালীতে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার বিষয় এই শিল্পে আরও অধিকতর প্রতিফলিত হইয়াছে।

উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান বহু সুঠাম নারীমূর্তি, রথারোহী বা অশ্বারোহী নরমূর্তি গ্রীস-ইটালীতে পাওয়া গিয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর এই টেরাকোটা শিল্পের অবনতি ঘটে। ইহার পর মধ্যযুগে ইটালীতে টেরাকোটা শিল্পের পুনরুজ্জীবন হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স নগরীর সুবিখ্যাত ডেল্লা রোব্বিয়ারা (Della Robbia) অত্যুৎকৃষ্ট চকচকে পালিশকরা টেরাকোটা শিল্পের প্রচলন করেন। সেখান হইতে ফ্রান্স ও স্পেনে ও পরে ক্রমশঃ সমগ্র ইওরোপে এই শিল্প বিস্তার লাভ করে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অনেক শিল্পী টেরাকোটাকে শিল্পমাধ্যমরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

'ভারত ও পাকিস্তান বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হইলেও একই ঐতিহ্যের অধিকারী। এই বিবরণীতে সামগ্রিক অর্থেই ভারত কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কিছু কিছু এখানেও শবাধারের আচ্ছাদনের উপর স্থাপিত অবস্থায় ছিল। সিন্ধু-উপত্যকা ও বেলুচিস্তান হইতে টেরাকোটা শিল্পের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সূক্ষ্ম বিচার করিলে বিভিন্ন স্থানের মূর্তিগুলির মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তবে মোটামুটি গড়ন সংক্ষিপ্ত ও শিল্পকৌশল অনুন্নত। অনেক স্থলে মনুষ্যমূর্তিগুলি বক্ষ বা কটিদেশ পর্যন্তই গঠিত হইয়াছে এবং বাহুদ্বয় সূক্ষ্মাগ্র। সিন্ধু-উপত্যকা হইতে প্রায় সম্পূর্ণদেহ কিছু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে কিন্তু সেগুলিরও হস্ত-পদের অঙ্গুলি, এমনকি জানু ও গুলফ সঠিক দর্শিত হয় নাই। চক্ষু ও স্তনদ্বয় এবং অলংকরণ আরোপিত (অ্যাপ্লিকে) এবং মুখাকৃতিতে পশু বা পক্ষীর আকৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। এইগুলি অধিকাংশই হস্ত গঠিত। মহেঞ্জো-দড়োতে উন্নত কলাকৌশলের পরিচায়ক কিছু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ছাঁচে গড়া কয়েকটি মস্তক বা মুখোস দক্ষ শিল্পীর সৃষ্টি। জীবজন্তুর মূর্তিগুলি মনুষ্যমূর্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। সুগঠিত ষাঁড়ের মূর্তি অনেক আছে। মৃন্ময় মূর্তিগুলি কলাকৌশলের বিচারে স্টাকো এবং প্রস্তর মূর্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মূর্তিগুলি ছাড়া বাঁশি, গাড়ি প্রভৃতি অনেক খেলনাও পাওয়া গিয়াছে।

নারীমূর্তিগুলি অধিকাংশই মাতৃদেবী ও প্রজনন-শক্তির পরিচায়ক বলিয়া অনুমিত হয়।

তক্ষশিলা, মথুরা, ভিটা, বক্সার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত অনেক টেরাকোটা মূর্তি সিন্ধু-সভ্যতার পরবর্তী, কিন্তু মৌর্য যুগের পূর্বের বলিয়া অনুমিত হয়। মথুরা ও গান্ধার অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত কিছু নারীমূর্তি এই যুগের বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। প্রাচ্য দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাচীন কালে এক সর্বজন-উপাস্যা মাতৃদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। নারীমূর্তিগুলি এই বিশ্ববরেণ্যা মাতৃদেবীর প্রতীক বলিয়া অনেকে সাব্যস্ত করিয়াছেন। আরোপিত (অ্যাপ্লিকে) ও ছাপ দেওয়া অলংকরণ এইগুলির বৈশিষ্ট্য। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে অহিচ্ছত্রের খননকার্যের ফলে মৌর্য যুগের স্তরে এইরূপ কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

পাটনার খননকার্যের ফলে মৌর্য যুগের বা অব্যবহিত পূর্ব যুগের বলিয়া ধার্য অনেক টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া

গিয়াছে। ইহার মধ্যে হাতে গড়া ও ছাঁচে গড়া দুই প্রকারের সুন্দর, প্রাণবন্ত মূর্তি আছে।

পরবর্তী যুগের ভারতীয় সমস্ত টেরাকোটাই ছাঁচে গড়া। শুধু গ্রামাঞ্চলের লোকশিল্পে সম্ভবতঃ হাতে গড়া মূর্তির প্রচলন ছিল। দাক্ষিণাত্যের মাস্কি হইতে বহু টেরাকোটা মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতে আবিষ্কৃত টেরাকোটা শিল্পসম্ভার অনেক বেশি। পাঞ্জাবের তক্ষশিলা হইতে বাংলার চন্দ্রকেতুগড় পর্যন্ত ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নানা স্থান হইতে শুঙ্গ, কাণ্ব, অন্ধ্র যুগের (খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতক) অজস্র টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশই নরনারীর মূর্তি। যুগ্মমূর্তিগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের বিবরণ অনুযায়ী মিথুন বা দম্পতি আখ্যায় অভিহিত। ইহার পরবর্তী যুগেও ভারতীয় চারুশিল্পে সততই দম্পতি মিথুনের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও ফলক দুইই আছে। ক্ষুদ্রায়তন ফলকগুলির সুকুমার কারুকার্য বিস্ময়কর। নারীমূর্তিগুলির কমনীয় মুখাবয়ব, জমকালো বেশভূষা ও অলংকার, বিচিত্র কেশসজ্জা— এই যুগের টেরাকোটা শিল্পের বিশেষত্ব। এইগুলি লোকধর্ম উপাস্য যক্ষিণী বলিয়া অভিহিত। নগ্ন বা সূক্ষ্মবেশ পরিহিতা দৃশ্যতঃ নগ্ন নারী-মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ প্রজনন-শক্তির পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত কোনও কোনও ফলকে শকুন্তলা দুষ্মন্তকাহিনী, উদয়ন বাসবদত্তা কাহিনী প্রভৃতি লোককাহিনী উৎকীর্ণ আছে। এলাহাবাদ জেলার ভিটা গ্রামে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত একটি গোলাকৃতি ফলক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শকুন্তলা নাটকের রাজা দুষ্মন্তের কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ দৃশ্যটি সম্ভবতঃ এখানে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

এই যুগের কিছু কিছু মৃন্ময় মূর্তিতে বিদেশীয় প্রভাব স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বসর বা প্রাচীন বৈশালীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রতিকৃতি মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূর্তিগুলি সাধারণতঃ বাস্তবানুগ, এতদ্ব্যতীত বসর বা তমলুকে প্রাপ্ত কয়েকটি পক্ষযুক্ত নারীমূর্তি পশ্চিম এশীয় প্রভাব সূচিত করে। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলি গান্ধার-রীতি-প্রভাবাপন্ন। কিন্তু এইগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। অধিকাংশ টেরাকোটাই ভারতীয় নিজস্ব শিল্পরীতির সৃষ্টি। লোকধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব অবশ্য টেরাকোটা শিল্পে নিবিড়।

কুষাণ যুগের (খ্রীষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতক) বহু অবয়বহীন বিজাতীয় আকৃতির টেরাকোটা মস্তক পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তরসদৃশ কঠিন এবং কয়েক ইঞ্চি উচ্চ। আকৃতি ও বেশভূষা বিচার করিলে এইগুলি বিদেশীদের অনুকৃতি বলিয়া মনে হয়। এই যুগে শক, পহ্লব, রোমান প্রভৃতি বহু বিদেশীয় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের বিভিন্ন আকৃতি, বিচিত্র বেশভূষা ও শিরস্ত্রাণ স্বভাবতঃ শিল্পীদের আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিছু পূর্ণাবয়ব মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র-সহকারে গায়ক ও বাদক এবং অশ্বারোহীর মূর্তি উল্লেখ-যোগ্য। সৌন্দর্যতত্ত্বের মাপকাঠিতে মোটামুটিভাবে কুষাণ যুগের মৃন্ময় ভাস্কর্য পূর্বাপেক্ষা নিম্ন মানের।

সম্প্রতি অন্ধ্রের নাগার্জুনকোণ্ডায় খননের ফলে এই যুগের কিছু উৎকৃষ্ট টেরাকোটা মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির সঙ্গে নাগার্জুনকোণ্ডার প্রস্তর ভাস্কর্যের মিল আছে। রাজস্থানে রঙমহলে প্রাপ্ত এই যুগের টেরাকোটায় গান্ধার রীতির প্রভাব দেখা যায়।

ভারতীয় সাহিত্য ও চারুকলার স্বর্ণযুগ গুপ্ত যুগে (৪র্থ-৭ম শতক) প্রস্তর-ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ন্যায় প্রভূত পরিমাণে চিত্তাকর্ষক মৃন্ময় মূর্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। মন্দিরের অলংকরণ ব্যতীত গৃহসজ্জার কার্যে ও সামাজিক নানা উৎসবের সময় টেরাকোটা মূর্তি ও অলংকরণের ব্যবহার ছিল। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' দেখা যায় রাজ্যশ্রীর বিবাহ-উৎসবে বহু মৃদ ভাস্কর নিযুক্ত হইয়াছিল।

বৃহদাকার মূর্তিগুলির মধ্যে পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যাকৃতির কাশিয়ার বুদ্ধমূর্তি ও অহিচ্ছত্রের গঙ্গা যমুনার মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মধ্যমাকারের উৎকৃষ্ট মূর্তি উত্তর প্রদেশের ভিতরগাঁও ও সাহেত মাহেত, বাংলার মহাস্থানগড়, সিন্ধুর মীরপুরখাস ও সৌরাষ্ট্রের দেবানোমোরিতে পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত অজস্র ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি ভারতের নানা স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। রাজঘাটে (বারাণসী) প্রাপ্ত মূর্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তপূর্ববর্তী যুগের মূর্তিগুলি অধিকাংশই লোকধর্ম-উপাস্য যক্ষ যক্ষিণীর। কিন্তু গুপ্ত যুগের ধর্মীয় মূর্তিগুলি অধিকাংশই হিন্দু দেব-দেবী বা মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ দেব-দেবী। অনেক নাগরিক নাগরিকার মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। বেশভূষা ও অলংকার পরিমার্জিত রুচির পরিচায়ক। নারী ও পুরুষ উভয়েরই সুসজ্জিত অলকদাম লক্ষণীয়। নগ্ন বা দৃশ্যতঃ নগ্ন নারীমূর্তি গুপ্ত-শিল্পে নাই বলিলেই চলে। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক হইতে গ্রীকো-রোমান প্রভাব ক্ষীয়মাণ। ভারতীয় শিল্পরীতিরই প্রাধান্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই যুগে গান্ধার-শিল্পে প্রস্তরের ব্যবহার নাই। মূর্তিগুলি স্টাকো বা টেরাকোটা সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচারে উত্তর ভারতের

টেরাকোটা শিল্প অপেক্ষা নিম্ন মানের, কিন্তু এই গান্ধার-রীতি-প্রভাবিত টেরাকোটা শিল্প বহুদিন প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরের উস্কর অঞ্চলে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর টেরাকোটা মূর্তিগুলি উন্নত মানের এবং এই গুলিতে গান্ধার-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সৌরাষ্ট্রের দেবীনোমোরি ও সিন্ধুর মীরপুরখাসের মূর্তিগুলিতেও গান্ধার-রীতির প্রভাব আছে।

খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতে কাশ্মীর, বঙ্গ দেশ ও আসাম ব্যতীত ভারতের অন্যত্র উৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন কম। উত্তর বঙ্গের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে খননকার্যের ফলে সুবিখ্যাত সোমপুর বিহার ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত (সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীর) হইয়াছে। মন্দির সজ্জার কার্যে প্রভূত পরিমাণে টেরাকোটা টালি বা ফলকের ব্যবহার হইয়াছিল। অধিকাংশ ফলকই স্বস্থানে বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীর নির্মিত কিছু ফলকও পাহাড়পুরে পাওয়া গিয়াছে। কিছু ধর্মীয় মূর্তিতে গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের প্রভাব দেখা যায়, কোনও কোনওটিতে পাল যুগের প্রস্তর ভাস্কর্যের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এইগুলি ছাড়া বহু ফলকে লোকশিল্পের প্রভাব সুপরিস্ফুট। এই লোকশিল্প অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রচ্ছন্নভাবে গ্রামাঞ্চলে প্রবহমান ছিল মনে করা স্বাভাবিক। বিদগ্ধ সমাজের মন্দির অলংকরণের কার্যে ইহার আকস্মিক ব্যবহার বিস্ময়কর। আরও উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার দৃশ্যাবলী ও বহু লোক কাহিনী এই ফলকগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষ এরূপ দৃশ্যাবলীর এত অধিক সংখ্যায় ব্যবহার ইহার পূর্বে কোথাও দেখা যায় না। পাহাড়পুরের ন্যায় লোক-শিল্পানুগ ফলক পূর্ব বাংলার ময়নামতী, মাহাস্থান প্রভৃতি স্থান ও আসাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ও প্রভূত গতিময়তা এই টেরাকোটা শিল্পের বৈশিষ্ট্য।

বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া গ্রামের ইষ্টক নির্মিত সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীর বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরগাত্রে নকশা-অলংকরণের সুন্দর বিন্যাস এই মন্দিরের একটি বিশেষত্ব। কিছু টেরাকোটা মূর্তি-ভাস্কর্যের সজ্জাও ছিল, কিন্তু সেগুলি এখন বিনষ্ট। সমসাময়িক উত্তর ভারতের কয়েকটি ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরেও এরূপ নকশা-অলংকরণের ব্যবহার ছিল।

তুর্কী বিজয়ের পর বাংলা দেশে মন্দির-নির্মাণ সাময়িকভাবে ব্যাহত হইয়াছিল। তখনকার কয়েক শত বৎসর টেরাকোটা শিল্পের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। গ্রামাঞ্চলে লোকশিল্পের ধারা নিশ্চয়ই প্রবহমান ছিল। বাংলার মুসলিম শিল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে (আনুমানিক ১৪০০-১৬০০ খ্রী) পুনরায় টেরাকোটা শিল্পের ব্যবহার দেখা যায়। দীর্ঘ কাল সংস্পর্শের ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিছুটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এই সময়ে, খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। স্থানীয় চালাঘরের আকৃতিতে বক্রাকৃতি কার্নিশ-সমন্বিত বহু মন্দির এই সময়ে নির্মিত হইতে থাকে। মন্দিরগুলি অধিকাংশই ইষ্টক-নির্মিত এবং অনেক ক্ষেত্রে টেরাকোটা অলংকরণ-শোভিত। হিন্দু মন্দিরগুলিতে মুসলিম স্থাপত্যের উন্নত নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় এবং মন্দিরের সম্মুখ ভাগের পরিকল্পনায় ও টেরাকোটা সজ্জার বিন্যাসে মুসলিম ইমারতগুলির প্রভাব সুস্পষ্ট। মুসলমান স্থপতিগণ স্থানীয় টেরাকোটা শিল্পীদের নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই নূতন হিন্দু স্থাপত্যরীতি ও টেরাকোটা শিল্পের উদ্ভব কখন কিভাবে হইয়াছিল তাহা গবেষণার বিষয়।

এইসব মন্দির-সজ্জায় বিভিন্ন মাপের ছাঁচে গড়া টেরাকোটা টালির ব্যবহার হইয়াছিল। টালিগুলি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী পলেস্তারা দ্বারা মন্দিরগাত্রে আঁটিয়া দেওয়া হইত। প্রধানতঃ মন্দিরের সম্মুখ ভাগেই ব্যাপক-ভাবে টেরাকোটা অলংকারের সমাবেশ দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে স্তম্ভগুলিও টেরাকোটা ভাস্কর্য মণ্ডিত। কদাচিৎ মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালেও টেরাকোটা সজ্জার বিন্যাস দেখা যায়। কয়েকটি টালির সংযোগে একটি ব্যাপক দৃশ্য রচনার দৃষ্টান্তও অনেক আছে। মন্দিরের প্রধান দ্বারের উপরে রাম রাবণের যুদ্ধের বৃহদাকার দৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

এই নূতন টেরাকোটা-ভাস্কর্যে লোকশিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ এই শিল্পকে রাজস্থানী চিত্রকলার ন্যায় সমুন্নত লোকশিল্প বলা যাইতে পারে। শিল্পীগণ পেশাদার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বংশানুক্রমে এই বৃত্তি অনুসরণ করিতেন।

বলা বাহুল্য কারুকার্য সর্বত্রই এক মানের নহে এবং একই মন্দিরে বিভিন্ন রীতির প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির সহজ সরল প্রকাশভঙ্গী, প্রাণস্পন্দন ও ছন্দোময় গতিবিভঙ্গ মনোমুগ্ধকর।

অদ্যাপি বিদ্যমান মন্দিরগুলির অধিকাংশই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্মের সেবায় এই শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ, কিন্তু

অনুরূপ কয়েকটি শৈব বা শাক্ত মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতেও অনেক শিব ও শক্তিমূর্তি সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।

দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও, রামায়ণ ও পুরাণ-বর্ণিত দৃশ্যাবলী, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নানা দৃশ্য মন্দিরগাত্রে সতত দৃষ্ট হয়। ধর্মনির্ভর নয় এরূপ বহু মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এই মন্দিরগুলির বিশেষ আকর্ষণ। এই দৃশ্যগুলিতে তৎকালীন সমাজজীবন সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। নৃত্য গীত রত নরনারী, নৌকাবিহার ও জলকেলি, গাড়ি, পালকি, আরোহী জমিদার, ধনীর দরবারগৃহ, বিবাহের শোভাযাত্রা, সমুদ্রগামী জাহাজ, যষ্টিহস্তে দ্বারপাল, মৎস্যবিক্রয়রতা নারী — এইরূপ নানা বিচিত্র দৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই টেরাকোটা শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য নকশা অলংকরণ। বিচিত্র ফুল, লতা পাতা, প্রস্ফুটিত পদ্ম বা কোরক, সর্পিললতা, পরস্পর জড়িত সাপ, কৃত্রিম গোলাপ, তারক ও অন্যান্য নানাবিধ জ্যামিতিক নকশার বিন্যাস অতীব মনোমুগ্ধকর।

অদ্যাপি বিদ্যমান মন্দিরগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরের শ্যামরাই, রাধাবিনোদ, জোড়বাংলা ও মদনমোহনের মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির, চাকদহের পালপাড়া মন্দির এবং বড়নগরের চারবাংলা মন্দির উৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের বহু ফলক আশুতোষ মিউজিয়ামে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই শিল্পের অবনতির লক্ষণ দেখা যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বা পরে এই টেরাকোটা শিল্প লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বর্তমান কালে ভারতের নানা স্থানে টেরাকোটা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সমধিক প্রসিদ্ধি এবং পৃথিবীব্যাপী সমাদর লাভ করিয়াছে। শিল্পীরা কৃষ্ণনগরের রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত এক প্রাচীন শিল্পীগোষ্ঠীর বংশধর। বংশানুক্রমিক দক্ষতা ও পাশ্চাত্য শিল্পশৈলীর প্রভাব ইহাদের কাজে সমভাবে দৃষ্ট হয়। দেবদেবী ব্যতীত স্বাভাবিক আকৃতির ও অপূর্ব প্রাণবন্ত পশুপক্ষী, খেলনা, পুতুল ও সমাজজীবনের দৃশ্যাবলী এই শিল্পীদের বিষয়বস্তু। প্রতিকৃতি রচনায় ইহাদের দক্ষতা অসাধারণ। এই সম্পর্কে বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামে নির্মিত পোড়ামাটির ঘোড়াও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কুম্ভকার', 'ঘট', 'টালি' ও 'মৃৎশিল্প' দ্র।

দ্র নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার মন্দির, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, A K. Coomaraswamy, 'Early Indian Terracottas', *Bulletin of the Museum of Fine Arts*, vol XXV, Boston, 1927, A K Coomaraswamy, *Archaic Indian Terracottas* Leipzig 1928, K N. Dikshit, 'Excavations at Paharpur, Bengal', *Memoir of the Archaeological Survey of India*, no 55, 1938, V S. Agarwala, *Rajghat Terracottas*, 1941, R C. Majumdar, ed *History of Bengal*, vol I, Dacca, 1943, D. H Gordon, 'Early Indian Terracottas', *Journal of the Indian Society of Oriental Art* vol XI, 1943, V S Agrawala Gupta Art', *Journal of the U P Historical Society Pannalal Special Number*, July-December, 1945, V S Agrawala, Terracotta of Ahichchhatra' *Ancient India* no. 4 July 1947-January 1948 Mukul De, *Birbhum Terracottas*, Delhi, 1959 O C Gangoly *Indian Terracotta Art* Calcutta 1959 P C Das Gupta *The Early Terracotta of Tamralipta*, Calcutta, C C Das Gupta *Origin and Evolution of Indian Clay Sculpture*, Calcutta, 1961

[illegible]

টেরেন্স তেরেন্তিয়ুস দ্র

টেলস্টার টেলিভিজন দ্র

টেলিকমিউনিকেশন এক স্থান হইতে দূরবর্তী অপর স্থানে বৈদ্যুতিক পন্থায় শ্রবণযোগ্য অথবা দৃশ্যমান বার্তা বা সংকেত প্রেরণের ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ 'টেলিকমিউনিকেশন' বলা হয়। 'টেলি' শব্দের অর্থ দূর এবং 'কমিউনিকেশনে'র অর্থ বার্তাবিনিময়। এই বার্তা নানা প্রকারের হইতে পারে, তবে প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই ৩টি বিশিষ্ট অংশের প্রয়োজন: ১ প্রেরক যন্ত্র ২. গ্রাহক যন্ত্র এবং ৩. এই দুই যন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে টেলিগ্রাফি প্রাচীনতম, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যামুয়েল মর্স ইহার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ('টেলিগ্রাফ' দ্র)। টেলিগ্রাফ প্রবর্তনের অনেক পরে

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল টেলিফোন উদ্ভাবন করেন ('টেলিফোন' দ্র)। শব্দ ব্যতীত অপর কোনও শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা এবং গৃহীত শক্তিকে উপযুক্ত গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে মূল শক্তিতে রূপান্তরিত করা অথবা অপর কোনওভাবে ব্যবহার করাও টেলিকমিউনিকেশনের অন্তর্ভুক্ত। ছবিতে যে আলো ছায়ার সমাবেশ থাকে, তাহাকে কোনও প্রকার বৈদ্যুতিক চক্ষুর সাহায্যে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিণত করিয়া তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করিয়া তাহার সাহায্যে অনুরূপ ছবি সৃষ্টি করাকে 'ফ্যাকসিমিলি' বা অবিকল প্রতিরূপ বলা হয়।

বেতারে বার্তা প্রেরণের জন্য দুই স্থানের মধ্যে কোনও জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সম্মুখে শব্দ করিলে তাহা বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিণত হয় এবং এই নিম্নহারের বিদ্যুৎ স্পন্দনকে প্রেরক যন্ত্রের উচ্চহারের স্পন্দনের উপর চাপাইয়া দিয়া মিশ্র বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয় এবং এই তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের আকাশ তার বা এরিয়্যাল হইতে বিকীর্ণ হয়। প্রয়োজনমত অনেকগুলি এরিয়্যাল এর সারির সাহায্যে বেতার-তরঙ্গ সমানভাবে বিভিন্ন দিকে না পাঠাইয়া নির্দিষ্ট দিকে পাঠানো যায়। এই বিকীর্ণ বেতার তরঙ্গ দূরে গ্রাহক এরিয়্যালে অনুরূপ বিদ্যুৎ স্পন্দনের সৃষ্টি করে এবং গ্রাহক যন্ত্র তাহার সাহায্যে বেতার তরঙ্গ বাহিত শব্দ বা বার্তার পুনরুদ্ধার করে।

ছবির আলো ছায়ার অনুরূপ পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহকে তারের মাধ্যমে না পাঠাইয়া বেতারেও পাঠানো যায় এবং সেই ব্যবস্থাকে টেলিভিজন বা 'দূরেক্ষণ' বলা হয় ('টেলিভিজন' দ্র)।

এইভাবে এক স্থান হইতে কোনও সাংকেতিক নিয়মে বৈদ্যুতিক শক্তিকে বেতারে দূরবর্তী স্থানে পাঠাইয়া সেখানে কোনও যন্ত্রকে চালানো বা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা, (যথা চালকবিহীন বিমান চালানো, কৃত্রিম উপগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করা) অথবা দূরবর্তী স্থান হইতে প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গকে রেডার বা অনুরূপ যন্ত্রের সাহায্যে নানাভাবে কাজে লাগানো, এই সবই টেলিকমিউনিকেশনের অন্তর্ভুক্ত।

হৃষীকেশ রক্ষিত

টেলিগ্রাফ বিদ্যুৎ-প্রবাহের বিস্তার (অ্যাম্প্লিটিউড) ও সময়ের তারতম্য করিয়া ইহার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা হয়। ইহাকে বলা হয় মর্স কোড্। টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা স্যামুয়েল মর্স, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন হইতে বাল্টিমোরে (প্রায় ৬৪ কিলোমিটার) প্রথম সংবাদ প্রেরণ করেন। টেলিগ্রাফে প্রধানতঃ ২টি যন্ত্র থাকে, একটি সংবাদ প্রেরক ও দ্বিতীয়টি সংবাদ গ্রাহক। প্রেরক যন্ত্রের চাবিতে চাপ দেওয়ামাত্র ব্যাটারি হইতে বিদ্যুৎ প্রবাহ গ্রাহক যন্ত্রের একটি তড়িৎ চুম্বককে কার্যকর করে ও তাহা একটি লৌহদণ্ডকে আকর্ষণ করিলে শব্দ হয়। গ্রাহক যন্ত্রের এই শব্দ প্রেরক যন্ত্রের চাবির চাপের তারতম্যের উপর নির্ভর করে ও ইহা শুনিয়া কি সংবাদ আসিতেছে জানা যায়। বর্তমানে মিনিটে ২৫ হইতে ৩০টি শব্দ পাঠানো হয়। বৈদ্যুতিক সংকেত তারের মাধ্যমে কিছুদূর গেলে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, এইজন্য রিপিটারের সাহায্যে এই শক্তি পুনঃসংযোজন করা হয়। রিপিটার একই সঙ্গে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্ররূপে কাজ করে। তড়িৎ-চুম্বক ছাড়া ইলেকট্রন টিউব ও ট্যানজিস্টরের রিপিটারও বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ পৃথিবীকে একটি তারের মত ব্যবহার করা হয়। ডুপ্লেক্স ব্যবস্থায় (ডুপ্লেক্স সিস্টেম) একই সঙ্গে দুই দিকে ও কোয়াড্রুপ্লেক্স ব্যবস্থায় (কোয়াড্রুপ্লেক্স সিস্টেম) একই সঙ্গে দুই দিকে দুইটি দুইটি করিয়া সংবাদ প্রেরণ করা হয়। যে টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবাদ ছাপা হইয়া যায়, তাহাকেই বলা হয় 'টেলিপ্রিন্টার'। বেতারের মাধ্যমেও টেলিগ্রাফ সংকেত পাঠানো হইয়া থাকে। 'টেলিকমিউনিকেশন' দ্র।

ইন্দুকুমার দত্ত

টেলিফোন আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল টেলিফোনের আবিষ্কর্তা (১৮৭৬ খ্রী)। ইহার প্রধান অঙ্গ দুইটি। একটির দ্বারা শব্দকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে ও বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে শব্দে পরিবর্তিত করা যায় (বাড়িতে এই যন্ত্রটি থাকে)। অপরটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ইহা একটি টেলিফোন যন্ত্রকে আর একটি টেলিফোন যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করে। শব্দকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিবর্তিত করা হয় মাইক্রোফোনের সাহায্যে। শব্দ হইলে বাতাসের চাপের যে তারতম্য হয়, তাহা অঙ্গারচূর্ণ পূর্ণ একটি প্রকোষ্ঠের রোধের (রেজিস্ট্যান্স) পরিবর্তন ঘটায় ও ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহে শব্দতরঙ্গের অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ স্পীকারের সাহায্যে পুনরায় শব্দতরঙ্গে পরিবর্তিত হয়। স্পীকারে শব্দতরঙ্গজনিত বিদ্যুৎ-প্রবাহের দরুন একটি তড়িৎ চুম্বকের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ফলে চুম্বকটির সম্মুখে বাঁধা একটি পর্দার উপর আকর্ষণের তারতম্য ঘটে ও তাহা শব্দেরই অনুরূপ বায়ু-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। একটি টেলিফোন যন্ত্রের

সহিত আর একটি টেলিফোন যন্ত্রের সংযোগ দুই ভাবে স্থাপিত হইতে পারে। ম্যানুয়াল টেলিফোন ব্যবস্থায় যে-টেলিফোনের সহিত সংযোগ চাওয়া হয়, তাহার নম্বর বলিলে অপারেটর তারের সাহায্যে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। স্ট্রাউজার স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের আবিষ্কর্তা (১৮৮৯ খ্রী)। এইরূপ টেলিফোন যন্ত্রের সহিত একটি নম্বর লেখা চাকতি (ডায়াল) থাকে। এই চাকতির সাহায্যে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠাইয়া ইচ্ছানুযায়ী টেলিফোন যন্ত্রের সহিত যোগাযোগ করা হয়। যে যন্ত্র এই বৈদ্যুতিক সংকেত অনুযায়ী যোগাযোগ ঘটায়, তাহাকে বলা হয় ইউনিসিলেক্টর বা সিলেক্টর। আধুনিক ব্যবস্থায় বহু দূরের সহিত সংযোগস্থাপনের জন্য ও একই তারের সাহায্যে বহুসংখ্যক কথোপকথনের ব্যবস্থা করার জন্য বেতার-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। ইহাকে 'কেরিয়র টেলিফোন' ব্যবস্থা বলে।

শুভেন্দুকুমার দত্ত

টেলিভিজ্‌ন দূরেক্ষণ। বিনা-তারে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে, দূরের দৃশ্য বা ঘটনা যখন যেমন ঘটিতেছে ঠিক তখনই তেমনই ভাবে দেখিতে পাওয়াকে বলে টেলিভিজ্‌ন। টেলিভিজ্‌নে দূরের দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধ্বনিও যাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে তখন তখনই শোনা যায় তাহারও বন্দোবস্ত থাকে। টেলিভিজ্‌ন প্রবর্তিত হইবার আগেই বিনা-তারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছবি প্রেরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী কর্ন সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম ইটালী হইতে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে ছবি পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরেই আমেরিকার বিজ্ঞানী রেঞ্জার সম্পূর্ণ এক নূতন পদ্ধতিতে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পার করিয়া বিনা-তারে ছবি পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের বেতারকেন্দ্রগুলি হইতে নিয়মিতভাবে ছবির আদান-প্রদান চলিয়াছিল।

টেলিভিজ্‌নের প্রথম প্রবর্তন হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। জন লোগি বেয়ার্ড নামক একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী বিজ্ঞানী বেতারে লণ্ডনের একটি বাড়ির এক ঘর হইতে অন্য ঘরে জীবন্ত মানুষের চলন্ত ছবি পর্দার উপর প্রদর্শন করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই বেয়ার্ড তাঁহার প্রেরক ও গ্রাহক উভয় যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বেয়ার্ডের পদ্ধতি ছাড়াও অন্য পদ্ধতি পরে উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশন (আর. সি এ.)-এর বিজ্ঞানী জোরিকিন্ (Zworykin) যে নূতন পদ্ধতির সূচনা করেন আধুনিক টেলিভিজ্‌ন কেন্দ্রগুলিতে তাহারই নানা উন্নত ও কার্যকর ব্যবস্থা দেখা যায়। ফিলাডেলফিয়া-র ফার্নস্‌ওয়ার্থ ভাই দুই জন যে ইলেকট্রন-ক্যামেরা নির্মাণ করেন, টেলিভিজ্‌নে তাহা এক সময়ে খুব প্রচলিত হইয়াছিল। বর্তমান কালে টেলিভিজ্‌নে বহু সুপরিকল্পিত প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে কথা বা গান এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা যায় ('বেতার' দ্র)। বর্তমান প্রবন্ধে এই মূল বিষয়টির সহিত পাঠকের পরিচয় আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

কথা বা গানের ব্রডকাস্টিং-এ যেমন মাইক্রোফোন যন্ত্র, বেয়ার্ডের টেলিভিজ্‌ন ব্যবস্থায় তেমনই ফোটো-ইলেকট্রিক সেল দরকার। আলো যখন ফোটো সেলের উপর পড়ে, ফোটো সেলে তখন বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্ট হয়। আলোর জোরের উপর এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের জোর নির্ভর করে। ছবি বা দৃশ্য আলো ছায়ার খেলা। কোথাও আলো বেশি, কোথাও কম – এইরূপ বিভিন্ন জোরের আলোক-বিন্দুর সমাবেশেই ছবি বা দৃশ্যের সৃষ্টি। ছবি বা দৃশ্যের এক একটি বিন্দু হইতে যে আলো আসে, তাহা যদি ফোটো সেলে দেওয়া যায়, তবে সেই বিন্দুর আলো তাহার জোর অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত হয়। বেয়ার্ডের ব্যবস্থায় একটি ধাতুর গোলাকার চাকতিতে কুণ্ডলের আকারে সাজানো পর-পর অনেকগুলি ছিদ্র করা হয়। আর্ক-বাতি হইতে আলো লেন্সের সাহায্যে এই চাকতির ছিদ্রগুলির উপর ফেলা হয়। এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে চাকতিটি জোরে ঘুরাইলেই আলো পর পর প্রত্যেকটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া ছবি বা দৃশ্যের উপর গিয়া পড়ে এবং সমগ্র ছবি বা দৃশ্য এক ক্রমিক পর্যায়ে আলোকিত হয়। আলোকিত ছবি বা দৃশ্যের বিভিন্ন বিন্দু হইতে যে আলো আসে তাহার পরিমাণ যে বিভিন্ন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই কম ও বেশি জোরের আলো ফোটো সেলে প্রবেশ করিয়া কম বেশি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। এই কম-বেশি পরিমাণের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে অনেক গুণ বাড়াইয়া বেতার প্রেরক যন্ত্রের উচ্চ-হার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর চাপাইয়া ছবি বা দৃশ্যের মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যায়। এই হইল টেলিভিজ্‌নের প্রেরক কেন্দ্রের কথা। ছবি বা দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি কথা বা গানও পাঠাইতে হয়, তবে আরও একটি প্রেরক যন্ত্র, এরিয়্যাল ও মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা দরকার। এই প্রেরক যন্ত্রের এরিয়্যাল হইতেই কথা বা গানের মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সংক্রমিত হয়।

ছবি বা দৃশ্যের মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন টেলিভিজ্‌নের গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়ালের তারে আসিয়া পড়ে, এই তারেও তখন অনুরূপ বিদ্যুতের স্পন্দন হইতে থাকে। এই মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুতের স্পন্দন হইতে ছবি বা দৃশ্যের কম-বেশি পরিমাণের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে পৃথক করিয়া দেওয়াই টেলিভিজ্‌নের গ্রাহক যন্ত্রের প্রধান কাজ। এই কম ও বেশি জোরের বিদ্যুৎ-প্রবাহ বায়ুশূন্য বিশেষ একটি টিউব (নিয়ন-বাতি)-এর ভিতর দিয়া চালনা করিয়া কম ও বেশি জোরের আলোয় রূপান্তরিত করা হয়। প্রেরক কেন্দ্রে যেমন ছিদ্রবিশিষ্ট চাকতি ঘুরাইয়া ছবি বা দৃশ্যের প্রত্যেকটি বিন্দুতে পর-পর ক্রমিকভাবে আলো ফেলা হয়, ঠিক সেইভাবে গ্রাহক কেন্দ্রেও যদি বায়ুশূন্য টিউব হইতে পাওয়া আলো অন্য একটি একই ধরনের ঘূরন্ত চাকতির ভিতর দিয়া কোনও পর্দায় ফেলা যায়, তবে দূরের ছবি বা দৃশ্য ঐ পর্দায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, ছবি বা দৃশ্যের আনুষঙ্গিক কথা বা গান শুনিতে হইলে গ্রাহক কেন্দ্রেও ভিন্ন একটি বেতার গ্রাহক যন্ত্র ও এরিয়াল খাটাইতে হয়।

বেয়ার্ডের টেলিভিজ্‌ন-পদ্ধতিতে ছবি বা দৃশ্যের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল), অর্থাৎ বলবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা সাধিত হয়। জোরিকিন্, ফার্নস্ওয়ার্থ এবং অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানী পরে টেলিভিজ্‌নের যেসব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, তাহাতে বৈদ্যুতিক উপায়ে ছবি বা দৃশ্যের বিশ্লেষণ করা হয়। জোরিকিনের ব্যবস্থায় প্রেরক কেন্দ্রে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম ইক্‌নোস্কোপ। ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞানে ক্যাথোড রে টিউবের ('ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফ' দ্র , নানা প্রয়োজনীয় প্রয়োগ সবজনবিদিত, ইকনোস্কোপ ক্যাথোড রে টিউবের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। জোরিকিনের টেলিভিজ্‌ন-ব্যবস্থায় গ্রাহক কেন্দ্রেও একটি ক্যাথোড রে টিউব থাকে – ইহাকে কিনেস্কোপ বলে।

ক্যাথোড রে টিউবে প্রতিপ্রভ বস্তুর প্রলেপ দেওয়া যে সমতল ও বৃত্তাকার কাচখণ্ডটি থাকে এবং ইহাতে যে দুই জোড়া প্লেটের মধ্য দিয়া ইলেকট্রন-রশ্মি অগ্রসর হয় সেগুলি ইক্‌নোস্কোপ যন্ত্রে থাকে না। পক্ষান্তরে এই যন্ত্রে কাচের আধারটির ভিতর খাড়াভাবে একটি অভ্রের পাতলা পাত বা শীট বসানো থাকে। এই অভ্রের ভিতর বিশেষ প্রক্রিয়ায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও পৃথক পৃথক রুপার কণিকা সন্নিবেশিত থাকে এবং ইহাদের উপর সিজিয়াম্ (Caesium) ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। অভ্রের ঠিক পিছনে পুরু তামার পাত থাকে। তামার পাতটির সঙ্গে বিবর্ধক ভাল্‌ভ যোগ করা হয়।

টেলিভিজ্‌নের ছবি ও দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি লেন্সের সাহায্যে ইক্‌নোস্কোপের ভিতর অভ্রের পাতটির উপর ফেলা হয়। সিজিয়ামের প্রলেপ দেওয়া রুপার কণিকাগুলির উপর আলো পড়ামাত্র তাহা হইতে ইলেকট্রন নির্গত হইতে থাকে। এইভাবে ঋণ-বিদ্যুৎ নিষ্ক্রান্ত হইলে রুপার কণাগুলি ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন হয়। প্রতিচ্ছবির সব স্থানে আলোর জোর সমান নয়— আলোর জোরের এই তারতম্যের ফলে অভ্রের ভিতরকার বিভিন্ন রুপার কণায় বিভিন্ন পরিমাণ ধন-বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়। এই ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুপার কণায় যদি ইলেকট্রন-রশ্মি পর্যায়ক্রমে গিয়া পড়ে, তবে ইলেকট্রনের ঋণ-বিদ্যুৎ রুপার কণার ধন-বিদ্যুতে মিলিয়া কতকটা কাটাকাটি হইয়া তামার পাতে অল্প-বিস্তর স্থির বিদ্যুৎ পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়।

ইলেকট্রনের রশ্মি অভ্রের পাতে প্রতিচ্ছবির উপর ক্রমিক পর্যায়ে যাহাতে পড়িতে পারে, ইক্‌নোস্কোপে তাহার ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থায় একজোড়া তারের কয়েল যন্ত্রটির বাহিরে ইলেকট্রন-রশ্মির দুই ধারে আড়াআড়িভাবে রাখা হয় এবং ইহাদের মধ্যে দিয়া করাতের দাঁতের আকারে তরঙ্গায়িত বিদ্যুৎ-প্রবাহ (স'-টুথ কারেণ্ট) চালনা করা হয়। অভ্রের গায়ে বিভিন্ন পরিমাণ ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ রুপার কণায় যখন ইলেকট্রন-রশ্মি পর্যায়ক্রমে পড়ে, তখন তামার পাতে সেই একই ক্রমে বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়। এই কম-বেশি বিদ্যুতের পরিমাণ মূলতঃ টেলিভিজ্‌নের ছবি বা দৃশ্যের কম-বেশি আলোর জোরের উপর নির্ভর করে। ইহা হইতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহই যখন বিবর্ধিত আকারে প্রেরক যন্ত্রের উচ্চহার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর চাপানো যায়, তখন এই ছবি বা দৃশ্যের মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের এরিয়াল হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

এই ব্যবস্থায় গ্রাহক কেন্দ্রে একটি সুগ্রাহী গ্রাহক যন্ত্র ও সেইসঙ্গে একটি কিনেস্কোপ যন্ত্র থাকে। এরিয়ালের মারফত প্রাপ্ত মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুৎ-স্পন্দন হইতে গ্রাহক যন্ত্রে ছবি বা দৃশ্যের বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ পৃথক করিয়া পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন পরিমাণ বিদ্যুৎ-চলাচলের ফলে, ক্যাথোড রে টিউবের ফিলামেণ্ট্‌টিকে ঘিরিয়া সামনেই যে ধাতুর নল (শিল্ড) থাকে, সেই নল ও ফিলামেণ্ট্‌টির ভিতর বিভিন্ন পরিমাণের ভোল্‌টেজ্ বা

বৈদ্যুতিক চাপের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে ক্যাথোড রে টিউবে ইলেকট্রন রশ্মির জোর কম বেশি দেখা যায়। প্রেরক কেন্দ্রে ইক্‌নোস্কোপ যন্ত্রে যেমন ইলেকট্রন রশ্মি অভ্রের পাতার পর পর ক্রমান্বয়ে চালিত হয়, গ্রাহক কেন্দ্রের ক্যাথোড রে টিউবেও তেমনই ইলেকট্রন রশ্মি একইভাবে চালিত করা হয়। সব ব্যবস্থা ঠিকমত হইলে গ্রাহক কেন্দ্রের ক্যাথোড রে টিউবের প্রান্তে প্রতিপ্রভ বস্তুর প্রলেপ দেওয়া কাচখণ্ডে টেলিভিজ্‌নের প্রেরক কেন্দ্রের ছবি বা দৃশ্য দেখা যায়। ছবি ও দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কথা বা গান শুনিবার জন্য গ্রাহক ও প্রেরক কেন্দ্রের বাড়তি ব্যবস্থার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

আধুনিক কালে অর্থিকন্ (Orthikon), ইমেজ্-অর্থিকন্ (Image Orthikon), ভিডিকন (Vidicon) প্রভৃতি যন্ত্রে টেলিভিজ্‌ন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এখন টেলিভিজ্‌নের ছবি বা দৃশ্যের সুস্পষ্ট রূপ তো পাওয়া যায়ই, উপরন্তু তাহাদের কতকটা স্বাভাবিক রঙেও দেখিতে পাওয়া যায়।

টেলিভিজ্‌নের গ্রাহক যন্ত্রে সিনেমার ছবির মত বড় আয়তনের ছবি পাওয়া এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। ছবির আয়তন দুই ফুট চৌকোর বেশি হয় কিনা সন্দেহ। টেলিভিজ্‌নের জন্য যে উচ্চহার বিদ্যুৎ স্পন্দনের উপর ছবি বা দৃশ্যের বিদ্যুৎ-প্রবাহ চাপাইয়া মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করা— ছবির স্পষ্টতার জন্য তাহার কম্পাঙ্ক (ফ্রিকোয়েন্সি) অত্যন্ত অধিক হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ বাহক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১০ মিটারের কম হইলে ছবি বেশ স্পষ্ট হয়। সেজন্য টেলিভিজ্‌নের প্রেরক যন্ত্রে অতি-হ্রস্ব বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ব্যবহার হয। অতি হ্রস্ব তরঙ্গের উপযোগী এরিয়্যালেরও বিশেষত্ব থাকে। এই অতি হ্রস্ব তরঙ্গের অসুবিধাও আছে। প্রথমতঃ আয়নমণ্ডলে প্রতিফলনের সাহায্যে অতি হ্রস্ব তরঙ্গকে আকাশপথে দূরদূরান্তে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ হ্রস্ব তরঙ্গ পৃথিবীর গা বাহিয়া ৮০/৯০ কিলোমিটারের (৫০/৬০ মাইল) বেশি অগ্রসর হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এই কারণে বিনা-তারে টেলিভিজ্‌নের দৌড় খুব বেশি হওয়া সম্ভব নয়। তবে যতটা দূর সম্ভব বেতারে এবং তাহার বেশি দূরে তারের সাহায্যে টেলিভিজ্‌নের ব্যাপক ব্যবস্থা ইওরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায়।

ভারতবর্ষে টেলিভিজ্‌ন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। আশা করা যায়, টেলিভিজ্‌ন অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে নিয়মিতভাবে প্রচলিত হইবে।

দ্র জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দূরেক্ষণ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, K. Fowler and H. B. Lippert, *Television Fundamentals*, New York, 1953, M. S Kiver, *Television Simplified*, Van Nostrand, 1962, V. K Zworykin and G. A. Morton, *Television*, New York

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

টেলিভিজ্‌ন প্রেরণ ও গ্রহণে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই। এইদিন আমেরিকান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানি ‘টেল্‌স্টার’ নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথে স্থাপনা করে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে স্থাপিত তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে টেলিভিজ্‌নের আদান প্রদান ঘটে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর ‘রিলে’ নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইওরোপ ও ব্রাজিলের মধ্যে টেলিভিজ্‌নের সংযোগ স্থাপন করা হয।

এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি সাধারণ হইতে একটু স্বতন্ত্র। বেতার বা টেলিভিজ্‌নের মাইক্রোওয়েভ কোনও কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে সাধারণভাবে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনও দূরবর্তী কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিলে তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রতিফলিত অতিক্ষীণ বেতার তরঙ্গ ‘মেজার’ (Maser, ‘মেজার’ দ্র) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ধরা হইয়াছে। দুইটি স্থানের মধ্যে যোগাযোগ সাধনে ব্যবহৃত এইপ্রকার সাধারণ কৃত্রিম উপগ্রহকে ‘প্যাসিভ’ বলা হইয়া থাকে। টেল্‌স্টার বা রিলের গঠনপ্রণালীতে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহার জন্য এই শ্রেণীর কৃত্রিম উপগ্রহকে ‘অ্যাকটিভ রিপিটর’ নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে— সূর্যালোকের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন করা যাইতে পারে এইরূপ অসংখ্য সৌর সেল (সোলার সেল) থাকে। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রেরিত বেতার বা টেলিভিজ্‌ন-সংকেত কৃত্রিম উপগ্রহটিতে গৃহীত হয় এবং ইহার মধ্যে স্থাপিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিলে হইয়া উহা পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে প্রত্যাগত সংকেত যথেষ্ট জোরালো থাকে।

পৃথিবী পৃষ্ঠের বক্রতার জন্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে সংকেত পাঠাইবার সময় এই ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যস্থতার প্রয়োজন। সকল স্থানের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করিতে হইলে কয়টি কৃত্রিম উপগ্রহ লাগিবে তাহা নির্ভর করে উহাদের কক্ষপথের দূরত্বের উপর। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ৩৫৭০০ কিলোমিটার উচ্চে

বিষুবরেখার বরাবর পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করিতে পারিলে উহা ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আসে। ফলে ইহা সব সময় পৃথিবী-পৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট স্থানের মাথার উপরে দৃষ্ট হইবে। এইরূপ তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহকে হিসাবমত দূরত্বে পর পর স্থাপন করিলে তাহাদের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র যোগাযোগ সাধন করা সম্ভব।

এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার প্রথম সোপান হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি 'সিংকম' নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করে। ইহা সঠিক কক্ষপথে স্থাপিত হইলেও যন্ত্রপাতি বিকল হইবার ফলে কোনও যোগাযোগ সাধন করে নাই। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল এই পর্যায়ে 'আর্লি বার্ড' নামে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টেলিভিজ্ন আদান প্রদান করিতেছে।

দ্র United States Information Service, *Telstar* ; *America's Scientific Quest* ; *Sojourner*, vol 3, no 8, 1965.

মনোজকুমার পাল

টেলিস্কোপ দূরবীক্ষণ দ্র

টোটকা ঠিক জ্ঞানসারে বিজ্ঞানসম্মত নয় অথচ নানাবিধ গাছ-গাছড়ার ঔষধরূপে রোগ নিবারণের জন্য ব্যবহারের নামই টোটকা চিকিৎসা। সাধু সন্ন্যাসী বা গ্রাম বৃদ্ধের পরম্পরায় প্রদত্ত ঔষধও টোটকা বলিয়া পরিচিত। বহুল প্রয়োগহ ইহাদের টোটকা ঔষধরূপে স্বীকৃতি দিয়াছে। শুধু গাছ গাছড়াই নয়, নানা রকম প্রাণী বা তাহাদের দেহাংশ, এমনকি তাহাদের মল মূত্র প্রভৃতিও পৃথিবীর সর্বত্র টোটকারূপে ব্যবহৃত হয়। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া'য় দেখা যায় পিত্ত, রক্ত, পশুপাখির নখ, মোরগের ঝুঁটি, পালক, পশম, লোম, ঘাম, থুথু, বৃশ্চিক, সাপের চামড়া, মাকড়সার জাল, উকুন প্রভৃতিও ঔষধরূপে তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সকল টোটকা সম্বন্ধে প্রথমেই বিরূপ ধারণা না করিয়া তাহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে যথাযথ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এইরূপ টোটকা ঔষধ বলিয়া পরিচিত কোনও কোনও ওষধি হইতেই উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বহু মূল্যবান ঔষধও আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন সর্পগন্ধার (রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা) শিকড় রক্তচাপের টোটকারূপে পরিচিত ছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া, আজ 'রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা' শুধু রক্তচাপের নহে, মানসিক ব্যাধিরও একটি অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কুচি, পুনর্নবা, অশোক প্রভৃতি ভারতীয় টোটকা ঔষধগুলি একইভাবে আজ ভেষজবিজ্ঞানসম্মত ঔষধ বলিয়া গণ্য।

এদেশে বহু গাছ গাছড়া টোটকা ঔষধরূপে নানা রোগে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে তাহাদের কতকগুলির উল্লেখ করা গেল, যেমন কোথাও কাটিয়া গেলে গাঁদা ফুলের পাতার রস, পেটের অসুখে গাঁধাল বা থানকুনি পাতার রস, খুব বেশি মাথাব্যথায় মানকচু পাতার নিম্নাংশ পোড়ানো রসের বহিঃপ্রয়োগ, কাশিতে বাসকের পাতার রস, সর্দি ও কাশিতে তুলসী পাতার রস, হৃদ্‌রোগে অর্জুন ছালের রস, কোষ্ঠকাঠিন্যে ইসবগুল, মধুমেহ রোগে কালোজামের বিচির উপকার পাওলা আবরণ, আঘাতজনিত মচকানো প্রভৃতিতে বেদনানাশক চুন হলুদের প্রলেপ, সর্দিতে মেথি, মূত্র পরিষ্কারের জন্য উড়থ কড়াই, স্বরভঙ্গে ব্রাহ্মীরস, কুষ্ঠ ব্যাধিতে খদির, কর্ণবেদনায় ঘৃত-কুমারী বা তুলসী পাতার রস, ছুলিতে শ্বেত চন্দন, কৃমি রোগে আনারস পাতার রস, হিক্কায় বড় এলাচচূর্ণ সহ মিছরির গুঁড়া, হাম, জলবসন্ত প্রভৃতিতে নিমপাতা সিদ্ধ জল, পাগলা কুকুর বা শৃগালের দংশনের প্রতিষেধে মাহলঙ, চোখ ভাল রাখিতে সুর্মা বা কাজল প্রভৃতি।

একইভাবে প্রাণীদেহজাত নানাবিধ টোটকাও ব্যবহৃত হয়, যেমন কর্ণপীড়ায় স্তনদুগ্ধ, যক্ষ্মায় ছাগল বা ভেড়ার লোম, হিক্কায় মধুসহ ময়ূরের পালকচূর্ণ, সূতিকা রোগে ধনেশ পাখির ঠোঁট ঘসা বা ভস্ম, বাতরোগে মহামাস তৈল বা বাঘের চর্বির মালিশ, ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরে যকৃৎ ও প্লীহাবৃদ্ধিতে গোবৎসের মূত্র, অর্শ রোগে জ্যান্ত কেঁচো, মৃগী রোগে মানুষের করোটির অস্থিভস্ম এবং আকন্দ গাছের পোকা গোলমরিচসহ ঔষধরূপে কিংবা ছাগলের নাদি-ভস্মের তিলক, ছাগলের শিং পোড়ানো ধোঁয়া কিংবা শৃগালের পিত্তে ভিজানো গোলমরিচকে শুখাইয়া জলে বাটিয়া তাহা নাকে টানার ব্যবস্থা প্রভৃতি। এমনই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক টোটকাও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

টোডরমল আকবরের কর্মচারী ও মন্ত্রীগণের অন্যতম। টোডরমলের পিতা ছিলেন পাঞ্জাবের টণ্ডন ক্ষত্রীবংশজাত। সেখান হইতে তিনি বর্তমান উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত লাহারপুরে আসেন। সেইখানেই

টোডরমলের জন্ম। সম্ভবতঃ তিনি শের শাহের অধীনে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। আকবরের অধীনে সামান্য কেরানী পদ হইতে ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া বকীলের পদ অলংকৃত করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। তখন সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে কোনও পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেক কার্যেই টোডরমল স্বীয় দক্ষতায় সম্রাটের পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করেন।

তিনি একজন সুদক্ষ সৈন্য ও রণকুশলী সেনাপতি ছিলেন। আকবর তাঁহাকে বিভিন্ন অভিযানে ও কূটনৈতিক কার্যে পাঠাইয়াছিলেন। উজবেক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে (১৫৬৫ খ্রী), চিতোর অভিযানে (১৫৬৭ খ্রী), রণথম্ভোরে (১৫৬৮ খ্রী), সুরাট দুর্গ সম্বন্ধে প্রতিবেদন পাঠাইবার জন্য (১৫৭৩ খ্রী), রাণা প্রতাপের নিকট গোগুণ্ডায় দূত হিসাবে (১৫৭৪ খ্রী) এবং বঙ্গ-অভিযানে বৃদ্ধ মুনিম খানের প্রথম সহকারী হিসাবে টোডরমলের কার্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সেনাপতি হিসাবে তিনি এই শেষোক্ত যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং টুকরা (টুর্করা, তুকারই) যুদ্ধে (৩ মার্চ, ১৫৭৫ খ্রী) পরাজিত দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। মুনিম খানের মৃত্যুতে (অক্টোবর, ১৫৭৫ খ্রী) দাউদ বাংলা অধিকার করিয়া লইলে টোডরমলের কৌশল ও খানজাহানের ঔদার্যের ফলে পলায়নরত মোগল সৈন্য নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। রাজমহলের যুদ্ধে (১২ জুলাই, ১৫৭৬ খ্রী) টোডরমল দাউদের প্রখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। দাউদ নিহত হন এবং বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র বঙ্গ দেশ অবশেষে পুনরধিকৃত হয়। গুজরাতের শাসনকর্তা উজীর খান, মজঃফর হুসেন মীর্জার বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হইলে আকবর দ্বিতীয়বার টোডরমলকে সেখানে পাঠান ও তাঁহার চেষ্টায় মীর্জা পরাজিত হন (১৫৭৭ খ্রী)। বিহারের বিদ্রোহ দমনে টোডরমলই প্রকৃত নেতা ছিলেন (১৫৮০ খ্রী)। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে মানসিংহের সহিত টোডরমলও গিয়াছিলেন (১৫৮৬ খ্রী)। একজন ক্ষত্রী তরবারি দ্বারা তাঁহাকে আহত করে (১৫৮৭ খ্রী)।

মোগল যুগের প্রশাসন-ব্যবস্থাতেও টোডরমলের বিশিষ্ট অবদান ছিল। নব-বিজিত গুজরাতের দেওয়ান হিসাবে তিনি জমি-বিলির নূতন ব্যবস্থা করেন এবং ছয় মাসের মধ্যে জমি জরিপ করাইয়া উৎপন্ন দ্রব্যের আধারে রাজস্ব-আদায়ের নীতিও নির্ধারিত করেন (১৫৭৩-৭৪ খ্রী)। পরে মজঃফর খান বকীলের অধীনে টোডরমল রাজস্বমন্ত্রী নিযুক্ত হন। আকবর টোডরমলের সহিত পরামর্শ করিয়া দাগ-ব্যবস্থা ও রাজকর্মচারীদের পদমর্যাদার ক্রম নির্ধারণ করেন। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আকবর টাঁকশাল সংস্কারের জন্য কোটপুতলীতে মজঃফর খান, শাহ্ মনসুর ও টোডরমল প্রমুখ রাজস্বসচিবদের এক সভা আহ্বান করেন। টোডরমলের অধীনেই বাংলার টাঁকশাল ন্যস্ত হয়। বঙ্গের বিদ্রোহ দমনের পর টোডরমল উজির পদে নিযুক্ত হন (১৫৮১ খ্রী)। পর বৎসরে টোডরমল দেওয়ান-ই-আশরফ (প্রধান দেওয়ান), কার্যতঃ বকীলের (প্রধান-মন্ত্রী) পদে উন্নতি লাভ করেন। ইহাতে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে তিনিই প্রথম হিন্দু নিযুক্ত হইলেন (১৫৮২ খ্রী)। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নওরোজ উৎসবে টোডরমল চারহাজারী মনসবদার নিযুক্ত হইয়া সম্মানিত হন।

সম্রাটের অনুপস্থিতিতে রাজধানীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দুইবার টোডরমলের উপর ন্যস্ত হয়। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর লাহোরে টোডরমলের মৃত্যু হয়।

মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজস্বসচিব হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। অসামান্য কর্মদক্ষতা, শাসনের বিভিন্ন বিভাগের, বিশেষতঃ অর্থ ও রাজস্বের জ্ঞান, কর্তব্য-পরায়ণতা ও আনুগত্য ছিল তাঁহার উন্নতির প্রধান কারণ। তাঁহার বকীল হইবার ফলে প্রশাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল। ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন যে তাঁহার আদেশেই রাজস্বের হিসাব ফারসীতে লিখিত হয় ও ইহার ফলে হিন্দুরা ফারসী ভাষা শিখিতে বাধ্য হয়। মানুষ হিসাবে টোডরমল ছিলেন স্বাধীনচেতা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন। সামাজিক রাজনীতি, জ্যোতিষ, আইন, ব্যবহারশাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি 'টোডরানন্দ' নামে এক গ্রন্থও সংকলন করিয়াছিলেন।

দ্র *Akbarnamah*, *Ain-i-Akbari*, *Massir-ul-Umara*; V A. Smith, *Akbar the Great Mogul*, Oxford, 1919; J. N. Sarkar, ed., *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948; A. L. Srivastava, *Akbar the Great*, Agra, 1962.

জগদীশনারায়ণ সরকার

টোডা উপজাতিবিশেষ। মাদ্রাজ রাজ্যে নীলগিরি পর্বতের উপত্যকায় টোডাদের বাস। ইহাদের দেহ দীর্ঘ এবং শ্মশ্রু ও গুম্ফের প্রাচুর্য দেখা যায়। উত্তর ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে টোডাদের শরীরের মিল বেশি, স্থানীয় মাদ্রাজের অধিবাসীদের সঙ্গে মিল কম। টোডাগণ পশু-

পালক ; উহারা প্রধানতঃ মহিষ পালন করিয়া থাকে। মহিষের দুগ্ধজাত দধি, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে চাউল এবং অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করে। অনুষ্ঠানাদিতে কদাচিৎ মহিষ অথবা শম্বর হরিণের মাংস খায়, অন্য মাংস স্পর্শও করে না। টোডাদের মধ্যে দুগ্ধের বহুল ব্যবহার আছে। পশুপালনের সমুদয় কার্য পুরুষেরা করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের ঐ সকল কর্মে কোনও অধিকার নাই। টোডা কুটিরগুলি বিশিষ্ট গড়নের হয়। ইহারা বস্ত্রবয়নে অনভিজ্ঞ। টোডা রমণীদের দেহে উল্কি আঁকার প্রচলন আছে।

টোডাগণ দুইটি শাখায় বিভক্ত: 'টারথার' এবং 'টিভালি'। বিবাহব্যবস্থা প্রতি শাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'টারথার' বিভাগে ১২টি এবং 'টিভালি' বিভাগে ৬টি গোত্র বর্তমান। প্রত্যেক গোত্র 'কুড়' এবং 'লোল্‌ম' এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত। 'টারথার'গণ নিজদিগকে 'টিভালি' অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া মনে করে। টোডা-সমাজে একটি স্ত্রীলোকের একাধিক পতির সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার রীতি প্রচলিত। সাধারণতঃ একাধিক ভ্রাতা একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া থাকে। বর্তমানে যৌথভাবে একাধিক স্ত্রীগ্রহণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উহারা সন্তানের পিতৃত্ব 'পুরুস্থুৎ পুমি' নামক অনুষ্ঠানের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া লয়। স্ত্রীর ৭ মাস গর্ভকালে স্বামীদের মধ্যে একজন ধনুর্বাণ লইয়া উল্লিখিত অনুষ্ঠান পালন করে এবং জাত সন্তানের পিতারূপে পরিচিত হয়। যত দিন না অপর কোনও স্বামী অনুরূপ অনুষ্ঠান পালন করে, অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিই পিতারূপে সমাজে পরিগণিত হয়। টোডাগণ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। ইহাদের পঞ্চায়েত বা 'নিয়াম' টারথার বিভাগের ৩ জন, টিভালি বিভাগের একজন এবং পার্শ্ববর্তী 'বাদাগা' নামক আদিবাসীদিগের একজনকে লইয়া গঠিত হয়।

প্রত্যেক গোত্রের পৃথক পৃথক শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করা হয়। মৃতদেহে অগ্নিসংযোগের পূর্বে তাহার কেশের কিয়দংশ কাটিয়া রাখার রীতি আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। টোডাগণ ভূত, প্রেত এবং ডাকিনী তন্ত্রে বিশ্বাসী। ইহাদের প্রধান দেবীর নাম 'টিয়েক ত্রি'।

বর্তমানে টোডাদিগের সংখ্যা প্রায় ১১০০। ইহার মধ্যে প্রায় ২০০ জন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

দ্র W. R. King, 'The Aboriginal tribes of the Nilgiri Hills', *Journal of Anthropology*, vol. I, London, 1870 ; J. W. Breeks, *An Account of the Primitive Tribes & Monuments of the Nilgiris*, London, 1873 ; W. E. Marshall, *A Phrenologist amongst the Todas* London, 1873; E. Thurston, 'Anthropology of the Todas & Kotal of the Nilgiri Hills', *Madras Government Museum Bulletine*, vol. I, no. 4, 1896 ; W. H. R. Rivers, *The Todas*, London, 1906 ; E. Thurston, *Castes & Tribes of South India*, vols. 1-7, Madras, 1909.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

টোয়েন, মার্ক (১৮৩৫-১৯১০ খ্রী) আমেরিকার সুবিখ্যাত হাস্যরস স্রষ্টা সাহিত্যিক। মার্ক টোয়েনের আসল নাম স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্স। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লরিডা রাজ্যে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। পিতার অকালমৃত্যুতে অতি অল্প বয়সেই স্যামুয়েলকে অর্থোপার্জনের উপায় অন্বেষণ করিতে হয়। প্রথমে তিনি ছাপাখানায় শিক্ষানবিশের ও পরে এক স্টিমার কোম্পানিতে পাইলটের কাজ গ্রহণ করেন। স্টিমার কোম্পানিতে কাজ করিবার সময়ে বহু বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। এই অভিজ্ঞতাকেই তিনি পরবর্তী কালে তাঁহার সাহিত্য-রচনার কাজে ব্যবহার করিয়াছেন। 'মার্ক টোয়েন' ছদ্মনামের উৎপত্তি এখানেই। নদীর গভীরতা পরিমাপ করা পাইলটের অন্যতম কাজ। 'মার্ক টোয়েন' (অর্থাৎ দুই ফ্যাদম গভীর) সেই মাপের সাংকেতিক শব্দ। স্টিমার কোম্পানির কাজ ছাড়িয়া তিনি এক সংবাদপত্রের দপ্তরে কাজ গ্রহণ করেন। ঐ সংবাদপত্রে তিনি তাঁহার নিজস্ব সরস ভঙ্গীতে কিছু কিছু ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে থাকেন। অল্প দিনের মধ্যেই পাঠকমহলে বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। লেখার চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ফলে নানা পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনায় এক অবিরাম হাস্যরসধারার সৃষ্টি হয়। তাঁহার ভূমধ্যসাগরের ভ্রমণবৃত্তান্ত 'দি ইনোসেন্ট্‌স অ্যাব্রড' (১৮৬৯ খ্রী) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে 'দি অ্যাড্‌ভেঞ্চার্স অফ টম সয়ার' (১৮৭৬ খ্রী), 'এ ট্র্যাম্প অ্যাব্রড' (১৮৮০ খ্রী), 'লাইফ অন দি মিসিসিপি' (১৮৮৩ খ্রী), 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাক্‌ল্‌বেরি ফিন' (১৮৮৪ খ্রী) প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

পরিণত বয়সে তিনি একটি প্রকাশন-সংস্থা স্থাপন

করিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত হন, কিন্তু উহাতে প্রভূত ক্ষতি হয় এবং তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তিনি পৃথিবীভ্রমণে বাহির হন। বক্তা হিসাবে তিনি পূর্বেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া (ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন) প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন। ৭৫ বৎসর বয়সে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি আমেরিকার সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক হিসাবে পরিচিত এবং একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত।

দ্র A. B Paine, *Mark Twain a Biography*, New York, 1935; G C Bellamy, *Mark Twain as a Literary Artist*, Norman, 1950

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

টোল সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র পঠন-পাঠনের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ধরনের বিদ্যালয়। ইহার পুরা বাংলা নাম চৌপাড়ি বা চৌবাড়ি— অর্বাচীন সংস্কৃত নাম চতুষ্পাঠী। এক একটি টোলে এক একজন অধ্যাপক থাকিতেন এবং তিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, টোলে মুখ্যতঃ সেই বিষয়ই পড়ানো হইত। অধ্যাপকের খ্যাতি অনুসারে দূরদূরান্ত হইতে ছাত্র উপস্থিত হইত। স্থানীয় ছাত্র ছাড়া অন্য ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা টোলেই হইত। থাকা-খাওয়া বা পড়ার জন্য ছাত্রদের কোনও অর্থ দিতে হইত না। জমিদারের স্থাপিত টোলের ব্যয় জমিদারের দেওয়া অর্থ বা ভূসম্পত্তির আয় হইতে নির্বাহিত হইত। অধ্যাপক-পরিচালিত টোলের ব্যয়-নির্বাহের কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে অধ্যাপকমহাশয় বৈষয়িক সমাজের নিকট হইতে যে দান প্রাপ্ত হইতেন তাহা দ্বারাই খরচ চলিয়া যাইত। এই প্রসঙ্গে ছাত্রদেরও কিছু কিছু আয় হইত। অনেক সময়ে ক্রিয়াকর্মে বড়লোকের বাড়িতে আয়োজিত শাস্ত্র-বিচার সভায় কৃতিত্ব দেখাইয়া অধ্যাপক সম্মান ও অর্থ লাভ করিতেন। টোলে পড়ার সময় নির্ধারিত থাকিত না। সকাল ও বৈকালেই সাধারণতঃ অবসরমত অধ্যাপকমহাশয় এক-একজন করিয়া ছাত্র পড়াইতেন। প্রতিপদ ও অষ্টমীতে পড়ানো বন্ধ থাকিত— এই দিনে ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে পড়ার বিষয় আলোচনা করিত। পাঠসমাপনান্তে অধ্যাপকমহাশয়ই ছাত্রকে উপাধি দান করিতেন। সরকারি পরীক্ষার প্রবর্তন হইলেও অনেকে পরীক্ষালব্ধ উপাধি অপেক্ষা গুরুদত্ত উপাধিরই অধিকতর সমাদর করিতেন। বর্তমানেও কিছু কিছু টোল আছে, তবে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তাহাদের পূর্ব-গৌরব নাই।

পাদ্রি ওয়ার্ড, অ্যাডাম ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার ও শেষের দিকের টোলের বিবরণ দিয়াছেন। বনমালী চক্রবর্তীমহাশয় টোলের শিক্ষাপদ্ধতির দোষ গুণ আলোচনা করিয়াছেন।

দ্র W Ward, *A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos*, vol. 1, 1818; Mahes Chandra Nyayaratna, *Reports on the Tols of Bengal, Bihar and Orissa*, Calcutta, 1892, Vanamali Chakravarty, *The Present State of Sanskrit Learning in Bengal*, Calcutta, 1910; William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1838)*, Calcutta, 1941.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ট্রট্‌স্কি, লিও ব্রন্‌স্টিন, লেভ দ্র

ট্রপোপজ বায়ুমণ্ডল দ্র

ট্রপোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডল দ্র

ট্রম্বে বোম্বাই রাজ্যের একটি শিল্পপ্রধান স্থান। ইহা বোম্বাই শহর হইতে ২৭ কিলোমিটার (১৫ মাইল) দক্ষিণে থানা খাড়ির মুখে অবস্থিত। এই স্থান হইতে এলিফ্যান্টা দ্বীপে যাইবার ব্যবস্থা আছে ('এলিফ্যান্টা' দ্র)।

বর্তমানে শিল্পোন্নয়নে পরমাণু শক্তির প্রয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠিত অ্যাটমিক এনার্জি এসট্যাব্লিশ্‌মেণ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্যই ট্রম্বের বিশেষ খ্যাতি। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭৫০০ জন বৈজ্ঞানিক ও কারিগর নিযুক্ত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, ধাতুবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রশাসন— এই ছয়টি বিভাগে পরিব্যাপ্ত। প্রত্যেক বিভাগ এক-একজন অধিকর্তার অধীনে। আণবিক শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষণের জন্য ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিক্ষণ-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় বৎসরে ১৫০ জন স্নাতকোত্তরকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এই প্রতিষ্ঠানের 'ভাবা পরমাণু-গবেষণা কেন্দ্রে' (অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার) ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগস্ট

তারিখে প্রতিষ্ঠিত 'অপ্সরা' এশিয়ার মধ্যে প্রথম রিঅ্যাক্টর। ইহার পর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'কানাডা-ভারত রিঅ্যাক্টর' ও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'জেরলিনা রিঅ্যাক্টর' চালু হয়। এই রিঅ্যাক্টরগুলিতে ৩৫০ প্রকারের রেডিও-আইসোটোপ উৎপন্ন হয়। এইগুলি আমাদের দেশে নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইতেছে। ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশেও আইসোটোপ রপ্তানি করা হয় ('আইসোটোপ' দ্র)। ট্রম্বেতে রেডিয়েশনের (তেজস্ক্রিয়তা) দ্বারা খাদ্য-সংরক্ষণের উপর গবেষণা হইতেছে।

ট্রম্বেতে ইউরিয়া ও নাইট্রোফসফেট সারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কারখানা আছে। নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের জন্য একটি 'গামা ফিল্ড' স্থাপিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা নানা প্রকারের চাল ও নানা শস্যের উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। সার-নির্মাণ ছাড়া ট্রম্বের পেট্রোকেমিকাল প্রকল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদেশ হইতে কাঁচা পেট্রোলিয়াম আনাইয়া পরিশোধন করিয়া তাহা হইতে পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি প্রস্তুত করার জন্য ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বার্মা শেল ও ক্যালটেক্স কোম্পানিও এখানে ২টি কারখানার পত্তন করিয়াছে।

নীহাররঞ্জন • নিবারন
সুবোধ মুখোপাধ্যায়

ট্রাম প্রথম যাত্রীবাহী ট্রাম ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক হইতে হার্লেম পর্যন্ত চলাচল করে। পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডেও ট্রামের প্রবর্তন হয়।

ট্রামগাড়ি আগে কাঠের লাইনের উপর দিয়া চলিত, পরে লৌহনির্মিত লাইনের প্রচলন হয়। প্রথম দিকে, প্রয়োজনমত একটি হইতে ৪টি ঘোড়ার দ্বারা ট্রাম টানা হইত, পরে স্টিম ইঞ্জিন (১৮৭১ খ্রী) এবং আরও পরে লৌহনির্মিত দড়ির সাহায্যে ট্রাম টানা শুরু হয়। বর্তমানে ট্রাম বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলে।

বর্তমানে ট্রামের গঠন-বিন্যাস প্রায় সব দেশেই এক-প্রকার। দুইটি চারি মেরু-বিশিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে আবৃত, সিরিজ অথবা কম্পাউণ্ড ডি. সি. মোটর ব্যবহার করা হয় এবং এই মোটরে অন্তর্বর্তী মেরু সন্নিবিষ্ট থাকে। দুইতলবিশিষ্ট ট্রামের জন্য এই মোটরের শক্তি ৩০-৫০ অশ্ব-শক্তি পর্যন্ত হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ-চলাচলের জন্য মাথার উপরে ট্রলি ওয়্যার এবং ট্রামের লাইন ব্যবহৃত হয়। ট্রামের অভ্যন্তরস্থ মোটরের সঙ্গে ট্রলি ওয়্যারের বৈদ্যুতিক সংযোগ সাধারণতঃ ঘূর্ণায়মান চাকা (হুইল ট্রলি) অথবা বো কলেক্টরের সাহায্যে করা হয়। বৈদ্যুতিক চাপের পরিমাণ ৫০০-৬০০ ভোল্ট ডি. সি, যদিও কোনও কোনও আমেরিকান ব্যবস্থায় ১২০০ ভোল্টের ব্যবহারও দেখা যায়। ট্রামের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রাম কন্ট্রোলারের ব্যবহার হয়। ইহার সাহায্যে সিরিজ-প্যারালাল সংযোগ ও মেরুর চৌম্বক শক্তির পরিবর্তন ঘটাইয়া গতি-নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ট্রাম থামাইবার জন্য বায়ুচালিত ব্রেক অথবা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা থাকে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সাধারণতঃ রিও-স্ট্যাটিক ব্রেকিং-এর ব্যবস্থা থাকে, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রিজেনারেটিভ ব্রেকিং-এর ব্যবস্থাও থাকে।

পূর্বে ট্রামে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য সাধারণতঃ রোটারি কন্ভার্টার ব্যবহৃত হইত, তবে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার রেকটিফায়ার বিশেষতঃ মার্কারি-আর্ক রেকটিফায়ারের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি।

যাত্রীবহনের ব্যাপারে ট্রামের প্রতিযোগী হইল ট্রলিবাস এবং মোটরবাস। তবে ট্রামগাড়ি চালানোর ব্যয় উহাদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে কম হওয়ায় ট্রাম এখনও যাত্রী-বহনের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হইতেছে।

দ্র *The Engineers' Yearbook*, London, 1942; E Malloy, ed., *The Electrical Engineers' Reference Book*, London, 1958.

সুবেন্দুপ্রসাদ বসু

ট্রায়াসিক মধ্যজীবীয় কল্পের (মেসোজয়িক এরা) প্রথম যুগটিকে এবং ঐ যুগের শিলাসমষ্টিকে 'ট্রায়াসিক' বা 'ট্রায়াস' নামে অভিহিত করা হয়। জার্মানীর এফ. ফন. আলবের্টি (F. von Alberti) ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই নামকরণ করেন। পার্মিয়ান যুগের শেষ হইতে জুরাসিক যুগের শুরু পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কোটি বৎসর ধরিয়া ট্রায়াসিক যুগের স্থায়িত্বকাল। প্রায় ১৮ কোটি বৎসর পূর্বে এই যুগের অবসান ঘটে।

এই যুগের মহাদেশীয় এবং সামুদ্রিক পাললিক শিলা জার্মানী, ব্রিটেন, আল্পস, ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজীল্যাণ্ড ইত্যাদি অঞ্চলে দেখা যায়। ভারতে ট্রায়াসিক সামুদ্রিক শিলা প্রধানতঃ হিমালয় অঞ্চলে ও কাশ্মীরে এবং মহাদেশীয় শিলা দামোদর-উপত্যকা, শোণ-মহানদী-উপত্যকা, গোদাবরী-উপত্যকা ও সাতপুরায় দেখা যায়। মহাদেশীয় শিলার অঞ্চলগুলি তখন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অন্তর্গত ছিল।

ট্রায়াসিক যুগের প্রাণীকুলের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সরীসৃপ, উভচর জীব ও অ্যামোনাইট (একপ্রকার বিলুপ্ত অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক জীব) ছিল প্রধান। এই যুগেই প্রথম স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয়। উদ্ভিদ জগতে গ্লসপ্‌টেরিস কুলের স্থান অধিকার করিয়াছিল থিন্‌ফেল্‌ডিয়া টাইলোফাইলাম্‌ কুল। পার্মিয়ান যুগের আর্দ্রতা কমিয়া এই সময়ে জলবায়ু শুষ্ক, অনেক ক্ষেত্রে মরুভূমিপ্রায় হইয়া ওঠে। হ্রদ ও নদীগুলি ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়। ট্রায়াসিক বালি পাথরে ও কাদা পাথরে এইজন্য জারণের (অক্সিডেশন) সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে।

এই যুগের খনিজ সম্পদের মধ্যে জিপসাম, খনিজ লবণ এবং কয়লা উল্লেখযোগ্য।

দ্র C. Diener, 'Trias of the Himalayas', *Memoirs of Geological Survey of India*, vol 36, part 3, 1912, D. N. Wadia, *Geology of India*, London, 1953; M. S Krishnan, *Geology of India and Burma*, Madras, 1960

শৌরীন্দ্র ঘটক

ট্রাস্ট ন্যাস দ্র

ট্র্যাক্টর ভারী বস্তু পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত স্বয়ংচালিত এক ধরনের শকট। কৃষিক্ষেত্রেই ট্র্যাক্টরের প্রথম ব্যবহার শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্র্যাক্টরের সাহায্যে জমির সংস্কার সাধনে ও বেশি ফসল উৎপাদনে প্রথম সচেষ্ট হয়। উনিশ শতকের শেষে আমেরিকায় অন্তর্দহন ইঞ্জিনের আবির্ভাব হয়। প্রথম যুগে জ্বালানিরূপে গ্যাসোলিন ব্যবহৃত হইত, এখন ডিজেল ইহার প্রধান জ্বালানি। আজকাল এক ধরনের সর্বার্থসাধক ট্র্যাক্টরের সাহায্যে বীজ-বপন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজও করা হয়। অনুর্বর জমিতে ট্র্যাক্টরের সাহায্যে মাটির ৩-৪ ফুট নীচের উর্বরা স্তরে চাষ করা যায়। ট্র্যাক্টর নানা ধরনের। ক্রাউলর ট্র্যাক্টরের বৈশিষ্ট্য হইল চাকার পরিবর্তে উহাতে এক বিশেষ ধরনের শিকল পরানো থাকে। শিকলগুলি এমনভাবে প্রস্তুত যে চলিবার সময় উহার বাহিরের খাঁজগুলি মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরে আর ভিতরের দিকে চলিবার উপযোগী একটি তলের সৃষ্টি করে। ক্যাটারপিলার, বুল্‌ডোজার প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত ভারী যন্ত্রগুলি জমিকে সমতল করা, বড় বড় গাছ উন্মূল করা, টেলিফোনের কেব্‌ল্‌ বসানো প্রভৃতি কাজে অপরিহার্য।

কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও কল-কারখানার বিস্তীর্ণ মেঝেতে ভার পরিবহনের কাজে একরকম হালকা ট্র্যাক্টর (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্র্যাক্টর) ব্যবহার করা হয়।

রাস্তায় ব্যবহৃত ট্র্যাক্টর ট্রাকেরই উন্নততর রূপ। ভার বহনের আধারগুলি ট্র্যাক্টরের পিছনে পৃথকভাবে লাগানো থাকে। চারি চাকার মধ্যে পিছনের বড় চাকা দুইটি ড্রাইভিং ও সামনের ছোট চাকা দুইটি স্টিয়ারিং বা নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। অক্ষদণ্ড (অ্যাক্‌স্‌ল) ও অন্যান্য অংশের গঠন সাধারণ অটোমোবাইলের অনুরূপ।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই সেন্ট্রাল ট্র্যাক্টর অর্গানাইজেশনের মারফত ট্র্যাক্টর ব্যবহারের প্রথম চেষ্টা হয়। উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে জমি কৃষিযোগ্য করা উহার প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হয়। ট্র্যাক্টর তৈয়ারির পরিকল্পনা শুরু হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে। মাদ্রাজের পেরামবুরে অবস্থিত কারখানাটি ইহার একটি উদাহরণ। অড্‌ন্যান্স বা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানাতেও নূতন ধরনের ট্র্যাক্টর তৈয়ারি করা হইয়াছে।

দ্র Edgar L. Barger, *et al*, *Tractors & Their Power Units*, New York, 1952, H E Gulvin, *Farm Engines & Tractors*, New York, 1953.

দেবানন্দ বসু

ট্র্যাজেডি সচরাচর আমরা ট্র্যাজেডি বলিতে বিয়োগান্ত নাটকের কথাই মনে করি— যদিও বর্তমান কালে শুধু আভিধানিক ব্যুৎপত্তির কথা ধরিলে, কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি প্রায় সর্ববিধ সাহিত্যকর্মেই ট্র্যাজেডির অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

ট্র্যাজেডির আবির্ভাব হয় গ্রীস দেশে। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা, প্রকৃতি অথবা প্রথম উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বহু গবেষণার পরেও এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং কিংবদন্তির মধ্যে বিক্ষিপ্ত বহুবিধ তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণ করিয়া এবং গ্রীক নাট্যসাহিত্যের পঠনভঙ্গী ও রচনাশৈলীর বিচার করিয়া পণ্ডিতেরা গ্রীক নাটক ও ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য এবং সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিলেও কয়েকটি মতবাদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

পেন্টেলিকস পর্বতের সানুদেশে ইকারিয়া গ্রামে দোরীয় নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের মধ্যে সাধারণভাবে গ্রীক নাটক এবং বিশেষ করিয়া ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। আকার এবং গঠনরীতির দিক হইতে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও পরিণতি কোরাস বা সম্মিলিত নৃত্য-গীতের মধ্যেই হইয়াছিল।

কিন্তু যেহেতু এইসব নৃত্য-গীতের সহিত দিওন্যুসিওস-এর উপাসনার যোগাযোগ আছে, সেই কারণে এই বিশেষ দেবতার পূজাপদ্ধতিও গ্রীক নাটক এবং ট্র্যাজেডির বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, দিওন্যুসিওসের বিগ্রহের সম্মুখে বসন্তকালে ধর্মীয় আচার ও ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত যে সব নৃত্য গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইত—তাহাই উত্তরকালে নাটক এবং বিশেষ করিয়া ট্র্যাজেডির রূপ ধারণ করিয়াছিল।

দিওন্যুসিওসের পূজা উপলক্ষে যৌথ নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান হইত, তাহাতে যে গায়ক এবং নর্তকদল যোগদান করিত তাহাদের কোরাস বলা হইত ('কোরাস' দ্র)। এই গায়কদল ডিথুরাম্ব বা লোকসংগীত, সাতুরস (Satyr) নাট্য, ট্র্যাজেডি এবং কমেডি এই ৪ প্রকারের নৃত্য গীতাভিনয়ের অনুষ্ঠান করিত। কথিত আছে যে আত্তিকায় যে দিওন্যুসিওস উৎসবের অনুষ্ঠান হইত সেই অনুষ্ঠানের উপলক্ষে ৫৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে থেসপিস নামক একজন নাট্যকার ৫০ জন লোককে লইয়া একটি কোরাস দল গঠন করিয়াছিলেন। সেই কোরাসের দলপতি ছিলেন থেসপিস নিজে। 'উদগাতা' বা 'কবির মুখপাত্র' বলিয়া বর্ণিত আরও একটি লোক ছিল যাহার সহিত থেসপিসের বাক্যবিনিময়ের ব্যবস্থা ছিল। এইভাবে, কিছু কাহিনী, কিছু বাক্য সংলাপ এবং কিছু নৃত্য গীতকে উপাদান করিয়া থেসপিসই গ্রীক নাটক ও ট্র্যাজেডির প্রথম যথার্থ প্রযোজক ছিলেন, এ কথা বলা যাইতে পারে। পরবর্তী যুগে কোরিলুস, প্রাতিনাস, ফ্রুনিকস্ প্রভৃতি নাট্যকারের হাতে গ্রীক ট্র্যাজেডি আরও পরিণত রূপ ধারণ করে। যদিও ইহাদের কোনও সম্পূর্ণ নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গ্রীক নাটকের যে গৌরবময় অধ্যায় খ্রীষ্টপূর্ব ন্যূনাধিক পঞ্চ শতকের সময় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাকেই ট্র্যাজেডির স্বর্ণযুগ বলা হইয়া থাকে। এই যুগের আরম্ভ আইস্খুলস (ঈস্কাইলাস, ৫২৫-৪৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রচিত নাট্যাভিনয়ে, ইহার বিশেষ উৎকর্ষ সোফোক্লেসের (৪৯৬-৪০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নাটকে। তাহার পর, এউরিপিদেসের (৪৮০-৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নাটকে আমরা ইহার সর্বাপেক্ষা পরিণত রূপ দেখিতে পাই।

অসমাপ্ত বা খণ্ডিত রচনাবশেষকে ছাড়িয়া দিলে এখন পর্যন্ত মোটের উপর ৩৩টি গ্রীক ট্র্যাজেডির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৭টি আইস্খুলসের, ৭টি সোফোক্লেসের এবং ১৯টি এউরিপিদেসের। সাহিত্যকৃতি ও রসসৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে এই ৩ জন নাট্যকারের নাট্য-সম্ভারের সহিত তুলনীয় সম্পদ পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে বিরল ('ঈসকাইলাস', 'এউরিপিদেস' এবং 'সোফোক্লেস' দ্র)। আইস্খুলস, সোফোক্লেস এবং এউরিপিদেসের পরেও প্রায় ৩০০ বৎসর ধরিয়া গ্রীস দেশে ট্র্যাজেডি প্রণয়ন এবং নাট্যমঞ্চে তাহার প্রযোজনা করা হইত। কিন্তু সে সব ট্র্যাজেডির কোনও কোনওটির বিক্ষিপ্ত অংশমাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পর হইতেই তাহাদের বেশির ভাগের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ট্র্যাজেডির স্বরূপ সম্বন্ধে আরিস্তোতল (অ্যারিস্টটল, ৩৮৫-৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁহার কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম: ট্র্যাজেডি হইল গুরুত্বপূর্ণ, ভাবগম্ভীর স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার দিক দিয়া ইহা বিভিন্ন খণ্ডে রূপায়িত অলংকরণে সমৃদ্ধ, নানা ক্রিয়াত্মক অভিব্যক্তির মাধ্যমে ইহার ব্যঞ্জনা, কাহিনীর মধ্য দিয়া নহে, এবং করুণা ও ভীতির সঞ্চার করিয়া চিত্ত হইতে এইসব প্রবৃত্তির ক্ষালনই হইল ইহার ধর্ম। ইহার পর হইতেই আধুনিক কাল পর্যন্ত করুণা ও ভয়কেই ট্র্যাজেডির প্রধান উপজীব্য বলিয়া মনে করা হয়।

গ্রীক ট্র্যাজেডির পর প্রাচীন কালে কিছু রোমান নাট্যকারের ট্র্যাজেডির বৃত্তান্ত এবং নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পাকুভিয়ুস (২২০-১৩০? খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং সেনেকার (৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-৬৫ খ্রী) নামই উল্লেখযোগ্য। তাহাদের অধিকাংশ নাটকেই গ্রীক ট্র্যাজেডির আকৃতি-প্রকৃতিকে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহার পর বহুকাল উল্লেখযোগ্য কোনও ট্র্যাজেডি রচনা বা অভিনয় ইওরোপে হয় নাই বলিলেই চলে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পর ইংল্যাণ্ডে মেরি সিড্নি, স্যামুয়েল ব্রাণ্ডন, টমাস কিড প্রভৃতি নাট্যকার কিছুটা গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুকরণে, কিছুটা সেনেকার ট্র্যাজেডির অনুকরণে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল নাটকের অধিকাংশই ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান হইলেও সাহিত্য এবং শিল্পমানের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু ফরাসী দেশে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কর্নেই (১৬০৬-৮৪ খ্রী) এবং শেষ ভাগে রাসীন (১৬৩৯-৯৯ খ্রী) যে সব ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছিলেন তাহারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। ১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে শেক্স্পীয়রের আবির্ভাব হয়। তাঁহার ট্র্যাজেডির মধ্যে

হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো এবং কিং লিয়ার-ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির আঙ্গিক ও শৈলীর সহিত শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি এবং আরও আধুনিক ট্র্যাজেডির কোনও সাদৃশ্য নাই। উপাদানের দিক দিয়াও গ্রীক ট্র্যাজেডির সহিত উত্তরকালের ট্র্যাজেডির কোনও সাদৃশ্য বা সংগতি নাই। প্রতিকূল দৈব ও বহিঃপ্রকৃতির প্রবল ক্ষমাহীন বিরোধের সহিত নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াও যে মানুষ নিজের সংকল্প অথবা বিচার-বিবেচনাকে পরিহার করিতে প্রস্তুত নহে এবং তাহারই ফলে ক্লান্ত, হতবীর্য ও যথাসর্বস্বহীন হইয়া পড়ে— সেই ভাগ্যাহত মানুষের চিত্র আমরা গ্রীক ট্র্যাজেডিতে পাই। পরবর্তী যুগে, সমাজব্যবস্থার এবং জীবনের সর্বপ্রকার পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনদর্শনও ভিন্ন হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অভাব, অভিযোগ, সমস্যা ও ব্যর্থতাই মানুষের মনে সেই গভীর হতাশা ও হৃদয়বেদনার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ট্র্যাজেডি রচনা করা চলে। সুতরাং এই পরিবর্তিত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্র্যাজেডি রচনার উপাদানও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া গিয়াছে। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শে শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির বিচার সম্ভব নহে, তেমনই আবার, গ্রীক ট্র্যাজেডি অথবা শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডি কোনওটির আদর্শে আধুনিক নাট্যকার ইব্‌সেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, হাউপ্‌টম্যান, চেখভ এবং অতি আধুনিক ককতো, এলিয়ট, জীদ, জিরোদু, আনুয়িল্‌, গের্য, সার্ত্র প্রমুখ নাট্যকারের ট্র্যাজেডির বিচার বা মূল্যায়ন সার্থক হইতে পারে না।

দ্র L Matthaei, *Studies in Greek Tragedy*, 1918; A W. Pickard-Cambridge, *Dithyramb Tragedy and Comedy*, Oxford, 1927, A W Pickard-Cambridge, *The Theatre of Dionyous in Athens*, Oxford, 1946, H. D. F Kitto, *Greek Tragedy*, London, 1950, F. L Lucas, *Tragedy*, London, 1957, D. W. Lucas, *The Greek Tragic Poets*, [London], 1959

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ট্র্যান্‌জিস্টর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ট্র্যান্‌জিস্টরের আবিষ্কার ঘোষণা করা হয়। ট্র্যান্‌জিস্টর-আবিষ্কারের কৃতিত্ব মূলতঃ আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারের শক্‌লে (Shockley), বার্‌ডীন (Bardeen) ও ব্র্যাটেন (Brattain) এই তিন জন বৈজ্ঞানিকের প্রাপ্য। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বৈজ্ঞানিকত্রয়কে ট্র্যান্‌জিস্টর আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

ট্র্যান্‌জিস্টর সাধারণতঃ জার্মেনিয়ম অথবা সিলিকনের কেলাস (ক্রিস্ট্যাল) হইতে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অতি বিশুদ্ধ অবস্থায় এবং অল্প তাপমাত্রায় এই দুইটি মৌলিক পদার্থের তড়িৎ-পরিবাহিতা খুবই অল্প। কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগে অথবা বিশেষ কয়েকটি ধাতু, যেমন আর্সেনিক, ইণ্ডিয়াম প্রভৃতির অতি অল্প পরিমাণে সংমিশ্রণে ইহাদের তড়িৎ-পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। মিশ্রণের পরিমাণ প্রতি এক কোটি জার্মেনিয়ম বা সিলিকন পরমাণুতে মাত্র একটি পরমাণু হইলেই চলে। এই ধরনের পদার্থকে অর্ধ-পরিবাহী (সেমিকণ্ডাক্টর) বলা হয়।

ধাতব পদার্থের ভিতর তড়িৎ পরিবহন ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণার গতির মাধ্যমে সাধিত হয়। কিন্তু অর্ধপরিবাহী পদার্থে তড়িৎ পরিবহন ইলেকট্রন ব্যতীত 'হোল' (hole) নামক ধনাত্মক কণার মাধ্যমেও সাধিত হইতে পারে। পরমাণুর কেন্দ্রের (নিউক্লিয়স) চারি দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান কতকগুলি বিশেষ ইলেকট্রনকে স্থানচ্যুত করিলে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয় সহজ কথায় তাহাকেই 'হোল' বলে। যে সকল অর্ধপরিবাহী পদার্থে তড়িৎ পরিবহন ইলেকট্রনের সাহায্যে হয় তাহাদের এন টাইপ (N-type) ও যেগুলিতে হোল এর সাহায্যে হয় তাহাদের পি টাইপ (P-type) অর্ধপরিবাহী পদার্থ বলে। কোন অর্ধপরিবাহী পদার্থ এন অথবা পি – এই দুই শ্রেণীর কোনটির অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা ইহার সহিত মিশ্রিত ধাতুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন, জার্মেনিয়মের সহিত আর্সেনিক মিশ্রিত করিলে উহা 'এন্‌' এবং ইণ্ডিয়াম মিশ্রিত করিলে উহা 'পি' টাইপ জার্মেনিয়মে পরিণত হয়।

প্রথমে যে ধরনের ট্র্যান্‌জিস্টর আবিষ্কৃত হয় তাহাকে পয়েন্ট কনট্যাক্ট ট্র্যানজিস্টর বলে। এই ধরনের ট্র্যান্‌জিস্টরে একখণ্ড এন টাইপ জার্মেনিয়মের উপর এক ইঞ্চির সহস্র ভাগের কয়েক ভাগ ব্যবধানে 'এমিটার' ও 'কালেক্টর' নামক দুইটি সূচ্যগ্র ধাতুখণ্ড বসানো থাকে। পরে শক্‌লে, জংশন ট্র্যানজিস্টর নামক নূতন এক ধরনের ট্র্যানজিস্টর আবিষ্কার করেন। বর্তমানে এই শেষোক্ত ট্র্যানজিস্টরই সমধিক প্রচলিত। একটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি 'এন'-টাইপ জার্মেনিয়ম বা সিলিকন স্তরের দুই পার্শ্ব ভাগ যথাযথ ধাতু সংমিশ্রণের দ্বারা 'পি'-টাইপ জার্মেনিয়ম বা সিলিকন স্তরে পরিবর্তিত করিয়া যে ট্র্যান্‌জিস্টর প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পি-এন-পি জংশন ট্র্যান্‌জিস্টর' বলে।

এন ও পি স্তরগুলির অবস্থান পরিবর্তন করিয়া 'পি-এন-পি' স্থলে 'এন-পি-এন' ট্র্যানজিস্টর প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। জংশন ট্র্যানজিস্টরের মধ্যের স্তরটিকে বলা হয় 'বেস' ও পাশের দুইটি স্তরের একটিকে 'এমিটর' এবং অপরটিকে 'কালেক্টর' বলে। ট্র্যান্‌জিস্টরের তিনটি স্তরের সহিত বৈদ্যুতিক সংযোগ সাধনের জন্য যথাক্রমে তিনটি পদ (টর্মিনাল) সন্নিবিষ্ট থাকে। এই পদগুলি ব্যাটারির সহিত যথাযথভাবে যুক্ত করিলে 'পি-এন-পি' ও 'এন-পি-এন' ট্র্যান্‌জিস্টরের ভিতর 'হোল' ও ইলেকট্রনের প্রবাহ শুরু হয়। ট্র্যান্‌জিস্টরের 'এমিটর' ও 'বেস' এই দুইটি পদের মধ্যে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-সংকেত প্রয়োগ করিলে উহা পূর্বোক্ত ইলেকট্রন বা 'হোল' প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার ফলস্বরূপ 'কালেক্টর' বা 'এমিটর' পদ দুইটির মধ্যে বিদ্যুৎ-সংকেতটি বহুগুণ বিবর্ধিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ট্র্যান্‌জিস্টরের কার্যপ্রণালীর ইহাই মূল কথা।

ট্র্যানজিস্টর কথাটি ইংরেজী 'ট্র্যান্স্‌ফর রেজিস্টর' কথা দুইটির সংক্ষিপ্ত রূপ। একটি ট্র্যানজিস্টরের 'এমিটর' ও 'বেস' পদের মধ্যে বৈদ্যুতিক রোধ (রেজিস্ট্যান্স) কালেক্টর' ও 'এমিটর' পদের মধ্যের রোধ অপেক্ষা অনেক অল্প, এই কারণেই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

রেডিও ভাল্‌ভের ন্যায় ট্র্যানজিস্টরের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার দ্বারা বৈদ্যুতিক সংকেত-বিবর্ধন (অ্যাম্‌প্লিফিকেশন) ও বৈদ্যুতিক স্পন্দন (অসিলেশন) উৎপাদন করিতে পারা যায়। বেতার ভাল্‌ভের তুলনায় ট্র্যানজিস্টর ব্যবহারের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে: ১. ট্র্যানজিস্টরের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, ফলে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বেতার ও টেলিভিজন-গ্রাহক যন্ত্র, শ্রবণ-সহায়ক (হিয়ারিং এড) ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নির্মাণ সম্ভবপর হইয়াছে ২. ইহার জন্য অতি অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি ব্যয়িত হয় ৩. ইহার স্থায়িত্বও বেশি ৪. আকস্মিক আঘাত ও উচ্চ কম্পনে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ট্র্যান্‌জিস্টরের অপর একটি সুবিধা এই যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করিবামাত্র ইহা কার্যকর হয়, বেতার ভাল্‌ভের ন্যায় ইহাকে উত্তপ্ত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। ইহার ফলেও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়ের যথেষ্ট সাশ্রয় হয়।

বর্তমানে ট্র্যানজিস্টরের কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে: ১. ইহার দ্বারা অধিক শক্তিসম্পন্ন সংকেত উৎপাদন করা যায় না ২. তাপমাত্রার উপর ইহাদের গুণাবলী বিশেষভাবে নির্ভরশীল, বস্তুতঃ জার্মেনিয়ম ট্র্যানজিস্টর ৭৫° সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে ব্যবহার করা চলে না এবং ৩. উচ্চ কম্পন-সংখ্যাযুক্ত সংকেতের পক্ষে ট্র্যানজিস্টরের ব্যবহার এখনও খুব কার্যকর হয় নাই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ট্র্যানজিস্টর সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ লাভ করিবে। নূতন ধরনের ট্র্যানজিস্টরের মধ্যে 'ড্রিফ্‌ট', 'মেসা', 'সারফেস বেরিয়ার', 'ফিল্‌ড এফেক্ট' ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ ধরণের ট্র্যান্‌জিস্টর ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতেছে। বর্তমানে (১৯৬৫ খ্রী) ট্র্যানজিস্টরের সাহায্যে সেকেণ্ডে একশত কোটিরও অধিক কম্পনসংখ্যাযুক্ত বৈদ্যুতিক স্পন্দনের উৎপাদন এবং প্রায় ১০০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন সংকেত বিবর্ধন করিতে পারা গিয়াছে।

ভারতবর্ষে সম্প্রতি বাঙ্গালোর ও পুনা এই দুই স্থানে যথাক্রমে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ট্র্যানজিস্টর-নির্মাণ শুরু হইয়াছে।

দ্র A. Coblenz and H. L. Owens, *Transistor: Theory and Application*, New York, 1955; M. S. Kiver, *Transistors in Radio and Television* New York, 1956; D. J. W. Sjobbema, *Using Transistors*, Eindhoben, (Holland), 1961.

সনৎদিনাথ দাঁ

ট্র্যান্‌স্‌ফরমার বিদ্যুৎ-মাত্রা পরিবর্তক। উৎসমুখী বিদ্যুৎ-প্রবাহকে (অল্টারনেটিং কারেন্ট) সহজেই ট্র্যান্‌স্‌ফরমার-এর সাহায্যে একটি প্রদক্ষিণ কক্ষ (সার্কিট) হইতে অন্য কক্ষে বিভিন্ন মাত্রায় প্রেরণ ও পরিচালন করা যায়। এই যন্ত্রের একাধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যুৎবাহী কুণ্ডলী (কয়েল) থাকে। ইহারা একটি যৌথ চৌম্বক আবেষ্টনী কক্ষের দ্বারা (কমন ম্যাগ্‌নেটিক সার্কিট) পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থায় থাকে। একটি কুণ্ডলীর প্রান্তদ্বয় বিদ্যুৎ-সরবরাহ-বিন্দুতে (পাওয়ার মেন্‌) সংযুক্ত থাকে এবং অন্যান্য কুণ্ডলীর প্রান্ত হইতে ইচ্ছানুযায়ী বৈদ্যুতিক চাপে (ভোল্টেজ) শক্তি আহরণ করা হয়। যে কুণ্ডলীটি সরবরাহ-প্রান্তে যুক্ত থাকে তাহাকে মুখ্য কুণ্ডলী এবং যেটি হইতে ব্যয়োপযোগী বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণ করা যায় তাহাকে গৌণ কুণ্ডলী বলে। মুখ্য কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ-সঞ্চালনের ফলে গৌণ কুণ্ডলীতে ব্যয়োপযোগী বিদ্যুতের আবেশ ঘটে, সেইজন্য মুখ্য কুণ্ডলীকে আগম কুণ্ডলী (ইন্‌পুট) এবং গৌণ কুণ্ডলীকে নিগম (আউট্‌পুট) বা নির্ভরকুণ্ডলী বলা হয়। মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর আবর্তন-সংখ্যার অনুপাত আগম ও নির্গম বিদ্যুৎ-চাপমাত্রার অনুপাতের সমান।

ট্রান্‌স্‌ফরমারের গঠনে দরকার প্রথমতঃ লৌহ বা লৌহানুগ ধাতুর একটি 'কোর'। বিদ্যুৎ-কুণ্ডলীগুলিতে

বিদ্যুৎ-সঞ্চালনের ফলে কোরে একটি চৌম্বক আবেষ্টনী ক্ষেত্র (ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ড) রচিত হয়। প্রচলিত ট্র্যান্‌স্‌ফর্মারগুলি সাধারণতঃ কোর টাইপ ও শেল টাইপ উভয়রূপেই গঠিত হয়। কোর টাইপ ট্র্যান্‌স্‌ফর্মারের চৌম্বক কক্ষটি একটি বলয়ের মত সবগুলি বিদ্যুৎবাহী কুণ্ডলীকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং শেল টাইপ ট্র্যান্‌স্‌ফর্মারের বৈদ্যুতিক কুণ্ডলীগুলি বলয়াকারে চৌম্বক পথকে বেষ্টন করিয়া থাকে। সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও কোর টাইপ ট্র্যানস্‌ফর্মারে শেল অপেক্ষা স্বল্পায়তন কোর ও অধিকতর আবর্তনসংখ্যা থাকে, সুতরাং ইহার লৌহ-তাম্র অনুপাত শেলের লৌহ-তাম্র অনুপাত হইতে কম। সাধারণতঃ উপকরণগুলির পারস্পরিক মূল্য ও সুলভতা বিবেচনা করিয়াই ট্র্যান্‌স্‌ফর্মারের গঠন ঠিক করা হয়। কোর নির্মিত হয় সিলিকন-মিশ্রিত লৌহ সংকর ধাতুর (stalloy) পাতলা পাতে। সিলিকন লৌহের প্রধান গুণ ইহার মধ্যে চুম্বকাবর্তন-ক্ষয় (হিস্টেরিসিস লস) অতি সামান্য। পাতের আকারে ব্যবহার করিয়া ঘূর্ণিপ্রবাহ-জনিত ক্ষয়ও (এডি কারেন্ট লস) অত্যন্ত কম করা সম্ভব। সিলিকন লৌহের বহু ব্যবহারজনিত পরিবর্তনও যৎসামান্য। সিলিকন লৌহ ব্যতীত হাইপার্‌নিক পার্মালয় প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন নিকেল-লৌহঘটিত সংকর ধাতুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যুতিক কুণ্ডলীগুলি বিদ্যুৎনিরোধক আবরণবিশিষ্ট (ইন্‌সুলেটেড) উপযুক্ত বেধের তাম্রসূত্রের সাহায্যে গঠিত। মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর তারের বেধ নির্দিষ্ট প্রবাহ-মাত্রার উপর নির্ভর করে এবং উহাদের আবর্তনসংখ্যা নির্ভর করে উৎস ও ব্যয়-প্রান্তের পারস্পরিক চাপমাত্রার উপর। চুম্বকীকরণের মাধ্যমে মুখ্য কুণ্ডলীর শক্তি নির্গম কুণ্ডলীতে সঞ্চারিত হয়, তাই কেবলমাত্র শক্তি আহরণ-কালেই মুখ্য কুণ্ডলীতে যোগ্য মাত্রায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটে নতুবা উন্মুক্ত নির্গম কুণ্ডলীতে মুখ্য কুণ্ডলীপ্রবাহ নামমাত্র। যৎসামান্য আভ্যন্তরীণ অপব্যয় ছাড়িয়া দিলে ট্র্যান্‌স্‌ফর্মারের মুখ্য ও নির্গম কুণ্ডলীর শক্তিমাত্রা (পাওয়ার) একই, বর্ধিত চাপে স্বল্প প্রবাহমাত্রা এবং বর্ধিত প্রবাহে স্বল্প চাপমাত্রাই ইহার কারণ। চুম্বকাবর্তন ও ঘূর্ণিপ্রবাহ-হেতু ট্র্যান্‌স্‌ফর্মারের নিজস্ব অপব্যয় ব্যতীত তাম্রসূত্রের বিদ্যুৎ বাধার (রেজিস্ট্যান্স) জন্যও কিছুটা শক্তিক্ষয় বিদ্যুৎ-আহরণকালে লক্ষিত হয়। এইজন্য নির্গম চাপ আগম চাপের ঠিক বিপরীত পর্বে অবস্থিত না হইয়া কিছুটা পিছাইয়া পড়ে। ক্ষেত্রবিশেষে এই পর্বত্রুটির সংশোধন প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন মাত্রার বিদ্যুৎচাপ যুগপৎ প্রয়োজন হইলে একাধিক উপযুক্ত নির্গম কুণ্ডলীর প্রয়োজন। উচ্চশক্তিবিশিষ্ট ট্র্যানস্‌ফর্মারে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য শীতলীকরণের ব্যবস্থা থাকে।

কার্য ও প্রকারভেদে ট্র্যানস্‌ফর্মার বিভিন্ন রকমের হয়, যথা—১. উচ্চশক্তিসম্পন্ন ট্র্যানস্‌ফর্মার ইহা সাধারণতঃ ৫০০ হাজার ভোল্ট এম্পিয়ার কিংবা ততোধিক শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ-উৎপাদন, পরিচালন ও বণ্টনের ক্ষেত্রেই ইহার ব্যবহার। ত্রিপর্ব বিদ্যুৎ-পরিচালনার জন্য ট্র্যানস্‌ফর্মারের তিনটি মুখ্য ও তিনটি নির্গম কুণ্ডলী অপরিহার্য, উপরন্তু তারকাপ্রথায় (স্টার কনেক্‌শন) সংযুক্ত থাকিলে আরও তিনটি ত্রিকোণবদ্ধ (ডেল্টা কনেক্‌টেড) দৃঢ়ীকরণ কুণ্ডলী (স্ট্যাবিলাইজার কয়েল) প্রয়োজন হয় ২. প্রবাহ (কারেন্ট) এবং চাপ (ভোল্টেজ) ট্র্যানস্‌ফর্মার : ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে প্রবাহ (কারেন্ট) ও চাপমাত্রা পরিবর্তন করা হয়। নির্গম চাপমাত্রা আগম চাপমাত্রা হইতে অধিক হইলে ইহাকে ঊর্ধ্বগ (স্টেপ আপ) এবং অন্যথায় ইহাকে নিম্নগ (স্টেপ ডাউন) ট্র্যানস্‌ফর্মার বলে ৩ মাপক (ইন্‌স্ট্রুমেন্ট) ট্র্যানস্‌ফর্মার . ইহা মাপক যন্ত্রাদিতে সন্নিবেশিত হয়। নিখুঁত পরিকল্পনা ও গঠনের জন্য ইহা নিম্নশক্তিবিশিষ্ট হইলেও অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান। ইহাদের আভ্যন্তরীণ অপব্যয় ও পর্বত্রুটি যৎসামান্য ৪ সমচাপ (কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ) সমপ্রবাহ (কনস্ট্যান্ট কারেন্ট) ট্র্যানস্‌ফর্মার স্বয়ংক্রিয় কৌশলে যে ট্র্যানস্‌ফর্মারের নির্গম চাপ বা প্রবাহমাত্রা স্থির রাখা যায় তাহাকে সমচাপ ও সমপ্রবাহ ট্র্যানস্‌ফর্মার বলে। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে ইহাদের ব্যবহার হয় ৫. অটো বা এককুণ্ডলী ট্র্যানস্‌ফর্মার : ইহাতে মূল্য-সংকোচের নিমিত্ত 'কোরে'র উপর মুখ্য ও গৌণ উভয়বিধ কুণ্ডলী না রাখিয়া একটিমাত্র কুণ্ডলীর কিয়দংশ মুখ্য ও কিয়দংশ গৌণ কুণ্ডলী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অটো ট্র্যানস্‌ফর্মারে বৈদ্যুতিক কক্ষ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক না হইলেও নির্গম কুণ্ডলী হইতে ইচ্ছানুযায়ী চাপে শক্তি আহরণ করা যায়।

শ্রীদামসখা মণ্ডল

ট্র্যান্‌স্‌মিটার বার্তাপ্রেরক যন্ত্র। ট্র্যান্‌স্‌মিটারের অন্যতম কাজ বার্তাদি এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণ করা। এই বার্তা নানা প্রকারের হইতে পারে : যথা অবিকল ধ্বনি— যেমন কণ্ঠস্বর, সংগীত প্রভৃতি (টেলিফোন, রেডিও), ইঙ্গিত— সংক্ষিপ্ত শব্দ বা সাংকেতিক চিহ্ন (টেলিগ্রাফ কোড, সিগ্‌ন্যাল ট্র্যান্‌স্‌মিশন), অবিকৃত প্রতিরূপ (ফ্যাক্‌সিমিলি ট্র্যান্‌স্‌মিশন) কিংবা প্রতিচ্ছবি (টেলি-

ভিজ্‌ন)। তার ও বেতার উভয় মাধ্যমেই বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব। তার বা বেতার যে প্রণালীতেই হউক না কেন আদান-প্রদানের এই কৌশলটিতে প্রেরক ও গ্রাহক দুইটি যন্ত্রেরই যুগপৎ প্রয়োজন।

ধ্বনি-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তর করার অংশটি প্রেরক যন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র। ইহাকে সাধারণতঃ মাইক্রোফোন বলে। দানা আকারের অঙ্গার কণার দ্বারা টেলিফোন যন্ত্রের মাইক্রোফোন প্রস্তুত হয়। পেষণ বা চাপমাত্রার ইতর বিশেষে অঙ্গার কণার পরস্পর স্পর্শবাধারও (কনট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স) কম বেশি হয়। কোনও বৈদ্যুতিক প্রদক্ষিণ-পথে (ইলেক্‌ট্রিক্যাল সার্কিট) এইজাতীয় বাধা থাকিলে বিদ্যুৎপ্রবাহমাত্রা পেষণ-মাত্রানুসারে কম-বেশি হইতে বাধ্য। অঙ্গার মাইক্রোফোনের গঠনে অঙ্গার-কণার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। ইহাতে দুইটি বৃত্তাকার ইলেক্‌ট্রোড বা বিদ্যুৎপ্রান্ত সমান্তরালভাবে রাখিয়া উভয়ের মধ্যস্থিত অংশটুকু দানাকৃতি অঙ্গারের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। একটি ইলেক্‌ট্রোড দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং অপরটি একখণ্ড কম্পনোপযোগী ধাতুপরদার (ডাইয়াফ্র্যাম) সহিত যুক্ত থাকে। পরদার সম্মুখে শব্দের আবির্ভাব ঘটিলেই শব্দগ্রাম অনুযায়ী পরদার উপর কম্পন ঘটে। এই কম্পন ক্রমশঃ সঞ্চারিত হইয়া অঙ্গার কণা কক্ষে বৈদ্যুতিক বাধার আনুপাতিক ইতর-বিশেষ ঘটায়। এইভাবে শব্দশক্তি বিদ্যুৎরূপ পরিগ্রহ করিয়া তারের মধ্য দিয়া দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারে (টেলিফোন) অথবা বেতার মাধ্যমে শূন্যে ছড়াইয়া পড়ে (রেডিও টেলিফোন)। অঙ্গার মাইক্রোফোনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অতিরিক্ত ধ্বনিপ্রসারক যন্ত্র (অ্যাম্‌প্লিফায়ার) ছাড়াই ইহা স্বয়ং প্রায় ২৫ ডেসিবেল শক্তি প্রসারণ করে। অবশ্য ইহার বিদ্যুৎ-কক্ষের সরবরাহকারী বিদ্যুৎশক্তি কমিয়া গেলে এই প্রসারণক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়। কার্যভেদে এইরূপ মাইক্রোফোনের বৈদ্যুতিক বাধা কম বা বেশি করা হয়। তড়িৎ-গতি (ইলেক্‌ট্রো-ডাইন্যামিক) কিংবা চাপোদ্ভূত বিদ্যুতের (পাইয়েজ ইলেকট্রিসিটি) সাহায্যেও লঘুভার মাইক্রোফোন প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু ইহাদের নিজস্ব শক্তি-প্রসারণক্ষমতা (অ্যাম্‌প্লিফিকেশন) না থাকায় ইহাদিগকে সাধারণতঃ বেতার প্রেরক যন্ত্রের সহযোগে ব্যবহার করা হয়।

বেতার প্রেরক যন্ত্রের জন্য প্রথম প্রয়োজন একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন সূক্ষ্ম তরঙ্গ-উৎপাদক যন্ত্র বা স্পন্দক। বৈদ্যুতিক কৌশল (ইলেকট্রিক ডিভাইস) ব্যতিরেকে বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও বর্তমানে সর্বত্রই উচ্চ স্পন্দনবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদনের জন্য ইলেকট্রনিক টিউব ব্যবহার করা হয়। এইপ্রকার বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দ্বারা পুষ্ট হইলে ঊর্ধ্বস্থ তড়িতবাহী তার বা শলাকাগুচ্ছ (অ্যানটেনা) হইতে চতুর্দিকে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়। এই তড়িৎ চৌম্বক শক্তির মাত্রা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-স্পন্দনসংখ্যার বর্গের সমানুপাতিক। উচ্চ তড়িৎ-চৌম্বক শক্তির জন্য তাই উচ্চ স্পন্দনসংখ্যা-বিশিষ্ট বেতার তরঙ্গ-উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ একটি সাধারণ স্পন্দকের স্পন্দনসংখ্যা সেকেণ্ডে $১০^{৬}$ বা ততোধিক।

কোয়ার্ট্‌জ বা স্ফটিকের দানা বিশেষভাবে কাটা হইলে বিশেষ স্পন্দন-সৃষ্টির উপযোগী হয়। এইরূপ স্ফটিক-স্পন্দক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে ইলেকট্রন তরঙ্গ-উৎপাদক যন্ত্রও অবিচল স্পন্দনের (স্টেডি ফ্রিকোয়েন্সি) সৃষ্টি করে। এইরূপ তরঙ্গকে বাহন করিয়া নির্দিষ্ট বার্তা শূন্যস্থ তরঙ্গ-প্রক্ষেপক শলাকা (অ্যান্‌টেনা) হইতে চতুর্দিকে উৎসারিত করা হয়।

বার্তা প্রেরণের উপযোগী করিতে হইলে বাহক তরঙ্গকে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ (মডিউলেশন) করা প্রয়োজন। বাহক তরঙ্গের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন করিয়া কিংবা বার্তা-তরঙ্গটি বাহক তরঙ্গের উপর উপস্থাপিত করিয়া এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিয়ন্ত্রিত তরঙ্গের বিস্তৃতি (অ্যাম্‌প্লিটিউড) স্পন্দনসংখ্যা কিংবা পর্বের (ফেজ) পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া গ্রাহক যন্ত্র প্রকৃত বার্তাটি গ্রহণ করে। বর্তমানে বিস্তৃতি পরিবর্তনের কৌশলই সমধিক প্রচলিত। কোনও দৃশ্যের উপর আপতিত বিশ্লেষক রশ্মিকে (স্ক্যানিং বীম) ফোটো-সেলের দ্বারা বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করিয়া বাহক তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করিলে বেতার মাধ্যমে প্রতিচ্ছায়াও দূরে ক্ষেপণ করা সম্ভব। 'টেলিফোন', 'টেলিভিজ্‌ন' ইত্যাদি দ্র।

শ্যামসখা মণ্ডল

ট্রেড ইউনিয়ন প্রাচীন কালে সকল সভ্য দেশেই বিশেষ বিশেষ কারু-জীবিকায় ও বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠনরূপে ট্রেড গিল্ডের উদয় হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী হইতে কারুজীবী গিল্ড, বণিক গিল্ড, গ্রামীণ গিল্ডের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারা শ্রেণী, সংঘ, সমূহ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইত। ইওরোপে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে বিশেষ বিশেষ হস্ত-শিল্পে ক্র্যাফ্‌ট গিল্ড বা আর্টিজ্যান্স গিল্ডের জন্ম হয়। ক্র্যাফ্‌ট গিল্ড ক্ষুদ্র উৎপাদন যন্ত্রের মালিকদের তথা স্বনিযুক্ত

শ্রমিকদের সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন উৎপাদন যন্ত্রে স্বত্বহীন, পরনিযুক্ত শ্রমিকদের সংস্থা। মধ্যযুগীয় গিল্ড ট্রেড ইউনিয়নের জনক নয়, ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতের মত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলেই ট্রেড ইউনিয়নের উৎপত্তি ঘটে। শিল্পবিপ্লবের ফলে নূতন শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয় এবং সমাজে শ্রেণীভেদের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে। উৎপাদনযন্ত্রের মালিকরূপী পুঁজিপতিশ্রেণী এবং বিত্তহীন ও শ্রমশক্তি-বিক্রয়ী প্রলেটারিয়েট বা মজুরশ্রেণী — এই দুই বিরোধী শ্রেণীর উদ্ভবের ফলেই ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংল্যাণ্ডেই ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম। পুঁজিবাদের প্রথম পর্বে ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকশোষণ ছিল ভয়াবহ প্রকৃতির। দিনে সতর ঘণ্টা কাজ করিতে হইত, পাঁচ বৎসরের শিশুদের ফ্যাক্টরিতে নিয়োগ করা হইত। অলিখিত আইনের দ্বারা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাহার উপর আসিল দমননীতির হাতিয়াররূপে ১৭৯৯-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কম্বিনেশন অ্যাক্ট। শ্রমিকসংঘ ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ও চুক্তির পবিত্রতার হস্তারক বলিয়া বিবেচিত হইত। নিতান্ত বাঁচিবার তাগিদেই ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকেরা গোপনে মিলিত হইয়া পরস্পরের স্বার্থরক্ষা ও হিতসাধনের জন্য ট্রেড ক্লাব গঠন করে। ইহাই ট্রেড ইউনিয়নের প্রাথমিক রূপ। দমননীতি শ্রমিক আন্দোলনকে রোধ করিতে পারে নাই, বরং তাহাকে বিদ্রোহের দিকে ঠেলিয়া দেয়। মেশিনই সকল সর্বনাশের মূল এই ভ্রান্ত ধারণার বশে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লাডাইটরা মেশিন ভাঙার অভিযান শুরু করে। অবশেষে জোসেফ হিউম ও ফ্রান্সিস প্লেস এর চেষ্টায় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কম্বিনেশন অ্যাক্ট রদ হয় এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ও ধর্মঘট করার অধিকার আইনতঃ স্বীকৃত হয়। ঐ সময় হইতেই ইংল্যাণ্ডে আইনসংগত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আরম্ভ।

সিডনি ও বিয়াট্রিস ওয়েব এর ভাষায় ট্রেড ইউনিয়ন 'মজুরিজীবীদের নিরবচ্ছিন্ন সংঘ, তাহাদের কর্মজীবনের অবস্থাবলীর রক্ষা ও উন্নতির জন্য ইহার সৃষ্টি]।' ইহার প্রধান কাজ কর্মনিয়োগের শর্ত (মাহিনার হার, কাজের ঘণ্টা, ছুটি, ছাঁটাই প্রভৃতি) সম্বন্ধে মালিক পক্ষের সহিত যৌথ দরাদরি এবং শ্রমিকদের হিতসাধন (বেকারত্ব, পঙ্গুত্ব, রোগ ও বার্ধক্যের অবস্থায় আর্থিক সাহায্যদান)। অন্যান্য কাজ শিক্ষাদান, সংস্কৃতিক প্রচেষ্টা, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি-গঠন, মামলা-পরিচালনা ইত্যাদি। শ্রমিকস্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন সরকারের ও পার্লামেণ্টের উপর চাপ দেয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার কাজই ট্রেড ইউনিয়নের পরিধিভুক্ত, কিন্তু ইহার বিশেষ কাজ হইল শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ও জীবনধারণ মানের উন্নয়ন।

শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ও পিকেটিং সহ ধর্মঘট করার আইনসংগত অধিকার ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের বনিয়াদ। সভ্যদের স্বেচ্ছামূলক যোগদান এবং পূর্ণ স্বয়ংশাসন ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। গঠনপ্রকৃতির দিক হইতে ট্রেড ইউনিয়ন নানা প্রকার। কোনও বিশেষ কর্মে দক্ষ শ্রমিকদের ইউনিয়নকে বলা হয় ক্র্যাফ্ট ইউনিয়ন। কোনও বিশেষ প্লান্ট-এর বা শিল্পের দক্ষ ও অদক্ষ সর্বপ্রকার শ্রমিকদের লইয়া গঠিত ইউনিয়নকে বলা হয় ইনডাসট্রিয়াল ইউনিয়ন। স্থানীয় ইউনিয়নগুলি একত্রিত হইয়া গঠিত হয় আঞ্চলিক অথবা জাতীয় ফেডারেশন। ক্র্যাফ্ট ইউনিয়ন হইতে ইনডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন এবং স্থানীয় ইউনিয়ন হইতে জাতীয় ফেডারেশনের দিকে গতি, ইহাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বাভাবিক প্রবণতা। তবে ইহার ব্যতিক্রম আছে। শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থার গঠনও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে পৃথিবীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 'কমিউনিস্ট ব্লক' এর ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস বা ডব্লিউ এফ. টি. ইউ (১৯৪৫ খ্রী) এবং 'আমেরিকান ব্লক'-এর ইন্টারন্যাশন্যাল কনফেডারেশন অফ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস বা আই. সি. এফ. টি. ইউ. (১৯৪৯ খ্রী) এই দুই আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিভক্ত।

পূর্ব পূর্ব যুগে কৃষক বা শ্রমিক-বিদ্রোহ ছিল প্রধানতঃ আর্থিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ, মুক্তি বা নূতন সমাজব্যবস্থা-গঠনের দ্যোতক অনেক ক্ষেত্রেই নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ তীব্রতর হওয়ায় প্রথম হইতেই শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যরূপে দেখা দিয়াছে শুধু শ্রমিকদের আত্মরক্ষাই নয়, পুঁজিবাদের অবসান ঘটাইয়া নূতন সমাজব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ (অ্যানার্কিজ্‌ম), ও মার্ক্‌সবাদ, এই তিন প্রকার ভাবাদর্শের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে। মার্ক্‌সবাদী ভাবাদর্শে দুই প্রধান ধারা দেখা দিয়াছে, যথা মার্ক্‌সবাদ ও লেনিন-বাদ বা আধুনিক কমিউনিজ্‌ম এবং সোস্যাল ডেমোক্রেসি বা সোস্যালিজ্‌ম। এইসকল ভাবাদর্শ ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বিভিন্ন লক্ষ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া এবং বিভিন্ন পথে

চালিত করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর এবং পৃথিবীর ইতিহাসের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

১৮৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুতীকল শিল্প, চটকল শিল্প ও রেলপথের প্রবর্তনের ফলে ভারতে ফ্যাক্টরি প্রথার জন্ম হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সোরাবজি শাপুরজি বেঙ্গলী ফ্যাক্টরিতে শিশু শ্রমের নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্দোলন করেন। ইহাই ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত। নারায়ণ মেঘজি লোখাণ্ডে ছিলেন ভারতের প্রথম শ্রমিকনেতা। তাঁহার আহ্বানে বোম্বাইয়ের ৬০০০ মিল-মজুরের এক সভায় সপ্তাহে একদিন ছুটি, মাধ্যাহ্নিক কর্মবিরতি, কাজের ঘণ্টার হ্রাস প্রভৃতি দাবি করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব ফ্যাক্টরি কমিশনের নিকটে প্রেরণ করার জন্য গৃহীত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লোখাণ্ডে বম্বে মিল্‌হ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। ইহাই ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন। ইহার অল্পকালের মধ্যে স্থাপিত হয় অ্যামাল্‌গ্যামাটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভেণ্ট্‌স (১৮৯৭ খ্রী), কলিকাতার প্রিণ্টার্স ইউনিয়ন (১৯০৫ খ্রী), বোম্বাইয়ের পোস্টাল ইউনিয়ন (১৯০৭ খ্রী)। এইগুলি ঠিক ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। ১৮৭৫ হইতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের স্তরেই আবদ্ধ ছিল, তাহার লক্ষ্য ছিল ফ্যাক্টরি আইনের প্রবর্তন ও শ্রমিক হিতৈষণা। শ্রমিক মঙ্গলের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, যেমন, ব্রাহ্ম সমাজের ওয়ার্কিং মেনস মিশন (১৮৭৮ খ্রী), শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরানগর ইনস্টিটিউট (১৮৮৩ খ্রী ?), কলিকাতার ওয়ার্কিং মেন্‌স ইনস্টিটিউশন (১৯০৫ খ্রী)। এই পর্যায়ে নাগপুর এম্‌প্রেস মিল্‌স-এ ধর্মঘট (১৮৭৭ খ্রী) হইতে শুরু করিয়া যে সকল ধর্মঘট ঘটিয়াছিল, সেগুলিতে শ্রেণী-চেতনার ও শ্রেণী-সংগ্রামের বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই, শুধু লোকমান্য টিলকের উপর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাই শ্রমিকদের ছয় দিনব্যাপী সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে (১৯০৮ খ্রী) ইহার ব্যতিক্রম।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত আরম্ভ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আসে, চারি দিকে ধর্মঘটের ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের হিড়িক পড়িয়া যায় এবং শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ১৯১৮-২১ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক অভ্যুত্থানের নানা কারণ ছিল, যথা, মিল মালিকদের আকাশ-ছোঁয়া মুনাফা, মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রকৃত মজুরির হ্রাস, রুশীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী প্রভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের মনে শ্রেণী-চেতনার ও মুক্তি কামনার উদয়, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ, সরকারের দমননীতি, জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে গান্ধীজীর আগমন, জেনিভায় ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আই. এল. ও.) প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. পি ওয়াদিয়ার নেতৃত্বে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন স্থাপিত হয়। ইহাই ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এ. আই. টি. ইউ. সি.) স্থাপিত হয়। ইহার সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার আই. এল. ও. সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে থাকেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ইউনিয়নের সংখ্যা ১২৫ এবং তাহাদের সভ্যসংখ্যা ২৫০০০০ বলিয়া অনুমিত হয়। প্রারম্ভে এ. আই. টি. ইউ সি-র সহিত সংশ্লিষ্ট ও সহানুভূতিসম্পন্ন ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১০৭, তাহাদের মধ্যে ৬৪টির সভ্যসংখ্যা ছিল ১৪০৮৫৪। তখনকার দিনে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছিল আইনের চোখে অবৈধ। অবশেষে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকদের জোটবদ্ধ হওয়ার ও ধর্মঘট করার অধিকার আইনতঃ স্বীকৃত হয়।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্ট প্রভাব ও কর্তৃত্ব ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তাহা চরম সীমায় পৌছায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর বোম্বাই সুতাকল মজুরদের সুবিখ্যাত সাধারণ ধর্মঘট এবং বাংলা দেশের চটকল ধর্মঘট কমিউনিস্ট নেতৃত্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে শ্রমিকেরা কমিউনিস্ট নেতৃত্বে কংগ্রেস প্যাণ্ডেল দখল করে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মঘটের কারণে নষ্ট কর্মদিবসের সংখ্যা ছিল ৩১৬ লক্ষ, ইহা আজ পর্যন্ত একটি রেকর্ড। এ আই টি. ইউ. সি. কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন হয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মসূচী ও পন্থা লইয়া পুরাতন নেতাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতাদের গুরুতর মতভেদ ঘটে, ফলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর অধিবেশনে এন এম. যোশী, শিব রাও, ভি. ভি. গিরি, দেওয়ান চমনলাল প্রভৃতি পুরাতন নরমপন্থী নেতারা এ. আই. টি. ইউ. সি. পরিত্যাগ করিয়া ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে একটি নূতন কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সম্প্রসারিত হইয়া ন্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নাম ধারণ করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট নেতারা অতি-বিপ্লবী নীতি অবলম্বন করেন, ফলে বোম্বাই

ট্রেড ইউনিয়ন

সুতীকলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘট ব্যর্থ হয় এবং কমিউনিস্ট-পরিচালিত গিরনি কামগর ইউনিয়ন ও জি. আই. পি. রেলওয়েমেনস ইউনিয়নের গুরুতর শক্তিক্ষয় ঘটে। অতি-বিপ্লবী নীতির ফলে এ. আই. টি. ইউ. সি-তে কমিউনিস্ট প্রভাব ক্ষীণতর হইতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪ খ্রী) কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্নতাকে বাড়াইয়া তোলে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এ. আই. টি. ইউ সি র কলিকাতা অধিবেশনে কমিউনিস্টরা এ. আই. টি ইউ সি বর্জন করিয়া রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে একটি নূতন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপন করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি এ. আই. টি ইউ. সি র অভ্যন্তরে নিজ নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে থাকে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টরা নীতি পরিবর্তনের ফলে এ আই. টি. ইউ সি তে ফিরিয়া আসেন।

মন্দা বাজার, র‍্যাশনালাইজেশন নীতি, বিদেশী পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির বিরোধ, মালিকদের আক্রমণ, তাঁহাদের আপসহীনতা ও ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধিতার মনোভাব, সরকারের দমননীতি প্রভৃতি কারণে ১৯২৪ হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত সময়টি শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য নানারূপ চেষ্টা হইতে থাকে এবং দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এ আই. টি. ইউ. সি.-র সহিত একীভূত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শ্রমিক আন্দোলনে নূতন প্রত্যাশা জাগ্রত হয় এবং ধর্মঘটের সংখ্যা ও ব্যাপ্তিকাল বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার পরে যুদ্ধের প্রতি মনোভাব লইয়া ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুনরায় ভাঙন ধরে। এ আই টি. ইউ. সি. র সংখ্যাগুরু অংশের নেতাদের মত ছিল এই যে, ভারত যুদ্ধ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে। এম. এন. রায় ও তাঁহার অনুগামীরা যুদ্ধে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সমর্থন করিতে চাহিলেন। রায়পন্থীরা এ. আই. টি. ইউ. সি. বর্জন করিয়া এক পান্টা ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার গঠন করিলেন (১৯৪১ খ্রী)। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে যোগদানের পর যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় কমিউনিস্টদের নীতি পরিবর্তিত হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পর জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় সকল নেতার কারাবাসের ফলে এ. আই. টি. ইউ. সি. কমিউনিস্টদের কর্তৃত্বাধীন হয় এবং সরকারি যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহিত পূর্ণভাবে সহযোগিতা করে। অবশ্য যুদ্ধ সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক প্রস্তাব এ. আই. টি. ইউ সি. তে তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাধিক্যের অভাবে গৃহীত হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এক দিকে মালিকদের মুনাফা যেমন আকাশচুম্বী হইতেছিল, অন্য দিকে তেমনিই শ্রমিকদের প্রকৃত আয় উত্তরোত্তর কমিতেছিল। শ্রমিকদের অসন্তোষ ও ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়িয়াছিল কিন্তু সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে অ্যাড্‌জুডিকেশন-এর দ্বারা সকল শ্রমবিবাদের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া নষ্ট কর্মদিবসের সংখ্যা শ্রমবিবাদের ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সংখ্যার অনুপাতে অনেক কম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন ও তাহাদের সভ্য, তিনটিরই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়াছিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীভক্ত শংকরলাল ব্যাঙ্কার ও অনসূয়াবেন সরাভাই এর চেষ্টায় আমেদাবাদে সুতীকল শ্রমিকদের টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন (মজুর মহাজন) স্থাপিত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদে সুতীকল শ্রমিকদের যে সার্থক ধর্মঘট হয়, তাহা হইতেই টি এল. এ. র জন্ম। সত্যাগ্রহ, অহিংবাদ, শ্রেণীযুদ্ধের অস্বীকৃতি, স্বেচ্ছামূলক সালিশীর দ্বারা শ্রমবিবাদের নিষ্পত্তি, ধর্মঘটকালে শ্রমিকদের পূর্ণ স্বাবলম্বিতা, ইত্যাদি গান্ধীর নীতির ভিত্তিতে টি এল এ পরিচালিত হইত। ইহা ভারতের সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা সুগঠিত ও সুপরিচালিত ইউনিয়ন হইয়া ওঠে। ইহার আয়ের ৬০ হইতে ৭০ শতাংশ শ্রমিক মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হইত। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার স্থান অনন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্ত পর্যন্ত ইহা কোনও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থায় যোগ দেয় নাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জীবনধারণ ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং প্রকৃত মজুরির হ্রাসের ফলে শ্রমিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়, শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপকতর হয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ও তাহাদের সভ্যসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং ধর্মঘট আন্দোলন বিপুল হইয়া ওঠে। ভারতের স্বাধীনতা নূতন প্রত্যাশা সৃষ্টি করিয়া শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আনয়ন করে। এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল অফিসের কর্মচারী, সরকারি চাকুরিয়া, শিক্ষক প্রভৃতি 'ভদ্রলোক' কর্মীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিস্তার। পরপৃষ্ঠার পরিসংখ্যান হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শ্রমিক অশান্তির পরিচয় পাওয়া যায়:

বৎসর	ধর্মঘট	সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা	নষ্ট কর্মদিবসের সংখ্যা
১৯৪৫	৮২০	৭৭৭৫৩০	৪০৫৪৪৯৯
১৯৪৬	১৬২৯	১৯৬১৯৪৮	১২৭১৭৭৬২
১৯৪৭	১৮১১	১৮৪০৭৮৪	১৬৫৬২৬৬৬

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা মালিকদের সঙ্গে ৩ বৎসরের জন্য এক শিল্পগত 'যুদ্ধবিরতি' চুক্তি সম্পাদন করে। ইহা ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বাধীন ভারতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ ঘটিয়াছে: ক. রাষ্ট্রীয় যোজনার মাধ্যমে ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি খ. শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উপর রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্ব গ. ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রিবিউন্যালের অ্যাড্‌জুডিকেশন বা বাধ্যতামূলক সালিশীর দ্বারা সকল শিল্পবিবাদের মীমাংসা (১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহারই উপর আত্যন্তিক জোর দেওয়া হইয়াছিল) ঘ. রাষ্ট্র, মালিক ও শ্রমিক – ইহাদের ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে (ইণ্ডিয়ান লেবার কন্‌ফারেন্স) আলোচনা ও চুক্তি ঙ. শ্রমিক ও মালিক, উভয় পক্ষের দ্বারা স্বীকৃত একটি কোড অফ ডিসিপ্লিন বা নিয়মশৃঙ্খলা বিধান (১৯৫৮ খ্রী) এবং স্বেচ্ছামূলক সালিশীর দ্বারা বিবাদনিষ্পত্তি (১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সরকার কর্তৃক ইহারই উপর জোর দেওয়া হইয়াছে)। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ও মালিক সংস্থার মধ্যে যৌথ দরাদরি প্রথা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কংগ্রেস নেতারা প্রথমে এ. আই. টি. ইউ. সি.-র অভ্যন্তরে থাকিয়া ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে টি. এল. এ. এবং হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সংঘের কংগ্রেস নেতাদের এবং জাতীয় কংগ্রেসের অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের এক সম্মেলনে এ. আই টি. ইউ. সি. বর্জন করিয়া ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (আই. এন্. টি. ইউ. সি.) নামে এক নূতন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। টি. এল. এ. ইহাতে যোগদান করে এবং একটি নেতৃত্বমূলক স্থান অধিকার করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক সম্মিলনীতে সোস্যালিস্ট পার্টির হিন্দ্‌-মজদুর পঞ্চায়েত ও রায়পন্থী ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার মিলিত হইয়া হিন্দ্‌-মজদুর সভা (এইচ. এম. এস.) নামে আর একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (ইউ টি. ইউ. সি.) নামে একটি চতুর্থ কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের সারমর্ম এইরূপ: যে কোনও সাত জন সভ্যের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহার কর্মনির্বাহকদের অন্ততঃ ৫০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট শিল্পটিতে রত বা কর্মনিযুক্ত হওয়া চাই। যথার্থ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের জন্য রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন ভারতীয় দণ্ডবিধির কবলে পড়িবে না বা তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা রুজু করা চলিবে না। ইউনিয়নের সাধারণ তহবিল তাহার প্রশাসন, শিল্পবিবাদের পরিচালনা, সভ্যদের হিতসাধন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে, তবে ইউনিয়নের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক তহবিল থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে চাঁদা দেওয়া সভ্যদের ইচ্ছাধীন। রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন যথাবিধি অডিট করাইয়া হিসাব রক্ষা করিবে এবং তাহার আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক বিবৃতি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রারের নিকটে প্রেরণ করিবে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পর ট্রেড ইউনিয়ন আইনের আর বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নাই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধনী আইনে ইউনিয়নের বাধ্যতামূলক স্বীকৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু ইহাকে বলবৎ করা হয় নাই। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধনী আইনে ইউনিয়ন সভ্যদের মাসিক চাঁদা ২৫ পয়সা করা হইয়াছিল।

গত চল্লিশ বৎসরে, বিশেষ করিয়া ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় অর্ধেক ইউনিয়ন রিটার্ন দাখিল করে না। ইউনিয়নের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে সভ্যসংখ্যা বাড়ে নাই। গড় সভ্যসংখ্যার ক্রমান্বয়ে হ্রাস ঘটিয়াছে। দুই-তৃতীয়াংশ ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা ৩০০-র কম, মাত্র ১৫টি ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা ২০০০০ বা তদূর্ধ্ব। নারী শ্রমিকদের অনুপাত ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১'১ শতাংশ এবং ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িয়া হয় প্রায় ১০ শতাংশ। ইউনিয়নের ও তাহাদের সভ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ শিল্পের প্রসার, শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদের ইউনিয়ন-চেতনার বিকাশ। অন্য কারণও আছে, যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একই প্লাণ্টে বা শিল্পে নানা প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের স্থাপন (অনেক সময়েই তাহারা মাত্র 'কাগুজে' ইউনিয়ন), মালিকদের দ্বারা যৌথ চুক্তির ভাঁওতা দেওয়ার জন্য কারখানা-স্তরে কোম্পানি ইউনিয়নের সৃষ্টি ইত্যাদি।

ভারতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার · ১৯২৭-৬৪ খ্রী

বৎসর	রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন	রিটার্নদায়ী ইউনিয়ন	মোট সভ্যসংখ্যা	গড় সভ্যসংখ্যা	নারী সভ্যসংখ্যা
১৯২৭-২৮	২৯	২৮	১০০৬১৯	৩৫৯৪	১১৬৮
১৯৩৮-৩৯	৫৬২	৩৯৪	৩৯৯১৫৯	১০১৩	১০৯৪৫
১৯৪৭-৪৮	২৭৬৬	১৬২০	১৬৬২৯২৯	১০২৬	১০২২৯৯
১৯৫৫-৫৬	৮০৯৫	৪০০৭	২২৭৪৭৩২	৫৬৮	২২০০৪৫
১৯৬৩-৬৪	১১৭০০	৭১৮১	৩৯২০৪০৮	৪৭৫	—

ইউনিয়ন সভ্যদের শিল্পগত বণ্টন এইরূপ: দ্রব্যনির্মাণ শিল্প (৪৫%), পরিবহন, ভাণ্ডার ও যোগাযোগ (১৭.৬%), খনিশিল্প (১০%) ইত্যাদি।

১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির আয় ছিল ১৬৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৫০ লক্ষ টাকা। মাসে ইউনিয়ন পিছু আয় প্রায় ২০০ টাকা এবং ব্যয় প্রায় ১৮০ টাকা। অধিকাংশ ইউনিয়নের দুই জন পুরা সময়ের কেরানী নিযুক্ত করারও টাকা নাই। ধর্মঘট তহবিল বলিয়া কোনও কিছু নাই। ভারতের শ্রমিকেরা দীর্ঘ কাল ধর্মঘট করিয়া কি করিয়া টিকিয়া থাকে তাহা বিস্ময়ের বিষয়। 'উপবাস করার ক্ষমতা'-র জোরেই দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট চলে। টি. এল এ এবং আরও কয়েকটি ইউনিয়ন বাদ দিলে, সাধারণভাবে ভারতীয় ইউনিয়নগুলি হিতসাধনের কাজ, শিক্ষাদান, সমবায় সমিতি প্রভৃতি কাজ করে না বলিলেই চলে।

ভারতে বর্তমানে যে চারিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা আছে তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক স্বার্থের সংবর্ধন। সমাজতন্ত্র তাহাদের সকলেরই চরম লক্ষ্য। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য কয়েকটি মূলনীতির ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্ট হইয়াছে।

সংস্থাগুলির কাজ অংশতঃ নিজ সংগঠনের পরিচালনাগত এবং অংশতঃ উদ্দেশ্যসাধক। শেষোক্ত কর্মসূচী চারি ভাগে বিভক্ত: ১ শ্রমিক আন্দোলন (সভাসমিতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্মঘট ইত্যাদি) ২ শ্রমিক সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারি সংস্থায় অথবা ত্রিপক্ষীয় সংস্থায় প্রতিনিধি প্রেরণ ৩. বৈদেশিক সংযোগ ৪ প্রচার ও গবেষণা। আই. এন. টি ইউ. সি. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনায় সহযোগিতা করে, শিল্পসমূহের কেন্দ্রীয় পরামর্শদায়ক পরিষদ, ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত পরামর্শদায়ক বোর্ড, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি ইত্যাদিতে তাহার প্রতিনিধি আছে। এইচ. এম. এস. ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নানাভাবে

কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ইউনিয়ন সংখ্যা ও সভ্যসংখ্যা : ১৯৬৩ খ্রী

	আই. এন. টি ইউ. সি.	এ. আই টি. ইউ সি.	এইচ. এম. এস.	ইউ. টি. ইউ. সি.
দাবিকৃত ইউনিয়নসংখ্যা	১৫৯৭	১৫৬৭	৩৪৮	৩৩৫
প্রমাণিত ইউনিয়নসংখ্যা	১২১৯	৯৫২	২৫৩	২৮৯
দাবিকৃত সভ্যসংখ্যা	১৮২৮৪০০	১০৩৭৯০০	৫৮৩৪০০	১৮২৬০০
প্রমাণিত সভ্যসংখ্যা	১২৬৮৩০০	৫০১০০০	৩২৯৯০০	১০৯০০০

সহযোগিতা করে, পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শদায়ক কমিটি, কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশন, কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কেন্দ্রীয় অছি পরিষদ ইত্যাদিতে তাহার প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান। সরকারের দ্বারা স্থাপিত সকল ত্রিপক্ষীয় সংস্থায় এ. আই. টি. ইউ. সি. এবং ইউ. টি. ইউ. সি. প্রতিনিধি পাঠায়। শুরু হইতেই আই. এন. টি. ইউ. সি. ভারতের তরফে আই. এল. ও.-তে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে। আই. এন. টি. ইউ. সি. ও এইচ. এম. এস. আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর সহিত এবং এ. আই. টি. ইউ. সি. ডব্‌লিউ. এফ. টি. ইউ.-যের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন সংস্থাগুলি মধ্যে মধ্যে বিদেশে ডেলিগেশন প্রেরণ করে।

আই. এন. টি. ইউ. সি. বয়নশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, খনি, পরিবহন, চাকুরি ও পেশা ও শর্করা শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত, এ. আই. টি. ইউ. সি-র প্রতিষ্ঠা বয়নশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, খনি, লৌহ ও ইস্পাত, বাগিচা, ইত্যাদিতে, এইচ. এম. এস. বয়নশিল্প, পরিবহন, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত, ইউ. টি. ইউ. সি. পরিবহন ও ব্যক্তিগত সেবাকর্ম প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত।

দ্র R K Mukherji, *The Indian Working Class*, 1928, *Encyclopaedia of Social Sciences*, vol. VII & XV, New York, 1935, S. D. Punekar, *Trade Unionism in India*, Bombay, 1948; Sidney Webb & Beatrice Webb, *History of Trade Unionism*, London, 1950; G. D. H. Cole, *An Introduction to Trade Unionism*, London, 1953; V. V. Giri, *Labour Problems in Indian Industry*, Bombay, 1959; V. B. Singh & A. K Saran, ed, *Industrial Labour in India*, Bombay, 1960; V. B Karnik, *Indian Trade Unions*, Bombay, 1960, Victor Feather, *Essentials of Trade Unionism*, London, 1963; *Indian Labour Year Book : 1964*; V. B. Singh, ed., *Economic History of India : 1857-1956*, New Delhi, 1965; Van Dusen Kennedy, *Unions, Employers and Government*, Bombay, 1966.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ঠগ একটি দস্যু-সম্প্রদায়ের নাম। ইহারা দলে দলে পথিকের ছদ্মবেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিত এবং কথাবার্তায় অন্যান্য পথিকদের সঙ্গে ভাব করিয়া তাহাদের সঙ্গ লইত। পরে নির্জন স্থানে উক্ত পথিকদের হত্যা করিয়া তাহাদের অর্থ আত্মসাৎ করিত। এইরূপ হত্যা করিবার জন্য ইহারা একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিত। এক খণ্ড বস্ত্রের এক কোণে একটি ছোট ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ ইহা ঘুরাইয়া পথিকের গলায় ফাঁস দিত। তাহার পর মৃতদেহ মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখিত। এইসব দস্যুদের এইরূপ প্রতারণা হইতেই সম্ভবতঃ তাহাদিগকে ঠগ বলা হইত, কারণ 'ঠক' শব্দের অর্থ 'প্রতারক'। দস্যুবৃত্তিতে যাত্রা করিবার পূর্বে তাহারা কালী, দুর্গা প্রভৃতির পূজা করিত এবং যে বস্ত্রখণ্ড দিয়া তাহারা হত্যা করিত এবং যে কোদালির দ্বারা শব ঢাকিয়া রাখিবার জন্য মাটি খোঁড়া হইত সেই দুইটি জিনিস নানা উপচারের সহিত মন্ত্রপূত করিত।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ঠগদের উপদ্রব চরমে পৌঁছিয়াছিল। শত শত অথবা সহস্র সহস্র লোক বিদেশে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসিত না। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ঠগ ও অন্যান্য দস্যুদের দমনের জন্য একটি নূতন শাসন বিভাগের সৃষ্টি করেন এবং স্লিম্যান নামে একজন সাহেবকে ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তিনি ঠগদের গুহ্য ভাষা ও সংকেতের রহস্যোদ্ধার করেন এবং ঠগ-দমনে অগ্রণী হন। প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের চেষ্টায় ঠগদল ধ্বংস হয়।

বাংলা দেশে দস্যুরা নৌকার মাঝিরূপে যাত্রীদের নির্জন স্থানে লইয়া গিয়া উহাদের প্রাণ সংহার করিত—ইহা ঠগবৃত্তির প্রকারভেদ মাত্র।

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতেই ঠগ দস্যুদের উপদ্রব ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দিল্লীর সুলতান জালালুদ্দীন খিলজী প্রায় এক সহস্র ঠগকে বন্দী করেন। ঠগদের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, যথা—১ সমস্ত ঠগ একটি মহাসংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অথবা ২. ইহারা হিন্দুদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইত ইত্যাদি।

দ্র Meadows Taylor, *Confessions of a Thug*, London, 1839; W. N. Sleeman, *Rambles and Recollections of an Indian official*, London, 1844; R. C. Majumdar, ed, *The History and Culture of the Indian People*, vol. IX, Bombay, 1963.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী (১২০৯?-৬৯ বঙ্গাব্দ) প্রখ্যাত বাঙালী কবি ও পালাগানের রচয়িতা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী

আনুমানিক ১২০৯ বঙ্গাব্দে নদিয়ায় মাতুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষালাভের পর তিনি জমিদারের সেরেস্তাতে কেরানীর কার্যে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই সংগীতরচনায় তাঁহার মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। সাতাশ-আঠাশ বৎসর বয়সে তিনি তৎকালীন কবিগায়ক ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন এবং চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বিভিন্ন কবিগায়কের জন্য গান ও পালা রচনায় নিযুক্ত হন। ঠাকুরদাস নিজে কখনও কবিগান করিতে আসরে নামেন নাই। তিনি কোনও কবিগানের দলও চালান নাই। কবিগান রচনা করিয়া ঠাকুরদাস যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। সখীসংবাদ-বিষয়ক গান রচনায় তাঁহার বিশেষ অভিনিবেশ ছিল। তাঁহার গানের বিশেষত্ব: প্রসাদগুণ, কারুণ্য ও কোমলতা।

দ্র ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, কলিকাতা, ১৯৫৮; প্রফুল্লচন্দ্র পাল-সম্পাদিত, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কলিকাতা, ১৯৫৮।

অশোকা সেনগুপ্ত

ঠাকুরদাস দত্ত (১২০৭৮-৮৩ বঙ্গাব্দ) গায়ক ও পাঁচালীকার। হাওড়া জেলার অন্তর্গত ব্যাঁটরা গ্রামে ঠাকুরদাসের জন্ম। তাঁহার পিতা রামমোহন দত্ত কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকুরি করিতেন। বাল্যকালে গৃহশিক্ষকের নিকট ঠাকুরদাস ইংরেজী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করার পর পিতার কর্মস্থলে নিয়োজিত হন। তিনি ৩০ বৎসর বয়সে এক শখের যাত্রাদল গঠন করেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই ঠাকুরদাস বিভিন্ন শৌখিন যাত্রাদলের জন্য পৌরাণিক বিষয়ে পালাগান রচনা করিয়া দিতেন এবং সংগীতরচনায় ও বিভিন্ন যাত্রাদলে নিপুণ অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ, তারকেশ্বর, এমনকি সাতক্ষীরা প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতেও তিনি আমন্ত্রিত হইতেন।

ঠাকুরদাস পরবর্তী কালে পাঁচালী রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজে যে শখের দল চালাইয়াছিলেন সেই দলে 'বিদ্যাসুন্দর', 'লক্ষ্মণ বর্জন' প্রভৃতি পালা গীত হইত। প্রায় তিন বৎসর পরে এই দল ভাঙিয়া যায়। তিনি তখন অপরাপর শখের দলে পালা রচনা করিয়া দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য পালাগানের মধ্যে 'কলঙ্কভঞ্জন', 'শ্রীমন্তের মশান', 'রাবণবধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসাদ ঘোষ তাঁহাকে 'ইণ্ডিয়ান বার্ড' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রা-পাঁচালীকার এবং প্রেমবিরহমূলক গীতি-রচয়িতাদের মধ্যে ঠাকুরদাসের নাম স্মরণীয়।

১২৮৩ বঙ্গাব্দের ২১ বৈশাখ তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৯০৪; ব্যোমকেশ মুস্তফী, পাঁচালীকার ঠাকুরদাস, কলিকাতা, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ; ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, কলিকাতা, ১৯৫৮।

অশোকা সেনগুপ্ত

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩ খ্রী) খুলনা জেলার সাবনা গ্রামে জন্ম। চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙায় ইংরেজী স্কুলে তাঁহার শিক্ষা। পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। তারপর শিক্ষকতা, দারভাঙ্গায় কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের চাকরি, জমিদারিতে ম্যানেজারি প্রভৃতি নানা বৃত্তি অবলম্বনে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে।

দারভাঙ্গায় থাকিতে তিনি 'পাক্ষিক সমালোচনা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন (ফাল্গুন ১২৯০ বঙ্গাব্দ)। ঝনজারপুরে অবস্থানকালে 'মালঞ্চ' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (পৌষ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ)। পরে কিছুদিন 'বঙ্গনিবাসী' (প্রকাশ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার সম্পাদনা করেন। আরও পরে কিছুদিন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

ঠাকুরদাসের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি: 'দুর্গোৎসব' (কাব্য, ১২৯০ বঙ্গাব্দ), 'সাহিত্যমঙ্গল' (প্রবন্ধ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ), 'সাতনরী' (খণ্ডকাব্য), 'শারদীয় সাহিত্য' (গদ্যপদ্যময় সমাজচিত্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), 'সহরচিত্র' (কৌতুকচিত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) ও 'সোহাগচিত্র' (কৌতুকচিত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)।

ঠাকুরদাস প্রচার, নবজীবন, প্রবাহ, নব্যভারত, সাহিত্য, জন্মভূমি, ভারতী, প্রদীপ ইত্যাদি পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এইসব রচনায় ঠাকুরদাসের চিন্তাশীল সমালোচনার এবং শ্লেষবিদ্রূপপূর্ণ বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্যাপি এগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

ঠাকুর-পরিবার পিরালী দ্র

ঠাট সংগীত দ্র

ঠানে থানা দ্র

ঠিকুজি কোষ্ঠী দ্র

ঠুংরি 'রাগদর্পণ' নামক ফারসী গ্রন্থে ঠুংরি সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ অনুসারে জানা যায় যে তৎকালে 'বরোয়া' (বর্তমান বার্রোয়া) রাগে একপ্রকার গান গাওয়া হইত এবং ইহা 'ঠুমরী' নামে পরিচিত ছিল। ক্রমে এই জাতীয় গান এইরূপ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যে ইহা ধ্রুপদ, খেয়াল বা টপ্পার ন্যায় একটি পৃথক গীতরীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়। ঠুংরি নামক একটি তালও প্রচলিত আছে। খেমটা, দাদরা প্রভৃতি বিভিন্ন গীতিকেও ঠুংরির পর্যায়ে ফেলা হইয়া থাকে।

ঠুংরি প্রেমসংগীত। সাধারণতঃ স্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি কলিতেই ইহা সম্পূর্ণ হয় এবং স্বল্প কয়েকটি ছত্রে ইহা রচিত হইয়া থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ শিল্পী খেয়াল গানের পর ঠুংরি গাহিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। ঠুংরিতে নানা রাগের মিশ্রণ ঘটে। সাধারণতঃ ভৈরবী, পিলু, বার্রোয়া, সিন্ধু, খাম্বাজ, ঝুম, বেহাগ প্রভৃতি রাগ[illegible] ইচ্ছানুসারে এই সংগীত শিথিল করা হয়। উচ্চাঙ্গের ঠুংরি মধ্যমান অথবা যৎ তালে গাওয়া হয়।

পাঞ্জাব, লখনৌ এবং বারাণসীতে ঠুংরির বিশেষ প্রসার ঘটায় এই স্থানগুলিতে ঠুংরির এক-একটি বিশেষ রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একপ্রকার ঠুংরিকে পাঁচাও ঠুংরি বলা হয়। ইহার প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল। বারাণসী ঠুংরি অপেক্ষাকৃত গম্ভীর এবং ইহাতে খেয়ালের বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। পাঞ্জাবী ঠুংরিতে দেশীয় সংগীতের প্রভাব দেখা যায়। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ্ আলী শাহ্ (১৮২২-৮৭ খ্রী) লখনৌ ঠুংরির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহার প্রচেষ্টাতেই এই রীতির ঠুংরি উত্তর ভারতে বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

দ্র ফকীরুল্লাহ্, রাগদর্পণ, ফার্সী পুঁথি, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ডক জলযান গ্রহণের নিমিত্ত কৃত্রিম জলাধারকে সাধারণতঃ ডক বলা হয়। ডকের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে জলযান নির্মাণ, পর্যবেক্ষণ, রক্ষণ, মেরামত ও মাল বোঝাই এবং খালি করার সকল প্রকার বন্দোবস্ত থাকে। ইহাতে জাহাজ বাঁধিবার বিবিধ ব্যবস্থা; মাল উঠাইবার নামাইবার জন্য ক্রেন, শুট্, কন্‌ভেয়ার, এলিভেটর; মাল রাখিবার জন্য গুদাম; পরিবহনের জন্য রেল, স্থল ও জলপথ এবং তৈল, কয়লা, বিদ্যুৎ ও কম্‌প্রেস্‌ড এয়ার সরবরাহের আয়োজন; অগ্ন্যুৎপাতনিরোধের এবং স্বাস্থ্যরক্ষারও সুবন্দোবস্ত থাকে।

ডক প্রধানতঃ তিন প্রকারের: ১. জলময় ২. শুষ্ক ৩. ভাসমান।

জলময় ডক আবার তিন প্রকারের: ক. উন্মুক্ত খ. আংশিক আবদ্ধ ও গ. সম্পূর্ণ আবদ্ধ।

জোয়ার-ভাঁটায় জলের ওঠা-নামা অল্প হইলে (প্রায় ৩ মিটার বা ১০ ফুট পর্যন্ত) এবং বন্দরে ঝড়ের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে, ডকের মুখে কোনও গেট বা প্রবেশদ্বার থাকে না। মাদ্রাজে এইরূপ উন্মুক্ত ডক আছে। এইরূপ ডকে জাহাজ অষ্টপ্রহর আসা-যাওয়া করিতে পারে। প্রবেশদ্বার, পাম্প ইত্যাদি না থাকায় ইহার ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত কম।

আংশিক আবদ্ধ ডকের মুখে একটি প্রবেশদ্বার থাকে। জোয়ারের শেষে এবং ভাটা আরম্ভের পূর্বে জল একরূপ নিশ্চল হইয়া আসে। ইহাকে 'হাই ওয়াটার' বা জলের 'সর্বোচ্চ অবস্থা' বলে। অবস্থার কিছু পূর্ব হইতে কিছু পর পর্যন্ত জাহাজ আসা-যাওয়ার নিমিত্ত ডকের প্রবেশদ্বার খুলিয়া রাখা হয়। ইহাতে ডকের জল ওঠা-নামা করে না। সেক্ষেত্রে জাহাজে মাল ওঠানো-নামানো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, বাহিরের আবহাওয়া হইতে জাহাজ নিরাপদ থাকে; জাহাজের ইঞ্জিনকেও প্রস্তুত রাখিতে হয় না।

ডকের জলের স্তর, বাহিরের জলের সাধারণ দিনের সর্বোচ্চ স্তর হইতে উঁচু রাখিতে হইলে ডকের প্রবেশপথে পর পর দুইটি গেটের প্রয়োজন; একটি ডকের মুখে এবং অপরটি নদী বা সমুদ্রের দিকে। এই দুই প্রবেশদ্বারের মধ্যবর্তী স্থানকে লক্ বলে। ইহার মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করাইয়া পাম্পের সাহায্যে ইহার জলের স্তর ডকের ভিতরে বা বাহিরের জলের স্তরের সমান করিয়া জাহাজ ডকের ভিতরে বা ডক হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, ভবনগর প্রভৃতি বন্দরে এইরূপ সম্পূর্ণ আবদ্ধ ডক আছে।

যে ডক হইতে প্রয়োজন অনুসারে পাম্পের সাহায্যে সমস্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া যায় তাহাকে শুষ্ক বা জলহীন ডক বলে। জাহাজের হাল, প্রপেলার এবং জাহাজের যে অংশ জলের নীচে থাকে সেই অংশ পর্যবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য জাহাজকে এইরূপ ডকে আনিয়া প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রবেশদ্বার একটি বাক্সের মত। ইহার মধ্যে জল ঢুকাইয়া বা বাহির করিয়া প্রবেশপথ রুদ্ধ বা উন্মুক্ত করা হয়। ইহাকে ক্যায়সন গেট বলে।

ভাসমান ডক অনেকগুলি কক্ষে বিভক্ত। ইহার আকৃতি জাহাজ ধারণের উপযোগী। কক্ষগুলি প্রয়োজন-মত জলপূর্ণ করিয়া ডকটিকে নির্দিষ্ট গভীরতায় নিমজ্জিত করা হয়। জাহাজকে ইহার উপর অবস্থিত করিয়া কক্ষস্থ জল পাম্পের দ্বারা বাহির করিয়া দিলে জাহাজ সমেত ভাসিয়া ওঠে। কোনও কোনও স্থলে রেল-লাইনের মত রেলের উপরে জাহাজকে নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে আংশিকভাবে জল হইতে টানিয়া তোলা হয়। ইহার পর প্রবেশপথ রোধ করিয়া বাকি জল পাম্পের সাহায্যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে স্লিপ ডক বলে।

মানব-সভ্যতার আদি যুগে জলযান ও পোতাশ্রয়ের উৎপত্তি। প্রথম পোতাশ্রয় নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক ছিল — কোনও নদীর ধারে বা পাহাড়ের আড়ালে। খ্রীষ্টজন্মের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে নীল নদীর তীরে মেম্‌ফিস্, ইউ-ফ্রাটেসের তীরে ব্যাবিলন, টাইগ্রিসের উপর নিনেভে বন্দর বিশেষ উন্নতিলাভ করে এবং ঐসব স্থলে ডক নির্মিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে কার্থেজ বন্দর খুবই উন্নত ছিল, তথায় বাণিজ্য ও যুদ্ধজাহাজের নিমিত্ত আচ্ছাদিত ডকও ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নেপল্‌স বন্দরেও একটি ডক ছিল। ১৬ ১৭শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্ত্যের বন্দরগুলিতে একে একে আধুনিক কৃত্রিম ডক প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৭শ শতকের শেষে ইংল্যাণ্ডের রদারহিথের হাইল্যাণ্ড নামক স্থানে প্রথম ডক নির্মিত হয়।

পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের মতে ১৬শ শতকে পশ্চিম ভারতের আগাশিতে জাহাজ-নির্মাণের বড় একটি ডক ছিল। শিবাজী মারাঠা নৌবহরের জন্য কোঙ্কণ উপকূলের বিজয়দুর্গ, কোলাবা, সিন্ধুবর্গা, রত্নগিরি, অঞ্জনবেলা প্রভৃতি নানা স্থানে ডক নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭শ শতাব্দীতে গোদাবরী জেলার নরসাপুরেও জাহাজ নির্মাণের ডক ছিল। ১৬শ শতকের শেষে শ্রীপুরের কেদাররায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য নৌশিল্প উন্নয়নে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং অনেক স্থানে ডক নির্মাণ করেন। ১৬১৩ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুরাটে এবং তৎপরে বোম্বাই ডকে জাহাজ নির্মিত হইত। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বোম্বাইয়ে একটি উন্নত ধরনের ড্রাই ডক ছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ডকে প্রথম জাহাজ নির্মিত হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ব্যাঙ্কশালে প্রথম ড্রাই-ডক নির্মিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে একটি ডক নির্মিত হইয়াছিল।

গত শতাব্দীর শেষ হইতে ভারতবর্ষের বন্দরে অধুনা দৃষ্ট আধুনিক ডক নির্মিত হইতে থাকে। কলিকাতায় দুইটি, বোম্বাইয়ে তিনটি, মাদ্রাজে দুইটি ও ভবনগরে একটি করিয়া ডক আছে।

পশুপতি ভট্টাচার্য

ডকুমেণ্টারি তথ্যচিত্র। 'ডকুমেণ্টারি' কথাটি জন গ্রিয়ার্সন-এর চলচ্চিত্র সম্বন্ধে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গ্রিয়ার্সনই প্রথমে (১৯২৬ খ্রী) 'নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের পলিনেশীয় অধিবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লইয়া রচিত 'মোয়ানা' চলচ্চিত্র সম্বন্ধে ঐ শব্দটি প্রয়োগ করেন। আবার অনেকের মতে, চলচ্চিত্রের জন্মদাতা লুমিয়ের (Lumiere)-এর আমলেই *documentaire* শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে।

সাধারণতঃ যেসব চলচ্চিত্রে গল্প নাই বা প্রধান নহে তাহাকে ডকুমেণ্টারি বলা হয়। গ্রিয়ার্সন বলিয়াছেন, বাস্তবের যথার্থ বর্ণনা, জীবনের বাস্তব অথচ নাটকীয় পরিচয় বিবৃত করাই ডকুমেণ্টারির বৈশিষ্ট্য। পল রোথা বলেন, মনগড়া কাহিনীর একান্ত বর্জনের জন্যই ছবিতে ডকুমেণ্টারি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। ডকুমেণ্টারিকে চলচ্চিত্রের কোনও কোনও ঐতিহাসিক 'ফ্যাক্ট ফিল্ম' বা তথ্যচিত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন, কারণ ইচ্ছামত পরিবর্তিত করা হয় নাই এমন তথ্যসম্ভারই ইহার প্রাণ – কল্পনাপ্রসূত গল্প নহে। এই 'ফ্যাক্ট ফিল্ম' কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, যেমন : সংবাদ চিত্র (নিউজরীল), ডকুমেণ্টারি, ভ্রমণ-চিত্র (ট্রাভেলোগ), বিজ্ঞান-চিত্র, শিক্ষামূলক চিত্র, শিল্পকলাবিষয়ক চিত্র এবং ক্রিস মারকার (Kris Marker)-এর অতি আধুনিক প্রবন্ধপর্যায়ভুক্ত চলচ্চিত্র।

চলচ্চিত্রের জন্ম হইতেই দুইটি ভিন্নমুখী ভাবধারা দেখা যায় — একদিকে লুমিয়ের-এর বাস্তবপ্রিয়তা, অন্য দিকে মেলিয়েস্ (Méliès)-এর কল্পনামূলক পরিবেশ-রচনা। পরে এই দুই-এর সংমিশ্রণে মিশ্রচিত্রের জন্ম হয়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবকে শুদ্ধ বাস্তব রূপে, তাহার যথার্থ রূপে, রূপান্তরিত করার চেষ্টা প্রত্যেক চিন্তাশীল ডকুমেণ্টারি চিত্র-নির্মাতার প্রধান সমস্যা। অনেকে তাঁহাদের ডকুমেণ্টারি ছবিকে শিল্প বলিতেও কুণ্ঠিত, কারণ তাঁহাদের মতে তাঁহারা শুধু অসংস্কৃত বাস্তবকেই ছবিতে প্রতিফলিত করেন।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ ডকুমেণ্টারি চলচ্চিত্রের নাম, নির্মাতাগণের নামের উল্লেখ সহ, লিপিবদ্ধ হইল : রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি, 'মোয়ানা' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯২৬ খ্রী),

আইজেনস্টাইন, 'অক্টোবর' (সোভিয়েত দেশ, ১৯২৮ খ্রী), প্যাবস্ট, 'লা পীঅব্র' (ফ্রান্স, ১৯২৮ খ্রী), গ্রিয়ারসন, 'দি ড্রিফ্‌টরস', (ইংল্যাণ্ড, ১৯২৯ খ্রী), পল রোথা, 'ওয়র্লড অফ প্লেন্টি' (ইংল্যাণ্ড, ১৯৪৩ খ্রী) ইত্যাদি।

বারীণ সাহা

ডঙ্কা ঢাক দ্র

ডন সোসাইটি বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮ খ্রী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইহার প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ইহার বিলয় ঘটে। তৎকালীন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) দোতলায় ডন সোসাইটির কর্মকেন্দ্র অবস্থিত ছিল।

ডন সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন বিজাতীয় শিক্ষাধারার অব্যবস্থা হইতে দেশের যুবসম্প্রদায়কে মুক্ত করিয়া জাতি-গঠনের উপযোগী স্বদেশী ও বাস্তবানুগ শিক্ষাদীক্ষায় তাহাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তাহাদের মনে-প্রাণে স্বদেশসেবা ও স্বার্থত্যাগের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে ব্যাবহারিক ও কারিগরী শিক্ষা-প্রদানও সোসাইটির আদর্শ ছিল।

ডন সোসাইটির কর্মসূচী ৩টি মূল শাখায় বিভক্ত ছিল: সাধারণ বিভাগ, শিল্প বিভাগ ও পত্রিকা বিভাগ। সোসাইটির সাধারণ বিভাগে সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস হইত। 'জেনারেল ট্রেনিং ক্লাস' রবিবারে অনুষ্ঠিত হইত। আর শুক্রবারে হইত 'মরাল অ্যাণ্ড রিলিজস্ ট্রেনিং ক্লাস'। প্রথম দিন ইংরেজীতে বক্তৃতা হইত। বক্তা থাকিতেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে বাংলায় বক্তৃতা হইত এবং পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামী বক্তৃতা দিতেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল রকমারি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগসম্বন্ধে আলোচনা হইত। ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা— ইহাদের কোনটিই আলোচনা বহির্ভূত ছিল না। আর এই আলোচনা হইত পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সহিত তুলনা-মূলকভাবে। কিন্তু আলোচ্য বিষয় যাহাই হউক না কেন, মূল লক্ষ্য থাকিত স্বার্থের বিশ্লেষণ এবং পরোক্ষভাবে স্বদেশসেবার আদর্শ-প্রচার।

দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় হইত গীতার কর্মযোগ ও গীতার আদর্শ।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডন সোসাইটির শিল্প বিভাগের পরি-চালনায় এক স্বদেশী দোকান খোলা হয়। এখানে স্বদেশ-জাত শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। এই বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিল্পবিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা, বাণিজ্যবিদ্যায় তাহাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া ও কারিগরিকর্মী করিয়া তোলা এবং স্বদেশী শিল্পের প্রতি তাহাদের মনে যথার্থ দরদ সঞ্চার করা। এই শিল্প বিভাগের উদ্যোগে স্বদেশী শিল্প-বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা এবং মাঝে মাঝে স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত। এইভাবে নানা উপায়ে— ডন সোসাইটি বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫ খ্রী) পটভূমি রচনা করে।

ডন সোসাইটির তৃতীয় শাখা ছিল পত্রিকা বিভাগ। এই বিভাগ খোলা হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় 'ডন' পত্রিকা (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) উক্ত সোসাইটির মুখপত্রে রূপান্তরিত হয় এবং 'দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন' নাম ধারণ করে। এই নামে পত্রিকাটি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। কিন্তু পত্রিকাখানি ডন সোসাইটির সত্যকার মুখপত্র হিসাবে কাজ করে মাত্র দুই বৎসর (১৯০৪-০৬ খ্রী)। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যক্রম পর্যালোচনে আরম্ভ হইলে ঐ পত্রিকা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ডন' পত্রিকা মূলতঃ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বাণীই প্রচার করে। ১৯১০ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ এই ৪ বৎসর ডন পত্রিকায় ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য, সংগীত ও ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বেই ডন সোসাইটি বাংলা দেশে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও স্বদেশ-সেবার কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই সমিতিতে যে সকল কৃতবিদ্য তরুণ দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ মনীষীর নাম স্মরণীয়।

দ্র হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬০, Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, *The Origins of the National Education Movement*, Jadavpur, 1957

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ডফ গোলাকার কাষ্ঠের ফ্রেমে বিস্তৃত চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র। বাম হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে বাজাইতে হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যাযাবরদের মধ্যে সাধারণতঃ ডফ প্রচলিত থাকিলেও মহারাষ্ট্রের 'তামাসা' প্রভৃতি যাত্রাভিনয় এবং 'লাবণী' প্রভৃতি সংগীতানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক যন্ত্ররূপে ইহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও কোনও ভজনগীতির আসরে মৃদঙ্গের অভাবে তাল রক্ষার জন্যও এই যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। মিশর, আরব ইত্যাদি দেশেও অনুরূপ যন্ত্র প্রচলিত আছে।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ডবাক সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যে সকল রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া বিরাট এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এলাহাবাদের একটি প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে তাহাদের বিবরণ ক্ষোদিত আছে। পূর্ব ভারতে যে সকল রাজা সমুদ্রগুপ্তকে কর দিতেন, তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং তাঁহার রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন তাহাদের রাজ্যের তালিকায় সমতট, ডবাক, কামরূপ ও নেপালের উল্লেখ আছে। সমতট পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গের প্রাচীন নাম, কামরূপ (উত্তর আসাম) ও নেপাল এখনও সুপরিচিত। ডবাক রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। কিন্তু উল্লিখিত চারিটি রাজ্যের সমাবেশ হইতে অনুমান করা যায় যে এগুলি সম্ভবত ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে লিখিত হইয়াছে। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে এই রাজ্য বর্তমান ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা লইয়া গঠিত ছিল। আসামে কপিলি নদীর উপত্যকায় 'ডবাক' নামে একটি স্থান আছে। কেহ কেহ ইহাকেই ডবাক নামের অপভ্রংশরূপে গ্রহণ করিয়া এই অঞ্চলেই ডবাক রাজ্য অবস্থিত ছিল, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ডমরু অবনদ্ধ পাতহ যন্ত্র অথবা বৈণব-যন্ত্র। ডমরু অতি প্রাচীন যন্ত্র, ইহার বাংলা নাম ডুগ্‌ডুগি। ইহার উভয় মুখ চর্মাচ্ছাদিত, মধ্য ভাগ সংকীর্ণ। দুইটি রজ্জুর প্রান্তে দুইটি সীসক-গুটিকা আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রটির মধ্যস্থল নাড়া দিলে বাদিত হয়। প্রধানতঃ ভল্লুক ও বানরের ক্রীড়া-প্রদর্শকেরাই এই যন্ত্র বাজাইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের একটি প্রিয় যন্ত্র বলিয়া খ্যাত। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক প্রাচীন দেশে যন্ত্রটি লক্ষিত হয়।

প্রদ্যুম্ন মিত্র

ডয়সেন, পাউল (১৮৪৫-১৯১৯ খ্রী) জার্মান ভারত-তত্ত্ববিদ্। পশ্চিম জার্মানীর কোবলেনৎস শহরের সন্নিকটে ওবের ড্রাইসের এক পরিবারে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি পাউল ডয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের ধর্মযাজক।

ডয়সেন বন, ট্যুবিঙ্গেন ও বেলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করেন। সংস্কৃতে তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ক্রিশ্চিয়ান লাসেন ও গিল্ডেমাইস্টেরের ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ছাড়াও তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষাতত্ত্বে এবং ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

ডয়সেন জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮৭৫ ৭৯ খ্রী) এবং আখেনের কারিগরী স্কুলেও তিনি দর্শন পড়াইতেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৮ বৎসর একাদিক্রমে তিনি ভারতীয় দর্শনের চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। বেলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে দর্শনের অধ্যাপকরূপে যোগদান করিয়া পরে প্রধান অধ্যাপকপদে বৃত হন এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কীল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন।

জ্ঞানার্জনের স্পৃহায় ডয়সেন নানা দেশে ভ্রমণ করেন। ১৮৯২ ৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া তিনি সংস্কৃত বিদ্যা-চর্চার কেন্দ্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ডয়সেন সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতে পারিতেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে অর্ডার অফ দি রেড ঈগল সম্মানে ভূষিত করা হয়।

দর্শনে, বিশেষ করিয়া ভারতীয় বেদান্ত দর্শনে ডয়সেন ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল 'দাস সিস্টেম দেস বেদান্ত' (বেদান্ত দর্শনের বিষয়বস্তু, ১৮৮৩ খ্রী), 'দি সূত্র্য দেস বেদান্ত' (বেদান্তের সূত্রাবলী, ১৮৮৭ খ্রী), 'অন দি ফিলসফি অফ দি বেদান্ত ইন ইট্‌স রিলেশন টু অকসিডেনটাল মেটাফিজিক্স' (বেদান্ত দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের অধ্যাত্মবাদের সম্পর্ক, ১৮৯৩ খ্রী), গেষিসটে দের ফিলোসফি (দর্শনের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৮৯৪ ও ১৮৯৯ খ্রী), 'সেক্‌যিগ্‌ উপনিষদস দেস্ বেদ' (বেদের ৬০টি উপনিষদ, ১৮৯৭ খ্রী)। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আউট্‌লাইন্‌স অফ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' (ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা), ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'এরিনেরুঙ্গেন আন্ ইণ্ডিয়ান' (ভারতের স্মৃতিকথা) প্রভৃতি

নিবন্ধগুলিও তাঁহার ভারত-বিদ্যাচর্চার স্মরণীয় নিদর্শন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডয়সেনের মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত

ডাইনামিক্স বিশ্বের বস্তুনিচয়ের স্থির অবস্থা ও চলমান অবস্থা যে বিজ্ঞানে আলোচিত হয় তাহার সাধারণ নাম বলবিদ্যা বা মেকানিক্স। ডাইনামিক্স ঐ বলবিদ্যারই শাখা, ইহার আলোচ্য বিষয় শক্তির ক্রিয়ার ফলে গতিশীল বস্তুর গতিবৈচিত্র্য। ডাইনামিক্সকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - কাইনেম্যাটিক্স ও কাইনেটিক্স। প্রথমটি গতির বিভিন্ন জ্যামিতিক পথ সম্বন্ধে আলোচনা করে, কিন্তু গতিসঞ্চারী শক্তি সম্বন্ধে তাহা নীরব। কাইনেটিক্সই (আমরা সাধারণতঃ ডাইনামিক্স বলিতে ইহাকেই বুঝি) হইল শক্তির ক্রিয়ায় বস্তুতে বিভিন্ন গতির আরোপের সূত্রাবলী সংক্রান্ত বিজ্ঞান। কাইনেটিক্সে প্রথমতঃ বস্তু, বিন্দুবৎ বস্তু, আয়তনযুক্ত বস্তু, বল ও স্থিতিকথিত ভর, বেগ, ভরবেগ, ত্বরণ— এ সকলের সংজ্ঞা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। শূন্যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর চলার পথ ও পার্থিব আকর্ষণের ফলে নিক্ষিপ্ত গোলা প্রভৃতির দূরত্ব পাড়ির বিষয়ে আলোচনা ইহার অন্তর্গত। কাইনেটিক্স এ আলোচনার শুরুতেই ভিত্তি হিসাবে বসিয়াছে নিউটনের গতিসূত্রসমূহ। প্রথম সূত্রে বলের সংজ্ঞা নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে প্রযুক্ত বলের পরিমাপ নির্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিখ্যাত সূত্রটি P mf, এইরূপে লিখিত হয়, P– বল, m— ভর ও f ত্বরণ। বস্তুতঃ নিউটনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-বিষয়ক তৃতীয় সূত্রেই প্রকৃতিতে বলের উপস্থিতি ও তাহার ক্রিয়ার বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান বিধৃত রহিয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানেও বলবিদ্যার প্রয়োগ সম্ভব হইয়াছে।

বলের ক্রিয়ার ফলে কার্য, শক্তি, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের সংজ্ঞা ও পরিমাপ নির্ণীত হইয়াছে, নিউটনের পরবর্তী কালে ডাইনামিক্সকে একটি সাধারণ চরিত্র দেওয়া হইয়াছে।

যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকের নিরলস সাধনা গতিবিদ্যাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে তাহাদের মধ্যে, দালাঁবেয়র (D'Alembert) লাগ্রাঞ্জ, হ্যামিল্টন, য়াকোবি ও পোয়াসোঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত সাধারণ বলবিদ্যা যাহা 'শক্তি' ও 'কার্যে'র বিভিন্ন সমীকরণমাত্রে পর্যবসিত, তাহাই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গঠনে গাণিতিক ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগানো হইয়াছে। বর্তমান কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পরমাণু ও পরমাণু-কেন্দ্রের রহস্য বুঝিবার একমাত্র উপায়।

দ্র A G. Webster, *Dynamics of Particles and of Rigid Elastic and Fluid Bodies*, Leipzig, 1904 , H Lamb, *Dynamics*, Cambridge, 1914 ; G Joos, *Theoretical Physics*, London, 1934.

বিমলেন্দু মিত্র

ডাইনামো একটি চুম্বকের শক্তির গণ্ডির মধ্যে যদি কোনও ধাতুনির্মিত তার সঞ্চালিত করা যায় তাহা হইলে ঐ তারের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ অনাবদ্ধ ইলেকট্রনগুলি তারের এক দিক হইতে অন্য দিকে সরিয়া গিয়া সাম্যের অভাব সৃষ্টি করে এবং যদি অন্য কোনও তার দ্বারা ঐ তারের দুই দিক যুক্ত করা যায় তবে দ্বিতীয় তারের ভিতর দিয়া ফিরিয়া পুনরায় সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। এই সঞ্চালন অপ্রতিহত রাখিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ডাইনামোতে এইভাবেই বিদ্যুৎ সৃষ্ট হয়। উহাতে কতকগুলি উত্তর ও দক্ষিণ-মেরু সংবলিত চুম্বকের নীচে ইঞ্জিন অথবা অন্য যে কোনও শক্তির সাহায্যে অনেক তার জড়ানো একটি লৌহনির্মিত আর্মেচার ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং তারের দুই প্রান্ত হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া বাহিরে আলো, পাখা ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। কমিউটেটরের সাহায্যে একমুখী প্রবাহ সৃষ্ট হয় নতুবা প্রবাহ উভয়মুখী হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে সর্বপ্রথম ডাইনামোর সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হ. এম. ক্লার্ক প্রথম চুম্বক মেরুযুগলের মধ্যে তার জড়ানো আর্মেচার ঘুরাইয়া ডাইনামো নির্মাণ করেন। ডাইনামো এবং জেনারেটর একই জিনিস। একমুখী বিদ্যুৎ তৈয়ারি করার যন্ত্রকে ডাইনামো অথবা ডি সি. জেনারেটর বলা হয় এবং উভয়মুখী বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রকে এ সি. জেনারেটর অথবা অল্টারনেটর বলে।

ডাইনামোর আর্মেচারের ভিতরে উভয়মুখী শক্তি তৈয়ারি হয় এবং কমিউটেটর-এর সাহায্যে বাহিরের তারে একমুখী বিদ্যুৎ প্রেরিত হয়। ডাইনামো অথবা ডি. সি. জেনারেটর খুব বেশি চাপের (হাই ভোল্টেজ) জন্য ব্যবহৃত হয় না। কারণ বেশি চাপের বিদ্যুৎকে উভয়মুখী হইতে একমুখী করার অসুবিধা (কমিউটেশন ডিফিকাল্টি) আছে। কিন্তু দূরে বিদ্যুৎ শক্তি পাঠাইতে হইলে বেশি চাপের দরকার। সেইজন্য আজকাল খুব ছোট গণ্ডি ব্যতীত অন্যত্র উভয়মুখী বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। অল্টারনেটরে কমিউটেটর দরকার হয় না, ভিতরে উভয়মুখী শক্তি

তার-সহযোগে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। ‘জেনারেটর’ দ্র।

হেমচন্দ্র গুহ

ডাইনোসরাস প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী দ্র

ডাক প্রাচীন কালেও ডাকের প্রচলন ছিল, তবে তখন কেবল সরকারি প্রয়োজনে উহা ব্যবহৃত হইত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোদোতসের বিবরণে জানা যায়, প্রাচীন পারসীক সাম্রাজ্যের সরকারি ডাক ঘোড়ায় চড়া ও পায়ে-চলা বাহকের (হরকরা) সাহায্যে দ্রুত গতিতে চলাচল করিত এবং নিয়মিত দূরত্বে তাহাদের বদল করার ব্যবস্থাও ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের ডাক-ব্যবস্থাও বেশ উন্নত ছিল।

ভারতে সুলতানি আমলে সাম্রাজ্যের সংবাদ অবগতির জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারি ডাক চলাচলের যে বন্দোবস্ত ছিল তাহার কিছু কিছু তথ্য আমরা জানি। আলাউদ্দীন খিলজির শাসনকালে (১২৯৬-১৩১৮ খ্রী) সামরিক প্রয়োজনে ডাক চৌকির প্রচলন ছিল। মহম্মদ-বিন-তোগলকের আমলের (১৩২৫-৫১ খ্রী) ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা ইব্‌ন বতুতার বর্ণনা হইতে বেশ জানা যায়। ঘোড়ায় চড়া ডাক-বাহক প্রায় ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) অন্তর এবং হরকরা প্রায় ২ কিলোমিটারের (১ মাইল) মধ্যে তিনবার বদল করা হইত। সেকালে সিন্ধু হইতে দিল্লী ছিল ৫০ দিনের রাস্তা, কিন্তু সরকারি ডাক যাইত ৫ দিনে। এইভাবে সুষ্ঠু ব্যবস্থায় সুলতান সাম্রাজ্যের দূরবর্তী স্থান হইতে সংবাদ পাইতেন। সুলতান সেকেন্দর লোদীও (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রী) ডাকচৌকির মাধ্যমে বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ অবগত হইতেন।

শের শাহের রাজত্বকালে (১৫৪০-৪৫ খ্রী) ডাক-ব্যবস্থার আরও উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার নির্মিত রাস্তা ও তাহাদের পার্শ্ববর্তী সরাইখানাগুলি ডাক চলাচলের খুব সহায়ক হইয়াছিল। সরকারি ডাক বহনের জন্য প্রত্যেক সরাইখানাতে দুইটি সরকারি ঘোড়া রাখা হইত। ঘোড়সওয়ার ব্যতীত পায়ে-চলা বার্তাবাহকও সাম্রাজ্যের বহু স্থানে ছিল। গুপ্তচরগণ ডাক-চৌকির মাধ্যমে সম্রাটকে সংবাদ প্রেরণ করিত। শের শাহ্ ডাক ও গুপ্তচর বিভাগের ভার অর্পণ করেন দারোগা-ই-ডাকচৌকির উপরে। মোগল আমলেও সরকারি ডাক-চলাচলের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজ কোম্পানি ভারতে ডাক-চলাচল ত্বরান্বিত করেন ও ইহার নানাবিধ উন্নতি সাধন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে একটি চিঠির জন্য প্রতি একশত মাইলে দুই আনা মাশুল ধার্য হয়। ডাক-টিকিটের প্রচলন তখনও হয় নাই। প্রয়োজনীয় মাশুল নগদ পয়সায় দিলে চিঠিতে তামার পাতের নিদর্শন বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

১৭৮৪ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ভিতরে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতার মধ্যে ডাক-চলাচল ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয় এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মসুলিপট্টম হইতে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতার মধ্যে প্রথম নিয়মিত সাপ্তাহিক ডাক চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাকের নূতন আইন প্রবর্তিত হইল। এই আইনে কোম্পানির অধীন সমস্ত জায়গায় ডাক-বহনের একচেটিয়া কর্তৃত্ব অর্পিত হইল সরকারের উপরে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ডাকবহন প্রায় বন্ধ করা হইল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিন জন সভ্য লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক বিভাগের যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাই ভারতের বর্তমান ডাক-ব্যবস্থার মূল কাঠামো।

এই বৎসর সর্বভারতীয় ডাক বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পৃথক সংস্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করিল এবং একজন ডিরেক্টর জেনারেলের অধীনে উহা স্থাপন করা হইল। পোস্ট মাস্টার জেনারেল হইলেন প্রদেশের ডাক বিভাগের কর্তা। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর প্রথম সর্বভারতীয় ডাক টিকিটের প্রচলন হয়। শুধু ওজন অনুযায়ী চিঠির মাশুল নির্ধারিত হইল এবং চিঠি ডাকে দিবার পূর্বে প্রয়োজনীয় ডাক-টিকিট লাগাইবার আদেশ হইল। ইহা না করিলে যতটা মাশুল কম হইত তাহার দ্বিগুণ গন্তব্য স্থানে আদায় করা হইত।

উপরি-উক্ত বৎসরে ভারতে বড় ডাকঘর ছিল ২০১টি এবং ছোট ডাকঘর ৪৫১টি। ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে শহরাঞ্চলে মোট ডাকঘরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৯০৩৩টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৮৭৮৬২টি, এই সময়ে মোট চিঠির বাক্স ছিল ১৭৭৯৩৮টি, ইহার মধ্যে শহরাঞ্চলে ৪৪০৩২টি এবং গ্রামাঞ্চলে ১৩০৯০৬টি। এই বৎসর দশটি ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, বোম্বাই এবং নাগপুরে কাজ করিয়াছে।

দেশীয় রাজ্যের ডাকঘরগুলির সম্পর্কে দেখা যায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ৬৫২টি রাজ্যের ভিতরে ৬৩৫টি সর্ব-ভারতীয় ডাক-ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ভারত স্বাধীন হইবার

পূর্ব পর্যন্ত কতকগুলি রাজ্য তাহাদের নিজস্ব ডাক-ব্যবস্থা বহাল রাখিয়াছিল। যে সকল রাজ্য ভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহাদের ডাকঘরগুলি সর্বভারতীয় ডাক বিভাগের অধীনে আসিয়াছে।

ডাকঘরের প্রধান কাজ চিঠি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় বহন করা এবং প্রাপকের নিকট বিলি করা, কিন্তু কার্যতঃ ইহার উপরে আরও অনেক কাজ প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়াছে টেলিগ্রাফের কাজ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল একজন ডিরেক্টর জেনারেলের অধীনে ডাক বিভাগ ও টেলিগ্রাফ বিভাগ একত্রিত হইয়াছে। ডাক ও তার বিভাগের সহিত যুক্ত হইয়াছে টেলিফোন এবং বেতারের কার্যও। এই সকল ছাড়াও ডাকঘরের আরও কতকগুলি কাজ করিতে হয়: যেমন— ভি. পি. পার্সেল, মনি-অর্ডার, ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার, সেভিংস ব্যাঙ্ক, মিয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট, জীবনবীমা প্রভৃতি।

চিঠি প্রাপকের নিকট দ্রুত পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ডাক বিভাগ সর্বদা সচেষ্ট। বর্তমান কালে এই কার্যের সহায়ক হইয়াছে অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন যান-বাহন, যেমন --আকাশযান, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি এবং বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি। ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে 'এয়ার মেল' বাদে ৬৩৪১৬৯ কিলোমিটার পথে ডাক-চলাচল হইয়াছে; ইহার মধ্যে প্রায় ১৯.৫% রেলগাড়িতে, ২৭% মোটরগাড়িতে, ৫১.৫% হরকরার সাহায্যে এবং বাকি ২% স্টীমার, নৌকা, ঘোড়া, উট এবং এক্কা প্রভৃতির সহায়তায়। 'এয়ার মেলে' ডাক-চলাচল করিয়াছে ৫৮৬৮৩ কিলোমিটার।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে চিঠি ইত্যাদি সর্টিং বা বাছাই করার কিছু কিছু ব্যবস্থা ডাকঘরে প্রথম আরম্ভ হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ এবং কানপুরের মধ্যে রেলগাড়িতে এই কাজ আরম্ভ হয়। এই ডাকগাড়িকে বলা হইত 'ট্র্যাভেলিং পোস্ট অফিস', ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নাম হয় 'রেলওয়ে মেল সার্ভিস', সংক্ষেপে আর. এম. এস.। এখন বহু রেলগাড়ির সহিত 'মেল ভ্যান' সংযুক্ত হইয়াছে। ডাকঘরে ও রেলগাড়িতে চিঠি সর্টিং হওয়ার জন্য উহার চলাচল দ্রুততর হইয়াছে।

গন্তব্য ডাকঘরে চিঠি পৌঁছাইলে বিশেষ ডাকপিয়ন দিয়া প্রাপকের নিকট বিলি করার ব্যবস্থাকে বলা হয় 'এক্সপ্রেস ডেলিভারি', ১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রবর্তিত হয়। তখন ইহার জন্য মাশুল ছিল দুই আনা। পরে ইহা বন্ধ হইলেও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

পৃথিবীর মধ্যে ভারত সর্বপ্রথম চিঠি বহনের জন্য আকাশযান ব্যবহার করিয়াছে; ইহা হইয়াছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ ও নৈনি জংশনের মধ্যে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আকাশযানে প্রথম নিয়মিত ডাক-চলাচল আরম্ভ হয় বোম্বাই ও করাচির মধ্যে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের আভ্যন্তরিক প্রথম শ্রেণীর ডাক অর্থাৎ পোস্টকার্ড, খাম ইত্যাদি রাত্রিকালে আকাশযানে কতকগুলি জায়গার মধ্যে চলাচল করে এবং পরবর্তী বৎসরে এইসব ডাকের জন্য আকাশযানের অতিরিক্ত মাশুল রহিত করা হয়।

বোম্বাই ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সাপ্তাহিক ডাক-চলাচলের উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পেনিনসুলার ও ওরিয়েন্টাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির সহিত ১২ বৎসরের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। পরবর্তী বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ডাক-বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে আকাশযানে ডাক-যাতায়াতের ব্যবস্থা হয় এবং ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত প্রথম শ্রেণীর ডাক বিভিন্ন দেশে আকাশযানে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। শেষোক্ত সুবিধা পরে ডাকঘরের অন্যান্য জিনিসের জন্যও দেওয়া হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারত 'বিশ্ব-ডাকসংস্থা'র (ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন) সভ্য হয়। এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভারত সর্বপ্রথম ইহার সভ্য হয়।

কোনও কারণে প্রাপকের নিকট চিঠি বিলি করা সম্ভব না হইলে বা প্রেরকের নিকট ফেরত পাঠানোও সম্ভব না হইলে উহা যায় 'ডেড্ লেটার' বা অচল চিঠির অফিসে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অচল চিঠির অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অফিসে প্রাপকের নিকট সম্ভব না হইলে প্রেরকের নিকট অচল চিঠি ইত্যাদি প্রেরণ করার চেষ্টা করা হয়।

বিভিন্ন মূল্যের সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐগুলির উপরে ছাপা হয় 'ইণ্ডিয়া' (India) কথাটি। এই বৎসর জনসাধারণ অর্ধ আনা ডাকটিকিটে একটি চিঠি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পাঠাইতে প্রথম সুযোগ লাভ করিল। ১৮৫৫ হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাকটিকিটে 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' এই কথাগুলি ছাপা থাকিত। কেবল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ছয়-আনা টিকিটে শুধু 'পোস্টেজ' কথাটি ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' কথা দুইটির প্রচলন আরম্ভ হয়— ইহা এখনও চলিতেছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এক পয়সার ডাকটিকিট প্রথম প্রচলিত হয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে টেলিগ্রামের জন্য পৃথক টেলিগ্রাফ-

টিকিটের প্রচলন বন্ধ হইয়া ডাকটিকিটই টেলিগ্রামের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ২, ৩, ৪, ৬, ৮ ও ১২ আনা মূল্যের ডাকটিকিট 'এয়ার মেল'-এর জন্য প্রচলন হয়। কমন্‌ওয়েল্‌থ দেশগুলির মধ্যে ভারত সর্বপ্রথম এইরূপ বিশেষ ধরনের টিকিট 'এয়ার মেল'-এর জন্য প্রকাশিত করিল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইবার পরে ডাকটিকিটের নকশা ও রঙ-এর পরিবর্তন হইয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও প্রসিদ্ধ ভারতীয়গণের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহাদের চিত্রসহ বহু রকমের ডাকটিকিট প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের দেশে পোস্টকার্ডের প্রথম প্রচলন হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। উহার মূল্য ছিল এক পয়সা।

বাঁকে ও কাঁধে ঝুলাইয়া পার্সেল বহন করা হইত, তজ্জন্য ইহাকে বলা হইত 'ভাঙ্গি'। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে জনসাধারণ পুলিন্দা বা ভারী চিঠি ভাঙ্গি-ডাকে প্রেরণের অনুমতি পায়. ইহার মাশুল নির্ধারিত হইত ওজন ও দূরত্বের উপরে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কেবল ওজনের উপরে মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভারত আন্তর্জাতিক পার্সেল পোস্ট ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার ফলে পৃথিবীর যে কোনও দেশের সহিত পার্সেল-চলাচলের সুবিধা হয়।

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভি. পি পার্সেল অর্থাৎ 'ভ্যালু পেয়েব্‌ল পার্সেল' প্রচলিত হয়। ইহাতে বিক্রেতা ডাকঘরের মারফৎ অন্যত্র পণ্য পাঠাইয়া ইহার মাধ্যমে তাঁহার পণ্যের মূল্য পাইতে পারেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি হইতে মনি-অর্ডারের কাজ সরকারি ট্রেজারি হইতে ডাকঘরে প্রদত্ত হয় এবং ঐ একই তারিখে বিদেশে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থাও হয়।

অল্প টাকা মনি-অর্ডারের পরিবর্তে 'ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে' পাঠাইবার ব্যবস্থা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল হইতে প্রবর্তিত হয়। ইহা ডাকঘরের একপ্রকার চেকের মত এবং চেকের মত 'ক্রস' করিয়া দেওয়া যায়। ইহা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহর ছাড়া বহু জায়গায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ প্রথম আরম্ভ হয়। বর্তমানে ডাকঘরে কয়েক রকমের মেয়াদী আমানতে টাকা রাখার এবং জীবনবীমার ব্যবস্থা আছে।

দ্র নরেন্দ্রনাথ রায়, ডাকের কাহিনী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১১৪, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, Zia-ud-din Barani, *Tarikh-i-Firuz Shahi*; Mahdi Husain, tr.; *The Rehla of Ibn Battuta, India, Maldive Island & Ceylon*, Baroda, 1953; K. R Quanungo, *Sher Shah*, Calcutta, 1921; Geoffrey Clarke, *The Post office of India and Its Story*, London, 1921; Mulk Raj Anand, *Story of the Indian Post Office*, New Delhi, 1954.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

ডাকটিকিট ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন পোস্টমাস্টার জেনারেল স্যর রোনাল্‌ড হিল জগতের প্রথম ১ পেনি ও ২ পেন্স মূল্যের ডাকটিকিট প্রস্তুত করিয়া ডাকঘরে বিক্রয়ার্থে বাহির করেন। পৃথিবীর এই প্রথম ডাকটিকিট 'পেনি ব্ল্যাক' ও 'টু'পেন্স ব্লু' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রথম প্রচলিত ডাকটিকিট কাঁচি দিয়া কাটিয়া ব্যবহার করিতে হইত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সংবাদ্ আর্চার টিকিটের চার পাশে ছিদ্র করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তদবধি পৃথিবীর সকল দেশের ডাকটিকিটে এই প্রকার ছিদ্র করা হয়। টিকিট জাল করিবার বিঘ্নস্বরূপ প্রত্যেক ডাকটিকিটের ভিতরে জলছাপ দিবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত কাগজের ব্যবহার প্রথম হইতেই করা হইতেছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাকবিভাগ প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন করেন। ভারতের প্রথম ডাকটিকিট কলিকাতার তদানীন্তন সার্ভেয়র জেনারেল মেজর থুলিয়ার লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে প্রস্তুত করেন। প্রথম দিকে ভারতীয় ডাকটিকিটের চারি পার্শ্বে সারিবদ্ধ ছিদ্র ছিল না এবং টিকিটের পশ্চাতে আঠা দেওয়া হইত না। উত্তরকালে ভারতের ডাকটিকিটে ছিদ্র এবং আঠার ব্যবস্থা করিয়া টিকিট ব্যবহারের উপায় সহজ করা হয়। বর্তমানে ভারত এবং অন্যান্য দেশের ডাকটিকিট ফোটোগ্রাভুর পদ্ধতিতে ছাপা হইতেছে। ভারতে নাসিক শহরে 'ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেস' নামক একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে সরকারি তত্ত্বাবধানে ডাকটিকিট ও কারেন্সি নোট ছাপা হয়।

ডাকটিকিট-সংগ্রহ বর্তমানে একটি বহু-প্রচলিত শখ, ইংরেজীতে ইহাকে 'ফিলাটেলি' বলা হয়। নানা দেশের পুরাতন এবং নূতন, ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত ডাকটিকিট কোটিপতি হইতে বালকেরা পর্যন্ত আগ্রহ-সহকারে সংগ্রহ করে এবং অ্যাল্‌বামে রক্ষা করে। পুরাতন ডাকটিকিট, বিশেষতঃ গত শতকের ডাকটিকিট বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এবং বিশেষ মূল্যবান।

ডাকটিকিটে প্রথমতঃ দেশের রাজা বা প্রেসিডেন্টের

প্রতিকৃতি ছাপা হইত। পরে দেশসমূহের নিসর্গ দৃশ্য, ঐতিহাসিক স্থাপত্যের দৃশ্য; দেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি ও নেতাগণের ছবি, দেশজ জীবজন্তু, ফুল, ফল ইত্যাদির ছবি মুদ্রিত হইতে থাকে। সহজে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এই পন্থা সর্বদেশের ডাক বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত হইতেছে। 'ডাক' দ্র।

দ্র Stanley Philips, *Stamp Collecting* New York, 1932; Hausberg, *Lithographed Stamps of India*; T Bagchee, 'Postage Stamps of India and Nepal', *Journal of the Royal Philatelic Society*, vol. 98.

তারাদাস বাকচী

ডাকিনী ডাক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। 'ডাক' মানে মন্ত্রসিদ্ধ গুণী পুরুষ, বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'ডাকার্ণব' গ্রন্থ নামে এবং 'ডাকের (বা ডাকপুরুষের) বচন' ছড়া নামে এই শব্দের প্রাচীন অর্থ রহিয়া গিয়াছে। ডাক শব্দটি 'ডঙ্ক' রূপেও পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতে সাপের রোজাকে 'সর্পক্ষত ডঙ্ক' বলা হইয়াছে। ডাক শব্দ এখন অপ্রচলিত তবে ডাকিনী শব্দ (তদ্ভব 'ডাইনী') মন্ত্রসিদ্ধ দৃষ্টিবিষ বৃদ্ধা গুণিনীর অর্থে এখনও প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্রে ডাকিনী শক্তিদেবীর এক বিশিষ্ট যোগিনী সহচরী। ইহার সঙ্গে আছেন হাকিনী, শাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী। 'হাকিনী' ডাক-শব্দমাত্র মনে করিয়া ডাকিনীর সাদৃশ্যে গড়া হইতে পারে। 'শাকিনী'র রূপান্তর 'শঙ্খিনী', শক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। 'রাকিনী'র পরিচিত রূপ 'রঙ্কিনী' অর্থাৎ চামুণ্ডা ('রঙ্ক' মানে ক্ষুধাতুর দরিদ্র)। এখন ডাকিনী যেমন ডাইনী হইয়াছে, শাকিনী তেমনই হইয়াছে 'শাকচুন্নি'। দুইই বিশেষ করিয়া শিশুর অরিষ্ট। 'ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিত্তে ডরে নাম থুইল নিমাই' (চৈতন্যচরিতামৃত)। বৌদ্ধতন্ত্রে ডাক ও ডাকিনী সাধারণ অর্থে যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-কুষ্মাণ্ড-অপস্মার ইত্যাদি অপদেবতার সঙ্গে উল্লিখিত আছে। বিশেষ অর্থ পাই 'বজ্র-ডাকিনী' শব্দে।

দ্র গায়কবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, সাধনমালা।

সুকুমার সেন

ডাগর ধ্রুপদ দ্র

ডান, জন (১৫৭২-১৬৩১ খ্রী) খ্যাতনামা ইংরেজ কবি। পরিবারের অন্যান্যদের মত ডানও প্রথম জীবনে গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন, পরে প্রটেস্ট্যাণ্ট-মতাবলম্বী হন। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে শিক্ষালাভের পর তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। আর্ল অফ এসেক্সের সঙ্গে তিনি ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কাদিস্-অভিযানে অংশ লইয়াছিলেন। ডান লর্ড কীপার স্যর টমাস এজার্টনের সচিব নিযুক্ত হন, কিন্তু মনিবের নিকট-আত্মীয়া অ্যান মোরকে গোপনে বিবাহ করায় তাঁহার চাকুরি যায়। দুঃখ-দারিদ্র্যভোগের পর তিনি ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন এবং গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সেণ্ট পল্‌স গির্জার ডীনপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এলিজাবেথ ড্রারির স্মৃতিতে রচিত দুইটি শোকগাথা (অ্যানিভার্সারিজ) ছাড়া প্রায় সমস্ত পদ্য ও গদ্য রচনাই তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ড্রাইডেন ও পরে জনসন ডানের কাব্যকে 'মেটাফিজিক্যাল' নামে অভিহিত করেন। তাঁহার কাব্যে আবেগ, বাক্‌চাতুর্য বা 'উইট', শ্লেষ, প্রগল্‌ভতা ও কথ্যরীতির সহিত উচ্চ ভাব, বৈদগ্ধ্য, মননশীল যুক্তি ও দার্শনিকতার যে অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায় উহাই 'মেটাফিজিক্যাল' কাব্য-ধারার বৈশিষ্ট্য। তৎকালে প্রচলিত পেত্রার্কীয় পদ-লালিত্যের পরিবর্তে ডানের কাব্যে এক ধরনের অমসৃণ দুরূহতা লক্ষ্য করা যায়। ডান নিজেই লিখিয়াছেন, 'কুহকিনী সাইরেনদের মত মনোমোহন গান আমি গাই না, আমার সংগীত কর্কশ।' তাঁহার ৫৫টি কবিতার সমষ্টি 'সংস্ অ্যাণ্ড সনেট্‌স'-এ বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম-অপ্রেম, তোষণ তাচ্ছিল্য, কৌতূহল-ঔদাসীন্য এবং খ্রীষ্টীয় জীবনবেদ ও পেগান ভোগবাদের অদ্ভুত সহ-অবস্থান দেখা যায়। 'কন্‌সিট' নামক অলংকার (যেমন প্রেমিক ও প্রেমিকাকে কম্পাসের দুই কাঁটার সহিত প্রসারিত তুলনা এবং নাটকীয় ক্ষিপ্রতা ও অস্থিরতা ডানের 'মেটাফিজিক্যাল' কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অসম্পূর্ণ দীর্ঘ কাব্য, 'প্রোগ্রেস অফ দি সোল' জন্মান্তরবাদ-অবলম্বনে রচিত। গদ্যে লেখা তাঁহার ধর্মীয় ভাষণগুলিও অনবদ্য। প্রেম ও শ্লেষমূলক কবিতার তুলনায় তৎপ্রণীত ধর্মমূলক কবিতার সংখ্যা অনেক কম। দুইটি উৎসর্গ-কবিতা বাদ দিলে ডানের 'পূত' সনেটের (হোলি সনেট্‌স) সংখ্যা ২৬, শ্রীমতী হার্বার্টকে উৎসর্গীকৃত সনেটটি শেক্সপীয়রীয় রীতিতে লেখা, বাকি সবগুলি পেত্রার্কীয়। বিংশ শতকে এলিয়ট-প্রমুখ আধুনিক কবি নিজেদের ডানের অনুবর্তী বা 'নব্য মেটাফিজিক্যাল' বলিয়া ঘোষণা করেন, বস্তুতঃ আধুনিক কাব্য-আন্দোলনে ডান সমধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের নামাবলীতেও রবীন্দ্রনাথ ডানের নাম

ডাফ, আলেক্‌জাণ্ডার

চিরকালের জন্য মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন (রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত 'শেষের কবিতা' দ্র)

দ্র E. Gosse, *The Life and Letters of John Donne*, London, 1899 ; H. J. C. Grierson, *The Poems of John Donne*, Oxford, 1912 ; H J. C. Grierson, *Metaphysical Lyrics & Poems of the 17th Century*, Oxford, 1921 ; T S. Eliot, *Selected Essays*, London, 1932 ; Joan Bennett, *Four Metaphysical Poets*, Cambridge, 1934 , R. E Bennett, *The Complete Poems of John Donne*, Chicago, 1942 ; J. B. Leishman, *The Monarch of Wit*, London, 1951 ; Helen Gardner, *The Divine Poems*, Oxford, 1952 ; T Redpath, *The Songs and Sonnets of John Donne*, London, 1956 ; Helen Gardner, *The Metaphysical Poets*, London, 1957.

সুনীল চক্রবর্তী

ডাফ, আলেক্‌জাণ্ডার (১৮০৬-৭৮ খ্রী) স্কটল্যাণ্ডীয় খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষাব্রতী। সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাফ খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হন এবং জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি অফ দি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের উপরোধে ভারতে তাঁহাদের প্রথম মিশনারির পদ গ্রহণ করিয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ঐ বৎসর ১৩ জুলাই তারিখে রাজা রামমোহন রায়ের আনুকূল্যে ফিরিঙ্গি কমল বসুর লোয়ার চিৎপুর রোডে অবস্থিত বাড়িতে ডাফ একটি ইংরেজী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে বাইবেল পাঠ আবশ্যিক করা হয়। ইহার কলেজ বিভাগ দ্রুত প্রসারলাভ করে এবং ইহা জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) নামে আখ্যাত হয়। ভারতে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার, খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার এবং ভারতীয়গণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদান, এই তিনটি ছিল ডাফ-এর উদ্দেশ্য। তাঁহার দ্বারা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

১৮৩৪-৪০ খ্রীষ্টাব্দকাল ডাফ বিলাতে অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে তিনি বহু বিতর্কমূলক বক্তৃতা দেন। এইগুলি 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া মিশনস' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় (১৮৪০ খ্রী)। ডাফ-এর হিন্দু ধর্ম-ব্যাখ্যার খণ্ডনার্থে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বেদান্তিক ডক্‌ট্রিনস ভিণ্ডিকেটেড' গ্রন্থটি লেখেন (১৮৪৫ খ্রী)। ডাফ লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের 'অ্যাংলিসিস্ট' (ইংরেজী-পন্থী) শিক্ষানীতির প্রবল অনুরাগী ছিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড 'ওরিয়েণ্টালিস্ট' (প্রাচ্যপন্থী)-দের সহিত আপসের চেষ্টা করিলে তাহার প্রতিবাদে ডাফ অক্‌ল্যাণ্ডকে অনেকগুলি পত্র লেখেন। এইগুলি 'ক্রিশ্চিয়ান অব্‌জার্ভার' কাগজে প্রকাশিত হয় (১৮৪১ খ্রী)। ডাফ এই পত্রিকার একজন পরিচালক ও লেখক ছিলেন।

স্কটল্যাণ্ডে খ্রীষ্টানমণ্ডলীর মধ্যে বিভেদ (১৮৪৩ খ্রী) উপস্থিত হইলে এক অংশ ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড গঠন করেন। ডাফ এই শাখাভুক্ত হইয়া তাঁহার পূর্বতন বিদ্যালয়ের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউশন' (পরে ডাফ কলেজ নামে অভিহিত) নামক এক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতার বাহিরেও ডাফ কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (টাকি—১৮৩২ খ্রী, বাঁশবেড়িয়া – ১৮৪৮ খ্রী)।

১৮৪৫ হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাফ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার কার্যভার বহন করেন। এই পত্রিকায় তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮৫০-৫৪ বৎসর চতুষ্টয় ডাফ বিলাতে ও আমেরিকায় কাটান। ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক তাঁহাকে এল এল ডি. এবং এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. ডি. উপাধি দেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' ডাফের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি (১৮৫৭ খ্রী) ডাফ অন্যতম সদস্যরূপে ইহার কার্যকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতত্যাগের (১৮৬৩ খ্রী) প্রাক্‌কালে তিনি ইহার ভাইস-চ্যান্সেলার হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু এই পদ গ্রহণ করেন নাই। ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেথুন সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। মহাবিদ্রোহকালে (১৮৫৭ খ্রী) ডাফ ইহার কারণ ও ফলাফলসম্পর্কে বিলাতের পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্র প্রকাশিত করেন। অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্গঠনকল্পে লর্ড ক্যানিং ডাফের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যায় পাঠান। নীল-আন্দোলনের সময় ডাফ প্রজাকুলের পক্ষে দাঁড়ান।

দ্র মন্মথনাথ ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ , যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ , যোগেশচন্দ্র বাগল, বেথুন সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৬১ , George Smith, *The Life of Alexander Duff*, vols I-II, London, 1879.

যোগেশচন্দ্র বাগল

ডাফরিন, লর্ড (১৮২৬-১৯০২ খ্রী) আইরিশ লর্ড প্রাইস ব্ল্যাকউডের পুত্র ফ্রেডরিক টেম্পল হ্যামিল্টন-টেম্পল-ব্ল্যাকউড ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি ব্যারন ডাফরিন হন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় তিনি যথাক্রমে ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারি (১৮৬৪-৬৬ খ্রী), সমর বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারি (১৮৬৬ খ্রী) এবং ক্যাবিনেটের বাহিরে মন্ত্রী (১৮৬৮-৭২ খ্রী) ছিলেন। ইহার পর তিনি ছিলেন ক্যানাডার গভর্নর-জেনারেল (১৮৭২-৭৮ খ্রী), সেন্ট পিটার্সবার্গে রাজদূত (১৮৭৯-৮১ খ্রী), কনস্টান্টিনোপলে রাজদূত (১৮৮১ খ্রী) এবং কায়রোয় ব্রিটিশ কমিশনার (১৮৮২-৮৩ খ্রী)। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর্ল অফ ডাফরিন হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের পর ডাফরিন ভারতের ভাইসরয় হন। ঐ সময়ে আফগান-সীমান্তে রাশিয়ার প্রসারশীলতা লইয়া ব্রিটিশ সরকার ও রাশিয়ার মধ্যে গুরুতর বিবাদ চলিতেছিল এবং পঞ্জদেহ্ ঘটনার (১৮৮৫ খ্রী) ফলে অবস্থা চরমে পৌছায়। ডাফরিন আফগানিস্তানের আমীর আবদুর রহমানকে রাওয়ালপিণ্ডির দরবারে অভ্যর্থনা করেন। অবশেষে একটি যুক্ত ইঙ্গ-রুশ কমিশন কর্তৃক আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমা নির্ধারিত হওয়ায় ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ইহার পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরেজগণ সহজেই উত্তর ব্রহ্ম দখল করেন ও ব্রহ্মের রাজা থিব ভারতের রত্নগিরিতে নির্বাসিত হন। ডাফরিনের শাসনকালে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথমে ডাফরিন ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সভ্যদের কলিকাতার বাগানবাড়িতে একটি প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু পরে তাঁহার মত-পরিবর্তন হয় ও কর্মত্যাগের পর বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে সেন্ট অ্যাণ্ড্রুজ ভোজে তিনি কংগ্রেসের কর্মপন্থাসম্বন্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। বিলাতে প্রত্যাগমনের পর তিনি মার্কুইস অফ ডাফরিন অ্যাণ্ড আভা হন। ইহার পর তিনি যথাক্রমে রোমে (১৮৮৮ খ্রী) এবং প্যারীতে (১৮৯২ খ্রী) রাজদূত নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র H. H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India*, vol. VI, Cambridge, 1932; R. C. Majumdar, ed., *The History & Culture of the Indian People*, vol. IX, Bombay, 1963.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ডাম্পিং শুল্কনীতি দ্র

ডায়াজেনেসিস জলের নীচে স্তরে স্তরে পলল সঞ্চিত হইবার পরে তাহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তনের ফলে উহা কঠিন শিলায় পরিণত হয়, তাহাকে ডায়াজেনেসিস আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উচ্চ তাপ বা চাপের বশেও শিলার যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাকে ঐ আখ্যা দেওয়া হয় না। ডায়াজেনেসিসের কয়েকটি প্রকারভেদ বা দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল।

স্তরীভূত পললের মধ্যে জলতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু থাকে। পললের আদি উপাদানের কণাগুলি বা দানার মধ্যে এই সকল জীব জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া চলে। ফলে দানাগুলির মধ্যে নূতন বন্ধন নির্মিত হইতে পারে। উপরন্তু পললের সহিত সংপৃক্ত জলে নানাবিধ পদার্থ দ্রবীভূত বা কলয়ডীয় অবস্থায় মিশিয়া থাকে। এই সকল পদার্থ পললের দানাগুলিকে আশ্রয় করিয়া, অথবা ঐ দানার মধ্যে অবস্থিত শূন্য স্থানে স্বতন্ত্রভাবে দৃঢ় (সলিডিফায়েড) হইয়া পললের খণ্ডগুলিকে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। কখনও কখনও জলে দ্রবীভূত পদার্থ এবং পললের উপাদানের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া সমগ্র শিলার বর্ণ, রূপ, গ্রথন বা বন্ধন নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে। 'শিলা' দ্র।

দ্র W. H. Twenhofel, *Principles of Sedimentation*, London, 1950.

সত্যময় মুখোপাধ্যায়

ডায়াবিটিস মধুমেহ দ্র

ডায়ার্কি মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার দ্র

ডারউইন, চার্লস (১৮০৯-৮২ খ্রী) ইংরেজ নিসর্গবিদ্ ও দার্শনিক। জীবনের রহস্যসম্পর্কে তাঁহার বিশ্লেষণ সৃষ্টির মূল নিয়মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পিতামহ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও লেখক এরাসমাস ডারউইনের প্রভাবের ফলে প্রকৃতিসম্বন্ধে তাঁহার গভীর আগ্রহের সঞ্চার হয়। 'বিগ্‌ল' নামক একটি ভ্রাম্যমাণ জাহাজে অবৈতনিক নিসর্গবিদ্‌রূপে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার নিকটবর্তী গালাপাগস প্রভৃতি নানা আগ্নেয়গিরি সঞ্জাত দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া চার্লস ডারউইন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আরও ২০ বৎসর পঠন পাঠন, মনন ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

বহু জীবাশ্ম (ফসিল) পরীক্ষার পর তিনি অভিব্যক্তিবাদ (থিওরি অফ ইভলিউশন) নামে এক মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে, জগতে প্রত্যেক স্থানের প্রাণী বা উদ্ভিদ অভিযোজনের ফলে স্থানোপযোগী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া বিবিধ প্রজাতির উৎপত্তি হয়। স্থান ও খাদ্যের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রতিনিয়ত নির্মম এক সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়, এই জীবন-সংগ্রামের অন্য নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন (ন্যাচরল সিলেকশন)। সেই সংগ্রামে যোগ্যতমের জয় ও অযোগ্যের পতন হয়, অর্থাৎ অভিযোজন ক্ষমতার গুণ বা দোষের উপর কোনও প্রজাতির অস্তিত্ব বা বিলুপ্তি নির্ভর করে।

ডারউইনের উপরি-উক্ত অভিব্যক্তিবাদ ওয়ালেস নামক অপর এক ইংরেজ নিসর্গবিদের সহিত যুগ্ম নামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডারউইন তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'দি অরিজিন অফ স্পিসিজ' প্রকাশ করিয়া এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদ ইওরোপে সেদিন নানা বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি করে এবং জনমানসে তাহার স্থান পাইতে অনেক সময় লাগিয়া যায়। আজ ডারউইনের মতবাদ অনেক পরিবর্তিত হইয়া এবং বলিষ্ঠতর আকার ধারণ করিয়া নব্য ডারউইনবাদ রূপে গৃহীত হইয়াছে।

ডারউইন ব্যক্তিগত জীবনে নম্র ও অমায়িক ছিলেন। আজীবন তিনি প্রকৃতির আরাধনা করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে অভিব্যক্তিবাদ-সম্পর্কিত বইগুলি সমধিক খ্যাত। ডারউইনের বিরচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক : 'দি অরিজিন অফ স্পিসিজ' (১৮৫৯ খ্রী), 'ফার্টিলাইজেশন অফ অর্কিডস' (১৮৬২ খ্রী), 'ভেরিয়েশন অফ প্লান্টস অ্যাণ্ড অ্যানিম্যালস আফটার ডোমেস্টিকেশন' (১৮৬৭ খ্রী), 'ডিসেন্ট অফ ম্যান' (১৮৭১ খ্রী) এবং 'ফর্মেশন অফ ভেজিটেবল মোল্ড থ্রু দি অ্যাকশন অফ ওয়র্মস' (১৮৮১ খ্রী)। 'অভিব্যক্তিবাদ' দ্র।

দ্র W. A Locy, *Biology and its Makers*, New York, 1935, T. H. Huxley & J. Huxley, *Evolution and Ethics*, London, 1947; G. Grigson & C H. Gibbs-Smith, ed, *People, Places, Things*, vol. I, London, 1954, S A Barnett, ed, *A Century of Darwin*, London, 1958.

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

ডাল কৃষিজাত সকলপ্রকার ডালই শিম্ব গোত্রের (ফ্যামিলি-লেগুমিনোসী, Family-Leguminosae) অন্তর্গত। সমগোত্রীয় অন্যান্য উদ্ভিদের মত ইহারা বায়ুর নাইট্রোজেনকে মূলের অর্বুদের সাহায্যে ধরিয়া রাখিতে পারে, এই নাইট্রোজেনের দ্বারা মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়। এ কারণে মাটিকে উর্বরা করিতে শিম্ব গোত্রের ফসল চাষ করা হয়।

ভারতে ডাল শস্যের বার্ষিক চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ১৩৮ লক্ষ হেক্টর এবং গড় বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ১২৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ভারতে প্রধান প্রধান কয়েকটি ডাল-উৎপাদনের হিসাব নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল।

অড়হর : বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, অবশ্য বর্ষজীবী ডাল শস্য হিসাবেই ভারতের প্রায় সর্বত্র চাষ করা হয়। বিজ্ঞানসম্মত নাম কাযানস কাযান (*Cajanus cajan*)। শুখা সহ্য করিতে পারে এবং অনুর্বর জমিতে চাষ করা যায়, জল-বসা এবং তুহিন সহ্য করিতে পারে না। গভীর মূল মাটির উন্নয়ন করে এবং ক্ষয়রোধ করে। শুষ্ক এবং আদ্র

ভারতে ডাল উৎপাদনের হিসাব

ডাল	বার্ষিক চাষের জমির পরিমাণ হেক্টর	বার্ষিক গড় ফলন মেট্রিক টন	হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ (একক চাষে) কিলোগ্রাম	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (একক চাষে) কিলোগ্রাম
অড়হর	২৫০০০০০	১৮৯০০০০	৪½-৫½	৬০০
খেসারি	২০০০০০০	৯৬০০০০	৩৫-৪০	৩৫০-৪০০
মটর	১১২০০০০	৯০০০০০	৬০-৯০	১১০০
মসুর	৮৪০০০০	৪০০০০০	২৮-৫৬	৪৫০-৫৬০
মাষকলাই	২০৯০০০০	৬৯০০০০	৯-১৩½	৫৬০-৮০০
মুগ	১৯০০০০০	৫৯০০০০	১১-২৮	৫৬০-৬৭০

উভয় আবহাওয়াতেই ডাল জন্মায় কিন্তু শুষ্ক অঞ্চলে সেচের প্রয়োজন হয়। ফুল ফোটা ও ফল পাকার সময়ে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকিলে প্রচুর ফলনে সহায়তা হয়। চুনের অভাব নাই, এমন সকলপ্রকার জমিতেই চাষ করা চলে। জলনিকাশের সুব্যবস্থা আছে এমন হালকা বা মাঝারি মাটি চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। একবার চষিয়া ও ২-৩ বার বিদা দিয়া জমি মোটামুটি তৈয়ারি করা হয়। জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, তুলা, চীনাবাদাম ইত্যাদি খরিফ ফসলের সঙ্গে অড়হরের মিশ্র চাষ করা হয়। খরিফে বর্ষার শুরুতে আষাঢ় মাস হইতে চাষ আরম্ভ হয়। ছিটাইয়া এবং সারিতে— উভয়ভাবেই বপন করা হয়, বর্তমানে সারিতে বোনাই বেশি প্রচলিত। আশ্বিন হইতে শুরু করিয়া ২।৩ মাস ধরিয়া ফুল ফোটে। জলদি জাতের ফসল ৬ মাসে এবং নাবি জাতের ফসল ৮½ মাসে পাকে। যখন যেমন পাকে, তেমনই শুঁটি তোলা হয় এবং অবশেষে সমস্ত পাতা শুখাইয়া গেলে গাছ কাটা হয়। অতঃপর কয়েকদিন শুখাইয়া গাছ জোরে ঝাঁকাইয়া শুঁটি মাটিতে ফেলিয়া পিটাইয়া দানা পৃথক করা হয়। ডাল ফলনের জন্য 'পশ্চিম বাংলা ১নং' অড়হর উল্লেখযোগ্য।

খেসারি বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম লাথিরস সাতীভস (*Lathyrus sativus*)। স্বল্পবিত্তদের আহার্য ডাল, পশুখাদ্য হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। পূর্বে ল্যাথ্যরিজম্‌-নামক নিম্নাঙ্গ অবশ হইবার মারাত্মক রোগটিকে খেসারির ডালের প্রভাব বলিয়া মনে করা হইত, বর্তমানে জানা গিয়াছে যে খেসারির সহিত একত্রে উৎপন্ন আকটা (ভিসিয়া সাতীভা, *Vicia sativa*) নামক আগাছার বিষাক্ত উপক্ষারই এ রোগের কারণ। নিচু, জলধারণক্ষম, মেটেল বা এঁটেল মাটিতে ধানের পরে অতিরিক্ত শস্য হিসাবে খেসারির চাষ করা হয়। ধান কাটার আগেই ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছিটাইয়া বীজ বপন করা হয়। ধান কাটার পর দুই-একবার হাত নিড়ানি দেওয়া যায়, এ সময়েই আকটা আগাছাগুলি অবশ্যই তুলিয়া ফেলিতে হয়। ফাল্গুনে ফসল কাটিয়া এক সপ্তাহ শুখাইয়া বলদ দিয়া মাড়াই করা হয়।

মটর : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ছোট বা পায়রা মটর মাঠের ফসল, বড় বা কাবুলি মটর বাগিচার ফসল। পায়রা ও কাবুলি মটর পীসম গণের (Genus-Pisum) অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির অন্তর্গত। মতান্তরে, ছোট ও বড় মটর পীসম সাতীভম (*Pisum sativum*) প্রজাতির অন্তর্গত দুইটি উপ-প্রজাতির উদ্ভিদ, বড় মটর সাতীভম এবং ছোট মটর স্পেসিওসম (*speciosum*)। বড় মটরের ফুল শাদা এবং বীজ গোল বা কুঞ্চিত ও শাদা, সবুজ বা হরিদ্রাভ বর্ণের। ছোট মটরের ফুল নীলাভ বা বেগুনি, বীজ ছোট মার্বেলের মত এবং ছোপছোপ ও প্রায়ই ধূসর-বর্ণ। শুঁটি ৫-১০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং তাহার মধ্যে ৬-৮টি বীজ থাকে। সবুজ অবস্থায় দানা পুষ্ট হইলে কাঁচা মটর-শুঁটি বা কড়াইশুঁটি খাওয়া হয়। পৃথিবীর সর্বত্র মটর-দানা এ অবস্থায় সংরক্ষিত করিয়া সমস্ত বৎসর ব্যবহার করা হয়। সমতল ভূমিতে রবিশস্য হিসাবে এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে (লদাখ পর্যন্ত) খরিফ শস্য হিসাবে চাষ করা হয়। ছোট মটর দো-আঁশ বা মেটেল জমিতে এবং বড় মটর হালকা দো-আঁশ হইতে ভারী মেটেল পর্যন্ত সকল প্রকার মাটিতেই চাষ করা যায়। পলিপড়া জমিতে জল সরিবার পর অথবা আউশ ধান কাটিয়া কিংবা ধানের মধ্যেই বীজ ছিটাইয়া বপন করা হয়। মাটি ভালভাবে তৈয়ারি করা প্রয়োজন। সুপার ফসফেট সার প্রয়োগে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ফাল্গুনে ফসল উপড়াইয়া তুলিয়া এক সপ্তাহ শুখানোর পর বলদ দিয়া মাড়াই করা হয়। প্রধানতঃ ডাল হিসাবে এবং অংশতঃ পশুখাদ্য অথবা সবুজ সারের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

মসুর বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম লেনস কুলিনারিস (*Lens culinaris*)। বাজারে বড় দানার জাতকে মসুর ও ছোট দানার জাতকে মসুরি বলা হয়। গুরুত্বে মাষকলাই ও মুগের পরেই ইহার স্থান। উত্তর ভারতের সর্বত্র মসুরের চাষ হয় এবং মধ্য ভারতের উষ্ণ সমুদ্র-সমতল অঞ্চল হইতে লদাখের ৩৫০০ মিটার উচ্চ শীতল অঞ্চল পর্যন্ত ইহার চাষ বিস্তৃত। হালকা দো-আঁশ ও পলিজ মাটিতে চাষ ভাল হয়, নীরস নিচু জমিতে চাষ করা হয়। সামান্য ক্ষারত্বও সহ্য করিতে পারে। শীতকালে রবিশস্য হিসাবে বিনা সেচে চাষ হইয়া থাকে। নাবি ফসলে কোনও কোনও সময়ে একবার সেচ দেওয়া হয়। আশ্বিন-কার্তিক হইতে অগ্রহায়ণ-পৌষ পর্যন্ত বীজ ছিটাইয়া বা সারি দিয়া বপন করা হয়। হেক্টর প্রতি ৪৫-৫২ কিলোগ্রাম ফসফেট সারের ব্যবহারে ফলন ভাল হয়। প্রায় ৩½ মাসে ফসল পাকে। সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্বেই গাছ উপড়াইয়া এক সপ্তাহ শুখাইয়া মাড়াই করা হয়। সেচের ফসলে ফলন দ্বিগুণ হয়। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে একক চাষের তুলনায় আনুপাতিকভাবে ফলন কম হয়।

মাষকলাই বা কলাই. বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ফাসেওলস মুঙ্গো ভার রাদিয়াতস (*Phaseolus mungo var radiatus*)। ইহার খোসার রঙ সাধারণতঃ

কালো, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সবুজাভ কালো। ভারতের সর্বত্র কলাই চাষ করা হয়। সমুদ্র সমতল হইতে ১৮০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত চাষ সম্ভব। অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে উৎপন্ন ডাল সুসিদ্ধ হয়। জল-ধারণক্ষম মেটেল অথবা এঁটেল মাটি চাষের খুব উপযোগী। পলিজ দো-আঁশ বা লাল মাটিতেও চাষ ভাল হয়। প্রকৃতি মুগের মত হওয়ায় জমি তৈয়ারি, সার প্রয়োগ, বপন, ফসলতোলা প্রভৃতিও মুগের অনুরূপ। ফাল্গুনে, অথবা খরিফ শস্যের জন্য আষাঢ়ে, কিংবা রবিশস্যের জন্য কার্তিকে চাষ করাই প্রশস্ত। ফসল সাধারণতঃ ৩ মাসে পাকে। পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে নিকষ কালো মাঝারি আকারের দানার জাত ‘প ব. -৭’ বিশেষ উপযোগী। কলাই-এর ডাল উপাদেয়, সহজপাচ্য, প্রোটিন, খনিজ ও ভিটামিন-প্রধান খাদ্য। ইহার বড়ি ও পাঁপড়ও উৎকৃষ্ট। সবুজ সার হিসাবে এবং ভূমি সংরক্ষণের কাজে কলাই খুব উপযোগী। হেক্টর প্রতি খড়ের উৎপাদন দানার প্রায় ২-২½ গুণ।

মুগ: বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ফাসেওলস আউরেয়স (*Phaseolus aureus*)। সবুজ খোসাযুক্ত কলাইকে মুগ কলাই এবং ইহার মধ্যে যে জাতের খোসার রং সোনালি সবুজ তাহাকে সোনামুগ কলাই বলে। স্বাদের উৎকর্ষের জন্য সোনামুগ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ডাল। অব পার্বত্য অঞ্চলে এবং পশ্চিম হিমালয়ের প্রায় ১৮০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন ফসল হিসাবে জন্মানো হয়। ভারতে খরিফ ও রবি উভয় পর্যায়ে ইহার চাষ হয়। সকল প্রকার জমিতে চাষ সম্ভব হইলেও গভীর, জলনিকাশী, পলিজ দো-আঁশ মাটিই সর্বোৎকৃষ্ট। ফুল ফোটার পূর্বে ৬০-৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত যথেষ্ট, ফুল ফোটার পরে বৃষ্টি ক্ষতিকর। হেক্টর প্রতি ২৮ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ১১২-১৬৮ কিলোগ্রাম সুপারফসফেট সার প্রয়োগে ফলন অধিক হয়। বীজ ছিটাইয়া বপন করা হয়। প্রায় ৬০ দিনে ফুল আসে এবং ৩-৪ সপ্তাহে ফসল পাকে। পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে ‘বি-১’ সোনামুগ প্রচলিত হইয়াছে। ইহা দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ পাকিয়া যায় এবং বৈশাখের বৃষ্টিতে ইহার চাষ করিতে পারিলে আমন জমিকে দুই-ফসলী করা সম্ভব হয়। ফসল কাটিয়া এক সপ্তাহ শুকানোর পর মাড়াই করা হয়। মিশ্র ফসলে ফলন একক ফসলের অর্ধেকেরও কম। দানা ও খড়ের উৎপাদন প্রায় সমান সমান। ‘ছোলা’ দ্র।

দ্র Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966; Director of Economics & Statistics, Government of India, *Agricultural Situation in India*, Delhi, 1967; Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India: Raw Materials*, vol VIII, New Delhi (in press).

মুরারিপ্রসাদ গুহ

সম্ভবতঃ আর্য সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ডালের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ঋগ্বেদের যুগে মাষকলাই-মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণের প্রথা ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে বঙ্গ দেশে আহার্যরূপে ডালের বিশেষ প্রচলন ছিল না। পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ উত্তর ভারত হইতে ডালের ব্যবহার বঙ্গ দেশেও প্রসার লাভ করে। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত বিশেষতঃ পূর্ব বঙ্গে আহারের সময় অন্যান্য পদের পর সর্বশেষে ডাল খাইবার রীতি ছিল। বর্তমানে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ডালের যথেষ্ট প্রচলন আছে। নিরামিষভোজী দক্ষিণ ভারতীয়দের আহারে ডালই প্রোটিনের প্রধান উৎস। উত্তর ভারতে নিরামিষভোজীরা যথেষ্ট দুগ্ধজাত দ্রব্য খাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঘন ডাল হইতেও যথেষ্ট প্রোটিন লাভ করেন।

ডাল প্রোটিন-প্রধান খাদ্য। ইহাতে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭-২৮ ভাগ, ডালে প্রোটিনের অংশ গমের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ও চালের তুলনায় প্রায় তিন গুণ। বিভিন্ন ডালে প্রোটিনের শতকরা পরিমাণ এইরূপ— অড়হর ২২·৩, কলাই ২০·০, খেসারি ২০·২, ছোলা ১৭·১, মটর ১৮·৬, মসুর ২৫·১ এবং মুগ ২০·৮। ডালে যে সকল প্রোটিন বর্তমান, তাহাদের মধ্যে গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিনই প্রধান। ডালের প্রোটিনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ পাচনতন্ত্রে পরিপাকের পর রক্তে বিশোষিত হয়। কিন্তু খাদ্যমূল্যের দিক দিয়া এই প্রোটিন মাছ, মাংস, ডিম বা দুধের প্রোটিনের তুলনায় নিকৃষ্ট, কারণ ডালের বিভিন্ন প্রোটিনে কোনও কোনও অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ— খেসারি ও মসুর ডালের প্রোটিনে ট্রিপ্টোফ্যান ও মেথিওনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের এবং ছোলার প্রোটিনে ট্রিপ্টোফ্যান ও সিস্টিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব আছে। অবশ্য ডালের সহিত অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য আহার করিলে সে সকল খাদ্যের প্রোটিনের সাহায্যে ডালের প্রোটিনের ঐ ত্রুটি নিবারিত হয়।

প্রোটিন ব্যতীত ডালে যথেষ্ট কার্বোহাইড্রেট, অজৈব

লবণ ও ভিটামিন বর্তমান। বিভিন্ন ডালে কার্বোহাইড্রেটের শতকরা পরিমাণ এইরূপ— অড়হর ৫৭.২, কলাই ৫৮.৮, খেসারি ৫৮.২, ছোলা ৬১.২, মটর ৫৮.৬, মসুর ৫৯.৭ এবং মুগ ৬০.৬। ডালের কার্বোহাইড্রেট মুখ্যতঃ শ্বেতসার বা স্টার্চ, ইহা ছাড়া কিছু কিছু শর্করা, হেমিসেলুলোজ, সেলুলোজ প্রভৃতিও ডালের কার্বোহাইড্রেটের অন্তর্গত। বিভিন্ন ডালে অজৈব লবণের শতকরা পরিমাণ নিম্নরূপ— অড়হর ৩.৬, খেসারি ৩.০, ছোলা ২.৭ এবং মসুর ২.১। অজৈব লবণের উপাদানগুলির মধ্যে ক্যালশিয়াম, ফসফরাস, লৌহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, ডালে লৌহের পরিমাণ অন্যান্য খাদ্যশস্যের তুলনায় অধিক। ডালের ভিটামিনগুলির মধ্যে থিয়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, পাইরিডক্সিন, ফোলিক অ্যাসিড প্রভৃতি বি বর্গীয় ভিটামিন ও ভিটামিন এ, সি এবং ই উল্লেখযোগ্য। ডালে স্নেহপদার্থের পরিমাণ অল্প— অধিকাংশ ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ০.৬-০.৭ ভাগ মাত্র। কিন্তু ছোলার ডালে স্নেহপদার্থের পরিমাণ সে তুলনায় অনেক বেশি। বিভিন্ন ডালে স্নেহপদার্থের শতকরা পরিমাণ এইরূপ— অড়হর ১.৭, কলাই ১.৬, খেসারি ০.৬, ছোলা ৫.৩, মটর ০.৫, মসুর ০.৭ এবং মুগ ০.৫।

অঙ্কুরিত ডালে প্রোটিন, ভিটামিন এ, সি এবং ই, থিয়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন প্রভৃতি বি বর্গীয় ভিটামিন ইত্যাদির পরিমাণ ও লৌহের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায়। অঙ্কুরিত ছোলা, মসুর ও কলাই ডালে প্রোটিনের খাদ্যমূল্যও বর্ধিত হয়, কিন্তু মুগ ও মটর ডালে অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় প্রোটিনের খাদ্যমূল্যের হ্রাস ঘটে। অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় ডালে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থের পরিমাণ কমিয়া যায়, সম্ভবতঃ ঐ সময়ে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যই এ সকল খাদ্যবস্তু ব্যয় হইয়া যায়।

খেসারি ডাল নিয়মিত আহার করিলে ল্যাথিরিজ্‌ম নামক রোগ হইতে পারে। এ রোগে সুষুম্নাকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পায়ের পক্ষাঘাত হইতে পারে, ফলে চলৎশক্তি ব্যাহত হয়। রোগটির কারণ সম্বন্ধে বহু মত আছে। কেহ কেহ মনে করেন, খেসারি ডালে মেথিওনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাবই এ রোগের কারণ, কাহারও মতে, বিষাক্ত ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত ডাল হইতে দেহে ঐ ছত্রাকের সংক্রমণেই এ রোগের উদ্ভব, কোনও কোনও বিজ্ঞানী আবার এরূপ মত পোষণ করেন যে, চাষের সময় খেসারির সহিত ভিসিয়া সাতীভা প্রজাতির আগাছা জন্মাইলে ঐ আগাছার বিষাক্ত উপক্ষার হইতেই ল্যাথিরিজ্‌ম রোগ হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের যে সকল অঞ্চলে নিয়মিত খেসারি ডাল খাওয়ার প্রচলন আছে, সে সকল স্থানে এ রোগের প্রসার উল্লেখযোগ্য।

মাছ, মাংস ইত্যাদি আমিষ খাদ্যের তুলনায় ডালের মূল্য কম, সেজন্য সকল দেশেই স্বল্পবিত্তের খাদ্যে ডাল প্রোটিনের অন্যতম প্রধান সূত্র। কিছুটা ডাল হইতে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, ততখানি প্রোটিন পাইবার উপযোগী মাংস কিনিতে ডালের তুলনায় তিন গুণ ব্যয় হয়। কিছু পরিমাণ ডাল হইতে দেহে যত কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার সমপরিমাণ শক্তি উৎপাদন করিবার মত মাংস কিনিতে ব্যয় হয় ডালের চার গুণ। সেইজন্য সকল দেশেই স্বল্পবিত্ত পরিবারে উচ্চবিত্ত পরিবারের তুলনায় অধিক ডাল খাওয়া হয়। ট্রিমেবেলিং, ওয়ার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে, মাথাপিছু দৈনিক গড়ে ২৫-৩৫ গ্রাম ডালজাতীয় শস্য আহার করা উচিত, সেক্ষেত্রে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তির শতকরা ২-৪ ভাগ এরূপ শস্য হইতে মিলিতে পারে।

দ্র H. Chattopadhyay, N. Nandi & S. Banerjee, 'Studies on the effect of germination on the fat and the carbohydrate content of pulses', *The Indian Journal of Physiology and Allied Sciences*, vol IV, no 2, 1950, H. Chattopadhyay & S Banerjee, 'Effect of germination on the total tocopherol content of pulses and cereals', *Food Research*, vol 17, no. 4, 1952, H Chattopadhyay & S. Banerjee, 'Effect of germination on the biological value of proteins and trypsin-inhibitor activity of some common Indian pulses', *Indian Journal of Medical Research* vol. 41, no 2, 1953, Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India Raw materials*, vols II & VI, New Delhi, 1950 & 1962.

দেবজ্যোতি দাশ

ডালের মধ্যে মসুরি ও মাষকলাই আমিষ বলিয়া পরিগণিত। তাই ইহা নিষ্ঠাবতী বিধবারা ব্যবহার করেন না— দেবকার্যেও ইহার ব্যবহার নাই। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে মুগ খেসারির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্যে মুগের লাড়ু ব্যবহৃত হয়। হবিষ্যে ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে মুগ অন্যতম। অনেকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ভিজানো

আম্রমুগ ও অন্য শ্রাদ্ধকার্যে ভিজানো খেসারির ডাল ব্যবহার করেন— সুবচনী পূজায় ও আশ্বিনের সংক্রান্তিতে গার্সি-ব্রতের লক্ষ্মীপূজায় নৈবেদ্যে ভিজানো খেসারির ডাল দেওয়া হয়। গার্সীর ব্রতে কাঁচা বা রান্নাকরা খেসারির ডাল খাওয়ার প্রথা আছে। ডাল, বিশেষ করিয়া খেসারির ডাল, শাক-সবজি ও তরকারি দিয়া রান্না করিয়া খাওয়ার নিয়ম আছে। সাত্ত্বিক জলখাবার হিসাবে চিনি নারিকেল কোরা দিয়া মুগ-ছোলা ভিজানো খাওয়ার রীতি ছিল।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ডালচিনি, দারুচিনি মশলা দ্র

ডালিয়া গাঁদা গোত্রের (ফ্যামিলি-কোম্পোসিটী, Family-Compositae) অন্তর্ভুক্ত বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। মেক্সিকো ডালিয়ার উৎপত্তিস্থল। ইহার ফুল উদ্যানজাত ফুলসমূহের মধ্যে জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ— ইহা খুব সহজে জমিতে ও পাত্রে ভালভাবে চাস করা যায় এবং ফুল দেখিতে খুব সুন্দর। শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকালে ডালিয়া ফোটে। ফুল বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতির হয়। গাঁদা বা চন্দ্রমল্লিকা ফুলের মতই ডালিয়া ফুলও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পিকার (ফ্লোরেট) সমন্বয়ে গঠিত ('গাঁদা' ও 'চন্দ্রমল্লিকা' দ্র)। বাগানে সিঙ্গল, অ্যানেমোন, কোলারেট, পিওনি, ক্যাক্‌টাস, ডেকোরেটিভ ও পমপন জাতের ডালিয়া চাষ করা হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটি এদেশে বেশি প্রচলিত। ডালিয়া গাছ বীজ বা শাখা-কলম প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে। বীজ হইতে উৎপন্ন ডালিয়া গাছের ফুল অনেক সময় প্রজাতির প্রকৃতির অনুরূপ হয় না, শাখা-কলম হইতে উৎপন্ন ডালিয়া গাছের ফুল নিজ প্রজাতির প্রকৃতি মানিয়া চলে।

তপনকুমার বসু

ড্যানিয়েল, উইলিয়াম (১৭৬৯-১৮৩৭ খ্রী) ইংরেজ চিত্র-শিল্পী। চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতৃব্য টমাসের (১৭৪৯-১৮৪০ খ্রী) সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন। দশ বৎসর পরে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি পিতৃব্যের সহিত একযোগে 'ওরিয়েন্টাল সিনারি' (১৭৯৫-১৮০৮ খ্রী) প্রকাশে যত্নবান হন। তিনি বহু চিত্রপুস্তক প্রকাশ করেন, যেমন, 'এ পিকচারেস্ক ভয়েজ টু ইণ্ডিয়া' (১৮১০ খ্রী), 'জুওগ্রাফি' (উইলিয়াম উড-এর সহযোগিতায়), 'দি সিটি অফ লখনৌ' ইত্যাদি। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল অ্যাকাডেমিসিয়ান হন। রয়্যাল অ্যাকাডেমি ও ব্রিটিশ ইন্‌স্টিটিউটে তাঁহার ২৩২টি চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। 'ড্যানিয়েল, টমাস' দ্র।

যোগেশচন্দ্র বাগল

ড্যানিয়েল, টমাস (১৭৪৯-১৮৪০ খ্রী) ইংরেজ চিত্র-শিল্পী, নিসর্গচিত্রের জন্য বিখ্যাত। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র চিত্রকর উইলিয়ামকে (১৭৬৯-১৮৩৭ খ্রী) সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আসেন। এদেশে ১০ বৎসর ধরিয়া তিনি চিত্রাঙ্কনে রত ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত কলিকাতার দৃশ্যাবলী 'ভিউজ অফ ক্যালকাটা' নামে প্রকাশিত হয়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি ও উইলিয়াম একযোগে 'ওরিয়েন্টাল সিনারি' নামক বিখ্যাত চিত্র-পুস্তক ৬ খণ্ডে প্রকাশিত করেন (১৭৯৫-১৮০৮ খ্রী)। 'হিন্দু এক্‌স্‌কাভেশন্‌স অ্যাট এলোরা' তাঁহার আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রগ্রন্থ। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল অ্যাকাডেমি ও ব্রিটিশ ইন্‌স্টিটিউটে তাঁহার ১৩৫টি চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল অ্যাকাডেমির পূর্ণ সভ্য (রয়্যাল অ্যাকাডেমিসিয়ান) হন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। 'ড্যানিয়েল, উইলিয়াম' দ্র।

যোগেশচন্দ্র বাগল

ড্যাল্‌হৌসি ৩২°৩২´ উত্তর ও ৭৫°৫৮´ পূর্বে অবস্থিত হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার একটি শৈলাবাস। পাঠানকোট হইতে ইহার দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল)। ড্যাল্‌হৌসি ধওলাধর পর্বতের ঢালে অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ২৩০৬ মিটার (৭৬৮৭ ফুট)। বাল্লুন, কাথলোগ, পোট্রেন তেহরা ও বক্রোটা - এই ৫টি পর্বত ড্যাল্‌হৌসিকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই পাহাড়গুলির উচ্চতা ১৫০০ মিটার (৫০০০ ফুট) হইতে ২১০০ মিটারের (৭০০০ ফুট) মধ্যে। পর্বতগুলি পাইন, দেবদারু প্রভৃতির গভীর বনে আবৃত। ড্যালহৌসির উপর হইতে উত্তরের তুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গ ও দক্ষিণের সমতল ভূমি দেখা যায়। এখানকার গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৯° সেন্টিগ্রেড (৮৫° ফারেনহাইট)। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১০০ মিলিমিটার (৮০ ইঞ্চি)।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার এই স্থানটি স্বাস্থ্যনিবাস করিবার জন্য চম্বা রাজের নিকট হইতে ক্রয় করেন। তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেলের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয় 'ড্যাল্‌হৌসি'। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্যাল্‌হৌসি পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। শহরটির আয়তন ১৪ বর্গ

কিলোমিটার (৫ বর্গ মাইল)। গ্রীষ্মকালে পর্যটকদের আগমনে এই শহরের লোকসংখ্যা প্রায় ৬০০০ হয়। স্থায়ী বাসিন্দা ১৪০০। ইহাদের অনেকে তিব্বতী বাস্তুহারা।

ড্যাল্‌হৌসি শহরের উপর দিয়া অনেকগুলি সুন্দর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে বক্রোটা পাহাড়ের গোলাকৃতি রাস্তা অন্যতম।

এই শহরের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কালাটপ ও খাজিয়ার গভীর বনে আবৃত সমতল ভূমি এবং দায়েনকুণ্ড (ধ্যানকুণ্ড)-শিখর উল্লেখযোগ্য। কালাটপে একটি বিশ্রামাগার আছে। ২৭৪৮ মিটার (৯১৬০ ফুট) উচ্চ দায়েনকুণ্ড-শিখর হইতে ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু ও বিপাশা নদীর সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখা যায়। অন্যতম দর্শনীয় স্থান সবুজ পাইন ও দেবদারু বনে পরিপূর্ণ খাজিয়ার সমতল ভূমি। এখানে প্রচুর আপেলের বাগিচা দেখা যায়। চম্বারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এখানকার প্রাচীন মন্দিরটি হিন্দু ও মোগল স্থাপত্য-শৈলীর সংমিশ্রণে রচিত। মন্দিরের শিখরটি স্বর্ণমণ্ডিত।

ড্যাল্‌হৌসিতে একটি সেনানিবাস আছে।

মঞ্জিরা সরদার

ড্যাল্‌হৌসি, লর্ড (১৮১২-৬০ খ্রী) ভারতের অন্যতম গভর্নর জেনারেল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল লর্ড ড্যাল্‌হৌসির জন্ম হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগের পর তিনি হাউস অফ লর্ড্‌সের সভ্য হন ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষে আসিবার অত্যল্পকাল পরেই তাঁহাকে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। মুলতানে মুলরাজের বিদ্রোহ; ইংরেজ কর্তৃক রানী ঝিন্দনের নির্বাসন, হজারার ছাতার সিং-এর প্রতি দুর্ব্যবহার এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্র শের সিং-এর বিদ্রোহ-ঘোষণা দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কারণ। ড্যাল্‌হৌসি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অক্টোবরের লিখিত চিঠিতে ঘোষণা করেন যে শিখেরা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

১৮৪৯ সালের ১৩ জানুয়ারি চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ হয়। ইহার জয়-পরাজয় অমীমাংসিত হইলেও ইংরেজ-পক্ষের ২৪৪৬ জন সৈন্য হতাহত হয় ও ৩টি রেজিমেন্টের পতাকা শত্রুদের হস্তগত হয়। ১৮৪৯ সালের ২ জানুয়ারি ইংরেজ-সৈন্য মুলতান অধিকার করে এবং মুলরাজ ২২ জানুয়ারি বিনা-শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি গুজরাতের যুদ্ধে শিখ-সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় ও শিখযুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মার্চ লর্ড ড্যাল্‌হৌসি সমগ্র পাঞ্জাব ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। পাঞ্জাবের রাজা দলীপ সিংকে ৪ হইতে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া নির্বাসিত করা হয়। অনেক ঐতিহাসিকই ড্যাল্‌হৌসির পাঞ্জাব-দখল নিদারুণ অন্যায় কার্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে ইংরেজগণ দলীপ সিং-এর অভিভাবক ছিলেন ও রাজত্বে তাঁহাদের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। পাঞ্জাব-দখলের সময়ে দলীপ সিং-এর বয়স মাত্র ১০½ বৎসর ছিল।

ব্রহ্মের ইংরেজ বণিকসম্প্রদায় দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করিলে ড্যাল্‌হৌসি, লর্ড কমডোর ল্যাম্বার্টকে প্রতিবিধানের জন্য পাঠান। ল্যাম্বার্ট অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। রেঙ্গুনের ব্রহ্মদেশীয় শাসক তাঁহার প্রেরিত দূতদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন এই অজুহাতে তিনি যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হয়। জেনারেল গড্‌উইন সহজেই রেঙ্গুন, পেগু ও প্রোম দখল করেন। ড্যাল্‌হৌসি একটি ঘোষণার দ্বারা পেগু প্রদেশ দখলে আনেন। কিন্তু ব্রহ্মের রাজা সন্ধি করিতে অস্বীকার করায় কোনও সন্ধি হয় নাই। টাইম্‌স পত্রিকা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এই যুদ্ধ সমর্থন করেন নাই। কব্‌ডেন এই যুদ্ধের নিন্দা করিয়াছেন এবং আর্নল্ডের মতে পূর্ব সমুদ্রে আমেরিকা ও ফরাসীদের প্রভাববিস্তারের ভয়ই ব্রহ্মদখলের কারণ।

দুইটি যুদ্ধের পর ড্যাল্‌হৌসি বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের সহিত সন্ধি করিয়া ব্রিটিশ-প্রভাব বিস্তারিত করেন।

স্বত্ববিলোপনীতির প্রয়োগ ড্যাল্‌হৌসির শাসনকালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ইংরেজের আশ্রিত কোনও রাজা অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গত হইলে তাহার রাজত্ব ইংরেজাধীনে আসিবে ও সরকারের অনুমতি ব্যতীত দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে তাহা স্বীকৃত হইবে না, ইহাই এই নীতির সার কথা। এই নিয়মানুসারে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, জৈতপুর ও সম্বলপুর রাজ্য ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সাতারার ব্যাপার ভারতে ইংরেজ-শাসনের এক দুরপনেয় কলঙ্ক। কুশাসনের অজুহাতে ড্যাল্‌হৌসি অযোধ্যা দখল করেন (১৮৫৬ খ্রী) ও নবাব ওয়াজিদ আলিকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় রাখেন। নিজাম ইংরেজ-সৈন্য রাখার

ডিউই, জন

খরচা দিতে না পারায় তাঁহাকে বেরার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হয় ও সিকিমরাজ ২ জন ইংরেজকে বলপূর্বক আটক করায় সিকমের কিয়দংশ ইংরেজগণ দখল করেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে যে ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন দেওয়া হইত তাহা তাঁহার দত্তকপুত্র নানাসাহেবকে দেওয়া হইল না।

আভ্যন্তরীণ শাসনে লর্ড ড্যাল্‌হৌসি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি ভারত গভর্নমেণ্টে পূর্তকার্যের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের প্রবর্তন করেন। সেচের সুবিধার জন্য গঙ্গাখাল সম্পূর্ণ করা হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়। ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফেরও অল্প মাশুলে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা হইতে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে উড্‌সাহেবের ডেস্‌প্যাচ আসে ও তদনুসারে ড্যাল্‌হৌসি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শেষ সনন্দ লাভ করেন, ইহাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা কর্মচারী-নিয়োগের রীতি প্রবর্তিত হয় ও বঙ্গ দেশে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়।

লর্ড ড্যাল্‌হৌসির কার্যকাল বৃদ্ধি করা হইলেও ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি কার্যে ইস্তফা দিয়া বিলাতে চলিয়া যান। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর ড্যাল্‌হৌসির মৃত্যু হয়।

ড্যাল্‌হৌসি ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্বে ইরাবতীর তীর পর্যন্ত প্রসারিত করেন ও আভ্যন্তরীণ শাসনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিলেও অনেকের মতে তাহার দেশীয় রাজ্য-অধিকারের নীতি অনেক পরিমাণে সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য দায়ী।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ডিউই, জন (১৮৫৯-১৯৫২ খ্রী) মার্কিন মনোবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্। ডিউই-র জন্ম, আমেরিকার বার্লিংটন শহরে। জন্‌স হপ্‌কিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। শিক্যাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যাপনা করিবার পর, তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৯৪ খ্রী) ও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার পরিচালনা করেন। শিকাগো হইতে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। জাপান, মেক্সিকো, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেখিবার জন্য তিনি ঐসকল দেশ ভ্রমণ করেন।

চিন্তাক্ষেত্রে ডিউই প্র্যাগ্‌ম্যাটিক ইন্‌স্ট্রুমেণ্টালিজ্‌ম বা ধারণার কার্যকর প্রয়োগ ও উপযোগিতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। জ্ঞান, সমাজ, রাষ্ট্র, সৌন্দর্য, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি এই চিন্তাধারাকে বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পিয়ার্স (Peirce) ও জেম্‌স এর চিন্তাধারাকে তিনি পরিণত রূপ দিয়াছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউই র দার্শনিক চিন্তার প্রভাব সর্বাধিক স্পষ্ট। বাস্তববোধই ডিউইর চিন্তার উৎস। ডিউই সম্পর্কে হোয়াইট্‌হেড বলিয়াছেন যে, মার্কিনী সভ্যতায় ও চিন্তা-ক্ষেত্রে ডিউইর দান এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় বেকন, দেকার্ত, লক ও হিউম-এর অবদান তুলনীয়।

প্র্যাগ্‌ম্যাটিস্ট দের মতে সত্য-নিরূপণের মাপকাঠি হইল প্রামাণ্য পরীক্ষায় সাফল্য— এই সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় ধারণার উপযোগিতার উপর। ডিউইর মতে প্রামাণ্য পরীক্ষায় যাহা উত্তীর্ণ ও যাহার উপযোগিতা আছে তাহাই সত্য, সত্য বলিয়া অপর কিছু নাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউই প্রয়োগসাপেক্ষ শিক্ষার উপর অধিক জোর দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, শিল্পবিপ্লবের পর যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সহিত শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকিবে। ডিউইর মতে জ্ঞান কর্মনিষ্ঠ, জ্ঞান ও কর্মশক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবনই শিক্ষা— যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি, শিক্ষার সমাপ্তি বলিয়া কিছু নাই।

ডিউইর মতে চিন্তা প্রয়োজনপ্রসূত ও ব্যবহারসাপেক্ষ। ইহা কোনও মানবিক বা ধারণাগত ব্যাপার নয়। পারি-পার্শ্বিক বাস্তব ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই ইহার অর্থ পরিস্ফুট হয়। আইডিয়া বা ধারণা সেই পরিমাণে সত্য যে পরিমাণে ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়— কাম্যবস্তু প্রাপ্তির সহায়ক হয়। শিক্ষা একদিকে মানুষের পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলার পথকে সুগম করে ও অন্য দিকে মানুষের সুপ্ত বৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া সেই পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন সাধন করিবার পক্ষে সহায়ক হয়।

ডিউই বলেন, বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, শিক্ষা ও গণতন্ত্রের কাজ হইবে সেই উন্নত বিজ্ঞানের জগতে মানুষের উন্নত চিন্তাশক্তি ও নৈতিক মান সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ডিউইর শিক্ষার আসল কথা হইল কর্মকুশলী বুদ্ধি, যাহা জীবনকে গতিশীল করে— সঞ্চিত অতীত অভিজ্ঞতাকে সূত্র করিয়া বর্তমানের বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে সহায়তা করে ও অগ্রসর হইয়া যাওয়ার পথকে

পরিষ্কার করিয়া দেয়। ভাল, মন্দ, এ-সব কথা ডিউইর মতে আপেক্ষিক; উহাই ভাল যাহা প্রগতিশীল, তাহাই মন্দ যাহা প্রগতির পরিপন্থী।

দ্র M. H. Thomas & H. W. Schn ider, *John Dewey: a Centennial Bibliography*, Chicago, 1962.

মনোরঞ্জন বসু

ডিক্‌টেটরশিপ একনায়কতন্ত্র দ্র

ডি কুইন্সি, টমাস (১৭৮৫-১৮৫৯ খ্রী) ইংরেজ সাহিত্যিক। টমাস ডি কুইন্সি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেস্টারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালেই বালক ডি কুইন্সি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। গ্রীক এবং লাতিন ভাষায় তাঁহার অনায়াস অধিকার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন। স্কুলজীবনে তিনি একাধিকবার বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যান। ১৯ বৎসর বয়সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এখানেও অতিশয় মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা না দিয়া অক্সফোর্ড ত্যাগ করেন।

অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালে তিনি আফিমের অভ্যাস করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যখন সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার কবিসুলভ কল্পনাপ্রবণ মনের সঙ্গে আফিমের আমেজ মিশিয়া এক বিচিত্র স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়। তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'কন্‌ফেশন অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম-ইটার' (১৮২২ খ্রী) অংশত: আত্মকাহিনী অংশত: নিছক কল্পনালোক-বিহার। ঐ একটি গ্রন্থই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাময়িক পত্রিকার জন্য তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'দি লজিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি' (১৮৪১ খ্রী) নামক অর্থনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ এবং একটি উপন্যাস ছাড়া তাঁহার সমস্ত রচনাই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ডি কুইন্সি স্বভাবধর্মে খেয়ালি ছিলেন। স্বভাবত: লাজুক প্রকৃতির হইলেও গুণীজনের সঙ্গ তিনি ভালবাসিতেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ডের লেক্‌ অঞ্চলে তিনি বাস করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী গদ্য সাহিত্যে ডি কুইন্সি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র David Masson, *De Quincey*, London, 1926.

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ডিকেন্‌স, চার্ল্‌স (১৮১২-৭০ খ্রী) ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ডিকেন্‌স ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের ল্যাণ্ডপোর্টে জন্মগ্রহণ করেন। কেরানী পিতা জন ডিকেন্‌স ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হন, দুর্গত পরিবারের সন্তান চার্ল্‌সকে শৈশবেই শ্রমিক-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হয়; বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভও অধিক অগ্রসর হয় নাই।

সতেরো বৎসর বয়সে ডিকেন্‌স সংবাদপত্রের রিপোর্টার বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁহার প্রথম ঔপন্যাসিক প্রয়াস 'স্কেচেজ বাই বজ়' ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা আনে। পরবর্তী রচনা 'পিক্‌উইক পেপার্স' (১৮৩৭ খ্রী) ডিকেন্‌সকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহার পর হইতে অবিচ্ছিন্ন খ্যাতি ও অর্থার্জনের পালা। অবশ্য ব্যক্তি-জীবনে ডিকেন্‌স বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডিকেন্‌সের উপন্যাস 'চরিত্র-চিত্রশালা'। ইহাদের অধিকাংশই তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ, যেন সমগ্র ইংরেজ জাতিকেই বিচিত্র রূপে-বর্ণে তিনি তাঁহার উপন্যাসে সাজাইয়া দিয়াছেন। ডিকেন্‌স যেন লণ্ডনের প্রকৃতি— এমন কথাও সমালোচকেরা বলিয়াছেন। 'পিক্‌উইক পেপার্স' ছাড়াও 'অলিভার টুইস্ট' (১৮৩৮ খ্রী), 'নিকোলাস নিক্‌লবি' (১৮৩৯ খ্রী), 'বার্‌নবি রাজ' (১৮৪০ খ্রী), 'ডেভিড্‌ কপার্‌ফিল্ড' (১৮৪৯-৫০ খ্রী), 'ব্লীক হাউস' (১৮৫২-৫৩ খ্রী), 'এ টেল অফ টু সিটিজ়' (১৮৫৯ খ্রী), 'গ্রেট এক্‌স্‌পেক্‌টেশন্‌স' (১৮৬১ খ্রী) প্রভৃতি তাঁহার বিশ্বখ্যাত সাহিত্যকীর্তি।

দ্র Kenneth Joshua Fielding, *Charles Dickens*, London, 1953.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডিগবয় ২৭°২৩´ উত্তর ও ৯৫°৩৭´ পূর্বে অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব আসামের লখিমপুর জেলার শহর। ইহা পেট্রোলিয়ামের জন্য খ্যাত। ডিব্রুগড় শহর হইতে ডিগবয় ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) পূর্বে অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব রেলপথ ও আসাম ট্রাঙ্ক রোড ইহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আসাম হইতে চীন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ১৬০০ কিলোমিটার (১০০০ মাইল) দীর্ঘ স্টিল্‌ওয়েল রোড ডিগবয় হইতে ১৯ কিলোমিটার

(১২ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত লিডো হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ডিগবয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট), এই উপত্যকা উচ্চ পর্বতমালার দ্বারা অর্ধচক্রাকারে বেষ্টিত। উত্তরে ৭৫০০ মিটার (২৫০০০ ফুট) উচ্চ তুষারাবৃত শিখর -সংবলিত পূর্ব হিমালয়। দক্ষিণ-পূর্বে ২৭০০ মিটার (প্রায় ৮০০০ ফুট) উচ্চ পাটকই পর্বতমালা ভারত ও ব্রহ্ম দেশের সীমা নির্দেশ করিতেছে। ডিগবয় হইতে প্রায় ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে বুড়ি ডিহিং নদী।

জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩০০০ মিলিমিটার (১২০ ইঞ্চি), প্রধানতঃ এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসে বৃষ্টি হয়। বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু কমিয়াছে।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট আর. উইল্‌কক্স উত্তর আসাম জরিপ করিতে গিয়া ঐ অঞ্চলে প্রথম তৈলের সন্ধান পান। মাকুম ও নামডাং-এ কয়েকটি অগভীর তৈলকূপ খনন করা হয়। উহার পর আসাম রেলওয়ে অ্যাণ্ড ট্রেডিং সংস্থা ডিগবয়ে তৈল আবিষ্কার করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯৮ মিটার (৬৬২ ফুট) গভীর কূপ হইতে ব্যবসায়-উপযোগী তৈল উত্তোলন করা হয়। ইহাই ভারতে তৈল শিল্পের প্রথম সূত্রপাত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আসাম অয়েল কোম্পানি এই কার্য গ্রহণ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বর্মা অয়েল কোম্পানি আসাম অয়েল কোম্পানির সহিত যোগদান করিয়া এই কার্যকে আরও উন্নত করেন।

ভারতে একমাত্র ডিগবয় শহরটিতেই তৈলক্ষেত্র ও তৈল শোধনাগারের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। শোধনাগারটি শহরের অভ্যন্তরে। তৈলক্ষেত্র শহরের দক্ষিণ-পূর্বে ১৪ কিলোমিটার (৯ মাইল) ও উত্তর পূর্বে প্রায় ২ কিলোমিটার (১½ মাইল) বিস্তৃত। ইহার আয়তন প্রায় ৫ বর্গ কিলোমিটার (২ বর্গ মাইল)। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ড্রিলিং (বেধন) বন্ধ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ৯০৯টি তৈল-কূপ খনন করা হয়। পরবর্তী কালে তৈল উৎপাদন কমিয়া যাইবার ফলে ডিগবয় হইতে ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে নাহারকাটিয়া হইতে বেশি পরিমাণ অপরিশ্রুত তৈল ডিগবয়ের তৈলের সহিত মিশাইয়া শোধনাগারে প্রেরিত হইয়া থাকে। ডিগবয়ের তৈলে যে মোম পাওয়া যায় তাহা অতি উৎকৃষ্ট।

ডিগবয়ের শোধনাগারের তৈল হইতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় :

উপাদান	শতকরা হার
মোটর স্পিরিট (পেট্রল)	২৩
কেরোসিন (উত্তম শ্রেণী)	৯
কেরোসিন (নিম্ন শ্রেণী)	১১
ডিজেল তৈল	১১·৩
জ্বালানি তৈল	১১·১
মোম	৯·৭
লুব্রিকেটিং অয়েল (পিচ্ছিল তৈল)	৬·৫
বিটুমেন (টার)	১·৮
কোক	১·৫
কাপিন প্রভৃতি	
ম্যা বিয়া প্রতিপাদক তৈল	৬·৬

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধে পেট্রল সরবরাহের জন্যই ডিগবয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ঐ সময়ের পর হইতে ইহা একটি আধুনিক শহরে পরিণত হইয়াছে। টিলাগুলির উপর সাধারণতঃ বড় বড় অফিস ও হাসপাতাল অবস্থিত।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৩৫০২৮। ভারতের প্রায় সমস্ত দেশের অধিবাসীদেরই এখানে দেখা যায়। তন্মধ্যে অসমীয়াদের সংখ্যাই বেশি।

এখানে কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত ৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের সাহায্যে আরও ৪টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১টি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্র Wallace E Pratt & Dorothy Good, ed., *World Geography of Petroleum*, New York, 1950; *Batori*, vol. XII, no 11, 1965.

জাস্টিন পা।

ডিগ্‌বি, উইলিয়াম (১৮৪৯-১৯ ৪ খ্রী) ইংরেজ সংবাদ-পত্রসেবী ও ভারতহিতৈষী। ডিগ্‌বি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে বিলাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সিংহলে ও পরে মাদ্রাজে সংবাদপত্রসেবায় রত ছিলেন। শেষোক্ত স্থলে 'মাদ্রাজ টাইম্‌স' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন (১৮৭৭-৭৯ খ্রী)। ডিগ্‌বি স্বদেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে প্রচারকার্য এবং কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ব্রিটেনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 'ইণ্ডিয়া কমিটি'-র সেক্রেটারি নিযুক্ত হন (১৮৮৯ খ্রী) এবং ইহার মুখপত্র

'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনা করেন (১৮৯০-৯২ খ্রী)। তিনি দক্ষিণ ভারত দুর্ভিক্ষ তহবিলের সেক্রেটারি ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, লর্ড কার্জনের এই উক্তির খণ্ডনকল্পে ডিগ্‌বি 'প্রস্‌পারাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নামক এক বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। ডিগ্‌বি-রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : *The Famine Campaign in Southern India* (১৮৭৬-৭৮ খ্রী), *Indian Problems for English Consideration* (১৮৮১ খ্রী), *India for the Indians and for England* (১৮৮৫ খ্রী) ; *Prosperous British India* (১৯০১ খ্রী)।

যোগেশচন্দ্র বাগল

ডিজ্‌নি, ওয়াল্টার (১৯০১-৬৬ খ্রী) মার্কিন কার্টুন চলচ্চিত্র প্রযোজক ওয়াল্টার (ওয়াল্ট) ডিজ্‌নি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স চালকের কাজ করেন। ১৯২৩-২৬ খ্রীষ্টাব্দকালে হলিউডে সজীব কার্টুন চিত্র লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান, 'অ্যালিস ইন কার্টুনল্যাণ্ড' (১৯২৩ খ্রী) ও অন্যান্য 'অ্যালিস' কৌতুকচিত্র নির্মাণ করেন। ১৯২৬-২৮ খ্রীষ্টাব্দকালে তাঁহার 'অস্‌ওয়াল্ড দি র‍্যাবিট' কার্টুনগুলি সৃষ্ট হয়। 'স্টিমবোট উইলি' (১৯২৮ খ্রী) তাঁহার প্রথম শব্দমুখর চিত্র, 'মিকি মাউস' এই চিত্রে বিশ্বজনপ্রিয় হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় রঙিন কার্টুন রচনা, রঙিন 'সিলি সীম্‌ফনি' চিত্রগুলি চিত্রামোদীদের আকৃষ্ট করে। 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফ্‌স' (১৯৩৮ খ্রী) তাঁহার প্রথম পূর্ণ-দৈর্ঘ্য কার্টুন চিত্র। ইহার পরে আসে 'পিনোচিও' (১৯৪০ খ্রী), 'বাম্বি' (১৯৪২ খ্রী), 'ডাম্বো' (১৯৪২ খ্রী)। শিশুমনে এই সকল লোকচিত্রগ্রাহী ছবির আবেদন সমধিক। 'ফ্যান্টাসিয়া' (১৯৪১ খ্রী) পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ব্যাখ্যামূলক কার্টুন চিত্র। প্রাকৃতিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত প্রামাণিক চিত্র ও সাধারণ নাটকীয় চিত্রের প্রযোজনাতেও ডিজ্‌নির কৃতিত্ব অসামান্য। সবসমেত তিনি প্রায় ৬০০ চিত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কয়েকটি নামকরা চিত্র : 'সিণ্ডারেলা' (১৯৫০ খ্রী); 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' (১৯৫১ খ্রী), 'দি লিভিং ডেজার্ট' (১৯৫৩ খ্রী) ; 'স্লিপিং বিউটি' (১৯৫৯ খ্রী), 'দি সুইশ ফ্যামিলি রবিনসন' (১৯৬০ খ্রী) ; 'দি অ্যাব্‌সেন্ট-মাইণ্ডেড প্রফেসর' (১৯৬১ খ্রী) ; 'দি লেজেণ্ড অফ লোবো' (১৯৬২ খ্রী) ও 'দি মুনস্পিনার্স' (১৯৬৪ খ্রী)। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত মায়াকানন 'ডিজ্‌নিল্যাণ্ড'-এর উদ্বোধন হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিজ্‌নির মৃত্যু হয়।

মন্মথ মল্লিক

ডিজেল খনিজ তৈল দ্র

ডিটার্‌মিন্যান্ট (Determinant) এক প্রকার গাণিতিক ছক। n সারি (রো) ও n স্তম্ভে (কলাম) n^2 সংখ্যক (n একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা) পদের (এলিমেণ্ট) সাহায্যে n শ্রেণীর (অর্ডার n) ডিটারমিন্যান্ট লিখিত হয়। প্রতিটি সারি ও প্রতিটি স্তম্ভ হইতে একটি এবং কেবলমাত্র একটি সংখ্যা লইয়া তাহাদের গুণফল করিয়া গুণফলকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে $+1$ অথবা -1 দ্বারা গুণ করিয়া এক-একটি পদ হয়, এইরূপে গঠিত সর্বসমেত $n!$ ($=1\cdot 2\cdot 3 \dots n$) পদের সমষ্টিই হইল ডিটারমিন্যান্ট-এর মান। যথা—

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ একটি n শ্রেণীর ডিটারমিন্যান্ট

এবং ইহার মান হইল $\sum(-1)^N a_{1e_1}\, a_{2e_2} \dots a_{ne_n}$। এই সমষ্টিতে সম্ভাব্য $n!$ পদ লওয়া হইয়াছে। ($e_1, e_2, \dots e_n$) এই ক্রমকে N-সংখ্যক পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের দ্বারা স্বাভাবিক ক্রমে অর্থাৎ $(1, 2, 3, \dots n)$ এই ক্রমে আনা যায় (যে কোনও দুইটি e-র মধ্যে পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তনকে একটি পরিবর্তন মনে করিতে হইবে)। এইরূপে—

$\Delta_1 = | a_{11} | = a_{11}$ একটি প্রথম শ্রেণীর ডিটারমিন্যান্ট।

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$ একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিটারমিন্যান্ট।

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

হইল একটি তৃতীয় শ্রেণীর ডিটারমিন্যান্ট।

জার্মান গণিতজ্ঞ লাইব্‌নিৎস্‌ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিটার্‌মিন্যান্ট-এর সাধারণ সংজ্ঞা প্রকাশ করেন। দুইটি সমান্তরাল রেখার দ্বারা বদ্ধ ডিটার্‌মিন্যান্ট লিখিবার এই

পদ্ধতি আর্থার কেইলি (A. Cayley) কর্তৃক ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয় । ইহার সর্বাধিক ব্যবহার এ সময় হইতেই হয়।

সারির সহিত স্তম্ভের পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করিলে ডিটারমিন্যান্ট-এর মান অপরিবর্তিত থাকে। যে কোনও দুইটি সারি অথবা দুইটি স্তম্ভ পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করিলে ডিটারমিন্যান্ট-এর মান -1 দ্বারা গুণিত হয়। ডিটারমিন্যান্ট হইতে r-তম সারি ও s-তম স্তম্ভ বাদ দিলে অবশিষ্ট সারি ও স্তম্ভ দ্বারা গঠিত ডিটারমিন্যান্ট-কে r-তম সারি ও s-তম স্তম্ভে অবস্থিত মৌলবস্তু a_{rs}-এর প্রথম মাইনর (ফার্স্ট মাইনর) কহে। A_{11}, A_{12}, A_{13} যথাক্রমে a_{11} a_{12} ও a_{13}-এর Δ_3-তে প্রথম মাইনর হইলে দেখা যায়

$$\Delta_3 = a_{11}A_{11} - a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$ ।

একাধিক সরল সমীকরণ সমাধানে ডিটারমিন্যান্ট ব্যবহৃত হয়, যথা .

$a_1x+b_1y+c_1z=O$, $a_2x+b_2y+c_2z=O$ এবং $a_3x+b_3y+c_3z=O$

এই সমীকরণত্রয় সমাধানযোগ্য (x y $z=O$ এই সমাধান ভিন্ন) হইবার জন্য $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = O$ হওয়া প্রয়োজন ও যথেষ্ট। আবার $\Delta \neq O$ হইলে $a_1x+b_1y+c_1z=d_1$, $a_2x+b_2y+c_2z=d_2$, $a_3x+b_3y+c_3z=d_3$, এই সমীকরণত্রয় সমাধানযোগ্য হইবে এবং একমাত্র সমাধান $X=A/\Delta$, $Y=B/\Delta$, $Z=C/\Delta$

এখানে

$$A = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

দ্র Thomas Muir, *The Theory of Determinants in the Historical Order of Development*, vols. I-IV, London, 1906-20 , Ferrar, *Determinants and Matrices*.

শক্তিকান্ত চক্রবর্তী

ডিনামাইট বিস্ফোরক দ্র

ডিপজিট অবক্ষেপ। সাধারণতঃ স্তূপ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ভূবিদ্যায় ইহা খনিজ বা আকরিক অবক্ষেপ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। অবক্ষেপ অসংখ্য প্রকার, যথা: রাসায়নিক, মহাদেশীয় (কন্টিনেন্টাল), অতলীয় (ডীপ সী), স্বজলীয় (ফ্রেশ ওয়াটার), স্থলীয়, আগ্নেয় ইত্যাদি। বিভিন্ন পারমাপ এবং গঠনের মণিক (মিনরাল) বা আকরিক অবক্ষেপ পূর্ববর্ণিত নানাবিধ প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। অবক্ষেপের উৎপত্তি, সংযুতি (কম্পোজিশন) এবং অবস্থানকে ভিত্তি করিয়া ইহার নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। সাধারণতঃ আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলায় বিভঙ্গ (ফ্র্যাকচার), বিদার (ফিশার), দারণ (জয়েন্ট), স্রংসতল (ফল্ট প্লেন), ভাঁজ (ফোল্ড), কৃন্ততল (শিয়ার প্লেন) বা স্খলনতল (স্লিপ প্লেন) প্রভৃতি অনুকূল গঠনের স্থান মণিক বা আকরিক অবক্ষেপের প্রাকৃতিক অবস্থান নিরূপণ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও পাললিক শিলার স্তরায়ণতলেও (বেডিং প্লেন) মণিকীভবন (মিনরালাইজেশন) পরিলক্ষিত হয়। প্রয়োজনীয় মণিক বা আকরিক কোনও অবক্ষেপের পর্যাপ্ত বিস্তার এবং প্রচুর কেন্দ্রীভবন ঘটিলে তাহাকে সম্পদশীল অবক্ষেপ (ইকনমিক ডিপজিট) বলা হয়।

দ্র A. M. Bateman, *Economic Mineral Deposits*, New York, 1946.

দর্শনকুমার দত্ত

ডিফ্থেরিয়া গলা, নাক অথবা স্বরযন্ত্র ডিফ্থেরিয়া রোগে ঝিল্লি-জাতীয় একটি পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়।

ক্লেবস ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডিফ্থেরিয়ার রোগজীবাণু আবিষ্কার করেন এবং লোফলার (Loeffler) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই জীবাণুর পৃথককরণে সক্ষম হন। এই জীবাণুর বিজ্ঞানসম্মত নাম করাইনি ব্যাক্টেরিয়াম ডিফ্থেরিঈ (*Corrne-bacterium diptheriae*)। ইহারা সচল জীবাণু নহে। ডিফ্থেরিয়া জীবাণু তিন প্রকার, যথা গ্রাভিস, ইণ্টারমিডিয়াম ও মিটিস। প্রথম দুই প্রকার জীবাণু অধিকাংশ সময়েই বিষময় এবং প্রাণান্তকারী, মিটিস অধিকাংশ সময় বিষহীন। কলিকাতায় মিটিস জাতীয় জীবাণুরই প্রাধান্য বেশি।

ডিফ্থেরিয়া সাধারণতঃ শিশুদেরই হইয়া থাকে ; দুই হইতে পাঁচ বৎসর বয়সেই ইহাদের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। ডিফ্থেরিয়া জীবাণু প্রধানতঃ গলা ও টনসিল আক্রমণ করে, ইহা ছাড়া নাক, চোখ এবং স্বরযন্ত্রও এই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

গলার ডিফ্থেরিয়া সাধারণতঃ খুব ধীরে ধীরে প্রকট হয়। অনেক সময় গলায় এবং টনসিলে সাদা ঝিল্লির মত পরদা দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও কাশি

দেখা যায়। সময়ে সময়ে বমিও হইতে পারে। গলার লসিকা গ্রন্থি ফুলিয়া যায়।

স্বরযন্ত্রের ডিফ্‌থেরিয়া সাধারণতঃ গলার ডিফ্‌থেরিয়া হইতেই হয়। ডিফ্‌থেরিয়ার পরদা বড় হইতে হইতে নিঃশ্বাসের পথ রোধ করিয়া ফেলে। প্রথম লক্ষণ— গলাভাঙা ও অবিশ্রান্ত কাশি, তাহার পর হয় নিঃশ্বাসের কষ্ট। শ্বাসনালী কাটিয়া নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে বাঁচিবার আশা থাকে না।

নাকের ডিফ্‌থেরিয়াতে নাক হইতে পুঁজ ও রক্ত পড়ে। নাক হইতে অনেক সময়েই গলায় রোগ ছড়াইয়া পড়ে।

চোখের ডিফ্‌থেরিয়া সাধারণতঃ নাকের ডিফ্‌থেরিয়া হইতে ছড়ায়। ইহা ছাড়া ত্বক, জননেন্দ্রিয় বা দেহের অন্য স্থানের ঘা প্রভৃতিতেও ডিফ্‌থেরিয়া হইতে পারে। ডিফ্‌থেরিয়ার জীবাণুর অধিবিষের (টক্‌সিন) প্রকোপে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইতে বা নার্ভের অবশতা ঘটিতে পারে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অধিবিষ রোধকারী সিরাম ব্যবহৃত হয়। আজকাল নানা প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক, বিশেষ করিয়া পেনিসিলিন, সিরামের সহিত ব্যবহৃত হয়। প্রতিষেধক টিকা লইলে গুরুতর ডিফ্‌থেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

নলীগোপাল মজুমদার

ডিফো, ড্যানিয়েল (১৬৬০?-১৭৩১ খ্রী) ইংরেজ লেখক। ১৬৬০ কিংবা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে জেম্‌স্ ফো-র পুত্র ড্যানিয়েলের জন্ম হয়। চল্লিশ বৎসর পরে ড্যানিয়েল পৈতৃক পদবী 'ফো'-র পূর্বে একটি 'ডি' যোগ করিয়া 'ডিফো' (Defoe)-তে রূপান্তরিত হন। বিশ্বসাহিত্যে এই নামেই তিনি সুপরিচিত।

বাল্যে মিস্টার মর্টনের স্কুলে সামান্য পঠন-পাঠনই তাঁহার শিক্ষাজীবন। যৌবনারম্ভে ধর্মান্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়েন। অল্প বয়সেই তাঁহার লেখার প্রতিভা প্রকাশ পায়। লেখনীই তাঁহার উপজীব্য হয়, সাংবাদিকতা ও বিতর্কমূলক পুস্তিকা রচনাই তাঁহার পেশা ছিল। ধর্ম সম্পর্কীয় একটি ব্যঙ্গ পুস্তিকার জন্য ডিফো গির্জা-কর্তৃপক্ষ এবং টোরি সরকারের রোষভাজন হন, ফলে 'পিলোরি' দণ্ড ভোগ এবং কারাবাস বরণ করিতে হয়। ইহাতে তিনি আরও জনপ্রিয় হন।

সমাজের নিম্নস্তরের মানুষগুলির সহিত ডিফোর গভীর সহমর্মিতা ছিল, তাহাদের তিনি আত্মজন মনে করিতেন। নিমজ্জিত জাহাজ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত, দীর্ঘকাল নির্জন দ্বীপবাসী জনৈক নাবিকের (আলেকজান্ডার সেল্‌কার্ক) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁহার অমর উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুশো' (১৭১৯ খ্রী) রচিত হয়। ইহা ছাড়া 'মোল্ ফ্ল্যাণ্ডার্স' (১৭২২ খ্রী) এবং 'রোক্সানা' (১৭২৪ খ্রী) তাঁহার দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল লণ্ডনে ডিফোর মৃত্যু হয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডিফ্র্যাকশন রশ্মিগুচ্ছ হিসাবে ধাবমান আলোর পথে অবস্থিত কোনও বস্তুর ছায়া দূরস্থিত পরদায় পড়িলে ছায়ার সীমারেখা তীক্ষ্ণ না হইয়া কিছুটা যেন অস্পষ্ট দেখায়। আলোক-তরঙ্গ তাহার তরঙ্গধর্মিতার জন্যই কোনও বাধার প্রান্তদেশ ঘুরিয়া জ্যামিতিক ছায়ার ভিতরেও কিছুটা প্রবেশ করে। ঐ ছায়ার প্রান্ত ভাগে বিশেষ অবস্থায় আলোক ও অন্ধকার রচিত বিশেষ প্যাটার্ন সৃষ্টি হইতে পারে— কারণ আলো ঐ বাধার জ্যামিতিক ছায়ার প্রান্তদেশে ঘুরিয়া যাওয়া নিজের কিছুটা অংশের সঙ্গেই ইণ্টারফিয়ারেন্স বা ব্যতিচার ঘটায়। এইরূপ ঘটনার নামই ডিফ্র্যাকশন।

ঐরূপ ঘটনার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৭শ শতকের বিজ্ঞানী গ্রিম্যাল্‌ডি। ডিফ্র্যাকশন সংক্রান্ত বহুবিধ প্রাকৃতিক ঘটনা নিত্য দৃষ্টিগোচর হয়। আকাশকে ঐ কারণেই নীল দেখায়।

ডি ফ্র্যা ক শ ন গ্রে টিং : ইহা একটি যন্ত্র যাহা দিয়া বর্ণালী সৃষ্টি করা যায়। কাচ অথবা স্পেকুলাম ধাতুর উপরে সূক্ষ্ম হীরক সূচী দ্বারা অতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট সমান্তরাল রেখা টানা হয় (প্রতি ইঞ্চিতে পঞ্চাশ হাজার রেখাও থাকিতে পারে)। সেটিকে ছাঁচ হিসাবে ব্যবহার করিয়া সেলুলয়েডের দ্বারা ছাপ তুলিয়া নেওয়া হয় (রেপ্লিকা)। ফোটো কপি প্রক্রিয়াতেও গ্রেটিং তৈয়ারি হয়। গ্রেটিং-এর সাহায্যে আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। কিন্তু রোল্যাণ্ড নির্মিত অবতল গ্রেটিং-এর ক্ষেত্রে কিছুই প্রয়োজন হয় না।

এ ক্‌ স-রে ডি ফ্র্যা ক্‌ শ ন : গ্রেটিং-এ রেখাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমতুল্য হইলেই ডিফ্র্যাকশন সম্ভবপর। এক্‌স-রের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোকের চারি হাজার হইতে সাত হাজার ভাগ (10^{-8} সেন্টিমিটার) ক্ষুদ্রতর। বিজ্ঞানী লাউএ দেখাইয়াছেন যে প্রাকৃতিক কেলাসসমূহে অণুসজ্জার ব্যবধান এমনই যে উহা এক্‌স-রের ক্ষেত্রে গ্রেটিং-এর মত কাজ করিয়া ডিফ্র্যাকশন ঘটায়। এক্‌স-রের ডিফ্র্যাকশন-পরীক্ষা এখন কেলাসের

অনুসজ্জা বুঝিবার বা কেলাসের গঠনতত্ত্ব জানিবার প্রধান উপায় ('এক্স রে' দ্র)।

ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন ইলেকট্রন রশ্মিপাতের ফলে ধাতব কেলাস হইতে ইলেকট্রনের ডিফ্র্যাকশন সম্ভব। ঐ ঘটনা ইলেকট্রনের দ্বৈত চরিত্র অর্থাৎ পদার্থ ও তরঙ্গধর্মিতার পরীক্ষামূলক প্রমাণ। এই ঘটনার সম্ভাব্যতায়ই ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ যন্ত্র সম্ভব হইয়াছে।

নিউট্রন ডিফ্র্যাকশন মন্দগতি নিউট্রন স্রোত কেলাসের অনুসজ্জার দরুন ঐ কেলাস হইতে ডিফ্র্যাকশন ঘটায়। এক্স-রে ডিফ্র্যাকশনের মতই নিউট্রন ডিফ্র্যাকশনও কেলাস পরীক্ষায় অতি মূল্যবান পদ্ধতি।

বিমলেন্দু মিত্র

ডিবেঞ্চার ডিবেঞ্চার বলিতে বুঝায় এমন এক দলিল ('লীগ্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট') যাহা দ্বারা কোনও প্রতিষ্ঠান (যেমন যৌথ মূলধনী কোম্পানি) নিজ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অপরের (দাদনকারীদের) নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য একপভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় যে আগামী-কালের কোনও বিশেষ তারিখে ঐ ঋণ প্রত্যর্পণ করিবে এবং ঐ ঋণের দরুন সুদ নির্দিষ্ট হারে, নির্দিষ্ট দিনসমূহে নিয়মিতভাবে দিয়া যাইবে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানি আইন অনুযায়ী উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ এর নিকট ২১ দিনের মধ্যে রেজেস্ট্রি করিতে হয় ও রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টি-ফিকেটের অনুলিপি প্রতি ডিবেঞ্চার পত্রের উপর প্রকাশ করিতে হয়। বন্ধক সম্পর্কিত সমুদয় কাগজপত্র কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে রাখিতে হয় এবং কোম্পানির যে কোনও অংশীদার বা পাওনাদার অনুরোধ করা মাত্র প্রদর্শন করিতে হয়।

ডিবেঞ্চার ঋণপত্রসমূহ কোনও বিশেষ মূল্যের (সাধারণতঃ ১০০০ টাকার) হয়। শেয়ার বাজারে এগুলির কেনা-বেচা হইয়া থাকে। বর্তমানে ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে বৎসরে আনুমানিক ১০০ কোটি টাকার ডিবেঞ্চারের কেনা বেচা হয়।

ডিবেঞ্চার সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয় ১. রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চার ও ২. বেয়ারার (bearer) ডিবেঞ্চার। রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে কোম্পানির খাতায় নিজের নাম রেজেস্ট্রি করিতে হয়। তবেই ক্রেতা সুদ ও আসল মূলধন দাবি করিতে পারে। বেয়ারার ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে নাম রেজেস্ট্রি করাইবার কোনও প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে ঋণপত্রের সহিত সংযুক্ত কুপনসমূহ দেখাইলেই সুদ পাওয়া যায়।

যৌথ কোম্পানিসমূহ ব্যতীত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহও ডিবেঞ্চার দ্বারা ঋণগ্রহণ করে। এগুলির কাজও স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে হয়।

দ্র Thomas Lewis, ed., *The Business Cyclopaedia and Legal Adviser*, vol II, London, 1956

অতুলকৃষ্ণ সুর

ডিভিডেন্ড যৌথ মূলধনী কারবারে লাভের যে, অংশ অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টিত হয়, তাহাকে ডিভিডেনড বলে। প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর ডিভিডেনড নির্দিষ্ট হারে দেওয়া হয়। কিন্তু অর্ডিনারি বা ইকুইটি শেয়ারের উপর নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেনড দেওয়ার কোনও প্রথা বা বিধান নাই। অর্ডিনারি বা ইকুইটি শেয়ারের উপর ডিভিডেনড যে কোনও হারে দেওয়া চলে। ডিভিডেনড ও ডিভিডেনডের হার কোম্পানির ডিরেক্টরগণের সুপারিশ অনুযায়ী অংশীদারগণের সভায় অনুমোদিত ও ঘোষিত হয়। উক্ত অনুমোদনের দিন হইতে ৪২ দিনের মধ্যে অংশীদারগণকে উক্ত ডিভিডেনড পেমেণ্ট করিবার বিধান ভারতীয় কোম্পানি আইনে নিবদ্ধ আছে। তিন বৎসরের মধ্যে ডিভিডেনড দাবি না করিলে ডিভিডেনড তামাদি হইয়া যায়।

[illegible]

ডিম যে সকল প্রাণীর যৌন প্রজনন হইয়া থাকে তাহাদের অনেকেই ডিম পাড়ে। অবশ্য স্তন্যপায়ী শ্রেণীর মধ্যে কেবল প্রোটোথেরিয়া উপশ্রেণীভুক্ত হংসচঞ্চু (প্লাটিপাস), একিডনা প্রভৃতি প্রাণীই ডিম পাড়িয়া থাকে।

ডিম্বাণু (ওভাম) তাহার চারি দিকে একাধিক ঝিল্লি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাদের বাহিরে একটি কঠিন খোলা, ইহাদের লইয়াই ডিম গঠিত। ডিম্বাণু ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন স্ত্রীযৌনকোষ। ইহার নিউক্লিয়াসে ক্রোমসোমের সংখ্যা দেহের অন্যান্য সাধারণ কোষের তুলনায় অর্ধেক। সুপরিণত হইবার সময় ডিম্বাণুর মধ্যে ভবিষ্যৎ ভ্রূণের জন্য খাদ্যবস্তু বা কুসুম সঞ্চিত হয়। স্তন্যপায়ী ও নিম্নস্তরের অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম্বাণুতে স্বল্প পরিমাণ কুসুম সাইটোপ্লাজমের সর্বত্র সমপরিমাণে ছড়াইয়া থাকে। সন্ধিপদ (আর্থ্রোপোডা) গোষ্ঠীর প্রাণীর ডিম্বাণুতে সাইটোপ্লাজম কুসুমের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকে।

পাখির ডিম্বাণুর নীচের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে কুসুম ও উপর দিকে অল্প পরিমাণে সাইটোপ্লাজ্‌ম্ বর্তমান। এই তিন প্রকার ডিমকে যথাক্রমে সমকুসুম (হোমোলেসিথাল), কেন্দ্রকুসুম (সেন্ট্রোলেসিথাল) ও পুচ্ছকুসুম (টেলো-লেসিথাল) ডিম বলে।

সাধারণতঃ সরীসৃপ ও পাখির ডিম্বাণু স্ত্রীদেহের ভিতরেই শুক্রাণুর সহিত মিলিত হইয়া নিষিক্ত হয়, মাছ ও উভচর প্রাণীর ডিম সাধারণতঃ স্ত্রীদেহের বাহিরে আসিবার পর নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুর পুনঃপুনঃ বিভাজনের ফলে ডিমের মধ্যে ভ্রূণের বিকাশ হইতে থাকে, অবশেষে ডিম ফুটিয়া পূর্ণাবয়ব শাবক বাহির হয়। কোনও কোনও জাতের মাছ, হাঙর, সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণীর ডিম বাচ্চা জন্মাইবার সময় পর্যন্তই মাতৃদেহের ভিতরে থাকিয়া যায়। পাখির ডিমে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বিশেষ তাপমাত্রার প্রয়োজন, সেজন্য ইহারা ডিমের উপর বসিয়া নিজদেহের তাপে ডিমকে উত্তপ্ত রাখে। অবশ্য মুরগি পালনের আধুনিক পদ্ধতিতে ইহার পরিবর্তে মুরগির নিষিক্ত ডিম ইনকিউবেটর যন্ত্রে কৃত্রিম উপায়ে উপযুক্ত তাপমাত্রায় রাখা হয়, যথাসময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় ('ইনকিউবেটর' দ্র)।

অনিষিক্ত ডিম হইতে সাধারণতঃ বাচ্চা হয় না। কিন্তু কোনও কোনও পতঙ্গ, কবচী প্রাণী (ক্রুস্টাশিয়া) প্রভৃতির ডিম্বাণু শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত না হইলেও ডিম হইতে বাচ্চা জন্মাইতে পারে। অনিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে ভ্রূণের এরূপ বিকাশকে পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি বলে। পুং-মৌমাছি এরূপ এক অপুংজনিজ প্রাণী। আবার ব্যাঙের বাচ্চা স্বাভাবিক অবস্থায় কেবল নিষিক্ত ডিম হইতে জন্মাইলেও কৃত্রিম উপায়ে অনিষিক্ত ডিম হইতে উহার ভ্রূণের বিকাশ ঘটিতে পারে ('ভ্রূণ' দ্র)।

ডিমের বিভিন্ন অংশ স্ত্রীজননতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গে উৎপন্ন হয়, ডিম্বাশয় হইতে ক্ষরিত স্ত্রীযৌনহর্মোনের দ্বারাই ডিমের অংশগুলির উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়। মুরগির ডিমের কেন্দ্রীয় হলুদ অংশটি সকুসুম ডিম্বাণু, ইহাই সাধারণভাবে কুসুম বলিয়া পরিচিত। ইহা ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয় হইতে বাহির হইয়া ইহা ডিম্বনালী দিয়া যোনির দিকে বাহিত হয়। সেই সময় ডিম্বনালীর ম্যাগ্‌নাম নামক দীর্ঘ সুগঠিত অংশের গ্রন্থিগুলির ক্ষরণে কুসুমের চারি পাশে অ্যাল্‌বিউমিন নামক শাদা অংশটি গড়িয়া ওঠে, ডিম্বনালীর পরবর্তী অংশে ইস্‌থ্‌মাস্‌-এ অ্যাল্‌বিউমিন স্তরের বাহিরে দুইটি ঝিল্লি উৎপন্ন হয়, ডিম্বনালীর শেষাংশ জরায়ুর ক্ষরণের ফলে ক্যালসিয়াম-প্রধান কঠিন খোলাটি তৈয়ারি হয় এবং সর্বশেষে যোনির গ্রন্থিগুলির ক্ষরণে খোলার গায়ে রঙ লাগে। অতঃপর ডিমটি যোনি দিয়া স্ত্রীদেহের বাহিরে আসে।

হাঁস ও মুরগির অনিষিক্ত ডিম মানুষের আহার্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ডিম জান্তব খাদ্য হইলেও প্রতীচ্যের বহু অঞ্চলে নিরামিষভোজীরা ডিম খাইয়া থাকে। হাঁস ও মুরগির ডিমের মধ্যে খাদ্যমূল্যের বিশেষ প্রভেদ নাই। মুরগির ডিমে শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ জল, ১২·৮ ভাগ প্রোটিন, ১১·৫ ভাগ স্নেহপদার্থ, ১ ভাগ অজৈব লবণ, ০·৭ ভাগ কার্বোহাইড্রেট ও কিছু ভিটামিন থাকে। পুষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়া ডিমের প্রোটিন অতিশয় উচ্চশ্রেণীর প্রোটিন, ইহাতে সকল প্রকার অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে এবং ইহার খাদ্যমূল্য দুধ বা মাংসের প্রোটিনের সমতুল্য। ডিমের প্রোটিন প্রধানতঃ তিন প্রকার— শাদা অংশের প্রোটিন ওভাল্‌বিউমিন ও ওভোগ্লোবিউলিন এবং কুসুমের প্রোটিন ওভোভিটেলিন, তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রোটিনে দুধের কেসিনের মতই ফসফরাস বর্তমান। ডিমের স্নেহপদার্থ অবদ্রব (ইমাল্‌শন) অবস্থায় থাকে, ইহা সুপাচ্য এবং ইহাতে অত্যাবশ্যক চর্বিজাতীয় অ্যাসিডের পরিমাণও যথেষ্ট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ডিমে অধিক পরিমাণে কোলেস্টেরল বর্তমান। অজৈব লবণের উপাদানগুলির মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহের উল্লেখ করিতে হয়, ডিমে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ দুধের তুলনায় কম, কিন্তু মাংসের তুলনায় বেশি। ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, থিয়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, পাইরিডক্‌সিন, বায়োটিন, ভিটামিন বি-১২ প্রভৃতি ভিটামিন ডিমে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রকৃতপক্ষে শিশুদের রিকেট্‌স রোগ নিবারণের মত পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি এবং ভুট্টাভোজীদের পেলাগ্রা রোগ প্রতিরোধের উপযোগী নিয়াসিন ডিমে বর্তমান। কুসুমের খাদ্যমূল্য শাদা অংশের তুলনায় অনেক বেশি— প্রায় সবটুকু স্নেহ-পদার্থ এবং অধিকাংশ প্রোটিন ও ভিটামিন কুসুমেই থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম ডিমে প্রায় ১৬০ কিলোক্যালরি এবং প্রতি ১০০ গ্রাম কুসুমে প্রায় ৩৫০ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপাদনের উপযোগী খাদ্যবস্তু আছে; ৬৪ গ্রাম ডিম খাইলে তাহা হইতে দেহে প্রায় ১০০ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে ('খাদ্য' দ্র)। শিশু, বালক, কিশোর, ক্রীড়াবিদ্‌, গর্ভবতী মাতা, রক্তাল্পতার রোগী প্রভৃতি প্রায় সকলের পক্ষেই ডিম অতি উত্তম খাদ্য। অল্পসিদ্ধ ডিম কঠিনসিদ্ধ ডিম অপেক্ষা উপকারী, কারণ

উত্তাপে তঞ্চনের ফলে প্রোটিন কঠিন হইয়া গেলে তাহার সহজপাচ্যতা ও খাদ্যমূল্য হ্রাস পায়।

নানা কারণে বহু পুষ্টিবিজ্ঞানী অত্যধিক ডিম খাওয়ার বিরোধী। ডিমে অধিক পরিমাণে কোলেস্টেরল থাকায় বেশি ডিম খাইলে দেহে কোলেস্টেরলের আধিক্য ঘটিতে পারে, কোলেস্টেরলের আধিক্য অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস রোগ ও উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ। ডিমের প্রোটিনগুলি অন্ত্রে পচন বৃদ্ধি করে এবং ইহারা অন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক নহে, এ হিসাবে ডিম দুধের তুলনায় নিকৃষ্ট। ডিমের শাদা অংশে অ্যাভিডিন নামক একটি প্রোটিন আছে, ইহা দেহে বায়োটিন নামক ভিটামিনের অভাব ঘটাইতে পারে, অবশ্য কুসুমে যে বায়োটিন থাকে তাহাই সাধারণতঃ অ্যাভিডিনের এরূপ কুফল রোধ করিতে পারে। ডিমে অম্ল উৎপাদক উপাদান অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় রক্তে ক্ষার ও অম্লের সাম্য ব্যাহত হইতে পারে। ইহা ছাড়া ডিমের অজৈব লবণগুলির পরস্পরের মধ্যে অনুপাত পুষ্টির পক্ষে সর্বোত্তম নহে। এই সকল কারণে আজকাল অনেকে ডিমের পরিবর্তে দুধের ব্যবহার বৃদ্ধির পক্ষপাতী। আধুনিক মত হইল, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সপ্তাহে ৪-৫টি ডিম আহার করা প্রয়োজন।

হাঁস ও মুরগির ডিম ছাড়া অন্যান্য পাখি, মাছ ও কচ্ছপের ডিমও অল্পাধিক মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। মেক্সিকোর আসতেক-জাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে হ্রদ অঞ্চলের একপ্রকার মাছির ডিমও আহার্যরূপে প্রচলিত ছিল।

শস্যই মুরগির প্রধান আহার্য, তাই ডিমের জন্য মুরগি পালন করিলে মনুষ্যখাদ্যের কিয়দংশ ব্যয় হয়। সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু পশুবিজ্ঞানী ডিম অপেক্ষা দুধ প্রচলনের এবং মুরগি অপেক্ষা গোরু পালনের উপর জোর দিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়া ও অন্য কয়েকটি দেশে আবার ডিমের জন্য কচ্ছপ পালনের চেষ্টাও করা হইয়াছে।

চিংড়ি-জাতীয় কোনও কোনও কবচী প্রাণীর ডিম উহাদের দেহ হইতে সংগ্রহ করিয়া বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়, পরে এই সংরক্ষিত ডিমগুলি লবণজল বা কৃত্রিম খাদ্যদ্রবে (কাল্চার মিডিয়াম) রাখিলে উহা হইতে শাবক বাহির হয় এবং অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছের খাদ্যরূপে এগুলি ব্যবহার করা যায়।

দ্র A. L. Romanoff & A. J. S Romanoff, *The Avian Egg*, New York, 1948; P D. Sturkie, *Avian Physiology*, New York, 1954; H. C. Sherman & C S. Lanford, *Essentials of Nutrition*, New York, 1957.

দেবজ্যোতি দাশ

ডিমিত্রিয়ুস গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্র

ডিম্বাশয় ওভারি। স্ত্রীজননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। ইহা একদিকে ডিম্বাণু (ওভাম) উৎপাদন করে, অপর দিকে রক্তে ঈস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরোন নামক দুইটি হর্মোন ক্ষরণ করে। ডিম্বাশয়ের এই উভয় কার্যই পিটুইটারি গ্রন্থির তিনটি যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ডিম্বাশয়ের হর্মোন দুইটিকে স্ত্রী-যৌন হর্মোন বলা হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সময় ইহাদের ক্ষরণ প্রথম আরম্ভ হয়। এই দুইটি হর্মোন জরায়ু, জরায়ুনালী প্রভৃতি স্ত্রী যৌনাঙ্গকে বর্ধিত ও কার্যক্ষম করে, স্ত্রী দেহের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করে এবং স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর চিত্তে যৌনবোধের সঞ্চার করে।

বয়ঃপ্রাপ্তি হইতে প্রায় ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত নারীর জননতন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি পরিবর্তন চক্রবৎ চলিতে থাকে ইহাদের ঋতুচক্র (মেনস্ট্রুয়াল সাইক্ল্) বলা হয় ('ঋতু' দ্র)। প্রত্যেক ঋতুচক্রের প্রথমার্ধে ডিম্বাশয় হইতে ঈস্ট্রোজেন হর্মোন ক্ষরিত হয়—ইহাই সে সময়ে জরায়ু ও অন্যান্য স্ত্রী যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায়। ঋতুচক্রের শেষার্ধে ডিম্বাশয় হইতে প্রোজেস্টেরোন হর্মোন ক্ষরিত হয় ও ইহা বিভিন্ন স্ত্রী যৌনাঙ্গের তৎকালীন পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। ঋতুচক্রের শেষে এবং ঋতুস্রাবের ঠিক পূর্বে ডিম্বাশয়ের হর্মোনগুলির ক্ষরণ কমিয়া যায়।

গর্ভধারণকালে ডিম্বাশয় হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রোজেস্টেরোন ক্ষরিত হয়, ইহারই প্রভাবে গর্ভকালে জরায়ুর বৃদ্ধি, ফুল (প্লাসেন্টা) সৃষ্টি, জরায়ুর সংকোচন হ্রাস, জন্মনালীর প্রসার, স্তনের বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। 'গর্ভ' ও 'স্তন' দ্র।

দেবজ্যোতি দাশ

ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান (১৮০৯-৩১ খ্রী) অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কবি, শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। ডিরোজিওর নাম বাংলার উনবিংশ শতকের নবজাগৃতির ইতিহাসে স্মরণীয়। পিতা প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ফ্রান্সিস্ ডিরোজিও, মাতা সোফিয়া জনসন ভাগলপুরস্থ ইংরেজ নীলকর আর্থার জনসনের সম্পর্কীয়া ভগ্নী। ডিরোজিও কলিকাতাস্থ ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।

ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান

স্কটল্যাণ্ডনিবাসী প্রেসবিটারিয়ান যুক্তিবাদী খ্রীষ্টান ডেভিড ড্রামণ্ডের (১৭৮৭-১৮৪৩ খ্রী) ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে ডিরোজিওর শিক্ষালাভ (১৮১৫-২২ খ্রী) হয়। ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে তিনি অল্প বয়সেই ব্যুৎপন্ন হন। ড্রামণ্ডের শিক্ষাগুণে কৈশোরেই ডিরোজিও সংস্কারমুক্ত উদার ও যুক্তিবাদী হইয়া ওঠেন। শিক্ষান্তে ডিরোজিও জেম্‌স স্কট অ্যাণ্ড কোম্পানির সওদাগরি অফিসে কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু উহা মনঃপূত না হওয়ায় অল্পকাল পরে তিনি কর্মব্যপদেশে ভাগলপুরে দূর সম্পর্কের মাতুলের নীলকুঠিতে যান। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে তিনি অনেকগুলি সুন্দর কবিতা লেখেন, তন্মধ্যে 'ফকির অফ জাংঘিরা' খণ্ডকাব্যটি নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ জ্ঞান করিতেন। এই খণ্ডকাব্যের প্রথমেই তিনি বন্দনা গীতিতে ভারতবর্ষের তৎকালীন হীন দশার উল্লেখ করিয়া খেদোক্তি করিয়াছেন। তাঁহার কোনও কোনও কবিতা 'জুভেনিস' ছদ্মনামে জন গ্রান্ট সম্পাদিত কলিকাতার 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়।

ডিরোজিও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। তিনি ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্য পড়াইতেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, অমায়িক ব্যবহার এবং প্রগাঢ় মমত্ববোধহেতু ছাত্রগণ অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পড়াইবার রীতি ছাত্রদের জ্ঞান-পিপাসা ও বিচারশক্তিকে জাগ্রত করে। তাঁহার ছাত্রগণ ডিরোজিওর অভিনব শিক্ষাদানরীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ডিরোজিওর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের অনেকেই পরে বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়াছিলেন, যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৫-৮৫ খ্রী), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮ খ্রী), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮ খ্রী), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮ খ্রী), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০ খ্রী), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩ খ্রী), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০ খ্রী), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮ খ্রী) প্রভৃতি। ইঁহারাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে আখ্যাত হন ('ইয়ং বেঙ্গল' দ্র)।

কলেজের ছাত্রগণ ক্লাসে ডিরোজিওর পড়া শুনিয়াই শুধু তৃপ্ত হইতেন না, তাঁহারা অবসর সময়ে, ছুটির পরে এবং কখনও কখনও ডিরোজিওর গৃহে গিয়া তাঁহার উপদেশ লইতেন। তাঁহার নির্দেশে ছাত্রগণ ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও নীতিবিষয়ক বিবিধ পুস্তকাদি পড়িতে যত্নবান হইতেন। সেইপ্রকার সমবেত আলাপ-আলোচনার ফলে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ডিরোজিও ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ছাত্র উমেশচন্দ্র বসু সম্পাদক। প্রথমে ডিরোজিওর বাসভবনে, পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলাস্থ বাগানবাড়িতে (বর্তমান ওয়ার্ড্‌স ইনস্টিটিউশন স্ট্রীট) এই সভার অধিবেশন হইত। সভায় পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হইত। প্রত্যেকটি বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি বলিবার আছে সে সম্বন্ধে ডিরোজিও বক্তব্য পেশ করিয়া ছাত্রগণকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে উপদেশ দিতেন। সভার কোনও কোনও অধিবেশনে ডেভিড হেয়ার, বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগ দিতেন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শে কলিকাতার ছাত্রসমাজে আরও ৭টি বিতর্ক-সভা স্থাপিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে ডিরোজিও যুক্ত হইয়া পড়েন। ডেভিড হেয়ারের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার পটলডাঙ্গা স্কুলে (বর্তমান হেয়ার স্কুল) ডিরোজিও একপ্রস্থ বক্তৃতা দেন। এখানে হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। ডিরোজিওর যুক্তিনিষ্ঠ বিচার ও সর্ব-প্রকার অন্ধবিশ্বাস পরিহার করার শিক্ষা ছাত্রদের চিত্তে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়ন জাগায়। ধর্মান্ধতা ও সামাজিক বিধি নিষেধের উদ[illegible]দল খড়্গহস্ত হইয়া ওঠেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহারা সরকারি বিধিব্যবস্থা এবং সামাজিক রীতিনীতির উপর প্রতিকূল ও নিন্দাত্মক মতামত ব্যক্ত করেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণের পক্ষে সহ-সভাপতি হোরেস হেম্যান উইলসন দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির হইবার পূর্বেই ইহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। ছাত্রেরা শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্মেরও বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হন। হিন্দু ছাত্রদের মদ্যপান, নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ ও আচারভ্রষ্টতা হিন্দু-সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সার্কুলার জারি করিয়া ছাত্রদিগকে ও শিক্ষকগণকেও ধর্ম বা রাজনীতি-সম্বন্ধে আলোচনামূলক সভাসমিতিতে যোগ দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অনেকেরই উগ্রতা প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই বাড়িয়াই চলিল।

শিক্ষক ডিরোজিওর সম্বন্ধেও সত্য-মিথ্যা নানা গুজব রটিতে লাগিল এবং পত্র-পত্রিকাদিতেও তীব্র নিন্দাবাদ চলিতে লাগিল। অভিভাবকগণ অনেকে আতঙ্কিত হইয়া নিজ নিজ সন্তানদের কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল, অধ্যক্ষসভার এক বিশেষ অধিবেশনে ডিরোজিওকে কলেজ হইতে অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই তারিখে এক পত্রে উইলসন এই সিদ্ধান্তের কথা ডিরোজিওকে জানাইয়া তাঁহাকে নিজ হইতে পদত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। উত্তরে ডিরোজিও অধ্যক্ষসভার সিদ্ধান্তের ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেও পদত্যাগপত্র পেশ করেন (২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ খ্রী)

ইহার পর ডিরোজিও পুরাপুরি সংবাদপত্রের সেবায় মন দিলেন। অল্পকাল 'হেসপারাস' নামে একখানি প্রতিবাসরীয় (একদিন অন্তর একদিন) পত্র সম্পাদন করিয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' দৈনিক প্রকাশ করেন। এই সময়ে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাদি বাহির হইত। নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও ডিরোজিওর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। ডিরোজিওর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর ধরা পড়ে। ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে ডিরোজিওর প্রত্যয় যে দ্বিধাহীন ছিল সে কথা তিনি একটি চতুর্দশপদী কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়. ১. 'পোয়েম্‌স' (১৮২৭ খ্রী), ২. 'দি ফকির অফ জাংঘিরা' (১৮২৮ খ্রী)। মৃত্যুর পর তাঁহার ২টি কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর, কলিকাতায় ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। পার্ক স্ট্রীটে পুরাতন গোরস্থানে তাহাকে সমাহিত করা হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১-৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৯, ১৩৪০ ও ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, যোগেশচন্দ্র বাগল, 'কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [প্রথম জীবন]', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রাজনারায়ণ বসু, হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য -সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, যোগেশচন্দ্র বাগল, 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, কলিকাতা, ১৯৬১, যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলিকাতা, ১৯৬৩, পল্লব সেনগুপ্ত, 'ডিরোজিওর কবিতা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, Peary Chand Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare*, Calcutta, 1877; Thomas Edwards, *Henry Derozio: The Eurasian Poet, Teacher and Journalist*, Calcutta, 1884; J C. Bagal, 'Henry Derozio, *Modern Review*, June, 1934; J C. Bagal, 'The Hindu College', *Modern Review*, December, 1955, *Presidency College Magazine*, vol 41, April, 1959; Elliot Walter Madge, *Henry Derozio: The Eurasian Poet and Reformer*, Subir Ray Choudhuri, ed., Calcutta, 1967.

যোগেশচন্দ্র বাগল

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড জেলা বোর্ড দ্র

ডিসেন্টি অ্যামিবা ও বক্ত আমাশয় দ্র

ডুপ্লে দ্যুপ্লেক্স দ্র

ডুবুরি বহু কাল হইতেই সমুদ্রের তলায় নামিয়া রত্ন, শঙ্খ, প্রবাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। পূর্বকালে ডুবুরিদের বিশেষ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি থাকিত না। পরবর্তী কালে জলের নীচে দীর্ঘ ক্ষণ থাকিবার জন্য ডুবুরিদের বিশেষ ধরনের পোশাকের ব্যবস্থা হয়। উপর হইতে এই পোশাকের মধ্যে বায়ুপ্রবাহের বন্দোবস্ত ছিল। ইহাতে ডুবুরির শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্য হইত। পোশাকটি জল-নিরোধক।

সাম্প্রতিক কালে ডুবুরির পোশাক স্বয়ংসম্পূর্ণ, জলের উপর হইতে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ডুবুরির পিঠে ধাতুনির্মিত অক্সিজেন সংমিশ্রিত বায়ুপূর্ণ ভাণ্ড থাকে। এই বায়ুভাণ্ড হইতে একটি নল মাউথ্‌পীসের (মুখের অংশ) সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। মাউথ্‌পীসটি ঠোঁট ও দাঁতের মাঝখানে আঁটিয়া থাকে। নলের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের ভাল্‌ব আছে। এই ভাল্‌বের বৈশিষ্ট্য হইল ইহা বায়ু প্রবেশ করিতে দেয় কিন্তু জল প্রবেশ করিতে বাধা দান করে। জলের তলা হইতে উঠিতে মনস্থ করিলে ডুবুরি বায়ু ভাণ্ড হইতে আনীত বাতাসের সাহায্যে তাহার পোশাক ফুলায়। ফলে ভাসিয়া ওঠা সহজ হয়। পোশাকের সাহায্য লইয়া ডুবুরিরা জলপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮৪ মিটার (২৭৫ ফুট) নিচু পর্যন্ত যাইতে পারিয়াছে।

অমিয়কুমার মজুমদার

ডুবোজাহাজ টর্পেডোর সাহায্যে বাণিজ্যপোত এবং রণপোত ধ্বংস করিবার জন্য যুগপৎ জলের উপরে এবং নীচে চলাচলের উপযোগী এক প্রকারের যুদ্ধযান

('জলযান' দ্র)। আড়াআড়িভাবে ডুবোজাহাজের আকৃতি প্রায় গোলাকার এবং দুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ডুবোজাহাজ দুই কাঠামোবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহাতে দুইটি বহিরাবরণ বর্তমান এবং এই দুই বহিরাবরণের অন্তর্বর্তী প্রদেশ জল অথবা হাওয়ার দ্বারা পূর্ণ করা হয়। ভিতরের আবরণটি খুব মজবুত ধরনের হওয়া চাই, যাহাতে জলের নীচে অবস্থানকালে বহির্দেশের জলের চাপ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

জলের উপরে চলাচলব্যবস্থায় ডুবোজাহাজ অন্য যে কোনও সাধারণ জলযানের মত। তবে ইচ্ছামত জলে ওঠা নামা করার জন্য ট্যাঙ্ক এবং ডুবো-ডানা ব্যবহার করা হয়। এতদ্ব্যতীত দৈর্ঘ্য বরাবর ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রান্ত ভাগে সমভার (ট্রিম) ট্যাঙ্ক বর্তমান থাকে।

সাধারণ ডুবোজাহাজে যুগপৎ ডিজেল ইঞ্জিন এবং ইলেকট্রিক মোটর থাকে। ডিজেল ইঞ্জিন চালনায় শুদ্ধ বাতাসের প্রয়োজন হয় বলিয়া কেবলমাত্র জলের উপরে এই ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় এবং জলের নীচে ইলেকট্রিক মোটর ডিজেল এঞ্জিনের স্থান অধিকার করে। তবে ইলেকট্রিক ব্যাটারি পুনরুজ্জীবিত করিবার নিমিত্ত ডুবোজাহাজকে মধ্যে মধ্যে জলের উপর উঠিয়া আসিতে হয়। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির দ্বারা চালিত ডুবোজাহাজ অপরিমিত সময় জলের তলদেশে অবস্থান করিতে পারে, কারণ পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানির জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয় না।

ডুবোজাহাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—১. এক বা অধিক পেরিস্কোপ বা দর্শনযন্ত্র ২. জলের উপর হইতে বাতাস সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে জার্মানী কর্তৃক আবিষ্কৃত 'স্নরকেল্' নামে এক ফাঁপা নলবিশিষ্ট যন্ত্র ৩. জলের তলদেশে চলাচলকালে ইঞ্জিন ও অপরাপর যন্ত্রপাতির আওয়াজ যাহাতে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম না করে, তাহার বিধিব্যবস্থা এবং ৪. বিপদের সময় জলের তলদেশে ডুবোজাহাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার জন্য বায়ুচাপযুক্ত ত্রাণকক্ষ ইত্যাদি।

কর্মভেদে বিভিন্ন প্রকারের ডুবোজাহাজের প্রচলন আছে। ডুবোজাহাজের সাফল্যজনক ব্যবহার প্রথম দৃষ্ট হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, রবার্ট ফুল্টনের 'নটিলাস' ডুবোজাহাজটির ক্ষেত্রে। নটিলাসই আধুনিক ডুবোজাহাজের আদি রূপ। প্রথম মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষই ব্যাপকভাবে ডুবোজাহাজের ব্যবহার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রেডারের সাহায্যে উড়োজাহাজ হইতে জলের তলায় ডুবোজাহাজ ধ্বংসের বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জলের নীচে দীর্ঘ কাল ধরিয়া চলাচলের উপযুক্ত দ্রুতগামী ডুবোজাহাজের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম পারমাণবিক শক্তির দ্বারা চালিত 'নটিলাস' ডুবোজাহাজটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জলে ভাসানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'ট্রিটন' জলের নীচে থাকিয়া ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। জলের অভ্যন্তর হইতে ক্ষেপণাস্ত্রনিক্ষেপের উপযোগী 'জর্জ ওয়াশিংটন' প্রভৃতি ডুবোজাহাজগুলি একাদিক্রমে কয়েক মাস পর্যন্ত জলের নীচে অবস্থান করিতে পারে।

ভবিষ্যতে আশা করা যায় যে, ডুবোজাহাজগুলি গভীরতর জলে অধিকতর দ্রুতবেগে চলাচলে সক্ষম হইবে। ডুবোজাহাজের ব্যবহারসম্পর্কে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন বিশেষ প্রয়াস করিতেছে।

দ্র National Research Council, Committee on Undersea Warfare, *Bibliography of the Submarine : 1557-1953*, Washington, D. C., 1954, R Blackman, ed, *Jane's Fighting Ships* (Annual)

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

ডুমুর বট গোত্রের (ফ্যামিলি-মোরাসিঈ, Family-Moraceae) অন্তর্ভুক্ত বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ বা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণ ডুমুর বা কাক ডুমুর (ফিকস হিস্পিদা, *Ficus hispida*) ভারতের প্রায় সর্বত্র জন্মিয়া থাকে। ইহার সকল পত্রগুলি রোমশ। পাতা ও শাখার মধ্যে দুধের মত শাদা আঠা বা তরুক্ষীর (ল্যাটেক্স) বর্তমান। ফুল একলিঙ্গ। ফুলগুলি উদুম্বরবিন্যাস (হাইপ্যানথোডিয়াম) নামক পুষ্পবিন্যাসের অভ্যন্তরে জন্মায় বলিয়া বাহির হইতে দেখা যায় না, এই পুষ্পবিন্যাস ও তাহার সকল আভ্যন্তরীণ অঙ্গ লইয়াই ডুমুরের ফল উৎপন্ন হয়। কচি ফল সবজি এবং কখনও কখনও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুমিষ্ট ফলের জন্য ফিকস কারিকা (*F carica*) প্রজাতির ডুমুর প্রসিদ্ধ। ইহার কাঁচা ও শুষ্ক ফল খাওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে ইহার চাষ আছে। বিখ্যাত স্মার্না ও ক্যাপ্রি জাতের ডুমুর এই প্রজাতির অন্তর্গত। শুষ্ক ফলে শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ জল, ৬৮ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ৪ ভাগ প্রোটিন, অল্প স্নেহপদার্থ এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম,

পটাসিয়াম ও লৌহ -ঘটিত অজৈব লবণ থাকে। ফল মৃদু বিরেচক।

দ্র Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India : Raw Materials*, vol. IV, New Delhi, 1956.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ডুয়ার্স হিমালয়ের পাদদেশে সমতল ও অরণ্যপূর্ণ তরাই অঞ্চলের পূর্বাংশ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮৮ কিলোমিটার (১৮০ মাইল) ও প্রস্থ প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল)।

ডুয়ার্স অঞ্চলকে ভুটান রাজ্যে প্রবেশের দ্বারপথ (দুয়ার) বলা হয়। পূর্বে এই অঞ্চল ভুটানের অন্তর্গত ছিল। ভুটান যুদ্ধের পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অঞ্চলকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা ও পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

ডুয়ার্সের উত্তর পশ্চিম দিকে ৩৫০/৪৫০ মিটার (১২০০/১৫০০ ফুট) উচ্চ মালভূমি। পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে ১২০ মিটার (৪০০ ফুট) উচ্চ ভূমেশ্বর পর্বত একমাত্র উচ্চভূমি। অবশিষ্ট অঞ্চল প্রায় সমতল ও তিস্তা, জলঢাকা, মানস, চম্পাবতী, গঙ্গাধর প্রভৃতি নদী দ্বারা বিধৌত। জমির ঢাল উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে। উত্তরাংশের ভূমি দক্ষিণ অপেক্ষা অধিক প্রস্তরময়।

ডুয়ার্সের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৪৫০০ মিলিমিটার (১৮০ ইঞ্চি)।

পূর্বে সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চল দীর্ঘ তৃণ, শরবন ও ঘন অরণ্যে পূর্ণ ছিল। শাল ও জারুল এ অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ। বর্তমানে অধিকাংশ অঞ্চল পরিষ্কার করিয়া চাষ-আবাদ করা হইতেছে। ধান, তামাক ও পাট এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উত্তরাংশে ও পশ্চিম ডুয়ার্সে তিস্তা নদীর পূর্ব দিকের মালভূমিতে চা-বাগান আছে। ডুয়ার্স অঞ্চলের জনবসতি খুব ঘন নয়। আলিপুর, বক্সা, ফালাকাটা ও ময়নাগুড়ি এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। ডুয়ার্সের সংরক্ষিত অরণ্যে বিশেষ বিশেষ বন্য পশুর সংরক্ষণাগার (স্যাংচুয়ারি) আছে। ইহাদের মধ্যে জলদাপাড়া, মহানন্দা ও গোরুমারা সংরক্ষণাগার উল্লেখযোগ্য।

দ্র *The Imperial Gezetteer of India*, vol. XI, *Oxford*, 1909 ; *West Bengal District Handbook : Jalpaiguri*, Calcutta, 1951.

অনিন্দ্যকুমার পাল

ডুয়োডেনাল আলসার পেপটিক আলসার দ্র

ডুরাণ্ড লাইন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিশনের সাহায্যে নির্দিষ্ট ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী সীমারেখা। তদানীন্তন সরকারের বৈদেশিক সচিব স্যর মর্টিমার ডুরাণ্ড এই কমিশনের সভাপতি থাকায় এই সীমারেখাকে ডুরাণ্ড লাইন বলা হয়। বর্তমানে ডুরাণ্ড লাইনকে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বলা যায়। ইহা সফেদ কোহ্ পর্বতের দক্ষিণে সফেদ কোহ্ এবং কাবুল নদীর মধ্য স্থলে স্থিত এবং ইহার এক অংশ কুনারের পূর্ব দিক দিয়া প্রসারিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজ সরকার ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সীমারেখা আবিষ্কার করিতে প্রয়াস করেন। বৈজ্ঞানিক সীমারেখার কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই, তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বহিরাগত শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিতে যে সীমারেখা সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহাই বৈজ্ঞানিক সীমারেখা। এই অবস্থায় বৈজ্ঞানিক সীমারেখা লইয়া মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। ইংরেজ কূটনীতিকেরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দলের মত ছিল যে, কান্দাহার অধিকার করিয়া ভারতের সীমারেখা কান্দাহারে স্থাপন করা এবং দ্বিতীয় দলের মতে ভারতের সীমারেখা সিন্ধু নদের তীরে হওয়া উচিত। ডুরাণ্ড লাইন উভয় মতের মধ্যে আপস করিয়াছিল।

দেশরক্ষার দিক হইতে ডুরাণ্ড লাইন বিফল হইয়াছিল, এ কথা বলা যায় না। তবে সীমান্তের উপজাতিগুলির ঐক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এই সীমারেখা গঠন করার ফলে এই লাইন সীমান্তে গুরুতর অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল।

অশোক মজুমদার

ড্যুরের, আল্‌ব্রেখ্‌ট (১৪৭১-১৫২৮ খ্রী) প্রসিদ্ধ জার্মান চিত্রশিল্পী। ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত নুরেমবের্গ শহরে ড্যুরের জন্মগ্রহণ করেন।

ড্যুরের ১৫০৫-০৭ খ্রীষ্টাব্দ ২ বৎসর ইটালীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্রকলায় ইটালীয় প্রভাব কোথাও কোথাও সুস্পষ্ট কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা নিঃসন্দেহ যে তিনি কখনও ইটালীয় গুণীদের অনুকরণ করেন নাই। তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে অনুরক্ত ছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপেই নিজস্ব এক চিত্ররীতি প্রবর্তিত করেন। তাঁহার চিত্রের নরনারীর রূপ আদর্শপ্রসূত নহে। অনেকাংশে স্থানীয়

জার্মান নরনারীর ন্যায় এবং নিজের চেষ্টাতেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিত্রে তিনি পরিপ্রেক্ষিত আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমসাময়িক গথিক রীতির বলিষ্ঠতা, বিষয়বস্তু ও পারিপার্শ্বিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন এবং গ্রীসীয় শিল্পের সুসমঞ্জসতা তাঁহার চিত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রতিকৃতি-রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। পশ্চিম ইওরোপের যুগসন্ধিক্ষণে ড্যুরেরই নবযুগের অগ্রদূত।

তৈলচিত্র ব্যতীত রেখাচিত্র, উডকাট (কাঠখোদাই) ও এন্‌গ্রেভিং-এ তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। সাবলীল ও প্রাণবন্ত রেখা এইগুলির বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ এন্‌গ্রেভিং ও উডকাটেই তাঁহার শিল্পশিক্ষার সূত্রপাত। সর্বতোমুখী প্রতিভা চিত্রকলার ইতিহাসে তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার খ্যাতি দেশে ও বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী পৃথিবীর নানা সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে 'ফোর সেন্ট্‌স', 'অ্যাডোরেশন অফ মেইজাই' এবং 'ফোর হর্‌স্‌মেন অফ অ্যাপোকালিপ্‌স' (উডকাট) প্রভৃতি চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অমরেন্দ্রনাথ রায়

ডেডেকিন্ড, জুলিয়ুস (১৮৩১-১৯১৬ খ্রী) জার্মান গণিতজ্ঞ। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর ডেডেকিন্ড-এর জন্ম হয়। তিনি প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ গাউসের ছাত্র ('গাউস, কার্ল ফ্রিড্‌রিখ' দ্র)। বাস্তব সংখ্যার তত্ত্ব ও বীজগণিতীয় সংখ্যার তত্ত্ব, এই দুই তত্ত্ব গণিতশাস্ত্রে ডেডেকিন্ডের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। মূলদ সংখ্যাসমূহের (র‍্যাশনাল নাম্বার= $\frac{p}{q}$, p, q পূর্ণসংখ্যা এবং q শূন্য নহে) ছেদ (কাট)-এর সাহায্যে তিনি অমূলদ সংখ্যার (ইর‍্যাশনাল নাম্বার) সংজ্ঞা দেন এবং প্রমাণ করেন যে, বাস্তব সংখ্যা-সমূহ (মূলদ ও অমূলদ সংখ্যাসমূহ) হইতে ছেদের সাহায্যে কেবলমাত্র বাস্তব সংখ্যাই পাওয়া যায়। তিনিই বীজ-গণিতে 'আইডিয়াল'-এর ধারণা প্রবর্তন করেন এবং বীজগণিতীয় পূর্ণসংখ্যাসমূহ যে এক ও অভিন্নভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষ্য, ইহা তদ্দ্বারা প্রমাণ করেন।

দ্র J. Dedekind, *Essays on the Theory of Numbers*, 1924 ; E T. Bell, *The Men of Mathematics*, 1937.

শক্তিকান্ত চক্রবর্তী

ডেভি ল্যাম্প অন্ধকার খাদের (মাইন) মধ্যে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ ধরনের বাতি। কয়লার খাদে সৃষ্ট মার্শ গ্যাস (Marsh Gas) বাতাসের সহিত মিশ্রণে একটি সহজদাহ্য বিস্ফোরক সৃষ্টি করে। ইহার দহনাঙ্ক ৭০০° হইতে ৭৫০° সেন্টিগ্রেড, তজ্জন্য খাদে মোম বা কেরোসিনের সাধারণ বাতি ব্যবহার করা বিপজ্জনক। ইহার প্রতিকার-কল্পে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর হাম্‌ফ্রে ডেভি (১৭৭৮-১৮২৯ খ্রী) এই ল্যাম্প উদ্ভাবন করেন। ইহা কেরোসিনে জ্বলে এবং সাধারণ দেওয়ালবাতির মতই চিমনির নিম্ন ভাগ হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হয়। কিন্তু চিমনির উপরিভাগ তামার বা লোহার তারজালি দ্বারা নির্মিত। ঐ ধাতুর দ্রুত তাপপরিবহন শক্তির ফলে ল্যাম্প হইতে নির্গত তাপ বাহিরের গ্যাসমিশ্রিত বায়ুর সংস্পর্শে আসার পূর্বেই প্রজ্বলনক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। অথচ বাহিরের বায়ু ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে এবং উহাতে মার্শ গ্যাস মিশ্রিত থাকিলে নীলাভ শিখায় জ্বলিতে থাকে এবং পরিমাপক গজের সাহায্যে নীলাভ রশ্মি হইতে খনিতে বিদ্যমান গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ও গ্যাসের আধিক্য হইলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা হয়। ইহার তাপে বাহিরের গ্যাসমিশ্রিত বায়ু উত্তপ্ত হইয়া দহনাঙ্কে পৌঁছিতে পারে না বলিয়াই ইহার নাম ডেভি-র নিরাপত্তাবাতি (ডেভিজ সেফ্‌টি ল্যাম্প)।

আবিষ্কারের পর হইতে ইহার নির্মাণপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা ইহাকে বহুভাবে উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলনের পর হইতে খনিতে কেবলমাত্র দাহ্য গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যই ইহা ব্যবহার করা হয়।

মণীন্দ্রমোহন লাহিড়ী

ডেভিস কাপ আমেরিকার জাতীয় ডাব্‌ল্‌স টেনিস চ্যাম্পিয়ান ডুইট এফ. ডেভিস-প্রদত্ত ট্রফি। বিশ্বের প্রধানতম অপেশাদার ও দলগত টেনিস প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ডেভিস কাপ খেলা হয় দেশে দেশে, দলে দলে। বর্তমান নিয়মানুযায়ী আন্তর্জাতিক টেনিস-নিয়ামক সংস্থার অনুমোদিত যে সকল দেশ ডেভিস কাপ-প্রতিযোগিতায় নাম পাঠায় তাহাদের বাছাই পর্বের আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ফলাফলে যে দেশ শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি পায় সেই দেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে পূর্ব বৎসরের ডেভিস কাপ-বিজয়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার অর্জন করে। সাধারণভাবে, ফাইনাল বা চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা বলিতে যাহা বুঝায় চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের মর্যাদা অবিকল তাহাই। পূর্ববিজয়ী চিরদিনই

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উন্নীত হইয়াই থাকে এবং পূর্ব বৎসরের বিজয়ীর স্বদেশেই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ডেভিস কাপ-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম বর্ষে খেলা হইয়াছিল বস্টন শহরে লংউড ক্রিকেট ক্লাবের কোর্টে। ডেভিস কাপের সূচনা হইয়াছিল আমেরিকা ও ব্রিটেনের দ্বৈত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষে। ক্রমে ক্রমে দেশে দেশে টেনিসের ব্যাপক প্রসার ঘটায় বিশ্বের নানা প্রান্তের জাতীয় দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে থাকে।

ডেভিস কাপের প্রথম ছয়টি অনুষ্ঠানে হয় আমেরিকা আর নাহয় ব্রিটেন বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সম্মিলিত অস্ট্রেলেশিয়া দল এই প্রতিযোগিতা জয় করে। অস্ট্রেলেশিয়া আরও ছয় বার এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠের সম্মান লাভ করিয়াছে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অস্ট্রেলিয়া এককভাবে ডেভিস কাপে অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। একক ও নিউজিল্যাণ্ডের সহিত দ্বৈত-ভাবে খেলিয়া অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একুশবার ডেভিস কাপ জয় করিয়াছে।

আমেরিকা ডেভিস কাপ জয় করিয়াছে অদ্যাবধি উনিশ বার, ব্রিটেন নয় বার এবং ফ্রান্স ছয় বার। দীর্ঘদিন ডেভিস কাপে অংশ লওয়া সত্ত্বেও বহু দেশ এখনও পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভারত ১৯৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রমানাথন কৃষ্ণাণের নেতৃত্বে মাত্র এক-বারের জন্য চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। সেই দলের আর এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।

অজয় বসু

ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র দ্র

ডেয়ারি গবাদি পশুর পালন ও প্রজনন এবং উৎপন্ন দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির বিপণন -ব্যবস্থার সংস্থা। ভারতে সচরাচর তিন প্রকার দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান দেখা যায়: ১. সমবায় দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান: যথা— কাতরা সমবায় ডেয়ারি-সমিতি (১৯১২ খ্রী) ও কলিকাতা সমবায় দুগ্ধ-সমিতি (১৯১৯ খ্রী) ২. ছোট ডেয়ারি, ইহাদের কোনও কোনওটির নিজস্ব গাভী আছে, আবার ইহাদের কতকগুলি দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া বিপণনের ব্যবস্থা করে ৩. বড় ডেয়ারি, ইহাদের নিজস্ব গাভী থাকে এবং উৎপন্ন দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিপণন করে। বর্তমানে অনেক রাজ্যেই রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন ডেয়ারি আছে, যেমন মহারাষ্ট্রের আরে দুগ্ধ-কলোনি ও ডেয়ারি এবং পশ্চিম বঙ্গের হরিণঘাটা দুগ্ধ-কলোনি ও কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় ডেয়ারি।

সাফল্যের সহিত গো-পালনের জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে শীতকালে ঠাণ্ডা না লাগে, বর্ষায় শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকে এবং পর্যাপ্ত আলো হাওয়া পাওয়া যায়, এমন গোশালা নির্মাণ করিতে হয়। গোশালার মেঝে কংক্রিটের হওয়াই ভাল, মেঝে নর্দমার দিকে ঢালু থাকিবে। ছাদ কাঠ বা লোহার ফ্রেমের উপর টিন দিয়া করা যায়। খাদ্য দিবার জন্য পাকা চৌবাচ্চা থাকা দরকার। গোরু প্রতি ১৬৫ × ৯০ সেন্টিমিটার পরিমাণ স্থান দেওয়া উচিত।

গোরুর খাদ্য হিসাবে নেপিয়ার, গিনি, লুসার্ন, ভুট্টা প্রভৃতি ঘাস উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ১ ভাগ চুনী, ২ ভাগ ভুষি বা তুষ ও ১ ভাগ খইলের মিশ্রণে উৎপন্ন সুসার খাদ্য এবং ২ ভাগ লবণ, ১ ভাগ বিশোধিত অস্থিচূর্ণ ও ১ ভাগ খড়ি গুঁড়ার মিশ্রণে প্রস্তুত খনিজ মিশ্রণও খাদ্যের অঙ্গ। সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক গোরুর প্রাত্যহিক চাহিদা ৩½-৪½ কিলোগ্রাম শুষ্ক ঘাস বা ভুষি, প্রায় ১৩-১৭ কিলোগ্রাম সবুজ ঘাস ও ১ কিলোগ্রাম সুসার খাদ্য, মহিষের প্রয়োজন উহার ১½ গুণ। দুধেল গাভী ও মহিষকে প্রতি ২ কিলোগ্রাম দুধের জন্য আরও ১ কিলো-গ্রাম হিসাবে সুসার খাদ্য দিতে হয়। প্রজননকার্যে নিযুক্ত ষাঁড়কে অতিরিক্ত ২ কিলোগ্রাম এবং গর্ভধারণকালের শেষ ২-৩ মাস গর্ভবতী গাভী বা মহিষকে অতিরিক্ত ১ কিলোগ্রাম সুসার খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। কৃষি বা বহন কার্যে নিযুক্ত বলদকে প্রয়োজনানুসারে ১-২½ কিলোগ্রাম সুসার খাদ্য দিতে হয়। গো মহিষের খাদ্যে ৬০-১২০ গ্রাম লবণ ও সামান্য খনিজ-মিশ্রণ অত্যাবশ্যক। প্রচুর ও পরিষ্কার পানীয় জল দেওয়া উচিত।

জন্মের পর গোশাবককে প্রথম ৪-৫ দিন মাতৃস্তন-নিঃসৃত গাঁজলা দুধ ও তদভাবে কডলিভার তৈল এবং ডিম মিশ্রিত দুধ খাওয়ানো হয়। ৩ সপ্তাহ বয়স হইতে একটু খড় ও কিছু সুসার খাদ্য এবং ২-৬ মাস বয়সে ১-৩ কিলোগ্রাম সুসার খাদ্য দেওয়া যায়।

গাভীর দুগ্ধোৎপাদন ও বলদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত প্রজননের দ্বারা গবাদি পশুর উন্নয়ন প্রয়োজন। যে সকল অঞ্চলে বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত গোরু আছে সেখানে নির্বাচনের (সিলেক্শন) মাধ্যমে উন্নততর প্রজাতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যত্র দুধেল জাতের (যথা জার্সি, আয়ারশায়ার প্রভৃতি ইওরোপীয় জাতের) ষাঁড়ের সহিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট দেশীয় জাতের গাভীর সংকরায়ণ

দ্বারা দেশীয় গাভীর দুগ্ধোৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইচ্ছানুযায়ী প্রজননের জন্য কৃত্রিম গর্ভাধান-পদ্ধতিও প্রচলিত হইয়াছে ('গোরু' দ্র)।

সার্থক গো-পালনের জন্য পশুচিকিৎসকের সাহায্যে রিণ্ডারপেস্ট, অ্যান্থ্রাক্স, যক্ষ্মা, ব্রুসেলোসিস, পেটফোলা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারণ করা অপরিহার্য।

সাধারণতঃ দিনে দুইবার দোহন করা হয়; পালান বহুক্ষণ দুধে পূর্ণ থাকিলে দুগ্ধস্রাবী কোষগুলির ক্ষরণশক্তি হ্রাস পায়। জীবাণুমুক্ত পাত্রে এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে (সম্ভব হইলে যান্ত্রিক উপায়ে) গোদোহন করা উচিত। বর্তমানে অধিকাংশ উন্নত ডেয়ারিতেই দোহনের পর প্যাস্টেরাইজেশন পদ্ধতির দ্বারা দুধ সংরক্ষিত করা হয় ('খাদ্য সংরক্ষণ' দ্র)। অতঃপর যান্ত্রিক উপায়ে বোতলে দুধ ভরিয়া ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হয়।

ডেয়ারিতে দুধের স্নেহপদার্থের দানাগুলিকে অপেক্ষাকৃত ছোট দানায় পরিণত করা হয়, ইহাকে বলে সমসত্ত্বীকরণ (হোমোজেনাইজেশন)। অধিক স্নেহপদার্থযুক্ত দুধে স্বল্প স্নেহপদার্থযুক্ত মাখনতোলা দুধ মিশাইবার পদ্ধতিকে মানকীকরণ (স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন) বলে; এরূপ মিশ্রিত দুধে শতকরা ৩ ভাগ স্নেহপদার্থ থাকিলে তাহাকে 'টোনড' এবং শতকরা ১.৫ ভাগ স্নেহপদার্থ থাকিলে তাহাকে 'ডাবল টোনড' দুধ বলা হয়।

ভারতে বাৎসরিক দুগ্ধোৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২০৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে প্রায় ১১৫ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ হইতে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। ভারতে দুগ্ধ হইতে বৎসরে প্রায় ৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন ঘি, প্রায় ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন দই, প্রায় ১২ লক্ষ মেট্রিক টন মাখন ও ননি, প্রায় ৮ লক্ষ মেট্রিক টন খোয়া, প্রায় ১.৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাখনতোলা দুধ, প্রায় ১৯ হাজার মেট্রিক টন ছানা এবং প্রায় ৪৫০ মেট্রিক টন কেসিন উৎপন্ন হয়। 'ঘি', 'দই' ও 'দুধ' দ্র।

দ্র Indian Council of Agricultural Research, *Dairying in India*, New Delhi, 1956; Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Animal Husbandry*, New Delhi, 1962

অঞ্জন সিংহ

ডেরিয়াস দরেইওস দ্র

ডোগরা, ডোগরী জম্মুর পাহাড়ী অঞ্চলের পাদদেশের অধিবাসীদের কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত। ইহার চারি দিকের এই কয়টি ভাষার সহিত ইহা সংপৃক্ত— দক্ষিণে পাঞ্জাবী, পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে পাহাড়ী, উত্তরে কাশ্মীরী এবং পশ্চিমে লহন্দা। ডোগরীর লক্ষণ বিচার করিয়া, ইহাকে পাঞ্জাবীর একটি উপভাষারূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে। এতাবৎ ডোগরী ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা না থাকাতে ডোগরীভাষীরা বিদ্যালয়ে পাঞ্জাবী ও হিন্দীর চর্চা করিয়া আসিতেছেন। ডোগরীতে রচিত প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদরীরা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নিউ টেস্টামেণ্ট'-এর এক ডোগরী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ডোগরীতে কিছু সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়। Buhler এইরূপ একখানি গণিতবিষয়ক অনুবাদ-গ্রন্থ 'লীলাবতী'র নাম করিয়াছেন। ডোগরীর নিজস্ব একটি লিপি আছে, কিন্তু ইহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং আজকাল ইহার ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে। আধুনিক শিক্ষিত ডোগরীভাষীগণ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে, উর্দু ও হিন্দীর পরিবর্তে ডোগরীর প্রচলন দাবি করিতেছেন, যেমন উত্তরে কাশ্মীর-উপত্যকায় কাশ্মীরীর প্রচলনের জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে। ডোগরীতে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসও চলিয়াছে, এবং ডোগরী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও বিকাশের জন্য সংস্থাও গঠিত হইয়াছে।

দ্র Suniti Kumar Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডোমিনিয়ন ইংরেজী শব্দ 'ডোমিনিয়ন' এর পুরাতন অর্থ শাসিত ভূভাগ বা অঞ্চল। পরে ব্রিটেনে শব্দটির অর্থান্তর ঘটে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানাডা 'ডোমিনিয়ন অফ ক্যানাডা' নামে অভিহিত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে সকল অংশ পূর্ণভাবে স্বয়ংশাসিত সেগুলিকে 'স্বয়ংশাসিত ডোমিনিয়ন' অভিধা দেওয়া হয়। পরে নামটি ছোট হইয়া দাঁড়ায় শুধু 'ডোমিনিয়ন'। যে সকল পূর্বতন ব্রিটিশ উপনিবেশ ('কলোনি' বা 'ডিপেনডেন্সি') খাস ব্রিটেনের সমান পদমর্যাদা ('স্টেটাস') লাভ করিয়াছে— ব্রিটিশ রাজমুকুটের অনুগত এবং ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের সভ্য— তাহারা এই নামে অভিহিত হইতে থাকে, যেমন: ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আইরিশ ফ্রি স্টেট (১৯২২ খ্রী)। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে লর্ড বাল্‌ফোর ডোমিনিয়ন-পদমর্যাদার ('ডোমিনিয়ন স্টেটাস') যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন তাহাই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের

'স্ট্যাটিউট অফ ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার'-এ আইনতঃ অবলম্বিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা-আইনে ভারত ডোমিনিয়ন বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ সময়ে পাকিস্তান ও সিংহলও ডোমিনিয়ন পদমর্যাদা লাভ করে। পরে ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের সাধারণ-তন্ত্র ('রিপাব্‌লিক') বলিয়া ঘোষণা করে। ডোমিনিয়ন কথাটির ব্যবহার ক্রমে অবলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; ইহার জায়গায় আজকাল 'কমন্‌ওয়েল্‌থের সভ্য' কথাটি ব্যবহার করাই রীতি। মালয় ও ঘানা স্বাধীনতা পাইলে (১৯৫৭ খ্রী) ডোমিনিয়ন শব্দটির উল্লেখ ছিল না।

দ্র *Encyclopaedia of Social Science*, vol. V, New York, 1954.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ডোমিসিল ডোমিসিল কথাটির অর্থ কোনও ব্যক্তির স্থায়ী নিবাস বা বাসভূমি। কোনও নাগরিক তাহার পদমর্যাদা, বিষয়সম্পত্তি, চুক্তি, বিবাহাদি বিষয়ে কোন্ দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে, ডোমিসিল তাহা ধার্য করে। যে দেশে কোনও ব্যক্তির স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার সাম্প্রতিক অভিপ্রায় থাকে, তাহাই তাহার 'ডোমিসিল' হয়।

ডোমিসিল দুই প্রকার: জন্মগত ও ঐচ্ছিক। মানুষ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে যে ডোমিসিল অর্জন করে তাহা তাহার জন্মগত ডোমিসিল। পরে যদি কেহ স্বেচ্ছায় কোনও ডোমিসিল অর্জন করে তাহা তাহার অর্জিত বা ঐচ্ছিক ডোমিসিল।

বৈধ সন্তান জন্মিবার পর সে পিতার এবং পিতার মৃত্যুর পর মাতার ডোমিসিল প্রাপ্ত হয়। অবৈধ সন্তান মাতার ডোমিসিলে পরিচিত হয়। পরিত্যক্ত শিশুকে যে দেশে পাওয়া যায় তাহাই তাহার ডোমিসিল। পিতামাতার ডোমিসিল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাবালক সন্তানের জন্মগত ডোমিসিল পরিবর্তিত হয়।

ঐচ্ছিক ডোমিসিল অর্জন করিতে হইলে দুইটি উপাদানের প্রয়োজন: ১. স্থায়ী বসবাস (তবে শুধু দীর্ঘ বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বসবাস করিলেই চলিবে না) ২. স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অভিপ্রায় (শুধুমাত্র মৌখিক বা লিখিতভাবে স্থায়ী বসবাসের ইচ্ছা ঘোষণা করিলেই চলিবে না, কোনও দেশে কোনও ব্যক্তির স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অভিপ্রায় আছে কিনা তাহা তাহার আচার-ব্যবহার, গতিবিধি, কাজকর্ম ও জীবনযাত্রা হইতে নির্ধারণ করিতে হইবে)।

আইনবিদদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি ডোমিসিল থাকিতেই হইবে, কিন্তু কাহারও একই সময়ে একাধিক ডোমিসিল থাকিতে পারে না। জন্মগত ডোমিসিল যাবজ্জীবন বর্তমান থাকে, যত দিন না কোনও সাবালক মানুষ স্বেচ্ছায় নূতন ডোমিসিল অর্জন করে। ইংল্যাণ্ডে উদনী বনাম উদনী মামলায় (১৮৯৬ খ্রী) বিচারকেরা রায় দেন যে, ঐচ্ছিক ডোমিসিল অর্জন করিলেও জন্মগত ডোমিসিল বিলুপ্ত হয় না, শুধু সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে মাত্র। আজকাল রাজনৈতিক জাতীয়তা (পোলিটিক্যাল ন্যাশন্যালিটি) গুরুত্বলাভ করায় ডোমিসিলের প্রশ্ন অপেক্ষা-কৃত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষের সংবিধানের ৫ ধারা মতে সংবিধান কার্যকর হইবার সময় সেই ব্যক্তিই ভারতের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন যাঁহার ভারতের (অর্থাৎ বর্তমান ভারতীয় ইউনিয়নের) ভূমিতে ডোমিসিল আছে এবং যিনি নিম্নলিখিত শর্তগুলির অন্ততঃ একটি পূরণ করিয়াছেন: ক. তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা খ. তাঁহার পিতামাতার মধ্যে অন্ততঃ একজন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা গ. তিনি সংবিধান চালু হইবার অব্যবহিত পূর্বে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল ভারতের ভূমিতে সাধারণভাবে বসবাস করিয়াছেন।

সুনীলকুমার মিত্র

ডোম্বী ডোম্ব (ডোম)-নারী। তন্ত্রে যোগিনী-রূপকে বায়ু স্কন্ধ বা বায়ু-তত্ত্ব। চর্যাগীতিতে ডোম্বী কাপালিক যোগীর সঙ্গিনী, বজ্রগীতিতে বজ্রধর হেরুকের প্রিয়া যোগিনী। ডোমনারীর নৌকা খেয়ার উল্লেখ চর্যাগীতিতে আছে; পরবর্তী কালের শিব-কথায় খেয়ারি ডোমনী কোঁচ নারীরূপেও পাওয়া যায়।

একাধিক বৌদ্ধ অথবা শৈব সিদ্ধাচার্য ডোম্বী বা ডোম্বীপাদ নামে খ্যাত ছিলেন। চর্যাগীতিকোষের বৃত্তিকার মুনিদত্ত এক লাড়ীডোম্বীপাদের (নাড়ডোম্বীপাদ?) রচিত একটি চর্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

সুকুমার সেন

ড্রাইডেন, জন (১৬৩১-১৭০০ খ্রী) ইংরেজী সাহিত্যের ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অন্যতম প্রধান কবি, নাট্যকার ও সমালোচক। ড্রাইডেনের জন্ম ইংল্যাণ্ডের নর্দাম্প্‌টন-শায়ারের এক যাজক-পরিবারে; শিক্ষালাভ বিখ্যাত ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার স্কুল ও কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। তিনি ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অভিজাত পরিবারে বিবাহ করেন

এবং ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজকবিপদে নিযুক্ত হন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া বার্ধক্যদশায় তিনি কেবলমাত্র লেখনী সম্বল করেন। ড্রাইডেন ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকবলিত হন। ড্রাইডেনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা ক্রমওয়েলের মৃত্যু উপলক্ষে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহার পর ড্রাইডেনের বহুপ্রসূ লেখনী হইতে অজস্র কবিতা, নাটক এবং গদ্য-রচনা ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে থাকে। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে রাজনীতিমূলক ব্যঙ্গ কবিতা 'অ্যাব্‌সালোম অ্যাণ্ড অ্যাকিটোফেল', 'দি মেডাল' এবং 'ম্যাক ফ্লেক্‌নো' অবশ্য উল্লেখ্য। শেষোক্ত কবিতাটির উৎস রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হইলেও ইহার সার সাহিত্যিক কলহ। ড্রাইডেন-প্রণীত অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইল এইগুলি: ধর্মবিশ্বাস-প্রণোদিত দীর্ঘ কবিতা 'রেলিগিও লাইকি' এবং 'দি হাইণ্ড অ্যাণ্ড দি প্যান্থার', একাধিক ওড (ode) এবং গীতিকবিতা, বহুবিধ কথা ও কাহিনী, হাস্যরসাত্মক নাটক 'ম্যারেজ আ লা মোড', মমিল ট্র্যাজেডি 'ঔরঙ্গজেব', অমিত্রাক্ষর ছন্দে অ্যান্টনি ও ক্লিওপাট্রার কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'অল ফর লাভ', বিখ্যাত সমালোচনা-প্রবন্ধ 'এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েজি'। বিভিন্ন নাটকের মুখবন্ধগুলিতে এবং প্রাচীন ও আধুনিক কাহিনীমালার উপক্রমণিকায় সাহিত্যসমালোচনার বহু সূত্র ড্রাইডেন সযত্নে আলোচনা করিয়াছেন।

ড্রাইডেনের সাহিত্যকৃতির প্রভূত প্রভাব পড়ে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী কবিতার উপর। ড্রাইডেন হইতে জনসন পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের যে ক্লাসিক্যাল যুগ তাহার সাহিত্যসূত্রগুলি ড্রাইডেনের রচনাতেই প্রথম প্রকাশ লাভ করে। আবেগ ও রোম্যান্টিক কল্পনার পরিবর্তে বুদ্ধি ও যুক্তির সমাদর, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির রাজ্যে কতকগুলি সর্বসিদ্ধ সূত্রের সন্ধান, কবিতায় 'হিরোইক কাপ্‌লেট'-এর পরিশীলন, ভাষা ব্যবহারে—গদ্যে অথবা পদ্যে— অর্থের যাথাতথ্য এবং সুচারু প্রয়োগে যত্ন, এই সকল গুণে ড্রাইডেনের রচনা সমৃদ্ধ। পরিহাস ও বিদ্রূপেও ড্রাইডেন অসামান্য পরিচ্ছন্নতা ও রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ড্রাইডেনের সাহিত্যকৃতি মোটামুটি উপেক্ষিত হইলেও বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে ড্রাইডেনের সমাদর প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই ইংরেজ কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়টের প্রাপ্য।

দ্র T. S. Eliot, *Homage to John Dryden*, London, 1924; T. S Eliot, *John Dryden; The Poet, the Dramatist, the Critic*, New York, 1932; F. R. Leavis, *Revaluation*, London, 1936.

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

ড্রিল ওলন্দাজ-দেশে 'ড্রিল' শব্দের উৎপত্তি। কোনও বস্তুর মধ্যে ছিদ্র করার যন্ত্রকে ড্রিল বলা হয়, ড্রিলকে বাংলায় 'ভোমর' বলে। ছিদ্র করার প্রক্রিয়াকে ড্রিলিং বলা হয়। আদিম কালে ছিদ্র করিবার বা খাঁজ কাটিবার জন্য হাঙ্গরের দাঁত অথবা কাঙ্গারুর কৃন্তক দাঁত ব্যবহৃত হইত। পরে ছিদ্র করিবার জন্য ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। ছিদ্র করিবার যন্ত্রটি ঋজু, উহার প্রান্তভাগ ধারালো। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিদ্র করিয়া ইহা আপন পথে চলে। সূচ, ভোমর বা তুরপুন, বেধনযন্ত্র, ইত্যাদি দ্বারা ছিদ্র করা যায়।

ড্রিলের ব্যাস ১ মিলিমিটার হইতে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে। ইহা প্রধানতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত. ১. হাতলে ঢুকাইবার অংশ ২. প্রান্তীয় ধারসমন্বিত ফলা ৩. প্রথম প্রবেশের জন্য ছুঁচালো কোণ।

ড্রিলকে হাত দিয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে ঘুরানো যায়। হাতে চালাইতে হইলে আপন অক্ষে আবর্তিত করাইবার জন্য ড্রিল দণ্ডটিকে একটি রজ্জুর দ্বারা বেষ্টন করা হয় এবং ঐ রজ্জুটিকে একটি ধনুর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়। ধনুটিকে অগ্র পশ্চাৎ চালনা করিলে রজ্জুটিতেও সেইভাবে টান পড়িবে এবং ড্রিল-দণ্ডটি আবর্তিত হইবে। ধনুর বদলে বক্র দণ্ডও ব্যবহার করা চলে। ড্রিলকে বেভেল বা ঢাল গিয়ার-এর সাহায্যেও ঘুরানো যায়। ছুতার-মিস্ত্রীরা কাঠের মধ্যে ছিদ্র করিবার জন্য যে ভোমর ব্যবহার করে, তাহা সাধারণতঃ এইভাবেই হাত দিয়া চালায়।

লোহা কাটিবার যন্ত্রচালিত ড্রিল বিভিন্ন প্রকারের হয়, যথা পিলার ড্রিল, গ্যাঙ্গ ড্রিল বা মাল্টি স্পিণ্ড্‌ল ড্রিল, রেডিয়াল ড্রিল এবং মাল্টিপ্‌ল ড্রিল্‌হেড মেশিন। পিলার ড্রিলে একটিমাত্র ভোমর লম্বভাবে থাকে। গ্যাঙ্গ ড্রিল-এ অনেকগুলি ভোমর থাকে এবং সেইগুলি ইচ্ছামত চালনা করা যায়। মাল্টিপ্‌ল ড্রিলহেড মেশিনে একসঙ্গে অনেকগুলি ছিদ্র করা যায়। রেডিয়াল ড্রিল একটি অনুভূমিক বাহুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং সেই বাহুটি ড্রিল-স্তম্ভকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে পারে। ড্রিল যন্ত্রের সঙ্গে মোটর সংযুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে চালানো যায় অথবা যন্ত্রটিকে বেল্টের সাহায্যে অন্য ঘূর্ণায়মান চালক দণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা যায়। বিদ্যুৎ, জল, কিংবা বায়ুর দ্বারাও ড্রিল যন্ত্র চালানো যায়।

কারখানায় উৎপাদনের কাজ ছাড়াও ড্রিল অন্যান্য কাজেও প্রয়োজন হয়। ভূমির অভ্যন্তরে খনিজ পদার্থের সন্ধানে, ভূতাত্ত্বিক গবেষণায়, কয়লাখনি অঞ্চলে জল ও গ্যাস-নিষ্কাশনে, পেট্রল উত্তোলন করার জন্য কূপ খননে, পর্বতের মধ্য দিয়া রেলওয়ে লাইন স্থাপনের জন্য বিস্ফোরক দ্রব্যের সংস্থাপন প্রভৃতি কাজে উপযুক্ত ড্রিল ব্যবহৃত হয়। পেট্রল উত্তোলনের জন্য ৬৭০০ মিটার পর্যন্ত ড্রিলের দ্বারা খনন করা হইয়াছে। ঘড়ি ও অলংকারের কাজে এবং দন্তচিকিৎসায় অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিবার জন্যও ড্রিল ব্যবহৃত হয়।

অমূল্যধন দেব

ড্রেজার জলের নীচের মৃত্তিকাদি ড্রেজার যন্ত্রের সাহায্যে কাটা হয়। ইহা উপযুক্ত যন্ত্রাদি-সমন্বিত স্টিম ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন অথবা ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে চালিত জলযান।

রজ্জুর সাহায্যে একটি থলি নৌকা হইতে জলতলে নামাইয়া তাহার দ্বারা কর্দমের অপসারণ ছিল প্রাচীন পদ্ধতি।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে বেলচার মত হাতলওয়ালা যন্ত্র ও থলি টানার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ক্রমে মানুষের কায়িক শ্রমের পরিবর্তে অশ্ব ও পরে ইঞ্জিন প্রযুক্ত হয় এবং ড্রেজারের আয়তন ও কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বেলচা ও থলি ক্রমে গ্র্যাব (গ্র্যাব ড্রেজার) ও বাকেট ড্রেজারে পরিণত হইয়াছে। গ্র্যাব ড্রেজারের প্রকাণ্ড দ্বিখণ্ড পাত্রটিতে কবজা লাগানো, পাত্রটি কপিকল ও রজ্জুর সাহায্যে জলনিম্নে নামাইলে আপন ভারে উহা মাটি কামড়াইয়া ভরিয়া লয়, তখন উহা উপরে তুলিয়া খালি করা হয়। বাকেট ড্রেজারে একটি শিকলে পর পর বালতি সাজানো থাকে, জলযানে প্রলম্বিত হেলানো খোঁটার মাথায় শিকলে ঝুলানো এই বালতিগুলি জলতলের কর্দমাদি লইয়া উঠিয়া আসে এবং জলযানের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঔদক ড্রেজার (হাইড্রলিক ড্রেজার) উদ্ভাবিত হয়। ইহারই অপর নাম শোষণ ড্রেজার (সাকৃশন ড্রেজার)। পাম্পের সাহায্যে জলমিশ্রিত কর্দম শোষণ করিয়া পাইপের মাধ্যমে অন্যত্র নিক্ষেপই ঔদক ড্রেজিং-এর বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে ইহাই জলনিম্নের মাটি কাটার কাজে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। পোতাশ্রয়ে ডকের দরজার মুখে মাটি কাটার কাজে গ্র্যাব ড্রেজারের প্রচলন। পরন্তু বাকেট ড্রেজার ডকের ভিতরে মাটি কাটে। ঔদক ড্রেজারগুলি নদী ও খালের নাব্য পথ পরিষ্কার রাখিতে ও সমুদ্র-সংগমে চরের বাধা দূর করিতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ঔদক ড্রেজারের সাহায্যে কলিকাতায় লবণ-হ্রদের ভরাট-কার্য (সল্ট লেক রিক্ল্যামেশন) হইতেছে।

কপিল ভট্টাচার্য

ঢক্কী, টক্কী প্রাকৃত দ্র

ঢপ কীর্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বৈষ্ণব পদাবলী ভাঙিয়া ঢপ কীর্তনের সৃষ্টি। ইহার প্রবর্তক বা সঠিক সময় নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কবিগান ও টপ্পার সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। বরং পাঁচালির সঙ্গেই ইহার কিছু মিল আছে। ঢপের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের কাহিনী হইতেই লওয়া। ইহাতেও একটি আখ্যায়িকা থাকে, গায়ক বা গায়িকা তাহা কথকতার দ্বারা বর্ণনা করে। বক্তৃতার শেষে তান, লয় ও সুর সহযোগে একটি ক্ষুদ্র পদ্য গাওয়া হয়। গদ্যের এই শেষাংশের নাম তুক্কো। তুক্কো ছাড়াও পরবর্তী ঢপের মধ্যে ছুট সংগীত আসিয়াছে, তাহার প্রবর্তন করিয়াছেন যশোহরের বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত গোপালনগর নিবাসী মোহনদাস বৈরাগী। মোহনদাসের ছুট সংগীত অনুপ্রাস, রাগ, সুর ইত্যাদির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঢপে একজনই গায়ক ও কথক থাকিত।

মোহনদাসের পূর্বে রূপোদাস, অঘোরদাস, দ্বারিকদাস শ্যামা বাউল ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ঢপের সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন মধুসূদন কিন্নর (১৮১৮-৬৮ খ্রী)। মধু কানের বিধিদত্ত ক্ষমতা ছিল। লেখা পড়া কিছু না জানিয়াও তিনি মুখে মুখে পালা রচনা করিতেন। তাঁহার চারিটি পালা মুদ্রিত আছে, কলঙ্কভঞ্জন, অক্রূর-সংবাদ, মাথুর এবং প্রভাস। রাগ রাগিনী ও খেয়াল ইত্যাদি উচ্চতর সংগীত ছাড়াও রাধামোহন বাউলের নিকট মধুসূদন ঢপ শিক্ষা করেন। মধুসূদন তাঁহার গানে 'সূদন' ভণিতা দিতেন।

মধুসূদন ঢপ কীর্তনের যে মার্জিত রূপ দিয়াছিলেন তাহা রক্ষিত হয় নাই। পুরুষ গায়কদের হস্তচ্যুত হইয়া ঢপ মেয়ে কীর্তনীয়াদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ঢপের প্রভাব পাঁচালিতে পড়িয়াছিল।

ভবতোষ দত্ত

ঢলকিশোর দারুকেশ্বর দ্র

ঢাক বৃহৎ চর্মবাদ্য, প্রাচীন পটহের একটি বর্তমান রূপ। ইহা একটি লোকবাদ্য। পূজা ও উৎসবে ঢাক ব্যবহৃত হয়। ইহার গোলাকার কাঠের খোলের উভয় মুখ চর্মাচ্ছাদিত এবং চর্ম-রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ। সাধারণতঃ ইহা দুইটি কাঠির দ্বারা এক পিঠে বাজানো হয়। অপর পিঠটি কেবল ধ্বনিগাম্ভীর্যের জন্যই প্রয়োজন। এইজন্য ‘ঢাকের বাঁয়া’ বলিয়া একটি চলিত কথা আছে।

প্রসূন মিত্র

ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলা ও রাজধানী। জেলাটি ২৩°১৪ উত্তর হইতে ২৪°২০ উত্তর এবং ৮৯°৪৫ পূর্ব হইতে ৯০°৫৯ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। জেলার আয়তন ৬৮৫২ বর্গ কিলোমিটার (২৭৪১ বর্গ মাইল)। এই জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ, পূর্বে কুমিল্লা (ত্রিপুরা), দক্ষিণে ফরিদপুর এবং পশ্চিমে ফরিদপুর ও পাবনা জেলা।

ঢাকা জেলাকে ৩টি প্রাকৃতিক ভাগে ভাগ করা যায়: ১. মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী পূর্ব ঢাকা ২. শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্য অংশ মধ্য ঢাকা এবং ৩. ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চল দক্ষিণ ঢাকা নামে পরিচিত। প্রায় সমগ্র ঢাকা জেলা সমভূমির অন্তর্গত। উত্তর দিকে মধুপুর জঙ্গল নামে খ্যাত অঞ্চলটি লৌহ কঙ্করময় পুরাতন পালমাটি-গঠিত উচ্চভূমি।

এই জেলায় সদর, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুনশীগঞ্জ এই ৪টি মহকুমা, ৩৫টি থানা ও ৫২৮৩টি গ্রাম আছে।

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা ঢাকা জেলার প্রধান নদী। পদ্মা দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢাকাকে ফরিদপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে (‘পদ্মা’ দ্র)। বর্তমানে ধলেশ্বরী ময়মনসিংহ জেলার নিকট যমুনা (যবুনা) হইতে নির্গত হইয়া সাভার ও মুনশীগঞ্জ শহরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেঘনায় পতিত হইয়াছে। ধলেশ্বরীর উপনদী শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া উলুখড়ার নিকট ঢাকা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং জেলার পূর্বাঞ্চলে দক্ষিণমুখী গতিতে প্রবাহিত হইয়া নারায়ণগঞ্জের ৪ কিলোমিটার (৩ মাইল) দক্ষিণে ধলেশ্বরীর সহিত মিশিয়াছে। পূর্ব দিকে মেঘনা ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া রায়বাড়ির নিকট পদ্মায় পড়িয়াছে (‘মেঘনা’ দ্র)। ইহা ছাড়া ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহ যমুনা ঢাকা জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত হইতেছে। ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা ঢাকা নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত বাহিয়া নারায়ণগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরীতে মিশিয়াছে।

জেলার গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রার গড় ২৬° সেন্টিগ্রেড (৭৮° ফারেনহাইট) ও শীতকালীন গড় ১৮° সেন্টিগ্রেড (৬৪° ফারেনহাইট)। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৯৪৮ মিলিমিটার (৭৭.৯৮ ইঞ্চি)।

হিন্দুযুগে ঢাকা প্রথমে সম্ভবতঃ সমতট পরে বঙ্গ ও গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার পৃথক কোনও ইতিহাস জানা যায় না। ঢাকার নিকটবর্তী বর্তমান রামপাল গ্রামের নিকট সেন রাজাদের রাজধানী ছিল এরূপ জনপ্রবাদ আছে এবং ইহার কোনও কোনও স্থান রাজা বল্লালসেনের স্মৃতি বহন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষে ইহা মুসলমানেরা অধিকার করে। ১৬শ শতাব্দীতে এখানে কয়েকজন জমিদার প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং মোগল সম্রাট আকবর কর্তৃক ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঠানরাজ দায়ুদ খানের পরাজয় ও মৃত্যু হইলে—ঈশা খাঁ, চাঁদরায়, কেদাররায় প্রমুখ কয়েকজন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন করেন এবং ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সম্রাটের নাম অনুসারে এই রাজধানীর নাম হয় জাহাঙ্গীরনগর। কিন্তু এই নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ সুবাদার হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে ঢাকার চরম উন্নতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা শহর হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পূর্ব বঙ্গের শাসনভার ঢাকার নায়েব নাজিমের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইংরেজ আমলে ঢাকা জেলা গঠিত হয়। পরবর্তী কালে অন্যান্য জেলা স্থাপনার পর ইহার আয়তন কমিয়া বর্তমান আয়তনে পরিণত হইয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগের পরে ঢাকা শহর পূর্ব বঙ্গ ও আসামের রাজধানী হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতবিভাগের পর ঢাকা জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে ঢাকা জেলার লোক-সংখ্যা ৫০৯৬০০০, তন্মধ্যে ৭৫৪০০০ শহরাঞ্চলে ও ৪৩৪২০০০ জন গ্রামে বাস করেন। লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১৯৩ জন।

জেলার কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, ডাল, ইক্ষু, তৈলবীজ ও তামাক প্রধান। গম ও বার্লিও কিছু-পরিমাণ উৎপন্ন হয়। ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুসারে ধান ৫১৪৮৮০ হেক্টরে (১২৮৭২০০ একর), পাট ৩৩২৫০ হেক্টরে (৮৩১২৫ একর), ডাল ২৭৪৪০

হেক্টরে (৬৮৬০০ একর); ইক্ষু ১৪০০০ হেক্টরে (৩৫০০০ একর), তৈলবীজ ১৮০০০ হেক্টরে (৪৫০০০ একর) এবং তামাক ৭৪০০ হেক্টরে (১১০০০ একর) উৎপন্ন হয়।

প্রধান শিল্পাঞ্চল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরের নিকটেই অবস্থিত। শিল্পগুলি প্রধানতঃ কৃষিজ ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে পাট ও কার্পাস-শিল্পই প্রধান। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহর অঞ্চলে প্রায় ১৩টি কাপড়ের কল আছে। ঢাকা শহরের ঢাকেশ্বরী কটন মিলের খ্যাতি আছে। ভারতবিভাগের পূর্বে ঢাকা জেলায় কোনও চটকল ছিল না। বর্তমানে জেলায় ৮টি পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে চিনি, দিয়াশলাই, অ্যালুমিনিয়াম, রবার, কাচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাট ও কাঁচা চামড়ার ব্যবসায় বেশ বড়। কুটিরশিল্পের মধ্যে বস্ত্র, রৌপ্য ও শঙ্খশিল্পের জন্য ঢাকার প্রসিদ্ধি আছে। এক সময়ে ঢাকাই মসলিন জগৎবিখ্যাত ছিল।

এই জেলায় মোট রেলপথ ১৪৫ কিলোমিটার (৯১ মাইল)। জাতীয় সড়ক, জেলা ও মিউনিসিপ্যাল পাকা সড়কের পরিমাণ ৮১ কিলোমিটার (৫১ মাইল)।

প্রধান রেলপথ-কেন্দ্র ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী। ধলেশ্বরী, মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি নদী ও তাহাদের সংযোগকারী খালগুলি নৌ-চলাচলের উপযোগী বলিয়া জেলার জলপথ যানবাহনব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্থান· অধিকার করিয়াছে। মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ভাগ্যকুল, তারপাশা ও সাভার প্রধান জলবাণিজ্যকেন্দ্র। ঢাকা ও তেজগাঁওতে বিমানের অবতরণ ক্ষেত্র আছে।

জেলায় শিক্ষিতের সংখ্যা ৯৬০৯৮৯, তন্মধ্যে ৭১৬৬৩৯ জন পুরুষ ও ২৪৪৩৫০ জন স্ত্রী। মোট জনসংখ্যার ২৩% শিক্ষিত। জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি কলেজ এবং ৭৬২৩টি বিদ্যালয় আছে।

ঢাকা জেলার শহরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ প্রধান।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ও প্রধান শহর ঢাকা (২৩° ৪০′ উত্তর, ৯০° ২৬′ পূর্ব) বুড়িগঙ্গার উত্তর কূলে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব রেলপথে ৪০৬ কিলোমিটার (২৫০ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার লোকসংখ্যা ৫৫০১৪৩ জন ছিল।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। পূর্বকালে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি ছিল। পরেও পাকিস্তান রাজ্য গঠন হইবার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকাই কাপড় বঙ্গ দেশে প্রসিদ্ধ ছিল এবং ঢাকা জেলার নানা স্থান উৎকৃষ্ট বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের সে গৌরব নাই। ঢাকাতে রৌপ্য ও শঙ্খ-শিল্পের খ্যাতি আছে। বর্তমানে কয়েকটি আধুনিক শিল্প— কাপড়ের কল, চটকল, দিয়াশলাই কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রমনা অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

শহরের বহু দ্রষ্টব্যের মধ্যে ঢাকার নবাববাড়ি, আহসন মঞ্জিল, লালবাগ, বড় কাটরা, ছোট কাটরা, বাকল্যাণ্ড বাঁধ, আর্মানি গির্জা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। মালীবাগে চাঁদরায়-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরীর মন্দির দর্শনীয়। রমনার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত হাজী খাজে সাহাবাজের মসজিদ, হুসেনী দালান, মুসলমান যুগের প্রসিদ্ধ কীর্তি। বুড়িগঙ্গার তীরে লালকেল্লার মধ্যে অবস্থিত পরীবিবির মকবরা বা সমাধিসৌধ, জাফরবাজার ও অনতিদূরে বাঁশবাড়িতে সাতগম্বুজ মসজিদ বিখ্যাত ও দ্রষ্টব্য। এক সময়ে ঢাকার ঝুলনযাত্রা, রাস ও রথযাত্রার প্রসিদ্ধি ছিল।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India, Provincial Series Eastern Bengal and Assam*, Calcutta, 1909 , H H. Nomani, *Census of Pakistan 1951*, vols 3 and 8 Dacca, 1951 , A H. Dani, *An Economic Geography of East Pakistan*, Dacca, 1956 , Nafis Ahmad, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958, Pakistan Publications, *Pakistan : 1963-64* Karachi, 1964 ; Government of Pakistan, *Outline of the Third Five Year Plan (1965-70)*, 1964 , East Pakistan Bureau of Statistics, *Statistical Digest of East Pakistan : 1963-64*.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঢালাই ঢালাই বা কাস্টিং প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় আকারের মোল্ড বা ছাঁচে গলিত ধাতু ঢালিয়া দেওয়া হয়। ছাঁচ বালুকার দ্বারা নির্মিত হইলে গলিত ধাতু শিলীভূত হইবার পর ছাঁচটি ভাঙিয়া ফেলা হয়। কিন্তু স্থায়ী ছাঁচের বেলায় উহার অংশগুলি পৃথক করিয়া লওয়া হয়; ঐ ছাঁচ ভাঙা হয় না।

প্রাচীন কালে এই মৌলিক পদ্ধতির রহস্য অজানা ছিল। সম্প্রতি ঢালাইয়ের কাজ সম্পূর্ণতঃ বিজ্ঞানভিত্তিক হইয়াছে। মাত্র কয়েক গ্রাম বা এক মিটারের সামান্য

ভগ্নাংশ হইতে বৃহদাকার ২৫৪ মেট্রিক টন (প্রায়) বা ২১·৩৩৬ মিটার (আসন্ন) পর্যন্ত ঢালাই করা যায়।

ঢালাই-এর জন্য বিভিন্ন প্রকারের ছাঁচ তৈয়ারি করা হয়।

ছাঁচনির্মাণে প্রথম প্রয়োজন নমুনা বা প্যাটার্নের। কতকগুলি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া প্যাটার্ন তৈয়ারি করা হয়। যে বস্তু ঢালাই করা হয় তাহার সহিত প্যাটার্নের তেমন কোনও বৈসাদৃশ্য নাই। কাষ্ঠ, ধাতু, প্লাস্টিক প্রভৃতির দ্বারা প্যাটার্ন বা নমুনা নির্মিত হয়। নমুনা নানা প্রকারের হইতে পারে, যথা : ১. খণ্ডাকৃতি ২. বিযুক্ত (স্প্লিট) ৩. শিথিল খণ্ড (লুজ পীস) ৪. দ্বারযুক্ত (গেটেড) ৫ যুগ্ম পত্র (ম্যাচ প্লেট) ৬ ফলো বোর্ড এবং ৭. সুইপ।

শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ শিল্পেই ঢালাই এর সাহায্যে উৎপাদন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি মোটর গাড়িতে ঢালাই-এর ওজনই প্রায় ২৭২·৮ কিলোগ্রাম (প্রায় ৬০০ পাউণ্ড)।

ঢালাই বিদ্যা অধুনা প্রযুক্তিবিদ্যার একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

অমিতাভ ভট্টাচার্য
সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢালি নৃত্য বীরনৃত্যবিশেষ। নর্তকের দক্ষিণ হস্তে সড়কি এবং বাম হস্তে ঢাল থাকে। শিল্পী ঢালে আঘাত-প্রতিরোধের এবং সড়কির দ্বারা আক্রমণের অভিনয় করেন। এই নৃত্যে ঢাক, ঢোল, টিকারা বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে হস্তপদচালনার কৌশল ও বিভিন্ন ভঙ্গী প্রদর্শিত হয়। নর্তকগণ কখনও গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে ঘোরেন, কখনও বা বিচিত্র পাদক্রমে কাল্পনিক জ্যামিতিক নকশা রচনা করেন।

মহরম উৎসবে বাংলার মুসলমানদিগের মধ্যেও ঢালি নৃত্যের রেওয়াজ এখনও আছে।

দ্র মণি বর্ধন, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, কলিকাতা

মণি বর্ধন

ঢেঁকি ও উদূখল ধান ভানা বা শস্য কোটার কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রবিশেষ। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঢেঁকির ব্যবহার প্রচলিত। চীন এবং ইন্দোনেশিয়াতেও ইহার ব্যবহার আছে। তবে ঢেঁকি অপেক্ষা উদূখল মুষলের প্রচলনই অপেক্ষাকৃত বেশি, ইহাতে এক খণ্ড পাথরের চটান অথবা একটি কাষ্ঠখণ্ডে 'গড' বা গর্ত খুঁড়িয়া মুষলের সাহায্যে শস্য কোটা হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে ভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে 'গড-কাঠ' বসাইয়াও উদূখল তৈয়ারি করা হয়। বিভিন্ন ধরনের উদূখলের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল :

১ ভূমিতে বা পাথরের চটানে গর্ত খুঁড়িয়া প্রস্তুত উদূখল উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, কেরল, গুজরাত, মধ্য প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ২. একটি দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ডে পরপর ৩-৪টি গর্ত খুঁড়িয়া ৩-৪ জন একত্রে শস্য কুটিতে পারে এরূপ উদূখলের প্রচলন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ব্যতীত ইন্দোনেশিয়াতেও আছে ৩. অন্ধ্র প্রদেশ, হায়দরাবাদ ইত্যাদি স্থানে একটি চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ডে গর্ত খুঁড়িয়া উদূখল প্রস্তুত করা হয় ৪. সোজা গোলাকার বেলনাকৃতি উদূখলের প্রচলন প্রধানতঃ কেরল, পাঞ্জাব, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে সীমাবদ্ধ ৫. ডমরু আকৃতির উদূখলও বহু স্থানে প্রচলিত। ইহার কটি অর্থাৎ সরু অংশ কোথাও বা মধ্য ভাগে, কোথাও বা নীচের দিকে অবস্থিত। উত্তর প্রদেশ, ত্রিপুরার উত্তর-পূর্বাংশ, হিমাচল প্রদেশ, আসাম ইত্যাদি অঞ্চলে ইহার ব্যবহার দেখা যায় ৬. জামবাটির আকৃতিবিশিষ্ট উদূখলের নমুনা ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

বর্তমানে ধান ভানার কল প্রচলিত হওয়ায় ঢেঁকি ও উদূখলের ব্যবহার কমিয়া আসিয়াছে।

দ্র নির্মলকুমার বসু, 'ভারতের গ্রাম-জীবন', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

ঢেকুর (গড়) ধর্মমঙ্গল দ্র

ঢেলা বাঁধা রোগমুক্তি কিংবা সন্তানকামনায় বৃক্ষশাখায় ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা এক-একটি ঢেলা বাঁধিয়া রাখিবার রীতি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বাংলার পল্লীতে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানসমাজেও এই রীতি জনপ্রিয়। ছোটনাগপুর ও ওড়িশার আদিবাসী অঞ্চলেও কোনও কোনও স্থানে এই রীতি প্রচলিত আছে। মনসাতলা, ষষ্ঠীতলা কিংবা পীরের থানে যে বৃক্ষ থাকে তাহার শাখাতেই ইহা বাঁধিয়া রাখা হয়। মনসা এবং ষষ্ঠী সন্তানদাত্রী এবং সন্তানের রক্ষয়িত্রী, সেইজন্য সন্তানকামনায় মনসাতলা এবং ষষ্ঠীতলায় এই ঢেলা বাঁধিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। রোগমুক্তির কারণ প্রধানতঃ

সূর্যদেবতা, পরে তিনি শিবের সঙ্গে একাকার হইয়াছেন বলিয়া শিব থানেও ঢেলা বাঁধিবার রীতি প্রচলিত আছে। 'চণ্ডী' দ্র।

দ্র Verrier Elwin, *Religion of an Indian Tribe*, 1954.

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ঢোকরা কামার পশ্চিম বঙ্গের সূত্রধর, কুম্ভকার, চিত্রকর, স্বর্ণকার, মালাকর ইত্যাদি ৯টি শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে ঢোকরা কামারগণ পড়েন না।

বাঁকুড়া শহরের নিকটে নতুন চটিতে, বর্ধমান জেলার গুস্‌করার সন্নিকটে দরিয়াপুরে এবং শোনা যায় আরও দুই-একটি স্থানে ঢোকরা কামারের বাস। মধ্য প্রদেশের বস্তার অঞ্চল, বিহারের রাঁচির নিকট লোহারডিতে, ওড়িশার লোহাকানি প্রভৃতি স্থানেও ঢোকরা কাজের শিল্পীরা বাস করেন।

cire-perdue পদ্ধতিতে পিতলের ঢালাইকাজ পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ঢালাই-পদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত। ঢোকরারা এই পদ্ধতিতে কাজ করিয়া থাকেন। ধুনা ও সরিষার তৈলের মিশ্রণে প্রস্তুত পদার্থকে সুতার মত পাকাইয়া মাটির ছাঁচের গায়ে নকশা তোলা হয়। ছাঁচের বহিরংশের ছিদ্র দিয়া গরম পিতল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ধুনা ও সরিষার তৈলের মিশ্রণ পুড়িয়া গিয়া পিতলকে জায়গা করিয়া দেয়। এইভাবে নকশা উঠানো হইয়া থাকে। পরে পিতলের নকশা-কাজটিকে উখা দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করা হয়।

ঢোকরা কামারগণ পিতলের নানারূপ মূর্তি, চাল মাপার কুনকে, প্রদীপ, পশু-পাখির প্রতিমূর্তি ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া থাকেন। ঢোকরা-শিল্পকাজ বর্তমানে দেশের ও বিদেশের বাজারে বিক্রয় হইতেছে এবং ইহার বেশ চাহিদা হইয়াছে। সরকারি উদ্যোগে কিছুদিন পূর্বে (১৯৬৭ খ্রী) ঢোকরা শিল্পীদের স্থানীয় সমবায়ের মারফত বর্ধমান জেলার দরিয়াপুরে একটি শিল্পীকলোনি স্থাপন করা হইয়াছে।

দ্র A Mitra, *The Tribes and Castes of West Bengal*, Calcutta, 1953; Ruth Reeves, *Cire-Perdue Cast Metal Work* New Delhi.

আশীষ বসু

ঢোল চর্মবাদ্যবিশেষ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাজানো হয়। কাঠের খোলের মুখদ্বয় চর্মাবৃত ও রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ। প্রতি দুই গাছ রজ্জুর মধ্যে এক-একটি করিয়া কড়া থাকে। দুই দিকেই কাঠির দ্বারা বাজানো হয়। পূজা-পার্বণে একাধিক ঢোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রফুল্ল মিত্র

ঢোলক লোকব্যবহৃত আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। ইহার খোল কাঠের তৈয়ারি, দুই দিকের মুখ পাতলা চামড়ায় ঢাকা। ঢোলক হাত বা কাঠির দ্বারা বাজানো হয়।

প্রফুল্ল মিত্র

তক্ষক ইন্দ্রের সখা ও মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে জাত পরাক্রান্ত নাগরাজ। কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত খাণ্ডব বনে ইহার বাস ছিল। খাণ্ডবদাহের সময়ে তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গমন করেন, পুত্র অশ্বসেন অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পায় (মহাভারত, ১।২১৪ ২৫)। ঋষি বেদের শিষ্য উত্তঙ্ক অধ্যয়নশেষে গুরুদক্ষিণারূপে পৌষ্য রাজমহিষীর কুণ্ডলদ্বয় তিন দিনে আনিবার জন্য গুরুপত্নী কর্তৃক আদিষ্ট হইলে তিনি অতিকষ্টে তাহা আহরণ করেন। কুণ্ডললোভী তক্ষক ছদ্মবেশে উত্তঙ্কের নিকট হইতে তাহা অপহরণ করিয়া নাগলোকে পলায়ন করেন। নাগলোক ধ্বংসমিত করিলে অগ্নিভয়ে তক্ষক নির্গত হইয়া উত্তঙ্ককে কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করেন (মহাভারত ১।৩-৫)। শৃঙ্গী নামক ঋষিপুত্রের অভিশাপে রাজা পরীক্ষিৎকে সপ্তরাত্রির মধ্যে তক্ষক ফলের মধ্যে তাম্র বর্ণ ক্ষুদ্র কীটরূপে অবস্থান করিয়া দংশন করেন। পিতার মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ জনমেজয় সর্পসত্র আরম্ভ করিলে তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। তক্ষকের নামে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তক্ষক অগ্নিতে পতনোন্মুখ হইলে আস্তীক মুনি তাঁহাকে রক্ষা করেন (মহাভারত ১।৩৭-৫৯)। রাজা পরীক্ষিতের তক্ষকদংশন-বিবরণ দেবীভাগবতেও (২।৯-১০) পাওয়া যায়।

যূথিকা ঘোষ

তক্ষশিলা প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী। ইহা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় ৩২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে শাহঢেরির (৩৩°৪৫´ উত্তর ও ৭২°৪৯´ পূর্ব) নিকটে অবস্থিত। রামায়ণের মতে, ভরত এই নগরটি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুত্র তক্ষকে এই স্থলে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তক্ষের নামানুসারে সম্ভবতঃ নগরটির নামকরণ হয়। মহাভারতে বর্ণিত জনমেজয়ের সর্পমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এই স্থলে। বৌদ্ধ জাতকের বহু কাহিনীতে বিশ্ববিদ্যালয়-নগররূপে তক্ষশিলার খ্যাতি উল্লিখিত আছে। রাজগৃহের প্রসিদ্ধ

শল্যচিকিৎসক জীবক এই কেন্দ্রেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেন। কূটরাজনীতিবিদ্ চাণক্য এই নগরের অধিবাসী ছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে তক্ষশিলা গান্ধার রাজ্যের রাজধানী এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। এই শতাব্দীর শেষার্ধে গান্ধার পারস্যের আ্যাকামিনীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। তৃতীয় দরেইওস (Darius, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৫-৩৩০ অব্দ)-এর রাজত্বকালে গান্ধারে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। তক্ষশিলা ইহাদের অন্যতম। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে তক্ষশিলার রাজা আম্ভি আলেকসান্দরের (আলেকজাণ্ডার) নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তক্ষশিলা রাজপ্রতিভূর প্রধান কর্মস্থল ছিল।

তিনটি মুখ্য বাণিজ্যপথের সংগমে অবস্থানের ফলে তক্ষশিলার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ইহার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু বহুবার ইহাকে বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিতে হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বাহ্লীক, ইন্দো গ্রীক ও শক-পহ্লব রাজশক্তি তক্ষশিলায় আপন অধিকার বিস্তার করে। তক্ষশিলা ইন্দো-গ্রীক ও শক-পহ্লব রাজগণের রাজধানী ছিল। কুষাণরাজ কনিষ্কের সময়ে রাজধানী পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার) স্থানান্তরিত হয়। রাজধানীর গৌরবচ্যুত হইলেও তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও মহিমা খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক পর্যন্ত স্তিমিত হয় নাই। এই যুগে তক্ষশিলা ভারতের একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ-কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের শেষ ভাগে বৌদ্ধ-বিরোধী হূণদের আক্রমণে নগরটি বিধ্বস্ত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্-এর (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) সময়ে তক্ষশিলা কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিংহাম শাহ্ঢেরির পার্শ্ববর্তী ঢিবিগুলিকে প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রথম প্রতিপন্ন করেন। ১৯১৩ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থলে ব্যাপকভাবে এবং ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সীমিতরূপে যথাক্রমে জন মার্শাল এবং মর্টিমার হুইলারের নেতৃত্বে খননকার্যের ফলে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত তিনটি শহরের ধ্বংসাবশেষ, প্রভূত বৌদ্ধ স্তূপ ও সৌধাবলী, একটি অদ্বিতীয় মন্দির এবং অসংখ্য ও বহু ধরনের প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নগরত্রয়ের প্রাচীনতমটির অবস্থিতিস্থলের বর্তমান নাম ভীড়-মাউণ্ড। ইহা ট্যাক্সিলা রেল স্টেশনের (ইহার পূর্ব নাম ছিল সরাইকালা) পূর্বে এবং তম্রানালা নামে একটি ক্ষুদ্র নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাক্-মৌর্য যুগে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে এই নগরের পত্তন হয়। এখানকার নগরবিন্যাসে এবং গৃহনির্মাণে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব লক্ষিত হয়। অধিকাংশ গৃহই অসমান পাথরে অনুন্নত পদ্ধতিতে নির্মিত।

ইন্দো-গ্রীকগণ নূতন শহর প্রতিষ্ঠা করেন ভীড়-মাউণ্ডের কিছু দূরে এবং তম্রানালার পূর্ব তীরে বর্তমান সিরকাপে। পহ্লবগণের রাজত্বকালে শহরটি নূতনভাবে গ্রীক নগর-নিবেশনের আদর্শে পরিকল্পিত হয়। নূতন প্রতিরক্ষা-প্রাচীরের নির্মাণসময়ে গ্রীক আদর্শসুলভ একটি গিরিদুর্গ নির্মিত হয়। প্রাচীরবেষ্টিত শহরের অভ্যন্তরে একটি দেওয়াল তুলিয়া শহরটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়— উচ্চ পার্বত্যভূমিতে গিরিদুর্গ ও মুখ্য রাজপ্রাসাদ এবং নিম্নভূমিতে জনগণের বাসস্থল। নিম্নভূমির সুপরিকল্পিত শহরটিও গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত। শহরের মধ্য দিয়া প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণমুখী। বহু সমান্তরাল রাস্তা রাজপথটির সঙ্গে সমকোণে মিলিয়া অসংখ্য ছকের সৃষ্টি করিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে এবং বিভিন্ন ছকের অভ্যন্তরে গৃহসমূহ সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত দেখা যায়। জনগণের বাসগৃহ ব্যতীত এই শহরে আবিষ্কৃত হইয়াছে ছোটখাটো একটি প্রাসাদ, একটি বৌদ্ধ মন্দির ও কয়েকটি স্তূপ।

তৃতীয় শহরের পত্তন হয় সিরসুখে সম্ভবতঃ কুষাণ আমলে। এই শহরটি সিরকাপের উত্তর-পূর্বে এবং প্রায় ২ কিলোমিটার (১ মাইল) দূরে সমভূমিতে অবস্থিত। ইহার পার্শ্বদেশে লুণ্ডীনালা। শহরটি দীর্ঘ চতুষ্কোণ। সিরসুখে খননকার্য সীমিতভাবে হওয়ার ফলে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

শহরত্রয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, বিশেষ করিয়া পাহাড়গুলি বৌদ্ধ কীর্তিরাজিতে পরিপূর্ণ। সম্রাট অশোকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া হূণদের আক্রমণ পর্যন্ত তক্ষশিলা ছিল ভারতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র। এখানকার স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বিভিন্ন জাতির আগমন ও ক্রমে তাহাদের সহিত স্থানীয় লোকের মিশ্রণের প্রভাব সুপরিস্ফুট। তাই অনেক সৌধে করিন্থীয় গাত্রস্তম্ভ, গ্রীক আদর্শসুলভ মোল্ডিং ও অলংকরণ দেখা যায়। মূর্তিসমূহেও বিশেষ করিয়া প্রথম আমলের হেলেনিষ্টিক কলা-শৈলীর প্রভাব নিবিড়। বস্তুতঃ তক্ষশিলা গান্ধার-কলার ('গান্ধার' দ্র) অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র।

তক্ষশিলার মুখ্য স্তূপ ধর্মরাজিকা (স্থানীয় লোকেদের কাছে 'চির' নামে পরিচিত) হথিয়াল পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে তম্রানালার তীরে সমুচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। ধর্মরাজিকা নামের জন্য মনে করা হয় যে ইহা ধর্মরাজ

অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, যদিও স্তূপের দৃষ্টিগোচর অংশ প্রাক্ কুষাণ যুগের নয়। মৌর্য যুগের ধ্বংসাবশেষ সম্ভবতঃ স্তূপগর্ভে নিহিত। স্তূপটির ভিত্তি নকশা গোলাকার। ইহার অর্ধগোলাকৃতি অণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ অসমান পাথরের নির্মিত এবং কেন্দ্র হইতে প্রসারিত ষোলটি প্রায় ১২ মিটার (৩৯ ফুট) পুরু দেওয়াল দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। বৃহদাকার চুনা পাথর ও কঙ্করে গঠিত ইহার গাত্রদেশের উপর মোল্ডিং এবং গাত্রস্তম্ভ শোভিত করা হইয়াছিল। আর সমগ্র অংশ চুনের পলস্তারায় আবৃত ও রঙ করা হয়। গাত্রস্তম্ভগুলির মধ্যস্থ কুলুঙ্গীগুলিতে সম্ভবতঃ পূর্বে বৌদ্ধ মূর্তি ছিল।

ধর্মরাজিকাকে কেন্দ্র করিয়া বহু ছোট ছোট স্তূপ, ক্ষুদ্রাকার মন্দির বা উপাসনা কক্ষ, সংঘারাম এবং একটি সর্পাকার চৈত্যমন্দির গড়িয়া ওঠে। কোনও কোনও স্তূপের মধ্যে অস্থিভস্ম পাওয়া গিয়াছে। দুই-একটির মধ্যে আবার কুষাণ-মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তূপগুলির মধ্যে একটির গাত্রভাগে এখন পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় বালি চুনে (স্টাকো) গড়া সারিবদ্ধ বুদ্ধমূর্তি, আবার একটিতে গান্ধার শিল্পাদর্শে ক্ষোদিত বুদ্ধদেবের জীবনীর কয়েকটি প্রধান ঘটনা। মন্দির বা উপাসনা-কক্ষগুলির একটির মধ্যে পাওয়া যায় একটি পাথরের পাত্র, পাত্রের মধ্যে রূপার ভাণ্ড, ভাণ্ডটির অভ্যন্তরে রৌপ্যপাতের উপর খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপি এবং একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণ-কৌটা, আর কৌটার মধ্যে কয়েক খণ্ড অস্থি। লিপির তারিখ ১৩৬, তারিখের পাশে অয়র (পহ্লবরাজ অ্যাজিস ?) নাম। লিপিপাঠে জানা যায় অস্থিখণ্ডগুলি স্বয়ং বুদ্ধদেবের। উপাসনাগৃহের একটির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গান্ধার ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন— বহুবিধ প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

হথিয়ালের উত্তর দিককার শেষ পাহাড়টির উপর অবস্থিত কুণাল স্তূপটিও উল্লেখযোগ্য। স্তূপটি খ্রীষ্টীয় ৩য় অথবা ৪র্থ শতকের। স্তূপটি একটি সু-উচ্চ বেদির ত্রিস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বনিম্নস্তরটি করিন্থীয় গাত্রস্তম্ভে সুশোভিত। স্তূপগর্ভে নিহিত আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্তূপ, এইটি শকদের আমলে নির্মিত হয়। কুণাল-স্তূপের ঠিক পশ্চিম দিকে একটি সুপ্রশস্ত সংঘারাম। সংঘারামটির উচ্চতা স্থানে স্থানে ১৩।১৪ ফুট। পূর্বদিকস্থ বহির্দেওয়ালটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৯২ ফুট। অভ্যন্তরে দুইটি ভাগ। বৃহত্তর ভাগটি চতুঃশালা-আদর্শে পরিকল্পিত। সংঘারামটি অগ্নিতে ধ্বংস হয়।

সিরসুক শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, প্রায় ২ কিলোমিটার (১ মাইল) দূরে, মোহ্ড়া মোরাদু গ্রামের সন্নিকটে এক মনোরম নির্জন অধিত্যকার উপর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সুন্দর নিদর্শন অনাবৃত হইয়াছে। এখানকার দুইটি স্তূপই চুন-বালির বৌদ্ধ মূর্তিতে শোভিত। মূর্তিগুলির অধিকাংশেরই জীবন্ত ভাব। স্তূপ সংলগ্ন দ্বিতল সংঘারামটিও বিশাল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই সৌধগুলি খ্রীষ্টীয় ৩য় ও ৫ম শতকের মধ্যে নির্মিত হয়।

মোহ্ড়া মোরাদুর উত্তর পূর্বে জৌলিয়াঁ গ্রামের নিকট পাহাড়ের উপর আর একটি উত্তম বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানকার মুখ্য স্তূপের মূলাংশ কুষাণ আমলের।

মোহ্ড়া মোরাদু এবং জৌলিয়াঁর মধ্যবর্তী পিপ্পল গ্রামেও একটি স্তূপ এবং সংলগ্ন সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। পহ্লবদের রাজত্বের শেষ ভাগে অথবা কুষাণ যুগে সংঘারামটি নির্মিত হয়। ইহার ধ্বংসাবশেষের পশ্চিম অংশে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে নির্মিত হয় দ্বিতীয় সংঘারাম।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন অঞ্চলটিতে বিদ্যমান। তক্ষশিলার প্রসঙ্গে একটি আয়ত মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু মন্দিরটি কোন ধর্মের, তাহা এখনও পর্যন্ত ঠিক হয় নাই। সিরকাপের প্রাকারের মুখ্য (উত্তর) প্রবেশদ্বার কিছু উত্তরে জণ্ডিয়ালে একটি কৃত্রিম মাটির ঢিবির উপর মন্দিরটি অবস্থিত। এই ধরনের মন্দির ভারতে আর কোথাও নাই। পক্ষান্তরে ইহার পরিকল্পনার সহিত গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরের অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ইহার আয়োনীয় স্তম্ভ ও গর্ভগৃহের মধ্যবর্তী স্থানে পাথরের নিরেট গাঁথুনি গ্রীক স্থাপত্যের পরিচায়ক নয়। মার্শাল অনুমান করিয়াছেন, মন্দিরের ছাদের এক বিশেষ অংশে একটি উচ্চ গুরুভার গম্বুজ ছিল এবং গম্বুজটি জরথুস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে জড়িত। পলস্তারাচ্ছাদিত মন্দিরটি চুনা পাথর এবং কঙ্করে নির্মিত তবে আয়োনীয় স্তম্ভ এবং গাত্রস্তম্ভগুলি বেলে পাথরের।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India: Reports*, vol. II & V Simla, 1871; *Ancient India*, no 4 1947-48; J. Marshall, *Taxila*, vols 1-3, Cambridge, 1951; J. Marshall, *A Guide to Taxila*, Cambridge, 1960.

দেবলা মিত্র

তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ডেরা ইস্‌মাইল খাঁ অঞ্চলে একটি পর্বত-

শ্রেণীর নাম সুলেমান। গোমাল নদীর দক্ষিণে এই পর্বত-শ্রেণী সিন্ধু ও আফগানিস্তানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই পর্বতের দুইটি শ্রেণী দুইটি সমান্তরাল রেখায় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্ব দিকের পর্বত-শ্রেণীর দক্ষিণ সীমান্তে ৩৩৭৪ মিটার (১১০৭০ ফুট) উচ্চে একটি শিখর আছে, ইহার নাম তখ্‌ৎ ই সুলেমান, অর্থাৎ সলোমোনের রাজসিংহাসন। প্রবাদ এই যে রাজা সলোমোন হিন্দুস্তানের এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং দৈত্য-দানব-বাহিত এক সিংহাসনে আকাশের মধ্য দিয়া নিজের দেশে প্রত্যাবর্তনকালে রানী একবার তাঁহার স্বদেশের দিকে শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী সলোমোন নিম্নস্থিত পর্বতের চূড়ায় সিংহাসন স্থাপনের উপযোগী একটি স্থান নির্মাণ করিবার জন্য বাহকদিগকে আদেশ দিলেন। তদনুসারে তাহারা পর্বতশিখরে একটি গর্ত খনন করিল। বর্তমানে গিরিচূড়ায় ২.৭৯ বর্গ মিটার (৩০ বর্গ ফুট) পরিমিত একটি গর্তকেই এই গর্ত বলিয়া নির্দেশ করা হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই স্থানটি পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহার অদূরে একটি মন্দির আছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

তট সমুদ্র এবং স্থলভাগের সংযোগস্থলকে উপকূল বলা হয়। উপকূলের সম্মুখের অংশটি তটভূমি। সমুদ্রজলের নিম্নসীমা হইতে ঊর্ধ্বসীমা পর্যন্ত স্থলভাগের অংশটি সম্মুখ তটভূমি এবং সমুদ্রজলের ঊর্ধ্বসীমা হইতে উপকূলস্থ উচ্চ পাহাড় পর্যন্ত অংশটি পশ্চাৎ তটভূমি নামে পরিচিত। তটভূমির উপর ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বালুকা ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া সৈকতের সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর তটভূমির বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। সমুদ্রের তরঙ্গ, জোয়ার, স্রোত, তটভূমির গঠন, তথাকার শিলাসমূহের কাঠিন্য ও ক্ষয়রোধ-ক্ষমতা, তটভূমির ঢাল, সমুদ্রতলের পরিবর্তন, স্থলভাগের উন্নয়ন বা অবনয়ন, সমুদ্রতলের উন্নয়ন বা অবনয়ন, তীরে আগ্নেয়গিরির অবস্থান, প্রবাল কীটের গঠন, হিমবাহের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির উপর তটভূমি ও উপকূলের আকৃতি ও গঠন নির্ভর করে।

সমুদ্রতরঙ্গের ক্ষয়কার্যের দ্বারা উপকূল-রেখা স্থলভাগের দিকে প্রসারিত হয় এবং উপসাগর, গুহা প্রভৃতির দ্বারা নানা আকৃতির উপকূল গড়িয়া ওঠে। বিভিন্নপ্রকার অবক্ষেপণে উপকূল-রেখা সমুদ্রের দিকে প্রসারিত হয় অথবা উপকূলেই নানারূপ সঞ্চয় ঘটিতে থাকে। সঞ্চয়ন বাঁধের আকারে গঠিত হইলে বার ও সমুদ্রের দিকে সংকীর্ণভাবে প্রসারিত হইলে স্পিট গঠিত হয়। উপকূলে বালিয়াড়ী, জলাভূমি প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়, ভারতবর্ষে কেরলের স্পিট, মেদিনীপুর বা মাদ্রাজের বালিয়াড়ী সৈকত, কচ্ছের রনের জলাভূমি, চিল্কার উপহ্রদ প্রভৃতি উপকূলের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন।

সমুদ্রতলের পরিবর্তনে নিমজ্জিত বা উত্থিত উপকূলের সৃষ্টি হয়। নিমজ্জিত উপকূলের মধ্যে রিয়া, ফিয়র্ড ও ডালমাশিয়ান উল্লেখযোগ্য। রিয়া উপকূলে পর্বত ও নদীগুলি উপকূল-রেখার সহিত আড়াআড়িভাবে বা সমকোণে মিলিত হয়। এই উপকূল ফাঁদলের আকারে গঠিত এবং অভ্যন্তরের দিকে বিস্তার ও গভীরতা কমিতে থাকে। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল বা নদী-উপত্যকা অবনমিত হইয়া সাধারণতঃ রিয়া উপকূল গঠিত। ফিয়র্ড উপকূল সাধারণতঃ হিমবাহ-অধ্যুষিত অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। হিমবাহের ঘর্ষণে সৃষ্ট বিভিন্ন উপত্যকা নিমজ্জিত হইয়া এই উপকূলের সৃষ্টি করে। এইসব উপকূলের নিকট অসংখ্য দ্বীপ দেখা যায়। উপকূলের অভ্যন্তরে জলভাগ গভীর থাকে। সমুদ্রোপকূলের সমান্তরালভাবে অবস্থিত পার্বত্য-ভূমির কিয়দংশ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ডালমাশিয়ান উপকূলের সৃষ্টি করে। এই উপকূলের সমান্তরালে অবস্থিত দ্বীপগুলি দীর্ঘ ও সংকীর্ণ।

উত্থিত উপকূলে সামুদ্রিক সোপানস্তর, খাড়া পাহাড়, জলাভূমি ও উপহ্রদ দেখা যায়।

দ্র F J Monkhouse, *The Principles of Physical Geography* London, 1954.

লতা চট্টোপাধ্যায়

তত্ত্ববোধিনী সভা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ দশজন যুবক ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর তত্ত্বরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শক্রমে দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে ইহার নাম হয় তত্ত্ববোধিনী সভা। সভার উদ্দেশ্য এইরূপ উল্লিখিত হয়: 'বিবিধ উপায়ের দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন'। ইহার সাধন-কল্পে সভা তিনটি উপায় অবলম্বন করে: ১. তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও গ্রন্থপ্রকাশ এবং ৩. বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকল্পে তরুণ পণ্ডিতদের দ্বারা বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন ও সংগ্রহ। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী অধ্যয়নের এবং ধর্মগ্রন্থাদি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। এই পাঠশালা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার

বাঁশবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ শুরু হয়। এই সময় হইতে ব্রাহ্মধর্মাভিত্তিক গ্রন্থাদিও বাহির হইতে থাকে। সভার তৃতীয় কার্য শুরু হয় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-প্রমুখ ৪ জন যুবককে চতুর্বেদ পড়িবার জন্য বারাণসীতে পাঠানো হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যভারও সভা গ্রহণ করে। এদেশীয়গণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে সভার কর্তৃপক্ষ আন্দোলন পরিচালনা করেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার পরিচালনার জন্য একটি অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়। ১৮৪৩-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যাঁহারা বিভিন্ন সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রমাপ্রসাদ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সভার মধ্যমণি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার ধর্মমতের বিবর্তনের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার পরিচালকদের কোনও কোনও বিষয়ে মতানৈক্য ঘটে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যায়। পত্রিকাপরিচালনা ও গ্রন্থপ্রকাশনাদির ভার অতঃপর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করে।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৪৫, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্যসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৮; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬২।

যোগেশচন্দ্র বাগল

তৎসম শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে'। প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ প্রসঙ্গে যে সকল শব্দ অথবা পদ সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে একই রকম সেগুলিকে তিনি তৎসম (অর্থাৎ পূর্বে উল্লিখিত সংস্কৃত ভাষার সমান) বলিতে চাহিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় যে সব শব্দ সংস্কৃত হইতে (উচ্চারণে না হইলেও লিপিতে) অবিকৃতভাবে প্রচলিত আছে সেইগুলিকে 'তৎসম' বলা হয়। যেমন অপর, দধি, কৃষ্ণ, বধূ, বাক্‌, মহান্‌, শত, যদি, কিন্তু, কেবল, এবং ইত্যাদি।

সুকুমার সেন

তদ্ভব তৎসমের সহযোগী শব্দ। সংস্কৃত (আদি-ভারতীয় আর্যভাষা) হইতে যেসব শব্দ কালোচিত সকল পরিবর্তন লাভ করিতে করিতে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় স্বাভাবিক অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে আসিয়াছে, ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় তাহাই 'তদ্‌ভব' ('তৎ' অর্থাৎ সেই মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন)। যেমন, আর (<আঅর <অঅর <অপর), দই (<দহি <দধি), বৌ (<বউ <বহু <বধূ), শ (<শঅ <শত), চাঁদ (<চান্দ <চন্দ <চন্দ্র), কানু (<কাহ্নু <কহ্ন <কহ্নঅ <কৃষ্ণক), মাছি, (<মাচ্ছি <মচ্ছি <মাচ্ছঅ <মচ্ছিআ <মক্ষিকা) ইত্যাদি।

যেসব শব্দ মূল সংস্কৃত হইতে আত্যন্ত ধারাবাহিক-ভাবে আসে নাই পরন্তু কোনও এক সময়ে তৎসম শব্দরূপে প্রচলিত হইয়া তৎপরবর্তী কালের উচিত পরিবর্তন লাভ করিয়াছে সেগুলিকে বলা হয় 'অর্ধ তৎসম'। যেমন কেষ্ট (<ক্রেষ্ট <ক্রিষ্ণ <কৃষ্ণ), ভদ্দর (<ভদর <ভদ্র), জষ্টি (<জইষ্টি <জইষ্টিঅ <জৈষ্ঠ্য <জৈষ্ঠ্য) ইত্যাদি।

সুকুমার সেন

তন্‌-জ্যুর বুদ্ধের দেশনা (কন্‌-জ্যুর) ভিন্ন অবশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রের তিব্বতী অনুবাদের সংকলন। এই সংকলনে বৌদ্ধ দেব-দেবীর বিভিন্ন স্তব ও কন্‌-জ্যুর-এর অন্তর্গত গ্রন্থাদির টীকাভাষ্য ছাড়াও বৌদ্ধ ন্যায়, মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনসম্পর্কে দিঙ্‌নাগ, নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, চন্দ্রকীর্তি-প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের রচনার তিব্বতী অনুবাদ সংগৃহীত আছে। তন-জ্যুর-সংকলনের গ্রন্থগুলি মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়—স্তোত্র, সূত্র, তন্ত্র ও বিবিধ।

সংস্কৃত ও চীনা হইতে বুদ্ধের দেশিত ত্রিপিটকের সূত্র, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ যে সংকলনে রক্ষিত আছে তাহাকে সাধারণভাবে 'কন্‌-জ্যুর' (বুদ্ধদেশনা) বলা হয়। এই সংকলনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে— বিনয়, সূত্র, অবতংশক, প্রজ্ঞাপারমিতা, তন্ত্র ও ধারণী। 'ভোট সাহিত্য' দ্র।

সুনীতিকুমার পাঠক

তন্তু বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপকরণ। তন্তুসমষ্টিকে পাক দিয়া সুতা প্রস্তুত অথবা পরস্পর সংলগ্ন রাখিয়া কাগজ বা কাগজের ন্যায় বিনা-তাঁতে বস্ত্র (নন-ওভন ফেব্‌রিক) করিতে হইলে, তন্তু সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও নমনীয় অথচ যথেষ্ট শক্তিবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই গুণগুলি থাকিলে যে কোনও বস্তু তন্তুপদবাচ্য হইতে পারে, কাচ ও লৌহ-তন্তুও বর্তমানে প্রচলিত।

তন্তুমাত্রেই আণবিক পর্যায়ে এমন কতকগুলি অণুর দ্বারা গঠিত যাহাদের অংশগুলি পরস্পর দীর্ঘ শৃঙ্খলের আকারে সংবদ্ধ। এই দীর্ঘ অণুগুলি সাধারণতঃ পাশাপাশি থাকে। এইরূপে সাজানো অণুগুলি আবার স্থানে স্থানে সমান্তরালরূপে পরস্পর অতি নিকটবর্তী হইয়া আণবিক শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়; এরূপ স্থানগুলি স্ফটিকধর্মী ও প্রায় নিশ্ছিদ্র, ইহাদের আধিক্যে তন্তুর শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাকি স্থানগুলিতে যথেষ্ট ছিদ্র থাকে ও জল, তৈল, রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি প্রবেশ করিতে পারে।

যাবতীয় তন্তুকে প্রধানতঃ প্রকৃতিজাত ও কৃত্রিম এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রকৃতিজাত তন্তুগুলি আবার তিন ভাগে বিভক্ত: ১. প্রাণিজ— যথা পশম, রেশম, মোহেয়ার, কাশ্মীর ২. উদ্ভিজ্জ— যথা, তুলা র‍্যামি, ফ্ল্যাক্স পাট, মেস্তা, শণ, নারিকেল-ছোবড়া, সিসল্, মেনিলা হেম্প ৩. খনিজ— যথা অ্যাজ্‌বেস্টস। ইহাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রকৃতিই দীর্ঘ অণু সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সমষ্টিকে তন্তুর আকার দিয়াছে।

কৃত্রিম তন্তুশ্রেণীও দুই ভাগে বিভক্ত: ১. রূপান্তরিত— যথা রেয়ন বা আর্ট সিল্ক ২. যৌগিক— যথা নাইলন, টেরিলিন। রেয়নের ক্ষেত্রে নূতন অণু সৃষ্টি করা হয় না, কৃত্রিম উপায়ে উহাদের সমষ্টিগত তন্তুর আকারকে পরিবর্তিত করা হয়। যৌগিক তন্তুর ক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্গার, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি পরমাণুযুক্ত পদার্থ হইতে কৃত্রিম উপায়ে নূতন দীর্ঘ অণু সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তন্তুর রূপ দেওয়া হয়।

প্রাণিজ তন্তু প্রাণীর শরীরগত প্রোটিন হইতে গঠিত হয়। পশমের প্রোটিনের নাম কেরাটিন, সিল্কের প্রোটিনের নাম ফাইব্রোইন।

উদ্ভিজ্জ তন্তুর মূল উপাদান হইল কার্বোহাইড্রেটজাতীয় পদার্থ সেলুলোজ। তুলা ও র‍্যামি তন্তুর শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই সেলুলোজ। পাট, শণ, ফ্ল্যাক্স, সিসল প্রভৃতি তন্তুতে লিগ্‌নিন নামক পদার্থটি শতকরা প্রায় ৫-১৫ ভাগে থাকে, সেই অনুপাতে সেলুলোজ কিছু কম থাকে।

কাপড়ের কলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিভাগ থাকে: ১. তন্তুগুলি হইতে বিজাতীয় ময়লা পরিষ্কার করিবার যন্ত্রাদি ২. বহু তন্তুকে সমান্তরাল করিয়া মোটা পাঁজে পরিণত করিবার জন্য কাঁটাযুক্ত বেলুনের মত রোলার সমষ্টির দ্বারা নির্মিত কার্ডিং মেশিন ৩. পাঁজগুলি ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর করিবার জন্য ড্রইং ও রোভিং ফ্রেম ৪. পাক দিয়া সুতা তৈয়ারি করিয়া ববিনে জড়াইবার যন্ত্র ৫. কাপড় তৈয়ারির তাঁত ও শেষে পালিশ বা রঙ বা অন্য কোনও গুণারোপ করিবার যন্ত্র। তন্তুসমষ্টিকে পরপর এই সকল স্তরের মধ্য দিয়া বস্ত্রাকারে পরিণত করা হয়।

১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র জগতে ও ভারতে বিভিন্ন তন্তুর উৎপাদনের হার নিম্নে তুলনা করিয়া ১০০০ মেট্রিক টনে দেখানো হইল—

তন্তু	সমগ্র জগৎ	ভারতে
পশম	১৪৬৪	৩৫
তুলা	১০৭০১	৭২৮
রেয়ন	২৫২৯	৩৭
অন্যান্য কৃত্রিম তন্তু	৫৪৪	—
সিল্ক	৩৩	০·১
ফ্ল্যাক্স	৫১৮	—
হেম্প	১১৮৯	৩৭
পাট	৯১৬	৩২৮

'অ্যাজ্‌বেস্টস', 'তুলা', 'নাইলন', 'পশম', 'পাট', 'রেয়ন', 'রেশম' ও 'শণ' দ্র।

দ্র H. R. Manersberger, *Mathews' Textile Fibres*, New York, 1947; J T. Marsh, *Textile Science*, London, 1948; R. W. Moncrieff, *Man-made Fibres*, London, 1957; R. Meredith, *Mechanical Properties of Textile Fibres*, New York, 1955; Commonwealth Economic Committee, *Industrial Fibres*, London, 1961; F. A. O., United Nations, *Production Yearbook*, vol. 15, Rome, 1961.

শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তন্ত্র সিদ্ধান্ত দ্র

তন্ত্রশাস্ত্র 'তত্রি' বা 'তন্‌ত্রি' হইতে 'তন্ত্র' শব্দের উৎপত্তি। ইহার অর্থ হইতেছে ব্যুৎপাদন বা জ্ঞান। তন্ত্র শব্দের অন্ত 'ত্র' ত্রাণ বা মুক্তির নির্দেশ দেয়। যে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় সাধন করিলে জীব মোক্ষ লাভ করিতে পারে সাধারণভাবে তাহাই তন্ত্রশাস্ত্র। অধ্যাত্মসাধন-শাস্ত্র হিসাবে তন্ত্রের স্বকীয় বিশিষ্টতা আছে। তত্ত্ব ও মন্ত্রের আলোচনা তন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। যাহা তত্ত্ব ও মন্ত্রের সমন্বয়ে ত্রাণ সাধিত করে, তাহাই তন্ত্র নামে অভিহিত। তত্ত্বজ্ঞান ও মন্ত্রসাধনের মাধ্যমে জীব উন্নততর স্তরে উঠিতে পারে,

এ কথা তন্ত্রমতে স্বীকৃত। তত্ত্ব হইল অর্থের দিক দিয়া বিশ্বের মৌল সত্তাসম্পর্কীয় জ্ঞান, অর্থাৎ 'সৎ' বিষয়ক জ্ঞান, মন্ত্র হইল 'চিৎ'-বিষয়ক জ্ঞান, 'সৎ' ও 'চিৎ'-এর মিলনই আনন্দ, 'সচ্চিদানন্দ বিভব' হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি হয়।

তন্ত্রে ৩৬টি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে: ৫টি শুদ্ধতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব, ৬টি মিশ্র বা শুদ্ধাশুদ্ধ বা বিদ্যাতত্ত্ব ও ২৫টি অশুদ্ধ তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। তন্ত্রমতে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনও বিভেদ নাই, ফলে শিব ও শক্তি অভিন্ন। শক্তি ও শিব সমরস। এই অভিন্নতার দুইটি ক্ষণ স্বীকৃত—একটি অতি সূক্ষ্ম ধ্যানগম্য সকল স্তর ও অপরটি হইল নেতিমূলক নিষ্কল অবস্থা।

'বেদ' ও 'তন্ত্র'— উভয়ের মূলে আছে শ্রৌতজ্ঞান, ফলে তন্ত্রশাস্ত্র কখনও কখনও পঞ্চম বেদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মনুসংহিতার বিখ্যাত বৃত্তিকার কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, শ্রুতি দ্বিবিধ বলিয়া কীর্তিত, যথা বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। তন্ত্রশাস্ত্রের পরিধি বিশাল। পঞ্চোপাসক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে: যেমন ১ শৈবতন্ত্র -- মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' ৭টি শৈব-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, 'নকুলীশ-পাশুপত', 'শৈব', 'প্রত্যভিজ্ঞা' ও 'রসেশ্বর'। শেষোক্তটিতে কোনও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা নাই ২ 'শাক্ততন্ত্র' ৩. 'বৈষ্ণব-তন্ত্র' ৪. 'বৌদ্ধতন্ত্র'। মধ্যযুগ তন্ত্রসাহিত্যের গৌরবময় যুগ।

বেদের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রও অপৌরুষেয় বলিয়া উক্ত। 'আগম', 'নিগম', 'রহস্য' প্রভৃতি শব্দও তন্ত্রের প্রায় সমার্থক। প্রত্যেক আগমের সাধারণভাবে ৪টি করিয়া পাদ আছে—ইহাদের মধ্যে জ্ঞান-পাদ বা বিদ্যাপাদ-এ দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রে অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈত, এই তিনটি মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়: ১. শিবমুখ-নিঃসৃত ৬৪খানি ভৈরব আগম অদ্বৈতপন্থী ২. ১০খানি শৈব আগম দ্বৈতপন্থী ৩. ১৮খানি রৌদ্র আগমে বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শংকরাচার্যের পরমগুরু গৌড়পাদ 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র'-নামীয় একখানি সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন। আচার্য শংকরের রচিত 'প্রপঞ্চসার' (পদ্মপাদের টীকাসহ), 'প্রয়োগ-ক্রম-দীপিকা' ও লক্ষ্মণ দেশিকের 'সারদাতিলক' (রাঘব ভট্টের টীকাসহ) তন্ত্রশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ। সোমানন্দের 'শিবদৃষ্টি' শৈবমতবাদের একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অভিনব-গুপ্ত (খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী) ছিলেন শৈব শাক্তসংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ। তাঁহার রচিত 'তন্ত্রালোক' তন্ত্রসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। তাঁহার 'মালিনীবিজয়বর্তিকা', 'পরা-ত্রিংশিকাবিবরণ', 'প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানে পূর্ণ।

আধুনিক যুগে তন্ত্রশাস্ত্রের সবপেক্ষা বড় পণ্ডিত ছিলেন ভাস্কর রায় (১৮শ শতাব্দী), তাঁহার রচিত বামকেশ্বর-তন্ত্রের টীকা 'সেতুবন্ধ', 'শাম্ভবানন্দকল্পলতা', 'বরিবস্যা-রহস্য', 'বরিবস্যাপ্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

আগম সম্মত মতবাদ হিসাবে 'কাশ্মীর-শৈববাদ' খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাশ্মীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সম্প্রদায় 'ত্রিক' বলিয়াও পরিচিত। 'স্বাতন্ত্র্যবাদ' 'আভাসবাদ' প্রভৃতি নামও কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন। এই মতবাদ যোগাক্রিয়াসাপেক্ষ, অধ্যাত্মসাধনলব্ধ পরম সত্তার উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'শিবসূত্র'-প্রণেতা বসুগুপ্ত (৮২৫ খ্রী) চরমতত্ত্ব উপলব্ধির পক্ষে শাম্ভব, শাক্ত ও আনব, এই তিনটি যোগনিষ্ঠ উপায় প্রতিষ্ঠা করেন। সোমানন্দ বসুগুপ্ত হইতে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া 'প্রত্যভিজ্ঞা' মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মতে 'স্বাত্মা' জীবের মৌল আন্তর সত্তা, ইহা অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকে। স্বাত্মা ও জীবের আন্তর সত্তা এক, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে। সোমানন্দের শিষ্য উৎপলাচার্য 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাকারিকা' ও দুইখানি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলি প্রধানভাবে অদ্বৈত শৈববাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ প্রতিবাদ-সকলের উত্তর। কাশ্মীর শৈববাদ তথা শৈব দর্শনে অভিনব-গুপ্তের অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আগমশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ করিয়া ৬৪খানি প্রামাণিক শৈবাগমের সহিত তিনি অদ্বৈত শৈববাদের যোগসূত্র সংস্থাপিত করেন। ক্ষেমরাজপ্রণীত 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' (১০৪০ খ্রী), যোগরাজ-কৃত পরমার্থসারের টীকা (১৬৬০ খ্রী), জয়রথপ্রণীত তন্ত্রালোকের টীকা ও ভাস্কর কণ্ঠ প্রণীত 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী'-র উপর টীকা (১৭০০ খ্রী) প্রভৃতি কতকগুলি সংক্ষিপ্তসার অভিনবগুপ্তের পরবর্তী কালে রচিত হয়।

শৈব সিদ্ধান্ত মতবাদের মূল উৎস ২৮টি শৈবাগম: ইহাদের মধ্যে 'কামিক' সর্বাপেক্ষা প্রধান। ঋষি তিরু-মূলর-প্রণীত 'তিরুমন্দিরম্' একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। দাক্ষিণাত্যের শৈব-অগ্রাচার্যেরা যেসব স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা 'তিরুবাচকম্' বলিয়া পরিচিত। পরবর্তী সনাতনাচার্যদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন মেকণ্ডের; তাঁহার 'শিবজ্ঞানবোধম্' (১৩শ শতাব্দী) শৈব-সিদ্ধান্ত চিন্তাধারার মূলগ্রন্থ।

পতি (ঈশ্বর), পশু (জীবাত্মা) ও পাশ (সংসার-বন্ধন), এই ত্রিবিধ তত্ত্ব সিদ্ধান্তমতে স্বীকৃত।

সিদ্ধান্তমতে ঈশ্বর নির্গুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের দ্বারা তিনি অবচ্ছিন্ন নহেন। তিরুমূলর ঈশ্বর-সম্পর্কে 'মুকুলা নির্গুণম্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ঈশ্বর বা শিব জগতের কর্তা বা নিমিত্ত কারণ। জগতের বিবর্তনাংশে সিদ্ধান্তীদের সাংখ্যের সহিত মিল আছে। সিদ্ধান্তীদের মতে শিব বিশ্বানুস্যূত ও বিশ্বোত্তীর্ণ, তিনি পরম কারুণিক।

সিদ্ধান্তীরা বিবর্তনের দ্বিবিধ ধারা স্বীকার করেন শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ মায়া হইতে শব্দতত্ত্ব ও ৫টি শুদ্ধতত্ত্ব (শিবতত্ত্ব) সৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট তত্ত্বসকল অশুদ্ধ মায়া হইতে উদ্ভূত। সিদ্ধান্তমতে মোট ৩৬টি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

সিদ্ধান্তীদের মতে আত্মা ও দেহ যেরূপ একান্ত সম্বন্ধযুক্ত, জীব ও শিবও তদ্রূপ। মুক্তাবস্থায় জীব তাহার স্বকীয় সত্তা বজায় রাখে। সত্তার দিক দিয়া জীব ও শিব স্বতন্ত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ উভয়ে এক।

মোক্ষের উপায় হিসাবে সিদ্ধান্তীরা মার্গ হিসাবে চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞান স্বীকার করেন। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি সব উক্ত মার্গের ফল। 'আনব মল' বা মূল অবিদ্যা দূর হইলেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্তমান কর্ণাটকের সুখ্যাত পণ্ডিত বাসবের প্রতিভার ফলে 'বীরশৈব' দর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। জগতের মূল অধিষ্ঠান বীরশৈবমতবাদে 'স্থল' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যে উৎস হইতে এই জগতের উৎপত্তি এবং যেখানে ইহার লয় তাহা এই মতবাদে 'লিঙ্গ' বলিয়া প্রচলিত। সক্রিয় তত্ত্ব হিসাবে লিঙ্গের ধারণা এই মতবাদে প্রধান, তাই এই সম্প্রদায় লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। লিঙ্গ একটি প্রতীক চিহ্ন।

শাক্তাদ্বৈতবাদে ৩৬টি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, মায়া এই জগতের উপাদান। মোক্ষের উপায় হিসাবে শাক্তেরা আত্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেন। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়া আত্মা ও দেহ এক এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবার পর জীবের আত্মা-সম্পর্কে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়। সবশেষে প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ইহাই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়। প্রত্যভিজ্ঞা সংসারদশার মূল যে অজ্ঞান তাহাকে নাশ করে এবং জীব মোক্ষলাভ করে। শাক্তেরা জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, উভয় প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন।

দ্র সুখময় ভট্টাচার্য, তন্ত্রপরিচয়, কলিকাতা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তন্ত্রকথা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১০৩, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, J. G. Woodroffe, *Shakti & Shakta*, London, 1918 ; P. C. Bagchi, *Studies in the Tantras*, Calcutta, 1939, Swami Pratyagatmananda, 'Philosophy of the Tantras', *The Cultural Heritage of India*, Calcutta, 1953 ; Gopinath Kaviraj, 'Sakta Philosophy', *History of Philosophy : Eastern & Western*, S. Radhakrishnan, ed., London, 1952-53 ; J. G Woodroffe, *Introduction to Tantra Sastra*, Madras, 1956.

মনোরঞ্জন বসু

তপতী সূর্যদেবের তপোনিরতা লাবণ্যময়ী গুণান্বিতা কন্যা, সাবিত্রীর কনীয়সী ভগিনী, কুরুরাজের জননী। সূর্যদেব সদাচারিণী প্রাপ্ত-যৌবনা তপতীকে কুরুবংশীয় রাজা সংবরণকে প্রদান করিতে সংকল্প করেন। গিরি-কাননে একাকী বিচরণকারী মৃগয়ারত সংবরণ অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যাকে দেখিয়া কামাসক্ত হন। রাজা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু সেই কন্যা আত্ম পরিচয় গোপন করিয়া অন্তর্হিতা হইলে তিনি বেদনাহত চিত্তে ভূপতিত হন। ইনিই সূর্যকন্যা তপতী, রাজাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পুনরায় আবির্ভূতা হইয়া স্বপরিচয় নিবেদন করেন এবং পিতা সূর্যদেবের নিকট তাঁহাকে যাচ্ঞা করিতে বলিয়া পুনরায় অদৃশ্যা হন। সৈন্যেরা রাজার অন্বেষণে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে অমাত্য ব্যতীত রাজা সকলকে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে বলেন। তিনি সেই গিরিকাননে কঠোরভাবে সূর্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে রাজা স্মরণ করিতে থাকায় দ্বাদশ দিবসে তিনি উপস্থিত হন এবং যোগবলে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া রাজার জন্য তপতীকে সূর্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলে সূর্যদেব তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। বিবাহের পর সংবরণ দ্বাদশ বৎসর গিরিকাননে স্বেচ্ছায় বিহার করিয়া সুখে কালযাপন করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রকোপে সংবরণের রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় প্রজাগণ চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হন। মহর্ষি বশিষ্ঠের অনুরোধে সংবরণ তপতীর সহিত রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে পুনরায় বর্ষণ আরম্ভ হয় ও পূর্বের সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে।

মহাভারতের (১।১৬০-৬৩) এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া কুলশেখরবর্মা 'তপতীসংবরণ' নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।

যূথিকা ঘোষ

তপস্যা শরীর ও মনের অশুদ্ধিনাশের উদ্দেশ্যে আচরণীয় যোগের অঙ্গস্বরূপ অনুষ্ঠান (পাতঞ্জল যোগসূত্র ২।২৯, ৩২, ৪৩)। ইহার বহু প্রকারভেদ আছে। শরীরকে সর্ব প্রকারে কষ্টসহিষ্ণু করিয়া তোলা ইহার অন্যতম লক্ষ্য। শারীর, বাচিক ও মানস এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে তপস্যার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১৭।১৪-১৯)। জৈনমতে, তপস্যা বারো রকমের— ছয় রকম বাহ্য, ছয় রকম আভ্যন্তর। জৈনদিগের নিত্য অনুষ্ঠেয় ষটকর্মের অন্যতম তপশ্চর্যা (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩১ বর্ষ)।

মনুসংহিতা (৬।১৭-৩২), কালিদাসের কুমারসম্ভব (৫।২০-২৮) প্রভৃতি গ্রন্থে নানা রকম কঠোর তপস্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি তপস্যার কথা বলা যাইতে পারে। যথা, গ্রীষ্মকালে চারি পাশে আগুন জ্বালাইয়া ঊর্ধ্বে সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখা, বর্ষায় আকাশতলে অবস্থান করা, শীতে ভিজা কাপড়ে বা জলের মধ্যে অবস্থান করা, বৃক্ষ হইতে যথাকালে স্বয়ং পতিত ফল ও পত্রের দ্বারা বা বৃক্ষের মত মেঘের জল ও চন্দ্রকিরণের দ্বারা জীবন ধারণ করা। বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বুদ্ধদেব অনেক প্রকারে কঠোর তপস্যার দ্বারা আত্মপীড়ন করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই আচরণের নিন্দা করিয়াছেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে 'তফসিলভুক্ত জাতি' কথাটি প্রথম পাওয়া যায়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তদানীন্তন আসাম, বঙ্গ দেশ, বিহার, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, বেরার, মাদ্রাজ, ওড়িশা, পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশের কতিপয় জাতি, কুল ও উপজাতিকে তফসিলভুক্ত জাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতশাসন (তফসিলভুক্ত জাতি) আদেশ (অর্ডার) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জারি করেন। ইহার পূর্বে এই সকল জাতিকে সাধারণতঃ 'অনুন্নত সম্প্রদায়' বলা হইত। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন আদম-শুমার (সেন্সাস) কমিশনার হাটন এই সকল জাতিকে সুসংবদ্ধভাবে শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের তফসিলভুক্ত জাতির তালিকাটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের পূর্বতন তালিকা অনুযায়ী করা হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে যে তালিকাটি রচিত হয় তাহা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের তফসিলভুক্ত জাতিগুলির তালিকার সংশোধিত সংস্করণ। বিচারের মাপকাঠি ছিল তফসিলভুক্ত জাতির সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবনয়ন, ঐতিহাসিক অস্পৃশ্যতা প্রথাই যাহার কারণ।

বর্তমান ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হইবার পরই কেবল বিশেষ উপজাতি (ট্রাইব) ও গোষ্ঠী (ট্রাইবাল কমিউনিটিজ) 'তফসিলভুক্ত উপজাতি' বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে 'অনুন্নত উপজাতি'র উল্লেখ ছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন (প্রাদেশিক বিধান সভা) আদেশের ১৩ সংখ্যক তফসিল (সিডিউল) অনুসারে আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ ও ওড়িশার কতিপয় উপজাতিকে 'অনুন্নত' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বস্তুতঃ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারেই আদিম উপজাতিসমূহকে, তথা অনুন্নত জাতিগুলিকে, তালিকাবদ্ধ করিবার প্রথম সযত্ন প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের তালিকায় আদিমত্ব ও অনুন্নত অবস্থা, এই দুইটি বিবেচনা করিয়া তফসিলভুক্ত উপজাতি নির্ণয় করা হয়। সকল তফসিলভুক্ত উপজাতির প্রধান প্রধান কয়েকটি সাধারণ বিশেষত্ব আছে, যথা: ১ উপজাতি হইতে জন্ম ২ আদিম জীবনযাত্রার প্রণালী ৩. অতি দূরে ও দুরধিগম্য স্থানে বাস ও ৪. সাধারণ ও সর্বতোমুখী পশ্চাৎপদ অবস্থা।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৪২ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি তফসিলভুক্ত জাতি ও তফসিলভুক্ত উপজাতির তালিকা বিজ্ঞাপিত করেন। এই তালিকাগুলি রাষ্ট্রপতির কয়েকটি আদেশের (অর্ডারস) সহিত সংলগ্ন তফসিলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (১৯৫০ ও ১৯৫১ খ্রী)। সংবিধান অনুযায়ী এই সকল আদেশের পরিবর্তন একমাত্র লোক সভায় আইন করিয়া হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন প্রথম দেখা দেয় দুই উপলক্ষে, যথা, নূতন অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি (১৯৫৩ খ্রী), নূতন হিমাচল প্রদেশ ও বিলাসপুর রাজ্য গঠন (১৯৫৪ খ্রী)। অনন্তর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাকা কালেলকরের সভাপতিত্বে নিযুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায় কমিশন যে সকল সুপারিশ করেন তদনুসারে নূতন আইন (১৯৫৬ খ্রী) জারি করিয়া আদেশগুলির পুনঃসংশোধন হয়। ঐ বৎসর রাজ্য পুনর্গঠন ও বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে আঞ্চলিক হস্তান্তর সাধিত হইলে সংশোধনী আইন পাশ করিয়া উক্ত আদেশগুলিকে পুনশ্চ পরিবর্তন করা হয়। বর্তমান মহারাষ্ট্র ও গুজরাত রাজ্যের সৃষ্টি (১৯৬০ খ্রী) হইলে আরও একবার পরিবর্তন সাধিত হয়। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলির তফসিলভুক্তদের জন্য পৃথক পৃথক সাংবিধানিক আদেশ জারি হয়, যথা, জম্মু ও কাশ্মীর (১৯৫৬ খ্রী), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (১৯৫৯ খ্রী), দাদরা ও নগর হাভেলী (১৯৬২

খ্রী), পণ্ডিচেরী (১৯৬৪ খ্রী), এবং উত্তর প্রদেশ (১৯৬৭ খ্রী)। সকল তালিকা একত্রিত করিয়া মোট ১১৬২টি তফসিলভুক্ত জাতি ও ৬১০টি তফসিলভুক্ত উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব পুনর্গঠন আইনানুসারে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ের তফসিলভুক্ত জাতির নূতন তালিকা প্রণীত হয়। পাঞ্জাব হইতে যে এলাকাগুলিকে বাদ দিয়া হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তথাকার তফসিলভুক্ত জাতির ও তফসিলভুক্ত উপজাতির নূতন তালিকা রচিত হয়।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন বি. এইচ লোকুরের সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। কমিটিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে বলা হয়. ১. তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতির বিদ্যমান তালিকার সংশোধনের জন্য গভর্নমেন্টের নিকট প্রেরিত প্রস্তাব সম্বন্ধে কি করণীয়, ২. ভারতভুক্ত কোনও রাজ্যের বা ভারতের কোনও অঞ্চলের কোনও বিশেষ এলাকায় কোনও জাতি ও উপজাতি যথাক্রমে তফসিলভুক্ত জাতি ও তফসিলভুক্ত উপজাতি বলিয়া তালিকাভুক্ত হইলে ঐ জাতি বা উপ-জাতির যে সকল লোক উক্ত রাজ্যের বা অঞ্চলের অন্যান্য এলাকায় অথবা অন্য রাজ্যে বা তফসিলভুক্ত অন্য অঞ্চলে বাস করে, তাহারাও তফসিলী জাতি বা তফসিলী উপজাতি বলিয়া গণ্য হইবে কিনা। লোকুর কমিটির রিপোর্ট ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট পেশ করা হয়।

বিষয়টিকে সকল দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করার জন্য লোকসভার তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতির সভ্য

তফসিলভুক্ত জাতি সম্পর্কিত তালিকা . ৩১ মার্চ ১৯৬৬ খ্রী

লোকসভা ও অন্যান্য সভা	সমগ্র আসন সংখ্যা	তফসিলভুক্ত জাতিদের জন্য রক্ষিত আসন	অরক্ষিত আসনে নির্বাচিত তফসিলভুক্ত সভ্য	তফসিলভুক্ত জাতির সমগ্র সভ্য সংখ্যা
লোকসভা	৫০৮	৭৬	—	৭৬
বিধানসভা	৩৪০৩	৪৯২	৭	৪৯৬
রাজ্যসভা	২৪১	—	১০	১০
বিধান পরিষদ	৬৬০	—	১৩	১৩

তফসিলভুক্ত উপজাতি সম্পর্কিত তালিকা ৩১ মার্চ ১৯৬৬ খ্রী

লোকসভা ও অন্যান্য সভা	সমগ্র আসন সংখ্যা	তফসিলভুক্ত উপজাতির জন্য রক্ষিত আসন	অরক্ষিত আসনে নির্বাচিত তফসিলভুক্ত উপজাতীয় সভ্য	তফসিলভুক্ত উপজাতির সমগ্র সভ্য সংখ্যা
লোকসভা	৫০৮	৩১	আসাম, নাগাল্যান্ড ও লাক্ষাদ্বীপ হইতে ১ জন করিয়া ৩	৩৪
বিধানসভা	৩৪০৩	২২২	৫	২২৭
রাজ্যসভা	২৪২	—	৩	৩
বিধান পরিষদ	৬৬০	—	৯	৯

গণের একটি সভা ও বিভিন্ন রাজ্যের তফসিলী মন্ত্রীগণের অপর একটি সভা আহ্বান করা হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে শ্রীমতী এম চন্দ্রশেখরণের সভাপতিত্বে প্রত্যেক রাজ্যে স্বতন্ত্র সভা ডাকা হয়। এই সকল সভায় রাজ্যের মন্ত্রীগণ ও রাজ্যের পার্লামেন্টের সদস্যগণও আমন্ত্রিত হন। বিষয়টি এখন ভারত গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন।

তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে বিধান কমিশন ও কমিটি গঠনের তারিখ

সভাপতি	তারিখ
কাকাসাহেব কালেলকর	২৯ জানুয়ারি ১৯৫৩
রেণুকা রায়	১ মে ১৯৫৮
বলবন্তরায় মেহতা	১৯৫৮ ৫৯
ভেরিয়ার এলউইন	১ মে ১৯৫৯
ইউ. এন ধেবর	২০ এপ্রিল ১৯৬০
অধ্যাপক এন. আর মালকানি	অক্টোবর ১৯৫৭
জয়প্রকাশ নারায়ণ	ডিসেম্বর ১৯৬০
এলয় পেকমাল	এপ্রিল ১৯৬৫
অধ্যাপক এন. আর মালকানি	এপ্রিল ১৯৬৫
এইচ. ভি. পটাশকর	মার্চ ১৯৬৫
বি. এন. লোকুর	জুন ১৯৬৫
শিলু অও (Shilu Ao)	অক্টোবর ১৯৬৬

নির্মলকুমার বসু

তবলা, বাঁয়া ভারতীয় সংগীতযন্ত্র। পুরাকালে ঊর্ধ্বমৃদঙ্গ নামে অভিহিত ছিল। দক্ষিণ হস্তে তবলা (ডায়না) ও বাম হস্তে বাঁয়া (ডুগি) বাজানো বিধেয়, গান ও ত্রিক বাদ্য-বাদনে ব্যবহার্য বাঁয়ার খোল তামা বা মৃত্তিকা নির্মিত এবং তবলার খোল কাঠে নির্মিত হয়। ১৩শ ১৪শ শতাব্দীতে আমীর খুসরো মৃদঙ্গ ভাঙিয়া তবলা প্রস্তুত করেন। তবলার বোলের বিভিন্ন নাম আছে, যেমন: রেলা, কায়দা, গৎ, আড়ি, কুয়াড়ি ও গৎপরণ। চর্মাচ্ছাদিত মুখের সহিত বজ্রবেষ্টন (ডুরি) থাকে। অঙ্গুলির দ্বারা বাজানো হয় বলিয়া ইহাকে চর্মাবরযন্ত্রও বলে। চর্মাবৃত ধারগুলি ঠুকিয়া স্বরের উচ্চতা ও লঘুতা রক্ষা করা হয়। সংগীতের সময় সামঞ্জস্য (মাত্রা) রক্ষাই বাঁয়া-তবলার উদ্দেশ্য।

প্রদ্যুম্ন মিত্র

তমলুক বিভিন্ন কারণে ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় প্রবাহিত রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত তমলুকের ভূমিগর্ভে অতীত তাম্রলিপ্তের ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে।

প্রাচীন ভারত ও সিংহলের নানা গ্রন্থে এবং বিভিন্ন গ্রীকো রোমান ও চৈনিক বিবরণীতে এই বন্দর-নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সিংহলের ধর্মগ্রন্থ 'মহাবংশে' বর্ণিত আছে যে, মৌর্য সম্রাট অশোকের ইচ্ছানুক্রমে পবিত্র বোধিদ্রুমের চারা লইয়া মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা সিংহলের উদ্দেশ্যে এই বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত যে একটি দেশ ও নগরী দুইয়েরই নাম ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

'কথাসরিৎসাগরে' উল্লিখিত আছে যে, তাম্রলিপ্তিকা নগরী পূর্ব সমুদ্রের অদূরে অবস্থিত ছিল। হেমচন্দ্রের রচিত 'অভিধানচিন্তামণি'তে তাম্রলিপ্তের অপরাপর নামের উল্লেখ আছে, যথা তামলিপ্ত, দামলিপ্ত, তামলিপ্তি, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ এবং স্তম্বপ। তাহা ব্যতীত 'ত্রিকাণ্ডশেষ' গ্রন্থে দেখা যায় তাম্রলিপ্তের অপর এক নাম ছিল বেলাকুল। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে বিজ্ঞানী প্লিনি (Pliny) এবং ২য় শতাব্দীতে গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy) এই নগরীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় গ্রন্থ 'শুই চিং চু'র একটি বাণী হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তের (তান মেই) কোনও নৃপতি পীত সাগরে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এল. পেতেচ (L Petech) অনুমান করেন যে, এই দৌত্যবার্তা নানকিং এর রাজদরবারে 'দক্ষিণ উ' রাজবংশের রাজত্বকালে সম্পাদিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা হিয়েন তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে জাহাজযোগে সিংহলে উপনীত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক ই ৎসিঙ তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্রপথে সম্ভবতঃ সুমাত্রা দ্বীপের পূর্বাঞ্চল (শ্রীবিজয়) অভিমুখে যাত্রা করেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসাঙ তাম্রলিপ্তে (তান মো-লি-তি) আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনানুযায়ী এই সুপ্রসিদ্ধ বন্দর-নগরী একটি সমুদ্র খাড়ির তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। চীনদেশীয় এক পুরোহিত তাম্রলিপ্তে তিন বৎসর কাল সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতীতে তাম্রলিপ্ত কেবলমাত্র একটি সামুদ্রিক বন্দর হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, স্থলপথেও এই নগরীর সঙ্গে একদা মগধ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন নগরী ও জনপদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। অতীতে তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটিলেও এই মহানগরীতে হিন্দু ধর্মেরও জনপ্রিয়তা

ছিল। হিউএন্-ৎসাঙের আগমনকালে তাম্রলিপ্ত বন্দর দেব মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপের দ্বারা শোভিত ছিল। প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্তে জৈন ধর্মেরও প্রসার ঘটিয়াছিল।

'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) তাম্রলিপ্তে 'যবন' নাবিকদের আগমনের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত গ্রীক সমুদ্র বিবরণীতে ('Periplus of the Erythraean Sea') গাঙ্গেয় মোহানায় অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্র গাঙ্গে বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতেও যে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি ভারতীয় বণিকসমাজকে আকর্ষণ করিয়াছে হাজারিবাগ জেলায় অবস্থিত দুধপানিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। টোডরমল্ল এই অঞ্চলকে সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত মহালের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তমলুকে এমন অসংখ্য পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। এই পুরাবস্তুগুলির মধ্যে মৌর্য, শুঙ্গ এবং কুষাণ যুগের জীবনযাত্রা ও নাগরিক সংস্কৃতির পরিচায়ক নানা পোড়ামাটির ফলক ও মূর্তি, উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের অনুরূপ মৃৎপাত্র এবং প্রাক্-খ্রীষ্ট কালের নানা বিচিত্র মৃন্ময় থালি ও কলসের নিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃৎফলকগুলিতে বৌদ্ধ জাতক-মালা ও অপরাপর কাহিনীর অন্তর্লীন ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। মৌর্যশৈলীতে রূপায়িত বিভিন্ন মৃন্ময় মূর্তিগুলি প্রাচীন হস্তিনাপুর (উত্তর প্রদেশ), পাটলিপুত্র (বিহার), পুষ্করণা এবং চন্দ্রকেতুগড়ে (পশ্চিম বঙ্গ) আবিষ্কৃত মৌর্য-শৈলীর অপরাপর ক্ষুদ্রায়তন মৃন্ময় প্রতিমার সঙ্গে তুলনীয়। তমলুকে এমন নানা শ্রেণীর পোড়ামাটির মূর্তি ও কৌলালের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যেগুলি সম্ভবতঃ অতীত বাংলার সঙ্গে হেলেনীয় ও রোমক জগতের বাণিজ্যিক অথবা সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পরিচয় দেয়। তমলুকের নিকটবর্তী তিলদাগ্রামে আবিষ্কৃত একটি পোড়ামাটির ফলকে এমন এক লিপি খোদিত আছে যাহা বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ধারণায় গ্রীক লিপি। অনুমান করা হয়, এই সংক্ষিপ্ত লেখ-নিদর্শনে এক অজ্ঞাত গ্রীক নাবিক তাহার নিরাপদ সমুদ্রযাত্রার জন্য পুবের বাতাসকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হইতে এম. এন দেশপাণ্ডে কর্তৃক তমলুকে এক খননকার্য পরিচালিত হয়। এখানকার আবাসিক স্তর-বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নপ্রদত্ত বিভিন্ন যুগসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়: প্রথম যুগ— নবাশ্মীয় কুঠার ও সামান্য দগ্ধ কৌলাল। দ্বিতীয় যুগ— (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতাব্দী) ছাঁচ-নির্মিত তাম্রমুদ্রা, উত্তর দেশীয় কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের অনুরূপ মৃৎপাত্র এবং মনোরম শৈলীতে নির্মিত মৃন্ময় পুত্তলিকা। তৃতীয় যুগ— (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম ২য় শতাব্দী) এই সময়কার কেন্দ্রমুখী বৃত্তাকার রেখাযুক্ত একশ্রেণীর অসংখ্য মৃৎপাত্র রোমক জগতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। এই যুগের স্তরে ইষ্টকানির্মিত ধাপযুক্ত পুষ্করিণী, বাঁধানো কূপ ইত্যাদিও দেখা যায়। চতুর্থ যুগ (খ্রীষ্টীয় ৩য় এবং ৪র্থ শতাব্দী) - এই সময়ে নির্মিত কুষাণ ও গুপ্তযুগের শৈলাজ্ঞাপক সৌন্দর্য ও লাবণ্যময় পোড়ামাটির মূর্তি। তন্মধ্যে একটি ভগ্ন নারীমূর্তির অপূর্ব সুন্দর নিম্নাংশ একান্তভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে আবিষ্কৃত পাল ও সেন যুগের নানা ভাস্কর্য নিঃসংশয়ে আদি ও মধ্য যুগের শিল্প ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়।

তমলুকের সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক স্তর নির্ধারিত হয় প্রায় বর্তমান কালে, যে সময়ে স্থানীয় রাজকুল ও লবণ-ব্যবসায়ীদের পোড়া ইটের বিভিন্ন হর্ম্যাদি নির্মিত হয়।

তমলুকের প্রাচীনতম ইতিহাস এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত। এখানে আবিষ্কৃত বিভিন্ন কৌলাল এক বিস্মৃত তাম্রাশ্মযুগীয় সভ্যতার নিদর্শন হইতে পারে, যাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আরও উত্তরে অজয় উপত্যকায় পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পাওয়া গিয়াছে। তমলুকের এই প্রাচীনতর সংস্কৃতি প্রাক্মৌর্যকালীন উন্নত জীবনযাত্রারও পরিচায়ক হইতে পারে।

দ্র 'বৃহত্তর তাম্রলিপ্তে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান', তরুণের স্বপ্ন, অষ্টম বর্ষ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ. B. C Sen, *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal* Calcutta, 1942, P. C Das Gupta, 'Some Early Indian Literary References of Tamralipta', *Calcutta Review,* October, 1953, A Ghosh, ed, *Indian Archaeology: A Review* New Delhi 1955, P. C. Das Gupta, *Early Terracottas from Tamralipta,* Calcutta, 1959; Thomas Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India,* New Delhi, 1961, S. K Saraswati, *Early Sculpture of Bengal,* Calcutta, 1962

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

তমসা ভারতে তমস বা তমসা নামে ৩টি নদী আছে। ইহাদের মধ্যে একটি মধ্য প্রদেশের মাইহারের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া রেওয়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া

এলাহাবাদের ২৮ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দক্ষিণে গঙ্গায় পড়িতেছে। অপর একটি তমসা নদী উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার পশ্চিম দিক হইতে নাহির হইয়া ঘর্ঘরা ও গোমতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া বালিয়া জেলায় গঙ্গায় পড়িয়াছে। উত্তর প্রদেশে যমুনার পশ্চিমে বন্দরপুচ্ছ শৃঙ্গের নিকট হইতে আর একটি তমসা নদী ঐ অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া যমুনাতে আসিয়া মিশিয়াছে। কথিত আছে তমসা নদীর তীরে মহাকবি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। তিনটি তমসার মধ্যে কোন্‌টি রামায়ণ বর্ণিত নদী সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তমুরা, তাম্বুরা অথবা চলিত ভাষায় তানপুরা। ইহা তুম্বুর বীণা, তুম্বরু নামক গন্ধর্ব ইহার সর্বপ্রথম নির্মাতা, এইরূপ কিংবদন্তি আছে। ইহার খোল অলাবু নির্মিত এবং উপরিভাগ কাঁপা বংশদণ্ড দ্বারা প্রস্তুত এবং খোলের মধ্য ভাগের সহিত ৪গাছি তার সংলগ্ন — ২ গাছি লৌহ ও অপর ২গাছি পিত্তলনির্মিত। ইহাকে টংকার বা তত যন্ত্র বলে। অঙ্গুলি দ্বারা একত্রে ৪গাছি তার বাজাইলে যে স্বর নির্গত হয় উচ্চাঙ্গ ধ্রুব পদ্ধতির গানে তাহার সহযোগ অপরিহার্য। ঐকতানের সহিতও তাম্বুরা ব্যবহৃত হয়।

প্রদ্যুৎ মিত্র

তরজা বাংলায় 'তরজা' শব্দটি দুইটি অর্থে প্রচলিত, চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃতে 'তরজা' প্রহেলিকাময় অধ্যাত্ম বিষয়ক রচনা অর্থে ব্যবহৃত - 'আর্যা তরজা পড়ে প্রভু অরুণ নয়নে। হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সংকর্ষণে।' (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৩পরিচ্ছেদ) এবং চৈতন্যচরিতামৃতে আছে— 'আচার্য গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারেঠোরে। আচার্য তর্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে॥' (মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ), বিশেষতঃ এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ১৯ পরিচ্ছেদেও প্রহেলিকা অর্থে তর্জার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। উল্লিখিত অর্থে তরজা শব্দটির উদ্ভব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মধ্যযুগে আর্যা ও তর্জা এই দুইপ্রকার প্রবন্ধগীতের পরিচয় পাই। বৃন্দাবনদাসের 'আর্যা তর্জা'র প্রয়োগ হইতে মনে হয়, চর্যা শব্দটির তর্জায় পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। ইহাতে অর্থগত সংগতি রক্ষিত হয়।

তরজার পরবর্তী অর্থ সংগীত-সংগ্রাম। তরজার লড়াই নামে পরিচিত সংগীত সংগ্রাম ১৯শ শতাব্দীতে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত ছিল। একদল গানে প্রশ্ন করে, অপর দল গান গাহিয়া তাহার উত্তর দেয়। তবে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিগানের সহিত ইহার বিষয় ও বিন্যাসে কোনও মিল নাই। তরজায় প্রধানতঃ ব্যক্তিগত বা সাময়িক বিষয় অবলম্বন করিয়া আক্রমণাত্মক উপস্থিত-মত সংগীত রচিত হইত। হিন্দু তরজাকারেরা ইহাতে পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে।

'তরজা' শব্দটি আরবী 'তরজ' হইতে আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ে ইহার প্রচলন এবং হোসেন খাঁ নামক জনৈক মুসলমান এই তরজাগানের উদ্ভাবক বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায় সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুমিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রচলিত 'তর্জার' সহিত পরবর্তী 'তরজা' শব্দের যোগ কতখানি তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন।

তরজায় ঢোলই প্রধান যন্ত্র।

দ্র তিনকড়ি বিশ্বাস, গাজনের বৃহৎ তরজা'র লড়াই, মদনমোহন কুমার, 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', বাংলা সাহিত্যের আলোচনা, কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

[illegible]

তরণীসেন রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের পুত্র। বাল্মীকির রামায়ণে এই চরিত্র নাই, ইহা কৃত্তিবাসের মৌলিকতার পরিচায়ক। তরণীসেনের চরিত্রে বৈষ্ণব ভক্তির প্রকাশ। রামচন্দ্রের হস্তে মৃত্যু হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত এই দৃঢ় বিশ্বাসে তরণীসেন রাবণের আদেশে রাম লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধক্ষেত্রে রামভক্ত তরণীসেন নানাভাবে রামচন্দ্রের স্তুতি করেন, তাঁহার গাত্রে বর্মে ও পতাকায় রামনাম লিখিত ছিল। বিপক্ষের বাণসমূহ বীরত্বের সহিত প্রতিহত করিয়া তরণীসেন লক্ষ্মণকে ভূপাতিত করেন। বিভীষণ পুত্রের স্বর্গপ্রাপ্তিকামনায় পরিচয় গোপন রাখিয়া একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগে তরণীসেনের মৃত্যু ঘটিবে ইহা রামচন্দ্রকে জানান। রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তরণীসেনকে বধ করেন। অসীম মাতৃভক্তি, অপূর্ব বীরত্ব, নির্ভীক আত্মোৎসর্গ ও অধ্যাত্মজ্ঞান তরণীসেনের চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

দ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

যূথিকা ঘোষ

তরল গতিবিদ্যা তরল বলবিদ্যা দ্র

তরল বলবিদ্যা

তরল বলবিদ্যা যে বিজ্ঞানে তরলের উপর বলের ক্রিয়া-সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাহাকে তরল বলবিদ্যা বলা হয়। এই শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, তরল স্থিতিবিদ্যা ও তরল গতিবিদ্যা। তরল পদার্থ স্থিতাবস্থায় থাকিলে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা তরল স্থিতিবিদ্যার বিষয়বস্তু, পক্ষান্তরে তরল গতিবিদ্যায়, তরলের গতিসম্বন্ধীয় সমস্যার আলোচনা করা হয়।

তরল স্থিতিবিদ্যার কয়েকটি সূত্র আর্কিমেদেস (খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২) কর্তৃক নিরূপিত হয়, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সূত্রটি এইরূপ: 'কোনও বস্তুকে তরল পদার্থে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নিমজ্জিত করিলে, আপাতদৃষ্টিতে তাহার ভারের হ্রাস হয়, এই হ্রাসের পরিমাণ বস্তুটি কর্তৃক অপসারিত জলের ওজনের সমান।' এই সূত্রের সাহায্যে কোনও অসম বস্তুর আয়তন, কঠিন বা তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব, অথবা কোনও সংকর ধাতুর বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা থাকিলে তাহাদের মিশ্রণের পরিমাণও নির্ণয় করা যায়।

আর্কিমেদেসের পরে সম্ভবতঃ স্টিভিনাস ই (Stevinus, ১৫৮৫ খ্রী) তরল স্থিতিবিদ্যার উপর তাত্ত্বিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি, কোনও পাত্রে তরল পদার্থ থাকিলে তাহার জন্য পাত্রের তলদেশে ও পার্শ্বদেশে প্রযুক্ত চাপের পরিমাণ নির্ধারণের উপায় সম্বন্ধে বলেন। তাহার এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি হইল বর্তমান কালের বাঁধ ও 'লকগেট' ইত্যাদি।

গ্যালিলিও (১৬১২ খ্রী) উদস্থৈতিক তুলা ও ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থার শর্তসম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাস্তবিক পক্ষে আর্কিমেদেসের সূত্রের সাহায্যে এই দুইটি বিষয়কেই ব্যাখ্যা করা যায়। ইহার অল্পকাল পরেই টরিচেলি (Torricelli, ১৬০৮-৪৭ খ্রী) কোনও ছিদ্র হইতে বহির্গামী তরল জেটের (Jet) বেগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন।

পাস্কাল (Pascal, ১৬২৩-৬২খ্রী) তরল কর্তৃক চাপসঞ্চালনসম্বন্ধীয় যে বিখ্যাত সূত্র বিবৃত করেন তাহা এইরূপ: 'কোনও বদ্ধ পাত্রে অবস্থিত তরলের উপর চাপ দিলে সেই চাপ সমভাবে সর্বদিকে সঞ্চালিত হয় এবং পাত্রের গাত্রে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।' ব্রামাহ্ (Bramah) নামক একজন ইংরেজ প্রযুক্তিবিদ্যাবিশারদ পাসকালের সূত্রের ব্যাবহারিক প্রয়োগ দ্বারা 'হাইড্রলিক প্রেস' নামক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন (১৭৯৬ খ্রী)। তাহার পরে নিউ-ম্যাটিক কন্ট্রোল, ফর্জিং, রিভেটিং ইত্যাদি ব্যাপারে এই সূত্রের আরও নানাবিধ প্রয়োগ হইয়াছে।

দালাঁবেয়র (d' Alembert, ১৭১৭-৮৩ খ্রী) কূট (প্যারাডক্স) ও প্রবহমান তরলের ক্ষেত্রে তাঁহার নামীয় অনবচ্ছেদ-সমীকরণের প্রস্তাবনা করেন।

অনবচ্ছেদ সমীকরণ এইভাবে লেখা যাইতে পারে —

কোনও গতিশীল তরলের যে কোনও স্ট্রিম ফিলামেন্টের জন্য

$Q = av =$ ধ্রুবক

এখানে Q = একক সময়ে প্রবাহিত তরলের পরিমাণ,

a = তরলের প্রস্থচ্ছেদ (গতিমুখের লম্বভাবে),

v = তরলের গতি।

তরল গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে দানিয়েল বের্নুয়ি (Daniel Bernoulli, ১৭০০-৮২ খ্রী)-এর অবদান সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার উপপাদ্যের সাংকেতিক সংজ্ঞা নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া যাইতে পারে,

সুপ্রতিষ্ঠভাবে প্রবহমান তরলের ক্ষেত্রে

$$\frac{p}{P} + \frac{1}{2} q^2 + hg = \text{ধ্রুবক},$$

এই সমীকরণে p, q, P, h, g হইতেছে যথাক্রমে চাপ, গতি, ঘনত্ব, কোনও নির্ধারিত তল হইতে তরলের মধ্যস্থিত বিন্দুর উচ্চতা এবং অভিকর্ষজনিত ত্বরণ। এই উপপাদ্যটি তরল গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার সাহায্যে তরলের গতি ও প্রবাহ মাপিবার যন্ত্র, যথা ভেঞ্চুরি-মিটার ইত্যাদির কার্যপ্রণালী বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে।

গাণিতিক তরল বলবিদ্যার ক্ষেত্রে অয়লার (Euler, ১৭০৭-৮৩ খ্রী), লাগ্রাঞ্জ (Lagrange, ১৭৩৬-১৮১৩ খ্রী) এবং স্টোক্স (১৮১৯-১৯০৩ খ্রী) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে স্টোক্সকেই আধুনিক তরল বলবিদ্যার জনক বলা হয়।

আবর্তহীন ও আবর্তযুক্ত প্রবাহ এবং কোনও প্রবাহের প্রথমোক্ত শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রূপান্তর সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন রেনো (১৮৪২-১৯১২ খ্রী)।

তরল বলবিদ্যার বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাহায্যে আজ জেট প্রপালশন সম্ভব হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, টার্বাইন নামক যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প ব্যয়ে তরলের অন্তর্নিহিত স্থৈতিক ও গতীয় শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছে।

দ্র A H Gibson, *Hydraulics and Its Applications*, London, 1947, L M. Milan-Thompson, *Theoretical Hydrodynamics*, New York, 1955; A. H. Lewitt, *Hydraulics and Fluid Mechanics*, London, 1963.

সুখেন্দুপ্রসাদ বসু

তরাই হিমালয় পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত ভাবর অঞ্চলের দক্ষিণে ও গাঙ্গেয় সমতলের উত্তরে সংকীর্ণ সমান্তরাল বনভূমিকে তরাই বলা হয়। ইহা যমুনা নদীর পূর্ব হইতে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলা ও আসামের তরাই অংশটির নাম ডুয়ার্স বা দুয়ার ('ডুয়ার্স' দ্র)।

তরাই প্রায় সমতল। তরাই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদীগুলির মধ্যে গণ্ডক, কোশী, তিস্তা প্রভৃতি প্রধান। তরাই এর পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫০০ মিলিমিটারের (১০০ ইঞ্চি) অধিক। পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম। সমগ্র এলাকাটি অত্যন্ত আর্দ্র ও ম্যালেরিয়ার প্রাবল্যহেতু অস্বাস্থ্যকর।

তরাই এর বনভূমিতে শালই প্রধান বৃক্ষ, ইহা ছাড়া মিশ্রবৃক্ষ ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। অরণ্যের মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ তৃণ, শরবন ও বাঁশ ঝাড়ে পূর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল অবস্থিত। তরাই এর জঙ্গলে হস্তী, ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি সংরক্ষিত বন ও বিশিষ্ট বন্য পশুর সংরক্ষণাগার আছে, যেমন করবেট ন্যাশনাল পার্ক ও জলদাপাড়া পশুসংরক্ষণাগার।

বনভূমি হইতে সরকারের প্রচুর রাজস্ব আদায় হয়, কাষ্ঠব্যতীত নানা প্রকার বনজ সম্পদও আহরণ করা হয়। উন্মুক্ত এলাকায় কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। ঘাস ও শরের জঙ্গল কাটিয়া আধুনিক কালে ধান, পাট ও তামাকের চাষ হইতেছে। পাহাড়ের ঢালে চা ও ফলের বাগিচা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বনজ ও কৃষিজ কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল কিছু শিল্পও অঞ্চলটিতে আছে।

এ অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। তবে উত্তর প্রদেশে ও চা বাগান অঞ্চলে লোকবসতি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০০ জনেরও অধিক।

সাহারানপুর, পীলীভীত, খেরী, মতিহারী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি শহর এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র।

দ্র L. D. Stamp, *Asia*, London, 1962; O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1954.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

তরানা তিলানা দ্র

তরুণাস্থি কার্টিলেজ। দেহের সংযোজক (কানেকটিভ) টিস্যুবিশেষ। ইহা ঈষদচ্ছ, শ্বেতাভ, স্থিতিস্থাপক অথচ দৃঢ়, সেজন্য তরুণাস্থির দ্বারা গঠিত অঙ্গগুলি একদিকে দৃঢ় এবং অপর দিকে স্থিতিস্থাপক ও ঘাতসহ। তরুণাস্থির কোষগুলি ২-৪টি করিয়া একত্রে থাকে, কোষের চারি পার্শ্বে থাকে প্রোটিন-প্রধান জমি (ম্যাট্রিক্স)। তরুণাস্থি প্রধানতঃ তিন প্রকার - প্রথম প্রকারে কোষগুলির চতুস্পার্শ্বের জমিটি তন্তুবিহীন, দ্বিতীয় প্রকারে জমিতে কোলাজেনঘটিত দৃঢ় শ্বেত তন্তু এবং তৃতীয় প্রকারে জমিতে ইলাস্টিনঘটিত স্থিতিস্থাপক পীত তন্তু বর্তমান। তন্তুবিহীন তরুণাস্থি নাসিকা, পঞ্জর, শ্বাসনালী, ক্লোমশাখা, স্বরযন্ত্র, দীর্ঘ অস্থির প্রান্ত প্রভৃতি অঙ্গে, শ্বেত তন্তুপ্রধান তরুণাস্থি জানুসন্ধি, মেরুদণ্ডের সন্ধি প্রভৃতি স্থানে এবং পীত তন্তুপ্রধান তরুণাস্থি কানের পাতা, মধ্যকর্ণ ইউস্টেকিয়ান নালী প্রভৃতি অঙ্গে থাকে।

ভ্রূণে দীর্ঘ অস্থিগুলি গঠনের সময় প্রথমে ভবিষ্যৎ অস্থির স্থানে তরুণাস্থি গড়িয়া ওঠে, পরে তরুণাস্থির জমিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস -ঘটিত লবণের অবক্ষেপ (ডিপোজিশন) ঘটে এবং ক্রমে তরুণাস্থিটি অস্থিতে রূপান্তরিত হয়। জন্মের পরেও দীর্ঘ অস্থির প্রান্তে তরুণাস্থি হইতে ক্রমাগত অস্থি উৎপন্ন হওয়ায় অস্থির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়।

দেব । ৩৮৮

তরু দত্ত (১৮৫৬-৭৭ খ্রী) পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ পিতার রামবাগানের (১২ মানিকতলা স্ট্রীট) বাসস্থানে তরু দত্তের জন্ম হয়। দত্তবংশের সকলেই কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারস্থ ক্রাইস্ট চার্চে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে যান এবং নীসের একটি পাসিঁনাতে ও পরে কেমব্রিজে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট যক্ষ্মা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার *Ancient Ballads and Legends of Hindustan* (১৮৮২ খ্রী) নামক ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ ভারতে ইংরেজী ভাষায় লেখা কবিতার ইতিহাসে নূতন যুগের প্রবর্তক। *A Sheaf Gleaned in French Fields* (১৮৭৬ খ্রী) নামক গ্রন্থে তরু দত্ত মূল ফরাসী হইতে কিছু কবিতার ইংরেজী তর্জমা প্রকাশ করেন। তাঁহার *Bianca* নামক উপন্যাসটি 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তরু দত্ত -প্রণীত ফরাসী উপন্যাস *Le Journal de Mademoiselle d' Arvers* প্যারিস হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

দ্র রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, কবি তরু দত্ত, কলিকাতা, ১৯৫৯, Harihar Das, *Life and Letters of Toru*

Dutt, Oxford, 1921; Dipendranath Mitra, 'The Writings of Toru Dutt', *Indian Literature*, vol. IX, no. 2, April-June, 1966.

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

তর্পণ জলের দ্বারা কৃত পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের তৃপ্তি-বিধায়ক অনুষ্ঠান। ইহা পিতৃহীন গৃহস্থের প্রতি দিন অবশ্যকর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম। ইহার নাম পিতৃ-যজ্ঞ। এই অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি দেবতা, সনক-সনন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট পুরুষ, মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষি, চতুর্দশ যম, পিতামহাদি দ্বাদশ পূর্বপুরুষ (পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ-প্রমাতামহী) ও ত্রিভুবনের উদ্দেশে দুই হাতের অঞ্জলি বা কোশাকুশি ভরিয়া জল দিতে হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিলতর্পণ বা তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ প্রশস্ত। অপর পক্ষের (শারদীয়া দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ব পক্ষের) প্রতিদিন, বিশেষ করিয়া মহালয়া অমাবস্যায়, তিলতর্পণ বহু প্রচলিত। ভীষ্মাষ্টমীতে (মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমী) জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থের অপুত্রক ভীষ্মের তর্পণ করিবার বিধান আছে। তান্ত্রিক উপাসনায় প্রতি দেবতার স্বতন্ত্র তর্পণের ব্যবস্থা আছে।

দ্র রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্ব।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

তলস্তয়, ল্যেভ নিকোলায়েভিচ (১৮২৮-১৯১০ খ্রী) আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, ইনি নাটক, ছোট-গল্প এবং আত্মজীবনীও লিখিয়াছেন। তলস্তয়ের রচনার সংখ্যা শতাধিক, পৃথিবীতে এত অধিকসংখ্যক অক্ষর আর কেহই লিখিয়া যান নাই।

রাশিয়ার তুলা প্রদেশের ইয়াস্‌নাইয়া পোলাইয়ানার এক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী বংশে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর তলস্তয়ের জন্ম। তিনি পরিবারের চতুর্থ সন্তান। প্রথমে গৃহে, পরে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার সমাপ্ত হয় নাই। ফরাসী মনীষী রুশোর চিন্তাধারার প্রভাবে প্রচলিত শিক্ষা-ধারার প্রতি তিনি আস্থা হারাইয়া ফেলেন এবং স্ব-শিক্ষায় বিশ্বাসী হন। ইহারই ফলে তাঁহার জীবনের ও চিন্তার গতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। বিলাসী ও অস্থির-চিত্ত তলস্তয় দক্ষিণ রুশিয়ার ককেশাস অঞ্চলে কিছু কাল ভ্রমণ করিয়া আসিবার পর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করেন। দৈনিক জীবনের অবসর-মুহূর্তগুলি কাটাইবার জন্য তিনি প্রথমে সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন এবং ঐ বৎসরেই তাঁহার আত্মজীবনী-মূলক রচনার প্রথম খণ্ড 'শৈশব' (*Detstvo*) প্রকাশিত হইলে রুশ সাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অসমাপ্ত উপন্যাস 'কসাক' (*Kazaki*) প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহার পরেই রচিত হয় তাঁহার মহত্তম উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি' (*Voyna i Mir*, ১৮৬২-৬৯ খ্রী)। শতাধিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত 'যুদ্ধ ও শান্তি'—অধিকাংশ সমালোচকের মতে, আজ পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ১৮৫৪-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈনিকরূপে যে অভিজ্ঞতা তলস্তয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই উপন্যাসের ভিত্তি। ফরাসী সম্রাট নাপোলেঁর রুশিয়া আক্রমণের পট-ভূমিকায় রুশ দেশ ও জাতিকে 'যুদ্ধ ও শান্তি' এক মহাকাব্যিক গৌরবে সমুত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

ইহার পর হইতেই তলস্তয়ের লেখনী অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় মহাগ্রন্থ ও অন্যতম বিশ্বখ্যাত উপন্যাস 'আনা কারেনিনা' (*Anna Karenina*) আত্মপ্রকাশ করে। অভিজাত-সমাজের চিত্রণ নৈপুণ্যে এবং নায়িকা আনার সকরুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে এই উপন্যাস তলস্তয়ের জীবনদৃষ্টি ও বাস্তবতাবোধকে অসামান্যভাবে উদ্‌ভাসিত করিয়াছে। বৃদ্ধ স্বামীকে আনা ভালবাসিতে পারে নাই— প্রেমিক ভ্রনস্কি তাহাকে বঞ্চনা করিল, সন্তানের প্রতি কোনও দাবি তাহার রহিল না। ঘরে এবং বাহিরে সর্বতোভাবে রিক্ত হইয়া চলন্ত ট্রেনের নীচে আনার আত্মহত্যা যে দুঃসহ ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইভানা ইলিচার মৃত্যু' (*Smert' Ivana Illyicha*, ১৮৮৬ খ্রী), 'প্রভু ও শ্রমিক' (*Khozyain i Rabotnik*, ১৮৯৫ খ্রী), 'পুনরুত্থান' (*Voskresenie*, ১৮৯৯ খ্রী) এবং ককেশাস অঞ্চলের অভিজ্ঞতাসম্ভব 'হাজী মুরাদ' (*Hadji Murad*, ১৯০১ খ্রী)।

ইহাদের মধ্যে 'পুনরুত্থান' (ইংরেজীতে *Resurrection* নামে পরিচিত) উপন্যাসটি নানা দিক হইতে বহুখ্যাত এবং বহুলভাবে আলোচিত। কাতুসা মাসলোভা-নাম্নী জনৈকা পতিতা নারীকে উদ্ধার করিবার জন্য অনুতপ্ত দিমিত্রির সাধনা এবং চূড়ান্ত গ্লানি হইতেও জীবনের নব-অভ্যুদয়ের বাণী এই উপন্যাসে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ সমালোচক মনে করেন, বক্তব্যের গুরুভারে 'পুনরুত্থান' শিল্পরূপে সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে মহত্তম মানবতার যে বাণী—

তলস্তয়ের যে আদর্শ ও বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই ইহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ভক্তি, সত্য ও কল্যাণের দ্বারা উদ্‌বোধিত কয়েকটি অনন্যসাধারণ ছোটগল্পও তলস্তয় সর্বকালের পাঠকের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

'যুদ্ধ ও শান্তি' হইতেই তলস্তয়ের সাহিত্যে কিছু প্রচার-ধর্মিতা আসিয়া গিয়াছে, ফলে যাঁহারা 'বিশুদ্ধ শিল্পে' বিশ্বাসী, তাঁহারা তাঁহার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিরূপতা পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তলস্তয় মাত্র 'সুন্দরের সাধনা'কেই পরমার্থ বলিয়া মনে করেন নাই, মানব কল্যাণকেই তাঁহার ব্রত বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনের ভোগী তলস্তয় উত্তর জীবনে সর্বত্যাগী হইয়াছেন, দরিদ্র কৃষকের মত অশন বসন গ্রহণ করিয়াছেন, স্বদেশের কোটি কোটি বঞ্চিত মানবের আত্মজন হইয়াছেন, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। 'পবিত্র হও', 'মুক্ত হও', 'অহিংস হও', 'শত্রুরও হিতকামী হও' – এই মূলমন্ত্রগুলিকে মাত্র প্রচারই নয়, জীবনেও তিনি অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলেই কাউন্ট তলস্তয়ের 'ঋষি তলস্তয়'রূপে 'পুনরুত্থান' ঘটিয়াছে। গান্ধীজীর জীবনে তলস্তয়ের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরিবার-পরিজন তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করিয়াছে, দাম্পত্য-জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। অভিজাত-নন্দিনী পত্নী স্বামীর এই জন্মান্তর সহ্য করিতে পারেন নাই, তিক্ততম পারিবারিক অশান্তিতে তলস্তয়ের বার্ধক্য অগ্নিশয্যায় পরিণত হইয়াছে। পরিশেষে যন্ত্রণায় জর্জরিত, বিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ তলস্তয় এক অন্ধকার রাত্রিতে অনিশ্চিত পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এগারো দিন পরে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর একটি ছোট রেল স্টেশনে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত তলস্তয়ের দেহান্ত ঘটে।

দ্র Romain Rolland, *Tolstoy*, London, 1911 ; Ilyo Tolstoy *Reminiscences of Tolstoy by His son*, New York 1914 ; Aylmer Maude, *Leo Tolstoy*, New York, 1918 ; Derrick Leon, *Tolstoy : His Life and Work*, London 1944 , Kalidas Nag, *Tolstoy and Gandhi*, London, 1950 , Maxim Gorky, *Tolstoy, Chekov and Andreev* Leonard Woolf, tr. , New York, 1951 , *The Private Diary of Leo Tolstoy*, L & A Maude, tr., New York, 1957.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তসর এক জাতের রেশম। ইহার রঙ অনেকটা তামাটে। তসর-কীট বন্য। উহা শাল, আসন, অর্জুন, কুল, সিধা প্রভৃতি প্রায় ১৫।১৬ রকমের বনজ বৃক্ষের পাতা খাইয়া ঐ সমস্ত গাছের ডালেই গুটি তৈয়ারি করে। পরে এই গুটি তুলিয়া আনিয়া সুতা কাটিতে হয়। তসর জন্মায় বিহারের ছোটনাগপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে। বাংলা দেশের বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের জঙ্গলেও কিছু কিছু তসর গুটি পাওয়া যায়। কিন্তু তসরের সুতা কাটা ও কাপড় বোনা হয় প্রধানতঃ বাংলা দেশের বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরের তসর তাঁতিদের দ্বারা। তসরের উৎপাদন বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ পাউণ্ড।

সত্যরঞ্জন সেন

তাও পৃথিবীর প্রাচীনতম দার্শনিক মতগুলির অন্যতম এবং পরবর্তী কালে চীন দেশে বহুল আচরিত ধর্ম। খ্রীষ্টপূর্ব ১১শ শতক হইতে চীন দেশে পারমার্থিক ও নীতিবিষয়ক জ্ঞানচর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে উত্তর চীনের অধিবাসী লাও-ৎসু ('লাও-ৎসু' দ্র) নামে ঋষিকল্প ব্যক্তি এই ভাবগুলিকে নিজস্ব চিন্তামণ্ডিত করিয়া ইহাকে তাও আখ্যা দেন এবং 'তাও-তে কিঙ্ (বা চিং)' নামে ৮১টি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ সমন্বিত একখানি পুস্তক সংকলন অথবা প্রণয়ন করেন। ইহাই তাও বাদের আদি গ্রন্থ। কাব্যময় পরিচ্ছেদগুলি গভীর তত্ত্বোপলব্ধি প্রসূত এবং ইহার সকলগুলি তাঁহার নিজস্ব রচনা না হইলেও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দার্শনিক মত যে লাও-ৎসু প্রবর্তন করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রখ্যাত চীনা দার্শনিক কনফুশিয়স তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ লাও-ৎসুর সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহার প্রবর্তিত আচরণবিধি চীনের জনজীবনকে ব্যবহারনিষ্ঠ করিয়া তুলিলেও লাও-ৎসুর দার্শনিক চিন্তাধারা ভাবুক ও পণ্ডিতসমাজ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লাও-ৎসু প্রবর্তিত 'তাও'কে একপ্রকার দার্শনিক অতীন্দ্রিয়বাদ বলা যাইতে পারে।

তাও শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'যাহার সাহায্যে কোনও পদার্থের মুখ বা আরম্ভে পৌঁছানো যায়', অর্থাৎ মৌলিক অর্থে 'মার্গ' বা 'পথ'। কিন্তু ইহা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত পথ নহে, ইহা দেবাদিষ্ট পথ, শাশ্বত ধর্ম। অর্থাৎ 'তাও' হইতেছে সেই পথ যাহার মধ্য দিয়া সব কিছু বাহিত বা পালিত হইতেছে। তাও মতের এই পথ বা পারমার্থিক তত্ত্বের কল্পনা উপনিষদের 'ঋত' শব্দের অন্যতম অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঋতের ন্যায় তাও হইতেছে সেই শাশ্বত সত্য পথ, যে

পথের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সব কিছু চালিত বা বাহিত হইতেছে—ইহা জগৎ ও জাগতিক তাবৎ চেষ্টার অন্তর্নিহিত এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি। 'তাও' নিজ অব্যক্তস্বরূপে অনাদি ও অনন্ত, অপরিবর্তনীয়। ইহা অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অপার্থিব, শাশ্বত, ভূমা, অবাঙ্‌মনসোগোচর। অনির্বচনীয় তাও হইতেছে বিশ্বপ্রপঞ্চের পরিচালক চিৎশক্তি, বিশ্বপ্রপঞ্চের নামরূপহীন রহস্যময় আদি কারণ, বিশ্বের মূলাধার। আবার মানুষের চিত্তে ইহা ব্যক্তরূপ, ব্যক্তগুণ, চিৎ বা বিচারশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল। তাওই জগতের কার্যকরশক্তিরূপে বিচরণ করে এবং জগতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেও ইহা জগৎ নিরপেক্ষ ধর্ম বা ঋত।

লাওৎসু প্রবর্তিত দার্শনিক মত খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত ধারায় বিদ্যমান ছিল, তাহার পর হইতে ক্রমশঃ ইহাতে বিভিন্ন মতের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয় এবং পরিশেষে যখন ইহা এক আচরিত ধর্মমতে পরিণত হয়, তখন নানা কুসংস্কার ইহাতে প্রবেশ করে, এমন কি জাদুবিদ্যা কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণপ্রস্তুত ও নানাবিধ যৌনাচারও ইহার অঙ্গীভূত হইতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম চীন দেশে নীত হইলে চীনসম্রাটগণ কখনও তাও ধর্ম, কখনও বা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকায় দুইটি ধর্মের জনপ্রিয়তা তদনুরূপে হ্রাস বৃদ্ধি পায়। 'তাও' দর্শনের প্রভাবের ফলে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। তেমনই আবার পরবর্তী কালের তাও-বাদে মহাযান বৌদ্ধ বিচারের ও অনুষ্ঠানের প্রভাবও পড়ে।

সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা চীন দেশের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় যাহাতে অনূদিত হয় সে বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিছু বিলম্বে হইলেও শেষ পর্যন্ত 'তাও তে কিঙ্ (বা চিঙ)' গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইয়া ভাস্করবর্মার নিকট আসামে প্রেরিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও অনূদিত পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। চীনা ঐতিহাসিকগণের পুস্তক হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায়।

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল চীনা হইতে বঙ্গ ভাষায় 'তাও-তে-চিঙ্' পুস্তকখানির অনুবাদ করিয়াছেন।

দ্র তাও তে-চিং, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত, নয়া দিল্লী, ১৯৬০, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'গ্রন্থপরিচয়', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

তাকাকুসু, জুনজিরো (১৮৬৬-১৯৪৫ খ্রী) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাপানী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্। বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনে তাকাকুসুর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি ফেলো এবং ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

তাকাকুসু ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হিরোশিমাতে জন্মগ্রহণ করেন। বংশপদবী ছিল সাওয়াই। কোবের (Kobe) তাকাকুসু পরিবার তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে। অক্সফোর্ডে সংস্কৃত পড়েন (১৮৯০ খ্রী)। মাক্স ম্যুলর তাঁহার গুরু। সেখান হইতে ফ্রান্স ও জার্মানীতে যান। দেশে ফিরিয়া (১৮৯৭ খ্রী) জাপানে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণাতে ব্রতী হন। এ সময়েই তাহার অনূদিত ঈৎ সিঙ-এর ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য-বিদ্যার জগতে ইহা বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এবং টোকিওর বিদেশী ভাষা শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইলে (১৯০৪ খ্রী) সেই পদ তিনিই প্রথম অলংকৃত করেন এবং পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হন (১৯৩০ খ্রী)। অবসর গ্রহণের পর হইতে আমৃত্যু তিনি সম্মানের ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মের মর্মকথা ও দর্শন বিষয়ে এক বক্তৃতামালা প্রদান করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াইতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের দার্শনিকদের এক সম্মেলনে তাঁহার এই বক্তৃতামালাকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা হইয়াছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

তাঁহার সম্পাদিত ও লিখিত রচনাবলীর মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার টীকা সুবর্ণ-সপ্ততির (চীনা সংস্করণ) ফরাসী অনুবাদ, অমিতায়ুর্ধ্যানসূত্র (১৮৯৪ খ্রী), পরমার্থকৃত বসুবন্ধুর জীবনী (১৯০৪ খ্রী), সর্বাস্তিবাদীদের অভিধর্ম সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ (১৯০৫ খ্রী), ঋগ্‌বেদ, গীতা, অষ্টোত্তরশত উপনিষদ এবং ৬০ খণ্ডে সটীক পালি ত্রিপিটক প্রভৃতির অনুবাদ, বিনয়পিটকের টীকা সমন্ত পাসাদিকা (১৯৪৭ খ্রী), ১৬০ খণ্ডে প্রকাশিত জাপানী বৌদ্ধ সাহিত্য, শতখণ্ডে সম্পূর্ণ তাইসো সংস্করণ ত্রিপিটক, ইংরেজীতে 'দি এসেন্স অফ বুদ্ধিস্ট ফিলসফি' (১৯৫৬ খ্রী), জাপানী ভাষায় পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস, ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের ইতিহাস, এবং বুদ্ধের জীবনী। বৌদ্ধ জ্ঞানকোষ-

গ্রন্থ *Hobogirin* তিনি সিলভ্যাঁ লেভির সহিত একযোগে সংকলন ও সম্পাদন করেন।

শিবদাস চৌধুরী

তাজমহল তাজের স্থপতি কে, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। সিবাস্টিয়ান মানরিকের (Sebastian Manrique) মত উল্লেখ করিয়া ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, জেরনিমো ভেরনেও (Geronimo Veroneo) তাজের স্থপতি। লতিফ 'তারীখ ই তাজমহল' অনুসরণ করিয়া ওস্তাদ ইশাকে তাজের প্রধান স্থপতি ও নকশানবিশ বলিয়াছেন। হাফিজ লুৎফুল্লার 'দিওয়ান ই মহন্দিস' অনুসরণ করিয়া চাঘতাই ও শ্রীবাস্তব ওস্তাদ আহ্‌মদ লাহোরীকে তাজের স্থপতি বলিয়াছেন। কাল খাণ্ডেলবালের মতে এখন কেহই তাজের স্থপতি বলিয়া জেরনিমো ভেরনেওর দাবিকে গুরুত্ব দেন না। মধ্য এশীয় ওস্তাদ ইশা তাজের স্থপতি এ সম্বন্ধে মতৈক্য আছে। হ্যাভেল, মার্শাল ও পার্সি ব্রাউনের মতে তাজে প্রতীচ্যের কোনরূপ প্রভাব নাই। পার্সি ব্রাউন বলেন, তাজ দিল্লীর খান-ই-খানানের সমাধির আদর্শে নির্মিত ও খান ই খানানের সমাধি হুমায়ুনের সমাধির আদর্শে রচিত হয়। তাজ ঐসলামিক স্থাপত্যের চরম বিকাশ।

সম্রাট শাহ্‌জাহান প্রিয়তমা পত্নী আর্জুমন্দ বানু বেগম বা মমতাজ মহলের সমাধির জন্য তাজমহল নির্মাণ করান। তাভের্নিয়ে-র (Tavernier) মতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাজের নির্মাণকার্য শুরু হইয়া ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়।

'পাদিশাহ্‌নামা' অনুসারে তাজনির্মাণে ব্যয় হয় ৫০ লক্ষ টাকা। অপর মতে, তাজনির্মাণে ব্যয় হয় ৪১১৪৮৮২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পাই।

তাজের প্রধান তোরণটি লাল বেলে পাথরে নির্মিত ও ইহা নিম্নতল হইতে ১০০ ফুট উচ্চ। ইহার উপরে উত্তরে ও দক্ষিণে ১১টি করিয়া ২২টি ছত্র ও তাহার পার্শ্বে চারিটি সরু মিনার ও চার কোণে চারিটি 'কর্ণকূট' আছে। তোরণমুখ আরব-লেখের দ্বারা অলংকৃত। তোরণ দিয়া প্রবেশ করিলেই একটি অষ্টকোণ গৃহ পাওয়া যায়, তাহার ধনুকাকৃতি ছাদের মধ্যস্থল হইতে একটি পারস্যদেশীয় বাতি ঝুলিতেছে। লর্ড কার্জন ইহা দান করেন।

তাজের প্রধান স্মৃতি-সৌধ দুইটি উন্নীত বেদিকার উপর অবস্থিত। প্রথমটির ভূমি ৪ ফুট উচ্চ ও লাল বেলে পাথরে নির্মিত। দ্বিতীয়টি মর্মর-রচিত ও প্রথমটি হইতে ১৮ ফুট উচ্চ। এই উন্নীত মর্মর বেদিকার চারি দিক হইতে চারিটি মিনার উঠিয়াছে। প্রত্যেক মিনার মর্মর বেদিকা হইতে ১৩৭ ফুট উচ্চ। ইহার তিনটি তল আছে ও মোট ১৫৪টি (৪৭+৪৯+৫৮) ধাপ আছে। মূল স্মৃতি-সৌধটি মর্মর বেদিকার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ১০৮ ফুট ও ইহার চারি কোণে চারিটি গম্বুজ আছে ও মধ্যে একটি বিরাট গম্বুজ ১৮৭ ফুট উর্ধ্বে উঠিয়াছে। এই গম্বুজের একটি সোনালি চূড়া আছে। এই সৌধের মধ্যস্থলে একটি অষ্টকোণ ঘর। ইহা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সমাধি গৃহ। সম্রাজ্ঞীর সমাধি মর্মরগৃহের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। সম্রাটের সমাধি ইহার একটু তফাতে ও ইহা হইতে একটু উচ্চ। সমাধি দুইটির চতুর্দিকে ৮ফুট উচ্চ একটি সছিদ্র মর্মর আচ্ছাদনী (স্ক্রিন) আছে। এই আচ্ছাদনীর আটটি পার্শ্ব আছে। যমুনা তাজের উত্তরে প্রবাহিত। তাজের পশ্চিমে একটি মসজিদ আছে ও পূর্বে 'মেহমানখানা' বা অতিথিশালা আছে।

ফার্গুসন ও স্পালাডিন তাজের পদ্ম ও পুষ্পের রত্নালংকরণ দেখিয়া ইহা বৈদেশিক বলিয়াছেন। কিন্তু পার্সি ব্রাউন দেখাইয়াছেন যে এই অলংকরণের কাজ কনৌজের কয়েকজন হিন্দু কারিগরের হস্তে ন্যস্ত ছিল (যথা চিরঞ্জিলাল, ছোটেলাল মন্নুলাল ও মনোহর সিং)। দিওয়ান-ই আফ্রিদির মতে বিশ প্রকার রত্ন তাজে ব্যবহৃত হয়। থর্নটনের মতে একটি পুষ্পে ১২ রকমের ১০০টি রত্ন ছিল।

দ্র J. N Sarkar, *Studies in Mughal India*, Calcutta, 1919; S C Mukherji, 'Architecture of the Taj & its Architect', *Indian Historical Quarterly*, vol IX 1933; S N Qanungo, Achitect of the Taj Mahal, *Indo-Asian Culture*, vol XI, no 4, 1963; A L. Srivastava, *Mediaeval Indian Culture*, Agra, 1964; Percy Brown, *Indian Architecture*, vol. II, Bombay, 1942; V. Smith, *A History of Fine Arts in India & Ceylon*, Bombay, 1932.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

তাজিয়া আরবী শব্দ। ইহার অর্থ মৃত ব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ, শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে হজরত আলীর দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসেনের সমাধি-স্তম্ভের প্রতিকৃতিও 'তাবুত্‌' বা তাজিয়া নামে অভিহিত। আবার হিজরী সন অনুযায়ী মহরম মাসে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ও হজরত আলীর দুই শহীদ সন্তানের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তস্মরণার্থে বুকে করাঘাত দ্বারা শ্রদ্ধাভরা বেদনা-

জানানোও তাজিযা। বিশেষতঃ ইমাম হুসেনের আত্মবলির জন্য বাৎসরিক দুঃখ-প্রকাশকে তাজিয়া বলা হয়।

এস এ মান্নদ

তাঞ্জোর, থানজাভুর মাদ্রাজ রাজ্যের একটি জেলা, তালুক ও শহর। জেলাটি ৯°৫০ হইতে ১১°৫০′ উত্তর এবং ৭৮°৫৫ হইতে ৭৯°৪০′ পূর্বে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৯৭১৯ বর্গ কিলোমিটার (৩৭৪০ বর্গ মাইল)। তাঞ্জোরের উত্তরে কোলেরুন নদী, পশ্চিমে তিরুচ্চিরাপ্পল্লী, দক্ষিণে পক প্রণালী ও রমানাথপুরম এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর। এই জেলাটি মোটামুটি ত্রিভুজাকৃতি।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে তাঞ্জোর জেলাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাঞ্জোরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল ও পলল গঠিত সমতল-ভূমি, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে শুষ্ক উচ্চ অঞ্চল। ব-দ্বীপ অঞ্চলে তিরুত্তুরাইপুণ্ডির দক্ষিণ পূর্বে লবণাক্ত জলাজমি ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কাবেরী ও ইহার উপনদী কোলেরুন ব্যতীত অপর কোনও উল্লেখযোগ্য নদী এখানে নাই। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকের বৃহৎ অংশ কর্করময় মোরামবেড, বেলে পাথর ও নিস দ্বারা গঠিত। এইখানেই ভল্লমের মালভূমি অবস্থিত। উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকের অঞ্চল পলি ও বায়ুচালিত বালুকা-রাশি দ্বারা গঠিত। সমুদ্রোপকূলে ছোট ছোট পাহাড বালিয়াড়ি দেখা যায়।

তাঞ্জোরের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর। সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে বার্ষিক গড উত্তাপ প্রায় ২৬° সেন্টিগ্রেড (৮০° ফারেনহাইট) পশ্চিম দিকের উচ্চ স্থানে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম। এখানে উভয় মৌসুমী বায়ু হইতেই বৃষ্টি হয। এখানকার গড বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১০০ মিলিমিটার (৪৪ ইঞ্চি)।

কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলই তাঞ্জোরের সর্বাপেক্ষা উর্বর অঞ্চল। ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান। জেলায় প্রত্যেক তালুকেই ধান চাষ হয়। নিকৃষ্ট ভূমিতে রাগী, জোয়ার, বাজরা, ডাল ও চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়া থাকে। কলা ও নারিকেলবৃক্ষ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তৈলবীজ, ইক্ষু, তামাক ইত্যাদিও এই অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাবেরী নদী ও ইহার শাখা-নদীগুলিই সেচব্যবস্থার প্রধান উৎস। এখানকার প্রধান প্রধান সেচ ব্যবস্থার মধ্যে গ্র্যাণ্ড অ্যানিকট, উচ্চ অ্যানিকট প্রভৃতি পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী ৭৬১০৯৯ হেক্টর (১৯০২৭৭৭ একর) কৃষিযোগ্য জমির মধ্যে ৫৯৮৮৫০ হেক্টর (১৪৯৭১২৬ একর) জমিতে সেচ করা হইয়া থাকে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে এই জেলার লোকসংখ্যা ৩২৪৫৯২৭ জন ছিল, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শতকরা ৮·৮২% বৃদ্ধি পাইযাছে।

নানা রকম তাঁত বয়ন ও ধাতুর কার্য এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পকার্য। পূর্বে তাঞ্জোর রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে ইওরোপ হইতে বস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বয়নশিল্পের অবনতি ঘটে। রেশমশিল্পের সঙ্গে গালিচা ও কার্পাসশিল্পেরও অবনতি বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। করনাড ও আয়ামপেটাই রেশম ও গালিচা শিল্পের কেন্দ্র ছিল। তাঞ্জোর ও কুম্বকোণম স্বর্ণ ও রৌপ্যের সূতা দ্বারা রেশমের উপর সূচিশিল্পের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতে মাদুরার পরে ধাতুশিল্পে তাঞ্জোরের স্থান। তাঞ্জোর নগর, কুম্বকোণম এবং মান্নারগুডি ধাতবশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। বাদ্যযন্ত্র, খেলনা 'পিথ মডেল' ইত্যাদি তাঞ্জোরের বিখ্যাত ক্ষুদ্র শিল্প।

উপকূলে অবস্থিত ও অসংখ্য রেলপথ দ্বারা যুক্ত বলিয়া তাঞ্জোরের বাণিজ্যিক সুবিধা আছে। এই জেলার (পনরটি) বন্দরের মধ্যে নাগাপটম প্রধান। প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে তাঞ্জোর, কুম্বকোণম, মায়াভরম, মান্নারগুডি উল্লেখযোগ্য। তাঞ্জোরের মিটারগেজ রেলপথ অসংখ্য। অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে জাতীয় সড়ক না থাকিলেও ১৬৩ কিলোমিটার রাজ্যসড়ক, ৩৫৩৯ কিলো-মিটার জেলাসড়ক ও ১১২৭ কিলোমিটার গ্রাম্য সড়ক এখানে বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর হইতে এই জেলায় খ্রীষ্টান মিশনারিদের দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত হয। পরবর্তী কালে সরকারি প্রচেষ্টায় শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

এই জেলার প্রধান নগর তাঞ্জোর (১০°৪৬′ উত্তর ও ৭৯°৯′ পূর্ব)। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের পার্শ্বে ও মাদ্রাজ হইতে ৩৫১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইহা ক্রমান্বয়ে চোল, নায়ক ও মারাঠাদের রাজধানী ছিল। রাজনীতি, ধর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঞ্জোর বহু শতাব্দী ধরিয়া নিজ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১১১০৯৯ জন।

বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালের স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হয়। দেশীয় রাজাদের রাজত্বকালে তাঞ্জোর সূক্ষ্ম-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

তাঞ্জোরের স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে মন্দির শিল্পের আধিক্য বেশি। বিভিন্ন রাজবংশ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার ফলে স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ বিশেষ রীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবংশগুলির নাম: পল্লববংশ (৬০০-৮৫০ খ্রী), চোল (৮৫০-১১০০ খ্রী), পাণ্ড্য (১১০০-১৩৫০ খ্রী), বিজয়নগর (১৩৫০-১৬৫০ খ্রী), নায়ক (১৫৬৫ ১৬০০ খ্রী)। তাঞ্জোরের স্থাপত্য-শিল্পে পল্লব ও চোল বংশের প্রভাব অধিক।

বিভিন্ন যুগের অসংখ্য মন্দির জেলার সর্বত্র বিদ্যমান। এই জেলায় মোট প্রায় ১৫০০টি মন্দির আছে। ইহার মধ্যে হিন্দুধর্মীয় মন্দিরের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। ৬৭৬টি মন্দির মূল্যবান ধাতুর কারুকার্যে শোভিত। ইহাদের মধ্যে রাজাগোপালাস্বামী, নবনীতেশ্বর, ত্যাগরাজস্বামী, শ্বেতরানীশ্বরাস্বামী, শ্রীনিবাশ পেরুমল, আদি কুম্ভেশ্বর, স্বামীনাথস্বামী, ময়ূরানাথ ও পরিমল রঙ্গনাথ প্রভৃতি মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য।

তিরুভেলুর, আলাংগুড়ি, তিরুপ্পুনড়ুরটির মন্দিরগুলিতে তামিল ভাষার বহু প্রস্তলিপি মন্দিরের গাত্রে পরিলক্ষিত হয়। লিপিগুলি চোল ও পরবর্তী রাজবংশগুলির সাক্ষ্য বহন করে। তাঞ্জোরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে দ্রাবিড় রীতির প্রবর্তন পল্লব রাজাদের সময়ে আরম্ভ হয় এবং চোল রাজত্বে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

চোল রাজত্বকালে দ্রাবিড় রীতিতে নির্মিত মন্দিরের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঞ্জোরের বিশাল বৃহদীশ্বর (শিব) মন্দির। একাদশ শতাব্দীতে চোল সম্রাট প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খ্রী) কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। এই শিবমন্দির চতুর্দশতল বিশিষ্ট ও ইহার উচ্চতা ৬০ মিটারের (২০০ ফুট) অধিক।

একটি আঙিনার কেন্দ্রস্থলে মন্দিরটি নির্মিত এবং চতুর্দিকের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরগুলিতে অসাধারণ পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের সাক্ষ্য লক্ষিত হয়। প্রধান মন্দিরের চূড়ায় চিত্রিত বিষয়বস্তু বৈষ্ণবধর্মের সাক্ষ্য বহন করে। আবার আঙিনায় চিত্রিত বিষয়বস্তুগুলি শৈবধর্মের পরিচায়ক।

কাঞ্চীপুরের রাজা ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরের প্রবেশদ্বার বা গোপুরম নির্মাণ করেন। মন্দির ও দ্বারের মধ্যস্থলে প্রায় ৫ মিটার দীর্ঘ ও ৪ মিটার উচ্চ বিখ্যাত নান্দী (বৃষ) মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XXII, Oxford, 1909; P. K. Nambier, *Census of India: 1961*, vol. IX, *District Census Handbook; Tanjavur*, vol. I. Madras. 1965.

অনিন্দ্যকুমার পাল

তাড়কা রামায়ণ-প্রসিদ্ধা রাক্ষসী, যক্ষপতি সুকেতুর কন্যা, জম্ভপুত্র সুন্দের ভার্যা, মারীচের জননী। সুকেতু যক্ষের কঠোর তপস্যায় প্রীত ব্রহ্মার বরে তাড়কার জন্ম ও সহস্র হস্তীর তুল্য বললাভ হয়। অগস্ত্য মুনি কর্তৃক সুন্দ নিহত হইলে তাড়কা মারীচের সহিত তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। মুনির শাপে তাড়কা বিকৃতবদনা ভয়ংকরী রাক্ষসীতে পরিণত হইয়া তাঁহার তপোবন ধ্বংস করিতে থাকে। ঋষি বিশ্বামিত্র বর্ণচতুষ্টয়ের কল্যাণকামনায় স্ত্রীবধের প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রকে যজ্ঞবিঘ্নকারী তাড়কাকে বিনাশ করিতে বলেন। রামচন্দ্র মায়াবিনী তাড়কার গতি ও বীর্য প্রতিরোধ করিতে এবং তাহার শিলাবর্ষণ প্রতিহত করিতে তাহার কর ছেদন করেন এবং লক্ষ্মণ কর্ণ ও নাসিকা কর্তন করেন। মায়াযোগে তাড়কা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিতা হয় ও পরে পুনরায় উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র তাহার বক্ষ শরবিদ্ধ করেন, ফলে তাড়কার পতন ও মৃত্যু ঘটে (রামায়ণ, ১।২৫-২৬)।

পুষ্পিতা ঘোষ

তাড়ি মদ্য দ্র

তাণ্ডব নৃত্য দ্র

তাঁত ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাঁত বলিতে তন্তু বোঝায়। কিন্তু প্রচলিত ভাষায় তন্তু বা সূত্রের দ্বারা বস্ত্রবয়নে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার নামও তাঁত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাঁতের জন্ম। ভারতবর্ষই তাহার আদি উদ্ভাবক, ইহাই অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা, কারণ ঋগ্‌বেদের ন্যায় সুপ্রাচীন গ্রন্থে বস্ত্রবয়নের উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় তাঁতির জীবনযাত্রার নিয়ম-কানুন ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়নের তত্ত্বাবধানের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক তাঁত তত্ত্বাবধায়কের নিয়োগ উল্লিখিত আছে।

তাঁতযন্ত্রের প্রধান অঙ্গ— শানা, মাকু, দক্তি ও নরাজ।

কাপড়ের বুনানির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কতকগুলি লম্বালম্বি ও কতকগুলি আড়াআড়ি সুতায় প্রয়োজনীয় বাঁধুনি দিয়া কাপড় তৈয়ারি হইয়া থাকে। লম্বালম্বি সুতাগুলিকে টানা এবং আড়াআড়ি সুতাগুলিকে পোড়েন বলা হয়।

শানার কাজ হইল টানা সুতার খেইগুলিকে পরস্পর পাশাপাশি নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া টানাকে নির্দিষ্ট প্রস্থ অনুযায়ী ছড়াইয়া রাখা। শানার সাহায্যেই কাপড় বুনিবার সময় প্রত্যেকটি পোড়েনকে ঘা দিয়া পরপর বসানো হয়।

যে কাঠের বা লোহার কাঠামোর মধ্যে নলিভর্তি পোড়েনের সুতা পরানো হয়, তাহার নাম মাকু। উহার কাজ হইল টানার সুতার মধ্য দিয়া পোড়েনের সুতা চালানো।

শানাটিকে শক্ত করিয়া রাখার কাঠামো হইল দক্তি। একখানি ভারী ও সোজা চওড়া কাঠে নালি কাটিয়া শানা বসানো হয় আর তাহার পাশ দিয়া কাঠের উপর দিয়া মাকু যাতায়াত করে। শানাটিকে ঠিক জায়গায় রাখার জন্য উহার উপরে চাপা দিবার যে একখানি নালা কাটা কাঠ বসানো হয় তাহার নাম মুঠ-কাঠ। শানা ধরিয়া রাখার এই দুইখানি কাঠ একটি কাঠামোতে আটকাইয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। এই সমগ্র ব্যবস্থাযুক্ত যন্ত্রটির নাম দক্তি।

শানায় গাঁথা আবশ্যকমত প্রস্থ অনুযায়ী টানাটিকে একটি গোলাকার কাঠের উপর জড়াইয়া রাখা হয়, উহাকে বলে টানার নরাজ। আর তাঁতি যেখানে বসিয়া তাঁত বোনে, সেখানে তাহার কোলেও একটি নরাজ থাকে—তাহার নাম কোল-নরাজ। টানার নরাজের কাজ হইল টানার সুতাকে টানিয়া ধরিয়া রাখা আর কোল-নরাজের কাজ বুনানির পরে কাপড় গুটাইয়া রাখা।

বুনিবার জন্য তাঁতে সুতা জুড়িবার পূর্বে টানা হাটা, শানা গাঁথা ও টানা নরাজে পেঁচানোর কাজ করিয়া নিতে হয়। ইহা ছাড়া আরও একটি কাজ থাকে, তাহার নাম 'ব' গাঁথা। টানা পেঁচাইবার পর উহার প্রত্যেকটি খেইকে 'ব'-এর সুতার সাহায্যে গাঁথিয়া লইতে হয়। উহার উদ্দেশ্য নকশা অনুযায়ী বুনিবার জন্য টানার সুতাকে পরপর উপর ও নীচে রাখিবার ব্যবস্থা করা যাহাতে পোড়েনের সুতা তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে।

'ব' তোলা বা গাঁথা সমাপ্ত হইলে টানার নরাজটি কোল-নরাজ অপেক্ষা ঈষৎ ঢালু করিয়া তাঁতের কাঠামোতে ঝুলাইতে হয়। তাহার পর আরম্ভ হয় বস্ত্রবয়নের কাজ।

বস্ত্রবয়নে প্রধানতঃ তিনটি ক্রিয়ার প্রয়োজন: ১. ঝাঁপ করা— যে ক্রিয়ার দ্বারা টানার সুতাকে উপরে ও নীচে দুই ভাগে ফাঁক করিয়া পোড়েন-ভর্তি মাকু যাইবার রাস্তা সৃষ্টি করা হয় ২. মাকু-মারা— টানার সুতায় প্রয়োজনমত ঝাঁপ করিয়া উহার মধ্য দিয়া পোড়েন চালাইবার প্রক্রিয়া ৩. ঘা-মারা— এক-একটি পোড়েন চালানোর পর উহা শানা-বসানো দক্তির সাহায্যে ঘা দিয়া ঠাস করিয়া বসানো। মুঠ-কাঠ হাতে ধরিয়া পোড়েনে ঘা মারিতে হয়।

উপরি-উক্ত তিনটি ক্রিয়া সম্পন্ন করার যন্ত্রের নামই তাঁত। যে তাঁতে ঐ ক্রিয়াগুলি কায়িক শক্তির দ্বারা চালিত হয় তাহাকে হস্তচালিত তাঁত (হ্যাণ্ড লুম) আর যে তাঁতে ঐগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে তাহাকে বৈদ্যুতিক তাঁত বা শক্তিচালিত তাঁত (পাওয়ার-লুম) বলে। হস্তচালিত তাঁত আবার তিন প্রকারের: ১. হাত-তাঁত ২. ঠকঠকি তাঁত এবং ৩ আংশিক স্বয়ংক্রিয় তাঁত।

পূর্বে হাত-তাঁত বা ঠকঠকি তাঁত এই উভয় প্রকার তাঁতেই গর্তে পা ঝুলাইয়া ঝাঁপ চাপিয়া বয়ন করা হইত, সেইজন্য তাহার নাম ছিল গর্ত-তাঁত (পিট লুম)। কিন্তু অধুনা অনেকে মেঝেতে কাঠের কাঠামোর (ফ্রেম) উপর তাঁত খাটাইয়া থাকেন, তাহার নাম ফ্রেম তাঁত (ফ্রেম লুম)।

শুধু হাতে ঠেলিয়া মাকু মারিয়া যে তাঁত চালানো হয়, তাহাকে বলে হাত-তাঁত। আর ঠকঠকি তাঁতে দক্তির দুই পার্শ্বে দুইটি বাক্স ও ঐ বাক্সের মধ্যে একটি করিয়া মেড়া থাকে। হাতল ও মেড়ার সহিত এমনভাবে দড়ি খাটানো হয় যে, ঐ হাতল ধরিয়া টানিলে মাকু এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে সহজে যাতায়াত করিতে পারে। উহাতে মাকুর আঘাত লাগিয়া ঠকঠক শব্দ করে বলিয়া উহার নাম ঠকঠকি তাঁত।

আংশিক স্বয়ংক্রিয় তাঁতে উপরি-উক্ত তিনটি প্রধান ক্রিয়া ব্যতীত আরও অতিরিক্ত দুইটি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঐ ক্রিয়া দুইটি তাঁত বুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয় বলিয়া এই তাঁতকে আংশিক স্বয়ংক্রিয় তাঁত বলা হয়। হাত-তাঁত বা ঠকঠকি তাঁতে অল্প অল্প কাপড় বুনিয়া উহা কোল-নরাজে জড়াইবার জন্য তাঁত বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, ইহাতে বহু সময় নষ্ট হয়। আংশিক স্বয়ংক্রিয় তাঁতে ('চিত্তরঞ্জন তাঁত' বলিয়া যাহা বাজারে প্রচলিত) দক্তি ঠেলিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি যন্ত্রের সাহায্যে কাপড় আপনা হইতেই কোল-নরাজে জড়াইয়া যায় আর সেইসঙ্গে টানার নরাজ হইতে টানার সুতাও খুলিয়া আসে। এই তাঁতে সাধারণ ঠকঠকি তাঁত অপেক্ষা দ্বিগুণ কাপড় বোনা যায়।

হস্তচালিত তাঁতের ন্যায় শক্তিচালিত তাঁতেরও প্রধান তিনটি ক্রিয়া বিদ্যমান। ঐগুলি ব্যতীত এই তাঁতে আরও কতকগুলি অতিরিক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; যথা কাপড়

জড়ানো, টানা খুলিয়া আসা, পোড়েন ছিঁড়িয়া বা ফুরাইয়া গেলে তাঁত বন্ধ হওয়া, ঘা দিবার সময় শানা শক্ত করিয়া ধরা ও ঝাঁপের মাকু আটকাইলে শানা খুলিয়া যাওয়া, মাকু বদলানো, মাকুর নলির সুতা ফুরাইলে মাকুতে পুনরায় সুতা-ভর্তি নলি লাগানো ইত্যাদি। তাঁত চলিবার সঙ্গে সঙ্গে উপরি-উক্ত ক্রিয়াগুলি আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়।

তুলা, রেশম ও পশম প্রভৃতি যতরকম আঁশের সুতা হউক না কেন, সকল সুতা দিয়াই বস্ত্রবয়ন করিতে তাঁতযন্ত্রের প্রয়োজন। পূর্বে উহা শুধু হাতেই চালানো হইত, এখন চলে প্রধানতঃ শক্তিতে।

বিবর্তনের মধ্য দিয়াই হাত-তাঁত শক্তি-তাঁতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তথাপি এখনও সবরকম তাঁতেরই অস্তিত্ব বজায় আছে। শক্তিচালিত তাঁতের ব্যাপক প্রসার ঘটিলেও হাত-তাঁতের প্রয়োজনীয়তা এখনও শেষ হয় নাই। এখনও এমন অনেক রকমের কাপড় এত সব আকারে ও বৈচিত্র্যে তৈরি হয় যাহা শক্তিচালিত তাঁত অপেক্ষা হস্তচালিত তাঁত-ই অনেক সহজে তৈয়ারি করিতে পারে।

সত্যরঞ্জন সেন

তাঁতিয়া তোপী রামচন্দ্র পাণ্ডুরং বা তাঁতিয়া তোপী মহারাষ্ট্রের দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নানা সাহেবের ব্যক্তিগত বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। কানপুরে সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা হিসাবে তিনি প্রথম পরিচিত হন। সতীচৌরাঘাটের হত্যাকাণ্ডে নানা সাহেব প্রভৃতির সহিত তাঁহাকে দোষী করা হয়। কিন্তু তাঁহার জবানবন্দীতে তিনি এ দোষ অস্বীকার করেন। কানপুর হইতে নানা সাহেবের পলায়নের পর তাঁতিয়া কাল্পী দখল করেন। পরে তাঁহাকে পুনরায় কানপুরে পাঠানো হয়। তিনি কানপুরে আসিয়া উইণ্ডহ্যামকে পরাজিত করিয়া কানপুর দখল করেন। ক্যাম্পবেল তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কানপুর অধিকার করেন (ডিসেম্বর, ১৮৫৭ খ্রী)। ইহার পর তাঁতিয়া চিরকারি দখল করেন ও ঝাঁসির রানীর সাহায্যার্থে গমন করেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি রোজ তাঁহাকে পরাজিত করিলে তিনি কাল্পীতে পলাইয়া আসেন। ঝাঁসির পতনের পর ঝাঁসির রানী কাল্পীতে আসিয়া তাঁতিয়ার সহিত যোগ দেন। কুঞ্চের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহারা আবার কাল্পীতে আসেন। কাল্পীর পতনের পর তাঁহাদিগকে গোপালপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর বিদ্রোহীরা গোয়ালিয়র দখল করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুন ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে ঝাঁসির রানীর মৃত্যু হয় ও ২০ জুন ইংরেজরা গোয়ালিয়র দখল করেন। রোজ তাঁতিয়ার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে ও নানার আত্মীয় রাও সাহেবকে জাওরা অলিপুরের যুদ্ধে পরাজিত করিলে তাঁহারা চম্বল পার হইয়া রাজপুতানায় পলায়ন করেন। ইহার পর তাঁতিয়া গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন বলা চলে, প্রথমে রাজপুতানায় পরে বুন্দেলখণ্ডে, তথা হইতে মধ্য প্রদেশে, পুনরায় বরোদার দিকে। সেদিকে বাধা পাইয়া পুনরায় রাজপুতানায় গমন করেন। চম্বল ও নর্মদা নদী পার হইয়া তিনি নানা স্থানে লুটপাট করিলেও ইংরেজ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিত না। তিনি পর্বত ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া সবাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথে গমনাগমন করিতেন। চাষীরা ও আদিম অধিবাসীরা তাঁহার বন্ধু ছিল। ঝালরাপাটনে, মানগ্রাউলিতে ও ছোট-উদয়পুরের যুদ্ধে তাঁতিয়া পরাজিত হন। ইন্দারগড়ে তিনি ফিরোজ শাহ্‌র সহিত যোগ দেন। দাওসাস ও পরে সিকারের যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর তাঁতিয়া একাকী মানসিং-এর সহায়তায় সেরোঙ্গের জঙ্গলে আশ্রয় লন। এখানে মানসিং তাঁহাকে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ মিড এর হাতে ধরাইয়া দেন। নিদ্রিত অবস্থায় ধৃত হইবার পর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল কোর্ট মার্শালে তাঁহার বিচার হয় ও তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৮ এপ্রিল তারিখে এই দণ্ডাজ্ঞা পালিত হয়। স্যর জর্জ ম্যাক্‌মানের মতে তাঁতিয়া আত্মসম্মানবোধ ও সাহসের সহিত মৃত্যুবরণ করেন। কর্নেল ম্যালেসন তাঁতিয়ার যুদ্ধ উপলক্ষে চলাচল, যুদ্ধার্থে অবস্থাননির্ণয়ের ক্ষমতা এবং গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে তাঁতিয়ার সেনাপতির দক্ষতা বা আক্রমণকারী সৈনিকের দুঃসাহস ছিল না।

দ্র S. N Sen, *Eighteen Fifty-Seven*, New Delhi, 1957; R C. Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, Calcutta, 1963; G B. Malleson, *History of the Indian Mutiny 1857-59*, vol III, London.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

তান মূর্ছনা হইতে তানের উৎপত্তি হইয়াছে। সংগীত-শাস্ত্র অনুসারে সাতটি স্বরের ক্রমিক আরোহণ ও অবরোহণকে মূর্ছনা বলা হয়। এই মূর্ছনার আরোহণ ক্রম হইতে একটি বা দুইটি স্বরের লোপ বা অপকর্ষ করিয়া তান নির্ণয় করা হইত। মূর্ছনাকৃত স্বরগুলি বিপরীতভাবে

উচ্চারিত হইলে তাহাকে কূটতান বলা হইত। সংগীত-শাস্ত্রে একস্বর হইতে ষট্স্বর পর্যন্ত তানকে যথাক্রমে আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব এবং ষাড়ব বলা হইয়াছে।

বর্তমানে দ্রুতভাবে বিবিধ স্বরবিন্যাসকে তান বলা হয়। সাধারণতঃ খেয়ালে তানের সর্বাধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। টপ্পাতেও একপ্রকার গমকযুক্ত তান ব্যবহৃত হয়, ইহাকে জমজমা বলে। স্বরের বিন্যাস অথবা কণ্ঠোত্থিত নাদ অনুসারে তানের বহু প্রকারভেদ আছে, হলকতান এইরূপ একটি উদাহরণ। ইহা কণ্ঠের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। গানের বাণী বা বোলসহযোগে তান করিলে তাহাকে বোলতান বলা হয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

তানপুরা তম্বুরা দ্র

তানসেন (১৫০৬-৮৫ খ্রী) গোয়ালিয়র রাজ্যবাসী মকরন্দ পাণ্ডে একজন সুগায়ক বিদ্বান নিষ্ঠাবান পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামতনুই উত্তর কালে তানসেন নামে পরিচিত হন। বাল্যকাল হইতেই তানসেনের সংগীত প্রতিভা ও অসাধারণ স্বরমাধুর্য প্রকাশ পায়। মাত্র দশ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে ভক্ত হরিদাস স্বামীর নিকট তিনি সংগীতে দীক্ষা লাভ করেন এবং সংগীতসাধনার নাদবিদ্যায় পারদর্শী হন। ঐ সময়ে মাতৃ পিতৃহারা হওয়ায় গোয়ালিয়রে ফিরিয়া যান এবং রানী মৃগনয়নীর সভাগায়ক পদে নিযুক্ত হন। রানীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় সখী হোসেনী ব্রাহ্মণীর সহিত ইসলাম ধর্মানুসারে তাঁহার বিবাহ হয়। তানসেনের গায়ন খ্যাতি তখন দেশব্যাপী। রেওয়াধিপতি রাজারামের আমন্ত্রণে রেওয়ারাজের সভাগায়ক পদ গ্রহণ করেন (১৫৪৫-৬০ খ্রী)। ঐ সময়ে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়। দিল্লীতে একটি আদর্শ সংগীতসভার প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাট আকবর ঐ সভার নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে তানসেনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট আকবর স্বয়ং রামতনু পাণ্ডেকে তানসেন নাম প্রদান করেন এবং তাঁহার নিকট সংগীতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তানসেনও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্রাটের সংগীত-গুরু ছিলেন। ঐ সময়ে তানসেন বহু রাগ ও ধ্রুপদ রচনা করেন। রাগগুলির মধ্যে দরবারী কানাড়া, দরবারী টোড়ী, মিয়াঁ কি মল্লার, মিয়াঁ কি সারং, ইমন্ কল্যাণ আজও হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রেষ্ঠ ভূষণস্বরূপ। তানসেনের ধ্রুপদগুলি ভাবসম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। পরব্রহ্ম, হরি, হর-পার্বতী, সরস্বতী, গণপতি প্রভৃতি দেব-দেবীগণের স্তুতি-বিষয়ক এবং মহম্মদ, পীর, রাজারাম, রানী মৃগনয়নী ও সম্রাট আকবরের বন্দনায় তিনি সহস্রাধিক ধ্রুপদ রচনা করেন। আলোচনা ও উপদেশ ছলে রচিত তাঁহার বহু ধ্রুপদ আজও প্রচলিত। তাঁহার তিন পুত্র— সুরথসেন, তানতরঙ্গ ও বিলাস খাঁ এবং এক কন্যা— সরস্বতী। তানতরঙ্গ, বিলাস খাঁ ও জামাতা মিশ্রি সিং এর বংশধরগণ তানসেনের সাংগীতিক ঐতিহ্য অটুট রাখিয়া নূতন রাগ ও সংগীতশৈলীর সৃষ্টিতেও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতেও ইঁহারা প্রধান কলাকার ও প্রবর্তক। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে তানসেন ছিলেন ভারতের এক অদ্বিতীয়, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও সুকণ্ঠ গায়ক। গোয়ালিয়রে তাঁহার সমাধি আজও ভারতীয় সংগীত সাধকদের তীর্থস্থানরূপে গণ্য হয়।

দ্র নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, সংগীতসুধাসিন্ধু, সংগীত-সুদর্শন, কুতবুদ্দৌলা, রিসালা তানসেন, [উর্দু], H. Blochmann, *Ain-i-Akbari*, vol I, Calcutta, 1939, H. S. Jarrett, *Ain-i Akbari*, vols. II-III, Calcutta, 1949.

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তাপ এক প্রকারের শক্তি। এক কেটলি ঠাণ্ডা জল উনানে বসাইলে উহা উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। উনান হইতে তাপশক্তি শোষণের ফলেই জল উষ্ণ হয়। ১ গ্রাম জলকে ১° সেন্টিগ্রেড মাত্রায় (১৪·৫° হইতে ১৫·৫°) উষ্ণ করিতে যে তাপ লাগে তাহাকে ১ ক্যালরি বলা হয়। ইহাই তাপ মাপিবার একক। পদার্থবিদ্যায় শক্তি সাধারণতঃ জুল বা আর্গে (১ জুল=১০^{৭} আর্গ) মাপা হইয়া থাকে। সেই হিসাবে ১ ক্যালরি তাপ প্রায় ৪·২ জুলের সমান।

তাপপ্রয়োগে বস্তুর নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটে, উষ্ণতা বৃদ্ধি ইহাদের অন্যতম। বরফে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা জলে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগে বস্তুর অবস্থান্তর ঘটিতেছে। এই তাপ উষ্ণতাবৃদ্ধি ঘটায় না বলিয়া ইহাকে লীন তাপ (লেটেন্ট হিট) বলা হয়। তাপপ্রয়োগে সাধারণতঃ বস্তুর আয়তন বর্ধিত হয়, কদাচিৎ সংকোচনও লক্ষ্য করা যায়।

তাপশক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া যান্ত্রিক শক্তি সৃষ্টি করা হয়। নানা প্রকার স্টিম ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন ও পেট্রল ইঞ্জিন এ এই রূপান্তর ঘটানো হইয়া থাকে।

তাপ সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। সূর্য হইতে যে উপায়ে পৃথিবীতে তাপ আসে তাহাকে তাপের বিকিরণ বলা হয়। কেটলির তলদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে যে উপায়ে তাপ ধাতব

দ্রব্যের মধ্য দিয়া কেটলির জলে সঞ্চালিত হয় তাহাকে পরিবহন বলে। আবার তাপপ্রয়োগে কেট্‌লির নীচের জল উষ্ণ হইয়া উপরে উঠিয়া আসে এবং উপরের কম উষ্ণ জল নীচে নামিয়া যায়, এইভাবে একটি প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া সমস্ত জলে তাপ সঞ্চালিত হয়। ইহাকে তাপের পরিচলন বলে।

দুইটি বস্তু পরস্পর ঘর্ষণ করিলে তাপ উৎপন্ন হয়। এ সৃষ্ট ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হইয়া তাপ হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু তাপের উৎস হইতেছে বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি (ইন্টার্নাল এনার্জি)। দহন-ক্রিয়ায় বস্তুর অন্তর্নিহিত রাসায়নিক শক্তি হইতে তাপ সৃষ্টি হয়। পরমাণু চুল্লিতে কেন্দ্রকের অন্তর্নিহিত শক্তির একাংশ তাপে পরিণত হয়। 'উষ্ণতা' দ্র।

শ্যামল সেনগুপ্ত

তাপগতিবিদ্যা থার্মোডাইনামিক্স দ্র

তাপবলয় সূর্যকিরণের তারতম্যের ফলে পৃথিবীর উপর বিভিন্ন তাপবলয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অক্ষাংশ অনুযায়ী পৃথিবীর উপর পাঁচটি তাপবলয় কল্পনা করা হইয়াছে। যথা: ১. উষ্ণবলয়— ইহা নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে কর্কট ক্রান্তি ও দক্ষিণে মকর ক্রান্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ২. উত্তর নাতিশীতোষ্ণ বলয় ও ৩. দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ বলয়— উষ্ণ বলয়ের উত্তরে ও দক্ষিণে সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত এই নাতিশীতোষ্ণ বলয় বিস্তৃত ৪. উত্তর হিমবলয় ও ৫. দক্ষিণ হিমবলয়— সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তের মধ্যস্থিত দুইটি অঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণ হিমবলয় নামে অভিহিত। সাধারণতঃ উষ্ণ বলয়কে শীতবিহীন ক্রান্তীয় অঞ্চল এবং হিমবলয়কে গ্রীষ্মবিহীন মেরু অঞ্চল বলা হয়। ইহাদের মধ্যবর্তী নাতিশীতোষ্ণ বলয়ে গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুরই প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।

অক্ষাংশ অনুযায়ী বিভাগ করা এই তাপবলয়গুলির অন্তর্গত সকল দেশেই কিন্তু একই প্রকারে তাপমাত্রা লক্ষিত হয় না। এই কারণেই আবহবিদ্ সুপান সমতাপ রেখা অনুযায়ী পৃথিবীর তাপবলয়গুলির সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন। সুপান দুই গোলার্ধে ক. ২০° সেন্টিগ্রেড (৬৮° ফারেনহাইট) বার্ষিক গড় সমতাপ রেখা ও খ. উষ্ণতম মাসের ১০° সেন্টিগ্রেড (৫০° ফারেনহাইট) সমতাপ রেখা অঙ্কন করিয়া পাঁচটি তাপবলয়ের সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন। এই সমতাপ রেখাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ২০° সেন্টিগ্রেড (৬৮° ফারেনহাইট) বার্ষিক গড় সমতাপ রেখাটি বাণিজ্যবায়ুর সীমানা নির্দেশ করে এবং ইহাও দেখা যায় যে কোনও স্থানে উষ্ণতম মাসের তাপমাত্রা ১০° সেন্টিগ্রেড (৫০° ফারেনহাইট) অপেক্ষা কম হইলে তথায় বৃক্ষাদি জন্মাইতে পারে না। সুপানের তাপবলয়গুলি হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্র C Finch Vernor and Glenn, T Trewarth, *Physical Elements of Geography*, London, 1949

সুনীলকুমার ঘোষ

তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিদ্যুতের মধ্যে তাপবিদ্যুতের স্থান অগ্রগণ্য। অর্থনৈতিক কারণে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করা হয়, তাপবিদ্যুতের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। বৈদ্যুতিক শক্তির বহুল চাহিদার ফলে এই সমস্ত তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের আয়তনও বাড়িয়া যাইতেছে, শুধু তাহাই নহে, বর্তমানে ১১০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক জেনারেটরও ব্যবহৃত হইতেছে। তবে সাধারণতঃ এই সমস্ত বৈদ্যুতিক জেনারেটরের শক্তি ৫০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ১৪০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন জেনারেটর চলিতেছে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া পরে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করার কারখানা মাত্র। শক্তির এই রূপান্তরের জন্য জ্বালানির অন্তর্নিহিত রাসায়নিক শক্তিকে কারখানার (তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের) বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

সমস্ত যন্ত্রাংশ-সংবলিত সত্যকারের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র অত্যন্ত জটিল। সহজভাবে বলিতে গেলে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলির তালিকা নিম্নরূপ হইবে.

১. বয়লার ২. টার্বাইন ৩. জেনারেটর ৪. তাপশক্তিকে বয়লার হইতে টার্বাইন পর্যন্ত লইয়া যাওয়ার জন্য একটি মাধ্যম।

তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি হিসাবে কয়লা বা খনিজ তৈল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্যাসের ব্যবহারও হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে (সেন্ট্রাল পাওয়ার স্টেশন) সাধারণতঃ নিম্নমানের কয়লা জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। বয়লারের চুল্লিতে এই জ্বালানিকে দহন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তাপশক্তিকে বয়লার হইতে

টারবাইনের নজল (nozzle) পর্যন্ত লওয়ার মাধ্যম হিসাবে জলের ব্যবহার প্রায় সর্বজনীন। অবশ্য অন্য মাধ্যমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বয়লারে উৎপন্ন তাপ জলকে উত্তপ্ত করিয়া বাষ্পীভূত করে। উচ্চচাপ ও তাপযুক্ত এই বাষ্প সঠিকভাবে নির্মিত একটি ছুঁচালো নলের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া প্রভূতগতিশক্তিসম্পন্ন হয় এবং টারবাইন নামক যন্ত্রকে ঘোরায়। পর্যায়ক্রমে টারবাইন বৈদ্যুতিক জেনারেটরকে ঘোরায় এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়।

ইহাই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের মূল কথা। 'টারবাইন' দ্র।

সুখেন্দুপ্রসাদ বসু

তাপ্তী দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান নদী, বৃষ্টিধারাপুষ্ট মধ্য প্রদেশের বেটুল-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে (২১°৪৮´ উত্তর ও ৭৮°১৫´ পূর্ব) ইহা উৎপন্ন এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ভেদ করিয়া পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া খম্বাত উপসাগরে পতিত হইতেছে। মধ্য ভারতের মালভূমির ক্ষয়জাত অনুচ্চ গিরিসমূহ জলবিভাজিকারূপে মহানদী এবং গোদাবরী উপত্যকা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, উত্তরে সাতপুরা গিরিশ্রেণী ইহাকে নর্মদা উপত্যকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। দক্ষিণে সহ্যাদ্রি পর্বত বা অজন্টা গিরিশ্রেণী অবস্থিত। তাপ্তী মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাত এই তিন রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। উৎস মুখ হইতে মোহানা পর্যন্ত নদীটির দৈর্ঘ্য মোটামুটি ৬৪০ কিলোমিটার (৪৫০ মাইল)। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নদীপর্যঙ্ক ১৮০-২৭০ মিটার (৬০০-৯০০ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত। ইহার প্রধান উপনদীর মধ্যে পূর্ণা, গির্ণা ও বোরাই উল্লেখযোগ্য।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ মনে করেন, তাপ্তী নদী একটি গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

নদী-উপত্যকার পলল ভূমি ব্যতীত সম্পূর্ণ অঞ্চলটি লাভা গঠিত। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের জলধারণক্ষম 'রেগুর' মৃত্তিকায় তুলা, তৈলবীজ, জোয়ার ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেচকার্যও অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ভারত সরকারের তাপ্তী নদী-পরিকল্পনার ফলে সেচের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপত্যকা অঞ্চলে কয়েকটি নাতিবৃহৎ জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আকোলা, অমরাবতী, বুরহানপুর, জলগাঁও প্রধান। ঐতিহাসিক সুরাট বন্দর ইহার মোহানার নিকট অবস্থিত।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XXIII, Oxford, 1909; O H K, Spate, *India & Pakistan*, London, 1957

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

তাভের্নিয়ে, ঝাঁ বাতিস্ত ট্যাভার্নিয়ার (১৬০৫-৯০? খ্রী) সপ্তদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ফরাসী ব্যবসায়ী ও ভূপর্যটক। পারীতে (প্যারিস) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত ভৌগোলিক ছিলেন। স্বীয় পরিবারে ভূবৃত্তান্তচর্চার আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার ফলে বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে দেশভ্রমণের প্রবল আগ্রহ জন্মায়। পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, ইটালী প্রভৃতি পরিদর্শন করেন ও প্রধান ইওরোপীয় ভাষাগুলি আয়ত্ত করেন। রত্নব্যবসায় তাঁহার বৃত্তি ছিল এবং মুখ্যতঃ এই উপলক্ষে তিনি ছয়বার (যথাক্রমে ১৬৩১-৩৩, ১৬৩৮-৪৩, ১৬৪৩-৪৯, ১৬৫১-৫৫, ১৬৫৭-৬২ ও ১৬৬৩-৬৮ খ্রী) পারস্য, ভারতবর্ষ, সিংহল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথমবার ব্যতীত প্রতিবারই তিনি ভারতবর্ষে আসেন। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পারী হইতে তিনি তাঁহার ছয়বার ভূপর্যটনের বিবরণ একটি ভূমিকাসহ ফরাসী ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন। ইহার ভারতসংক্রান্ত অংশ ১৭শ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের আকররূপে মূল্যবান ও আদরণীয়। স্যামুয়েল শাপ্পুজো নামক তাভের্নিয়ের সমসাময়িক জনৈক ফরাসী লেখক দাবি করিয়াছিলেন, এই ভ্রমণকাহিনী তাভের্নিয়ের সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে মুখ্যতঃ তাঁহার নিজের রচনা। কিন্তু এই দাবি পরবর্তী গবেষকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

রত্নবণিক হিসাবে মোগল রাজদরবারে তাঁহার যাতায়াত ছিল। মীর জুম্‌লা, শায়েস্তা খাঁ প্রমুখ সমসাময়িক প্রভাবশালী রাজপুরুষগণের সংস্রবেও ব্যবসায়সূত্রে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ ভারতভ্রমণের ফলে অর্জিত বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁহাকে ১৭শ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা, মুদ্রামান এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, হীরকাদি খনিজ সম্পদ, পথঘাট, যানবাহন, ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সংস্কার, লোকব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও বিস্তারিত আলোচনা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থে তদানীন্তন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জীবনের বিশদ ও বাস্তব চিত্র

প্রকাশ পাইয়াছে। মোগল রাজকোষে রক্ষিত মণিমানিক্যের সংগ্রহ প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ পাইয়া রত্ন-বিশেষজ্ঞরূপে যে বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণের নিকট তাহাও যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু অপরাপর ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব প্রশ্নাধীন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক ইওরোপীয় ভারত-পর্যটক বেনিয়ে, থেভনো, শার্দাঁ প্রমুখের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন না। ভারতবর্ষীয় জীবনচর্যার গভীরে তাহার দৃষ্টি যায় নাই। সম্ভবতঃ কোনও ভারতীয় ভাষাও তিনি জানিতেন না। তাঁহার বিষয়বস্তু সবদা কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত বা সুবিন্যস্ত নহে। ঐতিহাসিক বোধহীন ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে তিনি ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের আকর হিসাবে তাঁহার গ্রন্থ পল্লবগ্রাহী ও অকিঞ্চিৎকর। পরিণত বয়সে মস্কোতে তাভের্নিয়ের মৃত্যু হয়।

দ্র C. Joret, *Jean Baptiste Tavernier*, Paris, 1885; J. B. Tavernier, *Travels in India*, vols. I-II, V. Ball, tr., London, 1889.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

তামা রক্তাভ ধাতুবিশেষ। ইহার পরমাণুক্রমাঙ্ক (অ্যাটমিক নাম্বার) ২৯, পারমাণবিক গুরুত্ব (অ্যাটমিক ওয়েট) ৬৩·৫৪, গলনাঙ্ক ১০৮৩° সেন্টিগ্রেড ও স্ফুটনাঙ্ক ২৫৯৫° সেন্টিগ্রেড। বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগে তামার যোজ্যতা (ভ্যালেন্সি) ১ বা ২— তামার প্রথম প্রকার অবস্থাকে 'কিউপ্রাস' ও দ্বিতীয় অবস্থাকে 'কিউপ্রিক' বলে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই তামার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। মিশরে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের সমাধিতেও তামার তৈজসপত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। লোহের ব্যবহার উদ্ভাবিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই তামা ও টিনের সংকর ধাতু (অ্যালয়) ব্রঞ্জ ব্যবহৃত হইত।

তামার আকরিক প্রধানতঃ তিন প্রকার: ১. অক্সাইড আকরিক ২. গন্ধকঘটিত বা সাল্‌ফাইড আকরিক ৩. ধাতু হিসাবে বর্তমান তামা। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান হ্রদের তীর, রকি পর্বত ও গ্রেট বেসিন অঞ্চল, ক্যানাডার কেন্দ্রীয় অঞ্চল, কঙ্গো, চিলি, পেরু, রোডেশিয়া প্রভৃতি স্থানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তামার আকরিক পাওয়া যায়। ভারতের মানভূম ও সিংভূমে তামার আকরিক বর্তমান।

প্রধানতঃ গন্ধকঘটিত আকরিক হইতেই তামা নিষ্কাশিত হয়। প্রথমে আকরিক চূর্ণ করিয়া তৈল ও জলের সাহায্যে (অয়েল ফ্লোটেশন) ঘন করা হয়। এই ঘনীভূত আকরিককে উচ্চ তাপে পোড়ানো হয়, অতঃপর বালির সহিত মিশাইয়া বিশেষ চুল্লিতে ১০০০°-১২০০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিলে আকরিকের লৌহ বালির সহিত মিশিয়া গলিত ধাতুমল (স্ল্যাগ)-এ পরিণত হয় এবং উহাকে সরাইয়া ফেলা হয়। ইহার পর গন্ধকমিশ্রিত গলিত তাম্রকে কন্‌ভার্টার-এ উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে ১১০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে অবশিষ্ট লৌহ বালির সহিত মিশিয়া গলিত ধাতুমলে পরিণত হয় এবং কিছু পরিমাণে গন্ধকমিশ্রিত তাম্র তামার অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। পরে এই দুই প্রকার তাম্রযৌগের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে ধাতব তাম্র উৎপন্ন হয়। এই তামাকে উত্তাপ অথবা তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে পরিশোধিত করা হয়। শেষোক্ত পদ্ধতির সাহায্যে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ তামা পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ দ্বারা এভাবে পরিশুদ্ধ করিলে তামার আকরিকে স্বল্প পরিমাণে বর্তমান স্বর্ণ ও রৌপ্যও উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

নানা ধাতুর সহিত বিভিন্ন অনুপাতে তামা মিশাইয়া নিম্নলিখিত সংকর ধাতুগুলি উৎপাদন করা হয়: পিতল — তামা, দস্তা; কাঁসা— তামা, টিন, ব্রঞ্জ — তামা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম ব্রঞ্জ — তামা, অ্যালুমিনিয়াম, গান মেটাল —তামা, টিন, দস্তা, জার্মান সিল্‌ভার – তামা, দস্তা, নিকেল; ডেল্‌টা মেটাল -- তামা, দস্তা, লৌহ, মোনাল মেটাল— তামা, নিকেল। ইহা ছাড়া গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য তাম্রপাত্র, বিদ্যুৎপরিবাহী তার ও মুদ্রা প্রভৃতির নির্মাণে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাঠিন্য-করণে এবং তুঁতে ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদনেও তামার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত, যকৃৎ ও ডিমে তামা বর্তমান। লোহিত রক্তকণিকাগঠনে অনুঘটকরূপে সামান্য পরিমাণ তাম্রের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং ইহার অভাবে রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। নানারূপ সবজি ও ডিম হইতেই মানবদেহ প্রয়োজনীয় পরিমাণ তামা পাইয়া থাকে। কবচী প্রাণীর রক্তে যে রঞ্জক-পদার্থ (পিগ্‌মেন্ট) আছে তাহাতেও তামা বর্তমান।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তামাক বেগুন-গোত্রের (ফ্যামিলি-সোলানাসিঈ, Family-Solanaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী, বীরুৎ-জাতীয় উদ্ভিদ। দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রজাতির বিজ্ঞান-সম্মত নাম যথাক্রমে নিকোতিয়ানা তাবাকুম (*Nicotiana tabacum*) ও নিকোতিয়ানা রুস্তিকা (*Nicotiana*

rustica)। ইহাদের আদি উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকো। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন ও রাশিয়া মুখ্য তামাক-উৎপাদক দেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা ভারতে তামাক আমদানি করে। ভারতে বৎসরে প্রায় ৩·৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয় ও প্রায় ৩·৪ লক্ষ মেট্রিক টন তামাক উৎপন্ন হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলনের পরিমাণ ৮৭৬ কিলোগ্রাম তামাকপাতা। এ দেশে সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুঁকার তামাক, নস্য ও খইনির জন্য টাবাকম প্রজাতির এবং কেবলমাত্র নস্য, খইনি ও হুঁকার তামাকের জন্য রুস্টিকা প্রজাতির চাষ করা হয়। বর্তমানে ভারতের মোট তামাক চাষের ৪ শতাংশ পশ্চিম বঙ্গে সীমাবদ্ধ এবং ইহার অধিকাংশ কুচবিহারে। এই অঞ্চলের চুরুটের মোড়কের তামাক ভারতে সর্বোৎকৃষ্ট।

ভারতে তামাক চাষের কাজে ১০ লক্ষ এবং শিল্পে ৭ লক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন।

তামাক গাছের পত্র সরল ও একান্তর, ফুল উভলিঙ্গ এবং শাখার প্রান্তে ফোটে, ফুলে পাঁচটি যুক্ত বৃত্যংশ ও পাঁচটি যুক্ত দল বর্তমান। তামাকের ফল ক্যাপসিউল-জাতীয়।

সকল প্রকার আবহাওয়াতেই তামাকের চাষ সম্ভব। সাধারণতঃ শীতমণ্ডলে গ্রীষ্মে ও উষ্ণমণ্ডলে শীতে ইহার চাষ করা হয়। দেশের প্রায় সর্বত্র ‘টাবাকম’ চাষ করা হয়, কিন্তু ‘রুস্টিকা’ উত্তর এবং উত্তর পূর্ব ভারতের শীতপ্রধান অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। জলনিকাশের ব্যবস্থাযুক্ত হালকা দো আঁশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। মাটিতে জৈব ও খনিজ পদার্থ, বিশেষতঃ পটাস বেশি থাকিলে খুবই ভাল হয়। ভালভাবে সার দেওয়া উঁচু বীজতলায় চারা উঠাইয়া মাঠে চারা বসাইতে হয়। চারা বসাইবার মাস দুই আগে বীজতলায় শ্রাবণ-ভাদ্র হইতে আশ্বিন কার্তিক মাসে বীজ বপন করা উচিত। টাবাকম জাত ৯১×৯১ সেন্টিমিটার এবং রুস্টিকা ৬১×৬১ সেন্টিমিটার দূরত্বে বসানো হয়, হেক্টর প্রতি ১২ ১৫ হাজার চারার প্রয়োজন হয়। এক শতাংশ হেক্টর জমিতে দুই দফায় প্রতি বারে ১৫০ গ্রাম বীজ বপন করিয়া ১৫ হাজার চারা তোলা হয়। অগ্রহায়ণে চারা বসাইবার পরই একবার এবং ক্রমাগত ৪ ৫ দিন অন্তর সেচ দিলে চারা ঠিকমত লাগে। চারা বসাইবার ২-৩ মাস পূর্বেই হেক্টর প্রতি ৯০-১১৫ কুইনটাল আবর্জনা সার, চাষ দিয়া ভালভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে যাহাতে তামাকের পক্ষে ক্ষতিকর কেলাবিন এবং অন্যান্য দ্রব্য ধুইয়া যাইতে পারে। ভাল ফলনের জন্য মাটি অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ৩০ ৬০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন, ১৫-২০ কিলোগ্রাম ফসফেট এবং ৫০-৭৫ কিলোগ্রাম পটাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। চারা বসানোর পূর্বেই সমস্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা ভাল। পটাস সার সালফেট অফ পটাসরূপে প্রয়োগে তামাক ভাল জলে। পশ্চিম বঙ্গের জন্য ২৫ মেট্রিক টন খামারের সার এবং মাটির উপরে ছিটাইয়া মিশাইয়া দিবার জন্য ১১০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন হুকা এবং খইনির তামাকে প্রয়োগ অনুমোদন করা হয়।

জমিতে আগাছা একেবারেই হইতে দিলে চলিবে না। দুপুরে পাতা ঢলিয়া পড়া দেখিলে সেচ দিতে হইবে। মোট ৭-১০ বার হালকা সেচেই কাজ হয়। অতিরিক্ত সেচে ক্ষতি হইতে পারে। পাতার বৃদ্ধির সহায়তা করিবার জন্য ফুল আসিলে ডগা ভাঙিয়া দিতে হয়, পত্রকক্ষের শাখাও ভাঙিয়া দেওয়া হয়। তুলি দিয়া নারিকেল তেলের প্রয়োগে নূতন শাখা হওয়া বন্ধ থাকে। হুকা বা বিড়ির তামাকের জন্য ৮ ১০ খানি এবং সিগারেট বা মোড়কের তামাকের জন্য ১৪-১৮ খানি পাতা রাখিয়া ডগা ভাঙা হয়।

পাতার গায়ে মরিচা-পড়া দাগ হইতে আরম্ভ করিলে পাতা তোলার সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। চারা বসাইবার ৩½ মাস পরে বিড়ির জন্য এবং ৯০-১০০ দিন পরে চুরুটের জন্য তামাকপাতা তোলা হয়। হুঁকার তামাকের জন্য রুস্টিকা প্রজাতির পাতা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ও তাল কম প্রজাতির পাতা জ্যৈষ্ঠের শেষে তুলিতে হইবে।

বিশেষ বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতির জন্য তামাকপাতার বিশেষ পরিচর্যা বা ‘কিওরিং’ প্রয়োজন। সিগারেটের জন্য তামাকপাতার পরিচর্যা করিতে তাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাযুক্ত গুদামের প্রয়োজন হয় এবং এখানে কাঠের আগুনের সাহায্যে আবশ্যকমত গরম বাতাস নল বা ‘ফ্লু’র সাহায্যে চালনা করা হয়। বিড়ি বা হুঁকার তামাকের ক্ষেত্রে পাতাগুলি সকালে উঠানে মেলিয়া দিয়া বিকালে গুদামে গাদা করিয়া রাখা হয় এবং অত্যধিক গরমে পাতার ক্ষতি রোধ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গাদা ভাঙিয়া নূতন করিয়া সাজাইতে হয়। ইহার পর বিড়ি ছাড়া অন্যান্য তামাকের পরিচর্যা-করা পাতা সন্ধানের (ফার্মেন্টেশন) জন্য গাদা করা হয়। মাত্রাতিরিক্ত সন্ধান রোধের জন্য গাদা ভাঙিয়া সাজানো হয় এবং যখন বর্ণ ও গন্ধের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে, তখন ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

দ্র Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966; Director of Economics and Statistics, Government of India, *Agriculture Situation in India*, Delhi, 1967.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

তামাক পাতায় যে সকল উপক্ষার বা অ্যালকালয়েড বর্তমান তাহাদের মধ্যে নিকোটিন প্রধান। ফ্রান্সে প্রথম তামাকের প্রচলন করেন নিকোট, তাহারই নামানুসারে নিকোটিনের নামকরণ হইয়াছে। তামাকপাতা হইতে নিকোটিন নিষ্কাশন করা হয়, ঐ পাতায় ইহার পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫ ভাগ। ইহা স্বচ্ছ, বর্ণহীন, তিক্তস্বাদ, কটুগন্ধ, বিষাক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ। ইহা জলে দ্রবণীয় এবং ইহার স্ফুটনাঙ্ক ২৬৬-২৬৭° সেন্টিগ্রেড। নিকোটিন পিরিডিন ঘটিত উপক্ষার, পিরিডিন ও পাইরোলিডিন এর বলয়ের সমন্বয়ে ইহার অণু গঠিত। রসায়নাগারে ইহার জারণের (অক্সিডেশন) ফলে নিকোটিনিক অ্যাসিড নামক বি বর্গীয় ভিটামিন উৎপন্ন হয়, কিন্তু মানবদেহে নিকোটিন হইতে এভাবে ভিটামিনের সংশ্লেষণ সম্ভব নহে।

ধূমপান করিলে তামাকের নিকোটিন কিছু পরিমাণে চুরুট বা সিগারেটের ছাই এ রহিয়া যায় এবং কিছুটা ধোঁয়ার সহিত মুখে প্রবেশ করে, এই ধোঁয়া হইতে অল্প পরিমাণে নিকোটিন মুখবিবর, গলবিল, নাসারন্ধ্র, শ্বাসনালী প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্য দিয়া রক্তে বিশোষিত হয়। খইনি মুখে দিলে বা নস্য গ্রহণ করিলে যথাক্রমে মুখ ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দিয়া অনুরূপভাবে অল্প মাত্রায় নিকোটিন রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে অল্প পরিমাণে নিকোটিন প্রবেশ করিলে তাহার প্রভাবে আমেজ সৃষ্ট হয় এবং কিছুকালের মধ্যেই ধূমপান অথবা নস্য বা খইনি গ্রহণ নেশায় পর্যবসিত হয়।

দেহে নিকোটিনের ক্রিয়া রক্তে উহার মাত্রার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। অল্পমাত্রায় নিকোটিন নার্ভগ্রন্থিগুলিতে নার্ভকোষের ঝিল্লির বিছদন (ডিপোলা-রাইজেশন) ঘটায়, ফলে আবেগ সহজেই নার্ভগ্রন্থি পার হইয়া গ্রন্থি উত্তর নার্ভকে উদ্দীপিত করে, অর্থাৎ অল্প মাত্রায় ইহা নার্ভ উত্তেজক। কিন্তু নিকোটিনের মাত্রাধিক্য ঘটিলে নার্ভগ্রন্থিতে ঝিল্লির দীর্ঘস্থায়ী বিছদন সৃষ্ট হয়, ফলে আবেগ নার্ভগ্রন্থি অতিক্রম করিতে পারে না এবং গ্রন্থি-উত্তর নার্ভের ক্রিয়া বন্ধ হয়। নিকোটিনের প্রভাবে বিভিন্ন ঐচ্ছিক পেশীর মৃদু কম্পন ঘটে, হৃৎপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্কে বমনকেন্দ্র উদ্দীপিত হওয়ায় বমনোদ্রেক হয় এবং ত্বকের রক্তবাহগুলি অধিক উন্মুক্ত হইয়া ত্বকে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পাওয়ায় মুখমণ্ডল আরক্তিম দেখায়। অত্যধিক ধূমপানের ফলে অনিদ্রা, ক্ষুধাহীনতা, হাতের মৃদু কম্পন, বমনেচ্ছা প্রভৃতি যে সকল উপসর্গের সৃষ্টি হয়, সেগুলি প্রধানতঃ নিকোটিনেরই আধিক্যজনিত। মাত্রার তারতম্যে নার্ভের উদ্দীপনা ও অবসাদ— উভয়ই ঘটায় বলিয়া ভেষজশাস্ত্রে নিকোটিনের প্রয়োগ বিশেষ সুবিধাজনক নহে। কীটঘ্ন ঔষধ হিসাবে নিকোটিনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

দ্র T A Henry, *The Plant Alkaloids*, New York, 1949.

দেবজ্যোতি দাশ

তামিল দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা তামিল। যে চারিটি দ্রাবিড় ভাষায় উন্নত শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তামিলে। এই নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হইল বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘনকারী অগস্ত্যঋষির জনৈক শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচনা বলিয়া বর্ণিত 'তোলকাপ্পিয়ম্' নামক একখানি বিশিষ্ট ব্যাকরণগ্রন্থ। কাহারও কাহারও মতে রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী।

দীর্ঘকালব্যাপী তামিল সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণে রাখিলে দ্রাবিড় ভাষাসমূহের মধ্যে তো বটেই, ভারতের অন্যান্য জীবন্ত ভাষাসমূহের মধ্যেও তামিলকেই সর্বপ্রাচীন বলিতে হইবে। কিন্তু নামে এক হইলেও বিভিন্ন যুগের তামিল ভাষার রূপগত পার্থক্য কিছু কম নয়। আদি তামিল, পুরাতন তামিল, প্রাচীন তামিল, মধ্যযুগীয় তামিল, আধুনিক তামিল প্রভৃতি প্রয়োগ হইতেই এই ভাষাটির ব্যাকরণগত বিভিন্নতা অনুমান করা যায়।

অন্যান্য আর্যেতর ভারতীয় ভাষার মত তামিলেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে। কিন্তু তামিল-ভাষীদের স্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং 'উত্তরীয় ভাষা' অর্থাৎ সংস্কৃতের সহিত সাধারণ মানুষের পরিচয় না থাকার জন্য মালয়ালম্, কন্নড ও তেলুগুর মত সমৃদ্ধ দ্রাবিড় ভাষা-গুলিতে যে পরিমাণ সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছে, তাহার তুলনায় তামিলের উপর সংস্কৃতের প্রভাব সামান্যই বলা যায়। বর্তমান কালে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রতিনিধিমূলক ভাষা তামিল। মূল দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত আছে তামিলে। দ্রাবিড় ('তিরাম্বিট') ও তামিল ('তমিড') শব্দ দুইটির আকারে পার্থক্য থাকিলেও

উৎপত্তির দিক হইতে উহারা অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

তামিল বর্ণমালার ১২টি স্বরবর্ণের মধ্যে ঋ, ৯, ং, ঃ এই চারিটির স্থান নাই। হ্রস্ব দীর্ঘভেদে দুইটি 'এ' এবং দুইটি 'ও' আছে (অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে)। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তামিলে ব্যঞ্জনবর্ণের স্বল্পতা, মাত্র ১৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া তামিলের কাজ। সংস্কৃতের ২৫টি স্পর্শবর্ণের স্থলে তামিলে মাত্র ১০টি. ক ঙ চ ঞ ট ণ ত ন প ম। মহাপ্রাণ ধ্বনি ও বর্ণ তামিলে নাই। ঘোষবৎ-ধ্বনি থাকিলেও তদুপযোগী পৃথক বর্ণ নাই। তামিলে ঘোষ ও অঘোষধ্বনির অবস্থান এমনভাবে নির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত যে, একই বর্ণের সাহায্যে উভয় ধ্বনির কাজ চলিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মহাপ্রাণ ও ঘোষ অঘোষধ্বনির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্য সংস্কৃত শব্দের তামিল লিপ্যন্তরীকরণ সম্ভব নয়। তাই দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষা লিখিবার জন্য 'গ্রন্থ-লিপি' নামে একটি পৃথক লিপির উদ্ভাবন করিয়াছেন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণসমাজের ও সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে জ ষ স হ ক্ষ এই পাঁচটি বর্ণ তামিল ব্যাকরণে স্থান লাভ করিলেও আজ পর্যন্ত উহারা তামিল বর্ণমালার অঙ্গীভূত হয় নাই, 'উত্তরীয় ভাষার অক্ষর' এই নামে পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছে। গোড়া তামিলভাষীরা পারতপক্ষে এই বর্ণগুলি ব্যবহার করেন না। সংস্কৃতের তুলনায় তামিলে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি অপেক্ষাকৃত কম। তামিল লিখন-পদ্ধতিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার একেবারেই নাই। এই সমস্ত কারণে তামিল ভাষায় ব্যবহৃত এবং তামিল লিপিতে লিখিত অতিপরিচিত সংস্কৃত শব্দগুলিকেও চেনা কঠিন হইতে পারে: যেরূপ--- পরীট্চৈ (পরীক্ষা), পিরচ্নৈ (প্রশ্ন), পাক্কিয়ম্ (ভাগ্য), চিত্তিরৈ (চিত্রা), বরুটম্ (বর্ষ), চিবন্ (শিব), ইরবীন্তিরনাত (রবীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি।

সাধু ও চলিত তামিলের ব্যবধান খুব বেশি। কথ্য তামিলে যেমন স্থানগত বিভিন্নতা আছে তেমনই আছে সম্প্রদায়গত পার্থক্য। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের কথ্য তামিলে রূপভেদ খুবই স্পষ্ট। এই সমস্ত কারণে তামিলনাড়ে বাংলার মত একটি সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ কথ্য ভাষা গড়িয়া ওঠে নাই। অদূর ভবিষ্যতে তামিল সাহিত্যে কথ্য তামিলের প্রবেশলাভের সম্ভাবনাও তাই সুদূরপরাহত।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IV, Calcutta, 1906; Robert Coldwell, *A Comparative Grammar of the Dravidian in South Indian Family of Languages*, Madras, 1961; Suniti Kumar Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তামিল সাহিত্য দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন ঐতিহ্যপুষ্ট তামিল ভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি থাকিয়া এবং সংস্কৃত তথা ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে কিছু কিছু শব্দ এবং রীতি গ্রহণ করিয়াও তামিল সাহিত্য একটি দক্ষিণ দ্রাবিড়ীয় ধারা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়: ১. আদি তামিল (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) ২. প্রাচীন তামিল বা ক্ল্যাসিক তামিল – পড়ন-তমিড়, চেন-তমিড় (Pazan-tamiz, Cen-tamiz, ৫০০-১৩৫০ খ্রী) পল্লব, চালুক্য ও চোড় (Choza) সাম্রাজ্যের সময় ৩. মধ্যযুগীয় তামিল – ইটৈৎ-তমিড় (Itai-t-tamiz, ১৩৫০-১৮০০ খ্রী), পরবর্তী চোল ও বিজয়নগর যুগ ও মাদুরার নায়কদের সময় পর্যন্ত ৪. নূতন বা আধুনিক তামিল-- পুতুৎ তমিড় (Pu-t-tamiz, Putu-t-tamiz) অথবা গ্রাম্য তামিল কোডুম তমিড় (Kodun-damiz), ব্রিটিশ শাসনের কাল (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত।

আদি তামিল সাহিত্যকে 'সংগম' সাহিত্যও বলা হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তামিল ভাষায় সাহিত্যচর্চার ও কবি-সংবর্ধনার জন্য সাহিত্যসভা বা সংগম আহ্বান করার রীতি প্রচলিত ছিল। আধুনিক তামিল সাহিত্যে এমন অনেক নিদর্শন আছে যেগুলির সঙ্গে সংগম যুগের সাহিত্যকর্মের একটা যোগ লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টজন্মের অব্যবহিত পূর্বে অথবা পরেই সংগম-কবিরা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে ভাষায় তাঁহাদের রচনা পাওয়া গিয়াছে তাহা চেন-তমিড় বা প্রাচীন তামিল (৫০০ খ্রী হইতে)। সর্বপ্রাচীন তামিল পুস্তকের কাল সম্ভবতঃ ১ম খ্রীষ্টাব্দ।

সঙ্গম যুগের তামিল সাহিত্যের নিদর্শন বেশির ভাগই সংকলন-গ্রন্থাকারে পাওয়া গিয়াছে। দুইটি প্রধান সংকলনের মধ্যে প্রথম হইল পত্তুপ্পাট্টু (*Pattu-p-Pattu*) (গীতিকাব্য-দশক)। এই কবিতাগুলি ৮জন কবির দ্বারা রচিত এবং ১ম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের বিভিন্ন রাজগণকে উৎসর্গীকৃত। কবিতাগুলির ছত্রসংখ্যা ১০৩ হইতে ৭৮২ পর্যন্ত। কবিতাগুলিতে তদানীন্তন তামিলদের

সুখ দুঃখ, যুদ্ধ-শান্তি, ভালবাসা ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। সহজ সরল সত্যে ও সৌন্দর্যে ইহা পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যের সহিত তুলনীয়।

এই কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নক্কীরার্ বা নক্কীবার (Narkkıar বা Nakkıvar) প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ইনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি উল্লিখিত কাব্য-সংকলনের ৬ষ্ঠ এবং ১০ম কবিতার রচয়িতা বলিয়া অভিহিত। ৬ষ্ঠ কবিতাটিতে তামিল ও আর্যদের ধর্ম-বিশ্বাসের মিল লক্ষ্য করা যায়। ইহার বিষয়বস্তু যুদ্ধের দেবতা মুরুকন (Murukın) ইনি শিবপুত্র কার্তিকেয়, সুব্রহ্মণ্যম অথবা কুমার।

দ্বিতীয় সংকলনের নাম 'এট্টুত্তোকৈ' (Ettuttokaı. ৮টি সংকলন)। ইহার অন্তর্ভুক্ত পত্তিরপ্পাট্টু (Patırruppattu) দশজন বিভিন্ন কবির প্রত্যেকের দশটি করিয়া কবিতার গ্রন্থন। এইগুলি 'পত্তুপ্পাট্টু'র মতই তামিলনাডের জীবনধারাকে রোমান্টিক রূপে প্রকাশ করিয়াছে। দ্বিতীয় সংকলনের আর একটি কাব্যসংগ্রহ 'পরিপাটল' (Parı-Patal) এ তামিল দেব-দেবী, বিষ্ণু (তিরুমল) ও মুরুকনের বন্দনা করা হইয়াছে।

এই যুগে এই দুইটি গ্রন্থ ব্যতীত পাঁচটি বিস্তৃত বর্ণনামূলক কাব্য পঞ্চ কাব্যম্ (Panca Kavyam) রচিত হইয়াছিল। এইগুলিকে মহাকাব্যও বলা চলে। রচয়িতাগণ সকলেই সংগম যুগের কবি বলিয়া চিহ্নিত। এই কাব্যগুলির মধ্যে একটি হইল 'চিলপ্পতিকারম্' (Cılapp-atıkaram) নূপুরের কাব্য। ইহা ইলম্‌কো-অটিকল্ (Ilamko-v-atıkal)-নামক একজন জৈন ধর্মাবলম্বী চের রাজপুত্রের রচনা। বিয়োগান্ত এই কাব্যটিতে দুইজন তরুণ ব্যবসায়ীর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর তামিলনাডের জনসাধারণের জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনার জন্যই ইহার বিশেষ মূল্য। অন্য একটি কাব্যের নাম 'মণি-মেকলৈ' (Manı-mekalaı)। ইহার রচয়িতা চিত্তলৈচ্ চত্তনার (Chıtalaı-Ch-chattanar) নামক একজন বৌদ্ধ। এই কাব্যের নায়িকা মণি-মেকলৈ (Manı-mekalaı) একজন রাজপুত্রের প্রেমপূর্ণ বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে সে যুগের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও মতবাদ প্রতিফলিত হইয়াছে। আদি তামিলের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে 'মণি-মেকলৈ' ও চিলপ্পতিকারম্-কে চিহ্নিত করা চলে। এই যুগে রচিত জৈন কবি কঙ্কু বণির 'পেরুম-কতৈ' (Peıum-Kataı) কাব্য কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন এবং উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তার প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত।

৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পর রচিত হয় ১৮টি নীতিগর্ভ কবিতার সংকলন 'পতিনেন কীড্ক্ কণক্কু' (Patı-en-kez-k-kanakku), ইহার কবিতাগুলি ক্ষুদ্র এবং দ্বিপদী। এই ১৮টি সংকলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল তিরু-বাল্লুবর (tıru-Valluvaı) এর রচিত 'কুরল' (Kural)। তিরু বাল্লুবর্ ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভব। ইনি ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ লইয়া বহু দ্বিপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের তত্ত্বজ্ঞান-সাহিত্যের মধ্যে 'কুরল' একটি উচ্চ স্থানের অধিকারী। এই কাব্যটি ইংরেজী ও লাতিন-ব্যতীত অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় এবং বাংলা ও হিন্দীতেও অনূদিত হইয়াছে।

গুপ্ত যুগের ও পল্লব সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের উদ্দীপনা তামিল সাহিত্যে গৌরব আনয়ন করিয়াছিল। তামিলনাডের নায়নমার (Nāyan-mars) বলিয়া অভিহিত শৈব সন্ত ও মিষ্টিকদের হাতে শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শন উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়েই বৈষ্ণব সন্তেরাও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন (৫০০-১০০০ খ্রী)। শৈব সন্তদের দ্বারা রচিত শৈব স্তোত্র ও কবিতাগুলিকে ১১শ শতাব্দীতে নম্পিয়ণ্ডার্ নম্পি (Nampı-y antar nampı) ধারাবাহিকভাবে (১০ ভাগে) প্রকাশ করেন। সংকলনগুলিকে বলা হয় 'তিরুমুরৈ' (Tıru-muraıs) স্তোত্রগুলি 'দেবমালা' বলিয়া বর্ণিত। অষ্টম 'তিরুমুরৈ'তে যে ভক্তিস্তোত্র আছে তাহার রচয়িতা মাণিক্ক বাচকর (Mānıkka Vāchakaı)-নামক একজন শৈব সন্ত। তামিল শৈব সন্তদের মধ্যে ইনি চতুর্থ স্থানের অধিকারী। এই যুগের শৈব সন্তদের মধ্যে মাণিক্ক বাচকর সম্ভবতঃ সর্বপ্রধান। ইঁহার কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। উল্লিখিত সন্তদের (৬৩ জন) সম্বন্ধে তামিল দেশে যে সমস্ত কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তাহা তামিল শৈব ধর্ম-সাহিত্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এইগুলি 'পেরিয় পুরানম' (Periya-puranam, ১২শ শতাব্দী) নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

তামিল দেশের ১৮ জন বৈষ্ণব সন্তের আড্বার্ কর্তৃক রচিত ৪০০০ স্তোত্রের সংকলন করেন শ্রীনাথমুনি (১১শ শতাব্দী)। ('আড্বার' দ্র)। 'নাল-আয়ির প্ প্রবন্ধম' (Nāl-āyıra-p-pırapantam)-নামক এই সংকলনটিকে

বৈষ্ণবেরা বেদস্বরূপ মনে করেন। এইখানেই তিরুমুরৈ-এর ন্যায় প্রথম ভক্তিবাদের প্রতি বিশ্বাস দেশীয় ভাষায় ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। এই ভক্তির পাত্র কখনও শিব কখনও বা বিষ্ণু।

তামিল বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আণ্ডাল, আণ্টাল বা গোদা (Andal বা Goda) নামক একজন মহিলা কবিও আছেন। 'তিরুপ্পাবৈ' গ্রন্থে তাঁহার ৩০টি কবিতা পাওয়া যায়। ইহাতে প্রথম মানব-মানবীর (কৃষ্ণ গোপিনী) রূপকে ভক্ত ও ভগবানের প্রেম বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে এই জাতীয় ভক্তিকাব্য উত্তর ভারতেও বিস্তার লাভ করে। ইহা ইংরেজী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

দশম হইতে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে (চোল সম্রাটগণের গৌরবময় রাজত্বকাল) কয়েকজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে কম্বন বা কম্পন (Kampan), ওট্টক্কুত্তন (Ottakkuttan) এবং পুকড়েণ্ডি (Pukazhenti) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কম্বন তামিল ভাষায় 'রামায়ণে'র সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক। ইনি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেন নাই। সমালোচকদের মতে ইনি তামিল সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কম্বনকে প্রাচীন সংগম যুগের শেষ কবি এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অথবা সর্বভারতীয় প্রবণতাসমন্বিত মধ্যযুগীয় তামিলের উদ্গাতা কবি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। 'ওট্টক্কুত্তন' রামায়ণের শেষ সর্গের (উত্তর কাণ্ড) অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পুকড়েণ্ডি মহাভারতের অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদ সহজ ও সুন্দর ভাষায় হওয়ায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা নল-দময়ন্তীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত নল-বেণ্পা (Nala-Venpa)।

চোল সম্রাটগণের সময়ে শৈবদের একটি নূতন সম্প্রদায় শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মেয়্কণ্ড তেবর (Meykanta-tevar, ১২২৩ খ্রী)। তাঁহার 'চিবঞানবোতম্' (Civakenana-potam) বা 'শিব-জ্ঞান বোধম'(Siva-Jnanabodha) শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শনের মৌল গ্রন্থ। তাঁহার শিষ্য অরুল্ নান্তি শিবাচার্য (Arul-nanti Sivacharya) রচিত 'শিবজ্ঞানসিদ্ধি' তামিল শৈব দর্শনের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তামিল ভাষায় এবং সাহিত্যে একটি নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। ইহাকেই বলা হয় মধ্যযুগীয় তামিল (১৩৫০-১৮০০ খ্রী)। এই সময়ে ভাষা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিল, ছেদ-চিহ্নাদির ব্যবহার শুরু হইল এবং ক্রিয়ার কালগঠনে নূতন উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। মধ্য তামিল যুগে কোনও উল্লেখযোগ্য মৌলিক রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সময়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলতঃ মন্দির, আশ্রম ইত্যাদি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের (১৬৫০-১৬০০ খ্রী) কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন কুম্বকোণম (Kumbhakonam)-এর কালমেঘম্ (Kalamegam)। ইনি কিছু ধর্মসংগীত রচনা করেন। ইনি প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন পরে শৈব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন মহাভারতের অনুবাদক বিল্লিপ্পুত্তুরর (Villipputturar)। পরনজোতি (Paranjoti) রচিত শৈব পুরাণ গ্রন্থ 'চেদাবণ্য পুরাণম' কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়। শৈব ধর্মাবলম্বী কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কবি হইলেন তায়ুমানবর (Tayumanavar, ১৭৬২ খ্রী)। ইঁহার রচিত শিবস্তোত্রগুলি তামিলনাড়ের সর্বত্র অতি অনুরাগের সহিত গীত হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকজন মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের রচিত কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে খ্রীষ্টান মিশনারিরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তামিল ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় প্রথম তামিল ভাষার পুস্তক ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচিন হইতে প্রকাশিত হয়। ১৭শ এবং ১৮শ শতাব্দীতে কিছু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাদুরার জেসুইট পাদরি রোবের্তো দি নোবিলি (Roberto-di-Nobile, ১৬০৬ ৫৬ খ্রী) তত্ত্ববোধস্বামী নামে একগুলি গ্রন্থ তামিল গদ্যে প্রকাশ করেন ও একটি তামিল পর্তুগীজ অভিধান রচনা করেন। ইতালীয় জেসুইট কনস্টান্টাইন বেস্কি (Constantinus Beschi, ১৬৮০-১৭৪৬ খ্রী) বীরম মুনিবর বা বীর মহামুনি নাম গ্রহণ করিয়া তেম্বাবণি (Tembavani বা The unfading Garland) রচনা করেন। ইহা ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের কিছু গল্পের অনুবাদ। ১৩০ বৎসর পর্যন্ত ইহা হাতে লেখা পুথি ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়। ইনি একটি বিদ্রূপাত্মক গল্প রচনা করেন। লাতিন ভাষায় রচিত আধুনিক ও মধ্যযুগীয় তামিল ভাষার ব্যাকরণ এবং সাহিত্যতত্ত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জি. ইউ পোপ তামিল সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া ইহাকে বিদেশে প্রচারের সহায়তা করেন।

নূতন বা আধুনিক তামিল প্রবর্তিত হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর তামিল মানস প্রসারিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তামিল সাহিত্যের উন্নতিতে ইহা তেমন সহায়ক হইয়া ওঠে নাই। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে (১৮৫৭ খ্রী) তামিল সাহিত্যের আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতেও বহু কবি ও সাহিত্যিক পুরাতন রীতিতে সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ওপ্পল্লমণি (Oppallamani Pulavar, ১৮৬৯ খ্রী) ও অনন্ত ভারতী আয়েঙ্গার (Ananta Bharati Ayyangar, ১৭৮৬-১৮৪৮ খ্রী)। টি. মীনাক্ষী সুন্দরম পিল্লৈ (T Minakshi Sundaram Pillai) এবং শরবণ পেরুমাল অয়ার (Satavana Perumal Ayvar) — এই দুই জন তামিল ভাষার কিছু ক্লাসিক রচনা সম্পাদনা করেন। ইহা ছাড়া এইচ. এ. কৃষ্ণ পিল্লৈ (H A Krishna Pillai, ১৮২৭-১৯০০ খ্রী) 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' এর তামিল অনুবাদ এবং আরও কিছু রচনার জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত একটি নূতন ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রথম মৌলিক উপন্যাস ও নাটকের স্রষ্টা হইলেন বেদনায়কম পিল্লৈ (Vedanayakam Pillai, ১৮২৬-৮৯ খ্রী)। অধ্যাপক সুন্দরম ও লর্ড লিটনের একটি উপন্যাস অবলম্বন করিয়া সেক্সপীয়রীয় রীতিতে একটি নাটক রচনা করেন। গ্রাম্য জীবন অবলম্বনে রচিত রাজম আয়ার-এর 'কমলাম্বল' নামক উপন্যাসটিও প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান যুগের উপন্যাসিকদের মধ্যে সি. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা হিসাবে এবং এ. মাধবয়া সামাজিক উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের বিচারে তামিল উপন্যাস অপেক্ষা তামিল নাটকই উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তামিল নাটকে সেক্সপীয়রীয় প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া 'বঞ্চি' (Vanci) ও পুল্লু (Pullu) এই দুই প্রকার দেশজ নাটকও (বাংলা দেশের যাত্রার সহিত তুলনীয়) প্রচলিত হয়। তামিল নাটকের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব হয় নাই।

বর্তমান যুগের কবিদের মধ্যেও ক্লাসিক যুগের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহারা যে ক্রমশ: নূতন চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাতন ধারার কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ. কে. অমৃতম পিল্লৈ (১৮৪৫-৯৯ খ্রী), এম. ত্যালপাকম পিল্লৈ (M Tyalpakam Pillai, ১৮৫২-১৯১৬ খ্রী), এ. ষণ্মুখম পিল্লৈ (১৮৬৯-১৯১৪ খ্রী) এবং টি. লক্ষ্মণ পিল্লৈ (১৮৬৪ খ্রী)— ইনি তামিলনাডের রবীন্দ্রনাথ বলিয়া বিখ্যাত। ভি. পি. সুব্রহ্মণ্য মুদলিয়ার-এর নামও উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, দার্শনিক ও দেশপ্রেমিক সুব্রহ্মণ্য ভারতী (১৮৮২-১৯৪৬ খ্রী) তামিল কাব্যের নব ধারার উদ্গাতা বলিয়া পরিচিত। ইনি বহু জাতীয়সংগীত ও ধর্মমূলক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার দীর্ঘ কবিতার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল ১. কন্নন পাটু (Kannan-Pattu) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রচিত ২৩টি কবিতার সমষ্টি ২. পাঞ্চালী-শপথম (Pancali-Sapatam) মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

সুব্রহ্মণ্য ভারতী আধুনিক তামিল গদ্যেরও স্রষ্টা। ইনি কিছুকাল 'স্বদেশমিত্রম' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। ইনি তামিল ভাষায় 'গীতা'র অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত তলস্তয় ও রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনারও অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভারতী কিছু সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধও রচনা করেন। রচনার গভীরতা, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের জন্য ইনি তামিলগণের নিকট দ্বিতীয় অগস্ত্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তামিল ভাষার আধুনিক কবিদের মধ্যে ইনি সর্বজনপ্রিয় কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন।

ভারতীর সমসাময়িক কবিমণি দেশিক বিনায়কম পিল্লৈ এবং নামক্কল রামলিঙ্গম পিল্লৈ এই দুই জন কবির মধ্যে প্রথম জন অত্যন্ত প্রতিভাবান হইলেও দ্বিতীয় জন অধিক জনপ্রিয় এবং তামিলের 'পোয়েট লরিয়েট' বলিয়া স্বীকৃত।

শঙ্খালি (Sankali) নামক কবিতাগুচ্ছ এবং কাব্যোপন্যাস অবনুম অবলুম (Avanum Avalum, নায়ক ও নায়িকা) রামলিঙ্গমের জনপ্রিয় সাহিত্যকীর্তি। বিনায়কম পিল্লৈ-এর রচিত গীতিকবিতা এবং বিদ্রূপাত্মক রচনা জনপ্রিয়।

বিদ্রোহী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি ভারতী-দশন (Bharati-Dasan) ভারতী সুব্রহ্মণ্যমের ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কৃষকদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইলেন কোত্ত-মঙ্গলম সুব্বু (Kothamangalam Subbu)। স্বামী শুদ্ধানন্দ ভারতীর রচিত 'ভারতশক্তি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য।

তামিল সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও ছোটগল্পের রচয়িতা হিসাবে ইঁহাদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে. অণি কুপ্পুস্বামী মুদলিয়ার (Arni Kuppuswami Mudaliyar), জে. আর. রঙ্গরাজু ও ভাড়ুভুর ডোড়াই-স্বামী আয়েঙ্গার। এই সময়ে কয়েকজন মহিলা সাহিত্যিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী কোদানায়কের নাম উল্লেখযোগ্য।

আর. কৃষ্ণমূর্তি (ছদ্মনাম কল্কি) বর্তমানের ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ইহার কয়েকটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসেরও রচয়িতা। তিনি বিখ্যাত 'কল্কি' পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন।

বাংলা সাহিত্য হইতে অনূদিত গ্রন্থগুলি তামিল গদ্য-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা তামিল ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে।

বর্তমান কালে নাটকের ক্ষেত্রে পি. সম্বন্ধ মুদলিয়ারের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি প্রায় ১০০টি মৌলিক নাটক রচনা করেন। অনুবাদেও ইহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তামিল রঙ্গমঞ্চের সংস্কারক রূপে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া তামিল ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা একই সঙ্গে হইয়া আসিতেছে, সংস্কৃত যে বাহিরের ভাষা তাহা কোনও দিন অনুভূত হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে হিন্দী ও সংস্কৃত উত্তর ভারতীয় ভাষা বলিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে তামিলভাষীদের বিরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে। ইহার মন্দ দিক আছে আবার ভাল দিকও আছে। কারণ ইহার ফলে প্রাচীন তামিল ভাষার নিদর্শনগুলি সুযোগ্য টীকাসমেত জনসমক্ষে প্রকাশিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে প্রধানতঃ মহামহোপাধ্যায় ভি ভি. স্বামীনাথ আয়ারের এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায়। তমিড় বলর্চি কড়গম্ (Tamiz Valarcci Kazagam) বা তামিল অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে (১৯৪৭ খ্রী) এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'তামিল বিশ্বকোষ' রচিত হয় এবং তামিল ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কারপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়।

আধুনিক যুগের বিখ্যাত গদ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তামিল সাহিত্যের অধ্যাপক এস. বৈয়াপুরী পিল্লৈ (S. Vaiyapuri Pillai) এবং বি কল্যাণসুন্দরম্ মুদলিয়ার (V Kalyana-Sundaram Mudaliyar) স্মরণীয়। বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং মহাভারতের উপর লিখিত আলোচনা তামিল সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে এম. বরদারঞ্জন এবং কে ভি জগন্নাথন এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কল্কি (Kalki), আনন্দ-বিকটম্ (Ananda-Vikatam), কলৈ মগল্ (Kalai magal), বিড়ুতলৈ (Vidhuthalai), কলৈ-কতির (Kalai Kathir) প্রভৃতি তামিল পত্রপত্রিকা তামিল সাহিত্যের উন্নতিতে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

দ্র Suniti Kumar Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963

তাম্রবর্ণী মাদ্রাজের তিরুনেলভেলী জেলার একটি নদী। ইহা পশ্চিমঘাট পর্বতের অগস্ত্যমলৈ (৮°৩৭′ উত্তর ও ৭৭°১৫′ পূর্ব) হইতে উৎপন্ন হইয়া পার্বত্য অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হয়। তিরুনেলভেলীর সমতল অংশে প্রবেশ করিবার সময়ে ইহা পাপনাশম পুণ্যতীর্থের নিকট একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে, পরে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া সর্বসমেত ১২৮ কিলোমিটার (৮০ মাইল) পথ অতিক্রম করিয়া মান্নার উপসাগরে পতিত হয়। চিত্তার ইহার প্রধান উপনদী।

তাম্রবর্ণীতে সারা বৎসর জল থাকে। নদীতে কয়েকটি বাঁধ দিয়া সেচনের কাজ করা হয়। পাপনাশম, অম্বাসমুদ্রম প্রভৃতি শহর নদীতীরে অবস্থিত। মৎস্য, বায়ু এবং ভাগবত পুরাণে তাম্রপর্ণী নামে একটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, ঐ নদীর তীরে গোকর্ণ তীর্থ ও অগস্ত্যমুনির আশ্রম ছিল।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XXIII, Oxford 1908

উমা সেন
অরুণপ্রকাশ মজুমদার

তাম্রলিপ্ত তমলুক দ্র

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯১ খ্রী) বঙ্কিম-পর্বের খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বনগ্রামের নিকটবর্তী বাগ আঁচড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল এম এস. উপাধি লাভ করেন এবং অতিরিক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরূপে তিনি সরকারি কাজও করিয়াছেন। সরকারি কার্যোপলক্ষে তিনি বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করিয়া লোক চরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪ খ্রী) প্রধানতঃ

এই অভিজ্ঞতার ফল। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটি সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিম-প্রভাববর্জিত। কল্পনাসমৃদ্ধ রোমান্সের পথ বর্জন করিয়া তারকনাথ বাঙালী মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখ ও ক্ষুদ্র সংঘাতগুলির অন্তরঙ্গ চিত্র আঁকিয়াছেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক চরিত্রচিত্রণ ও অনাবিল হাস্যরস ইহাকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। 'স্বর্ণলতা' ছাড়া তারকনাথ ৪খানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন: 'ললিত সৌদামিনী' (১৮৮২ খ্রী), 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭ খ্রী), 'তিনটি গল্প' (১৮৮৯ খ্রী) ও 'অদৃষ্ট' (১৮৯২ খ্রী)। শুধু 'স্বর্ণলতা'ই নয়, অন্যান্য উপন্যাসেও লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার সহিত তিনি লেখক হিসাবে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। তিনি 'কল্পনা' নামক একখানা মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করিয়াছিলেন (প্রকাশ— আগস্ট, ১৮৮১ খ্রী)। 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ 'সরলা' (অমৃতলাল বসু-কৃত) অসাধারণ মঞ্চসাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২৭, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

রথীন্দ্রনাথ রায়

তারকনাথ দাস (১৮৮৪-১৯৫৮ খ্রী) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন কাঁচরাপাড়ার (২৪ পরগনা) নিকটে মাঝিপাড়া গ্রামে জন্ম, পিতা কালীমোহন দাস। তারকনাথ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মায় মিশন ইনস্টিটিউশন হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল জেনারেল অ্যাসেম্বলি (এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজ) এবং টাঙ্গাইলের (মৈমনসিংহ জেলা, পূর্ব বঙ্গ) পি. এম. কলেজে পড়েন। ছাত্রজীবনে তিনি একাধিক বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হন, সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে প্রভাবিত হন। কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ অবস্থায় তারকনাথ উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক রাজনীতির প্রচারকালে পুলিশের নজরে পড়েন। গ্রেফতার হইবার আগেই তিনি দেশত্যাগ করিয়া জাপানে (১৯০৫ খ্রী) এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় উপস্থিত হন। সেখানে 'ফ্রি হিন্দুস্থান' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁহার স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ এম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলিটিক্যাল সায়ান্স বিভাগের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মার্কিন নাগরিক হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে তিনি ইওরোপে যান এবং সেখানে আবার ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে লিপ্ত হন। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিলে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসেন (১৯১৭ খ্রী)। এখানে ভারতে বিদেশী অস্ত্র পাঠাইবার ব্যাপারে সানফ্রান্সিসকোতে ষড়যন্ত্রের দায়ে তারকনাথের ২২ মাস কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর তাঁহার আবেদনক্রমে অ্যাটর্নি জেনারেল তারকনাথের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়া লন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি পি এইচ ডি. ডিগ্রি লাভ করেন, বিষয় — আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক আইন। ঐ বৎসরেই এক মার্কিন মহিলার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯২৫-৩৪ এই দশ বৎসর দাস-দম্পতী ইওরোপে ছিলেন। ভারতীয় ছাত্রদিগের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্য তাঁহার চেষ্টায় জার্মানীর মিউনিকে 'ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট' সংস্থা স্থাপিত হয়। তারকনাথ দাস ফাউণ্ডেশনের উদ্ভব হয় এই উদ্দেশ্যে এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় ইহা রেজিস্ট্রিকৃত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার একটি শাখা রেজিস্ট্রি করা হয়।

তারকনাথের পরবর্তী জীবন প্রধানতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে 'ফরেন পলিসি ইন দি ফার ঈস্ট' শীর্ষক তাঁহার বক্তৃতাবলী বিশেষ সাড়া জাগায়, পরে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটুমল ফাউণ্ডেশনের ভ্রাম্যমাণ সদস্য ও অধ্যাপক হিসাবে তারকনাথ বিশ্ব সফর করেন। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বরে দেশত্যাগের ৪৭ বৎসর পরে তিনি ভারতে পৌঁছিলেন। সফরের পরে আমেরিকায় ফিরিয়া যান। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্কে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'মডার্ন রিভিউ'-তে তাঁহার বহু প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ইণ্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স' উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতির্ময় বসু রায়

তারকাসুর ত্রিভুবনের উৎপীড়ক অসুর। তার নামক অসুরের পুত্র। শিবপুরাণে (৯-১৯) ও দেবীভাগবতে (৭।৩১) তারকাসুরের কাহিনী পাওয়া যায়। কঠোর তপস্যার ফলে তারকাসুরের দেহনিঃসৃত তেজ ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে থাকিলে সমস্ত দেবগণের অনুরোধে দাহশান্তির

জন্য ব্রহ্মা তাহাকে দুইটি বর দান করেন। প্রথম বরে কেহ তাহার তুল্য বলশালী হইবে না এবং দ্বিতীয় বরে একমাত্র শিববীর্যসম্ভূত তেজ তাহার বিনাশের কারণ হইবে। বরলাভে বলীয়ান তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার উপদেশে হিমালয়শিখরে তপস্যারত মহাদেবের চিত্ত উমার প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্নবান হন। ইন্দ্রের অনুরোধে হিমালয় পর্বতে কামদেবের উপস্থিতিতে মহাদেবের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ায় তিনি তৃতীয় নেত্র হইতে নির্গত বহ্নিতে কামদেবকে ভস্ম করেন। মহাদেব একমাত্র তপস্যালভ্য, ইহা নারদঋষির নিকট হইতে জানিয়া পার্বতী দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ঋষিগণ মহাদেবকে তাহা নিবেদন করেন। মহাদেব জটাধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আসিয়া পার্বতীর নিকট শিবনিন্দা করিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধা হন। মহাদেব পার্বতীর ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হন। হর-পার্বতীর বিবাহ হইলে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। কার্তিকেয় দেবসেনাপতি হইয়া দশ দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর তারকাসুরকে বধ করেন।

দীপিকা ঘোষ

তারকেশ্বর (২২°৫০´ উত্তর ও ৮৮°২´ পূর্ব), হুগলি জেলার একটি থানা ও শহর, পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত শিবতীর্থ। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৫৮ কিলোমিটার (৩৬ মাইল)। কলিকাতা হইতে রেল বা মোটরযোগে তারকেশ্বরে যাওয়া যায়। ১৯৬১ সালে শহরটির জনসংখ্যা ৮১২৮ জন ছিল।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বালীগড় পরগনার অধীন জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে গ্রামের গাভীগণ একটি পাষাণখণ্ডের উপর বাঁট ঢালিত। মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপ স্বপ্নাদেশে উহা স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ বলিয়া জানিতে পারেন এবং সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া উহার সেবা করিতে থাকেন। রামনগরের রাজা ভারামল্ল এইস্থানে তারকনাথের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। আনুমানিক ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ভারামল্ল দশনামী শৈব সন্ন্যাসী তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত মায়াগিরি ধূমপানকে তারকেশ্বরে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত সম্পত্তি প্রদান করেন। সেই হইতে গিরি সম্প্রদায় তারকেশ্বরের মঠের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ধমানের মহারাজাও পরবর্তী কালে মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মোহান্তের অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ হয়। আন্দোলনের ফলে মন্দিরটি কিছু কাল সরকারি রিসিভারের তত্ত্বাবধানে ছিল।

মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি বাসুদেবমূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে। অনেকে ইঁহাকে ব্রহ্মা নামে নির্দেশ করেন। মন্দিরের মধ্যে পটাঙ্কিত দুর্গা, অন্নপূর্ণা এবং কালিকা আছেন। মন্দিরের পশ্চিমে 'দুধপুকুর সরোবর' বা 'দুধসাগর' এবং পূর্বে কালিকার মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের পার্শ্বে মুকুন্দ ঘোষের সমাধি আছে। বালীগড়ের রাজা চিন্তামণি দে নাটমণ্ডপ, বাজার ও বিভিন্ন পথ তৈয়ারি করিয়া দেন। তারকেশ্বরে নিত্যই মহোৎসব লাগিয়া আছে। শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসের গাজন উৎসবে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। শ্রাবণী মেলাও একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব।

দ্র গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পঞ্চানন চক্রবর্তী, তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথ, কলিকাতা, *The Imperial Gazetteer of India*, vol XXIII, Oxford, 1908

পঞ্চানন চক্রবর্তী

তারনাথ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম Nam gyal Pein-ts'ogs। জন্মকালে তাঁহার নাম রাখা হয় Kun dgah sNyin po (= আনন্দগর্ভ)। জোনঙ্ মঠে তিনি তারনাথ নাম গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন করেন এবং ৩১ বৎসর বয়সে উক্ত মঠের নিকটে নিজেই একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, মঠের নাম rTag brten। এই মঠে তিনি বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং বহু মূর্তি ও চৈত্য স্থাপন করেন। পরিণত বয়সে মঙ্গোলিয়াবাসীদের অনুরোধে মঙ্গোলিয়ায় গমন করেন এবং সেখানে চীন সম্রাটের আনুকূল্যে কয়েকটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তারনাথ মঙ্গোলিয়াতেই দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পর ভক্তেরা তাঁহাকে দেবত্বমর্যাদা দেন ও তাঁহার অনুবর্তীগণকে তাঁহার অবতাররূপ বলিয়া গণ্য করার প্রথা প্রবর্তন করেন। ইঁহারা পরবর্তী কালে মঙ্গোলিয়ার খালখা প্রদেশে উর্গা নামক স্থানে গ্র্যাণ্ড লামা বলিয়া পরিচিত।

৩৪ বৎসর বয়সে (১৬০৮ খ্রী) তারনাথ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস' সমাপ্ত করেন।

অমিতা মজুমদার

'বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস' গ্রন্থে তিনি অজাতশত্রু হইতে সেনরাজাদের কাল পর্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ইতিহাসে এই বইটি সুবিখ্যাত। তারনাথের বইয়ের অনেক দোষ আছে। তাঁহার ইতিহাস ও কালক্রম (Chronology) অনেকাংশে কল্পনাপ্রসূত বা উদ্ভট। তিনি অশোকের বংশে চার জন রাজার নাম

করিয়াছেন, যথা বিগতাশোক, বীরসেন, নন্দ ও মহাপদ্ম, চন্দ্রগুপ্ত এবং বিন্দুসারকে অশোকের পরে বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অলৌকিক ঘটনায় অত্যধিক বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এইসব দোষ সত্ত্বেও তাঁহার ইতিহাস হইতে আমরা প্রধানতঃ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারি। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকগণ সম্বন্ধে তাহার মতবাদ ও বিধানসমূহের (Institutions) উল্লেখ করিয়াছেন। প্রচারকগণ কোন রাজার সময়ে ছিলেন বলায় তাঁহাদের কালনিরূপণ কিয়দংশে সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার বই হইতে আমরা ইতিহাসের অংশ-বিশেষ উদ্ধার করিতে পারি, যেমন ভঙ্গল (Bhangal) রাজগণের বংশ-পরম্পরা, পালরাজা গোপালের পুণ্ড্রবর্ধনের নিকট জন্ম (দ্রষ্টব্য, সন্ধ্যাকর নন্দীর মতে বরেন্দ্রী পালরাজগণের "জনকভূঃ"), পালরাজ্যের বিখ্যাত শিল্পী ধীমান ও বীটপালের নাম, "বর্ণাশ্রমী হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনও সামাজিক পার্থক্য ছিল না" ইত্যাদি। বাটি, ভঙ্গল প্রভৃতির ভৌগোলিক বিবরণ আমাদের ভৌগোলিক তত্ত্ব-নির্ণয়ে সাহায্য করে।

দ্র নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, L. A. Waddel, *The Buddism of Tibet or Lamaism*, London, 1895; *Taranatha, Geschichte des Buddhismus in Indien*, A Schiefner, tr, partly translated into English by (1) U N Ghoshal and N. Dutt, *Indian Historical Quarterly*, vol. III, 1927, R. C. Majumdar, ed, *History of Bengal*; Dacca, 1943, Bhupendranath Datta, *Mystic Tales of Lama Taranath*, Calcutta, 1944

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

তারা[১] ১. দেবগুরু বৃহস্পতির রূপবতী ভার্যা। রূপমুগ্ধ চন্দ্র তারাকে অপহরণ করিলে বৃহস্পতি নিজে চন্দ্রভবনে উপস্থিত হন, চন্দ্র রূঢ় বাক্যে তাঁহাকে ও পরে ইন্দ্রদূতকে ফিরাইয়া দেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পরামর্শে তারাকে প্রত্যর্পণ করিতে চন্দ্র অসম্মত হন। দেব দানবের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রহ্মা উভয় পক্ষকে নিবৃত্ত করেন। ব্রহ্মার অনুরোধে চন্দ্র গর্ভবতী তারাকে প্রত্যর্পণ করেন। চন্দ্রের ঔরসে তাঁহার গর্ভে জাত পুত্রের নাম বুধ (দেবীভাগবত, ১।১১; হরিবংশ, ১।২৫)। এই কাহিনী আশ্রয় করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে 'সোমের প্রতি তারা' এই প্রণয়-পত্রিকা রচনা করেন।

২. সুষেণ নামক বানররাজের দুহিতা, কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালির ভার্যা, অঙ্গদের জননী। দুরূহ কর্তব্যনির্ণয়ে ও বিপদপ্রতিকারে সমর্থা তারার পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যশাসন করিবার জন্য মৃত্যুকালে বালী সুগ্রীবকে অনুরোধ করেন (রামায়ণ, ৪।২২।১১-১৩)। পতির মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের আদেশে ইনি দেবর সুগ্রীবকে বিবাহ করেন। প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চ কন্যাদের মধ্যে তারা অন্যতমা।

৩. দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা।

যূথিকা ঘোষ

তারা[২] রাত্রিতে আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখা যায় তাহাদের মধ্যে চন্দ্র ও অপর তিন-চারিটি ব্যতীত সকলেই তারা। ইহারা পরস্পরের মধ্যে সর্বদা অপরিবর্তিত অবস্থানে থাকিয়া চলে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি উজ্জ্বল বস্তু স্থান পরিবর্তন করে, তাহারা গ্রহ। সকল তারাই সূর্যের মত এক একটি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। তারাদের দূরত্বের সহিত তুলনা করিলে সূর্য আমাদের অতি নিকটে তাই সূর্যকে এত উজ্জ্বল দেখায়। বেশির ভাগ তারার আয়তন ও উজ্জ্বলতা প্রায় সূর্যেরই মত। অন্যান্যদের আয়তন সাধারণতঃ সূর্যের দশ গুণ হইতে দশাংশের মধ্যে থাকে। তবে সূর্যের শতকোটিগুণ বড় তারাও আছে আবার দশলক্ষাংশ ছোট তারাও আছে। সকল তারাই একরকম উপাদানে গঠিত। কিন্তু তাহাদের দীপ্তির পার্থক্য বহু লক্ষগুণ, ভরের পার্থক্য সহস্রগুণ এবং ঘনাঙ্কের (ডেনসিটি) পার্থক্য চারি শত কোটিগুণও হইতে পারে।

তারার সংখ্যা: আকাশে তারার সংখ্যা অগণ্য মনে হইলেও বাস্তবে কিন্তু খালি চোখে সমগ্র আকাশে পাঁচ হাজারের বেশি তারা দেখা যায় না। এক সময়ে আকাশের অর্ধাংশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও এক সময়ে আড়াই হাজারের অধিক তারা দেখিতে পায় না। দূরবীনে লক্ষ লক্ষ তারা দেখা যায়। প্রায় দশ লক্ষ তারা তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীনে দেখা যায়। বর্তমানে বৃহত্তম দূরবীন দিয়া নব্বই কোটি তারা দেখা সম্ভব।

তারামণ্ডল: তারামণ্ডল বলিতে আকাশের বিভিন্ন বিভাগ বুঝায়। সমগ্র আকাশে ৮৮টি তারামণ্ডল আছে। আকাশের এক-এক স্থানে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল তারাগুলি বিভিন্ন আকৃতিতে সজ্জিত কল্পনা করা যায়। কোনও তারামণ্ডলকে তাহার এই আকৃতির বিশেষত্ব দিয়া চিনিতে হয়। প্রত্যেক মণ্ডলের তারাগুলিকে উজ্জ্বলতার নিম্নক্রম অনুসারে গ্রীক বর্ণমালার আলফা (α), বিটা (β), গামা (γ), ডেল্টা (δ) প্রভৃতি অক্ষরের দ্বারা পরিচয় দেওয়া

হয়। গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর শেষ হইলে রোমান অক্ষর ব্যবহার করা হয়। উজ্জ্বল তারার ডাকনামও আছে, যেমন লুব্ধক, অগস্ত্য, জ্যেষ্ঠা, অভিজিৎ, রোহিণী ইত্যাদি।

দূরত্ব। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান জ্যোতিষী বেসেল (F W Bessel) সর্বপ্রথমে লম্বন (Parallax) পরিমাপ করিয়া হংসমণ্ডলের ৬১ (61 Cygni) তারার দূরত্ব নির্ণয় করেন। ঐ বৎসরেই হেণ্ডারসন (T. Henderson) এবং স্ট্রুভে (F. G. Struve) যথাক্রমে সেণ্টরাস মণ্ডলের সর্বোজ্জ্বল তারা (α Centauri) এবং অভিজিৎ (Vega) তারার দূরত্ব নির্ণয় করেন। ইহার পূর্বে তারাদের দূরত্ব-সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। খালি চোখের গোচর তারাদের মধ্যে সেণ্টরাস মণ্ডলের এই সর্বোজ্জ্বল তারাটি আমাদের নিকটতম। ইহার দূরত্ব চার আলোক-বর্ষ অর্থাৎ ইহা হইতে আমাদের নিকট আলো আসিয়া পৌঁছিতে চার বৎসর সময় লাগে। (আলোক সেকেণ্ডে ২৯৯৬০০ কিলোমিটার বা ১৮৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, সূর্য হইতে আমাদের নিকট আলো আসিতে ৮ মিনিট সময় লাগে।) লম্বন প্রক্রিয়া ৩০০ আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত প্রযোজ্য। ইহার বেশি দূরত্বনির্ণয়ে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা হয়।

তারাপ্রভা। খালি চোখের গোচর তারাগুলিকে উজ্জ্বলতা অনুসারে ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। অত্যুজ্জ্বল তারাগুলিকে বলা হয় প্রথম প্রভার এবং অতি ক্ষীণ জ্যোতিঃ তারাগুলিকে বলা হয় ষষ্ঠ প্রভার। প্রথম প্রভার তারা ষষ্ঠ প্রভার তারার প্রায় শতগুণ উজ্জ্বল। এই হিসাবে যে কোনও প্রভার তারা তাহার পরবর্তী নিম্নপ্রভার তারা অপেক্ষা ২½গুণ উজ্জ্বল। দূরবীনে দৃষ্ট তারাগুলির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রচলিত।

যুগ্মতারা। জ্যোতিষীরা দূরবীনযোগে এবং অন্য উপায়ে নির্ণয় করিয়াছেন যে তারাদের মধ্যে শতকরা পঁচিশটিই যুগ্ম। দুইটি তারা কাছাকাছি থাকিয়া পরস্পরের আকর্ষণে ঘোরে এমনও দেখা যায়।

অস্থির উজ্জ্বলতার তারা। কতকগুলি তারা আছে যাহাদের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং কমে। উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধির দুইটি কারণ আছে।

যুগ্মতারা পরস্পরের বন্ধনে থাকিয়া ঘুরিবার কালে যদি কম উজ্জ্বল তারাটি আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া বেশি উজ্জ্বল তারাটিকে আড়াল করে, তখন কয়েক ঘণ্টা যুগ্ম তারাকে কম উজ্জ্বল দেখায়।

আর একপ্রকার তারা আছে আভ্যন্তরীণ কারণে ইহাদের উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ইহারা একবার স্ফীত হয় আবার নির্দিষ্ট কাল পরে সংকুচিত হয়, এই প্রক্রিয়া অবিরাম চলিতে থাকে। উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধির পর্যায়কাল এবং প্রকৃত উজ্জ্বলতার মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমান পর্যায়কালবিশিষ্ট তারার প্রকৃত উজ্জ্বলতা সমান। কিন্তু প্রতীয়মান উজ্জ্বলতা দূরত্বের বর্গানুপাতে কমে বলিয়া ইহাদের কোনও একটি তারার প্রকৃত দূরত্ব অন্য উপায়ে জানিতে পারিলে তখন অপর সকলের দূরত্ব গণিতের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। এই শ্রেণীর তারাকে সিফাইড তারা (Cepheid variables) বলে। সিফিয়ুস মণ্ডলের ডেল্টা (δ Cephei) এই শ্রেণীর একটি প্রসিদ্ধ তারা, ইহা হইতেই তাহাদের নাম। ইহাদের পর্যায়কাল এক দিনের কিছু বেশি হইতে আরম্ভ করিয়া পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত হইয়া থাকে।

দীর্ঘ পর্যায়কালবিশিষ্ট অস্থির উজ্জ্বল এক শ্রেণীর তারা আছে। ইহাদের মধ্যে সিটাস মণ্ডলের মাইরা বা আশ্চর্য তারা প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ সময়ে ইহা খালি চোখের অগোচর থাকে, উজ্জ্বলতম অবস্থায় ইহা দ্বিতীয় প্রভার তারা।

নবতারা (Novae বা Temporary Stars). কখনও হঠাৎ একটি তারা অত্যুজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয় এবং কিছু কাল পরে ইহা নিতান্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া দৃষ্টির অগোচর হয়। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে টাইকো ব্রাহে (Tyco Brahe) এইরকম একটি তারা দেখিতে পান। ইহা দীর্ঘ ১৮ মাস দৃষ্টিগোচর ছিল— উজ্জ্বলতম অবস্থায় ইহাকে শুক্র গ্রহের অপেক্ষাও উজ্জ্বল দেখাইয়াছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হারকিউলিস মণ্ডলে একটি নবতারা দেখা গিয়াছিল। নভেম্বরের প্রথম ভাগে ইহা ১৪·৫ প্রভার তারা ছিল, কিন্তু ডিসেম্বর মাসেই ইহা ১·৫ প্রভার তারাতে পরিণত হয়, অর্থাৎ ইহার উজ্জ্বলতা ১৬০০০০গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। চার মাস পরে ইহা পূর্বেকার উজ্জ্বলতায় ফিরিয়া যায়।

একটি তারার হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে এবং তাহার বাহিরের স্তর অতি ভীষণ বেগে জ্যোতিষ্কটির অঙ্গ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। যখন কিছু কাল পরে ইহা শীতল হয় তখন জ্যোতিষ্কটির উজ্জ্বলতা পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আকাশের কোনও কোনও স্থানে কাছাকাছি অনেক তারা দেখা যায়, ইহাদের বলা হয় তারাপুঞ্জ। একটি পুঞ্জের সকল তারা একই গতিতে এক ঝাঁক পাখির মত একই অভিমুখে চলে। প্রায় চারি শত তারাপুঞ্জ আছে। গোলকাকৃতি এক শ্রেণীর তারাপুঞ্জ আছে। ইহাদের মধ্যে তারাগুলি খুব ঘনসন্নিবিষ্ট। ইহাদের কোনও কোনওটিতে এক লক্ষ বা ততোধিক তারা

বিদ্যমান। ইহাদের দূরত্ব আমাদের নিকট হইতে কুড়ি হাজার হইতে এক লক্ষ আলোকবর্ষ। শতাধিক এই শ্রেণীর গোলকাকৃতি তারাপুঞ্জ জানা যায়।

নাক্ষত্র জগৎ ও নাক্ষত্র বিশ্ব: আমরা যে নাক্ষত্র জগতে আছি সূর্য তাহারই অন্তর্গত একটি সাধারণ তারা। এই নাক্ষত্র জগতে তারার সংখ্যা দশ সহস্রকোটি হইবে। আমাদের এই নাক্ষত্র জগৎ মহাশূন্যে যে স্থান জুড়িয়া আছে তাহার আকৃতি চেপ্টা বিস্কুটের মত। দূরতম দুই প্রান্তের দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ, চওড়া দিকের দুই প্রান্তের দূরত্ব কুড়ি হাজার আলোকবর্ষ, সূর্য এখানে ছায়াপথের মাঝামাঝি স্থলে কেন্দ্র হইতে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

বিশ্বে আমাদের নাক্ষত্র জগতের মত দশ সহস্রকোটি বা তাহারও অধিক নাক্ষত্র জগৎ আছে। সন্নিহিত দুইটি নাক্ষত্র জগতের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব দশ লক্ষ আলোকবর্ষ।

দ্র কামিনীকুমার দে, তারামণ্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা, কলিকাতা, ১৩৬৭; R. L. Waterfield, *A Hundred Years of Astronomy*, London, 1938; Hubert Jay Bernhard Dorothy A Bennett and Hugh S. Rice, *New Handbook of the Heavens* New York 1948 Robert H Baker, *An Introduction to Astronomy*, New York 1952; Fred Hoyle, *Frontiers of Astronomy*, London, 1959; Irving Adler, *The Stars*: *Stepping Stones into Space* 1962

কামিনীকুমার দে

তারাকিশোর শর্মাচৌধুরী সন্তদাস বাবাজী দ্র

তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-৫৭ খ্রী) 'ইয়ং বেঙ্গল' এর অন্যতম নেতা। তারাচাঁদ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী হইতে ইংরেজী অনুবাদের জন্য রামমোহন রায়ের সহায়তায় 'ক্যালকাটা জার্নাল' এর কর্মে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদে উইলসনকে তারাচাঁদ সক্রিয় সহযোগিতা করেন। কিছু কাল ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙা স্কুলের (হেয়ার স্কুল) প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির জন্য ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি ইংরেজী-বাংলা অভিধান সংকলন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সঙ্গে তিনি মনুসংহিতার সটীক ইংরেজী অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। তারাচাঁদ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

তারাচাঁদ কিছু কাল হুগলি জেলার জাহানাবাদে (আরামবাগ) মুনসেফ ছিলেন, কিন্তু চক্রান্তের ফলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে তিনি ব্যবসায়কর্মে লিপ্ত হন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। নব্য বঙ্গের নেতা বলিয়া ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি এই দলকে ব্যঙ্গ করিয়া 'চক্রবর্তী ফ্যাকশান' নামে অভিহিত করে। তারাচাঁদ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক ইংরেজী বাংলা পত্রিকায় অন্যতম প্রধান লেখক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁহার নেতৃত্বে নব্য দল জর্জ টমসনের আনুকূল্যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলে তিনি 'কুইল' (*Quill*) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তারাচাঁদ কিছু কাল বর্ধমানের মহারাজার প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

দ্র শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৫৭; যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলিকাতা, ১৯৬৩; Bimanbehari Majumdar, *History of Political Thought from Rammohun to Dayananda (1821-84)*, Calcutta, 1934

যোগেশচন্দ্র বাগল

তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬-৮৫ খ্রী)। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। তারানাথ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। 'বাচস্পত্য' (১৮৭৩-৮৪ খ্রী) ও 'শব্দস্তোমমহানিধি' (১৮৬৯-৭০ খ্রী) নামক অভিধান তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিতকুলপতি তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত, কলিকাতা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

যোগেশচন্দ্র বাগল

তারাপীঠ পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত অন্যতম পীঠস্থান। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের লুপ লাইনে কলিকাতা হইতে ২১৪ কিলোমিটার (১৩৩ মাইল) দূরে রামপুরহাট

স্টেশন ও মহকুমা শহর। ইহারই ঈশানকোণে প্রায় ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরে চণ্ডীপুর গ্রামে দ্বারকা নদীর পূর্ব তীরে তারাদেবীর মন্দির ও প্রাচীন আশ্রম তারাপীঠ অবস্থিত। অধুনা রামপুরহাট পৌঁছিবার পূর্বেই তারাপীঠ রোড নামে স্টেশন স্থাপিত হইয়াছে।

ইহা একটি প্রসিদ্ধ শাক্ততীর্থ। আনুমানিক ৭ম-৮ম খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা তারা-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

এই স্থানটি বহু দিন অপ্রচারিত ছিল। কথিত হয় জয়দত্ত সওদাগর এই পীঠস্থানের সংস্কার করেন। তারাপীঠের মন্দিরটি নাটোরের মহারানী কর্তৃক নির্মিত। উত্তর কালে এই পীঠটি সাধক বামাখ্যাপার নামের সহিত সংযুক্ত হয়। বামাখ্যাপার মাহাত্ম্যে এই স্থানটির খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সম্প্রতি এখানে বামা মিশন কর্তৃক বামাখ্যাপার মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এখানকার শ্মশান প্রসিদ্ধ; প্রতিদিন অন্ততঃ একটি কবিয়া মড়া এই শ্মশানভূমি স্পর্শ না করিলে মায়ের পূজা হয় না বলিয়া প্রবাদ আছে। আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে মহাপূজা হয় ও একটি মেলা বসিয়া থাকে।

দ্র বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, শবামলীলা, হুগলি, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ; L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Birbhum*, Calcutta, 1910.

শুভেন্দুগোপাল বাগচী

তারাপুরওয়ালা, আইরাচ জাহাঙ্গীর সোরাবজী (১৮৮৪-১৯৫৬ খ্রী) ভারতের একজন অগ্রগণ্য ভাষা-তাত্ত্বিক ও বহুভাষাবিদ্। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুলাই দাক্ষিণাত্য-হায়দরাবাদে ইহার জন্ম। ইংরেজী ও সংস্কৃতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট হইয়া (১৯০৩ খ্রী) বিলাত যান ও ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন (১৯০৯ খ্রী)। পরে আবার কেমব্রিজের বি. এ. (১৯১১ খ্রী) ও ভুর্ৎসবুর্গ (Wurzburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (১৯১৩ খ্রী) হইয়া আসেন। সংস্কৃতে ই. র‍্যাপসন ও যুলিউস যোলি, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে পি. জাইল্‌স, আরবীতে নিকল্‌সন, পারসীক শিক্ষায় ই. জি. ব্রাউন এবং আবেস্তায় বার্থলোমে তাঁহার গুরু ছিলেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৯১৭ খ্রী)। এখান হইতে বিশ্বভারতীতে ইরানীয় বিদ্যার আমন্ত্রিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৯২৭-২৯ খ্রী)। অতঃপর অন্ধেরীতে এম. এফ. কামা আথরন্ ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯৩০-৪০ খ্রী)। সেখান হইতে পুনার ডেকান কলেজের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তেহ্‌রান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভারততত্ত্বের অধ্যাপক হইয়া যান, কিন্তু কিছু দিন পরেই অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। বোম্বাইয়ে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

তাঁহার বক্তৃতামালা ও গ্রন্থগুলিতে ভাষাতত্ত্ব ও তাহার বিভিন্ন দিক, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসীক লেখমালা, জরথুশত্র ধর্ম ও ভারতীয় পার্শীদের ইতিহাস ও গুজরাতী সাহিত্যসম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ সুললিত আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী: *Selections from Avesta*, *Elements of the Science of Language* এবং *The Gathas of Zarathustra*।

দ্র *Indian Linguistics : Taraporewala Memorial Volume*, vol. 17, June, 1957.

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

তারাবাঈ (১৬৭৫-১৭৬১ খ্রী) তারাবাঈ শিবাজীর সৈন্যাধ্যক্ষ হাম্বির রাও-এর কন্যা। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয় এবং আট বৎসর বয়সে শিবাজীর পুত্র রাজারামের সহিত বিবাহ হয়। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার একটি পুত্র জন্মে, ইনি তৃতীয় শিবাজী।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে তারাবাঈ-এর স্বামীবিয়োগ হয়। তখন মারাঠা রাষ্ট্র ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ, এক দিকে অন্তর্বিবাদ, অন্য দিকে ঔরঙ্গজেব ইহাকে গ্রাস করিতে ব্যগ্র। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তারাবাঈ তাঁহার পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে সমর্থ হন এবং সাত বৎসর কাল স্বয়ং রাষ্ট্রের শাসনকার্য এবং মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও লুটপাট দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে থাকেন। তারাবাঈ-এর প্রতিরোধের ফলেই ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পরিকল্পনা সফল হয় নাই।

তিনি প্রখর বুদ্ধি, অসীম ধৈর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রণনীতি ও কূটনীতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিপুণ; কিন্তু তিনি অতিরিক্ত ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন। সিংহাসনে শম্ভুজীর পুত্র শাহুর ন্যায্য অধিকারে তারাবাঈ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। অন্তর্বিবাদের ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন, কিন্তু তাহার পরেও রাষ্ট্রের উপর তাঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

তারা মাছ স্টার্‌ফিশ। কণ্টকত্বক গোষ্ঠীর (ফাইলাম একিনোডের্মাটা, Phylum-Echinodermata) অন্তর্গত সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। দেহ নক্ষত্রাকৃতি, দেহের মধ্য ভাগ হইতে পাঁচটি বাহু নক্ষত্রাকারে প্রসারিত। দেহ ছোট ছোট শক্ত খোলার দ্বারা আবৃত। দেহের মধ্য ভাগের নিম্নদেশে মুখ, ইহার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে পায়ুছিদ্র এবং তাহার অল্প দূরে একটি বহুছিদ্রযুক্ত চাকতি অবস্থিত। প্রতিটি বাহুর নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলপদ সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। নলপদগুলি দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিচিত্র জলবাহী নলের সহিত সংযুক্ত। নলপদগুলির সাহায্যে তারা মাছ চলাফেরা করিতে পারে এবং ঝিনুক ও শামুক শিকার করে। কণ্টকত্বক প্রাণীদের মধ্যে তারা মাছ সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ও দক্ষ শিকারীরূপে পরিচিত। সামুদ্রিক প্রাণী হইলেও সন্তরণের পরিবর্তে ইহারা সমুদ্রের তলদেশে বিচরণ করে। ইহাদের ডিম হইতে যে শূককীট বাহির হয় তাহার কিন্তু সন্তরণক্ষমতা থাকে। পুনর্জীবনক্ষমতা তারা মাছের বৈশিষ্ট্য। দেহচ্যুত একটি বাহু হইতেই দেহের মধ্য ভাগ ও অবশিষ্ট চারিটি বাহুর পুনর্জন্ম হইতে পারে। 'কণ্টকত্বক প্রাণী' দ্র।

বঙ্কুবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়

তারাসুন্দরী ১৮৯৭ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গ রঙ্গালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তারাসুন্দরী বালিকা-বয়সেই রঙ্গালয়ের সংস্রবে আসেন এবং প্রথমে বালকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে থাকেন। এই ভূমিকাগুলির মধ্যে 'প্রফুল্ল' নাটকে যাদবের ভূমিকা (১৮৮৯ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতলাল মিত্রের শিক্ষকতায় তিনি 'চন্দ্রশেখর' নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয়কৃতিত্ব দেখান। বিভিন্ন রঙ্গালয়ে প্রধান স্ত্রী-ভূমিকায় বহু দিন তিনি সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করেন। ইহার মধ্যে মতিবিবি (১৯০১ খ্রী), রিজিয়া (১৯০২ খ্রী), সরস্বতী (১৯০৫ খ্রী), আয়েষা (১৯০৬ খ্রী), চাঁদবিবি (১৯০৭ খ্রী), বিরজা (১৯১২ খ্রী), মনোয়ারা বেগম (১৯২১ খ্রী) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি জনা (১৯২৪ খ্রী), উড়িষ্যা (১৯২৫ খ্রী) এবং শকুন্তলা (১৯২৬ খ্রী) প্রভৃতি ভূমিকায়ও অভিনয় করিয়াছিলেন।

দ্র উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী, কলিকাতা, ১৯১৯।

প্রভাতকুমার দাস

তারিণীচরণ মিত্র আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তারিণীচরণ মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার পরিবার সম্ভবতঃ কলিকাতার সিমলা অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তারিণীচরণ বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষা জানিতেন এবং হিন্দী ও উর্দুতে কয়েকটি মূল ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে জন গিল্‌ক্রাইস্টের অধীনে তিনি মাসিক একশত টাকা বেতনে উহার হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুনশীপদে নিযুক্ত হন। পরে দুই শত টাকা বেতনে প্রধান মুনশীরূপে তাঁহার পদোন্নতি হইয়াছিল। গিল্‌ক্রাইস্টের পরিচালনায় 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' এবং 'নীতিকথা' এই দুইখানি অনুবাদ পুস্তকের সহিত তারিণীচরণের নাম যুক্ত আছে। তাঁহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আটান্ন বৎসর বয়সে তিনি একশত টাকার পেনসনে অবসর গ্রহণ করেন। ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটির (প্রতিষ্ঠা ১৮১৭ খ্রী) তিনি অন্যতম পরিচালক সদস্য এবং উহার বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের বাংলা ও হিন্দুস্থানী প্রধান ব্যক্তিদের সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র তিনি সভ্য ছিলেন। এই সভা সতীদাহনিবারণ আইনের বিরোধিতা করে। তারিণীচরণের মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই।

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

তাল পাল্‌মী গোত্রের (Family-Palmae) অন্তর্ভুক্ত একবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম বোরাসসস ফ্লাবেলিফের (*Borassus flabellifer*)। সুউচ্চ সরল শাখাহীন কাণ্ডের শীর্ষদেশ হইতে মূল গুচ্ছাকারে মাটিতে নামিয়া যায়। কাণ্ডের শীর্ষদেশে করতলাকার পত্র দেখা যায়, পত্রের বৃন্ত মোটা এবং ৬০-১২০ সেণ্টিমিটার লম্বা। পুষ্পবিন্যাস পুং বৃক্ষে শাখান্বিত, কিন্তু স্ত্রী বৃক্ষে সরল। ফুল ক্ষুদ্র, ফল বৃহৎ ও ত্রিকোণাকার। কাণ্ড হইতে থাম, ছাতার বাঁট, ছড়ি প্রভৃতি, পাতা হইতে হাতপাখা, চাটাই, ব্যাগ ইত্যাদি এবং পত্রবৃন্ত ও কাণ্ড হইতে উৎপন্ন তন্তুর দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করা হয়। পুং-বৃক্ষের রস হইতে তাল গুড়, তাল-মিছরি এবং মদ্য তৈয়ারি করা হয়। কাঁচা ফল বা তালশাঁস এবং সুপক্ক তালের রস খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়। গাছের শীর্ষদেশে সাগুর ন্যায় একপ্রকার বস্তু আছে, ইহা অজীর্ণতায় উপকারী।

দ্র A. F. Hill, *Economic Botany*, New York, 1952.

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

কোনও কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তালের ব্যবহার দেখা যায়। ভাদ্র মাসের শুক্লা নবমীতে তালনবমী ব্রতের ব্যবস্থা আছে। এই ব্রতের প্রধান উপকরণ তাল। ইহাতে তালের উপরেই পূজা করা লৌকিক ব্যবহার। এই ব্রত উপলক্ষে দেবতাকে তাল ও তালের পিঠা দেওয়া হয় এবং ব্রাহ্মণকে তাল দান করা হয়। জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব উপলক্ষে তালের বড়া খাওয়ার রীতি আছে। ভাদ্র মাসে দেবতাকে তাল দেওয়ার নিয়ম আছে, অথচ এই সময়ে তাল খাওয়া অনেকে বৈধ বলিয়া বিবেচনা করেন না। 'চাতুর্মাস্য' দ্র।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

তাল, লয় প্রতিষ্ঠার্থক 'তল্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' করিয়া তাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। লঘু গুরু, প্লুত প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা পরিমিত কাল গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে নিয়মিত করে এবং তাহাকেই ব্যাপকভাবে তাল বলা হয়। বিশ্রান্তি বা বিরতিযুক্ত সশব্দ বা নিঃশব্দ ক্রিয়া দ্বারা তালের মান নির্দিষ্ট হয়। সীমায়িত অর্থে মাত্রা পর্ববিশিষ্ট আনদ্ধ যন্ত্রে বাদনোপযোগী বাণী দ্বারা রচিত ছন্দকেও তাল বলা হয়। এই রচনার বৈচিত্র্যে বিভিন্ন তালের সৃষ্টি হইয়াছে, যথা – একতাল, ত্রিতাল, চৌতাল ইত্যাদি। বিভিন্ন তালের মাত্রা, সংখ্যা ও লয়ের ব্যবহারের তারতম্যে বিভিন্ন ছন্দোবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ত্রিতালের কোনও ছন্দোবৈচিত্র্য না থাকায় সরল হইয়াছে সুতরাং ত্রিতালকেই আদর্শ বিবেচনা করিয়া অন্যান্য তালের ছন্দোবৈচিত্র্য সুপরিস্ফুট হয়, এইজন্য ত্রিতালকেই মুখ্য তাল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। প্রত্যেক তালেই একটি প্রধান প্রস্বন-স্থান আছে তাহাকে 'সম' বলা হয়, 'সমে'র বিপরীত ধর্মী প্রস্বনহীন স্থানকে 'বিষম' বলা হয়, সমের পূর্ববর্তী স্থানকে অনাগত এবং পরবর্তী স্থানকে অতীত বলা হয়। তাল কয়েকটি নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্রার সমষ্টি, এই মাত্রাগুলি পরস্পর সমান কালের ব্যবধানে অবস্থিত। যে কোনও দুইটি মাত্রার মধ্যবর্তী 'কাল'কেই 'লয়' বলা হয়।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

তালাক আরবী শব্দ। মুসলমান আইন অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম পন্থা। স্বামী নিজে বিবাহ-সম্বন্ধ ভঙ্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। দুই প্রকার 'তালাক' উল্লেখযোগ্য: ১. তালাকুস-সুন্নাত ২. তালাকুল বিদ্'আৎ অথবা তালাকুল-বাদাই। হজরত মহম্মদ বা তাঁহার শিষ্যদের নীতি অনুযায়ী তালাককে তালাকুস সুন্নাত বলা হয়। তালাকুস-সুন্নাত দুই পদ্ধতিতে সম্ভব – আহসান ও হাসান। 'আহসান' মতে, স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা একবার স্ত্রীর মাসিক ঋতুমুক্ত অবস্থায় প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু পরবর্তী তিনটি ঋতুমুক্ত অবস্থায় যৌনসম্বন্ধ রাখা চলিবে না। 'হাসান' অনুযায়ী, একবার করিয়া স্ত্রীর পর পর তিনটি ঋতুমুক্ত অবস্থায় তিনবার বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। তালাকুল বিদ্'আৎ বা বাদাই অনুসারে স্ত্রীর একটি ঋতুমুক্ত অবস্থায় স্বামীকে তিনবার 'আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম' অথবা একবার 'আমি চির-কালের জন্য বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ করিলাম' বলিতে হয়।

এস এ মাসুদ

তাশিলামা তিব্বতের দুই প্রধান লামার অন্যতম পাঞ্চেন লামারই আর এক নাম। 'পাঞ্চেন লামা' দ্র।

নিম চন্দ্র সিংহ

তাস্সো (১৫৪৪-৯৫ খ্রী) ইটালীর নেপল্স-এর নিকটবর্তী সোরেন্টো শহরের এক সম্ভ্রান্ত বংশে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ জন্ম। পিতা বেরনার্ডো-র (Bernardo Tasso) কবি হিসাবে সুনাম ছিল। তাস্সো ১৮ বৎসর বয়সে 'রিনাল্ডো' (*Rinaldo*) এপিক রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাসসোর জীবনের অধিকাংশ সময় ফেরারায় অতিবাহিত হয়। তিনি সেখানকার রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দুইটি প্রধান রচনা 'আমিনতা' (*Aminta*), 'পাস্টোরাল' (*Pastoral* নাটক, রচনাকাল ১৫৭৩ খ্রী) ও এপিক গ্রন্থ 'জেরুসালেমের মুক্তি' (*Gerusalemme Liberata*, রচনাকাল ১৫৭৫ খ্রী, প্রথম প্রকাশ ১৫৮১ খ্রী, সংশোধিত প্রকাশন ১৫৯২ খ্রী)। এই দুইটি গ্রন্থ, বিশেষতঃ দ্বিতীয়টি ইওরোপীয় সাহিত্যের ধ্রুপদী গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থই সমগ্র ইটালী ও ক্রমে ইওরোপে তাঁহার নাম প্রতিষ্ঠিত করে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইতে থাকে, ১৫৭৯-৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফেরারার ডিউক চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে উন্মাদাগারে রাখেন। উন্মাদাগার হইতে বাহির হইয়া ইটালীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে পোপের আমন্ত্রণে

রোমে আসেন। পোপ পেনসনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। মাতার সম্পত্তিরও কিছু উদ্ধার হয়, কিন্তু তখন ভগ্নস্বাস্থ্য কবির শেষ অবস্থা। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি সেন্ট অনোফিও কনভেন্ট-এ প্রবেশ করেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল ইটালী তথা ইওরোপের এক শ্রেষ্ঠ কবির মৃত্যু হয়।

তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *Gerusalemme Liberata* বা 'জেরুসালেমের মুক্তি' নামক মহাকাব্য ভার্জিল ও আরিস্তোর রচনার ছকে লিখিত এবং ক্ল্যাসিক্যাল ও রোম্যান্টিক রীতির সার্থক সংমিশ্রণ। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেড) যোদ্ধৃগণ কর্তৃক জেরুসালেমের অধিকার বর্ণনা করেন। কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু অবিশ্বাসীদের উপর খ্রীষ্টানদের জয়। এই ভিত্তিতে নানাবিধ রোম্যান্টিক ও বীরত্বব্যঞ্জক (শিভালরিক) কাহিনীতে তাহার আবেগপূর্ণ ভাবধারার সম্যক প্রকাশ হইয়াছে। ফেরারার রাজসভাতে অবস্থানফলে তাঁহার লেখাগুলি রাজসভার জাঁকজমক ও আড়ম্বর এবং বীরত্বের গাথায় পূর্ণ। ফলতঃ তিনি অন্তরে অন্তরে রাজকীয় ও মধ্যযুগীয় বীরত্ব এবং প্রেমগাথা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁহার কল্পনাতে তিনি ভগবান ও দেবদূতদের, প্রাচীন কালে দেবগণের ন্যায় মানবজাতির বিভিন্ন ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করাইয়াছেন এবং অবিশ্বাসীরা যে অপদেবতাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত— ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

[illegible]

তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রী) চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি পেশাদার পালোয়ান ছিলেন ও পরে লাঠিয়াল হন। এই সময়ে দাঙ্গায় লিপ্ত হওয়াতে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি মক্কায় যান ও তথায় ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য হন। মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ওয়াহাবি ধর্মমত অনুসারে ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য প্রচার করিতে লাগিলেন। দরিদ্র কৃষকদিগের রক্ষার জন্য জমিদারগণের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। ক্রমে হায়দরপুরের নিকটবর্তী নারিকেলবেড়িয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ ক্রোশ ব্যাপিয়া তাঁতি ও কৃষকদের মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। এই সময়ে মিস্কিন শাহ্ নামক একজন ফকির তাঁহার সহিত যোগ দেওয়ায় তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি হয়। ইহার পর পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ি আক্রমণ করিয়া তিতুমীর ব্যর্থমনোরথ হন। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ও টাকি ও গোবরডাঙার জমিদারের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইলেন। তাহারা কর দেন নাই। গোবরডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির কুঠিয়াল ডেভিস সাহেব তিতুমীরকে দমন করিতে আসিয়া পরাজিত হইলেন। ইহার পরে গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় তিতুমীরের সহিত সংঘর্ষে নিহত হন। পুনরায় তাহাকে দমন করিবার জন্য আসিয়া বারাসতের কালেক্টর আলেকজাণ্ডার পরাজিত হন ও বসিরহাটের দারোগা নিহত হন। এই জয়ের ফলে তিতুমীরের সাহস বাড়িয়া গেল। তাঁহার দলও বাড়িতে লাগিল। তিতুমীর ইতিপূর্বে নিজেকে 'বাদশাহ্' বলিয়া ঘোষণা করেন, নারিকেলবেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করিয়া তথায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন ও তাঁহার ভাগিনেয় মাসুম খাঁ তাঁহার সেনাপতি হন। গর্বিত তিতুমীর চতুর্দিক লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। পুনরায় তাঁহার সহিত সংঘর্ষে নদিয়ার কালেক্টর পরাজিত হন। এইসব খবর কলিকাতায় পৌঁছিলে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল বেণ্টিঙ্কের আদেশে কামান এবং গোরা ও সিপাহী সৈন্য লইয়া একজন কর্নেল তিতুমীরকে দমন করিবার জন্য আসিলেন। গোলার আঘাতে নারিকেলবেড়িয়ার কেল্লা ধ্বংস হইল ও তিতুমীর নিহত হইলেন এবং ৩৫০ জন বন্দী হইল (১৮৩১ খ্রী)। বিচারে ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয় ও তিতুমীরের ভাগিনেয় মাসুমের ফাঁসি হয়। এইভাবে তিতুমীরের বিদ্রোহের অবসান হইল। তিতুমীরের এই 'হাঙ্গামা'কে ব্রিটিশ ভারতে গণবিক্ষোভের নিদর্শন বলা হইয়াছে।

দ্র বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর, কলিকাতা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

[illegible]

তিথি চান্দ্র দিন। ইহা চান্দ্র মাসের ত্রিংশাংশ। এক অমাবস্যা হইতে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত সময় এক চান্দ্র মাস। তারাদের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র অবস্থান পরিবর্তন করে। সূর্য ধীর গতিতে এবং চন্দ্র দ্রুত গতিতে তারাদের মধ্যে ভ্রমণ করে। সূর্য ও চন্দ্র খ-গোলকে এক অবস্থানে যখন আসে তখন চান্দ্র মাসের আরম্ভ হয়। দুইটি জ্যোতিষ্ক এক অবস্থানে আছে বলিতে বোঝায় তাহারা একই দৃষ্টিরেখার উপর অবস্থিত। সূর্য হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের প্রত্যেক দ্বাদশ অংশ অতিক্রমের সময়কে

এক তিথি বলে। তারাদের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য সমগতিতে চলে না। তাই তিথিগুলির কাল পরিমাণ সমান নয়। প্রায় পনর দিন পরে উভয়ের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য দাড়ায় ১৮০° অংশ। চন্দ্র ও সূর্য তখন তারাদের মধ্যে (রাশিচক্রে) বিপরীত দিকে অবস্থান করে, এই দিন পূর্ণিমা। এই ১৮০° অংশ অতিক্রম করিতে আমরা পনরটি তিথি পাই। তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে প্রতিপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা। এই পনর দিন শুক্লপক্ষ, ইহাতে চন্দ্র বাড়িতে থাকে ও এক-এক কলা পূর্ণ হইয়া পূর্ণিমার দিন ১৬ কলা পূর্ণ চন্দ্র দর্শন দেয়। ইহার পর চন্দ্র হ্রাস পাইতে থাকে। পুনরায় প্রত্যেক দ্বাদশ অংশ অতিক্রমণের সময় কৃষ্ণপক্ষের পনর তিথি। প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বের মত দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদিক্রমে কৃষ্ণা চতুর্দশীর পরের তিথি অমাবস্যা।

চন্দ্র গোলকাকৃতি জড়পিণ্ড, ইহার নিজের কোনও আলো নাই। চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখায়। অমাবস্যার সময়ে চন্দ্রের আলোকিত অর্ধাংশ পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে, তাই আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রপৃষ্ঠের আলোকিত অর্ধাংশ পৃথিবীর দিকে থাকে, সেইজন্য চন্দ্রকে পূর্ণ গোলাকার দেখায়। অন্য সময়ে চন্দ্রের অবস্থান অনুযায়ী তাহার আলোকিত অর্ধাংশের পৃথিবী হইতে দৃষ্ট অংশের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ইহাই চন্দ্রকলার বৃদ্ধি বা হ্রাস।

দ্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, নব্যস্মৃতি।

নলিনীকুমার বসু

তিব্বত প্রায় ২৭°-৩৭° উত্তর এবং ৭৮°২৫′-১০০° পূর্ব। পৃথিবীর ছাদ নামে খ্যাত এশিয়ার একটি সুউচ্চ মালভূমি। বর্তমানে ইহা কমিউনিস্ট চীনের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাকে কিন্নর খণ্ড নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিব্বতের প্রাচীন নাম বোদ।

তিব্বত নামটি অনেকে মনে করেন, স্তোদ বোদ অর্থাৎ উচ্চ ভোট শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন ভারতে তিব্বতকে ভোট দেশ বলা হইত।

তিব্বতের আয়তন প্রায় ১২৫০০০০ বর্গ কিলোমিটার (৫০০০০০ বর্গ মাইল)।

তিব্বতের উত্তর সীমানা কুয়েনলুং ও দক্ষিণে হিমালয় পর্বত, পূর্ব সীমানা চীনের সি কিয়াঙ দেশের পর্বত, পশ্চিমে কাশ্মীর ও কারাকোরাম শৈলমালা। তিব্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৬০০-৪৮০০ মিটারের (১২০০০-১৬০০০ ফুট) মধ্যে। এখানে কোনও নিম্ন সমভূমি নাই। সমগ্র দেশকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। উত্তরে বিশাল তুষারাবৃত মালভূমি, পশ্চিম ও দক্ষিণে কারাকোরাম ও হিমালয়ের অরণ্যপূর্ণ পাদদেশ, দক্ষিণ পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের নদী উপত্যকা এবং উত্তর-পূর্বে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পর্বতে সমাকীর্ণ ও গভীর নদীখাতে পূর্ণ অঞ্চল।

সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র, সালউইন, মেকং, ইয়াংসি কিয়াং ও হোয়াংহো প্রভৃতি এশিয়ার বহু বৃহৎ নদীর এবং গঙ্গার বহু উপনদীর উৎসস্থল তিব্বত। মানস সরোবর ও নিকটবর্তী রাক্ষসতাল তিব্বতের বিখ্যাত পবিত্র হ্রদ। ইহা ছাড়া কোকোনর, তেংরি নর প্রভৃতি বহু হ্রদ দেখা যায়। ইহা বহু সুউচ্চ পর্বতের কেন্দ্র।

তিব্বতের জলবায়ু অত্যন্ত তীব্র। বৃষ্টিপাত খুবই কম। দক্ষিণ পূর্বে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ২০০ মিলিমিটার (৮ ইঞ্চি)। ৩০০-৩৫০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত বিশেষ কোথাও হয় না।

তিব্বতে উচ্চ স্থানগুলি সাধারণতঃ বৃক্ষশূন্য। দক্ষিণ অঞ্চল নানারূপ বনজ সম্পদে পূর্ণ। পাইন জাতীয় গাছ ছাড়া ল্যারিয়া প্রভৃতি অন্যান্য বৃক্ষও প্রচুর দেখা যায়। নিম্ন বা উচ্চস্থানে বহু প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ জন্মায়।

কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে বার্লি, গম, মটর প্রভৃতি নদী-উপত্যকাগুলিতে উৎপন্ন করা হয়। খাম (পূর্ব তিব্বত) অঞ্চলে গম, মটর ছাড়া ভুট্টাও উৎপন্ন হয়।

গৃহপালিত পশু তিব্বতীদের ব্যবসায় ও ধন-সম্পদের মূল। চমরী গাই, ভেড়া, ছাগল, শৃগাল প্রভৃতির পশম, লোম ও চামড়া বহু শতাব্দী হইতে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে রপ্তানি হইয়া আসিতেছে। অতীতে স্বর্ণ, লবণ ও সোহাগা-ও রপ্তানি করা হইত। পশ্চিমের হ্রদ অঞ্চলে স্বর্ণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পশ্চিমের জালুং-এর খনি উল্লেখযোগ্য। অতীতে দেশীয় প্রথায় লৌহ নিষ্কাশন করা হইত। বর্তমানে উত্তর তিব্বতে নানা গুরুত্বপূর্ণ ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। চা, তামাক, চিনি ও রেশম পূর্বে প্রধান আমদানি সামগ্রী ছিল।

তিব্বতীরা মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত মধ্য এশিয়ার তুর্কি-মঙ্গোলীয় ও দক্ষিণ অধিবাসীদের তিব্বতীয় বর্মীদের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য বেশি।

পশুপালন তিব্বতীদের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসায়ের সূত্রে বহু প্রাচীন যুগ হইতে ইহারা পার্শ্ববর্তী দেশগুলির

সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের জনসংখ্যা ১২৭৩৯৬৯ জন ছিল।

নির্মলচন্দ্র সিংহ

তিব্বতের অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে একজন ভারতীয়ই সর্বপ্রথমে তিব্বতে রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজবংশের পতনের পর তিব্বত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। তাহার পর খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩০ অব্দে নাম্‌-রি স্রং-সান পো এই ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি একত্র করিয়া এক অখণ্ড তিব্বত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরবর্তী হাজার বছরের ইতিহাসে কোনো বিশেষত্ব নাই। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিব্বতের রাজা লুং-সান-সো নংৎসান নানা দেশ জয় করিয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং তাহার সমধিক বিখ্যাত পুত্র স্রোং বত্‌সন সগম পো চীন ও ভারতবর্ষের কতকাংশ অধিকার করেন। ভারতে তিব্বতের প্রভুত্বের কোনও স্থায়ী ফল হয় নাই, কিন্তু চীনের সহিত প্রায় দুই শত বৎসর তিব্বতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং তিব্বতীরা চীনাদের বহুবার হারাইয়া দেয় এবং অনেক প্রদেশ জয় করিয়া লয়। অবশেষে ১৩শ শতাব্দীতে মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খাঁ তিব্বত জয় করেন, কিন্তু কুবলাইয়ের মৃত্যুর ৭৫ বৎসর পরেই তিব্বত হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে।

পূর্বোল্লিখিত সম্রাট স্রোং বত্‌সন-সগম পো একটি চীনা ও একটি নেপালী রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। দুই রাজকুমারীই নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাবে স্রোং-বত্‌সন সগম-পো বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং পণ্ডিত পাঠাইয়া ভারতীয় লিপির অনুরূপ এক লিপি প্রস্তুত করাইয়া তিব্বতে প্রচার করেন। ইহার পূর্বে তিব্বতীয়রা লিখিতে জানিত না।

খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে গৌড়দেশীয় আচার্য এবং নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শান্তিরক্ষিত (অথবা শান্তরক্ষিত) তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে দুইবার সে দেশে যান এবং বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন। তাঁহার ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভবও তিব্বতে গিয়া ঐ কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন। তিব্বতের রাজা মগধের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে রাজধানী লাসায় একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং শান্তিরক্ষিতকে তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। শান্তিরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব তিব্বতের বিখ্যাত লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন।

পূজনীয়ার্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত 'উত্তর' শব্দের তিব্বতীয় ভাষায় প্রতিশব্দ 'লামা'। মঠের কর্তাকে লামা বলা হয়। তিব্বতে লামা প্রভুত্বকে তিনটি যুগে ভাগ করা হইয়াছে: ১. আদিম ২. মধ্য ও ৩. আধুনিক। দলাই লামার অভ্যুদয়ের সময় হইতে আধুনিক যুগের আরম্ভ। এই তিন যুগের ইতিহাস দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অতীশদীপংকর তিব্বতে আসেন এবং ধর্মের বিশেষ সংস্কার করেন। ইহার পর ১৩শ শতাব্দীতে কুবলাই খাঁ চীন জয় করিলে লামাদের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। কুবলাই কুনফুশিয়ান, ক্রিশ্চান, মুসলমান ও বৌদ্ধ আচার্যদের (তিব্বতের শাক্য লামা) নিজ সভায় আহ্বান করিয়া পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলে তিনি স্থির করেন যে তাহার সাম্রাজ্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্মই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, এবং উক্ত কার্যে তিনি লামাদের উপর নির্ভর করেন। কথিত হইয়াছে যে সম্রাট শার্লামান যেমন প্রথম ক্রিশ্চান পোপ সৃষ্টি করেন কুবলাই সেইরকম শাক্য লামাকে প্রধান আচার্য বা লামার পদে বরণ করেন, শাক্য লামা চীন সম্রাটকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সম্মত হইলেন এবং পরিবর্তে সমগ্র তিব্বতের শাসনভার পাইলেন, পরবর্তী কালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের দরুন শাক্য লামার প্রতিপত্তি কমিয়া যায় এবং ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গে-লুগ-পা সম্প্রদায় বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। ইহারাই অবতারবাদ প্রচার করে। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে গে লুগ পার পঞ্চম লামার অনুরোধে মঙ্গোল রাজকুমার গুশি খাঁ তিব্বত জয় করেন এবং উক্ত লামাকে তিব্বত উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন ও তাহাকে 'দলাই' (সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের ন্যায় বিশাল) উপাধি প্রদান করেন। এইভাবে দলাই লামার তিব্বতে প্রভুত্বের আরম্ভ হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনা আক্রমণে ভারতে পলাইয়া আসার পূর্ব পর্যন্ত দলাই লামার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

চীনের সহিত তিব্বতের সম্পর্ক বিষয়ে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে কমিউনিস্ট চীন তিব্বতকে চীনের প্রদেশ বলিয়া দাবি করিতেছেন। ইতিহাস এই দাবি ঠিক সমর্থন করে না। মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খাঁ কর্তৃক তিব্বতবিজয়ের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, কুবলাই মঙ্গোল ছিলেন, চীনা নহে, তিনি শাক্য লামাকে রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত করেন। মঙ্গোলগণ কুবলাইয়ের মৃত্যুর ৭৫ বৎসর পর তিব্বত হইতে বিতাড়িত হয়। অতঃপর ১৭শ শতাব্দীতে মাঞ্চু জাতি

চীন দখল করে এবং এই বংশের রাজা ইয়ং শেং (১৭২৩-৩৫ খ্রী) তিব্বতের আভ্যন্তরিক গোলযোগের সুযোগ লইয়া তিব্বতে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এখানেও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার দরুন মাঞ্চুরা তিব্বত জয় করিয়াছিলেন এ কথা বলা যায় না : দলাই লামাকে আবার রাজগুরু বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল এবং তিনি স্বীয় রাজ্যের রক্ষাভার চীন সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিলেন, দলাই লামার শাসনের দায়িত্ব এবং সর্বময় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের গুর্খারাজ তিব্বত আক্রমণ করিলে দলাই লামা চীনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুর্খারা পরাজিত হয় এবং তিব্বতে চীনের প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে তিব্বতে মাঞ্চুরাজের আধিপত্য নামেমাত্র পর্যবসিত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনা তিব্বত আক্রমণ করিয়া লাসা দখল করিল, চীন প্রতিরোধ দূরের কথা প্রতিবাদও করিল না। তিব্বত ও ইংরেজের সহিত যে সন্ধির ফলে এই যুদ্ধের অবসান হয় (১৯০৪ খ্রী) তাহাতে চীনের কোনও স্বাক্ষর ছিল না। অবশেষে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল চীন তিব্বতের অধিপতিরূপে এই সন্ধিপত্র স্বীকার করিয়া লইল। এই সময়ে এই অঞ্চলে রাশিয়ার অত্যধিক ক্ষমতা ছিল, নচেৎ ইংরেজরা তিব্বতের সহিত সন্ধিপত্রে চীনের স্বাক্ষর লইতেন কিনা বলা যায় না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড তিব্বত সম্বন্ধে এক বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমিকত্ব স্বীকৃত হয়, কিন্তু তৎসহ তিব্বতের রাজ্য সীমানা শাসনপদ্ধতি, অর্থাৎ দলাই লামার প্রভুত্বও অব্যাহত রাখা হয়। ইহার পর হইতেই চীনা সরকার তিব্বতে অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দলাই লামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকার চীনের ব্যবহারের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান, কিন্তু দলাই লামাকে কোনো সাহায্য করেন নাই। যাহা হউক ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সমস্ত চীনা সৈন্য তিব্বত হইতে বিতাড়িত হয় এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি দলাই লামা মঙ্গোলিয়ার সহিত এক সন্ধি করিয়া তিব্বতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এপ্রিল মাসে আবার চীন ও তিব্বতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ অবসানের জন্য চীন, ইংরেজ ও তিব্বতের মধ্যে সিমলায় আলোচনা শুরু হয় (অক্টোবর, ১৯১৩ খ্রী)। সিমলার চুক্তিপত্র চীন গ্রহণ করে নাই, ফলে আবার তিব্বতের সহিত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং চীন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। চীন সন্ধির প্রস্তাব করে, কিন্তু আভ্যন্তরিক গোলমালের জন্য এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনের অন্তর্বিপ্লবের ফলে মাঞ্চু রাজ্যের অবসান হইলেও এবং চীন ইওরোপীয় শক্তিগুলির নিকট সবপ্রকারে অপদস্থ হইলেও, তাহার বৈদেশিক কূটনীতির ধারা অব্যাহত রাখে; পরে চিয়াং কাইশেক এবং বর্তমানে কমিউনিস্টগণ সেই সাম্রাজ্যবাদীনীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত প্রকারান্তরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজস্ব মুদ্রা চালু রাখে এবং ভারতের সাহায্যে ডাক ও তার বিভাগের প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে প্রেরিত চীনা মিশন বিতাড়িত হয়। ঐ বৎসর চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, কমিউনিস্ট নেতাগণ অবিলম্বে চিয়াং কাইশেকের নীতি অনুযায়ী তিব্বত আক্রমণ করে। ফলে দলাই লামা ভারতের একপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পরে এক সন্ধি হয়, তাহাতে তিব্বত চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহার আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে চীন কোনও হস্তক্ষেপ করিবে না এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দলাই লামা তিব্বতে ফিরিয়া যান। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও চীনের মধ্যে এক সন্ধি হয় তাহাতে উভয় রাজ্যই পরস্পরের সহিত পঞ্চশীল অনুযায়ী ব্যবহার করিতে সম্মত হয়। ভারত তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য স্বীকার করে এবং ইংরেজ আমলে তিব্বতে ভারতবর্ষের যে সকল সুযোগ ও অধিকার ছিল তাহা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। চীন কঠোর হস্তে তাহা দমন করে। দলাই লামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এখনও পর্যন্ত এ দেশে আছেন। তিব্বত বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে চীনের করায়ত্ত।

দ্র স্বামী অভেদানন্দ, কাশ্মীর ও তিব্বতে, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, সুনীতিকুমার পাঠক, তিব্বত, কলিকাতা, ১৯৬০, Ekai Kawaguchi, *Three Years in Tibet*, Madras, 1909, Marco Pallis, *Peaks and Lamas*, London, 1939; Dalai Lama, *My Land and my People*, New York 1962; Sarat Das, *Indian Pandits in the Land of Snow*, Calcutta, 1965.

অশোক মজুমদার

প্রতিটি শিল্পকর্মকে তিব্বতীরা ব্যাবহারিক ও বুদ্ধিগত দুই রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিল্পকর্মের মূল্যায়ন করিতে প্রথম প্রশ্ন হইবে : ইহা কি যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল তাহা সিদ্ধ করিয়াছে? দ্বিতীয়তঃ ইহা কি নির্ভুলভাবে নির্মিত হইয়াছে? অর্থাৎ ঐ শিল্পকর্মটি ধর্মানুশীলনের

প্রচলিত ধারাগুলির যথাযথ অনুবর্তনের দ্যোতনা করিয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য।

তিব্বতী শিল্পকলা ধর্মাশ্রিত এবং ধর্মার্থেই উৎসর্গীকৃত। সেইজন্য ইহা ব্যক্তির সকলপ্রকার আত্মপ্রদর্শন প্রচেষ্টার বিরোধী।

ঐতিহাসিক বিচারে তিব্বতী শিল্পধারাগুলির উৎস ভারতে প্রসারিত বৌদ্ধ ধর্ম, পরবর্তী কালে চৈনিক প্রভাব পড়িয়াছে। ইহার কতকগুলি বাহ্যিক ক্ষেত্রে যথা: পোশাক, রন্ধন এবং গৃহকার্যে ব্যবহৃত নানারূপ দ্রব্যাদিতে চৈনিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, অবশ্য শিল্পরচনারীতিটি সর্বতোভাবে তিব্বতীয়। ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তিতে তিব্বতীয় শিল্পের জন্ম এবং নানা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া এখনও তিব্বতী শিল্পী তাঁহার মৌলিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আনুমানিক ১৬শ শতাব্দীতে তিব্বতীয় ধর্মপ্রচারকগণ মঙ্গোলীয়দিগকেও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনও মঙ্গোলীয় শিল্পকে তিব্বতীয় শিল্পের শাখারূপে চিহ্নিত করা যায়। তিব্বতীয়দের নিকট স্বকীয়তা বা মৌলিকতা বলিতে 'মূল'-এর প্রতি আনুগত্যই বুঝায়। এই শিল্পপ্রতিভাসম্পন্ন জাতির নিকট স্বেচ্ছায় নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ বিজাতীয়। অবশ্য বর্তমান শিল্পসভ্যতার প্রভাবে, বহির্বাণিজ্যের ফলে ও সামরিক আক্রমণে তাঁহাদের শিল্পধারার স্বাতন্ত্র্য ও শুদ্ধতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সমগ্র তিব্বতে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য মঠ, মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান। তিব্বতীয় স্থপতিগণের মধ্যে সর্বযুগেই অট্টালিকা নির্মাণের স্থান-নির্বাচন এবং ভূ-প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্থাপত্য কর্মে ব্যবহার করিবার ব্যাপারে এক আশ্চর্য বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা যায়, তিব্বতীয় স্থাপত্যশিল্পের প্রায় প্রতিটি নিদর্শনই কোনও না কোনও দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির এবং মঠ স্থাপত্যশিল্পের মহত্তম নিদর্শনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এবং কোনও একটি অপরটির অনুকরণ নহে। বর্তমানে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে স্থাপত্যশিল্পের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবর্ষের আয়ত্তাধীন কাশ্মীর সংলগ্ন লদাখ ইত্যাদি কয়েকটি অঞ্চলে তিব্বতীয় স্থাপত্যের এই ধরনের উৎকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ এখনও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। সিকিম ও ভুটান দেশের স্থাপত্যশিল্পের সহিত তিব্বতীয় স্থাপত্যশিল্পের আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান।

এই প্রসঙ্গে প্রতিটি তিব্বতীয় বাস্তুগৃহের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য: প্রতি গৃহে পূজার স্থান বা বেদিটি গৃহের প্রকৃত কেন্দ্র এবং তাহা সজ্জিত করিবার জন্য সকল আঙ্গিকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। চিত্রাঙ্কণ, মূর্তি-খোদাই, পুস্তকাদিতে কাঠ-খোদাইয়ের ছাপ, ধাতুর কাজ (প্রদীপ ও পাত্রে) এবং ধর্মীয় গুরুজনস্থানীয়দের বসিবার নিমিত্ত নির্মিত কার্পেট সমস্তই যেন এই পবিত্র স্থানটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই সংস্থাপিত। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যায় যে জনসাধারণের মধ্যেই কলানৈপুণ্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল — ইহা কোনও বিশেষ ধনী শ্রেণীর অবসর-বিনোদনের উপকরণ ছিল না।

স্থাপত্য হইতে স্বাভাবিকভাবেই চিত্রাঙ্কণের কথা আসে। তিব্বতে মন্দির ও মঠসমূহের ভিতরের প্রাচীর-গুলিতে ধর্মীয় ইতিহাস ও দেবলোক-সমূহের প্রতীক চিহ্ন ব্যাপকভাবে অঙ্কিত হইত। এই প্রাচীন চিত্রকলার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাদের অঙ্কনশৈলী বৌদ্ধ-শিল্পকলার অনবদ্য উদাহরণ। ভারতের গুহামন্দিরগুলির চিত্রশিল্পের সহিতই কেবল ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। আধুনিক যুগের জীবিত চিত্রাচর্য শিল্পীদের কথা বলিতে গেলে লদাখের ফিয়াঙে (Phiyang) যে সব কারুশিল্পী আছেন, তাঁহাদের কথাই উল্লেখযোগ্য।

টঙ্কা (থাংকা) শিল্পের সময় স্থির করার অসুবিধা আছে তথাপি এ পর্যন্ত বলা যায় ১৮শ শতাব্দীতে কি রচনাকৌশল, কি রূপকল্পনা সর্বদিক দিয়াই এই চিত্রকলা অনবদ্য ও অতুলনীয় ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের পর ইহা ক্রমশঃ অবনতির পথে নামিয়া গিয়াছে।

টঙ্কা চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি. এক টুকরা বস্ত্রখণ্ডকে ফ্রেমের ভিতর ঢুকাইয়া চারি দিকে সুতা দিয়া ঘিরিয়া টান করিয়া রাখিতে হয়। যখন কাপড়টি কোনও স্থানে কুঁচকাইয়া যায়, এই সুতাটি টান করিয়া তাহা ঠিক করা হয়। ইহার পর এই অকুঞ্চিত বস্ত্রখণ্ডের উপরিভাগ সূক্ষ্ম প্লাস্টার দ্বারা আবৃত করা হয়। এই প্লাস্টার খুব পাতলা হয়, কেননা প্রয়োজনমত ইহাকে গুটাইয়া লওয়া যায় এবং প্লাস্টার শুখাইয়া গেলে অ্যাগেট দিয়া পালিশ করিয়া লওয়া হয়। ইহার উপর কাঠ-কয়লা দিয়া মূর্তি ও প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হয়, ইহার পর রঙ-এর কাজ শুরু হয়। রঙ লেপনে বিভিন্ন মৃত্তিকা ও খনিজ পদার্থ এমন কি স্বর্ণও লওয়া হয়। সমস্ত পটভূমি এইরূপে চিত্রিত হইলে ঐ জমিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য শুরু হয়। সর্বশেষে মুখাবয়বগুলি স্পষ্ট করিয়া তোলা হয়।

অভিজ্ঞ শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এই কার্য শুরু হয়। সাধারণতঃ তরুণ লামারা, তাঁহাদের ধর্মগুরু অথবা একজন

নামকরা শিল্পীর নিকট এই শিল্পশিক্ষা শুরু করে। প্রথম দিকে শিষ্য গুরুর কার্য নিরীক্ষণ করে ও সর্ববিষয়ে (যেমন রঙ তৈয়ারি করা ও ক্যানভাস ঠিক করিতে) সাহায্য করে। শেখার সময়ে নকশাগুলি পুস্তকাদি অথবা গুরুর আঁকা ছবি হইতে নকল করে, ঐসব পুস্তকের বুদ্ধমূর্তির বা অন্যান্য দেবমূর্তির মাপজোখ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি মূর্তির জ্যামিতিক আনুপাতিক মাপ আছে। ধ্যান মূর্তিগুলিতে বিশেষ কয়েকটি স্থানে মুখভাব প্রকাশ করার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি অর্ধস্বচ্ছ পট বা ক্যান্ভাসের পশ্চাদ্ভাগে কোনও পবিত্র অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা থাকে। সমস্ত সৃষ্টিটি সাধারণ দৃষ্টিতে আনন্দদায়ক এবং ইহা একাধারে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার পরাকাষ্ঠা। তিব্বতীয়দের নিকট প্রতীক রূপে প্রকাশিত সত্যই সৌন্দর্য। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে যে পুস্তকে, সত্যের আলোচনা আছে ও যে চিত্রে এই সত্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে তিব্বতীয়দের নিকট বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই।

চিত্রাঙ্কনের সহিত প্লাস্টিক আর্ট এর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বুদ্ধ বা অন্যান্য ধর্মগুরুদের মূর্তি তৈয়ারিতে যে সমস্ত উপকরণ লাগে, তাহা স্টাকো ও পিতল (পরে ইহা গিল্ট করিয়া লওয়া হয়)। স্টাকো মূর্তিগুলি সর্বদাই চিত্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু ধাতুমূর্তিগুলির শুধু কেশ বা বিশেষ কোনও অংশে রঙ দেওয়া হয়। সত্যকারের প্রস্তর ভাস্কর্য বহু শতাব্দী ধরিয়া লুপ্তপ্রায়। পুরাতন মন্দিরগুলিতে বিশাল ও সুন্দর কালো ব্যাসল্ট এর মূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত মূর্তিও দেখা যায়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ত্রিমাত্রিক মূর্তিগুলি ছাঁচে তৈয়ারি, খোদাই করা নহে।

নেপালের নেওয়ারী শিল্পীদের নিকট হইতে এই ছাঁচে ঢালাই পিতলের তৈয়ারি মূর্তির প্রচলন হইয়াছে। চিত্রকলায় দেব দেবী বা মহাপুরুষের মূর্তি রচনায় যে ধরনের তাল মান বা লক্ষণ নির্ধারিত, ভাস্কর্যেও তাহা অনুসৃত। পিতলের মূর্তিগুলিতে প্রতীকসূচক অনুপাত, দেহভঙ্গী, মুদ্রা, আয়ুধ ইত্যাদির রূপায়ণ প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারেই হইয়া থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকটিরই পৃথক পৃথক ব্যঞ্জনা ও অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। এইভাবে প্রতিমূর্তির অন্তর্নিহিত বাণী অভিব্যক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি মূর্তির মধ্যে একটি ফাঁপা জায়গায় একটি কাগজে বিশেষ মন্ত্র লিখিয়া রাখিয়া ঐ মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহার পর ঐ স্থানটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যতদিন মন্ত্রলেখা কাগজখণ্ডটি ঐ স্থানে থাকে ততদিন মূর্তিটিকে জীবন্ত বলিয়া ধরা হয় এবং ঐ মূর্তি সমস্ত প্রকার পূজা গ্রহণ করিতে পারে।

এবার কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ও বয়নশিল্পের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহার সহিত পোড়ামাটির কাজেরও উল্লেখ করিতে হয়, তিব্বতে এই শিল্প চকচকে (গ্লেজ্ড)। শিল্প হিসাবে ইহার ক্ল্যাসিক্যাল নিখুঁত রূপ মিশর ও গ্রীক মৃৎ শিল্পের কথা মনে করাইয়া দেয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একটি অঞ্চল এই শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

উপরি-উক্ত শিল্পকলাগুলিতে তিব্বতীরা অতি নিপুণ। প্রতি তিব্বতী গৃহে এমনকি যাযাবার পশুচারণকারীদের তাঁবুতেও ইহার কিছু না কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

কাঠের কাজ তিব্বতের একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। কাঠে তৈয়ারি চায়ের পাত্র খুব সুন্দর, অনেক সময় এইগুলিতে রুপার কারুকার্যও থাকে। পুথি বাঁধিয়া রাখার জন্য কাঠগুলিতেও নানারূপ সুন্দর খোদাইয়ের কাজ দেখা যায়। তাহা ছাড়া গৃহের আসবাবপত্র ও স্থাপত্যকর্মেও তিব্বতী কাঠের কাজের সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়।

তিব্বতী ধাতুকর্মের নিদর্শন পূজার জিনিসপত্র ছাড়া প্রাত্যহিক ব্যবহারের পাত্রাদিতেও দেখা যায়। নানা রকমের চায়ের কেটলিও বিশেষ দ্রষ্টব্য, নল একরকম, হাতল আর একরকম, সমগ্র আকৃতিই নানা বিচিত্র জীবজন্তুর আদলে নির্মিত। তিব্বতী অস্ত্রশস্ত্রও দেখিবার মত উহাদের হাতল ও খাপ সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত।

তিব্বতী বয়নশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। বহুসংখ্যক তিব্বতী এবিষয়ে দক্ষ। এই শিল্পে পশমই ব্যবহৃত হয়। বাছাই করা শেমা পশম কালচে রঙ করার পর যে গাত্রবাস তৈয়ারি হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা দামী। ইহা জল আটকায়, কয়েকপুরুষ স্থায়ী হয় এবং সুদৃশ্য। তিব্বতীরা সচরাচর রেশম বা কার্পাস তুলা ব্যবহার করেন না। রেশম আসে চীন হইতে, কার্পাস তুলা ভারত হইতে। বিশেষ কাজেই উহাদের ব্যবহার।

তিব্বতী গালিচা একটি প্রধান দেশজ শিল্প যদিও ইহার উৎস চীন। বহু ক্ষেত্রেই চীনের গালিচার মত এক বা তিনটি বৃত্তের মধ্যে চতুষ্কোণের নকশা লক্ষণীয়। গালিচার প্রান্তদেশেও চীনা-নকশা দেখা যায়। তিব্বতী গালিচাগুলি বসিবার আসন হিসাবেই ব্যবহৃত হয় এবং এইজন্যই ইহাদের আকার ছোট। এই শিল্পের কেন্দ্র ছিল গ্যান্‌ৎসে ও থাম্পা দজুঙ। থাম্পা দজুঙের গালিচাগুলি নিম্নমানের,

গ্যান্‌-ৎসের কার্পেটের কারুকর্ম সূক্ষ্মতর, উহা উচ্চমানের। অবশ্য নানা কারণে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গ্যান্‌ ৎসে গালিচার আর তেমন উচ্চমান দেখা যায় না।

তিব্বতী শিল্পকলার একটি মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইল। বর্তমানে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তিব্বতী পরম্পরাগত শিল্পের বহু নিদর্শন নষ্ট হইয়াছে।

দ্র G. Tucci, *Tibetan Painted Scrolls*, 1952.

মার্কো পালিস

তিব্বতী ভাষা তিব্বত ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভাষার নাম তিব্বতী ভাষা। ভোট-চীনীয় ভাষাবর্গের ভোট-বর্মী শাখার একটি উপশাখা হইল তিব্বত হিমালয় অঞ্চলের ভাষাগোষ্ঠী —তিব্বতী এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিব্বতীর অনেকগুলি উপভাষা আছে। সেইগুলি ভুটান, সিকিম, নেপাল, লদাখ, পাহুল, স্পিটি, বালটিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। তিব্বতী ও তাহার উপভাষাগুলি ভাষাতাত্ত্বিকগণের নিকট ভোটিয়া নামেও পরিচিত। আদর্শ তিব্বতী বলিতে মধ্য তিব্বতের য়ু (U) এবং ৎসাঙ (Tsang) অঞ্চলের ভাষাকেই বুঝায়। তিব্বতী ও তাহার উপভাষাগুলিকে পশ্চিমা, মধ্য অঞ্চলীয় ও পূর্বী— এই তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

তিব্বতী সাহিত্যের দুইটি প্রধান যুগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগের আরম্ভ ৭ম শতাব্দীতে। প্রচলিত ধারণা এই যে তিব্বতের সম্রাট স্রোঙ বচ্‌সন সগম-পো (Shrong-btsan-sgam-po) র মন্ত্রী থোন্‌ মি-সম্‌ ভোত (Thon-mi-Sam-bho-ta) ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতী লিপির উদ্ভাবন করেন, তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে থোন মি সম্‌ ভো-ত তিব্বতী লিপির ঠিক জনক নহেন— তিনি তিব্বতের পূর্বপ্রচলিত লিপিকে গুপ্তলিপির আদর্শে বিন্যস্ত করিয়া তিব্বতী উচ্চারণের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। গুপ্তলিপির কোন্‌ ছাঁদটি তিব্বতী লিপির মূল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তিব্বতী সাহিত্যের প্রথম যুগ সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবিত অনুবাদ সাহিত্যের যুগ। তিব্বতী ভাষায় মৌলিক সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয় অনেক পরে— এই দ্বিতীয় যুগের ভাষার সহিত আধুনিক তিব্বতী ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয় এবং এই ভাষা তিব্বতের মধ্য অঞ্চলের ভাষার খুবই নিকটবর্তী।

তিব্বতীর আদি স্তরে (যে রূপ ভাষাতাত্ত্বিকগণ কল্পনা করেন) উপসর্গ আর প্রত্যয়ের প্রাধান্য ছিল, পরে ক্রমশঃ সেগুলি লুপ্ত হইতে থাকে এবং স্বরের তারতম্য (tone) তিব্বতীর রূপতত্ত্বে প্রাধান্য লাভ করে। আধুনিক তিব্বতীতে বাক্যগঠনের ভিত্তি হইল শব্দের নির্দিষ্ট ক্রম এবং বাক্যগত শব্দের সম্পর্ক সূচক অব্যয়জাতীয় শব্দের ব্যবহার।

দ্র H A Jaschke, *The Tebetan English Dictionary*, London, 1881, G A Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol III, part I, Calcutta, 1909, David Diringer, *The Alphabet*, London, 1949

দীপংকর দাশগুপ্ত

তিমি স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত সেটাসিআ (Cetaceae) বর্গের প্রাণী। তিমি জলচর, কিন্তু মাছ নহে। সমস্ত সাগরে, গঙ্গায় ও চীন দেশের কয়েকটি নদীতে তিমি দেখা যায়। বর্তমান কালের জীবিত প্রাণীদের মধ্যে তিমি সর্ববৃহৎ — দৈর্ঘ্য ১ হইতে ৩৫ মিটার। একটি ২০ মিটার দৈর্ঘ্যের তিমির ওজন প্রায় ১৫০০ কুইন্টাল।

মাছের মতই তিমির শরীর সরলরেখী (স্ট্রিমলাইনড), বর্ণ শাদা, কালো বা শাদা ও কালোয় মিশানো। বিশাল শরীরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়িয়া মাথা। ঘাড় নাই। মুখবিবর প্রশস্ত এবং ঠোঁট দুইটি কঠিন। মুখের নিকটে কয়েক গুচ্ছ ছাড়া তিমির দেহের আর কোথাও লোম থাকে না। সামনের পা দুইটি দাঁড়ের মত এবং অঙ্গুলিবিহীন। পিছনের পা-দুইটি সচরাচর দেখা যায় না, যদিও তাহাদের সংগঠক কয়েকটি হাড় মাংসের মধ্যে গ্রথিত আছে। মাথার দিক হইতে দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ দূরত্বে তিমির দেহের বিস্তার সর্বাপেক্ষা বেশি। ইহার পর হইতে লেজের দিকে দেহ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। দেহের শেষ অংশে লেজ। লেজটি উপর হইতে নীচের দিকে চাপা। এই লেজ ও দাঁড়ের মত সম্মুখের দুই পা দিয়া তিমি সাঁতার কাটে। তিমির চোখ দুইটি ছোট, বহিঃ-কর্ণ নাই এবং নাসারন্ধ্র মাথার শীর্ষে, কোনও কোনও তিমির একটি মাত্র নাসারন্ধ্র থাকে। পায়ুছিদ্রের দুই পার্শ্বে রন্ধ্রের মধ্যে তিমির স্তন্যগ্রন্থি অবস্থিত।

সকল তিমিই মাংসাশী। মাছ, ছোট ছোট চিংড়িজাতীয় প্রাণী, শম্বুক প্রভৃতি ইহাদের প্রিয় খাদ্য। ওরসিনস (Orcinus) জাতের তিমি পেঙ্গুইন পাখি, সীল বা অন্য তিমিও খায়।

তিমির ফুসফুস দুইটি দীর্ঘ। একবার শ্বাস গ্রহণ করিয়া ইহারা প্রায় ৫০-৬০ মিনিট জলের তলায় থাকিতে পারে। দীর্ঘকাল জলের মধ্যে থাকার পরে ভাসিয়া

উঠিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে নিঃশ্বাস বায়ুতে বর্তমান জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় ধোঁয়ার মত দেখায়, ফলে মনে হয়, তিমির নাসারন্ধ্র দিয়া ফোয়ারা বাহির হইতেছে। আসলে ঘটনাটি শীতকালে মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির হওয়ার সমতুল।

ওদোন্তোসেতি উপবর্গের তিমির দাঁত থাকে। আকারে ইহারা খুব বড় হয় না। শুশুক (পর্পয়েজ) এই উপবর্গের প্রাণী। মিস্টাসেতি উপবর্গের তিমির দাঁত থাকে না, তাহার পরিবর্তে তালু হইতে বেলীন (baleen) নামক একটি জটিল গঠনের প্রত্যঙ্গ মুখবিবরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এই বেলীনে প্রায় দুই হইতে তিন শত শক্ত এবং ২-৩ মিটার দীর্ঘ দণ্ড আছে। মিস্টাসেতি উপবর্গের তিমি আকারে বৃহৎ। ধূসর তিমি, নীল তিমি, কুঁজো তিমি এবং বেলীনা এই উপবর্গের তিমির উদাহরণ।

তিমির মসৃণ চামড়ার নীচে একটি পুরু চর্বির আস্তরণ থাকে। এই আস্তরণ (ব্লাবার) হইতে চর্বি নিষ্কাশনের জন্য এবং অন্ত্রের মধ্যে বর্তমান অ্যাম্বারগ্রীনের জন্য তিমি শিকার করা হয়। অ্যাম্বারগ্রীন হইতে সুগন্ধ প্রসাধন-দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

দ্র H. F. Walter & L. P. Sayles, *Biology of the Vertebrates*, New York, 1959; R. S. Lull, *Organic Evolution*, New York 1961.

সীমানন্দ অধিকারী

তিরিচ মীর হিন্দুকুশ পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ, ৩৬°১৫´৩০´´ উত্তর ও ৭১°৫০´০০´´ পূর্ব, পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্রল প্রদেশে অবস্থিত পাকিস্তানের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ, উচ্চতা ৭৭০০ মিটার (২৫২৬৩ ফুট)। এইখানে উঠিলে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, রাশিয়া ও চীন দেখা যায়।

তিরিচ মীর শব্দটির অর্থ পরীদের বা জিনদের রাজ্য। স্থানীয় কিংবদন্তি এই যে, এইস্থানে অবস্থিত পরীদের দুর্গদ্বারে এক অতিকায় ব্যাঙ বসিয়া থাকে, কেহ এই শৃঙ্গে উঠিলেই তাহাকে খাইয়া ফেলে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নরওয়েদেশীয় অভিযাত্রী দল এই শৃঙ্গে অভিযান করেন এবং তাঁহাদের অষ্টম ক্যাম্পে থাকিবার সময় প্রবল ভূমিকম্প হয় এবং তাহার ফলে হিমানীসম্প্রপাত হওয়াতে তাঁহাদের সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহারা ৪ জন ও তাঁহাদের দোভাষী এইচ. আর. এ. স্ট্রেইথার (Streather) ইহাতে আরোহণ করেন।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে নরওয়ের ৫ জন অভিযাত্রী পুনরায় ঐ শিখরে আরোহণ করেন।

দ্র B. G. Berghese, *Himalayan Endeavour*, Bombay, 1962; *Himalayan Journal*, vol II & vol. XVI, Calcutta, 1941 & 1955.

কমলা মুখোপাধ্যায়

তিরুপতি ১৩°৩৮´ উত্তর ও ৭৯°২৪´ পূর্বে অবস্থিত অন্ধ্র প্রদেশের চিত্তুর জেলার চন্দ্রগিরি তালুকের একটি শহর। মাদ্রাজ শহর হইতে ইহার দূরত্ব ২৩২ কিলোমিটার (১৪৪ মাইল)। ইহার আয়তন প্রায় ৪ বর্গ কিলোমিটার (১·৭০ বর্গ মাইল)। শহরটি পূর্বঘাট পর্বতমালার অংশ চন্দ্রগিরি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। শহরের জলবায়ু মোটামুটি স্বাস্থ্যকর ও শুষ্ক। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ৮২৫ মিলিমিটার (৩৩ ইঞ্চি)। ইহা একটি প্রাচীন শহর। ইংরেজ-শাসনকালে ইহা মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তর আরকট জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুসারে ইহা নূতন গঠিত অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছিল।

তিরুপতি শহরের লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৩৫৮৪৫ জন, তন্মধ্যে ১৯২৩০ জন পুরুষ ও ১৬৬১৫ জন স্ত্রী। শহরটি কর্নূল ট্রাঙ্ক রোডের সহিত যুক্ত।

তিরুপতি একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। স্টেশন হইতে ১২ কিলোমিটার (৮ মাইল) দূরে চন্দ্রগিরি বা তিরুমালার পবিত্র পর্বতে অবস্থিত শ্রীভেঙ্কটেশ্বর পেরুমালের বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। পেরুমালের ২ মিটার (৭ ফুট) উচ্চ প্রস্তরমূর্তির চারিটি হাত আছে এবং বিষ্ণুমূর্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য বর্তমান। এই মন্দিরে বিজয়নগরের রাজার অর্থাৎ কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁহার দুই রানীর তাম্রমূর্তি আছে। তিরুপতির পিতল ও কাষ্ঠশিল্প প্রসিদ্ধ।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXIII, Oxford 1908; A. Chandrasekhar, *Census of India: 1961, Andhra Pradesh, District Census Handbook*, Chitoor District, 1965.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তিল পেদালিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Pedaliaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম সেসামম ইন্ডিকম (*Sesamum indicum*)।

ইহার পত্র সরল এবং পত্রবিন্যাস উপরের দিকে একান্তর ও নীচের দিকে অভিমুখ। তিলের মধ্যমাক্রান্ত, উভলিঙ্গ, অসমাঙ্গ ও ওষ্ঠাধরাকৃতি ফুলে ৪টি পুংকেশর ও ২টি গর্ভপত্র থাকে। বিদারী (ডেহিসেন্ট) ফলের ভিতর বহু ক্ষুদ্র বীজ উৎপন্ন হয়। বীজগুলির আবরণ কৃষ্ণ বর্ণ। বীজে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ তৈল থাকে। সাধারণভাবে বীজ পিষিলে প্রায় স্বচ্ছ স্বাদহীন, বর্ণহীন ও খাদ্যোপযোগী তিল তৈল পাওয়া যায়, ইহা রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। গরম অবস্থায় উৎপন্ন তৈল ঈষৎ লাল বর্ণ, ইহা সাবান, কেশতৈল প্রভৃতিতে এবং জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। তিলের বীজ হইতে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়। হিন্দুর ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তিলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ভারত ও চীনে প্রাচীন কাল হইতেই তিলের চাষ করা হয়, বর্তমানে আফ্রিকা ও আমেরিকার কোনও কোনও স্থানে ইহার চাষ হইতেছে।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

তিলের চাষ ও উৎপাদনের পরিমাণে পৃথিবীতে ভারতের স্থান সর্বপ্রথমে। ভারতে বার্ষিক ২৫ লক্ষ হেক্টরের বেশি জমিতে ইহার চাষ হয় (পৃথিবীতে ৫৮ লক্ষ হেক্টর), বার্ষিক ফলন প্রায় ৪·৭ লক্ষ মেট্রিক টন (পৃথিবীতে ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন) এবং গড় ফলন হেক্টরে ১৯০ কিলোগ্রাম (পৃথিবীতে ২৯০ কিলোগ্রাম)। ইহা একটি প্রধান তৈলবীজ। বীজে তৈলের পরিমাণের তারতম্য শতকরা ৪৬-৫২ ভাগ হইয়া থাকে। রবি ও খরিফ দুই খন্দেই চাষ সম্ভবপর। খরিফের চাষে জল দাঁড়ায় না এমন হালকা বেলে মাটি এবং রবিশস্য হিসাবে চাষে জলধারণক্ষম দোঁ-আঁশ বা পলিমাটি উপযুক্ত। তিলের প্রকার ঋতুবদ্ধ, অর্থাৎ খরিফের প্রকার রবিতে এবং রবির প্রকার খরিফে ভাল হয় না। ২-৩বার চাষ দিয়া মাটি ধুলার মত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। হেক্টর প্রতি ২½-৫½ কিলোগ্রাম বীজ ছিটাইয়া বা সারিতে বপন করা হয়। সাধারণতঃ বিনা সারে চাষ করা হয়। জলদি জাতের তিল পাকিতে ৩-৩½ মাস ও নাবি জাতের তিল পাকিতে ৫½ মাস সময় লাগে। ডালপালা শুখাইতে আরম্ভ করিলে ফসল তুলিতে হইবে, নচেৎ মাঠেই তিল ঝরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। গাছ হাত দিয়া তুলিয়া অথবা কাটিয়া ১ সপ্তাহ শুখানোর পর বলদ দিয়া মাড়াই করা হয়।

দ্র Indian Central Oil-Seeds Committee, *Sesamum*, Hyderabad, 1961; Food & Agriculture Organization, United Nations, *Production Year book 1965*, vol 19, Rome, 1966; Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

পবিত্র ও মাঙ্গলিক পঞ্চশস্যের অন্যতম। নানাভাবে তিলের ব্যবহারের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। তিল-বাটা গায়ে মাখা, তিল জলে স্নান করা, তিলের দ্বারা হোম করা, তিল দান করা, তিল খাওয়া, তিল বপন করা—তিলের দ্বারা এই ছয়রকম কাজ করা প্রশস্ত। ইহার নাম ষট্‌তিলাচরণ—যিনি ইহা করেন তিনি ষট্‌তিলী। জন্মতিথিতে ও মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। জন্মতিথিতে তিল গুড় ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিবার নিয়ম আছে। দেবকার্য ও পিতৃকার্যে তিল ও তুলসীর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আদ্যশ্রাদ্ধের মুখ্য অঙ্গ তিল কাঞ্চন দান বা সোনার সহিত তিলদান। সধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে তিল ব্যবহার নিষিদ্ধ। তিলের পরিবর্তে তাঁহারা যব ও ধান ব্যবহার করিয়া থাকেন।

দ্র রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব, জন্মতিথিকৃত্যপ্রকরণ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

তিলক হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তগণ কর্তৃক ললাটাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অঙ্কিত চিহ্ন। সাম্প্রদায়িক নিয়ম অনুসারে চন্দন, খড়িজাতীয় জিনিসের গুঁড়া, ভস্ম প্রভৃতির সাহায্যে ইহা অঙ্কিত হয়। অনেক সময়ে একটি কাষ্ঠময় বা ধাতুময় মুদ্রা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ প্রথার উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না, তবে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে ললাটে হোমভস্মের টীকা অঙ্কনের প্রথার সঙ্গে ইহার দূরায়ত যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব শৈব শাক্ত প্রভৃতি প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের স্ব স্ব তিলক-চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলেও বৈষ্ণবদের মধ্যেই তিলক-চিহ্নের বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য দেখা যায় এবং প্রত্যহ স্নানান্তে তিলক-গ্রহণকে বৈষ্ণব ভক্ত মুখ্যসাধনরূপে গণ্য করেন। সাধারণভাবে, নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম এবং পৈত্র্যাদি কর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বে তিলকসেবা করিয়া থাকেন।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে বাণভট্ট রচিত 'কাদম্বরী' গ্রন্থে শৈব

তপস্বী দৃঢ়দস্যু এবং জাবালি ঋষির বর্ণনা প্রসঙ্গে ললাটে ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কনের প্রথার কথা জানা যায়। এই ত্রিপুণ্ড্র যে পরবর্তী কালের শৈব উপাসকদের তিনটি সমান্তরাল রেখার সমাহারে গঠিত তিলক-চিহ্নবিশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই। ৭ম শতকের পূর্বে সাম্প্রদায়িক ভক্তগণের মধ্যে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথা প্রবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক, তবে ঠিক কবে এবং কিভাবে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নগুলির উৎস সন্ধানের সূত্রে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তিতে পরিদৃষ্ট লাঞ্ছনগুলির অধ্যয়ন অপরিহার্য। বৈষ্ণব শৈবাদি উপাসকগণের তিলক-গুলির সঙ্গে তাঁহাদের স্ব স্ব ইষ্টদেবতার বিগ্রহধৃত কিছু কিছু চিহ্ন লাঞ্ছনের সৌসাদৃশ্য মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্তমান কালে দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণুমূর্তিগুলির ললাটে তিনটি ঊর্ধ্বাধঃ রেখার সমাবেশে অঙ্কিত তিরুনামম্ বা শ্রীনামম্ নামে যে চিহ্ন দেখা যায়, তাহা শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত তিলক চিহ্নগুলির অন্যতম। শৈব ভক্তদের ললাটশোভন ত্রিপুণ্ড্র শিবলিঙ্গের পূজা বা রুদ্র-ভাগে অঙ্কিত চিহ্নের অনুরূপ। দেবীমূর্তির ললাটমধ্যস্থ ত্রিনয়নের নিম্নে যে রক্তবর্ণ বিন্দুচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহা শক্তি-সাধকের অন্যতম লাঞ্ছন। অর্থাৎ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিতে অঙ্কিত চিহ্নসমূহের অনেকগুলিই যে সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তিলক চিহ্ন রঙের মত অস্থায়ী জিনিসে অঙ্কিত হয় বলিয়া অনুরূপ লাঞ্ছনযুক্ত প্রাচীন দেবতা-মূর্তি পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ তিলক-প্রতিম চিহ্নযুক্ত মূর্তিগুলি সবই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। অধ্যাপক নীলকণ্ঠ-শাস্ত্রী প্রখ্যাত চোল সম্রাট রাজরাজের (৯৮৫-১০১৪ খ্রী) সমকালীন একটি লিপির সাক্ষ্যে বলিয়াছেন ১০ম-১১শ শতাব্দীতেও বিষ্ণুমূর্তির ললাটে স্বর্ণনির্মিত শ্রীনামম্ উৎকীর্ণ করিবার প্রথা বর্তমান ছিল। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসংগত নয় যে, ঐ সময়ে ইষ্টদেবতার চিহ্নের অনুসরণে বিষ্ণুর ভক্তগণের একাংশ অন্ততঃ তাঁহাদের ললাটে শ্রীনামম্ চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন।

বস্তুতঃ, খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকের মধ্যে রচিত পদ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, দেবীভাগবত প্রভৃতি কিছু পুরাণ ও উপপুরাণ গ্রন্থের সাক্ষ্যেও এ কথা মনে হয় যে, ঐ সময় হইতে শৈবাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতে থাকে। এইসব গ্রন্থের অন্তর্গত তিলক ধারণের নিয়মাবলী পরবর্তী কালের রচনায় পূর্ণতঃ অথবা অংশতঃ উদ্ধৃত হইয়াছে। ১০ম ও ১১শ শতকের চর্যাগীতি-কোষের লুইপাদ রচিত একটি চর্যায় ব্যবহৃত 'বাণচিহ্ন' শব্দবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, এই 'বাণচিহ্ন' সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নেরই ভাষান্তর। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মত গ্রহণান্তে অনুমান করেন, দক্ষিণ ভারতে যেমন তিলকাদি চিহ্ন তিরুনামম্ বলিয়া বর্ণিত হইত, উত্তর ভারতে বোধ হয় মধ্যযুগে ও পরে এগুলির আখ্যা ছিল বাণচিহ্ন (বর্ণচিহ্ন)। সংক্ষেপে, লেখ ও সাহিত্যের মিলিত সাক্ষ্যে এই অনুমান অসংগত নয় যে, খ্রীষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর পর হইতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভক্ত-গণের মধ্যে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথার ক্রমপ্রচলন হয়। এবং আমাদের একটি বিশেষ অনুমান, শৈব তপস্বী ও উপাসকগণের ত্রিপুণ্ড্র ধারণের প্রথা হইতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্তগণ ললাটাদি অঙ্গে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করে।

মোটামুটিভাবে ১০ম হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়পরিসরকে সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নগুলির রূপ-বিবর্তন-কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। প্রাচীন চিহ্নগুলির বিবর্তনের সঙ্গে কয়েকটি নূতন তিলক-চিহ্নও এই সময়-সীমায় দেখা দিয়াছিল এবং সন্দেহ নাই বৈষ্ণব-শৈবাদি সম্প্রদায়ের বিভাজনের সঙ্গে তিলক-চিহ্নগুলির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে নূতন চিহ্ন-লাঞ্ছনের উদ্ভব-ক্রিয়া বিজড়িত। বর্তমানে বৈষ্ণব শৈব সৌর শাক্ত এবং গাণপত্য এই পাঁচটি ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের বিভিন্ন উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত ভক্তগণ স্ব স্ব তিলক-চিহ্নাদি ধারণ করেন।

পুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক তিলকের বিস্তৃত বর্ণনা ও তাহাদের ধারণ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সাক্ষাৎ মেলে। এইসব গ্রন্থে বর্ণিত তিলকগুলির কয়েকটির সঙ্গে অধুনাপ্রচলিত তিলক-চিহ্নের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। বাস্তব নিদর্শন ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে দেখা যায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বৈষ্ণবগণই তিলকসেবার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁহাদের তিলক চিহ্নও সংখ্যা ও বৈচিত্র্য-বিচারে বিশেষ আকর্ষণীয়। স্নানের পর বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম করিয়া দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ প্রত্যেক বৈষ্ণবের কর্তব্য বলিয়া মনে করা হয়। এই দ্বাদশ নাম ও দ্বাদশ অঙ্গ : ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ পার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম পার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর (পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড)।

এই পুরাণে প্রথমে ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ ও পরে

ললাটাদিক্রমে তিলক গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পদ্মপুরাণে ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের বর্ণনা এইরূপ: একান্তধর্মাবলম্বী অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ অন্তরাল সহিত হরিপদাকৃত পুণ্ড্র অঙ্কন করিয়া থাকেন। নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত মৃত্তিকা (গঙ্গামৃত্তিকা) দ্বারা ইহা অঙ্কিত করিতে হইবে। 'হরিমন্দির' নামে খ্যাত এই ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের ঊর্ধ্বাধঃ রেখার মধ্যে ব্যবধান রাখিবার জন্য পুরাণকার বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন। তবে বর্তমানে শ্রীবৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের ভক্তগণের মধ্যে যে সকল তিলক দেখা যায়, সেগুলি পদ্মপুরাণ বর্ণিত ঊর্ধ্বপুণ্ড্র জাতীয় হইলেও পুরাণোক্ত বর্ণনার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে না। বৈষ্ণবদের বিভিন্ন উপবিভাগভুক্ত ভক্তদের তিলক চিহ্নের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বড়কলইপন্থী শ্রীবৈষ্ণবদের তিলক ইংরেজী 'ভি' অক্ষরের অনুরূপ, শ্বেত বর্ণের এই তিলকের মধ্যবর্তী রেখার ঊর্ধ্বাংশটি সিন্দুর চর্চিত। বল্লভাচারী বৈষ্ণবগণের একাংশ ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের আকার সদৃশ তিলক চিহ্ন ধারণ করেন, এই চিহ্ন ললাটের নিম্নভাগ হইতে কেশ-রেখার উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের চিহ্নের সঙ্গে মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বিষ্ণুভক্তগণের তিলক চিহ্নের প্রভেদ লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া এইটুকু বলা চলে, বৈষ্ণবদের বিভিন্ন শাখাগত ভক্তগণ একরেখ বা অধিকরেখ নানা ধরনের ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন। ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ছাড়া তাঁহারা অন্যান্য অঙ্গে শঙ্খ চক্র গদাদির চিহ্নও অঙ্কন করেন।

শৈবগণ ললাটদেশে যে-চিহ্ন অঙ্কন করেন তাহার নাম ত্রিপুণ্ড্র। সাধারণতঃ ইহা তিনটি সমান্তরাল রেখার সাহায্যে রচিত হয়। তবে কোনও কোনও গ্রন্থে ইহা ঈষৎ বক্র ও খণ্ডচন্দ্রের আকার সদৃশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং বাস্তবেও এইরূপ ত্রিপুণ্ড্রের সাক্ষাৎ মেলে। একাধিক গ্রন্থে ত্রিপুণ্ড্রধারণ শিবোপাসকদের অবশ্যকরণীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং কঙ্কালমালিনী নামক একটি তন্ত্র-গ্রন্থে আছে, ত্রিপুণ্ড্রধারণে গঙ্গাদি পবিত্র নদীতে স্নানের এবং শ্রীবিষ্ণুর ও শিবের কোটি মন্ত্র জপের পুণ্য অর্জিত হয়। কঙ্কালমালিনী, শাম্ভবতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে শৈব ছাড়া বৈষ্ণবাদি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদেরও ত্রিপুণ্ড্রধারণ করিতে বলা হইয়াছে। শৈব তিলক-চিহ্নের অন্যান্য রূপ-ভেদের মধ্যে ত্রিপুণ্ড্র, অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত চিহ্ন, অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমাহারে রচিত চিহ্ন, বিল্বপত্রাকৃতি এবং এক জাতীয় প্রস্তরগুটিকাকৃত চিহ্ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শৈব তিলক-চিহ্নের সঙ্গে শাক্ত তিলক-চিহ্নের সাদৃশ্য বিদ্যমান। দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক শাক্তদের তিলক চিহ্ন বক্রাকৃতি ত্রিপুণ্ড্র ও বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত, বিন্দুটি ত্রিপুণ্ড্রের সর্বনিম্ন রেখার নীচে মধ্য স্থলে অঙ্কিত হয়। বামাচারী তান্ত্রিক শক্তি সাধকের তিলক একটি ঈষৎবক্র রেখা ও দুইটি বিন্দুর সাহায্যে রচিত হয়, বিন্দু দুইটি রেখার উপরে ও নীচে মধ্যবর্তী অংশে স্থাপিত হয় এবং উপরের বিন্দুটি যথার্থ বর্তুলাকার না হইয়া কিছুটা কোণাকৃতি। মহাকালীর উপাসকদের তিলক আবার অন্যরূপ। অর্থাৎ শাক্ত তিলক চিহ্নের মধ্যেও প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, শিব শক্তিকে যাঁহারা যুগ্মভাবে উপাসনা করেন, তাঁহাদের তিলক-চিহ্নও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শাক্ত তিলক-চিহ্নের মধ্যে বিন্দুর নিত্য উপস্থিতি সবিশেষ লক্ষণীয়।

সৌর এবং গাণপত্য তিলক চিহ্নের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ। সৌর সম্প্রদায়ের চিহ্ন দুইটি স্থূল সরলরেখার সমন্বয়ে গঠিত, সর্বনিম্ন দ্বিতীয় রেখাটি আকারে প্রথম রেখাটির এক চতুর্থাংশেরও কম এবং প্রথম রেখাটির সঙ্গে কেন্দ্রস্থলে যুক্ত, এই ক্ষুদ্র রেখাটি দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হয়। গাণপত্যদের তিলক চিহ্ন ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের মত এবং ইহার মধ্যস্থলে প্রদীপশিখা সদৃশ একটি রেখা পরিদৃষ্ট হয়।

তিলক-চিহ্ন প্রসঙ্গে দুইটি সামাজিক তথ্যের উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ, তিলক চিহ্নধারণের বিধিব্যবস্থাতেও হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। যদিও সকল বর্ণের হিন্দুই তিলক গ্রহণের অধিকারী, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণভেদ অনুসারে ভক্তদের বিভিন্ন ধরনের তিলক ধারণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিবার্চনচন্দ্রিকায় বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক এবং শূদ্র বর্তুলাকার তিলক ধারণ করিবে। এই নির্দেশে অবশ্য সাম্প্রদায়িক তিলক চিহ্নের উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ, গ্রাম ভারতের লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনার সঙ্গে কিছু কিছু তিলক-চিহ্নের দূরায়ত সংযোগ থাকা বিচিত্র নহে। উদাহরণতঃ বলা যায়, দক্ষিণ ভারতের গ্রামদেবী গঙ্গম্মাকে যাঁহারা বাড়িতে পূজা করেন, তাঁহারা অনুষ্ঠানের পূর্বে ঘরের দেওয়াল গোময়ের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর যে চিহ্ন আঁকেন, তাহা প্রায় অবিকল শৈবদের ত্রিপুণ্ড্র। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথার উদ্ভবে ও চিহ্নগুলির রূপবৈচিত্র্যের বিবর্তনে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতি কতখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা ব্যাপক ও গভীর গবেষণার বিষয়।

দ্র হরকুমার ঠাকুর, হরতত্ত্বদীধিতি, কলিকাতা, ১৮৯২; জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬০, S. C. Belnos, *The Sandhya or the Daily Prayers of the Hindus* Allahabad, 1851; Rev. H. Whitehead, *Village Gods of South India*, Calcutta, 1921; D. A. Pai, *Religious Sects in India among the Hindus*, Bombay, 1928.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

তিলানা তেলেনা বা তরানা — কণ্ঠ-সংগীতের বিভাগ-চতুষ্টয়ের অন্যতম। খেয়ালের উপসংহার হিসাবে তিলানা গাওয়া হয়। এই গানে অর্থবাহী ভাষার পরিবর্তে দ্রুত উচ্চারণোপযোগী কতকগুলি নিরর্থক শব্দের রচিত ছন্দ ব্যবহার করা হয়, যথা— তেনা, তুম, তুম, দিম্, তেরেনা, দেবনা ইত্যাদি। সংগীতরত্নাকর শাস্ত্রেও স্বস্তিবাচক তেন, তেনা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার আছে। তিলানার গানে ছন্দোগত মাধুর্য ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। গানের অর্থযুক্ত ভাষা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ কিছু পরিমাণে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিশুদ্ধ রাগ উপভোগ কালে তাহলে অর্থহীন অথচ ঝংকারযুক্ত শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

তিলোত্তমা অতুলনীয় রূপযৌবনশালিনী এক নারী। ত্রিলোকের রমণীয় পদার্থসমূহের তিল তিল অংশ লইয়া নির্মিত বলিয়া ইঁহার নাম তিলোত্তমা। ত্রিভুবন বিজয়ী অত্যাচারী দৈত্যাধিপতি সুন্দ ও উপসুন্দের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা অনুপমলাবণ্যময়ী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন। কঠোর তপোনিরত পরস্পর অতি প্রীতিমান ভ্রাতৃদ্বয়কে ব্রহ্মা 'কেবল পারস্পরিক বিরোধ উভয়ের মৃত্যুর কারণ হইবে' এই বর দান করেন। পুষ্পচয়নরতা রত্নভূষিতা তিলোত্তমাকে দেখিয়া দৈত্যদ্বয় অতিশয় কামাসক্ত হয় এবং তাঁহাকে ভার্যারূপে লাভ করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে যে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তাহাতেই উভয়ের মৃত্যু ঘটে। তিলোত্তমার সাফল্যে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দান করেন। (মহাভারত, ১।২০১-২০৪)।

যূথিকা ঘোষ

তিসি তৈলবীজ দ্র

তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। উত্তর সিকিমের বিভিন্ন হিমবাহ অঞ্চল হইতে উদ্ভূত লাচেন চু, লাচুন চু ও লোনাক চু-র সম্মিলিত ধারাই সংস্কৃতে ত্রিস্রোতা নামে পরিচিত। ইহাই বর্তমানের তিস্তা নদী। উত্তর পার্বত্য অঞ্চল হইতে সিকিমের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এই নদী গ্রেটরংগিতের সহিত মিলিত হইয়া দার্জিলিঙ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। পরে দার্জিলিঙের তরাই অঞ্চল, জলপাইগুড়ির ডুয়ার অঞ্চল ও পশ্চিম কুচবিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রংপুর জেলায় ফুলবাড়ির নিকট তিস্তা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। ইহার প্রধান উপনদী রেমু-গ্রেটরংগিত, রংগো, রিলী, সিভক, ঘাঘাট। দার্জিলিঙ এবং পার্বত্য অঞ্চলে তিস্তা 'সিভক গোলা' নামে এক গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া সমভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এই স্থানে নদী খরস্রোতা এবং অন্যত্র কিন্তু নিম্নভূমিতে ইহা নৌচলাচলের উপযোগী। পুনঃপুনঃ গতিপরিবর্তনের জন্য নিম্নভূমিতে তিস্তা পাগলা নদী ও ইহার পরিত্যক্ত খাতগুলি বুড়ি ও মরা তিস্তা নামে পরিচিত। তিস্তার দৈর্ঘ্য ২৬৮ কিলোমিটার (১৬৮ মাইল)।

পূর্বে তিস্তা করতোয়া ও আত্রাই-এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মায় মিলিত হইত। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল বর্ষণ ও বন্যার জলে ইহা গতি পরিবর্তন করিয়া ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া মিলিত হয়। তুষারগলা জল ও মৌসুমী বর্ষণপুষ্ট এই নদীতে প্রবল বন্যা হয়। তিস্তা নদীর উপর তিনটি সেতু আছে। ইহার মধ্যে তিস্তাঘাট উল্লেখযোগ্য। লাচেন গ্রামে লাচেন চু ও লাচুন চু নদীর সংগমস্থলে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XXIII, Oxford, 1908; O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1957.

হেনা ঘোষ

তীবর, তিয়র ধীবর দ্র

তীরভুক্তি প্রাচীন বিদেহ দেশ পরবর্তী কালে তীরভুক্তি নামে পরিচিত হয়। বৈশালী অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত গুপ্ত যুগের সীলমোহরে তীরভুক্তির প্রধান এবং অন্যান্য রাজ-কর্মচারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণ বামন তাঁহার লিঙ্গানুশাসন গ্রন্থে তীরভুক্তিকে একটি দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণের মিথিলাখণ্ডে তীর-ভুক্তির সীমানা উত্তরে হিমবত্, দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্বে কোশী এবং পশ্চিমে গণ্ডক পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শক্তি-সংগমতন্ত্রের মতে ইহা গণ্ডকী এবং চম্পারণ্যের মধ্যে

অবস্থিত। সম্ভবতঃ গণ্ডকী বলিতে বর্তমান গণ্ডকী এবং গঙ্গা নদীর সংগমস্থলকে বুঝাইতেছে। চম্পারণ্য বর্তমানে চম্পারণ নামে পরিচিত।

প্রাচীন তীরভুক্তি বর্তমান ত্রিহুত নামের মধ্যে বাঁচিয়া আছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত ইহা বিহার প্রদেশের পাটনা বিভাগের সর্বোত্তরবর্তী একটি জেলা ছিল। ইহার মজঃফরপুর, হাজীপুর, সীতামারী, দারভাঙ্গা, মধুবাণী, তাজপুর— এই ছয়টি উপবিভাগ ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি এই বৃহৎ জেলাটিকে মজঃফরপুর এবং দারভাঙ্গা— এই দুই জেলায় বিভক্ত করা হয়।

ত্রিহুত অঞ্চলের ভূভাগ সাধারণতঃ পলিপ্রধান জমি, মধ্যে মধ্যে নদী আছে, বনভূমিও যথেষ্ট। ধান্য এ অঞ্চলের প্রধান শস্য।

গঙ্গা, বৃহৎ গঙ্গা, বয়া, ছোট গণ্ডক এবং তিলগুজা নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

দীপকরঞ্জন দাস

তীর্থংকর মৌলিক অর্থে যিনি তীর্থ করেন। কিন্তু জৈন সাহিত্যে 'তীর্থ' শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। 'তীর্থং নাম প্রবচনম্'-- প্রবচন অর্থে উপদেশ। যেহেতু সাধু ও গৃহী শিষ্যবর্গ এই উপদেশের লক্ষ্য সেইজন্য সাধু সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা রূপ চতুর্বিধ সংঘও তীর্থ। এইজন্য আপ্তপুরুষ যখন কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়া সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা-রূপ চতুর্বিধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন ও যখন তাঁহার উপদেশ অবলম্বনে দ্বাদশাঙ্গ শ্রুত সাহিত্য নিরূপিত হয়, তখনই যথার্থতঃ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় বলা যায়। ইহা দ্বারা ইহা হইতে বা ইহাতে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় বলিয়াই ইহার নাম তীর্থ।

বন্ধনমুক্ত কেবলীমাত্রই তাই তীর্থংকর নন, তাঁহারা সামান্য কেবলী। যাঁহারা কেবল জ্ঞান লাভ করিবার পর তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন, শুধু তাঁহারাই তীর্থংকর। যাঁহারা জন্ম হইতেই জ্ঞানবান ও লোকোত্তরসৌভাগ্য-সম্পন্ন তাঁহারা তীর্থংকর হন। শাস্ত্রে ইঁহাদের বহুবিধ বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। তবে ইঁহারা অবতার নহেন। কারণ ইঁহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আত্মা। আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা ইঁহারা তীর্থংকরত্ব অর্জন করেন ও মুক্ত হইবার পর সংসারে আর প্রত্যাবর্তন করেন না। জৈন সাহিত্যে ২৪ জন তীর্থংকর ব্যতীত অতীত ও ভবিষ্যৎ তীর্থংকরদের নাম ও সামান্য পরিচয়াদি পাওয়া যায়।

গণেশ লালওয়ানী

তীর্থস্থান স্থানবিশেষকে পুণ্যতীর্থরূপে গণনা করিবার প্রথা ভারতের প্রাচীন অনার্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আর্যজাতি ভারতে উপনিবেশস্থাপনের পর ধীরে ধীরে এই অনার্য ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন। নিরুক্তকার যাস্ক ঔর্ণবাভ নামক প্রাচীন ঋষির একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা হইতে মনে হয়, গয়শিরঃ অর্থাৎ বর্তমান বিহারের অন্তর্গত গয়া উত্তর-বৈদিক যুগে তীর্থরূপে পরিগণিত হইত। আবার ঐ যুগেই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর উপত্যকাস্থিত কুরুক্ষেত্র অঞ্চলকে পুণ্যক্ষেত্র মনে করা হইত, তাহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন কালে যে সকল স্থানকে পুণ্যতীর্থরূপে গণনা করা হইত, তন্মধ্যে দুইটি নদীর সংগমস্থানের মাহাত্ম্য উল্লেখযোগ্য। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে আর্যদিগের ভ্রমণ নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। কিন্তু উত্তরকালীন একটি পৌরাণিক শ্লোকে দেখা যায়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে তীর্থযাত্রা করা যাইত।

পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে তীর্থভ্রমণের সর্বপ্রথম উল্লেখ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলানুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তীর্থযাত্রাকে ধর্মযাত্রা বলিয়াছেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাই আমরা তাহাকে ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রাম এবং বোধিলাভক্ষেত্র বোধগয়াতে তীর্থযাত্রী হিসাবে দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান বুদ্ধ শাক্যমুনির জন্মস্থান বলিয়া তিনি লুম্বিনীগ্রামে আসিয়া পূজা দিয়াছিলেন এবং গ্রামবাসীদিগকে 'বলি' সংজ্ঞক করদান হইতে অব্যাহতি দিয়া উৎপন্ন শস্যের অষ্টমাংশ মাত্র রাজার প্রাপ্য হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের জনৈক হিন্দু-ধর্মাবলম্বী শকনায়ক প্রভাষ, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থস্থানে গিয়া নানা পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর বাংলাবাসী এক ব্যক্তি নেপালের বরাহক্ষেত্রে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া বরাহদেবতাকে নিষ্কর ভূমিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব মালবের জনৈক নরপতি প্রয়াগের গঙ্গা যমুনাসংগমে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তীর্থস্থানে প্রাণবিসর্জনের প্রথা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। গঙ্গা নদীর পবিত্র সলিলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আশায় উত্তর মধ্যযুগে অনেকে বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। নানা কারণে যাঁহারা স্বয়ং দূরবর্তী তীর্থস্থানে যাইতে পারিতেন না, তাঁহারা অর্থব্যয়ে প্রতিনিধি পাঠাইয়া যথাসম্ভব তীর্থযাত্রার পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করিতেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুণ্যতীর্থের সংখ্যা অগণিত। নদী বা উহার সংগম, দেব-দেবীর মন্দির, সাধকের সিদ্ধিলাভক্ষেত্র ইত্যাদি স্থানমাহাত্ম্য দ্যোতিত করিত। পুরাণগুলিতে একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়, তদনুসারে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (মায়াবতী), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা পুরী (উজ্জয়িনী) এবং দ্বারাবতী এই সাতটি তীর্থ মোক্ষদায়িনী। কিন্তু শ্লোকটিতে গয়া, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর, পুষ্কর, প্রভাস, বদরিকা, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি মহাতীর্থগুলির নাম নাই। মহাভারতের বনপর্বে বহুসংখ্যক ভারতীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। কিন্তু মধ্যযুগে পুরাণগুলিতে বিস্তারিত তীর্থমাহাত্ম্যমূলক অনেক অধ্যায় সংযুক্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন তীর্থস্থানের বর্ণনাই কতকগুলি পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তীর্থভ্রমণের পুণ্যফলও পুরাণসমূহে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। তন্ত্রগ্রন্থে অনেকগুলি শৈব ও শাক্ত তীর্থকে পীঠস্থান বলা হইয়াছে। তীর্থযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য তীর্থকল্পলতা, তীর্থকৌমুদী, তীর্থসার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ পুণ্যলোভেই তীর্থে ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু তীর্থপর্যটনের একটা ব্যাবহারিক লাভ এই ছিল যে, নানা দেশের নানা প্রকার লোকের সংস্পর্শে আসিয়া তীর্থযাত্রীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন বর্ধিত হইত। মধ্যযুগে জ্ঞানলাভের উপায় বর্তমান কালের অনুরূপ ছিল না। তীর্থপর্যটন তখন কূপমণ্ডুকতা দূর করিবার অন্যতম প্রধান উপায় ছিল। 'পীঠস্থান' দ্র।

দ্র N. L. Dey, *Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*, London, 1927; D C Sircar, 'The Sakta Pithas', *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*, vol XIV, 1948; P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. IV, Poona, 1953; D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1960

দীনেশচন্দ্র সরকার

তুকারাম (আনুমানিক ১৬০৮-৪৯ খ্রী) মহারাষ্ট্রের ভক্তিবাদী সন্ত ও কবি। তুকারামের জন্ম ছোট ব্যবসায়ীর ঘরে, তাঁহার পিতার নাম বোলহোবা, মাতার নাম কনাকাই— ডাকনাম মোর (অম্বাইল নামেও তিনি পরিচিত)। তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় ডেহু নামক স্থানে; তুকারামের নামের সঙ্গে জড়িত সেই স্থানটি এখন একটি তীর্থস্থান। অতি অল্প বয়সেই তিনি মাতাপিতাকে হারান। তাঁহার প্রথম স্ত্রী ও শিশুপুত্রের যখন অকালমৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়স খুব বেশি নয়। তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। সাংসারিক বুদ্ধি তুকারামের কিছুই ছিল না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল।

একদিন ধ্যানের সময় নামদেব সম্ভবতঃ তুকারামকে কবিতা রচনা করিতে অনুপ্রেরিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন 'নামদেব পাণ্ডুরং (বিঠোবা) এর সঙ্গে আসিয়া কবিতা লিখিবার জন্য আমাকে আদেশ দেন।' তখন হইতেই 'অভঙ্গ' রীতিতে কবিতা-রচনার সূচনা হয়। 'গাথা' নামে সংগৃহীত তাঁহার স্বরচিত কবিতা (প্রায় নয় হাজার ছত্র) অভঙ্গ রীতিতে রচিত। ইহা ছাড়াও ছয় হইতে দশ ছত্রে রচিত কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাও তুকারামের নামের সহিত জড়িত— সেইসব কবিতার শেষ ছত্রে 'তুকা মহনে' (কহে তুকারাম) ভণিতা আছে।

সহজ, সরল, কথ্য ভাষায় শুদ্ধ জীবনের ও ভক্তির বাণী তুকারাম প্রচার করেন। রাম, কৃষ্ণ, হরি, পাণ্ডুরং বা বিঠোবা— যে কোনও দেবতার নাম স্মরণ-বন্দনের মাহাত্ম্য তিনি মানিতেন—'যে মুহূর্তে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা যায় সেই মুহূর্তে জাতি-বৈষম্য মন হইতে দূর হইয়া যায়'— তুকারাম তাঁহার শিষ্যদের এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বিঠোবার মন্দিরের কীর্তন গানের মাধ্যমে তুকারাম ধর্মের বাণী প্রচার করিতেন। গানের মাঝামাঝি সময়ে তুকারাম গ্রাম্য লোকদের নিকট কতকগুলি আধ্যাত্মিক বিষয় সহজভাবে বলিতেন ও কখনও পদ্যে উপমার মাধ্যমে সুকৌশলে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে মহাকাব্য বা পুরাণ হইতে একটি আখ্যান বলা হইত— এই আখ্যানের সহিত পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ের অনেকখানি মিল থাকিত ও বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইত। আলোচনার সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুকারামের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী নিজের রচনা আসিয়া পড়িত।

আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় যে তুকারাম অভঙ্গ রীতিতে 'ভগবদ্গীতা' অনুবাদ করেন। স্থানীয় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহার এই অশাস্ত্রীয় কার্যের জন্য শাস্তির বিধান দেয়। কথিত হয় যে 'জল-পরীক্ষা' দিয়া তুকারাম তাঁহার আন্তরিকতা ও শুদ্ধতা প্রমাণ করেন। ঈশ্বর তুকারামের নিকট দয়ালু মহান পিতা নহেন, তিনি ঈশ্বরকে স্নেহশীলা জননীরূপে দেখিয়াছেন। 'অভঙ্গ' দ্র।

দ্র যোগীন্দ্রনাথ বসু, তুকারাম চরিত, কলিকাতা, ১৯০১, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবরত্নমালা, কলিকাতা, ১৯০৭, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রূপান্তর, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, J. N Fraser & J F. Edwards, *Life and Teaching of Tukaram*, Calcutta, 1922

পদ্মাবতী দত্ত টিকেকর

তুঙ্গভদ্রা দক্ষিণ ভারতের একটি নদী ও স্টেশন। ৬৪৪ কিলোমিটার (৪০০ মাইল) বিস্তৃত নদীটি দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা নদীর প্রধান উপনদী। ইহা তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুই নদীর মিলিত স্রোতোধারা। উভয়ের উৎপত্তি পশ্চিমঘাট ও সংযোগস্থল উত্তর সিমোগ জেলার কুদালির নিকট। মহীশূর ও অন্ধ্র রাজ্যের প্রাচীন মালভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার পর বেলারি জেলায় কুর্নুলের অদূরে কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রার বহু উপনদী আছে, ইহাদের মধ্যে কুমুদবতী (চোরাদি), ভারদা, হরিদ্রা ও বেদাবতী (হাগারী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রাকে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র মনে করা হয়। ভাষ্যকার সায়নাচার্যের প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠ এই নদীর তীরে অবস্থিত। উহার উপত্যকায় বিখ্যাত রাঘবেন্দ্র স্বামীর মন্দির অবস্থিত।

তুঙ্গভদ্রা দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিবিরল অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, কাজেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া ইহার জল সেচকার্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে অন্ধ্র প্রদেশ ও মহীশূর রাজ্য সরকারদ্বয়ের যুক্ত প্রচেষ্টায় বহুমুখী তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বেলারি জেলার মাল্লাপুরম নামক স্থানে ১৭৬১ মিটার দীর্ঘ ও ৪৯ মিটার উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাস হইতে ইহার জল সেচের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। সমগ্র পরিকল্পনার কার্য সম্পূর্ণ হইলে খালের সাহায্যে অন্ধ্র প্রদেশ ও মহীশূর রাজ্যে ৩৪ লক্ষ হেক্টর জমি সিক্ত করা সম্ভব হইবে এবং কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে অন্যূন ৯৯০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করাও সম্ভব হইবে।

বাঁধটির উত্তরে অধুনা হম্পেটের নিকট বিজয়নগরের রাজধানী অবস্থিত ছিল। ভদ্রার তীরে ভদ্রাবতী শহর লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XXIV, Oxford, 1908; Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, *Our River Valley Project*, New Delhi, 1961, Publication Division, Government of India *India 1965*, New Delhi, 1965.

শিবরাম ভট্টাচার্য

তুঁত মোরাসিঈ গোত্রের (Family-Moraceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। ইহার পত্র সরল, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, দন্তুর বা খণ্ডিত ও পত্রবিন্যাস একান্তর, পাতা ও শাখার ভিতর দুগ্ধসদৃশ আঠা থাকে। ইহার ফুল ক্ষুদ্র, অগুজ্জ্বল, একলিঙ্গ ও সমাঙ্গ। রসাল বৃতি ফলের সহিত যুক্ত হইয়া সংযুক্ত ফল সৃষ্টি করে। রেশমের গুটিপোকা পালনার্থে পৃথিবীর নানা স্থানে মোরাস আল্‌বা (*Moras alba*) প্রজাতির তুঁত গাছ লাগানো হয়। ভারতবর্ষে সাধারণত: মোরাস ইন্‌ডিকা (*M indica*) প্রজাতির তুঁত গাছ দেখা যায়। বহু দেশে তুঁত গাছের ফল খাওয়া হয়।

দুর্গাকুমার ভট্টাচার্য

তুতিকোরিন ৮°৪৮´ উত্তর এবং ৭৮°১১´ পূর্বে অবস্থিত। মাদ্রাজ রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দর। ইহা মাদ্রাজের তিন্নেভেলি (বর্তমান নাম তিরুনেলভেলি) জেলায় ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। মাদ্রাজ হইতে ইহার দূরত্ব ৭১৬ কিলোমিটার। বস্তুত: বন্দরটির জন্যই শহরের প্রসিদ্ধি, গুরুত্ব হিসাবে মাদ্রাজ বন্দরের পরেই ইহার স্থান। প্রাচীন নাম তুত্তিক্কোডি। শহরটির আয়তন ১৩৭৮ বর্গ কিলোমিটার, মোট লোকসংখ্যা ১২৪২৩০ (১৯৬১ খ্রী)। মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৭১২৭৮ (১৯৬১ খ্রী)। নগরীর শাসনভার মিউনিসিপ্যালিটির উপর ন্যস্ত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ৬৩৫ মিলিমিটার (২৫ ইঞ্চি)। শীতকালে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। শহরটি শণ ও কার্পাস বয়নশিল্পের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ, মোট শ্রমিকের সংখ্যা ১২৫২৮। উপকূলভাগে প্রচুর ইল্‌মেনাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পর্তুগীজরা এখানে বসবাস আরম্ভ করে ও তাহাদের নিকট হইতে ইহা ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের হস্তগত হয় এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের দখলে আসে। শহরে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে (প্রাচীন) শিব ও বিষ্ণুর মন্দির, ওলন্দাজদিগের নির্মিত গির্জা (১৭৫০ খ্রী), রোমান ক্যাথলিক গির্জা, ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য।

গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকারের এবং মুক্তা-আহরণের ব্যবস্থাও এখানে আছে। ইহা ব্যতীত ধীবরদের জন্য

শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চামড়া, কাঁচা তুলা, কফি, মশলা ইত্যাদি ও আমদানি দ্রব্যের মধ্যে জ্বালানি তেল, যন্ত্রপাতি, ভারী কলকবজা ইত্যাদি প্রধান।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXIV, Oxford, 1908, *Census of India, 1961*, vol. IX, Madras, 1965.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

তুন্দ্রা ইহা রুশ শব্দ, অর্থ — বিস্তৃত বিলজাতীয় নিম্নভূমি। ইহা সুমেরু প্রদেশের শীতল মরুভূমি অঞ্চলের নাম। এখানে সারা বৎসর জমিতে বরফ জমিয়া থাকে, কেবল নাতিদীর্ঘ গ্রীষ্মের ২।৩ মাস জমির উপরিভাগে কয়েক ফুট বরফ গলিয়া জলাভূমির সৃষ্টি করে।

এই অঞ্চলে শেওলা, লিচেন ও বাঁচজাতীয় খর্বাকৃতি অল্পসংখ্যক বৃক্ষ বা শীত উদ্ভিদ দেখা যায় না, কৃষি প্রায় অসম্ভব। সাইবেরিয়াতে মূলজাতীয় (যেমন গাজর) কিছু শস্যের চাষ হয়।

স্থলে ক্যারিবু (caribou), ষাঁড় (musk ox), বৃহৎ শৃঙ্গ হরিণ, লোমশ শৃগালজাতীয় জন্তু, শাদা ভালুক ইত্যাদি এবং সমুদ্রে সীল, সিন্ধুঘোটক, বিভিন্ন মাছ এবং পেঙ্গুইন, বক ও হংসজাতীয় নানা প্রকার পাখি দেখা যায়।

এস্কিমো ও ল্যাপ্ (Lappe) এই অঞ্চলের অধিবাসী, ইহাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য মঙ্গোলীয়। এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, কিন্তু অনুসন্ধান ও খননকার্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 'এস্কিমো' দ্র।

সান্ত্বনা দাস

তুর্কী একটি ভাষার (টার্কিশ্) নাম। এই ভাষা অল্টাই বা তুর্ক মঙ্গোল ভাষার গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ইওরোপে সংলগ্ন ও অসংলগ্ন অঞ্চলে প্রচলিত উরাল গোষ্ঠী এই অল্টাই গোষ্ঠীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অনেক পণ্ডিত একদা এই দুই গোষ্ঠীকে এক বৃহত্তর গোষ্ঠীর দুই স্থূল শাখা বিবেচনা করিতেন। অল্টাই গোষ্ঠীর ভাষা এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত মালার আকারে বিস্তৃত। পশ্চিম শাখাকে তুর্কী শাখা বলা হয়, তুর্কী ভাষা ইহারই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। মধ্যদেশীয় শাখা হইল মঙ্গোল, পূর্ব শাখা মাঞ্চু।

পদগঠনরীতি অনুসারে উরাল-অল্টাই গোষ্ঠীদ্বয়ের ভাষাগুলি 'সংশ্লেষক' (আগ্ল্যুটিনেটিভ্)। অর্থাৎ এ ভাষায় প্রকৃতি-প্রত্যয় পর পর এমন ভাবে সংলগ্ন থাকে যে সহজেই সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। যেমন তুর্কী ভাষায়--'এব্' (বাড়ি), 'এব্লের্' (বাড়িগুলি), 'এবিন্' (বাড়ির), 'এব্লেরিন' (বাড়িগুলির), 'এব্দে' (বাড়িতে), 'এব্লের্দে' (বাড়িগুলিতে), 'এব্দেন' (বাড়ি হইতে), 'এব্লের্দেন' (বাড়িগুলি হইতে) ইত্যাদি।

অল্টাই গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে তুর্কী সবাপেক্ষা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ। একদা আরবী অক্ষর ব্যবহৃত হইত। কামাল আতাতুর্কের আমল হইতে রোমান লিপি চলিতেছে। আধুনিক কালে তুর্কী সাহিত্য সমৃদ্ধির পথে চলিয়াছে। পুরাতন তুর্কী সাহিত্যও অবজ্ঞেয় নয়, গল্পে ছড়ায় ও কবিতায় তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

সুকুমার সেন

তুর্গেনেভ, ইভান সের্গেইভিচ (১৮১৮-৮৩ খ্রী)। রুশ সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগে'র (১৮৬০-৮০ খ্রী) প্রধান তিন জন সাহিত্যিকের একজন, মধ্য রাশিয়ার ওরেল শহরে অভিজাতবংশে তাঁহার জন্ম। পারিবারিক স্নেহে বঞ্চিত তুর্গেনেভ রাশিয়ায় ও জার্মানীতে শিক্ষালাভ করেন। পরেও জারতন্ত্রের অত্যাচারে অনেক সময়ে প্যারী শহরে থাকিতেন। সেখানে ইওরোপীয় শিল্পী সাহিত্যিকদের সমাজেও তুর্গেনেভ ছিলেন সমাদৃত বন্ধু। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গেই ছিল তাঁহার প্রাণের যোগ। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে একই সঙ্গে রুশ প্রকৃতি ও রাশিয়ার পল্লীর অবজ্ঞাত ভূমিদাস স্ত্রী পুরুষের প্রতি অকৃত্রিম মমতা লক্ষণীয়। রাশিয়ার সমকালীন বিদ্রোহ ও বিপ্লব চেতনায় চঞ্চল, উদ্বেল, নব্য শিক্ষিত যুবক যুবতীর ভাবসংকটের ও জীবনসংকটের চিত্র এবং উদারবুদ্ধি লেখকের আশা ও উদ্বেগ তাঁহার রচনাবলীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুমার্জিত ভাষায়, নিপুণ কলাকৌশলে ও চরিত্রাঙ্কণের দক্ষতায় তিনি সমসাময়িক রুশীয় সমাজের ইতিহাসকে তাঁহার গল্পে ও উপন্যাসে স্থায়ী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এইসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'শিকারীর রোজনামচা' (১৮৪৭-৫২ খ্রী), 'রুদিন' (১৮৫৬ খ্রী), 'বাবুদের বাসা' (১৮৫৯ খ্রী), 'পূর্বাহ্ণ' (১৮৬০ খ্রী), 'পিতা পুত্র' (১৮৬২ খ্রী), পরবর্তী 'ধোঁয়া' (১৮৬৭ খ্রী) ও 'অনাবাদী জমিতে' (১৮৭৭ খ্রী) এই ধারাই অব্যাহত, কিন্তু শিল্পশক্তির চরম বিকাশ 'পিতাপুত্রে'ই দেখা যায়।

দ্র গোপাল হালদার, রুশসাহিত্যের রূপরেখা, কলিকাতা, ১৯৬৬।

গোপাল হালদার

তুলট হরিতালাদি দ্বারা মাজা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ হাতে তৈয়ারি কাগজ। সাধারণতঃ তুলা (কার্পাস) হইতে প্রস্তুত হইত বলিয়া এই নাম। ব্যাপক অর্থে কুটির-শিল্পজাত যে কোনও কাগজ।

সর্বপ্রথম চীন দেশে আনুমানিক ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে তুলট তৈয়ারির কলা আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তী কালে তাঁহাদের নিকট হইতে আরব ও মোগলদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে এই শিল্প ছড়াইয়া পড়ে। জাপানে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে এবং সমরখন্দ ও বাগদাদে ৮ম শতাব্দে তুলট কাগজের কারখানা হইয়াছিল বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়।

ভারতে সর্বপ্রথম ১০ম শতাব্দে গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণের পর এই শিল্প প্রবর্তিত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। মতান্তরে চীন হইতে তিব্বত ও নেপাল হইয়া কাগজ তৈয়ারির কলা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। মোগলেরা তুলট কাগজশিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও বঙ্গে এই শিল্প ছড়াইয়া পড়ে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এক শিয়ালকোটেই বাৎসরিক ৯ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলট কাগজ উৎপন্ন হইত এবং শিখদের আমলে সেখানে মণ্ড তৈয়ারির কাজে ১২০০ ঢেঁকি নিযুক্ত ছিল। প্রাচীন কাগজ-শিল্পীদের কাগজী বলা হইত এবং তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। তাঁহারা সাধারণতঃ গ্রামের এক সুনির্দিষ্ট অংশে অথবা পৃথক গ্রামে বাস করিতেন। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে ও উত্তর প্রদেশে এবং বাংলা দেশের মৈনান (হাওড়া), মাদপুর (দেউলটি হাওড়া), কলমা ফরিদপুর (হুগলি), দেওয়ানগঞ্জ (হুগলি) ইত্যাদি গ্রামে এখনও কাগজীদের বসতি আছে।

প্রাচীন কালে পুরাতন কার্পাসবস্ত্র অথবা পাট বা শণকে চুনের জলে ২ হইতে ৯ দিন ডুবাইয়া রাখিবার পর ঢেঁকিতে কুটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করা হইত। অতঃপর তাহাকে বার বার জলে ধুইয়া কাগজ তৈয়ারির উপযুক্ত মণ্ড পাওয়া যাইত। তাহার পর ঐ মণ্ডকে জলপূর্ণ পাত্রে জলের সহিত ভালভাবে গুলিয়া ঘাস, বাঁশ অথবা সরের কাঠির ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া কাগজ তোলা হইত। এই কাগজ হইতে জল শুখাইয়া তেঁতুলের বীজ ও চাল ইত্যাদির কলপ দিয়া প্রয়োজনমত আকারে কাটিয়া লইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত কাগজ প্রস্তুত হইত। বর্তমানে উপরি-উক্ত কাঁচামাল ব্যতিরেকে পুরাতন কাগজ, কাপড়ের ছাঁট, বাঁশ ও খড় ইত্যাদি হইতেও তুলট কাগজ তৈয়ারি হয় এবং মণ্ড তৈয়ারি, ছাঁকিয়া তোলা, জলনিষ্কাশন, কলপ দেওয়া, মসৃণ করা ও কাগজ কাটা ইত্যাদি তুলট তৈয়ারির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নানা রকম ছোটখাটো যন্ত্রের ব্যবহার হয়। বর্তমানে উন্নত ধরনের তুলটের মণ্ড বিটার-এ (Beater) তৈয়ারি হয় ও এই বিটার শক্তিচালিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া রজন, ফটকিরি, কষ্টিক সোডা, শিরিষ, ব্লিচিং পাউডার ও চীনামাটি ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগে তুলটের মান খুবই উন্নত করা সম্ভবপর হইয়াছে। বর্তমানে মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে ভাল তুলট কাগজ তৈয়ারি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে ইওরোপে প্রস্তুত কলের সস্তা কাগজ ভারতে আমদানি শুরু হওয়ায় এই শিল্প ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হয়। গ্রামীণ শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অখিল ভারত খাদি ও গ্রামীণ শিল্প আয়োগ তাহার উত্তরাধিকারী হয়। এই উভয় প্রতিষ্ঠানই তুলট-শিল্পের গবেষণা, নূতন যন্ত্রপাতি ও উন্নততর যন্ত্রকৌশলের প্রবর্তন, ইহার প্রশিক্ষণ এবং কাগজীদের সমবায় সমিতি ও এই কার্যে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধন ও অন্যান্য খাতে অর্থ সাহায্য দিয়া এই শিল্পের ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এতদুদ্দেশ্যে ২৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এইসব সহায়তার ফলে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে প্রায় এক হাজার কারিগর এই শিল্পে কাজ করিয়া ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলট উৎপাদন করিত সেখানে ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ৩৬ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলট উৎপন্ন হয় ও ইহার দ্বারা ৪ হাজার শিল্পীর জীবিকা নির্বাহ হয়।

তুলট তৈয়ারির কাঁচামাল প্রধানতঃ সেইসব জিনিস যাহা সচরাচর নষ্ট হয়, কাজেই এই শিল্প আবর্জনাকে সম্পদে রূপান্তরিত করে। তুলট যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও কারিগরি কারণে কলের কাগজ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক টেকসই ও পোকাতেও কম কাটে। দামী দলিল দস্তাবেজ, নকশা ও চিত্রশিল্পের কাজে তুলট অপরিহার্য।

দ্র Satish Chandra Das Gupta, *Hand Made Paper*, Calcutta, 1945, K. B Joshi, *Paper Making as a Cottage Industry*, Wardha, 1948; All India Khadi & Village Industries Board, *Hand-Made Paper Industry*, Bombay, 1955; All India Khadi & Village Industries Commission, *Annual Reports, 1961-66*.

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলসী লাবিয়াটিঈ গোত্রের (Family-Labiateae) অন্তর্গত ওসিমম (Ocimum) গণ-ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ অথবা ক্ষুদ্র গুল্মজাতীয়, গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ। ইহাদের শাখা বর্গাকৃতি, পত্র সরল এবং পত্রবিন্যাস বিপরীত। তুলসীর ক্ষুদ্র ফুলগুলি উভলিঙ্গ। ফুলের পাঁচটি যুক্ত বৃত্যংশ ফুল ঝরিয়া পড়িবার পরও থাকিয়া যায়। পাঁচটি পাপড়ি যুক্ত হইয়া দুইটি ঠোঁটের আকার ধারণ করে। পুংকেশর চারিটি এবং গর্ভপত্র দুইটি। তুলসীর ফলে চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। বীজ দ্বারা ইহার বংশবিস্তার হয়।

নিম্নলিখিত কয়েকপ্রকার তুলসী বাংলা দেশে দেখা যায়: ১. তুলসী বা কৃষ্ণতুলসী (ওসিমম সাংকৃতম, *Ocimum sanctum*) বাংলা দেশের সর্বত্র জন্মায়। পুষ্পের কিয়দংশ ও শাখা কৃষ্ণাভ লাল। ইহা হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্দিকাশির জন্য পাতার রস মধুর সহিত শিশুদের সেবন করানো হইয়া থাকে ২. বাবুই তুলসী (ওসিমম বাসিলিকম, *Ocimum basilicum*) দেখিতে সাধারণ তুলসীর ন্যায়, কিন্তু শাখা ও পুষ্পের রঙ শাদা। ইহা ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে মসলার ন্যায় রন্ধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ৩. রাম তুলসী (ওসিমম গ্রাটিস্সিমম, *Ocimum gratissimum*) ফুল ও পাতা তুলসীর তুলনায় বড়।

দ্র A F Hill, *Economic Botany*, New York, 1952

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

তুলসী গাছ অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। নারায়ণ-পূজায় ও শ্রাদ্ধকার্যে তুলসীর পাতা অপরিহার্য। দেবকার্য ও পিতৃকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে তিল-তুলসীসহ জল লইয়া সংকল্প করিতে হয়। দেবকার্যে এই সময়ে হরীতকীরও প্রয়োজন হয়। শ্রাদ্ধের অন্তর্গত প্রতিটি অনুষ্ঠানে তিল ও তুলসী ব্যবহৃত হয়। শালগ্রাম শিলার উপরে ও নীচে সব সময়ে তুলসী লাগাইয়া রাখিতে হয়। বলা হয়, যেখানে তুলসী গাছ সেখানে হরি সন্নিহিত থাকেন। তাই বাড়িতে তুলসী গাছ রাখা প্রশস্ত মনে করা হয়। অনেক বাড়িতে এই উদ্দেশ্যে তুলসীমঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। তুলসী গাছের গোড়ায় জল দেওয়া পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। তুলসীতলা পরিষ্কার করা, সন্ধ্যায় — বিশেষ করিয়া কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া মেয়েদের কর্তব্যরূপে পরিগণিত। তবে কোথাও কোথাও সধবা স্ত্রীলোকেরা এইসব কাজ করেন না। পূজার জন্য তুলসী তোলাও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তুলসীতলা পবিত্র স্থান, তাই মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় শয়ন করানোর প্রথা ছিল। গলায় ধারণ ও জপের জন্য বৈষ্ণবেরা তুলসী-কাঠের মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

তুলসীদাস (আনুমানিক ১৫২৩।৩১ ১৬২৩।২৬ খ্রী) হিন্দী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কবি। ইহার সম্বন্ধে খাঁটি কথা খুব কমই জানা যায়। তুলসীদাসের বয়ঃকনিষ্ঠ নাভাজীদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ ভক্তমাল গ্রন্থে তুলসীদাসের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রচুর নয়। নিজের রচনায় তুলসীদাস আত্মকথা কিছুই বলেন নাই। তবে তাঁহার কোনও কোনও উক্তি হইতে কিছু কিছু অনুমান করিতে পারা যায়। যেমন তিনি সোরোঁ ক্ষেত্রে বাল্য ও যৌবনের কিয়দংশ কাটাইয়াছিলেন এবং তাঁহার গুরু ছিলেন নরহরিদাস। তাঁহার জন্মস্থান ও পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে জনশ্রুতি একমত নহে। এখন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে তুলসীদাসের জন্ম হয় বাঁদা জেলার রাজপুর গ্রামে এক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী। তাঁহার বাল্যকালে নাম ছিল রামবোলা, পত্নীর নাম রত্নাবলী। তুলসীদাসের বৈরাগ্য অবলম্বন লইয়া একটি রোমাণ্টিক গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি পত্নীকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না। একদা রত্নাবলী পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। তুলসীদাস বিরহে কাতর হইয়া শ্বশুরবাড়ির দিকে ছুটিয়াছিলেন এবং বন্যাস্ফীত নদী পার হইয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পতির এই মূঢ়তায় পত্নী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, এই অনুরাগ তোমার যদি রামের প্রতি হইত তাহা হইলে সংসারে সোনা ফলিত। এই কথা তুলসীদাসের মনে লাগিয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে তিনি ঘর ছাড়িয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বৈরাগ্য গ্রহণের পরে তুলসীদাস মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া অবশেষে অযোধ্যায় আসেন। সেখানে থাকিতেই তাঁহার রামায়ণ গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করেন (আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রী)। তাহার পর তিনি কাশীতে আসেন এবং দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যন্ত কাশীতেই থাকেন। তাঁহার রামচরিত কাব্য এখানেই সমাপ্ত হয়। রচনার সমাপ্তিকাল জানা নাই। কাব্যটির যে প্রাচীনতম পুথি জানা আছে তাহার লিপিকাল সংবৎ ১৭০৪ (১৬৪৭ খ্রী)।

তুলসীদাসের রামচরিত কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'রামচরিত-

মানস' অর্থাৎ রামচরিত্ররূপ মানস সরোবর, যাহাতে শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের মনোহংস যথেষ্ট বিহার করিতে পারে। তাই তুলসীদাসের কাব্যের ভাগ সাতকাণ্ডে নয়, 'সোপান'-এ। 'রামচরিতমানস' অবধী অর্থাৎ পূর্বী হিন্দী ভাষায় রচিত। তবে ইহাতে তদানীন্তন সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ভাষা ব্রজভাষার (ও পশ্চিমা হিন্দীর কোনও কোনও আঞ্চলিক ভাষার) চিহ্ন আছে। রচনারীতি সাধু, অলংকারপুষ্ট, স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল। সংস্কৃতবিদ্যায় কবির অধিকার যে প্রগাঢ় ছিল তাহার পরিচয় সর্বত্র রহিয়াছে। কবিত্বের, সহৃদয়তার ও পাণ্ডিত্যের সহিত সরল বিশ্বাসের ও দৃঢ় ভক্তির সমন্বয় তুলসীদাসের কাব্যটিকে অনন্য মহত্ত্ব ও মর্যাদা দান করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারতীয় সাহিত্যের আর কোনও গ্রন্থ এতকাল ধরিয়া এত দেশ ব্যাপিয়া এত অধিক সংখ্যক পাঠক-শ্রোতাকে আনন্দ দিয়া যুগপৎ সাহিত্য ও সংগীতরসের এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির জোগান দিয়া আসিতে পারে নাই। উত্তরাপথের এক বৃহৎ অংশকে ভাবের ও ভক্তির ডোরে এক করিয়া রাখিয়াছে তুলসীদাসের রামচরিতমানস।

তুলসীদাসের রামচরিতমানস বাংলা ভাষায় অনেকবার অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃতেও অনূদিত হইয়াছিল 'প্রেম-রামায়ণ' নামে। অনুবাদক দশরথ কবিচন্দ্র ওড়িশার লোক ছিলেন।

তুলসীদাসের আরও কিছু রচনা আছে। তাহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'বিনয় পত্রিকা' ও দোঁহাবলী। তুলসীদাসের কিছু কিছু দোহা বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত আছে।

দ্র F. E Keay, *History of Hindi Literature*, Calcutta, 1920 ; S.K. Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

সুকুমার সেন

তুলসীবাঈ (১৭৮৭?-১৮১৭ খ্রী) ইন্দোরের যশোবন্ত রাও হোলকার-এর আদরিণী উপপত্নী। যশোবন্ত শেষ বয়সে উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে তুলসীবাঈ রাজ্য পরিচালনা করিতেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র মলহর রাও-এর অভিভাবিকারূপে তুলসীবাঈ রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ইংরেজের সহিত সংগ্রাম বাধিলে দ্বিতীয় বাজীরাও হোলকার-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষগণ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অস্থিরমতি তুলসীবাঈ তাঁহার সমর্থকদের পরামর্শে গোপনে ইংরেজের সহিত আপস রফা করিবার চেষ্টা করেন। হোলকারবাহিনী ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হইলে ইংরেজের সহিত গোপনে মীমাংসার খবর ফাঁস হইয়া যায় এবং তুলসীবাঈ রাজ্যের ইংরেজবিরোধীগণ দ্বারা গ্রেফতার হন ও মলহর রাওকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করা হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে ৩০ বৎসরবয়স্কা তুলসীবাঈকে হত্যা করিয়া তাহার দেহ শিপ্রা নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়।

চিন্তামণ বামন দাতার

তুলা পৃথিবীতে মোট ব্যবহৃত তন্তুর মধ্যে তুলা শতকরা ৬৮ ভাগ অধিকার করিয়া আছে। ভারতে জন্মানো তুলা গস্‌সিপিয়াম গণের ৪টি প্রজাতির অন্তর্গত এবং তাহারা হইতেছে . গ. আরবোরিয়াম এবং গ হের্বাসিয়ম কর্কশ, কম দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত দেশী তুলা, গ. হির্‌সুটম সূক্ষ্ম, মাঝারি হইতে লম্বা দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত আমেরিকা এবং কম্বোডিয়া তুলা, এবং গ বার্বাদেনসে— অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত দীর্ঘ আঁশের ঔনদ্রজ এবং মিশরীয় তুলা। প্রাচীন ভারতেই প্রথম তুলা চাষ করা শুরু হয় ইহার আঁশের জন্যই। ঋগবেদে ইহার উল্লেখ আছে। মহেঞ্জো-দড়োতে প্রাপ্ত তুলাজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ বিচারে অনুমান হয় যে এশীয় জাতের তুলার চাষ খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় তুলায় প্রস্তুত সূক্ষ্ম মসলিনের লোভে ইওরোপীয়রা নূতন বাণিজ্য-পথের সন্ধান করে। বর্তমানে পৃথিবীতে ৩৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে তুলার চাষ হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ ১১৯ লক্ষ মেট্রিক টন আঁশ। ভারত ছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ তুলা-উৎপাদক, দেশ বিভাগের দরুন উৎকৃষ্ট উৎপাদন অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যে বিপর্যয় দেখা দেয় তাহা সত্ত্বেও নিবিড় চাষ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যের দ্বারা বর্তমানে ভারতের স্থান চতুর্থ। অবশ্য শতকরা ৮৭ ভাগ অঞ্চলে তুলার চাষ বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল।

ভারতের কৃষি-অর্থনীতিতে তুলার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। তুলা, পাট, আখ, চীনাবাদাম এবং তৈলবীজ প্রভৃতি অর্থকরী ফসল চাষের জমির ⅓ অংশেই ইহার চাষ হয়। ভারতে প্রতি বৎসর উৎপাদিত তুলার মূল্য ২৫০-৩০০ কোটি টাকারও বেশি। কাপড়ের কল, বিভিন্ন তাঁতশিল্পে এবং লেপ, তোষক ইত্যাদির জন্য বাৎসরিক ৬০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের পণ্য ভারতীয় তুলা হইতেই

উৎপন্ন হয় এবং এইসব শিল্পে মোট প্রায় ৩৩ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে।

তুলার বীজ দুগ্ধবতী গাভীর একটি পুষ্টিকর ঘনীভূত খাদ্য। অধুনা শিল্পে এবং খাদ্যে ব্যবহারের জন্য বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা হইতেছে এবং এই শিল্পও দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ভারতে মোট উৎপাদিত বীজের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিদেশে রপ্তানি করা কাঁচা তুলার বাৎসরিক গড় মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা এবং কাপড়ের মূল্য ৫৭ কোটি টাকারও বেশি।

চাষের এবং কারিগরির বৈশিষ্ট্যে ভারতীয় তুলার ব্যাপক তারতম্য হইয়া থাকে, কারণ চাষের উপযোগী চারিটি প্রজাতির মধ্যে যে তিনটি প্রধানতঃ ভারতে চাষ করা হয়—পাঞ্জাবের অপার্বত্য অঞ্চল হইতে কন্যাকুমারীর পাদদেশ এবং আসামের অতি বৃষ্টি অঞ্চল হইতে কচ্ছের শুখা অঞ্চলে তাহাদের জন্মানো হয়।

সর্বাপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যের আঁশের মধ্যে 'বাংলা' জাত দেশী তুলার পর্যায়ে পড়ে, ইহার অপেক্ষা 'কুমিল্লা'র দৈর্ঘ্য আরও কম, কর্কশ এবং রঙ সাদা অথবা খাকি হইয়া থাকে।

দীর্ঘ আঁশের আমেরিকার তুলা ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দক্ষিণ ভারতে প্রথম প্রচলিত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অঞ্চলে 'জর্জিয়ান আপল্যাণ্ড' এবং 'নিউ অর্লিনস' প্রকারগুলি সাফল্যের সহিত নূতন জলবায়ুতে অভ্যস্ত করা হয় এবং তাহাদের বলা হয় 'ধারওয়ার আমেরিকা' তুলা। পরে

ভারতে তুলা ও তুলাবীজ উৎপাদন ঃ ১৯৬৫-৬৬ খ্রী

(ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের অন্তর্গত বোম্বাইস্থিত তুলা উন্নয়নের আঞ্চলিক কার্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

রাজ্যের নাম	তুলা চাষের জমির পরিমাণ হাজার হেক্টর	তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হাজার গাঁট	তুলার বীজ উৎপাদনের পরিমাণ হাজার মেট্রিক টন
অন্ধ্র প্রদেশ	১২৬·৮	১০৩ ৬	৩৭·৩
আসাম	১৭ ০	৬ ৯	২ ৫
উত্তর প্রদেশ	৮১ ৮	৫৫·৮	২০ ১
ওড়িশা	১ ১	১·৪	০·৫
কেরল	৭ ২	৬·৯	২·২
গুজরাত	১৭২৫ ৯	১৩০৯ ৭	৫০৭ ২
জম্মু ও কাশ্মীর	১ ১	১ ৫	০ ৫
ত্রিপুরা	৫·৭	৫·৪	১ ৯
দিল্লী	০·৩	০·২	০ ১
পণ্ডিচেরী	০·৩	০·৩	০·১
পশ্চিম বঙ্গ	৫০ হেক্টরের কম	৫০ গাঁটের কম	৫০ মেট্রিক টনের কম
পাঞ্জাব	৬৫৮ ০	১০৩৭ ০	৩৭৩ ৩
বিহার	২·০	৪ ৫	১ ৬
মধ্য প্রদেশ	৮৫১·২	৩০৯ ৪	১০২ ৮
মহারাষ্ট্র	২৫৩২ ৭	৯৬৮ ১	৩৬৮·৬
মহীশূর	৯৩৭ ১	১২৬ ৮	৭০·৮
মাদ্রাজ	৪২২·৩	৪৫৫·১	১৭১·৮
রাজস্থান	২৭৮ ১	১৬৫·১	৫৯·৬
হিমাচল প্রদেশ	০·৩	০ ১	৫০ মেট্রিক টনের কম
মোট—	৭৮২৬ ৬	৪৭০৭ ৯	১৭০৮ ৩

পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের হিসাব ১. ১১. ৬৬ তারিখে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের পূর্বে ঐ সকল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির হিসাব।

ভারতে উৎপন্ন তুলার রপ্তানির হিসাব

(ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের অন্তর্গত বোম্বাই শহরস্থিত তুলা উন্নয়নের আঞ্চলিক কার্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বৎসর	তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হাজার গাঁট	তুলা রপ্তানির পরিমাণ হাজার গাঁট
১৯৫৬ ৫৭	৪৭৩৫	২৯৯
১৯৫৭ ৫৮	৪৭৩৭	৩০৮
১৯৫৮-৫৯	৪৬৮৬	৪০০
১৯৫৯ ৬০	৩৬৭৮	২০১
১৯৬০ ৬১	৫৩৯৪	৩০০
১৯৬১-৬২	৪৫১২	৩২৮
১৯৬২-৬৩	৫৩৭৪	৩৫৪
১৯৬৩ ৬৪	৫৪৯৩	২৭৩
১৯৬৪ ৬৫	৫৬৬৪	২৪৩
১৯৬৫-৬৬	৪৭০৮	১৬৯

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোচীন হইতে তুলা রপ্তানির কালে কম্বোডিয়ার তুলাবীজ (আমেরিকার আপল্যাণ্ড জাতির একটি রূপ) গাঁটে মিশিয়া পণ্ডিচেরীতে পৌছায়। ইহাই বর্তমানের কম্বোডিয়া তুলা। বর্তমানে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩১ ভাগেই আমেরিকার তুলার জাত চাষ করা হয় এবং ইহার মূলে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অধিষ্ঠিত এবং অধুনালুপ্ত ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা সমিতির অবদান অনস্বীকার্য।

তুলা গ্রীষ্মমণ্ডলের ফসল। ইহা ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে চাষ করা হয়। ভারতের তুলা চাষের প্রায় অর্ধেক অঞ্চল মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং মহীশূরে সীমাবদ্ধ। ইহা ছাড়াও পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম-উত্তর প্রদেশ এবং আসামে ইহার চাষ হয়। বাংলা, বিহার, ওড়িশায় অথবা ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইহার চাষ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। পশ্চিম বঙ্গের উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলে কতকগুলি কোইম্বাটুর জাত উপযোগী এবং অধুনা পারভানি আমেরিকা জাতের তুলা হায়দরাবাদের মতই সাফল্যজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

গাঙ্গেয় পলি, উপদ্বীপীয় ভারতের কালো মাটি এবং দক্ষিণ ভারতের লাল এবং ল্যাটেরাইট মাটিতে তুলা ভাল জন্মায়। ইহা তুহিন এবং জলবদ্ধতা সহ্য করিতে

ভারতে তুলাজাত বস্ত্র উৎপাদনের হিসাব

(ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বোম্বাইস্থিত টেক্সটাইল কমিশনারের কার্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বৎসর	সুতা উৎপাদনের পরিমাণ মেট্রিক টন	কাপড় কলে উৎপাদন: বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ মিটার	ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ: ভারতীয় তুলা হাজার গাঁট	ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ: বিদেশজাত তুলা হাজার গাঁট	বিকেন্দ্রীভূত শিল্পে উৎপাদন: বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ মিটার
১৯৫৬	৭৫৮০৭৮	৪৮১২৩	৪৩৭২	৬১৯	১৬৬১০
১৯৫৭	৮০৭৪৫১	৪৮৬২২	৪৬২৫	৫৬৭	১৮১১০
১৯৫৮	৭৬৪৪৮৮	৪৫০৫২	৪৪৬০	৫২৪	১৯৬৮০
১৯৫৯	৭৮১৪৬৪	৪৫০৩৮	৪৬২৯	৪৫৭	২০৭৫০
১৯৬০	৭৮৭৯৫৯	৪৬১৬২	৪১১২	২৮৫	২০১৩০
১৯৬১	৮৬২২৯৪	৪৭০১৪	৪৫১৬	১০৪৬	২৩৭২০
১৯৬২	৮৫৯৫৬৩	৪৫৬০৩	৪৬২৮	৯৮৭	২৪১২০
১৯৬৩	৮৯০৫৭৪	৪৪২২৯	৫১২৪	৭১০	২৮৭৬০
১৯৬৪	৯৬৪৮১৯	৪৬৫৩৫	৫৫৯৯	৬৩৮	৩০৬৬০
১ ৬৫	৯৩৯২৩৬	৪৫৮৭৫	৫৩৬৩	৭৪৯	৩০৫৬০
১৯৬৬ (জানুয়ারি নভেম্বর)	৮২৫৩৬৪	৩৮৯১৩	৪৮৬৩	৫১৫	২৮২১০

পারে না। শুষ্ক অঞ্চলে এবং পলিজ মাটিতে ইহা সেচের দ্বারা চাষ করা হয়। জমি তৈয়ারির প্রধান উদ্দেশ্য মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা এবং সাধারণতঃ ২-৪ বার লাঙ্গল অথবা বিদা দিয়া মোটামুটি জমি তৈয়ারি করা। প্রস্তুতির চাষ দায়সারা করিয়া দেওয়া হইলে অন্তর্বর্তী-কালীন চাষ ঘন ঘন দেওয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদি, দীর্ঘ আঁশের ফসল এবং বেশি জল ধারণক্ষম ও সেচের জমিতেও বীজ বপন জলদি করা হয়। উত্তর ভারতেও দক্ষিণ ভারতের অপেক্ষা জলদি বীজ বপন করা হয়। তুলার বীজে আঁশের দরুন গঙ্গের দ্বারা বপন সহজ করার জন্য কাদা, গোবর অথবা উভয়ের প্রলেপ দেওয়া হয়। বীজের উপরে অ্যামোনিয়াম সালফেটের প্রলেপ প্রয়োগে গাছ দ্রুত পূর্ণতা পায় এবং ফলন বৃদ্ধি পায় এরূপ বলা হয়। বপনের পূর্বে রাতে ভিজাইয়া রাখিলে বীজের অঙ্কুরিত হওয়া সহজ হয়। বীজবাহিত রোগ পোকার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বীজ ধূপন এবং শোধন করা হইয়া থাকে। প্রধান বপনপদ্ধতি অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ৬-২২ কিলোগ্রাম বীজ লাগে। তুলা সাধারণতঃ ছিটাইয়া বোনা হয়, তবে সারিতে বোনা ক্রমেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। বর্ষার স্বভাব প্রকার, প্রাপ্য জল এবং মাটির উর্বরতা অনুযায়ী ০·৩ ১·২ মিটার সারিতে ১৫ ৪৬ সেন্টিমিটার দূরে দূরে প্রতি গর্তে তিনটি করিয়া বীজ বপন করা হয়। ইহাতে পর্যাপ্ত সার দেওয়া হয় না। সেচের চাষে কেবলমাত্র ৩৭-৭৮ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন সার লাভজনক প্রমাণিত হইয়াছে। হেক্টর প্রতি ২৫ মেট্রিক টন কম্পোস্ট বা জৈব সার প্রয়োগ অনুমোদন করা হয়। সাধারণতঃ অন্যান্য ফসলের সহিত পর্যায়ক্রমে চাষ করা হইয়া থাকে। বর্তমানে জোয়ার (অথবা গম)-চীনাবাদাম-তুলার পর্যায় সুপারিশ করা হইতেছে। একক চাষ না করিয়া তুলার মিশ্র চাষ ভারতের সর্বত্রই জনপ্রিয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ধান, ভুট্টা, জোয়ার, মাড়োয়া, বিমলি, তিল, রেড়ি, ডালশস্য অথবা সবজির সহিত তুলার মিশ্র চাষ করা হয়। চারার বয়স তিন সপ্তাহ হইলে প্রতি গর্তে একটি করিয়া রাখিয়া বাকি গাছ উঠাইয়া ফেলা হয় অথবা অন্যত্র ফাঁক ভরাট করা হয়। ফুল ফোটা শুরু হয় ৭-১০ সপ্তাহ পরে। পরাগ নিষেকের সঙ্গে সঙ্গে সর্পিল ভাবে নীচে হইতে উপরের দিকে বীজকোষের গঠন শুরু হয় এবং প্রায় ৪ সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণতা পায়। বীজকোষ সম্পূর্ণ পাকিয়া, সম্পূর্ণ ফাটিয়া, সূর্যালোকে তুলা ফাঁপিয়া উঠিলেই তোলা উচিত। উপযুক্ত ব্যবধানে ৩ অথবা ৪ বারে তুলা তোলার কাজ শেষ করা হয়। তুলা পরিষ্কার সকালে আবর্জনামুক্ত করিয়া তোলা উচিত। হেক্টর প্রতি কার্পাস (বীজসহ তুলা) ফলনের তারতম্য গড়ে প্রায় ৩০০ ৭০০ কিলোগ্রাম হইয়া থাকে এবং ইহার মধ্যে আঁশের পরিমাণ ১/৩ অংশেরও কিছু বেশি হইয়া থাকে। উন্নত জাতের তুলায় সযত্ন চাষে হেক্টর প্রতি ২২৫ ৩৫০ কিলোগ্রাম আঁশ পাওয়া সম্ভব।

বিভিন্ন জাতের তুলার বিশুদ্ধতা এবং গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কেন্দ্রের দুইটি প্রধান আইন হইতেছে: ১ তুলা পরিবহন আইন (১৯২৩ খ্রী) এবং ২ তুলার আঁশ ছাড়ানো এবং প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কারখানার আইন (১৯২৫ খ্রী)।

ভারতে তুলার উৎপাদন, ব্যবহার, রপ্তানি প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারত সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত নানাবিধ তথ্য ৭৩৫-৩৬ পৃষ্ঠার তালিকাগুলিতে প্রদত্ত হইল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে তালিকাগুলিতে উল্লিখিত প্রতি গাঁট তুলার পরিমাণ ১৮০ কিলোগ্রাম।

দ্র Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India*, vol IV, New Delhi, 1956; Indian Central Cotton Committee, *Improved Methods of Cotton Cultivation*, Bombay, 1958, Indian Central Cotton Committee, *Cotton in India . Fifteen years of progress*, Bombay, 1963, Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966; Food and Agriculture Organization, United Nations, *Production Yearbook*, vol 19 Rome, 1966.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

তুলাতন্তুর শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই সেলুলোজ নামক কার্বোহাইড্রেট। সী আইল্যাণ্ডে সর্বাপেক্ষা লম্বা (৩ ৫ সেন্টিমিটার) তন্তুবিশিষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। মিশরীয় তুলাও ঐ জাতীয়। আমেরিকান তুলার তন্তু প্রায় ২-৩ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। সূক্ষ্ম সুতার জন্য দীর্ঘ তন্তুর প্রয়োজন। তুলাতন্তু বহিস্থ প্রাথমিক স্তর, দ্বিতীয় স্তর ও মধ্যস্থ শূন্য স্থানে বিভক্ত। কস্টিক সোডা-র সংযোগে দ্বিতীয় স্তরটি স্ফীত হইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করে ও তন্তু মসৃণ হয়। ইহাকেই মার্সেরাইজেশন বলে।

শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলাদান দান দ্র

তুষার বায়ুতে সর্বদা জলীয় বাষ্প বর্তমান থাকে। উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করিবার শক্তি হ্রাস পায় ও জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। শীতপ্রধান দেশে ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অত্যধিক শৈত্যবশতঃ বায়ুর জলীয় বাষ্প শীঘ্রই তুষারে পরিণত হয় এবং তথায় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত হইয়া থাকে।

এই হালকা তুষার কণা স্তূপাকারে ভূমিতে পড়িয়া পেঁজা তুলার মত সঞ্চিত হইতে থাকে। উষ্ণতা বেশি হইলে সঞ্চিত তুষার গলিয়া যায়। ঐ তুষার গলা জলে ভূপৃষ্ঠের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। জল তুষারে পরিণত হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে কোনও শিলার ফাটলে বা ভূমিখাতে সঞ্চিত জল অধিক শীতে তুষারে পরিণত হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া পার্শ্ববর্তী শিলাসমূহ ভাঙিয়া ফেলে। তুষারের ষট্‌কোণযুক্ত তুষার স্ফটিক নিজ হইতে বা কোনও ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া মেঘহীন আকাশেও গঠিত হইতে পারে। ভাসমান তুষার স্ফটিকের আকৃতিগত পার্থক্য হইতে উহা কিরূপ ধরনের আবহাওয়ায় গঠিত হইয়াছে তাহার নির্দেশ পাওয়া যায়।

দ্র Glenn T. Trewartha, *An Introduction to Climate*, London, 1954.

সীমা চট্টোপাধ্যায়

তুষারযুগ একটি ভূতাত্ত্বিক সময়। বহু কোটি বৎসর পূর্বে তুষারস্তূপ ও হিমবাহ পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশগুলির অনেকাংশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। তুষারস্তূপ কোনও কোনও স্থানে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। টিলাইট নামক হিমবাহ অবক্ষেপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান, কার্বনিফেরাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগে তুষারযুগের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে প্লাইস্টোসিন যুগে সর্বশেষ তুষারযুগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই সময়ে উত্তর আমেরিকা, ইওরোপ ও এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ স্থান তুষার দ্বারা আবৃত ছিল। বর্তমানে আলাস্কা, গ্রীনল্যাণ্ড ও অ্যান্টার্কটিকার তুষার আচ্ছাদন ঐ তুষারস্তূপের অংশবিশেষ। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ কম থাকায় তুষার রাশির ব্যাপ্তি কম ছিল।

তুষারযুগের কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নানা অনুমান করেন, যেমন পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা, পৃথিবীর কক্ষতলের সহিত মেরুরেখার সর্বদা ৬৬½° কোণ করিয়া অবস্থান, সৌরকলঙ্কজনিত সৌরতাপের পরিবর্তন, পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে অক্ষরেখার স্থিতির পরিবর্তন (অয়ন চলন) প্রভৃতি প্লাইস্টোসিন যুগে প্রায় দশ লক্ষ বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে চারবার তুষারস্তূপের সম্প্রসারণ ও পশ্চাদপসারণ ঘটিয়াছিল।

তুষারস্তূপ বিগলিত হওয়ার পর পৃথিবীব্যাপী জল ও স্থলের উচ্চতার এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ভার-সাম্য (আইসোস্ট্যাসি) রক্ষার জন্য সত্বর তুষারমুক্ত স্থানগুলিতে ভূসঞ্চালন শুরু হইয়া যায়। মহাসাগরের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, তটরেখার পরিবর্তন হয়, কর্তিত শিলাস্তূপ নদীপথের গতি বদলায়। ভূপৃষ্ঠের শিলাক্ষয়ের জন্যই উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহু হ্রদের সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে এই ফলাফল লইয়া বহু গবেষণা চলিতেছে।

দ্র A Austin Miller, *Climatology*, London, 1938, Frederick E Zeuner, *Dating the Past*, London, 1958, F J Monkhouse, *Principles of Physical Geography*, London, 1962

বাণী বসু

তৃণভূমি যে অঞ্চলের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ তৃণ তাহাই তৃণভূমি নামে পরিচিত। এইসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ২৫০-৬০ মিলিমিটারের (১০-১২ ইঞ্চি) অধিক হয় না।

অতি অল্প ও অনিয়মিত বৃষ্টি অথবা অত্যধিক বৃষ্টি দুই ই তৃণের পক্ষে প্রতিকূল। সেইজন্য পৃথিবীর তৃণভূমি অঞ্চলগুলি উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল ও শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশে দেখা যায়।

পৃথিবীর তৃণভূমি অঞ্চলগুলিকে সাধারণতঃ উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ও পার্বত্য — এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি ভাগের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি বা সাভানা অঞ্চল নিরক্ষীয় বনভূমির উত্তর বা দক্ষিণ সীমা হইতে ২৫°/৩০° উত্তর বা দক্ষিণে মরু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে গ্রীষ্মে বৃষ্টি হয় ও শীতকালে বৃষ্টি হয় না। শীত ও গ্রীষ্মের উষ্ণতার প্রভেদ কম দেখা যায়। এখানে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। তৃণগুলি ৩/৪ মিটার (৮/১০ ফুট) দীর্ঘ ও বেশ পুরু হইয়া থাকে। নিরক্ষীয় বনভূমির নিকট তৃণভূমির মধ্যে কিছু বৃক্ষও দেখা যায়। মধ্য ভাগে প্রকৃত তৃণভূমি অঞ্চল। মরুর দিকে তৃণভূমির তৃণাচ্ছাদন কমিয়া

যায়। উষ্ণ অঞ্চলের এই তৃণভূমিকে আফ্রিকার উত্তর-পূর্বে সাভানা, দক্ষিণ আমেরিকার গিয়ানা ও ভেনেজুয়েলা অঞ্চলে লানো এবং ব্রাজিলে কামপো বলে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ও মধ্যের কিছু অংশে এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও অঞ্চলে এইরূপ তৃণভূমির সীমিত অঞ্চল আছে।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মহাদেশের মধ্য ভাগে মহাদেশীয় চরম জলবায়ুর জন্য পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তৃণভূমি অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম অতি প্রখর, বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রথমেই অল্প বৃষ্টি হয়। শীতকালে তুষারপাত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে কোনও কোনও স্থানে ওষধি ও কন্দজাতীয় উদ্ভিদও দেখা যায়। এই তৃণভূমি অঞ্চল স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তর আমেরিকার মধ্যে ক্যানাডা হইতে মিসিসিপি পর্যন্ত বিস্তৃত তৃণভূমিকে প্রেরি বলে। ইউরেশিয়ায় ইউক্রেন হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত রাশিয়ার বিখ্যাত কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চল, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, সাইবেরিয়া—ইহাকে স্তেপ্ বলা হয়। ইহা দক্ষিণ আমেরিকায় প্যাম্পা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেল্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় ডাউন নামে পরিচিত।

উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বৃক্ষসীমার ঠিক উপরে তৃণভূমি অঞ্চল দেখা যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তুষার গলা জলে ভূমি সিক্ত থাকে। উষ্ণতা বেশি না থাকায় বাষ্পীভবন কম হয়। অক্ষাংশ ও উচ্চতার উপর এই তৃণভূমি অঞ্চলের অবস্থান নির্ভর করে।

তৃণভূমি অঞ্চলে হরিণ, জিরাফ, খরগোশ প্রভৃতি বহু প্রকার তৃণভোজী প্রাণী ও তাহাদের ভক্ষণকারী হিংস্র জন্তুও দেখা যায়।

পশুপালনই এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ইহার ফলে এখানে দুধ, মাংস চামড়া, পশম প্রভৃতির ব্যবসায় ও তৎসংক্রান্ত নানাবিধ শিল্পগুলি যথেষ্ট উন্নত। বর্তমানে বহু স্থানে কৃষিকার্য করা হয়। প্রেরি ও স্তেপ্ অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে এত বেশি শস্য উৎপাদন করা হয় যে উহাদের 'শস্য ভাণ্ডার' বলা হয়। মরু অঞ্চলের নিকটবর্তী অধিবাসীগণ এশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের কিরঘিজ, প্রেরি অঞ্চলের রেড-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীগণ এখনও যাযাবর। যুগ যুগ ধরিয়া নিম্নভূমির পশুপালকগণ পার্বত্য অঞ্চলের ঋতু অনুসারে চারণভূমির খোঁজে উপরে আসে ও শীতকালে নামিয়া যায়। হিমালয়, আল্‌পস, টিয়েন্‌শান প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে এইরূপ বহু জাতি দেখা যায়।

দ্র F. J. Monkhouse, *Principles of Physical Geography*, London, 1960, Joseph E Van Riper, *Mans Physical World*, London, 1962.

সেবতী মিত্র

তৃষ্ণা দেহে জলাভাবজনিত অনুভূতি। প্রতি মুহূর্তে শরীর হইতে মল, মূত্র, ঘর্ম, বিবিধ ক্ষরিত রস ও নিঃশ্বাসের সহিত কিছু জল বাহির হইয়া যায়। উপযুক্ত পরিমাণে জল পান করিয়া দেহে জলের এই অভাব পূরণ না করিলে রক্ত ও অন্যান্য রসের অভিস্রবণ প্রেষ (অসমোটিক প্রেসার) বর্ধিত হয়, ফলে কোষের ভিতর হইতে অধিক পরিমাণে জল বাহির হইয়া আসে। এজন্য ঐ কোষগুলিতে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তৃষ্ণা তাহার পরোক্ষ ফল। কোষগুলিতে প্রয়োজনমত জলের অভাব হইতেছে—তৃষ্ণা তাহারই বিপদ-সংকেত। পিপাসার্ত প্রাণীর লালা ও শ্লেষ্মাগ্রন্থিগুলির ক্ষরণ কমিয়া মুখ ও গলা শুকাইয়া যায়। এই ক্লেশকর অবস্থাই জল পান করিয়া পিপাসা-নিবৃত্তির প্রেরণা দেয়।

ক্ষুধার ন্যায় তৃষ্ণাও একটি নার্ভকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই তৃষ্ণাকেন্দ্রটি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস-এ অবস্থিত ক্ষুধাকেন্দ্রের অতি নিকটে অথবা উহার সহিত মিশিয়া থাকার জন্য তৃষ্ণাকেন্দ্রের পৃথক সত্তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। দেখা গিয়াছে, হাইপোথ্যালামাসের এক অংশ বিকল হইলে প্রাণী জলাভাবে শুখাইয়া গেলেও জল পান করিতে চায় না, আবার অন্য এক অংশ উদ্দীপিত হইলে প্রা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পান করিতে থাকে। পাকস্থলীর পূর্ণতাবোধও পিপাসাকে কিছু পরিমাণে প্রশমিত করিতে পারে।

পারমলবিকাশ সেন

তেগ বাহাদুর শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগ বাহাদুর গুরু হরগোবিন্দের দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম গুরু হরকিশানের মৃত্যুর পর বাবলার ২২ জন সোধি গুরুত্বের দাবি করেন। তেগ বাহাদুর মাখনচাঁদের সাহায্যে গুরু হন। তিনি গুরু হইবার পর আনন্দপুরে একটি নগরী স্থাপন করেন। ইহার পর নারাঙ্গের মতে গুরুর কার্যাবলী ঔরঙ্গজেবের পছন্দ না হওয়ায় তিনি তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান ও সেখানে জয়পুরের রাজার সহায়তায় তিনি মুক্তি পান। কিন্তু মেকলিফের মতে তিনি তীর্থ ও প্রচারে বহির্গত হইয়া পাটনায়

আসিলে তথায় জয়পুরের রাজা রামসিং তাঁহাকে তাঁহার আসাম অভিযানে অনুগমন করিতে অনুরোধ করেন, ইহাতে গুরু সম্মত হন। আসামে অবস্থানকালে পাটনায় ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। আসাম-যুদ্ধের নিষ্পত্তির পর গুরু পুনরায় পাটনায় প্রত্যাবর্তন করেন ও তথায় কয়েক বৎসর বাস করেন। ইহার পর তিনি একাকী আনন্দপুরে প্রত্যাগমন করেন ও শতদ্রুতীরে মাখোয়াল বলিয়া একটি গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। ইহার পরে ক্যানিংহাম ও লতিফের মতে তেগ বাহাদুর জনৈক গোড়া মুসলমান আদম হাফিজের সহিত যোগ দিয়া হান্সি ও শতদ্রুর মধ্য ভাগে লুটতরাজ করায় মোগলরাজের বিরাগভাজন হইয়া ধৃত হন ও সম্রাটের সমীপে নীত হন। কিন্তু মেক্‌লিফের মতে গুরু শান্ত ও সংযত জীবন যাপন করিতে ছিলেন, শুধু কাশ্মীরী পণ্ডিতগণকে জোর করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করানোর প্রতিবাদ করায় তিনি ধৃত হন। দিল্লীতে গমনের পূর্বে তিনি তাঁহার পুত্র গোবিন্দ সিংহকে পরবর্তী গুরু মনোনীত করেন। নারাঙ্গের মতে গুরুর আত্মীয় রাম রায় ও ধীরমল মোগলরাজ সভায় প্রিয়পাত্র ছিলেন ও তাঁহাদের চক্রান্তে গুরু তেগ বাহাদুর ধৃত ও নিহত হন। দিল্লীতে নীত হইবার পর ঔরঙ্গজেব গুরুকে হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে নয় কোনও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইতে বলেন। গুরু কিছুই না করায় ও দৃঢ়ভাবে মুসলমান ধর্ম-গ্রহণে অস্বীকার করায় দারুণ দৈহিক অত্যাচার সহ্য করিয়া অবশেষে মৃত্যু বরণ করেন। শিখগুরু তেগ বাহাদুরের আত্মোৎসর্গ হিন্দুদিগকে, বিশেষ করিয়া শিখদিগকে প্রতিরোধগ্রহণে কৃতসংকল্প করে ও দশম গুরু গোবিন্দের পক্ষে শিখদিগকে সম্পূর্ণভাবে সামরিক জাতিতে পরিণত করা সহজসাধ্য করে।

দ্র Syad Muhammad Latif, *History of the Panjab*, Calcutta 1891, Max Arther Macauliffe, *The Sikh Religion Its Gurus, Sacred Writings & Authors*, vol IV, Oxford, 1909, Gokul Chand Narang, *The Transformation of Sikhism*, R C Majumdar, H. C Raychaudhuri & Kalikinkar Dutta, *An Advanced History of India*, London, 1946

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

তেজপাতা মশলা দ্র

তেজস্ক্রিয়তা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক বেকেরেল্ (Becquerel) সর্বপ্রথম তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার করেন। এক্স-রশ্মির আবিষ্কারের ন্যায় বেকেরেলের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারও এক আকস্মিক ব্যাপার। অধ্যাপক বেকেরেল্ ইউরেনিয়াম ধাতুজাত এক খনিজ পদার্থ একটি সুগ্রাহী ফোটোগ্রাফিক প্লেটের খুব নিকটে রাখিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি লক্ষ্য করেন যে ঐ প্লেটে কৃষ্ণ বর্ণের রেখাপাত হইয়াছে। অনেক পরীক্ষার পর তিনি প্রমাণ করেন যে ইউরেনিয়াম ধাতুজাত অনেক পদার্থ হইতেই তেজোরশ্মি আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসে— যাহার ফলে ফোটোগ্রাফিক প্লেটে কালো দাগ পড়ে। এই রশ্মিরই নামকরণ হইয়াছিল— বেকেরেল্ রশ্মি, আর যেসব পদার্থ হইতে এই রশ্মি স্বতঃই নির্গত হয়, তাহাদেরই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নামে অভিহিত করা হয়।

বেকেরেলের আবিষ্কারের কিছু পরে অধ্যাপক পিয়ের কুরি ও মাদাম কুরি পিচ ব্লেণ্ড হইতে আর একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার করেন— তাহার নাম দেওয়া হয় পোলোনিয়াম। ইহার কয়েক বৎসর পর কুরি দম্পতি আরও একটি প্রভূত শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার করেন— ইহারই নাম রেডিয়াম। ৩০ টন পিচ ব্লেণ্ড হইতে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাত্র ২ মিলিগ্রাম রেডিয়াম তাঁহারা পৃথক করিতে পারিয়াছিলেন। রেডিয়ামের আবিষ্কারের পর হইতেই তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয় বলা যাইতে পারে। এই সময়ে একে একে অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার হয়, যথা আইওনিয়াম, রেডিও থোরিয়াম, মেসো থোরিয়াম ইত্যাদি।

অধ্যাপক রাদারফোর্ড পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে যে তেজোরশ্মি আপনা হইতেই নির্গত হয়, তাহাতে আল্‌ফা (α) ও বিটা (β) নামে দুই রকমের বিদ্যুৎ কণা দেখা যায়। আল্‌ফা কণাগুলি ধন বিদ্যুৎসম্পন্ন আর বিটা-কণাগুলি ঋণ বিদ্যুৎসম্পন্ন বেগবান ইলেকট্রন ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভিলার্ড (Villard) অনতিকাল পরেই দেখাইয়াছিলেন যে, এই দুই রকম বিদ্যুৎ কণা ছাড়াও তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে স্বতঃ উৎসারিত তেজোরশ্মির মধ্যে একপ্রকার শক্তিমান অতি হ্রস্ব বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বর্তমান থাকে। ইহাকেই গামা-রশ্মি বলা হয়। গামা রশ্মি বিদ্যুৎ কণা নয়, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। আলোর বেগে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই বিদ্যুৎ-বিক্ষেপ চারি দিকে সঞ্চারিত হয়। এ কথাও শীঘ্রই প্রমাণিত

হয় যে, হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকই (নিউক্লিয়াস) হইতেছে আল্‌ফা-কণা।

আল্‌ফা, বিটা ও গামা রশ্মির পদার্থ ভেদ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এই অনুপ্রবেশনশীলতা আল্‌ফা-কণার অপেক্ষাকৃত কম। ১ মিলিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর পাত আল্‌ফা-কণার গতিরোধ সহজেই করিতে পারে। বিটা রশ্মির অনুপ্রবেশনশীলতা আল্‌ফা কণার শতগুণ বলা যাইতে পারে। গামা-তরঙ্গ প্রায় ৩০ ৫০ সেন্টিমিটার পুরু লোহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে। আল্‌ফা, বিটা ও গামা, এই তিন রকমের রশ্মিই বায়ু কিংবা কোনও গ্যাসের ভিতর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক 'আয়ন' এর সৃষ্টি করে। ইহাকেই বলা হয় আয়নন প্রক্রিয়া (আয়োনাইজেশন)— যাহার ফলে বায়ু বা কোনও গ্যাসের অণুগুলির ভিতর যে পরমাণু থাকে, তাহা হইতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরমাণু হইতে ইলেকট্রন এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইলে তড়িৎ প্রবাহের সুযোগ হয়। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে সেজন্য বায়ু বা অন্য কোনও গ্যাসে তড়িৎ-পরিবাহিতা লক্ষিত হয়।

তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ যে স্বতঃই রূপান্তরিত হইতে হইতে ক্রমশঃ ভারী ওজন হইতে অপেক্ষাকৃত কম ভারী মৌলে পরিণত হয় এবং এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে আল্‌ফা কণা, বিটা-কণা এবং গামা রশ্মি নির্গত হয়, তাহা রাদারফোর্ডের সময় হইতেই জানা ছিল। তেজস্ক্রিয় মৌলের স্বতোরূপান্তরকে মোটামুটিভাবে তিনটি সিরিজ্ বা শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে যথা ১. ইউরেনিয়াম রেডিয়াম শ্রেণী ২. থোরিয়াম শ্রেণী ও ৩ অ্যাকটিনিয়াম শ্রেণী। প্রত্যেক শ্রেণীতেই তেজোরশ্মির স্বতঃ-উৎসারণের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের রূপান্তর আপনা-আপনি হইতে থাকে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতেই শেষ পদার্থ দেখা যায়— সীসা। সীসায় রূপান্তরিত হইবার পর হইতেই তেজস্ক্রিয়তার অবসান হয়।

তেজোরশ্মি নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তেজস্ক্রিয় মৌলের স্বতোরূপান্তর সম্পর্কে যে বিধি নিয়ম দেখা যায়, পরমাণুর গঠনতত্ত্ব হইতে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

সচরাচর যে হিলিয়ামের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাহার কেন্দ্রকে প্রোটন-সংখ্যা ২ এবং নিউট্রন সংখ্যা ২, কাজেই ইহার ভর-সংখ্যা ৪। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই হিলিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রকই হইতেছে আল্‌ফা কণা। সুতরাং কোনও পরমাণুর কেন্দ্রক হইতে আল্‌ফা-কণা বাহির হইয়া গেলে, কেন্দ্রকের ভর সংখ্যা ৪ কমিয়া যাইবে এবং কেন্দ্রকের প্রোটন-সংখ্যাও ২ কমিয়া যাইবে। ধরা যাক, কোনও মৌলের পারমাণবিক-সংখ্যা Z এবং তাহার ভর-সংখ্যা A, তাহা হইলে আল্‌ফা-কণা পরমাণুর কেন্দ্রক হইতে বাহির হইয়া গেলে মৌলের রূপান্তর নিম্নলিখিত নিয়মে সাধিত হইবে, যথা.

$$১\quad \left.\begin{array}{l} Z \rightarrow Z-2 \\ A \rightarrow A-4 \end{array}\right\}$$

রেডিয়ামের দৃষ্টান্ত লইলে পারমাণবিক সংখ্যা হইবে $Z=88$ এবং ভর সংখ্যা হইবে $A=226$, সুতরাং রেডিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক হইতে আল্‌ফা-কণা নির্গত হইলে রেডিয়াম একটি নূতন মৌলে পরিবর্তিত হইবে— যাহার পারমাণবিক-সংখ্যা $Z=86$ এবং ভর-সংখ্যা $A-222$। কাজেই দেখা যায় যে, পর্যায়সারণীতে এই নূতন মৌলটি দুই ধাপ পিছাইয়া যাইবে। এই নূতন মৌলটির নাম— রেডন (radon)। ইহা একটি তেজস্ক্রিয় গ্যাস। এখন দেখা যাক, পরমাণুর কেন্দ্রক হইতে বিটা-কণা বাহির হইয়া গেলে পরমাণুর রূপান্তর কিভাবে হয়। বিটা কণা ঋণ বিদ্যুৎসম্পন্ন ইলেকট্রন। সুতরাং কেন্দ্রক হইতে বিটা কণা নির্গত হইলে কেন্দ্রকের প্রোটন-সংখ্যা ১ বাড়িয়া যাইবে এবং পরমাণুর রূপান্তর নিম্নলিখিত নিয়মে সম্পন্ন হইবে, যথা

$$২.\quad Z \rightarrow Z+1$$

এ ক্ষেত্রেও নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হইবে— যাহার পারমাণবিক-সংখ্যা হইবে ১ বেশি। প্রোটনের তুলনায় বিটা কণার ভর নাই বলিলেই হয়, সেজন্য নূতন পরমাণুটির ভর সংখ্যা প্রায় একই থাকিবে। সুতরাং কেন্দ্রক হইতে বিটা কণা বিকীর্ণ হইলে যে নূতন মৌলটি পাওয়া যাইবে, তাহা পর্যায়সারণীতে এক ধাপ আগাইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তেজোরশ্মিবিকিরণের ফলে যে নূতন মৌলের সৃষ্টি হয়, পর্যায়সারণীতে তাহার স্থান পরিবর্তনের নিয়মগুলি (ডিস্‌প্লেসমেন্ট ল্জ) উল্লিখিত দুইটি সূত্র হইতে পাওয়া যায়। ফাজান (Fajan) ও সডি (Soddy) এই সূত্র দুইটি প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

তেজস্ক্রিয় মৌলের আয়ুষ্কাল. তেজোরশ্মি নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু ভাঙিয়া ভাঙিয়া পর-পর যে-সব নূতন মৌলের সৃষ্টি হয়, তাহাদের কোনও কোনওটির আয়ুষ্কাল কয়েক সেকেণ্ড, কোনও কোনওটির কয়েক মিনিট বা ঘণ্টা, আবার কোনও কোনওটির হাজার বৎসরেরও বেশি। তেজস্ক্রিয় মৌলের বিঘটন-ক্রিয়া (ডিসইন্টিগ্রেশন) যত দ্রুত হয়, তত শীঘ্রই তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণুগুলি ভাঙিয়া ভাঙিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণুগুলি রূপান্তরিত হইতে হইতে যে সময়ে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ অর্ধেক

তেজস্ক্রিয়তা

হইয়া যায়, সেই সময়কেই বলা হয় পরমাণুর অর্ধ-আয়ুষ্কাল (হাফ লাইফ)। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধ-আয়ুষ্কাল নিম্নে দেওয়া গেল :

ধাতু	সময়
রেডিয়াম	১৬২০ বৎসর
পোলোনিয়াম	১৩৬ দিন
অ্যাক্টিনিয়াম সি	২ মিনিট
অ্যাক্টিনিয়াম ইমানেশন ইত্যাদি	৪ সেকেণ্ড

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়ায় বাহিরের কোনও উত্তেজনার প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি ওজনে খুব ভারী, খুব বেশি সংখ্যায় প্রোটন ও নিউট্রন কেন্দ্রকে ঠাসাঠাসিভাবে থাকিলে অসাম্য-অবস্থার সম্ভাবনাই খুব বেশি—যার ফলে কেন্দ্রক হইতে তেজোবিন্দুরূপে প্রাথমিক কণাগুলি বাহির হইয়া আসা স্বাভাবিক। এখানে বলা আবশ্যক যে আমরা এখন জানি, বিটা কণার নিজস্ব অস্তিত্ব পরমাণুর কেন্দ্রকে বর্তমান নাই। এ কথাও প্রমাণিত হইয়াছে যে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কেন্দ্রকে নিউট্রন নিয়তই প্রোটনে রূপান্তরিত হইতেছে এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে ইলেকট্রন বা বিটা-কণার সৃষ্টি হইতেছে। বাহির হইতে গতিশীল প্রাথমিক কণার আঘাতে অপেক্ষাকৃত অল্প ভর-সংখ্যার মৌল হইতেও যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা যায় তাহা ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম দেখাইয়াছিলেন মাদাম কুরির কন্যা ইরিন্ জোলিও-কুরি ও জামাতা ফ্রেডারিক জোলিও। পদার্থের গঠনতত্ত্বের পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে পোলোনিয়াম হইতে নির্গত আলফা-কণা দিয়া যদি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুকে ধাক্কা দেওয়া যায়, তবে ধাক্কার ফলে অ্যালুমিনিয়ামের কিছু সংখ্যক কেন্দ্রক হইতে নিউট্রন নির্গত হয় এবং অ্যালুমিনিয়াম কেন্দ্রকগুলি এক নূতন তেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত হয়। এই নূতন মৌলের নাম তেজস্ক্রিয় ফসফরাস (রেডিও ফসফরাস)। ইহার পারমাণবিক সংখ্যা ১৫ এবং ভর-সংখ্যা ৩০। তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ক্ষণস্থায়ী—অল্প সময়ের মধ্যেই এটি পজিট্রন বিকীর্ণ করিয়া স্থায়ী সিলিকন পরমাণুতে পরিণত হয়।

যে প্রক্রিয়ায় রেডিও-ফসফরাসের সৃষ্টি হয়, প্রচলিত সংকেত অনুসারে তাহা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় :

$$\mathrm{Al}^{A=27}_{Z=13} + \mathrm{He}^{A=4}_{Z=2} \rightarrow \mathrm{P}^{A=30}_{Z=15} + \mathrm{n}^{A=1}_{Z=0}$$

(অ্যালুমিনিয়াম + আলফা-কণা → রেডিও ফসফরাস + নিউট্রন)

আর যেভাবে রেডিও ফসফরাস পজিট্রন বিকীর্ণ করিয়া পরে সিলিকন পরমাণুতে পরিণত হয় তাহা নিম্নলিখিত ভাবে লেখা হয় :

$$\mathrm{P}^{A=30}_{Z=15} \longrightarrow \mathrm{Si}^{A=30}_{Z=14} + e$$

(রেডিও ফসফরাস → সিলিকন + পজিট্রন)

তেজস্ক্রিয় ফসফরাস আবিষ্কারের পর বহু কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। ওয়াল্টন, ককক্রফ্ট, লরেন্স এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী নিজেদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, আলফা কণা বা ডয়টেরনকে ত্বরান্বিত করিয়া ইহাদের চল-শক্তি প্রভূতভাবে বর্ধিত করিয়াছিলেন। এইসব প্রচণ্ড গতিশীল প্রাথমিক কণা দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ভর-সংখ্যার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে যখন আঘাত করা সম্ভব হইল, তখন এই আঘাতের ফলে নূতন নূতন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হইতে দেখা গেল। এইভাবে উৎপন্ন কয়েকটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গতি-সম্পন্ন প্রোটন দ্বারা কার্বন-পরমাণুকে আঘাত করিলে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেনের উদ্ভব হয় এবং অল্পক্ষণ পরেই এই তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন পজিট্রন বিকীর্ণ করিয়া কার্বনের একটি স্থায়ী আইসোটোপে পরিণত হয়। আবার দেখা যায়, বোরনকে বেগবান ডয়টেরন দিয়া আঘাত করিলে তেজস্ক্রিয় কার্বন পাওয়া যায়। অল্পক্ষণ পরেই এই তেজস্ক্রিয় কার্বন পজিট্রন বিকীর্ণ করিয়া বোরনের এক স্থায়ী আইসোটোপে পর্যবসিত হয়। এই প্রসঙ্গে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লরেন্স তাঁহার সাইক্লোট্রন (Cyclotron) যন্ত্রে ডয়টেরনকে ত্বরান্বিত করিয়া এবং সোডিয়াম-পরমাণুর সহিত তাহার সংঘাত ঘটাইয়া তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম পাইয়াছিলেন। তেজস্ক্রিয় সোডিয়ামের অর্ধ-আয়ুষ্কাল ১৫ ঘণ্টা, সেজন্য তেজস্ক্রিয় সোডিয়ামকে চিকিৎসার কাজে বা শারীরবিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রয়োগ করা সহজ ও সুবিধাজনক হইয়াছে। তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম গামা রশ্মি ও ইলেকট্রন বিকীর্ণ করিয়া পরে স্থায়ী ম্যাগনেসিয়ামে রূপান্তরিত হয়।

নিউট্রন দিয়াও যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব— বিখ্যাত ইটালীয় বিজ্ঞানী ফের্মি তাহা দেখাইয়াছিলেন। বেরিলিয়াম (Beryllium)-কে আলফা-কণা দিয়া আঘাত করিলে অসংখ্য নিউট্রন নির্গত হয়। এইভাবে প্রাপ্ত নিউট্রন দিয়া ফের্মি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি

করিয়াছিলেন। পদার্থকে এইভাবে সহজেই তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিণত করা যায়। আজকাল প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থকেই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিণত করা সম্ভব। 'পরমাণু' দ্র।

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

তেজারতি মহাজনি দ্র

তেরেন্‌তিয়ুস (খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৫ ১৫৯) লাতিন নাট্যকার। খুব সম্ভব, ইনি উত্তর আফ্রিকাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লটাসের সহিত তাঁহার রচনার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। তিনি বিদগ্ধ ও সূক্ষ্মমনা পাঠকদের জন্যই লেখনী ধরিযাছিলেন। যদিও প্লটাসের সরল ও প্রাণবন্ত বর্ণনা তাঁহার রচনাভঙ্গীতে অনুপস্থিত, তথাপি তেরেনতিয়ুসের লেখায় সমধিক সাবলীলতা, সুষমা ও ভাবমাধুর্য লক্ষিত হয়। তাঁহার কথোপকথনগুলি স্বচ্ছন্দ ও সুসংবদ্ধ। তিনি ছয়টি মিলনান্ত নাটক লিখিযাছেন – সেগুলির অধিকাংশই পরবর্তী ইওরোপীয় নাট্যকারগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। তেরেনতিয়ুসকে সম্ভবতঃ বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইযাছিল, কারণ তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকাগুলিতে তিনি তাঁহার বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাব দিযাছেন। তাহার লেখায় 'আমি একজন মানুষ, মানবিক কিছুই আমার চিন্তা বা ভাবনার বাহিরে বলিযা গণ্য করি না' এই মহাবাণী পাওয়া যায়।

বাবরাব আদুনায়ান

তেলকুপি ২৩°৩৮′ উত্তর ও ৮৬°২৫′ পূর্ব। পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিযা জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। এই গ্রাম হইতে প্রায় ১৪ কিলোমিটার (৯ মাইল) দূরবর্তী পাঞ্চেতের সন্নিকটে দামোদরের উপর এক বাঁধ নির্মিত হওযায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার অধিকাংশ স্থান দামোদরের স্ফীত জলধারায় নিমজ্জিত হয। পুরুলিযা জেলার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত এই গ্রামটি রঘুনাথপুর হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) ও চেলিযামা হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরে অবস্থিত ছিল। তেলকুপির আযতন ছিল প্রায ৭ বর্গ কিলোমিটার (১৬১৩ একর)। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অধিবাসীদের সংখ্যা ১৪১৮ ছিল। গ্রামবাসীদের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী।

তেলকুপি তৈলকম্পী নামের অপভ্রংশ। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত কাব্যের ভাষ্য হইতে জানা যায়, তৈলকম্পী পঞ্চকোটের শিখর রাজবংশের নৃপতি রুদ্রশিখরের রাজধানী ছিল। পঞ্চকোটের রাজা উপাধিধারী জমিদারেরা খুব সম্ভব শিখরবংশোদ্ভূত। ইহাদের জমিদারির বহুলাংশ শিখরভূম নামে পরিচিত। পঞ্চকোটের রাজারা জলপ্লাবনের পূর্ব পর্যন্ত তেলকুপির মন্দিরগুলির স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং এখানকার মন্দিরের পূজা-পার্বণের ব্যয় অধিকাংশই বহন করিতেন।

শিখর বংশের রাজধানী থাকায় তেলকুপিতে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির প্রচুর নিদর্শন ছিল।

গ্রামটি মন্দিরে মন্দিরে আকীর্ণ ছিল। অধিকাংশ মন্দিরই বেলে পাথরের। মন্দিরের সর্বাপেক্ষা অধিক সমাবেশ ছিল দামোদর নদের একেবারে কিনারায় ভৈরবথানে। আনুমানিক ১৫শ ১৬শ শতাব্দীতে নির্মিত ভৈরবনাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ নাতিপ্রসর স্থলটি ভৈরবথান। ভৈরবনাথের মন্দির পবিত্রতম বলিযা বিবেচিত হইত। ভৈরবথানেই প্লাবনের কিছু পূর্ব পর্যন্ত ন্যূনপক্ষে ত্রয়োদশটি মন্দির বিরাজমান ছিল, আরও ত্রয়োদশটি মন্দির গ্রামের বিভিন্ন অংশে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটি (ইহারা তেলকুপির প্রান্তে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত) এখনও বিদ্যমান।

মন্দিরে পরিকীর্ণ তেলকুপি একটি পবিত্র তীর্থরূপে বিবেচিত হইত। এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পঞ্চোপাসনার অন্ততঃ চারিটি মত— শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও শাক্ত— সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও শৈব ধর্মই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও এখানে ১৬টি শৈব মন্দির বিরাজিত ছিল। শিবলিঙ্গেরই সাধারণতঃ আরাধনা করা হইত। উমার সহিত শিবের একটি শান্তমূর্তি আর একটি ভয়ংকর অন্ধকাসুরহন্তৃমূর্তিও এইখানে পূজিত হইত। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে তিনটি সূর্যের মন্দির ছিল। ভৈরবথানেই ন্যূনপক্ষে বিষ্ণুর দুইটি মন্দির ছিল।

তেলকুপি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কেন্দ্র ছিল তাহাই নহে, জৈন ধর্মও অন্ততঃ কিছুটা প্রসার লাভ করে। প্লাবনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ভৈরবথান মন্দিরের জগমোহনের অভ্যন্তরে নেমিনাথের শাসনদেবী অম্বিকার একটি প্রাচীন মূর্তি (খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতাব্দীর) ছিল।

খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত তেলকুপিতে স্থাপত্যকর্ম অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। এই মন্দিরবাজি উত্তর ভারতীয় নাগর রেখ মন্দিরের আঞ্চলিক শাখার স্থাপত্যরীতির মূল্যবান প্রামাণিক নিদর্শন ছিল। বঙ্গীয় রেখ দেউলের বিবর্তনধারার ইতিহাসে ইহাদের

ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, এখানকার মন্দিরের কতকগুলি মুখ্য বৈশিষ্ট্য কেবল প্রতিবেশী জেলা বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মন্দিরসমূহেই নহে, ওড়িশার কোনও কোনও অঞ্চলের মন্দিরেও পরিলক্ষিত হয়। তবে, সামগ্রিক স্থাপত্য রূপরীতির দিক হইতে তেলকুপির প্রথম পর্বের মন্দিরগোষ্ঠীর সহিত ময়ূরভঞ্জ জেলার খিচিং এবং চন্দ্রশেখর-মন্দিরের সহিত সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি।

তেলকুপির মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যকৃতির স্থান গৌণ। একটি মাত্র মন্দির ছাড়া সমস্ত মন্দিরই রেখ-গোষ্ঠীর।

দ্র নির্মলকুমার বসু, 'মানভূম জেলার মন্দির', প্রবাসী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, 'Report of a Tour through the Bengal Provinces in 1872-73', *Archaeological Survey of India*, vol. VIII, Calcutta, 1878; *An Report of the Archaeological Survey of Bengal Circle, for the year ending with April 1903*, Calcutta, 1903; H. Coupland, *Bengal District Gazetteers: Manbhum*, Calcutta, 1911, N. K. Bose, 'Notices of the temples of Telkupi', R. D. Banerji, *History of Orissa*, II, Calcutta, 1931, R. Prasad, *District Census Handbook: Purulia*, Patna, 1956.

দেবলা মিত্র

তেলাঙ্গ, কাশীনাথ ত্র্যম্বক (১৮৫০-৯৩ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী নেতা ও বিশিষ্ট পণ্ডিত। গোয়ার গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যবিত্তপরিবারে বোম্বাই শহরে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. এ. ও আইন অধ্যয়ন করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায়ও গভীর জ্ঞানী ছিলেন এবং হিন্দু আইনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম ছিলেন এবং উহার বোম্বাই প্রদেশের সম্পাদক ছিলেন। বোম্বাই আইন পরিষদে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এবং মার্জিত ব্যবহার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সকল শ্রেণীরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেট-এর সভ্য এবং অত্যল্পকালের জন্য ইহার ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন। হাইকোর্টে প্রদত্ত তাঁহার রায়গুলি প্রামাণিক নজীর বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সভাপতি নিযুক্ত হন। 'দি সেক্রেড বুক্‌স অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থাবলীভুক্ত 'ভগবদ্‌গীতা'-র ইংরেজী অনুবাদ ও শংকরাচার্য সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবন্ধ তাঁহার পাণ্ডিত্যের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। বোম্বাই-এর ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপনা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

চিন্তামণ বামন দাতার

তেলিয়াগড়ী বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলায় সাহিবগঞ্জ (২৫°১৩ উত্তর ও ৮৭°৪০ পূর্ব) রেলস্টেশনের প্রায় ১২ কিলোমিটার (৭ মাইল) পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়ে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ। মোগল যুগে বাংলার পশ্চিম সীমানা এই গড়ী পর্যন্ত চিহ্নিত হইত। পশ্চিম হইতে গৌড়ে বা বঙ্গে প্রবেশ করিবার একমাত্র পথ ছিল এই তেলিয়াগড়ী, ইহা দীর্ঘ কাল বাংলার ভাগ্যনির্ধারকরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত ছিল। পাঠান বঙ্গাধিপ হুসেন শাহের আমলে এই গড়ীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত। শের শাহ্ তেলিয়াগড়ীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হন ও ইহা স্বীয় দখলে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করেন, ইহাতে হুমায়ুনের সহিত শের শাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়।

আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ ও তদানীন্তন বঙ্গাধিপ দাউদ খাঁর গড়ীতে যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয় 'তবাকং-আকবরী' গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে। পিতৃদ্রোহী শাহ্‌জাহান বা তার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর বিরুদ্ধে তেলিয়াগড়ীতেই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেন। শাহ্‌সুজার সহিত মীরজুমলার যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও তেলিয়াগড়ীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শরফ্‌রাজ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিহারের শাসক আলীবর্দীর শক্তি খর্ব করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু তেলিয়াগড়ী করতলগত থাকায় শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী বঙ্গ দেশ জয় করিতে সমর্থ হন।

তেলিয়াগড়ীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সর্বশেষ উদাহরণ জানা যায় স্কট নামক এক ব্রিটিশ কর্নেল কর্তৃক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রেরিত পত্রে।

বাংলা দেশ দখলে রাখিবার পরিকল্পনা পেশ করিয়া তিনি বলেন, পাঁচ শত সুদক্ষ সৈন্য এই গিরিপথ আগলাইয়া থাকিলে হিন্দুস্থানের সমগ্র শক্তি আমাদের কোনও ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না।

তেলিয়াগড়ীতে একটি পাথরে নির্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXII, Oxford, 1908.

সবিতেশেখর মজুমদার

তেলুগু ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে তেলুগু ভাষার প্রচলন, তাহা 'আন্ধ্র' নামে পরিচিত। 'আন্ধ্র' শব্দটি মূলতঃ জাতিবাচক। তবে ইহা প্রাচীন কালে ভাষাও বুঝাইত। পরে আন্ধ্র অঞ্চল ও তাহার ভাষা 'তেলেঙ্গ' নাম পাইয়াছিল। ইহাই 'তেলুগু' শব্দটির মূল।

প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধির দিক হইতে দ্রাবিড় ভাষাসমূহের মধ্যে তামিলের পরেই তেলুগুর স্থান। লোকসংখ্যার হিসাবে অবশ্য তেলুগু শীর্ষস্থানীয়। বর্তমানে ততটা না হইলেও প্রাচীন যুগে তেলুগুভাষীরা খুব দুঃসাহসিক ও শৌর্যসম্পন্ন ছিল বলিয়া ভারতের বহির্দেশে সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

মার্জিত ভাষা চতুষ্টয়ের মধ্যে মূল দ্রাবিড় হইতে প্রথমে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তেলুগু। এই কারণে তামিল ও মালয়ালমভাষীদের কাছে তেলুগু অনেকটা দুর্বোধ্য। তামিলভাষী অঞ্চলে তেলুগু ভাষার একটি নাম 'বড়ুগু' অর্থাৎ উত্তরী দেশের ভাষা এবং তেলুগুভাষীরা সেখানে তাই 'বড়ুগন্' নামেও পরিচিত। বর্তমান যুগে কন্নড ভাষীরা তেলুগু লিপি গ্রহণ করিলেও ভাষা হিসাবে তেলুগু কন্নড হইতে অনেকাংশে পৃথক।

দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মধ্যে তেলুগুর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইল: ইহাতে নামপুরুষের একবচনে স্ত্রীলিঙ্গবোধক কোনও পৃথক শব্দ নাই, ক্লীবলিঙ্গ শব্দ দিয়া কাজ চলে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায় ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যও বহুবচনে ব্যবহৃত হয় (তামিলে ইহা কদাচিৎ চোখে পড়ে)। অন্যান্য মার্জিত দ্রাবিড় ভাষার হাজার সংখ্যাবাচক শব্দটি সংস্কৃত 'সহস্র' হইতে উদ্ভূত, তেলুগুতে খাঁটি দ্রাবিড় শব্দ পাওয়া যায় 'বেয়্যি'। নামপুরুষের ক্রিয়াপদে কখনও কখনও কাল, পুরুষ, সংখ্যা ও লিঙ্গবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। ধ্বনির দিক হইতে তেলুগু ভাষার শব্দাবলী স্বরান্ত। চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল্ প্রভৃতি বিদেশী শব্দগুলিকেও 'উ'-যোগে স্বরান্ত করিয়া লওয়া হয়।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তেলুগু লোকসংগীত তেলুগু ভাষার সংগীত লালিত্য ও তেলুগুভাষীদের কবিচিত্ততার দরুন তাহাদের লোকসংগীতগুলি সুরে ও কবিত্বে সমৃদ্ধ। ১২শ শতকে বিদ্যমান বিভিন্ন লোকসংগীতের সাহিত্যিক উল্লেখ পাওয়া গেলেও বর্তমানে প্রচলিত গীতগুলি ২-৩ শতকের বেশি পুরাতন নয়, কতকগুলি আবার পুরাতনেরই নূতন রূপান্তরমাত্র।

জো-জো কিংবা লালী ধুয়ার ঘুমপাড়ানি গানগুলি যেমন ভক্তিমূলক তেমনই পল্লী ও ঘরোয়া জীবনের উদ্বেগও কৌতুকময়। স্ত্রীলোকেরা ঢেঁকি-চালনার বা জাঁতা ঘুরাইবার কালে এবং কৃষকেরা বীজবপন, চারারোপণ, ফসলকাটা ও শস্যমাড়াই করিবার সময়ে গান গাহিয়া শ্রমের লাঘব করে। পল্লীর প্রেম ও বীরত্ব এবং প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ও শস্যসংগ্রহই এইসব গানের বিষয়বস্তু।

পালপার্বণগুলি বিশেষ বিশেষ সংগীতে মুখরিত হয়। সংগীতে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধনুর্মাস উৎসব, ইহা পৌষ-সংক্রান্তিতে সমাপ্ত হয়। ভিক্ষাজীবী বিভিন্ন উপজাতি ও বৈরাগী-সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব সংগীত, বাদ্যযন্ত্র ও বিচিত্র পরিচ্ছদ লইয়া সমবেত হয়। সূর্যোদয়ের পূর্বেই সাতানি জিয়েরের হারি-রো-হারি ধুয়া শুরু হয়। তাহার পর গাঙ্গিরেদ্দুল রাখাল তাহার সুসজ্জিত বলদগুলিকে ডু-ডু সহযোগে নাচাইতে থাকে। পরে শঙ্খ ঘণ্টা ও শিবস্তোত্রের গুঞ্জনে জঙ্গম দেবরের অভিনন্দন চলে। দণ্ডের উপরে বা দড়িতে দোম্মরীর নাচের রাস্তার ধারে জাদুকরের খেলার পৃথক পৃথক সংগীতও আছে। কিন্তু গোবর ও মাটিতে নির্মিত গোব্বিদেবরের চারি পাশে কুমারীদের নৃত্যকালীন সংগীতই সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করে।

গৃহস্থের প্রতিটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উপযুক্ত সংগীতের ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় ও সংগ্রহ থাকিলেও বিবাহ সংগীতের সংখ্যাই সর্বাধিক। প্রতিটি বিবাহে সীতারাম কল্যাণ ও গৌরীশংকর কল্যাণ বিশেষভাবে অভিনীত হয় এবং মঙ্গলহারতি গীত, ফুলের তোড়া খেলার গীত, দরজা খোলার গীত, সুব্বিগীত, আহারকালীন গীত ও অন্যান্য গীত গাওয়া হয়। কন্যার বিদায়কালীন অপ্পকালু গীতটি অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী।

আবার কোনও কোনও সম্প্রদায়ের শবযাত্রারও বিশেষ বিশেষ লোকসংগীত আছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পালনাড়ু বীরদের গণ্ডা-গান। গায়েনরা যুদ্ধের সাজসজ্জায় ঢাল তলোয়ার নাচাইয়া এই গান গাহিয়া থাকে।

জঙ্গমদের একটি সম্প্রদায় কাহিনীর কথকতায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। বালনাগম্ম কথা ও কাম্ভোজ-রাজুকথা একাধারে করুণ, উদ্দাম ও বিস্ময়কর। বোব্বিলির পতন এবং দেসিঙ্গা ও আরে মারাঠীদের কাহিনী আবার বীরত্বপূর্ণ। কামম্মাজাতীয় কাহিনীগুলিতে সতীদাহবরণকারী নারীদের প্রশস্তি আছে।

অধিকাংশ লোকগাথা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের প্রসঙ্গ হইতে জন্ম লইলেও প্রায় ক্ষেত্রেই মূল পাত্র পাত্রীর চরিত্র রূপান্তরিত হইয়া অক্লেশেই ঘরোয়া চরিত্রে পরিণত

হইয়াছে। উর্মিলার নিদ্রা, লক্ষ্মণের হাস্য, লবকুশের জয়, কলিঙ্গমর্দন ও অন্যান্য কৃষ্ণলীলা এবং ভারত-সাবিত্রী ইহার নিদর্শন।

ঊনবিংশ শতকের স্বর্ণকারজাতীয় সন্ত বীরব্রহ্মণ ও তাঁহার অনুগামীদের রচিত সংগীতে মাঝি, জেলে, নাপিত, ধোপা, কুমোর ও অন্যান্য কারিগরদের বৃত্তি ও যন্ত্রপাতির প্রতীকে বেদান্তের তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে।

লোকসংগীতের ছন্দ মূলতঃ মাত্রানির্ভর এবং তাহাদের রাগ ও তাল অসংখ্য। তেলুগু লোকসংগীতের দানেই অন্নমাচারিয়া, ক্ষীএইয়া, শারঙ্গপাণি ও ত্যাগরাজের মত প্রসিদ্ধ গীতকারগণ তাঁহাদের গীত সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

তেলুগু লোকনৃত্য নানা প্রকার। অত্যন্ত জনপ্রিয় রামভজনম নৃত্যে দ্বাদশ বা ততোধিক ব্যক্তি অঙ্গে পরিচ্ছদ, পায়ে কিংকিণী ও হাতে ঘুঙুর যষ্টি লইয়া অংশ গ্রহণ করে। একটি জ্বলন্ত দীপস্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার চারি পাশে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী ও সংগীতে এই নৃত্য হয়। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এক মন্দিরের উৎসব হইতে আর এক মন্দিরের উৎসবে এই অনুষ্ঠান চলিতে থাকে।

অনুরূপ কোলাটম নৃত্যে কুমারীরাই অংশ গ্রহণ করে এবং দীপস্তম্ভের পরিবর্তে বেণীবদ্ধ অবস্থায় একটি সুতার দড়ি রাখা হয়। তাহাদের হাতে ঘুঙুর-যষ্টি বা চিরুতার পরিবর্তে কেবলমাত্র যষ্টি বা কোলা থাকে।

ধনুর্মাসে জিয়ের তাহার মাথায় অক্ষয় পাত্রের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া, হাতে চিরুতা ও তম্বুরা লইয়া নাচিতে থাকে এবং ছন্দোময় ভঙ্গীতে বাসয়া দক্ষিণা গ্রহণ করে। দোম্মরী উঁচু দড়ি ও যষ্টির উপরে সুকৌশলে নৃত্য করে। দুই বা ততোধিক বালিকার দ্বারা অনুষ্ঠিত সুন্দর চম্মচক্ক নৃত্য বালিকাদের নিকট একটি প্রিয় খেলা।

যানাদী স্ত্রীলোকেরা তাহাদের বিবাহ-উৎসবে ও শবযাত্রাকালে সারা রাত্রি ধরিয়া নাচে। যাদবরা ওলা ও শীতলাকে তুষ্ট করার জন্য কুম্ভনৃত্যের অনুষ্ঠান করে। যানাদী ও যাদবদের আবার কুচিপুডি যক্ষগণের অনুরূপ নিজেদের পথযাত্রার গান আছে।

চেঞ্চু, কোয় ও সবররা পাহাড় ও অরণ্যে বাস করে। তাহাদের নিজস্ব নৃত্যও অগণিত। বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠানে তেলুগু নববর্ষ উদ্‌যাপন করিবার পূর্বে তাহারা কখনও আমে হাত দেয় না।

জঙ্গমরা তম্বুরা লইয়া এবং তাহাদের ঢক্কিতে তাল দিয়া নাচিতে নাচিতে কাহিনী শোনাইতে থাকে। পালনাড়ু বীরগাথার গায়েনরা যুদ্ধসাজে ঢাল-তলোয়ার লইয়া রণনৃত্যে কাহিনী শোনায়। হরিকথাও নৃত্যে ও গীতে বিবৃত হইয়া থাকে।

বাংলা দেশের বিবাহের প্রতীকরূপে লোহা পরাইবার ন্যায় অন্ধ্র দেশের বিবাহে কন্যার কণ্ঠে 'তালি' পরাইবার বিধি আছে। হরিজনদের একটি সম্প্রদায় পায়ে ঘুঙুর পরিয়া ঢপ্পু নামক রণ-দামামার ধ্বনি তুলিয়া চিন্দু নামক ভয়ংকর রণনৃত্যে এই 'তালি' পরাইতে আসে। এই উপলক্ষে অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিবার ফলে এই নৃত্য বর্তমানে আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

কুচিপুডি যক্ষগান একটি নৃত্যনাট্য হইলেও যেরুকট ও সুঙ্কর কোণ্ডায়ার ন্যায় ভূমিকাগুলি আরণ্যক লোক-নৃত্যের প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে।

লম্বাডি অথবা বন্‌জারা মূলতঃ মধ্য ভারত হইতে আসিয়া অন্ধ্রের বিভিন্ন অংশে বসতি করিয়াছে। এই সমাজের স্ত্রীলোকেরা নানা রঙের কাপড় জোড়া দিয়া এবং নকশায় কাচের খণ্ড বসাইয়া পরিচ্ছদ তৈয়ারি করিয়া পরে। রঙ-বেরঙের পোশাকে তাহাদের ছন্দোবদ্ধ নৃত্য রাজকীয় অনুষ্ঠানে সমাদর লাভ করিয়াছে।

সিদ্দিগণ আফ্রিকা হইতে আসিয়া হায়দরাবাদে বসতি করিয়াছে। তাহাদের বিবাহ ও উৎসবাদির নৃত্যগুলিকে তাহাদের প্রাচীন আদিবাসীসুলভ ভীষণ রণনৃত্য বলা যায়।

মহরমের সময় মল্লবীরেরা হলুদ বর্ণে রঞ্জিত এবং কালো ও পিঙ্গল রেখায় অঙ্কিত হইয়া ঢপ্পু বাদ্যের সঙ্গে ব্যাঘ্রনৃত্য করে। এই নৃত্যটি প্রকৃতপক্ষে বাঘের অনুকরণে শিকারী-নৃত্য। দশহরা উৎসবে হিন্দুরাও এই নৃত্যানুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের মধ্যে অন্ধ্র প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থানহেতু এখানকার লোকনৃত্যে উত্তর ও দক্ষিণের সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনের মহৎ প্রয়াস রূপায়িত হইয়াছে।

নেদুরি নরসিংহ শাস্ত্রী

তেলুগু সাহিত্য একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নন্নয় ও নারায়ণ ভট্টের রচিত চম্পূকাব্য 'মহাভারত' দ্বারা অন্ধ্র সাহিত্যের সূচনা ধরা হয়। গ্রন্থের সূচনাতেই দেশীয় রীতি ও দেশীয় শব্দব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের গ্রহণ এবং সংস্কৃত ছন্দ, রীতি ও যতিনিয়মের গ্রহণ দ্বারা ব্যঞ্জনা, সংযম ও মাধুর্যে অন্ধ্র ভাষার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায়। নন্নয়ের মাত্র আড়াই পর্বের এই অসমাপ্ত কাব্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য দুই শতাব্দীর পর তিক্কন ব্রতী

হন এবং বিরাটপর্ব হইতে স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত রচনা করেন। ভাষামাধুর্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ তেলুগু গ্রন্থ। আরও ৭৫ বৎসর পর এররাপ্রগড মধ্যবর্তী অসমাপ্ত অরণ্য পর্ব সমাপ্ত করিবার পর হরিবংশও সম্পূর্ণ করিলেন। তিনি নিজে একটি রামায়ণও রচনা করেন। অন্ধ্র বা তেলুগু সাহিত্যে 'কবিত্রয়' বলিতে এই তিন কবিকেই বুঝাইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পালকুরিকি সোমনাথের নেতৃত্বে বীরশৈব কবিরা সংস্কৃত ভাষার প্রভাবমুক্তির আন্দোলন শুরু করেন। পালকুরিকি তাঁহার রচনায় জাত্য তেলুগু ব্যবহার এবং চম্পুর পরিবর্তে জনপ্রিয় দ্বিপদী ছন্দ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থের মধ্যে 'পণ্ডিতারাধ্য-চরিত্রম' ও 'বাসবপুরাণ' উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয়নগর রাজসভার সম্মানিত কবিসার্বভৌম শ্রীনাথ সংস্কৃত 'নৈষধ' অবলম্বনে এক কাব্য, 'স্কন্দপুরাণ' অবলম্বনে 'কাশীখণ্ড' ও 'ভীমখণ্ডম' পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের স্বাদবহ।

বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেবরায়ের সভাকবি পেদ্দনের 'মনুচরিত্র' হইতেই প্রবন্ধকাব্য (প্রাচীন যুগের দেবতা বা রাজার কাহিনী অবলম্বনে পদ্য ও গদ্যে রচিত বড় গল্প) রচনার সূচনা হয়। নন্দী তিম্মনের 'পারিজাতাপহরণ' এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য। কৃষ্ণদেবরায় স্বয় বৈষ্ণবপদাবলীর গোদাদেবী-সম্পর্কিত 'আমুক্ত মাল্যদ' রচনা করেন। 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামে একটি সংযুক্ত কাহিনী কাব্য পিঙ্গলি সুরণ রচনা করেন। 'কলাপূর্ণোদয়ম' তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ উপাখ্যানকাব্য এবং 'প্রভাবতী প্রদ্যুম্ন' তাঁহার একটি সংলাপাশ্রিত কাব্য। তেনালি রামলিঙ্গ বা রামকৃষ্ণ 'পাণ্ডুরঙ্গমাহাত্ম্যম্' রচনা করেন।

তল্লিকোট যুদ্ধোত্তর কাল (১৫৬৫-১৮০০ খ্রী) তল্লিকোটযুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে বিজয়নগর রাজ্যের দক্ষিণাংশে মাদুরা, তাঞ্জোর, পুদুক্কোট স্বাধীনতা লাভ করে। ফলে অন্ধ্র সাহিত্যের কেন্দ্র বর্তমান তামিল দেশে স্থানান্তরিত হইলেও দক্ষিণের রাজারা তেলুগুর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বজায় রাখিয়াছিলেন। এমনকি রঘুনাথ নায়কের (১৬১৪-৩৩ খ্রী) মত অনেক রাজা নিজেরাও তেলুগুতে কাব্য রচনা করিয়াছেন। এইসব দক্ষিণী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চেমকুর বেঙ্কটকবি জনপ্রিয় 'বিজয়বিলাসমু' রচনা করেন।

লোকনাট্য ও লোকসংগীতের উপযোগী আঙ্গিকে, নাটকীয় সংলাপ ও নৃত্যসহযোগে 'যক্ষগান' নামে কাব্য ও সংগীতের এক মিশ্রসাহিত্য এই সময় সৃষ্ট হয়। ক্ষেত্রায়া'-র 'যক্ষগান' শ্রেণীর ভক্তিগীতিগুলি সাহিত্যেও স্থান লাভ করিয়াছে। সন্ত ত্যাগরাজের 'কৃতী'-ও তদ্রূপ।

চম্পুরীতিতে কাব্যধর্মী গদ্যের চর্চা হইলেও যথার্থ গদ্যের অনুশীলন এত কাল হয় নাই। দক্ষিণী সাহিত্যিকগণ গদ্যে রামায়ণ, মহাভারত, জৈমিনিভারত রচনা করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দেন। এই প্রসঙ্গে বেঙ্কট কৃষ্ণপ্পনায়েক, অনন্তভূপ, বীররাজু প্রভৃতি স্মরণীয়। তাঁহাদের রচনায় ঘরোয়া কথার আমেজ স্পন্দিত। প্রাচীন গ্রন্থের দ্বিপদী রূপান্তরও এই সময়েই ঘটে।

সংস্কৃত শতকের ন্যায় শতক রচনাও শুরু হইল। ভক্তি-শতকের মধ্যে গোপন্নর 'দাশরথিশতক', নীতিশতকের মধ্যে 'সুমতিশতক', দর্শনশতকের মধ্যে 'মানসবোধ' ও 'চিৎসবোধশতক' উল্লেখযোগ্য। 'বেমনশতকে' আছে হাজার কবিতা, চন্দ্রশেখরশতকে' আছে উদ্ধৃতির মধ্যে চলিত ভাষা, পুরুষোত্তমের 'অন্ধ্রনায়কশতকে' আছে ব্যাজনিন্দা। সামাজিক প্রথা, জাতি, মন্দির, দর্শন, নীতি, যোগ, জাদুবিদ্যা ও নানাবিধ জ্ঞানসম্পর্কে সহজ সরল ও যথাযথ ভাষায় সরল বিচক্ষণতা এইসব শতকে প্রকাশ পাইয়াছে। শতক সাহিত্যের মাধ্যমেই কাব্য সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছাইল।

মুদ্রাযন্ত্রের যুগ (১৮০১-১৯২০ খ্রী) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই মুদ্রাযন্ত্রের যুগ ধরা হয়। লেখকদের অধিকাংশই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং তাঁহাদের ইংরেজী-জ্ঞানও ভাসা ভাসা। ইংরেজী সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব ধীর ও মন্থর গতিতে শুরু হইল, ফলে অধিকতর রক্ষণ-শীলতাই এই যুগের লক্ষণ। প্রথম ছাপা তেলুগু বই ১৭৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। অক্ষের বুনিয়াদী বা ধ্রুপদী সাহিত্যের অধিকাংশই এই সময়ে মুদ্রিত হয় এবং তেলুগু বর্ণমালায় সংস্কৃত গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী নাটকগুলির ব্যাপক অনুবাদের ফলে মৌলিক নাটকেরও জন্ম হইল। কৃষ্ণমাচার্যের 'চিত্রনলীয়', 'বিষাদসারঙ্গধর', বেঙ্কটরায় শাস্ত্রীর 'প্রতাপরুদ্রয়', পি. নরসিংহ রাও এর 'রাধাকৃষ্ণ', জি. গুরুজাড আপ্পারাও-এর 'কন্যাশুল্কম' প্রভৃতি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটক এবং এখনও মঞ্চে ইহাদেরই একাধিপত্য চলিতেছে।

লক্ষ্মীনরসিংহমের 'হেমলতা', লক্ষ্মীনরসিংহম রচিত 'রামচন্দ্রবিজয়মু', 'গণপতি' এবং কে. বেঙ্কটশাস্ত্রীর কয়েকটি উপন্যাসের মত কিছুসংখ্যক মৌলিক উপন্যাসও

এই সময়ে লিখিত হয়। তবে এই সময়ের অধিকাংশ উপন্যাসই বাংলা হইতে অনূদিত।

এই সময়ের প্রবন্ধ মুখ্যতঃ শিক্ষামূলক ও বিতর্কমূলক। বিখ্যাত গবেষক লক্ষ্মণ রাও-এর প্রবন্ধাবলী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এই যুগে তিরুপতি বেঙ্কটেশ্বরুলু-প্রমুখ কবিগণ কাব্যের প্রকাশভঙ্গী সাধারণের উপযোগী করিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিকতার আন্দোলনও চলিতে থাকে। রায়প্রোলুর গীতিকাব্য ও বেঙ্কটপার্বতীশ্বরুলু-র ভক্তিমূলক কাব্য 'একান্ত সেবা' এই লক্ষণাক্রান্ত। জি. গুরুজাড আপ্পারাও এবং বি. আপ্পারাও আবার গানের ছন্দে চলতি তেলুগুতে গীতিধর্মী গদ্য লেখার চেষ্টা করিয়া সাফল্য দেখাইলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত রসসূত্র এবং গ্রীক, লাতিন ও জার্মানীর নন্দনতত্ত্বাদিতে পারঙ্গম শিবশংকর স্বামীর সভাপতিত্বে মাত্র ১৬ জন উদীয়মান আধুনিক লেখকসহ 'সাহিতি সমিতি' গঠিত হয়। যিনি কোনও কালেই ইহার সদস্য হন নাই এমন খ্যাতিমান লেখক দুর্লভ। দেশী, বিদেশী, প্রাচীন ও নবীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহাদের প্রায় সকলেই সুপরিচিত ছিলেন। 'সাহিতি সমিতি' ও পরবর্তী 'নব্য সমিতি'-র আবির্ভাবে সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আধুনিক নানা ধারার অনুশীলন শুরু হয়। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী অগ্রণী কবি উমামহেশ বিশেষ পরিচিত নহেন। বরং শ্রীরঙ্গম্ শ্রীনিবাস রাও বামপন্থী কবিই সর্বাধিক পরিচিত এবং তরুণ কবিরা বিশেষভাবে তাঁহারই অনুকারী। তাঁহার কবিতায় সংগীত-লালিত্য ও বাক্‌চাতুর্য আছে, ফলে নিছক মতামতগুলিই যথার্থ কবিতার ভ্রম সৃষ্টি করে।

নাট্য: পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের 'আনারকলি' কাব্যগুণে অতুলনীয়। দীক্ষিতুলু-র 'শবরী' ভক্তিপ্রাণতা ও শৈশব-সারল্যের সমন্বয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তাহা ছাড়া বাবিলালের 'বসন্তসেন' ও 'নায়কুরালু' বহুবার সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ হইয়াছে।

একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রগতি সম্ভব হয় এবং বিশ্বের এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নাটিকাগুলির পাশাপাশি স্থানলাভের যোগ্যতাও অর্জন করিয়াছে। এই পথের প্রথম পথিক নোরি।

রাজমন্নারের নাটিকায় শিল্পচাতুর্য ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নাটকীয় অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স (anti-climax) ঘটাইবার দিকে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন। নাবল বেঙ্কটেশ্বর রাও-এর নাটকে পল্লীর চাষীজীবন ও সংলাপ রূপায়ণে বস্তুনিষ্ঠতা দেখা যায়।

ছোটগল্প: ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ছোটগল্প জনপ্রিয়তায় সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে দীক্ষিতুলু সর্বশ্রেষ্ঠ। 'নাকোডুকু-'র ঘরোয়া ঘটনা, 'সুরি, সিথি, বেন্‌কি'-র কিশোরজীবন, 'বতিরও'-এর বিলাসময়ী মহিলা, 'তালবন মুলো'-র চেঞ্চু বা সুগালির জীবন বা আদর্শবাদিতা ইত্যাদি যে কোনও বিষয় তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার মর্মস্পর্শী আকর্ষণ বর্তমান।

মুনিমাণিক্যম্ নরসিংহ রাও লঘু হাস্যরসযুক্ত ঘরোয়া গল্প সৃষ্টিতে পারদর্শী। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কান্তম স্মরণীয়, নিরক্ষর স্ত্রী হইয়াও সে তাহার বিচক্ষণতার জন্য শিক্ষিত স্বামীকে বোকা বানাইয়াছে। বেঙ্কটচলমের গল্প যৌন আবেদনযুক্ত এবং ভ্রষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ। বিশ্বনাথ শাস্ত্রী সম্প্রতি বিশিষ্ট গল্পলেখকরূপে অবতীর্ণ। পদ্মরাজু একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও অর্জন করিয়াছেন।

উপন্যাস: বর্তমানে মৌলিক উপন্যাস সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে ও গুণে সমৃদ্ধ। ব্যারিস্টার পার্বতীশম সর্বপ্রথম জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির বিলাতযাত্রা অবলম্বনে একটি আদ্যোপান্ত হাস্য-রসাত্মক উপন্যাস রচনা করেন।

বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের উপন্যাস সংখ্যায় বহু এবং বিচিত্র। তাঁহার 'বীরবল্লু' একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁহার রচনা বিরাট প্রতিভার পরিচায়ক চারিত্রপরিচয়ে পূর্ণ। বাপীরাজু আবার তাঁহার রচনায় প্রবাহসাম্য রক্ষা করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যে উদারমতাবলম্বী এবং উজ্জ্বলপ্রেম-বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার 'তুফান' এবং শাতবাহন আমলের ঐতিহাসিক কাহিনীর উপন্যাস 'হিমাবিন্দু' সুগভীর আধ্যাত্মিক আবেদনযুক্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় নোরি সিদ্ধহস্ত।

বিবিধ: অন্ধ্র সাহিত্য বর্তমানে বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইতেছে। চলিত তেলুগুর নির্বিচার ব্যবহার দ্বারা সাংবাদিকতার দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে। বাবিলাল ও আড়পের রচনা সাহিত্যগুণসম্পন্ন। কুরুগান্টি-প্রমুখ সাহিত্যসমালোচকদের সহানুভূতি ও দৃষ্টিসাম্য উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ ও জানকীরামের আত্মজীবনী স্ব-স্ব গুণে সুন্দর। জীবনী-সাহিত্যেও বহু বিচিত্র অগ্রগতি ঘটিয়াছে।

সাহিত্যের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে পুরাণ ও সংস্কৃত নাটক গদ্যে ও পদ্যে এখনও অনূদিত হইতেছে; অপরূপ শতক ও প্রবন্ধ-কাব্য এখনও রচিত হইতেছে।

নোরি নরসিংহ শাস্ত্রী

তেলেঙ্গানা, তেলিঙ্গানা ৭৭° হইতে ৮১°১৫' পূর্ব এবং ১৬°৩০' হইতে ১৯°৩০' উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। এই অঞ্চল অন্ধ্র প্রদেশের মহবুবনগর, হায়দরাবাদ, মেডক, নিজামাবাদ, আদিলাবাদ, করিমনগর, ওয়ারঙ্গল, খম্মম ও নালগোণ্ডা প্রভৃতি ৯টি তেলুগুভাষী জেলা লইয়া গঠিত।

এই অঞ্চলের অধিকাংশই সমপ্রায় ভূমির অন্তর্গত এবং আর্কিয়ান যুগের নীস শিলাভিত্তিক। উত্তরাংশ ভিন্ন এখানকার গড় উচ্চতা প্রায় ৬০০ মিটার, সমপ্রায় ভূমিতে মধ্যে মধ্যে কোণাকৃতি পর্বত দেখা যায়। হায়দরাবাদ শহরের চতুর্দিকে গ্র্যানিট পাথরের ছোট ছোট পাহাড় আছে। সমস্ত অঞ্চলই শুষ্ক। ছোট নদীগুলি গ্রীষ্মকালে শুখাইয়া যায়। উত্তরাংশ জঙ্গলাকীর্ণ, কিন্তু অন্যান্য অংশে সর্বত্র সাভানা-জাতীয় তৃণভূমি। পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাটের মধ্যে বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৬৫০-৭০ মিলিমিটার (২৫-৩০ ইঞ্চি), গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ৩৩° সেন্টিগ্রেড (৯১° ফারেনহাইট) এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ ১৪° সেন্টিগ্রেড (৫৭° ফারেনহাইট)।

কেহ কেহ বলেন, কালেশ্বর, শ্রীশৈল ও ভীমেশ্বর এই তিনটি শৈলে শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রদেশ ত্রিলিঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়, তাহাই এখন অপভ্রংশে তেলিঙ্গ, তেলুগু প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। আবার কেহ বলেন যে, পূর্বকালে ত্রিকলিঙ্গ নাম ছিল, 'ক' লোপ পাইয়া ত্রিলিঙ্গ ও তিলিঙ্গ হয়। মহাভারতে ত্রিলিঙ্গের উল্লেখ নাই। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে প্লিনি মোদোগলিঙ্গ শব্দের উল্লেখ করেন। তৈলঙ্গ ভাষায় মুডু শব্দের অর্থ তিন, সুতরাং মোদোগলিঙ্গ শব্দ দ্বারা ত্রিকলিঙ্গ বোঝায়। খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে টলেমি ত্রিগলিপটন দেশের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ত্রিকলিঙ্গ হইতে আসিতে পারে।

খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে উৎকলরাজ উদ্যোতকেশরীর সময়ে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে সর্বপ্রথম তিলঙ্গ দেশের কথা আছে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন্‌ৎসাঙ এখানে আসেন। আশোকের পর তেলেঙ্গানা অঞ্চলে অন্ধ্র, পল্লব, চালুক্য, যাদব ও তুর্কী রাজবংশ আধিপত্য করে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে তেলেঙ্গানা মোগল অধিকারে আসে। আইন-ই-আকবরীতে 'তেলেঙ্গানা বা তেলঙ্গ সুবা বেরারের দক্ষিণাংশ বলিয়া নির্দেশিত ছিল। তৎকালের 'তৈলঙ্গানা' সরকার ১৯টি পরগনায় বিভক্ত ছিল।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর সরকাররূপে ইহা ইংরেজদের অধীন হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতার সময়ে ইহা হায়দরাবাদ রাজ্যরূপে নিজামের শাসনাধীন ছিল। তেলেঙ্গানাতেই ভূদান আন্দোলনের জন্ম ঘটে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপুনর্গঠনের পর তেলেঙ্গানা অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'অন্ধ্র প্রদেশ' দ্র।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXIII and vol. XIII, Oxford, 1908; K. Gopalachari, *Early History of Andhra Country*, Madras, 1941; P. T Raju, *Telugu Literature*, Bombay, 1944; O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1957; National Council of Applied Economic Research, *Techno Economic Survey of Andhra Pradesh*, New Delhi, 1962; A. Chandrasekhar, *Andhra Pradesh State Atlas*, part IX, Nasik, 1966.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তেস্‌সিতোরি, লুইজি পিও (১৮৮৭-১৯১৯ খ্রী) উত্তর ভারতের আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে রাজস্থানী অন্যতম। ইটালীয় ভারতবিদ্যাবিদ্‌ তেস্‌সিতোরি এই রাজস্থানী ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় একজন পথিকৃৎ। তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতে আসেন, পাঁচ বৎসর ভারতে থাকিয়া রাজস্থানী ভাষা লইয়া গবেষণা করেন এবং রাজস্থানী ভাষায় রচিত পুরাতন সাহিত্যের বহু নিদর্শন সংগ্রহ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাস ইটালীতে কাটাইয়া তেস্‌সিতোরি আবার ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ঐ বৎসরেই নভেম্বর মাসে বিকানীরে পরলোকগমন করেন। তেস্‌সিতোরির প্রধান কীর্তি পুরাতন পশ্চিমা রাজস্থানী ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ 'হিস্টরিক্যাল গ্রামার অফ দি ওল্ড ওয়েস্টার্ন রাজস্থানী স্পীচ' ১৯১৪ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' পত্রের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—ইহা এখনও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই। রাজস্থানী ভাষা বিষয়ক এই মূল্যবান আলোচনা ছাড়াও, তেস্‌সিতোরি রাজস্থানী ভাষায় রচিত কয়েকখানি প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের সম্পাদনা করেন এবং এইগুলি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১. 'বচনিকা রাঠৌর রতনসিংঘজী রী, মহেসদাসোত খিড়িয়া জগা-রী কহী' (১৯১৭ খ্রী) ২. 'বেলী ক্রিসন-রুকমণী রী রাঠৌর রাজা প্রিথীরাজ রী কহী' (১৯১৯ খ্রী) ৩. 'ছন্দ রাউ জৈতসী রো বিঠু সূজে রো কিয়ৌ' (১৯২০ খ্রী)।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ যজুর্বেদ দ্র

তৈমুরলঙ্গ (১৩৩৬-১৪০৫ খ্রী) ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গের জন্ম হয় এবং ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমরকন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন চাঘতাই তুর্কীদের নেতা, পারস্য, আফগানিস্তান ও মেসোপটেমিয়া জয় করিয়া তিনি ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তলম্ব, দীপালপুর ও ভাতনীর প্রভৃতি জনপদ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় এক লক্ষ হিন্দু বন্দী ছিল। পাছে তাহারা বিদ্রোহী হয় সেইজন্য তৈমুর তাহাদিগকে হত্যা করিলেন এবং তোগলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদকে পরাজিত করিয়া তিনি দিল্লী অধিকার করিলেন। দিল্লীতে তাঁহার দুই সপ্তাহ অবস্থানকালে কয়েক দিন দিল্লী, সিরি, জাঁহাপনা ও পুরাতন দিল্লীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন সংঘটিত হয়। প্রত্যাবর্তনকালে মীরাট, কাঙরা, ও জম্মু প্রভৃতি জয় ও লুণ্ঠন করিয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন (১৩৯৯ খ্রী)।

তাঁহার আক্রমণে দিল্লী বিধ্বস্ত হয় এবং উত্তর ভারতে অপূরণীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়। এই আঘাতে জরাজীর্ণ দিল্লী সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ঘটে। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

তৈল সান্দ্র (ভিসিড), দাহ্য, প্রশম (নিউট্রাল) তরল পদার্থ। তৈল প্রধানতঃ তিন প্রকার— ভূগর্ভ হইতে নিষ্কাশিত হাইড্রোকার্বন-ঘটিত খনিজ তৈল, জুঁই চামেলি গোলাপ খসখস প্রভৃতি উদ্ভিদ হইতে নিষ্কাশিত সুগন্ধি উদ্বায়ী গন্ধ তৈল এবং কড হেরিং সার্ডিন হাঙ্গর তিমি সীল প্রভৃতি প্রাণী ও সরিষা চীনাবাদাম জলপাই তিল তিসি রেড়ি প্রভৃতি উদ্ভিদ হইতে নিষ্কাশিত চর্বিজাতীয় তৈল ('খনিজ তৈল' ও 'গন্ধ তৈল' দ্র)। নিম্নের আলোচনায় অবশ্য তৈল বলিতে কেবল চর্বিজাতীয় তৈল বুঝাইবে।

তৈল (অর্থাৎ চর্বিজাতীয় তৈল) স্নেহপদার্থ। ইহার প্রতিটি অণু এক অণু গ্লিসারিন ও তিন অণু চর্বিজাতীয় অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। ইহা জলে অদ্রাব্য, জলের সহিত মেশে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা কম হওয়ায় ইহা জলে ভাসে। ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেন্‌জিন প্রভৃতি দ্রাবকে তৈল দ্রবীভূত হয়। তৈলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অণুর চর্বিজাতীয় অ্যাসিড ও অসংপৃক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিডের পরিমাণ অধিক হওয়ায় ঘি, চর্বি ও অন্যান্য স্নেহপদার্থের তুলনায় ইহার গলনাঙ্ক কম, সেজন্য সাধারণ তাপমাত্রায় তৈল তরল থাকে। দীর্ঘ দিন সংরক্ষণে তৈলের অণুর অসংপৃক্ত স্থানগুলিতে অক্সিজেন যুক্ত হইয়া দুর্গন্ধ অ্যালডিহাইড-জাতীয় পদার্থ ও মুক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিডের উদ্ভব ঘটে। নিকেল অনুঘটকের সাহায্যে হাইড্রোজেন যোগ করিয়া উদ্ভিজ্জ তৈলের অসংপৃক্ত অণুগুলিকে সংপৃক্ত করিলে বনস্পতি উৎপন্ন হয়। অসংপৃক্তি কম থাকায় বনস্পতির গলনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত অধিক, ফলে সাধারণ তাপমাত্রায় ইহা অর্ধ কঠিন। আমেরিকা ও ইওরোপের নানা দেশে মাখনের পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য তুলার বীজ, সয়াবিন, চীনাবাদাম প্রভৃতির তৈলের সহিত দুধ, রঞ্জক-দ্রব্য প্রভৃতি মিশাইয়া মার্গারিন উৎপাদন করা হয়।

তৈল (অর্থাৎ চর্বিজাতীয় তৈল) দুই প্রকার— জান্তব ও উদ্ভিজ্জ। জান্তব তৈল প্রধানতঃ সামুদ্রিক প্রাণী হইতে আহৃত হয়। এ উদ্দেশ্যে জাপান ও উত্তর আমেরিকার সমীপবর্তী সমুদ্র, উত্তরসাগর ও মেরুসাগরে সার্ডিন, হেরিং, কড, হাঙ্গর, তিমি, সীল প্রভৃতি ধরা হয়। সাবান, রঙন, রঙ প্রভৃতি উৎপাদনে, বাতি জ্বালাইবার কাজে ও খাদ্যে এই সকল তৈলের ব্যবহার হইয়া থাকে। কড, হাঙ্গর প্রভৃতির যকৃতের তৈলে যথেষ্ট ভিটামিন এ এবং ডি বর্তমান।

উদ্ভিজ্জ তৈলগুলিকে অসংপৃক্তি অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, তুলার বীজ, ভুট্টা, সয়াবিন প্রভৃতির তৈলে অসংপৃক্তি মাঝামাঝি ধরনের, ইহারা সহজে সম্পূর্ণ শুখায় না এবং খাদ্য, বার্নিশ প্রভৃতিতে ইহাদের ব্যবহার হয়। তিসি, হেম্পবীজ প্রভৃতির তৈল অত্যন্ত অসংপৃক্ত হওয়ায় সহজেই শুখাইয়া যায়, তাই তেল রঙ, বার্নিস ইত্যাদিতে এগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলপাই, রেড়ি প্রভৃতির তৈলে অসংপৃক্তি অত্যন্ত কম বলিয়া এইগুলি সাধারণতঃ শুখায় না, সেজন্য যন্ত্রে পিচ্ছিলকারক (লুব্রিকেন্ট) তৈল হিসাবে ইহাদের প্রচলন আছে, খাদ্যে এবং ভেষজ ও সাবান-শিল্পেও ইহারা ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ তৈলগুলির মধ্যে চীনাবাদাম, তিল, তিসি, রেড়ি, সরিষা, সয়াবিন প্রভৃতির তৈল বীজ হইতে, ভুট্টার তৈল ভ্রূণ হইতে এবং জলপাই, নারিকেল প্রভৃতির তৈল ফলের শাঁস হইতে নিষ্কাশিত হয় ('চীনাবাদাম', 'তিল', 'তৈলবীজ', 'নারিকেল' ও 'ভুট্টা' দ্র)।

পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে সরিষা ও চীনাবাদামের তৈল, কেরলে নারিকেল তৈল, অন্ধ্র, মহীশূর ও মাদ্রাজে তিলের তৈল এবং কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশে কিছু কিছু তিসির তৈল খাওয়া হয়। চীনাবাদাম, তুলার বীজ প্রভৃতির তৈল হইতে ভারতে বনস্পতি উৎপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভূমধ্যসাগরীয় দেশে জলপাইয়ের তৈল, চীন ও জাপানে সয়াবিনের তৈল, আমেরিকায় ভুট্টার তৈল, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডে তিসি ও সূর্যমুখীর তৈল এবং মিশরে তুলার বীজের তৈল আহার্যে ব্যবহারের উল্লেখ করিতে হয়। উদ্ভিজ্জ তৈলে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগই স্নেহপদার্থ; কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন বা জলের লেশমাত্র নাই। এত অধিক খাদ্যবস্তু থাকায় তৈল সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চীনাবাদাম, সয়াবিন প্রভৃতির তৈলে লিনোলেয়িক অ্যাসিড, লিনোলেনিক অ্যাসিড ও অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড নামে দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক তিনটি অসংপৃক্ত চর্বিজ্জা তীয় অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। উদ্ভিজ্জ তৈলে খুব সামান্য অজৈব লবণ থাকে, ভিটামিন এ, বি, সি, ডি এবং কে প্রায় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন ই বর্তমান। খাদ্যের তৈলের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই দেহে কাজে লাগে, প্রতি ১০০ গ্রাম তৈল হইতে প্রায় ৯০০ কিলোক্যালোরিরও অধিক শক্তি উৎপন্ন হয় ('খাদ্য' দ্র)।

তৈলবীজ ও তৈলের উৎপাদন বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। ৩৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই লেবাননের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাম্রযুগের চাষীরা জলপাইয়ের চাষ করিত। ক্রীটে আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নব্যপ্রস্তর যুগের চাষীরা জলপাইয়ের চাষ আরম্ভ করে। ক্রমে জলপাইয়ের তৈল ক্রীটের অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্যে পরিণত হয়, ঐ দ্বীপে মিনোয়ান যুগের ক্নসস রাজপ্রাসাদের (আনুমানিক ১৭৫০-১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ধ্বংসাবশিষ্ট ভাণ্ডারে জলপাই তৈলের বহু পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে সময় মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশই ক্রীট হইতে তৈল আমদানি করিত। সমসাময়িক যুগে সাইপ্রাস দ্বীপেও উৎকৃষ্ট জলপাই তৈল উৎপন্ন হইত। মিশরে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হইতেই তৈল ব্যবহারের উল্লেখ আছে, তৃতীয় রাজবংশের যুগে (আনুমানিক ২৯৮০-২৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মৃৎনির্মিত বৃহৎ তৈলাধারে তৈল সঞ্চিত থাকিত, একাদশ রাজবংশের আমলে (আনুমানিক ২১৬০-২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ভারী পাথর ও বিশাল মূর্তি টানিয়া লইয়া যাইবার সময় তৈল ঢালিয়া পথ পিচ্ছিল করা হইত এবং অষ্টাদশ রাজবংশের সময় (আনুমানিক ১৫৯০-১৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রাজস্ব হিসাবে তৈল অর্পণের প্রথা ছিল। আনাতোলিয়ার হিত্তী রাজ্যেও (আনুমানিক ১৭৮০-১১৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) যথেষ্ট জলপাই তৈল উৎপন্ন হইত। বোঘাজকোয়াই এর ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত মৃৎফলকে উৎকীর্ণ হিত্তী আইনের ধারা হইতে বুঝা যায় যে হিত্তী রাজ্যে মাখন অপেক্ষা তৈলের মূল্য অধিক ছিল। হিত্তী রাজন্যবর্গের শবদাহের পর দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিগুলিকে কিছুকাল উৎকৃষ্ট তৈলে ডুবাইয়া রাখার প্রথা ছিল। ক্রীটে মিনোয়ান রাজ্যের পতনের পর (আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তৈলের ব্যবসায় গ্রীসের অন্তর্গত মুকেনাই (Mycenai)-র অধিবাসীদের কুক্ষিগত হয়। ভারতে সিন্ধু সভ্যতার যুগে (আনুমানিক ২৮০০-২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) হরপ্পায় তিলের চাষ ও ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, বৈদিক যুগে খাদ্যে তিল ও সরিষা ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

দ্র E. W. Eckey, *Vegetable Fats and Oils*, New York, 1954; L. P. Dryden, J. B. Foley, P. F. Gleis & A. M. Hartman, 'Experiments on the comparative nutritive value of butter and vegetable fats', *Journal of Nutrition*, vol 58, 1956

দেবজ্যোতি দাশ

তৈলঙ্গস্বামী মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ভিজিয়ানাগ্রামের হোলিয়া নামক স্থানে ব্রাহ্মণকুলে মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদিনাম শিবরাম (মতান্তরে গণপতি বা তৈলঙ্গধর)। পিতার নাম নৃসিংহ। কেহ কেহ বলেন মাতার আদেশে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে মাতৃবিয়োগের দিনেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। পদব্রজে তিনি বহুবার ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং অসাধারণ যোগশক্তির জন্য সর্বত্র অতুল খ্যাতিলাভ করেন। শেষ জীবনে তিনি কাশীধামে পঞ্চগঙ্গাঘাটে বাস করিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কাশীতে যাইয়া ইঁহাকে দর্শন করেন। ঐ সময়ে তাঁহার আত্মানুষিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া অগণিত ব্যক্তি নিয়ত স্তম্ভিত হইতেন। তাঁহার শীতোষ্ণজ্ঞান, ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধ বা খাদ্যাখাদ্যবিচার কিছুই ছিল না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষজ্ঞানে সকলেই তাঁহাকে অশেষ ভক্তি করিতেন। ১৮০৯ শকাব্দের পৌষ মাসে (১৮৮৭ খ্রী) শিষ্যগণের মতে দুই শত আশি বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

দ্র গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জীবনীসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনী ও তত্ত্বোপদেশ, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, মহাকাব্য রত্নাবলী, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, শংকরনাথ রায়, ভারতের সাধক, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

তৈলবীজ ভ্রূণের পুষ্টির জন্য বীজের অভ্যন্তরে শস্য (এন্ডোস্পার্ম) অথবা বীজপত্রে নানা প্রকার খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে। তিল, তিসি, রেড়ি, সরিষা প্রভৃতির বীজে প্রধানতঃ তৈলজাতীয় স্নেহপদার্থ ভ্রূণের জন্য সঞ্চিত থাকে, তাই ইহাদের তৈলবীজ বলা হয়। ইহাদের ঘানিতে নিষ্পেষণ করিলে উদ্ভিজ্জ তৈল বাহির করা যায়।

তিসি লিনাসিঈ গোত্রীয় (Family Linaceae) দ্বিবীজপত্রী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম লিনম উসিতাতিস্সিমম (*Linum usitatissimum*)। ইহার ক্ষুদ্র বীজগুলির বহিঃত্বক জল শোষণ করিয়া আঠাল হইয়া যায়। ইহার বীজপত্রে শতকরা ৩২-৪৩ ভাগ হলুদ, লাল বা বাদামি বর্ণের একপ্রকার গন্ধযুক্ত তৈল বর্তমান। এই তৈল বায়ুর অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে শুখাইয়া কঠিন হইয়া যায়। ১২৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ফুটাইলে তিসির তৈলের শুষ্ক হইবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। কাঠ ও লোহা রঙ করিতে এবং বার্নিশ, লিনোলিয়ম, সাবান, ছাপার কালি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে তিসির তৈল ব্যবহৃত হয়। বিনা উত্তাপেও তিসির তৈল উৎপন্ন করা যায়, ইওরোপে তাহা খাদ্য হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

রেড়ি এউফোরবিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Euphorbiaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বৃহৎ গুল্ম বা ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার বিজ্ঞানসম্মত নাম রিসিনস কোম্মুনিস (*Ricinus communis*)। চ্যাপ্টা বীজের বীজত্বক কৃষ্ণাভ দাগযুক্ত, ধূসর বর্ণ, কঠিন ও মসৃণ। বীজের এক প্রান্তে শাদা কোমল ক্যারানকল (caruncle) অবস্থিত। বীজে শ্বেত বর্ণের শস্যের ভিতর ২টি শাদা, পাতলা, শিরাযুক্ত বীজপত্র বর্তমান। শস্যে শতকরা প্রায় ৩৫-৫৫ ভাগ তৈল থাকে। এই তৈল ঘন, বর্ণহীন অথবা ঈষৎ সবুজ এবং সহজে শুখায় না। জোলাপ, জ্বালানি তৈল, যন্ত্রে ব্যবহার্য পিচ্ছিলকারক (লুব্রিকেটিং) তৈল প্রভৃতি হিসাবে এবং সাবান, কেশতৈল, কালি, প্লাস্টিক প্রভৃতি উৎপাদনে রেড়ির তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল বিষাক্ত বলিয়া পশুখাদ্যের অনুপযোগী, কিন্তু ইহা সার হিসাবে উত্তম।

সরিষা ক্রুসিফেরিঈ গোত্রীয় (Family-Cruciferae) দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। ব্রাসসিকা গণের (Genus-Brassica) বিভিন্ন প্রজাতি সরিষা বলিয়া পরিচিত। রাই, শ্বেত, টোরি, কোলজা, রেপ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সরিষা চাষ করা হয়। সরিষার ক্ষুদ্র গোলাকৃতি বীজের আবরণ শ্বেত, হরিদ্রা বা বাদামি বর্ণের হইয়া থাকে। বীজপত্রে শতকরা ৩০-৪৫ ভাগ তৈল বর্তমান। তৈল প্রধানতঃ রন্ধনে এবং খইল পশুখাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সরিষার চাষ এবং উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশি। পৃথিবীতে যেখানে বিভিন্ন প্রকার সরিষার বার্ষিক চাষের পরিমাণ ৫১ লক্ষ হেক্টর, সেখানে ভারতেই চাষের পরিমাণ ২৮ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি, বার্ষিক ফলন পৃথিবীতে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভারতে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। হেক্টর প্রতি গড় ফলন পৃথিবীতে ৫৭০ এবং ভারতে ৪৯০ কিলোগ্রাম। সরিষা উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ উভয় মণ্ডলেরই ফসল, সন্তোষজনক বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষাকৃত শীতল আবহাওয়ার প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতের সরিষার মধ্যে টোরি, রাই ও বাদামি সরিষাই প্রধান। উর্বর দোআঁশ অথবা পলিমাটি চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ৪-৬ বার চাষ করিয়া জমি ধুলার মত তৈয়ারি করিয়া আশ্বিন কার্তিক মাসে হেক্টর প্রতি ৫½-৭ কিলোগ্রাম বীজ ছিটাইয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বপন করা হয়। মিশ্র চাষে বীজ কম লাগে। সাধারণতঃ বিনা সেচে চাষ হয়, কিন্তু সেচের দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জৈব এবং রাসায়নিক উভয় প্রকার সার প্রয়োগেই সকল জাতের সরিষা সাড়া দিয়া থাকে। ভাল ফলনের জন্য টোরিতে ৩৪, বাদামি সরিষায় ৪৫-৫৬ এবং রাই-এ ৫৬-৬৭ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ অনুমোদন করা হয়। মাঘ-ফাল্গুনে হাত দিয়া উপড়াইয়া অথবা কাস্তে দিয়া কাটিয়া গাছগুলি কয়েকদিন শুখাইয়া বলদ দিয়া মাড়াইয়া ও ঝাড়িয়া রাখিতে হয়। মোটামুটি ভাল চাষে হেক্টর প্রতি টোরি ৫-৭¼ শত, বাদামি সরিষা ৯-১১¼ শত এবং রাই ১১¼-১৩½ শত কিলোগ্রাম ফলন দেয়। 'তিল' দ্র।

দ্র Indian Central Oil-Seeds Committee, *Rape & Mustard*, Hyderabad, 1958; Food & Agriculture Organization, United Nations, *Production Yearbook 1965*, vol. 19, Rome,

1966; Indian Council of Agricultural Research. *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966

মুরারিপ্রসাদ গুহ

উপরি-উক্ত তৈলবীজগুলি ব্যতীত জলপাই ও নারিকেলের শাঁস হইতেও উদ্ভিজ্জ তৈল নিষ্কাশিত হয়।

জলপাই ওলেয়াসিঈ গোত্রীয় (Family-Oleaceae) ৩-১২ মিটার উচ্চ চিরহরিৎ বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ওলেয়া এউরোপীয়া (*Olea europaea*)। আদি উৎপত্তি-স্থল সম্ভবতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও মধ্য এশিয়া। বর্তমানে ফল ও তৈলের জন্য স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী, ফ্রান্স, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, সাইপ্রাস, আলজিরিয়া, আর্জেন্টাইনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশে জলপাইয়ের চাষ হয়। ইহার পত্র প্রশস্ত এবং ফুল উভলিঙ্গ অথবা পুংলিঙ্গ, কেবল উভলিঙ্গ ফুল হইতেই ফল হয়। বায়ুর সাহায্যে পরাগ সংযোগ ঘটে। ফল ড্রুপজাতীয়। সুপক্ব ফলের শাঁসে শতকরা ২০-৫০ ভাগ তৈল থাকে। ফলের শাঁস হইতে নিষ্কাশিত তৈল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও অন্যান্য দেশে রন্ধনের কার্যে ব্যবহৃত হয়। ফলের আচারও উপাদেয় খাদ্য। 'তৈল' ও 'নারিকেল' দ্র।

তোগলক তোগলক বংশ (১৩২০-১৪১২ খ্রী)। দিল্লীর সিংহাসনে তোগলক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন গিয়াসুদ্দীন তোগলক। তিনি জাতিতে তুর্কী ছিলেন এবং স্বকীয় কর্মদক্ষতায় উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শাসন-কার্যে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং মদ্যপান প্রভৃতি কতকগুলি সমসাময়িক কলুষতা হইতে মুক্ত ছিলেন। সরকারি ডাক চলাচলের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন এবং প্রাচীরবেষ্টিত তোগলকাবাদ শহর নির্মাণ করাইয়া সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই বংশের অবশিষ্ট আট জন সুলতানের মধ্যে (নসরৎ শাহ্-সহ), মহম্মদ বিন তোগলকের (১৩২৫-৫১ খ্রী) এবং ফিরোজ তোগলকের (১৩৫১-৮৮ খ্রী) শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহম্মদ বিন তোগলক ছিলেন সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তি, নিষ্ঠাবান মুসলমান, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদারভাবাপন্ন এবং সমসাময়িক কালের নৈতিক কলুষতামুক্ত। এক দিকে অত্যন্ত বিনয়ী ও দানশীল, অপর দিকে তাঁহার চরম নৃশংসতার ও ধৈর্য-হীনতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁহার অসাধারণ ও কতকটা অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি ছিল এবং অনেক নূতন নূতন পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় আসিত। তিনি তাম্রখণ্ড দিয়া বর্তমান কালের ন্যায় নোটের প্রচলন করিয়াছিলেন, দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী সরাইয়া লইয়াছিলেন এবং পারস্য ও হিমালয় পর্বতে স্থিত দেশ জয় করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনারূপায়ণে বাস্তব জ্ঞান ও ধৈর্যের অভাবে এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতায় সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও তিনি কল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই বরং নিজের ও সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। যে সাম্রাজ্য তখন ছিল বিশালায়তন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে পতনোন্মুখ হইল এবং বাংলা ও দাক্ষিণাত্য দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তোগলক ছিলেন দয়াবান ও প্রজাকল্যাণকামী। তাঁহার আমলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বর্তমান ছিল। তিনি বেকারত্ব দূর করার জন্য কর্মসংস্থানসংস্থা, দাতব্য চিকিৎসালয়, সেচের জন্য খাল-খনন ও আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্করদ প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য করিয়াছিলেন। অসংখ্য মসজিদ, উদ্যান, সরাইখানা এবং হিসার, ফতেহাবাদ, জৌনপুর, ফিরোজপুর এবং ফিরোজাবাদ শহরের পত্তনও তিনি করেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির অভাব, দুর্বল ও অব্যবস্থিত নীতির অনুসরণ, জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, ক্রীতদাসপ্রথা, ধর্মান্ধতা ও তজ্জন্য অন্যান্য ধর্মের উপর অত্যাচার এবং বাংলা ও দাক্ষিণাত্য পুনর্জয়ে অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিয়াছিল।

তাঁহার পরবর্তী শাসকদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা এবং ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ফলে ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে তোগলক সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়।

দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী

তোগলকাবাদ তোগলক বংশীয় প্রথম সুলতান গিয়াসুদ্দীন (১৩২০-২৫ খ্রী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর সুলতানদের অন্যতম রাজধানী। ইহা বর্তমান দিল্লী নগরীর দক্ষিণে কুতব মিনার হইতে ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) পূর্বে অবস্থিত। দিল্লী-আগ্রা রেলপথে তোগলকাবাদ স্টেশন আছে। ১৪শ শতকের প্রসিদ্ধ মুসলিম পর্যটক ইব্ন বতুতা এই নগরীর বিশালতা, সমৃদ্ধি ও জাঁকজমকের কথা

বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ('ইব্‌ন বতুতা' দ্র)। কিন্তু বর্তমানে বলিষ্ঠ, সুদৃঢ় ও অতীব আকর্ষণীয় গিয়াসুদ্দীনের সমাধিব্যতীত নগরীর সমস্ত সৌধাবলী ধ্বংসপ্রাপ্ত। বস্তুতঃ এখন তোগলকাবাদকে এক বিরাট জনহীন ধ্বংসস্তূপ বলা চলে।

নগরীটি এক অত্যুচ্চ শিলাময় ভূখণ্ডের উপর নির্মিত হইয়াছিল। অতি স্থূল এবং হেলানো প্রাচীরে বেষ্টিত এই ভূখণ্ডের পরিধি আনুমানিক ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল)। প্রাচীরের বাহিরে তিন দিকে পরিখা এবং অপর দিকে একটি জলাশয়। অবশ্য বর্তমানে অধিকাংশ সময়েই এই জলাশয় শুষ্ক থাকে। প্রাচীরের কিছু দূরে দূরে এক একটি বিশাল গোলাকৃতি বুরুজ। নগরে প্রবেশের জন্য বহু তোরণদ্বার ছিল। নগরদুর্গ ও প্রাসাদ প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত স্বতন্ত্র অংশে অবস্থিত ছিল। নগরীর নির্মাণকার্যে অতি বৃহদাকার শিলাখণ্ডের ব্যবহার লক্ষণীয়।

গিয়াসুদ্দীনের সমাধি নগর-প্রাচীরের বাহিরে এক কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। সমাধি হইতে নগর-দুর্গে যাতায়াত করিবার জন্য একটি খিলানযুক্ত বাঁধানো পথ আছে। সমাধিটির বহিঃপ্রাচীর পঞ্চভুজাকার, মধ্যে মধ্যে এক-একটি বুরুজ। প্রয়োজন হইলে সমাধিটি দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করা যাইত। বহিঃপ্রাচীর ও সমাধি-সৌধের সংলগ্ন প্রাচীর দুইই অত্যন্ত স্থূল এবং হেলানো। মূল সমাধি সৌধ চতুরস্র - প্রতি বাহু ১৮ মিটার (৬১ ফুট) লম্বা। সৌধের নিম্নভাগ লাল বেলে পাথরে নির্মিত, মধ্যে মধ্যে শাদা মারবেল পাথরের পটী। লাল ও শাদা পাথরের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহারে বিচিত্রতার সৃষ্টি হইয়াছে, অন্য অলংকরণ নাই। উপরের বিশাল গম্বুজটি সম্পূর্ণরূপে শাদা মারবেল পাথরে নির্মিত। চূড়ায় হিন্দু মন্দিরের মত আমলক ও কলস। সমাধি সৌধের উচ্চতা সর্বসাকুল্যে ২৪ মিটার (৮০ ফুট)। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে। দরজার উপরে শাদা মারবেল পাথরের জালি, পশ্চিম দিকে মিহরাব। প্রবেশ-দ্বারগুলিতে প্রকৃত খিলান ও কড়ির যুগপৎ ব্যবহার লক্ষণীয়। পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহের (রাজ্যকাল ১৩৫১-৮৮ খ্রী) সমযকার ইমারতগুলিতেও এইরূপ খিলান ও কড়ির যুগপৎ ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

দ্র J. Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture*, London, 1910; Percy Brown, *Indian Architecture : The Islamic Period*, Bombay, 1942.

অমরেন্দ্রনাথ রায়

তোরমান তোরমান সম্ভবতঃ হূণজাতীয় ছিলেন। ৫ম শতাব্দীর শেষে অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করেন। তাঁহার অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ফলতঃ এইগুলি হইতে বেশ বোঝা যায় যে তিনি বিদেশী। ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত ইরান শহরে একটি লিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা ভানুগুপ্ত ইরানের নিকট একটি ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই আবার মহারাজাধিরাজ তোরমানের প্রথম রাজ্যাঙ্কের একখানি লিপিও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমিত হয় যে, ভানুগুপ্ত তোরমানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জৈন গ্রন্থ অনুসারে তোরমান জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়া পাঞ্জাবে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে পব্বাইয়া নামক স্থানে বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

তোরসা পশ্চিম বঙ্গের একটি নদী। ইহার উৎপত্তিস্থল তিব্বতের ট্যাং গিরিপথের দক্ষিণে ২৭°৪২´ উত্তর ও ৮৯°১১´ পূর্বে। আমো চু নামে প্রবাহিত এই নদী তিব্বতের চুম্বী উপত্যকা ও ভুটানের মধ্য দিয়া আসিয়া তোরসা নামে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। পরে আরও দক্ষিণে কুচবিহার জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময়ে ইহা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া একটি শাখা কালজানি নদী এবং অপরটি জলঢাকার সহিত মিশিয়াছে। তোরসার তীরে কুচবিহার একটি বড় শহর।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol XXII, Oxford, 1908 O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1957.

হেনা ঘোষ

ত্বক প্রাণীদেহের বহিরাবরণ। ইহা প্রধানতঃ দুই স্তরে বিন্যস্ত - বহিস্ত্বক (এপিডার্মিস) ও অন্তস্ত্বক (ডার্মিস)। বহিস্ত্বকের বহিরংশের স্তরগুলি কেরাটিন-যুক্ত মৃত কোষ দিয়া গঠিত, ইহারা মুখ্যতঃ আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে আঘাত ইত্যাদি হইতে রক্ষা করে। বহিস্ত্বকের অভ্যন্তর-ভাগের স্তরগুলি সক্রিয় ও জীবিত কোষে গঠিত, ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি কোষ প্রোটোপ্লাজম-এর সেতু দিয়া পরস্পর সংযুক্ত। শেষোক্ত স্তরে মেলানিন নামক কৃষ্ণ বর্ণ রঞ্জক পদার্থে (পিগ্‌মেন্ট) পূর্ণ কতকগুলি কোষ বর্তমান।

বহিস্ত্বকে রক্তবাহ নাই, এগুলি অন্তস্ত্বকেই শেষ হয়। অন্তস্ত্বকে বহুশাখাবিশিষ্ট কোষ (ফাইব্রোব্লাস্ট), ক্ষণপদযুক্ত বিশাল কোষ (ম্যাক্রোফ্যাজ), কোলাজেন ঘটিত তন্তু, জালক (রেটিকিউলার) তন্তু প্রভৃতি বর্তমান। অন্তস্ত্বকে বহু স্বেদগ্রন্থি থাকে, ইহাদের প্রণালীগুলি বহিস্ত্বকের মধ্য দিয়া আসিয়া ত্বকের উপর পৌঁছায়। চুল বা রোমগুলি অন্তস্ত্বকের মধ্যে কেশস্থলী (হেয়ার ফলিক্‌ল) হইতে উৎপন্ন হইয়া বহিস্ত্বক ভেদ করিয়া ত্বকের বাহিরে আসে। অন্তস্ত্বকে কেশস্থলীর গাত্রে সিবাম স্রাবী গ্রন্থিগুলি (সিবেসিয়াস গ্ল্যানড্‌স) উন্মুক্ত হয়। ইহাদের চর্বিপ্রধান ক্ষরণ সিবাম কেশের গাত্র বাহিয়া ত্বকের বাহিরে গিয়া ত্বকের শুষ্কতা নিবারণ করে ও ত্বককে মসৃণ রাখে। অন্তস্ত্বকের নীচে অবস্থিত উপত্বকে (সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু) মেদ বা চর্বি সঞ্চিত থাকে। ত্বকে স্পর্শ, তাপ, ব্যথা প্রভৃতি অনুভূতির গ্রাহক যন্ত্র (রিসেপ্টর) বর্তমান।

দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে রক্ষা করাই ত্বকের প্রধান কার্য হইলেও ইহা দেহের তাপনিয়ন্ত্রণ, দেহ হইতে বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ, তাপ বেদনা স্পর্শ ইত্যাদির অনুভূতি, সূর্যালোকের সাহায্যে ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ প্রভৃতি কর্মেও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। 'ইন্দ্রিয়', 'ঘাম', 'চর্ম', 'দেহতাপ' ও 'ভিটামিন' দ্র।

অসিতকুমার চৌধুরী

ত্রৎস্কি, লেভ (১৮৭৯-১৯৪০ খ্রী) উক্রেনের খারসন্‌ জেলায় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর লেভ ত্রৎস্কি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আসল নাম লেভ ডেভিডোভিচ ব্রনস্টাইন। বিপ্লবের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর তিনি লেভ ত্রৎস্কি নাম গ্রহণ করেন। অডেসা ও নিকোলায়েভ — এই দুইটি শহরে তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। নিকোলায়েভ এর বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়েই তিনি 'নারোদ্‌নিক' নামে সুপরিচিত বিপ্লবী-গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে তিনি বেশি দিন থাকেন নাই, মার্ক্‌স এর মতবাদ গ্রহণ করিয়া 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক' দলভুক্ত হন ও 'দক্ষিণ রুশীয় শ্রমিক ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিকদিগের ধর্মঘট চালনা করিবার অপরাধে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে দুই বৎসর জেলে আটক রাখিয়া চারি বৎসরের জন্য তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৎস্কি সাইবেরিয়া হইতে পলাইয়া লণ্ডনে চলিয়া যান। সেখানে তিনি লেনিনের সঙ্গে মিলিত হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক' দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই কংগ্রেসে 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক' দল 'বল্‌শেভিক' ও 'মেন্‌শেভিক' —এই দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া যায়। কিছুকাল 'মেনশেভিক' গোষ্ঠীভুক্ত থাকার পর ত্রৎস্কি এই দল ত্যাগ করিয়া নির্দলীয় হিসাবে কাজ করিতে থাকেন।

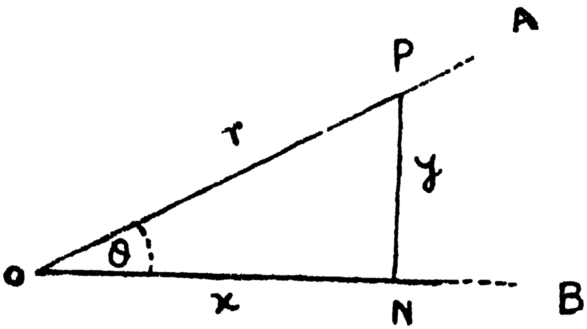
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশীয় বিপ্লবের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা। 'পিটার্সবুর্গ শ্রমিক প্রতিনিধিদের কাউন্সিল'— পৃথিবীর এই প্রথম সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন ত্রৎস্কি। বিপ্লবে পরাজিত হইলে তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়, সেখান হইতে পলাইয়া তিনি ইওরোপে চলিয়া যান। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভিয়েনায় বাস করেন ও 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই সময়ে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন ত্রৎস্কি।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বল্‌শেভিক দলে যোগদান করেন ও কেরেনস্কি গভর্নমেন্টের প্রবল বিরুদ্ধতা করার ফলে কারারুদ্ধ হন। তিনি পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ও লেনিনের সঙ্গে একত্রে অক্টোবর বিপ্লবের পরিচালনা করেন। তিনি সোভিয়েত-রাষ্ট্রের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পরে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমরমন্ত্রীর পদাভিষিক্ত থাকেন। ত্রৎস্কির সহযোগিতায় লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ (থার্ড ইনটারন্যাশন্যাল) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি স্টালিনের গণতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামনীতির ও আমলাতান্ত্রিক চক্রের প্রবল বিরুদ্ধতা করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে বল্‌শেভিক দল হইতে বহিষ্কৃত করা হয় ও 'আল্‌মা আটা'-য় নির্বাসিত করা হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে তুরস্কে নির্বাসিত করা হয়। নাৎসিজমের বিরুদ্ধে ত্রৎস্কি প্রবল আন্দোলন চালান। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেকসিকো দেশে আশ্রয় নেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'চতুর্থ আন্তর্জাতিক সংঘ' (ফোর্থ ইনটারন্যাশন্যাল) প্রতিষ্ঠা করেন। অসাধারণ বাগ্মী ও লেখক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান।

দ্র I. Deutscher, *Prophet Armed. Trotsky: 1879-1921*, London, 1954; I. Deutscher, *Prophet Unarmed: Trotsky 1921-29*, London, 1959.

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিকোণমিতি 'ত্রিকোণ' অর্থে ত্রিভুজ এবং 'মিতি' অর্থে পরিমাপ, সুতরাং ত্রিকোণমিতি বলিতে ত্রিকোণ-ক্ষেত্রের পরিমাপক গণিতশাস্ত্র বুঝায়। বর্তমানে ত্রিকোণমিতির পরিসর ব্যাপকতর। জ্যামিতিক কোণের সংজ্ঞাকে এখানে প্রসারিত করা হইয়াছে। ত্রিকোণমিতিতে ঘূর্ণন-প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন কোণের যে কোনও পরিমাপ হইতে পারে এবং ঘূর্ণনের প্রকৃতি অনুসারে কোণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুই-ই হইতে পারে। ত্রিকোণমিতিকে এবংবিধ কোণ লইয়া কয়েকটি অনুপাতের চর্চা বলা যায়।



$\angle AOB$ যে কোনও কোণ θ (থিটা), ইহার একটি বাহুর যে কোনও বিন্দু P হইতে অন্য বাহুর উপর PN লম্ব টানা হইলে $\triangle PON$ একটি সমকোণী ত্রিভুজ পাওয়া যায়। ইহার ভূমি ON-কে x, লম্ব PN কে y এবং অতিভুজ OPকে r দ্বারা সূচিত করিলে নিম্নলিখিত ভাবে θ কোণের কোণানুপাতগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়:

সাইন (Sine) $\theta = \frac{y}{r}$, কোসাইন (Cosine) $\theta = \frac{x}{r}$

ট্যানজেন্ট (Tangent) $\theta = \frac{y}{x}$, কোসেকান্ট (Cosecant) $\theta = \frac{r}{y}$, সেকান্ট (Secant) $\theta = \frac{r}{x}$, কোট্যানজেন্ট (Cotangent) $\theta = \frac{x}{y}$,

সংক্ষেপে ইহাদের সাইন (sin), কস (Cos), ট্যান (tan), কোসেক (Cosec), সেক (Sec) ও কট (Cot) বলা হয়। ইহা ছাড়া $1 - \cos\theta$-কে ভার্স (Vers) এবং $1 - \sin\theta$ কে কোভার্স (Covers) বলে।

ত্রিকোণমিতির দুইটি শাখা প্রধান: সামতলিক ক্ষেত্রগুলির কোণানুপাতপ্রসঙ্গে সামতলিক ত্রিকোণমিতি (প্লেন ট্রিগনমেট্রি) এবং গোলকের উপর অঙ্কিত ত্রিভুজাদির কোণানুপাত লইয়া গোলক-ত্রিকোণমিতি (স্ফেরিক্যাল ট্রিগনমেট্রি)। প্রদত্ত অথবা মাপের দ্বারা প্রাপ্ত কোণ এবং দূরত্ব হইতে অজ্ঞাত কোণ এবং দূরত্ব-নির্ণয়ে ত্রিকোণমিতির ব্যবহার।

পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতিগণিতের এই তিনটি শাখার সমবায়ের বহু পূর্বে ত্রিকোণমিতির উৎপত্তি হইলেও ইহার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে ধীরে ধীরে। প্রাচীন হিন্দু ও আরবগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চাপ্রসঙ্গে গোলক-ত্রিভুজের সমাধানকল্পে প্রথমে গোলক-ত্রিকোণমিতিতে কাজ শুরু করেন। এইভাবে সামতলিক ত্রিকোণমিতির বহু পূর্বেই গোলক ত্রিকোণমিতির প্রসার ঘটে। অবশেষে ১৩শ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আওতার বাহিরে ত্রিকোণ-মিতির স্বাধীন চর্চা শুরু হয়। গ্রীক লেখকগণের মতানুসারে হিপার্কাস খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর মধ্য ভাগে ১২ খণ্ডে বৃত্তচাপের যে তালিকা প্রণয়ন করেন তাহাই ত্রিকোণমিতির আদি পর্ব। পরবর্তী কালে ১ম শতাব্দীর শেষ ভাগে মেনেলাউস বৃত্তচাপ ত্রিকোণমিতি সম্পর্কীয় এক গ্রন্থ ৬ খণ্ডে রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত গ্রন্থাবলী নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এ বিষয়ে তাঁহাদের কাজের প্রকৃতি ও অগ্রগতি জানা যায় নাই।

ত্রিকোণমিতির উপর প্রথম যে প্রামাণিক রচনা পাওয়া যায় তাহা ২য় শতাব্দীর মধ্য ভাগে আলেকজান্দ্রিয়া-নিবাসী টলেমি লিখিত ১৩ খণ্ডে রচিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক 'আল্‌মাজেস্ট' (Almagest) এর অংশবিশেষ। তাহার কাজ সাধারণতঃ গোলক ত্রিকোণমিতি সম্পর্কীয়। ৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগে আরবের আল বাত্তানি (Al Battani) ত্রিকোণমিতিতে ট্যানজেন্ট ও কোট্যানজেন্ট ব্যবহার করেন। সামতলিক ত্রিকোণমিতির সাইন সম্পর্কীয় সূত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব পারসীক অল্‌ বিরুনীর প্রাপ্য। পাটীগণিত ও বীজগণিতের অগ্রগতির ফলে ইওরোপীয় গাণিতিকগণ ত্রিকোণমিতিতে চাপের পরিবর্তে কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক রেখার পরিবর্তে কোণানুপাত ব্যবহার করিয়া আধুনিক ত্রিকোণমিতির সূচনা করেন।

ত্রিকোণমিতিতে হিন্দুদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাহারা ৩°৪৫′ অন্তর সাইনের (চাপের অর্ধজ্যা) সারণী (টেব্‌ল) তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ইহাতে $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, $\cos\theta = \sin(90° - \theta)$ এবং $1 - \cos 2\theta = 2\sin^2\theta$— এই সূত্রগুলিমাত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সারণী সমকোণী ত্রিভুজের কোণ এবং বাহুনির্ণয়ে ব্যবহৃত হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের শেষের দিকে আরবেরা হিন্দুদের এই কাজের অনুবাদ করেন। এল্‌ফিন্‌স্টোন তাঁহার ভারত-ইতিহাসে লিখিয়াছেন— 'সূর্যসিদ্ধান্তে

ত্রিকোণমিতির এমন সব পদ্ধতি আছে যাহা গ্রীকেরা জানিত না। এমন অনেক সমস্যার সমাধান রহিয়াছে যাহা ইওরোপে ১৬শ শতাব্দীর আগে আবিষ্কৃত হয় নাই।' হিন্দুরা জ্যা, কোটিজ্যা ও উৎক্রমজ্যা আবিষ্কার করেন। এগুলি বর্তমান ত্রিকোণমিতির যথাক্রমে সাইন, কোসাইন ও ভার্সসাইন। সূর্যসিদ্ধান্তের সারণীতে এমন অনেক ত্রিকোণমিতিক পদ্ধতি আছে যাহা ব্রিগ্‌স ১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কার করেন।

হীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত

ত্রিচিনোপল্লী, তিরুচ্চিরাপ্পল্লী মাদ্রাজ রাজ্যের জেলা ও শহর। জেলাটি ১০° হইতে ১১°৩২´ উত্তর এবং ৭৭°৩০´ হইতে ৭৯°৩০´ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন ১৪২৫৮ বর্গ কিলোমিটার (৫৫১৪ বর্গ মাইল)। এই জেলার উত্তরে সালেম এবং দক্ষিণ আরকট জেলা, পূর্বে থানজাভুর (তাঞ্জোর) জেলা, দক্ষিণে রামনাথপুরম এবং মাদুরা জেলা এবং পশ্চিমে কোয়েম্বাটুর জেলা অবস্থিত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য পাঁচটি রাজস্ববিভাগ দশটি তালুকে বিভক্ত। এই সকল তালুকের মধ্যে কুলীতলাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তিরুচ্চিরাপল্লী সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। উন্নয়নের সুবিধার জন্য জেলাটিকে ঊনচল্লিশটি উন্নয়নকেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে।

জেলার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল পার্বত্য। ইহা ছাড়া সর্বত্র ঈষৎ তরঙ্গায়িত কাবেরীর পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চল। জেলার প্রায় ২৭২ বর্গ কিলোমিটার (১০৫ বর্গ মাইল) অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হরিৎ পর্বত বা পচ্চাইমালাই পর্বত দণ্ডায়মান। গড় উচ্চতা প্রায় ৬০৯.৬ মিটার (২০০০ ফুট)। পার্বত্য অঞ্চলে অসংখ্য পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কোল্লাইমালাই (১৪২১.৩ মিটার বা ৪৬৬৩ ফুট) এবং তালাইমালাই (৮৪০.৬ মিটার বা ২৭৫৮ ফুট) উল্লেখযোগ্য। পাহাড়গুলির অধিকাংশই ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ। পাহাড়সমাকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে অনুর্বর সমতল ভূমি দেখা যায়।

কাবেরী এবং উহার শাখানদী কোলেরুন প্রধান নদী, ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য ছোট ছোট নদী অঞ্চলটিকে একটি নাব্য অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে। কাবেরী নদী জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রবেশ করিয়া উহার মধ্য দিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়াছে ('কাবেরী' দ্র)। প্রতি বৎসর প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য বন্যা দেখা দেয়। ইদানীং মেত্তুরে বাঁধ নির্মাণ করিয়া বন্যানিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য নদীগুলির মধ্যে অমরাবতী, আয়ার, কারুভাত্তার, ভেল্লার (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং নোন্দিম প্রধান।

এই জেলার পূর্বাঞ্চলে পাললিক শিলার প্রাধান্য এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগ আর্কিয়ান গ্র্যানিট ও নীস দ্বারা গঠিত। কাবেরী নদীর উত্তর এবং দক্ষিণে শাদা ও নীলাভ চুনাপাথর এবং জেলার পূর্বাঞ্চলে রক্তিম বালুকাবৃত বেলে পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। জেলার উত্তর পূর্ব কোণে কৃষ্ণমৃত্তিকা, পশ্চিমে বালুকাবৃত কৃষ্ণ-মৃত্তিকা ও কাবেরীর দক্ষিণে কাঁকর ও বালুকাময় অনুর্বর মাটি দেখা যায়। কাবেরী উপত্যকার পলিমাটি চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, ইহা ব্যতীত অন্য মাটি অধিকাংশই অনুর্বর।

জলবায়ু শুষ্ক। গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা ৩৮° সেন্টিগ্রেড (১০১.৮° ফারেনহাইট) ও শীতকালে গড় তাপমাত্রা প্রায় ২০° সেন্টিগ্রেড (৬৭° ফারেনহাইট) হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ৮৯০ মিলিমিটার (৩৫ ইঞ্চি)। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় কালেই বৃষ্টিপাত হয়।

দক্ষিণ ভারতের পরবর্তী কালের ইতিহাসে এই জেলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগমযুগ হইতে এই অঞ্চল চোল বংশীয়দের অধিকারে ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে এবং পরবর্তী কালে টলেমির বিবরণে জানা যায় যে, বর্তমান তিরুচ্চিরাপ্পল্লী শহরই (তৎকালীন নাম উরাইয়ুর) চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। পরে পল্লবগণ এবং পাণ্ড্যগণ কিছুদিন রাজত্ব করে। ১৩০০ হইতে ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত মহম্মদ তোগলক এই অঞ্চল শাসন করেন। পরে ইহা মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চল প্রথম ইংরেজ অধিকারে আসে এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পুরাপুরি ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই জেলা বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। পাহাড়ী অঞ্চলে শুষ্ক মিশ্র ধরনের বনভূমিতে সেগুন, চন্দন, ব্ল্যাক্‌ উড, বাঁশ পাওয়া যায়। এই জেলার খনিজ সম্পদের মধ্যে লৌহ, জিপসাম ও অভ্র প্রধান, ইহা ব্যতীত কোরাণ্ডাম, ম্যাগনেসিয়া, তামা, গার্নেট, চুনা পাথর প্রভৃতি বর্তমানে পাওয়া গিয়াছে।

কৃষিই এই জেলার প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ। ধান প্রধান শস্য (ব-দ্বীপ অঞ্চলে), জোয়ার, বাজরা, ডাল, চীনাবাদাম, এরণ্ড, ইক্ষু, কার্পাস, লঙ্কা, নারিকেল, কলা, প্রভৃতিও চাষ করা হয়। গোচারণের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। সেচব্যবস্থায় নদীই প্রধান।

এখানকার বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে বয়লার কেন্দ্র (তিরুচ্চিরাপ্পল্লী শহরের বাহিরে), গোল্ডেন রক্ রেল-কারখানা, অস্ত্রনির্মাণ (তিরুভেরুম্বুর), সিমেন্ট (ডাল-মিয়াপুর ও পুলীযুর), চিনির কল (পুগালুর, কারুর), বস্ত্রবয়নকেন্দ্র (কারুর, ভাল্লাচ্চর, ত্রিচি) প্রভৃতি প্রধান। কুটিরশিল্পের মধ্যে — তাঁতের বস্ত্র, খাদি, সিল্ক, পশমবস্ত্র, মাদুর বয়ন, মুক্তা, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, সোনা-রুপার কাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিরুচ্চিরাপ্পল্লী প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র এবং অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে আনিযালুর, পেরাম্বালুর, তুরাইযুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে জেলার জনসংখ্যা ৩১৯০১৭৮। অধিকাংশ লোকই (৭৮) গ্রামে বাস করে। মোট ১৪০৫টি গ্রাম ও ৩৩টি শহর আছে। তামিল প্রধান ভাষা, তেলুগু, উর্দু, কানাড়ী ও মালয়ালম ভাষাভাষীও আছে। জনশিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি শিক্ষালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতির বিস্তার ঘটিয়েছে।

এই জেলায় অসংখ্য উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে রথযাত্রা, দশেরা, দীপাবলী, আদিপুরম প্রভৃতি প্রধান। থানজাভুর (তাঞ্জোর) এর পরই রাজ্যের সর্বাধিক মন্দির এই জেলায় আছে (প্রায় ২০০০টি), একমাত্র লালগুডি তালুকেই ১২৪টি শিব, বিষ্ণু, মুরুগন প্রভৃতি মন্দির আছে। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথস্বামীর মন্দির, রককোর্টে পল্লাইয়ার ও থায়ুমানাস্বামীর মন্দির, জম্বুকেশ্বর মন্দির, সুব্রাহ্মণ্যস্বামী মন্দির, কদম্বনেশ্বর মন্দির ও কল্যাণ বেঙ্কটরমণস্বামীর মন্দির অন্যতম। তিরুচ্চিরাপ্পল্লীর নিকট চোলযুগের মন্দির ও পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান।

জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত। তিরুচ্চিরাপ্পল্লী দক্ষিণ রেলপথের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্র ও এখানে রেল-কারখানা আছে। ব্রডগেজ ও মিটারগেজ লাইনের দ্বারা জেলার ভিতরে ও বাহিরে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগা-যোগ রক্ষা করা হইয়াছে। তিরুচ্চিরাপ্পল্লী শহরে বিমানঘাঁটি আছে। সড়ক-ব্যবস্থা বেশ উন্নত। মোট ৩৪৭৬ কিলোমিটার (৩০৬০ মাইল) সড়ক আছে।

জেলার প্রধান শহর ও শাসনকেন্দ্র তিরুচ্চিরাপ্পল্লী। ১০°৪৯´ উত্তর ও ৭৮°৪১´ পূর্বে কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। মাদ্রাজ শহর হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৪০১ কিলোমিটার, ইহা অন্যতম প্রধান রেলজংশন, আয়তন ২৩·২৬ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ২৪৯৮৬২ (১৯৬১ খ্রী)। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত হয়। তিরুচ্চিরাপ্পল্লী দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র এবং ইহার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও যথেষ্ট। ইহার বস্ত্রশিল্প প্রসিদ্ধ।

শহরের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে নদীর দক্ষিণ তীরে প্রায় ২ কিলোমিটার (১ মাইল) ব্যাপী দীর্ঘ দুর্গ এবং সেনা-নিবাস প্রধান। গোল্ডেন রক্ ও ফকির রক্ও দর্শনযোগ্য। জেলার অন্যান্য বড় শহরের মধ্যে কারুর (জনসংখ্যা ৫০৫৬৭), পুডুক্কোট্টাই (৫০৪৮৮), গোল্ডেন রক্ (৪৭০৭০) ও শ্রীরঙ্গম (৪১৯৪৯) প্রসিদ্ধ।

দ্র The *Imperial Gazetteers of India*, vol. XXIV, Oxford 1908, F R Hemingway, *Madras District Gazetteer: Trichinopoly*, Madras, 1967.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ত্রিদণ্ডী দণ্ডী দ্র

ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের একাধিক বিভাগ ও নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু সচরাচর ইহা ত্রিপিটক নামে পরিচিত। বৌদ্ধদের মতে, বুদ্ধবচন ও ত্রিপিটক অভিন্ন। ইহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত যথা ১. বিনয়পিটক, ২. সুত্তপিটক ও ৩. অভিধর্মপিটক। বিনয়পিটক – ব্যাখ্যা-কারের আক্ষরিক ব্যাখ্যানুসারে বিবিধ ও বিশেষ নিয়মে কায় ও বাক্যকে বিনমন করে বা বিনীত করে বলিয়া ইহাকে বিনয় বলা হয়। সুত্তপিটক— আত্মহিত পরহিত ইত্যাদি সূচনা করে বলিয়া অথবা শ্রোতাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারী সুন্দরভাবে উক্ত হইয়াছে বলিয়া অথবা যেমন সূত্রদ্বারা পুষ্প গাঁথিয়া রাখা হয় সেইরূপ ইহার সাহায্যে হিতবচন সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সূত্র বলা হয়। অভিধর্মপিটক— বাস্তব লক্ষণ নিরূপণে, স্বভাববিশ্লেষণে ও বিভাগবিশেষের ব্যাখ্যায় যেহেতু ইহা সূত্র বা ধর্ম হইতে ‘অতিরিক্ত’ ও বিশিষ্ট, সেইজন্য ইহাকে অভিধর্ম বলা হয়। ‘পর্যাপ্তি’ (পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্তি অথবা পাঠ) এবং ‘ভাজন’ (আধার) — এই দ্বিবিধ অর্থে পিটক শব্দ ব্যবহৃত হয়। পিটক শব্দের বিকল্প রূপ ‘পেটক’। ইহা পেটিকা শব্দেরই অনুরূপ এবং ‘ভাজন’ ও ‘মঞ্জুষা’র সমার্থক। কথিত আছে, ভগবান গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে তাঁহার পাঁচ শত অর্হৎ শিষ্য রাজগৃহে সমবেত হন। তথায় ‘প্রথম সংগীতি’তে তাঁহারা আবৃত্তির মাধ্যমে বুদ্ধবচনগুলির সংগ্রহ, সংস্থাপন ও নির্ধারণ করেন। ‘প্রথম সংগীতি’তে সংগৃহীত ও নির্ধারিত সমুদয় বুদ্ধবচন

যতদিন লিপিবদ্ধ হয় নাই ততদিন পর্যন্ত তিনটি পিটকে স্থাপিত হইয়া আচার্য-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল, অর্থাৎ এগুলি মুখে মুখে পঠন ও ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

ত্রিপিটকের শিক্ষা ও লক্ষ্য ত্রিবিধ। বিনয়পিটকে আজ্ঞাসূচক শিক্ষা, সূত্রপিটকে সাধারণ ব্যবহার বা লৌকিক শিক্ষা, অভিধর্মপিটকে পরমার্থ শিক্ষা, বিনয়পিটকে যথাপরাধ উপদেশ, সূত্রপিটকে যথানুরূপ উপদেশ, অভিধর্মপিটকে যথাধর্ম বা যথাযথ উপদেশ, বিনয়পিটকে সংযম ও অসংযমের কথা, সূত্রপিটকে দৃষ্টিখণ্ডনের কথা, অভিধর্মপিটকে নাম-রূপবিভাগের কথা আছে। বিনয়পিটকে সুশিক্ষিত হইলে চারিত্রিক গুণসম্পন্ন হওয়া যায় এবং ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত করা যায়, যথা— জাতিস্মরতা, দিব্যদৃষ্টি বা জীবগণের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান ও আস্রব বা তৃষ্ণার ক্ষয়সম্পর্কে জ্ঞান, সূত্রপিটকে সুশিক্ষিত হইলে সমাধিসম্পন্ন (স্থিরচিত্ত) হওয়া যায় এবং ছয় প্রকার অভিজ্ঞান লাভ করা যায়, যথা— উপরি-উক্ত ত্রিবিদ্যাসহ বিবিধ অলৌকিক শক্তি, দিব্যশ্রুতি ও অপরের চিত্তসম্পর্কে জ্ঞান, অভিধর্মপিটকে সুশিক্ষিত হইলে প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় এবং চারি প্রকার 'প্রতিসংবেদ' বা 'প্রতিসংভেদ'জ্ঞান (প্রভেদজ্ঞান, পালির পটিসম্ভিদা), যথা— অর্থসম্পর্কে জ্ঞান, ধর্ম বা হেতুসম্পর্কে জ্ঞান, নিরুক্তিসম্পর্কে জ্ঞান ও প্রতিভাযুক্ত জ্ঞান লাভ করা যায়। কায় ও বাক্য— এই দুই ভিত্তির উপর বিনয় প্রতিষ্ঠিত। চিত্ত বা মনের উপর সূত্র ও অভিধর্ম নির্ভরশীল।

ত্রিপিটকের যে সমস্ত সংস্করণ অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে পালি ত্রিপিটক যেমন প্রাচীনতম তেমনই ব্যাপকতম। পালি বিনয়পিটক ৬ ভাগে, সূত্রপিটক ৫ ভাগে এবং অভিধর্মপিটক ৭ ভাগে বিভক্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া

ত্রিপুরা ২২°৫৬′ হইতে ২৪°৩২′ উত্তর ও ৯১°১০′ হইতে ৯২°২২′ পূর্বে অবস্থিত। ভারতের কেন্দ্রশাসিত ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য। আয়তন ১০৪৬১ বর্গ কিলোমিটার (৪০৩৬ বর্গ মাইল, ১৯৬১ খ্রী); এই রাজ্য ১০টি মহকুমা এবং ৪৫টি তহশিলে বিভক্ত। শহরের সংখ্যা মোট ৬টি এবং গ্রামের সংখ্যা ৪৯৩২টি। উত্তর-পূর্বে আসাম রাজ্যের কাছাড় ও মিজো পার্বত্য এলাকা ব্যতীত অপর সকল দিকেই পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত; যাতায়াতের অসুবিধার জন্য এই রাজ্য একটি দুর্গম অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। সীমান্ত এলাকায় অবস্থানের জন্য ইহার সামরিক গুরুত্বও যথেষ্ট।

এই রাজ্যের প্রায় অধিকাংশই পার্বত্য অঞ্চল; সমতল ভূমির একান্ত অভাব। ভূপ্রকৃতি অনুসারে পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকার সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। ছয়টি বৃহৎ ও সমান্তরাল পর্বত-শ্রেণী প্রায় ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) ব্যবধানে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত। পূর্ব সীমান্ত বরাবর এই পাহাড়গুলির উচ্চতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব দিক হইতে উল্লেখযোগ্য পাহাড়গুলির মধ্যে জমপাই ও সখন্তলং প্রধান। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ বেতলিং শিবের উচ্চতা ৯৭৫ মিটার (৩২০০ ফুট)। এই পর্বত-শ্রেণীগুলি জলবিভাজিকার কাজ করে।

গোমতী এই রাজ্যের প্রধান নদী। খোয়াই, দোলাই, মনু, জুরি এবং লংগাই প্রভৃতি পার্বত্য নদীগুলি পার্বত্য এলাকা হইতে উৎপন্ন হইয়া গোমতী নদীতে পতিত হইয়াছে। ফেণী ও মুথরী আরও ২টি উল্লেখযোগ্য নদী।

ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী এই অঞ্চলের গঠন 'আপার টার্শিয়ারি' যুগের বলিয়া অভিহিত করা হয়। সমভূমি এলাকা অধুনা নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত।

সাধারণতঃ এখানকার মৃত্তিকাকে ল্যাটেরাইট মাটি, পলিমাটি এবং পার্বত্য মাটি— এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সমভূমির নদীবাহিত পলিমাটিই সর্বাপেক্ষা উর্বর।

ত্রিপুরা নাতিগ্রীষ্মপ্রধান পার্বত্য অঞ্চল, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম। বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক গড় ১২২৫ মিলিমিটার (৮৫ ইঞ্চি) এবং আর্দ্রতা বেশি। মে হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় ৩৫° সেন্টিগ্রেড (৯৫° ফারেনহাইট) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ১০° সেন্টিগ্রেড (৫১° ফারেনহাইট)। বৃষ্টিপাতের আধিক্যহেতু প্লাবন দেখা দেয়। ত্রিপুরার প্রধান নদী গোমতীর উৎসমুখে ত্রিপুরার একমাত্র জলসেচ প্রকল্প উদয়পুরের নিকট নির্মিত হইতেছে। স্থানীয় জলসেচ-ব্যবস্থা ১৮৪০০ হেক্টর (৬৬০০০ একর) ভূমিতে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (৮৬০০ কিলোওয়াট), বন্যানিয়ন্ত্রণ মৎস্যচাষ, শিল্পপ্রকল্পের প্রসার (দক্ষিণ অঞ্চলে) প্রভৃতি বহুমুখী পরিকল্পনা ইহার অঙ্গীভূত। রাজ্যের একমাত্র হ্রদ রুদ্রসাগর মৎস্যচাষ এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মৎস্যক্ষেত্র আছে।

ত্রিপুরার এক বিরাট অংশব্যাপী (২২%) বনভূমি থাকিলেও ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সামান্য। দুর্গম প্রকৃতি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ-ব্যবস্থা, ভূমিক্ষয়, ঝুম চাষের

জন্য বনভূমি অপসারণ ইত্যাদি বনজ সম্পদ আহরণের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। বনভূমির অধিকাংশই 'মিশ্র' ধরনের বৃক্ষে পূর্ণ। দক্ষিণের বনভূমিতে শাল, তুন, জারুল, গর্জন, গামহার, বেত ও প্রচুর বাঁশ এবং উত্তরের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে বাঁশবন দেখা যায়। বনভূমির কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নৌকা নির্মাণে ব্যবহার করা হয় এবং সংরক্ষিত বনভূমিতে সেগুন, মেহগনী, শিশু, রবার ও তুঁত গাছের চাষ করা হয়। ইদানীং বন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা অরণ্য উচ্ছেদ বন্ধ করিয়া বনজ সম্পদকে দ্রুতভাবে মানবকল্যাণে নিযোগ করা হইতেছে। এই অঞ্চলের সংরক্ষিত বনভূমিতে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, পাইথন সাপ প্রভৃতি দেখা যায়।

ত্রিপুরা খনিজ সম্পদে খব সমৃদ্ধ নয। আগরতলা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাসনপত্র তৈয়ারির উপযুক্ত মৃত্তিকার স্তর, ফেণী নদীর উপত্যকায় সোনারামপাড়া ও বেল-চোমির নিকট লিগ্‌নাইট কয়লা, সোনামুড়া ও উদয়পুরের নিকট বোলজাতীয় কয়লা এবং উদয়পুর, সাবরুম ও বেলোনিয়ার চুনা পাথর উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত ত্রিপুরাতে খনিজ তৈলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান স্তম্ভ কৃষি। শতকরা ৭৫ ভাগ লোক এই জীবিকার উপর নিভরশীল। রাজ্যের সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব কৃষি হইতে সংগৃহীত হয়। পার্বত্য এলাকায় ঝুম চাষ করা হয় এবং উপজাতীয় অধিবাসীরা এই ধরনের প্রথায় চাষ-আবাদ করে। ধান্য সর্বপ্রধান শস্য (৮০% জমিতে ধান চাষ হয়), ইহা ব্যতীত কার্পাস, পাট, চা, ইক্ষু, আলু, সরিষা, পেঁয়াজ, পান, আদা, সুপারি, তৈলবীজ, চীনাবাদাম, ডাল, তিল, লঙ্কা, তামাক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাট ও চা বিদেশে রপ্তানি করিয়া মুদ্রা অর্জন করা হয়। উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চাষবাস সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। ত্রিপুরাতে বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ করা হয়। উহাদের মধ্যে আনারস, কমলালেবু, নারিকেল, কাজুবাদাম এবং লিচু উল্লেখযোগ্য। এখানে রেড়ির (তৈলবীজ) চাষও হয়।

বর্তমানে জেলার প্রচলিত শিল্পের মধ্যে হস্তচালিত তাঁত ও বাঁশের কাজ, চামড়ার কাজ প্রভৃতি কুটিরশিল্পই ত্রিপুরার একমাত্র শিল্প-সম্পদ। বর্তমানে এই রাজ্যে ছোট ছোট কারখানায় লোহার কাজ, পিতলের কাজ, ঢালাইয়ের কাজ ইত্যাদি হয়। চা-শিল্প এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। এই স্থান হইতে অন্যত্র কার্পাসবস্ত্র, কাঠ, তিল, বাঁশ, বেত, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। আগরতলা, খোয়াই, কৈলাশহর, উদয়পুর, বিশাল-গড এবং মোহনপুর প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র।

ত্রিপুরার জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। দেশ-বিভাগের পূর্বে এই রাজ্যে উপজাতীযগণের সংখ্যাই সর্বাধিক ছিল। কিন্তু অধুনা পূর্ব পাকিস্তান হইতে ক্রমাগত শরণার্থীগণ আসিয়া এই রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহাদের সংখ্যা ও দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। উপজাতীয়দের মধ্যে ত্রিপুরী, রিয়াং, মগ, চাকমা, কুকী, মণিপুরী, জামাতিয়া, লাওয়াতিয়া, গারো, লুসাই প্রভৃতি প্রধান। প্রধান ভাষা বাংলা, ইহা ব্যতীত মণিপুরী ও আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষাও চলে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল ৬৪৬৭০৭ এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১১৪২০০৫। কৃষিকার্য, ব্যবসায ও কুটিরশিল্প জনগণের প্রধান উপজীবিকা। আগরতলা (জনসংখ্যা ৫৪৮৭৮), ধর্মনগর, খোয়াই, রাধাকিশোরপুর, বেলোনিয়া এবং কৈলাশহর – এই ছয়টি শহর। আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী এবং প্রধান শহর। এই শহরের স্বায়ত্তশাসনভার মিউনিসিপ্যালিটির উপর ন্যস্ত।

এই রাজ্যে রেলপথ নাই, উপত্যকা অঞ্চলে নদীগুলি কেবলমাত্র বর্ষায় ছোট নৌকা, ভেলা ও ডিঙিতে পারাপার হওয়া যায়। বাহিরের সহিত আকাশপথে যোগাযোগ আছে এবং আগরতলায় রাজ্যের একমাত্র বিমানঘাঁটি অবস্থিত। সংযোগ ব্যবস্থা প্রধান প্রধান সড়কগুলির মাধ্যমেই রক্ষা করা হয়।

শিল্পরুচির স্বাক্ষর হিসাবে রাজপ্রাসাদ 'নীড়মহল' এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য ডম্বুর জলপ্রপাত প্রভৃতি পর্যটকগণকে আকৃষ্ট করে। রাজ্যের উৎসবের মধ্যে হোলি, দশেরা, মহরম, দেওয়ালি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের মেলা হয়, উহার মধ্যে আগরতলার মেলাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদয়পুর ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী।

দ্র 'সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা', আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ১৯৬৩, *The Imperial Gazetteer of India*, vol XIII, Oxford, 1908, *Census of India, Paper no I*, New Delhi, 1962.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস প্রধানতঃ 'রাজমালা' হইতে উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু 'রাজমালা'র প্রথমাংশ প্রাচীন

প্রবাদ ও গল্পমূলক। ঐতিহাসিক পর্বে নবাব তুঘ্রিল খাঁ (১২৭৯ খ্রী) ও ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪৫-৫৭ খ্রী) ত্রিপুরা লুণ্ঠন করেন। ইহার পর ডাঙ্গরফার রাজত্বকালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রত্নফা গৌড়েশ্বরের সহায়তায় রাজ্যলাভ করেন ও তাঁহার নিকট হইতে 'মাণিক্য' উপাধি পান। তদবধি ত্রিপুরা রাজগণের 'মাণিক্য' উপাধি হইয়াছে। ধন্য-মাণিক্য (১৪৬৩-১৫১৫ খ্রী) রাজা হইলে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের সহিত তাঁহার বিরোধ হয় ও 'রাজমালা'র ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম, পট্টিকেরা, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত, থানাংছি প্রভৃতি দখল করেন। ইহার পর বিজয়মাণিক্যের (১৫২৯-৭০ খ্রী) সময় রাজমালার মতে সোলেমন কররানীর সৈন্যেরা পরাজিত হয়। বিজয়মাণিক্য শ্রীহট্ট ও নোয়াখালির অংশবিশেষ এবং চট্টগ্রাম জয় করেন। তাহার পর চট্টগ্রাম পুনরায় ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হয়। ইহার পর অমরমাণিক্য রাজা হইয়া 'অমর সাগর' খনন করেন। এই কার্যে শ্রীপুরপতি চাঁদরায়, বাকলা, ভাওয়াল ও ভুলুয়ার রাজগণ সাহায্য করায় ত্রিপুরারাজের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ইহার আরাকান অভিযান ব্যর্থ হয়। এমন কি আরাকানরাজ ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর দখল করেন। ইহার পর যশোধর মাণিক্যের সময় সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে ঢাকার নবাব ফতেজঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠান। ইহার কিছুকাল পরে মুর্শিদাবাদের নবাবের ইচ্ছানুসারে ত্রিপুরার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইতে লাগিল। সুজাউদ্দীন যখন বাংলার নবাব তখন ত্রিপুরারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র যোগনের সাহায্যে ত্রিপুরার গদী পান। তখন নবাব ত্রিপুরার নাম বদলাইয়া 'রোসেনাবাদ' ('আলোর দেশ') রাখেন। আলীবর্দী খাঁর সময়ে তাঁহার জামাতা নুবাজিস মহম্মদ পুনর্বার ত্রিপুরা দখল করেন।

ইহার পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার ওড়িশার দেওয়ানী পাইলে ত্রিপুরার যে অংশ সমতল ভূমি ও যাহা খাজনার খাতে (রেণ্ট রোল) ছিল তাহা ইংরেজদের দখলে আসে, ইংরেজগণ একজন রাজাকে গদীতে বসান ও ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক রাজাকে অভিষিক্ত করেন (ইন্‌ভেস্টিচার) ও তাঁহাকে নজর দিতে হয়। ত্রিপুরার রাজগণকে কর দিতে হইত না। ইংরেজ গভর্নমেন্টের সহিত তাঁহাদের কোনও সন্ধি হয় নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-স্বার্থ রক্ষার জন্য একজন ইংরেজকে 'পোলিটিক্যাল এজেন্ট' হিসাবে রাখা হয়। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় ও ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার পদাধিকার বলে ত্রিপুরা রাজ্যের 'পোলিটিক্যাল এজেন্ট' হন। ত্রিপুরার রাজা ১৩টি কামানধ্বনি দ্বারা সংবর্ধিত হইতেন। এইভাবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি রাজ্য হয় ও ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হয়। ত্রিপুরার রাজগণ বাংলা ভাষার উৎসাহদাতা ও তাঁহাদের অনেকেই শিল্পী, সাহিত্যিক ও চিত্রকর।

ত্রিপুরা রাজ্য : ভারতবিভাগের পরে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা রাজ্য ভারতভুক্ত হইয়া ইহা সরাসরি ভারত সরকারের অধীনে আছে। তদবধি ইহা ভারতীয় সংবিধানের 'সি' শ্রেণীর রাজ্যরূপে গণ্য আছে।

দ্র দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নব জ্ঞান ভারতী, কলিকাতা, ১৯৫৮, Charles Stewart, *History of Bengal*, London, 1813, *The Imperial Gazetteer of India*, vol XIII, Oxford, 1908, Publication Division, Government of India, *India* 1962, 1963, Delhi, 1963.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ত্রিবন্দরম, ত্রিবান্দ্রম কেরল এর একটি জেলা ও শহর। জেলাটি ৮°২৭ হইতে ৯°২২´ উত্তর এবং ৭৬°৭´ হইতে ৭৭°৩০´ পূর্বে ইহা ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমে কেরল রাজ্যের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। পূর্বে ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। জেলার আয়তন ২১৯৪ বর্গ কিলোমিটার (৮৪৭ বর্গ মাইল)। জেলাটিকে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ৬টি তালুকে ভাগ করা হইয়াছে। এই জেলার মোট শহরের সংখ্যা ১৩টি। জেলার উত্তর সীমানায় এই রাজ্যের কুইলন জেলা, পূর্বে মাদ্রাজ রাজ্যের তিরুনেলভেলি জেলা, দক্ষিণে কন্যাকুমারী জেলা এবং পশ্চিমে আরব সাগর অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে এই জেলাকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়. ক. পূর্ব দিকে নীস শিলাদ্বারা গঠিত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল জেলার উচ্চতম স্থান এবং উত্তুঙ্গ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অংশবিশেষ অগস্ত্যমলয় ও মহেন্দ্রগিরি পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। ধীরে ধীরে উচ্চতা পশ্চিম দিকে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া বিস্তৃত উপত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বের এই সু-উচ্চ পর্বতশ্রেণী হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় পশ্চিমে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত

হইয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া শেনকোটা গিরি-পথের দ্বারাই পূর্বাংশে মাদ্রাজ রাজ্যের সহিত যোগাযোগ সাধিত হয়। পাহাড়গুলি দক্ষিণ পূর্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত, প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ও ঘন জঙ্গলাবৃত। খ. ল্যাটেরাইট শিলাদ্বারা গঠিত মধ্য ভাগের বন্ধুর মালভূমি অঞ্চল। উহার উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট)। অঞ্চলটি বনজঙ্গল ও গুল্ম প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত। গ. নিম্ন সমভূমি ও উপকূল অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাই পলিমাটি গঠিত, অতি উর্বর ও চাষবাসের পক্ষে উপযোগী। ছোট খাঁড়ি দ্বারা সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশি উপকূলের সমভূমির ভিতরে অনুপ্রবেশ করিয়া লবণাক্ত উপহ্রদ ও বিস্তৃত জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তটভাগ সংকীর্ণ নিচু ও বালুকাময়। পশ্চাদ্‌ভাগের এই বিস্তৃত জলাশয়গুলিকে কৃত্রিম খালদ্বারা সংযোজন করিয়া জলপথের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ত্রিবন্দরম জেলার প্রথম ও অতি প্রাচীন শিলাস্তরে লৌহ-আকরিক, চীনামাটি, অভ্র, অঙ্গারক লৌহ (plambags) নানা ধরনের মৃত্তিকা, গ্রাফাইট, ল্যাটেরাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়। সমুদ্রতীর হইতে প্রচুর পরিমাণে ইলমেনাইট, সিলিমানাইট, রুটিল, মোনাজাইট ও জার্কন বালুকা সংগ্রহ করা হয়।

এই জেলার নদনদীগুলি সাধারণতঃ বর্ষণপুষ্ট। বর্ষার সময়ে পার্বত্য এলাকায় সৃষ্ট অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদীর মধ্যে অগস্ত্য মলয় পর্বত হইতে উত্থিত নেয়ার নদী উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রতীরে জোয়ারের জলস্ফীতির সময়ে লবণাক্ত জলরাশি ভিতরে অনুপ্রবেশ করে এবং চাষোপযোগী জমিতে প্রবেশ করিয়া ক্ষতিসাধন করে। সমভূমিতে লবণাক্ত ও সুমিষ্ট জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু হ্রদ রহিয়াছে।

ত্রিবন্দরমের জলবায়ু আর্দ্র। উষ্ণতা বেশি নহে। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩২.২° সেন্টিগ্রেড (৯০° ফারেনহাইট) পর্যন্ত ওঠে। শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.৫° সেন্টিগ্রেড (৬৯° ফারেনহাইট) হয়। উচ্চতা হিসাবে তাপমাত্রার পার্থক্য লক্ষিত হয়। পার্বত্য এলাকার জলবায়ু প্রায় সারা বৎসরই ঠাণ্ডা এবং মনোরম, সমভূমি এলাকায় গরম ও আর্দ্রতা অধিক। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় প্রায় ১৪৫০ মিলিমিটার (৫৮ ইঞ্চি), পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাতের গড় প্রায় বাৎসরিক ৫০৮০ মিলিমিটার (২০০ ইঞ্চি)।

প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, এই জেলাটি প্রাচীন কেরল রাজ্যের অংশ হিসাবে পরিগণিত হইত। খ্রীষ্টজন্মের পর প্রথম কয়েক শতক ধরিয়া পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন নৃপতি শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং ৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই নৃপতিগণের শেষ প্রধান চেরামান পেরুমাল এইস্থানে রাজত্ব করিতেন। পরবর্তী কালে ইহা চোল, পাণ্ড্য ও বিজয়নগর রাজ্যের অধিগত হয়। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নৃপতি মার্তণ্ড বর্মা বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৯ এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মহীশূররাজ টিপু সুলতান কর্তৃক এই রাজ্য আক্রান্ত হয়। এই সময় হইতেই এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইংরেজ ও খ্রীষ্টানদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় রাজা ইংরেজদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাহাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লন। পরবর্তী কালে দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের কর্তৃত্ব ও শাসনকার্য চালাইয়া গিয়াছেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে এই অঞ্চল কেরল রাজ্যের একটি জেলারূপে পরিগণিত হইয়াছে।

ত্রিবন্দরম জেলার মোট বনভূমির পরিমাণ ৪৪৬৫৯ হেক্টর (১১০৩৫২ একর মোট এলাকার প্রায় ২০.৭৮)। ঐ সকল বনে প্রচুর পরিমাণে সেগুন মেহগনী চন্দন আবলুস দেবদারু প্রভৃতি গাছ জন্মায়। কাঠ, বেত, বাঁশ মধু, কর্পূর, রবার ও ভেষজ উদ্ভিদ এখানকার মূল্যবান বাণিজ্য সম্পদ। বনজ বাঁশ দেবদারু দিয়া কাঠ, আসবাব, কাগজ, প্লাইউড, রেয়ন, দিয়াশলাই প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষিই জনগণের প্রধান উপজীবিকা। জেলার মোট ভূমির ৬৮০ কৃষিকার্যে নিয়োজিত। পার্বত্য এলাকায় পর্বতগাত্রে ঢালের উপর বৃহৎ বাগিচাগুলিতে চা, কফি ইত্যাদি নানা ধরনের শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রধান শস্যগুলির মধ্যে ধান, রাগী, ভুট্টা, ডাল, ফল, আদা, তিল, চীনাবাদাম, লঙ্কা, মরিচ, তামাক, তুলা, রবার, তৈলবীজ, পান, এলাচ, সুপারি, চা, কফি, কাজু, ট্যাপিওকা, ইক্ষু, তুলা, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, আনারস প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধান এবং নারিকেল দুইটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কতকগুলি খালের সাহায্যে জলসেচ করিয়া কৃষিকার্যের সহায়তা করা হইতেছে।

এই জেলার কুটিরশিল্পগুলির মধ্যে নারিকেলের দড়ি, তৈল ও অন্যান্য নারিকেলজাত শিল্পই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট দড়ি এখানে প্রস্তুত হয় এবং কুটিরশিল্পের মধ্যে সর্বাধিক শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কাঁসার বাসনপত্র,

কথাকলি নৃত্যের উপযোগী পোশাক ও আনুষঙ্গিক জিনিস নির্মাণ, হস্তীদন্তের কাজ, মাদুরশিল্প প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। বড় আকারের শিল্পগুলির মধ্যে রবার-কারখানা, বস্ত্রবয়ন, তাঁতশিল্প, রঙ এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই জেলায় আছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুসারে এই জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭৪৪৫৩১ (পুরুষ: ৮৬৯৮৮৪ এবং নারী: ৮৭৪৬৪৭)। মোট শ্রমজীবীর মধ্যে পুরুষ ৪০০৫৯৫ জন এবং নারী ১৪০২৯৬ জন। মোট শিক্ষিতের মধ্যে পুরুষ ৪৬৩৬৩১ জন এবং নারী ৩২৬৬০৭ জন। ত্রিবন্দরম জেলার প্রধান ভাষা মালয়ালম।

সমগ্র দেশের মধ্যে কেবল রাজ্যেই শিক্ষিতের হার সর্বাধিক। এই জেলাতেও শিক্ষিতের হার উচ্চ পর্যায়ের। বর্তমানে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইন কলেজ, মিশনারী কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। নারী শিক্ষিতের সংখ্যাও যথেষ্ট।

রাজ্য সরকার জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। জলনিষ্কাশন, হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, উন্মাদ আশ্রম, কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসাগার, পশু চিকিৎসালয় প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে।

এই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি উন্নত ধরনের। জেলার মোট সড়কের পরিমাণ ১৬৭৭·১৮ কিলোমিটার (১০৩৮ মাইল), প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪৭·২ (প্রতি বর্গ মাইলে ১২২·৬)। সড়কপথে কুমারিকা অন্তরীপের সহিত ত্রিবন্দরম-এর যোগাযোগ রক্ষা হইতেছে। রেলপথে ত্রিবন্দরমের মিচারগেজ শাখা মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীগুলি বর্ষাকালে নৌবহনযোগ্য। পশ্চিম সমভূমি অঞ্চলের বিস্তৃত জলাশয় ও উপহ্রদগুলি কৃত্রিম খাল দ্বারা সংযোজন করিয়া জলপথের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ত্রিবন্দরম জেলার প্রধান প্রধান উৎসবগুলির মধ্যে ওনম্ উৎসব উল্লেখযোগ্য। জেলায় অসংখ্য বিষ্ণু ও শিবের মন্দির এবং গির্জা আছে।

জেলার প্রধান শহর ত্রিবন্দরম ৮°২৯′ উত্তর ও ৭৬°৫৭′ পূর্বে অবস্থিত। ইহা কেবল রাজ্যের রাজধানী, জেলার প্রধান কার্যালয়, প্রধান শাসনকার্যালয় ও বৃহৎ বন্দর। মশলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবে প্রাচীন যুগে এই স্থানের গুরুত্বও যথেষ্ট ছিল। এই শহরকে করায়ত্ত করার জন্য পর্তুগীজ, ফরাসী, মুসলমান, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বহুবার সংঘর্ষ হইয়াছিল। প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সম্মিলিত রাজ্যের রাজধানীও এই স্থানে ছিল। এই শহরে স্বাধীনতালাভের পূর্বে ব্রিটিশ শাসকের এবং বর্তমান মহারাজার বাসস্থান ছিল। শহরটি উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত এবং দক্ষিণ ভাগে জনবসতি ঘন, এই অঞ্চলে পরিখাবিহীন দুর্গের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদটি অবস্থিত। উত্তরাংশে সামরিক ছাউনি ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫৯·৪৫ মিটার (১৯৫ ফুট) উচ্চে ল্যাটেরাইট শিলার পাহাড়ের উপর একটি পর্যবেক্ষণ-আগার ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ত্রিবন্দরম মাদ্রাজের সহিত রেলপথে সংযুক্ত এবং দূরত্ব ৬৩৫ কিলোমিটার (৩৯৫ মাইল)। জলপথে কোচিন বন্দর, কুইলন প্রভৃতি শহরের সহিত যোগাযোগ আছে। জলের স্বল্পতার জন্য ভারী ও বড় জাহাজ ত্রিবন্দরম বন্দরে ভিড়িতে পারে না।

ত্রিবন্দরম ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। অনন্তপদ্মনাভস্বামীর মন্দির-দর্শনার্থী বহু তীর্থযাত্রী বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর এখানে আসেন। মন্দিরটি দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং বস্তুতঃ মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই শহরটি বিস্তারলাভ করিয়াছে। অনন্তদেবের পবিত্র স্থান হিসাবেই শহরটি 'তিরু অনন্তপুরম্' হিসাবেও আখ্যাত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু লোক এই শহরে বাস করে। প্রাচীন প্রথায় তৈয়ারি বহু অট্টালিকার সমাবেশ এই শহরে লক্ষ্য করা যায়। শহরের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি হিসাবে হাইকোর্ট, কাছারী, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ অব আর্ট স্কুল, সাধারণ গ্রন্থাগার, গির্জা, নেপিয়ার মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, প্রমোদ-উদ্যান, সামরিক ছাউনি, অ্যাকোয়ারিয়াম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXIV, Oxford, 1908; *The Imperial Gazetteer of India, Provincial Series: Madras*, vol. 2, Calcutta, 1908; O. H K Spate, *India and Pakistan*, London, 1957; National Council of Applied Economic Research, *Techno-Economic Survey of Kerala*, New Delhi, 1962; *Census of India 1961*, vol 7, *Kerala*, part, VIF, *Village Survey Monographs: Trivandrum District*, Trivandrum, 1963.

শরৎকুমার চক্রবর্তী

ত্রিবাঙ্কুর কেরল দ্র

ত্রিবেণী ২২°৫৯´ উত্তর ও ৮৮°২৬´ পূর্ব। হুগলি জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। ইহা মুক্তবেণী নামেও পরিচিত। যেখানে তিনটি জলপ্রবাহ মিলিত হয় তাহাকে ত্রিবেণী বলে। লোকেদের বিশ্বাস যে এলাহাবাদে প্রয়াগের নিকট গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী একধারায় মিলিত হইয়াছে এবং এইখানে আসিয়া বিযুক্ত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত', বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিবেণী প্রসিদ্ধ বন্দর ও সংস্কৃত-বিদ্যার কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তিরপানি বলিত।

এখানকার জাফর খাঁর মসজিদ মুসলমান আমলের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই মসজিদের উৎকীর্ণ আরবীলিপি হইতে তৎকালীন বাংলার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। নিকটবর্তী সমাধিক্ষেত্রে সংস্কৃত লিপিক্ষোদিত কতকগুলি প্রস্তর ফলক রহিয়াছে। এখানে কয়েকটি হিন্দু ও জৈন মূর্তি এবং ওড়িশা রাজ হরিচন্দনের নির্মিত পুরাতন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আছে।

ত্রিবেণীর গঙ্গায় স্নান করা অতি পুণ্যকাজ বলিয়া মনে করা হয়। ত্রিবেণীতে বারুণী, দশহরা, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি, মকর-সংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা প্রভৃতি উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India* vol XXIV, Oxford, 1908

পঞ্চানন চক্রবর্তী

ত্রিশঙ্কু ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুরাগ্রহী রাজা। সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গগমনের অভিলাষে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিলে কুলগুরু বশিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রগণ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। বশিষ্ঠের পুত্রগণের অভিশাপে তিনি চণ্ডালে পরিণত হন। নীলবস্ত্রপরিহিত লৌহাভরণ-ভূষিত ভীষণাকৃতি ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি ঋষিদের আহ্বান করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞভাগগ্রহণে দেবতারা উপস্থিত না হওয়ায় বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণের চেষ্টা করিলে দেবগণ বিরোধিতা করেন। গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কু স্বর্গবাসের অযোগ্য, এই কারণে স্বর্গাগত ত্রিশঙ্কুকে ইন্দ্র অধোমুখে পৃথিবীতে পতিত হইতে নির্দেশ দেন। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে অর্ধপথে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রলোক সৃজন করিলেন। অন্য ইন্দ্র ও দেবতা সৃষ্টি করিতেও তিনি প্রবৃত্ত হন। নিম্নশির ত্রিশঙ্কু আকাশে দেবতুল্য হইয়া শোভা পাইবেন এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট তারাগণ তাঁহার অনুগমন করিবে, সন্ত্রস্ত দেবগণ এই পর্যন্ত অনুমোদন করেন (রামায়ণ, ১।৫৭-৬০)।

হরিবংশ (১।১২-১৩) ও দেবীভাগবত (৭।১০-১৪) অনুসারে ত্রিশঙ্কুর পিতার নাম ত্রয্যারুণ বা অরুণ। ত্রিশঙ্কুর আসল নাম সত্যব্রত, ইনি তিনটি অপরাধের জন্য ত্রিশঙ্কু নামে পরিচিত হন। বিশ্বামিত্রের সহায়তায় ইনি সশরীরে স্বর্গগমনে সমর্থ হন। দেবীভাগবতে (৭।২৭) ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্রের প্রজাবর্গসমভিব্যাহারে স্বর্গগমনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী বাংলা রামায়ণের মতে হরিশ্চন্দ্র শেষ পর্যন্ত স্বর্গগমনে ব্যর্থ হইয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন। ত্রিশঙ্কুর অন্তরালে অবস্থানের কথা কালিদাসের শকুন্তলার দ্বিতীয় অঙ্কে উল্লিখিত হইয়াছে। চলতি বাংলায় ত্রিশঙ্কুর অবস্থা প্রভৃতি প্রয়োগে ইহার ইঙ্গিত আছে।

যূথিকা ঘোষ

ত্রিশরণ বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ত্রিরত্ন এবং ত্রিশরণ সমার্থক। আচার্য বুদ্ধঘোষ আক্ষরিক অর্থে শরণ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন: 'হিংসা করে' এই অর্থে শরণ – শরণাগতের ভয়, সন্ত্রাস, দুঃখ, দুর্গতি, পরিক্লেশকে হনন করে, বিনাশ করে, নিবারণ করে, এইজন্য ইহার নাম শরণ। বস্তুতঃ শরণ, ত্রাণ, লয়ন (পালি লেন), পরায়ণ —ইহারা একার্থবোধক শব্দ। যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে শরণরূপে গ্রহণ করেন তিনি দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখোপশমের উপায়স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ —এই চতুরার্যসত্য সম্যক্ প্রজ্ঞায় দেখিতে পান (উপলব্ধি করেন)। এইরূপ শরণ সর্বদুঃখহর, নিরাপদ ও উত্তম। ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্নতা এবং সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক ক্লেশ-বিদূরিত (চারিত্রিক দোষবর্জিত) এবং তৎপরায়ণতা দ্বারা উদ্দীপিত চিত্তের উৎপত্তির নাম শরণাগমন বা শরণাগতি। ইহা একটি বৌদ্ধ পদ্ধতিবিশেষ। এই পদ্ধতি অনুসারে শরণাগমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তিনবার এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি'। সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রথমে বুদ্ধকে, তাঁহার উপদেশ বলিয়া অনন্তর ধর্মকে এবং তাঁহার ধর্মের ধারক, বাহক ও অনুশীলনকারী বলিয়া অন্তে সংঘকে শরণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এ স্থলে ত্রিরত্নই

'গমনীয়', গমনের প্রকৃতি বুঝাইতে শরণ শব্দের প্রয়োগ। লোকোত্তর ও লৌকিকভেদে শরণাগমন দ্বিবিধ, যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা তাঁহাদের শরণাগমন লোকোত্তর এবং সাধারণ লোকের শরণাগমন লৌকিক। লৌকিক শরণাগমনকে 'ত্রিরত্নে শ্রদ্ধার্জন' বলা হয়। ইহার অপর নাম শ্রদ্ধা-ভিত্তিক সম্যক্ দৃষ্টি। ইহাকে চারি প্রকারে প্রকাশ করা যায়, যথা— আত্ম নিবেদন দ্বারা, তৎপরায়ণতা দ্বারা, শিষ্যভাবে উপগমন দ্বারা (সান্নিধ্যে আসিয়া) এবং দাক্ষিণ্যকে (দক্ষিণাহকে) প্রণিপাত দ্বারা। এই চারি প্রকারের মধ্যে যে কোনও প্রকারে যিনি কার্য করেন তিনিই লৌকিক শরণাগত বিবেচিত হন।

দি নন্দলাল বড়ুয়া

ত্রিষষ্ঠীগড় ধর্মমঙ্গল দ্র

ত্রেতা যুগ দ্র

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯খ্রী) চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ৬ শ্রাবণ ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম হয়। পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। বালক ত্রৈলোক্যনাথ গ্রামের বিদ্যালয়, চুঁচুড়ার ডাফ সাহেবের স্কুল এবং ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্তী তেলিনীপাড়া স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল বলিয়া বাল্যকালেই তাঁহাকে উপার্জনের চেষ্টায় বাহির হইতে হয়। প্রথমে দ্বারকা (বীরভূম), উখড়া (রানীগঞ্জ) এবং শাহাজাদপুরের (সিরাজগঞ্জ) স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর কটক জেলায় পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন (১৮৬৮ খ্রী)। এই সময়ে স্যর উইলিয়াম হাণ্টারের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। হাণ্টার সাহেব তাঁহাকে 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার' সংকলনের অফিসে করণিকের পদে নিযুক্ত করেন (১৮৭০ খ্রী)। অতঃপর তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান করণিক এবং পরে বিভাগীয় ডাইরেক্টরের একান্ত সহকারী হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে বদলী হন এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিভাগ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর হইয়া আসেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি কি শিল্পদ্রব্য নির্মিত হয় তাহার কয়েকটি বিবৃতিমূলক তালিকাপুস্তক তিনি ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলা দেশে সাহিত্যিকরূপেই তাঁহার প্রধান পরিচয়। তিনি যে উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তন করেন বাংলা সাহিত্যে তাহা অজ্ঞাত ছিল। ত্রৈলোক্যনাথের বাংলা রচনা 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ), 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬ খ্রী), 'ফোকলা দিগম্বর' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) 'মুক্তামালা' (১৯০১ খ্রী), 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা' (১৯০৩ খ্রী), 'ময়না কোথায়' (১৩১১ বঙ্গাব্দ), 'মজার গল্প' (১৩১২ বঙ্গাব্দ), 'পাপের পরিণাম' (১৩১৫ বঙ্গাব্দ), 'ডমরু চরিত' (১৯২৩ খ্রী)।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৩৬, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি ও হর্মোন দ্র

থাট ঠাট দ্র

থানজাভুর তাঞ্জোর দ্র

থানা ঠানা, ঠানে) মহারাষ্ট্র প্রদেশের একটি জেলা ও শহর। জেলাটি ১৮°৫৩ হইতে ২০°২২ উত্তর ও ৭২°৩৯ হইতে ৭৩°৮৮ পূর্বে অবস্থিত। ইহার উত্তরে দমান ও সুরাট, পূর্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, দক্ষিণে কোলাবা এবং পশ্চিমে আরব সাগর। জেলার আয়তন ৯১৬৫ বর্গ কিলোমিটার (৩৫৩৮ বর্গ মাইল)।

থানা জেলার সমগ্র অঞ্চল নিম্ন। ইহার মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় অবস্থিত। ইহাদের উচ্চতা ৭৬০ মিটারের (২৫০০ ফুট) অধিক নহে। জেলার পূর্ব ও উত্তর পর অংশ অরণ্যাবৃত, তটের দিকে ভূমি নিম্ন ও অল্প উর্বর। তটরেখার নিকট ভূমি উর্বর।

থানা জেলার প্রধান নদী বৈতরণ। এই নদী পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। উল্হাস আর একটি উল্লেখযোগ্য নদী। ভোরঘাটের উত্তরে সংকীর্ণ গিরিখাত হইতে নির্গত হইয়া ইহা বেসিন খাঁড়ির মধ্যে প্রবাহিত। বেসিন খাঁড়িতে বৎসরের সকল সময়েই নৌকা চলাচল করে।

থানা জেলায় কোনও প্রাকৃতিক হ্রদ নাই, কতকগুলি কৃত্রিম হ্রদ আছে। তাহাদের মধ্যে বেহার, তুলসি এবং তানসা প্রধান। এই সকল হ্রদ হইতে বোম্বাই শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

থানা জেলার সমুদ্রতীরে বহু দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সল্‌সেটি প্রধান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সল্‌সেটির পরেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বেসিনের নাম উল্লেখযোগ্য। বেসিন তালুকের অন্তর্গত আবলানা দ্বীপকে 'সিন্ধু দুর্গ' বলা হয়।

পলিমাটির দ্বারা গঠিত উপত্যকা ছাড়া থানা জেলা সম্পূর্ণ দাক্ষিণাত্য মালভূমির অন্তর্গত। থানার পশ্চিম সীমান্ত বরাবর বহু উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়।

থানার জলবায়ু আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। প্রায় সব সময়েই তাপমাত্রা সমান থাকে। এখানে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় (প্রায় ২২৫০ মিলিমিটার : ৯০ ইঞ্চি)।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে থানা জেলা মৌর্য রাজগণের শাসনাধীনে ছিল। পরবর্তী কালে থানাসহ সমগ্র কোঙ্কণ অন্ধ্রভৃত্য রাজগণের অধীনে আসে। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদনগরের মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বকাল পর্যন্ত ইহা চালুক্য ও শিলাহরগণের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ বেসিন অধিকার করেন। পরে শিবাজী থানা জেলার কল্যাণ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়াগণ পর্তুগীজদের নিকট হইতে বেসিন পুনরুদ্ধার করেন। জেলার উত্তর ভাগ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়াগণ ব্রিটিশকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

কানহেরির (কৃষ্ণগিরি) বৌদ্ধ গুহামন্দির, সোপারা র অশোকলিপি ও বেসিন-এর দুর্গ এই জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য সামগ্রী।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী থানার জনসংখ্যা ১৬৫২৬৭৮।

থানা জেলার ৪৪৯৫৫৫ হেক্টর (১১২৩৮৮৪ একর) জমিতে চাষ হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান প্রধান। তাহার পর রাগি, তৈলবীজ, ডাল, শণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে নোনা জমিগুলিকে কৃষিযোগ্য করা হইতেছে।

সামুদ্রিক মৎস্যের ব্যবসায় থানার অধিবাসীদের বিশিষ্ট উপজীবিকা। টাটকা মাছ বোম্বাই শহরে ও শুঁটকি মাছ দাক্ষিণাত্যে রপ্তানি হয়। শামুক ও মুক্তাও থানার খাঁড়িগুলিতে পাওয়া যায়।

থানার ৩৮৩৭৫৭ হেক্টর (৯৬৬৮৯৪ একর) জমিই বনভূমি। কয়েকটি বন সংরক্ষিত। বনজ দ্রব্যের মধ্যে কাঠ, জ্বালানি কাঠ, কাঠকয়লা ও বাঁশ হইতে প্রচুর আয় হয়।

থানায় খনিজ দ্রব্য কিছু নাই, কেবলমাত্র বেসিনের টুঙ্গার পাহাড়ে কিছু বক্সাইট পাওয়া যায়।

জেলার উপর দিয়া জাতীয় সড়ক, রাষ্ট্রীয় সড়ক ও বড় বড় রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। ফলে ভারতের অন্যান্য বড় বড় শহরের সহিত থানার যোগাযোগ আছে। থানায় প্রচুর খাঁড়ি থাকাতে জলপথেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে।

থানার একটি প্রধান শিল্প লবণ। ইহা হইতে প্রচুর আয় হয়। এখানে উৎপন্ন মাটি ও পিতলের জিনিস প্রসিদ্ধ। থানার সুতি কাপড় বিখ্যাত।

থানা শহরে (১৯°১২´ উত্তর ও ৭২°৫০´ পূর্ব) জেলার প্রধান সরকারি কার্যালয় অবস্থিত। বোম্বাই হইতে ইহার দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার (২১ মাইল)। সল্‌সেটি খাঁড়ির পশ্চিম তটে অবস্থিত এই শহরের লোকসংখ্যা ১০১১০৭ জন।

চিন্তামণি বামন দাতার
মঞ্জিরা দবদার

থানেশ্বর ২৯°৫৮´৩০´´ উত্তর ৭৬°৫২´ পূর্ব। পূর্ব পাঞ্জাবে করনাল জেলায় আম্বালার ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দক্ষিণে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত হিন্দু তীর্থ। গ্রহণের সময়ে এখানে সর্বাধিক জনসমাগম হয়। মহাভারতে এবং বামনপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে, প্রাচীন নাম স্থাণ্বীশ্বর। ৭ম শতাব্দীতে পুষ্যভূতি রাজবংশের শাসনকালে ইহা রাজধানী হিসাবে সমৃদ্ধিলাভ করে। হিউএন-ৎসাঙ্ বৃহৎ নগরী হিসাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মামুদ থানেশ্বর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। পরবর্তী কালে শিখ অভ্যুদয়ের সময়ে থানেশ্বর মির্থসিং নামক জনৈক শিখের শাসনাধীনে আসে, এই শিখ বংশের অবসানের ফলে থানেশ্বর ব্রিটিশের শাসনে আসিয়া কিছু দিন জেলার প্রধান শহররূপে পরিগণিত হইতে থাকে। এখনে উহা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ একটি পরিত্যক্ত স্থানমাত্র।

রত্নাবলী ঘোষ

থার্মাল আয়োনাইজেশন তাপীয় আয়নক্রিয়া। অতি উচ্চ তাপমাত্রায় মৌলিক পদার্থের পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বিচ্যুত হইতে পারে— ফলে পরমাণুটি আয়নিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে উচ্চ তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়া ঘটিতে পারে— ৪০০০° বা তদূর্ধ্বে তাহাতে যে কোনও মৌলিক

পদার্থই গ্যাসীয় ভিন্ন অপর কোনও অবস্থায় থাকিতে পারে না। এইরূপ তাপমাত্রার অস্তিত্ব সূর্য বা অন্য কোনও নক্ষত্রপৃষ্ঠেই সম্ভব। তাপশক্তির প্রভাবে গ্যাসীয় পরমাণুর আয়ননকে বলা হয় তাপীয় আয়নক্রিয়া। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা এই প্রক্রিয়ার বিশদ গাণিতিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং তাহার সাহায্যে সূর্যের বর্ণালী (স্পেকট্রাম) সম্পর্কে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

সূর্যালোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া সূর্যে কি কি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব আছে এবং তাহারা কি পরিমাণে আছে, তাহা অনুমান করা সম্ভব। কারণ কোনও পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায় যে আলো বিকিরণ করে তাহা পরমাণুটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। সূর্যপৃষ্ঠের প্রচণ্ড তাপমাত্রায় অনেক পরমাণু যে আয়নিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে সূর্যালোকের বর্ণালী সম্যকরূপে বোঝা সম্ভব হয় নাই। তাপীয় আয়নক্রিয়ার গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করিয়া এই সম্পর্কে অনেক সমস্যাই পরিষ্কার করা গিয়াছে। নক্ষত্র হইতে আগত আলোকের বর্ণালীর সম্পর্কেও এই সূত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহার সাহায্যে নক্ষত্রপৃষ্ঠের সম্ভাব্য তাপমাত্রার একটি সঠিক অনুমান করা সম্ভব। 'বর্ণালীবিদ্যা' দ্র।

দ্র M. N. Saha and B N Srivastava, *A Treatise on Heat*, Allahabad, 1965

মুক্তিপাবন বসু

থার্মিয়নিক্‌স তাপের প্রয়োগে ধাতুদেহ হইতে ঋণ-বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রনের নির্গমন এবং তৎসংক্রান্ত বিজ্ঞান থার্মিয়নিক্‌স নামে পরিচিত। ইলেকট্রন নির্গমন এবং নির্গত ইলেকট্রনসমূহের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ- আধুনিক ইলেকট্রনিক্‌স বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির মূল।

যে কোনও ধাতুপিণ্ড কতকগুলি ক্রিস্ট্যাল বা কেলাসের সমাহারে গঠিত। কেলাসের মধ্যে পরমাণুসমূহ একটি বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সুবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে। প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আছে ধন বিদ্যুৎসম্পন্ন বস্তুপিণ্ড — নিউক্লিয়াস এবং তাহার চতুর্দিকে সঞ্চরমান ঋণ বিদ্যুৎ কণিকা বা ইলেকট্রন। কাঠামোর মধ্যে সুবিন্যস্ত ধাতব পরমাণুগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহাদের বহির্ভাগে অবস্থিত কিছু কিছু ইলেকট্রন অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবে বিধৃত থাকে। তাহারা কিছুটা স্বাধীনভাবে এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুতে যাওয়া-আসা করিতে পারে। ইহাদিগকে বলা যাইতে পারে 'মুক্ত ইলেকট্রন'। বাহির হইতে শক্তির জোগান দিয়া মুক্ত ইলেকট্রনের শক্তি এরূপভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব যাহাতে তাহারা ধাতুদেহের বৈদ্যুতিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিতে পারে। যে ন্যূনতম শক্তির সাহায্যে একটি ইলেকট্রনকে ধাতুদেহের বৈদ্যুতিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা সম্ভব তাহাকে বলা হয় 'ওয়ার্ক ফাংশন', ইহার পরিমাণ বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম।

বাহির হইতে শক্তির জোগান দেওয়ার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে তাপ প্রয়োগ অন্যতম এবং প্রধান উপায়। তাপ প্রয়োগ করিয়া ধাতুপৃষ্ঠ হইতে ইলেকট্রন নির্গমন কে বলা হয় তাপীয় বিচ্ছুরণ (থার্মিয়নিক এমিশন)। সাধারণতঃ বায়ুশূন্য পাত্রে ধাতুটিকে গরম করিয়া তাহাকে এরূপ তাপমাত্রায় আনিতে হয় যাহাতে তাহা আলোক বিকীরণ করার মত অবস্থায় নীত হয়। ইলেকট্রন এমিশন বা নির্গমনের পরিমাণ ধাতুর পরম তাপমাত্রার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। রিচার্ডসন (Richardson) এবং ডুশমান (Dushman) এই সম্পর্কে একটি গাণিতিক সূত্র নির্ণয় করিয়াছেন। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সহিত নির্গমন অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়— তাপমাত্রা সামান্য কয়েক শতাংশ বাড়াইলেই নির্গমন বহুগুণে বাড়িয়া যায়।

ইলেকট্রন নির্গমনের উৎস হিসাবে বিশুদ্ধ ধাতু ভিন্ন অন্যান্য পদার্থও ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ ধাতুর মধ্যে টাংস্টেন এর ব্যবহার সমধিক। টাংস্টেন-এর তারের উপর অতি পাতলা থোরিয়াম এর আস্তরণ লাগাইলে তাহা আরও উপযোগী হয়। তবে আধুনিক কালে অক্সাইড-কোটেড ফিলামেন্ট বা ক্যাথোডের ব্যবহার সর্বাধিক। নিকেল নির্মিত তারের উপর বেরিয়াম অক্সাইড ও স্ট্রনসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণের অথবা অনুরূপ কোনও অক্সাইডের একটি আস্তরণ লাগাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প তাপমাত্রায় ইহা প্রচুর ইলেকট্রন সরবরাহ করিতে সক্ষম। অক্সাইডের ওয়ার্ক ফাংশন কম বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। বিজলী বাতির ভিতরের তারের মত সরাসরি বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠাইয়া ঋণ বিদ্যুতের উৎসটিকে গরম করা সম্ভব। আবার এরূপে উত্তপ্ত একটি তারের নিকটে উৎসটিকে রাখিয়া সেটি পরোক্ষভাবে গরম করাও সম্ভব। ইলেকট্রন ঋণ বিদ্যুৎ সম্পন্ন কণিকা। কাজেই নির্গমনের উৎসের নিকট একটি ধন-বিদ্যুতাহিত (পজিটিভ্‌লি চার্জ্‌ড) পরিবাহী রাখিলে ইলেকট্রনসমূহ তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হয় এবং এইভাবে ইলেকট্রন

প্রবাহের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই নানা ধরনের ইলেকট্রন টিউব বা ভাল্‌ভ নির্মিত হইয়াছে। ইহার ব্যবহার বহুবিধ। বেতার, টেলিভিজ্‌ন্‌, রাডার, কম্পিউটার— এইসব যন্ত্রে ভাল্‌ভ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

দ্র Karl R. Spangenberg, *Vacuum Tubes*, New York, 1948; T. S Gray, ed, *Applied Electronics*, New York, 1951; F. E Terman, *Electronic and Radio Engineering*, New York, 1955.

মুক্তিসাধন বসু

থার্মো ইলেক্‌ট্রিসিটি বিদ্যুৎ দ্র

থার্মোডাইনামিক্‌স বিজ্ঞানের যে শাখা তাপশক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তির মধ্যে, অথবা আরও বিস্তৃত অর্থে তাপশক্তি এবং অপর যে কোনও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করে তাহাকে থার্মোডাইনামিক্‌স বলে।

থার্মোডাইনামিক্‌সে বস্তুর বাহ্যিক যান্ত্রিক শক্তিকে এবং যে সমস্ত বাহ্যিক অবস্থার উপর এই যান্ত্রিক শক্তি নির্ভর করে, যথা গতিবেগ, ত্বরণ ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করা হয়। ইহার পরিবর্তে আমরা বস্তুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা উহার কয়েকটি ভৌতিক রাশির সাহায্যে নির্ণয় করি। এই রাশিগুলিকে থার্মোডাইনামিক চল (ভ্যারিএব্‌ল্‌) বলে। ঐগুলির মধ্যে আয়তন (V), চাপ (P) এবং তাপমাত্রা (T) হইল তিনটি চল।

কোনও বস্তুখণ্ডের মধ্যে তাপীয় সাম্য, রাসায়নিক সাম্য এবং যান্ত্রিক সাম্য বিদ্যমান থাকিলে বস্তুখণ্ডটি থার্মোডাইনামিক সাম্য (থার্মোডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম) অবস্থায় আছে।

থার্মোডাইনামিক্‌সের শূন্যতম সূত্র (জিরোএথ্‌ ল): এই সূত্র বলে যে, দুইটি বস্তু পৃথকভাবে একটি তৃতীয় বস্তুর সহিত সমতাপমাত্রায় থাকিলে ঐ দুইটি বস্তুর তাপমাত্রাও সমান হইবে। এই সূত্র হইতে আমরা তাপমাত্রার ধারণা পাইতে পারি। কোনও বস্তুর তাপমাত্রা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে ঐ বস্তু অপর বস্তু হইতে তাপ গ্রহণ করিবে, না অপর বস্তুকে তাপ প্রদান করিবে। ইহা বস্তুর তাপীয় অবস্থা (থার্মাল স্টেট) বুঝাইয়া দেয়।

থার্মোডাইনামিক্‌সের প্রথম সূত্র (ফার্স্ট ল). থার্মোডাইনামিক্‌সের প্রথম সূত্র শক্তির নিত্যতা প্রমাণিত করে। যান্ত্রিক শক্তিকে তাপশক্তিতে অথবা তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হইলে তাহারা সমানুপাতী হয়।

ধরা যাক, W একক কার্য করিলে H একক তাপ উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে প্রথম সূত্র হইতে পাই যে,

$$W \propto H$$

অথবা $$W = JH \quad (১)$$

এখানে J একটি ধ্রুবক। ইহাকে জুলের (Joule) ধ্রুবক বলে। ইহার মান হইল ৪.২×১০^৭ আর্গ/ক্যালোরি।

সাম্যাবস্থায় স্থিত বস্তুমাত্রকেই আপাতদৃষ্টিতেই যান্ত্রিক শক্তি রহিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় উহাও কায করিতে পারে। এই কার্য করিবার শক্তি ঐ পদার্থের অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তি হইতে আসে। পদার্থের আভ্যন্তরীণ ঐ শক্তির নাম উহার অন্তঃশক্তি (ইনটার্নাল এনার্জি)। কোনও বস্তুর আভ্যন্তরীণ শক্তি প্রধানতঃ উহার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

ধরা যাক, কোনও বস্তুখণ্ডকে dQ পরিমাণ তাপ সরবরাহ করা হইল। তাহা হইলে উহার চাপ (P) স্থির রাখা হইলে আয়তন কিছুটা বাড়িবে এবং আভ্যন্তরীণ শক্তিও কিছু বাড়িয়া যাইবে। ধরা যাক, আয়তনের বৃদ্ধি $=dV$ এবং আভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি $=dU$, তাহা হইলে, শক্তির সংরক্ষণসূত্র (ল অফ কন্‌জার্ভেশন অফ এনার্জি) হইতে আমরা লিখিতে পারি—

$$dQ = dU + p\,dV \quad (২)$$

ইহাই থার্মোডাইনামিক্‌সের প্রথম সূত্রের গাণিতিক রূপ।

আর একটি থার্মোডাইনামিক ধর্ম হইল এন্‌থাল্‌পি। ইহার দ্বারা আমরা কোনও পদার্থের মোট তাপের (টোটাল হিট) পরিমাণ বুঝিতে পারি। যদি কোনও পদার্থখণ্ডের আভ্যন্তরীণ শক্তি $=U$, চাপ $=p$ এবং আয়তন $=v$ হয়, তাহা হইলে উহার এন্‌থাল্‌পি বা মোট তাপের পরিমাণ H হইবে।

$$H \quad U + pv \quad (৩)$$

থার্মোডাইনামিক্‌সের দ্বিতীয় সূত্র (সেকেণ্ড ল): থার্মোডাইনামিক্‌সের দ্বিতীয় সূত্রটি তাপ-প্রবাহের দিক নির্দেশ করে। ইহাতে বলা হইয়াছে, কোনও বাহ্যিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত তাপ কোনও বস্তু হইতে উষ্ণতর কোনও বস্তুর দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। অর্থাৎ, তাপ সর্বদা কোনও বস্তু হইতে কম উষ্ণ বস্তুর দিকেই

প্রবাহিত হইবে। তাপীয় ইঞ্জিন-এ আমরা এই সূত্রের প্রয়োগ দেখিতে পাই।

থার্মোডাইনামিক তাপমাত্রার স্কেল: লর্ড কেল্‌ভিনই প্রথম দেখান যে থার্মোডাইনামিক্‌সের সাহায্যে এমন একটি তাপমাত্রার স্কেল করা যায়, যাহা কোনও পদার্থের কোনও বিশেষ ধর্মের উপর নির্ভর করে না, এই স্কেলের নাম থার্মোডাইনামিক স্কেল অথবা পরম স্কেল (অ্যাব্‌সলিউট স্কেল)। দেখা গিয়াছে যে, এই তাপমাত্রাস্কেল জাত্য গ্যাসস্কেলের (পার্‌ফেক্‌ট গ্যাসস্কেল) সহিত একরূপ। এই স্কেলের এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড-স্কেলের এক ডিগ্রির সমান। কিন্তু সেন্টিগ্রেড-স্কেলের শূন্য তাপমাত্রা পরম স্কেলের শূন্যের ২৭৩°২ ডিগ্রি উপরে। পরম স্কেলের শূন্য তাপমাত্রাকে বলা হয় পরম শূন্য (অ্যাব্‌সলিউট জিরো)।

এন্‌ট্রপি, ফ্রি-এনার্জি এবং ওয়ার্ক-ফাংশান: চাপ, আয়তন এবং তাপমাত্রার ন্যায় এন্‌ট্রপি (ϕ) একটি ভৌত রাশি। ইহা পদার্থের থার্মোডাইনামিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং কেবলমাত্র বর্তমান অবস্থা ও অতীত অবস্থার উপর নির্ভরশীল, কিভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে না। কোনও তাপীয় পরিবর্তনে গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাণকে ঐ বস্তুর পরম তাপমাত্রা দ্বারা ভাগ করিলে যে রাশি পাওয়া যায় তাহাই হইল এন্‌ট্রপি পরিবর্তনের পরিমাণ। ধরা যাক, T পরম তাপমাত্রায় কোনও বস্তু dQ পরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করিল। তাহা হইলে ঐ বস্তুর এন্‌ট্রপির পরিবর্তন ($d\phi$) হইবে,

$$d\phi = \frac{dQ}{T} \quad (৪)$$

কোনও বস্তুর এন্‌ট্রপি আমরা সরাসরি মাপিতে পারি না। অপরাপর কয়েকটি ভৌত ধর্ম মাপিয়া এন্‌ট্রপির পরিবর্তনের মান বাহির করি। ম্যাক্সওয়েল সর্বপ্রথমে চাপ, তাপমাত্রা, আয়তন এবং এন্‌ট্রপিকে লইয়া চারিটি থার্মোডাইনামিক সমীকরণসূত্র (ফর্মুলা) রচনা করেন। এই সমীকরণসূত্রগুলি বিভিন্ন সমস্যাসমাধানে বিশেষ সহায়তা করে।

রাসায়নিক থার্মোডাইনামিক্‌সে আমরা তাপমাত্রা এবং এন্‌ট্রপির ন্যায় আরও দুইটি থার্মোডাইনামিক অপেক্ষক (ফাংশান) ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহারা হইল ফ্রি-এনার্জি (F) এবং ওয়ার্ক-ফাংশান (A)। ইহাদিগকে দুইটি সহজ সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায়; যথা—

$$A = U - T\phi \quad (৫)$$

এবং

$$F = H - T\phi \quad (৬)$$

কিন্তু সমীকরণ (৩) হইতে জানি যে,

$$H = U + pV$$

সুতরাং ওয়ার্ক ফাংশান এবং ফ্রি-এনার্জির মধ্যে সম্পর্ক হইল,

$$F = A + pV \quad (৭)$$

এই সকল সমীকরণে ব্যবহৃত সংকেতচিহ্নগুলির অর্থ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

থার্মোডাইনামিক্‌সের তৃতীয় সূত্র (থার্ড ল): স্ট্যাটিস্টিক্যাল থার্মোডাইনামিক্‌সে বলা হয় যে, কোনও বস্তুর এন্‌ট্রপি ঐ বস্তুর অণুর গতির উপর নির্ভর করে। তাপমাত্রা কমিয়া গেলে অণুগুলির গতিবেগও কমিয়া যায়। অর্থাৎ ধরিতে পারি যে, কোনও বিশুদ্ধ কেলাসিত (ক্রিস্ট্যালাইন) পদার্থের তাপমাত্রা পরম শূন্যের যত নিকটবর্তী হইতে থাকিবে আণবিক অস্থিরতাও তত কমিয়া আসিতে থাকিবে। অপর অর্থে পদার্থের তাপমাত্রা পরম শূন্যের দিকে যাইতে থাকিলে উহার এন্‌ট্রপির মানও শূন্যের দিকে যাইতে থাকিবে। এই ধর্মকে থার্মোডাইনামিক্‌সের তৃতীয় সূত্র বলা হয়। গাণিতিক সংকেতে—

$$\underset{T \to 0}{\alpha t}\, \Delta\phi = O$$

কাজেই পরম শূন্যের খুব নিকট উপস্থিতিতে এন্‌ট্রপি-পরিবর্তনও খুব সামান্য বলিয়া শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরম শূন্যে পৌছানো অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ইহাই হইল নার্ন্‌স্‌ট (Nernst)-এর বিখ্যাত 'পরম শূন্যে পৌছানোর অসম্ভবতার নীতি'।

থার্মোডাইনামিক্‌সের সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করা হইতেছে।

দ্র Dodge, *Chemical Engineering Thermodynamics*, 1949; Richard Glazebrook, *Dictionary of Applied Physics*, vol. I, London, 1950; Mark Waldo Zemanskey, *Heat and Thermodynamics*, New York, 1951; E. Fermi, *Thermodynamics*, New York, 1956; Edward Uhler Condon and Hugh Odishaw, *Handbook of Physics*, New York, 1958; John Geldart Aston and James John Fritz, *Thermodynamics and*

Statistical Thermodynamics, London, 1959; Meghnad Saha and B N. Srevastava, *A Treatise on Heat*, Allahabad, 1965

দিলীপকুমার বসু

থার্মোমিটার তাপমান-যন্ত্র। প্রাচীনতম তাপমান যন্ত্র সম্ভবতঃ গালিলেও নির্মাণ করেন। ১৭শ শতকের মধ্য ভাগে ইটালীর ফ্লোরেন্সে প্রথম কোহলপূর্ণ তাপমান-যন্ত্রের খবর পাওয়া যায়। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট (১৬৮৬-১৭৩৬ খ্রী) প্রথম পারদপূর্ণ কাচ-নির্মিত তাপমান যন্ত্র নির্মাণ করেন। তাঁহার নামেই উষ্ণতার একটি মান, ফারেনহাইট স্কেল প্রচলিত হয়। তিনি ধরিয়াছিলেন সাধারণ মানুষের রক্তের উত্তাপ ৯৬° এবং ঐ হিসাব অনুযায়ী বরফের গলনাঙ্ক ৩২° ফারেনহাইট ও বাষ্পের উষ্ণতা ২১২° ফারেনহাইট নির্ণয় করেন। বরফের গলনাঙ্ক ও বাষ্পের উষ্ণতা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তাপমানের নির্দিষ্ট বিন্দু ধরা হয়। রোমার (R A. F. de Reumer, ১৬৮৩-১৭৫৭ খ্রী) উক্ত নির্দিষ্ট বিন্দু দুইটি ০° ও ৮০° বলিয়া স্থির করেন (১৭৩০ খ্রী) ও ঐ হিসাব রোমার-মান নামে প্রচলিত। ঐ নির্দিষ্ট বিন্দু দুইটি ০° ও ১০০° বলিয়া প্রথম প্রচলিত করেন সুইডেনের সেলসিয়াস (Anders Celsius, ১৭০১-৪৪ খ্রী) অর্থাৎ তিনিই বহু প্রচলিত সেন্টিগ্রেড স্কেলের প্রবর্তন করেন। ইঁহারা সকলেই পারদ-থার্মোমিটার অর্থাৎ পারদপূর্ণ কাচের ক্ষুদ্র গোলক ও পারদ-প্রসারণের জন্য বায়ুহীন কাচনলযুক্ত যন্ত্র নির্মাণ করেন।

প্রথমে উচ্চতাপমান-যন্ত্র বা পাইরোমিটার ছিল এক ধরনের গ্যাস থার্মোমিটার (প্রিন্সেপ, ১৮২৮ খ্রী)। একই ধরনের উন্নত যন্ত্র আবিষ্কারে হাম্‌ফ্রি ডেভি, রেনো (Henri Victor Regnault) ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডারের নাম করা যাইতে পারে ('থার্মোডাইনামিক্‌স' দ্র)।

বিকিরণ থার্মোমিতি: বিখ্যাত কির্‌খফ (Kirchoff)-এর কাজ ও ভীনের তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া বিকিরণ থার্মোমিতি বা রেডিয়েশন পাইরোমেট্রি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গেই স্টিফান বোল্‌ৎজ্‌মান ও প্লাঙ্কের বিখ্যাত সূত্রাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র আজও ধাতুশিল্পে ব্যবহৃত হয়, উহার নির্মাণকৌশল ও কার্য: একটি বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যস্থ তারকুণ্ডলীতে অল্প অল্প করিয়া বিদ্যুৎ-শক্তি বাড়াইয়া গেলে ঐ কুণ্ডলী প্রথমে লাল, পরে কমলা, হলুদ ও অবশেষে শাদা হইয়া জ্বলিবে। বিকিরণের সূত্রানুযায়ী ঐ রঙ তাহার ক্রমবর্ধমান উত্তাপের সঙ্গেই পরিবর্তনশীল। এখন ঐ বাতিটি যদি দূরস্থ কোনও বিকিরণকারী উত্তপ্ত পদার্থ, যেমন ধাতুগলন চুল্লির দিকে ফেরানো কোনও দূরবীনের মধ্যে রাখিয়া ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল ঐ তার-কুণ্ডলীর রঙের সহিত দূরাগত ঐ চুল্লিনিঃসৃত আলোর রঙের সহিত মিলানো যায়, তবে যখনই দূরাগত আলোর রঙ ও তারকুণ্ডলীর রঙ একই হইবে, তখন মনে হইবে যেন তারকুণ্ডলীটি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই অবস্থায় ঐ বিশেষ তারকুণ্ডলীর মধ্যে প্রবহমান বিদ্যুৎ-শক্তি মাপিয়া ও তারের অন্যান্য ভৌত অবস্থা জানিয়া হিসাব করিয়া তারের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট করা যায় ও ঐ অবস্থায় বোঝা যায়, দূরস্থ ঐ বিকিরণকারী চুল্লির উত্তাপও ঐ তাপমাত্রার মতই হইবে।

বিদ্যুৎ-শক্তি থার্মোমিতি প্ল্যাটিনাম বা যে কোনও ধাতুর তারের রোধ উহার তাপমানের উপর নির্ভরশীল। প্ল্যাটিনামের গলনাঙ্ক অতি উচ্চ (১৭৭৩° সেন্টিগ্রেড) তাই প্ল্যাটিনাম তারই রোধ নির্দেশক থার্মোমিতিতে ব্যবহৃত হয়। এই সূত্রে ক্যালেণ্ডারের বিখ্যাত প্ল্যাটিনাম থার্মোমিটারের নাম করা যায়। ইহা অতিশয় উচ্চ তাপ-মাত্রার অতি সূক্ষ্ম হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাপক্ষম। এই বিভাগে থার্মোকাপ্‌ল ও বহু থার্মোকাপ্‌লের সমাহারে প্রস্তুত থার্মোপাইলের নাম করা যাইতে পারে। থার্মোকাপ্‌ল অতি উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্যও ব্যবহৃত হয়। প্ল্যাটিনাম ও প্ল্যাটিনাম রেডিয়াম মিশ্র ধাতুর তার প্রথম লা শ্যাতেলার ব্যবহার করেন, তামা ও কনস্ট্যানটান নামক মিশ্র ধাতুর তার, মলিব্‌ডেনাম ও টাংস্টেন তার প্রভৃতি থার্মোকাপ্‌ল নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। তামা কনস্ট্যান্টান থার্মোকাপ্‌ল স্বচ্ছন্দে -২০০° সেন্টিগ্রেড হইতে প্রায় ১০০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

অতিশয় নিম্ন তাপে (২৭০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি) বর্তমানে বিভিন্ন অর্ধপরিবাহী (সেমিকনডাক্টিং) পদার্থ থার্মোমিতিতে ব্যবহার করা হইতেছে, এমন কি, সাধারণ পরিশুদ্ধ অঙ্গার নির্মিত বিদ্যুৎ-রোধকও ব্যবহার করা হইতেছে।

বিমলেন্দু মিত্র

থার্মোস্টাট উষ্ণতানিয়ন্তা। যন্ত্রদ্বারা স্বয়ংক্রিয় উপায়ে নির্ধারিত মানে তাপ রক্ষা করা হয়; তাপ কম হইলে বৃদ্ধির ব্যবস্থা ও বাড়িলে হ্রাসের ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়। ইহার

দুইটি অংশ : প্রথমাংশ উষ্ণতাচেতন ও দ্বিতীয়াংশ উষ্ণতার সংকেতানুগ ভাল্ব, সুইচ ইত্যাদি। ভৌত অবস্থার পরিবর্তনগত দিক হইতে ইহা তিন প্রকারে গঠিত হইতে পারে; ১. প্রসারণ দ্বারা, ইহা তিন প্রকার যথা : ক. কঠিন পদার্থের, যথা ধাতুযুগল (বাইমেটালিক স্ট্রিপ) খ. তরল পদার্থের গ. বায়বীয় পদার্থের, যথা বোরডনের অথবা পিস্টন পদ্ধতিতে; ২. তাপবিদ্যুৎ দ্বারা, যথা তাপবিদ্যুৎ-যুগল (থার্মোকাপ্‌ল); ৩. রোধতাপমিতি (রেজিস্ট্যান্স থার্মোমেট্রি) দ্বারা; ইহা বিভিন্ন প্রকারের চুল্লি, বয়লার, বায়ু-চুল্লি (এয়ার ওভেন), বাষ্পকোষ্ঠ (স্টিম ওভেন), শোষকাধার (ড্রায়ার), রাসায়নিক পদ্ধতি ও শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্র M. G. Say, *Concise Encyclopaedia of Electrical Engineering*, London.

সুশীলরঞ্জন কর্মকার

থ্যাকারে, উইলিয়াম মেক্‌পীস (১৮১১-৬৩ খ্রী) ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুলাই কলিকাতায় ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ও পার্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলের নিকট একটি বাড়িতে থ্যাকারের জন্ম হয়। ইংল্যাণ্ডের চার্টার হাউস বিদ্যালয়ে এবং কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ট্রিনিটিতে কবি টেনিসন ('টেনিসন' দ্র) ও এডওঅর্ড ফিট্‌জেরাল্ডের (১৮০৯-৮৩ খ্রী) সহিত তাঁহার বন্ধুতা ঘটে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে থ্যাকারে বিখ্যাত 'পাঞ্চ' কৌতুকপত্রিকায় লিখিতে শুরু করেন। এই পত্রিকাতেই 'স্নব পেপারস' (পরে 'দি বুক অফ স্নব্‌স' নামে বিখ্যাত) প্রকাশিত হয়। থ্যাকারের সুবিখ্যাত এবং সম্ভবতঃ সর্বপ্রধান রচনা হইল 'ভ্যানিটি ফেয়ার' (১৮৪৭-৪৮ খ্রী)। জীবনে কোনও নৈতিক অথবা আস্তিক আদর্শে অবিশ্বাসী, কেবলমাত্র স্বার্থ ও সুখকামী একশ্রেণীর চরিত্রের সমাবেশ এই উপন্যাসে ঘটিয়াছে এবং লেখক তাহাদের জীবনের বন্ধ্যাতা এবং কলুষের নির্দয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

থ্যাকারের পরবর্তী রচনার মধ্যে বিখ্যাত হইল 'পেণ্ডেনিস' (১৮৪৯-৫০ খ্রী), 'হেনরি এস্‌মণ্ড' (১৮৫২ খ্রী), 'দি নিউকম্‌স' (১৮৫৩-৫৫ খ্রী) এবং 'দি ভার্জিনিয়ানস' (১৮৫৭-৫৯ খ্রী)। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে থ্যাকারে ১৮শ শতকের ইংরেজ হিউমরিস্ট বা কৌতুককারদের উপর এক বক্তৃতামালা প্রদান করেন এবং এই বিষয়েই বক্তৃতা দিবার জন্য পরের বৎসর আমেরিকা যাত্রা করেন (১৮৫২-৫৩ খ্রী), ইংল্যাণ্ডের অধীশ্বর জর্জদের বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য থ্যাকারের দ্বিতীয়বার আমেরিকাসফরের তারিখ ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। থ্যাকারের জীবনের শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবপ্রতিষ্ঠিত 'কর্ন্‌হিল ম্যাগাজিনে'র সম্পাদনা (১৮৫৯ খ্রী)। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইংরেজী উপন্যাসের ইতিহাসে থ্যাকারের কৃতিত্ব মানবচরিত্রের নির্মম বিশ্লেষকরূপে। ভাববিলাসিতা, আত্মপ্রতারণা এবং নৈতিক মিথ্যাচারের দাস আত্মাভিমানী মানুষ যে কি করিয়া অলীক সুখের মায়ায় পৃথিবীতে ঘুরিয়া মরিতেছে, ইহাই থ্যাকারের সকৌতুক পর্যবেক্ষণের বিষয়। এক দিকে যেমন সমকালীন ভিক্টোরীয় সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি থ্যাকারের রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্য দিকে তেমনই মানবচরিত্রের কয়েকটি আদিম প্রকৃতি ও বিকৃতির নিপুণ চিত্রও তাঁহার রচনায় আছে। সম্ভবতঃ নীতিসচেতন ব্যঙ্গকার হিসাবে এই দিক দিয়া সুইফ্‌টের ('সুইফ্‌ট' দ্র) পরেই তাঁহার নাম করিতে হয়।

দ্র Geoffrey Tillotson, *Thackeray the Novelist*, Cambridge, 1954.

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

থ্যালোফাইটা অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনুন্নত গোষ্ঠী ('ক্রিপ্টোগাম' দ্র)। ইহাদের দেহ এক বা একাধিক কোষ দিয়া গঠিত এবং দেহে সপুষ্পক উদ্ভিদের ন্যায় মূল, কাণ্ড বা পত্র নাই। কোনও কোনও সামুদ্রিক থ্যালোফাইটার দেহে কাণ্ড ও পত্রের অনুরূপ অংশ আছে, কিন্তু এ সকল অংশের গঠন ও কার্য সাধারণ উদ্ভিদের কাণ্ড ও পত্র হইতে ভিন্ন। রেণু (স্পোর) এবং যৌন ও অযৌন জনন দ্বারা থ্যালোফাইটা-র বংশবৃদ্ধি হয়। শ্যাওলা, ছত্রাক ও ব্যাক্‌টিরিয়া লইয়া থ্যালোফাইটা গোষ্ঠী গঠিত ('ছত্রাক', 'ব্যাকটিরিয়া' ও 'শ্যাওলা' দ্র)। এই গোষ্ঠীর নানা উদ্ভিদ শিল্প ও অন্যান্য কাযে প্রযুক্ত হয়। সামুদ্রিক শ্যাওলা হইতে আয়োডিন, আগার-আগার, অ্যালজিন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ ক্লোরেলা ('ক্লোরেলা' দ্র) হইতে পশুখাদ্য উৎপন্ন হইতেছে। ডায়াটম নামক শ্যাওলার জীবাশ্ম (ফসিল) বিশেষতঃ চুল্লির দেওয়ালে ও চিনির রস-পরিস্রাবণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে আহার্য হিসাবে আগারিকাস ও অন্যান্য কয়েক জাতের ব্যাঙের ছাতা চাষ করা হয়। খমিরের সাহায্যে অ্যালকোহল

এবং বিভিন্ন ছত্রাকের সাহায্যে নানা প্রকার অ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধের উৎপাদনও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

থিওসফি গ্রীক দার্শনিক ইয়াম্‌ব্লিখস (Iamblichus) সর্বপ্রথম 'থিওসফি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাহার পর বোমে (Boehme, ১৫৭৫-১৬২৪ খ্রী), শেলিঙ (১৭৭৫-১৮৫৪ খ্রী) প্রভৃতি দার্শনিক ইহার নানা দিক লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাদাম ব্লাভাৎস্কি (১৮৩১-৯১ খ্রী) ও কর্নেল অল্‌কট (১৮৩২-১৯০৭ খ্রী) আমেরিকায় থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করিলে থিওসফি আন্তর্জাতিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। নূতন থিওসফি প্রাচীন থিওসফি হইতে কিছু ভিন্ন— প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয়বাদ বা অলৌকিকবাদের দ্বারা ইহা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই মতানুসারে প্রকট এবং অপ্রকট সমগ্র চরাচর বিশ্বের পশ্চাতে সর্বব্যাপী, শাশ্বত, অসীম ও অপরিবর্তনীয় একটি মৌলতত্ত্ব রহিয়াছে। জগৎ ও মনুষ্য এই তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত ও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিলে মানুষ তাহার সৃষ্টির প্রয়োজন বুঝিতে পারিবে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান অর্জন না করিতে পারিলে তাহা সম্ভবপর নহে।

থিওসফি-চর্চার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মাধীন ৪৭টি স্বয়ংশাসিত সভা আছে। মাদ্রাজের আডিয়ার শহরতলিতে ইহার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ও বারাণসীতে ইহার ভারতীয় কেন্দ্র অবস্থিত। সভার উদ্দেশ্য হইল: ১. জাতিধর্মবর্ণ ও নারীপুরুষ-নির্বিশেষে সৌভ্রাত্রস্থাপন ২. ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক চর্চায় উৎসাহদান ৩. প্রকৃতির রাজ্যে যে ঘটনাসমূহের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং মানুষের মধ্যে যে গূঢ় শক্তি রহিয়াছে তাহাদের উৎস-সন্ধান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে থিওসফি ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী হিন্দুসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ভারতে থিওসফির প্রচারে অ্যানি বেসান্টের দান উল্লেখযোগ্য। 'অল্‌কট', 'অ্যানি বেসান্ট' ও 'ব্লাভাৎস্কি' দ্র।

দ্র হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব), কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; H. P. Blavatsky, *Isis Unveiled*, New York, 1877; H. P. Blavatsky, *The Key to Theosophy*, New York, 1889; Annie Besant, *Theosophy and the New Psychology*, London, 1904; H. N. Datta, *Theosophical Gleanings*, Adyar, 1938.

মধুসূদন প্রসাদ

থিয়োডোলাইট জরিপের কাজে ব্যবহৃত একপ্রকার যন্ত্র। ইহার সাহায্যে সাধারণতঃ অনুভূমিক কোণ ও উন্নত কোণের পরিমাপ করা হয়। থিয়োডোলাইটের সাধারণতঃ চারিটি অংশ থাকে: ১. ২টি অনুভূমিক বৃত্তাকার চাকতির একটি অপরটির উপরে স্থাপিত। নির্দিষ্ট দাগ (রেফারেন্স মার্ক)-সংবলিত উপরের চাকতির সহিত লম্বভাবে একটি ফ্রেম এবং অনুভূমিকভাবে স্থাপিত একটি স্পিরিট লেভেল সংযুক্ত থাকে। নীচের অনুভূমিক চাকতিটির প্রান্তসীমায় বিভিন্ন ডিগ্রির দাগ কাটা থাকে। ইহাকে উপরের চাকতির সহিত একত্রে অথবা প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে ঘুরাইতে পারা যায় ও উভয় চাকতিতেই উহাদের আটকাইবার জন্য ক্ল্যাম্প এবং ধীরে নড়াইবার জন্য ট্যান্‌জেন্ট স্ক্রু-এর ব্যবস্থা থাকে, ২. দ্বিতীয় অংশ খাড়াভাবে অবস্থিত দাগকাটা একটি বৃত্তাকার চাকতি। এই চাকতিতেও ক্ল্যাম্প, ট্যানজেন্ট স্ক্রু ও স্পিরিট লেভেল আটকানো থাকে, ৩. তৃতীয় অংশে আছে বিভিন্ন বর্ধন-শক্তিসম্পন্ন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র। অনুভূমিক বৃত্তের কেন্দ্রের ভিতর দিয়া একটি অক্ষ খাড়াভাবে এবং উন্নত বৃত্তের (ভার্টিক্যাল) কেন্দ্রের ভিতর দিয়া একটি অক্ষ অনুভূমিকভাবে সন্নিবেশিত থাকে। দূরবীক্ষণটি অনুভূমিক বৃত্তের সহিত যুক্ত ফ্রেমটির সহিত এরূপভাবে অবস্থিত যে, ইহাকে অনুভূমিক বা খাড়া উভয় দিকেই ঘুরাইতে পারা যায়। পরস্পর লম্বভাবে ছেদনকারী দুইটি কেশযুক্ত (হেয়ার) একটি ডায়াফ্রাম, স্ক্রুর দ্বারা দূরবীক্ষণের সহিত যুক্ত উপরি-উক্ত তিনটি অংশ তিনটি লেভেলিং স্ক্রু-যুক্ত একটি তলের (বেস্) সহিত সংযুক্ত। ওলন ঝুলাইবার জন্য যন্ত্রের নিম্নে আংটা সংলগ্ন থাকে।

থিয়োডোলাইট ব্যবহার করিবার সময়ে প্রথমে ওলনের সাহায্যে যন্ত্রটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া লেভেলিং স্ক্রু ঘুরাইয়া স্পিরিট লেভেলকে কেন্দ্রে আনিয়া যন্ত্রকে অনুভূমিক করিতে হয়।

দুই বিন্দু বা বস্তুর অন্তর্বর্তী অনুভূমিক কোণ মাপিবার জন্য দূরবীক্ষণ-সংলগ্ন ডায়াফ্রামের কেশের ছেদবিন্দুকে উহাদের একটির প্রতিচ্ছবির উপর স্থির রাখিয়া উপরের অনুভূমিক চাকতির নির্দিষ্ট দাগের বিপরীতে অবস্থিত নিম্ন চাকতির দাগ অনুযায়ী মান নির্ণয় করা হয়। নীচের চাকতিকে শুধু বন্ধ করিয়া দূরবীক্ষণটিকে অন্য বিন্দু বা

বস্তুর দিকে ঘুরাইলে উপরের চাকতির নির্দিষ্ট দাগ নীচের চাকতির আর একটি নূতন দাগে আসে। এই দুই মানের পার্থক্যই বিন্দু দুইটির মধ্যবর্তী অনুভূমিক কোণ নির্দেশ করে।

উন্নত কোণ মাপিবার জন্যও যন্ত্রটিকে পূর্বের ন্যায় অনুভূমিক করিতে হয়। পরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে খাড়াভাবে ঘুরাইয়া উন্নত করিলে উন্নত বৃত্তের দাগ অনুসারে কোণের মান নির্ণয় করিতে পারা যায়।

দূরত্ব ও উচ্চতার নির্ণয়, ত্রিকোণমিতিক জরিপ প্রভৃতি কাজে অতি সূক্ষ্ম পরিমাপের নির্ণয় সাধারণতঃ থিয়োডোলাইটের সাহায্যেই করা হয়। বিভিন্ন জরিপে বিভিন্ন প্রকারের থিয়োডোলাইট ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালে মাইক্রপ্‌টিক থিয়োডোলাইটে অনুভূমিক ও উন্নত বৃত্ত দুইটি প্রধান দূরবীক্ষণের সহিত সমান্তরালভাবে যুক্ত আর একটি ছোট দূরবীক্ষণের মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে। ইহাতে অতি সহজে অল্প সময়ে একবারেই উভয় মাননির্ণয় সম্ভব হয়। 'জরিপ' দ্র।

দ্র Arthur Lovat Higgins, *Higher Surveying*, London 1914, David Clark, *Plane and Geodetic Surveying for Engineers*, vol 1, London, 1948

সিদ্ধান্তরঞ্জন বেতাল

থিব (রাজ্যকাল ১৮৭৮-৮৫ খ্রী) ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ব্রহ্মের রাজা মিণ্ডন এর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র থিব ২০ বৎসর বয়সে রাজা হন ও প্রথমে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ও পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতৃবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। ইহার পর বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লইয়া ভারত সরকার ও ব্রহ্মরাজের মধ্যে মতভেদ হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে থিব ফরাসী দেশের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি ও অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ইহা কার্যকর হয় নাই। ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রেঙ্গুনের বণিক সংঘ ও ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানি ইংরেজ সরকারকে উত্তর ব্রহ্ম দখলের পরামর্শ দেন। লণ্ডনের বণিক-সম্প্রদায়ও ঐ একই উপদেশ দেন। এই সময়ে থিব-এর সহিত বোম্বে বর্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন নামক একটি ইংরেজ বণিক-কোম্পানির বিবাদ হয়। তাঁহার মতে ঐ সংস্থা রাজার ন্যায্য পাওনা ১০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, তিনি ঐ কোম্পানিকে ২৩৫২০৬৬ টাকা জরিমানা করেন। এই ব্যাপারের কোনও মীমাংসা হয় না এবং ভারত সরকার কয়েকটি দাবি উপস্থাপিত করিয়া ব্রহ্মরাজকে এক চরমপত্র দেন। থিব অধিকাংশ দাবিই মানিয়া লন, শুধু ভাইসরয়ের পরামর্শে ব্রহ্মের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে এই শর্তটির সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ইহা কতদূর ন্যায়সংগত তাহা বিচার করিবার জন্য তাঁহার ও ইংরেজ সরকারের বন্ধু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ— যথা ফরাসী, জার্মানী ও ইটালীকে মধ্যস্থ স্বীকার করা হউক। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজ সরকার সেনাপতি প্রেণ্ডারগাস্টকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর উত্তর ব্রহ্ম আক্রমণ করিতে বলেন। ইংরেজ সৈন্য অতি সহজেই মান্দালে দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর থিব ইংরেজ সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। থিব ও তাঁহার পত্নী ভারতের রত্নগিরিতে নির্বাসিত হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে থিব এর মৃত্যু হয়।

দ্র P. E Roberts, *History of British India under the Company and the Crown*, Oxford, 1930, R C Majumdar ed, *The History and Culture of the Indian People*, vol IX, part 1, Bombay, 1963

বিশ্বপুষ্প দত্ত

থিবো, জর্জ ফ্রিড্রিখ উইলিয়াম (১৮৪৮-১৯১৪ খ্রী) হিন্দু দর্শন, গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গবেষণায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌। জার্মান দেশের অন্তর্গত হাইডেলবার্গ শহরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ইওরোপের প্রসিদ্ধ সংস্কৃতচর্চা কেন্দ্র হাইডেলবার্গ ও বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন। অতঃপর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে আসেন ও কয়েক বৎসর প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ফ্রিড্রিখ মাক্স ম্যুলর (১৮২৩-১৯০০ খ্রী) এর অধীনে গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগে যোগদান করিয়া ইনি প্রথমে বারাণসী সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনায় ব্রতী হন। পরে ১৮৭৯ হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যথাক্রমে এই কলেজ ও এলাহাবাদের মুর সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষরূপে কার্য করিয়া সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৭ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কার্য করেন, এই সময়ে তাঁহাকে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনাও করিতে হইত। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগ প্রবর্তিত হইলে বিশেষজ্ঞ হিসাবে থিবো এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ('কারমাইকেল প্রফেসার অফ এন্‌শেণ্ট হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কাল্‌চার') পদে

নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে থিবো ইওরোপে প্রাণত্যাগ করেন।

ভারতে ও ভারতের বাহিরের প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক পত্র-পত্রিকাদিতে থিবো-রচিত বহু ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'অর্থ-সংগ্রহ : পূর্ব মীমাংসা' (মূল সংস্কৃত ও ইংরেজী অনুবাদ, ১৮৮২ খ্রী), 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' (বরাহমিহির রচিত। ভাষ্যসহ সংস্কৃত মূল ও ইংরেজী অনুবাদ : পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর সহযোগিতায়, ১৮৮৯ খ্রী), 'দি শুল্বসূত্রম অফ বৌধায়ন' (ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, ১৮৭৫ খ্রী), 'দি বেদান্ত সূত্রম' (ইংরেজী অনুবাদ, ১৮৯০-১৯০৪ খ্রী), 'অ্যান এলমেণ্টারি স্যান্সক্রিট গ্রামার' (১৯১১ খ্রী)।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

থিয়েটার রঙ্গমঞ্চ দ্র

থিয়েটার, বাংলা রঙ্গমঞ্চ, বাংলা দ্র

থুম্বা রকেট স্টেশন মালাবার উপকূলে ত্রিবন্দরম শহরের নিকটে থুম্বা একটি আন্তর্জাতিক রকেট-উৎক্ষেপণকেন্দ্র। মার্কিন, সোভিয়েৎ ও ফরাসী মহাকাশ-গবেষণা সংস্থার সঙ্গে ভারতীয় পারমাণবিক সংস্থার মিলিত উদ্যোগে এই ঊর্ধ্বাকাশ-গবেষণা স্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। রকেটের নাসিকাগ্র ভাগে বিবিধ ইলেকট্রনিক যন্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া আকাশে রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। ঊর্ধ্বাকাশে চলিবার পথে বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর গঠন, উষ্ণতা, চাপ, বায়ুকণার আয়নন-প্রক্রিয়ায় সৌরতরঙ্গের প্রভাব, আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে আয়নের ঘনত্ব, ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা চলে। রকেটের যন্ত্রাদির সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাবলী বেতার-সংকেতরূপে ভূপৃষ্ঠস্থিত গ্রাহক-কেন্দ্রে ধরা পড়ে।

ভূ-চৌম্বক নিরক্ষ অঞ্চলে থুম্বা অবস্থিত। এই অঞ্চলের আকাশে ৯৫-১০৫ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে জেট্-এর আকারে প্রবহনশীল তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রানিরূপণ এই কেন্দ্রে রকেট-সহযোগে গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ রায়

থেরবাদ ইহা বস্তুতঃ বৌদ্ধদের একটি পারিভাষিক শব্দ, সংস্কৃতে স্থবিরবাদ নামে প্রচলিত এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ প্রবীণদের মতামত। পালি মজ্ঝিমনিকায়ের অরিয় পরিয়েসন-সুত্তে 'থেরবাদ' (স্থবিরবাদ) এবং 'ঞাণবাদ' (জ্ঞানবাদ) এই দুইটি শব্দের পাশাপাশি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা প্রবীণদের মতামত এবং শেষোক্ত শব্দ দ্বারা পরম জ্ঞানলাভ সম্পর্কে আলোচনা বুঝায় (দীঘ-নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৩ ; অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃ ৪২ দ্রষ্টব্য)। থের শব্দটি সংস্কৃত স্থবির অথবা স্থির হইতে উদ্ভূত। বৌদ্ধ সাহিত্যে 'থের' অথবা স্থবির একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক শব্দ এবং একমাত্র গৌতম বুদ্ধের ভিক্ষু-শিষ্যদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ। ধম্মপদ নামক পালি গ্রন্থে (২৬০-২৬১ গাথা) 'থের' অথবা স্থবিরের ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, পক্ককেশ হইলেই কেহ স্থবির হয় না। এইরূপ ব্যক্তিকে মাত্র বয়সে পরিপক্ক ও জরাজীর্ণ বলা যায়। যাঁহার মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও দম বিদ্যমান এবং যিনি যথার্থই মনের মালিন্য দূর করিয়াছেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকেই স্থবির বলা হয়। পালি অঙ্গুত্তরনিকায়ে (২য় খণ্ড, পৃ ২১) আরও সুস্পষ্টভাবে উক্ত আছে যে, বয়সে তরুণ হইলেও পণ্ডিত ভিক্ষু স্থবির বলিয়া অভিহিত হন। সাধারণতঃ স্থবির বলিতে, বৌদ্ধেরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি অথবা স্থিতপ্রজ্ঞকে বুঝাইয়া থাকেন।

গৌতম বুদ্ধের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে মগধের রাজধানী রাজগৃহে প্রথম সংগীতি অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। তথায় বুদ্ধের পাঁচশত শিষ্য মিলিত হইয়া তিন মাসে পরস্পরের আবৃত্তির মাধ্যমে বুদ্ধের উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রের রূপদান করেন। এইভাবে বুদ্ধবচনসমন্বিত ধর্মশাস্ত্র 'থের' অথবা প্রবীণ ভিক্ষুদের দ্বারা সংগৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'থেরবাদ' অথবা স্থবিরবাদ বলা হয় (মহাবংস, ৩য় অধ্যায়)। ইহার পর হইতে একশত বর্ষ পর্যন্ত বুদ্ধবচনের একমাত্র ও অদ্বিতীয় ধারক ও বাহক-রূপে স্থবিরবাদ বিরাজ করিতে থাকে। স্থবিরবাদের অপর নাম আচার্যবাদ। ইহার অনুগামীরা স্থবিরবাদী নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য, বুদ্ধবচনের যে সকল সংকলন আজ অবধি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে পালি ভাষায় বিধৃত স্থবিরবাদ নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম।

রাজগৃহ সম্মিলনের এক শত বর্ষ পর বৈশালীতে 'দ্বিতীয় সংগীতি' অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অপর একটি মহাসম্মিলন আহূত হয়। কথিত আছে, এই সময়ে ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে প্রচলিত মাত্র কয়েকটি ক্ষুদ্র ও নগণ্য আচারবিধি লইয়া সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে মতবিরোধ দেখা

দেয়। যাঁহারা এইসব আচরণবিধি আর মানিয়া চলিতে চাহিলেন না তাঁহারা এই সম্মিলন ত্যাগ করিয়া যান এবং এক পৃথক সম্মিলন আহ্বান করেন। আরও কথিত আছে অনুষ্ঠিত দশসহস্র ভিক্ষুর উপস্থিতিতে তাঁহাদের এই সম্মিলন হয় এবং ইহার নামকরণ করা হয় 'মহাসংগীতি'। ইহাতে যোগদানকারীরা 'মহাসাংগীতিক' অথবা 'মহাসাংঘিক' নামে পরিচিত হন। এইভাবে মহাসাংঘিক ভিক্ষুরাই সর্বপ্রথম স্থবিরবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংঘভেদ করেন। তাঁহারা ভিন্নমত পোষণ করিয়া নিজেদের অভিপ্রায় এবং বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধবচনের মূল সংগ্রহের বহুপ্রকার পরিবর্তন সাধন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে মহাসাংঘিকরা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যান এবং তাঁহাদের মধ্যে 'গোকুলিক' এবং 'একব্বোহার' (এক ব্যবহার)— এই দুই মতবাদের সৃষ্টি হয়। অতঃপর গোকুলিকদের মধ্যে 'বহুসুত্তক' (বহুশ্রুতক) এবং 'পন্নত্তিবাদ' অথবা 'পঞ্ঞত্তিবাদ' (প্রজ্ঞপ্তিবাদ) নামে আরও দুই মতবাদ জন্মায়। তাহার পর আবার মহাসাংঘিক হইতে 'চেতিযবাদ' (চৈত্যবাদ) নামে আর একটি মতবাদের উদ্ভব হয়। সবসমেত এই পাঁচটি মতবাদ মহাসাংঘিক হইতে উৎপন্ন হয়।

মহাসাংঘিকদের দৃষ্টান্ত অনুকরণে স্থবিরবাদীদের মধ্যেও বহু মত পার্থক্য ঘটে। স্থবিরবাদ হইতে 'মহিংসাসক' (মহীশাসক) এবং 'বজ্জিপুত্তক' (বৃজিপুত্রক) নামে পুনরায় দুই ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। ইহার পর বৃজিপুত্রক চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া 'ধম্মুত্তরিক' (ধর্মোত্তরিক), 'ভদ্দযানিক' (ভদ্রযানিক), 'ছন্দাগারিক' এবং 'সম্মিতিয' (অথবা 'সম্মতিয়')-- এই চারি নামে পরিচিত হয়। মহীশাসকও দ্বিধাবিভক্ত হইয়া 'সব্বথবাদ' অথবা 'সব্বত্থিবাদ' (সর্বাস্তিবাদ) এবং 'ধম্মগুত্ত' (ধর্মগুপ্ত অথবা ধর্মগুপ্তিক) এই দুই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সর্বাস্তিবাদ হইতে 'কস্সপিক' (কাশ্যপিক), কাশ্যপিক হইতে 'সংকন্তিক' (সংক্রান্তিক) এবং তাহা হইতে ক্রমে 'সুত্তবাদ' (সূত্রবাদ অথবা সৌত্রান্তিক) উদ্ভূত হয়। সুতরাং বুদ্ধের দেহত্যাগের ২য় শতকে এই ১১টি এবং মহাসাংঘিকাদি ৬টি মিলিয়া একত্রে ১৭টি মতবাদ মূলতঃ স্থবিরবাদ হইতে জন্মলাভ করে। নানা বিরুদ্ধ মতবাদের প্রাদুর্ভাব পরবর্তী কালে এইভাবে আরও বহুসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও স্থবিরবাদ মহামহীরুহের ন্যায় শাখা প্রশাখায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আজও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও সিংহলে বিদ্যমান রহিয়াছে (দীপবংস, ৫ম অধ্যায়, মহাবংস, ৫ম অধ্যায়)।

দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া

থেরীগাথা পালি দ্র

থোরিয়াম মৌলিক ধাতু। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্জেলিয়াস ইহা আবিষ্কার করেন। ইহার পারমাণবিক ওজন ২৩২·১২, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১১·২ এবং গলনাঙ্ক ১৮৪৫° সেন্টিগ্রেড। থোরিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ইহার ১২টি আইসোটোপ আছে। মোনাজাইট বালুকায় ইহার অক্সিজেন ঘটিত যৌগিক বর্তমান। মোনাজাইট হইতে থোরিয়াম নিষ্কাশনের সময়ে হিলিয়াম গ্যাস উৎপন্ন হয়। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য থোরিয়াম ব্যবহৃত হয় বলিয়া ভাবতে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। থোরিয়ামের অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। গ্যাস-বাতিতে যে জাল বা ম্যানটল ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রথমে সুতা বা রেশমের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর তাহা থোরিয়াম ঘটিত রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণে ডুবাইয়া লইবার পর উচ্চ তাপে পোড়াইয়া লইতে হয়। উচ্চ তাপে ইহা শুভ্র আলোক বিকিরণ করে।

আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়

থ্রম্বোসিস জীবিতাবস্থায় রক্তবাহের মধ্যে রক্তজমনের নাম থ্রম্বোসিস। সাধারণতঃ ধমনী অথবা শিরায় থ্রম্বোসিস দেখা যায়। কোনও রক্তবাহে থ্রম্বোসিস হইয়া রক্ত-সঞ্চালন ব্যাহত হইলে অথবা বন্ধ হইলে সেই রক্তবাহের বিভিন্ন শাখা দিয়া বেশি পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ধমনীর ক্ষেত্রে থ্রম্বোসিসগ্রস্ত অংশের পূর্ব হইতে উদ্ভূত শাখাগুলিতে এবং শিরার ক্ষেত্রে ঐরূপ অংশের পরে উদ্ভূত শাখাগুলিতে রক্তসঞ্চালনের একপ বৃদ্ধি ঘটে। যে শাখাগুলি সাধারণ অবস্থায় বন্ধ থাকে এ সময়ে সেগুলিতে রক্তসঞ্চালন হইতে থাকে। এই বিকল্প রক্তসঞ্চালনে যদি দেহাংশের রক্তাভাব না হয়, তবে থ্রম্বোসিসের কোনও উপসর্গ প্রকাশ পায় না।

ধমনীর থ্রম্বোসিসের প্রকৃত কারণ এখনও অজ্ঞাত। সাধারণতঃ বার্ধক্য বা অন্য কোনও কারণে ধমনীগুলির স্থিতিস্থাপকতার অভাব, অত্যধিক রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরল এবং চর্বিজাতীয় পদার্থের আধিক্য প্রভৃতিই থ্রম্বোসিসের কারণ বলিয়া ধরা হয়। শিরার প্রদাহজনিত রোগ, রক্তে তরল পদার্থের অভাব, পলিসাইথিমিয়া রোগে লোহিত রক্তকণিকার আধিক্যবশতঃ রক্তের ঘনত্ব-বৃদ্ধি এবং রক্তসঞ্চালনের শ্লথ গতির জন্য শিরায় থ্রম্বোসিস হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক অথবা ফুসফুসের ধমনীর থ্রম্বোসিসকে

থ্রম্বোসিস

যথাক্রমে করোনারি, সেরিব্রাল অথবা পাল্‌মোনারি থ্রম্বোসিস বলা হয়। অঙ্গাদির ধমনীতে থ্রম্বোসিস হইলে সেই অঙ্গ শীতল হইয়া যায়, নাড়ীর স্পন্দন কমিয়া যায় এবং পরিশেষে রক্তাভাবে অঙ্গটি পচিয়া যাইতে পারে। করোনারি থ্রম্বোসিস সাধারণত: ৫০ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষের বেশি হয়। মধুমেহ রোগেও এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। করোনারি থ্রম্বোসিসগ্রস্ত রোগী সহসা বুকের বাম দিকের উপরিভাগে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। এই যন্ত্রণা কখনও কখনও গ্রীবাদেশ অথবা বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পর্যন্ত বিস্তারিত হয়। রোগী দুর্বল, ঘর্মাক্ত এবং শীতল হইয়া যায়, চেতনা হারায় এবং মৃত্যু পর্যন্তও ঘটিতে পারে। রক্তাভাবে হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক সংকোচনের ফলে নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত, শ্লথ অথবা অনিয়মিত হইয়া রক্তচাপ কমিতে থাকে। কখনও কখনও বমি হয়। হৃৎপিণ্ডের অবসাদের জন্য নিলয়ের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এ অবস্থায় রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন, ক্ষেত্রবিশেষে রক্তের অস্বাভাবিক তঞ্চন দূর করিবার জন্য হেপারিন, ডিণ্ডিভ্যান ইত্যাদি তঞ্চনরোধক ঔষধ দেওয়া হয়। সাময়িকভাবে সুস্থ হইলে রোগীর রক্তে কোলেস্টেরল কমাইবার জন্য নিকোটিনিক অ্যাসিডজাতীয় ঔষধ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই রোগ প্রতিরোধ করিতে হইলে অত্যধিক চিন্তা ও উদ্বেগ কমানো এবং কোলেস্টেরল বা সংপৃক্ত স্নেহপদার্থপূর্ণ খাদ্যসামগ্রী (যেমন ডিম, ঘি ইত্যাদি) কম খাওয়া কর্তব্য।

মস্তিষ্কের ধমনীর থ্রম্বোসিসে মস্তিষ্কের বিশেষ অংশে রক্তসঞ্চালনের অভাব ঘটায় উক্ত আক্রান্ত অংশ-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ ও কার্যাদি বিপর্যস্ত হয়। ফলে রোগীর কোনও অঙ্গ অথবা দেহার্ধ ধীরে ধীরে অবশ হইতে থাকে। সকল সময়ে চেতনালোপ না হইতেও পারে। অনেক সময়ে দৃষ্টিশক্তির অথবা গলাধঃকরণের কার্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং মুখের পক্ষাঘাত দেখা দেয়। রোগের সূচনায় যে জটিলতা দেখা দেয় তাহা কাটিবার পর ধমনীকে প্রসারিত করিবার জন্য নিকোটিনিক অ্যাসিড অথবা আর্লিডিন-জাতীয় ঔষধ দেওয়া হয়।

ফুসফুসের ধমনীর থ্রম্বোসিসে করোনারি থ্রম্বোসিসের ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, জ্বর এবং ফুসফুসধরা কলা (প্লিউরা) র প্রদাহ হইতে পারে। এক্স-রে দ্বারা গৃহীত বুকের ছবিতে অনচ্ছ দাগ দেখা যায়। এই রোগে হেপারিন ও ডিণ্ডিভ্যান-জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়। সকল থ্রম্বোসিস রোগের পরে অঙ্গের অবশতা কাটাইবার জন্য ফিজিওথেরাপি করা হইয়া থাকে।

শিরার থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শিরাটি এবং অঙ্গটি ফুলিয়া ওঠে, বেদনা হয়, জ্বরও হয়। অঙ্গটিকে বিশ্রাম দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ও রক্ত-তঞ্চন-রোধক ঔষধ এবং অবস্থাবিশেষে অস্ত্রোপচারের দ্বারা রোগ নিরসন করা যায়। ফাইলেরিয়া, পলিসাইথিমিয়া ইত্যাদি রোগের প্রভাবে থ্রম্বোসিস হইলে উহাদিগেরও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। পোর্টাল শিরায় থ্রম্বোসিস হইলে রক্তবমন, রক্তদাস্ত, পেটে জল, প্লীহাবৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে পারে। অস্ত্রোপচার দ্বারা ইহার চিকিৎসা করা হয়।

কমলকুমার মল্লিক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

প্রকাশক
শ্রীসৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৬

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা ১৩

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	১৪	বগ্রাদ	বাগদাদ
৪	১	১৪	ডাহিজ্যারের	[illegible]
৪	১	২১	[illegible] বৃহত্তর	[illegible] বৃহৎ
৪	১	[illegible]	বাহিনীর এবং অজ্ঞাতম	বাহিনীর [illegible]
১২	১	[illegible]	বিদ্যাসাগর	[illegible]
১[illegible]	১	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১২	১	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১[illegible]	১	[illegible]	নামাগ [illegible]	[illegible]
১	[illegible]	২	[illegible] ([illegible] [illegible])	[illegible]
[illegible]	১	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	২	G. Buehler	J G Buhler
[illegible]	১	৫	[illegible]	[illegible] [[illegible]]
[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১	[illegible]	1037	1957
[illegible]	১	৭	[illegible]	[illegible] ([illegible])
[illegible]	[illegible]	৪	কর্নওয়ালিস এর সময়ে	[illegible] গোবিন্দ
[illegible]		৭	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১	১০	[illegible]	[illegible]
[illegible]	২	[illegible]	[illegible]	[illegible] কোনও কোনও [illegible]
১১[illegible]	১	১[illegible]	Watters	Walters
১২২	১	২৬	বচক্	[illegible]ক্
১২২	১	[illegible]৮	বাচরবী	বাচরবা
১৫৭	১	[illegible]৪	Bombyx	[illegible] mori
১৭[illegible]	[illegible]	১৮	[illegible]	[illegible]
১[illegible]৮	১	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১[illegible]৮	২	৯	[illegible] পার্বতী	পূর্ব ও পশ্চিম পার্বতী

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০১	২	১	১৩°৪' পূব	২৮°৪' ও ২৯°৮' পূর্ব।
[illegible]০৮	১	[illegible]	Perceval,	Perceval Landon,
[illegible]০৮	১	[illegible]	Enka	Erika
২১৬	১	২৫	Lamden	Landon
২[illegible]৬	১	২৭	Larbes	Forbes
২[illegible]	[illegible]	১৫	উর্দু নিম্ন প্রাথমিক	নিম্ন প্রাথমিক
[illegible]	[illegible]	২[illegible]	৬৮৫°	৬৮ ৫°
২৭৫	১	৮	সাবডজ	সাব জজ
২৮১	১	২	হরিজাগা	হাঁড়িয়া।
২৯১	২	[illegible]	হিন্ডোর	হিন্দী।
২৯৫	১	[illegible]৫	বুদ্ধচৈতন্য	শাক্যবুদ্ধ চৈতন্য
৩[illegible]২	১	১৭	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]	[illegible]	১৪	গম্ভীর	গম্ভীরা
৩[illegible]৯	১	১১	শিল্পীগণ উৎকরণ	শিল্পীগণ নানাবিধ উপকরণ
[illegible]৯	১	১৯	অনিলের উপর [illegible]	বাংলা
৩১৯	২	১৯-২০	রামগড়ের নিকট	বানারী গ্রামের [illegible]
[illegible]	২	২৯	সিতনবাস।	সিত্তনবাসল
৩[illegible]২	[illegible]	৪	সিত্তনবাসল	সিত্তনবাসল
[illegible]	২	[illegible]	সি উহং	সিং উড
[illegible]	১	[illegible]	[illegible]	[illegible] ট বাড়, স্থাপিত হয়। উড বাড়ারা নানাদিকে বাড়বানী প্রতিষ্ঠিত করেন।
৩৭৬	১	[illegible]	২ সিড চুফনের	কং সিউ চুয়ান গর
৩৭৬	১	১০	তাহমিং	তাইপিং
৩৭৭	১	৩২	ফরাসী	ফারসী
৩৯০	১	৩৭	২৪°১৫	২৫°১৫'
৩৯৮	১	২২	চোসার	চোসার
৪১১	১	২৩	এ বি এস. এ.-এর	এ বি এন এ

[২]

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮০৯	১	১৭	অপ টিমাস	অপ টিমাম
৭৩৯	২	১	দুগম	দুর্গম
৪৫৬	২	২৭	পুনড	পুরাণ
৪৫৬	২	২৪	গোনাগু	গোনন্দ
৪৫৬	১	২৪	কাবকোটা	কার্কোট
৪৫৬	২	২৪	লোহারা	লোহর
৮৫৬	২	২৬	মিহিবকুলা	মহিরকুল
৪৭৬	২	২৭	প্রবর সেনা	প্রবরসেন
৪৭৬	১	১৭	গলনাঙ্গ	স্তনাঙ্গ
৪৯২	১	০৪	বিশ	বিশ
৫১০	১	[illegible]	৩৯০	[illegible]
৫০০	১	২০	মানা	মানা
৫০৬	২	১৫	(বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ)	(বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ)।
৫২৬	২	১১	কবিতা বিষয়ক আলোচনা,	কবিতা-বিষয়ক আলোচনা।
৫০৬	২	০৫	মহাযান বৌদ্ধ	মহাযান বৌদ্ধ
৫০৮	২	৪	'পি সে'	'পি. সে'
৫৪১	১	৭	'ত্রৈগর্তিক মিত্র' (১৮৯২ খৃঃ)	'ত্রৈকিক মিত্র' (১৮৮০ খ্রী)
৫৫৯	২	৯	ফাগু	ফাগু
৫৬৭	১	০৬	দ্বৈতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	দ্বৈ[illegible] বিশ্বাস
[illegible]	-	১৮	তুলনা	তুলনা)
৬৭৫	২	১০	an'n	ªnen
৬৬৬	১	১৫	বমানাথের কৃপাণ	বামনাথের কৃপাণ
৬৭৭	১	৭	সাক্ষিত	সাহিত
৬৮৬	১	১৭	অম্বা	অম্বা [কলাম [illegible]]
৬৯০	১	[illegible]	বমানাথপুরম	বামনাথপুরম
৭১৭	-	১৭	কোটি-নর	কোটিনর

গ্যেটে (১২৯ পৃ) গুলাব সিং (১৬৮ পৃ) গোল্ড্‌স্টুকার (২১১ পৃ) চন্দ্রগ্রহণ (২৮৫ পৃ) চুয়াড় হাঙ্গামা (৩৮৫ পৃ) চৈৎ সিংহ (৩৭১ পৃ) জাতীয়তাবাদ (৫০১ পৃ) ড্রেবেল (৬৬৪ পৃ) প্রসঙ্গগুলিকে যথাক্রমে গ্রথন (২২৭ পৃ) গুল্ম (১৬৯ পৃ) গোলমরিচ (২০৯ পৃ) চন্দ্রদ্বীপ (২৮৬ পৃ) চুলবগণ (৩৮৫ পৃ) চৈতি (৩৯৫ পৃ) জাতীয় পতাকা (৪৩৮ পৃ) ড্রাইডেন (৬৬৩ পৃ) এর পূর্ববর্তী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

'খাম্বাত উপসাগর খম্বাত উপসাগর দ্র', 'গণ্ডওয়ানা ল্যাণ্ড গণ্ডোয়ানা মহাদেশ দ্র', 'চীনা চিত্রকলা চিত্রকলা দ্র', 'জিহাদ জেহাদ দ্র' — এই নির্দেশিকাগুলি যথাক্রমে খাবেল (৩০ পৃ), গণ্ডক (৮২ পৃ), চীনাবাদাম (৩৭৭ পৃ), জিহ্বা (৫২০ পৃ)-এর পরে সন্নিবেশনীয়। ১২ ১৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত খনিজ সম্পদ প্রসঙ্গটিতে সর্বত্র 'আকর' স্থ. । 'আকরিক' পড়িতে হইবে। চাহানকোষা (৫৩ পৃ) এখন আর অশ্বত্থ বৃক্ষের কাণ্ডের উপর স্থাপিত নাই, উহা একটি বেদির উপর রক্ষিত হইয়াছে।

ঘনীভবন, চিদম্বরম, চুম্বকবিদ্যা, তদন্তকার্য, তরঙ্গতত্ত্ব এবং ত্বরণযন্ত্র প্রসঙ্গগুলি চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে স্থান পাইবে।

দ্বিতীয় খণ্ডে এলাচি (৪৩ পৃ) প্রসঙ্গের মূললেখকরূপে শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহের নাম ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয় নাই।